দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

অষ্টাদশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৩৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

অষ্টাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ, ১৩৩৭—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক—লেখসূচি

চিত্রসূচি

পৌষ—১৩৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

বহুবর্ণ চিত্র

দেশের ডাক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ
মহাশয়ের অনুগ্রহে

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

পৌষ—১৩৩৭

দ্বিতীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { প্রথম সংখ্যা

অহল্যার তপস্যা

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তের একটা মন্ত্র মনে আসিতেছে। তৃতীয় মন্ত্রে তমঃ, সলিল ও তুচ্ছ অপিধান—এই সকল কথা আছে। অনুভবের দিক্ দিয়া এ সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক ভাবেও যে এ সকল কথা বুঝা যায় না, এমন নয়। যাঁরা বাহিরে তাকাইয়া তমঃ, সলিল প্রভৃতি বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা ঠেকাইয়া রাখিতে চাহি না। আমরাও "বেদ ও বিজ্ঞানে" বাহির হইতে সলিল প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সেখানেও সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং এখানেও দিতেছি যে, সে সব বাহিরের ব্যাখ্যা যত লাগসই হ'ক না কেন, আসলে বহিরঙ্গ ব্যাখ্যা, অন্তরঙ্গ নয়। কাটা-ছাঁটা বা আড়ষ্ট ভাবে যে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, তা আমরা আগে একাধিক বার বলিয়াছি। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক স্তরের ব্যাখ্যা আগেও ছিল; মন্ত্রদ্রষ্টারা সে ভাবেও তত্ত্বগুলি আমাদের বুঝাইতে চাহিতেন বলিয়াই, ছিল। বেদের অনেক মন্ত্রে জলকে সকল ভেষজ বা ঔষধির আশ্রয় বলা হইয়াছে। এ কথার মধ্যে নিগূঢ় ভাবে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা থাকিলে থাকিতে পারে, হয় ত আছেও; কিন্তু সকল রোগ-ব্যারাম যে একমাত্র জলের দ্বারাই সারান যাইতে পারে, এই বৈদ্যতত্ত্বটিও (Hydropathy), বুঝানও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল,

সন্দেহ নাই। এই ভাবে বেদমন্ত্রে অনেক জায়গায় জ্যোতিষতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ঋতত্ত্ব প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অনেক তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। কিন্তু অখণ্ড অনুভব সত্তারূপ ব্রহ্মতত্ত্বেই যে নিখিল শ্রুতি-বাক্যের পর্য্যবসান, এ কথা শুধু আমরা বলিতেছি না, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত অভিন্নভাবে জড়িত যে জ্ঞানকাণ্ড বরাবরই প্রচলিত ছিলেন, সেই জ্ঞানকাণ্ডই স্বয়ং এ কথাটি আমাদের ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে ফাঁকে ফাঁকে, ইসারায় ইঙ্গিতে; আরণ্যক, উপনিষৎ ভাগে খোলাখুলি ভাবে বটে, কিন্তু "হাটে বাজারে" নয়—"রহসি"। "নাদীক্ষিতায়োপদিশেৎ। নানুচানায়।"—এই ছিল তাঁদের দস্তুর।

অশ্বমেধ যজ্ঞে সত্য-সত্যই একটা অশ্ব দরকার হইত সন্দেহ নাই। আধুনিক যে সকল পণ্ডিতেরা "যজ্ঞটজ্ঞ" সবই উড়াইয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া একটা আধ্যাত্মিক অথবা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান, তাঁদের এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না যে, হাজার হাজার বছর ধরিয়া এ দেশে সত্য-সত্যই অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, এবং ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে যে আকারে বর্ণনা আছে, সেই আকারেই অনুষ্ঠিত হইত। একটা নজির—বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঠিক গোড়াকার মন্ত্রেই দেখি যে, সাধারণ ঘোড়া লইয়া যজ্ঞ চলিলেও, যজ্ঞের মন্ত্রে ও ও ধ্যানে, সে ঘোড়া সাধারণ ঘোড়া ছিল না। বৃহদারণ্যক সেই অশ্বের ভিতরেই ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন, অর্জ্জুন যেমনধারা একদিন পার্থ-সারথির ভিতরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটি যেমন মন্ত্রে ও ধ্যানে ব্রহ্ম, সে অশ্বের বলিদানও তেমনিধারা আসলে সেই ব্রহ্মেরই আত্ম-বলিদান—যে আত্ম-বলিদানের ফলে, অখণ্ড, অসীম অনুভব-সত্তা নানা খণ্ডে নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া ফেলেন, এবং সেই বিভাগের ফলে আমাদের এই কারবারি জগৎরূপে নিজেকে সাজাইয়া দেখান। সৃষ্টির গোড়াতেই যে এই রকম একটা আত্ম-বলিদান আছে। প্রজাপতিকে তাই "যজ্ঞ" করিয়াই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। আমরা "ঋতস্য পন্থা" প্রবন্ধে কথাটা কিছু ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

অশ্বমেধ যজ্ঞে অভিষেকের সময়ে যে সকল বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সে সবের মধ্যে ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের সেই প্রসিদ্ধ শুনঃশেপ সূক্তগুলি অন্যতম। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষি মুক্তির জন্য দেবতাদের কাছে স্তব করিয়াছিলেন। স্তবের সেই মন্ত্রগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অভিষেকের সময়ে পাঠ করিতে হয়। কেন এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়, তার একরকম কৈফিয়ৎ আমরা অন্যত্র দিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আসল কৈফিয়ৎটি বোধ হয় এই—"আমি অথবা ব্রহ্ম অথবা অখণ্ড অনুভব-সত্তা, সাধ করিয়াই হউক আর যে জন্যই হউক, সৃষ্টিরূপ এই যূপকাষ্ঠে, সেই শুনঃশেপ ঋষির মত, নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, বলির জন্য। যূপকাষ্ঠে এইরূপ বন্ধনের ফলে আমার সংসার; এইরূপ বন্ধনের ফলে আমি বিরাট্ অসীম ও অখণ্ড হইয়াও, যেন ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। ইহাই হইল আমার বলিদান। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া, সম্রাট্ যিনি, তাঁহাকে, এই মূল বলিদানের কথাটি চিন্তা করিতে হয়। না করিলে তাঁর যজ্ঞ সাঙ্গ ও সফল হয় না। তাঁর স্বারাজ্য-সিদ্ধি হয় না; তিনি নামে সম্রাট্ হইলেও, আসলে স্বরাট্ হইতে পারেন না। স্ব বা আমিকে স্বরূপে না জানিলে ও পাইলে, কে কবে স্বরাট্ হইয়া থাকে, কার কবে স্বারাজ্য হইয়া থাকে? এই জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে ওই অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্বের আসল রূপটি ভাবনা করিতে হয়। না করিতে পারিলে তাঁর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হইল না। ভারতবর্ষ আজ যদি আত্মবলি-যজ্ঞে ব্রতী হইয়া স্ব-পরিচয়ের কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যায়, তবে, তার "সম্রাট্" হওয়া হয় ত হইবে, কিন্তু "স্বরাট্" হওয়া হইবে না।

অবশ্য এটা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয় যে, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে অশ্ব প্রভৃতি কেবল বাজে উপলক্ষ্য মাত্রই ছিল; তত্ত্ব-চিন্তাই আসল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছিল। এ সব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যাপক ও বড় রকমের ছিল। মানুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই সে প্রয়োজনের সামিল ছিল। সুতরাং সে সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষ ঐহিক ও পারত্রিক দুই রকম শ্রেয়ঃ কামনা করিত এবং পাইত। সকল প্রকার শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সের অনুগত ছিল। ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তার

সাধক বা উপকারকভাবে অন্ন, রয়ি, গো, স্বারাজ্য ইত্যাদির চিন্তন ও সাধন চলিত। অন্ততঃ এইটাই ছিল বেদপন্থী সমাজের একটা দাবী।

অন্ন প্রভৃতি চাওয়ার যে মনোভাব, আর ব্রহ্মকে চাওয়ার যে মনোভাব, এ দুইটি মনোভাবের মধ্যে কোনো মিল থাকিতে পারে না—এই মনে করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিষম ভুল করিয়াছেন। খৃষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দেহকে, দেহের ভোগকে, জড়কে ও জড়ের উপকরণগুলিকে, একেবারে তুচ্ছ করার একটা ভাব গোড়া হইতে আছে দেখিতে পাই; মানুষের জন্মটাই যেন একটা পাপের মধ্য দিয়া, কেন না, দৈহিক সম্পর্কের ফলে এই জন্ম হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ সকলেই এই গোড়ার গলদ হইতে জন্মিয়াছি। ত্রাণকর্ত্তা যীশু অযোনিসম্ভব—আমাদের মত স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে তাঁর জন্ম হয় নাই। সুতরাং, সেই গোড়ার গলদ তাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি জীবের ত্রাণের জন্য যে সুসমাচার প্রচার করিলেন, তার মূলমন্ত্র এই—এ দেহটা পাপময়, অতএব এ দেহের সম্পর্ক যতটা ছাড়িতে পারা যায়, ততটাই ভাল। আমাদের দেশে কিন্তু দেহকে ও জড়কে এই রকম ভাবে "নোংরা" করিয়া দেখা গোড়া হইতে চলন ছিল না। শেষকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে, এবং আরও অন্যান্য কারণে, সে রকম করিয়া দেখা আমাদের মধ্যেও কিছু কিছু চ'ল হইয়াছে। গোড়ায় ব্রহ্মবস্তু একটা আলাদা বস্তু, আর জড় একটা আলাদা বস্তু—এই রকম-ধারা একটা ভেদ-দৃষ্টি তেমন বাহাল হয় নাই। তখন অদিতিরই আমল ছিল, দিতি ঠাকুরাণী কশ্যপ ঠাকুরের "সুওরাণী" তখনও হন নাই। এই কারণে মনে হয়, যাঁরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের মূলতত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব কিছু কিছু ভাবনা করিতেন। সময়ে সময়ে সেটা ভুলিয়া যাবার আশঙ্কা তাঁদের যে মোটেই ছিল না এমন নয়। আশঙ্কা ছিল বলিয়াই শ্রুতি অনেক স্থলে কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাদিগকে বেশ একটু শাসাইয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা, আবার সেই গোড়ার কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক্। ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল ১২৯ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে আছে দেখিতে পাই—"তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্"; এখানে তপঃ বা তপস্যার কথা আছে দেখিতেছি। কেবল এখানে বলিয়া নয়, সংহিতার আরও অনেক স্থলে এবং ব্রাহ্মণ-উপনিষদের অসংখ্য স্থানে আমরা দেখিতে পাই লেখা আছে—তিনি তপঃ করিয়াছিলেন; প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন; তপস্যা করিয়াই এই সব সৃষ্টি করিলেন। এখন আমাদের তলাইয়া দেখা উচিত, এ 'তপঃ বা তপস্যা' কথার আসল মানেটা কি। মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, আদি কারণের সেই তপস্যা জ্ঞানময় তপস্যা, আমাদের মত একটা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন নয়। তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন মানে, তিনি জানিয়াছিলেন। কেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, তাঁর আবার অজানা কি, যে তিনি জানিবেন? তাঁর জ্ঞাত ত নিত্যপূর্ণ, অথবা সত্য, অনন্ত জ্ঞানই তাঁর স্বরূপ। তাই যদি হয়, তবে তিনি জানিয়াছিলেন এ কথার তাৎপর্য্য কি? অন্য প্রসঙ্গে অখণ্ড অনুভব সত্তার যে নথি আমরা তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি, সেই নথি দৃষ্টে ব্রহ্মের এই জ্ঞানময় তপঃ আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। ব্রহ্মের দিক্ হইতে সত্য-সত্যই সৃষ্টি স্থিতি লয় বলিয়া একটা কোন ব্যাপার আছে কি না, তা আমরা জানি না; জানিতে চাহিলে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনা দুই-ই হার মানিয়া ফিরিয়া আসে। সংহিতার ঐ সূক্তের প্রথমে ও শেষে সেই অনির্ব্বচনীয়তার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা, আমাদের দিক্ হইতে, সৃষ্টি বা লয়ের মত কোন এক রকম অবস্থা না ভাবিয়া যেন পারি না। আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের নিজেদেরই অনুভব সেই রকম ভাবিতে আমাদের প্ররোচিত করে। তাই আমরা ভাবি, এক সময়ে এ সব কিছুই ছিল না; তার পর প্রজাপতি সেই প্রলয়ের রাত্রির মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া এই সকল তৈয়ারি করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য যে, এটা আমাদের ভাবনা। ভাবনা অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়াও করা যাইতে পারে, অথবা অনুভবের সঙ্গে কোনো রকম মিল রাখিবার চেষ্টা না করিয়াও করা যাইতে পারে। প্রথম রকমের হইলে সে ভাবনা সত্য হওয়া সম্ভব; শেষের রকম হইলে, সে ভাবনাতে সত্য না থাকাই সম্ভব।

এখন নিজের অনুভব পুঁজি করিয়া আমরা ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টির একটা নক্সা আঁকিতে বসিয়াছি। আমরা

গোড়ায় একটা প্রলয়ের অবস্থা আঁকিলাম, এবং সেই অবস্থার নাম দিলাম রাত্রি ও সলিল। তার পর সে রাত্রি ও সলিলের মধ্যে আদি বস্তুটি লুকাইয়া বসিয়া আছেন, এই রকম আঁকিলাম। কেন যে এই রকম আঁকিলাম, তার কৈফিয়ৎ আমরা নিজেদের অনুভবের মধ্যেই এক রকম খুঁজিয়া পাইতে পারি। এখন এই রকম করিয়া ব্রহ্ম বস্তুটিকে আঁকার মানে কি? এর মানে এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞই হউন আর সর্ব্ববিৎই হউন, অনন্তজ্ঞানময় হউন আর যাই হউন, আমাদের সুষুপ্তির মত একটা অবস্থা এক সময় সাধ করিয়া তিনি লইয়া থাকেন; অর্থাৎ তাঁর অনন্ত জ্ঞান নিজের দেওয়া একটা অজ্ঞানের আবরণে যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। অবশ্য আমরা নিজের মতন করিয়াই ব্রহ্মকে আঁকিতেছি। এই রকম করিয়া আঁকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এমন যদি কোন জীব থাকিত, যে জীব সব সময় জাগিয়া থাকে, আদপে ঘুমায় না, তাহা হইলে সে জীব ব্রহ্মের ছবি আঁকিতে গিয়া হয় ত তার তুলিতে রাত্রি ও জলের রং, অর্থাৎ ব্রহ্মের সুষুপ্তির অবস্থা মোটেই ফলাইতে চেষ্টা করিত না। পক্ষান্তরে, যদি এমন জীব রহিত যে জীব সব সময় ঘুমাইয়াই কাটায়, কুম্ভকর্ণের মত ছটি মাসও জাগে না, তাহা হইলে সে জীবের পক্ষে কোন রকম কাহারও ছবি আঁকা সম্ভবই হইত না; যদি বা হইত, তবে আমরা দেখিতাম যে, তার তুলি কেবল একটা কাল রংয়েই ডুবিয়া পটখানিতে কালিই লেপিয়া দিয়াছে, এবং সে কালির জমাটের ভিতর অন্য কিছুই আর ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য আমরা মনে করি যে, এই দুই রকম জীবের মধ্যে কোনো রকম জীবই সত্য সত্য বিদ্যমান নাই; সুতরাং আমরা যে ছবি আঁকিতেছি—একবার ঘুমান একবার জাগা, আবার ঘুমান আবার জাগা—সেই ছবিটাই তত্ত্বের ও তথ্যের নিখুঁত ছবি।

অবশ্য মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় ছাড়া ছোটখাটো প্রলয়ের কথাও শাস্ত্রকারেরা, বিশেষতঃ পুরাণকার, আমাদের বলিয়াছেন। সেই সব ছোটখাট প্রলয়ে আমাদেরই কেউ কেউ না কি সাক্ষীরূপে হাজির থাকিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জবানবন্দী পাকা করিয়া লিখিয়া নথিভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে কারণ সলিলে বটপত্রে শিশুরূপী বিষ্ণু যখন ভাসিতেছিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় সেই জলরাশির মধ্যে শিশুটিকে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁর মনে হইল, কে এ ছেলেটি জলে ভাসিতেছে; এর মা বাপই বা কারা, এবং কোথায়? শিশুটি হাঁ করিল; মার্কণ্ডেয় কিছু না জানিতে পারিয়াই তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুখের মধ্য দিয়া দেহের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে সৃষ্টি সবই অটুট ভাবে বর্ত্তমান আছে; পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, আকাশ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, ভূত, প্রেত—এ সকলই সেই শিশু কলেবর-মধ্যে স্ব স্ব স্থানে ও স্ব স্ব অধিকারে পূর্ব্ববৎ বাহাল রহিয়াছে, কিছুই লয় হয় নাই! মার্কণ্ডেয় কত কাল ধরিয়া যে সেই দেহ মধ্যে বিচরণ করিলেন, এবং কত কি দেখিলেন, তা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁর মনে হইল তিনি সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যেই রহিয়াছেন; লয়ের কোন লক্ষণ সেখানে নাই। কিন্তু কোন্ ফাঁকে তিনি আবার উগ্‌লাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাহির হইয়া দেখেন—সেই অনন্তজলরাশি, তার মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল সেই বালকটি ভাসিতেছে। মার্কণ্ডেয় অবশ্য ছাড়িবার পাত্র নন্। ছেলেটি তাঁকে "মার্কণ্ডেয়" বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকাতে প্রথমে চটিয়া গেলেন। যতক্ষণ ছেলেটি তাঁকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিস্মিত করিতে না পারিল, ততক্ষণ তিনি শান্ত হইলেন না।

এটা অবশ্য মহাপ্রলয়ের ছবি নয়। কিন্তু তা না হইলেও, এ ছবির ভিতর দিয়াও সেই মূল ছবির অনেকটা রকম-সকম আমরা ধরিতে বুঝিতে পারি। মার্কণ্ডেয় আমাদের সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সত্য-সত্যই প্রলয়ের সময় ব্রহ্মের একটা অব্যক্ত অবস্থা হয়। এ জগৎটা একার্ণবীকৃত হইয়া যায়, নির্ব্বিশেষে একাকার হইয়া যায়, আমাদের সুষুপ্তির সময় যেমন হইয়া থাকে,—তেমনিধারা। কিন্তু সেই একাকারের মধ্যেও বীজরূপে বিশ্বটি রহিয়া যায়। বালকরূপী সেই বীজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মার্কণ্ডেয় তাই সমস্ত সৃষ্টিটাই পূর্ব্ববৎ বাহাল দেখিতে পাইলেন; এমন কি বুঝিতেই পারিলেন না যে, সব লয় হইয়া গিয়াছে। এ গল্পের মধ্যে আর যা রহস্য আছে তা

আমরা পরে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব। এখানে কথাটা এই যে, আমরা সৃষ্টির ছবি নিজের মতন করিয়াই আঁকি, এবং আঁকিতে বাধ্য আছি। সেইরূপ আঁকায় আমরা দেখি যে, অনন্ত জ্ঞানময় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আদি বস্তুটিও কোনো রকম একটা অজ্ঞানের অব্যক্ত আবরণে নিজেকে যেন ঢাকিয়া ফেলিতেছেন; তার ফলে তাতে সব যেন সঙ্কুচিত ও লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে; একটা বীজের ভিতরে গাছ যেমন লুকাইয়া থাকে, তেমনিধারা; অথবা তার চাইতে ভাল দৃষ্টান্ত, আমাদের ঘুমের অবস্থার ভিতরে আমরা যেমনধারা লুকাইয়া থাকি, তেমনিধারা। ফল কথা, এও একরকম অজ্ঞান। নিত্য জ্ঞানময়ে এ অজ্ঞানের আরোপ কি করিয়া হইতে পারে, তার কৈফিয়ৎ আমরা বুঝি না। এখন, এই অজ্ঞানকে দূর করিবার জন্য, যোগনিদ্রা হইতে জাগিবার জন্য, ব্রহ্মকে যে ব্যাপারটি করিতে হয়, অথবা করিতে হয় বলিয়া আমরা মনে করি, সেই ব্যাপারটির নাম তপঃ বা তপস্যা। সে তপঃ জ্ঞানময়, কেন না, জ্ঞান ছাড়া অজ্ঞান আর কিছুতে দূর হবার নয়।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অন্য নাম হইতেছে বাধা। শাস্ত্র যে বলিয়াছেন—"জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ", এ কথাটা আমাদের বেশ ভাল করিয়া বুঝা দরকার। জড়ের ভিতরে, প্রাণিদেহের ভিতরে এবং আমাদের অনুভবের ভিতরে অজ্ঞান একটা বাধাস্বরূপ হইয়া কাজ করিতেছে। কোনো একটা জড়পদার্থ যে সসীম বলিয়া আমাদের মনে হয়, সেটা কেবল আমাদের সবখানি না দেখার জন্যই হইয়া থাকে। কোনো একটা জড়পদার্থকে আমরা ছোট করিয়া দেখিতেছি বলিয়া, আসলে সেটি ছোট নয়। তার সত্তা ও শক্তিব্যূহ এ দুই-ই অসীম, বিরাট্। তবে সকল জিনিষকে অসীম ও বিরাট্ করিয়া দেখিলে, আমাদের কারবার চলে না বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে এক একটা গণ্ডীর ভিতরে ভরিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক অনুভবের পিছনেই বিশ্বের সকল শক্তি সম্মিলিত ভাবে কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। আমার স্নায়ুর কম্পনের ফলে আমি কোনো একটা কিছু অনুভব করি। এখন এই কম্পনটি কোথা হইতে আসিয়াছে? আমরা মনে করি যে, বাহিরে একটা তাল পড়ার শব্দ অথবা কোথাও একটা আগুন জ্বলিয়া উঠার উত্তেজনা আমার স্নায়ু-স্পন্দনের মূলে রহিয়াছে! মোটামুটি হিসাবে, কথাটা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে দেখিতে গেলে, ঐ এক-একটা ঘটনা নয়, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া জমাট হইয়া একসঙ্গে আমার ভিতরে ঐ স্পন্দনটি উৎপন্ন করিয়াছে। এ হিসাবের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী কোনো একটা তারার ঘটনাগুলিও বাদ পড়ে না। এ বিশ্বের সকল সামগ্রী পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা; কেউই আলাদা এক-ঘরে হইয়া নাই, থাকিতে পারে না। আমাদের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জের ঘটনাগুলির একটা নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। এ বিরাট্ বিশ্বযন্ত্রে কোনখানে কোন একটা সুর যে বাজিয়া উঠে, তার হেতু এই যে, সমস্ত যন্ত্রটাই তার সকল ঘাটে ঘাটে পরদায় পরদায় তারে তারে বাঁধা রহিয়াছে। অনুভবের কোন বিষয়ের সত্তা ও শক্তি তাই সামান্য নয়; আসলে সেটা বিশ্বেরই সত্তা ও বিশ্বেরই শক্তি।

আমরা কারবারের খাতিরে জিনিষকেও ছোট করিয়া দেখি, তার শক্তিকে সামান্য মনে করিয়া থাকি, এবং তার সম্বন্ধগুলিও একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আমরা বড় একটা দেখিতে পাই না। আমাদের কারবারে তার একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা, ওজন ও সীমা আসিয়া পড়িয়াছে। যতদিন আমাদের কারবার চলে, ততদিন একটা জিনিষকে তার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা, ওজন ও গণ্ডীর ভিতরেই আমরা দেখিতে থাকি। এইভাবে বাহিরের সব জিনিষগুলি আলাদা আলাদা হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক জিনিষের একটা আলাদা মাপ, ওজন ও চৌহদ্দি হইয়া আছে। জড়ের বেলায় এই লক্ষণগুলি খুবই পাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা জড় পদার্থ যে জায়গাটুকুতে থাকে, সে জায়গাটুকু হইতে সে সরিয়া না গেলে আর একটা পদার্থ আসিয়া সে জায়গাটুকু দখল করিতে পারে না। ইহাকে বলে জড়ের স্থানাবরোধকতা। এই বন্দোবস্তের ফলে প্রত্যেক জড়পদার্থ আপন এলেকাতে "গ্যাঁট" হইয়া বসিয়া আছে, অপর কাহাকেও সে এলেকাতে ঢুকিতে দেয় না; ঢুকিতে চেষ্টা করিলে বাধা দেয়। জড় আপন এলেকার ভিতর দিয়া অপর কোন বস্তুকে বিনা ওজর আপত্তিতে যাইতে

দেয় না। আগন্তুককে বাধা দেওয়া (resistance)—এও জড়ের একটা মৌলিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আছে বলিয়া জড়বস্তুগুলি সকলে আপন আপন আকার প্রকার অনেকটা বজায় রাখিয়াই চলিতেছে। এ ছাড়া জড়ের ওজন বলিয়াও একটা লক্ষণ আছে। জড়ের এই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া আমরা যে সাধারণ কথাটি পাই, সেটা হইতেছে এই—জড়গুলি আলাদা আলাদা এলেকায় আপন আপন সত্তাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। এক রকম বাধা হইতেই এ সকলের জন্ম। আমরা অন্য প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বিশ্বের সত্তা ও শক্তিকে এক-একটা বাধা দিয়া এক-একটা গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ না করিলে ঐ রকম পদার্থের উদ্ভব ও প্রত্যয় হইতে পারে না। তার পর বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়াই সেই সকল পদার্থ আপন আপন অস্তিত্ব, অধিকার বজায় রাখিয়া চলিতেছে। যাতে জন্ম, তাতেই আবার স্থিতি। যে পদার্থ মোটেই কোনো রকম বাধা দেয় না, তাকে পদার্থ বলিতেই বৈজ্ঞানিকেরা নারাজ হইবেন। যে সকল জড়পদার্থ কঠিন, তারা ত স্পষ্টই বাধা দিয়া থাকে। তরল ও বায়বীয় পদার্থ অল্পবিস্তর বাধা দেয়। এমন কি সর্ব্বব্যাপী ঈথারের ভিতর দিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে একটু-আধটুখানি বাধা পাইয়া থাকে কি না, তা লইয়াও বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতে কসুর করেন নাই। হয় ত ঈথারও অল্প পরিমাণে বাধা দিয়া থাকে। আগন্তুককে বাধা দেওয়াই দ্রব্যের মূল লক্ষণ। আমাদের মনে হয় যে, অখণ্ড অনুভব সত্তায় কোনরূপ বাধা হইতে এদের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই এরা বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়া টিকিয়া আছে।

বাধা দেওয়া যে জড়ের গোড়ার কথা, তা আমরা এই আলোচনায় দেখিলাম। আসলে এ বাধা যে অখণ্ড অনুভব সত্তায় অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বাধা, তা আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি। কিন্তু সে যাই হ'ক, বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়া জড় যেমন টিকিয়া আছে, তেমনি আবার বাধা অতিক্রম করার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের ভিতরে দেওয়া আছে। এই স্বাভাবিক প্রেরণাটি আছে বলিয়াই জড় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ক ও খ দু'য়ের আপন আপন এলেকায় নির্ব্বিবাদে থাকিতে চায়; এটা ওটাকে বিনা বাধায় আপন এলেকার ভিতরে ঢুকিতে দেয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখি যে, একটা গিয়া অপরটার ঘাড়ে পড়িতেছে, এটার সঙ্গে ওটার ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এ ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির মালিক যিনি তিনিও, আমাদেরই মত শক্তের ভক্ত ও নরমের যম। ক যদি নরম হয়, তবে খ গিয়া ক-কে চাপিয়া ধরে, তাকে এতটুকু করিয়া ফেলে। ক খ দু'জনেই সমান হইলে, ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েরই এলেকা কিছু না কিছু খাটো হইয়া যায়। ইংরাজিতে ইহাকে বলে impact। স্বনামধন্য সার আইজ্যাক্ নিউটন জড়ের এই রকম "ইম্প্যাক্ট" লইয়া কয়েকটি আইন রচিয়া গিয়াছেন; সেই আইন কয়টির উপরেই আধুনিক জড়বিদ্যা এক রকম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধরা যায়। ক, খয়ের ঘা খাইয়া উল্টাইয়া ঘা দেয়; অহিংস-নীতি জড়ের এলেকায় কোন মহাত্মাই আজ পর্য্যন্ত চালাইতে পারেন নাই। নিউটন দেখাইয়াছেন যে, ঘাত ও প্রতিঘাত এ দুইটা তুল্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া।

এই নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে একটা সত্য আমরা প্রত্যক্ষ না করিয়া পারি না। সে সত্যটি এই—কোনো জড়ই আপন এলেকায় সুস্থির হইয়া থাকিতে রাজি নয়; সে চায় সে আরও বড় হইবে; সে তার প্রতিবেশীর এলেকাতে চড়াও হইয়া সেটুকু গ্রাস করিবে। এইটাই সেই স্বাভাবিক প্রেরণা, যার কথা আমরা একটু আগে বলিয়াছি। জড় কত বড় এলেকা পাইলে সন্তুষ্ট হয়? যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অসীম ও বিরাট্ না হইতেছে, সবই আপনাতে টানিয়া লইতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নাই। তাই সে অহরহঃ চলিতেছে, অপরের গায়ে পড়িতেছে, অপরকে আপন প্রভাবে বদ্‌লাইতে চাহিতেছে। সে নিজে যা, আর সবও তাই না হওয়া পর্য্যন্ত তার যেন শান্তি নাই। জড়ের ভিতরে কোনো কোনো বস্তু খুব তেজাল' ও রোখাল' বলিয়া বোধ হয়; একটুতেই তাদের প্রভাব চারিধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এক জায়গায় সামান্য একটু রেডিয়াম থাকিলে তার শক্তিব্যূহ যে কতদূর ছড়াইয়া পড়ে, তার সমাচার বৈজ্ঞানিক এখন আমাদের বেশ ভাল করিয়াই দিতেছেন। ঈথারে কোন

স্থানে তাড়িত-তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে, সেগুলি বিনা তারেও যে কেমনধারা সুদূরে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তা আমরা এই বেতার-বার্ত্তাবহের যুগে ভাল মতেই জানিতেছি। আলোকরশ্মি তাড়িত-তরঙ্গ বলিয়াই এখন বৈজ্ঞানিকদের বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়াছেন। এ আলোকরশ্মি যে কতদূরের যাত্রী এবং চক্ষের পলকে সে যে কত দীর্ঘ পথ চলিয়া থাকে, তা এখন আমাদের আর জানিতে বাকি নাই। এই সকল শক্তির খেলায় আমরা দেখিতে পাই যে, জড় ছোট হইয়াও আপন "কোট" কতখানি বড় করিয়া লইতেছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এটা আমরা কিছু কিছু দেখিতে পাই। জলে এক ফোঁটা তেল পড়িলে সমস্ত জলের বুকের উপরে সেই তেলের ফোঁটাটি তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়ে; ঘরের কোথাও একটুখানি কস্তুরী রাখিলে সমস্ত পাড়া তার গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে। এ-সব দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, জড় ছোট হইয়া থাকিতে চায় না; আপনাকে বড় করিতে চায়; যে বাধা তাহাকে একটা গণ্ডীর ভিতরে পুরিয়া রাখিয়াছে, সে বাধাটি সে লঙ্ঘন করিতে চায়। সে চেষ্টা অহরহঃ তার ভিতরে চলিতেছে।

অনেক জড়বস্তুকে আমাদের নিতান্ত ভাল মানুষ গোবেচারি বলিয়া মনে হয়। ঐ একটা পাথর পড়িয়া রহিয়াছে; ওটাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, ওর ভিতরে কোন রকম একটা বড় হবার বা ছোট হবার চেষ্টা আছে। আমরা দেখিতে জানি না, অথবা দেখিতে চাই না, বলিয়াই এই রকম করিয়া দেখি ও ভাবি। সে পাষাণপুরীতে কোনো মতে ঢুকিতে পারিলে আমরা দেখিতাম যে, সেখানেও যে সত্তাশক্তিটি কঠিন নিগড়ে বাঁধা হইয়া পড়িয়াছেন, সে সত্তাশক্তিটিও "প্রাণপণে" সে বন্ধন হইতে আপন মুক্তির চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অনন্ত কাল ঐ পাথর হইয়া পড়িয়া থাকিতে নারাজ। প্রত্যেক পাষাণের ভিতরেই এইরূপে গৌতম-শাপভ্রষ্টা অহল্যার আত্মা একটা মুক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণুর স্পর্শে পাষাণী মানবী হইয়াছিল শুনিতে পাই। কিন্তু প্রত্যেক পাথরের ভিতরেই যে একটা বদ্ধ সত্তা ভাবী মুক্তির আশা-পথ চাহিয়া রহিয়াছে, এ কথা আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব না কি? হিন্দুর দৃষ্টিতে পাথর বলিয়া আলাদা কোনো একটা জিনিষ নাই। আত্মা বা অখণ্ড-অনুভব-সত্তাই আপন লীলায় ও কর্ম্মে ঐ পাথর হইয়াছেন। যতক্ষণ পাথর হইয়া আছেন, ততক্ষণ ঐ পাষাণপুরী হইতেছে তাঁর ভোগ-আয়তন বা ভোগ-শরীর। যেমন কর্ম্ম তেমন ভোগ হইতেছে। ভোগের অবসানে সে ভোগায়তনটি ভাঙ্গিয়া যাইবে; অপর ভোগের নিমিত্ত অন্য ভোগ-আয়তন তখন নির্ম্মিত হইবে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, জড়পদার্থের ভিতরেও বন্ধন হইতে মুক্তির একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ও বন্দোবস্ত দেওয়া রহিয়াছে; বাধা যতদিন প্রবল, ততদিন বাধা ভাঙ্গিবার চেষ্টা থাকিলেও, বাধা রহিয়া যায়। ততদিন পাথর ঐ পাথর হইয়াই থাকে। কিন্তু ভিতরকার ঐ প্রেরণাটি প্রবল হইলে বাধা শিথিল হইয়া আসে, এবং একদিন চলিয়াও যায়। তখন পাথরটি আর পাথর থাকে না, আর কিছু হইয়া যায়। পাথরের ভিতরে যে আকর্ষণটি গোপনে রহিয়া তাকে আত্মা বা স্বরূপে লইয়া যাইতে চায়, সেই আকর্ষণটি হইতেছে শ্রীরামের পদ স্পর্শ। লোকে যে বলিয়া থাকে, রাম নামে ভূত পলায়, ভূতের ভয় দূর হয়, সে অতি খাঁটি কথা। আমরা শ্রীরামকে যেরূপে এখানে চিনিলাম, সেরূপে প্রকাশ হইলে সত্য সত্যই ভূত আর ভূতভাবে চিরদিন থাকিতে পারে না। ভূতের ভয় আর কিছুই নয়, তার বাধা, তার গণ্ডী। এই বাধা বা গণ্ডীর "ভয়েই" পাথরটি পাথর হইয়া রহিয়াছে, নিজের অখণ্ড অনুভব-স্বরূপ যেন খোয়াইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পাষাণও যে তপস্যানিমগ্ন—ব্রহ্মের জড়সমাধিমূর্ত্তি!

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী, রত্নপ্রভা

(২০)

খাইতে খাইতে সহসা কি মনে পড়ায় ঠাকুর্দ্দা পুনরায় মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন। খুব নরম ভাবে বলিলেন "আচ্ছা প্রসাদ, তোরা ত সত্যাশ্রয়ী ব্রহ্মচারী, মিথ্যে কথা তোদের বল্‌তে নেই। আমার কাছে একটা সত্যি কথা কবুল কর্‌বি ?"

ব্রহ্মচারী মাথায় তেল ঘষা স্থগিত রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন "মনু মহারাজের হুকুম আছে,—সময় বিশেষে,—স্ত্রীলোক বিশেষকে মিথ্যে কথা বলে ঠকালে পাপ নেই।"

বৃদ্ধ বিশেষ বিনীতভাবে বলিলেন "ওরে না, না, আমি তোর ঠাকুর্দ্দা, গুরুজন। আমার বড় ইচ্ছে হয়—জান্‌তে। সত্যি করে একটি কথা বল্‌।"

"কি ?—"

বৃদ্ধ পুনশ্চ নিরতিশয় বিনয়ের সহিত হাসি মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তুই এখন আমার নাৎ-বৌকে একটু একটু ভালবাসিস, কি বল্‌? দোহাই ধর্ম্ম, মিথ্যে বলিস না।"

ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া আবার দুহাতে সজোরে তৈল ঘর্ষণে মনোযোগী হইলেন, আর তাঁর মুখ দেখা গেল না; ব্রহ্মচারিণী অস্ফুট স্বরে 'কায আছে' জানাইয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ ব্যগ্র অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "আহা নাৎ-বৌ, তুমি উঠো না ভাই, একটু বসো। বুড়ো হয়েছি, কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। দিন ত ফুরিয়ে এসেছে। যে ক'দিন আছি তোমাদের নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করি।"

"করুন।"—বলিয়া নিরুপায় ভাবে একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী আবার বসিলেন।

কথাটা ব্রহ্মচারীর কাণে গেল। হাসি চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে সকোপে তর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচারিণীর উদ্দেশে বলিলেন "ব্যস্‌! এ্যাপ্লিকেশন মাত্রেই উনি অমনি সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন 'করুন!—' ওই যে সাংসারিক, পাটোয়ারী-বুদ্ধিতে ঝুনো বুড়ো মাথা,—কম মনে কোর না! ঠোক্করে গুঁড়ো করে ছাড়্‌বেন। সাধন-ভজনের যদি বাসনা থাকে, দেশ ছেড়ে চম্পট দাও। বরং বিষয়-ভোগ করা ভাল, কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করায়—মহা ক্ষতি! মহা ক্ষতি!"

ঠাকুর্দ্দা মহা রাগত ভাবে বলিলেন "হোক ক্ষতি! তুই শূয়ার থাম ত! নিজে ত গোল্লায় গেছিস্, আবার বৌটাকে শুদ্ধ কিম্ভূত-কিমাকার বানাবার চেষ্টা! না নাৎ-বৌ, তুমি উঠো না, বসো।"

তার পর একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলেন "বল্‌ না প্রসাদ, নাৎবৌকে এখন একটু-একটু ভালবাসিস ত ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "নাঃ, আধমরা হয়ে গেছি! আর ত বক্‌তে পারি না। স্নান করে আসনে বস্‌তে চল্‌লুম। প্রণাম ঠাকুর্দ্দা—" ব্রহ্মচারী সত্যই উঠিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর্দ্দা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আহা বোস্, বোস্, আর একটু বোস্, ব্যস্ত কেন ?"

"আসনে বসবার সময় হয়ে আস্‌ছে মশাই।"

"আহা, একদিন—একদিন। আমি এখুনি উঠ্‌ব। তোর সঙ্গে একটু কথা আছে, বোস্‌। ও-সব ঠাট্টা-তামাসা থাক।" ব্রহ্মচারী বসিয়া বলিলেন "বলুন।"

ঠাকুর্দ্দা খাওয়া শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইলেন। পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া মুখে একটা পান ফেলিয়া, চিবাইতে চিবাইতে কি যেন একটু ভাবিলেন। তার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন "নাঃ, তোকে লুকিয়ে কায করা ঠিক নয়। এর পর জানতে পেরে খ্যাক্ ম্যাক্ করবি, নাৎ-বৌকে বিপদে ফেলা হবে। ছাখ্‌ ভাই, তোর বাড়ীতে ত আমি জল খেলুম—"

"অতএব মূল্য পরিশোধ করতে হবে না কি?"

"আপত্তি করিস্ নি লক্ষ্মী মাণিক আমার! আমার সেই ভাল আমগাছটায় এবার খুব আম এসেছে, তোর ঠাকুমা গাঁশুদ্ধ লোককে বিলিয়েছে, কিন্তু ভয়ে তোকে পাঠায় নি—পাছে তুই ফিরিয়ে দিস! ও-দিকে হা হুতোশে মরে যাচ্ছেন—তাই আমি আজ নিজে গোটাকতক আম নিয়ে এসেছি—"

যোড়হাত করিয়া ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বলিলেন "কি করব ঠাকুর্দ্দা, আমার ব্রতের নিয়ম, —অপ্রতিগ্রহ!"

ঠাকুর্দ্দা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিলেন "কিন্তু জ্ঞাতির অন্নেও ত দোষ নেই ভাই। তাতেও তোর মনে খুঁৎ হয়,—একটা পয়সা মূল্য ধরে দে—!"

তার পর পাছে ব্রহ্মচারী আরও কিছু আপত্তি তোলেন, সেই ভয়ে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিণীর দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "দাও তো নাৎবৌ, আমাকে একটা পয়সা।"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "অতগুলা আমের মূল্য কি একটা পয়সা হয়?"

"হয়—হয়! তুই আর বকিস্ নি বাপু! দাও নাৎবৌ, একটা পয়সা দাও দিদি,—আম-কটা তুলে রাখ।" বলিয়াই বৃদ্ধ পুঁটুলি খুলিয়া আমগুলা মেঝেয় নামাইতে লাগিলেন! ব্রহ্মচারিণী নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী চিন্তিত ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "দাও পয়সা, নাও আর কি বলব?"

ব্রহ্মচারিণী আমগুলা ঘরে রাখিয়া আসিয়া একটা পয়সা আনিয়া ঠাকুর্দ্দার হাতে দিলেন। ঠাকুর্দ্দা প্রবল আগ্রহে পয়সাটা বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া বলিলেন "ছাখ্‌ ভাই, সত্যিকার একটা পয়সা নিলুম, তুই যেন আর আপত্তি করিস নি।"

চিন্তিত ভাবে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমি আপত্তি করব না বটে, কিন্তু আমার ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আপত্তি না হলে হয়! শাস্ত্রের অনুশাসন সব আমি ঠিকমত ভাবে মেনে চল্‌তে পারি না—দায়ে ঠেকে অনেক কিছুই উল্টে-পাল্টে নিতে হয়। কিন্তু ওই একটা জিনিস,—দান প্রতিগ্রহ, ওটা কিছুতেই আমার শরীরে সয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমার অসুখ করে।"

পয়সাটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরিয়া ঠাকুর্দ্দা আশ্বাসের স্বরে বলিলেন "এই ত মূল্য নিলুম, আবার দান কি? এ জিনিসে কখ্‌খনো তোর অসুখ করবে না, তুই দেখে নিস্।" ব্রহ্মচারী অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুর্দ্দা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন "আচ্ছা, যেতে দে ও-কথা। এবার একটা কথা জিজ্ঞেসা করি,—হ্যাঁরে ভাই, যুগাদ্যার 'থানে' ওই যে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীটি এসেছেন, যার কাছে তুই যাওয়া-আসা করিস্, ও-লোকটি কেমন?"

একটু বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কে কেমন, কারুর মন ত আমি দেখতে পাচ্ছি নে ঠাকুর্দ্দা, পরচিত্ত অন্ধকার। তবে শাস্ত্রজ্ঞ, সাধক, ব্রাহ্মণ,—আমাদের নমস্য। এই পর্য্যন্ত জানি।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তুই ত তান্ত্রিক সাধনা করিস না, তুই ও-লোকটার সঙ্গে অত মেশামেশি করিস্ কেন ভাই?"

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "গোঁড়ামি,—আমার গুরুর নিষেধ। যে ধর্ম্মের, যে সম্প্রদায়ের লোক হোন না,—ভগবানের যে নাম, যে রূপের উপাসক হোন না, নিষ্কপট সাধক মাত্রেই আমাদের আদরের পাত্র, পূজার পাত্র; তাঁদের সঙ্গ, আমাদের আত্মার কল্যাণকর। যখন অবসাদ আসে,—তখন সাধনে মনকে উৎসাহ দেবার জন্য—সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা দরকার হয়। বসে আছি জঙ্গলের মধ্যে; একটা ভাল লোকের সঙ্গ পাই নে, তাই প্রাণের দায়ে তাঁর কাছে ছুটোছুটি করি।"

ব্রহ্মচারীকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া ঠাকুর্দ্দা খুব নরম

হইয়া গেলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "রাগ করছিস কেন ভাই? রাগের কথা ত কিছু নেই। তুই যদি তাঁকে নিষ্কপট সাধু বলে বুঝে থাকিস্, সে ত ভালই। কিন্তু তবুও প্রসাদ—" তিনি আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি বলবেন, বলুন না।"

ঠাকুর্দ্দা একটু হাসিয়া বলিলেন "যা তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করছ, বল্‌তে ভয় হচ্ছে যে।"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চক্ষু রক্তবর্ণ করবার কথাই যে বলছেন! এক তো পরনিন্দা বিষবৎ ত্যজ্য,—তা আবার সাধু সন্নিসীদের ব্যাপার! কপটকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিষ্কপটকে আঘাত করে বসা যে কত বড় গুরুতর সর্ব্বনাশ,—সে যে জেনেছে, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।—এই আপনার ওই নাৎবৌটি,—এক এক সময় আমায় এমন অতিষ্ঠ করে তোলেন, ইচ্ছে হয় বাড়ী ছেড়ে চলে যাই!"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিণীর দিকে একটা রূঢ় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া তিনি থামিলেন। ঠাকুর্দ্দা ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিলেন "অতিষ্ঠ করেন? সে কি? সে ত ভারি অন্যায় কথা! কিসের জন্যে?"

"ওই সাধু সন্নিসীদের ত্রুটি আবিষ্কার!—সকলকেই সন্দেহ!"

কৌতূহলী হইয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "সন্দেহ? কাকে রে, কাকে?"

পুনশ্চ মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে ব্রহ্মচারী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "কাকে? কার নাম কর্‌ব? এই আমাকেও হচ্ছে, স্বামিজীকেও হচ্ছে,—দুদিন পরে হয় ত—আপনাকেও হবে। ওঁর অসাধ্য কর্ম্ম নাই।"

ব্রহ্মচারিণী নতমুখে নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এইবার নিম্নস্বরে বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা, আমার শ্রাদ্ধ সপিণ্ড-করণ ত হয়েছে। এ আলোচনাটা ওই পর্য্যন্ত আজ থাক। আহ্নিকের সময় উৎরে যাচ্ছে,—ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য চেপেছে দেখতে পাচ্ছেন? স্নান করে আসনে বস্‌তে বলুন।"

ব্রহ্মচারী হাত কামাই দিয়া কাণ পাতিয়া কথা কয়টা শুনিলেন, এবং রাগের পরিবর্ত্তে একটু হাসিয়া বলিলেন "আহ্নিকের সময় উৎরে গেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্যই চাপে বটে। কিন্তু ওঁর ঘাড়ে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ কে ক'জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চেপে বসে আছে, একবার খানাতল্লাসী করে দেখ্‌তে বলুন ত ঠাকুর্দ্দা।"

ঠাকুর্দ্দা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "দুজনেই দুজনের ঘাড় খানাতল্লাসী করে দাগী আসামীদের গ্রেপ্তার কর্ ভাই, এ সংসারাবদ্ধ বুড়োমানুষকে মধ্যস্থ মেনে বিপদে ফেলিস নি। তোদের আহ্নিকের সময় উৎরে যাচ্ছে,—আমি উঠি। এর পর সময়-মত আমার সঙ্গে একবার দেখা করিস প্রসাদ, তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

দুজনে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর্দ্দা বিদায় লইলেন। ব্রহ্মচারী বিনা বাক্যে স্নানের জন্য ছুটিলেন। ব্রহ্মচারিণী ঠাকুর্দ্দার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া স্নানের জন্য গেলেন।

আসনে বসিতে বিলম্ব হইল, উঠিতেও অন্য দিনের চেয়ে বেশী বিলম্ব হইল। ব্রহ্মচারিণী সবে মাত্র রান্নাঘরে আসিয়া হবিষ্য চাপাইতেছেন, ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। উঁকি দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু বিরক্ত স্বরে বলিলেন "এতক্ষণে হবিষ্য চাপছে? আজ নেই-বা হবিষ্য হোত!"

ক্ষমাপ্রার্থী দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আমারই দোষ,—বড় দেরী হয়ে গেছে। এখুনি হবিষ্য হয়ে যাবে। ততক্ষণ একটু সরবৎ দেব, কি ফলটল?"

"তাহলে আজ আমি হবিষ্য করব না। তুমি একা কর। কর্‌বে ত?"

"তাই কি হয়? কাল আবার অষ্টমী আছে। আজ হবিষ্য বন্ধ রাখ্‌বে কি?"

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তাহলে বেরুব কখন ছাই?"

খুব নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "নেই বা একদিন বেরুলে? রোজ দুপুরবেলা রোদে ছুটাছুটি করা, সেও তো ভাল নয়। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে নিজের কায-কর্ম্ম যে কতখানি মন লাগিয়ে করতে পার, তা তুমিই জানো। কিন্তু অবসন্নতায় যে টল্‌মল্ করো, তা'ত স্পষ্ট দেখতে পাই।"

ব্রহ্মচারী একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে চাহিলেন; তার পর অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরুত্তরে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন

"তোমার রাগ আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছে, একটুতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠো। কথা বলতে ভয় করে। কিন্তু শরীরের ওপর বড় অত্যাচার করছ, এটা মোটে ভাল হচ্ছে না।"

ব্রহ্মচারী তাঁর শেষ কথাটায় কর্ণপাত করিলেন না। মাঝের কথাটাই তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল; একটু হাসিয়া বলিলেন "কথা বল্‌তে ভয় করে? সত্যিই? কিন্তু বলতে বাকী রাখছ কি?"

নিজের কায করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন "অনেক—অনেক বাকী রেখেছি ব্রহ্মচারি,—সব কথা বলতে গেলে আমারও মাথার ঠিক থাকবে না, তোমারও রাগের সীমা থাক্‌বে না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "থাকবে। কি বলতে চাও, বল ত। বস্‌ব এখানে?"

"তোমার অভিরুচি।"

হবিষ্য করিবার আসনখানা টানিয়া লইয়া ব্রহ্মচারী দুয়ারের কাছে বসিলেন। বলিলেন "বল কি বল্‌বে?"

"বলবার কথা এত বেশী আছে যে, কোন্‌টা আগে আগে বল্‌ব, ভেবে পাচ্ছিনে। একটু সরবৎ এনে দেব?"

"না। তোমার কথা কি আছে, বল।"

"এখুনি ত রেগে উঠ্‌বে?"

"না, প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুতেই রাগব না। তুমি নির্ভয়ে বল।"

উনানে ফুটন্ত হবিষ্যের উপর ডালবাঁটাটুকু ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারিণী হাত ধুইয়া ফিরিয়া বসিলেন; বলিলেন "স্বামিজী তান্ত্রিক; হয় ত ওই মতটাই তাঁর ধাতের ঠিক উপযুক্ত,—ওতেই তিনি সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারবেন।"

"পারবেন কি? পেরেছেন ত!"

"অর্থাৎ তিনি সিদ্ধপুরুষ? তথাস্তু, তাও না হয় তোমার খাতিরে মেনে নিচ্ছি।"

"পূর্ণ সিদ্ধ আমি বলছি নে।"

"তবে?"

একটু বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "এই—যাকে বলে 'হাফ্ বয়েল্!' অনেকটা এগিয়েছেন, সাধন-জীবনের প্রথমকার স্তরগুলা অতিক্রম করেছেন, এটা বুঝ্‌তে পারি।"

বলিয়া তিনি প্রমাণ স্বরূপ স্বামিজীর মুখ হইতে শোনা,—তাঁর সাধন-জীবনের কতকগুলা বিশিষ্ট অবস্থার বিচিত্র রহস্যের বর্ণনা করিলেন। সে সব ব্যাপার বাস্তবিকই যথার্থ ক্রিয়াবান সাধকের সাধন-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উভয়েই সেটুকু জানিতেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "এগিয়েছেন ভালই, তাঁকে নমস্কার করছি। কিন্তু এ তো মাত্র পাঠশালার পড়া,—স্কুল-কলেজের সব শিক্ষাই যে এখনো বাকী! এইটুকু মাত্র শক্তি নিয়ে ভেল্কি দেখাতে সুরু করলে নিরীহ লোক-সমাজেরও ক্ষতি করা হয়, শক্তির অপব্যবহারে সাধকের নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। কত উচ্চ—উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছেও সামান্য সামান্য একটু লোভ, সামান্য একটু বাসনার টানে কত মহা মহা শক্তিশালী সাধকের পতন হয়েছে।"

"আর আমার পতন ত চব্বিশ ঘণ্টাই সম্মুখে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"—বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন।

"রয়েছে ত। সেই জন্যে ভগবানের ওপর দৃঢ় ভক্তি ও নির্ভর রেখে আত্মরক্ষার জন্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সতর্ক থাকা জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। যাক সে কথা। তোমার কথাই হোক। ভিন্নমতাবলম্বীর সঙ্গে বাদবিচারে প্রবৃত্ত হবার তোমার দরকার কি?"

"নিজের মত পুষ্টির জন্যে। সংশয় ছিন্ন হোক, সত্যোপলব্ধি হোক। চরিতার্থ হয়ে মহা উৎসাহে যথার্থ সত্যের সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করি,—এই-আমার উদ্দেশ্য।"

একটু থামিয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে পুনশ্চ বলিলেন "তাতে যদি আংশিকভাবে তান্ত্রিক সাধনাও গ্রহণ কর্‌তে হয়,—তাতেও আমি স্বীকার।"

ব্রহ্মচারিণী উনানের দিকে ফিরিয়া হবিষ্যটা একবার দেখিয়া লইলেন। জ্বালটা ঠেলিয়া আগুন উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন "তুমি যে শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের মতগুলা স্বীকার করছ, সবগুলার অর্থ বুঝেই স্বীকার করছ ত?"

ব্রহ্মচারী দুহাতে নিজের মুখ আচ্ছাদন করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন "অর্থ যে সবগুলার বুঝেছি, তা বলতে পারি নে। কতক বুঝেছি, কতক বুঝি নি। কতকগুলা নিজে ক্রিয়াকর্ম্ম করে না বুঝলে, বোঝবার উপায় নাই।"

ব্রহ্মচারিণী সবিদ্রূপে বলিলেন "যথা 'কারণ' তত্ত্ব,

'ভৈরবী' তত্ত্ব,—ইত্যাদি ইত্যাদি। দোহাই ব্রহ্মচারি, রাগ কোর না যেন!"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "খোঁচাও দিতে ছাড়্‌বে না, রাগ করতেও দেবে না! বেঁধে ঠ্যাঙানো আর কাকে বলে? আর আমি যদি ওই শ্লেষোক্তির পাল্টা জবাব দিই, তাহলে লাঠালাঠি জুড়ে দেবে ত?"

অত্যন্ত সহজভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তা দেব না? বাঃ! সুরাপায়ীকে স্পর্শ করলে যে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়!"

"সে ত আমাকেও হয়! কি করব? স্বামিজীকে বড় ভালবাসি—"

"তাই বন্ধুত্বের খাতিরে 'নয়'-কে 'হয়' করে চল্‌ছ? ভাল, শরীরে সইছে ত? মনেও?"

"কই আর সইছে? প্রত্যেক দিনই ত মন, শরীর অসুস্থ হচ্ছে। এক এক সময় মনে করি স্বামিজীর সংস্রব ছেড়ে দেব,—কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যই বল, আর স্বামিজীর 'এ্যাট্রাক্‌সন্ পাওয়ার'ই বল,—আকর্ষণে টাল্ সামলাতে পারি নে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছুট্‌তে হয়। আর শুধু কি আমি?—কত লোক যে ওই লোকটির অনুগ্রহ-ভিক্ষা করে ফেরে—আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। সেদিন দু দণ্ডের জন্যে এখানে এসেছিলেন, তাও সন্ধান করে এখানে লোক এসে হাজির। দেখলে ত?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সন্ধানটা উনি নিজেই দিয়ে এসেছিলেন।"

"কি রকম? তোমায় কে বল্লে?"

"খালি সিগারেটের বাক্সটা ফেলে গিয়েছিলেন। সেটা ঝেঁটিয়ে ফেল্‌তে গেলুম, ভেতর থেকে একটা চিরকুট খসে পড়ল। বোধ হয় সেটা অসাবধানে বাক্সর ফাঁকে ঢুকেছিল,—ওঁরা টের পান নি। তাতে ওই রকম কথাই লেখা ছিল।"

উষ্ণ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "এ তোমার ভারী অন্যায়! পরের চিঠি—"

"পর যদি অনুগ্রহ করে আমার চোখের সামনে ফেলে রেখে যান, আমি কি করব? তুলে রেখেছি; যাঁর জিনিস, তাঁকে ফেরৎ দিও।"

তার পর দুজনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

উনানের দিকে মুখ ফিরাইয়া হবিষ্যের জ্বাল ঠিক করিয়া দিতে দিতে ব্রহ্মচারিণী সসঙ্কোচে বলিলেন, "আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করব ব্রহ্মচারি?" ব্রহ্মচারী বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতেছিলেন। অন্যমনে বলিলেন "পরচর্চ্চা ছাড়া যদি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, কর।" হেঁট মুখে নিজের কায করিতে করিতে মৃদু হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তোমার স্বামিজীর নিন্দে-বান্দার কথা নয়। তোমার নিজের সম্বন্ধেই,—বল্‌ব?"

"আমি ত ভণ্ড-তপস্বী। আমার সম্বন্ধে যার যা প্রাণ চায়, বল।"

অধিকতর হেঁট হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা তোমায় 'ডুবে জল' খাওয়ার কথা কি বলছিলেন?"

"মহাপ্রভু—তোমার জন্যেই। রাস্তাঘাটে দেখা হলেই ওই নিয়ে রঙ্গ-বঙ্গ! এক বাড়ীতে বাস করছি,—কৌতূহলে উৎকণ্ঠায় ওঁদের যেন দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। এই ঝুনো-সংসারী মানুষগুলো,—ওদের মনোবৃত্তি ভগবান যে কি উপাদানেই গঠন করেছেন, অবাক্ হয়ে তাই ভাবি! কাণ্ডজ্ঞান বলে একটা জিনিস কি শরীরে নেই!"

"প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হচ্ছে ব্রহ্মচারি, রেগে উঠ্‌ছ যে! পরনিন্দা নিজেই জুড়ে দিলে?"

অপ্রতিভ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "সত্যি, অন্যায় হোল। নাঃ, সংসারীরা আমাদের নমস্য।"

"কিন্তু তাঁর কথাটা তুমি যত সহজ বলে মনে করেছ, তত সহজ নয় বোধ হয়। আমাকে লক্ষ্য করা, তাঁর উদ্দেশ্য নয়।" "কেন?"

"তাহলে আমার ওপর তোমার শাসন-ভারটা খয়রাৎ করতেন না। বোধ হচ্ছে, তোমার বিরুদ্ধে কারুর কাছে কিছু খবর পেয়েছেন, সেটার মীমাংসা করতে এসেছিলেন। তুমি রেগে উঠে' তাঁকে ঘাব্‌ড়ে দিলে। নইলে কথাটা শোনা যেত। মনে হয়, সেই জন্যেই তোমাকে এর পর সময়-মত দেখা কর্‌তে বলে গেলেন,—কথাটা ধীরে সুস্থে আলোচনা কর্‌তে চান!"

অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ব্রহ্মচারী সহসা হাসিয়া বলিলেন "নাঃ, এই সংসারী মানুষগুলির মন বুদ্ধি বড় জটিল রহস্যময়! সোজা কথা এঁরা এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন যে তাক্ মেরে যেতে হয়।

এঁদের অর্দ্ধেক কথাই আমি বুঝ্‌তে পারি নে! এঁদের লীলাখেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক এক সময় আমার সন্দেহ হয়, আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি বুঝি!”

“তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখে আমারও অধিকাংশ সময় সেই রকম সন্দেহ হয়।” ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন। সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন “দাঁড়াও, আজ হবিষ্য করে গিয়ে ঠাকুর্দ্দা বুড়োর মাথা গুঁড়ো করছি। তাতে ধৃষ্টতার চরম সীমায় উঠ্‌তে হয়, সো-ভি-আচ্ছা!”

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী ব্যগ্রভাবে বলিল “আহা বুড়োমানুষ, দুপুরবেলা ঘুমোন,—তাঁর শান্তিভঙ্গ কোর না। অন্য সময় যেও। হবিষ্য হয়ে গেছে, বসো।”

২১

হবিষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজে হবিষ্য করিয়া নিত্যকার নিয়মমত রান্নাঘর ধুইয়া, বাসন মাজিয়া, পুনশ্চ স্নান করিয়া কূয়াতলা হইতে ভিজা কাপড়ে বাহিরে আসিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন ব্রহ্মচারী বারেণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন।

অন্য দিন এ সময় তিনি নিজের ঘরে হয় বিশ্রাম করেন, নয় শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকেন। কখনও বাহিরে আসেন না। অন্ততঃ যতক্ষণ না ব্রহ্মচারিণী কাযকর্ম্ম সারিয়া নিজের ঘরে ঢোকেন,—ততক্ষণ ব্রহ্মচারীকে বাহির হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ভিজাকাপড়ে, খোলা মাথায় ব্রহ্মচারিণী অন্য দিনের মতই নিঃসঙ্কোচে নিজের ঘরে যাইতেছিলেন। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্রহ্মচারীকে সামনে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মাথায় কাপড় টানিয়া-টুনিয়া হেঁট হইয়া পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা দিতে ব্যস্ত হইলেন। ভিজা কাপড়ে কাহারও সামনে বাহির হওয়া, তাঁর কাছে অত্যন্তই রুচিবিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল। ব্রহ্মচারী অন্যমনস্ক ছিলেন। পদশব্দে একবার চাহিয়াই ত্রস্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিনা বাক্যে নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে ঢুকিয়া, কাপড় বদলাইয়া ভিজা কাপড়খানা শুকাইতে দিলেন। তার পর খোলা জানালার কাছে রৌদ্রে কম্বল পাতিয়া, ভিজা চুলগুলা শুকাইতে দিয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন। দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ,—আহারের পর পুনরায় জপ আরম্ভ করাই তাঁর অভ্যাস ছিল, কদাচিৎ এক আধদিন একটুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইতেন। দুয়ার ভেজানো ছিল। একটু পরে দুয়ারের কাছে মৃদু শব্দ হইল। সন্তর্পণে দুয়ার ফাঁক করিয়া ব্রহ্মচারী উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিলেন “জপে বসেছ কি না দেখ্‌ছি।”

ব্রহ্মচারিণী মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—ব্রহ্মচারীর পায়ে খড়ম, মাথায় এলোমেলো ভাবে নামাবলীখানা জড়ানো।—অর্থাৎ বাহিরে যাইবার সাজসজ্জা। কোন কথা না বলিয়া তিনি নীরবে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী সেটুকু লক্ষ্য করিলেন; গম্ভীর হইয়া বলিলেন “আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, বাইরের দুয়ারে খিল দিয়ে শোও।”

“কোথা যাওয়া হবে? ঠাকুর্দ্দার ওখানে?” “না।” “তবে?” “যেখানে হোক।”

ব্রহ্মচারিণী নীরব হইলেন। ব্রহ্মচারী দেখিলেন ওই অনির্দ্দেশ্য “যেখানে হোক” সম্বন্ধে আর কোন নিশ্চয়তা-জ্ঞাপক সংবাদ আদায়ের চেষ্টা হইল না। হইলে তর্ক বিতর্কের একটু সুবিধা হইত এবং বোধ হয় সেইটুকুই এখন তিনি কামনা করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারিণী স্তব্ধ হইয়া যাওয়ায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঠাকুর্দ্দার সকালবেলার কথার অনুকরণে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “আমার অন্য লোক আছে।”

“ব্রহ্মচারি—”বলিয়া দৃষ্টি তুলিয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কি ভাবিয়া হঠাৎ আবার থামিলেন। ব্রহ্মচারী নামাবলীখানা খুলিয়া পাগড়ীর আকারে পুনশ্চ সুবিন্যস্তভাবে মাথায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন “কিছু বল্‌বে?” একটু ক্ষুব্ধস্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন “বল্‌লে তুমি শুনবে?” “না, তা শুনব না। বরং যা বল্‌বে ঠিক তার উল্টাটা করব। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নিয়ে চল্‌ব না।”

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন “সে ত জানা কথা। বেশ, পৌরুষের দম্ভ অভিমানের জয় হোক। আমার কিছু বল্‌বার দরকার নেই।” একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন “যদি শুঁড়ির দোকানে যাই?” দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারী চৌকাঠের উপর দাঁড়াই-লেন। ব্রহ্মচারিণী চাহিয়া দেখিলেন,—ধীরে বলিলেন—“সে ত যাচ্ছই। আবার “যদি” কেন?

"স্বামিজীকে তুমি শুঁড়ি বলছ ?"

"তোমরা কে, আর কি চর্চ্চায় নিযুক্ত হয়েছ নিজেই একটু বিবেচনা করে দেখ না।"

"কথাটা স্পষ্ট করেই বল,—স্বামিজী শুঁড়ি আর আমি তাঁর মাদকের খরিদদার ? বেশ, জীবনে কখনো ও-সব নেশা-ভাঙ করিনি,—এবার একবার করেই দেখা যাক্ না। তোমার আপত্তি আছে ?"

ব্রহ্মচারিণী কোন উত্তর দিলেন না। নিকটে গঙ্গাজলের পাত্র ছিল, সেটা হইতে একটু জল লইয়া হাত ধুইলেন। তার পর দেয়ালের প্রেকে ঝুলান নিজের রুদ্রাক্ষ মালাটি পাড়িয়া লইলেন।

ব্রহ্মচারী সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না। নিজ মনেই হাসিমুখে বলিলেন "যদি মাতালই হই, তাতে আপত্তিই বা কি ? পৃথিবীতে মাতাল নয়ই বা কে ? একদিন ধর্ম্মের নেশায় মাতাল হয়েছিলাম, এবার না হয় অন্য নেশাই ধরা যাক। সকলের কথাই মান্‌তে হয়, জীবনে সব রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নি বলে,—অনেকেই ত তাঁকে অনভিজ্ঞ বলে গাল দেয়।"

দু'হাতে নিজের কপাল চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্ট হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "যেমন শক্ত্যানন্দ স্বামী তোমায় গাল দিচ্ছেন! আর তোমার পিছনে লেগে, নূতন নূতন, অপরূপ অভিজ্ঞতালাভের জন্যে তোমায় উৎসাহ দিয়ে মাতিয়ে তুলছেন!"

হাসিমুখে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "বস্‌ব এখানে একটু ? কিছু মনে কর্‌বে না ত ?"

একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কিন্তু, আমার এখানে ত বস্‌তে দেবার কিছু নেই। আসন, কম্বল সবই যে আমার ব্যবহার করা। এ তো তোমার চল্‌বে না।"

"না।—" বলিয়া ব্রহ্মচারী একবার এদিক ওদিক চাহিলেন। নিকটে জানালার উপর একখানা ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল; সেটা টানিয়া লইয়া, চৌকাঠের বাহিরে পাতিয়া বলিলেন, "এতেই চল্‌বে; কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না ত ?"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আশ্চর্য্য কি ? মানুষের মন একটা বৃহৎ ভূত, তার মধ্যে কখন কি ভাবের উদয় হয় বলা শক্ত। নিজের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "নিজের অবস্থা, সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে; অপরের অবস্থা শোচনীয় করে তোলাই এখন একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া সেই কম্বলের উপরই নিজের অভ্যস্ত নিয়মে পায়ের উপর পা মুড়িয়া সহসা যথারীতি "আসন" করিয়া বসিলেন। তার পর হাতে গঙ্গাজল ঢালিয়া আচমন করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন "মিছে সময় নষ্ট কোর না ব্রহ্মচারি, নিজের কায কর গে। ঘরে যাও।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ঘরে যাব কি ? বাঃ, আমি এখুনি বেরুব। তুমি নিজের কাযে বস্‌বে, বসো।—একবার থাম একটা কথা শোনো।" ব্রহ্মচারিণী হাতের জল ফেলিয়া দিয়া প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন "গার্হস্থ্য আচার অবলম্বন না করে সন্ন্যাস নেওয়াটা—বর্ণাশ্রম আচারের দিক থেকে ঠিক নয়, জানো ত ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "শ্রুতিতে আছে, যেদিন বৈরাগ্য হবে, সেইদিনই সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তাই করেছিলেন, জানো ত ?"

মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আঃ, কি মুস্কিল! তুমি ত শঙ্করাচার্য্য নও। খামকা পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড লোপ করে কি হবে ?" হঠাৎ যেন ব্রহ্মচারিণীর গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিল! থতমত খাইয়া, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন "খামকা !" তার পর মাথা হেঁট করিয়া তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন "বুঝেছি ব্রহ্মচারি, এ তোমার কথা নয়, স্বামিজীর কথা। কিন্তু এ সব তর্কের মীমাংসা ত বহুদিন আগে হয়ে গেছে। এখন এ সব কথা নিয়ে করুণ-রসের সৃষ্টি করতে যাওয়া, বা অনর্থক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা, ধৃষ্টতা মাত্র।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "অনেক উচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসী গুরুর মতও শুনেছি, সন্তানলাভ না হলে জীবনের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকে, সন্ন্যাসে যথার্থ অধিকার হয় না।" "শঙ্কর, চৈতন্য, যিশু কেউ সন্তানলাভ করেন নি, তাঁদের কি সন্ন্যাসে যথার্থ অধিকার হয় নি ? না, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ ছিল ?" ব্রহ্মচারী সাহসে ভর দিয়া বলিয়া ফেলিলেন "ছিল না, তাই বা কে বলতে পারে ?"

"বটে, কুতর্কের জেদ্ এতদূর চেপেছে ? ভাল,—ছাগল, ভেড়া, শিয়াল, কুকুরগুলা ত বৎসর বৎসর বিস্তর সন্তান উৎপাদন করে। জীবনের অভিজ্ঞতায় সুতরাং তারা নিশ্চয়ই খুব পরিপক্ব হয়,—কিন্তু সন্ন্যাসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় তাদের ক'জন শঙ্কর চৈতন্যের উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে ?"

তর্কে সুবিধা করিতে না পারিলেই ব্রহ্মচারী রাগের দ্বারা সে ত্রুটি সংশোধন করিতে চাহিতেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন " 'মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ কর'—মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাযে করা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষই !"

"অতএব—? শূকর কুক্কুরের মনোবৃত্তির অনুসরণ করে, সাধারণ মানুষকে আত্মগঠন করবার বিধি-বিধানটুকু সযত্নে দিতে হবে ?—উচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসী গুরুরা এ সব বলুন আর না বলুন, তোমার স্বামিজী যে বলেছেন, এইটেই যথেষ্ট।" একটু থামিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে ব্রহ্মচারিণী পুনশ্চ বলিলেন "ভাল করছ না ব্রহ্মচারি, মোটেই ভাল করছ না ; এ সব সঙ্গের দ্বারা, শেষ পর্য্যন্ত হয় ত তোমার ভয়ানক হানি হবে।"

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "হয়—হবে। না-হয়, শেষে শক্ত্যানন্দকেই শিক্ষাগুরু পদে বরণ করব। তুমি তাঁকে শিক্ষাগুরু করবে ত ?"

"আমি !—"বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। বলিলেন "আমার শিক্ষাগুরু হতে হলে,—বাবাজীবনকে আরও অনেক উচুঁতে উঠতে হবে। আগে তাঁকে সেখানে পৌঁছুতে দাও !"

ব্রহ্মচারী নরম হইয়া বলিলেন "কিন্তু,—বাস্তবিক শক্ত্যানন্দ স্বামী অসামান্য পণ্ডিত।"

"সাধনাহীন পাণ্ডিত্য,—ভয়ানক জিনিস।"

"সাধনাহীন ? ভুল তোমার। তিনি রীতিমত সাধনা করছেন। তন্ত্রে তাঁর অসাধারণ অধিকার।"

"তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য—উচ্চ লক্ষ্যই তিনি ধরতে পারেন নি ; পারলে, তাঁর চেহারাও অন্য রকম দেখতাম, আমিও তাঁকে ভক্তি করতাম। জ্ঞানের যা পরম শত্রু,—তার হাতে শির সমর্পণ করে' আত্মহত্যা করার নাম আত্মজ্ঞান লাভ নয়। তিনি তোমাকে ভুল বোঝাচ্ছেন, এ আর আশ্চর্য্য কি ? নিজেও ভুল বুঝে, ভুল কায করে, নিজের আত্মিক উন্নতির পথ রোধ করছেন,—তাও তো বুঝতে পারছি। ওই তাকের ওপর সিগারেটের বাক্স রয়েছে, পেড়ে নাও। ছাখো ওর মধ্যে সেই চিরকুটখানা রয়েছে।"

দুয়ারের পাশে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট তাক ছিল। ব্রহ্মচারী উঠিয়া তার উপর হইতে সেদিনের সেই খালি সিগারেটের বাক্সটা পড়িলেন। বাক্সটা খুলিতেই তার ভিতর হইতে রাংতা পাত, পাৎলা কাগজ, এবং এক-টুকরা ছোট কাগজ বাহির হইল। কাগজখানায় লাল কালীতে লেখা ছিল "অনিলবাবু, আমি ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতেছি। নিমাইকে লইয়া ওইখানে আইস। অভিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা গোপনে বুঝাইয়া দিব।" তার পর "স্ত্রীলোকটির" লিখিয়া কাটিয়া দিয়া পুনশ্চ লেখা "বশীকরণের ফল অব্যর্থ, নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইতি শ্রীশক্ত্যানন্দ স্বামী।"

ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে বার বার সেই কয়টি অক্ষরের উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর হস্তাক্ষর, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কি বিশ্রী সংবাদ! এ কি মহাপাপ! স্বামিজী অভিচার-ক্রিয়ার সংস্রবে থাকেন! এ তো মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী সাধকের উচিত কার্য্য নয়। ভগবানের মঙ্গল রূপ, মঙ্গল শক্তির উপাসনা দ্বারা নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করাই উচিত। এ সব সংহার শক্তি, সংঘাত শক্তি প্রয়োগে ত শুধু নিজের আত্মিক ক্ষতি এবং নিরীহ জনের নিদারুণ সর্ব্বনাশ করা হয় মাত্র !—ব্রহ্মচারী নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কি হোল ? মুখখানিতে যে মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণ রাত্রির অমাবস্যা নেবে এল।"

"অবাক্ হয়ে ভাবছি, এর মানে কি ?"

"মানে,—বুঝতে গেলে, আর বোঝাতে গেলে শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। বাইরের আগুন ঘরে এনে কায কি ?"

"তা বটে, রাস্তায় খড়কুটো কত কি পড়ে থাকে, তাকে মাথায় করে এনে ঘরে ঢোকান মূর্খতা। কিন্তু এটা আমায় আগে দাও নি কেন ?"

"দেব কাকে ? তোমার মনের স্থিরতা যে একদিনও দেখতে পাচ্ছি নে। শুধু এই নয়,—স্বামিজীর চরিত্রের বিরুদ্ধেও চারি দিকে অসন্তোষ-গুঞ্জন চলছে—তার

কিছুকিছু খবরও আমার কাণে পৌঁছেছে। ঠাকুর্দ্দাও আজ—"

ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "ব্যস্, ও-সব চর্চ্চা ওই পর্য্যন্ত থাক। যদি নিজের মাথাটি খেতে চাও, পরনিন্দা কর,—পরনিন্দা শোনো। আমায় ও-সব শুনিও না। লোকের কথা,—হুজুগের কোলাহল, ওর মাহাত্ম্যে 'দিনকে রাত' করে।"

একটু থামিয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন "কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দিলে আমাকে ভালই,—কিন্তু না দিলে বোধ হয় আরও ভাল করতে। আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এই মনকে স্থির করে নিয়ে আবার নিজের কাযে লাগাতে—আমায় ঢের খাটতে হবে।"

তার পর নিজ মনেই কি ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভাবে হাতের সেই লেখা কাগজটুকু টুকরা টুকরা করিতে করিতে অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন "কিম্বা—তাই দিলে দিলে,—যদি আগে দিতে, তা'হলে বোধ হয় ভাল হোত। আমিও হয় ত ভুল বুঝে, একটা বোকামি করে বসে আছি।"

"কি? বশীকরণের ফাঁদে পড়েছ?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমিই না হয় আত্মরক্ষায় অসতর্ক,—অন্যমনস্ক। কিন্তু আমার রক্ষাকর্ত্তা কি অস্ত্রহীন? নিদ্রিত?"

"বলা যায় না। গ্রহের ফের বলেও একটা কথা আছে,—তা ছাড়া রক্ষাকর্ত্তাদের রকম-সকম দেখেও মনে হয়, তাঁরাও সময় সময় মানুষকে পাকচক্রে ফেলে একটু মজা দেখতে ভালবাসেন! ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত অত বড় ব্রহ্মবিদ্—সর্ব্বজ্ঞ সাধক, তাঁকেও তান্ত্রিক অভিনব গুপ্তের অভিচারে, দারুণ রোগে মরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তিনিও অভিচারের শক্তিকে ঠেকাতে পারেন নি!"

কৌতূহল-উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তার পর কি হয়েছিল বল ত। শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর জীবনরক্ষার জন্যে প্রত্যভিচার প্রয়োগ করেন, নয়?"

"হাঁ, তাতেই গুরু আরোগ্য লাভ করেন। আর অভিনব গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগে ভবলীলা শেষ করেন। শঙ্করাচার্য্য অন্যায়কে ঠুকতে কসুর করতেন না ত, শত্রুও জুটেছিল ঢের। তান্ত্রিকদের হাতে বিপন্নও হয়েছিলেন বহুবার। কিন্তু তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কাগজটুকু ছিঁড়ে কুটি কুটি করলে!"

অন্যমনস্ক ব্রহ্মচারী এবার সচেতন হইয়া নিজের হাতের দিকে চাহিলেন। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিলেন "তাই ত, এটা ছিঁড়ে ফেললুম! তা যাক গে, এতে কি আর হোত?"

মৃদু হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "হয় ত কিছু হোত। সরল হওয়াটা ধর্ম্মার্থীর পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু ঠকে চলবার জন্যে বোকা হওয়াটা মোটে প্রার্থনীয় নয়। যা করে ফেলেছ, তার চারা নেই; কিন্তু এবার থেকে একটু সাবধান হয়ে চলো। যাও না, গঙ্গার তীরে খানিক ছুটোছুটি করে এস, দেহ মনের গ্লানি দূর হবে।"

উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "ঠিক বলেছ। সংসারী ঠাকুর্দ্দার সঙ্গও নয়, অসংসারী স্বামিজীর সঙ্গও নয়। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর কোলে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের মধ্যে দৌড় ঝাঁপ করে পাপের বোঝা নামাই গে। ওই সঙ্গে মহাশ্মশানকে প্রদক্ষিণ করে, দেহজ্ঞানটার শ্রাদ্ধ করে আসি, কি বল?"

"মন্দ কি? আর সেই সঙ্গে শ্মশান-কালিকাকে একটা নমস্কার ঠুকে বলে এসো—মা, আমার কাঁধের ভূতপ্রেত-গুলোকে নামাও। এদের উৎপাতে নিজেও জ্বালাতন হচ্ছি, অপরকেও জ্বালাতন করছি।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তাই বলব। দুয়ারটা বন্ধ করে এসে আসনে বসো।"

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারিণীও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিতে চলিলেন। তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখে তখন স্নিগ্ধ-মধুর মৃদু হাসি খেলা করিতেছিল।

পথের মোড় ঘুরিতেই ঠাকুর্দ্দার চাকরের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ হইল। দম্পতীর আহ্নিক-পূজা হবিষ্য সমাধার সময় হিসাব করিয়া, হিসাবী-বৃদ্ধ এইবার নির্ব্বিঘ্নে বাসন মাজিবার জন্য ভৃত্যকে পাঠাইয়াছেন। ব্রহ্মচারী হাসিমুখে মিষ্ট কথায় ভৃত্যকে বিদায় দিলেন।

(২২)

সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী একেবারে গঙ্গাস্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিলেন। বাহিরের রোয়াকে গোবরের মা

বসিয়া ছিল ; সে ব্যগ্র হইয়া বলিল "এই যে বাবাঠাকুর, তুমি কি মায়ের 'থান' থেকে আসছ ? ভিজে কাপড় কেন বাবা ?"

আহ্নিক পূজার সময় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মচারীর মন সেই দিকে ছুটিতেছিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন "গঙ্গাস্নান করে আস্‌ছি।"

"মায়ের থানে যাও নি ?"

"না। কেন ?"

"আমি গোবরাকে সেইখানে পাঠিয়েছি—সেই সন্নিসী ঠাকুরের কাছে। আমার ছোট নাতিটার ক'দিন জ্বর হয়েছিল ; আজ রস-তড়কা হয়ে গেঁচেখুঁচে অজ্ঞান হয়ে গেছল। তাই সেই সন্নিসী ঠাকুরের 'জলপড়া' আন্‌তে গেছে। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেনার জল পড়াতেই ছেলেটা ভাল হবে ত ?"

গোবরের মার কণ্ঠস্বরে সংশয় এবং নিদারুণ উৎকণ্ঠা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে যেন ব্রহ্মচারীর কাছে শুধু একটিমাত্র 'হাঁ' এই সমর্থনটুকু প্রার্থনা করে।

ব্রহ্মচারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিজের ব্রহ্ম-চিন্তার ব্যাকুলতা জোর করিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, স্মরণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন,—এমন অদ্ভুত কথা তিনি কাহাকেও বলিয়াছেন কি না ? জলপড়া, তেলপড়া, ধূলা-পড়ায় স্বামিজীর কতখানি দক্ষতা আছে, তার কোন সংবাদই তিনি জানেন না। মাত্র আজ দুপুরবেলা স্বামিজীর অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ পাইয়াছেন, তাতেই তাঁর চক্ষু স্থির হইয়াছে। আবার এ কি বিভ্রাট !

স্বামিজীর ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী আজ যে সংবাদ পাইয়াছেন, তার পর চোখ বুজিয়া স্বামিজীকে বিশ্বাস করা, বা অপরকেও বিশ্বাস করিতে বলা, তাঁর পক্ষে কঠিন। কিন্তু কাহারও অসাক্ষাতে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করাও তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। বরঞ্চ সামনাসামনি দোষ দেখাইয়া দিয়া আত্ম সংশোধনে কাহাকেও মনোযোগী করিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। এখন এ নিরীহ প্রৌঢ়ার প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দিবেন ? এ যে একান্ত ভাবেই তাঁর কাছে সত্য সংবাদ প্রার্থনা করিতেছে !

কষ্টে আত্মদমন করিয়া তিনি গলা ঝাড়িয়া জবাব দিলেন "দ্যাখো মা, স্বামিজীর জলপড়ার গুণাগুণ কিছু আছে কি না আমি জানি নে। তোমাদের ইচ্ছা হয় জলপড়া নিয়ে দ্যাখো ; কিন্তু ডাক্তার বৈদ্যের পরামর্শ ও—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে গোবরের মা বলিল "কিন্তু সবাই যে বল্‌ছে, টোট্‌কা টুট্‌কিই এ-সব রোগে ভাল। দৈবির অসাধ্য কর্ম্মো নেই।"

নিজের গুরুকে ব্রহ্মচারীর স্মরণ হইল। মনে মনে সসম্ভ্রমে গুরুর চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন, হায় সর্ব্বত্যাগী যোগৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ,—লোকালয়ের বহু সৌভাগ্যে, কদাচিত লোক-সমাজের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, ভগবৎ ইচ্ছার অনুকূলে, দুই দশটা শক্তির খেলা দেখাইয়া জন-সাধারণকে কি ধাঁধাতেই আপনারা ফেলিয়াছেন! সেই যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাবকে নজীর দেখাইয়া—হীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, মন্দ-স্বভাব বুজরুকের দল অবাধে গব্যঘৃতের নামে সুরা চালাইয়া নিরীহ সরল জন-সমাজকে ঠকাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে !

মনটা একেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর এই চিন্তায় একেবারে তিক্ত হইয়া আসিল! ব্রহ্মচারী সভয়ে তাড়াতাড়ি নিজের চিন্তাস্রোত রোধ করিলেন।—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন,—না, হিংসা, বিদ্বেষ, পরপীড়ন তাঁর ধর্ম্ম নয়। দুর্ব্বৃত্তের শাসন, বিচার ?—দূর হউক এ সব জঞ্জাল! কে তিনি ? কতটুকু ক্ষমতা তাঁর ? কতটুকু তিনি নির্ভুল ভাবে সত্য বুঝিয়াছেন যে, বুদ্ধির অহঙ্কারে, কর্ত্তৃত্বাভিমানে আত্মহারা হইয়া কায করিবেন ?

শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বলিলেন "সে রকম দৈববলে বলীয়ান মহাপুরুষরা কি ভুতুড়ে কীর্ত্তি জাহির করবার জন্যে সর্ব্বদা লোক-সমাজের মধ্যে আড্ডা দিয়ে বেড়ান ? তাতে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ড হয়ে যাবে যে! অবশ্য স্বামিজী এ সব 'জল পড়া টড়া' কি কতদূর জানেন,—আমি জানি নে—"

বাধা দিয়া ব্যগ্র উত্তেজিত কণ্ঠে গোবরের মা বলিল "তুমি জান না বাবা ? সে কি ? তুমি তেনাকে মাথায় করে রেকেছ বলেই ত, সবাই তেনার কাছে মাথা নোয়ায় ! নইলে কে তেনাকে চিন্‌ত ? কে মান্‌ত ?"

বটে, এতদূর! তাহা হইলে ব্রহ্মচারী নিজেই অপরাধী! অন্ধ মমতায় তিনি স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন,—

অতএব তাঁর মুখ চাহিয়াই জনসমাজ নির্ব্বিচারে অন্ধ বিশ্বাসে এই অজ্ঞাত মহাপুরুষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছে! হে গোবিন্দ—রক্ষা কর! এ কি গুরুতর দায়িত্বের বোঝা ব্রহ্মচারীর স্কন্ধে চাপাইলে!

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "ত্যাখো বাছা, আমি সবাইকেই নিজের চাইতে মহৎ বলে মনে করি, এমন কি রাস্তার শিয়াল কুকুরগুলাকে পর্য্যন্ত। কিন্তু, সে ত কোন কাযের কথা নয়। অসুখ বিসুখ ডাক্তার বদ্যিরাই বোঝে ভাল,—মামলা মোকদ্দমা উকীল মোক্তাররাই বোঝে ভাল;—যার যা কায, তাকে সেই ভার দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচয়। জলপড়া, কচুপোড়া, করবে কর,—কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তারকেও একবার দেখাও। আচ্ছা, আমার আহ্নিকের সময় উৎরে যাচ্ছে, এখন কাযে বস্‌তে চললুম। উঠে এসে তোমাদের খবর নেব।"

গোবরের মা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "গড় করি বাবা, আমার নাতিকে তুমি একটু আশীর্ব্বাদ করো, যেন ভাল হয়ে ওঠে।"

প্রতি-নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারী ক্লিষ্ট হাস্যে বলিলেন "তোমাদের অন্ধ ভক্তির অত্যাচারে আমাকেও এবার ভণ্ড জুয়াচোর করে তুলবে। সে রকম আশীর্ব্বাদ করার ক্ষমতাই যদি থাকৃত, তবে আজ এখানে বসে থাক্‌ব কেন?"

ব্যাকুল কণ্ঠে গোবরের মা বলিল "সে রকম না পারো,—যে রকম পারো, তেম্নি আশীর্ব্বাদ কর বাবা। তোমার একটা কথা শুনলেও বুকে বল হয়।"

সনিঃশ্বাসে গভীর আবেগভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন "ভগবান মঙ্গল করুন, ভগবান মঙ্গল করুন,—ছেলেটি সুস্থ হোক। ঘরে যাও বাছা। আমি কিছুই জানিনে,—"

কৃতজ্ঞ করুণ কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে কি বলিতে বলিতে গোবরের মা চলিয়া গেল। দুয়ার খোলা ছিল, ভিতরে ঢুকিয়া ব্রহ্মচারী খিল দিলেন। কাপড় বদলাইয়া নিজের আসনে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণী তার পূর্ব্বেই পূজার আসনে বসিয়া আহ্নিকে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

নিত্য-নিয়মিত কায সারিয়া যথাসময়ে ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। তিনি আজ ভাল করিয়া চলিতে পারিতে-ছিলেন না, একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রোয়াকে উঠিয়া নিজের কম্বলে বসিলেন। ডান পায়ের পেশীগুলা দুহাতে ধরিয়া সুকৌশলে এদিকে ওদিকে মোচড় দিয়া কি যেন একটা চিকিৎসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পূর্ব্বেই আসিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া ছিলেন। সামনে লণ্ঠন রাখিয়া হেঁট হইয়া তিনি দোয়াত কলম লইয়া একখানা পোষ্টকার্ড লিখিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীকে আসিতে দেখিয়া তিনি মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর খঞ্জ গমন ও পরবর্ত্তী ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিয়া হাতের কলমটা দোয়াতের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন "শ্রীচরণ-কমলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ সুরু হোল কেন?"

ব্রহ্মচারী নিজের কায করিতে করিতে উত্তর দিলেন "শ্রীকর-পদ্মের অভাবে। গঙ্গার ধারে খুব হাঁটাহাঁটি করে যখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি,—তখন এক মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে তীরস্থ করে তারা ধরে বসল "ভগবানের নাম শোনাও ঠাকুর, আমরা আর 'হড়ে কিষ্‌ণো' কর্‌তে পারছি নে।" মনে মনে বললুম—অমন সুচারু উচ্চারণ না পারাই ভাল। 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' বলে বৃদ্ধাকে ভবপারে পাঠিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরলুম। আসনে বসে পাখানি টাটিয়ে আড়ষ্ট,—আর উঠতে চায় না। জানিয়ে দিচ্ছে ওরা বড় কেউ-কেটা নয়। অত্যাচার করলে শোধ নিতে জানে।"

"কেবল আমিই শোধ নিতে পাচ্ছি নে। পায়ে একটু গরম জলের সেঁক দিয়ে দেব?"

হেঁট মুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন "রক্ষা কর, তুমি তপস্বিনী মানুষ।"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন "তপস্বিনীদেরও জীব-সেবায় অধিকার আছে। তাতে তাদের আত্মিক কল্যাণ ঘটে।"

"সেটা ক্ষেত্র-বিশেষে। এ সব ক্ষেত্রে 'ফলং মড়কং ভবেৎ।'—সেবার কাঙাল হবার মত অবস্থা এখনো ঘটে নি। চিন্তা কি? বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যদি টিকে থাক, তবে সেবার অধিকার পাবে, নির্ভাবনায়।"

কলমটা পুনশ্চ তুলিয়া লইয়া, আলোর কাছে ঝুঁকিয়া নিবের ডগাটা এক-টুকরা কাগজে পরিষ্কার করিতে করিতে মৃদু হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, না?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "নিঃসন্দেহে! গোল্লায় ত গেছিই, —জাহান্নম পর্য্যন্ত পৌঁছুবার সখ নেই। সেবার হুজুগে সীমাতিক্রম করবার দুঃসাহসিক উৎসাহ তোমার প্রায়ই দেখতে পাই। এমন অকালকুষ্মাণ্ড হচ্ছ কেন?"

তার পর হাতের কায স্থগিত রাখিয়া, একটু ভাবিয়া পায়ের পীড়িত স্থানটার উপর সজোরে চপেটাঘাত করিলেন। তার পর ঘাড়ের নীচে দুহাত রাখিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া বলিলেন "ছেলেবেলায় কুস্তির ওস্তাদের কাছে কতকগুলো প্যাঁচ কসরৎ শিখেছিলাম, এগুলো প্রয়োগ করলে ব্যথায় বেশ উপকার হয়। এ মুষ্টিযোগগুলো শিখে রেখো, নিজের পায়ে ব্যথা হলে—"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "মাপ কর। আমার পায়ে ব্যথা হয়েও কায নেই, মুষ্টিযোগেও কায নেই। অমন জোর মুষ্টিযোগ ঝাড়্‌লে, আমার পা আস্ত থাক্‌বে না।"

"না হয় ভাঙলই। তাতে কি? তা বলে মুষ্টিযোগ প্রয়োগে নিরুদ্যম হওয়াটা ভাল কথা নয়। জ্ঞানীরা ঠিকই বলেছেন,—যৌবনের বুদ্ধিটা অতিশয় পঙ্কিল—মলিন।"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "মুমুক্ষুদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সৎসঙ্গ, ঈশ্বর-ভক্তি আর আসক্তি-কর আলোচনায় একদম—নির্ম্মম হওয়া।"

"অর্থাৎ আমার বচন-বাজীর ওপর কটাক্ষ হচ্ছে, বুঝতে পারছি। চিঠিখানা চলছে কোথা?"

"কাশীতে। মার কাছে।"

"কদিন আগে তাঁর চিঠি এসেছিল নয়? এখন ভাল আছেন ত।"

তার পর মাতার ভগ্ন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। মাতা কাশীতে তাঁর এক কাশী-বাসিনী বৃদ্ধা পিসিমাতার কাছে অবস্থান করিতেছেন, শীঘ্র দেশের দিকে তাঁহাদের ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার লোক সেখানে নাই,—সেজন্য তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া বিদেশ বাস অন্য আত্মীয়স্বজনরা পছন্দ করিতেছেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা হইল।

উপসংহারে ব্রহ্মচারিণী সহসা বলিলেন "আমায় দিন-কতক ছুটি দাও না,—মার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি।"

কথাটা তিনি সহজ ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিবার সময় কি একটা অজ্ঞাত কারণে আপনা আপনিই তাঁর দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল। নিজের কাপড়ের কোঁচকান ফুঁপিটা অকারণে বার বার টানিয়া সোজা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর স্বচ্ছ-সরল উৎফুল্ল মুখখানা সহসা একটু ম্লান হইয়া গেল। অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ছুটির দরখাস্ত আমার কাছে কেন? কর্ত্তাদের কাছে পেশ করে ছাখো।"

"সে ত করবই। তোমার মতটা আগে জানা চাই।"

পুনরায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমার মতও নেই, অমতও নেই। যেতে ইচ্ছে হয়, যাও। বাধা দেব না—এই পর্য্যন্ত।"

"বাধা দেওয়াটা অত্যন্ত স্থূল ব্যাপার। কিন্তু মত দেওয়াটা তার চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম জিনিস।"

একটু চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "অভিমানের সুরাপানে মন একেই মাতাল,—তাকে আর কোন বিষয়ে লিপ্ত করে অনর্থ সৃষ্টি করতে সাহস হয় না।"

হাই তুলিয়া, দু হাতে মুখ আড়াল করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "নির্লিপ্ত হয়ে থাক্‌তে পারলে ত সব গোলই চুকে যেত। তা হতে পারছ কই? সেইজন্যেই ত—" বলিয়া থামিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন "রাত হয়ে যাচ্ছে। ফলটল নিয়ে আস্‌ব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "না, আর একটু হোক। গোবরের মার নাতিটির একবার খবর নিয়ে আসি। কিন্তু সেই জন্যেই ত'—কি বলছিলে?"

ব্রহ্মচারী উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "আমাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে দিনকতক পাটনায় ঘুরে এস না।"

অদ্ভুত প্রস্তাব! আশ্চর্য্য হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমি পাটনায় ঘুরতে যাব? অপরাধ?"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে বলিলেন "ভ্রমণশীল যোগী, আর বহমান স্রোতের জলই নির্ম্মল বিশুদ্ধ থাকে। এক জায়গায় অনেক দিন থাকা গেছে, কেমন যেন একটা মায়া জড়িয়ে আস্‌ছে। এবার একবার ঘুরে ফিরে বেড়ানো দরকার।"

কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী সনিঃশ্বাসে বলিলেন "অর্থাৎ, মায়ামুগ্ধ মনটাকে শাস্তি দিয়ে উদাসী

করে তোলা কর্ত্তব্য ? পরামর্শটা উপেক্ষনীয় নয়। নিজের শিথিলতা-ক্রটি অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে, দিব্য মনের সুখে দিন কাটছে,—এর পরিণাম ভাল নয়। আমার এবার খুব খানিকটা সাজা পাওয়া দরকার। তোমারও দিন-কতক এই দন্ত-নিষ্পেষণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া উচিত। তাতে দুজনেরই উপকার হবে।"

ব্রহ্মচারিণী অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। শুধু একটা চাপা মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন। তার পর সহসা যেন নিজেরই কোন একটা গোপন দুর্ব্বলতাকে ব্যঙ্গ করিয়া সহাস্যে বলিলেন "কিন্তু তারপর ? বিরহের ব্যাপ্ত রূপে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখ্তে হবে না ত ?"

মৃদু অনুযোগের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কি ঠাট্টা কর ব্রহ্মচারি, লজ্জা করে না ? গোবরের মার খবর নেবে ত যাও-না এই বেলা।"

"যাই—" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন। পায়ের ব্যথার দিকে তিনি আর মনোযোগ দিলেন না ; কিন্তু ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বের চেয়ে কম হইলেও—এখনও তিনি অল্প খোঁড়াইতেছেন।

বাহিরের দুয়ার খুলিতে খুলিতে অন্যমনে তিনি গান ধরিলেন—

"চিন্তা করো না রে আর।
দেখিয়ে সামান্য নদী, এতে ভয় করিলি যদি,
ভবনদী কিসে হবি পার।
সে যে প্রবল বিষম নদী দুকূল পাথার।"

ওই পর্য্যন্ত, আর নয় !

একান্ত পুরাতন পরিচিত সঙ্গীত,—কণ্ঠস্বরও ওই একান্ত পরিচিত উদাসীনের উদাস কণ্ঠই বটে ! কিন্তু এ কোন্ চিন্তা-পীড়িতের চিন্তা দূর করিবার আয়োজন ? কোন্ মমতার প্রতি নির্ম্মম তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া, কোন্ ভয়ার্ত্তকে অভয় দিবার জন্য সাড়ম্বর উৎসাহ ?

ব্রহ্মচারিণীর অচঞ্চল শান্ত চিত্তাকাশে, জীবনে বুঝি আজ প্রথম—একটা ক্ষোভের কুয়াসাচ্ছন্ন মলিন মেঘ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে—গুরুগুরু গর্জ্জনে, দূরে—অতি দূরে যেন বজ্রনির্ঘোষের শব্দও শোনা গেল। একটা সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি সবলে নিজেকে সংযত করিয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া কাযে মন দিলেন।

ব্রহ্মচারীর ফিরিতে বেশ একটু বিলম্ব হইল। দুয়ারে খিল দিয়া, কুয়াতলা হইতে পা ধুইয়া আসিয়া তিনি নিজের কম্বলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গম্ভীর।

ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিয়া বলিলেন "এবার ফল দুধ দিই ?" "দাও।" সংক্ষিপ্ত উত্তর। আহার্য্য আসিল ! যথারীতি নিবেদন করিয়া নীরবে আহার শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী আঁচাইয়া আবার কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারীর হাতে হরিতকী দিয়া ব্রহ্মচারিণী এঁটো বাসনগুলা তুলিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন,—ব্রহ্মচারী সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "আজ বিকালে স্বামিজী আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন ?"

চমকাইয়া উঠিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "হ্যাঁ, গোবরের মার কাছে শুনে এলে বুঝি ?"

অপ্রসন্নভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন "যার কাছেই শুনি। তুমি ত বল নি আমায় !—"

অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে বলিলেন "শ্রান্ত হয়ে এসে শুয়েছ, তোমার বিশ্রামের সময়টুকু বিষিয়ে তুলব ? হয় ত রাগের মাথায় রাত্রের আহার নিদ্রাই ছেড়ে দিতে !"

"এই ত শুনে এলুম। আহারে অরুচির প্রমাণ পেলে ?" একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সেটা বাইরের লোকের মুখে শুনেছ বলে। আমার মুখে শুন্লে মেজাজ সদ্যঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। এখনি সমারোহ করে আমার আত্মশ্রাদ্ধ জুড়ে দিতে !"

সহসা ব্রহ্মচারীর মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল। আলোচ্য প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া,—একটু উন্মনা হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, আমি তোমায় বড় বকি, না ? তুমি চলে গেলে—এই সব দুর্ব্ব্যবহারের জন্যে আমার কিন্তু, মন কেমন করবে। আজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতেও ভারী মন কেমন করেছে।"

ব্রহ্মচারিণীর ওষ্ঠাধর ক্ষণিকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া, এঁটো বাসনগুলা তুলিয়া লইতে লইতে পরম নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন "তার জন্যে এখন থেকে

শোকে অভিভূত হয়ে কি কর্‌বে বল? এখন ভূত ভবিষ্যতের শোক দুঃখ রেখে বর্ত্তমানে—স্বামিজীর ব্যবহারে মন দিলে—”

ব্রহ্মচারী যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “হাঁ হাঁ বল, আজও তিনি তেম্নি নিঃশব্দে সাড়া না দিয়ে বাড়ী ঢুকেছিলেন? এটা তাঁর সুবিবেচনার কায হয় নি। যে সমাজের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে, সে সমাজের চোখে এ রকম ঠাট্টা তামাসাগুলা—”

“গৌরবের ব্যাপার নয়, বরং আশঙ্কাজনক।” সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচারিণী চুপ করিলেন।

কথাটা ব্রহ্মচারী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে গোবরের মার কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীর জন্য দুয়ারের খিল খুলিয়া রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণী পূজার ঘরে গিয়া যথারীতি আসনে বসিয়াছিলেন। সহসা স্বামিজী আসিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্যাপারটা নিজের বাড়ী হইতে লক্ষ্য করিয়া গোবরের মা তাড়াতাড়ি এ-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছে। কর্ম্ম-তৎপর স্বামিজী ততক্ষণে ব্রহ্মচারীর শোবার ঘর পরীক্ষা করিয়া, ব্রহ্মচারিণীর শয়ন-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। বোধ হয়, সে ঘরখানাও তদারক করিবার ইচ্ছা ছিল। মাঝখান হইতে গোবরের মা আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়। ব্রহ্মচারীর অনুপস্থিতি, ব্রহ্মচারিণীর আসনে অবস্থান,—বৃত্তান্তটা জানাইয়া অভ্যর্থনা-লাভেচ্ছু স্বামিজীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেয়। বিদায়-অভিনন্দনের ফাঁকে স্বামিজী যথাযোগ্য সহৃদয়তার সহিত গোবরের মায়ের পারিবারিক কুশল প্রশ্ন করিয়া নাতিটি পীড়িত জানিয়া, নিজে জলপড়া দিবার প্রস্তাব করেন। সুতরাং গোবরকে তার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এতক্ষণে গোবর জলপড়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলের অকল্যাণ হইবার ভয়ে জলপড়া অবহেলা করা হয় নাই বটে, কিন্তু ডাক্তারী ঔষধও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ছেলে এখন ভাল আছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ওই জলপড়ার দক্ষিণা সম্বন্ধে স্বামিজী এমন উদারতার সহিত ত্যাগ স্বীকার জানাইয়াছেন যে, অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র গোবর্দ্ধন বেচারা বিস্ময়ে, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী যে সাক্ষাৎ দেবতা, সে বিষয়ে তার মায়ের যত সংশয় এবং উদ্বিগ্নতাই থাক,—ভক্ত-প্রবর গোবর্দ্ধনের আর তাতে কোন সন্দেহই নাই। পরিবারবর্গের দায়িত্ব স্কন্ধে না থাকিলে সে আজই দশ আনা পয়সা খরচ করিয়া ভজা কামারের কাছে একটা লোহার ত্রিশূল গড়াইয়া ফেলিত, এবং একটা গাঁজার কলিকা সংগ্রহ করিয়া, পূরা সন্ন্যাসী হইয়া, স্বামিজীর শিষ্যত্বে আত্ম-নিবেদন করিয়া দিত—এমন মহৎ সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। স্বামিজীও না কি তার এই সাধু প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন!

এ-সব সংবাদের উত্তরে ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে শুধু হাসিয়া আসিয়াছেন মাত্র। স্বামিজীর আপত্তিকর ব্যবহারের স্মৃতিগুলা কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর মনকে পীড়া দিতেছিল। সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, করুণার সহিত স্বামিজীকে মিত্রের দৃষ্টি দিয়া দেখিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু অলক্ষিতে একটা শঙ্কাজনক দুশ্চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করিয়া দিতেছিল। চিত্তের এই দ্বন্দ্ব আন্দোলন প্রকাশ করিতে বা স্বামিজীর বিষয় লইয়া স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিতেও তাঁর শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। ব্রহ্মচারিণীর বাক্যাবলীর মধ্যে লুকোচুরির প্যাঁচ নাই, হেঁয়ালির কুয়াসা নাই,—আলোচনা-স্থলে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য মোসাহেবী ছন্দে আলাপ করিবার পাত্রী তিনি নহেন। কোনও বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সেটা প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং দুঃখের বিষয়, প্রায়ই ব্রহ্মচারীর ভাগ্যে অদূর ভবিষ্যতে সেই মন্তব্যটাই অতি নিষ্ঠুরভাবে সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়ায়! যথা—স্বামিজীর বশীকরণ-শক্তি প্রভৃতি কুহক-বিদ্যা-প্রতাপ!—সিগারেটের বাক্সের ভিতর হইতে স্বামিজীর স্বহস্ত-লিখিত সাক্ষ্য আত্ম-প্রকাশ করিবার বহু পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারিণী,—সেই আসন্নপ্রসবা নারী ও তাহার উপপতিকে গৃহে স্থান দিবার জন্য স্বামিজীর অনুরোধ জানিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘তিনি এখনও স্বামিজীর বশীকরণ-বিদ্যা প্রভাবে অভিভূত হন নাই,—তাঁর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইতে এখনও বিলম্ব আছে।’—প্রকারান্তরে ইহা ব্রহ্মচারীর বশ্যতা-স্বীকার-সূচক আচরণের

প্রতি কটাক্ষ! সুতরাং ব্রহ্মচারী রাগিয়া উঠিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই এবং ব্রহ্মচারিণীকে অপমানসূচক বাক্যে তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ সে স্মৃতিও ব্রহ্মচারীকে লজ্জিত ও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্রহ্মচারিণীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের উত্তরে দুশ্চিন্তা-বিব্রত ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "কিছুই বুঝতে পারছি নে। স্বামিজী ক্রমশঃ আমায় ভাবিয়ে তুলেছেন।"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন "আমাকেও।"

ব্রহ্মচারী বিমূঢ়ের মত বলিলেন "তোমাকে? কেন?"

অধিকতর ধীর স্বরে উত্তর হইল "তাঁর প্রচণ্ড কুহক-শক্তিস্রোতের মুখে পড়ে, অসামান্য শক্তিশালী গজরাজকে ওলট্ পালট্ খেতে দেখে! ব্রহ্মচারি, সাবধান! তোমার সামনেই ভীষণ সঙ্কট!"

(ক্রমশঃ)

হাইতি

শ্রীভারতকুমার বসু

হাইতি হচ্ছে প্রজা সাধারণের দ্বারা চালিত একটা দ্বীপ। কিন্তু এটার রক্ষা-ভার গ্রহণ ক'রে আছে আমেরিকা। ক্যারিবিয়ান্ সাগরের উপর এই দ্বীপটা অবস্থিত।...

'হাইতি' কথাটার অর্থ হচ্ছে 'পার্ব্বত্য'। উক্ত দ্বীপের 'হাইতি'—এই নামকরণ ক'রে যায় তারা, যারা

বিভিন্ন-আকৃতি মৃৎ-পাত্রের বেসাতি।

ছিল সেখানকার আসল অধিবাসী। তাদের বলা হ'তো "কারিব্"। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস্ হাইতির নতুন নাম দিলেন—'হিস্পানোলা'। কিন্তু পরে 'হিস্পানোলা'ও ব'দলে গিয়ে দাঁড়ালো—"সেণ্ট্ ডোমিংগো" ও "স্যাণ্টো ডোমিংগো"-তে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বীপটা তার পূর্ব্ব নাম—হাইতি ই আবার ফিরে পায়।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস্ হাইতি দেশটাকে আবিষ্কার করেন। সেই সময় ওই দেশটা পাঁচটা "ষ্টেটে" বিভক্ত ছিল। পাঁচটা "ষ্টেট্" সর্ব্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। এর ই সুযোগ নিয়ে স্প্যানিয়ার্ডরা দেশটাকে সদলবলে আক্রমণ ক'রলে এবং দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে নির্ম্মম অত্যাচারের দ্বারা

একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেললে। এই অর্দ্ধেক লোকের স্থান তারা পূর্ণ ক'রলে—আফ্রিকা থেকে অগণন নিগ্রোকে সেখানে আনিয়ে। সেখানকার বাকী জীবিত অর্দ্ধেক লোককে তারা ক্রীতদাসের মতো নিস্তেজ ক'রে রাখলে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্প্যানিয়ার্ড্‌রা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই তাদের অধিকৃত রাজ্য ভোগ ক'রলে। কিন্তু উক্ত সালে ফরাসীরা হাইতির মধ্যে এসে ঢুকলো। তারা অবিলম্বে দেশটাকে এক রকম হস্তগত ক'রে ফেললে এবং তার নতুন নাম দিলে—"সেণ্ট্ ডোমিংগো"। এই ভাবে হাইতির মধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের দেহে- আসল ইণ্ডিয়ান,

কৃষক-পরিবার।

নিগ্রো, স্প্যানিস, ফরাসী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির বিমিশ্র রক্ত ছড়িয়ে যেতে লাগলো। ১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী-দেশে বিপ্লব বাধ্‌লো, তখন হাইতির অধিবাসীরাও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। প্যারিসের জাতীয় সঙ্ঘ অবিলম্বেই হাইতিকে সমস্ত স্বাধীন অধিকার দিলে। কিন্তু তাতে গণ্ডগোল বাধলো সেখানকার অধিবাসী ও ফরাসী জমীদারদের মধ্যে। তখন ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালে। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের শেষাশেষি হাইতিতে ইংরেজরা প্রথম প্রবেশ ক'রলে।

তাতে দেশ ভয়ানক ক্ষেপে উঠল। টুসেণ্ট্ উভার্‌চার্ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে চালিত হ'য়ে হাইতিয়ানরা দিলে শীগ্‌গিরই ইংরেজ ও স্প্যানিয়ার্ড্‌দের দেশ থেকে তাড়িয়ে —ফরাসীরাও হাইতি থেকে পালিয়ে যেতে পথ পেলে না। কিন্তু গোলমাল একবার বাধলে, বড় সহজে তা শান্ত হয় না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাইতি দেশের কেবল বিদেশী শক্তির সঙ্গে কলহ, ষড়যন্ত্র, হত্যা, বিগ্রহ ইত্যাদির ভীষণতা ফুটে উঠতে লাগলো। এই সব রাজনৈতিক অপ্রীতিকর ব্যাপারের জন্য শেষে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে আমেরিকা নিজে এর বিহিত করবার জন্য হাইতিতে এসে উপস্থিত

নদীর ধারে কাপড় কাচছে।

হ'লো। আমেরিকান্‌রা পাশবিক দমননীতির দ্বারা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি হাইতিকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে এবং তার পর থেকেই হাইতির রক্ষক স্বরূপ হ'য়ে রইল। হাইতির অধিবাসীদের—ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিস, রাজনীতি—সমস্তরই অধিকার আমেরিকান্‌দের হস্তগত হ'য়ে গেল।...সেখানকার গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত নিম্ন-পদস্থ চাকুরে যারা, তারা সকলেই নিগ্রো। কখনো তাদের উপর ডাকঘর ঝাড়ু দেবার কাজ দেওয়া হয়।

কখনো তাদের পিঠে ক'রে 'কফি'র থলি 'কাষ্টাম্ হাউসে' ব'হে নিয়ে যেতে হয়। কখনো কখনো বা সেখানকার দিয়ে তাদের জিম্মায় প্রচুর অর্থ অন্যত্র পাঠানো হয়। বছর কয়েক আগেও এইভাবে অর্থ পাঠানো হ'তো। কিন্তু

পোর্ট-আউ প্রিন্সে দোকানের সারি।

"ভুডু" অর্থাৎ সর্প-দেবতার মন্দিরে যাবার দুয়ারের পাশে ব'সে র'য়েছে।

জ্যাকমেল্ ও পোর্ট্-আউ-প্রিন্স্ নামক দুটী স্থানের মাঝখান দিয়ে যে বিজন বন-পথ চ'লে গেছে, তার উপর দুঃখের কথা এই যে, ওই সব লোক সাধারণ-জীবনে বেশ সরল ও নির্লোভ-প্রকৃতি হ'লেও, অর্থের থলির ঝুণুঝুণু ঝঙ্কারে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠতো অসাধারণ, অদম্য লোভ। প্রায়ই দেখা যেতো, উক্ত লোকদের দ্বারা অর্থের থলি পথের মধ্যে থেকেই লোপাট্ হ'য়ে গেছে। হাইতির সহুরে লোকদের দায়িত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের এইটী হচ্ছে অন্যতম নমুনা। সেখানকার পল্লীবাসী চাষাদের প্রকৃতি কিন্তু একেবারে ভিন্ন। তারা হচ্ছে খাঁটী লোক এবং রীতিমত বিশ্বাসী। তাদের সম্বন্ধে এক ভ্রমণকারী এই রকম লিখেছেন—

"সেখানকার পল্লীগ্রামগুলিতে বেড়াবার সময় আমি অনেক যায়গাতেই থেমে রাত্তিরটায় থাকবার জন্য আশ্রয় চেয়েছিলুম। কিন্তু একবারও কোনো গৃহস্বামী-ই,—যত গরীব-ই সে হোক না কেন, আমার সুখ-সুবিধার জন্য আমাকে কোনো অর্থ-ই মূল্যস্বরূপ দিতে দেয় নি। বিদায় নিয়ে আসবার সময় আমি গৃহস্বামীদের উপহার দিতুম। কিন্তু আমার সে দেওয়া হ'তো—মানুষ মানুষকে যেমন দিয়ে থাকে। আমার উপহার দেওয়াটাতে—আমার আশ্রয় পাবার মূল্যের পরিবর্ত্তে কোনো জিনিষকেই বোঝাতো না।"

হাইতির পাড়াগাঁয়ের চাষারা যে প্রত্যেকেই এক-একটী ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, এ কথা ব'ললে ভুল বলা হবে। কিন্তু

তা ব'লে এটা যুক্তিযুক্ত নয় যে, তাদের "যুধিষ্ঠির" ক'রে তোলবার জন্য তাদের প্রতি দেখাতে হবে প্রাণঘাতী, নির্ম্মম অনুশাসন। হাইতি-ভ্রমণকারী মিঃ এইচ্, হেস্‌কেথ্ প্রিচার্ড লিখেছেন—"হাইতির এক পাড়াগাঁয়ে ভ্রমণ করবার সময়ে একদিনকার একটা ঘটনার কথা আমার মনে প'ড়ছে। সেদিন বিকেলে সেখানকার এক জেনারেলের হুকুমে একটা লোককে বন্দুকের গুলিতে মেরে ফেলা হ'লো। ব্যাপারটা সাংঘাতিক এমন কিছুই হয় নি। মাত্র একটা গরু চুরী যায় এবং সেই নিহত হতভাগ্যেরই উপর যত সন্দেহ এসে পড়ে। আমি জানি না, সে বাস্তবিকই দোষী ছিল কি না,—হয় ত তার উপর সন্দেহ অমূলকই ছিল;—কিন্তু তাকেই গুলি করা হ'লো। সেখানকার এক নেটিভ্ আমাকে ব'লেছিল যে, ওইভাবে গুলি করার ফলে, সেখানে অনেক বছর ধ'রে চুরীর আর কোনো ভয় থাকবে না!"

হাইতির পল্লীগ্রাম অঞ্চলে উক্ত "জেনারেল্"রাই হচ্ছেন সেখানকার লোকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ওই সব জেনারেল্ পল্লীবাসীদের উপর অসাধারণ অধিকার ও প্রভুত্ব রাখেন অনেক বছর পর্য্যন্ত। এই সব দারুণ শক্তিধারী জেনারেলের কথার একটু নড়্‌চড়্ করে কার সাধ্যি! সাধারণতঃ উক্ত জেনারেলের পদ পেতে হ'লে, কোনো লোকেরই বিদ্যা তত না থাকলেও চলে। তবে তাঁকে গোঁয়ার ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি হ'তেই হবে! যোহানিস্ মেরিসিয়ার নামে কয়লার মতো কালো একটা নিগ্রো একবার এই জেনারেলের পদ পায়। সে কিছু প'ড়তেও জানতো না, অথবা লিখ্‌তেও পারতো না। কিন্তু সে তার কাজ বেশ ভাল ভাবেই চালিয়ে যেতো; কারণ, কোনো লোক তার সম্বন্ধে কিছু লিখলে, সে সেই লেখাটা অপর এক ব্যক্তিকে দিয়ে পড়িয়ে নিতো। সে লেখার মধ্যে লেখক যদি আভাসেও জেনারেলের উপর কোনো চাতুরী দেখাতো, তা হ'লে তার দুর্গতির সীমা থাকতো না।...

এই সব জেনারেলের প্রত্যেকেরই অনেকগুলি ক'রে স্ত্রী থাকে। স্ত্রীদের সংখ্যা দুই থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচেরও বেশী হয়। উক্ত জেনারেলরা মাহিনা পায় খুবই অল্প। সে মাহিনা আবার একেবারেই সময় মতো পাওয়া যায় না। তাদের মাহিনার পরিমাণ বড় জোর বার্ষিক ১৪০ পাউণ্ড। কিন্তু আগেই বলা হ'য়েছে, এ মাহিনা তারা সময় মতো একেবারেই পায় না। কিন্তু তা সত্বেও, তাদের হাতের মুষ্টি কখনো শূন্য থাকে না। তা রীতিমতই ভ'রে থাকে সেই সমস্ত নিরীহ, দুর্ব্বল লোকের কষ্টে-

পথের ধারে ঝর্ণার স্নিগ্ধ ধারা

পোর্ট-আউ-প্রিন্সের একটা রাজপথ।

অর্জ্জন-করা অর্থের দ্বারা, যাদের শাসন করবার জন্যই উক্ত জেনারেলরা এসেছে।

হাইতির প্রত্যেক পল্লীগ্রাম একটা মাত্র জেনারেলের দ্বারা পরিচালিত হ'লেও, সেখানকার সহরগুলিতে আছে প্রায় দু শ'টা জেনারেল। এই দু শ'টা জেনারেলের

অধিকাংশই অনুশাসনের অনেক ক্ষমতা হ'তেই একেবারে বঞ্চিত। তারা কেবল নামেই জেনারেল। কতকগুলি জেনারেলের কেবল পদ-সম্ভ্রমই সর্ব্বস্ব। হাইতির রাজকীয় কাজে যে-যে ব্যক্তি সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারবে, সেই-সেই ব্যক্তিই "ষ্টেটে"র দ্বারা "জেনারেলে"র পদ-সম্ভ্রম পাবে। এইখানে এ-কথা অবশ্যই ব'লে রাখা দরকার যে, জেনারেলের পদ যে রকমই হোক না কেন, এর দ্বারা অর্থ পদ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ পদ পেলেও, আইনজীবীর পেশা তাঁরা অনায়াসেই পেতে পারেন। একমাত্র রাজনীতির চর্চ্চাতেই জীবন কাটাবার মতো লোকের সংখ্যা সেখানে অতি—অতি অল্প।...রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সেখানকার মতো গরম দেশেও এনামেল্‌যুক্ত খড়ের টুপী মাথায় পরেন, এবং গায়ে চড়ান ফ্রক্‌-কোট্‌ ও কালো রঙের পা-জামা। এই সব রাজনৈতিক ব্যক্তি,—হাইতিতে

পোর্ট-আউ-প্রিন্সের একটী বিখ্যাত গির্জ্জা ও তার সম্মুখস্থ স্থানেরই দৃশ্য।

হাইতির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট্‌—এ্যাণ্টনি সাইমন
ইনি যখন সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ ক'রেছিলেন, এই ফটোটী তখন তোলা হয়।

অর্জ্জন করা যায়—রীতিমত দুই পকেট বোঝাই ক'রে; এবং হাইতিতে যে ব্যক্তি জেনারেলের পদ লাভ ক'রতে পারেন না, সারা জীবনেও তিনি কোনোদিন অর্থের মুখ দেখতে পান না।...

সেখানকার রাজনৈতিক ব্যক্তিরা প্রায়ই জেনারেলের আমেরিকান্ শাসনের পূর্ব্বে,—যথেষ্ট সম্মানজনক পদ পেতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মন্ত্রীত্বের সম্মান লাভেও বঞ্চিত হ'তেন না। কিন্তু হায়, এ সম্মান কেবল সম্মানই হ'তো। এর দ্বারা কোনো বিশেষ শক্তি দেওয়া হ'তো না। তাই বোধ হয়, তখন সেখানকার

রাজনৈতিক মন্ত্রী দিব্যি আরামে নিশ্চিন্ত মনে রাত্তিরে ঘুমোবার পর, সকালে চোখ মেলে চাইতেই দেখতে পেতেন, তাঁর চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে—অস্ত্রধারী বিস্তর সৈন্য,—তাঁকে জেলখানার ফাটকে উচ্চ ক'রে দিতে পারতো না। কারা-ভোগের সময়ও উক্ত রাজনৈতিকরা তাঁদের পেটেণ্ট করা খড়ের টুপী এবং ফ্রক্-কোট খুলে ফেলতেন না। প্রায়ই দেখা যেতো, জেলখানার মধ্যে অত্যন্ত-ময়লা-হ'য়ে-যাওয়া উক্ত টুপী এবং

হাইতির রাজধানী পোর্ট-আউ প্রিন্সের একটী প্রধান পথ। এখানকার সমস্ত বাড়ী-ই কাঠের তৈরী।

হাইতির একটী "জেনারেল্" (কিছু বছর আগেকার)। এঁর নাম জেনারেল্ জেফিরিণ্।

পথিক
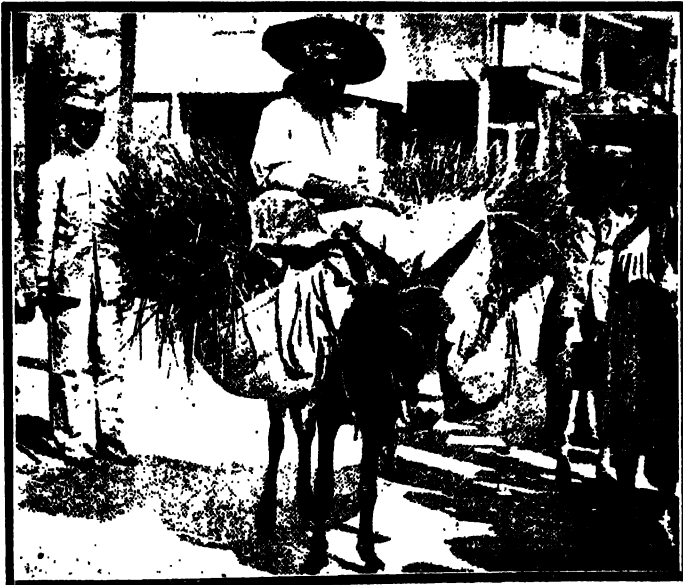
আটক করবার জন্য; এবং এ আটক তিনি অল্প সময়ের মধ্যে হ'তেন-ও। তাঁর 'মহাসম্মাননীয়' মন্ত্রীত্বের পদ কিছুতেই তাঁর ভাগ্য থেকে কারাদণ্ড-ভোগের কৃষ্ণ টীকাকে কোট প'রে, দু বছরেরও বেশী সময় পর্য্যন্ত জেল-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে, কাতরভাবে হাতে-বাঁধা লোহার শিকল আন্দোলন ক'রে উক্ত রাজনৈতিক বন্দীরা ক্ষিদের জ্বালায়

জেলখানার নোংরা আহার্য্যকে পাবার জন্য বারবার প্রার্থনা ক'রছেন।

জেলখানার মধ্যে অপরাধীরা কলের সাহায্যে ধোলাইয়ের কাজ ক'রছে।

মুরগীর লড়াই। লড়াইয়ের বিচার ক'রবেন তিনি, যিনি সামনেকার ওই চেয়ারে ব'সে র'য়েছেন। লড়াই যাঁরা দেখছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুলিসের লোক। এই রকম মুরগীর লড়াই দেখে হাইতির লোকেরা আমোদ পায় প্রচুর।

হাইতিতে গুড় থেকে এক রকম মদ তৈরী হয়। সেখানকার প্রত্যেক লোকেরই উপর এই মদের প্রভাব অসাধারণ।

বিগত দিনে হাইতির প্রধান সহর—পোর্ট্ আউ প্রিন্স্-এ মাত্র একটী খুব ছোট হোটেল ছিল। এই হোটেলটীর চারিদিকেই থা ক তো অনেকগুলি জানালা। বাইরে থেকে দাঁড়কাকের মতো এই জানালার ভিতর দিয়ে বালক-চোরের দৌরাত্ম্যের তাই সুবিধা হ'তো বিশেষ রকম। যদি কোনো খরিদ্দার ওই রকম কোনো জানলার ঠিক পাশে ব'সে খেতে আরম্ভ ক'রতেন, তা হ'লে, অবিলম্বেই তিনি দেখতে পেতেন, বাইরে থেকে একটী নিগ্রো-বালকের কয়লার মতো কালো একখানা হাত সেই জানলার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এল এবং চকিতের মধ্যেই সেই হাত তাঁর প্লেটের উপর থেকে খাবার তুলে নিয়ে বাহিরের পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

উক্ত হোটেলে সকাল সাড়ে আট-টায়, কি, ন'টার সময় রাজনৈতিক এবং জেনারেলদের ভীড় হ'তো। তাঁরা কিন্তু নিশা-ভঙ্গের স্বল্প আহারে সন্তুষ্ট হ'তেন না। তাঁরা তাঁদের উদর-গুলিকে পূর্ণ ক'রে নিতেন—যথেষ্ট পরিমাণ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় দিয়ে—আনন্দের সঙ্গে। এই আনন্দ-ক্রিয়া সম্পাদনের পর তাঁরা বেরিয়ে প'ড়তেন, এবং বিভিন্ন প্রকারের তর্কের আসরে মস্‌গুল্ হ'য়ে মস্তিষ্কের 'প্যাচ্' ক'ষ্‌তেন। তার পর কিছুক্ষণের জন্য পরিশ্রমের ইতি ক'রে, দুপুর বেলায় 'খানা'র আগে একটু 'চাঙা' হ'য়ে নেবার জন্য সুরাসারের (spirit)

দোকানে একবার 'ঢুঁ' মেরে যেতেন। তখনকার দিনে হাইতিতে পানীয় স্পিরিট্ পাওয়া যেতো প্রচুর পরিমাণে।

শোনা যায়, বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেক্‌জাণ্ডার ডুমা-র দেহে না কি হাইতিয়ান্ রক্তের গন্ধ ছিল (The great French novelist, Dumas, had some Haitian blood in his veins)।

হাইতির লোকেরা কোনো কিছু জিনিষ ভবিষ্যতে পাবার আশা রাখে সু-প্রচুর। যদি কোনো হাইতি-বাসীকে

পথের উপরে জেনারেল্ হিপ'লিটের স্মৃতি-উদ্দেশ্যে স্থাপত্য-শিল্প। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি হাইতির প্রেসিডেণ্টের পদ পান।

কোনো পাশ্চাত্যের লোক বলেন যে, তাঁর দেশে জলাধার রাখবার এমন চমৎকার বন্দোবস্ত করা আছে যে, তার দ্বারা দেশের সমস্ত যায়গাতেই খাবার জল সুন্দরভাবে সরবরাহ হ'তে পারে, তা হ'লে সেই হাইতি-বাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের দেশে-ও ওই রকম জলাধার রাখবার ব্যবস্থা করা হবে!"—সেখানকার লোকেরা মনের মধ্যে একটী দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, ভবিষ্যতের জন্য তারা যা আশা করে, একদিন সে আশা পূর্ণ হবেই হবে! বাস্তবিক পক্ষেই, তাদের আশা কখনো বিফল হয়ও না।

হাইতির একটী ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানকার একটী পূজার নাম—"ভুডু"র পূজা। "ভুডু"র পূজা অর্থে 'সাপের পূজা' বোঝায়। এই অদ্ভুত পূজার ব্যাপার সেখানে আমদানী হ'য়েছে—আফ্রিকা থেকে "মনৃডঙ্গো"-জাতীয় নিগ্রোদের দ্বারা। এই পূজার প্রভাব আজও সেখানে রীতিমত-ই ছড়িয়ে আছে। এমন কি, সেখানকার রাজধানী—"পোর্ট্-আউ প্রিন্স্" সহরেও এই পূজা ব্যাপারটীকে মেনে চলা হয় যথেষ্ট

কফির মটর (coffee beans) বাচছে।

ভয়-ভক্তির সঙ্গে। সহরের মধ্যে এই পূজা উপলক্ষে সাদা মুরগী বলি দেওয়া হয়, এবং পাড়াগাঁয়ে বলি দেওয়া হয় কালো রঙের ছাগল।

এই "ভুডু"-পূজার ব্যাপারটী সেখানকার লোকদের মনের মধ্যে যে কতখানি শিকড় গেড়ে ব'সে আছে, তা বলা কঠিন। তবে দেখা গেছে, উক্ত পূজার সময় বলি দেবার যায়গায় ৫।৬ জন জেনারেল্‌ও দাঁড়িয়ে আছেন।

"ভুডু" পূজার ব্যাপারটী নেহাৎ যে সরলতারই দাবী রাখে, তা নয়। "ভুডু"-দেবতাকে পূজা করা হয় কেবল মঙ্গলের জন্য নয়,—অমঙ্গলের জন্যও। শেষোক্ত কারণে,

"ভুডু" দেবতাকে মনে-মনে স্মরণ ক'রে সেখানকার নিগ্রোরা পরস্পরকে বিষ-প্রয়োগের দ্বারা কাবু ক'রতেও কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য তারা সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের কোনো ক্ষতি করে না।

হাইতির সর্ব্বত্রই "ভুডু"-দেবতার পূজারীরা ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত পূজারী কাউকে বিষ প্রয়োগ করবার রীতিমত ব্যবসা করে ব'ললে অত্যুক্তি করা হয় না।

পোর্ট-আউ-প্রিন্সের একটা বাজার।

তাদের এই ব্যবসার প্রণালী খুব সোজা। ধরুন, কোনো নিগ্রোর এক শত্রু আছে। নিগ্রোটা পূজারীর কাছে গিয়ে বিষ চাইলে। বিষ পাবার পর সে এমন ব্যবস্থা ক'রলে, যাতে তার শত্রু অজান্তে সেই বিষ খেয়ে ফেলতে পারে। উক্ত বিষের কিন্তু কার্য্যকারিতা এই যে, তা খেলে, লোক মারা যাবে না বটে, কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে প'ড়বে, কিম্বা খুব সম্ভব পাগল হ'য়ে যাবে!…যাই হোক, উক্ত বিষ শত্রুকে খাওয়াবার পর, শত্রুর আত্মীয়রা বিশেষভাবে অস্থির হ'য়ে উঠলো। তারা বিনা বিলম্বে খোঁজ ক'রে সেই লোককে বা'র ক'রলে, যে উক্ত বিষ বিক্রী ক'রেছিল। বিক্রেতার কাছে গিয়ে তারা বিষ-নাশক ওষুধ কিনতে চাইলে। বিষের ব্যাপারে "ভুডু" পূজারীর সঙ্গে বিক্রেতার ত রীতিমতই ব্যবসা চ'লছিল। সে সবই জানে। বিষ-নাশক ওষুধের দাম সে একটু চড়িয়েই বললে। বিষ-খাওয়া নিগ্রোটার আত্মীয়েরা যদি যথা কথিত দামে বিষ-নাশক ওষুধটা নিয়ে গেলেন ত ভালই; নচেৎ বিষের ক্রিয়ায় নিগ্রোটা হয় ভুগতেই লাগলো, কিম্বা মারা গেল!…

সহাস্য-মুখ নিগ্রো বালক।
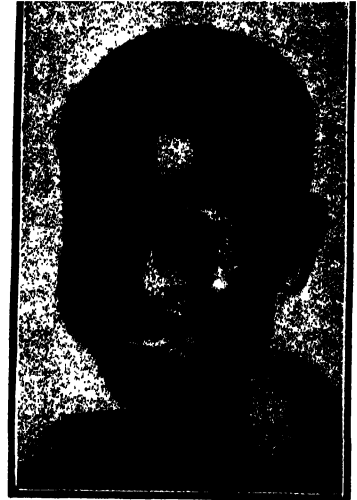
"ভুডু"-পূজারীরা উপরি-উক্ত ভাবে ব্যবসা ক'রে বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করে। অবশ্য এইখানে ব'লে রাখা দরকার, শত্রুর জন্য তারা যে কেবল বিষ প্রয়োগেরই ব্যবস্থা করে, তা নয়; অনেক সময়ে তারা শত্রুর বাড়ীর দরজায় পশমের গোলক, কিম্বা লাল ন্যাকড়ার 'বল্' অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জলে-ভরা বোতল ঝুলিয়ে রাখাবার ব্যবস্থা করে। নিগ্রোরা এই জিনিষগুলিকে বাড়ীর দরজায় ঝোলানো দেখলেই অতিরিক্ত রকম ভয় পায়; কারণ, তারা জানে যে, এই চিহ্নগুলি-ই কোনো ব্যক্তির প্রতি "ভুডু"-পূজারীর ক্রোধকে প্রকাশ ক'রছে। তারা

সেই ভয়ানক জিনিষগুলির প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য, রীতিমত সন্তর্পণে দূরে দূরেই চলা-ফেরা করে। ভুলেও সেগুলোর কাছাকাছি আসে না।···

হাইতিকে এখনো সভ্য দেশ বলা যায় না। এই কারণেই, সেখানকার রাজধানী—পোর্ট-আউ-প্রিন্সেও খবরের কাগজের সংখ্যা যার-পর-নাই অল্প। এই সব খবরের কাগজে থাকে—মাত্র এক পাতা-বোঝাই খবর। এই খবর বিক্রী হয়—বড় জোর, একশ'টী ক্রেতার কাছে। বিদেশী ভ্রমণকারীরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যান এই কথাটা ভেবে যে, ওই সব খবরের কাগজ অত ক্ষীণভাবে চ'লেও টিকে থাকে কি ক'রে!···

হাইতির লোকেরা বরাবরই গরম-মেজাজী। এই-জন্যই বিদ্রোহের সংখ্যা সেখানে প্রচুর। সেখানকার প্রথম ১৭ জন অনুশাসক প্রেসিডেণ্ট্‌দের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাকীগুলির মধ্যে অনেকেই খুন হয়েছিলেন এবং অনেকে পালিয়েও বেঁচেছিলেন। সেখানকার আইন-শাস্ত্র তৈরী হ'য়েছে—নেপোলিয়ানের আইন-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। সেখানকার বিচারকরা সকলেই হচ্ছে নিগ্রো। এই বিচারকদের প্রায় প্রত্যেককেই ঘুষের দ্বারা হস্তগত করা যায়। সেখানকার উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী যারা, তাদের ঘুষ দিলে, তাদের দিয়ে যে-কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারা যায়। সেখানকার লোকরা সুবৃহৎ অট্টালিকার চেয়ে কলাগাছের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম ক'রতে ভালবাসে।

হাইতির মধ্যে মোট ১০,২০৪ বর্গমাইল জায়গা আছে। সেখানকার মোট জন-সংখ্যা ২,৫০০,০০০। অধিকাংশ অধিবাসীই হচ্ছে নিগ্রো।—সেখানকার লোকেরা ধর্ম্মে—রোম্যান্ ক্যাথ'লিক। সেখানকার উৎপন্ন জিনিষগুলির মধ্যে কফি, কোকো, তুলো, তামাক,

হাইতির মানচিত্র।

কাঠের গুঁড়ি, চিনি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে সোণা, রূপা, তামা, লোহা, এ্যান্টিমণি, টিন্, গন্ধক, কয়লা, চীনা মাটী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। পোর্ট-আউ প্রিন্স্ হচ্ছে সেখানকার রাজধানী। রাজধানীর মোট জন-সংখ্যা ১২০,০০০।

রক্তের টান

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে কলিকাতায় আসিয়া হিরণ রোগে পড়িল। এ সংবাদ দেশে কিরণকে দেওয়া হইয়াছে। হরসুন্দরীও জানিতে পারিলেন। জানিল না শুধু চঞ্চলা।

হরসুন্দরী মন্দিরে বসিয়া অনুক্ষণ দেবতাকে ডাকিতেছিলেন; এবং কিসে সংসারের অখণ্ডতা ফিরিয়া আসে সেই প্রার্থনাই করিতেছিলেন। তিনি ছেলে দুটিকে কমলার সঙ্গে এই আশায় জুড়িয়া দিয়াছিলেন যে, হয় ত এই স্নেহের সামগ্রী দুটি সমস্ত গর্ব্ব ও সমস্ত দ্বন্দ্বকে পরাভূত করিয়া, একদিন দৈবাতের মধ্যে সকলকে টানিয়া একত্র করিবে। কিন্তু ইহার কোন নিদর্শনই তিনি পাইতেছিলেন না। যাহা হউক, হিরণের অসুখের সংবাদ শুনিয়া তথায় যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিরণ ছুটি পাইলেন না। নরেশকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,

"হিরণের অসুখ, বৌমা তাকে হাতে-গড়ে মানুষ করেছেন। আমার সঙ্গে একবার কি তিনি তাকে দেখ্‌তে যেতে পারেন? এ আমার আদেশ নয়—ইচ্ছামাত্র।"

নরেশ আসিয়া কমলাকে জানাইল।

কমলা পলকের জন্য চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল, "পাপ যে কত রকমে হয়েছে আমার—তার অবধি নেই। আবার কি একটা মোহ ডেকে নিতে পারি? তাঁর ইচ্ছাকেই চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়ে এসেছি; আজও দেবো;"

তার পর একদিন রাত্রিকালে ইঁহাদের সঙ্গে লইয়া নরেশ নৌকাযোগে কলিকাতায় রওনা হইল। হলধরকে ডাকিয়া হরসুন্দরী বলিয়া গেলেন, তাঁহার বড় বৌমার সঙ্গে কাহারও যখন কোন সম্পর্ক নাই, তখন তাহার সম্বন্ধে কোন খবর কাহাকেও দিতে সে যেন ব্যস্ত না হয়।

হরসুন্দরীর এক বৃদ্ধা ভগিনীও সঙ্গী হইলেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না; এবং আত্মীয় বন্ধুজন ইঁহারা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। থাকিবার মধ্যে একটিমাত্র দেবর—সেও সন্ন্যাসী-ধরণের লোক। গৈরিক বস্ত্র আর লোহার চিম্‌টা হাতে দেখিলেই তাহার পিছু পিছু সে এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়।

কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা দেখিলেন হিরণের অসুখ অনেকটা আরাম হইয়াছে।

হিরণের বাসায় অনেকগুলি ঘর ছিল। কমলা ছেলে দুটিকে লইয়া দ্বিতলের কোণের একটি ঘরে যাইয়া স্থান লইল। কতকগুলি ঘরে সে একেবারেই যাইত না। বিশেষ প্রয়োজনের বেলা যে-ঘরে সে বাধা মনে না করিত কদাচিৎ সেইরূপ দু'একটি ঘরে সে যাইত।

হিরণের গৃহে রান্নার লোক ছিল। তা'ছাড়া যুড়ী গাড়ী, সহিস কোচম্যান, চাকর চাকরাণী তাঁবেদার হুকুমদার—সকলই ছিল। সেদিন বামুন ঠাকুর আঙুলের কড়ে জনে জনের মাথা তিন তিনবার গণিয়া ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল তরিতরকারী—সমস্ত পরিমাণ মত গোছাইয়া লইল এবং রান্না করিতে যাইয়া বসিল।

কমলা এক সময় নরেশকে বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,

"ঠাকুরপো! আমাদের বাজারের কি করেছ?"

ইহা যে-সে প্রশ্ন নয়।

নরেশ যেমন হতভম্ব হইয়া গেল, তেমনি যাহা সে ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন মনে মনে কমলার সেই অলঙ্ঘনীয় দুরদৃষ্টের পুনরাবৃত্তি করিতে যাইয়া তাহার সমুদয় আত্মশ্লাঘা নিঃশব্দে স্থিরভাবে দুটি চক্ষু দিয়া একতলার প্রাঙ্গণের উপর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছ—টাকা নেই?"

নরেশ আর সেদিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া কহিল, "আছে। আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।"

এই বলিয়া সে হরসুন্দরীর ঘরের মধ্যে যাইয়া

ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, "মা! বৌদি বাজার করতে বল্লেন।"

ইহা যে এখনও হয় নাই, এবং সে ব্যবস্থা যে বধূকেই করিতে হইল, সেজন্য তিনি একটু চকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"হাঁ। বাজার করা চাই বই কি! আমার রান্নাটাও যেন তাঁর পয়সায়—তাঁর হাতে হয়।"

সেই হইতে নরেশ সুদ্ধ ইঁহারা সকলে পৃথক রান্নাবান্না করিয়া খাইতেছেন। হিরণ সুস্থ হইয়া জানিল, অনুরোধও করিল। হরসুন্দরী জানাইলেন,

"এ সাহস কেবল নিরালা জায়গা পেয়ে বাড়িয়ে তুলেছিস্ তুই। সে হয় না হিরণ!"

ইহার প্রতিবাদ ঘাড় হেঁট করিয়া যতটুকু করা যায়, সে করিয়াছিল—ফল হয় নাই।

দেহে বল পাইলে হিরণ আবার আদালতে যাওয়া-আসা সুরু করিল। চঞ্চলা ফিরিয়া আসিল কি না সে সংবাদ পর্য্যন্ত সে লইল না।

চঞ্চলা আসিয়া মায়ের সঙ্গে পিত্রালয়েই উঠিয়াছিল। কাছারী খুলিয়াছে—স্বামী এতদিন দেশ হইতে ফিরিয়াছেন, তাহার মনে এ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে যদি কাশী যাইবে—কেন বলিয়া কহিয়া গেল না—কোন সদুত্তরই ছিল না। তাই দেখা করিতে লজ্জা হইতেছিল।

অথচ দেখা করিবার জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড়ও করিতেছিল। গোপাল নিকটে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি বোধ করি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। তাহার চোখে ঘুম নাই। জীবনটা শুধু মরুভূমি হইয়া চলিল—কোন কাজেই লাগিল না। মাতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলিতেছে—স্বামীর সঙ্গে সংযোগের ফাঁক বাড়িয়া যাইতেছে—তাহার আর শক্তিতে কুলায় না!

তার পর সে মনে করিল, চাকরবাকরগুলির কাজের যে প্রকৃতি—স্বামীর হয় ত কষ্ট হইতেছে—গৃহগুলি হয় ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া গেল। আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু সে স্থির করিল, হিরণ আদালতে চলিয়া গেলে সেই সুযোগে সে বাসায় যাইবে। এবং ইতিমধ্যে নিজের হাতে গৃহের শৃঙ্খলা সাধন করিয়া স্বামীকে সে চকিত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে অসাড় দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়াই যাত্রার জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল। এতদিন স্বামীর সঙ্গে মতে মতে অনৈক্য ঘটাইয়া প্রতি-নিয়তই সে ফাঁক বাড়াইয়া আসিয়াছে। তাহা পূরণ করিয়া লইতে—আজ আর আপনাকে সে রাখিয়া ঢাকিয়া চলিবে না। স্বামীর পদে সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিয়া সে আজ তাহার সমস্ত হারজিতের সামঞ্জস্য করিয়া লইবে।

ঘড়িতে দশটা, এগারটা—বারটা বাজিল। চঞ্চলা তখন সহিসকে গাড়ী যুতিতে অনুমতি করিল। তার পর জননীকে প্রণাম করিয়া গোপালকে সঙ্গে লইয়া সে গাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

সে মনে মনে যে সকল কল্পনা লইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, গাড়ীতে উঠিতে সে ভাব আর রহিল না। মনে কেমন ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। না জানি কি সূত্রে আবার কি বিপ্লব বাধিয়া উঠে।

মাতার বিমর্ষ ভাব দেখিয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা! গোপালগঞ্জে যাবে ত?"

মাতা দেখিল, বালক ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় নামটি মনে করিয়া রাখিয়াছে। সে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "যাব বৈ কি বাবা?"

"এই যে বলেছিলে, যাবে না?"

"তোমার দিদিমা বুড়ো হয়েছেন সেইজন্যে বলি। সে যে বাবা, তোমারই বাড়ীঘর। তা' ছেড়ে তুমি কি সংসারে বড় হতে পার?"

গোপাল উল্লসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে আমার দাদারা আছে—তারা কত বড়?"

"তোমারই মত।"

বালক যেন কতই মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাদের জন্য কি নিয়ে যাব?"

চঞ্চলা বলিল, "লাটিম নেবে—ফানুস নেবে—ইঞ্জিন নেবে।"

গোপাল দ্রুত বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা! সেখানে ছানাবড়া পাওয়া যায়?"

"পাড়াগাঁ, বোধ করি পাওয়া যায় না।"

"এক হাঁড়ি ছানাবড়াও নেব—কেমন?"

সে ইহার ভক্ত ছিল। ভাবিতেছিল ঐ বস্তুটার দ্বারাই বোধ করি সে ভ্রাতাদের সৌহার্দ্দ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

মাতা বলিল, "নিও। যা' যা খুসী হবে একটা ফর্দ্দ করে দিও, সবই কিনে দেব।"

অতি অল্প সময়ে পুত্রের সহিত এই আলোচনায় তাহার মনে এক অনন্থভূত আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহাদের গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঠাকুরাণী:কে দেখিয়া ভৃত্য পথ ছাড়িয়া দিল। গোপালের হাত ধরিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে উপরে আসিয়া উঠিল। দুই তিনটি ঘর অতিক্রম করিবার পর শয়নগৃহের দ্বারদেশে পা দিতেই সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এক-পা ঘরে—এক-পা বাহিরে—সে দেখিল তাহারই পালঙ্কের উপর দুইটি বৃদ্ধা বসিয়া গল্প করিতেছেন। আর দুইটি বালক মেঝের উপর মারবেল গড়াইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বৃদ্ধা দুটির ওষ্ঠে তামাক পোড়ার কস্—পরিহিত বস্ত্র মলিন। ছেলে দুটি উলঙ্গ। সে ইঁহাদের চিনিতে পারিল।

ইঁহাদের চালচলন দেখিয়া তাহার গা যেন কেমন 'রি' 'রি' করিয়া উঠিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্রোধ হইল এই যে, তাহার কাশী যাওয়ার প্রতিশোধ দিবার জন্যই স্বামী বোধ করি এই সকল আয়োজন করিয়াছেন। হয় ত ইঁহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধে একটা ষড়যন্ত্রও চলিতেছে। এতটুকু ধৈর্য্য তাঁহার নাই—ছিঃ!

সে তাহার প্রথম পদ ঘরের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

এই অপরিচিতা রমণীর আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাবে হরসুন্দরী কম বিস্মিত হইলেন না। তাঁহারা কথা বলিবারও অবকাশ পাইলেন না—চঞ্চলা এইরূপ বেগে আসিল ও চলিয়া গেল।

হরসুন্দরী বাহির হইয়া আসিলেন। কমলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কে? চিন্‌লাম না ত? এল—আর গেল—কেন?"

কমলা তাহার নিজের ঘরেই ছিল; এবং পদশব্দে জানালার ঈষৎ ছিদ্র দিয়া চঞ্চলাকে সে চিনিতেও পারিয়াছিল। কিন্তু নিজকে চিনাইবার মুখ তাহার ছিল না। তাই সে ঘরের বাহির হয় নাই। সে বলিল,

"আমাদের ছোট বৌ যেন। আহা! রূপের কি বাহারই খুলেছে। সেই বের বার দেখেছিলুম—এখন সমস্ত দেহটা ভরাট হয়ে যেন পদ্মফুলটির মত হয়েছে। দেখলে মা?"

হরসুন্দরী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কোথায় গেলেন তিনি? একবার দেখ ত?"

কমলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটিও নামিয়া পড়িল। ভৃত্যের কাছে সে সংবাদ পাইল,—কর্ত্রীঠাকুরাণী যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতেই আবার চলিয়া গিয়াছেন।

এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যের মাঝখানে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে সে উপরে উঠিয়া গেল। বলিল, "ছোট বৌ এসেছিল মা! কিন্তু এমন করে চলে গেল কেন? বোধ হয় কাকেও চিন্‌তে পারে নি। ছেলেমানুষ, কি বা জ্ঞানবুদ্ধি! হঠাৎ তার ঘরে কতকগুলো অজানা অচেনা লোক দেখে বোধ করি চলে গেছে। আমরা যদি তাকে চিন্‌তে না পারি—আর বাড়ীর কর্ত্রী বলে যদি তার পরিচয় দিতে হয়—সে যে বড় লজ্জা মা!"

সংসারে যাহাদের দরদের অন্ত নাই, তাহারা কেবল কোমল দিক্‌টাই দেখিতে পায়; এবং সেইখানেই তাহারা মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংশয় থামাইয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা বিচক্ষণ, তাহারা বিভিন্ন স্তর ভেদ করিতে করিতে সত্যের চিরন্তন দরজায় আসিয়া ক্ষান্ত হয়। হরসুন্দরী তাঁহার গৃহের দুর্ব্বল প্রদীপের বিচ্ছিন্ন জ্যোতিগুলি একত্রে মিলাইয়া দিবেন—কল্পনার এই ইন্দ্রজাল লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু অতি শীঘ্র কে যেন তথায় নিষ্ঠুর বাতাস তুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,

"বৌমা এসেছিলেন হিরণ যেন না জান্‌তে পারে।"

"কেন?"

"তাঁর এই চলে যাওয়া নিয়ে হয় ত একটা কু-অর্থ সে ধরে বসবে।"

কমলা কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পথে গোপাল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলিয়া মাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ঘরে ছেলে দুটি কে? বেশ ছেলে দুটি। কেমন মারবেল খেলছে। সেও তাদের সঙ্গে মিশে খেল্‌লে বেশ হত! কেন তিনি যেতে যেতেই চলে এলেন? বুড়ী দুটি কে? তাদের খাটের উপর বা কেন এসে বসেছে। ইত্যাদি রাশি রাশি প্রশ্ন সে এক নিশ্বাসে করিয়া ফেলিল। মাতা কিন্তু একটি প্রশ্নেরও জবাব দিল না। স্বামীর মাতা যিনি—সেই পরমারাধ্যা জননীর পায়ে নত হইয়া তাঁহার মর্য্যাদাটাও সে রাখিয়া আসিতে পারিল না, তাহার এই হঠকারিতার জন্য মনের মধ্যে তখন একটা অভিযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অতি সহজে যে শ্লীলতা সে নষ্ট করিয়া আসিল, তাহারই জন্য তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটা এখন 'হায়!' 'হায়!' করিতে লাগিল।

মাতার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া গোপালেরও মন বিগড়াইয়া গেল। সে বলিল,

"আমাদের বিছানার উপর বসে ও বুড়ী দুটো কে? ওদের ত কোন দিন দেখিনি।"

চঞ্চলা জিভ কাটিল। ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ বুড়ী বল্‌তে নেই। তোমার ঠাকুমা হন যে! তুমি চেন না, আমি যেমন তোমার মা, উনিও তেমনি আমাদের মা! বাড়ী-ঘর সকলই তাঁর—আমরাও তাঁর।"

কিন্তু সমস্যাটা পূরণ হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে যেতে যেতে চলে এলে?"

"তোমার দিদিমা আমাকে বড় করে রাখতে চান্‌। আর সকল কাজের গোড়ায় সেই বুদ্ধিটে আমারও প্রাণে জেগে ওঠে।"

বালক এ কথার মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মাতার নিভৃত কক্ষ হইতে নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য অনেকখানি ব্যর্থ আগ্রহ তাহার জন্মিল। সে প্রশ্ন করিল,

"আমরা তা হলে দিদিমার কাছেই থাকব?"

"হাঁ।"

"আর বাবা?"

"তিনি তোমার ঠাকুমার কাছে থাক্‌বেন।"

বালকের সকল প্রশ্নগুলিরই জবাব সে এখন আগ্রহের সহিত দিতেছিল; কিন্তু হৃদয়ের রক্ত-শোষণ করিয়াই তাহাকে দিতে হইতেছিল।

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা সকলে থাক্‌ব—বাবা কেন দিদিমার কাছে থাক্‌বেন না?"

চঞ্চলা একটু হাসিয়া বলিল, "ছেলে কি মা ছেড়ে থাকে? এই বুঝি বুদ্ধি তোমার!"

গোপাল লজ্জায় মাথা নীচু করিল; আর কোন প্রশ্ন সে করিল না।

গৃহে পৌঁছিলে চঞ্চলা গোপালকে লইয়া নিজের ঘরে গেল এবং দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। কাত্যায়নী তখন নিজের ঘরে দিবানিদ্রা দিতেছেন। তিনি যখন উঠিলেন, সহিসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"দিদিমণিকে রেখে এলি?"

সহিস বলিল, "না। তিনি ত যেতে যেতেই চলে এলেন।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে একটু জোরে জোরেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তা' জানি নে মা!"

তিনি ত্বরিত পদে মেয়ের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন, "গোপাল—গোপাল!"

"কেন?"

"তোরা চলে এলি যে?"

চঞ্চলা তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল।

কাত্যায়নী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা বল্‌ছিস না যে? দরজাটা খোল ত দেখি?'

মায়ের পরামর্শমত গোপাল বলিল, "দরজা খুলে এখন কি হবে? মার অসুখ করেছে!"

"হ্যাঁ! কি অসুখ করল্‌ আবার? দরজাটা খোল্‌না?"

চঞ্চলা দ্বার খুলিতে বলিলে সে খুলিয়া দিল।

মাতা কপালে হাত দিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "গা ত বেশ ঠাণ্ডা। কি অসুখ হল? চলে এলি কেন?"

চঞ্চলা দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। বলিল, "মা! আমার বড্ড মাথা ধরেছে। তুমি এখন যাও, যা' শুন্‌তে হয় পরে শুনো।"

কাত্যায়নী অগত্যা চলিয়া গেলেন; কিন্তু একটা অদম্য সংশয়ে তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। তিনি কতবার মেয়ের কক্ষের দিকে আনাগোনা করিলেন, দ্বার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় চঞ্চলা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাথা ধরা ছাড়ল ?"

"ভাল ছাড়ে নি।"

"চলে এলি কেন ?"

যাঁহার নিকট এই হীনতা সে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহারও নিকটে সে সকল প্রকাশ করিয়া বলিতে ঘৃণায় ও ক্লান্তিতে তাহার মুখ বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে শুধু বলিল,

"বড্ড অসুখ করতে লাগল।"

"তা বেশ করেছিস্। পথে ঘাটে কি কম কষ্টটা গেছে। অত তাড়াতাড়ি করে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল। একটু দম না নিয়ে কি লোকে দু'পা নড়ে ?'

চঞ্চলা চুপ করিয়া রহিল; কোন কথাই বলিল না। তাহার সম্মুখে যে জটিল সমস্যা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য যুক্তি গ্রহণ করিতে কোন আগ্রহই সে আজ প্রকাশ করিল না।

যে সমস্যা চঞ্চলার মনের মধ্যে ভারাক্রান্ত হইয়াও গোপন রহিল, কাত্যায়নীর নিকটে তাহা অন্য এক উপায়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আদালত হইতে ফিরিবার মুখে হঠাৎ একদিন হিরণ ইঁহাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল; এবং জননীর আগমন-বার্তা জানাইয়া চঞ্চলাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিল। হরসুন্দরী এবং কমলা দূরে ছিলেন—সে ছিল ভাল। কিন্তু একই গৃহে এরূপ সম্পর্কশূন্য হইয়া বাস করায় সে আদৌ সুখস্বস্তি পাইতেছিল না।

যাহা হউক, কাত্যায়নী সহসা কোন সদুত্তর দিলেন না। সে দিবস জামাতাকে তথায় আট্‌কাইয়া ফেলিলেন; এবং তাঁহাদের কাশী যাওয়ার পর্ব্ব উত্থাপন করিয়া—প্রথমতঃ মেয়েকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইলেন। বলিলেন,

"কাশী যাওয়া আমার ঠিকই ছিল। যাবার বেলায় মেয়েটার শুক্‌নো মুখখানা দেখে আর ছেড়ে যেতে পারলুম না। তোমাকে বলে কয়ে আসে সে সময়ও ছিল না।"

হিরণ কহিল, "তাতে আর কি হয়েছে। আপনার সঙ্গে যাবে তার আর কি জিজ্ঞাসা করতেন। জিজ্ঞাসা করলেও তার যাওয়া ছাড়া আর কি হতে পারত ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সে ত জানি বাবা। সে সময় তার দেশের বাড়ীতে যাওয়ার কথা চল্‌ছিল কি না ?"

"তা' হলই বা। দেশের বাড়ীতে এমন কোন ক্রিয়াকাণ্ড ছিল না যে, আপনাকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে তা'র না গেলেই নয়।"

চঞ্চলার দাদা সুরেন তখন মধুপুরে শরীর গড়িতেছিল।

কাশী যাওয়ার কৈফিয়ৎ হইতে মাতা তাহাকে মুক্ত করিয়া লইলেও তাহার অন্তরে কিন্তু আর একটা দাবদাহ জ্বলিয়া জ্বলিয়া স্বামীর নিকটে তাহাকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছিল। যে দেহ হইতে স্বামী-দেবতা দেহ পাইয়াছেন, সেই পরমারাধ্যা দেবীর পদে একটা প্রণাম করিবার সামান্য ক্ষণটিতেও তাহার অন্তর্বিপ্লবের প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত হইল, এই লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারিতেছিল না।

আহারাদির পর গোপালের সহিত হিরণের যখন বেশ গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় চঞ্চলা ধীরে ধীরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

হিরণ কহিল, "এস। গোপাল এক মস্ত ফর্দ্দ দাখিল করে বসেছে। সে তার খেলার সাথীদের জন্য কল্‌কাতা শুদ্ধ কিনে নিয়ে যেতে চায়।"

চঞ্চলা কোন কথা বলিল না। নীরবে খাটের এক পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিল।

হিরণ কহিল, "এখন তার মায়ের ফর্দ্দটা পেলে বুঝ্‌তে পারি আমার শক্তির সাথে মেলে কি না।"

চঞ্চলা মাথা নীচু করিয়া এবার বলিল, "আমাকে আর কিছু দিও না—ঋণ পরিশোধ হবে না।"

একাগ্র দৃষ্টি দিয়া হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"দিতেই ত আছ তুমি। যতটা অবাধ্য আমি কাশী যাবার দিন হয়েছিলুম—কিন্তু সেইখানেই যদি এর শেষ হত ?"

হিরণ পুত্রের মুখে একটু আগেই শুনিয়াছিল যে, তাহারা মাতা পুত্র ইতিমধ্যে একদিন বাসায় যাইয়া

খাটের উপর বুড়ী দুটিকে দেখিয়া তখনি-তখনি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিল, চঞ্চলা বুঝি তাহাই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিল, এবং এতকাল পরে নিজের বিরুদ্ধ আচরণের সন্ধান পাইয়া নিজের স্বভাবগত মূল ভিত্তির উপর ফিরিয়া আসিতে পারিল। সে বলিল,

"দেখ, মানুষ ভ্রম-প্রমাদের অতীত নয় আমি জানি। আর তাই জানি বলে চুলচেরা বিচারও আমি কোন দিন করি না।"

অভ্যাসের ঝোঁকে যে উত্তরটি সত্বর তাহার মুখে আসিল, এবং পলকের জন্ম থামিয়াও যাহাকে সম্বৃত করিয়া লইতে পারিল না, তাহা কিন্তু হিরণকে পুনর্ব্বার বিস্মিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। সে বলিল,

"কিন্তু তাই ত করেছ তুমি। আমার কাশী যাওয়ার প্রতিশোধটা এ ভাবে না দিলে কি তোমার হিংসার ক্ষুধা মিট্‌ত না?"

হিরণের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমাকে হিংসা কর্‌তে পারি—এমন কোন বস্তু যদি তোমার ভিতরে থাকে, সে আমার পরম লাভ। কিন্তু কাশী যাওয়ার প্রতিশোধটা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি। অনেক সময় অনেক আঘাত অনেককে না বুঝেও দিতে হয়। বুঝিয়ে বল্‌লে ভাল হ'ত।"

চঞ্চলা তেমনি বিরক্তভাবে বলিল, "আমার কাছে একবার জিজ্ঞাসা করার সবুর সইল না—বাড়ীসুদ্ধ এনে হাজির কর্‌লে—আমাকে জব্দ করা নয়?"

হিরণ বলিল, "এতটা ভাবা যায় না। জব্দ হবার কথা বল্‌লে এই প্রমাণ হয় যে, হয় তুমি তাঁদের সংস্পর্শ আদৌ ইচ্ছা কর না—নয় ত তাঁদের সর্ব্বরকমের যোগ্যতাকে তুমি ভয় কর।"

চঞ্চলার ধৈর্য্য ও সংযম ক্ষণেকের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। 'হয়' আর 'নয়' দুই দিক্‌কার দুটি খোঁচাই তাহার নিকট এত বৃহৎ যে, নিমেষের মধ্যে তাহার সমস্ত দেহ ক্লেদসিক্ত হইয়া অঙ্গের বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিল। মুখ দিয়া আর একটি কথা বাহির করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। অন্য দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে চঞ্চলা ঘুমাইয়া পড়িল।

কার্ত্তিক মাস—শুক্লা পঞ্চমী তিথি। গঙ্গার জল—রাজপথ—সৌধমালা জ্যোৎস্নার কিরণে হাস্যময়। আকাশ-প্রান্তে দুই চারিটি নক্ষত্র সঙ্গীগণের প্রতিভূস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিশ্ব প্রকৃতির নিকট বিদায় সম্ভাষণ করিতেছিল। বিরল বৃক্ষশ্রেণী শীতবায়ু স্পর্শে কাঁপিতেছিল। আর কাঁপিতেছিল গঙ্গাতীরস্থ একটি দ্বিতল গৃহে দু'খানা রক্ত-মাখা ঠোঁঠ। নিম্নে জাহ্নবী—চন্দ্রকরে বৃক্ষছায়াকে লইয়া ঢেউ তুলিতেছিল—আর গৃহমধ্যে মৃদু বাতাস শ্বেত শয্যার উপর একটি লাবণ্যময়ী রমণীর ভ্রমরকৃষ্ণ অলকদাম ও রঙ্গিন বস্ত্র লইয়া লুফালুফি করিতেছিল। হিরণ বসিয়া বসিয়া উভয়কেই দেখিতেছিল।

অনিমেষ নেত্রে সে দেখিতেছিল—মন্ত্রমুগ্ধ হয় নাই। অন্তরে চিন্তা—জ্বালা। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক পথ-নির্ণয়ের জন্য যে ভাবে তাকায়, হতবুদ্ধি হইয়া সেইরকমই সে তাকাইতেছিল। বৈদ্যুতিক আলোকে রূপের সে উৎসব-তীর্থ তাহার নিকট বেদনারই সৃষ্টি করিতেছিল।

এই সময় চঞ্চলা স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এলোচুলগুলি অঙ্গুলি সঞ্চালনে বাঁধিতে বাঁধিতে সে কহিল,

"তুমি ঘুমাওনি?"

সে স্বর এমন মিষ্ট যে, সে শান্ত অচঞ্চল দেহটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—এই ত সুখ—এই ত শান্তি! এ যেন শুধু ক্ষণিকের স্মৃতির বস্তু না হয়—এ তুমি সত্য করে' রাখ।

চঞ্চলার মনে তখন একটুও উত্তাপ নাই। সে যেন ঘুমের সঙ্গে জল হইয়া গিয়া প্রেমভক্তিতে আকার পাইয়াছে। অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্বামীর দিকে সে চাহিয়া রহিল। হিরণ আবেগভরে তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,

"হয় তুমি এই রকমই কোমল হও—নয় ত কঠোর হও। আমি আর পার্‌ছি নে।"

চঞ্চলা তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু দুটি স্বামীর দিকে তুলিয়া ধরিয়া আবার ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। বোধ হইল সে কিছু কষ্ট হইয়াছে। ইহাদের স্বামী স্ত্রীর

ব্যক্তিত্বটা এই যে সমস্যার আকারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এই সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারে দিন দিন তাহা আরও পাকিয়া চলিতেছে।

চঞ্চলার অন্তরে হিরণের সম্বন্ধে যে বেদনা উঠিতেছিল, তাহা জাগাইয়া তুলিবার সমস্ত লালসাই এই 'কঠোর' 'কোমলের' অভিযোগে কাটিয়া গেল। ব্যাকুলভাবে উর্দ্ধমুখে মনে মনে সে তখন হাত তুলিতেছিল,—আমার কি মৃত্যু নাই—মৃত্যু নাই!

হিরণ বলিয়াই চলিল, "আমার অন্তরে শুধু একটা জ্বালা নয় চঞ্চল! তার উপর অনুক্ষণ এই যে ব্যথা তুমি দিচ্ছ—আর তবুও আমি তোমাকে চাইছি—সে কি তোমার ঐ রূপের মোহ?"

এতটা সহ্য করিতে নিজকে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখায় সে অপারগ হইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইয়া দুইহাতে আলমারি খুলিয়া কাঁচিগাছটা টানিয়া বাহির করিল; এবং মস্তকের সুদীর্ঘ কেশগুলি স্বামীর সম্মুখে বসিয়া গোছায় গোছায় পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া কাটিতে লাগিল। তার পর কাঁচিগাছটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বলিল,

"ছাই রূপ—শেষ করলাম।"

ইহার কাণ্ড দেখিয়া হিরণ শুধু চকিত হইল না, তাহার দেহ পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া গেল। উঠিয়া যাইয়া বাধা দিতেও সে সমর্থ হইল না। কর্ত্তিত চুলগুলি মাটিতে পড়িয়া বাতাসে নড়িয়া চড়িয়া তাহার মনে তখন আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল যে, অসংখ্য সর্পশিশু সহস্র ফণায় কিলিবিলি করিয়া তাহার দিকে যেন ছুটিয়া আসিতেছে! এই আকস্মিক জীবন্ত দৃশ্যের ভিতরে করুণভাবে এইরূপই সে বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল।

চঞ্চলা সেই মেঝের উপরই লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। হিরণের আর নিদ্রা হইল না।

পরদিন হিরণ যখন প্রস্থান করিবে, তখন চঞ্চলা তাহাকে নিজের ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইল। স্বামী আসিলে যে উঠিয়া যাইয়া তাহার হাত দু'খানা জড়াইয়া ধরিল। মনে একটুকু উত্তাপ নাই—সে স্পর্শ এমনই শান্ত ও সহজ। মস্তকের আচ্ছাদন কতকটা সরাইয়া বাম হস্তে ক্ষুদ্র চুলের এক গোছা ধরিয়া সে বলিল,

"দেখ, এ চুলগুলো কতদিনে বাড়বে?"

বিরোধের মধ্যে এ কি বিস্ময়কর প্রণয়-নিবেদন! হিরণ মুগ্ধ—ব্যথিত—ক্লান্ত। ইহার সৌন্দর্য্য হরণে নিজের বাক্যের অসামান্য শক্তির কথা ভাবিয়া সে লজ্জায় তখন মরিয়া যাইতেছে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। বলিল,

"কতদিন আর লাগবে—খুব শীগ্‌গিরই বেড়ে যাবে।"

চঞ্চলা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ত মাসে মাসে চুল ছাঁটো, হিসেব করে বল্‌তে পার না, কতদিনে আগের মত হবে?"

এমন স্বচ্ছন্দ হৃদয়ের কোন্ কোণে একটু স্বার্থ-বুদ্ধি লুকাইয়া আছে, যাহা ভোগের পথে কেবল বাধা হইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত বিচিত্রতা ও সমস্ত জটিলতার উপরে আজ যেন ইহার শান্ত, শুদ্ধ ও অকপট মূর্ত্তি স্বামীর অন্তরের প্রার্থনায় প্রতিশ্রুতি দিয়া স্নায়ু সকলে বিদ্যুৎ খেলাইয়া দিতেছে।

হিরণের মনে তখন দ্বন্দ্ব, গ্লানি বা বিকারের লেশমাত্র নাই। সে আদরের সঙ্গে চুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া কহিল, "এই ছ'মাস বাদে যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে।"

চঞ্চলা অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ছ'মাস পরে আমাকে নিয়ে গেলে হয় না? না আজই নিয়ে যেতে চাও?"

হিরণ কহিল, "তাই যেও।"

দীর্ঘশ্বাসে ঘর দ্বার বোঝাই হইয়া গিয়া চঞ্চলার বুকের অর্দ্ধেক বোঝা হাল্‌কা করিয়া দিল।

ইহার অল্প কিছুদিন পরেই এক বিপদ ঘটনা হইল। হরসুন্দরীর ভগিনী হিরণের মাসীমা একদিন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন।

ভগিনীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য হরসুন্দরী অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, শেষ কালের তাঁহার এই ভার বোঝা লইবার লোক কোন দিকে কেহ ছিল না, তাই বিধাতা এবার শেষ মুহূর্ত্তটায় ভগ্নিকে তাঁহার সহযাত্রী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেদের তিনি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করেন না। কি করিয়া তাঁহার এই শেষ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে—তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হিরণও এ-সম্বন্ধে ভাবিতেছিল। কিন্তু কলিকাতায় বাড়ী করার জন্য তাহার অর্জ্জিত সকল অর্থই কাত্যায়নীর হাতে যাইয়া জমিতেছে। তিনি ইহাকে বাজে-খরচই মনে করিবেন। সুতরাং সেখান হইতে এক কপর্দ্দকও পাইবার আশা নাই। অথচ কিছু না করিলে মাতাই বা কি মনে করিবেন—লোকে-ধর্ম্মেই বা কি বলিবে! হিরণ এই চিন্তায় কিছু কাতর হইয়া পড়িল।

অবশেষে দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল দেখিয়া হরসুন্দরীর অনুমতিক্রমে কিরণকে এক চিঠি দেওয়া হইল—যদি ইঁহার দেওরের সন্ধান সে পায় সঙ্গে করিয়া আনিবে। না পায় নিজেই আসিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া পিণ্ডদান করিয়া যাইবে।

হিরণ উৎসাহের সঙ্গে এ পত্র দিল। গৃহের সকলগুলি লোক রান্নাঘরে না মিলিলেও এক বাড়ীতে আসিয়া একত্র হইয়াছেন। এ সময় কিরণ আর চঞ্চলা আসিলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে, যদি কমলার অদৃষ্টচক্র কোন রকমে ঘুরাইয়া দেওয়া যায়।

কিরণ এ সময় একবার আসিতেও পারেন। কিন্তু চঞ্চলার সম্বন্ধে যে আশা ছিল,—যেদিন সে নিজের হাতে চুল কাটিয়া স্বামীর পদতলে রূপের নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে,—সেদিন সে আশা-ভরসাও অন্তর্হিত হইয়াছে। চঞ্চলার মত মেয়ে যে প্রয়াগ-প্রত্যাগতার মত মুণ্ডিত মস্তক লইয়া লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। তা'ছাড়া চুল বাড়ার জন্য ইতিপূর্ব্বে সে ছ'মাসের ছুটিও মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছে।

কিন্তু এই চঞ্চলাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। সে যেন স্বামীর শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই অপহরণ করিয়া মায়ের ঘরে কেন্দ্র করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে না পাইলে হিরণের যে কি করিবার আছে সে জানে না।

চঞ্চলাও এই দুর্ঘটনার খবর শুনিয়াছিল। স্বামী আসিলে একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসীমার কাজ কি ভাবে করবে মনস্থ করেছ?"

হিরণ মুখ শুষ্ক করিয়া বলিল, "কি আর করব—দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে পিণ্ডটা কোনমতে দিতে হবে।"

চঞ্চলা কিছু সময় নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর মুখাগ্নি তুমিই ত করেছ শুনেছি। শেষটুকু কি এইরকমে থামিয়ে দেওয়া যায়? দেবরটির ত ঐ দশা। কিছু না করলে মা-ই বা কি মনে করবেন? মা আর মাসীতে কি তফাৎ আছে?"

হিরণ কথা বলিল না।

চঞ্চলা বলিল, "বৃষ-উৎসর্গ একটা করা চাই। তা' ছাড়া তিন ভা'য়ের তিনটি ষোড়শ—আর অধীর, সুধীর, গোপাল এরাও ত এক একটা করবে।"

আত্মীয়-পর-নির্ব্বিশেষে মমতার সঙ্গে চঞ্চলা এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল, হিরণের নিকট ইহার এ চিত্ত-সংযম অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিলেও, সে ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না, বরঞ্চ বিরক্তই হইতেছিল।

তারপর স্বামীকে বসাইয়া রাখিয়া চঞ্চলা অন্য ঘরে উঠিয়া গেল। সেখানে বাক্স খুলিয়া গণিয়া গাঁথিয়া টাকার একটি তোড়া বাঁধিল; এবং মাতাকে গোপন করিয়া স্বামীর হস্তে সে আনিয়া দিল। বলিল,

"এই নিয়ে যাও। পাঁচশো টাকা এতে আছে। সমস্তটা তাঁর কল্যাণে ব্যয় কোরো। আর যদি কিছু ধার কর্জ্জ হয়, পরে দেখা যাবে।"

অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে চঞ্চলার মনের ক্লান্তি তখন চরমে উঠিয়া শান্তি খুঁজিতেছে। কোন কিছুর মধ্য দিয়া ইহার সূত্রপাত করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

হিরণ শুধু সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া খানিকটা স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি ইহার সমস্ত দেহটার উপর ছড়াইয়া দিতে লাগিল। তার পর টাকার তোড়াটি হাতে লইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের বাহিরে গেলে চঞ্চলা দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কবে?"

এ ব্যাপারের মীমাংসা একবার হইয়া গেছে। হিরণ একটু থতমত খাইয়া বলিল, "ছ'মাস বাদেই ত তুমি যেতে চেয়েছ।"

"তা চেয়েছিলুম। কিন্তু তুমি কালই গাড়ী নিয়ে এস। দিদির সঙ্গে দেখা করার এর চেয়ে সহজ উপায় আবার কতদিনে কি হবে না হবে বলা যায় না। দেওয়ালের দু-কামরায়—দু'দিকে দু'জনা চুলের অপেক্ষায় বসে থাকব? সেদিন বলেছি—আজ ভাবতে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।" একটু পরে সে বলিল, "আচ্ছা! ছাদে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে

ডাক্‌লে বোধ হয় দিদিরা শুন্‌তে পান্‌—কি বল? এত কাছে রয়েছি না?"

হিরণ মনে মনে অনেকটা তৃপ্তি লাভ করিল। বলিল, "কালই গাড়ী আন্‌ব আমি। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইহাদের স্বামী স্ত্রীর ভিতরে কতটা বোঝাপড়া চলিতেছে—চঞ্চলার মাথার উপরই তাহার নিদর্শন ছিল। কাত্যায়নী আশ্চর্য্য হইয়া যখন ইহা দেখিলেন, চঞ্চলা কৈফিয়ৎ দিল যে জট পাকানর দরুণ রাগ করিয়া সে চুল কাটিয়া ফেলিয়াছে। এজন্য তিরস্কার ও গালি তাহাকে কম হজম করিতে হয় নাই।

পরদিন হিরণ যখন গাড়ী লইয়া আসিল, তখন নেড়া মাথা লইয়া দশের সম্মুখে পাঠাইতে মাতা আপত্তি তুলিলেন।

চঞ্চলা উপস্থিত হইলে কমলা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া চক্ষু দুটি রাঙা করিয়া ফেলিল। ইহার কারণ চঞ্চলা দীনভাবে এইমাত্র বুঝিল যে, সে নিজেই ইঁহাদের অন্তরে কত কি ভাবিবার অবকাশ দিয়া এই অপরিসীম বেদনা তুলিয়া দিয়াছে। সমস্ত দিনটা সে কুণ্ঠিত হইয়া কাটাইল।

পরদিন সে দেখিল, রান্নার দুই জায়গায় দুইটি পৃথক ব্যবস্থা হইতেছে। এক দিকে ঠাকুরই রাঁধিল—এক দিকে বড়-জা রাঁধিলেন। দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন সকলে বড়-জার হাতেই খাইলেন। হইতে পারে—শাশুড়ী বাহিরের কাহারও হাতের রান্না খান্‌ না। কিন্তু তাহার মেজো ভাসুর, এমন কি অধীর, সুধীর পর্য্যন্ত যখন সেখানে খাইল, তখন কিসের বেদনা সে না জানুক—দেহের ভিতর তাহার তীব্র যাতনা ঠেকিতেছিল। হয় ত বা তাহার সেদিনের দুপুরবেলাকার সেই নির্লজ্জ ব্যবহারের ফলে স্বামীর একটা অঙ্গ এমন ভাবে পড়িয়া গিয়াছে। সে এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

বিকালে ছোট বোনটির চুলগুলি সংস্কৃত করিয়া দিবার জন্য মাথার কাপড় ধরিয়া টানিতে যখন ইহার কর্ত্তিত কেশগুচ্ছ ঘোমটার আড়াল হইতে কমলার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল, তখন সে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"এতবড় ব্যারামে ভুগেছিস্‌, একটিবার খবর দিস্‌নি?"

চঞ্চলা হাসিয়া কহিল, "ব্যারাম কিছু না, ও এমনিই কেটেছি।"

কমলা চোখ দুটি কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি গো! খালি খালি খাম্‌কা চুলগুলো কেটে ফেল্‌লি?"

"তাই ত কেটেছি। কি হবে এই ছাই চুল দিয়ে?"

কমলা অধিকতর বিস্মিত হইল। বলিল, "কি হবে চুল দিয়ে—জনে জনে আমি দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব—এখন এই কর্ম্মের বাড়ীতে লোকের সাম্‌নে কি করে বের হবি বল্‌ দেখি? আহা! এ তুই করেছিস্‌ কি?"

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল, "মন্দ কিছু করি নি। লোকে 'হাঁ' করে' চেয়ে থাক্‌বে তুমি দেখো।"

রোগ না—পীড়া না—খাম্‌কা কেহ চুল কাটে? কমলার মনে কেমন খট্‌কা লাগিল। সে তাহার হাত ধরিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল্‌—কেন কাট্‌লি?"

চঞ্চলা শুষ্ক মুখে বলিল, "লোকে খোঁটা দেয় যে!"

কমলা রাগিয়া বলিল, "লোকে কেন খোঁটা দিতে যায়—আর তুই বা কেন তা শুন্‌তে যাস্‌? এ সকল তা'হলে ঠাকুরপোরই কীর্ত্তি বল্‌?"

"ঠাকুরপোর কীর্ত্তি নয় বৌদি! একজনের মাথা নিয়ে অপরে যথেচ্ছাচার কর্‌তে পারে এ কথন শুনেছ?"

এই কথা মুখে লইয়া হিরণ ঘরে ঢুকিল।

চঞ্চলা ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিল। কমলা রুষ্ট হইয়া কহিল, "শোনা কেন—চোখেও ত দেখেছি। একজনা আর একজনাকে পাগল করে দেয় শোননি? অপরের মাথা নিয়ে দুরে দুরে বেশ কাজ করা যায়।"

হিরণ হাসিয়া বলিল, "তা হলে বোধ করি শাস্তি পাবারই অধিকারী আমি। কি সাজা দেবে দাও।"

কমলারও মুখে এবার হাসি ফুটিল। সে বলিল, "সাজা—তিন দিন বনবাস—পত্নীর অদর্শন।"

"তথাস্তু। কিন্তু উনি দয়া করে যদি কোন সময় দর্শন দিয়ে বসেন, সে দোষ কিন্তু আমার নয়।"

দাশরী

শিল্পী- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
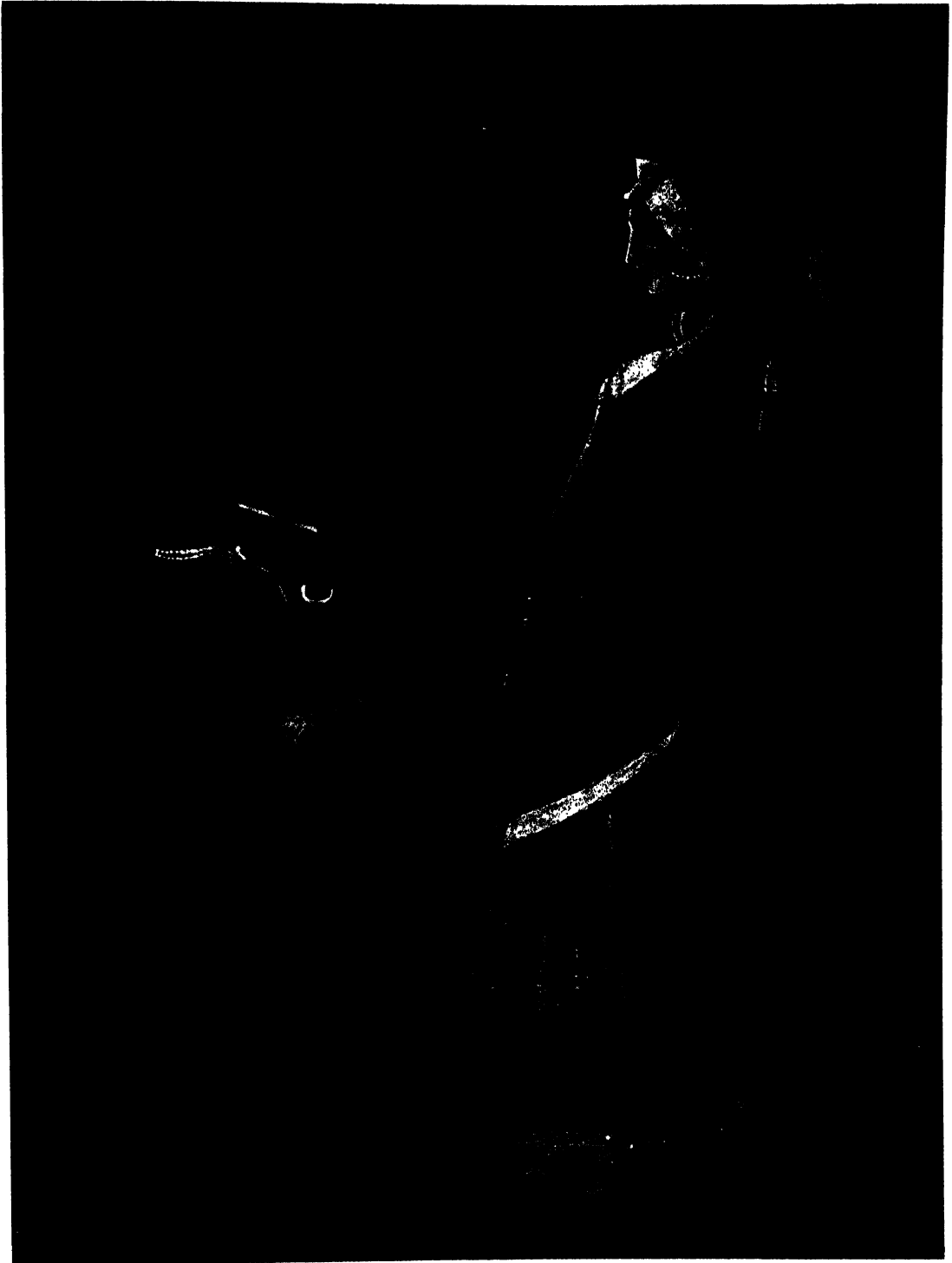
চঞ্চলা স্বামীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিজেদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াই হিরণ পলকে মৌন হইয়া গেল। কমলার অবস্থাটা তখন মনের মধ্যে বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত কথা বলিতে গেলেই সে এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ এত সহজে আর এত অল্প সময়ে চঞ্চলা যে ইহার নিকট ধরা দিয়াছে, এই হেতু একটা নিবিড় আনন্দও মনের মধ্যে ঠেলা মারিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু লজ্জায় সে তখনি-তখনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চঞ্চলা ছোঁ পাতিয়া দ্বারের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। হিরণ বাহির হইয়া যাইতেই যে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুই হাতে কমলার মাথাটা ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "এস দিদি! তোমার চুলগুলো বেঁধে দি!"

কমলা তাহার হাত দুখানা সস্নেহে টানিয়া লইয়া বলিল, "মনে ত সেই সাধই ছিল, তোর হাতে একদিন চুল বাঁধব। সে পথ ত রাখিস্‌নি। আবার যে-দিন তোর চুল হাঁটু পর্য্যন্ত বেয়ে পড়্‌বে, সেইদিন দুই বোনে একত্রে বাঁধ্‌ব। তার আগে নয়।"

শিক্ষা এবং সভ্যতার অভাব বশতঃ সে যাহাদের এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই একজনের নিকট হইতে কত কত লোভনীয় বস্তুর সন্ধানে তাহার চক্ষু-দুটি এখন ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিতেছে। তাহার চক্ষু দিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া পড়িল।

কমলা নিজের হাতে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, "এ সকল যে ঠাকুরপোর কীর্ত্তি সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তা' ভাই! ঠাকুরপোর ত আর কাণ দুটো কাটা যায় নি, যে জন্যে কান্না! এবার চুল যা' বাড়্‌বে —দেখে নিস্‌।"

এমন ভগিনীর সঙ্গে জোড় ভাঙ্গিয়া সে নিজেরই চোর কোঠায় কি পাপে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া আছে! তাহার সমস্ত মন বিকারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কোন্‌ ভাষায় সে আজ ইহাকে জানাইবে,—"ও গো! আমি তুচ্ছ চুলের জন্য কাঁদি না।"

যাহা হউক কমলার সংশ্রবে তাহার অন্তরে দিন দিন এ ধারণা পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে, ইহাদের সহিত স্বচ্ছন্দ বিচরণে কোন বাধাই নাই। মাতা অকারণে অবাধ্যতার যে নির্ম্মম প্রবৃত্তি বাড়াইয়া তুলিতেছেন, ইহাকে সে আর প্রশ্রয় দিতে পারিবে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কমলার ভাতের হাঁড়ীর অংশী দিন দিন বাড়িতেছে। চঞ্চলা পরদিনই বলিয়াছিল, "মাকে দিচ্ছ—ভাসুরকে দিচ্ছ—আর আমি বুঝি উড়ে বামুনের প্রসাদ পাব? সে হচ্ছে না—তোমার পাতে বসে আমি খাবো।"

কমলা সে কথার উত্তর দেয় নাই। কিন্তু সকলকে খাওয়াইয়া কমলা নিজের ভাত বাড়িয়া লইলে, চঞ্চলা সত্য-সত্যই তাহার একপাতে খাইতে বসিয়া গেল। সেই হইতে গোপালও সেই ঘরে খাইতেছে। শুধু হিরণই কর্ম্মচারিদের লইয়া পৃথক হইয়া পড়িলেন।

নরেশের ক্রমে সংসার ভারি হইয়া পড়িল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় দু' পাঁচটাকা যাহা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা বেশী দিন ছিল না। সে এক চা-কোম্পানীর সেয়ার বিক্রী করিবার কাজ পাইয়াছে। কিছু কিছু উপায়ও হইতেছে। তাহারই দ্বারা এই বৃহৎ সংসার সে চালাইতেছিল।

হিরণ তখনও চঞ্চলাকে কিছুই শুনায় নাই। সে কিরণের অপেক্ষাই করিতেছিল। কিরণ আসিলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়ায়, সর্ব্বপ্রথমে সে দেখিয়া লইবে, তার পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

চঞ্চলা এখন আর বড়জায়ের কাছ-ছাড়া হয় না। সে তাহার পিছু পিছু ঘুরে।

হরসুন্দরীর স্নেহও অপরিমিত। সে স্নেহও সে উপভোগ করিতে পাইত। কিন্তু ব্যাকুলা বধূকে আরও ব্যাকুল করিয়া ঘর-সংসারের প্রতিটি কথা তিনিও যেন কণ্ঠের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার বলিবার অনেক কথাই ত ছিল। অন্য কিছু লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করুন, সেদিনকার তাহার যেমন আসা—তেমনি যাওয়া—ইহাকে দুর্ব্যবহার বলিয়া ব্যথা না দিন্‌, ছেলেমানুষী বলিয়া উপদেশ দিলেও সে যে খোলসা হইতে পারিত। ইঁহারা কেন পৃথক খাইতে-ছেন—আর মেজো ভাসুরই বা কেন সে খরচ জোগাইতে-

ছেন—সে হেতু খুঁজিয়া পাইত না। এই কারণে তাহার মনে একটা অস্বস্তি লাগিয়া ছিল। স্বামীকে সে একদিন জিজ্ঞাসাও করিয়া ছিল। হিরণ বলিয়াছে,—"সে অনেক কথা, এখনও তোমার শোনার সময় আসে নি, পরে শুনবে।" এইমাত্র।

হিরণের ছোঁয়া খাওয়ার মধ্যে কমলা যাইত না। কাজেই কতকগুলি ঘরের সংস্পর্শ সে বাঁচাইয়া চলিত। এদিকে শ্রাদ্ধের দিনও ঘনাইয়া আসিল। চঞ্চলা এতদিন বাড়ীতে ছিল না, গৃহগুলি অপরিচ্ছন্নতায় ভরিয়া আছে। কমলা আজ দু'দিন ভাবিতেছিল, মাসীমার কার্য্যটি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হইলে মায়ের কষ্টের সীমা থাকিবে না। হিরণ পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু শুধু টাকা হইলে সুব্যবস্থা হয় না। যদি এই দু'টি দিনের জন্যও তাহার হাতের বন্ধনটি খুলিতে পাইত!

সেদিন দুপুরবেলা দেবরের যে যে ঘরে যাইতে সে নিজের কাছে ছাড়া পাইত, সেই সেই ঘরের আবর্জ্জনা মুক্ত করিবার জন্য কমলা সম্মার্জ্জনী হস্তে লাগিয়া গিয়াছিল। চঞ্চলা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নরেশকে সঙ্গে লইয়া হরসুন্দরী কালী দর্শনে গিয়াছেন—তখনও ফিরেন নাই। এমন সময় চঞ্চলার মাসীমা ও প্রতিবাসী কয়েকটি যুবতী রমণী তাহার গৃহস্থালী দেখিবার জন্য গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঢুকিয়াই প্রথম একটি ঘরে কমলাকে তদবস্থ দেখিয়া দাসী চাকরাণী বোধে শুধু চঞ্চলার খবরটি তাহার কাছে লইয়া চঞ্চলার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

চঞ্চলা উঠিয়া সকলকে যত্ন করিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ইঁহারা তাঁহার জাকে দেখিতে চাহিলেন।

সে ত্বরিত পদে কমলার নিকটে আসিয়া বলিল, "দিদি! মামীমারা এসেছেন। তোমায় ডাকছেন। একখানা ধোপদোস্ত কাপড় পরে এস। একটা সেমিজও যেন থাকে।"

কমলা বলিল, "তাঁরা আমাকে দেখে গেলেন যে! এখন আবার বাবুটি সেজে কি করে যাই? না দেখ্‌তেন, সে এক রকম হ'ত। চল, এই বেশেই যাচ্ছি।"

"তা' হোক, তুমি কাপড়খানা ছেড়ে এস।"

এই বলিয়া সে দ্রুতপদে আবার তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেল।

কমলা দেখিল, তাহার পরিহিত বস্ত্রখানা বিশেষ ময়লা নয়। ছাড়িয়া আর একখানা পরিতেও লজ্জা করিতে লাগিল। সে শুধু হাত পা ধুইয়া সেই কাপড়েই আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত রমণীগণের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনিই বুঝি তোমার জা? তা' এঁর সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌তেই ত আলাপ করে এলুম।"

প্রশ্ন এক জনাই করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন চঞ্চলার প্রতি কটাক্ষ করিয়া একযোগে অস্ফুট বিদ্রূপ-হাস্য কষ্টে সম্বরণ করিয়া লইলেন।

চঞ্চলা কোন মতে জবাব করিল, "হাঁ।" কিন্তু সে কেমন ঘরে কেমন দ্বারে পড়িয়াছে কমলা অতি সাধারণ বেশে আসিয়াই এক মুহূর্ত্তেই যেন সমস্তটা ফাঁস করিয়া দিল। এই লজ্জায় সে মাথা নীচু করিয়া রাখিল।

তার পর চঞ্চলাকে ফেলিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সকলে কমলাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কমলা বেশ সংযতভাবে বিনয় ও শিষ্টাচারের সহিত যথাযথ সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছিল। চঞ্চলা ভাবিতেছিল, "হায়! হায়! গায়ে একখানা গহনাও নাই! ভগবান কি লজ্জার দায়েই ফেলিলেন!"

কমলার আচার-ব্যবহার ও সদালাপে সকলেই কিন্তু পরিতুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে সে এক সময় উঠিয়া যাইয়া ঝিকে দিয়া খাবার আনাইল, এবং চঞ্চলার হাত দিয়া সাজাইয়া সকলকে জলযোগ করাইল। তার পর গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিয়াও আসিল।

শ্বশুর-গৃহের গর্ব্ব ইঁহারা কতটা হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, এই ভাবনায় চঞ্চলার ভিতরে তখন আগুন জ্বলিতেছে। সে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, "কি লজ্জায় ফেলে দিলে তুমি আমাকে। এই দুপুর বেলা ঝাঁটা নিয়ে গোশালা মুক্ত কর্‌তে না বস্‌লে কি একেবারেই চল্‌ত না?"

কমলা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল, ইহার কোন্‌খানে জ্বালা ধরিয়াছে। সে সহাস্যে বলিল, "অত রেগে গেলি কেন? ঝাঁটা ধরেছি বলে কি গোল্লায় গেলাম? যাদের পতি পুত্র লয়ে ঘর কর্‌তে হয়, এ সকল যে তাদের অঙ্গের ভূষণ! আমাদের মেয়ের জাতে এ আর কে বা না জানে?"

চঞ্চলা নিজের কথার উপর জোর দিয়া বলিল, "কিন্তু যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা এ-সকল ইতরের কাজ আদৌ পছন্দ করেন না।"

কমলার মনে পড়িয়া গেল, বহু দিন পূর্ব্বে হিরণ তাহাকে এইরূপই আভাস দিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল, "তাঁরা কি পছন্দ করেন না করেন, আমি জানি না। তোরও জেনে দরকার নেই। সংসার-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোর মনে যখন নূতন নীতি স্থির হয়ে যাবে, তখন আর এ-সকল আঁধার থাক্‌বে না। আমরা কার সংসারে কাজ করি জানিস্? পতির—যিনি সকল দেবতার বড়—তাঁর। আর পুত্রের—যার মত স্নেহের পাত্র দ্বিতীয় নাই—তার।"

চঞ্চলা স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল; বলিল, "দিদি কিন্তু কথায় কথায় বেশ জ্ঞান দিতে পারে। আচ্ছা! তুমি কতদূর লেখাপড়া শিখেছ?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "কিছুই শিখিনি!"

"কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তায় তা' বোধ হয় না।"

কমলা বলিল, "লেখাপড়ার কি শেষ আছে? আর তারই দূরত্বের পরিচয় চাচ্ছিস্ তুই আমার কাছে?"

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "একটু আগে সংসার সম্বন্ধে নূতন নীতির কথা কি বল্‌ছিলে না?"

কমলা বলিল, "নূতন নয়—সেও পুরাতন। যারা লেখা-পড়া শিখ্‌তে অনেকটা সময় বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে, তাদের কাছে নূতন ঠেকে—তাই বলেছি। যত কিছু শিক্ষাই সে পাক্ না কেন—সংসারে রমণী—জননী—সর্ব্ব-শেষে এ বড় শিক্ষা তাকে পেতেই হবে।"

"সে ত যেদিন গোপালের মা হয়েছি, সেই দিনই জেনেছি।"

"জেনেছিস্। কিন্তু এ স্রোত যখন বেড়ে যাবে তখন ত আর শুধু গোপালের মা থাক্‌বি নে, শত শত পুত্রের মাতা হবি। একে কি তুই হীন কাজ বলিস্? তবে বড় কাজ কি? নারীর শিক্ষা হচ্ছে প্রাণ বড় করা, বিতরণই তার একমাত্র কাজ। এর চেয়ে বড় সুখও নেই—বড় ধর্ম্মও নেই।"

চঞ্চলা সেইখানে বসিয়া বসিয়া যেন আত্মস্থ হইতে লাগিল।

বিকালে ছেলেদের লইয়া গাড়ীতে সে বেড়াইতে বাহির হইল। ফিরিবার সময় দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া কতক সে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই ছেলেদের পরাইল। কতক পুঁট্‌লি বাঁধিয়া লইয়া আসিল। ছেলেরা—কোন্‌টা পূজার সময় ব্যবহার করিবে—কোন্‌টা গায়ে দিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে—ইত্যাদি প্রশ্নে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। চঞ্চলা সদয় উত্তরে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিল। স্বহস্তে ছেলেদের জামা জুতা পরাইয়া, ইহাদের কৌতূহলী কৃতজ্ঞ চক্ষুগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে মুগ্ধ হইতেছিল। টাকা পয়সার এমন সদ্ব্যবহার বুঝি আর কিছুতেই নাই।

গাড়ী হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণে পা দিতেই ছেলেরা 'মা' 'মা' রবে—আনন্দ-চীৎকারে দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। কমলা তখন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে। সে বলিতে বলিতে আসিল, "কি রে! ইডেন গার্ডেনে গিয়েছিলি—না যাদুঘরে?" কিন্তু বাহিরে পা দিতে না দিতেই সে দেখিল, যেন লক্ষ্মীর একখানা সচল প্রতিমা বরপুত্রগণের হাত ধরা-ধরি করিয়া গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

অধীর বলিল, "জরি দেওয়া একে কি বলে জান মা? কাকীমা বল্লেন,—সাচ্চা কাজ।" সুধীর বলিল, "এই পুঁট্‌লিতে আরো আছে মা! খুলে দেখ,—লাল, বেগুণ, হলদে, সবুজ—কত রকমের।" গোপাল বলিল, "সমস্তই মা কিনে দিয়েছেন।"

কমলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "এ তোর কি কাণ্ডখানা বল্ দেখি? মাসীমার কাজে পাঁচ-সাতশো টাকা ব্যয় হবে—সে যা হোক্ সৎ কাজেই ব্যয় কর্‌বি। কিন্তু এ সকল কি?"

চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ সকলও অসদ্ব্যয় হয় নি। তুমি এদের হাতগুলো ধুয়ে দাও। রসগোল্লার রস মেখে কি করেছে দেখ। জামাগুলোয় এখুনি মেখে-জুকে ফেল্‌বে।"

কমলা সকলকে লইয়া ঘরে উঠিল।

(ক্রমশঃ)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা

(সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর এখন আর সরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ন'ন। না হইলেও, বে সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি সরকারের উপকার সাধন করিতে লাগিলেন। পর পর বহু ছোটলাটই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

সংস্কৃত কলেজ

বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্পদিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—কাউয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করিলেন। ডিরেক্টরের মত এই, সংস্কৃত কলেজ এক অতিপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও বর্ত্তমান যুগের কিছু পিছনে পড়িয়া আছে, আরও উন্নতির দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার সহিত অধিকতর পরিমাণে সুসঙ্গত করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে স্কুল এবং কলেজ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত। স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ানো হইবে এবং কলেজের আণ্ডার-গ্রাডুয়েট ছাত্রগণ সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অল্প মাহিনায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অন্যান্য বিষয়ের লেকচার শুনিতে পাইবে।

বিদ্যাসাগর কিছুদিন পূর্ব্বেই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছোটলাট তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। উত্তরে পণ্ডিত লিখিলেন,—

"কাউয়েল, রোয়ার এবং উড্রো সাহেব লিখিত সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত তিনটি বিবরণী আমি যত্ন ও মনোযোগসহকারে পড়িয়াছি।...কাউয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখানো হয়। এই সকল জিনিষ অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শন-সমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শেখানো হয় তাহাতে ধর্ম্মগত কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।......

"ডাঃ রোয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হোক এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী ইংরেজি স্কুল ও কলেজ সমূহে সংস্কৃত চর্চ্চা চালাইবার জন্য ব্যয়িত হোক। স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলনের আমি যতটা পক্ষপাতী, ততটা আর কেহ নয়। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের বিলোপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আমার অপেক্ষা অধিকতর বিরোধীও কেহ নাই। কাউয়েল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, সংস্কৃত যদি শিখিতেই হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা ভাল। ইংরেজি স্কুল-কলেজে ইহা উপযুক্তরূপে শিক্ষা করা যায় কি না সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে, বিশেষ যখন ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ভালরূপে বাংলা শিখাইবার চেষ্টাও সফল হয় নাই। ডাঃ রোয়ারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিলে, যে ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণরূপে রক্ষা করাই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেই ভাষা

ও সাহিত্য ভারতবর্ষের এই অংশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" (১৮৫৯, ১৭ই এপ্রিল)

বাংলা-সরকার ডিরেক্টরের সঙ্গে একমত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবটি বড়লাটের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাইলেন (২৫ এপ্রিল)। বড়লাটও একটি বিষয় ছাড়া সকলই মঞ্জুর করিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মৃতি-অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়াতে, পাঠ্য-তালিকা হইতে ইহা বাদ দিবার প্রস্তাব ছোটলাটকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলা হইল। *

ছোটলাট ক্যাম্পবেলের সময়ে সংস্কৃত কলেজের নূতন ব্যবস্থা হইল। তাঁহার নীতিই ছিল সকল বিষয়ে ব্যয়-সঙ্কোচ করা। ১৮৭১, ৩০ মে বাংলা-সরকার ডিরেক্টরের উপর আদেশ জারি করিলেন, যেন সুযোগ পাইলেই কলেজের নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করা হয়। স্মৃতির অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি অবসর গ্রহণ করিতেই ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন ঐ পদটি উঠাইয়া দেওয়া হোক (১৮৭২, ১০ই ফেব্রুয়ারি)। সংস্কৃত কলেজের উচ্চতম ইংরেজি-বিভাগও উঠাইয়া দিবার আদেশ হইল। ঠিক হইল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত ছাড়া সব বিষয়ই পড়িবে।

কিন্তু স্মৃতির অধ্যাপনা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন এই আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন করিলেন। ছোটলাট আবার বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলেন। তিনি লিখিলেন, যে-সকল দেশীয় ভদ্রলোক সংস্কৃত শিক্ষায় আগ্রহশীল বিদ্যাসাগর যদি তাঁহাদের মতামত জানিয়া এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। †

তদনুসারে বিদ্যাসাগর ছোটলাটের সহিত দেখা করিলেন। বিদ্যাসাগর জানাইলেন, তাঁহার অভিমত স্মৃতির জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপকের পদ থাকা দরকার। ছোটলাট এরূপ আশা করেন নাই। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি আদেশ জানাইলেন, দর্শন ও অলঙ্কারের সহিত স্মৃতির অধ্যাপকের পদ এক হইয়া যাইবে। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতি বাংলা-সরকারের আদেশের মর্ম্ম এই :—

"... ছোটলাট এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের গোড়াতেই জানাইয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের বহু ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ আলাপে এবং অন্যরূপেও এ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত দুই ভদ্রলোক এবং অপরাপর যোগ্য ব্যক্তির প্রস্তাব এতই পরিমিত ও সঙ্গত বলিয়া মনে করেন যে তিনি মূলতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইতে পারিয়া আনন্দিত হইতেছেন...। (১৮৭২, ১৭ মে) *

উপরিলিখিত পত্রখানি যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুরা ভাবিলেন, বিদ্যাসাগর স্মৃতির অধ্যাপক পদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ছোটলাটের মতে সায় দিয়াছেন। এজন্য বিদ্যাসাগরকে দেশবাসীর নিকট হইতে বহু গালাগালি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি ছোটলাটকে এই পত্র লিখিলেন,—

"সংস্কৃত শিক্ষাপ্রচারে যাঁহারা আগ্রহশীল, হিন্দুসমাজের এমন-সব প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিতে আমাকে বলা হইয়াছিল। লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে প্রস্তাবগুলি আমার নিকট হইতে আসিয়াছে। সেজন্য আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি যে, স্মৃতি-অধ্যাপনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব আমার নিকট হইতে আসে নাই। বস্তুতঃ আমি আপনাকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে স্মৃতির একজন স্বতন্ত্র অধ্যাপক দরকার; এখনও আমার সেই মত। আপনি জানেন, স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু বিপুল, সারা-

---

* Home Dept. Education Cons. 20 May 1859, Nos. 16-18

† H. L. Johnson, Private Secretary, to Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, dated Belvedere the 22nd April 1872.—Education Con July 1872, Nos. A. 27—29.

* Education Con. June 1872, Nos. A 16—28. পত্রখানি ১৮৭২, ২২ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

জীবনের চেষ্টায় ইহা শিখিতে হয়। একথা সত্য, এমন কেহ কেহ আছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহাদের জ্ঞান গভীর এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও যাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়; কিন্তু এইরূপ বহুমুখী জ্ঞান অল্পই দেখা যায়। অন্য বিষয়ের অধ্যাপক পদের সহিত স্মৃতির পদ এক করিয়া ফেলিলে এই বিষয়টিকে খাটো করা হইবে এবং ইহার কার্য্যকারিতাও কমিয়া যাইবে, কেন-না যে অধ্যাপক অবসর মত ইহা পড়াইবেন তিনি বিষয়ের বিপুলতা অনুসারে ইহাতে যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার তাহা দিতে পারিবেন না। আমি সরকারী পত্রে দেখিয়াছি, কলেজের অধ্যক্ষের মতে 'অপরাপর কাজ করিয়াও অধ্যাপক মহাশয় এখন অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন।' ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের কাজে যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমি এই মত সমর্থন করিতে পারি না। যিনি কলেজে আইন পড়িয়াছেন মাত্র, কিন্তু শুধু আইনই যাঁহার গভীর অধ্যয়নের বিষয় নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য দর্শন অথবা গণিতের এমন-কোনো অধ্যাপককে আপনি যদি তাঁহার অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাঁহাকে আইন পড়াইতে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার যে ফল হয়, তাহা বিবেচনা করিলে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটির গোলযোগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। আইন-ব্যবসায়ীরা যে এই পদ্ধতি সমর্থন করিবেন না সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, অথচ সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ বন্দোবস্তের প্রস্তাবই করা হইয়াছে। পণ্ডিত মহেশচন্দ্রের গুণ এবং পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি, কিন্তু আমার ভয় হয়, এতগুলি কাজের ভার একসঙ্গে তাঁহাকে দিলে শুধু স্মৃতির অধ্যাপনা কেন, যে-বিষয়গুলি পড়াইতে তিনি বিশেষরূপে উপযুক্ত সেইগুলির অধ্যাপনাতেও ত্রুটি হইবে। আপনি বলিয়াছেন, 'স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হইবে, এই ইচ্ছা আছে এবং বরাবরই ছিল।' কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আপনার ইচ্ছা সুসিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনার আদেশের এই অংশটি পুনর্বিবেচনা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। এই অধ্যাপক পদ তুলিয়া দেওয়াতে মাসে একশত টাকা মাত্র ব্যয়-সঙ্কোচ হইবে, এই টাকা এতই অল্প যে আমি একান্তভাবে আশা করি, হিন্দুসমাজের কথা ভাবিয়া আপনি এ বিষয়ে এই সুবিধাটুকু করিয়া দিবেন।...

"স্মৃতির অধ্যাপক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার পরামর্শ আপনাকে আমি দিয়াছি—সরকারী পত্রের লিখনরীতি হইতে ইহা অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের আগ্রহ এত বেশী যে তজ্জন্য লোকে আমাকে ভুল বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে অতি অনির্দ্দিষ্টভাবে আমার নামের উল্লেখে সাধারণের মনে যে ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মিতে পারে, তাহা অপনীত করিলে আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে।" (১৮৭২, ২৩ মে)

বিদ্যাসাগরের পত্রে কোনই ফল হয় নাই। তবে এই ব্যাপারে ছোটলাট তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত চিঠিপত্র ১০ই জুন তারিখের 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের মন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা অপসারিত করিয়াছিলেন।

গণশিক্ষা

জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোটলাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ছোটলাট শুধু শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা সচেষ্ট এরূপ কয়েকজন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে চাহিলেন। ইঁহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ছোটলাটকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"...সরকার যে ভাবিয়াছেন বিদ্যালয়-পিছু মাসিক পাঁচ-

সাত টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া কোনো শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবেন, আমার মতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কার্য্যকর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। পাঠ, লিখন এবং কিঞ্চিৎ গণিত শিখাইতে যাঁহারা কোনরূপে সমর্থ, নিজ নিজ গ্রামের প্রতি আকর্ষণ যতই থাক এমন যৎসামান্য বেতনে তাঁহাদিগকে কার্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত করিতে পারা যাইবে না। ··

"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকাবন্দি বিদ্যালয়গুলিতে যে-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহার সঠিক খবর আমি জানি না। বিহারের বিদ্যালয়গুলিতেও ঐ একই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ধরিয়া লইলেও আমি বলিব বাংলার পাঠশালাগুলিতে যে ব্যবস্থা আছে ইহা অনেকাংশে তদনুরূপ। যতটা বুঝিতেছি, বিহারের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমা হইতেছে পত্র-লিখন, জমিদারী হিসাব ও দোকানের খাতাপত্র রাখা পর্য্যন্ত। বিহারের এবং বাংলার পাঠশালাগুলির মধ্যে প্রভেদ এই যে, কিছু উন্নত ধরণের কয়েকখানি ছাপা বই বিহারে নামমাত্র ব্যবহৃত হয়। বাংলা দেশে এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচার যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গুরুমহাশয়দের অল্পকিছু মাসিক বেতনের ব্যবস্থা, তাঁহাদের পাঠশালাগুলিতে খানকয়েক মুদ্রিত পুস্তকের প্রবর্ত্তন এবং সেগুলি সরকারী পরিদর্শনের অধীন করিলে সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য, এরূপ শিক্ষা, নগণ্য হইলেও জনসাধারণের মধ্যে (যদি জনসাধারণ কথার অর্থে শ্রমিক শ্রেণী বুঝিতে হয়) বিস্তৃত হইবে না। কেন-না, এখনও পর্য্যন্ত বিহারে বা বাংলায় এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক বালকই পাঠশালায় শিক্ষার্থী হয়।

"শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উপরই ইহার কারণ আরোপিত করা যায়। সাধারণতঃ অবস্থা এতই খারাপ যে ছেলেদের শিক্ষার দরুণ তাহারা কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ। একটু বড় হইলেই যখন কোনরূপ কাজ করিয়া যৎসামান্য কিছু উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত হয়, তখন আর তাহারা ছেলেদের পাঠশালায় রাখিতে পারে না। তাহারা ভাবে—এবং সম্ভবতঃ এ ভাবনা যথার্থ—যে ছেলেদের কিছু লেখাপড়া শিখাইলেই তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না, তাই ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাইতে তাহাদের কোনরূপ প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা যে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবে, এ আশা করিতে পারা যায় না,—বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফলের কথা এখনও প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টায় কোনো কাজ হইবে না। যদি এ বিষয়ে পরীক্ষা করা সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সরকার যেন অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ পরীক্ষা ব্যক্তিগত এবং বে-সরকারীভাবে করা হইয়াছে, কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই।

"বিলাতে এবং এদেশে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বোঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

"একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। একশত বালককে লিখন পঠন এবং কিছু অঙ্ক শেখানো অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা-প্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোনো রাজসরকার এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও, শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন-প্রকারে ভাল নয়।" (১৮৫৯, ২৯ সেপ্টেম্বর) *

---

* *Education Dept. Procdgs* October 1860, No. 5.

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন

১৮৫৪, ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অ্যাক্ট ২৬ পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য—'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা।' সাক্ষাৎভাবে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালকদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৩, মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন খোলা হয়।* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিনশত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে সরকার স্থানীয় চারিজন ভদ্রলোককে এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিলেন; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ইহা পরিদর্শন করিবেন এবং কোনরূপ উন্নতির প্রয়োজন বোধ করিলে সরকারের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সরকারের নির্ব্বাচিত প্রথম চারিজন পরিদর্শক ছিলেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং বাবু রমানাথ ঠাকুর। প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়।

১৮৬৩ নভেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাস্বরূপ তিনি ১৮৬৪, ৪ এপ্রিল সরকারের নিকট এক বিবরণী পাঠাইলেন। ছাত্রদের শিক্ষার অধিকতর উন্নতি ও ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যবস্থার প্রস্তাব ইহাতে ছিল। পর বৎসরের প্রারম্ভে তিনি আর একটি বিবরণী দাখিল করেন; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন পরিচালনার্থ নিয়মাবলীর ১১ সংখ্যক নিয়মের দিকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই নিয়মে আছে 'কেবল অতি গুরু অপরাধেই শারীরিক শাস্তির বিধান হইবে।' অর্ডার-বুক হইতে দেখা যাইতেছে প্রায় প্রতিমাসেই এক অথবা অধিক-সংখ্যক বালক চার হইতে বার ঘা পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত লাভ করিয়াছে। যে-সকল কারণে তাহারা এইরূপ শাস্তি পাইয়াছে তাহা 'গুরু অপরাধের' পর্য্যায়ে পড়ে বলিয়া আমার মনে হয় না। একটিমাত্র ঘটনা সম্ভবতঃ ইহার ব্যতিক্রমস্থল, সেটিও আবার ভালরূপে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই শাস্তি অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জ্জিত হইয়াছে। বেত্র ব্যবহার না করিয়াও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। বালকদের শিক্ষাদান কার্য্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।" (১৮৬৫, ১১ই জানুয়ারি)

ছাত্রদের পরবর্ত্তী ব্যবহারে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের সুনাম বাড়ে নাই। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে বলা হইতে লাগিল, পরিচালক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কুদৃষ্টান্ত নাবালক ছাত্রদের পক্ষে হিতকর নহে; লোকে তাঁহার নৈতিক চরিত্রের উপর প্রকাশ্যভাবে দোষ আরোপ করিতে লাগিল। ১৮৬২ সালের ২০এ ডিসেম্বর তাহেরপুরের জমিদার চন্দ্রশেখর রায় এবং রাজশাহী ও নিকটবর্ত্তী জেলার আরও ষাটজন জমিদার প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ ত্রুটি দেখাইয়া সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে প্রার্থনা জানানো হইল, স্ব স্ব জেলা-স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে নাবালকদিগকে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনে পাঠানো ঠিক হইবে না। ইহাতে তাহারা পারিবারিক প্রভাবের অধীনে থাকিবে, অল্পবয়সে তাহাদিগকে কলিকাতার নাগরিক প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হইবে না। সরকার প্রথমে

* প্রথমে চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ অক্টোবর মাসে ইহা মানিকতলা আপার সার্কুলার রোডে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠানটিকে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের কোন শহরে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের গঠন এবং পরিচালন প্রণালী সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন (১৮৬৫, ২৪ এপ্রিল)। সে কমিটির সদস্য হইলেন—অস্থায়ী ডি. পি. আই. উড্রো, বোর্ড-অফ-রেভেনিউ-এর জুনিয়ার সেক্রেটারী লেন, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ব্যাপারে পণ্ডিত যে স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য এবং সৎ জমিদার রূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া, কেবল অল্পস্বল্প ইংরেজির জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।···

"এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্ত্তী নিন্দনীয় জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস ইষ্টিটিউশন হইতে নিষ্ক্রান্ত ছাত্রদের সহিত অন্য তরুণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে শেষোক্ত তরুণরাই ভাল।···

"এখন নাবালকত্বের বয়সের সীমা ১৮ বৎসর। ইহা বাড়াইয়া ২১ বৎসর করিলে, আমার বিবেচনায়, ছাত্রদের পক্ষে খুবই হিতকর হইবে, কেন-না সেক্ষেত্রে তাহারা নিজের উন্নতিসাধনের জন্য দীর্ঘতর অবসর পাইবে এবং এমন বয়সে বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে যখন মানুষের চরিত্র একরকম গঠিত হইয়া যায়।" (১৮৬৫, ১ সেপ্টেম্বর)

শারীরিক শাস্তিবিধানের সম্বন্ধে রিপোর্টে উড্রো সাহেব কিছুই উল্লেখ করেন নাই। নাবালক জমিদারদের পক্ষে ইহার যে একান্ত প্রয়োজন এবং এতদ্ভিন্ন শৃঙ্খলারক্ষা যে অসম্ভব, পরিচালক রাজেন্দ্রলালের এই মত লেন সাহেব সমর্থন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য, সরকারও এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর বিদ্যাসাগর আর অধিক দিন ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক থাকেন নাই। তাঁহার পরিদর্শনের শেষ তারিখ ১৮৬৫, ২৮এ মার্চ। খুব সম্ভব, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত কোনো বিষয়ে মতভেদই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।*

উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত

সরকার পুনরায় বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস পরীক্ষাগুলিতে যে-সকল ভাবী পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তৎসম্পর্কে কলেজীয় এবং জেলা-স্কুলগুলির পাঠ্য-বিষয়ে কতদূর পর্য্যন্ত সংস্কৃত চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার ও রিপোর্ট দিবার জন্য ১৮৬৩, আগষ্ট মাসে এক কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগরকে এই কমিটির একজন সদস্য করা হয়। উড্রো সাহেব হন ইহার সভাপতি এবং কাউয়েল অন্যতম সদস্য।

১৮৭৩, ১১ই জুলাই ডি. পি. আই. অ্যাটকিনসন্ সাহেব ইংরেজি ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটীর সভ্য হইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন। তাঁহার বিবেচনায় এ বিষয়ে দেশীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই; তিনি লিখিলেন,—

"দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষগ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।"

---

* বাংলা-গভর্ন্মেন্টের রাজস্ব-বিভাগের দপ্তরে আমি ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের তিনখানি রিপোর্ট দেখিয়াছি। সুবলচন্দ্র মিত্রের পুস্তকেও এগুলি মুদ্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অনেকস্থলে ভুল, এমন কি মূলের সহিত পার্থক্য আছে।

দো-টানা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

(১)

সেই সে বচ্ছর যখন আশ্বিনে ঝড়ে বাজ পড়ে দত্তদের বৈঠকখানাটা ফেটে চৌচির হল—সেই সে বচ্ছরেরই কথা গো। তখন বোলু পাঁচ বছরেরটি, স্থাপা আমার কোলে, আর দুর্গা সবে পেটে। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার ছেলেপুলে, ওদের বয়েস আমি আর জানি নে। ওগো হ্যাঁ, সেই বচ্ছরই,—সেই যে নয়নতারার বঠ্‌ঠাকুরের বৌ কোথায় গেল, পাড়াটাময় ঢি-ঢিতে কাণ পাতবার জোটি ছেল না। ওরে পুঁটি, আয় না, তোর চুলটা বেঁধে দিই। কি যে সব বাপু আজকাল ধিঙ্গিপদ মেয়ে হইচিস্ তোরা! সোমথ বয়েস, আজ বই কাল সোয়ামীর ঘর কত্তে যাবি, এলো চুল দুলিয়ে দিন নেই রাত নেই ঢলে ঢলে বেড়ানো, ও কি ঢঙ্‌লা?

হ্যাঁ' ঠাকুঝি, এই বলি। যা' বলছিনু শোন তারপর। সেবার সেই পেরথম আমি ঠাকুর পোর সঙ্গে গিয়ে কলকেতা দেখনু। উহ্! কি সহর, দিদি, গায় গায় সব বাড়ী, আর বাড়ী, আর বাড়ী। ছাতে উঠে সে বাড়ীর মেলা, দেখলে বুদ্ধি হরে যায়। সঙ্গে ছেল ম্যানোকা জ্যাঠাই, আর গণু ঠাকুর্দা। হরনাথের জামাইও তার পরিবার নিয়ে সঙ্গে এয়েছেল। ফামবাজারের কাছে ফামপুকুরে আমাদের বাড়ী;—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ঐ নামই, ফামবাজারই বলি—আমার ছোট্‌-ঠাকুরের ঐ নাম কিনা, তাই ঠাকুর দেবতারও নাম করবার জো-টি নেইকো। বৃন্দাবনে গেছনু; ফামকুণ্ডে চান করে রাধাফ্যাম নাম নিতে হয়; তা' আমার পোড়া কপাল, ঐ নমো নমো করেই সারতে হ'ল। ভগবান অন্তরযামী, জানছেন সব; আমার ভক্তি নিষ্ঠে থাকলেই হ'ল, তা ফ্যামই বলি, আর বদনমোহনই বলি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই গল্প—যা বলছিনু। তোরা বাছা বড় মুখহল্‌সা, বড্ড বকাস্; আমিও আবোল-তাবোল বকে মরি, গল্প গিয়ে থাকে শিকেয় তোলা। মাথাটা পুঁটি একদণ্ড স্থির রাখতে পারিস নি কো; মেয়ের মাথা নড়ছে যেন লাটিম। আ-মর! রকম দেখো না! হ্যাঁ, ঠাকুর-পোর সঙ্গে ইষ্টিশনে নেমে বাছা গঙ্গার পুলটা হেঁটে পার হনু। সিদিনকে আবার হু হু করে পাতা-মাতা উড়িয়ে পুবে হাওয়া বইছিল। হাতে আমার নারকেল নাড়ু, আর আমসত্বের পুঁটলী; আঁচল ধরে পিছু পিছু আসছে বোলু, স্থাপাকে নিইচি কোলে, আর ও-হাতে ধরিচি গিয়ে ঠাকুর-পোর উড়ুনীর খুঁটটা। লজ্জায় মরি, দিদি; সে কি ঝড়ো হাওয়া, কাপড়-চোপড় সামলায় সাদ্দি কার। পেছনে হুড়ি করে বাঁধা চুলটা গেল এলিয়ে; মুখে চোখে নিজের চুলের ঝাপ্‌টা খাই, আর আমসত্বের পুঁটলী-ধরা হাতে পরণের কাপড়খানা ধরে টানাটানি করি। তাও বলি, সহরে বাস—'লাজ লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়'।

"হ্যাঁ লা, হ্যাঁ, এই তো বলছি গল্প। কোন-গতিকে বড়োবাজার এসে গাড়ী করলে ঠাকুর-পো;—চোদ্দ আনা ভাড়া। ছেলেপুলে পুঁটলী-পাঁটলা নিয়ে ধড়ে প্রাণে এসে ভর দুকুরবেলা বাড়ী পৌঁছে বাঁচনু। ভদ্দোরলোকের মেয়ে যেন হেঁটে গঙ্গার ঐ পুল পার না হয় কখ্‌খনো।

সেবার কলকেতায় এক বচ্ছর ছিনু। কাছেই এষ্টার থিয়েটার। ঠাকুর-পো কি খপরের কাগজে চাকরী জুটিয়ে পাশ পেয়েছেল। সেই আমার পেরথম থিয়েটার দ্যাখা। পালা ছেল "ভ্রেমর"। বুক ঢিপ ঢিপ করে মরি আর কি? অত লোকের গাঁদি, আলো; রসনচৌকী, বাদ্দিভাণ্ড—আমার হ'ল যেন 'ভিখিরীর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপন দেখা'। সেই যে দিগম্বর নন্দীর ছেলের বিয়ের বরসভা দেখেছি, আর এই থিয়েটার।

(২)

আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো মেয়েদের দিকে। চিক-ফ্যালা জায়গা। যত বাড়ীর বৌ-ঝিই গিন্নী বান্নীই যে এয়েচে

দিদি, যেন চাঁদের হাট বসে গ্যাচে। তাঁদের আবার ছেলে কোলে; কারু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আটটি, কারু দশটি। একজনরা এয়েছেন—কোথাকার নাকি রাণী। কি পদ্ম-পাপড়ীর মত টানা-টানা চোখ, ধনুর মত ভুরু, আর রঙ ঠাকুঝি, সে রঙের কাছে দুধে-আলতাও ম্যাড় ম্যাড় করে, রঙ একেবারে ফেটে পড়ছে। আহা! এমন সোণার পিরতিমে বিধবা; পোড়া একচোখো বিধির বালাই নিয়ে মরি; মানুষের সুখ দেখতে পারে না যেন। তার মেয়ের মাথায় সোণার মুটুক, সব্বাঙ্গ সোণায় মোড়া, হিরে চুণী পান্নার ঝিলিকে চোখ দিদি, ঠিকরে পড়ে। গলায় মুক্তোর শতনরী হার, মাথায় সোণার মুটুকের কোল-ঘেঁসে আবার হিরের টায়রা। মেয়ে বাপু কি মোটা, যেন বিষ্ণুপুরী তামাকের জালা, একটি ছোট্ট-খাট্টো শুঁড়-কাটা হাতি বসে রয়েচে। মেগো, কি কুচ্ছিৎ! বল্লে পেত্তয় যাবে না, অমন লক্ষ্মী পিরতিমের মত মার পেটে অমন জালা পেত্নীর মত মেয়ে হোলো কেমন করে বাপু কে জানে? কত্তাটি বোধ হয় ছেল কালির চুলো। কিন্তু কথায় বলে 'মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পুত', বাপের মত মেয়েই বা কেমন করে হয়!

আহা! থিয়েটার তো নয়, একেবারে রাজবাড়ী দিদি, রাজবাড়ী। মস্ত চাঁদোয়া খাটানো, থামে থামে ইলেক্‌টিরিকের দেয়ালগিরী, মাঝখেনে একশো বাতীর ঝাড় ঝুলতে নেগেচে। সামনে বাছা বন—একেবারে জনমনিষ্যি-হীন অজগর বিজবন; তা'র মাঝখেনে একটা পোড়ো মন্দির; ভাঙা ঘাটে তালপুকুরের ভাঙা পৈঠেয় বসে এলো চুলে ভিজে কাপড়ে এক ছুঁড়ী বাসন মাজতে লেগেচে। হাতে বাউটি, খাড়ু, এয়োতির চিহ্নি ঐগে কি বলে নোয়া আর শাঁখা, কপালে ডগডগ কচ্চে সিঁদুর। কি কল বানিয়েচে বাপু জানিনেকো, সারা বনটা মন্দির আর পুষ্কর্ণিটে কাঁপতে নেগেচে, আর দুলচে, যেন জলে আঁকা ছবি। গোরার বাদ্দি এনেছেল ওরা, চোতু-দা'র বে-তে যেমন গোরার বাদ্দি আসে, ঠিক তেমনিতর; খালি তফাৎ এই—এ বাদ্দির সঙ্গে ব্যায়লা বাজে।

(৩)

সে একঘর চাঁদমুখের হাটে, ভাই, আমি হয়ে পড়নু বাঁশবনে ডোমকাণা। আহা! কি যে সব রূপ গো, আর গয়না-গাঁটি সাজসজ্জির ঢেউ-ঢেউ। এক-একজন গিন্নী আর বউ যেন স্যাকরার দোকান গো, স্যাকরার চলন্ত দোকান; ভাসানের দুগ্‌গো পিরতিমেকে যেমনতর রাজরাজড়ার ঘরে সাজিয়ে বের করে, এ যেন তেমনি। তা' দেখো, সবাই কিন্তু বড় ঘরের নয়, রাজা-গজা থেকে গরীব-গুরবোর ঘরের ঘরণী অবধি এয়েচে; হাতে দু'গাছি নোয়া রুলী, মাথায় এয়োতির চিহ্নি সরু করে কাটা সিঁদুরের টানটুকু, আর একখানি চওড়া রাঙা পেড়ে ধোপদস্ত আটপৌরে সাড়ী; তা'তেই গেরস্ত ঘরের লক্ষ্মীদের কি সুন্দর মানিয়েছে, ভাই! 'সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা'।

উদিকে বাদ্দি থামলো; আর পট উঠলো। সে কি, ভাই, য়্যাক্টো করার ধাঁচা, যেন সব জলজীয়ন্ত মানুষের কথাবার্ত্তা। মরি হেসে আর কেঁদে। রোহিণী মুখপুড়ীর কিন্তু ভাই গোড়া থেকে মনে মনে ছেল ঐসব অকথা কুকথা; জমিদারের ছেলেকে পেলো তাই; নইলে ও একটাকে নিয়ে ভাসতোই, তা' আমি এই তোমায় বলে দিনু। ও-সব মেয়েমানুষ সোজা পাত্তর নয়; রূপ থাকলে হবে কি? ওরা পুড়িয়ে মারবার অগ্নিশিখে, রূপের আগুণ মালসায় করে আলেয়ার মত পথে ঘাটে ওরা দপ্‌ দপ্‌ করে জলতে লেগেছেই। পুরুষ মানুষ ওদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে আচে!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবচি, আর চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে ভ্রমর মুখপুড়ীর দুঃখু দেখচি। কার কোলের ছেলে পাশেই ট্যাঁ করে কেঁদে উঠলো। চেয়ে দেখি, এক-খানি পটে আঁটা ছবি। আহা! কি রূপ ভাই, রূপের ওর বালাই নিয়ে মরি। অত গয়না-গাঁটি-ঢাকা রাণী রাসমণির দলকে একেবারে কানা করে দিয়েচে, ভাই, শুধু রূপে! চোখ দু'টি টানা বলে টানা, একেবারে কাণ অবধি ভাই, টেনে নে গেছে যেন পটোর তুলির পোঁচে। তোমার দিকে চোখের পাতা তুলে চাইলে প্রাণটা আঁচু-পাঁচু করে ওঠে, দিদি, চোখের সে অতল তালপুকুরের মত ভাব দেখে। গায়ের রঙ ভাই, মেম সায়েবকে হার মানায়, ইহুদী মেয়ে দেখেচো?—সেই ধরণের কতকটা। পাতলা ছিপছিপে মানুষটি, ছোট্ট হাঁ-টুকু, রাঙা টুকটুকে ঠোঁট, লম্বা লম্বা সরু সরু আঙুল হাত পায়ের। পরণে একখানি নীলাম্বরী, গলায় সরু চেন-হার, হাতে দু'গাছি সোণার চুড়ি, সোণার

শাঁখা বাঁ হাতে, আর কাণে দু'টি ফুল। চুলের ঢল নেমেছে কোমর ছাড়িয়ে, খোঁপা বাঁধেনি বলে গুছিয়ে সামলে রাখতে পারচে না।

কোলে তার খোকা, সাত আট মাসেরটি, নুদুস-নাদুস পুতুলটুকু যেন। তেমনি গোলাপী গাল, নীল চোখ; ধপধপে রঙ,—কেবল কাঁদে আর মা তার মুখে মাই গুঁজে ছ্যায়। আমায় চাইতে দেখেই ফিক করে হাসলো; হাত বাড়িয়ে খোকাকে এগিয়ে ধরে বললো, "নেবে ভাই একটু ওকে? উনি ডাকচেন, একবার দেখে আসি, বুঝি জল-খাবার এনেচেন।" আমি তো ভাই বত্তে গেনু। এক গাল হেসে আগ-বেড়ে খোকাকে কোলে নিয়ে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে বল্লু, "দাও না ভাই, এ আবার একটা কতা, একটুখানি ওকে নেবো, তার আর কি?"

কি? নাম ওর? না বাপু, জিজ্ঞেস করিনিকো; ঠাকুর-পো বলে দেছিল, সহুরে মেয়ে-লোকের নাকি ধরণ-ধারণ আলাদা; নাম জিজ্ঞেস থামকা কত্তে নেই। তবে ওরা বামুন, ভট্‌চায বামুন। ওর সোয়ামী কোথায় হেড কেরাণীর কাজ করে, এক শো টাকা মাইনে পায়; শাশুড়ী আচে, যা' আচে, এক খুড়শ্বশুর ওদের অন্নে থাকে। ঐ একটি ছেলে, সবে হয়েচে। বে হয়েচে এই বছর দুই উৎরোয়নি এখনও। ফিরে এল এক-ঠোঙা জলখাবার নিয়ে। সন্দেশ, গজা, মিহিদানা, অমন কত কি! আমার বলা ন্যাপাকে এক পেট খাওয়ালো, বাছা কত আদর করলো। চুমো খেলো। আর নিজের খোকাকে বুকে আঁকড়ে সে কি আদরের ঘটা। ওকে বুকে চেপে ধরে দোলে, চুমু খায়, আর কেঁদে ফেলে; বলে, "এ ধন আমার সাত রাজার মাণিক, আমি হতভাগী কি ওকে রাখতে পারবো। বিধাতা পুরুষ ভাই বড় নিষ্ঠুর, সুখ দেয় দুঃখ দেবার জন্যে; বড্ড ভয় করে, ভাই, খোকা বুঝি আমায় কবে ফাঁকি দেবে। এই সি দিনকে মরতে মরতে বেঁচেছে। কত রোগ-নাড়া গেছে এরই মধ্যে, সবে তিন মাস সত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ভাল আচে।"

সে পালাটা সাঙ্গ হ'তে দু'টো রাত হ'ল। তার মধ্যে মেয়েটা না হবে তো বার পঁচিশেক উঠে গেল; একবার সোয়ামী ডাকচে বলে, একবার ঝির হাতে পান আনাতে; একবার খোকার দুধ এয়েচে বলে; একবার অমনিতর কি একটা অছিলেয়। খোকাকে কখন আমার কোলে ছ্যায়, কখন পাশের একটি কড়ে রাঁড়ী মেয়ের কোলে তুলে দে উঠে যায়। ফিরে আসে চোখটা রাঙ্গা করে চোখের জল মুছতে মুছতে,—এসে বসে পড়ে হাসে—সে কি মনমরা প্রাণ-হাঁচ-পাঁচ-করা হাসি ভাই, দেখলে চোখ ফেটে জল আসে।

(৪)

রাত তখন দুপুর। একবার ভেতর-বাগে উঠে গিছিনু; থিয়েটারের ঝি মাগী আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেল। দেখনু, কে একটা মিন্সে মুখখানা গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আচে, আর ঐ মেয়েটা হাত-জোড় করে তার কাছে কি বলচে, আর হাপুস নয়নে কাঁদতে লেগেছে। তখুনি আমার কেমনতর খট্‌কা লাগলো; মনটা ডেকে ডেকে বল্লো, 'মিষ্টি আমেই পোকা ধরে', কে এ কদম গাছের কানাই? কে এ বিটলে মিন্‌সে, অমন একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত মানুষটো কাঁদচে, তা মিন্‌ষের রকম দেখো; মুখ তো নয় যেন কাটের বারকোষ। কি আর করি বল, আমি তো ওর পর বই আর আপন নই; গুটি গুটি ফিরে এনু; মনটা কেমনতর খিঁচড়ে গেল গো। সে ফিরলে জিজ্ঞেস করনু, "হ্যাঁ, বাছা, ও তোমার কে?" শুনে যেন কেমনতর হয়ে গেল। মুখখানা শক্ত করে গুম হয়ে খানিকটা বসে রইল; তার পর গোমড়া মুখ তুলে বললো, "উনি আমার স্বামী!"

আ! তা' বাছা, অমনতর রাগারাগি কান্নাহাটি করছিলে কেন? সোয়ামী গুরুজন, যা' বলেন শুনতে হয়। অবিশ্যি সংসারে থাকতে হলে অমন একটু-আধটু মন-ভাঙাভাঙি হয়, হাঁড়িকুড়ি একত্তর থাকলেই ঠোকাঠুকি লাগে, তা'তে কিছু দোষ নেই। এই দেখোনা, চতুদা'—তার নাম চৈতন, আমার জ্যাঠতুতো ভাই, তার দুই সংসা'র। বড়র ছেলেপুলে হল না, সে বৌ বাঁজা; তা বংশ রক্ষে তো কত্তে হবে? আবার সানাইও বাজলো, বিয়েও হল। সে বৌ চালাক মেয়ে, চোখে-মুখে হাতে-পায়ে কথা কয়। তা' বাপু, যখন সতীনের ঘরে পড়েছিস্, মানিয়ে গুণিয়ে থাক। তা না; নেগে গেল দু'জনে চুলোচুলি ঝটাপটি তেরাত্তির না পোয়াতে। তার ওপর ঘরে দুই ননদ, ক'জন জ্যাঠশাশুড়ী, খুড়-শাশুড়ী; কোঁদলের আগুন জললো তো' আর রক্ষে নেই; আর কোঁদল বড় ছোঁয়াচে

জিনিস,—কথায় বলে বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘর মানে না। সেবার ভোর জ্যোষ্টি মাসে দুপুর বেলা কৈলেশ দাঁর কাঠের গোলায় আগুন। দেবতার কৃপা হল—

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি বাছা, সেই গল্পই বলছি। আমার ঐ কেমনতর রোগ, বলতে বলতে খেই ফেলি হারিয়ে। তা' দিদি, ওকে বোঝানু বিস্তর। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী', আর আমি তার কে বল?—'বাঁশতলায় বিয়ল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই', আমার আর তার ওপর জোরই বা কি? সেই এস্তক ও-যেন আমায় এড়িয়ে চলতে নাগলো। আমিও বাপু একটু চটে গিছনু, হ্যাঃ! আমার অত-শত পোষায় না। সোজা মানুষের কাছে আমি বাঁশের কঞ্চির চেয়ে সোজা, বাঁকার কাছে বঁড়শীর মত বাঁকা। আমি সেই থেকে পিট ফিরিয়েই রইনু; একমনে থিয়েটারের পালার গায়েন শুনতে লাগনু, আর আড়ে-আড়ে ওর দিকে চোখ রাখনু একটা। সেই যে কাদের কড়ে রাঁড়ী মেয়ে আমাদের ও-পাশে বসে ছেল, তার কোলে ছেলে দিয়ে দু'বার উঠে গেল। তা' দিক, আমার কি বল? রাগ আমার শরীলে নেই, তাই; নইলে বলার মাকে তুচ্ছু-তাচ্ছিল্যি করে এমন বাপের বেটী আমাদের বন-বিষ্টুপুরে তো দেখিনি। রাঁড়ী মেয়েটা আধ ঘণ্টার মধ্যে ওর সঙ্গে কি ভাবটাই জমিয়ে নিলে, দিদি! আমি আড় চোখে দেখি আর হাসি—

'বাঁচলে কত দেখবো আর
ছুঁচোর গলায় চন্দরহার,
বেড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে'!

আহা! ছেলেটার দিকে চাইলে দু' চক্ষু জুড়িয়ে যায়। ধপধপে রঙ, চোখে কাজল পরিয়ে দেছে, এক-মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, রাঙা তুল-তুলে হাত পা গুলি যেন মোমের পুতুলের, দেখলে মায়ায় প্রাণটা কেমনতর করে। ও মা! এমন নাড়ীছেঁড়া ধন, সাত রাজার মাণিক দিদি, কি করে ত্যাগ করে? সুন্দর হ'লে হবে কি, ডাইনী বাছা, ডাইনী, ওর কাছে আবার মাতৃ-স্নেহ।

যদি সেওড়াতলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।

হা আমার পোড়া কপাল! বাঘের আবার গো-বধ? হ্যাঁ? কি করেছেল মাগী? আর কি করেছেল! তাইতো বলতে নেগেচি। বলি আগে আগাগোড়া শোনই না সব। আমি কি আর নেকী, ধান খেয়ে মানুষ গা? হ্যাঁ, কি বল? হ্যাঁ হ্যাঁ বাপু চক্ষে ধুলো দেবে আমার? তেমনি বাপের মেয়ে আমি? তক্ষুণি মনে মনে এঁচে নিইচি, এত যার মুনি-মন-টলানো রূপ, ও-কি কখনো ভাল হয়? মিষ্টি হাসিতে ছিষ্টি নাশ। ঐ রূপের আগুণে বাবা লঙ্কা মজেচে, সবংশে রাবণরাজা ধ্বংস পেয়েচে। ও বাপু রূপ নয়, রূপ নয়, সর্ব্বনাশা আগুণ, ও হাসি নয় মিচরির ছুরী। তার পরে শোন, বাছা, যা' বলছিনু বলি, শোন।

ওর যেন আমাদের কাছে মন আর বসে না, কেবলি উঠে-উঠে যায়, আবার এসে ছেলে কোলে নিয়ে যেন কেমনতর ভাবে দিক-বিদিক জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। পেরথম-পেরথম ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অজচ্ছল চুমো খাচ্ছিল; শেষটা আর তা' খায় না, আদরও করে না, শুধু অমনিতর পাগলের মত চেয়ে থাকে, আর হটাৎ পাশের বিধবা মেয়েটার কোলে ধপ্ করে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মত উঠে যায়!

রাত তখন একটা হবে। এক-মনে থিয়েটার দেখছি। আলো নিবিয়ে আসরখানা অন্ধকার করে দিয়েচে। রাতবিরেতকাল, জমিদারদের মস্ত বাগান, শান-বাঁধানো ঘাট, আর জলে পা ডুবিয়ে ঘাটে বসে রোহিণী; পিতলা কলসী তার জলের ঢেউয়ে ভাসচে। পেছনে গোবিন্দলাল দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে তার রূপ দেখচে। থিয়েটারে কি সুন্দর দেখায় ভাই, যেন হুবহু বাগান, তালপুকুর, দুরে মালীর গোলপাতার ঘর, খোয়াফ্যালা পথ, রাঙচিতের ব্যাড়া, সজনের গাছ, গাঁদা দোপাটির-কেয়ারী করা রাস্তা ওদিক দিয়ে ঘুরে চলে গেছে। সব পষ্টো, ছবির মত চোখের সামনে ভাসচে।

ইরিমধ্যে কবার যেন সেই সুন্দরী এলো-গ্যালো, অত শত খেয়াল করিনি। একবার সেই কড়ে রাঁড়ী মেয়েটা আমার গায়ে ঠ্যালা দিতে চেয়ে দেখি তার কোলে ছেলে। ছুঁড়িটা কাঁপতে নেগেছে, আর হাপুস নয়নে কাঁদছে।

"ওমা ওকি লো?"

"ও দিদি, কি হবে?"

"ক্যান্ লা! কি হয়েচে, কি?"

"ঘণ্টাখানেক হ'ল ছেলে আমার কোলে দিয়ে কোথা গেছে, আর দেখা নেই, থিয়েটার যে ভাঙ্গে, দিদি।"

"আ মর! রকম দেখো? তা' কান্না কিসের? তার ছেলে সে এসে নেবে' খন, মা কি সন্তানকে ফেলে যেতে পারে?"

"না দিদি, আমার মন ডেকে বলছে, সে আর আসবে' না; যাবার সময়ে তার মুখ যদি দেখতে!"

কিছুতেই আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে পারিনে, ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে ভাই সে তার কি কান্না! আরও আধঘণ্টা গেল; থিয়েটার ছ্যাথা আমার মাথায় উঠলো। দু'জনে হা-পিত্তেশ করে ঢোকবার পথটার পানে চেয়ে ঠায় বসে! কাকস্য পরিদেবনা! থিয়েটারের ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস-পড়া কয়ু, হ্যাঁ গা, সেই যে সুন্দরপানা মেয়েটি এখানে বসে-ছেল, এই খোকার মা, তুমি ক'বার তাকে ডেকে দিলে তার সোয়ামী ডাকে বলে, সে কোথা গ্যাল গা? ডেকে দাও একবার; তার ছেলে নিক, ইদিক পালা যে সাঙ্গ হয়।

ততক্ষণে চার-ধারে লোক জমে গেছে; সবাই সুধোয় "কি গা, কি? কার ছেলে? কোথায় গ্যালো?" ঝি মাগী পেরথমে তো বোঝে না, যেন হাবা মনিষ্যি। তার পর বুঝলো তো আমাদের অঙ্গ শেতল করে দিব্যি বলে বসলো," ত্যানারা তো কবে গাড়ী ডেকে চলে গ্যাছে, মা। মেয়েটী বড্ডই, মা, কান্নাহাটি করতে লেগেছিলেন, আর বাবুটি এক-রকম কোলপাঁজা করে তাকে গাড়িতে তুলে নে গেল যে। তা' খোকাকে নে যায় নি! ও মা! কি হবে, মা, আমার কি ছাই অত শত মনে ছ্যাল।"

তার পর হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, দিদি! থিয়েটারের কর্ত্তাদের মধ্যে পড়ে গেল ছুটোছুটি, খোঁজ-খোঁজ রব। নীচে-ওপরে কোথায়ও তার তিনকুলের কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন পুলিশ এলো সেই হারানো ছেলে নিতে। সেই কড়ে রাঁড়ী মেয়েটার ভাই, খোকাকে বুকে চেপে কি কান্না; সে কিছুতেই ছেলে দেবে নী, বলে 'সে যে আমায় দিয়ে গ্যাচে গো।' তার জ্যাটা না কে কাঁচায়-পাকায় এতোবড় ঝাঁটার মত গোঁপ, ভুঁড়ো মিন্সে ঘোলা চোক পাকিয়ে মেয়েটাকে কি ধমকটাই দিলে ভাই; শুধু মারতে বাকি রাখলে। তখন মেয়েটা খোকাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে লুটিয়ে প'ড়ল সেইখানে। মা গো মা, কাণ্ড দেখে আমি তো গালে হাত দে থ'। 'বাইরে খুব মিঠে, নিম নিসিন্দে পেটে'—অত সুন্দর গা, যেন পটের আঁকা জগদ্ধাত্রীটি, আর তার মনে কি না এই ছেল! য়্যাঁ! সাধে বলে—

'পুড়লো চিতে উড়লো ছাই
তবে না মেয়ের গুণ গাই।'

ছ্যা ছ্যা ছ্যা! একটুখানি সুখের নেগে এই কলঙ্ক, এই টি টি, আর পেটের ছেলেকে ত্যাগ! মেয়েলোকের সুনাম গেল তো তার মরণই মঙ্গল, 'যাকে বলে ছি, তার রইল কি?' য়্যাঁ, কি বল, দিদি? স্ত্রীলোকের ইহকাল বল, পরকাল বল সবই সেই। সোয়ামী হচ্ছে দেবতা, মেয়ে-লোকের ইষ্টিকবচ। কি বল? য়্যাঁ?

হ্যাঁ লো ঢলানী, গাল টিপলে দুধ পড়ে, সিদিনকার পুচকে মেয়ে, তুই কি জানিস্ যে, ক্যাঁট-ক্যাঁট করে কথা কস্? শোনো দিদি একবার পুঁটি হতচ্ছাড়ীর কথা! মেয়ে-নোকে আবার সোয়ামী নাকি বেছে নেয়। সে সব আদ্দিকালের কতা, তখন স্বয়ম্বরা হ'তো, তেনারা ছিল সব দেবতা, মানুষের সঙ্গে তাদের তুলনা! 'চাঁদের কাছে জোনাক পোকা, ঢাকের কাছে ট্যামটেমি!' সোয়ামী কি ধন তা' তুই কি বুঝবি? যার হাতে তুলে মেয়েকে বাপ-মা দিলে, তা'তেই মন বসে লো, দিব্যি মন বসে। কতায় বলে 'পিতৃদত্তা কন্যে আর রাজদত্ত ভূঁই'। মা-বাপ যে দেবে না তো কে দেবে লা শুনি? ও-পাড়ার মেধো-যেদো নাকি? আজ-কালকার মুখে আগুন; মেয়ে না সব ছ্যাকড়া-উড়ুনী ঢলানী। আবার ছ্যাকা-পড়া করা হচ্ছে! ক্যান্ লা ক্যানো, তোরা জজ মাজিষ্টর হবি নাকি? এঁহ্! উনুনমুকী থ্যাবড়ানাকী, উনি হবেন স্বয়ম্বরা! কালে কালে কতই না দেখবো! আহাহা!

চীনের মুসলমান

গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি

প্রাথমিক যুগ

(২)

হুই-হুইদিগের বর্ত্তমান অবস্থা

১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনে রিপাব্লিক্ বা গণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, হুইহুইদিগের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেনাপতি মা-আং-লিয়াং যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কাংসু প্রদেশের মুসলমানদিগকে প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাসন করিতেন। দুঃখের বিষয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা গিয়াছেন। মা-আং-লিয়াং অসাধারণ বীরপুরুষ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পিকিং গবর্ণমেণ্ট বহু রাজকীয় সম্মানে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। হুইহুই-দিগকে তিনিই অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মা-আং-লিয়াংএর মৃত্যুর পর বৎসরই (অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে) হুই-হুইদিগের সহিত তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশ-বাসীদের একটী সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে হুইহুইগণই জয়লাভ করিয়াছে। তিব্বতীরা হুইহুইদিগের নির্দ্দেশ মতে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মা আং লিয়াংএর পর আর একজন চীনা মুসলমান বর্ত্তমানে হুইহুইদিগের চিন্তা-নায়ক রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নাম মা হউয়েন-চাং। খুব সম্ভব, তিনি এখনও জীবিত আছেন। মা-আং-লিয়াং যেরূপ বীরত্বের দিক দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মা-হউয়েন-চাং সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণতার দিক দিয়া হুইহুইদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে মা-সাং-রেং বা 'সাধু মা' বলিয়া অভিহিত করে। চীনা মুসলমানগণ তাঁহাকে এতদূর ভক্তি করে যে, তাহা নরপূজারই সমতুল। ইহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ চীনা মুসলমানদিগের এই কার্য্যকে কিন্তু যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন; কেন না, ইসলামে এরূপ নরপূজার বিধান নাই।

বর্ত্তমানে কাংসু প্রদেশের মুসলমানগণ এমনই শক্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছে যে, চীনা এবং তিব্বতীদিগকে সমভাবে তাহারা অবজ্ঞা করিয়া চলে। মুসলমানদিগের সহিত শীঘ্রই যে চীনাদিগের আর একটী সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তাহা অনেকেই অনুমান করেন। সে ভাবী সংঘর্ষের ফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ভবিতব্যই জানে।

চীনের সর্ব্বপ্রথম মস্‌জিদ
প্রথম আরব দূত কর্ত্তৃক ক্যাণ্টন-নগরে সংস্থাপিত। (ষষ্ঠ শতাব্দী)

চীনা মুসলমানদিগের বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতি

চীনা মুসলমানদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু শতাব্দীর সংমিশ্রণেও তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে নাই। আচার ব্যবহারে তাহারা চীনাদের অপেক্ষা এতদূর স্বতন্ত্র যে, দেখিলেই তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়।

চীনা মুসলমানদিগের নামের পূর্ব্বে প্রায়ই 'মা' এই কথাটী যুক্ত থাকে। 'মা' শব্দের অর্থ হইতেছে 'মোহাম্মদ'। হজরত মোহাম্মদের নামের সহিত নিজ নাম যোগ করিতে প্রত্যেক চীনা মুসলমানই অতিশয় লালায়িত। আমাদের দেশেও এই আগ্রহ নিতান্ত কম নহে। চীনা পরিবারের প্রায় প্রত্যেক নামেই 'মা' শব্দের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে এই 'মা' শব্দের প্রচলন এত অধিক যে, এক পরিবারের বিভিন্ন লোককে পৃথক করিবার জন্য ১নং 'মা', ২নং 'মা' ইত্যাদি রূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে।

চীনা মুসলমানগণ মোটামুটি তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—(১) আরব হুই-হুই, (২) সালার বা তুর্কী হুইহুই, (৩) মঙ্গোল হুইহুই। বলা বাহুল্য, এই তিন জাতীয় মুসলমানই বিভিন্ন সময়ে চীনদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই এই তিন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

চীনা মুসলমান চীনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৈন্য। সাহস ও আনুগত্যে তাহারা অতুলনীয়। চীনা সৈন্যদের মধ্যে প্রায়ই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়, কিন্তু হুইহুই সেনাদলে বিশৃঙ্খলতা নাই। তাহারা এতই অনুগত যে, তাহারা মনে করে, তাহাদের জীবন সেনাপতির আজ্ঞাধীন। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা সাহস ও ধর্ম্মান্ধতার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধকালে তাহাদিগকে দুর্জ্জয় ও শক্তিশালী করিয়া তুলে। তাহারা যখন যুদ্ধে যায়, তখনকার দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক। 'অজু' করিয়া শুদ্ধ হইয়া তাহারা নামাজ পড়ে এবং অবিরত কোরাণ পাঠ করিতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহারা যে শহীদ হইবে, এই বিশ্বাস তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল। কাজেই তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গেই তাহার আত্মীয় স্বজন দুই এক জন অনুগমন করে। সৈন্যগণ যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তবে লুণ্ঠিত দ্রব্য বহিয়া আনিতে তাহারা সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, যদি কোন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা নিজে গিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে। কাজেই হুই-হুই সেনাদলের ক্ষয় নাই।

প্রত্যেক হুই-হুইই অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী; কাজেই কোনরূপ বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সময় তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে সেনাদল গঠন করিতে হয় না। অশ্বারোহণেও তাহারা সুপটু। পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্য রূপেই তাহারা অধিকতর রণ-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে। একমাত্র 'কসাক' সৈন্যই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে, অন্য কেহ নয়।

তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশে হুই-হুই এবং তিব্বতীদিগের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ লাগিয়া আছে। এই কারণে হুই-হুইদিগের ক্ষাত্রভাব সতত জাগরূক রহিয়াছে। তাহারা তিব্বতে নির্ভয়ে বাণিজ্য করিতে যায়। যেরূপ অল্প সংখ্যায় হুইহুইগণ তিব্বতে গমন করে, সেরূপ অল্প সংখ্যায় চীনাম্যান কখনও গমন করিতে সাহস করে না। হুই-হুইদিগের হস্ত দিয়া বহু আধুনিক বন্দুক তিব্বতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। কাজেই যদি কোন কালে হুই-হুই ও তিব্বতীদের মধ্যে মিলন ঘটে, তবে চীনের ইতিহাস যে নূতন করিয়া লিখিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হুই-হুইদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। রমণীরা অবাধে বাহিরে যাতায়াত করে। বহু-বিবাহের প্রচলন থাকিলেও তাহা খুব কম। সাধারণতঃ লোকে এক স্ত্রীই গ্রহণ করিয়া থাকে। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ততদূর না থাকিলেও, স্বাধীনতার হিসাবে তাহারা অন্যান্য দেশের মুসলিম নারী অপেক্ষা অনেকটা উন্নত। হুই-হুই নারীরা অতিশয় কর্ম্ম-পটু। পুরুষের মতই তাহারা সারাদিন পরিশ্রম করিতে পারে।

হুই-হুইদিগের মধ্যে কোনরূপ উচ্চশিক্ষার প্রচলন নাই। হুই-হুই বালক বাল্যকালে মস্‌জিদে আরবী ও পার্শী শিক্ষা করে। ছোটবেলা হইতেই তাহারা এরূপ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠে যে, কোন পিতামাতাই পুত্রকে

শিক্ষা দিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চাহে না। অর্থ সংগ্রহের প্রতি হুই-হুইদিগের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল।

হুই-হুইগণ ভীষণ প্রতিহিংসা-পরায়ণ। পুত্রদিগকে ছোটবেলা হইতেই তাহারা অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা দেয়। বংশানুক্রমিক পারিবারিক ইতিহাস তাহাকে শুনান হইয়া থাকে। বংশের কেহ যদি কখনও চীনাদের হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পুত্রদিগকে উৎসাহিত করা হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, সে যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, কেন না, যে-কোন মুহূর্ত্তে এই কর্ত্তব্যের জন্য তাহার নিকট আহ্বান আসিতে পারে। এই কারণে কোন সমবয়স্ক চীনা বালক অপেক্ষা হুই-হুই বালক অধিকতর সাহসী ও যুদ্ধপটু হইয়া উঠে।

ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি-নীতি

এক দিকে হুই-হুইদিগের ক্ষাত্র ভাব যেরূপ প্রবল, অন্য দিকে তাহাদের ধর্ম্মভাবও তদ্রূপ প্রবল। যেখানেই হুই-হুইগণ বাস করে, সেখানেই মিনারে মিনারে আজানের সুমধুর ধ্বনি গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলে। যুদ্ধ এবং নামাজ হুই-হুই চরিত্রের বড় দুইটী বৈশিষ্ট্য। হুই-হুই সেনাদলে এই জন্য মোল্লাদিগের অবস্থান বা সহগমন অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক হইয়া পড়ে।

হুই-হুইদিগের মধ্যে মোল্লার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সামাজিক জীবনে মোল্লাই একরূপ রাজা। প্রতি শুক্রবারে নিয়মিত ভাবে সকলকে মস্‌জিদে যাইতে হয়। নামাজ না পড়িলে হুই-হুই মহাল্লায় কাহারও স্থান হয় না। কোন কারণ বশতঃ কেহ মস্‌জিদে অনুপস্থিত হইলে মোল্লার নিকট তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মোল্লাদিগের শিক্ষার জন্য রীতিমত ট্রেনিং স্কুল আছে। সেখানে মোল্লাগণ আরবী পার্শী ভালরূপে শিক্ষা করেন এবং সমাজে মোল্লাকী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। আধুনিক ভাবে শিক্ষিত হইবার জন্য মোল্লাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল কায়রো বিশ্ব-বিদ্যালয়েও আসিয়া থাকেন।

চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে প্যান্-ইস্‌লামিক (Pan-Islamic) আন্দোলনও স্থান লাভ করিয়াছে। ইস্‌লাম যে অখণ্ড রূপে এক, সমগ্র বিশ্বের মুসলমান যে এক বিরাট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, এ জ্ঞান চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। "হুই-উ-আর-চিয়াও" (Islam, the undivided religion) অর্থাৎ 'অখণ্ড ধর্ম্ম ইসলাম'—এই চুম্বক-বাণী প্রত্যেক চীনা মুসলমানই জানে এবং প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে। চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতি বৎসর মক্কায় হজ করিতে আসে।

হুই-হুইগণ আফিম, মদ এবং শূকর-মাংস আদৌ স্পর্শ করে না। শূকর-মাংস চীনাদিগের প্রধান খাদ্য; অথচ তাহাদের মধ্যেই হুই-হুইদিগের বাস এবং তাহাদের সঙ্গেই প্রতিদিন নানা বিষয়ের আদান-প্রদান! কাজেই হুই-হুইগণ খুব হুঁশীয়ার হইয়া চলে। শূকর-মাংসকে তাহারা এতদূর ঘৃণা করে যে, কোন চীনাম্যানের বাড়ীতে তাহাদের ব্যবহৃত পাত্রে তাহারা চা পর্য্যন্ত পান করিতে রাজী হয় না। উভয় জাতির মধ্যে অনেক সময় নিমন্ত্রণ চলে বটে, কিন্তু সে এক অদ্ভুত ধরণের নিমন্ত্রণ! যদি কোন চিনাম্যান হুই-হুইদিগকে নিমন্ত্রণ করে, তবে হয় তাহাকে কোন হুই-হুই হোটেলে খাবার সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দিতে হয়, নয় ত হুই-হুইগণ নিজেরাই তাহাদের বাবুর্চ্চির দ্বারা গৃহস্বামীর বাড়ীতে পাক করাইয়া খায়। অবশ্য তাহার যাবতীয় ব্যয়-ভার গৃহস্বামী বহন করেন।

উভয় জাতির মধ্যে অনেক সময় আন্তর্জাতিক বিবাহও ঘটিয়া থাকে। চীনাম্যানদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে হুই-হুইগণ আপত্তি করে না বটে, কিন্তু কন্যা দান করিতে তাহারা আদৌ রাজী হয় না। কোন চীনা বালিকাকে নববধূ বেশে তাহারা যখন গৃহে আনে, তখন তাহাকে তিন দিন যাবৎ অনাহারে রাখা হয় এবং পবিত্র করিবার জন্য তাহাকে অনবরত অজু-গোছল করান হয়! উদ্দেশ্য—যাহাতে শূকর মাংসের সমস্ত গ্লানি তাহার অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া যায়।

চীন দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন সংগঠিত মিশন নাই। তবুও মুসলমানের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। China Inland Mission নামক খৃষ্টানদিগের একটি মিশন বহুদিন যাবৎ চীনে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু চীনা মুসলমানদিগের উপর তাহারা আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। "Once a Hwei-

Hwei always a Hwei-Hwei"—অর্থাৎ একবার যে মুসলমান হইয়াছে, চিরদিনই সে মুসলমান থাকিবে,—চীনা মুসলমানদিগের এই বাক্য যেন খৃষ্টান মিশনকে সতত উপহাস করিতেছে!

বর্ত্তমানে চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাও ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। শিল্পে বাণিজ্যে তাহারা বেশ উন্নত, কিন্তু কোনরূপ উচ্চ শিক্ষায় তাহারা এখনও অনেক পশ্চাৎপদ। পক্ষান্তরে সামরিক বিদ্যায় তাহারা খুবই পারদর্শী। সামরিক বিভাগে বহু উচ্চ পদস্থ মুসলমান রহিয়াছে। শুধু সামরিক বিভাগ নয়, সব বিভাগেই মুসলমানগণ চীনাদের ন্যায় উচ্চপদ লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোনই বাধা ঘটে না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি, বিচারক, মন্ত্রী প্রভৃতি বহু দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

চীনে ইস্‌লামের ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক চিন্তাশীল রুশীয় সাহিত্যিক লিখিয়াছিলেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে ইস্‌লামই চীনের জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত হইবে; এবং প্রাচ্যের ইতিহাস নূতন ভাবে লিখিত হইবে। অবশ্য সে ভবিষ্যদ্বাণী এখনও সফল হয় নাই বটে, তবুও উহার সফলতা সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আসুক সেই শুভ প্রভাত! প্রাচ্য গগন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক!

প্রমাণ-পঞ্জী—

1. The Preaching of Islam by Dr. Arnold
2. The Crescent in North-west China by G. F. Andrew.
3. The Arabian Prophet (a life of Mohammad from Chinese sources, transtatd by Isac mason.)

শেষোক্ত বইখানি 'লিউ-চাই-লিয়াং' নামক নান্‌কিন্‌-নিবাসী জনৈক চীনা মুসলমান কর্ত্তৃক চীনা ভাষায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত লেখক। Isac Mason এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আজি বৈরাগী ভারতবর্ষ কৌপীন-পরিধায়ী
মহা তমসার তীরে তীরে ফিরে ত্যাগের মন্ত্র গাহি'।
মন্ত্রে ফাটিয়া আকাশ-নিকষ ঝলে বিদ্যুৎ-বিভা,—
রাত্রি শিহরে,—জাগিবে কখন দেবী গায়ত্রী দিবা।
ভগবান,—ভগবান,
ত্যাগী বৈরাগী ভারতবর্ষ—
তুমি তার রাখো মান!

প্রজ্ঞা-প্রবীণ বৃদ্ধ ভারত নির্ভরি' নতশিরে
দক্ষিণ কর-ধৃত যষ্টিটি সত্যের, চলে ধীরে।
অনৃতের পারে কোথায় অমৃত-জ্যোতির তোরণ-দ্বার?—
ধ্যান-গম্ভীর,—উদ্দেশে কারে করিছে নমস্কার।
ভগবান,—ভগবান,
প্রজ্ঞানী ধ্যানী ভারতবর্ষ—
তুমি তার রাখো মান!

প্রেমিক তাপস ভারতবর্ষ মহান্ বক্ষে বহি'
পরম করুণা,—মানবের লাগি' অপের বেদনা সহি',
দস্তী বন্দী দন্তী-শ্বাপদে বশীভূত করি' প্রেমে,
রচে তপোবন;—নারায়ণ আসে নরের দুয়ারে নেমে!
ভগবান,—ভগবান,
প্রেমিক তাপস ভারতবর্ষ—
তুমি তার রাখো মান!

ঔর্বাগ্নি

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কালিদাসের শকুন্তলায় (তৃতীয় অঙ্কে) রাজা দুষ্মন্ত মন্মথকে বলিতেছেন,—তুমি হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলে, তবু তোমার এত জ্বালা কেন? হাঁ বুঝেছি; যেমন ঔর্ব অদ্যাপি সাগরে জ্বলিতেছে, তেমন তুমি ভস্ম হয়েও কুসুম-শরে তীক্ষ্ণ হয়ে আছ।

কথাটা এই। ভূমি-উদ্‌গীর্ণ অগ্নির নাম ঔর্ব ছিল। এক কালে এক দেশে প্রসিদ্ধ ছিল; পরে সে দেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই, সাগরে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব ঔর্ব নির্বাপিত হইয়াও হয় নাই। মন্মথও সেইরূপ ভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

আমরা যে অগ্নি জ্বালি, কাষ্ঠ-তৃণাদি ইন্ধন না পাইলে সে অগ্নি জ্বলে না। ঔর্বাগ্নি নিরিন্ধন। অসাধারণ নিসর্গ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সকলেই স্ব স্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার কারণ অনুমান করে। প্রাচীন কালে উপাখ্যান দ্বারা সে কারণের ব্যাখ্যা করা হইত। প্রাচীন কালেই বা বলি কেন, এখনও সহস্র সহস্র উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। মানব-চিত্ত কারণ না জানিয়া তৃপ্ত হয় না। কিন্তু স্মর্তব্য এই, উপাখ্যান যেমনই হউক, নিসর্গবিষয়ক উপাখ্যানের মূলে সত্য থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সে নিসর্গের নামের দুই অর্থ থাকিলে কিংবা ঘটাইতে পারিলে মনোরঞ্জন উপাখ্যানের অবসর হয়। ঔর্ব অসাধারণ, নামও দ্ব্যর্থ, উপাখ্যানও চমৎকার।

উপরে যে নীরস ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, সেটা সত্য কি? কোন্‌ দেশে এবং কোন্‌ কালে ঔর্বাগ্নি প্রথমে ভূমিতে ও পরে সমুদ্রে দৃষ্ট হইয়াছিল?

প্রত্ন-মানব তিনটি নিসর্গজ অগ্নি অবগত ছিল। একটি ভূমিতে জাত, ভৌম অগ্নি; একটি অন্তরিক্ষে জাত, বিদ্যুদগ্নি; অপরটি দিব্যলোকে শাশ্বত অগ্নি, সূর্য। শীতদেশে বাস করুক আর গ্রীষ্ম দেশেই করুক, সকলেই সূর্যের অগ্নি বুঝিতে পারে। প্রখর গ্রীষ্মকালে, বনের শুষ্ক বৃক্ষশাখা, প্রবল-বাত্যা-সঞ্চালনে পরস্পর ঘৃষ্ট হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে। এইরূপে খাণ্ডব-বন পুড়িয়া গিয়াছিল; নাম হইল কৃষ্ণ ও অর্জুনের। অতিশয় ঘৃত ভোজন করিয়া অগ্নির অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল, খাণ্ডব-বন ভক্ষণ করিয়া তাঁহার রোগ সারিয়া গিয়াছিল। কাষ্ঠে অগ্নি আছে; নইলে কাষ্ঠ জ্বলিতে পারিত না। এ তত্ত্ব প্রাচীন কালে জানা ছিল। ওষধি শব্দের ব্যুৎপত্তি,—ওষ দাহ, ধি ধারণ করে, অর্থাৎ ওষধি দাহ্য। এই দাহের কারণ সূর্য, ইহা বুঝিতে বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। বিদ্যুদগ্নি আরও ভয়ঙ্কর; সরস আর্দ্র বৃক্ষ এই অগ্নিতে দগ্ধ হয়, শুষ্ক বৃক্ষ জ্বলিয়া উঠে। শুধু অগ্নি নয়; ভীম গর্জনে দশ দিক্‌ কম্পিত হয়। ভৌম অগ্নি আরও অসাধারণ, বিনা ইন্ধনে জ্বলিতে থাকে। এই অগ্নি দ্বিবিধ। একটি শৈলের সন্ধিপথে নির্গত দাহ্য বাষ্প। কখন কখন ভৌতিক কারণে সে বাষ্প প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সে অগ্নি-স্থানকে জ্বালামুখী বলে। অপরটি আগ্নেয়গিরির অগ্নি। এই অগ্নি যুগান্তকারী কালানল ও সংবর্তক নামে খ্যাত ছিল।

ভূমণ্ডলে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে। কিন্তু অধিকাংশ গিরি সমুদ্রের দ্বীপে কিংবা সমুদ্রের নিকটস্থ ভূখণ্ডে বিদ্যমান। এশিয়া মহাদেশে কামাট্‌কাস্‌কা হইতে দক্ষিণে জাপান, ফিলিপাইন, সিলিবিস, যব, সুমাত্রা হইয়া আন্দামান দ্বীপের প্রায় শত মাইল পূর্বে বঙ্গসাগরে বারেণ ও নরকোন্দম্‌ দ্বীপ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির সারি চলিয়া আসিয়াছে। আগ্নেয়গিরি হইতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প, দ্রবীভূত অশ্ম (পাথর), এবং অশ্ম ও ভস্ম, এই ত্রিবিধ দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়। জলীয় বাষ্প দূর হইতে ধূমবৎ দেখায়। অশ্ম-দ্রবের প্রচণ্ড তাপে গিরিমুখ জ্বালামালী মনে হয়। জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে পতিত হয়, এত যে মনে হয় সে গিরি জলপান করিয়াছিল। অত্যল্প গিরি হইতে অশ্ম-দ্রব উদ্‌গীর্ণ হয়। হইলে তাহা গিরির মুখের চতুর্দিকে শিখর নির্মাণ করে। দ্রব নির্গত না হইলে অশ্ম ও ভস্ম দ্বারাও গিরি নির্মিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি বাত্যায় তাহা দীর্ণ

হইয়া পড়ে। শিখরও প্রায়ই ছিন্ন-শির্ষ হয়। কদাচিৎ শিখর হয় না। মধ্যস্থলে বিল অবশ্য থাকে। গিরি-পার্শ্বেও বিবর থাকে। বয়সে আগ্নেয়গিরি ত্রিবিধ। কতকগুলি মৃত, উদ্গারের বয়স গত হইয়াছে; কতকগুলি সুপ্ত, কখন্ জাগিয়া উঠিবে বলিতে পারা যায় না; অপরগুলি জাগ্রত, সর্বদা ধূমায়মান।

ঋগ্বেদের ঋষিরা ত্রিবিধ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সূর্যাগ্নি সকল দেশেই সুলভ, কিন্তু সকল দেশেই বজ্রপাত হয় না, এবং সকল দেশেই ভৌম অগ্নি বিদ্যমান নাই। পুরাণ-মতে ঋষ ধাতুর অর্থ গতি হইতে ঋষি শব্দ উৎপন্ন। আদ্যকালে ঋষিরা যাযাবর ছিলেন। তখন তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে আসেন নাই। তখন তাঁহারা স্বদেশে স্বর্গে বাস করিতেন। তাঁহারা কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন। শিলায় শিলা বেগে নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কিন্তু কাষ্ঠের অরণি-জাত অগ্নি অক্লেশে শুষ্ক তৃণে সংক্রামিত করিতে পারা যায়। বোধ হয় এই হেতু তাঁহারা অগ্নি উৎপাদনের এই উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাত অগ্নিকে 'কুমার' বলিতেন। অগ্নি বিনা অন্নপাক হয় না। সে অগ্নির যে নানা বিশেষণ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই। শীতকালে অগ্নি-সেবন সুখকর; রাত্রিকালে বৃকাদি হিংস্র-পশু হইতে অজ-মেষ-গবাদি রক্ষা করিতেও অগ্নি চাই। অতএব অগ্নিই পরমদেব; তিনি ত্রিধা মূর্তিতে ভুমিতে, অন্তরিক্ষে ও আকাশে বিরাজিত।

ঔর্বাগ্নি বা ভৌমাগ্নি অবশ্য বিস্ময়াবহ। পুরাণে ইহার উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে। হরিবংশের দুই অধ্যায়ে দুই উপাখ্যান আছে। ৪৫ অধ্যায়ে এক উপাখ্যান আছে। এটি মৎস্য পুরাণে অবিকল আছে। উপাখ্যানটি এই,—সত্য যুগে বৃত্রাসুর বধের পর দেবাসুরে তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল। অসুরদিগের নাম দানবও ছিল। দানবেরা মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিল। দেবরাজ তামস অস্ত্র দ্বারা রণভূমি তমসাবৃত করিয়া ফেলিলেন। সে অন্ধকারে কে দেবসৈন্য কে দানবসৈন্য নির্ণয় হইতে পারিল না। তখন ময়দানব মায়া দ্বারা যুগান্তকারী ঔর্বাগ্নির তুল্য উগ্র অগ্নি সৃষ্টি করিল। সে অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর হইল, কিন্তু দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইলেন। দেবরাজ বরুণকে সে অগ্নি নির্বাপিত করিতে অনুরোধ করিলেন। বরুণ বলিলেন, এই অগ্নি জল দ্বারা নির্বাপিত হইবার নয়। পূর্ব কালে উর্ব-ব্রহ্মর্ষির তপঃপ্রভাবে নিখিল জগৎ সন্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন দেব, ঋষি, মুনি এবং দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপু, উর্ব ঋষিকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, ঋষিবংশের মধ্যে আপনার বংশ নির্মূল হইতে চলিল। আপনি একা, আপনার পুত্রাদি নাই, বংশরক্ষার চেষ্টাও নাই।" উর্ব উত্তর করিলেন, তিনি কৌমারব্রত বনবাসী, তাঁহার ত গৃহস্থাশ্রম নয়। আর, যদি অপত্য চাই, ব্রহ্মা মানসী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় দেহ হইতে পুত্র উৎপাদন করিবেন। অনন্তর উর্ব স্বীয় উরু অগ্নিতে নিবিষ্ট করিয়া এক কুশ দ্বারা উরু মন্থন করিতে লাগিলেন। * সহসা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নিশিখা উদ্গত হইল। এই অগ্নি উর্বের পুত্র, ঔর্ব। উৎপন্নমাত্র পুত্র পিতাকে বলিলেন, "আমি ক্ষুধায় পীড়িত, আমায় ত্যাগ করুন, আমি জগৎ ভক্ষণ করি।" তখন ব্রহ্মা আসিয়া উর্বকে বলিলেন, "তুমি সর্বলোকহিতকামনায় তোমার পুত্রের তেজ ধারণ কর, সমুদ্রের বদনস্বরূপ বড়বা-(অশ্বা) মুখে ইহার বাস, এবং জল ইহার হবিঃ-স্বরূপ অন্ন হইবে। তোমার এই পুত্র কালান্তক অনল হইবে।" হিরণ্যকশিপু এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া উর্বের অনুরক্ত শিষ্য হইল। উর্ব প্রীত হইয়া দানবেশ্বরকে বিনা ইন্ধনজাত অগ্নিরূপ মায়া দান করিলেন। তাহার জীবদ্দশা পর্যন্ত ইহার প্রভাব থাকিয়া পরে বিলুপ্ত হইবে। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবরাজ চন্দ্রকে হিম বর্ষণ করিতে বলিলেন। সে হিমে দানবেরা নিপীড়িত হইতে লাগিল।

এই উপাখ্যান হইতে পাইতেছি,—(১) ভূপৃষ্ঠের উরু সদৃশ কোন দীর্ঘ পর্বতে ঔর্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় এই পর্বতের নাম উর্ব ছিল। সেই হেতু তৎপুত্রের নাম ঔর্ব। অরণি-মন্থন না করিলে 'কুমার' জন্মিতে পারে না; এই

---

* হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে শ্লোকটির অর্থান্তর করিয়া লিখিয়াছেন, উরুতে অগ্নি স্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা মন্থন করিলেন। মূলে আছে, উর্বস্তু তপসাবিষ্টো নিবেশ্যোরুং হুতাশনে। মমন্থৈক দর্ভেণ পুত্রস্য প্রভবারণিম্। বোধ হয় কথাটা এই, উরুটি আগুনে প্রবিষ্ট করাইয়া শুষ্ক করিলেন, পরে অরণি দ্বারা শুষ্কীভূত উরু মন্থন করিলেন। মৎস্য-পুরাণেও শ্লোকটি অবিকল এইরূপ।

হেতু মন্থনের ব্যপদেশ। তা ছাড়া বিলও চাই। (২) পরে সেরূপ অগ্নি সমুদ্রের কোন দ্বীপের গিরিতে দেখা গিয়াছিল। সে গিরির আকার অশ্বমুখতুল্য, ছিন্ন-শিরঃ শিখর। (৩) বোধ হয় ঔর্বের দেশে জল-বর্ষণ হয় না, হিম বর্ষণ হয়। (৪) পৌরাণিকেরা কল্পিত উপাখ্যানের কালের পৌর্বাপর্যে অবহিত হইতেন না। কিন্তু ঔর্ব যে অতি প্রাচীন কালের ঘটনা, তাহা 'সত্যযুগ' দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সত্যযুগ, পাঁজির সত্যযুগ নয়। বুঝিতে হইবে ত্রেতাযুগের পূর্বে। 'তারকাময় সংগ্রাম,' এই নাম হইতেই প্রকাশ, সে সংগ্রাম আকাশে যজ্ঞ-পুরুষ বা কাল-পুরুষ নক্ষত্রে ঘটিয়াছিল। সে আজি ছয় হাজার বৎসর পূর্বের কথা। সে কালে ও সে দেশে হিরণ্যকশিপু দানবও ছিল।

হরিবংশের আর এক অধ্যায়ে (১০ম অঃ) ঋষির আর এক কর্ম পাইতেছি। এটি নানা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজ-চক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বাহু নামে রাজা ছিলেন। তিনি দ্যূত-পানাদি-ব্যসনাক্ত ও অধার্মিক ছিলেন। শক যবন পারদ পহ্লব কাম্বোজ, এই পাঁচ জাতি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ জাতির সহিত সমবেত হইয়া বাহুকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। বাহু পত্নী সঙ্গ অরণ্যে পলায়ন করেন। দুঃখ ক্লেশে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী যাদবী তখন অন্তর্বত্নী ছিলেন। ভৃগুবংশজ ঔর্বের আশ্রমে বাহুরাজ-পুত্র সগরের জন্ম হয়। ঔর্ব সগরকে বেদশাস্ত্র অধ্যাপন করিয়া মহাঘোর আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। সগর সে অস্ত্রবলে পিতৃবৈরী পার্বত্য-ম্লেচ্ছ-জাতিকে ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের অশ্ব পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগের সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে প্রবিষ্ট ও অদৃশ্য হইল। সগরের ষষ্টি-সহস্র পুত্র সে ভূমি খনন করিতে গিয়া কপিলরূপ বিষ্ণুর চক্ষুঃ-সমুত্থ তেজে চারিজন ব্যতীত সকলেই দগ্ধ হইল। * পরে সগরের পৌত্রের পৌত্র ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

এই বৃত্তান্ত হইতে পাইতেছি, ঔর্ব ভৃগুবংশীয়, এই হেতু তিনি ভার্গব, এবং তাঁহার আশ্রম গান্ধার দেশের উত্তরে কিংবা পশ্চিমে ছিল। সে কালের গান্ধার, রামায়ণে নাম গন্ধর্বদেশ, বর্ত্তমান কাবুলদেশ।

সগর রাজার গুরু ঔর্ব, আর ভৌমাগ্নির ঔর্ব এক ছিলেন না। পুরাণ-পাঠকালে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ পরাশর প্রভৃতি নাম গোত্র-নাম। পূর্বকালে নাম ও গোত্র, অর্থাৎ প্রকৃত নাম ও বংশ নাম, এই দুই দ্বারা মানুষ চিনিতে পারা যাইত। বিখ্যাত বংশের ঋষিদের প্রকৃত নাম বলিবার প্রয়োজন হইত না, গোত্র-নাম জানিলেই সমকালিক লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিত।

ঔর্ব এক গোত্র-নাম। প্রথম ঔর্ব এক ভৃগুর পৌত্র। কিন্তু ভৃগু এত পুরাতন যে তাঁহার পিতার নাম জানা ছিল না। হুতাশন হইতে তাঁহার জন্ম কল্পিত হইয়াছিল, কেহ অঙ্গিরারও জন্ম জানিত না। তাঁহার জন্ম অঙ্গার হইতে। যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, হুতাশন ও অঙ্গার হইতে উৎপত্তিরও সেই অর্থ। অর্থাৎ ভৃগু অগ্নি-উৎপাদনের, এবং অঙ্গিরা অঙ্গারে অগ্নি-রক্ষার উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বর্ণের মূল গোত্র বিবেচনা করিলেও ভৃগু ও অঙ্গিরা সমকালীন বলিতে পারা যায়। মহাভারতে শান্তিপর্বে (২৯৬ অঃ) আছে, মূল গোত্র চারিটি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু।

* সগরের ষষ্টি-সহস্র সন্তান, গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য এবং আকাশের অসংখ্য তারার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা স্বরূপ কল্পিত। পুণ্যাত্মা পরলোকে কি-না দিব্যলোকে তারা হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস দ্বারা পুণ্যাত্মার সদ্‌গতিপ্রাপ্তি ও তারার উৎপত্তি, দুইই বুঝিতে পারা যায়। 'ষষ্টি-সহস্র', বোধ হয় অনুপ্রাস জন্য। কেহ কেহ কথায় কথায় বলে, 'লক্ষ লক্ষ লোক'। রাজা দশরথ নাকি ষষ্টি সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। 'সহস্র' বাক্যালঙ্কার। বার বৎসরে বৃহস্পতির বর্ষ, পাঁচ বৎসরে যুগ। এক যুগে ষাটি বর্ষ, ইহা হইতে ষষ্টির সমাদর হইয়া থাকিবে। ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। বাক্যটির দুই অর্থ আছে। আকাশে মন্দাকিনী। সেটি দেবলোকের গঙ্গা। ইহার সংস্থান "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ হিমালয়ের উত্তরদেশ। সে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গার অবতরণেরও বৃত্তান্ত চাই। এইরূপ উপাখ্যান অনেক আছে। মর্ত্ত্যলোকে যেটা আছে কিম্বা ঘটিয়াছে, স্বর্লোকেও সেটা আছে কিম্বা ঘটিয়াছে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, তাহার নির্ণয় এক কথায় হইতে পারে না।

এখানে অবশ্য বুঝিতে হইবে 'কোন এক কালে।' সে কাল যে বহু প্রাচীন, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু বহু-প্রাচীন কালের কথা কেনই বা মনে থাকিবে। বোধ হয়, এই চারি বংশ পিতৃভূমি প্রথম ত্যাগ করিয়া ইরাণে আসিয়াছিলেন। পরে আর তিনটি আসিয়াছিলেন। এই সাত বংশ পরে সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এই সপ্ত বংশ হইতে সপ্ত গণিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বায়ুপুরাণে (৬৫ অঃ) দেখিতেছি, ভৃগুর উত্তমবংশীয়া দুই ভার্যা ছিলেন, একটি হিরণ্যকশিপুর কন্যা, অপরটি পুলোমার কন্যা। তৎকালের দুই দানব রাজার কন্যা।* ভার্গববংশে শুক্রের জন্ম। এই প্রাচীন সম্বন্ধহেতু তিনি অসুরদিগের গুরু হইয়াছিলেন। অঙ্গিরা (অঙ্গিরস্) বংশ হইতে আঙ্গিরস বৃহস্পতি। ইনি সুরগণের গুরু ছিলেন। দুই-ই নীতিবেত্তা ও ধনুর্বেদ-কর্তা ছিলেন। সগর-গুরু ঔর্ব শিষ্যকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইনিই এই অস্ত্রের আবিষ্কারক।

এই ঔর্ব কখন ছিলেন? যখন সগর রাজা ছিলেন। ইহাঁর কাল-নির্ণয় কঠিন নহে। বৈবস্বত নামে এক ঋষি ছিলেন। পরে তিনি এক মনু হন। তাঁহার নয়টি পুত্র ছিল। এক পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু বংশের ভূ-পালগণ আর্যাবর্তে রাজত্ব করিতেন। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশের ভূ-পালগণের নাম আছে। দুই দশজনের নামে ও পর্যায়ে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় বড় একটা নাই। বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকু হইতে সগর ৩৮, বৃহদ্বল ৯৬, এবং ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা সুমিত্র ১২৩ পুরুষ। বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ নামে শূদ্র রাজা দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করেন। সেই সময় ইক্ষ্বাকুবংশের সুমিত্র ও কুরুবংশের শেষ রাজা ক্ষেমক বিনষ্ট হন। অতএব বৃহদ্বল হইতে সগর ৯৬—৩৮ =৫৮ পুরুষ পূর্বে ছিলেন। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ (রাজ্যকাল নহে) গণিলে ৫৮×৩০=১৭৪০ বৎসর। যদি খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১২৫০+১৭৪০=২৯৯০, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ত্রিসহস্রাব্দে সগর ছিলেন। উপরি-উক্ত পুরুষ-গণনা হইতে ভারতযুদ্ধ-কালও পাইতেছি। বৃহদ্বল হইতে সুমিত্রকে ধরিয়া ২৮ পুরুষ, অর্থাৎ ২৮×৩০=৮৪০ বৎসর। খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনিই নন্দবংশ ধ্বংস করেন। পুরাণমতে নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব আদি নন্দ মহাপদ্ম খ্রীঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে সুমিত্রকে নিহত করেন। অতএব ৮৪০+৪২৫=১২৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। (সূক্ষ্ম গণনায় ১২৬১।)

ইক্ষ্বাকুবংশের আরম্ভকালও পাইতেছি। সুমিত্র পর্যন্ত ১২৩×৩০=৩৬৯০ বৎসর। সুমিত্র ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অতএব ইক্ষ্বাকু খ্রীঃ পূঃ চতুঃসহস্রাব্দে ছিলেন।" *

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ চতুঃসহস্রাব্দ স্মরণীয় কাল। এই কালে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন, এবং মূলা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইত। মূলা নামের সার্থকতা এই। ইক্ষ্বাকুর কালে বৈবস্বত মনুর কাল। বৈবস্বত মনু হইতে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ। (এই মনু নামক কাল-পরিমাণ বর্তমান পাঁজির নয়।) ইনি সপ্তম মনু। তাঁহার পূর্বে ছয় মনু-কাল গত হইয়াছিল, এইরূপ স্মৃতি ছিল। ছয় মনুতে ১৭০০ বৎসর। আমার অনুমানে, এই সময় আর্যগণ ইরাণে বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ের ইতিহাস প্রায় কিছুই নাই, দুই চারিটা শ্রুতিমাত্র ছিল। সে শ্রুতি-পরম্পরা যে কাহিনীতে পরিণত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই। পৌরাণিকেরা এক মনুর কালের ঘটনা অন্য মনুতে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুরাণের মনু-গণনা হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৭০০ অব্দ পর্যন্ত পাইতেছি। জ্যোতিষিক নিদর্শন হইতেও খ্রীঃ পূঃ ষট্-

* দেব দানব দৈত্য যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব কিন্নর, সকলেই মানুষ ছিল। পরে শব্দের অর্থ বিস্মরণ ও এই সকল বিভিন্ন জাতির অদর্শন হেতু ইহাদিগকে মনঃ কল্পিত বোধ হইয়াছিল।

* বিষ্ণুপুরাণ মতে শ্রীরামচন্দ্র ৬২ পুরুষ, বায়ুপুরাণ মতে ৬৪ পুরুষ। দুই মতেই বৃহদ্বল ৯৪ পুরুষ। অতএব ভারত যুদ্ধের ৯৪—৬৩=৩১ পুরুষ=৯৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, অর্থাৎ ১২৫০+৯৩০=২১৮০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে।

সহস্রাব্দের পূর্বের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। দক্ষ প্রজাপতি এই কালে ছিলেন।

আমরা কথায় কথায় ইরাণে চলিয়া গিয়াছি। এদিকে ভারতে সগর-পুত্রগণ কপিল ঋষির অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, "তিনি শরৎকালের নির্মল আকাশস্থিত সূর্যের ন্যায় তেজঃ দ্বারা সকল দিক্ অনবরত উদ্‌ভাসিত করিতেছিলেন।" এখানে জিজ্ঞাস্য, এই উপাখ্যান দ্বারা গঙ্গা-অবতরণের প্রয়োজন-কল্পনা, না সত্য সত্য কোন নিসর্গজ অগ্নির উৎপত্তি-ব্যাখ্যা। এই অগ্নি পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে দেখা যাইত। স্থানটি বঙ্গসাগরের কূলে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে। বর্তমানের বালু-মৃন্ময় দেশে ভৌম-অগ্নির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পুরাণ মানিলে তখন গঙ্গা নদী সবে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছিলেন। সে স্থান রাজমহলের নিকটে। বোধ হয়, সেখানে এক জ্বালামুখী ছিল, সেটি কপিল ঋষি। রাজমহল হইতে বীরভূম পর্যন্ত অনেক উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। পূর্বকালে এখানে একটি আগ্নেয়-গিরি ছিল। কোলগং রেল ষ্টেশন হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে ও অল্প পূর্বে তিন-পাহাড়ীর পশ্চিমে এই গিরি অবস্থিত। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তাহার অগ্ন্যুদ্গার অসম্ভব নয়। তখন যে পূর্ববঙ্গ সাগর-প্লাবিত ছিল, তা নয়। পূর্ববঙ্গ বরং উচ্চ ছিল। সাগরের একটা বিস্তীর্ণ খাড়ী রাজমহল পর্যন্ত থাকিলেই সেখানে সাগর-সঙ্গম। সগর রাজার সময়েই যে জ্বালামুখী থাকিতে হইবে, তাহাও নয়। পরবর্তী কালে গঙ্গার মাহাত্ম্য-প্রচারের সময় কপিল ঋষির দর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সে কোন্ কালে তাহা বলিবার উপকরণ নাই। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশ যে বহু পূর্বকালেই আর্যগণের বিদিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র অনু। তাঁহার এক বংশধর, তিতিক্ষু, পূর্বদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে বলির জন্ম। বলির রাজধানী গঙ্গাতীরে ছিল। ইঁহার ঔরস পুত্র ছিল না। এক জন্মান্ধ ঋষি দ্বারা তাঁহার পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে। প্রথমে অঙ্গ, পরে কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ। এই পাঁচ দেশ নামে তাঁহারা খ্যাত ছিলেন। অর্থাৎ 'অঙ্গাধিপ' নামে 'অধিপ' যোগ করা হইত না। নামগুলি আর্যদিগের প্রদত্ত। হয়ত রাজমহলের কাছে গঙ্গার বঙ্ক (বাঁক) হইতে বঙ্গ নাম। রাজমহলের পশ্চিমে অঙ্গ, পদ্মার উত্তরে পুণ্ড্র, গঙ্গা ও পদ্মার মাঝে বঙ্গ, বঙ্গের ও গঙ্গার পশ্চিমে সুহ্ম, এবং সুহ্মের পশ্চিমে কলিঙ্গ। কলিঙ্গ দেশ নর্মদা পর্যন্ত ছিল। ভারতযুদ্ধের অঙ্গাধিপ কর্ণ হইতে বলি ১৮ পুরুষ উর্দ্ধে। অতএব ১২৫০+(১৮×৩০)=১৭৮০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশে আর্যগণের যাতায়াত আরম্ভ বলিতে পারা যায়। এই বলি, দৈত্য বলি নহেন, কিন্তু আর্যক্ষত্রিয়ও ছিলেন না। তাঁহার বংশ বালেয় ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত ছিল। (মৎস্যপুরাণ)

ত্রিপুর-দাহ উপাখ্যানের উৎপত্তিও কি এক জ্বালা-মুখীতে? মহাভারতে (কর্ণ পর্ব, ৩৪ অঃ), হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে যে বর্ণনা আছে, কিয়দংশও সত্য হইলে তাহা রোমাঞ্চকর। নর্মদাতটে মাহেশ্বর পর্বতের নিকটে অমরকণ্টক পর্বতে বাণ নামে এক ভীষণ অসুর ত্রি-পুর, তিনটি নগর, নির্মাণ করিয়া বাস করিত। কিন্তু আশ্চর্য, সে ত্রিপুর স্বীয় তেজে গগনে সর্বদা ভ্রমণ করিত (এই উৎপাত কি হইতে পারে?)। দেব ও ঋষি ভয়ে বিহ্বল হইয়া রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ব্যাপার ভয়ানক, রুদ্রকে সহস্র বৎসর চিন্তা করিতে হইয়াছিল। রুদ্র এক শর দ্বারা পর্বতের তিনটি শাখা বিদ্ধ করিলেন। ফলে 'সম্বর্তক' বায়ু বহিতে লাগিল, অগ্নি ধাবিত হইল, শিখর পুড়িয়া গেল, পাদপ উদ্যান গৃহ নরনারী জ্বলিতে লাগিল। এ যেন বিসুবিয়স্ গিরির ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পী ও হরকুলিনী নগরদ্বয়ের ধ্বংস। ত্রিপুরের দুইটি পুর বিনষ্ট হইয়াছিল। সেখানে রুদ্রকোটি ও জ্বালেশ্বর শিব আছেন। এ কি তাঁহাদের অধিষ্ঠানের হেতুস্বরূপ ত্রিপুর-দাহ? কে জানে। অতি পুরাকালে দক্ষিণাপথ আগ্নেয় অশ্ম-দ্রবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইয়াছিল। কিন্তু সে কালের তুলনায় হিমালয় যে শিশু। ভারতবর্ষের ভূমি-বিদেরা সে আগ্নেয়-প্রলয়ের অসংখ্য সাক্ষী পান নাই। হয় ত পূর্বকালে এখানে ওখানে দুই একটা অগ্নি-মুখ ছিল।

মহাভারতে (আদি, ১৭৮-১৮১ অঃ) একটি জ্বালামুখীর বর্ণনা আছে। বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বৈরিতা চিরপ্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট করিয়াছিলেন। একটির, শক্তির, পত্নীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। ইনি রাক্ষস দ্বারা পিতৃ ও পিতৃব্যদিগের বধ শুনিয়া রাক্ষসবধ-সত্র অনুষ্ঠান করেন। বসিষ্ঠ ঋষি পৌত্রের ক্রোধানল প্রশমিত করিলেন।

সেই যজ্ঞে সঞ্চিত অগ্নি উত্তরে হিমালয়-পার্শ্বে মহাবনে নিক্ষিপ্ত হইল। সেখানে অদ্যাপি সে অগ্নি পর্বে পর্বে রক্ষঃবৃক্ষ অশ্ম ভক্ষণ করিতে দেখা যায়।

কিন্তু হিমালয়ে আগ্নেয়গিরি নাই, পূর্বকালেও ছিল না। কোন জ্বালামুখী হইবে। পঞ্জাবে এক জ্বালামুখী তীর্থ আছে। কাংড়ার নাম জ্বালামুখী। অথবা স্থান-নির্দেশ ভুল হইয়াছে। কারণ জ্বালামুখী থামিয়া থামিয়া জ্বলে না, অশ্ম-ভক্ষণও করে না। হিমালয়ের পশ্চিমে বলিলে উর্বপর্বত পাইতাম। হিমালয়ের পশ্চিমে ইহার অর্থ, হিমালয়ের সমসূত্রে নয়।

বসিষ্ঠ ঋষি পরাশরের ক্রোধ শান্তি নিমিত্ত ঔর্ব-উপাখ্যান শোনাইয়াছিলেন। পূর্বকালে কৃতবীর্য নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ভার্গবদিগের যজমান। রাজা এক যজ্ঞ সমাপনান্তে পুরোহিতদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তির পর তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের অর্থাভাব ঘটে। তাঁহারা ভার্গবদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন ভার্গব ভূমিগর্ভে ধন নিক্ষিপ্ত, কেহ ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন, কেহ বা অল্প স্বল্প ক্ষত্রিয়দিগকে দান করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা ক্রোধান্ধ হইয়া ভার্গবদিগকে সবংশে বধ করিলেন, গর্ভস্থ শিশুও রক্ষা পাইল না। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ হিমালয়ে পলায়ন করিলেন। এক ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়ভয়ে স্বীয় উরুদেশে গর্ভ ধারণ করিলেন। আর এক ব্রাহ্মণী ভয়ে ক্ষত্রিয়দিগকে নির্জনে সে গুপ্ত গর্ভ বলিয়া দিলেন। ক্ষত্রিয়েরা আসিলে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরু বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইল। তাহার তেজে ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হইয়া গেল। তখন তাহারা ব্রাহ্মণীর পদানত হইল, এবং ভার্গব ঔর্বের প্রসন্নতায় দৃষ্টি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ঔর্বের ক্রোধ শান্ত হইল না, সর্ব-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। পিতৃগণ আসিয়া বুঝাইলেন। ঔর্ব স্বীয় তেজ মহাসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। সে অনল অগ্ন্যুদ্গারী মহৎ অশ্বশিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্র জল পান করিয়া থাকে।

এই উপাখ্যান হইতে পাইতেছি, বহু পূর্বকালে গান্ধার দেশে ভার্গবেরা ঔর্বাগ্নি দেখিয়াছিলেন। তদনন্তর সে অগ্নি সমুদ্রে অশ্বমুখ নামক আগ্নেয়গিরিতে দেখা গিয়াছিল। আরও পাইতেছি, ঊর্ব ঋষির অপত্য বলিয়া ঔর্ব নাম হয় নাই, উরু হইতে জাত বলিয়া, নাম ঔর্ব। অবশ্য মানুষের উরু হইতে পারে না; উরু-সদৃশ পর্বত বুঝিতে হইতেছে। সংস্কৃত কোষে 'উরু', 'ঊরু' দুইটি শব্দ আছে। 'উরু', অর্থে বিস্তীর্ণ; স্ত্রীলিঙ্গে 'উর্বী' পৃথিবী। কিন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ উকার ভেদ সকলে করিতেন না। উর্বের পুত্র, ঔর্ব। হ্রস্ব উকারও আছে। 'উর্বরা', 'ঊর্বরা' দুই বানানই পাওয়া যায়। অতএব উরু অর্থে পর্বতও আসিতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোন্ দ্বীপে বড়বা দৃষ্ট হইয়াছিল? রামায়ণে (কি। ৪৪ অঃ) সে দ্বীপের নাম আছে। সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর (অনার্য মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন "পূর্বদিকে সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ ও সুবর্ণ-দ্বীপ (সুমাত্রা) অন্বেষণ করিবে। ব্রহ্মা জলোদ-সাগরে ঔর্ব ঋষির কোপজ তেজঃ দ্বারা সর্বভূতভয়াবহ বৃহৎ বড়বামুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণীগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।"

পূর্বে দেখিয়াছি, মালয় দ্বীপের নিকটস্থ সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে। ইং ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যস্থিত সমুদ্রে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎক্ষেপ হইয়াছিল। শিখরের এক পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা হইতে উদ্গত ভস্ম সূক্ষ্ম রজোরূপে আবহে দিগ্দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ গিরিকে অশ্বমুখ মনে করা স্বাভাবিক বটে। প্রাচীনকালে সাদৃশ্য দেখিয়া নামকরণ হইত। বড়বা অর্থে অশ্বমুখাকৃতি দ্রব্য বুঝাইত। সংস্কৃত সাহিত্যে নামকরণের এই রীতির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও আছে, ইদানী আমরা সেই রীতি ভুলিয়া যাইতেছি। "দ্বারে দ্বারে সিংহ আছে" বলিলে বুঝি সিংহ-মূর্তি আছে। বড়বা শব্দে অশ্বা, ও অশ্বামুখাকার দুই-ই বুঝায়। অশ্বা পুত্র প্রসব করে, অশ্ব করে না। এই হেতু বড়বা স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার এক নাম বামী, যে বমন করে, উদ্গীরণ করে। "ত্রিকাণ্ডশেষ" কোষে (১২শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্বের) বড়বাগ্নির অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে একটি নাম 'বাণিজ'। বাণিজ শব্দের প্রচলিত অর্থ, বণিক্। বোধ হয় তাহারা বড়বাগ্নির বৃত্তান্ত প্রচার করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে জ্বালামুখী আছে, আগ্নেয়গিরি নাই। শোনা যায়, ইং ১৭৫৭ সালে পণ্ডিচেরীর নিকটস্থ সমুদ্রে আগ্নেয়

উৎক্ষেপে একটা চড়া জাগিয়াছিল। পরে সেটা নিমগ্ন হইয়াছে। আরাকান প্রদেশের নিকটস্থ রামড়ি দ্বীপে কর্দম-গিরি আছে। কখন কখনও তাহা হইতে ধূমও নির্গত হয়। কিন্তু সেটা বড়বা নয়। হিমালয়ে নাই। নিকটবর্তী দেশের মধ্যে বেলুচিস্থানের পশ্চিমে পারস্যে দুইটি আছে। এক পর্বতের উত্তরে একটি, দক্ষিণে অপরটি। দক্ষিণেরটির নাম কু-ঈ-বস্‌মন্‌, বসমনের (ভস্‌মনের ?) পর্বত, ১১।১২ হাজার ফুট উচ্চ। এটি এখন সুপ্ত। উত্তর-দিকটির নাম কু-ঈ-তফ্‌তন্‌, জ্বলন্ত পর্বত, ১৮ হাজার ফুট উচ্চ (অবশ্য পর্বতপাদ হইতে এত নয়)। এটি জাগ্রত। ইহাতে তিনটি শৃঙ্গ আছে। বোধ হয় এই পর্বত ঔর্ব উপাখ্যানের উরু, এবং ভস্‌মন গিরিতে ঔর্বাগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল। আরও বোধ হয় এক কালে এই পর্বতের নিকটে ভার্গবদিগের বাস ছিল। ইরাণের মধ্যে উত্তম স্থানও বটে। রাজা কৃতবীর্য হৈহয়-বংশীয় ছিলেন। সগর রাজার উপাখ্যানে পাইয়াছি, হৈহয় জাতির আদি বাস কাবুল। কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য-অর্জুন নামে খ্যাত। ইনি জব্বলপুরের দক্ষিণে নর্মদাতটে মাহিষ্মতী পুরী করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কৃতবীর্যের মৃত্যুর পর ইনি মধ্য-ভারতে আসিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হৈহয় স্বদেশেই ছিলেন। ভার্গববংশ তাহাঁদের পুরোহিত ছিলেন। অতএব এই উপাখ্যানেও পাইতেছি, ভার্গবদিগের বাস বর্ত্তমান ভারতসীমার পশ্চিমে ছিল। বস্তুতঃ পারস্য পর্যন্ত ভারতের সীমা ছিল। বেলুচিস্তানে সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ পর্যন্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। ইহারই পশ্চিম পারে ঔর্ব পর্বত।

কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা তাহাঁদের স্বদেশ হইতে একেবারে ইরাণের উক্ত পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে আসেন নাই। বোধ হয় প্রথমে ইরাণের পশ্চিমোত্তর ভাগে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কাস্পীয়ান হ্রদ অধিক দূরে নয়। এই হ্রদের দক্ষিণে একটি, পশ্চিমে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। দক্ষিণেরটি ঋষিদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেটি বড়বা নয়। তাঁহারা কি যবদ্বীপেই প্রথমে বড়বা দেখিয়াছিলেন ? পারস্যসাগরে বড়বা নাই। পূর্ব-দিকে মাদাগাস্কার দ্বীপে ছিল, এখন উহার অনুদ্বীপে আছে। লোহিত-সাগরেও ছোট ছোট দ্বীপে ছিল। ঋষিগণ নানা দিগ্‌দেশে গিয়াছিলেন। হয়ত সেখানে বড়বা প্রথম দেখিয়াছিলেন।

পুরাণে ভূগোল-বর্ণন আছে, বড়বাও আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ কঠিন। এ বিষয় এখানে পাড়িলে ঔর্বাগ্নি ঢাকা পড়িবে। অতএব সামান্য ভাবে বলি। বায়ুপুরাণ দেখি। লিখিত আছে (৩৮ অঃ), "সুবক্ষ ও শিখী শৈলের অন্তরালে এক বিস্তীর্ণ শিলাতল আছে। উহা নিত্য তপ্ত মহাঘোর, দুস্পর্শ, রোমহর্ষণ, সর্বপ্রাণীর অগম্য, সুদারুণ। উহার মধ্যস্থলে ত্রিংশৎ যোজনব্যাপী সহস্র-সহস্র জ্বালাময় সুদারুণ বহ্নিস্থান আছে। সে অগ্নি অনিন্ধন। সেখানে দেব হুতাশন সর্বদা জ্বলিতে-ছেন, তিনি লোক-সম্বর্তক অনল।" বর্ণনাটি ভৌমাগ্নির। জ্বালামুখীর বোধ হয় না। বিশেষতঃ সম্বর্তক নাম আছে। সম্বর্তক অগ্নি, প্রলয়কালীন অগ্নি। এইরূপ সম্বর্তক মেঘ, প্রলয়কালীন জলবর্ষী মেঘ। দেশটি কোথায় ? সুবক্ষ ও শিখীশৈলের অন্তরালে। এই দুই পর্বত কোথায় ? কৈলাস পর্বতের পশ্চিম দিকে। কৈলাস কোথায় ? হিমালয়ের পশ্চিমে ও উত্তরে। বোধ হয় বর্তমান নাম পীর পঞ্জাল। কৈলাসের পশ্চিমে বলিলে, পুরাণে পশ্চিম রেখায় বুঝায় না। শিখী, যাহার শিখা, চূড়া আছে। পারস্যের কু-ঈ-তফ্‌তন্‌ ত্রিশিখ। কৈলাসের পশ্চিমে আর কোন সুদারুণ অগ্নিস্থান নাই।

মহাভারতে লিখিত আছে (ভীষ্মপর্ব, ৭ অঃ), "মাল্য-বান্‌ পর্বতের শিখরদেশে সম্বর্তক নামক কালাগ্নি নিরন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।" কিন্তু মাল্যবান্‌ পর্বত কোন্‌টি ? এখানে বলা আবশ্যক, এক প্রাচীন কালে তৎকাল-জ্ঞাত পৃথিবী চতুর্দ্বীপা ও চতুঃসাগরা মনে করা হইত। তখন 'পামীর' সানুদেশ মেরু, এবং পরে ইলাবৃত হইয়াছিল। ইলাবৃত, চারি পর্বতে বেষ্টিত। মেরুদেশের পশ্চিমের পর্বতটি মাল্যবান্‌। ভাস্করাচার্য ইহাকেই মাল্যবান্‌ মনে করিয়া-ছিলেন। তদনুসারে মাল্যবান্‌ দীর্ঘ হইয়া হিন্দুকুশের সহিত মিলিয়া আফগানিস্থান ভেদ করিয়া পারস্যের পূর্বসীমা দিয়া সাগর-নিকটবর্তী হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ লিখিয়াছেন, (১১৩ অঃ), মাল্যবান্‌ পর্বত পশ্চিমদিকে সাগর পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার পশ্চিমে কেতুমাল দ্বীপ। অতএব পারস্যের আগ্নেয়গিরি।

দ্বিতীয় উল্লেখ বড়বার। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, (৪৬ অঃ), "চক্র, বলাহক, ও মৈনাক শৈল আয়ত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে পড়িয়াছে। চক্র ও মৈনাকের মধ্যে সম্বর্তক নামে অগ্নি আছে। সে অগ্নি সমুদ্র-জল পান করে। ইনি বড়বামুখ শ্রীমান ঔর্ব।" এটি যে সমুদ্রপায়ী বড়বানল, তাহা স্পষ্ট আছে। কোথায়? মৈনাক পর্বতের নিকটে। যে সকল পর্বত দীর্ঘ হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট, তাহাদের নাম মৈনাক। বড়বা সমুদ্র-নিমগ্ন অগ্নি নয়, মৈনাকও সমুদ্র-নিমগ্ন পর্ব্বত নয়। সমুদ্র-নিমগ্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার উপরে দেখা যাইবে না। পৌরাণিক বলিতেছেন, কিম্পুরুষ বর্ষের (তিব্বতের) মহানদী সকল পূর্বদিকে লবণ-সাগরে পড়িয়াছে। তার পর বারটি পর্বতের নাম করিয়া বলিতেছেন, এই সকল পর্বত লবণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকলের একটির বিশেষ নাম মৈনাক। ত্রিপুরা, আরাকান, টেনাসিরম্, মালয়, সুমাত্রা, বর্ণিও প্রভৃতির পর্বতগুলি দক্ষিণে সমুদ্রে প্র বষ্ট। বোধ হয় মৈনাকটি আরাকান পর্বত। আর মনে হয়, এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। পূর্বকালে পশ্চিমে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল, তেমনি পূর্বদিকে মালয়দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। ইহার পরে ভারতবর্ষের নিকটস্থ ও সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত অনেক অন্তর-দ্বীপ ভারত-দ্বীপ নামে আখ্যাত ছিল। বড় দ্বীপের নিকটস্থ ছোট ছোট দ্বীপকে অনুদ্বীপ বলিত। বহু ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশিষ্ট বর্হিণ দ্বীপ (মার্গুই দ্বীপপুঞ্জ)। তার পর অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ (যবদ্বীপ), মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ, এই ছয় ও বর্হিণ দ্বীপ, এই সাত ভারত-দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের বর্ণনায় সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ এই। দেশের নাম যে কত পরিবর্তন হয়, তাহা এই সকল নামে দেখা যাইতেছে। মলয় ও যম বা যব, এই দুইটি চিনিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু, আশ্চর্য, মৎস্যপুরাণকার এখানে বড়বার অস্তিত্ব শোনেন নাই। বায়ুপুরাণও শোনেন নাই।

কিন্তু আর এক স্থানে দেখিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ লিখিয়াছেন (৪৯ অঃ), শাল্মল দ্বীপে মেঘবর্ণ মহিষ পর্বত আছে। সেখানে বারিজ মহিষ-অগ্নি বাস করে। মৎস্য-পুরাণ লিখিয়াছেন (১২২ অঃ), কুশদ্বীপে মেঘবর্ণ মহিষ-পর্বত আছে। ইহা হরি-পর্বত নামেও খ্যাত। সেখানে মহিষ নামক জলজ অগ্নির নিবাস। এখানে দেখা যাইতেছে, দুই পুরাণেই পর্বতের বর্ণনা এক। কিন্তু একে শাল্মলদ্বীপে, অন্যে কুশদ্বীপে বলিয়াছিলেন। পর্বতটিতে আগ্নেয়গিরি আছে, এবং কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণস্থ গিরিটি মনে হয়। এটি এলবার্জ পর্বতের অঙ্গ। এই দেশ শাল্মল ও কুশ, দুই দ্বীপেই বলা যাইতে পারে। আর একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। মহিষ পর্বত বারিজ অগ্নিস্থান হইলেও ইহাকে বড়বা বলা হয় নাই। হয় ত ইহার আকার বড়বা তুল্য নয়।

পুরাণে ভৌমাগ্নির উল্লেখ পাইলাম। বেদে নাই কি? শুনিয়াছি পার্সীদিগের "জেন্দ অবেস্তা" গ্রন্থে এক স্থানের উর্ব আছে। সে স্থান ঔর্বাগ্নির উর্ব কি না, পণ্ডিতেরা মিলাইয়া দেখিতে পারেন। বেদে এমন সুদারুণ নিরিন্ধন অগ্নির উল্লেখ না থাকিলে আশ্চর্যের কথা হইবে। কিন্তু বেদ আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতান্তরের অন্ত নাই। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের চুম্বক করিয়াছেন, এবং শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত পদ্য দ্বারা সূক্তের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বইখানির নাম "বেদবাণী"। আমি এমন চুম্বক আর দেখি নাই। ইহাতে বেদ-বিদ্যাবান্‌দিগের মত সঙ্কলিত হইয়াছে। অগ্নি-সম্বন্ধে দেখিতেছি, অগ্নির ত্রিমূর্তি, আকাশে সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। এই যে পৃথিবীতে অগ্নি, সেটা কি অরণিজাত, না নিসর্গজ; অরণিজাত অগ্নিকে পার্থিব বলা চলে কি? অরণি-জাত অগ্নি 'যুবা,' 'কুমার'। মাতরিশ্বা নামে এক দেব সে অগ্নি ভার্গবদিগকে দিয়াছিলেন (৩।৫।১০)। বায়ুর নাম মাতরিশ্বা। অগ্নি বায়ুসখ; বায়ু দ্বারা অগ্নির জলন বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বায়ু দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি হয় না। অতএব বোধ হয়, প্রবল বায়ু-প্রবাহে শুষ্ক বৃক্ষশাখাদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে যে অগ্নি জন্মে, মাতরিশ্বা সে অগ্নি ভার্গবদিগকে দেখাইয়াছিলেন, * এবং ভার্গবেরা তাহা দেখিয়া অরণিদ্বয়-ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন।

---

* মৎস্যপুরাণ লিখিতেছেন (১৬৬ অঃ), সূর্য বৃক্ষশাখা আশ্রয় করেন, এবং সে শাখা বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাদের সম্ঘর্ষণে অগ্নি জন্মে, এবং শতধা প্রজ্বলিত হইয়া সর্ব দ্রব্য দগ্ধ করে।

ঋষিরা কোন্ দেশে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন? ঋগ্বেদের বহু স্থানে সে দেশকে পৃথিবী বা ইলা বলা হইয়াছে। পৃথিবী বা ইলা বলিতে যদি পৃথিবীর যে কোন স্থান বুঝি, তাহা হইলে সুসঙ্গত অর্থ হইবে না। তাঁহারা নিশ্চয় স্বদেশকে পৃথিবী ভাবিতেন। সেই ইলা, পরে ইলাবৃত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। যদি এই অর্থ হয় তাহা হইলে খ্রীষ্ট-পূর্ব ষট্সহস্রাব্দের পূর্বে।

কিন্তু এই অগ্নি নিসর্গজ নয়। অথচ অগ্নি দ্বি-জন্মা। এক জন্ম সূর্যে, অন্য জন্ম কোথায়? ঋগ্বেদে (২।২৪।৬,৭) আছে, কতকগুলি অভিজ্ঞ কবি এক মহামার্গ ধরিয়া আসিতেছিলেন; পথে সন্দেহ করিলেন, পণিরা এক গুহায় তাহাদের 'পরম নিধি' সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, 'অনৃত', মিথ্যা। তাঁহারা বাহুদ্বারা 'ধমিত' প্রজ্বলিত অগ্নি পণিদের 'অশ্মে', পর্বতে ত্যাগ করিলেন। সে দাহকারী অগ্নি পূর্বে সেখানে ছিল না। তদনন্তর তাঁহারা পুনর্বার মহামার্গে আসিতে লাগিলেন।" এখানে সায়ণ নানা কথা বলিয়া শেষে লিখিয়াছেন, আঙ্গিরস ঋষিরা পণিদের নিবাস-পর্বত দগ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্লোকের সোজা অর্থ থাকিতে পণি নাম দেখিয়া 'নিধি' গো, এবং সরমার সাহায্য-কল্পনা অনাবশ্যক। আমার অনভিজ্ঞ বুদ্ধিতে মনে হয়, এখানে আগ্নেয়গিরির উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কবি'রা পর্বতের উপরে দীপ্তি দেখিয়া পণিদের হিরণ্য মনে করিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, হিরণ্য নয়। সেখানে অগ্নি রাখিয়া গেলেন, যেন তাহাতেই অশ্মে অগ্নির সঞ্চার। বেদেও পৌরাণিক ব্যাখ্যা।

দুই অগ্নি গেল। বিদ্যুদগ্নির বহু উল্লেখ আছে। সে অগ্নি জলের ভ্রূণ (৩।১।১২,১৩)। ঋগ্বেদে অপাংনপাৎ নামে এক দেবের বন্দনা আছে (২।৩৫)। অপাংনপাৎ কি-না অপ্ জলের নপ্তা, নাতি। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তিনি বড়বা। কিন্তু আমার বোধ হয়, সে অনুমান সর্বৈব মিথ্যা। অপাংনপাৎ বড়বা হইলে "বিদ্যুৎবাস পরিধান করি, অপাংনপাৎ আকাশচারী" প্রভৃতি বাক্য একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

বন মন্দিরে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

শ্মশানের শিব,
তোমারে মন্দিরে বন্দী করেছিল অন্ধ মূঢ় জীব।
বিরাট প্রাসাদ গড়ি বিরচিল ঐশ্বর্য্যের ঘটা,
চারিদিকে বিথারিল সমারোহ দীপালোক ছটা,
তুমি আঁধারের দেব ভুলে গেল, পাশরিল আর
ধুতুরা, কঙ্কাল মুষ্টি, ভস্ম তব পূজার সম্ভার।
ভুলে গেল সঙ্গী তব ভূত প্রেত পিশাচের দল,
ভুলে গেল ভূষা তব ভুজঙ্গম, ভক্ষ্য হলাহল,
করিয়া তুলিল তোমা ভোগাসক্ত জনপদবাসী
রাজভোগে আড়ম্বরে ইন্দ্রতুল্য ব্যসনবিলাসী।

হায় মূঢ় জীব,
ভুলে গেল তুমি যে গো সর্ব্বত্যাগী শ্মশানের শিব।
সহজে কুপিত নও ভোলানাথ ক্ষ্যাপা আশুতোষ,
ধীরে ধীরে ধিকি ধিকি জ্বলি শেষে ক্ষিপ্ত হলো রোষ,
লোকালয় ভেঙে-চুরে শেষে রুদ্র রচিলে শ্মশান,
দেউলে তুলিলে তাই ত্রিশূলাগ্রে অশ্বথ-নিশান।
প্রেত এলো, সর্প এলো, জয়ধ্বনি করিল ফেরুরা,
ফুটিল আকন্দ দ্রোণ সিদ্ধিবনে ফুটিল ধুতুরা।
তুচ্ছ মানবের সৃষ্টি! পদে ঠেল ইন্দ্রেরো ত্রিদিব,
পাষাণের শিব তুমি ফিরে হলে শ্মশানের শিব।
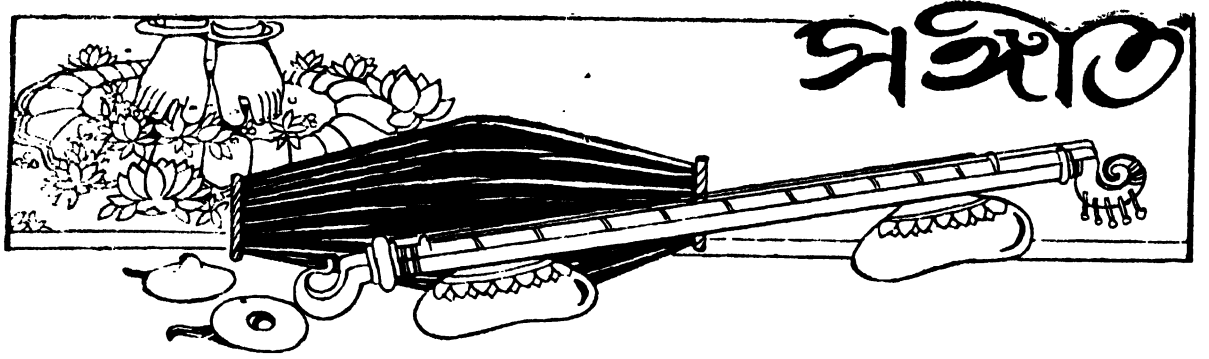
নটরাজ। *

কথা, সুর ও স্বরলিপি……শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজু মূর্চ্ছিত মন
আজু লুণ্ঠিত মন
হের কুঞ্জন-অন্দর নৃত্য-মোহন।

চরণারবিন্দ
অনুপ অনিন্দ্য,
ধন্য গোবিন্দ!
সুন্দর তন।

তেরো পদ প্রান্ত
পরশত—কান্ত!
বিদূরিত ধ্বান্ত
উজল ভুবন।

লচক সুগন্ধ
ভঙ্গিম ছন্দ
উছল আনন্দ
মুগ্ধ লগন।

* গানটির সম্বন্ধে একটি কথা মাত্র ব'লে রাখি—বা ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কথার সৌন্দর্য্য—সত্যকার কাব্যরস অত্যন্ত কম মেলে। কবীর, মীরাবাই, দাদু প্রভৃতি দুচারজন ভক্ত কবির কয়েকটি মাত্র গান ছাড়া সত্যকার কাব্যময় গান হিন্দীতে নেই এ কথা কাব্য-রসিক মাত্রেই মানতে বাধ্য। যে-দুএকটি গানে একটু আধটু কাব্যের পলাতক আভাব পাওয়া যায় তা শিশির বিন্দুর মতনই অনাদৃত, ক্ষণিক ও পলাতক। এই কারণে—(অন্য কয়েকটি কারণও আছে অবশ্য)—সঙ্গীতরসজ্ঞের মনে এই একটি ধারণা জন্মে গেছে যে উচ্চসঙ্গীতে কথা বুঝি

ণ্সজ্ঞমা পণদা পা | জ্ঞঋসা জ্ঞঋা সা | ণ্দ্া ণ্দ্া ণ্া | সা -া -া | ণ্সজ্ঞমা পণদা পা |
আ - জ্‌ মূ - র্ ছি - ত মন্ - - আ - জ্‌

জ্ঞঋসা জ্ঞঋা সা | ণ্দ্া ণ্দ্া ণ্া | সা -া -া | া সণ্া সা | া া পা | জ্ঞপা পা দা |
লু - ন্ ঠি - ত মন্ - - - • - হে র - - কুন্ - জ ন

র্সণা ধণা ধণা | দা পা সা | জ্ঞসা জ্ঞা রজ্ঞা | জ্ঞা -া পা | মজ্ঞা মা জ্ঞঋসা |
অন্ - - দ র - নৃ - - ত্য - মো হ ন্ রে

সা -া -া | -া -া -া | া া মজ্ঞা | মা ণদা ণা |
আজ্‌ মূর্চ্ছিত মন আজ্‌ লুণ্ঠিত মন্ - - - - - - - চ র ণা র

দর্সা -া -া | র্সণা র্সা -া | -া -া র্সণা | র্সা ণর্ঋা ণর্সা | ণদপা ণদা ণদা |
বিন্ - - দ - - - - - অ ম্বু প অ নিন - -

পা -া সা | -া -া পা | -া পা দা | পদা ণদা পদা | পমা -া -া |
দ্য - - - - ধন্ - ন্য গো বিন্ - - দ

-া -া জ্ঞরা | মজ্ঞা সা পা | মজ্ঞা মা জ্ঞঋসা | সা -া -া |
- - সুন্ - দ র তন্ - রে আজ্‌ মূর্চ্ছিত মন আজ্‌ লুণ্ঠিত মন্ - -

-া -া -া | া া সা | সা সা ঋা | জ্ঞা মা -া | জ্ঞমা -া -া | া া
তে রো প দ প্রান্ - - ত - - প

অকিঞ্চিৎকর হ'তে বাধ্য—নইলে সুর মাঠে মারা যায় ব'লে। তর্কটা একটা বড় তর্ক—মানি, কিন্তু খুব গোড়া থেকে ভাবলে ভ্রান্তই মনে হয়।
ভাব লীলায়িত সুরের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ব'লেই কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের দলে ভিড়ে যায় নি—ও কবিত্বময় কথা নির্বিশেষ
আলাপের মধ্যে ডুবে যেতে পারে নি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে গানের কাব্য যে-মুহূর্ত্তে বিশিষ্ট রসে গৌরব লাভ করে, সে-মুহূর্ত্তে
যে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য চায়ই চায়—বাঁচবার জন্যে। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় ভাবুক বিশেষজ্ঞ অমিয় সান্যাল মহাশয় কয়েকটি বিশিষ্ট ঠুংরি গানের
সমালোচনায় এ সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করেছেন। আসল কথা এই, গান যে-মুহূর্ত্তে একটা বিশিষ্ট প্রাণ নিয়ে ফুটে ওঠে
সে-মুহূর্ত্তে সে হ'য়ে ওঠে স্বয়ম্বরার মতন। অর্থাৎ যে-কোনো সুর যে-কোনো তানে তার বরণমালা মেলে না, আর—তাকে ভোলাবার
ছলবল আরম্ভ করতে হয়—তার চিত্ত চুরি করবার আর্ট শিখতে হয়, ওস্তাদদের মতন শুধু তাকে ধর্ষণ করলেই তাকে মেলে না। এ কথা বলার কারণ
এই যে আজকের দিনে অধিকাংশ নির্বিশেষ হিন্দুস্থানী গানে অধিকাংশ ওস্তাদ গানের চিত্তজয় করতে ছোটেন না—তানের তাণ্ডব নৃত্যে ধর্ষণ
ক'রেই তাকে পেতে চান, এবং এ-পাওয়ায় যে সম্পূর্ণ বিফলকাম হ'ন তাও বলা চলে না। কারণ যার চিত্তই নেই তাকে হরণ করার দরকার
করে না। গ্রাস করলেই পেট ভরে, মন ভরাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গান যেখানেই গান হ'য়ে ওঠে সেখানেই রচনা-স্বাতন্ত্র্যকে খানিকটা
স্থান শ্রদ্ধাভরেই ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ সেখানে শুধু virtuosityতে চলে না—ডাক পড়ে ঐ composerএর। এ কথাটি পরে প্রবন্ধে
বিশদ ক'রে বলবার ইচ্ছে রইল। উপস্থিত এ গানটির স্বরলিপির পাদটীকায় এ-অবতরণিকা গেয়ে রাখার উদ্দেশ্য—সঙ্গীতানুরাগী দরদীর কাছে
আবেদন জানানো যে এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে—ভাবের, ছন্দের ও সুরের। নানারকম তান যোগানো ও বৈচিত্র্য আনার অবসর আছে নিশ্চয়ই—
নইলে গান কখনো বড় হয় না—কিন্তু যে-সে-তান নয়, হর্ষের তান, স্তবের তান, নৃত্যের তান। দুঃখের বিষয় স্বরলিপিতে সে-সব ইঙ্গিত দেওয়া
চলে না—তাই এ ভূমিকা।

মা ঙ্মা জ্ঞমা | জ্ঞসা জ্ঞঋা জ্ঞঋা | সা -া -া | া া সা | পা দা ণা |
র শ ত কান্ - - ত - - - - বি দু রি ত

দপা পদা পা | মা -া -া | মা -া পা | মপা ণা দা |
ধ্বা ন্ - ত - - - উ - জ্ঞ ল - ভু

পমা পা মজ্ঞরজ্ঞা | | সা -া -া | -া -া -া |
বন্ - রে আজু মূর্চ্ছিত মন্ আজু লুন্ঠিত মন্ - - - - -

া া মা | মা পদা ণা | দণা র্সা -া | ণর্সা -া -া | -া ণা ণা |
- - ল চ ক সু গন্ - - ধ - - - - ভ

র্সা ঋর্া ণর্সা | দণাপা পদা -া | পা সা -া | া া সা | পা দা ণা |
ঙ্ গি ম ছন্ - - দ - - - - উ ছ ল আ

দপা পদা পদা | পা মা -া | -া -া জ্ঞরা | জ্ঞা সা পা | মজ্ঞা মা জ্ঞসা |
নন্ - - দ - - - - মু গ্ ধ ল গন্ - রে

| সা -া -া | -া -া -া | া া পা | -া পা দা |
আজু মূর্চ্ছিত মন্ আজু লুন্ঠিত মন্ - - - - - - - কুন্ - জ ন

মপা জ্ঞমা পণা | পদা পা -া | মজ্ঞা রজ্ঞা রজ্ঞা | সা -া পা | পা দা পা |
অন্ - - দ র - নৃ - - ত্য - মো হ - -

মা -া -া | মা পা মা | জ্ঞা -া -া | জ্ঞা মা জ্ঞজ্ঞা | সা জ্ঞা ঋা | সা -া -া |
অন্ - - - - - - - - হ - - - - - অন্ - -

| সা -া -া |
আজু মূর্চ্ছিত মন্ আজু লুন্ঠিত মন্ - - .

মায়ের দিন

শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

রাতের অন্ধকার যখন পাৎলা হয়ে আসে, শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করে তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলোর চাকার ঝনঝনানি শব্দে ঘুমন্ত নগরের জনহীন পথ আকুল হয়ে ওঠে, তখন কমলার ঘুম ভেঙে যায়। সেই সময়ে তার স্নেহঘেরা কোলে ছোটখুকীর চোখ থেকেও ঘুম চলে যায়; গাছের পাতা-ঢাকা নীড়-গুলিতে পাখীদের গান গেয়ে ওঠার সময় স্নিগ্ধ ভোর-বেলায় ছড়ানো বিছানাতে মা ও মেয়ের খেলায় মায়ের দিনের আরম্ভ হয়। তরল অন্ধকারে মায়ের বড় মুখখানির দিকে চেয়ে সদ্য-জাগা পাখীর ছানার মত 'অ্যাঁ' 'অ্যাঁ' শব্দ করে খুকী আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, কমলা তার নবীনকোমল অধরে চুম্বন দিয়ে এলানো শাড়ীটা কোনমতে জড়িয়ে বিছানা থেকে ওঠে, ছেলেমেয়েদের গায়ে বিছানার চাদরটা টেনে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় যে চাদরটা বিছানাতে পাতা হয়েছিল, ভোরবেলায় সে চাদরটা যে কি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেজেতে গিয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েদের নিদ্রা-পদ্ধতির সে এক রহস্য। স্বামীর খাটের পায়ের দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেয়, ভোরের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস যেন স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না করে। তার পর, সে আবার বিছানাতে শুয়ে ছোটখুকী চাঁপুকে বুকে টেনে নেয়, তার তুলতুলে পায়ে হাত বুলিয়ে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। সারা দিনের কাজে খুকীকে যে একটু আদর করবে তারও সময় হয় না,—এই ভোরবেলা হচ্ছে কমলার মাতৃ-স্নেহলীলার সময়। খুকী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর দুধ খায়,—মাঝে মাঝে সুর করে বলে' ওঠে—অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ।

—দুষ্টু চাঁপু, চুপ্‌, এক্ষুনি বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। চাঁপু তার ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দু'টি নাচায়।

খাটের ওপর স্বামী শোন; তলায় মেজেতে লম্বা বিছানা,—এক দিকে খুকী আর খুকীর মা, তার পর লাখী, তার পর রাণু, তার পর মণা, তার পর শোভা,—বয়সের বাড়তি অনুসারে শোয়, মাঝে একটি করে পাশ-বালিশ ব্যবধান। এই পাশ-বালিশ হচ্ছে প্রত্যেকের বিছানা-বাসের সীমানা। লাখীর কিন্তু দু'দিকে দুই পাশবালিশ ও পায়ের দিকেও একটা বালিশ চাই,—তার বয়স চার কি না,—সেজন্যে চারটে বালিশ না হলে তার চোখে ঘুম আসে না। রাণু কিন্তু ভারি লক্ষ্মী। সে বলে, তার একটা পাশ-বালিশও চাই না। কি হবে মা, বাজে বালিশ নিয়ে, আমি ত আর লাখীর মত ছোট নেই যে গড়িয়ে মেজেতে পড়ে যাবো। ছ'বছর তার বয়স, এরি মধ্যে গিন্নি। সবচেয়ে দুষ্টু হচ্ছে মণা। তার ওপর রাতে ঘুমের ঘোরে সে ঘুরপাক খায়,—শোভা বেচারাকে লাথি মেরে তার ওপর দিব্যি পা তুলে মহানন্দে ঘুমোয়। শোভা যে সবার বড়দিদি এই গর্ব্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে সে আর নালিশ করে না,—ছোট ভাই ঘুমের ঘোরে হাত পা ছোঁড়ে, তা কি করা যায়। সে মাঝে মাঝে বলে বটে, মা, ও চরকির পাশে আমি শোব না, কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় আর আলাদা বিছানা করতে দেয় না, সে মণার পাশেই শোয়।

দু'টো মোটা পাশবালিশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে শোভা ভাবে আজ নিরাপদে ঘুমানো যাবে; কিন্তু রাতে যখন চরকি ঘোরে,—কোথায় থাকে পাশ-বালিশ, কোথায় বা থাকে মাথার বালিশ,—মণার এক পা চলে যায় শোভার বিছানাতে, আর এক পা চলে যায় মেজেতে,—চাদরটা তালগোল পাকিয়ে থাকে,—কিন্তু কারুর ঘুমের কোন কম্‌তি বা ব্যাঘাত হয় না।

খুকীর দুধ খাওয়া শেষ হলে খুকীর চোখ ধীরে ধীরে বুজে আসে, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুকীর মায়ের আর ঘুমানো চলে না। কমলা ধীরে উঠে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চুলগুলো মাথায় কুণ্ডলী করে বেঁধে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে

দেখে। ইচ্ছে করে প্রত্যেককে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। লাখীকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার চার-পাশে চারটি বালিশ ঠিক করে রাখে। রাণু কি শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে,—তার কোলের পুতুলটিরও নড়চড় হয় নি। মণাটাকে মেজে থেকে তুলে বিছানাতে শুইয়ে দেয়,—মণা কি বিড়বিড় ক'রে বকে ওঠে—'গোল' 'গোল', আর সঙ্গে সঙ্গে পা ছোঁড়ে—সারা বিকেল ফুটবল খেলে তার আশ মেটে নি।

চারি দিক নিঝুম, সবাই ঘুমোয়,—ভোরের আলো পূবের পাঁচিল দিয়ে আসে—ময়নাটা খাঁচায় উসখুস করে। কমলা ময়নাটাকে বলে, গোলমাল করিস না। তার পর ঝি-চাকরদের জাগাতে নীচে চলে যায়। মধুটা কোন দিন যদি সকালে ওঠে,—দালান বারান্দা সিঁড়ি সব ধুতে হবে,—ধুয়ে শুকিয়ে যাবার আগে যদি সবাই উঠে পড়ে, পায়ে পায়ে কাদা হয়ে যায়। এই ধোওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কত গোলমাল না হয়েছে। স্বামী বলেন, 'আচ্ছা, কলকাতা সহরের সব বাড়ীর দালান বারান্দা সিঁড়ি উঠান সব জল দিয়ে যদি ধুতে হয়, কত জল লাগে বল ত! অত জল মিউনিসিপ্যালিটি দেবে কি করে?' কমলা বলে, 'তা হিঁদুর বাড়ী আমি ম্লেচ্ছপনা করতে দেবো না।'

মধুর ঘরের শিকলি ঝন্‌ঝন শব্দে বেজে ওঠে।—'হতভাগা ওঠ্‌না, কলে জল এসেছে কতক্ষণ।'

—'উঠি মা!'

কমলা নিজেই বাল্‌তি ও ঝাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করে,—জানে, ঝাঁটার শব্দ না শুনলে মধু উঠবে না। আর মা ধুচ্ছেন জানলে সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে মধু ছুটে আসে—'মা আমায় দিন্‌, আমায় দিন্‌।'

কমলা দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে,—সব ঠিক আছে,—রাতে তাহলে বেরাল ঢোকে নি। উনানের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাহির হয়ে আসে—ওসব ক্রীম, পাউডারে দাঁত মাজা তার পোষায় না।

মুখ ধুয়ে কমলা ওপরে উঠে আসে,—সব দরজার গোড়ায় জল-ছড়া দেয়,—শাশুড়ী ঠাকরুণের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,—'মা, রাতে কেমন ঘুম হল।' উত্তর আসে, 'ভাল না মা।' কয়েক দিন হল শাশুড়ীর হাঁপানিটা বেড়েছে। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খুকীর সুখস্বপ্নহাস্যভরা মুখখানি দেখে, তার পর মণাকে ডাকে, 'খোকা খোকা'। মণা রোজ মাকে বলে, মা ভোরে উঠিয়ে দিও, পড়া মুখস্থ করবো; কিন্তু কোন দিন সে ভোরে উঠতে পারল না। কমলা দু'তিনবার ডাকে, হাত ধরে ঝাঁকুনি দ্যায়। মণা গাঁইগুই করে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম-ভরা ছেলেকে টেনে তুলতে কমলার মনে বাজে,—বলে, ঘুমোক, কত পড়বে!

স্বামীর, ছেলেমেয়েদের দাঁত-মাজার সরঞ্জাম ঠিক করে রেখে, ওপরের ঠাকুর-ঘর মুছে, উনানে আগুন দিয়ে, স্নান করে কমলা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, তখন সূর্য্য উঠে গেছে,—অরুণ-রথচূড়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে গয়লার কাছ থেকে দুধ মেপে নেয়। মধুর সিঁড়ি বারান্দা ধোওয়া হয়ে গেছে,—সে এসে দাঁড়ায়—'মা, চা, বাবু যে হাঁকছেন'। 'হাঁকতে দে, জল বসিয়েছি। চায়ের বাটি না হলে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির যে মাথা খাচ্ছেন। হ্যাঁ রে ছেলেমেয়েগুলোর সব মুখ ধোওয়া হয়েছে?'

'মুখ ধোওয়া কোথায় মা, সব এখন যুদ্ধ হচ্ছে।'

'যুদ্ধ কি রে?'

'বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি।'

'আবার আজ হচ্ছে, রোস দেখাচ্ছি!'

বিছানা ধামসানো বা বালিশ ছোঁড়া কমলা মোটেই পছন্দ করে না,—তার বুকে যেন বাজে,—হনহন করে সে ওপরে চলে যায়।

শোবার ঘরে দু'পক্ষে যুদ্ধ চলে,—এক দিকে মণা আর লাখী, অপর দিকে শোভা আর রাণু,—তাদের বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দ্যান। মণা সব চেয়ে ওস্তাদ,—তার তাগটা ঠিক হয়। লাখী বেচারার ছোট বালিশগুলিই সবাই টেনে টেনে ছোঁড়ে। সে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বালিশ, আমার বালিশ'। তার পর নিজের পক্ষের জয় হচ্ছে দেখে হেসে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁপু কিন্তু সুখে নিদ্রা যায়।

মাকে দেখে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যায়,—মণা কিন্তু হাতের বালিশটা শোভাকে ছুঁড়ে মারতে ছাড়ে না।

—'হতভাগা ছেলেরা, সকালে উঠে কাণ্ড দেখ না, মেয়ে'—

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে—'মা, মণাই ত আরম্ভ করলে'—

'আমি! বাঃ; বাবা ত প্রথমে'—

'মা দেখো না, আমার বালিশ, এই তুলো বেরিয়ে গেল।'

'মণা শীগ্‌গীর ওঠ, হতচ্ছাড়া ছেলে—আর হ্যাঁ গা, তুমি বুড়ো মিনসে, তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে'—

স্ত্রীকে দেখেই স্বামী শুয়ে পড়েন,—তিনি নীরবে চোখ বোজেন। মণা দৃপ্ত ভাবে উঠে চলে যায়,—জানে মা এখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে, সুতরাং তার ওপর কোন চড় বা চাপড় পড়ার আশঙ্কা নেই।

স্বামীর চা ও ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ওটমিল-মিশ্রিত দুধভরা বাটিগুলি সাজিয়ে মধুর হাতে দিয়ে কমলা ভাঁড়ার-ঘরে তরকারি কুটতে বসে,—ঠাকুর এখুনি এসে পড়বে। মধু এসে দাঁড়ায়,—'বাজার কি আনতে হবে মা।' ঝি ঝামা দিয়ে কড়া মাজতে-মাজতে কলতলা মুখর করে তোলে। লাখী এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে শোভা।

'দেখ মা, লাখী দুধ খাচ্ছে না।'

'মা, আমায় বাবা একটু চা দিচ্ছে না কেন।'

কমলার সামনে বঁটি,—চারি-দিকে তরকারির পাহাড়,—আলু চেরা, পটল কাটা চলছে। তার সঙ্গে হুকুম করা,—ছেলেমেয়েদের অভিযোগের মীমাংসা করা,—বামুনঠাকুরের ফরমাজ শোনা, সব চলেছে।

'লক্ষ্মী লাখু, দুধ খাও গে, আমার সঙ্গে চা খেও। ওই রে চাঁপু জেগেছে,—রাণু, নিয়ে আয় ত মা, দুধটা খাইয়ে দে'না।'

শোভা হচ্ছে পড়ুয়ে মেয়ে—সে সংসারের কাজে ঘেঁসে না। রাণুর প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে,—'ঐক্য বাক্য' আর তার পোষাচ্ছে না,—মূর্খতার অখ্যাতি সে বহন করতে রাজী আছে,—বিদুষী বলে সে বিখ্যাত হতে চায় না। সেজন্যে সংসারের একটু কাজ করতে পারলে সে খুসি,—ততক্ষণ ত মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়াটা ফাঁকি দেওয়া যায়। সে সর্ব্বদাই মাকে সাহায্য করতে ব্যস্ত,—চাঁপু কাঁদলেই সে পড়ার ঘর থেকেও ছোটে।

ঠাকুরকে চাল ডাল বের করে, তরকারি বুঝিয়ে, কমলাকে একবার ওপরে যেতে হয়। বাড়ীখানা এতক্ষণে সরগরম হয়ে উঠেছে। পড়ার ঘরে মণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাণু চেঁচাচ্ছে,—কলতলায় ক্ষেত্তরের মা বাসন মাজার সঙ্গে বক্‌বক করছে,—রান্নাঘরে তেলের কল্‌কল শব্দ হচ্ছে,—আর শোবার ঘরে কেষ্টো খাটের বিছানা তুলছে,—তলার বিছানাতে লাখীতে চাঁপুতে স্বামীতে মিলে হাসাহাসি চেঁচামেচি চলছে,—বারান্দাতে ময়নাটাও তার সঙ্গে ডেকে উঠছে। কমলা শোবার ঘরের দিকে এখন যায় না,—চাঁপু 'মা' বলে চেঁচালে, তাকে কোলে না নেওয়া দু'পক্ষের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হবে, শেষে ক্রন্দনের জয়ই হবে। সে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘরে চলে যায়,—সকাল থেকে ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করবার সময় পায় নি। সাদা শাড়ীটা ছেড়ে একটা তসরের কাপড় পরে; কিন্তু আহ্নিক করতে বসে নীচের কলরব কাণে আসে,—মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীচে মধুর গলা শোনা যায়। কি—মাছ পেল, কত পয়সা ফিরলো,—এ সব জানতে মন উসখুস্‌ করে,—আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসতে হয়।

মাছ কত ভাগ করে কুটতে হবে বলে, রান্নাঘরটা পরিদর্শন করে' ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে কমলা দেখে, শাশুড়ী ঠাকরুণ নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণ দখল করে বসেছেন,—তাঁর স্নান-আহ্নিকও হয়ে গেছে। শাশুড়ী বলেন, 'দাও বৌমা, পানগুলো আমিই সাজছি; না, বাপু, তোমার এ মেয়ের জ্বালায় পারা গেল না।' চাঁপু ঠাকুরমার কোলে চড়ে নেমে এসেছে, এখন কোল থেকে নামতে চায় না, আলুর খোসা দিয়ে তাকে ভুলোতে হয়।

সকালের ঘড়ির কাঁটাগুলো ছুটে চলে,—ঠাকুরের ঝোল সাঁত্‌লানো হতে না হতেই কলের ঘরে ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়।

লাখী দিগম্বর হয়ে এসে বলে, 'মা, আমায় কেউ চান করিয়ে দিচ্ছে না।'

মণা বলে, 'আমার খদ্দরের সার্ট কোথায় মা?'

শোভা বলে, 'আমি কোন্‌ শাড়ী পরব?'

রাণু মুখ লাল করে বলে, 'মা, আজ এক মেম আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন, আমি সেই সোণালী ফ্রকটা পরব?'

শোভা মনে মনে বলে ওঠে, 'সিল্কের শাড়ী পরে গেলে

আবার হেড মিস্ট্রেস্ চটেন,—নিজেরা ত বিকেলে কত সাজ গোজ করে বেরুন হয়।'

'হ্যাঁ রে, স্কুলে যাবি, আবার সাজগোজ করে যাওয়া কি রে।'

রাণুর ইচ্ছা আজ ফ্রক না পরে শাড়ী পরে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দিদিদের দয়া হলে তারা লাখীকে স্নান করিয়ে দেয়। কিন্তু স্নানের সময় লাখী এত জল ছোঁড়ে, দুষ্টুমি করে,—একবার গা মুছিয়ে দিয়ে আবার গা মোছাতে হয়,—দেরী হয়ে যায়,—সেজন্তে সহজে তারা কেউ লাখীকে স্নান করাতে রাজী হয় না। কমলাকে স্নান করাতে হয়। এই নবনী-কোমল দেহে তেল রগড়ানো, সাবান মাখানো, ধোয়ানো, জল মোছানোতে আনন্দ আছে, কিন্তু রোজ সে সুখ উপভোগ করবার সময় কোথায়, মধুকে ডাকতে হয়—'দে বাবা লাখীকে চান করিয়ে।' কমলা চাঁপুকে স্নান করায়।

তার পর দালানে আসন-পিঁড়ে সশব্দে পড়ে যায়। 'ঠাকুর ভাত দাও।' 'শাগ্‌গির!' ছেলেমেয়েরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

'হ্যাঁ রে মণা, এই ত সাড়ে ন'টা, আস্তে খা'—

'মা, আমার আজ পরীক্ষা।' ওজর একটা আছেই। কিন্তু পরীক্ষা আছে বলে আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে যাবার কারণ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিল না। মণার মনে শুধু জাগে, কাল দুটো লাট্টু হারিয়েছি, আজ সেগুলির উদ্ধার করতে হবে।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসে, একটু দেখবারও সময় নেই,—কমলা তোলা-উনানে তাড়াতাড়ি পটল ও লুচি ভেজে এ্যালোমিনিয়মের বইএর মতন টিফিনের বাক্স সাজায়। বামুন-ঠাকুরের আলুর দম এখনও হয়ে ওঠেনি! ভাঁড়ার-ঘরের দরজার চৌকাটে বসে ঠাকুমা কিছু তদারক করেন।

'গাড়ী আয়া বাবা।' শোভা আর রাণু ঝড়ের মত ছোটে,—পিঠের ওপর বেণী দোলে,—জুতোর হিলগুলো সিঁড়িতে খট্‌খট্ করে,—বুঝি হিল-ওয়ালা জুতোশুদ্ধ ঠিকরে পড়ে। ওরে খাবারের বাক্স? সেদিকে তাদের হুঁস থাকে না,—খাতা-বইগুলো বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। মধু টিফিনের বাক্স নিয়ে পেছনে ছোটে, কমলাও উঠে এসে ভাঁড়ার-ঘরের জালতি-দেওয়া জানলা দিয়ে ছাখে,—মেয়ে দুটো উঠল, দরজা বন্ধ হল, বাস্ চলল।

'মা, স্কুলে যাচ্ছি।' বইভরা চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে মণা সামনে এসে দাঁড়ায়। 'আজ পরীক্ষা বুঝি?' 'হ্যাঁ মা,' বলে সে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নেয়।

পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম করে গেলে ফলটা ভাল হবেই, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। কমলা তার সার্টের কলারটা ঠিক করে দেয়, গলায় বোতামটা আঁটতে চায়। 'থাক মা, ওটা খুলে রাখা ফ্যাসান, আর যা গরম।' নিমেষের মধ্যে খোকা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ দিকে স্বামী খেতে বসেন; তাঁর পাশে লাখী ও চাঁপু।

চাকরদের জলখাবার দিয়ে, এক হাতে এক বড় পেতলের বাটিতে চা ও আর এক হাতে পাখা নিয়ে কমলা স্বামীর কাছে এসে বসে। চা নয়, চায়ের সরবৎ—তাতে চায়ের চেয়ে দুধ ও চিনির ভাগই বেশী,—এতেই বেলা একটা পর্য্যন্ত চলবে।

মায়ের সঙ্গে চা খাবে, না, বাবার সঙ্গে গরম মাছ-ভাজা খাবে,—এ সমস্তা লাখী সমাধান করে উঠতে পারে না। 'চা ছাই না' বলে' গরম মাছ-ভাজাই খেতে আরম্ভ করে। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে চায়ের বাটির দিকে এমন ভাবে চায় যে চা একটু দিতেই হয়। চাঁপু কিন্তু একটু আলু খেয়েই সন্তুষ্ট, - লক্ষ্মী মেয়ে!

পান নিয়ে যখন কমলা উপরে আসে, স্বামীর অর্দ্ধেক সাজগোজ হয়ে গেছে,—মধু পাখার বাতাস করছে। সে মাকে দেখেই পাখাটা রেখে অকারণে চলে যায়। কমলা পাখা করতে করতে দু'একটা সংসারের কথা বলে। সকালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন,—আফিসের পোষাক পরার অবসরে পাখার বাতাসে সাংসারিক প্রেমালাপ হয়। কমলা কোটটি ধরে, স্বামী দু'টো হাত তাতে ভরে বলেন,—'থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার।' তার পর এক হাতে টুপি নিয়ে অপর হাতে কমলার ঠাণ্ডা নরম গালে আদর করেন। কমলার গাল-দুটিতে রক্ত ফেটে পড়ে, বলে, 'যাও, ঢং করতে হবে না।'

স্বামী বলেন, 'সংসার-সংগ্রামে রণক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশ পরিয়ে পাঠাচ্ছো,—বিজয়-তিলক দাও।' কমলা একটু

ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার কাছে যেন পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এই ভঙ্গীতে তাকে বড় সুন্দর দেখায়। কোন দিন বা উচ্ছ্বাসের আবেগে স্বামী একটি চুমো খেয়ে ফেলেন। কমলার সমস্ত দেহে পুলকের শিহরণ লাগে।

'তবে আসি প্রিয়ে।'

স্বামীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়,—সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ কাণে আসে,—ঘরের মাঝে কমলা উদাসভাবে যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে থাকে,—সব কাজ ভুলে যায়। বাড়ী-খানা স্তব্ধ, নিঝুম, মনটা ভারী হয়ে আসে। আঁচল দিয়ে খাটের পায়াগুলো ঝাড়ে,—অকারণে কুলুঙ্গি থেকে তেলের, ঔষধের শিশিগুলো নামিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু কাজে মন থাকে না। সকালের সেই কর্ম্মময়ী কমলা যেন বদলে গেছে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে।

দালানের কোণ থেকে একটা ডাক আসে—'মা, মা, দেখো না—'

কমলা চমকে ওঠে, মনের কুয়াসা কেটে যায়, বলে—'যাই, বাবা, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর ত—মাগুর মাছের ঝোল হয়েছে কি?'

'হয়েছে মা।'

সাবান দিয়ে ধোবার জন্যে রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, খুকীর জামা সব জড় করে মধুকে দিয়ে কমলা লাখীকে মাগুর মাছের ঝোল ভাত খাওয়াতে বসে। লাখী একটু পেটরোগা,—বাবা মা দাদা দিদিদের সঙ্গে বার বার খাওয়াই তার কারণ। মুখ তার সারা দিন টুক্‌টাক্ চলছে। স্বামী তার জন্যে বকেন, আবার নিজেই দিতে ছাড়েন না,—খাবার সময় সামনে এসে বসলে কিছু মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।

লাখীকে খাওয়াতে বসলেই চাঁপু কোথা থেকে টলতে টলতে চলতে চলতে এসে থালার কাছে থপ্ করে বসে পড়ে, বলে—'ম্যা ম্যা, ভত্ ভত্', তএর ওপর এমন একটা জোর দেয় যে না হেসে থাকা যায় না।

সকালে কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, যেন মেলগাড়ীর ইঞ্জিন ছুটে চলেছে। এখন কাজ চলে ঢিমেতেতালে। ভাঁড়ার-ঘরের খুঁটিনাটি, বসার ঘরের টেবিল সাজানো, শোবার ঘরের ঝাড়পোঁছ চলে অলস ভাবে। এই ধুলোঝাড়া, গোছানো, সাজানো, মোছা যেন পরম উপভোগের সুখকর কাজ।

গির্জ্জের ঘড়িতে বারোটা বাজে,—দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে,—গলির জনস্রোত, গাড়ি চলা মন্দ হয়ে আসে। খাঁচার ময়নাটা ছাতু ছোলা খেয়ে ঝিমোয়, শাশুড়ী ঠাকরুণ মাঝে মাঝে হাঁক দেন, 'বৌমা, আর কত বেলা করবে।'

'এই যে মা, ছাদের কাপড়গুলো তুলে যাচ্ছি।'

ছাদের সিঁড়ির মাঝে জানলার কোণে কিন্তু দাঁড়াতে হয়,—পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের অসুখ,—খবরটা নেওয়া দরকার। জানলায় দাঁড়াতেই পাশের বাড়ীর বৌ ডাকে, 'দিদি, এখনও খাওয়া হয় নি?'

'দেখ না ভাই, কাজের কি আর শেষ আছে।'

'আর তোমার আবার যে রকম ঝরঝরে কাজ ভাই।'

তার পর জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ হয়। পাশের বাড়ীর বৌ বলে, মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না,—বাঙ্গালীর ঘরে অসুখ কি লেগেই থাকবে? বউয়ের মেজাজ আজ ভাল ছিল না,—সংসারের টানাটানি। তার পর কমলার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চেয়ে বসে। কমলা জানায়, পাঁচ টাকা সে কোন মতে দিতে পারে,—সন্ধ্যে-বেলায় যেন বৌ আসে। কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনে বৌএর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—মেয়েটার ঔষধ-পথ্য টাকার অভাবে হচ্ছে না। তার পর পাড়ার গল্প ওঠে,—কার ছেলে পিকেটিং করে জেলে গেছে,—কার মেয়ে রোজ পিকেটিং করতে যায়, এত সাহসও আজকাল মেয়েদের! এবার পুজোয় খদ্দর ছাড়া কিছু কিনবে না ঠিক করেছে, কিন্তু খদ্দরের যা দাম—তারপর কমলার নতুন চুড়ির প্যাটার্ণটা দেখতে চায়।

একটা ছেলের কান্নার শব্দ আসে,—দুপুরের জানলায় নিভৃত আলাপ ভেঙে যায়।

শাশুড়ী ঠাকরুণকে খাওয়াতে বসিয়ে নিজে খেতে বসতে দেড়টার আগে হয় না,—বাহিরে দালানে ঝি-চাকররাও একসঙ্গে খেতে বসে।

খাওয়ার পরও কি কাজের বিরাম আছে,—একগাদা। সেলাই পড়ে,—ছেলেমেয়েগুলো কাপড় ছিঁড়তে ওস্তাদ।

তার পর এ সব খদ্দরের কাপড় সেলাই করাও হাঙ্গামা। মণা কিন্তু খদ্দর ছাড়া কিছু পরবে না, আর সেই বেনী ছেঁড়ে। তবু হাপ-প্যাণ্ট করে ছেঁড়া কিছু কমেছে।

নিঝুম অপরাহ্ন, চাঁপু মেজেতে একটা কাঁথার ওপর ছোট বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। লাখী পাশে বসে অসম্ভব সব কথা বলে, 'মা, আচ্ছা তুমি বড় না বাবা বড়? আচ্ছা, তোমার ত বাবার মত গোঁফ নেই, মেয়েদের থাকে না বুঝি—' লাখীকে বুকে টেনে চুমো খেয়ে কমলা বলে, 'চুপ কর লাখী, একটু ঘুমো না বাছা।' লাখী তার জন্তু-জানোয়ারের রঙীন ছবিভরা এ, বি, সি, ডির বইখানি নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে মনে কথা কয়। কখন তার চোখ ঢুলে পড়ে, কমলা তাকে কোলে টেনে সরু সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ছাদে দু' একটা পায়রা বক্‌বকম্ করে।

চারি দিক নীরব। জনহীন পথে একটা ফিরিওয়ালার ডাক করুণ সুরের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা চিল ছাদ দিয়ে উড়ে যায়। নীচে চাকরেরা ও ওপরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, একটা মাছি ভন্‌ভন্ করে ঘোরে।

লাখীকে শুইয়ে দিয়ে কমলার আর সেলাই করতে ভাল লাগে না। আলমারীটা যেন টানে, যাদুমন্ত্রে ভুলোয়। আলমারী খুলে সে সাজানো কাপড়গুলি আবার সাজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু আলমারী সাজানো আসল ব্যাপার নয়,—আলমারীর ওপরের তাকের পেছনে নীল সিল্কের রুমাল মোড়া দুটি ছোট্ট জামা বাহির করে,—সে দু'টির দিকে চেয়ে মেজেতে বসে পড়ে,—তার মন কোন্ অজানা দেশে উড়ে যায়—এই সময়টা তার দিন-রাতের সুখ-দুঃখের কর্ম্মের বাহিরে। জামা দু'টি তার প্রথমা কন্থার,—এক বছর হতে না হতে নিউমোনিয়াতে সে মারা গেছল;—সে কতদিন,—পনেরো ষোল্ বছর হবে। সেই প্রথম-জাতাকে হারানোর সুপ্তলোক অপরাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে মনের অতল থেকে জেগে ওঠে,—এখন সে লোকের দুঃখজ্বালা নেই,—বেদনা গভীর নয়,—রহস্যময়,—মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যায়। কমলা ভাবে, সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, পাড়ার নীলিমার মত হয় ত সুন্দরী হত, হয় ত তার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত,—ফুটফুটে খোকার মা হত, হয় ত সে—। কিন্তু তাকে বড় করে ভাবতে যেন সে পারে না,—সেই এক-বছরের ননীর পুতুলটিই চোখে ভেসে ওঠে,—চোখ ছলছল করে।

জামা দুটি ভাল করে পাট করে তুলে রেখে আলমারী বন্ধ করে মেজেতে আঁচল পেতে সে বসে। এই অলস মধুর অপরাহ্নটুকু তার স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নবোনার, মন নিয়ে খেলা করার সময়—কত কথা কত সাধ মনে হয়—ঘুমন্ত লাখীর দিকে চাঁপুর দিকে চেয়ে—সাদা মার্কেলের ওপর কালো চুল এলিয়ে সবুজ পাড় ছড়িয়ে শোয়, কখন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার ঘড়িটা টিক্‌টিক করে,—সময় কেটে যায়,—বাড়ী নীরব,—যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্থার স্বপ্নপুরী।

ঝনঝন শব্দে কড়ার শব্দ হয়, সদর দরজা নড়ে ওঠে। মধু ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দুড়দাড় করে ছুটে, দালান পেরিয়ে, সিঁড়িতে খট্‌মট শব্দ করতে করতে মণা স্কুল থেকে আসে,—সমস্ত বাড়ী জেগে ওঠে। কমলার ঘুম ভেঙে যায়, চাঁপু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে,—ঘুম থেকে জেগে একটু কাঁদা তার স্বভাব। বইয়ের ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মণা তাকে ভুলোতে বসে। চাঁপু চুপ করলে মণা লাখীর চুল ধরে টানে। কমলা বকে উঠলে, মণা পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের করে বলে, 'তোমার জন্যে এনেছি মা।' কমলার আর বকুনি দেওয়া হয় না। শুধু বলে, 'জুতো খোল, সার্ট ছেড়ে হাত মুখ ধুতে যা' ভূত কোথাকার।'

'মা বড্ড ক্ষিদে।'

'হাত মুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুগে, পথের যত ময়লা গায়।'

একটু পরেই মেয়েরাও স্কুল থেকে এসে পড়ে। কাপড় জামা না ছেড়েই রাণু চাঁপুকে আদর করতে বসে,—স্কুল থেকে একটি ফুল এনেছে, সেটি তার হাতে দেয়।

কমলার সংসারের কাজ আবার আরম্ভ হয়। ছেলে-মেয়েদের কাপড়-ছাড়া, হাত মুখ-ধোওয়া তদারক করতে হয়। তার পর সবাইকে জলখাবার দিয়ে চাঁপু ও লাখীকে দুধ খাওয়াতে বসে।

বেলা গড়িয়ে যায়, রান্নাঘরে আগুন পড়ে, বাড়ী

ধোঁওয়াতে ভরে ওঠে। কমলা ঝিকে বকে, 'এত দেরীতে আগুন দিস্, এখন যদি বাবু এসে পড়েন।' স্বামী আসার আগে চুলবেঁধে গা ধুয়ে নিতে হয়। শাশুড়ী ঠাকরুণ বলেন, 'এসো বৌমা, চুলটা বেঁধে দি।' 'নিজেই বেঁধে নিচ্ছি মা।' আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসে। চাঁপু এসে আয়নায় উঁকি মারে, আপন মনে হাসে, মাথার ফিতেটা টানে—চুল বাঁধতে দেরী হয়ে যায়।

'বড় জ্বালাতন করিস্ চাঁপি'। চাঁপুর কিন্তু বকুনিকে গ্রাহ্য নেই, নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে সে ব্যস্ত, চিরন্তনী নারী!

কোন দিন শাশুড়ী ছাড়েন না,—চুল বাঁধতে বসেন। চুল বাঁধা হলে সীমন্তে সিন্দূররেখা টেনে বলেন, 'জন্ম এয়োস্ত্রী থাকো, আশীর্ব্বাদ করি।' মুখ রাঙা করে শাশুড়ীর পায়ের ধূলো সীমন্তে মুছে কমলা গা ধুতে যায়, বুক দুরদুর করে।

স্বামী আসার আগেই কমলা ফলের রেকাব, জলখাবারের রেকাব সাজিয়ে ধোওয়া কাপড় গুছিয়ে ঘরে বসে থাকে,—টুকটাক কাজ করে, যেন প্রতীক্ষা করছে না, কাজ করছে।

ঘরে ঢুকেই খাবারের রেকাব দেখে স্বামী খুসি হন, কমলার সদ্য সাবান-ধোওয়া গালে আদর করে বলেন, 'সাঙ্গ হয়েছে রণ! তুমি এস এস নারি, আন তব হেমঝারি!'

'যাও! হ্যাঁগা, এ প্যাকেটটাতে কি?'

'তোমার জন্যে নতুন শাড়ী।'

'হ্যাঁ! খালি ঠাট্টা! খোকার বিস্কুট এনেছ?'

'ওই ভুল হয়ে গেল।'

'দশটা টাকা দিতে হবে আজ।'

'কাউকে দিতে হবে বুঝি!'

'না, আমার হাতে কিছু টাকা নেই।'

'দেখ, কি সময় পড়েছে, এ টানাটানির বাজার, কিছু টেনে খরচ করতে হয়।'

এই রকম সাংসারিক প্রেমালাপ কিছুক্ষণ চলে। বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সাজগোজ ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে স্বামী যান বেড়াতে অর্থাৎ মিত্তিরদের বাড়ীর তাসের আড্ডায় অথবা ইউনিয়ান ক্লাবে।

'ওগো, আজ সকাল সকাল এসো।'

'হ্যাঁ, বেশী রাত হবে না।'

কিন্তু সাড়ে ন'টা দশটার আগে আর বাড়ী ফেরা হয় না।

তার পর ভাঁড়ার-ঘরে রান্না ঘরে কাজের অবধি থাকে না। ঠাকুরকে সব রান্নার জিনিষ দিতে, রান্না বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়ে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে। তার পর তার আর কাজের বেগে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না—দুধ জ্বাল, রুটি লুচি বেলা, কত কাজ! কাজের মাঝে মন উস্‌খুস্ করে, রাণু, লাখী ও চাঁপুকে নিয়ে মধু পাড়ার পার্কে কখন বেড়াতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন, মণাও এখনও হকি খেলে আসে নি, শোভাটা পাড়ার কোন্ বাড়ীর ছাদে আড্ডা দিচ্ছে। হাতের লেচিগুলো কমলা তাড়াতাড়ি পাকায়।

কলরব করতে করতে ছেলেমেয়ের দল বাড়ীতে ঢোকে, সব মুখ রাঙা, ঘর্ম্মাক্ত। নানা অভিনয়, অভিযোগ, আবদারে রান্নাঘরের সামনে দালানটা মুখর হয়ে ওঠে। কমলার সে সব শোনার অবসর থাকে না, সে রুটি ব্যালে। ঠাকুমা সিঁড়ির ওপর মালা জপতে জপতে মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, 'ওরে গোলমাল করিস না।' মধু লাখীকে টানতে টানতে এসে বলে, 'মা, লাখুর ঘুম পেয়েছে।'

'দু'খানা গরম লুচি খাইয়ে দেনা বাবা।'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাখী বলে, 'আমাল পটল ভাজা কৈ?'

খেতে বসে কিন্তু লাখীর সব ঘুম চলে যায়, সে আর রান্না-ঘর ছেড়ে উঠতে চায় না। দাদা-দিদিরা যখন মাষ্টার মশাইএর কাছে পড়াশোনা সেরে দালানে খেতে বসে, তখন তার মুখ চলছে। সবার খাওয়া শেষ না হলে সে উঠতে চায় না। খাওয়া শেষে শোভা নিজে মুখ ধুয়ে লাখীর হাতমুখ ধুইয়ে দেয়, বলে, 'চ, শুতে।'

দলবেঁধে হল্লা করে সবাই শুতে যায়; চাঁপুর দুধের বাটি নিয়ে কমলা ওপরে আসে,—সবাই কোথায় কি রকম শুল তদারক করে। চারটে বালিশ চার ধারে ঠিক আছে কি না তা দেখে লাখী নিশ্চিন্ত মনে শোয়। মণা স্কুলের গল্প করে; রাণু বলে ওঠে, 'বেশী বক্‌বক্ করিস নে, ঘুমোতে

দে।' হঠাৎ লাখী উঠে বসে, বলে, 'বিছানা বড় ঠাণ্ডা।' অয়েল-ক্লথের ওপর কাঁথা দিয়ে সে শোবে না, সে কি চাঁপুর মত ছোট।

মণা অমি বলে ওঠে, 'কিন্তু রাত্তিরে বিছানা ভেজাতে'—

রাণু বলে,—'তুমিও ত বাপু সেদিন'—

'যাঃ! সে বুঝি আমি'—কথাটা তোলা যে ভুল হয়েছে, তা মণা বুঝতে পেরে চুপ করে।

চাঁপু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম ভরে আসে, ঘরের আলো নিভে যায়, দালানের আলোটা মিটমিট জ্বলে, আবার বাড়ী নিঝুম নিদ্রিত হয়।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কমলা সিঁড়ির পাশে দালানের কোণে একটা সেলাই বা একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বসে। আজ সন্ধ্যেতে অজিত, কি নির্ম্মল, কি সারদা, কেউ আসে নি সেই কথা মনে পড়ে। এরা হচ্ছে পাড়ার ছেলে, তাকে দিদি বলে ডাকে। সন্ধ্যেবেলায় দালানে প্রায়ই তাদের বৈঠক বসে। কেউ ফাষ্ট ইয়ার, কেউ থার্ড ইয়ারে পড়ে। কচি বয়স, তরুণ মন। সবাই এসে দিদির কাছে কত সংবাদ দেয়, কত অভিযোগ কত আবদার জানায়—সঙ্গে সঙ্গে চা, খাবার, মাঝে মাঝে মাছের কচুরি বেগুনি লাভ হয়। কি তর্ক করতে পারে ছেলেগুলো! এখন দেশের কাজে বড় ব্যস্ত।

বাংলা মাসিকের একটা গল্প কমলা পড়তে আরম্ভ করে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এই রকম প্রটের একটা গল্প। কি করে স্বামীকে সংসারকে ছেড়ে মেয়েমানুষ চলে যেতে পারে, কমলা তা কল্পনা করতে পারে না। সেই দুঃখিনী হতভাগিনীর জন্যে তার চোখে জল আসে, গল্প পড়তে ভাল লাগে না, পত্রিকা মুড়ে রাখে। সিঁড়িতে মস্‌মস্ জুতোর শব্দ হয়, কমলা চমকে ওঠে, তার চোখের তন্দ্রা চলে যায়, স্বামী আসছেন।

স্বামীকে খাইয়ে নিজে যখন খেতে বসে রাত এগারোটা বেজে যায়। তার পর ঝি চাকর খেলে রান্নাঘর ধোওয়া হয়। সদর দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে, ভাঁড়ার-ঘরে কুলুপ দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে কমলা যখন ওপরে ওঠে, দেখে, স্বামী দিব্যি খাটে শুয়ে, নাসিকা-গর্জ্জন হচ্ছে।

দালানে একটু চুপ করে বসে, আকাশে তারাগুলো ঝিলমিল করে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে মৃদু বাতাস বয়। সুখনিদ্রা-শান্ত শিশুগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, "প্রভু, এদের তুমি সুখে শান্তিতে রেখো।'

'ওগো শুতে এসো, রাত যে একটা হবে।' বলে স্বামী পাশ ফেরেন।

ধীরে ঘরে ঢুকে কমলা চাঁপুর পাশে শুয়ে নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

এম্নি করে মায়ের দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন যে কি অঘটন ঘটল কমলা তা নিজেই প্রথমে বুঝতে পারে নি। মেথরের দল মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী হাঁকিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে। মধু নিজেই উঠে সিঁড়ির বারান্দা ধুয়েছে। বাইরে রোদ উঠে গেছে, কমলার তখনও ঘুম ভাঙে নি। যখন সে জাগল, লজ্জিত ভাবে দেখল, স্বামী উঠে খাটে বসে,—ছেলেমেয়েরাও জেগেছে, তবে মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে গোলমাল করছে না,—ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে।

স্বামী বল্লেন, 'কি গো, এত দেরী আজ, শরীরটা খারাপ?'

'কেন, একদিন দেরী হতে পারে না! আমি কি কল না কি যে রোজ এক সময়ে উঠতেই হবে, না আমি কলের কুলি যে ভোরের ভোঁ বাজলেই কাজে ছুটতে হবে!'

'না, তা বলছি না।'

কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কমলা নীচে নেমে গেল। মায়ের মেজাজ আজ সুবিধের নয় দেখে ছেলেমেয়েরা সেদিন হল্লা বা বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করতে সাহস করলে না।

সারা সকাল কোন কাজে কমলার মন লাগল না,—দেহ শ্রান্ত, মনটা কেমন ভার,—গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

দেরীতে উঠে সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল সেদিন; দশটা প্রায় বাজে, সব রান্না হল না, ছেলেমেয়েরা শুধু ডাল ভাত ও ভাজা খেয়ে স্কুলে গেল; কমলা আপন মনে বলে উঠল, 'আমি কি মাইনে-করা চাকরাণী, আমার যেমন

খুসি আমি কাজ করবো।' স্বামী স্নান করে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, 'ঠাকুর, যা হয়েছে দাও।'

সেদিন কমলা বিশেষ কিছু খেলে না, খেতে অরুচি। মধু ও বামুনঠাকুর খাওয়াতে কত পীড়াপীড়ি করলে, তাদেরও ভাল করে খাওয়া হল না। শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন, 'আজ শরীরটা ভাল নেই বৌমা, শুয়ে থাকগে।' কমলা মনে মনে বল্লে, 'হ্যাঁ, শুয়ে থাকবো, সংসারের কাজ কে করবে।'

অপরাহ্ণে সে নিজের ঘরে এলিয়ে শুয়ে পড়ল, কোন সেলাই বা বই হাতে নিলে না। লাখী একটা আবদার করতে গিয়ে থাপ্পড়া খেয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল।

কমলার মন বড় চঞ্চল মনে হল; তার সেই প্রথম-জাতা কন্যার কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো। তার ছোট জামা ছুটি বাহির করে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। কেন যে কাঁদছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না, কোন অজানা বেদনা শান্ত হল। কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্কা হয়ে আসতে লাগলো, বিদ্যুতের ঝিলকির মত তার মন চমকে উঠল, ততক্ষণে সে বুঝতে পারল তার কি হয়েছে আজ; মুখ প্রথমে গম্ভীর হল, তার পর রহস্যময় মধুর সুন্দর হয়ে উঠল।

সারা দিনের কাজ সেরে রাতে যখন কমলা শুতে গেল, সে শোবার ঘরে ঢুকল না, সামনের বারান্দায় লালপাড়-ওয়ালা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল,—তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল, একটা তারা খসে পড়ল।

স্বামী কখন পাশে এসে বসেছেন জানতেই পারে নি। স্বামী তার মাথায় হাত বুলাতে সে স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, স্নিগ্ধ স্বরে বল্লে—'ওগো।'

—'কি!'

স্বামীর মুখ তার মুখের ওপর নত হয়ে পড়তে সে স্বামীর কাণে কাণে কি কথা কয়ে রহস্যময় হেসে উঠল, তারা-ভরা আকাশ ঝিকমিক করতে লাগলো।

স্বামী হেসে বল্লেন—'এই ব্যাপার, আবার আর একটি।' যেন কমলাই একমাত্র দায়ী!

অধরে আদর করে বল্লেন, 'তা বেশ, কাল দিদিকে চিঠি লিখে দেব।'

'না গো না, অত তাড়াতাড়ি নেই, এখনও অত অকর্ম্মণ্য হই নি।'

স্বামী তার তাম্বুল-রঞ্জিত আবেগ কম্পিত ওষ্ঠে চুম্বন করলেন।

প্রথম রাতে কমলার চোখে ঘুম হল না। একবার ছাদে ঘুরে এল, দালানে-ঝোলানো বিদ্যাসাগর, গান্ধী, চিত্তরঞ্জনের বাঁধানো ফটোগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রণাম করলে। অমন কোন মহাপুরুষ তার গর্ভে জন্মাবে, অত পুণ্যবতী নয় সে,—তবু গর্ভবতী মাতার মানস-স্বপ্ন কে বলতে পারে!

তারাগুলির দিকে চেয়ে কত কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কমলা ঘুমিয়ে পড়ল।

অশ্রু-তর্পণ

শ্রীমানকুমারী বসু

১

সে গিয়েছে চলে—
রাগ করে গেছে চলে,
ভেসে গেছে আঁখিজলে,
কে করিল অপরাধ গেল না তো ব'লে,
কার অনাদরে মেয়ে,
বুকে শেলাঘাত পেয়ে,
নিয়ে গেল অভিমান মরমের তলে,
কেন কেঁদে গেল বাছা গেল না তো ব'লে।

২

আপনারে ঢেলে দিয়া,
সে ছিল পরার্থ নিয়া,
সে ফুল ফুটিতেছিল পরের কল্যাণে,

সে কি আত্ম-বিসর্জ্জন
সে যে কি উদার মন,
সে জানিত আর তার বিধাতাই জানে!

৩

সে ছিল ব্যথার ব্যথী,
সে ছিল খেলার সাথী,
প্রাণের দোসর ছিল মরমের বল,
সে যে ছিল অপরূপ,
সর্ব্বার্থ-সাধিকা রূপ,
অমলিন অনাঘ্রাত সোণার কমল !

৪

মা' বাবা কি দাদা দিদি,
সবারি বুকের নিধি,
সে যে বড় আদরিণী স্বরগ-বালিকা,
সতত পবিত্র শুচি,
দেবকাজে সদা রুচি,
নিষ্পাপ নির্ম্মল সে যে হোমানল-শিখা !

৫

কখন হারানু তারে,
বুঝিতে নারিনু হা রে !—
শুয়েছিল মা'র কোলে দেখি শেষে নাই,
রবি ডোবে ধীরে ধীরে,
পশ্চিম নীরধি নীরে
আকুলা অবনী মুখে মাখা যেন ছাই !

শেষে খুঁজি পাতি পাতি,
সিত তৃতীয়ার রাতি,
কোথা না পাইনু তারে—এ কি লুকাচুরি,
এত পাহারার মাঝে,
কে জানে কেমন সাজে,
কৌশলী নিঠুর চোর করি গেল চুরি !

সেই থেকে বাড়ীঘর,
মরু—মহা মরুন্তর,
সব ক'টি প্রাণ যেন পড়েছে মুরছি,
যেন গো আশার শেষ,
নিভেছে আরাম লেশ,
মহা শূন্যতায় যেন সব গেছে মুছি !

৮

তার সে রসাল বনে
কাঁদে পাখী কলস্বনে,
সরসী-সলিল শোকে উঠে উছলিয়া,
ওরে শান্তিসুধা ধন !
তোর "শান্তি নিকেতন"
দেখ্ এসে কি হয়েছে তোরে হারাইয়া !

৯

সেই শত উচ্চ আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
ওরে লক্ষ্মী সরস্বতী !—এ কি অবহেলা,
জনমের আহরণ,—
আজীবন প্রয়োজন,
পলকে ফেলিয়া গেলি ভেঙে দিলি খেলা !

১০

কুমারী তাপসী তুই,
ত্রিদিবের শুভ্র যুঁই,
চিনিতে পারি নি মোরা তাই গেলি চলে ?—
ওরে শানু প্রাণধন !
শান্তিহারা এ জীবন
কত দিন র'ব আর শুষ্ক ধরাতলে ?

মাতৃহারা
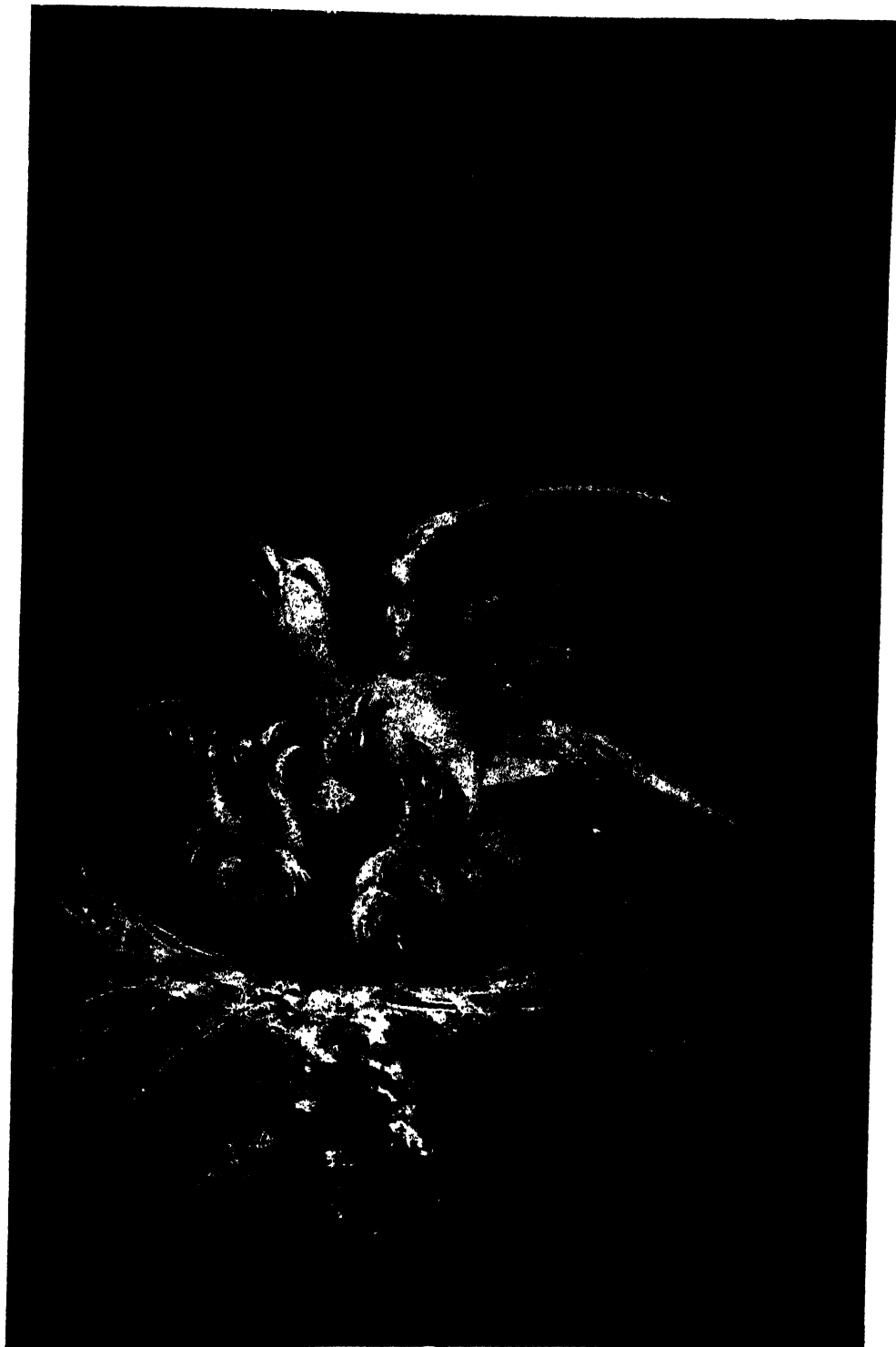
শিল্পী— শ্রীযুক্ত হরিদাস গাঙ্গুলী

খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ

স্বাস্থ্য-সঞ্চয় ও দেশভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া গত পূজাবকাশে যখন শিলং যাই, তখন একবার কল্পনাতেও আসে নাই যে সেখানে বাংলার প্রাণের ঠাকুর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তগণের সেবা কার্য্যের এমন একটী বিরাট ও সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র দর্শনের সৌভাগ্য আমার ঘটিবে। কি করিয়া সে সুযোগ ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথা বলিব।

গৌহাটী হইয়া মোটর-যোগে শিলং যাইতে হয়। পাণ্ডুঘাটে পৌঁছিলেই ৺কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডাগণ বিরাট নাম ধাম-সম্বলিত খাতা হস্তে দর্শন দিলেন; এবং শিলং-পথে মাকে না দেখিয়া গেলে যে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, তাহাও সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। পাণ্ডা-ঠাকুরগণের ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে হইবে; তাঁহাদের সেই বিরাট খাতাগুলিতে আসমুদ্র-হিমাচলবাসীর নাম পাইবেন। আমি ইতঃপূর্ব্বে একবার দেবী দর্শন করিয়াছি এবং পাণ্ডামহাশয়কেও ভুলি নাই; কাজেই আমার অদৃষ্টে জেরা বেশী ভোগ করিতে হয় নাই; কিন্তু পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়কে এবং বন্ধুবর হরিকিঙ্কর বাবুকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয় ও হরিকিঙ্কর বাবু প্রথম শ্রেণীর উকীল—জেরায় তাঁহারা ভয় পান না; কিন্তু কলিকাতা হইতে পূর্ব্বদিন বেলা ৪টায় গাড়ীতে উঠিয়াছেন,—সমস্ত রাত্রি ও দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অভুক্ত ও অস্নাত আছেন; তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, পাণ্ডা সমভিব্যাহারে নীল শৈলের উপর কামাখ্যা- দেবীর মন্দির দর্শন করা গেল। কথিত আছে যে, এই মন্দির বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং কামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মন্দিরটী কুচবিহারাধিপতি কর্ত্তৃক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত। এই মন্দিরটীও ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। কুচবিহারাধিপতি যে সকল সদ্‌ব্রাহ্মণকে এই স্থলে আনয়ন করেন, বর্ত্তমান পাণ্ডাঠাকুরগণ তাঁহাদেরই বংশধর। প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর সময়ে এখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় এবং পাণ্ডা-ঠাকুরেরা যথেষ্ট পাইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখযোগ্য যে, এখানকার পাণ্ডারা অতি বিনয়ী এবং তীর্থযাত্রীর সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহার করেন। যজমানকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া থাকেন এবং অর্থের জন্য জুলুম করেন না। আমরা সঙ্গীগণ সহ অবেলায় স্নানাহার একটু গুরুতর রকমে সমাধা করিয়া রাত্রিতে
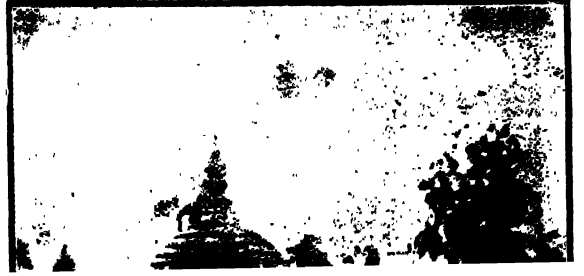
কামাখ্যার মন্দির—গৌহাটী

পাণ্ডা মহাশয়ের গৃহে সুখে কাটাইলাম এবং পরদিন ভোরে গৌহাটী হইতে যাত্রা করিয়া মোটর-যোগে শিলংএ বেলা দুইটায় পৌছিলাম। গৌহাটী হইতে শিলংএর রাস্তাটী নির্ম্মাণ করিতে ইঞ্জিনিয়ারদের বহু শ্রম করিতে হইয়াছিল। রাস্তাটীকে মেরামত করিতেও বহু অর্থ-ব্যয় করিতে হয়! রাস্তাটী দেখিবার মত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শিলং গিরি-নগরীর পত্তন হয়। তৎপূর্ব্বে চেরাপুঞ্জীই খাসিয়া পাহাড়ের প্রধান সহর ও কেন্দ্রস্থল ছিল। শিলং-যাত্রী মাত্রেই চেরাপুঞ্জীতে অন্ততঃ একবেলার জন্যও যান। * চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে গড়ে ৪২৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জীতে।—'

শিলংএ বহু দর্শনীয় স্থান আছে তন্মধ্যে পোলো-গ্রাউণ্ড (Polo-ground.) ওয়ার্ড লেক (Ward lake), বিশপ-প্রপাত (Bishops Fall) ও লাটসাহেবের বাড়ী দেখিবার মত। শিলংএর বড়বাজার পুলিশ বাজারে প্রয়োজনীয় বহু জিনিস পাওয়া যায়; তন্মধ্যে আগন্তুকেরা শিলং মাখন ও কমলা মধু (Shillong Butter ও Orange Honey) সংগ্রহ করিতে ভুলেন না। মৌখারের বাজারে নিত্য ব্যবহার্য্য সব জিনিস পাওয়া যায়; এখানকার সজীওয়ালীরা সবই খাসিয়া রমণী। ইহারা যেমন পরিশ্রমী, পুরুষেরা তেমনি বিলাসী ও অলস।

শিলং কুষ্ঠাশ্রম

চেরাপুঞ্জী বাজারে খাসিয়া শব্জিওয়ালী

শিলং সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার মুন্সি-প্যালিটী দুইটী—একটী সিভিল, অপরটী মিলিটারী। সহরে পাকা রাস্তার পরিমাণ ৮৮ মাইল। মুন্সিপ্যালিটীতে বিদ্যুতালোক সরবরাহ করেন Hydro-Electric Company। শিলং সহর বিদ্যুতালোকে অতি রমণীয় দেখায়। মুন্সিপ্যালিটী বহু অর্থব্যয়ে একটী কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শিলংএ বহু দর্শনীয় স্থান আছে। উহার বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেখক বেশীর ভাগ সময়

* চেরাপুঞ্জী পথে Elephant falls দেখিবার মত।

সমাজ-সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকলাপ দেখিয়াই অতিবাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে খাসিয়া পাহাড়ে খৃষ্টান-মিশন, ব্রাহ্ম-সমাজ ও রামকৃষ্ণ-মিশনের সমাজ-সেবার দিকই দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে।

সমাজ-সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যের কথা বলিবার পূর্ব্বে খাসিয়াদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের কথার আলোচনা করা সমীচীন হইবে।

ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, খাসিয়া জাতি মঙ্গোলীয় মহাজাতির মন-আনাম শাখার একটী প্রশাখা। কোন কোন শিক্ষিত খাসিয়া ভদ্রলোকের বিশ্বাস, তাঁহারা আর্য্য-

বিডন জল-প্রপাত

জাতির বংশধর। খস জাতির উল্লেখ মহাভারতে আছে। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান যে, ইহাই মহাভারতের নারীরাজ্য—(A State having Matriarchate system of Government)

অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় খাসিয়াদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কুষ্মাণ্ড, কর্কট, বানর অথবা কোন প্রকারের লেবু অথবা মৎস্য ছিল। খাসিয়ারা খুব মাংসপ্রিয় এবং তাহাদের মধ্যে পানদোষ প্রবল। খাসিয়া ও সিনটেং জাতির ভিতর একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা নাই। প্রকৃত পক্ষে এ দেশে মেয়েরাই বিবাহ করে; কারণ, বর পিতামাতার গৃহ ত্যাগ করিয়া নব-পরিণীতা স্ত্রীর গৃহে থাকে। মৃত ব্যক্তির শব দাহ করার প্রথা তাহাদের মধ্যে আছে। খাসিয়ারা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই। অপদেবতার পূজাতে খাসিয়াদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্য করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এই ছোট দুইটী জেলাতে প্রায় ১৫ জন রাজা ও ১২ জন সর্দ্দার আছে। সকলগুলিই বৃটিশ সরকারের মিত্র-রাজ্যের মত।

দূর হইতে শিলংএর দৃশ্য

খাসিয়া ও সিনটেং জাতির সহিত নানাজাতির সংমিশ্রণ হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে বহু অনৈসর্গিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; এবং তাহার ফলে এই সবল ও কর্ম্মঠ জাতি ধীরে ধীরে মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে প্রায় ৪০,০০০ স্ত্রী-পুরুষ খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে We'sh Mission খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য করিতেছেন। ১৮১৩ খৃঃ প্রথমে খৃষ্টান মিশনরীরা এখানে প্রচারের জন্য আসেন। তার পর এক

শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। Welsh Mission খাসিয়া জেলাকে ১০টী Missionary districtএ ভাগ করিয়াছেন এবং খাসিয়াদের মধ্য হইতে ১০০০ পাদ্রী তৈরী করিয়াছেন। অধিকাংশ গ্রামেই স্কুল ও গীর্জ্জাঘর একসঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষার একচেটিয়া দখল পাওয়ায় মিশনারীরা খৃষ্টীয় গল্প-বহুল বহু পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন।

খৃষ্টীয়ান মিশন খাসিয়াদের বহু হিত সাধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে বিলাসিতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই জাতির আর্থিক অভাব দিন দিন বাড়িতেছে; এবং তাহাদিগকে নৈতিক বলহীন করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে খাসিয়ারা "পচই" জাতীয় মদ খাইত। খৃষ্টীয়ান মিশনারীদের দেখাদেখি তাহারা এখন উগ্র সুরা চুয়াইতে শিখিয়াছে। খাসিয়ারা কোন প্রকার ঔষধ পূর্ব্বে ব্যবহার করিত না - এখন পেটেণ্ট ঔষধের ছড়াছড়ি। বিলাসিতা ও জামা- কাপড়ের বাহুল্য ও জাঁকজমক অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে Welsh Mission এখানে আসিলেও তাহার পূর্ব্বেও ৩০ ত্রিশ বৎসর অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায় এখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক শত বর্ষাধিককাল সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন আদর্শাবলম্বী মিশনারীগণ এই জাতিকে কোন কার্য্যকরী শিক্ষা না দিয়া ইহাদিগকে অর্থ সম্পদে দুর্ব্বলই করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম-সমাজ এখানে আসিয়াছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মসমই ও সেলা নামক দুইটী স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পবিত্র জীবনের আদর্শে অনেক খাসিয়া ব্রাহ্ম হন এবং বহু খাসিয়া বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজ খাসিয়াদের মধ্যে মদ্যপানের প্রতি অনাসক্তি, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান করিবার ইচ্ছা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টান মিশনারীরা খাসিয়াদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার বিরোধী। নানা প্রকার কথবা প্রচারের ফলে খাসিয়ারা হিন্দুজাতিকে ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত

খাসিয়া পাহাড়

বিশপ জল-প্রপাত

হইয়াছে। তাহাদের ধারণা হিন্দুরা পৌত্তলিক; এবং জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হিন্দুসমাজে খুবই প্রবল। ব্রাহ্ম-সমাজ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহারের প্রতি খাসিয়াদের মনে প্রীতি ও অনুরাগের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মন্মথ দাশ মহাশয় শিলংএ একটী অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়া বহু খাসিয়া বালকের যথার্থ হিতসাধন করিতেছেন। নীলমণি বাবু চলিয়া আসার পর মফঃস্বলে প্রচার ও সেবাকার্য্যও বিশেষ কমিয়া গিয়াছে।

হিন্দুসমাজ সম্প্রতি খাসিয়া পাহাড়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। খাসিয়াদের মধ্যে হিন্দুসমাজের কার্য্য করিবার এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ১৩০৪ সালে বৈষ্ণব গোসাইরা সেলা অঞ্চলে প্রচার-কার্য্যে গিয়াছিলেন; তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু-সম্মিলনী ও রামকৃষ্ণ-আশ্রম খাসিয়া জাতির উন্নয়নে অবহিত হইয়াছেন।

খাসিয়াদের মধ্যে বহু হিন্দু ক্রিয়া কলাপ আচরিত হয় এবং তাহাদের পৌরাণিক কাহিনী-গুলিও হিন্দুদের অনেকটা অনুরূপ। কিন্তু খাসিয়াদের সহিত মেলামেশা না থাকায় হিন্দু-সমাজের অনেকের ধারণা যে খাসিয়ারা অসভ্য, শৌচাচারবিহীন ইত্যাদি। অনেক খাসিয়া সিলেট প্রভৃতি সহরে যাইয়া হিন্দু হোটেলে স্থান না পাইয়া মুসলমান হোটেলে খাইতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি খাসিয়াদের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। খাসিয়া ভাষায় দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা চালাইবার যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শতকরা ২৫টী সিলেটী বাংলা শব্দ বা তাহার অপভ্রংশ। হিন্দুসমাজ ও বাঙ্গালী সাধারণকে এই জাতির ইতিহাস জানিয়া ও ইহাদের সহিত মিশিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

হিন্দু-মিশন ও রামকৃষ্ণ-মিশন এই দুইটী পাহাড়ে সম্প্রতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; অর্থাভাবে ও বহু প্রতিবন্ধকতার জন্য তাঁহাদের কার্য্য আশানুরূপ বাড়িতেছে না।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু-মিশনের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর গোস্বামী খাসিয়াদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য ও শুদ্ধি-কার্য্য

সেলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

হিন্দু-সম্মিলনী পরিচালিত শিলং অনাথ-আশ্রম

চালাইতেছেন। প্রায় সহস্রাধিক খাসিয়া ইতিমধ্যেই হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার অধিবাসিগণের অর্থানুকুল্যে (১)

চেরাপুঞ্জী, (২) মহাদেব, (৩) সাবর পল্লী (৪) ওমিও এবং নংস্কেন গ্রামে বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বঙ্গভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্মিলনীর উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া খাসিয়াদের মধ্যে নূতন ভাব ও জাতীয়তা প্রচার করা। অনেক স্থান হইতে স্কুল খুলিবার আবেদন আসিতেছে ; কিন্তু কর্ম্মীর ও অর্থের অভাবে কার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

হিন্দু-সম্মিলনী-পরিচালিত হিন্দু অনাথ-আশ্রমটী শিলং-যাত্রী মাত্রেরই দর্শনীয়। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০টী
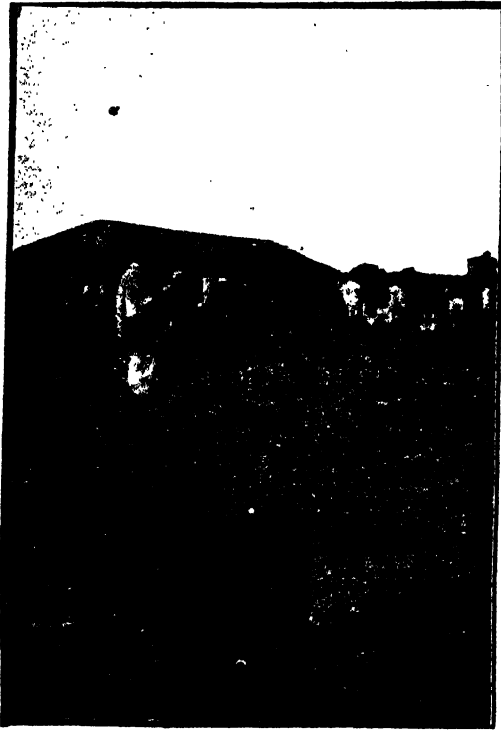
চেরাপুঞ্জিতে লেখক—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী

বালক ও বালিকা এখানে ভরণ পোষণ ও শিক্ষা পাইয়াছে। যে সকল বালক-বালিকা পিতামাতার মৃত্যুতে আশ্রয়হীন বা পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত অথবা পিতামাতার নৈতিক ও শারীরিক অনুপযুক্ততার দরুণ তাহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত, তাহারাই অনাথাশ্রমে স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমানে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত আশ্রমে চরকায় সুতাকাটাও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং একটী বালিকাকে 'শিলং উইভিং স্কুলে' ও একটী বালককে 'ফুলার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল' স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটী খাসিয়া বালিকার সহিত একজন পশ্চিমাঞ্চল প্রবাসী ক্ষত্রিয়ের বৈদিক আচারে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। একটী বালিকা বিবাহের পর পুত্র সহ স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু আচারে হিন্দু উপাসনা ও প্রার্থনা এখানে নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। সম্মিলনীর উদ্যোগে পূজার সময় সমস্ত হিন্দু খাসিয়াকে কয়েক বৎসর যাবৎ অন্যান্য বাঙ্গালীর সহিত পংক্তিভোজন করান হইতেছে এবং পূজায় অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের নেতা শ্রীযুক্ত ভাই পরমানন্দ এই প্রতিষ্ঠানটী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া লিখিয়াছেন—'I have great pleasure in recording that this is the most beneficial Hindu Institution that has been started in Shillong and every Hindu should admire the energy and spirit of sacrifice of those that are trying to make it successful.'

গত পূজার সময় এই অনাথ-আশ্রমে নবমীর সন্ধ্যায় যে স্বর্গীয় আনন্দ পাইয়াছি, তাহার আভাষ শিলংএ যাঁহারা যান তাঁহারা অনাথ-আশ্রমে উপস্থিত হইলেই আংশিক-ভাবে পাইবেন। মায়ের পূজায় এই অনাথেরা না যোগ দিলে "মিছে যত সহকার শাখা, মিছে সব মঙ্গল কলস।"

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন কর্ম্মী—স্বামী অচ্যুতানন্দ প্রথম খাসিয়াদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী লইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, রামকৃষ্ণের বাণী ও স্বামীজির সামাজিক মতবাদ এই হিন্দু-ভাবাপন্ন ও বলিষ্ঠ সরল জাতিকে যথার্থ মুক্তি দিতে পারিবে। মিশনারীদের সহিত কোন প্রকাশ্য বিরোধ না করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বামী অচ্যুতানন্দের সূচিত কার্য্য ব্রহ্মচারী মহাচৈতন্যের হস্তে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

প্রথমে শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। সেলাতে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রথমে খোলা হয়। এই স্কুলে সেলার রাজসভা বার্ষিক ৫০০৲ সাহায্য দেন এবং এখানে ৬০টী বালক-বালিকা অধ্যয়ন করে। সেলাতে আরো তিনটী স্কুল আছে। এখানে প্রতি রবিবার হরিসভা হইয়া থাকে

এবং রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভারতের অন্যান্য মনীষীদের জীবনালোচনা হইয়া থাকে। একটী বোর্ডিংএ ছাত্র ও সন্ন্যাসী শিক্ষকেরা একত্র বসবাস করিয়া তাহাদের জীবনাদর্শে ছাত্রদিগকে গড়িয়া তুলিতেছেন। বয়স্কদের জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয়ও চলিতেছে। এখানে শিক্ষা-প্রাপ্ত কয়েকটী ছাত্র কলিকাতায় পড়িতেছে এবং বালিকারা নিবেদিতা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ের Deputy Commisioner এই শিক্ষা-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

১৯২৫-৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কেন্দ্রীয় মিশন বিশেষ ভাবে এই কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। সেলাতে এখন দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ গড়ে ৩০টী লোক পাহাড় ভাঙ্গিয়া গ্রামান্তর হইতে এখানে ঔষধ লইতে আসে—ইহা আমি দেখিয়াছি। পাঠাগার ও ধর্ম্মসভার সাহায্যে সেলা ও মৌলাং কেন্দ্রে শিক্ষাকার্য্যের আশাতিরিক্ত প্রসার হইয়াছে। রামকৃষ্ণ সেবকগণ পরিচালিত স্কুলে বর্ত্তমানে ৪০০ বালক ও বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মচারী মহাচৈতন্য এই কার্য্যের পরিচালনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। শিলং সহরে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। এই মহাপ্রাণ কর্ম্মীকে আমি কঠোর কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া দারুণ শীতেও লোক-সেবাতে সমাহিত দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি যে, হিন্দু জাতির মধ্যে কর্ম্মীর অভাব নাই। স্বামীজি লেখক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রচার কার্য্যের ও প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও রামকৃষ্ণলীলামৃত আলোক-চিত্রের সাহায্যে খাসিয়াদের মধ্যে প্রচারের ফলে লোক-শিক্ষা সহজ ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। গত পূজার সময়ে লেখক যখন একটী সভায় স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন বিবৃত করিতেছিলেন, তখন অসংখ্য খাসিয়া কণ্ঠে 'জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি জয়' ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে অদূর ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ সেবকেরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। চাই আরো কর্ম্মী, আরো অর্থ।

কল্পনা সখী

শ্রীসুলতা সেন

আমার অলস আঁখির পাতায় কে আনিল নব জাগরণ ?
দিল না আমায় ঘুমাতে ;
গলায় আমার দিল পরাইয়া কমনীয় ফুল-আভরণ ;
আমি—চমকিনু কার চুমাতে ?
বুলাইল স্নেহ কত না যতনে লুণ্ঠিত মোর কেশে কে ?
মুছাইয়া দিল বেদনা।
সান্ত্বনা-বাণী নিত্য বহিয়া আনে যে আমার, কে ? সে কে ?
কে হরিল মোর চেতনা ?
কার অজানিত পরশনে আজ ধুয়ে গেল মোর অবসাদ
সুদূর শোভার বক্ষে ?
বিরহও আজ হোলো রে রঙিন, জ্বালাহীন হল অপরাধ,
কে দিল এ মোহ চক্ষে ?
সে থাকে রে শ্যাম পাতায় লতায়, সে থাকে নির্জন পাহাড়ে,
সে থাকে পাখীর কাননে।
রূপসী সখির কাল চোখ দুটি বাঁধিয়া রেখেছে তাহারে ;
সে আছে শিশুর আননে।
কুলে কুলে ভরা সরসীর জলে, ফল ফুল ভরা তরুতে,
সে রহে ক্ষ্যাপার চাওয়াতে ;
তপ্ত বালুর প্রসারিত তটে সে রয় শুষ্ক মরুতে
কাল-বোশেখির হাওয়াতে।
সে থাকে আমার ছিন্ন কুটীরে বুকের আলোকে আঁধারে
তুচ্ছ নিত্য করমে ;
শুধু পেতে তারে চিত্ত আমার তাহারি দুয়ারে বাঁধা রে ;
তার—আসন রচেছি মরমে।
প্রিয় হতে প্রিয় সাথী সে আমার জীবনের বড় বিত্ত
প্রীতিময় তার সঙ্গ ;
পঙ্ক মুছিয়া পঙ্কজ দিয়ে হৃদয়ে এনেছে তীর্থ
(শুধু) তারই মায়াময় রঙ্গ।

অভাগী

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যবিনোদ

(১)

যৌবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া সহসা ইলা তাহার পিতার নিকট হইতে যে প্রাণময় ও স্নেহময় আহ্বান পাইল, সে-রূপ আহ্বান সে, জ্ঞান হইয়া অবধি, কখনই পায় নাই। সে আহ্বানে ইলার সমস্ত প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহা অসাড় ও নিস্তেজ হইয়া গেল—পিতার দারুণ রোগের সংবাদ পাইয়া।

একমাত্র কন্যা লিলিকে লইয়া ইলা বাড়ীর চাকরকে সঙ্গে লইয়া পিতৃ-সন্দর্শনে সেইদিনই কলিকাতা রওনা হইল। স্বামী ছিলেন কয়লা-খনির ম্যানেজার। অফিসের কাজের তাড়া ও মালিকের কড়া হুকুমের ঝকি ঘাড়ে চাপিয়া থাকায় মিঃ বোস্ (ইলার স্বামী) ইলার অনুগমন করিবার ফুরসৎ পাইলেন না। কিন্তু ইলার তাহাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হইল না। ইলারা বাঙালী ক্রিশ্চান্। তাহার উপর সে শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা; সুতরাং অবাধ চলা-ফেরায় সে রীতিমত ভাবেই অভ্যস্তা ছিল।

*　　*　　*　　*

যাইবার সময় ইলা যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুকে করিয়া গিয়াছিল, ফিরিবার সময় তাহার কণামাত্র অবশিষ্ট ছিল না। নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে ইলা শূন্য প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই তাহার স্নেহময় পিতা ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে গিয়া ইলা আর তাঁহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইল না।

তিনদিন কলিকাতায় থাকিয়া, পিতার সমাধিস্থান সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া ইলা ফিরিয়া আসিল।

সেদিন তাহারা যখন আসান্‌সোলে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় বারোটা। মিঃ বোস্ তখন অফিসে বাহির হইয়া গিয়াছেন। ব্যথিতা ইলা নিতান্ত অবসন্ন ভাবে তাহার পড়ার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। তাহার তখন কিছু খাওয়া দাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। মনিয়াকে ডাকিয়া লিলিকে নাওয়ানো ও খাওয়ানোর ভার দিয়া, সে ভারাক্রান্ত মনে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। এমন সময় ইলার নজর পড়িল—তাহার টেবিলের উপর একখানি নীল খামের দিকে; উপরে তাহারই নাম লেখা।

ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া ইলা খামখানি তুলিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। লিলির মিস্‌ট্রেশ্ তাহার নিকট কতকগুলি কথা জানাইবার জন্যই বোধ হয় পত্রখানি লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। মৌখিক জানাইতে হয়তো তাঁহার মনে কোনো সঙ্কোচ হইয়া থাকিবে। ইলা পড়িতে লাগিল—

মাননীয়াসু—

মিসেস্ বোস্, আশা করি, আপনার পিতৃদেব সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া আপনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার সহিত বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ হয় নাই। আর সুযোগ হইলেও তখনো পর্য্যন্ত হয় তো আমার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। আপনার ফিরিতে দুই চারিদিন বিলম্ব হইবে জানিয়াই আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; কারণ, এখানে আমার আর একদিন থাকাও শোভা পাইত না। জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আজ প্রায় কুড়ি বৎসরকাল জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বহু দ্বারে কর্ম্ম করিয়া ফিরিয়াছি; শান্তি কোথাও পাই নাই সত্য, কিন্তু মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিয়াছি। আজ সে গৌরবটুকুও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়া আমার অল্প যে কয়েকদিন কাটিয়াছিল, সে কয়েকটী দিন নিতান্ত মন্দ যায় নাই; বিশেষতঃ আপনার ব্যবহার আমাকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল। আপনাকে আমি যে দিন প্রথম দেখি, সেইদিন হইতেই যেন আপনাকে আমার বেশ লাগিয়াছিল; এবং সেই 'বেশ লাগা'টুকুই ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে একটা স্নেহের

আকর্ষণ গড়িয়া তুলিতেছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য-রূপ। তাঁহার অভিশাপ যাহার জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার সকল পথেই যে কাঁটা ছড়ানো; নহিলে, আমার এই কল্পিত সুখ-নীড়ে এত-বড় একটা হীন অপবাদ ও কলঙ্কের আঘাত আসিয়া লাগিবে কেন? বেশী কথা আমার বলিবার ইচ্ছা ছিল না; নিজের তরফের সাফাই দিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আজ সকল কথা আপনাকে না জানাইয়া যেন কোনোমতেই থাকিতে পারিতেছি না। জীবনের বোঝা এতই ভারি হইয়া উঠিয়াছে যে, সেটাকে একটু হাল্‌কা করিয়া না লইলে বোধ হয় আর তাহা বহিতে পারিব না।

আজ নিঃস্ব হইয়া পথে দাঁড়াইলেও, এই মন্দভাগিনীর জীবনে একদিন সকল সম্পদই ছিল। লক্ষপতি পিতার সর্ব্ব স্নেহের একমাত্র দুলালী হইয়াই আদরে যত্নে বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম। আমার বাবা ছিলেন অভ্র-ব্যবসায়ী। তিনি হাজারীবাগে থাকিতেন। ঠাকুরদাদার সময় হইতে আমাদের পরিবার খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; জানি না কেন! আমাদের পৈত্রিক বাস ছিল ঢাকায়। কিন্তু আমি মানুষ হইয়াছিলাম বাবার কাছে থাকিয়া—হাজারীবাগে।

আমি যখন সবেমাত্র আঠারো বৎসরের, তখন আমার বিবাহ হয়। আমার স্বামী ছিলেন হিন্দু-সন্তান। কিন্তু তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্যই ক্রিশ্চান্ হইয়াছিলেন। বিবাহের পর জীবনটা যেন এক রঙীন্ মাধুর্য্য ও সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তখন ভাবিতে পারি নাই, যে আমার স্বামী আমাতে মুগ্ধ হইয়া ক্রিশ্চান্ হন্ নাই, তিনি আমার পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারের আশায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাক্, সে সব কথা আলোচনা করিয়া এখন আর লাভ নাই।

পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া একটী কোল-ভরা ফুট্‌ফুটে মেয়েকে কোলে পাইয়া সকল ব্যথাই ভুলিয়াছিলাম। স্বামীর ভালবাসাকে কখনো অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। টাকাকড়ি, সম্পত্তি সব কিছু তাঁহার ব্যবস্থার উপরেই ছাড়িয়া দিয়া, সুখী হইতে চাহিয়াছিলাম।

শেষের দিকে স্বামী আমার সহিত বড়ই দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার যেরূপ ভালবাসা ও আদর পাইয়াছিলাম, তাহার তুলনায় শেষের দিকটা যেন ঠিক্ বিপরীত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও ইহার কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। বেদনা ও অভিমানে আমার অন্তরটা এক-একবার যেন টন্ টন্ করিয়া উঠিত। তখন বাবা ছিলেন না; পীড়িত জীবনটা জুড়াইবার মত অন্য কোনো আশ্রয়ই আমার ছিল না।

কিছুদিন পরেই জানিতে পারিলাম, আমার স্বামী একজন এ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান্ মহিলার প্রণয়ে পড়িয়াছেন। বুঝিলাম—জীবনে ভাঙন ধরিয়াছে। প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না; ইচ্ছাও হইল না। বাহিরে স্বামীর নির্য্যাতন যতই বাড়িতে লাগিল, অন্তরে বেদনার আগুন ততই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নানা অশান্তিতে জ্বলিয়া পুড়িয়াই বোধ হয় রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িলাম।

সেই রোগেই যদি জীবনের অবসান হইত, তাহা হইলে আর জীবনের পেয়ালা বোধ হয় এরূপ কাণায় কাণায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত না। কিন্তু তাহা হইবার নয়। আমার বিধিলিপি কে খণ্ডাইবে?

রোগ-শয্যা হইতে উঠিলাম বটে, কিন্তু অশান্তির মাত্রা বিন্দুমাত্র কমিল না। স্বামীর সঙ্গে এখন নিতান্ত সামান্য কারণ লইয়াই বিবাদ বাধিয়া যাইত। তিনি যেন আমাকে তাড়াইবার জন্যই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

আমাকে সেই সব নানা সূত্রের অছিলাগুলি শুনাইয়া স্বামী আমার নামে ডাইভোর্স স্যুট্ করিলেন। অশান্তির সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণে একটা উৎকট ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। আমার না কি কি একটা ভীষণ সংক্রামক দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়াছে; আমাকে লইয়া তাঁহার সংসার-জীবন চলিতে পারে না, এই সব নানা কারণ দেখাইয়া স্বামী আমার সহিত বিচ্ছেদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আদালতে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। আদালতে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে যেন লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতেছিল। লজ্জায়—ঘৃণায় আমি নিজের কাছেই নিজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা, চাল-চলন—সব কিছুর দিক দিয়া বাহিরটা পুরাদস্তুর খৃষ্টান্ হইয়া উঠিলেও, আমি যে

বাঙালীর মেয়ে। অন্তরের 'লজ্জাশীলা বঙ্গ-বধূ'কে তো তখনো গলা টিপিয়া মারিতে পারি নাই।

আদালত স্বামীর আবেদন মঞ্জুর করিলেন। প্রাণটা এক-একবার হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ডলির মুখপানে চাহিয়া সব কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কে জানিত যে স্বামীর অন্তরটা একবারে অত পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। উঃ! তিনি যেন ঠিক দস্যুর মত আমার জীবনটার উপর লুঠপাট করিয়া দিলেন। তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিলে, তাঁহাকে আর স্বামী বলিয়া উল্লেখ করা তো দূরের কথা, পরিচিত বলিতেও ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা পারি না।

ডলি আমার সঙ্গে থাকিলে, পাছে তাঁহাকে খরচ বহন করিতে হয়, এই ভয়েই বোধ হয় তিনি আমার সংক্রামক ব্যাধির অছিলা তুলিয়া আইনের সাহায্যে আমার সেই জীবন-সর্ব্বস্বকেও কোল হইতে কাড়িয়া লইলেন। পূর্ব্বে সে কথা জানিতে পারিলে, আদালতে গিয়া নির্ব্বিবাদে সকল কথা মাথা পাতিয়া লইতাম না; ডলির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম।

কিন্তু, তখন আর উপায় ছিল না। তাহার উপর আদালতের রায় দেখিয়া আমি পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমাকে ডাইভোর্স করিয়া স্বামী তাঁহার সেই প্রণয়িণীকে বিবাহ করিবার পথ পরিষ্কার করিলেন।

পূর্ব্বে নানা চক্রান্ত করিয়া পিতার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই আমার স্বামী হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সঞ্চিত অর্থের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও না কি আমার চিকিৎসাতেই প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি মাত্র কয়েক শত টাকা আমাকে দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা স্পর্শ করিতে পারিলাম না। ডলির জন্য রাখিতে বলিলাম।

আমি শূন্য প্রাণে, শূন্য হাতে, শূন্য কোলে পথে দাঁড়াইলাম। উঃ, ডলি, মা—আমার! জানি না আজও সে বাঁচিয়া আছে কি না! প্রাণকে পাষাণ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। সে যে কত ব্যথা, সে যে জীবন-ভরা কি দারুণ হাহাকার, তাহা আপনি হয়তো বুঝিতে পারিবেন—আপনি সন্তানের মা হইয়াছেন।

মায়ের কোল শূন্য করিয়া তাহার সন্তানকে কাড়িয়া লইলে আর কোনো মাতা এরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিনা জানি না। আমার বুকখানা যে মরুভূমির মত শুষ্ক ও নীরস হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয় আমি সব কিছু ছাড়িয়া আসিয়াও প্রাণে মরি নাই। প্রাণটা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনটাকে খাটো করিতে পারি নাই বলিয়া তেজের ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আর তাঁহাদের কোনো খোঁজ-খবরই লই নাই। জীবিকার অন্বেষণে কলিকাতায় চলিয়া আসি; তাহার পর হইতে এই রূপ ভাবেই দেশে দেশে ঘুরিতেছি।

কথায় কথায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বলিবার স্রোত হইতে নিজেকে ফিরাইতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন।

আমার যদি বিন্দুমাত্রও সম্বল থাকিত, আমি নিঃশেষে তাহা ব্যয় করিয়াও লিলিকে এক ছড়া হার গড়াইয়া দিতাম। কিন্তু নিরুপায়! পথের কাঙ্গাল হইয়াছি সত্য, কিন্তু এখনো হীন হইতে পারি নাই।

মিঃ বোস্‌কে আমার নমস্কার দিবেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আমি আজ রাত্রেই বোধ হয় আসানসোল্ ছাড়িয়া যাইব। ইতি

বিনীতা

শ্রীঅরুণা সেন।

ইলার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। অরুণার চিঠিখানি পড়িয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল। ইলা কোনো কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। এই বিধি-নির্য্যাতিতা অভাগীর জীবনের অনেক কাহিনীই যেন তাহার মনের মধ্যে একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা দিয়া গেল। নির্ব্বাক—নিস্পন্দ ভাবে ইলা বিছানায় পড়িয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার চোখ দুইটি বেদনার অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল।

(২)

মিঃ বোস্ আজ একটু সকালেই আফিস হইতে ফিরিলেন। ইলার পিতার মৃত্যু-সংবাদ তিনি পূর্ব্বে অফিসের ঠিকানাতেই পাইয়াছিলেন। ক্যাম্বেল

পাতালের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মৃত টি, কে, ডাটের উপদেশ-মত তাঁহার গচ্ছিত 'শীল-মোহর' করা খামখানি ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইয়াছেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পৃথক পত্রে সমস্ত কথাই লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ইলাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে মিঃ বোস্ তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাকিয়া কোনো সাড়া না পাওয়ায় তিনি বরাবর ইলার পড়ার ঘরে চলিয়া গেলেন। ইলা তখনো ঠিক সেইভাবেই অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া ছিল।

মিঃ বোস্ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আদরের সুরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ডার্লিং, মনটা বোধ হয় তোমার খুবই খারাপ কো'রছে? কিন্তু তার তো কোনো উপায় নেই। What cannot be cured must be endured. মনকে শক্ত কো'রবার চেষ্টা কর।"

ইলা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কেবলমাত্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; কোনো কথা বলিল না।

মিঃ বোস্ পুনরায় ইলার গায়ের উপর একখানি হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন—"মন খারাপ ক'রে কোনো লাভ নেই ডার্লিং! যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে। এই দেখ, তোমার বাবা হাসপাতালের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে যে সব কাগজ ও চিঠিপত্র রেখে গেছলেন, সেগুলো তিনি সব পাঠিয়েছেন।"

খাম ও চিঠিখানি হাতে করিয়া লইয়া আর একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ইলা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল—"তুমি কি লিলির মিস্‌ট্রেস্‌কে কোনো বিষয়ে অপমান ক'রেছ?"

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া মিঃ বোস্ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"না, তেমন্ কোনো কথা তো বলিনি। তবে লিলির নেক্‌লেস্‌টা হারানো সম্বন্ধে আমার একটু..."

বোসের কথা শেষ না হইতেই ইলা বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল—"থাক্, আর ব'ল্‌তে হবে না; বুঝেছি। তাই, কিছু না জেনে, না শুনেই সেই ভদ্র-মহিলাকে, আমি চ'লে যাওয়ার পরদিনই তাড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হ'য়েছ।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ইলা তাহার পিতার পত্র ও উইলখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

পিতা লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়াসু—

মা, আমার শেষ মঙ্গল-আশীষ নিও। তোমার বাপ হ'য়েছিলুম বটে, কিন্তু বাপের উপযুক্ত কোনো ব্যবহারই তোমার সঙ্গে ক'রতে পারি নি। একটা মোহের চক্রে পড়ে' সারা জীবনটা কেবল পাক্ খেয়েই গেলুম। যতদিন রক্তের জোর ছিল, ততদিন ভেবেছিলুম—ছলে বলে কৌশলে দুনিয়াকে ভোগ ক'রতে পাওয়াই বুঝি জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতা। কিন্তু আজ বার্দ্ধক্যের দরজায় এসে পা দিয়ে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। লেখাপড়া শিখেছিলুম বটে, কিন্তু অন্তরটা চিরদিন বোম্বেটে হ'য়েই ছিল; মনুষ্যত্ব বোধ হয় কোনো দিনই ছিল না। সময় থাক্‌তে যদি আমার চোখ ফুট্‌তো, তা হ'লে জীবনটা এমন ব্যর্থ হয়ে যেতো না। অনেক কাজ ক'রে যেতে পার্‌তুম, জীবনে বড় হবার অনেক সুযোগ এসেছিল। আমি নিতান্ত গরীব মা-বাপের ছেলে হ'য়ে জন্মেছিলুম বটে, কিন্তু স্বর্গীয় মিঃ ডি, এন্, সেনের অনুগ্রহে আমার আর্থিক অভাব সবই ঘুচেছিল। তাঁর প্রকাণ্ড কারবার ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হ'য়েছিলুম আমি। কিন্তু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের ঋণ যে কেমন ক'রে শোধ ক'রেছি, তা তুমি জান না। যদি জান্‌তে, আমায় বাবা ব'লতেও আজ তোমার জিবটা জড়িয়ে যেত। ফিরিঙ্গি রঞ্জনরের মেয়ে ঐ অ্যালেনের প্রণয়ে পড়ে' তোমার বাপ যে কত বড় দস্যু হ'য়ে পড়ে'ছিল, সে কথা তুমি কল্পনা ক'র্‌তেও পার্‌বে না। অর্থ ও সম্পত্তি সব হজম্ ক'রে, পরলোকগত সেন সাহেবের মৃত্যুকালে বড় বিশ্বাস ক'রে হাতে তুলে' দেওয়া, একমাত্র স্নেহের দুলালী অরুণাকে পথে বসিয়েছি, একবারে নিঃস্ব ক'রে। জোর ক'রে, স্নেহের সব বাঁধনকে ছিঁড়ে দিয়ে নিতান্ত কচি অবস্থায় তোমাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি, শুধু আমার পৈশাচিক লালসা মেটাতে। তখন তুমি মাত্র তিন বছরের শিশু। আর বল্‌তে পার্‌ছি না। জীবনে যখন অনুশোচনা এল, তখন আর সময় ছিল না; তবুও চেষ্টা ক'রেছিলুম, সন্ধান ক'রতে পারিনি। তোমাদের উপর সারা জীবনটা শুধু অত্যাচার ক'রেই গেলুম। তোমার বিমাতা অ্যালেন অনেক কিছু হাত ক'রে স'রে পড়েছে।

অন্ততঃ জন্মদাতা বলে'ও আমায় ক্ষমা ক'রো মা।

আর, আমার জীবনের এই শেষ অনুরোধ :—যদি তোমার মহাপাপী পিতার অধঃপতিত আত্মাকে পরলোকে একটু শান্তি দিতে চাও, তা হ'লে সেই অভাগীর খোঁজ আর একবার ভালরূপে ক'রে দেখো। হয় তো তার কোনো সন্ধানই পাবে না। বড় অভিমানিনী ছিল সে; জীবনের অত বড় ধাক্কা বোধ হয় সে সহ্য ক'রতে পারে নি। হয় তো আত্মহত্যা ক'রেছে। তবুও—যদি দেখা পাও, শেষ জীবনে তাকে পূজো ক'রে, তোমার পিতার হ'য়ে, তার পিতার ঋণ একটু শোধ ক'রো। উঃ! নিজের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে ক'রতে আজ নিজেই শিউরে উঠ্‌ছি।

তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। আমার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই উইলে তোমাদের নামেই তা লিখে দিয়ে গেলুম। তার মধ্যে কেবল একটা অংশ রইল তোমার মায়ের; যদি তাঁর সন্ধান কোনো দিন মেলে।

ঈশ্বর মঙ্গল করুন। আমার সব দোষ ভুলে' গিয়ে আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও মা ডলি। ইতি

তোমারই—

হতভাগ্য পিতা।

তাহারি মা! ইলার মাতৃহীন তৃষিত হৃদয় যে আজিও মায়ের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে। লিলির মা হইয়া অবধি, মাতৃ-হৃদয়ের অমূল্য সম্পদকে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়া, ইলার প্রাণ যে তাহার অজ্ঞাত মাতার জন্য সতত কাঁদিয়া মরে।

পিতার পত্রখানি পড়িতে পড়িতে ইলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল; আগাগোড়া পড়িয়া সে যেন সহসা মূর্চ্ছিতের মত একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কৌচের উপর লুটাইয়া পড়িল।

বিহ্বল বোস্ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—" কি হো'ল ডার্লিং, অমন কো'রছ কেন ?"

ইলা কোনা কথা না বলিয়া অরুণা ও পিতার পত্র দুই-খানি স্বামীর কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া, দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল——'ওঃ, মা! যেখানে তোমার পূজোর আসন, সেইখানে তুমি দাসী হ'য়ে এ'সে, কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে চলে গেছ। তোমার এই অভাগী সন্তান তোমার কোলের মধ্যে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেল্‌লো মা ………।"

হৈমন্তী

শ্রীগোপাললাল দে বি-এ

ধানের সবুজ বান বহে যায় দিগন্তরে,
নব শীষে শীষে করতালি চলে রনঝন্;
পাতায় পাতায় শন্ শন্ বাজে বাতাস ভরে,
দূরে দূরে যায় বায়ুভরে তার অনুরণন।
মেঠো পথখানি ছাওয়া কুশকাশ তৃণের দলে,
কৃষক কোথায় মাঠেতে সেথায় কৃষাণী, কালো,
চলে হাসি, তার কালো কেশপাশ বসন-তলে,
কালো মেঘ সম ধান তারই পাশে সেজেছে ভালো।

বন-তুলসীর গন্ধে আকুল বায়ুর ডাকে,
যেমন গেলাম হেম-ধূলিময় পল্লী-পথে
দেখি বনলতা ফুটে আছে শত পথের বাঁকে,
পুষ্পধনুর ঘর্ঘর বাজে ভ্রমর-রথে।
খেজুর তালের গাছ রহে থির ছবির মত,
নবীন বেণুর শীর্ষ শোভিছে নীলাম্বরে,
হাওয়া নাই তবু অশথ পাতারা নৃত্য-রত,
জলে কদলীর ছায়া হেরি মন কেমন করে।

সরসী সায়রে টলমল করে শীতল জল,
লহরী-লীলায় চল-চঞ্চল শফরী খেলে,
পদ্ম-বাসিত জলে ভাসে নীর-কুসুম-দল,
তীরে বসি' আছে সারাদিন মাছ-শিকারী ছেলে।
শ্যামা শীস্ দেয় কপোতের পাশে রাখিয়া তাল,
দূর হ'তে আসে ঘুঘুদের মধু-কল-কূজন,
চন্দনা শোনে ভঙ্গিম-গ্রীব সুচিরকাল,
দূরে দিগ্বধূ ছল ছল চায় উদাস-মন।

রাতে পাদপীঠে চলে শিশিরের আলিম্পনা,
সন্ধ্যায় ঝরে হিমকুঙ্কুম শ্যামল মুখে,
প্রভাত বায়ুতে চুয়া চন্দন কুহেলী-কণা,
বর্ষা-স্নানের সিক্ততা মোছে রৌদ্র-সুখে।
চন্দন-টীকা দিয়া ভগিনীরা পায়সে তোষে,
ঘরে ঘরে আছে স্বাদু নবান্নে নিমন্ত্রণ;
বনে আছে ভোজ, মাঠে 'পৌষলা' প্রথম পোষে,
মধুর-মদিরা খর্জ্জুর-রসে তৃপ্ত-মন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দী ভাষা ও কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বছর কয়েক আগে হিন্দী ভাষা ও কবি-সমাদর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে নিবেদন করেছিলুম।

কবিত্ব ও কবি-সমাদরের এত ছড়াছড়ি আর কোনো ভাষার ইতিহাসে বড়-একটা দেখা যায় না। রাজ-দরবারে কবি, প্রতি পল্লীতে জনপ্রিয় কবি, মেয়েদের মজলিসে মেয়ে-কবি, গানেওয়ালা কবি,—তাঁদের কাব্য-চর্চ্চা, তাঁদের উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা ("বিদাই") অযোধ্যার প্রতি জনপদের অধিবাসীদের জীবনের মাধুর্য্য শত শত গুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। কবিতা-কুঞ্জের মধুর কাকলী ছন্দিত হয়ে মনে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করতো।

হিন্দী কবিদের মধ্যে ভূষণ কবি সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে দেশবাসিগণ তাঁকে "কবিভূষণ" উপাধি দিয়েছিলেন। পরে তিনি এত লোকপ্রিয় হ'ন্ যে, তাঁকে সবাই "ভূষণ" বলে ডাক্‌তো। তাঁর আসল নামটি আজও অজ্ঞাত। এঁর বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

গঙ্গ কবিকে আকবর বাদ্‌শার সেনাপতি নবাব বাহাদুর আব্দুল রহীম খান্‌খানা সাহেব ছত্রিশ লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন! শুধু দু-লাইনের একটি কবিতা রচনা করে তিনি ঐ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভূষণ কবির পাল্‌কীর দণ্ড স্বীয় স্কন্ধে বহন করে মহারাজা ছত্রশাল নিজেকে ধন্য ও কবিকে সম্মানিত করেছিলেন।

চন্দ্‌ বরদাই হিন্দী ভাষার আদি যুগের একজন মহাকবি। তিনি শেষ হিন্দু-সম্রাট পৃথ্বীরাজের সভা-কবি ছিলেন। উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন—এমন কি উভয়ের মৃত্যু একদিন একই সময়ে হয়েছিল। চন্দ্‌ বরদাইর পুত্র জলহও একজন যশস্বী কবি ছিলেন। চন্দ্‌ কবির "পদ্মাবৎ" ও "চন্দ্‌ রাসো' নামক গ্রন্থদ্বয় অতি প্রসিদ্ধ।

সুরদাস ও তুলসীদাস সর্ব্বজন সমাদৃত মহাকবি ছিলেন। দারিদ্র্য-ব্রতী ও জ্ঞানভিক্ষু হয়ে তাঁরা কাব্যচর্চ্চা করেছেন। রাজা-রাজড়া, এমন কি সম্রাট কর্ত্তৃক দেওয়া মোটা পুরস্কারও তাঁদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

নরহরি একজন বড় হিন্দী কবি। কবিতা শুনিয়ে আকবর বাদ্‌শাকে খুসী করে তিনি গোবধ-প্রথা উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আকবর বাদ্‌শার "নওরত্তনে"র অন্যতম সদস্যত্রয়—রহীম, বীরবল ও টোডরমল উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁর মধ্যে রহীম ছিলেন মহাকবি। এঁরা শ্রদ্ধার সহিত কাব্যচর্চ্চা করতেন ও কবিদের পুরস্কৃত করতে কখনও পশ্চাৎপদ হতেন্ না।

কবি নরহরির পুত্র হরিনাথ শাজাহান বাদ্‌শার সভাকবি ছিলেন। বাদ্‌শা তাঁকে রথ, পাল্‌কী, হাতী, ঘোড়া ও জায়গীর দিয়েছিলেন।

হরিনাথ আমেরের রাজা সওয়াই মানসিংহ বাহাদুরকে নিম্নলিখিত কবিতাটি শুনিয়ে এক লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন!

কবিতাটি এই—

"বলী বোই কীরতি লতা,
কর্ণ-করি দ্বৈপাত ;
সীচী মান মহীপ নে,
জব দেখি কুম্হিলাত।
জাতি জাতি নে গুণ অধিক,
শুনো ন কবহু'কাণ।
সেতু বাঁধ রঘুবর তরে
হেলা দে নৃপমান।"

সোজা কোথায় এর অর্থ হোলো এই যে,—বলী দানের কীর্ত্তিলতা রোপণ করেন, দাতাকর্ণ তাকে পত্র-পুষ্পে শোভিত করে তোলেন এবং যখন কীর্ত্তিলতা জলাভাবে (দানের অভাবে) শুকিয়ে যাচ্ছিল, তখন মানসিংহ জলধারা সিঞ্চন করে তাকে বর্দ্ধিত করে,—সঞ্জীবিত করে তোলেন। সেতুবন্ধ স্থাপন করে বিশ্বপতি রঘুবর তরে গিয়েছিলেন ; আর মানসিংহ হেলাভরে (অর্থাৎ অবলীলাক্রমে) তা পার হয়ে যাচ্ছেন।

কবি হরিনাথ ঐ টাকা নিয়ে হাতীতে চড়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যেতেই, পথে এক গরীব ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়। সে কবিকে দেখে নিম্নলিখিত কবিতাটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে শোনালে—

"দান পায় দোউ বড়ে,
কী হরি কী হরিনাথ ;
উন্ বঢ়ি ঊঁচে পগ কিয়ো,
ইন্ বঢ়ি ঊঁচে হাত।"

এর মর্ম্মার্থ হোলো এই যে, দান পেয়ে কে বড় তা বুঝতে পাচ্ছি না। হরি বড় না হরিনাথ বড়, তা বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ দুজনই যাচক—একজন হাতীতে চড়ে যাচ্ছেন আর একজন সাধারণ ভাবে।

কবি হরিনাথ কবিতাটি শুনে আহ্লাদিত হয়ে ঐ টাকা গরীব ব্রাহ্মণকে দিয়ে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরে গেলেন।

বাঁধোগড়ের বঘেলা রাজা রামচন্দ্র জী হরিনাথের কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন।

হরিনাথ বড় কবি হলেও জাঁকজমক খুব পছন্দ করতেন। কোথাও যেতে হলে সাথে বহু লোকজন ও হাতীঘোড়া নিয়ে যেতেন। অযাচিত অজস্র অর্থ ও জায়গীর তিনি পেতেন; এবং অকাতরে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তা তিনি প্রার্থী ও দরিদ্রকে পরম সমাদরের সহিত বিলিয়ে দিতেন—এমনি মহাপ্রাণ কবি তিনি ছিলেন! কবিবর কেশোদাস হিন্দী ভাষার একজন বড় কবি। ওড়ছার মহারাজা রামসিংহ বাহাদুরের ভাই যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ সিংহের তিনি পরম প্রিয় কবি ছিলেন।

একবার মহারাজা বীরবলকে কবিতা শুনিয়ে কেশোদাস ছয় লাখ্ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন!

গোস্বামী তুলসীদাস এঁকে পরম স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তাঁরই উপদেশানুযায়ী তিনি "রামচন্দ্রিকা" মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

বিহারীলাল একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার লালিত্য, ছটা ও সলীল গতি সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে।

বিহারীলাল জয়পুরাধিপের সভাকবি ছিলেন। এই রাজ-দরবারে থেকেই বিহারীলাল "বিহারী সৎসই" নামক অতি প্রসিদ্ধ কবিতাবলী রচনা করেন।

বিহারী সৎসইর কয়েকটি টীকা বর্তমানে হিন্দী সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা বিহারী সৎসইর টীকা রচনা করে ১২০০্ টাকা "মঙ্গলা-প্রসাদ" পারিতোষিক পেয়েছেন।

পুরানো কবিদের রাজ-সমাদরের একটি চিত্র দিয়ে এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ করা যাক্।

রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ ছিলেন হিন্দী ভাষার একজন মহাকবি। তাঁর অবদান হিন্দী ভাষার মণিকোঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে। আগামী বারের প্রবন্ধে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাবে।

তিনি রাজা হয়ে রেওয়া রাজ্যের গদীতে বসে প্রচার করলেন যে, কেউ তাঁকে নূতন ধরণের কবিতা না শুনালে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে না।

বলা বাহুল্য, রেওয়া দরবার থেকে বরাবরই কবিদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হোতো। কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তখনও অনেকের অবস্থা ছিল "যে জন সেবিবে ও রাঙ্গাচরণ সেই সে দরিদ্র হবে।"

রাজার উল্লিখিত ঘোষণা শুনে অনেক কবি প্রমাদ গণলেন। অনেকের ভয় হোলো তাঁদের জীবিকা উঠে গেল। অনেক চিন্তার পর স্থির হোল যে, বর্তমান কবি-শ্রেষ্ঠ হরিনাথকে রেওয়া-দরবারে পাঠান যাক্।

সকল কবি গিয়ে হরিনাথকে ধরলেন। অনেক বলা-কওয়ার পর হরিনাথ অবশেষে রাজী হলেন এবং এক শুভ দিন দেখে রাজবাড়ীর অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

রাজ-প্রাসাদের সদর দেউড়ীতে গিয়ে শাস্ত্রীর নিকটে অবগত হলেন যে রাজা ও রাণী একত্র বসে হর-পার্ব্বতীর পুজো করছেন। পুজো শেষ হলে অন্দর-মহলে চলে যাবেন। আজকাল কবিরা কেউ কাব্যচর্চ্চা করতে আসে না। মহারাজকে নূতন ধরণের ভাবপূর্ণ কবিতা না শোনাতে পারলে কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় না। মহারাজ নিজে মহাপ্রতিভাশালী কবি। তাঁর সহিত যে-সে লোকে কাব্যচর্চ্চা করতে আসে না।

কবি হরিনাথ ভাবনায় পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেন রাজার নিকটে যেতেই হবে। মন্ত্রীদের বক্‌শীস্ দিয়ে ও অনেক অনুনয় করে তিনি সাতটি দেউড়ী পার হয়ে মহারাজার খাস্-মহলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন যে দ্বিতলের প্রশস্ত অলিন্দে বসে মহারাজা ও মহারাণী স্বর্ণার্ঘ্য ও পুষ্পপাত্র সামনে রেখে হর-পার্ব্বতীর পূজায় নিমগ্ন। কী স্বর্গীয় দৃশ্য!

অর্চনা দেখে কবির চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পূজা দেখলেন।

যখন পূজা শেষ হয়ে গেল, অঞ্জলি দেওয়া হোলো, নমস্কার করা হোলো, রাজা-রাণী উঠে দাঁড়ালেন,—এমন সময় কবি হরিনাথ অতি উচ্চৈঃস্বরে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

হরিনাথের মধুর আবৃত্তি রাজা-রাণী শুনতে পেলেন।

হরিনাথের কবিতার অর্থ হোলো এই যে, "লোকমুখে শুনেছি যে রেওয়া-নরেশ মহারাজা বিশ্বনাথ একজন মহাকবি। আমিও একজন ক্ষুদ্র অখ্যাত-অজ্ঞাত কবি। একজন মহাকবির নিকটে একজন ক্ষুদ্র কবি এসেছে কাব্য-চর্চ্চা করতে। "বিদাই" বা পুরস্কারের লোভে আসি নি। মহাকবির সহিত দেখা না হ'লে, এই ক্ষুদ্র কবিটি চলে যাবে তার ব্যথাভরা অন্তর নিয়ে।"......

মহারাজা কবিতাটি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পূজার দালানে বসেই কবির তলব হোলো।

কবি হরিনাথ ধীর-পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্বিতলে উঠে দেখলেন যে, তখনও মহারাজ ও মহারাণী পূজার আসনেই বসে আছেন। তাঁদের সামনে বিরাজিত হর-পার্ব্বতী বিগ্রহ।......

হরিনাথ তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করলেন। সে কবিতাটি অতি সুন্দর। রচনা-লালিত্য ও শব্দচয়ন সম্পদে গৌরবোজ্জ্বল।

তার অর্থ হোলো এই যে "আমি আজ চিনতে পারছি না কে কাশীর দেবাদিদেব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা, আর কে রেওয়া-নরেশ বিশ্বনাথ ও তাঁর মহিষী অন্নপূর্ণা। দুজনই তো দীনবন্ধু,—গরীবের জন্য, আর্ত্তের জন্য তাঁদের দ্বার অবারিত। কার নিকটে কী প্রার্থনা জানাবো।"......

মহারাজা কবিকে দরবার-গৃহে নিয়ে পরম সমাদর করলেন এবং পুনরায় তাঁর রাজ্যে কবি, জ্ঞানী-গুণীদের সম্মানের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তন করলেন।

মহারাজা বিশ্বনাথ পরম প্রতাপশালী ও যশস্বী রাজা ছিলেন।

তাঁর অকাল-মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে কবি হরিনাথ যে কবিতায় মনের দারুণ দুঃখ ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর শেষ কলিটি এই—

"আজ সব দীনন্ কো গুথি গো দয়া কে সিন্ধু,
আজ সব দীনন্ কো সকল গাথ, লুট গো।"

আজ সকল দরিদ্রের একমাত্র দয়ার সিন্ধু শুকিয়ে গেল—আজ সকল দরিদ্রের ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হয়ে গেলো।

খাদ্যের কথা

শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায় এম-এস্‌সি, এফ-সি-এস

১

স্বাস্থ্যই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ; অথচ আমাদের পক্ষে এ কথাটার কোন মূল্যই নেই; কারণ, আমাদের স্বাস্থ্য নেই, বল নেই—আমরা সব হারিয়ে বসেছি। ঘরে রোগ-শোকের যন্ত্রণা ভোগ করা, আর বাইরে নিয়ত অপমানের বোঝা বওয়া—এই যেন আমাদের জীবন। আমাদের জাতের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হচ্ছে এই যে, আমরা অতিমাত্রায় সহনশীল হয়ে উঠেছি। এটা নির্ব্বিকারের লক্ষণ কি না, তা ঠিক্ জানি না; কিন্তু এটা যে বাঁচার লক্ষণ নয়, তা একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই চোখে পড়ে। আমাদের জীবন-পথে চলার এই যে গতিটা, তার মধ্যে না আছে কোন আনন্দ—না আছে কোন বৈচিত্র্য। আমরা যেন, শুধু চল্‌তে হয়—এই জন্যই চলে যাচ্ছি। তাই আহারের বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের চিন্তার বাইরে। কিন্তু জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচতে হলে—ঘরে ঘরে উৎকট ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে—মোট কথা, মানুষ হিসাবে আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হলে—আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় আহারের বিধি বিধান সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা দরকার।

এটা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আমাদের শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার এই কয়টা জিনিষ—বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, সূর্য্যের আলো, আর পুষ্টিকর খাদ্য। খাদ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বায়ু ভিন্ন আমরা এক পলও বাঁচতে পারি না—আর আমরা যে সব খাদ্য-বস্তু গ্রহণ করি, জল তার পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং পরিণামে আমাদের দেহযন্ত্রের কার্য্যকরী শক্তি যোগাইয়া দেয়। সূর্য্যের আলো আমাদের শরীরে উত্তাপ-শক্তি দান করে। আমরা খাদ্য-বস্তুর ভেতর যে সমস্ত শক্তি পাই, তা সবই সূর্য্য থেকে পাই; কারণ, সূর্য্যই হচ্ছে জগতে সবচেয়ে বড় শক্তির আধার। তা ছাড়া রোগ-বীজাণু-ধ্বংসে ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে সূর্য্যের আলো অব্যর্থ ঔষধ। সূর্য্যের আলো আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের ভেতরকার শক্তি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করে তা পরে দেখান যাবে।

খাদ্য জিনিষটা কি, কেন আমরা খাদ্য খাই, তাহাই প্রথমে আলোচ্য। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন ও বলবৃদ্ধির জন্য আমরা যা খাই, তাহাই আমাদের খাদ্য। উহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করা; আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই শক্তি বৃদ্ধি করার সমস্ত উপকরণ যোগান। আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের ভেতর আমরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাই—(১) ভাইটামিন জাতীয় পদার্থ, (২) প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ, (৩) শর্করা জাতীয় পদার্থ, (৪) স্নেহ বা তৈলজাতীয় পদার্থ ও (৫) লবণ জাতীয় পদার্থ। এর মধ্যে কতকগুলি Building materials, অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের সমস্ত উপকরণ যোগানই এদের কাজ। প্রোটীনজাতীয় আর লবণজাতীয় পদার্থগুলি এই উপকরণ যোগায়। শরীরের উত্তাপ রক্ষা আমাদের দেহের একটা প্রধান কাজ। স্নেহ বা তৈলজাতীয় আর শর্করা জাতীয় পদার্থগুলি ইন্ধন যুগিয়ে তা রক্ষা করে। আর ভাইটামিন্, আমাদের যে জীবনী-শক্তি রয়েছে, তাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে আমাদের সমস্ত দেহযন্ত্রটাকে চালিয়ে নেয়। ভাইটামিনকে খাদ্যের প্রাণ বলে গণ্য করা হয়। প্রোটীন জাতীয় স্নেহ বা তৈল জাতীয় কিংবা শর্করা জাতীয় যে-কোন পদার্থই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাতে যদি ভাইটামিন্ না থাকে, তবে এদের কোনই সার্থকতা থাকে না। কারণ, ভাইটামিন্ না থাকার দরুণ আমাদের ভেতরকার জীবনীশক্তিকে সাহায্য করবার কেউ থাকে না—তার একাই কাজ করতে হয়। তার ফলে জীবনী-শক্তির হ্রাস ঘটে এবং পরিণামে আমরা স্বাস্থ্য হারিয়ে বসি। এই ভাইটামিন জিনিষটা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

(১) ভাইটামিন জাতীয় পদার্থ:। আজকাল ভাইটামিন সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খাদ্য-বস্তুর মধ্যে উহা এত অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান যে, কোন রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহা নির্ণয় করা যেত না। ডাঃ হপ্‌কিন্স (Dr. Hopkins) বিশ বছরেরও অধিক কাল একনিষ্ঠ সাধনার ফলে নূতন নূতন পরীক্ষা দ্বারা এই ভাইটামিন ও প্রোটীনজাতীয় পদার্থগুলি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা দ্বারা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লোকের চোখের সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণা খাদ্য-জগতে এক নূতন চিন্তা-প্রবাহ এনে দিয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগতের চরম সম্মান নোবেল প্রাইজ্ এ বছর তিনি পেয়েছেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, কোন রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ভাইটামিনের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যেত না। উহার অস্তিত্ব শুধু ব্যবহার (Experiment) দ্বারাই প্রকাশ পায়। ডাঃ হপ্‌কিন্স্ (Dr. Hopkins) দুই দল ইঁদুর নিয়ে প্রথমে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এক দলকে, যে সব খাদ্য-দ্রব্যে ভাইটামিন আছে বলিয়া ধারণা, এরূপ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়; আর অপর এক দলকে ঠিক্ উহার বিপরীত খাদ্য দেওয়া হয়। পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে তিনি আসেন যে, প্রথমোক্ত দল বেশ সবল ও সুস্থ হয়; আর অপর দল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের খাদ্য-দ্রব্যে শুধু প্রোটীন কিংবা স্নেহ বা তৈলজাতীয় পদার্থ ছাড়াও এমন একটা জিনিষের প্রয়োজন, যা আমাদের জীবনীশক্তির জন্য নিতান্তই দরকার। এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটাই হচ্ছে ভাইটামিন্। জগতে ইথার (Ether) যেমন মহাব্যাপক হয়ে আছে, —কোন পরীক্ষা দ্বারাই তাকে ধরবার জো নেই—অথচ ইথারের অস্তিত্বে কোন বৈজ্ঞানিকেরই লেশমাত্র সন্দেহ নেই—এও ঠিক্ যেন তেম্নি। প্রায় সব খাদ্য-দ্রব্যের ভেতরই ভাইটামিন্ রয়েছে; অথচ কোন রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহাকে ধরবার জো নেই। এই ছিল আগেকার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। কিন্তু অজানা অচেনা পথে—প্রকৃতির অন্তরের গোপন রাজ্য তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে তার রহস্য প্রকাশ করাই বৈজ্ঞানিকের আনন্দ,—প্রকৃতিকে জয় করাই তার জীবনের চরম সাধনা। তাই ভাইটামিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব নির্ণয় করার জন্য বৈজ্ঞানিক জগতে গবেষণার ধুম

পড়ে যায়। অধুনা বৈজ্ঞানিক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে আমাদের খাদ্য-দ্রব্যে ভাইটামিনের স্বরূপ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র (Spectroscope) দ্বারা পরীক্ষা করলে বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিনগুলি বিভিন্নপ্রকার Lines (রেখা) দেখায়। তা ছাড়া বিশুদ্ধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারাও তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এণ্টিমণি ট্রাই-ক্লোরাইড্ (Antimony trichloride) কিংবা আর্সেনিক্ ক্লোরাইড্ (Arsenic chloride) দ্বারাও বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিন বিভিন্ন প্রকার বর্ণ দ্বারা তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার ভাইটামিন্ আবিষ্কৃত হয়েছে—যথা ক, খ, গ, ঘ ও ঙ। এক্ষণে প্রত্যেকটী ভাইটামিনের গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

'ক' ভাইটামিন্—গাছের সবুজ পাতার উপর সূর্য্যের আলোর সাহায্যে উহার উৎপত্তি। কাজেই প্রায় সব জাতীয় শাক্-সব্জির ভেতর উহা বর্ত্তমান আছে। গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি সবুজ ঘাস খায়—তাই তাদের দুধেও এই জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। নদীর তীরে কিংবা পুকুর-ধারে যে সব জল-জাতীয় আগাছা জন্মে, তাতেও উহা যথেষ্ট আছে। মাছগুলি এই সব খেয়ে জীবন ধারণ করে ; তাই তাদের তৈল, ডিম, কলিজা ও যকৃৎ প্রভৃতিতে এই জাতীয় ভাইটামিন আছে। তা ছাড়া টাট্কা ফলেও বেশ আছে।

'ক' জাতীয় ভাইটামিন যাতে আছে—মাছের তৈল (কড্ লিভার তৈলে যথেষ্ট), মাছের ডিম, দুধ, মাখন, ঘোল, ননী, ঘি, ছানা, মাংসের চর্ব্বি, ডিম, আটা, ঢেঁকিছাঁটা চাউল, গম, চিঁড়া (আতপ), মুগ ও ছোলার অঙ্কুর, টমেটো বা বিলাতি বেগুন, নারিকেল, আম, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি যাবতীয় ফল, প্রায় সবরকম শাক্সব্জি, কপি ইত্যাদি।

'ক' জাতীয় ভাইটামিনের উপকারিতা—উহা শরীরে যথাবিধি রক্ত-সঞ্চালন করে—শরীরের কোন স্নায়ুর (tissues) ভেতর জল জম্তে দেয় না। উহার সবচেয়ে প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরকে সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমরা সকলেই জানি যে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণরূপে তাদের রোগ-বীজাণুর (Microbes) উপর নির্ভর করে। এই রোগ-বীজাণুগুলিই (Microbes) হচ্ছে মারাত্মক। আমাদের নাসারন্ধ্র, মুখরন্ধ্র, চক্ষুর পাতা, ও মলদ্বার প্রভৃতি এই সকল রোগ-বীজাণু ঢুক্‌বার একমাত্র পথ। আর আমাদের শরীরে যদি ঘা প্রভৃতি ক্ষত থাকে, তাতেও রোগ-বীজাণুবাহক মশা কিংবা ছারপোকার কামড়ে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, টাইফাস্ প্রভৃতি রোগ আমাদের আক্রমণ করে। 'ক' জাতীয় ভাইটামিন নাসারন্ধ্র প্রভৃতি রোগবীজাণু ঢুকার পথ সমূহ ও শরীরের ত্বক্ সর্ব্বদা সবল রাখে—তাই আমরা এর সাহায্যে বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির কবল থেকে পরিত্রাণ পাই।

'ক' জাতীয় ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগ নিচয়—সাধারণ দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, পেটের ব্যারাম, রোগ-নিবারণ-ক্ষমতার হ্রাস, চক্ষুর পীড়া, রাত-কাণা ইত্যাদি।

'খ' ভাইটামিন—সাধারণতঃ গাছপালা যে জমি থেকে রস টেনে নেয়—তার উপরই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। গাছের ফল ও শিকড় প্রভৃতিতেই উহার আধিক্য দেখা যায়। গরু ছাগল প্রভৃতি গাছের ফল ও শিকড় অনেক সময় খেয়ে থাকে—তাই তাদের দুধে এই জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

'খ' জাতীয় ভাইটামিন যাতে আছে—আটা, গম, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, সর্ব্বপ্রকার ডাল, টমেটো বা বিলাতী বেগুন, গোল আলু, শাঁক্ আলু, রাঙ্গা আলু, গাজর, মুলা, শালগম, কপি, মটরশুঁটি, লেবুর রস, দুধ, ঘোল, ছানা, আম, নারিকেল, পেঁপে, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি যাবতীয় ফল, শাক্-সব্জি ইত্যাদি।

'খ' জাতীয় ভাইটামিনের উপকারিতা—মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ও যকৃৎএর (Brain, Heart & Liver) উপরই এর সবচেয়ে বড় প্রভাব। উহা মস্তিষ্কের অবসাদ আস্তে দেয় না—হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎএর ক্রিয়ায় দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে দেয় না। তা'ছাড়া পরিপাক-ক্রিয়ায়ও খুবই সাহায্য করে। তাই আমাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি করার জন্যও এর একান্তই দরকার।

'খ' জাতীয় ভাইটামিন অভাবজনিত রোগনিচয়—বেরীবেরী রোগটার সঙ্গে আজকাল আমরা খুবই পরিচিত। এই রোগের প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের খাদ্যে 'খ' জাতীয় ভাইটামিনের অভাব। আমরা সাধারণতঃ কল-ছাঁটা চাউল ব্যবহার করি। তাতে মোটেই এই জাতীয় ভাইটামিন থাকে না। তাই বেরীবেরী রোগের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হলেই চিকিৎসকগণ ঢেঁকী-ছাঁটা চাউল ব্যবহার করতে আমাদিগকে উপদেশ দেন। বেরীবেরী ছাড়া পরিপাক-শক্তির হ্রাস ও ফুসফুস (Lungs) ঘটিত দুর্ব্বলতাও খ-জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে প্রকাশ পায়।

'গ' ভাইটামিন—উহা সাধারণতঃ শাকসব্জি ও টাট্কা ফলে পাওয়া যায়। মুগ, ছোলা প্রভৃতি ডালের অঙ্কুরেই উহা সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়।

'গ' জাতীয় ভাইটামিন যাতে আছে—শাকসব্জি, টাট্কা ফল, আম, জাম, কাঁঠাল ও কলা প্রভৃতি, মুগ, ছোলা, কলাই, অড়হর, প্রভৃতি ডালের অঙ্কুর, 'গুড়' দুধ প্রভৃতি।

'গ' জাতীয় ভাইটামিনের উপকারিতা—উহা রক্তকে বিশুদ্ধ রাখে এবং রক্তের সঞ্চালন কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। হাড় এবং দাঁতের পুষ্টিসাধন করা এর একটা প্রধান কাজ। দেহকে রোগ-বীজাণু প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোও এর একটী কাজ।

'গ' জাতীয় ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগনিচয়—এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। স্কার্ভি রোগে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী ভোগে। এই রোগে শিশুদের হাড় নরম হয়—তার ফলে হাত, পা ও বক্ষঃস্থলের বিকৃতি ঘটে। আমাদের দেশে এই স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে বছর বছর যে কত শিশু তার মায়ের বুক খালি করে যমের বাড়ী চলে যায়, তার খোঁজ কেউ করে না। শিশুর হাত পা ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠে—ওদিকে মায়ের বুকের দুধ কিংবা গরুর দুধও খাওয়ান হয়—অথচ হঠাৎ একদিন তার ডাক আসে ওপার থেকে—সেও চলে যায় সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। শিশুদের এ শত্রুর কবল থেকে বাঁচাতে হলে, এমন খাদ্য তাকে খাওয়ানো দরকার, যাতে 'গ' জাতীয় ভাইটামিন আছে। গরুর দুধে 'গ' জাতীয়

ভাইটামিন আছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, সবুজ শাক্-সব্জিতেই উহা বেশী থাকে। কাজেই যে সব গরু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খায় না—তাদের দুধে এই জাতীয় ভাইটামিন কদাচিৎ থাকে। আর আমাদের মা-লক্ষ্মীদের দিনের পর দিন যা স্বাস্থ্য দাঁড়াচ্ছে—তাতে তাদের নিজের জীবনটাকে নিয়ে চলাই তাদের একটা মহা সমস্যার বিষয়। কাজেই কোলের ছেলের মায়ের বুকের দুধও পরিমাণ-মত মিলে না। তাই শিশুগুলি যখন হঠাৎ তাদের মায়ের কোলের মায়া ত্যাগ করে চলে যায়, তখন আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার—কেন এমন হয়। উপযুক্ত পরিমাণ 'গ' জাতীয় ভাইটামিনের অভাবেই এই স্কার্ভি রোগে শিশুমৃত্যুর হার দিন্ দিন্ বেড়ে চল্‌ছে। সাধারণতঃ টাট্‌কা লেবু ও কমলালেবুর রসই হচ্ছে এই রোগের প্রতিষেধক। শিশুদের দুধ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে ফলের রস খাওয়ানো এই স্কার্ভি রোগ থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভিরোগ ছাড়া, শিশুদের দাঁতের মাড়ী খুব নরম হওয়া, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্তপড়া, ও পরিণামে রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়।

'ঘ' ভাইটামিন—'ক' জাতীয় ভাইটামিনের মত উহাও সবুজ ঘাস পাতা, ও শাক্-সব্জিতে থাকে।

'ঘ' জাতীয় ভাইটামিন যাতে আছে—দুধ, ছানা, মাছের ডিম, পশুর যকৃৎ, কলিজা প্রভৃতি, আটা, দুধ, প্রায় সব রকম শাক্-সব্জি ও ফল ইত্যাদি।

'ঘ' জাতীয় ভাইটামিনের উপকারিতা—উহা শরীরের হাড় বৃদ্ধি ও মাংসপেশী সতেজ করে।

'ঘ' জাতীয় ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগনিচয়—রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগটী শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই 'ঘ' জাতীয় ভাইটামিনের অভাবেই সাধারণতঃ এই রোগ হয়। এই রোগে শিশুদের হাড়গুলি খুব নরম হয় ও তাদের বৃদ্ধির সমতার অভাব ঘটে। তারা ভয়ানক চঞ্চল ও খিট্‌খিটে মেজাজের হয়ে উঠে। আগে আমাদের দেশে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গে সরিষার তৈল মাখিয়ে রৌদ্রের উত্তাপে রাখা হতো—তাতে তাদের হাড়ের অতি সুন্দর গঠন ও বৃদ্ধি হতো; কারণ সরিষার তৈলে সূর্য্যের আলোর ক্রিয়ায় এই 'ঘ' জাতীয় ভাইটামিন তৈরী হয়। আজকাল আবাল্য আমরা অতিমাত্রায় সভ্য হয়ে উঠেছি; তাই আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীরা শিশুদের সরিষার তৈল মাখিয়ে রৌদ্রে রাখা একটা ভয়ানক লজ্জা ও অসভ্যতার ব্যাপার বলে মনে করেন। অথচ পরিমাণ-মত 'ঘ' জাতীয় ভাইটামিনই শিশুদের রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগে একমাত্র মহৌষধ।

'ঙ' ভাইটামিন—এই জাতীয় ভাইটামিন সাধারণতঃ শাক-সব্জি ও চর্ব্বিতে পাওয়া যায়।

'ঙ' জাতীয় ভাইটামিনের উপকারিতা—আমাদের শরীরের রক্ত হইতে সবচেয়ে সারবান্ পদার্থ যে বীর্য্য তৈরী হয়—ঙ জাতীয় ভাইটামিন উহাতে খুবই সাহায্য করে।

'ঙ' জাতীয় ভাইটামিন অভাবজনিত রোগনিচয়—সাধারণতঃ মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। তা ছাড়া প্রজনন-শক্তি-হীনতা ও মেয়েদের নানারূপ স্ত্রীরোগ প্রকাশ পায়।

একেবারেই কোন জাতীয় ভাইটামিন নাই যাতে—পাউরুটী, কল-ছাটা চাউল, সাদা চিনি, চা, কফি, কোকো, নারিকেল তৈল, ফলের সিরাপ, ইত্যাদি।

ভাইটামিনে উত্তাপের প্রভাব—অনেক সময় খুব বেশী উত্তাপে আমাদের খাদ্য-বস্তুর ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায়। যাতে আমাদের অসতর্কতায়, অজ্ঞতায় এই পরম উপকারী জিনিষটী নষ্ট না হয়ে যায়, সেদিকে আমাদের খুবই দৃষ্টি রাখা উচিত। শাক্-সবজির ভাইটামিন বেশী উত্তাপেও নষ্ট হয় না। ডিম, যকৃৎ ইত্যাদিও বেশী উত্তাপে ভাইটামিন থেকে বঞ্চিত হয় না। টমেটো বা বিলাতী বেগুন বেশী উত্তাপে ভাইটামিন হারিয়ে ফেলে—তাই উহা কাঁচা অবস্থায় গ্রহণ করাই সবচেয়ে উপকারী। এক-জ্বাল দেওয়া দুধে বেশ ভাইটামিন থাকে—কিন্তু দুধ ক্ষীর করে খেলে ভাইটামিন কিছুই থাকে না।

ভাইটামিন সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলে ইহাই প্রতীয়মান হবে যে একটু সাবধান হলেই আমরা প্রকৃত খাদ্য-বস্তু মনোনীত করে সুস্থ সবল হতে পারি এবং ব্যাধির কবল থেকেও নিষ্কৃতি পাই। আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। কলছাঁটা চাউল ব্যবহারে কোনই ফল নাই; কারণ উহাতে ভাইটামিন মোটেই থাকে না। তার পর ঢেঁকীছাঁটা চাউলে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকা সত্বেও উহার সদ্ব্যবহার আমরা করি না; কারণ, ভাতের ফেনকে আমরা নগণ্য জিনিষ বলে মনে করি, আর ফেলে দিই, ভাতের ফেনে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। তার পর শাক্-সব্জির কথা—দৈনন্দিন আহারের সঙ্গে আমাদের শাক-সব্জি কতক গ্রহণ করা চাইই।

আমাদের বার মাস ছয় ঋতুতে প্রকৃতি আমাদিগকে তাঁর বিবিধ ফলসম্পদ দান করতে কার্পণ্য দেখান নি। আমাদের আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, পেঁপে, কুল, নারিকেল, কলা, পেয়ারা, বেল ইত্যাদি ফলে যথেষ্ট ভাইটামিন রয়েছে এবং আমরা ইচ্ছা করলেই সবাই অল্প-বিস্তর এই সব ফল খেতে পারি। পাঁউরুটী, চা, কোফি, ককো ইত্যাদি আজকালকার পোষাকী খাদ্য। এতে ভাইটামিন মোটেই নেই। তা ছাড়া ক্ষুধা নষ্ট করতে চা, কফির মত সর্ব্বনেশে বিষ আর কিছুই নেই। সাহেবদের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা যে কতদূর অধঃপাতে যাচ্ছি—সেদিকে আমাদের খেয়াল্ নেই। সাহেবরা যাতে ভাইটামিন রয়েছে এমন অনেক জিনিষ খেয়ে (যথা ডিম, মাখন, নানারকম ফল) তার পর চা কিংবা কোকো খায়, শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে' তোলার জন্য। আর আমাদের হয় তো প্রাতঃকালে এক কাপ চা কিংবা এক কাপ ককো গ্রহণেই জলযোগ শেষ হয়। কাজেই একটু সাধারণ বিচার-বুদ্ধি সহ খাদ্য-বস্তু মনোনীত করলে অনায়াসে আমরা যথেষ্ট ভাইটামিন পেতে পারি।

(২) প্রোটীন জাতীয় খাদ্য—প্রোটীন জাতীয় খাদ্যে সাধারণতঃ নাইট্রোজেনের ভাগ খুব বেশী। এর জন্য এর উপকারিতাও বেশী; কারণ, এই জাতীয় খাদ্য শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের সমস্ত উপকরণ যোগায়।

প্রোটীন জাতীয় খাদ্যে শতকরা ১৫ থেকে ১৯ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আমরা দৈনন্দিন আহারের মধ্যে প্রোটীন জাতীয় খাদ্য বেশী খাই। চাউল, আটা, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, ঘোল, ডিম, শাক্-সবজি এবং প্রায় ফলেই এই প্রোটীন বিদ্যমান আছে। এই প্রোটীন আমাদের দেহের রক্ত, মাংস বাড়িয়ে কি ভাবে তার আপন নির্দিষ্ট কাজটী করে যায়, তা আমাদের ভাল করে বুঝা দরকার। আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে যে Gastric Juice (পাচক রস) রয়েছে, তাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hcl) আছে। এই এসিড্ জিনিষটা আমাদের দেহ যন্ত্রের একটী অদ্ভুত কাজ সম্পন্ন করে। সমস্ত প্রোটীন জাতীয় খাদ্যকে হাইড্রোলাইসিস্ (Hydrolysis) দ্বারা এমাইনো এসিডে (Amino Acids) পরিণত করাই এর কাজ। মূলতঃ এই এমাইনো এসিড্গুলিই আমাদের রক্তকোষে প্রবেশ করে দেহের নূতন নূতন স্নায়ুমণ্ডলী (tissues) তৈরী করে। কি অবস্থায় এবং কি ভাবে এরা আমাদের দেহ-যন্ত্রকে সাহায্য করে, এ সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ ফিশার (Dr. Ficher) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমরা যে সমস্ত প্রোটীন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি, তারা আমাদের পাকস্থলীর ক্রিয়ার পর নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করে ; যথা (১) মেটা প্রোটীন্ (Meta Protein) (২) প্রোটিওসেস্ (Proteoses) (৩) পেপটোজ্ (Poptoes) (৪) পলি পেপ্টাইড্স্ (Poly peptides) ও (৫) এমাইনো এসিড্। এদের প্রত্যেকটী রক্তকোষের ভিতর প্রবেশ করে আমাদের দেহ-গঠনের সাহায্য করে—এই ছিল ডাঃ ফিশার (Dr. Fischer) প্রভৃতি মনীষিগণের ধারণা। কিন্তু অধুনা ডাঃ হপ্কিন্স্ (Dr. Hopkins) তাঁর গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের শেষ পরিণতি হচ্ছে এমাইনো এসিড্ (Amino Acid) ; আর এই এমাইনো এসিড্গুলিই (Amino Acids) আমাদের দেহ-গঠনের সবচেয়ে বড় সহায়ক। কোন্ প্রকারের খাদ্য-বস্তু থেকে কি পরিমাণ এমাইনো এসিড্ (Amino Acids) আমরা পাই, তারও একটা হিসাব তিনি দেখিয়েছেন।

যারা সহজেই এমাইনো-এসিডে পরিণত হয়। প্রায় সমস্ত প্রাণীর এবং শাক্-সবজির স্নেহকোষের মধ্যেই প্রোটীন আছে।

প্রোটীন জাতীয় খাদ্যবস্তু—(যারা সহজেই এমাইনো-এসিডে পরিণত হয়) দুধ, ঘোল, দই, ডিম, মাংস, যকৃৎ, মাছ, আটা, চাউল, ডাল, নানারূপ শাক্-সবজি ও ফল প্রভৃতি।

প্রোটীন জাতীয় খাদ্য যাতে একেবারেই নাই—চিনি, চর্বি, তিসির তৈল, ও অন্যান্য ভেষজ তৈল।

প্রোটীন্ জাতীয় খাদ্যের অভাবে রোগনিচয়—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি, অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বিহীনতা, খর্ব্বাকৃতি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়।

(৩) (৪) স্নেহ বা তৈল জাতীয় ও শর্করা জাতীয় খাদ্য—এই জাতীয় খাদ্য আমাদের পাকস্থলীর ক্রিয়ার ইন্ধন যুগিয়ে দেহের উত্তাপ রক্ষা করে। যেমন রেলওয়ে ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে ষ্টিম তৈরী হয় না—এও ঠিক্ তেমনি। এই শর্করা জাতীয় কিংবা তৈল জাতীয় খাদ্যের অভাবেও আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয় না এবং তখনই আমাদের দেহ-যন্ত্রটী বিকল হয়ে পড়ে।

স্নেহ বা তৈলজাতীয় খাদ্য যাতে আছে :—মাখন, ঘি, মাংসের চর্ব্বি, মাছের তৈল, মাছ, যকৃৎ, নানাজাতীয় ভেষজ তৈল ও নানা প্রকার ডাল প্রভৃতি।

শর্করাজাতীয় খাদ্য যাতে আছে—চাউল, আটা, ময়দা, চিনি, দুধ, গোল আলু, সর্ব্বপ্রকারে ডাল, ফল ও শাক্-সবজি প্রভৃতি।

স্নেহ বা তৈল জাতীয় ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজই হচ্ছে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করা। তা ছাড়া আমাদের অন্যান্য খাদ্যের পরিপাকের সমতা রক্ষা করাও এর একটা কাজ। আমরা সাধারণতঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করি। চাউল, আটা, রুটী, গোলআলু প্রভৃতি আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যে অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা জাতীয় পদার্থ আমরা পাই। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, পাকস্থলীতে ঠিক্ ভাবে দগ্ধ না হওয়ায় উহা আমাদের অন্ত্রদেশে (Intestine) বায়ু

প্রোটীন থেকে প্রাপ্ত এমাইনো এসিডের নাম ও তাহার শতকরা পরিমাণ

খাদ্য বস্তুর নাম	গ্লিসিন্ (Glycine)	এলালিন্ (Alanine)	লিউসিন্ (Leucine)	গ্লুটামিক্ এসিড্ (Glutamic Acid)	টাইরোসিন্ (Tyrosine)	হিষ্টিডিন্ (Histidine)	লাইসিন্ (Lysine)	ট্রিপ্টোফেন্ (Tryptophane)	আরজিনিন্ (Arginine)	সাইটোসিন (Cytosine)
আটা	×	২·০	৬·৬	৪৩·৭	৩·৫	৩·৪	·৯	১·১	৩·২	·২
দুধ	·৪	২·৪	১৪·০	১২·৯	১·৯	২·৬	৯·০	×	১·২	১.
মাছ	×	×	১০·৩	৪০·১	২·৪	২ ৬	৭·৫	×	×	×
ডিম	২·০	৩·২৪	৬·১	১·৭৩	১·৩৩	১০·৯৬	৪ ২৮		৫ ৪২	৩১

এমাইনো এসিড্গুলি আমাদের শরীরের কত উপকারে আসে তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই আমাদের এমন খাদ্য মনোনীত করা দরকার যাতে প্রোটীন জাতীয় জিনিষ আছে। কেবল প্রোটীনের প্রতি দৃষ্টি রাখলেই চলবে না—এমন সব প্রোটীন আমাদের গ্রহণ করা উচিত

ও এসিড্ তৈরী করে ; আর তার ফলে অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি যাবতীয় রোগ আমাদের ঘরে ঘরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

স্নেহ বা তৈল জাতীয় খাদ্যবস্তু শরীরের ইন্ধন যোগান ছাড়াও আরো

কয়টী কাজ করে। উহারা আমাদের দেহে মাংসপেশীর উপরে অর্থাৎ ত্বকের নিম্নভাগে ছড়িয়ে থাকে এবং রোগের সময় যখন আমরা বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে অক্ষম হই—তখন তারাই ইন্ধন যুগিয়ে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। আমাদের দেহে লবণ-জাতীয় পদার্থের ক্রিয়ায়ও এই তৈল জাতীয় পদার্থ খুব সাহায্য করে। তা ছাড়া অনেক দুষ্ট রোগ-বীজাণুর হাত থেকেও উহারা আমাদের রক্ষা করে।

স্নেহ বা তৈল জাতীয় খাদ্যের অভাবজনিত রোগ নিচয়—এই জাতীয় খাদ্যের অভাব ঘট্‌লে আমাদের দেহে মোটেই চর্ব্বি সংগৃহীত থাকে না। তার ফলে হাত পা জলে ভর্ত্তি হয়ে উঠে।

(৫) লবণজাতীয় খাদ্য—এই লবণজাতীয় পদার্থগুলি অতি অধুনা আমাদের চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরা যে আমাদের কত উপকারে আসে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝ্‌তে পারা যায়। লবণজাতীয় পদার্থের মধ্যে এইগুলি মোটামুটি হিসাবে প্রধান—চূণ (Calcium), ফস্‌ফরাস (Phosphorus), লোহা (Iron), নিমক (Nacl) ও আইওডাইড্ (Iodide) প্রভৃতি। চূণ (C lcium) আমাদের হাড় ও দাঁত গঠনের প্রধান উপাদান। দুধ, ছানা, ঘোল, ডিমের পীতাংশ, নানা রকম ডাল ও ফলে চূণজাতীয় পদার্থ আছে। উপযুক্ত পরিমাণ চূণের অভাবে শিশুদের হাড় বৃদ্ধি পায় না ; তাই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটে। ফস্‌ফরাস (Phosphorus) আমাদের শরীরের একান্ত দরকারী জিনিষ। দেহকোষগুলিকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলাই উহার প্রধান কাজ। তা'ছাড়া আমাদের রক্তকণাকে সতেজ রাখা ও পরিপুষ্ট করাও এর একটা কাজ। দুধ, ঘোল, ডিম, ডাল, মাছ, মাংস, চাউল, আটা প্রভৃতিতে উহা আছে। লোহা আমাদের দেহের রক্তকণার প্রাণবিশেষ —রক্তকণার লালরংএর উদ্ভব এর থেকেই হয়। তা'ছাড়া লোহার আর একটী প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের ফুস্‌ফুসে (Lungsএ) অক্সিজেন (Oxygen) বহন করা। মাংস, ডিম, যকৃৎ, ডাল, ঢেঁড়স্, পেঁয়াজ, নানা প্রকার ফল, টমেটো প্রভৃতিতে লোহা বিদ্যমান আছে। আমাদের দেহে লোহার অভাব হলে রক্তহীনতা, শ্বাস-গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের ক্ষমতার হ্রাস ঘটে। নিমক (Common Sa't) আমরা রোজই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করি। নিমক আমাদের রক্তকণাকে সবল রাখে,—স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর জল জমতে দেয় না—আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনের সমতা রক্ষা করে। মাছের তৈল কিংবা শাক্‌সব্‌জি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় আইওডিন (Iodine) আমরা পাই।

* দুধ আমাদের শিশুদের প্রধান খাদ্য। শিশুদের যে সব লবণজাতীয় পদার্থ অতি প্রয়োজনীয় তার প্রায় সবই দুধে আছে। দুধ-ভস্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত লবণজাতীয় পদার্থগুলি পাওয়া যায়।

	পটেশিয়াম্ সল্ট্ (K_2O)	সোডিয়াম্ সল্ট্ (Na_2O)	চূর্ণ (CaO)	মেগ্‌নিসিয়াম সল্ট্ (MgO)	লোহা (Fe_2O_3)	ফস্‌ফরাস্ (P_2O_5)	গন্ধক জাতীয় (SO_3)	ক্লোরাইড্ জাতীয় (Cl)
শতকরা কত ভাগ	২৪'৫	১৪'৮	২২'৫	২'৬	'৩	২৬'৫	১'০	৮'৬

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে চূণ, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে দুধে আছে ; কেবল লোহার ভাগ অতি কম। এ বিষয়টা আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুদের পরিমিত পরিমাণে দুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও তারা কৃশ হয়ে পড়ে, দুর্ব্বল হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ উপযুক্ত পরিমাণ লোহার অভাবে তাদের রক্তহীনতা ঘটে। তাই একমাত্র উপায় হচ্ছে—দুধ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাজা ফলের রস খাওয়ানো।

খাদ্যের পরিমাণ—উপরিউক্ত বিষয়গুলি পাঠে দেখা যায় যে উপযুক্ত খাদ্য মনোনয়নের উপরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শরীরের সবলতা ও পরিপুষ্টি রক্ষা করে কোন জাতীয় খাদ্য কতটুকু আমাদের গ্রহণ করা উচিত, তাহাই বর্ত্তমানে আলোচ্য। সাধারণতঃ আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ বিভিন্নজাতীয় খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন—

প্রোটীন জাতীয় খাদ্য—	৮০ থেকে ৯০ গ্র্যামস্।	
স্নেহ বা তৈল জাতীয় খাদ্য—	৭০ থেকে ৮০	„
শর্করা জাতীয় খাদ্য—	৪০০ থেকে ৪৫০	„
	মোট ৫০০ থেকে ৬২০	„

অতএব আমাদের খাদ্যপরিমাণ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হলে কোন্ খাদ্য-বস্তুতে কি পরিমাণ কোন্ জাতীয় জিনিষ আছে, তার সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। নিম্নে খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণের একটী তালিকা দেওয়া গেল। এর থেকে খাদ্যবস্তুর বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে।

খাদ্য বস্তুর নাম	প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ শতকরা কত ভাগ আছে ;	স্নেহ বা তৈল জাতীয় পদার্থ শতকরা কত ভাগ আছে ;	শর্করাজাতীয় পদার্থ শতকরা কত ভাগ আছে ;
চাউল	৬'২	১'২	৭৫'৬
আটা	৬ ৫	১'১	৬৮'০
ভুট্টা	১০'৪৬	৪'৫	৭১'২
যব	১২'০	১'৯	৭০'২
গোল আলু	২'২	০৫	২১'৭
ডাল	১০'৪	১'৬	৫৪'০

মাংস	২০'০	৬'৬	×
মাছ	১৬'৩	৪'২	×
গরুর দুধ	১'৫	৩'৩	৭'৫
মহিষের দুধ	২'২	৭'২	৩ ৬
ছাগলের দুধ	৩'০	৪'৬	৫'০
দই	২'৩	১'৭	১'২
শাক্-সবজি	'৮	'০৭	১'২
উদ্ভিজ্জ্য তৈল	×	৪৬	×
ঘি	×	৩৭'২	×
শালগম, গাজর	১'৮	'১৬	১২ ৫
কপি (বাঁধা)	৩'৭	'৭	৮'০
সীমের বীচি	২৫'০	১০৫	৪৯ ২
আম	'৮	'৫	৮'২
আনারস	'৪৬	×	১৩'০
নারিকেল	২'৭	২৩'৮	১২'৮
চিনাবাদাম	২৭'৫	৪৪'৫	১৫'৭

উপরিউক্ত খাদ্যবস্তুর বিশ্লেষণ থেকে খাদ্যের স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত নয় এবং এর থেকে সব জাতীয় খাদ্যের পরিমিতরূপ সংগ্রহই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত খাদ্য। দৈনন্দিন কিরূপ খাদ্য মনোনয়নের উপর আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি নির্ভর করে তারও একটা মোটামোটি হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

খাদ্য বস্তুর নাম	পরিমাণ	কতটা প্রোটিন পাওয়া যায়	কতটা তৈল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়	কতটা শর্করাজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।
চাউল	৩ ছটাক=১৮০ গ্র্যামস্ ;	১১'১৬ গ্র্যামস্ ;	২'১৬ গ্র্যামস্ ;	১৩৫'৬ গ্র্যামস্।
ডাল	১ ছটাক=৬০ "	৬'৪৮ "	৯'৬ "	৩২'৪ "
মাছ	৪ ছটাক=২৪০ "	৩৮'০ "	৭'৮ "	×
তৈল	১ ছটাক=৬০ "	× "	২৪ ৬ "	×
আটা	৫ ছটাক=৩০০ "	২০'০ "	৫'৪ "	২০৪'০ "
আলু	২ ছটাক=১২০ "	২'৬ "	'৭ "	২৫'৮ "
শাক্-সবজি	২ ছটাক=১২০ "	১'০ "	'০৮ "	১৪ ৪ "
দই	২ ছটাক=১২০ "	২'৭ "	২'১ "	১'৪ "
নারিকেল	১½ ছটাক=৯০ "	১'৬ "	২১'৩ "	৯'১ "
অন্যান্য ফল	১ ছটাক=৬০ "	১'২ "	'৮ "	৮'৫ "
		মোট ৮৪'৭৪	৭৩ ৫৪	৪০১ ৭

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আমাদের দৈনন্দিন ৮০ থেকে ৯০ গ্র্যামস্ প্রোটিন, ৭০ থেকে ৮০ গ্র্যামস্ তৈলজাতীয় পদার্থ ও ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্র্যামস্ শর্করাজাতীয় পদার্থের দরকার। উপরিউক্ত তালিকায় এই পরিমাণ খাদ্যের সাদৃশ্য দৃষ্ট হবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে, দারিদ্র্য আমাদিগকে চারি দিকে ঘিরে আজ পঙ্গু করে তুলেছে—এটা অতি সত্য কথা। তবু শুধু রসনার পরিতৃপ্তির জন্য কতকগুলি অখাদ্য খেয়ে যাতে আমাদের অর্থ নষ্ট না হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের অবস্থানুযায়ী অর্থ খরচ করে আমাদের যথার্থ উপকারী খাদ্য-বস্তুগুলি মনোনীত করা বিশেষ ভাবনার বিষয় নয়। আসল ভাবনা হচ্ছে—এ দিকে আমাদের মোটেই দৃষ্টি নেই। খাদ্য-বস্তু মনোনয়নে শিথিলতা আর অবহেলাই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। তার পর আর একটা দিকেও আমাদের একটা বড় সমস্যা আজ চোখের উপর রয়েছে—সেটা হচ্ছে রান্নার ব্যাপারটা। আজ ঘরে ঘরে উড়ে পাচকের অস্তিত্বটা একটা অতি আধুনিক সভ্যতা বলে গণ্য করা হয়। তার শ্রীহস্তে যে রন্ধন ব্যাপারটা ঘটে—তাতে না থাকে ভাইটামিন—না থাকে অন্য কোন

সার পদার্থ। অত্যধিক মসলার প্রয়োগে আর ভাজার ফলে ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায় ; আর প্রোটীন, স্নেহ ও শর্করাজাতীয় পদার্থগুলি স্বাভাবিক গুণগুলি হারিয়ে বসে। কাজেই মুখরোচক এই অখাদ্যগুলি খেয়েই পেটের জ্বালা নিবারণ করতে হয়। তাই না থাকে আমাদের স্বাস্থ্য, না থাকে আমাদের বল, না থাকে আমাদের মানুষের মত বাঁচবার ক্ষমতা। ঘরে ঘরে মা-লক্ষ্মীদের কল্যাণ-হস্ত রান্না-ব্যাপারটা সংশোধিত করে আবার আমাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুক—শক্তি ফিরিয়ে আনুক—এই একমাত্র কামনা।

কল্পতরু

"যক্ষ্মারোগ ও ভাওয়ালী"

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সাহা

মা-ভৈঃ ! পাঠকগণ আশ্বস্ত হউন—ইহা ভ্রমণ-কাহিনী বা উপন্যাস নহে। ইহা কুমায়ুন পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত একটী স্বাস্থ্য-নিকেতন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। যে ভীষণ যক্ষ্মারোগ ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিছু দিন পূর্ব্বে যে রোগের চিকিৎসা নাই বলিয়া সকলে ইহাকে শিব-অসাধ্য রোগ বলিয়া জানিতেন, এখন তাহার চিকিৎসা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেকটা সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চিকিৎসায় অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়া, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ব্যাধিমুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। আমাদের বাংলা দেশে অনেক সময়ে লোকে যাহাকে জীর্ণজ্বর বা খুসখুসে কাস বলিয়া মনে করেন, তাহা সম্ভবতঃ এই যক্ষ্মার রূপান্তর মাত্র। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ইহা কিরূপ সংক্রামক ব্যাধি! দেশে ভেজাল খাদ্যের বিস্তারে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী যেরূপ স্বাস্থ্য ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে—রোগও ততই দুর্ব্বল মনুষ্য-দেহে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভারতবর্ষে এখন এ রোগের এত প্রাদুর্ভাব যে, সমস্ত প্রদেশেই অতি শীঘ্র স্যানাটারিয়া-চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়—ইহাই বিশেষজ্ঞদিগের মত। অথচ বাংলার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে এত দান-বীর এবং দেশপ্রাণ লোক থাকিতেও বাংলাদেশে একটীও স্বাস্থ্য-নিবাস নাই। যে দেশে, দেশবন্ধু, মহারাজ বিজয়চাঁদ, মহারাণী স্বর্ণময়ীর বংশধরের মত দানবীরেরা বর্ত্তমান, সে দেশে যে একটী স্বাস্থ্যনিবাস নাই, ইহা বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। এ অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে বাংলাকে কে রক্ষা করিবে? যে দেশে ডাঃ স্যার নীলরতন ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত দেশপ্রাণ বর্ত্তমান, সেই দেশের স্বাস্থ্য-সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? ডাঃ সরকার ও ডাঃ রায় কি বাংলা দেশকে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন না? বাংলা কি আজ অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে? যুক্তপ্রদেশই কি আজ বাংলাকে এ কঠিন রোগের হাত হইতে মুক্তি দিবে? মাভৈঃ! পাঠকগণ জানিয়া রাখুন লোটনী ভাওয়ালীর কথা। হিমালয়াবস্থিত ভাওয়ালী একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা নৈনিতাল জিলার অন্তর্গত। ইহার প্রচলিত নাম ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়াম। এই ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে যুক্তপ্রদেশের রোগীদের স্থান হইয়া যদি 'বেড' খালি থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে অথবা অন্যান্য প্রদেশের লোককে স্থান দেওয়া হয়। কাজেই অনেক বাঙ্গালী এখানে আবেদন করিয়াও স্থান পান না। এই স্বাস্থ্য-নিবাসে যক্ষ্মারোগী ভিন্ন অন্য কোন রোগীকে স্থান দেওয়া হয় না। কাজেই যক্ষ্মা রোগী ভিন্ন অন্য কোন রোগী যেন ভুল বশতঃ এখানে না আসেন। ভাওয়ালী আসিতে হইলে, রোহিলখণ্ড কুমায়ুন (আর, কে, আর,) রেলের কাঠগুদাম ষ্টেশনে নামিতে হয়। কলিকাতা হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসে বেরিলী ভায়া কাঠগুদামে আসিতে হয়। কাঠগুদাম হইতে বাইশ মাইল মোটর-যোগে ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়ামে পৌঁছিতে হয়। বিরভট্টি হইতে অন্য লাইন নৈনিতাল অভিমুখে গিয়াছে। যাহারা ভাওয়ালী অথবা আলমোড়ার যাত্রী, তাহাদিগকে নৈনিতাল সার্ভিসএ না উঠিয়া, ভাওয়ালী-আলমোড়া মোটর সার্ভিসএ উঠিতে হইবে, নতুবা অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা বেশী। ভাওয়ালী বাজার হইতে স্যানিটেরিয়াম এক মাইল দূরে অবস্থিত। কাজেই যাঁহারা স্যানিটেরিয়ামে যাইবেন, তাঁহাদিগকে স্যানিটেরিয়াম ফটকে নামিতে হইবে, নতুবা ভাওয়ালী বাজারে মোটর লইয়া যাইবে। ফটকে নামিয়া উপরে অফিসে যাইয়া খবর দিলে রোগীদের জন্য অবস্থানুসারে, ডাণ্ডি বা ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থা আছে। স্যানিটেরিয়ামে আসিতে হইলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে নিয়মাবলী আনাইয়া তদনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হয় ; এবং তদুত্তরে যদি তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এখানে আসা উচিত ; নচেৎ বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়।

এখানে থাকিবার অন্য কোন স্থান নাই। কয়েকটী ভদ্রলোক অনাহূত আসিয়া সপরিবারে যে কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। অথচ ইহার কোন প্রতিকারই সম্ভব নহে। কারণ 'বেড' সময়-সময় খালি থাকিলেও তাহা অপরকে দেওয়া চলে না—উহা পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভ হইয়া থাকে। ফেব্রুয়ারী, জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন করিলে স্থান পাওয়ার অধিক সম্ভাবনা। ভাওয়ালী সমতল ভূমি হইতে ৫৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে পাইন ও দেবদারু বৃক্ষই অধিক দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। পাইন বৃক্ষের হাওয়া ঐ রোগ হইতে আরোগ্য লাভের পক্ষে বিশেষ সহায় করে, ইহাই নূতন চিকিৎসকদের মত। যাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও এ রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ—তাঁহাদের ভ্রম বশতঃ দেওঘর, পুরী, সিমুলতলা, মধুপুর, ঝাঁঝা, বিন্ধ্যাচল, চুনার, প্রভৃতি স্থানে না যাইয়া, ভাওয়ালীর মত স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া একান্ত উচিত। স্যানিটেরিয়ামে 'বেড্' পাওয়া না গেলেও, ভাওয়ালী বাজার অথবা নিকটস্থ ফুলমণি কটেজ, নবাব কটেজ্‌ এবং হয়সৌলী, ভুমিয়াধারা নামক স্থানে ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত বাড়ীর ভাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকার মধ্যে হইয়া থাকে। সিজন হিসাবে ভাড়া লইলে কতকটা সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মার্চ্চ মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানকার জলবায়ু ভাল ; তন্মধ্যে সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শীত বেশী থাকে বলিয়া উক্ত কয় মাস স্যানিটেরিয়াম বন্ধ থাকে। মার্চ্চএর মাঝামাঝি খুলিয়া নূতন বৎসরের কার্য্য পরিচালনা করা হইয়া থাক। সিমলার নিকট ধর্ম্মপুরেও একটী স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। ধর্ম্মপুর অপেক্ষা ভাওয়ালীর চিকিৎসা প্রণালী অনেক ভাল এবং চিকিৎসক বিশেষ বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ। সেজন্য অনেকে স্যানিটেরিয়ামে "বেড" না পাওয়া সত্ত্বেও বাহিরে বাটী ভাড়া করিয়া এই চিকিৎসকের অধীনে থাকেন; স্যানিটেরিয়ামে যাঁহারা ইয়োরোপিয়ান ওয়ার্ডে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের জন্য আহার ও বাসস্থানের বাবত মাসিক ১৫০৲ টাকা ২০০৲ শত টাকার মধ্যে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। ভারতবাসীদের জন্য এ, বি, সি, ডি, ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডি ওয়ার্ড যুক্তপ্রদেশের গরীব রোগীদের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অন্যান্য প্রদেশের কোন রোগীকে ডি ওয়ার্ডে লওয়া হয় না। এ বি, এবং সি ওয়ার্ডে প্রত্যেক প্রদেশের লোকই লওয়া হয়। প্রত্যেক প্রদেশের লোকের নিকট হইতে পূর্ব্বে সমান ভাবে স্যানিটেরিয়াম ফী লওয়া হইত। বর্ত্তমান বৎসর হইতে অন্যান্য প্রদেশের রোগীদের নিকট হইতে দ্বিগুণ হিসাবে লওয়ার ব্যবস্থা কমিটি ধার্য্য করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের রোগীদের জন্য ১৯৩০ সাল হইতে কমিটি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোককে বর্ত্তমান বৎসর হইতে দ্বিগুণ হিসাবে ফী দিতে হইবে। ইহা বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ যে সুবিধাটুকু এত দিন পাইয়া আসিতেছিল—বর্ত্তমান বৎসর হইতে সে সুবিধাটুকু নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল,—বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা চিরকালই রহিয়া গেল। যে ভাওয়ালী হইতে দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহু বাঙ্গালী ব্যাধিমুক্ত হইয়া বঙ্গ জননীর কোলে ফিরিয়া আসিয়া, ভাওয়ালীর কথা বাঙ্গালীকে জানাইবার জন্য মাসিক পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালী যে ভাবে সেই ভাওয়ালীতে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসক—স্যানিটেরিয়াম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর. কে, কেকার, এল.এম.এস, টি, ডি, ডি ওয়েল্স, মহোদয় বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালা আমাকে দিন দিনই অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালায় যক্ষ্মারোগ দিন দিন যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গালা সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া, বাঙ্গালীর জন্য শিলং অথবা আলমোড়ার মত স্বাস্থ্যকর স্থানে শীঘ্রই স্যানিটেরিয়াম স্থাপন করা একান্ত উচিত। নতুবা বাংলা যক্ষ্মা রোগে উৎসন্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ভাওয়ালীর মত স্বাস্থ্যকর স্থানেও আজ বাঙ্গালীর স্থান রহিল না। ইহা বাংলার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। যে ভাওয়ালী হইতে এতদিন বহু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-সন্তান অল্প ব্যয়ে ব্যাধি-মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, সেই সুবিধাটুকু নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালীর দুঃখের সীমা রহিল না।

স্যানিটেরিয়াম ওয়ার্ড ফী—

(যুক্ত প্রদেশ)	(বিভিন্ন প্রদেশ)
(এ) ওয়ার্ড ৮০৲ টাকা......	১২০৲ টাকা প্রতি মাসে
(বি) ওয়ার্ড ৪০৲ টাকা......	৬০৲ টাকা প্রতি মাসে
(সি) ওয়ার্ড ২০৲ টাকা......	৩০৲ টাকা প্রতি মাসে

(ডি) ওয়ার্ডে যুক্ত প্রদেশের রোগীদের সুবিধার্থে গরীব রোগী-দিগকে বিনা-ভাড়ায় থাকিবার ও বিনা ব্যয়ে আহারের ব্যবস্থা কমিটি ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। এ, বি, সি, ওয়ার্ডের রোগীদিগকে নিজ ব্যয়ে আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত একজন রোগী সি, ওয়ার্ডে মাসিক ৮০ টাকাতে অনায়াসে চলিতে পারেন।

ইনজেক্শান ও পেটেন্ট ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য মোটামুটি ঔষধ স্যানি-টেরিয়াম ঔষধালয় হইতে দিয়া থাকে। এখানে নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার চিকিৎসা প্রচলিত—

১ম, ক্লোরিন গ্যাস, ২য় লিপিয়ন, ৩য়, স্যানোক্রাইসিন, ৪র্থ, নিওমোথোরাক্স। যে সমস্ত রোগীর বহুমূত্র, (ডায়াবিটিস্) এবং অজীর্ণতা (ডিসপেপ্‌সিয়া) বর্ত্তমান, তাহাদের পক্ষে কোন পার্ব্বত্য স্থানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে বরং উপকার না হইয়া অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশের স্ত্রীলোকদের জন্য বিনা ভাড়ায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে। তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্যান্য প্রদেশের স্ত্রী-রোগীদের থাকিবার বিশেষ কোন সুবিধা না থাকিলেও (এ) অথবা (বি) ওয়ার্ড ভাড়া নিয়া থাকিবার ব্যবস্থা আছে। যদি বাংলার জন্য আলাহিদা স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দাতৃগণ ভাওয়ালী ধর্ম্মপুরের স্বাস্থ্য-নিবাসে বাঙ্গালীর জন্য এক-একটি কুটীর দান করিলেও অনেকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। বিকানীর, বলরামপুর, প্রতাপগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজামহারাজগণ এইরূপ এক-একটি কুটীর দান করিয়া স্ব-স্ব দেশবাসীর কষ্টের লাঘব করিয়াছেন। আমাদের দেশের পরহিতব্রত দানবীরগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হউন। অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, এরূপ এক একটি কুটীর নির্ম্মাণ ও পরিচালনের জন্য প্রায় দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। স্যানিটেরিয়াম কুটীরগুলির মধ্যস্থলে ঔষধালয় ও ল্যাবরেটরী গৃহ অবস্থিত। রোগীদের জন্য বিশ্রামগৃহ বা খেলঘর রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক রোগীর অবস্থাবিশেষে, গ্রামোফোন, কেরেম-বোর্ড, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি এবং সকলের পাড়বার উপযোগী পুস্তকাদির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক রোগীর কক্ষগুলি বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উপযোগী ব্যবহার্য্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত। ভাওয়ালী স্থানটী অতি মনোরম। ভাওয়ালী বাজার হইতে স্যানিটেরিয়াম এক মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও ভাওয়ালী নামেই ইহা অধিক পরিচিত। ভাওয়ালী বাজার মাঝারী গোছের ও এখানে মোটামুটি নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রায় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস ও ঔষধালয় আছে। স্যানিটেরিয়াম-প্রাঙ্গণে একটি বেণের দোকান আছে। রোগীদের দৈনিক আহার্য্য জিনিসপত্র বেণেই যোগাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু বেণে অধিক মূল্য আদায় করিতে ছাড়ে না। দ্রব্যমূল্য,—দুগ্ধ প্রতি সের চারি আনা। ডিম প্রতি ডজন বার আনা হইতে এক টাকা। মাসে প্রতি

সের দশ আনা হইতে বার আনা। মুরগী (ফাউল) প্রত্যেকটা পাঁচসিকা হইতে দুই টাকা। ঘৃত, প্রতি সের সাতসিকা হইতে দুই টাকা। চাউল টাকায় দুই সের। তরি-তরকারী দুষ্প্রাপ্য না হইলেও অত্যধিক মূল্য বেশী. তন্মধ্যে আলু এবং ঢেঁড়শই প্রধান। ফলাদি দুষ্প্রাপ্য না হইলেও ইহার মধ্যে সম্ভপক চেরী, কায়ফল. পিচ, খোবানী, আপেল, নাশপাতী, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্য মাঝে মাঝে আসিয়া থাকে, প্রতি সের দেড় টাকা দুই টাকা। তাহা না কি মহা-সৌল মৎস্য।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল ম্যানিফোল্ড রামপুরের নবাবের নিকট স্যানিটেরিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সময়ে নবাব সাহেবের পরিবারবর্গের ভিতর এই ব্যাধি দেখা দিয়াছিল। রামপুরের নবাব সাহ্লাদে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া স্বয়ং পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন। যুক্তপ্রদেশে স্বর্গীয় সম্রাটের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, কুমায়ূন পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি স্যানিটোরিয়ামই সম্রাটের স্মৃতি-মন্দির হউক। মেজর ওয়াল্টন স্থান নির্ব্বাচনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, হৃষীকেশ, রামনগর, নৈনিতাল, আলমোড়া, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মনের মত স্থানগুলি পূর্ব্বেই কোথাও সৈনিক-বিভাগের দ্বারা, কোথাও চা কর প্রভৃতির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। কোথাও সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা-মত স্থান নির্ব্বাচন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কোন স্থান গাড়ীর পথ হইতে অতি দূরে, কোন স্থানে জল পাওয়া দুঃসাধ্য, কোথাও শীতাধিক্য—এইরূপ বহু বাধা তাঁহার সম্মুখীন হয়। এমন অবস্থায় রামপুরের নবাব সাহেব ভাওয়ালীর সন্নিকটে লোটনী শিখরে অবস্থিত তাঁহার দুইটি জমিদারী দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এখানে পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার অসুবিধা হইলেও, কাজে আসার উপযুক্ত কয়েকটি ইমারতও পাওয়া গেল। ইহাতে কমিটীর প্রায় ষাট হাজার টাকার সুবিধা হইল। এখানকার একমাত্র অসুবিধা যে, এখানে অধিক বারিপাত হয়। কমিটিও এই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেজর ককরেন প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। মৃত সম্রাটের স্মৃতি-রক্ষার্থেই ইহার নাম রাখা হইয়াছে, King Edward VII Sanatorium। উক্ত নামেই ইহা পরিচিত।

বর্ত্তমান স্যানাটোরিয়াম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ আর, কে, কেকার. এল, এম-এস, টি-ডি-ডি-ওয়েল্‌স মহোদয় অতি সুবিজ্ঞ, ধীর, ভদ্র চিকিৎসক। ইঁহার সদয় ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার নিকট কোন ইতর-বিশেষ নাই। ইনি সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন। ইনি যুক্তপ্রদেশের উচ্চবংশীয় লোক হইলেও বাঙ্গালী ও অন্যান্য প্রদেশের লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ শ্রীখণ্ডি, এম-বি, বি-এস, মহোদয়ের ব্যবহারও বিশেষ প্রশংসনীয়।

এইবার আমি স্বাস্থ্য-নিবাসের নিকটস্থ দু-একটী স্থান সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিব। ভাওয়ালী হইতে নৈনিতাল পাঁয়দলে মাত্র পাঁচ মাইল, আলমোড়া মোটরযোগে পঞ্চান্ন মাইল, রাণীক্ষেত পঁচিশ মাইল (এখানে সেনানিবাস) ভীমতাল চার মাইল, রামগড় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বদরী-নারায়ণ বা বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রীরা আলমোড়া বা রাণীক্ষেত হইয়া এই পথেই ফিরিতেন। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকবার কলেরা হওয়ায় এখন এ পথে আর যাত্রীদের আসিতে দেওয়া হয় না। ভীমতাল ভাওয়ালী হইতে দুই হাজার ফিট নীচে ও কিছু অধিক গরম। ভীমতাল হ্রদের শোভা এই পর্ব্বতমালার মধ্যে অতি সুন্দর। এই হ্রদের তিন দিকে ইংরেজদের কুটীর ও হোটেল অবস্থিত। পূর্ব্বে অনেকেই স্বাস্থ্যলাভের জন্য আলমোড়ায় যাইতেন। কিন্তু রেল ষ্টেশন হইতে অধিক দূরে বলিয়া যাওয়া বড়ই কষ্ট-সাধ্য। রেল ষ্টেশন হইতে আলমোড়া ৭৫ মাইল, মোটরযোগে অতিক্রম করিতে হয়। আলমোড়া, শুনিতে পাই, ভাওয়ালী বা নৈনিতাল হইতে অধিক স্বাস্থ্যকর। ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়াম হেতু আলমোড়া হইতে এখানে রোগীর সংখ্যা অধিক। ভাওয়ালী বা নৈনিতালে হারাহারি বারিপাত প্রায় একশত ইঞ্চি হয়। আলমোড়ায় ইহা হইতে অনেক কম। আলমোড়ায় বাটী ভাড়া ও খাদ্যদ্রব্য ভাওয়ালী এবং নৈনিতাল অপেক্ষা অনেক সস্তা—আলমোড়ায় মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক একজন একটি চাকর লইয়া থাকিলে মাসিক ব্যয় ৭০৲ টাকার মধ্যে বেশ চলিতে পারে। ভাওয়ালী অপেক্ষা আলমোড়া এক হাজার ফিট নীচু বলিয়া তথায় শীত একটু কম হইয়া থাকে। শীতঋতুতে স্যানাটেরিয়ম হইতে অনেক রোগীকে আলমোড়ায় যাইবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। আলমোড়ায় ডাঃ খজানচান্দ, এম-বি, বি-এস, মহোদয়ের ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি অতি ভদ্র চিকিৎসক। এ প্রদেশের মধ্যে নৈনিতালই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য সহর। নৈনিতালই যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস—সেই জন্য এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এখানে খুব জমজমাট থাকে। হ্রদের চারি দিকে পাহাড় এবং এই পাহাড়ের গায়েই সরকারী অফিস, কাছারী ও বড়লোকের বাংলা। হ্রদটী যেন পাহাড়ের মধ্যে ঘুমাইয়া আছে, এত শান্ত, এত স্থির। তল্লিতাল ও মল্লিতাল নামে দুইটী বাজার আছে। তল্লিতালে একটি পোষ্ট অফিস আছে এবং তাহার তলদেশ দিয়া একটি গন্ধক ঝরণা প্রবাহিত। এখানে "চীনা" নামক একটী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আছে। চড়াই বড় কঠিন ; কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়া উপরে উঠিতে পারিলে, এখান হইতে চিরতুষার-ধবলিত হিমালয়ের নন্দাদেবী প্রভৃতি শৃঙ্গ দেখিয়া নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়। চীনা হইতে সমগ্র নৈনিতালের দৃশ্যও বড় সুন্দর। নৈনিতাল হইতে অনেক বড়লোক এবং ইংরেজগণ ভাওয়ালী স্যানাটেরিয়াম দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন।

স্যানাটেরিয়ামে যে প্রণালীতে চিকিৎসা হয়, বম্বার এরূপ চিকিৎসা অন্য কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। এখানকার চিকিৎসায় একেবারে আরোগ্য না হইলেও, অনেকে যে কার্য্যক্ষম হইয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এরূপ রোগীর সংখ্যা কম নহে। তবে রোগের প্রারম্ভেই আসিলে উপকার হয়, নচেৎ সন্দেহস্থল হইয়া পড়ে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদের মতে যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে যে সকল বিধি-নিষেধ অবশ্য-পালনীয়, তাহা নীচে

লিপিবদ্ধ করিতেছি। রুগ্ন অবস্থায়, এমন কি, আরোগ্যলাভ করার পরও সকল নিয়ম পালন করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা পুনরায় আক্রান্ত হইবার বেশী সম্ভাবনা।

(১) পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত বায়ু সেবন ও বিশ্রামের উপরই যক্ষ্মা রোগীর ভবিষ্যত নির্ভর করে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, ধূলা বালিযুক্ত স্থানে ভ্রমণ, সিনেমা থিয়েটার এবং স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি অতিশয় ভয়াবহ ও বিশেষ অনিষ্টকর। জ্বরের অবস্থায় অতিশয় শীতের সময়ও কদাচ মুখ ঢাকিয়া শুইতে নাই। পর্য্যাপ্ত গরম কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া, রাত্রি-দিন গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। মুক্ত বায়ুতে যক্ষ্মা রোগীর ঠাণ্ডা লাগে না।

(২) জ্বরের অবস্থায় একবারও বিছানা হইতে উঠা নিষেধ। জ্বরের সময় বেড়াইলে জ্বরের বৃদ্ধি ও শক্তির হ্রাস হয়।

(৩) আরোগ্যের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে। এ রোগ অল্পে-অল্পে সারে ও অল্পে-অল্পে বাড়ে।

(৪) প্রচুর বলকারী খাদ্য—ডিম, মাখন, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস ইত্যাদি আহার করা একান্ত প্রয়োজন—পেটের গোলমাল না থাকিলে কদাচ আহার ছাড়িবে না—জ্বরের অবস্থাতেও নহে। প্রতি সপ্তাহে একবার অন্ততঃ শরীরের ওজন লওয়া উচিত। ওজন কমিয়া গেলে আহারের উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে।

(৫) সকালে ও বৈকালে থার্ম্মমিটার দিয়া জ্বর দেখা উচিত। আধ মিনিটের থার্ম্মমিটার হইলে পাঁচ মিনিট ধরিয়া জিহ্বার নীচের উত্তাপ লওয়া উচিত। বগলের উত্তাপ যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে কোন উপকারে আসে না। উত্তাপ লইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মুখ খুলিতে, কথা কহিতে বা কিছু খাইতে নাই। ঘুম ভাঙ্গিবার পর (বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে) সকাল ৬টায় ৯৭·২ ডিগ্রি উত্তাপ হওয়া উচিত। এবং বৈকালে চারিটায় ৯৮·৪ পর্য্যন্ত হইলে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ নাই। ইহার বেশী উত্তাপ উঠিলে মনে করিতে হইবে শরীরের অবস্থা একটু খারাপের মুখে। স্ত্রীলোকদের উত্তাপ পুরুষ রোগীদের অপেক্ষা ৪° পয়েন্ট অধিক হয়। যদি সকালে ৯৮° হয়, বা বৈকালে ৯৯° হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত উত্তাপ না কমিয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই শয্যাত্যাগ করা উচিত নহে—ইহাই সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদের মত। বিশ্রামই জ্বরের একমাত্র ঔষধ। যখন জ্বর থাকিবে না, তখন ভ্রমণ শ্রেয়ঃ। জ্বরের সময় ব্যায়াম বিষবৎ অনিষ্টকর।

(৬) যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ধীরে ধীরে বেড়ানই একমাত্র হিতকর ব্যায়াম। ঘণ্টায় দুই মাইলের অধিক বেগে ভ্রমণ করা উচিত নহে। সন্ধ্যায় ও সকালে বেড়ান বিধেয়, দ্বিপ্রহরে নিষিদ্ধ।

(৭) ধূম বা মদ্যপান পরিত্যাজ্য। কোন বলকারী খাদ্য নিষিদ্ধ নহে। তবে উহা সহজপাচ্য হওয়া উচিত। অতিরিক্ত মসলার তরকারী বিশেষ অনিষ্টকর। পেটের গোলমাল যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে পেটের পীড়া বড় অনিষ্টকর।

(৮) ঔষধের উপর অতি বিশ্বাস রাখা উচিত নহে। পেটেণ্ট ঔষধ অনর্থক অর্থ-ব্যয়। সহ্য হইলে কডলিভার অয়েলই সেবন করা উচিত। ইহাতে বল ও মেদ বৃদ্ধি করে।

(৯) শ্লেষ্মা যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নহে। শ্লেষ্মাতে যক্ষ্মার বীজাণু থাকে, তাহাই অপরে সংক্রামিত হয়। শ্লেষ্মা পুড়াইয়া বা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

(১০) দুগ্ধ (খাঁটি) যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে অতিশয় উপকারী। অন্ততঃ এক সের হইতে দেড় সের দুধ প্রত্যহ পান করা উচিত।

(১১) রাত্রি জাগরণ করা উচিত নহে। আহার নিদ্রা সমস্তই নিয়মিত সময়ে হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৭ লক্ষ। যক্ষ্মায় পরিমাণ কেহ খোঁজ রাখেন কি? শুধু কলিকাতা সহরেই প্রায় এগার হাজার লোক যক্ষ্মায় ভুগিতেছেন। ডাঃ বেণ্ট্‌লী বলেন, বাংলা দেশে যত লোক সর্ব্বব্যাধিতে মরে, তার এক-দশমাংশের মৃত্যুর কারণ এই কাল-ব্যাধি যক্ষ্মা। কলিকাতা সহরে শতকরা ৮টি মৃত্যু ঘটে যক্ষ্মারোগে। এই রোগটির সহরেই বেশী প্রাদুর্ভাব। বদ্ধগৃহে, আলোক-বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে, বস্তিতে অথবা গলিতে যাহাদের বাসগৃহ অবস্থিত, তাহাদের মধ্যেই এই রোগের বহুল বিস্তৃতি দেখা যায়। যক্ষ্মারোগের কারণ বহুবিধ—সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে অবরোধ-প্রথা ও দারিদ্র্যের ফলেই বহু লোকের যক্ষ্মা হয়। কলিকাতার মত সহরে হাজার-করা ২০টি পুরুষ যেখানে মরে, সেখানে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার প্রায় ৪০টি।

ইহা ব্যতীত যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা, এক হুঁকায় তামাক খাওয়া, রেষ্টুরেণ্ট অথবা চায়ের দোকানে এক পাত্রে খাওয়া, ধূলিকণাপূর্ণ দোকানের খাবার খাওয়া, অথবা একত্রে খাওয়ার ফলে বহু লোকের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয়। রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়িলে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করা যায়। আলো ও বাতাস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। এ রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে ঘরে খোলা হাওয়া এবং উপযুক্ত আলো প্রবেশ করে, সেইরূপ ঘরে বাস করা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি প্রচার করা, তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় রোগ নির্দ্ধারণ বিষয়ে সাহায্য করা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তব্য। দেশময় উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। আলোকচিত্র ও বায়োস্কোপ সাহায্যে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার করা প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সমস্ত বিধি-নিষেধ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা উচিত। প্রত্যেক রোগীকেই মুক্তিলাভ হওয়ার পর, সব দিক বিবেচনা করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত বায়ু সেবন ও বিশ্রামের উপর যতটুকু তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—ঠিক ততটুকু নির্ভর করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপর। স্যানাটোরিয়ামে রোগীদিগের জন্য যে প্রণালীতে সময়ের নির্দ্দিষ্ট তালিকা করা হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। প্রাতে ৬টায় গাত্রোত্থান এবং বিছানা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মুখে পাঁচ মিনিট থার্ম্মমিটার দ্বারা টেম্পারেচার লইতে হইবে।

২। ৬৷৹ হইতে ৭টার মধ্যে প্রাতঃরাশ। তৎপর ৭টা হইতে ৮৷৹ মধ্যে মর্ণিংমিল (Break-fast) দুগ্ধ, ডিম, টোষ্ট মাখন ইত্যাদি।

৩। ৭৷৹টা হইতে ৮৷৹ পর্য্যন্ত (Visit the Doctor walking Patients) ভ্রমণোপযোগী রোগীদিগকে ডাক্তার দেখিয়া থাকেন।

৪। ৮৷৹টা হইতে ১১৷৹টা পর্য্যন্ত ভ্রমণ, খেলা-ধূলা ও নিজ-নিজ কার্য্য।

৫। ১১৷৹টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোগীকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বিশ্রাম করিতে হইবে। তৎপর ১২টা হইতে ১২।৫ মিনিট পর্য্যন্ত মুখে থার্ম্মমিটার দ্বারা টেম্পারেচার লইতে হইবে, পরে স্নান ও মধ্যাহ্ন ভোজন কার্য্য সমাধা।

৬। ১০৷৹টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোগীকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বিশ্রাম করিতে হইবে। তৎপর ৪টা হইতে ৪টা ৫ মিনিট পর্য্যন্ত টেম্পারেচার লওয়া। (Walking Patients only) এবং ৪৷৹টায় দুগ্ধ পান (Afternoon meal Tea) ও পরে বিশ্রাম, খেলা ধূলা।

৭। ৫টা হইতে ৫।৫ মিনিট পর্য্যন্ত বিছানাগত রোগীদিগকে টেম্পারেচার লইতে হইবে (Bed Patients only)।

৮। ৬৷৹টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সমস্ত রোগীদিগকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বিশ্রাম করিতে হইবে।

৯। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭৷৹টার মধ্যে প্রত্যেক রোগীকে ইভিনিংমিল (Dinner) শেষ করিতে হইবে। পরে ৭৷৹টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম ও খেলাধূলা (As Prescribed)। ৯৷৹টায় দুগ্ধ পান ও তৎপর শয়ন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক রোগীর উপরিউক্ত নিয়ম পালন করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সমস্ত রোগী নিয়মের ব্যতিক্রম করে বা ইচ্ছানুরূপ চলে, তাহাদিগকে স্যানাটোরিয়াম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত বিধি-নিয়মই স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসার একমাত্র উপায়।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার পুরাতন ছড়া ও কবিতাদি

ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সকল বিষয়েই কেমন কৌশল সহকারে ব্যবসা করিত, তাহা সকলেই বেশ জানিত। তাই সে সময় হিন্দুস্থানীরা এই কথা বলিত—

"সাহেব মেরা বেনিয়া, করে সকল ব্যাপার।
বিন ডারি বিন্ পলরা, যোখে সকল সংসার।"

—

নবাব রেজা খাঁর অত্যাচার ও ছিয়াত্তরের মম্বন্তর উপলক্ষে কোন কবি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"নদ নদী খাল বিল সব শুকাইল,
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত মাল কিনিয়া বাজারে,
দেশ ছারখার গেল রেজা খাঁর ডরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর,
ছিয়াত্তরে মম্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর।
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে,
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

—

কান্ত বাবুর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ছড়া হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"কান্তবাবু হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায়,
তুড়ুং লাগাতে তায় ক্লেভারিং যায়।
হেষ্টিংস্ যাহার হাতে তারে করে কাবু,
বাঙলায় হেন লোক আছে কে হে বাবু?"

—

দেশের লোক কলিকাতায় কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও উমেদারগণের গুণ দেখিয়া বলিত—

"জাল জুয়াচুরি মিথ্যাকথা।
এই তিন নিয়ে কলিকাতা॥"

কালী সিংহ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে লোকে বলিত—

"ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে কালী, সিংহি সেতখানার।"

"দেখো মেরি জান কোম্পানি নিশান,
বিবি গৈয়ে দমদমা উড়ি হৈ নিশান,
বড়া সাহেব ছোটা সাহেব বক্কা কাপ্তেন,
দেখো মেরি জান, লিয়া হৈ নিশান।"

রেণেলের প্রস্তুত হুগলি-নদীর নক্সা
(কলিকাতা হইতে নয়াসরাই)

ক্লাইবের কলিকাতায় অবস্থান-কালে একটি পুত্র হয়। নবাব মীরজাফর পুত্রের জন্য একটি হিন্দুস্থানী মুসলমানী দাই দিয়াছিলেন। সে শিশুকে কোলে করিয়া যখন ঘুম পাড়াইত, তখন বলিত—

সেকালে কলিকাতা প্রধানতঃ ব্যবসার স্থানই ছিল। দেশ ছাড়িয়া লোক কলিকাতায় বাস করিতে যাইত। সেই উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন—

"ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি ॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হল যে কাঙাল ॥
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে ॥"

—

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে দেশে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তখন হিন্দুর ছেলেরা প্রথম প্রথম বড় কেহ কলেজে যাইত না। এই বিদ্যালয়-সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া এই মত কবিতা রচিত হইয়াছিল—

"খানাকুলের বামুন একটা করেছে স্কুল,
জাতের দফা হলো রফা থাকবে না ক কুল।"

—

প্রথম প্রথম কলিকাতার অবস্থা এমন ছিল যে, পশ্চিমের সিপাহীগণ পেটের জন্য কলিকাতায় আসা অপেক্ষা দেশে থাকিয়া মৌহা খাওয়া পছন্দ করিত। তাহারা বলিত —

"দাদা হো'য় খা'জ হো'য় আর হো'য় হৌ হোহা।
কলকাতা নাহি যাও, খাও মৌহা ॥"

মহারাজা নন্দকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই ছড়া বাঁধা হইয়াছিল—

"ভাদুরের নন্দকুমার, লক্ষ ব্রাহ্মণের কল্লে সুমার,
কেউ খেলে মাছের মুড়ো কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।"

—

সেকালের সৌখিন বাবুদের বুলবুলির লড়াই প্রভৃতিকে কটাক্ষ করিয়া কবিতা রচিত হইয়াছিল—

"দুর্গাপূজা ঘণ্টা নেড়ে খোকা হাল বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুরে´ কি না কাক॥
বিষয়-কর্ম্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হায় হায়! মারা গেল লোকগুলি॥"

দেউলিয়া আইন জারি হওয়ার পর কলিকাতায় মাড়োয়ারী মহাজনের আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তখন খোট্টারা বলিত—

"নালিশ হুয়া তাগাদা ছুটা
ঘর ঘর রূপেয়া বাটো
বরে ভাগ্‌সে ডিগ্রী হুয়া
কাগজ লেকে চাটো।"

সিরাজের ভয়ে হেষ্টিংস্ কাশিমবাজারে কৃষ্ণকান্ত নন্দীর (কান্তবাবু) গৃহে গোপন আশ্রয় লওয়া প্রসঙ্গে রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—

"হেষ্টিংস্ সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত,
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়,
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।
কান্ত মুদি ছিল তাঁর পূর্ব্বে পরিচিত,
তাঁহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।

ভাগীরথী হইতে কলিকাতার দৃশ্য ১৭৫৬

সিরাজের লোকে তাঁর করিল সন্ধান,
দেখিতে না পেয়ে শেষ করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়ে কান্ত করে হায় হায়,
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?

ওল্ড-কোর্ট্ হইতে কলিকাতা

ঘরে ছিল পান্তাভাত, আর চিংড়ি মাছ
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।

কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলাপাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তা ভাত।
পেটের জ্বালায় হায় হেষ্টিংস তখন
চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন।

* * * * *

কলিকাতার সহরতলি

সূর্য্যোদয় হল আজ পশ্চিম গগনে,
হেষ্টিংস্ ডিনার খান কান্তের ভবনে।"

কোম্পানীর আমলের প্রাচীন টাকা

শত বৎসর পূর্ব্বের কোম্পানীর পয়সা

হেয়ার সাহেব সেকালে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, তাহ কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের "সুরধুনী কাব্যে" লিখিত নিম্নলিখিত কবিতা হইতে বুঝিতে পারা যায়—

"দেখ মাতা গোলদীঘি, বড় হক্ক জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়।
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্য ক'রেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।"

—

চিৎপুর, কলিকাতা, কালীঘাট ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ছিল কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে এইরূপ বুঝা যায়। উহাতে লেখা আছে—

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা
বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।

* * * * *

কালীঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।"

—

যুবরাজ কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় কুলনারীদের লক্ষ্য করিয়া সংবাদপত্রে এইরূপ কবিতা বাহির হইয়াছিল—

১। "সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল-তলায়॥
পুণ্য দিনে বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবদল, বিদ্যাসাগর কোথা।
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই।
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে।
বকুল-তলায় পথের ধারে কত শত মেয়ে॥
কাল, ফিকে, গৌর, সোণা—হাতে গুয়াপান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥

* * * *

ধন্ত হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব সি, এস্, আই॥"

২। "হেদে ও সহরবাসি আর কি হাসি হাস্‌বি
রেড়ো ব'লে
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব।
নাড়ীটেপা ফেয়ার সাহেব, বারটেল নায়েব॥
আর কেনলো ঘোম্‌টা খোল কবির কথা রাখো।
লাইট্ পেয়ে রাইট্ হয়ে পার হওলো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কবজা তুলে দেখ্‌বে বাজু দেখবে কাণের দুল।
দেখ্‌বে কণ্ঠি কণ্ঠহার পিটের ঝাপা ফুল॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ প'রে চরণ চাপ।
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ॥
এগিয়ে এস বুড় ঠাক্‌রুণ সাৎপোয়াতির মা।
ভক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না॥

* * * * *

কবি চৈল হত ভোম্বা হিন্দুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক॥

কলিকাতার পশ্চিমদিকের দৃশ্য—১৮০৫

বাঙ্গালার বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী কুলকামিনী হইল স্বাধীন॥"

সেকালের খ্যাতনামা সাহেব অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্রগণের দুর্বিনীত ও অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন—

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব্‌চার্ণকের কলিকাতায় আগমন
(কাল্পনিক চিত্র)

"দক্ষিণারঞ্জনো রামো রসিকং কৃষ্ণমোহনঃ।
তারাচাঁদো রাধানাথো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥

হরচন্দ্রো রামতনুঃ শিবচন্দ্রশ্চ মাধবঃ।
মহেশোঽমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ॥

ফিরিঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ্ ডিরোজিও কুশেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ ॥"

—

জলের কল, ফুটপাথ, ড্রেণ প্রভৃতি হইলে কোন কবি লিখেছিলেন—

"আজকাল, কলকাতাতে বড়ই সুখ,
দেখ্‌তে পাচ্চি ভাই।

এস্‌প্ল্যানেড্ হইতে কলিকাতার দৃশ্য

বোটানিক গার্ডেন হাউসের দৃশ্য

সব, রাস্তা ঘাটের শৃঙ্খলাতে,
বলিহারী যাই ॥

* * * *

দেখ, নরদামা সব কেমন রাস্তা
হ'ল বুজে গিয়ে।
যত, মশা মাছি পোকা মাকড়,
গেল পলাইয়ে ॥

* * * *

রাস্তার ধারের নর্দ্দামা সব,
কেমন গেল বুজে।
মানুষ চলবার ফুটপাথ হ'ল,
চ'লে যাও চোক বুজে ॥

* * * * *

রাত্রিতে গ্যাস্‌লাইট জ্বাল,
আর অন্ধকার নাই।
অন্ধকার রাত্রে দিনের
মত চ'লে যাই ॥

* * * *

জলের কল হয়ে আর,
জলকষ্ট নাই।
যত জল চাই তত
অকাতরে পাই ॥

* * * *"

—

কোন একজন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া সেকালে কোন কবি, (সম্ভবতঃ ভোলা ময়রা) নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন—

"বাবু বটে ঈশ্বর বাবু, বাবু শম্ভু রায়,
উমেশ বাবু শুঁট্‌কো বাবু, ব'সে
আছেন কেদারায়।
বাবু তো বাবু লালা বাবু, কোল-
কাতায় বাড়ী,
বেগুন-পোড়ায় নুন দেয় না যে
ব্যাটা, সে হাড়ি।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের
মধু আলি,
রাগ ক'রো না, রায় বাবু গো, দুটো সত্য কথা বলি—

* * * * * *"

—

সে কালে গাঁজা খাওয়াটা খুব প্রবল ছিল। গুলি, চণ্ডুরও স্থানে স্থানে আড্ডা ছিল। সেই সময় এই ছড়াটি লিখিত হয়—

"বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে,
এই সব মহাতীর্থ যে না চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।"

—

প্রাচীন কলিকাতায় যে হাট পত্তন হইয়াছিল, চণ্ডী কাব্যে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে।

"ধালিপাড়া, মহাস্থান,
কলিকাতা কুচিনান,
দুই কূলে বসাইয়া বাট
পাষাণে রচিত ঘাট,
দুকুলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট

সেকালে বাঙ্গলা পদ্যে ইংরাজী শব্দের অর্থ শিখান হইত, তাহার নমুনা—

"গাড্ ঈশ্বর, লাড্ ঈশ্বর, কম
মানে এস,
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট্
মানে ব'স।
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন,
ফাদার সিষ্টার পিসী,
ফাদার ইন্‌ল মানে শ্বশুর,
মাদার-সিষ্টার মাসী
আই মানে আমি, আর ইউ
মানে তুমি,
আস্ মানে আমাদিগের,
গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন, আর নাইট্ মানে রাত,
উইক্‌কে সপ্তাহ বলে, রাইস্ মানে ভাত।
পম্‌কিন্ লাউ কুমড়ো, কোকম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, আর প্লোমেন্ চাষ॥"

—

কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের প্রসিদ্ধির কারণ উল্লেখ করিয়া তখনকার লোক ছড়া বাঁধিয়াছিল—

"বনমালী সরকারের বাড়া।
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
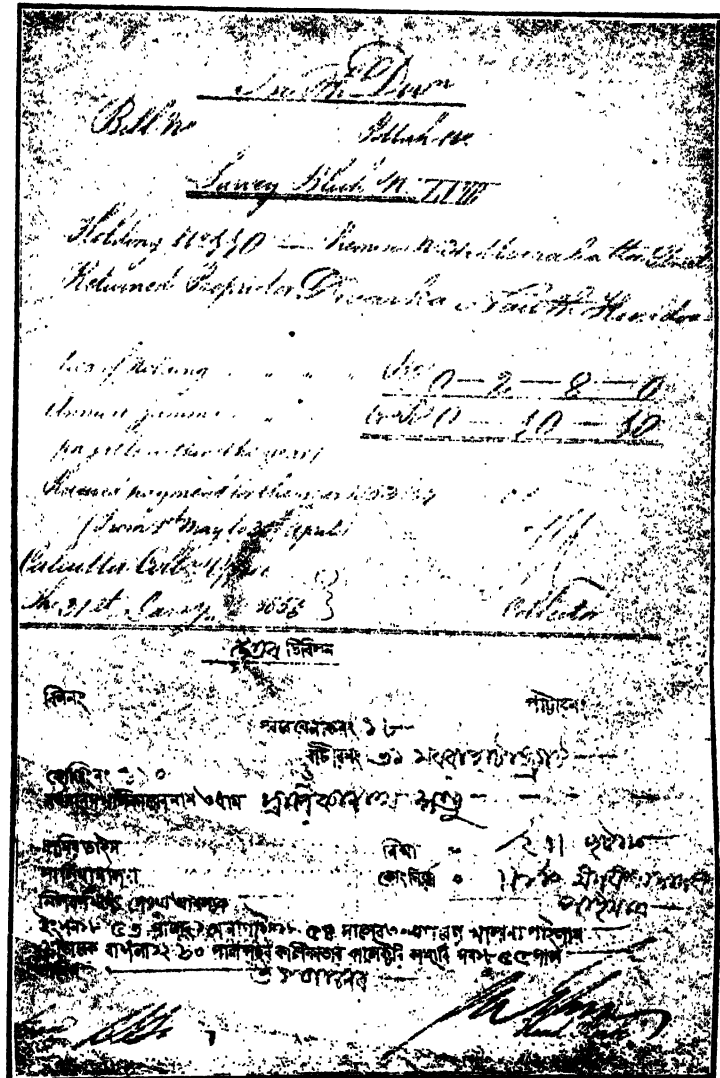
পূর্ব্বেকার কলেক্টরির খাজনার বিল

আমির চাঁদের দাড়ি।
হুজুরি মল্লের কড়ি।"

ইহার অন্য দুই প্রকার পাঠও দেখা যায়, যথা,—

নন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি

হুজুরি মল্লের কড়ি
বনমালি সরকারের বাড়ী ॥

অপরটি—

গোবিন্দ রামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
নকুবড়ের কড়ি
মথুর সেনের বাড়ী ॥

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, কবিকঙ্কন ও ঘটক-কারিকা গ্রন্থে কালীঘাটের নিম্নলিখিত মত উল্লেখ আছে।—

"চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়া অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট।

সেকালের ষ্ট্যাম্প কাগজ

দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোল বলিদান,
দ্বিজগণে করে চণ্ডীপাঠ ॥"

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী।

"বালুঘাট এড়াইল, বেনের নন্দন,
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরীবর,
তাহার মেলানি বাহে মাইননগর ॥"

কবিকঙ্কন।

লক্ষ্মীর আরাধ্য কালী, যাহে স্থিরামতি
অদূরে বড়িশা তথা করিলা বসতি।
যতকালে কালীঘাটে কালিকার স্থিতি
লক্ষ্মীনাথে কুলভাঙ্গে সাবর্ণের মতি।
কালীঘাট কালী হ'ল চৌধুরি সম্পত্তি।
হালদার পূজক এই ত তার বৃত্তি ॥
ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্বে দেয় যতেক বৃত্ত
কুলীন কুল নাশে সবে হল প্রবৃত্ত।
মানসিংহ যথা যায়, পুনঃ কাশীবাসে
কহে গুরু আজ্ঞা সিদ্ধ, গুরু অভিলাষে।
জানুক না জানুক অন্যের কেহ বিদ্যা
সৈন্যের রক্ষণে পটু চৌধুরী অনবদ্যা।"

ঘটক-কারিকা।

প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কোন লেখক কলিকাতাকে পৃথিবীর মধ্যে একটী নোংরা স্থান বলিয়াছেন। এটকিন্‌সন্ নামক একজন কবি লিখিয়াছেন—

"Calcutta! what was thy condition then?
An anxious, forced existence, and thy site
Embowering jungle, and noxious fen,
Fatal to many a bold aspiring wight.
On every side tall trees shut out the light;
And like the Upas, noisome vapours shed;
Day blazed with heat intense, and masky night
Brought damps excessive, and a feverish bed;
The travellers at eve were in the morning dead."

সেকালের ডাক্তারদের সম্বন্ধে কোন কবি লিখিয়াছেন।—

"Some doctors in India would make Plato smile;
If you fracture your skull they pronounce it the bile
And with terrific phiz and stare most sagacious,
Give a horse-ball of jalap and pills saponaceous
A sprain in your toe or an aguish shiver,
The faculty here call a touch of the liver,
And with ointment mercurii and pills calomel
They reduce all the bones in your skin to a jelly

* * * * * *

ওয়ারেণ হেষ্টীংস সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত ছড়াটি বোধ হয় বেনারসের চেত সিংহের ব্যাপারের সময় রচিত হইয়াছিল—

"হাতিপর্ হাওদা, ঘোড়াপর্ জীন্,
জল্‌দি যাও, জল্‌দি যাও,
ওয়ারেন্ হেষ্টিন্।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন এই কবিতাটি কেহ লিখিয়াছিলেন—

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা লইয়া এই মত কবিতা একজন রচনা করিয়াছিলেন—

"কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবেনা কভু গোষ্পদের জলে।
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর সম বিদ্যার সাগর॥"

অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা আছে—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয়-যশের মালা পরাইবে মায়॥"

রামতনু লাহিড়ী সম্বন্ধে সুরধুনী কাব্যে নিম্নলিখিত রূপ লিখিত আছে—

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল-হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখদুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিজড়িত ধর্ম্ম-উপদেশ।
একদিন তাঁর কালে করিলে যাপন,
দশদিন যাবে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

রাজা রামমোহন রায়ের নামে এই মত ছড়া বাঁধিয়াছিল—

"সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল;
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"যত ছুঁড়ী গুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত কৈশোরে যখন প্রথম কলিকাতা যান তখন লিখিয়াছিলেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

কুমারী মেরী কারপেণ্টার কলিকাতায় আসিলে এই রূপ কবিতা রচিত হইয়াছিল—

"অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক কবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তার বিবাহ না করেছে;
করে তুলেছে তোলাপাড়ী এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কারপেণ্টার সবল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মাদ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকাতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এটকিনসন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেলেন বেঁচে॥"

ইংরাজি-কথা শিখানের জন্য সেকালে নামতার মত ঘোষান হইত; যথা,—

"ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা।
পমকিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা॥"

ভবিষ্য পুরাণে গোবিন্দপুর ও সুরধুনী তটে কালীর নাম উল্লেখ আছে—

"তাম্রলিপ্তে প্রদেশেচ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তেচ কালী সুরধুনী তটে।"

কবি ভোলা ময়রা সে-কালের বড়লোকদের ধাঁজ, ধরণ চেহারা প্রভৃতি তাঁহার গানের মধ্যে গাহিয়াছিলেন—

"আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই,
নই কবি কালিদাস তবে খোসামুদের মাথা খাই।
বাবুতো, লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী,
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে ব্যাটা ত হাঁড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি।
মাপ কর গো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।
মোষের মত মুন্সী বাবু মসীর মত কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারাখানা ভালো॥
পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসী মড়া যার পানের কড়ি নাই॥"

বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহনকে বাঁধা দিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। পরে তিনি আসলের পরিবর্ত্তে একটি নকল বিগ্রহ লইয়া যান। সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া দুইটি শুনা যায়।

"সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোণার মদন মোহন বাঁধা দিয়ে গেল॥"

অপরটি—

"কারুর কিছু হারিয়েছে।
বাগবাজারের মদন মোহন পালিয়েছে॥"

আহীরীটোলায় নিমাই চরণ গোস্বামীর (যাঁহার নামে নিমুগোস্বামীর লেন্ হইয়াছে) বাটীতে বহু ধুমধামের সহিত চৈত্র মাসে রাসোৎসব হইত। এই উপলক্ষে ৪০।৫০টি বাঁশ একত্র করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া আটচালা হইত। তাহা হইতে লোক গান বাঁধিয়াছিল—

জন্ম মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ॥"

কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক মুসলমান উৎপীড়নে ত্রিবেণী হইতে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে দস্যুভয়ে বাসগৃহের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করেন। তাহা হইতে প্রবাদ আছে—

"কায়েত মরে খেয়ালে,
বেণে মরে দেয়ালে।
জোলা মরে তাঁতে,
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে মাছ আর ভাতে।" *

সে-কালের সমাজ-চিত্র ও লোকের মনোভাব নিম্ন লিখিত ছড়ায় বুঝা যায়—

"গুরমশায়ের মার ধোর ঘুচে গেল জারি জুরি,
ডফ্ কেরি পাদরীরা সবায় পড়ায় ধরি ধরি।
বিলিতি খানা খাইয়ে তারা ছেলেদের মাথা খেলে,
মুরগী ভেড়ার ছেনাগুলো কাঁটা চামচেয় গেলে।"

* * * * * *

"টেবিল চেয়ার ছেড়ে আর কেও যে চায় না খেতে,
আসন পেতে বসলে খেতে বলে 'ধুলো পড়ে পাতে।'
শুক্‌নো ডাবা গঙ্গায় দিয়ে ধরে সবে গুড়গুড়ী,
হেঁকে চলে পাল্কী ছেড়ে বেনীয়ান বাবু করে গাড়ী।"

এইরূপ জনপ্রবাদ—রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র মাড়ের পিতা পীরিতিরাম কায়েত হইবার চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"দুলোল হল সরকার, ওকুর হলো দত্ত।
আমি কিনা থাক্‌বো যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত॥"

মহারাণী স্বর্ণময়ী দাওয়ান রাজীবলোচনের কথায়, কাত্যায়নী গুরু বিনোদীলালের কথায় ও রাসমণি ধনা

* কথিত আছে—ইহা সুপ্রসিদ্ধ রূপচাঁদ পক্ষীর গান।

খানসামার কথায় দানাদি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ছড়ায় প্রকাশ পায়—

"ঠাকুরে বিনোদিলাল, চাকরে ধনাই,
দেওয়ানে রাজীব রায়, বলিহারি যাই ॥"

——

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র স্বভাব-কবি মহেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন।—

"সাত মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট কর্‌লে 'প্রভাকর',
জন্মে কলম ধরেনিকো 'রাম' হল এডিটার।
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর।"

——

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছেলেরা তাদের হেডমাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকদের নামে নিম্নলিখিত ছড়া বাঁধিয়াছিল—

"গুড্‌ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং,
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা,
তার নীচে গুপে কানা।" *

——

ইংরাজদের কাছে বাঙ্গালীর লাঞ্ছনা দেখিয়া কোন কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

"তাঁতীর শোভা তাঁতখানা,
দর্জ্জির শোভা সূতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে,
জুতো আর গুঁতো ॥" †

* হুগলী কলেজের ছেলেদের এই প্রকার একটী ছড়া শুনা যায়।

"গোঁপলুপ্ত গোপালগুপ্ত সংস্কৃত পড়াচ্চে,
মৃতদার ক্যাণ্টদার উকি ঝুঁকি মারচে।"

† এই কবিতা ও ছড়া গুলির সহিত ছবিগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। এ গুলিও প্রাচীন কলিকাতা সম্পর্কীয়।

কলিকাতা সম্পর্কীয় ইংরাজি কবিতাও অনেক দেখা যায়, তাহা এখানে উদ্ধৃত হয় নাই। যে দুইটী দেওয়া হইয়াছে উহা বেশ উপভোগ্য বলিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের যুগে বাঙ্গলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী—Constitutional agitation (বৈধ আন্দোলনের)এর সফলতায় তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। অকৃত্রিম দেশভক্তিতেও তিনি তাঁহার সমসাময়িক কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিও (Indian National Congress) লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রাণতার পুরস্কার প্রদান করেন। কিন্তু তিনি আত্ম-প্রচারে বিমুখ ছিলেন বলিয়া আমরা ইহার পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে"র প্রচ্ছদপটে তাঁহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে পারি নাই। অনেক চেষ্টার পর আজ আমরা সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য বোধ করিতেছি।

বঙ্গীয় সন ১২৫৭ সালের ২৩এ পৌষ (১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী) ফরিদপুর জেলার সেনদিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাচরণের পিতামহ রাম-কিশোর মজুমদার মহাশয় স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন ; পিতা রাধামাধব মজুমদার মহাশয়ের ফার্সী ও সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ন্যায়পরতা এমন অসাধারণ ছিল যে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজের ক্ষতি-বৃদ্ধি গ্রাহ্য করিতেন না। রাধামাধবের পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী যখন 'সতী' হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, রামকিশোর তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধামাধব এই পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী

ছিলেন। পিতৃব্যপত্নী যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে যাইতেছেন, এ বিষয়ে পাছে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে, এই আশঙ্কায়, রাধা-মাধব এই সতীদাহের সংবাদ দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেনদিয়া গ্রামে আনয়ন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তিন দিন ধরিয়া সতীকে নানারূপ প্রশ্ন করেন, এবং এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি অনুমতি প্রদান করেন, এবং তাঁহার সম্মুখেই এই কার্য্য সাধিত হয়। মহিলাটিকে সতী হইতে কেহ যে প্ররোচিত করে নাই, তিনি যে স্বেচ্ছায় সতী হইতেছেন, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মজুমদার বংশের সম্মান বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার দরুণ রামকিশোর পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। অম্বিকাচরণের জননীর নাম সুভদ্রাদেবী। তিনি অতি বুদ্ধিমতী ও উদারহৃদয়া মহিলা ছিলেন। অম্বিকাচরণ পিতার ন্যায়পরতা এবং জননীর উদারতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সপ্তম বর্ষ বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় অম্বিকাচরণের বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার দিন কয়েক পরে তিনি একটি ইংরেজী স্কুলে গমন করেন। কিন্তু অল্প কাল মধ্যে এই স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি বরিশাল গমন পূর্ব্বক তত্রত্য জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অম্বিকাচরণ স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ, এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি অতি-অল্প-দিন পূর্ব্বে দ্বিতীয়-শ্রেণীর-কলেজে-উন্নীত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রবে আসেন। এক বৎসর এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার পর তিনি আইন কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসনে আসিয়া তাহার স্কুল বিভাগে হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। দুই বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার কালে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে ও বন্ধুত্ব জন্মে। এই বন্ধুত্ব উভয়ের জীবনকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে উভয়ে মিলিয়া একটি তর্ক-সভা স্থাপন-করিয়াছিলেন, এবং সুরেন্দ্রবাবু তাহার সভাপতি ও মজুমদার মহাশয় সরকারী সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অম্বিকাচরণ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফরিদপুরে ওকালতি ব্যবসায় করিতে গমন করেন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুর পীপ্‌ল্‌স্ এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই প্রথম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে প্রথম জাতীয় রাজনীতিক সম্মিলন হয়। তাহারই পরিণতি স্বরূপ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি লইয়া নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। অম্বিকাচরণ ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের দুইটি সভাতেই যোগদান করিয়াছিলেন। উভয়ত্রই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল—বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্যীকরণ। এই বিষয়ে পরে তিনি, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত, অপর সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ ভারতবাসীকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া অম্বিকাচরণের সাহায্যে ফরিদপুরের মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। অম্বিকাচরণ ২০ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুরে অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ফরিদপুর কলেজ স্থাপিত হয়। তাঁহারই উৎসাহে ফরিদ-পুরে টাউনহল নির্ম্মিত হয়। টাউনহলটি এখন তাঁহার নাম বহন করিতেছে। অম্বিকাচরণের ফারদপুর মিউনি-সিপ্যালিটির সভাপতিত্ব-কালে তথায় জলের কলের সূচনা হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে জুরীর দ্বারা বিচার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। দুইবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে একবার, এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আর একবার।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তদুপলক্ষে যে স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি হয়, অম্বিকাচরণ এই দুই আন্দোলনেই যোগদান করিয়াছিলেন। স্বদেশী শিল্প-দ্রব্যের প্রচারার্থ তিনি জেলায় জেলায় ভ্রমণ পূর্ব্বক বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় অম্বিকাচরণ সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভাতেই বৃটিশ পণ্য বয়কট করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, ও স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে জাতীয় মহাসমিতির ৩১শ অধিবেশন হয়। বঙ্গের জননেতা অম্বিকাচরণ এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেস সভায় ভারতের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দল পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে অম্বিকাচরণের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ৩১শ অধিবেশে উভয় দলের পুনর্মিলন হয়।

অম্বিকাচরণ একখানিমাত্র গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষকে ইহাই তাঁহার একমাত্র ও শেষ দান। বইখানির নাম Indian National Evolution। এই গ্রন্থখানিতে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

সন ১৩২৯ সালের ১৪ই পৌষ (১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ডিসেম্বর) অম্বিকাচরণ লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ফরিদপুরের টাউনহলটির নামকরণ হইয়াছে—"অম্বিকা মেমোরিয়েল হল"। বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে—"অম্বিকা মেমোরিয়েল পাব্লিক লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার এবং গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার আফিম কমিটী *

ডাক্তার রায় শ্রীহরিধন দত্ত বাহাদুর

(১৯২৭)

ইং ১৯২৭ সালের ১৩ই মে দার্জিলীং হইতে পত্র আসিল—গভর্ণমেণ্ট একটী আফিম কমিটি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া আমাকে তাহার একজন সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। অন্যান্য তিনজন সদস্যের নাম মিঃ জে, এন, রায় ও-বি-ই, রায় শরৎকুমার রাহা বাহাদুর এবং রেভারেণ্ড হারবার্ট এণ্ডারসন। পত্রখানি বাঙ্গলার সরকারী দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ আর, এন, রিড লিখিত। তখন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলার একজন মিনিস্টার ছিলেন এবং আবকারী বিভাগের কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা, হাবড়া, বালী, শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরে আফিম বিক্রয় অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন এবং কিরূপ উপায়ে তাহা রোধ করা যায়, তাহাই কমিটীকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতেই আমাদের কার্য্যের সীমা নিবদ্ধ জানিয়া মনে ভরসা হইল। কমিটীর কাজে দূর দেশে যাইতে হইলে আমার নিজ কার্য্যাদি ফেলিয়া যাইতে হইত। বালী ব্যারাকপুর ইত্যাদি স্থানে অবসর-সময়-মত দিনের মধ্যে যাওয়া-আসা চলে; অতএব নিজের কাজের বিশেষ ক্ষতি না করিয়াও আফিম কমিটীর কাজ করা সম্ভব দেখিয়া সুখী হইলাম।

বহুদিন চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী থাকায় আফিম সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু শ্রমজীবীদের এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশী মেশামেশি না থাকায় আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় নাই।

* এই প্রবন্ধ ১৯২৮ সালে লিখিত হয়।

অতিরিক্ত আফিম ব্যবহারে এবং তাহার অবাধ বিক্রয়ের ফলে কত লোকের কি বিষম ক্ষতি হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু ইহার বিষময় ফল কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ সম্প্রদায় মধ্যে কি ভাবে উহা আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল। অতএব এখন উহার সুযোগ পাইব মনে করিয়া, কমিটীর সদস্য-পদ গ্রহণ করাই স্থির করিলাম। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা টেম্পারেন্স ফেডরেশন্ কর্ত্তৃক আমার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে জানিয়া বরং একটু গৌরব বোধ করিলাম।

গভর্ণমেণ্ট হইতে আমাদের জানান হয় যে ১৯২৫।২৬ সালে কলিকাতা, হাবড়া ও বালীতে প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে ৮৫৪ সের; শ্রীরামপুরে ৮৪.৭ সের এবং ব্যারাকপুরে ৬৯৬ সের আফিম বিক্রীত হইয়াছিল। জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহাসভায় (League of Nations) গবেষণার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে প্রতি ১০,০০০ লোকের ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য এক বৎসরে গড়ে ৬ সের আফিম আবশ্যক হয়। যে সকল দেশ বা জাতির মধ্যে চিকিৎসার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে এবং যেখানে মাদকতার জন্য আফিম ব্যবহৃত হয় না, সেখানে উক্ত ৬ সের সীমা নির্দ্দেশ ন্যায্য বিবেচিত হইলেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ সমুচিত বলা যায় না। বাস্তবিক এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে এবং থাকাই সম্ভব। যাহা হউক, ভারতের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট এবং গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি ১০,০০০ লোকের জন্য বৎসরে ৩০ সের অবধি আফিম বিক্রয় অতিরিক্ত বা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই ৩০ সের সীমা-নির্দ্দেশ ন্যায্য কি না তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে; যাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদের কমিটীকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালার যে সকল স্থানে আফিম বিক্রয় ৩০ সের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তথায় উহার কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করাই আমাদের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাজ করিতে বলিয়াছেন—(১) বিক্রীত আফিমের কি পরিমাণ ঔষধার্থে এবং কি পরিমাণ মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়; (২) অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম বিক্রীত হওয়ায় অধিবাসীদের মধ্যে বাস্তবিক কি অনিষ্ট সম্পাদিত হইতেছে, এবং উহা তাহাদের স্বাস্থ্য, নীতি ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় হইতেছে কি না; (৩) কি পরিমাণে শিশুসন্তানকে আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়ানর প্রথা বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে কি ফল হইতেছে; (৪) আফিমের অতিরিক্ত চাহিদা বা বিক্রয় কমাইবার উপায় কি এবং আফিমখোরদের নাম তালিকাভুক্ত করা আবশ্যক কি না এবং আবশ্যক হইলে তাহা সম্ভব কি না।

কমিটীর সভাপতি হইলেন মিঃ জে, এন, রায়। তিনি প্রবীণ বয়সে এবং দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলেও যেরূপ তৎপরতার সহিত এই কমিটীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তিনি প্রশংসার যোগ্য। বাস্তবিক, কালক্ষেপ না করিয়া তিনি ১৭ই মে ১১টার সময় রাইটার্স বিল্ডিং কমিটি-রুমে আমাদের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন আমরা চারিজন সদস্যই পরামর্শ করিয়া আমাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিলাম। স্থির হইল যে প্রতি মঙ্গলবার ১১॥০টার সময় আমাদের কমিটীর অধিবেশন হইবে।

২৪শে মে দ্বিতীয় অধিবেশনে পরামর্শ করিয়া আমরা কতকগুলি জিজ্ঞাস্য বিষয় স্থির করিলাম; এবং সেগুলি পাঠাইয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত হইল। ২০শে জুন জবাব দিবার শেষ দিন ধার্য্য হইল। আফিম সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, প্রসিদ্ধ কয়েকজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক এবং মাদক নিবারিণী সভার জনকতক সভ্যকে মতামতের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেওয়া স্থির হইল। যাহাতে আমাদের কার্য্যাবলী সাধারণের গোচরে আইসে এবং সাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, সেজন্য সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে আমাদের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। বলা বাহুল্য যে আমাদের কমিটীর যাবতীয় কার্য্য প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, কেবল যাঁহারা সাধারণের সম্মুখে মতামত প্রকাশে দ্বিধা বা আপত্তি করেন, তাঁহাদের জন্য অন্য (camera sitting) বন্দোবস্ত ছিল। আমার উপর ডাক্তারদের

তালিকা করার ভার পড়ে এবং রাহা মহাশয়ের উপর ভার পড়িল আবকারী বিভাগ হইতে পাঁচজন বিশেষজ্ঞের নাম নির্দ্ধারণ করার। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারী, লাইসেন্স প্রাপ্ত কয়েকজন আফিম-বিক্রেতা এবং কয়েকটী বৃহৎ কারখানার কর্ম্মকর্ত্তা ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর নাম স্থির করা হইল।

প্রশ্নাদি যাহা পাঠান হইবে তাহার উত্তর সংগৃহীত হইতে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। অতএব ততদিন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পূর্ব্বেই আমরা কতকগুলি আফিমের দোকান পরিদর্শন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলাম। সেজন্য প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বৈকাল ৪৷৷০ হইতে ৬৷৷০ অবধি সময় নিরূপিত হইল এবং রাহা মহাশয় তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের উপর আমাদের ঐ কার্য্যের সুবন্দোবস্তের ভার দিলেন। তদ্ব্যতীত অত্যধিক পরিমাণে আফিম সেবনে অভ্যস্ত কয়েকজন ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস ও আফিম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হইল। কলিকাতায় চীনা, বর্ম্মিস ও শিখদের মধ্যে অনুসন্ধানে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের ভিতর হইতে উপযুক্ত লোকের সন্ধান করা হইল। আমরা আরও শুনিতে পাইলাম যে, সহরে বেশ্যামহলে না কি আফিম কাটতি হইয়াছে; সেজন্য উহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা স্থির হইল। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিক আফিম সেবনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে কি না তাহাও জানা আবশ্যক বিবেচিত হইল। আফিম বিক্রয়ের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার বা দোকানদারগণকে আমাদের কার্য্যে সম্যক সাহায্য করিতে বলা হইল। এইরূপ প্রাথমিক কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়া আমরা অনুসন্ধান-কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

১৬৪ জন রেজেষ্টারীভুক্ত ডাক্তার, ২৮জন কবিরাজ, ১৯জন হাকিম ও ৩৪জন মিলের ডাক্তারের নিকট জিজ্ঞাস্য বিষয় লিখিয়া পাঠান হইল। ১৬টী সাধারণ সভাসমিতি, ২২জন সংবাদপত্রাদির সম্পাদক, ১০জন বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য এবং ২৬জন খ্যাতনামা দেশনায়কের নিকটও ঐ সকল প্রশ্ন পাঠান হইল। প্রশ্নাদির উত্তরের জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া ৩০ জুন ধার্য্য করা হইল। ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি আফিমের দোকান পরিদর্শন করিলাম। এই পরিদর্শনে আমরা অনেক নূতন কথা ও তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছি।

বাজারে আফিম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হারে লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার দ্বারা বিক্রীত হয়। কলিকাতা, ২৪পরগণা, হাওড়া ও হুগলীতে উহা যে দামে বিক্রয় হয় তাহা হইতে বাঙ্গালার অন্যত্র উহার নির্দ্ধারিত মূল্য কিছু কম; আবার মেদিনীপুর সীমান্তে উহার দাম আরও কিছু কম। লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানদারেরা সরকার হইতে আফিম নিজ নিজ দোকানে লইয়া যায় এবং তথায় শালপাতার মোড়কে নিম্নলিখিত তালিকামত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দামে যথাযোগ্য পরিমাণে বিক্রয় করে।

খুচরা আফিমের মোড়ক ও দাম

কলিকাতা, হাওড়া ইঃ		বাঙ্গালার অন্যত্র	
পরিমাণ	দাম	পরিমাণ	দাম
১½ গ্রেণ	১ পয়সা	১ ২/৭ গ্রেণ	১ পয়সা
৩ „	২ „	৩ ১/৭ „	২ পয়সা
৬ „	১ আনা	৬ ২/৭ „	১ আনা
১২ „	২ „	১/১৬ তোলা বা ১১¼ গ্রেণ	৭ পয়সা
⅛ তোলা বা ২২½ গ্রেণ	৩ আনা ৩ পয়সা	⅛ „ ২২½ „	৩ আনা ১ পয়সা
¼ „ ৪৫ „	৭ „ ২ „	¼ „ ৪৫ „	৬ „ ২ „
½ „ ৯০ „	১৫ „ „	½ „ ৯০ „	১৩ „ „
১ „ ১৮০ „	১ টাকা ১৪ আনা	১ „ ১৮০ „	১ টাকা ১০ আনা

গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি হইতে বিক্রয়ের জন্য আফিম সরবরাহ করা হয়। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীতে বিক্রয়ের জন্য যে আফিম দেওয়া হয় তাহার মূল্য প্রতি সের ৯১৲ এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের জন্য মূল্য প্রতি সের ৭১৲ ধার্য্য হইয়াছে। লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকান-দারেরা এবং ঔষধের কারখানাওয়ালারা ঐ নির্দ্ধারিত মূল্যে আফিম কিনিতে পান। ঐ মূল্যের মধ্যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট আফিমের মূল খরচা হিসাবে সের প্রতি ২৬৲ লন এবং বক্রী টাকা কর বা ডিউটী (duty) হিসাবে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট পান। দোকানদারেরা কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীতে সেই আফিম ১৫০৲ টাকায় এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ১৩০৲ টাকায় এক সের বিক্রয় করে; কেবল মেদিনীপুরের প্রান্তস্থ দোকানগুলিতে উহা ১২০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। পূর্ব্বোক্ত তালিকা-মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়কে দোকানদারেরা খরিদ্দারের সুবিধা-মত বিভাগ করিয়া দেয়।

লাইসেন্স জন্য দোকানদারকে একটী ফী (fee) দিতে হয়। ইহা ক্রমবর্দ্ধিত অনুপাতে যত সের আফিম বিক্রয় হইবে তাহার উপর নির্দ্ধারণ করা হয়। প্রচলিত তালিকায় দেখা যায় যে ১ সেরে ১২৲ টাকা হইতে বাড়িতে বাড়িতে ৫০ সেরে উহা ২৫৪২৲ টাকা, ১০০ সেরে ৫১৩২৲ টাকা হইয়া থাকে। আফিমের দাম ও লাইসেন্স ফি দিয়াও দোকানদারেরা ১ সের আফিমে ৪৭৲ টাকা, ১০ সেরে ১৬৮৲ টাকা, ৫০ সেরে ৪০৮৲ টাকা, ১০০ সেরে ৭৬৮৲ টাকা মোট লাভ করে।

বর্ত্তমান আইনানুসারে মোট তিন তোলা অবধি আফিম যে কেহ এক সময়ে নিজের নিকট রাখিতে পারে। কিন্তু ভেণ্ডাররা একদিনে একজনকে একতোলার অধিক বিক্রয় করিতে পারে না; বঙ্গের স্থানে স্থানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে এবং কয়েক স্থানে দুই তোলা এবং কোথায় বা তিন তোলা অবধি বিক্রয়ের অনুমতি আছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে আফিম বিক্রয় নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে ১৬ বৎসর বয়সের সীমা ছিল, এখন ২০ বৎসর হইয়াছে। বালকে অন্যের জন্যও আফিম ক্রয় করিতে বা বহন করিতে পারে না। আফিম ধারে বিক্রয় বা অন্য কোন দ্রব্যাদির সহিত বিনিময় নিষিদ্ধ; করিলে ভেণ্ডারেরা দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

আফিমের দোকানগুলি সকাল ১০ টায় খোলে এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে বন্ধ হয়। কলিকাতা, ২৪ পরগণা ইত্যাদি স্থানে ১৬ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই অক্টোবর অবধি সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় এবং ১৬ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ অবধি ৫৷৷০টায় বন্ধ হওয়াই নিয়ম। আফিম হইতে যে "গুলী" বা "চণ্ডু" তৈয়ারী হয় তাহা এক তোলা অবধি নিজের নিকট রাখা যায় এবং একাধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া সেবনের জন্য দুইতোলা অবধি গুলী বা চণ্ডু রাখিতে পারে; কিন্তু বিক্রয় করিতে পারে না। পাঠক হয় ত গুলী ও চণ্ডুর কথা শুনিয়াছেন; কিন্তু অতি অল্প জনেরই সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। আমি পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

ঔষধপ্রস্তুত করণে আফিম আবশ্যক হইলে আবকারী বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইতে হয়; নতুবা বেশী আফিম ক্রয় করা যায় না। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, ঔষধের কারখানা বা ব্যবসায়ী ঐরূপ লাইসেন্স লইয়া নিজ নিজ আবশ্যকমত আফিম ক্রয় করিতে ও রাখিতে পারেন।

আমরা জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা সহরে ও তাহার উপকণ্ঠে ৩০ খানি এবং হাওড়ায় ১১খানি আফিমের দোকান আছে। বেশ স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই ৪১ খানি দোকানে এক্ষণে গড় হিসাবে মাসে প্রায় ৯৪০ সের আফিম বিক্রীত হয়—অর্থাৎ বৎসরে ১১, ২৮০ সের আফিমের কাটতি আছে। কলিকাতা, উহার উপকণ্ঠ ও হাওড়ার মোট লোক সংখ্যা ১৪,০০,০০০ ধরা হইলে এবং এই লোক-সমষ্টির জন্য সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ১০,০০০ জন্য ৩০ সের সীমা নির্দ্দেশ প্রয়োগ করিলে মোট আফিম বিক্রয় ৪২০০ সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে।

কলিকাতা সহরে ৩২টী ওয়ার্ড আছে। বিভিন্ন আফিমের দোকানের বিক্রয়-তালিকা দৃষ্টে জানা গেল যে, সহরের মাঝখানে পরস্পর-সংলগ্ন ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আফিম বিক্রয় হয়। তথায় ৮ খানি দোকানের কাটতি প্রায় ৪৪০০ সের; লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহা নির্দ্দিষ্ট সীমার প্রায় ৮ গুণ। ২২ নং ওয়ার্ডে কাটতি ৪½ গুণ, ২৫ ও ২৬ ওয়ার্ডে ৪ গুণ, ৫ ও ৬ এ ৩ গুণ এবং ১, ২, ৩, ৪, ১৩, ১৪, ১৫ ১৬, ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডে ২ গুণ। তেমনি হাওড়ায় ১০টী ওয়ার্ডের মধ্যে ২নং এ কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং তাহা সীমার ১০ গুণ,

ছেলেবেলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৭নং এ ৫ গুণ, ১নং এ ৩ গুণ এবং ৪, ৫ ও ১০এ ২ গুণ বেশী।

লাইসেন্স-প্রাপ্ত আফিম-বিক্রেতার কার্য্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। গভর্ণমেন্টের আবকারী বিভাগ উঁহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কর্তৃত্ব উঁহাদের উপর নিতান্ত কম নহে। দুই বিভাগ হইতে প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী পাঠে দোকানগুলি কি ভাবে চালিত হয় তাহা বুঝা যায়। আইন যেরূপ বিস্তারিত ভাবে গঠিত এবং পদে পদে নিয়মের এত বাঁধুনি আছে যে গোপনে আফিম বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করার সম্ভাবনা কোথায় তাহা বুঝা বা বাহির করা কঠিন। আমরা অনেক আফিমের দোকান দেখিলাম,—সর্ব্বত্রই আইন নিয়ম ইত্যাদির বন্দোবস্ত, কিন্তু কার্য্যকালে সব আইন সর্ব্বত্র মান্য পায় কি না তাহা জানি না। যাহা হউক ঐ সব নিয়মাদির আলোচনা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত না থাকায় তাহা লইয়া অধিক সময় আমাদের দিতে হয় নাই।

জুন মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতার বাহিরের কতকগুলি দোকান পরিদর্শন আরম্ভ হইল। বৈকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি মোটর যোগে অনেক দোকান দেখিয়া বেড়াইলাম। ঐরূপে কোন্নগর, রিষড়া, হাটের বাজার, তেলিনীপাড়া, গরিফা, কাঁটালপাড়া, ভাটপাড়া, জগদ্দল, টীটাগড়, খড়দা, আলমবাজার, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে যাইতে, বিশেষতঃ জুন জুলাই মাসের গরমের সময়, যে বিশেষ সুখকর হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। রৌদ্রের তাপ কমিবার পূর্ব্বেই আমাদের বাহির হইতে হইত—এবং উত্তপ্ত রাস্তায় মোটর-চালনোত্থিত প্রচুর ধূলিকণায় মেঘ সৃষ্ট হইয়া আমাদের কয়েক ঘণ্টা আবৃত করিয়া রাখিত। ঐ সকল দোকানে বসিয়া আমরা ক্রেতাদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; দেখিয়াছি—বিভিন্ন প্রকৃতির নানা ব্যক্তি প্রত্যহ বৈকালে সেথায় আফিম ক্রয় করে। প্রায়ই বৈকালে সেথায় ভীড় হয় এবং আগে লইবার জন্য ঝগড়াও হয়। অনেক ক্রেতার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহাদের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং নানাপ্রকারে আমরা এই পরিদর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল যে আফিমের দোকানগুলিতে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসের জন্য ক্রেতৃগণ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিরূপণের ব্যবস্থা করা হইবে; যথা, প্রত্যহ কত লোক ক্রয় করে, কি পরিমাণের মোড়ক কত বিক্রয় হয়, ক্রেতার জাতি, স্ত্রী কি পুরুষ, বয়স, বাসস্থান, আফিমের প্রয়োজন ইত্যাদি। ১লা জুন হইতে ১৫ দিন কলিকাতায় এবং পুরা জুন মাসের জন্য শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরে উঁহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফলে জানা গেল যে প্রত্যহ গড়ে কলিকাতায় ২৩,২৫৮, শ্রীরামপুরে ২,৩২৮ এবং ব্যারাকপুরে ২,৬৭৬ জন আফিম কেনে; এবং যথাক্রমে প্রায় ২৮॥ সের (২৯৩৩০ প্যাকেটে), ৩$\frac{1}{8}$ সের (৩২০২ প্যাকেটে) ও ৪$\frac{৩}{৪}$ সের (৩৫৪২ প্যাকেটে) আফিম বিক্রীত হয়। আরও জানা গেল প্রত্যহ যারা ১২ গ্রেণ বা তদধিক আফিম কেনে তাদের সংখ্যা কলিকাতায় ৮৫১৮ এবং ইহাদের মধ্যে ৫৪৪৩ বাঙ্গালী, ১৪০৭ উড়িয়া, ১৬৬৮ শিখ চীনা ইত্যাদি; শ্রীরামপুরে ২৩২৮ জনের মধ্যে ১৬৭১ বাঙ্গালী, ২৫৪ উড়িয়া, ২৯৩ হিন্দুস্থানী, ৩৯ বিলাসপুরী, ৬৫ মাদ্রাজী, ৩৬ অন্যান্য: ব্যারাকপুরে ২৬৭৬ জনের মধ্যে ১৪৯৩ বাঙ্গালী, ৩৭৭ উড়িয়া, ৬২২ হিন্দুস্থানী, ১৭ বিলাসপুরী, ১২৮ মাদ্রাজী, ৩৯ অন্যান্য। সর্ব্বত্রই রোগ প্রতীকারার্থ আফিমের প্রয়োজন বলিয়া অনেকে লিখাইয়াছে; কচিৎ কেহ শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ব্যবহারের কথা বলিয়াছে। ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক।

কলিকাতায় আফিমের ধূমপানের জন্য যে সকল আড্ডা আছে, তাহার কয়েকটী পরিদর্শন করা স্থির হইলে পুলিশ ও আবকারী বিভাগ হইতে আবশ্যক ব্যবস্থা করা হয়। ১৯শে আগষ্ট, ১৯২৭, রাত্রে আমরা প্রথম পরিদর্শনে বাহির হই। কয়েকটী সম্ভ্রান্ত মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আড্ডাগুলির রহস্য দেখিতে আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া এই পরিদর্শন চলে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্যে আমরা এমন সব জঘন্য স্থানে গিয়াছিলাম, যেখানে সাধারণের যাওয়া দুঃসাধ্য এবং অতীব বিপজ্জনক।

আফিমের ধূমপানের জন্য কেহ গুলী, কেহ চণ্ডু ব্যবহার করে। দুই প্রথাতেই আফিম ধূম্রাকারে পরিণত করিয়া মুখ দিয়া ফুসফুসের ভিতর টানিয়া লওয়া হয় এবং পরে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ফুসফুসের ভিতর

দিয়া ঐ ধূম রক্তের সহিত মিশিয়া তীব্র মাদকতা উৎপাদন করে এবং সেবনকারীকে শীঘ্র অভিভূত করিয়া ফেলে। গুলী খাওয়ার প্রথা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু চণ্ডু খাওয়া প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডু চীনাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস এবং এখনও উহা চীনাদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত।

সহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অনেকগুলি আড্ডা আমরা দেখিয়াছি, এবং গুলি ও চণ্ডুখোরদের কার্য্য, ব্যবহার ও চালচলন পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছি'। কলিকাতা আমার জন্মস্থান এবং এতাবৎ কাল এখানে বাস ও কাজ-কর্ম্ম করিলেও, এবং বহু লোকের সহিত নানা প্রকারের মেলা-মেশা থাকিলেও, এই সুন্দর ঐশ্বর্য্যময়ী বিরাট নগরীর মধ্যে যে এত কদাচার ও জঘন্যতা বিদ্যমান আছে. তাহা আমার প্রত্যক্ষ জানা ছিল না। কোথায় কোথায় আড্ডা আছে তাহা দেখিলাম পুলিশের অজ্ঞাত নহে। সরকারী লোকেরা আমাদের এমন কতকগুলি স্থানে লইয়া গেল, যথায় চণ্ডু বা গুলীর আড্ডা আছে বা থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। প্রায়ই এই আড্ডাগুলি অতি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার গলির ভিতর অবস্থিত; এবং কোথাও বা জঘন্য বস্তির মধ্যে ঘৃণাকার-জনক আবর্জ্জনা-স্তূপের বা পায়খানা বা নর্দ্দামার ধারে অবস্থিত। কলিকাতার মাঝখানে সুরম্য অট্টালিকার ধারেও কয়েকটী আড্ডা আমরা দেখিয়াছি এবং সহরের উত্তর অংশে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ধনী লোকের দ্বারা রক্ষিত অল্পসংখ্যক আড্ডা আছে। এই সব আড্ডায় আফিমের ধূমপানে নষ্টবুদ্ধি লোকদের দেখিয়া মনে দয়ার উদ্রেক হয়। অনেকেই অস্থিচর্ম্মসার; তাহাদের চক্ষু কোটরগত; মুখে চোখে রক্তের অভাব। তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, জোর করিয়া কথা কহিতে কষ্ট বোধ করে এবং সদাই ভীত ও আত্মগোপনে উৎসুক। আপনাদিগকে লোক-সমাজে ঘৃণিত ও ভৎ‍র্সনার পাত্র জানিয়া তাহাদের এত সঙ্কোচ ও গোপনতা। একদিন খিদিরপুরে আমরা পৌঁছানমাত্র চতুর্দ্দিকে বিষম গোলমাল পড়িয়া গেল; এবং কাছাকাছি যত আড্ডা ছিল সবগুলি জনমানব-শূন্য হইল। বহু কষ্টেও সরকারী কর্ম্মচারীরা আর তাহাদের আনিতে পারিলেন না।

চণ্ডুর আড্ডার অধিকাংশই চীনাদের দ্বারা রক্ষিত। সহরের চীনা পাড়ায় অনেক এরূপ আড্ডা আছে এবং খিদিরপুরে ও অন্যান্য স্থানেও কয়েকটা আছে। ঐ আড্ডাগুলিতে প্রত্যহ বহু ব্যক্তির সমাবেশ হয়; এবং চণ্ডুর ধূমে বিভোর হইয়া কত লোক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়। বাঙ্গালীর উপর চণ্ডুর আধিপত্য এখনও বেশী হয় নাই সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত কয়েকটী চণ্ডুর আড্ডা আমরা দেখিয়াছি; এবং ক্রমে উহাদের প্রসার বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। একদিন সন্ধ্যাকালে একটী আড্ডায় হঠাৎ উপনীত হইয়া কয়েকটী বাঙ্গালী যুবককে দেখিতে পাই। দরজার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই একটী গোলমাল শোনা গেল এবং আমরা প্রবেশ করিলে ঘরটীকে সান্ধ্য-সম্মিলনের ক্লব বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা যখন বুঝাইয়া দিল যে আমাদের দ্বারা কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন আড্ডাধারীরা আস-পাশ হইতে তাহাদের লুক্কায়িত সাজ-সরঞ্জামাদি আনিয়া বহু সমাদরে তাহাদের কার্য্য প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। একবার টানিয়া "অপার আনন্দ" পাইতে অনুরোধও আমরা পাইয়াছিলাম; কিন্তু অতদূর সাহসী আমাদের মধ্যে কেহই ছিলেন না। অন্যত্র আমরা একটী দেবালয়ের মধ্যে নীত হই। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠান এবং তাহার এক দিকে হিন্দুর দেবতা প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে একটা বৈঠকখানার মত ঘর; সেই ঘরে চণ্ডুর আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। যিনি ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার স্বর্গগত আত্মা আজ কি ভাবে অবস্থিত তাহা বলিতে পারি না। এ কথা সত্য যে বহু হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অনুষ্ঠানগুলির তথাকথিত তত্ত্বাবধায়কের হস্তে দারুণ লাঞ্ছনা হইতেছে। ইহার কি প্রতীকার নাই? আমরা যে দেব-মন্দিরের কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত বহুজন-পরিচিত মন্দির। যখন আমরা সেখানে প্রবেশ করি, তখন মন্দির-সংলগ্ন খোলা জায়গায় কতকগুলি যুবক ব্যায়ামে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের দেখিয়া স্বদেশবৎসল উন্নতমনা যুবক বলিয়া মনে হইয়াছিল। জানি না তাঁহারা এই চণ্ডুর আড্ডার খবর রাখেন কি না; মনে করিলে সহজেই তাঁহারা এই দুষ্ট ব্যধির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। এরূপ

সুন্দর পবিত্র দেব-মন্দিরের ভিতর এত কদাচার অতীব বিসদৃশ !

অন্যত্র এক দ্বিতল গৃহে আমরা নীত হইলে দেখিলাম, সেখানে বেশ পাটী-পাতা বিছানা এবং চতুর্দ্দিকে কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত। আমরা একজন ব্যতীত আর কাহাকেও সেখানে প্রথমে পাইলাম না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর এবং পুলিশ আমাদের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত কথা বলিল। বুঝা গেল, ইহা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের চণ্ডু খাবার একটী আড্ডা। বাহিরের লোকের নিকট ইহা একটী গান-বাজনার ও বসিবার স্থান; কিন্তু ইহার নিগূঢ়-রহস্যবেত্তারা বিনা আপত্তিতে সেখানে চণ্ডুর ধূম পান করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন। আমরা কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিলাম, এবং ক্রমে ক্রমে কয়েকটী লোকের শুভাগমন দেখিলাম। সকলেই ভদ্রবেশ-পরিহিত—দেখিলে তাহাদের চণ্ডুখোর বলিয়া ধরা কঠিন। বাস্তবিক এইরূপ ভদ্রলোকের জন্য রক্ষিত আড্ডা অতীব আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। লোকজন কম দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া আড্ডাধারী আমাদের বলিল যে "যদি আপনারা রবিবার বা ছুটির দিন আসেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বহু সোনার চাঁদের সাক্ষাৎ পান।" এই আড্ডা একটী বিখ্যাত বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত এবং ইহার সহিত প্রায় সংলগ্নভাবে কতিপয় পতিতা নারীর নিবাস। আমরা শুনিয়াছিলাম যে পতিতা নারীদের মধ্যে এই ধূম পান চলিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই নাই।

সহরের উত্তরাংশে একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা একটী দ্বিতল মাটকোটায় উঠিয়া একটী চণ্ডুর আড্ডায় প্রবেশ করি। সেখানেও সেই পাটী-পাতা এবং গান-বাজনার যন্ত্রাদি রহিয়াছে। ঘরটী ও তাহার চতুঃপার্শ্ব অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং প্রবেশ-পথ আবর্জ্জনাপূর্ণ। ঘরের ভিতরে তখন কয়েকজন চণ্ডু সেবনে ব্যস্ত ছিল। সম্মুখের দেয়ালে বিলম্বিত মহাত্মা গান্ধীর ছবি। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলাম, মহাত্মাকে তারা অত্যন্ত ভক্তি করে এবং তাই তাঁহার ছবি রাখিয়াছে। হায়! নেশাখোরদের দ্বারা প্রতিদিন এই জঘন্য স্থানে মহাত্মার ছবির কি অসহনীয় অবমাননা করা হইতেছে!

চীনাদের মধ্যে চণ্ডুর ধূমপান অতিশয় প্রচলিত। প্রায় ৪।৫ হাজার চীনা এই সহরে বাস করে এবং তন্মধ্যে প্রায় হাজার স্ত্রীলোক। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, দশ বার শত চীনা চণ্ডুতে অভ্যস্ত। কিন্তু চীনা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই নাই। কাঁচা আফিম খাওয়া তাদের মধ্যে চলিত নহে। দিনের কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যায় অনেক চীনাই চণ্ডু সেবনে বিভোর হইয়া থাকে। ঔষধার্থে খাওয়ার ওজর শুনা যায় না এবং মাদক হিসাবে ব্যবহারের কথা স্বীকার করিতে তাহারা সঙ্কুচিত নহে। ছেলেদের বা শিশুসন্তানকে আফিম খাওয়াইতে আমরা দেখি নাই। শুনিলাম আগে না কি চীনাদের মধ্যে চণ্ডু খাওয়া আরও অধিক দেখা যাইত; শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কমিতেছে। যাহা হউক, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট লজ্জাজনক; এই মহা কলঙ্ক অপনোদনে চীনা নায়কদের যত্নবান হওয়া উচিত। সহরের মধ্যস্থলে চীনাদের এই অধঃপতনের জ্বলন্ত উদাহরণ যত শীঘ্র দূরীভূত হয় ততই আমাদেরও মঙ্গল।

বাঙ্গালার বাহির হইতে আগত ভারতীয় শ্রমজীবীদের মধ্যে শিখ ও উড়িয়াদের ভিতর আফিম বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ম্মীজদের সংখ্যা কলিকাতায় বেশী নয় এবং তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানিতে পারি নাই। সেন্সস রিপোর্টে পাওয়া যায় যে ১৯২১ সালে এখানে ১৭০০ শিখ বাস করিত। এক্ষণে ৬।৭ হাজার শিখ কলিকাতায় আছে। ইহাদের ভিতর আফিমের বড়ই প্রচলন। কিন্তু অনেকেই কাঁচা আফিম খায়। বহু শিখ মোটর চালক প্রভৃত পরিমাণ আফিম সেবনে অভ্যস্ত।

কাঁচা আফিম হইতে চণ্ডু তৈয়ারী হয়। দেখিতে ইহা প্রায় আলকাতরার মতন। আফিম জলে গুলিয়া তাহা আগুনের উপর ফোটান হয়; ফুটিতে ফুটিতে উপরে যে গাদ উঠে তাহা বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং পরে সেই ফোটান জলীয় আফিম মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। ছাঁকিবার পর আবার তাহা আগুনে ফোটান হয়। ক্রমে যখন উহা ঘন হইয়া আইসে তখন উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ "ইনি" বা "ইক্কি" মিশ্রিত করা হয়। এই ইক্কি চণ্ডুর ধূমপানের পাইপ বা নলের ভিতরস্থ ধূমের পথে ঐ নলের গায়ে পাওয়া যায়। ইহা একটী পরিবর্ত্তনজনক

খামির পদার্থ বলিয়া মনে হয়। একটী কাটির সাহায্যে উহা আফিমের সহিত বেশ ভাল করিয়া মিশান হয়। শুনিলাম, এই ইঙ্কি না মিশাইলে না কি ভাল চণ্ডু তৈয়ারী হয় না। কেহ কেহ বলেন যে ইহা ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। চণ্ডুর আড্ডাধারীরা ইঙ্কি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে; দাম শুনিলাম প্রায় ১ টাকা ভরী বা তোলা। শুনিলাম চীনদেশে ধনী ব্যক্তিরা চণ্ডু তৈয়ারী হইবার ১০।১২ মাস পরে উহা ব্যবহার করেন; তাহাতে না কি উহা মজিয়া আরও উৎকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হয়। চণ্ডুর সঙ্গে কেহ কেহ গন্ধ-দ্রব্যাদি মিশায়। আড্ডার আবশ্যক-মত চণ্ডু প্রায়ই তথায় তৈয়ারী করা হয় এবং আমরা অনেক স্থলে তাহার সরঞ্জামাদি দেখিয়াছি। যাহারা নিজে তৈয়ারী করিতে পারে না, তাহারা চীনাপাড়ায় চণ্ডু-বিক্রেতার নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনে। ২ বা ২॥০ টাকায় ১ তোলা চণ্ডু পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, চণ্ডু বিক্রয় নিষিদ্ধ হইলেও, অন্ততঃ ১৩।১৪ খানি দোকান চীনাপাড়ায় বেশ চলিতেছে। বহুবাজারের উত্তরে এবং লোয়ার চিৎপুর রোডের পূর্ব্বে এই মহানগরীর বক্ষঃস্থলে এই দোকানগুলি বেশ কারবার করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

পুলিশ ও কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে আমরা ঐরূপ কয়েকটী চণ্ডুর দোকান পরিদর্শন করিয়াছি। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এগুলি চণ্ডু খাইবার স্থান নহে। এখানে কেবল সার পদার্থ তৈয়ারী করিয়া খরিদ্দারগণকে সরবরাহ করা হয়। এগুলি প্রায়ই বৈকাল ও সন্ধ্যার সময় খোলা হয়। পুলিশ কর্ম্মচারীরা যখন আমাদের লইয়া ঐরূপ কোন দোকানের সম্মুখে গেল তখনি চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িল এবং যে যেখানে ছিল সকলে সাবধানতা অবলম্বন করিল। তখন পুলিশ দোকানীকে বুঝাইয়া আমাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা জানাইল এবং অল্পক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তখন একটী ছোট কাঠের দরজা ভিতর হইতে খোলা হইল এবং আমরা কষ্টে ভিতরে গেলাম। ঘরটী অতি ছোট এবং প্রায়ই তাহার ভিতর একজন মাত্র লম্বা হইয়া শুইতে পারে এমন একখানি ছোট তক্তাপোসের উপর বিছানা। পাশেই একটী হাতমুখ ধুইবার "ওয়াস-ষ্ট্যাণ্ড" এবং তাহার উপর জলপূর্ণ পাত্র ইত্যাদি। ঐ ওয়াস্-ষ্ট্যাণ্ডটী এরূপ ভাবে বাহিরের ড্রেনের সহিত সংযুক্ত যে, তাহাতে জল ফেলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়। ঐ হাতমুখ ধুইবার ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটেই একটী দেরাজের টানার ভিতর চণ্ডু রক্ষিত হয়। চণ্ডু রাখিবার জন্য শামুকের খোলা ব্যবহৃত হয় এবং বিক্রীত চণ্ডু ছোট ছোট ঝিনুকে করিয়া ক্রেতাকে দেওয়া হয়, তাহাতে লইয়া যাইবার সুবিধা হয় এবং শীঘ্র উহা নষ্ট হয় না। ক্রেতা প্রায়ই বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে এবং ছোট জানালার ভিতর দিয়া চণ্ডু বিক্রয় করা হয়। ঘরের ভিতর দরজার মাথায় একটী আলো জ্বলে এবং সম্মুখে কাচ লাগান থাকায় বাহির হইতে আলোক দেখা যায়; এই আলোক না কি চণ্ডুর দোকানের চিহ্ন।

ঘরের আসবাবের বর্ণনা পড়িয়া পাঠক হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিছানা ও হাতমুখ ধুইবার সাজসরঞ্জামের উদ্দেশ্য এই যে, যদি কখন কোন বাহিরের লোক হঠাৎ ভিতরে আসে, তবে উহা একজন সামান্য ব্যক্তির থাকিবার ঘর বলিয়া মনে হইবে; এবং যদি কখন পুলিশ বা আবকারী-বিভাগ হইতে ধরপাকড় হয়, তখন সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র সমস্ত চণ্ডু ওয়াস্-ষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে, উহা অতি শীঘ্র জলের সহিত মিশিয়া বাহিরের ড্রেনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। তখন ঐ ঘরে চণ্ডুর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং অনুসন্ধানেও সাক্ষ্যস্বরূপ কিছুই মিলে না। আশ্চর্য্য এই যে, এতগুলি চণ্ডুর দোকান প্রত্যহ এই সহরে রীতিমত ব্যবসা চালাইতেছে জানিয়াও কেহ কিছু করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে উপস্থিত আইন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চণ্ডু রাখা অথবা চণ্ডু সেবন করা অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। আইন দ্বারা চণ্ডুর ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ করা না হইলে ঐ ব্যবসা বন্ধ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

কিরূপে চণ্ডু সেবন করা হয় তাহা জানিতে অনেকের বলবতী ইচ্ছা দেখা যায়। পুলিশ কোর্ট হইতে চণ্ডু সেবনের একসেট সরঞ্জাম আমার নিকট আসিয়া পড়ে এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা দেখিয়া আনন্দিত হন। সেজন্য পাঠকের অবগতির জন্য উহার প্রতিকৃতি এবং ব্যবহার-প্রণালী দিলাম। উহা পড়িয়া চণ্ডুর দিকে কেহ প্রলোভিত হইবেন

এ আশঙ্কা আমার নাই; বরং দারুণ অনিষ্টের কারণ জানিয়া সকলেই উহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াই আশা করি।

চণ্ডু সেবনের সরঞ্জামের মধ্যে "পাইপ" বা হুঁকাই সর্ব্বপ্রধান। উহা কমবেশ ২০ ইঃ লম্বা ও ১ ইঃ মোটা একটী নল; প্রায়ই ইহা বংশ বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং পিতল রৌপ্য ইত্যাদির বেষ্টনী দ্বারা মণ্ডিত। নলটার এক দিক বন্ধ এবং আর এক দিকে মুখ দিয়া টানিবার জন্য একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রটার চার পাশ প্রায়ই হস্তিদন্ত বা রৌপ্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে। পাইপের বন্ধ দিকটার ৭।৮ ইঃ নিম্নে কলিকার আকার বিশিষ্ট অংশটী অবস্থিত এবং উহা পাইপের গায়ে পিতল বা রৌপ্য বেষ্টনীর দ্বারা আঁটিয়া বসান থাকে; আমরা এই অংশটাকে চণ্ডুর কলিকা বলিতে পারি। উহা পোড়া মাটীতে তৈয়ারী, ভিতরটা ফাঁপা (আন্দাজ ২ বা ২॥ ইঃ প্রশস্ত এবং ১॥ ইঃ গভীর) এবং উপরে ঢাকা-আঁটা। ঐ ঢাকার মধ্যভাগে একটু টেপা (concave) এবং তাহার ঠিক মাঝখানে একটী সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র কলিকার গলার ভিতর দিয়া পাইপের মধ্যস্থিত ধূম-নির্গমের পথের সহিত মিলিত (প্রতিকৃতি দেখুন)।

চণ্ডু খাইতে হইলে একটী প্রদীপের আবশ্যক হয়। চীনাদের আড্ডায় যেরূপ প্রদীপ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রতিকৃতি দিলাম। উহার তৈলাধারটী কাচের হয় এবং শিখা খুব তেজাল নহে। একটী কাচের আবরণ দ্বারা তাহা ঢাকা থাকে। এই আবরণ দেখিতে কাচের গ্লাশের মত। ঐ ঢাকার উপরিভাগে একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া চণ্ডু সহজে আলোক-শিখার সংস্পর্শে আনা যায় (প্রতিকৃতি দেখুন)। চীনারা মাথার নিয়ে বালিশ হিসাবে চীনামাটী বা পোর্সিলেন্ নির্ম্মিত একপ্রকার ইট ব্যবহার করে এবং চণ্ডুর আড্ডায় ইহা সারি সারি পাতা থাকে। উহার উপর মাথা রাখিয়া কি আরাম পাওয়া যায় তাহা উপলব্ধি করা আমা-দের পক্ষে কঠিন।
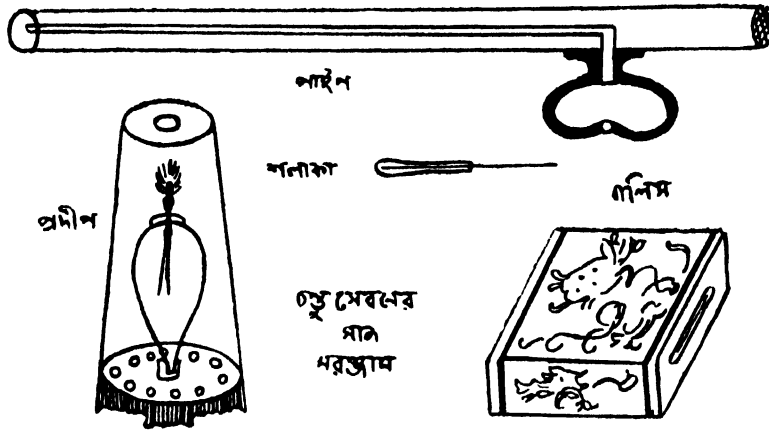
চণ্ডুখোরেরা প্রায়ই কয়েক-জন একত্র হইয়া ধূমপান করে। দুই-দুইজন পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়া পাশাপাশি শয়ন করে এবং মধ্যস্থানে উভয়ের মুখের কাছাকাছি প্রদীপটী জ্বলিতে থাকে। এ অবস্থায় একজন পাইপটী হাতে ধরিয়া একটী লৌহ শলাকার সাহায্যে একটু চণ্ডু তুলিয়া প্রদীপের আবরণের গর্ত্তের ভিতর দিয়া প্রদীপের শিখার উপর ধরে। অল্পক্ষণেই শিখার উত্তাপে চণ্ডুটুকু গুলী পাকাইয়া যায়। তখন সেই গুলীটাই শলাকার সাহায্যে চণ্ডুর পাইপস্থ কলিকার মধ্যস্থলের টেপা অংশের ছিদ্রে লাগান হয়। ইহার পরই ধূমপায়ী শায়িত অবস্থাতেই পাইপটী এমন ভাবে ধরে যে তৎসংলগ্ন কলিকায় অবস্থিত চণ্ডু প্রদীপ-শিখার সংস্পর্শে আইসে। ইহাতে শিখার উত্তাপে চণ্ডুর ধূম নির্গত হইতে থাকে। তখন পাইপের ছিদ্রে মুখ দিয়া ধূমপায়ী টান দেয় এবং তাহার মুখ ও বক্ষ পূর্ণ করিয়া ভিতরে ঐ ধূম টানে ও অল্পে অল্পে বাহির করিয়া দেয়। একজনের টানা হইলে সে তাহার সঙ্গীর হাতে পাইপটী দেয় এবং সেও তখন টানিয়া ধূমপান করে। যতক্ষণ সমস্ত চণ্ডু পুড়িয়া শেষ না হয় ততক্ষণ হাত বদলা-বদলী চলে। তখন নেশায় বিভোর হইয়া দুজনেই অল্পক্ষণ শুইয়া থাকে এবং পরে সরিয়া যাইয়া অন্যকে স্থান ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যহ চণ্ডুর আড্ডায় এই অপরূপ দৃশ্য পুনঃ পুনঃ চলিয়া থাকে। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্ব-প্রধান নগরীর বক্ষঃস্থলে এই বীভৎস কাণ্ড চলিতেছে—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

"গুলী"র অন্য নাম "মাদত"। ইহা আফিম হইতে উৎপন্ন এবং চণ্ডুর রূপান্তর বলিলে ভুল হয় না। বাঙ্গালায়

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে। গুলী তৈয়ার করিতে হইলে আফিম জলে গুলিয়া তাহা আগুনে ফুটাইতে হয় এবং পরে তাহার সহিত শুষ্ক পেয়ারা পাতা, মসুরীর ডাল বা তদ্রূপ পদার্থ গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া ঘন করা হয়। বেশ ঘন হইলে তাহা হইতে গুলী পাকান হয়, সেইজন্যই উহার নাম হইয়াছে "গুলী"। গুলী খাইতে সাধারণ হুঁকা ও তাহার উপরে ছোট কলিকা এবং হুঁকাতে সংলগ্ন বাঁশের বা কাঠের লম্বা নল ব্যবহৃত হয়। এখানেও দেখা যায়, প্রায়ই জনকতক একত্র বসিয়া গুলী খাইয়া থাকে। তাহারা সম্মুখে বিড়ার-আকার-বিশিষ্ট একটী আধারে হুঁকা বসায়। এক এক আড্ডায় ৭।৮ জনের জন্য পাশাপাশি হুঁকা রাখিয়া গুলী খাইবার ব্যবস্থা আমরা দেখিয়াছি। আধারে হুঁকা বসাইয়া উহার কলিকার ছিদ্রের উপর গুলী রাখা হয়। হুঁকার সংলগ্ন লম্বা দৃঢ় নলটী ধূমপায়ী সম্মুখে বসিলে, ঠিক তার মুখের নিকট থাকে। তখন একখণ্ড কাট কয়লায় আগুন ধরাইয়া এক হাতে উহা দ্বারা কলিকাস্থিত গুলীতে আগুন দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নলটীতে মুখ দিয়া টানিতে হয়। তখন গুলী পুড়িয়া উঠে এবং নলের ভিতর দিয়া তাহার ধূম মুখে যাইয়া পৌঁছে। ধূমপায়ী তাহা বক্ষের মধ্যে টানিয়া লয় এবং পরে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দেয়। শীঘ্রই গুলী পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। শুনিলাম দুই তিন পয়সায় একটী গুলী পাওয়া যায়। যে যেমন পরিমাণে অভ্যস্ত সে সেই পরিমাণে গুলী পুড়াইয়া নেশা করে।

বলা বাহুল্য গুলীখোরেরা প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর কুলী মজুর ও মিস্ত্রী প্রভৃতি; মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের মধ্যেও গুলীখোর দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা সহরে পুলিশের জানা ৯৩টা চণ্ডুর আড্ডা এবং ৫৯টা গুলীর আড্ডা আছে। শুনিলাম যে ঐ সকল আড্ডায় প্রত্যহ অন্যূন ১৫০০ লোক চণ্ডু ও ৯০০ লোক গুলী খায়। বারাকপুরে ৮।৯টা আড্ডা আছে এবং শ্রীরামপুরে ৫।৬টা আছে। ঠিক খবর পাওয়া কঠিন হইলেও অনুমান করা গিয়াছে যে প্রত্যহ প্রায় ২৫০০ লোক নেশার জন্য আফিমের ধূমপান করে এবং সেজন্য প্রায় ৭ সের আফিম প্রত্যহ পোড়ে।

নেশার বশীভূত হইয়া পড়িলে লোকের কতদূর অধঃপতন হয়, তাহা এই আড্ডাগুলি পরিদর্শন করিলে বেশ বুঝা যায়। নিতান্ত মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই ঘৃণিত ধূম-পান প্রথার সমর্থন করিতে পারেন না। বাস্তবিক ইহা যে এতদিন আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হয় নাই, তাহাই পরিতাপের বিষয়। কমিটীতে রাহা মহাশয় আমাদিগকে জানান যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট আফিমের ধূম পান বন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং সেজন্য শীঘ্রই আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে। এ কথা শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম এবং সেজন্য ধূম-পান বন্ধ করা বিষয়ের আলোচনায় নিরস্ত হইলাম।

পরিদর্শন-কার্য্য শেষ হইয়া আসিল এবং ইতিমধ্যে অনেকের নিকট হইতে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর আসিয়া পৌঁছিল। তখন কতকগুলি বিখ্যাত ব্যক্তির নামের তালিকা করা হইল এবং আমাদের অধিবেশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইল। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আমাদের ১৮ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর অবধি বারটী অধিবেশন হয় এবং বহু লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তথায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সাক্ষীদের মতামত পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত।

কতিপয় প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে আমরা কতকগুলি অতিরিক্ত প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলাম। আফিম বহুদিন সেবনে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির মধ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহাই জানিবার উদ্দেশ্য ছিল। বহুদিন মদ্যপানের ফলে যন্ত্রাদির গঠনগত যে সকল সূক্ষ্ম (histological) পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সুবিদিত। আফিমখোরের মৃতদেহের যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কিরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বহু চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের শবব্যবচ্ছেদাগারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ থাকিলেও তথায় নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরা এদিকে মনোযোগ করেন নাই।

প্রাপ্ত উত্তরগুলি আলোচনা করিয়া যাহা বুঝা গিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনেকেই উত্তর দিয়াছেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কলকারখানা-গুলিতে নিযুক্ত নিরক্ষর কুলী-মজুরদের মধ্যে আফিম খাওয়ার প্রচলন খুব বেশী। তাঁহারা মনে করেন যে

আফিম খাইলে নানাবিধ ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে কষ্ট হয় না। কতকগুলি পাটের কলে পশ্চিমপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বিলাসপুর প্রভৃতি হইতে আগত কুলী-মজুরদের নৈতিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ এবং পারিবারিক জীবনের অভাবে প্রায়ই তাহারা আফিমের মাদকতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মিলের ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে অস্বাস্থ্যকর ভোজন, পেটের অসুখ, হাঁপানী, কাসি, জঘন্য নোংরা বস্তিতে বাস, বাঙ্গলার সেঁতসেঁতে জমী ও হাওয়া এবং আফিমে অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি কুলী-মজুরদের মধ্যে অতিরিক্ত আফিম প্রচলনের কারণ। "আনন্দ বাজার" ও "মডার্ণ রিভিউ"র সম্পাদকেরা বলেন যে কলকারখানার সন্নিকটে আফিমের দোকান স্থাপিত হওয়ায় উহার কাট্‌তি এত বাড়িয়াছে। রেভারেণ্ড পেটন বলেন যে, ইংলণ্ডে যেমন কুলী-মজুরদের বস্তিগুলিতে (industrial slums) মদের অত্যধিক প্রচলন, তেমনি হেথায় অস্বাস্থ্যকর জঘন্য নোংরা স্থানের বাসিন্দা কুলী-মজুরদের মধ্যে আফিম চলিতেছে। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মতে আফিম সহজপ্রাপ্য ও সস্তা বলিয়া প্রায়ই লোকে সেদিকে ধাবিত হয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পাইতে অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য বশতঃ আফিম খাইয়া সর্ব্ব ব্যাধি নিবারণ করিতে চায়। আফিমে অভ্যস্ত অন্য প্রদেশের কুলীরা আরও দশ জনকে আফিম খাইতে শিখায়। সেজন্য মিলের সান্নিধ্যে আফিমের প্রচলন বাড়িতেছে। অনেকেই বলিয়াছেন যে, আফিমের মাদকতা, সাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি না করা, ও কতিপয় ব্যাধির উপশম করা, এই তিনটী গুণের জন্য আফিমের কাট্‌তি বাড়িতেছে।

সহরের শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে। সারা-দিন পরিশ্রমের পর মাদক হিসাবে আফিম খাওয়ার কথার অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। এখানেও অন্য প্রদেশ হইতে আগত আফিমসেবীর অনুকরণ সংক্রামক হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মেজন্য ছোপরার মত ট্যাক্সিচালক, দ্বারবান প্রভৃতিরা বহুক্ষণ কাজ করিতে হওয়ায় আফিম ব্যবহার করে। অনেকেই বলিয়াছেন যে বর্ম্মিজ প্রভৃতি ও সর্ব্বোপরি চীনাদের দরুণ আফিম বিক্রী বাড়িয়াছে। গুণ্ডাদের মধ্যে মাদক হিসাবে আফিম চলে এবং বহু-সংখ্যক গুলী ও চণ্ডুর আড্ডা থাকায় সহরে এত অধিক আফিম বিক্রয় হইতেছে। সাধারণ অধিবাসীদের ভিতর বহুমূত্র, উদরাময়, বাত, হাঁপানী, কাসি ইত্যাদি ব্যাধি-গ্রস্ত অনেক ব্যক্তি আফিম সেবন করে এবং মদের দাম বেশী বলিয়া কেহ কেহ সস্তা ও সহজপ্রাপ্য আফিমের শরণ লইয়াছে। বর্ম্মায় চালান দিবার জন্য এখানে আফিম কেনার কথা আমরা শুনিলেও তাহার ঠিক সংবাদ কেহ দেন নাই। পানে খাইবার সুরতী ইত্যাদির সহিত আফিম মিশ্রণ, বিড়ি বা সিগারেটের উপর আফিমের জল ছিটান এবং চা এর দোকানে "ভাল চা"র কাপে আফিমের আরক মিশানর কথা কেহ কেহ উত্থাপন করিলেও উহার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ আমরা পাই নাই। কতকগুলি আফিমঘটিত ডাক্তারী ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়ায় এত চলিত হইয়াছে যে অনেকে নিজের ইচ্ছামত সেগুলি ব্যবহার করে। এতদ্ভিন্ন হাকিমী ও কবিরাজীতে কতকগুলি আফিমঘটিত ঔষধ প্রচলিত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে আফিমের কথা না থাকিলেও এক্ষণে কবিরাজী ঔষধে উহা ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ নানাবিধ ঔষধে কত আফিম কাট্‌তি হইতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

বুঝা গেল যে, মাদকতার জন্য গুলী বা চণ্ডুর ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও কাঁচা আফিম গলাধঃকরণ করিয়া নেশা করার অভ্যাস সাধারণের মধ্যে বেশী নাই। আফিম-ক্রেতাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অল্প পরিমাণ সেবন করে, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের ভিতর হইতেই আফিম-খোরের উৎপত্তি হয়। বাস্তবিক অনেকেই ঔষধ হিসাবে আরম্ভ করিয়া কিছুদিনের মধ্যে তাহা বাড়াইয়া ফেলে এবং স্বাস্থ্য হারায়।

কোকেনের পরিবর্ত্তে আফিম ধরার কথা দুইটী এসোসিয়েসন আমাদের জানাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে দুশ্চরিত্র যুবকেরা ইন্দ্রিয় সম্ভোগে সাহায্যার্থ আফিম খায় এবং বেশ্যামহলে চণ্ডুর ধূমপানের কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আফিমে সম্ভোগ-ক্ষমতা বাড়ে কি না তাহাতে মতভেদ আছে। ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর সি-আই-ই, মহোদয়ের মতে অল্প পরিমাণ

আফিমে প্রথম উত্তেজনা জন্মিলেও পরে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-ক্ষমতা শিথিল হইয়া যায়; এবং অধিক আফিম সেবনে উহা একেবারে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। বাঙ্গলার ভদ্র সমাজে মাদক হিসাবে আফিম খাওয়া ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক্তারদের অনেকেই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর মধ্যে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে আফিম ধরা বিরল এবং প্রায়ই তাহা কোন ব্যাধি নিবারণোদ্দেশ্যে প্রথম আরম্ভ করা হয়। কিন্তু অসুখের ওজর সর্ব্বত্র সত্য নহে। মদ ছাড়িবার উদ্দেশ্যে আফিম খাওয়ার কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং মদ ছাড়িতে বা যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আরম্ভ করিয়া, পরে মদ বন্ধ হইলেও অথবা যন্ত্রণা দূরীভূত হইলেও, আফিম চলিতেছে, এমন ঘটনা অনেকেই দেখিয়াছেন।

আফিম ব্যবহারের কুফলের কথা বহু ডাক্তারেরা জানাইয়াছেন। ডাঃ চুণীলাল বসুর মতে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ আফিমেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। মেজর্ ছোপরার মতে অধিক বয়সেও বেশী দিন আফিম সেবনে সমূহ ক্ষতি হয়। কবিরাজ গণনাথ সেন বলেন যে ১½ গ্রেণের অধিক আফিম কিছুদিন সেবন করিলে দেহের শক্তির হ্রাস হয় এবং পীড়িত হইলে সাধারণ ঔষধ তাহার দেহে ফলপ্রদ হয় না। কাহারও কাহারও মতে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ ও ভাল আহার্য্য পাইলে অল্প পরিমাণ আফিম সেবনে মানবের দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হয় না। যাহা হউক সকলেই স্বীকার করেন যে, কোষ্ঠবদ্ধতা আফিমসেবীর নিত্যসহচর এবং প্রায়ই লিভারের কার্য্য শিথিলতা ও হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে। আফিম হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা, নিদ্রালুভাব, অলসতা, পরিশ্রমে কাতরতা, ক্ষুধামান্দ্য, ত্বকের শুষ্কতা, বর্ণের মলিনতা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, মণিকার কুঞ্চন, দেহের ভারক্ষয়, জীবনীশক্তির হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘোর আফিমখোর মানসিক শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং তাহার নিজের উপর আধিপত্য থাকে না। তাহার দেহ ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকে, সে নানা দুষ্কার্য্যে রত এবং আফিমের জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে ও নীচতায় নিজেকে মনুষ্য নামের অযোগ্য করিয়া ফেলে।

অনুসন্ধানে জানা গেল, আফিমখোর কয়েদীকে জেলে তাহার প্রার্থনা-মত আফিম দেওয়া হয় না। প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল সিমসন্ জানান যে, হঠাৎ বন্ধ করিলে পাছে কোন গোলমাল হয়, সেজন্য দিন কয়েক তাকে অল্প মাত্রায় আফিম দেওয়া হয়; কিন্তু শীঘ্র উহা আরও কমাইয়া পরে বন্ধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, আফিম বন্ধ করার উপকার ভিন্ন অপকার হয় না; এবং অনেক স্থলে তাহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ডাঃ ডি, এন, সেনের অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। হাসপাতালে আফিমখোর রোগীর চিকিৎসাকালে অপকারের সম্ভাবনা দেখিলে ডাক্তারেরা আফিম যথাসম্ভব কমান বা বন্ধ করিয়া দেন। অনেক সময় রোগীকে ভুলাইবার জন্য আফিমের ন্যায় তিক্ত কোন ঔষধের গুলী পাকাইয়া তাহাকে দেওয়া হয়।

প্রাপ্ত উত্তরগুলি পাঠে বুঝা গেল যে, শিশু সন্তানকে আফিম দ্বারা ঘুম পাড়ানর প্রথা বিশেষ চলিত নহে,—কেবলমাত্র বাঙ্গলার বাহিরের লোকদের মধ্যে তাহা অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে মিলগুলির সন্নিকটে কাজের সময় কোন কোন বিলাসপুরী ও মাদ্রাজী স্ত্রী-মজুর নিজ নিজ শিশুদের ঐ উপায়ে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। পশ্চিম ও উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যেও উহা কখন কখন দেখা যায়। রাজমিস্ত্রীর কাজে স্ত্রী-মজুররা কেহ কেহ নিজ শিশুকে আফিম খাওয়ায়। কাজের সময় ব্যতীত রাত্রেও সন্তানের ক্রন্দন বন্ধ করিতে আফিমের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর বয়স অবধি খাওয়াইয়া আফিম বন্ধ করা হয়। ভুলক্রমে মাত্রা বেশী হওয়ায় কখন কখন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে এবং সেরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। অল্প মাত্রায় কিছু দিনের জন্য আফিম ব্যবহারে শিশুর দেহে কি ফল হয় তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর কুলী-মজুরেরা সন্তানদের পেটের অসুখ, সর্দ্দি, কাসি ইত্যাদি পীড়ায় আফিম আনিয়া খাওয়ায় তাহা দেখা গিয়াছে। আয়া ও স্তন্যদাত্রী ধাত্রীদের পালিত শিশুকে আফিম খাওয়ানর কথা শুনিয়াছি; কিন্তু উহার যথার্থ সংবাদ বা দোকান হইতে তাহাদের আফিম ক্রয় করার প্রমাণ আমরা পাই নাই।

সাক্ষ্য প্রদান কালে * * * বলেন যে, কোন কোন

সম্ভ্রান্ত পশ্চিমের মুসলমান পরিবারে শিশু সন্তানকে আফিম দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান আছে; এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইহাতে সর্দ্দি কাসি থাকে না এবং শিশুর স্বাস্থ্যের মঙ্গল হয়। পরিবারস্থ মহিলারা নিজে নিজেই শিশুদের আফিম খাওয়ান এবং বাটীর কর্ত্তাদের তাহা অবিদিত নহে। ৩ বা ৪ বৎসর অবধি আফিম চলে; পরে বন্ধ করা হয় এবং ইহাতে শিশুর ক্ষতি হয় না। তিনি আরও বলেন যে, হাকিমেরা শিশুদের জন্য ঐরূপ আফিম ব্যবস্থা করেন। ডাঃ * * * ও ডাঃ * * * যাঁহারা বহু মুসলমান পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, বলেন যে পশ্চিমের এবং বঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে শিশুদের আফিম খাওয়াইবার প্রথা আছে।

বড় বড় কল-কারখানায় ডাক্তার ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু প্রায়ই তাহা প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয়। ৬ বা ৭ হাজার লোকের জন্য একজন ডাক্তার ও তদনুযায়ী বন্দোবস্ত কখন সমুচিত বলা যায় না। নানা কারণে ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি কুলী-মজুরদের তাদৃশ চিত্তাকর্ষক না হওয়ায় পীড়ার সময় তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতে পারে নাই। তাই পেটের অসুখ, বাত, সর্দ্দি, কাসি, ইত্যাদি রোগে তারা নিকটস্থ আফিমের দোকানে ঔষধ কিনিতে দৌড়ায়। বাস্তবিক ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যেটুকু চিকিৎসার বন্দোবস্ত তাহাদেরই জন্য করা হইয়াছে তাহারও সাহায্য তাহারা লইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ৪০ বৎসর বয়সের পর আফিম সেবনে দেহের বিশেষ কোন হানি হয় না এবং উহা সমাজের অহিতকারী নহে। অল্প বয়স্ক ছেলেদের বা যাহারা সুখাদ্য খাইতে পায় না তাহাদেরই ক্ষতি করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন না করিলে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করে না। যাহা হউক, কল-কারখানার মজুরদের মধ্যে আফিম প্রচলন হইলে সেথাকার কাজকর্ম্মের শিথিলতা, এবং তাহাদের উদাহরণ ফলে অন্যান্য লোকেরও কার্য্য-কুশলতা হ্রাস পায়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মিঃ পেটন্, ডাঃ চুনীলাল বসু প্রভৃতি স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালার আফিম-খোরেরা সংখ্যায় এত অধিক নহে যে, তাহাদের জন্য সমগ্র সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে বা লোকসমূহের দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতন হইতেছে। অনেকেই বলেন যে, আফিমের অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার, চিকিৎসার বন্দোবস্তের প্রসার এবং পারিপার্শ্বিক মতামতের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান হওয়ায় শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারে আফিম সেবন প্রথা অনেক কমিয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ঘরে ঘরে কর্ত্তা বা গৃহিণীকে আফিম খাইতে দেখা যাইত, সেরূপ আর দেখা যায় না। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক ভদ্র বাঙ্গালী প্রায়ই আফিম খায় না এবং গত ২৫ বৎসরে ঐ শ্রেণীর মধ্যে আফিম ব্যবহার আরও কমিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। শ্রমিক প্রতিনিধি মিঃ চৌধুরী মনে করেন যে, সারা দিন পরিশ্রমের পর কুলী-মজুরেরা অল্প পরিমাণ আফিম সেবন করিলে ক্ষতি নাই; এবং তাহাতে উহাদের কার্য্যকুশলতা কমে না। কিন্তু মিলের বহুদর্শী ডাক্তারেরা বলেন যে, আফিম সেবনে অলসতা অনিবার্য্য। এইরূপ মতভেদ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। কোন বিজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে, আফিমে সমাজের নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য নহে; এবং তাঁহার মতে তামাক আফিমের তুলনায় অধিকতর অনিষ্টকর। অন্য একজন বলিয়াছেন যে, তিনি বহু দিনের অভিজ্ঞতায় আফিমসেবীর মধ্যে দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি দেখেন নাই; কর্ণেল সিম্সন্ ও মেজর দে বলিয়াছেন যে, পুলিশের নথিপত্রাদি হইতে দেখা যায় যে, দুষ্ক্রিয়ার সহিত আফিম খাওয়ার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই বিষয়ের আলোচনা কালে একদিন * * * পত্রিকা আফিম খাওয়াইয়া আমরা লোককে নির্ব্বিরোধী করিতে সরকারকে পরামর্শ দিতেছি বলিয়া রসিকতাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। সম্পাদক মহাশয়ের দায়িত্বজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হই। কিন্তু পরে তিনি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, পতিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাদকতার জন্য আফিম খাওয়া চলিত নাই; কিন্তু ঐ শ্রেণীর বৃদ্ধাদের মধ্যে আফিম খাওয়া দেখা যায়। জন-কতক বেশ্যার চণ্ডু খাওয়ার কথা আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু উহা প্রসার পায় নাই। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আফিমের চলন বেশী বলিয়া মনে হইল না,—তাহাদের মধ্যে গাঁজাই অধিক প্রচলিত।

রোগের প্রতীকার বা প্রতিষেধার্থে আফিম ব্যবহার চলিত আছে ; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত আলোচনায় দেখা গেল যে, আফিমের ঐরূপ গুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁহারা বলেন যে, ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিবার শক্তি আফিমের নাই। উহা কেবল স্থলবিশেষে সাময়িক উপকার সাধন করে ও রোগের যন্ত্রণা দমন করে। উহা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। মেজর ছাপরার মতে আফিমের ব্যাধি আরোগ্য বা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই ; বরং উহা ক্ষতিকর। তিনি বলেন যে, ডায়াবিটিস রোগীকে আফিম দিলে তাহার কষ্টের লাঘব হয় ও মূত্রে শর্করা কমে সত্য, কিন্তু পরে সমূহ ক্ষতি হয় এবং বহুদিন ব্যবহারে ঐ রোগীর আয়ুঃ হ্রাস হয়। ডাঃ মূরও ঐরূপ মত প্রকাশ করেন। এই মতের বিরুদ্ধে দেখান হয় যে, শত শত ডায়াবিটিস রোগী নিয়মিত ভাবে আফিম খাইতেছে এবং উপকার না পাইলে তাহারা কখন উহা ব্যবহার করিত না। যাহা হউক উহার মীমাংসার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই।

আবকারী কর্ম্মচারীরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন আফিমসেবীর জীবনী সংগ্রহ করিয়া দেন। একজন যশস্বী প্রতিভাবান বাঙ্গালা লেখকের আফিম সেবনের কথা উল্লিখিত হয়। কয়েকজন আফিমসেবী সাক্ষ্য দিতে আসিয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও আফিমের গুণাবলীর বর্ণনা করেন। একজন ৪০ বৎসরের পর সকলকেই অল্প আফিম খাইতে উপদেশ দেন এবং যাহাতে উহা সকলের সহজ-প্রাপ্য হয় তাহাই করিতে বলেন। আশ্চর্য্য এই যে, তিনি তাঁহার নিজ পুত্র ও পৌত্রগণকে আফিম ধরাইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে ইতস্ততঃ করেন। বাস্তবিক আফিম-খোর নিজ পুত্রকে আফিমে অভ্যস্ত করাইয়াছে এমন ঘটনা বিরল।

কি রূপে আফিমের বর্ত্তমান বিক্রয়াধিক্য কমান যায়, তাহা লইয়া অনেক প্রস্তাব ও বাদানুবাদ হয়। সংক্ষেপে তাহার আভাষ নিম্নে দেওয়া হইল। কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে, আফিম বিক্রয়ের ও নিজের নিকট রাখিবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আরও কমাইয়া ৪ তোলা বা ৪৫ গ্রেণ করা হউক। ডাঃ চুণীলাল বসু উহা ২০ গ্রেণ করিতে বলেন। কেহ বা আরও কম করিতে বলেন ; এবং এক ব্যক্তি উহা আইন করিয়া ৩ গ্রেণে পরিণত করিতে বলেন।

মেজর ছোপরা, কর্ণেল গার্ড, ডাঃ মূর প্রভৃতি পরামর্শ দেন যে, আফিমের খুচরা বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হউক, যাহাতে সস্তায় আফিম না পাওয়া যায়। কিন্তু মাড়োয়ারী এসোসিয়েসান, ষ্টেট্‌সম্যান সংবাদপত্র ও কতকগুলি মিলওয়ালা বলেন যে তাহা হইলে যাহারা বাস্তবিক পীড়ার জন্য আফিম ব্যবহার করে তাহাদের উপর অন্যায় করা হইবে।

অনেকেই বলেন যে, দোকানের সংখ্যা কমাইলে আফিমের কাট্‌তি কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ কলকারখানার প্রবেশ-পথের অতি সন্নিকটে আফিমের দোকান করিতে দেওয়া উচিত নহে।

সার দেবপ্রসাদ ছুটীর দিনে আফিমের দোকান বন্ধ রাখিতে এবং অন্যান্য দিনে বিক্রয়ের সময় কমাইয়া দিতে বলেন। এক্ষণে ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ককে আফিম বিক্রয় করা নিষিদ্ধ আছে, কেহ কেহ এই ২০ বৎসরের স্থলে ৩০ করিতে বলেন।

ডাক্তারদের কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে আবকারী আফিমের সহিত খয়ের, একষ্ট্রাক্ট জেনস্যন প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া বিক্রয় করা হউক। উহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, অথচ আফিমের তীব্রতা কমিয়া যাইবে। ক্রমে ঐ ভেজাল দ্রব্যের ভাগ বাড়াইয়া আফিমের পরিমাণ কমান যাইতে পারিবে। শতকরা ২০ ভাগ ভেজালে বিশেষ আপত্তি উঠিবে না। অনেক হাসপাতালে আফিমখোর রোগীর জন্য ঐরূপ উপায়ে আফিম কমান হয়।

বর্ত্তমান লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানগুলির পরিবর্ত্তে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারখানার উপর আফিম বিক্রয়ের ভার দেওয়ার প্রস্তাব আমাদের নিকট আসে। প্রস্তাবকারীরা বলেন যে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট বা প্রেশক্রিপশন লইয়া বা আবকারী বিভাগ হইতে অনুমতি-পত্র (permit) লইয়া যে আসিবে, তাহাকেই ডাক্তারখানা আফিম বিক্রয় করিবে। আর যদি অবাধ বিক্রয়ই বাহাল রাখা হয়, তাহা হইলেও ডাক্তারখানায় যাইয়া আফিম ক্রয় করায় সাধারণের অসুবিধা হইবার কথা নহে। বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারখানা প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং সেখানে রেজেষ্টারি-করা

ডাক্তার থাকেন। ঔষধ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্প খরচে সেখানে আফিম বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না এবং আবকারী বিভাগ তাহাদের সহযোগিতায় কাজ করিলে সম্ভবতঃ দুই পক্ষই লাভবান হইবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার কয়েকটী অন্তরায় থাকিলেও কতকগুলি সভাসমিতি এবং কয়েকজন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বার ইহার সমর্থন করেন।

সার দেবপ্রসাদ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান প্রথা বদলাইয়া নির্দ্দিষ্ট মাহিনার সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের উপর আফিম বিক্রয়ের ভার দেওয়া হউক। ১৬০ এর মধ্যে ৯৩ স্থান হইতে ঐরূপ প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া যায়। যে তিনজন লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানদার সাক্ষ্য দেন তাঁহারাও নির্দ্দিষ্ট মাহিনায় আফিম বিক্রয়ের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সকলেরই স্বীকার্য্য যে, বিক্রয়ের উপর কমিশন দেওয়ার প্রথায় কাটতি বাড়াইবার দিকেই বিক্রেতার দৃষ্টি থাকে। মিঃ রায় চৌধুরী অল্পসংখ্যক অংশীদার লইয়া একটী পাবলিক বোর্ড "(Public Board) গঠন করিয়া তাহার উপর আফিম বিক্রয়ের ভার দিতে চান।

কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে, যাহাদিগকে আফিম বিক্রয় করা সঙ্গত বিবেচিত হইবে তাহাদের সুবিধার জন্য একটী অনুমতি-পত্র বা "পারমিট" (permit) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। উহাতে নাম ধামের সহিত নির্দ্ধারিত আফিমের পরিমাণ লিখিত থাকিবে; উহা না দেখাইয়া কেহ আফিম ক্রয় করিতে পাইবে না এবং লিখিত পরিমাণের বেশী আফিম কেহই তাহাকে বিক্রয় করিবে না। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিলে তবে এই পারমিট দেওয়া হইবে, এরূপ প্রস্তাব হয়। কিন্তু অনেকেই ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা সর্ব্বত্র সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। আবকারী বিভাগ হইতে জানা আফিমখোরদের নাম তালিকাভুক্ত বা রেজেষ্টারি করিয়া এবং প্রত্যেকের বরাদ্দ নির্দ্দেশ করিয়া সেই মত আফিম ক্রয় করিবার পারমিট দেওয়া যাইতে পারে। ঐ তালিকার বাহিরের কেহ আফিম চাহিলে বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বরাদ্দের অধিক পরিমাণ চাহিলে তখন ডাক্তারের সার্টিফিকেট আবশ্যক হইবে। জনকয়েক ডাক্তার বলেন যে, প্রত্যহ ২, ৩ বা ৪ গ্রেণ অবধি আফিম বিক্রয়ের জন্য রেজেষ্টারি করার প্রথা আবশ্যক নাই; কিন্তু উহার অধিক পরিমাণ যাহারা চাহিবে, তাহাদের উপর ঐ বিধান প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

কাহারও কাহারও মতে ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক আফিমখোরের রেজেষ্টারির জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার নাই; কিন্তু অল্প-বয়স্কের জন্য তাহা আবশ্যক। কেহ বা এই বয়সের সীমা ৫০ করিতে চাহেন। দেখা গেল যে, আফিমখোরদের নাম তালিকাভুক্ত করা এবং অবাধ আফিম বিক্রয় বন্ধ করা অনেকেরই মত, যদিও কি ভাবে রেজেষ্টারি করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। যাহাতে দোকানদারদের হাতে ঐ রেজেষ্টারি করার ভার না পড়ে, সেজন্য অনেকেই সাবধান হইতে বলেন।

তালিকাভুক্ত আফিমখোরেরা যদি বরাদ্দের অতিরিক্ত আফিম চায়, তাহা হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আবশ্যক হইবে এবং কেহ কেহ বলেন যে, তখন উহাকে বর্দ্ধিতহারে দাম দিতে হইবে। তালিকার বহির্ভূত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্বিগুণ বা তাহারও অধিক দাম লওয়ার প্রস্তাব আমরা পাইয়াছি।

আরও প্রস্তাব হয় যে, আফিমের কাটতি কমাইবার জন্য উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেশের সর্ব্বত্র বক্তৃতা, উপদেশ, ও পুস্তিকা দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। যাহাতে কেহ অবৈধ উপায়ে আফিম আনাইয়া (smuggling) গোপনে বিক্রয় করিতে না পারে সেজন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গুলী, চণ্ডু প্রভৃতির ধূম পান আইন করিয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। যাহাতে দরিদ্র শ্রমজীবীরা সৎসঙ্গ পায়, ও সন্ধ্যাকালে নির্দ্দোষ আমোদে সময় অতিবাহিত করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, কত বিভিন্ন মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। সভাপতি মহাশয়ের সাহায্যে আমরা সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি এবং সেজন্য আমাদের কয়েকটী অধিবেশন হয়। শেষে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের রিপোর্ট পাঠান হয়। ঐ রিপোর্টে আমরা যে সকল উপায় অবলম্বনে আফিমের কাটতি কমান সম্ভব বিবেচনা করি বলিয়া সরকারকে জ্ঞাপন করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিলাম—

(১) কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরে এক ব্যক্তিকে আফিম বিক্রয়ের ও সঙ্গে রাখিবার নির্দ্দিষ্ট সীমা কমাইয়া ১২ গ্রেণ করিতে হইবে। আফিমখোরেরা আবকারী বিভাগ হইতে একটী অনুমতিপত্র বা পারমিট পাইবে এবং উহার সাহায্যে তাহারা আধ তোলা বা ৯০ গ্রেণ অবধি আফিম ক্রয় করিতে পাইবে। এই পারমিটের জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট আবশ্যক হইবে না। ১২ গ্রেণ নির্দ্ধারণের কারণ এই যে তাহা আবকারী বিভাগের বর্ত্তমান বন্দোবস্তের বিরোধী নহে; অথচ উহাতে অধিকাংশ আফিম ক্রেতার ২ বা ৩ দিনের প্রয়োজন মিটিবে।

(২) যথায় আফিম বিক্রয়ের সীমা ৩ তোলা আছে তথায় তাহা কমাইয়া এক তোলা হইবে এবং শীঘ্র অর্দ্ধ তোলা করিতে হইবে; নতুবা ঐ সকল স্থান হইতে অধিক পরিমাণ আফিম ক্রয় করিয়া আনিবার চেষ্টা হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩) যাহারা প্রত্যহ ১২ গ্রেণের বেশী আফিম খায় তাহাদের নাম রেজেষ্টারি করিয়া একটী পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। এই কার্য্য ছয় মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। আবকারী বিভাগের উপর এই কার্য্যের ভার থাকিবে।

(৪) পারমিট দেওয়া বা রেজেষ্টারী করা শেষ হইলে পর আর অন্য কাহাকেও ১২ গ্রেণের অধিক আফিম রাখিতে দেওয়া হইবে না এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট ব্যতীত আর পারমিটের সংখ্যা বাড়ান হইবে না।

(৫) পারমিট দিবার ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া গেলে ক্রমে আফিমের দাম অল্পে অল্পে বাড়ান হইবে।

(৬) সমগ্র বাঙ্গালায় আফিমের দাম একরূপ রাখা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ দুষ্কর না হইলে পারমিট প্রথা প্রবর্ত্তনের পরে যাহারা ১২ গ্রেণের অধিক আফিম ক্রয় করিবে তাহাদের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে আফিমের দাম সর্ব্বত্র আদায় করা হইবে।

(৭) আফিমের দোকানগুলি গভর্ণমেণ্টের নিজের অথবা ইজারা করা ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং সেগুলি চালাইবার ভার নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী ব্যক্তির উপর দেওয়া হইবে এবং বিক্রয়ের উপর কমিশন দেওয়ার প্রথা রদ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আফিমের দোকানের সংখ্যা কমান হইবে। যে প্রথায় যত বেশী বিক্রয় হয় ততই ভেণ্ডারের লাভ বাড়ে। তাহা আপত্তিজনক বলিয়া নিরোধ করিতে হইবে।

(৮) উপরিউক্ত উপায়গুলি কার্য্যে পরিণত হইলে পর ১২ গ্রেণ অবধি আফিম ক্রেতাদিগের জন্যও পারমিটের ব্যবস্থা করা আমাদের মতে বাঞ্ছনীয়। তাহাতে আফিম-সেবীরা সংযত থাকিবে এবং আফিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। পারমিট লইবার ব্যবস্থা মানবেচ্ছার স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিলেও, অনিষ্টকর মাদক দ্রব্যাদির আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, ঐরূপ উদ্দাম স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত—যেন কিছুদিন পরে পারমিট ব্যতীত কেহই আফিম ক্রয় করিতে না পারে।

(৯) আফিমখোরদের মতিগতি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে ও চিকিৎসার জন্য সমুচিত বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

(১০) জনহিতার্থ প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতিগুলিকে সরকারী সাহায্য দান করিয়া উহাদের দ্বারা আফিমের বিষক্রিয়া ও অপকারিতা সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। সাধারণকে আবশ্যকমত শিক্ষা না দিলে এবং তাহাদের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুদূর-পরাহত।

(১১) বড় বড় কলকারখানায়, বিশেষতঃ যেখানে বহু স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিয়া উপজীবিকা অর্জন করে সেখানে, কাজের সময় তাহাদের শিশুসন্তানদের রক্ষার্থ আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও "ক্রিস" (creche) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়।

(১২) যেমন আফিমের বিক্রয় কমিবে তেমনি দোকানের সংখ্যাও কমাইতে হইবে। মিল ও কারখানার ফটকের অর্দ্ধ মাইলের ভিতর আফিমের দোকান স্থাপন করা হইবে না।

আমরা ঐ সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য যথাসাধ্য শেষ করিয়াছি। এক্ষণে সরকার বাহাদুর কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ইতি—

এই প্রবন্ধ বহু দিন পূর্ব্বে লিখিত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে কমিটীর মন্তব্যাদি প্রকাশ করা বিধেয় নয় বলিয়া ইহা এত দিন প্রকাশিত হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে Statesman পত্রে আমাদের সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অবশ্য সেজন্য আমি দায়ী নহি। উহা প্রকাশের পর স্থানে স্থানে আমাদের কার্য্য আলোচিত হইয়াছে এবং তিন বৎসর কাটিয়া গেলেও গভর্ণমেণ্ট মতামত প্রকাশের সুবিধা পাইলেন না। যাহা হউক বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়ায় ইহা প্রকাশ করিলাম। ইতঃমধ্যে সভাপতি মাননীয় জে, এন, রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাদাম বোভারী

নভেলের ইতিহাসে গোস্তাব ফ্লবেয়ারের অমর উপন্যাস "ম্যাদাম বোভারী" একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার যে ধারা 'জোলা' এবং জোলার মন্ত্র-দীক্ষিত সেই-সময়কার ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্য দিয়া আজ নানা সাহিত্যে নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—তাহার আদি-উৎস বলা যায়—এই উপন্যাসখানিকে। জোলা, দদে, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-বস্তুতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তকগণ ফ্লবেয়ারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

নানা কারণে "ম্যাদাম বোভারী" সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটা সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা যায়। যখনি যুগান্তকারী একজন প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন—অথবা যখনি এইরূপ যুগান্তকারী কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ধারা, আদর্শ বা লিখন-পদ্ধতি পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই সময়কার অন্যান্য লেখকের সাহিত্যও তাঁহার প্রভাবে তেমন বলশালী হইয়া আর উঠিতে পারে না। একটা পরিপূর্ণ প্রতিভার প্রদীপ্ত শিখার চারিদিকে তখন অন্যান্য অল্পেতর প্রতিভাগুলি পতঙ্গের মতন গুঞ্জন করিয়া ফিরে এবং সেই অনলের আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসের দীর্ঘ জীবনের প্রতি বাঁকে এই দৃশ্য দেখি। শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আর তাহার চারিদিকে একই সুরে পতঙ্গরা গুঞ্জন করিতেছে—অগ্নিশিখা তাহাদের যে মন্ত্রটুকু শিখাইয়াছে, তাহারই পাঠাভ্যাস চলিতেছে।

গ্যেটে, হুগো, টলষ্টয়,—আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবিলেই এই ব্যাপার বোঝা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার পর, সেই সময় হইতে আজও পর্য্যন্ত দু'এক স্থানে বাদে, তাঁহাকে ব্যর্থ অনুকরণ করা মানেই ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিশেষ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিও এই প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তিনি বা তাঁহারা যে সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রতিভার আত্মজ হওয়া সত্ত্বেও তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও কাব্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সঙ্গে বহু প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাব-ধারা ও প্রকাশের রূপকের প্রভাব তাঁহাদের মধ্যে এমন ভাবে প্রতিফলিত হয় যে, তাঁহাদের সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও, এবং বহুসংখ্যক সু-পুস্তক রচনা হওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্যের মূল-ভাণ্ডারে বিশেষ কিছুই সঞ্চিত হইতে পারে নাই। তাই মাঝে মাঝে সাহিত্যে এমন একটা রূপ ফুটিয়া উঠে যখন সবই এক রকমের দেখায়—একটা ঝুড়িতে ডিমের মত সবই একাকার। অথচ সাহিত্য রূপময়। সাদার মধ্যে সব রঙ আছে জানিয়া বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের তাহা গ্রাহ্য করা মোটেই পোষায় না। সাতটা রঙের সাতটা রূপ, ইহাতেই সাহিত্যের প্রাণ;—একটা রঙে সাতটা থাকিলেও, তাহাতে তাহার চলে না। সুতরাং একটা রূপের রাজত্ব যখন চলে, তখন সাহিত্য একদিক দিয়া যেমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে, তেমনি আর একদিক দিয়া তাহার ভাণ্ডারে আর নূতন কিছুই জমা হয় না। এই সমস্যার কি কোনও সমাধান নাই? বড় গাছের আওতায় গুল্ম বাড়িতে পারে না বলিয়া কি, বড় প্রতিভার আওতায় আর সমস্তই গুল্ম-প্রতিভা হইয়া থাকিবে? তৃণ যে ভাবে এই নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, সেই নিয়মেই কি মানুষ মস্তিষ্কের উপসর্গের অধিকারী হইয়াও প্রতিভার এই অপগতি মানিয়া লইবে?

হয় ত অনেক সাহিত্যিককেই জীবনে এই সমস্যার

সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকাংশই ইহার কোনও সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই—দুই একজন পারিয়াছেন। গোস্তাব ফ্লবেয়ারকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—ভীষণভাবে। কারণ তাঁহার সম্মুখে ছিলেন—ভিক্‌টর হুগো! হুগোর সর্ব্ব-গ্রাসী প্রতিভা যে সেই সময় ফরাসী সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস-অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। যে যাহা লিখিতে যায়, তাহাতেই হুগোর ছাপ আসে। হুগো যে সমস্ত অতি-মানব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য হওয়ায় অপ-মানব সৃষ্টি হইতে লাগিল। যে ভাষা, যে-ভঙ্গী, যে ভাবনা অতি-মানবের মুখে শোভা পায়, অপ-মানবের মুখে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। আর অতি-মানব যত সহজে অপ-মানব হইয়া উঠে, অপ-মানব তত সহজে অতি-মানব হইতে পারে না। তাই হুগোর "আইডিয়ালিসম্"এর প্রভাবে বিকৃত রোমান্টিসিসম্ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

গোস্তাব যখন দেখিলেন, যাহা কিছু লিখিতে যাইতেছেন, তাহাই হুগোর অনুকরণ হইয়া যাইতেছে—তখন তিনি মস্তিষ্ককে হাতে লইয়া প্রাণপণে আত্ম-রক্ষার জন্য ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে; প্রথমে তাহা না হইলে আত্ম-রক্ষার কোনও উপায় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন। তবে কোনও ক্ষেত্রে এই শক্তি স্বাভাবিক ভাবে থাকে, কোনও ক্ষেত্রে তাহা প্রজ্ঞার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়।

ফ্লবেয়ার দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া এই শক্তির অধিকারী হন। হুগোর সমস্ত প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি বস্তুতান্ত্রিকতার নূতন রূপ লইয়া আসিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি 'ম্যাদাম বোভারী' লিখেন। প্রত্যেকটী কথা ব্যবহার করিতে তাঁহাকে বহু চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং এই বিশেষ সতর্কতার ফলে ফ্লবেয়ার ফরাসী সাহিত্যের সব চেয়ে বড় 'ষ্টাইলিষ্ট' বলিয়া পরিগণিত।

ফ্লবেয়ার যখন 'ম্যাদাম বোভারী' প্রকাশ করেন (১৮৫৬), বাস্তবতার রূঢ় চিত্রকে সহসা চোখের সামনে দেখিয়া কেহ কেহ মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন,—অশ্লীল! ধর্ম্মরাজের মন্দিরেই সর্ব্বপ্রথম টনক নড়িল। অশ্লীলতার অভিযোগে ফ্লবেয়ারকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল। বহু হাঙ্গামা ও কর্ম্মভোগের পর ফ্লবেয়ার আদালতের হাত হইতে অব্যাহতি পান। নিম্নে ম্যাদাম বোভারীর মূল উপন্যাসের শুধু মর্ম্ম-কথাটী বলা হইল,—

ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত নরম্যাণ্ডী প্রদেশের তোস্তে গ্রামে কোনও ডাক্তার ছিল না। চার্লস্ বোভারী ডাক্তারী শিখিয়া তাই গ্রামেই 'প্র্যাক্‌টিস্' করিতে লাগিলেন। প্রায়ই আসে-পাশের গ্রাম হইতে 'কল' আসিত এবং বুড়ো ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গ্রামান্তরেও যাইতে হইত।

একদিন ভোরবেলা—তখনও সূর্য্য উঠে নাই, ডাক্তারের বাড়ীর কড়া ঘন ঘন নড়িয়া উঠিল। চার্লস্ নামিয়া আসিয়া শুনিলেন—আঠারো মাইল দূরে এক গ্রামে এক কৃষকের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—তাঁহাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে। যাইতে হইল।

গ্রামে গিয়া দেখিলেন, আঘাত সামান্যই। কৃষকটীর নাম রওয়াল। অবস্থা মন্দ নয়—বয়স হইয়াছে। প্রথম স্ত্রী পরলোক গমন করার পর তিনি দ্বিতীয়বার আর দারপরিগ্রহণ করেন নাই। অবিবাহিতা কন্যা এম্মাই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী।

সুতরাং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় চার্লস্এর একমাত্র সহায়কারী হইল এম্মা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে চার্লস্ লক্ষ্য করিলেন যে এম্মার আঙ্গুলের নখগুলি অপূর্ব্ব শুভ্র; চোখ তুলিয়া দেখিলেন, একজোড়া ঘন ভ্রূর মধ্যে ভ্রমর-কৃষ্ণ দুটী চোখ, কিন্তু তাহাতে যেন কোনও মমতা নাই। বিবর্ণ মুখ, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহা রক্তিম হইয়াও উঠে। ওষ্ঠের উপরে কোমল ঈষৎ রোম-রেখা সর্ব্বদাই শ্রম-বারি-সিক্ত।

যাইবার সময় রওয়ালকে ডাকিয়া চার্লস বলিয়া গেলেন, 'কেমন থাকেন দেখবার জন্যে আবার তিন দিন পরে একবার আসবো।'

কিন্তু আসিলেন ঠিক পরের দিনই, এবং তাহার পর হইতে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার করিয়া যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন।

রওয়াল ডাক্তারের এতখানি সহানুভূতি দেখিয়া

আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল এবং সারাগ্রামে ঘোষণা করিয়া জানাইল যে, এ রকম ডাক্তার এ-অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই সময় এক সাংসারিক দুর্ঘটনা চার্লসের শান্ত জীবনকে একটু চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার স্ত্রীটী সহসা পরলোকগমন করিলেন। ব্যাপার যদি তাহাতে মিটিয়া যাইত, তাহা হইলে বিশেষ কোনও দুঃখের কারণ হয় ত নাও থাকিতে পারিত। বধূর দিক দিয়া সম্পত্তি পাইবার আশাতেই চার্লসের মা এই বিবাহ দিয়া-দিয়াছিলেন। সহসা বধূটী মরিয়া গিয়া প্রতারণা করিয়া যাওয়াতে চার্লসের মার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে উকীলের হাতে সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার ছিল, তিনি সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া বৃত্তিগত প্রতিভার পরিচয় দিতে কোনও কুণ্ঠা-প্রকাশ করিলেন না।

চার্লস যে দুঃখিত হয় নাই তাহা নয়। তবে সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের বোধ তাহার তত তীব্র ছিল না। আপনার বিপুল দেহ ও সহজ জীবনের অনাড়ম্বরতার মধ্যে তাহার দিন একরকম বেশই চলিয়া যাইতেছিল। বিপুল কোনও আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না, বৃহৎ কোন সম্ভাবনার মোহও তাহার নিশীথ-নিদ্রাকে কণ্টকিত করিয়া তুলিত না;—তবে স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি তাহারও লোভ ছিল না, তাহা নয়। এই ক্ষুদ্র গ্রামে ডাক্তারী করিয়া এমন কি-ই বা সঞ্চয় করা যায়?

স্ত্রীর মৃত্যু এবং সম্পত্তি-প্রাপ্তির আশার এইরূপ অপমৃত্যুতে চার্লস্ যখন মুহ্যমান্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা একদিন দেখে রওয়াল কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ কিছু অর্থ এবং একটী বেশ ভাল মোরগ উপহার পাঠাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার দর্শন-ভিক্ষা জানাইয়া সংবাদও পাঠাইয়াছে।

চার্লস্ যতটুকু ডাক্তারী-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল, ততটুকুও যদি মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান তাহার থাকিত, তাহা হইলে হয়ত রওয়ালের আহ্বানের পূর্ব্বেই তাহাকে এই পথে আর বহুবার যাতায়াত করিতে হইত।

একান্ত দূর গ্রামে থাকিয়া আপনার সঙ্গীহীন যৌবনকে লইয়া এম্‌মা সংসারের কাজের অবসরে যে সমস্ত নভেল পড়িত, তাহা হইতেই সে তাহার আপনার স্বর্গ-লোক রচনা করিয়া লইয়াছিল। কল্পিত নায়ক-নায়িকাদের প্রেমোন্মাদনায় সে ডুবিয়া যাইত। আপনার যৌবনোদ্বেল দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত, কবে কোন্ অলেখা মহাকাব্যের স্বর্গ হইতে তাহার নায়ক তাহার জন্য আসিবে—জীবন প্রেমের রঙে রাঙিয়া উঠিবে! প্রেমের এ অদ্ভুত শক্তির কথা সে নভেল পড়িয়া বেশ ভাল রকমই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

সুতরাং, শুভলগ্নে পুনর্ব্বার যখন ডাক্তার তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিল, তখন এম্‌মার কালো চোখের আলো জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন পরে তাহার কল্পনার নায়ক মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া তাহাকে ধরা দিল!

ডাক্তারেরও স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল—বিশেষতঃ এম্‌মার মত সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহা হইল। এম্‌মা ও চার্লসের বিবাহ হইয়া গেল!

নূতন পত্নী ঘরে আনিয়া চার্লসের আনন্দের আর সীমা নাই। সারাদিন সে কাজের মধ্যে পরমানন্দে ডুবিয়া থাকে। আপনার ছোটখাটো কাজের মধ্যে সে যেন এক নূতন প্রেরণা পাইল। এম্‌মার বস্ত্রাঞ্চলের সীমানার মধ্যে চার্লসের সমস্ত জগৎ বাঁধা পড়িয়া গেল।

কিন্তু এম্‌মার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রেমে-পড়ার যে সমস্ত তীব্র অনুরাগের কাহিনী সে বইএ পড়িয়াছিল, তাহার কিছুই তাহার বোধ হইল না। যে চিন্তা তাহার কিশোর-চিত্তকে স্বপন-গন্ধে আকুল করিয়া রাখিয়াছিল, বিস্ময়ে এম্‌মা দেখিল, কর্পূরের মত তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে এ কি হইল? এত প্রেম, এত আশা, এত মাদকতা, জীবনে কি এখানেই তাহার পরি-সমাপ্তি? বইএ কি মিথ্যা কথা লিখিয়াছে? সে কিছুতেই হইতে পারে না, তাহারই ভুল হইয়াছে—চার্লসকে বিবাহ করা তাহার ভুল হইয়াছে!

সে যতই চার্লসকে ভাল করিয়া দেখে, ততই তাহার মনে হয়, যে-নায়কের আবির্ভাবের জন্য সে যৌবনকে পুষ্পিত করিয়া রাখিয়াছে, সে-নায়ক তো চার্লস নয়। চার্লস কথা বলে নিতান্ত গন্ত-সংসারের ছোটখাটো কথা। সাঁতারও কাটে না, বর্শাও ছোঁড়ে না; কোথায় বৃহত্তর জগৎ বিপুলতর জীবন লইয়া পড়িয়া আছে, তাহার কোনও

খবর রাখে না। এই গ্রামটুকু, এই গেরস্থালী, এই প্রতি-দিনের খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, এইটুকুর মধ্যেই তাহার মন পরিতৃপ্ত; এবং এম্‌মার আরও রাগ হয় যখন ভাবে যে, এই সামান্য লইয়া সেও সন্তুষ্ট হইয়া আছে, ইহাই চার্লসের বিশ্বাস।

তাহার উপর শাশুড়ী! তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঝগড়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া আপনার মনে এম্‌মা ভাবে,—কেন বিয়ে করলাম?

নভেলে প্রতি-পাতায় যেমন করিয়া রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে, জীবনে কচিৎ তাহা সম্ভব হয়। মাঝে মাঝে কোথাও তরঙ্গ উঠে, মাথার উপরে বজ্র আঁধার-মেঘে গর্জ্জন করে; তাহা ব্যতীত জীবন-নদী অনাদিকাল হইতে অব্যতিক্রম ছন্দে একান্ত নিঃশব্দেই প্রতিদিনের অতি সাধারণ প্রয়োজনের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে।

নিতান্ত একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এম্‌মার নিকট সহসা একটা অভিনবত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল। সেই প্রদেশের জমিদার ফ্রান্সের শাসন-পরিষদের সদস্য হইবার জন্য নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইলেন। সহসা প্রজা ও প্রতিবেশীদের উপর তাঁহার সু-নজর বৃদ্ধি পাইল, কারণ ভোটের প্রয়োজন। বিশিষ্ট প্রতিবেশীদের লইয়া তিনি একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করিলেন সেখানে স্বয়ং গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। বোভারীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া তিনি ডাক্তারের চেরী-বাগান এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীর রূপের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গেলেন। রূপের প্রশংসায় কোন্ নারী না সন্তুষ্ট হয়? এম্‌মা যে-দিন থেকে নিমন্ত্রণের কথা শুনিল, সেইদিন হইতে তাহার আর আনন্দের সীমা নাই! আপনার মনে সে ভাবে—আলো, উৎসব, নৃত্য, আনন্দ, সঙ্গীতের কথা।

নিমন্ত্রণের দিন। চার্লস্ ট্রাউসার পরিতে-পরিতে বলিল, এটা বড্ড টাইট হয়ে গেছে—নাচবার সময় বড়ই অসুবিধে হবে।

এম্‌মা হাসিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ, তুমি নাচবে না কি? তোমার মত ডাক্তারের না নাচাই উচিত; লোকে হাসবে যে?

চার্লস্ একটু অপ্রতিভ হইয়া হাসিল মাত্র।

এম্‌মা সারা দুপুর ধরিয়া আপনার সাজগোছ লইয়া ব্যস্ত ছিল। অপরাহ্নে যখন প্রসাধন ও সজ্জা শেষ করিয়া বাহির হইল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের নব-সংস্করণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চার্লস পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহার স্কন্ধে চুম্বন করিল।

বিরক্ত হইয়া এম্‌মা বলিয়া উঠিল, আঃ, কর কি, সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে!"

নৃত্য-সভায় এম্‌মা একজন বলিষ্ট-দেহ যুবকের সঙ্গে নৃত্য করিল। যুবকের কেশের সুরভি তাহার ভাল লাগিতেছিল, চারিদিকের আলো তাহার মনকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছিল। বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা নৃত্য করিল।

রাত্রি-শেষে ভোর-বেলা স্বামী-স্ত্রীতে তাহারা আবার বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। গতরাত্রির উৎসবের দীপ নিভিয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে সহসা রাস্তায় একটা চকচকে জিনিষের উপর এম্‌মার নজর পড়িল। চার্লস্ গাড়ী হইতে নামিয়া দেখে, একটা চমৎকার সিগার-কেস্। কাহারও পকেট হইতে হয় ত পড়িয়া গিয়াছে। সিগার কেশটী দামী এবং তাহার ভিতর তখনও দুটী সিগার ছিল। গন্ধেতে মনে হয় যে, সিগারগুলোও দামী। কেশটী পকেটে রাখিয়া চার্লস বলিল, ভালই হল, আজ সন্ধ্যেয় খাওয়া যাবে!

ব্যঙ্গ করিয়া এম্‌মা বলিল, তুমি আবার সিগার খাও না কি?

সুবিধে পেলে কখনও কখনও খাই বই কি?

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগার ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করায় চার্লস্ ভয়ানক কাশিতে লাগিল। কোনও মতে ধোঁয়া আর সে লইতে পারে না।

চার্লসের অবস্থা দেখিয়া এম্‌মা বলিল, যা সহ্য হয় না, তা খাবার দরকার কি? কুড়িয়ে পেয়েছ বলেই কি খেতে হবে?

রাগে এম্‌মা সিগার-কেশটী লইয়া ঘরে একটা আয়নার পিছনে ফেলিয়া রাখিল।

রাত্রি-বেলা যখন সবাই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এম্‌মা নিঃশব্দে উঠিয়া আয়নার পাশ হইতে সিগার-কেশটী বাহির করিল। কেশটী খুলিতেই ভার্বিনা আর তাম্রাকের গন্ধ নাকে গিয়া লাগিল; তাহাই সে ফুলের গন্ধের মত

নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিল। সেই গন্ধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার নভেলে পড়া জীবনের কথা, যেখানে আনন্দ আর কল্পনারাজ্যের মধ্যে মানুষ কি আনন্দেই না থাকে। এম্‌মা আপনার সাধ্যমত তাহার আশেপাশের জগৎটাকে তাহার মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল। তাহাতে চার্লসের খরচ একটু বেশী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাত্রিবেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সে বাড়ী ফিরিত, তখন ঘরের পারিপাট্য, সাজসজ্জায় একটু বিলাসিতার আভাস তাহার ভালই লাগিত। সকলের উপর আহার ভাবিতে ভাল লাগিত যে, এম্‌মা তাহারই জন্য এই সব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে,—হইলই বা সামান্য খরচ! এম্‌মাকে সে যতই দেখিত, ততই তাহার নূতন লাগিত, ভাল লাগিত। এম্‌মা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, চার্লসের অন্তর গলিয়া যাইত।

এম্‌মা কিন্তু হাসিত তাহার আপনার মনকে ভুলাইতে; নূতন নূতন আসবাবপত্র কিনিত, তাহার অন্তরের বাসনাকেই যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত করিতে। প্রতিরাত্রে যখন সে কর্মশ্রান্ত চার্লসকে অভ্যর্থনা করিত, তখনই তাহার মনে কে যেন বলিয়া উঠিত, এই বোকা লোকটার সেবার জন্যই কি এতদিন তুমি বসেছিলে? সে আপনার মনে হাসিয়া উঠিত; সেই হাসিতে চার্লসের অন্তর ভরিয়া যাইত। জীবনে সমস্ত জিনিষই ডাক্তারের কাছে সহজ লাগিত;— কোনও বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা তাহার মনকে সহজ-আনন্দের বাহিরে কোনও রস-আস্বাদনের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আনিয়া দেয় নাই; যেটুকু জগৎ লইয়া সে আসিয়াছিল, সেইটুকুর মধ্যে তাহার দিন পরমানন্দে চলিয়া যাইতেছিল।

চার্লসের এই আত্ম-তৃপ্তি দেখিয়া এম্‌মার রাগ হইত। তাহার অন্তরের নিরুদ্ধ-বাসনা ও ক্রোধ আত্ম-প্রকাশের জন্য একটা হেতু খুঁজিত; কিন্তু চার্লসের এই 'অহেতুক' আত্ম-তৃপ্তি তাহার আত্ম-প্রকাশের পথ [illegible] করিয়া দিত। গতি যাহার নিরুদ্ধ, বাধার পাষাণ-গাত্রে আস্ফালন করাই তাহার একমাত্র শান্তি। সে শান্তিটুকুও এম্‌মা ভোগ করিতে পারিত না এবং তাহারও জন্য দায়ী করিত ঐ নির্ব্বোধ স্বামীটিকে!

একদিন পুরাণো কাপড় গোছাইতে, হঠাৎ একটা কিসে লাগিয়া তাহার আঙ্গুল কাটিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখে, তাহার বিবাহের মুকুট। কাগজের ফুল-আট্‌কানো তারে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। কি মনে করিয়া এম্‌মা মুকুটটা সেই আগুনে ফেলিয়া দিল। কাপড় আর কাগজ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিল। এম্‌মা একমনে দেখিতে লাগিল কাপড়ের ফুলগুলি কেমন পুড়িয়া মরিতেছে।

এমনি করিয়া চার্লসের আত্ম-তৃপ্ত সহজ জীবনের পাশে এম্‌মা আপনার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা লইয়া দিবাযাপন করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর সন্তান-সম্ভবা হওয়ায় এম্‌মার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। চার্লস ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন সে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিল এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহার ব্যবস্থাও করিল।

তোস্তে গ্রামের পসার প্রতিপত্তি পিছনে ফেলিয়া ডাক্তার আর এক নূতন গ্রাম ঠিক করিল। এম্‌মার বায়ু-পরিবর্ত্তন এবং তাহার নূতন প্রাক্‌টিস সেইখানেই চলিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

আর ১০১ ধ্বংস পথে—

রাত্রি গভীর—ঘন কুয়াসার জাল ধরণীর মুখে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েচে। বৃটেনের বৃহত্তম আকাশ-পোত চলেছে সেই অন্ধকার কুয়াসা ভেদ করে—গতি তার বহুদূর, সুদূর ভারতে। ভিতরের আরোহীরা পানাহার সমাপন করে, হাসি-গল্প করতে করতে কখন পড়েছে ঘুমিয়ে। সবাই জানে নূতন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে আকাশ-পথ থেকে নূতন সূর্য্যকে অভিনন্দন জানাবে। জেগে আছে কেবল চালক ও তার সহকারীর দল।

আর ১০১ বেরিয়েছে পৃথিবীর কাছে বৃটেনের বৈজ্ঞানিক

এরোপ্লেন থেকে ১০১এর ধ্বংস-দৃশ্য

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাধিস্থ মৃতদেহের সন্ধান

মনীষার পরিচয় দিতে। করাচীর বন্দরে উৎসাহী লোকের ভিড় জমে গেছে—সেই অতিকায় আকাশচারী ব্যোমযানের অভ্যর্থনার জন্য! এমন সময় সংবাদ এল—আর-১০১ আর নাই। ফ্রান্স মুলুকে বোভিসের পাহাড়ের কাছে পড়ে তার অস্তিত্ব গেছে চূর্ণ হয়ে। জন ছয়-সাত ছাড়া আরোহীদেরও কাউকে বাঁচতে হয়নি।

জল-যান টাইটেনিকের ধ্বংসের পর বিজ্ঞান-জগতে এত বড় ভয়াবহ সংবাদ বুঝি শোনা যায় নি। কোথায় ভারত! সে রাত্রে যারা ভারতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের ঘুম আর ভাঙ্গল না।

ইংরেজের ব্যোমযানের কারখানায় আর-১০১এর মত বিরাট আকাশযান আর তৈরী হয় নি। এর প্রশস্ত ভোজনাগার যে-কোন হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত; ৫০।৭০জন নর-নারীর শয়নের উপযোগী ব্যবস্থা ছিল এর মধ্যে। তা' ছাড়া বাথরুম, প্রসাধন-কক্ষ, ভ্রমণের উপযোগী প্রশস্ত স্থানও তার মধ্যে ছিল। আর-১০১কে চলমান প্রাসাদ বললেও কোন রকমে অত্যুক্তি করা হ'ত না,—সে ছিল জার্ম্মাণীর বিস্ময়কর গ্রাফ জেপলিনের প্রতিদ্বন্দ্বী!

এর আকৃতি ছিল যেমন বিরাট, এর ধ্বংস-কাহিনী তেমনি বিরাট আর ভয়াবহ!

বোভিসের হাঁসপাতালে অবশিষ্ট কয়েকজন যাত্রী

চিকাগোর ব্যবসায়ী-নিকেতন—

চিকাগোতে আজ চলেছে পরিবর্ত্তনের যুগ। নূতন পথঘাট, নূতন যান বাহন, আলো ও জল সরবরাহের নূতন নূতন ব্যবস্থা···এই নিয়েই যে ব্যস্ত! পথের ধারে বাড়ীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে—সেগুলি বুঝি এবার আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। ধনীতে ধনীতে সেখানে চলেছে উচ্চতম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করার প্রতিযোগিতা।

চিকাগোর ব্যবসায়ী-নিকেতন

এখানে যে অট্টালিকাটীর ছবি দেওয়া হ'ল, সেটী সে-দেশের ব্যবসায়ী-নিকেতন,—অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী মিলে এ'টী করেছেন। লোক-সংখ্যার দিক দিয়ে চিকাগো পৃথিবীর তৃতীয় সহর, যুক্তরাষ্ট্রে তার চেয়ে আরও একটী বড় সহর আছে—কিন্তু আফিস হিসাবে এত বড় বাড়ী

যা কি পৃথিবীর আর কোথাও নেই—সে কথা বাড়ীখানির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনেকটা অনুমান করা যায়। এতে প্রতিদিন কুড়ি হাজার লোক কাজ করে।

——

ভার্জ্জিল-সমাধি—

অতীত রোমের কীর্ত্তি-কাহিনীর সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছে—মহাকবি ভার্জ্জিলের নাম তাঁদের অবিদিত নয়।
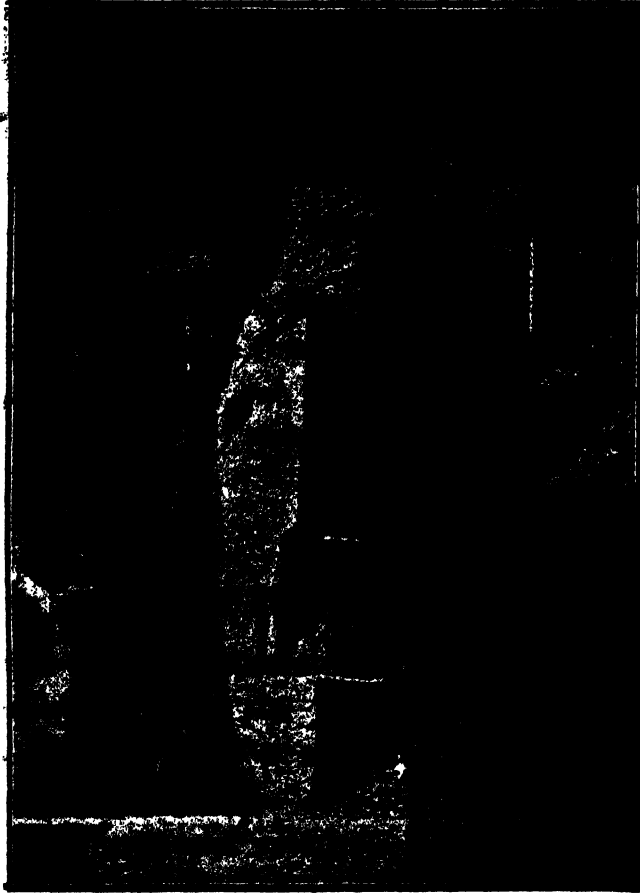
ভার্জ্জিল সমাধি

বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁর জন্ম—কিন্তু আজও তাঁর কাব্য-গাথা সুধিজনের মনে রসের খোরাক জুগিয়ে আসচে। আজিকার এই নব-সভ্যতা দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর এক প্রান্তে বসে আমরা এই মহাকবিরই মৃত্যুহীন রচনার মধ্যে পাই অতীত রোমের, অতীত সভ্যতার ত্যাগ ও সাহস, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস-রঞ্জিত একখানি মূর্ত্তি! এখানে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যকতাহীন—শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে—পৃথিবীতে আজও তাঁর ভক্তের সংখ্যা বহু। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা তাঁর যত বেশীই হ'ক, এই মহাকবির সমাধির সঙ্গে বোধ করি খুব অল্প লোকেরই চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমরা এখানে সেই অমর কবির সমাধির ছবি দিলাম। সমাধিটী বহু যুগের ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করে এত কাল দাঁড়িয়ে থাকলেও, তা'র অনেক অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি স্থানীয় সরকারের চেষ্টায় সেটীর আমূল সংস্কার সাধিত হয়েছে।

পুলিশের সতর্কতা—

আধুনিক লণ্ডনে মোটর-ডাকাতির উপদ্রব এত বেড়ে চলেছে যে তা রীতিমত বিস্ময়কর।
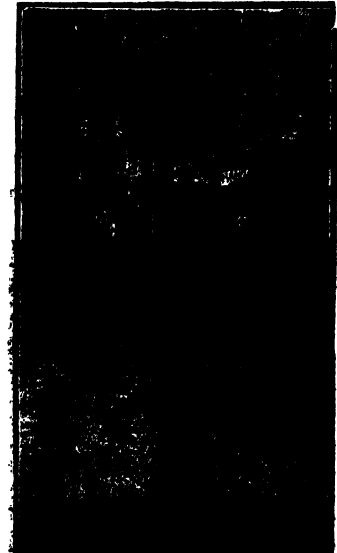
পুলিশের সতর্কতা

মোটর-ডাকাতির সুবিধা এই যে, তারা ঝড়ের মত এসে সঙ্কল্প সাধন করে ঝড়ের মত বেরিয়ে যাওয়া যায়। ফলে, পুলিশ কিছু করে ওঠবার আগেই তারা যায় দৃষ্টির অগোচর হয়ে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে লণ্ডন পুলিশ এক নতুন ব্যবস্থা করেচে। দমকল ডাকবার জন্য পথে পথে যেমন ব্যবস্থা থাকে, এও প্রায় তেমনি। এর সাহায্যে পুলিশ পূর্ব্ববর্ত্তী সকল থানাকে সতর্ক হ'বার জন্যে নিমেষের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করতে পারে; এবং সেখানকার পুলিস

তাকাজনের যাথা দেবার মত প্রস্তুত হয়ে নেবার সময় পায়।

শূন্যে রেল-পথ—

পার্বত্য-প্রদেশ অনেক দেশে আজকাল শূন্য-রেলপথের প্রচলন হয়েছে। পাহাড় কেটে রেল-পথ বসানোর চেয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ব্যবস্থাই সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ এক পাহাড়ের চূড়া থেকে আর এক পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত এই রকম রেলপথ বসান হয়,—অবশ্য উপরের তার সহ্য করবার জন্য নীচে লোহার স্তম্ভ থাকে। এই শূন্য রেল-পথ থেকে নীচের যে বিরাট দৃশ্য চোখে পড়ে—পায়ে হেঁটে বা সাধারণ রেলপথে তা' কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে যে শূন্য-রেলপথটীর ছবি দেওয়া হ'ল, তা স্পেনের অন্তর্গত টিবলাণ্ডো নামক স্থান থেকে নেওয়া। বার্সিলোনার চারি ধারে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, এই রেল-পথ তা'রই উপরে অবস্থিত।

শূন্যে রেল-পথ

তুরস্কের প্রাসাদ-শ্রেণী—

কল-জমা কামাল পাশার অধিনায়কতায় তুরস্কের রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তনের স্রোত বয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। যা' কিছু পুরাতন, যা কিছু আধুনিকতার বিরোধী—তা লোপ পেতে সুরু হয়েছে। কেবল এখনও সেখানে গত-যুগের কয়েকটী প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে—অতীত তুরস্কের স্মৃতি-চিহ্নের মত। আমরা এখানে কতকগুলির ছবি দিলাম। এই বাড়ীগুলি কৃষ্ণ-সাগরের মুখে বসফরাসের উপর আনাদলুকাভাগী গ্রামের। বাড়ীগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে আগাগোড়া সেগুলি কাঠের সাহায্যে তৈরী। প্রাচীন কালের এই বাস-গৃহগুলির অধিকাংশই তখন নির্ম্মিত হ'ত সোজা জলের বুকের উপর,—এই বাড়ীগুলিও তাই। তুরস্কে আজ যে-ভাবে নব-সভ্যতার বিস্তার হচ্ছে, তা'তে এর আয়ুষ্কাল আর দীর্ঘ নয় বলেই মনে হয়।
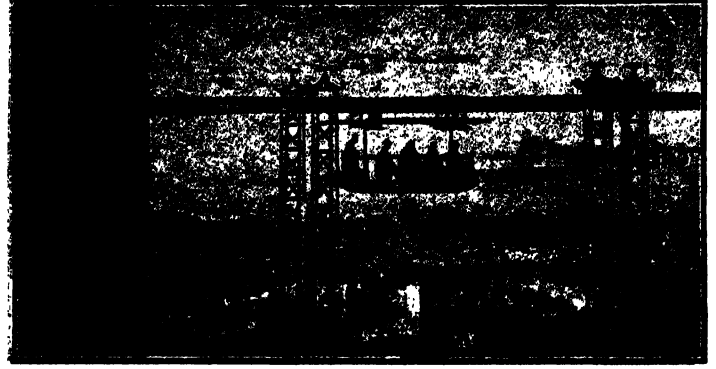
তুরস্কের প্রাসাদ-শ্রেণী

বঙ্গোপসাগরে মর্ম্মর পাহাড়—

বঙ্গোপসাগরের ইতস্ততঃ এমন কতকগুলি দ্বীপ ছড়ান আছে—যাদের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হ'লেও অতি অল্প কথাই তাদের সম্বন্ধে জানা যায়। আন্দামান, নিকোবার এবং মাগু'ই দ্বীপগুলির মত এরা নিতান্ত অখ্যাত। অতীত কালের চীনা ও আরব নাবিকদের নিকট কিন্তু এগুলি বিশেষ পরিচিত ল। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, য় শতাব্দীতেও এইগুলির অস্তিত্ব ছিল। ফলে, এই দ্বীপগুলির
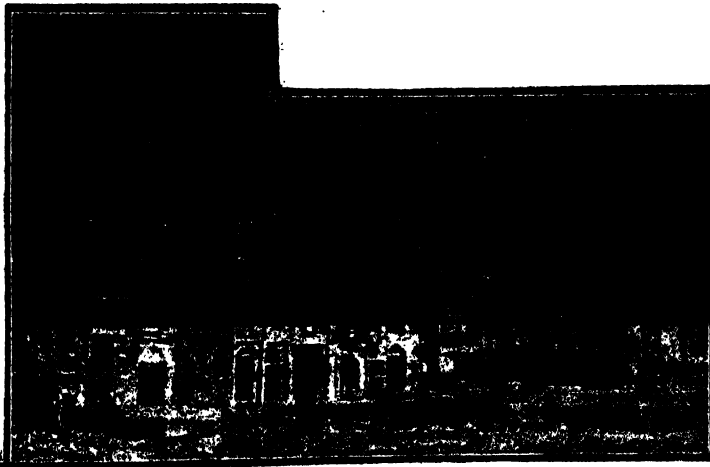
সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব, ভয়াবহ কাহিনী প্রচলিত আছে। সে যাই হ'ক, যাঁরা এ'পথে ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের মতে এই দ্বীপগুলি শোভায়-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব। এই দ্বীপগুলির একটীতে এক বিশাল মর্ম্মরপাহাড় আছে; কিন্তু সে কথা অনেকে জানেন না। ব্যোমযানে যেতে যেতে এই পাহাড় দেখা যায়। এই মর্ম্মর-পর্ব্বতটী এক হাজার ফীট উঁচু এবং বহুদূর বিস্তৃত।

রেডিও প্রদর্শনী—

বেতার-যন্ত্র সুদূরকে নিকট করেছে, এর সাহায্যে দূরের মানুষকে আমরা কাছে পেয়েছি। কয়েক বৎসর আগে বেতার-যন্ত্রের অবস্থা যা ছিল আজ আর তা' নেই। বেতারের দ্রুত উন্নতি বিজ্ঞান-জগতের এক নূতন অধ্যায়। এই কথাটাকেই পরিস্ফুট করবার জন্য সম্প্রতি অলিম্পিয়ায় এক বিরাট বেতার-প্রদর্শনী হয়ে গেছে। বেতার-প্রদর্শনী অবশ্য ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার হয়ে গেছে, কিন্তু এইটিই বৃহত্তম। বেতার উদ্ভাবনের আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত তার যত রকমের উন্নতি হয়েছে—তার প্রত্যেকটী স্তর প্রদর্শনীতে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরে মর্ম্মর-পাহাড়

রেডিও প্রদর্শনী

জাপানের প্রথম খৃষ্টান—

জাপানে এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল অসীম। কিন্তু সেখানকার রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

ধর্ম্ম-জীবনেও বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল এবং এখনও দিচ্চে। ফলে আধুনিক জাপানে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা

জাপানের প্রথম খৃষ্টান

রীতিমত বেগ পেতে হ'য়েছিল। যাঁরা প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্যে, দেশে তাঁদের নিন্দা এবং প্রশংসা দুই প্রবল ভাবে শোনা যায়। এখানে যে দুই জনের ছবি দিলাম, তাঁদের বাম দিকের লোকটী জাপানের প্রথম খৃষ্টানদের একজন। অপর ব্যক্তি প্রথমে খৃষ্ট-ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এখন তিনিও এই ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েচেন।

——

নিজাম-সাগর-বাঁধ—

হায়েদ্রাবাদ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত 'নিজাম-সাগরকে' বেঁধে ফেলবার জন্যে প্রবল উদ্যোগ-আয়োজন চলেচে। কারণ বর্ষাকালে এই 'সাগর' সত্যিই সমুদ্রের মত দুর্জ্জয় হ'য়ে ওঠে এবং তার নিকটের অধিবাসীদের বিপদের আর অন্ত থাকে না। জলের স্রোত পাড় ছাপিয়ে লোকালয়ের মধ্যে সগর্জ্জনে প্রবেশ করতে থাকে। সে দৃশ্য যে কত ভয়াবহ তা' ছবিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। এই বিরাট জল ভাগের উপর যে বাঁধ তৈরী হচ্চে, তেমন বিপুল বাঁধ ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও নেই। শুধু তাই নয়,—স্থাপত্য-কৌশলে এবং আকারের বিপুলতায় সেটী নীল-নদের পৃথিবী বিখ্যাত 'অ্যাস্যুয়ান ড্যামকেও' পরাস্ত করবে। তখন একে আর সাগর বলা ঠিক হ'বে
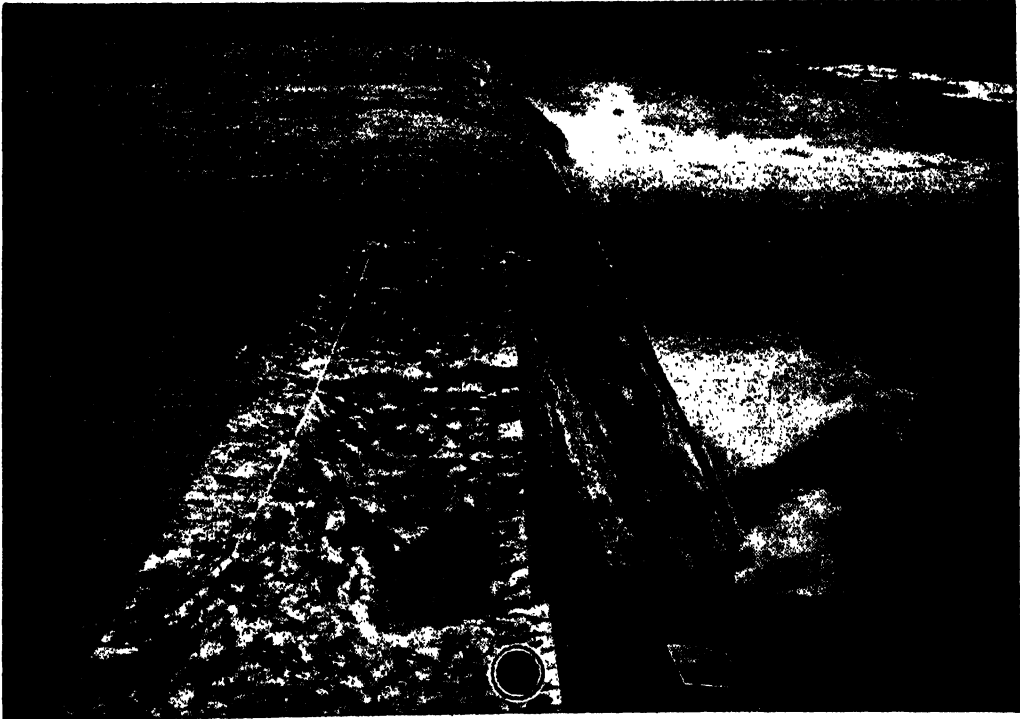
নিজাম-সাগর-বাঁধ

বড় অল্প হ'বে না। কিন্তু সহজে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রসার সেখানে হয় নি। প্রথম প্রথম এ' জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকদের

না—৩৬০ বর্গ মাইলব্যাপী এক বিরাট হ্রদে 'নিজাম-সাগর' তখন রূপান্তরিত হ'বে।

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

নীরস কর্ত্তব্য-কঠোর দিনগুলোকে সরস করে' তোলবার চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে একটা সাহিত্য-সংহতি গড়ে' তুলেছিলাম।

যে জীবনটাকে বিশ্ব-ব্যাপী মুক্তি যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত করে' রেখেছি, তারই বিগত শান্ত দিনের আনন্দ-চঞ্চল ছবিগুলো স্মৃতি-পট থেকে চয়ন করে' রেখায় ফুটিয়ে তুলতে হবে,—

হেলায়-ত্যাগ করে'-আসা জীবনের পুঁথি-পত্র নাড়া-চাড়া করে' তার মধ্যে থেকে বড় বড় ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে' সান্ধ্য-অধিবেশনে সবার সুমুখে পাঠ করতে হবে—

এই ছিল আমাদের সাহিত্য-সভার প্রধান কার্য্য। সবার পালা শেষ হ'য়ে, বাকী ছিল মাত্র আমারই।

জীবন-কাহিনী পাঠ করতে আরম্ভ করবার পূর্ব্বে বল্লাম—আমার বিগত জীবনেতিহাসের যে অধ্যায়টাকে আমি সবার-থেকে বড় মনে করি, যার স্মৃতি আজও আমার মনে বিরাজ করছে—অম্লান, আজ শুধু তার কথাই বলব।

আমার জীবনের রৌদ্র-দীপ্ত দেউলে যে অতিথি একদিন এসেছিল, শেষ-পর্য্যন্ত তাকে কেমন করে' কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম—এ কাহিনী সেই কথাটুকুই বল্‌বার চেষ্টা করবে।

—এক—

অমিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—এম-এ পরীক্ষা দিয়ে যখন নিশ্চল হয়ে ঘরে বসেছিলাম।

প্রথম সাক্ষাৎ হয়—আর্ট্ এক্‌জিবিসনে।

ছবি পরিচয় করে দেয়—দাদা, এই হচ্ছে অমিয়া মিত্র, যার কথা তোমায় বল্‌তাম। অমিয়া···আমার দাদা··· ওদিকে না, এই দিকে দেখ! জান দাদা, অমিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কবিতা লেখে, কারুকে দেখায় না·· আর কি করিস···!

নমস্কারের পর্ব্বটা আমাদের পরিচয়ের প্রথম ধাপটা এগিয়ে দিলে—

ছবির মধ্যস্থতায় পরের কথাবার্ত্তা সহজ ভাবে চলতে লাগল······!

সুরু যার এমনি করে'ই, সে পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠ্‌তেও বিলম্ব হয় না, বিশেষ যেখানে তৃতীয়-পক্ষের অতখানি আগ্রহ—

ছবির সহায়তায় অতি অল্প দিনেই অমিয়া আমার দুর্গে অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়ে গেল।

প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম—ও সহজ সাধারণ নয়; এতদিন যাদের দেখে এসেছি তাদের থেকে ওর একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে—

ও যেন এক ঝলক প্রবল ঘূর্ণী-হাওয়া, যার আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে' যায়—।

পুরুষ-চিত্তকে জয় করবার যে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, তার বিরুদ্ধে আমার সত্তাকে সর্ব্বদা সজাগ করে রাখ্‌তাম—

কোন দিন কোন মুহূর্ত্তেই অন্তরের দুর্ব্বলতা ওর পরিহাস-চঞ্চল চোখের সামনে মেলে দিইনি!

ওর ওই আকাঙ্ক্ষা এবং আমার প্রতিরোধের সংঘর্ষে, দুজনার মধ্যে এক জীবন-ব্যাপী অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল।

সেদিন ঠিক ছিল, অমিয়ার বাড়ী থেকে চা খেয়ে বায়স্কোপে যাব—

নতুন নতুন ছবি দেখ্‌বার আগ্রহের ওর অন্ত ছিল না।

পাঁচটা নাগাদ ওদের বাড়ী পৌঁছে নীচে থেকে শুনতে পেলাম, অমিয়া পিয়ানোর সঙ্গে গান গাইছে—

"My whole life has been but a pledge
Of a meeting true with thee···"

ইচ্ছে করেই ওপরে উঠ্‌লাম না; বেহারাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অমিয়া নেমে এল; প্রস্তুত হ'য়েই ছিল।

ওর দিকে তাকিয়ে খানিক-ক্ষণের জন্যে মুগ্ধ চোখ-দুটোকে ফিরিয়ে নেওয়া গেল না;—

বল্লাম—বিজয়া যেদিন নরেনের মাইক্রস্কোপ দেখবার জন্যে নেমে এসেছিল—চিত্রকরের মডেলের পক্ষে আজ তোমাকে তার চেয়ে কম লোভনীয় দেখাচ্ছে না, অকপট ভক্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পুনরুক্তি করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—

অমিয়া হেসে উত্তর করল—কিন্তু আমি তাতে বিচলিত হব না মোটেই। Flirt করতেও শিখেছেন দেখ্‌ছি!

নিমেষে মনের সমস্ত আনন্দ মুছে গেল—সামান্য সেণ্টিমেণ্টের মুখেই ও এমনি কঠোর হয়ে' দাঁড়ায়…!

সীট রিজার্ভ করাই ছিল—দুজনে যথাস্থানে গিয়ে বস্‌লাম। শো আরম্ভ হয়ে' গেল।

আঘাতের ব্যথায় মনটা ভারী হয়ে' উঠেছিল—চুপ করে বসে রইলাম।

অমিয়াও কোন কথা বললে না—ওর কোমল ডান হাতখানা আমার দুহাতের মধ্যে ধরা দিয়ে নিঃশব্দে ছবি দেখতে লাগল……

ক্ষণপূর্ব্বের কঠোরতার আঘাতের জন্য ওর অকপট অনুশোচনা সারা দেহ দিয়ে অনুভব করে' ধন্য হলাম—

মনটা আবার হাওয়ার মতো হালকা হয়ে গেল।

বাইরে এসে অমিয়া বল্লে—কী চমৎকার বাতাস দিচ্ছে, গাড়িটা মাঠের ওপর দিয়ে একটু ঘুরিয়ে আনুন রমেণবাবু!

আকাশের দিকে চেয়ে বল্লাম—কিন্তু মেঘ করেছে যে ··

আমার হাতের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে অমিয়া বল্লে—তা করুক!

ময়দানের ফাঁকা রাস্তা ধরে' গাড়ি ছুটলো।

জ্যৈষ্ঠ-সন্ধ্যার উতল বাতাসে দুলে অমিয়ার চূর্ণ-কুন্তলের প্রান্তগুলো আমার মুখ-চোখের ওপর উড়ে পড়তে লাগল।

ওপরে আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল—ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে খণ্ড-চন্দ্র যেন আমাদেরই মতো উধাও যাত্রা সুরু করেছে—

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তার চকিত দৃষ্টির ভিতর ও কি বিপুল ইঙ্গিত! ··

সেই আবছা-জ্যোৎস্নার স্তিমিত আলোয় অমিয়ার মুখখানা আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মায়া-জাল সৃজন করলে—

মোটরের দোলানিতে গায়ে গা ঠেকে শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল·…।

এমনি করে' কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি না; এক সময়ে ডাক্‌লাম—অমিয়া!

—বলুন।

—দেখ অমিয়া, অনেক দিন ধরে' একটা কথা তোমায় বলবার জন্য সঞ্চিত করে' রেখেছি; আজ—

কথার মাঝেই অমিয়া বলে উঠল—কি বলবেন তা আমি জানি, কিন্তু দোহাই রমেনবাবু, কাব্য রাখুন; দেখুন, হঠাৎ কি রকম ঝড় উঠ্‌ল!

বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মতোই আমার সারা অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, অমিয়ার কথার ধরণে মুহূর্ত্তে তা শুদ্ধ হিম হয়ে গেল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম।

—দুই—

দিন পনেরো পরের কথা—

এ ক'দিন একেবারেই অমিয়ার দেখা মেলে নি।

সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে Browningখানা নিয়ে বসেছিলাম—

পূব দিকের জান্‌লা দিয়ে সদ্য-উদিত পূর্ণ-চন্দ্রের আবছা হাসি ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছিল—

চোখের ওপর ভাস্‌ছিল—

……"What I mean to do
When the long dark autumn evening comes···"

এমন সময় সহসা দমকা হাওয়ার মতো অমিয়া ঘরে ঢুকলো এবং বোধ করি বাতাস লেগেই বাতিটা দপ করে' নিভে গেল···

সেই অতর্কিত অন্ধকারের মধ্যে অমিয়ার অস্ফুট কল-হাস্য যেন কল্প-লোকের রহস্য-পুরীর আবহাওয়া বহন করে' নিয়ে এল!

বাতিটা জ্বেলে বল্লাম—ব্যাপার কি? চোখের ভয়ে বাতির আলোর আশ্রয় নিইছি; কিন্তু এমনি দুঃসময়ে সেটা অবধি বিমুখ হয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা পৌঁছল কি না জানি না; হেসে ও বল্লে—ব্যাপার আপনার! ক'দিন একেবারে ডুব মেরে রইলেন, টিকি দেখবার জোটি নেই! হঠাৎ এ রকম অদৃশ্য হবার কারণ কি? কোন—

—দাঁড়াও, দাঁড়াও! প্রশ্নের চাপে যে হাঁপিয়ে উঠলাম। আমি তো মোটেই অদৃশ্য হই নি; তোমাকেই বরঞ্চ এ ক'দিন দেখতে পাওয়া যায় নি। চার-পাঁচ দিন বিকেলে তোমাদের বাড়ী গেছি; কিন্তু···

—হ্যাঁ, গিছলেন বুঝি; কখ্‌খনো···

—মিছে কথা কই নি। অনেকবার।

মনে মনে বল্লাম—আমার মুখের এই স্বীকারোক্তিটাই তো শুনতে এসেছ; বেশ, ক্ষতি কি!

—মিষ্টার বোস, সৌরীনবাবু · বড্ড পীড়াপীড়ি করতেন রোজ এসে; কি করে' মুখের ওপর কাটাই···বেশ লোক; দেবো আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে···এ ক'দিন খুব grand কেটেছে···দুদিন এম্পায়ারে, Pygmalior আর Man and Superman; একদিন Picture Palaceএ Interference; একদিন—

হেসে বল্লাম—থাক্, আর বলতে হবে না; তোমার আনন্দ-উপভোগের বিস্তৃত তালিকা শুনতে আমার আগ্রহ হচ্ছে না মোটেই!

কথাগুলোর মধ্যে যে ঝাঁঝটুকু প্রকাশ পেল, তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে' মাথাটা দুলিয়ে ও বল্লে—আপনি রাগ করেছেন···হ্যাঁ, নিশ্চয় রাগ করেছেন···আমি কি করব, মা বল্লেন; আমার মোটেই—

···না না, রাগ করব কেন? কি অধিকারেই বা—!

মনে মনে বল্লাম—যাচাই করবার চেষ্টা করছ; কিন্তু কোন ফল হবে না! তোমার খেয়ালী-মনের রুদ্ধ-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অহরহ উমেদারী করা—ও আমার পোষাবে না।

অমিয়া কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে বন্ধু ধীরাজের গম্ভীর কণ্ঠের ডাক এল—

সাড়া দিয়ে, চাদরখানা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

—তি —

দুপুর-বেলা ঘরের মধ্যে হ্যামসুনের নতুন উপন্যাসখানা নিয়ে বসেছিলাম।

পড়তে ভাল লাগছিল না; অকারণে মনটা বাইরের স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের মতো ভারী হয়ে' উঠেছিল।

সৌরীনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে—নতুন করে।

কলেজের চারটে বছর একসঙ্গে বসা—দাঁড়ানো··· তার পর ছাড়াছাড়ি—

আইনের মোহ ওকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

কলেজের ক্লাসে যে ছিল একান্ত মুখ-চোরা, নেহাৎ গো-বেচারী, ভালমানুষ, আজ সে লম্বা লম্বা ছাড়া কথা কয় না—

নীট্‌শে, শোপেনহাওয়ার, রাসেল্‌···

তার ওপর আবার—desperately in love!

হোক, তাতে আমার কি যায়-আসে—?

জোর করে', mysteriesএর ভিতর প্রবেশ করছি, এমন সময় অমিয়া এসে ঘরে ঢুকলো—

যে কথাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলছিলাম, সেই কথাটাই পাড়লে—

অনিচ্ছা সত্বেও বই বন্ধ করতে হল।

—কেমন লোক বলুন তো—সৌরীন্‌বাবু; বেশ, চমৎকার—না?

হেসে বল্লাম—খুব চমৎকার। কলেজে রোজ ওকে নানা উপায়ে April-fool করে' আমরা যত আনন্দ পেতাম, নিজে ঠকে ও তার চেয়ে কম আনন্দ পেত না; দেখলাম—সৌরীনের প্রকৃতির মধ্যে আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি; এখনো খুব সহজেই ওকে ঠকানো যায়।

আমার কথা শুনে অমিয়া প্রথমটা বিস্মিত হোয়ে তাকিয়ে রইল—বোধ করি আমার কথাটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল···

ক্ষণ-পরেই মুখ লাল করে' বল্লে—আপনার মতো অতখানি অহঙ্কার তার নেই; তা বলে সে নেহাৎ মূর্খও নয়—

অমিয়ার দীপ্ত ক্রোধ দেখে আমার হাসি এল; বল্লাম—চুপ, চুপ, it is more than a declaration······

পরিহাসের তীব্র দাহ সহ্য করতে পারলে না; আরক্ত মুখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বইখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। পড়া এগুলো না।—মাথার ওপর চেয়ে দেখি, একটা ছোট পোকার

পিছনে একটা টিকটিকি ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—সুযোগের অপেক্ষায়।

দৃশ্যটা চমৎকার লাগলো—

দেখি—কতক্ষণের অপেক্ষায় ওর সুযোগ মেলে।

—চার—

ধীরাজকে গিয়ে বল্লাম—বন্ধু, অনেক চেষ্টা করেও এত-দিন যা পাওনি, আজ তা বিনা চেষ্টায় পেলে। আমি তোমাদের। নামটা লিখে নিও, আর যা যা ceremonyর প্রয়োজন হয় বলো'……

বৈচিত্র্যহীন জীবনের ওপর বিতৃষ্ণার আর অন্ত ছিল না…ঘরের মধ্যে প্রতিদিন যেন তিল তিল করে' হাঁপিয়ে উঠছিলাম…

অসীমকে উপলব্ধি করবার যে চির জীবন্ত আগ্রহ মানুষের মনে ঘুমিয়ে থাকে, আজ সহসা তারই আহ্বানে সারা অন্তর অধীর হয়ে' উঠেছে…

ঠিক এমনি সময়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা—ধীরাজের বাড়ীতে।

—শুনলাম, তুমি না কি একলব্যের মতো আমায় গুরু বলে' মান! বেশ, বেশ; তা, আমার দক্ষিণা কই?

অত বড় প্রসিদ্ধ লোক! যাঁর নাম ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, যাঁর ভয়ে ভারতের রাজ-শক্তি ভীত, ত্রস্ত,—তাঁর সঙ্গে আজ সাম্না-সাম্নি আলাপ—!

আনন্দে, গর্ব্বে, মোহে মন আত্মহারা হয়ে গেল।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গৌরবময় দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে পারবো, এর বড় সৌভাগ্য আমার আর কী হ'তে পারে…!

বল্লাম—আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই! সেই দিন হ'তে আমার জীবনের গতি নতুন ধারা বেছে নিলে—

যৌবনের চলার পথে যে ছিল অ-ধরা প্রিয়ার স্তুতি-গান-রচনা-নিযুক্ত শেলীর শিষ্য কবি, সে মরে গিয়ে সেদিন জন্মলাভ করল—চলার পথের সকল দাবী নিঃশেষে মিটিয়ে নেবার জন্য সদা প্রস্তুত—সব্যসাচীর মন্ত্রশিষ্য।

বিবাহের যে সম্বন্ধটা চলছিল বাধ্য হয়ে' সেটাকে ভেঙ্গে দিতে হ'ল।

মা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তার পর কানা-ঘুষোয় আসল খবরটা জানতে পেরে কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধালেন।

বল্লাম—মা এত কান্নাকাটি করো' না; লোকে জানতে পারলে তোমার ছেলের অমঙ্গল-আশঙ্কা কিছুমাত্র কমবে না; বরং…

এদিকটা বোঝবামাত্র মা থেমে গেলেন; তার পর কোন দিন আর কোন কথাই বলেন নি—

কিন্তু ভিতরের ক্রম-বর্দ্ধিত উদ্বেগ তাঁর শরীরকে যে দিনের পর দিন জীর্ণ করে ফেলতে লাগল,—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—

কিন্তু তখন আমি গুরুদেবের কাছে সত্যে বদ্ধ!

নস্টেই যখন বিবাহটা ভেঙ্গে দিলাম, তখন সত্যসত্যই অমিয়া আশ্চর্য্য হয়ে গেল—

ও ভেবেছিল, এ বিবাহে আমার বরাবরই মত আছে; এবং তা আমি করবও!

সেদিন অমিয়ার কাছে একটু অভিনয় করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—

ওর বিস্মিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে' উদাত্ত-কণ্ঠে বল্লাম—আমার ব্যর্থ জীবনের দিন-গুলো আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে এক রকম করে' কেটে যাবেই! কিন্তু আর একজনকে ঘরে এনে সারা জীবন তার সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করা আমার বরদাস্ত হবে না অমিয়া।

কথা শুনে অমিয়া নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—আগেকার দিনের মতো কোন রহস্য-তরল প্রত্যুত্তর করতে পারলে না…

ওর মৌন চোখের গভীর দৃষ্টির অন্তরালে অন্তরের গোপনতম অকথিত বাণী মুখর হয়ে' উঠেছিল—

আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত জীবনের অঙ্গনে আজ নিরাশার গাঢ় ছায়া ঘনিয়ে এসেছে; তবুও তার রেশ এখনো মাঝে মাঝে শুনতে পাই…।

—পাঁচ—

তার পরদিন—

ধীরাজের কাছ থেকে সদ্য-প্রাপ্ত টেলিগ্রামের উত্তরের একটা খসড়া লিখে নিচ্ছিলাম—

অমিয়া এসে বল্লে—আপনি এত-বড় মিথ্যেবাদী…!

চকিত হয়ে বল্লাম—আমি!…কেন?

—না তো কি! বিয়ের সম্বন্ধ কেন ভেঙ্গে দিলেন আমি কি জানি না! কিসের জন্য কাল তবে আমার কাছে একরাশ বাজে-কথা বল্লেন…!

স্মিত-মুখে ওর পানে তাকালাম।—সমস্ত মুখটা ওর চূর্ণ-রক্ত-রাগে মণ্ডিত হয়ে গেছে—

সারা অঙ্গে কী সে উদ্দীপ্ত শ্রী!

মার কাছ থেকে সমস্ত খবরই ও সংগ্রহ করেছিল—

সবাইকে ছেড়ে মা যে কেন ওকেই অবলম্বন করে' প্রাণের রুদ্ধ বেদনার কথা উক্ত করে' দিতেন—তার হেতু খুঁজে পাই নে আজো…মাঝে মাঝে কত কী যে মনে হয়…!

উত্তপ্ত কণ্ঠে অমিয়া বলতে লাগল—কখ্খনো আপনি যেতে পাবেন না—বলে দিচ্ছি……জ্যাঠাইমা দিন দিন কি রকম ভেঙে পড়ছেন—দেখতে পাচ্ছেন না… এর বেলা বুঝি খুব বাহাদুরী হচ্ছে…কিছুতেই তুমি ওসব দলে যোগ দিতে পাবে না।

টুক্রো টুকরো মুক্তোর মত ওর চোখের কোলে অশ্রু টলটলিয়ে উঠ্‌ল…!

ওর পানে চেয়ে ঈষৎ হেসে বল্লাম—জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো তোমার মুখে বড্ড বেমানান শোনাল অমিয়া…কিছুদিন আগে যদি বল্‌তে—!

সৌরীনের সঙ্গে ওর বিবাহের সব ঠিক হয়ে' গিছল—সে খবর আমি পেয়েছিলাম!

যখন আমার বিবাহের কথা চলছিল তখন আমার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ভেবে নিয়ে অমিয়া পরিহাস করে বলেছিল—শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলাম, ভবিষ্যতের অনেক দুর্ভাবনাই কেটে গেল; হ্যাঁ, বলছিলাম কি—আমার কাছ থেকে যে স্মৃতি-চিহ্ন চেয়েছিলেন, নেবেন না তা?—একখানা পুরনো বই, ছেঁড়া খাতা, কিম্বা খানিকটে খোঁপার ফিতে…?

নিজের নিষ্ঠুর পরিহাসে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসেছিল—

সেটা যে কতখানি নির্ম্মম হয়ে আর একজনের বুকে বাজ্‌তে পারে, তা জানতে চায় নি।

আজ সেটুকু ফিরে দেবার লোভ ছাড়তে পারলাম না—বল্লাম—এতখানি ট্রেনিং পেয়ে বন্ধুদের কাছে এত শিক্ষালাভ করে—আজ সহসা তোমার এতখানি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে ফেলা উচিত হয় নি অমিয়া; কেউ যদি শুনতে পেত তা'হলে হয় ত ভাব্‌ত—আময়াটা কি উইক, মনের কথা সহজেই ফাঁস্ করে ফেলে…!

আমার এই অপ্রত্যাশিত প্রচ্ছন্ন কঠিন পরিহাস মুহূর্ত্তে ওর সজল অশ্রু-উৎসকে যেন শুষ্ক পাষাণ করে' দিলে—

ধীরে ধীরে সেখান থেকে অমিয়া চলে গেল।

ভাব্‌লাম—যাক্, এতদিনে এ দিকটা কাটান-ছেঁড়ান হয়ে' পরিষ্কার হয়ে গেল; বাঁচা গেল…

ধীরাজকে উত্তর দিয়ে দিলাম—তিন দিনের মধ্যে রওনা হচ্ছি…।

—ছয়—

অমিয়ার বিবাহের দিন এগিয়ে এসেছে—

সঙ্গে সঙ্গে আমারও দীক্ষা-নেবার দিন…

স্নেহের নির্ভয় নীড় ছেড়ে ঝড়ের ঘূর্ণীতে গা ঢেলে দিতে হবে—

মনটা কদিন ধরে' বারবার অন্যমনস্ক হয়ে' উঠ্‌ছিল—

সহসা একদিন সকলের অজ্ঞাতে যাত্রা সুরু করে' দিলাম—

স্নেহের নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করে' আসার পিছনে যে ব্যাকুল ক্রন্দন গুঞ্জরিত হয়ে' চলার পথের বহুদূর পর্য্যন্ত যাত্রা-পথিকের অন্তর বিহ্বল করে তোলে—বিদায়-ক্ষণের সে করুণ-রাগিণী ধ্বনিত হবার পূর্ব্বেই এক বাদল-আঁধার-রাত্রে যাত্রা আমার আরম্ভ হয়ে গেল…।

আগের দিন অমিয়াকে নিরালায় পেয়ে বলেছিলাম—কাল যাচ্ছি অমিয়া…

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—

বোধ করি নিজেকে স

তার পর মৃদু-স্বরে বল্লে—এ কটা দিন থেকে যেতে পারেন না?

বল্লাম—না অমিয়া, তা পারি না; কালই…

—বেশ, তাহলে যাবার আগে আমায় আশীর্ব্বাদ কোরে যান…

সেদিন প্রথম সে আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলে ; সেই প্রথম, সেই শেষ !

সে কি আকুল আত্ম-নিবেদন ! সেদিন তার সকল সম্বল সে বুঝি আমারই পায়ে উজাড় করে' দিতে চেয়েছিল !

সৃষ্টির প্রথমারম্ভ থেকে তরুণী-নারীর এ নিঃশেষিত আত্মদান পুরুষ-চিত্তকে চিরদিন ধরে' জয় করে' এসেছে···

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বল্লাম—এমন জোরে কেউ কোন দিন আমার আশীর্ব্বাদ চায় নি ; কি আশীর্ব্বাদ করব তা তো ভেবে পাচ্ছি না অমিয়া···

ক্ষণকালের জন্য কোন উত্তর পেলাম না···

আজ ওর প্রতিবাদের প্রখরতা, পরিহাসের প্রচুরতা, ওর তরল কলকণ্ঠ—গোধূলির ছায়াচ্ছন্ন বালুচরের মত স্তিমিত, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—

ও আজ পরাজিত !

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বল্লে—আশীর্ব্বাদ করুন যেন পরজন্মে···

—ও আমি মানি নে ; তুমি তো জানো।

অমিয়া নিস্তব্ধ হয়ে' দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে বল্লাম—আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও···।

সামান্য সাধারণ শুভেচ্ছা—

কিন্তু সেদিন সে আশীর্ব্বাণী অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল—

ও আহত, ও দীর্ণ—আমার চেয়ে শতগুণ !

ওর আধুনিকতার নিষ্কারুণ্য, ওর শিক্ষার গর্ব্ব, পুরুষের প্রতি ওর দারুণ অবজ্ঞা, শেষ-পর্য্যন্ত ওকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি—এ আমি সেদিন নিশ্চয় জেনেছিলাম !

—সাত—

আজ দুবছরের বেশী আমার চলা আরম্ভ হয়ে গেছে—

কিন্তু কিসের মূল্য দিয়ে এ মৃত্যু-পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছি···! আজ পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে ভাবি···

সেদিনের সেই পৌরুষের গর্ব্ব, ত্যাগের আনন্দ, martyrdomএর গৌরব,—আত্মপ্রসাদের সমস্ত অনুভূতির অন্তরালে যে দুর্ব্বলতা আত্মগোপন করেছিল—আজও তো তাকে সম্পূর্ণ জয় করে' উঠ্‌তে পারি নি—

আজও মার সেই মমতা-কাতর মুখখানি মনে পড়ে যায়—

আজও সেবা-পরায়ণা ভগ্নীর অজস্র যত্নের কথা মনে আসে—

আজও অমিয়ার দৃপ্ত কথাগুলো মনের তলায় গুঞ্জরণ করে' ফেরে—

যখনই কথাচ্ছলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ব্রতটাকে সমর্থন করতাম, তখনই অমিয়া প্রতিবাদের উগ্রতায় প্রখর হয়ে' উঠ্‌ত···

বলতাম—অমিয়া ! বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য মহা-মানবের এ অভিযান ; তাদের কল্যাণের জন্য নিজের তুচ্ছ স্বার্থ যে ত্যাগ করাই চাই···ত্যাগ না করতে পারলে—

কথার মাঝেই অমিয়া অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ত—বিশ্বের কল্যাণের জন্যে বুদ্ধ কি ত্যাগ করেন নি, খৃষ্ট কি ত্যাগ করেন নি, গান্ধী কি ত্যাগ করেন নি ? তাঁদের ত্যাগ কি কারুর চেয়ে ছোট ; তাঁদের সে বাণী—সেই কি ছোট··?

কথাগুলো আজও মাঝে-মাঝে খোঁচা দেয় ; প্রশ্ন তোলে। সর্ব্ব-সময়ের চির-মৌন সহচরটিকে হাতে নিয়ে ভাবি,—ওর শীতল অন্তরের মত নিজেরও যদি বিবেকের উত্তাপটা না থাকৃত···!

মধ্যে অমিয়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি ; ও লিখেছে—

তোমার আশীর্ব্বাদ সার্থক হয়েছে রণেন দা,' আমি খুব সুখী হয়েছি·· খোকাটি হয়েছে খুব ভাল···এমনি দুষ্টু ···তার নাম রেখেছি সত্যব্রত ··বেশ নামটি, না···?

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া ঘনিয়ে আসে।

পাশের সহচরটিকে লক্ষ্য ক'রে বলি—যেমন করে' অমিয়া আজ আমার কাছ থেকে নিজেকে বহুদূরে নিয়ে গেছে, তেমনি করে' তুমিও আমায় ওর দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দূরে নিয়ে যেতে পার না বন্ধু···?

কোন সাড়া পাই না।

পুস্তক-পরিচয়

[কয়েকমাস 'ভারতবর্ষে' পুস্তক-পরিচয়-প্রদান বন্ধ ছিল। কিন্তু, সাময়িক সাহিত্যে উৎকৃষ্ট পুস্তকের পরিচয় প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায় আমরা এই মাস হইতে পুনরায় তাহার ব্যবস্থা করিলাম। —'ভারতবর্ষ' সম্পাদক]

দীপালি—চৌদ্দটি গল্পের দীপ, ভূত চতুর্দ্দশীর চৌদ্দপ্রদীপের মতোই এই বইখানির "দীপালি" নামটিকে যেন সার্থক ক'রে তুলেছে! প্রত্যেক গল্পটিই দীপ-শিখার মতোই স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ-নির্ম্মল। প্রাণের উত্তাপে ও আবেগে এই দীপালির আলোকমালা যেন অবিরত কম্পিত চঞ্চল! ভূতপূর্ব্ব বোমাচার্য্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যেদিন "দ্বীপান্তরের বাঁশী" হাতে ক'রে রাজনীতির পথ ছেড়ে সাহিত্যের আসরে এসে দেখা দিয়েছিলেন সেদিন তাঁর তাপস অগ্রজ অরবিন্দের চেয়েও বাংলাদেশকে তিনি অধিকতর বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন! কিন্তু বোমার শব্দ ও বাঁশীর সুর এক নয় ব'লেই বোধ হয় বারীণদা' বাঁশী নিয়ে বেশীদিন ভুলে থাকতে পারেন নি। হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে দাদার আশ্রমে গিয়ে ভগবৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। কিন্তু, বারীণদা' আমাদের চিরদিনই ক্ষ্যাপা মায়ের দুরন্ত দুলাল, প্রকৃতির চির-চঞ্চল শিশু! শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!" তাই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম থেকে পালিয়ে এসে অতীতের বোমাচার্য্য বর্ত্তমানে একেবারে সাহিত্যাচার্য্য হ'য়ে দেখা দিয়েছেন! দীপালির গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায় এ একেবারে পাকা-হাতের—পাকা-লেখা! প্রত্যেক ছত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে। শিল্পীর নিখুঁত দৃষ্টি নিয়ে তিনি যা' কিছু খুঁটিয়ে দেখেছেন, তাঁর সুদক্ষ লেখনী সে সমস্তই যেন নিপুণ তুলিকাগ্রে ছবির মতো ক'রে এঁকেছে। দিব্য সরল অনাড়ম্বর ঝরঝরে রচনা, যেন এক একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৃষ্টি! দীপালি পড়ে বোঝা যায় বারীণদা' আমাদের একাধারে দার্শনিক, কবি ও চিত্রকর! যদিও সামান্য লোকেদের হাসি-কান্নার সামান্য কাহিনী, তাদের সুখদুঃখের ছোটখাটো কথা, নিতান্ত সাদা ভাষায় সহজ ক'রেই আমাদের বলেছেন তিনি। কিন্তু, তাঁর সেই অপরূপ ক'রে বলার ভঙ্গীতেই বারীণদা আমাদের মন ভুলিয়েছেন। চোখের সামনে প্রত্যেক গল্পের ঘটনা ও তাদের পাত্র-পাত্রীগুলি যেন সজীব হ'য়ে জেগে ওঠে! তাদের ব্যথা আমাদের বুকে বাজে, তাদের দরদে হৃদয় নুয়ে পড়ে, তাদের কথা মনের মধ্যে যেন একটা সাড়া জাগিয়ে তোলে! এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব! আমাদের বিশেষ ক'রে ভালো লেগেছে তাঁর একাধিক উপমার অনুপমত্ব! এবং জীবিত কালের উপযোগী—প্রাণবন্ত মানুষের—স্বাভাবিক চিন্তা-প্রসূত তাঁর সহজ দার্শনিকতা! তাঁর গল্পগুলির মধ্যে যে তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা আধুনিক প্রাণ-ধর্ম্মেরই আকাঙ্ক্ষিত, এবং বর্ত্তমানের সজীব-পন্থার অনুকূল। 'দীপালি'র বিরুদ্ধে শুধু একটি কথা বলবার আছে, বারীনদা' তাঁর নায়ক নায়িকাদের চেহারা ও অবস্থা মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে গোল বাধিয়েছেন। এ বিষয়ে লেখক মাত্রেরই সতর্ক থাকা উচিত। বইখানি বেশ ভালো এণ্টিক কাগজে পরিপাটি ক'রে ছাপা, বাঁধাইও সুন্দর। রঙীন কাপড়ের উপর মুদ্রিত ত্রিবর্ণের চমৎকার চিত্রাঙ্কিত সুদর্শন প্রচ্ছদপট প্রভৃতি—প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সুরুচি বিজ্ঞাপিত ক'রছে।

শতনরী—রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা" প্রকাশের পর থেকেই এদেশের অন্যান্য কবিদেরও "চয়নিকা" প্রকাশ হ'তে সুরু হ'য়েছে। "শতনরী" কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ধরণেরই একখানি কাব্য-সঞ্চয়ন। কবির 'ঝরাফুল' 'শান্তিজল' 'প্রসাদী' ও 'ধানদুর্ব্বার' ভাণ্ডার উজাড় ক'রে শ্রেষ্ঠ মণিগুলি বেছে নিয়ে এই "শতনরী" গাঁথা হয়েছে। এর সঙ্গে কবির অনেক নূতন প্রকাশিত রচনাও সংযুক্ত আছে। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-মঞ্জুষার বাছা বাছা মণিমাণিক্যগুলি আহরণ ক'রে তরুণ কবি হেমচন্দ্র বাগচী আজ বঙ্গবাণীর শুভ্রকণ্ঠ যে সমুজ্জ্বল "শতনরী" হারে সালঙ্কৃতা ক'রেছেন তা'তে দেবীর এই নবীন পূজারীরও জয়গান না ক'রে থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্ত্তী সহযোগীদের মধ্যে মাত্র তিন চার জন কবির নামই সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য; কিন্তু, রবীন্দ্রানুবর্ত্তীদের মধ্যে বহু শক্তিশালী কবি তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার গুণে অক্ষয় সুযশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই অগ্রজ। করুণানিধানের সুমধুর রচনাবলীর সঙ্গে বাংলার কাব্যামোদীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, সুতরাং নূতন করে আজ আবার তাঁর কবিতার কোনো সমালোচনার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। শুধু এই কথাটি ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে,—রবীন্দ্রনাথ এ দেশের কাব্যলোকে যে নবযুগের অমৃত-রসধারা প্রবাহিত ক'রে আমাদের সাহিত্যকে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছেন, অভিনব রবিকরস্পর্শে যে নবীন চেতনার গভীর প্রাণস্পন্দন তার মধ্যে জেগে উঠে, তাকে বর্ত্তমানে এই অপূর্ব্ব নবরূপ, নূতন সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র প্রকাশ-মাধুরী এনে দিয়েছে, কবি করুণানিধান সেই নবোদিত আদিত্য মণ্ডলের একজন প্রথম সার্থকতপা তাপস! ভানুকিরণোদ্ভাসিত তরুণ যুগের সেই সিদ্ধাগ্রজ কবি করুণানিধানের কাব্যকরঙ্কের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি সংগ্রহ ক'রে আজ যে অতুল "শতনরী" মণিহার বিরচিত হ'য়েচে, আশা করা যায় তা' সর্ব্বজন-মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। "শতনরী"র মধ্যে কবি হেমচন্দ্র নিপুণ মণিকারের মতো কবি করুণানিধানের ভাণ্ডার হ'তে পাওয়া পঞ্চবিধ পঞ্চরত্নগুলিকে পাঁচটি পৃথক অংশে সন্নিবেশিত করে "শতনরী"কে আরও অধিকতর সুশ্রী ও মূল্যবান ক'রে তুলেছেন।

'কানে-কানে', 'বন্দনা', 'মুণু': 'মধুপ্রশস্তি', ও 'পথে' 'শতনরী'র এই পঞ্চবিভাগে আমরা কবি পরিবেষিত পঞ্চামৃতের আস্বাদ পেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হ'য়েছি। "শতনরী"র ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি প্রসাধন অঙ্গও সুন্দর হয়েছে।

গীতায়ন—'গীতায়নে'র কবি শ্রীমতী প্রভা নটরাজের মন্দিরের সর্ব্ব-সুপরিচিতা পূজারিণী। নৃত্যে গীতে অভিনয়ে আবৃত্তিতে রঙ্গনাথের রঙ্গপীঠের এই দেবদাসী একজন নিপুণা নটী বলে খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু, এই সুদক্ষা বারমুখ্যার নিভৃত অন্তরের গোপন কোণে যে একটি মহিয়সী মহিলার কবিপ্রাণ তার ভাবের একতারায় গুঞ্জন ক'রে গীতি-কাব্যের ঝঙ্কার তোলে, এ কথা অনেকেই হয়ত' জানতেন না! শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ আজ জনপ্রিয়া সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভার এই 'গীতায়ন' খানি প্রকাশ ক'রে সাধারণের নিকট এই নাট্য-শিল্প-কুশলার কবি-ভূমিকারও অবগুণ্ঠনখানি উন্মোচন ক'রে দিয়ে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 'গীতায়নে' গীতরচয়িত্রী শ্রীমতী প্রভার ভাব-মুগ্ধ মর্ম্মের যে সুন্দর পরিচয়টি আমরা পেয়েছি তার জন্য এই অভিনেত্রী কবিকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাঝে মাঝে দু' একটি গানে দু' একজন পরিচিত কবির রচনাভঙ্গীর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া গেলেও, 'গীতায়নের' অধিকাংশ গানই ছন্দ, শব্দ, ও ভাব-সম্পদে যে সুরচিত হ'য়েছে, এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

লাল কালো—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বই বটে, কিন্তু সকল দিক দিয়েই অতুলনীয়! ছাপা, ছবি ও রচনা হিসাবে এ বইখানিকে শিশু সাহিত্যের 'তাজমহল' বলা যেতে পারে। স্বপ্ন ও মনোজগতের অবচেতনাগত বিকল্পনের তত্ত্বধার ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু বহুব্যয়ে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য এই রঙীন্ খেলনাটি গড়ে তুলেছেন। বই-খানির পাতায় পাতায় রূপদক্ষ শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের নিপুণ তুলিতে আঁকা একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণের অসংখ্য ছবি আছে। ছেলেদের জন্য এ-রকম বিলাতী ছাপা ইংরাজী বই দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি বায়সাপেক্ষ! বাংলাভাষায় সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের ছেলেদের বই এমন অল্পমূল্যে প্রকাশ ক'রে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু এক নূতন কীর্ত্তি করেছেন ব'লতেই হবে। লাল-কালোদের এই লড়াইয়ের গল্পটি গল্পের দিক দিয়েও বেশ নূতন। ডাক্তার বাবুর লেখার ভঙ্গীটিও ভারী চমৎকার। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে ছেলেদের ছড়া রচনা বাংলা ভাষায় এর আগে আর চোখে পড়েনি। এদিক দিয়েও ডাক্তার বাবু এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু, কবিতা এতে খুঁড়িয়েছে! তা' হ'লেও, "লাল কালো" ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে যেন একাধারে মজার গল্পের বই ; আবার, চমৎকার রঙীন্ খেলনা হ'য়ে উঠেছে!

আলেয়া—আলেয়ার আলো যেমন ধরা-ছোঁয়া দেয় না, কিন্তু দীপ্তি দেয়, কবি শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "আলেয়া"খানি পড়েও যেন সেই রকম আমরা কবিকে কোথাও ঠিক্ ধরতে পারলুম না, কিন্তু তার দীপ্তি দেখেছি। কবি শ্রীরাধাচরণ প্রায় বিশবৎসরের উপর একনিষ্ঠ সাধনা ক'রে বাংলা সাহিত্যের কাব্যগগনে একাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পাশে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিতে পেরেছেন। মাসিক-পত্রের পাঠক-পাঠিকা তাঁর এই শান্ত সংযত সুন্দর ও সুমিষ্ট রচনাগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধ'রেই পরিচিত আছেন। 'আলেয়া' তাঁর এই প্রথম কবিতার বই, কিন্তু, কেবলমাত্র 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত কবিতা ছাড়া আর কিছু এতে নেই বলে 'আলেয়া' শ্রীরাধাচরণের কাব্যপ্রতিভার সমগ্র পরিচয় বহন ক'রে আনতে পারেনি। তা না হ'লেও, 'আলেয়া' যে তাঁর সাধনার স্নিগ্ধ রূপ সুষমাকে অনবগুণ্ঠিত ক'রে দেখাতে পেরেছে এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

"কণ্ঠ তারে পায়না নাগাল
বাজ্‌ল না সে বীণার তারে,
শব্দ সাগর স্তম্ভিত তার
স্তব্ধতারি তোরণ-দ্বারে।"—

ভাষায়—'মূকের ভাষা'কে এমন মুখর ক'রে তুলতে পারেন যে কবি তিনি শক্তিমান্। 'ঠাকুরদা ও নাতি'র মধ্যে আমরা এই কবির কল্পনার যে পরিচয় পাই, প্রকাশ ভঙ্গীর যে মাধুর্য্য দেখি, উপমার যে ঐশ্বর্য্য তাঁর ঝল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌ছে এই কবিতাটি অঙ্গে, তা'তে 'আলেয়ার' সমস্ত দৈন্যই যেন ঢাকা পড়ে গেছে বলে মনে হয়! বইখানির ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদপট প্রভৃতিও বেশ সুচারু ও সুকুমার।

"ঠাকুরদা ও নাতি—
সাঁঝ পেল' কি কুড়িয়ে পথে
প্রভাতকে তার সাথী?

*   *   *   *

শুকনো ডালে কে সাজালে
সবুজ পাতার পাতি?

*   *   *   *

ভাটার মুখে একটা যেন
উঠলো জোয়ার মাতি!

*   *   *   *

জ্বলচে শ্মশান-ঘাটের বাটে
প্রসব-ঘরের বাতি!"—চমৎকার রচনা!

নীলা—'পাথারে'র কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর নূতন কাব্যগ্রন্থ এই "নীলা"। 'নীলা'কে কবি বহুসমাদরে নীলারই অতলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সাগরের সুনীল রূপ এই কবির মনটিকে যেমন ক'রে নাড়া দেয় তেমনটি আর কিছুতে পারে না। তাই সাগর সম্বন্ধে তাঁর কবিতাও হ'য়ে ওঠে অবাধ উচ্ছ্বসিত উদ্দাম! ছন্দের বন্ধনে তারা সংযত হ'য়ে থাকতে চায় না। সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে বালুকায় বেলাভূমি যেমন ক'রে ধ্বসে যায় 'নীলা'র কবি প্রমথবাবুর কবিতার ছন্দও তেমনি ক'রেই তাঁর ভাবের ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে ক্ষণে ক্ষণে খসে পড়েছে। যেমন—

"বহে কুঞ্জায় মালার গন্ধ মলয়ানিল,
জলে খুঁজে পার্থ মীন-চোখের মণিটি নীল," ইত্যাদি।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির রচনাও যে ক্রমে শিথিল ও বিকল হ'য়ে প'ড়ছে 'নীলায়' তার অসংখ্য পরিচয় পেয়ে আমরা দুঃখিত হলুম।

জীবনপথে—"আলো ও ছায়া", "মাল্য ও নির্ম্মাল্য" "ধূপ ও দীপ" প্রভৃতি একাধিক কাব্যগ্রন্থে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় তাঁর যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, সে যে তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়, তিনি যে ও সবের চেয়ে অনেক ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন—এই কথাটাই সপ্রমাণ করেছে তাঁর এই নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "জীবনের পথে"। 'জীবনের পথে' বইখানিতে এই প্রবীণা কবির যৌবনের রচিত কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা সন্নিবেশিত হ'য়েছে। তরুণ জীবনের পরম অনুভূতি হ'তে উৎসারিত তাঁর এই কবিতাগুলি এই প্রবীণা মহিলা-কবির, একদা প্রেমস্নিগ্ধ, ভাবসুন্দর ও কল্পনাতুর মর্ম্মের সুমধুর রূপটি আমাদের কাছে আজ মেলে ধ'রেছে। তাঁর সকল গ্রন্থের আগে এই অতুল সম্পদ নিয়ে যদি এ বইখানি প্রকাশ হতো তাহ'লে আমাদের বিশ্বাস—বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবির জন্য রচিত অভিনন্দন ও প্রশস্তি সেদিন সকলে মিলে তাঁকেই নিবেদন ক'রে দিতে বাধ্য হ'তো! 'জীবনের পথে' বইখানি তিনটি অংশে বিভক্ত, 'সহযাত্রী', 'একেলা' ও 'ঝরাফুল'। এই তিনটি বিভাগেই যে সকল কবিতা দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিই নিটোল চতুর্দ্দশপদী। তার মধ্যে 'সহযাত্রী' ও 'একেলা'র প্রায় সমস্ত কবিতাগুলিকেই অনুপম বলা চলে। চৌদ্দটি ছত্রের সীমার মধ্যে কবি তাঁর যে অসীম প্রেমের উপলব্ধিকে বিকশিত ক'রে তুলেছেন তা' যথার্থ ই বিস্ময়কর!

"— শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু ;—দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে।"

কবির সঙ্গে আমরাও তাঁর 'জীবনের পথে' এ পরিচয় পেয়ে ধন্য হলুম! এ সত্য আজ আমাদের কাছে যেন একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে—

"বহু ভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার ;"

অর্পণ—এই কবিতার দেশেও কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় নিতান্ত অপরিচিত নন। "অর্পণ" তাঁর নব-প্রকাশিত চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ! 'রূপলীলা' কে যদি এক একটি পৃথক কবিতা বলে গণ্য করা হয়, তাহ'লে দেখা যায়—গিরিজাবাবু তাঁর এই নূতন বইখানিতে সর্ব্বসমেত চুয়াল্লিশটি কবিতা অর্পণ করেছেন। ১৩৩১ সালের আশ্বিনে এই কাব্যখানি প্রকাশিত হ'য়েছে, কিন্তু হ'লে কি হবে, কবির কথাতেই বলি—

"ক্ষুদ্র তারা দিয়ে যায় তিমির সাগরে
স্তিমিত কিরণ,
কে চাহে তাহার পানে? সেত' নাহি করে
আঁধার হরণ!"

গিরিজাবাবু এখনো কাব্যলোকের যে স্তরে রয়েছেন বাংলার কাব্য-সাহিত্য পঁচিশ বছর আগে সেখান থেকে আরও অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, আজকের দিনে তাঁর এই 'অর্পণ' যদি সাধারণের কাছে আদৃত না হয় তাহ'লে আমরা বিস্মিত হব না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে—আজ এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি বাণীর মন্দিরে তিনি এই 'অর্পণ' অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন বলেই কবির আশঙ্কা।—

"আমার মর্ম্মের গীত নীরবে গুমরি
লভিবে মরণ!"

হয়ত' সত্য হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা ক'রতে বসবেন তাঁদের সকলকেই এ কথা একবাক্যে ব'লতে হবে যে কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় সে যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। রবীন্দ্র-প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা থেকে আত্মরক্ষা ক'রে যে ক'জন পুরাতন পন্থী কবি তাঁদের সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছেন গিরিজাবাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

হিন্দু ষড়্দর্শন—সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দর্শন সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী এই 'হিন্দু ষড়দর্শন' নামক সংগ্রহ-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয়েকটী বক্তৃতার মধ্যে বেদান্তের কথা বিশেষ কিছু বলা হয় নাই, প্রথম দুইটী বক্তৃতায় বেদান্তের জন্য জমি কতকটা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশা দিয়াছেন, আর একখানা পুস্তকে বেদান্তের কথা বলিবেন। এই গ্রন্থে লেখক মহাশয় সংক্ষেপে দর্শন সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা করিয়াছেন; হিন্দুর ষড়্দর্শন পাঠের জন্য লোকের আগ্রহ জন্মাইবার জন্যই এই বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, নিতান্ত নীরস বিষয়ও তিনি এমন করিয়া বলেন যে, পাঠকদিগের তাঁহার বক্তব্য বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইবার যো থাকে না—তাঁহার বলিবার ভঙ্গী এমনই সুন্দর এবং অননুকরণীয়। যাঁহারা মূল দর্শন পাঠ করিবার সময় পাইবেন না, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পড়িলে ষড়দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির মূল্য বারো আনা মাত্র।

পাটের কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকখানিতে পাটের কথা আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি যে সময়োপযোগী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বৎসরে পাটের বাজারে যে প্রকার হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পাট চাষ ও উহার ক্রয়-বিক্রয় লাভালাভ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার জন্য অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। নির্ম্মলবাবুর এই পাটের কথা বইখানি পড়িলে সকলেই পাটের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। লেখক মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও বিষয়-বিবৃতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বইখানি যাহাতে পাট-চাষীদের নিকট পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।

বংশানুক্রমিতা—এখানি ফরাসী দার্শনিক রিবর্টের d'ia Heredite নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। বাঁকুড়া বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থখানির অনুবাদক। বৃহৎকায় ৫২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এই অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অনুবাদক মহাশয় তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে বংশানুক্রম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে। মূল গ্রন্থের অনুবাদ ব্যতীত অনুবাদক মহাশয়ের স্বাধীন মন্তব্যগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বংশানুক্রম সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়না, অথচ বিষয়টী তুচ্ছ করিবার নহে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি, বলিতে গেলে, এ বিষয়ের পথিপ্রদর্শক। পুস্তকখানির মূল্য দুই টাকা মাত্র।

পুস্তক প্রাপ্তি-সংবাদ

"সুধা"—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নীতি-কবিতা; মূল্য আট আনা।

"জ্যেঠামহাশয়ের গল্প"—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন-রচিত বালকদিগের চরিত্র গঠনোপযোগী কয়েকটি গল্প। মূল্য বারো আনা।

"বাস্থ্য-সুহৃদ্"—প্রথম ভাগ; তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, বি ই-এস প্রণীত; মূল্য দশ পয়সা।

"বাস্থ্য-সুহৃদ্"—দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ শ্রেণীর জন্য); শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত; মূল্য অজ্ঞাত।

"গীতার স্বরাজ্য"—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত; গীতায় রাজনীতির বিশ্লেষণ। মূল্য একটাকা।

"নূতন সমাজের ইঙ্গিত"—শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত; আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি; মূল্য চারি আনা।

"গীতাঞ্জলি"—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কৃত ছন্দে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। মূল্য দেড় টাকা।

"সরল কৃষি শিক্ষা"—শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু প্রণীত কৃষি বিষয়ক পুস্তক। মূল্য পাঁচ সিকা।

"চীনের সিন্দুর"—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ প্রণীত সামাজিক নাটক; মূল্য এক টাকা চারি আনা।

"ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা"—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ; শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ এফ-টি-এস, রায় সাহেব প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

শোক-সংবাদ

৺নলিনবিহারী সরকার

পরলোকে নলিনবিহারী সরকার

আমাদের পরমাত্মীয় প্রসিদ্ধ এটর্ণী নলিনবিহারী সরকার গত ২১ কার্ত্তিক অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নলিনবিহারীর মৃত্যুতে আমরা কেবল স্নেহভাজন সুহৃদে বঞ্চিত হইলাম এরূপ নহে, আমাদের একজন সুদক্ষ ও সাধু ব্যবহারাজীবেরও অভাব হইল। নলিনীবিহারী পরলোকগত সবজজ আশুতোষ সরকার মহাশয়ের পুত্র। তিনি ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ ঢাকা জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ৫৩ বৎসর বয়সে প্রৌঢ়ত্বের সীমাপ্রান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

নলিনবিহারী আবাল্য মেধাবী ছাত্র ছিলেন; ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সগৌরবে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; ১৯০৫ অব্দে তিনি এটর্ণী হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবেক-সম্পন্ন, পরিশ্রমী এটর্ণী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। গত বৎসর চৈত্রমাসে তাঁহার

পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি পিতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন ; সেই আঘাত সহ্য করিয়াও তিনি সংযত-চিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিতেছিলেন ; কিন্তু পিতৃবিয়োগের কয়েক মাস পরেই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া সহসা তাঁহাকে পরলোকে প্রস্থান করিতে হইল। এরূপ বন্ধু-বৎসল সদাশয় সুহৃদের অকাল বিয়োগ-শোকে আমরা অভিভূত। ভগবান তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের হৃদয়ে শান্তিদান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

স্বর্গীয় জগবন্ধু দত্ত

যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম ও বৈষয়িক বুদ্ধির সহায়তায় কমলার প্রসন্নতা লাভ করেন, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থের সদ্ব্যয় করেন, মহাপ্রাণ জগবন্ধু দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনের কাহিনী, কঠোর দারিদ্র্যের সহিত তাঁহার সংগ্রামের ইতিহাস, উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনা অপেক্ষা অল্প বিস্ময়োদ্দীপক নহে।

বরিশাল জেলার বানরিপাড়া বিখ্যাত পল্লী। এই পল্লী দেবপ্রকৃতি জগবন্ধুর জন্মস্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারে। এই গ্রামে ১২৭৯ সালে জগবন্ধুর জন্ম হয়। তিনি স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর ষোল বৎসর বয়সে সেখানে একটি ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন ; কিন্তু এই ব্যবসায়ে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই ; মনের দুঃখে তিনি দুইবার অহিফেন সেবনে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। অবশেষে তিনি আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৪৲টি টাকা মাত্র লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ; কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় ; তিনি কোনদিন অনাহারে থাকিয়া, কোনদিন একমুঠা 'চানা' চিবাইয়া এবং আশ্রয়হীন ভাবে পথিপ্রান্তে রাত্রিযাপন করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যিনি বাল্যে বীণাপাণির সেবায় বঞ্চিত ছিলেন। তিনি অধ্যবসায় বলে এরূপ উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত করিয়া সাফল্য লাভ করেন যে, তাঁহার 'জে, বি, ডি' মার্কা কালী সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, এবং এই কালীর ব্যবসায়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

অর্থোপার্জ্জন অনেকেই করেন, কিন্তু জগবন্ধু বাবুর মত স্বোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় কয়জন করিতে পারেন? তিনি বাগবাজারে প্রায় চারিলক্ষ টাকা ব্যয়ে যে গৌড়ীয়-মঠ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার স্বদেশবাসী ও বৈদেশিকগণের বিস্ময় আকর্ষণ করিবে। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব একালে বিরল। তাঁহার এত সাধের মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েকদিন পরে গত ৩রা অগ্রহায়ণ রাত্রি বারটার সময়

৺জগবন্ধু দত্ত

তাঁহার আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে। তাঁহার দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার বিধবাপত্নীদ্বয় ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গাব্দ

রায় শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত বাহাদুর ধর্ম্মভূষণ বি-এল্

বঙ্গাব্দ জিনিষটা কি, তাহা আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হজরৎ মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের তারিখ হইতে মুসলমানগণের হিজরী সন আরম্ভ হইয়াছে। হিজরী অর্থ পলায়ন। মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া রাজকার্য্যে এই হিজরী সন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা হইত। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে এক হিজরী বৎসর হয়। ইহার দিন-সংখ্যা ৩৫৪; সৌর বর্ষের দিন-সংখ্যা ৩৬৫¼।

বাদশাহ আকবর খৃঃ ১৫৫৬-১৪ ফেব্রুয়ারী (হিজরী ৯৬৩ সন রবি II ২) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজকার্য্যের অসুবিধা নিবারণার্থ চান্দ্র হিজরী বৎসরকে সৌর বর্ষে পরিবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু ৯৯২ হিজরীর পূর্ব্বে এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আবুল ফজল কৃত বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের সমস্ত ঘটনা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ফ্রান্‌সিস্ গ্লাডউইন সাহেব ১৭৮৩ খৃঃ এই গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৮৯৮ খৃঃ এই গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করেন। আমরা তাহার ২৩৪ পৃঃ হইতে উদ্ধার করিতেছি—

His Maj-sty had long been desirous of establishing a new aera in Hindustan, in order to remove the perplexity that a variety of dates unavoidably occasion. He disliked the word Hijera (p), but was apprehensive of offending ignorant men, who superstitiously imagine that this aera and the Mahommedan faith are inseparable: although it be evident to the sensible part of mankind, that dat s are only of use in worldly transaction, and can have no connection with religion. But as the world abounds with ignorant people, whilst the number of the wise and discerning is but small, he delayed carrying his intention into execution till the 992nd. Year of the Hijera, when his light having shone upon mankind, and enlarged their understandings, he embraced that opportunity for accomplishing this purpose. The illustrious Emeer Futtah Ullah Sheerazy corrected the calendar from the astronomical tables of Ulugh Beg, making this aera to begin with His Majesty's reign: and contemplating the character of the monarch, named it Tarik Ilahee (or the mighty aera).

অনুবাদ—নানাপ্রকার অব্দের গোলযোগ নিবারণের জন্য বাদশাহ (আকবর) হিন্দুস্থানে একটী নূতন অব্দ প্রচলিত করার জন্য অনেক দিন হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। হিজরী অর্থ পলায়ন। তিনি এই শব্দ পছন্দ করিতেন না; কিন্তু অজ্ঞ লোকের বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাহারা (অজ্ঞ লোকগণ) মনে করে যে এই অব্দের সহিত মুসলমানী ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যদিও বিবেচক মানবগণের নিকট ইহা প্রতিভাত যে অব্দের সহিত সাংসারিক বিষয়ের মাত্র সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত কোন সংস্রব নাই। কিন্তু এই পৃথিবীতে অজ্ঞ লোকের সংখ্যাই বেশী, জ্ঞানী ও বিবেচক লোকের সংখ্যা মাত্র অল্প। এই জন্য বাদশাহ হিজরী ৯৯২ সন পর্য্যন্ত তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত ছিলেন। এই সময় মানব-জগতে তাঁহার জ্ঞানের আলোক পতিত হয়; এবং তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির প্রসার হওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করার এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। প্রসিদ্ধ ইমির ফতেউল্লা সিরাজী, উলাহ বেগের কৃত জ্যোতিষের স্মারকলিপি হইতে বৎসর গণনা বিশুদ্ধ করিয়া বাদশাহের রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ করিলেন। বাদশাহের

(P) Flight.

প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অব্দের নাম দিলেন তারিখ ইলাহী অর্থাৎ বৃহৎ অব্দ।

মুসলমানগণের মধ্যেও জ্যোতির্ব্বিদের অভাব ছিল না। আইন-ই-আকবরীর উদ্ধৃত অংশে দুইজন জ্যোতির্ব্বেদের নাম পাইতেছি—ইমির ফতেউল্লা সিরাজী ও উলাহ বেগ। আইন-ই-আকবরী ২০৬ ও ২৩৭ পৃঃ নানা দেশীয় মাসের নাম দিয়াছেন। ৫৬৯-৫৯২ পৃষ্ঠায় হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। ২১৯-২৩৬ পৃষ্ঠায় নানা দেশের প্রচলিত অব্দের কথা ও ২২৩ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত যুধিষ্ঠিরাব্দ, বিক্রম সম্বৎ, শালিবাহনের শকাব্দ প্রভৃতি নানা অব্দ, যাহা প্রচলিত আছে ও ছিল, এবং হিন্দুগণের বিশ্বাস-মতে যে সকল অব্দ ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে, তাহার আলোচনা করিয়া সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ২২৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর হইতে ১০ দিন ৫৩ ঘড়ী ২৯ পল ১২ বিপল ছোট এবং ২ বৎসর ৮ মাস ১৭ দিনে চান্দ্র বৎসর এক মাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় আছে যে কোতোয়ালের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা দেখিবে, যেন হিন্দু পঞ্জিকায় এই প্রবর্ত্তিত অব্দ সন্নিবিষ্ট হয়।

প্রাচীন পারসীক জাতির মধ্যে যে সৌর বৎসর প্রচলিত ছিল, বাদশাহ সেই আদর্শ গ্রহণ করিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

The era of the Hijra and the Arabian months were changed for a Solar year dating from the vernal equinox nearest the King's (Akbar's) accession and divided into months named after those of ancient Persis.

অনুবাদ—হিজরী অব্দ ও আরব দেশীয় মাস সৌর বর্ষে পরিণত হয় এবং বাদশাহের রাজ্যাভিষেকের নিকটবর্ত্তী বসন্তকালে সূর্য্যের বিষুব রেখা অতিক্রমের সময় হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া প্রাচীন পারস্যের অনুকরণে মাসের বিভাগ করেন।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ, স্মিথ তাঁহার আকবরের ইতিহাসের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

The Ilahi year was Solar, a modification of the Persian year, and about II days longer than the Hijri year. Akbar dropped the Persian intercalation, and made his adaptation by changing the lengths of the months, some being 30, some 31 days, and some 32.

অনুবাদ—আকবরের বৃহৎ অব্দ (Ilahi year) সৌরাব্দ ও পারসীকের রূপান্তরিত বৎসর ছিল। হিজরী বৎসর হইতে প্রায় ১১ দিন দীর্ঘ। আকবর পারসীকগণের অতিরিক্ত দিন পরিত্যাগ করিয়া মাসের পরিমাণ ৩০, ৩১ ও ৩২ দিন ধরিয়া অতিরিক্ত দিনগুলি বর্ষের অন্তর্ভূত করিয়া লন।

প্রাচীন পারসীকগণ ৩৬৫ দিনে ও ১২ মাসে বৎসর গণনা করিতেন, প্রতি মাসের সংখ্যা ৩০ দিন ছিল। বৎসর শেষে উদ্বৃত্ত ৫ দিনের নাম দিয়াছিলেন গাথা। আকবর তাহা না করিয়া এই অতিরিক্ত ৫ দিন মাস-গণনার মধ্যে ধরিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য কোন মাস ৩০, কোন মাস ৩১ ও কোন মাস ৩২ দিন হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁহার ইতিহাসের ৩১ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন—

The student should note that the Ilahi era of Akbar dates from Rabi ii, 27, equivalent to March 11, twenty-five days later than the actual accession. The era was from the next nauroz or Persian New Year's day, and the interval of twenty-five days was counted as part of the first regular year.

এই ইলাহী বৎসর তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভের ২৫ দিন পর ১১ই মার্চ (রবি II ২৭) ও পারসীকগণের নূতন বৎসর (নারোজ) হইতে গণিত হইয়াছিল। এই অতিরিক্ত ২৫ দিন পূর্ব্বে বৎসরে ধরিয়া লইয়াছিলেন।

বঙ্গাব্দ ফসলী ও বিলায়তী সমস্তই আকবরের সৌরে পরিবর্ত্তিত এই হিজরী সন হইতে উদ্ভূত।

The chronology of modern India for four hundred years from the close of the 15 th. century A. D. 1494-1894 By James Burgess C. I. E, L. L. D, F. R. S. E., F. R. G. S., M. R. A. S :—

February 14 A. D. 1556, Rabi 11 2 H 963. Akbar introduces the Fasli or harvest year—a Solar year for Revenue and other

purposes instead of the Mahomedan lunar year but dating from the Hijra year 963. The Fasli year 963 began with the lunar month Ashin 10 September 1555 and correspond t the Hindu lunar-solar Samvat from which if 649 be subtracted, the Fasli year is found. In Orissa the era termed Vilayati San commenced from the Ist. of solar month Ashin, Sep. 8, 1555; hence it corresponds with the Hindu solar years of the Saka reckoing with Ashin. The Bengali San 963 began with Ist. Vaisakh Saka 1479 or 27th. March 1556 and following the Saka reckoning with a difference of 417 years (515 ?).

ইং ফেব্রুয়ারী ১৪।১৫৫৬, রবি II ২ হিজরী ৯৬৩—আকবর চান্দ্র মুসলমানী বৎসরের পরিবর্ত্তে রাজস্ব ও অন্যান্য অভিপ্রায়ে সৌর ফসলী বৎসর (ফসলের বৎসর) হিজরী ৯৬৩ সন হইতে প্রবর্ত্তন করেন। ৯৬৩ ফসলী বৎসর আরম্ভ হয় চান্দ্র আশ্বিন মাস হইতে—ইং ১০ সেপ্টেম্বর ১৫৫৫। হিন্দু সৌর-চান্দ্র সম্বৎ হইতে ৬৪৯ বাদ দিলে ফসলী বৎসর পাওয়া যায়। (বর্ত্তমান সম্বৎ ১৯৮৭ হইতে ৬৪৯ বাদ দিলে বর্ত্তমান ফসলী ১৩৩৮ সন হইবে)

উড়িষ্যায় এই ফসলী অব্দের নাম বিলায়তী। ইহা সৌর ১লা আশ্বিন (খৃঃ ১৫৫৫।৮ সেপ্টেম্বর) হইতে আরম্ভ হয়। ইহা হিন্দুদিগের সৌর শকাব্দ সহ মিল হয়; কিন্তু গণনা আশ্বিন মাস হইতে। (বর্ত্তমান বিলায়তী অব্দ ১৩৩৮)। বাঙ্গালা ৯৬৩ সন আরম্ভ হইয়াছে শক ১৪৭৯।১লা বৈশাখ (২৭ মার্চ ১৫৫৬)। ইহা শকাব্দ সহ মিল হয়—পার্থক্য ৫১৫ বৎসরের।

বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৫২ হইতে ৫১৫ বাদ দিলে বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সন পাওয়া যায়।

বঙ্গাব্দ ৯৬৩ হিজরী হইতে গণিত হইয়াছে। ১৫৫৬।২৭ মার্চ, শক ১৪৭৯ ১লা বৈশাখ হইতে বঙ্গাব্দ ৯৬৩ সন আরম্ভ হইয়াছে। ফসলী ও বিলায়তী বর্ষও হিজরী সন। ফসলী ৯৬৩ সন চান্দ্র আশ্বিন মাস (১০ই সেপ্টেম্বর ১৫৫৫ খৃঃ) হইতে বিলায়তী ৯৬৩ সন সৌর আশ্বিনের ১লা তারিখ (৮ সেপ্ ১৫৫৫) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য বঙ্গাব্দ হইতে প্রায় ৬ মাসের পার্থক্য ঘটিয়াছে।

১৫৫৬।২৭ মার্চ (অর্থাৎ যে তারিখ হইতে আকবরের সৌর ইলাহী বৎসর আরম্ভ হইয়াছে) হইতে বর্ত্তমান খৃঃ ১৯৩০।২৭ মার্চ পর্য্যন্ত ৩৭৪ সৌর বৎসর হয়। এই বর্ষ সংখ্যা ৯৬৩ হিজরীতে যোগ দিলে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু হিজরী সন সৌর বৎসর হইতে ১১ দিন ছোট; কাজেই ৩৭৪ সৌর বৎসরে প্রতি বর্ষে আরও ১১ দিন পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে হিজরী সন ১২ বৎসর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এজন্য আমরা বর্ত্তমান ১৯৩০।৩০ মে হইতে হিজরী ১৩৪৯ সন পাইতেছি।

Book of Indian Eras published in 1883 by Alexandar Cunningham C. S. I C. I. E., Major-General, Royal Engineer (Bengal) P. 82—The Fasli Era owes its origin to Akbar's love of innovation. It should properly be dated from the time of his own accession or the 2nd. Rabi-us-Sani in the Hijra year 963 or 14th. February 1556; but the actual Solar reckoning of the Fasli system in Bengal begins with the 1st. Vaisak, of the Hindu Solar year. In the account published by James Prinsep, the different reckonings of the Fasli calendar in various parts of India are all noticed. It is altogether a mongrel era, the first 963 years being purely lunar ones, the Bengali Sanh beginning with the 1st. of the Hindu Baisaph, the Fasli of Northern India with the 1st. of the lunar Aswin and the Vilayati with the 1st. of the Solar Aswink.

অনুবাদ—আকবরের নূতনত্বপ্রিয়তাই ফসলী অব্দ প্রবর্ত্তনের কারণ। ইহা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় ২রা রবিউস সানি ৯৬৩ হিজরী (ইং ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬) হইতে গণিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে ফসলী বৎসর সৌরমতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে হিন্দুর সৌরবর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে। জেম্‌স প্রিন্‌সেপ সাহেব যে তালিকা মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ফসলী বৎসরের প্রারম্ভ বর্ণিত আছে। ফসলী বৎসর একটী মিশ্র বৎসর। ইহার প্রথম ৯৬৩ বৎসর ছিল চান্দ্র হিজরী বর্ষ। তৎপর হইতে ইহা সম্পূর্ণ সৌরবর্ষ। বঙ্গাব্দ হিন্দুর ১লা বৈশাখ, উত্তর ভারতের ফসলী বর্ষ ১লা চান্দ্র

আশ্বিন (অপর পক্ষের প্রতিপদ) ও বিলায়তী ১লা সৌর আশ্বিন হইতে গণিত হইতেছে।

100 years Indian Calendar by Jagjiban Ganeshji Jetha Bhai Lim Bhai (Kathiawar) from 1845 to 1944 A. D.—page 19.

"The Bengali San prevails throughout Bengal. It is used with the Bengali Solar Calendar. It dates from the time of the Emperor Akbar. His reign began in February 1556 A. D., when the Hijri year 963 was current and the Hindu Solar year which began in that Hijri year was given the same number. The reckoning has been kept up since according to Solar years"

অনুবাদ—বাঙ্গালা সন সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচলিত। ইহা বাঙ্গালা সৌর পঞ্জিকাতে ব্যবহৃত হয়। ইহা আকবরের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার রাজত্ব ১৫৫৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়, তখন হিজরী সন ছিল ৯৬৩। হিন্দু ৯৬৩ সৌর বৎসর সেই হিজরী বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বর্ষ-সংখ্যা হিজরী বর্ষ সংখ্যা মতে ধরা হইয়াছিল। তৎপর হইতে গণনা সৌরবর্ষ অনুসারে রক্ষিত হইতেছে।

আকবরের রাজ্যাভিষেক চান্দ্র হিজরী ৯৬৩ সনকে প্রারম্ভ ধরিয়া ৯৬৩ বঙ্গাব্দ, ফসলী ও বিলায়তী সন গণিত হইয়াছে। বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ, উত্তর ভারতের ফসলী তৎপূর্ব্ব চান্দ্র ১লা আশ্বিন ও বিলায়তী সৌর ১লা আশ্বিন হইতে গণিত হইয়াছে। এজন্য বঙ্গাব্দ ফসলী ও বিলায়তী একই ৯৬৩ হিজরী বর্ষ হইতে গণিত হইলেও বঙ্গাব্দ সহ ফসলী ও বিলায়তী বর্ষের কয়েক মাসের পার্থক্য ঘটিয়াছে। ফসলী ১৩৩৮ সন চান্দ্র আশ্বিন অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে; আর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ আগামী ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইবে। দেশের অবস্থানুসারে বর্ষারম্ভ পৃথক পৃথক ভাবে গণিত হইয়া আসিতেছে। ইহাই ফসলী ও বিলায়তী সহ বঙ্গাব্দের পার্থক্যের কারণ।

ঘোষের বার্ষিক ডাইরিতে লিখিত আছে (১৯৩০ খৃঃ ডাইরি ৫ পৃষ্ঠা)—

The Bangali year used in the Province of Lower Bengal commenced in April 1556. The era was introduced by the Emperor Akbar the Great.

পি, এম, বাগচির পঞ্জিকাতে বঙ্গাব্দ সৌরে পরিবর্ত্তিত হিজরী সন বলিয়া লেখা আছে।

সন, মুসলমানী শব্দ, বর্ষজ্ঞাপক। সন বলিলে মূলতঃ হিজরী সনই বুঝাইবে। এজন্য প্রাচীন কাগজে বঙ্গাব্দকে সন বলিয়া সর্ব্বত্রই লিখিত আছে। আমি বৈদ্য বইর দ্বিতীয় সংস্করণে মহারাজ রাজবল্লভের দানপত্রের যে প্রতিলিপি দিয়াছি তাহাতে ১১৬৫ বঙ্গাব্দকে সন বলিয়া লিখিত আছে। মৎপ্রণীত মহামুদ্গার গ্রন্থে ১২০৪ বঙ্গাব্দের দলিলের যে প্রতিলিপি দিয়াছি তাহাতেও সন লেখা আছে। বিক্রমপুরের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৫পৃঃ যে প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি দিয়াছেন তাহাতেও বঙ্গাব্দকে সন বলিয়া লিখিত আছে, যথা—১১৬২ এগারশ বাষাঠ্যি বাংলা পরগণাতী সন ৫৫৪ পাছ স চৌপান্ন সহরে ১৪ রবিকুরি মাহে ৩রা মাঘ রোজ বুধবার। এই পরগণাতী সন কোন স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার সময়ে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইহাকেও সন বলা হইয়াছে এবং দলিলে মুসলমানী মাসের নাম দিয়াছে। রবিয়ল্ আউয়ল্ ও রবিয়স্ সানি নামে ২টী মুসলমানী মাস আছে, তাহারই কোন একটীকে অপভ্রংশ ভাষায় বিকুরি লিখিয়াছে এবং মুসলমানী "রোজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে।

শাল ও সাল শব্দ হিন্দু অব্দ জ্ঞাপক। বিশ্বকোষে আছে "সাল—সল্যতে ইতি সল গতৌ ঘঞ্।" সুবলের অভিধানে আছে "শল—গমন করা+ঘঞ্।" কালক্রমে সন, সাল ও শালের প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। এখন সনকেও শাল এবং শাল (সাল)কেও সন বলা হইয়া থাকে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে আছে "সাল—আকবর শাহের প্রবর্ত্তিত অব্দ। এই বৎসর গণনা করিতে হইলে শকাব্দা হইতে ৫১৫ বৎসর বাদ দিতে হয়।" সাল ও সনের প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই। তিনি এখানে বঙ্গাব্দের কথাই বলিয়াছেন কারণ বর্ত্তমান শকাব্দা ১৮৫২ হইতে ৫১৫ বাদ দিলে আমরা বর্ত্তমান বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ পাইতেছি।

আমরা দেখিয়াছি যে, আকবর সিংহাসনে বসিয়াই সৌরে প্রবর্ত্তিত হিজরী সন প্রচলন করেন নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে, আকবরের রাজত্বের ত্রিংশ বর্ষে অর্থাৎ ৯৯২ হিজরীতে এই সৌর বৎসর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার গণনা তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল ৯৬৩ হিজরী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কানিংহ্যামও তাঁহার Book of India Eras নামক গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন—

The Ihahi Era was established by Akbar so late as the 30th year of his reign in A. H. 992 or A. D. 1584. The era dates from Akbar's accession to the throne which was A. H. 963 or 1556 A. D.

বঙ্গাব্দের সঙ্গে কোনও বৈদ্য রাজার সম্পর্ক নাই। যাঁহারা বঙ্গাব্দকে বৈদ্যাব্দ নামে অভিহিত করিতেছেন, তাঁহারা মূল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

সাময়িকী

সুইন্‌বার্ণের একটী কবিতা

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রারম্ভে অমর ইংরাজ-কবি সুইন্‌বার্ণের একটী কবিতার উল্লেখ করিতে হইতেছে। শুভ-কার্য্যের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক প্রয়োজন।

এই কবিতাটীর উল্লেখ করার সম্বন্ধে একটী ঘটনাও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে কোনও ব্যক্তি না কি গোল-টেবিল বৈঠকের ভারতীয় সদস্যদের নিকট এই কবিতার এক-একটী কপি পাঠাইয়াছেন। এই কবিতাটীরও নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। ভারতের মত একদিন ইতালীও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। সেদিন স্বদেশের মুক্তির জন্য ম্যাট্‌সিনী গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে নবীন ইতালীর যুবকরা জীবন-মরণ পণ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইতালীর যুবকরা যখন সংগ্রামে জীবনদান করিতেছিল, সেই সময় ইতালীর মডারেট-দলের নেতারা এক সভায় শত্রুপক্ষের সহিত এক চুক্তির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। মুক্তির উপাসক ইংরাজ-কবি সেই ব্যাপার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া উক্ত ঘটনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন,—

"রাজ-সভাতলে তাহারা বসিয়া আছে—স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক। অকস্মাৎ সেখানে নগ্নতনু পূতপাবকের মত এক নারী আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্ব-অঙ্গে অস্ত্র-ক্ষত, নারীর চরণে শৃঙ্খল! বহুদিনের সঞ্চিত লাঞ্ছনার ভারে নতমস্তকে নারী সভাতলে আসিয়া দাঁড়াইল!

সহসা সেই দগ্ধ-লতিকাকে দেখিয়া সভাসদ্‌গণ চমকিয়া উঠিল। অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিল, কে এ নারী, চিনি না ত এ'কে!

তাহার পর মুখ ফিরাইয়া, ভিক্ষা সমুৎসুক ভিখারী যেমন পথ হইতে স্বর্ণকণা তুলিয়া লয়, তেমনি ভাবে, প্রভুর কৃপাকণা কুড়াইয়া লইয়া দাসখৎ লিখিয়া দিল।

নারীর স্মরণে জাগে, ইহারাই স্বদেশের কথা বলিয়া নিশিদিন জাগিয়াছে। সন্ধি ক্ষণে তাহারা সমস্তই ভুলিয়া গেল। জরির পোষাক পরিয়া হাসিয়া মাথায় জীর্ণবস্ত্র তুলিয়া লইল।

দেশ জননী তেমনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া—তেমনি কাতর তাঁহার দৃষ্টি!

সভাসদগণ দাসখৎখানি নারীর হাতে তুলিয়া দিল! কিন্তু বিস্ময়ে তাহারা দেখে, সে হস্ত হিম হইয়া গিয়াছে। যেটুকু প্রাণ ছিল, ভিক্ষা-পত্র স্পর্শে তাহা চলিয়া গিয়াছে।

যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আসিয়াছিল, সেই তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া গেল!"

যিনি এই কবিতাটী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি-দের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনি হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজ কবি যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সেদিন এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের সেণ্ট জেম্‌স্ প্রাসাদে সেই ঘটনারই আজ পুনরভিনয় হইতে চলিয়াছে।

—

গোল বৈঠকের অধিবেশন—

লণ্ডনের নিদারুণ শীত। তাহারই মধ্যে সেণ্ট-জেম্‌স্ প্রাসাদের রাণী আনীর বৈঠকখানা ঘরে বিখ্যাত ভাস্কর স্যার ক্রিষ্টফার রেনের নির্ম্মিত "মেডুসা"র মাথায় অগ্নি জ্বলিতেছে। গ্রীক পুরাণে বলে "মেডুসা"র মাথা যে দেখিত, সেই পাথর হইয়া যাইত। কিন্তু সে পুরাণের কথা।

বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত এক টেবিলের চারিদিকে রাজা, মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট। মধ্যখানে সভাপতির আসনে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। সকলে সমবেত

হইয়াছেন, ভারতের ভাগ্য নিরূপণের জন্য। কোনও পরাধীন জাতির ভাগ্য এই রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আর কখনও নিরূপিত হয় নাই।

—

একজন অনুপস্থিত

সভার কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। রাজপ্রাসাদের সেই অপরূপ সজ্জা, রাজা মহারাজাদের সেই মণিমাণিক্যের ঘটা, ভারতীয় বক্তাদের সমস্ত বক্তৃতা, বৃটীশ মন্ত্রীর সমস্ত স্তোক-বাক্য, সকলের উপর একটী জিনিষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—একজন লোক অনুপস্থিত। যে আসিলে সমগ্র ভারত আসিত, যে কথা কহিলে সমগ্র ভারত কথা কহিত, ইংলণ্ড ও ভারতের মিলিত মন্ত্রণা-সভায় সেই অনুপস্থিত। ভারতের নাম লইয়া যখন কতকগুলি শক্তিহীন, সহচরহীন ব্যক্তি কথার ফানুষ রচনা করিতে ব্যস্ত, তখন যারবাদার কারাগারের এক নির্জন প্রকোষ্ঠে ভারত-সংগ্রামের সেই সেনা-নায়ক তূলা হইতে সূতা প্রস্তত করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে চিন্তার নব নব সূত্র রচনা করিতেছেন।

এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, মহাত্মা গান্ধীর অর্থাৎ কংগ্রেসের অনুপস্থিতি, সমস্ত আড়ম্বরকে নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রশ্ন বহু মণীষীর মনে উঠিয়াছে। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতিরেকে দেশের লোকের নিকট তাহা গ্রাহ্য হওয়া আর এক সমস্যার ব্যাপার এবং এই সমস্যা ভারতীয় প্রতিনিধি এবং স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতাতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

—

'রবীন্দ্রের সহ নমস্কার'

মহাত্মা গান্ধীর এই অনুপস্থিতি সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ভারতবাসীর দিক দিয়া একটা ঐতিহাসিক বিবৃতি হিসাবে জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে পরিগণিত হইবে। ভারতের আকাশে আজ দুই সূর্য্য এক সঙ্গে সমুদিত হইয়াছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্ম্মজীবন আমাদের যুগের হৃৎ-পিণ্ড। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতদ্বৈধের দুই একটী উদাহরণ সাহিত্যে স্থায়ীভাবে রহিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বিলাতের 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, অসহযোগ-মন্ত্রে সন্দেহবাদী বিশ্বকবি মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের নিকট আজ তাঁহার সন্দেহকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, " * * * সকল রকমের জাতি-গত বে-বন্দোবস্তের একটা সামঞ্জস্য সমাধানের জন্য আজ অভিনব মন্ত্র এবং মহত্তর প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সেই অভিনব মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া তিনি সে মন্ত্রকে কর্ম্ম-রূপ দিয়াছেন। যে (গোলটেবিল) বৈঠক তাঁহারই নৈতিক প্রভাবের ফলে আজ সম্ভব হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা তিনি সেই বৈঠককে তাঁহারই মন্ত্র-প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেন। এই বৈঠককে আশ্রয় করিয়াই তিনি ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাস-স্রষ্টাদের নিকট তাঁহার বাণীকে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। * * * * এ কথা সত্য যে, এই রকমের কোনও বৈঠককেই গোড়া হইতেই তৈরী-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ইহার মুখ দিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের বাণীকে ধ্বনিয়া তুলিতে হইলে, প্রতিভার প্রয়োজন এবং মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয়ই সে প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু ভাবিতে দুঃখ হয় যে, মহাত্মা গান্ধীর অনুপস্থিতিতে সে সুযোগ চলিয়া গেল; ভারত, ভারত কেন, সমগ্র জগতের কল্যাণের একটী সুযোগ চলিয়া গেল। কারণ আজ সময় আসিয়াছে, যখন মানব-সভ্যতার মহামহোৎসবের জন্য সমস্ত দ্বৈপায়ন দূরত্ব মোচন করিয়া একটী মহাদেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু এখানেই আমার কলম থামিয়া যাইতেছে; কারণ যে নির্ম্মম বেদনা সম্প্রতি আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা এই বহু দূরের কল্পলোকের চিন্তায় আজ বাধা দিতেছে। ঢাকায় যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানি এবং তাহা হইতেই বুঝিতে পারি পেশাওয়রের বিষণ্ণ কাহিনী কি। **** আমি জানি, যে ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। তাই যখনি সেই যুগের কথা বলিতে যাই,

যখন আপনার আত্ম-রক্ষার জন্য ভূত আপনি পালাইতে বাধ্য হইবে, তখন আপনার অন্তরের লজ্জায় আপনি নীরব হইয়া উঠি। আজ যাঁহারা দুঃখভোগ করিতেছেন, বেদনার আঘাতে যাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাঁহারা ক্রুদ্ধস্বরে আমাকে বলেন, 'ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও-সমস্ত আলোচনা বন্ধ কর! আমাদের দেশের মাটীতে দাঁড়াইয়া এই যে দুঃখ-বরণ করিয়া সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের স্বপক্ষে দাঁড়াইবার জন্য বিশ্ব-জগৎকে আবেদন না করিয়াই, আজ আমরা সহায়-সম্বলহীন, অস্ত্রহীন হইয়াও এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব; বলিব, আমরা তোমাকে ভয় করি না। আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিবার আছে জানি কিন্তু তাহার চেয়েও জানি, আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য আজ কোনও বাহিরের লোক নয়, একান্ত আমাদেরই প্রয়োজন!'

*** আবরণহীন অত্যাচারের সম্মুখে এই অভিনব বীর্য্য আজ মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতের অসংখ্য নরনারীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞানতার গহ্বরে যে জাতি এইরূপ সুদীর্ঘ দিন অন্ধকারে পড়িয়া ছিল, তাহার পক্ষে সহসা এইরূপ নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার বহুবার সন্দেহ হইয়াছে। মানব চরিত্রে অগাধ বিশ্বাস ও আপনার অন্তরের অদম্য শক্তির মায়াপ্রভাবে মহাত্মা গান্ধী এই অলৌকিকতাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতার পর, সেইজন্য যখন দেখি মহাত্মা গান্ধী ইচ্ছা করিয়াই এই বৈঠকে যোগদান করিলেন না, তখন তাঁহার সিদ্ধান্তকে সন্দেহ করিতে সঙ্কোচ হয়। আমার সন্দেহের চেয়ে, তাঁহার ভাব-নিষ্ঠাকেই অধিকতর বিশ্বাস করিয়া লইলাম।"

একদিন কবি অরবিন্দকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ছন্দে নমস্কার নিবেদন করিয়াছিলেন, আজ নব যুগের আর এক মহাদীপ্তিকে কবি আপনার জ্যোতির পরিপূর্ণতার মধ্যে অভিনব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

সম্রাট ও প্রধান-মন্ত্রীর শুভেচ্ছা

এইবারে আসল বৈঠকের কথা। ১২ই নভেম্বর স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত থাকিয়া সভার উদ্বোধন করেন। যথারীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া সম্রাট উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্রাট বলিলে পুরাকালে যাহা বুঝাইত, ইংলণ্ডের সম্রাট বলিলে তাহা বুঝায় না। মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার মুখ দিয়া যাহা বলান, তিনি তাহাই বলেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি যাহা বলেন, তাহা শুনিতে বেশ মিষ্ট হইলেও, তাহাতে কাজের কথা কিছুই থাকে না। সম্রাটের বক্তৃতায় সেইজন্য "নব ইতিহাসের জন্মের" সুসংবাদ আছে, কিন্তু ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের নাম-গন্ধও নাই! অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় হয় ত এমন একটা কিছুর নাম-গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে, যাহাতে অন্ততঃ বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদের মুখরক্ষা হইবে। কিন্তু মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডও তাঁহার বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, অন্তরের ইচ্ছাকে গোপন করিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষা অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং কি ভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী, তা তিনি উদারনৈতিক দলের হউন, অথবা শ্রমিকদলের হউন, খুব ভাল করিয়াই জানেন। প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথার আভাস পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু, এই উপলক্ষে কংগ্রেস-আন্দোলনকে নিন্দা করিবার সুযোগ হারান নাই; এবং যাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহাদের "উন্নতির অগ্রনায়ক" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। প্রধান-মন্ত্রীর তক্তে বসিয়া আজ মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের এইরূপ কথাই বলা প্রয়োজন, তাই তিনি বলিয়াছেন—কারণ মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীই বড়। তাহা না হইলে তিনি হয় ত ভুলিয়া যাইতেন না যে, একদিন তিনিই প্রচার করিয়াছেন, "There could be co-operation only among equals and there could be no co-operation between a subject nation striving for freedom and those who resisted those efforts."—'সমান শক্তি-সম্পন্নদের মধ্যেই সহযোগিতা সম্ভব। যে পরাধীন জাতি স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং যে জাতি সেই প্রচেষ্টা দমন করিতে চাহিতেছে—তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা কখনই সম্ভব নয়।'

১৪টী সর্ত্তের টর্পেডো

১২ই তারিখের উদ্বোধন-কার্য্যের পর পুনরায় ১৭ই তারিখে বৈঠকের অধিবেশন বসে এবং উক্ত দিন হইতে পর্য্যায়ক্রমে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। যখন এই আলোচনা লিখিত হইতেছে, তখন পর্য্যন্ত আসল কার্য্যারম্ভ কিছুই হয় নাই বলিলেও হয়। ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে কি না—পাইলে সেই শাসনের কি রূপ হইবে, কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইবে—এই সমস্ত বিষয়, যাহার জন্য বৈঠকের অধিবেশন, তাহার কোনও আলোচনা এখনও হয় নাই। কয়েকটী কমিটী স্থাপিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের মিলিত আবেদন যাহাতে বৈঠকে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে; এবং আর একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটীশ-ভারতের সম্পর্ক এবং বৃটীশ-ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক বিবেচনার জন্য। প্রথমোক্ত কমিটীতে মিঃ জিন্নার ১৪টী সর্ত্ত টর্পেডোর মত মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে—এবং হিন্দু মুসলমানের মিলিত আবেদন হওয়ার সম্ভাবনা নাকি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের এ-পারে এত চেষ্টা সত্ত্বেও যাহাদের জোড় লাগিল না—সমুদ্রের ও-পারে গিয়া বিলাতের হাওয়ায় এমন কি আছে যে, তাহা জোড়া লাগিয়া যাইবে? লর্ড আরউইন এক-ধারে স্যার শফী, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মিঃ জিন্নাহ এবং আর এক দিকে ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ জয়াকর প্রভৃতিকে দাঁড় করাইয়া বিলাতের রঙ্গমঞ্চে হিন্দু-মুসলমান অসদ্ভাবের যে প্রহসন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে সফল হইতে চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ দেখুক, ইংরাজের কোনও অপরাধ নাই; হিন্দু ও মুসলমান কোনও বিষয়েই মিলিত হইতে পারিল না। কিন্তু বৃটীশের মন্ত্রণা-সভায় হিন্দু মুসলমান মিলিত না হইলেও, আজ বৃটীশের কারাগারে হিন্দু ও মুসলমান একই শৃঙ্খলে যে মিলিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ গোল-টেবিলের গণ্ডগোলের মধ্যে চাপা পড়া তো চাই! যুক্ত-রাষ্ট্র সম্পর্কিত-কমিটীতে ও-ধারে বর্ম্মাকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ সভায় যখন এই সমস্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য আসিবে, তখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে; কিন্তু কমিটীর এই ধরণের প্রস্তাব হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে!

"ওভার এ্যাক্‌টিং"

যাঁহারা থিয়েটার দেখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, 'ওভার-এ্যাকটিং' কাহাকে বলে। মাঝে মাঝে অভিনেতারা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটাইয়া মাত্রা ছাড়াইয়া যখন অভিনয় করেন এবং পদে-পদে তাল সামলাইতে গিয়া বেতাল হইয়া পড়েন, তখন তাহাকে 'ওভার এ্যাক্‌টিং' বলে। খুব করুণ দৃশ্য, কিম্বা কোনও বীরত্বের ব্যাপার ওভার-এ্যাক্‌টিংএর দরুণ হাস্যকর হইয়া যায়। গোল-টেবিল বৈঠকের অমন দামী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে নামিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিরা সকলেই উৎসাহের বশে একটু 'ওভার-এ্যাক্‌টিং' করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং তাহার ফলে ব্যাপারটা একটু হাস্যজনক হইয়া উঠিয়াছে। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ মওলানা মোহাম্মদ আলী সব চেয়ে বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং একান্ত বীর-রস পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতা সব চেয়ে হাস্যকর হইয়াছে। আর একটী ব্যাপার এই যে, ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, বেশ ভাল করিয়া কায়দা-মাফিক দুই চারিটী ইংরাজী ভাষা প্রয়োগ করিতে পারিলেই হয় ত প্রধান-মন্ত্রী বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য, অতএব, স্যার সপ্রু ও মিঃ জয়াকর জিন্নাও যখন বলিতেছেন, তখন ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হউক! সেইজন্য দেখি, বক্তৃতা দেওয়ার যত-প্রকার কায়দা আছে, ভারতীয় প্রতিনিধিগণ তাহার একটী নমুনা দিয়াছেন। মিঃ জিন্নাহ্ একজন প্রসিদ্ধ "ডিবেটর"। অন্যান্য উপনিবেশের মন্ত্রীগণের উপস্থিতির সুবিধা লইয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কায়দা করিয়া করিয়া বলিলেন, "বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আর একটী নূতন উপনিবেশের জন্ম দেখিবার জন্য আজ যে অন্যান্য উপনিবেশের মন্ত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা সত্যই আনন্দের ব্যাপার!" বক্তৃতার যে কায়দা এই উক্তিতে আছে, তাহার জন্য মিঃ জিন্নাহ্‌কে যথেষ্ট প্রশংসা করা যায়; কিন্তু অন্যান্য উপনিবেশের মন্ত্রীদের ভাগ্যে নূতন উপনিবেশের জন্ম দেখার সৌভাগ্য আছে কি না

জানি না; তবে আমাদের মনে হয় যে, তাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়া যাইতে পারিবেন, স্বায়ত্ত-শাসন-অধিকারের জন্য সহস্র সহস্র লোক যখন আত্মদান করিতেছে, তখন কতকগুলি মস্তিষ্কবিলাসী লোকদের দ্বারা উহা কিরূপ অনায়াসে পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—শত তিক্ত কথা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও মডারেট মডারেটই থাকিয়া যায়। এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, স্যার সপ্রু তাঁহার জীবনে এবং সম্প্রতি গোল-টেবিল বৈঠকে তাঁহার বক্তৃতায়। বর্ত্তমান বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য এবং সেই সঙ্গে বৃটীশ-শাসকদের মহানুভবতা ও সদাশয়তার প্রশংসায় স্যার সপ্রুর বক্তৃতা মডারেট মানসিকতার চমৎকার উদাহরণ হইয়াছে। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশবাসীরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। স্যার সপ্রু যখন জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বৈঠকে যোগদান করিতে পারিলেন, তখন কেহ যদি তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলে, তাহা উড়াইয়া দিবার মত শক্তি নিশ্চয়ই স্যার সপ্রুর আছে। মিঃ জয়াকর এবং স্যার শফী তাঁহাদের বক্তৃতায় ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে হয় যে, ভয় সব চেয়ে বেশী তাঁহারাই পাইয়াছেন। মিঃ জয়াকর বলিয়াছেন, "আমরা যদি শূন্য হাতে ফিরি, তাহা হইলে যে কি হইবে তাহা ভাবিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।" তবে আমাদের মনে হয় মিঃ জয়াকরের আশঙ্কা অমূলক। বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরাইবেন না মনে হয়, হাতে দুইটী নাড়ু অন্ততঃ দিয়া দিবেন। ও-ধারে বিলাতের রক্ষণশীল-দলের প্রতিনিধি লর্ড পীল স্পষ্টই শুনাইয়া দিয়াছেন—স্বায়ত্ত-শাসন বা ঔপনিবেশিক অধিকার কিছুই জুটিবে না। কংগ্রেসের লোকেরা বড়ই মন্দ প্রকৃতির। বৈঠকের ফলে যদি কিছু অধিকার ভারতবাসীর হস্তগত হয়, তাহা হইলে এই কংগ্রেসী দল সেইটুকু ক্ষমতা কাজে লাগাইয়া বৃটীশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদের আন্দোলন আরও তীব্র করিয়া তুলিবে। অতএব হে সাপ্রু, হে জয়াকর, সেটুকু ক্ষমতাও আমরা দিতে অনিচ্ছুক। আর এ ঝগড়াই বা কেন? ইংরাজও তো ভারতবাসী—ভারতবাসীদের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে বসবাস করার ফলে তাঁহারাও ভারতের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হইয়া উঠিয়াছেন।" লর্ড পীলের এই উক্তিতে হিন্দুশ্রেষ্ঠ ডাঃ মুঞ্জে উত্তেজিত হইয়া বলেন, "যে গরু দুধ দেয়, কৃষক স্বভাবতঃই তাহাকে ভালবাসে। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্কও ঠিক তাহাই।" ডাঃ মুঞ্জে সত্য কথাই বলিয়াছেন, তবে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—ইংরাজের হইয়া কোন গোয়ালা ভারত ধেনুকে দোহন করিয়া বিলাতী বাল্‌তীতেই দুধ ঢালিয়া দেয়? সব চেয়ে মজা করিয়াছেন কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আলী। যদি গোল-টেবিলের রঙ্গমঞ্চে তাঁহার এই বক্তৃতা না শুনিতাম—তাহা হইলে সত্যই মনে করিতাম "কমরেড"এর মোহাম্মদ আলী এখনও মরেন নাই। স্থান, কাল, পাত্র ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে ভুলিয়া গিয়া মোহাম্মদ আলী একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। শুনিতে বেশ ভাল লাগে—"আমি সেই একটী লোককে বিশ্বাস করি, যিনি এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন এবং যাঁহার নাম জর্জ্জ।" কিন্তু ইংলণ্ডের রাজশক্তির ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন, এ বিশ্বাস যতই গভীর হউক, তাহার পরিণাম কি! "স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার হাতে না লইয়া আর ক্রীতদাস-ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। আপনাদিগকে আমাকে এইখানেই কবর দিতে হইবে।" গ্রীক ওরেটারীর মত শোনায় বটে, কিন্তু সামান্য কল্পনার সাহায্যে যখন ভাবা যায় যে, আর সবার মত সমুদ্র যাত্রা সমাপন করিয়া মওলানা মোহাম্মদ আলী এই কৃতদাস-ভারতেই পুনরায় পদার্পণ করিয়া স্বাধীনতার আন্দোলনেরই প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন এই সমস্ত কথার অর্থ অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সভাপতির আসনে বসিয়া এই সমস্ত উচ্ছ্বাস, আবেদন, ভয়-প্রদর্শন, উষ্মা, সমস্তই শুনিলেন এবং প্রাথমিক অধিবেশনের শেষে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সকল আশা সংহার করিয়া যে উপ-সংহার বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কোথাও মনে হইল না যে, তিনি এই যে এতগুলি লোক এত কথা বলিল, তাহার কিছুতে কর্ণপাত করিয়াছেন। হঠাৎ শুনিলে ব্যথিত হইবে বলিয়া লোকে সাধারণতঃ কোনও বিশেষ দুঃসংবাদ যেমন করিয়া বলে, ঠিক তেমনি করিয়া মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছেন—

"আপনারা যখন দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন হয় ত আপনাদের দেশবাসীর উপেক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে; হয় ত আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিবে; যে কৃষ্ণ পতাকা আপনাদের বিদায়-অভিনন্দন দিয়াছিল, সেই কৃষ্ণ পতাকাই হয় ত আপনাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইবে!"

এই কৃষ্ণ-পতাকার আশ্বাস-বাণীর অন্তরালে যে না-বলা-কথার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে যে-কোনও লোকের বিশেষ বিলম্ব হইবে না। মিঃ কেলকার এখনও ফিরিয়া আসিব'র জন্য তাঁহাদের পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু সে আবেদন কে শুনিবে?

তাঁহাদের ভাগ্যকে স্মরণ করিয়া ব্রাউনিঙের অমর-কবিতা স্মরণে জাগিতেছে,—

"Blot out his name, then record
one lost soul more,
One task more declined, one
more footpath untrod,
One more devil's triumph and sorrow
for angels,
One more wrong to man, one
more insult to God!
Life's night begins; let him never
come back to us!
There would be doubt, hesitation,
and pain,
Forced praise on our part—the
glimmer of twilight,
Never confident morning again!"

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ—

এ বৎসর পদার্থ-বিদ্যার জন্য জগৎ-খ্যাত নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ভারতের কৃতি-সন্তান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ। এসিয়াবাসীর পক্ষ হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সম্মান সর্ব্ব প্রথম। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য এই ভারতবর্ষ হইতেই আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই সম্মানের অধিকারী হন। বহু-কালের এবং বহু-ভাবের অবিচ্ছিন্ন অবসাদ ও গ্লানির মধ্যে এইরূপ বিশ্বজয়ী প্রতিভার বিকাশ এই ভারতেই সম্ভব।

স্যার রমণ অসামান্য প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ত্রিচিনা-পল্লীতে স্যার রমণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে এফ, এ পরীক্ষা দেন এবং আঠারো বৎসরের মধ্যে তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ এবং এম-এ উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

যে আলোচনার হৃদয়-রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আজ বিশ্ববাসী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছে, শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমেই কিন্তু তাঁহাকে তাহার স্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে হয়। ভারত-সরকারের 'ফাইনান্সে'র দফতর-খানায় তাঁহার কর্ম্ম জীবনের সূচনা হয়; কিন্তু সেই কর্ম্মের অন্তরালেই তিনি আলোর আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠেন এবং আপনার একান্ত নিভৃতে আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা করিতে থাকেন। তাঁহার গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বাহির হওয়ায়, সেই সময় বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন সর্ব্বময় কর্ত্তা তীক্ষ্ণধী স্যার আশুতোষ সরকারী দফতরখানার মধ্যে এই প্রতিভাটীকে আচয়েই আবিষ্কার করিলেন এবং বৈজ্ঞানিককে সরকারী ফাইলের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া একেবারে বিজ্ঞানাগারে আনিয়া ফেলিলেন! সেইদিন হইতে অধ্যাপক রমণ আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণায় লিপ্ত আছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন আলোক-তত্ত্বকে তাঁহার নামানুসারে Roman Effect বলা হয়।

গত ২০শে নভেম্বর তিনি সুইডেন অভিমুখে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছেন। সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলম শহরে প্রথামত রাজসভায় নোবেল-পুরস্কার গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। সেখান হইতে তাঁহাকে বিখ্যাত হিউস্ মেডেলের সম্মান গ্রহণ করিবার জন্য ইংলণ্ডে আসিতে হইবে। স্যার রমণ নোবেল-প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান-

প্রতিষ্ঠান হইতে নানাবিধ উপাধি পান। ১৯২৪ সালে তিনি ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটীর সদস্য হন। "Indian Journal of Physics" তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্ত্তমানে তিনি উহার সম্পাদক। কলিকাতার বিখ্যাত বিজ্ঞানাগার" Association for the Cultivation of Science"এর তিনি বর্ত্তমান অবৈতনিক সেক্রেটারী।

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমণ

১৯২৮ সালে ভারতীয় সরকার তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। উক্ত বৎসর ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ম্যাতুইচি মেডেল দিয়া সম্মানিত করেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানে চারিটী বিরাটকায় প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একজন X-Rayর আবিষ্কারক ডাঃ রন্‌জেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রেডিয়াম আবিষ্কারক ফরাসী রমণী ম্যাদাম কুরী, তৃতীয় বেতার-আবিষ্কর্ত্তা সিনেটর মার্কনী, চতুর্থ বৈজ্ঞানিক দার্শনিকতার যুগান্তকারী আপেক্ষিক-তত্ত্বের জনক আইন্‌ষ্টাইন্‌। আজ এই সমস্ত যুগান্তকারী বিশ্বজয়ী প্রতিভার দলে হৃতসর্ব্বস্ব, মৃত গৌরব ভারতবর্ষ হইতে একজন যোগদান করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত মতিলাল—

একান্ত অসুস্থ হইয়া ভারত গৌরব পণ্ডিতজী বাঙ্গলার অতিথি হইয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে চিকিৎসাধীনে তিনি বন্ধুর গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

একদিন যে পরিবারের ঐশ্বর্য্য বিলাসের কাহিনী সারা ভারতে রূপকথার মত লোকে শুনিত আজ সেই পরিবারের নায়ক হইতে বধূ পর্য্যন্ত সকলে ব্রতধারী, পথচারী, সন্ন্যাসী। 'আনন্দ-ভবন'ও আজ জাতীয়-ভবনে পরিণত। পুত্র জওহরলাল দীর্ঘ দিনের জন্য কারাগারে। কন্যা, স্ত্রী, বধূ কারাবাসীর অসমাপ্ত কার্য্য সমাপন করিবার ভার লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিতজী স্বয়ং অত্যধিক শ্রমে কারাগারে কাল-ব্যাধি লইয়া মুক্তি-লাভ করিয়াছেন। প্রত্যহ তাঁহার মুখ হইতে রক্ত পড়িতেছে। রঞ্জন-রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন বিকোচন-শক্তি বিশেষ-ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারত আজ তাঁহার মঙ্গল-কামনায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য-সমীরে যে মহাপুরুষের স্মৃতি আজও গঙ্গার জলকণার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে যেন দক্ষিণেশ্বরের এই অতিথি অচিরেই নিরাময় হইয়া উঠেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—

শ্রীমান্ অমল হোম সম্পাদিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের ষষ্ঠ বার্ষিকী সংখ্যা দেখিয়া আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিবার কথা নয়। আজ ছয় বৎসর ধরিয়া শ্রীমান্ অতীব যোগ্যতার সহিত এই গেজেট সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন—গেজেটের যে কোনও সংখ্যা দেখিলেই তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। বিশেষ করিয়া গেজেটের বার্ষিক সংখ্যাগুলি সত্যই সম্পাদকের কৃতিত্বের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। নাগরিক ব্যাপার সম্বন্ধে নানা দেশ ও নানা লোক হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্পাদক কাগজটীকে একটা চরিত্র-গৌরব দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মুদ্রনের ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতে গেজেটের এই বার্ষিক সংখ্যা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, করপোরেশনের সমস্ত দলাদলির মধ্যে সম্পাদক অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত কাগজটীকে কলঙ্কের স্পর্শ-দোষ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা গেজেটের এবং গেজেট-সম্পাদকের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

—

কলিকাতার নূতন শেরিফ—

কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক, বিখ্যাত ঠাকুর-বংশের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার নূতন শেরিফ হইয়াছেন। আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে এক বৎসরের জন্য ইনি শেরিফের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক বৎসর-অন্তে কলিকাতায় পর্য্যায়ক্রমে একজন য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় শেরিফের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের মধ্যেই শেরিফের কার্য্যালয় এবং শেরিফকে তাঁহার কার্য্যালয়ের খরচ স্বয়ং বহন করিতে হয়। প্রফুল্লবাবু স্বনামখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের বিশিষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রফুল্লবাবু অন্যতম এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিভবের সহিত অন্তর-বিভবও বিজড়িত। তিনি স্বয়ং একজন সুরসিক ও সুপণ্ডিত এবং ললিত-কলার তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দুই বৎসর ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি প্রাচ্যকলা-সম্মতভাবে একটী ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

—

কলিকাতায় রোমহর্ষকর বিপ্লবী কাণ্ড—

গত ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১২॥টার সময় কলিকাতার মধ্যস্থলে লাটসাহেবের দফতরখানার ভিতরে এক ভয়াবহ বিপ্লবী কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। তিনজন বাঙ্গালী যুবক য়ুরোপীয় পোষাক পরিধান করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রবেশ করিয়া জেল বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল কর্ণেল সিম্‌সনের অফিসের দ্বারে উপস্থিত হয়। সাক্ষাৎ-কারের জন্য আরদালী যথারীতি যখন কাগজ দিতেছিল, তখন যুবাদের মধ্যে একজন আরদালীকে ঠেলিয়া দিয়া কর্ণেল সিম্‌সনের ঘরে প্রবেশ করে। কর্ণেল সিম্‌সন তখন একখানি চিঠি লিখিতেছিলেন, তাঁহার সহকারী মিঃ গুহও সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই আততায়ীরা গুলী ছুঁড়িতে থাকে এবং উপর্য্যুপরি আঘাতের ফলে কর্ণেল সিমসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর যুবকরা ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় অপর প্রান্তের দিকে গুলী ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চলিতে থাকে। আরদালীরা ভয়ে সকলে পলায়ন করে। গুলীর শব্দ শুনিয়া জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মি. জে. ডবলু. নেল্‌সন বাহির হইয়া আসেন; কিন্তু তিনিও আততায়ীদের দ্বারা আহত হন। সরকারের ফাইনান্স মেম্বর মিঃ মারকে লক্ষ্য করিয়াও গুলী ছোঁড়া হয়, কিন্তু গুলী তাঁহার গায়ে লাগে নাই। অতঃপর আততায়ীগণ আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেদের নিজরাই গুলী করে। একজন আততায়ী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপর দুইজন আত্মহত্যায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহাদের কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তবে তাহাদের অবস্থা নাকি অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। দুইটি যুবকের মধ্যে একজনের নাম বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া জানা গিয়াছে। এই ব্যক্তিকে লোম্যানের হত্যাকারী বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। মিঃ

নেল্‌সনের অবস্থা ভাল—আশা করা যায়, তিনি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া উঠিবেন। মিঃ সিম্‌সনের এই অকাল-মৃত্যুতে এবং এই উন্মাদ কাণ্ডে সকলেই মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইদানীং সংবাদাদি পাঠে মনে হয়, যে বিপ্লব আন্দোলন আবার যেন মাথা তুলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অহিংস-আন্দোলনের নেতাদের প্রভাব হইতে এই সময় জনসাধারণকে দূরে রাখা ভারত-সরকারের যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

—

ভারতে সমবায় আন্দোলন—

কিছু দিন পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং গবর্ণর মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিগত ২৬ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যে সমবায় আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে কোন কাজ হয় নাই; মোটের উপর ভারতবর্ষে এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। "নিখিল ভারত সমবায় সমিতির" সভাপতি সার লালুভাই শ্যামলদাস বিগত ১লা নবেম্বর তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলের সভায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কেবল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কথাই জানেন, দেশের সাধারণ অধিবাসীর কথা জানেন না, জানিলে তিনি কখনও এরূপ মন্তব্য করিতে পারিতেন না। সার লালুভাই মনে করেন যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেবল বড় বড় ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন; কিন্তু সমবায় আন্দোলন, দেশের প্রকৃত চাষী ও বিপন্ন অধিবাসীকেই অর্থ সাহায্য করে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের কাজ। পরিশেষে সার লালুভাই গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করেন যে, যেন কর্ত্তৃপক্ষ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলিকে সমানভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড তৃতীয় খণ্ড—২॥৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস 'নির্ব্বাসিতের নির্য্যাতন'—১৸৹

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত কাব্য 'আহরণী'—২৲

শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত উপন্যাস 'প্রাণের টানে'—১।৹

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন অনূদিত কাব্য 'মেঘদূত'—২৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'খেয়াল'—১।৹, 'বন্ধু আমার!'—১৲ 'কলিকাতায় চলাফেরা'—৸৹

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'লাইব্রেরী-আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার'—১।৹

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গীতিকাব্য 'অর্পণ'—১॥৹

শ্রীদুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় সাহেব প্রণীত 'ষটেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা'—১।৹

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত 'পথের ইঙ্গিত'—।৹

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী প্রণীত নাটিকা 'মিস্ কিরণবালা'—॥৹, 'প্রেমে পাঠ্য'—।৹

শ্রীভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত নাটক 'প্রতারিতা'—১।৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

প্রাচীন চিত্র হইতে

টিপু সুলতানের মৃত্যু

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৈয়দ সাদিগ আলি মিরজা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মাঘ—১৩৩৭

তীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বিশ্বদোল

অধ্যাপক—শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

আগেকার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যে বাধাতে জড়ের উদ্ভব, এবং যে বাধাতে জড়ের স্থিতি, সেই বাধাটা অতিক্রম করার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের ভিতরে রহিয়াছে। কেবল হিন্দুই যে বলেন এমন নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বলিবেন যে, ঐ পাথরটা চিরদিন পাথর হইয়াই ছিল না, এবং চিরদিন পাথর হইয়াই থাকিবে না। প্রাণি-জগতে যে ক্রম-বিকাশ আজ প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত, সে রকম ধারা একটা ক্রমবিকাশ বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল জড়ের রাজ্যেও মানিতে সুরু করিয়াছেন। এক জাতীয় এটম বদ্‌লাইয়া অন্য জাতীয় হইয়া যাইতেছে। সুতরাং ঐ পাথরটাও নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া পাথর হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আবার নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া আর কিছু হইবে। গোড়ায় কি ছিল, এবং শেষে কি হইবে—এটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক এখনও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। হিন্দুর দৃষ্টি এর ভিতরে আত্মারই লীলা, কর্ম্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টকেও দেখিয়া ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত ততদূর ফুটে নাই।

সে যাই হ'ক, তিনটি আসল কথায় বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের সায় দিতে আপত্তি হইবে না। প্রথম, বাধাই হইতেছে জড়-বস্তুর স্বরূপ, এবং বাধাতেই জড়-বস্তুর পরিচয়। দ্বিতীয়, জড় বস্তুর ভিতরে বাধা বা গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বড় হইবার একটা প্রেরণা দেওয়া রহিয়াছে। কিছুদিন আগে রেডিয়ামের আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা হয় ত এ কথাটা সাধারণ সত্য ভাবে লইতে রাজী হইতেন না। এখন তাঁরা দেখিতে পাইতেছেন যে, নিখিল-ভূতের অভ্যন্তরে কোন এক অনির্ব্বচনীয় কারণে ছোটখাট একটা বিপ্লব অহরহই চলিতেছে। সেই বিপ্লবে তার নিজস্ব বাধা বা গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; এক রকম বাধা বা গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য রকমের হইতেছে। ফল কথা, বাধা বা গণ্ডী ভাঙ্গনের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক্ সর্ব্বত্রই আছে। রাদারফোর্ড, সডি প্রমুখ এই বিপ্লবের অভিনব পুরাণ-কারেরা আমাদের বলিতেছেন যে, এ বিপ্লবটি স্বতঃ, অর্থাৎ ঘরোয়া কোন কারণে চলিতেছে; বাহিরের অবস্থাপুঞ্জ দ্বারা এ বিপ্লবের কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় যায় না। আমাদের "বেদ ও বিজ্ঞানে" এ কথাটাকে আমরা বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন, জড়ের ভিতরে এই যে গণ্ডী ভাঙ্গার স্বাভাবিক ঝোঁক্, সেইটাকেই আমরা আগে পাষাণ-কারাগারে শৃঙ্খলিতা অহল্যার আত্মার মুক্তি-ব্যাকুলতা বলিয়াছি। অভিশপ্তা অহল্যা যেমন-ধারা পাষাণময়ী হইয়া মুক্তির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, সুধু সে পাষাণ নয়, সৃষ্টির সকল পাষাণ বা সকল ভূতই তাদের পাষাণত্ব বা ভূতত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জড়-সমাধি করিয়া রহিয়াছে। আমরা যেটাকে একটা তুচ্ছ পাথর দেখিতেছি, আসলে সেটা ব্রহ্মের একটা জড়-সমাধির মূর্ত্তি। অতএব কথাটা দাঁড়াইল এই যে, জড় বাধা হইতেই জন্মিয়াছে, এবং বাধা দিয়াই বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু তার বাধা অতিক্রম করার একটা প্রচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক ঝোঁক্ অবশ্যই রহিয়াছে। এই যে বাধাকে ঠেলিয়া নিজেকে বড় এবং চরমে ভূমা করিয়া তোলার ঝোঁক্—সেইটাই হইল জড়ের ভিতরে ব্রহ্মের তপঃ বা তপস্যার মূর্ত্তি। সৃষ্টি করিতে গিয়া ব্রহ্ম তপস্যা করিলেন—এ তপস্যা যে কি রকম তপস্যা তা আমরা জড়ের পরীক্ষা করিয়াও কতকটা বুঝিতে পারিলাম। একটা বাধা বা গণ্ডী বস্তুকে খাটো করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। যে উপায়ে বা শক্তিতে সেই বাধা বা গণ্ডী ঠেলিয়া বস্তুটি নিজের সঙ্কোচ ও কার্পণ্য দূর করিতে পারে, ক্রমশঃ নানা অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়া শেষ কালে নিজেকে আবার ব্রহ্ম বা ভূমা ভাবে উপনীত করিতে পারে, সেই উপায় বা শক্তি হইতেছে তপঃ। আমরা দেখিলাম যে, জড়ের ভিতরেও এই তপঃ শক্তি রহিয়াছে, যদিও তাকে চিনিয়া ধরিয়া ফেলা শক্ত।

বৈজ্ঞানিক কথাগুলিকে এত বড় করিয়া লইতে আপাততঃ প্রস্তুত না হইলেও, তৃতীয় একটা কথায় সায় দিতে তিনি এখনিই প্রস্তুত হইয়াছেন। সে কথাটি হইতেছে এই—সকল বস্তুই, এমন কি জড়ও, একটা গণ্ডীর মধ্যে চিরকাল থাকিতে চাহে না; সুতরাং, জড়ের কোনো আয়তনই অচলায়তন নহে; এক আয়তন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তার স্থানে অপর আয়তন গড়িয়া উঠিতেছে। এ আয়তনটি যে আসলে ভোগ আয়তন, জড় যে আসলে আত্মা, বন্দী যে আসলে খোদ ব্রহ্ম—এইটা বুঝিলে একেলে বৈজ্ঞানিক এবং সেকেলে ঋষিতে আর কোন তফাৎ রহিবে না। সে মিলের যতই দেরি থাকুক না কেন, জড়ের ভিতরে তপস্যার যে মূর্ত্তি আমরা ঋষিদের দৃষ্টিতে দেখিলাম, সে মূর্ত্তি যে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সম্প্রতি প্রকট হইয়া উঠিতেছে—এ কথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হইবে কি?

জড়ের মধ্যে তপস্যার মূর্ত্তি অস্পষ্ট, ভাল করিয়া খেয়াল করিয়া না দেখিলে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে আসিয়া এ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। জড়ের বেলা যত লম্বা আলোচনা আমরা করিলাম, প্রাণের বেলা তত লম্বা আলোচনা করার দরকার হইবে না। একটুখানি তাকাইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে নিজেকে সকল গণ্ডী ও বাধার বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়া। একটা বটের বীজ কত ছোট! সেই ছোট বীজের ভিতরে একটা সত্তা-শক্তি কিসের যেন চাপনে খুব ছোট ও সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতেছে। একটা বড় স্প্রীং যেমন-ধারা চাপে ছোট হইয়া থাকে, তেমনি। কিন্তু সে চাপের ভিতরে থাকিয়া সে ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই! একটু অনুকূল অবস্থা পাইলেই, সে বীজের ভিতরকার সত্তা-শক্তি নিজের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া নিজেকে বড় করিতে চায়; বীজ

হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে চারা গাছ, চারা গাছ হইতে ক্রমশঃ বড় গাছ, শেষ কালে হয় ত এমন একটা অতিকায় বৃক্ষ হইয়া বসে, যে বৃক্ষ এক বিঘা জমিতে হাত পা ছড়াইয়াও যেন স্বস্তি বোধ করে না। গোড়াকার সেই চাপ যেন সে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিতেছে, এবং চাপটি যত সরিয়া যাইতেছে সে ততই বড় হইতেছে। গোড়াকার সেই চাপে কায়েমি বন্দোবস্তে থাকিতে সে যেন নারাজ। বীজের মধ্যে এই যে বাধা, গণ্ডী, চাপ ঠেলিয়া দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা রহিয়াছে, সে প্রেরণাটি খুবই সুস্পষ্ট; কেহই সেটিকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মাটি পাথরের বেলা আমাদের মনে যে খট্‌কা ও অনাস্থা হইয়াছিল, এখানে সে সবের কোন আশঙ্কা নাই। হিন্দুর দৃষ্টিতে ঐ বীজের দেহ একটা ভোগ-আয়তন, আর ঐ মহামহীরুহের দেহও একটা ভোগ-আয়তন। ভোগের যখন যেরূপ অধিকার, তখন সেরূপ আয়তন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মই এই সব বিচিত্র আয়তনের ভিতর দিয়া ভোগ করিতেছেন। তিনিই ঋতভুক্। সুধু ভোগ নয়, তপস্যা করিতেছেন।

যেথানেই দেখি একটা চাপ বা বাধা কোন জিনিষকে সঙ্কুচিত ও কৃপণ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই বস্তুটি সেই চাপ বা বাধার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া করিয়া সেটিকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিতেছে, সুতরাং নিজেও আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইতেছে, সেইখানেই আমরা বলিব যে, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যা বা "যোগ" আছে। বটের বীজকে বটগাছ হইতে গেলে তপস্যা করিতে হয় - কেন না, একটা স্বাভাবিক চাপ বা বাধাকে আর একটা স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারা জয় করিয়া, অপসারিত করিতে হয়। ইহাই হইল তপস্যার লক্ষণ। যেথানেই একটা সঙ্কোচের অবস্থা হইতে বিকাশ বা অভ্যুদয়ের অবস্থার দিকে ধীরে ধীরে বস্তু অগ্রসর হইতেছে, সেইখানেই তপস্যা হইতেছে। বস্তুটি নিজে জ্ঞাতসারেই করুক, আর অজ্ঞাতসারেই করুক, তপস্যা সে করিতেছে। ব্রহ্ম সৃষ্টির মুখে কি যেন একটা চাপ বা বাধা দূর করিয়া দেন, তার ফলে এই মহাবটের আদি বীজটা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে; এই বিরাট্ যন্ত্রের মেইন স্প্রীংটা হইতে যেই চাপ সরাইয়া লন, আর যন্ত্রটা নিজের বিরাট্ আকার পাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। আমরা এতক্ষণ ধরিয়া তপস্যার যে লক্ষণ আন্দাজ করিয়াছি, সে লক্ষণ-মত ব্রহ্মের বা সৃষ্টির কর্তার এই প্রথম কাণ্ডটিও তপস্যা।

বটের বীজের দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা প্রাণীর জগতে সনাতন তপস্যা-চিত্রটি বুঝিতে চাহিলাম। তাকাইয়া দেখিলে সে চিত্র আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যে বিন্দু হইতে আমাদের উৎপত্তি এবং আর আর সব জীবের উৎপত্তি, সে বিন্দুর মধ্যেও ঐ তপস্যা। আমাদের দেহের ভিতরে ঐ বিন্দু কত সূক্ষ্ম আকারে বিরাজ করিতেছে! অথচ তার সেই সূক্ষ্ম সত্তার ভিতরে লক্ষ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণকারী অনন্ত-বাসনা-সংস্কার-সহকৃত একটি জীবের আত্মা বাস করিতেছে। নারীর জরায়ুতে সেই বিন্দু সিঞ্চিত হইলে, তখন সেই বিন্দুর অভ্যন্তরশায়ী আত্মা এক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেন। মোটামুটি দশ মাস দশ দিনে সে তপস্যা সাঙ্গ হয়। সে তপস্যাটি আসলে কি? যে চাপ বা বাধা বা গণ্ডী সে আত্মাকে একটা বিন্দুর ভিতরে পুরিয়া ছোট এতটুকু করিয়া রাখিয়াছে, সেই চাপ, বাধা বা গণ্ডী আস্তে আস্তে সরাইয়া দেওয়া। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ তপস্যা আর একটুখানি বড় করিয়া করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভে সেই বিন্দুর ভিতর হইতে একটা শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর শিশুর চেতনা শুধু যে ঐ দশ মাস দশ দিনে ফুটিয়া উঠে এমন নয়, যত দিন শিশু জরায়ু মধ্যে বাস করে, তত দিন না কি সে তার সব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথাও মনে করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে আমাদের যে স্বাভাবিক ভুলিয়া যাওয়া রূপ একটা গণ্ডী আছে, সে গণ্ডী তত দিন তার থাকে না। গর্ভস্থ শিশু তাই একটুখানি অসাধারণ গোছের তপস্বী। আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞান কথাটা অন্য আকারে বলেন—গর্ভের ভ্রূণ তার জাতির অতীত ক্রম-বিকাশের বড় বড় পার্টগুলির রিহার্শল দিয়া থাকে।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীব-কোষের ভিতরে একটা তপস্যা অহরহঃ চলিতেছে। সেই তপস্যার ফলে জীব-কোষের পুষ্টি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। জীবকোষের দেহে একটা কেন্দ্র থাকে, যে কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ব্যাপার চলিয়া থাকে। সেই কেন্দ্রই হইতেছে জীবকোষের শক্তিকেন্দ্র। জীবকোষের তপঃ-

শক্তি এই শক্তিকেন্দ্র হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে। জলে একটা জীবকোষ ভাসিতেছে। পরীক্ষা করিয়া জানিলে দেখিতে পাইব যে, সে জীবকোষটি সুস্থির হইয়া নাই—তার ভিতরে একটা চাঞ্চল্য সজাগ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে নিয়ত আহার চেষ্টা করিতে হইতেছে, আহার পাইয়া তার পুষ্টি হইতেছে; পুষ্ট হইয়া এক সে দুই হইয়া যাইতেছে, দুই চারি হইতেছে—এই ভাবে এক হইতে বহু উৎপন্ন হইতেছে। সে বহুও আবার সব সময় যে আলাদা হইয়া থাকে এমন নয়; তারা দল বাঁধিয়া এক একটা কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করে। এই রকমই একটা সূক্ষ্ম বটের বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড বড় একটা বটগাছ জন্মিয়া থাকে: মাতৃগর্ভে একটা সূক্ষ্ম বিন্দুকণা হইতে কালে হাতীর মত অথবা তিমি মাছের মত একটা বিশালকায় জন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে শক্তি-প্রভাবে এই আশ্চর্য্য ঘটনাটি নিয়ত ঘটিতেছে, সে শক্তিটি তপঃশক্তি। এ তপঃশক্তি নহিলে সৃষ্টি ও বিকাশ হয় না।

অবশ্য প্রতি জীবকোষের ভিতরে এর বিরোধী একটা শক্তিও রহিয়াছে। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, সে শক্তিটি হইতেছে শ্রম অথবা মৃত্যু। এই শ্রম বা মৃত্যু সৃষ্টি ও বিকাশে বাধা দিয়া থাকে; বস্তুর সত্তাকে সঙ্কুচিত ও মূচ্ছিত করিয়া রাখে। এই শ্রম বা মৃত্যুই হইতেছে তপস্যার অন্তরায়। এই মৃত্যুর কথা আমরা কিছু পরে আবার আলোচনা করিব। প্রত্যেক জীবকোষের জীবন-ব্যাপারে এই দুইটি বিরোধী শক্তিকে আমরা অহরহঃ দেখিতে পাই। একটি শক্তি হইতেছে ইন্দ্র, অপরটি হইতেছে বৃত্র বা অহি; একটি হইতেছে অগ্নি, অপরটি হইতেছে সলিল বা অপ্। এ কথাও আমরা পরে ভাঙ্গিয়া বলিব। জড়ের কথা আমরা আগেই সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও এই দুইটা বিরোধী শক্তি—ইন্দ্র, ও বৃত্র—বিদ্যমান রহিয়াছে। বজ্রের কথায় এ দু'য়ের পরিচয় আমরা আগেই ভাল করিয়া লইয়াছি। জড়ের মধ্যে চাপ ও বাধা দিবার যেমন একটা স্বাভাবিক বন্দোবস্ত আছে, তেমনি আমরা দেখিয়াছি যে, সে চাপ ও বাধাটিকে ঠেলিয়া সরাইবারও একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের মধ্যে আছে। দ্বিতীয়টিকে আমরা জড়ের তপঃশক্তি বলিয়াছি; প্রথমটিকে আমরা জড়ের শ্রম, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু বলিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরাও এই শেষেরটিকে জড়ের জড়ত্ব (Inertia) বলেন। আমাদের পরিভাষা মত এই Inertia হইতেছে এ ক্ষেত্রে বৃত্র বা অহি।

আমাদের অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়াও আমরা এই দুইটি বিরোধী শক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমাদের ভিতরে যখন অবসাদ, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মূর্চ্ছা, মোহ, জড়তা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বুঝিতে হইবে আমরা বৃত্র বা অহির এলেকায় রহিয়াছি, যে বৃত্রের নাম শাস্ত্র দিয়াছেন তমঃ। সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে আমাদের চিত্তের তিন রকম অবস্থার কথা বলা হয়—শান্ত, ঘোর, মূঢ়। এখন চিত্তের এই মূঢ় অবস্থা তপঃশক্তির বিরোধী একটা অবস্থা; অর্থাৎ, এই মূঢ় অবস্থা দেখিলেই আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমাদের স্বাভাবিক তপঃশক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে। এই মূঢ় অবস্থা হইতে আমাদের চিত্ত যখন জাগিয়া উঠে ও প্রস্ফুটিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের স্বভাবিক তপঃশক্তি আবার সবল হইয়াছে। এইভাবে দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের নিত্য জীবনে সদাই চলিতেছে। একবার দেবতাদের জয়, অসুরদের পরাজয়, আর একবার অসুরদের জয়, দেবতাদের পরাজয়। এ হার-জিতের মামলার চরম নিষ্পত্তি যে কবে হইবে, তা আমরা জানি না; কিন্তু উপায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া এর নিষ্পত্তির পথ অনেকটা সুগম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই উপায়-বিশেষই হইতেছে মানুষের ধর্ম্মসাধন।

আমরা জড়ে, প্রাণে ও অন্তঃকরণে তপস্যার মূর্ত্তি মোটামুটি একরকম দেখিয়া লইলাম। যেটি তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতেছে, সেটির চেহারাও আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। এখন তপঃ এই কথাটার প্রচলিত মানেটা আমাদের একটুখানি বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তপ্ ধাতু হইতে তপঃ ও তপস্যা এ দুইটি কথা হইয়াছে। তপঃ ও তাপ মূলে একই কথা। তাপ বলিতে আমরা সচরাচর বুঝি তেজঃ বা অগ্নি; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Heat। এই অগ্নি বা হিট্ যে নিখিল ভূতে বিদ্যমান, সে কথা শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে আমাদের বারবার শুনাইয়াছেন। আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায়, এবং "বেদ ও বিজ্ঞানে" অগ্নির এই সর্ব্বব্যাপিত্বের কৈফিয়ৎ ও নজির দুই-ই দাখিল করিয়াছি। এখানে সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন অগ্নি বা হিটের একটা সাধারণ কর্ম্ম হইতেছে দ্রব্যের আয়তন বড় করিয়া দেওয়া, বস্তুকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া—Heat expands bodies। শৈত্য (Cold)এর বিপরীত কার্য্যটি করিয়া থাকে; দ্রব্যের আয়তন ছোট করিয়া দেয়—Cold contracts bodies। এ প্রাকৃতিক সত্য দুইটির দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অগ্নি বা তেজ, বস্তুর ভিতরে থাকিয়া বস্তুকে বড় করিয়া রাখে; এইজন্য সেই তাপকে আমরা তপঃ বলিতেছি। শৈত্য বস্তুকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে; এই জন্য শৈত্যকে আমরা তপের বিরোধী অবস্থা বলিতেছি। বস্তুর ভিতরে তাপ রহিয়াছে বলিয়া সে সজাগ হইয়া রহিয়াছে, এবং তার সকল প্রকার ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে। তাপ না থাকিলে বস্তু একেবারে যেন মরিয়া রহিত, তার কোনরূপ চেষ্টা, কোনরূপ ব্যাপার সম্ভবপর হইত না। তাপ অবশ্য একটা আপেক্ষিক ধর্ম্ম; "ক" "খয়ে"র তুলনায় গরম, আবার গ-এর তুলনায় ঠাণ্ডা। কিন্তু তা হইলেও, প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে দানাগুলির দোলা-কাঁপা নিত্যই চলিতেছে; এ দোলযাত্রার আদিও নাই অন্তও নাই; যদি বা থাকে, আমরা তার কোনই খবর রাখি না। এখন এই নিত্য দোল জাগাইয়া রাখিয়াছে কিসে? ঐ অগ্নি বা তাপ, যার কথা আমরা বলিতেছি।

এই নিত্যদোল আবার একঘেয়ে হইলে লীলাময়ের লীলা চলে না; এই জন্য এ দোলে রকমারি হইয়াছে। আমরা দেবদোল ও নরদোলের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু জানি না যে, এই মহাব্রজে প্রত্যেক রজঃ আপন ভাবে, আপন লীলায় এই নিত্যদোল খেলিয়া যাইতেছে। এই নিত্যদোল বিশ্বদোল। এই বিশ্বদোলে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বিশ্বের যত খেলা চলিতেছে; দোল না থাকিলে অথবা দোল একঘেয়ে হইলে, এ সকল খেলা কিছুই থাকিত না। জড়ের তরফ হইতে বৈজ্ঞানিক এ কথা খুবই মানিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন যে, দ্রব্যে তাপ আছে বলিয়াই সেটি দ্রব্য হইয়া রহিয়াছে; আরও বলেন যে, একটা দ্রব্য ও অপর একটা দ্রব্য এ দু'য়ের মধ্যে তাপের তফাৎ আছে বলিয়াই, দ্রব্যে দ্রব্যে দোলের নিত্য হোলি খেলা চলিতেছে; তাপ না থাকিলে অথবা তাপের বৈষম্য না থাকিলে, এ সব খেলা একেবারে থামিয়া যাইত। জড়-জগতে তাপের সাম্য (Equilibrium) নাই বলিয়াই জড়-জগতে সকল রকম গতি ও ক্রিয়া চলিতেছে। সাম্য যদি কোন রকমে হইয়া পড়ে, তবে সে অবস্থায় কোন দ্রব্য যদি থাকে, তবে সে স্থাণু হইয়া যাইবে; তার কোন গতি এবং কোন ক্রিয়া থাকিবে না। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগতের সকল গরম জিনিষই নিজেদের তাপ চারিধারে বিলাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে চাহিতেছে। সকল জিনিষের তাপ সমান হউক, এটার তাপে এবং ওটার তাপে কোন তফাৎ না থাকুক,—এই রকম একটা অবস্থার দিকে ক্রমশঃ যেন এই জগৎটা হাঁটিয়া চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহাকে বলে—Mobile Equilibrium of Temperature। সব জিনিষেরই তাপ এক রকম হবার দিকে একটা ঝোঁক্ রহিয়াছে। এখন বিশ্বের তাপ বা দোল যদি একঘেয়ে হইয়া যায়, তবে বিশ্ব অচল হইবে। এই অচল হবার দিকে, অর্থাৎ প্রলয়ের দিকে, বিশ্বের একটা ঝোঁক রহিয়াছে, এ কথা বৈজ্ঞানিকও এখন মানিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিশ্বের সেই অচল অবস্থাই হইতেছে শ্রম বা মৃত্যু। বিশ্ব আবহমান কাল হইতে অগ্নি বা তাপরূপে নিজের তপঃশক্তি বহাল রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া, এখনও টিকিয়া আছে। এ বিরোধী শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে যে কাজ করিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। যেখানেই তপঃশক্তি কাজ করে, সেখানেই, সবল ভাবেই হউক আর দুর্ব্বল ভাবেই হউক, তার বিরোধী শক্তিটিও কাজ করিয়া থাকে। যেখানে অগ্নি আছেন, সেখানে সলিলও আছেন; যেখানে ইন্দ্র আছেন, সেখানে বৃত্রও আছেন। একই অখণ্ড অব্যক্ত অবস্থা হইতে এই বিরোধী শক্তি দুইটার উদ্ভব। বেদ তাই ইন্দ্র ও বৃত্র এ দু'জনকে কোন কোন স্থানে "সহোদর" করিয়াছেন। দুয়ের আদি হইতেছে একটা বিরাট্ অব্যক্ত অবস্থা, যা হইতে শক্তির ঐ দুইটি বিরোধী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বলা বাহুল্য যে, সকল দ্বৈত বা বিরোধের মূলে একটা অদ্বৈত অব্যক্ত অবস্থা থাকে, যেমন আমাদের সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ। এগুলি সব পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু প্রত্যেক বিরোধটির মূলে একটা করিয়া অদ্বৈত অব্যক্ত অবস্থা আছে। ঠিক সুখও নয়, অথবা ঠিক দুঃখও নয়, এমন একটা অবস্থা হইতে

আমাদের সকল সুখ দুঃখের অনুভব ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার তাতেই গিয়া লয় পাইতেছে; ঠিক জ্ঞানও নয় অথবা ঠিক অজ্ঞানও নয়, এমন একটা অবস্থা আমরা চিন্তা করিতে পারি না কিম্বা বলিতে কহিতে পারি না বটে, কিন্তু আছে, এবং সকল জানা-অজানার আশ্রয় ও নিলয় হইয়া আছে। এই রকম ধারা, আমাদের রাগ দ্বেষের মূলেও একটা অব্যক্ত অবস্থা আছে, যে অবস্থাকে কেহ কেহ উদাসীন অবস্থা বলেন, কিন্তু যে অবস্থা বলিয়া কহিয়া বুঝান যায় না। ইন্দ্র ও বৃত্র যে এক অব্যক্ত অবস্থার গর্ভে জন্মিয়াছেন এবং এখন জন্মিতেছেন, সেই অবস্থাটিকে লক্ষ্য করাই বোধ হয় শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই যাই হ'ক্, বিশ্বের সর্ব্বত্র তপঃশক্তি এবং তার বিরোধী শক্তিটির চেহারা আমরা যেন দেখিলে চিনিতে পারি। সে চেহারা ফুটিয়াছে অনেক রকমে, কিন্তু আসলে সেটি একই রকম।

কেবল মাত্র যে জড়ে তপঃ তাপরূপে বিরাজ করিতেছেন এমন নয়, প্রাণে এবং অন্তঃকরণেও তিনি ঐ রকম একটা কিছু হইয়া বিরাজ করিতেছেন; না করিলে প্রাণের রাজ্যে ও মনের রাজ্যেও এই নিত্য-দোল ও হোলি বন্ধ হইয়া যাইত। দোল ও হোলি এ দুইটিকে আলাদা করিয়া বলার হেতু আছে। কোন জিনিষে তাপ থাকিলে, তার দানাগুলি দোলে; দোলে বলিয়াই সেটার তাপ আমরা বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিকের কথায়— Heat is a mode of motion। জীবকোষের ভিতরে তাপ অথবা তাপের মত একটা কিছু, রহিয়াছে বলিয়াই, তার দানাগুলি নিয়ত দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, সজীব ও সজাগ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনেও তাপ বা তাপের মত একটা কিছু আছে বলিয়াই আমাদের মন মনন করিতেছে,—ঘুমাইয়া বা মরিয়া নাই। জড়, প্রাণ ও মনের এই যে সজাগ ও সক্রিয় ভাব, যে ভাবের বিরাম যতদিন সৃষ্টি ততদিন নাই, সেই ভাবটিকে আমরা বলিতেছি "দোল"। আমরা আগেই সংবাদ লইয়াছি যে, ভিতরে রস বা আনন্দ আছে বলিয়াই এই নিত্য দোললীলা চলিতেছে; এমন কি জড়ের বেলাতেও তাই। কিন্তু বিশ্বের সকল অধিবাসী কেবল যে এই ভাবে সজাগ রহিয়াছে এমন নয়,— পরস্পরের সঙ্গে ভাবের, বেদনার ও কাজের কারবার করিতেছে; শুধু জাগিয়া নাই, সকলে মিলিয়া খেলিতেছে। এই খেলাটা হইতেছে হোলি খেলা; যেমন তাদের জাগিয়া থাকা হইতেছে দোললীলা। দোল ও হোলি এ দুইটিকে আলাদা করিয়া বলার হেতু আমাদের এই।

এখন প্রাণিজগতে এমন একটা সময় আসে, যখন নিখিল প্রাণের ভিতরের শৈত্য অবসাদ যেন দূর হইয়া যায়, এবং ভিতর হইতে কি যেন একটা অব্যক্ত উষ্মা বা তাপ যেন তাহাকে সজাগ ও চঞ্চল করিয়া তোলে। সেই সময় সকল প্রাণীর ভিতরে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়, একটা বিকাশের ব্যাকুলতা গুমরিয়া উঠে। সেই কাল বিশেষ ভাবে দোলযাত্রার কাল। সে দোলযাত্রায় জাগিয়া ও চঞ্চল হইয়া বিশ্বপ্রাণী যে উৎসবে মাতিয়া উঠে, সেই উৎসরের নাম বসন্ত-উৎসব বা মদনোৎসব। সে উৎসব, যে খেলার ভিতর দিয়া নিজেকে জানাইতে চায়, সেই খেলাটি হইতেছে হোলি খেলা। নিত্য দোল ও নিত্য হোলি-খেলা ত আছেই; তার কথা আমরা আগে বলিয়াছি। এ যেন প্রকৃতির আসরে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত। বসন্ত বাসরে প্রকৃতির এই আসর পাতা হইয়া থাকে। তখন ঝরা পাতার নগ্নতার ভিতর হইতে গাছপালা আবার নূতন পাতা মুকুল ও ফলফুলে নবীন হইয়া উঠে; সকল রিক্ত ও পুরাতন আবার যেন পূর্ণ ও তরুণ হইয়া উঠে; ছোট একটি ঘাসও এ মহোৎসবের নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে না। পশু, পক্ষী, মানুষ—এদেরও অন্তরের বীণাটিও বিশ্ব-প্রাণীর এই যৌবনের সঞ্চারের সুরে সুর মিলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রকৃতিতে এই যে বসন্তোৎসব, এটিকে তপঃ বা তপস্যা বলিলে অনেকে হয় ত রাগ করিবেন; কেন না তাদের ধারণায় তপঃ একটা কৃচ্ছ্র-সাধন, নিজের উপর একটা জবরদস্তি করা। আমরা কিন্তু তপস্যার লক্ষণ এ ভাবে করি নাই। এ ভাবে করিলে সৃষ্টি, বিকাশ, এবং সকল খেলার ভিতরে আমরা তপস্যাকে দেখিতে পাইতাম না; এবং বুঝিতে পারিতাম না, কেন ও কি করিয়া প্রজাপতির সৃষ্টি ব্যাপারটিকে একটা তপঃ—বা তপস্যা ভাবা যাইতে পারে। আমরা নিখিল বস্তুতে তপঃকে যে চেহারায় দেখিতে পাইয়াছি, সে চেহারা কেবল মাত্র যে একটা ঊর্দ্ধবাহু অথবা বল্মীকে

পরিণত কোন এক "তপস্বীর" চেহারা এমন নয়। সে চেহারা হইতেছে সৃষ্টির ও বিকাশের চেহারা, সকল বাধা ও গণ্ডী ঠেলিয়া সরাইবার চেহারা। যে বস্তুটি নিখিল পদার্থে এই চেহারা ধরিয়া রহিয়াছে, তার আসল নাম রস বা আনন্দ। আমরা কখনও সেটিকে ইন্দ্র বলিয়া থাকি, কখনও বা অগ্নি বলিয়া থাকি, কখনও বা আর কিছু বলিয়া থাকি। নাম যাহাই হ'ক বস্তু বা তত্ত্ব এক। তাপের বিরোধী বা অন্তরায় একটা কিছুও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সে একটা কিছুর নাম কখনও বা দিই রাত্রি, কখনও বা দিই মৃত্যু, কখনও বা দিই সলিল. কখনও বা দিই বৃত্র বা অহি, কখনও বা দিই মধু-কৈটভ। নাম তার আলাদা আলাদা, কিন্তু বস্তু এক। ভোল ফিরাইয়া সেই আবার সংবর্ত্তাসুর, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি আকারে বৃন্দাবনের রাসলীলায় বিঘ্ন ঘটাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু বিঘ্ন হয় নাই। কেন না, স্বয়ং রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সে লীলার মূল তদ্বিরকারক। যে শক্তিতে সেই সকল রাস-বিঘ্ন দূর হইয়াছিল, সেই শক্তি আমাদের ঐ পরিচিত তপঃশক্তি—যে শক্তিতে এই সৃষ্টির লীলা চলিয়াছিল ও চলিতেছে।

অশ্রু-ভরা জীবনের পরে

শ্রীসুলতা চক্রবর্ত্তী

অশ্রু ভরা জীবনের পরে
মৃত্যু আসি' তুলি নেবে সব ব্যথা মোর
শান্তি দান তরে
অশ্রু-ভরা জীবনের পরে।

সে দিন একাকী নিশি জাগি' কার লাগি'
রহিব না বসি,
জীবনের সব আশা মায়াবীর সব খেলা,
একে একে নাশি,'
মৃত্যু সেথা আনি দিবে বিস্মৃতির মাঝে
দীপ্ত সুখ মোরে
অশ্রু ভরা জীবনের পরে।

তখনো আমার দ্বারে, তুমি যদি বারে বারে
আসিয়া দাঁড়াও
অনুতাপে চিত্ত ভরি' মোর গাঁথা মালা পরি'
হাতটি বাড়াও
সেদিন জীবন-শেষে
প্রাণের দেবতা মোর, নিশি কেঁদে হ'বে ভোর
ফিরে যাবে দ্বারে এসে।

নবীন বসন্ত যদি কাঁদায় তোমার হৃদি
ব্যাথা দিয়ে যায়,
ভাবিয়া আমার স্মৃতি রচ যদি দুখ-গীতি
গাহ যদি তায়
তোমার সঙ্গীত-ধ্বনি গগনে উঠিবে রণি'
বৃথা শুনাবার আশে
সে দিন জীবন-শেষে।

তোমার নয়ন-জলে আঁখি যদি প্রতি পলে
সিক্ত হ'য়ে আসে,
একবার ভেব মনে নীরবে আরেক জনে
কেঁদেছে কিসের আশে
সে দিন জীবন শেষে।

অশ্রু-ভরা জীবনের পরে
কেন মিছে এলে তুমি কাঁদিতে আপনি
মালা লয়ে করে?
আজি তুমি যেও ভুলে
আমিও তোমার দ্বারে
গিয়েছিনু রিক্ত করি' মোরে
ভুলে যেও ঘৃণা, ভরে তুমি গিয়েছিলে দ্বারে-
ছিঁড়েছিলে মোর প্রেম-ডোরে
ভুলে যেও সব কথা মিলনের আকুলতা
ভুলে যেও মোরে
অশ্রু-ভরা জীবনের পরে॥

রক্তের টান

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলার হাত হইতে পাঁচশো টাকার তোড়াটি হিরণ যেদিন পাইল, সেইদিনই জ্যেষ্ঠকে আসিবার জন্য আর একখানি চিঠি খুব অনুনয় করিয়াই সে লিখিল; এবং তাহার মাসীমাতার শ্রাদ্ধে যে টাকাটা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও সে জানাইল। কিরণের কাছে গ্রামের অনেকেই এ সংবাদ পাইলেন। এতটা টাকা ব্যয় হইতেছে দেখিয়া কিরণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিনা-খরচায় কলিকাতাটা দেখিয়া আসাও চলিবে—মন্দ কি! গুরু পুরোহিত এবং বাছা-বাছা মাতব্বর গোচের কতগুলি লোকও কিরণের সহিত যাত্রা করিলেন।

কোন্ দিন ছুটি পাইবেন পূর্ব্বে জানিতে না পারায় কিরণ পূর্ব্বে ইঁহাদের খবর দিতে পারেন নাই। হঠাৎ তিনি একদিন সকালে দলবল লইয়া হিরণের বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সকলকে নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিয়া সরাসরি উপরে উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু বাহিরের বারাণ্ডায় পা দিতেই হঠাৎ কমলাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন। ডান হাতের যে ঘরের দরজাটা কাছেই খোলা ছিল, সেই ঘরে দৃষ্টি পড়িতে সেখানে হরসুন্দরীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। চৌকাট ধরিয়া তিনি হাঁক ছাড়িয়া বলিলেন, "মা! দেশ থেকে এঁরা সব এসেছেন যে!"

সে স্বর যেমন তিক্ত, কমলার উপর কটাক্ষটাও তেমনি বিষাক্ত।

স্বামীর এই উৎকণ্ঠার ভাব লক্ষ্য করিয়া, ইহার পর যে সকল বিশ্রী আলোচনা পর পর উঠিবে, কমলার কাছে তার সমস্তটাই যেন ঐ এক কটাক্ষের দ্বারাই বলা হইয়া গেছে। কিন্তু আরও দুই একটি কথা সঙ্গে সঙ্গেই উঠিল। কমলাকেও শুনিতে হইল।

হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা — কারা?"

"গুরুদেব এসেছেন—পুরোহিত ঠাকুর—কাকামশায়—গ্রামের আরও অনেকে এসেছেন। হিরণ কিছুমাত্র জানায়নি—এখন কি করি বল ত?"

কমলার কাণে গেল বলিয়া শুনা—নতুবা এটুকুও শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বামীর প্রথমবারের স্তম্ভিত দৃষ্টি হইতেই সকল কথা জানা গিয়াছিল। সে পাশের ঘরে যাইয়া দেখিল অধীর ও সুধীর বই দপ্তর মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়া-শুনায় খুব ব্যস্ত। গোপাল তখনও উঠে নাই—মাতার সঙ্গে নিদ্রা যাইতেছে। নরেশ সকালে উঠিয়াই কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার ফিরিবার কিছু স্থিরতা নাই। তিনটা—চারিটা—কোনদিন বা সন্ধ্যাও হইয়া যায়।

সে তখন অধীর ও সুধীরকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া লইয়া অন্দরের খিড়কীর পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কলিকাতার পথ—রাস্তায় পা দিতেই সে দিশেহারা হইয়া গেল। এ বিষয়ে তাহার শক্তি ও জ্ঞান একেবারেই ছিল না। এত পুরুষ-মানুষের পায়ে পায়ে জড়াইয়া কি চলিতে পারা যায়? একটু অসাবধান হইলেই ঘাড়ের উপর লোক আসিয়া পড়ে। অথচ কোথায়—কতদূরে যাইয়া—পা দু'খানা সে স্থির করিতে পারিবে এমন একটা ভরসার নির্দ্দেশও ছিল না। কিন্তু তাহার নারী-জীবনের সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটিকে লইয়া এই যে ইহারা হীন ভাবে ক্রীড়া করিতেছে, আর ব্যর্থতার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতেছে—ইহা কি কোন দিনই কালের গর্ভে চাপা পড়িবে না? বেদনায় পায়ে তাহার কেবল কম্পই উঠিতেছিল। এইরূপ সঙ্কোচভরে কিছুদূর হাঁটিয়া সে চলিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িল। ছেলে দুটিও অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল।

গলির ভিতরে কোন বাড়ীর রোয়াকে একটি মেয়েকে খেলিতে দেখিয়া সে বলিল, "মা! একটু জল দিতে পার?"

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া গেল। কিন্তু এবার একটি বয়স্থা মেয়েই জল লইয়া তাহাকে ভিতরে ঢুকিবার জন্য সম্বোধন করিল।

জলের গ্লাসটি হাতে দিতে সে তাহা ছেলেদের পান করাইল। একটি বর্ষীয়সী রমণী নিকটেই ছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাদের মেয়ে গা? ও বৌমা! রূপের ব্যাখ্যানা কর—রূপ দেখতে হয় ত এসে দেখ।"

গৃহিণীর পুত্রবধূ বাহির হইয়া আসিলেন। আহা! ছেলে দুটি বা কি চমৎকার! সকলে তাহাকে অজস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কমলা সংক্ষেপে শুধু জানাইল, সংসারে সে একান্ত অসহায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা সে জানাইল না।

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত, এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে আশ্রয় পাওয়া ত মুস্কিলের কথা! নেড়া বোঁচা হলে কর্ত্তাকে বলে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারতুম। কাজকর্ম্ম সব জান ত?"

কমলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "জানি।"

"ভদ্রঘরের বৌ ত বটে! রান্নাবান্নাও বেশ জান বোধ করি?"

কমলা পুনশ্চ কহিল, "জানি।"

"জানে ত অনেকে। কত লোকই রাখ্‌লুম। মুখে দিতে গেলেই জিভ্‌ বেরিয়ে এল।"

কমলা দ্বারের দিকে তাকাইয়া দেখিল, পথ দিয়া অজস্র লোক চলিতেছে। রাস্তায় পা বাড়াইতে তাহার আর ভরসা হইতেছিল না। গৃহিণী বলিলেন, "দুটি ছেলে কোলে করে এসেছ, একদিন রেঁধে বেড়ে খাইয়ে দেখাও, তার পর অন্য কথা—কি বল বৌমা?"

বধূটি বলিলেন, "আজকেই রাঁধুন না? নিরামিষ তরকারিটা কেমন হয় দেখা যাক্‌।"

কমলা অত্যন্ত মুখ নীচু করিয়া সুধীরের মাথার চুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিল, "রান্নার কাজ ত আমাকে দিয়ে করাতে পারবেন না মা?"

"কেন?"

তাহার মুখখানা মাটির দিকে আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমার কলঙ্ক আছে।"

গৃহিণীর চক্ষু দুটি ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। বেশ উৎসাহের সহিত তিনি বলিয়া গেলেন,—"তাই বলো—দোষ না থাক্‌লে এমন লক্ষ্মীকে কেহ পথে ছেড়ে দেয়? ভাগ্যিস্‌ নিজের মুখে কথাটা স্বীকার করে বসেছ—এখুনি জাত-জন্ম খেয়ে ফেলেছিলে আর কি! আমার যেমন মায়ার শরীর—মানুষ দেখ্‌লেই পাগল হই। বৌমা! শুন্‌লে এঁর কোষ্ঠীর খবর? মেয়েমানুষ রাখার আর নাম-গন্ধ কোর না। আমার উড়িয়্যের বামুনই ভাল।"

কমলার চোখ দিয়া কয়েক ফোটা জল পড়িয়া মাটি ভিজিতে লাগিল। সে বলিল, "আমি নিজের কাছে ভালই আছি মা!" একটু পরে সে বলিল, "আমি আপনার কাছে কাজ নিতে আসি নি। এখানে এসেই মনে হয়েছে,—একটু আশ্রয় আমার চাই-ই চাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "এই বয়েস পর্য্যন্ত মানুষ চরিয়ে এলুম—সে আর বুঝতে পারি নি! এই বল্‌লে,—কলঙ্ক আছে। এখন বল্‌ছ,—নিজের কাছে ভালই আছ, লোকের চোখই দুষে গেছে। এ রকম বল্‌লে কি কাজ পাওয়া যায়? এখনও পাকা পোক্ত হতে পার নি বাছা! কবে ঘর ছেড়ে এসেছ?" কমলা উত্তর কহিল না।

গৃহিণী বলিলেন, "ডপ্‌কা বয়েস, প্রবৃত্তির জোরেই

বেশী। পুরুষগুলোর ব্যাভার ত জান না, ওরা ঘরের বারই কর্‌তে জানে—শেষ পর্য্যন্ত পুষ্‌তে জানে না। আমার কাছে যা বলেছ—বলেছ। এ রকম আর কোথাও বোল না—কাজ পাবে না।"

কমলা সেখানে আর অপেক্ষা করিল না। ছেলে দুটি লইয়া আবার সে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূর সঙ্গে গৃহিণীর বিদ্রূপ-হাস্যটা তখনও কাণে আসিয়া পড়িতেছে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কষ্টে ও ক্লান্তিতে তাহার আর পা চলিল না। একটা পড়ো-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল।

বেলা বাড়িতেছে। ছেলেরাও খাদ্যের জন্য অস্থির করিয়া তুলিতেছে; এবং কিল চড় মারিয়া জানিতে চাহিতেছে, কেন সে ঘর ছাড়িয়া আসিল!

পথ দিয়া কত লোকই চলিতেছে। কমলার কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সে ঘোমটার আড়ালে মুখখানা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। কিছু সময় পরে একটা প্রৌঢ়া নারী তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি কাদের মেয়ে গা? ছেলে দুটো যে তোমাকে টেনে ছিঁড়ে খেলে।"

কমলা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি এখানে একটু বস্‌বেন?"

রমণী উপবেশন করিল। তাহার গায়ে গহনা—পরণে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী—পায়ে আলতা। কমলার কাছে বেশ গৃহস্থ লোক বলিয়াই ঠেকিল। সে বলিল,

"পথের লোকের দৃষ্টির কাছে আমি আর বসে কাটাতে পার্‌ছিনে। কোথায় যেয়ে একটু আড়ালে দাঁড়াই বলুন ত?"

রমণী বলিল, "পথে-ঘাটে আড়ালে দাঁড়াবার মত জায়গা বা কোথায়? পরিচয় দিলে হয় ত চেষ্টা-চরিত্তির করে ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পার্‌তুম।"

কমলা বলিল, "ঠিকানা আমার নেই ত মা! এত বড় সহর, নিরাশ্রয় মেয়েদের নির্ভাবনায় থাক্‌বার মত নিরাপদ স্থান কি কোথাও একটু নেই?"

রমণী ইহার সম্বন্ধে কল্পনায় অনেকখানি কথা মনের মধ্যে বেশ গোছাইয়া লইল। ইহার ভিতরকার গৃহটি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া না উঠিলে বাহিরের প্রাঙ্গণে কেহ ইহাকে ছাড়িয়া দিত না। সে বলিল, "আমি ত মেয়েলোক। তাড়াতাড়ি এর একটা জবাব আমি তোমাকে দিতে পারলুম না। এখন আমার বাড়ীতেই চল। শেষে ভেবে-চিন্তে যা' হয় স্থির করা যাবে।"

কমলা আর আপত্তি করিল না। নীরবে ইহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেল। গৃহে পৌঁছিলে রমণী উপরের তলার একটি ঘরে তাহাকে লইয়া যাইয়া বসাইল। বলিল, "আমার একটি মেয়ে এই ঘরেই ছিল। আজ তিন-মাস একটি বাবুর সঙ্গে সে কাশিপ্যে চলে গেছে। আর ফিরে এল না। এই ঘরেই থাক তুমি। ভাবনা কি, সংসারে কেউ উপসী থাকে না বাছা! এক রকমে চলে যাবে।"

ছেলেদের কিছু মুড়ী কিছু বাতাসা আনিয়া দিয়া সে বলিল, "তুমি একটু জিরিয়ে নাও—আমি ততক্ষণ রান্নার জায়গাটা পরিষ্কার করে দিই গে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কমলা দেখিল, খাটের উপরকার শয্যাটি বেশ পরিচ্ছন্ন। কতকগুলি তাকিয়া বালিস শয্যার উপর গড়াইতেছে। ঝাড় লণ্ঠন, আয়না, আলমারি—নানাবিধ মনোরম দ্রব্যে গৃহটি সাজান। ছেলে দুটিকে লইয়া মেঝের এক পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িয়াছিল। পার্শ্বের কয়েকটি কক্ষ হইতে নারীকণ্ঠের অশ্লীল চীৎকার মাঝে মাঝে তাহার কাণে বাজিয়া সমস্ত বাড়ীটা কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল।

অধীর ও সুধীর মুড়ীর কতক খাইয়া কতক ছড়াইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং পথে গাড়ী ঘোড়ার চলাচল দেখিতেছিল। হঠাৎ তাহারা 'কাকা!' 'কাকা?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

নরেশ তখন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিতেছিল; এবং চীৎপুর রোডের এক বিড়ির দোকানে দাঁড়াইয়া পান কিনিতেছিল। পরিচিত স্বর অনুসরণ করিয়া ইহাদের ভাই দুটির দিকে যখন তাহার দৃষ্টি পড়িল, তখন ত্রাসে দুই পার্শ্বের অনেকগুলি বাড়ীই সে দেখিয়া লইল। পরে সাম্‌নের দিকটায় ছুটাছুটি করিয়া যখন গলির ভিতরে একটা অনতিবিস্তৃত সিঁড়ি সে খুঁজিয়া পাইল, তখন কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই সে উপরে উঠিয়া আসিল; এবং সর্ব্বপ্রথমে তাহার নজর পড়িল, একদল পতিত নারী একস্থানে ঘোঁট করিয়া বসিয়া আনন্দে হল্লা

করিতেছে। ক্রোধে ও উত্তেজনায় সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছে। আজিকার এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত কি কারণে, কেন উপস্থিত হইল, সে ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিরণের কলিকাতায় আসিবার সম্ভাবনা সে কাণে শুনিয়াছিল মাত্র। কিন্তু প্রত্যূষে যাহাকে যে স্বজনগণে পরিবৃত থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে, কোন্ আকস্মিক বিদ্রোহে তাহাকে আবার এই জঘন্য স্থানে টানিয়া আনিল? ঘরে বাহিরে দুর্ব্বলা নারীকে লইয়া এই যে অপমানের খেলা চলিতেছে, ইহার কি শেষ নাই?

ঘরে ঢুকিয়া পড়িবার তাহার বিলক্ষণ সাহস ছিল, যদিও বাধা ছিল বিস্তর। সে ঘরে প্রবেশ করিল না। ঐ খাট—ঐ শয্যা—ঐ ঠাট্‌বাট—চোখে পড়িল না—ভালই হইল। কে তাহাকে এখানে আনিয়াছে একটা বাক্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি ঐ পতিতা নারীদের লইয়া যদি সে করিত—ফল হয় ত অশুভই হইত। কিন্তু ঘৃণায় এ সকল সে কিছুই করিল না। বাহির হইতে ভগ্নস্বরে সে হাঁক দিল, "অধীর!"

অধীর বাহির হইয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মা কোথায়? এখানে আছেন না কি? নিয়ে আয় তাঁকে।" কমলা অবগুণ্ঠিত হইয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তাহার দেহের বল তখন ধরিত্রীর সঙ্গে মিলিয়া ক্ষয় হইতেছে।

ইহাদের লইয়া সে নীচে নামিয়া আসিল; এবং গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই পায়ে ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কোন আলোচনাই হয় নাই। রেলে চাড়য়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো কি বাড়ী যাচ্ছ?"

নরেশ তখন যে খাবার কিনিয়াছিল, ভাগে ভাগে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বলিল, "হাঁ। হলধরের আশ্রমই ভাল। এখানে আর থাক্‌তে সাহস হয় না। দাদা এসেছেন বুঝি?"

কমলা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না। নরেশের আর শুনিবার কিছুই ছিল না—কমলার বলিবার অনেক ছিল। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আলোচনা আর কিছুই হইল না। নরেশ শুধু ভাবিতে ভাবিতে চলিল,—একটিবারের অবি-বেচনার ফল—কত রকমে আর কতকাল ধরিয়া যে চলিতে থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিরণের অসুখ শুনিয়া মাতা কলিকাতায় আসিয়াছেন কিরণ শুনিয়াছিলেন; কমলারা আসিয়াছে জানিতেন না। দেশের গুরু-পুরোহিত আত্মীয়-স্বজনকে আনিয়া তিনি হঠাৎ যে বিপদ এবং সমস্যার ভিতরে পড়িয়াছিলেন, কমলার বহির্গমনে তাহা কাটিয়া গেল। হিরণ অনুসন্ধান করিল, হরসুন্দরী গৃহে বসিয়া ছট্‌ফট্ করিলেন—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে গোপন হইয়া রহিল। আর কোন কিছু বুঝিল না কেবল চঞ্চলা। কিন্তু তাহার উদ্বেগ ও কষ্টের পরিসীমা রহিল না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর সে পাইল না। নরেশেরও সেই হইতে দেখা নাই। কিসে কি ঘটিল—সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কিন্তু শ্রাদ্ধের কার্য্য খুব নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল না। কিরণ, হিরণ দুই ছেলেকে ডাকিয়া হরসুন্দরী জানাইলেন, মাসীমার কাজে এক পয়সাও ব্যয় করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। গঙ্গার তীরে পিণ্ডদান করিলেই চলিবে; এবং সে ব্যয় তিনি নিজেই দিবেন। পুরোহিতও তিনি এইখান হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইবেন।

কিরণ মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। শ্রাদ্ধের আয়োজন অল্পই হউক—বেশীই হউক ক্ষতি নাই। ব্যয়-ভূষণের যে জনরব রটিয়াছে, তাহা না হয় কোন একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়া ইহাদের ঠাণ্ডা করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ইঁহাদের গৃহে ডাকিয়া আনিয়া এরূপ অপমানিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে কেমন হইবে? দেশের পুরোহিতের দ্বারা কাজ করাইয়া ইঁহাদের জন্য অল্প স্বল্প আয়োজন করিলেও মাতা পারিতেন। তিনি হরসুন্দরীকে এইরূপই বুঝাইতে লাগিলেন। অতঃপর হরসুন্দরী বলিলেন "গুরুদেবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিগে যা। যা' বল্‌তে হয় আমি বল্‌ব'খন্—তোর ভাবনা নেই। কিন্তু দেখিস্, সঙ্গে যেন আর কাকেও পাঠাস্‌নে।"

গুরুদেব রামলোচন শিরোমণি শিষ্যার নিকটে আসিয়া পা বাড়াইয়া দিলেন। হরসুন্দরী অঞ্চলে পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। বলিলেন, "হিরণের ঘরে আপনারা পদধূলি দিয়ে গেলেন—বহু ভাগ্যের কথা।" একটু পরে ঘাড় হেঁট করিয়া তিনি বলিলেন, "শ্রাদ্ধটা যে ভাবে করার স্থির ছিল,

এখন আর তা' নেই। ছোট-বৌমা কিছু টাকা ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত ছিলেন—এখনও আছেন। কিন্তু আমার প্রাণে এখন আর তা'তে সায় দিচ্ছে না। যাঁর কাজ—তিনি আমার বোন্। আমার মন যাকে মন্দ বল্‌ছে—তাঁর মৃত আত্মাও তাকে মন্দ বল্‌বে—তিনিও তৃপ্ত হ'তে পারবেন না। কিরণই এ ভুল করেছেন।"

রামলোচন বলিলেন "কিরণ কি ভুল করেছেন তুমি এখনও আমাকে বল নি মা! যদি একমাত্র তাঁর এই ভুলের দরুণই তোমাদের ইপ্সিত কাজ বন্ধ হয়ে যায়—সে ছোট ভুল নয় নিশ্চয়ই—মস্ত বড় ভুল। কিন্তু তার সংশোধনের কি কোন উপায়ই নেই?"

"না।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "আমার অন্তরে যে ঝড় বইছে আপনাকে খুলে বলাই ঠিক। বাইরে ভাল থেকে অন্তরে বিদ্রোহ করা আমি উচিত মনে করিনে, বিশেষ আপনাদের সঙ্গে।"

রামলোচন বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার কথা তুলে অনেকখানি ভাবিয়ে তুলেছ মা! শিষ্যের সঙ্গে একমাত্র বিদ্রোহ হতে পারে জ্ঞান লয়ে—যদি শিষ্যটি গতানুগতিকপন্থী না হন। কিন্তু সে বিদ্রোহে কত আনন্দ তা' কি তুমি জান না মা?"

হরসুন্দরী বলিলেন, "আমার ত সে জ্ঞান নেই, অথচ বিদ্রোহ কর্‌তেও বাধা হয় নি। আপনি আমাদের ইষ্টদেবতা। শিষ্যের ইষ্ট করেন বলেই ইষ্টদেবতা। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় হচ্ছে—বড়-বৌমার কষ্টের দিনে কি ইষ্ট করেছেন আপনি? ত্যাগ করার মত কিছুমাত্র কারণ কি তাঁতে ঘটেছে?"

রামলোচন কেমন ভ্যাবাচাকা মারিয়া গেলেন। এত বড় একটা সমস্যার উদ্ভব এত শীঘ্র হইবে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি লোকটি খুব সরল—বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কিছুমাত্র না। তোমাদের রীতি-নীতি আমি ভাল বুঝি না। বুঝি নাই বা বলি কেন? আমাদের ব্রাহ্মণের সমাজেও এ ব্যাপারের পরিণতি এই রকমই ঘট্‌ত।"

হরসুন্দরী বলিলেন, "কি ঘট্‌ত না ঘটুত শুন্‌তে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি না। আমি শুধু জান্‌তে চাইছি,—অন্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ত তা খাটে না। আপনার প্রাণের ছন্দ অনুক্ষণ আমাদের পিছনে থেকে ইষ্টের দিকেই ত গতি দেবে। তবে বড়-বৌমাকে ত্যাগ করে তাঁর প্রতি এত বড় একটা অনিষ্ট আপনি কর্‌লেন কি করে? কিরণই তাঁকে অকারণ সকল সুখ থেকে বঞ্চিত করে' পাপ করেছেন। তাঁকে ত্যাগ করাই ত আপনার কর্ত্তব্য ছিল। তা'তে আমার ছেলেদের চৈতন্য হ'ত—সমাজের লোকেরও চোখ্ ফুটত—সংসারের মঙ্গল হত—আমাদের সংসারটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না। মা হয়ে আমি কিন্তু সন্তান ত্যাগ কর্‌তে পেরেছি।"

হরসুন্দরী সাবধান হস্তে যে অপরাধের বোঝা গুরুদেবের মাথায় চাপাইয়া দিলেন, তাহা যেমন প্রচুর তেমনি তর্ক-শূন্য। তিনি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন।

হরসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু এই প্রার্থনা জানাবার জন্য আপনাকে আমি কাছে ডেকে আনি নি। কারুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিয়ে নেওয়া আমারও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। ছেলেদের যতদিন শাসন আর শিক্ষার কাল ছিল—আমি শক্তিমত তা' তাদের দিয়ে এসেছি। এখন যদি ব্যভিচার কর্‌তেই তারা অগ্রসর হয়—মায়ের কথা অমান্য কর্‌তেও বা তাদের আট্‌কাবে কেন? তাই আমি তাদের কিছু বলি নি। আপনাকেও হুকুম কর্‌তে আমি জানাই নি। শুধু এত-বড় পাপের সংশ্রবে কি লালসায় আপনি জুড়ে রইলেন, আর এই নিষ্পাপকে ছেড়ে দিলেন, সেই কথাই আম ভেবে এসেছি। কিন্তু সে জন্য কোন প্রশ্ন আমার নেই। আপনি জ্ঞানী—আপনার বিবেকে যা বলে নি—আমি কেন তার জন্য অনুরোধ জানাতে যাব? আমার এখনকার কথা এই যে,—আপনাদের দ্বারা কাজ করিয়ে—আর দেশের যাঁরা এসেছেন তাঁদের খাইয়ে আমার দিদির আত্মার শান্তি হবে না। উপায় কি বলুন। দিদির দেওরকে নিয়ে কিরণ একলাটি আস্‌বেন—এই আমি জান্‌তুম। নরেশকে দিয়েই আমি কাজ করাতুম। কিন্তু আমার অপর একটু লালসা ছিল।"

রামলোচন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "ভিন্ন সমাজের গণ্ডগোলের মধ্যে আমি যেতে চাই নি। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোমাদের ইষ্ট নিয়েই যখন আমার কারবার, তখন

যাওয়া খুবই কর্ত্তব্য ছিল। যা হোক্, কিরণকে ত্যাগ কর্‌লে এঁরাও হয় ত দল বেঁধে গুরু ত্যাগ কর্‌বেন। কিন্তু তুমি ছেলে ছাড়্‌তে পার—আর আমি শিষ্য ছাড়্‌তে পারি নে,—জেনে-শুনে এ অপবাদ কি বেশীক্ষণ ঘাড়ে রাখা যায়? যাক্—তুমি কিছু ভেব না মা! আমি একটা উপায় কর্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

হিরণের বাসায় কোন কিছুর অপ্রতুল ছিল না। ইঁহারা বেশ জামাই-আদরে কাটাইতেছিলেন; আর নিকটবর্ত্তী ভোজের প্রতীক্ষা সকলে বেশ আগ্রহের সহিতই করিতেছিলেন।

রামলোচন নীচে আসিয়াই কিরণ ও হিরণকে তথায় ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরোহিত মাধব ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বেশ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ মাধব! এঁদের সমাজগত কোন কথার মধ্যে এতদিন আমাদের আসার কোন প্রয়োজন হয় নি—আসিও নি। এঁরা বড়-বৌমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঘরের বার করে দিয়ে পাপ কিছু কম জড়ো করেন নি। আর তার পরেই এই সর্ব্বপ্রথম এঁদের বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে। আমরা ভগবানের নাম নিয়ে থাই, পাপের ভয়টা অন্ততঃ আমাদের থাকা উচিত।"

রামলোচনের এ ভূমিকার অর্থ কি—সঠিক কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বিস্ময়ে সকলে চক্ষু স্থির করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। রামলোচন বলিলেন,

"রামনামের এক-একখানা নামাবলী তোমারও গায়ে আঁটা আমারও গায়ে আঁটা। এঁদের ত সে বালাই নেই। তা'ছাড়া বুকে আবার গঙ্গা-মৃত্তিকের ছাপও রয়েছে। এতগুলি দেবতাকে স্পর্শ করে তুমি আমি যা' তা' একটা কিছু কর্‌তে পারি নে। দেবতাকে নাড়াচাড়া করায় একটা উপদ্রবও আছে। ভূতের উপদ্রব নয়, যে ওঝা ডেকে একটা নিষ্পত্তি করে নিলুম। দেবতার উপদ্রব থামাতে হ'লে নিজেদের উপদ্রবই আগে থামাতে হবে।"

মাধব বলিলেন, "সে কি আর মিথ্যা হতে পারে?"

রামলোচন বলিলেন, "মিথ্যা ত নয়ই। তাই বল্‌ছিলুম, অধর্ম্মকে ত্যাগ কর্‌তে হবে মাধব! আলোচাল কলার সঙ্গে আর কতটা ঘুলিয়ে যাব?"

এতক্ষণে রামলোচনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঁহারা অনেকটা অবধারণ করিলেন। নটবর বলিলেন, "আমাদের সামাজিক ব্যাপারের মধ্যে আপনাদের কি থাকা সঙ্গত ঠাকুর মশায়? আপনারা গুরু পুরোহিত—সম্মানের বস্তু। আপনাদের একটু তফাৎ থাকাই উচিত।"

রামলোচন বলিলেন, "ঐখানেই ঘরের রুটি গেছে—আর রুটিও মেরেছ। এখন যেদিন দুখানা নেবু আর দুখানা শসা কাট্‌তে পাব, সেইদিনই ডাকো—আর সেই-দিনই আসি। সম্পর্ক এখন শসার সম্পর্কই হয়েছে। সে যাক্, তোমাদের সামাজিক ব্যাপারে আমরা থাক্‌তে চাই না। বড়-বৌমাকে ফাঁসি দিতে বা শূলে চড়াতে তোমাদের হাত আছে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আল্‌গা হতেও আমাদের হাত আছে। বাবা-ঠাকুরদাদা তোমাদের ঘরে ত আমাদের বন্ধক রেখে ছেড়ে যান্ নি।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণের বাড়ী যে ব্যাপার ঘটেছে, তার মাসীমার কাজে তার সংশ্রব কি?"

"বসন্ত যদি উপস্থিত থাক্‌ত আর টাকা-পয়সা ব্যয় কর্‌ত, কোন সংশ্রবই ছিল না। সে সংসার-ত্যাগী লোক। তার সম্বন্ধে কথা ভিন্ন।" কিছুক্ষণ আর কেহ কোন কথা বলিলেন না।

রামলোচনের কথার অপ্রধান অংশ বাদ দিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইঁহারা কিরণ ও হিরণের সহিত বর্ত্তমানে সংশ্রব-শূন্য হইতেছেন। এ পাপে আর কে কে পাপী, তাহা ইঁহারা এখন খুলিয়া বলিতে প্রস্তুত নহেন। প্রয়োজনমত জানা যাইবে।

তখন রামলোচন আর এই ভেড়ু মাধব ঠাকুরকে শিক্ষা দিবার জন্য ইঁহারা সলা পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন।

শ্রাদ্ধের কার্য্যে এই যে বাধা পড়িল, হিরণ ও চঞ্চলা শেষটা ইহাতে স্বস্তিলাভই করিল। কমলা চলিয়া যাওয়ার পর এ সকল তাহাদের ভাল লাগিতেছিল না।

শেষ দিন পর্য্যন্ত নটবরের দলের লোকেরা অপেক্ষা করিয়াই রহিলেন। কিন্তু সত্যসত্যই যখন ঠিকা পুরোহিত ডাকাইয়া গঙ্গাতীরেই সামান্যভাবে পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন নটবরের দলের লোকেরা—পদদলিত সর্পের মত গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে দেশে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেশ মনিবের কাছে ছুটি লইয়া যাইবার অবসর পায় নাই। কাজেই তাহাকে তাড়াতাড়ি করিয়া আবার কলিকাতায় আসিতে হইল। আসিয়া সে মাতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিল। কিরণের দল তখন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। হিরণ তাহার নিকট কমলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "সে ত তোরাই ভাল জানিস্, আমি কি সে সময় বাড়ীঘরে ছিলুম?" কিন্তু মায়ের কাছে সে সকল কথাই খুলিয়া বলিল; এবং যাহা সে জানিত না, তাহাও শুনিল। কমলার পুনর্ব্বারের এই অচিন্তনীয় বিপদের কথা শুনিয়া হরসুন্দরীর অন্তরে ঝড় বহিতে লাগিল।

কমলা চলিয়া গেলে তিনি নিজেই রান্না করিতে গিয়াছিলেন। চঞ্চলা বলিয়াছিল, এরূপ করিলে সে পায়ের তলায় মাথা খুঁড়িয়া মরিবে। সেই অবধি সে তাহার অনভ্যস্ত হস্তে দুইটি সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। রান্নাই বা কি! আলু বা কলা সিদ্ধর বেশী তিনি কিছু করিতে দেন না। চঞ্চলাও শ্বশ্রূর পাতে সেই হবিষ্যান্নই গ্রহণ করে।

নরেশ আসিলে, দেশে রাখিয়া আসিবার জন্য—মাতা তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন। বধূকে দূরে রাখিয়া তিনি আর একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না।

চা-কোম্পানীর সেয়ার বিক্রয় করিয়া নরেশ বেশ পয়সা পাইতেছিল। এ কাজ সে সহসা ত্যাগ করিতে পারিল না। অধীর, সুধীর ইহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে টাকারই প্রয়োজন। হলধরের পাঠশালার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ইহাদের দুটি চাল সিদ্ধ করিয়াই দিতে পারা যায়—তার বেশী কিছু করা যায় না। কাজেই সে কার্য্য ত্যাগ না করিয়া ছুটি লইয়া মাতাকে দেশে আবার সেই মদনগোপালের মন্দিরে রাখিয়া আসিল।

হরসুন্দরী চলিয়া গেলে চঞ্চলা যেন চোখে তারা দেখিল। কমলার জন্যই তাহার প্রাণ আই-ঢাই করিতেছিল। *বিচ্ছেদের ফলে আজ প্রথম* সে বুঝিল, তিল তিল করিয়া সে তাহাকে কতটা ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় গেল - কেন গেল, ইহার সদুত্তরও সে কাহারও কাছে পাইল না। গুরুদেবের সঙ্গে শাশুড়ীর যে কথোপকথন হয়, তাহার দুই একটি কথা কাণে পড়িয়াছিল মাত্র। সেও ভাঙ্গা ভাঙ্গা—স্পষ্ট নয়—বুঝা যায় না।

স্বামীকে লইয়া সে একলা পড়িল। আগের দিন আর ছিল না, সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিল। স্বামী যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। সমস্ত আনন্দ ও উৎসাহ কোথায় যাইয়া যেন থিতাইয়া পড়িয়াছে। বড় জায়ের কথা উঠিলে আগে ইনি চতুর্ম্মুখ হইতেন। আর এখন খোঁচাইয়াও একটি কথা বাহির করিতে পারা যাইতেছে না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সে মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

কিরণের উপর হিরণ এবার খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। পরিবারটি যেরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সকলের এক স্থানে মিলিত হওয়াই সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার ছিল। ঘটনাক্রমে যদিও তাহা সংঘটন হইল, কিরণের আবির্ভাবেই একে একে আবার সকলে খসিয়া গৃহটি ছন্নছাড়া করিয়া গেলেন। সে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ইহাই তাহার স্বভাব। সে নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে নিজেই জ্বলিতে পারে, অপরের কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে না।

চঞ্চলাও যখন তাহাকে নিঃস্ব করিয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার মনের অশান্তি দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। কিছুদিন একলাটি এ-রূপ ক্ষত-বিক্ষত হইবার পর অবশেষে সে কাত্যায়নীর নিকটে যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। তখন সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এই বিদেশ বিভূঁয়ে কোন রকমে সে কাটাইয়া দিবে। কেহ মরিল কি ছাড়িল—কোন খোঁজ-খবরই সে আর লইতে যাইবে না।

সে এখন অবকাশ পাইলেই কাত্যায়নীর নিকটে আসিয়া বসে—গল্প গুজব করে। কাত্যায়নী দেখিলেন জামাইটি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সরল হইয়া উঠিয়াছেন। এখানে একটা পাঁচিল তুলিলে কেমন হয়—মধুপুরে কি দেওঘরে একটা বাটী করা যায়—সুরেনের বিবাহ দিতে কেন তিনি মনোযোগী হইতেছেন না—এইরূপ তাঁহাদের অভিভাবকশূন্য সংসারে জামাতার যে অনেকখানি কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া তিনিও ইহাকে আরও অধিক আচ্ছন্ন করিয়া ধরিতে লাগিলেন; এবং মেয়ে

জামাইকে অত্যন্ত কাছাকাছি রাখিবার জন্য গোড়া হইতে তাঁহার যে সঙ্কল্প ছিল, তাহা এ সময় কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলেন।

ইঁহাদের বাড়ীর কিছু দূরে এক খণ্ড জমী বহু দিন হইতে খালি পড়িয়া ছিল। জমীর মালীকের সঙ্গে দর-দস্তর স্থির করিয়া একদিন মেয়ে ও জামাই উভয়েরই মুকাবেলায় তিনি কথা পাড়িলেন। হিরণ উৎসাহের সহিত রাজী হইল। চঞ্চলা কিন্তু বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল, "এখন দরকার নাই।" "কেন নাই?" এ প্রশ্নের জবাব সে দিল না। মাতা ইহাদের ভাবী গৃহের চমৎকার এক ছবি এক সময় মেয়ের অন্তরে অতি সহজে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে কাজের বেলায় মেয়েকে তাঁহার অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে হইল। কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত সায় দিল না। অবশেষে স্বামী ও মাতা উভয়েরই একান্ত আগ্রহ দেখিয়া সে সম্মতিও দিল না—নিষেধও করিল না। চুপ্ করিয়া রহিল।

ফলে বাড়ী প্রস্তুত হইল। নিত্য নূতন নূতন সাজসজ্জা বাজার হইতে সংগ্রহ করায় গৃহখানি সর্ব্বরকমে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল। বন্ধুবান্ধবের নিকটে হিরণের পসার-প্রতিপত্তিও দিন দিন বাড়িয়া গেল।

এখন আর চঞ্চলার সঙ্গে বিরোধ করিবার কোন কারণ নাই। পরিবারবর্গের প্রতি স্ত্রীর মমতা-বুদ্ধির অভাব দেখিলেই তাহার দুটি চক্ষু নিরাশায়, বেদনায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত। এখন কাত্যায়নীর উদ্যোগ আয়োজনে—ভোগ-বিলাসের সঞ্জীবন মন্ত্রে—আর সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধায় সেও সেই মমতা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া বসিল।

পূজার সময় একবার করিয়া সে দেশে যাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতার বাড়ীতে প্রায়শঃ ভোজ ও নৃত্য-গীতাদির মজলিস বসিতেছে। দশের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য এ সকল অত্যন্ত আবশ্যক। কাত্যায়নী থাকিয়াই এ সকলের বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এইরূপে শ্বশ্রূর রচিত বিলাসকুঞ্জের মাঝখানে হিরণ হাত পা ছাড়িয়া দিল।

চঞ্চলা এ সকল লইয়া তর্ক তুলিল না; কিন্তু এ সকলের ভিতরেও সে প্রবেশ করিল না। কমলার অদৃষ্টের ভিতরে যে ভয়ঙ্কর একটা ওলট-পালট ব্যাপার ছিল, ইহাই তখন তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। অন্তরে যখন আর বেদনার স্থান দেওয়া যায় না, তখনই ত গৃহস্থ-ঘরের বধূরও একলাটি পথে যাইয়া দাঁড়াইতে প্রাণে আপ্‌শোষ থাকে না—বরঞ্চ পায়ে সে দুরন্ত বল পায়। কোন্ পাপে তাহার বড়-জা দুরদৃষ্টের এরূপ ক্রীড়া-পুত্তলি হইল, তাহার নিজের মুখে না শুনিতে পাইলে মনে স্বস্তি নাই। তাহার অসহায় দৃষ্টিটা অনুক্ষণই চোখে পড়িতেছে, সে যদি ইহার মধ্যে প্রার্থনার বস্তু কিছু খুঁজিয়া না পায়—আরও যদি অতিরিক্ত স্পষ্ট করিয়া চাহিতে হয়, তবে সে প্রার্থনা অন্যের কাছে করা যায়—স্বজনের কাছে নয়।

অনুক্ষণ খোঁচাইতে খোঁচাইতে হিরণের মুখে একদিন সে এইমাত্র শুনিয়াছিল যে, নরেশ ইহাদের দেশে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মনে এ ধারণা দৃঢ় হইল যে, ইহাদের স্বামী স্ত্রীতে ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব চলিতেছে, নচেৎ ভাসুর গৃহে পা না দিতেই এত বড় একটা দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া সে পথে যাইয়া উঠিবে কেন? যদি মুক্তির সন্ধানে সে আয়ুঃক্ষয় করিয়া বসে! চঞ্চলা কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এক সময় যে কাত্যায়নীর কাছে যাইয়া বলিল, "মা! বাড়ীঘর ত হল। এখন দেশ থেকে দিদিদের আনই না কেন?"

মায়ের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কোন জবাব সে পাইল না। কিন্তু সে দুইদৃষ্টি ফেলিয়া মাতৃস্নেহের ওজন করিতে লাগিল। বুঝিল, এই অন্ধ স্নেহই তাহার প্রাণের বৃদ্ধি ও পরিণতিকে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিতে বসিয়াছে। তথাপি এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানিবার জন্য সে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল। মাতা বলিলেন, "আন্‌লে ত ভাল হয়। এই ঐশ্বর্য্যি বিলেস কর্‌লি—দু'ভাগ বিলিয়ে দিয়ে, একভাগে যদি তোর চলে, আন্ না?"

নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকল কথাগুলিই সে কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু জীর্ণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "কিন্তু তুমি যতটা মনে কর—ততটা তফাৎ আমি মনে কর্‌তে পারি নে।" এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কমলার জীবন-সন্ধ্যার ইতিহাসের পৃষ্ঠাটা স্রষ্টা যে কোন্ বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, বুঝিতে মানুষের দৃষ্টি খুলে না। হঠাৎ একই সময়ে দুই দিকে দুইটি বিপত্তি ঘটিয়া কমলার কষ্টের সংসার-যাত্রার পথেও গোলযোগ ঘটাইয়া দিল। হলধর বাড়ীতে সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িল। নরেশও কর্ম্মস্থলে ট্রাম হইতে নামিবার সময় হাত-পা ভাঙ্গিয়া হাসপাতালে আশ্রয় লইল।

কমলার ছোট ছেলে সুধীরও পীড়িত। ঔষধ-পত্র জুটিতেছে না। ইদানিং নরেশ বেশ উপার্জ্জন করিতেছিল। খরচপত্র বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ—সে একটা ব্যাঙ্কে জমা রাখিত। ব্যাঙ্কটি ফেল হইয়া যাওয়ায় গচ্ছিত টাকা ফেরৎ পাইবারও আর আশা রহিল না। সে এক চিঠি লিখিল, তাহার সারিয়া উঠিতে সময় লাগিবে। হলধর যেন একপ্রকারে চালাইয়া লয়।

হরসুন্দরী বরাবরই বধূর নিকট নিকট কাটাইতেছিলেন। মদনগোপালের মন্দিরে থাকিয়া প্রতিদিনই তিনি ইহাদের সংবাদ লইতেন। কিন্তু কমলা নিজের দুরবস্থার কথা কাহাকেও কোন দিন জানাইত না। হলধর পীড়িত, এ সংবাদ নরেশকে দিয়া লাভ নাই। অসুস্থ শরীরে তাহার উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে মাত্র। আর হরসুন্দরীর অবস্থাও সে জানে; তাঁহাকে এ সংবাদ দিয়া কেবল বেদনাতুর করিয়া তোলা হইবে। হলধর রোগশয্যায় থাকিয়াও সর্ব্বদা ইহাদের সংবাদ লইত। কমলা জানাইত, এক রকমে চলিয়া যাইতেছে।

সেদিন কমলা মেঝের উপর বসিয়া কিছু সময় ছেলেদের পুস্তকগুলির জীর্ণ-সংস্কার করিল। তার পর বিছানায় যাইয়া সে শুইয়া পড়িল। নানারূপ অনিয়মে ছেলেদের শরীর ভাল থাকিতেছে না। তার পর নরেশ, হলধর ও হরসুন্দরী এই তিনটি প্রাণী তাহার হতাশার একমাত্র সম্বল ছিলেন। ইহাঁরাও কেহ কষ্টে—কেহ বা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তা' ছাড়া সর্ব্বত্রই প্রাণহীনতার ছায়া চারিদিকে জাগিয়া আছে। এই সকল কত কি সে ভাবিতেছিল। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাহার ভাবনা হইল, ছেলেদের বুভুক্ষা-বহ্নি কি দিয়া সে প্রশমিত করিবে।

কোলের ছেলে সুধীরের জ্বর। সকাল হইতে কাতরোক্তির দ্বারা আহার্য্য প্রার্থনা করিয়া সে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে। গত রাত্রে বলিতে গেলে সে পথ্যই পায় নাই। সকাল হইতেই খাদ্যের জন্য একঘেয়ে কান্নার সুরে মাতৃবক্ষকে সে অবসন্ন করিয়া তুলিতেছিল।

কমলা সস্নেহে পুত্রের ললাটে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার যে অসুখ করেছে বাবা? অসুখে কি খেতে আছে? জ্বরটা ছেড়ে যাক্—খাবার তৈরি করে দেব'খন্।"

ছেলেটি শুনিতেছিল না। সে কেবলই সুর টানিয়া টানিয়া কাঁদিয়া মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। চিন্তা ও ভয়ে মাতার অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শুধু মুখের স্তোকবাক্যে ত সন্তানদের বাঁচাইয়া রাখা যায় না। গৃহে পয়সা নাই—হাঁড়িতে তণ্ডুল নাই—উপায় কি? সকল ঝড় ঝাপটা যখন এক সময় পেটের উপর আসিয়া পুঞ্জীভূত হইল, তখন তাহার মনের মধ্যে এই চিন্তাই বৃহৎ হইয়া উঠিল যে, বিপদের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়—কি করিয়া সে নিজের মন, বুদ্ধি ও শক্তিকে একত্রে গাঁথিয়া রাখিবে? দুঃখ-কষ্টের সংঘাতে শেষটা কি সংসারে সে ছোট হইয়া পড়িবে?

নরেশ কাজ ছাড়িয়া দিলে পাঠশালাটি অন্য শিক্ষকের অধীনে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অধীর পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পীড়িত সন্তানটির গায়ে হাত রাখিয়া মাতা নিশ্চল হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন। স্নান করেন নাই—উনানও জ্বলে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! ভাইটি কেমন আছে? বেলা কত হয়েছে, এখনও রাঁধ্‌তে যাও নি?"

ছেলে ফিরিয়া আসিলে খাদ্যের জন্য বিব্রত করিয়া তুলিবে, এই চিন্তায় কমলা বার বার দ্বারের দিকে তাকাইতেছিল। যে দুঃখ ও গ্লানি পাথর হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, পাছে ইহার সংস্পর্শে ছেলেদেরও প্রাণ-শক্তি মুস্‌ড়াইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সমস্ত কষ্ট ও গ্লানি অন্তরে চিতাইয়া নিজের কর্ম্মপটুতাকে শরীরী করিয়া সে সর্ব্বক্ষণ চলিত। কিন্তু সকল ছাড়িয়া অন্নের সমস্যা যখন দেখা দিল, তখন তাহার দেহের বলও চলিয়া গেল। অধীর বই দপ্তর রাখিয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে জননীকে জড়াইয়া ধরিল বলিল, "সত্যি মা! কখন্ রাঁধ্‌তে

যাবে তুমি? সকালে কিছু খেতে দিলে না—ক্ষিধে পায় না বুঝি?"

কমলা তাহাকে সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। মুখে চুমু খাইয়া সে বলিল, "আজ যে বাবা উপোস ষষ্ঠী। আজ কিছু খায় না।"

বিষণ্ণ মুখে সে মায়ের দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল "কিচ্ছুই কি খেতে নেই?"

কমলা হাসিল। সে হাসি অত্যন্ত ম্লান। সে বলিল, "আজ বাবা ভাজা পোড়া খায়। আমি এখ্‌খুনি গা ধুয়ে আসি। এসেই কাঁঠালের বিচি ভেজে দেব'খন্।"

অধীর সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বাপ্‌ রে! সমস্ত দিনটা কাঁঠালের বিচি খেয়ে থাক্‌ব?"

"এ বেলা ত থাকো—ও-বেলা তখন দেখা যাবে।"

অধীর বলিল, "এই ত পথে আস্‌তে দেখ্‌লাম সকলকারই রান্নাঘরের মট্‌কা ফুঁড়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অনেকে খেতেও বসে গেছে। কৈ—তারা ত উপোস ষষ্ঠী করে নি?"

কমলার চক্ষু দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। বলিল, "সকলেই কি করে বাবা? দুই ছেলের মা যে—সেই-ই করে।"

অধীর মনে মনে গণিয়া গাঁথিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু দুইটি ছেলের জননী সে আর একটিও খুঁজিয়া পাইল না। কাহারও তিনটি—কাহারও চারিটি—কাহারও পাঁচটি—কাহারও বা একটি। সে তখন বিষণ্ণ মুখে মায়ের কথাই মানিয়া লইল। তথাচ সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও করবে—আমরাও করব?"

"হ্যাঁ বাবা! তা না হ'লে যে ফল হয় না।"

সে তখন বলিল, "তবে যাও। শীগগির শীগ্‌গির গা ধুয়ে এস। আমাকে কিন্তু চার গণ্ডা—দু'গণ্ডা—কাপড়ে—দু'গণ্ডা হাতে।"

কমলা তখনকার মত কাঁঠালের বিচি খাওয়াইয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। কিন্তু এই যৎসামান্য খাদ্যে সে তাহাকে অধিকক্ষণ শান্ত রাখিতে পারিল না। ক্ষুধার তাড়নায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বলিল, "থাক্‌গে মা, উপোস ষষ্ঠী প'ড়ে—আমি যে আর পার্‌ছি নে থাক্‌তে!"

এদিকে সুধীরকে লইয়াও প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে। পথ্য না পাইলে সে কতক্ষণ বাঁচিবে!

কিরণের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী সে পরিত। এই অত্যন্ত আদরের বস্তুটির উপর তাহার বারবার নজর পড়িতেছিল। হয় ত ইহা ছেলেদের কিছুক্ষণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোক তাহার পর হইয়া গেছে; কাহার হাতে দিয়া কাহার কাছে সে ইহা পাঠাইবে? অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া অধীরকে সে বলিল,

"তোমার বড়মার কাছে একবার যেতে পারবে?"

বড়মা ললিতা। ছেলেরা তাহাকে বড়মা বলিয়াই ডাকিত। অধীর বলিল, "পারব। কেন যেতে হবে মা?"

কমলা বলিল, "পথেঘাটে কুকুরে যদি তাড়া করে?"

সে হাসিয়া বলিল, "লাঠি দেখালে কুকুর আবার কাছে আস্‌বে? কোথায় ভেগে পালাবে। আমরা রোজই ত তাঁদের বাড়ীর সাম্‌নেকার মাঠে খেল্‌তে যাই।"

কমলা একখানা চিঠি লিখিয়া খামের মধ্যে অঙ্গুরীটি পূরিল। তার পর ছেলের হাতে দিয়া বলিল, "পত্রখানা বড়মার হাতে দিও। পত্র পড়ে যা বলেন শুনে এস। দেরী যদি কর—আমি কিন্তু খুব ভাবব।"

ললিতার ভগিনীর বিবাহ সম্মুখে ছিল। অধীর দেখিল, সে যাত্রার জন্য বাক্স পেটরা গোছাইতেছে। ললিতা হাতের কাজ ফেলিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল ও মুখচুম্বন করিল। বলিল, "মরে যাই? এই রোদ্দুরে কি ঘরের বের হয়? আহা! গা দেখি ঘেমে গেছে! বেলা পড়্‌লে কেন এলে না?" অধীর পত্রখানা তাহার হাতে দিল।

পত্র খুলিতেই অঙ্গুরীটি বাহির হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "অঙ্গুরী কেন?"

"মা দিলেন। কেন তা' জানি নে।"

ললিতা পত্র পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—"অঙ্গুরীটা রেখে আমাকে পনরটি টাকা দিও। কি জন্য অঙ্গুরী রাখা—আর কি জন্য টাকা দেওয়া—যদি প্রশ্ন কর, অঙ্গুরী ফেরৎ পাঠাবে।"

ললিতার চোখে কিছুক্ষণ পলক পড়িল না। সহসা সই কেন এমন ব্যবহার করিল? ইহা যেন প্রণয়ের চিহ্নকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সে অন্তরে বেদনা পাইল।

যাহা হউক অঙ্গুরীটি সে বাক্সে তুলিয়া রাখিল, ফেরৎ পাঠাইতে সাহস হইল না। পনরটি টাকা অধীরের কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "সইকে বল্‌বে, আমার বোনের বে, তাই বাপের বাড়ী যাচ্ছি। ফিরতে মাসখানেক দেরী হবে।"

সে যাইতে উদ্যত হইলে ললিতা তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। অনাহারের করুণ চিহ্ন তখন তাহার মুখের উপর গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা পেয়েই চলে যাচ্ছ? আমি ত তোমাকে এক্ষুনি যেতে বলি নি। বস, বেলাটা পড়ে যাক্‌। সই কি রেঁধেছিলেন?"

অধীর উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আপনি জানেন না? আজ যে উপোস ষষ্ঠী—ভাত খায় না।"

ললিতা ভাবিল,—উপোস ষষ্ঠী আবার কি গো? টেবিলের উপর হইতে পঞ্জিকা লইয়া সে দেখিল, সেদিন দশমী তিথি।

সে চিন্তিত হইল। অস্থির মনে সে কখনও পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কখন বালকের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। পরে অত্যন্ত আদরের সহিত গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "উপোস ষষ্ঠীতে ভাত খায় না—আর কি কিছু খেতে নেই?"

অধীর বলিল, "ভাজা-পোড়া খায়—আমরা কাঁঠালের বিচি ভেজে খেয়েছি।"

"কিন্তু আমরা ত উপোস ষষ্ঠী করি নি?"

"আপনি দেখি কিছুই জানেন না। আপনার যে মোটে একটি ছেলে। দুই ছেলের মা যে—সেই করে।"

ইহার অধিক আর জানিবার কি ছিল? কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না। সে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল এবং কিছু দুধ ও সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মা বলিয়াছেন ভাজা-পোড়া ভিন্ন খাইতে নাই—সে তাহা স্পর্শও করিল না।

ললিতা কত বুঝাইল, দুধও জ্বালে চড়াইয়া ভাজিতে হয়। জ্বালে ত ভাতও চড়াইতে হয়—সে তাহা শুনিল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহার পুত্র অমূল্যকে তথায় ডাকাইয়া আনাইল এবং ইহার সহিত খেলায় নিযুক্ত রাখিয়া সে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে লুচি ও পটল ভাজিয়া লইল এবং থালায় করিয়া সাজাইয়া লইয়া আসিল; বলিল, "এবার কিন্তু লুচি আর পটল ভেজে এনেছি। বিচি-ভাজাও যেমন—আলু ভাজা, লুচি ভাজা, পটল ভাজাও তেমনি। যা' খেতে হয় না—আমি তাই কি হাতে তুলে দিতে পারি? খাও, এ সকল খেলে দোষ নেই।"

সে তখন নিঃসন্দেহে খাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই উপোস ষষ্ঠীর মধ্য দিয়া বালকটি গৃহের যে কি নিগূঢ় বার্ত্তা ব্যক্ত করিয়া গেল, বসিয়া বসিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা। * তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন।

মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিটিউশন

মেট্রোপলিট্যান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিট্যানের নাম এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম মেট্রোপলিট্যান ছিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষের লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১, মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে এই বৎসরে দুইজন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিদ্যালয় পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসরগ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানারূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যকরূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতে বিদ্যালয়টির নূতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউশন। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৮) মৃত্যুতে এবং তৎপূর্ব্বে অপর তিনজন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ পর্য্যন্ত পড়া যায় তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ পড়াইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পর্য্যন্ত

* ১৮৪৮-৪৯ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেস হইতে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। ব্যবসায়টি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়া ইহা হইতে রীতিমত লাভ হইত।

পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন। ১৮৭৪ সালে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউশন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাটক্লিফ সাহেব বলিয়াছিলেন,—"পণ্ডিত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন!" ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যান ফার্ষ্ট গ্রেড কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোনো কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মেট্রোপলিট্যানের সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিস্তারের এক নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা বিস্তারে যে প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা লাভ করিল।

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন নিয়ম-মত কাজ চলিতেছে কি-না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, শিক্ষকেরা কখনও বালকদের উপর শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিতেন।

বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব ভারত-সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

> "১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্ত্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীয়। মেট্রোপলিট্যান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা বিদ্যমান ছিল।"

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহা কেনা হয়। সুবৃহৎ বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮৭ সালের গোড়া হইতেই এখানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়।

গ্রন্থ-রচনা

বিদ্যাসাগর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দু-চারখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্মৃতি বা পাঠ্যপুস্তক। অবশ্য একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি তাহার নিদর্শন। বিদ্যাসাগরের গদ্য কিঞ্চিৎ সংস্কৃতানুসারী হইলেও অতি সুললিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ব্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> "প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।…

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি অতুলনীয় প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়...তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।...

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্য-কুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।...

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন।...বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্দ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।...

"বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" *

বিদ্যাসাগরের রচনা কিরূপ আবেগময়ী, ওজস্বী ও প্রাঞ্জল ছিল তাহা 'বিধবাবিবাহ' পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে :—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর, দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ

* "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী, ১২৯৯)

* "বিদ্যাসাগর চরিত"—সাধনা, ভাদ্র, ১৩০২, পৃঃ ৩০৩০৫

ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এক কালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।…

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু, তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থাবিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।…

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান-দোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"

যাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কখনও ইহার ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। নিম্ন-উদ্ধৃত অংশের মত সীতার বনবাসের বহু স্থলই তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগরিত থাকিবে।—

"সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ, দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর-মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদ-দেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল!"

বিদ্যাসাগরের "প্রভাবতী সম্ভাষণ"ও একটি আবেগপূর্ণ রচনা।—

"বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ; কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।…

"আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।...

"বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদন দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।...

"একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্বশরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে।...

"তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কর্ম্ম করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

"কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, পিপাসায় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।...

"তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপরনাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।...

"বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।"

(সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯)

দয়া-দাক্ষিণ্য

দরিদ্র এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষী রূপে বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্‌গুণের জন্য আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামে পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরাই নয় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজস্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডন এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাব্রতীর সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন।

রাজ-সম্মান

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ সালে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গভর্ম্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই

খাণ্ডারবাণীর মধ্যেই বীণাপাণির সহস্রদল উপ্ত, এবং সত্য রসবোধ হচ্ছে রাগের 'টুইড্‌ল্‌ডাম' ও 'টুইড্‌ল্‌ডি'র সূক্ষ্ম ভেদ নিয়ে রেগে আগুন হওয়া। কেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তরও প'ড়েই আছে; কারণ—"সরল মিষ্টতা ও সুরের প্রশান্তি হচ্ছে অক্ষমতারই পরিচায়ক, ওসব শুধু বাইজীদেরই সাজে, ওস্তাদদের নয়।" এ কথা যে একটুও বাড়িয়ে-বলা নয়, তা ওস্তাদি মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যে ভুক্তভোগীরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন। তাই রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতন অনুপম স্রষ্টা গুণীর গান শুনে ওস্তাদপ্রবরেরা করুণার চুম্‌কুড়ি দিয়ে বলেন "আরে হাঁ—য়োড়িসি মিঠা গাতে হেঁ!" তাই বালক চন্দ্রশেখরের অপূর্ব্ব ভজন লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে শ্রোতাকে শোনানোর পথে এত বাধা ছিল। * এবং তাই তিমিরবরণের সুরের ঝরণার স্বর্ণবরণে ওস্তাদেরা আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে না উঠে—বিরক্তিতে বিবর্ণ হ'য়ে ওঠেন, যে কথা সেদিন তিমিরবরণের একজন রসজ্ঞ গুণী বন্ধু আমাকে দুঃখ ক'রে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন য়ুরোপযাত্রার পথে বম্বেতে তিমিরবরণের বাজনা শুনে আর্টক্রিটিক মিষ্টার ভকিল, সুইস ভাস্কর মিস্ বোনার (Miss Bonner) ও আরও অনেক রসজ্ঞ সুধী যখন মুগ্ধ হ'ন তখন তাঁরা আশ্চর্য্য হ'য়ে তাঁকে বলেন যে তিমিরবরণের বাজনা ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁরা ওস্তাদদের কাছ থেকে যে-রিপোর্ট পেয়েছিলেন সে রকম অপবাদ ওঁরা কোন্ প্রাণে রটালেন?

কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করা হয় ত নিষ্ফল—একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে। সত্য প্রতিভার জয়টীকা প'রে যে-শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন, অনেক বিপদ্-বন্ধুর পথই তাঁকে একলা অতিক্রম করতে হয়। সুন্দরের অভিসারের পথ কুসুমাস্তৃত নয়। সৃষ্টির পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—দুর্গম। বাধার উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়েই নদী বেগ সঞ্চয় করে; বিঘ্ন আছে ব'লেই না বিঘ্ননাশনের একাগ্র আরাধনার মহিমা! সেক্সপীয়র কি সাধে ব'লেছেন "The course of true love never does run smooth!"

বছর আড়াই আগে যখন তিমিরবরণের স্বরোদ প্রথম শুনি, তখন যেন এ-কথা আর একবার নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেছিলাম। হৃদয় একদিকে যেমন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গিয়েছিল ভেবে—যে এই গুণীবিরল বাংলাদেশে এমন প্রতিভার জয়শ্রী-মণ্ডিত গুণীর দেখা এখনো কালে-ভদ্রে মেলে; তেমনি অপর দিকে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম এ নবীন সাধকের অদ্ভুত অধ্যবসায়, অনুরাগ ও সাধনার পরিচয় পেয়ে। দিনের পর দিন যে পূজারী রাত তিনটেয় উঠে সকাল আটটা অবধি স্বরোদের সাধনা করতে পারে, সঙ্গী সহচর বন্ধু আড্ডা আরাম বিলাস সব ছেড়ে সেই সুদূর পাণ্ডববর্জ্জিত মাইহার রাজ্যে গিয়ে মাসের পর মাস গুরু আলাউদ্দীনের কাছে প'ড়ে থাক্‌তে পারে, শুধু সঙ্গীতশিক্ষার জন্য একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর স্বপাকে রেঁধে খেয়ে চল্‌তে পারে, একবারও না ভেবে—যে এ অপরিণামদর্শী সাধনার ফলে আখেরে জীবিকা উপার্জ্জন হবে কি না হবে, এ সঙ্গীত-উদাসী দেশে এ সাধনার দরদী মিল্‌বে, কি না মিল্‌বে, যদি না মেলে তবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভদ্র-সন্তানের শেষটায় কী গতি হবে,—তার সাধনায় মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় আছে! বিজ্ঞজনেচিত সুবুদ্ধি যে সুরপ্রেমিক শুধু সুরের প্রেমে এ-ভাবে ভুল্‌তে পারে তাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন না করে থাকা যায়? আজ তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের সহচর হ'য়ে য়ুরোপ যাত্রা ক'রেছেন—সকলে তাঁকে বাহবাও দিচ্ছে। কিন্তু আমি ত জানি সে-দিনের কথা—যে-দিন এ নবীন সাধক এ-সব ভাবনাকে স্বপ্নেও স্থান না দিয়ে শুধু সাধনাকেই জীবনের ব্রত ক'রে একলা চলেছিলেন! মনে তাঁর তখনো নিরাশা আসে নি বলে। এ বে-দরদী যুগে একাগ্র সঙ্গীতসাধনায় সময়ে সময়ে হতাশা না আসে কার? শিল্পীকে ত বাঁচতে হবে! কিন্তু তবু মনের জোর, ইচ্ছাশক্তি ও একান্ত অনুরাগের প্রণোদনায় যে তিনি এক সময়ে সব পরিনামচিন্তা ভুলেছিলেন, এ-কথা তাঁর আজকের সাফল্যের

* চন্দ্রশেখর এলাহাবাদের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালক। এমন অপরূপ মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাল সুরের ওপর কর্ত্তৃত্ব ও দরদভরা কণ্ঠ জীবনে দু' একটা বই শোনার সৌভাগ্য হয় না। তার গান শুনে হৃদয় গলে নি এমন শ্রোতা ১৯২৪এর লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে একজনও ছিল কি না সন্দেহ—ওস্তাদপন্থী পাষাণ-হৃদয় ছাড়া অবশ্য। অথচ যখন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ও আমি তাকে একরকম জোর ক'রেই সম্মেলনে গান করাই তখন ওস্তাদিপন্থীরা কী খাপ্পা! মিষ্ট গান ওস্তাদি আসরে! অথচ মজা এই টেকনিকের দিক থেকেও ওস্তাদেরা কেউ বালক চন্দ্রশেখরের ভুল ধরতে পারেন নি। "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" এ গোলমালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রেছি, শুধু এই ধরণের ওস্তাদি মনস্তত্ত্বকে বেআব্রু ক'রে দেখাতে।

দিনে ভুল্‌লে ত চল্‌বে না। বরেণ্য গায়ক শ্রীকৃষ্ণ রতন-জনকরেরও এ ধরণের সাধনা ছিল বটে; কিন্তু তিনি তাঁর "নৌকা পোড়াননি"—তিমিরবরণের মতন। য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীটিও হাতে রেখেছিলেন—কী জানি কি হয় ভেবে! কিন্তু তিমিরবরণ সব ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্‌মার ভরসা ছেড়ে, বন্ধু বান্ধব হিতৈষীদের অজস্র হিতোপদেশ ছেড়ে (শুধু মাত্র স্নেহময় দাদা মিহিরকিরণের উৎসাহকে সম্বল ক'রে) সুজলা সুফলা বাংলাদেশকেও ঠেলে, সেই সুদূর প্রবাসে একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। আজকের দিনে তাঁর এ নিষ্ঠা ও সঙ্গীতানুরাগের কথা যেন আমরা না ভুলি। ফুলের সৌরভে মুগ্ধ হবার সময় যেন বিস্মৃত না হই কত সাধনায় ও কী অক্লান্ত জীবনী-শক্তির গৌরবে তাকে প্রতিকূল মাটি থেকে রসসঞ্চয় ক'রে ফুটতে হয়। একটা বড় জীবনের বিকাশপথে যে কত দ্বন্দ্ব, কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত অশ্রুবেদনার পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকে, সে-খবর রাখে ক'য়জন; কিন্তু ঐখানেই কি অসামান্য প্রতিভার মহিমা নিহিত নয়?

তিমিরবরণকে অসামান্য প্রতিভা ব'লে অভিনন্দন করাটা হয়ত আজকের দিনে অনেকের কাছে অত্যুক্তি শোনাবে। বিজ্ঞজনে ঘাড় নেড়ে হয়ত বল্‌বেন: "এ বাড়াবাড়ি—ছোক্‌রার 'পার্ট্‌স্‌' আছে—এইমাত্র বড়জোর বলা চলে।" কিন্তু সত্যই এ আমার অত্যুক্তি নয়। তিমিরবরণের যা আছে তা পার্ট্‌স্‌ মাত্র নয়, তা প্রতিভার খাঁটি সোনা, সুরের দীপ্তশ্রী বিতরণের ক্ষমতা, সংহত প্রাণশক্তি। 'পার্ট্‌স্‌' সম্বন্ধে ভুল হয়—কিন্তু প্রতিভার জাতই যে আলাদা!···বম্বেতে যেদিন ঋষিকল্প সঙ্গীতসাধক পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রথম দেখি ও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই, সেদিন এ নবযুগের প্রধান সঙ্গীত-অধ্বর্য্যুর চরণে মন সম্ভ্রমে লুটিয়ে প'ড়েছিল। মাদ্রাজে যেদিন প্রথম আবদুল করিমের দরবারী কানাড়ার আলাপচারী শুনি, সেদিন তাঁর তানের অকল্পনীয় মৌলিকতা, সুরের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও বৈচিত্র্যের অফুরন্ত সম্ভারে মন ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়েছিল। লক্ষ্ণৌয়ে যেদিন প্রথম আলাউদ্দীনের পুরিয়া আলাপ শুনি ও তাঁর অনুপম মাইহার ব্যাণ্ডের সৃষ্টি-প্রতিভার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, সেদিন মন গৌরবে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল যে এমন একজন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের স্রষ্টা গুণী এ ওস্তাদি বাহ্বাস্ফোটপ্রপীড়িত, হৃৎশুষ্ককগমকবিভীষিকাকণ্টকিত, ধাধাতেহাই-পড়ন-আর্ত্তনাদ-ধমকিত সুর-দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দুর্ভাগা দেশেও কখনো কখনো পথ ভুলে দেখা দেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় জেগেছিল বোধ হয় সেইদিন যেদিন একটি লাজুক যুবককে নিয়ে আমার প্রতিভাবান্ তরুণ গায়ক-বন্ধু শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার কলিকাতায় আমাদের ওখানে এসেছিলেন। এত অল্প বয়সে স্বরোদের মতন বিপর্য্যয় যন্ত্র বাজাবে এ! দূর্। বোধ হয় আমার মুখচোখের চেহারা দেখে ব্যাপারটা এঁচে নিলেন—বন্ধুবর। আমার কানে কানে বল্‌লেন: "আগে শুনুনই ত!" আমিও তাঁর কানে কানে বল্‌লাম: "কিন্তু এই সর্ত্তে মনে রেখো যে ভাল না লাগলে ভদ্রতার খাতিরেও ভাল বল্‌তে পারব না—ও আমার ধাতে নেই

অভ্যাগত। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী। প্রোফেসর, আলাউদ্দীন খাঁন। তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

জানই ত! সমালোচনার ক্ষেত্রে রূঢ় সত্যপরতা আমার কাছে মিথ্যা শীলতার চেয়ে ঢের বেশি কাম্য।—আর এত অল্প বয়সে—মাত্র তেইশ চব্বিশে—কি আর যন্ত্রী হওয়া যায় হে! গান বরং করা চলে। গলাকে কায়দায় আনা অনেক বেশি সোজা—কিন্তু স্বরোদের মতন দুর্দ্ধর্ষ যন্ত্রকে কায়দায় আনা—ও এক আলাউদ্দীন হাফেজ আলিরই কর্ম্ম। নিরীহ ভদ্র তরুণ বঙ্গসন্তান কি আর ও পারে? যার কর্ম্ম তারে সাজে—অন্য জনে—" এমন সময়ে তিমির-বরণ পুরবী আলাপ ধরলেন। আমাদের জনান্তিকে কথাবার্ত্তা আর এগুল না।

প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে বাজালেন ঐ একটি রাগ! এই নিরীহ—লাজুক—ভদ্র বঙ্গযুবক!...আর কী অপরূপ ঢঙে—কী কল্পনা, দরদ, সৃষ্টির নির্ভীক পদক্ষেপে!!!... মনে আছে, সমস্ত রাত তিমিরবরণের বাজনা স্বপ্নে শুনেছিলাম; আকাশে বাতাসে তার এক একটি মিড়ের রেশ কান পেতে শুন্‌তে পেতাম যেন,—লিখি পড়ি কথা কই, কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব-সুন্দর ভঙ্গিমা, বাজাবার সময় তাঁর তন্ময়তা, ভাবে ভঙ্গীতে তাঁর অবনম্র দৃষ্টি, চালচলনে কোমল সৌকুমার্য্য ভেসে ভেসে ওঠে; সে এক অভিজ্ঞতা বটে! জীবনে বহু গানবাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। ছয় বৎসর বয়স থেকে ৺অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর গান শোনা সুরু করি। আর আজ আমার এই চৌত্রিশ বৎসর বয়স। কিন্তু বল্‌লে হয়ত অত্যুক্তির মতন শোনাবে যে এই প্রায় ত্রিশ বৎসরের গান শোনার অভিজ্ঞতায় এমন বিস্ময়ের রোমাঞ্চ বোধ হয় সবশুদ্ধ আট দশ বারের বেশি অনুভব করি নি। তিমিরবরণের চেয়ে ভাল বাজনা শুনি নি বল্‌ছি না; বা এমন কথাও বলি না যে অল্পবয়সী বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণীর মধ্যে অনুরূপ বিস্ময়জনক মনীষার দেখা মেলে নি। কিন্তু এই অল্প বয়সে যে স্বরোদের মতন দুরায়ত্ত যন্ত্রকে দিয়ে সুর মীড় মূর্চ্ছনা ও ছন্দের কথা কওয়ানো যায়, সুরের সৌন্দর্য্যের এ-ভাবে নিত্য-নব ফুল্‌কি কাটা যায়, আর সেটা এতখানি সাবলীল কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে, প্রাণশক্তির এতখানি উৎসারিত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে—এ আমি তিমিরবরণের বাজনা না শুন্‌লে কখনো কল্পনাই করতে পারতাম না। আজ তাঁর বিদেশযাত্রার উৎসব উপলক্ষে আমরা কেবল কামনা করি যেন যে-অসহ্য বিস্ময়ের ও পুলকের আনন্দ তাঁর বাজনা থেকে এর মধ্যেই সুর-রসিকরা পেয়েছেন, সে-আনন্দ দেবার ক্ষমতা তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সমৃদ্ধ হয়, গভীর হয়। বাইরের বাধার আঘাতে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি-উৎস তেজসঞ্চয় করুক, দীপ্তি অর্জ্জন করুক, বৈচিত্র্যলাভ করুক। এবং সর্ব্বোপরি—ওস্তাদির সস্তা স্তুতিবাদের লোভে তাঁর জন্মগত অধিকার—এই সহজ মিষ্টতা ও অলোকিক প্রেরণা—পথ না হারাক্, যশের মোহে সৃষ্টির উজ্জ্বলতাকে অমলিন রাখা যে সুকঠিন—এ চেতনা তাঁর অন্তরে চিরসমুজ্জ্বল থাকুক। যিনি সকল প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী সেই বীণাপাণির কাছেই যেন তিনি বরাবর প্রার্থী থাকৃতে পারেন—সেই শ্বেত-সরোজবাসিনীর সিত প্রেরণাকেই যেন জীবনের প্রতি ছন্দে প্রতি পদক্ষেপে প্রতি লীলালাস্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন! প্রার্থনা করি শ্রোতাকে যেন তিনি গ'ড়ে তোলেন, তাঁর অন্তরের গোপন লোকের রসধারায় স্নাত ক'রে, শুভ্র ক'রে, পূত ক'রে,—শ্রোতার ফরমাসে যেন নিজের প্রেরণার নির্দ্দেশকে অবহেলা না করেন—অর্থের লোভেও না, যশের লোভেও না, এমন কি সঙ্গীতের বহুল প্রচারের লোভেও না। আর সবচেয়ে শঙ্কাকুল চিত্তে তাঁর কাছে কাতর নিবেদন জানাই, যেন ভবিষ্যতে ওস্তাদদের দলে মিশে ও তাদের মন ভোলাতে গিয়ে কালোয়াৎ না ব'নে যান,—যেন চিরদিন আজকের মতন বিনয়গৌরবদীপ্ত সরল শিল্পীই থাকেন। ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের যে-সঙ্কীর্ণতার দরুণ আমাদের গৌরবময় সঙ্গীতকলা আজ নিষ্প্রভ- সে সঙ্কীর্ণতাকে, সে দাম্ভিকতাকে, অপরের কৃতিত্ব অস্বীকার করার সে মূঢ় প্রবণতাকে যেন তিনি আজীবন এড়িয়ে চল্‌তে পারেন।

এখানে একটা কথা একটু বিশদ ক'রে বলা হয়ত অবান্তর হবে না। অনেকে আমার সম্বন্ধে অনুযোগ ক'রেছেন যে, ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের আমি একটু বেশি আক্রমণ ক'রে অবিচার ক'রে থাকি।

আমার প্রথম বলবার কথা এই যে ওস্তাদদের আমি আক্রমণ করি না—as such; বস্তুতঃ আমার উদ্দিষ্ট ঠিক 'ওস্তাদ' নন্, আমার টার্গেট—'ওস্তাদি' ও তার আনুষঙ্গিক যত কিছু গ্রাম্যতা, বীভৎসতা, অসুন্দর দাম্ভিকতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি আছে সেই সব। আর এ

সবকে "বড় বেশি" আক্রমণ করা কি সম্ভব? যাঁরা সুরের দরদী তাঁরা ত মনে করেন সব নষ্টের মূল এই—ওস্তাদিকে অদ্যাবধি খুব কমই আক্রমণ করা হ'য়েছে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। বাস্তবিক পক্ষে, ওস্তাদি-রূপ সঙ্গীত আগাছাকে নিষ্করুণ ব্যঙ্গে উপ্ড়ে ফেলা প্রতি সুকুমারমতি কলানুরাগীরই একটা অন্যতম কর্ত্তব্য। কেন কর্ত্তব্য সে কথা "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা"য় ও অন্য বহু লেখায় বার বার বলেছি।

দ্বিতীয় কথা, ওস্তাদদের মধ্যেও যেখানে ভাল উচ্চমনা মানুষ দেখেছি, সেখানে তাঁর অকুণ্ঠ সুখ্যাতি ক'রেছি। যেমন আলাউদ্দীন, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চৌবে—কিন্তু ব্যস্—আর ত কই খুঁজে পাই না। বড় বিরল যে ও-সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চমনা লোক। ওরা যে কাউকে শেখাতে চায় না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, ভাল সুর ভাল মোচড় দেখিয়ে দিতে চায় না। যাকে ওস্তাদি ভাষায় বলে বাৎলাতে চায় না। এবং জানেও না—কেমন ক'রে শেখাতে হয়। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়—প্রায় প্রতি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরই বার-বার ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতা। তবে এ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা খানিকটা বিশদ ক'রে বলেছিলাম ১৩৩৩এর পৌষের উত্তরায়। তাতে ওস্তাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান্ কথা ব'লেছিলেন। তাই 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদককে অনুরোধ করছি যে সংখ্যায় এ-প্রবন্ধটি ছাপাবেন সেই সংখ্যায়ই যাতে সঙ্কলনের মধ্যে সে-প্রবন্ধটিও ছাপেন; কারণ তা থেকে সাধারণে অনেকটা বুঝতে পারবেন, ওস্তাদদের মধ্যে কোন্ গুণগুলি আমাদের অনুকরণীয় ও কোন্‌গুলি নয়; একটু পরিষ্কার হবে কেন তাঁদের প্রভাব আমাদের সঙ্গীতের সৌকুমার্য্যের 'পরে বিষাক্ত বাষ্পের মতন কাজ করেছে; বোঝা সহজ হবে কী কারণে ওস্তাদপন্থীর হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বীণাপাণির উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। আর সুকুমারমতি প্রতিভাবান্ গুণীর চেষ্টায় যে সঙ্গীতের নষ্ট গৌরব কত শীঘ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সে কথার ওপর জোর দেওয়ার জন্যেই, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীকৃষ্ণরতন দনকর, (ও আজ তিমিরবরণ) প্রমুখ গুণীদের দৃষ্টান্ত ও গুণপনাকে ক্রমাগত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে ধ'রেছি। সুরের সুষমা সম্বন্ধে বিরস ওস্তাদ ও নীরস ওস্তাদিপন্থীর গভীর অজ্ঞতা, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান-হীনতা, বিশ্লেষণ-অক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাকি কথা ঐ প্রবন্ধটিতেই পঠিতব্য। এ প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট হিসেবেই যেন 'ভারতবর্ষে'র সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেটি পড়েন।

কিন্তু একটি কথা এ প্রবন্ধে বলব যদিও যতটা বিশদ ক'রে বলতে চাই ততটা বিশদ ক'রে বলা চল্‌বে না—সেজন্যে একটি আলাদা বড় প্রবন্ধ লেখাই শ্রেয়ঃ। তবু

উদয়শঙ্করের নৃত্য (১)

এ-প্রসঙ্গের খানিকটা অবতারণা আজ করতেই হবে—কেন তিমিরবরণকে এত বড় মনে করি সেটা বোঝাতে।

কথাটা এই যে, ওস্তাদদের গুণের সম্মান করা উচিত এ-কথা বলাই বাহুল্য হ'লেও—তাঁদের গুণাগুণের মধ্যে কোন্‌টাকে গুণ বলব ও কোন্‌টাকে অগুণ বল্‌ব সেটা একটু নিষ্করুণ ভাবেই বিচার করবার সময় এসেছে। আর সে বিচার ওস্তাদেরা (বা ওস্তাদিপন্থীরা) করতে পারেন না—যেহেতু তাঁদের না আছে সমালোচনার শক্তি, না আছে খোলা মন, না আছে উদারতা, না আছে স্বাধীনচিন্তার শিক্ষা। থাক্‌বার মধ্যে তাঁদের আছে শুধু 'কস্‌রত' ও 'মেহন্নতের' প্রশংসনীয় ক্ষমতা। এখানে 'প্রশংসনীয়' কথাটি আমি ব্যঙ্গচ্ছলে

প্রয়োগ করি নি। 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা'-য় ওস্তাদদের এ কসরত ও মেহন্নতের ক্ষমতার শুধু যে অকুণ্ঠ সুখ্যাতিই ক'রেছি তাই নয়—সঙ্গীতসাধনায় এ অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠাকে যথেষ্ট বড় ক'রেই দেখেছি। কেবল সঙ্গে সঙ্গে এই প্ল্যাটিটিউডটিও একরকম দায়ে প'ড়েই বার বার উচ্চারণ করতে হ'য়েছে যে, শুধু কস্‌রত ও মেহন্নতে আর্ট সত্যিকার বড় হয় না, হ'তে পারে না। আর্ট ত শুধু টেকনিকের ওপর বিস্ময়জনক কর্তৃত্ব নয়—আর্টের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সহজ প্রেরণাই যে টেকনিকের মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। অথচ ওস্তাদেরা এই কথাটাই প্রায় ভুলে যান। পরমহংসদেবের একটি প্যারাব্‌ল মনে পড়ে।

উদয়শঙ্করের নৃত্য (২)

পোদো এক পোড়ো মন্দিরে অজস্র ময়লা ও চামচিকের আড়তে ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁকই ফুঁকছে—বিগ্রহ আছে কি না, না দেখে। তাতে একজন ভক্ত গেয়েছিলেন: "ওরে পোদো শাঁক ফুয়ে তুই করলি গোল, মন্দিরে তোর নেই মাধব।" ভাবটা এই (পরমহংস দেব ব'লেছিলেন) যে ভক্তি নেই, আত্মনিবেদন নেই, প্রাণপ্রতিষ্ঠা নেই, শুধু ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক ফুঁকলে কী হবে! আমাদের ওস্তাদদের সম্বন্ধে এই কথাটি অবিকল খাটে। গানের মধ্যে আসল জিনিষই নেই—তাঁরা শুধু ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক ফুঁকে হট্টগোল ক'রেই খুসিতে ভরপূর। ভাবেন বুঝি বীণাপাণি ওতেই তৃপ্ত হ'তে বাধ্য। "ভাব্‌বার কথা"য় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ে: "খাঁসাহেব বীণাপাণিকে কী ঠাওরান? ওতে যে আমরাই ভুলি না!"

তাই এখানে টান পড়ে সেই মূল প্রশ্নটি নিয়ে: উচ্চ সঙ্গীতের মধ্যে সত্য কলানুরাগীর কী খোঁজা উচিত? শুধু শাঁক ফোঁকা, না তার চেয়েও কিছু বেশি? গানবাজনার মূল্য দেব কোন্ বস্তুকে?—এবং বোধ হয় এইখানেই ওস্তাদিপন্থীদের সঙ্গে সুকুমার রসগ্রাহীর মূলগত —ফাণ্ডামেণ্টাল—মতভেদ—unbridgeable gulf; ওস্তাদদের তরফের কথা বারবারই বলা হ'য়েছে। আজ একটু সুকুমারপন্থীদের তরফের কথা বলি। প্রথমতঃ ওস্তাদিপন্থীদের একটি ভিত্তিহীন অভিযোগের উত্তরে দু'কথা বলা দরকার: ওস্তাদেরা ভেবে থাকেন যে সুকুমার-পন্থীরা সঙ্গীতে টেকনিককে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান। এ কথা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা একটু ভেবে দেখ্‌লেই বোঝা যায়। কারণ তাই যদি আমরা চাইব তবে ওস্তাদদের পাশ কাটিয়ে গেলেই ত চল্‌ত। তাহ'লে ওস্তাদদের কাছে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই বা যান কেন, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই বা যান কেন, শ্রীকৃষ্ণ, তিমিরবরণ প্রভৃতি আজকালকার ছেলেরাই বা যান কেন? যান কি শুধু এইজন্যেই নয় যে টেকনিকের দিক্ থেকে এমন অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এখনো ঐ অসুর-সাধক ওস্তাদদের কাছে আছে যা আয়ত্ত করতে পারলে সঙ্গীতের কলাকারুরও শ্রীবৃদ্ধি হ'তে বাধ্য। নইলে শত লাঞ্ছনা স'য়েও সঙ্গীতপিপাসু ঐ ওস্তাদদের কাছেই শিষ্যত্ব স্বীকার করতে যাবেন কেন?

বস্তুতঃ, ওস্তাদদের কাছে যে আমাদের অনেক কিছু শিখ্‌বার আছে এ-কথা সত্য ব'লেই ত এত ফ্যাসাদ। ওরা শেখাবে না, অথচ আমাদের শিখে নিতেই হবে। ওরা দেবে না পণ ক'রে ব'সে আছে—আমাদেরও পণ, আদায় করতেই হবে। নইলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ যে ওদের সঙ্গেই সমাধিস্থ হবে—যেমন অনেক রাগ রাগিণী,

তান আলাপ গান গৎ প্রভৃতি হ'য়েছে। (সৌভাগ্যক্রমে ওস্তাদদের কাছ থেকে নানা ফিকির ফন্দীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বহু গান উদ্ধার ক'রে নিয়েছেন ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর সে সবের দুয়ার খুলে দিয়েছেন সকলেরই জন্যে।* পণ্ডিতজীর গোয়ালিয়র ও লক্ষ্ণৌ স্কুল হ'য়ে অবধি ওস্তাদদের একচেটিয়া প্রতিপত্তির অনেকখানি ক'মেছে—যেজন্যে তাঁদের পণ্ডিতজীর ওপর এত রাগ। আমার এ কথা তাঁর মুখেই শোনা।) তাই যতটা পারা যায় ওদের কাছে শিখে নেওয়া দরকার—এ কথা প্রতি চিন্তাশীল মানুষই মান্‌তে বাধ্য।

কেবল এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ওস্তাদদের কাছ থেকে কি তাঁদের মনোভাবটিও নেব, না নেব শুধু রত্নটুকু, আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে? আমরা বলি—সুকুমারপন্থীদের আদর্শ হোন্ ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সঙ্গীতে স্বাধীনচিন্তায় সমগ্র ভারতের—পথপ্রদর্শক; অনুকরণীয় হোন্ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাউদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ, তিমিরবরণ—যাঁরা ওস্তাদদের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়েছেন—কুসংস্কার না; সুর নিয়েছেন—মল্লযুদ্ধ না; সৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়েছেন—গতানুগতিকতা না; স্বাধীনচিন্তা নিয়েছেন—সঙ্কীর্ণতা, অন্ধতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা না।

মোট কথা, সুকুমারপন্থীরা চান যে, সঙ্গীতে টেকনিক গানের অন্তর্নিহিত প্রেরণাটিকে মূর্ত্তই ক'রে তুল্‌বে—পদে পদে ব্যাহত করবে না। কাজেই তাঁদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে গানের টেকনিকটি শিখে ওস্তাদি গানের নীর থেকে ক্ষীরটুকু উপচয় করা, প্রবুদ্ধ লোকমত, রসজ্ঞ সমজদার গ'ড়ে তোলা, কুসংস্কারকে ছেড়ে প্রতি বিষয়ে গোড়া থেকে ভাব্‌তে শেখা, সঙ্গীতজগতে সাঁচ্চা-ঝুটোর মধ্যে তফাৎ করতে জানা। অধুনাতন ওস্তাদদের মধ্যে দুচার জন "খানদানী ঘর" ছাড়া ঝুটা মালের ব্যাপারীই বেশি—যাঁরা মণি দেখ্‌লে কাচ ভেবে বসেন ও কাচকে দেন মণির মূল্য। সুকুমারমতি গুণীকে হ'তে হবে মণিকার—এবং সেজন্যে যা স্বীকৃতমত তাকেই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা, আর যারই পক্ষে প্রশস্ত হোক্ না কেন তাঁর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য। এবং এক শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্তের পক্ষেই এ নতুন orientation দেওয়া সম্ভব। ওস্তাদেরা তাদের অভ্যাস ও ঐতিহ্যের চাপে নিস্তেজ পঙ্গু—তাদের কাছে sense of value আশা করা মূঢ়তা। তাই তিমির-

উদয়শঙ্করের নৃত্য (৩)

বরণের বাজনা শুন্‌তে শুন্‌তে বড় আনন্দ হয় দেখে যে ওস্তাদির গতানুগতিকতার মোহে sense of value তাঁর ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায় নি—যেমন অনেক অসতর্ক শিক্ষার্থীর প্রায়ই ঘ'টে থাকে। সব সত্য অনুরাগীরই ঐকান্তিক কামনা হোক্ যেন এই sense of value ওঁদের জীবনের পথে অক্ষয় হ'য়ে থাকে। কেন না কেবল তাহ'লেই সঙ্গীতে যা গ্রহণীয়, পূজার্হ, তা বড় হবার অবসর পাবে, অবান্তর কচায়ণ, দৌড়ঝাঁপ ও বাহ্বাস্ফোটে ভেসে যাবে না।

এবং ঠিক এই জন্যেই যে-সব নামজাদা ওস্তাদেরা তাঁদের অন্ধ দাম্ভিকতাবশে সঙ্গীত-জগতে কাম্য অকাম্য সম্বন্ধে

---

* আমি শুনেছি ওস্তাদ আলাউদ্দীনও না কি এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরকম উদার। মাইহারে নাকি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি শিষ্য আছে—ও তাদের সকলকে তিনি যে শুধু প্রাণ খুলে শেখান তাই নয়—তাদের কাছে অর্থমূল্যে বিদ্যা-বিক্রয় করেন না। স্বভাব-বিনীত উদার-স্বভাব আলাউদ্দীনের এ অপূর্ব্ব বদান্যতার জয়গান না করবে এমন লোক কে আছে—আজকের দিনে? শুধু আক্ষেপ হয়—যে এ বিষয়ে ওস্তাদদের মধ্যে তিনি প্রায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ বল্‌লেই হয়।

নিত্য ঠিকে ভুল ক'রে থাকেন, যে-সব কালোয়াতদের বধির কানে, অ-মরমী প্রাণে সঙ্গীতের সত্যতম সুন্দরতম

উদয়শঙ্করের নৃত্য (৪)

মহত্তম স্পন্দন কোনো সাড়াই তোলে না ; এক কথায় যে-সব সুরের পালোয়ান তাঁদের গতানুগতিকতা ও কল্পনার দৈন্যে সুরের প্রাণস্পন্দনটুকু খুইয়ে ব'সে আছেন, তাঁদের sense of valueকে আক্রমণ করা অত্যন্ত দরকার। অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গীতে যা সত্য বড় তাকেও বড়ই রাখতে হবে—শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্যে শিল্পীকে টেনে নামানো চল্‌বে না—(সবদেশেই যে আর্টের এ vulgarisation একটা অত্যন্ত ব্যাপক ট্রাজিডি সে সম্বন্ধেও পূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে)—কিন্তু তাই ব'লে লোকের কাছে বিজ্ঞ সাজার জন্যে যা মিথ্যা তাকে সত্য ব'লে প্রচার করলে চল্‌বে না—যাকে হুট্ করা উচিত তাকে বাহবা দিলে চল্‌বে না। সাধারণকে তোষামোদ করাও যেমন বর্জ্জনীয়—ওস্তাদদের সব দাবী-দাওয়ায় ঢেরা সই করাও ঠিক তেম্‌নিই দূষণীয়।

এই জন্যে যাঁরা নিরীহতাবাদী, শীলতাবাদী, নীরবতাবাদী তাঁদের সঙ্গে সত্য সঙ্গীতানুরাগীর সত্য কলাবিলাসীর এক-মত হওয়া একান্ত অনুচিত। যা মন্দ তার সম্বন্ধে শীলতার খাতিরে নীরব থাকলে মন্দের আগাছা কচুরিপানারই মত বেড়ে ওঠে ও কন্‌ফারেন্সে ফার্ষ্ট প্রাইজ পায়। * হাভেলক এলিস তাঁর Dance of Lifeএ এক স্থলে লিখেছেন যে, ভাল লোক যেন শুধু ভালভাবে নেচেই ক্ষান্ত থাকেন ; তাহ'লেই মন্দ লোপ পাবে। ক্ষুরধারবুদ্ধি বার্ট্রাণ্ড রাসেল New Leaderএ সেন্টিমেন্টাল কথাটির উত্তরে ব্যঙ্গের সুরে লিখেছিলেন যে, দুর্ভাগ্যবশে এ সংসার ঠিক্ ফুলের বাগান নয়। বাইবলের মধ্যে যদি কোন সত্য কথা লেখা থাকে তবে সেটা এই যে শয়তান ব'লে জীবটি সংসারের অলিকে গলিতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন ; কাজেই সুন্দরকে বাঁচতে হ'লে অসুন্দরের বিরুদ্ধে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তেই হবে—শুধু নেচে চল্‌তে যে চায়, সে সত্বরই দেখবে যে সব বাগানই আগাছায় ছেয়ে গেছে, নাচবে কোথায় ?

এলিসকে রাসেল একটু তীব্রভাবে আক্রমণ ক'রেছেন বটে কিন্তু তাই ব'লে কথাটা ত আর মিথ্যা নয়—বর্ণে বর্ণে সত্য যে। জীবনের দিকে একবার তাকালেই কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় না (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়)

হায়রে অস্তির চাইতে নাস্তি বেশি, সৃষ্টির চাইতে শূন্য !
আর ঐ বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য ?
হায়রে সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশি, ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র !
আর ঐ ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশি, পূজার চাইতে মন্ত্র !
হায়রে ফুলের চাইতে পত্র বেশি, মণির চাইতে কর্দ্দম !
আর ঐ স্বপ্ন ক্ষান্তির পরেই ভার্য্যার তর্জ্জন গর্জ্জন দুর্দ্দম !

কথাটাকে সুরানুরাগীর আক্ষেপের ভাষায় বল্‌তে গেলে একটু আধটু বদ্‌লে দিলেই চলে :

হায়রে সুরের চাইতে অসুর বেশি, গমক চাইতে ধমক !
আর ঐ রাগের শান্ত চিন্তার চাইতে—হুহুঙ্কারের চমক !
হায়রে গুণীর চাইতে বেগুণ বেশি, ঝঙ্কার চাইতে চিৎকার !
আর ঐ পূজার চাইতে নিত্যই বেশি বীণাপাণির সৎকার।
ওস্তাদ প্রাণকাড়া তান চাইতে ছিট্‌কান্ মল্লযুদ্ধের কর্দ্দম।
আর ঐ ওস্তাদিরই নামে চালাও তর্জ্জন গর্জ্জন দুর্দ্দম !

তাই ফের বলি যে ভরসা রাখ্‌তে হবে আমাদের

* সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গীতে প্রবুদ্ধ লোকমতের পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে আল্লাবন্দেখাঁর অসহ্য গমকার্ত্তনাদের প্রতিপত্তি কমবে। ১৯২৫এর লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে গতানুগতিক ওস্তাদিপন্থীদের ভ্রূভঙ্গীতেও লোকে ভয় পায় নি—আল্লাবন্দেখাঁও তাঁর পুত্র সঙ্গীতরতন আলিখাঁর অসহ্য টি—টি—টি—টি রূপ গমকে শ্রোতারা ক্ষেপে উঠে ওঁদের হাততালি দিয়ে থামিয়ে দেয় ও তাঁরা রেগে সভা ত্যাগ করেন।

ওস্তাদদের কাছে নয়—ওস্তাদিপন্থী বিজ্ঞদের কাছেও নয়—ভরসা রাখ্‌তে হলে শ্রীকৃষ্ণ তিমিরবরণের মতনই তরুণ সুরসুন্দরদের কাছে। এঁদেরই ওপরে যে আজ ভার প'ড়েছে—শ্রোতা গঠনের! ওস্তাদেরা ত শ্রোতা নন। সুন্দর গান বাজনা শুন্‌বেন বা বুঝবেন তাঁরা কেমন ক'রে! গান বাজনায় যে উৎক্ষেপ-প্রক্ষেপের এঁরা পক্ষপাতী, যে মল্লযুদ্ধে আজন্ম অভ্যস্ত, তিমিরবরণ ত তা দিতে পারবেন না।

বলা বাহুল্য যে এসব মন্তব্য সব ওস্তাদদের সম্পর্কে খাটে না। ওস্তাদদের মধ্যেও আলাউদ্দীন, আবদুল করিম, মোরাদ খাঁর মতন সুরসাধক আছে। কিন্তু one swallow does not make a summer; তাই ব্যতিক্রম আছে মেনেও, ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আমার বাহাল রইল যে আমাদের সঙ্গীত তাঁদের হেফাজতে পড়ার দরুণ উত্তরোত্তর অবনতির পথেই চ'লেছে। আর বার বার এ-আক্ষেপ করা দরকার; ওস্তাদেরা গান-বাজনায় যে সব গুণপনা ও যে-ধরণের "মেহন্নতকে" মূল্য দেন তার মূল্য খর্ব্ব করা দরকার; সঙ্গীতে প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে তোলা দরকার। ওস্তাদদের কাছে যতটা পারা যায় শিখে নিতেই হবে—ছলে বলে কলে কৌশলে—যেমন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নিয়েছেন—কিন্তু সেটা তাঁদের গড্ডালিকাপ্রবাহে গা-ভাসিয়ে দিয়ে তাঁদেরই একজন হ'তে নয়—আমাদের উচ্চসঙ্গীতে উৎকর্ষের একটা নতুন ষ্টাণ্ডার্ডের প্রবর্ত্তন করতে। * আসরের পর আসরে গিয়ে ওস্তাদ ও তজ্জাতীয় সমজদারের তাণ্ডব-লীলা দেখে শুনে যিনিই হতাশ হ'য়েছেন তিনিই জানেন গানের এ-ধরণের ব্যভিচারের আদর হওয়ার জন্যে কুশ্রী ষ্টাণ্ডার্ড কতখানি দায়ী। সেইজন্যে সুরের মল্লযোদ্ধার প্রতি সম্ভ্রমকে ব্যঙ্গে, আক্রমণে, অনাদরে যেটায় হোক্ নাশ করা এত দরকার হ'য়ে প'ড়েছে আজকের দিনে। নইলে সঙ্গীত-জগতে নতুন orientationএর আশা সুদূরপরাহত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য জন্মালেও আমরা অনাদৃতই থেকে যাবো। বড় শিল্পীর বিকাশ সম্ভব হয় না যদি খানিকটা আনুকূল্যও তাঁদের না জোটে! বড় দুঃখেই রসজ্ঞ বন্ধু সোমনাথ মৈত্র সেদিন লিখেছিলেন যে উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা দেখে মনে হয় তবু যাহোক্ কখনো কদাচিৎ এ ওস্তাদ-কণ্টকিত যুগেও এক আধজন এমন সত্য গুণীর দেখা মেলে যার স্তব-গান ক'রে আশা মেটে না।

খুব সত্য কথা। এবং আরও আনন্দের কথা এই যে উদয়শঙ্করের মতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভার সঙ্গে তিমিরবরণের মতন উদীয়মান্ প্রতিভার যোগাযোগ এ-যুগে মাঝে মাঝে সম্ভব হয়। এই দুই তরুণ মনীষীর সঙ্গত যে শুধু মণি-কাঞ্চন সংযোগ তাই নয়—য়ুরোপ এই শ্রেণীর সুকুমারমতি মনীষারই অপেক্ষায় র'য়েছে। আমরা এ-দুই উদীয়মান্ তরুণ শিল্পীর সর্ব্বাঙ্গীন জয়যাত্রা কামনা করি:

ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদু রেণুরম্যাঃ।
শান্তানুকূলপবনাচ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

পদ্মের পরাগে ধূলি কোমল হোক, শান্ত অনুকূল বাতাসে পথ শিবময় হোক্।

পরিশেষে এঁদের য়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বদিনে উদয়শঙ্কর আমাকে বম্বে থেকে যে-একটি চিঠি লেখেন সেটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত ক'রে দু একটি কথা বল্‌তে চাই। কারণ এতে শুধু তিমিরবরণের নয়—উদয়শঙ্করেরও একটি বড় সুরে সুন্দর সহজ বিনয় ও রসগ্রাহিতা ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন:

* উদাহরণতঃ, সদৃশ রাগের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টান্‌তে পারাটা একটা বড় কৃতিত্ব নয়—কেন না ওর কৃতিত্ব সৃষ্টির কৃতিত্ব নয়, বৈয়াকরণিকের কৃতিত্ব মাত্র। পরে একটি প্রবন্ধে আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলার চেষ্টা করব। আজ শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বা আলাউদ্দীনের মতন একটি নূতন রাগ সৃষ্টি করতে পারা, শেখাবার একটি নূতন পদ্ধতি প্রচলন করতে পারা, ছাত্রদের মধ্যে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারা, নতুন তানের সৃষ্টি করতে পারা, নতুন ঢঙের গান তৈরী করতে পারা (যেমন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ বা কাজী নজরুল ইস্‌লাম)—এই সবই হচ্ছে সৃষ্টিমূলক গুণপনা। সংস্কৃত শাস্ত্র ঘেঁটে নজীর বাহির করা, বার রকম তোড়ী, আঠার রকম কানাড়া, তের রকম সারং—এ-সবের মধ্যে চুলচেরা শ্রেণীবিভাগ করা—এ-সবের তাত্বিক বাড়ে কেবল তখনই যখন গুণীর সৃষ্টির স্রোতে ভাঁটা পড়ে। এক সুরে পাঁচশ ধ্রুপদ খেয়াল শেখার চেয়ে—নতুন সুরে পাঁচটি গান সৃষ্টি করতে পারা ঢের বড় শ্রেণীর কৃতিত্ব। কিন্তু ওস্তাদেরা দাম দেন পুঁজির—কল্পনার নয়। এই ধরণের নতুন ষ্টাণ্ডার্ড চাই সুকুমারপন্থীদের কাছ থেকে।

"I regard myself as lucky in having Timirbaran with me. I have been travelling throughout India for the last seven months, but was never so much impressed as by his music. He is really wonderful with his sarode. When I came to India I never dreamt of a decent Indian orchestra, but Timirbaran's orchestra that lately accompanied my dances in Calcutta made me change my mind. I only hope there will be more parties than that."

চিঠিটা পড়তে পড়তে মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে যে সে-কবি লাখ কথার এক কথা ব'লেছিলেন যিনি ব'লেছিলেন: "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।" * যে অলোকসামান্য শিল্পীর নবনবোন্মেষশালিনী নৃত্য-প্রতিভা স্বয়ং আনা পাভিলোভার মতন বিশ্ববিজয়িনী নর্ত্তকীকেও বিস্মিত করতে পারে; যে-ছন্দসুন্দরের গুণপনায় পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত; এ মেকি ও ভেলের যুগে যাঁর মৃতসঞ্জীবনী যাদুদণ্ডে মুমূর্ষু ভারতীয় নৃত্যকলাও জেগে ওঠে—এ বিনয় তাঁকেই সাজে ও তাঁতেই সম্ভব। উদয়শঙ্কর জহুরি ব'লেই জহর দেখেই চিন্‌তে পেরেছেন ও এমন মনোজ্ঞ বিনয়ের সঙ্গে বল্‌তে পেরেছেন যে তিমির-বরণকে সতীর্থ হিসেবে পাওয়াকে তিনি তাঁর সৌভাগ্য বিবেচনা করেন। তিনি যদি ওস্তাদমাত্র হ'তেন বা বিজ্ঞ বঙ্কিমগ্রীব সমালোচক মাত্র হ'তেন, তাহ'লে অজ্ঞাত অখ্যাত তিমিরবরণের এ-ভাষায় সুখ্যাতি করতে তাঁর মন সরত না;—তিনি খুঁজতেন নজীর, খুঁজতেন পাঁচজনের সার্টিফিকেট, খুঁজতেন চল্‌তি ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ধ্রুবতারা। একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতেন: "কেমন হে? মন খুলে সুখ্যাতি করব না কি? না, পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে দুটো উৎসাহের কথা ব'লেই ক্ষান্ত হব?"

আর ওস্তাদ ও ওস্তাদপন্থীদের মতামত জিজ্ঞাসা করলে যে কী উপদেশ পেতেন, তা কল্পনা করা শক্ত নয় নিশ্চয়ই।—"তিমির! সর্ব্বনাশ! ওর বাজনার আবার সুখ্যাতি করবে কি বল? ওকে যে জন্মাতে দেখ্‌লাম হে এই সেদিন! বাজনা আবার ও শিখল কবে হ্যা? পারে ও গন্‌গন্‌ খাঁর মতন দীপক বাজিয়ে জলে আগুন ধরাতে? না, পারে বাদলউদ্দীনের মতন মল্লার গেয়ে শাহারায় বৃষ্টি নামাতে? হঁ্যা, গানবাজনা শুনেছিলাম বটে সেই রামভরোস কিকড়সিঙের বাড়ীতে। গান তাকেই বলে, বুঝলে হ্যা! রসুলাল্লা মহশাল্লা বক্স ঈশানমুখী হ'য়ে ব'সে গাইতে গাইতে যখন নৈঋ'ত মুখে গান শেষ করলেন তখন যে সে কী কাণ্ড!—দেখা গেল যে গোটা গাল্‌চের সঙ্গে জাজিমটা ফুলদানি শুদ্ধ তাঁর কোলের ওপর উঠে এসেছে!! নাদব্রহ্মের এ মহিমা দেখাবে দুধের ছেলে তিমির!!! হুঁ:—"

এ আমার আর্ত্তরঞ্জন নয়—আমাদের ভূয়োদর্শী ওস্তাদ-বর্গ ও ততোঽধিক সূক্ষ্মদর্শী ওস্তাদিপন্থীদের বোলচাল এর চেয়েও হসনীয়, অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাঁরা নিজেরা জানেন না কী প্রলাপ তাঁরা বকেন!

অপর প্রবন্ধে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কয়েকটি গল্পে ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকা যে পরিচয় পাবেন। ওস্তাদদের মুখে এরকম বহু অক্ষরে অক্ষরে সত্য লোমহর্ষক কাহিনী নিত্যই শোনা যায়, সুরব্রহ্মের চিরন্তন মহিমা যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সকলেরই ধারণা যে সুরব্রহ্ম কেবল তাঁদের ঘরোয়ানি চীজ্‌—বাকি সব কম্‌বখ্‌ত।

ওস্তাদ সম্প্রদায়ের এ-ধরণের ফাঁপা বুলির উল্লেখ করার কারণ গোড়ায়ই ব'লেছি: তিমিরবরণের

* প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়ার সুবিখ্যাত সঙ্গীত-কণ্ডাক্টর Leopold Stokoswki-র কথা। যখন বছর আড়াই আগে তিনি কল্‌কাতায় আসেন তখন আমাদের ওখানে গান-বাজনার আসরে তিমিরবরণের স্বরোদ তাঁকে শোনান হ'য়েছিল। তার পরে তিনি আমাকে গোয়ালিয়র থেকে একখানি চিঠি লেখেন যে তিমিরবরণের স্বরোদ যে তাঁর মনের মধ্যে কি গভীর অনপনেয় ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে তা তিনি ভাষায় বর্ণনা করতে অপারগ; ভারতীয় সঙ্গীত যে মানুষের কত বড় কীর্ত্তি তার পরিচয় এই রকম দুচারজন অসামান্য শিল্পীর কাছেই তিনি পেয়েছেন; এ তরুণ যুবক যদি কখন আমেরিকায় পদার্পণ করেন তখন যেন সর্ব্বাগ্রে তাঁকে জানানো হয়—তিনি দেখাবেন এ-শ্রেণীর গুণীর সম্মান করতে হয় কেমন ক'রে—ইত্যাদি ইত্যাদি। জয়পুরে গহরবাইএর গান শুনতে ব'লেছিলাম তাঁকে। সে গানও তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত ক'রেছিল। সুর সম্বন্ধে এ গুণীর সহজ অন্তর্দৃষ্টি দেখে আমরাও সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছিলাম।

একজন অনুরাগী উচ্চ সমজ্‌দার সেদিন দুঃখ ক'রে আমাকে চিঠি লিখেছেন যে ওস্তাদিপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে যত সব অপবাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু যিনি সত্য শিল্পী এতে দুঃখ করলে ত তাঁর চল্‌বে না। নিন্দা, অপবাদ, বিরুদ্ধতা এ-সবের মধ্য দিয়েই যে তাঁকে পথ কেটে চল্‌তে হবে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের জীবনী কি তিমিরবরণ জানেন না? আর বাধারই বা এখন হ'য়েছে কি? এই ত সবে কলির সন্ধ্যা! তিমিরবরণের জানা দরকার যে তাঁর বিরুদ্ধে একদিকে দাঁড়াবে ঐ পূর্ব্বোক্ত বোলচাল-সম্বল অজ্ঞের দল, অপরদিকে—গতানুগতিক বিজ্ঞের দল। বহু অবান্তর কচায়ণ তুল্‌বে তারা, একজন শুধু বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লেই তাকে টেনে নিজেদের নগণ্যতার স্তরে নামাতে চাইবে তারা, অন্ধকারের দূত হ'য়ে আলোর আবাহনের বিরুদ্ধে জোটবেঁধে দাঁড়াবে তারা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ,
এই তব রুদ্রের প্রসাদ!

কিন্তু তিমিরবরণ এ-সব বাধা তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার দুনিবার গতিতেই অতিক্রম ক'রে যাবেন এ আমাদের একান্ত কামনা ও ধ্রুব বিশ্বাস।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহুমুখী স্রষ্টা যন্ত্রী আলাউদ্দীন যাঁর গুরু, তরুণ বয়সে বিস্ময়কর সাধনা যাঁর পাথেয়, গুরুপ্রদর্শিত পথে বালকবালিকা দিয়ে নূতন ধরণের অরকেষ্ট্রা গঠন করতে যিনি সক্ষম, বিনয় যাঁর ভূষণ, শ্রদ্ধা যাঁর সম্বল, সৌকুমার্য্য যাঁর অঙ্গরাগ, তন্ময়তা যাঁর চির সহচর—ও সর্ব্বোপরি বীণাপাণির চরণ যিনি আশৈশব ভক্ত হৃদয়ের সবুজ অনুরাগ দিয়ে অর্চ্চনাপরায়ণ—বাধা তাঁর কী করবে? অরসিকের অদূরদর্শী সমালোচনা তাঁকে ব্যাহত করবে কেমন ক'রে? একজন চিন্তাশীল লেখক সত্যই ব'লেছেন: "No man can be written out of reputation but by himself." নিন্দুকে তিমিরবরণের কোনো সত্য ক্ষতিই করতে পারবে না কখনো—নিন্দা অপবাদে প্রতিভার কখনো স্থায়ী ক্ষতি হ'তেই পারে না। কেবল তিমিরবরণ যেন তাঁর ভিতরের তাগিদের কাছে খাঁটি থাক্‌তে পারেন, এই তাঁর অনুরাগিবৃন্দের একমাত্র কামনা। শুধু সস্তা চমক লাগিয়ে বাইরের পাঁচজনের কাছে বড় হবার মতি যেন তাঁর কখনো না হয়—এই তাঁর বন্ধুবর্গের নিবেদন। এবং শেষবার বলি—কারণ এইটেই সবচেয়ে বড় কথা—তিনি যেন ওস্তাদ বনে না যান—যশের সস্তা লোভে। শিল্পী হৃদয়ের কবোষ্ণ অনুভূতিই যেন তাঁর ধ্রুবতারা হয়। গুণী, সঙ্গীতকার, ভাবুক, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় তিমিরবরণকে বলি যেন শিল্পসৃষ্টির এই চরম কথাটি তিনি কখনো না ভোলেন:

"মহাবিশ্ব অনুকম্পায় ক্ষুব্ধ হয় নি যাহার প্রাণ;
গাইতে হয় না রুদ্ধ কণ্ঠ মিথ্যা তাহার গাওয়াই গান!
হোক্ না সুন্দর স্বরের ভঙ্গী হোক্ না শুদ্ধ তাল ও লয়,—
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার তাহার সেই গান গানই নয়।

সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণের, ওষ্ঠ, অক্ষির আকার ভেদ;
গ্রীবা, গণ্ডের প্রকার মাত্র;—সে ত শুদ্ধই অস্থিমেদ!
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি মুখের সেব্য—প্রেমের নয়,—
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি সে-সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।

কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধ—মিষ্ট শব্দের কথার হার;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার তাহার কাব্য শব্দসার!
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত ঝঙ্কারিত—কবির প্রাণ,—
উৎসারিত মহাপ্রীতি;—তাহাই কাব্য, তাহাই গান!

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী, রত্নপ্রভা

(২৩)

ব্রহ্মচারী অন্তরে অন্তরে শিহরিলেন! সত্যই ত, তিনি নিজের সম্বন্ধে কি করিতেছেন? যাঁহাকে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, অন্ধ বিশ্বাসে যাঁহার মতবাদের নিকট আত্ম-সমর্পণে উদ্যত হইয়াছেন, সে অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে একবারও কি চোখ চাহিয়া দেখিবার কিছু নাই? সে মতবাদের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র এবং যথার্থ মহাজনগণের আচার-ব্যবহারের কি কতখানি মিল বা গরমিল, সেটা বিচার করিয়া বুঝিবার কিছু নাই? এ কি ভ্রান্তি? এই জ্ঞানহীন, বিচারহীন, নির্ব্বিকার অন্ধ ভক্তি তাঁহাকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে?

উৎকণ্ঠায় ব্রহ্মচারীর মন অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত, স্থির রাখিলেন। স্বামিজীর অনেক দিনের অনেক দুর্ব্বোধ্য রহস্যময়, আচরণ মনে পড়িল। সেগুলা অন্ধ ভক্তির দিক হইতে ব্রহ্মচারী এত দিন এক রকম দেখিয়াছেন,—আজ মনে হইল, সে দেখা ভুল হইয়াছে। শুধু অন্ধ ভক্তির অন্ধ বিচারই কি সব? যুক্তির দিক হইতে, নীতির দিক হইতে. মানব-জীবনের উন্নততর, পবিত্রতর আদর্শের দিক হইতে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দিক হইতে সেগুলা বিচার করিলে, কি পাওয়া যায়?

নিজের এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজিতে গিয়া ব্রহ্মচারী আরও ভীত হইলেন। অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে আজ মনে পড়িল, স্বামিজীর সঙ্গ-মাহাত্ম্যে তিনি নির্ব্বিচারে একটা উৎকট উল্লাস অনুভব করেন, সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর সাধন-জীবনের কি ক্ষতিই না হইতেছে! স্বামিজীর অদ্ভুত প্রহেলিকাময় বাক্য ও ব্যবহারের কুহকে ব্রহ্মচারীর নিজের মধ্যে যে বার বার ব্রত বিরোধী মনোবিকার আবির্ভূত হইতেছে! স্বামিজী অবশ্য তাঁর স্বাভাবিক চাতুরী ও সুমধুর বাক্যচ্ছটায় ব্রহ্মচারীকে অভিভূত করিয়া তার কারণ অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী নিজে ত বুঝিতে পারেন, তাঁর আত্ম-সংশোধনের চিরাভ্যস্ত শক্তি আজকাল কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে! অবস্থা-বিপর্য্যয়-দ্বন্দ্বে আজকাল অনর্থক বিরক্তি-রূঢ়তার উত্তেজনায় নিজের কত শক্তিহানি করিতেছেন! আদর্শনিষ্ঠা শিথিল হইয়াছে; উচ্চ চিন্তার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। সাধকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সুপবিত্র মানসিক শান্তি-স্থিরতা আজকাল ত নাই বলিলেই চলে। এ ক্ষতিগুলা যে ব্রহ্মচারী আজ প্রথম বুঝিতেছেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে মন স্থির হইলে আত্মানুশীলন করিয়া দেখেন; নিজের ত্রুটিগুলি, অবনতিগুলি বেশ ভালরূপে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তার মূল কারণ কি,—সেটা বিশেষ রূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া একটা নিশ্চিন্ত সমাধানের অঙ্কে পৌছিতে সাহসও হয় না, শক্তিও পান না। কেমন একটা অস্বাভাবিক অবসাদ-জড়তা, তাঁর অন্তর্নিহিত সমস্ত উচ্চ ক্ষমতাকে যেন চাপিয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মচারী অনেক ক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, অনেক ভাবিলেন। শেষে জোর করিয়া সমস্ত দুশ্চিন্তা ঠেলিয়া শুষ্ক ম্লান হাস্যে বলিলেন "তুমি কি মনে কর? তিনি কি আমার ওপর আভিচারিক শক্তি প্রয়োগ কয়্ছেন?"

ব্রহ্মচারিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন "তাঁর চিঠিখানার খাতিরে, না-হয় স্বীকার কয়্ছি, সে ক্ষমতা তাঁর আছে। হীন স্বার্থের খাতিরে সে ক্ষমতার অপ-প্রয়োগও তিনি করে থাকেন, তাও হয় ত অসম্ভব নয়। পৃথিবীর আব্‌হাওয়া বড় খারাপ! অনেক উচ্চ অবস্থায় উঠে, এক মুহূর্ত্তের মতিভ্রমে মানুষ লোভের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে। আমারি কোন্ দিন কি মতিভ্রম হবে কে বল্‌তে পারে?"

তিনি থামিলেন। ব্যথিত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "কিন্তু তুমি যা সন্দেহ

করছ, তা যুক্তি-বিচারে টেকে কই ? আমি পুরুষ মানুষ। আমায় নিয়ে তিনি করবেন কি ? তাতে আমি সম্বলশূন্য ফকীর ! ধন-সম্পত্তি নাই, থাকলেও—"

সহসা কি যেন মনে পড়ায় ব্রহ্মচারী নিজের মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। এবং বলিতে না পারার যথার্থ হেতুটা গোপন করিবার জন্য টানিয়া টানিয়া খানিক কাসিলেন। একটা ঘোর দুশ্চিন্তার অন্ধকারে তাঁর ললাটদেশ আচ্ছন্ন হইল। দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া আত্মদমন করিলেন। পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে বলিতে লাগিলেন "ধন-সম্পত্তি থাকলেও না-হয় বুঝতাম, সেইগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেই আমায় বশীভূত করছেন। কিন্তু তা' তো আমার নেই। আমার ওপর খামকা শক্তির অপব্যয় করে তাঁর লাভ কি ? বরঞ্চ তোমার মত অবস্থার মানুষদের ওপর—"

ওই পর্য্যন্ত বলিয়াই ব্রহ্মচারী ত্রস্তে রসনা সংযত করিলেন। ম্লান হাস্যে অনুনয় করিয়া বলিলেন "অপরাধ নিও না। আলোচনা স্থলে, আমি কথার-কথা হিসাবেই বলছি। অবশ্য এত বড় গর্হিত কায তাঁর দ্বারা—" তিনি থামিলেন। নিজ মনেই মাথা নাড়িয়া যেন নিজের কাছে বার-বার অসংশয়ে স্বীকার করিতে লাগিলেন, "এ হইতে পারে না, হইতে পারে না।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এত বড় গর্হিত কায তাঁর নৈতিক-বুদ্ধি বা ধর্ম্ম-জ্ঞানে আটক খায়, এ বিশ্বাস এখনো রাখো ? কিন্তু ভুল ব্রহ্মচারী,—আমি নিজে প্রামাণ্য সাক্ষী !"

ব্রহ্মচারী ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেন ! বিস্ময় ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া, স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন "তুমি নিজে ? অর্থাৎ ? তোমার ওপরও তিনি চাল চেলেছিলেন ? তোমার ওপরও শক্তি-প্রয়োগে নিরস্ত হন নি ?"

যোড় হাত করিয়া শান্ত, অচঞ্চল কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "প্রত্যক্ষ সত্যও, পাত্র বিশেষের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ। বিশেষতঃ স্বয়ং রাহু এখন তোমার মাথায় চড়ে বসে আছেন, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধিকে আমি ভয় করি। যদি সময় আসে, ভবিষ্যতে সে কথা প্রকাশ করব। এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর না।"

রুদ্ধশ্বাসে প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন "কিন্তু কোন্ বিষয়ের কথা হচ্ছে, তার গুরুত্ব বুঝে তুমি সাবধান হও। তিনি যদি সত্যিই ভুল করে থাকেন, করুন। কিন্তু তুমি যেন ভুল বুঝে, তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা মনে স্থান দিও না। জানো তার দায়িত্ব ?"

শান্ত, ধীর কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "জানি। যতক্ষণ ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে সমস্ত প্রমাণ না দেখিয়েছেন, ততক্ষণ সব অবিশ্বাসকে আমিও অবহেলা করেছি। কিন্তু এবার তোমায় সতর্ক করা বড় দরকার ; তাই প্রত্যক্ষ সত্যের আভাস মাত্র প্রকাশ করলুম। তুমি অন্ধ বিশ্বাসে, আত্মহারা হয়ে, অনেক—অনেক দূর চলে গিয়েছ। স্বীকার কর, আর না কর, আমি বুঝতে পারি—তুমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছ। আরও ভয়ানক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।"

ব্রহ্মচারী মৌন হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে গভীর বিষাদ-ভরা কণ্ঠে, সংশয়ের সহিত বলিলেন "হয় ত তা সত্যি। কিন্তু তিনি তোমার ওপর আভিচারিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন, এটা যে বিশ্বাসে কুলোয় না। তিনি জ্ঞানবান পণ্ডিত,—তুমি যে তাঁর কাছে কন্যাস্থানীয়া—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "থাম ব্রহ্মচারি। তত্ত্বজ্ঞানের উপাসক নর-দেবতা বিবেকানন্দ পৃথিবীটা যে চোখে দেখেছিলেন, কুৎসিত প্রবৃত্তির উপাসক নর-পশুরা পৃথিবীকে সে চোখে দেখে না।"

পরক্ষণে নিজের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "হরিবোল, হরিবোল ! মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করে, পরের উপদ্রবটা উপলক্ষ্য মাত্র। পরের দোষ-ত্রুটি, দুর্ব্বলতার কাহিনী নিয়ে রসনাটি বেশ কলুষিত করছি, আর সহ্য হচ্ছে না। রাতও হয়েছে, অনুমতি দাও, উঠি এবার।"

তিনি উঠিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন "একটু থাম। একটা কথা বল।"

"কি ? স্বামিজী কি ভাবে শক্তি-প্রয়োগ করেছিলেন ? আমি কি করে তা টের পেয়েছিলাম ? ক্ষমা কর ব্রহ্মচারি, যা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নয়, আমি তা প্রকাশ করতে পারব না।"

"আমার কাছেও নয় ?"

"না। অন্ততঃ যত দিন না তোমার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হবে, তত দিন নয়।"

ব্রহ্মচারী নিজের মনেই মৃদুস্বরে বলিলেন "মনটা এম্নি অধঃপাতেই গেছে বটে! কিন্তু উপায় কি?"

তার পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আর একটা কথা বল। তুমি সে শক্তি-স্রোতকে ঠেকালে কি করে?"

ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিত-মুখে বলিলেন "বিবেকানন্দ স্বামীর বাণী মনে পড়ে? 'সেই সব জিনে, নিজে জিনে যেই—!' তুমিও ত জানো ব্রহ্মচারি,—

"যো যা'কু শরণ লিয়ে, সো রাখে তা'কু লাজ
উলট্ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ!"

মাছ অত্যন্ত ক্ষীণ-প্রাণ জীব, কিন্তু সে জলের শরণ নিয়ে থাকে বলে, জলস্রোতের উণ্টা মুখেও স্বচ্ছন্দে চলে যায়। কিন্তু মহাশক্তিশালী গজরাজ তুমি, করছ কি?"

বিস্মৃতির যবনিকা ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মচারীর অন্ধকার চিত্তাকাশে সহসা যেন তীব্র আলোক-রশ্মিপাত হইল! ক্ষণেকের জন্য তিনি স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে বলিলেন "ইঙ্গিতটার জন্য ধন্যবাদ। মনটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটু সাহায্য করবে?"

"কি?—"

"বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু পড়ে শোনাবে?"

ব্রহ্মচারিণী আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটু ভাবিলেন। তার পর নিজ-মনে মৃদুস্বরে বলিলেন "শাস্ত্র-চর্চ্চায় আর সাধু মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনায় মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়। কালাকাল বিচার নিষ্প্রয়োজন।"

ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার ঘুম পায় নি এখনো?"

"ঘুম থাকলে ত, পাবে।"—অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলিয়াই ব্রহ্মচারী থামিলেন। কার উপর বলা শক্ত,—সহসা নিদারুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "মরবার পর যমের বাড়ী গিয়ে রৌরব নরকভোগ,—সেটা কি আর এমন আশ্চর্য্য কথা? কুবুদ্ধির জোর থাকলে মানুষ বেঁচে থেকে, সজ্ঞানে সশরীরেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। আমার এক এক সময় ইচ্ছা হয়, দেহটা ধ্বংস করে দিয়ে দেহ-জ্ঞানের শাস্তি, পীড়ন থেকে ছুটি নিই।"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "মন্দ নয়। শুক পাখী দাঁড়ে বসে, দিব্যি "কেষ্ট কেষ্ট" করে, কিন্তু যেই দেখে বিড়াল বাবাজী এসে ঘাড়ে ধরেছে, অম্নি কেষ্ট বিষ্টু ভুলে নিজের মর্ম্মবাণী প্রচার সুরু করে—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্। শুকের কেষ্ট বলা, আর আমাদের বেদান্ত পড়া—সমান সমান! না হলে আমাদের এত দুর্দ্দশা হয়?—বস, আসছি।"

বলিয়া তিনি বারেণ্ডার আলোটা তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী শুনিতে পাইলেন, তিনি ঘরের ভিতর অন্যমনস্কভাবে মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন

"কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ণ ভবতি জন্মশতেন।"

একটু পরে তিনি একখানা বই হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী ফিরিয়া তাঁর দিকে চাহিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন "মোটের মাথায়, তুমি বেশ আছ, কি বল?"

ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে নিজের কম্বলখানা টানিয়া ব্রহ্মচারিণী আলো ও বই লইয়া বসিলেন। বলিলেন "অনর্থকর কুচিন্তায় মস্তিষ্ককে প্রপীড়িত না করলে, মানুষ মোটের মাথায় বেশ ভালই থাকে। মাথাটা সাফ কর ব্রহ্মচারি, মাথাটা সাফ কর। পাপ চিন্তার বাড়া শান্তি-দাতা শত্রু আর কেউ নেই।"

ব্রহ্মচারী ম্লান হাস্যে বলিলেন "উপদেষ্টার আসন পায়ের দিকে নয়, দয়া করে সামনে এস।"

হেঁট হইয়া বাতিটা বাড়াইয়া আলো উজ্জ্বল করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "এইখানে বসি, নইলে তোমার চোখে আলো লাগবে।"

পা গুটাইয়া লইয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। সহসা ব্রহ্মচারিণীর চোখের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন "কোন্ আলো? লোচন-জাত পাবক-শিখা?"

অকস্মাৎ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আবার শক্ত্যানন্দ ঠাকুর কাঁধে ভর দিলেন? এই রইল বই, ইচ্ছে হয় নিজে পড়ো। আমি চললুম। তোমার মত মানুষের মঙ্গল-চেষ্টা করা,—আমি ত ছেলেমানুষ, আমার ঠাকুরদাদারও সাধ্য নয়!"

ব্রহ্মচারী ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া বলিলেন "দোহাই তোমার। যোড় হাত করছি, বস।"

ব্রহ্মচারিণী উঠিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আবার বসিলেন। কোন কথা না বলিয়া অপ্রসন্ন-গম্ভীর মুখে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী পা দুখানা ঘুরাইয়া অন্য দিকে ছড়াইয়া দিয়া আবার শুইলেন। চোখের উপর চাদরের খুঁটটা টানিয়া ঢাকা দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "ঠাকুরদা বেচারা স্বর্গে গেছেন,—কায-কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন। অসময়ে ডাকাডাকি করলে 'বিষম্' খেয়ে সারা হবেন। ও-গুলা করা ঠিক হয়।"

ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তোমার শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের দল যা করছেন, কেবল সেইগুলাই ঠিক হচ্ছে। যে আগুনে দেবতার প্রীত্যর্থে হোম করা যেত, সেই আগুনে মহাপুরুষেরা পাশবিক উল্লাসে গৃহদাহ সুরু করেছেন। বুদ্ধির বালাই নিয়ে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। শঙ্কর বিবেকানন্দ ঘুমিয়ে পড়েছেন, অবিবেক-মত সংস্কার করবার ত কেউ নেই। জ্ঞান যোগের মোহমুদ্গর হেনে—" ব্রহ্মচারিণী বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিলেন।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্বের মত মৃদু স্বরে বলিলেন "জ্ঞানযোগের মোহমুদ্গর হেনে, তার পর?—এই সব পশু-মস্তিষ্কগুলা চূর্ণ করতে চাও?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সে কায করবার উপযুক্ত লোক কেউ দেশে থাকতেন, তবে দেশটার কল্যাণ হোত। আমিও ভারি খুশী হতাম।"

ব্রহ্মচারী তেমনি মৃদু স্বরে বলিলেন "এ প্রার্থনাটা ঠিক স্ত্রীজনোচিত সৌজন্য মমতা প্রকাশক হোল না।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দিন-রাত দেহজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আগলে নিয়ে বেড়াতেও পারব না, আর মানুষের অকল্যাণকর যা কিছু অন্যায়, তার ওপর মায়া-মমতাও রাখব না। তাতে যা মনে করতে পারো, কর।"

একটু থামিয়া বহির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মৃদু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন "কি করলে বল দেখি? এমন কথা বললে যে রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। ক্রোধের স্পর্শ মাত্রও আমি সহ্য করতে পারি নে। শরীর এমন অসুস্থ বোধ হচ্ছে, যেন জ্বর এসেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সসঙ্কোচে বলিলেন "তবে বই পড়া এখন থাক। ঘুমোও গে যাও।"

"না। মনটা এখন বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করাই দরকার। ঘুমের জন্যে ছুটি পেলে, ওই রাগই এখন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াবে। আমি পড়ে যাচ্ছি, মন দিয়ে শোন। এর মাঝে যেন আবার মানুষের চোখের রূপ-বর্ণনা, কাণের গুণ-বর্ণনা নিয়ে উত্ত্যক্ত কোর না।"

তার পর ব্রহ্মচারীর কোন মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি বইখানির মাঝখান হইতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ স্বামীর অভিমত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে, গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-পূত দৃঢ় তেজস্বিতার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। মহিমময় সুউচ্চ ভাবের সহিত আন্তরিক পবিত্র-নিষ্ঠা গম্ভীর মধুর শব্দে, সজীব ভাবে ধ্বনিত হইয়া যেন এক স্বর্গীয় সুর-লহরী সৃষ্টি করিল।

শ্রোতা ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কাণ পাতিয়া নিস্পন্দ অভিভূতের মত পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া যেমন স্থির হইয়া শুইয়া ছিলেন, তেমনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁর অশান্তি-বিক্ষোভ-পীড়িত চিত্তে অজ্ঞাতেই বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল! তিনি যেন বহু দিনের পর আজ অকূল সমুদ্রে সত্যই কূল পাইলেন। নিরাপদ শান্তিময়, পবিত্র-আনন্দ-উৎসব-পূর্ণ চির-কল্যাণকর আশ্রয়, যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া তিনি আশৈশব পবিত্রতর, উচ্চতর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিতেছিলেন, সে আশ্রয় কখন যেন মনের ভুলে কোথায় হারাইয়াছিলেন! আত্মগঠনের শক্তি যেন ভুল-বশে আত্মনাশেই নিযুক্ত হইয়াছিল! ভয়ে ভাবনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া তিনি অন্ধকারে হাতড়াইয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যেন উল্টা পথেই চলিতেছিলেন! সহসা চোখের সামনে উজ্জ্বল দিবালোক ফুটিল। মোহ-সংশয়ের জমাট অন্ধকার অন্তর্হিত হইল! বিস্ময়াহত ব্রহ্মচারী চাহিয়া দেখিলেন—ওই ত সেই হারানো-আশ্রয়! কিন্তু দূরে, বহু দূরে! তিনি অন্ধকারে চলিতে চলিতে আজ যে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পায়ের নীচের সে পথটার দিকে চাহিয়া সহসা লজ্জায় ঘৃণায় তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। উঃ, করিয়াছেন কি! কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন? ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল!

পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মচারিণী এক স্থানে থামিলেন। বলিলেন "শুনছ ব্রহ্মচারি!"

অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন "শুনছি। তুমি পড়ো।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "যিনিই যত মিষ্টি করে মনোমুগ্ধকর ভাষায় মিথ্যা কথা বলুন, শঙ্কর বিবেকানন্দ তীব্র ভাষায় গাল দিয়ে যে সত্যি কথাগুলা বলেছেন, তার মত মিষ্টি আমার কিছুই লাগে না।"

ক্লেশভরে একটু ব্যঙ্গ-হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "দেবি, নিজের বুকে হাত রেখে মন্তব্য প্রকাশ করো। শঙ্করের মিষ্টি গাল চাটিখানি আওড়াব? "নার্য্যা পিশাচ্যা"—কার উপমা?"

ব্রহ্মচারী চোখের কাপড় সরাইয়া ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের দিকে অসঙ্কোচ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "ঠিক বলেছেন তিনি! আজন্ম-সত্যাশ্রয়ী, সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর মিথ্যে কথা বল্‌বার ছেলে নন্। পৈশাচিক বৃত্তির উপাসনায় আত্মমর্য্যাদা বলিদান দিয়ে যে সব মেয়ে পিশাচীত্ব লাভ করেছে, তাদের 'পিশাচী-নারী' বলা ত মিথ্যে কথা নয়! কিন্তু মাতৃজাতির মর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ঠিক ছিল। উভয় ভারতীর মত মেয়ে তাঁর কাছে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন।"

কথা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারী আবার চোখে ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমায় ফাঁকি দেখিয়ে ঠকাবার যো নেই। বিচার-বুদ্ধিটা আর একটু স্থূল হলে সংসারের উপকার হোত।"

"দোহাই ব্রহ্মচারি! অত বড় অভিসম্পাতটা দিও না। একেই বুদ্ধি কম বলে' এ পৃথিবীর অনেক জিনিস বুঝে সুঝে নিতে আমার কষ্ট হয়। এর চেয়ে স্থূল-বুদ্ধি হলে একেবারে মারা যেতাম।"

"তোমার বুদ্ধি কম? কে বলে?"

"আমিই বলি। তেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি থাক্‌লে তোমার ওই বৈরাগ্যের গিল্টি করা রাগের মানে বুঝতে কি ভুল করি! না, তোমার শঙ্ক্যানন্দ ঠাকুরের মর্কট-বৈরাগ্যকে, খাঁটি বিবেক-বৈরাগ্য ভেবে একদিন ভক্তি-মুগ্ধ হই?"

তার পর ব্রহ্মচারীকে কোন মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ মাত্র না দিয়া তিনি আবার ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া থামিলেন। গম্ভীর হইয়া কি একটু ভাবিয়া সহসা বলিলেন "তুমি বীরভাবে উপাসনা করতে চাও, নয়? শাস্ত্রে যথার্থ বীরভাব যা'কে বলেছে, সে অবস্থাটা কি, যদি জানতে চাও, বিবেকানন্দ স্বামীর আদর্শকে লক্ষ্য করো। একেই বলে শক্তি-সাধনা!—এ বীরভাব কি ব্যভিচার-সমর্থক মাতালের সম্পত্তি?"

ব্রহ্মচারীর মনের ভিতর এই ধরণেরই কি একটা চিন্তাস্রোত বহিতেছিল। অনুকূল বাতাসের স্পর্শ পাইয়া সে স্রোত প্রখর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উৎসাহদীপ্ত মুখে উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন "আমিও ওই কথা ভাবি। বীরভাব ত ব্যভিচার-সমর্থক মাতালের সম্পত্তি নয়! ও যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশের অবস্থা! ওর পর আর একটু এগোলেই—"

ব্রহ্মচারিণী তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "বুঝেছ সে কোন্ স্থান?"

তার পর দুজনে বহুক্ষণ ধরিয়া সাধক-জীবনের উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা, এবং বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত বিভিন্ন উপলব্ধির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুজনেই আত্ম-বিস্মৃত। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। কাহারও সেদিকে লক্ষ্য নাই।

গ্রাম্য চৌকীদার কখন যে একবার হাঁক দিয়া গিয়াছিল, টের পাওয়া যায় নাই। সে যখন রাত্রি তিনটার সময় আবার হাঁক দিল, তখন দুজনের চমক ভাঙ্গিল। বিস্মিত হইয়া দুজনেই ক্ষণেক পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "এঃ, গোটা রাতটাই জাগরণে কাট্‌ল!"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন "ঘুমিয়ে কাটালে আপশোষের বিষয় হোত। চল, আসনে বসা যাক।"

(২৪)

যথাসময়ে পূজাহ্নিক সারিয়া ব্রহ্মচারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী জলখাবার সাজাইয়া রোয়াকের থামে ঠেস্ দিয়া নিদ্রালস-চক্ষে চুপ

বিশ্রাম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল
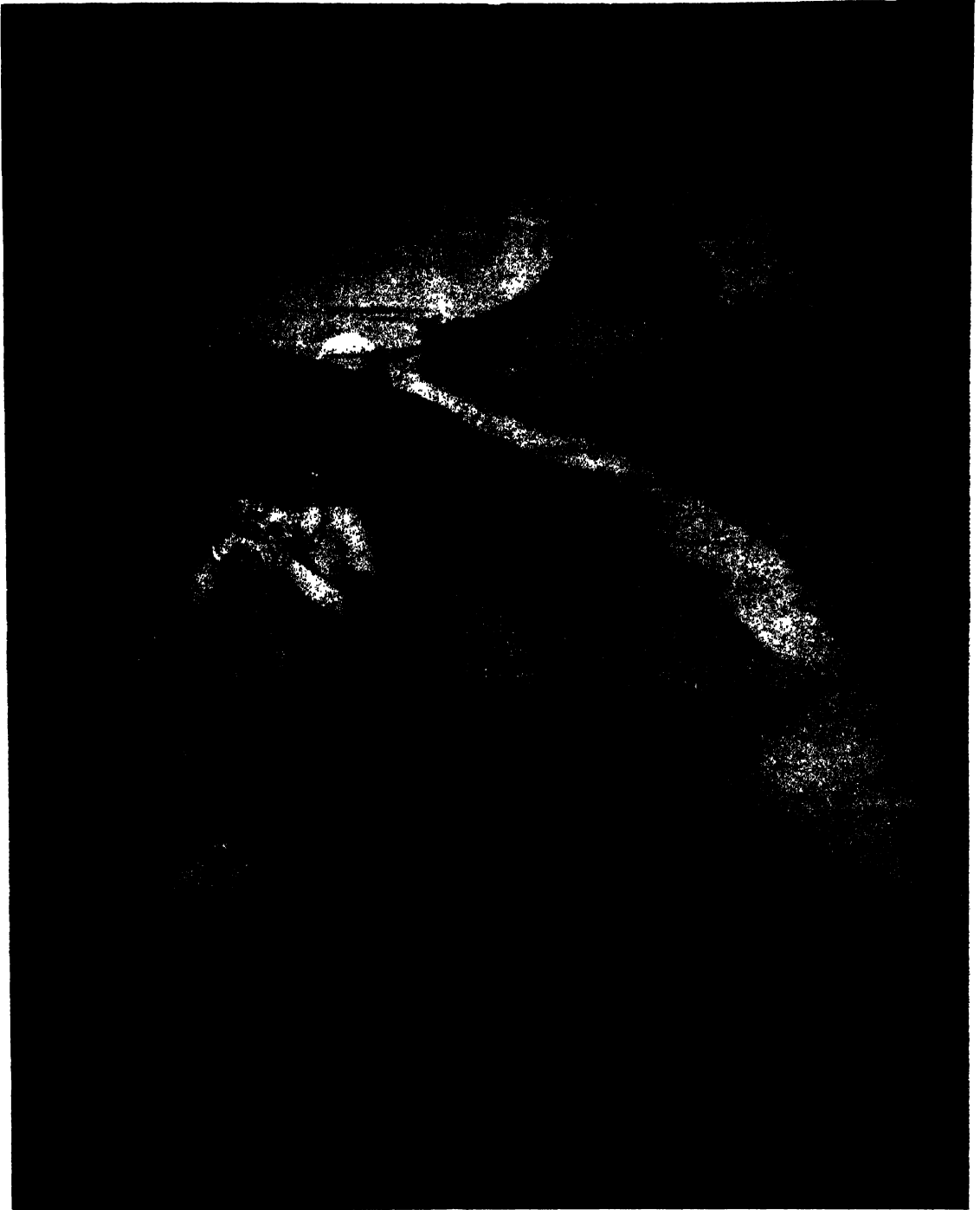
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

করিয়া বসিয়া ছিলেন ; পদশব্দে ফিরিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ব্যথাটা সার্‌ল না ?"

ব্রহ্মচারী আসিয়া আসনে বসিলেন ; বলিলেন "উহুঁ, আজ আরো বেড়ে গেছে। রাত জাগাটা ভাল হয় নি। বেদান্ত না-হয় মাথায় চড়েছিল, তা বলে পায়ের ব্যথাটা ভুলে যাওয়া মোটে উচিত হয় নি। কর্ম্মফল যাবে কোথা ?"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনিও নিজের কপালময় প্রচুর চন্দন লেপন করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া বলিলেন "অত চন্দন মেখেছ কেন ? মাথা ধরেছে ?"

একটু লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "না। প্রসাদী চন্দন আজ বেড়ে গিয়েছিল, এম্নিই কপালে দিয়েছি। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আমরা আসনে বসবার পর খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, টের পেয়েছ ?"—

ব্রহ্মচারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে, একবার ভিজা উঠানের দিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "তাই ত দেখ্‌ছি। যাক, দেবতাদের সুবিবেচনা আছে বটে। রাত জেগে মাথার রক্ত তাতিয়ে তোলা হয়েছে — এর পর এটুকু ঠাণ্ডা পেয়ে উপকার বড় কম হোল না। কাযও তাই আজ বেশ আরামের সঙ্গে শেষ করা গেছে। কিন্তু উঃ, পা-টা—।"

ক্লেশভরে ডান পা-খানি বার কয়েক ছড়াইয়া ও গুটাইয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন "এইটেই বেশী পাজী। বাঁ পা-খানা এর চাইতে ভদ্র।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "আজ একটু চায়ের ব্যবস্থা কর্‌তে পারো ? তাতে বোধ হয় ব্যথাটার উপকার হবে।"

"শুধু চা নয়। একটু গরম জলের সেকও দিতে হবে। আমি জল গরম করে আন্‌ছি, তুমি এগুলো নিবেদন করে নাও।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

জলযোগ করিয়া উঠিয়া ব্রহ্মচারী হাত মুখ ধুইতেছেন, বাহির হইতে সন্তর্পণে চাপা গলায় ছোট ঠাকুর্দ্দা ডাক দিলেন "প্রসাদ, প্রসাদ।"

ব্রহ্মচারী তটস্থ হইয়া বলিলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন ঠাকুর্দ্দা।"

ঠাকুর্দ্দা বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন "আহ্নিক পুজো অং বং সব সারা হয়েছে ? আমি আবার ভয়ে ভয়ে ডাকৃছি, কি জানি যদি আসনেই থাক।"

"না—আসনের কায শেষ হয়েছে, মায় জলযোগ পর্য্যন্ত। আসুন, র'কে উঠে আসুন। ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন।"

ঠাকুর্দ্দা বারেণ্ডায় উঠিলেন। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিলেন। ঠাকুর্দ্দাকে একখানা আসন দিয়া, নিকটে নিজের কম্বল পাতিয়া শ্রান্তদেহে আড় হইয়া শুইলেন। বলিলেন "শরীর ভাল ত ঠাকুর্দ্দা ? বাড়ীর খবর সব ভাল ? তার পর ? এ বর্ষাবাদলে দেবতার মর্ত্তে আগমন কেন ?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "শুনলুম কোন্ অসুর না কি ঠেঙিয়ে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করেছে, তাই খবর নিতে এলুম। পায়ে কি হোল ?"

"যাক্। এ খবরটাও এর মধ্যে কর্ণগোচর হয়েছে ? কে বল্লে আপনাকে ? গোবর্দ্ধনচন্দ্র বুঝি ?"

তার পর নিজের মনেই মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "হুঁ। কাল আমাকে খোঁড়াতে দেখেছে,—ওরাই কেউ খবর দিয়েছে।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—"হ্যাঁ, ওরাই বল্‌লে। বেশ খোঁড়াচ্ছিস ত। কি হোল পায়ে ?"

ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে বিবরণটা প্রকাশ করিলেন। রাত জাগার কথাটাও সরল চিত্তে বলিতে গিয়া সহসা থামিলেন। মনে পড়িল ঠাকুর্দ্দা বড় সুবিধার লোক নহেন। তুচ্ছ কথাটা বাঁকা দিকে ঘুরাইয়া লইয়া, শিষ্টতা-বিগর্হিত ভাষায় যে সম্ভাষণ সুরু করিবেন, তাতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। অতএব আত্মরক্ষার জন্য গোলমাল করিয়া কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন "এ কিছু না ঠাকুর্দ্দা। দু-একদিনেই সেরে যাবে।

তার পর কথাটা চাপা দিবার জন্য সানুনয়ে বলিলেন "তা আপনি এক কায করুন না, ঠাকুর্দ্দা, দিন-কতক একটু বেদান্ত-টেদান্ত চর্চ্চা করুন না ?"

ঠাকুর্দ্দা অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কোন দরকার নেই। সংসারী মানুষ, দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে স্বোয়াস্তিতে দিন কাটাচ্ছি। বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা কর্‌লে ত তোমার মত 'ছিরি' হবে। আমার অত বাহারে কায নেই।"

সেই সময় ব্রহ্মচারিণী মাথায় কাপড় টানিয়া চায়ের কেট্‌লি লইয়া সামনে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করিয়া, হাসিমুখে তিনি কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "শোন তোমার গুণধর দাদাশ্বশুরের কথা। এঁরা ঋষি-বংশধর! এঁদের পূর্ব্বপুরুষদের কলিজার ধন বেদান্ত গিয়ে আমেরিকার মাটীতে সোণা ফলাচ্ছে, আর এঁরা কি না কাঠ-পাথর বনে বসে আছেন। বলেন কি না, বেদান্ত-চর্চ্চায় এঁদের সুখ-স্বোয়াস্তি নষ্ট হবে! হা রে কপাল! নাঃ, চোদ্দপুরুষ ধরে বাল্য-বিবাহ করে, এ ভদ্রলোকদের মাথা একদম নষ্ট হয়ে গেছে!"

ঠাকুর্দ্দা একটু হাসিয়া বলিলেন "তুইও তো এই ভদ্রলোকদের বংশে জন্মেছিস, বাল্য-বিবাহ তো তোকেও কর্‌তে হয়েছে।"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "সেই জন্যই জড়পিণ্ড হয়ে বসে আছি। চোদ্দপুরুষের বাল্য-বিবাহ-গত সাধনার দান, এই ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর শক্তিহীন মস্তিষ্ক নিয়ে, কাযের ক্ষমতা কি আর আছে? যথার্থ বল্‌ছি মশাই, শক্তির অভাবে, স্বাস্থ্যের অভাবে আমার যখন নিজের সাধনায় ব্যাঘাত হয়, তখন আপনাদের বাল্য-বিবাহের ওপর কি ভক্তিই যে উথলে ওঠে, কি বল্‌ব! এখনও আপনারা বলেন কি না মেয়েদের বাল্য-বিবাহ না দিলে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবেন! ওঃ! বলিহারি আপনাদের চোদ্দপুরুষকে, আর বলিহারি তাঁদের স্বর্গীয় কল্পনাকে! আমার ইচ্ছে হয় গিয়ে একদিন দেখি, ভদ্রলোকরা সেখানে কি করছেন! সম্ভবতঃ সামাজিক দলাদলি-চর্চ্চার সঙ্গে গুড়ুক তামাক ফুঁক্‌ছেন, কিম্বা গাঁজার ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "হুঁ; তুই গেলেই খাতির করে বলবেন 'এস ভাই, একটু 'তামুক' খেয়ে যাও।' স্বর্গের তামুক, নিশ্চিত সে দা-কাটা বস্তু নয়!"

ব্রহ্মচারী একটু হাসিয়া বলিলেন "সম্ভবতঃ নয়।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কিন্তু তোকে তাঁরা সেখানে ঠাঁই দেবেন, তা মনে করিস নি। এক ছিলিম তামাক খাইয়ে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবেন। পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার হবার ব্যবস্থা ত কিছু কর্‌লি না, ড্যামেজ স্যুট ত তোর কাঁধে ঝুলছে। স্বর্গে ঠাঁই পাবে না, জানো ত?"

"ভালই হয়েছে ঠাকুর্দ্দা। আশা করি, পুন্নাম নরকে আপনার ঠাকুর্দ্দাদের প্যাটার্ণের ভদ্রলোকের ভিড় কম, কি বলুন? যায়গাটা নিরিবিলি ত?"

"বল্‌তে হলে, আমায় একদিন গিয়ে দেখে আস্‌তে হয়। তবে আশা করা যায়, সেখানকার অধিবাসী-সংখ্যা অল্প।"

ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে দু পাত্র চা প্রস্তুত করিয়া, এক পাত্র ব্রহ্মচারীকে, এক পাত্র ঠাকুর্দ্দাকে দিলেন। মৃদু অনুযোগের স্বরে বলিলেন "আঃ, কি সব যা-তা কথা হচ্ছে ঠাকুর্দ্দা? একটু ভক্তি-তত্ত্বের অনুশীলন করুন, শোনা যাক। দেখুন ত ঠাকুর্দ্দা, আপনার চায়ে আর একটু চিনি দেব?"

ঠাকুর্দ্দা এক চুমুক চা পান করিয়া তৃপ্তির সহিত বলিলেন "আঃ। না, আর চিনি চাই না। সত্যি নাৎ-বৌ, তোমার তৈরী চা আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

বিনীত সলজ্জ হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আপনি আজ বেশ সুন্দর সময়ে এসেছেন। চায়ের জল চড়িয়ে আপনার জন্যে মন-কেমন করছিল।"

ঠাকুর্দ্দা ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "প্রসাদ শুন্‌লি?"

ব্রহ্মচারী নিবেদন করিয়া চায়ের পাত্র মুখে তুলিতে-ছিলেন। ঠাকুর্দ্দার কথা শুনিয়া নিরুত্তরে একটু হাসিলেন মাত্র।

ঠাকুর্দ্দা পুনশ্চ বলিলেন "কিছু বল্‌লি না যে? এত-খানি অনুরাগ,—এ'ও তোর বৈরাগ্যে সয়?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া চায়ের পাত্রটা নামাইয়া রাখিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এ সব মস্তিষ্কে কি বেদান্তের তিষ্ঠাবার ঠাঁই আছে? নষ্টামি দেখ দেখি! দেব তোমার দাদাশ্বশুরের কথার জবাব!"

মাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিত মুখে মাথা নাড়িলেন।

ঠাকুর্দ্দা ততক্ষণে আবার চায়ের পাত্র মুখে তুলিয়া-ছিলেন। ব্যাপারটা কি ঘটিল, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না। একটু কৌতূহলী হইয়া বলিলেন "নাৎ-বৌ কি বল্‌লেন্ রে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "বলছেন, 'ঠাকুর্দ্দা একে ছেলে-

মানুষ, তায় ঠাকুমা চিরটা কাল আদর দিয়ে দিয়ে 'আহ্লাদে-গোপালটি' করে তুলেছেন। ওঁর রসনা আর বাসনার অসংযমে, দুঃখিত হওয়া নিষ্ফল!"

ঠাকুর্দ্দা অবিশ্বাস-ভরে মাথা নাড়িয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"দাদাবাবু, বাবু আছেন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর্দ্দা হাঁকিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, এই যে। হরিশ এসেছিস? ভেতরে আয়।"

ঠাকুর্দ্দার বাড়ীর চাকর হরিশ্চন্দ্র বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। ঠাকুর্দ্দা ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন "ছাখো নাৎবৌ, তোমার বাজার-টাজার কি কর্‌তে হবে, একে পয়সা কড়ি বুঝিয়ে দাও। এ বাজার করতে যাচ্ছে।"

চাকরকে বলিলেন "ছাখ হরশে,—মাছ-টাছের সঙ্গে ঠেকাঠেকি করে যেন কিছু আনিস্ নি। জানিস ত, এদের সব ঠাকুর-দেবতা পুজো-আর্চ্চার ব্যাপার। যেন অনাচার না হয়।"

হরিশ তটস্থ হইয়া বলিল "হ্যাঁ বাবু, তা আর জানি না?"

ঠাকুর্দ্দা পুনরায় বলিলেন "এই দাদাবাবুর পায়ে ব্যথা হয়েছে। যে ক'দিন ব্যথা না সারে, রোজ দুবেলা এসে খোঁজ নিস। হাট-বাজারগুলো যখন যা দরকার করে দিস্। বুঝলি?"

চাকর বলিল "যে আজ্ঞে।"

ব্রহ্মচারী একটু বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন "তুমি কি বাজার করে দেবার জন্যে বলে পাঠিয়েছ?"

ব্রহ্মচারিণীও বিস্মিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "না। আজ আমার সব জিনিষই আছে। তাতে আবার আজ অষ্টমী, হবিষ্য পর্য্যন্ত নাই। ফল টল সব ঘরে আছে।"

বলিতে বলিতে একটু হাসিয়া পুনশ্চ বলিলেন "নাঃ, আমাদের ঠাকুর্দ্দা বেদান্ত জানেন না কে বলে? পঁয়ষট্টি বছরের পুরানো, সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক মাথা,—ও মাথাকে গড় করি। কার পায়ে ব্যথা, কার বাজার করা—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "কার পুন্নাম নরকভোগ, কত দুর্ভাবনা বেচারা ভাব্‌ছেন! নিঃস্বার্থ জীব-কল্যাণ-ব্রত, তাহা বেদান্ত আর কি! যাক, ঠাকুর্দ্দা যখন লোক এনেছেন, যাহোক কিছু আন্‌তে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গিয়া লোকটিকে গুটিকতক পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। তার পর রান্নাঘর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া ঠাকুর্দ্দার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা, আমার গরম জল তৈরী হয়েছে। আপনার নাতিকে বলুন না, পায়ের ব্যথায় একটু সেঁক দিতে। এর পর সমস্ত দিনে আর সময় পাওয়া যাবে না।"

কথাটা ব্রহ্মচারী শুনিতে পাইলেন। একটু ভাবিয়া অনিচ্ছার সহিত বলিলেন "নিজেও ভুগবে, আমাকেও ভোগাবে? আচ্ছা নিয়ে এস গরম জল। ফ্লানেল ভিজিয়ে নিংড়ে দাও, আমি নিজে সেঁক দিচ্ছি।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "নাৎ-বৌ দিলে হবে না?"

"না।"

"তা হলে আমি দিই?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া নমস্কার করিলেন। বলিলেন "তা হলে ত কাস ছেড়ে মহাব্যাধি হবে। মাপ করুন ঠাকুর্দ্দা, আমি কারুর সেবা সইতে পারি নে, বড় অস্বস্তি বোধ হয়। বরঞ্চ নিরপেক্ষ দর্শক সেজে বসে থাকুন, আপনাকে মধ্যস্থ রেখে সেবার মামলাটা আপোষে নিষ্পত্তি হোক।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "যাও, তোমার গরম জল নিয়ে এস।"

ব্রহ্মচারিণী চলিয়া　　　।

(ক্রমশঃ)

গৌতমের বৈরাগ্য ও সম্বোধি লাভ

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ্-ডি

কপিলবস্তু নগরের শাক্যবংশ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। যিনি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনও চিরস্মরণীয়। মহাপুরুষের জননী মায়াদেবীর স্মৃতি চির-আরাধ্য। মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ সহিত গৌতম শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি পরম সুকুমার ছিলেন। তাঁহার ক্রীড়া, রমণ ও বিচরণের জন্য রাজা শুদ্ধোদন হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের বাসোপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সকল প্রাসাদে আবৃত বাতায়ন, ধূপ দ্বারা গন্ধিত, পট্টদামযুক্ত মুক্ত-পুষ্পাবকীর্ণ কূটাগারসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কূটাগারসমূহে স্বর্ণময় এবং রৌপ্যময়, নানা প্রস্তরণ ও উপাধানযুক্ত পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। অগুরু-চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, বিবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র, চম্পক-পুষ্পের মাল্য, নাট্য, গীত, বাদ্য, তূর্য্য, সুন্দরী রমণীগণ, অশ্ব, হস্তী, নানা প্রকারের যান, সিংহাদি-চর্ম্ম-পরিবৃত নানাবিধ হাওদা ও জিন, নানাবিধ ছত্র ইত্যাদি বিবিধ বিলাস-দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে পদ্মদলপূর্ণ সরোবররাজি খনন করা হইয়াছিল। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই ধারণা গৌতমের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উচ্চ এবং বিশাল প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত তাঁহার প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তথাপি গৃহবাস তাঁহার পক্ষে বন্ধন বলিয়া মনে হইত। প্রব্রজ্যাই মুক্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি রাজ্য-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের জীবন যাপন করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতমাতার নয়নের জল, রাজ-সিংহাসন, পত্নীর অকৃত্রিম প্রেম কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বেশে তিনি বৈশালী নগরে উপনীত হইলেন।

বৈশালী নগরে আরাড়কালাম নামে এক জন ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা তাঁহার তিন শত শিষ্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন "বৎসগণ! দর্শন কর, দর্শন কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।" শিষ্যগণ তদুত্তরে বলিতেন "গুরুদেব! আমরা দর্শন করিতেছি, এবং বর্জ্জন করিতেছি।" গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই গৌতম দেখিলেন যে, আরাড়কালামের উপদিষ্ট ধর্ম্মের সাহায্যে মানবের দুঃখ-নাশ হইবে না। তখন তিনি আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য রাজগৃহ নগরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি শুনিলেন যে, উদ্রকারাম-পুত্র সাত শত শিষ্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া থাকেন। একান্ত অধ্যবসায় বলে তিনি শীঘ্রই উদ্রক-আরাম-পুত্রের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত উপদেশ শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। সেখানেও তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, ঐ উপদেশের দ্বারা মনুষ্যের দুঃখের বিনাশ হইবে না। তখন তিনি গয়ায় যাত্রা করিলেন।

যখন তিনি গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের উপর বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তিনটি অশ্রুতপূর্ব্ব রূপক তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল।

প্রথম উপমা—যেমন জ্যোতিষ্কামী পুরুষ আর্দ্রকাষ্ঠে আর্দ্র অরণি দ্বারা জল মধ্যে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি কামাসক্ত, সে ব্রাহ্মণই হউক আর শ্রমণই হউক, তীব্র দুঃখ ও বেদনা ভোগ করে, জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় উপমা—যেমন অগ্নিকামী পুরুষ এক খণ্ড আর্দ্র-কাষ্ঠের সহিত অন্য এক খণ্ড আর্দ্র কাষ্ঠ স্থলে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ কাম-চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি—সে শ্রমণ হউক বা ব্রাহ্মণ হউক—কেবল দুঃখই ভোগ করে, জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

তৃতীয় উপমা—যেমন অগ্নিকামী-পুরুষ শুষ্ক কাষ্ঠে শুষ্ক

কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া স্থলে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে, সেইরূপ কামশূন্য শরীর ও কামশূন্য চিত্তযুক্ত ব্যক্তি তীব্র শারীরিক দুঃখ সহ্য করিলে কামপরায়ণ ব্যক্তি তাহার প্রতি বিনীত হয়। সে শ্রমণ হউক বা ব্রাহ্মণ হউক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই তিনটি উপমা প্রতিভাত হইলে গৌতম মনস্থ করিলেন যে, তিনিও কামশূন্য শরীরে এবং নিষ্কাম চিত্তে বিচরণ করিবেন; এবং শারীরিক তীব্র বেদনা সহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিবেন।

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উরুবিল্বের সেনাপতি গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে সুদর্শন বৃক্ষমূল, মনোজ্ঞ হ্রদ, সমভূমিভাগ, ও পবিত্রতোয়া নৈরঞ্জনা নদী দর্শন করিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। সেই স্থানেই তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। চিত্ত দ্বারা শরীরকে এরূপ ভাবে নিগৃহীত করিলেন যে, মুখ ও ললাট হইতে ভূমিতে স্বেদ মুক্ত হইল। বস্ত্রপ্রান্ত-ভাগ বাহিয়া ঘর্ম্ম পড়িতে লাগিল।

গৌতম আস্ফানক ধ্যান করিতে লাগিলেন। মুখ ও নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলেন। কর্ম্মকারের গর্গরীর ন্যায় কর্ণবিবরে মহা শব্দ হইতে লাগিল। গোঘাতক যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গরুর মস্তকে আঘাত করে, সেইরূপ রুদ্ধবায়ু তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। কেবলমাত্র একটি কুল ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িল। পঞ্জর ও মেরুদণ্ড দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষু কোটরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মস্তক শুষ্ক ও দেহের গৌরকান্তি মলিন হইয়া গেল। কেবলমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করে জানিয়া, তিনিও কেবলমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শরীর পূর্ব্ববৎ শীর্ণ হইল। তার পর কেবলমাত্র তিল ভক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, শরীর সেইরূপই শীর্ণ হইল। পরে আহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে শরীর আরও শীর্ণ হইল।

তখন গৌতম মনে করিলেন যে, তপস্যা দ্বারা এই পর্য্যন্তই হয়। ইহার অধিক হয় না। এই পথে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে সম্বোধি লাভ করা যায়। তার পর তাঁহার মনে হইল যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বে শাক্যদিগের উদ্যানে শীতল জম্বুছায়ায় কামশূন্য ও পাপশূন্য হৃদয়ে যে বিবেকজ প্রীতিসুখ (প্রথম ধ্যান) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পথই জ্ঞান লাভের উপায়। অনাহারে দুর্ব্বলের পক্ষে সেরূপ ধ্যান সম্ভবপর হয় না। তখন তিনি মুগের নির্য্যাস, কুলথের নির্য্যাস এবং হরেণুকের নির্য্যাস খাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি শরীরে বল পাইলেন। সুজাতা নাম্নী গ্রামিকার নিকট হইতে মধুপায়স গ্রহণ করিয়া নৈরঞ্জনা-তীরে উপস্থিত হইলেন। নৈরঞ্জনায় স্নান করিয়া তাঁহার শরীর শীতল হইল। তৃণব্যবসায়ী স্বস্তিকের নিকট হইতে তৃণমুষ্টি লইয়া বোধিবৃক্ষের সম্মুখে তৃণাসন করিয়া, বোধিবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া সরলভাবে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া নিষ্কাম ও নিষ্পাপ-চিত্তে সবিতর্ক বিবেকজ প্রীতিসুখ প্রথম ধ্যান উৎপাদন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। সবিতর্ক বিচারের উপশম হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হইল। অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখ (দ্বিতীয় ধ্যান) উৎপন্ন হইল। তখন বিরাগে প্রীতিকে উপেক্ষা করিয়া সুখে তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তখন সুখ ও দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হইল। সৌমনস্য ও দৌমনস্য দূরে গেল। অদুঃখ, অসুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হইল। তখন দিব্য, বিশুদ্ধ ও অলৌকিক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, দুষ্কর্ম্মের ফলে লোকে নরকে যাইতেছে এবং সুকর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ হইতেছে।

সমাহিত চিত্তে পরিশুদ্ধান্তঃকরণে চিন্তা করিতে করিতে তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সমস্ত পূর্ব্বজন্মের কথা তখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। শত শত পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। রাত্রির শেষভাগে অরুণোদয় কালে, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, প্রাপ্তব্য, সমস্তই তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল। শাক্যকুলরবি গৌতম সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়া জগতে 'ভগবান বুদ্ধ' নামে বিখ্যাত হইলেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

তমলুক ও তাম্রলিপ্ত

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত-রায়, সাহিত্য-ভারতী

(প্রতিবাদ)

বিগত ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয় "তাম্রলিপ্ত ও কিরণসুবর্ণ" প্রবন্ধে তমোলুক যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নহে এইরূপ এক অভিনব অনুমান উপস্থাপিত করিয়াছেন। মাঘ মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "তমোলুক তাম্রলিপ্ত কি না" প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু চৈত্র সংখ্যায় ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া স্বমত পোষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি উভয় প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, আমি এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি। আলোচনা পরিচালনা ও যথাযথ প্রতিবাদ করিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তমলুক মহকুমাবাসী হইয়া তমলুকের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় কয়েকটি কথা না লিখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছি না।

মহামতি কানিংগাম, আর্ডেনউড, হান্টার, ম্যাকক্রিণ্ডেল, রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় প্রভৃতি প্রাত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান তমলুককেই মহাভারত, টলেমী ও চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বর্ণিত তাম্রলিপ্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু কয়েকটি অনুমানের অবতারণা করিয়া এই নিশ্চিত সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথম কথা এই যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তই যে বর্ত্তমান তমোলুক তৎসম্বন্ধে বহু পণ্ডিতের লিপিবদ্ধ দৃঢ় কারণ সম্বলিত অসংখ্য প্রমাণ ও বহু কাল হইতে এই ধারণা ও সত্য, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ সুরেন্দ্রবাবু স্বীয় বুদ্ধি-প্রসূত অভিনব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু যে সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব, পৌরাণিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়া বর্ত্তমান তমোলুক যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নহে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমস্ত তত্ত্বের অনুশীলনের কষ্টিপাথরে কষিয়া লওয়ার মত বর্ত্তমান যুগে কয়টি স্থান আছে বলিতে পারি না। এই সব তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিলে সামান্য তমলুক কেন এই পৃথিবীর সম্বন্ধেও নানা বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। ভূতত্ত্ববিৎ, উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, প্রাণীতত্ত্ববিৎ, জ্যোতির্ব্বিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ, পুরাণতত্ত্ববিৎ, ইতিহাস-ভূগোল-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে সিদ্ধান্তের মিল সব সময়ে হয় না। এই অবস্থায় বিভিন্ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার উৎপাত সহ্য করিয়া কয়টি স্থানের প্রাচীনত্ব ও অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায়, তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ পৃথিবীর প্রাচীনত্বের বা বয়সের কথা ধরিলে ভূতত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের বিচারের মিল হয় না। "জীব-বিদ্যা বলেন মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন বিচার-সঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই (অদূর-ভবিষ্যতে যে আসিবে না এ কথা সুরেন্দ্রবাবু বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না)। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরের মধ্যে মনুষ্য-শরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কট-দেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কট মহাশয়ের অভিব্যক্তি ব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে কে বলিতে পারে?" এই সিদ্ধান্তের সহিত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের মিল হয় না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণই আবার দুই দলে বিভক্ত। "এক দল বলেন, মাতাঠাকুরাণীর বয়সের গাছ পাথর নাই; আর এক দল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ সে ত কালিকার কথা।" এক দল বসুন্ধরার বয়ঃক্রম মাত্র ছয় হাজার বৎসর বলিয়া সার্টিফিকেট দেন; আর এক দল দশ-বিশ কোটি বৎসর বলিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই ত অনুমান-সিদ্ধ আন্দাজ নামক বিচার-প্রণালীর পরিণাম! (১)

মহামতি কানিংহাম, আর্ডেনউড্, ম্যাক্ক্রিনডেল প্রভৃতি নিরপেক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান তমলুককে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আজ হঠাৎ বিভিন্ন তত্ত্ববিদের বিভিন্ন কষ্টিপাথরে কষিয়া লওয়ার মত কি প্রয়োজনীয়তা ঘটিল বুঝিলাম না। আজ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার কষ্টিপাথর লইয়া উৎপাত আরম্ভ করিবেন, কাল জীবতত্ত্ববিৎ বা উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার কষ্টিপাথর লইয়া উৎপাত আরম্ভ করিবেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ববিদের অত্যাচারে কয়টি স্থানের বা কয়টি জাতির প্রাচীনত্ব ও অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যাইবে তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। এই সব কারণে, বর্ত্তমান তমলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্ত কি না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবু যে সমস্ত অভিনব অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন,—কোন বিশেষজ্ঞ তাহার যথাযথ প্রতিবাদ করিবার

(১) প্রকৃতি—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে না করিলেও, প্রতিবাদের খাতিরে কিঞ্চিৎ না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বপক্ষে প্রথমে ও বিশেষ ভাবে জমির স্তর বা লেভেলের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "পণ্ডিতেরা মনে করেন জমির স্তর সাধারণতঃ ১০০ বৎসরে ১ ফুট উঠিয়া থাকে।" আচার্য্য হক্‌সিলির মতে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচ সাত বৎসর লাগে। আবার লর্ড কেল্‌ভিনের মতে গড়ে হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া স্তর জমে। (২) সুতরাং একটি প্রমাণিত বিশিষ্ট স্থানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ জন্য এই স্তর উৎপত্তির আলোচনার কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বুঝিলাম না। স্তর লইয়া আলোচনা করিলে হক্‌সিলি ও কেলভিনের মতে বরং তমলুকের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়! এতদ্ব্যতীত সুরেন্দ্রবাবুই লিখিয়াছেন "সাধারণতঃ ১০০ বৎসরে ১ ফুট বাড়ে।" সুতরাং এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম (exception) রহিয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করেন। যদি তাঁহার মতে ধরা যায় তাহা হইলে এই তমলুক যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে নাই, এ কথা তিনি বলিতে পারেন কি? সুতরাং যে সব স্থান উল্লিখিত নিয়মের মধ্যে পড়িয়াছে সেইরূপ কয়েকটি স্থানের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রয়াগের বটবৃক্ষ, সারনাথের বেদী ও তদুপরিস্থ স্তম্ভ এবং পাটলিপুত্রের ভূগর্ভস্থিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সেই সেই স্থানবিশেষের লেভেল (spot level) কিংবা country বা ground levelএর কথা লিখিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল না। যদি সেই সেই স্থান বিশেষের spot level হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাবুও তমলুকের যে কয়েকটি স্থান-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সুরেন্দ্রবাবু উড়াইয়া দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন কেন জানি না। সুরেন্দ্রবাবুই স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে এবং সপ্তগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের জমি বর্ত্তমান সময়ে সাগরের mean level হইতে ১৭ হইতে ২০ ফুট উচ্চ। সুরেন্দ্রবাবুর মতে যদি ১০০ বৎসরে ১ ফুট স্তর জমে ধরা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের যুদ্ধের সময় সপ্তগ্রাম সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই হিসাবটা ভাল করিয়া বুঝিলে সুরেন্দ্রবাবু হয় ত ১০০ বৎসরে ১ ফুট স্তর জমে, এ কথা উত্থাপন করিতেন না; অথবা আর কোন দূরবর্ত্তী উচ্চ স্থান নবগ্রামকে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেন।

১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং লিখিয়াছেন যে "তৎকালে তাম্রলিপ্তের ভূমিসকল নিম্ন ছিল; কিন্তু উর্ব্বর থাকাতে কর্ষিত হইয়া যথেষ্ট ফুলফল হইত, (৩) সুরেন্দ্রবাবুর স্তরের হিসাবে ঐ সময় সপ্তগ্রামের জমি সাগরের mean level অপেক্ষা ৪।৫ ফুট মাত্র উচ্চ ছিল। সুরেন্দ্রবাবুর স্তর-হিসাবের মতে মহাভারতের যুদ্ধের সময় সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, এমন কি ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইউয়ান চোয়াংএর সময়ও সাগরের mean level হইতে মাত্র ৪।৫ ফুট উচ্চ ছিল। এই অবস্থায় সেই স্থান তাম্রবর্ণের শক্ত পাথর মাটির (Labrite) দেশ ছিল ও সেই অনুসারে তাম্রলিপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ উক্তি বা অনুমান কতদূর সমীচীন তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। এ কি রাম জন্মিতে না জন্মিতে রামায়ণ লেখা? মাটি কবে তাম্রবর্ণ হইবে এই ভাবিয়া তাম্রলিপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল কি? তাম্রলিপ্ত নামটা কি আধুনিক?

সুরেন্দ্রবাবু পরে হস্তী প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধে হস্তীর 'স্বচ্ছন্দ বাসের' কথা না থাকিলেও প্রতিবাদ প্রসঙ্গে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। কে যে কোথায় স্বচ্ছন্দে বাস করে ও করিতে পারে, এ কথা বলা বড় কঠিন। পুরাণ-লিখিত সংখ্যা-নির্দ্দেশের উপর সুরেন্দ্রবাবুর কিরূপ ধারণা আছে জানি না। পুরাণকারগণ কথায় কথায় সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, যোজন যোজন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন। অধিক কথা কি, এই ঐতিহাসিক যুগেও গত ইয়োরোপ মহাসমরের সৈন্য-সংখ্যা ও মৃত্যু-সংখ্যার বহরের উপরেও সন্দিহান হইতে হয়। সুরেন্দ্রবাবু বিশেষ ভাবে (১০০০) সহস্র সংখ্যার ও স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যে স্থানের রাজা (১০০০) সহস্র হস্তী প্রদান করেন, সে স্থান অসংখ্য হস্তীর আবাসভূমি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু হস্তীর সংখ্যা (১০০০) ছিল কি না, সুধিগণের বিবেচ্য। ভিন্ন স্থান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া হস্তী উপহার দেওয়ায় কোন অপরাধ থাকিতে পারে কি না এবং সুসমৃদ্ধ তাম্রলিপ্ত-রাজের পক্ষে অন্য স্থান হইতে হস্তী আনিয়া উপহার দেওয়া অসম্ভব কি না বুঝিতে পারি না। ভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য হস্তী আনয়ন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সম্রাটকে প্রদান করাই হয় ত তাম্রলিপ্ত-রাজের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পরিচায়ক। আর এক কথা। ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্র-বাবুর হিসাব মতে সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব ছিল না; এমন কি, চীন পরিব্রাজক-গণের আগমন সময়েও সাগরের mean level হইতে ৫।৬ ফুট মাত্র উচ্চ ছিল। যে তমলুক অঞ্চল সাগরের mean level হইতে এখন ৭।৮ ফুট উচ্চ, সেখানে এখন হস্তীর কেন মানুষের অনেক সময় চলাফেরা করা কঠিন বলিয়া সুরেন্দ্রবাবু আশঙ্কা করিয়াছেন। যে সপ্তগ্রামের লেভেল চীন পরিব্রাজকদের আগমন সময়েও মাত্র ৫।৬ ফুট উচ্চ ছিল, সেই স্থানে হাতীর দল নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দে বাস ও ভ্রমণ করিত! সপ্তগ্রামের হস্তী হালকা ছিল বোধ হয়?

সুরেন্দ্রবাবু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ভ্রম-প্রমাদের কথা, এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত কথনও ভ্রান্ত হইতে পারে না এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রে স্থান পায় না, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রত্নতত্ত্বের কোন অংশ ভ্রমপূর্ণ হইলে সমস্ত অংশই যে ভ্রান্ত হইবে তাহার কোন কারণ বা যুক্তি নাই। সাধারণতঃ সাক্ষ্যের কোন অংশ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় মিথ্যা হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন বিচারক গ্রহণ করিতেই

---

(২) প্রকৃতি—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

(৩) Samuel Beal's Budhist Records of the Western World, vol. II and Hunter's Orissa, vol. I.

পারেন না। এ ক্ষেত্রেও কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ হইবে এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এতদ্ব্যতীত কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণাও ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে এ কথা মনে করা সমীচীন নহে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার যে অংশ-বিষয়ে ভ্রান্তি রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশ অপ্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

মহাভারতীয় ও পৌরাণিক যে সমস্ত উপাখ্যান তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা তমলুকে আরোপিত না করিলে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না; কিন্তু তমলুকরাজের তাম্রশাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদি পাওয়া গেলে সুরেন্দ্রবাবুর গবেষণার কি শুদ্ধত্ব প্রকাশ পাইত, তাহা বুঝিতে পারি না। সেই সেই মুদ্রায় তমলুক ওরফে তাম্রলিপ্ত কিংবা সপ্তগ্রাম ওরফে তাম্রলিপ্ত লিখিত থাকিবার কোন ভরসা রাখেন কি? তাম্রলিপ্তরাজের মুদ্রা তমলুক হইতে সপ্তগ্রামে বা সপ্তগ্রাম হইতে তমলুকে নীত হইতে পারে না, এমন কথা সুরেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন কি? সুতরাং তমলুকরাজের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, এই কথার অবতারণা করিয়া, তমলুক যে তাম্রলিপ্ত নহে, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি থাকিতে পারে? এই কথার দ্বারা সপ্তগ্রাম যে তাম্রলিপ্ত তাহা প্রমাণিত হয় কি না সুধিগণের বিবেচ্য। এ-সব অঞ্চলে কোন কোন স্থানে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি অঙ্কিত কোন কোন মুদ্রা মৃত্তিকা খনন করিলে পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রবাবুর মতে এ অঞ্চলকে অযোধ্যা বলা যাইবে কি?

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণ নদ পূর্ব্ব খাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হইলে, ভূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির হইয়াছিল। ঐগুলি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই সচ্ছিদ্র ছিল। উহাদের উপর কিছুই খোদিত ছিল না। কোন কোনটির উপর পদ্ম, চক্র, চৈত্য ইত্যাদি অঙ্কিত ছিল। পণ্ডিতগণের অনুমান, ঐ সকল মুদ্রা খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। ঐগুলি তাম্রলিপ্তের প্রাচীন ক্ষমতাশালী রাজবংশের মুদ্রা হইলেও হইতে পারে। (৪)

সুরেন্দ্রবাবু তাম্রলিপ্তের অন্য নাম দামোলিপ্ত (দামলিপ্ত)—দামোদর নদের দ্বারা লিপ্ত হইতে পারে, কল্পনা করিয়াছেন। দামোদরের অন্য নাম বিষ্ণু বলিয়া বিষ্ণুগৃহও বলা যাইতে পারে, উল্লেখ করিয়াছেন। তাম্রবর্ণ পাথর (Labrites) দ্বারা লিপ্ত থাকিয়া তাম্রলিপ্ত নাম হইয়াছে, এরূপ অনুমানও করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে দামল জাতি হইতে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত হইয়াছে, এ কথা সুরেন্দ্রবাবু স্বীকার করেন নাই। দামল বা দামিল জাতি কাহারা ও তাহাদের ইতিবৃত্ত কি ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ পান নাই। তমলুক দ্রাবিড় বা দামল জাতি হইতে দামোলিপ্ত, তমোলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নাম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। বাঙ্গলায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, তাহা কতক বুঝা যায়। এখনকার Anthropologistরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মঙ্গল বা দ্রাবিড় জাতির মিশ্রনে উৎপন্ন হইয়াছে। (৫) এই দামল জাতির বংশধরগণ মাদ্রাজের দামিল বা তামিল জাতি। এই প্রাচীন তামিল জাতি হইতেই উদ্ভূত তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশে বা পালিভাষায় তাম্রলিপ্তি (তাম্রলিপ্ত) শব্দ হইতেই তামিল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; পণ্ডিত কনস ভাই পিলে মহাশয় তাঁহার "The Tamil Eighteen Hundred years Ago" নামক গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। (৬)

"Most of these Mongolian tribes emigrated to southern India from Tamalitti, the great emporium of trade at the mouth of the Ganges, and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the more ancient inhabitants of the Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the worl Tamlitti. The Tamraliptas are alluded to along with the Kosals and Odras, as inhabitant of Bengal and adjoining sea-coasts in Vayu and Vishnu Purans. উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"They were known as Tamiles most probably because they had emigrated from Tamlitti (Tamralipti).

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত (১৯১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সহিত তামিল ভাষায় যে সমস্ত সম্পর্ক দেখাইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না। Indian Shipping প্রণেতা কনসটন্ত পিলে মহাশয়ের "The Tamils Eighteen Hundred Years Ago"—গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং পিলে মহাশয়ের মত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (৭) পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যেমন বিজয়সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি, তেমনি বঙ্গের এক সময়ে রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায়, (৮) ময়ূরধ্বজ ও তাম্রধ্বজের প্রসঙ্গে কৃষ্ণার্জ্জুন সহ যুদ্ধ ইত্যাদি রত্নপুর বা রত্নাবতীপুরে সংঘটিত হইয়াছিল, মহাভারতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রত্নপুর বা রত্নাবতীপুর নাম এখনও তমলুকে প্রচলিত আছে। রত্নাবতী নামে একটি স্থানও পূর্ব্বে তমলুকের অন্তর্গত ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি নগরের উপকণ্ঠে রত্নালী গ্রামই ইহার অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে স্থির করেন। তাম্রধ্বজ রাজের সহিত কৃষ্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ যে স্থানে হইয়াছিল তাহা

(৪) মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেন্দ্র বসু।

(৫) বাঙ্গলা সাহিত্য সভার ৭ম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—মানসী. বৈশাখ, ১৩২৪।

(৬) তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী

(৭) তমলুকের ইতিহাস পরিশিষ্ট—সেবানন্দ ভারতী

(৮) পৃথিবীর ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড

(৯) Hunter's Orrisa

এখনও রণসিঙ্গা নামে বিখ্যাত। ইহা তমলুকের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। তমলুক যে তাম্রলিপ্ত নহে, ইহা প্রমাণ জন্য সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় আমাদিগকে তাম্রলিপ্ত হইতে যথাক্রমে, তেলেঙ্গু, তালাণ্ডু ও সপ্তগ্রাম এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে যথাক্রমে, কিরণসুবর্ণ, চন্দ্রকণা ইত্যাদি এক একটি উদ্ভট কষ্টকল্পিত শব্দের অবতারণা করিতে হয় না। তাম্রলিপ্তের পুরাণ-লিখিত বিভিন্ন নামের সহিত সপ্তগ্রাম বা তেলেঙ্গুর কোন প্রকার মিল আছে কি না জানি না।

রাজা ময়ূরধ্বজের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন তাম্রলিপ্তে জিষ্ণুহরি মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, ইহা জৈমিনি ভারতে উল্লিখিত আছে। এই জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি তমলুক ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে বিদ্যমান নাই। সুরেন্দ্রবাবুর কল্পিত সপ্তগ্রামে এরূপ কোন মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় কি? এমত অবস্থায় পাঠকগণ কি ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হইতে পারগ হইবেন।

বর্ত্তমান ব্রহ্মপুরাণোক্ত তাম্রলিপ্ত কপালমোচন তীর্থ তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কালসহকারে রূপনারায়ণের স্রোত-বেগে কপালমোচন তীর্থের সরোবর বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে জিষ্ণুহরির মন্দির ছিল, এক্ষণে সে স্থান রূপনারায়ণ গর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জিষ্ণুহরির মন্দির ও ভীমাদেবীর মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক্ষণে কপালমোচন তীর্থের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথায় এখনও বারুণী উৎসবে পুণ্যসঞ্চয়-কল্পে বহু জন সমাগম হইয়া থাকে। সকলেই তথায় অবগাহন করিয়া পবিত্র হয়েন। প্রতি বৎসর তমলুকে মকর-সংক্রান্তি, মাঘী পূর্ণিমা, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং অক্ষয়তৃতীয়ার সময় মেলা হইয়া থাকে। (১০) এতদ্ব্যতীত তমলুক একটি উপপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য পীঠস্থানের ন্যায় ইহারও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীপূজা আবহমান কাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরেন্দ্রবাবুর সপ্তগ্রাম বা তেলেঙ্গুর সহিত এই-সব আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ আছে কি? এখন হয় ত সুরেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিবেন যে, তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে এই সমস্ত উপাখ্যান তমলুকে আরোপিত না করিয়া তাহার সপ্তগ্রামে আরোপিত করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় কি না। তমলুক সহরের 'শঙ্করআড়া' বা 'শঙ্কর এড়ই' নাম কপালমোচনতীর্থের নিদর্শন। তমলুক-রাজের প্রদত্ত কোর্সিনামা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ। কোন বংশের কুলজি বা কোর্সিনামা অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। তমলুকের রাজবংশের কোর্সিনামা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুপরীক্ষিত। এ বিষয়ে হাণ্টার সাহেবের ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অক্সফোর্ড অকেন হল হইতে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া পত্রযোগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। (১১)

শ্রুতিবাবুর উল্লিখিত মানচিত্রগুলি sketch মাত্র, কখনও জরিপ করিয়া অঙ্কিত হয় নাই, এই কারণ দেখাইয়া মানচিত্রগুলির accuracy সম্বন্ধে—সুরেন্দ্রবাবু সন্দিহান হইয়াছেন। অথচ ঐ-সব মানচিত্রে তমলুকের রাস্তাঘাটের উল্লেখ বা অঙ্কন নাই বলিয়া তমলুকে কোন রাস্তাঘাট ছিল না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এই অবস্থায় তমলুকে কোন দিক দিয়াই স্থলপথে উপস্থিত হওয়া যাইত না—এরূপ কথা কতদূর সমীচীন, তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। ডায়মণ্ডহারবার হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তৎকালে তমলুক দিয়া একটি প্রাচীন পথ ছিল। ওমালি সাহেব অনুমান করেন, বর্ত্তমান উড়িষ্যা ট্রাঙ্করোড অনেকটা সেই প্রাচীন পথটির পাশ দিয়া গিয়াছে। (১২) মানচিত্রগুলি বিনা জরিপে sketch করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে; অথচ চীন পরিব্রাজকগণ সম্ভবতঃ যথারীতি জরিপ করিয়া করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া সুরেন্দ্রবাবুর হয় ত ধ্রুব বিশ্বাস। এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব মানচিত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন বা জরিপ করিয়া-ছিলেন বা কাহারও নিকট অবগত হইয়াছিলেন—সুরেন্দ্রবাবু তাহার কোন লিখিত প্রমাণ পাইয়াছেন কি? এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় তৎকালে যে পথ (বক্র হউক বা সরল হউক) ছিল, তাহার দূরত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই; অথচ সুরেন্দ্রবাবু এই প্রকার inaccurate দূরত্বের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণসুবর্ণকে চন্দ্রকণায় ও তাম্রলিপ্তকে সপ্তগ্রামে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই।

অধিক দিনের কথা নয়, ইংরাজ-শাসন-কালে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় কাশীজোড়া-রাজের জমিদারীর কর আদায় সম্পর্কে স্মিথ সাহেব কাশী-জোড়াকে কলিকাতা হইতে ৮০ মাইল দূর বলিয়া লিখিয়াছেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে কটক রাস্তা দিয়া প্রায় ৩০ মাইল ও রেলরাস্তা দিয়া প্রায় ৪০ মাইল। কিন্তু সোজাসুজি প্রায় ২৫ মাইল হইবে। যদি সুরেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত মতে ৮০ মাইল গিয়া কাশীজোড়ার সন্ধান করিতে হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে যদি কাশীজোড়ার নামের সহিত কোনপ্রকার সাদৃশ্য থাকে এমন একটা গ্রাম জুটে, তাহা হইলে সেই স্থানেই কাশীজোড়ার পত্তন করিতেই হইবে। এই অবস্থায় পরিব্রাজকগণের লিখিত দূরত্বের উপর নির্ভর করিয়া স্থান-বিশেষের অনুসন্ধান করা কতদূর সমীচীন হইবে তাহা পণ্ডিত-গণের বিবেচ্য। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন পরিব্রাজকের প্রদত্ত বর্ণনা, দূরত্ব ও দিক ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সঠিক মানচিত্র না থাকিলে দূরত্বের কথা দূরে থাকুক দিক নির্ণয়ই সঠিক হয় না। সুরেন্দ্রবাবু পরিব্রাজকগণ বর্ণিত যে সমস্ত দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া স্বমত পোষণের চেষ্টা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সেই সমস্ত আলোচনায় বিরত থাকিলাম।

তমলুক গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল কি না এ সম্বন্ধেও সুরেন্দ্রবাবু সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন। গঙ্গাখালি (গেঁয়োখালি) খাল হইতে রূপনারায়ণ নদের গঙ্গা নাম হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও, যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতে তমলুকই যে তাম্রলিপ্ত তাহা প্রমাণিত হইবার কি অন্তরায় হইবে? যে কারণেই হউক, তমলুক গঙ্গার ধারে অবস্থিত

(১০) তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী।

(১১) তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী।

(১২) Gistrict gazetteer.

বলিয়া লিখিত আছে, এই কথার দ্বারা তাহার প্রমাণ হয়। রূপনারায়ণ নদ নানা নামে পরিচিত থাকিলেও সেই সব নামের একটা নামও ডিব্যারেরা প্রভৃতির মনে থাকিল না। গঙ্গাখালী খালের নামটি মনে থাকিল এবং সেই নাম অনুসারে রূপনারায়ণের নাম গঙ্গা লিখিত হইয়াছে এরূপ আজগুবী গল্পের ভিত্তি কতখানি তাহা বিবেচ্য। রূপনারায়ণ বা গঙ্গার একটি খালি বা খাল বলিয়াই ইহার নাম গঙ্গাখালি (গঙ্গারখালী) হওয়াই সঙ্গত মনে হয়।

এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য এই যে এতদঞ্চলে সাধারণতঃ লোকে নদীকে গঙ্গা বলিয়া থাকে। অধিক দিনের কথা নয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের জনৈক কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী শীতলামঙ্গল রচনাকালে লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতটে সিংহ হলধর॥
নিত্যানন্দ কবি কয় খয়রায় ঘর।
বিত্তাবান নয় কিন্তু শীতলা কিঙ্কর॥"

কবিকে কংসাবতী নদীর তীরে খয়রা গ্রামে হলধর সিংহ বাস করাইয়াছিলেন।

মণ্ডলঘাট হইতে মণ্ডলঘট্ট, হিজলী হইতে হৈজল, তমলুক হইতে তাম্রলিপ্ত না কি বিকৃত করিয়া লেখা। হস্ত, ভক্ত, চক্র, হট্ট, অট্ট ইত্যাদি হইতে যথাক্রমে বিকৃত হইয়া হাত, ভাত, চাক, হাট, আট ইত্যাদি হইয়াছে। এইসব দেখিয়া মনে হয় মণ্ডলঘট্ট, তাম্রলিপ্ত বিকৃত হইয়া মণ্ডলঘাট, তমলুক হইয়াছে। তমলুক তাম্রলিপ্তের বিকৃতি কি তাম্রলিপ্ত তমলুকের বিকৃতি তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ধৌত হইয়াছিল। (১৩) বিগত ১৭৩৭ ও ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ভীষণ ঝটিকা ও জলপ্লাবনে এই নগর আরও দুইবার প্লাবিত হইয়াছিল। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পরে ও পূর্ব্বে এই নগর একাধিকবার জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই এ কথা বলা যায় না। এই সব হইতে অনায়াসে কল্পনা করা যায়, বর্ত্তমান তমলুক বহু মন্দির ও অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষের উপর দণ্ডায়মান; সমস্ত নগরটি অন্ততঃ অধিকাংশ স্থান খুঁজিয়া না দেখা পর্য্যন্ত এই নগরের নিম্নে যে সম্পূর্ণ সৌধ বা পোতাসনাল ইত্যাদি নাই বা থাকিতে পারে না এরূপ অনুমান প্রামাণ্য নহে। তর্কস্থলে বর্গভীমার বর্ত্তমান মন্দিরের বয়স ৩০০ বৎসর বা ৩৫০ বৎসর ধরিয়া লইলেও মন্দির পুনসংস্কার করা হইয়াছে বা কোন বিশেষ কারণে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে এরূপ কোন অনুমান করিবার বাধা আছে কি না জানি না। তমলুকের প্রাচীন জিষ্ণুহরি মন্দির রূপনারায়ণের গর্ভে বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির তমলুক রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত জাতীয় নৌকা তমলুকে এখন যায় না এই উক্তির দ্বারা তিনি কি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন যুগেও যাইত না? নানা কারণে বাঙ্গলার নদীগুলির অবস্থা দ্রুতবেগে মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। অধিক কথা কি, ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে রূপনারায়ণের যে কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, তাহাতে ন্যূনাধিক শত বৎসরের মধ্যে যে জাতীয় নৌকা যাতায়াত করিত এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে, সমুদ্র তাম্রলিপ্ত হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র তমলুক বা সপ্তগ্রামের মধ্যে কোন্‌টি হইতে ৬০ মাইল দূরে?

"তমলুক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বলিয়া "মাদলা পঞ্জীতে" তমলুক বা তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায় না" এ কথার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রবাবু উক্ত পঞ্জীতে ময়নাচোর, দাঁতনচোর প্রভৃতি বিশির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাদলা পঞ্জীর লিখিত বিশিগুলি পরে পরগণা নামে সরকারী কাগজপত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চান যে, সেই সময়ে তমলুক সমুদ্র-গর্ভে ছিল বা একটি অপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। কিন্তু দেখা যায়, দক্ষিণ রাঢ়ের শূর বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত সেই সময়ে একটি ক্ষুদ্রতম রাজ্যে পরিণত হইয়া দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। মেদিনীপুরের Gazetteer প্রণেতা ওমালী সাহেবও অনুমান করেন, রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত রাজ্য দক্ষিণ রাঢ়ের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। (১) শূর বংশের পরে সেন বংশ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সেন বংশের বিজয় সেনের সময় অনন্তবর্ম্মা রাঢ়দেশ জয় করেন; কিন্তু স্থায়ীভাবে রাঢ়দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। কলিঙ্গ রাজ্য কংসাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং এক সময়ে যে ময়না, দাঁতন প্রভৃতি পরগণা হইতে বিভিন্ন ছিল, অর্থাৎ কলিঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে। এই জন্যই বোধ হয় বহুকাল পর্য্যন্ত তমলুক ও মণ্ডলঘাট পরগণা হুগলি কালেক্টরীর অন্তর্ভূক্ত ছিল, সুতরাং মাদলা পঞ্জীতে তমলুক বা তাম্রলিপ্তের নাম না থাকাই স্বাভাবিক।

মৎস্য

শ্রীপ্রমোদকুমার বেদান্তরত্ন এম-এ

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে জীবন ধারণ করিতে হইলে, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতে হইলে, আমাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান থাকা চাই এবং প্রতিদিনকার খাদ্য বিচারপূর্ব্বক খাওয়া চাই। তাঁহারা বলেন সাধারণতঃ প্রোটীন (Protein) পূর্ণ খাদ্যই আমাদের শরীরের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। খাদ্যবীর্য্যের (Vitamines) ত কথাই নাই—সেগুলি না থাকিলে আমাদের জীবন ধারণই অসম্ভব। তাঁহারা এমনও বলেন বেরিবেরি, স্কার্ভি (Scurvy) প্রভৃতি ব্যারাম প্রোটীন খাদ্যের অভাবেই হইয়া থাকে। তাহার পর এই প্রোটীন না কি শাক, সজী, মৎস্য, মাংস

(১৩) Imperial Gazetter of India, Vol VIII.

(১) District Gazetteer. Page 21.

প্রভৃতি সমস্ত খাদ্যেই অল্প-বিস্তর আছে। কিন্তু আমাদের না কি শাক-সব্জী হইতে শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্প। তাই তাঁহারা মৎস্য, মাংস ও ডিম্ব ভোজনের জন্য আমাদিগকে উপদেশ দেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাদানুবাদের ক্ষেত্র যথেষ্টই বিদ্যমান আছে। আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী উভয়ের দিক হইতেই যথেষ্ট কথা বলিবার আছে। তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে, যাঁহারা আমিষভোজী তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়া থাকিতে পারেন না। উপর্য্যুপরি কয়েক মাস নিরামিষ ভোজনের পর তাঁহারা কি যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করেন। যাহাই হউক, আমরা আজ যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে এ বাদবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। বাংলা দেশ মৎস্যপ্রধান দেশ এবং এ দেশের অধিবাসী প্রধানতঃ মৎস্যাশী। পূর্ব্বে এ দেশে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যাইত এবং বর্ত্তমানেও যাহা পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। এই কারণেই বোধ হয় বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কিয়দংশকে পুরাকালে মৎস্যদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইত। বঙ্গদেশের অধিবাসীবৃন্দের ডাল ভাতের পর মৎস্যই প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাহাও আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। দুগ্ধ ত উঠিয়াই গিয়াছে; মৎস্যও উঠিতে চলিয়াছে। দিন দিন মৎস্যের দর যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ওই খাদ্যটী শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে। যেখানে জন-প্রতি দৈনিক এক পোয়া মাছের কমে কিছুতেই চলিত না, সেখানে এখন এক ছটাকও মিলে কি না সন্দেহ। এ যেন ঠিক 'গোঁফে সর লাগাইয়া ঢেঁকুর তোলা'র মত হইয়াছে। তাহার উপর টাট্‌কা মাছ পাওয়া ত একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মৎস্যের অপ্রতুলতাই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কোনই প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি না। খাদ্য হিসাবে মাছের উপকারিতা প্রচুর। নিম্নের শ্লোকটী হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

"মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্যায়ামাধ্বরতানাঞ্চ বাতার্ত্তানাঞ্চ পূজিতাঃ।
মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগাঃ বাতসমুদ্ভবাঃ॥"

ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

সাধারণতঃ মৎস্য মাত্রেই পুষ্টিকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর ও কফপিত্তকর। ব্যায়ামশীল, ভ্রমণকারী ও বায়ুরোগাক্রান্তের উপকারক। যাহারা মৎস্যভোজী তাহারা কখনও বায়ুরোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না।

প্রতীচ্য মতে মৎস্য ভোজনে চিন্তাশক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, স্নায়বিক শক্তির বৃদ্ধি হয়, মাংসপেশী-সমূহ পুষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আবার খাদ্য হিসাবে মৎস্যকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৃহন্মৎস্য মাত্রেই গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও মলরোধক। ক্ষুদ্র মৎস্য মাত্রেই লঘুপাক, মল সংগ্রাহক এবং গ্রহণী রোগে উপকারী। বলা বাহুল্য, সুস্থ ও সবল ব্যক্তি ব্যতিরেকে বৃহৎ মৎস্য আহার করা উচিত নয়।

ফল কথা, মাংস ভোজনের যে সমস্ত উপকারিতা মৎস্যে তাহা সম্পূর্ণ রূপেই বিদ্যমান আছে। সেই জন্যই মৎস্য আমাদের আদর্শ খাদ্য। তদুপরি মাংস ভক্ষণের যে সমস্ত অসুবিধা আছে, মৎস্যে তাহা নাই। প্রত্যহ মাংস ভোজন সম্পূর্ণ সম্ভবপর নয়; তাহার পর উহা ব্যয়সাধ্য। কারণ একটা পাঁঠা কাটিতে গেলে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া পড়ে, বাজার হইতেও সব সময় প্রয়োজন ও পছন্দমত পাওয়া যায় না, এবং আমদানী করারও বিশেষ অসুবিধা আছে। অপর পক্ষে মৎস্য, যাহার যেরূপ প্রয়োজন সে সেইরূপ পাইতে পারে। দামও সস্তা এবং জোগাড় করাও বিশেষ অসুবিধাজনক নয়। সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্গদেশে মৎস্যের চল এত বেশী। এ ক্ষেত্রে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতের বাহিরে, যেমন বিলাতে, মাছ ও মাংসের চল সমানই; বরং মাংসের চলই বেশী। তাহার উত্তর এইমাত্র যে, ভারতের বাহিরে যে সমস্ত দেশে মাংসের চল আছে, সে সমস্ত শীতপ্রধান দেশ; এবং সেখানে মাংস ভোজনে ধর্ম্মের বাধা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই মাংস অপেক্ষা মৎস্যের চল বেশী হইবেই।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, মৎস্য যে আমরা প্রয়োজন মত পাই না তাহার প্রধান কারণ অপ্রতুলতা। হইতে পারে রেলগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতি দ্রুতগামী যান প্রচলিত হওয়ার পর হইতে সহজে পচনশীল মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্যের কারবার সহস্রগুণে বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এই নদীমাতৃক বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা পরিলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানে প্রভূত মৎস্য পাওয়া যাইত, এখন আর তাহা যায় না। নদী সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং স্থানে স্থানে কচুরী-পানার দৌরাত্ম্যে ধীবরকুলের অন্ন-সংস্থান করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের দোষ আছে। আমরা অদৃষ্টবাদী এবং গতানুগতিক। আমরা দুঃখ করিব, পুরাবৃত্ত আওড়াইব, কিন্তু কিসে কি হইতেছে তাহা খুঁজিয়া দেখিব না। কিসে মৎস্যকুল সংরক্ষিত হয়, কিসে তাহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পায়, তাহা একবার চিন্তা করিয়াও দেখিব না। কাজেই আমাদের মৎস্যের আয়-ব্যয়-স্থিতির হিসাব-নিকাশে গরমিল হইয়া যাইতেছে। অন্য দেশে হেরিং ফিশারি, স্যামন ফিশারি হইতে দেশের মাছ যোগান দিয়া পরে বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে; কিন্তু আমরা নিজেরাই খাইতে পাই না, তার আবার পরকে দিব কি !!! অন্যান্য দেশে মৎস্য-বিজ্ঞান সুগঠিত হইয়া উঠিতেছে; আর আমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বই জনই মাছের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিদেশীয়ের সাহায্যে। অথচ মাছ না হইলে আমাদের চলে না!

জীবতত্ত্বের আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, মেরুদণ্ডসম্পন্ন জীবগণের মধ্যে মৎস্যই আদি সৃষ্টি। সেই মৎস্য হইতেই ধীরে ধীরে এক দিকে পক্ষী এবং অপর দিকে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারগণও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীভগবান সর্ব্বপ্রথমে মৎস্যরূপেই ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জীবতত্ত্বের এই আদি সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতীচ্যজগতে ধীরে ধীরে Ichthyology বা মৎস্য-বিজ্ঞানের সূচনা এবং

পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পুরাকালে পণ্ডিতরা খাদ্য হিসাবে মৎস্যের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার আকৃতির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অনুশীলনই লেখকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। যদি কোনও সহৃদয় পাঠকের এ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে তাহা হইলে জানাইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। প্রতীচ্য জগতের মৎস্য-বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্থান গ্রীস ও রোম। মহামতি এরিষ্টটলই প্রথম মৎস্য সকলের একটা শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি মাত্র দুই শত খাদ্য মৎস্যের তালিকা ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেলোন (Be'on), স্যালভিয়ানী (Salviani) এবং রণ্ডেলেটিয়াস্ (Rondeletius) এই বিজ্ঞানের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলোবি (Willoughby), রে (Ray) সাহেবের সাহায্যে আরও কিঞ্চিৎ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া যান। ইহার পর লিনীয়াস (Linnaeus) এবং তৎশিষ্য আরটেডি (Artedi) মৎস্য সকলের শ্রেণী-বিভাগ করেন। কিন্তু মহামনীষী কুভিয়ের (Cuiver) সর্ব্বপ্রথম প্রধান প্রধান মৎস্যের একটী তালিকা করিয়া মৎস্য সকলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মৎস্য-বিজ্ঞান তাঁহারই মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। যদিও কুভিয়ের প্রণীত পুস্তকে অনেক বিষয়ের সম্বন্ধেই সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তথাপি তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে সুচারু এবং বিজ্ঞানসম্মত তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই জন্যই কুভিয়েরকে মৎস্য-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক (Father of Ichthology) বলা যাইতে পারে। কুভিয়েরের মতানুবর্ত্তী হইয়া সোয়েনসান (Swainson) মৎস্যকুলকে মোটামুটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহা নীচে দেওয়া গেল। যথা:—

১। একাস্থপটেরিগাই (Acanthopterigii)
২। ম্যালাকপটেরিগাই) Mala copterigii)
৩। এপোডেজ্ (Apodes)
৪। প্লেক্টোগ্নাথেস্ (Plectognathes)
৫। কার্টিলাজিনস্ (Cartilagines)

মহামতি ভাবমিশ্র সমগ্র জলজন্তুদিগকে তিনটী গণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—

১। কোষস্থগণীয়।
২। পাদিগণীয়।
৩। মৎস্যগণীয়।

তাঁহার মতে—

"শঙ্খ শঙ্খনখশ্চাপি শুক্তি শম্বুক কর্কটাঃ।
জীবাঃ এবম্বিধাশ্চান্যে কোষস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

শঙ্খ, শঙ্খনখ (ক্ষুদ্রশঙ্খ) শুক্তি, শম্বুক, কর্কট প্রভৃতি জীবগণ কোষস্থগণীয়।

"কুম্ভীরঃ কূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধা মকর শঙ্করঃ।
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ॥"

কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র (হাঙ্গর), গোধা (ভাবমিশ্র গোধটীকে জলজন্তু বিশেষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন), মকর (যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মকরটী কুভিয়েরের কার্টিলাজিনস্ শ্রেণীভুক্ত ষ্টার্জীয়ন [Sturgeon] জাতীয় মৎস্য বলিয়াই মনে হয়), শঙ্কু (শঙ্করমাছ), ঘণ্টিক (ঘড়িয়াল বা মেছোকুমীর), শিশুমার (শুশোক) প্রভৃতি জীবগণ পাদিগণীয়।

"রোহিতাদ্যাস্তু যে জীবাঃ তেমৎস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

রোহিত কাতল প্রভৃতি জীবগণই মৎস্য নামে পরিচিত।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কোষস্থ জীবগণ মৎস্যগণীয় নহে এবং পাদিগণীয় কুম্ভীর, গোধা প্রভৃতি জীবগণ সরিসৃপ শ্রেণীভুক্ত। গোধাটী কিন্তু জলজন্তু নয়। বেশির ভাগ স্থলেই থাকে। আবার দেখা যায় নক্র, শঙ্কু প্রভৃতিও পাদিগণীয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা মৎস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ মোটামুটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরিয়াই এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন; কোনও একটী ক্রম ধরিয়া বিভাগ করেন নাই।

নিখিলের যাবতীয় জীবজন্তু মাত্রেরই একটী ধারাবাহিক,—কি বাহ্যিক, কি আভ্যন্তরিক,—আকৃতিগত সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিবার একটী ক্রম আছে। সেইটীকে খুঁজিয়া বাহির করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। সেইটী বাহির করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভের পথ সহজ হইয়া যায়। সর্ব্বনিম্নস্তরের জীবের সহিত সর্ব্বোচ্চ স্তরের জীবের সম্বন্ধ কোথায় কি ভাবে জড়িত আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের সে পরিশ্রম আজও ফলবতী হয় নাই; কবে যে হইবে তাহা বলা সুকঠিন। তবে জড়ধর্ম্মী প্রাণিগণের জীবন-যাপন-প্রণালী আলোচনা করিয়া তাঁহারা অতি ক্ষীণ আলোকের আভাষ পাইয়াছেন; এবং তাঁহারা ভরসা করেন যে, ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধ তাঁহারা লোকচক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারিবেন। এই কারণেই তাঁহাদের ক্রমিক শ্রেণী-বিভাগের দিকে ঝোঁক এত বেশি। এই শ্রেণী বিভাগ, তাঁহাদের মত মানিয়া লইলে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। তাঁহাদের মতে, আদি জীবসৃষ্টি কীট রূপেই হইয়াছিল এবং তাহা হইতে মৎস্য; মৎস্য হইতে উভচর (জলচর ও স্থলচর) এবং উভচর হইতে একদিকে ডিম্ব-প্রসবকারী খেচর ও অপর দিকে শাবক-প্রসবকারী ভূচরের আবির্ভাব হইয়াছে। তবে এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রাণিগণ যেমন নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে, তেমনি এমন কতকগুলি জীব আছে, যাহারা উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন স্তরে নামিয়াছে। যথা তিমি। তিমি মাছের অবয়বাদি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা স্থলচর প্রাণী ছিল এবং পায়ের উপর ভর দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার পদের অস্তিত্বজ্ঞাপক অস্থি বর্ত্তমানে তাহার দেহের পুরু চর্ব্বির স্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। মৎস্য এই ক্রমের একটী পর্য্যায় এবং তাহারও মধ্যে ক্রম বিভাগ আছে। মহামনীষী কুভিয়ের প্রভৃতি সেই ক্রম-বিভাগ যে ভাবে করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা ব্যক্ত করিলাম।

সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর যথাক্রমে দেখান হইয়াছে।

১। মেরুদণ্ড-বিহীন (Cartilagines)। এই শ্রেণীতে হাঙ্গর, শঙ্কোচ প্রভৃতি মৎস্যকে স্থান দেওয়া হয়। ইহাদের শরীরে অস্থি নাই। তৎপরিবর্ত্তে একরূপ শ্বেত পদার্থ আছে যাহাকে কার্টিলেজ বলে। মনুষ্য-শরীরেও কয়েকটী স্থানে কার্টিলেজ আছে। যথা :—কাণ, নাক, বক্ষাস্থির সহিত পঞ্জরাস্থির যোজক সকল এবং বুকের কড়া (Ensiform Cartilage)। যাঁহারা শঙ্কোচ মাছ খাইয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন যে উক্ত মৎস্যের অস্থি মোটেই নাই। আছে ঝুনো নারিকেলের শাঁসের মত কতকগুলি পদার্থ। উহাদিগকেই কার্টিলেজ বলে। এই মৎস্যগুলির সাধারণ মৎস্যের মতই পাখ্না আছে ; কিন্তু কল্‌সার (চিরুণীর আকৃতি-বিশিষ্ট মৎস্য মুণ্ডস্থ ফুসফুসের কার্য্যকরী যন্ত্র) পরিবর্ত্তে কতকগুলি ছিদ্র মাত্র আছে। তাহারই মধ্য দিয়া উহারা শ্বাস গ্রহণ করে। ইহাদের নাসিকা চওড়া ও সূক্ষ্মাগ্র এবং নাসিকার নিম্নে মুখগহ্বর অবস্থিত। ইহারা বেশির ভাগ একেবারেই ছানা প্রসব করে ; ডিম্ব প্রসব করে না। এই মেরুদণ্ডবিহীন মৎস্যের আবার পাঁচটী বিভাগ আছে। যথা—

১। স্কোয়ালিডি (Squaiid:e)

২। রেইডি (R:idae)

৩। পলিওডোনাইডি (Polyodonidae)

৪। ষ্টুরিওনাইডি (Sturionidae)

এবং

৫। কিমেরাইডি (Chimeridae)

প্রত্যেক বিভাগের আবার তন্নিম্ন বিভাগ আছে এবং তন্নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ মাছ আছে।

২। বর্ম্মযুক্ত (Plectognathes)। ইহারাও অস্থ্যাধারবিহীন মৎস্য। ইহাদেরও অস্থির পরিবর্ত্তে কার্টিলেজ আছে। তবে তাহা একটু উন্নত স্তরের কার্টিলেজ। এই শ্রেণীর মৎস্য সচরাচর আমাদের দৃষ্টি-পথে পড়ে না। ইহাদেরও কল্‌সার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ছিদ্র আছে ; তাহার ভিতর দিয়াই শ্বাস গ্রহণ করে। কাহারও কাহারও কান্‌কো (Operculum) আছে। তাহা চর্ম্ম দ্বারা এরূপ প্রচ্ছন্ন যে, চর্ম্ম না কাটিলে কান্‌কো দেখিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সহিত ইহাদের এই পার্থক্য যে, ইহাদের বক্ষনিম্নস্থ পাখ্না (Ventral fin) আছে, উহাদের নাই। ইহাদের দেহ খুব স্থূল, খাট, গুরুভার এবং প্রায়শই বিকৃত। বক্ষ নিম্নস্থ পাখ্না পদাকৃতি বিশিষ্ট এবং ইহার সাহায্যে ইহারা মাটির উপর চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র এবং মুখগহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। অধরৌষ্ঠাস্থি প্রলম্বিত এবং মুখ নিম্নদিকে ব্যাদিত হয়। কতকগুলির দেহ খুব নরম কিন্তু বেশির ভাগেরই দৃঢ় এবং অচল শল্ক অথবা অস্থি দ্বারা সুরক্ষিত। কাহারও কাহারও দেহ কণ্টকাবৃতও আছে। প্রায় কাহারও পঞ্জরের স্থানে কার্টিলেজ নাই। ইহারাও পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। ব্যালিষ্টাইডি (Balistidae)

২। কিরোনেক্‌টাইডি (Chironectidae)

৩। লোফাইডি (Lophid e)

৪। সিংনাথাইডি (Syngnathidae)

৫। পলিপ্‌টেরাইডি (Polypteridae)

শেষোক্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। Polypterus Niloticus নামক নীল নদের একটী পৃথক্ মৎস্য পাওয়া যাওয়াতে এই শ্রেণীর আরও বহু মৎস্য থাকা সম্ভব এই অনুমান করিয়া Swainson এই শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন। এই পর্য্যায়ভুক্ত কোনও মৎস্যই আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। তবে মহামতি ভাবমিশ্র গোগরা নামক একটী মৎস্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহা এই পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। গোগরা মৎস্য কিন্তু গর্গর বা গাগর মাছ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

৩। পদবিহীন (Apodes)। পদ=বক্ষনিম্নস্থ পাখ্না। ইহাদের শরীর কাহারও অস্থ্যাধার-বিশিষ্ট, কাহারও অর্দ্ধ কার্টিলেজ এবং কাহারও সম্পূর্ণ কার্টিলেজ। ইহাদের বক্ষনিম্নস্থ পাখ্না অন্তর্হিত ; কান্‌কোটি সম্পূর্ণ গঠিত নহে। ওই স্থানটী কেবল মাত্র চেরা। ইহারা লম্বা এবং সর্পাকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের পৃষ্ঠস্থ, গুহ্যদ্বারস্থ এবং লাঙ্গুলস্থ পাখ্না সাধারণতঃ একত্র সংযোজিত। গাত্র পিচ্ছিল এবং শল্কবিহীন। শল্ক থাকিলেও তাহা এত ক্ষুদ্র ও চর্ম্ম-নিহিত যে, দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে অভিনিবেশ চাই। এই শ্রেণীর মৎস্য মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেক মাছই আছে। যথা ;—বাম, কুঁচিয়া, বাঙোচ্ বা ভাউচা ইত্যাদি। ইহারাও পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

১। মুরিনাইডি (Muraenidae)

২। সিনব্রানকাইডি (Synbranchidae)

৩। ষ্টার্ণার্কাইডি (Sternarchidae)

৪। পেট্রোমাইজোনাইডি (Petromyzonidae)

৫। সাইক্লপ্‌টেরাইডি (Cyclopteridae)

৪। নরম পাখ্নাযুক্ত (Malacopterigii)। অবশ্য পাখ্নার প্রথম দণ্ড স্থূল ও দৃঢ়। ইহাদের সকলেরই বক্ষনিম্নস্থ পাখ্না আছে। কান্‌কোর ছিদ্র সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে ছিদ্র বলা যাইতে পারে না—চেরা বলা যাইতে পারে। সার কথা কান্‌কো কর্ণাস্থির সহিত সংযোজিত নয়। ইহাদের সকলেরই অস্থ্যাধার-বিশিষ্ট দেহ। উন্নতির দিক হইতে দেখিতে গেলে মৎস্য জাতির ভিতর ইহাদিগকে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে স্বাদু জলচরগুলি (রুই, মৃগেল প্রভৃতি) ভূমিতে বিচরণ করে এবং আর কতকগুলি শিকারী মৎস্য। কতকগুলি একেবারে বাচ্চা প্রসব করে ; বক্রী ডিম্ব প্রসব করে। এই শ্রেণীতে রুই, কাত্‌লা, ইলিশ, কড, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্যকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর মৎস্য সকলই মনুষ্যের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং সেই হিসাবে ইহারা শ্রেষ্ঠ মৎস্য। ইহারও পাঁচটী ভাগ করা হইয়াছে।

১। স্যামোনাইডি (Salmonidae)

২। গ্যাডাইডি (Gadidae)

৩। প্লিউরোনেক্‌টাইডি (Pleuronectidae)

৪। সাইলিউরাইডি (Siluridae)

৫। কবিটাইডি (Cobitidae)

৫। কণ্টক-পক্ষক (Acauthopterigii)। এই জাতীয় মৎস্যের পৃষ্ঠস্থ প্রথম পাখ্না কণ্টকবিশিষ্ট। দ্বিতীয়টী রোহিত প্রভৃতি মৎস্যের মত। আর যদি পৃষ্ঠে দুইটী পাখ্না না থাকে, তাহা হইলে পাখ্নার প্রথম দণ্ড কয়েকটী কণ্টকময় হয়। বক্রী সাধারণ মত হয়। গুহ্যস্থ পাখ্নাও তদনুরূপ। কান্কোর আকৃতি ও তাহার ছিদ্র পূর্ব্বানুবর্ত্তী; অথবা তদপেক্ষাও উন্নত। কান্কো প্রায়শই কণ্টকযুক্ত থাকে—যথা কই মাছ। চক্ষু বৃহদাকার এবং পার্শ্বস্থিত। দেহ বৃত্তাকার। বক্ষনিম্নস্থ পাখ্না কণ্ঠস্থ পাখ্নার (Pectoral fin) নিকটবর্ত্তী। শল্ক সকল শক্ত, উজ্জ্বল, নানা প্রকার রঙে রঞ্জিত অথবা উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণের। ইহারা অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং দ্রুত ও দীর্ঘ সন্তরণপটু। ইহারা সকলেই ডিম্ব-প্রসবকারী। দু একটী একেবারেই বাচ্চা প্রসব করে। এই শ্রেণীর মাছের মধ্যে ভেট্কী, কই, খরসলা, খলিশা, ভ্যাদা প্রভৃতি মৎস্য আমাদের পরিচিত। ইহাদেরও পাঁচটী ভাগ আছে।

১। ম্যাক্রোলেপ্টেজ্ (Macroleptes)

২। মাইক্রোলেপ্টেজ (Microleptes)

৩। জিম্নেট্রেজ্ (Gymnetres)

৪। ক্যান্থিলেপ্টেজ্ (Canthileptes)

৫। ব্লেনিডেজ্ (Blennides)

এই পর্য্যায়ে যাবতীয় পরিচিত মৎস্যের অর্দ্ধেকই পরিগণিত হয়। উহা বড় কম নয়। কারণ বৈজ্ঞানিকগণ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় নয় সহস্র প্রকারের মৎস্য তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

কুভিয়েরে প্রবর্ত্তিত এই শ্রেণী-বিভাগ বর্ত্তমানে চলিত নাই। তাঁহার পর Huxley, Bloch, Muller প্রভৃতি মনীষিগণ উহা উল্টাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও কুভিয়েরের মত অনুযায়ী বেশির ভাগ কার্য্যই চলিতেছে। বস্তুতঃ কুভিয়ের প্রবর্ত্তিত বিভাগ একটু গোলমেলে হইলেও সাধারণের পক্ষে তাহা সহজে বোধগম্য। যাহা হউক বর্ত্তমানে মৎস্য মাত্রকেই মাত্র চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। নীচে Encyclopedia Britannicaতে Dr. Gunther, Mullerএর মতানুযায়ী সে কয়টী ভাগ দেখাইয়াছেন তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা সন্নিবেশিত করা গেল। স্থানাভাবে পূর্ণরূপে আলোচনা করা গেল না।

প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ।

১। আদিম মৎস্য (Palaeichthyes)। এই শ্রেণী আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ক। কন্দ্রপ্টেরাইডি (Chondropteridae) এবং (খ) গ্যানয়ডি (Ganoidae)। এই শ্রেণীতে হাঙ্গর, শঙ্কোচ মাছ প্রভৃতি পড়ে।

২। পূর্ণাস্থিক (Teleostei)। অস্থিপূর্ণ দেহ। কশেরুকাগুলি পৃথক্ ও পরস্পর গ্রথিত। কল্সা মুক্ত। এই শ্রেণীর মৎস্য ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা—ক। Acauthopterigil; খ। Acauthopterigii Pharingognathi; গ। Anacauthini; ঘ। Physostomi; ঙ। Lophobranchii; চ। Plectognathi. এই শ্রেণীতে রোহিত ভেট্কী প্রভৃতি মৎস্য স্থান পাইয়াছে।

৩। "চক্রতুণ্ডী" (Cyclostomata)। শরীর কার্টিলেজপূর্ণ এবং মেরুদণ্ড অপ্রাপ্তাবস্থ। কশেরুকার পরিবর্ত্তে একটীমাত্র দণ্ড অবস্থিত। একনাসিক। ওষ্ঠাস্থিবিরহিত। মুখ বৃত্তাকার ওষ্ঠ বিশিষ্ট। পঞ্জরাস্থি-বিহীন। কল্সা থলিয়াকৃতিবিশিষ্ট। পৃষ্ঠস্থ বা বক্ষ-নিম্নস্থ পাখ্না নাই। এই শ্রেণীতে কুঁচিয়া প্রভৃতি মৎস্যকে স্থাপন করা যাইতে পারে।

৪। হৃৎপিণ্ড বিরহিত (Leptocardia)। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকরী শিরাবিশিষ্ট। অন্ত্র সরলাকৃতি। শরীর কার্টিলেজপূর্ণ এবং মেরুদণ্ড কশেরুকাবিহীন। মথোর খুলি ও মস্তিষ্ক বিরহিত। পঞ্জরবিহীন। রক্ত বর্ণহীন। শ্বাস প্রশ্বাসের নালী পাকাশয়ের সহিত সংযুক্ত। শ্বাস-ত্যাগের বহু ছিদ্র। ওষ্ঠাস্থিবিরহিত।

বাঙ্গলা ভাষা

শ্রীবীরেশ্বর সেন

১৩৩৩, মাঘ মাসের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শব্দ চয়ন" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৩৩তম ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই প্রবন্ধটীর প্রতি অবহিত হওয়া উচিত। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গলা লেখক ইংরেজী অনেক শব্দের বাঙ্গলায় কি প্রতিশব্দ হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করাই সেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্ব্বে ইংরেজী শব্দের অনুবাদ স্বরূপ যে সকল বাঙ্গলা শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি যে ভুল অনুবাদ এবং অনেক চলিত বাঙ্গলা শব্দ যে আজকাল ভুল বানান করিয়া লেখা হয়, ইহা ভূমিকা স্বরূপ প্রথম দুই পৃষ্ঠায় সুযুক্তির সহিত বিচার করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই যে রবীন্দ্রবাবুর মতের অনুমোদন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার একটা কথায় আমি একমত হইতে পারিলাম না। তিনি বলেন যে sympathy শব্দের প্রকৃত বাঙ্গলা "দরদ"। এই কথা কোন মতেই মানিয়া লওয়া যায় না। দরদ শব্দটা পারসী দর্দ্ শব্দের প্রায় অপরিবর্ত্তিত রূপ। শব্দটা বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে সুপ্রচলিতও নহে। পঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত দেশে যাহারা এই শব্দ ব্যবহার করে, তাহারা প্রায়ই শারীরিক বেদনা অর্থে ইহা প্রয়োগ করে। শিরমে দরদ, পেটমে দরদ, ইহা সকলেই অবশ্য শুনিয়াছেন। Sympathy শব্দের প্রকৃত পারসী হম্ দরদী। এই হম দরদীই যে symathyর ঠিক বাঙ্গালা তাহা রবীন্দ্র-বাবু ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছেন। দর্দ শব্দের মূল ধাতু কি তাহা জানি না। হয় ত তাহা সংস্কৃত দৃ ধাতু যাহার অর্থ বিদীর্ণ করা। হম্=সম্=syn=sym. তাহা হইলেও সম পূর্ব্বক দৃ+অন করিলেও

বাঙ্গলায় সমব্যথা হয় এবং তাহার অর্থও sympathy হইতে পারে ; কিন্তু কোনরূপেই পারসী শব্দ হম দর্দী বা দরদ বাঙ্গলা হইতে পারে না। অন্য পক্ষে sympathyর বাঙ্গলা সহানুভূতি সুপ্রচলিত। ইহা হিন্দীতেও গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে সহানুভূতিযুক্ত বিশেষণ প্রস্তুত করা কিছুই কষ্টকর নহে। Sympathyর বাঙ্গলা যদি পারসী দর্দ শব্দ হয়, তাহা হইলে ইংরেজী সিম্প্যাথিও হইতে পারে। অনুকম্পা শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত কাহারও বোধ হয় বিরোধ হইবে না। তবে অনুকম্পা শব্দ এখন ঠিক sympathyর প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হয় না। অনুভূতি এবং অনুভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলা গান, কবিতা এবং গদ্যেও "সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী" এই কথা দ্বারা sympathyর অতি সুন্দর অনুবাদ হয়। একটা ইংরেজী শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদ যে ঠিক্ একই শব্দে প্রকাশ করিতে হইবে এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। বিশেষত ইংরেজী দুই তিনটা শব্দকে বাঙ্গলা একই শব্দে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করাও বৃথা শ্রম বলিয়া বোধ হয়। যেমন made to pass through ইহার বাঙ্গলা হইয়াছে 'অতিসারিত' শব্দ দ্বারা। তবে কোন কোন প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ প্রকাশ করিতে ইংরেজী একাধিক শব্দের প্রয়োজন হয়। যেমন স্বয়ংবরার ইংরেজী a woman who chooses her husband. রবীন্দ্রবাবু এই সুপ্রচলিত স্বয়ংবরা শব্দ ত্যাগ করিয়া "পতিম্বরা" প্রস্তুত করিয়াছেন কেন বুঝিলাম না! বিশেষত বানানটা পতিম্বরা না হইয়া পতিংবরা হইবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে ইংরেজীর যে সকল নূতন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ রচিত হইয়াছে, সেই শব্দগুলিকে প্রথমে বাম পার্শ্বে বর্ণানুক্রমে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণ ভাগে মূল ইংরেজী দিয়া শব্দ-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই অবস্থাপনের ব্যবস্থাটা বোধ হয় উল্টা হইয়াছে। কেন না, ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই তালিকা হইতে নবপ্রস্তুত বাঙ্গলা শব্দ খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই সুকর হইবে না।

নব-প্রস্তুত কোন কোন শব্দ বাঙ্গলায় সুপ্রচলিত হইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। বিশেষত moving tortuouslyর বাঙ্গলা অক্ষুবৎ কখনই চলিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহার উদাহরণ স্বরূপ তালিকার প্রথম কয়েকটা শব্দ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। মূল ইংরেজী শব্দ প্রথমে দিয়া পরে রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তুত শব্দ দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমার প্রস্তাবিত অনুবাদও দিলাম।

ইংরেজী	নব-নির্ম্মিত বাঙ্গলা শব্দ	আমার অনুবাদ
Unemployed	অকর্ম্মান্বিত	কর্ম্মহীন, বেকার
Occulist	অক্ষি ভিষক্	চক্ষুচিকিৎসক
Incongruous	অঘটমান	অসংগত, বিসদৃশ, সাদৃশ্যহীন
moving tortuously	অক্ষুবৎ	বক্রগতি
Charred	অঙ্গারিত	অঙ্গারীভূত, অঙ্গারীকৃত
Exaggerated	অতিকথিত	অত্যুক্তিযুক্ত
Survival	অতিজীবন	জন্মান্তর, উদ্বর্ত্তন
Over ruled	অতিদিষ্ট	অগ্রাহ্য
Sturting eyes	অতিনিমেষ চক্ষু	উদ্গচ্ছৎ চক্ষু উদ্গামী চক্ষু
Far out of sight	অতিপরোক্ষ	দৃষ্টির বাহিরে বহুদূর
Over-population	অতি প্রজন	অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধি, অতিরিক্ত জনবৃদ্ধি
Well-filled	অতিভৃত	পরিপূর্ণ
Presidence	অতিষ্ঠা	অগ্রবর্ত্তিতা, অগ্রেগমন, আধ্যক্ষ্য

Reporter শব্দের বাঙ্গলা প্রতিবেদক শব্দ কাদম্বরীতে আছে। ইহা উত্তম অনুবাদ। ভট্টিকাব্যে আর একটা শব্দ পাওয়া যায়। তাহা আখ্যাচক। দুইটাই বোধ হয় সমান চলিতে পারে।

প্রবন্ধকার যে তালিকা দিয়াছেন তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত। ইহা ভালই হইয়াছে ; কেন না, বিশাল সংস্কৃত শব্দ-সমুদ্র খুঁজিয়া না পাইলেই বাঙ্গলা ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রবেশিত করা উচিত। কিন্তু আলোচ্যমান প্রবন্ধে অকারণে "অনুবাদ" শব্দ ত্যাগ করিয়া "তর্জমা" লিখিত হইয়াছে। সেইরূপে "আরম্ভ" শব্দ সুপ্রচলিত এবং অনায়াস-বোধ্য হইলেও প্রবন্ধ-লেখক "সুরু" লিখিয়া থাকেন। সুনীতি বাবুও এই পারসী শব্দটা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে তিনি বানানটা শুদ্ধ করিয়া "শুরু" লেখেন। এই দুইটা পারসী শব্দের জাতি-পক্ষপাতের কারণ বুঝা যায় না।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পথঘাটের নামোৎপত্তির কথা।*

অভয় মিত্র ষ্ট্রীট্—অভয়বাবু সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ মিত্রের প্রপৌত্র ছিলেন।

অক্ষয়কুমার বসুর গলি—শ্যামবাজারে কাঁটাপুকুরের বসু বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভীম ঘোষের গলি—ইনি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আধপেটা খাওয়াইতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভুবনমোহন সরকারের গলি—তিনি চিকিৎসক ছিলেন ও বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি নামক সভার সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্বনাথ মতিলাল গলি—ইনি বৌবাজারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ ষ্ট্রীট্—বৈষ্ণবচরণ শেঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ শেঠেদের পূর্ব্বপুরুষ কোম্পানীর দালাল জনার্দ্দন শেঠের পুত্র ছিলেন।

বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট্—আত্মরাম সরকারের পুত্র বনমালী সরকার প্রথমে পাটনার রেসিডেণ্টের দেওয়ান ছিলেন এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। ১৭৪০-৫০ খৃষ্টাব্দে কুমারটুলিতে তাঁহার একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা সে সময়ের প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল।

বৃন্দাবন বসুর লেন—ইনি বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট্—সুপ্রসিদ্ধ বসাক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যচরণ শেঠের পুত্র ছিলেন।

দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্—দর্জ্জিপাড়ার মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট্—ইনি পাটনার আফিংয়ের এজেন্সির দেওয়ান ছিলেন। বাগবাজারে নিজ নামে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দুর্গাচরণ পিতুরির গলি—তিনি খ্যাতনামা ধনী ও কণ্ট্রাকটার ছিলেন। নূতন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মাণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বানার্জ্জির লেন—ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং রোগ নির্ণয়ে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট্—ইনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রপিতামহ ছিলেন। ব্যবসা দ্বারা এবং চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ান রূপে কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন—তিনি উকীল রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে বোর্ড্ অব্ রেভিনিউ-এর দেওয়ান হন। তিনি বহু প্রকার ব্যবসার দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন। বেলফাষ্ট নগরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ফাল্গুন দাস লেন—ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। জাহাজের কুলি সরবরাহ করিয়া তিনি বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র ধর লেন—ইনি মেডিক্যাল্ বোর্ডের হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন।

গোকুল মিত্র লেন—ইনি বালী হইতে কলিকাতায় আইসেন। লবণের কাজ করিয়া তিনি বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের গৃহদেবতা মদনমোহনকে বাঁধা রাখিয়া তিনি একলক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। তিনি

* এই প্রবন্ধের সহিত যে সব পথের চিত্র দেওয়া হইল তাহা সবই প্রাচীন কলিকাতার চিত্র।

কলিকাতার ন ষ্ঠাব

পরে মদনমোহনের জন্ত একটি বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে পূজা পার্ব্বণ যথেষ্ট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তাঁহাদের প্রাসাদোপম বাটী পূর্ব্বকালে বিশিষ্ট দর্শনীয় বস্তু ছিল।

গৌরমোহন ধরের গলি—ইনি প্রথম বাঙ্গালী প্রাম্বার ছিলেন।

গিরীশ বিদ্যারত্ন লেন—সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং একটী সুবৃহৎ সংস্কৃত ছাপাখানার মালিক ছিলেন।

প্রাচীন কলিকাতার একটী পল্লীদৃশ্য

বিশপস্ প্লেশ্—চৌরঙ্গী

গঙ্গারাম পালিতের গলি—ইনি দিঘাভাঙ্গার পালিত বংশের লোক ছিলেন।

হেমচন্দ্র করের গলি—ইনি প্রভিন্সিয়াল্ সিভিল্ সার্ভিসের সভ্য ছিলেন।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্—ইনি জোড়াসাঁকোর স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। তিনি নিজে কলেক্টর গ্লাড্উইনের (Gladwin) দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বলরাম চন্দননগরে গভর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান ছিলেন।

হরিঘোষের ষ্ট্রীট্—ইনি পূর্ব্বোক্ত বলরামের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন এবং মুঙ্গেরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার অনেক অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাটীতে বহু আশ্রয়হীনকে স্থান দিতেন বলিয়া লোক বলিত 'হরিঘোষের গোয়াল।'

হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি রোড—সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি লর্ড ক্যানিংয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে লোকে তাঁহাকে প্রথম বলিয়া থাকে।

হুজুরীমলের গলি—ইনি একজন ধনশালী শিখ ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি বৈঠকখানায় একটি প্রকাণ্ড জলাশয় এবং বর্ত্তমানে আরমনী ঘাট যেখানে আছে তথায় একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত জলাশয় হইতে হুজুরীমল্স ট্যাঙ্ক লেন নাম হইয়াছে। তিনি আরমেনিয়ান গির্জ্জার চূড়াটি পুনর্নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, কালীঘাটে কয়েক বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন ও মন্দিরের নিকট একটি পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

যদুনাথ দের লেন—ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান হিসাব রক্ষক ছিলেন।

জয় মিত্র ঘাট লেন—বরানগর ঘাটের দ্বাদশ মন্দির ইনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

জগবন্ধু বোসের লেন—ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। কলেজ অব্ ফিজিশিয়ন্স্ এণ্ড সার্জ্জেন্স ইঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট্—ইঁহার পিতার নাম চূড়ামণি দত্ত। ইনি অর্থে রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

কাশী ঘোষের গলি—ইনি নদীয়ার রাজার দেওয়ান

রামদেব ঘোষের পুত্র ছিলেন। মেসার্স্ ফেয়ারলি ফার্গুশন্ কোম্পানীর সহকারী মুৎসুদ্দির কাজ করিয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষের লেন—লেডী হেষ্টিংসের সরকার রামলোচন ঘোষ, যিনি হেষ্টিংসের দেওয়ান নামে খ্যাত ছিলেন, ইনি তাঁহার পৌত্র ছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য আনন্দনারায়ণ ধর্ম্মতলা বাজারের অধিকারী ছিলেন। এক সময় ঐ বাজারকে 'আনন্দ বাজার' বলিত।

কেশবচন্দ্র সেন লেন—ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ধর্ম্ম-প্রচারক ও সুবক্তা কেশবচন্দ্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত গৌরিফা নিবাসী দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র ছিলেন। ইনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পর পর টাঁকশাল ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিবাহ সংক্রান্ত আইন সংস্কৃত হইয়া বিধিবদ্ধ হয়।

কৃষ্ণদাস পাল লেন—তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট্ নামক সংবাদপত্রের অতি তেজস্বী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং ইম্পিরিয়াল্ লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।

কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট্—১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাসিক দুই সহস্র টাকা বেতনে হুগলীতে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রদের তিনি একলক্ষ টাকার চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন, কাশীতে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত পথটির উভয় পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন।

লালমাধব মুখার্জ্জির গলি—ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন এবং সাবর্ডিনেট মেডিক্যাল্ সার্ভিসের সভ্য ছিলেন। ইনি সরকার কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন।

মহেশচন্দ্র চৌধুরীর লেন—ইনি হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ গোঁসাইএর গলি—ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন।

মনোহরদাস ষ্ট্রীট—ইনি বড়বাজারের একজন খ্যাতনামা ব্যবসাদার ছিলেন।

মথুরাসেন গার্ডেন্ লেন—একজন বিখ্যাত পোদ্দার ছিলেন। তিনি লাট সাহেবের বাটীর অনুকরণে এক প্রকাণ্ড চারিটি ফটক দেওয়া প্রাসাদসম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি একটি ঠাকুরবাড়ীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জানবাজার ষ্ট্রীট্

এসপ্ল্যানেড রো—টাউনহল

মতিলাল শীল ষ্ট্রীট—ইনি কলুটোলার খ্যাতনামা শীল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিস্তর ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়মে একটি সামান্য চাকুরী পান। পরে শিশি বোতলের কাজে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। শীলস্ ফ্রী কলেজ এবং বেলঘরিয়ায় অতিথিশালা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি।

নিমু গোস্বামীর গলি—ইঁহার প্রকৃত নাম নিমাইচরণ। ইনি একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি আহীরীটোলার গোস্বামী বংশোদ্ভব ছিলেন।

নীলমাধব সেনের গলি—ইনি প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক ছিলেন।

নীলমণি দত্তর গলি—ইনি একজন চিকিৎসক ছিলেন।

নীলমণি হালদারের গলি—হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ নোট জালকারী প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ইনি সহোদর ছিলেন।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট্

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট্—মনোহর দাসের পুষ্করিণী

ভ্রাতার কার্য্যে সহায়তা করার জন্য ইঁহার সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট—ইনি দর্জ্জিপাড়ার মিত্রবংশ-সম্ভূত। ভারত যখন ইংরাজ অধিকারে যায়, ইনি সেই সময়ের লোক; উমিচাঁদের সমসাময়িক ছিলেন।

নবীন সরকারের গলি—ইনি প্রভিন্সিয়াল একজিকিউটিভ সার্ভিসের সভ্য ছিলেন।

নবকুমার রাহা লেন,—ইনি বেঙ্গল থিয়েটারের একজন অভিনেতা ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেনের গলি—ইনি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের সম্পাদক, এটর্ণী, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিমোহন সেন জয়পুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

নন্দলাল মল্লিক লেন—ইনি পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক বংশের রাজা শ্যামাচরণ মল্লিকের পুত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্যবসায় করিয়া ইঁহারা সম্পদশালী হন।

নন্দলাল বসুর গলি—শ্যামবাজারের জগৎচন্দ্র বসুর পৌত্র।

নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট্—ইঁহাকে তৎকালে 'ব্ল্যাক্ ডেপুটী' বলিত। অন্যায় কাজ করার জন্য ইনি কর্ম্মচ্যুত হন। তিনি হুগলীতে পলায়ন করেন। কাউন্সিলের আদেশে পরে তিনি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। রথতলার ঘাটটি তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত।

উমেশচন্দ্র দত্ত লেন,—রামবাগানের দত্তবংশ সম্ভূত। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ছিলেন; এবং তথায় বহু দিন কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অনাথ দেবের গলি এবং অনাথবাবুর বাজার লেন—ইনি রামদুলাল দের (সরকার) পৌত্র ছিলেন এবং লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র ছিলেন।

পশুপতিনাথ বসুর লেন,—শ্যামবাজারের জগৎবাবুর পৌত্র ছিলেন। তিনি বহু দিন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ছিলেন।

প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীট্—তিনি একজন খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, বারাসত স্কুল ও হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একটি মেয়েদের ও একটি ছেলেদের স্কুল এবং বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ঠাকুর ল প্রফেসারশিপের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। মূলাজোড়ের সংস্কৃত কলেজ এবং তথাকার মন্দির রক্ষা ও পূজাদির জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সেনেট হলের সম্মুখে ইঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার হন। ইনি রেভারেণ্ড ডাক্তার কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ লেন—ইনি ছোট আদালতের জজ হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক আছে।

পদ্মনাথের গলি—পদ্মনাথ চীনাবাজারের একজন খ্যাতনামা পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন।

রাধানাথ মল্লিক লেন—ইনি পটলডাঙ্গার মল্লিক বংশ সম্ভূত একজন খ্যাতনামা জমিদার ছিলেন।

রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট—ইনি মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র ছিলেন।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণর গলি—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজা কালীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি প্রভিন্সিয়াল একজিকিউটিভ সার্ভিসের সভ্য এবং বহু দিন শিয়ালদহার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রাজা গোপীমোহন ষ্ট্রীট—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র ছিলেন এবং একজন বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ লেন ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ছিলেন। বিডন স্কোয়ারে ইঁহার একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট—এই প্রশস্ত পথটি মহারাজা নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার নিজের নামে অভিহিত করেন। ইহার অর্দ্ধেক অংশের এক্ষণে অন্য নাম হইয়াছে। ইনি হেষ্টিংসের মুনসী রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনসী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রারম্ভিক যুগে ইনি কোম্পানীকে পরামর্শাদি দিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লেন—ইনি রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ইনি বহু বৎসর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ লেন—ইনি রাজা রাধাকান্ত দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।
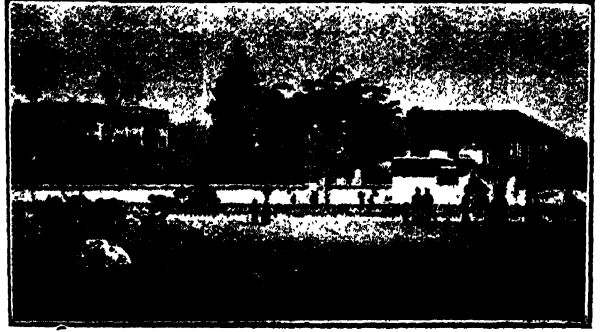
কিড্ ষ্ট্রীট

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ লেন—ইনি রাজা রাধাকান্ত দেবের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট—ইনি ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন। কথিত আছে ইনি এবং ইঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস নবাব কাশিম আলি খাঁর দ্বারা নিহত হন।

রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—ইনি পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক

কসাইটোলা রোড্, ধর্ম্মতলা

বংশের বৈষ্ণব দাস মল্লিকের পোষ্য পুত্র ছিলেন। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রত্যহ বহু লোককে অন্নদান করিতেন, এখনও তাঁহার চোরবাগানের বাটীতে প্রত্যহ উপস্থিত দরিদ্রদের ভোজন করান হইয়া থাকে।

রমাপ্রসাদ রায়ের গলি—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া বিস্তর অর্থ

উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম উকীল হইতে হাইকোর্টের জজ হন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটায় এজলাসে বসিতে পারেন নাই।

রামকান্ত বসুর গলি—ইনি বাগবাজারের বসু বংশ সম্ভূত ছিলেন।

রামমোহন মল্লিক লেন—ইনি প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ মল্লিকের পুত্র। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

চৌরঙ্গীর রাস্তা—১৭৮৭

রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট্—১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম বৃটিশ জাহাজ 'থ্যাকন্' গার্ডেনরিচে আসিয়া পৌছায়, উহার কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড তাঁহাদের কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্ত শেঠ বসাকদের নিকট একজন দোভাষীর অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা তাঁহার কথায় মনে করেন তাঁহার একজন ধোপার আবশ্যক হইয়াছে। সেই কারণ ধোপা রতন সরকারকে পাঠাইয়া দেন। লোকটি খুব বুদ্ধিমান ছিল এবং কথিত আছে দুই চারিটা ইংরাজি কথা জানিত। সে ব্যক্তি দীর্ঘকাল কোম্পানীর কার্য্যে থাকিয়া ধনশালী হয়। রতু সরকার গলি নামে যে পথটি আছে, উহাও তাহারই নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

চৌরঙ্গী রোড—প্রথম চিত্র

রতন সরকার লেন—কাল জমিদার নন্দরাম সেনের ইনি প্রিয় ভৃত্য ছিলেন।

শ্যামাচরণ দের লেন—ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন।

শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন—ইনি একজন বড় লোহ ও হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ছিলেন।

স্যার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র ছিলেন। ইনি বহু বৎসর বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সভাপতি এবং লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।

স্যার রাজা রাধাকান্ত লেন—ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রকাশ করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এবং সতী আইনের বিরুদ্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্—ইনি বেহালার একজন ধনী তালুকদার ছিলেন। ইহার পৌত্র হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ।

শোভারাম বসাকের গলি—অষ্টাদশ শতাব্দীর বসাকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। হলওয়েল্ সাহেব শ্যামবাজারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চার্লস্ বাজার করিয়াছিলেন, কিন্তু শোভারাম তাঁহার এক আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামে পুনরায় শ্যামবাজার নাম দেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট্—ইনি একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শঙ্কর ঘোষের গলি—ইঁহার প্রকৃত নাম রামশঙ্কর ঘোষ। তিনি কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি হইয়া অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। চোরবাগানের কালী মন্দির তাঁহারই সম্পত্তি।

শ্রীনাথ দাসের গলি—তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন।

বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট্—স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, কিন্তু ডিরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রাক্শনের সহিত অবনিবনাও হওয়ায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ লেন—ইনি শোভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের পুত্র; ষ্টাটুটরি সিভিল সার্ভিসের একজন সভ্য ছিলেন।

বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট্—কুমারটুলির মজুমদার বংশের তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃত উপাধি ঘোষ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র যিনি আকনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন তিনি মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে মজুমদার উপাধি পাইয়াছিলেন। এই বংশের রামসুন্দর গঙ্গায় একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

হিদারাম ব্যানার্জ্জির গলি—তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন।

কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্—ইনি রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় ছিলেন।

মদনগোপাল বসুর লেন—ইনি শ্যামবাজারের ধনাঢ্য লবণ ব্যবসায়ী দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র ছিলেন।

চৌরঙ্গী রোড্—দ্বিতীয় চিত্র

মোহনলাল ষ্ট্রীট্—কোম্পানীর পাটনার আফিংএর কুটির দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রের পুত্র ছিলেন।

শ্যামলাল ষ্ট্রীট্—ইনি পূর্ব্বোক্ত মোহনলালের সহোদর ছিলেন।

ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্—লর্ড ক্লাইভের নাম হইতে এই নাম হইয়াছে। যেস্থানে ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক ছিল সেই স্থানে ক্লাইভের বাড়ী ছিল। এখন তথায় রয়েল্ এক্সচেঞ্জ বাড়ী হইয়াছে।

চৌরঙ্গী রোড্—তৃতীয় চিত্র

রাসেল্ ষ্ট্রীট্—চিফ্ জাষ্টিশ্ রাসেলের (H. Russel)

নাম হইতে হইয়াছে। তিনি এখানে প্রথম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

লাউডন্ ষ্ট্রীট্—কাউণ্টেস্ অব্ লাউডনের সময় ইহা নির্ম্মিত হয়।

মিড্‌লটন্ ষ্ট্রীট্—এই নামে একজন সিবিলিয়ন প্রথম এখানে বাস করেন, তাহা হইতে রাস্তার নাম হইয়াছে।
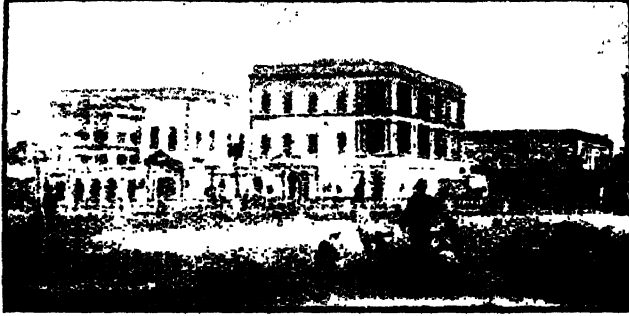
চৌরঙ্গী রোড্—চতুর্থ চিত্র

ইহা পূর্ব্বে স্যার এলাইজা ইম্পের পার্কের অংশ ছিল। মিড্‌লটন্ (Thomas Fanshaw Middleton) ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ হইয়া আইসেন। মিডলটন রো নামও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ দেওয়া হইয়াছিল।

বারেটো ষ্ট্রীট্—পোর্ট্‌গীজ ব্যবসাদার জোসেফ্ বারেটোর

চৌরঙ্গী রোড্—পঞ্চম চিত্র

নাম হইতে। ইনি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

গ্র্যাণ্ট্‌স্ লেন—কশাইটোলার গলি হইতে এই গলির ভিতর ঢুকিতে দক্ষিণ দিকের প্রথম বাড়ীতে গ্র্যাণ্ট্ সাহেব (Charles Grant) বাস করিতেন। তাহা হইতে রাস্তার নাম হয়। তিনি অতি সামান্য—কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এ দেশে আসিয়া পরে কোর্ট্ অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মিশন রো—মিশন চার্চ্চ হইতে এই নাম হয়।

টেরিটি বাজার—তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভদ্রলোক টিরেটার (Mr. Tiretta) নাম হইতে এই নাম হইয়াছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বাজার স্থাপন করেন। তাঁহার মাসিক আয় ছিল প্রায় ৮০০০৲ টাকা। তিনি রাস্তাঘাট ও বাড়ী ঘর সকলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ডিয়ার পার্ক—মিড্‌লটন্ রোর নিকট হরিণ খেলা করিয়া বেড়াইত, সেই কারণ ইহাকে ডিয়ার পার্ক বলিত এবং তাহা হইতেই পার্ক ষ্ট্রীট্ নাম হইয়াছে।

কাউন্সিল্ হাউস্ ষ্ট্রীট্—কাউন্সিল্ হাউস্ কোম্পানী খরিদ করিয়া লইবার পর হইতে এই নাম দেওয়া হয়।

ক্যামাক ষ্ট্রীট্—কোম্পানীর এক কর্ম্মচারীর নাম হইতে হইয়াছে। সর্টস্ বাজারে তাঁহার এক সম্পত্তি ছিল।

ওল্ড্ কোর্ট্ হাউস ষ্ট্রীট্—ইহার উত্তর দিকে পুরাতন বিচার গৃহ বা টাউনহল্ ছিল। তাহা হইতে রাস্তার নাম হইয়াছে। এই স্থানেই বিচারপতি (Hyde) বাস করিতেন। টাউনহল ১৭২৫-২৭ খৃষ্টাব্দে M. Bourchier দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খিদিরপুর—কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার কীডের (Colonel Kyd) নাম হইতে।

পার্ক ষ্ট্রীট্—বিচারপতি এলিজা ইম্পের পার্কে যাইবার পথ ছিল, তাহা হইতে এই নাম হইয়াছে। আপজনের কলিকাতার নক্সায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উহাকে বেরিয়্যাল্ গ্রাউণ্ড রোড্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ওয়েষ্টন্ লেন—ওয়েষ্টন্ (C. Weston) সাহেবের এখানে বাড়ী ছিল; সেই হইতে এই নাম হইয়াছে।

টালিগঞ্জ—টলি (Colonel Tolly) সাহেবের নাম হইতে টালিগঞ্জ হইয়াছে। টলিজ নালা নামে যে খাল আছে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তিনি নিজ

ব্যয়ে কাটাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উহাকে সারমনস্ নালা বলিত।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্—এই পথ-পার্শ্বে হেষ্টিংসের একটি বাড়ী ছিল। তথায় তাঁহার পত্নী বাস করিতেন। সেই কারণে তাঁহার নামে রাস্তার নাম হয়। এখন সে বাটীতে মেসার্স্ বার্ণ্ কোম্পানীর অফিস আছে।

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট্—এই স্থানে পূর্ব্বে পোষ্ট অফিস ছিল। ঐ বাটী কলভিল্ সাহেবের (Sir j Colvilles) বাটীর অপর দিকে ছিল।

ওয়াট্‌গঞ্জ—কর্ণেল হেনরী ওয়াট্‌সন্-এর নাম হইতে ওয়াটগঞ্জ নাম হইয়াছে। ইনিই খিদিরপুরের ডক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বাঁক্‌শাল্ ষ্ট্রীট্—ডচেরা বাঁক্‌শাল ঘাটে বাণিজ্য করিত। 'ব্যাঙ্ক' অর্থাৎ নদীতীর 'শল' অর্থে কর বুঝায়। ইহাই কলিকাতার প্রথম ড্রাই ডক্—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে স্থানান্তরিত হয়।

আলুগুদাম—এই নামে যে স্থানটি আছে উহা পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে উৎপন্ন। এখানে তুলার গুদাম ছিল। পোর্ত্তুগীজ ভাষায় তুলাকে 'অল্' বলে। তাহা হইতে আলুগুদাম নাম হইয়াছে।

আণ্টুনিবাগান লেন্—ফিরিঙ্গী কবিওয়ালা আণ্টুনীর পূর্ব্বপুরুষ এখানে বাস করিতেন। তাহা হইতে আণ্টুনী বাগান নাম হইয়াছে। তিনি বঁড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীর কর্ম্মচারী ছিলেন।

ক্রীক্ রো—এখানে একটি খাল ছিল, তাহা হইতে এই নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে ২৬নম্বর ক্রীক্ রোর বাটীতে উক্ত খালে নামিবার একটি সিঁড়ি আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্লক্‌ম্যান্ ষ্ট্রীট্—ইনি ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভূগোল লেখক ছিলেন।

ঘন্‌ফিল্ডস্ লেন্—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীলামের কাজ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ডফ ষ্ট্রীট্—সুপ্রসিদ্ধ মিশনারী ফ্রীচার্চ ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা আলেকজাণ্ডার ডফের নামে প্রতিষ্ঠিত।

ফেয়ারলি প্লেস্—সুপ্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স ফেয়ার্লি ফার্গুশন্ কোম্পানীর ইনি একজন অংশীদার ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের পিলখানারও ইনি কণ্ট্রাক্টার ছিলেন।

হেয়ার ষ্ট্রীট্—বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তক মহাপ্রাণ ডেভিড হেয়ারের নাম হইতে।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট্—ইনি ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।
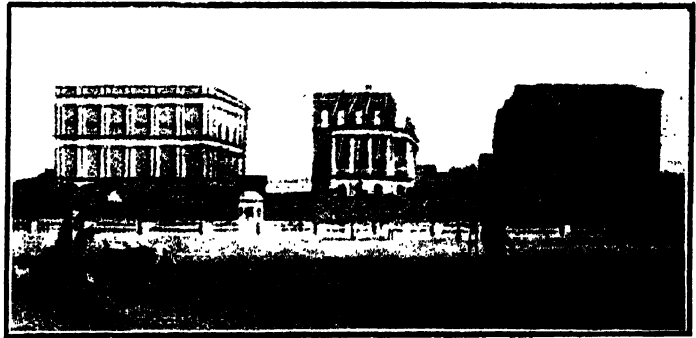
চৌরঙ্গী রোড—৬ষ্ঠ চিত্র

চৌরঙ্গী রোড্—৭ম চিত্র

লারকিনস্ ষ্ট্রীট্—উইলিয়ম লারকিনের নামে ইহার নামকরণ হয়।

লায়নস্ রেঞ্জ—টমাস লায়নের নামে এই নাম হয়।

ম্যাকলিয়ড ষ্ট্রীট্—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সার্জ্জন লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ম্যাকলিয়ডের নাম হইতে রাস্তাটি এই নাম প্রাপ্ত হয়। ইনি করপোরেশনের ডাক্তার এবং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

মার্শডেন ষ্ট্রীট্—পুলিশ আদালতের প্রধান প্রেসিডেন্সী

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রেডরিক্ জন মার্শডেনের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

আউটরাম্ রোড ও আউটরাম ষ্ট্রীট্—মেজর জেনারেল্ স্যার জেমস্ আউটরামের নামে এই নাম হয়।

ফিয়ার্স লেন্—স্যার জন্ বাড ফিয়ার কলিকাতা হাই-কোর্টের পিউনী জজ ছিলেন, পরে সিংহলের প্রধান বিচারপতি হন। তিনি ভারতীয়দের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।

লালদীঘি—১৭৮৮

এসপ্ল্যানেডের এক অংশ

রবার্ট ষ্ট্রীট—ইনি একজন সুদক্ষ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রবিনসন্ ষ্ট্রীট—রেভারেণ্ড জন্ রবিনসন্ হাইকোর্টের অনুবাদক ছিলেন।

শর্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতায় ইঁহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

সুকিয়াস ষ্ট্রীট ও সুকিয়াস্ লেন—বিখ্যাত আরমানী ধনী ব্যবসায়ী পিটার সুকিয়ার নাম হইতে রাস্তাগুলি এই নাম প্রাপ্ত হয়। বৈঠকখানায় ইঁহার একটী প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী ছিল।

ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ওয়েলিংটন লেন—ডিউক অব ওয়েলিংটনের নাম হইতে হইয়াছে।

উড ষ্ট্রীট—মিঃ হেনরী উডের নাম হইতে হইয়াছে।

বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, গুলু ওস্তাগর লেন, লাল ওস্তাগর, নয়াবদি ওস্তাগর লেন—ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ দরজি ছিল এবং তাহাদের ব্যবসা-স্থান এই সকল স্থানে ছিল

নিমু খানসামা, ছকু খানসামা, করিমবকস খানসামা ও পাঁচু খানসামা লেন্—সে-কালে ইহারা খানসামার কাজ করিলেও, এই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ অধিবাসী ছিল।

অখিল মিস্ত্রীর লেন—একজন মিস্ত্রীর নাম হইতে এই নাম হইয়াছে।

রামহরি মিস্ত্রী ও রামকান্ত মিস্ত্রী লেন—দুইজন সূত্রধরের নামে এই দুইটী গলিপথের নামকরণ হইয়াছে।

ছিদাম মুদি, পাঁচি ধোবানী ও শ্যামা বাইয়ের নামেও তিনটী পথ আছে। শ্যামাবাই একজন নাচওয়ালী ছিল।

সরিফ দপ্তরি, রফিক্ সারেঙ, ইমামবক্স থানাদার প্রভৃতির নামেও কতিপয় রাস্তা আছে।

মুসলমান নাম-সংযুক্ত পথ পূর্ব্বে খুবই কম ছিল। মৌলুবি বাজলার রহমান্ লেন্, মৌলুবি গোলাম্ সোভান্ লেন্, মৌলুবি ইমদাদ আলি লেন্—এই সকল খ্যাতনামা লোকের এই সকল স্থানে বাস হেতু নাম হইয়াছে।

মির্জা মেন্দি লেন্—ইনি একজন ধনাঢ্য শিয়া ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি খুব সমারোহের সহিত মহরম মিছিল বাহির করিতেন।

নবাব আবদুল লতিফ লেন্—ইনি প্রাদেশিক একজি-

কিউটিভ সার্ভিসে ছিলেন, পরে ভূপালের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট—যে দিন প্রিটোরিয়ায় বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হয়, সেই দিন এই রাস্তার নামকরণ হওয়ায় এই নাম দেওয়া হইয়াছিল।

মলঙ্গা—মালঙ্গী হইতে এই নাম হইয়াছে। যাহারা লবণ তৈয়ারি করিত তাহাদের মালঙ্গী বলিত। পূর্ব্বে এই স্থানে লবণ তৈয়ারি হইত, নুনের গোলা ছিল। এখন এখানে যে সব সুবর্ণবণিক বাস করিয়া থাকেন, তাঁদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষেরা এই কাজ কবিতেন।

বরানগর—বারবণিতার সংশ্রব হইতে বারনগর ও উহা হইতে বরানগর নাম হইয়াছে। হেজের রোজনামা গ্রন্থে ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থে বারনগর নামই পাওয়া যায়।

ধর্ম্মতলা—মুসলমানদের মসজিদ হইতে এই নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে যেখানে কুক্ কোম্পানীর আড়গড়া আছে উহা তথায় অবস্থিত ছিল। সে জমি তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জাফর নামক এক জমাদারের সম্পত্তি ছিল। ধর্ম্মতলার রাস্তার উভয় পার্শ্ব পূর্ব্বে তরুরাজি-শোভিত ছিল। তখন ইহাকে এভেনিউ বলিত। পথের উভয় পার্শ্বে গভীর নর্দ্দামা করিয়া পথটিকে উঁচু করা হইয়াছিল। পার্শ্বে মাত্র কতিপয় চালা ঘর ছিল। ইহাই তখনকার দিনে সহর হইতে সল্টওয়াটার লেক্ ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইবার পথ ছিল।

এসপ্ল্যানেড্ রো, কাউন্সিল্ হাউস্ ষ্ট্রীট্—১৭৮৮

চিৎপুর—চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম হইতে চিৎপুর হইয়াছে। এখানকার চিত্তেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি ঠাকুর সন্ন্যাসী ফকিরেরা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখানে চোর ডাকাতের আড্ডা ছিল এবং ডাকাতে কালী বলিত। এই দেবী সমীপে নরবলি প্রচলিত ছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল শনিবার অমাবস্যার রাত্রিতে এখানে কালীর মন্দিরে নরবলি হইয়াছিল। চিৎপুর কলিকাতার মধ্যে একটী অতি পুরাতন বর্ত্ম।

ওল্ড্ কোর্ট্ হাউস ষ্ট্রীট্—১৭৮৮ (দক্ষিণ দিকের দৃশ্য)

ফৌজদারী বালাখানা—হুগলীর ফৌজদার যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহারা এই স্থানের বালাখানা-বাটীতে থাকিতেন। সেই হইতে এই নাম হইয়াছে।

আলিপুর—মির্জ্জাফর আলির নাম হইতে আলিপুর।

বৈঠকখানা—কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্ চার্ণক্ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে বসিয়া মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেন—উহাই

তাঁহার বৈঠকখানার কার্য্য করিত। সেই অবধি এই স্থানের নাম বৈঠকখানা হইয়াছে।

নিমতলা ষ্ট্রীট্—নিম্ব বৃক্ষ হইতে এই নাম হইয়াছে।

মাণিকতলা—মাণিকপীর হইতে পথের নাম মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ হইয়াছে।

শেঠবাগান—পুরাতন দুর্গের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়বাজার পর্য্যন্ত একটি রাস্তা ছিল। উহা মেরামত ও

থিয়েটার ষ্ট্রীট—লায়নস্ রেঞ্জ ও পুরাতন চীনা বাজারের রাস্তা যেখানে মিলিত হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বকালে একটী থিয়েটার ছিল। তাহা হইতে এই নাম। উপস্থিত এ রাস্তাটী নাই।

হোগলকুড়িয়া—হোগলাবন হইতে এই নাম হইয়াছে।

সিমলা—সিমুলিয়া হইতে সিমলা হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে বহু সিমুল গাছ ছিল।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দৃশ্য (পূর্ব্বদিক হইতে)—১৭৯৪

পরিষ্কার রাখিবার জন্য কোম্পানীর দালাল জনার্দ্দন শেঠ বারাণসী শেঠ প্রভৃতিকে কোম্পানী ৫৫ বিঘা জমি বিঘা-প্রতি আট আনা কম খাজনায় বিলি করিয়াছিলেন। এই হইতে শেঠবাগান নাম হইয়াছে।

প্রাচীন কলিকাতার একটি পথের দৃশ্য।

হামাম্ গলি—এখানে পূর্ব্বে সাধারণের জন্য স্নানাগার ছিল; তাহা হইতে এই নাম হয়।

কয়লা ঘাট—কেল্লাঘাট হইতে এই নাম হইয়াছে অনেকে অনুমান করেন।

হাতিবাগান—সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ-কালে তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হস্তীগুলি এই স্থানে রক্ষিত হইত।

রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট্—নবাব নাজিম আলি খাঁর দেওয়ান উদান্ত সিং (Udwanta Sing) এর নাম হইতে এই নাম হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া টেরেস্—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থ এই নামকরণ হইয়াছে এবং এলবার্ট রোড তাঁহার স্বামীর নাম স্মরণার্থ রাখা হইয়াছে।

হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কর্ণ-ওয়ালিশ স্কোয়ার, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট্, ওয়ে-লেসলি স্কোয়ার, ওয়েলেসলি প্লেস, ওয়েলেসলি লেন্, মাকুইশ্ ষ্ট্রীট, ময়রা ষ্ট্রীট, এমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক লেন্, ডালহাউসি স্কোয়ার, ক্যানিং ষ্ট্রীট, রিপন ষ্ট্রীট, রিপন লেন, ল্যান্সডাউন রোড, ও এল্গিনরোড নামগুলি এই সকল নামের গভর্ণর জেনারেলের নাম হইতে হইয়াছে।

হ্যালিডে ষ্ট্রীট, গ্রাণ্ট্ ষ্ট্রীট, বিডন্ ষ্ট্রীট, বিডন্ স্কোয়ার,

বিডন রো, গ্রে ষ্ট্রীট এবং ইডেন হস্পিট্যাল লেন—এই এই নামের ছোটলাটের নাম হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে।

চারণক্ প্লেশ, হলওয়েল্ লেন্, ভ্যান্সিটার্ট রো, ক্লাইভ্ রো, ক্লাইভ্ ঘাট ষ্ট্রীট প্রভৃতি নামগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর গভর্ণরদের নাম হইতে হইয়াছে।

চৌরঙ্গী—এই স্থান পূর্ব্বে ভয়ানক জঙ্গলময় ছিল। উহার মধ্যে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চৌরঙ্গ গীরি নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাঁহার নাম হইতে চৌরঙ্গী নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন চোর ইঙ্গরাজদের এখানে আড্ডা ছিল। তখন ইরাজদের 'ইঙ্গরাজ' বলিত।

সাল্থ্ ষ্ট্রীট—কলিকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল চেম্বারম্যানের নামে নামকরণ হয়। হগ্ ষ্ট্রীট মেটকাফ্ ষ্ট্রীট প্রভৃতির নামও ষ্টুয়ার্ট হগ্ ও সি, টি, মেটকাফের নাম হইতে হইয়াছে।

মটস্লেন্—মিঃ মটের নামানুসারে পথের নাম হইয়াছে। ইনি প্রাচীন কলিকাতার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। হেষ্টিংসের সহিত ইঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ফ্রি স্কুল্ ষ্ট্রীট্—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী ফ্রি স্কুল স্থাপিত হয়, তাহা হইতে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। এই রাস্তার ৩৯ নম্বর বাড়ীতে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক উইলিয়ম থ্যাকারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রিচমণ্ড থ্যাকারে আলিপুরে বাস করিতেন। সে পথটিকে এখনও "থ্যাকারে রোড" বলে।

সদর ষ্ট্রীট—এই পথে "সদর কোর্ট" নামে একটী আদালত ছিল, তাহা হইতে এই নামকরণ হইয়াছে।

ফ্যান্সি লেন্—কথিত আছে পূর্ব্বকালে এখানে একটী ফাঁসি-মঞ্চ ছিল, তাহা হইতে ক্রমে "ফ্যান্সি" হইয়াছে।

হরিণবাড়ী লেন—পূর্ব্বে এই স্থানে প্রচুর হরিণ দেখা যাইত বলিয়া এই নাম হইয়াছে—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

সার্কিউলার রোড্—ইহা কলিকাতাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে; সেই কারণ এই নাম হইয়াছে। এই রাস্তার ধারেই ডিরোজিও সাহেব বাস করিতেন।

জেনারেলের পুষ্করিণী—চৌরঙ্গী

কটন্ ষ্ট্রীট—জব্ চার্ণকের কলিকাতায় আগমনের পূর্ব্বে এখানে একটি তুলা ও সূতার হাট ছিল। তখন ইহাকে "রুয়েহাটা" বলিত।

মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট—সুপ্রীম্-কোর্টের দেওয়ান মুক্তারাম দের নামে এই পথের নামকরণ হইয়াছে।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট - নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর ক্ষতিপূরণের যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা বণ্টনের জন্য যে কয়েকজন কমিশনর নিযুক্ত হন, দয়ারাম বসু তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার বংশোদ্ভূত দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর নাম হইতে পথের নাম হইয়াছে।

বজবজ রোড—বজবজ দুর্গে যাতায়াতের পথ ছিল।

জানবাজার ষ্ট্রীট—জন নামক এক সাহেবের এখানে বাজার ছিল; তাহা হইতে এই নাম হইয়াছে।

ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন—এ স্থানে পূর্ব্বে একটী খাল ছিল, কথিত আছে এ স্থানে অনেক ডিঙ্গা বা নৌকা ডুবিয়া যাইত।

অক্রূর দত্তের গলি—ইনি কোম্পানীর আমলে কমিশেরিয়েটে কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমের যুদ্ধে ইংরাজ সেনার সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটের দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বেলভেডিয়ার রোড্—বাঙ্গলার ছোটলাটের বাসভবন —"বেলভেডিয়ার" এই স্থানে অবস্থিত থাকায় এই নাম হইয়াছে।

জগদীশনাথ রায়ের লেন—চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি কাঁচড়াপাড়া হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করেন। ইনি পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ইঁহার নামেই উৎসৃষ্ট করেন। জয়পুরের রাজমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সংসারচন্দ্র সেন মহাশয় ইঁহার জামাতা ছিলেন।

ডেকার্স্ লেন—জন্ ডেকারের (John Dacre) নাম হইতে।

সেণ্ট্ জেমস্ স্কোয়ার ও সেণ্ট্ জেমস্ লেন্—সেণ্ট্ জেমস্ গির্জ্জা হইতে এই নাম হয়।

টার্ণবুলস্ লেন্—টার্ণবুল্ (Robert Turnbull) বহু দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারি ছিলেন।

থিয়েটার রোড্—হেম্যান্ উইলসন্ (Horace Hayman Wilson) তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া এই স্থানে স্যান্ সোসি থিয়েটার (Sans Souci Theatre) নামে একটী সখের থিয়েটার দল ও উহার বাটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই নাম হয়।

কলেজ ষ্ট্রীট্—হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ হইতে এই নাম হইয়াছে। মেডিক্যাল্ কলেজ ষ্ট্রীট্ এই নামেও একটী পথ আছে।

এসপ্ল্যানেড্ রো

চার্চ্চ লেন্—সেণ্ট্ জন্ চার্চ্চ হইতে এই নাম হয়।

মিউনিসিপ্যাল অফিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা কর্পোরেশনের অফিস এই পথে থাকায় এই নাম হইয়াছে।

বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্—পূর্ব্বে ইহাকে রাণী মুদির গলি বলিত। কলিকাতা অবরোধ কালে মানিকচাঁদের অধিনায়কত্বে ইংরাজদের সহিত এই স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। জমিদারদের বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ হইতে এক্ষণে এই নাম হইয়াছে।

পাথুরিয়াঘাটা—পাথর দ্বারা বাঁধান একটি ঘাটের নাম হইতে এই নাম হইয়াছে।

শ্যামপুকুর—বসাকদের পূর্ব্বপুরুষ শ্যাম্ বসাকের একটী পুষ্করিণীর নাম হইতে স্থানের নাম হইয়াছে।

এজরা ষ্ট্রীট্—ইহুদি সওদাগর এজরা (E. D. J. Ezra)র নাম হইতে এই নাম হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পথগুলির পূর্ব্বে ভিন্ন নাম ছিল।—

বর্ত্তমান নাম	পূর্ব্বের নাম
প্রতাপ চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্	ফক্স লেন্
চিন্তামণি দাসের গলি	পটুয়াটোলা বাই লেন্
মারকুইস্ ষ্ট্রীট্	জোড়াতলাও ষ্ট্রীট্
বেণ্টিক্ ফার্ষ্ট লেন্	নানকু জমাদারের গলি
ঘোষের লেন্	শুঁড়িপাড়া ফার্ষ্ট লেন্
হগ্ ষ্ট্রীট্	জানবাজার সেকেণ্ড লেন্
ডট্স্ লেন্	জানবাজার থার্ড লেন্
সার্কেট্ ষ্ট্রীট্	জানবাজার ফোর্থ ফিফ্থ লেন্
ডক্টরস্ লেন	হাড়িপাড়া লেন্
টার্ণবুলস্ লেন্	প্রিয় খানসামা লেন্
মদনমোহন দত্তর লেন্	রমজান ওস্তাগরের লেন্
পার্ক্ লেন্	মেন্দিবাগান লেন্
ইডেন্ হস্পিট্যাল্ লেন্	নিমুখানসামার লেন্
শ্যামাচরণ দের লেন্	রতন্ মিস্ত্রীর লেন্

খ্যাতনামা অধিবাসী বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন দেবদেবী, কোন জাতি বিশেষের নাম, বৃক্ষাদির নাম, দ্রব্যাদির নাম প্রভৃতি হইতেও অনেক স্থানের নাম হইয়াছে। যথা,—

দেবদেবী হইতে—কালীঘাট, ভবানীপুর, গোবিন্দপুর, চিৎপুর (চিত্তেশ্বরী হইতে), কালীতলা, শিবতলা, পঞ্চাননতলা, ব্রীজতলা (ব্রজনাথ হইতে), রাধাবাজার প্রভৃতি।
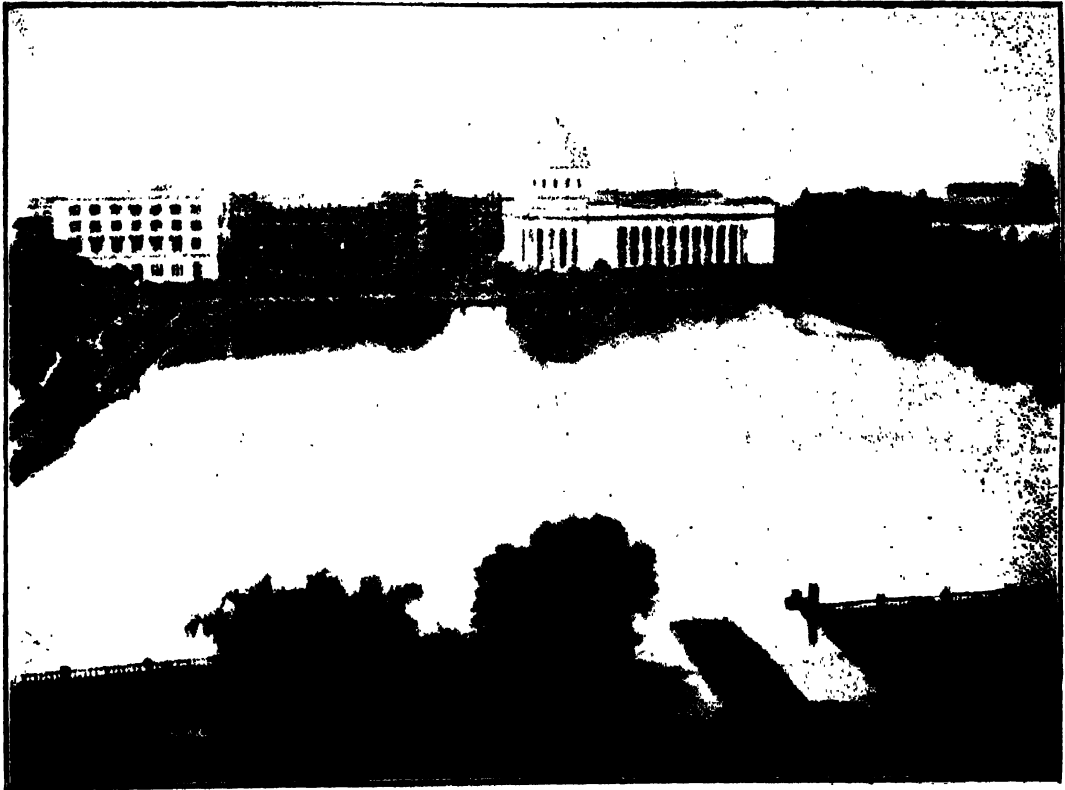
বৃক্ষাদি হইতে—কদমতলা, বেলতলা, বাঁশতলা, বড়তলা, আমড়াতলা, নিমতলা, নেবুতলা, বাদামতলা, তালতলা ইত্যাদি।

পুষ্করিণী হইতে—পদ্মপুকুর, কাঁটাপুকুর, ঝামাপুকুর প্রভৃতি।

জাতি হইতে—কুমারটুলী, জেলেপাড়া, মুচিপাড়া,

ডালহাউসী স্কোয়ারের উপর হইতে দৃশ্য।

নিকরীপাড়া, আরমানি-টোলা, খালাসিটোলা, কাঁসারি-পাড়া, বেনিয়াটোলা, ময়রাহাটা, ধোবাপাড়া, সিকদার-পাড়া প্রভৃতি।

বাজার হইতে—শোভাবাজার, বড়বাজার, বৌবাজার

জিনিষের নাম হইতে—ময়দাপটি, দয়েহাটা, ৺রমাহাটা, প্রভৃতি।

বাগানের নাম হইতে—নারিকেলডাঙ্গা, কলাবাগান, ফুলবাগান, হাতিবাগান, হালসিবাগান, বাদুড়বাগান, হরিতকীবাগান ইত্যাদি।

পূজাপার্ব্বণ হইতে—রথতলা, চড়কডাঙ্গা প্রভৃতি। *

* প্রাচীন বিষয়ই আমাদের আলোচ্য হইলেও যে সকল পথের নাম ও নামোৎপত্তির কথা লিখিত হইল, তাহার সমস্তগুলিই যে অর্দ্ধ-শতাব্দীর পুর্ব্বেকার তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এ সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বিপরীত

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মেয়ে ত' অনেকেরই হয়, কিন্তু এমন মেয়ে—

সবাই বলে, 'বাবা, জন্মে কখনও দেখিনি।'

মেয়ে বড়লোকের, এবং শুধু বড়লোকের নয়—ওই একমাত্র। বাল্যকালে মা মরিয়াছে, আদর-যত্নে প্রতিপালিত, তের বছরের মেয়ে—মনে হয় যেন ষোলো বছরের যুবতী। মোটা-সোটা কদাকার কুৎসিত নয়, অস্থিচর্ম্মসার রোগা-পট্‌কা নয়,—পল্লীগ্রামের সতেজ সবুজ দেবদারুর মতই স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

বাবা ডাকেন, 'শঙ্করী!'

বাড়ীর ছাতের উপর শঙ্করীর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বলে, 'যাই।'

'যাই' বলিয়া আর আসে না। কেদারবাবুর ভয় হয়। বর্ষায় পিছোল্ কাটের সিঁড়ি দিয়া দস্যি মেয়ে ছাতে উঠিয়াছে, পা হড়্‌কাইয়া পড়িয়া যাইতেই বা কতক্ষণ! রাগিয়া বলেন, 'ছাতে উঠেছিস্ কেন? নেমে আয় শীগ্‌গির! নেমে আয় বলছি।'

ছাতের কিনারে ছোট প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া শঙ্করী বলে, 'কি বল? তুমি বল না বাপু ওইখান থেকে। দেখতে পাচ্ছ না—আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছি যে!'

ঘুড়ি!··· কেদারবাবু অবাক্।

নিজেই শেষে ধীরে-ধীরে উঠিলেন। ছাতের সিঁড়িটার কাছে গিয়া ডাকিলেন, 'আয় মা, নেমে আয় শঙ্করী। ছি, ছি, ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ানো···অত বড় মেয়ে··· লোকে দেখলে—'

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। বেশি কথা বলিবার উপায় নাই।

শঙ্করীর মাথাটা বোধ করি আজ ঠাণ্ডা ছিল। ছাত হইতে নামিয়া আসিল। এবং নামিয়া আসিয়াই ঘুড়ি ও লাটাইটা তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'ঘুড়ি ওড়াব তাও তোমার সহ্য হোলো না। বাবা রে বাবা!'

বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইতেছিল, কেদারবাবু ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'ভবদেবের পেঁপে গাছটা কে কেটেছে রে? ভবদেব নালিশ করতে এসেছিল।'

শঙ্করী হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছি কেটে। দিইছিই ত!'

'কেন কাটলে? ছি! পরের অনিষ্ট করতে আছে. কখনও?' বলিয়া মেয়েকে তাঁহার আদর করিয়া কেদার-বাবু কাছে টানিয়া আনিলেন।

শঙ্করী বলিল, 'দেব না? ভব'দার বৌকে বললাম, ওই পাকা পেঁপেটা দে বৌ, আমরা কেটে কেটে খাই, এই সময় ভবদা বাড়ী নেই। তা মাগী কিনা আমায় যা' তা' বলে' তেড়ে মারতে এলো। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কেটেছি বেশ করেছি।'

কেদারবাবু বলিলেন, 'ছি! ও-কথা কি বলতে আছে

মা! পেঁপে খাবার ইচ্ছে হয়েছিল আমায় তুমি বললে না কেন?'

শঙ্করী এবার মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কথাটার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

কেদারবাবু বলিলেন, 'দশটি টাকা দিয়ে ভবদেবকে বিদেয় করলাম। এমন করে' জরিমানা আর আমি কত দেব মা? বল্ আর দুষ্টুমি করবি নে!'

ঘাড় হেঁট করিয়া শঙ্করী বলিল, 'না।'

দিন কয়েক পরেই দুর্গা পূজা।

কেদারবাবুরা তিন ভাই—তিন সরিক্। কিন্তু এই পূজার সময় সকলেই একত্র হয়।

চারি দিকে লোকজনের ছুটাছুটি। কেদারবাবুর বিশ্রামের আর এতটুকু অবসর নাই। শঙ্করীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখিস্ মা, পূজোর সময় আর দৌরাত্যি করিস্ নে যেন।'

শঙ্করী বলিল, 'কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই। আমি বুঝি দৌরাত্যি করি?'

কেদারবাবু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন। দুর্গাবাড়ীর প্রকাণ্ড চত্বরে বড় বড় কাঁচা বাঁশের খুঁটি দিয়া সামিয়ানা খাটানো হইতেছে। রাণীগঞ্জ হইতে আলোর ঠিকাদার পঞ্চু তখন পাঁচ-পাঁচটা পাঞ্চ-লাইটে কেরোসিন তেল দিয়া পাম্প্ করিতে সুরু করিয়াছে। এ বৎসর আর দেশোয়ালী যাত্রা হইবে না। কলিকাতা হইতে সাবিত্রী অপেরা পার্টির প্রকাণ্ড দল আজ সকালের ট্রেণে তাহাদের গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ধুমধামের আর অন্ত নাই।

সন্ধ্যার পরে যাত্রা আরম্ভ। সংবাদ পাইয়া আশ-পাশের প্রায় দশ-বারোখানা গ্রামের লোক সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সামিয়ানার নীচে জড়ো হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আলো জ্বলিল, আসর পাতা হইল, বাজনা বাজিল, প্রোগ্রাম বিলি হইল, কিন্তু চারি দিকে এত এত লোকের ভিড়—গোলমাল কিছুতেই থামে না।

বাবুদের বাড়ীর ছেলেরা সিল্কের জামা পরিয়া ছড়ি হাতে লইয়া লোকগুলাকে বসাইয়া দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোলমাল চুপ করাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাই বলিয়া যাত্রা বন্ধ রাখা চলে না। সবাই বলিতে লাগিল, যাত্রা আরম্ভ হইলেই গোলমাল থামিবে। দলের ম্যানেজার কেদারবাবুর হুকুম লইয়া গিয়া আসর হইতে ঢং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ একদল সখী আসিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান আরম্ভ করিল।

কিন্তু গোলমাল কিছুতেই থামে না।

অথচ তাহার পরেই প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, রাজপথ, শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা।

শ্রীকৃষ্ণের পরনে ভেল্‌ভেটের উপর সাম্‌লা-চুম্‌কির কাজ-করা পোষাকটা নিতান্ত খাটো হইয়াছিল বলিয়া বেচারা ভাল করিয়া নড়িতে-চড়িতে পারিতেছিল না। তা না পারুক্, ছোকরার রং কালো হইলেও চেহারা ভালো, বক্তৃতাও সে করিতেছিল প্রাণপণে চীৎকার করিয়া,—কিন্তু তবু তাহার এক বর্ণও শোনা যায় না।

কেষ্টর শেষ কথাটা শুনিতে না পাইয়া পাছে ঠিক সময়ে আসরে ঢুকিতে না পারে বলিয়া সাজঘর হইতে রাধিকাকে অনেকখানি আগাইয়া আসিতে হইয়াছে।

আসরে ঢুকিবার ফটকের কাছাকাছি একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়াইয়া রাধিকা বিড়ি টানিতেছিল। নিজের বক্তৃতা শেষ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া চোখ টিপিয়া কেষ্ট তাহাকে আসিতে বলিল।

আসরে তখন হারমোনিয়ামে সুর দিয়াছে। রাধিকাকে গান গাহিয়া গাহিয়া ঢুকিতে হইবে।

গানের প্রথম কলিটা আরম্ভ করিয়া হাসি-হাসি মুখে সে কেষ্টর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এবং যেই দাঁড়ানো, আর অমনি কপালে হাত দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কান্না!

ব্যাপার দেখিয়া ত' সকলেই অবাক্। যাহারা এতক্ষণ গোলমাল করিতেছিল, হঠাৎ তাহারা চুপ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

কোথা হইতে সজোরে একটা ঢিল আসিয়া রাধিকার কপালে লাগিয়াছে।

এত বড় একটা ঢিল—বাঁ করিয়া আসিয়া লাগিল তাহার কপালে; বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ,—কাঁদিয়া ফেলিবার কথা।

কিন্তু এই এতগুলা লোকের মধ্যে কে যে ঢিল ছুঁড়িয়াছে এবং কেন যে ছুঁড়িয়াছে, কে জানে। তবে ঢিলটা কোন্‌দিক হইতে আসিয়াছে, কাছে যাহারা বসিয়া ছিল তাহারা ঠিক বলিয়া দিল।

কেদারবাবুর ভাইপো নরেশ গেল তাহার সন্ধান করিতে।

আসরের লোকজন তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে রাধিকাকে লইয়া।—'চুপ কর্ ছি, কাঁদে না, ও আর কী এমন হয়েছে! রক্ত ত' পড়ে নি!'

সাজ ঘরে টিঞ্চার আইডিন ছিল; ম্যানেজার নিজে গিয়া শিশিটা লইয়া আসিলেন। লোকজন সরাইয়া রাধিকার ফোঁটা-তিলক-কাটা কপালের এক পাশে তাহাই খানিকটা লাগাইয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ওঠ্, বাবা ওঠ্, ভারি ত' একটু লেগেছে, তার আবার ফুলে' ফুলে' কান্না ছাখ ছেলের! অমন কত লাগে! ওঠ্, আমার যাত্রা মাটি হয়ে গেল। ওঠ্, এইবার সব চুপ করেছে; গানটা জম্‌বে ভালো। নাও হে নাও, তোমরা আর হাঁ করে' বসে থেকো না। লাগাও সঙ্গৎ!'

বলিয়া তিনি একরকম জোর করিয়াই রাধিকাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

আবার গান চলিতে লাগিল।

শ্রোতারা তখন চুপ করিয়াছে।

কেদারবাবু আসরের এক পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় নরেশ তাহার ছড়ি হাতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, 'আসুন!'

হুঁকাটা অন্য হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন রে?'

'আসুন, আপনি একবার উঠেই আসুন না!'

কেদারবাবু উঠিয়া তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

পূজার তিন দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আজ বিজয়া দশমী—কেদারবাবুর পা যেন আর চলিতেছিল না।

তাঁহারই বৈঠকখানার সুমুখে গিয়া নরেশ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কে ঢিল ছুঁড়েছিল জানেন?'

'কে?'

নরেশ বলিল, 'দেখুন খুলে'। এই ঘরে আমি বন্ধ করে' রেখেছি।'

কেদারবাবুর বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—শঙ্করী নয় ত?

শিকল খুলিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, জানালার পথে পাঞ্চ্-লাইটের খানিকটা আলো ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে এবং সেই আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল, বসিবার চৌকিটার পাশে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া—শঙ্করী!

নরেশ বলিল, 'ওদের জমীর সঙ্গে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট্ টানছিল। বললে, ঢিল ছুঁড়েছি বেশ করেছি। গোলমাল কর্‌ছিল থামিয়ে দিয়েছি।'

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু একটি কথাও বলিলেন না। নরেশের হাতে ছিল বেতের ছড়ি। তাহাই তিনি কাড়িয়া লইয়া নীরবে আগাইয়া গিয়া শঙ্করীর পিঠের উপর সপ্ সপ্ করিয়া সজোরে ঘা-কতক্ বসাইয়া দিলেন।

বেতের ছড়ি কাপড়-জামা ভেদ করিয়া শঙ্করীর পিঠের চামড়ায় গিয়া লাগিল। 'মা গো!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শঙ্করী আত্মরক্ষা করিবার জন্য চৌকির ও-পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। কেদারবাবুর মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে। চৌকিটা ডিঙ্গাইয়া গিয়া আবার তিনি শঙ্করীর গায়ে মাথায় হাতে পিঠে যেখানে পাইলেন সজোরে বেত চালাইতে লাগিলেন।

এবার আর শঙ্করী একটি কথাও উচ্চারণ করিল না, হাত দিয়া বার-কতক্ সে তাহার পিতার প্রহার প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল মাত্র, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া শেষে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া অনবরত জল গড়াইতে লাগিল।

চোখের সুমুখে এত মার নরেশেরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কেদারবাবুকে একরকম জোর করিয়াই সে সেখান হইতে টানিয়া আনিয়া দরজার শিকলটা আবার টানিয়া দিয়া বলিল, 'থাক্, ও এই ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাক্ সারারাত। আপনি যান।'

হাতের ছড়িটা ফেলিয়া দিয়া উন্মাদের মত কেদারবাবু একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, একবার উঠানের উপর বারকতক পায়চারি করিলেন, তাহার পর আপনমনেই বিড় বিড় করিয়া কি যেন বকিতে বকিতে তাঁহার দোতলার ঘরে গিয়া খিল্ বন্ধ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। গত তিনটি দিনের মধ্যে এমন করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইবার অবসর তাঁহার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও মিলে নাই,—শুইবামাত্র তাঁহার ঘুমাইয়া পড়িবার কথা; কিন্তু কন্যাকে প্রহার করিয়া আসিয়া অবধি কিসের যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে এমনিভাবে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয়নে তাঁহার না হইল তৃপ্তি, চোখে তাঁহার না আসিল ঘুম। শঙ্করীর মাতার মৃত্যুর পর হইতে আজ অবধি শঙ্করীকে প্রহার করা দূরে থাক্ কোনো দিন একটি রূঢ় কথা বলিয়া তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিয়াছে। অথচ আজ তিনি এত বড় নিষ্ঠুর হইলেন কেমন করিয়া! কেদারবাবু নিজেকেই নিজের আচরণের জন্য বারে-বারে ধিক্কার দিতে দিতে হঠাৎ কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, রাত্রির শেষ প্রহরে কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরজা খুলিলেন। সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া দেখেন, যাত্রা কখন্ ভাঙ্গিয়া গেছে,—লোকজন কেহ কোথাও নাই, চারি দিক নিস্তব্ধ।

কেদারবাবু বৈঠকখানার দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

শিকল খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঠাণ্ডা মেঝের উপর শঙ্করী কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে হয় ত কিছুই সে খায় নাই, মা'র খাইয়া হয় ত সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছে। কেদারবাবু তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আবার তেমনি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়াই চীৎকার করিয়া ঝি-চাকরকে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিলেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বেরিয়ে যা সব আমার বাড়ী থেকে—কালই দূর হয়ে যা! কাউকে চাই নে আমি।'

কি অপরাধ যে তাহারা করিয়াছে কেহ বুঝিতে পারিল না।

বাবুর চীৎকার শুনিয়া লণ্ঠন হাতে লইয়া তরু-ঝি বাহিরে আসিতেছিল, কেদারবাবু তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মেয়েটা যে সন্ধ্যে থেকে পড়ে' আছে বাইরের ঘরে, তা সে খেয়েছে কি না খেয়েছে, বেঁচে আছে না মরেছে, সে সবই বুঝি আমায় দেখতে হবে? দূর, দূর! কি জন্যে যে আছিস তোরা সব······ বেরো বেরো—আমার বাড়ী থেকে বেরো! বাড়ীতে একটা গিন্নি-বান্নি—' বলিয়া কথাটা তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি আবার তাঁহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

নীচে ঝি-চাকরের জটলা চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তরু আসিয়া বাবুর দরজার কাছে দাঁড়াইল। ভয়ে-ভয়ে বলিল, 'মেয়ে ত' কিছু খেলে না বাবা!'

কেদারবাবু তেমনি শুইয়া শুইয়াই জবাব দিলেন, 'এই কি খাবার সময় না কি মানুষের? এখন খেলে তার অসুখ করবে, খাওয়াস্ নে কিছু।'

'খাবে কেমন করে' বাবা! গা-টা কেমন যেন ছ্যাক্-ছ্যাক্ করছে। জ্বর-জ্বালা কিছু হলো কি না তাই বা কে জানে!' বলিয়া ঝি সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

কেদারবাবু তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। 'কি বললে তরু? জ্বর?'

'হ্যাঁ বাবা, গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।'

'হবে না? বেশ হয়েছে। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সারারাত···মর্ মর্ ছি ছি, আমার মরণটা হলে যে বাঁচি। চল্, দেখি।' বলিয়া তিনি ঝি'র পিছু-পিছু পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, শঙ্করীকে তাহার বিছানার উপর আনিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, সত্যই জ্বর। ডাকিলে সাড়া দেয় না। বেহুঁস অবস্থায় কোনো রকমে সে এখানে আসিয়াই জ্বরের ধমকে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই। বুড়া দয়াল কবিরাজকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া আনা হইল। কোনও ভয় নাই বলিয়া লাল-লাল গোটাকতক বড়ি তিনি দিয়া গেলেন। কিন্তু

তিন চার দিন পরে শঙ্করী যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া আবার তেম্‌নি আগের মত ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেদারবাবুর আশঙ্কা, উদ্বেগ, এবং প্রার্থনার আর অন্ত রহিল না।

বিবাহ দিলে হয় ত' তাহার এই চঞ্চলতা থামিয়া যাইতে পারে ভাবিয়া কেদারবাবু এইবার শঙ্করীর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাই-বা কেমন করিয়া সম্ভব! বিবাহের পর কন্যা তাঁহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, একটি দিনের জন্যও হয় ত' তাহাকে আর তিনি দেখিতে পাইবেন না, হয় ত' তাহার এই চঞ্চল স্বভাবের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিবে, শাস্তি দিবে, অথচ বলিবার কিছু নাই, কন্যার সম্পূর্ণ অধিকার পরের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

দু'তিনটা সম্বন্ধ তিনি নিজে ভাঙ্গিয়া দিলেন। ভাল ঘর, ভাল বর, জমিদারের ছেলে,—কিন্তু না, কেদারবাবু বলিলেন, 'আর কিছুদিন পরে হ'লেই যেন ভাল হয়। মেয়ে এখন আমার নিতান্ত ছোট।'

কিন্তু 'ছোট'র অজুহাত দেওয়া বুঝি আর চলে না। বয়সকে ফাঁকি দিয়া শঙ্করী প্রতিদিন যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

ঘটক তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারাই মেয়ে দেখিবার জন্য বরপক্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিল। দু' একটা ভাঙ্গিয়া গেল কোষ্ঠীর মিল হইল না বলিয়া, দু' একটা ভাঙ্গিল টাকাকড়ির গোলমালে।

কেদারবাবু মনে-মনে খুশীই হইলেন।

কিন্তু ঘটকের কল্যাণে লোক আসা তখনও বন্ধ হয় নাই। কন্যাপক্ষ বড়লোক। বিবাহ হোক্ আর নাই হোক্, পাওনার লোভে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দু'টা সম্বন্ধ তাহারা আনিবেই।

এবার যাহাদের আনিল তাহারা বড়লোক। কল্যাণ-চকের জমিদার। ছেলেটি কলিকাতায় থাকিয়া বি এ পড়ে। এমনটি বোধ হয় একবারও আসে নাই। টাকার খাঁকৃতি একরকম নাই বলিলেই হয়। মেয়েটি পছন্দ হইলেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন—এইরূপ ইচ্ছা। কেদারবাবু ভাবিলেন, হয় ত' তাহা হইলে এইখানেই হোক্।

কিন্তু বিধির এম্‌নি বিড়ম্বনা—

গয়না কাপড় পরাইয়া দিয়া, পিঠে একপিঠ চুল খুলিয়া দিয়া শঙ্করীকে আনিয়া সেইখানে বসাইয়া দেওয়া হইল। পরমাসুন্দরী মেয়ে! অপছন্দ হইবার কিছু নাই।

বরের বাবা নিজে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শঙ্করীর আপাদ-মস্তক মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, 'এ আর দেখব কি। আহা চমৎকার মেয়ে! তোমার নাম কি মা?'

লজ্জায় শঙ্করী মাথা হেঁট করিল না, কথা বলিতে গিয়া থতমত খাইল না, স্পষ্ট পরিষ্কার তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আমার নাম—শ্রীমতী শঙ্করী দেবী। ডাক-নাম টুনু।'

কেদারবাবু হাসিতে লাগিলেন।—'মেয়ে আমার লিখতে পড়তে সবই জানে। কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না সব দিকেই ওস্তাদ।'

শঙ্করী ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'ধেৎ! রান্না-বান্না আমি কিছু জানি না।'

কেদারবাবু হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিলেন, 'তবে যে সেই সেদিন—মাছের ঝোলটা বললি আমি রাঁধলাম!'

শঙ্করী তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'বা রে! তা আবার কখন্ বললাম?'

কেদারবাবুর অবস্থাটা বরকর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি ব্যাপারটাকে তরল করিয়া দিবার জন্যই বোধ করি হো হো করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ, তোমার বাবার দেখ্‌ছ কি, সব মিছে কথা।'

শঙ্করী একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'ওদের পাঁচী খুব ভাল রাঁধতে জানে। ওর মা ওকে শিখিয়েছে। আমার মা নাই যে!'

শেষের কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করিল যে, বরকর্ত্তার মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া গেল। বলিলেন, 'তা হোক্, তুমি লেখাপড়া জানো ত' মা, তাহ'লেই হবে।'

শঙ্করী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উহুক্! পড়তে একটু একটু পারি, কিন্তু লিখতে ভাল পারি না। কেলো-মাষ্টারের পাঠশালে দ্বিতীয় ভাগ পড়তাম। তা কেলো-মাষ্টার

একদিন আমাকে মেরেছিল। আমিও দিয়েছিলাম কামড়ে তার হাতটাকে ছিঁড়ে' একেবারে রক্ত বের করে'। বাস্, সেইদিন থেকে আর যাই না।'

চিঠি লিখিয়া তাঁহার অভিমত জানাইবেন বলিয়া বরকর্ত্তা চলিয়া গেলেন।

তাহার পর এক সপ্তাহ যায়, দু' সপ্তাহ যায়, চিঠি আর তিনি লেখেন না।

ঘটক তখন নিজে একদিন তাঁহার সন্ধান করিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল,—'আজ্ঞে না কর্ত্তা, হলো না ওখানে। ছেলে এখন বিয়ে করতে রাজি নয়।'

কেদারবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, 'হবে না তা আমি সেই দিনই জানি। হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখু আছে।'

বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'এবার যা তুই যেখান থেকে পারিস্ যেমন হোক্ নিয়ে আয় সম্বন্ধ,—আমি সেইখানেই বিয়ে দেব।'

ঘটক বুঝিল, এটা নিছক্ রাগের কথা। বলিল, 'তাহ'লে আজ্ঞে মাধবপাড়ার ওরা কি দোষ করেছিল? ঘর ভাল, বর ভাল, পাঁচশ' টাকা বেশি চেয়েছিল বই ত' নয়। তা রাজি হয়ে যান ত' দেখুন আমি তাদেরই আবার ধরে' নিয়ে আসি।'

কেদারবাবু বলিলেন, 'তাই আন্।'

তাহাই হইল।

মাধবপাড়ার মুখুজ্যেরা মাঝারি-গোছের গৃহস্থ। ছেলেটির বয়স একটুখানি বেশি, দেখিতেও তেমন সুশ্রী নয়। তা হোক্, পুরুষ আবার সুশ্রী কুশ্রী আছে না কি?

একে বড়লোক, তায় আবার ওই একটি মাত্র মেয়ে। পাঁচশ' টাকার একটা দাঁও কষিয়া রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তাহারা প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

বরের বাপ আসিয়া তাহার পরের দিনই ধান-দূর্ব্বা এবং পাঁচটি টাকা হাতে দিয়া শঙ্করীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

বিবাহ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

এবং হইলও তাই।

বর দেখিয়া সকলেই অবাক্।—যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙ্গা,—তার না আছে মুখের শ্রী, না আছে চলার ছাঁদ।

পাড়া-পড়্‌শীরা কেদারবাবুর দোষ দিতে লাগিল। 'মিন্‌ষে এদ্দিন-ধরে' তবে করছিল কী গা! ওমা! এত এত টাকা খরচ করে' শেষে কি না এই বাঁদরটাকে ধরে নিয়ে এলো।'

বয়স্কা যাহারা, তাহারা বলিল, 'মিছে তক্ক মা, ও যার যা বরাতে থাকে। মা-মরা মেয়ের সুখ হওয়া বড় শক্ত।'

যুবতীরা রাত্রে বাসর জাগাইতে আসিয়া জামাইকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে থাকে। বলে, 'কি হে, তোমার কি পানের দোকান ছিল না কি ভাই?'

জামাই রাগিয়া মুখ ভারি করিয়া কাহারও কথার জবাব দেয় না। বলে, 'যান আপনারা, আমার ঘুম পেয়েছে, বিরক্ত করবেন না।'

জামাই যত রাগে মেয়েরা তত রাগায়।

শঙ্করী কিন্তু মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখে না।

* * * *

ব্যাপারটা যে কেদারবাবু বুঝেন নাই তাহা নয়। কিন্তু এখন আর বুঝিয়াই বা উপায় কি!

বিবাহের সমস্ত ব্যাপার চুকাইয়া, নিজের ঘরে গিয়া একটু হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে তাঁহার অনেক রাত্রি হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রি অধিক হইলে কি হইবে, ঘুম তাঁহার চোখে আসিল না। প্রথমেই মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রীকে।—স্ত্রীর সেই অন্তিম-শয্যা। তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া সত্যই সে যেদিন বুঝিল আর বাঁচিবে না, সেদিন চোখে তাহার সে কী করুণ দৃষ্টি! মরিতে সে চায় না, তবু তাহাকে মরিতে হইবে। শঙ্করীকে কাছে ডাকিয়া বুকের উপর টানিয়া আনিয়া সে কী কান্না! মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। শঙ্করীর হাতখানা তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া স্ত্রী তাঁহার নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল, 'দেখো।'

শঙ্করী তখন নিতান্ত ছোট। ছোট হইলেও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয় ত' তাহার হইয়াছে। মুখখানি শুক্‌নো। চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছিল।

কেদারবাবু বলিলেন, 'আঃ, ছি! কি করছ গো!'

আর-কিছু তিনি বলিতে পারেন নাই। বলিবার আছেই বা কি!

তাহার দু'দিন পরে মৃত্যু! বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল ঝরিতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। পাশের ঘরে শঙ্করী ঘুমাইতেছে। ঝি চাকর সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া বিছানার পাশে কেদারবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

থাকিয়া থাকিয়া আজ তাঁহার শুধু সেই দৃশ্যই মনে পড়িতে লাগিল।—'আজ তোমার সেই শঙ্করীর বিবাহ। আজ তুমি কোথায়?'

চোখের জল মুছিয়া তিনি বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। জানালার পথে ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিতেই চাহিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। জানালার বাহিরে তাঁহারই বাঁধানো পুকুরের পাশ দিয়া বাউরী কুলি-মজুরেরা গান গাহিতে গাহিতে কয়লা কুঠিতে কাজ করিতে চলিয়াছে। সুমুখে সবুজ ধানের ক্ষেত—দূরে একটি গাছে-ঘেরা ছোট্ট গ্রামের প্রান্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। তাহারই মাথার উপর রক্তবর্ণ রঞ্জিত আকাশ। সেই দিক পানে কিয়ৎক্ষণ তিনি তাঁহার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যুক্তকরে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, 'হে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর, হে বিশ্বদেব, মেয়ের বিবাহ দিয়া অপরাধ করিলাম কি না জানি না, যদি করিয়া থাকি ত' ক্ষমা করিও। শঙ্করীর সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিও।'

পরদিন বিদায়ের পালা।

বর-কন্যা চলিয়া যাইবে। যে শঙ্করীকে একটি দিনের জন্যও কেদারবাবু চোখের আড়াল করেন নাই, সেই তাহাকেই আজ নিতান্ত অপরিচিত সংসারে তাহার উপর সমস্ত দাবী-দাওয়া চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়াই পাঠাইতে হইবে।

অথচ উপায় নাই।

মাতৃহীন কন্যার বিদায়ের আয়োজন মুখ বুজিয়া তিনি নিজেই করিতে লাগিলেন। দরজায় খিল বন্ধ করিয়া নূতন একটি প্রকাণ্ড বাক্সের ভিতর শঙ্করীর ভাল ভাল জামা কাপড়, সেমিজ সায়া, আল্‌তা এসেন্স, সাবান চিরুণী—এমন-কি মাথার কাঁটাটি পর্য্যন্ত পরিপাটি ভাবে সাজাইয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে গিয়া বুকের ভিতরটা তাঁহার হু হু করিয়া উঠিল, বাক্সের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে কান্নার বেগ দমন করিতে গিয়া দুই হাতে মুখ চাপা দিয়া তিনি ভাল করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সকালে কুশণ্ডিকা হইয়া গেছে। শঙ্করীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে সে আর তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। সন্ধ্যায় নিজে খাইতে বসিয়া কেদারবাবু ডাকিলেন, 'শঙ্করী!'

কেদারবাবুর এক ভাই-ঝি ছিল কাছে দাঁড়াইয়া। শঙ্করীকে সে ডাকিয়া দিল।

সর্ব্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার। পরণে চমৎকার একখানি শাড়ী। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ। সলজ্জ দেবী-প্রতিমার মত অপরূপ রূপলাবণ্যবতী শঙ্করী ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'বাবা!'

কেদারবাবু হেঁটমুখে অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। ডাক শুনিয়া 'মা' বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

বলিবার কিছুই নাই, শুধু প্রাণ ভরিয়া একটিবার দেখিতে চান! জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খেয়েচিস্ শঙ্করী?'

'না বাবা।'

'আয় তবে বোস্ এইখানে।'

শঙ্করী বসিল।

নিজের থালাটা দেখাইয়া দিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'খা।'

শঙ্করী বলিল, 'তুমি খাবে না বাবা?'

'এই যে খাই।' বলিয়া থালা হইতে তিনি নিজেও একখানা লুচি তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর বাল্যকালে শঙ্করীকে কাছে বসাইয়া যেমন করিয়া খাওয়াইতেন, সেদিনও ঠিক তেমনি করিয়াই খাওয়াইতে লাগিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে যাইবার দিন।

পাল্‌কি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে।

লোকাচার-মতে কেদারবাবুকে কন্যার সুমুখে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইঁদুরের গর্ত্তে বেওয়ারিশী

চুরি করা যে চা'ল থাকে, তাহাই একমুঠা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শঙ্করী দাঁড়াইল তাহার পিতার সম্মুখে।

মেয়েরা বলিয়া দিল, 'ওই চালের মুঠোটা তোর বাবার হাতে দিয়ে বল্—এতদিন তোমার যা খেয়েছি, তোমার যা পরেছি, তা এই শোধ করে' দিলাম।'

চালের মুষ্টি পিতার প্রসারিত অঞ্জলিপুটে ফেলিয়া দিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করীকে তাহাই বলিতে হইল।

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে গিয়া কেদারবাবুর কি যে হইল কে জানে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেথান হইতে এমনভাবে চলিয়া গেলেন যে, শঙ্করী তাঁহাকে প্রণাম করিবারও অবসর পাইল না।

এইবার শঙ্করী কাঁদিয়া ফেলিল। মেয়েরা তাহাকে চুপ করাইতে করাইতে গাঁট-ছড়া-বাঁধা বরের সঙ্গে পাল্‌কির কাছে লইয়া গেল।

রৌদ্র বেশি হইতেছিল বলিয়া বেহারারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করী কিন্তু কিছুতেই পাল্‌কিতে চড়িতে চায় না, সজল চক্ষে বারে বারে শুধু সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে থাকে।

কিন্তু অত-সব মনের কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি সেথানে কাহারও ছিল না, শঙ্করীকে তাহারা একরকম জোর করিয়াই বরের পাশে পাল্‌কিতে বসাইয়া দিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া বাড় দুইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল এবং বেহারারা তৎক্ষণাৎ পাল্‌কি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কেদারবাবু এতক্ষণে ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েরা তখন আপন-আপন বাড়ীর দিকে চলিতেছে; কে একজন বর্ষিয়সী মহিলা কহিল, 'চলে' গেল বাছা তুমি এতক্ষণে এলে ?'

'হ্যাঁ এই জামাটা।' বলিয়া তিনি তাঁহার নিজেরই হাতের পানে তাকাইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, জামা তিনি আনিতে ভুলিয়াছেন; এবং জামার ছুতা করিয়া কন্যার মুখখানি আর-একবার দেখিবার সুযোগ হয়ত-বা তাঁহার হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু পাল্‌কি তখন অনেক দূরে।

পাঁচ দিন পরে শঙ্করী ফিরিল। অষ্ট-মঙ্গলার পর আবার গেল, আবার আসিল। এবার কিন্তু জামাই আসিয়াই শ্বশুরমহাশয়কে একটি প্রণাম করিয়া পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, 'বাবা দিয়েছেন।'

বৈবাহিকের চিঠি। চিঠিখানি কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ পড়িয়া ফেলিলেন। যথাযোগ্য নমস্কারান্তে তিনি নিবেদন করিয়াছেন—'দু'দিন পরেই বিপিনের সঙ্গে শ্রীমতী বধূ-মাতাকে এ বাটি পাঠাইয়া দিবেন। সেইজন্যই বিপিনকে সঙ্গে দিলাম। বধূমাতার বয়স হইয়াছে, কিন্তু আপনার বাড়ীতে অভিভাবিকা কেহ নাই বলিয়াই হোক্ কিম্বা যে কারণেই হোক্, তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। তাহাকে এখন কিছুদিন আমরা এইখানেই রাখিব। ইহাতে কোনো প্রকারেই অন্যমত করিবেন না। আপনার বৈবাহিকার এবং আমার কন্যাদের তাহাই ইচ্ছা জানিবেন। পাঠাইতে অন্যথা যেন না হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

চিঠিখানি মুড়িয়া রাখিয়া কেদারবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'বেশ, তাই হবে।'

বলিলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তাঁহার অহরহ শুধু এই কথাটাই বারে-বারে উদয় হইতে লাগিল যে, বিবাহের পর, সেদিন সেই বিদায়ের মুহূর্ত্তে কন্যা তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। কন্যার উপর আর কোনও অধিকারই তাঁহার নাই। বৈবাহিক লিখিয়াছেন, বধূ-মাতার বয়স হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধি তাহার এখনও পরিপক্ক হয় নাই। মেয়েটা হয় ত' সেখানে গিয়াও তাহার স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছে, হয়ত' এমন-কিছু করিয়া বসিয়াছে, যাহার জন্য তাঁহারা চটিয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই বোধ করি তাহার এই শাস্তির ব্যবস্থা।

বাড়ীতে গৃহিণী নাই। কেদারবাবু কি আর করেন, শঙ্করীকে কাছে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া পিঠে হাত দিয়া, মুখের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'সেখানে তোর কষ্ট হয় নি ত' মা ?'

শঙ্করী মুখ তুলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বাবা হয়েছিল। ওখানে আর আমায় পাঠিয়ো না কিন্তু। আমি যাব না বলে' দিচ্ছি।'

কেদারবাবুর বুকের ভিতরটা সহসা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। কন্যার পিঠের উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিলেন, 'ছি মা, ও-কথা কি বলতে আছে? যাবে, আবার আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।'

শঙ্করী বলিল, 'প্রথমবারে কেউ কিছু বলে নি বাবা, কিন্তু এবারে গিয়ে আমি খুব কেঁদে ফেলেছিলাম। সত্যি বলছি বাবা, আর আমায় পাঠিয়ো না তুমি।' বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। বলিল, 'একদিন একটা কাঁচের গেলাস্ ভেঙ্গে ফেলেছিলাম, আর একদিন মার্ব্বেল্ খেলেছিলাম, আর লাট্টু ঘুরিয়েছিলাম—সেই পিণ্টু বলে' একটা ছেলে আছে আমার ঠাকুরঝির,—সেই তার সঙ্গে। আর কিচ্ছু করি নি বাবা, মা-কালীর দিব্যি ক'রে বলছি। তাইতে আমায় সে কী বকুনি! শাশুড়ী-মাগী ত' একেবারে যা-না-ইচ্ছে তাই! সারারাত আমি তোমার জন্যে কেঁদেছিলাম বাবা।'

কেদারবাবু হেঁট্‌মুখে কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর ধীরে-ধীরে শঙ্করীকে অনেক কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শঙ্করীর সেই এক কথা—'আমি আর গেলে ত!'

নিরুপায় হইয়া কেদারবাবু তাঁহার ভাই-ঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, 'দ্যাখ্ মা, তোরা যদি পারিস ওকে কোনও রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—'

এবং শুধু ভাই-ঝি নয়, পাড়ার মেয়েরা সকলে মিলিয়া শঙ্করীকে সেইদিন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা বুঝানো দূরে থাক্, এতগুলা মেয়ে—একটিবারের জন্যও এমন-কি জোর করিয়াও তাহাকে জামাইএর কাছে লইয়া যাইতে পারিল না।

বিপিনকে শেষে অগত্যা একাই ফিরিতে হইল। কেদারবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৈবাহিক মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন। লিখিলেন, 'ভাই আমাকে ক্ষমা করিও। কোনো প্রকারেই এবার আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। মেয়েটা কান্নাকাটি সুরু করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে পাঠানো বিপদজনক। আমি একা মানুষ। মেয়েটার মা নাই যে বুঝাইবে। তাহা হইলেও আমি যত শীঘ্র পারি তাহাকে বুঝাইয়া নিজে গিয়া আপনার বাড়ীতে দিয়া আসিব।'

'পুনশ্চ—আপনি লিখিয়াছেন, আমার মেয়ের বয়স হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। দেখিলে তাহাকে বড় বলিয়া মনে হইলেও আমি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, গত চৈত্র মাসে বয়স তাহার এই সবে বারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এখন সে তেরোয় চলিতেছে।'

একটি বৎসর আর কোনও পক্ষের কোনও উচ্চবাচ্য নাই।

আমের সময় আম, পূজার সময় জামা-কাপড়, শীতের সময় শাল দিয়া কেদারবাবু তাঁহার জামাতাকে 'তত্ত্ব' করিয়া পাঠান, কিন্তু বরকর্ত্তা নীরব। বধূমাতার জন্য না পাঠান 'তত্ত্ব', না দেন একখানা চিঠি।

কেদারবাবু মনে-মনে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিলেও বলেন, 'না দিক্। মেয়ের আমার অভাব কিছু নেই।'

শঙ্করী হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মেয়েরা তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার বাড়ন্ত গড়নের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হাসি-ঠাট্টা উপহাস-বিদ্রূপ করে, শঙ্করী হয় ত-বা কখনও তাহাতে কান দেয় না, আবার কখনও-বা রাগিয়া গিয়া মেয়েদের গায়ে থুতু দিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়া ছুটিয়া পলায়।

এম্‌নি করিয়া একা নির্ভাবনায় তাহার দিন কাটিতে থাকে।

এমন দিনে হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে কেদারবাবুর কাছে তাঁহার বৈবাহিকের এক চিঠি আসিয়া হাজির!

'এবার যদি মেয়েকে আপনার না পাঠান্ তাহা হইলে ছেলের আমি আবার বিবাহ দিব। এই আমার শেষ চিঠি।'

চিঠি পাইয়া কেদারবাবু এইবার একটুখানি শক্ত হইয়া উঠিলেন। শঙ্করীকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টাই আর করিলেন না।

পুরোহিতকে দিয়া ভাল একটি দিন দেখাইয়া শঙ্করীকে তাহার মামার বাড়ী লইয়া যাইতেছেন বলিয়া নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া বৈবাহিকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, 'ছেলেমানুষ ভাই ওর দোষ-অপরাধ কিছু নিও না।'

বৈবাহিক-মহাশয় কথাটা শুনিয়া টপ্ করিয়া খানিকটা জিব বাহির করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'রাধামাধব!

যাত্রী

শিল্পী— শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
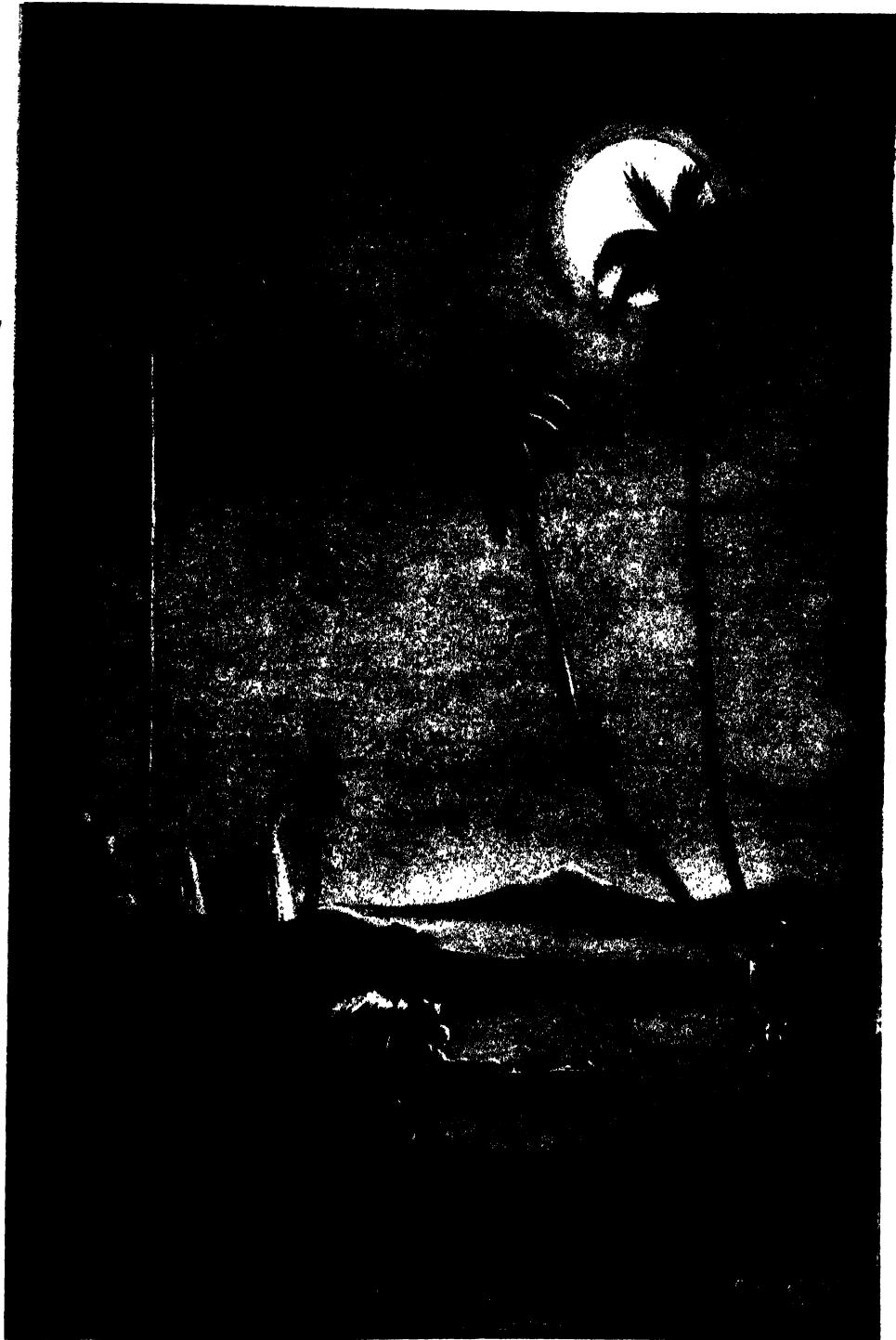
ও যে আমার ঘরের লক্ষ্মী! এসো মা এসো! তবে কি না ···মেয়ে যদি তোমার এতই অবুঝ, বিয়েটা দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। বেহ্মজ্ঞানী টানি হয়ে গেলেই পারতে।'

শ্লেষের অর্থ তিনি বুঝিলেন। কিন্তু কন্যার পিতা,—বুঝিলেও কিছু বলিবার উপায় নাই।

কন্যার কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিলেন, শঙ্করী কাঁদিতেছে।

অন্তরাল হইতে বেয়ান্-ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মেয়ের বয়েস না কি শুনলুম বেই-মশাই লিখে পাঠিয়েছিলেন বারো, কিন্তু ভাই আমরা সব অসভ্য-বর্ব্বর মানুষ, সব জিনিসই উল্টো বুঝি। ১২টাকে তাই উল্টে নিয়েছিলুম। ···তা এতই যদি কাঁদছ মা, তা বেশ হয়েছে, এক বছর পরে পায়ের ধূলো দিয়ে আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছ, এবার আবার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে' চলে' যাও।'

কেদারবাবুর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, ক্রন্দনরতা কন্যাকে চুপ করাইবার চেষ্টাও করিলেন না, ধীরে-ধীরে শুধু 'আসি' বলিয়া নিজের চোখের জল গোপন করিবার জন্য সেই যে তিনি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিলেন, দুর্নিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের মুখের পানে আর-একবার ফিরিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার আর হইল না।

বিবাহ দিয়া যাহার দুরন্তপনা থামাইতে চাহিয়াছিলেন, কেদারবাবু আজ আবার তাহাকেই ফিরিয়া পাইতে চান।

এক শঙ্করীর অভাবেই সমস্ত বাড়ীখানি তাঁহার দিবা-রাত্রি খাঁ খাঁ করিতে থাকে; দাপাদাপি নাই, ছুটাছুটি নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, গোলমাল নাই,—সমস্ত পৃথিবী নিথর নিস্তব্ধ; কোলাহল-মুখরিত এই শব্দময়ী ধরিত্রীর পরমায়ু যেন শেষ হইয়া গেছে।

শঙ্করী যে-ঘরে থাকিত, কেদারবাবু এক-এক সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পা টিপিয়া টিপিয়া সকলের অলক্ষ্যে সেই ঘরে প্রবেশ করেন; নীলরঙের বাক্সটি তাহার যেখানে থাকিত সেটি সেখানে নাই; আন্‌লার অব্যবহৃত কাপড়-জামা দিব্য পরিপাটি সাজানো। কিন্তু এ পরিচ্ছন্নতা এখন আর তাঁহার ভাল লাগে না। শঙ্করী থাকিতে চারি দিক যেমন বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিত, আজও তিনি তেম্‌নিটি দেখিতে চান। চুপি চুপি তাহার কাপড় জামাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন; বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া ওঠে,না জানি সেখানে সে কত কষ্টই না পাইতেছে···! বারে-বারে মনে হয় শুধু—এ শাস্তি তাঁহার নিজেরই দেওয়া। তিনি নির্ম্মম। তিনি নিষ্ঠুর।

•

এমন করিয়া কেদারবাবুর দিন যেন আর কাটিতে চায় না।

গত ছ'টি মাসের মধ্যে বৈবাহিকের কাছ হইতে একটি-মাত্র চিঠির তিনি জবাব পাইয়াছিলেন। তাও আবার অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত। শঙ্করীর কথা তিনি কিছুই লেখেন নাই।

ঘন ঘন 'তত্ত্ব' লইয়া লোক পাঠানো হয়। লোকজন ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'শঙ্করী আপনার মস্ত মেয়ে হয়েছে দেখলাম বাবু, আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।'

কেদারবাবু ভাবেন, এইবার তিনি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। কিন্তু নিজের যাওয়া আর কোনো ক্রমেই হইয়া ওঠে না। শঙ্করীর শ্বশুর-শাশুড়ীর কথাগুলা মনে হইতেই সর্ব্বশরীর কেমন যেন রী-রী করিতে থাকে, আত্ম-সম্মানে কোথায় যেন বাজে।

কিন্তু অপত্য স্নেহের জোয়ারে আত্মসম্মান ভাসিয়া যায়। মনে-মনে সঙ্কল্প করেন, এবার আর কোনও কথা নয়, এবার তিনি নিজে গিয়া কন্যাকে তাঁহার একটিবার মাত্র চোখে দেখিয়া আসিবেন।

ইহাই স্থির করিয়া কেদারবাবু শঙ্করীর কাছে যাইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন দিনে সহসা একটি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া শঙ্করী তাঁহার দরজায় আসিয়া নামিল।

কেদারবাবু আনন্দে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'হঠাৎ···কই চিঠিপত্র···একটা খবর—'

শঙ্করী নীরবে তাহার আয়ত দুইটি চক্ষু একবার পিতার মুখের দিকে তুলিয়া আবার হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ান কাঁধ হইতে তাহার বাক্সটা নামাইয়া দিয়া কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা চিঠিখানি বাহির করিয়া কেদারবাবুর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। বাবু বলিলেন, 'কি রে, চলে' যাচ্ছিস্ যে? বোস্, খেয়ে দেয়ে সেই ও-বেলায় যাবি।'

'আজ্ঞে না, হুকুম নেই।' বলিয়া গাড়োয়ানটা চলিয়া গেল।

কেদারবাবু চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন।

সর্ব্বনাশ!

বৈবাহিক লিখিয়াছেন,—

'পুরা ছয়টি মাস ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও কন্যাকে আপনার বশে আনিতে পারিলাম না। অন্যান্য গুরুজনদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে হইয়াও স্বামীকে যে চিনিতে পারিল না, এমন-কি তাহাকে কিল চড় লাথি মারিতেও যে কসুর করে না, তাহাকে আর আমার বাড়ীতে রাখিতে সাহস করিলাম না, আপনার মেয়ে আপনার কাছেই পাঠাইয়া দিলাম।'

চিঠি পড়িয়া কেদারবাবু আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমার মেয়ে আমার কাছে আসবে না ত' যাবে কোথায়? আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসতাম। শয়তান বেটারা মেয়েটাকে আমার মেরে' ফেলবার চেষ্টা করেছিল। বেশ হয়েছে মা, বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে।'

কথাটা ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

ছড়াইয়া পড়িল এই ভাবে যে,—শঙ্করীকে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাড়াইয়া দিয়াছে, আর কখনও তাহাকে লইয়া যাইবে না।

শঙ্করীর চেয়ে বয়সে যাহারা বড়, সেই সব মেয়েরা তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'না না, কিছু জিজ্ঞেস্ করতে তোকে ভয় করে। হ্যাঁ লা, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে বল্ দেখি?'

শঙ্করী তাহাদের ভেংচি কাটিয়া জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছে! যা খুসী তাই অমনি বল্লেই হলো কি না! তাড়িয়ে দিয়েছে ত' দিয়েছে—তাতে তোমাদের কি বাপু?'

সমবয়সী যাহারা—সদ্য-বিবাহিতা, শঙ্করীর সঙ্গে পুকুরে স্নান করিতে গিয়া শ্বশুরবাড়ীর কথা কয়, স্বামীর গল্প করিতে গিয়া মশ্‌গুল হইয়া ওঠে।

শঙ্করীর সঙ্গে নীরুর ভাব যেন একটুখানি বেশি। আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নীরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোদের কি হয়েছিল লা?'

শঙ্করী হাসিতে হাসিতে বলে, 'শুনবি?'

বলিয়া তাহার কানে-কানে চুপি-চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হয়। তাহার পর দু'জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

নীরু বলে, 'ওমা! এই কথা!'

ঘাড় নাড়িয়া শঙ্করী বলে, 'হ্যাঁ।'

নীরু বলে, 'তবে যে বলে তোকে না কি তাড়িয়ে দিয়েছে?'

তাড়াইয়া দিবার কথাটা বলিতে শঙ্করীর লজ্জা হয়। বলে, 'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছে না কচু! আবার আসবে দেখিস্।'

দিনকতক পরেই দেখা গেল, নীরুকে যে কথা সে বলিয়াছিল অত্যন্ত সন্তর্পণে, সেই কথা লইয়াই ডাবিদের বাড়ীতে প্রকাশ্যে আলোচনা চলিতেছে।

শঙ্করী গিয়াছিল ডাবিকে জিজ্ঞাসা করিতে—বৈকালে সে আজ বাঁধা পুকুরে কাপড় কাচিতে যাইবে কি না। জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সে তাহাদের উঠানের পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল।

কম্‌লি তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আঙুল বাড়াইয়া আর সবাইকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই ত্যাখ্ কে এসেছে! বলি হ্যাঁ লা, শঙ্করী, শোন্ শোন্ এই দিকে আয়!'

'কি বলছিস্?' বলিয়া শঙ্করী আগাইয়া আসিল।

কম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল, 'বরের গালে বুঝি মেরেছিলি এক—চড়?'

শঙ্করী রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'কে বললে শুনি?'

'সবাই বলছে।'

শঙ্করী বলিল, 'তারা দেখতে গিয়েছিল বুঝি!'

কম্‌লি বলিল, 'দেখতে যাবে কেন, তুই ই ত' বলেছিস্ হাবিকে।'

হাবি তাহাদের দলের মধ্যেই বসিয়া ছিল। বলিল, 'না ভাই ও বলে নি, আমি শুনিছি, লিলির কাছে।'

লিলি বলিল, 'আমি শুনেছি পাঁচির কাছে।'

কিন্তু পাঁচি সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং মীমাংসা কিছুই হইল না। নীরুর নামটা কেহই করিল না দেখিয়া

শঙ্করীর জোর বাড়িল। বলিল, 'এই চললাম আমি পাঁচির কাছে। না যদি বলা হয় ত'—'

সেই দিন হইতে কথাটা একরকম চাপাই পড়িয়া গেছে। সে সম্বন্ধে কেহ আর কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করে না। কথা উঠিলে বরং নিজেরাই চাপা দেয়। বলে, 'কাজ কি ভাই পরের কথা নিয়ে। বলে, নিজের ভাবনাই কে ভাবে তার ঠিক নেই।'

কিন্তু মাসখানেক পরে নিজের ভাবনা ভুলিবার মত একটা সংবাদের মত সংবাদ পাওয়া গেল,—শঙ্করীর বর না কি আবার বিবাহ করিয়াছে। সে আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না।

খবরটা সত্য কি না তাহারই যাচাই চলিতে লাগিল।

. কেদারবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, সত্যি। কি করব বল্,—আমার—' বলিয়া কথাটা তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না। কম্পিত হস্তে নিজের কপালটা দেখাইয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরতিশয় বেদনায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এ সংবাদ কিছু দিন আগে পাইলে শঙ্করী কি করিত জানি না, কিন্তু সেদিন সে রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুইয়া কেবলমাত্র এপাশ-ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মাথার চুল ছিঁড়িয়া, হাত কাম্‌ড়াইয়া, উঠিয়া বসিয়া একাকী সেই নির্জন গৃহের স্তব্ধ অন্ধকারে এমন-সব কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিল যাহা দেখিলে মনে হয় মেয়েটা হঠাৎ বুঝি-বা পাগল হইয়া গেছে।

কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে গোপনে সে যাহা করিল, দিনের আলোকে কেহ সে কথা টেরও পাইল না।

সকলে ভাবিয়াছিল, মেয়েটা সুন্দরী হইলে কি হইবে, দেমাগ্ যাহার এত বেশি, স্বামী তাহার বিবাহ করিয়া ভাল কাজই করিয়াছে। শঙ্করীর গুমর এইবার ভাঙ্গিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড!

শঙ্করী দিব্যি হাসিয়া হাসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এত বড় যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে তাহার এতটুকু চিহ্নমাত্র সে-মুখে কোথাও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে না।

কিন্তু হিতৈষী মেয়েদের তাহা ভাল লাগিবে কেন?

শঙ্করীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র কেহ-বা গালে হাত দিয়া সহানুভূতি জানায়—'ও মা গো। বলে, এমন সুন্দর পিতিমের মত মেয়ে ছেড়ে মুখপোড়া কি না আর-একটা বিয়ে করলে!'

আবার কেহ-বা শঙ্করীকে খুঁচিয়া খুঁচিয়া বলে, 'বলি হ্যাঁ লা, কোথাকার হাবা মেয়ে লা তুই! মনে একটু দুঃখু হয় না তোর! আমরা হ'লে ত' কেঁদেই সারা হতাম।'

শঙ্করী সেখান হইতে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারিলে বাঁচে।

হয় ত' আড়ালে গিয়া আজকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিম্বা নীরুর কাছে গিয়া দু'টা মনের কথা কয়।

নীরুর সঙ্গেই ভাব যেন একটুখানি বেশি।

শেষে নীরুই একদিন আবিষ্কার করিল, শঙ্করী পোয়াতি।— 'ওমা, সেই এসে' অব্‌ধি? কই এত্‌দিন তবে বলিস নি যে লা?'

লজ্জায় শঙ্করীর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল, 'যাঃ! আমার লজ্জা করে।'

কথাটা এ-কান ও-কান হইতে হইতে কেদারবাবুর কানে গিয়া পৌঁছিল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া চোখ দুইটা তাঁহার ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দুর্গার মন্দিরে গিয়া হাতজোড় করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রতিমার বেদীর সুমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—'করুণাময়ী মা আমার, তুই আমার মুখ রক্ষা করিয়াছিস্ মা! শঙ্করী যেন আমার পুত্রবতী হইয়া সকল দুঃখ ভুলিতে পারে।'

শঙ্করীর তত্ত্বাবধানের জন্য সেইদিনই কেদারবাবু গ্রামের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখিলেন। তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, 'শঙ্করী ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না, তার সমস্ত ভার তোমার ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম মা। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি যেন তার কাছে কাছে থেকো।'

কেদারবাবুর আনন্দ যেন আর ধরে না।

সেদিন কি একটা কাজের জন্য তিনি শহরে

গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীতে পা দিয়াই ডাকিলেন, 'শঙ্করী!'

না ডাকিলে শঙ্করী আজকাল তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া শঙ্করী ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'কি বাবা?'

'তোর জন্যে আজ কি এনেছি বল্ দেখি মা?'

শঙ্করী বলিল, 'রোজ রোজ কী যে তুমি করছ বাবা!'

হাসিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'বল্ না পাগ্‌লী, কি এনেছি বল্!'

শঙ্করী বলিল, 'কোথায় আছে বল—দেখি আগে।'

'হ্যাঁ, দেখে অমন্ সবাই বলতে পারে। পকেটে আছে।'

শঙ্করী তাঁহার পকেটে হাত দিয়া বাহির করিল—দুইটি পাকা আম।

পৌষ মাসে পাকা আম। দুর্লভ নিঃসন্দেহ।

শঙ্করী বলিল, 'রোজ রোজ কেন এত খরচ কর বাবা আমার জন্যে?'

'কেন করি?' কেদারবাবু হাসিয়া তাঁহার মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোর একটা ছেলেমেয়ে হোক্ আগে, তার পর বুঝবি।'

এমনি প্রত্যহ।

যা' তিনি কখনও করেন না, আজকাল তাহাই করিতে লাগিলেন। গ্রামের রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইতেছেন, মাখন ময়রা তাহার চালায় বসিয়া উনানে কড়াই চড়াইয়া বেগুনী ভাজিতেছে। কেদারবাবু থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—'কি হে মাখন, বেগুনী ভাজছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকে আজকাল···শীতকাল কি না,···' বলিতে বলিতে বেসম-মাখা হাতেই মাখন একটি প্রণাম করিয়া তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পকেট হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'দে ত' বাবা চার পয়সার। মেয়েটা আমার বেগুনী খেতে বড় ভালবাসে।'

মাখন অবাক্ হইয়া গেল। অত বড় লোকটা হাতে করিয়া চার পয়সার বেগুনী লইয়া যাইবে···মাখন বলিল, 'আমি দিয়ে আসছি আজ্ঞে, আপনি বসুন।'

'না রে না, কাজ ছেড়ে তোকে আর যেতে হবে না, দে।'

বলিয়া তিনি হাত পাতিয়া শালপাতার ঠোঙায় বেগুনী লইয়া বাড়ী গেলেন।

কোনো দিন হয় ত ছেলেরা পেয়ারা গাছে চড়িয়া পেয়ারা পাড়িতেছে। কেদারবাবু ধীরে-ধীরে তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'কই দেখি রে, দে দেখি দুটো পেয়ারা আমায়।'

এমনি করিয়া আদর যত্নে শঙ্করীর দিন কাটিতে থাকে।

শঙ্করী আজকাল আর বড়-একটা বাড়ীর বাহির হয় না, সমবয়সী বন্ধু বান্ধবেরাই তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া গল্প করে, বই পড়ে, তাস খেলে, গান গায়; বাজি রাখে,—বলে, 'শঙ্করীর মেয়ে হবে কি ছেলে হবে ঠিক্ করে' যে বলতে পারবি তাকে পাঁচ টাকার সন্দেশ।'

কেহ বলে, 'মেয়ে।'

কেহ বলে, 'ছেলে।'

'আচ্ছা তবে দেখাই যাক্, কার কথা ঠিক হয়।'

দেখতে দেখতে দশটি মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর আষাঢ়ের এক বর্ষণ-মুখর প্রভাতে শঙ্করীর হইল একটি মেয়ে।

'আহা, একটি ছেলে হ'লেই বেশ ভাল হতো।'

'তা হোক্, মেয়ে ত' আর ফেল্‌না নয় মা!'

কেদারবাবু রাত্রির শেষ প্রহর হইতে দুর্গা-বাংলায় বসিয়া বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব পাঠ করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পঞ্জিকা খুলিয়া মেয়ের জন্মক্ষণ, তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া রাখিলেন। সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। ধাত্রী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। একটি গিনি হাতে দিয়া কেদারবাবু নাৎনীর মুখ দেখিলেন। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, বড় বড় চোখ, মাথায় কৃষ্ণ কুঞ্চিত চুল·· বহু কাল পূর্ব্বে শঙ্করীর জন্মক্ষণটি তাঁহার মনে পড়িল। সেও ঠিক এই রকমই দেখিতে হইয়াছিল। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'দেখতে অবিকল আমার শঙ্করীর মতই হয়েছে।'

বহু কালের বৃদ্ধা ধাত্রী শঙ্করীর জন্মদিনেও উপস্থিত ছিল; কিন্তু দেখিতে সেও ঠিক এই রকমটিই ছিল কি না সে কথা আজ আর তাহার মনে নাই; না থাকিলেও ঘাড় নাড়িয়

কেদারবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, একেবারে হুবহু ঠিক মায়ের মত।'

কাপড় জামা বদলাইয়া শঙ্করী তখন আঁতুড় ঘরের এক পাশে নির্জ্জীবের মত শুইয়া ছিল। কথাগুলো তাহার কানে যাইতেই একাগ্র করুণ দৃষ্টিতে সে তাহার সদ্যোজাত কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া, মনে-মনে সর্ব্বদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া জানাইল,—মেয়ে যদি দেখিতে ঠিক তাহারই মত হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু হে ভাগ্যনিয়ন্তা, হে অদৃশ্য লিপিকার, কন্যার ললাট-লিপি যেন ঠিক তাহারই অদৃষ্টলিপির অনুরূপ অনুকৃতি না হয়; বাল্যাবধি সেও যেন ঠিক তাহারই মত দুরন্ত চঞ্চল হইয়া আজীবন শুধু দুঃখ, দুর্ভোগ, আর বঞ্চনা সহ্য না করে!

শঙ্করীর শিশুকন্যার প্রতি দিনের প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই-বা করিলাম, করিবার প্রয়োজনও কিছু নাই।

অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া কেদারবাবু তাহার নাম রাখিলেন—অপর্ণা। অপর্ণা—দেবী দুর্গার নাম। কেদারবাবু শঙ্করীকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'মার কাছে আমি অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক আরাধনা করেছি শঙ্করী, তাই মা আমার ঘরে জন্ম নিয়েছেন। মার পূজো এ-বছর আমি কেমন করে' করব দেখিস্।'

পূজায় সে বৎসর সত্যই ধুমধামের আর অন্ত রহিল না। সমস্ত খরচ কেদারবাবু নিজে বহন করিলেন।

তবে এত আনন্দের মধ্যেও একটি দুঃখ তাঁহার বুকের মধ্যে অনির্ব্বাপিত বহ্নিশিখার মত অহরহ জ্বলিতে লাগিল। অপর্ণার জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত কত চিঠি যে তিনি তাঁহার জামাতাকে লিখিয়াছেন, কতবার গোপনে যে তাহাকে আনিতে পাঠাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আসা দূরে থাক্, জামাতা কিম্বা বৈবাহিক—কেহই তাঁহার চিঠির একখানি জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই।

না করুক্। অপর্ণাকে কোলে লইয়া, তাহার মুখের পানে তাকাইয়া, কেদারবাবু তাঁহার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যান; দিবারাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময় অপর্ণাকে তিনি তাঁহার কাছে-কাছে রাখেন; শঙ্করীকে ডাকিয়া বলেন, 'হ্যাঁ মা শঙ্করী, বুড়ো বয়েসে শেষে কি আমার সেই জড়ভরতের মত হ'লো না কি রে?'

আবার কখনও-বা ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলেন, 'অপর্ণা বড় হবে, তার বিয়ে দেবো—ততদিন বাঁচব ত' মা?'

শঙ্করী বলে, 'বালাই ষাট্! ও-সব কথা কেন বলছ বাবা?'

কিন্তু শঙ্করীর সর্ব্বদাই ভয় হয়, বাবা যে-রকম ভাবে মেয়েটাকে আদর দিতে সুরু করিয়াছেন, শেষে সে ঠিক তাহারই মত না হইয়া যায়। দুরন্ত চপল হওয়ার যে-দুঃখ, সে-দুঃখ শঙ্করী আজ তাহার মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। ধন নয়, জন নয়, মান নয়,—এই অট্টালিকা, এই অর্থ-সম্পদ, পিতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, এত সোহাগ, এত আদর, এত যত্ন,—আজ সবই যেন তাহার কাছে নিরর্থক, অন্তঃসারশূন্য নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। নারী-জীবনের একমাত্র কাম্য—স্বামীর এতটুকু স্নেহ-সোহাগ হইতে বঞ্চিত তাহার অপর্ণাও যেন না হয়।

মেয়েটা তাই কাঁদিয়া-কাটিয়া বায়না ধরিলে ওই অতটুকু মেয়েকেও শঙ্করী নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত চড়-চাপড় মারিয়া চুপ করাইতে গিয়া আরও কাঁদাইয়া দেয়।

কান্না শুনিয়া কেদারবাবু ছুটিয়া আসেন। রাগিয়া শঙ্করী বলে, 'কাঁদুক্ বাবা, এখন থেকে অত বেয়াড়া হ'তে ওকে তুমি দিও না।'

মেয়ে তাঁহার এতদিনে বুঝিয়াছে।

শঙ্করীর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কেদারবাবুকেও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

পরে বলেন, 'কিন্তু দেখে নিস্ শঙ্করী, অপর্ণা দুরন্ত চঞ্চল কখনও হবে না। ও যে মা-দুর্গা এসেছে আমার বাড়ী, সে-কথা ত' তোকে আগেই ব'লে দিয়েছি।'

পাঁচ বছরের অপর্ণা একদিন তাহার এক খেলার সাথীকে এমন মার মারিল যে, তাহার মা আসিয়া মেয়েটার কপালের রক্ত দেখাইয়া শঙ্করীকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিয়া গেল।

শঙ্করী আর না চাহিল বাট্, অপর্ণার মাথার উপর জোরে-জোরে গোটাকতক চড় বসাইয়া দিয়া তাহার কানে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কেদারবাবুর কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'নাও বাবা, তোমার মা-দুর্গার কীর্ত্তি ছাখো! ভবানীর মেয়েটাকে এমন মার মেরেছে

যে, তার কপালের চাম্‌ড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। আমি জানি বাবা, ওর অদৃষ্টে যে কি আছে তা আমি জানি।' বলিয়া অভিমান-ভরে সজল চক্ষে শঙ্করী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অপর্ণা হইয়াছে ঠিক শঙ্করীর মত। বাল্য কালে দেখিতে শঙ্করী ঠিক যেমনি ছিল, অপর্ণাও দেখিতে ঠিক তেম্‌নি,—তেম্‌নি দুরন্ত, তেম্‌নি চপল।

শঙ্করীর এত প্রার্থনা, দেবতার কাছে এত মাথা কুটা-কুটি সবই যেন ব্যর্থ করিয়া দিয়া অপর্ণা দিনে-দিনে আরও বেশি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

মারিয়া, শাসন করিয়া শঙ্করী কোনো প্রকারেই যখন অপর্ণাকে বুঝাইয়া বশে আনিতে পারে না, তখন সে দোষ দেয় তাহার বাবার। বলে, 'বাবাই আমার যত নষ্টের মূল। আমার সর্ব্বনাশের ত' আর-কিছু বাকি নেই, আবার মেয়েটারও সর্ব্বনাশ না করে' ছাড়বে না। আমরা না হয় সহ্য করছি; কিন্তু মেয়েছেলে, ওকে পরের বাড়ী যেতে হবে, পরে সহ্য করবে কেন মা ?"

যাহারা শোনে, তাহারা হয় ত খোসামুদি করিয়া বলে, 'ছেলেমানুষ—অমন একটু-আধটু হয়ই, বড় হ'লে শুধরে যাবে দেখো।'

শঙ্করী ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করে। বলে, 'না মা, তা হয় না।'

বলিয়া তাহার নিজের কথাটা মনে পড়িয়া যায়। একাকী কোনও নির্জ্জন ঘরে গিয়া কাঁদিতে বসে। কল্পনায় সে যেন অপর্ণার ভবিষ্যৎ তাহার চোখের সুমুখে দেখিতে পায়। মনে হয়, অপর্ণা বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, সেখানে সকলে তাহাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছে, শাশুড়ী ননদের অত্যাচারের আর সীমা নাই, স্বামী তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না,—অবশেষে একদিন সকলে মিলিয়া জোট পাকাইয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। অভাগী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল মায়ের কাছে। কাহারও দুঃখ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই! সারা জীবন ধরিয়া দু'জন দু'জনের মুখের পানে চাহিয়া কান্না!—এই ত' পরিণাম!

শঙ্করী শেষে আর পারিয়া উঠিল না। আশা ভরসা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া মেয়ের হাল ছাড়িয়া দিয়া একে-বারে নির্ব্বিকার উদাসীন হইয়া সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কথায়-গল্পে দিন কাটাইতে লাগিল। অপর্ণা যেন তাহার কেহই নয়; তাহার সঙ্গে যেন তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই!

মা'র কাছে অপর্ণা কোন-কিছুর জন্য নালিশ করিতে আসিলে শঙ্করী বলে, 'আমি কি জানি! যা বাবার কাছে যা।'

বাবা বলেন, 'হ্যাঁ মা শঙ্করী, এমন করে' মেয়ের হা'ল ছেড়ে দিলে কেমন করে' কি হবে বল্ ত? আমি আর কত দিন বাঁচব মা?'

সত্যই ত! বাবার বয়স হইয়াছে। আজ হোক্ কাল হোক্ দশ দিন পরে হোক্ একদিন তাঁহাকে বিদায় লইতেই হইবে। সেদিনের কথাটা শঙ্করীর একটি দিনের জন্যও মনে হয় নাই। আজ হঠাৎ তিনি নিজেই সে কথাটা তাহাকে মনে করাইয়া দিলেন। শঙ্করী তাহার ঘরে গিয়া একাকী তাহার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—'হে মা দুর্গা, হে মা কালী, বাবাকে আমার আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিও।'

শঙ্করীর ইচ্ছা, বারো তেরো বছর বয়সে অপর্ণার বিবাহ সে কিছুতেই দিবে না। অথচ কেদারবাবু ঠিক সেই একই কথা বলিয়া জেদ ধরিয়া বসিলেন,—'শরীর আমার সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছে মা, আর ত' বেশি দিন বাঁচব না, অপর্ণার বিয়েটা আমায় দেখে যেতে দে।'

মুখে শঙ্করী কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে-মনে বলিল, 'হ্যাঁ, মেয়ে আমার মত হোক্ তখন ত' আর তুমি পুড়তে আসবে না, জ্বলে পুড়ে মরব আমিই।'

শঙ্করীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ভাবছিস কি শঙ্করী? বিয়ে দেবার বুঝি তোর ইচ্ছে নেই?'

মাথা হেঁট করিয়া শঙ্করী বলিল, 'আর একটু বড় না হ'লে ··বুদ্ধি-সুদ্ধি···'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

কেদারবাবু বলিলেন, 'ভাবিস্ নে মা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি ওকে। ও সুখী হবে। তা নইলে আমি আর দেখ পাব না।'

শঙ্করী ভাবিল, আশীর্ব্বাদ তিনি তাহাকেও করিয়াছিলেন। ও-কথার কোনও মূল্য নাই। বাবার কাছে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলাও যায় না। অথচ ওই দুরন্ত মেয়ের এই এত কম বয়সে জোর করিয়া বিবাহ দিবেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে—ভুক্তভোগী সে নিজে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে।

ছেলে একটি বেশ ভালই পাওয়া গেল। মুক্তাজোড়ে বাড়ী। গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কেদারবাবু নিজে গিয়া দেখিয়া আসিলেন। ছেলেটি দেখিতেও চমৎকার। কলিকাতার কোন্ একটা কলেজে আই-এ পড়িতেছে। অপর্ণার সঙ্গে মানাইবে ভাল।

কেদারবাবু আর দেরি করিলেন না। গরমের ছুটিতে ছেলেটি বাড়ী আসিল। সেই সময়েই তিনি দিন স্থির করিয়া অপর্ণার বিবাহ চুকাইয়া দিলেন।

যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে!

পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কেদারবাবু রাজ্যের লোক জড়ো করিতে লাগিলেন।

তা দেখিবার বস্তুই বটে।

শঙ্করীকে শাশুড়ী বলিয়া মনেই হয় না। মেয়ে-জামাই প্রণাম করিলে পর লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদের কথা ফুটিল না। মনে-মনেই বলিল, 'তোমরা সুখী হও।' মায়ের মন,—আরও কত-কী যে বলিল তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

আশীর্ব্বাদ করিল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাহার দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। নিজের বিবাহিত জীবনের প্রতিদিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত আজও সে ভুলিতে পারে নাই। মেয়েকে সে তাহার চেনে, এবং চেনে বলিয়াই বেশি ভয়! তাই সে তাহাদের ঘরের মা দুর্গা হইতে আরম্ভ করিয়া বারুইপুরের পাড়ে তেঁতুলগাছের তলায় যে ব্রহ্মচারী-বাবাজি আছেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত মনে-মনে তাহার সহস্র কোটি প্রণাম জানাইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, তাহার যা হইবার তাহা ত' হইয়া গেছে, তেমন্‌টি যেন আর তাহার মেয়ের কপালে না হয়!

কেদারবাবু কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন কে জানে। অপর্ণার বিবাহ দিয়া দু'মাস পার হইতে না হইতেই হঠাৎ একদিন বৈকালে তাঁহার জ্বর হইল এবং তিন দিন অবিশ্রান্ত জ্বরভোগের পর চারদিনের দিন সকালে শঙ্করী ও অপর্ণাকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং তাঁহার জন্য কোনোরূপ চিন্তা করিতে না বলিয়া দিব্য সজ্ঞানে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া চক্ষু স্থির করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে নাভিশ্বাস উঠিল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই বার কতক্ হিক্কা তুলিয়া তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

শঙ্করী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অপর্ণা কাঁদিতে লাগিল। ভাই, ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী সকলেই আসিয়া জড়ো হইল।

কেদারবাবুর অবশ্য মরিবার বয়স হইয়াছিল, দুঃখ করিবার কিছু নাই। তবে শঙ্করী ছেলেমানুষ, তাহারই মাথার উপর সব দিক রক্ষা করিবার ভার আসিয়া পড়িল, এই যা দুঃখ।

শঙ্করী এই ভয়ই করিয়াছিল। অপর্ণাকে লইয়া যদি একটা-কিছু হয় ত' এইবার সাম্‌লাইবে কে?

একমাস পরেই পূজা।

এ বৎসর শঙ্করীর চোখে পূজা আসিল কান্না লইয়া। ষষ্ঠীর দিন হইতে সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চুপ করিল বিজয়ার দিন।

পূজার ছুটিতে শঙ্করীর জামাইটি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছিল; বিজয়ার দিন আসিল শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে। জামাইএর সুমুখে কান্নাকাটি করা উচিত নয় বলিয়াই সে জোর করিয়া কান্না চাপিয়া রাখিল।

সরকারকে পাঠাইল পুকুরে মাছ ধরিতে এবং সারাদিন ধরিয়া সেদিন সে জামাইএর সুখ-সুবিধার আয়োজনেই ব্যস্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে একমাত্র অপর্ণার চিন্তাটাই তাহাকে নিরতিশয় ব্যথার মত নিরন্তর পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল।

উপরের ঘরে জামাইকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একটিবারের জন্যও অপর্ণা সে পথ মাড়ায় নাই। রাত্রে আজ সে তাহাকে সেখানে পাঠাইতে পারিবে কিনা কে জানে।

দিনের পর রাত্রি আসিল। শঙ্করী কাছে বসিয়া জামাইকে পেট ভরিয়া খাওয়াইল, খাওয়াইয়া উপরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অপর্ণাকে বলিল, 'চল্।'

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যাঃ!'

'যা নয় মা, ওঠ, আর কেলেঙ্কারী করিস নে।' বলিয়া জোর করিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে নিতান্ত নির্লজ্জের মত শঙ্করী তাহাকে উপরের ঘরের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া দরজাটা বাহির হইতে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

তাহার পর সমস্ত রাত্রি শঙ্করীর চোখে আর ঘুম নাই।

অতি প্রত্যূষে পা টিপিয়া টিপিয়া শঙ্করী তাহাদের দরজার কাছে গিয়া কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ঘুমাইতেছে! নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। নিঃশব্দে দরজার শিকলটা খুলিয়া দিয়া সেখান হইতে তেম্‌নি চোরের মতই সে পলায়ন করিল।

দিনের পর দিন।

কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

অপর্ণাকে প্রত্যহ জোর করিয়াই দিয়া আসিতে হয়। ভয়ে শঙ্করীর বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতে থাকে।

জামাইটির হাসি-হাসি মুখ। সর্ব্বদাই হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়। কিন্তু অপর্ণার কথা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করে। অথচ অপর্ণাকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে তাহার গায়ে থুতু দিতে আসে।

তিন দিন পরে জামাই মাথা হেঁট করিয়া বলিল, 'মা, আজ আমি যাব বিকেলে।'

জামাইএর মুখে 'মা' ডাক শুনিবামাত্র আনন্দে শঙ্করীর আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'আজই যাবে? কেন বাবা, আর দু'দিন থেকেই যাও না! এখন ত' ছুটি তোমার?'

জামাই বলিল, 'না মা, পড়াশোনা···আর বাবা' বলে দিয়েছিলেন······'

ইহার উপর আর কথা চলে না। মৌন নত মুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কির ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য শঙ্করী তাহার সরকারকে ডাকিয়া পাঠাইল।

বৈকালে ঝি আসিয়া জানাইল, 'জামাইবাবুর মাথা ধরেছে মা, আজ আর তাঁর যাওয়া হবে না।'

জামাইএর জন্য শঙ্করী জল-খাবার তৈরী করিতেছিল, 'মাথা ধরেছে? দাঁড়া ত' মা এইখানে একটু, দেখে আসি।' বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উপরে উঠিয়া গেল।

'কি বাবা, মাথা ধরেছে সুধাংশু?'

দেখিল, চাদরটা গায়ে টানিয়া লইয়া সুধাংশু খাটের উপর শুইয়া আছে। বলিল, 'সামান্য।'

'দেখি।' বলিয়া শিয়রের কাছে উঠিয়া বসিয়া শঙ্করী তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, 'কই না, গা ত' গরম হয় নি।'

সুধাংশু বলিল, 'না।'

এমন সময় ফিক্ ফিক্ করিয়া চাপা হাসির শব্দে সমস্ত ঘর যেন ভরিয়া গেল।

আচম্‌কা চারি দিকে চাহিয়া শঙ্করী কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কিন্তু এ-হাসি যে অপর্ণার, শঙ্করী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। দুষ্টু মেয়ে হয় ত বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে! অজানা আতঙ্কে শঙ্করীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সুধাংশু তাহার কন্যার এই নির্লজ্জ ব্যবহারে পাছে কিছু মনে করে ভাবিয়া আগে হইতেই সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য বলিল, 'মেয়েটা ভারি চঞ্চল বাবা সুধা, তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, ছেলেমানুষ, অপরাধ নিয়ো না যেন।'

এবার আর শুধু হাসি নয়, অপর্ণা হুস্ করিয়া খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে শায়িত সুধাংশুর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, 'বল্‌ব? বলব?—না মা, ওর কিচ্ছু হয় নি মা, মাথা ধরেছে বলে' চালাকি করে' শুয়ে আছে মা, ও আজ যাবে না।'

'তাহ'লে আমিও বলি।' বলিয়া তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সুধাংশু বলিল, 'ও আজ আমায় এমন এক চড় মেরেছে মা! আমিও ওকে এমন মার মারব, আপনি কিছু তখন বলতে পাবেন না বলে রাখছি।'

বালিশটা অপর্ণা তাহার স্বামীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল। বলিল, 'ধেৎ! বলব না বলে' আবার শেষে······'

বলিয়া কৃত্রিম অভিমানভরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে উভয়ে উভয়ের মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

এ দৃশ্য শঙ্করী আজ কাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইবে? চোখ দুইটি সহসা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পাশের ঘরে সে তাহার বাবার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গ্যয়াটেমালা

শ্রীভারতকুমার বসু

গ্যয়াটেমালা হচ্ছে মধ্য-আমেরিকার অন্তর্গত একটী দেশ। এই দেশটী পর্ব্বতের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতমালা সমুদ্র-বক্ষ থেকে সাত হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত। এখানে এত বেশী আগ্নেয়গিরি আছে যে, তা গুণে বলা যায় না। সকলের চেয়ে সর্ব্বনেশে আগ্নেয়-গিরি যেটি, তার নাম "ফুয়েগো"। উচ্চতায় এটি ১২৫১৭ ফিট হবে।

গ্যয়াটেমালার ইণ্ডিয়ান

গ্যয়াটেমালা দেশটী হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা। এখানকার সাগর-তীরস্থ স্থানগুলি ছাড়া আর সর্ব্ব স্থানেই বাস করার পক্ষে বেশ আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর। সাগর-তীরস্থ স্থানগুলি তেমন বাসযোগ্য নয়, কারণ, সেখানে ম্যালেরিয়ার জীবাণু অত্যধিক মাত্রায় ছড়িয়ে থাকে।

সেখানকার অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের কথানুযায়ী "গ্যয়াটেমালা"র অর্থ হচ্ছে "তরুরাজিতে পরিপূর্ণ একটী দেশ"। বাস্তবিকই, সেখানকার অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদই হচ্ছে—অজস্র 'মেহগনি' কাঠের বন। এই কাঠ যে কত মূল্যবান, তার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। উক্ত কাঠের বনগুলি ছড়িয়ে আছে প্রায় ১,৩০০,০০০ একার জমি দখল ক'রে।

পল্লী-প্রদেশের বালক

আগে গ্যয়াটেমালা দেশটী স্প্যানিসদের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫২২ সালে স্প্যানিস রাজ-কর্ম্মচারী পেড্রো-ডি এ্যাল্‌ভারাডো গ্যয়াটেমালাকে শাসন ক'রতে আসেন।

ইতিপূর্ব্বে মেক্সিকোর অন্তর্গত ইউকুটান্ দেশে সেখানকার নেটিভ্দের শাসন করবার সময়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'য়েছিল। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে, নতুন জায়গায় নতুন শাসন ক'রতে আসা মানেই—খুব কড়া মেজাজে চলা। কাজেই তিনি ইউকুটান্ দেশের নেটিভদের প্রতি রীতিমত কড়া-মেজাজী হ'য়ে নির্দ্দয় অত্যাচারের দ্বারা তাদের এমন অস্থির ক'রে তুললেন যে, তার কাহিনী লেখবার চেষ্টা ক'রলেও পাপ হয়। গ্যায়াটেমালাতেও তিনি সেই উপায় অবলম্বন ক'রলেন ; নির্দ্দয়ভাবে প্রহার এবং অত্যাচারের দ্বারা তাঁর শাসন-কার্য্য আরম্ভ হ'লো। ফলে, দেশ ক্ষেপে উঠলো এবং তাঁর এক ধার থেকে আত্মীয় যে যেখানে আছে, সবাইকার মৃত্যু-কামনা ক'রতে লাগলো ; কিন্তু হায়, গ্যায়াটেমালার সুখ সূর্য্য বড় সহজে আত্মপ্রকাশ ক'রলে না। প্রায় তিন শ' বছর ধ'রে পরাধীনতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে, শেষে ১৮২১ সালে সেখানকার লোকেরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

পার্ব্বত্য পথ—এখানে যাতায়াতের জন্ম অশ্বতরের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই

সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যাই বেশী। কোনো-কোনো জাতির মধ্যে মিশ্রিত রক্তেরও গন্ধ আছে। শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা সেখানে এত অল্প, যে, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা যায় না।

শিক্ষা জিনিষটাকে সেখানে যার-পর-নাই আদর করা হয়। শিক্ষার যে কি আভিজাত্য এবং মূল্য আছে, সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তা বোঝাবার

"ইণ্ডিয়ান" পল্লীবাসীদের বড় শান্তিময় পর্ণ কুটীর

চেষ্টা করা হ'য়ে থাকে। সেখানে প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে "মিনার্ভা" অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর পূজা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই পূজার ব্যাপারে প্রত্যেক ছাত্রই তার অগাধ উৎসাহ ঢেলে দেয়।...ছাত্রীরাও এই পূজায় খুব আগ্রহের সঙ্গে যোগ দান করে। ছেলে-মেয়েদের পিতামাতাও এই পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে থাকেন।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—১৯১৮ সালের ৩রা তারিখে ভীষণ ভূ-কম্পনের ফলে গ্যায়াটেমালা-নগরের একটী বিখ্যাত গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ

সেখানে শিক্ষার আবহাওয়া প্রথম নিয়ে আসেন যে মহানুভব ব্যক্তি, তাঁর নাম প্রেসিডেণ্ট্ জাষ্টো রিউফিনো ব্যারিয়স্। মেক্সিকো এবং গ্যায়াটেমালার মাঝখানে একটী দেশে মিঃ ব্যারিয়স্ জন্মগ্রহণ করেন। ব্যারিয়স্ বুঝেছিলেন যে, গ্যায়াটেমালাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হ'লে, প্রথমতই চাই—সেখানকার লোকদের বুদ্ধির উৎকর্ষতা। তাই তিনি কতকগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রলেন এবং প্রত্যেক পিতামাতার কাছে তাঁর অনুরোধ জানিয়ে কতকগুলি ছাত্র ছাত্রী সংগ্রহ ক'রলেন।...মিঃ ব্যারিয়স্

কুইরিগ্যায়া-দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত নানা চিত্র-অঙ্কিত অদ্ভুত মূর্ত্তি। এ-মূর্ত্তির রহস্য আজো অতল তিমিরের গর্ভে লুকিয়ে আছে

চাইতেন, বিদ্যা বুদ্ধি লোকের মধ্যে যতটুকু থাকুক না কেন, তাতে যেন ত্রুটী না থাকে। এই জন্যই যতক্ষণ না তিনি বুঝতেন যে, কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করবার পক্ষে

সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ততক্ষণ তিনি একেবারেই পছন্দ ক'রতেন না যে, সে তার পেশা আরম্ভ করে। আগে গ্যয়াটেমালার লোকদের সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর জিনিষ ছিল—মদ। মিঃ ব্যারিয়স্-ই প্রথমে বিশেষ চেষ্টা ক'রে একটী নতুন আইন তৈরী করিয়ে সেখানে সুরার ব্যবসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন। তার ফলে, সেখান থেকে 'সুরা-মত্ততা'—কথাটী একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেল। এর পরই তিনি সেখান থেকে মদ্য প্রিয় সন্ন্যাসীদের তাড়িয়ে দিলেন এবং বহু বছর ধ'রে দেশের উপর গির্জ্জা যে প্রভাব ছড়িয়ে রেখেছিল, তারও ইতি ক'রে দিলেন। দেশে তিনি প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ ধর্ম্ম বিস্তার করবার চেষ্টা দেখতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ইংলণ্ডের গির্জ্জাতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন—কতকগুলি মিশনারী পাঠিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু নানা কারণে মিশনারীদের আসা আর হ'য়ে উঠলো না। মিঃ ব্যারিয়স্ তখন আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের পুরোহিতদের কাছে তাঁর উক্ত প্রার্থনা জানিয়ে পাঠান। কিন্তু এ প্রার্থনাও বিফল হ'লো। যাই হোক, গ্যয়াটেমালায় কিন্তু আজও গির্জ্জার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক রবিবারটী বিশ্রামের দিন ব'লে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। এই নিয়মটী আজ পর্য্যন্তও উল্টে যায় নি।

বৃক্ষতলে দোকান ; বিক্রী করবার জন্য মেয়েরা জিনিস সাজিয়ে ব'সে আছে

গ্যয়াটেমালার মধ্যে প্রয়োজনীয় শস্য এবং কফি যে সব স্থানে জন্মায়, সেগুলো গ্রীষ্মপ্রধানও নয়, এবং পর্ব্বত-পূর্ণও নয়। কিন্তু কলা, রবার ও মেহগনি-কাঠ যেখানে জন্মায়, সেগুলো হচ্ছে গরম জায়গা এবং জলাভূমি। শেষোক্ত জিনিষগুলির রপ্তানীর দ্বারা সেখানে প্রতি বছরই প্রচুর অর্থ এসে থাকে।

"ইণ্ডিয়ান্" অধিবাসী

সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা, তাঁদের আচার এবং ব্যবহার যার-পর-নাই ভদ্রোচিত। অন্তর তাঁদের মহানু-

ভূত্তিপূর্ণ এবং তাঁরা খুবই অতিথি-সৎকার প্রিয়। আকৃতিতে তাঁরা অনেকটা ইয়োরোপবাসীর মত দেখতে। তাঁদের সৌজন্য-পরিচয়ের একটী উল্লেখ্য জিনিস হচ্ছে এই যে, যখনি তাঁরা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখনি তাঁরা উভয়ের কর-মর্দ্দন করেন আশ্চর্য্য রকম বেশী বার। এই রকম কর-মর্দ্দন যে কেবল সভায়, কিম্বা, বিদায়-গ্রহণের সময়েই করা হয়, তা নয়;—কাউকে তার নিজের এবং তার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করবার সময়েও

ভূ-কম্পের ধ্বংসলীলা; ১৭৭৩ সালের ভূ-কম্পনের ফলে গ্যয়াটেমালা নগরের একটী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। এই রকম অনেক বাড়ীর-ই ধ্বংসাবশেষ আজও সেখানে প'ড়ে আছে

—এমন কি, সুখের সংবাদে আনন্দ এবং দুঃখের সংবাদে সহানুভূতি জানাবার সময়েও উক্ত আশ্চর্য্য রকম বেশী বার কর-মর্দ্দন একটুও কমে না। ওই সব ব্যক্তির পাল্লায় দিন-কতক প'ড়লে, যে-কোনো বিদেশীও ওই ভাবে কর-মর্দ্দনের ব্যাপারে এম্‌নি অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়বেন যে, চট্ ক'রে সে অভ্যাস ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে একটু কষ্টকর হ'য়ে উঠবে—নিশ্চয়ই!

গ্যয়াটেমালার রাজধানী হচ্ছে গ্যয়াটেমালা। এই রাজধানীটির উপর দিয়ে বিধাতার অভিশাপ যে কতবার ঝ'রে প'ড়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ১৯১৭ সালে বড়দিনের সময়ও এম্‌নি এক স্মরণীয় অভিশাপ মাথায় নিয়ে তাকে কী করুণ ভাবেই না দুর্ভাগ্য ভোগ ক'রতে হয়েছিল। প্রথমতঃ পুরো তিন দিন ধ'রে আরম্ভ হ'লো—মুষলধারায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। চতুর্থ দিনে সুরু হ'লো—বিপুল ঝঞ্ঝার

মাল-বাহক

তাণ্ডবনৃত্য, আর, তার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ ক'রলে—বজ্র ও বিদ্যুতের ভীষণতা। পরের দিন রাত্রে মাটী ভয়ানক কাঁপতে লাগলো এবং তখন কোনো প্রকারেও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবপর হ'লো না। কাছেই দুটী আগ্নেয়-গিরি থেকে জল, বালি, ছাই ইত্যাদি প্রবল বেগে বেরুতে সুরু ক'রলে। তখন লোকেরা অতিরিক্ত ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালাতে লাগলো। আগ্নেয়গিরির পুনরায় উৎপাতের ভয়েই তাই

ফলবিক্রেতা বিক্রী করবার জন্য সুস্বাদু এবং রসাল ফল বাজারে নিয়ে যাচ্ছে

গ্যায়ামেটমালা রাজধানীটিকে পরে আগেকার স্থান থেকে তিন মাইল তফাতে সরিয়ে আনা হ'লো। এর পর আড়াই শ' বছরের মধ্যেই গ্যায়াটেমালা সম্পদে, শিক্ষায়, সভ্যতায় বেশ উন্নত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার ততোধিক নিষ্ঠুর অভিশাপ আবার তার উপর এসে প'ড়লো। একদিন হঠাৎ সেখানকার একটী নগরের মাটী কেঁপে উঠলো। এবার কিন্তু নিকটস্থ আগ্নেয়-গিরি থেকে কোনো ধাতুদ্রব উদ্গত হ'লো না। অতি ভীষণ ভূ-কম্পনের ফলে নগরটী একেবারে ধ্বংস হ'য়ে গেল। আজও সেই স্থানে প্রচুর পাথরের খণ্ড ইতস্ততঃ প'ড়ে আছে; গির্জ্জার ভাঙ্গা থাম্ ছড়িয়ে আছে, এবং অনেক বাড়ীর ভগ্নাবশেষ তাদের দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই জায়গার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আজকাল এই স্থানে লোক বাস করে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

গ্যায়াটেমালায় এক রকম কীট পাওয়া যায়। তার নাম "লাক্ষা-কীট" (cochineal insect)। আজও পর্য্যন্ত এই কীট সেখানে অনেক কাজে আসে। যে-পাতায় এই লাক্ষা কীট জীবন-ধারণ করে, সেই পাতা শুকিয়ে
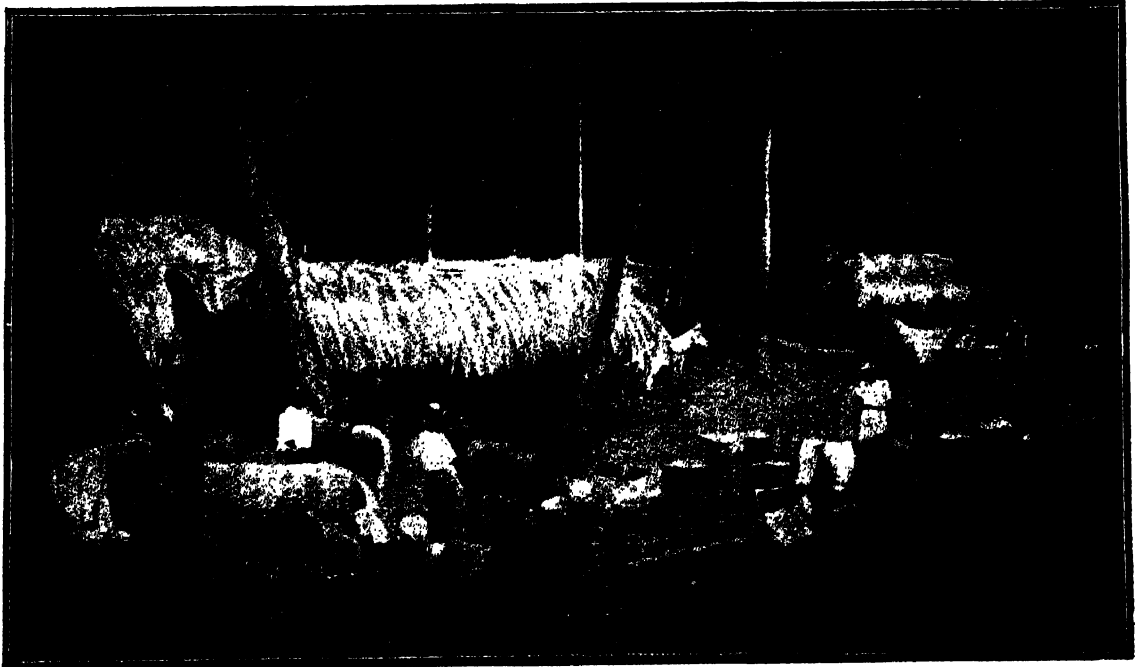
বন থেকে 'গাম' নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। সামনেই যে-পর্ণকুটীরগুলি দেখা যাচ্ছে, ও-গুলি সামান্য কিছুদিনের জন্য তৈরী-করা কর্ম্মীদের বাস-ভবন

গেলেই, এই কীটগুলোকে তুলে ফেলা হয়। তার পর সেগুলোকে তাপে শুকিয়ে নেওয়া হয়, কিম্বা সিদ্ধ করা হয়। শুকিয়ে নিলে সেগুলো থেকে নীল রং পাওয়া যায় এবং সিদ্ধ ক'রলে লাল রং পাওয়া যায়। এই রংয়ের দ্বারা সেখানকার ইণ্ডিয়ান্ রমণীদের বসন শ্রী-যুক্ত করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, উক্ত মেয়েরা প'রে আছে—রং-করা আঁট্-ঘাঘ্রা এবং ব্লাউস্। এই সব বসন ওই ভাবে রং-করা না হ'লে যেন তাদের মনঃপূতই হয় না।—সেখানকার

ভাঙা ফল-হাতে গ্যায়াটেমালার নারী

লোকেরা তাদের পরিধেয় বাড়ীতেই তৈরী করে, এমন কি, তাদের জুতো পর্য্যন্ত।

সেখানকার মেয়েরা দেখতে ভারী সুন্দর। যেম্নি নধর তাদের মুখ-শ্রী, তেম্নি লাবণ্যময় তাদের তনুর কান্তি। গায়ের রং তাদের যা-ই হোক, অধরের কোণে তাদের সরল, মধুর হাসি রাত-দিন লেগেই আছে।··· সেখানে নারীর ছবি বাজারে বিক্রী হয় গরম কেকের মতো। তার একমাত্র কারণ, ছবির নারী সুন্দরী ব'লে।··· সেখানকার মেয়েরা মুখে কোনো রকম অঙ্গরাগ ব্যবহার করে না। কিন্তু ইয়োরোপের অনেক মেয়েই কৃত্রিম উপায়ে তাদের মুখ সৌন্দর্য্যযুক্ত করবার চেষ্টা ক'রে থাকে। আমেরিকার মেয়েরা তাই তাদের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা ক'রে বলে, "যদি কেউ তাদের মুখে চুমা খায়, তা হ'লে তাদের মুখের পাউডারের বিষে সে-ব্যাচারী হয় ত মুস্কিলে প'ড়তে পারে।"

একবার একটী সুইস্ মহিলা মেয়েদের জন্য একটী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্কুলে তিনি নিয়ম ক'রে

তরুণী

দিলেন, কোনো ছাত্রীই অঙ্গরাগ ব্যবহার ক'রে সেখানে আসতে পারবে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যহ স্কুল আরম্ভ হবার আগে তিনি পাত্রভরা জল, স্পঞ্জ এবং তোয়ালে নিয়ে দাঁড়াতে লাগলেন ছাত্রীদের অপেক্ষায়। কোনো মেয়ে যদি অঙ্গরাগ মেখে স্কুলে আসতো, তিনি তখনি তাকে ডেকে, তার গা থেকে সমস্ত অঙ্গরাগ ধুয়ে তুলে দিতেন।···

সেখানকার "ইণ্ডিয়ান" নারী ও পুরুষ উভয়েই বেশ সবল ও স্বাস্থ্যপূর্ণ। তারা ঘণ্টায় ছ' মাইল পথ অনায়াসেই

হেঁটে যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, ইণ্ডিয়ান্ জননীরা তাদের শিশুকে পিঠে ঝুলিয়ে এবং মাথায় রীতিমত ভারী কার পুরুষরাও পিঠে ক'রে বোঝা বয়। বোঝার দড়িটা কপালের সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে রাখে। এই ভাবে বোঝা

কফি ক্ষেতের কর্ম্মীদের আনন্দ।—ফটো তোলাবার জন্য অল্প-বয়সী ছেলেটী, বাঁশের উপর ভর্ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাটীকে দেখবার সময়ে যে কি-রকম আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছে, ছবিতেই তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে

গ্যয়াটেমালার মানচিত্র

বোঝা নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছে। সে চলার জন্য তারা একটুও ক্লান্তি বোধ ক'রছে না। সেখান-বওয়ার কাজে এরা এম্নি অভ্যস্ত হ'য়ে যায় যে, বোঝা যথাস্থানে রেখে আসবার পর পিঠের খালি ঝুড়ি নিয়ে ঘরে আসতে অস্বস্তি বোধ করে। কাজেই তারা উক্ত ঝুড়ির মধ্যে পাথরের খণ্ড রেখে নিজেদের দেহের টাল্ ঠিক ক'রে নেয়। এই-সব "ইণ্ডিয়ান্" প্রকৃতিতে খুব সরল এবং তারা খুব কর্ম্মঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু। কিন্তু দৃষ্টি তাদের বড়ই করুণ। বোধ হয়, ১৬শ শতাব্দীতে পিশাচ স্প্যানিস্‌দের নির্দ্দয় অত্যাচারের কথা আজও তারা ভুলতে পারে নি। তাদের দেশের, তাদের জাতির স্মৃতির শ্মশানে তাই যেন তারা ঠিক প্রাণ-খোলা হাসি হেসেও হাসতে পারে না।…কিন্তু তা ব'লে এখানে এ কথা নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, আনন্দকে তারা নির্ব্বাসিত করে নি। তারা উৎসবের খুব পক্ষপাতী এবং কোলাহল যথেষ্ট ভালবাসে। রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জার সব ক'টি উৎসবেই তারা অফুরন্ত উৎসাহ ঢেলে দেয় এবং প্রত্যেক উৎসবের শেষে আতসবাজী পুড়িয়ে আমোদ পায়।

সেখানকার মৃতদেহের শোভাযাত্রার বিষয় কিছু বলা দরকার। এ সম্বন্ধে মিষ্টার ও মিসেস্ এ, পি, মড্স্লে তাঁদের "A Glimpse at Guatemala"—নামক ভ্রমণ-পুস্তকের এক যায়গায় যা লিখেছেন, তারই অনুবাদ নীচে দিলুম—

"একদিন যখন আমরা গ্যয়াটেমালার স্যান্টো টমাস্ নগরের একটি গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলুম, তখন দেখি, একদল শবযাত্রী সেই গির্জ্জারই দিকে আসছে। তারা মৃতদেহটী নিয়ে সিঁড়ী বেয়ে উঠে, উপাসনা-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো। দরজার সামনে একটী ধূপাধারে সুগন্ধি ধূপ জ্ব'লছিল। তারা মৃতদেহটী নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো না। দেহটীকে তারা ধূপাধারের চারিধারে তিনবার ঘোরালে, তার পর একটী 'রকেট্'-বাজী ছুঁড়লে। এই সব হবার সময়ে মৃতদেহের সঙ্গে যে-সব আত্মীয় এসেছিল, তারা চীৎকার ক'রে কান্না আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। রকেট্ ছোঁড়বার পরই মৃতদেহটী নিয়ে তারা চ'লে গেল।"

গ্যয়াটেমালার অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ হচ্ছে এই যে, দিনের বেলাতেও সেখানে যথেষ্ট রকেট্-বাজী পোড়ানো হয়। যে-কোনো উৎসবাদির সময়ে 'রকেট্' সেখানে পোড়ানো চাই-ই। কোনো লোক তীর্থস্থান থেকে নিজের ঘরে ফিরে আসবার পর 'রকেট্' পুড়িয়ে তার আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

সেখানকার স্যান্টো টমাস্-নগরে প্রত্যেক রবিবার বিকেল বেলায় মিউনিসিপ্যালিটির আজ্ঞা প্রচার করা হয় বড় অদ্ভুত ভাবে। একটী লোক বিশেষ-একটী দেওয়ালের উপর উঠে চীৎকার ক'রে জানিয়ে দেয়—পরবর্ত্তী সপ্তাহে নগরবাসীরা কি-কি কাজ ক'রবে। এই চীৎকারের শব্দ পাহাড়ের উপর দিয়ে দূরে ভেসে চ'লে যায়। এর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই অনেক দূর থেকে একটা উত্তর ভেসে আসে। এই ভাবে কথার আদান-প্রদান শেষ হ'লেই, উক্তিকারীরা পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে নীরব হয়।

সেখানকার ইণ্ডিয়ানরা তীর্থ থেকে ফিরে এলে একটী দ্রষ্টব্য ব্যাপার ঘ'টে থাকে। সন্ধ্যে হ'লেই তীর্থ-ফেরৎ একদল লোক সহরের এক স্থানে এসে ভীড় করে। তার পর তারা মশাল জ্বেলে সেগুলোকে মাটীতে পোঁতে। তার পর তারা যে যার মাদুর বিছিয়ে সারি হ'য়ে ব'সে যায় এবং মশালের আলোয় খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। আহারাদির পর প্রত্যেকে তাদের ঝুলির ভিতর থেকে বের করে এক একটী ছোট কালো বাক্স। সেই বাক্সর এক ধার খুব চক্‌চকে। এই ধারেই তাদের ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি আঁকা থাকে। প্রত্যেকেই যে যার বাক্স সাম্‌নে রেখে কিছু তফাতে স'রে গিয়ে বসে। তার পর মন্দির-দুয়ারে 'হত্যা' দেওয়ার মতো ভঙ্গীতে হামাগুড়ি দিয়ে ছবির দিকে চ'লতে সুরু করে। কপাল তাদের ভুঁয়ের উপর দিয়ে লুটিয়ে যায়। এই ভাবে বারকতক চলার পর তাদের ইষ্ট-দেবতার পূজা শেষ হয়।

সেখানে শস্য জন্মায় প্রচুর এবং তার উৎপাদনের বিষয়ে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু ফসলের দিক দিয়ে চাষাদের একমাত্র আপদ হচ্ছে—পিঁপড়ে। রক্তবীজের মতো এদের সংখ্যা। এরা যখন সারি বেঁধে চ'লতে সুরু করে, তখন সামনে যা পায়, তাই ধ্বংস করে। যাই হোক, এই পিঁপড়েগুলোর দ্বারা একটা উপকার হয়; এরা আরশুলা এবং কাঁকড়া-বিছের বংশ নাশ ক'রতে সিদ্ধ-হস্ত।...

গ্যয়াটেমালায় রেল ছাড়া আর-কোনো উপায়ে দেশ-ভ্রমণের আরাম নেই। সেখানকার রাজধানী ছাড়া আর-কোনো স্থানেরই রাস্তা তেমন ভাল নয়। সনাতন যুগের মতো আজো সেখানে অশ্বতর-বাহিত গাড়ীর চ'ল্‌তি আছে।...

মেক্সিকোর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে গ্যয়াটেমালা অবস্থিত। এর দক্ষিণে আছে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্ব্বদিকে আছে ব্রিটিশ হন্‌ডুরাস্, হন্‌ডুরাস্ উপসাগর ও স্যাল্‌ভাডর। মোট ৪৮,২৯০ বর্গমাইল জায়গা এখানে আছে। মোট জন-সংখ্যা ২,০০৩,৫৮০। সৈনিকের কাজ ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে নেওয়া বাধ্যতা-মূলক। সেখানকার জমি খুব উর্ব্বরা। প্রধান শস্য হচ্ছে—কফি, চিনি, চাল, কলা, গম এবং মটর। আলুও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। সেখানকার প্রধান ব্যবসা হচ্ছে—মেহগনি-কাঠ ও 'গাম্'। ১৯২০ সালে মোট ২,৯০৮,৯৪০ পাউণ্ড মূল্যের তুলো, পাট, কাগজ, শস্য, ইস্পাত, চামড়া ইত্যাদি আমদানী করা হ'য়েছিল এবং

৩,৭২০,৫৮১ পাউণ্ড মূল্যের কফি, রবার, কাঠ, চামড়া, কলা ও চিনি রপ্তানী করা হ'য়েছিল। সেখানে রেলপথ গেছে প্রায় ৪.৫০০ মাইল পর্য্যন্ত, এবং টেলিফোনের লাইন গেছে ৫১৬ মাইল পর্য্যন্ত। সেখানে ভাল রাস্তা খুব কম-ই আছে। শিক্ষা সেখানে বাধ্যতামূলক; এবং তা অর্জ্জন করা যায় বিনামূল্যে। ৬ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ ক'রতেই হবে। বছর কতক আগে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট-স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল ১,৩৩৪। সেখানে শিল্প এবং সঙ্গীত-বিস্তারও বিদ্যালয় আছে। সেখানকার লোকেরা ধর্ম্মে রোম্যান্ ক্যাথ'লিক।

গায়াটেমালার রাজধানীর নাম গ্যায়াটেমালা। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে সেখানে যে-ভূমিকম্প হয়, তার আগে সেখানকার (রাজধানীর) মোট জন-সংখ্যা ছিল ৯৯ হাজার।

আঁধারে আলো

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

(বৈকালে—জানালায়—একা)

পথ চেয়ে বসে আছি সেই থেকে এই,—
ছ'টা বাজে, গ্যাস্ জ্বালে; তবু দেখা নেই!
সবাই তো এ'পাড়ার ফিরে এলো ঘরে,
আজ কেন আসতে সে এত দেরী করে?

কাল থেকে বোলে বোলে মানলুম হার!—
—কিছুতে কি ফুরসুৎ মিল্‌লো না তার?—
দেড় গজ 'কার্‌পেট্' দু' প্যাকেট্ 'উল্'
এই তার আন্‌তে কি রোজই হয় ভুল?

দু'বেলা তো মনে ক'রে দিই বার বার,
তবু ভোলে?—এর মানে বুঝিনি কি আর?
আগে তাকে কোনো কথা একবার বই
বল্‌বার দরকার হোতো না তো কই!!

আজকাল যেন আর দেয় না সে কাণ!
মিছে কথা কয় খালি;—ভুলে যাওয়া ভাণ!
গ্রাহ্য করে না দেখি ক'দিন ধরেই;
আন্‌ছে না কিনে এটা ইচ্ছে করেই।

না আসুক!—আমি তাকে ব'ল্‌ছিনি আর!
মনে করে কোরবো বা খোসামোদ্ তার!
সে-মেয়ে যে নই সেটা বোঝাবোই তাকে,
ফাঁকি দেয়া নয় বড় সহজ আমাকে!

এ যে তার অবহেলা, বুঝি আমি বেশ!
আজ থেকে আর নয় ; হয়ে গেলো শেষ।
ভালোমানুষীতে ওর ভুলছিনি আমি!
সত্যি যা' বোল্‌বোই, হোলেই বা স্বামী!

গো বেচারী সেজে থাকে যেন ভাল কত!
ধড়িবাজ লোক কেউ নেই ওর মত!—
থাকবো না কাছে তার স'য়ে অপমান ;
চ'লে যাবো যে-দিকেতে যেতে চায় প্রাণ!

কিসের খাতির এত ? কথা রাখে না যে,
তার বাড়ী কেন মিছে খেটে মরি বাজে ?
আমি যেন কেউ নই!! উনিই মালিক ?—
রোসো, আজ বোঝাপড়া ক'রে নেবো ঠিক।

যত কিছু বলিনেকো তত যায় বেড়ে!—
আসুক বাড়ীতে আজ, বোল্‌বো না ছেড়ে!
আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়েই দিক্!
ঘর-সংসার ওর নিজে বুঝে নিক্!

এখনো যে ফিরলো না ব্যাপার কী তার ?
এতো দেরী কখনো তো করেনি সে আর!
তাই তো!...কী হোলো ?...এ'তো ভাল কথা নয় ;
না—না—ওই আসছে সে!—ঠিক!—নিশ্চয়!

* * *

(সন্ধ্যায় - ছাদে—দু'জনে)

এখানেও এসে তবু নেই নিস্তার!
দেবোনাকো সাড়া, খুশী! কি করেছি কার ?
ছাদে কেন একা আছি ?...জবাব তো তার
তোমার শোনার কিছু নেই দরকার!

সেই থেকে খোঁজাখুজি সারা বাড়ী ভোর—?
কেন ? আমি পলাতক আসামী, না চোর ?
নজরবন্দী হ'য়ে গারোদখানায়
কয়েদী থাকতে হবে এ তো কি বা দায় ?

হিম পড়ে আজকাল ....পড়ুক্ দেদার!
ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে ?.. লাগুক্ আমার!
আমি তো কারুর ঘর জুড়ে বসে নেই,—
বাড়ী ছেড়ে যাইনিকো,—অপরাধ এই!

ঘরে যেতে হবে ?…কেন ?…হুকুম এ' নাকি ?—
বেশ ! সারারাত্ যদি ছাদেতেই থাকি,
কারুর তো বাধা দিতে নেই অধিকার !—
দাসী বাঁদি নই কারো, ডেকোনাক' আর !

নোংরা ছাদের কোণ ?—শ্যাওলায় কালো ?—
তা' হোক্ ! এখানে আমি বেশ আছি ভালো !
থাকবো কি রাত্ ভোর এইখানে ?—তার
দিয়েছি তো উত্তর !—'ইচ্ছে আমার' !

নামবো না আপাততঃ !…খানিকটে পরে ?…
নীচেয় যেতেও পারি,—ঢুকবো না ঘরে।
আঃহ ! কেন হাত ধরো ?—টেনোনাক' ছাড়ো—
জ্বলে পুড়ে সারা আমি,—জ্বালিও না আরও !

ছাড়বে না হাত তুমি ?—বলো না কী চাও ?
কোনো কথা শুনবো না !—যাও, চলে যাও !
আমি তো কারুর কিছু ধারিনেকো ধার,
এসোনাক' কেউ মোটে সামনে আমার !—

শুনতে চাইনে আর শুভ সংবাদ !
মরণ হ'লেই বাঁচি ! মেটে সব সাধ।
জগতে আপন যার নেই কোনোখানে,
বেঁচে-থাকা কী যে পাপ—সে-ই শুধু জানে !

থাক্ থাক্ চুপ্ করো,—তোমার প্রেমের
ও সব কেতাবী-বুলি শোনা গেছে ঢের !
সবেতেই জিতে নাও বচনের চোটে !
মিছে কথা ঠোঁটে কিছু বাধে না তো মোটে !

কথায় ভেজে না চিঁড়ে !—আজ চেয়ে মাপ্
কাল তো আবার ফের ভুলে যাবে সাফ্ !
তার চেয়ে ছেড়ে দাও, টেনোনাকো পিছু,
বেশী কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই কিছু !

আজ গিয়ে শোবো আমি পিসিমার ঘরে,
কাল ভোরে চলে যাবো 'গোপাল-নগরে' !
উহু—সরো, ছাড়ো—ছাড়ো,—লাগ্ছে আমার !
বেহায়ার মত ছি ছি, জড়িও না আর !—

ছেড়ে দাও, রাত হোলো,—নেমে যাই, সরো!
—অবাক্!—কী বোলে চুমু চাও এর পরও!—
লজ্জা কি নেই মোটে?—ঈষ্!···তাই নাকি?
'কাম্‌পেট্' 'পশমে'র বখ্‌শীষ বাকী?—

তাই আজ দেরী হোলো ফিরতে তোমার?
সত্যি?—এনেছো?·· বলো গা ছুঁয়ে আমার!
কী মিথ্যে কথা তুমি কইতে যে পারো!
দেখি—দেখি,দাও,—বাঃহ্!—উহু—ছাড়ো—ছাড়ো—

সুড়সুড়ি লাগে বড়ো, ছাড়ো পড়ি পায়!
কাতুকুতু দিয়োনাগো!—দোহাই তোমায়!
বেজায় জুলুম বাপু!—এই নাও,···হ'লো? ··
···যাও, ভারী দুষ্ট,—হুঁ!···ঘরে যাই চলো।

মা! মা! ও-মা!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

নামটা ছিল বেজায় বিদ্‌কুটে। ও দেশে না কি অমনি নামই চলে। একজনের নামের মধ্যে দিয়ে সাড়া দিতে চান্ তিন পুরুষ!

এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক জিনিস মানুষের কাছে। নিজে ত বাঁচবই। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি পূর্ব্ব-তিন-পুরুষ আর উত্তর-তিন-পুরুষের গতি হয়ে যায়, তো মন্দ কি?

মৃত্যু অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে লড়াই চলেইছে শুধু জীব জগতের নয়, বস্তু-বিশ্বেরও। মহাকাল তাঁর দংষ্ট্রা উদ্যত ক'রে আছেন, প্রতি জিনিষটির উপর; রুচি নেই, অরুচি নেই! চলেছে নির্ম্মম ধ্বংসের কাজ। আর অপর দিকে ব্রহ্মাণ্ড গড়েই চলেছেন, সে-সৃষ্টির আদি নেই অন্ত নেই! যা' গড়ছেন তাই আর্ট। বাঃ! বাঃ!

মাঝখানে মহা-বিষ্ণু। মুখে তাঁর স্নিগ্ধ তারিফের হাসি! ব্রহ্মাকে ব'ল্‌ছেন, কেয়াবাৎ জি! আবার ওদিকে ফিরে মহাকালের কাণে কাণে চুপি চুপি বলেন, চালাও, চালাও, ভাইয়া! চক্রী! ফলে, উঠে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী তাণ্ডবের উত্তাল তুমুল তরঙ্গ!

আরে এ কি দাদা, এরি মধ্যে উঠ্‌লে যে? পুরাণ-কাহিনী শুনে বুঝি ভয় পেলে? বাড়ী গিয়েই বা ক'রবে কি? গুড়ুকের ভুড়ুক্ ভুড়ুক্, আর গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া? আচ্ছা ব'সো ব'সো, পুরাণ বন্ধ ক'রে নতুনই বলছি, শোন ত একবার।

যেমন দেশ, তেম্‌নি নাম, রাম সর্ব্বেশ্বর বসুদেব ধনঞ্জয়। যেন, কোন্ ব্রীজের উপর দিয়ে পাশ ক'র্‌ছে জি-পি রেলের মালগাড়ীগুলো! ঘটাং, ঘটাং ঘটাং! দিনের চাকা ঘুরে যায় ত' ওর শেষ নেই রে বাপ্। কি নামের শ্রী!

ফের উস্‌খুস্? আচ্ছা, এবার সোজাসুজি ব'লে যাই। আফিং খাই কি না! প্রতি কথাটাই বাজিয়ে বাজিয়ে ব'লতে ইচ্ছে করে। তার কি যো আছে ছাই, সবাই যে, কি বলে গিয়ে ভাল ভাষায়?—গৃহ-মুখী ষণ্ড!

২

রাম সর্ব্বেশ্বর বসুদেব ধনঞ্জয়কে অর্দ্ধেক করে হয়েছে বসুদেব ধনঞ্জয়, আরো অর্দ্ধেক করা যাক্, এস; কেন না, শাস্ত্রে বলেছে: অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। কি রাখি, কি ছাড়ি? ধনঞ্জয়? মাথা নাড়্‌ছ?

বসুদেব?

হাঁ! এইবার দাদার মুখে হাসি বেরিয়েছে!

আচ্ছা, তাই ভাল। তবে, শোন এবার সোজা-সুজি বলি:—

বসুদেব এম্-এ দিয়ে ঘরে ব'সে ছিল, নামটা গেজেটে দেখার জন্যে। ফার্ষ্ট ত হবেই; তাকে ঠেকায় কে?

কিন্তু ঘর যে অচল, মাথার উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়-পড়, সেই খবর এই ক'দিন হ'লো জান্‌তে পেরে রাতে তার নিদ্রা নেই, দিনে তার আহার নেই!

ভাবে সে, বীজ-গণিতের একখানা বই ধাঁ ক'রে মাস খানেকের মধ্যে লিখে ফেলে, এ-দিকটা আবার চালিয়ে দেয়। বিধবা লচ্ছি আর কত টাল্ সামলায়?

রাত বারোটা কি একটা হবে। মিট্ মিট্ ক'রে আলোটা জ্বল্‌ছে; তেল ফুরিয়ে এসেছে বাতিটায়।

হঠাৎ টেবিলের উপর বসুদেবের ফাউন্‌টেন্ পেন্‌টা আপনি-আপনি ন'ড়ে ন'ড়ে দুলে উঠ্‌লো।

এ কি ভূমি-কম্প?

নাঃ, তবে?

এ কি! এ যে আবার নড়ে! ব্যাপার কি?

বসুদেব দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো উত্তেজনায়। দেখে, ভাল ক'রে, নিরীক্ষণ ক'রে!

ইংরিজি হরফে লেখা হ'লো, থ্যাংক্ ইউ! অর্থাৎ ধন্যবাদ তোমাকে।

বসুদেবের মনে হ'লো কিসের ধন্যবাদ? কার ধন্যবাদ? আর লেখে কে? কাগজের উপর কলমটা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মতই ছুটে চল্লো; অনর্গল লিখে:—

আজ থেকে কোন একটা বিশেষ কারণে আমি এই কলমটাকে আশ্রয় করেছি······

কখন থেকে?

ঠিক রাত বারোটা তখন।

কেন?

আজ বল্‌তে পারবো না। হয় ত' তোমার সঙ্গে বছর খানেকের আলাপ-পরিচয় হ'লে······

জিজ্ঞেস করছিলে কিসের ধন্যবাদ—তাই বলি:—

আমার যত কথা বলার আছে, সে সব কথা পর পর লিখে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারে এই দুনিয়ার মধ্যে সে কেবল একজন লোক।

কে সে?

কলমে বড় বড় হরফে লেখা হ'লো:—

রাম সর্ব্বেশ্বর বসুদেব ধনঞ্জয় এম্ এ; তুমি গো, তুমি!

বসুদেব মনে মনে বল্লে, এম্-এ তো এখনো হই নি?

উত্তর: হয়েছ। আজ রাত্তির ন'টার সময়ে ছাপা-খানায় গিয়ে তোমার নাম ছাপা দেখে এসেছি।

বটে!

এমন সময় লণ্ঠনটাতে তেল ছিল না; দপ্ দপ্ ক'রে সেটা নিভে গেল।

বসুদেব আর করে কি? পাশের খাটখানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কলমটা হাতে তুলে নিতেই থর্ থর্ ক'রে সারা হাতটা কাঁপে। তাড়াতাড়ি সেটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়েই কি রক্ষা আছে বসুদেবের? এগিয়ে তেড়ে আসে যেন কলমটা তার দিকে। যেন মাথা তুলে বলে, নেও, নেও! ওগো, ভয় নেই!

বসুদেব কলমটা তুলে নিয়ে ক্যাপটা খুলে লেখার কায়দা ক'রে এক টুকরো কাগজের উপর ধরতেই বড় বড়

সকালে লচ্ছি এসে বসুদেবকে তুল্লে। তার এক হাতে চায়ের পিরীচ-পেয়ালা; আর অন্য হাতে খান কয়েক সেঁকা পাঁপড়ের টুকরো।

বসুদেব উঠে বল্লে, আর তোর চা? লচ্ছি, তোর?

আমি ভাই, ক্ষিদে পেয়েছিল ব'লে আগেই খেয়েছি। তোমার উঠ্‌তে দেরি হয়েছে কি না?

লচ্ছি ছিল বড়; কিন্তু সে ভাইটিকে তুমি ছাড়া

কোন দিন তুই বলে নি। আর বসুদেব বড় বোনকে কোন দিন ভুলেও তুমি ব'লতো না। ওদের দেশের তো "দাদা-দিদির" কোন বালাই নেই।

লচ্ছি সকালে চা আর পাঁপড় পাবে কোথায়, যে খাবে? ওটা ওর একটা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু লচ্ছি জীবনে কখ্খনো মিথ্যে ব'লত না।

তবে, এটা?

এ কি মিথ্যে? রামঃ, এ হলো জীব-সত্য। পরম শিব।

কিন্তু বসুদেব ওর সব চালাকি বুঝেছিল। তাই সে চীৎকার ক'রে উঠলো; নিয়ে আয় আর একটা বাটি, শী-গ্-গি-র—

লচ্ছি একটা হাতল ভাঙ্গা চায়ের পেয়ালা তাড়াতাড়ি এনে দিতেই অর্দ্ধেক চা ঢেলে দিয়ে বসুদেব বল্লে, ভারি তুই গিন্নী হয়েছিস্ লচ্ছি; আমার রাগে গা' জ্বলে যায় তোর এই সব ন্যাকামির ঢং দেখ্‌লে। নেই তো কি? তোর দোষে নেই? না আমার দোষে?

লচ্ছি অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে, অতো চেঁচিও না লক্ষ্মী ভাইটি আমার। ও-বাড়ীর লোকেরা কি মনে করবে!

বসুদেব এবারে হাস্‌লো। মনে যা' করে ওরা, তা' আমার ভাল ক'রেই জানা আছে।

জানিস্, কি মনে করে ওরা? মনে করে যে একটা দেবী-প্রতিমাকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে তার হাড় পাঁজর চুরমার ক'রে দিচ্চে অহরহ! শয়তানের দল! আমি ষাঁড়?

দূৎ! ব'লে লচ্ছি চায়ের পেয়ালা আর বাটিটা নিয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উত্তরের জান্‌লাটা এক ধাক্কায় খুলে দিয়ে বসুদেব আবার কলম ধ'রে বস্‌লো।

কলমে বড় বড় অক্ষরে লেখা বেরুলো—

গুড্ মর্ণিং।

৫

কলম লেখে:—অত ভাবনা কিসের? তোমার সহায় যখন আমি, তখন টাকার অভাব নেই, কত চাও বল না?

ফের, ঐ এক প্রশ্ন, কে আমি?

জান্‌তে পারবে গো! একদিন আস্‌বেই যেদিন ও-কথা তোমার কাছে কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যাবে না—

কি ক'রে টাকা দেব তোমাকে?

যা বলি তা' কর। এক মাসের জন্যে একটা ভাল ঘর ভাড়া নেও। মাঝ-সহরে ও বড় রাস্তার ধারে, বুঝেছ? তার ওপর খুব বড় বড় ক'রে লিখে দাও:—

তোমার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের
সকল রহস্য জেনে যাও। এক বর্ণ
অসত্য হ'লে টাকা হাতে হাতে ফেরৎ।

হঠাৎ কলম থেমে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বসুদেব ভাবে, এ কি, কোথায় গেল স্পিরিট?

নিঃশ্বাসের চাপা শব্দ শুনে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, লচ্ছি দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ ক'রে সেই লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছে।

বসুদেব, ও কি ভাই? তোমার মাথা ভাল আছে তো?

খানিক চুপ ক'রে থেকে সে বল্লে:—গভীর সন্দেহ; কাল রাত থেকে যে আমার কি হ'য়েছে, তা তোকে কি ব'লবো লচ্ছি!

লচ্ছি কাছে ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, ছিঃ ভাই। মন উতলা করতে নেই। এম্-এ'টা পাশ ক'রে একটা কিছু কর। আমি সীতার সঙ্গে তোমার বিয়েটা দিয়ে ফেলি।

বসুদেব মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্লে, তোর ঐ এক কথা! তুই কোথায় যাবি তখন?

লচ্ছি আবার কোথায় যাবে, তোমাকে ছেড়ে? সীতা আর আমি তোমার সুখ-সেবায় দিন কাটাবো—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘর ভ'রে উঠবে

বাচ্ছাদের চীৎকারে?

না না, বসুদেব, তাদের সুখের কলরবে! সে আমার ভারি মিষ্টি লাগবে।

বাইরে থেকে কে কড়া নেড়ে বল্লে, বাবুজি, তার হ্যায়!

হঠাৎ বসুদেবের মুখটা পাঁশের মত নিষ্প্রভ মলিন হ'য়ে গেল। লচ্ছি বল্লে, ও কি ভাই, তুমি ভয় পেয়েছ না কি?

না, না, তুই তারটা নিয়ে আয়; ব'লে দিচ্ছি, ওতে পাশের খবর আছে। কোন ভুল নেই!

যদি তাই হয় তো তোকে একপেট খাওয়াব, ব'লে লচ্ছি তার আন্‌তে চ'লে গেল।

৬

দিন কয়েক পরে।

সূর্য্য সবে পাটে নেমেছে। লচ্ছি তাড়াতাড়ি ক'রে ছুটে বসুদেবের ঘরের দিকে, ওর অঙ্ক কষায় যদি একতিল বাধা হয় ত রক্ষে রাখবে? হৈ হৈ কাণ্ড ক'রে বাড়ীটা মাথায় করবে।

ঘরে এসে দেখে, বসুদেব খাটের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে বেড়ে রাতের মতই ঘুম দিচ্ছে।

তবুও সে আলো ধরিয়ে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে দেখলে যে, বসুদেবের বেগুনি রং-এর সব চেয়ে দামি ফাউন্‌টেন্ পেন্‌টা আগে-পেছনে আনা-গোনা করছে।

একটা কলম যে এমনি নিজে নিজেই চল্‌তে পারে, তা লচ্ছি নিজে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতো না। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা, শক্ত নয় কি?

কলমটা ঠিক ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে লচ্ছি হাতে ক'রে যেমন তুলে নিয়েছে—আর যাবে কোথায়? তার হাত দুটোতে যেন বিজলীর ঝাঁকি!

সে চমকে, মাগো ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেই—বসুদেব উঠে প'ড়ে বল্লে, কি রে লচ্ছি?

লচ্ছি তার দিকে ফিরে বল্লে, বসুদেব ভাই, এ কলমে বুঝি ব্যাটারি পুরেছ? আগে তো, আমি কত ঝেড়েছি মুছেচি; আজকে এত ঝাঁকি মারছে কেন? এ আবার কি নতুন উৎপাত!

বসুদেব গম্ভীর ভাবে বল্লে—বল্, তুই ভয় পাবি নে?

ভয় আবার কিসের? ব'লে লচ্ছি হাস্‌লো।

বল্, তুই এ-কথা আর কাউকে ব'লবি নে?

কে আমার পাঁচজন চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনি, সারা দিন? যাকে না বল্লে আমার নয়? লচ্ছি রাগের ভান ক'রে বল্লে।

বসুদেব বল্লে, না লচ্ছি, হাসির কথা নয়। আজকে রাত্তিরে আসিস্, বোল্‌বো তোকে; কিন্তু সাবধান, ভয় পাস্ নে।

লচ্ছি মনে-মনে হাসে। ভয় যদি তার মনের মধ্যে এক কড়ার ক্রান্তিও থাকতো! সে সব চুকে-বুকে গেছে যে। বলবন্তের মাথা কোলে ক'রে যে দুমাস কাঠের মত কাটিয়ে দিতে পারে, তার আবার ভয়? যার কপাল চিরদিনের তরে পুড়েছে তার আবার ভয়!

বলবন্ত ছিল বিধবার চক্ষের মণি; একমাত্র সন্তান।

৭

বসুদেবের স্পিরিটের গল্প লচ্ছি বিশ্বাস করে নি। মোটা বুদ্ধির মোটা কথা। সে হাসে, বলে, মরা গরুতে আবার ঘাস খায় না কি? যত সব আজগুবি কথা বসুদেবের!

কিন্তু কলম নড়ার ব্যাপারটা সে কিছুতেই যেন বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না। এমন তো' কক্ষণও দেখি নি! ওটা ওর বুজ্‌রুকি না কি? সেদিন আমাকে সেই কিসের দুটো তার ধরিয়ে—উঃ! কি ঝাঁকিই না দিতে লাগলো। বল্লে, ব্যাটারি, বিদ্যুৎ! আজ আবার বলে স্পিরিট। ষ্টোভ জ্বালতে স্পিরিট লাগে জানতুম। ভূতকেও ওরা স্পিরিট বলে, না? ঠিক তো! ভুলে গিয়েছিলুম।

আচ্ছা, একবার সীতাকে গিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস ক'রে আস্‌তে হচ্ছে; সে তো বি-এ পড়ছে, আমার মত ভূত নয়। দেখি, সেই বা কি বলে শেষ পর্য্যন্ত। তার কাছে তো আর চালাকি, ধাপ্পা-বাজি চলবে না?

কলমটা নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে? সেটা কি ঠিক হবে? নাঃ, তাকেই আনি না, সঙ্গে ক'রে!

বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে লচ্ছি বলে:—

ও মা! ঐ সীতাই না আস্‌চে? সত্যি! ও যেন আমাদের নিজের লোক। কেমন ক'রে যে মনের টান বুঝতে পারে!

ইস্! কি সুন্দর দেখ্‌তে সীতা! কি সুন্দর ওর স্বাস্থ্যটি! যেমন মনের জোর, তেম্‌নি দেহখানি। চল্‌চে দেখ রাস্তায়! কে ব'লবে, ও একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে! ওর হাঁটন দেখে পথের লোক স'রে গিয়ে, ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে!

এইবার আমাকে দেখতে পেয়েছে। কি মিষ্টি হাসি ওর। দেখি, বসুদেবকে খবর দেই; সে ভারি খুসী হ'য়ে যাবে!

বাঃ, বারে! এই তো ছিল ঘরে, কখন বেরিয়ে গেল! থাকে থাকে, কোথায় যে চ'লে যায়! ও,

টেনিস্ ব্যাটটা নেই; খেল্‌তে গেছে; এখ্‌নি তবে ফিরে আস্‌বে; এসেই ব'লবে :—লচ্ছি, খেতে দে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে! তার পর একটু এদিক-ওদিক হ'লেই আমার সঙ্গে ঝগড়া! আমি কি পারি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে? ঠিক হবে যেদিন ওকে সীতার হাতে প'ড়তে হবে!

লচ্ছি, বড় গোছের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে!

এস, আমার লক্ষ্মী দিদিটি! কি ক'রে জান্‌লে যে আমি তোমার কাছে যেতে চাইছিলুম, তুমি কি মনের কথা জান্‌তে পার?

সীতা হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এলো। এসে বল্লে, লচ্ছি, বসুদেব এম-এ'তে ফার্ষ্ট হয়েছে? এখন আমাকে পেট ভ'রে জিলিপি খাওয়াও! বলেছিলুম না?

লচ্ছি তার দুটো হাত ধরে আদর ক'রে বল্লে, সীতার কথা কবে মিথ্যে হয়েছে, শুনি? খাওয়া? সে আর একটা বেশী কথা কি? আজ, এখেন্ থেকে খেয়ে তবে যেতে পাবে, তুমি। বসুদেবটা কখন পালিয়েছে, দেখ্‌ছি।

সী। সেই তো গিয়ে আমাকে পাশের খবর দিলে, বল্লে, ওদিকে লচ্ছি ব'সে আছে খাবার কোলে ক'রে; তাই তো এলুম ছুট্‌তে ছুট্‌তে!

ল। আর সে?

সী। সে বল্লে, আস্‌চি, একটু খেলে নিয়ে—ক্লাব থেকে।

ল। বেশ হয়েছে, এর মধ্যে আমার কথাগুলো শেষ ক'রে নি।

সী। কি কথা, লচ্ছি?

ল। ভারি মুস্কিলে পড়েছি ভাই, একটা বড় বিপদ হবে ব'লে মনে হয়। আজ বসুদেব খেলা করতে করতে কেঁচো খুঁড়চে; তার পর যখন কেউটে বেরুবে তখন কে তাকে ঠেকাবে?

সী। কি হয়েছে কি?

ল। আমার মাথা আর মুণ্ডু ···

৮

সীতা কলমটা নড়া দেখে অবাক হ'য়ে রইল। তাই তো! এমন তো কখখনো দেখা যায় না!

সে কলমটা নিতে গেল। সেই সময় লচ্ছি চেঁচিয়ে উঠলো, নিও না, নিও না, ও ভয়ঙ্কর ঝাঁকি মারবে তোমার হাতে!

সীতা হাসে, বলে, হাত তো আর ছিঁড়ে প'ড়বে না, ঐ এক ফোঁটা কলমের জোরে!

তাই তো! ভারি আশ্চর্য্যি! কি বলে বসুদেব? সীতা জিজ্ঞেসা করে।

ওর কথা কোন মানুষে বিশ্বাস করে? বলে কি না স্পিরিট, ভূত গো ভূত!

সীতা অনেকক্ষণ কি ভাবলে, তার পর বল্লে, লচ্ছি, বসুদেব বাজে কথা বলে নি, এ ভূতই বোধ হয়। এমন সব ঘটনার কথা আমি প'ড়েছি, কাগজে!

হঠাৎ লচ্ছির মুখখানা সাদা হ'য়ে গেল! সে সীতার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, তবে ওটা ধ'রে কাজ নেই তোমার, সীতা!

সীতা কলমটা রেখে দিয়ে, পাশের কাগজের তাড়া, যা' বসুদেব রাশি রাশি লিখেছিল, তাই প'ড়তে ব'সে গেল। মধ্যে মধ্যে ব'লে উঠে, ভারি মজার ত'। আর লচ্ছি তার মুখের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। যেন বুঝে নিতে চায় সীতার মুখ দেখে, সত্যিকার ব্যাপারটা কি!

বসুদেব ফিরলে লচ্ছি তাদের পেট ভ'রে খাওয়ালে।

তার পর সে এসে চেপে তাদের মধ্যে ব'সে বল্লে, এইবার আর আমি কারুর কথা শুন্‌বো না। আজ শুন্‌তে চাই, কবে তোমরা বিয়ে করবে। আমি আর কিছুতেই একলা থাকতে পার্‌বো না।

সীতা লজ্জা পেয়ে হাসে; বসুদেব বলে, আমার কি? আমি আজ পাই ত' কাল্‌কের জন্যে সবুর করতে চাই নে, লচ্ছি! ওই সীতারই মত নেই, তোকে ব'লছি আসল কথা, তা' তুই তো আমার কথা বিশ্বাস ক'রবি নে?

লচ্ছি সীতার একখানা হাত টেনে নিয়ে বললে, সীতা, কি হবে ভাই তোমার বি-এ পাশ ক'রে; আর আমাদের ঘর থেকে কি পাশ দেওয়া যায় না? তোমার সব খরচ আমি দেব—

বসুদেব বলে, তুই পাবি কোথায়, শুনি?

গম্ভীর মুখে লচ্ছি বলে, তুমিই দেবে!

সীতা আর বসুদেব হো হো ক'রে হেসে উঠে।

এবার লছ্‌মি সত্যি রাগ করলে ; সে বিড় বিড় ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো, থাক্‌তো যদি আজ আমার বলবন্ত তো দেখ্‌তো সবাই ;—তার দু' চোখে দুটো মুক্তোর মত অশ্রু এসে জম্‌লো।

বসুদেব উঠে এসে লছ্‌মির হাত ধ'রে বল্লে, লছ্‌মি, তুই যদি আমার উপর রাগ করিস্‌, তো তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমার আর কি হ'তে পারে ? ছি-ই-ই, লছ্‌মি—ই-ই……

লছ্‌মি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে, একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাস্‌লে !

বসুদেব বল্‌লে, আজ হোল কি বার ? শনি, না ? রবি এক, সোম দুই, মঙ্গল তিন ; বুধবার তুই সীতাকে খেতে বলিস্‌—সেদিন সব ঠিক-ঠাক করে ফেলা যাবে !

লছ্‌মি হেসে ফেল্‌লে,—দেখো বসুদেব ভাই, এবার যদি লছ্‌মিকে দাগা দিয়েছ তো, লছ্‌মিও তোমায় দাগা দেবে।

সীতাকে বাড়ী দিয়ে আস্‌তে হবে। বসুদেব বল্লে, কি গো মাদাম্‌, এখানেই কি ব'সে রাত কাটাবে ?

না মশাই, সীতাকে অনেকবার যে বনবাস যেতে হবে। তার ভাগ্যে বসার সুখ কি আছে ?

কৃষ্ণপক্ষের রাত ! তখনি অন্ধকার হয়ে গেছে।

৯

সীতা বেরিয়ে বল্লে, একটু ঘুরে টিলক-পার্কে গিয়ে খানিকটা ব'সবো তোমার সঙ্গে।

বসুদেব ব'ল্লে, আর তোমাব সেই নেকি পিসীটা ঘ্যান্‌ ঘ্যান করবে তো, ফিরলে ?

সীতা বল্লে, যদি এতটুকুও দুঃখ না সইব তোমার সঙ্গ পেতে তো তুমি যে বে-দামির সামিল হ'য়ে যাও।

তোমার কাছে কবেই বা আমার দাম, যেন নিলামের কেনা মাল !

চুপ্‌, ব'লে সীতা বসুদেবের মুখ চেপে ধরলে। যত বড় মুখ তত বড় কথা ? তুমি সীতার সাম্‌নে তার প্রেমিককে ছোট করতে সাহস করছ ?

বসুদেব বল্লে, আগে হরধনুটা ভাঙ্গি' তার পর তো জনক-দুলারিকে পাব ?

আর তোমার হরধনু ভেঙ্গে কাজ নেই, সীতা বল্লে ; এবারে শক্ত পাল্লায় প'ড়েছ, লছ্‌মি তোমায় আর কিছুতেই রেহাই দেবে না।

পার্ক এসে প'ড়লো—তারা দুজনে এক পাশের এক বেঞ্চিতে গিয়ে ব'স্‌লো।

সীতা বল্লে, কি সব পাগ্‌লামি করছ ওই কলমটা নিয়ে ?

পাগ্‌লামি, সীতা ? তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি ওতে আমার কোন বুজ্‌রুকি নেই !

তা জানি গো, তা ভাল ক'রেই জানি। কিন্তু ও ক'রে লাভ ?

বসুদেব বল্লে, লাভ ক্ষতি জানি নে সীতা, আমি হাজার দশেক টাকা চাই ; দুজনে মিলে বিলেত যাব। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে ; নৈলে এক্‌লাটি যেতে আমার মন চাইবে না।

তাই দোকান খুল্‌বে, জোচ্চুরির ?

কিসের জোচ্চুরি ? তোমার ভূত ভবিষ্যত ব'লে দিলে, তুমি যদি খুসী হয়ে আমাকে টাকা দাও, তো তার মধ্যে জোচ্চুরি কোথায় সীতা ?

সীতা বল্লে, কিন্তু একদিন কলম যদি না লেখে, না যদি কিছু বলে ? তখন ?

অসম্ভব। তাই কি আর হয় ? এ কথা বল্লেও বসুদেব মনে-মনে বুঝলে যে সীতা একটা মস্ত কাজের কথাই বলেছে।

সীতা বল্লে, দিন পনর কুড়ি আগে তুমি কি জান্‌তে যে তোমার উপর কোন প্রেত প্রসন্ন হবে ?

না, তা তো জান্‌তুম না।

বসুদেব, ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে দেখ, কি করতে চলেছ তুমি। জীবনের কোন বড় কাজই ফাঁকি ফক্কিকারির উপর দিয়ে হ'তে পারে না।

সীতা ! ব'লে বসুদেব সীতার একখানি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে বল্লে, সীতা, আমি যে তোমায় ভালবাসি, তার মধ্যে তো এক-বিন্দু ফাঁকি নেই ! তবে কেন আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পাব না ?

সীতা বল্লে, কারণ খুব সহজ বসুদেব, কারণ আমাদের হাতে সে টাকা নেই। কোন দিন হয় তো যাব দু' জনেই এক সঙ্গে। এখন না !

সে কবে, কবে, সীতা? আমি দূর ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে কিছুতেই থাকতে পারব না।—ও কথা বল্লে, আমি যাব না, কোথাও যাব না!

লক্ষীটি বসুদেব, আরো এক বছর অপেক্ষা কর। এই বছরের উপার্জ্জন থেকে তুমি নিশ্চয় যেতে পারবে—বসুদেব, বসুদেব—

বসুদেব কথা না ক'য়ে ভীষণ আপত্তিসূচক মাথা নাড়তে লাগলো।

১০

লচ্ছি একলা ঘরে কলমটা তুলে নিয়ে কাগজের উপর রাখতেই সেটা হিজিবিজি লিখতে সুরু ক'রে দিলে।

অবাক্ হ'য়ে লচ্ছি দেখলে, কি লেখা হয়।

ঘুরতে ঘুরতে কলম বড় বড় অক্ষরে লিখলে, আমি বলবন্ত।

সেই কাগজের উপর লচ্ছির চোখ থেকে শ্রাবণের ধারার মত চোখের জল টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো!

হায়! এ যে স্বপ্নের অতীত! লচ্ছির কাছে তার প্রাণের বলবন্ত ফিরে এসে, এ কি ব'লতে চায়!

লচ্ছি যেন শুনতে পায়! দূরে, দূরে, সেই নীল সমুদ্রের সীমান্ত থেকে কে যেন ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকচে—

মা! মা! ও-মা!

তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো!

লচ্ছি কলম রেখে ঘর-ময় চ'রকির মত ঘুরতে লাগ্‌লো।

বলবন্ত আর আমি? আর কেউ থাকবে না সেখেনে। সমস্ত দিন ব'সে ব'সে আমি দেখ্‌বো কি সে লেখে ও কি সে ব'লতে চায়। আমার হারাণো মাণিক বলবন্তকে আমি ফিরে পাব। আর কাউকে আমি চাইনে!

কিন্তু কলমটা তো আমার নয়! বসুদেব দেবে? একেবারে দিয়ে দেবে, ঐ কলমটা আমাকে?

পাগল! সে এই আসচে মাসের পয়লা দোকান খুলচে বড়বাজারে, এই কলমের জোরেই তো? এরই আশায়! কলম বসুদেব আমাকে কিছুতেই দেবে না।

তবে?

একটা বিকট সম্ভাবনায় লচ্ছির মুখ সাদা হ'য়ে গেল। তবে তাই ঠিক্! এখ্‌খুনি, এখ্‌খুনি; আর এক মিনিটও দেরি করলে, বসুদেব ফিরে আসবে। তখন? তখন কি আর পালাবার পথ থাকবে?

লচ্ছি নিমেষে পাগলের মত অস্থির হয়ে মনে মনে বার-বার ক'রে ব'লতে লাগ্‌লো, লচ্ছি পালা, পালা; নইলে এখুনি বসুদেব ফিরে এসে, চুরির মতলব জানতে পারলে আর কলম তুই কোন দিন পাবিনে। তাহ'লে কেমন ক'রে বলবন্তের সঙ্গে কথা কইবি তুই? কেমন ক'রে? তোর হারাণো মাণিক!

কলমটা বুকের মধ্যে পুরে লচ্ছি তাড়াতাড়ি সেই অন্ধকার রাত্রে পথের মধ্যে বা'র হ'য়ে গেল। পা টিপে-টিপে চোরের মত চলে সে, সেই পথে, যেদিকে লোকজন চলা এরি মধ্যে বন্ধ হ'য়ে গেছে!

১১

বসুদেব ফিরে এসে সটান শুয়ে প'ড়লো নিজের খাটে। লচ্ছি যে কলম নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, সে কল্পনাও তার মনের মধ্যে আসেনি।

লচ্ছির উপর সব ভার। আলো পর্য্যন্ত নিবাবে—সেও লচ্ছি। তার মাথার শিয়রে জলের গ্লাসটি রাখ্‌বে, সেও লচ্ছি। লচ্ছি নৈলে কি এক মুহূর্ত্ত বসুদেবের চলে?

শেষ রাত্রে বসুদেবের ঘুম ভাঙ্গলো। টেবিলের উপর তেমনি জ্বলছে বাতিটা! জল? জলের গ্লাস কই?

আঃ! লচ্ছিটা বুঝি আজ কিচ্ছু না ক'রেই শুয়ে প'ড়েছে! এক-একদিন ওর কাঁধে যেন ভূত চাপে!

বসুদেব বেরিয়ে বারান্দার ছাদে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ পূবদিকের কপালে যেন শিবের কপালের মতই শোভা পাচ্চে। দিকচক্রের কাছে যেন একটা সোণালি রেখা!

বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে জল জল করছে!

সকালের হাওয়াতে বসুদেবের মেজাজটা জুড়িয়ে গেল। মনে হ'লো, এই সময় যদি এক কাপ্ চা!

সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে গিয়ে লচ্ছির ঘরের সামনে দাঁড়ালো;—দোর খোলা, ঘরে কেউ আছে ব'লে মনে হয় না।

বসুদেব ভয়ে ভয়ে, ডাকলে, লচ্ছি, ও লচ্ছি! তোর কি অসুখ ক'রেছে?

নিরুত্তরের নিস্তব্ধতা বসুদেবের বুকে যেন সমুদ্রের ঢেউএর মত একটা ধাক্কা দিয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে নিজের ঘরের আলোটা নিয়ে যখন ফিরছে, তখন তার পায়ের তলায় যেন সমস্ত পৃথিবীটা টলছে!

তার মনের ভিতর দিয়ে হু হু ক'রে ঝড়ের মত দুশ্চিন্তার স্রোত ব'য়ে চলেছে; যদি লচ্ছি না বাঁচে! কি অসুখ হ'লো? কলেরা? তার পর কোলাপ্স্?

লচ্ছির ঘরের মধ্যে বসুদেব যখন গিয়ে দেখ্লে লচ্ছি তার বিছানায় নেই, তখন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে শূন্য মনে হ'লো!

ঘর থেকে বা'র হ'য়ে এসে চড়া-বিকৃত গলায় বসুদেব ডাকলে, লচ্ছি, লচ্ছি—লচ্ছি! উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কাছে একটা কাঁসার বড় খালি বাটি প'ড়ে ছিল—তা তা থেকে শব্দ উঠ্লো;

নেই—ই—ই—ই—ই!

বসুদেব এক লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিলে!

১২

সী-ঈ-তা!

ছি, বসুদেব, অমন করতে নেই।

কেন লচ্ছি চ'লে গেল?

সীতা কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে বসুদেবের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্লো।

সী-ঈ-তা!

কি, বসুদেব?

আমি কি ক'রে লচ্ছিকে ছেড়ে থাক্বো?

সীতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, লচ্ছি আবার আস্বে!

লচ্ছির তো যাবার আর কোন জায়গা নেই?

তাই তো আশ্চর্য্য মনে হয়!

সীতা! তুমি আজ আমাকে ছেড়ে চ'লে যেও না।

তাই ভাব্চি, কি করি।

ভাব্চো? তবে বুঝি চ'লে যাবে?

বসুদেব, তুমি আমাদের বাড়ী চল।

না, সীতা! লচ্ছি যদি এসে আমাকে না দেখে ফিরে যায়! এ বাড়ী ছেড়ে আজ আমি স্বর্গেও যাব না!

দুজনে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

ঐ! ঐ না? নীচে কার পায়ের শব্দ হচ্চে।

নীচের দোর যে বন্ধ বসুদেব!

না, না, সীতা, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি ঐ কড়ায় কে এসে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে; শুধু বাড়ীতে কেউ নেই মনে ক'রে কড়াটা নাড়চে না। সীতা, তবে কি আমার লচ্ছি ফিরে এসেছে?

নীচের দোরের কড়া জোরে নড়ে উঠলো।

বা-বু জী, তার হ্যায়!

খাটের উপর ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বসুদেব বল্লে, যাও সীতা যাও, ঐ লচ্ছি তার ক'রেছে! আ! বাঁচলুম, তবে লচ্ছি কাল আস্বে।

আলোর কাছে তার নিয়ে গিয়ে সীতা পড়লে, একবার দুবার, তিনবার।

কি বল্ছে লচ্ছি?

এ লচ্ছির তার নয়, বসুদেব।

তবে? তবে লচ্ছি আস্বে না?

তারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সীতা এসে বসুদেবের কাছে ব'সলো।

কার তার সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে বসুদেবের মনে প'ড়লো না।

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে কাট্‌ল।

সীতা ধীরে ধীরে বল্লে, বসুদেব তোমাকে আমি চেঞ্জে নিয়ে যাব।

কোথায় সীতা?

মাইশোর।

কেন?

তোমার চেঞ্জ একান্ত দরকার ব'লে।

টাকা?

মাইশোরের রাজা দিতে রাজি হ'য়েছেন।

কত টাকা তিনি দেবেন?

মাসে পাঁচ-শো!

অসম্ভব সীতা, এ হ'তে পারে না।

ঐ তারে ঐ কথাই তিনি জানিয়েছেন। তোমায় প্রোফেসার বাহাল ক'রেছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের।

আমার সঙ্গে কে যাবে ?

আমি।

তুমি ? তোমার পিসী যেতে দেবেন ?

স্বামীর সঙ্গে যেতে দিতে তাঁর আপত্তি হওয়া তো উচিত নয়।

স্বামী ? আমাদের তো বিয়ে এখনো হয়নি, সীতা।

ক্ষতি কি তাতে ? সে তো কালই হ'তে পারে।

সে কি ক'রে হয় ? লচ্ছি নেই, বিয়ে দেবে কে ?—

সীতা ! আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি ; তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে নিজের জীবনটাকে মাটি ক'রে দিও না !

বেশ, তবে আমি উঠি !

সীতা, তুমি আমায় একলা ফেলে চ'লে যাচ্চ ?

উপায় কি ?

সীতা, তুমি যেওনা…তুমি যা' ব'লবে শুন্‌বো।

আচ্ছা, তবে তুমি ঘুমোও।

বসুদেব শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়লো।

সীতা তার শিয়রে ব'সে আধার-ভাব্‌না ভাব্‌তে লাগ্‌লো : শিশুকাল থেকে বসুদেব লচ্ছির উপর নির্ভর ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে। মা-বাপ্‌ সামান্য কিছু রেখে গিয়েছিলেন। তারপর, বসুদেবের স্কলার্সিপে চ'লেছে। তাই আজ লচ্ছির বিরহ তার পক্ষে অসহ। কিন্তু হঠাৎ অকারণে লচ্ছি যে কেন চ'লে গেল, তা' ঠিক করা যায় না।

বসুদেব বিছানায় প'ড়ে শিশুটির মতই ঘুমুচ্ছে। সীতা পা টিপে-টিপে বাইরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। শুব্ধ রাত ; মাথার উপর অগণিত নক্ষত্র ঝল্‌মল্‌ ক'রছে। পথে লোকজন নেই। পথের আলো এক-এক ক'রে নিভতে সুরু ক'রে দিয়েছে।

সীতার মনে কিন্তু একটুও শান্তি ছিল না। কাল পিসী যে কি কাণ্ড ক'রবে, তা' কেউ জানে না। একটা গণ্ডগোল ক'রে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে আন্‌তে পারে ! সবাই জানে যে, বসুদেব তাকে বিয়ে করবে ; কিন্তু তবুও ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা' কেউ ব'লতে পারে না। একজন কুমারীর পক্ষে পরের বাড়ীতে রাত্রিবাস, এই অন্যায়ের সমর্থন কেউ ক'রবে না—সে কথা সীতা ভাল ক'রেই জানতো। রাত এখনো আছে, এখন ফিরে গেলে হয় না ?

সীতা ফিরে এসে বসুদেবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো ; কি করি ? বসুদেবকে কি ডাক্‌বো ?

নিষ্ঠুর গর্জ্জনে কড়া আবার বেজে উঠ্‌লো ; দোরে কার ঘন-ঘন করাঘাত !

বিছানার উপর বসুদেব চম্‌কে জেগে উঠে বল্লে, সীতা, ঐ বুঝি লচ্ছি ফিরে এসেছে—

না বসুদেব, ও বোধ হয় পিসী এসেছেন—এইবার তাঁকে ঠেকান—

দোর খুল্‌তেই পিসী বাঘিনীর মত হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন।

সীতা কোন কথার উত্তর না দিয়ে, ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে পথে বা'র হয়ে গেল।

বসুদেব পাথরের মূর্ত্তির মত সেই দোরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাত্রির বাকিটুকু শেষ কর্‌লে !

* * * *

সেই রাতেই বসুদেবকে সঙ্গে ক'রে সীতা মহীশূর যাত্রা করলে। পিসী কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজি হ'লেন না।

আমরা শুনেছি, লচ্ছির ফেরার অপেক্ষায় সীতা-বসুদেব দীর্ঘ এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে অবশেষে তারা একদিন জাহাজে চ'ড়ে বিদেশ-যাত্রা ক'রেছিল।

রাজা নিজে উদ্যোগী হ'য়ে সীতাকে বসুদেবের হাতে অর্পণ ক'রে ব'লেছিলেন—রামায়ণের কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সীতা কোনদিন অপবিত্র হ'তে পারে না ; দীর্ঘ এক-বৎসর সে যে-পরীক্ষা দিয়েছে তা' অগ্নি-পরীক্ষার চেয়ে একটুও কম নয় !

তিনি সীতার হাতে রাজ-সরকারের স্ত্রী-শিক্ষার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ব'লেছিলেন, তোমার মত উপযুক্ত কন্যা আমি আর একটা পাব কিনা সন্দেহ !

* * * *

আর লচ্ছি ?

সে আজো পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে দেশে দেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! গভীর রাত্রে তার কথা মনে ক'রে একবার কাণ দিয়ে শুন্‌লে শুন্‌তে পাওয়া যায়—দিকচক্রের এক দিক থেকে অন্য দিক পর্য্যন্ত ধ্বনিত হচ্চে—তারি কণ্ঠস্বরে আকাশ বাতাস !

সঙ্কলন

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Man approaches nearer his perfection when he combines in himself the idealist and the pragmatist, the originative soul and the executive power... But the greatest men of action who were endowed by nature with the most extraordinary force of accomplishment, have owed it to the combination in them of active power with an immense drift of originative thought devoted to practical realisation. They have been great executive thinkers, great practical dreamers.

Progress and Ideal......Aurobindo.

এবার কদর পিয়ার ঠুংরি ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের খেয়াল শিখতে গিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে কিছুদিন থাকতে হ'য়েছিল। সে সময়ে প্রায়ই লক্ষ্ণৌয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে মহাপ্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে দেখা হ'ত। তাঁর নানান্ উজ্জ্বল মধুর কথাবার্ত্তা পান করতে করতে উপরিউক্ত কথাগুলি মাঝে মাঝেই মনে হ'ত। আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের একটা রেশ মনের মধ্যে রণিয়ে রণিয়ে উঠ্‌ত যে এতবড় একটা মানুষের মতন মানুষ—এ স্বল্পোৎসাহপ্রাণ, মন্থরগতি সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, হৃতগৌরব ভারতে আজ আমাদেরই মধ্যে র'য়েছেন !...

রবীন্দ্রনাথ সেদিন এঁর সম্বন্ধে একটি কথা ব্যবহার করেছিলেন—"তপস্যা" !...

বাস্তবিকই তপস্বী ! একটি মাত্র ছোট্ট কথায় বোধ হয় এই অদ্ভুতকর্ম্মা মারাঠীর এর চেয়ে ভাল বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের আর একটা কথা, বাঙ্গালীর মধ্যে নিষ্ঠা ব'লে কোনও জাতীয় গুণ নেই যেমন আছে কল্পনা বা ভাবালুতা। আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম যে, নিষ্ঠা তাহ'লে কার আছে? তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ; "কেন, মারাঠীর ?" সেদিন এ সঙ্গীত-তপস্বীকে লক্ষ্ণৌয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের একটি শূন্যপ্রায় ঘরে দেখে মনে হ'ল, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি।..... রাণাডে, তিলক, গোখলে, পরাঞ্জপয়ের সমধর্ম্মাবলম্বী বটে—নিষ্ঠায়, তপস্যায়, ত্যাগে।

মনে হচ্ছিল কোথায় এ ব্রাহ্মণের গৃহ...সুদূর বম্বেতে ; আর কোথায় তিনি তাঁর বাড়ী-ঘর ছেড়ে খর-শীত লক্ষ্ণৌয়ের একটি মাত্র ঘরে সামান্য একটি সতরঞ্চির উপর ব'সে ও নিতান্ত সাধারণ শ্রমজীবীর একটি খাটিয়ায় শুয়ে জীবনযাপন করছেন ! উদ্দেশ্য—বেতন নয়, স্বাচ্ছন্দ্য নয়, বিলাস নয় ; উদ্দেশ্য—শুধু লক্ষ্ণৌ কলেজের গোড়াপত্তনটি সুদৃঢ়রূপে বেঁধে দিয়ে যাওয়া। ঘরে সোফা, কৌচ, আরাম-কেদারা ত' দূরের কথা—টেবিলের মতন একখানি টেবিলও নেই। থাক্‌বার মধ্যে দু তিনটি নিতান্ত সাধারণ চেয়ার, দুটি দড়ির খাটিয়া, একটি তাম্বুরা, একটি সেতার ও দু-একটি সামান্য তোরঙ্গ। একটা ঘর—তাতেও আবার পণ্ডিতজী একা থাকেন না, তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরকেও থাকতে হয়। কারণ, অন্য সব ঘরগুলি শিক্ষার্থীদের গান-শেখা প্রভৃতি নানা কাজের জন্যে দরকার হয়। ..

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গোয়ালিয়র স্কুল অবশ্য এখন পূর্ণ সাবালক অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু যখন দশ বৎসর আগে তিনি সেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে অক্লান্ত কর্ম্মে ব্রতী হ'ন, তখন এক দিকে যেমন ওস্তাদ-সম্প্রদায় হেসেছিলেন, অপর দিকে তেম্‌নি ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে একটা 'হুজুগে' বা 'পাগল' ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন। সে সময়ে পণ্ডিতজী তাঁদের কাউকেই নিজের

* পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনীর সঙ্গে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিচিত নন—তাঁরা এ প্রবন্ধটি হয়ত সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না। "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা"য় আমি তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছি সেটি পড়া থাক্‌লে এ অনুবৃত্তি বোঝা সহজ হবে। এ প্রবন্ধটি চার বৎসর আগে 'উত্তরা'য় যেমন বাহির হ'য়েছিল ঠিক্ তেম্‌নিই মুদ্রিত করলাম—কোথাও একটুও বদ্‌লাম না।

এ বৎসর যেদিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে এই ঘরটিতে আমার প্রথম দেখা হ'ল, সেদিন তিনি গোয়ালিয়র থেকে আস্‌চেন। বৎসরে দুবার ক'রে এ তরুণ অক্লান্তকর্ম্মী বৃদ্ধকে গোয়ালিয়রে ছুটতে হয়—তাঁর নিজের- হাতে-গড়া সাধের সঙ্গীত-বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে।—অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ কাজ তিনি বরাবর ক'রে এসেছেন—এক কপর্দ্দকও পারিশ্রমিকের অপেক্ষা না রেখে, এবং তাঁর অবস্থা খুব সচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও। এখন তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ঠিক একটি অনুরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল্‌বার চেষ্টায় এসেছেন—কত দিন কত বৎসর এখানে থাকতে হ'তে পারে সে কথা একবারও না ভেবে। নতুন লক্ষ্ণৌ-বিদ্যালয়ে সকলেই পারিশ্রমিক নেন—কেবল পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ছাড়া। এঁর কাজ শুধু কলেজটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়া। সে জন্য এ ক্লান্তিহীন বৃদ্ধ শেষ জীবনে গৃহের অভ্যস্ত আলস্য-অবসরের লোভনীয় আরাম ত্যাগ ক'রে বন্ধুবান্ধববর্জ্জিত এ সুদূর দুঃসহ-শীত লক্ষ্ণৌয়ে এসে অম্লানবদনে শ্রম স্বীকার ক'রে যাচ্ছেন শুধু এই ভরসায়—কবে কোন্ দূর অতীতের ক্রোড়ে তাঁর সদ্যোজাত সঙ্গীত-শিশুটি নবযুগের প্রেরণা ও জীবনীশক্তির রসে মানুষ হয়ে উঠবে। ..

মহৎ উদ্দেশ্যটির সদর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্তে তার-স্বরে বক্তৃতা দিতে বদ্ধপরিকর হ'ন নি, অথবা কোনও আশু ফসল ফলিয়ে দেশবাসীর চমক লাগিয়ে দেবার প্রয়াস পান নি:—তিনি তখন শুধু বিনা-পণে, ফলের অপেক্ষা না রেখে, তাঁর উজ্জল আদর্শবাদের অচঞ্চল শিখাটুকুকেই সম্বল ক'রে তাকে নিজের নিহিত বিশ্বাসের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে চ'লেছিলেন। তিনি একলাই চ'লেছিলেন—তাঁর ডাক শুনে কেউ আসে কি না দেখবার না ছিল তাঁর রুচি, না ছিল তাঁর অবসর। পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি, অদ্ভুত সংগ্রহ, অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-শক্তি ও অসামান্য অধ্যাপকতার গৌরব সঙ্গীত-রসিকদের মধ্যে আজ অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু দশ বৎসর আগে তাঁর পানে কে চেয়েছিল—কয়জনার কাণে তাঁর স্বর পৌঁছেছিল? বাইরে থেকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে বটে যে লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, বম্বে প্রমুখ সহরে পণ্ডিতজীর স্বহস্ত-উপ্ত সঙ্গীত বীজ যেন অনেকটা মায়াবলেই দুদিনে বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কয়জন এ খবর রাখেন, কি উদ্যম ও জীবনব্যাপী সাধনার কর্ষণে এ উর্ব্বরাশক্তি সংহত হ'তে পেরেছে? বস্তুতঃ যাঁরা একটু খবর রাখেন একজনও সুগায়ক তৈরি করা কত সুকঠিন, কতখানি সাধনা-সাপেক্ষ—তাঁরা পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গোয়ালিয়র স্কুলের তরুণ ছাত্রদের অসামান্য সঙ্গীত-পারদর্শিতা দেখে প্রথমে বিস্মিত না হ'য়েই পারবেন না। কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডের অনুপম সংস্পর্শে এলে এক মুহূর্ত্তেই বোঝা যায় কেমন ক'রে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।...

সেদিন লক্ষ্ণৌয়ে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর বাড়ীতে ভাতখণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিষ্য যুবক শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের অনুপম খেয়াল ও ঠুংরি শুনতে শুনতে ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে, কতখানি অধ্যবসায়ের ফলে না জানি এমন একটি শিষ্য গ'ড়ে তোলা যায়! মনে হচ্ছিল—তরুণ যুবকের মধ্যে এতখানি জ্ঞান ও শিল্পের প্রেরণা যে দিতে পারে সে মানুষটির মহত্ত্বের পরিমাপ করতে যাওয়াও বোধ হয় বিড়ম্বনা! মনে হচ্ছিল—এ একটা সৃষ্টি! ও যেটা সবচেয়ে বেশী মনে হচ্ছিল সেটি এই যে, যদি বিশ্বাস অটুট রাখা যায় ও সে বিশ্বাসকে মূর্ত্তি দেবার যথোচিত সাধনা থাকে তা হ'লে সংসারে বোধ হয় সব বাধা-অন্তরায়ই জীবন-বিধাতার যাদু-দণ্ডের স্পর্শে অপহৃত হ'য়ে যেতে বাধ্য। কারণ পণ্ডিতজী নিজে ভাল গাইতে না পারা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ আজ কেমন ক'রে এই বয়সেই ভারতের শ্রেষ্ঠতম 'খেয়ালী'দের সমাসন অধিকার ক'রে ব'স্‌ল এ প্রশ্ন প্রথমটায় মনে স্বতঃই উদয় হয়। যুবক রতনজনকর শুধু যে একজন খুব উচ্চশ্রেণীর গায়ক তাই নয়—রাগরাগিণী সম্বন্ধে তাঁর পুঁজিও যেমন বিস্ময়কর, রাগাদির বিশ্লেষণ-ক্ষমতাও তাঁর তেমনি মুগ্ধকরী। আর তাঁর গানের যেটা সবচেয়ে বড় সম্পদ, সেটা হচ্ছে তাঁর সহজ সৌকুমার্য্যের সৌরভ ও নিরভিমান ফুটে-ওঠার গৌরব; এক কথায় তাঁর গানের জন্ম হাঁক-ডাকের তাগিদে নয়—তাঁর গানের ধারার উদ্ভব—তাঁর আত্মবিকাশের স্বতঃ-উৎসারিত গঙ্গোত্রী হ'তে। অথচ এত বড় একজন গায়ক গ'ড়ে উঠ্‌ল জাকরুদ্দীন, অল্লাবন্দে, আবদুল করিম, উজীর খাঁ প্রভৃতি বড় বড় ওস্তাদের শিক্ষা-প্রেরণায় নয়, এ অসাধ্য সাধন হ'ল কি না পণ্ডিত ভাতখণ্ডের হাতে—যাঁকে ঠিক্ ওস্তাদ গায়ক বলা চলে না! এ অবোধ্য প্রহেলিকার সমাধান কে করবে?

বস্তুতঃ এটা প্রহেলিকা নয়। আমাদের সঙ্গীত বর্ত্তমান সময়ে অশিক্ষিত ওস্তাদের হাতে প'ড়ে যে কি সঙ্কীর্ণ স্রোতোহীন অবস্থায় পৌঁছেছে, তার শোচনীয়তা নিয়ে যিনিই একটু মাথা ঘামিয়েছেন তাঁরই মনে হ'তে বাধ্য যে, আমাদের সঙ্গীতের এ দুর্দশার জন্তে ওস্তাদদের সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞতা বড় কম দায়ী নয়।

ভারতের মহামহোপাধ্যায় ওস্তাদগণ—যাঁরা আজীবন নাদব্রহ্মের চর্চ্চায় তুম্বুরু, হাহা হুহু, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরকেও হারিয়েছেন, তাঁরা—সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞ এ কথা বলার দরুণ যে আমি আবার ওস্তাদদেবিগ.ণর অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম প্রায় হ'ব এ কথা আর যারই অগোচর থাকুক না কেন আমার অগোচর নেই (কারণ আমি ভুক্তভোগী)। তবে গরজ বড় বালাই—উপায় কি! তবে এত বড় একটা অভিযোগ ওস্তাদ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আনার দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আমি পূর্ণভাবে সচেতন সেটা প্রমাণ করবার সাধু উদ্দেশ্যে আজ মহাপ্রাণ সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতামতও উদ্ধৃত ক'রব। আর প্রসঙ্গতঃ তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা উপলক্ষ্যে আমাদের ওস্তাদগণের সঙ্গীত-সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে আমার অনেকদিন-ধ'রে গ'ড়ে-ওঠা ধারণাটিও খুলে লিখ্‌বার প্রয়াস পাব।

পণ্ডিতজীর কাছে একাধিকবার শুনেছি—"রায় মহাশয়, যদি আপনি কোন ওস্তাদপুঙ্গবকে সুরট গাইতে বলেন ত হয় ত তিনি ভুল করে দেশ গাইবেন ও যদি দেশ গাইতে বলেন তবে সুরট গাইবেন। কিন্তু যদি তাকে দেশ সুরটের যে কোনও একটি গাওয়ার পর অপর সুরটি গাইতে বলেন তবে শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদ আপনাকে বল্‌বেন যে সেটা তিনি আর একদিন গাইবেন"—ব'লে তিনি হেসে উঠ্‌তেন।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করতাম—"বলেন কি পণ্ডিতজী? বড় বড় ওস্তাদেরা যদি দেশ সুরটের সূক্ষ্ম প্রভেদ না জানেন, তবে কে জান্‌বে? Who shall decide when doctors disagree?"

পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-হাসি হেসে বল্‌তেন—"আমি সমস্ত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেই এ কথা বল্‌ছি, রায় মহাশয়। এবং মনে রাখ্‌বেন যে আমি আমাদের সঙ্গীতের রূপভেদ সম্বন্ধে ওস্তাদদের কাছে সমাধান না পেয়ে তবেই শেষটায় নিজে ভাব্‌তে বাধ্য হয়েছি। কম দুঃখে প'ড়ে আমি আমাদের সঙ্গীতের ব্যাকরণ লেখারূপ thankless কাজে হাত দেই নি। তাই আমার এ সাক্ষ্য আপনি অবিশ্বাস করবেন না যে খুব কম ওস্তাদেই রাগ-রাগিণীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে চোখ চেয়ে তাদের বিস্তার ক'রে থাকেন।"

—"তার মানে?"

—"আমি অনেকবার কন্‌ফারেন্স প্রভৃতিতে ওস্তাদদের ডেকে তাদের সাক্ষ্য নেবার জন্তে এ রকম সদৃশ রাগ গেয়ে শুনিয়েছি—কিন্তু তারা বল্‌তে পারে না কেমন ক'রে ও কেন সে রাগগুলির রূপভেদ হয়।"

—"সে কি বলুন!"

—"তা হ'লে আপনাকে আরও একটু shock ক'রে দিই শুনুন। খুব কম ওস্তাদই আছে যারা জানে তারা যে-সব রাগ গায় তাতে কি কি পর্দা লাগে। ধরুন, একজন অল্‌হৈয়াবিলাবল্‌ গাইছে (বাংলাদেশে আমরা যাকে বলি আলেয়া)—তাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন সে কোমল নি ব্যবহার করছে কি না তা হ'লে সে হয় ত বলবে হাঁ কিম্বা না। যদি আপনি তাতে প্রতিবাদ করেন তা হ'লে সে বলবে 'হো সক্‌তা সাব্‌। ময় ফির গাতা হুঁ দেখ্‌ লিজিয়ে কোমল নিখাত লগ্‌তা কি নহি।' (আমি আবার গাচ্ছি দেখে নিন্‌ কোমল নিখাদ লাগ্‌ছে কি না।)

—"তা হ'লে তারা বড় গায়ক হ'ল কেমন ক'রে?"

—"খুব সহজে। গান তারা গায়—তাদের অসাধারণ অভ্যাস-বশে অর্থাৎ তাদের গলা সুরের দৌড়-ঝাঁপে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে ব'লে, আর কিছুই নয়। বিশ্লেষণ তারা জানে না একদম। অবশ্য, দু-একজন ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিতে হবে—যেমন উদয়পুরের ওস্তাদ জাকরুদ্দীন খাঁ।"

"যদি তাতে ভাল গাওয়া যায় তবে বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা ঘামাবই বা কেন, পণ্ডিতজী?"

—"রায় মহাশয়, নিজে ভাল গাওয়া যার আদর্শ তার পক্ষে বিশ্লেষণ নিয়ে খুব মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু যদি অপরকে নিজের আয়ত্ত শিক্ষার কিছু ফল দিতে হয় তা হ'লে স্বরজ্ঞানের দাম অমূল্য। এতে যে কত শ্রমের লাঘব হয় তা আমি স্কুল করতে গিয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছি। আমার গোয়ালিয়র স্কুলের দশ বার বছরের এমন কয়েকটি ছেলে দেখেন নি কি, যারা দু'শ তিনশ ধ্রুপদ ও একশ দেড়শ খেয়াল নির্ভুল গাইতে পারে? তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি যা গাইবেন খুব কঠিন স্বরবিন্যাস হ'লেও গাইবা মাত্র স্বরলিপি ক'রে নিতে পারে। ওস্তাদেরা শুধু হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে শেখে ও শেখায় তাতে ক'রে অল্প দিনে এত সন্তোষজনকভাবে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।"

এ কথা আমারও অনেকবার মনে হ'য়েছিল যে ওস্তাদরা শুধু যে শেখাতে চায় না তাই নয়, তারা শেখাতে জানেও না। তা ছাড়া সময়ের তাদের কাছে কোনও মূল্যই নেই—কারণ বর্ত্তমান যুগে তারা সত্যিই একটা anachronism—তাই তারা কখনও বোঝে না যে শিক্ষিত ভদ্রলোকে তাদের দীর্ঘসূত্রিতায় কতটা নিরাশ হ'ন ও কতখানি অসুবিধায় প'ড়ে শেষটায় সঙ্গীত ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ন। বর্ত্তমান যুগে মানুষের উপর নানান্‌ বিচিত্র কাজের ও কর্ত্তব্যের দাবী-দাওয়া ধীরে ধীরে তাদের অধিকার বিস্তার করার দরুণ শিক্ষণীয় বস্তুকে শীঘ্র শেখার প্রয়োজনও বেড়েই চলেছে ও চল্‌তে বাধ্য। ওস্তাদদের একটি রাগ ছ'মাসে আয়ত্ত করলে চল্‌তে পারে; কারণ তাঁদের অন্য কোনও কাজ নেই—কিন্তু সভ্য মানুষকে সভ্যতার দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে রাগিণীর সার্গম ছাড়াও অন্য অনেক জিনিষ শিখ্‌তে হয়। পণ্ডিতজীর পদ্ধতিতে বালকেরা যে কি আশ্চর্য্য রকম সহজ উপায়ে অনেক কিছুই শিখতে পারছে সেই দৃশ্যই তাঁর পদ্ধতির সারবত্তার সবচেয়ে ভাস্বর সাক্ষ্য। তাই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের অগাধ জ্ঞান ও অনুপম শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে একটু পরিচিত হ'লে আরও বেশি ক'রে মনে হয় যে, মামুলি ওস্তাদির শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন না ক'রলে আমাদের দেশে সঙ্গীতের বহুল প্রচার 'নৈব নৈব চ।' এক কথায়, আমাদের উচ্চসঙ্গীত শেখাবার সবচেয়ে যোগ্য লোক হবেন আজ তাঁরা, যাঁরা আমাদের সঙ্গীতের techniqueটি সম্বন্ধে একটু স্বাধীনভাবে ভাব্‌তে শিখেছেন;—অর্থাৎ যাঁরা ওস্তাদদের কাছ থেকে রাগগুলি শিখে নেবেন মাত্র, কিন্তু তাদের classify করবেন—নিজেরা প্রবুদ্ধভাবে। এই প্রবুদ্ধ classification-এর কাজে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গবেষণা ও অক্লান্ত শ্রমের দৃষ্টান্ত প্রশংসার অতীত। তিনি বাণীর মুমূর্ষু সন্তানগুলিকে অজ্ঞ ওস্তাদ সম্প্রদায়ের বিভীষিকাময় গোলকধাঁধার অন্ধকূপ থেকে যে প্রাণপাত পরিশ্রমে বাহিরে টেনে এনেছেন ও দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধ'রে তাদের যেভাবে মুক্ত আলো-হাওয়ার আব্‌হাওয়ায় এনে মানুষ ক'রে এসেছেন, তার জন্যে ওস্তাদ-প্রপীড়িতা, শঙ্কাতুরা বীণাপাণি আশ্বস্ত মাতৃহৃদয় নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তাই বার মনে হয় অরবিন্দের অনুপম কথাটি যে মানুষের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয় তখনই, যখন তার মধ্যে সৃষ্টিপ্রতিভা ও আদর্শবাদের সঙ্গে কর্ম্মিষ্ঠতা ও সাধনপটুতার মণিকাঞ্চন-সংযোগ হয়। তিনি আরও বড় সত্য কথা ব'লেছেন যে—when the idealist is liberated, when the visionary abounds, the executive worker is uplifted, finds at once an orientation and tenfold energy and accomplishes things which he would otherwise have rejected as a dream and chimera, which to his ordinary capacity would be impossible and which often leave the world wondering how work so great could have been done by men who were in themselves so little.

পণ্ডিতজীর সাধন-ক্ষমতার (practical ability) কিছু পরিচয় দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—পাঠকপাঠিকাবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় সত্ত্বেও। তবে এ বিষয়ে আমার justification এইটুকু মাত্র যে, এতবড় একটা মানুষের সম্বন্ধে অনেক সামান্য কথাও অনেক সময়ে নীরস বোধ হয় না। তাই এবার লক্ষ্ণৌ কলেজে পণ্ডিতজীর সঙ্গে যে সব কথা হ'য়েছিল একটু বিস্তারিত ভাবেই সে সব কথা উদ্ধৃত করতে চাই।

লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত বিদ্যালয় কেমন চল্‌ছে জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ছাত্র অনেক পেয়েছি রায় মহাশয়, তারা খাটছেও বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন?—তারা প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্র, তাই কেউ এক বছর, কেউ দু বছর, কেউ বড় জোর তিন বছর থাক্‌বে। তার উপর তারা কলেজের পড়ার বেশি ক্ষতি করতেও পারে না। কাজেই, তাদের দিয়ে বেশি ফল পাওয়া যাবে ব'লে ভরসা হয় না। গোয়ালিয়রে আমার স্কুলে আজ দু'শ ছেলে গান-বাজনা শেখে—তারা প্রায় সকলেই স্কুলের ছাত্র, কাজেই, তাদের আমি একাদিক্রমে পাঁচ বছর ক'রে পাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"তাহ'লে উপায় কি?"

—"উপায়?" ব'লে পণ্ডিতজী একটু থেমে চিন্তিত সুরে বল্‌লেন—"আমি এখানকার সব স্কুলের হেডমাষ্টারদের অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছি

প্রতি ক্লাসের কয়েকজন ক'রে ছেলে আমাদের কলেজে পাঠাতে—যাতে আমরা তার মধ্যে থেকে পরীক্ষা ক'রে বেছে নিতে পারি। আর এখানকার অনেকগুলি তালুকদার নবাব প্রভৃতিকে ধরেছি এই ব'লে যে, তাঁরা মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে চাঁদা না দিয়ে—প্রতি তালুক থেকে দু' একজন ক'রে একটু-আধটু সঙ্গীতপটু বালককে পনর কুড়ি টাকা ক'রে স্কলার্শিপ দিয়ে এখানে পাঠালে কলেজের বেশি উপকার হয়।"

—"থাকবে কোথায় ?"

—"কাছে একটা বোর্ডিং করব ঠিক্ ক'রেছি। সেখানে আমাদের এই কলেজের একজন অধ্যাপককে পরিদর্শক ক'রে দেব। দেখি এ প্রস্তাবে তালুকদারেরা রাজি হ'ন কি না।"

—"রাজি হবেন কি ?"

—"বলতে পারি না। অনেকটা নির্ভর করচে আমাদের এডুকেশন মিনিষ্টার রায় রাজেশ্বর বালি বাহাদুরের এবারকার ইলেক্‌শনে সাফল্যলাভ করার উপর। তিনি যদি এবারও ইলেক্‌টেড হ'ন তাহ'লে তিনি আমাদের এ কলেজের জন্যে আরও চেষ্টা করবেন। তাই আমরা নিশিদিন প্রার্থনা করছি—যাতে বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

আমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরও হেসে উঠ্‌লেন। আমি বললাম —"বালি সাহেব আপনাদের অধ্যাপক যোগানর বন্দোবস্ত কেমন করেছেন ?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"এখানে আপাততঃ দু'জন মুসলমান ওস্তাদ নিযুক্ত করা গেছে ও আমার দুটি ছাত্রকে কাজে লাগিয়েছি—রতনজনকর ও নাথ্‌।"

(নাথ্‌ পণ্ডিতজীর গোয়ালিয়র স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র। প্রায় পাঁচ শ ধ্রুপদ খেয়াল জানেন, বলা বাহুল্য—পণ্ডিতজীর পদ্ধতিতে অতি সুচারুরকম শিক্ষিত, অতি সুগায়ক, যদিও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের সঙ্গে তুলনায় নয়—কারণ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা এক শ্রীকৃষ্ণ।)

—"এঁরা ত সব গান শেখায়। কিন্তু বাজনা শেখাবার ব্যবস্থা করবেন না বুঝি ?"

—"করব বৈ কি ! তবে আমি চাই সেতার, এস্রাজ, বীণা শেখাবার আগে বাদ্য-শিক্ষার্থীর একটু স্বরজ্ঞান হয়।"

—"কিন্তু গাইতে যদি সে না পারে ?"

—"বাদ্য শিক্ষার্থীকে ভাল গায়ক হ'তে হ'বে এ কথা কে বলছে ? ভাল গাইতে নাই বা পারল, কিন্তু কিছু ত পারবে ? এবং এই কিছু গলার আয়ত্ত করার দাম অনেক—কারণ তার পর বাজনা ঢের সহজ হ'য়ে যায়। নইলে প্রথম থেকেই সেতার, এস্রাজ শেখাতে গেলে ভাল ফল হয় না—সে প্রায়ই দীর্ঘসূত্রী ও অলস হ'য়ে পড়ে, দেখা যায়। আজ তারা সেতারের তার ছিঁড়ে ফেলে, কাল তারা একটা সুর নিয়েই প্রিং প্রিং ক'রে শেষটা হাই তুলতে থাকে, পরন্তু তারা মাথা ধরায় কাবু হ'য়ে পড়ে—এই রকম অপ্রত্যাশিত বাধা এসে সব পণ্ড ক'রে দেয় রায় মহাশয়—এ আমি দেখেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর আবার হেসে উঠ্‌লেন। আমিও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বল্‌লাম—"এ কথা খুবই ঠিক্ পণ্ডিতজী, কারণ যন্ত্রবাজি প্রথমটায় গলাবাজির চেয়ে কঠিনও বটে—অশ্রাব্যও বটে। কিন্তু সে কথা যাক্। আপনি যে চারজন শিক্ষক এনেছেন তাঁরা ত সকলেই 'খেয়ালি'। 'ধ্রুপদী'র কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

পণ্ডিতজী বিষণ্ণ সুরে বল্‌লেন—"ঐখানেই ত মুস্কিলে প'ড়েছি, রায় মহাশয়—ধ্রুপদ গান যে লোপ পেয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বাংলা দেশ থেকে একজন কাউকে আনব, কিন্তু গোঁসাইজী মরে গিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আর কোনও বড় ধ্রুপদী বাংলা দেশে আছে কি এখন ?"

—"কৈ দেখতে ত' পাই না।"

—"সেই ত গোল। কি করি বুঝতে পারছি না। লাহোরে একজন মৌলা-বক্স ছিলেন—তাঁকে আনব ভাবছিলাম—কিন্তু তিনি মাস-তিনেক হ'ল মারা গেছেন।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে

—"ইন্দোর থেকে অল্লাবন্দে খাঁর ছেলে 'সঙ্গীতরত্ন' নাসিরউদ্দিন খাঁকে আনা যায় না ?"

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"সে রত্নটিকে আনবার চেষ্টা আমি ক'রেছিলাম, রায় মহাশয়। কিন্তু তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনবেন ? তিনি ব'লে পাঠালেন—আমার নিমন্ত্রণে তিনি ত আসতে পারেনই না, আমাদের এডুকেশন মিনিষ্টারও তাঁর কাছে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি নন। তাঁদের ইন্দোরের পোলিটিকাল এজেন্টকে স্বয়ং আমাদের লাট সাহেবকে দিয়ে ব'লে পাঠাতে হ'বে যে, লাট সাহেব ইন্দোর রাজসভার নব-রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'রত্নটির' জন্য হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছেন, তবে তিনি আসতে পারেন। আমরা কে ? লাট সাহেবই জগতে একমাত্র যোগ্য নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা।"

আমরা হেসে উঠ্লাম।

পণ্ডিতজী হো-হো ক'রে বালকের মতন তাঁর শুভ্র-হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—"আরও আছে, রায় মহাশয়। আমাকে সঙ্গীত-রত্ন ব'লে পাঠিয়েছেন যে, যদি তিনি আসেনই তা'হলে এটা যেন আমি জেনে রাখি যে, তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও প্রচলিত মতামতই মান্‌বেন না, কোন বইয়েরই ধার ধারবেন না, কোন পদ্ধতিই স্বীকার করবেন না, কোনও রাগ ফরমাস মতন শেখাবেন না—যতদিন ইচ্ছে একটা রাগই শেখাবেন, তাতে শিক্ষার্থীর উদরাময়ই হোক বা অনিদ্রাই সুরু হোক।"

হেসে বল্লাম—"তাহ'লে কি রকম নিয়ম অনুসারে তিনি চল্‌বেন?"

পণ্ডিতজী হাসতে হাস্‌তে বল্লেন—"কেন?—তাঁর নিজের উদ্ভাবিত নিয়ম অনুসারে! তিনি ত সাফ ব'লেই দিয়েছেন যে, তিনি নিজে নানারকম গবেষণাপূর্ণ বই লিখ্‌বেন ও সেই সব আমাদের এখানে পাঠ্যপুস্তক কর্‌বেন। আর ভাবনা কি?"

—"আপনার পদ্ধতি তা'হলে—"

—"আমার পদ্ধতি রায় মহাশয়? আমার পদ্ধতি সম্বন্ধে কত লোক কত রকম বিজ্ঞ মতামত প্রকাশ করে শুন্‌বেন? আমার শত্রু কম নয়, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু যেটা আমার কাছে অনেক চিন্তা ও চেষ্টার ফলে আস্তে আস্তে প্রকাশ হয়েছে সেটা অনভিজ্ঞ সমালোচকের কাছে এক মুহূর্ত্তেই ডিশমিশ হ'য়ে যায় কেমন ক'রে, তাই সময় সময় ভাবি, আর মনে মনে হাসি।"

—"কি রকম?"

—"শুনুন তা হ'লে। এবার গোয়ালিয়রে এক বেগম সাহেবার সঙ্গে অনেক দিন বাদে দেখা। তিনি বল্লেন,—'পণ্ডিতজী, আপনারা ক্লাস-টলাস ক'রে সকলকেই এক ধরণের একমাটা শিক্ষা দেওয়াটা হচ্ছে আগাগোড়াই ফাঁকা।' আমি বল্লাম,—'তাহ'লে কি ধরণের শিক্ষাটা আগাগোড়া নিরেট একবার শোনান না বেগম সাহেবা!' বেগম সাহেবা হেসে বল্লেন,—'খুব সোজা। সকলেই কিছু একসঙ্গে ধ্রুপদী খেয়ালী টপ্পী হবে না। কারুর কারুর গলা বিশেষ ক'রে ধ্রুপদের উপযোগী; কারুর কারুর গলা খেয়ালের উপযোগী, কারুর কারুর গলা টপ্পা-ঠুংরির। তাই ঠিক শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা—যাতে শিক্ষক প্রতি বালকের অধিকার বুঝে নিয়ে সেই অধিকার অনুসারে তাকে ধ্রুপদে বা খেয়ালে বা ঠুংরিতে তালিম দিতে পারেন। বুঝলেন ত কেমন পরিষ্কার আইডিয়া?' আমি বল্লাম—'বেগম সাহেবা, মাফ করবেন, আইডিয়াটি ত খুব পরিষ্কার বটে—কিন্তু তাকে কাজে লাগানোটা আমার কাছে ঠিক ততটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে না। তাই যদি সে বিষয়ে আমায় কিছু সারগর্ভ লেক্‌চার দিতে পারেন তা'হলে বড় বাধিত হব।' বেগম সাহেবা অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন,—'এর আবার শক্তটা কোথায় পণ্ডিতজী, আমি দেখাতে পারি—' আমি বাধা দিয়ে বল্লাম,—'বেগম সাহেবা, আপনি চলুন এখুনি আমার ইস্কুলে ও সেখানে দশটি মাত্র ছোট ছেলে আপনার সামনে ধ'রে দেব। তারা বেশ সুন্দর গায় সকলেই। আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, শুধু তাদের প্রত্যেকের গলা শুনে ব'লে দিতে হবে তাদের মধ্যে কার কার গলা বিধাতা ধ্রুপদের ছাঁচে গড়েছেন, কার কার গলা খেয়ালের ছাঁচে ও কার কার গলা টপ্পা-ঠুংরির ছাঁচে। তা'হলেই আমি কাল থেকে তাদের তদনুসারে আলাদা আলাদা শুধু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি শেখাব। আসবেন কাল আমার ইস্কুলে?' বেগম সাহেবা এ নিমন্ত্রণে কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে বল্লেন—'তা কখনও বল্‌তে পারি আমি? ছোট ছেলেদের গলা একবার শুনেই কেমন ক'রে আগে থাকতে বলা যাবে কার গলা ধ্রুপদের জন্য তৈরী, আর কার গলা খেয়াল, টপ্পার জন্যে উপযোগী?' আমি বল্লাম—'একবার শুনে আপনাকে রায় দিতে কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে বেগম সাহেবা? আপনি তিনশ' তিয়াত্তর বার শুনুন না।'

ব'লে পণ্ডিতজী হাস্‌তে বল্লেন—"বেগম সাহেবা তখন বোধ হয় একটু বুঝতে পারলেন যে, বাইরে থেকে সমালোচনা করা যত সহজ, কার্য্য-ক্ষেত্রে নেমে কাজ করাটা ঠিক্ ততটা সহজ নয়। এই কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, রায় মহাশয়। তাই আমার গান শেখানোর পদ্ধতির ওস্তাদমহলে এত নিন্দা ও আমার রাগের শ্রেণীবিভাগের রীতির এত ভুল বোঝা।"

ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন—"কিন্তু রায় মহাশয়, বেগম সাহেবার যুক্তিটি সম্পূর্ণ বাজে নয়, সত্যের খাতিরে এ কথা আমি মান্‌তে বাধ্য। তাঁর কথার মধ্যে এইটুকু সত্য আছে যে, কারুর কারুর গলা বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেবল আমার বল্‌বার কথা হচ্ছে শুধু এইটুকু মাত্র যে, সেটা ধরা যায় পরে,—যখন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের একটু বিকাশ হয়। কিন্তু তা যতদিন না হয় ততদিন একটা সায়েণ্টিফিক্ পদ্ধতি অনুসারে তাদের গোড়ার গাঁথুনিটা পাকা ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া মরজগতের মানুষী-শক্তি সম্বল শিক্ষকে আর কি করতে পারে বলুন? তারা ত আর প্রতিভার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই আমি চাই যে, ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই আমি প্রতি বালককে পাঁচ বৎসরে শিখিয়ে দেব—(১) স্বরজ্ঞান, যাতে ক'রে তারা যা যা গাইবে সে সবের রূপভেদ ও পর্দ্দা-ব্যবহার সম্বন্ধে বেশ সচেতন হ'তে পারে; (২) ধ্রুপদ ও খেয়ালের সব চেয়ে ভাল ঢঙের তিন চারশ' গান; যাতে ক'রে তারা বুঝতে পারে কি রকম ঢঙের গানকে সত্যিকার উচ্চ-সঙ্গীত বলা যায়। এর ফলে পরে তারা ভাল ভাল ঢঙের গানের আরও রচনা বা বিকাশ করতে পারবে ও ভাল গায়কের পৃষ্ঠপোষকও হ'তে পারবে। আর (৩) গানে লয়ের অর্থ ও তার স্থান; কেন না আলাপে লয় দরকার হয় না বটে, কিন্তু অনেককে একটা পদ্ধতি অনুসারে শেখাতে হ'লে গান লয়ে না বাঁধলে চলে না।"

—"কিন্তু আলাপ—"

—"আমি আলাপের বিরোধী নই। জানেন ত আমি উদয়পুরের বিখ্যাত 'আলাপী' ৺জাকরুদ্দীন খাঁর কি রকম ভক্ত ছিলাম? কেবল, প্রথম থেকেই আলাপ দিয়ে শিক্ষার্থীকে সুরের মহিমা শেখানো যায় না। ধরুন, ধ্রুপদ গানের দুরকম ঢঙ্ আছে, এক তন্ত্রকারদের ঢঙ্ ও আর এক গায়কদের ঢঙ্।"

—"তন্ত্রকারদের ঢঙ্ আপনি কাকে বল্‌ছেন?"

—"কেন ? আপনি কি উজীর খাঁ-প্রমুখ বড় বড় বীণাকারদের বীণায় ধ্রুপদ বাজানো শোনেন নি ?"

—"শুনেছি। উজীর খাঁর নিজেরই আলাপ শুনেছি, তাঁরা টেনে টেনে আলাপ করেন। মিড়ই তাঁদের প্রধান সম্বল।"

—"ঠিক্ ; মিড়ই তাঁদের প্রধান সম্বল। তাঁরা যদি দরবারী-কানাড়া রাগটি তন্ত্রকারদের ঢঙ্গে বাজান বা গান করেন, তাহ'লে কর্‌বেন কি জানেন ? তাঁদের পুরো রেখাবের ওপর স্থায়িত্ব যেন আর ফুরোতে চাইবে না। এতে ক'রে দরবারীর মিষ্টতা ও প্রশান্তি বাড়ে মানি, কিন্তু সেটা শেখানো যায় না। সেটা পরে আপনিই আসে—রাগের ছবি একবার চিত্তপটে আঁকা হ'য়ে গেলে।"

ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন—"আমি চাই রায় মহাশয়—যাতে ক'রে সঙ্গীত জিনিষটা অনেকের মধ্যে প্রচার হয়। আমি উচ্চ সঙ্গীতকে আগেকার মতন পর্দানসীন ক'রে রাখার বিরোধী। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হ'লে নারীর গৌরব বাড়ে কি না সেটা বলতে পারি না—কিন্তু সঙ্গীতের যে সর্ব্বনাশ হয় এটা নিশ্চিত।"

—"কিন্তু মাফ করবেন পণ্ডিতজী—উচ্চ সঙ্গীত ত সকলেই এখনি বুঝবে না—"

"তা অবশ্য মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ত সত্যি যে, অনেক সঙ্গীতপ্রিয় লোক আছেন—যাঁরা উচ্চ সঙ্গীতের সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল অথচ কোথাও সত্যকার উচ্চ সঙ্গীত শুনতে পান না—কালোয়াতির জগঝম্পে নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসেন এই বলতে বলতে যে, বীণাপাণি উচ্চ সঙ্গীত তাঁদের জন্য সৃষ্টি করেন নি। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, উচ্চ সঙ্গীতকে বিলিয়ে দাও—তার দুয়ার খুলে দাও, তার মন্দির শুধু রাজন্য-ব্রাহ্মণের একচেটে ক'রে রেখো না। পাছে সে-মন্দির ভক্তিহীন অসমজদার শূদ্রের স্পর্শে অপবিত্র হয়, এই ভয়ে মন্দিরে বিগ্রহের শ্বাসরোধ কোরো না। উচ্চ সঙ্গীতের মধ্যে যদি কোনও সত্য গরিমা থাকে তাহ'লে সে গরিমা অজ্ঞ প্রগলভের অবজ্ঞায় ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু সত্যিকার সঙ্গীতানুরাগীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখাটা কেবল সঙ্গীতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারই সহায়তা করতে পারে, নয় কি ? বাস্তবিক পক্ষে উচ্চ সঙ্গীত অনেকটা পর্দানসীন হওয়ার জন্যেই আজ এমন রক্তহীন বিবর্ণ হ'য়ে পড়েছে। শিক্ষিত-সম্প্রদায় এখন উচ্চ সঙ্গীতের চর্চ্চা না করলে তার নবজন্ম সুদূরপরাহত। আজকের দিনে উচ্চ সঙ্গীতকে আগেকার মতন মাত্র রাজসভার খেলনা হিসেবে কাচের আলমারীতে সন্তর্পণে আগলে রাখ্‌লে চলবে না। এইটেই হচ্ছে এখনকার যুগধর্ম্ম, এ কথা বুঝবার সময় এসেছে। এর একটা কারণ এই যে, ভাল ঢঙের সঙ্গীতকে বাঁচতে হ'লে ভাল গুণীকে বাঁচতে হবে ; এখন ভাল গুণীকে বাঁচতে হ'লে পাঁচজনের পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা খানিকটা রাখ্‌তেই হবে—যেহেতু রাজারাজড়ারা প্রায়ই সঙ্গীতবিরাগী হ'য়ে পড়েছেন—এবং পাঁচজনকে যদি ভাল জিনিষের পৃষ্ঠপোষক হ'তে হয় তাহ'লে ভালর ভালত্ব সম্বন্ধে তাদের আগে একটু চোখ ত ফোটা চাই ? এখন, ভালটা কী, সে সম্বন্ধে এ চোখ ফুটবে তাদের কেমন ক'রে যদি আবহমানকাল ভালর স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞই থেকে যেতে হয়—যেমন আজকের দিনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হয়েছে ? দু একটা উদাহরণ দেই শুনুন। আপনি যদি আজ গোয়ালিয়র অঞ্চলে যান ত দেখ্‌তে পাবেন সেখানে খেয়াল ছাড়া অন্য কিছু লোকে শুনতেই চাইবে না। তাই সেখানে খেয়ালীর খুব আদর। বম্বে অঞ্চলে শুদ্ধ-রাগ-গায়কের তেমনি আদর। এ-আদর অসম্ভব হ'ত যদি খেয়াল ও উচ্চ রাগরাগিণী বেকুবের না-বোঝার ভয়ে অন্তঃপুরেই অন্তঃসারশূন্য অহমিকার বিলাসে ক্রমে নিস্তেজ ও রক্তলেশশূন্য হ'য়ে পড়ত। তাই সঙ্গীতকে তেজ ও শক্তি সঞ্চয় করতে হ'লে অন্তঃপুরের বিলাস ছেড়ে বাইরের আলো-হাওয়ার মধ্যে আসন পাততে হবে—অনেক রূঢ় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ;—তাই আমি এখানকার কলেজে প্রতি শনিবারে সন্ধ্যায় demonstration class খুলেছি। সকলেই সেখানে অমনি আসতে পারে শ্রীকৃষ্ণের গান শুনতে। আপনি একদিন এসে দেখে যাবেন এর মধ্যেই এ ক্লাসে কি রকম ভিড় হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে।"

মনে পড়ল রোলাঁ একবার আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন—"তোমার যা দেবার আছে দু'হাতে বিলিয়ে যাও। দোহাই তোমার, এ কথা ভেবো না, তোমার শ্রোতা তোমার দান গ্রহণ করবার যোগ্য হ'য়েছে কি না। তোমার মধ্যে সত্য যা, বরণীয় যা, চিরন্তন উপলব্ধি যা—তা মানুষ বুঝবেই, এ বিশ্বাস হারিও না।" রবীন্দ্রনাথও আমাকে এইরকমই একটি কথা লিখেছিলেন যে, সাধারণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাল জিনিষ ক্রমাগত দিতে থাকলে তারা ক্রমে ক্রমে সে ভাল জিনিষটির মূল্য দেবার উপযোগী শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রে থাকে।

* * * * *

পরদিন সকালে আবার পণ্ডিতজীর কাছে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঘরের মধ্যে পণ্ডিতজী একটি সঙ্গীত-কল্পদ্রুম পড়ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর প্রস্তুত হচ্ছিলেন—লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ ঠুংরি রচয়িতা নবাব কদর পিয়ার পুত্রের কাছে ঠুংরি শিখ্‌তে যাবার জন্যে। আমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা ছিল—একত্রে কদর পিয়ার টুংরি শিখ্‌তে যাবার।

পণ্ডিতজী আমাদের দেখেই তাঁর উদ্ভাসিত উজ্জ্বল স্বাগতের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"আসুন আসুন রায় মহাশয়। বসুন প্রফেসর মুখার্জ্জি।"

আমরা বসতেই আমি বল্লাম,—"পণ্ডিতজী, আমি কাল আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তাগুলি বাড়ী গিয়েই লিখে ফেল্‌লাম—আমাদের একটি মাসিকীতে ছাপাবার জন্যে। আপনার কলেজের ভবিষ্যৎ প্ল্যান—কি ভাবে ছাত্র গড়তে চান—ওস্তাদেরা কেন শেখাতে পারে না—আপনার এইসব মতামত আর কি।"

পণ্ডিতজী বললেন—"আপনি আমাকে বড় বেশি বাড়ান রায় মহাশয়—"

—"সে আমাদের বিবেচ্য পণ্ডিতজী, আপনার নয়। আমি প্রফেসর মুখার্জ্জিকে আপনার সঙ্গে কালকের কথাবার্ত্তা সব বলছিলাম ও আপনি

গোয়ালিয়রে এবার ওমরাওখাঁর গান শুনে খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন, বল্ছিলাম।"

পণ্ডিতজী আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"গোয়ালিয়রে এবার আর একটি বাইজীর গান শুনেও বড় খুসি হয়েছি।

বন্ধু বল্লেন—"কে পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"কে একজন নতুন বাইজী সিন্ধিয়ার চাকরি করেন—ছ শ' টাকা ক'রে পান।"

আমি বল্লাম—"কি নাম তাঁর?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"ইন্দর বাই। চমৎকার ঠুংরি গা'ন। শুনেছেন তাঁর গান আপনারা কেউ?"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠ্লেন—"ইন্দর বাই? শুনেছি তাঁর গান। দিলীপ তাঁর 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়' কয়েক বৎসর আগে তাঁর খুব সুখ্যাতি ক'রেই লিখেছিলেন।"

তিন বৎসর আগে লক্ষ্ণৌয়ের একটি তালুকদারের বাড়ীতে ৺কালীপূজার দিন শ্রদ্ধেয় অতুলপ্রসাদ সেন আমাদের ইন্দর বাইয়ের গান শুনতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা'য় আমি এঁর খেয়ালের প্রশংসা করতে না পারলেও ঠুংরির ও গজলের খুবই সুখ্যাতি করেছি!

পণ্ডিতজী বল্লেন—"তাই না কি! সত্যি ভারি চমৎকার ঠুংরি এই ইন্দর বাইয়ের।"

ঠুংরির এতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বারবার পণ্ডিতজীর মতন পণ্ডিতের কাছে শুনে একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার কি সত্যিই ঠুংরি বেশ ভাল সঙ্গীত ব'লে মনে হয়, পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"নিশ্চয়ই—যদি ঠুংরি ভাল ক'রে গাইতে পারা যায়। তাই ত আমি আমাদের কলেজে ঠুংরিও শেখানোর বন্দোবস্ত ক'রেছি। তবে ঠুংরি প্রায়ই লোকে গাইতে পারে না।"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বল্লেন—"এ কথায় দিলীপ খুব খুসি হবে পণ্ডিতজী। কারণ সে ঠুংরির ভারি ভক্ত।"

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বল্লাম,—"ঠিক্ কথা পণ্ডিতজী। আমার মনে হয় ঠুংরির বিকাশ আরও হবে যদি আমরা ঠুংরিকে মেয়েলি গান ও সহজ সঙ্গীত ব'লে অবজ্ঞা না করি। তাই আপনার কাছে আমার এ মতের সমর্থন পেয়ে খুসি না হয়েই আমি পারি নি। তবে মুস্কিল হয় কি জানেন ঠুংরিকে পেলো ক'রে গাওয়া এত সহজ—ও শুধু মেয়েদের অনুকরণে গাইলে পুরুষের গলায় এত খারাপ শোনায় যে—"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"এ কথা খুব ঠিক্। তাই আমি আমার ক্রমিক পুস্তকমালিকাতে লিখেছি যে, ঠুংরি গাওয়া মোটেই সহজ নয়। এই দেখুন না—"

ব'লেই তিনি তাঁর পুস্তকের এক স্থলে খুলে প্রায় চার পাঁচ মিনিট ধ'রে তাঁর ঠুংরির উপর মন্তব্য প'ড়ে শোনালেন। তার ভাবার্থ এই যে, ঠুংরিতে রাগের বিশুদ্ধতার চেয়ে শ্রুতিমধুরতাকে বড় ক'রে দেখা হয় ব'লে ঠুংরি ওস্তাদ সমাজে অবজ্ঞাত বটে, কিন্তু ঠিকমতন ঠুংরি গাইতে পারলে তা অতি সুন্দর সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ঠুংরি গাওয়া সহজ নয় ও রীতিমত শিক্ষা-সাপেক্ষ।

ব'লে থেমে বল্লেন—"তাই ত আমি শ্রীকৃষ্ণকে রোজ নবাব কদর পিয়ার প্রসিদ্ধ ঠুংরি শিখ্‌তে তাঁর ছেলের কাছে পাঠাই। শ্রীকৃষ্ণ গত কয়েক মাসের মধ্যে অনেকগুলো ঠুংরি শিখেছে, শুনেছেন কি—"

আমি বল্লাম—"হাঁ, ভারি সুন্দর গা'ন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর ঠুংরি অতি উচ্চদরের। তাই আমি খুব খুসি না হ'য়েই পারছি না যে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের কলেজে ঠুংরি শেখাবার ভার নিয়েছেন।"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"হাঁ, আমার ভরসা আছে শ্রীকৃষ্ণ ভালই শেখাবে। উপস্থিত আমাদের কলেজের তিনটি অভাবের জন্যে আমি একটু ভাবিত আছি। (১) বাজনা শেখানোর বন্দোবস্ত করা, (২) ছোট ছেলে-মেয়েদের যোগাড় করা ও (৩) মহিলাদের ক্লাস খোলা।"

বন্ধু বল্লেন—"মেয়েরা চান শুধু আপনার কিম্বা রতনজনকরের কাছে শিখ্‌তে।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বল্লেন—"সেই ত মুস্কিল। আমায় অনেকে বল্লেন কাগজে ছাপিয়ে দিতে যে মেয়েদের ক্লাসে মুসলমান ওস্তাদের কোনও হাত থাক্‌বে না। কিন্তু সে রকম কোনও বিজ্ঞাপন কাগজে দিই কেমন ক'রে বলুন ত? তাহ'লে ঐ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আবার এখানেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠ্‌বে না কি?"

আমি বল্লাম—"কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমান ওস্তাদদের কাছে কেবল লম্বা লম্বা কথা শুনতে যাওয়া—"

পণ্ডিতজী হঠাৎ খুব একচোট হেসে ব'লে উঠ্লেন—"যা বলেছেন রায় মহাশয়। দু একটা গল্প মনে পড়্ল—এবার গোয়ালিয়রে একজন ওস্তাদের মুখে শুনে ভারি উপভোগ ক'রে এসেছি। ওস্তাদের লম্বা লম্বা কথা কিন্তু বড় সুন্দর শুনতে লাগে আমার।"

বন্ধু বল্লেন—"কি রকম?"

পণ্ডিতজী টেবিল চাপ্‌ড়ে সেই রকম খোলা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"রকম কিছু নতুন নয়। ওস্তাদদের সেই রাজা-উজীর মারার গল্প—তানালাপের অতি বিশ্বাসযোগ্য মহিমার কাহিনী, অতীত-গৌরবকে বংশদণ্ড দিয়ে উঁচু ক'রে ধরার সেই চিরপরিচিত প্যাথেটিক প্রয়াস।—এই আর কি।" ব'লে খুব হাস্‌তে লাগলেন।

আমি বল্লাম—"ব্যাপার কি পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"এবার একজন গোয়ালিয়রের ওস্তাদের সুরের মল্লযুদ্ধ শুনছিলাম। তিনি গাইছিলেন—'পিয়ারা তুমরে কারণ চিত উদাস'। কিন্তু তিনি বীণাপাণির সুর নিয়ে যে ছেনাবব করছিলেন তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছিল, আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, না তিনি সত্যি কথা বল্‌ছেন। যাক্! তাঁর একান্ত উদাসী ভাবের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া শেষ হ'লে তিনি আমার দিকে গর্ব্বিত দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। সে দৃষ্টির অর্থ অবশ্য এই মাত্র—'দেখ্‌লেন ত আমার কাণ্ড-কারখানাটা একবার?' আমাকে ত' কিছু বল্‌তে হয়। কি করি? বল্লাম—'বাঃ, খাঁ সাহেব, যে কাণ্ড তুমি করলে ও যে অদ্ভুত তানালাপের মল্লযুদ্ধ

দেখালে—তাতে স্বয়ং তানসেনেরও বাক্য হ'য়ে যেত, আমি ত কোন্ ছার।' খাঁ সাহেব পরম খুসি হ'য়ে বল্লেন—'পণ্ডিতজী, আপনি সমজদার সাধুপুরুষ বটে—কিন্তু দুঃখ রইল আপনি আমার ওস্তাদ "হোমরাও খাঁ"র আশ্চর্য্য তানকর্ত্তব শোনেন নি। হায় কিছুদিন আগে যদি জন্মাতেন—'

"আমি এ কথায় আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্যে যথোচিত লজ্জাপ্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—'সে আলাপ ও তানকর্ত্তব কি রকম ছিল?' তাতে ওস্তাদ-প্রবর বল্লেন -সে আর বল্ব কি পণ্ডিতজী——সে কহতব্য নয়।—তবু যখন শুন্‌তে চাইছেন তখন বলি শুনুন। আমাদের গোয়ালিয়রের মহারাজার বৈঠকখানার ছাদ দেখেছেন ত? কত উঁচু নিশ্চয়ই জানেন।' আমি বল্লাম—'না খাঁসাহেব, অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে জানি না। আমি মেপে না রেখে বড়ই অন্যায় করেছি।' ওস্তাদজী ক্ষমা ক'রে বল্লেন—'তা—হোক্ গে। কিন্তু সে ছাদখানি যে অতি প্রচণ্ড উঁচু ছাদ এটা মানেন ত?' আমি বল্লাম—'বেশক্।'

"—'তাহলে বুঝুন আমার ওস্তাদজীর তানের কাণ্ডকারখানা একবার—তিনি যখন তাঁর রক্তজমাটকারী তান ছাড়তেন তখন সেই অত উঁচু ছাদের পাথরগুলোও স্পষ্ট দুলে উঠ্‌ত—সকলেই দেখেছে।'

"—বটে!! কেয়া তাজ্জব!!!"

"—'আশ্চর্য্য! এখনও আশ্চর্য্যের হয়েছে কি?'

"—'আরও আশ্চর্য্য আছে না কি?'

"ওস্তাদজী বল্লেন—তব্ কেয়া?'

"—'কি রকম?"

"ওস্তাদজী বল্লেন -'মহারাজ সিন্ধিয়া আমার ওস্তাদজীর প্রচণ্ড গমকে তাঁর প্রাসাদের ছাদের পাথর কাঁপ্‌তে দেখে ত মহা আশ্চর্য্য। আমার ওস্তাদ তাতে হাত জোড় করে শুধু বল্লেন যে—এ ত কি হুজুরালি, আমি এমন তান ছাড়তে পারি যে তাঁর হাতীশালের বিরাটতম হাতীও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। মহারাজ সিন্ধিয়া অবিশ্বাসের হাসি হেসে তখনি হাতী আনালেন। ওস্তাদ হোমরাও খাঁ তান ছাড়লেন, পাথর দুলে উঠ্‌ল—হাতী উর্দ্ধলাঙ্গুল হ'য়ে দৌড় দিল ও সিন্ধিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ সে হাতী ওস্তাদজীকে বখ্‌শিস দিলেন। বুঝলেন পণ্ডিতজী! একেই বলে তান। আর একেই বলে শ্রোতা। আগেকার যুগে যেমন ছিল ওস্তাদ—তেম্‌নি ছিল গান ও তেম্‌নি ছিল সব সিন্ধিয়ার মহারাজের মতন শ্রোতা, যে কথায় কথায় হাতীকে হাতীই বক্‌শিস দিয়ে ফেলে। আমার ওস্তাদের কাছে শুনেছি যে তান সহজে আসে না। আগেকার যুগে লোকে প্রথম কুড়ি বৎসর শুধু সা রে গা মা সাধ্‌ত। তার পরে পঁচিশ বৎসর আলাপ সাধ্‌ত। তার পর ত্রিশ বৎসর ধ'রে শুধু তান সাধ্‌ত—তবে তাদের সামান্য কিছু আস্‌ত—অতি সামান্য—যৎকিঞ্চিৎ আর কি।* বুঝলেন পণ্ডিতজী -এ কি আর আপনার শাস্ত্রের কর্ম্ম! ওসব নদীতে ফেলে দিন গে যান। আপনাদের এখনকার দিনে যা হয় সে গান নয় পণ্ডিতজী—গান, আলাপ, তান? সে সব ছিল আগেকার দিনে—যখন লোকে এক একটা তানের জন্যে হেলায় জান দিত।'

"আমি শিউরে উঠে বল্লাম—'জান দিত! বলেন কি খাঁ সাহেব!! নিজের জান!!!'

"ওস্তাদজী অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন—'তব্ কেয়া? নইলে কি আর তান হয় পণ্ডিতজী, হয় কেবল আপনাদের ঐ স্বরলিপি। হস্‌সু খাঁ কেমন ক'রে মারা গিয়েছিলেন জানেন?'

"আমি বল্লাম—'কেমন করে জান্‌ব ওস্তাদজী, বলুন না, শুনি ও শিখি।'

"ওস্তাদজী বল্লেন—'এ গল্প খোদ আমার ওস্তাদের কাছে শোনা। কাজেই এর এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। হস্‌সু খাঁ এমন একটা সাড়ে তিন সপ্তকের তান ছাড়লেন যে, তাঁর বুকের একটা পাঁজর একেবারে আর একটা পাঁজরের ওপর চ'ড়ে বস্‌ল।'

"—'বলেন কি!! এমন!!!'

"—'তব্ কেয়া? নৈলে আর তান ব'লেছে কেন—পণ্ডিতজী! কিন্তু পাঁজর স্থানভ্রষ্ট হলে হবে কি? সেখানে বিখ্যাত আহম্মদ খাঁ ব'সেছিলেন যে! তিনি ত আর ছাড়বার পাত্র নন—তিনি হস্‌সু খাঁকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে বল্লেন—একটা বুকের পাঁজর অন্য একটা পাঁজরের ওপর চ'ড়ে ব'সেছে ব'লে হয়েছে কি! তাই ব'লে তান ত' আর অসম্পূর্ণ রাখা চলতে পারে না! ব'লে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বল্লেন—"থেমো না হস্‌সু খাঁ, তানটা শেষ কর। মর, কিন্তু মর্য্যাদা ছেড়ো না। মনে রেখো, তুমি ওস্তাদ ও যা ছাড়ছ সেটা তান। তার কাছে জান তুচ্ছ। কি করেন? হস্‌সু খাঁ মরিয়া হয়ে তান শেষ করলেন—পাঁজর কিন্তু আর নাম্‌ল না—আরও উঠে গেল ও হস্‌সু খাঁ সেইখানেই চোখ কপালে তুল্লেন'।"—ব'লে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ তাঁর উদাত্ত হাসির সৌরভে সেদিনের অরুণোজ্জ্বল প্রভাতকে আরও সুরভিত ক'রে দিলেন।

চ'লে আস্‌বার পথে ক্রমাগতই মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌ছিল বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সান্দ্র প্রতিভা-উজ্জ্বল আননের প্রতিচ্ছবি, আর চিত্তপটে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল তাঁর অটল আত্মনির্ভরোদ্দীপ্ত বর্ণচ্ছটার কিরণ-সম্পাত। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে গুণগুণিয়ে উঠ্‌ছিল যে, একটা আহ্লাদিয়া যদি আমাদের মগ্নচৈতন্যে একবার তার শিকড়পাত করতে পারে, তাহ'লে সে কি আশ্চর্য্য উপায়েই না সে আমাদের সমস্ত জীবনখানিকে এক সময়ে না এক সময়ে তার ফলে-ফুলে-পাতায়-শাখায় ভ'রে দিতে পারে! নইলে কি আর আমাদের মতন ক্ষীণপ্রাণ, শিল্প-উদাসীন দেশেও সঙ্গীতের মতন এমন একটা অকেজো সখ এমন একজন তেজস্বী মহতের আজীবন একাকিত্বকেও গৌরবদৃপ্ত ও মধুর ক'রে তুল্‌তে

---

* আমাদের এক বন্ধুর ক্লাসের এক পণ্ডিত সগর্ব্বে তাঁকে ব'লেছিলেন "পঁচিশ বৎসরে ব্যাকরণ শেখা? রে মূঢ়! তা কি হয়? আমি ত্রিশ বৎসর পাণিনি, পনের বৎসর মুগ্ধবোধ ও দশ বৎসর অলঙ্কার শাস্ত্র প'ড়ে তবে সবেমাত্র একটি মূর্খ হ'তে সুরু ক'রেছি।"

পারত!......আমরা বস্তুগাদ বস্তুবাদ ক'রে চেঁচাই বটে—কিন্তু আইডিয়ার প্রভাব বস্তুতান্ত্রিকতার ওপরেও কত বেশি! ..

সব চেয়ে বেশি ক'রে মনের নিহিত দেশে রূপ পরিগ্রহ করছিল—পণ্ডিতজীর স্বপ্নচিত্রটি—যে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি কেমন ক'রে অদূর ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে তাঁর বৃহৎ গোয়ালিয়র কলেজের মতন গড়ে উঠ্‌বে, ও তার দৃষ্টান্তে ভারতের নগরে নগরে সঙ্গীত-বিদ্যালয় শত শত পদ্মের মতনই সহজ প্রেরণায় ফুটে উঠ্‌বে। মনে হচ্ছিল যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতন একজন সামান্য-পরিচিত দীনবেশ লোকের এভাবে প্রশস্তি করাটা হয় ত অনেকের কাছে আজকের দিনে অত্যুক্তি মনে হ'তে পারে,—কিন্তু যেদিন অদূরে তাঁর মন্ত্রদীক্ষিত তরুণ তীর্থযাত্রীর দল আমাদের মুমূর্ষু ললিতকলাকে ওস্তাদের ছায় আলো-হাওয়ার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রেখে স্বাধীন-চিন্তা ও আন্তরিক প্রেরণার সুধারসে তাকে নবজীবন দান করবে; যেদিন আমাদের ললিতকলার অন্তর্লীন দীপ্তিটি আজকের মতন আগাছার আওতায় অন্তঃসলিলা না থেকে সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যের মলয়-পরশে চারিদিকে তার কলোচ্ছল পরিমল ছড়িয়ে দেবে; যেদিন আমাদের অপূর্ব্ব স্বরসম্পদ অনুদার আবহাওয়ায় আজকের মতন শ্বাস-রোধের অপেক্ষায় চেয়ে না থেকে ঘরে ঘরে তরুণ-তরুণীর মিলিত শঙ্খঘণ্টার আরতিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌বে; এক কথায় যেদিন আমাদের সঙ্গীতের শতদল সুকুমার প্রতিভার ও সহৃদয় সাধনার যাদুস্পর্শে সহস্রদল লক্ষদল কোটিদল হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অপূর্ব্ব সৌরভটি বিলিয়ে দেবে;—সেদিন আমরা বুঝ্‌ব সঙ্গীতের নবজন্মে এই বাণীর একনিষ্ঠ পূজারী, সেবার অনন্যচিত্ত সাধক, ভাবের আত্মবিস্মৃত তপস্বীর দানের মূল্য কতখানি। সে দিন কি আমরা রবীন্দ্রনাথের শিবাজী-তর্পণের সুরে সুর মিলিয়ে এ সঙ্গীত-ঋত্বিককে সমস্বরে বিস্মিত অনুরাগে এই ব'লে তর্পণ করব না?—

অজ্ঞাত অখ্যাত রহি দীর্ঘকাল
হে রাজবৈরাগী গিরিদরী-তলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া
উঠে জাগি' পরিপূর্ণ বলে—
সেই মত বাহিরিলে, বিশ্বলোক
ভাবিল বিস্ময়ে,—'যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন ক'রে এত কাল
এত ক্ষুদ্র হ'য়ে কোথা ছিল ঢাকা!'

('উত্তরা' হইতে)

ভাগলপুরের পথে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কিবা শান্তি দিলে মোরে কি তৃপ্তি উদার,
শ্যামলা বিপুলা স্নিগ্ধা পৃথিবী আমার!—
দক্ষিণে বিততা গঙ্গা দিগন্তশায়িনী,
শুভ্র-বালু-বেলাময়ী মৃদুল-ভাষিণী;
বামে স্তব্ধ গিরিশ্রেণী উচ্চ নীচ পথে
দূর হ'তে দূরান্তরে রহে শতে শতে।

হে ধরা, পর্ব্বত যেন তব ওষ্ঠাধর
কি কথা বলিতে গিয়ে উচ্ছ্বাস-কাতর।
গঙ্গা তব কল্লোলিত চলমান প্রাণ,
পর্ব্বত উদ্দাম দৃপ্ত প্রাণ শক্তিমান!
তোমার প্রাণের আজ এ দুই মূরতি—
তরঙ্গিত, বহমান, আর দৃপ্ত অতি,

আজি মোর চিত্তে বলে—নহে প্রাণহীন,
এ ধরণী চিরন্তন জীবনে নবীন!

পরিচয়

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

মেসের মধ্যে হট্ট-গোল লাগিয়াই থাকে।

সারদা তার লুঙ্গী ও জামা কাচিতে কাচিতে সকাল বেলাতেই গান ধরিয়া দেয়, রাধাবল্লভ রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত 'ভীষ্মের শরশয্যা' লইয়া আবৃত্তির নামে করে চীৎকার।—উপরন্তু—হারমনিয়াম, বাঁশী, ফুটবল ও পলিটিক্সের তর্ক ত' আছেই! ঝীয়ের সঙ্গে চাকরটার এবং চাকরের সঙ্গে ম্যানেজার গোষ্ঠবাবুর প্রাত্যহিক আলাপটাও কোন অংশে কম উল্লেখযোগ্য নয়।

মাস কয়েক এইখানেই আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু ইহারি মধ্যে অতিষ্ঠ!

এই অর্থহীন কলরব, অকারণ বক্তৃতার কোন অর্থ ই খুঁজিয়া পাই না! এরা সবাই বুঝাইতে চাহে একের চেয়ে অপরের জ্ঞান অনেক বেশী। কিন্তু রাগ আমি করি না, —ইহা ছাড়া করিবেই বা কি? জীবনে ইহাদের নব নব সম্ভাবনা নাই, আছে বিরক্তিকর বৈচিত্র্যহীনতা; সেটার হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্যই বুঝি এই ক্লান্তিহীন কলরব, অন্তহীন উৎসাহের অভিনয়!

দোতালার যে ঘরটায় আশ্রয় লইয়াছি তার পর আর কোন ঘর নাই। বাহিরে সঙ্কীর্ণ একটু গলি—বাতাস প্রবেশ করিলেও অসূর্য্যম্পশ্যা। জানালা খুলিলেই—আর একটী বাড়ীর জানালা চোখে পড়ে—বন্ধ। সেদিকে দৃষ্টি দিই না, কারণ প্রয়োজন হয় না।

ঘরের কোণে মাকড়সায় জাল বুনিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ছবিটার উপর একপুরু ধুলা জমিয়াছে। মেস হইতে যে কেরোসিন কাঠের টেবিলটী দৈবাৎ জুটিয়াছে সেটীর উপর পোড়া চুরুট ও তার ছাই জমিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ!

ঐ সবের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর নাই।

একটা ছোটখাট দৈনিকের সম্পাদকত্ব লইয়া বড়ই ব্যস্ত আছি। চীন, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হনলুলু, ব্যাটাভিয়া, মেক্সিকো—পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্যা লইয়া আলোচনা হইয়া গেছে, এখনও—কম্পোজিটার—আফিসে পৌঁছিলেই দেয় তাড়া। কাজেই—ঘরে বসিয়াই কিছু কিছু লিখি। আমার অপরিচিত কোন দেশে দুর্ভিক্ষের দাবাগ্নি জ্বলে—জল-প্লাবনে লোকালয় ভাসিয়া যায়, মানুষের অসহায় ক্রন্দনে আকাশ হয় ত আকুল হইয়া ওঠে!—এই সব লিখি। আমার আফিস ও মেসের ছোট ঘরের মধ্যে বসিয়া নর নারীর কাণে বাহিরের বিপুল পৃথিবীর কাহিনী পৌঁছাইয়া দিই!

তাই কি ছাই নিরালয়ে কাজ সারিবার উপায় আছে!

মেসে আছেন এবং নাই—এমন কত লোক আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমায় নির্ব্বাসন-দণ্ড দিবার উপক্রম করেন। তবু টিঁকিয়া আছি।

প্রায় পাঁচটী মাস!

শীতের সকাল, জানালা খুলিয়া দিতেই দেখি ও-বাড়ীর জানালাটীও খোলা।—অভাবনীয় কাণ্ড! কারণ, এই ক' মাসের মধ্যে যত দিন ওদিকে দৃষ্টি দিয়াছি, কোন দিনই সেটা খোলা দেখি নাই। গলিটার মতই ঘরটাও সূর্য্যালোক হইতে নির্ব্বাসিত, এই কথাই জানিতাম।

কিন্তু আজ?

সারদার মুখে সংবাদ পাওয়া গেল—এই দিকের ঘর-কয়খানি এতদিন খালি ছিল, আজ নূতন ভাড়াটে আসিবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

সারদা বলিল, এত দিন একলা ছিলেন, এইবার প্রতিবেশী জুটল।

সারদার মত খুব বেশী উৎফুল্ল হইতে পারি না; প্রতিবেশী তথা প্রতিবেশিনীকে লইয়া মনে মনে কাব্য রচনা করিবার বয়স আর নাই!—বলিলাম, দেখ হে, কোন বিরাট-ভুঁড়ি-সমন্বিত মাড়োয়াড়ী পরিবারের শুভাগমন হ'লে খুব আনন্দ করা চলবে না; তখন তোমার ঘরে আমায় আশ্রয় নিতে হ'বে।

মনে মনে কাব্য-রচনা করি আর নাই করি, দুই চারি দিনের মধ্যেই কে বা কাহারা সেখানে আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু জানালা আবার বন্ধ হইয়া গেল!—যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের দেখা হয় না।

ভাবিয়াছিলাম সেদিকে মন দিব না, কিন্তু আবার সেটা বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই বাধিল উৎপাত। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভ—এ ত' আদি পুরুষই আমাদের মনে গাঁথিয়া দিয়া গেছেন! তাই যতই ভাবি ওদিকে আমার কোন প্রয়োজন নাই, ততই একটা অদৃশ্য আকর্ষণ যেন মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

দিন কয়েক যাইতেই বুঝি আমার সমস্ত মন ও কাণ অবাধ্যের মত সেই দিকেই পড়িয়া আছে!

কথাবার্ত্তাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই।

—না, জানালা খোলবার কোন দরকার নেই। মেস-শুদ্ধ লোক এই দিকেই তাকিয়ে আছে, জান?

—ঘরে আর জানালা নেই ত আমি কি করব? বাড়ীর মালিক ত' আমার ইয়ে নয় যে বললেই আর একটা জানালা ফুটিয়ে দেবে।

—না, মেয়েদের এতখানি স্বাধীনতা দিতেও আমি রাজী নই। মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করলেই ত' পার, ছাতে ওঠবার দরকার কি? মেসের ছেলেগুলো সন্ধ্যের সময় ছাদে উঠে মুগুর ভাঁজে—আমি দেখেছি।

কেবল এক পক্ষেরই কথা! অপর পক্ষ কেবল মুখ বুজিয়াই থাকে বোধ করি,—তা ছাড়া উপায়ই বা কি!

সেদিন সারদা আসিয়া বলিল, আজ একটা দুর্লভ জিনিষ তার চোখে পড়িয়াছে—এই পাশের বাড়ীরই আঠার-উনিশ বচরের একটী মেয়েকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে ক্ষণকালের জন্য একবার আসিয়াছিল বুঝি···কিন্তু মেসের ছাদে অপর এক ব্যক্তি দেখিয়াই তখনই নামিয়া গিয়াছে।

—সারদাকে বলিলাম, কাজটা ভাল হয় নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে ও এসেছিল আকাশের সঙ্গে একবার বন্ধুতা পাতিয়ে নিতে—তুমি সাধলে তাতে বাদ!

সারদা বুঝিল না, বলিল, অত কবিত্ব-জ্ঞান থাকলে আমিই ত' 'অরুণের' সম্পাদক হতে পারতাম।

বলিলাম, তা পারতে না। কারণ দৈনিকের সম্পাদকের পক্ষে কবিত্ব—কোয়ালিফিকেশন নয় – অপরাধ।

ক'দিন কাজের ভিড় একটু বেশী করিয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়ীর কোন্ মেয়েটী দিবারাত্র বন্ধ ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছে মনেই ছিল না! সংবাদপত্রসেবী মুসোলিনী কেমন করিয়া তরুণ ফ্যাসিষ্টদের লইয়া রোজ অভিযান করে, মহাযুদ্ধের আগুন উল্কা-পিণ্ডের মত কোন্ নিরীহ দেশের উপর দিয়া ছুটিয়া যায়, সেই খবরই রাখি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আবার প্রতিবেশী বাড়ীটার দিকে মন দিতে হয়।

দুপুরে শয্যার উপরে পড়িয়া আছি! অকস্মাৎ, ও-দিকটা হইতে কবিতার কল-গুঞ্জন! ঘুমন্ত মধ্যাহ্নটাই যেন সেই কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিবার পর একটী মাত্র ছত্র বুঝা যায়—

মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধু-পারে
মহা-মরু দেশে—

চোখ মুদিয়া কল্পনা করিয়া লই—'বসুন্ধরার' কবির মত ওই অদেখা মেয়েটীর চিত্তও আজ জল, স্থল, আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—তার মনের দুয়ারে না-জানি কত বিচিত্র দেশ ও মানুষের করাঘাত! কণ্ঠে কী অপার ঔদাসীন্য! কিন্তু উপায় নাই। বাস্তব পৃথিবী তার পাশের ঘরখানার মধ্যেই শেষ হইয়া গেছে!

—কতক্ষণ এমনি ভাববিলাসে ডুবিয়া ছিলাম কে জানে!

আর একটী নারী-কণ্ঠ শুনা গেল।

—আচ্ছা বউমা, আমার ছেলে যখন পছন্দই করে না, তখন ও-সব ছাইভস্ম পড়াই বা কেন! যদি জিজ্ঞেসা করে, তা হ'লে আমি ত' আর সত্যি কথা না ব'লে পারব না।—আর এও বলি বাছা, ও ছাই কি মনে মনে পড়া হয় না।

অপর পক্ষের কোন কথাই কাণে পৌছায় না—মাটীর মতই মূক; সহনশীলা। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল—দুইটা বাজে। এখনও প্রবন্ধ শেষ নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসি। জাপানের নারী-জাগরণ সম্বন্ধে একটা উদ্দীপনা-ভরা প্রবন্ধ,—কালকের কাগজ গরম মুড়ির মত বিকাইবে নিশ্চয়! আমার ঘরের অদূরে কোথায় কোন্ নিষ্পেষিত-যৌবনার বুকে বন্ধনের বেদনা বাজিয়াছে, তা আলোচনা করিলে মন ভাল থাকে বটে, চাকরী বজায় থাকে না। কাগজ বিক্রীর জন্য চাই বড় বড় ফাঁকা আওয়াজ,—আন্তরিকতা নয়। সুতরাং, এই মনোবিলাসে কাজ নাই।

সান্ধ্যদীপ
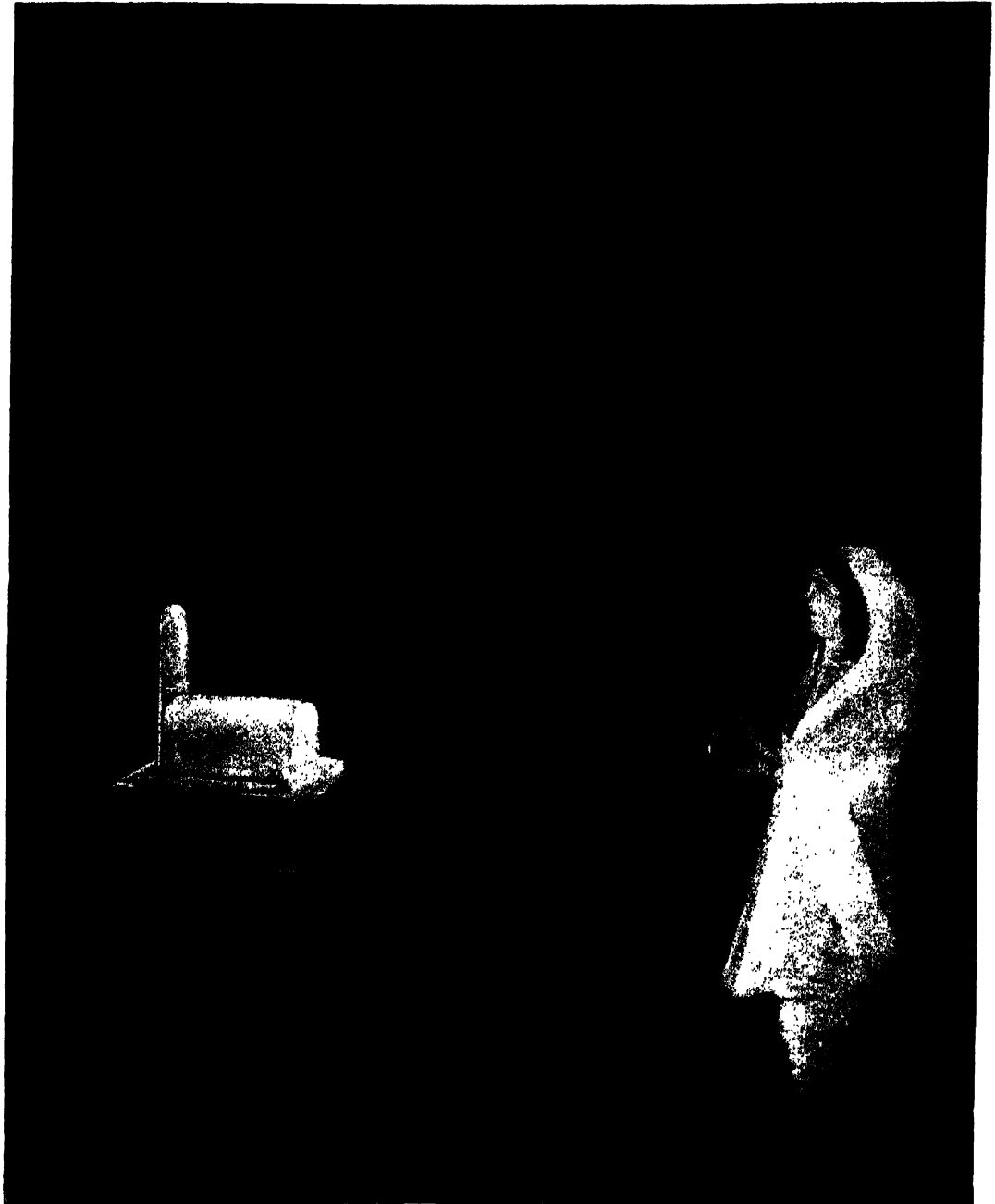
শিল্পী— শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সারদা প্রত্যহ একবার করিয়া জ্বালাতন করে। ও বাড়ীর জানালা খোলা ছিল কি না, কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া গেল কি না—এমনি হাজার রকম। শুধু কি সারদা, আরও কত জন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া যান; কথাবার্তা বলেন কম, জানালার দিকেই কাণ ও মন থাকে বেশী। ও-বাড়ীর সেই অপরিচিত মেয়েটী যেন বন্দিনী রাজকন্যা—ডাইনী বুড়ী বাড়ীটা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে,—আর মেসের এই এতগুলি রাজপুত্র তাহার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল!

উহারা স্থির জানে, ও-বাড়ীর মেয়েটীকে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি, তাহাদের কাছে কথাটা প্রকাশ করিতে চাই না। এ জন্য কেউ কেউ আবার আমার ওপর ঈর্ষান্বিত—কেউ আবার বেশী ভাড়ায় আমার ঘরখানি দখল করিতেও রাজী!

দিনের মধ্যে হাজার রকমের বিশ্রী রসিকতা—বন্ধ জানালার উদ্দেশে মাথামুণ্ডহীন গান—সহ্য করিতে পারি না। নারী সম্বন্ধে জ্ঞান ইহাদের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তার একটী মাত্র রূপের সঙ্গেই পরিচয়! ওই পাশের বাড়ীর জানালার ভিতরে বন্দিনী একটী মেয়ের দিন-রাত্রি কি করিয়া কাটে, সে সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, উৎকণ্ঠাও নাই।

দিন কতক পরেই শুনা গেল, ও বাড়ীতে অসুখ। ডাক্তারের আসা-যাওয়া প্রায়ই চোখে পড়িতে লাগিল। কিন্তু অসুখ কা'র?

সারদাই শেষে একদিন খপর আনিল—অসুখ ওই বাড়ীরই বউটীর। অনেক চেষ্টা করিয়া বেচারী খপরটুকু সংগ্রহ করিয়াছে।

অসুখের কারণ কি সেটা অনুমান করা কঠিন নয়, আমিও বুঝিলাম।

সারদাকে ডাকিয়া বলি, ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন ফল হ'বে না। ওর রোগ-মুক্তির জন্য চাই আকাশ, চাই আলো। বলতে পার ও-বাড়ীর মালিককে গিয়ে?

কেহই রাজী হয় না; কত রকম আইনের ভয় আছে—এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত। কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে নিত্য এই নিঃশব্দতার জন্য প্রতিবাদ শুনা যায়—মনে হয়, গোটাকতক মন্ত্রের জোরে একটা তাজা, দুরন্ত প্রাণকে পলে পলে পিষিয়া মারিবার অধিকার কেউ কাহাকেও দেয় নাই। ভাবি, মনের মধুই যদি পচিয়া মদ হইয়া যায়, তবে শরীরটাকে ধরিয়া রাখিয়া লাভ কি?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত! কাজে কিছুই করিতে পারি না। অপরিচিত একটী মেয়ের জন্য বেশী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে গেলে দশের চোখে সেটা দূষণীয় হইবার সম্ভাবনা।

দিন যায়, রাত্রি যায়।

সংশয়ের স্রোত ঠিক চলিয়াছে; সবাই নিয়মিত সময়ে নিজের কাজে যায় এবং ফিরিয়া আসে; ক্ষুধা পাইলে খায়, রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া নিরুপদ্রবে ঘুমায়!

কেবল রাত্রি জাগিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিব, সেই সময় আমারই যত জ্বালা!—পথের ধারের জানলা দিয়া রাত্রির জনহীন পথ ও তারা-ভরা আকাশ দেখা যায়। দিনমানের মত্ততা তন্দ্রা-শিথিল, বাতাস নিঃশব্দ—কতদূর হইতে ভাসিয়া আসে! শুকনো প্রবন্ধ লিখিতে ভাল লাগে না—ও কেবল মস্তিষ্কের কীট, হৃদয়ের সুধা তাহাতে নাই। দীর্ঘ রাত্রে চেয়ারে বসিয়া নিজেকে অত্যন্ত একা মনে হয়। টেবিলে মাথা রাখিয়াই হয় ত ঘুমাইয়া পড়ি।

ভোরের বাতাসের স্পর্শ লাগে অগোছাল চুল-গুলিতে। তন্দ্রার ঘোরে মনে হয়, কার সুশীতল স্পর্শ-ই বুঝি—স্পর্শ যা'র তাহাকেও বুঝি চিনি!

কিন্তু চিনি না—কেউ তাকে চিনে নাই।

দেড় মাস ধরিয়া মানুষের দেহের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের লড়াই!

তার পর, সেদিন অনেক রাত্রে মোমবাতির মৃদু আলোকে বসিয়া বসিয়া একখানা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মধ্যে নিমগ্ন আছি;—সময় কোথা দিয়া, কেমন করিয়া কাটিতেছে তার ঠিক নাই—একেবারে উষর বালু-মরুর মাঝখানের আরবদেশের চিররহস্যময় 'শেখের' অদ্ভুত গালিচা বিছান তাঁবুর মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি·· হঠাৎ প্রায় শুব্ধ সহরের শান্তির বুক চিরিয়া ও-বাড়ী হইতে উঠিল ক্রন্দন-কলরোল।

বুঝিলাম—শেষ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া রক্ত-মাংসের খাঁচার মধ্যে যে বন্দী-চিত্ত কোনমতে শ্বাসটুকু বজায় রাখিয়াছিল, আজ আর সে রহিল না।

মেস-শুদ্ধ সবাই উঠিল জাগিয়া—সারদা আমার ঘরে

ঢুকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহারই অনুরোধে ও-বাড়ীর দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিই।

পাশের বাড়ীতে পয়সার অভাব ছিল না জানিতাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাণ্ড খাটে, শুভ্র শয্যার উপর, অপর্য্যাপ্ত পুষ্প-সম্ভারের মধ্যে সদ্যঃপ্রাণহীনা বধূটীকে বাহির করা হইল।

ভোরের পাণ্ডুর চন্দ্রমার মত শীর্ণ দেহ—চওড়া ললাট, সীমন্ত ছাপিয়া সিন্দুর—পায়ে আল্‌তা—যেন ওরই বুকের রক্ত। উপরের রজনীর তারাময় কালো আকাশ—যে আকাশকে ও ভাল করিয়া কত কাল দেখে নাই, যে আকাশের পিপাসায় তার সমস্ত রক্ত চুপে চুপে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

বড় বড় দুইটী চোখ—ঠিক যেন চোখ মেলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া মনে হইল—ওই বিস্ফারিত দৃষ্টিহীন চোখ দুটী দিয়া সেও যেন সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীকে দেখিয়া লইতেছে; এ' দেখায় তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই! ঘরের যে দেওয়ালগুলি এতদিন তাহাকে গ্রাস করিয়া ছিল, আজ সেগুলি অকারণ, মিথ্যা।

—আমরাও দেখিলাম; পাশের ও নিকটের সব-কয়টী বাড়ীর দুয়ার জানালাও গেল খুলিয়া এবং কেহ তাহাতে বাধা দিল না।

প্রাচীন ভারতের শারীর সাধন-পদ্ধতি ও তাহার প্রভাব

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

পাশ্চাত্য জগতে ব্যায়ামে প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ ও প্রভাব যে কতটা, তাহা ব্যায়ামবিদ্‌গণের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন প্রাচীন গ্রীসেও সভ্যতা ও culture বলিয়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এবং তখন হিমালয়ের পাদভূমিতে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারিত হইত এবং জাতীয় উন্নতি অব্যাহত রাখার জন্য ব্যষ্টির জীবন যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাও উপলব্ধ হইয়াছিল। ব্যষ্টির শারীর ও মানস উভয়বিধ শক্তির পূর্ণতা সাধনের উপরই যে জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহা সেই পুণ্য-ভূমির মানবের জ্ঞান-গোচর হইয়াছিল; এবং তাঁহারা তজ্জন্য বিজ্ঞানসম্মত শারীর-সাধন-পদ্ধতি, যাহা তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান-অভ্যাস দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল—সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শরীর গঠনে Herculean type এবং Apollo typeএর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতেও যে শরীর-গঠনের দুই প্রকার আদর্শ ছিল, তাহা সাধারণতঃ অপরিজ্ঞাত। 'বলদেব' আদর্শ, Herculean আদর্শের অনুরূপ এবং 'কৃষ্ণ' আদর্শ Apollo আদর্শের অনুরূপ। বলদেব আদর্শে পেশীর আয়তনের এবং শক্তির চরম বৃদ্ধির দিকে, এবং 'কৃষ্ণ' আদর্শে সমস্ত পেশীর সুবিন্যস্তভাবে উন্নতি, যাহাতে শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গীন পৈশিক পারগতালাভ হয়, এই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য। কর্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বলশালী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ আদর্শে শরীর গঠন করিয়াছিলেন এবং ভীম, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহাবলিগণ বলদেব আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের শারীর-সাধন-পদ্ধতি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যোগসম্মত শারীর-সাধন-পদ্ধতি এবং সাধারণ পদ্ধতি। যোগিগণ মানবের শারীর প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন এবং শারীর ও মানস শক্তির পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রকৃতির গুহ্য এবং মূল সূত্র সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর বর্ত্তমানে এতদ্বিষয়ক বহুল চর্চ্চা বশতঃ আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় কেমন বৈজ্ঞানিক, কত উচ্চতর ছিল। এটা কিছুদিন পূর্ব্বেও ভালরূপ জানা সম্ভবপর ছিল না এবং তাহার কারণ তখনকার লোকের এ সম্বন্ধে জ্ঞানের অল্পতা। এই শারীর-যোগ-পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্যই ছিল নীরোগ দেহ লাভ, স্থিরযৌবন রক্ষণ, পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্তি এবং শারীর-মানস শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি। তাঁহাদের মতে দেহ-মনের এরূপ গঠন করিতে হইবে যে, ধ্যান-ধারণা-সমাধি এবং উচ্চতর চিন্তা-বিকাশের জন্যই হউক, অথবা

সময়োপযোগী নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ শারীর-মানস পরিশ্রমের জন্যই হউক, কিম্বা পৈশিক বলের চরম বিকাশের জন্যই হউক—তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। এই প্রকার শরীর গঠনের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে দেহ-শোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শোধন দ্বিবিধ—বাহ্য এবং আন্তর। চর্ম্ম, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, জিহ্বা, নাসা প্রভৃতির জল ও বস্ত্রাদির দ্বারা ধৌতি ও পরিষ্করণ বাহ্য শুদ্ধির অন্তর্গত। আর stomach, small intestine, large intestine প্রভৃতিকে জল দ্বারা ধৌতির উপায় আন্তর ধৌতিতে বিবৃত আছে। এই সমস্ত যন্ত্রগুলির ধৌতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী দিন পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের জ্ঞানাধিগম্য হয় নাই। Kellogg প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসকগণ colon সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সমস্ত অভিনব তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শরীর নীরোগ রাখিবার জন্য যে তাহার কতটা কার্য্যকারিতা, তাহা দেখাইয়া বর্ত্তমান জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন—সে সমস্ত তথ্যই Kellogg প্রভৃতির আবিষ্কারের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ঋষিগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না এবং ঐ যন্ত্রকে স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থায় রাখিবার জন্য ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত চিকিৎসক Laneএর ন্যায় উহাকে দেহ হইতে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার উপদেশও দেন নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত উপায় জানা থাকিলে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে colon কখন 'বেয়াড়া' হয় না; বরং স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিয়া যায়। Colonএর stasis এবং তাহার ফলস্বরূপ autointoxicationএর সমস্যা তাঁহারা operationএর দ্বারা সমাধান করিতে চেষ্টা করেন নাই; তজ্জন্য বিশেষ সাধন পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আজ Kellogg প্রভৃতি Laneএর মতের অসারত্ব বুঝিতে পারিতেছেন এবং তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও মত প্রবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা অতি প্রাচীন কালের ভারতের যোগিগণের 'বাক্যের' প্রতিধ্বনি। মানুষ যত উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইবে, ততই উচ্চতর, সহজ এবং ফলপ্রদ উপায় জানিতে পারিবে। এই উচ্চতর জ্ঞান বিকাশই প্রাচীন যোগী-প্রবর্ত্তিত-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করিবার সামর্থ্য দান করিয়াছে। Colonকে জল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধৌতির জন্য তাঁহারা একপ্রকার প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাতে কোন প্রকার যন্ত্রেরই সাহায্য আবশ্যক হয় না। আজ পর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ইহা ভাবিতেও পারেন নাই। তাঁহারা enemaর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আর এই enemaর দ্বারা ধৌতি এবং বিনা যন্ত্রের সাহায্যে ধৌতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমি আমার গ্রন্থে বিনা যন্ত্র সাহায্যে ধৌতির শ্রেষ্ঠতা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখও একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, লেখক বিনা যন্ত্র-সাহায্যে colon সম্পূর্ণভাবে ধৌত করণের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন।
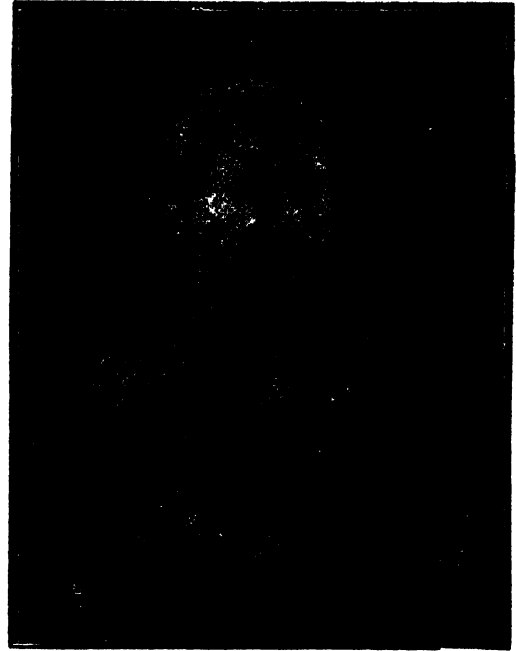
প্রফেসার শ্যামসুন্দর গোস্বামী (পূর্ব্বের চেহারা)

জল দ্বারা stomach ধৌতি করার প্রয়োজনীয়তাও আজকাল পাশ্চাত্য-জগতে স্বীকৃত হইতেছে। অবশ্য বহু কাল পূর্ব্বে তাহা ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। এখন small intestine পরিষ্কার করার কথা। পাশ্চাত্যগণ এ যাবৎ 'Laxative' প্রভৃতি ঔষধ সাহায্যে তাহা করিবার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। তবে উচ্চ শ্রেণীর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণ ঐ সমস্ত ঔষধের অপকারিতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। গরম জল পান দ্বারা এবং গরম জল পানের সহিত ব্যায়াম দ্বারা তাঁহারা এই যন্ত্রকে পরিষ্কার করিতে উপদেশ দেন। এই প্রকার পদ্ধতি যে পরমোপকারী এবং নানা রোগ নিবারণার্থ ইহার ব্যবহার যে বিশেষ ফলপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র অবসর নাই। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে জল দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করিবার উপায় তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রাচীন যোগিগণ 'বারিসার' নামক প্রক্রিয়া দ্বারা stomach হইতে আরম্ভ করিয়া, small

প্রফেসার শ্যামসুন্দর গোস্বামী

intestine এবং colon পর্য্যন্ত সমস্ত অংশই উত্তমরূপে জল দ্বারা ধৌত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! লেখকও সম্প্রতি ঐ প্রকারে জল দ্বারা কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া সমস্ত alimentary canal ধৌত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নাম—"Alimentary canal washing Method"।

ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যাহাতে তাহারা সর্ব্বাবস্থাতে উপযুক্ত পরিমাণে oxygen রক্তে ঢালিয়া দিতে পারে এবং তাহাদের যে সমস্ত অংশ সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় না, তাহাদের উপযুক্তভাবে চালনা করিবার জন্য 'বায়ুসাধন' নামক প্রক্রিয়ার প্রচলন যোগীরা করিয়াছিলেন। রক্ত-শুদ্ধির জন্য কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকার শোধন-পদ্ধতিই যথেষ্ট নহে, উহার সহিত বায়ুসাধন এবং যথাযথ খাদ্য গ্রহণ এই দুইটাই যে অবশ্য গ্রহণীয় তাহা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। ফুসফুসের ব্যায়াম-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিদ্‌গণও একমত এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে নানা প্রকার ব্যায়াম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যোগীদিগের ফুসফুসের ব্যায়ামে বায়ুসাধন ব্যতীত আর একটী পদ্ধতি আছে। তাহার নাম "প্রাণায়াম"। প্রাণায়াম ফুসফুসের ভিন্ন ভিন্ন অংশে "measured pressure" প্রয়োগের উচ্চতর বৈজ্ঞানিক কৌশল। Sympathetic systemএর যে অংশ দ্বারা skeletal muscle innervated আছে, তাহাকে stimulate করা, আর আন্তর পেশীগুলি যে নাড়ী-কেন্দ্র ও নাড়ী (nerve) সকলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাদিগকে শক্তিশালী করা, এবং চিত্তের নানা দিগভিমুখী গতি রোধ করিবার জন্য সংযম-শক্তি লাভ করা—এইগুলিই প্রধানভাবে প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। আজ পর্য্যন্ত এ সমস্ত তথ্য বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অনধিগম্যই রহিয়া গিয়াছে। ব্যায়ামের সময় পেশীর উপর মানস-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পৈশিক উন্নতি দ্রুততর হয় সে তথ্য Sandow, প্রভৃতি পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিদ্‌গণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। যদিও ব্যায়ামের সময় তাঁহারা মানস প্রয়াস দ্বারা পেশীর উপর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু নানা বিষয়াভিমুখী চিত্তকে কি প্রণালীতে একাগ্র, শান্ত ও শক্তিশালী করা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। চিত্ত সংযম লাভের প্রাণায়ামই হইল প্রথম সোপান এবং 'ধ্যান' হইল শেষ। যোগিগণ

প্রদর্শিত 'ধ্যান' প্রক্রিয়া যে কত উচ্চ শ্রেণীর মানস ক্রিয়া, তাহার পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। Nerve force নিয়মিত করিতে ধ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। অবশ্য এ কথা যোগীরা বলিয়াছেন যে শোধন, হিত ও মিতাহার প্রভৃতি দ্বারা শরীর শুদ্ধি না করিতে পারিলে প্রাণায়াম এবং ধ্যানে ফল লাভ করা কঠিন।

আজকাল পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিদ্‌গণ স্বতন্ত্র পেশী (skeletal muscle) গণের উপর মানস শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া বৎসর পূর্ব্বে ইহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত "নৌলী" ক্রিয়া rectus abdominis পেশীর উচ্চতর controlএর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যোগীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরতন্ত্র পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শক্তি-লাভ করা, আর তাহা লাভের জন্য স্বতন্ত্র পেশীকে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা নিজের বশে আনয়ন করা। এই পরতন্ত্র পেশীগুলির সংযমন দ্বারা তাঁহারা colonএর peristalsis and antiperistalsis, ejaculatory ductএর পৈশিক গতি প্রভৃতির উপর control করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই উচ্চতর সংযম শক্তি লাভের ফলেই

গোস্বামী ইনষ্টিটিউট্

ব্যায়ামজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সাধারণতঃ অধিকাংশেরই ধারণা যে এই বিদ্যা পাশ্চাত্য দেশ হইতেই উদ্ভূত। Sandow প্রথমে বহু চিকিৎসকগণের সমক্ষে muscle control প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাহার পর জার্ম্মাণীর Maxick এই বিষয়ের আরও উন্নতি সাধন করেন। আরও বলা হয় যে "Perpendicular isolation of rectus abdominis" নামক control Maxickএর দ্বারা আবিষ্কৃত। অবশ্য এই মত যাঁহাদের, তাঁহারা জানেন না যে, যোগিগণ সহস্র সহস্র "উর্দ্ধরেতা" হওয়া সম্ভাবিত হইয়াছিল। এই সমস্ত উচ্চতর পৈশিক নিয়ন্ত্রণবিদ্যা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিকট এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত রহিয়াছে।

Endocrine organগুলির স্বাভাবিক কার্য্যকরী অবস্থা যে শরীর রক্ষার জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প দিন হইল জানিতে পারিয়াছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যোগীরা কিন্তু এ তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রক্তশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং কতকগুলি বিশেষ ব্যায়ামই ছিল ঐ উপায়ের প্রধান প্রধান অঙ্গ। এই ব্যায়াম-পদ্ধতির সাধারণ ব্যায়াম পদ্ধতি হইতে বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহাতে নিয়মিতভাবে পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ (alternate contraction and relaxation) করা হইত না, যেমন শেষোক্ত ব্যায়ামে করিতে হয়। কেবল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা এমন পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হইত, যাহাতে সেই অংশেই রক্ত সঞ্চরণ অধিক হয়। এই প্রকার ব্যায়াম প্রণালীতে অনাবশ্যক nerve forceএর অপচয় অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়, এবং অনাবশ্যক স্থলে
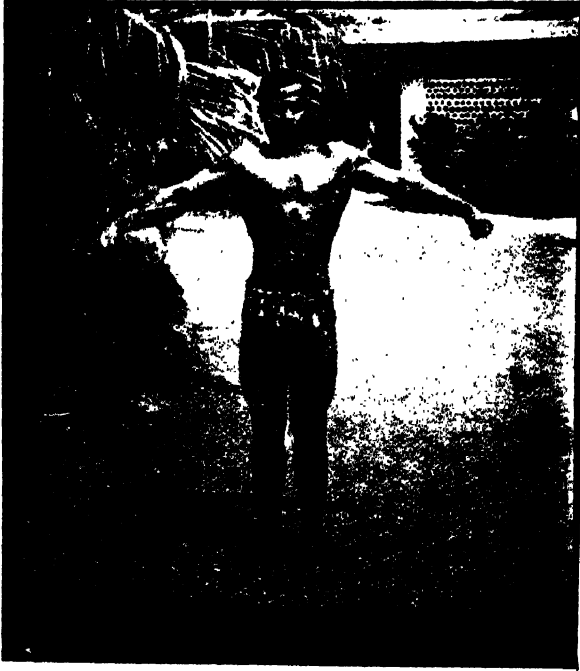
ব্যায়াম কৌশল

অধিক রক্ত সঞ্চারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। এতৎ উপায়ে spinal stimulation এবং brain stimulationও সম্পাদিত হইত। ইহা ব্যতীত venous systemএর কোন অংশে যাহাতে রক্ত সংগৃহীত না থাকিতে পারে, বরং অতি সহজেই নির্গত হইয়া যায়, তাহারও বিজ্ঞান-সম্মত উপায় এই ব্যায়াম পদ্ধতির দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগীরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল পেশীর আয়তন এবং বল বৃদ্ধিই চরম উদ্দেশ্য নয়। ব্যায়ামের দ্বারা পেশীর আয়তন ও বল বৃদ্ধি ত' হইবেই, তদ্ব্যতীত পরতন্ত্র পেশীর নিয়ন্ত্রণ, venous systemএ যথোপযুক্ত রক্ত-সঞ্চালন, brain এবং spine stimulation প্রভৃতি শারীর বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাপারগুলিও যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহার উপায় উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা করিতে হইবে। ব্যায়াম সম্বন্ধীয় এই প্রকার গভীর গবেষণা ও ব্যায়ামের এই প্রকার বিস্তৃত প্রয়োগ প্রাচীন ভারতের যোগিগণ কর্ত্তৃক সম্ভাবিত হইয়াছিল। তাঁহারা সাধারণ ব্যায়াম প্রণালীর অসম্পূর্ণ অংশ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম পদ্ধতির দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যায়াম প্রণালীর সহিত এই বিশেষ ব্যায়াম প্রণালীর বৈজ্ঞানিক সংযোগই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এবং তাহার ফলও যে কিরূপ অমৃতময় হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন কালের মানবের শারীর-মানস শক্তির পরিমাণ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অতঃপর খাদ্য সম্বন্ধে যোগীদের মত। তাঁহারা মাংস, মৎস্য ও ডিম্ব বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Animal foodএর মধ্যে কেবল দুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্যায়াম-বিদ্‌গণের সাধারণতঃ এই ধারণাই ছিল যে শরীর গঠনের জন্য মাংস বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু নব খাদ্য-বিজ্ঞানের উদ্ভবে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শরীর গঠনে মাংস একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং গঠন-কল্পে খাদ্যের protein অংশ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে পরিমাণে দৈনিক proteinএর প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হইত, তাহা যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বর্ত্তমানে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। Chittenden, Sherman, Kumagawa প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে খুব কম্ পরিমাণ protienই দৈনিক প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ শরীরের পক্ষে অপকারক। যে পর্য্যন্ত protien শরীরের প্রয়োজন তাহা amino acid গণে পরিণত হয় এবং তাহা রক্ত দ্বারা tissue সমূহে নীত হয়। অবশিষ্টাংশ কতক colonএ পড়ে এবং কতক liverএ urica আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। আর মাংস protein যে শরীর গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় সে ধারণাও সম্প্রতি দূরীভূত হইয়াছে।

এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে সব proteinএর গুণ অর্থাৎ food value সমান নহে; কারণ সব proteinএ সর্ব্বপ্রকার amino acid নাই। শরীর গঠনের জন্য যে সমস্ত amino acid গুলির প্রয়োজন তাহা যাহাতে আছে সেই proteinই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকেই complete protein বলে। যদিও মাংস complete proteinএর তাহা এই যোগিগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। মাংসে নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। আর মাংস একেবারে ঐ সকল পদার্থ বর্জ্জিত হইতে পারে না; কারণ ঐ জন্তুর শরীরে metabolismএর ফলস্বরূপ তাহা জমিবেই। আর জন্তুটী নিহত হইলে তাহার tissue হইতে সেই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হয় না, কারণ রক্ত সঞ্চালন

ব্যায়াম প্রদর্শন

গৌরসুন্দর গোস্বামী—গোস্বামী ইন্‌ষ্টিটিউটের একজন ছাত্র

অন্তর্গত এবং অন্য কোন প্রকার complete protein না পাইলে মাংস ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু মাংসের অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ অপকারক গুণ আছে, সেইজন্য তাহা আদর্শ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। আর তখন বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর আরও কতক সময় পর পর্য্যন্ত উক্ত বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না rigor mortis উপস্থিত হয়। ইহা ব্যতীত মাংসে

অপকারক নানা প্রকার bacteria, parasite প্রভৃতি অবস্থান করে। অনেকের ধারণা যে মৎস্য মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য। কিন্তু Professor Deujardin Beaumety দেখাইয়াছেন যে ইহা মাংস অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, কারণ, ইহাতে মাংস অপেক্ষা অনেক শীঘ্র পচন ক্রিয়া (putrefaction) আরম্ভ হয়। ডিম্ব মাংস এবং মৎস্য অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্য আছে এবং অবস্থা

দীনবন্ধু প্রামাণিক

বিশেষে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যোগিগণ ইহার ব্যবহারও নিবারণ করিয়াছেন। ইহা কি নিষ্কারণ? না। Intestinal floraর পরিবর্তন সাধনের জন্য অন্ততঃ কিছুকাল ডিম্বের ব্যবহারও বর্তমান নব-খাদ্য-বিজ্ঞানও নিষেধ করিতেছেন। যোগীরা অন্ত্রের ঐ প্রকার স্বাস্থ্যকর অবস্থা রাখিবার জন্য ডিম্ব ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক পাহালোয়ানগণ প্রাচীন পারস্য সৈনিকগণ, Saracenগণ, প্রাচীন Gaulগণ, Baveriaর কাঠুরিয়া প্রভৃতি যাহারা বলের জন্য অতি বিখ্যাত তাহারাও মাংস ব্যবহার করে নাই। অতএব মাংস, মৎস্য বিবর্জ্জিত আহারে যে শরীর গঠন এবং বললাভ হইবে না এই ধারণা ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ এবং যোগীরা তাহা বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

Complete proteinএর জন্য তাঁহারা দুগ্ধ এবং nutএর উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিয়াছিলেন। দুগ্ধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবলমাত্র সম্পূর্ণ protein নহে, ইহা colonএ গিয়া মাংসের ন্যায় পচে না, বরং সেখানে lactic acidএ পরিণত হয় এবং colonএর পচন ক্রিয়া (putrefaction) নিবারণ করে। সেইজন্য colon flora পরিবর্ত্তনের জন্য বর্ত্তমানে "Milk diet"এর ব্যবস্থা হইয়াছে। দুগ্ধস্থ proteinএর আর দুইটী বিশেষ গুণ আছে যাহা human nutrition-এর দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, খুব কম পরিমাণে দুগ্ধ proteinই শরীরের ওজন রক্ষা করিতে সমর্থ—প্রায় শতাংশের ৩৫ ভাগ। দ্বিতীয়তঃ, শরীর শতাংশের ৬৩ ভাগ দুগ্ধ protien ব্যবহার করিতে সমর্থ। মনুষ্য শরীর এত বেশী অন্য protien ব্যবহার করিতে পারে না। আর শরীরের বৃদ্ধির জন্য lysin নামক amino acid অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শরীর হইতে ইহা উৎপাদিত হয় না। দুগ্ধে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আছে। দুগ্ধে সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনীয় amino acidই আছে, কেবল glycocole ব্যতীত। কিন্তু সুবিধা এই যে মনুষ্য শরীর ইহা উৎপাদন করিতে পারে, সেইজন্য দুগ্ধে ইহা না থাকিলেও তাহার অভাবে কোন ক্ষতি হয় না। আর nutএর protein সম্পূর্ণ। নারিকেল, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। যোগীরা এই সমস্ত nutএরও ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন।

খাদ্যের fat অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক আমিষ fat, অপর নিরামিষ fat। মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, আর নারিকেল তৈল, জলপাইএর তৈল প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যে fatএ ভিটামিন A আছে, সেই fatই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে দেখা যায় যে nutএর মধ্যে যে fat আছে, যদিও তাহার পরিমাণ অনেক, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর নহে। ঘৃত এবং মাখনই এ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চর্ব্বি প্রভৃতিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর fat সরবরাহ করে। যোগিগণও এই কথা অবগত ছিলেন এবং প্রধান ভাবে ঘৃত, মাখন ও সরের ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছিলেন। আর carbohydratesএর জন্য যোগারা চাল, গম প্রভৃতি cereal, আলু প্রভৃতি vegetables, নানাপ্রকার ফল ইত্যাদির উপদেশ দিয়াছেন। তার পর food salt এবং vitamin সকলের জন্য কাঁচা তরিতরকারী; শাক সব্জি, ফলমূল প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যবহার উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব নব খাদ্য-বিজ্ঞানের আলোকে দেখিতে গেলে এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ খাদ্যবিজ্ঞানের উন্নত পদ্ধতি শরীর গঠন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত চক্ষুর পেশীগুলির যথোচিত চালনায় যে দৃষ্টিশক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত, এমন কি আমরণ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তাহাও দেখাইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-বিশেষজ্ঞ W. H. Bates M. D. মহোদয়ের চক্ষুব্যায়াম আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বেই যোগিগণ তাহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যোগিগণের পদ্ধতিতে এরূপ তথ্য আছে যাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে অক্ষম।

এইবার প্রাচীন ভারতের সাধারণ শারীর-সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। মাংসপেশীর আয়তন ও বলের চরম বৃদ্ধির দিকেই এই পদ্ধতি বিশেষভাবেই লক্ষ্য রাখিয়াছিল এবং তজ্জন্য কুস্তি এবং ভার লইয়া ব্যায়ামেরই ব্যবস্থা বিশেষরূপে করিয়াছিল। তদানীন্তন ব্যায়ামবিদ্‌গণ এ কথা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নানা অবস্থায় এবং নানা ভাবে পেশীর চালনা পৈশিক উন্নতির একটী অত্যাবশ্যক কথা। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক ভাবে কুস্তির প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুস্তির যে অসংখ্য কৌশলের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যে অপরকেই পরাজিত করা সহজসাধ্য ছিল তাহা নহে, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত পেশীগুলিকে যথাযথরূপে নানাবস্থায় এবং নানাভাবে পরিচালিত করা। মাংস-পেশীর উপর মানস-শক্তি প্রয়োগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতর কৌশল প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইপ্রকার বৈজ্ঞানিকভাবে পেশীর উপর মানস-শক্তির প্রয়োগের ফলে কেবল যে পেশীগুলিরই উন্নতি সাধিত হইত তাহা নহে, অধিকন্তু মস্তিষ্কেরও যথেষ্ট চালনা হইত এবং তাহার যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত হইত। যাহা হউক, এই প্রকার ব্যায়াম যে brain buildingএর অত্যন্ত উপযোগী তাহা আমরা বুঝিবার অবস্থায় আসিয়াছি।

তৎপরে পেশীর উপর যথোচিত 'resistance' প্রয়োগ, যাহা পৈশিক উন্নতির প্রধান অংশ, তাহাও ভারতীয় প্রাচীন ব্যায়ামবিদ্‌গণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং পেশীর উপর বৈজ্ঞানিকভাবে resistance প্রয়োগের জন্য নাল, মুদ্গর ও গদা সাহায্যে ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নাল লইয়া তিন প্রকার ব্যায়ামের প্রচলন ছিল, যাহা বর্ত্তমানের dumb-bell, bar-bull এবং kettle-bellএর মত। অবশ্য নাল লইয়া এমন অনেক প্রকারের ব্যায়াম ছিল যাহা পাশ্চাত্য মতে নাই। মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম ভারতের নিজস্ব এবং এখন পর্য্যন্ত পাশ্চত্য মতে ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। সেইজন্য Arthur Saxon বলিয়াছিলেন যে, মুদ্গরের দ্বারা ব্যায়াম পৈশিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা করে না। ইহা তাঁহার অজ্ঞতারই পরিচায়ক। দেবী চৌধুরী যিনি বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ভার উত্তোলন করিয়াছেন, এমন কি তাহার অর্দ্ধেকও আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যজগতে কেহ উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই—তিনি নিয়মিত মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম করিতেন এবং অত্যন্ত গুরুভার মুদ্গর উঠাইতে পারিতেন। আর গদা লইয়া ব্যায়াম বর্ত্তমানের anti-bar-bellএর মত। ভারতীয় ব্যায়ামবিদ্‌গণ পেশীর উপর যে কেবলমাত্র resistance প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু নানা ভাবে resistance প্রয়োগের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং একই পেশীর উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ resistance প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

চীনের জন-নায়ক—

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ ১৯১১ সালে চীনে গণ-তান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তার পর এতগুলি বৎসর

মার্শাল চ্যাং শপথ গ্রহণ করচেন

অতিবাহিত হওয়া সত্বেও চীনের রাজ-নৈতিক আকাশে শান্তি আর দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। নানকিংএ যে কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা কতদূর ঠিক বলিতে না পারলেও, তার বিরোধীর সংখ্যা যে কম নয়, এ' কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। এঁদের মধ্যে সকলের আগেই মনে পড়ে বিদ্রোহী সেনানায়ক ইয়েন হলী-সান এবং ফেঙ্গ যুহসিয়াং-এর নাম। সাত মাস ধরে এঁরা চীনের বুকের উপর বিদ্রোহের আগুন জেলে রেখেছিলেন। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ার তরুণ শাসক মার্শাল চ্যাং সুয়ে লিয়াংএর চেষ্টায় চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কত দিনের জন্য তা অবশ্য বলবার উপায় নেই। বিদ্রোহের আগুন যখন জলছিল, তখন তিনি কিছুতেই তার সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হ'ন নি। কিন্তু গত ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিহলী-প্রদেশ, পিকিং এবং তিয়েনসিন দখল করবার জন্য দুই দল সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর সৈন্যদল নিরুপদ্রবে পিকিং অধিকার করতে সমর্থ হয়। ফলে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহী সেনানায়কদ্বয় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আপোষের কথা কইতে সম্মত না হয়ে পারলেন না। মার্শাল চ্যাং সুয়েলিয়াং ঘোষণা করলেন, শান্তি, সংস্কার এবং গঠনমূলক শাসন-তন্ত্রই তাঁর লক্ষ্য এবং তাঁরই চেষ্টায় চীন কিছু দিন বিদ্রোহের উত্তেজনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েচে।

মার্শাল চ্যাংয়ের বয়স সবে তিরিশ; কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি সমগ্র উত্তর চীনের হৃদয় জয় করেচেন।

সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে মার্শাল চ্যাং

উপরন্তু গৃহ যুদ্ধ বিক্ষত চীনে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সম্মান স্বরূপ তাঁকে চীনে নৌবাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং বিমান

বাহিনীর সহকারী কমাণ্ডার-ইন-চীফএর পদে বরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি মার্শাল চ্যাং কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট এবং কুয়োমিণ্টাং (গণ-তান্ত্রিক) দলের প্রতিনিধিদের সম্মুখে চানের সহকারী জঙ্গী-লাট রূপে শপথ গ্রহণ করেচেন।

ব্যাঙ্কের সাবধানতা—

অনেক সময়ে মূল্যবান কাগজ ও জিনিস-পত্র বাড়ীতে রেখে মানুষ নিরাপদ হ'তে পারে না। সাধারণ ব্যাঙ্কে

ব্যাঙ্কে সতর্কতা

গচ্ছিত রেখেও অনেকের মনে ভয়-ভাবনা থেকে যায়; কারণ পাশ্চাত্যের বড় বড় সহরগুলিতে আজকাল ব্যাঙ্ক-ডাকাতিটা অত্যন্ত সুলভ হয়ে উঠেচে। এই সকল অসুবিধা দূর করবার জন্ম লণ্ডনের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তাঁদের প্রধান কার্য্যালয়ে একটী সুদৃঢ় কক্ষ নিৰ্ম্মাণ করেচেন। এই কক্ষের ভিতর-বাহির কঠিন লৌহের দ্বারা নিৰ্ম্মিত। আপনার ইচ্ছা হ'লে আপনি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রসিদ নিয়ে এই কক্ষের মধ্যে আপনার ক্যাস-বাক্স বা লোহার সিন্দুকটী রেখে আসতে পারেন। ছবিতে যে খোপগুলি দেখা যাচ্চে তার মধ্যে আপনার সিন্দুক বা বাক্স অত্যন্ত নিরাপদভাবে রাখা থাকবে। ব্যাঙ্ক থেকে আপনাকে দু'টী চাবী দেওয়া হ'বে। ইচ্ছা বা প্রয়োজন হ'লে আপনি মধ্যে মধ্যে নিজের সম্পত্তির তদারক করে যেতে পারেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-স্মৃতি—

মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে পাশ্চাত্যের যে কয়টী মহিলা মৃত্যুহীন খ্যাতি অৰ্জ্জন করেচেন, তাঁদের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম সকলের আগে মনে পড়ে।

যুদ্ধে-আহত মানুষের বন্ধুহীন, অসহায় অবস্থা কল্পনা করে নাইটিঙ্গেলের চোখে বুঝি জল আসত। তাই, ক্রিমিয়ান যুদ্ধের কোলাহল শুনতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন আহতদের সেবার জন্ম স্কুটারীর উদ্দেশে। সে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের কথা। এর পর দু' বৎসর তাঁকে

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ব্যবহৃত যান

সেখানে থাকতে হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বাহিনী স্কুটারী পরিত্যাগ করবার পর, তিনিও সেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় রুগ্ন, আহত, বিকলাঙ্গ মানুষের জন্ম তিনি কি ভাবে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন, তা আর নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই। সেই সময় নাইটিঙ্গেল যে গাড়ীখানি ব্যবহার করেছিলেন, এখানে তার ছবি দেওয়া হ'ল। নাইটিঙ্গেল গোষ্ঠীর মিঃ শোর নাইটিঙ্গেল সম্প্রতি এই গাড়ীখানি সেণ্ট টমাস হাঁসপাতালে দান করেচেন।

কচ্ছপের জন্ম-কথা—

কচ্ছপরা জলে বাস করে—এ' আমরা সবাই জানি। সুতরাং অনেকের ধারণা থাকা সম্ভব যে, জলেই তারা ডিম পাড়ে এবং সেইখানেই ডিম ফুটে শাবক জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্যের একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বলেচেন যে, কোথাও কোথাও তা সম্ভব হ'লেও সকল দেশে না কি

তা হয় না। স্ত্রী-জাতীয় কচ্ছপগুলি সাধারণতঃ ডাঙ্গার উপরেই ডিম পেড়ে যায়। একসঙ্গে তারা প্রায় পঞ্চাশ থেকে এক শ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে—এবং সেগুলি একটা গর্ত্তের মধ্যে জমা করে রেখে যায়। সাধারণতঃ নদীর চরেই তারা এ' কাজ করে থাকে। সালফ কেম্ব্রিজে এ' রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় কচ্ছপের ডিম খুঁজে বা'র করবার জন্য সেখানকার আদিম অধিবাসীরা বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত।

কচ্ছপের ডিমের আড়ত

সামুদ্রিক মৎস্য—

সমুদ্রের গর্ভে বিস্ময়ের অন্ত নেই! বৈজ্ঞানিক দল সেই বিস্ময়গুলিকে একের পর এক আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরচেন। বহু কাল আগে সমুদ্র-গর্ভে এক রকম মাছ পাওয়া যেত যা দেখতে কতকটা কাতলার মত, কিন্তু তার দেহের বর্ণ ছিল কোথাও আগুনের মত লাল এবং কোথাও শঙ্খের মত শুভ্র! উপরন্তু তার গায়ে সজারুর মত বড় বড় কাঁটা ছিল এবং কণ্টকের স্পর্শ পেলে মানুষের মৃত্যু ছিল অনিবার্য্য। সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান কালে এই শ্রেণীর জলজীব খুব অল্পই দেখা যায়। এখানে সেই মৎস্যের আকৃতি প্রকাশিত হ'ল।
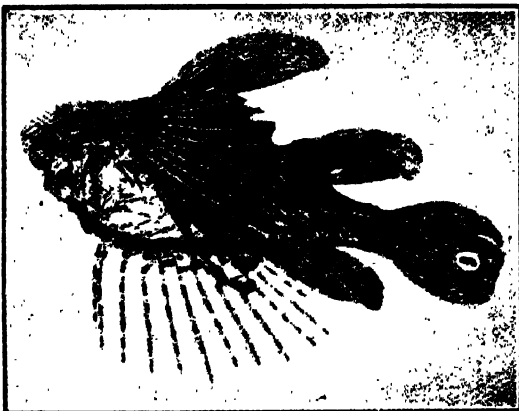
সজারু মৎস্য

জেনারেল চ্যাং কাই শেক—

চীনের জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট চ্যাং কাই শেকের পরিচয় নূতন করে বলবার আবশ্যকতা নেই। চীন গণ তন্ত্রের এই অনতিদীর্ঘ জীবনে তাঁকে এত বেশী রকম ঝড় ঝাপটা পেতে হয়েচে যে আর কোন গণতন্ত্রের সভাপতিকেই বোধ হয় তা সহ্য করতে হয় নি। জেনারেল চ্যাং-কাই শেক সম্প্রতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে খৃষ্টান হয়েছেন। সাংহাইয়ের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক

জেনারেল চ্যাং কাই-শেক ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী

সেটলমেণ্টে তাঁর শ্বশ্রূ মিসেন সুঙের বাটীতে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হয়েচে। চীনা ধর্ম্ম-যাজক রেভারেণ্ড জেড, টি, কুরাং পৌরোহিত্য করেছিলেন। এখানে জেনারেল চ্যাং এবং তাঁর পত্নীর প্রতিকৃতি প্রকাশিত হ'ল।

আবিসিনিয়ায় রাজ-অভিষেক—

সম্প্রতি খুব সমারোহের সঙ্গে আবিসিনিয়ার নূতন রাজার অভিষেক হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি ইথিও-পিয়ার সম্রাট নামে অভিহিত হ'বেন। অভিষেক-কালে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে ডিউক অফ গ্লসেষ্টার সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আবিসিনিয়ার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যা' ধারণা, তা থেকে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, সেখানকার অধিবাসীরা আজও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পড়ে আছে। কিন্তু অভিষেক উৎসব দেখে যাঁরা ফিরে এসেচেন, তাঁরা এই ধারণার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেচেন, সেখানে নূতন রাজার অধীনে নানা প্রকার অগ্রগতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠচে—বিমান-পোত এবং

আবিসিনিয়া-বাসনা

(অশ্বারোহণে ধীর কদমে বন্ধু সম্ভাষণে চলিয়াছেন, পশ্চাতে সোরার ভৃত্য)

টেলিফোন সেখানে আজ আর বিস্ময়ের বস্তু নয়। দুইজন আবিসিনিয়াবাসী বিমান-চালক হয়েচেন। নিখিলের কর্ম্ম-প্রবাহের সঙ্গে অসভ্য ইথিওপিয়াও একতালে পা ফেলে চলতে চাইচে!

আবিসিনিয়ার রাজধানী আড্ডিস আবাবায় বৃটিশ বিমান বিভাগের একটী বড় আড্ডা বসেচে। পথঘাট

আবিসিনিয়ার রাজকর্ম্মচারী

এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক না হয়ে উঠলেও সেখানকার শাসনকর্ত্তা এ বিষয়েও উদাসীন হয়ে নেই; রাজধানীর পথঘাট ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ মনোহর হয়ে উঠেছে।

খনি দুর্ঘটনা—

১৯৩০ সালের ২১শে অক্টোবরের প্রাতে হলাণ্ড সীমান্তের কাছে—আয়লাস্যাপেল নামক স্থানে এক ভীষণ খনি-দুর্ঘটনা হয়েছিল; পৃথিবীর খপর যাঁরা রাখেন, এ সংবাদও তাঁরা পেয়েচেন। খনিটী ছিল কয়লার এবং কোন জার্ম্মাণের। ২১শে তারিখে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে চতুর্দ্দিকের বাড়ী-ঘর মাটীর মধ্যে নেমে যেতে আরম্ভ করে,—সমস্ত গহ্বর-গুলি জলে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়! যাঁরা সে দেশে ছিলেন, তাঁরা বলেন এত বড় খনি-দুর্ঘটনা য়ুরোপে বহু কাল হয় নি; আশ পাশের চল্লিশ মাইলব্যাপী স্থান না কি এই বিরাট-বিস্ফোরণের ফলে ভুমিকম্পের মত কেঁপে উঠেছিল!

খনির ভিতরে তখন কাজে নিযুক্ত ছিল দু'হাজার লোক, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাদের সকলকে মাটীর নীচে সমাধি লাভ করতে হয় নি। যতদূর জানা গেছে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬২ জনকে এই দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছিল।

২৬শে অক্টোবর তারিখে—কয়লা-খনির তরফ থেকে প্রচুর সমারোহের সঙ্গে তাদের সমাধিস্থ করা হয়। শোনা যায় এক লক্ষ লোক সেদিন সেই বিরাট সমাধি-ভূমিতে সমবেত হয়েছিল।

মাটীর জঠর থেকে রত্ন আহরণ করতে গিয়ে মাটীর নীচেই তারা প্রাণ দিলে; জীবিতকালে তারা শুধু দু'হাতে ধূলো-কালিই মেখেছে,—তা'দের সমাধি-শিয়রে বাতিদানে হাজার হাজার বাতি জ্বলেছিল, কিন্তু ধরণীর সেই হতভাগা সন্তান-দল সে কথা বোধ করি জানলেও না।

খনি দুর্ঘটনা

ষ্টীমার-বাহিত সেতু—

সাত-শ' পঞ্চাশ টন ওজনের প্রশস্ত একটা সেতু—নিয়ে যেতে হ'বে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে!

সেতুর স্থান-পরিবর্ত্তন

প্রত্যেকটি অংশ খুলে নিয়ে যেতে হ'লে আবার সেটা 'ফিট' করতে হ'লে বহু সময়ের প্রয়োজন। সমস্তটাই একসঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে। প্রথমে লোকে স্থির করেছিল যে, এ আর সম্ভব হ'তে হয় না। কিন্তু এই রকমেরই অদ্ভুত একটা কাজ সম্প্রতি সম্ভব হয়েচে হলাণ্ডে।

কিজারসভিয়ার নামক স্থান থেকে ৭৫০ টন ওজনেরই একটী সেতু দুইটী ষ্টীমারের সাহায্যে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ বলেন, স্থাপত্য-জগতে এই কাজটী একটী নূতন বিস্ময়!

মনে ও বনে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

যদি চরণ বাড়া'তে হয় বনেরই পথে,—
বলো গহন মনের কথা ভুলি কি মতে !
শুধু গাছের সবুজে ভুলে ক'দিন নয়ন,
যদি পথিক কাঁদিয়া ফিরে মনের রথে ?

আছে বিপুল বিরাট সেথা বনস্পতি—
থাক্, কি লাভ কাহার বা সে কিসের ক্ষতি !
যদি না দুলে শাখায় দোলা বন-বালিকার,
নীচে মৃগীর নয়নে মৃগ না নাচে যদি !

জানি লতায় সেথায় মধু-মালতী ফুটে,
তার কোথায় সুরভি, অলি না যদি জুটে ?
যদি আদরে গলায় তারে না পরে বঁধু,
তবে বৃথায় ফুলের বুক ভরিয়া উঠে !

সেথা বিমল সরসী জলে কমল দোলে,
পাশে 'পিয়া কাঁহা পিয়া' জল-পিপিরা বোলে ;
যদি না পড়ে জলের বুকে পিয়ারই ছায়া,
তবে বিফল বিরহ কাঁদে বনের কোলে !

যবে স্তব্ধ দুপুর—ঝরা পাতাটি পড়ে—
শুনি, গাছের মাথায় নাহি শাখাটি নড়ে !
দূরে উদাস ধ্বনিটি আসে কাট্‌-ঠোকরার,
সারা কাননের কান খাড়া তারি উপরে !

রাতে চাঁদের আলোটি ঝরে পাতার ফাঁকে,
পাশে আঁধার মুরছি' মরে শাখার বাঁকে ;—
সেই ছায়ায় হাতের মাঝে হাতটি টানি'
যদি কেহ না জাগিবে, ব্যথা জানা'ব কা'কে ?

ভাবি, মন কি বনের চেয়ে কম সে গহন ?
সেথা ফুলের মাঝারে কাঁটা দ্বিগুণ দহন ;
জাগে তাপস সেথায় তবু দেবতা নিয়ে—
আমি কি করি' বিজন বোঝা করিব বহন ?

শুনি, এসেছে পথের ডাক লইতে সেথায়—
বুঝি, লোকের চোখের ভাবে, মুখের কথায় ;
আমি যেতেও রয়েছি রাজী বনেরই দিকে—
এই মনটা রাখিয়া যাই, বল্‌তো কোথায় !

মনোমোহন বসু

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ যে দেশাত্মবোধ সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়াছে, বঙ্গদেশে যাঁহারা তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় মনোমোহন বসু ছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময়ে বাঙ্গলায় যে দেশাত্মবোধ বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, ইহার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অনেকের অন্তরে তাহার বিকাশ ও পরিণতি ঘটিতেছিল। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জাতীয়তার অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা দেখা যায় মনোমোহন বসু মহাশয়ের সাহিত্য-রচনায়।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের বসু বংশ ততোধিক প্রসিদ্ধ। মনোমোহন এই বসু-বংশীয়। সন ১২৩৮ সালের আষাঢ় মাসে সোজা ও উল্টা রথের মধ্যবর্ত্তী বুধবারে নিশ্চিন্তপুরে মাতুলালয়ে মনোমোহন বসু মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। এই নিশ্চিন্তপুর গ্রাম ছোট জাগুলিয়া হইতে ষোল ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, এবং কবির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ

নাট্যকার ও হাস্যরসিক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভূমি গৌজা চৌবেড়িয়ার সন্নিকটবর্ত্তী।

মনোমোহনের পিতা ৺দেবনারায়ণ বসু কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত কোম্পানীর ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। "তাঁহা হইতেই ডাকের ঠিকা গ্রহণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয়।" মনোমোহনের জননী প্রসন্নময়ী বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ভূষিতা মহিলা ছিলেন। দেবনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে মনোমোহন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় জননী বর্ত্তমানেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহারা তিনজনই ছিলেন গৌরবর্ণ, কেবল মনোমোহন ছিলেন শ্যামবর্ণ। মনোমোহনের তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

শিশু মনোমোহন

শৈশবে পিতৃহীন মনোমোহনকে শিক্ষা দান ও 'মানুষ' করিবার ভার তাঁহার জননীর উপর পড়িল। তখনকার প্রথা ছিল—পাঁচ বৎসর বয়সে আড়ম্বর অনুষ্ঠানের সহিত শিশুর 'হাতে-খড়ি' উৎসব হইত। কিন্তু প্রতিভা সর্ব্বত্র আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা নিয়মের দাসত্ব করে না—সে আপন পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেই পথে চলিয়া যায়। কথিত আছে—অতি শিশু বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে বর্ণমালা শিক্ষা করেন; শিশু বিদ্যাসাগর পথিপার্শ্বস্থ 'মাইল ষ্টোন' দেখিয়া ইংরেজী সংখ্যা গণনা করিতে শিক্ষা করেন। মনোমোহনও 'হাতে-খড়ি'র বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে—সাড়ে তিন বৎসর বয়সেই বর্ণমালা শেষ করিয়া গুরু মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে দিগম্বর বেশে পরিধেয় বস্ত্রখানি মাথায় পাগড়ীর মত করিয়া জড়াইয়া সারি দিয়া দণ্ডায়মান পাঠশালার ছাত্রগণকে শিশু-কণ্ঠে নানা বিষয় 'ঘোষাইতেন'; এবং 'গুরু দক্ষিণা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', 'লঙ্কাকাণ্ড' প্রভৃতি পুঁথি ও গ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শিশু-কণ্ঠে এই সকল গ্রন্থের আবৃত্তি শুনিবার জন্য পুরমহিলারা ও পল্লীবাসিনীরা বসুদিগের দরদালানে অপরাহ্নে শিশুকে মাঝখানে লইয়া মণ্ডলাকারে বসিতেন। তিনি আধ আধ ভাষে পুঁথি পড়িয়া বা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন।

ছাত্র মনোমোহন

দু'একটি পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া এবং ইংরেজী 'স্পেলিংবুক' শেষ করিয়া মনোমোহন নিশ্চিন্তপুরের রাধামোহন তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়া মাতামহকে শুনাইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি নিশ্চিন্তপুরের পাঠশালায় সখের গুরুমহাশয়-গিরিও করিতেন। দশ কি এগার বৎসর বয়সে তিনি ছোট জাগুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিবার পর বার-তের বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি জেনারেল এসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে টিফিনের ছুটির সময় তিনি ছেলেদের লইয়া কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন। সাহেব অধ্যাপকরা পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা শুনিয়া মহা আমোদ করিতেন।

এই সময়ে জেনারেল এসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে একটি স্বর্ণ পদক ও কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইবে। মনোমোহন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, মনোমোহন অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর একটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। মনোমোহন ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হন, এবং প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার ওগিলভির নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রথম স্থান-প্রাপ্ত প্রবন্ধটি দেখিতে চাহেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে মনোমোহন প্রবন্ধগুলির পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। শুনা যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বিচারের ভার প্রাপ্ত হন। এই দ্বিতীয় বার পরীক্ষার ফলে মনোমোহনই পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কবি মনোমোহন

মনোমোহন বাল্যাবধি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। সে হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় মনোমোহনের সতীর্থ। মনোমোহন ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'তত্ত্ব-

বোধিনী' পত্রিকারও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। মনোমোহন যখন জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসন হইতে জুনিয়রসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বিদ্যালয়েই সিনিয়র পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ৺কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। একদা অধ্যয়নরত ছাত্র মনোমোহন কয়েকজন বয়স্য সহ গুরুদর্শনার্থ ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন। কলেজ হইতে এক প্রকার পলাইয়া তাঁহারা নৌকাযোগে কাশীতে পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া মনোমোহন গুরুর সহিত মিলিত হন। সেই বৎসর কাশীতে ৺মহাপূজা উপলক্ষে দুইটি সখের কবির দল হয়। এক দলের নাম কাশীবাসীর দল। এই দলে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় বাঁধনদার ছিলেন। অপর দলের নাম মথুরা ছাত্রের দল। এই দলের কোন বাঁধনদার ছিলেন না। এই উভয় দলে কবির লড়ায়ের প্রস্তাব হইলে বাঁধনদারের অভাবে কার্য্য পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় পরামর্শ দিলেন, মনোমোহনকে মথুরা ছাত্রের দলের বাঁধনদার করা হউক। মনোমোহনের বয়স তখন বোধ হয় ঊনবিংশ বৎসর। তিনি একে কলেজের ছাত্র, তাহার উপর কাব্যচর্চ্চায় ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। তিনি কিছুতেই গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'হাফ আখড়াই' কবি-সংগ্রামে গান বাঁধিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে সকলের, বিশেষতঃ স্বয়ং গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে গান বাঁধিতে সম্মত হন। সেই সঙ্গীত-সংগ্রামে কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্রের পরাজয় ঘটে।

"সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছন্তি
পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"

এই নীতিবাক্যের অনুসরণে কবিগুরু পরম প্রীতিভরে শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করেন যে, "দ্বাপরে অর্জ্জুনের নিকট দ্রোণ পরাস্ত হন, আর এই কলিতে আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরদিনই এইরূপ সঙ্গীত-সংগ্রামে বিজয়ী হও।"

বস্তুতঃ, মনোমোহন বাবুর উপস্থিত সঙ্গীত রচনার অসাধারণ শক্তি ছিল। বাল্যাবধি তিনি মুখে মুখে কবিতা ও গান রচনা করিতে পারিতেন। উত্তর জীবনে তিনি বহু 'দাঁড়া-কবি' ও 'হাফ-আখড়াইয়ে'র আসরে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া নিজ সম্প্রদায়কে বিজয়-শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে তাঁহার রচিত সখী সংবাদ শুনিয়া হাফ-আখড়াইয়ের প্রকাশ্য সভাস্থলেই বড়বাজারের ধনী-প্রবর সুকবি ও ভাবুক বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়ের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে দেখা গিয়াছিল। তাঁহার উস্তরী কবি গান শ্রবণে স্বর্গগত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশ্য সভাস্থলেই মনোমোহন বাবুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। মনোমোহন যাত্রা, কবি, হাফআখড়াই, পাঁচালী, বাউল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সরল, বিশুদ্ধ দেশী ভাবমূলক, দেশী সুরে রচিত, সাহেবীয়ানা-বর্জ্জিত, জাতীয় ভাব-প্রণোদিত বাঙ্গলা কবিতা রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের পর সম্ভবতঃ মনোমোহনই বাঙ্গলার শেষ কবি। স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনোমোহন-রচিত গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া "মনোমোহন-গীতাবলী" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার ভূমিকা-স্বরূপ মনোমোহন বাবু হাফ-আখড়াইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া দেন। তাহাতে, মোহনচাঁদ বাবু কর্ত্তৃক কিরূপে হাফ-আখড়াইয়ের সৃষ্টি হয়, এবং তাহা শুনিয়া ফুল আখড়াইয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার গুরু রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) মহাশয় কিরূপ সন্তোষ লাভ করিয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

পরলোকগত, শ্রদ্ধেয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন কলিকাতায় মনোমোহন বাবুদের পাড়ায় আসিয়া প্রথম বাস করেন, তখন মনোমোহন বাবু সেই উপলক্ষে একটী সুন্দর গান রচনা করেন ; তাহার প্রথম লাইনটী এই—

"চাঁদের হাট বসালে পাড়ায় গুরুদাস !"

নাট্যকার মনোমোহন

মনোমোহনের প্রধান কীর্ত্তি তাঁহার নাট্যাবলী। মনোমোহনের আদি নিবাস ছোট জাগুলিয়া বেশ বড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—বহু ভদ্রলোকের বাস তথায় ছিল। সাহিত্য-চর্চ্চা—গান, কবিতা, যাত্রা, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি ভদ্রসন্তানগণের আলোচ্য বিষয়ের নিত্য চর্চ্চার সেখানে অভাব ছিল না। মনোমোহনের বয়স যখন ৩৪।৩৫

বৎসর, সেই সময়ে ছোট জাগুলিয়ায় থিয়েটারের প্রস্তাব হয়। এই থিয়েটার করিবার উৎসাহে সেই গ্রামে ৬০০৲ টাকা চাঁদা উঠে। ইহা হইতেই সেই গ্রামের তৎকালীন সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট জাগুলিয়ার প্রস্তাবিত থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য মনোমোহন "রামাভিষেক" নাটক রচনা করেন। ইহা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কথা। থিয়েটারের জন্ত চাঁদা উঠিল, নাটকও রচিত হইল বটে, কিন্তু থিয়েটার হইল না। সেই বৎসর উড়িষ্যায় ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—সমগ্র বঙ্গে সাড়া পড়িয়া যায়। থিয়েটারের জন্য সংগৃহীত চাঁদার কিয়দংশ—প্রায় পাঁচ শত টাকা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ তহবিলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; অবশিষ্ট টাকা স্থানীয় অন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়িত হয়।

ছোট জাগুলিয়ায় না হউক, অন্যত্র 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। Indian Athenaeum পত্রে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় বৌবাজারের সখের থিয়েটারের দলের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারে এই সখের (Free) থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাটীতে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয় হইতেছিল। বহুবাজারের চুণীলাল বসু এই নাটকে নায়ীর ভূমিকা অভিনয় করিতেন, এবং বলদেব ধর অন্য ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। সেই সূত্রে ঠাকুর পরিবারের সহিত তাঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'নব-নাটকে'র অভিনয় হয়। চুণীলাল বসু ও বলদেব ধর এই অভিনয় দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু অভিনয় স্থলে যাইতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় স্থানাভাব বশতঃ তাঁহারা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। ইঁহারাই অনতিবিলম্বে বহুবাজারে সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের স্থান মিলিল, ধনী পৃষ্ঠ-পোষকও জুটিল, কিন্তু অভিনয়োপযোগী নূতন নাটক চাই যে। কবি ও হাফ-আখড়াইয়ের কবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া মনোমোহন ইতোমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বহুবাজার সখের থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দের অনুরোধে এই থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিয়া দিতে তিনি সম্মত হইলেন; এবং 'রামাভিষেক' নাটকখানি সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের দুর্গা-পূজার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শনিবারে মহাসমারোহে ইহার প্রথম অভিনয় হয়, এবং প্রতি শনিবার অভিনয় হইতে থাকে। কিছু দিন অভিনয়ের পর দুই বৎসরের জন্য এই থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন 'সতী নাটক' লিখিয়া দেন। এই নাটক লইয়া থিয়েটার আবার খোলা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুর প্রারম্ভে এক শনিবারে 'সতী নাটকে'র প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। কুচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, ছাতুবাবু, ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, চন্দ্রমাধব ঘোষ, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার নিয়মিত দর্শক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। চারি বৎসর ধরিয়া এই বইখানির অভিনয় হইবার পর মনোমোহন এই থিয়েটারের জন্য তৃতীয় নাটক 'হরিশ্চন্দ্র' রচনা করেন, এবং মহা-সমারোহে ইহার অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার অভিনয় বেশী দিন চলে নাই, কারণ, থিয়েটার ইহার অল্প দিনের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। এই থিয়েটারের পরিণামে বাঙ্গলায় পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

মনোমোহন অনেক গুলি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'রামাভিষেক' নাটক রচিত হয় সন ১২৭৪ সালে। ইহাই তাঁহার প্রথম নাটক। তাহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে 'প্রণয় পরীক্ষা' (১২৭৬), 'সতী নাটক' (১২৭৯), 'হরিশ্চন্দ্র' (১২৮৬), 'পার্থ-পরাজয়' নাটক (১২৯০), 'রাসলীলা' নাটক (১২৯৬), 'আনন্দময়' নাটক (১২৯৭), 'সতীর অভিমান' ('নাট্যমন্দিরে' প্রকাশিত), 'নাগাশ্রমের অভিনয়' (প্রহসন), রচনা করেন।

সম্পাদক মনোমোহন

ছাত্রাবস্থায় এবং তাহার পরে মনোমোহন বসু মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'প্রভাকরে' এবং অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে তিনি স্বয়ং কিছুদিন 'বিভাকর' নামে একখানি সাময়িক পত্র পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহার পর "মধ্যস্থ" নামে

একখানি মাসিকপত্র তাঁহার সম্পাদকতায় কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 'মধ্যস্থ' পত্রে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের চিত্র লিপিবদ্ধ আছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে

মনোমোহন স্বয়ং একজন বড়দরের সাহিত্যিক ত ছিলেনই, অধিকন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের তিনি ছিলেন অন্যতম। সন ১৩০৩ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একবার একটী বক্তৃতায় এক স্থলে মনোমোহনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তিনি অতি যত্নে শিশু পরিষদের ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। এমন কি, সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী রচনায় তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই সকল নিয়মাবলীর অধিকাংশ মূলতঃ মনোমোহনবাবুর স্বহস্ত-প্রসূত। 'সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠায়ও মনোমোহন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

ঔপন্যাসিক মনোমোহন

মনোমোহন বাবু একখানি মাত্র উপন্যাস প্রকাশিত করিয়াছিলেন—দুলীন। বইখানি প্রথমে 'মধ্যস্থ' পত্রে মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। পরে সংশোধিত ও সংমার্জ্জিত হইয়া গ্রন্থাকারে বাহির হয়। ইহা প্রকাণ্ড বই। এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং উপন্যাসের হিসাবে অতি সুন্দর গ্রন্থ। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার History of Bengali Literature-এ এক স্থলে লিখিয়াছেন—He (মনোমোহন) has written a meritorious Tale regarding the life of Maharaj Ranjit Singh. অর্থাৎ মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবনী-প্রসঙ্গে এখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। বস্তুতঃ এই বইখানি মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজনীতি, রাজ্যশাসন-নীতি, চতুরতা, লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতার ইতিহাসই বটে। এই একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াই তিনি ঔপন্যাসিকের খ্যাতি পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'মধ্যস্থ' পত্রে 'কুলীনচাঁদ', 'রায়জী মহাশয়' প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই।

হাস্যরসিক মনোমোহন

মনোমোহনের রচনা হাস্যরস-প্রধান। রস-রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার এক একখানি গান হাস্যরসের কোহিনূর। তদুপরি, মজলিসি লোক যাহাকে বলে তিনি তাহাই ছিলেন। মজলিসে, সভায় তাঁহার 'উপস্থিত কথায়' হাস্যরসের বন্যা ডাকিত। হাস্যরসে কে বড় এই লইয়া একবার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত মনোমোহন বসু মহাশয়ের বিনয়ের সংগ্রাম হইয়াছিল। মনোমোহন বলেন দীনবন্ধু বড়, দীনবন্ধু বলেন মনোমোহন বড়। ডাক্তার বড় না আইন ব্যবসায়ী বড় এই লইয়া একবার স্বর্গীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়েরও ঐরূপ বিনয়-সংগ্রাম হইয়াছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই চিলিয়ান-ওয়ালা সমরের ন্যায় জয়-পরাজয় অমীমাংসিতই রহিয়া যায়।

বক্তা মনোমোহন

বাঙ্গলাভাষায় মনোমোহনের বক্তৃতা-শক্তিও অনন্য-সাধারণ ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয় একবার লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গলা-ভাষায় মনোমোহন বসু অদ্বিতীয় বক্তা ছিলেন। তৎকালে "জাতীয় সভা" নামে একটি সভা ছিল। এই সভায় মনোমোহন হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। এই দুইটি বক্তৃতা পরে "হিন্দুর আচার ব্যবহার" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দু-মেলায় বিবৃত তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়া "বক্তৃতা-মালা" নামে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাগুলি জাতীয় ভাবমূলক। মনোমোহনের এই জাতীয় বক্তৃতাগুলি এমন ভাবময়ী ও ওজস্বিতাপূর্ণ যে, তৎকালে যাঁহারাই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কেবল যে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির অজস্র প্রশংসাই করিয়াছেন, তাহা নহে; বাঙ্গলা ভাষায় যে এমন সুন্দর বক্তৃতা করা যাইতে পারে তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত

হইতেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরবাবু, ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড পত্রে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি প্রাচীন ও বর্ত্তমান মনীষিবর্গ স্বীকার করিয়াছেন যে মনোমোহন বাঙ্গলা ভাষায় গভীর জাতীয় ভাবমূলক বক্তৃতা করিতে শুধু যে অদ্বিতীয় ছিলেন তাহা নহে—একপ্রকার প্রথম পথি-প্রদর্শক ছিলেন। যদি কোন দিন মনোমোহনের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে এই সকল মতামত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হয়, তাহা হইলে পাঠকবর্গ তাঁহার বক্তৃতাশক্তির পরিচয় পাইতে পারিবেন। এখানে কেবল একজনের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধার করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রঠাকুর মহাশয় একদা বলিয়াছিলেন—"* * * তিনি (মনোমোহন) হিন্দুমেলা সংক্রান্ত সভায় স্বরচিত সরস প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, তা ছাড়া, উপস্থিত-মত মনের উষ্মা মধুরাম্ল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিতেন। তিনি খুব একজন সুবক্তা ছিলেন।"

মনোমোহনের দেশাত্মবোধ

দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা এবং রাজনীতিক স্বর্গীয় গোখলে মহোদয় একদা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে What Bengal thinks to-day —whole of India thinks to-morrow অর্থাৎ আজ বঙ্গদেশ যে ভাবে চিন্তা করিবে, আগামী কল্য সমগ্র ভারতবর্ষ সেইভাবে চিন্তা করিবে। তেহি নো দিবসা গতাঃ—আজ বাঙ্গলার সে দিন অবশ্য নাই—আজ বাঙ্গলা চিন্তা-রাজ্যে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পিছাইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু একদিন যথার্থই বঙ্গদেশ দেশাত্মবোধমূলক আন্দোলনে সমগ্র ভারতের পথি-প্রদর্শক ছিল। আজ এই যে সমগ্র ভারতে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রথম সূচনা হয় বাঙ্গলায়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, "হিন্দু মেলা" কংগ্রেসের সূতিকাগার।

আর সেই কংগ্রেসের ধাত্রীরা হইতেছেন—

৺নবগোপাল মিত্র
৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৺রাজনারায়ণ বসু ও
৺মনোমোহন বসু।

ইঁহারাই Fathers of Indian Nationalism! ইঁহারাই ভারতব্যাপী দেশাত্মবোধের আদি-গুরু!

নব্যবঙ্গের অনেকেই নবগোপাল মিত্রের নাম পর্য্যন্ত জানেন না—দুঃখের বিষয়। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যে হিন্দুমেলা কংগ্রেসের সূতিকাগার—নবগোপাল মিত্র ছিলেন সেই হিন্দুমেলার প্রাণ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" গ্রন্থের ২৫৭ ও ২৫৮ পৃষ্ঠায় নবগোপাল মিত্র ও জাতীয় মেলার কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুমেলার আরও কয়েকটি নাম ছিল; যথা, চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এই মেলা হইত বলিয়া 'চৈত্রমেলা'; এখানে জাতীয়তার প্রচার হইত বলিয়া 'জাতীয় মেলা'। কিন্তু এই মেলা সাধারণে নবগোপালের চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল। আর এই হিন্দুমেলার সঙ্গে মনোমোহনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের ভাষায় শুনুন—"৺মনোমোহন বসু হিন্দুমেলার একজন উদ্যোগী ও উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। তিনি অতি সহজ ও সরস ভাষায় লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন করিতেন। তাঁর বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় অমন সহজ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে আর কাহাকেও শুনি নাই।"

মনোমোহন বাবু একবার এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"নবগোপালের সভার নাম 'National'; তাঁহার ব্যায়াম-শালার নাম 'National'; তাঁহার পত্রিকার নাম 'National Paper'; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি জীবিতাবস্থায় 'Nation'; তিনি মৃত অবস্থায় 'Nation'। তিনি স্বপ্ন দেখেন 'National'। এক কথায় তিনি জীবন্ত জাগ্রত 'National'।" মনোমোহন এই "জাতীয় মেলা"র সভাপতিরূপে প্রায়ই ভাবময়ী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া তৎকালীন চিন্তাশীল বাঙ্গালী সমাজকে মাতাইয়া তুলিতেন। কেবল বক্তৃতায় নহে—জাতীয় মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও দেশ কম মাতিয়া উঠে নাই। তিনিই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয় ভাবে উদ্বোধিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"দিনের দিন্ সবে দীন্ হয়ে পরাধীন্
অন্নভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনু ক্ষীণ।
*　　*　　*　　*"

জাতীয় শিল্প-ধ্বংসে ব্যথিত হইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম কাঁদিয়াছিলেন—

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার—
*　　*　　*
.................................।"

যে সময়ে লোকে "স্বাধীনতা" কথাটি উচ্চারণ করিতেও ভয় পাইত, সেই সময়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহস করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ?
ধর্ব্বে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ ?
—বাকল, টেনা, ডোর, কৌপীন ?"

শেষ কথা

মনোমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, বক্তৃতা, জাতীয়তা, সম্পাদকতা, হাফ আখড়াই, রসিকতা,—সকল বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার সমান স্ফুরণ হইত। তাহা ছাড়া, তাঁহার জীবনীর সহিত হাফআখড়াইয়ের ইতিহাস, বাঙ্গলার নাট্যশিল্পের ইতিহাস, জাতীয়তারও বাঙ্গলার, তথা, ভারতের দেশাত্মবোধের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এইজন্য মনে হয়, মনোমোহনের একখানি বিস্তৃত জীবনী রচিত হওয়া উচিত। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিবার অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়াছি। এখনও চেষ্টা করিলে আরও অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। ইহার পর হয় ত তাহা একেবারে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে। বিস্তৃত জীবনী সঙ্কলিত হইলে, তাহার সহিত, বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা সাহিত্যের, হাফ আখড়াইয়ের, কবির গানের, নাট্যকলার ও জাতীয়তার ইতিহাসের অনেক উপকরণ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে ; কারণ, মনোমোহনের জীবনীই বাঙ্গালী জাতির দেশাত্মবোধেরও একাংশের ইতিহাস। এই হিসাবে এই জীবনী অমূল্য।

'মনোমোহন গীতাবলী'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার কবি, হাফ আখড়াই, নাটক, বাউল, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত একত্র গ্রথিত হইয়াছে। মনোমোহন শিশুদের পাঠের জন্য পদ্যমালা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বিদ্যালয়ে পঠিত হইত, এবং ছাত্ররা ইহার কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিত। এখনও ইহার আদর হ্রাস হয় নাই। মনোমোহন বাবু যদি কেবল পদ্যমালা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, কাব্য ও সাহিত্যের অপর সকল দিক ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কবি-যশঃ একটুও ম্লান হইত না। আর, পল্লীবাসী নরনারীর পাঠের জন্য তিনি "সত্যনারায়ণ কথা" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত করেন নাই। উহা পুঁথির আকারে ছিল ; এক্ষণে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সন ১৩১৮ সালের ২১এ মাঘ (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) ৮৪ বৎসর বয়সে মনোমোহন লোকান্তরিত হন।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাদাম বোভারী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রুয়ে থেকে কুড়ি মাইল দূরে এক গ্রামে বোভারী-দম্পতী উঠিয়া আসিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের গ্রামের হোটেলে প্রথম পদার্পণ করিতে হইল। কারণ তাঁহাদের আগমন উপলক্ষে উক্ত গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ হোটেলে এক ভোজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এতদিনের একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার

গ্রামের অতিথি হইবেন, গ্রামবাসীর পক্ষে উহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তাহার উপর, ডাক্তারকে সন্তুষ্ট রাখিতে সবাই চায়।

এই সম্মানটুকু এমমার বড় ভাল লাগিল। বিশেষ করিয়া হোটেলে ভোজের সময় বসিয়ে লিওর সহিত আলাপ ও কথাবার্ত্তা এবং তাহার সুগঠিত যৌবনদীপ্ত মুখখানি এমমার অন্তর স্পর্শ করিল। পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত কথার আদান-প্রদান হইল, তাহাতে দুইজনই বুঝিল যে পরস্পরের ভাব ভাবনা ও রুচির বেশ একটা মিল আছে। এমমা যখন এই নূতন বন্ধুর সহিত আলাপে ব্যস্ত ছিল, তখন চার্লস্ সেইখানকার একজন ওষুধ বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। তাহারাও উভয়ে সানন্দে আবিষ্কার করিতেছিল যে, তাহাদেরও দুইজনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

এমমা আশা করিয়াছিল, তাহার একটী পুত্র সন্তান হইবে। কিন্তু হইল একটী মেয়ে। মেয়ের নামকরণ লইয়া এমমা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। চার্লসের দেওয়া কোন নামই তাহার পছন্দ হয় না। তোস্তে গ্রামের জমিদারের ভোজ-সভায় এমমার মনে পড়িল যে জমিদার-গৃহিণী কোন্ একটী সুন্দরী মেয়েকে বার্থা বলিয়া ডাকিয়াছিল। সেই নামই তাহার ভাল লাগিল এবং মেয়ের নাম বার্থা রাখা হইল।

শিশু-কন্যাকে লালন-পালন করিবার জন্য, সেই গ্রামের রুলে-পরিবারের গৃহিণী স্বয়ং ভার লইলেন এবং কন্যাকে সেইখানেই রাখা হইল। বোভারী দম্পতী প্রত্যহ তাহাদের বাড়ী গিয়া কন্যাকে দেখিয়া আসিতেন।

গ্রামের শেষে রুলেদের বাড়ী। এমমাকে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া যাইতে হইত। সেইজন্য চার্লস প্রায়ই এমমার সঙ্গে যাইত। একদিন কার্য্যগতিকে এমমাকে একলা যাইতে হইল। পথে লিওঁর সঙ্গে দেখা। এমমার শরীর তখনও ভাল করিয়া সারে নাই। তখনও তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা বাহির হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুশলপ্রশ্নের পর লিওঁ এমমার সহায়তার জন্য নিজের হাত বাড়াইয়া দিল। এমমা দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। লিওঁর স্বর্ণাভ কুঞ্চিত চ্ছ এমমার কেশের সহিত বাতাসে মশয়া যাইতেছিল। লিওঁর হাতের আঙ্গুলের দিকে চাহিতে এমমার নজরে পড়িল নখগুলি কি পরিষ্কার স্বচ্ছ!

এমনি প্রায়ই তাহাদের দেখা হয়। ক্রমশঃ প্রতি-দিনের দেখা-শোনা কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া দুজনার বন্ধুত্ব বেশ সহজ হইয়া আসে। লিওঁ আপনার মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখে, সে এমমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে তাহার ভয় ও সঙ্কোচ হয়। এমমাও আপনার মনে বিচার করিয়া দেখে কোথায় কি একটা পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেম করিয়া একবার ভুল করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে সন্দেহ সত্যই সে প্রেমে পড়িয়াছে কি না। সে পড়িয়াছিল প্রেম আসে বন্যার মত, একটা তুমুল তরঙ্গের মত, একটা অসম্ভব চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা; এক্ষেত্রে সেরূপ কোনও লক্ষণ ভিতরে বা বাহিরে প্রকট না হওয়ায়, এবং অপর-পক্ষের শান্ত-ভাব দেখিয়া এমমাও মনে প্রতিহত বাসনার বিক্ষোভ ভোগ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ এই বিক্ষোভ এমমার প্রতি কার্য্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকল কার্য্যে তাহার বিরক্তি। একদিন রাগের উপর সে বার্থাকে ছুঁড়িয়াই ফেলিয়া দিল। বার্থার অপরাধ সে নাকি তাহার বাপের মতই কুৎসিৎ হইয়াছে।

লিওঁও ওধারে আপনার নিরুদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল। আশঙ্কা ও আসক্তির মধ্যে অস্থির হইয়া সে স্থির করিল, এইখানেই এই ব্যাপারের যাহা হয়, একটা নিষ্পত্তি করিবে। সে প্যারীতে চলিয়া যাইবে স্থির করিল।

যাইবার দিন বিদায়-সম্ভাষণ উপলক্ষে এমমার কর-মর্দ্দন করিতে গিয়া সেই কোমল উষ্ণ করপুটের স্পর্শে লিওঁর সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেইটুকু করপুটের মধ্যে বিলুপ্ত যেন হইয়া গেল। এমমা বড় বড় চোখ দুইটী তুলিয়া একবার লিওঁর দিকে চাহিল। চোখ নামাইয়া আবার চাহিতে গিয়া দেখে, লিওঁ চলিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই রকমটী যে হইবে, তাহা এমমা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। লিওঁ চলিয়া যাইবার পর তাহার মনের অশান্তি যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলায় দুজনে সেই গ্রামের পথে একটুখানি বেড়ান, নানা বিষয়ে সেই

সব ছোট-খাটো কথা, সেই সকল কাজের শেষে প্রতিদিন দেখা, বৈচিত্র্যহীন জীবনে সেই একটুখানি নূতনত্বের আভাস, আজ এত বড় হইয়া সে দেখা দিবে তাহা এমমা ভাবে নাই।

সে আপনাকে শত তিরস্কার করিতে লাগিল—তাহারই জন্য তো লিওঁ এইরূপভাবে প্যারী চলিয়া গেল। যে প্রদীপ আর একটু বাতাসেই জ্বলিয়া উঠিত, সে কেন তাহাকে ফুৎকারে নিভাইয়া দিল?

লিওঁর চলিয়া যাইবার পর চার্লসকে দেখিলে এমমার অন্তরের বিক্ষোভ যেন আরও বাড়িয়া উঠিত। মনের দুঃখ মিটাইবার জন্য এমমা বহুকালের এক সনাতন প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্থানীয় পোষাক ও গহনা বিক্রেতার দোকান হইতে কিছু কিছু নূতন পোষাক ও গহনা কিনিতে আরম্ভ করিল। বিক্রেতা লোকটীও ছিল ভালো। সে নগদ মূল্যের জন্য কোন দাবী করিত না। বিল সব ডাক্তার মহাশয়ের জন্য জমা হইত। পুরাণো খবরের কাগজ দেখিয়া এমমা প্যারীর হাল ফ্যাসানের পোষাক তৈয়ারী করিল, চুল সেইরকম ভাবে কাটিল। প্যারীর ভবিষ্যৎ অধিবাসিনীর মত সে সাধ্যমত নিজেকে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। মাঝে খেয়াল হইল যে, সে নব্য নারীদের মত ইতালীয়ান্ ভাষা শিখিবে। কালবিলম্ব না করিয়া সে চার্লসকে দিয়া একটী ইতালী ভাষার অভিধান এবং প্রাথমিক ব্যাকরণ কিনাইল। স্ত্রীর শিক্ষা গৌরবে চার্লস উল্লসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যতই দিন যায় এমমার শরীর ততই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাও হয়। বিব্রত হইয়া চার্লস তাহার মাকে আনাইলেন। শ্বাশুড়ী আসিয়া বউএর গতিবিধি ও ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"ও সব বুঝি না বাপু—বউকে যদি খেটে খেতে হতো তাহলে এ সব ব্যায়রাম আর হতো না।" কথা বউএর কাণে গিয়া উঠিল এবং স্বাভাবিক নিয়মে শ্বাশুড়ীকে আবার স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে হইল। আপনার মানসিক ও দৈহিক ব্যাধি লইয়া এমমা আপনার কল্পনায় প্যারীর দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল।

সহসা একটী ঘটনা ঘটিল। সামান্য ঘটনা। পাশের গ্রামের জমিদার রুডলফ্ চিকিৎসার জন্য চার্লসের শরণাপন্ন হইল।

অসুখ একটু বেয়াড়া রকমের। শরীর হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া দিতে হইবে; রক্তাধিক্য বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন পিঁপড়ে কামড়াইতেছে। চার্লস অপারেশন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু 'অপারেসন' কৃতকার্য্য না হওয়ায় রুডল্‌ফ্ অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং শুশ্রূষার জন্য চার্লস্ এমমার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এমমার শুশ্রূষায় রুডলফ্ অল্পকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরাইয়া পাইলেন এবং চোখ চাহিতেই বিস্ময়ে দেখেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক অপরূপ সুন্দরী। রুডল্‌ফ্ ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মেয়েটীর মুখের দিকে আর একবার গভীর-ভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। নারী-তত্ত্ব সম্বন্ধে রুডলফের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে সেই আবহাওয়ার মধ্যে এই শুশ্রূষাকারিণীকে দেখিয়া তাঁহার যেন কোথায় কি বিসদৃশ লাগিতেছিল। এই সুদূর গ্রামে প্যারীর উদ্যানের ফুল কেমন করিয়া ফুটিল? পরিচয়ে যখন জানিলেন যে, এই নারী ডাক্তারেরই স্ত্রী, তখন রুডল্‌ফ্ অন্যান্য বহু পুরুষের মত এমমাকে অন্তরে দয়া করিতে লাগিলেন। এই মোটা কদর্য্য ব্যক্তি তিনদিন ধরিয়া যে দাড়ি কামায় নাই, হাতের নোখগুলোও কাটে না, জামায় একমাসের ঘামের গন্ধ;—আর এই নারী—সুন্দরী, রূপকলাময়ী! তার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি রুডলফকে যেন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছিল যে, সে বন্দিনী, মুক্তি চায়!

সুস্থ হইয়া সে-দিন চলিয়া আসিবার পর এমমার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য রুডলফ্ একটা কৃষি-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিল। অন্যান্য লোকদের সহিত যথারীতি ডাক্তার দম্পতীদেরও আমন্ত্রণ করা হইল।

সভার পুরস্কার-বিতরণ কার্য্য যখন হইতেছিল তখন রুডলফ্ এমমাকে লইয়া প্রদর্শনীর নানাবিধ জিনিষ দেখাইতেছিল এবং তাহারই অন্তরালে আপনার প্রেম-নিবেদনের শুভ-অবসরটুকু খুঁজিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে, তাহারা উভয়ে দেখে যে, তাহারা সভা হইতে দূরে একান্ত নির্জনতার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। কেহই তাহাতে বিস্মিত হইল না। তাহাদের দুইজনের

অন্তরের সম্মিলিত কামনাই যেন এই নির্জনতাকে রচনা করিয়াছে।

রুডলফ্ এমমার হাত চাপিয়া ধরিল। এমমা তাহাতে বাধা দিল না। এমমার দুইটী হাত যুক্তভাবে বুকে তুলিয়া ধরিয়া রুডলফ্ বলিল, "নির্জনতা এত সুন্দর আর কখনও হয় নি—তুমি, শুধু তুমি—"

ঈষৎ আনত-আননে এমমা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"তোমার পক্ষে তা হয়ত সত্য, কিন্তু কিছুদিন পরে তোমার মনেও থাকবে না যে আমার ছায়া তোমার জীবনে এসে পড়েছিল—এও তো সত্য ?"

"না, না কখনই নয়! আমার জীবনের প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তুমি সজীব হয়ে থাকবে—"

সেদিনকার এই ঘটনার পর ছয় সপ্তাহ আর তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কার্য্যগতিকে রুডলফকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়াই সে এমমাদের বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা করিতে চলিল। দেখে, এমমা এই ছয় সপ্তাহেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহারই অদর্শনের বেদনা যেন তাহাকে কৃশ করিয়া দিয়াছে। নিরুদ্ধ কামনার ধূমে তাহার আনন মলিনতর হইয়া গিয়াছে—কিন্তু নয়নে তাহার অনির্ব্বাণ বহ্নির উত্তাপ-জ্বালা যেন শত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চার্লস স্ত্রীর এই স্বাস্থ্যহানিতে সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তাই রুডলফের নিকট ডাক্তার কিরূপে পত্নীর নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করা যায়, তাহার পরামর্শ চাহিল। রুডলফ একটু ভাবিয়া বলিল, "আমার মনে হয় উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবেই এই স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। নিয়মিত অশ্বারোহণ করলে, আমার মনে হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরে আসবে—"

একটু বিব্রত হইয়া চার্লস বলিল, "কিন্তু আমাদের তো ঘোড়া নেই—"

"তাতে কি হয়েছে—আমি কিছুদিনের জন্তে একটা ঘোড়া ব্যবহার করতে দিতে পারি—"

এমমা কিন্তু তাহাতে ঘোরতর আপত্তি জানাইল। সুতরাং সেদিনকার মত আলোচনা সেইখানেই থামিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে যখন তাহারা একলা হইল, চার্লস ক্ষুব্ধ স্বরে এমমাকে বলিল, "রুডলফের ইচ্ছায় এ-রকম বাধা দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি, এমমা!"

"বাঃ! ঘোড়ায় চড়বো কি এই বেশে? এর জন্তে তো একটা আলাদা পোষাক চাই!"

"তা বেশ! আর একটা পোষাক তৈরী করে নেবে!"

যথাসময়ে পোষাক তৈরী হইয়া আসিল। চার্লস বিল সই করিল। দরজী লোকটী ছিল ভাল—টাকার জন্য তত তাগাদা করিত না, কারণ সে জানিত যত বিলম্ব হইতেছে সুদও তত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ইদানীং বিল একটু বেশী হইয়া যাওয়ার জন্য সে তাগাদার সুর একটু বদলাইয়াছে।

চার্লস স্বয়ং রুডলফকে লিখিয়া জানাইল যে, তাহার স্ত্রীর মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ঘোড়া পাঠাইয়া দিতে পারেন।

পরের দিনই সকালে রুডলফ স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া এবং সঙ্গে আর একটী ঘোড়া লইয়া উপস্থিত। এমমা নূতন পোষাক পরিয়া সানন্দে ঘোড়ায় চড়িল। রুডলফ তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিল। গ্রামের বন ছাড়িয়া তাহারা দুইজন বনের পথ ধরিল। সদ্যজাত বনকুসুমের গন্ধে এমমার অন্তরে যেন আজ শত নিষ্পেষিত কুসুম-কলি সৌরভে জাগিয়া উঠিল। এতদিন পরে যেন তাহার মনে সত্যে ও স্বপ্নে মিশিয়া এক অনাস্বাদিত রসের প্রথম স্পর্শ লাগিল। বনের মধ্যে এক নির্জন-স্থানে ঘোড়া হইতে তাহারা দুজনে নামিল। শিশির ভেজা ঘাসে পা ফেলিতে এমমার মনে হইতেছিল যে, সে যেন এক নূতন পৃথিবীর অঙ্গে আজ এই প্রথম পদার্পণ করিল।

এক শিলাসনে পাশাপাশি বসিতেই এমমার সর্ব্ব-অঙ্গে শিহরণ জাগিয়া উঠিল। রুডলফ প্রেম-নিবেদন করিল। এই ভাষা, এই ছন্দের জন্যই অন্তরের সংগোপনে এমমা এতদিন ধরিয়া বসিয়াছিল—সহসা এইরূপ ভাবে তাহারই উদ্দেশ্যে তাহা প্রযুক্ত হইতে শুনিয়া প্রথম ভয়-ভীতা বিহঙ্গমের মত তাহার অন্তরে কে যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল। অবসন্ন দেহে রুডলফের কাঁধে মাথা রাখিয়া এমমা বলিয়া উঠিল, "চুপ কর, চুপ কর—আর আমি শুনতে চাই না—"

তাহারা যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন বনের মধ্যে এক কাঠুরিয়ার কুঁড়ে ঘরে ঘন চুম্বনের অন্তরালে তাহারা শপথ করিল, তাহাদের মিলন অনাদিকালের—মৃত্যুর পরও তাহাদের আত্মা সম্মিলিত ভাবেই থাকিবে।

সেইদিনের পর হইতে প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা পত্রালাপ করিতে লাগিল। এমমা স্বামীর সহিত অশ্বারোহণে, কখনও বা একা, গ্রামের ধারে নদীর তীরে একটী নির্দ্দিষ্ট যায়গায় বালুকার মধ্যে গোপনে চিঠি রাখিয়া আসিত। প্রভাতে রুডলফ আসিয়া সেই স্থানে পত্রের উত্তর রাখিয়া যাইতেন। এমনি করিয়া চিঠির খেলার মধ্য দিয়া তাহাদের অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি ঘটিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দূর গ্রামে এক রোগী দেখিতে চার্লস চলিয়া গিয়াছে। সহসা এমমার মনে হইল, সে যদি রুডলফের বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিত!

অন্ধকারে সে কখন বাহির হইয়াছে—দূর পথে শঙ্কাকম্পিত চিত্তে সে চলিয়াছে—রুডলফের বাড়ীর দরজায় গিয়া কখন দাড়াইয়াছে! দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখে সম্মুখের ঘরে মৃদু আলোকে একা শুভ্র শয্যায় রুডলফ ঘুমাইতেছে! পথ-শ্রমে অবসন্ন দেহ শঙ্কায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

তারপর যখনই চার্লস গ্রামান্তর যাইত, এমমা রুডলফের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইত। যত দিন যায় এমমার কামনার শিখা দীপ্ততর হইয়া উঠে—কিন্তু রুডলফের পুরুষ চিত্তে নামে ক্লান্ত ছায়া। এমমা তাহা বোঝে না। এই গ্রাম ছাড়িয়া দূরে, বহুদূরে, ইতালীর সূর্য্যাকরোদ্ভাষিত চির-আনন্দের নগরীতে পলাইয়া যাইবার জন্য এমমা নিয়ত রুডলফকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু রুডলফের চিত্ত তাহাতে সায় দেয় না। অবশেষে এমমার চুম্বনের ঘন আবেদনে রুডলফ সম্মত হইল। বিশেষ করিয়া স্বামীর অজ্ঞাতসারে সে যে-সমস্ত কর্জ্জ করিয়াছিল, তাহার তাগাদায় এবং জানাজানি হইবার আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া উঠিতেছিল। কোনও কোন স্থলে তাগাদা মিটাইবার জন্য এমমা ডাক্তারের নামে কর্জ্জও গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন ধরিয়া যে-দেনা তিলেতিলে জমা হইতেছিল, তাহা একত্র হইয়া কখন যে এক বিরাট বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এমমা লক্ষ্য করে নাই। তাই এই দেনার হাত হইতে পালাইবার জন্য এমমা আরও অস্থির হইয়া উঠিল।

চার্লসের দিন কিন্তু তেমনি চলিয়াছে। পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে ইদানীং সে নিঃশব্দে গবেষণা করিতেছিল। কিন্তু গবেষণাকে যখন সে সাক্ষাৎ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেল, দেখে ফল তাহার বিপরীত হইয়াছে; এতদিন ধরিয়া ডাক্তার হিসাবে যেটুকু সুনাম সে অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তবুও তাহার আনন্দের কোথাও ব্যাঘাত নাই, তাহার পৃথিবী তেমনি স্থির আছে, যেমন সে প্রথম জন্মিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল।

পলায়নের দিন স্থির। এমমা প্রস্তুত। এক ভৃত্যের হাতে রুডলফ একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছে—"রাগ করো না এমমা···আমি তোমার সারা জীবনকে ভারাক্রান্ত করবার দায়িত্ব নিতে পারবো না······"

চিঠি পড়িয়া এমমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল—নিদারুণ এক চীৎকারে অচৈতন্য হইয়া সে পড়িয়া গেল। ছয়সপ্তাহ সে আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতির এই বিচিত্র ধারা চার্লস্ বুঝিতে পারেন না। আপনার পুরাতন ডাক্তারী বইগুলি তিনি নাড়া-চাড়া করেন, আর হতাশ হইয়া পড়েন।

এমমা সারিয়া উঠিলে চার্লস চিত্তবিনোদনের জন্য রুয়ে নগরে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। রুয়ে থিয়েটারে সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাহারা যাত্রা করিল।

রুয়ে থিয়েটারে অভিনয় দেখিবার অবসরে চার্লস এমমার জন্য কিছু খাবার আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে এমমাকে জানাইলেন, লিওঁর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে।

সহসা লিওঁর নামে এমমা সচকিত হইয়া উঠিল। সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিরুদ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"লিওঁ! লিওঁকে ভুলে গেছ তুমি বুঝি?"

এমমার বুকে কে যেন হাতুড়ির আঘাত করিতে লাগিল। মনে পড়িল—একদিন তাহারই উপর অভিমান করিয়াই তো সে চলিয়া গিয়াছিল!

দুই এক মিনিটের মধ্যে লিওঁ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিতান্ত প্রাথমিক আলাপের পর লিওঁ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে জানাইল যে, আইন-অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিশ্রামের জন্য কিছুদিন সে রুয়েতে আছে।

পরের দিন সকাল-বেলাতেই বোভারী-দম্পতীর স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু চার্লেসের অনুরোধে এমমাকে আর একদিন থাকিয়া যাইতে হইল। এমমার অন্তরে কে যেন বলিয়া উঠিল, না থাকিলেই ভাল ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় লিওঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনের অভিজ্ঞতার পাত্র হইতে দুজনেই আজ তিক্ত-কষায়-মধুর রস স্বাদ করিয়াছে। তাই আজ লিওঁর অন্তরে সঙ্কোচের বাধা নাই, কিন্তু এমমার অন্তরে আজ সন্দেহের বিড়ম্বনা। লিওঁ তেমনি প্রেম-নিবেদন করে—এমমা হাসে। বলে, আমি তো আজ বৃদ্ধা! লিওঁ শোনে না। কথা হইল গির্জ্জায় তাহারা দেখা করিবে।

সারারাত্রি ধরিয়া এমমা আপনার মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে সে লিওঁকে নিরস্ত করিবে। যাহাতে তাহারা আর পরস্পর না দেখা সাক্ষাৎ করে, সেই মর্ম্মে এমমা একখানি পত্র লিখিল। কিন্তু পত্র লইয়া যাইবে কে? এমমা মনে মনে ঠিক করিল, গির্জ্জায় গিয়া সে পত্রখানি স্বয়ং লিওঁর হাতে দিয়াই চলিয়া আসিবে।

গির্জ্জায় দেখা হইল। দেখা হইবামাত্রই সে পত্রখানি লিওঁকে দিবার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু পত্র না লইয়া লিওঁ এমমার হাত ধরিল। সম্মুখে একটি গাড়ী ছিল। গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "চল!"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে তোমার খুসী।" উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এমমা দেখে যে লিওঁ কখন তাহাকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়াছে এবং সেও উঠিয়াছে। রুয়ের রাজপথ ছাড়াইয়া গাড়ী যখন জন-বিরল প্রান্তরের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে, তখন দেখা গেল যে একটি কোমল মৃণাল হস্ত গাড়ীর পর্দ্দা সরাইয়া একটা শাদা কাগজ কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। বাতাসে কাগজের কুচিগুলি প্রান্তরের বন-কুসুমের উপর ইতস্ততঃ গিয়া পড়িতেছিল।

স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াই এমমা এক মহাবিপদে পড়িল। এতদিন যে দরজী সুদের লোভে বিল অনবরত পিছাইয়া রাখিয়া চলিয়াছিল, অতঃপর সে জানাইয়াছে সুদে আসলে টাকা না পাইলে সে আর শুনিবে না—নালিশ করিবে এবং একদিন সত্যই আট হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী লইয়া পুলিসের ওয়ারেণ্ট আসিয়া হাজির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে, আসবাব-পত্র সমস্ত নীলাম হইবে! তার পর?

এমমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। এ কি সর্ব্বনাশ! সহসা লিওঁর কথা মনে পড়িল। এ বিপদে সে কি সহায়তা করিবে না?

এমমা তাড়াতাড়ি রুয়ে যাত্রা করিল। যে উকিলের অফিসে লিওঁ কাজ করিত, সে তাহা জানিত। অফিসে ঢুকিতেই বৃদ্ধ উকিলটির সহিত দেখা হইল। বৃদ্ধ এমমাকে সাদরে অফিসে লইয়া গেল। এমমা উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধকে বিপদের কথা বলিল। কিন্তু বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার সহিত প্রেমালাপেরই আয়োজন করিতে-লাগিল।

ক্রোধে এমমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "আমার এই শোচনীয় অবস্থার সুবিধা নিতে আপনার লজ্জা হয় না?"

সেখান হইতে চলিয়া আসিতেই লিওঁর সহিত দেখা। আট হাজার ফ্রাঙ্কের কথা শুনিয়া লিওঁ বিস্ময়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি? আমি টাকা পাব কোথায়?"

সত্যকারের একটা উন্মাদনা এমমার সমস্ত দেহ ও মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রুডলফের কথা ভাবিল। শেষবার সেইখানেই চেষ্টা করিবে। কিন্তু রুডলফ নূতন করিয়া পুরাতন সম্পর্ক বাঁচাইতে রাজী আছে, কিন্তু টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রান্ত অবসন্ন পদে এমমা যন্ত্র-চালিতের মত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। চার্লস তখনও বাড়ী ফিরে নাই। এমমা আপনার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরের দিন গ্রামের চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল

বিষপান করিয়া ডাক্তারের পত্নী এমমা আত্মহত্যা করিয়াছে।

দিন তেমনি আর চলে না! চার্লস যেন সহসা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে পৃথিবীতে সে সহজ আনন্দে বিচরণ করিয়াছে, যত দিন যায়, তাহার মনে হয় সে যেন তাহার কিছুই বোঝে না। আপনার ঘরে ছোট মেয়েটিকে লইয়া সে বিস্ময়ে দিন কাটায়! কেন যে এমমা এমনি করিয়া চলিয়া গেল—সে যতই ভাবিতে যায়, ততই বুঝিতে পারে না।

সহসা একদিন পুরাতন আসবাব-পত্র ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে এক তাড়া চিঠি তাহার হাতে পড়িল। এ হস্তাক্ষর সে তো কোনও দিন দেখে নাই! এ যে এমমাকে লেখা! রুডলফের চিঠি এমমার কাছে লেখা। একখানি একখানি করিয়া চার্লস চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আর পড়িতে পারিল না। সহসা যেন জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল—তাহার বিরাট দেহ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মত পঙ্গু হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে সেইঘরে সেই চেয়ারে আসিয়া চার্লস বসিল। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কি ভাবিতে লাগিল। অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহার আঁখিপল্লব ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিল।

মাতৃহারা সঙ্গীহীন মেয়েটি খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া আসিয়া বাবাকে ডাকিল। সাড়া মিলিল না। হাত ধরিয়া টানিতেই চার্লস বোভারীর অসাড় মৃতদেহ মাটীতে পড়িয়া গেল।

বন্ধুর চিঠি

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শেল্‌ফের উপর হইতে উপন্যাসখানা টানিয়া লইতেই, তাহার ভিতর হইতে একখানা খাম বাহির হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবনীকুমারের কলিকাতা হইতে লেখা একখানা পুরানো চিঠি। উপন্যাসের চাইতে পুরানো চিঠির আকর্ষণ বেশী প্রবল বলিয়া মনে হইল,—উপন্যাস সরাইয়া রাখিয়া চিঠি খুলিলাম—

প্রিয়বরেষু,

সঞ্জীব, তোমার পত্র কয়েক দিন হয় পাইয়াছি, অথচ আজ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে নাই। আজিকার চিঠি অপ্রাসঙ্গিক কথা দিয়াই ভর্ত্তি করিব—কিছু মনে করিয়ো না।

মনটা ভালো ছিল না,—স্ত্রীকে একটি মূল্যবান উপহার দিবার মতলব করিয়াছিলাম, তাহার জন্মদিনটা আগাইয়া আসিতেছে। একটা লোককে কতকগুলা টাকা ধার দিয়াছিলাম; বহুবার তাগাদার পরে, আজ নিশ্চয় দিবে বলিয়া কথা দিয়াছিল। সেইখানে গিয়াই তাহার সহিত অল্প বিস্তর কলহ হইয়া গেল। শুনিলাম, সরকারের আদালত খোলা পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হইলে, তথায় যাইতে হইবে। শুনিয়া, আনন্দিত হই নাই;—তাহারই ফলে, যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে বলিতাম, বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে যাইতেছি, সেখানে এখন বলিতেছি, একটা লোককে কতকগুলা টাকা ধার দিয়াছিলাম!

অনেক মূল্যবান কথা, পণ্ডিতদিগের বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলাম, এই অনিত্য সংসার, এই অসার জীবন, আজ আছে, কাল নাই,—তাহারই মাঝে দুই খণ্ড তাম্র-চাক্তি, চার টুক্‌রা দস্তা ও নিকেল এবং ছাপমারা কয়েকটা কাগজের জন্য কত বন্ধু-বিচ্ছেদই না ঘটিতেছে! পরকালের জবানবন্দীতেও ইহ-কালের আদালতের জবানবন্দীর মত কত মিথ্যা কথাই না বলিতে হইবে,—সাফাই গাহিবার জন্য কত জাল জুয়াচুরী হয় ত সেখানে গিয়াও করিতে হইবে,—কিন্তু উকীল, ব্যারিষ্টার মিলিবে কি? মিলিবে নিশ্চয়ই,

নহিলে মুহুরী, নাজির, সেরেস্তাদার, পেয়াদা, ইহারা সেখানে গিয়া কোন্ কাজে নিযুক্ত হইবে?—তুমি হয় ত ভাবিতেছ, এ বছর কলিকাতাতে শীত কেমন পড়িয়াছে, বাজারে ফলমূল কেমন দেখা দিয়াছে,—এই সকল কথা না লিখিয়া, পরকালে গিয়া নাজির মুহুরীরা কোন্ কাজে নিযুক্ত হইবে, সে প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন? জিজ্ঞাসা আমি কাহাকেও করিতেছি না,—তোমাকে চিঠি লিখিতে হইবে,—অথচ এদিকে স্ত্রীর জন্মদিন ঘনাইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই টাকাটার জোগাড় করা আবশ্যক। অনেক ভাবিতেছিলাম; সহধর্ম্মিণীর উপহারের কথা সহজে ভুলিবার জিনিষ নয়, সেইজন্যই টাকার অভাবে, মনের মাঝে বিজ্ঞজনোপযোগী বাক্য সকল ধরা পড়িতেছিল। গুছাইয়া যদি লিখিতে পারিতাম, তবে হয় ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য একটা "ডাক্তার" উপাধি বরাতে জুটিত; কিন্তু সাজাইয়া গুছাইয়া দাঁড় করাইবার ক্ষমতা আমার নাই, অতএব "ডাক্তারী"র সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত নির্লোভ, এই কথা বলিয়াই সম্ভ্রম বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

তুমি জান, আমি সাহিত্যিক নই। স্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে উপহার দিই বটে, কিন্তু সাহিত্য-রচনা করি না, অর্থাৎ ও-জিনিষ আমার আসে না। তোমার সমালোচনা-প্রবৃত্তি হয় ত তীব্র হইয়া উঠিবে,—যাহা বলিব, তাহা হয় ত সত্যই তোমার আক্রমণের উপযুক্ত হইবে, কিন্তু, আর আসিব না। একদিনের উৎসাহের ঝোঁকে টাট্‌কা টাট্‌কা কয়েকটা কথা লিখিয়া ফেলিতেছি বলিয়া, এ কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই যে, গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমস্ত চিন্তাগুলা দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করিয়া তোমার কষ্টের হেতু হইব।

লোকটার ব্যবহারে সমস্ত মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অপরাহ্ণের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া উত্তেজিত মস্তিষ্কটাকে শীতল করিতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুবর উত্তমকুমারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম।

উত্তমকুমারকে বন্ধু বলিতে আমার বাধে না,—কেন, তাহার দুইটি কারণ অনুভব করিতেছি। এক, সে অত্যন্ত ধনীর সন্তান, কাজেই উত্তমকুমার আমার বন্ধু, এ কথা মনুমেণ্টের উপরে দাঁড়াইয়া, মুখে মেগাফোন লাগাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে পারি; আকাশের গায়ে গায়ে লাউড-স্পীকার আঁটিয়া দিয়ো, আপত্তি করিব না। এবং আমার কাছ হইতে টাকা লইয়া "বন্ধুবর" যে "একটা লোক"এ পরিণত হইবেন, শীঘ্র এমন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

উত্তমকুমারের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলাম। মনে হইতেছিল, সমস্ত পৃথিবীর সকল লোককে সবাই যেন বলিয়াছে, সরকারের আদালত খোলা পড়িয়া আছে, টাকা আদায় করিতে হইলে সেইখানে যাইতে হইবে।

শীতের হাওয়া কন্‌কনাইয়া আসিতেছে। জুতা, মোজা, গরম জামা, ওভারকোট, দস্তানা আঁটিয়া চলিয়াছি,—তবু যেন পোড়া শীত যাইতে চাহে না। গোটা পাঁচেক জামা, এবং সর্ব্বশেষে শালের আবরণের মধ্য হইতে উত্তম হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, বলে, "যত উদ্ভট তোমার খেয়াল, শুধু শুধু আমায় এতটা হাঁটাচ্ছ—গাড়ী করে বেরোলেই হ'ত।"

উত্তমের নিজের মোটর আছে, আমার নাই। সময়ে অসময়ে তাহারই গাড়ীতে চড়িয়া পথচারী লোকগুলার দিকে ঘৃণামিশ্রিত করুণার চক্ষে চাহিয়া দেখি;—মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেও একটা কাঁটা যেন কোথায় বিঁধিয়া থাকে।

আজ আমার অনুরোধে তাহাকে হাঁটিতে হইতেছিল। বাংলাদেশের বড়লোকের ছেলে, অতএব ঘটিটা, বাটিটা, গেলাসটার অপেক্ষা বেশী সচল নন্। তিনি যে অনুগ্রহ করিয়া শীতের বৈকালে আমার সহিত পদব্রজে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর বন্ধুপ্রীতির উদাহরণ সর্ব্বশাস্ত্রে দুর্লভ এবং উত্তমের এরূপ ত্যাগ অনন্যসাধারণ; সেইজন্য ইহার তুলনা দিতে পারিব না।

ধীরে ধীরে চলিয়াছিলাম,—উত্তম পায়ের কাছে যাহা দেখিতেছিল, তাহাতেই একবার করিয়া লাথি মারিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ফুটপাথের উপরে এক জায়গায় কতকগুলা খবরের কাগজ উঁচু করা ছিল। চলিতে চলিতে বন্ধুবর তাহাতে তাঁহার পদস্পর্শ করাইলেন—মৃদু নয়, সজোর। কাগজগুলা সরিয়া গিয়া বাহির হইল এক মনুষ্য-মূর্ত্তি—বিকল, অকেজো, ভাঙ্গা কলকারখানার মতন চেহারা,—হাত, পা, চোখ, মুখ, কান কাহারও যেন

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবার কিছুমাত্র দাবী নাই; অসংখ্য রোগের নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ বাসস্থান স্বরূপ আকৃতি।

উত্তম হাসিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! কাগজ চাপা দিয়ে মানুষ থাকে তা জান্‌তাম না,—তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল।"

কাগজের আড়াল হইতে মনুষ্য-মূর্ত্তি চাহিয়া রহিল,—বিস্মিত ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি,—তাহার কাগজপত্র গুটাইয়া লইয়া, সে যেন কোথায়ও লুকাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়, এম্‌নিতর একটা ভাব তাহার মুখের উপরে লেখা দেখিয়াছিলাম।

উত্তম কহিল, "আমাদের দেশেই এ সব চলে, বিলেত হ'লে আর দেখ্‌তে হ'ত না।—এই রোগের ডিপোকে রাস্তায় এ রকম করে' শুয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে, তাও আবার কাগজ চাপা দিয়ে—" বলিয়া সে হাসিল; তাহার পরে কহিল, "ও-সব দেশে হ'লে কবে ধরে' নিয়ে যেত,—আর আমাদের এখানে, ও নির্ব্বিবাদে রাস্তায় ঘাটে চরে' বেড়াচ্ছে! আরে ছ্যা ছ্যা, এ দেশের আবার উন্নতি আছে?"

উত্তম বিলাত যায় নাই,—ভবিষ্যতে কোন দিন যাইবে কি না, আমি জানি না। যাইতেও পারে, না ও যাইতে পারে,—কিন্তু, সে বিলাত সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। তাহার বৌদিদির ভাইয়ের মামা-শ্বশুরের ছেলের কোন্ এক বন্ধু না কি বিলাত গিয়াছিলেন;—সেই অজুহাতে, উত্তমকুমার আমাকে প্রায়ই বিলাতের কাহিনী শুনায়,—সেখানকার রাস্তাঘাটের বর্ণনা, আচার-ব্যবহারের চমৎকারিত্ব, সামাজিক রীতিনীতির সুবিস্তৃত ইতিহাস, এবং আরও যে কত কাহিনী, তাহার ইয়ত্তা নাই।

লোকটার কাগজ-চাপা দিয়া ফুট্‌পাথের উপরে শয়নের মধ্যে বোধ হয় খুব বেশী পরিমাণে হাস্যরস সংগুপ্ত ছিল, আমি সেটা ধরিতে পারি নাই। থাকিয়া থাকিয়া, উত্তম কেবলই সেই কথার উল্লেখ করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, "কাগজঢাকা দিয়ে ঘুমোন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার,—আমি কখনও শুনি নি—"

সে বিলাতের কাহিনী শুনিয়াছে, অসংখ্য প্রকারের জোগাড়যন্ত্র এবং সুবিপুল আয়োজন করিয়া লর্ড-বংশীয়দিগের খরগোস এবং শৃগাল শিকারের লোমহর্ষণকারী কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রকমের বিবরণ সে জানে; তিন-চার লাখ টাকা খরচ করিয়া ড্যান্সের ফ্লোর তৈরী করার বহু ইতিবৃত্ত তাহার মুখস্থ। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে স্যাভয় হোটেলের এক-একটা ভোজের যে সব কাহিনী উত্তম বলে, তাহা যদি তুমি শুনিতে। একাধিক গিনি মূল্যের চুরুটের সমস্ত খবর সে বলিতে পারে, কিন্তু কাগজ-চাপা দিয়া বিকলাঙ্গ, রোগের ডিপো-স্বরূপ, মনুষ্য-মূর্ত্তি পথের ধারে নিদ্রা যায়, এ রকম আশ্চর্য্য কাহিনী সে আর শোনে নাই।

মাঠের পরপারে, গঙ্গার তীর ঘেঁসিয়া রাঙা সূর্য্য অস্ত যায়,—দিনের শেষে গঙ্গার জলে স্নান করিয়া, সকল মলিনতা ধুইয়া ফেলিয়া পরদিন দেখা দিবে শান্ত সুন্দর রূপে। পৃথিবীর ধূলা বালি অতিক্রম করিয়া আমার মন ভাসিয়া যায় বহু ঊর্দ্ধে। সকল পবিত্রতার, সকল শান্তির পায়ের তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সর্ব্বদুঃখ-দুর্দ্দশার বন্ধন এড়াইয়া চাহিয়া থাকে পূর্ণ তৃপ্তিতে। গঙ্গাতীরের অস্তগামী সূর্য্যের ফিকে রাঙা আলোয় পৃথিবীর দুঃখও হঠাৎ ফিকে হইয়া আসে।

উত্তমকুমারের সগোত্রেরা মোটরে চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। অন্যান্য খাদ্যের রসদ যাহাদের প্রচুর পরিমাণে স্তূপীকৃত হইয়া থাকে, বাহিরের হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত বেশী করিয়া তাহাদেরই খাওয়া চাই;—আহার্য্যের সম্বল যাহাদের অল্প, মাঠের বাতাসে অধিকার তাহাদেরই নাই! তেলা মাথায় তেল দেওয়ার অতি সহজ উদাহরণ, অসাধারণ কিছু নয়।

সাহেব মেমের ভিড়; নিটোল, পূর্ণস্বাস্থ্য, চক্‌চকে পোষাক, চট্‌পটে চেহারা; হাসিতে, খুসীতে, বিপুল আনন্দের তৃপ্তিতে পৃথিবীকে ভরিয়া দিবে।

উত্তমকুমার সমুৎফুল্লভাবে গল্প করিয়া চলিল, "অবনী, কাল তাহ'লে আস্‌ছ?—চমৎকার হ'বে কিন্তু,—উইনপুরের কুমার আস্‌বেন, রাজকুমারী আর রাণীকে সঙ্গে নিয়ে, স্যার বিশ্বেশ্বর আর লেডী ব্যানার্জ্জি আস্‌ছেন ছেলে মেয়েদের নিয়ে, মহারাজ হীরেন্দ্রনাথ আস্‌বেন মহারাণীর সঙ্গে, কুমার প্রতাপচন্দ্র আস্‌ছেন উইথ্ ফ্যামিলী, ব্যারিষ্টার বোস্, মিত্তির, চ্যাটার্জ্জি, গুপ্ত, রায় সবাই

আস্‌ছেন, গভর্ণমেণ্টের বড় বড় অফিসিয়্যালদের প্রায় বেশীর ভাগ আর এক্সপেক্টেড্ টু কাম্,—প্র্যাক্‌টিক্যালী স্পীকিং, দি ক্রিম অভ্ দি ক্যালকাটা এ্যারিষ্টোক্র্যাসী উইল্ বি দেয়ার—" চেয়ার, টেব্‌ল, অর্গ্যান, পিয়ানো, পর্দ্দা, শাড়ী, গরদ, শাল, আলোয়ান, ক্রেপ্, সিল্ক, জুতা, মোজার একঘেয়ে কাহিনী,—সোফা, কৌচ, লাউঞ্জ চেয়ারের ইতিহাস, সিনেমা, থিয়েটার, গার্ডেন পার্টি, ড্যান্স, টেনিস্, বিলিয়ার্ডের ইতিবৃত্ত, কেক, স্যাণ্ডউইচ্, প্যাষ্ট্রী, বিস্কিট, ফ্রিটার্, জ্যাম্, জেলি, পুডিং, চকোলেটের গল্প, সোসাইটির কুৎসা ও কেলেঙ্কারীর মুখরোচক আলাপ, চোখ টিপিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া পরনিন্দা, পরচর্চ্চার কতই না ইঙ্গিত,—ইহাই সমাজ, এ্যারিষ্টোক্র্যাটিক সমাজ! —উত্তমের কাকলী অফুরন্তভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু তুমি মনে মনে যাহা বলিতেছ, তাহা, খুব সম্ভব অনুমান করিতে পারি। চিঠি লিখিতে বসিয়া যে কলগুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছি, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে আপাততঃ আমাকে ধন্যবাদ দিবে। কিন্তু মনে রাখিয়ো, আমি তোমাকে লিখিতে পারিতাম, আমার তিরিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, বড় মেয়েটা সর্দ্দিতে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে স্কুলে দিব, না আরও কিছু-কাল বাড়ীতে পড়াইব, আগামী গরমের ছুটিতে দার্জ্জিলিঙ যাইব, ইচ্ছা আছে। স্থির করিতে পারিতেছি না। ভাইপোটা এম্ এ পাস্ করিয়া বসিয়া আছে, কোনও একটা চাকরী জুটাইতে পারি নাই,—এমন কিছু ভালো পাশও করে নাই যে, সহজে প্রোফেসারী মিলিবে,—তুমি তাহার জন্য কিছু করিতে পার কি? মনে রাখিয়ো, আমি তোমাকে এ সকল কথাই লিখিতে পারিতাম; আরও লিখিতে পারিতাম, কমলালেবুর জোড়া চায় আট পয়সা, মাছের বাজার আগুন, তরী-তরকারীও বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না। এই ধরণের কথাই ত চিরকাল লিখি,—আজ যদি তোমাকে আমার চিন্তার কিছু অংশ গ্রহণ করিতে বলি, তবে রাগ করিয়ো না। সম্মুখে যদি থাকিতে, তাহা হইলে বিরামহীন আলাপের মধ্য দিয়া সকল জিনিষ সহজ হইত। কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম—

সন্ধ্যাবিহারী গাড়ীগুলার দিকে চাহিয়া দেখিলে, তাহাদের আরোহীবৃন্দের পানে তাকাইলে, হাসিভরা মুখ, এবং মুখভরা হাসি চোখে পড়িবে। মনে হইবে, মানুষের দুঃখের কাহিনী যে কবি তাহার সকল অনুভূতি দিয়া লেখে, সে ভাববিলাসী ছাড়া আর কিছু নয়;—দুঃখ জগতে আছে, থাকিবেও। কিন্তু পয়সা দিয়া যাহারা বই কিনিয়া পড়ে, এবং তাহাদের নিকট হইতে যাহারা বই লইয়া পড়িবার ছলে আর ফেরত দেয় না, এই উভয়বিধ পাঠকের কাণের কাছে কতকগুলা বাজে লোকের অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব এবং মাথার উপরকার আবরণের অভাবের কথা শুনান, কবির পক্ষে নিমকহারামী ছাড়া আর কিছু নয়। পয়সা যে দেয়, তাহার সেণ্টিমেণ্টের সুবিধা গ্রহণ করিয়া একগাদা অলীক দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া তাহার পুস্তক-পাঠের অবসর মুহূর্ত্তটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার অধিকার লেখকের নাই।

উত্তম একদিন একটা গল্প পড়িয়া বলিয়াছিল, "এ-সব বাজে কথা,—নিম্নশ্রেণীর চাইতে মধ্যবিত্তদের অবস্থা ঢের বেশী খারাপ। বাইরের চাল ঠিক রাখতে, ঠাট বজায় রাখ্‌তেই তাদের প্রাণান্ত—"

শোনা কথা।—নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধে উত্তমের অভিজ্ঞতার প্রসার যতটুকু, মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তদপেক্ষা এক তিলও বেশী নয়। সে কাহারও কাছ হইতে এই কথাটা শুনিয়া থাকিবে,—সেইটাই সুবিধামত আমার কাছে বিজ্ঞ ব্যক্তির মত মুখ করিয়া বলিয়া ফেলিল। কিন্তু আমি মধ্যবিত্তদের অবস্থা জানি। অতএব, এ কথা জানি যে উত্তমের কথা সত্য নয়,—এবং এ কথা যাহারা বলে, তাহারা হয় কিছু জানে না, নয় ত ন্যাকামি করিয়া মনকে চোখ ঠারে।—শীতের সন্ধ্যা ঘোলাটে হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিতেছে,—ওভারকোটের বোতামগুলা ভালো করিয়া আঁটিয়া দিয়া, হাত দুইটা পকেটের শেষ প্রাপ্ত পর্য্যন্ত তলাইয়া দিলাম। শালটা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া উত্তম পথ চলিতে লাগিল।

রাস্তার উপরে একটা বড় খাবারের দোকান,—তাহার বৃহৎ চুল্লীটা রাস্তার উপরেই; চুল্লীর মুখটা ফুটপাথের গায়েই;—হালুইকর উঠিয়া গেছে, উনান গেছে নিবিয়া, নীচে ছাই জমা হইয়া আছে। উনানের প্রায় গা ঘেঁসিয়া ফুটপাথের উপরে বসিয়া কয়েকজন কুলী শ্রেণীর লোক,—

তাহাদের দু'একজনের ঝুড়িগুলা কিছুদূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে চলিতে, তাহাদের একজনের গায়ে উত্তমের পা লাগিতেই, বন্ধুবর দাঁড়াইয়া পড়িলেন; বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এরা এখানে বসে' করছে কি?" তাহাদের প্রত্যেককেই উনানের গা ঘেঁসিয়া বসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে, এবং চুল্লীটার দিকে হাত-পা অগ্রসর করিয়া দিতে দেখিয়া, অনুমানে কহিলাম, "আগুন পোহাচ্ছে বোধ হয়—"

উত্তমকুমার হঠাৎ অনাবশ্যক কৌতূহলের সহিত অগ্রসর হইয়া গিয়া, জামার আস্তীনটা গুটাইয়া লইয়া, শালটা সরাইয়া, উনানের মধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া কহিল, "আগুন ত দূরের কথা, একটুখানি সামান্য আঁচও এখানে নেই—"

হাতের কাছেই কিছু কুড়াইয়া আনা খবরের কাগজ জমা করা ছিল,—তাহারই কয়েকখানা লইয়া, কয়েকজনে ফুটপাথের উপরে উনানের সহিত ঘেঁসাঘেসি করিয়া, বিছাইয়াছে।—সেই দিকে চাহিয়া বলিলাম, "না থাক্ আঁচ, না থাক্ আগুন,—তবুও ওই উনুনেরই পাশে, ওরা বোধ হয় সমস্ত রাত্তির কাটিয়ে দেবে—"

উত্তম আবার ভালো করিয়া গায়ের গরম কাপড়টা জড়াইয়া লইল; দার্শনিকের মতন গম্ভীরভাবে কহিল, "মানুষের সুখ, দুঃখ সমস্তই কল্পনায়,—আসল জিনিষ হ'চ্ছে মন,—এই মন যদি ঠিক থাকে তাহ'লেই সব হ'য়ে গেল আর কি!—ওদের মানস-লোকে আছে আগুন, বাইরের সত্যিকার আগুনের অভাব সেইজন্যেই ওদের পীড়িত করে না—"

কথা কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, ইহাদের তত্ত্বজ্ঞানগুলো ইহারা নিজেদের বেলা প্রয়োগ করে না কেন? হিসাব যাহাদের এতটা নির্ভুল, নিজেদের সম্বন্ধে এক্সপেরিমেণ্টে তাহাদের এত আপত্তি কেন?

—এক ভিখারিণী হাঁটিয়া যায়, পরিধানে অত্যন্ত মলিন, শতছিন্ন ন্যাকড়া,—গলার দুই পাশ দিয়া ততোধিক ছেঁড়া এবং তাহার চাইতেও ঢের বেশী অপরিষ্কার একটা ট্যানা সামনের দিকে ঝুলান।—সে যে মনুষ্যনামধারী কোন জীব, এ কথা ভাবিতেও অতিশয় কষ্ট হয়,—আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেও যে সেই দেশেরই সন্তান, এ কথা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন, ও আমাদিগকে হঠাৎ অত্যন্ত অপমান করিল, এবং মনটা নিমেষে উহার উপরে বিরূপ হইয়া উঠে। উত্তমকুমারের ছেলেমেয়েরা, এবং এমন কি আমার কন্যাও কচি হাতে বালা পরিয়া, গলায় হার ঝুলাইয়া, ফ্রক পরিয়া, পেরাম্বুলেটারে চড়িয়া, দাসীর তত্ত্বাবধানে হাওয়া খাইতে যায়। খুব দয়ার্দ্রচিত্ত না হইলেও অকস্মাৎ মনে হয়, ও-ও একদিন আমার কন্যার মতন আসিয়াছিল,—মানুষের সহিত মানুষের ভেদ লইয়া নয়—দু'টি হাত, দু'টি পা, আধো-আধো ভাষা লইয়া ও-ও একদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল।

চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—আমার ভ্রম কি না বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল,—রোলস্ রয়েসের লোকগুলা যেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, ট্রামের লোকগুলা যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে দেখিয়া। আমি তাহাকে কিছুই দিতে পারিলাম না,—সঙ্গে একটি পয়সাও ছিল না, তাড়াতাড়ি করিয়া বাহির হইতে গিয়া, ব্যাগটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। উত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কাছে কিছু আছে কি না,—সে কহিল, "তুমি যা তাড়া দিতে লাগলে,—জামা পরবারই সময় পাই নে, তা আবার পকেটে কিছু থাক্‌বে?"

মুখে বলিলাম, "আহা"—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মানুষের দুঃখের তিলমাত্র দূর করিবার জন্য কড়ে আঙুলটিও তুলিলাম না। নিষ্ক্রিয় সহানুভূতির দৌড় এই পর্য্যন্তই,—আর এম্‌নিতরই হয়! আজিকার পৃথিবীতে স্বার্থসর্ব্বস্ব, অত্যাচারী, পরস্বাপহারী ধনীর প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে বাদ দিলে ক্ষতি হইবে না,—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাক্যবাগীশ, নিশ্চেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন লোকগুলোকেও বাদ দেওয়া দরকার;—ইহারা, একমাত্র কথা বলা ছাড়া আর কোনও কাজেই লাগে না, এবং নিষ্ফলা সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোলমাল বাধাইয়া তোলে। আমার মনে আছে, একদিন রেলগাড়ীতে একটি অন্ধ শিশুর সহিত দু'টি হস্তবিহীন একটি ছেলে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। আমার কাছে রেলের টিকিটখানি ছাড়া আর একটি পয়সাও ছিল না।—তাহাদের সমস্ত

কাহিনী শুনিয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া, চোখের জল মুছিয়া বলিয়াছিলাম, "আমার কাছে একটি পয়সাও নেই—"

সেদিন বুঝিয়াছিলাম, হয় ত কাব্যের দিক দিয়া, কবিত্ব করার সার্থকতা হিসাবে আমার নিরুত্তম অনুকম্পার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে ইহা একেবারেই বাজে।

আজ এখনকার প্রয়োজন এমনতর ধনীর, যাঁহার বুকে থাকিবে সত্যকার অন্তঃকরণ; হাত যাঁহার উপরে উঠিবে, ভয় প্রদর্শন করিতে নয়,—অভয় দিতে। সারা বুক দিয়া যিনি অনুভব করিবেন, এবং সমস্ত হাত দিয়া যিনি কাজ করিবেন,—এবং সে হাত দুর্ব্বল, অক্ষম হাত নয়। আজ প্রয়োজন অর্থশূন্য ফকীরের নয়, আজ প্রয়োজন রাজার,—কিন্তু তিনি হইবেন ঋষি,—আজ আবশ্যক রাজর্ষির।

কিন্তু, তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, আমার চিঠি শেষ হইয়াছে কি না; যদি না হইয়া থাকে তবে আমার পত্রকে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসে পরিণত করিয়া, এইখানে ড্যাস্ দিয়া "ক্রমশঃ" লিখিয়া বাকী বক্তৃতাটা পরবর্ত্তী কিস্তির জন্য রাখিলেই হয় ত তোমার মতে ভালো হয়। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখিয়ো যে, আমিও কম আত্মত্যাগ করিতেছি না,—এই স্ফীতোদর পত্রটি তোমার নিকট পাঠাইতে হইলে সাধারণ ডাকমাশুলে কুলাইবে না, পোষ্টাফিসের লোকেরা এই সকল চিন্তা-সম্পদের যথাযোগ্য সমাদর না করিয়া ব্যবসাদারের মতন নিশ্চয়ই বেশী পয়সা চাহিয়া বসিবে!—কিন্তু আমি দু'এক আনা অতিরিক্ত টিকিটের ভয়ে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না,—ইহা কি স্বার্থত্যাগ নয়?

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়ো,—আমার নিজের সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছু লিখি নাই, এবং তোমার সম্বন্ধেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এমন কি কুশল প্রশ্নটি পর্য্যন্ত না;—আর চিঠির শেষ অবধি নিজেদের সম্বন্ধে সকল কথাই বোধ হয় অলিখিত থাকিয়া যাইবে। আজ যে বেদনায় শুষ্ক হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিল, তাহাতে নিজেদের স্থান নাই, নিজের কথা বলিবার দিন যেন আজ নয়,—ইহাকে কি তুমি ত্যাগ বলিবে না?

চাহিয়া দেখিলাম, ভিখারিণী অদৃশ্য হইয়াছে,—সে যেন হঠাৎ আসিয়া চারিদিককার বিলাস, প্রাচুর্য্য এবং অর্থাতিশয্যকে উপহাস করিয়া গেল,—যে ধিক্কার সে ইহাদিগকে দিয়া গেল, তাহার উত্তরে ইহারা যেন মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে পারিল না!

আজ দুঃখে মন ভরিয়া আছে,—পৃথিবীর সকলের দৈন্য ব্যথা আজ যেন আমার বলিয়া মনে হইতেছে,—অন্য দিন এমনটি হয় না। কোন কেরাণীকে বাড়ী ফিরিতে দেখিলে মনে হইতেছে, ইহার বাড়ীতে কত অভাব, কত কষ্টে এ দিন চালায়, আমাদের অভাব ইহার তুলনায় কত কম, অথচ প্যান্‌প্যানানির আমাদের সীমা নাই। নিজের মন আজ ভালো নাই, তাই এমনতর বোধ করিতেছি, কাল উত্তমকুমারের গার্ডেন-পার্টিতে যাইব সাজিয়া গুজিয়া, কাল আর এ সব কথা মনে থাকিবে না, আজ তাই সদ্যসদ্য কথাগুলা তোমার নিকটে লিখিয়া ফেলিলাম।

রাস্তা দিয়া প্রত্যহই চলি, কখনও গাড়ীতে, কখনও হাঁটিয়া,—কিন্তু বড়লোকদেরই দেখি রোজ, আজ নীচু দিকে চোখ পড়িতেছে।

বাড়ী ফিরিলাম। কাল্‌কের গার্ডেন-পার্টির সাজ-পোষাকের এবং গৃহিণীর শাড়ী, জামার রঙ্ ও গহনার বিশেষত্বের আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক-একবার ফুটপথের উপরকার কাগজ-চাপা দেওয়া লোকটার কথা, উনানের পাশের কুলীগুলার কথা, ভিখারিণীর কথা মনে পড়িতেছে; কিন্তু কাল উত্তমকুমারের উৎসব চলিবে জাঁকাইয়া, সেই প্রচুর আনন্দ ও অফুরন্ত হাস্য-কোলাহলের মাঝখানে কি ইহাদিগকে মনে রাখিব?

উন্মেষ

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

অজন্মা, অশেষকর্ম্মা, গড়িয়া চলেছ নিরন্তর
কি প্রতিমা নিরুপমা বর্ণচিত্রে ফুটায়ে অন্তর !
একে মিলাইয়া অঙ্গে ভেঙ্গে যেন গড় বারবার ;
পূর্ণ হবে কবে ছবি, শিল্পী কবি, এ কিগো অপার !

আমার অন্তরে আমি প্রতিপলে করি অনুভব—
ভাঙ্গিয়া গড়িছ মোরে সম্ভবিয়া যাহা অসম্ভব।
দূরে বহুদূরে কোথা আমার সে মূর্ত্তি পুরাতন !
হে আমার নিত্য স্রষ্টা, নব চেতনার আয়তন
আপনি প্রসার লভি আরও যে নূতন হতে চায়,
বিকশে প্রাচীন দৃশ্য বিশ্বকে জড়ায়ে নিয়ে গায়।

কত জীর্ণ বাসনার কঙ্কালে সঞ্চারি নব প্রাণ,
অজানা চেতনা দিয়ে জাগাইছ আমায় মহান্।
যাহা ছিল অন্ধকার আজি তার অঙ্গে ঝলে ভাতি,
ছিল তুচ্ছ, ছিল ক্ষুদ্র, আজি তারা অনন্তের সাথী।

আলো ছিল মনোরম সীমা-বাঁধা দিগন্ত-অঙ্গনে—
উষার স্পন্দনে আর সুরঞ্জিত সন্ধ্যার নন্দনে ;
কোথা ছিল দীপ্তিবিশ্ব আঁধারের গুহায় গুহায় ?
কিরণে করুণাবাণী—অমানিশা পোহায় পোহায়।

সুপ্তি নাই স্বপ্ন নাই জাগরণে তরঙ্গ-চঞ্চল
বহে আকাঙ্ক্ষার ধারা কলস্বরে ধ্বনিয়া মঙ্গল ;
কাল নাই, দেশ নাই, নাই শেষ ; আদি ও উদ্ভব,
অফুরন্ত জীবনের আনন্দের অমিত উৎসব।

জানা দিয়ে প্রাণে বাঁধা, ওগো তুমি মধুর অজ্ঞেয়,
ক্ষুদ্রকে করিছ ভূমা চিত্তভূমে ওগো অপ্রমেয়।
অল্পে নাই সুখ, সে ত মিথ্যা ভ্রান্তবাদ ;
ক্ষুদ্রে মিলাইয়া ক্ষুদ্র বাঁধিছ অপার পারে বাঁধ।

ব্যথিত রোদনে সিক্ত যত চিত্ত আছে ওগো প্রিয়,
আমার এ ক্ষুদ্র চিত্তে নিত্য নিত্য প্রেমে বেঁধে দিও।
বেদনে রোদনে ঝরা অমৃতে হৃদয় যাবে ভেসে,
বিন্দু বিন্দু মিলে সিন্ধু উথলিবে তোমার অশেষে।

এস কাঁচা কচি হাসি, যৌনসুখে মুগ্ধ তোরা যারা,
দীনের সেবায় যারা ঢালিতেছ করুণার ধারা ;
রুগ্ন ভগ্ন মুমূর্ষু যে অশ্রু ফেলে ধরণী ভাসাও,
আমার অন্তরতম কামনায় আপনা মিশাও।
সাজায়ে পূজার থালা পাদ্য অর্ঘ্য করিব রচনা,
বিশ্বে বেঁধে আমা সাথে বিশ্বনাথে করিব অর্চ্চনা।

হে অমৃত, বিকশিত আনন্দে বা বেদনে জ্বালায়
প্রাণের কুসুম বিশ্বে, গেঁথে দাও গলার মালায়
জগতের প্রাণপুষ্পে বিমোহিয়া আমার সৌরভে।
ছুটে যাব নিত্য নব বিকাশের অশেষ উৎসবে।

সাময়িকী

সমুদ্র-পারের কোলাহল—

আমাদের মনে হয় গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সমগ্র জগতের সম্মুখে বৃটীশরাজনৈতিকগণ দেখাইতে পারিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের মধ্যে অদৃশ্য ভবিতব্যতা লইয়া কিরূপ শোচনীয় ভাবে আত্মকলহে মগ্ন; এবং তাঁহারাই যখন তাঁহাদের সমস্যার কোনও আপোষ-মীমাংসা করিতে অসমর্থ, তখন ইংরাজের কি অপরাধ? যে উদ্দেশ্যে বৈঠকের অধিবেশন বসিল, তাহার কোনও উল্লেখ নাই, আলোচনার কথা তো দূরে থাকুক, শুধু সাব-কমিটীর উপর সাব-কমিটী গড়িয়া উঠিতেছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র আকাশ বাতাস আজ সাম্প্রদায়িক কলহে মুখরিত। ইহা কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসা না হওয়ার ফলে, বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে স্বভাবতই বৃটীশ-রাজনৈতিকদের পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করার দায়িত্বও অপস্থত হইয়া যাইবে। সারা ভারতবর্ষ হইতে টিকি ও টুপী বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে?

পরম দুঃখের বিষয় যে, এই টিকি ও টুপীর লড়াইএর জের সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে এদেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং নানা সভাসমিতি এবং ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া বাদানুবাদ ও চুলচেরা শাব্দিক ভাগ-বাঁটোয়ারার মধ্যে ভারতেও সাম্প্রদায়িক কলহের একটী সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্ট হইতেছে। একদিকে হিন্দু মহাসভা আর একদিকে ফজলুল হক-গজনভীর দল ভবিষ্যৎ ভারতের সমস্ত দায়িত্বের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সমগ্র ভারতবাসীর হইয়া আজ সাম্প্রদায়িক কলহে লিপ্ত হইতে চলিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা আজ কারারুদ্ধ। কংগ্রেস এই বৈঠক সম্বন্ধে নির্লিপ্ত, কারণ তর্ক করা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া জনসাধারণের অন্তরের পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, আজ কংগ্রেসের এই নির্লিপ্ততার সুবিধা লইয়া সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প আবার ভারতের আকাশকে ছাইয়া ফেলিতে চলিয়াছে—হিন্দু-ভারত ও মোছলেম-ভারতের কাল্পনিক ভৌগলিক সীমা-রেখা এই তেত্রিশ কোটী হিন্দু-মুসলমানের ভারতবর্ষের স্বরূপকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। গোলটেবিল বৈঠকে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা নিরপেক্ষ ভাবে সমাধানের ভার বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উপর দেওয়া হউক! প্রহসনকে আরও ব্যাপকভাবে হাস্যকর করিয়া তুলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে! কোনও লণ্ডন, অথবা কোনও জেনেভার ক্ষমতা নাই যে, এই সমস্যার সমাধান করে। জেনেভা হইতে বলিয়া দিলেই হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভবপর একমাত্র তাহাদেরই স্বদেশে, তাহাদেরই স্বগ্রামে, তাহাদেরই প্রতিদিনের কর্ত্তব্যের মিলনের ও সংঘর্ষের মধ্য-দিয়া; কোনও বাহিরের সালিশীর ফলে অন্তরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না;—অন্তরের পরিবর্ত্তন হয় সাক্ষাৎ মিলনে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া, জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া; এবং এই দুই শ্রেণীর মিলিত কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়াই একদিন এই সমস্যার সমাধান হইবে। কংগ্রেস এই মিলিত কর্ম্ম-সাধনার আদর্শকেই তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সমাধান করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাঙ্গলার নিভৃত-পল্লীর এক কোণে করিমুদ্দীন মিঞা যদি শাঁখের আওয়াজ শুনিয়া হরি মণ্ডলকে মারিতে আসে, অথবা হরিমণ্ডল যদি করিমুদ্দীন মিঞার ছায়া মাড়াইলে অশুচি মনে করে—লীগ অব নেশনস্ তাহার কি করিবে? লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়া রাজা-রাজড়ার তর্ক-সভার সিদ্ধান্তই বা তাহার কি

করিবে? যদি কোনও দিন এ সমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইবে শুধু কর্ম্মের মধ্য দিয়া পরস্পরের পরিচয়ে, বহুদিনের মিলিত কর্ম্ম-সাধনা ও জ্ঞান-সাধনার ফলে; এবং তাহা সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ নহে, তাহা কর্ম্ম ও সময়-সাপেক্ষ। তর্কে ইহার আশু মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা শুধু আজ ইহাকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিতেছি; এবং যে অধিকারের জন্য আমাদের এই সংগ্রাম, তাহাই বিস্মৃত হইতেছি। স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতির জন্যই গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন—হিন্দু মুসলমান-সমস্যা সমাধানের জন্য নয়! আর যাঁহারা আজ গোলটেবিল বৈঠকে গিয়াছেন, অথবা যাঁহারা আজ টেলিগ্রামে সংগ্রাম করিতেছেন, এই সমস্যা সমাধানের কোনও দায়িত্ব তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের সহায়তার বাহিরে এ সমস্যার সমাধান হইতেছে, যেখানে একই লাঠির আঘাতে একই হাসপাতালে পাশাপাশি শয্যায় হিন্দু মুসলমান দুইজনেই শয্যাগ্রহণ করিতেছে,—একই কারাগারে যেখানে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি কক্ষে কারা-প্রবাস যাপন করিতেছে, একই দুর্ভিক্ষ, একই অনশনে-অর্দ্ধাসনে যেখানে তাহারা একসঙ্গে মৃত্যুর আশঙ্কায় দাঁড়াইয়া আছে। এ সমস্যার সমাধান লণ্ডনে নয়, জেনেভায় নয়; যদি হইতে হয়, এই গঙ্গা যমুনা-নর্ম্মদার তীরেই হইবে;—শিক্ষিত লোকের তর্ক-যুদ্ধের ফলে নয়—অশিক্ষিত লোকের শিল্প-সাধনা ও কর্ম্ম-দীক্ষায়।

পরাধীন ভারতে আর ফিরিব না—

মওলানা মোহাম্মদ আলী যখন গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, হয় আমি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লইয়া ফিরিব, নতুবা দাস ভারতে আর পদার্পণ করিব না,—তখন কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে সফল হইয়া উঠিবে। গত ৪ঠা জানুয়ারী লণ্ডনে যুদ্ধ-ক্ষেত্র-রত সৈনিকের মত মওলানা মোহাম্মদ আলী পরিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসে তিনটী মৃত্যু চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে; একটী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের; মরণের সহিত বিবাহের জন্যই তিনি বরবেশে সজ্জিত হইয়া হাস্য-কৌতুকের মধ্যে যাত্রা করেন,—আর একটী মৃত্যুর সাক্ষী হিমালয়ের বরফ-চাপা পাথর, আর এই মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু।

এই আকস্মিক শোক-সংবাদে আজ ভারতের সকল শ্রেণীর লোকই ব্যথিত হইয়াছেন—কারণ একদিন ছিল যখন মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই বিনা দ্বিধায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেদিন মহীয়সী মহিলা বি আম্মা বেগম দুই সন্তানের সহিত মহাত্মা গান্ধীকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া, নারী হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এক নূতন সুরের প্রবাহ আনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মোহাম্মদ আলী পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত হন। যদিও শেষদিকে তাঁহার পন্থা অন্যান্য সহযাত্রীদের সহিত পৃথক হইয়া যায়, তবুও ভারতের এক বিরাট অংশের উপর তাঁহার প্রভাব বিশেষভাবেই ছিল—এবং পন্থা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ হইতে শেষকালে বিচ্যুত হন নাই।

গত ৩০শে ডিসেম্বর লণ্ডনে তিনি এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন—"I am still alive, see,—and I can continue working to bring Hindus and Muslims together"—"দেখছেন, আমি এখনও জীবিত আছি এবং হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের জন্য আমি এখনও চেষ্টা করবো।" বস্তুত, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন-কামনাই ছিল তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। হিন্দু-জনসাধারণের উপর আর কোনও মুসলমান নেতার এরূপ প্রভাব ছিল না।

মৌলানা মোহাম্মদ আলীর পিতা ছিলেন রামপুর ষ্টেটের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। বড় ভাই শওকৎ আলীর বয়স যখন দুইবৎসর এবং মোহাম্মদ আলী যখন একান্ত শিশু, সেই সময় তাঁহাদের পিতা পরলোক গমন করেন। বিধবা জননী দুইটী সন্তানকে স্বয়ং লালন-পালন করেন এবং তাঁহাদের সমস্ত শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় মুসলমান সমাজে ইংরাজী-শিক্ষাকে হারাম বলিয়া বিবেচনা করা হইত; কিন্তু আলী জননী দুইটী সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় ভূষিত করিবার মানসে নব-প্রতিষ্ঠিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেখানকার শিক্ষা

সমাপ্ত করিয়া মোহাম্মদ আলী বিলাত গমন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানকার উপাধি গ্রহণান্তর তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লিন্‌কন্‌স্ ইনে যোগদান করেন। ১৯০২ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরোদা সিভিল সার্ভিসে অহিফেন-বিভাগে তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। সেখানকার কাজ ইস্তফা দিয়া তিনি সাংবাদিকের কাজ বাছিয়া লন এবং কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ "Comrade" বাহির করেন। Comardeএর সম্পাদক রূপে সংবোদিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ভারতের চারিদিকে, এমন কি ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। পরে তিনি হামর্দ্দ বলিয়া উর্দ্দু পত্রিকাও বাহির করেন। সাংবাদিক রূপে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নাম ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিকরূপেই উচ্চারিত হয়।

মহাযুদ্ধের সময় মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধ শক্তি তুরস্কের স্বপক্ষে আন্দোলন করার অপরাধে আলী ভ্রাতৃদ্বয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নজরবন্দী হন। ১৯১৫ সালে তাঁহারা নজরবন্দী হন এবং ১৯১৯ সালে ২৫শে ডিসেম্বর রাজকীয় ঘোষণা উপলক্ষে কারামুক্ত হন। কারামুক্ত হইয়া তিনি খেলাফৎ আন্দোলনের জন্য তুমুলভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং খিলাফতের ব্যাপার লইয়া তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এই খেলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন এবং করাচীতে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। মওলানা মোহাম্মদ আলী যখন ১৯২৩ সালে কারাগারের বাহিরে আসিলেন, তখন মহাত্মা গান্ধী কারাগারে। মহাত্মা গান্ধীর অবর্ত্তমানে মোহাম্মদ আলী মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ভারতময় প্রচার করিয়া বেড়ান। এই সময়ে তিনি বলেন যে, 'ভারতময় ভ্রমণ করিয়া আমি শুধু অন্বেষণ করিতেছি—যারবাদা কারাগারের দ্বার খোলবার চাবী কোথায় আছে!" ১৯২৪ সালের কোকোনদ কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হন।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে জঘন্য অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে, তাহা আশা করা যায় রূপান্তর গ্রহণ করিবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই আলোচনা-সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। মওলানা মোহাম্মদ আলী এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-সমাধানের চেষ্টায় দেহত্যাগ করিলেন—তাঁহার মৃতদেহের সম্মুখে ভারতীয় প্রতিনিধিরা কি এমনি কলহ করিবেন?

কবি একবালের সাম্প্রদায়িকতা—

এলাহাবাদে নিখিল ভারত মোসলেম লীগের সভাপতি-রূপে বিখ্যাত কবি ডাঃ একবাল যে বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, "সোণেকি হিন্দুস্তানে"র কবি তাঁহার সোণার ভারতকে কর্দ্দমে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতে-ছেন। আজ চারিদিকে যখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার জন্য হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভারতের পরিকল্পনা নব-জাতীয়তার মূলে শক্তি যোগাইতে বারে-বারে ব্যর্থ-কাম হইতেছে, তখন ভারতের একজন বিখ্যাত কবির মুখ হইতে সাম্প্রদায়িক আদর্শের এরূপ ব্যাখ্যা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ডাঃ একবাল তাঁহার বক্তৃতায় ইসলামের সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বলৌকিকতার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ঘোষণা করিয়া-ছেন যে—"পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান লইয়া একটী ভারতীয় মোসলেম ষ্টেট সংগঠন করাই মুসলমানদের সর্ব্বশেষ ভবিতব্যতা বা কর্ত্তব্য!" ইস্‌লামের মানবতার নীতির দোহাই দিয়া ডাঃ একবাল বলিতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমানদের বর্ত্তমান জাতীয়তার প্রতি ঝোঁক তাহার মানবতার বিরোধী। মানবতার যাহা আদর্শ, তাহাতে ভূগোলিক সীমানার কোনও বন্ধন নাই; কোনও বিশেষ কর্ম্ম, গোষ্ঠী বা স্বার্থের সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা তাহাতে নাই। সকল বিভিন্ন স্বার্থের কল্যাণকর সমন্বয়ের উপরই মানবতার আদর্শ স্থাপিত। ডাঃ একবাল নিশ্চয়ই সে মানবতার কথা বলেন নাই; কারণ তাহা হইলে তিনি ভারতকে দুই খণ্ডে পৃথক করিয়া ভারতীয় মুসলমান-দের জন্য নূতন করিয়া মোসলেম-ভারত-ষ্টেট গঠনের কথা বলিতে পারিতেন না। ডাঃ একবাল ইস্‌লামিক ঐক্যের এক নূতন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিতে চান যে, যে সমস্ত দেশে ইসলামধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকিবে, ইসলামের

ঐক্য-বিধানের জন্য সেই সমস্ত দেশকেই ইসলাম-ধর্ম্ম মানিয়া লইতে হইবে—নতুবা সেই সমস্ত দেশ মুসলমানদের স্বদেশ হইতে পারে না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে হয় ত কোনও বিজয়ী আরব সেনানায়ক এ কথা ভাবিতে পারিতেন; কিন্তু বিংশ-শতাব্দীতে যখন মুসলমানদের বিভিন্ন দেশে খৃষ্টান-রূপ বিধর্ম্মীর পদানত হইয়াই থাকিতে হয়, তখন একজন ছন্দ-বিলাসীর মুখে এ কথা মোটেই মানায় না। চীন, রুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ইসলামধর্ম্মাবলম্বী বহু সহস্র লোক আছে;—কিন্তু তাহারা কোনও দিন ভাবে না যে চীন, তাহাদের স্বদেশ নয়, চীনা ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে অন্ধ গোঁড়ামীর এইরূপ অভিব্যক্তি আর কোনও দেশের ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদের আছে বলিয়া জানা নাই। আর এ কথাও সত্য নয় যে, ভারতে যে সমস্ত মুসলমান আছেন, তাঁহারাই একমাত্র ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী, আর অন্য দেশের মুসলমানেরা ইসলামধর্ম্মাবলম্বী নয়! ডাঃ একবালের এই বক্তৃতার সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের কোনও যোগ আছে কি না জানি না; কিন্তু তাঁহার এই সাম্প্রদায়িকতার অভিনব ব্যাখ্যা তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীদেরও মনে আঘাত দিয়াছে। মৌলানা ইয়াকুব হাসান মাদ্রাজের এক জনসভায় বলিয়াছেন, "যে সমস্যা-সমাধানের জন্য আজ সমগ্র ভারত উদ্‌গ্রীব, স্যার একবালের বক্তৃতা সেই সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহাকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। * * * ডাঃ একবাল যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া যদি হিন্দুরা শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের দোষ দিবার কিছুই নাই।"

—

পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য—

দক্ষিণেশ্বরে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে পণ্ডিত মতিলাল অনেক সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহার পুত্রবধূর কারাদণ্ড হওয়ায় পৌত্রীর তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি বাধ্য হইয়া, সম্পূর্ণ নিরাময় হইবার পূর্ব্বেই এলাহাবাদ গমন করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট অন্তরের প্রার্থনা জানাই যে, পণ্ডিতজী তাঁহারই আশীষে শীঘ্রই নিরাময় হইয়া উঠুন। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের কথা বলিতে গিয়া পণ্ডিতজীর অন্তরের কথা কল্পনায় ভাসিয়া উঠিতেছে। যে পরিবারের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার কাহিনী একদিন ভারতের সীমা ছাড়াইয়া দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছিল, আজ সেই পরিবারের এ কি অপূর্ব্ব আত্মদান! ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে এইরূপ একটী পরিবারের এইরূপ সমগ্র আত্মদানের কাহিনী বিরল। বিরাট আনন্দ-ভবন আজ স্বরাজ-ভবন, জাতির সম্পত্তি; পুত্র আজ কারাগারে, পুত্রবধূ কমলা তিনিও আজ স্বামীর পদাঙ্ক-বর্ত্তিনী হইয়া ছয়মাসের জন্য কারারুদ্ধ! স্ত্রী, কন্যা সংগ্রামের অন্যতম অধিনায়িকা—এমন কি পুত্রবধূর জননীও আজ কারারুদ্ধ। জগতের ইতিহাসে এই অপূর্ব্ব অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। এইস্থানে আর একটী সংবাদও দিতেছি। জননায়ক শ্রীযুক্ত পেটেল মহোদয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে কারামুক্ত করা হইয়াছে; কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মালব্যজীকে ঐ কারণে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

—

গান্ধীবাদ নিপাতে যাউক—

—মিঃ গান্ধী বলিয়া যে ব্যক্তিটী আজ সবরমতী আশ্রমে কারারুদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এবং তাহার অনুচরবর্গের বাজে ভণ্ডামির উত্তরে মাঝে মাঝে বৃটীশ সরকার সান্ত্বনাপূর্ণ করুণার আশ্বাস-বাণী ভারতবাসীকে শুনাইয়াছেন। তাহাতে এই সমস্ত গান্ধীর অনুচরদের মধ্যে একটা লোভ দেখা দিয়াছে এবং তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, বৃটীশ-সরকারকে ভয় দেখাইয়া, তাহারা তাহাদের বাসনা মত ইংরাজ-অধিকৃত এই ভারতবর্ষকে আবার নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবে।

কিন্তু আজ এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, করুণার আশ্বাস বাণীর কোনও প্রয়োজন নাই; এই সমস্ত গান্ধী-ভক্তদের স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া উচিত যে, ভারতে এমন কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, যাহা ইংরাজ অর্জ্জন করে নাই; এবং যাহা ত্যাগ করিলে শ্বেত দ্বীপের অঙ্গে আঘাত লাগে, এমন কোনও ত্যাগের দ্বারা মহানুভবতার পরিচয় দেওয়ার অহেতুক স্পৃহাও ইংরাজের নাই।

আর তাহার সঙ্গে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া দরকার, গোলটেবিলের পুতুল খেলায় যাহা হইতেছে বা যাহা হইবে, তাহা শুধু খেলার সামিল। ভারতের শাসন-তন্ত্র নড়াইবার বা বদলাইবার বিন্দুমাত্র অধিকার গোল-টেবিল বৈঠকের নাই।

আজ দীর্ঘ যুগ ধরিয়া ইংরাজ আপনাদের অসামান্য ত্যাগ এবং শক্তির বলে ভারতে সুশৃঙ্খলা আনিয়াছে এবং আজ যদি ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কাল এই তেত্রিশ কোটী লোক আপনাদের মধ্যে মারামারি করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। প্রমাণ, চীন!

সোণার ভারতে আজ যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী ইংরাজ সরকার নয়; গান্ধীর-মত-বাদ পুষ্ট কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিকের দুর্বুদ্ধির ফলেই আজ ২০ হাজার ভারতীয় প্রজা বৃটীশের কারাগারে বন্দী-জীবন যাপন করিতেছে; অনেকে উত্তেজনার মাথায় শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইয়া পুলিস ও সৈন্যের লাঠীর ও গুলীর আঘাতে আহত হইয়া পড়িতেছে।

ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। যদি ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রথম অনুকম্পার দৃষ্টিতে এই সমস্ত বিপ্লবীদের অগ্রাহ্য না করিয়া, ভারতের জন-সাধারণের বৃহত্তর শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের কঠোর-হস্তে দমন করিতেন, তাহা হইলে আজ এ সমস্ত প্রশ্নই উঠিত না। যেদিন লাহোর-কংগ্রেসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, যেদিন সেখানে ইউনিয়ান জ্যাক পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, সেইদিনই কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত ছিল; উহার তথাকথিত নেতাদের ধরিয়া নির্ব্বাসন দেওয়া উচিত ছিল। গান্ধী যে-দিন আইন-ভঙ্গ করিবার দম্ভ প্রকাশ করেন, সেইদিনই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আজ এই সহস্র সহস্র নিরীহ ভারতীয় প্রজাকে কারাজীবন যাপন করিতে হইত না।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন গোলটেবিলের মধ্য দিয়া আর কোনও বিপদ না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। সামান্য কিছু অধিকার পাইলেই, ভারতীয় বিপ্লবীরা তাহার সাহায্যে আরও অধিকতর দাবী করিবে। অন্যায় লোভীর দাবীর সীমা নাই। সেইজন্য আজ সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। একদিন যাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে, তাহার শক্তি-বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? আজ হউক, কাল হউক, গান্ধীবাদকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে। বিড়ালের মাংস দিয়া ব্যাঘ্রের ক্ষুধা কি মিটে? সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বরের মাথার মুকুটে যে কোহিনূর জ্বলিতেছে, তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার কোনও বাসনা ইংরাজের নাই।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা আমাদের কথা নয়, ইংলণ্ডের একটী শক্তিশালী রাজনীতিক-দলের পক্ষ হইতে মিঃ চার্চ্চিল গোলটেবিল বৈঠক-ওয়ালাদের কাণের কাছে স্পষ্ট বিশুদ্ধ ইরোজী ভাষায় প্রকাশ্য সভায় ইহা শুনাইয়া দিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের উক্তিতে হয়তো সমুদ্রের এ-পারে কেহ কেহ মর্ম্মাহত হইতে পারেন, সমুদ্রের ও-পারে হয়ত বৈঠক-ওয়ালারা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই সত্য, নির্ভীক ও স্পষ্ট উক্তির দ্বারা মিঃ চার্চ্চিল যথার্থই ভারতের উপকার সাধন করিতে চান। এ বিষয়ে আর যাহারই সন্দেহ থাকুক, আমাদের কোনও সন্দেহ নাই যে, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার ন্যায় স্পষ্টবাদী ইংরাজ রাজনৈতিকগণ সত্যই ভারতের বন্ধু! তাঁহারা মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন, কোন বৃথা আশ্বাস বাণী প্রচার করেন নাই!

পরলোকে বিনয় বসু—

কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএর ভয়াবহ ও শোচনীয় বৈপ্লবিক কাণ্ডের অন্যতম অনুষ্ঠাতা এবং ঢাকায় লোম্যানের হত্যাকারী বলিয়া অভিহিত বিনয় বসু গত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহত্যাগ করিয়াছে। আত্মহত্যার জন্য গুলীর দ্বারা মস্তকে আঘাত করার ফলে, গুলী তাহার মাথার খুলি ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। যতক্ষণ সে বাঁচিয়াছিল, মগজ নাকি চুয়াইয়া পড়িত।

মৃত্যুর আগের দিন বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা বাবু রেবতী বসু এবং বৃদ্ধা মাতা হাসপাতালে মরণ-পথ যাত্রী পুত্রকে দেখিতে যান। এক ঘণ্টা তাঁহারা অচৈতন্য পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া পুত্রের প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন। মাতা-পিতার সে ব্যাকুল আহ্বানে পুত্র সাড়া দিতে পারে নাই। শুধু একবার মাত্র পুত্র ডান হাতখানি কপালে

ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধ হয় জনক-জননীর নিকট পুত্রের সেই শেষ-নমস্কার-প্রচেষ্টা।

শনিবার সকাল-বেলা বিনয় বসু মৃত্যুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করে। রাত্রি দশটার সময় পুলিস দাহের জন্য মৃতদেহ আত্মীয়স্বজনের নিকট সমর্পণ করে। শীত-রাত্রির জন-বিরলতার মধ্যে, পুলিস-প্রহরী বেষ্টিত হইয়া, কচিৎ বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সহিত শবদেহ শ্মশানে আনীত হয়। তাহার পরই ভস্মাবশেষ। এই সকল বিপ্লবী কাজে যে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

—

কর্ণেল সিমসনের হত্যার জের—

কলিকাতা লাটসাহেবের দফতরে কর্ণেল সিমসনের হত্যাকাণ্ডের পর উক্ত বিল্ডিংয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে; পশ্চিম দিকের সিঁড়ি ছাড়া আর সকল সিঁড়িতে সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে কেহ প্রবেশ-পত্র ছাড়া উপরে না যাইতে পারে, এজন্য প্রত্যেক সিঁড়ি ও লিফটে সার্জ্জেণ্ট পাহারা বসানো হইয়াছে। নীচেতলায় বাহিরের লোকের অপেক্ষা করিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ও ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই ব্যাপার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছেন। কাহারও দেখা করিবার প্রয়োজন থাকিলে তাঁহাকে একখানা কাগজে নাম ঠিকানা, এবং সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়া দিতে হইবে। সাক্ষাতের অনুমতি হইলে তবে উপরের তলায় সাক্ষাৎ-কারীকে লইয়া যাওয়া হইবে। যাঁহারা অবিরত রাইটার্স-বিল্ডিংএ কার্য্যগতিকে যাইতে বাধ্য হন্, তাঁহাদিগকে একখানা করিয়া প্রবেশ-পত্র দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

—

ভারতের নূতন বড়লাট—

সারা বৃটীশ-সাম্রাজ্য খুজিয়া অবশেষে লর্ড উইলিংডন লর্ড আরউইনের পদের উত্তরাধিকারীরূপে সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন! আগামী মার্চ্চ মাসে লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড উইলিংডন ভারতে আসিয়া সম্ভবতঃ ১লা এপ্রিল হইতে বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

লর্ড উইলিংডনের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ১৯১৩ সালে ইনি বোম্বাইএর গভর্ণর হইয়া ভারতে আসেন। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করার পর পুনরায় তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ৯২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত প্রদেশের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে ১৯২৬ সালে তিনি কানাডার গবর্ণর জেনারেল হইয়া কানাডায় গমন করেন। লর্ড উইলিংডন বংশমর্য্যাদার দিক দিয়া অলিভার ক্রমওয়েলের বংশধর। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর।

—

ব্রহ্মদেশে সশস্ত্র বিপ্লব—

গত ২২শে ডিসেম্বর সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, থারাওয়াডী প্রদেশে এক সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিয়াছে। বিপ্লবী দল দুরধিগম্য জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া প্রথমে জিএাগ্রাম এবং ওয়েরো নামক দুইটী গ্রাম আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে বনবিভাগের এন্‌জিনীয়ার মিঃ ক্লার্ক বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। বিপ্লবীরা তাঁহার বাংলা পুড়াইয়া দেয়; এবং অস্ত্রশস্ত্র যাহা পায়, তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় হাজার বলিয়া অনুমান। তাহারা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া অর্থ অপেক্ষা বন্দুক এবং যুদ্ধের অস্ত্র সংগ্রহেই অধিক মনোযোগী। দুই তিন স্থলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিসের সাক্ষাৎ সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। সিউ কাইলন নামক একজন সান দলপতি এই বিপ্লবদলের নেতা বলিয়া প্রকাশ। বর্ম্মার রাজা হইবার বাসনায় নাকি এই ব্যক্তি বহুদিন হইতে আলথাউং পর্ব্বতের দুরধিগম্য প্রদেশে সংগোপনে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিল। বৃটীশ-সৈন্যরা প্রথমতঃ এই বিপ্লবীদের আড্ডাস্থলের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই। দুই এক স্থলে খণ্ডযুদ্ধের ফলে বহু বিপ্লবী আহত ও মৃত হয়। ২রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটীশ সৈন্যবাহিনী দুরধিগম্য জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আলথাউং পর্ব্বতের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা দখল করে এবং তাহা পুড়াইয়া দেয়। এই স্থলে সংঘর্ষের

ফলে সতেরো জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছে এবং নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকাশ যে, দলপতি সানকাউলনও নাকি আছে। বহু ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিপ্লবের অন্যান্য কেন্দ্রেরও খবর পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, বিপ্লব অচিরাৎ একেবারে প্রশমিত না হইলেও, স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড উৎপাত হইবার সম্ভাবনা আছে।

—

পাঞ্জাবে লাটের উপর গুলি-বর্ষণ—

লাহোরে ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণকালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঞ্জাবের গভর্ণর এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্‌সেলর মহোদয়ের সভাপতিত্বে কন্‌ভোকেসন উৎসব হইয়াছিল। কনভোকেসন উৎসব শেষ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর যখন মোটরে উঠিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় জনতার ভিতর হইতে তাঁহার উপর এই ঘৃণিত আক্রমণ হয়। প্রথম গুলীটি গিয়া লাগে দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের হাউস সার্জ্জেন মিস্ ম্যাকডোরসেটকে। পরবর্তী দুইটী গুলী স্যার জিওফ্রের অঙ্গে গিয়া লাগে। এই সময় ইন্‌স্পেকটর বুধসিং এবং সাব-ইন্‌স্পেক্টর চরণসিং আততায়ীর দিকে ধাবমান হন। তাঁহারাও গুলীর দ্বারা বিদ্ধ হন। তিকি থানার সাব ইন্‌স্পেক্টার মেহতা দেওয়ানচাঁদ পাহারায় ছিলেন। তিনি জীবন বিপন্ন করিয়া আততায়ীর উপর লাফাইয়া পড়েন এবং দুইটী গুলি এড়াইয়া তিনি আততায়ীকে ধরিয়া ফেলেন। সাব-ইন্‌স্পেক্টর চরণসিং গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। অন্যান্য আহত ব্যক্তিরা সকলেই ক্রমশ সারিয়া উঠিতেছেন। আততায়ীরূপে ঘটনাস্থলে যে ব্যক্তি ধৃত হয়, তাহার নাম হরিকিষণ। সে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মারধানের অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ। এই ব্যাপারে পাঞ্জাবের নানাস্থানে গ্রেফতার এবং অনুসন্ধান চলিতেছে; হরিকিষণ অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

—

পুরাতন বাঙ্গালা সংবাদপত্র—

আমাদের তত্ত্বাবধানে পুরাতন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণের মধ্যে কাহারও নিকট যদি ১৮৫৮ অব্দের পূর্ব্বের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকা থাকে, অথবা তাঁহাদের জানাশুনা কাহারও নিকট থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে দয়া করিয়া সংবাদ দান করিলে আমরা সেই সকল খণ্ড পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিব। বাঙ্গালা-দেশের সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ একটু তৎপর হইলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে।

সাহিত্য-সংবাদ

—নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী—

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক 'কারাগার'—১৷৹

শ্রীবিমলা দেবী প্রণীত গল্পের বই 'চিত্রলেখা'—৷৷৵৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পলাসীর মোহনলাল'—৸৹

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মহারাজ নন্দকুমার'—১৷৹

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'সাধনা ও পরমানন্দ'—১৲

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দে প্রণীত উপন্যাস 'অভিশপ্ত'—১৷৹

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত নাটিকা 'রক্তপর্ণা'—।৹

শ্রীহৃষীকেশ বিশ্বাস প্রণীত 'সরল এস্‌রাজ শিক্ষা' ১ম ভাগ—১৲

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সঙ্গীত-মুকুর' ২য় ভাগ—৸৹

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন প্রণীত 'জ্যোতিষ যোগ-তত্ত্ব' ২য় ভাগ—১৷৹

শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল'—২৷৹

শ্রীমৎ বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত'—৪৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.
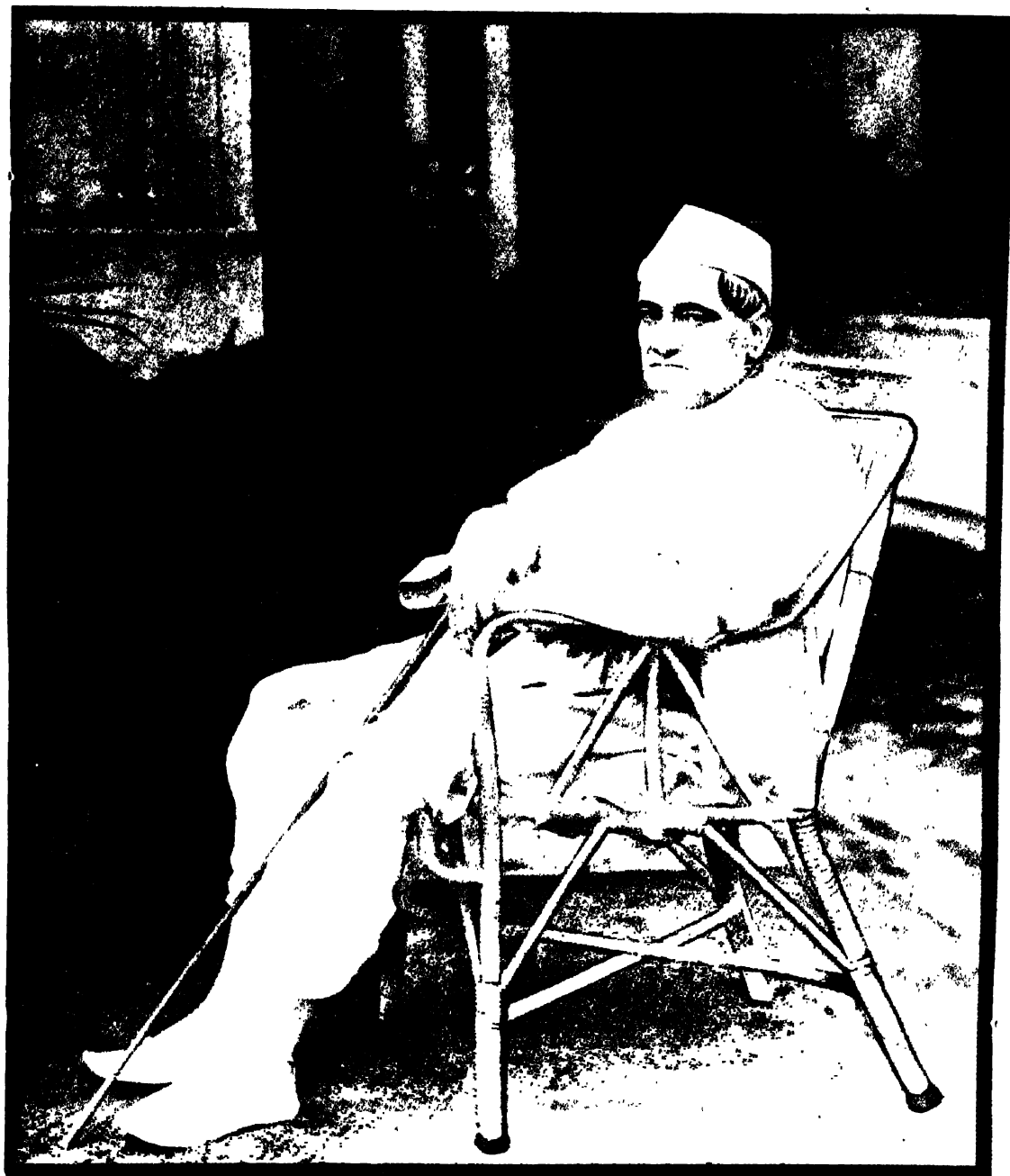
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

ফাল্গুন—১৩৩৭

দ্বিতীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { তৃতীয় সংখ্যা

মধু ও কৈটভ

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

জড়, প্রাণ ও অন্তঃকরণের রাজ্যে তপস্যার আসন যে কোথায় কি ভাবে আস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সকল পদার্থের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধ্য দিয়া তপঃশক্তির চেহারাখানি আমরা বেশ ভাল মতে দেখিতে পাই। সে স্বাভাবিক ধর্ম্মটি হইতেছে, বস্তুর স্থিতি-স্থাপকতা—ইংরাজিতে যেটিকে বলে Elasticity। জড় পদার্থে এই ধর্ম্মটির পরিচয় খুব স্পষ্ট, কিন্তু জড় ছাড়া অন্য পদার্থেও এ ধর্ম্ম রহিয়াছে। একটা রবারের বল জোরে টিপিয়া ধরিলে সঙ্কুচিত হইয়া যায়; চাপ সরাইয়া লইলে আবার সেই বল আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া যায়। স্থিতি-স্থাপকতার এই একটা স্পষ্ট উদাহরণ। সকল জিনিষেই এই ধর্ম্মটি কিছু না কিছু রহিয়াছে। এ ধর্ম্মটি আর কিছুই নয়, বস্তুর নিজস্ব সত্তা ও রূপটি বজায় রাখিবার প্রয়াস। কোন আগন্তুক কারণে সেই নিজস্ব সত্তা ও রূপটি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে, বস্তুর ভিতরে এমন একটি স্বাভাবিক প্রেরণা ও বন্দোবস্ত দেওয়া আছে, যার ফলে বস্তু সেটিকে সহজে নষ্ট হইতে দেয় না, কথঞ্চিৎ নষ্ট হইলেও সেটিকে আবার স্বভাবে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। বস্তু নষ্ট হইতে পারে দুই রকমে—বস্তুটি থাকিয়াও যদি তাহার কার্য্যকরী শক্তি চাপা বা ঢাকা পড়িয়া যায়, তবে তার ফলে

বস্তুটি থাকিয়াও না থাকার সামিল হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে বস্তু শক্তির প্রতিরোধ, অর্থাৎ, বস্তুটির আবরণ হইল। অথবা অন্য রকমেও বস্তু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বস্তুটির যদি বিকৃতি অথবা বৈরূপ্য ঘটে, তবে আমরা বলি বস্তুটি নষ্ট হইয়া গেল। বস্তুর এই আবরণ ও বিক্ষেপ আমাদিগকে আলাদা করিয়া বলিতে হইতেছে বটে, কিন্তু মূলে ব্যাপারটা একটি কথাতেই বলিতে পারা যায়—অন্যথা ভাব; বস্তুটি যে রকম ছিল এখন আর সে রকম নাই। আবরণ হইলেও এই কথা, বিক্ষেপ বা বিকৃতি হইলেও এই কথা। শাস্ত্রকারেরা এই দুটিকে আলাদা করিয়া বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আসলে এই দুইটা হইতেছে, একই ব্যাপারকে দুই দিক্ দিয়া দেখা। যেখানে মধু সেইখানে কৈটভ, একজন ছাড়া অপরে থাকে না। জড়ে, প্রাণে ও অন্তঃকরণে এই দৈত্য-যুগলের প্রাদুর্ভাব কখনও বেশী, কখনও কম সর্ব্বদাই রহিয়াছে। সে প্রাদুর্ভাবের ফলে সকল বস্তুই নিজের স্বাস্থ্য ও স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবার মত হয়। কিন্তু সে দৈত্য-যুগলকে বাধা দিবার মত একটা স্বাভাবিক শক্তিও প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে রহিয়াছে। সেই স্বাভাবিক শক্তি হইতেছে তপঃশক্তি। যোগ-নিদ্রায় মগ্ন বিষ্ণুর নাভি কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দৈত্য-যুগলের আবির্ভাব হওয়ায় সব নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইল। তখন সব রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মাকে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সে উপায় আর কিছুই নয়, তপস্যা। ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হরণ করিলেন; বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আবার তখন স্বভাবে ফিরিয়া আসিল; রবারের বলের উপর হইতে যেন চাপটা সরিয়া গেল।

তপঃশক্তির মোটামুটি বিবরণ আমরা লিখিলাম বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে একটা সূক্ষ্ম কথা সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ফলে সকল জিনিষের ভিতরেই মধু-কৈটভ এবং তপঃশক্তি রহিয়াছে বটে, এবং তাদের পরস্পর সংঘর্ষ চলিতেছে বটে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, এ শক্তি দুটির মাত্রা নিয়ত নির্দ্দিষ্ট নহে। বিজয়-লক্ষ্মী যে কা'র গলে জয়মাল্য দিবেন, তা আগে হইতে ঠিক হইয়া নাই। তপঃশক্তির বেশী-কমি হইতে পারে; সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা এ শক্তির উপচয় আবশ্যক মত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জড়ের মধ্যে কোন রকম সাধনার সাড়া আমরা অবশ্য পাই না; সাধনা থাকিলেও আমরা তা ধরিতে বুঝিতে পারি না। কিন্তু প্রাণের ও মনের রাজ্যে এ সাধনা যে চলিয়াছে অথবা চলিতে পারে, এ পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সজীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (living tissue) প্রতিনিয়ত ভিতরের ও বাহিরের শত্রুকে বাধা দিবার এবং ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক জীবকোষ যেন এক একটা দুর্গ। সে দুর্গ অল্প-বিস্তর সুরক্ষিত—রীতিমত পাহারার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি আমাদের দেহ-দুর্গে অনেকটা রক্ষীর কাজ করিয়া যাইতেছে। তা ছাড়া আমাদের দেহের গ্রন্থিবিশেষ হইতে কতকগুলি অদৃশ্য রস নিঃসৃত হইয়া দেহের পোষণ, ও রক্ষণ কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেছে।

যে শক্তি-প্রভাবে দেহের কোষগুলি এই ভাবে শত্রু ঠেকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেছে, সেই শক্তি আমাদের পরিচিত তপঃশক্তি। আমরা সকলেই জানি যে, শরীরের কোন অঙ্গ, রোগে হউক অথবা আঘাতে হউক, অসুস্থ হইয়া পড়িলে, আমাদের জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে অনেক সময় সে অসুস্থ অঙ্গটি আবার সারিয়া উঠে। ইহাও আমাদের প্রাণশক্তির সেই স্থিতিস্থাপকতা অথবা তপঃশক্তি। এ তপঃশক্তি না থাকিলে শরীর রক্ষাও হইত না, এবং শরীরের কোথাও কোনরূপ দোষ বা হানি হইলে, তার আর কোন প্রতিকার হইত না। চিকিৎসকেরা এই natural tissue resistance এবং cureএর কথা বেশ ভাল মতেই জানেন। এখন কথাটা এই যে, কোনো কোনো উপায়ে দেহের এই স্বাভাবিক তপঃশক্তি বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। সেই সেই উপায়ই হইতেছে স্বাস্থ্য-সাধনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা। বৈদ্যশাস্ত্রে মোটামুটি সে সাধনার কথা আছে। অসাধারণ ফল লাভ করিতে হইলে যোগমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। সে উপায়ে কেবল রোগ-ব্যাধি কেন, জরা-মৃত্যু পর্য্যন্ত জয় করা সম্ভবপর হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রাণের তপঃশক্তির পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি।

অন্তঃকরণেও যে স্বাভাবিক তপঃশক্তিটি কাজ করিতেছে, তার সাধারণ চেহারাখানি আমরা সহজেই

দেখিতে পাই। মনে কোন কারণে ব্যথা লাগিলে, সে ব্যথায় মন কিছু কালের জন্য মুষড়াইয়া পড়ে; কিন্তু সে ব্যথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার নিজের স্বাভাবিক আনন্দে ফিরিয়া যাইবার একটা প্রেরণা ও চেষ্টা স্বভাবতই মনের মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই জন্য পুত্রশোকাতুরা জননীর মুখেও দু'দশ দিন পরে হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখি। সেই রবার বলের মত মনের সর্ব্বদাই চেষ্টা রহিয়াছে, তার সকল চাপ ও বাধা সরাইয়া ফেলিয়া আবার স্বাভাবিক স্বস্তিতে ফিরিয়া যাইবার দিকে। সে চাপ ও বাধা (মধু-কৈটভ) নানা সাজে, নানা আকারে, নানা সময়ে আসিয়া দেখা দেয়। কখনও মোহ, কখনও অবসাদ, কখনও ক্লান্তি, কখনও বেদনা, কখনও অজ্ঞান, কখনও সংশয়—এই রকম নানা চেহারা সেই অন্তঃকরণ-বিচারী দৈত্যযুগলের। সর্ব্বদাই এ দৈত্য-যুগলের সঙ্গে একটা লড়াই চলিতেছে। হার-জিতের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু কোন কোন উপায়ে হার-জিতের ঠিক-ঠিকানা করিয়া লওয়া চলিতে পারে। সেই সেই উপায় হইতেছে সাধনা। অষ্টাঙ্গ যোগ সে সাধনার প্রশস্ত রাজমার্গ। অষ্টাঙ্গ যোগের মূল কথা দুইটি—প্রত্যাহার ও সংযম। পাতঞ্জল দর্শনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে এক কথায় সংযম বলা হইয়াছে—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম চারিটী সোপান—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম—ঠিক যোগ নহে, যোগের যোগাড়-যন্ত্র মাত্র। আসল যোগ আরম্ভ হইল প্রত্যাহারে, এবং যোগের পরিসমাপ্তি হইল সমাধিতে। চিত্ত চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে; সেই ছড়ান চিত্তকে গুটাইয়া ফিরাইয়া আনা—এর নাম প্রত্যাহার। এতক্ষণ চিত্ত কোন কিছুতে স্থির ছিল না, জলৌকা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া ছিল, এইবার তাকে কোন কিছুতে স্থির করিয়া ফেলা, একাগ্র করা—ইহাই হইল সংযম। স্বাভাবিক তপঃশক্তির অনুশীলন করিতে হইলে এই পথে আমাদের চলা ছাড়া উপায় নাই, অর্থাৎ, প্রত্যাহার ও সংযম এ দুইটি আমাদের করিতেই হইবে।

তপস্যার দুই রকম বিবরণ আমরা পাইলাম। যে শক্তি-প্রভাবে বস্তু নিজের সত্তাকে প্রসারিত করিতে পারে, সেই শক্তিটিকে আমরা আগে তপঃ বলিয়াছি। তার পর, যে শক্তির প্রভাবে বস্তু স্থিতিস্থাপক হয়, সেই শক্তিটিকে আমরা তপঃ বলিলাম। বলা বাহুল্য যে এ দুইটি বিবরণ আলাদা হইলেও পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। শেষ কালে, অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়া তপঃশক্তির আরও এক রকম পরিচয় আমরা পাইলাম—প্রত্যাহার ও সংযম। তলাইয়া দেখিতে গেলে, এ ক্ষেত্রেও মূল কথাটি একই। যে বস্তু স্থিতিস্থাপক এবং যে বস্তু নিজ সত্তাকে প্রসারিত করিতে সমর্থ, সে দুই বস্তুই চাপ বা বাধা সরাইয়া দিবার শক্তি রাখে। সে শক্তিটি না থাকিলে বস্তু স্থিতিস্থাপক হইত না, অথবা বিকাশ প্রাপ্তও হইত না। অতএব মূল ব্যাপার হইতেছে গণ্ডী বা বাধা সরাইয়া দিবার শক্তি। এই শক্তিই তপঃশক্তি। প্রত্যাহার ও সংযমের বেলাতেও শক্তিকে এই মূর্ত্তিতেই আমরা দেখিতে পাই। শক্তিগুলি যতক্ষণ ছড়াইয়া এবং এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে শক্তিগুলি যেন থাকিয়াও নাই। শক্তিগুলি সব এক-মুখ বা একাগ্র যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ শক্তিগুলিকে ঠিক সমর্থ মনে করা যায় না। শক্তিগুলিকে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইলে, প্রথম কাজ হইতেছে তাহাদিগকে মোড় ফিরাইয়া একমুখ বা একাগ্র করিয়া আনা। এই কাজটির নাম প্রত্যাহার। তার পর সে একাগ্র শক্তিপুঞ্জ যদি কোন কেন্দ্রে স্থির করিতে পারা যায়, তবে যে ব্যাপারটি হইল, তার নাম সংযম (ধারণা ইত্যাদি)। সূর্য্যের আলোক-রেখাগুলি চারিধারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যদি কোন বক্র দর্পণে সেই আলোক-রেখাগুলি প্রতিফলিত করিয়া তাহাদিগকে একটা কেন্দ্রে সম্মিলিত ও ঘনীভূত করিতে পারা যায়, তবে সে আলোক-রেখাগুলি একটা অসাধারণ সামর্থ্য লাভ করিয়া বসে। যে সকল কাজ বিচ্ছিন্ন আলোক-রেখাগুলি কোন মতেই করিতে পারিতেছিল না, সে সকল কাজ সম্মিলিত কেন্দ্রীভূত আলোক সহজেই করিতে পারে।

তপস্যার প্রত্যাহার ও সংযম বলিয়া যে রূপটি আমরা দেখাইলাম, সে রূপ কেবলমাত্র যে সাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমন নয়। অবশ্য সাধনার ক্ষেত্রেই সে রূপটি স্পষ্ট ধরিতে পারা যায়, কিন্তু সৃষ্টির সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের বন্দোবস্তও রহিয়াছে। জড়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ এ সকল ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আছে। জড়ের রাজ্যে যেখানে দেখিতে পাই পদার্থের শক্তিগুলি এলোমেলো ভাবে

ছড়াইয়া না রহিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনো কোনো দিকে নিজদিগকে অভিমুখীন করিয়া রাখিতেছে, সেখানেই আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, পদার্থ তার স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমশক্তি ব্যবহার করিতেছে। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, একেবারে এলোমেলো ভাবে, লক্ষ্যহারা ভাবে ছড়াইয়া কোন পদার্থেরই শক্তিপুঞ্জ নাই, থাকিতেও পারে না। জগতে যদি একটা মাত্র পদার্থ একলা থাকিত, তবে কি হইত বলিতে পারি না; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে কারবারে প্রবৃত্ত হইয়া তাদের দিকে নিজের শক্তিগুলিকে কোনো না কোনো রকমে সাজাইয়া রাখিয়াছে। একটা চুম্বকের নিকট যদি লোহা ছাড়া আর পাঁচটা জিনিষ পড়িয়া থাকে, তবে আমাদের মনে হয় যেন চুম্বকটির সেই সব জিনিষের সঙ্গে কোন কারবার নাই, কোনটার দিকে কোন পক্ষপাতও নাই। যেই আসরে লোহা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি যেন তার সঙ্গে চুম্বকটির কারবার সুরু হইল, তার দিকে চুম্বকটির পক্ষপাত হইল। এতক্ষণ যেন চুম্বকের শক্তিগুলি অসাড় হইয়া ও এলাইয়া পড়িয়া ছিল; যেই লোহা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সে শক্তিগুলি নিজদিগকে সংহত করিয়া ও সাজাইয়া লইল। এতক্ষণ যেন শক্তি-পিণ্ড ছিল, কিন্তু শক্তিব্যূহ ছিল না; এইবার সেটি হইল। এই রকম আমরা মনে করিয়া থাকি।

বলা বাহুল্য যে, এ নিতান্ত মোটামুটি হিসাব। আমরা মোটার খবর রাখি, চিকণের রাখি না বলিয়াই, এই রকম মনে করিয়া থাকি। লোহা কাছে থাক আর না থাক, চুম্বকের শক্তিগুলি কখনই একান্তভাবে এলাইয়া পড়িয়া থাকে না। আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গেও তার কারবার চলিতে থাকে এবং চলিতে বাধ্য আছে; তবে সে কারবার গোপন কারবার। লোহার সঙ্গে তার কারবারটা এতই স্পষ্ট ও বিচিত্র যে, সে ক্ষেত্রে আমাদের আর বেহুঁস হইয়া থাকিবার যো নাই। আসল কথা, লোহার বেলা চুম্বকের শক্তিগুলি যে আকারের, এবং যতখানি স্পষ্ট একটা ব্যূহ তারা রচনা করে, কাঠের বা কাগজের বেলা সে রকম বা ততখানি স্পষ্ট ব্যূহ তারা রচনা করে না। অন্ততঃ আমাদের হিসাবে সেই রকমই বোধ হয়। যে শক্তিগুলির নির্দ্দিষ্ট কোন এক দিকে প্রবণতা নাই, সে শক্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা "Scalar" নাম দিয়া থাকেন; এবং যে সব শক্তি এক একটা দিকে অভিমুখীন (directed), সে সব শক্তিকে তাঁরা "Vector" এই নাম দিয়া থাকেন। এখন গণিত-বিদ্যার কল্পনায় কোন দিকে প্রবণতা নাই এমন শক্তি-পিণ্ড থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে শক্তি মাত্রেই কোন না কোন দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। কোনো এক নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝোঁক অবশ্য চিরস্থায়ী নয়; চুম্বকের কাছে যতক্ষণ কাঠ ও কাগজ রহিয়াছে, ততক্ষণ চুম্বকের সে সব দিকে ঝোঁক এক রকম, আবার লোহা আসিয়া উপস্থিত হইলে, সে ঝোঁকটা অন্য রকম হইয়া দাঁড়ায়। শক্তির মোড় এ রকম নানা সময় নানা দিকে ফিরিতেছে; কিন্তু কোনো না কোনো দিকে মোড় না থাকিয়া যায় না। শক্তিগুলিকে কোনো দিকে মোড় ফিরাইয়া রাখিতে হইলেই, একটুখানি স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের প্রয়োজন হয়। চুম্বকের কাছে যতক্ষণ লোহা নাই কিন্তু আর পাঁচটা জিনিষ রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুম্বকের স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম-শক্তি যেন গোপন হইয়া রহিয়াছে; আমরা তার কোন পরিচয় পাইতেছি না। কিন্তু যেই লোহা আসিয়া হাজির হইল, অমনি সে শক্তিটি সুস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠিল। এখন চুম্বক আর কাগজ ও কাঠ এ সকলে যেমন অপক্ষপাত করিয়াছিল, লোহার বেলায় তেমনটা অপক্ষপাত করিতে নারাজ; মনে হয় যেন তার সকল শক্তিগুলি গুটাইয়া আনিয়া সে লোহারই দিকে আগাইয়া দিতেছে। যদি লোহার গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া ও কাগজের গুঁড়া একসঙ্গে মিশান থাকে, তবে সে তাদের ভিতর হইতে লোহার গুঁড়াগুলিকে বাছিয়া টানিয়া লয়; কাঠের বা কাগজের গুঁড়া যেমন পড়িয়া ছিল তেমনই পড়িয়া থাকে। এখানে প্রত্যাহার ও সংযমের একটা স্পষ্ট চেহারা আমরা দেখিতেছি না কি?

আকাশে বেশ জমাট মেঘ হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেই মেঘরাশি বিদ্যুদ্গর্ভ। আমাদের ধরিত্রী ত বিদ্যুদ্গর্ভা বটেই। মেঘের বিদ্যুৎ আর পৃথিবীর বিদ্যুৎ আলাদা জাতীয়—একটা ধনাত্মক, অপরটা ঋণাত্মক (পজেটিভ্ ও নেগেটিভ্)। অতএব এটা ওটার সঙ্গে মিলিতে চায়।

আমরা ভাব বুঝি পৃথিবীর বিদ্যুৎ পৃথিবীময় একসা হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর মেঘের বিদ্যুৎ সারা মেঘে একসা হইয়া ছড়াইয়া আছে। কিন্তু আসলে ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীতে যেখানে যত সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ আছে, তারা পৃথিবীর বিদ্যুৎ-পিণ্ডটিকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি তার সূচ্যগ্র মুখে পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার মহাব্যোমে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে বিলাইয়া দিতেছে, অথবা বাহির হইতে বিপরীত শক্তিকে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে টানিয়া লইতেছে। আমাদের দেহের শিরা-উপশিরা-গুলি, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্তুগুলি যেমন, পৃথিবীর বিরাট্ দেহে গাছপালার ঐ সূচীমুখ পত্রগুলিও তেমনই। উহারা যেন পৃথিবীর বিপুল তাড়িত শক্তিকে নানা দিকে নানা ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মেঘের সঙ্গে অথবা অপর কোন বাহিরের বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর কারবার, অর্থাৎ শক্তির খেলা, সাধারণতঃ ঐ সকল প্রণালীতে চলিয়া যাইতেছে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীর তাড়িত শক্তি নির্ব্বিশেষ পিণ্ড অবস্থায় পড়িয়া নাই; বৃক্ষ লতাদি রূপ পৃথিবীর অগণিত রোমরাজি অথবা স্নায়ুজাল অবলম্বন করিয়া সেই বিপুল শক্তি নানা দিকে অভিমুখীন হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে মেঘকে বেশ একখানা গালিচার মতন দেখায়; কিন্তু আসলে মেঘ কত বন্ধুর, কত উচ্চ-নীচ। মেঘের গায়েও সূক্ষ্মাগ্র-বিশিষ্ট কত-না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর অঙ্গে গাছপালার পাতাগুলি যে কাজ করিতেছে, মেঘের গায়ে ঐ সকল সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গগুলিও অবশ্য সেই কাজ করিতেছে, অর্থাৎ, তারাও মেঘনিষ্ঠ তাড়িত শক্তিকে একটা নির্ব্বিশেষ পিণ্ড ভাবে অপক্ষপাতে থাকিতে না দিয়া কোনো কোনো নির্দ্দিষ্ট দিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রবণ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর বেলাতে গাছপালার ঐ রকম বন্দোবস্তের ভিতর দিয়া তাড়িত শক্তির যে স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের ব্যবস্থা রহিয়াছে, মেঘের ভিতরেও তদনুরূপ একটা ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া মেঘে ও পৃথিবীতে তাড়িত শক্তির বিনিময় প্রায় একরকম নির্ব্বিবাদেই চলিয়া যায়। ব্যবস্থায় যেখানে কুলায় না, সেইখানেই যে ঘটনাটি ঘটে, তাহাকে আমরা বলি বজ্রপাত। এই বজ্রের কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিয়াছি। আপাততঃ কথাটা এই যে, জড়ের রাজ্যেও সর্ব্বত্র একপ্রকার স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আমরা দেখিতে পাই।

সে প্রকারটি হইতেছে এই—জড়ের শক্তিগুলি কখনই নির্ব্বিশেষ পিণ্ড অবস্থায় পড়িয়া থাকে না; আমরা খেয়াল করিতে পারি বা না পারি, কোনো না কোনো নির্দ্দিষ্ট দিকে তাদের এক-একটা ঝোঁক আছেই; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ঝোঁকটা এত প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমরা সেটা লক্ষ্য না করিয়া পারি না; যেমন চুম্বক ও লোহার বেলায়, যেমন মেঘ হইতে পৃথিবীতে বজ্রপাতের বেলায়। মেঘ ও পৃথিবী এই দুইটা পক্ষ না হইয়া, দুইখানা মেঘই দুইটা পক্ষ হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ দুইখানা মেঘের মধ্যে সৌদামিনী দূতীয়ালী করিতে থাকেন। নানা নির্দ্দিষ্ট পথে (lines)এ বিশ্বের বস্তুনিচয় তাদের শক্তির আদান-প্রদান অহরহঃ করিয়া যাইতেছে; মেঘে মেঘে, মেঘে পৃথিবীতে, পৃথিবীতে চন্দ্রে সূর্য্যে, জলে বাতাসে, এই রকম সকলের ভিতরেই এই শক্তির কারবার দিনরাত চলিতেছে। এ কারবারের অধিকাংশই আমাদের মোটা হিসাবে গোপন। কারবার খুব খোলসা ও জাঁকাল রকমের হইলে, আমরা তবে তার হিসাব রাখিয়া থাকি। যেমন একটা মেঘ হইতে আর একটা মেঘে যদি দেখিতে পাই যে বিজলীর তীব্র ছটা খেলিয়া গেল, অথবা আমাদের চোখ ঝল্‌সাইয়া এবং কাণে তালা লাগাইয়া মেঘ হইতে বাজ আসিয়া পৃথিবীতে পড়িল, তবেই আমরা মনে করি যে, মেঘে মেঘে এবং মেঘে পৃথিবীতে একটা কিছু কারবার হইয়া গেল। কিন্তু কারবারের বিরাম যে এক নিমেষের জন্যও হবার নয়। পৃথিবীর অঙ্গে প্রতি গুল্ম-পাদপের প্রতি সূক্ষ্মাগ্র পত্র যে অহরহঃ মহাব্যোমে পৃথিবীর অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তাড়িত শক্তির পসরা বহিয়া আনিয়া বেচিতেছে, বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে কারবার চালাইতেছে, এ কথা শুনিলে আমাদের যেন উপন্যাসের মত ঠেকে।

জড়ের জগতেই হউক, আর প্রাণের জগতেই হউক (মনের জগতের ত কথাই নাই) সর্ব্বত্রই আমরা একটা বাছিয়া চলা দেখিতে পাই। সকলে সকলের সঙ্গে মিশিতে চায় না, থাকিতে চায় না; ক, খকে চায়, গকে তাড়াইয়া

দিতে চায়। জড়ের ভিতরে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এ ত আছেই, তা ছাড়া তাদের এক একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যও আছে। প্রাণ ও মনের রাজ্যে এই দুইটা রাগ ও দ্বেষ রূপে দেখা দিয়াছে। এখন বাছিয়া চলিতে হইলেই আর পাঁচটার সঙ্গ হইতে নিজেকে এড়াইয়া চলিতে হয়। 'ক' যদি বাছিয়া বাছিয়া 'খ'য়ের সঙ্গ করে, তবে তাকে অবশ্য 'গ' 'ঘ' ইত্যাদির সঙ্গ অল্প-বিস্তর এড়াইয়া চলিতে হইবে। এরই নাম প্রত্যাহার। এই রকম ধারা প্রত্যাহার স্বষ্টির নিখিল পদার্থকে অহরহঃ করিতে হইতেছে। এ প্রত্যাহার না শিখিলে চুম্বকের সঙ্গে লোহা মিশিত না, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন গ্যাস মিলিয়া জল হইত না। মকরধ্বজে আদপে সোণা নাই, ইহা না কি রসায়নবিৎ দেখাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু বৈদ্য বলিবেন, সোণা থাকুক আর না থাকুক, সোণা কাছে না থাকিলে এবং সোণার শক্তিতে শক্তিমান না হইলে, পারদের বাপের সাধ্য নাই যে, সে সিদ্ধমকরধ্বজ উৎপাদন করিতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় সুবর্ণের এই প্রভাবকে বলে Catalylic action)। এ ক্ষেত্রে পারার দানাগুলি কেবল যে বাছিয়া বাছিয়া বাতাসের অক্সিজেনের দানাগুলির সহিত মিশিতেছে এমন নয়, সোণাকে সাক্ষী রাখিয়া তারা এই রকম মিশ খাইতেছে। সোণা ছাড়া আরও ত অনেক ধাতু আছে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য নামঞ্জুর; সোণা হাজির থাকিলে তবে আমরা মিশিব, নহিলে না—এই যেন হইল তাদের জিদ্‌। একটা অদ্ভুত গোছের বাছাই ও মেলামেশা ব্যাপার—ক খয়ের সঙ্গেই মিশিবে, গয়ের সঙ্গে নয়, কিন্তু গকে হাজির থাকা চাই। জড়ের রাজ্যে স্বাভাবিক সংযম ও প্রত্যাহারের এও এক মজার দৃষ্টান্ত। মজার বটে, কিন্তু অসাধারণ নয়; সচরাচর এইরূপ ঘটিতেছে।

জড়ের রাজ্যে প্রত্যাহার ও সংযমের আদৌ স্থান নাই বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে। এ ধারণা যে ঠিক নয়, তাই দেখাইবার জন্য আমরা জড়ের এলাকা কটাক্ষে একবার দেখিয়া লইলাম। আমরা দেখিলাম যে, জড়বস্তুও বিশেষ বিশেষ স্থলে তার শক্তিগুলিকে অন্য দিক হইতে গুটাইয়া লইয়া বিশেষ কোনো কোনো দিকে অভিমুখীন করিয়া দিয়া থাকে। জড়ের রাজ্যে এও এক রকম বাছাই ব্যাপার। প্রাণ ও মনের রাজ্যে আসিয়া এ বাছাই ব্যাপারটিকে খুবই স্পষ্টাকারে আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক প্রাণী, এমন কি প্রত্যেক জীবকোষ বাছিয়া বাছিয়া তার মেলা-মেশা, ছাড়াছাড়ি ইত্যাদি ঠিক করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুতেই যে রস ও লীলা আছে, তা আমরা আগেই খোলসা করিয়া বলিয়াছি। প্রত্যেক বস্তুই আপনার রুচিমাফিক তার লীলার সহচর ঠিক করিয়া লইতেছে। এ বিশ্বের বিরাট্‌ কারবার একটা বাছাইয়ের কারবার। প্রাণ ও অন্তঃকরণের রাজ্যে এ কারবার দৃষ্টান্ত দিয়া খোলসা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

আমরা যে সকল ভাব ও ব্যাপার লইয়া সাধন করি, সে সকল ভাব ও ব্যাপার কিছু-না-কিছু আমাদের স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ভিতরেই দেওয়া রহিয়াছে। স্বভাবে যার বীজ বা কাঠামোখানি আদৌ দেওয়া নাই, সে জিনিষ লইয়া আমাদের সাধন ও অনুশীলন করা সম্ভবপর হয় না। স্বভাবে যেটি হয় ত অল্প মাত্রায় আছে, সাধনে সেটিকে বেশী মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়। স্বভাবে যেটি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, সাধনে সেটিকে আমরা ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারি। স্বভাবে যে ভাবটির ভিতরে খাদ রহিয়াছে, সাধনে সে ভাবটিকে আমরা খাঁটি করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বভাবে যেটা আদৌ নাই, সেটাকে লইয়া সাধন হয় না। যোগীরা প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। আমরা স্বভাবতঃ প্রতিনিয়ত অজপারূপে প্রাণায়াম করিতেছি বলিয়াই, আমাদের পক্ষে প্রাণায়ামের সাধন করা সম্ভবপর হয়। সাধারণ ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই মনটাকে এক দিক্‌ হইতে ফিরাইয়া অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি বলিয়াই, আমরা প্রত্যাহারের সাধন করিতে পারি। যে বস্তুতে আমরা রস পাই, তাতে কিছুক্ষণের জন্য লাগিয়া থাকিতে পারি বলিয়াই আমাদের পক্ষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। মনের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা আমাদের স্বভাবতই সময় সময় হইতেছে; অবশ্য বেশীক্ষণের জন্য নয়, এবং সে অবস্থাগুলি আমাদের তেমন স্ববশেও নয়; আপনা হইতেই একটু-আধটু হইয়া যাইতেছে। হইতেছে বলিয়াই এ সকলের অনুশীলন ও সাধন করা আমাদের চলে। অনুশীলন ও সাধনের ফলে এ সকল ভাবের মাত্রা,

গাঢ়তা ও নির্ম্মলতা সকলই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এবং এ ভাবগুলি আমাদের স্ববশে আসিয়া থাকে।

যে বস্তুতে আমাদের আগ্রহ আছে, সে বস্তুটি যখন আমরা ভাবি, তখন আমরাও তন্ময় হইয়া গিয়া থাকি ; হট্টগোলের মধ্যে থাকিয়াও আমরা গোল শুনিতে পাই না ; নানা বিক্ষেপের কারণের ভিতরে রহিয়াও, কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া থাকি। এ অবস্থা কি ধারণা, ধ্যান বা সমাধির অবস্থা নয় ? এমন কি যে সচ্চিদানন্দ-ঘন অখণ্ড অনুভব-সত্তার কথা আমরা আগে বারবার বলিয়াছি, সে অনুভব সত্তা আমাদের ভিতরে স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই রহিয়াছে বলিয়াই, সমাধিতে অথবা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে সেটির অপরোক্ষানুভূতি আমাদের হইতে পারে। স্বভাবতঃ এটি না থাকিলে, কোন উপায়েই এটিকে পাওয়া যাইত না। অতএব তপঃশক্তির বিশ্বব্যাপী রূপটি দেখিয়া বিস্মিত হইলে আমাদের চলিবে না। তপস্বীর মধ্যে তপঃশক্তির অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সে শক্তি কেবল মাত্র তপস্বীতে নয়, সকল ভূতে এবং সকল প্রাণীতে স্বভাবতঃই রহিয়াছে, এবং কিছু না কিছু নিজের পরিচয় দিতেছে ; কি ভাবে দিতেছে, তার কতকটা আভাষ আমরা আগেই পাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশ্বভুবনে সর্ব্বত্র তপঃশক্তি ওতপ্রোত থাকার কারণটি স্পষ্ট। বীজে যে শক্তি থাকে, বিকাশে সে শক্তি কোনো না কোনও আকারে না থাকিয়া যায় না। প্রজাপতির তপঃশক্তি এ সমস্ত সৃষ্টিটার মূলে। প্রজাপতি তাঁর তপঃশক্তি লইয়া এই সৃষ্টির সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্য সৃষ্টিতে এমন কোনো কিছু নাই, যার ভিতরে তপঃশক্তি কিছু না কিছু বিরাজ না করিতেছে। সেই রস ও লীলার বেলা আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, তপের বেলাও সেই কথা বলিতেছি। সৃষ্টির এলাকা আমাদের জ্ঞানে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত —জড়, প্রাণ, মন। আমরা এ তিনটিকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তপঃশক্তি একটা সামান্য আকারে এ তিনের ভিতরে কাজ করিতেছে। সেই সামান্য বা সাধারণ আকারে তপঃশক্তিকে চিনিয়া ধরিয়া ফেলা দরকার। কেন না, সে ভাবে ধরিয়া ফেলিতে না পারিলে আমরা গোড়াকার তপঃশক্তিটি চিনিতে ও ধরিতে পারিব না। তপঃশক্তির একটা আসল রূপ আছে, আবার কতকগুলি ছদ্মবেশও আছে। অমুক মানুষ তপস্যা করিতেছে বলিলে আমরা সচরাচর এই ভাবিয়া থাকি যে, সে ব্যক্তি উর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছে, অথবা পঞ্চাগ্নি তপ করিতেছে, অথবা বৎসরের পর বৎসর ঘাস পাতা খাইয়া আছে ; এই রকম একটা কিছু কৃচ্ছ্র-সাধন আমরা মনে করিয়া থাকি। তপস্যা কথাটার সঙ্গে কঠোর ও কৃচ্ছ্র এ কথা দুইটা যেন অবিনাভাব সম্বন্ধে জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রজাপতি গোড়ায় তপস্যা করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিলে আমাদের এই ধরণের কোনো এক রকম তপস্যার কথা মনে উদয় হয়—যেন প্রজাপতি কিছু-কাল না খাইয়া ছিলেন, এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়া নিজেকে উইঢিপিতে পরিণত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ সকল তপস্যার আসল রূপটি নহে।

তপস্যার আসল রূপে কাহারও ভয় পাইবার কোন কথা নাই। আমরা সে আসল রূপটি এই কয়বারের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া ধরিতে কতকটা চেষ্টা করিয়াছি। কোনো একটা গণ্ডী বা বাধা অথবা চাপ আমাদের সত্তা-শক্তিটিকে বাঁধিয়া, চাপিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। শুধু আমাদের বলিয়া কেন, জড়, প্রাণ ও মনের রাজ্যে সর্ব্বত্রই ঐ রকম বাধা, সর্ব্বত্রই ঐ রকম চাপ। বাধা অথবা চাপ নানা আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাদের কতক কতক আমরা আগেই ধরিয়া ফেলিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ প্রাণ ও আত্মার রাজ্যে, সেই বাধা ও চাপকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রেরণাও সদাই সজাগ হইয়া কাজ করিতেছে। বাধা অথবা চাপ ঠেলিয়া সরাইতে পারিলেই বস্তুর বিকাশ, স্ফূর্ত্তি এবং আনন্দ। বস্তুর বস্তুত্বই সৎ, চিৎ এবং আনন্দে তৈয়ারি। বাধা অথবা চাপ এই সৎ-চিৎ-আনন্দকে কুণ্ঠিত, ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। সুতরাং, বাধা বা চাপ সরিয়া যাওয়া মানেই সৎ-চিৎ-আনন্দের পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি। যে স্বাভাবিক প্রেরণার কথা আমরা আগে বলিয়াছি, সেটি এই পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তির দিকে আমাদের

সত্তা শক্তিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এবং ইহাও আমরা দেখাইয়াছি যে, সেই স্বাভাবিক প্রেরণাই তপঃশক্তি। সুতরাং তপঃশক্তির সঙ্গে কঠোর ও কৃচ্ছ সাধনা নিয়ত জড়াইয়া ফেলা আমাদের উচিত হয় না। কৃচ্ছ সাধনা তপস্যার একটা সবিশেষ রূপ মাত্র; আসল রূপটি নয়। আসল রূপটি না চিনিতে পারিলে, আমরা প্রজাপতির তপস্যাপূর্ব্বক সৃষ্ট ব্যাপারটি আদৌ বুঝিতে পারিব না। এবং ইহাও বুঝিতে পারিব না যে, কেমন করিয়া সৃষ্টির আদিতে সেই তপস্যা সৃষ্টির সর্ব্বত্র এখনও বাহাল হইয়া রহিয়াছে।

আমরা তপস্যার আসল চেহারাটি আরও দুই-এক রকমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, একটুখানি রকমারি হইলেও মূলে সে চেহারা অভিন্ন। বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা এবং স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আলোচনা করিয়া আমরা গোড়ায় হাত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর শক্তিপুঞ্জ একটা পিণ্ডের আকারে থাকিলে স্থিতিস্থাপকতাও হয় না, বিকাশও হয় না। শক্তিপুঞ্জ নিজেকে শক্তিব্যূহরূপে সাজাইয়া লইতে পারিলে, তবে সে কাজটি হয়। শক্তিগুলির কোন বিশেষ দিকে অথবা কেন্দ্রে অভিমুখীনতা এবং প্রবণতা থাকা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্রই সেরূপ ব্যবস্থা স্বভাবতই অল্পবিস্তর রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই বাছিয়া বাছিয়া চলে, বাছিয়া বাছিয়া সঙ্গ করে; একের কাছ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া লয়, অপরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই হইল স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম। এ ব্যবস্থাটি না থাকিলে বস্তুর বস্তুত্ব রক্ষা পায় না, বস্তুর কোনোরূপ অভ্যুদয় অথবা বিকাশও সম্ভবে না।

শেষ কালে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, স্বভাবে সর্ব্বত্র যে ব্যবস্থা নিহিত, সে ব্যবস্থার সবিশেষ অনুশীলন ও সাধন কোনো কোনো কেন্দ্রে (বিশেষতঃ মানবে) হইতেছে, অথবা হইতে পারে। হয় ত সর্ব্বত্রই একটু-আধটু অনুশীলন চলিতেছে, আমরা তার বড় একটা খোঁজ রাখি না। একটা ধূলি-রেণু যে আবার তপস্বী, সে যে আবার তার তপঃশক্তির অনুশীলন ও স্ফুরণ করিতেছে, এ কথা শুনিলে আমরা বিস্ময়ে বদনব্যাদান করিয়া থাকি। যেমন সেই আনন্দ ও লীলার বেলায় করিয়াছিলাম, তেমনি। কিন্তু সে যাহাই হউক, কোন কোন কেন্দ্রে তপঃশক্তির স্বাভাবিক পুঁজিটি সাধনা দ্বারা বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা যে চলিতেছে, সে পক্ষে কোনরূপ সন্দেহ করা চলে না। যেখানে সেরূপ একটা চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা বলি, তপস্যা ও যোগ চলিতেছে। যেখানে স্বাভাবিক পুঁজিটি ছাড়া আর বড় একটা কিছু দেখিতে না পাই, সেখানে ভাবি তপস্যা ও যোগের সম্ভাবনা ও সূচনা যেন এখনও হয় নাই। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের কারবারি হিসাব। তপস্যা ও যোগ স্বভাবতঃ না চলিতেছে এমন পাত্র নাই। তপঃশক্তির আদি বিগ্রহ প্রজাপতি নিখিল সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া, সবই তপঃশক্তির বিগ্রহ; যেমন আনন্দ ও লীলার বিগ্রহ। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না, যে তপঃশক্তির বিরোধী একটা শক্তি (সেই গণ্ডী বাধা বা চাপ যেটাকে কখনও বৃত্র বা অহি বলিয়া, কখনও বা মধু কৈটভ বলিয়া প্রাচীনেরা কহিয়া গিয়াছেন) সকল বস্তুতে তপঃশক্তির সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। শুধু যে এখন রহিয়াছে এমন নয়, গোড়া হইতেই রহিয়াছে। প্রজাপতি মহাশয়কেও সৃষ্টির সূচনায় তপস্যা করিতে হইয়াছিল এই কারণে যে, তখন তপঃশক্তির বিরোধী শক্তিতেই নিখিল বিশ্ব আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়াছিল। এই মূল রহস্যটি বুঝাইবার জন্যই পুরাণপ্রভৃতিতে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে আমরা মধু-কৈটভ আদির গল্প দেখিতে পাই। কেবল আমাদের দেশের পুরাণে বলিয়া নয়, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস্, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া—এ সকল দেশের পুরাণেই সৃষ্টির প্রারম্ভে তপঃশক্তির সঙ্গে তপঃশক্তির বিরোধী শক্তির সংগ্রামের একটা বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণ-কথাতেই তপঃশক্তি জ্যোতিঃস্বরূপে এবং তার বিরোধী শক্তিটি তমঃস্বরূপে কল্পিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সে তামসিক শক্তি আবার অনেক স্থলে একটা বিরাট্ দানবাকারে দেখা দিয়াছে। কোথাও তার নাম হইয়াছে বৃত্র, কোথাও বা নাম হইয়াছে টাইটান্, আবার কোথাও বা নাম হইয়াছে টিয়ামাট্। এই আদি দৈত্যটিকে পরাস্ত করিয়া সেই আদি দেবতা সৃষ্টিরূপ তাঁর আদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাকে সৃষ্টির সূচনায় কেন যে মধু-কৈটভের

প্রাদুর্ভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তার কৈফিয়ৎ এখানেই দেওয়া রহিয়াছে। কি যেন কি একটা অজানা শক্তি এ বিশ্বের সত্তাটিকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল, প্রজাপতিকে তপঃশক্তির দ্বারা সেই চাপ সরাইয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি সেটি সরাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বের বিকাশ হইতে পারিয়াছে, নহিলে হইতে পারিত না।

আমরা "অহল্যার তপস্যা", "বিশ্বদোল" এবং "মধু ও কৈটভ"—এই তিন দফায় তপস্যার কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

পারের যাত্রী

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

একশত বিশ বর্ষ পূর্ণ, কহিল কবীর ভক্তগণে
মম ব্রত-কাল হইয়াছে শেষ, আর কেন রই নির্ব্বাসনে?
এ কাশীর ডেরা ভাঙ্গো শিষ্যেরা, তল্পীতল্পা গুটাও সবে,
চল মগহরে, আর কেন দেরী, জন্মভূমেই মরিতে হবে।
এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল শিষ্য সাধু-সমাজ,
দাবানল যেন জ্বলিল সহসা তপোবন-শিরে পড়িয়া বাজ।

নির্ব্বাক্ সবে—প্রধান শিষ্য কহিল তখন নয়ন মুছি
শেলসম এই বার্ত্তা দারুণ। তবু এ অশ্রু নয়'ক শুচি।
পরমানন্দ-ধামে এ যাত্রা—মোরা কাঁদি প্রভু বিমোহভরে,
মিছে মায়া ডোরে রাখিব না ধরে আপনারে আর ধরণী'পরে।

শুধু জিজ্ঞাসি, বুঝিতে নারিনু—এ কি কথা প্রভু শুনিনু কাণে,
কাশীতে মরণে সদ্যোমুক্তি আপনার চেয়ে কে বেশী জানে?
মরিবার আগে সবে কাশী আসে, ছাড়ি অন্তিমে কাশী এ হেন
যেখানে মরিলে রাসভ-জন্ম, সেখানে হে প্রভু যাবেন কেন?

কহিল কবীর,—"এত যে গভীর তত্ত্বের বাণী সকলি বৃথা?
কুরুক্ষেত্রে এ যেন হায়রে ব্যাখ্যাত হলো বৃথাই গীতা।
এত দিনকার প্রেমের সাধনা বৃথাই বন্ধু বৃথাই সবি,
মাটীর মহিমা বিনা পরিণামে পরমা মুক্তি যদি না লভি।
লোকের অন্ধ ধারণাই বড়?—সাধনার নাই কিছুই দাম?
মাটীর দোষেই গর্দ্দভ হ'ব—আমার দয়িত এতই বাম?
স্বর্গাদপি যে গরীয়সী মোর সে পাঠাবে মোরে রাসভ-লোকে?
দরদী অন্তরঙ্গ সখারা তাই কি কাঁদিছ আমার শোকে?"

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী, রত্নপ্রভা

(২৫)

ঠাকুর্দ্দা কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া কি ভাবিলেন। তার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বেশ আছিস্ তোরা। খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট নেই। হপ্তায় দু একটা উপোস লেগেই আছে। ছেলেপিলেও নেই যে তাদের দায়ে ঠেকে নিত্যি হাটবাজারের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। এ এক-রকম মন্দ নয়। আচ্ছা প্রসাদ, সত্যিই কি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে, স্পর্শদোষ বিচারের সঙ্গে সাধন-ভজনের কোন সম্পর্ক আছে?"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে একটু হাসিলেন।

ঠাকুর্দ্দা অনুরোধের স্বরে বলিলেন "বল্ না ভাই।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন। "এক ফকীরের মুখে গান শুনেছিলাম—

'ঘরকা ভেদ মিঞা, কোই না জানে
যো জানা সো চুপ্ রহা।'

যে জেনেছে, সে ত চুপ করে গেছেই,—আমি জেনেও জানতে পারছি না, সুতরাং আমাকেও এ সব প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাক্‌তে দিন ঠাকুর্দ্দা। আর, গরীব ফকীর-সন্ন্যাসীদের এ সব খবর নিয়ে আপনি করবেনই বা কি? তার চেয়ে আপনাদের সুসভ্য গ্রাম্য-সমাজের সুপবিত্র সামাজিক দলাদলি কিম্বা সুমধুর পারিবারিক কলহ কিচি-মিচির কাহিনী কতকগুলা বলুন, শুনে দেহ মন পবিত্র হোক, বেদান্তের নেশা কেটে যাক।"

ব্রহ্মচারিণী এলুমিনিয়মের হাঁড়িতে গরম জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে হাঁড়ি নামাইয়া ফ্লানেল ভিজাইতে দিয়া, নিজে একটা আসন লইয়া নিকটে বসিলেন। ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন, পায়ের পীড়িত স্থানটায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "উঃ ঠাকুর্দ্দা, পায়ে কি ব্যথাই ধরেছে! আজ পদ্মাসন করে বস্‌তে পর্য্যন্ত পারি নি।"

ঠাকুর্দ্দা অপরাধীর মত ম্লান মুখে ভয়ে ভয়ে বলিলেন "আর কখনো তোমায় কিছু খেতে দেব না ভাই। কাল পীড়াপীড়ি করে আমগুলো দিয়ে গেলুম, এমন 'কাল্ বাক্যি' বল্‌লে, কাল থেকেই ব্যথা!—সকালে খবর শুনেই আমার চক্ষুঃস্থির হয়েছে। তাড়াতাড়ি হরেশকে ডাক্ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি।"

আমের কথা ব্রহ্মচারী ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ঠাকুর্দ্দার কথায় মনে পড়িল। হাস্যোৎফুল্ল মুখে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ওঃ বৃদ্ধ! এ ব্যথা তবে আপনারই দান! ভাল—ভাল। 'তোমার হাতের বেদনা দান, সে এড়ায়ে চাহি না মুকতি।' আপনার জন্য ব্যথা ভোগ করছি, এতে আমি ধন্য!"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তা তুমি বল্‌তে পারো। কিন্তু এমন জান্‌লে আমি তোমায় আম দিতাম না। ব্যথাটা হোল হোল, ঠিক কাল থেকেই বাপু! অবাক্ হয়ে ভাবছি,—উঃ এ দৈত্যকুলে কি প্রহ্লাদই জন্মেছ তুমি! তোমার গুরুকে গড় করি।"

ঠাকুর্দ্দা নমস্কার করিলেন; ব্রহ্মচারীও সহাস্য মুখে যুক্ত-কর কপালে ঠেকাইলেন। ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে গরম ফ্লানেল নিংড়াইয়া, ব্রহ্মচারীর সামনে একটা রেকাবিতে রাখিলেন। স্বহস্তে ফ্লানেল তুলিয়া ব্রহ্মচারী ব্যথার উপর চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন "না মশাই, আমি প্রহ্লাদ নই। ভক্তিকে আমি ভয়ানক ডরাই। আমার ঠাকুর্দ্দারাই বরঞ্চ নারদ প্রহ্লাদ রামানুজের দল। ভক্তি নিয়ে কেঁদে-কোকিয়ে কেষ্ট-বিষ্টুদের কাহিল করে দিয়েছেন। বায়নাক্কার বাহার কত? যোগমার্গ মানব না, বেদান্ত-ভি ডোণ্ট্ কেয়ার!"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী হাসিলেন। একটু কৌতূহলী হইয়া বলিলেন "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা,—আমার ঠাকুর্দ্দারা ত এই রকম। আপনাদের ঠাকুর্দ্দারা কেমন ছিলেন?"

প্রশ্নটার অর্থ, তাঁহারা যোগমার্গ এবং বেদান্তের মতবাদ মানিতেন কি না? ঠাকুর্দ্দাও যে তাহা না বুঝিলেন, এমন নয়; কিন্তু সোজাসুজি তার উত্তর দিলেন না। অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তাঁরা ছিলেন, ভাল। এমন বিবেকানন্দী বচন শোনাবার নাতি ত তাঁদের ছিল না। দিনগুলা তাঁরা স্বোয়াস্তিতে কাটিয়েছেন।—"

সাম্‌লাইতে না পারিয়া, ব্রহ্মচারী এবার খুব খানিকক্ষণ হাসিলেন; তার পর বলিলেন "নাঃ, যে যোগমার্গ নেয় নিক, মোদ্দা এমন ঠাকুর্দ্দা যেন তার একটি থাকে। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, আপনাদের নাতিরা ত এই পর্য্যন্ত করলে, আমাদের নাতিরা এসে কি করবে বলুন দেখি?"

ঠাকুর্দ্দা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েই মোহমুদ্গর ঘুরুতে সুরু ক'রে দেবে।"

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া ফ্লানেল নিংড়াইতেছিলেন। ফ্লানেলটা রেকাবিতে রাখিয়া একটু হাসিয়া ঠাকুর্দ্দার দিকে চাহিলেন। নিম্নস্বরে সবিনয়ে বলিলেন "অসম্ভব নয় ঠাকুর্দ্দা। এ দেশের মায়েদের মাথাগুলো যদি জ্ঞানচর্চ্চার অধিকারে বঞ্চিত না রাখেন, তবে এমন জ্ঞানবান বিবেক-নিষ্ঠ ছেলে সব পাবেন, যারা—যথার্থ মানুষ। পশু নয়। সত্যকার ধর্ম্ম, সত্যকার কর্ম্ম,—জিনিসটা যে কি, সেটা বুঝে নেবার মত সদ্ অসদ্ বিবেক-বুদ্ধিটা তারা জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করবে। এই ত আমার মনে হয়।"

ব্রহ্মচারী ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "শুনছেন ঠাকুর্দ্দা, জ্ঞানের জন্যে নালিশ! এ কি সওয়া যায়? একেই ত বলে নারী-বিদ্রোহ। বলুন না ঠাকুর্দ্দা, শাস্ত্রমতে এ দেশের মেয়েদের মূর্খ থাকাই যে পরম ধর্ম্ম।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে বলিলেন "শাস্ত্রমতে? ঠাকুর্দ্দা, কথাটা ঠিক ত?"

ঠাকুর্দ্দা জবাব দিবার পূর্ব্বেই নাতি ত্রস্তে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "আহা-হা ভুল হয়েছে। শাস্ত্রমতে নয়, লোকাচার-মতে। লোকাচারই যে এদেশে আদৃত শাস্ত্র।"

ব্রহ্মচারিণী মাথা হেঁট করিয়া পুনশ্চ গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইতে ভিজাইতে নিজ মনেই বলিলেন "লোকাচার-মতে পরম ধর্ম্ম অনেক রকমই আছে। একদিন বিধবাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারাও পরম ধর্ম্ম ছিল, গঙ্গাসাগরে ছেলে ফেলাও পরম ধর্ম্ম ছিল, আরও কত কি পরম ধর্ম্ম—"

ব্রহ্মচারী পরিহাস-ভরে বলিলেন "বাবুদের বারনারী সেবাও পরম ধর্ম্ম ছিল, এমন কি সেটা না করাই আভিজাত্যহীনতার পরিচয় ছিল। এই ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দারাই কি কীর্ত্তি করে গেছেন, জিজ্ঞাসা করো না। বলুন ত ঠাকুর্দ্দা, আপনার পূর্ব্বপুরুষদের সুপবিত্র রুচিজ্ঞানের পরিচয়।"

নিদারুণ অপ্রসন্নতার সহিত ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "বলে', তোমার কাছে মার খাই আর কি? আমার অত সখে কায নাই।" তিনি উপেক্ষা-ভরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

ব্রহ্মচারিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা, পায়ে ব্যথা কি সাধে হয়?"

আত্মত্রুটি ক্ষালনের একটা সুযোগ পাইয়া ঠাকুর্দ্দা যেন কৃতার্থ হইলেন; সোৎসাহে বলিলেন "ওই সব অবাক্য কুবাক্য বলার ফল আর কি?—শেষে দোষ পড়্‌ল কি না আমার আমের ঘাড়ে! পেটে খেলুম আম, পায়ে হোল ব্যথা! এই কি সম্ভব?"

অর্থাৎ—ব্রহ্মচারী যে কোনরূপে হোক, কথার ফাঁদে পড়িয়া, একবার সেটা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করুন, ঠাকুর্দ্দা তাহা হইলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মচারী অতটা বুঝিলেন না, নিজের বিশ্বাস-মত তৎক্ষণাৎ বলিলেন "বুকে হোল নিউমোনিয়া, মুখে খেলুম ওষুদ,—নিউমোনিয়া ভাল হোল। কেন হোল মশাই?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "অন্ধদের হস্তী দর্শন মামলা সুরু হোল। যা তর্কের বিষয় নয়, তা নিয়ে তর্ক করতে গেলে, কুতর্কের কুজ্ঝটিকায় অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়-বাদ, নাস্তিক্যবাদ, সব বাদই হবে। বাকী জমা কিছুই থাকবে না ঠাকুর্দ্দা!"

ঠাকুর্দ্দা প্রীত হইয়া বলিলেন "যা বলেছ দিদি, 'সব বাদ'ই হবে। জমা কিছুই থাকবে না।"

ব্রহ্মচারীর দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন "যেমন ওর নেই। মায়া, মমতা, ভক্তি, ভালবাসা, সব কসে মড়ম্বা করে পুঁটুলি বেঁধে ওর ভগবানকে দিয়েছে। কারুর জন্তে কিছু বাকী-জমা রাখে নি।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন "উহুঁ! ঠাকুর্দ্দার জন্তে একমুঠো চুরি করে রেখেছি। সত্যি ঠাকুর্দ্দা, আপনাকে জ্বালাতন করতে বড় ভালবাসি।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "শোন কথা। আমায় ভালবাসেন কেন? না, জ্বালাতন করবার জন্তে। আর আমিও যদি তেমি করে ওজন মেপে ভালবাসটা return করি, তা হলে?"

কথা বলিতে বলিতে সহসা গতকল্যকার রহস্যালাপের কথা ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল। ঠাকুর্দ্দার সেই অর্দ্ধেক-বলা হেঁয়ালিটার আধখানা স্মৃতি মনে পড়িল, আধখানা মনে পড়িল না। ব্যগ্র হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "হ্যাঁ মশাই, কাল আপনি কি কথা বলতে গিয়ে উঠে পালালেন? আমি পুকুর চুরি—না, না, ভরাডুবি বুঝি, কি একটা অকাণ্ড-কুকাণ্ড করেছি না কি?"

ঠাকুর্দ্দা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ভরাডুবি? কই তা তো আমি বলি নি।"

বিপদগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আহা তেমি ধরণেরই কি-যে বল্লেন। সংসারীদের হেঁয়ালি, এ-কি আমার মনে থাকে? না, ওর মানে ছাই বুঝতে পারি? কই তুমি বলো ত কথাটা কি?"—তিনি ব্রহ্মচারিণীকে লক্ষ্য করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন কথাটা কি?—কিন্তু ঠাকুর্দ্দার সামনে সে আলোচনায় যোগ দিতে তিনি আপত্তি বোধ করিলেন; গরম জলের হাঁড়িতে হাত ডুবাইয়া জলের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। ব্রহ্মচারীর কথার উত্তর না দিয়া, নিজ মনেই অস্ফুট স্বরে বলিলেন "জলটা আর একবার ফুটিয়ে আনি।"

তিনি উঠিতেছেন, সেই সময় হরিশ চাকর বাড়ী ঢুকিল; ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে বলিল "বিন্দুবাবু এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

ঠাকুর্দ্দা তৎক্ষণাৎ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন "বিন্দের একটা কথা ত? সে আধ-ঘণ্টা।"

বাহিরের লোকটি সে কথা শুনিতে পাইল, সে ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল "না, আধঘণ্টা নয়। আমার কথা পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। মামা, আমি ভেতরে যাব?"

ক্ষণেকের জন্য সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলেন। এই লোকটিকে অসঙ্কোচে এস বলিয়া বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইতে সকলেই যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন; অথচ শিষ্টাচার বিরুদ্ধভাবে তাকে ফিরাইয়া দিতেও লজ্জাবোধ করিতেছেন, এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। ব্রহ্মচারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আমার আহ্নিকের সময় হয়ে এসেছে—"

ঠাকুর্দ্দা নিম্নস্বরে বলিলেন "বেশ। তাই বলে ফিরিয়ে দাও। প্রসাদ, পাপকে প্রশ্রয় দিও না, শেষে পস্তাবে।"

ক্ষণকাল ভাবিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিধার সহিত বলিলেন "কিন্তু যদি এমন কিছু কথা থাকে, যা-না-শোনার জন্তে শেষে আমায় অনুশোচনা ভোগ করতে হবে—"

ঠাকুর্দ্দা অধিকতর নিম্ন স্বরে বলিলেন "টাকার দরকার ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। আমি বলে দিচ্ছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা হলে আমি নিশ্চিন্ত। আজ আমি রিক্ত হস্ত। হরিশ, ওকে ডাক।"

যতক্ষণ হাতে এক পয়সা থাকিত ততক্ষণ ব্রহ্মচারী অপর অভাবগ্রস্ত প্রার্থীর জন্য নিজেকে সত্যই দায়গ্রস্ত মনে করিতেন। হাতের পয়সা ফুরাইলে ভাবিতেন দায়োদ্ধার হইয়াছি। কারণ সে অবস্থায় প্রার্থীকে বিমুখ করিলে ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না।

ব্রহ্মচারিণী উঠিতেছিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া আবার বসিলেন। ফ্লানেলের টুকরা রেকাবি ইত্যাদি সমস্ত গুটাইয়া তুলিয়া লইতে লইতে অস্ফুট স্বরে ব্রহ্মচারীকে

শুনাইয়া বলিলেন "তাহলে এখন আর সেঁক দেওয়া হবে না। আমি নেয়ে নিজের কাযে বস্‌তে চললুম।"

কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া বলিলেন "মনে পড়িয়ে দিচ্ছি, অপরের অসৎ ভাব-প্রবাহের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ব্যাপারটায় যেন দৃষ্টি থাকে।"

ব্রহ্মচারী নিজের পায়ের পেশীগুলা মোচড়াইয়া দেখিতে দেখিতে নতমুখে চিন্তিতভাবে বলিলেন "হুঁ। ধন্যবাদ।"

ঠাকুর্দ্দা ততক্ষণে চায়ের এঁটো বাটিগুলা হরিশের জিম্মায় গছাইয়া দিয়া বলিতেছিলেন "তোর জন্যে এগুলা আগলে নিয়ে বসে আছি। বাজারের ডালা নামা, যা আগে, এগুলো পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আয়।"

ব্রহ্মচারিণী বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। হরিশ পাত্রগুলা তুলিয়া লইল। অগত্যা সেকের সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া একখানা গরদের কাপড় ও গামছা লইয়া ব্রহ্মচারিণী কুয়াতলায় স্নানের জন্য গেলেন।

আহ্বান শুনিয়া বিন্দে ওরফে বিন্দুমাধব বাড়ী ঢুকিল। লোকটি ব্রহ্মচারীর দূর সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি-ভগিনীর পুত্র। ভগিনী এখন স্বর্গীয়া, ভগিনীপতি জীবিত। সম্পন্ন, ধনবান ব্যক্তি, পশ্চিমে থাকেন। একমাত্র পুত্র বিন্দু-মাধবকে সুশিক্ষিত ও সদাচারশীল করিবার চেষ্টায় তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু বুদ্ধিমান বিন্দুমাধবের কাছে সুশিক্ষা ও সদাচারের আদর্শ অন্যরূপ ছিল। সে সাধারণের মত গতানুগতিক পথ গ্রহণ করিল না। অসামান্য প্রতিভা বলে বালক বয়স হইতেই সে বাপের বাক্সর টাকা, জামার সোণার বোতাম, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সোনার আংটি আশ্চর্য্য কৌশলে হস্তগত করিতে শিখিল এবং বেশ্যালয় গমনই যে মানব জীবনের চরমতম মহত্ব ইহা নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিল। বাপ মা প্রথম প্রথম নিজেরাই কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিলেন, ছেলেকে সৎপথে আনিবার জন্য যত কিছু উপায় থাকে সব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু বৃথা, বৃথা! অসাধারণ প্রতিভা লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তার জাতিনাশের ক্ষমতা কাহারও নাই। ছেলে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর এমন উন্নতি দেখাইতে লাগিল যে পাড়া-প্রতিবেশী—সহর-বাসী মায় পুলিশের দারোগা কনেষ্টবল পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। দুঃখে কষ্টে মা দেহত্যাগ করিলেন, বাপ আরও কিছুদিন দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া টাকার জোরে বার বার ছেলের জেলখাটা বন্ধ করিয়া শেষে হতাশ হইলেন। বিন্দু অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিল ও মহা উৎসাহে ট্রেণের ফাষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশে ঘুরিয়া যাত্রীদের বিস্তর মূল্যবান জিনিস চুরি করিয়া মনের সুখে কিছুদিন নবাবী করিল এবং হঠাৎ একদা ধরা পড়িল। তার পর কি যে ঘটিল কেহ বলিতে পারে না। বছর কয়েক পরে সহসা শোনা গেল সে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়া বিখ্যাত সাধু হইয়া পড়িয়াছে এবং গাঁজায় দম কসিয়া যখন গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেয়, তখন মুগ্ধ না হয়, এমন শ্রোতা জগতে দুর্লভ। কিছুকাল পরে সে দেশে ফিরিল এবং গৈরিক বস্ত্র, খড়ম ও সুদীর্ঘ রুক্ষ চুল ও দাড়িগোঁফের সাহায্যে নিজের ধোপা-নাপিতের আবশ্যকহীনতা প্রমাণ করিয়া অনেকের কাছে খাতির জমাইয়া ফেলিল। আত্মীয় স্বজনরা কেহ কেহ তাকে গৃহে স্থান দিলেন, কিন্তু অচিরাৎ সাধুর কৃপামাহাত্ম্যে যখন আশপাশের অল্প-বয়স্কা কুলবধূ এবং কুলকন্যারা উত্যক্ত হইতে লাগিলেন, এবং গৃহস্থের ঘটিবাটি হইতে বাক্সের টাকা, গহনাপত্র অদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া একে একে সকলে বিদায় দিলেন। পিতা সংবাদ পাইয়া ত্যাজ্যপুত্র করিলেন। সাধু বিন্দুমাধব অগত্যা এখানকার বাগ্দীপাড়ায় আসিয়া তার এক পূর্ব্ব প্রণয়িনীর গৃহে আড্ডা লইল। প্রণয়িনী লোকটি ভাল, বয়সে বিন্দুর মাতৃ-বয়স্কা হইলে কি হয়, এমন আদর্শ প্রণয়ী-পালন ও সেবা জগতে না কি খুব কমই দেখা যায়। নিজে সাত দুয়ারে গতর খাটাইয়া বেচারা যাহা কিছু পায়, তাতেই বিন্দুর খরচ চালায়, নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া বিন্দুকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়ায়। বিন্দুর রোগের সময় আশ্চর্য্য মমতার সহিত সেবা-শুশ্রূষা করে, অভাবের সময় গালাগালি দেয়, রাগের মাথায় মারামারিতেও পিছ-পা হয় না। তবু সে বিন্দুকে এত ভালবাসে যে, আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন বিবাহিত দম্পতীর মধ্যে না কি তেমন ভালবাসা ঘটে নাই। বিন্দুর মতে তাহা এ জগতের তুচ্ছ জাগতিক স্বার্থ-ঘটিত সম্বন্ধ নয়, নিছক স্বর্গীয় ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিষয়টা লইয়া বিন্দু সুবিধা পাইলেই যেখানে সেখানে গভীর গবেষণামূলক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা বিন্দুমাধবকে দেখিলে সরিয়া পড়েন, অল্প-বয়স্করা বিন্দুর

কথাবার্ত্তায় মোহিত হয়, বিন্দুর সঙ্গ শ্লাঘনীয় মনে করে। বিন্দুর বক্তৃতার কৃপায় তাহাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হইতেছে এবং তাহারা সর্ব্ববিধ কুসংস্কার মুক্ত, উদার-প্রাণতা লাভ করিতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। তাহারা বিন্দুকে ভক্তি করে। তা ছাড়া বিন্দু গুণী ব্যক্তি; সাপের মন্ত্র, ভূতের মন্ত্র, বাণ মারা, হাত চালা, ডাকিনী-বিদ্যা, কাক-চরিত্র, ভবিষ্যৎ-গণনা, এমন কি তন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ সাধন-পদ্ধতি পর্য্যন্ত জানে। বিশেষতঃ বশীকরণ ও মারণ বিদ্যায় সে না কি সিদ্ধ-হস্ত। সেজন্য ভয়ে কেহ তার কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায় না। মোটের মাথায় বিন্দু গুণী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। কেহ তাহাকে পূজা করে, কেহ তাহাকে ভয় করে, কেহ বা তাহার কথাবার্ত্তা চালচলন দেখিয়া-শুনিয়া হাসে।

(২৬)

বিন্দুমাধব আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ধীর পদক্ষেপে গম্ভীর ভাবে উঠানে আসিতে আসিতে ঠাকুর্দ্দার উদ্দেশে বলিল "ছোট কর্ত্তা কি নাতির পায়ের তদারক করতে এসেছেন।"

কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, ঠাকুর্দ্দা তাহা উপলব্ধি করিলেন। একটু জোরের সহিত বলিলেন "হ্যাঁ।"

বিন্দু বারেণ্ডায় উঠিয়া ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশ-মত একটা আসন লইয়া বসিল। সুগম্ভীরে বলিল "শ্রীমন্তকা কণ্টক্ ফুটে দরদ্ পুছে স কৈ। দুনিয়া গিরে পাহাড়সে বাত্ না পুছে কৈ।" পয়সা আছে, কাযেই মামার পায়ে ব্যথার খবর নিতে হাজির হয়েছেন। আমার পয়সা নেই, তাই সদ্যঃ কলেরা হয়ে মলেও দেখতে যান না।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কি করে যাই গোপাল, তুমি একপাশে বিমলি বাগ্দিনী আর এক পাশে তার বিধবা ভাই-ঝি ক্ষেমিকে নিয়ে, সব কুণ্ঠা ছেড়ে বৈকুণ্ঠলীলা করছ। আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজবদ্ধ জীব, অত বড় বৈকুণ্ঠে মাথা গলাতে কি সাহস পাই? শুনলাম সস্তা দামে বিস্তর পচা ইলিশ কিনে তিন মূর্ত্তিতে আমোদ প্রমোদ করে খেয়েছ, তার পর কলেরার মত হয়েছে, আক্রা দামে ডাক্তার নিয়ে গেছ, ওসুদ-বিসুদ খেয়ে ভাল হয়েছ। একেবারে ডাক্তারের কাছেই সব খবর পেলাম, সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। অত পচা ইলিশ খেয়েছিলি কেন?"

বিন্দুর শরীরে বিধাতা অনেক সদ্‌গুণ দিয়াছিলেন, তার মধ্যে একটা অসাধারণ সদ্‌গুণ ছিল, অবস্থা-বিশেষে বাক্-সংযম। সাধারণ ভদ্র-সমাজ যে-গুলাকে অসৎ কায, দণ্ডার্হ কায বা নিন্দনীয় কায বলিয়া মনে করে, সে সব কায সম্পাদনে বিন্দুর তিলার্দ্ধও লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ছিল না; এবং সে সব কথা লইয়া যে যাহা খুশী বলুক, বিন্দুমাধব তাতে বিন্দুমাত্রও টলিত না।

আজিও টলিল না। অতিশয় গম্ভীর হইয়া দার্শনিক-জনোচিত বিরাট বিজ্ঞতার সহিত রসিকতা করিয়া বলিল "ভগবান যখন পচা ইলিশ সৃষ্টি করেছেন, তার দাম সস্তা করেছেন, তখন তা খাওয়াই উচিত। তাতে মরি মরব। মরবার পরে এ আফশোস্ থাক্‌বে না, যে, না খেয়ে মরেছি।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তা বই কি। ভগবান যখন বিম্‌লি বাগ্দিনীর মত গুণবতীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন বিন্দের মত গুণগ্রাহী সৃষ্টি করতেও বাধ্য। নইলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানকে পাঁচজনে ছি ছি করত নিশ্চয়। হ্যাঁ রে, ক্ষেমির একটা ছেলে হয়েছে নয়? সে ত তোরই ছেলে?"

বিন্দু অপরূপ ভঙ্গীতে একটু মুচকি হাসিয়া বলিল,"তার কোন লক্ষণ দেখেছেন?"

ঠাকুর্দ্দা চটিয়া উঠিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না। বিন্দু অধিকতর বিজ্ঞতার সহিত বলিল "যদি সত্যিই আমার ছেলে হয়, তবে জেনে রাখ্‌বেন, বাগ্দীর ঘরে জন্মালেও ও-ছেলে একদিন রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে।"

ঠাকুর্দ্দা বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত বলিলেন "কেন?"

উত্তরে বিন্দু সেই ছেলের জন্ম-বৃত্তান্তের সহিত দেবলীলা-সম্পর্কীয় এক অলৌকিক কাহিনী জুড়িয়া এমন রসগর্ভ বক্তৃতা সুরু করিল যে, ঠাকুর্দ্দা শুম্ভিত হইয়া গেলেন। বিন্দুর আগমন অবধি ব্রহ্মচারী একটু অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া ছিলেন, এবার তাঁরও অন্যমনস্কতা ঘুচিল, চোখে একটু কৌতুকের ভাব জাগিল। স্মিত মুখে তিনি বিন্দুর সুগম্ভীর মুখ-ভাব ও বিচিত্র কৌশলময়ী বচন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বিন্দু কখনও 'ছোট কথা' বলিত না।

নিজের বক্তব্য শেষ করিয়া বিন্দু বলিল "আজন্ম-

ব্রহ্মচারীর সন্তান, সে যেখানেই জন্মলাভ করুক—সে একজন মহাপুরুষ হবেই।"

ঠাকুর্দ্দার স্তম্ভিত ভাবের নেশা কাটিয়া গেল। সবিস্ময়ে বলিলেন "কে আজন্ম-ব্রহ্মচারী রে? তুই?"

বিন্দু অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিল "নয় ত কে? আমি কি আপনাদের মত বিয়ে করেছি?"

ব্রহ্মচারী আর পারিলেন না; অস্বস্তি-পীড়িত চিত্তে একটু ব্যঙ্গভরা বিনয় করিয়া বলিলেন "বাপ্ বিন্দে, আর নয়। আজন্ম-ব্রহ্মচর্য্যের খুব পিণ্ডি চট্‌কেছ, এবার থাম বাপ্! কি একটা কথা বল্‌তে এসেছ, সেটা বিনা ভূমিকায় সোজা বল। এ নরক-যন্ত্রণা আর ত সয় না।"

বিন্দে বলিল "নরক-যন্ত্রণা মনে করলেই নরক-যন্ত্রণা। নইলে স্বর্গই বা কোথা, নরকই বা কোথা? আমাদের কাছে পুণ্যও যা, পাপও তাই; শুচিতাও যা, অশুচিতাও তাই; ব্রহ্মচর্য্যও যা, ব্যভিচারও তাই—"

সে আরও বলিত, কিন্তু ব্রহ্মচারী বাধা দিলেন। বলিলেন "উঃ, নির্ব্বিকল্প সমাধির চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হোল যে! থাম বিন্দে—"

"থাম্‌তে বলেন থামছি। কিন্তু আপনি ত মামা শাস্ত্রালোচনা করেন, শাস্ত্রে কি বলে? শুচিতা অশুচিতা—"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "বিন্দে, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ঢের যায়গায় ঢের শুনেছি, কিন্তু তোর মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুন্‌লে আমার হৃদ্‌কম্প হয়।"

ঠাকুর্দ্দা মাথা নাড়িয়া বলিলেন "আমার ব্লাড্-প্রেসার বাড়ে। বিন্দে, তুই কোন্ লগ্নে জন্মিছিলি রে?"

বিন্দু বলিল "যে লগ্নে অবতারেরা জন্মেছিলেন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "অবতারেও অরুচি ধরালি বাপ্।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "অমন আমাবস্যের 'খ্যাণ' খুঁজে আজ পর্য্যন্ত কোন অবতার জন্মাতে পারেন নি। কস্মিন কালে পারবেনও না। ত্যাখ্ বিন্দে, তোকে ব্যগ্রতা করে বল্‌ছি,— অনুরোধ নয়, রীতিমত অনুনয়! তোর ব্যক্তিগত কুসংস্কার-গুলো তোর মধ্যেই চেপে রাখ। ওগুলো পরের মধ্যে চালাতে যাস্ নে। আমার বাস্তবিক দুর্ভাবনা বোধ হয়।"

ইহার উত্তরে বিন্দু অতিশয় গম্ভীর হইয়া কি একটা গুরুতর জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। ব্রহ্মচারিণী কুয়াতলা হইতে স্নান করিয়া সামনের উঠান দিয়া সেই সময় পূজার ঘরে গেলেন। স্বামীর সমবয়স্ক যুবক ভাগিনেয়ের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না, সামনেও আসিতেন না। যদি দৈবাৎ সামনে আসিতে হইত, তবে রীতিমত ঘোমটা দিয়া আসিতেন। আজও তিনি ঘোমটা দিয়া মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

বিন্দুমাধব তীক্ষ্ণ বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া দেখিল; মুখের কথা সামলাইয়া লইয়া বলিল "মামী এখানেই রয়েছেন? মামা তাহলে পুরোদস্তুর সংসারীই হলেন?"

ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। বিন্দুমাধব নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল "শক্তি না হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?"

ঠাকুরর্দ্দা বলিলেন "শুধু সিদ্ধি? মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, ভাং—কোন্‌টাই বা লাভ হয়? কিরে প্রসাদ, তুই যে চুপ হয়ে, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিস? তোর বিবেকানন্দী-বচন গেল কোথা?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "এত বড় অবিবেকানন্দ সামনে উপস্থিত থাকতে বিবেকানন্দ! এরই বুলি-চালি চাট্টি-খানি শুনুন।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "ওর বুলি-চালি বাগ্দীপাড়া, কৈবৎ পাড়া-টাড়ায় জমে ভাল। সেদিন দেখি জেলে-পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলোকে জুটিয়ে বটতলায় বসে তন্ত্রের শক্তি-শোধন ব্যাপার, সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে বোঝাচ্ছে! তারা ত তাক্ মেরে গেছে, এত বড় রসালো তত্ত্ব! ওর চ্যালা হবার জন্যে সবাই খুনোখুনি জুড়ে দেবে, দেখিস।"

শ্রীমান বিন্দুমাধব ভৈরব নিনাদে বলিল "আপনারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তাই শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখেন না। মামা ত শক্ত্যানন্দ স্বামীর কাছে তন্ত্র পাঠ করছেন, মামাকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি। ভৈরবীতন্ত্রে "পানেভ্র্যান্তিভবেৎ যস্য—"

ব্রহ্মচারী মহা বিব্রত হইলেন। সেদিন এইখানে বসিয়া, শক্ত্যানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার আলোচনা এবং সে আলোচনার সংবাদ ব্রহ্মচারিণীর কর্ণগোচর হওয়া মনে পড়িল। তা ছাড়া আজও তিনি এখন আসনে বসিয়াছেন, এ সময় তাঁর কাণের কাছে হল্লা হাঙ্গামা করিয়া উপাসনায় ব্যাঘাত করা, ভগবানের কাছে অপরাধী হওয়া বলিয়াই ব্রহ্মচারী মনে করিতেন। তাতে আবার বিন্দুমাধবের ভৈরব গর্জ্জনে ভৈরবী-তন্ত্রের ব্যাখ্যা!

ব্যতিব্যস্ত ভাবে বিন্দুকে থামাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন "ওহে আস্তে, আস্তে। তোমার মামীমা পূজোয় বসেছেন।"

বিন্দু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল "বস্‌লেনই বা পূজোয়! তাতে আমার কি? আমিও শাস্ত্র আলোচনা করছি, মন্দ কায ত করি নি।"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। একবার মনে করিলেন এ কথার কোন জবাব দিবেন না; কিন্তু আবার কি ভাবিয়া একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিলেন। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "মন্দ কায আমিও বলি নি। কিন্তু নীরব উপাসকের উপাসনায় ব্যাঘাত দেবার জন্ম, সরবে শাস্ত্র-বিচার সুরু করলে,—হয় ত তাতে ধার্ম্মিকতার পরিচয় খুব বেশী দেওয়া হয়, কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মোন্নতি যে তাতে হয় না, সেটা নিজের জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বুঝেছি। শাস্ত্র-জ্ঞানের অভিমান ত খুব রাখ বাবা, শাস্ত্রের এই নীতি-বাক্যটাও—ধর্ম্মের খাতিরে না হোক ন্যায়ের খাতিরে মনে রেখো—"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্ম, ন ধর্ম্ম সঃ কুধর্ম্ম তৎ।" যে ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্মে বাধা দেয়, সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম।"

বিন্দু অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল "শাস্ত্রের নীতি-বাক্য ত বল্‌লেন, কিন্তু ওর যুক্তি কি, হেতু কি, প্রমাণ কি, তা ত বললেন না। আপনার বিশ্বাস অপরের ধর্ম্মাচরণে বাধা দিলে আপনার ধর্ম্মহানি হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস—"

ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়া বলিলেন "কুতর্ক আর কুযুক্তিতে এমন সুমার্জ্জিত পাণ্ডিত্য আর দেখলুম না; অতএব দু'শো তারিফ করছি! বিন্দে তোর বিশ্বাস কি, জান্‌তে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। প্রসাদের যদি থাকে, ও যেন বাগ্‌দীপাড়ায় গিয়ে তোর কাছে জেনে আসে। দুই ভাগ্নে-বৌয়ের কাছে শাস্ত্র-বাক্যের দর-দাম ওজন যাচাই করে যেন নতুন আক্কেল লাভ করে।"

ব্রহ্মচারী কাণে হাত দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করিয়া সলজ্জ হাস্যে বলিলেন "উঃ, বড্ড গালাগালি দিলেন ঠাকুর্দ্দা। কি বল্‌ব, বিন্দু যে আমাদের সন্তান, জবাব দেবার মুখ নেই। আমি স্নান করে আসনে বস্‌তে চললুম, বিন্দু, আমার ঠাকুর্দ্দাকে নিরিবিলিতে ভৈরবী-তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক একটু শোনাও ত বাবা। কিন্তু একটু চুপি চুপি।"

মুহূর্ত্তে ঠাকুর্দ্দা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হুঁ। ঠাকুর্দ্দার ঘরে যে ভৈরবী আছেন, তিনি তাহ'লে ঝাঁটার চোটে নতুন তন্ত্র সৃষ্টি করে দেবেন। তাঁকে আমার নাৎ-বৌ পাও নি যে ভৈরবী-তন্ত্র বৈষ্ণবী-তন্ত্র সব তন্ত্রে ঠোকর দেবে, আর তিনি চুপ করে বসে বসে দেখ্‌বেন।"

বলিতে বলিতে সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঠাকুর্দ্দা সহসা সংশয়-ভরা কৌতূহলের সহিত বলিলেন "হ্যাঁ রে প্রসাদ, ভৈরবী-তন্ত্র-টন্ত্রগুলা কি রে?"

সলজ্জ হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি বুঝ্‌তে পারি নে, ঠাকুর্দ্দা, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। চরিত্রবান, সদাচার-নিষ্ঠ, অকপট ধার্ম্মিক, তান্ত্রিক সাধক যে যেখানে আছেন, আমি সবাইকে কোটী কোটী প্রণাম করছি। তাঁদের সাধন-পদ্ধতি বোধ হয় আলাদা। কিন্তু বিন্দে-টিন্দে ক্লাশের সাধকদের জন্যেও তো একটা কিছু চাই। ভৈরবী-তন্ত্র-টন্ত্রগুলা বোধ হয় তাদেরই গায়ের মাপ দিয়ে তৈরী। অধিকারী-ভেদে সাধন-ভেদ শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা।"

চিন্তিত হইয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "তাহলে বিম্‌লি আর ক্ষেমি—"

ব্রহ্মচারী যোড়হাত করিয়া বলিলেন, "দোহাই ঠাকুর্দ্দা! বেদান্ত-দর্শনে ও-প্রশ্নের কোন জবাব লেখে নি। ওটা আপনাদের বৈষ্ণব-মতে ব্রজের ভাব, না ব্রজলীলা কি বলে? তাও হতে পারে; কিম্বা বিন্দের ভৈরবী-তন্ত্র মতে অপর কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাপারও হতে পারে। আমার আক্কেল-বুদ্ধি ও সব ব্যাপারে একদম ঘোলাটে ধরণের! কিছুই পরিষ্কার ঠাওর কর্‌তে পারি নে। বরঞ্চ বিন্দেকে জিজ্ঞাসা করুন—"

বলিয়া নিজের গামছাখানা টানিয়া কাঁধে ফেলিলেন। রোয়াকের পৈঠা কয়টা ডিঙাইয়া উঠানে নামিলেন। পূজা-গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সামনের দুয়ার জানালাগুলা বন্ধ আছে, অর্থাৎ এখান হইতে নিতান্ত চীৎকার না করিলে অতদূর পর্য্যন্ত কথা পৌছিবে না। তিনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর্দ্দার উদ্দেশে হাসিমুখে চুপি চুপি বলিলেন, "বিন্দে শুধু থিওরী দিয়ে ঠকাবে না। চাই কি আপনাকেও প্র্যাক্‌টিক্যালি অনেক কিছু তত্ত্বের রসাস্বাদ করিয়ে তৃপ্তি দেবে।"

বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দে-ছুট্! চাপা গলায় শিবাপরাধ-

ক্ষমাপণ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে কুয়াতলায় ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি স্নান জুড়িয়া দিলেন। পিছনে ঠাকুর্দ্দা বিড় বিড় করিয়া কি কটু কাটব্য ঝাড়িতে লাগিলেন, সেগুলায় আর কাণ দিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে স্নান করিয়া কাপড় বদলাইবার জন্য ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বিন্দের সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার তখন মহা রাগারাগি চলিতেছে। গ্রামের কে মুখুজ্জেদের যুবতী বিধবা মেয়ে, ও কে বোসেদের যুবতী বিধবা ভ্রাতৃবধূ না কি বৈষয়িক কারণে জ্ঞাতি-শত্রুদের জব্দ করিবার জন্য সাধু বিন্দুমাধব ও সাধু শক্ত্যানন্দ স্বামীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা না কি, কি সব গুণ তুক্ করিয়া, বাণ মারিয়া, বিধবা দুইটির সমুদয় শত্রু নিপাতের বন্দোবস্ত করিতেছেন। গ্রামে ইহা লইয়া কাণা-ঘুসা চলিতেছে। সাধু মুরুব্বির কৃপালাভে গর্ব্বিতা বিধবা দুটি সেজন্য না কি গ্রামশুদ্ধ লোককে ছড়া কাটিয়া গালাগালি দিয়া বুকশূল, অম্লশূল, অন্ধতা, কুষ্ঠ-ব্যাধি ইত্যাদি রোগ ধরিবার অভিশাপ বর্ষণ করিতেছেন। শক্তিশালী অভিচারদক্ষ সাধু মহাপুরুষরা যখন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, তখন অভিচার-শক্তিহীন, সম্মুখ-শত্রুদের কে গ্রাহ্য করে? উক্ত বিধবা দুটি না কি ভয়ঙ্কর স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছেন, এবং স্পর্দ্ধা-ভরে সাধু-সেবার অছিলায় এমন সব কাণ্ড অনুষ্ঠান সুরু করিয়াছেন, যাতে তাঁর আত্মীয় অভিভাবকরা ত পরের কথা,—নিরপেক্ষ নিরীহ বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দাকে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তা-বিব্রত হইতে হইয়াছে। ঠাকুর্দ্দা সহজে কাহারও কথায় কাণ দেন না; এবং পরকুৎসা জিনিসটাও তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন। কিন্তু, এ ব্যাপারটা এতদূর বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে যে, ঠাকুর্দ্দাকেও স্বচক্ষে কিছু 'আশ্চর্য্য ব্যাপার' দেখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ বিচলিত হইয়াছেন।

বিন্দুর সহিত এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুর্দ্দা আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন। সুনিপুণ অভিনেতার মত বিন্দু অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যা কথা বলিতে পারে এবং সাধারণত ভুলিয়াও সত্য কথা বলে না; কিন্তু নিজের বাহাদুরী প্রমাণ করিবার সময়, নিজের ঘৃণিত গুপ্ত কুকীর্ত্তিগুলিও এক এক সময় প্রকাশ করিয়া ফেলে।

আজও ঠাকুর্দ্দার প্রশ্নের উত্তরে সে দম্ভ করিয়া উক্ত বিধবা দুটির সম্বন্ধে এমন কথা প্রকাশ করিয়াছে, যাহা শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য, অমার্জ্জিত বুদ্ধি, মূর্খ স্ত্রীলোক দুটিকে অসৎ পথে পরিচালিত করার জন্য ঠাকুর্দ্দা ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্দুকে,—সঙ্গে সঙ্গে শক্ত্যানন্দ স্বামীকে কটূক্তি করিতেছেন। উত্তরে বিন্দুও উষ্ণ হইয়া ভৈরবী-তন্ত্র, না কাপালিক-তন্ত্র, কোন্ তন্ত্র হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়া—সংশোধন করিয়া মদ্যপান এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলবিন্দু দ্বারা পরস্ত্রীকে অভিষেক করিয়া লইলে সে যে "বিশুদ্ধা শক্তি" হইতে পারে এবং সেইরূপ "শক্তি" হইতেই যে সাধকের সমুদয় সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতেছে। ঠাকুর্দ্দার স্বর্গগত পিতামহও সম্ভবতঃ কখনো সে সব তত্ত্ব শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং রুচি ও সংস্কারে আঘাত লাগায় তিনি মর্ম্মান্তিক রুষ্ট হইয়াছেন; চাপা গলায় উভয়ের মধ্যে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে।

ব্রহ্মচারীর তখনও শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র পাঠ চলিতেছে; তিনি কোন দিকে দৃকপাত বা কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন, দড়িতে কাপড় শুকাইতে দিলেন। তারপর ঠাকুর্দ্দার সামনে আসিয়া, তাঁহাদের বিতণ্ডা থামাইয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে যোড় হাতে আবৃত্তি করিলেন:—

> "করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
> শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাহপরাধম্।
> বিহিতমবিহিতমং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
> জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীঠাকুর দাদা।"

তার পর পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন "অনেক রাগিয়েছি, এবার ক্ষমা চাইছি। আশীর্ব্বাদ করুন, এবার মনঃস্থির করে যেন আমার আহ্নিক পূজোটি সারতে পারি। আসনে বসতে চললুম। আপনারা যখন যাবেন, দয়া করে সদর দুয়ারটা ভেজিয়ে—"

ব্যস্ত-বাগীশ ঠাকুর্দ্দা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না—না। আমরা এখুনি যাচ্ছি, তুমি দুয়ারে খিল দিয়ে পুজোয় বস গে। আয় বিন্দে—"

ঠাকুর্দ্দা উঠানে নামিলেন। বিন্দে উঠিবার কোন লক্ষণ

দেখাইল না, নিশ্চেষ্টভাবে যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। ঠাকুর্দ্দা পুনশ্চ ডাকিলেন "আয় বিন্দে—"

বিন্দে গম্ভীর হইয়া জবাব দিল "আপনি যান, আমি একটু পরে যাব।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "না—না, পরে নয়। আমার সঙ্গেই চল্। শাস্ত্রীয় যুক্তির দোহাই দিয়ে কোন কদাচারেই তোমার আপত্তি নাই। এদের ঘটিটা বাটিটায় 'দিষ্টি' দেবে, সেটাও তোমার পক্ষে হয় ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা—"

মহা লজ্জা-বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আহা-হা কি করেন ঠাকুর্দ্দা—"

ক্রুদ্ধ স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন "ঠিক কর্‌ছি। আমি তোর মত উদো-মাদা সন্নিসী নই, —সংসারী। এ সংসারে অনেক ঘা খেয়েছি। বিন্দের মত বাইশ 'শো বজ্জাতের পাল্লায় পড়ে ঢের ঠকেছি। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। বিন্দে আয়।"

অগত্যা বিন্দে উঠিল। উঠানে নামিতে নামিতে অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বলিল "চুরি যদি করি, নিজের মামার জিনিসই চুরি কর্‌ব। পরের ত করি না—তবে দোষ কি?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কি সাংঘাতিক আত্মীয় মর্য্যাদা!—এমন যুক্তি-বিচার শিখলি কোথা? বাগ্দীপাড়ার শাস্ত্রে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সদর দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, সে কথা ভুলিয়া তিক্ত তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "প্রসাদ, তোর ধর্ম্মের দোহাই, তোর গুরুর দোহাই,—একটা সত্যি কথা বল্। পরস্ত্রীর ধর্ম্মনাশ করে কখনো মানুষের ধর্ম্মলাভ হয়?—এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?"

ব্রহ্মচারীর মুখের উপর কে যেন সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিল; বিবর্ণ মুখে, মর্ম্মান্তিক ক্লেশের সহিত তিনি বলিলেন "নিজের পায়ে কুড়ুলের চোট মার্‌লে পায়ের দৌড়ের ক্ষমতা বাড়ে, এ কথা যে বিশ্বাস করে,—ও-কথাও সে বিশ্বাস কর্‌বে। আমার গুরুর দোহাই দিলেন, তাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অভিমত শোনাচ্ছি—শুনুন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—"

বলিতে বলিতে বিন্দুমাধবের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্রহ্মচারী সহসা থামিলেন। ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমার গুরুর অভিমত পরে আপনাকে জানাব। এখন আমার আসনে বস্‌বার সময়; মন অস্থির হয়ে পড়েছে। স্থির হয়ে সব বল্‌তে পারব না। তবে অতি-সহজ নৈতিক-বুদ্ধিতে এটা ত বোঝেন, যা দুর্নীতি যা অবৈধ,—সে রকম কাযের দ্বারা কখনো আত্মোন্নতি-মূলক ধর্ম্মলাভ হয় না, পশু-ধর্ম্মে উন্নতি লাভ হয় মাত্র!"

বিন্দু অতিশয় বিজ্ঞতার সহিত বলিল "বাসনা নিবৃত্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। যার যা বাসনা —"

ব্রহ্মচারী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিলেন "কুৎসিত, ঘৃণিত, অসংযত লালসা-পরিতৃপ্তির নাম কর্ম্ম নয় বিন্দে। পশু-ধর্ম্মও ধর্ম্ম,—সে ধর্ম্মের সম্বন্ধে যেখানে যত খুশী লেক্‌চার ঝেড়ে বেড়া। সে ধর্ম্ম উৎসাহের সঙ্গে পালন করবার মত পশু সংসারে যথেষ্ট আছে। কুতর্কের দ্বারা অতি-বড় প্রকাণ্ড মিথ্যাকেও অতি-বড় প্রকাণ্ড সত্য বলে চালানো যায়। তুইও পশু-ধর্ম্মকে আত্মিক ধর্ম্ম বলে প্রচার করে তোর উপযুক্ত শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি কর—আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ব না। কিন্তু ভদ্রসমাজ বলে একটা সমাজ এখনো আছে। মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সম্বন্ধে তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান এখনো লোপ পায় নি; তাঁদের নীতিজ্ঞানকে, ভদ্র রুচিকে জবাই করে কশাই বৃত্তি চালাস্ নে। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

অন্য কেহ হইলে এ তিরস্কারে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু বিন্দুমাধব যথাপূর্ব্বং তথাপরং অটল নির্ব্বিকার! নিতান্তই নিরুদ্বিগ্ন মুখে সে বলিল, "আপনি পূজায় বস্‌তে যাচ্ছেন, আপনাকে এখন বলা হোল না, কিন্তু আমার একটা কথা আছে। কোন্ সময় এলে আপনার সঙ্গে কথা হবে বলুন।"

ব্রহ্মচারী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর্দ্দা মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কোন সময়েই নয়। তোমার কথার মধ্যে ত দেখি দুই কথা—এক কসাইখানার গল্প, আর এক টাকার দরকার।"

বিন্দু অম্লানবদনে বলিল "হ্যাঁ! বাবা এ মাসে এখনো টাকা পাঠান নি, তাই টাকা গোটাকতক দরকার বটে। তা ছাড়াও কথা আছে। ক্ষেমির ছেলের অসুখ হয়েছে, ডাক্তারের সঙ্গে ত মামার বন্ধুত্ব আছে। ওকে বলে দেবেন যেন আজ গিয়ে দেখে আসে।"

ইহা অনুরোধ নয়, আদেশ। এ শ্রেণীর আদেশ প্রায়ই ব্রহ্মচারীকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া পালন করিতে হইত,—শুধু অসমর্থদের জন্য নয়, সমর্থদের জন্যও। পল্লী-গ্রামের অবস্থা যাঁহারা জানেন, এটুকু সত্য তাঁহাদের অবিদিত নাই যে, একজন সহৃদয় দানোৎসাহী, সামর্থ্যবানকে হাতের কাছে পাইলে বিন্দুমাধব-শ্রেণীর অনেকেই তাঁর স্কন্ধের উপর দিয়া "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদ-বাক্যটি সার্থক করিয়া লইতে চায়।

একে আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ-প্রায়, তার উপর বিন্দু-মাধবের গভীর গবেষণাচ্ছাদিত অসহনীয় ধৃষ্টতার অত্যাচার,—তার উপর আবার তার উপপত্নীর জারজ-সন্তানের জন্য চিকিৎসক! জ্বলিয়া উঠিয়া রুক্ষ স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমার হাতে টাকা নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজে করগে বাবা।"

বিন্দু অতি সংযত স্বরে বলিল, "সে ত করছি-ই। কিন্তু এখন আমার হাতেও টাকা নেই।—ডাক্তার আপনার বন্ধু, যদি আপনি বলে-কয়ে দেন—উপকার হয়।"

ব্রহ্মচারী দুয়ার বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন "বন্ধুত্বের খাতিরে অন্যায় জুলুম করে কাউকে পরোপকারে প্রবৃত্ত করাবার সামর্থ্য আমার নেই। ডাক্তারকেও পয়সার জন্যে খাটতে হয়, তারও পয়সা চাই।"

তার পর আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়া তিনি দ্রুতপদে পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন।

(২৭)

সেদিন সন্ধ্যার পর পূজাহ্নিক সারিয়া ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী তখনও আসেন নাই, কম্বলও যথাস্থানে পাতা নাই। ব্রহ্মচারী অন্যমনস্কের মত একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অনুমানে বুঝিলেন ব্রহ্মচারিণী তখনও পূজাপাঠ সারিয়া উঠেন নাই। তুলসীতলায় ঘি'য়ের প্রদীপ সাজান ছিল, ঘর হইতে দেশলাই আনিয়া নিজেই সেটা জ্বালিয়া দিলেন। তার পর লণ্ঠন জ্বালিয়া, কম্বল ও একখানা মোটা বই আনিয়া রোয়াকে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু পড়ায় মন লাগিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন। বাতাসে দুয়ার-জানালার সামান্য খুটখাট্ শব্দেও চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন, ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বার বার পূজা-গৃহের দুয়ারের দিকে চাহিতে লাগিলেন, —হয় ত তিনি আসিতেছেন! কিন্তু না, তিনি নয়! তবে?

নিজের মানসিক চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী নিজের মনেই হাসিলেন! লজ্জিত হইয়া আবার পড়ায় মন দিবার চেষ্টা করিলেন, এবং ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাইয়া শেষে উঠিলেন। মনে মনে কি একটা কৈফিয়ৎ স্থির করিতে করিতে পূজা-গৃহের দিকে চলিলেন।

পূজা-গৃহের বারেণ্ডায় পা দিয়া ব্রহ্মচারী সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন। অন্ধকার বারেণ্ডা দিয়া কে একজন তীরবেগে বাহিরে আসিতেছিলেন, ঠিক চৌকাঠের কাছেই তার সাম্‌নে পড়িলেন! যদিও অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না, কিন্তু তাঁর আঁচলের চাবি এবং হাতে জড়ানো রুদ্রাক্ষ মালার ঘসাঘসির শব্দে বুঝিতে বাকী রহিল না,—মানুষটি কে। ত্রস্তে পা টানিয়া লইয়া, ব্রহ্মচারী পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন; মৃদু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "এত দেরী?"

সে প্রশ্ন বোধ হয় ব্রহ্মচারিণীর কাণে গেল না। ব্যস্ত উদ্বিগ্নভাবে ধরা গলায় তিনি বলিলেন "আমায় ডাক্‌ছিলে?"

আশ্চর্য্য হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমি?"

"তুমি নয়? তা হলে?—" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হতবুদ্ধি-বিহ্বলের মত ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিকে আর যাহাই বলা হউক, প্রকৃতিস্থের স্বাভাবিক দৃষ্টি বলা চলে না। ব্রহ্মচারীও নিগূঢ় বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত দুজনেই বিস্ময়াভিভূত,—স্তম্ভিত! ওই যে অনির্দ্দিষ্ট 'তাহা হইলে'-টা কি,—সে প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে কেহই যেন সাহসী হইলেন না।

জোর করিয়া বিস্ময়-বিকল ভাবটা দমন করিয়া ব্রহ্মচারী ধীরে বলিলেন "তোমার নিত্যক্রিয়া শেষ হয়েছে ত? তা হলে এস।"

ব্রহ্মচারিণী কি একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলায় যেন আট্‌কাইয়া গেল। উপরে নির্ম্মল নীল আকাশে শুক্লাষ্টমীর উজ্জ্বল চন্দ্র হাসিতেছিল; বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তিনি একবার সেই দিকে চাহিলেন। বার দুই ঢোক গিলিয়া আবার কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন,

এবারও বলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তাঁর চন্দ্রালোক-স্নাত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভাব-বিহ্বল দুই চোখে অশ্রুবিন্দু টল টল করিতেছে। মুখে এক অনির্ব্বচনীয়, অপূর্ব্ব ভাব!

ব্রহ্মচারী দুই হাতে নিজের বক্ষঃ চাপিয়া উদ্বেলিত হৃৎস্পন্দন সবলে দমন করিয়া অধিকতর ধীর-স্বরে ডাকিলেন "নীলিমা।"

সে ডাকে ব্রহ্মচারিণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সহসা অস্বাভাবিক ব্যস্ত উত্তেজিত হইয়া তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন "হাঁ—হাঁ, যাই, যাই। তোমার পায়ের ব্যথা কেমন আছে?"

ওবেলা সেঁক দিয়া পায়ের ব্যথা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল; সমস্ত দিনে ব্রহ্মচারী আর সে দিকে মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রের অনিদ্রার গ্লানিটুকু কাটাইবার জন্য আজ সমস্ত দুপুরটা ঘুমাইয়াছেন; বৈকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক-পর্ব্বে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কোথায় ব্যথা, কার ব্যথা, কে-ই বা স্মরণ রাখে?

কিন্তু এবার স্মরণ করিতে হইল। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার সেঁকে উপকার হয়েছে, ব্যথা কমেছে।" রোয়াকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন "ওখানে বস্‌বে চল।"

"যাই। তুমি এগোও।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হাতে জড়ানো জপের মালাটা নমস্কার করিয়া, হাত হইতে খুলিলেন। বাঁ কাঁধের উপর হইতে চাবিশুদ্ধ আঁচলটা খসিয়া পড়িতেছিল, সেটা কাঁধে ঠিক করিয়া দিয়া মালাটাও তার সঙ্গে কাঁধে ফেলিলেন। সেটা আট্‌কাইবার মত কোন ব্যবস্থাই যে সেখানে নাই, তা মনে পড়িল না। তার পর স্খলিত-পদে রান্নাঘরের দিকে চলিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ওখানে কেন?"

"একটু দরকার আছে। এখুনি আসছি।" বলিয়া শিকল খুলিয়া তিনি রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। তার পর ধীরে ধীরে রোয়াকে আসিয়া নিজের কম্বলে বসিলেন। দুহাতে জানু বাঁধিয়া, তার উপর মাথা গুঁজিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী গামছায় ধরিয়া এক কড়া আগুন লইয়া আসিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আগুন কি হবে?"

ব্রহ্মচারিণীর বাক্‌শক্তি তখনও যেন নিজের আয়ত্তাধীনে আসে নাই। কড়াই-টা ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে নামাইয়া কি উত্তর দিতে হইবে একটু ভাবিয়া লইলেন। তার পর থামিয়া থামিয়া বলিলেন "এই—তোমার—পা"

ব্রহ্মচারী তাঁকে থামাইয়া দিয়া সপরিহাসে বলিলেন "কি—পা পোড়াতে হবে?"

এই তুচ্ছ পরিহাসটাও আজ সহজভাবে গ্রহণ করিবার মত ব্রহ্মচারিণীর বাহ্যিক বোধশক্তি জাগ্রত ছিল না। একটু ব্যাকুল হইয়া,—যেন কি করিয়া ব্রহ্মচারীর ভুল সংশোধন করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া,—শঙ্কিতভাবে বলিলেন "না, না, সেঁক দিতে হবে।"

ব্রহ্মচারী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তার পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া স্মিত-মুখে বলিলেন "হুঁ। কিন্তু সেঁক এখন থাক। এস, একটু শাস্ত্র-তত্ত্ব-বিচার করা যাক। আহা, তোমার মালা যে পড়ে যাবে! থাম, ঠিক করে দিই।—শিব, শিব—"

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া তিনি ব্রহ্মচারিণীর কাঁধের উপর হইতে মালাটা টানিয়া লইলেন। দুহাতে ধরিয়া ব্রহ্মচারিণীর মাথা গলাইয়া সেটা গলায় পরাইয়া দিলেন; এবং ব্রহ্মচারিণীর কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁর মাথার সামনের দিকটা ধরিয়া আনত মুখখানা তুলিয়া আবার ডাকিলেন "নীলিমা!"

মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারিণী অবসন্ন ভাবে টলিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী সম্ভবতঃ এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁর কাঁধ ধরিয়া সামলাইয়া লইয়া,—যেন কিছুই হয় নাই এমনি সহজভাবে হাসিয়া বলিলেন "এ কি কাণ্ড? এ যে তান্ত্রিকদের সুধাপানের ওপরে যাচ্ছে!—"

ব্রহ্মচারিণী কোন উত্তর দিলেন না। ব্রহ্মচারীর হাত ছাড়াইয়া নিকটস্থ থামে ঠেস দিয়া ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিলেন।

কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া কাটিল। একজন অভিভূতের মত নিজের ভাবে মগ্ন, আর একজন

সতর্ক মনোযোগে তাঁর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে তৎপর। কাহারও মুখে কথা নাই।

আরও খানিক পরে ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু বিষণ্ণ ভাবে মৃদু-অনুযোগ-পূর্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন।

ব্রহ্মচারী সে দৃষ্টির অর্থ কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "বিবেক আর প্রজ্ঞার সাহায্যে নিজেকে স্থির কর। আনন্দের ছিটে ফোঁটা পেয়েই যদি এম্নি আত্মহারা হয়ে পড়ো,—বড় বড় আনন্দ ভোগ করবে কে? তুমি না ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে পূজা করো? বেদান্ত কি জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করতে বলে? না—জীবন্মৃত অবস্থা লাভ করতে বলে?"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। জলের হাঁড়িটা আনিয়া আগুনে চাপাইয়া দিয়া ফ্লানেলের টুকরা, রেকাবি সমস্ত গুছাইয়া লইয়া ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে বসিলেন। হেঁট মুখে নির্ব্বাক হইয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "কি ভাবছ? আমার সঙ্গে কথা বল।"

ক্লিষ্ট ভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কি বল্‌ব? একটু চুপ করেই থাকি না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "না। বাহ্য-জগতের ব্যাপারে নেমে এস। সমস্ত চিত্তবৃত্তি স্তম্ভিত করে জড়ভরত ব'নে যাওয়াই কি ভাল? আমার পা টন্ টন্ করছে যে, সেঁক দেবে না?"

এলুমিনিয়মের পাৎলা হাঁড়িতে ইতিমধ্যে গরম জল ফুটিতে সুরু হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিণী তার মধ্যে ফ্লানেল ভিজাইয়া যথারীতি নিংড়াইয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমিই পায়ে দিই?"

ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন "আরে না—না, তুমি আমার পা ছুঁয়ো না। তোমার দাদাশ্বশুরের আমে একেই আমার পা টন্ টন্ করছে। আবার তুমি পা ছুঁলে হয় ত দাঁত কন্ কন্, নয় ত মাথা ঝন্ ঝন্—যা হোক কিছু বিভ্রাট ঘটবে। সেটা সুচিকিৎসা নয়। আমার হাতে দাও, আমি নিজে সেঁক দিচ্ছি।"

ব্রহ্মচারিণী এবার যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তবুও ব্রহ্মচারীর কথাটা যেন ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তন্দ্রাভার-জড়িত চক্ষু তুলিয়া, অর্থশূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "নিজের হাতে? সে ত ভাল হবে না।"

ব্রহ্মচারী এবার রাগ জানাইবার জন্য রীতিমত কড়া সুরে বলিলেন "হবে। আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে! ফ্লানেলটা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, সেদিকে হুঁস্ আছে? উনি আবার আমায় বলেন যে হুঁসিয়ার!"

বলিতে বলিতে তিনি আবার হাসিলেন। এক মাতালের নেশা দেখিয়া আর এক মাতালের নেশা ছুটিয়া যাওয়ার প্রচলিত প্রবাদটা তাঁর স্মরণ হইল। বাহ্য ব্যাপারে এই অর্দ্ধ-অচেতন, অর্দ্ধ-সচেতন জীবটির কাণ্ডজ্ঞান উদ্বোধনের জন্য তাঁর নিজের কাণ্ডজ্ঞান যে আজ প্রখর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—ক্ষণেকের জন্য স্থির হইয়া সেটুকু মনে মনে উপলব্ধি করিয়া লইলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "ফ্লানেলটা রেকাবিতে রাখো। দেখি গরম আছে কি না।"

ব্রহ্মচারিণী বিনা-বাক্যে আদেশ পালন করিলেন। ফ্লানেল তুলিয়া পায়ে চাপিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আছে গরম। ও ফ্লানেলটা গরম করতে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী এবারও নীরবে আদেশ পালন করিলেন এবং যথারীতি নিংড়াইয়া ফ্লানেল রেকাবিতে রাখিলেন। সেঁক চলিতে লাগিল। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। একজন মোহাবিষ্টের মত নিঝুম হইয়া যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত কায করিতেছেন, আর একজন মনের উদ্বেগ-চাঞ্চল্য গোপন করিবার জন্য, কাযের অছিলায় ব্যস্ত। সুধু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি গোপনে অপরকে লক্ষ্য করিতেছে।

দণ্ডখানেক এমনি করিয়া কাটিল। সেঁকের সরঞ্জাম নিজেই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওঠো। চল, দেখি তোমার ভাঁড়ার-ঘরটা। রাত্রের ব্যবস্থা সেরে নিয়ে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। অভ্যাসমত ভাঁড়ার-ঘর খুলিয়া যথারীতি রাত্রের আহার্য্য সাজাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী দুয়ারের বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সমস্ত কাযই ঠিক নিয়মমত হইল; কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, যে

মানুষটি কাযগুলা করিয়া যাইতেছেন,—তিনি শুধু অভ্যাস-বশেই করিতেছেন; তাঁর মন কিন্তু অপর কোন কিছু দুর্নিরীক্ষ্য ব্যাপারে তন্ময় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। খাইতে বসিয়া ব্রহ্মচারী আবার দেহযাত্রা নির্ব্বাহের তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ প্রসঙ্গ হইতে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচার পর্য্যন্ত নানা কথা তুলিলেন; কিন্তু দু একটা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া আর কিছুই জবাব পাইলেন না, এবং সে উত্তরগুলাকে প্রকাশ করিবার ভাষাও বেশ সামঞ্জস্য-পূর্ণ বা সুসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। এই মানুষটাকে এখন কথাবার্ত্তা বলাইবার চেষ্টা যে একান্ত বৃথা সেটুকু বুঝিলেন। অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁর মুখ অজ্ঞাতেই বিমর্ষ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনের গোপন কোণে, কোথায় যেন একটা কিসের ব্যথা অতি সঙ্গোপনে অতি সঙ্কোচের সহিত গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজন্ম-ভোগ-বীতস্পৃহ চিত্তে, এ সংসারের কোন কামনা কোন বাসনাকে তিনি স্থান দেন নাই। সাধারণ মানব-চিত্ত-সুলভ উপভোগ-তৃষ্ণা তিনি চিরদিনই ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে, যাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে, তাঁহাকে চিরদিনই নিজের উন্নতি-পথের কণ্টক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে কি পরিমাণে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার কাছ হইতে কতখানি ওজনের ভালবাসা আদায় করিতে হইবে, এ সব গুরুতর সমস্যা কোন দিন তাঁর চিত্তকে পীড়িত করে নাই। বরঞ্চ স্বার্থপরতার চুক্তিসূত্রে গাঁথা ওই ভালবাসা নামক পদার্থটার রং ঢং মার্জ্জিত মোহ, তাঁর কাছে চিরদিন হাসি-তামাসার ব্যাপার মাত্র ছিল। সে মোহকে প্রশ্রয় দিয়া মাথায় তুলিয়া লওয়ার চেয়ে সাবধানে তার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত ডিঙাইয়া চলাই তাঁর ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। নিতান্তই ধর্ম্ম ও লৌকিক কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁর সংস্রব সহ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁর নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সেবা যত্ন গ্রহণ করিতেছেন, তাও সব সময়ে সন্তুষ্ট চিত্তে নয়। সেবায় কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, অনেক সময় নিজের দুর্ব্বলতা ও চিত্তবিক্ষেপের জ্বালায় অসহিষ্ণু হইয়া কৃতঘ্নের মত ব্যবহার করিয়াছেন,—সব সত্য। কিন্তু তবু এই বিরক্তি বিতৃষ্ণার মাঝে কোথায় যে কি একটা অদৃশ্য বাঁধন পড়িয়াছে, যাহা চোখে দেখা যায় না, মন-বুদ্ধি দিয়া বিচার করা যায় না,—হয় ত তাহা গুণজ মুগ্ধতা,—অথবা হয় ত তাহা নিরুপায় আশ্রিতের প্রতি আশ্রয়দাতার করুণা মাত্র;—বস্তুতঃ তাহা যে কি, তা ব্রহ্মচারী স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না, এবং তাহা বুঝিবার জন্য তিলার্দ্ধ সময় নষ্ট করিতেও তাঁর প্রবৃত্তি নাই;—কিন্তু সে বাঁধনে আজ বড় টান ধরিয়াছে। দৈহিক সুখ-দুঃখের মত মানসিক সুখ-দুঃখেও উদাসীন থাকার অভ্যাসটা তাঁর যত দৃঢ়ই হউক, সে ঔদাস্য এবার উন্মনা ব্যাকুলতায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে।

নিজের মনের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিলেন। তার পর অভ্যস্ত সংস্কার-বলে, দৃঢ় শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া, অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাই ভাবিতে লাগিলেন।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, সমস্ত কায শেষ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী নীরবে অন্য দিনের মত নিজের ঘরে যাইতে-ছিলেন; ব্রহ্মচারী ডাকিয়া বলিলেন "শোনো। আহার-নিদ্রার সুনিয়ম রক্ষায় তোমার একটু মনোযোগী হওয়া এবার দরকার। আজ রোয়াকে এই খোলা হাওয়ায় ঘুমোও। আমি বারেণ্ডায় এই থামের আড়ালে যাচ্ছি।"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন "না।"

"না, কেন?"

"বাইরে ঘুমোন আমার অভ্যাস নাই।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন। (ক্রমশঃ)
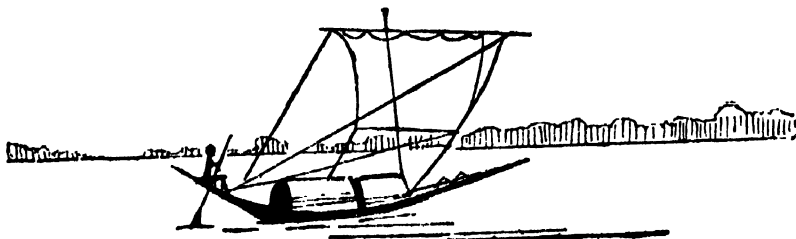
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও আহার

অধ্যাপক শ্রীগোপেশ্বর পাল এম-এস্‌সি

"খুকু আমার, সোনা আমার, চাঁদ আমার খাও ত; কে খায় কে খায়, আমাদের খুকুমণি খায়" কিংবা "খা, বলছি, খা, তা না হ'লে টুঁটি টিপে খাওয়াব, না হয় এক থাপ্পড় দেব" শিশুদের খাওয়াইবার এ রকম প্রথা বাঙালীর সংসারে বিরল নয়।

আহার-বিমুখ শিশুদিগকে এই ভাবে তোষামোদ করিয়া, ভয় দেখাইয়া, বা জোর করিয়া খাওয়াইলে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া তাহাদের কি অনিষ্ট হয়, তাহাই আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

মনোবৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন মানসিক উত্তেজনায় কিংবা কোনরূপ মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না। আমরাও এ বিষয় সকলেই অল্প-বিস্তর প্রত্যক্ষ ভাবে জানি। বয়স্কদের মন অনেক বেশী দৃঢ় এবং শিশুর মন বহুগুণে অধিক ভাবপ্রবণ; সেজন্য পাকযন্ত্রের ক্রিয়া সামান্য মানসিক উত্তেজনায় বিচলিত হয়। কাজেই ক্রোধশীল বা ভীত শিশু আহার গ্রহণ করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না। আমরা জানি, সকল রকম পরিপন্থী অবস্থায় শিশু ক্রুদ্ধ হয়, সেজন্য শিশুকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া খাওয়াইলে শিশু রাগিয়া উঠে। ফলে তাহার ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না।

ক্রীড়াশীল শিশুকে জোর করিয়া আটকাইয়া খাওয়াইলে ঐ একই রূপ কুফল পাওয়া যায়।

আহার নিদ্রাদির সুনিয়মিত অভ্যাস, দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয়। অসময়ে আহারের ফলে পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত হয়; এবং মনের উপর তাহার প্রভাব কতখানি বিস্তৃত হয় তাহাও আমরা সকলেই জানি। সেজন্য শিশুদের আহারের একটা সময় নির্দ্ধারিত রাখা প্রত্যেক জনক জননীর উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে জোর করিয়া শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহাকে খাওয়ান ঠিক নয়। শিশু কোন বেলা কম খাইল, কোন বেলা বেশী খাইল, আবার কোন বেলা খাইতেই চাহিল না। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না; বরং জোর করিয়া খাওয়াইলে স্বাস্থ্যহানির অধিক সম্ভাবনা। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এরূপ সাময়িক আহারে অরুচি দেখিতে পাই। এরূপ অরুচি দৈহিক অস্বাস্থ্যের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিয়া আমরা আহার্য্য গ্রহণে বিমুখ হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ শিশুদের সময় এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই; শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে অতি-ব্যগ্রতাই ইহার কারণ। জোর করিয়া আমরা শিশুকে খাওয়াই; ফলে, অনেক সময় শিশু ভুক্ত দ্রব্য উদ্বমন করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহাতেও তাহার জননী তাহাকে নিস্কৃতি দেন না; তাহার পরও সন্তানকে জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করেন। এইরূপে অনেক সময় বমন রোগের সৃষ্টি স্থায়ীভাবে হইয়া থাকে এবং আহার্য্যের উপর শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের দুগ্ধের উপর বিতৃষ্ণা এই ভাবেই জন্মে।

শারীরিক অসুস্থতা না থাকিলে আহারে বিমুখ শিশুকে তোষামোদ করিয়া খাওয়াইলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু মনোবিদ্যার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এ প্রকার পন্থাও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আহারের সময় জননীরা শিশুদিগকে তোষামোদ করিলে শিশুরা এক প্রকার আরাম পায়; এবং জননীদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ভাবিয়া ও নিজেদের ক্ষমতার গুরুত্ব অনুভব করিয়া শিশুরা আনন্দ পায়; ফলে ভবিষ্যতে এই আনন্দ পাইবারই জন্য জননীদের তোষামোদ বিনা শিশুরা খাইতে চায় না।

নানা প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি দিয়া অনেক জননী সন্তানদের খাওয়াইয়া থাকেন। এ-সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আহারের সময় শিশু যাহা আব্দার ধরে, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া জননী স্নেহবশতঃ এবং সন্তানের স্বাস্থ্য-অবনতির ভয়ে সে সমস্ত আব্দার পূর্ণ করেন বা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুতি দেন, ফলে শিশুর লালসা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। জননীদের এই ধরণের স্নেহশীলতা শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

শিশু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিতে না চাহিলে, জননী ব্যস্ততা বা বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। বরং উদাসীনতার ভাব দেখাইবেন। এই ভাবে যদি দুই কিংবা ততোধিক আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।—প্রতিবারেই ঠিক সময় খাদ্যদ্রব্য শিশুর সম্মুখে আগাইয়া দিবেন, কিন্তু শিশু না খাইতে চাহিলে তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে সরাইয়া লইবেন। এ-সব ক্ষেত্রে জননীর দৃঢ় ও শান্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শরীরের কোন অসুখ না থাকিলে শিশু নিশ্চয়ই খাইবে; ক্ষুধা তাহাকে খাইতে বাধ্য করিবে।

শিশু যাহাতে নিজ হাতে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। অতি অল্প বয়স হইতেই শিশু-দিগকে এ বিষয় স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দিবেন। নিজ হাতে খাইতে শিখিলে আহারের সময় শিশুকে নিঃসঙ্গ কিংবা অন্যান্য শিশুদের সহিত রাখা ভাল। বয়স্কদের সহিত তাহাদের খাইতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বয়স্করা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী আহার্য্য শিশুদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হন। ফলে শিশু ক্রুদ্ধ কিংবা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জননীর উপস্থিতি সময় সময় বাঞ্ছনীয়। আহারের সময় তাঁহার স্মিতহাস্য ও মিষ্ট বাক্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ব্যস্ততা ও দুশ্চিন্তা যেন তিনি প্রকাশ না করেন।

কোন একটা বিশেষ খাদ্য বা উপকরণ প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া শিশু খাইতে না চাহিলে বিনা বাক্যব্যয়ে শিশুকে সেইরূপ করিতে দিবেন। ইহা লইয়া জননীর তর্কবিতর্ক করিলে শিশু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কিংবা মাতা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য শিশুর আব্দারই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখেন। ফলে শিশুর প্রলোভন বাড়িয়া যায়।

কোন একটা জিনিষ খাইব না বলিয়া শিশু জিদ ধরিলে জোর করিয়া খাওয়ান উচিত নয়; সেইরূপ করিলে সেই খাদ্যের উপর শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। তখনকার মত শিশু সেই দ্রব্যটা নাই বা খাইল! পরে হয় ত আপনা হইতেই চাহিয়া খাইবে।

শিশুদিগকে তাহাদের রুচি অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য খাইতে দিবেন—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পছন্দমত যে-কোনও খাদ্য দিবেন না। কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ খাদ্যোপকরণ শিশুদের শরীর গঠনের উপযোগী এ সম্বন্ধে পিতামাতার একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আজকাল শিশুর উপযোগী খাদ্যোপকরণের ও তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাপের তালিকা, বিশেষজ্ঞরা অল্প-বিস্তর প্রস্তুত করিতেছেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যোপকরণ জন্মে। কিন্তু একই প্রকার উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য খাদ্যোপকরণের তুলনা-মূলক উপাদান বা উপযোগিতা, মূল্য ও প্রাপ্তি-কাল এই তিন দিক বিবেচনা করিয়া তালিকা প্রস্তুত হইলে, সকল পিতামাতা নিজ নিজ সন্তানের রুচি অনুযায়ী খাদ্যোপকরণ সহজেই বাছিয়া লইতে পারেন। অনেক সময় দেখিতে পাই, পিতামাতা শিশুদের বেদানা বা আঙুর খাওয়াইতে পারিলে নিজদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করেন; কিন্তু বেদানা বা আঙুরের মূল্যের অনুপাতে তাহাদের উপযোগিতা নাই বলিলেও হয়। কমলালেবু শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু বর্ষা ও শরৎকালে ইহা দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য—সে সময় বাতাবী লেবু সুপ্রাপ্য ও সুলভ অথচ সম উপযোগী।

শিশুখাদ্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ, তবুও এ কথা বলিতে পারি যে, আমাদের দেশে শিশুদের আহার্য্যের মধ্যে মিষ্ট সামগ্রীর প্রাচুর্য্য এবং ফল ও শাকসবজীর অভাব দেখিতে পাই। তার উপর সময় অসময় শিশুদের মিষ্টান্ন খাইতে দেওয়া হয়—তাহাতে কেবল যে যকৃতের দোষ হয় তাহা নহে—চরিত্র-গঠনেও ইহার অপকারিতা যথেষ্ট। শিশু কোন কারণে কাঁদিল, মিষ্ট দ্রব্য দিয়া তাহাকে চুপ করান হইল; শিশু কোন সামগ্রী লইবার জন্য আব্দার ধরিল, অমনি মিষ্টান্ন দিয়া তাহাকে ভুলান হইল; শিশু কোন একটা কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইল, অমনি মিষ্টি দিয়া তাহাকে সেই কাজে প্রবৃত্ত করা হইল। এই রকমে শিশুদিগকে মিষ্টি খাওয়াইবার দৃষ্টান্তের অভাব বাঙালীর সংসারে নাই। ফলে শিশু শিক্ষা করিল—কাঁদিলে, আব্দার ধরিলে বা অবাধ্য হইলে মিষ্টি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের আহার সংক্রান্ত আর একটি কদাচারের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

আমাদের স্নেহশীল পিতা, মাতা, ভগিনী, বিশেষতঃ

পিসীমাতা, ঠাকুরমাতা তাঁহাদের নিজ নিজ আহারের সময় ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে না লইয়া আহার করিতে বসেন না। শিশুদের প্রসাদ না দিলে তাঁহারা আহারে তৃপ্তি পান না, অন্ততঃ শিশুরা কিছু না খাইলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হন। কাজেই একই শিশুকে এক ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টা অন্তর কিছু না কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহারা কি কখনও ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহারা এইরূপে শিশুদিগের মনে অল্প অল্প লালসা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতেছেন? এবং এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে আহারের ফলে শিশুর যে অজীর্ণ হয়, তাহার জন্য তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে দায়ী?

উপরন্তু, ছোট ছোট শিশুদের লইয়া আহার করিবার সময় কয়জন পিতা, মাতা, ঠাকুরমাতা বা পিসীমাতা, পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া আহারের অংশ প্রত্যেককে সমানভাবে দিতে পারেন? মনে করিবেন না এই পক্ষপাতিত্ব সরল শিশুর বোধের অগম্য। মনে রাখিবেন ইঁহারাই শিশুর হৃদয়ে দ্বেষ ও হিংসার বীজ এইভাবে বপন করেন।

মন্‌সুন্‌

ডাক্তার শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এস্‌সি,

প্রতি বৎসর মে, জুন মাসে বর্ষার হাওয়া কেন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তিন-চারি মাস প্রচুর বারি বর্ষণ করে, এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, এই কথা কোন বিদ্যালয়ের বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহার প্রাকৃতিক ভূগোলের লিখিত বিবরণ হইতে অনায়াসে বলিয়া যাইবে যে, গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে প্রখর রৌদ্রের তাপে হাওয়া উষ্ণ ও হাল্কা হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়; এবং ইহাদের পরিত্যক্ত স্থান ভারত-সমুদ্র হইতে জলীয়বাষ্প-পূর্ণ বায়ু আসিয়া দখল করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত করে। এই উত্তর যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা সে জানে না। বিদ্যালয়ের বালক কেন, বোধ হয় আমাদের দেশের অনেকেরই মন্‌সুনের আগমন এবং তিরোধান সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা নাই।

উষ্ণ হাওয়াই যদি বর্ষার কারণ হইত, তাহা হইলে সাহারা মরুভূমির উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইত; সুতরাং উহা মরুভূমি না হইয়া সুজলা সুফলা রমণীয় ভূমিতে পরিণত হইত।
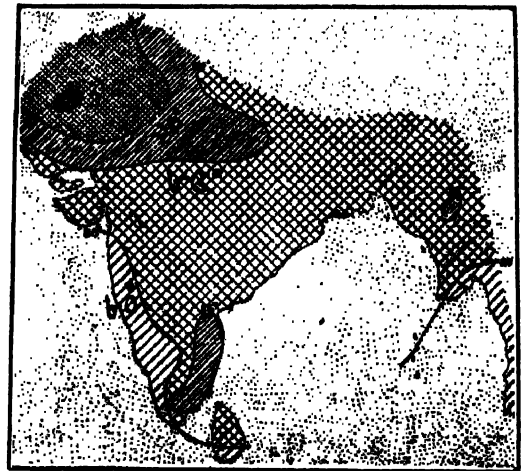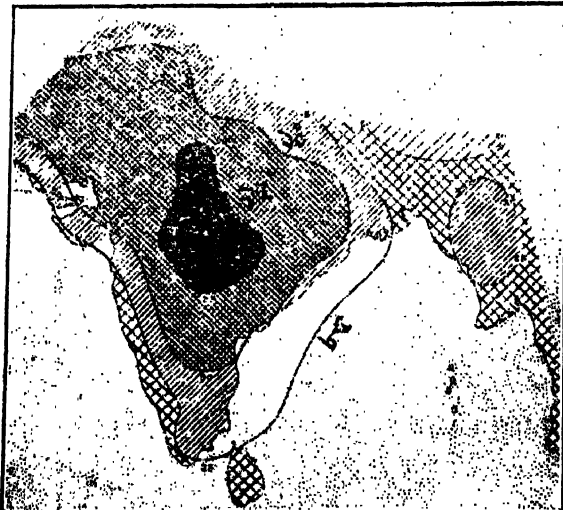
(১) মে মাসে ভারতবর্ষের উপরে হাওয়ার উষ্ণতার মানচিত্র

(২) জুলাই মাসে ভারতবর্ষের উপরে হাওয়ার উষ্ণতার মানচিত্র

মসী-চিহ্নিত স্থানের উষ্ণতা ফারনহাইট্ তাপ মাত্রার হিসাবে ৯৫ ডিগ্রি

ভারতবর্ষের উষ্ণতার মানচিত্র পরীক্ষা করিলে (১নং ও ২নং চিত্র) দেখিতে পাওয়া যায় যে, মে মাসে হাওয়ার উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; জুলাই মাসে বায়ুর উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যদি বায়ুমণ্ডলের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের হাওয়া চতুর্দ্দিকের হাওয়া হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণতার দরুণ হাল্কা হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থান চতুর্দ্দিকের ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া অধিকার করে। সুতরাং মে মাসে সারা ভারতবর্ষে যদি প্রখর উত্তাপের দরুণ হাল্কা হইয়া হাওয়ার উর্দ্ধে উত্থান সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সমুদ্র হইতে জলীয়-বাষ্পপূর্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িত এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাও আরম্ভ হইয়া যাইত। সুতরাং হাওয়ার উষ্ণতাই যদি বর্ষার কারণ হইত, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বত্র বর্ষার প্রকোপ মে মাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মে মাসে ভারতের সর্ব্বত্র বর্ষার আগমন হয় না; জুন মাসের প্রারম্ভে বর্ষা বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষে আসিতে থাকে এবং জুলাই মাসেই উহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকোপ হয় (৬নং ও ৭নং চিত্র দেখুন)। আরও আমরা দেখিতে পাই, অনাবৃষ্টির জন্য যে বৎসর ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয়, সে বৎসর সমস্ত বর্ষাকালে হাওয়া অসহ্য গরম হইয়া থাকে ; কিন্তু অতিবৃষ্টির বৎসরে হাওয়া তদপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা থাকে।

ইহা হইতে সহজেই অনুভূত হইবে, উত্তাপের জন্য এই বিশাল ভারতবর্ষের উপরে হাওয়ার উর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। যদিও এই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হাওয়া উর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয় না, তথাপি উহা যে স্থানে স্থানে বেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা বর্ষার পূর্ব্বের বহু বজ্র-তুফানে (Thunder-storm) প্রাপ্ত হই। কারণ পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে এই প্রকারের তুফানের কেন্দ্রস্থলে হাওয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ ফিট কিংবা তাহারও অধিক বেগে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। মে মাসে ভারতবর্ষের বহু স্থানে এইরূপ ঝঞ্ঝাবাত সমুদ্ভূত হইলেও ইহা স্থানীয় ব্যাপার; সুতরাং ভারতে মনসুনের আগমনের প্রধান কারণ স্থানে স্থানে বায়ুর এইরূপ উর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্তি নহে।

কি জন্য সমস্ত বর্ষাকালে সমুদ্র হইতে জলীয়-বাষ্পপূর্ণ হাওয়া সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে কি কি কারণে হাওয়া গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার আলোচনা করার প্রয়োজন।

পৃথিবীর উপরে এই যে বিশাল বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে, ইহার চাপ সর্ব্বত্র সমান নহে এবং প্রত্যেক স্থানের উপরে অনুক্ষণ উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আবহাওয়ার আলোচনার জন্য যে সকল মানমন্দির আছে, তাহাতে প্রতি-দিন বায়ু-চাপ-মাপক-যন্ত্রের (Barometer) সাহায্যে এই চাপের পরিমাণ লওয়া হয়। এই চাপের পরিমাণ সমুদ্রের এবং নিম্নভূমির উপরে পারদ মাত্রার হিসাবে সাধারণতঃ ২৯ হইতে ৩০.৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। আবহাওয়া বিভাগে হাওয়ার গতির আলোচনার জন্য যে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে যে সমস্ত স্থানে বায়ুর চাপের পরিমাণ সমান, তাহার উপর দিয়া রেখা অঙ্কন করা হয়।
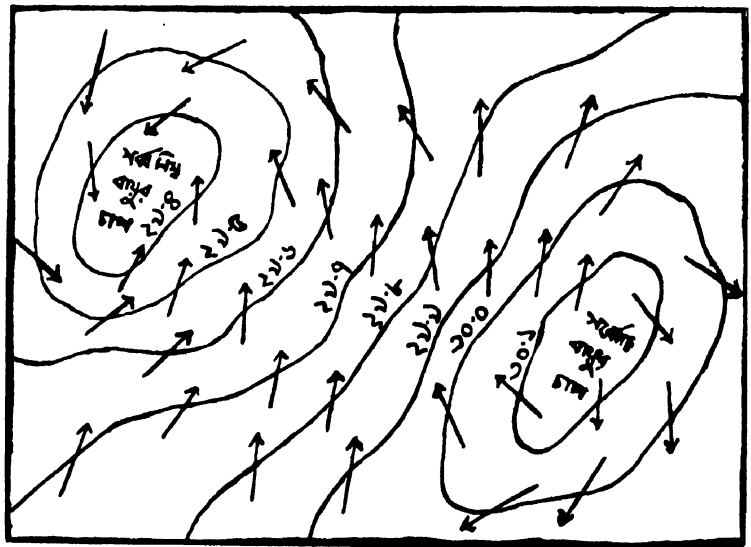
(৩) বায়ুর সমচাপ রেখার সহিত বায়ুর গতির সম্বন্ধ ; তীরগুলি বায়ুর গতির দিক নির্দ্দেশ করিতেছে

এই রেখাকে বায়ুর সম-চাপ-রেখা বলা হয়। মনে করা যাক, কতকগুলি স্থানের উপর বায়ুর চাপের পরিমাণ ২৯·৫ ইঞ্চি ; এই স্থানগুলিকে একটী রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিলে, ঐ রেখা ২৯·৫ ইঞ্চি সম-চাপ-রেখা হইবে (৩নং চিত্র)। পৃথিবীর উপরে বায়ুর সম-চাপ-রেখাগুলি অঙ্কন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা পরস্পর কাটাকাটি করে না, এবং প্রত্যেক সম-চাপ-রেখা চক্রাকারে ঘুরিয়া নিজের সঙ্গেই পুনরায় আসিয়া মিলিত হয়।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানের উপরে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিংবা সর্ব্বাপেক্ষা কম, তাহার চতুর্দ্দিকে এই সম-চাপ-রেখাগুলি চক্রাকারে অবস্থান করে। বায়ুর গতি-প্রণালীর সঙ্গে এই সম-চাপ রেখাগুলির একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। গতির দিক সম-চাপ-রেখাগুলির সঙ্গে প্রায় মিলিয়া যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য বায়ুমণ্ডলের উপরে যে ধাক্কা লাগে, তাহার ফলে উহার উত্তর অর্দ্ধাংশে যে স্থানে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়—তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ু চক্রাকারে ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীত মুখে চলিতে থাকে, এবং যে স্থানে চাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ু ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার অভিমুখে চলিতে থাকে। পৃথিবীর দক্ষিণ অর্দ্ধাংশে বায়ুব গতি এই নিয়মের বিপরীত অভিমুখী হয়।

ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরে নানা প্রকারের বাধা ও ঘর্ষণের জন্য বায়ু সম চাপ-রেখা-পথে না চলিয়া সাধারণতঃ উহার সঙ্গে ২০ হইতে ৪০ ডিগ্রি কোণ করিয়া চলে, এবং উহার দিক সর্ব্বনিম্ন বায়ুর চাপের দিকে অন্তর্মুখী এবং সর্ব্ব উচ্চ

(৪) মে মাসে এশিয়া ভূখণ্ডের উপরে বায়ুর চাপ ও বায়ুর গতি। রেখাগুলি বায়ুর সমচাপ রেখা ও তারগুলি বায়ুর গতির দিক নির্দ্দেশ করিতেছে

(৫) জুলাই মাসে এশিয়া ভূখণ্ডের উপরে বায়ুর চাপ ও বায়ুর গতি। রেখাগুলি বায়ুর সমচাপ রেখা ও তীরগুলি বায়ুর গতির দিক নির্দ্দেশ করিতেছে

বায়ুর চাপের দিকে বহির্মুখী হইয়া থাকে। (৩নং চিত্র দেখুন)

বায়ুর গতির উপরিউক্ত নিয়মগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহা পৃথিবীর যে স্থানের উপরে বায়ুর চাপ অধিক সে স্থান হইতে যে স্থানের উপরে চাপ

ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া গমনের সময় ঘর্ষণের জন্য এবং উচ্চ নীচ ভূমিতে বাধা পাওয়ার দরুণ বায়ুর গতি অনেকটা জটিল হইয়া পড়ে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের এক মাইল কিংবা আধ মাইল উপরে বায়ুর গতি-পথে এই সমস্ত বাধা থাকে না।

পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ স্থানে বায়ুর

কম সেই দিকে প্রবাহিত হয়; এবং দুইটি স্থানের মধ্যে চাপের মাত্রার ব্যতিক্রম যত অধিক হয়, বায়ুর গতির মাত্রাও ততই অধিক হইয়া থাকে। বঙ্গ ও আরব সাগরে যে
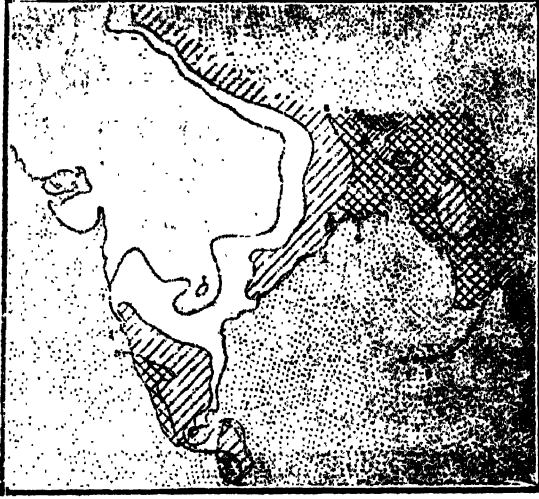
(৬) মে মাসের বৃষ্টির মানচিত্র। সংখ্যাগুলি চিহ্নিত স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ ইঞ্চির হিসাবে নির্দ্দেশ করিতেছে

সমস্ত ভীষণ ঝড় উৎপন্ন হয়, তাহাদের কেন্দ্রস্থলের উপরে বায়ুর চাপ বহির্ভাগের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কখনও কখনও প্রায় ২ ইঞ্চি কম হয়। এই নিমিত্ত বায়ু বিপুল বিক্রমে ঘণ্টায় প্রায় ৮০।৯০ মাইল বেগে কেন্দ্রস্থলের চতুর্দ্দিকে ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটার বিপরীত অভিমুখে বহিতে থাকে।

সময়ে সময়ে এমন অবস্থা হয় যে, বহু বিস্তৃত স্থানের উপরে বায়ুর চাপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; ঐরূপ ঘটিলে ঐ স্থানের উপরে বায়ু মৃদু অথবা একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে।

বায়ু সর্ব্বনিম্ন চাপের কেন্দ্রাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে উহা ঐ স্থানের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়; কারণ সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে না উঠিলে ঐ স্থানে বায়ুর সমষ্টি ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন স্থানের উপরেই ঐরূপ ঘটা সম্ভবপর নহে। এই রূপ আবার সর্ব্ব উচ্চ বায়ুর চাপের কেন্দ্রস্থান হইতে বায়ুর গতি বহির্মুখী হওয়ার ফলে ঐ স্থানের উপরিস্থ বায়ু ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে।

বায়ু যখন ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে তখন ঐ সঙ্গে উহার তাপেরও হ্রাস হইতে থাকে। ৩০০ ফিট উপরে উঠিলে উহার তাপের মাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি কমিয়া যায়। এই তাপ-মাত্রার হ্রাসের ফলে বায়ুর অভ্যন্তরস্থ জলীয় বাষ্প জমিয়া মেঘাকৃতি ধারণ করে এবং আরও অধিক তাপের হ্রাস হইলে ঘন মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং বারি বর্ষণ সুরু করে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই, যে স্থানের উপরে বায়ুর চাপ কম, সেই স্থানের উপরে অনেক সময় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই একই নিয়মে বায়ু নিম্নে অবতরণের সময় উহার তাপের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যে স্থানে বায়ু নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে, সে স্থানের উপরের মেঘ পুনরায় বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থানের উপর বায়ুর চাপ অধিক, সে স্থানের আকাশ প্রায়ই নির্ম্মল, মেঘশূন্য হইয়া থাকে।

যে স্থানে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম, সে স্থানের উপরেই যে কেবল বায়ুর ঊর্দ্ধমুখী গতি হয় এরূপ নহে। অন্যান্য কারণেও বায়ু ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া আসিতে আসিতে যখন অসমতল
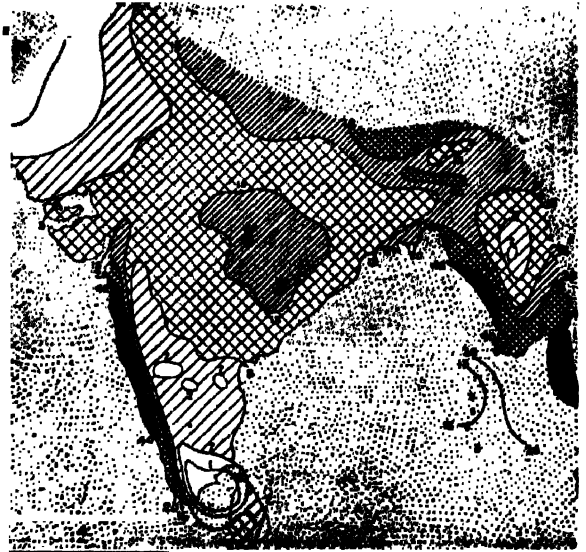
(৭) জুলাই মাসের বৃষ্টির মানচিত্র। সংখ্যাগুলি চিহ্নিত স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ ইঞ্চির হিসাবে নির্দ্দেশ করিতেছে

তীরের উপরে আসিয়া ধাক্কা খায়, তখন কিয়ৎ পরিমাণে ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়; এইরূপে পর্ব্বত-গাত্রে বাধা প্রাপ্ত

হইলেও উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপ কারণে বায়ু যদি উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় এবং উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর উপরের বায়ুর চাপের মানচিত্র পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দক্ষিণ-ভারত মহাসাগরে আফ্রিকার পূর্ব্ব তীরের নিকটে সব সময়েই বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে (৪নং ও ৫নং চিত্র)। কেবল শীতকালে ও বর্ষাকালে কিয়ৎ পরিমাণে উহার স্থানের ও মাত্রার পরিবর্ত্তন হয়, এই মাত্র। কেন ঐ স্থানের উপরে বায়ুর চাপের পরিমাণ সারা বৎসরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে, ইহা আবহাওয়া-বিজ্ঞানের একটী জটিল প্রশ্ন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বায়ু-মণ্ডলের উপর পৃথিবীর আহ্নিক-গতির প্রকোপ এবং ভারত-মহাসাগরের চতুর্দ্দিকে যে ভাবে স্থলের সন্নিবেশ আছে, তাহার ফলে যে উত্তাপের তারতম্য ঘটে, তাহাতেই ঐ স্থান হইতে হাওয়ার বহির্ম্মুখী গতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারত-মহাসাগরে বায়ুর চাপের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ যাহাই হউক, ঐ স্থানই যে মনসুনের হাওয়ার উৎপত্তি-স্থান, সে সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। ৫নং চিত্রে যে জুলাই মাসের বায়ুর সমচাপ রেখাগুলি দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে স্থানের উপরে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে স্থান হইতে, যেখানে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম, তদভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়। ৫নং চিত্রে অঙ্কিত তীরগুলি ঐ সময়ে জল ও স্থলের উপর হাওয়ার গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। উহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হাওয়া বহু বিস্তৃত সমুদ্র পথের উপর দিয়া আসিতে আসিতে বঙ্গসাগরে পৌঁছিয়া ধীরে ধীরে বাঁকিয়া গিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং হিমালয় পর্ব্বতের সহিত সমান্তরালভাবে বহিয়া সিন্ধু দেশের উপরিস্থিত সর্ব্বনিম্ন বায়ু চাপের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে প্রবাহিত বায়ু-প্রণালীর সহিত মিশিয়া যায়। ঐ চিত্র হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারত মহাসাগর হইতে আগত হাওয়ার অপরাংশ আরব সাগরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে, এবং মধ্য ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া সিন্ধু দেশের বায়ু প্রণালীর সহিত মিশিয়া যায়।

ভারত-মহাসাগর হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিতে মন্‌-সুনের হাওয়ার প্রায় চারি হাজার মাইল পথ চলিতে হয়; সুতরাং উহা সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন পৌঁছায়, তখন মনসুনের বায়ু জলীয় বাষ্পে একেবারে পরিপূর্ণ থাকে এবং এক মাইল কিংবা দুই মাইল উর্দ্ধে যেখানে বায়ুর উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার আকার ধারণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল ঘন মেঘে আবৃত করিয়া ফেলে এবং ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মুষলধারে বারিবর্ষণ করে।

সমুদ্রের উপরে এই চারি হাজার মাইল-ব্যাপী বিস্তৃত পথ ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাতের কিরূপ সাহায্য করে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। কারণ শুধু সমুদ্র হইতে হাওয়া আসিলেই বৃষ্টিপাত হয় না, এ কথা সমুদ্রতীরবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। দিবাভাগে প্রায় প্রতিদিনই সমুদ্র-তীরের বায়ু সূর্য্য-তাপে উষ্ণ ও হাল্কা হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং উহার পরিত্যক্ত স্থান সমুদ্র হইতে শীতল বায়ু আসিয়া গ্রহণ করে। এই প্রকারের সমুদ্র হইতে আগত বায়ু সমুদ্র তীরের উভয় দিকে ১৫।২০ মাইলের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং ইহার মধ্যে জলীয় বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় বৃষ্টি হয় না।

বায়ুর সর্ব্বোচ্চ চাপ যদি ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে না হইয়া ভারতের অতি নিকটে হইত, তাহা হইলে বর্ষার বায়ুর সমুদ্রের উপরের পথ অনেক ছোট হইয়া যাইত। এইরূপ হইলে ইহার মধ্যে জলীয় বাষ্পও বহুল পরিমাণে কম হইত এবং ভারতবর্ষে বৃষ্টির পরিমাণও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইত। যে মঙ্গলময় বিধাতা ভারত-সাগরে বায়ুর সর্ব্বোচ্চ চাপের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ভারতবর্ষে বর্ষাকালে প্রচুর বারিবর্ষণের উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়।

দক্ষিণ-ভারত-সাগরে বায়ুর চাপ সারা বৎসরই উচ্চ থাকে সত্য, কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শীতকালে মধ্য-এশিয়ার সর্ব্বত্র বায়ুর চাপ

উচ্চ থাকে। ঐ সময়ে হিমালয় পর্ব্বত ও মধ্য এশিয়ার বিশাল পর্ব্বতমালার উপরে প্রচুর বরফ জমিয়া যায় এবং কারণ হইত, তাহা হইলে উহার অবস্থান সিন্ধুদেশের উপরে না হইয়া সাহারা মরুভূমির উপরে হওয়াই উচিত ছিল।

(৮)সাধারণ বর্ষার দিনের মানচিত্র (৪ঠা আগষ্ট ১৮৯৪)। বামদিকের চিত্রে এ-দিন যে যে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এক একটী বৃত্তের দ্বারা দেখান হইয়াছে। বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ সংখ্যাটী বৃষ্টির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। যে-স্থানের বৃত্তের মধ্যে কোন সংখ্যা দেখান হয় নাই, সে স্থানে ½ ইঞ্চির কম বৃষ্টি হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই চিত্র হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, ঐদিন ভারতবর্ষের বহু স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। ডান দিকের চিত্রটী দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বহুবিস্তৃত সমুদ্র হইতে আগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ হাওয়া অবাধে ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে

প্রচণ্ড শীতে বায়ু ঠাণ্ডা ও ভারী হইয়া উঠে এবং উহার চাপের বৃদ্ধি হয়। শীতের শেষে ক্রমে ক্রমে যখন সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইতে থাকে, তখন ঐ স্থানের উপরে, বিশেষতঃ সিন্ধু-দেশের মরুভূমির উপর, বায়ু হাল্কা হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং উহার চাপও কমিয়া যায়। এক দিনে এই পরিবর্ত্তন ঘটে না; এপ্রিল ও মে দুই মাস এই পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া চলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সাগরের বায়ু নিম্নচাপের চতুর্দ্দিকে বহিবার জন্য একটা গতি প্রাপ্ত হয়। জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের উপর বায়ুর চাপ যখন সর্ব্বনিম্ন হয়, তখন সারা ভারতবর্ষে মন্‌সুনের বায়ু ছড়াইয়া পড়ে।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে প্রখর সূর্য্যের উত্তাপই মন্‌সুনের সময় ও উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের উপরে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন হওয়ার একটী প্রধান কারণ। ইহা ভিন্ন অন্য কারণও আছে। ৪নং চিত্র পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিন্ধু-দেশের উপরে এই সর্ব্বনিম্ন চাপের চতুর্দ্দিকের সম চাপ-রেখার চক্র সমস্ত মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকা ব্যাপিয়া আছে। সুতরাং উত্তাপই যদি সর্ব্বনিম্ন চাপের সম্পূর্ণ তবে সাহারা মরুভূমির উপরে না হইয়া ঐ সর্ব্বনিম্ন চাপের সিন্ধুদেশের উপর অবস্থানের কারণ কি? হিমালয় পর্ব্বত এবং মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের উচ্চ পর্ব্বতমালা গ্রীষ্মকালে তাপের দরুণ উৎপন্ন বায়ু প্রণালীর গতি এমন ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় যে, সর্ব্বনিম্ন চাপ সিন্ধুদেশের উপরে আসিয়া পড়ে। যদি উহা সিন্ধুদেশের উপরে না হইয়া সাহারা মরুভূমির উপরে হইত, তাহা হইলে মন্‌সুনের বায়ুপ্রবাহ ভারতবর্ষের উপর দিয়া না বহিয়া আরব-সাগরের উপর দিয়া আফ্রিকাভিমুখে চলিয়া যাইত। এই-রূপ হইলে বর্ষার সময় ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত যে বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই নিম্ন চাপের স্থান-নির্দ্দেশ ব্যাপারেও আমাদের এই পুণ্য-ভূমির উপর জগৎ পিতার অপার করুণা দেখিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে স্থানের উপর বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম, সে স্থানের বায়ু উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে—বর্ষাকালে সিন্ধু-

দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারের কৌশলটি অতি আশ্চর্য্য। বর্ষাকালে যদি সিন্ধুদেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হইত, তাহা হইলে ঐ স্থানের হাওয়া বারিপাতের দরুণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইত; এবং ঐরূপ হইলে, ঐ স্থানের উপর হাওয়ার চাপ আর সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকিত না। সিন্ধুদেশের উপরে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মনসুনের বায়ুপ্রবাহও মৃদু হইয়া যাইত। কেন এরূপ হয় না, ইহার কারণ অনেক দিন বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের উপরের বায়ু স্তর পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, গ্রীষ্মকালে ঐ দেশের দুই তিন মাইল উপরে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের উচ্চ পর্ব্বতমালা হইতে আগত এক প্রকারের ঠাণ্ডা এবং অতি

পৌঁছায়, তখন অতি উষ্ণ হইয়া উঠে; সুতরাং তিন চার মাইল উর্দ্ধে না উঠিলে উহার জলীয় বাষ্প জমিয়া মেঘ হইতে পারে না। কিন্তু সিন্ধুদেশের সর্ব্বনিম্ন চাপের ফলে মনসুনের বায়ু উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া যখন দুই তিন মাইল উপরে আসিয়া পৌঁছায়, তখন উহার জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সাধারণ নিয়মানুসারে সিন্ধুদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হওয়া উচিত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রক্রিয়ার ফলে এই স্থানে বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না। ইহাও বিধাতার একটী অপূর্ব্ব কৌশল; কারণ বৃষ্টি হয় না বলিয়াই সমস্ত বর্ষাকাল সিন্ধুদেশের উপরে বায়ুর চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে; এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মনসুনের বায়ুপ্রণালী
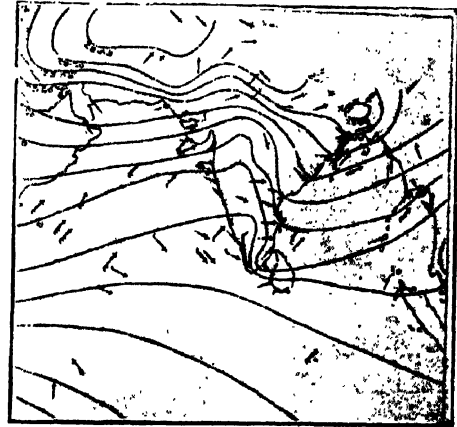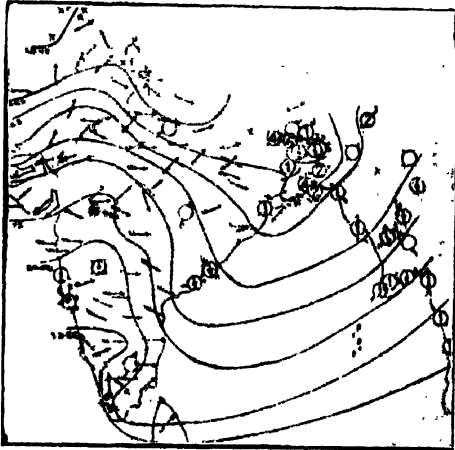
(৯)অনাবৃষ্টির বৎসরের একটী দিনের মানচিত্র (১৮ই আগষ্ট, ১৮৯৯)। এই বৎসর ভারতবর্ষে অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। বামদিকের চিত্রে ১৮ই আগষ্ট তারিখে যে যে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে। বৃত্তের মধ্যস্থিত সংখ্যাটী বৃষ্টির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। যে-স্থানের গোলকের অভ্যন্তরে কোন সংখ্যা নাই, সেখানে ½ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই চিত্র হইতে সহজেই অনুভূত হইবে যে, এই দিনটীতে ভারতবর্ষের খুব কম স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছিল। ডানদিকের চিত্রে ঐ-দিনে সমুদ্রের উপরে হাওয়ার গতির দিক দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ আরব সাগরের হাওয়া উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বহিয়া ভারত-সাগর হইতে আগত হাওয়াকে বাধা প্রদান করিতেছে

শুষ্ক হাওয়া বহিতে থাকে। এই শুষ্ক হাওয়া মনসুনের হাওয়ার সমস্ত জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লয় এবং এই জন্য বর্ষার সময় ঐ স্থানের উপরে মেঘোৎপত্তি হয় না। মেঘোৎপত্তি না হওয়ার দরুণ সূর্য্যের উত্তাপ অতি প্রখর হইয়া থাকে এবং মনসুনের হাওয়া যখন ঐ স্থানে আসিয়া

প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ধুদেশ নিজে বারিবর্ষণ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বর্ষণের উপায় করিয়া দেয়। প্রাকৃতিক জগতে এই মহিমময় ত্যাগের তুলনা নাই। বর্ষাকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিরূপ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য ৭নং চিত্রে জুলাই

মাসে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অঙ্কন করিয়া দেখান হইয়াছে।

এই চিত্র হইতে সহজেই অনুভূত হইবে যে বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতে প্রচুর তারতম্য রহিয়াছে। এই তারতম্যের কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মন্‌সুনের বায়ু আরব-সাগরের উপর দিয়া আসিয়া যখন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা ঊর্দ্ধে উঠিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঊর্দ্ধে উঠিলে হাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সুতরাং উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত পশ্চিমঘাটের উপরে ও পশ্চিম তীরে প্রচুর পরিমাণে বারি-বর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষার হাওয়া যখন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উহার অধিকাংশ জলীয় বাষ্প নিঃশেষ হইয়া যায়; বিশেষ পশ্চিমঘাট হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিতে হাওয়ার কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। এই উভয় কারণে দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম হইয়া থাকে।

ভারত মহাসাগর হইতে আগত মন্‌সুন্ বায়ুর অপরাংশ বঙ্গ-সাগরের উপর দিয়া বহিয়া মালয় ও আরাকান তীরের পাহাড়ে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ-সব স্থানে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করে। ব্রহ্মদেশের উচ্চ পর্ব্বতমালায় ধাক্কা খাইয়া এই হাওয়ার গতির দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং উহা বঙ্গদেশের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম কিংবা পশ্চিমাভিমুখে বহিতে থাকে। বঙ্গদেশের উপর দিয়া যাইতে যাইতে এই হাওয়া প্রচুর বারিপাতে উহার খাল বিল জলে পূর্ণ করিয়া দেয়। খাসিয়া পাহাড়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়া এই হাওয়া যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন সে স্থানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। খাসিয়া পাহাড়ের উপরিস্থিত চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এই নিমিত্ত ইহা একটী জগদ্বিখ্যাত স্থান। এখানে এত অধিক বৃষ্টি হওয়ার কারণ, খাসিয়া পর্ব্বত অত্যন্ত খাড়া। এই জন্য হাওয়া সোজা উপরে উঠিতে বাধ্য হয় এবং বর্ষণের পরিমাণও অত্যধিক হইয়া থাকে।

হিমালয় পর্ব্বত এত উচ্চ যে মন্‌সুনের বায়ু উহা অতিক্রম করিতে পারে না। এই নিমিত্ত এই পর্ব্বতে ধাক্কা খাইয়া উহার সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে বহিয়া মন্‌সুনের বায়ু যুক্ত-প্রদেশের উপর দিয়া পঞ্চনদে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সিন্ধুদেশের উপরের পূর্ব্বোক্ত বায়ু-প্রণালীর সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইরূপে যুক্ত-প্রদেশে ও পাঞ্জাবে বিশেষতঃ হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহার কারণ, ঐ স্থানের উপর যখন মন্‌সুনের বায়ু উপস্থিত হয়, তখন উহা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। চলিতে চলিতে যতই বৃষ্টিপাত হয় জলীয় বাষ্পও ততই কমিয়া যায়। এই জন্যই যুক্তপ্রদেশের ও পাঞ্জাবের অনেক স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারত-সাগর হইতে আগত মন্‌সুনের বায়ু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ বঙ্গ-সাগরের উপর দিয়া বহিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করে, এবং অপর ভাগ ভারতের পশ্চিম তীর দিয়া দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে প্রবেশ করে। প্রথম ভাগ যখন হিমালয় পর্ব্বতে ধাক্কা খাইয়া যুক্তপ্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে বাধ্য হয়, তখন দ্বিতীয় ভাগ আসিয়া মধ্য-প্রদেশে পৌঁছায় এবং উভয় ভাগের সহিত একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বিভিন্ন দিকে চলিতে চলিতে দুইটী রেলগাড়ী কিংবা মোটর গাড়ীতে যদি সংঘর্ষ ঘটে, তবে উভয় গাড়ীই ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মধ্য-ভারত এবং মধ্য-প্রদেশের উপর যখন মন্‌সুনের বায়ুর দুই অংশের সংঘর্ষ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ স্থানের উপরে বায়ুর ঊর্দ্ধমুখী গতি হইয়া থাকে। এই গতির ফলে ঐ স্থানের উপর বৃষ্টির পরিমাণ পারিপার্শ্বিক অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। বর্ষার সময়ের প্রতিদিনের আবহাওয়ার মানচিত্রে এই ব্যাপারটী বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপরিউক্ত উভয় প্রকারের মন্‌সুন্ বায়ুর মিলন-স্থল উহাদের গতির তারতম্যের উপরে নির্ভর করে। যদি আরব-সাগর হইতে আগত বায়ু বঙ্গ-সাগর হইতে আগত বায়ু অপেক্ষা প্রবল হয়, তাহা হইলে এই মিলন হিমালয়ের অতি সন্নিকটে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গ-সাগরের বায়ু যদি প্রবল হয়—তবে এই মিলন মধ্য-প্রদেশের উপর ঘটিয়া থাকে।

বর্ষার সময়ে এই দুই ভ্রাতা কখনও একজন অপরাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, কখনও বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য উহাদের মিলন-স্থলের প্রতিদিনই কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন

হইয়া থাকে। এই কারণে অতিরিক্ত বর্ষণের স্থানের প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন ঘটাতে উত্তর ও মধ্য-ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় সম-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। অধিকাংশ দিনে মধ্য-প্রদেশের উপরেই মিলন ঘটিয়া থাকে, এই জন্য ঐ স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।

মনসুনের এমন যে সুন্দর কৌশল তাহাতেও কখনও কখনও এমন খুঁৎ উপস্থিত হয় যে, অনাবৃষ্টির দরুণ দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। ১৮৯৯ সালে ভারতবর্ষে এইরূপ অনাবৃষ্টি হয়। এই অনাবৃষ্টির কারণ বুঝাইবার জন্য অনাবৃষ্টির বৎসরের একটী দিনের মানচিত্র এবং সাধারণ বর্ষার দিনের একটী মানচিত্র ৮নং ও ৯নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সিন্ধুদেশের উপরে বায়ু-চাপ সাধারণতঃ যত কম হওয়া উচিত ছিল, এবং উহার অবস্থান যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, ১৮৯৯ সালের বর্ষার সময় তাহা হয় নাই। বায়ুর চাপ কম না হওয়ার দরুণ উহার চতুর্দ্দিকে বায়ুকে ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীতাভিমুখে প্রবাহিত করিবার ক্ষমতাও অনেক কম; সুতরাং আমরা ৯নং চিত্রের ডান দিকের অংশে দেখিতে পাইতেছি যে, আরব-সাগরের দক্ষিণাংশের বায়ু সিন্ধুদেশের উপর নিম্নচাপের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে না বহিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব্বগামী হওয়ার দরুণ এই বায়ু ভারত-মহাসাগর হইতে আগত উত্তর-পূর্ব্বগামী মনসুন্ বায়ুকে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতেছে। এইরূপে মনসুনের সমস্ত বায়ু-প্রণালীতে একটা অসঙ্গতি উপস্থিত হইয়াছে; আরব সাগরের উপর দিয়া মনসুন্-বায়ু আর সহজ ভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আরব-সাগর-বাহী ভ্রাতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় বঙ্গ সাগর-বাহী ভ্রাতাও কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, সর্ব্বত্র প্রখর রৌদ্র, অসহনীয় গরম, দেশব্যাপী হাহাকার।

সাধারণ বর্ষার দিনের যে মানচিত্র (৮নং চিত্র) দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সিন্ধুদেশের উপরের বায়ু-চাপ অনাবৃষ্টির দিনের বায়ু-চাপ অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব-নিম্ন চাপের চতুর্দ্দিকে সম-চাপ-রেখাগুলির গঠন ও অবস্থানও ভিন্ন প্রকারের। সমুদ্রের উপরের সম-চাপ-রেখাগুলি অনাবৃষ্টির দিনের সম চাপ-রেখা অপেক্ষা অনেক ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ভারত-মহাসাগর হইতে আগত মনসুন্ বায়ু অবাধে বঙ্গ ও আরব-সাগরের উপর দিয়া বহিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসর সিন্ধুদেশের উপরের বায়ুর চাপ এবং উহার চতুর্দ্দিকের বায়ু-চক্র সচরাচর যে মাসে যেরূপ থাকে, সমস্ত বর্ষাকাল সেইরূপ থাকে। চাপ আর কমে না, বায়ুচক্রও প্রবল হয় না। সুতরাং যে মাসে যেমন আরব-সাগর-বাহী বর্ষার বায়ুর আগমন হয় না, কেবল বঙ্গ-সাগরের উপর দিয়া ক্ষীণ একটা বর্ষার হাওয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, দুর্ভিক্ষের বৎসর সমস্ত বর্ষাকাল বায়ুপ্রণালী অনেকটা ঐরূপ থাকে। কেন এইরূপ হয়, তাহার কারণ অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই।

তীর্থে

শ্রীসুলতা দেবী

অবিরাম মুখরিত শৈলশির যেথা
সমীরের মধুবাদ্যে আরতি পূজায়,
কঠিন প্রস্তর-পথে প্রাণপণে সেথা
পশিলাম তীর্থ-ক্ষেত্রে দর্শন আশায়।
বহি অর্ঘ্য নম্রশিরে পুণ্য কামনায়
চলিলাম ত্রস্তপদে বিপুল পুলকে,
পূজারী হাঁকিয়া কহে "প্রণামী কোথায়?
যত টাকা তত পুণ্য জানে সর্ব্বলোকে।"
হ'ল শুব্ধ মন্ত্রছন্দ ওঁকার বন্দনা,
কম্পিত করেতে খসে অর্ঘ্য পাত্রখানি।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যদি পূজা ও অর্চ্চনা
নাহি শক্তি, রিক্ত দীন—উপজিল গ্লানি।
ধর্ম্মের বিপনি এ কি, বিক্রেতা পূজারি,
অর্থে ধনী কিনে পুণ্য, বঞ্চিত ভিখারী।

রক্তের টান

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অধীর ও সুধীরের সঙ্গে গোপালের বেশ ভাব জমিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ জ্যেঠাইমাতার ক্রোড়টি এমন স্নিগ্ধ, হাসিটি এমন প্রসন্ন—এমন মানুষ সে কুত্রাপি দেখে নাই। ইঁহারা চলিয়া গেলে গোপাল দিন-কতক খুব কান্নাকাটি করিল। চঞ্চলা আদর করিয়া এবং খেলার সামগ্রী আনিয়া দিয়া ইহাকে কতকটা ভুলাইতে পারিল বটে, কিন্তু শিশু চিত্তের ঐকান্তিক গাঢ় অনুরাগের হ্রাস ইহাতে হইল না। মাটির অত্যন্ত তলদেশে বালুকার স্তরে স্তরে জলধারা ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিবার মত ইহাদের এই রক্তের ধারা শিরার মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিল; সুযোগ পাইলেই গতিশীল হইয়া তাহারা আবার রক্তে রক্তে একাকার হইয়া উঠিবে।

গোপাল উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ইহাদের স্বপ্ন দেখিল; এবং ইহাদের কাছে যাইবার জন্য সে বায়না ধরিল। হিরণ কয়েকবার ধমক দিলেন। কিন্তু তাহার কান্নাকাটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চঞ্চলা স্বামীকে কহিল, "অনেকদিন যাওনি, চল না একবার বেড়িয়ে আস্বে।"

দেশের সঙ্গে চঞ্চলার মিলন ঘটাইতে যাহার অন্তরে অপরিসীম উদ্বেগ ছিল, তাহার সে উদ্বেগ ক্রোধে বিষাক্ত ও নির্জীব হইয়া গেল; কিন্তু চঞ্চলা এক অভিনব গতি লাভ করিল। ইহাই সংসারে মানব-মনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা।

ছেলের ব্যাকুলতায় ইহাদের সহিত সংস্রব স্থাপন করিতে চঞ্চলাও যেন ক্ষেপিয়া উঠিল; এবং তাহার ব্যাকুল দুই নয়নের দৃষ্টি অনুক্ষণ স্বামীর পায়ের তলায় হেঁট হইয়া পড়িতে লাগিল।

হিরণের অন্তর তখনও রোষে ভরিয়া ভারী হইয়া আছে। দেশে সে যাইবে না—যাইবার ইচ্ছাও নাই। নানারূপ ওজর-আপত্তি সে করিতে লাগিল।

কাত্যায়নী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। গোপাল সহায় হইয়াছে—মাতাও বাড়ীতে নাই—এ সুযোগ সে ত্যাগ করিল না। অবশেষে সঙ্কোচ এড়াইয়া স্বামীকে সে তাগিদ দিতে লাগিল,—"ওর মন পুড়ছে ওর জ্যেঠাইমার জন্যে। স্বপ্ন পেয়ে সেই ব্যথাটা আরও জেগে উঠেছে। দিদি যত দিন ছিলেন খেতে শুতে বস্‌তে ছেলেটাকে আমার কাছে ঘেঁস্‌তে দেখেছ? ভেবেছিলুম বুঝি ভুলে গেছে! দেখ্‌তে ত পাচ্ছ ওর যা শরীর হয়েছে! ছেলেটা ক্ষয়ে গেল—তোমার সময় না থাকে—আমিই না হয় সঙ্গে করে একবার ঘুরে আসি। তুমি আর অমত কোর না।"

হিরণদের দেশে যাইতে হইলে কতক রেলে আর কতক নৌকায় যাইতে হয়। সে বলিল, "তুমি যাবে কার সঙ্গে? এ কি শুধু রেলের পথ, যে গাড়ীতে তুলে দিলুম, আর গিয়ে নেমে পড়্‌লে। নৌকা ভাড়া করা—নামা ওঠা—সঙ্গে শক্ত লোক না থাক্‌লে কি চলে?"

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে বরাবর নৌকায় যাওয়া যায় না?"

"তা' যায়। সময় লাগে।"

"এখন ঠাণ্ডা সময় আছে। একখানা নৌকাই ভাড়া করে দাও তুমি। বিধু ঠাকুরপো বাড়ী যাবে। তাকে সঙ্গে নিলেই হবে।"

হিরণ তখন আর কোন জবাব করিল না।

এদিকে জিজ্ঞাসারও শেষ ছিল না। পুত্র কাঁদিতেছে, আর মাতা ফোড়ন দিতেছেন—অবশেষে এক সময় বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "যেতে পার, যাও না বিধুকে নিয়ে।"

চঞ্চলা এই অবধিই প্রশ্ন করিল। কি জানি, বেশী মোলায়েম করিয়া লইতে গেলে, আবার কল বিগ্‌ড়াইয়া না যায়। তারপর বিধুকে ডাকাইয়া আনিয়া যাত্রার জন্য সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাই সে করিয়া ফেলিল।

বিধু হিরণের মামাতো ভাই; কলিকাতায় থাকিয়া চাকরী করিত।

চঞ্চলা যদি শুধু দেশে যাইবার কথা তুলিত, হিরণ বোধ করি আর একটু বাঁকিত। কিন্তু গোপালের জ্যেঠাইমার কথা উপর্য্যুপরি তুলিতে ভিতরে একটুখানি তর্ক উঠিয়াছে। চঞ্চলা ত ইঁহার কোন খবরই জানে নাই। বাড়ীর সকল লোকই জানিল, শুধু সেই-ই জানিল না। যদি কোন কর্ত্তব্য তাঁহার সম্বন্ধে চঞ্চলার থাকে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আড়াল করিয়া রাখা অন্যায় হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অবশেষে সে সম্মত হইল। কিন্তু যাঁহার নিকটে সে যাইতেছে, তাঁহার দুর্দ্দশা আর নিজেদের লজ্জার কথা প্রকাশ করিয়া স্ত্রীকে একটু গোছালো করিয়া দিতে সেদিনও সে মনে জোর পাইল না।

বিধুকে সঙ্গে লইয়াই চঞ্চলা যাত্রা করিল। নৌকাখানা সহর ছাড়িয়া ক্রমে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোপাল দ্বারপথে চাহিয়া 'হাঁ' করিয়া দেখিতেছিল। এটা কি গাছ—ওটা কি পাখী—নেংটি-পরা লোকগুলো ও কি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে—সূর্য্যটা অত বড় আর লাল হয়ে উঠল কেন, ইত্যাদি প্রশ্নে মাতাকে সে অনেকটা অন্যমনস্ক করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, চঞ্চলার বুকখানা তখন অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। বালিসের উপর থুঁৎনির ভর রাখিয়া নদীর কাল জলের দিকে তাকাইয়া অতীত কালের সকল ঘটনাগুলিই একে একে সে খোঁচাইয়া তুলিতে লাগিল। নদীর উপরে তখন স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছে। মাঝিদের সঙ্গে বিধুও গুণ গুণ রবে গান ধরিল।

চঞ্চলার চিন্তার শেষ ছিল না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কি না সে জানে না, কিন্তু সে এখন বুঝিতেছে, সেই প্রথমবার স্বামীর ঘরে আচারে ব্যবহারে নিজের অহঙ্কারকে উগ্র করিয়া পায়ের প্রতি চিহ্নটি সে কাল করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতায় পুনর্ব্বার একত্র বসবাসের কালে কমলা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সে কলঙ্ক হইতেও তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এই যে সুদীর্ঘ কাল কাহারও খোঁজ-খবর না লইয়া সে বাড়ী ঘর করিতেছে—বিলাস-তরঙ্গে ভাসিতেছে—ইহাতে তাহার জননী কাত্যায়নীর হাত যথেষ্ট থাকিলেও, ষোলআনা আঁচড়ই যে তাহারই অঙ্গে বাজিবে। তাহার মনটা কি পাথর দিয়া গড়া? গোপালের স্বপ্নের ফলে আজ যেমন সে স্বামীর নিকট হইতে ছেঁড়াকাটা হইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিল, এত দিন কেন নিজের চেষ্টায় সে ততটা পারে নাই?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অসাড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া বিধুকে সে ডাকিল; বলিল, "ঠাকুরপো! পান খাও।"

বিধু নৌকার ভিতরে সরিয়া আসিল। কহিল, "পান আগে যা' খেতুম—এখন ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়।"

চঞ্চলা পানের পাত্রটি টানিয়া লইল। দুইটি খিলি সাজিয়া বিধুর হাতে দিল। নিজেও একটা গালে পুরিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন বাড়ী যাও নি ঠাকুরপো?"

"বেশী দিন আর কৈ—এক মাস আগেও ত একবার গিয়েছিলুম।"

দেশের লোকের মধ্যে সে একমাত্র বিধুকেই ভাল চিনিত, আর ছোট ভায়ের মত দেখিত। বিধু প্রতিদিনই তাহাদের গৃহে আসিয়া গোপালকে লইয়া একবার ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া যাইত। চঞ্চলার এ ছেলেটিকে বেশ লাগিল। সে বলিল, "তুমি ত খুব ঘন-ঘনই দেশে যাও - ছুটি পাও ত?"

বিধু বলিল, "না গিয়ে কি করি বলুন, বৌঠান্? আমি একলা এই ছেলেমানুষ। কিন্তু ঘাড়ের বোঝাটা ত ছোট নয়। সংসারের প্রয়োজন ত আছেই—একটু অসুখ-বিসুখ হলে মায়েও ডাকেন—বোন্ তিনটিও ডাক দেয়—ভাই দুটিও ডাকে। মনিব লোক ভাল, তাই বেঁচে যাচ্চি।"

চঞ্চলা এবার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিদের খবর জান?"

বিধু বলিল, "এক মাস আগে যা দেখে-শুনে এসেছি, তার পরে আর কোন খবর পাই নি।"

"শুনেছিলুম ভাসুরের অসুখ—কাজ কর্ম্ম কর্তে পারেন না। তার পর তাঁর শরীরের খবরও পাই না—সংসার কি ভাবে চল্‌তে সে খবরও কিছু জানি না।"

"হাঁ। দাদা অনেক দিন ধরেই ভুগছেন। মেজো বৌদি মেজদাকে পত্র লিখে কিছু কিছু খরচ-পত্র আনাতেন,

তাইতে সংসার চল্‌ত। মেজদা ত কল্‌কাতায় থাকেন, জানেন বোধ হয় ? কোথায় যে তাঁর আওতাখানা, সে খবরটি পর্য্যন্ত দেন না। পথে ঘা' দুই একদিন পাকড়াও করি। কিন্তু আজ তিন চার মাস তাঁকে পথে-ঘাটেও দেখি নি।"

নরেশকে অধুনা তিন জায়গায় খরচ পাঠাইতে হইতেছিল। কমলাকে ও হরসুন্দরীকে নিয়মিত খরচ-পত্র সে পাঠাইত। কিরণ রোগে পড়িলে ইন্দুও স্বামীকে লিখিয়া খরচ-পত্র আনাইতেছিল। সে হাত ভাঙ্গিয়া হাসপাতালে আশ্রয় লওয়ার পর সকলকারই কষ্ট হইয়াছে। হরসুন্দরীকে যে খরচ সে পাঠাইত, তাঁর এক সন্ধ্যার অন্নে তত কিছু দরকার হইত না। সেই উদ্বৃত্ত অর্থে এখন চলিতেছে। কিরণও সুস্থ হইয়া কাজ-কর্ম্মে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু হলধরও রোগ-শয্যা ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। নরেশও সেই হইতে হাসপাতালে পচিতেছে। কমলার কষ্টের অবধি নাই।

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি বেশ ভালই আছেন ?"

বিধু কহিল, "তাঁর ভাল-মন্দ আপনি কোন্ বুঝতে পারেন ? আমি ত একটা মহামুখ্যু। ভিতরের খবর ত তিনি কাকেও কিছু দেবেন না ? গেলেই হেসে হেসে গল্প করে ভুলিয়ে রাখেন। দু' একদিন বেলায় যেয়েও দেখেছি, রান্নাবান্নার উদ্যোগ হয় নি, ছেলেদের নিয়ে চুপ্ করে বসে আছেন। সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তেন,—খাওয়া ত—সে যখন হয় এক সময় হবে। তুমি বসো ঠাকুরপো ! তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করি। অদ্ভুত লোক দেখেছেন একবার ?"

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "মেজো ভাসুর বাড়ীতে খরচ-পত্তর পাঠান্—তবে তাঁর কষ্ট কেন ? তিনি কি আলাদা খান্ ?"

বিধু কথা বলিতে বলিতে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে অত্যন্ত ত্রস্ত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র ইহার সঙ্গে চঞ্চলার সংস্রব ছিল। হিরণ তাহাকে কমলা-ঘটিত কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে দেখিল, তাহার অসাবধানতার ফলে এখন যে প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল, ইহার জবাব দিতে হইলে পর পর আরও অনেক প্রশ্নই উঠিবে। তখন ছোড়দার নিষেধ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া চলা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। সে একটু পথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাড়ী আর কতক্ষণ থাকৃতে পাই বলুন। যে ডাক্ নিয়ে যাই, তারই খাটুনি খেটে আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাবার অবকাশই থাকে না। খোঁজ-খবর ভালমত কি করে রাখ্‌ব বলুন।"

চঞ্চলার যে উদ্বেগ, কথাটা এই জায়গায় হয় ত থামিবে না। তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য যে তখনি-তখনি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যাবে বৌঠান্ ?"

চঞ্চলা বলিল, "যে ভিজে কাঠ কেনা গেল, ধোঁয়ায় এখনও চোখ রাঙা হয়ে আছে। আর তোমার হাতের খিচুড়ী এত শীঘ্র কি করে বা পেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ে ? যদি গোপাল আর তোমার কষ্ট না হয়, যে দুধ আর চিঁড়ে কিনেছ—সন্দেশও আছে—তাই খেয়ে রাত্তিরটা কাটাও। আর হাঙ্গামায় কাজ নেই।"

দুপুরবেলা চুলীতে ফুঁ পাড়িয়া উভয়েরই চোখ লাল হইয়া আছে। বিধু যেন বাঁচিয়া গেল। ইহারা দুই খুড়া ভাইপো জলযোগ করিয়া রাত্রি কাটাইল। চঞ্চলা কিছুই খাইল না।

পরদিন রাত্রি এক প্রহরের সময় ইহাদের নৌকা গোপালগঞ্জের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বিধু বলিল, "আপনি একলা নৌকায় থাক্‌বেন কি করে ? মাঝিদের দ্বারা দাদাকে বরঞ্চ একখানা পাল্কী পাঠাতে খবর পাঠাই। কি বলেন ?"

চঞ্চলা বলিল, "পথ ত খুব বেশী না—রাত্রির বেলা কে বা দেখতে আস্‌ছে। চল, হেঁটেই যা'ব।"

তার পর গোপালকে সঙ্গে লইয়া ইহারা গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুধীর বুঝি বাঁচে না। ঔষধ-পথ্যের অভাবে রোগটি এবার বেশ জট পাকাইয়া বসিয়াছে।

হলধর সারিয়াছে—সুস্থ হয় নাই। দাঁড়াইতে গেলে পা কাঁপে। টোট্‌কা ঔষধপত্রে রোগীর যখন আর চলিল না, হলধর তখন লাঠি ভর দিয়া যাইয়া স্থানীয় এক কবিরাজকে ডাকিয়া আনিল।

কবিরাজটি বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কোন ভরসাই পাইলেন না। হলধর বলিল, "কবরেজ মশায়! দাদাকে আপনি বাঁচিয়ে দেন্—টাকার জন্য আকিঞ্চে করবেন না। আমার ঠ্যাং দুখানায় একটু বল হতে দিন্—যত টাকা লাগে, আমি দেব। খাতার পিঠে আপনি লিখে রাখুন।"

কমলার চোখ দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছিল। সে তাঁহার পায়ের গোড়ায় একটি টাকা রাখিয়া বলিল, "বৈদ্যকে ঔষধের কড়ি না দিলে রোগ সারে না—তাই দেওয়া। নতুবা এই একটি টাকা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আপনি দয়া করে' যদি খোকাকে বাঁচিয়ে দেন।"

কবিরাজ বলিলেন, "ও টাকা তুমি তুলে রাখ মা! সময় মত আমি চেয়ে নেব। সাধ্যমত ঔষধপত্র দিতে আমি ক্রটি করব না। তুমি মনে কোন সন্দেহ রেখ না।"

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানি, শত্তুর হয়ে এসেছে কি না —বাঁচবে ত ?"

কবিরাজ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "শিশুদের রোগ হঠাৎ যেমন বাড়ে—থামেও তেমনি হঠাৎ। কোন ভাবনা কোর না মা।"

হরসুন্দরীও এ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি এবং দিনের অধিক সময় পীড়িত শিশুর শিওরে বসিয়া কাটাইয়া যাইতে লাগিলেন। শুধু দুপুর বেলা আহারের সময় একবার করিয়া মন্দিরে যাইতেন।

কৃপণতা না করিয়া কবিরাজটি উপযুক্ত ঔষধপত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের পথেই চলিল। দুলের ঘরে পীড়িত সন্তানটি বক্ষে লইয়া অবলম্বনহীন হইয়া কমলা এক একবার চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অসহায় পুত্র দুটির উপরও গ্রামের লোকের কর্ত্তব্য ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া গেছে। যাঁহারা তাহার কলঙ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আসিতেন, পুত্রটির গায়ের তাপ লইতে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন না।

পরদিন অবস্থা কিছু ভাল দেখা গেল। একটু আশ্বাস পাইয়া হরসুন্দরী প্রার্থনার জন্য সেদিন মন্দিরে চলিয়া গেলেন।

সন্তান সম্বন্ধে মাতা শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হন না। সমস্ত দিনটা ভাল গেল দেখিয়া কমলা মনে চতুর্গুণ বল পাইল। সন্ধ্যার সময় ঘরদ্বার ঝাঁট্‌পাট্‌ দিয়া পরিষ্কার করিয়া সমস্ত ঘরে সে ধুনার ধোঁয়া দিল। তার পর সুস্থ মনে প্রার্থনায় যাইয়া বসিল। যাঁহার উদ্দেশে সুখ দুঃখ সকলই নির্ভয়ে সমর্পণ করিতে পারা যায়, তাঁহারই শ্রীচরণ অনুধ্যান করিতে করিতে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ দিয়া তখন জল পড়িতেছে। হঠাৎ রোগীর কণ্ঠের এক বিশ্রী আওয়াজ কাণে আসিয়া বাজিতেই সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুত্রের সন্নিকটে আসিয়া দেখিল, হিক্কা দেখা দিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের বাহিরে হলধরের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে আবার ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের রোগশয্যার কাছে বসিয়া পড়িল।

অধীরকে সকাল সকাল সে খাওয়াইয়া দিয়াছিল। মাতার আদেশে সে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিদ্রা হয় নাই। এক্ষণে মাতার এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া, সেও বিছানা ছাড়িয়া ভ্রাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল; এবং বুঝিল, একটা অত্যন্ত দুঃসময় যেন নিকটে ঘনাইয়া আসিতেছে।

রোগীর শিয়রে একটি প্রদীপ ম্লান আভা বিস্তার করিয়া গৃহখানিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। এই সময় রোগীর আর একটি উপসর্গ উপস্থিত হইল। কমলা দেখিল, হিক্কার সঙ্গে সঙ্গে নীচের ওষ্ঠখানা একবার বিস্তৃত একবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই অসময়ে সাহায্য করিতে পারে এমন একটি লোকও যে হাতের কাছে নাই। হলধর অসুস্থ দেহ লইয়া সমস্ত দিন এই সুধীরেরই জন্য এটা-সেটা করিয়া এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বুঁচির মাকে ডাকিয়া আনিয়া রোগীর শিয়রে বসাইয়া দিল; বলিল, "খোকা ভারি এলোমেলো হয়ে পড়েছে। হলধর ঘুমিয়েছে, ওকে আর ডাকব না; তুমি একটু বসো—আমি কবিরাজ মশায়কে ডেকে আনি।" এই বলিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সে একলাই পথে বাহির হইয়া পড়িল; এবং নিজের কম্পিত

দেহটাকে কোন রকমে খাড়া করিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় সে ছুটিয়া চলিল।

গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্নাও যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। কমলা বাহ্যজ্ঞানরহিতা। কবিরাজের বাড়ী সে চিনিত! পা দুখানা যেন নিজের বেগেই সেইদিকেই চলিতেছে।

ঠিক এই সময়ে বিধুকে লইয়া চঞ্চলাও সেই পথে আসিতেছিল। ইহারা দেখিল, একটি মেয়ে যেন নক্ষত্রের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। মস্তকের অবগুণ্ঠন বাতাসের সঙ্গে উড়িতেছে। আলুলায়িত কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশ আহত করিয়া ইহার গতির মাত্রা যেন বাড়াইয়া দিতেছিল। মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা—যেন কে কোথায় তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া লইতেছে!

কমলার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে কেবল মাটির দিকে চাহিয়াই ছুটিতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারই লণ্ঠনের আলোকে চঞ্চলা তাহাকে চিনিতে পারিল। বিধু গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া অল্পই পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

চঞ্চলা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং গতিরোধ করিল; বলিল, "তুমি? এত রাত্রে কোথায় ছুটে চলেছ দিদি?"

ইহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেই কমলা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বোধ হইল, কিছুই সত্য নহে; সমস্তই সে বিভীষিকা দেখিতেছে! তাহার দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে ধূলির উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!

চঞ্চলাও সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল। বিধু তখন কাছে আসিয়া গেছে। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

চঞ্চলাকে অবলম্বন পাইয়া কমলা তাহার শিথিল দেহ লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া ধরিল, এবং তাহারই ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চঞ্চলা সান্ত্বনার হস্তে তাহার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে দিদি? বল। সুনাম দুর্নাম জ্ঞান নেই তোমার—সেবার তেমনি ভাবে চলে এলে! এবার ডাঙায় পা দিতে না দিতে, যা ভাব্‌তে পারা যায় না—সেই উন্মাদের বেশেই চোখে পড়ে গেলে? কি হয়েছে বল, আমি যে আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি নে!"

কমলা মুখ তুলিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমি ভাই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি তোকে দেখে। এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, এ সত্য—কি স্বপ্ন! স্বপ্নই হোক্—তুই শুধু আমাকে একবার বুকে চেপে বল্,—'ভয় কি দিদি!' সেই জোরে আমি বাকী পথটুকু এগিয়ে যাই! তোর সুধীর বোধ করি এতক্ষণ অভিমান করে চলে গেল!"

এই যে ভিক্ষা এ চাহিতেছে, এ সাহস দিবার সুকৃতি কয়জনের আছে? চঞ্চলার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কমলার আর অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। বিধুকে দেখিয়া তাহার সাহস বাড়িল। সে সংক্ষেপে বিপদের কথা জানাইলে চঞ্চলার ব্যবস্থামত বিধুই কবিরাজ ডাকিতে গেল। ইহারা সকলে কমলার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কমলা যখন ফিরিল, তখন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। বুঁচির মা বলিল, "দেখ ত মা! ছেলেটার যেন তাগত নেই—আমি ঠিক ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছি নে।"

কমলা তাহার সর্ব্বনাশের পরিমাণ তখনও ঠিক বুঝে নাই। সে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কাছে বসিয়া পুত্রের অসাড় দেহের বুকে—পঞ্জরে—নানা স্থানে স্খলিত হস্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ধরিতে লাগিল। তখনও আশা হইতেছিল, মাতার সুশীতল করাঙ্গুলির কাছে পুত্র বক্ষে স্পন্দন তুলিয়া সাড়া দিবে!

কমলার চক্ষে জল নাই; পলকও নাই; পাষাণের মত যে স্থির হইয়া গেছে। অথচ তখনও যেন ইহার শেষ সত্যটুকু বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিতেছে। এই রূপে মিনিট দুই কাটিল। তার পর পার্শ্বের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া সে চঞ্চলার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল; বলিল, "তুই দ্যাখ্ দেখি ভাই! ছেলের বোধ করি ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে! মায়ের অসাক্ষাতে কি এমন যায়?"

স্বামীর জন্মভূমিতে পা না দিতেই সুধীর যে তাহাকে এই কঠোর পরীক্ষায় রাখিয়া চলিয়া গেল, শুধু তাহাই

নয় ;—এই স্নেহশীলা নারী—এই দুঃসময়েও যে স্নেহ অজস্র-ভাবে ঢালিয়া দিতেছে—ইহার মর্যাদা রাখিবে সে কি দিয়া? সেও এই মৃত অঙ্গের সমস্ত স্থানে হস্ত চালনা করিয়া অবশেষে হেঁট-মুণ্ডে চক্ষু দিয়া বর্ষণ নামাইতে লাগিল।

বুঁচির মা যাইয়া হলধরকে জাগাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিল। কমলা তখন অঞ্চল দিয়া সন্তানের মৃত্যু-মলিন ওষ্ঠের কস্ মুছাইয়া দিতেছে। ইহার সান্ত্বনা কি ছিল হলধর খুঁজিয়া পাইল না। সে কেবল চৌকাঠের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া বিধু আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ প্রতিবাসী—আত্মীয়। তিনি বিধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! আর অশান্তি বাড়িয়ে কাজ কি? এস! আমাদের কাজ আমরা করি।"

ইঁহারা যখন কমলার বক্ষঃ খালি করিয়া স্নেহের নিধিকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন নিদ্রিত প্রতিবাসীদের সচকিত করিয়া অনীবের সঙ্গে সঙ্গে বুঁচির মা আর চঞ্চলাও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিল না কেবল কমলা। কে জানে—লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহার অন্তরে তখন কি ক্রিয়া করিতেছিল।

পরদিন সকালে কিরণ, হরসুন্দরী, প্রকাশ, ললিতা ইঁহারা ত আসিলেনই—তা' ছাড়া পাড়ার আরও অনেক-গুলি স্ত্রী পুরুষ আসিলেন। অনেকে সান্ত্বনাও দিলেন। ইন্দুও আসিয়াছিল। সে দুই হাতে কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

কিরণ এক সময় বলিলেন, "মা! তুমি ত মন্দিরে পড়ে রয়েছ। আমার মুক্তির প্রার্থনাটা কেন কর না। বেঁচে যাই।"

এ দুঃসময়ে এ রকমের প্রশ্ন করা কঠিন ছিল—সে তাহা করিল। মাতার জবাব দেওয়া আরও কঠিন ছিল—তিনিও তা দিলেন। বলিলেন, "তোর ঐ দুর্ব্বলতার কথাগুলো আমাকে না শুনালে কি পারিস্ নে? ছেলেটা ঔষধ পায় নি—পথ্য পায় নি—ছেড়ে গেল! কিন্তু তোর তাতে ক্ষতি কি? এর চেয়ে বড় বস্তুই যে তুই হাতে পেয়েছিস্। কাজে যা' নেই—কান্নায় কি তা' ফুটিয়ে তোলা যায়? লোকে 'মায়াকান্না' বলে উপহাস করে—এটা তোর বোঝা উচিত।"

হরসুন্দরী কিরণের কাছেই বসিয়া ছিলেন। অন্যান্য মেয়েরা কমলাকে বেড়িয়া লইয়া বসিয়া ছিল। ললিতা সস্নেহে কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি! তোমার চোখে একবিন্দু জল নেই—কাঁদলে ভাল ছিল কিন্তু।"

কমলা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বেঁচে থাকবার মত বাছাকে আমি কি দিতে পেরেছি বল? আমি যে কাঁদ্‌ব তার দাবী কই? যিনি সুধীরের মা—আমারও মা—এই কষ্টের সময় তিনিই ত কোলে তুলে নিলেন। এতে কি কাঁদা যায়?"

চঞ্চলা গৃহের এক কোণে বসিয়া অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছিল। সুধীর যে মায়া কাটাইল, এই দুঃখটাই শুধু তখন আর বড় ছিল না। সে যখন শুনিল, ছেলেটি 'খেতে দে!' 'খেতে দে!' করিতে করিতেই ঘর অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন এই হীন কলঙ্কটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য তাহার এতদিনকার আচরণ হইতে কোন কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় কি না দেখিবার চেষ্টায় সে লজ্জিত ভাবে নিজের চরিত্রটা ঘাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সুধীর ঔষধ পায় নাই—পথ্য পায় নাই—এ কলঙ্কের দায় হইতে মুক্তি পাইতে তাহার পিতা মাতার পথ যতটা পরিষ্কৃত হইয়া আছে, তাহার যে তার শতাংশেরও একাংশ নাই। তাহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারিত? মাতার অভিপ্রায়ে সায় দিয়া নিরীহ স্বামীর নিকট হইতে শুধু নিজের প্রয়োজনের সম্পর্কটা যে কত বিশাল করিয়া তুলিয়াছে, আজ চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

চঞ্চলার এই অচেনা মুখখানা পাড়ার মেয়েরা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বিবাহের সময় একে সে ছোটটি ছিল, তাহাতে অল্প দিনের সংস্রব, সে কথা কাহারও মনেও নাই। রক্ষা যে, এ সময় কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু সে যখন বুঝিতে পারিল ইঁহাদের বক্র দৃষ্টিটা একমাত্র তাহাকে লইয়াই কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সুশোভন সাজসজ্জা ও অঙ্গাভরণ তাহার নিজেরই কাছে এমন লজ্জার বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছিল যে, সম্মুখের পিপীলিকা-

গুলি দয়া করিয়া যদি তাহাদের গর্ত্তের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিত, সে সেই ছিদ্রপথে লুকাইয়া এই সঙ্কট কাল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত। গায়ের অলঙ্কারগুলি যেন সূচ হইয়া তাহাকে বিঁধিতে লাগিল। সে তাহার সমস্ত দেহ বস্ত্রে ঝাঁপাইয়া কতকটা মুড়িসুড়ি দিয়া বসিল; এবং অন্যের চোখে ধূলি দিয়া যতগুলি গহনা খোলা যায়—খুলিয়া ক্রোড়দেশে সঞ্চিত করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলা যে নৌকায় আসিয়াছিল, সেই নৌকায় ফিরিয়া যাইবে স্থির ছিল। প্রায় পক্ষাধিককাল অতীত হইল, যাওয়া হয় নাই। স্বামীকে লিখিয়া জানাইয়াছে—যাইতে বিলম্ব হইবে।

এই পনর দিনে ঘর-সংসারের অনেক খবর সে জানিতে পারিল। সে শুনিয়াছিল, ভাসুরের অসুখ—কাজকর্ম্ম করিতে পারেন না—কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভাসুরের সঙ্গে বড় জায়ের সংসার যে ভিন্ন; এবং যত কিছু কষ্ট ইহারই সংসারে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সে খবর সে জানিত না। আর সে যে এত বড় কষ্ট—হাঁড়ি-কুঁড়ি ঘাঁটিলেও একটা তণ্ডুলের দানা বাহির হয় না, দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকায়—সে তাহা বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু সবচেয়ে ইহাই অধিক আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল যে, স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া নীচ হলধরের গৃহে আসিয়া তাহাকে আশ্রয় লইতে হইল—কোন্ অচিন্তনীয় বিবরণ না জানি ইহার পিছনে আছে। এই শোক-তাপের ভিতরে সে কিছুই জানিতে চাহিতে পারিল না। তাহার চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল।

এই পনর দিন কমলাকে সে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেয় নাই। রাঁধিল—বাড়িল—সকলকে খাওয়াইল। ছেলেদের আবদার অত্যাচারও সহ্য করিল। কি তৃপ্তি!!

একদিন সকালে রান্না চাপাইয়া দিয়া সে একবার কমলার কাছে আসিয়াছে, এমন সময় সহসা কিরণ আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কমলা মেঝের উপর বসিয়া ছিল। ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। চঞ্চলাও ভাসুরকে প্রণাম করিয়া বড় জায়ের আড়ালে আসিয়া উপবেশন করিল।

সুধীর ছাড়িয়া যাওয়ার পর কিরণ স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কমলাকে ঘরের বাহির করিয়া দিতে অধিকক্ষণ সময় লাগে নাই—সুধীরের চলিয়া যাইতে বেশী সময় হয় নাই—ছোট বৌমারও হলধরের গৃহে আসিয়া মাথা রাখিতে ভাবিবার সময় লাগিল না—শুধু নিজের লজ্জাটারই শেষ হইতে আর সময়ের শেষ নাই।

মায়ের ইঙ্গিতক্রমে গোপাল যাইয়া কিরণকে প্রণাম করিল এবং খাটের উপরকার বিছানাটা পাতিয়া দিল। কিরণ তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিলেন। বলিলেন, "এস! তোমার কারণেই আসা। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় নি। যদি পরিচয় নাই কর—কোলের উপর এসে একটু বসো—অনেক দিন আমি কাকেও কোলে করি নি।" এই বলিয়া তাহাকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অধীর মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া ম্লানমুখে পিতাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; সেও যেন পর হইয়া গেছে।

হলধর বাড়ীতে ছিল না। গৃহে কথা বলিবার মত লোক নাই।—তুমি কি পড়? তোমার বাবা একবার বাড়ীতে আসিলেন না কেন? এইরূপ কিছু কিছু প্রশ্ন গোপালকে লইয়া কিরণ করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "তোমাদের নিতে এসেছি আমি। তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো—বাড়ী ঘরে একবার যাবেন না তিনি?"

গোপাল উঠিয়া যাইয়া এক হাতে জ্যেঠাইমার ও এক হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। তার পর সে উত্তর করিল, "জ্যেঠাইমাকে ছেড়ে মা ত এখন যেতে পারছেন না। বাড়ীতে উঠবেন বলেই এসেছিলেন তিনি। এখন আর যেতে পারবেন কি না বুঝে দেখ্‌বার সময় পান্ নি।"

কিরণ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িলেন; বলিলেন, "সবাই বুঝে দেখবার সময় নিলেন। নেই নি কেবল আমি। তার প্রায়শ্চিত্ত আর কত কাল ধরে চল্‌বে?"

কমলা মাথা নীচু করিয়া ভাবিতেছিল,—এ আলোচনার এইখানেই শেষ হোক্—এইখানেই শেষ হোক্।

আলোচনা করেই বা কে? একটি ভাদ্রবধূ—একটি উপেক্ষিতা—আর দুইটি শিশু।

গাগরী আজ হয়নি ভরা
সখা মিছেই আমার আঁচল ধরা।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী
শ্রীমতী স্নেহপ্রভা দেবীর সৌজন্যে

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

হইলে কি হয় ? কিরণ তখন আর থামিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিলেন, "বুঝে দেখতে গেলে, যাওয়া তিনি উচিত বলে মনে করবেন না। তিনি কেন—কেহই করে না। কিন্তু কা'কেও জানাতে পারলুম না যে, মনের পাপের চেয়ে বাইরের পাপই আমার বেশী হয়েছে।"

চঞ্চলা দেখিল, কমলার দেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তৃষ্ণায়ও বোধ করি বুক পর্য্যন্ত কাঠ হইয়া গেছে। ঘোমটার আড়াল হইতেও বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া মাটি ভিজিতেছে। সে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

কিরণের আজিকার কথাগুলি বেশ খোলা—বেশ সোজা। ইহা তামাসা নয়—তিরস্কার নয়—চিত্তের পরিবেদন মাত্র। স্বামীর অন্তরের এই অংশই কমলা চিনিত এবং পূর্ণ বলিয়াই জানিত।

কিরণের আজ বলিবার অন্ত ছিল না। আজ যদি তাঁহাকে গালি দিবার মত কেহ এই সম্মুখে বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে ঘরের এই লোকগুলি যে ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন—তাহার সঙ্গে অন্তরের সত্য তত্ত্বটুকু যতক্ষণ প্রকাশ করিয়া না বলিতে পারিতেন, ততক্ষণ সমস্ত তিরস্কারই তিনি সহ্য করিয়া যাইতেন। তিনি পুনশ্চ বলিলেন,

"কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, আমি যেমন অক্ষম—তেমনি অপটু। এই দুর্ব্বল লোকটির দিকে কেহই একটু জোর দিলে না। যে যার পথ বেছে নিয়ে চলে গেল। হিরণ ছেলেমানুষ। কিন্তু নরেশ ধম্‌কালে—হাত ধরে টান্‌তে পার্‌লে না। তিন তিন্‌টে সংসার সে চালাচ্ছে—নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত আমার সেবার জন্য কাছ-ছাড়া করে রাখ্‌লে—শুধু তার আশ্রয়ের মধ্যে জোর করে আমাকে ঠেলে দিয়ে তালা বন্ধ কর্‌তে তার বেধে গেল! আর মা—এই ছেলে তাঁর পেটে জন্মেছে, এ দুঃখে বোধ করি ছেলের সুমতির জন্য দেবতার পায়ে আশ্রয় নিলেন। কেহই বুঝে দেখ্‌লেন না,—আমি কোথায় ?—কত দূরে ? একটু বেশী জোর যদি কোন দিক্ দিয়ে পড়্‌ত—আমি নিকটেই ছিলুম—নিকটেরই হতুম।"

কমলা আর বসিতে পারিতেছিল না। চঞ্চলার দেহের উপর তাহার দেহ অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িল। হয় ত শীঘ্রই ইহার মূর্চ্ছা হইবে। কিরণ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি উঠ্‌লাম গোপাল! তোমাদের সকলে তোমরা যদি বা থাক—কিন্তু আমার এমন অবস্থা—তোমাদের দ্বারে এসে দু'মিনিট কাল বস্‌বার একটু আসন পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোপাল বলিল, "মা বল্‌ছেন, আপনি এখন যেতে পাবেন না—আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।"

কিরণ চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "এঁদের অভাব ভেবে পাঁচটি টাকা আমি একদিন দিয়ে গিয়েছিলুম—তাও ছেলেটার অসুখের দিনে। সে টাকা হয় ত খরচ হয় নি—সুধীরের জীবনের সঙ্কটের দিনেও না। বোধ করি বাক্সে তোলাই আছে। তুমি ছেলে মানুষ, সব কথা জানও না—বোঝও না। খেতে আমি পারি। কিন্তু যাঁরা খাওয়াবেন—তাঁরা চোখ বুজেই আমার পাতে ঢেলে দেবেন।"

গোপাল বলিল, "মা সে সকল জানেন না। আমার মা-ই রাঁধবেন। তিনি না খাইয়ে আপনাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।"

কিরণ ভাবিয়া দেখিলেন; বলিলেন, "তা' হ'লে আমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। ভাত হ'লে আমাকে ডেকে পাঠিও।"

"মা বল্‌ছেন, এখানে বিছানা করে দেবেন ?"

"না—থাক্। সকালে এখন বিছানার প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাজ না থাকে ত চল না—বসে বসে গল্প করব'খন্।" তার পর ছেলেদের লইয়া তিনি বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ চলিয়া গেলে কমলা সেইখানে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, কোন কথা বলিল না। চঞ্চলাও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ভাসুরকে সে কি দিয়া খাওয়াইবে এই ব্যস্ততায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে ভাত চাপাইয়া দিয়া কেবলই দ্বারের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে, এমন সময় বিধু আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া মাছ তরকারী, ঘি দুধ এই সকল আনিতে তাহাকে বাজারে পাঠাইয়া দিল।

ভয়ে ভয়ে রান্না শেষ করিয়া ছেলেদের সে প্রথমে খাওয়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "অধীর! বাবা! রান্না কেমন হয়েছে ?"

অধীর পরম পুলকিত হইয়া বলিল, "খুব ভাল রান্না হয়েছে কাকী মা! মা-ও এমন রাঁধ্‌তে পারেন না।"

গোপাল বলিল, "তুমি ত বেশ রাঁধ্‌তে পার মা। ঠাকুরই ত রাঁধে—তুমি শিখ্‌লে কবে?"

চঞ্চলা হাসিয়া কহিল, "কার কাছে আমি এসেছি জানিস্? হাওয়াতে সব হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে এ রকম পেরে উঠ্‌তাম না।"

ছেলেদের প্রশংসা-বাক্যে কিন্তু তাহার প্রত্যয় হইল না। বেশ পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট্‌পাট্‌ দিয়া ভাসুরের জন্ত জায়গা করিয়া দিল এবং ভাত দিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, ভাসুর অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত সকল তরকারীগুলিই চাটিয়া মুছিয়া খাইতেছেন। একটা নিবিড় আনন্দ বেড়িয়া বেড়িয়া যেমন তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল, সেইরূপ কেন যে তাহার সেবা-হস্তখানি অভিসম্পাতের মত এমন অনাদৃত করিয়া রাখিয়াছে, এই বেদনায় তাহার চোখের কোণে দু' ফোঁটা জলও আসিয়া জমিতেছিল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমার রান্নাটি বেশ লোভনীয়। কিন্তু উনি কি সেই অবধিই রাঁধ্‌ছেন? অভ্যাস নাই—শেষটা আগুনের তাতে একটা অসুখ-বিসুখ বেধে বস্‌বে?"

কি মিষ্ট বাক্য! কি পরিপূর্ণ স্নেহ! চঞ্চলার তৃষ্ণা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই সাড়াটাই তখন সে অনুভব করিতেছিল যে, যদি সে আপনার অত্যন্ত নিকট এই পরিজনবর্গের সহিত নিজের অন্তরে অন্তরে এবং পরস্পরের অন্তরে অন্তরে পূর্ণ মিলন ঘটাইতে না পারে, তবে সংসারে সব চেয়ে বড় লাভে সে বঞ্চিত হইবে।

আহারাদি শেষ হইলে গোপালকে আদর করিয়া কিরণ চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সংসারে কি একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া ইহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চঞ্চলার নিকট অস্পষ্ট। কিন্তু ভাসুরের কথায় এটুকু জানা গিয়াছে,—ইহারা স্বামী স্ত্রীতে কত নিকট—অথচ কত পৃথক।

বার দুই হরসুন্দরীর—আর আজ এই ভাসুরের—সংসারের এই কর্ত্তা দুটির কথাবার্ত্তায় এটুকু সে জানিল, পরস্পরের দিকে ঝুঁকিতে মনে ইঁহাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কমলার উদ্বেগ ধরা যায় না—হরসুন্দরীরও তাই—কিন্তু ইচ্ছাটা ধরা যায়। ইঁহাদের কাহারও আচরণে কোন দিন ঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু কি যে অভিযোগ—কি যে অপমান—আর কি যে বাধা—কোথায় কোন্‌ অন্তরালে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, স্বামীও ত একদিন স্পষ্ট করিয়া শুনাইলেন না?

কমলার অন্তর সেদিন স্থির ছিল না। কিরণ যাহা শুনাইয়া গেলেন, সমাজের সঙ্গে ইঁহার সর্ত্তটুকু বাদ রাখিলে আশ্চর্য্য কথা কিছু ছিল না। কিন্তু কলিকাতায় ইঁহার সেই সর্ব্বশেষ আচরণের পর কমলার নিকটে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। তথাপি কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল,—"হে প্রভু! আমাকে কষ্ট দিতেছ—দাও! স্বামীকে কেন দুঃখ দাও?"

খাটের উপর চঞ্চলা ও গোপালের শয়নের ব্যবস্থা কমলা করিয়া দিয়াছিল। চঞ্চলা তাহা শুনে নাই। মেঝের উপর ঢালা বিছানা করিয়া তাহারা সকলে একত্রে শুইত। অন্য দিন চঞ্চলা শয়ন করিয়াই গল্প জুড়িয়া দিত। সেদিন কাহারও মন ভাল ছিল না। অধীর ও গোপাল ঘুমাইয়া পড়িল। ইহাদের চোখে নিদ্রা নাই। কিন্তু গৃহে কোন সাড়াশব্দও ছিল না। চঞ্চলা ভাবিতেছিল, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে সে কি ইহার একটা কিছু সুরাহা করিতে পারিবে না? কমলাও ভাবিতেছিল, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। দশজনের চক্রে ভগবানও ভূত হইয়া যান।

কিছুক্ষণ পরে চঞ্চলা হঠাৎ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল এবং দুই হাতে কমলার পা দু'খানা বুকে তুলিয়া লইয়া জড়াইয়া ধরিল। কমলাও উঠিয়া বসিয়া পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এ কি কচ্ছিস্‌ তুই?"

চঞ্চলা বলিল, "কেন তুমি ঘর ছেড়ে এসেছ, না বল্‌লে আজ কিছুতেই তোমার পা ছাড়্‌ছি নে।"

কমলা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চঞ্চলা পা ছাড়িতেছে না দেখিয়া বলিল, "গুরুজনের অপরাধ শুন্‌তে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। তুই শুন্‌তে চাচ্ছিস্‌, এতে যে তোর পাপ হবে।"

সে বলিল, "তা হোক্‌। আমি জানি, সে শুন্‌লে

আমার পুণ্যই হবে। আমি জানি, তুমি দুঃখের কথাই বল্‌বে—পাপের কথা বল্‌বে না।"

কমলা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পদদ্বয় তখনও চঞ্চলার বুকে আটক রহিয়াছে। সে বলিল, "যা শুন্‌তে হয় কাল সকালে হলধরের মুখেই শুনিস্‌। আমাকে অব্যাহতি দে তুই।" চঞ্চলা একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে হলধরকে কাছে ডাকাইয়া একে একে সকল কথাই সে শুনিল। গুরুদেবের সঙ্গে হরসুন্দরীর সেই আলোচনা, আর ভাসুরের গত-কাল্‌কার সেই খেদোক্তি এখন বেশ অর্থপূর্ণ হইয়া অন্তরে গ্রহণ করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাহার চোখের পাতা বুজিল না। নারীর মর্য্যাদা লইয়া এমন ঢালাফেলা এই দেশের লোকে করিতে পারে ইহা সে কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছিল না। কমলাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়াই কাটাইল। এই মিথ্যা অপবাদের ব্যবধান ঘুচাইতে স্বার্থের সঙ্গে—এমন কি নিজের অদৃষ্টেরও সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া—মায়ের ঈপ্সিত সুখ এবং বিলাস না হয় বাকী থাক্‌—ভগিনীকে সে নিরাপদ করিবে মনের ভিতর এই দৃঢ়তা তখন বেশ ভরপুর হইয়া উঠিতেছে।

কমলার সঙ্গে ইহার সম্পর্কে কোন আলোচনাই সে করিল না। সুযোগ মত এক সময় সে বলিল, "দিদি! বেশী দিন থাকব বলে ত গুছিয়ে গাছিয়ে আসি নি, আমি কালই যাই—কি বল?" কমলা বলিল, "আচ্ছা।"

একলাটি কমলার প্রাণ সর্ব্বদা 'খা' 'খা' করিত। ইহাদের লইয়া সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, আরও কিছু দিন ইহারা কাছে থাকিয়া ব্যথাটা জুড়াইয়া দিয়া যায়। কিন্তু গোপালের হয় ত অসুখ বিসুখ করিতে পারে। এমন ঘরে সে কোন দিন থাকে নাই। তাহাদের অনাটনের সংসারে কষ্ট চারি দিকেই লাগিয়া আছে। তা' ছাড়া চঞ্চলা আসা অবধি সেই যে সে রান্না-ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, বলিলে শুনে না, রাগ করে। চিরদিন সে গৃহকর্ম্মে অনভ্যস্ত, শেষটা একটা কঠিন রোগ বাধাইয়া বসিবে? আরও একটা কথা সে ভাবিতেছিল, হলধরের সকল কথা বোধ করি এ প্রত্যয় করে নাই।

বিধু সেই হইতে চঞ্চলার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার ছুটিও ছিল। চঞ্চলা হরসুন্দরীর নিকট যাইয়া বিদায় লইয়া আসিল। যখন ইহারা যাত্রা করিবে তখন গোপাল জ্যেঠাইমাতার অঞ্চল চাপিয়া ধরিল।

চঞ্চলা সর্ব্বদা গৃহকর্ম্ম লইয়া থাকিত। কমলা ছেলে-দের লইয়া সময় কাটাইয়া দগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার প্রয়াস পাইত। জ্যেঠাইমাতাকে সে এমন পাইয়া বসিয়াছিল যে, সে তাঁহার নিকট খাইবে—শুইবে—থাকিবে—মায়ের ধার দিয়াও যাইবে না। চঞ্চলা বলিল, "আমিও ওই কথা ভাবছিলুম দিদি! তোমার নেওটা হয়ে পড়েছে, ও থাক্‌ তোমার কাছে। কত দিক্‌ আর খালি করে দেবে তুমি?"

কমলা ঘোর আপত্তি করিতে লাগিল। ছেলে এখন বলিতেছে, মাতা চলিয়া গেলে হয় ত ঠেকাইয়া রাখা দায় হইবে। বিশেষতঃ তাহার মত হতভাগিনীর ছেলেপুলে লইয়া বাস করা—সুধীর যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছে!

গোপাল কিন্তু থাকিবে—মাতাও তাহাকে রাখিয়া যাইবে—কমলা অগত্যা সম্মত হইল।

সুধীরকে হারাইয়া কমলা কোন দিন মুখ ফুটিয়া কাঁদে নাই। আজ দুই বোনে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া জলধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

চঞ্চলা চলিয়া গেলে কমলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলেদের লইয়া আনমনে বসিয়া রহিল। তার পর ঘরের কাজ সারিয়া রান্নাঘরে যাইয়া ঢুকিল। ঘরে রান্নার সামগ্রী কি আছে না আছে সংবাদ পর্য্যন্ত লইতেও চঞ্চলা তাহাকে দিত না। বিধুকে কলের ইঙ্গিতের মত চালাইয়া সমস্তই সে নিজে সংগ্রহ করিয়া লইত। হাঁড়িকুড়ি নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিল, চালে ডালে, নুনে তেলে প্রায় তিনমাসের দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া আছে। কমলার দুই চক্ষু ছাপাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চঞ্চলা বিধুকে দিয়া বাজার হাট করাইত। প্রত্যহ কিছু কিছু অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় করাইয়া এ সকল সে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে এই সকল দেখিতেছে, এমন সময় গোপাল ঘরে ঢুকিয়া কোঁচার খুঁট হইতে একতাড়া নোট খুলিয়া জ্যেঠাইমার হাতে দিল। বলিল, "মা বলে গেছেন, আপনাকে দিতে।"

কমলা মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া গোপালকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

"দি লেডী অব্ দি লেক"-এর দেশে

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল এম-এস্‌সি, এম-বি

সারা দিনই ঝরঝর করে বৃষ্টি হচ্চে, তাই মাথায় করে গেলুম, ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ওখানে। এ রকম বাদলার দিনে, কা'ল বেরিয়ে আর কোন লাভ নেই, তাই প্রস্তাবটা মুলতুবী রাখার ইচ্ছাটাই ছিল ষোল আনা। কিন্তু ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়েই দেখি, লণ্ডন থেকে চারজন ভদ্রলোক ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ-জন্যই যাবার প্রস্তাবটা স্থগিত রাখতে, আমাদের একটু বাধ বাধ ঠেক্‌ছিল; কিন্তু ডাঃ চক্রবর্ত্তী ভয়ানক অপ্টিমিষ্ট (optimist), বল্লেন, কাল দিন ভালো হতেই হবে, এতগুলি থাকতে হলো, তবু বড়দলের দেখাই নেই। মোটর ছাড়তে যখন প্রায় পাঁচ মিনিট বাকী, আমরা উৎকণ্ঠিতভাবে শুধু ঘড়ির কাঁটা দেখছিলুম, এম্নি সময়ে লটবহর অর্থাৎ ক্যামেরা, খাবারের ঝুড়ি, জলের পাত্র প্রভৃতি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছলেন তাঁরা, ডাঃ বাগচি, মিঃ পি শেঠ ও তাঁহার কাকা এবং স-পত্নী-কন্যা ডাঃ চক্রবর্ত্তী। সব শুদ্ধ আমরা এগারো জন বাস্‌খানা অধিকার করে বস্‌লুম। বাসে চৌদ্দটি সিট্ থাকে সাধারণতঃ, কিন্তু ভারতীয়দের অভেদ্য দুর্গে, কোন শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গবই আর

লক্ কেট্রিনের তীরে মধ্যাহ্ন-ভোজন

ডাঃ পরশুরাম, ডাঃ কৃষ্ণস্বামী, মিঃ বি, শেঠ, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ পাল (লেখক), ডাঃ মিত্র, ডাঃ ঘোষ,

লোকের, এত বড় ইচ্ছাটা কখনো বিফল হতে পারে না। মনে মনে একটু দ্বিধা রেখে, পরদিন ভোরেই, রওয়ানা হওয়া ঠিক করে এলুম সে রাত্রিতে।

ভোরে আটটায় ডাঃ মিত্র, ডাঃ ঘোষ, আর আমি, এই তিনজন গিয়ে পৌঁছলুম সেণ্ট এণ্ড্রুজ স্কোয়ারে। কিছুক্ষণ পরেই, দুটি মান্দ্রাজী বন্ধু, ডাঃ কৃষ্ণস্বামী ও ডাঃ পরশুরাম্ এসে দেখা দিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঢুকতে সাহস কর্লেন না, সুতরাং গৌণভাবে, বাস্‌খানা আমাদেরই রিজার্ভ হয়ে রৈল। ডাঃ ঘোষ সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে 'ইণ্টারপ্রিটার'এর পদ লাভ করে, গাইড্ ও সাফারের পাশে সামনের আসনখানা অধিকার করে বস্‌লেন।

গাড়ী এডিনবরার প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট অতিক্রম করে, গিয়ে সহরের বাইরে পড়লো। ডাঃ ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে

বল্লেন "ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, হাতের ডান দিকেই মস্তবড় হাঁসপাতাল ও চিড়িয়াখানা দেখুন।" উঁচু নীচু রাস্তায় দু'চারবার উঠা-নামা করে, গাড়ী গিয়ে খোলা মাঠের মাঝে পড়লো। দু' পাশেই গমের ক্ষেত, তারি মাঝে মাঝে লাল লাল পপি ফুল ফুটে বেশ দেখাচ্চে! রাস্তার দুদিকে নানারকম গাছ, সবুজ পাতায় ভরে উঠেছে। পূবের আকাশে সূর্য্যদেব মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন, আবার মুখ ঢাকছেন, বেরিয়ে আসবেন কি না ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তবে ভাগ্যি ভাল, ঝরঝর অবিরল বারিধারা সেদিন মোটেই ছিল না। হাতের বাঁ দিকে একটা মস্ত উঁচু পাঁচীল ঘেরা স্থানে, চারি দিকের সহরগুলির আবর্জ্জনা পোড়ানো হয়—এ কথাটা শুনে, যেই ডাঃ চক্রবর্ত্তীমাথা উঁচু করে দেখতে দাঁড়িয়েছেন, অম্নি হঠাৎ এক ঝলক্ দম্‌কা হাওয়ার বেগে মাথার টুপীটা গেল উড়ে। তা' টের পাওয়ার আগেই বোধ করি গাড়ীখানা আধমাইল এগিয়ে গেছে। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মোটর থামলো; আর, লম্বা লম্বা পা ফেলে, কারো অপেক্ষা না রেখেই ডাঃ ঘোষ পবনের বেগে ছুটলেন টুপীর উদ্দেশে। দেখা গেল, আরো দুতিনজন ছোকরা সাইকেলে করে যাচ্ছিল। তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টুপীটারই উদ্দেশে জোরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে! ডাঃ ঘোষকে খুব বেশী ছুটতে হলো না; একজন সাইকেলবাহীই অনেকটা কষ্ট করে টুপীটা কুড়িয়ে এনে, হাতে তুলে দিয়ে গেল। বাস্তবিক, পরস্পরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করার ইচ্ছাটা এদেশের অনেক লোকের মাঝেই দেখেছি; এটা এদের একটা মস্ত বড় সদ্‌গুণ বলতে হবে। ডাঃ ঘোষ ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নিজের স্থান অধিকার করেছেন। ডাঃ বাগ্‌চির বোধ হয় একটু শীত কচ্ছিল; ওভার-কোটের ওপেন ব্রেষ্টটা উঁচু করে কাণ ঢেকে বসেছিলেন। এবার তিনি সুযোগ বুঝে, গাড়ীর হুড্‌টা তুলে দিতে অনুরোধ কর্লেন। বেশ দেখতে দেখতে মুক্ত আকাশের নীচে যাচ্ছিলুম; তাই হুডটা তুলে দিতে ডাঃ বাগচি ও মহিলা-সঙ্গিনীরা সন্তুষ্ট হলেও, আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। যাক্ সে কথা!

লক্ কেট্রিনের পারে জেটি

গাড়ী আবার চল্‌লো! ততক্ষণ সূর্য্যদেব মুখের আবরণ খুলে বাইরে এসেছেন। তাঁর হাসি দেখে, আমাদেরও সকলের মুখই হাসিতে ভরে উঠ্‌লো। একটা মস্ত বড়
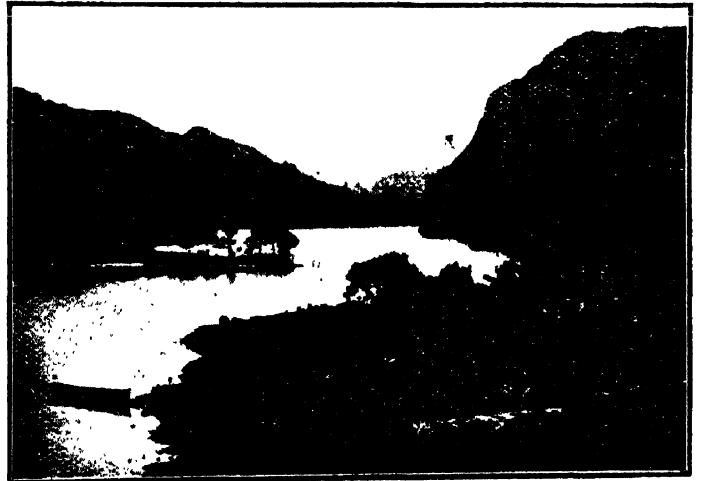
গব্‌লিন কেভ্‌এর কাছে লক্ কেট্রিন

কোল-ফিল্ড অতিক্রম করে আমরা এসে একটি প্রসিদ্ধ ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম লিন্‌লিথ্‌গোতে (Linlithgow) ঢুক্‌লুম। দেখে গ্রাম বলে মোটেই মনে হয় না। সহরের মতই

রাস্তাঘাট ; রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ী ! তেম্নি পার্ক, তেম্নি জলের কল, তেম্নি ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বন্দোবস্ত ! আমাদের দেশের সহরগুলির মতই, কোন তারতম্য নেই। ডাঃ ঘোষ গাইডের মুখে শুনে অতিকষ্টে দু তিনবারের

লক্‌ কেট্রিন

চেষ্টায় 'লিন্‌লিথ্‌গো গ্রাম' কথাটা উচ্চারণ কর্লেন। গ্রামের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে, আমরা উপরে চেয়ে দেখ্‌লুম, এক গাড়ী বোম্বাই ভারতীয় লোককে দেখতে প্রত্যেক জানালার পাশেই বৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী ও বালিকার

এলেন দ্বীপ ও বেনভেন্যু পাহাড়

ভিড় জমে গেছে ! অবশ্য রাস্তায়ও যে লোকের কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি আমাদের উপর ছিল না, তা হলফ করে বলতে পারি না।

লিন্‌লিথগো ছাড়িয়ে আমরা ফলকার্কএ (Falkirk) ঢুকলুম। ল্যাটিন ও স্যাক্সন ভাষায়, এর অর্থ, "পাঁচ মেশালি" (mixed people)। এটী লোহার কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। একটু দূরেই দক্ষিণ দিকে, এণ্টনিনের পাঁচীল ও রোমানদের কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে। স্কট্‌ ও ইংরেজদের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য, এ স্থানে বারবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বেজে উঠেছিল। ১২৯৮ ইংরেজীর ২২শে জুলাই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ফলকার্কের যুদ্ধে ওয়ালেস্‌কে পরাজিত করেন। আবার ১৭৪৬ ইংরেজীর ১৭ই জানুয়ারী, প্রিন্স চার্লস্‌ ষ্টুয়ার্ট এখানেই জেনারেল হোলির সৈন্যগণের উপর জয়লাভ করেন। এই সকল হিসাবে ফলকার্ক একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

ফলকার্কের পরই বেনক্‌বার্ণ (Bannock-burn)সহর। এরি চারিদিকে নদীটি ঘুরে, প্রায় এক মাইল দূরে ফর্থ নদীর সঙ্গে মিশেছে। ষ্টার্লিংও এরই মাঝামাঝি স্থানে—১৩১৪ ইংরেজী ২৪শে জুন, দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের এক লক্ষ ইংরেজ সৈন্য, ও রাজা রবার্ট ব্রুসের অধীনে ত্রিশ হাজার স্কচ্‌ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এড-ওয়ার্ড ষ্টার্লিং রাজ-প্রাসাদটি অধিকার করিতে চান, কিন্তু পরদিনের যুদ্ধেই তাহা ব্রুসের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে স্কচ্‌রা জয়লাভ করে, এবং ঐ যুদ্ধ বেনক্‌বার্ণের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ ! স্কচেরা এ যুদ্ধের কথাতে এখনো গর্ব্ব অনুভব করে।

বেনক্‌বার্ণ পার হয়েই ষ্টার্লিং (Stirling) সহর। উত্তর ও দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডের মাঝে দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে, তারই উপর ষ্টার্লিং রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলুম ! এই সহর এবং প্রাসাদ, দুই ই শেষ পর্য্যন্ত প্রথম এডওয়ার্ডের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। এটাকে হাতে রাখবার জন্যই দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, বেনক্‌বার্ণে ব্রুস্‌কে আক্রমণ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এখানে অনেক সময় রাজা নিজে থাকতেন ;—তারও

কিছু পরে এটি একটি দুর্গ ও সেনাবাসে পরিণত হয়। এখন শুধু রাজকর্ম্মচারীদের অফিস মাত্র আছে। পুরাতন অংশগুলির বেশীর ভাগই তৃতীয় জেমস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। যে কক্ষে আর্ল ডগ্‌লাস্ দ্বিতীয় জেমস্ কর্ত্তৃক ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে অন্যায় ভাবে নিহত হন, তাহা এখানে ডগলাস্ কক্ষ নামে পরিচিত। প্রাসাদের কাছে গ্রেফ্রায়ার গীর্জ্জা, চতুর্থ ও ষষ্ঠ জেমস্ দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছিল। পশ্চিম প্রান্তে চতুষ্কোণ টাওয়ারএর গায়ে, ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল মঙ্ক কর্ত্তৃক অবরোধের সময়ের কামানের গোলার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট আছে।

ষ্টার্লিংএর পর আমরা দেখতে দেখতে ব্লেয়ার, ড্রামাণ্ড ও ডুন ক্যাস্‌ল পার হয়ে ক্যালেণ্ডারে গিয়ে পৌঁছলুম। এখানেই লাঞ্চের জন্য গাড়ী আধ ঘণ্টা থামলো! পাশেই ক্যালেণ্ডার হোটেল; তাতে আমরা ঢুকে চা-যোগ-পর্ব্ব শেষ কর্‌লুম। তখনো গাড়ী ছাড়তে প্রায় পোনর মিনিট বাকী! তাই ডাঃ মিত্র, ডাঃ ঘোষ ও আমি, তিনজনে পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম। ক্যালেণ্ডার যদিও একটা গ্রাম, তবু একটা সহর বল্লেও চলে। গ্রীষ্মের সময় এখানে অনেক দূরদেশ থেকে দর্শকেরা ও অনেকে সহর ছেড়ে গ্রীষ্ম যাপনের জন্য এখানে আসেন। ক্যালেণ্ডারের নীচেই একটি পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী কুলুকুলু করে বয়ে যাচ্ছে। আমরা তিন জন নীরব নিস্তব্ধ নির্ঝরিণীর তীরে এসে দাঁড়ালুম! হাতের ডান- দিকে অনতিউচ্চ পাহাড়ে সবুজ পাতায় ভরে উঠে গাছগুলি বেশ দেখাচ্ছে! সামনেই বেনলেদী নামক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ! দেখে মনে হয় যেন কোন চারুশিল্পী এক অভিনব চিত্রপট অঙ্কিত করে রেখেছে নির্ঝরিণীর তীরে আমরা একটু এগিয়ে যেতেই দেখলুম, একজন মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তি তন্ময় হয়ে স্রষ্টার এই অপূর্ব্ব দৃশ্যপট দেখছে! তার ধ্যানে বাধা দিয়েই ডাঃ মিত্র তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ কর্‌লেন। কথাপ্রসঙ্গে সে বল্লে, সে একজন শিল্পী; এই চমৎকার স্থানটির একটি দৃশ্যপট আঁকবার জন্যই সে সেখানে এসে কিছুদিন ধরে আছে। তার মুখে এই স্থানের অনেক ঐতিহাসিক গল্প শুনলুম। ওই সম্মুখের পাহাড়গুলিই নাকি সুপ্রসিদ্ধ দস্যুরাজ 'রবরয়ে'র এককালে লীলা নিকেতন ছিল! অকস্মাৎ আমাদের গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো! আমরা শিল্পীকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিয়ে এসে আবার গাড়ীতে উঠ্‌লুম।

লক্ কেট্রিন ও বেন্‌ভেন্যু

ট্রোসাক্‌স্‌এর পথে

ক্যালেণ্ডার হতে লক্ কেট্রিন (হ্রদ) নয় মাইল। এ পথটুকু বাস্তবিকই চমৎকার। গাড়ীখানা একবার খাড়া পাহাড়ের উপর চড়ে, আবার ঠিক তেম্নি খাড়া

পাহাড়ের গায়ে নামে। আমাদের সামনেই আরো কখানা গাড়ী যাচ্ছিল। দূর থেকে তাদের একটার পর একটা পাহাড়ে চড়তে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন একটা সরীসৃপ-জাতীয় জন্তু হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠ্‌ছে। আবার যখন তারা নামছিল, তখন মনে হচ্ছিল, যেন কে ধাক্কা দিয়ে জন্তুটাকে নীচে ফেলে দিলে। খাড়া পাহাড়ে উঠবার ও নামবার বেলা গাড়ীর ভিতরে আমরা সবাই কখনো পশ্চাতের দিকে আবার কখনো সামনে ঝুঁকে পড়ছিলুম। কখনো গাড়ীখানা একটা পাহাড়ের গা ঘেঁসে তারই তিন দিক ঘুরে, আর একটা পাহাড়ের কাছে এসে ঘুরে যাচ্ছিল। সামনের গাড়ীগুলি একবার পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে আবার হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে আবার আর একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে ভোঁ পোঁ পোঁ করে জানিয়ে দিচ্ছিল যে তারা কাছেই আছে। এই দেখে আমার ছোটবেলাকার লুকোচুরী খেলা মনে পড়ছিল। এ যেন গাড়ীগুলির লুকোচুরী খেলা চলছে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে—নানা রকম লতা ও গাছ, ফুলে ও সবুজ পাতায় ভরে উঠে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। 'Caledonia stern and wild' যে এত অপরূপ সৌন্দর্য্য তার বুকে লুকিয়ে রাখতে পারে, না দেখলে এ কথনই বিশ্বাস কর্ত্তুম না।

ফর্থ ব্রিজ

একটু এগিয়ে যেতেই, হাতের বাঁয়ে, লক ভেনাবার দেখতে পেলুম। তারপর একে একে বোক্যাস্‌ন্‌, কলিয়ান্‌টোগ্‌ল্‌ ফোর্ড, ভানক্র্যাগান্‌, ব্রিগ্‌ ওটার্ক প্রভৃতি, 'দি লেডী অব দি লেকের' উল্লিখিত ও সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি পার হয়ে গেলুম। অনেকদিন আগের পড়া কবিতার কথাগুলি ঝাপ্সা ঝাপ্সা মনে পড়ছিল; কিন্তু চোখের সামনে দেখছিলুম, সেই অস্পষ্ট কল্পনার সুস্পষ্ট বাস্তব মূর্ত্তি! যতই দেখছিলুম, ততই মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছিল; আর ভাবছিলুম, প্রকৃতির এই নিস্তব্ধ, নীরব, নিভৃত কোণে, যে স্কট্‌, বার্ণস্‌ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের জন্ম হয়েছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

খানিকক্ষণ পরেই লক আক্রে পার হয়ে, ট্রোসাক্‌এর মধ্য দিয়ে চল্লুম। কোথাও সুউচ্চ পাহাড়, কোথাও লতাপাতা তৃণগুল্ম-পরিপূর্ণ বনানী, কোথাও ওক্‌ গাছের জঙ্গল—কোথাও ঝর্‌ ঝর্‌ করে জলের স্রোত পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে। বাস্তবিকই এত সুন্দর যে কবি যখন ট্রোসাক্‌ সম্বন্ধে বলেছেন :—

"So wondrous wild the
whole might seem,
The scenery of a fairy
dream"

তাকে কখনই অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। স্বপ্নে দেখা পরী-রাজ্যের মতই তাহা অভিনব, মনোমুগ্ধকর ও অবর্ণনীয়।

প্রায় দেড়টার সময় আমরা এসে লক্‌ কেট্রিনের পারে পৌছ্‌লুম। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা চমৎকার হ্রদটি। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের লক্ষলক্ষ প্রতিবিম্ব বুকে থৈথৈ করছে; জল এসে পারে আঘাত কচ্ছিল বারবার। অনেকক্ষণ অবাক্‌ হয়ে তারই দিকে চেয়ে রৈলুম। যেখানে এসে মোটরগুলি থামে, তারই কাছে একটা ছোট জেটি। সেখান থেকে ছোট জাহাজ ছাড়ে। অনেক দর্শকই, আগে এসে পৌছেছিল। তারা দলে দলে জাহাজে উঠলো। প্রায় ৪৫ মিনিটে জাহাজখানা ষ্টুনাক্রেকার পর্য্যন্ত যায়। জাহাজ থেকে ট্রোসাকের দৃশ্য খুবই চমৎকার দেখায়। জাহাজখানা বিখ্যাত গবলিন কেভ্‌, সিলভার ষ্ট্রাণ্ডএর ভগ্নাবশেষ ও হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এলেন দ্বীপ ঘুরে আসে। 'দি লেডী অব দি লেক্‌'এ, এর প্রত্যেকটিরই উল্লেখ আছে। হ্রদের

জল এত স্বচ্ছ যে, তার মধ্যে যে সকল প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা সত্য বলে ভ্রম হয়। ট্রনাক্কেকারের ওদিকটায় পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য বড় কম নয়। এই সকল অঞ্চলেই সুপ্রসিদ্ধ দস্যুরাজ রবরয়ের আড্ডা ছিল বলে স্কটের উপন্যাসে বর্ণিত আছে।

এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করে আমরা গিয়ে হ্রদের তীরে একটা বাঁধানো স্থানে বসলুম। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী, অনেক কষ্ট করে দুই ঝুড়ি খাবার তৈরী করে এনেছিলেন। পথে ট্রোসাক্ হোটেল হতে ডাঃ ঘোষ ছুটে গিয়ে, একটা জগ্ ভর্ত্তি করে চা নিয়ে এসেছিলেন। ক্ষিদেও পেয়েছিল বেশ, সুতরাং পুরো সাহেবী পোষাক সত্বেও দিব্যি আসন পেতে, ঠিক বাঙ্গালী ষ্টাইলে বসে পড়া গেল পাথরের উপর। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী ঠিক আমাদের দেশের মতই পরিবেশন কচ্ছিলেন; আর উপরে তাই দেখতে একটা পুলের উপর সাহেব, মেম, আর ছেলেমেয়ের ভিড় লেগেছিল। আমরা সবাই যখন একান্ত চিত্তে রসনার তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত, এম্নি সময় অলক্ষিতে, মিঃ পি, শেঠ একটা স্ন্যাপ্ নিয়ে নিলেন। বেচারা মিস্ চক্রবর্ত্তী সবে মাত্র পাউরুটীতে কামড় দিয়েছিলেন, আর ডাঃ ঘোষ ডাঃ মিত্রের পাত হতে আস্ত ডিমটা চুরী কর্ব্বার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, সে অবস্থায়ই তাঁদের ছবি উঠে গেল! আর যাই হউক, ডাঃ ঘোষের অপকর্ম্মের একটা জলন্ত প্রমাণ, একেবারে ফিল্মের গায়ে ছাপা হয়ে রইল, এ দুঃখটা অনেকদিন তাঁর যায়নি?

খাওয়ার পরই মিঃ শেঠ্ ক্যামরা নিয়ে ছুটাছুটি কচ্ছিলেন ও অনেকগুলি ছবি তুল্লেন। সকলে দাঁড়িয়ে আমাদের আর একটা গ্রুপ উঠেছিল বটে, কিন্তু, ফিল্ম ডেভেলাপ করার বেলা দেখা গেল, একটা বিস্কুটের ফ্যাক্টরীর ছবির উপরেই সেখানা উঠেছে!

প্রায় পাঁচটার সময় আমরা এসে আবার গাড়ীতে চড়লুম। হ্রদের পার হতে গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত খাবারের ঝুড়ি আর জলের পাত্রগুলি কাজ শেষ হয়ে গেছিল বলেই বোধ হয় অত্যন্ত গলগ্রহ ভাবে এ-হাত হতে ও-হাতে চালান হচ্ছিল। আসবার পথে বেচারাদের খুব আদর ছিল এবং সকলেই তাদের ভার নিতে অল্প-বিস্তর উৎসুক ছিলেন! ফিরবার পথে মিস্ চক্রবর্ত্তী ঠিক জাপানীদের মত একটা পোষাক পরে, জাপানী ছাতা হাতে যাচ্ছিলেন, তাই তাঁকে জাপানী মেয়ে মনে করে, দেখবার জন্য অনেকেরই চোখ তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। শুধু তাই নয়,—হ্রদের পারে লেডী অব দি লেক সাজিয়ে, যখন মিঃ শেঠ তার ছবি তুলছিলেন, তখন উপর থেকে চার পাঁচজন, মিস্ চক্রবর্ত্তী ও ফটোগ্রাফারের ছবি একসঙ্গে তুলে নিয়ে গেল!

ফিরবার পথে গাড়ী ক্যালেণ্ডার ডুন হয়ে ব্রিজ অব এলানে থামলো! এতক্ষণ আমাদের পাশে বসে মাদ্রাজী বন্ধু দুজন, তাঁদের ভাষায় কথা বলছিলেন, কি, কড়াই-মটর-ভাজা চিবিয়ে খাচ্ছিলেন, ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না। এবার গাড়ী থামতেই দুজনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। যাঁরা চা খাবেন, তারা হোটেলে ঢুকেছিলেন; কিন্তু আমাদের ও-কাজটা হ্রদের পারেই শেষ হয়ে গেছিল, সুতরাং, একটু নেমে বেড়িয়েই সময়টা কাটিয়ে দিলুম। ব্রিজ অব এলান তার জলের জন্য প্রসিদ্ধ! এখানকার জল উদরাময় ও স্কার্ভি রোগের পক্ষে খুবই উপকারী। এলান নদী এসে ফর্থএ পড়েছে। চারিদিকের স্থানগুলি বেশ সুন্দর। একটু দূরেই ক্রেগ গীর্জ্জা ও ওয়ালেস্ মনুমেণ্টের চূড়া দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসর হাইল্যাণ্ড ষ্ট্রাথালানদের একটি মহাসভার অধিবেশন হয়। গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এসেছিল, কিন্তু মাদ্রাজী বন্ধু দুজনের দেখা নাই। অনেকক্ষণ গাড়ীর হর্ণ বাজাতে বাজাতে তবে দেখা গেল তাঁরা পাহাড়ের উপর হতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন।

ব্রিজ অব এলান ছেড়ে এয়ার্থ, পোলমণ্ট হয়ে, আবার লিন্‌লিথগোতে পৌছলুম। এখানে যাবার পথে পুরাতন রাজপ্রাসাদটি দেখা হয়নি; তাই দেখতে নামলুম। একটা স্কোয়ারের উপর লর্ড লিনলিথগোর প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। অল্প দূরেই একটা ছোটখাটো হ্রদের উপর পুরাতন প্রাসাদটি! ইহা প্রথম ডেভিড ও প্রথম এডওয়ার্ডের দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছিল! দ্বিতীয় রবার্ট হতে ষষ্ঠ জেমস্‌এর রাজত্ব পর্য্যন্ত ইহাই রাজাবাস ছিল। ১৫৪২ ইংরেজীতে, এখানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেরী কুইন অব স্কটের জন্ম হয়। ১৫৯৬ সনে এখানে এডিনবরা কোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল বসতো। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়

এখানেই সকলে এসে আশ্রয় নেয়। ষষ্ঠ জেমস্ নিজে এখানে থাকতেন। কিন্তু ১৭৯৬ ইংরেজীতে, জেনারেল হোলীর সৈন্তেরা প্রাসাদটিকে পুড়িয়ে দেয়। সেই হতে এটা একরকম পরিত্যক্ত অবস্থায়ই আছে। অধুনা আবার একটু সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। পাশেই প্রকাণ্ড গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ ও সুবিস্তীর্ণ কবরের স্থান।

লিনলিথগোর পর ফর্থ ব্রিজ। এদের মতে ফর্থ ব্রিজই নাকি পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রিজ! কিন্তু আমাদের চোখে তা' লাগলো না। আমার মনে হয়, পদ্মার উপর সারাব্রিজ এর চেয়ে অনেক বড়। তবু বাস্তবিকই ইহা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার ঔৎকর্ষের বিরাট নিদর্শন! ব্রিজের মধ্যবর্ত্তী আর্চটি ১৭০০ ফিট লম্বা, এবং অন্যান্যগুলি প্রায় ৭০০ ফিট লম্বা। ব্রিজটি জলের উপর প্রায় সাড়ে তিনশো ফিট্ উচু। ১৮৮৩ ইংরেজীতে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১৮৯০ ইংরেজীর ৪ঠা মার্চ্চ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এডওয়ার্ড ইহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। আমাদের ইণ্টারপ্রিটার ডাঃ ঘোষের ধারণা ছিল, আমরা ব্রিজের উপর দিয়েই যাবো; তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে আমাদের বলেছিলেন; কিন্তু যখন আমাদের গাড়ীখানা উপরে না উঠে ব্রিজের সাড়ে তিনশো ফিট্ নীচে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন তিনি বোধ হয় খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

আধ ঘণ্টা পরেই আবার যথাস্থান এডিনবরায় পৌঁছা গেল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বল্লেন "কেমন, দিন্‌টা ভাল গেল না? এতজনের একান্ত আগ্রহটা কখনো বিফল হতে পারে না।" কথাটা বোধ হয় সত্য।

জাগরণ

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

যুগান্তরের তমিস্রা ছেদি' ছোঁয়ায়ে তরল সোনা,
পূর্ব্ব-গগনে নবারুণ হের আঁকি দিল আলিপনা।
আলোক-আভাসে সুপ্তি ত্যজিয়া উঠিল নিখিল নর,
নহে নবারুণ, মহামানবেরে বন্দিল চরাচর—

মূর্চ্ছা-মগন ছিল এ ভারত, ছিল এ বঙ্গভূমি,
ফুকারি' তোমার অভয় শঙ্খ জাগায়ে দিয়েছ তুমি।
তরুণ ভারত পেয়েছে শক্তি; পেয়েছে অমর প্রাণ,
শুনেছে সকলে অন্তর-মাঝে তোমার বজ্রগান—

অমৃতপুত্র রক্ততিলক উজলিছে তব ভালে,
জাগ রে নূতন পুণ্যতীর্থে শুভ প্রত্যূষ-কালে—
মৃত্যু অথবা মুক্তি সকলে শুধু এই কর পণ,
সুচির নিদ্রা অথবা তোমার অনন্ত জাগরণ।

নিদ্রা-অলস নেত্র মেলিয়া চমকিয়া উঠে সবে,
পূর্ব্ব-গগনে রক্তলেখায় ডাকিছে মহোৎসবে।
পশ্চাতে কাঁদে জীবনের প্রীতি, সমুখে মরণ-গান,
ঘুমাবে সে কি? না, দিবে প্রাণাহুতি; কণ্টক-অভিযান!

গিরি কান্তার সঘনে কাঁপিল, কাঁপিল সাগর-জল,
দিকে দিকে উঠে হোমানলশিখা, বুকের বজ্রানল!
সুপ্তি-জড়িমা নিমেষে টুটিল, উঠিল দৃপ্ত তেজে,
চরণে বাজিছে শৃঙ্খল, তবু বুকে হাসি ওঠে বেজে!

দলে দলে চলে ভক্ত পথিক, না জানে শঙ্কা ভয়,
সত্যের লাগি' এ কারাবরণ, মৃত্যুর পরাজয়!
উপল-কঠিন নির্ম্মমপথে সুরু হ'ল অভিযান,
পশ্চাতে কাঁদে জীবনের প্রীতি, সমুখে মরণ গান।

মহাশ্মশানের ভস্মে ছুটেছে মহাজীবনের বান,
কঙ্কাল-বুকে কখন সহসা শিহরি' উঠিল প্রাণ!
নাচিছে সে প্রাণ, রক্তের তালে তাথিয়া তাথিয়া থৈ,
কম্পন তার কাঁপন ধরাল, আকাশে বাতাসে ঐ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মীমাংসা-দর্শন

শ্রীসূর্য্যকুমার তর্ক-সরস্বতী

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে মীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই কর্ম্ম-মীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসাই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি এবং বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় মীমাংসার সোপান। কর্ম্ম-মীমাংসার আলোচনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি আজ শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং সেইজন্যই হিন্দুসমাজ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতীয় দর্শনের অপূর্ব্ব প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে চলিয়াছে, তখন এই দর্শনের বিশেষ একশাখা, বহু দিন যাবৎ তাহার পূর্ব্ব-গৌরব বিস্মৃত হইয়া ভারতের এক প্রান্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা বস্তুতই দুঃখের বিষয়। এই মীমাংসা-দর্শনই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল, এবং ইহার সবিশেষ আলোচনা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ এক দিক্‌কে উদ্ভাসিত করিবে, এই আশায় মীমাংসা-দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ একজনও আমার এই আলোচনায় যদি একটু সাহায্য বা আনন্দ পান, তাহা হইলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি

মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনা ও জ্ঞান-প্রভায় 'একসময়ে মহাযোগীশ্বর' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান রামচন্দ্রের বংশধর পুষ্যামিত্র মহর্ষি জৈমিনি সন্নিধানে যোগ শিক্ষা লাভ করেন (১)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় হিরণ্যনাভও তাঁহারই পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অমর উপদেশামৃত পান করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি (২)। তাই দেখা যাইতেছে, তৎকালীন উচ্চবংশীয় জ্ঞান-পিপাসু অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান প্রভায় আজও জগৎ উদ্ভাসিত, সেই মহর্ষিও আবার জৈমিনি শিষ্য হিরণ্যনাভ হইতে যোগাভ্যাস করেন। অতএব মহা-যোগীশ্বর জৈমিনি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা যে অসাধারণ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

জৈমিনিকৃত মীমাংসা-দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য

জৈমিনির শ্রেষ্ঠ অবদান—মন্ত্রশক্তি বা তন্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব এই মীমাংসা-দর্শনের ভিতর দিয়াই প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। জৈমিনি-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে এই—

(১) শব্দ ও শব্দার্থ নিত্য এবং সেই জন্যই মন্ত্র নিত্য।

(২) দেবতা মন্ত্রময়ী এবং মন্ত্রানুষ্ঠান কর্ম্ম অপূর্ব্ব ফলপ্রসূ। (৩)

(৩) বৈধকর্ম্মযজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম এবং চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়। (৪)

মন্ত্রশক্তি বা শব্দবাদ

এখন জৈমিনি-দর্শনের মূল মন্ত্রশক্তি বা শব্দবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। সাধারণতঃ মন্ত্র কতকগুলি সুসংবদ্ধ, সুসমঞ্জস শব্দের সমষ্টি মাত্র। শব্দ অদৃশ্য জগতে আকার ধারণ করে; কারণ শব্দের বিশেষ বিশেষ তরঙ্গে বিশেষ বিশেষ রূপের সৃষ্টি হয়, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ বাদ্যযন্ত্রের শব্দের দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে, ঐ শব্দতরঙ্গ বালুকাময় আস্তরণে জ্যামিতিক রেখা বা ক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে। রাগ রাগিণীর বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি বা রূপ যে আছে, ইহা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বহু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মেঘরাগ পরম গম্ভীর এক মহান পুরুষ, বসন্তরাগ পুষ্পশোভিত এক অনন্তসুন্দর মানবের আকৃতি সৃষ্টি করে। তাই দেখা যাইতেছে বাতাস এবং ব্যোম এই উভয়ের আন্দোলন এবং কম্পন দ্বারা বিশেষ বিশেষ রূপের সৃষ্টি আজগুবি কল্পনা নয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমাস্ এ্যালভা এডিসনের এডিফোন্ যন্ত্রও এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে।

(১) মহীং মহেচ্ছুঃ পরিকীর্য্য সূনৌ
মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
তস্মাৎ স যোগাদধিগম্য যোগ
মজন্মনেঽকল্পত জন্মভীরুঃ॥ রঘুবংশ ১৮ সর্গ ৩৩ শ্লোক।

(২) মহাযোগীশ্বর-জৈমিনি শিষ্যো হিরণ্যনাভো
যতোযাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৪, ৪, ৪৮ শ্লোক।

(৩) ফলায় বিহিতং কর্ম্ম ক্ষণিকং চিরভাবিনে।
তৎসিদ্ধির্নান্যথেত্যেব মপূর্ব্বমপি কল্প্যতে॥
প্রভাকর।

(৪) নিত্যনৈমিত্তিকৈর্য্যজ্ঞৈঃ কুর্ব্বানোদুরিতক্ষয়ম্।
জ্ঞানঞ্চ বিমলীকুর্ব্বন্নভ্যাসেনতু পারয়েৎ॥
অভ্যাসাৎ সকবিজ্ঞান্ কৈবল্যং লভতে নরঃ॥
শ্রীধরাচার্য্য।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা

মিসেস্ ওয়াটস্ হাগ্‌স্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে অসাধারণ গবেষণায় (৫) দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহাও এই একই সত্যের সমর্থক। আইডোফোন্ নামক (Eidophone) এক ক্ষুদ্র যন্ত্রে যে রাগিণীর ঝঙ্কার তিনি তুলিয়াছিলেন, তাহা এই যন্ত্রেরই খণ্ডবিশেষে এক বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছিল। একদিন ঐ বিদুষী মহিলা ঐ ভাবে এক বিশেষ সুরের গান করিতে করিতে একটী পুষ্প প্রত্যক্ষ করেন এবং বহু চেষ্টায় ঐ পুষ্পের সুর নির্ণয়ে সমর্থ হন। লর্ড লেক্‌টেনের গৃহে ঐ সুরে তিনি সুদৃশ্য পুষ্পগুচ্ছের সৃষ্টি করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াভিভূত করেন এবং দর্শকগণের বিস্ময়োৎফুল্ল অভিব্যক্তিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হয়। ক্রমে তিনি এই জনসভাকে সুরে সুরে তমালতালীবনরাজিনীলা-সমুদ্র প্রত্যক্ষ-গোচর করান, এবং শ্রদ্ধায় সকলের মস্তক এই বিদুষীর প্রতি এমনই নত হইয়া আসে যে, সুরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের যে কি ভাবে পরিবর্ত্তন হইতেছে ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন। অদৃশ্য জগতের ছায়াচিত্র আজ প্রত্যক্ষ—ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে! উপরিউক্ত বিদুষী-মহিলার গবেষণা হইতে দেখা যায় যে, প্রতি শব্দেরই একটা রূপ বা আকার আছে এবং বিশেষ সুর দ্বারা বিশেষ এক আলাপনে বিশেষ রূপ পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া হইতে আমরা মন্ত্র সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেমন—"অগ্নিম্ দূতং বৃণীমহে"—মন্ত্রের উচ্চারণে যে রূপ" প্রতিবিম্বিত হইবে, 'অগ্নিম্' স্থলে 'বহ্নিম্' করিলে তাহা হইবে না, যদিও এই উভয় শব্দ একার্থবোধক। কারণ অগ্নিম্' শব্দটী যে কম্পনের সৃষ্টি করে, বহ্নিম্ উচ্চারণে তাহা হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে, মন্ত্রসৃষ্টিতে অর্থ হইতে রূপের প্রতি অধিক দৃষ্টি। সেই জন্যই মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি বৈদিক 'মন্ত্র' মন্ত্রই এই কথা বলিয়াছেন। একটু পরিবর্ত্তনে বা ভাবান্তরিত করায় তাহার ফল বিনষ্ট হয়. ইহাই তাঁহার অভিমত এবং "স বাগ্‌বজ্রং যজমানং হিনস্তি" বৃত্রবধের এই বেদবাণীও ইহারই সমর্থন করে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক বীজমন্ত্র

এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহা বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে না বা যাহার বিশেষ অর্থও নাই ;—এই সকল মন্ত্রের সার্থকতা কোথায় তাহা না জানিয়া অনেকেই এই দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। তান্ত্রিক বীজন্যাসে বা অথর্ববেদের কোন কোন স্থানে এইরূপ দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রগুলি বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ না করিলেও এই শব্দোচ্চারণে যে বিশেষ কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাহা এক বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই রূপই মন্ত্রের লক্ষ্য বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (৬)। শব্দ ব্রহ্ম সম্পর্কে বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে যে 'Word is God.' এবং বেদপাঠে এত যে উদাত্ত অনুদাত্ত বা স্বরিত প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ ধ্বনির প্রয়োজন, ইহার মূলেও এই একই কথা। পরন্তু ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে ধ্যানের মন্ত্রোচ্চারণে বিশেষ বিগ্রহের আবির্ভাব হইলেই যে আমাদের মন সেই রূপে নিমগ্ন হইতে পারে, বৃহদারণ্যকে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে (৭)।

তরুবীজ ও মন্ত্রবীজ

তাহা হইলে এই কথা বলা যায় যে, তরুবীজ ও মন্ত্রবীজ কার্য্যতঃ একই। তরুবীজে যেমন ফলপুষ্পশোভিত বনস্পতির আভাস আছে, বপন করিলে পর তাহা জাগিয়া উঠে, সেইরূপ মন্ত্রবীজে মন্ত্রাধিষ্ঠাতা দেবতা নিমগ্ন আছেন। কেবল তাঁহার জাগরণের অপেক্ষা।

শব্দ ও বর্ণ

এই সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিবার আছে। ইংরেজী 'Sound'কে সংস্কৃতে শব্দ অথবা বর্ণ বলা যায়। বর্ণ অর্থ রঙ্। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়—অদৃশ্য বা জগতে সূক্ষ্মজগতে শব্দ রঙ্এরও সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং শব্দ সমষ্টি মিশ্রিত রঙ্এর আকৃতি ধারণ করে। বেঞ্জামিন ল্যাম্‌লি প্রণীত "Reminiscences of the Opera" নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি এমন একজন লোককে জানিতেন, গানের প্রতি সুর তাঁহার নিকট এক অপরূপ রঙ্এর ঝরণায় সৃষ্টি করিতে এবং কা'র গানে কি রঙ্এর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারও তালিকা তিনি দিয়াছেন। ঠিক এই ভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রতি রঙ্এর আবার একটী শব্দ বা সুর আছে। যেমন রব (শব্দ) হইতে রবি (সূর্য্য) হইয়াছে। সূর্য্যকে রবি বলার কারণ সূর্য্যেতে সকল রঙ্এর সমাবেশ। উপরিউক্ত মহিলা হাগ্‌সের গানেও রঙ্এর আভাস দেখা যাইত এবং প্রাচীন আর্য্যদের ধর্ম্মগ্রন্থে কেন এত রঙ্এর খেলা, তাহাও ঐ বিজ্ঞানের চিত্র বলিয়া অনুমিত হয়।

ঠিক এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, জৈমিনির মন্ত্রানুষ্ঠান পদ্ধতিতেও এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে নিহিত আছে। তাই মন্ত্রের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কিংবা মন্ত্রের কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনে ফলোদয় হয় না, ইহা যোগবলে বুঝিতে পারিয়াই আচার্য্য জৈমিনি বৈদিক মন্ত্রভাগের সুমীমাংসা করে "মীমাংসা-দর্শন" রচনা করেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জৈমিনি কৃত মীমাংসা-দর্শন ও বাদরায়ণ কৃত বেদান্ত-দর্শন অর্থাৎ পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই উভয় মিলিয়াই পূর্ণ মীমাংসা-দর্শন। রামানুজ স্বামীও ইহাই বলিয়াছেন। এই দুই মীমাংসা আবার এমনই ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত যে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মঙ্গল কর্ম্মের উপরই সেই বিশ্বমঙ্গল আছেন। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতাই তাই। মঙ্গল কর্ম্ম সেই বিশ্বকর্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার একটী সাধনা এবং সেই সাধনার সূত্রই জৈমিনির মীমাংসা-দর্শন।

(৫) Philosophy of Gods—By Hirendra Nath Dutta M. A., B. L.
Esoteric Christianity—Anne Beasant.

(৬) তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।
পাতঞ্জলি সূত্র সমাধিপাদ, ২৭ সূত্র।
শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেবরূপতাম্।
মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেণ দেবরূপং প্রজায়তে॥
শক্তিসাধনতন্ত্রে।

(৭) তেন উ এতদ্দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি।
বৃহদারণ্যক্ ১, ৫, ২৩।

এই পর্য্যন্ত আমরা জৈমিনি-দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্য কি, তাহার সার্থকতা কোথায়, ইহা আলোচনা করিয়াছি। এখন জৈমিনি-দর্শনের বহিরঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ এই বহিরঙ্গেরও আমাদের প্রয়োজন আছে। কবে কোন্ সুদূর এক স্নিগ্ধ প্রভাতে মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার মীমাংসা-দর্শন রচনা করেন, কোন্ দিন ভগবান বাদরায়ন এই ব্রহ্মবাদ জগৎকে দান করিয়া যান, এই উভয় মীমাংসার মধ্যে সম্বন্ধ কি, আমাদের সভ্যতায় ইঁহাদের স্থান কোথায়, ইহাও ভাবিবার বিষয়।

বহিরঙ্গ আলোচনা

মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শন ব্যতীত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র তন্ত্র (৮) ও সংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে কর্ণাট প্রভৃতি দেশে জৈমিনি বিদ্যালয় নামক অনেক বিদ্যালয় ছিল। সম্প্রতিও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে জৈমিনি-দর্শনের বিশেষ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয় (৯) এবং আধুনিক বিজ্ঞানের শব্দবাদ, তাড়িৎ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জৈমিনির অনেক গবেষণা ছিল। তিনি যে তাড়িৎ-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তাহার প্রমাণও বজ্রবারণ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় (১০) এবং সেইজন্যই বোধ হয় আশ্বলায়নের ঋষিতর্পণে তাঁহার নাম উল্লিখিত থাকিয়া তদীয় অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে (১১)।

জৈমিনি ও বাদরায়ন

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন যে, ভগবান জৈমিনিই মীমাংসা গ্রন্থের আদি প্রণেতা এবং সেই জন্যই জৈমিনি কৃত মীমাংসা-শাস্ত্রের নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং বাদরায়ন কৃত মীমাংসা-শাস্ত্র তাহার অল্প পরবর্ত্তী হওয়ায় তাহাকে উত্তর-মীমাংসা বলা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাদরায়ন এবং জৈমিনি উভয়েই স্বীয় স্বীয় পুস্তকে একে অন্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন (১২)। সমসাময়িক দুই মহাজ্ঞানী ঋষি একে অন্যের মতে শ্রদ্ধাবান্, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কিন্তু এই দুই ঋষির মধ্যে কে কাহার গ্রন্থ প্রথম রচনা করিয়াছেন ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

শাস্ত্রদীপিকার যুক্তিস্নেহ প্রপূরণী টীকায় বর্ণিত আছে যে, গুরু-পরম্পরায় ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, বশিষ্ঠ, পরাশর ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইঁহারা যথাক্রমে একে অন্যকে মীমাংসা-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা জৈমিনিকে বলেন (১৩)। পৌরাণিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি সংখ্যক দ্বাপরে পরাশর-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন বেদ বিভাগে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জৈমিনিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতঃ সামবেদ ও অন্যান্য নানা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করেন (১৪) এবং মহাভারত রচিত হইলে পর মহর্ষি বাদরায়নের শ্রীমুখ হইতে জৈমিনি তাহাও শ্রবণ করেন। প্রথমতঃ মহাভারতের নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হয়। পরে পক্ষীদিগের উপদেশে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তিনি "জৈমিনি-ভারত" নামে আরো একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব জৈমিনি যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও বাদরায়ন একই মহাপুরুষ কি না? বদরিকাশ্রমে বাস হেতু পরাশরাত্মজ দ্বৈপায়ন বাদরায়ন নামে প্রসিদ্ধ হন, ইহাই কিম্বদন্তী; এবং এই বাদরায়ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ও তাঁহার 'হিমালয়' পুস্তকে বদরিকাশ্রম ও ব্যাসগুহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তথায় ব্যাসাধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ চিহ্নগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। উপরিউক্ত প্রমাণাদি হইতে ইহা স্থির পাইতেছি যে, বাদরায়ন ও জৈমিনি একই সময়ে

---

(৮) সিদ্ধোত্তরানুপসন্ত্রানি কপিলোক্তা ন যানি চ।
অদ্ভুতানি তথৈতানি জৈমিন্যুক্তানি যানি চ॥
বারাহীতন্ত্র।

(৯) Introduction to Jaiminiya Grihyasutra—Dr. W. Caland University of Bonn, Germany.

(১০) প্রচণ্ড পবনাঘাতে মেঘেষু গুণিতেষু যঃ
ত্রিঃ পঠেজ্জৈমিনের্ম্মন্ত্রং প্রাঙ্মুখোবাপ্যুদঙ্মুখঃ।
তস্যমাভূদ্ভয়ং ঘোরং বৈদ্যুতীয়োঽবদীদতি॥
আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এবচ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥
বজ্রবান মন্ত্র।

(১১) তৃপ্যন্তু জৈমিনিসুমন্তু বৈশম্পায়নপৈলাঃ।
আশ্বলায়ন গৃহ্য ৩-৪-৪।

(১২) ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়নস্যানপেক্ষত্বাৎ। পূর্ব্বমীমাংসা ১ম অ, ৫ম সূত্র
সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ। বেদান্তদর্শন ১-২-২৯।

---

(১৩) ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে মীমাংসাং প্রোবাচ, সোঽপি ইন্দ্রায়, সোঽগ্নয়ে, সচ বশিষ্ঠায়, সোঽপি পরাশরায়, পরাশরঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সোঽপি জৈমিনয়ে, সোঽপি যোপদেশানেন্তরমিমং ন্যায়ং গ্রন্থে নিবদ্ধবান্।
পার্থসারথিমিশ্রকৃত শাস্ত্রদীপিকার যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী টীকা।

(১৪) পরাশর উবাচ—
দ্বাপরে মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতি মেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥
কৃষ্ণ দ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোহন্যোহি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৪ অধ্যায় ২, ৫।
অথ শিষ্যান্ প্রজগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ।
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেবচ॥
* * * *
জৈমিনিং সামবেদার্থ শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত॥
বায়ুপুরাণ ৬০ অধ্যায় ১১, ১২।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈবস্বমাত্মজম্॥
মহাভারত ৬৩ অ ৮৯ শ্লোক।

আবির্ভূত হন এবং জৈমিনি বাদরায়নের শিষ্য রূপে দর্শন এবং বেদাধ্যয়ন করেন। মীমাংসা শব্দে ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা এই উভয়ই বুঝায় এবং বেদে ও ধর্ম্মমীমাংসা ভাগ মন্ত্রকাণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধে ও ব্রহ্মমীমাংসা ব্রাহ্মণকাণ্ড উত্তরার্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ আমার মনে হয় যে, মন্ত্রকাণ্ড বা সাধনার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক বলিয়াই পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ-ভাগ এই সাধনার ফলস্বরূপ বলিয়াই তাহা পরে বর্ণিত হয় এবং এই নীতি অবলম্বনে জৈমিনির গ্রন্থ পূর্ব্ব-মীমাংসা ও বাদরায়নের গ্রন্থ উত্তর-মীমাংসা রূপে পরিচিত হইয়াছে। এইখানে পৌর্ব্বাপর্য্যের অন্য কোনও প্রশ্ন নাই।

কাল নির্ণয়

মহর্ষি বাদরায়ন ও জৈমিনি সমসাময়িক। তাই জৈমিনির কাল নির্ণয় করিতে হইলে বাদরায়নের আবির্ভাব কাল পাইলেই চলে। মহর্ষি বাদরায়ন মহাভারত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। এখন মহাভারত এবং গীতার কাল নির্ণয়েরই আমাদের প্রয়োজন। মহাভারতের কাল নির্ণয় লইয়া সুধিমণ্ডলী বহু গবেষণা করিয়াছেন। একটী প্রচলিত রীতি আছে যে, সন্তানের ঠিকুজি না থাকিলে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে হয়। সেইরূপ মহাভারতের বচনই মহাভারতের কালনির্ণয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—ইহাতে আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, কলি ও দ্বাপরের সন্ধিই ভারতযুদ্ধের সময় (১৫)। পঞ্জিকার মতে কলির ৫০৩১ বৎসর গত হইয়াছে। খনার বচন (১৬) হইতেও ইহার যাথার্থ্য পাইতেছি। তাহা হইলে এই প্রমাণ হইতে পাওয়া গেল যে ভারতযুদ্ধ অন্ততঃ ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং মহাভারতও এই সময়েরই অল্প পরে লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর চিন্তামণি রাও মহাশয় বর্ত্তমান সময়ের অন্যূন ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ গবেষণাকারী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ (১৭) অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে, মহাভারত অন্যূন ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

আর একটি কথা—কালিদাস এবং পঞ্জিকাকার উভয়ের মতেই কলি ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এইদিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর কলির আরম্ভ বলিয়া ভাগবতীয় প্রমাণ রহিয়াছে (১৮)। প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের তিরোভাবের পরই যদি কলিযুগ হয়, তবে, কলির প্রারম্ভে বা যুগসন্ধিতে ভারত যুদ্ধের সম্ভব হয় না। ইহাতে আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলা কালেই কলির আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রভাবে কলির প্রভাব মোটেই বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পরই কলি সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে তাহাই বলিয়াছেন (১৯)।

উপরিউক্ত প্রমাণাদি হইতে ইহা যথাসম্ভব স্থির বলা যাইতে পারে যে, ভারত যুদ্ধ বর্ত্তমান সময়ের ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এবং মহাভারতও ঐ সময়েই রচিত। ইহাই বাদরায়ন বেদব্যাসের ও তৎসম-সাময়িক জৈমিনির আবির্ভাবের কাল। এই সময়েই আচার্য্য জৈমিনি রামচন্দ্রের বহু পুরুষ পরবর্ত্তী পুষ্যমিত্র প্রভৃতিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মসূত্র ও গীতা

মহাভারতের কাল নির্ণয়ে আমরা প্রায় আশানুরূপ অগ্রসর হইয়াছি। এখন বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারতের মধ্যে কোন গ্রন্থ পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহা একটু দেখার প্রয়োজন। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র ও জৈমিনির মীমাংসাসূত্র একই সময়ে লিখিত। মহাভারতীয় গীতার "ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি বিনিশ্চিতৈঃ" এই উক্তি হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের ও গীতার পূর্ব্বে রচিত। ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ থাকায় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীভাষ্যের অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গীতোক্ত ব্রহ্মসূত্র শব্দের অর্থ উপনিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য না অন্য কিছু? আনন্দগিরি রামানুজ ও

---

(১৫) অন্তরে চৈবসংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১ম অঃ, ১৩শ শ্লোক।

(১৬) রন্ধ্র মুনি চন্দ্র রাম শক মিশাইয়া তায়।
একত্র করিয়া দেখ কলির কত যায়॥

রাম—৩, চন্দ্র—১, মুনি—৭, রন্ধ্র—৯ এই ৩১৭৯ এর সহিত প্রচলিত শকাব্দা ১৮৫২ যোগ করিলেই কলির গতাব্দ ৫০৩১ পাওয়া যায়।

(১৭) যুধিষ্ঠিরো বিক্রম শালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ
বিজয়াভি নন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ
ষট্শক কারকা নৃপাঃ॥

যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ হ্যব্ধখাষ্টভূময়ঃ ১৮০০০।

যুধিষ্ঠিরাব্দ——	৩০৪৪
বিক্রমাব্দ	১৩৫
শালিবাহন	
শকাব্দ (অদ্য পর্য্যন্ত)	১৮৫২
	৫০৩১

(১৮) বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ
তদাবিশৎ কলিযুগং পাপে যদ্রমতে জনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কঃ ২য় অঃ ২৯ শ্লোক।

(১৯) যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীব ধন্বনা।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি॥
শ্রীভাগবত ১ম স্কঃ, ১৭শ অঃ।

মাধবাচার্য্য সকলেই বলেন ইহা বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্রকেই বুঝাইতেছে। আমারও তাহাই মনে হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদের শ্লোকাদির শৃঙ্খলা না থাকায় বাদরায়ন কৃত ব্রহ্মসূত্রে সাধক বাধক প্রমাণ মূলে তাহার এক শৃঙ্খলা করা হইয়াছে। উপরিউক্ত 'হেতুমদ্ভিঃ' পদ দ্বারাও তাহাই অনুমান করা যায়। কেহ কেহ আর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, শ্যামপরাশর বাদরির সন্তান এই বাদরায়ন হইতে পারেন কিনা? (২০) শ্যামপরাশর বাদরির সন্তান বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্র বা মহাভারত প্রভৃতি প্রণয়ন করেন নাই; কারণ শ্যামপরাশর বাদরির সন্তান ও সত্যবতীর গর্ভে উৎপন্ন পরাশরাত্মজ বাদরায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং শেষোক্ত সত্যবতী তনয়ই ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন।

মীমাংসা-দর্শন রচনার কাল

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে (ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে) মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার মীমাংসা-সূত্র বা কর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন রচনা করেন।

মীমাংসা-দর্শনের বিভিন্ন অধ্যায়

এই জৈমিনি কৃত মীমাংসাদর্শনকে প্রাচীন কালে অধ্বরমীমাংসা, কর্ম্ম-মীমাংসা, যজ্ঞবিদ্যা ও ধর্ম্মমীমাংসা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইত। এই মীমাংসা-দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথমে ধর্ম্মের প্রামাণ্য, দ্বিতীয়ে যাগযজ্ঞাদির প্রভেদ, তৃতীয়ে যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাব, চতুর্থে যাগাদির ইতিকর্ত্তব্যতা, পঞ্চমে ক্রমনির্ণয়, ষষ্ঠে অধিকারী নিরূপণ, সপ্তমে সামান্যাতিদেশ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশের বিধান, নবমে উহবিচার, দশমে বাধ নির্ণয়, একাদশে তন্ত্রতার এবং দ্বাদশে প্রসঙ্গাধিকরণ নির্ণীত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ কাণ্ড নামে আরও চারিটী অধ্যায় এই মীমাংসা-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন তাহা পাওয়া যাইতেছে না।

বৌদ্ধপ্রভাবকালে মীমাংসা দর্শনের অবস্থা

সুদূর ভারতযুদ্ধের কাল হইতে বৌদ্ধ প্রভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রেই বিস্তৃত ছিল। মীমাংসা-দর্শনের অন্তর্নিহিত মন্ত্রবাদ যাগযজ্ঞাদি ভারতে যে আরণ্যক সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতেই কালপ্রভাবে যাগযজ্ঞাদির অন্তর্নিহিত সত্যকে মানব ভুলিয়া আসিতেছিল। আর বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ে ইহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থাহীন হইয়া ভারত এক নূতন ভাবে আপ্লাবিত হইতে থাকে। বেদব্যাসের ভবিষ্যদ্বাণী এডুকান্ পূজয়িষ্যন্তি নার্চ্চয়িষ্যন্তি দেবতাম্ এই ভাবই ভারতে দৃঢ়মূল হয়। তখন দেবোপাসনার বদলে এডুকের অর্থাৎ বুদ্ধের অস্থির উপর নির্ম্মিত সমাধি প্রাসাদে ডাগোবা বা পেগোডায় বুদ্ধোপাসনা প্রচলিত হইয়া পড়ে। কিয়ৎকাল পরে মহাগুরু শঙ্কর প্রভৃতির অভ্যুত্থানে ভারতে আবার ব্রাহ্মণ্যভাবের উদয় হয়। লুপ্ত যাগযজ্ঞাদি আবার তাহার স্থান পরিগ্রহ করে। যে মীমাংসা-শাস্ত্র এতদিন লুপ্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয়। মীমাংসা-শাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিয়া মীমাংসাদর্শন হইতে স্মৃতিশাস্ত্রের উপযোগী কতিপয় অধিকরণ সংগ্রহ করতঃ মীমাংসা-শাস্ত্রের বহু প্রকরণ গ্রন্থ রচনায় তদানীন্তন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মনোনিবেশ করেন এবং ঐ সময় হইতেই ধর্ম্মবিষয়ে মীমাংসা-দর্শন ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হয় (২১)।

মীমাংসা-দর্শনের বৃত্তি ভাষ্য ও টীকাকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবন

এই জৈমিনিকৃত মীমাংসা-দর্শনকে সাধারণের হাতে পৌঁছাইবার জন্য বহু মনীষী বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী মীমাংসা-দর্শনকে সরল ও মধুর করিয়াছে। উপরিউক্ত মীমাংসা-সূত্রের বৃত্তি, ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে উপবর্ষ, শবরস্বামী, কুমারিল ভট্ট, প্রভাকর, মাধবাচার্য্য, পার্থসারথি মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনার ইতিহাস জানিতে স্বতঃই আমাদের ইচ্ছা হয়, কিন্তু দীর্ঘ হাজার বৎসরের কৃষ্ণ এক যবনিকা আমাদের সম্মুখে এক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তবে ইঁহাদের জীবনী সম্পর্কে যতদূর পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হইল।

বৃত্তিকার উপবর্ষ

মহর্ষি উপবর্ষাচার্য্য বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা-দর্শনের দার্শনিক ভাব ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে ইনি বিশেষভাবে উদ্ভাসিত করিয়া যান। বার্ত্তিক-প্রণেতা তাঁহাকে বৃত্তিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপবর্ষাচার্য্য বেদান্ত ভাষ্যের বিশিষ্টাদ্বৈত মতের অবতারক। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাঁহার রচিত মীমাংসাবৃত্তি এখন পাওয়া যায় না।

ভাষ্যকার শবরস্বামী

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মগধের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মীমাংসা ভাষ্য-কারের জন্ম হয়। দর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বৌদ্ধ প্রভাবে দেশ আপ্লাবিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিন্ধ্যারণ্যের শবর পল্লীর এক প্রান্তে এক স্নিগ্ধ কুটীরে গিয়া জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহাতেই তিনি শবর স্বামী নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার লিখিত মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্য 'শবরভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মনে হয় এই ক্ষুদ্র শবর পল্লীতেই এই বিরাট ভাষ্য রচিত হইয়াছিল।

---

(২০) বাটিকোবাদরিশ্চৈব শুদ্ধা বৈ ক্রোধনায়নাঃ।
ক্ষৈমিরেষাং পঞ্চমস্তু খ্যাতাঃশ্যামপরাশরাঃ॥
মৎস্যপুরাণ ২০১ অ ৩৭ শ্লোক।

(২১) অক্ষপাদ প্রণীতেচ কানাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতি বিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥
জৈমিনীয়েচ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশোন কশ্চন।
শ্রুত্যাবেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌহিতৌ॥
পদ্মপুরাণ।

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার পুত্র অমরসিংহ অমরকোষের রচয়িতা (২২)।

বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্ট

মহামতি কুমারিল ভট্ট শবর স্বামীর দার্শনিক তত্ত্বকে সরল এবং বোধগম্য করিবার জন্য বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত বার্ত্তিক গ্রন্থ শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক ও টুপটীকা এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। এই কুমারিল ভট্ট কুমারাবতার (কার্ত্তিকের অবতার) বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। (২৩)

টীকাকার প্রভাকর

সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক প্রভাকর শবরভাষ্যের ব্যাখ্যা অবলম্বনে বৃহতী, ও লঘ্বী এই দুইখানা পুস্তক রচনা করেন। এই প্রভাকরের 'গুরু' আখ্যা অবলম্বনের একটী কৌতূহলপ্রদ উপাখ্যান আছে। মীমাংসা শাস্ত্রে অধ্যয়নার্থী জনৈক ছাত্রের পুস্তকে "তত্রাপি নোক্তম্ তত্রতু নোক্তম্" এইরূপ দ্বিরুক্ত পাঠ লিখা ছিল। অধ্যাপক মহাশয় ইহার সমাধান করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে প্রভাকর ইহার সমাধান করতঃ "অত্র অপিনা উক্তম্ তত্র তুনা উক্তম্" এই অর্থ লিখিয়া রাখেন। অধ্যাপক মহাশয় প্রত্যাগমন করতঃ ইহা দেখিতে পাইয়া প্রভাকরকে 'গুরু' এই আখ্যা প্রদান করেন। তদবধি প্রভাকর 'গুরুপ্রভাকর' নামে পরিচিত হন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক পুস্তকেও প্রভাকর সম্প্রদায়কে গুরু সম্প্রদায় বলা হইয়াছে। (২৪)

মাধবাচার্য্য

জৈমিনীয় ন্যায়মালা গ্রন্থকার মাধবাচার্য্য বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি আবির্ভূত হন। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী পম্পানগরী ইহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম সায়ন এই মাধবাচার্য্য 'পরাশরমাধব' নামে পরাশর সংহিতার ভাষ্য এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন।

পার্থসারথি মিশ্র

পার্থসারথি মিশ্র কুমারিল ভট্টের বার্ত্তিক গ্রন্থ অবলম্বনে শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়রত্নমালা এই দুই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে শাস্ত্রদীপিকা গ্রন্থ বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং পণ্ডিত সমাজে ইহা সবিশেষ সমাদৃত। অনেক স্থলেই ইনি প্রভাকরের মতন খণ্ডন করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র

মীমাংসার ন্যায় কণিকা গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র ষড়দর্শনের টীকা প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীই তাঁহার আবির্ভাব-কাল। তাঁহার বিশেষ জীবনী মৎপ্রণীত সম্বন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বিস্তৃতি ভয়ে তাহা আর এ স্থলে উল্লিখিত হইল না।

মহর্ষি জৈমিনি প্রমুখ মহাত্মবৃন্দ এবং তদ্ব্যতীত যে সকল বিখ্যাত পণ্ডিত টীকা টিপ্পনী প্রণয়ন ক্রমে মীমাংসশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রণীত কতিপয় বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম শৃঙ্খলাব্দ ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রচার বাহুল্য অনুভব করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
জৈমিনি	মীমাংসা-সূত্র
উপবর্ষ	বৃত্তি
সবর স্বামী	ভাষ্য
কুমারিল ভট্ট	বার্ত্তিক
গুরুপ্রভাকর	বৃহতী ও লঘ্বী
বাচস্পতি মিশ্র	ন্যায় কণিকা
পার্থ সারথি মিশ্র	শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়রত্নাকর, ন্যায়রত্নমালা, তন্ত্ররত্নম্
মণ্ডনমিশ্র	বিধিবিবেক, ভাবনাবিবেক, বিভ্রমবিবেক
মাধবাচার্য্য	জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর
আপদেব	মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ
কৃষ্ণযজ্ব	মীমাংসা পরিভাষা
রামকৃষ্ণ	পূর্ব্ব মীমাংসাধিকরণ কৌমুদী
লৌগাক্ষী ভাস্কর	অর্থসংগ্রহ
খণ্ডদেব	মীমাংসা কৌস্তুভ
রাঘবানন্দ	ন্যায়াবলী দীধিতি
হলায়ুধ	মীমাংসা শাস্ত্রসর্ব্বস্ব

(২২) ব্রাহ্মণ্যামভবদ বরাহমিহিরোজ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ।
রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রম নৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ॥
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্র বৈদ্য তলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃকৃতী।
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামী-দ্বিজস্যাত্মজাঃ॥
অমরকোষ ভূমিকা।

(২৩) ইত্যুচিবাংসমথভট্ট কুমারিলংত
মীমাংসকম্বরমুখাম্বুজম্ম্যাহমৌনী।
প্রত্যার্থকর্ম্মবিমুখান্ সুগতান্নিহন্তুম্
জাতং গুহং ভুবি ভবন্তমহংনুজানে॥
মাধবীয় শঙ্করবিজয়।

(২৪) প্রভাকর গুরূণাং সিদ্ধান্ত ইতি সর্ব্বমবদাতম্।
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

এই পৃথিবী ও জড়জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে কেবল-মাত্র অসীম শূন্যময় আকাশ অনন্ত-বিস্তৃত ছিল। সম্প্রতি আইনষ্টিন নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতে এই আকাশ অসীম হইলেও অনন্ত-বিস্তৃত নহে। তিনি এই অদ্ভুত রহস্যময় তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে

প্রমাণ করিয়াছেন। তখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বায়ু, জল, মৃত্তিকা কিছুই ছিল না। তৎকালে এই অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কারণ তখন আলোকের আবির্ভাব হয় নাই। বৈদিক ঋষি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে জগতের এই অবস্থার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য মূল সূত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজোনোব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হিনরাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
অনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥
তম আসীত্তমসা গূড়ংমগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥"

বঙ্গানুবাদ—যাহা নাই তাহা তখন ছিল না; যাহা আছে, তাহাও ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থানও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক অদ্বিতীয় বায়ু ব্যতিরেকে আত্মামাত্র নিশ্বাস ও প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন-বর্জ্জিত ও সমস্তই সলিলবৎ তরল ভাবাপন্ন (ethereal condition) ছিল। আবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা (evolution) প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

জগতের এই অবস্থার কোন এক সময়ে এই অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কণার (electrical particles) আবির্ভাব হইল। এই বিদ্যুৎকণা হইতেই আদিভূত ৯২টী পরমাণু (atoms) সকলের ও ঐ পরমাণু সকল হইতেই অণু (molecules) সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এই অণু হইতেই জগতস্থ যাবতীয় সজীব ও নির্জীব পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিদ্যুৎকণা সকল উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল।

এই বিদ্যুৎকণা সকল দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের একটীকে পুরুষ (positive) ও অপরটী স্ত্রী (negative) নাম দিয়াছেন। ইহাদের স্পন্দন ও গতি হইতেই সর্ব্বপ্রথম আলোকের উৎপত্তি।

কত কোটী কোটী বৎসর এই ভাবে অতীত হইয়া গেলে। অসীম শূন্যময় আকাশের স্থানে স্থানে ঘটনাক্রমে কতকগুলি বিদ্যুৎকণা পুঞ্জীভূত হইয়া অধিকতর আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের কেন্দ্রাভিমুখে অনতিদূরস্থ বিদ্যুৎকণা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইল। এইরূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের (universe) উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্ত আকাশে এমন কত ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং তাহার প্রত্যেকের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকলের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী তাহাদেরই আমরা আকাশে তারকা ও নক্ষত্র রূপে দেখিতে পাই। কোন একটী স্থানে একটী আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া যদি উহা এক সেকেণ্ড বাদে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে ঐ আলোকের উৎপত্তি-স্থান পৃথিবী হইতে একলক্ষ ৮৬ সহস্র মাইল দূরে আছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে যে নক্ষত্রগুলি আছে, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম যে আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা পৃথিবীতে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে ৯ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল। এই হিসাব হইতে আমরা পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র কতদূরে আছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

আমাদের এই সূর্য্য প্রথমে একটী পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎকণার সমষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ও তাহার কেন্দ্রাভিমুখে নিকটবর্ত্তী বিদ্যুৎকণা সকল আকর্ষণ করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া তাহার (mass) পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সকল বিদ্যুৎকণা গতি ও বেগ বশতঃ তাপ-বিশিষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ বাষ্পাকারে ৯২ প্রকার পরমাণু (atoms) রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাই আমাদিগের সূর্য্যের উৎপত্তির ইতিহাস। যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সূর্য্য এই ভাবে থাকার পর কোন এক সময় অনন্ত আকাশে যে সকল নক্ষত্ররাশি পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী দৈবক্রমে সূর্য্যের কোল ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যখন সে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন তাহার আকর্ষণে তাহার নিকটস্থ সূর্য্যের উপরিভাগ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা হইতে বাষ্পময় পদার্থ সকলের কিয়দংশ সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই নক্ষত্রের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বাষ্পপিণ্ড সকল তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই ঐ নক্ষত্র-তারকা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ঐ বাষ্পপিণ্ড সকল তাহার নাগাল না পাইয়া পুনরায় সূর্য্যে ফিরিয়া না যাইয়া গতিবিশিষ্ট হইয়া শূন্যমার্গে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই বাষ্পপিণ্ড সকলের মধ্যে একটী হইতেছে আমাদের এই পৃথিবী। ভাগ্যিস্ এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল; তাই আমাদের পৃথিবী এবং আমরা তাহার উপর উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎকালে ইহার আভ্যন্তরিক উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের ১০ লক্ষ ডিগ্রী বা ততোধিক ছিল। কোটী কোটী বৎসর তাপ বিকীরণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া এক্ষণে উহা বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৯২টী পরমাণু যাহা প্রথম বাষ্পাকারে ছিল, তাহাই রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action) ও জড়শক্তির ক্রিয়ার (Physical force) প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন কঠিন স্তর সকল ও উপরিস্থ জল ও বায়ু রূপে পরিণত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, আদিতে যে জড় ও জড়শক্তি শূন্যময় আকাশে যে বিদ্যুৎকণারূপে এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল এই জড় ও জীবজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদেরই ক্রমবিকাশ (Evolution) মাত্র। মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি সমন্বিত মানবদেহও ঐ উপাদান হইতে

ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। এই জড় ও শক্তি অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে এবং উহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে কার্য্য করিয়া এই জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই দুইটী অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত, মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বাক্ ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্তই যদি জড় ও জড়শক্তির বিকাশ তাহা হইলে জীবের অনুভূতি, প্রাণ, আত্মা ও অহং জ্ঞান (Consciousness) কোথা হইতে হইল? ইহাও কি জড় ও জড়শক্তির বিকাশ? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন দেশ (Space) কাল (Time) জড় ও জড়শক্তি (Matter and its inherent force or energy) এই তিনটী সজীব ও নির্জীব জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে আর একটা জিনিষ আছে তাহা প্রাণ বা আত্মা (Spirit or soul)। এই আত্মা জড়বিজ্ঞানের অতীত। কারণ ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে; ইহাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়। ইহা অনুভূতি-সাপেক্ষ,—অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রাসায়নিক মিশ্রণ বা পরীক্ষা যন্ত্র (test tube) বা অঙ্কশাস্ত্রের অধিকারের বহির্ভূত। এই আত্মাই জীবে প্রাণ রূপে অবস্থিতি করেন এবং ইহা হইতেই জীবের অহং জ্ঞানের (Consciousness) উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন জড়-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হইতে পারে জড় ও জড়-শক্তির ক্রমবিকাশ বশতঃ এই জড় ও জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; তথাপি মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু প্রভেদ আছে। মানবদেহ সাধারণ জীব-দেহের উন্নত অবস্থা হইলেও প্রভেদ এই যে, নিম্নশ্রেণীর জীবের অনুভূতি আসিলেও তাহাদের অহংজ্ঞান (Consciousness) নাই। অহংজ্ঞান কেবল মানবেরই আছে। এই অহংজ্ঞান হইতেছে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর যিনি এই বাস্তব জগতের অন্তরালে অধিষ্ঠান করেন। তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহারই ইচ্ছায় বিদ্যুৎকণাই বল, বা অণু পরমাণুই বল, যাহা কিছু জগতের উপাদান, সমস্তই তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদান্তমতে এই পরমাত্মা বা পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনি অনন্ত আকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর বিদ্যমান আছেন। ইনি চিৎস্বরূপ ও পরিপূর্ণ "সচ্চিদানন্দং ও জ্ঞানমনন্তং"।

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোঃ নিহিতো গুহায়াম্।"—কঠোপনিষৎ।

অনুবাদ—আত্মা পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আবার সর্ব্বপ্রকার বৃহৎ বস্তু অপেক্ষা বৃহৎ। আত্মা সমুদয় প্রাণীর হৃদয় রূপ গুহাতে নিহিত আছেন।

এই আত্মা যখন জীবের দেহ মধ্যে থাকেন, তখন ইহাকে জীবাত্মা বলা হয়। এই পরমাত্মা বা পুরুষের প্ররোচনায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই সচরাচর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি।

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
"হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" গীতা।

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নিরাকার পরমাত্মায় নিদিধ্যাসন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তিগণ, পুরুষকে রাম ও কৃষ্ণরূপে ও প্রকৃতিকে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীরূপে কল্পনা করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হেকেল বলেন, মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন মনস্তত্ত্ববিদ্গণের এই আত্মা বা ঈশ্বর কোথায় আছেন, এই জগতের মধ্যে না বাহিরে? ইহার আকার কিরূপ? যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে বায়ুর ন্যায় কি বাষ্পের মত? যদি তেজোময় হন তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে তাঁহার তেজ আকাশে বিকীর্ণ হইতে থাকায় এতকালে নিশ্চয় বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে ঈশ্বর ইচ্ছা ও মন বিশিষ্ট এবং তাঁহাতে দয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি মানুষের গুণ সকল পূর্ণমাত্রায় আছে এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার কার্য্য সকল মানুষের কার্য্যের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে; অথচ তিনি নিরাকার এবং সর্ব্বত্র আছেন এরূপও বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাষ্পময় মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীববিশেষ ভিন্ন অন্য কি কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি ঈশ্বর শক্তিবিশেষ হন তাহা হইলে এই শক্তির আধার কি? মস্তিষ্কাদি দেহযন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল শক্তিমাত্রের কখন মানুষের মত মন, বুদ্ধি, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণ সকল থাকিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, তাপ, আলো, শব্দ, রাসায়নিক ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্রিয়া (electricity and magnetism) এক গতি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ। যন্ত্রাদি সাহায্যে আমরা ইহার কোন একটাকে ইহাদের অপরটীতে পরিণত করিতে পারি এবং উহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইতে পারি যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন করায় ঐ শক্তির কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় নাই।

এই জগতের যাবতীয় জড় ও জড়শক্তির সমষ্টি চিরকাল একই আছে ও থাকিবে—উহা যে কোন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত হউক না কেন। এই জড় ও জড়শক্তির পরিবর্ত্তন গতি ও বিশ্রামের উপর জগৎ চলিতেছে। জড়ের গতি ও বিশ্রাম উভয় অবস্থাতেই শক্তি তাহাতে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে। গতি অবস্থায় শক্তি কার্য্যকরী হয় ও বিশ্রাম অবস্থায় ঐ শক্তি রুদ্ধ থাকে মাত্র। উহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন জীবের প্রাণ বিভিন্ন জড় পরমাণুর গতি ও স্পন্দন বশতঃ তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। মস্তিষ্ক ও জটিল স্নায়ুমণ্ডলীই জীবের মন ও অহং জ্ঞানের কারণ। ঔষধাদির দ্বারা অথবা

পীড়াবশতঃ মানবের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্তম্ভিত হইলে তাহার মন ও অহং জ্ঞান থাকে না। মস্তিষ্কস্থ পরমাণু সকলের স্পন্দন ও তাহাদের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়াই মন ও অহং জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতিরেকে পৃথক্‌ভাবে মন ও অহং জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কল্যকার আমি ও আজকের আমি, শিশু আমি ও অদ্যকার বৃদ্ধ আমি, ঠিক এক আমি নই। আমাতে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর আমিত্ব-বোধ থাকে না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার আমিত্ব-জ্ঞান হয়। স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তির উপর আমিত্ব-বোধ অনেকটা নির্ভর করে। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় যখন স্মরণশক্তি ও ধারণা-শক্তির হ্রাস হয় তখন আমিত্ব-বোধও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমিত্ব-বোধ কোন অনৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া হইতে হয় না; ইহা সাধারণ নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফল। বর্ব্বর ও অসভ্য অবস্থায় মানবের আমিত্ব বোধ ভাল রকম প্রস্ফুটিত হয় না। সভ্যতার ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত মানবের আমিত্ব-বোধ ক্রমশঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়। এই আমিত্ব-বোধ জীবের ক্রমবিকাশ (evolut on) রূপ নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফল।

জড়বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন মানবের জীবাত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই। যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি তাহা একটী পৃথক অবাস্তব পদার্থ নহে। উহা অণু, পরমাণুর ন্যায় বাস্তব পদার্থ। নরদেহে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর যাবতীয় বিভিন্ন ক্রিয়ার সংষ্টিকে আমরা জীবাত্মা বলিয়া থাকি। শারীর-যন্ত্রের নানাবিধ ক্রিয়া যেমন জড়শক্তি ও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, জীবাত্মারও উৎপত্তি ঐ সকল কারণে হইয়া থাকে। দেহ ব্যতিরেকে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব মনুষ্যের কল্পনাপ্রসূত। মৃত্যুর পরও সূক্ষ্ম শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার আশা, প্রিয়তম আত্মীয়স্বজন যাহাদের ত্যাগ করিয়া গেল তাহাদের সহিত পুনর্মিলনের আশা, মানুষ ত্যাগ করিতে পারে না। এজন্য মৃত্যুর পর তাহার জীবাত্মা তাহার দেহ হইতে অশরীরী এবং সূক্ষ্ম অবস্থায় শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিবে এবং ইহকালে ভালমন্দ কৃত-কার্য্যের জন্য পরকালে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে এরূপ একটা ধারণা মানুষের মনে আপনা হইতেই হয়। জড়বিজ্ঞানের মতে এরূপ জীবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

যে অপরিবর্ত্তনীয় অত্যদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জড়পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে আর কিছু আছে কি না, যাহাকে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ করুণা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি মানুষিক গুণবিশিষ্ট অথচ নিরাকার কল্পনা করিয়া ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান এবং একমাত্র মহৎ মন বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাতে নিদিধ্যাসন করেন, সেই কিছু বাস্তবিক কি পদার্থ তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে জানি না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যাহা জানা যায় না বা ধরা ছোঁয়া যায় না, এরূপ কল্পিত পদার্থের পশ্চাতে অনুধাবন করিয়া লাভ কি? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহার নিশ্চয়রূপে সন্ধান পাইয়াছি, অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি (matter and force), ও যাহা অনন্ত কাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহারই গবেষণা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই জগৎ বাস্তব পদার্থ। বাস্তব পদার্থই জ্ঞেয়; অবাস্তব পদার্থ কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি বাস্তব পদার্থ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা হয় তো কালে আমরা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিব। এই পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম-মত প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই তুল্যভাবে মিথ্যা ও অযৌক্তিক, কবিকল্পনাসম্ভূত ও বংশ-পরম্পরাগত শোনা কথা মাত্র। যুক্তিহীন কুসংস্কার, ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মমত সকল জগতে প্রচার করিয়া সরল-বিশ্বাসী জনগণের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত মারামারি, কাটাকাটি, ভীষণ যুদ্ধ ও নরহত্যা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই ধর্ম্মের নামে। কত লক্ষ লক্ষ লোক নিজ সমাজস্থ প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করায় আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া গৃহত্যাগী এমন কি দেশত্যাগী পর্য্যন্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর তাহাই ভগবান্—"সত্যং শিবং সুন্দরং।" বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞানই সত্য; যাহা জগতের হিতকর তাহাই শিব ও যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ও মনের প্রীতিদায়ক তাহাই সুন্দর। বিজ্ঞানচর্চ্চা, জগতের হিতকর কার্য্য সকল করা এবং শিল্প ও কলাদির অনুশীলন করা, যে প্রাকৃতিক নিয়মে জগতের কার্য্য হইতেছে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা ও নৈতিক জীবন যাপন করাই ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা।

—

জীবজন্তুর যক্ষ্মা

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ

যক্ষ্মা যে শুধু মানব-সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে এমত নহে। এই মারাত্মক ব্যাধি মানবের সংশ্লিষ্ট ও সমাজভুক্ত জীবজন্তুর মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যক্ষ্মার এত প্রকোপ ছিল না। সভ্যতার বিস্তৃতির সহিত মানব-সমাজে ইহার প্রসারও যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বহুমূত্র, বাত, বেরিবেরি প্রভৃতির মত যক্ষ্মাকে সভ্যতার ব্যাধি বলা যাইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাক, এই যক্ষ্মা ইতর জীবে কিরূপে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

ইতর প্রাণীরা যখন প্রকৃতির অঙ্কে, স্বভাবের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তাহাদের কোনও ব্যাধি দেখা যায় না; কিন্তু গৃহপালিত হইলেই মনুষ্যের সহবাসে আসিয়া নানা-রোগ-দুষ্ট হইয়া পড়ে। বন্য পশুকে পালন করিয়া আমরা যে তাহাদিগকে শুধু ক্লেশ প্রদান করি এমত নহে, আমাদের নিকট হইতে নানা রোগ তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই বোধ হয় বিবেকানন্দ পশু-পক্ষীকে পালন করিয়া মানব-মনোরঞ্জন বৃত্তিসমূহ শিক্ষা দিবার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে গাভীর যক্ষ্মার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি গাভীর বসন্ত ব্যতীত যক্ষ্মারোগও হইয়া থাকে। এই দুই রোগই অনেক বিষয়ে মানব ব্যাধির অনুরূপ। এ যক্ষ্মার কারণ কি? গাভী এক্ষণে

সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত পশু হইয়া পড়িয়াছে। বন্য অবস্থায় গরুকে আর দেখা যায় না। গৃহপালনে গাভীর দুগ্ধ-প্রদান শক্তির অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। গো-পালনের দোষেই যে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সহরে শতকরা প্রায় ৩০টী দুগ্ধবতী গাভী যক্ষ্মাগ্রস্তা। এই যক্ষ্মার সংক্রামণ গাভীর বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বাছুরদের মধ্যে যক্ষ্মা আদৌ দেখা যায় না। এমন কি যক্ষ্মাগ্রস্তা গাভীর বৎসকে প্রথম হইতেই পৃথক করিয়া অপর একটী সুস্থ গাভীর স্তন্য পান করাইলে তাহার আর ভবিষ্যতে যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

গো-যক্ষ্মার প্রধান কারণ—গৃহপালিত গাভীরা উপযুক্ত মাত্রায় রৌদ্র সেবন করিতে পায় না এবং তাহাদের রীতিমত আহার দেওয়াও হয় না। অনেক গৃহস্থের বাটীতে যে গোয়ালঘর দেখা যায়, তাহাকে গাভীর কারাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সব ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করে না এবং সম্যক বায়ু চলাচলও হয় না। যক্ষ্মার বীজাণু এই সকল গৃহে নির্বিঘ্নে জন্মিবার সুযোগ পায় এবং অন্ধকারে ৮০° হইতে ১০৫° ডিগ্রির মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহার উপর সবুজ তৃণাদি সকল গাভী আহার করিতে পায় না এবং তাহাদিগকে উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করিতে দেওয়াও হয় না। পরন্তু একটী সঙ্কীর্ণ ঘরে অনেক সময়ে একাধিক গাভীকে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই সকল কারণেই গাভীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায় এবং রৌদ্রের অভাবে দুগ্ধে ক্যালসিয়ম্ প্রভৃতির অভাব ঘটে।

সহরে যে সকল অস্থিচর্ম্মসার গাভী দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই যক্ষ্মা দেখা যাইবে। গাভীর যক্ষ্মা আছে কি না তাহা নিরাকরণ করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পরীক্ষাকে "টিউবারকিউলিন টেষ্ট" বলা হয়। সন্দেহ হইলেই গাভীকে টিউবারকিউলিন ইনজেকসন্ দিয়া দেখিতে হইবে গাভীর গাত্রতাপ বর্দ্ধিত হয় কি না। ইন্‌জেক্‌সনের পর ৬।৮ ঘণ্টার মধ্যে গাত্র-তাপ বর্দ্ধিত হইলে (১০৪° হইলেই) ও গাভীর কাঁপুনি আসিলে বুঝিতে হইবে যে উহা যক্ষ্মা-পীড়িত। সুস্থ গাভীকে টিউবারকিউলিন প্রয়োগ করিলে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইরূপ অসুস্থা গাভীকে গোয়ালঘর হইতে তৎক্ষণাৎ পৃথক রাখিতে হইবে। এইরূপ রুগ্না গাভীর মধ্যে দুগ্ধের লোভে বৎস প্রজনন চেষ্টা নিষ্ঠুরতা মাত্র। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে বৎস প্রজনন করিলে গাভী হইতে বৎসের মধ্যেও যক্ষ্মা সংক্রামিত হইয়া থাকে। অবশ্য বৎস যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তত কাল উহার মধ্যে যক্ষ্মা প্রকাশ পাইতে পারে না।

এই বৎস প্রজনন ব্যাপারে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। এ দেশে অধিকাংশ স্থলে সুনিয়মে গাভীর বৎসোৎপাদন করা হয় না। অনেক স্থলেই বৃষ গাভীর যোগ্য হয় না। আমি এক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে একটী বয়স্কা গাভীর নিকট একটী অল্পবয়স্ক বৃষকে প্রণোদিত করা হইতেছে। এরূপ বয়সের প্রভেদ ব্যতীত গোত্রাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় না। অনেক স্থলে সগোত্রে অর্থাৎ এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে সহবাস করান হইয়া থাকে। এইরূপ সহবাসের ফলে গাভীর সন্তান রুগ্ন হয়—এবং সেরূপ সন্তান সহজেই যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। Consanguinous breeding বা সগোত্র সঙ্গম গো যক্ষ্মার একটী গৌণ কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

গো-যক্ষ্মা নিবারণের নিমিত্ত ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট এক উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ডের মত গো-পালনের দেশ। দেশের দরিদ্র গোপগণের যক্ষ্মা-পীড়িতা গাভীকে সে দেশের গভর্ণমেণ্ট মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন এবং তাহার মাংস বিক্রয় করিয়া ব্যয়িত অর্থের পূরণ করা হয়। এরূপ গাভীর মাংসে সংক্রামকতার কোনও ভয় থাকে না। সে দেশে যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীকে বিক্রয় করা গোপালকের ইচ্ছা-সাপেক্ষ বলিয়া সহজেই গো-যক্ষ্মা প্রশমিত হইয়া আসিতেছে।

কিছু কাল পূর্ব্বে ইডেন গার্ডেনে একবার শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে একটী গোশালার আদর্শ দেখান হইয়াছিল। সেই পাকা মডেল গোশালায় ২৭টী প্রশস্ত জানালা ছিল ও সম্মুখ ভাগ একেবারে উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল। এইরূপ গোশালা নির্ম্মাণ করিলে এবং গাভীকে ফাঁকা মাঠে রৌদ্রে চরিয়া টাট্‌কা ঘাস পাতা ভক্ষণ করিতে দিলে গাভীর যক্ষ্মা অনেক পরিমাণে দমন করা যাইতে পারে।

তার পর বানরের কথা। বানরের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। বানরেরা সর্ব্বদাই বনে বনে বিচরণ করে; কিন্তু তথাপি ইহাদের যক্ষ্মা হয় কেন? পশুশালার বানরেরা কক্ষে বদ্ধ থাকে বলিয়া তাহাদের না হয় যক্ষ্মায় ধরিতে পারে। আমার মনে হয় বানরেরা মনুষ্যের আবাসে উপদ্রব করিতে আসিয়াই প্রথমে এই ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হইয়াছে। পরে সেই সংক্রামিত বানর হইতেই কপি-সমাজে যক্ষ্মার সংক্রামণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল বানর দুর্ব্বল তাহারাই শীতবাত সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং উহাই শেষে যক্ষ্মায় পরিণত হইয়া তাহাদের জীবনান্ত করিয়া থাকে। পশুশালার কপিগৃহে সকল সময় রৌদ্র আসে না। এইরূপ রৌদ্রবিরল গৃহে অধিক দিবস আটকাইয়া রাখিলে বানরেরা যক্ষ্মা পীড়িত হইয়া থাকে। স্বভাবের মধ্যে থাকিলে বানরেরা উপযুক্ত রৌদ্র সেবন ও যথেচ্ছা লতা পাতা ভক্ষণ করিয়া—এবং স্থান পরিবর্ত্তনাদির দ্বারা স্বভাব চিকিৎসা করিতে পারে; কিন্তু পালিত অবস্থায় ইহাদের অবস্থা শোচনীয়। মানবযক্ষ্মার মত বানরের যক্ষ্মাও কালে প্রতিরুদ্ধ না হইলে মারাত্মক হইয়া থাকে। পালিত বানরের মধ্যে যক্ষ্মা-বীজ প্রতিপালক দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। বানর পালকের যক্ষ্মা থাকিলে তাহার উচ্ছিষ্ট রুটি, দুগ্ধ, ফল মূলাদি ভক্ষণ দ্বারা বানরেরা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

বিড়ালেরাও যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ মৎস্যাদির অবশিষ্ট ভাগ আহার করিয়াই বিড়ালেরা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া ও দুগ্ধের পাত্র প্রভৃতিতে মুখ ডুবাইয়া যক্ষ্মার বীজ বিস্তার করিয়া থাকে।

বিড়ালের লোম ভক্ষণ করিলে যে যক্ষ্মা হয় বলিয়া শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য—আহার-স্থলের ত্রিসীমানায় ইহাদিগকে আসিতে না দেওয়া। যক্ষ্মা ব্যতীত ডিপ্‌থিরিয়ার সংক্রামণও ইহারা এই ভাবেই করিয়া থাকে। বিড়াল দ্বারা স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি এই সকল কারণেই ভক্ষণ করা উচিত নয়। প্রতি গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া বেড়ানই ইহাদের নিত্যকর্ম্ম এবং আজকাল বহু পরিবারের মধ্যেও যখন যক্ষ্মার প্রভাব দেখা দিয়াছে তখন বিড়ালকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। বিড়ালের আর একটী কদভ্যাস এই যে ইহারা একটু আদর পাইলেই রাত্রে পালকের শয্যায় শয়ন করিতে প্রয়াস পায়। পালকের যক্ষ্মা থাকিলে তাহার পার্শ্বে নিদ্রিত মার্জ্জার যে সেই রোগ জীবাণু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু রোগীর ব্যবহৃত পাত্রাদি ও তাহার ত্যক্ত নিষ্ঠীবনাদি লেহন করিয়া ইহারা সহজেই যক্ষ্মা দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কুকুরও এইরূপে যক্ষ্মাগ্রস্ত প্রতিপালকের ব্যবহৃত পাত্রাদি হইতে দুগ্ধাবশিষ্ট ও রুটির অংশাদি ভক্ষণ করিয়া এবং তাহার কক্ষে শয়ন করিয়া যক্ষ্মা দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে; এবং তাহার পর অপর সকলকেও সংক্রামিত করিয়া থাকে। এই সকল কারণেই কুকুর বিড়াল আমাদের সমাজে এত হেয় হইয়াছে।

ঘোটকদিগের মধ্যেও যক্ষ্মার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। ঘোটকের যক্ষ্মা মানব যক্ষ্মার মত মারাত্মক। ঘোটকের যক্ষ্মা যক্ষ্মাগ্রস্ত মহিস প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। মহিষেরা প্রায়ই অশ্বশালে বাস করে। কোনও যক্ষ্মাগ্রস্ত মহিস ঘোটকশালায় থাকিলে তাহার নিষ্ঠীবনাদি ঘোটকের ঘাস দানার মধ্যে পড়াই সম্ভব। এইরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াই ঘোটক যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্তা গাভীর দুগ্ধ পান করানর ফলে অনেক সময় ঘোটক শিশুরাও এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শেষে ঘোটকের প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

ছাগের যক্ষ্মা হয় না বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ছাগদুগ্ধ পান, ছাগ ঘৃত সেবন এবং ছাগ সহ বাস করিলে যক্ষ্মা রোগের উপশম হয় এ কথার আমি পত্রান্তরে এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু অধুনা প্রতীচ্যের একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন যে অল্পবয়স্ক ছাগেরা যক্ষ্মা রোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্যাদি ভক্ষণ করিয়া সংক্রামিত হইয়া থাকে।

মেষেরা এক স্থানে পুঞ্জীভূত ভাবে বাস করিতে ভালবাসে। অপরিচ্ছন্ন খোঁয়াড়ে বর্ষার দিনে এই ভাবে অধিক কাল থাকিলে ইহাদের যে পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপের পার্ব্বত্য মেষেরা স্বভাবের অঙ্কে অতি সুস্থ ভাবে বিচরণ করে; কিন্তু পালনের দোষেই, অর্থাৎ এক খোঁয়াড়ে বহু মেষকে একত্র রাখিবার নিমিত্তই তাহারা যক্ষ্মাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। বন্য শশকদের কোনও ব্যাধি হয় না; কিন্তু বৎসরের যে সময়ে তাহাদের বহু শাবক জন্মিতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে একটী বিবরে অনেকগুলি শাবকের একত্র বাস হেতু ইহাদের মধ্যে একপ্রকার মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহাতে ইহাদের বংশ ক্ষয় হইয়া সৃষ্টি প্রকরণে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

শূকরেরা পূর্ব্বোক্তরূপে এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধাদি পান করানর ফলে যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। শূকরেরা যে সকল অপরিষ্কার স্থানে থাকিতে ভালবাসে ঐ স্থানে গৃহাদির আবর্জ্জনার সহিত যক্ষ্মার বীজ আসিয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

গৃহপালিত শশক, গিনিপিগ্ প্রভৃতি যক্ষ্মাপীড়িত পালক দ্বারাই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধাদির পীতাবশেষ ও রুটি প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া ইহাদিগকে রুগ্ন করা অনুচিত।

রাত্রে রোগীর ব্যবহৃত পাত্রাদি ও উচ্ছিষ্ট বস্তু অনাবৃত করিয়া রাখিলে ছুঁচা ও ইন্দুরেরা তাহা ভোজন করিয়া যক্ষ্মাগ্রস্ত হইতে পারে এবং বিড়ালের মত রোগের বীজাণু এক বাটী হইতে অপর বাটীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। মূষিক দ্বারা প্লেগ বিস্তারের কথা স্মরণ করিলেই এ বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইবে।

তার পর পক্ষীর কথা। পক্ষীদের মধ্যেও যক্ষ্মা দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ গৃহপালিত শুক ও মোরগদিগের মধ্যেই avian tuberculosis-এর প্রকোপ লক্ষিত হইয়াছে। বাটীর কাহারও যক্ষ্মা থাকিলে ঐ রোগীর প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি (রুটি, বিস্কুট, ফল প্রভৃতি) ভক্ষণ করিয়া শুক মোরগ প্রভৃতিরা যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াছে। Encyclopaedia Medica-য় এ বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। এক পরিবারে একজনের যক্ষ্মা ছিল। বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে সে অভ্যাস বশতঃ নিষ্ঠীবন ও কফ ত্যাগ করিত। বাগানের একটী মুরগী তাহার মুখ-নিক্ষিপ্ত কফাদি ভক্ষণ করিয়া ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আর এক স্থানে ঐ ভাবে একে একে ৮০টী মোরগ আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের প্রাণ বধ করিতে হইয়াছিল। মারিয়া ফেলিবার পর দেখা গেল যে ঐ সকল মুরগীর যকৃতে যক্ষ্মার গুটিকা প্রকাশ পাইয়াছিল।

মাছেদের মধ্যেও যক্ষ্মা দেখা গিয়াছে। এই piscine tuberculosis বা মীন যক্ষ্মাকে চিকিৎসকেরা mammalian tuberculosis বা গো-যক্ষ্মাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বা মীনযক্ষ্মাকে যক্ষ্মা বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে ইহা যক্ষ্মাগুটিকার অনুরূপ বিভিন্ন ব্যাধি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। মাছেদের মধ্যে "কার্প" মাছেরাই মীনযক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। শিঙ্গী, মাগুর প্রভৃতির "বসন্ত" হওয়ার কথা যে শুনা যায় তাহাও অনেকে "বসন্ত" বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর মাছের কাঁটার আঘাত লাগিলে উহাদের চর্ম্মে যে ক্ষত হয় তাহাকেই সাধারণতঃ বসন্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাই তাঁহাদের মত।

আলো-আঁধার

শ্রীহাসিরাশি দেবী

পাশাপাশি বাড়ীর জানালা খুলিয়া প্রায়ই এ উহাকে ডাকে "দিদি!" উত্তরও আসে। তাহার পরে দুইজনের কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জন ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে লীন হইয়া যায়,—ইহাই প্রতিদিনের ঘটনা।

সেদিনও রাণু জানালা খুলিয়া মন্দারকে ডাকিবার জন্য মুখ তুলিল; কিন্তু ডাকিতে পারিল না,—মন্দারের কক্ষমধ্যে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিয়া সরিয়া গেল।

তাহার কাপড়ের খস্ খস্ শব্দে মুখ তুলিয়া সত্যেনও সম্মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু রাণুর শুভ্রাঞ্চলের এতটুকু ছাড়া আর কিছু সে দেখিতে পাইল না; মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীকে ডাকিল—"মন্দার—"

পার্শ্বের কক্ষে কি একটা কার্য্যে মন্দার ব্যস্ত ছিল, কিন্তু স্বামীর আহ্বান অবহেলা করিতে পারিল না; আসিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখের খোলা জানালাটার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সত্যেন কহিল, "তোমায় কে যেন ডাকছিল।"

স্বামীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্দার সত্যকে মিথ্যায় ঢাকিতে পারিল না, রাণুর নিষেধও ভুলিয়া উত্তর দিল—"রাণুদি' বোধ হয়।"

"রাণুদি'? রাণুদি' কে?"

মন্দার যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তাহার পরে উত্তর দিল—"ও-বাড়ীর ছোট-বৌ।"

অবহেলা-জ্ঞাপক ভঙ্গীতে শুধু একটা 'ওঃ' বলিয়া সত্যেন নীরবে বসিয়া রহিল। মন্দারও কোনও প্রশ্ন করিল না, "কাজটা সেরে আসি" বলিয়া ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

কিছু দিন হইতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে মেঘটা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুতেই যেন কাটিতে চাহিতেছিল না।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়,—বাড়ীর পুরাতন এবং চিরাচরিত পদ্ধতি উল্টাইবার জন্য সত্যেনের প্রাণান্তকর চেষ্টা।

পূর্ব্বপুরুষের আমলের তিন মহাল বাড়ী; বাহিরে সদর, মাঝে অন্দর এবং তাহার পরে রন্ধন-বাড়ী। এই তিনটি মহালের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলেও, আগের ও পশ্চাতের মহালের সঙ্গে মাঝের মহালবাসিনীদের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত অল্প। মাঝের মহালবাসিনীদের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যেরও যাহাতে সম্বন্ধ না থাকে, ইহাই ছিল না কি পরলোকগত কর্ত্তাদের ইচ্ছা। কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় অবরোধের কঠিন প্রাচীরই তাহাদের ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, বোধ হয় রাখিতও,—কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে বিস্তীর্ণ জমীদারী এবং সংসারের সকল ভার হাতে পাইয়া সত্যেন প্রথমেই মাঝের মহালের চিরাচরিত প্রথা দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

ফলে পূর্ব্বপুবাসিনীগণের সহিত মতভেদ তো ঘটিলই,—মন্দারও শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর মতকে অবহেলা করিয়া স্বামীর কথায় সম্মত হইতে পারিল না।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। অন্য দিন সত্যেন এ সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও, সে দিন সে স্ত্রীর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া বারম্বার ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। কক্ষটি সুসজ্জিত। দেয়ালে খাটান ছবিগুলি হইতে খাটের বিছানা, মশারী, মায় পাপোষটি পর্য্যন্ত গৃহকর্ত্রীর পরিচ্ছন্নতা ও সৌখীনতার পরিচয় প্রদান করে; অথচ ইহাকেই বহু চেষ্টা করিয়াও সত্যেন নিজের মনোমত করিয়া সাজাইতে কেন পারিতেছিল না, ইহাই যেন ছিল তাহার নিকটে আশ্চর্য্যের বিষয়। আর আজ সেই বিস্ময়ের যাহা হোক একটা 'হেস্ত নেস্ত' না করিয়া যে সে শয্যা গ্রহণ করিবে না, ইহা স্থির করিয়া সে বসিয়াছিল। কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, শুধু ঘড়ির দোলকটার শব্দ শোনা যাইতেছিল—"টিক্ টিক্ টিক্—।"

সিঁড়ীতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণ পরে দ্বারের সম্মুখের ভারী নীল পর্দ্দাটাকে সরাইয়া মন্দার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে জলের গ্লাশ, অন্য হাতে পানের ডিবা। দেখিতে সে সুন্দরী নহে, তবে কুৎসিতাও জোর-গলায় বলা চলে না। লাল চওড়া পাড় শাড়ীখানি মাথার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ছিল, পাশ দিয়া দেখা যাইতেছিল কাণের দুইটি হীরার দুল, এবং গলায় হারটিকে; হাতেও বিশেষ গহনা নাই, শুধু নীচের হাতের সরু চুড়ীগুলির উপরে উজ্জ্বল আলোর ধারা যেন পিছলিয়া পড়িতেছিল।

মন্দার হাসিল; হাতের গ্লাশ ও ডিবাটি টেবিলের উপরে নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"এখনও জেগে ব'সে আছ যে!"

সত্যেন উত্তর দিল না, ইঙ্গিতে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া পার্শ্বের চেয়ারখানা আগাইয়া দিল।

মন্দার আসিয়া বসিলে কহিল—"তোমরা স্বামীকে দেবতা বল, নয় ?"

মন্দার নীরবে মাথা নাড়িল, কিন্তু স্বামীর এ প্রশ্নের হেতু বুঝিতে পারিল না।

হাসিয়া সত্যেন কহিল—"আমার কথা শুনে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়েছো, নয় মন্দার? কিন্তু পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, এটা জেন।"

মন্দার একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল, হাসি চাপিয়া বলিল—"রাত হয়েছে, বারটা বাজে।"

সত্যেন প্রশ্ন করিল "ঘুম পাচ্ছে ?"

মন্দার উত্তর দিল "না।"

সত্যেন বলিল—"তবে চল, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঐ জানালাটার পাশে গিয়ে বসি, বেশ হাওয়া আসছে ঐদিক থেকে।"

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা রাত্রি; চারি দিক যেন জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছিল। বহুদূর হইতে একটা নিদ্র'হারা পাখী তখনও চীৎকার করিতেছিল—"চোখ গেল, চোখ গেল।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সত্যেন কহিল—"যদি তোমরা স্বামীকে দেবতা ব'লেই জেনে থাক, তবে দেবাদেশ যাই হোক না কেন, পালন করাও তো তোমাদের পক্ষে পুণ্যের। কি বল মন্দার?"

কথার শেষে তাহার কণ্ঠে যে ব্যঙ্গ-স্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিলেও, মন্দার শ্লেষের জবাব দিল না, নীরবেও রহিল না; ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল—"পাপপুণ্যের বিচার করবার কর্ত্তা তো আমি নই। যিনি কর্ত্তা, তিনিই তাঁর কাজ করে যাবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে। তাই ব'লছি, স্বামীর আদেশ পালন করা অনুচিত ব'লবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে এইটুকু শুধু ব'লতে পারি যে, সেটাও স্থান কাল বুঝে পালন করাই যেন সব চেয়ে ভাল; কারণ, তাতে কারও কিছু ব'লবারও থাকে না।"

উষ্ণ স্বরে সত্যেন বলিল—"তাহ'লে তোমরা সব চেয়ে লোকের কথাটাকেই বেশী মেনে চল, কেমন ?"

মন্দার দিন কয়েক হইতে সত্যেনের উষ্ণ স্বর শুনিতে ও উত্তর দিতেও অভ্যস্তা হইয়া গিয়াছিল; তাই আজও ভয়ে, বিস্ময়ে ও দুঃখে হতবুদ্ধি ভাবে নীরবে রহিল না সেও একটু চড়া স্বরে উত্তর দিল—"কি করবো, আমায় যে সংসারের সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়, কাজেই এদের মত না নেওয়া ছাড়াও আমার তো আর কোনও উপায় নেই!"

পূর্ব্ববৎ স্বরে আরও একটা কি কঠিন কথা বলিতে গিয়া সত্যেন সহসা নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের বাড়ীটার খোলা বারান্দার উপরে; দেখিল রেলিংয়ের উপরে হাত রাখিয়া ও আকাশের দিকে চাহিয়া শুভ্রবসনা নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার মুখের উপরে ও সর্ব্বাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়াছে জ্যৈষ্ঠের অম্লান জ্যোৎস্না। সত্যেন চমকিয়া উঠিল, মনে হইল ও-মুখ যেন তাহার চেনা।

মন্দার প্রশ্ন করিল—"চুপ ক'রলে যে ?"

সত্যেন জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল; কহিল—"ওদিককার জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় এস মন্দার!" বলিয়া স্ত্রীর মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই সত্যেন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং জানালা বন্ধ করিয়া মন্দারও উঠিল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুই একটি কথা ছাড়া আর কোনও কথা হইল না, আর সে কথার মধ্যেও সরল ভাব ছিল না, ছিল আদেশের সুর এবং অবহেলার আঘাত। সত্যেন বলিল—"আমার কথামত তুমি চ'লবে কি না, তাই আমি শুনতে চাই।"

মন্দারও দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর মতকে ছেঁটে ফেলে, তা আমি পারব না।"

সত্যেন আর কোনও কথা কহিল না, নীরবে আসিয়া শয়ন করিল, মন্দারও আর তাহাকে ডাকিতে সাহস করিল না।

২

বিবাহের পরের আট দিন না যাইতেই যেদিন রাণুর সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া গিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহার পরিচয়-পত্র হইয়াছিল "অলক্ষণা"। পিতামাতা যেদিন শুধু কিশোরী কন্যাকে দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অখিলের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, সেদিন অখিলও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, রাণুকে সে এমন ঘরে এবং এমন হাতে সম্প্রদান করিবে, যে স্থানে রাণুর অতুল রূপ মুহূর্তের জন্যও বেমানান দেখাইবে না।

কিন্তু মানুষের সকল ইচ্ছা সব সময়ে সফল হয় না, অখিলেরও হয় নাই; তাই সে বন্ধু এবং সতীর্থ সত্যেনের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাহার হাতে রাণুকে সম্প্রদান করিল, সেও একদিন রাণুকে ফেলিয়া যে দেশে চলিয়া গেল, সে দেশের ঠিকানা শুধু অখিলই নয়, রাণুও জানিতে পারে নাই।

তাহার পরে আজ প্রায় সাত-আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অখিলও পৃথিবীর বক্ষ হইতে বিদায় লইয়াছে; আছে মাত্র রাণু;—তাহাও ভাসুর এবং জায়ের গলগ্রহ হইয়া।

তাই আজ প্রায় সাত আট বৎসর পরে সত্যেনকে দেখিয়া রাণু চমকিয়া উঠিল। পরিচয়ে জানিল, সে আজ কলেজের ছাত্র নহে, সাগরদিঘীর জমিদার এবং মন্দারের স্বামী।

রাণুর মনে পড়িল এই সত্যেনই একদিন অখিলকে আশ্বাস দিয়াছিল "ভেব না হে,—রাণুর জন্যে তোমার ভাবনা নাই, ওর ভার আমার হাতে দাও।" তাহার পরে তাহার পিতার সে বিবাহে নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক সেই পত্রখানা—উঃ—

সমস্ত এক এক করিয়া আজও মনে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ীর ঘা বসায়।

কয়েক দিন মন্দার এই দিককার জানালাটা খুলে নাই, ডাকেও নাই; রুদ্ধ জানালার দিকে চাহিয়া রাণু জায়ের ছোট ছেলেটিকে সুর করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল।—

"খোকা ঘুমাল' পাড়া জুড়াল' বর্গী এল দেশে;
চড়া-পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"

খট্ করিয়া জানালা খুলিয়া গেল, সেই সঙ্গে ডাক আসিল "রাণুদি—।" রাণু মুখ তুলিয়া হাসিল; কহিল—"কয়েক দিন কি এ ঘরের বাসও তুলে দিয়েছিলে দিদি?"

মন্দারের মুখখানা মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পরে শুষ্ক হাসি হাসিয়া সে কহিল—"না ভাই, সময় পাইনি, শাশুড়ীর ব্রত উদ্‌যাপন ছিল কি না তাই।"

রাণু খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া জানালার নিকটে সরিয়া আসিল; পরিহাস-তরল স্বরে কহিল—"আমি ভেবেছিলাম বুঝি কর্তাটির নিষেধ আছে।"

শুষ্কস্বরে মন্দার জবাব দিল—"না ভাই, উনি সে রকম মানুষ ন'ন।"

রাণু কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে বড়-বৌয়ের ডাক শোনা গেল—"বলি ছোট! রান্নাঘরের ভাজা মাছগুলো ঢেকে এসে হাসি মস্কারায় মেতেছিস্, না সেগুলো বেরালের পেটে দিয়ে নিশ্চিন্দি হ'লি।"

রাণু বিবর্ণ মুখে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, মন্দারও কিছুক্ষণ তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। রাণু যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মন্দারের কক্ষের জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সংসারের মধ্যে নিত্যকারের অশান্তি ডিঙাইয়া মনের মধ্যে রাণু মাঝে মাঝে যে মধুর স্পর্শটি অনুভব করিত, সে স্পর্শ ঐ মন্দারের ব্যবহারে, তাহার সহিত হাসিতে ও কথায়। কিন্তু কয়েক দিন হইতে সেই একটি মাত্র সান্ত্বনা-স্থল হারাইয়া বক্ষ হইতে দুর্নিবার ক্রন্দনের একটা ঢেউ আসিয়া যেন বারে বারে রাণুর কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিতেছিল।

রাণুর শয়ন-কক্ষের জানালা এবং মন্দারের শয়ন-কক্ষের জানালা হইতে এই দুইটি তরুণীর মধ্যে নিত্যকারের সুখ-দুঃখের আলোচনা, কথাও কাহিনীর মধ্য দিয়া উভয়ের মনে

সখিত্বের যে সেতুটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে যেন এতটুকু ফাঁকও ছিল না।

তাই ঘরে ফিরিয়া যখন মন্দারের কক্ষের বন্ধ জানালাটার দিকে দৃষ্টি পড়িল, তখন রাণুর মুখে কোনও শব্দই বাহির হইল না,—শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষ কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণপরে খোকাকে পুনরায় সুর করিয়া ঘুম পাড়াইবার ছড়া শুনাইতে লাগিল—

খোকা ঘুমাল' পাড়া জুড়াল' বর্গী-এল দেশে ;
চড়া পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে!

(৩)

বহুদিন পরে রাণুকে দেখিয়া যেদিন সত্যেন জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহার পরে মাস খানেক চলিয়া গিয়াছে। শয্যা-পার্শ্বের সেই জানালাটা বন্ধই থাকে, কারণ তাহার আদেশ। মন্দার এক-একবার সেই রুদ্ধ জানালাটার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়, কাহার ডাক শুনিতে চেষ্টা করে,—তাহার পরে সত্যেনের সম্মুখে পড়িলেই যে শুষ্ক মুখে সরিয়া আসে, তাহাও সত্যেনের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না ; অথচ সে যেন তাহা দেখিয়াও দেখে নাই, এমনি একটা ছলনার মুখে সে দিবারাত্রি স্ত্রীর নিকটে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে।

দিন ও রাত্রির মধ্যে অন্দরের, বিশেষ এই ঘরটার সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ; কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার জন্যও মন্দার কেন যে তাহার আদেশ অমান্য করিত না, ইহার আদি অন্তও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না ; বলিতে ইচ্ছা হইত—স্বামীর ইচ্ছা যদি এতদিন না মেনেও এসে থাকতে পার মন্দার, তবে এবারেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু বলিতে গিয়াও সে থামিয়া যায়, কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া উঠে।

এক একবার মনে হয়, সে নিজেই তাহার আদেশ খণ্ডন করিয়া জানালা খুলিয়া দেয় ; কিন্তু তাহার পরের কথা মনে পড়িতেই সে আড়ষ্ট হইয়া যায় ; মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পায়, মন্দারের দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিয়াছে সন্দেহের ছায়া। তীব্র দৃষ্টিতে সে যেন সত্যেনের হৃদয়ের তলদেশ দেখিয়া, অতীতের স্মৃতির রাজ্য ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাহাতে শুধু সত্যেনই নয়, পার্শ্বের বাড়ীর ঐ বিধবা বধূটি পর্য্যন্ত সেই সন্দেহের জালে জড়াইয়া পড়িয়া মৌন অসহায়ের দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; যেন, বলিবার মত তাহার আর কিছুই নাই।

সত্যেন শিহরিয়া উঠে ; মনে পড়ে পূর্ব্ব-পরিচিতা অনূঢ়া কিশোরী রাণুর কথা,—পার্শ্বের বাড়ীর বিধবা ছোট বৌয়ের কথা নয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সত্যেনের মনে হইল, মন্দার যেন শয্যাপার্শ্বের রুদ্ধ জানালাটার নিকট হইতে তাহার পদশব্দ শুনিয়া দ্বারের নিকটে সরিয়া আসিল। কিন্তু মুখে সে সন্দেহের ভাব প্রকাশ না করিয়া সত্যেন হাসিল ; প্রশ্ন করিল, "কি করছিলে ?"

মন্দার শুষ্কস্বরে জবাব দিল,—"মাথাটা বড় ধরেছে ব'লে শুয়ে ছিলাম।"

সত্যেন প্রশ্ন করিল—"তবে উঠলে যে ?"

মন্দার বলিল—"কয় দিন ধ'রে তোমার জন্যে খানকয়েক রুমাল সেলাই করবো মনে করছি, তা আর কিছুতেই হ'য়ে উঠে নি,—তাই মনে হল—" বলিতে বলিতে সে সরিয়া গিয়া জানালার পার্শ্ব হইতে সেলাইয়ের কলটাকে টানিয়া বারান্দার দিকে লইয়া চলিল।

সত্যেন প্রশ্ন করিল—"ওটাকে আবার টানাটানি বাধিয়েছ কেন ? বেশ তো ছিল।"

ম্লান হাসিয়া মন্দার উত্তর দিল—"বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধিকে! ঐ অন্ধকারের মধ্যে শেলাই করতে গিয়ে কি শেষে হাতখানাকেও খোয়াব ? আমি তা পারব না।"

সত্যেন এ কথার কোনও উত্তর দিল না, ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বারান্দা হইতে মেশিনের অবিশ্রান্ত শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল—ঘরর ঘরর ঘরর—।

ক্ষণ পরে সত্যেন ডাকিল "মন্দার!"

মন্দার সেলাই রাখিয়া উঠিয়া আসিল, বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আজ এখনও জেগে আছ যে ? দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরের বাঁধা গতের মত ঘুমটুকুও চটে গেল না কি ?"

শুষ্কস্বরে সত্যেন কহিল—"না—কিন্তু বলিহারির কথা

এইমাত্র কি ব'লছিলে না? সত্যিই কি জানালাটাকে বন্ধ ক'রে তোমার সেলাইয়ের অসুবিধা হচ্ছে?"

হাসিয়া ফেলিয়া মন্দার কহিল—"কথার ছিরি দেখ,—সত্যি, নইলে কি আর আমি তোমায় তামাসা করেছি না কি, না, ওই ভারী মেশিনটাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই আমার সখ উছলে পড়ছে?"

সত্যেন নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিল; তাহার পরে যেন কতকটা ঝোঁকের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"তবে জানালাটা খুলে দিলেই তো পারতে! হাতও তো আমি বন্ধ ক'রে দিয়ে যাই নি।"

মন্দার উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ছায়া গভীর ভাবে ভাসিয়া উঠিতেই সত্যেন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। দ্বিপ্রহরের খাওয়া দাওয়ার পরে মাঝের বাড়ীর বিশেষ করিয়া এই দিকটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ,—শুধু রন্ধন-বাড়ী হইতে বাসন মাজিবার শব্দ এবং দাসীদের কণ্ঠস্বর মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া কাণে আসিতেছিল।

হঠাৎ পার্শ্বের বাড়ীর এই দিককার ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের গর্জ্জন শুনা গেল "সবই তো খেয়েছিস্ সর্ব্বনাশি! তবু কি এখনও আশা মেটে নি! শেষে কি আমার ছেলেটাকেও গিলতে চাস্?"

সত্যেন চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিল না। মন্দারই কথা কহিল, বলিল—"ওতে চমকাবার বিশেষ কিছু নেই।"

সত্যেন প্রশ্ন করিল—"কেন?"

মন্দার উত্তরে জানাইল—"রাণুদির ভাসুরপোর খুব অসুখ কি না, তাই।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সত্যেন প্রশ্ন করিল—"ওটা বুঝি তোমার রাণুদিকে লক্ষ্য ক'রেই হ'চ্ছে?"

সম্মতি জানাইয়া মুখ তুলিতেই সে দেখিল সত্যেনের মুখের উপরে একখানা কালো ছায়া ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সত্যেন কহিল—"সত্যি—বড় হতভাগী।"

মন্দারও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"সেই জন্যেই তো বলে যে বিধবা হ'য়ে পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকার চেয়ে মরণও ঢের ভালো।"

সত্যেন শুধু নীরবে বসিয়া রহিল, স্ত্রীর এ কথায় কোনও জবাব দিল না; কিন্তু রাত্রে যখন গরমের ছলে সে নিজের হাতেই বহু দিনের রুদ্ধ জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন মন্দার আর নীরবে থাকিতে পারিল না,—ধীর স্বরে শুধু কহিল—"ওটা খোলার চেয়ে আর না খোলাই বরং ভালো ছিল।"

চমকিয়া সত্যেন প্রশ্ন করিল "কেন?"

তেমনি মৃদুস্বরেই মন্দার জবাব দিল—"ওই লাঞ্ছনা গঞ্জনার পরেও বেচারীকে যদি শুধু আমাদের জন্যেই আরও কিছু সইতে হয়, সেটা কি আমাদের দোষ নয়?"

"আমাদের জন্যে?"

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহারই কথার পুনরুক্তি করিয়া সত্যেন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল; তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে ঐ "আমাদের" মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাণুর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অবধি থাকে না!

(৪)

কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে।

রাণু দেখে, বন্ধ জানালা খুলিয়া গিয়াছে, আর বন্ধ থাকে না। মন্দারও আসিয়া দাঁড়ায়, ডাকে, গল্পও করে; কিন্তু, তেমন হাসি যেন সে আর হাসিতে পারে না, কোথায় যেন তাহার সে হাসির রত্ন হারাইয়া গিয়াছে।

রাণু শুধু অনুভব করে, মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে পারে না; যেন সঙ্কোচে, কুণ্ঠায় বাধে।

সামনা-সামনি ঘর; কক্ষ মধ্যে থাকিয়াই রাণু জানিতে পারে মন্দার গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতীক্ষায় জাগিয়া কাটায়।

সত্যেনেরও যে দিন দিন ফিরিতে বিলম্ব হয়, এবং এই বিলম্বের জন্য যে সে নানা কাজের অছিলায় স্ত্রীর নিকট হইতে আপনার দোষ স্খালনের চেষ্টা করে, তাহাও তাহার অজানিত ছিল না; কিন্তু সত্যেন অথবা মন্দারও জানিত না যে, তাহাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া আর একজন তাহাদের এই মনোমালিন্যের জন্য হৃদয়ে অনেকখানি বেদনাই বহন করে; এবং মন্দার যখন স্বামীর সকল অপরাধ ভুলিয়া যায়—তখন তাহার বক্ষ কম্পিত করিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসে।

সেদিন একাদশী।

সমস্ত দিনের উপবাস ও শ্রম-ক্লান্ত দেহে রাণু জানালার উপরে মাথা রাখিয়া নীরবে বসিয়া ছিল।

অন্ধকার গভীর রাত্রি, শুধু বাতাসের সন্ সন্ শব্দ ব্যতীত আর কোনও শব্দ কাণে আসিতেছিল না।

রাণু একবার মুখ তুলিয়া মন্দারের শয়ন-কক্ষের দিকে চাহিল; দেখিল আলোকোজ্জ্বল কক্ষে মন্দার একাকী বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে,—কিন্তু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে কাণে আসিল সত্যেনের কণ্ঠস্বর; সে জড়িত স্বরে গান ধরিয়াছে—

যদি বারণ কর তবে গাহিব না,
যদি সরম লাগে চোখে চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পায় বাধা,
তবে, তোমার ও ফুলবনে যাইব না॥

রাণু চমকিয়া উঠিল—মন্দার স্বামীকে প্রশ্ন করিতেছে, "তোমার কাণ্ডখানা কি, বল তো?"

সত্যেন পাল্টা প্রশ্ন করিল "কাণ্ডখানা? মানে?"

রাণু দেখিল মন্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া উষ্ণ স্বরে জবাব দিল—"এ কথাটাও যে আজ তোমায় বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে, তা আমি কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবি নি।"

সত্যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, "সত্যিই কি আমার পক্ষে এটা অন্যায় হ'য়েছে মন্দার?"

উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মন্দার দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না।

জানালার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে যাইতে রাণু শুনিল, সত্যেন বলিতেছে—"অন্যায়ই যদি হ'য়ে থাকে, তবে তার ক্ষমাও তো আছে; একবারই ভুল হয়, বড় জোর দুবার, কিন্তু তিনবারের বার তো আর ভুল হয় না মন্দার!"

রাণু নিঃশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের দুইটি কোণ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল দুই ফোঁটা জল।

* * * *

দিন দিন সত্যেনের শান্ত প্রকৃতি যে উগ্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহা মন্দারের অজানিত ছিল না; এবং অন্দরে ফিরিতে দিনের পর দিন, রাত্রি গভীর হইলেও সে সত্যেনকে আর একটা প্রশ্নও করিত না। সত্যেনও জবাবদিহির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। বাহিরে—বৈঠকে—বন্ধুমহলের আনন্দ কোলাহল, এবং মাঝে মাঝে নর্ত্তকীদের নূপুর ধ্বনির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেই আগ্রহ যে তাহার দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাহা শুধু মন্দার নয়, নিজেও সে বুঝিয়াছিল। কিন্তু মনের মধ্যে ইহার হেতু সে কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না।

স্বামীর অবহেলা এবং অনাদর সহিয়াও মন্দারের দিন কাটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যেদিন বাহির হইতেই বন্ধুদের সহিত শিকার করিতে সত্যেন দূর দেশে কিছু দিনের মত চলিয়া গেল, একবার অন্দরে আসিবার প্রয়োজনও মনে করিল না, সেদিন তাহার যাত্রার সংবাদ সরকার মহাশয়ের মুখে পাইয়া, মন্দার কিছুতেই চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া মুখ তুলিতেই দৃষ্টি পড়িল রাণুর শয়ন-কক্ষের দিকে।

কয়েক দিন হইতে রাণুর কক্ষের এ জানালা বন্ধ। ইহার কারণও মন্দার জানিয়াছে,—রাণুর অত্যন্ত অসুখ; সেইজন্য উপরের ঘর হইতে নীচের তলের একধারের একটি নির্জ্জন কক্ষ তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ, নিউমোনিয়া রোগটা না কি ভাল নহে।

একবার মন্দারের ইচ্ছা হইল, আজ সে জমিদার-বাড়ীর চিরাচরিত অবরোধের জাল ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যায় ঐ বাড়ীটায়,—যে ঘরে রাণু একাকী শয়ন করিয়া অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে ভগবানের কাছে তাহার এ জন্মের সমাপ্তি প্রার্থনা করিতেছে; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলে—"জীবন তো কারও সুখের নয় রাণুদি! জীবনের আরম্ভ এবং শেষের দিন কেউ জানলে যে কোনও মুহূর্ত্তেই হয় তো এ দোকানপাটের লটবহর ছারখার হয়ে যাবে; তবে এ প্রার্থনাই বা কেন?" কিন্তু মন এ কথা বলিলেও কাজে মন্দার তাহা করিতে পারিল না,—চিরদিনের কুণ্ঠা তাহাকে পাষাণ-প্রাচীরের মত ঘেরিয়া রাখিল। শুধু খবর লইয়া জানিল রাণুর অসুখ দিন দিন খারাপের পথেই চলিয়াছে।

* * * *

সপ্তাহখানেক পরে বাড়ী ফিরিয়া সত্যেন সাশ্চর্য্যে দেখিল, সদর হইতে দলে দলে কাঙালীগণ হাসি-মুখে বিদায় লইতেছে, এবং সদর ও অন্দরের মধ্যস্থ উঠানটিতে কীর্ত্তনের আসর বসিয়াছে।

ক্রুদ্ধ সত্যেন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল "বউরাণীর খেয়াল।" কোনও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে সত্যেন যখন আপনার শয়ন কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন মন্দার অন্যমনে রাণুর শয়ন-কক্ষের দিকে চাহিয়া ছিল। সত্যেনের পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই সে উষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করিল– "শুনলাম এ সমস্ত তোমার ইচ্ছায় হ'চ্ছে, সত্যি কি ?"

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া অচঞ্চল স্বরে মন্দার জবাব দিল "হ্যাঁ।"

সত্যেন কহিল "কেন ?"

মন্দার সজল চক্ষে কহিল—"যদি কেউ চিরজীবন যন্ত্রণা ভোগ করে' পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, আর তার মৃত্যুর পরে স্নান করে শুদ্ধ হবার লোকের অভাব না থাকলেও তার আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করবার লোক একজনও না থাকে, তাহ'লে—সেই কামনায় এই কয়েকটা টাকা খরচ করাও কি আমার পক্ষে অপরাধের বিষয় ?"

বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে সত্যেন কহিল—"বটে! কিন্তু মন্দার, যাঁর জন্যে হঠাৎ তোমার দয়ার সাগর এমন ক'রে উছলে উঠলো, তিনি তোমার কে ছিলেন শুনতে পাব' কি ?"

মন্দার উত্তর দিল—"রাণুদি।"

সত্যেনের দৃষ্টির সম্মুখের সমস্ত জিনিস মুহূর্ত্তের জন্য দুলিয়া উঠিতেই সে দৃঢ়-মুষ্টিতে টেবিলের এক পার্শ্বে চাপিয়া ধরিল;—ক্ষণপরে শুনিল কীর্ত্তনীয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছে—

"দুখিনীর দিন বৃথায় কেটেছে
ভাসিয়া নয়ন নীরে,
বহুদিন পরে পুন দেখা হ'লো
বঁধুয়া আইলে ফিরে ;—
প্রাণ ছিল তাই দেখা হ'ল প্রাণ বঁধুয়া
আইলে ফিরে—;
নইলে দেখা হ'তো না হে।"

পালামৌ

শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

চয়নপুর

পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পর্য্যন্ত আমার পালামৌ যাইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। এবার পূজার ছুটীতে প্রথম হোষ্টেল-জীবনের পর আমাদের অনেকগুলি কলেজের ছাত্রের বেশ আনন্দেই যাওয়া হইয়াছিল। কলেজ ২৩শে সেপ্টেম্বর বন্ধ হ'বার আগে তিন দিন কিসের একটা ছুটী পাওয়া গিয়েছিল। সেই সুযোগে আমি ভাগলপুরে আমাদের বাড়ীতে ঠাকুমার কাছে গিয়াছিলাম; কারণ, ছুটিতে আমাদের Patna Scienceএর Chemical tripএর সঙ্গে বাঙ্গালোর পর্য্যন্ত লম্বা পাড়ি দেবার কথা ছিল। ভাগলপুরে সে সময় ভাগ্যক্রমে একজন অন্যতম বাঙ্গালা সাহিত্যিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল বহু দিন পরে। প্রথম বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী, মজঃফরপুরে রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মূল-সভাপতিত্বে যাহার উদ্বোধন হইয়াছিল, সেখানে সাহিত্য-শাখায় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। মজঃফরপুরেই তাঁহাকে প্রথম দেখি; এবং পরে মোকামায় আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আবার বহু দিন পরে তাঁহার সহিত ভাগলপুরে সাক্ষাতে ভারি আনন্দ হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া

বাঙ্গলা এবং অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে দু'তিন ঘণ্টা কথা হইল।

দু'দিন পরে আমার চলে আসায় ঠাকুমা কোন রকমে প্রথমটা মত দিতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু অতদূর বাঙ্গলোর পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছা কিছুতেই আমায় আট্‌কাইতে পারিল না। আসিয়া শুনিলাম Trip ফিরিবে যেদিন কলেজ খুলিবে তা'র মাত্র দু'একদিন পরে। শুনিয়াই আমার প্রোগ্রাম নষ্ট হইয়া গেল। আমি ঠিক করিয়াছিলাম ৭।৮ দিনে বাঙ্গালোর ঘুরিয়া আসা অনায়াসেই হইবে এবং আমার পালামৌ যাবার যথেষ্ট সময় থাকিবে। মাত্র ১৯.২০ দিন এখানে পূজায় ছুটী। না, বাঙ্গালোর যাওয়া আর কোন মতেই হ'ল না শেষ পর্য্যন্ত। প্রথমটা দুঃখ খুব হ'লেও পালামৌ যাবার আনন্দে আবার মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিল।

কোয়েল নদীর ওপরে সাহপুর গ্রামের কয়েক মাইল দূরে চয়নপুর। পালামৌ জেলায় চয়নপুর একটী মস্ত বড় গ্রাম। কেহ কেহ 'চৈনপুর'ও বলে এবং ইংরাজিতে লেখা হয় CHAINPORE। 'চয়নপুর' নামটি কি করিয়া হইল, তাহা কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিলাম না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বুঝি কোন দেবকন্যা কোন এক অজানা অচেনা দেবতার জন্য পুষ্প চয়ন করিয়া সেখানে যুগযুগান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। চয়নপুর রাজবংশের কোন পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে জায়গাটির নামকরণ হইয়াছে কি না, সে খবরটিও কাহারও নিকট পাইলাম না। কোয়েল নদীর পাড় হইতে সাহপুর গ্রাম দ্বিখণ্ডিত করিয়া একটী পাকা রাস্তা চয়নপুর গ্রামের মধ্য দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে।

একদিন বাবা, আমি এবং বন্ধুবর শ্রীযুত গণপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গিয়াছিলাম চয়নপুর। পূজার সময়, তখন জল আছে বেশ নদীতে; তবে নৌকা খেয়াঘাটে বাঁধাই থাকে, পারাপার করে না। ডালটনগঞ্জ হইতে কত লোক চলিয়াছে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া। আমরাও তাহাদের মধ্যে নামিয়া পড়িলাম। আমাদের সাইকেল দু'টী এবং বাবার ঘোড়াটী সহিস ও দু'টী কুলিতে লইয়া চলিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি ততই কাপড় উঠাইতে লাগিলাম; এবং ক্রমে কাপড় হাঁটুর উপর উঠিলেও জল বাড়িয়াই চলিল। দিক্‌বাস পরার ভয় সকলের হয়েছিল। আমাদের সঙ্গীগুলির মত আমাদের জলের মধ্যে বালির উপর হাঁটা অভ্যাস না থাকায়, আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। আন্দাজে পথ ঠিক করিতে হইতেছিল; কারণ দু'হাত এপাশ ওপাশ হ'লেই হয় তো "একগলা গঙ্গাজলে" মরণ; না হয় গল্পের সেই হাতীটির মত চোরা বালিতেই পা আট্‌কাইয়া পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ছাড়া উপায় ছিল না। কোন রকমে আধঘণ্টা-টাক্ সময় লাগাইয়া আমরা নদী পার হইয়া সাহপুর

চয়নপুরের দেবালয়

গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে স্কুলের মাষ্টার সাহেবের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় দুজনেই "বহুৎ খুস্ হুয়া" দু'চার বার অনর্গল বলে বিদায় লইলাম সেই জোড়া মন্দিরটির পাশে। আমরা নিজ নিজ যানে চড়িয়া চলিলাম। সেই সময় একটী মস্ত উটের পিঠে অনেক বোঝা চাপাইয়া একজন লোক নদী পার হইবার জন্য যাইতেছিল। আমাদের ঘোড়াটি সেই অদ্ভুত জানোয়ারকে বোধ হয় "চীনের জুজু" মনে করিয়াই পিছু হাঁটিতে

আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়সূচক শারীরিক প্রক্রিয়াও দেখালেন। আমার ঘোড়ায় চড়া বিশেষ অভ্যাস নাই, ভয়ে তো আমি অস্থির—পড়ে বুঝি নর্দ্দমায়; কিন্তু বাবা হ'চ্ছেন ওস্তাদ ঘোড়-সওয়ার, সাম্‌লাইয়া লইলেন। রাস্তাটী সুন্দর, দু'ধারে পলাশ-বন। এই পলাশ গাছে 'লা' হয় প্রচুর। লাক্ষা হইতে চয়নপুর ষ্টেটের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। আমরা আগাইয়া চলিলাম। রাস্তাটি অনেকখানি বাঁকিয়া একটি মস্ত বড় বাঁধের মত জলার পাশ দিয়া
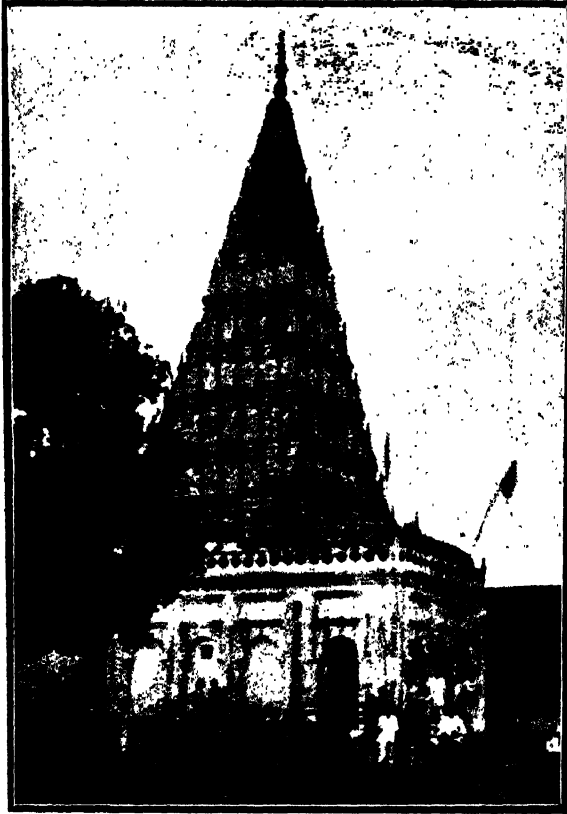
চয়নপুরের মন্দির

গিয়াছে। জলাটিতে কত রকম সাদা হল্‌দে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট মাছ এবং কত কি পোকা মাকড় ঠিক নাই কিল্‌বিল্‌ করিতেছে; দেখিয়া মনে পড়ে—ফরাসী একজন সাহিত্যিক, মোপাঁসার 'লভ' বলে একটী ছোট্ট গল্পে বহু দিন পূর্ব্বে পড়েছিলাম—The first germ of life vibrated in the stagnant muddy water. ক্রমে রাস্তাটী যাইয়া পড়িল চয়নপুর গ্রামের মধ্যে। দু'ধারে খাপ্‌রার একতলা, দু'তলা মাটির ও ইটের বাড়ী, এবং মধ্যে মধ্যে পাকা দালানও দেখলাম। বাড়ীর সম্মুখে এবং রাস্তায়ও দেখলাম কত 'বঁধুয়া। কাঁখে গাগরী লয়ে যায় সরে মৃদুমন্দ'। এখানে অবশ্য সরোবরের বদলে 'ইঁদারা'ই বেশী। কত বয়সের শিশু-রাস্তার উপর নির্ভাবনায় খেলা করছে। ছেলেমেয়েদের এখানে রাস্তায় বাহির হইলেই গাড়িঘোড়া চাপা পড়বার ভয় নাই। রাস্তার দু'ধারে অনেক স্যাকরার ও কাঁশারির দোকান দেখলাম। একটি মুদির দোকানের দাওয়ায় ছোট একটী শিশুকে লইয়া হুঁকা হাতে বৃদ্ধ দাদামশাই একখানি হিন্দী বর্ণ-পরিচয়ের পাতা উলটাইতেছিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোধ হয় আমাদের তিনজনকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান-কারীদের তিনটী দলভ্রষ্ট মনে করিয়া অনেকগুলি আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল।

চয়নপুরে 'দরি', সতরঞ্চ, এবং তামা পিতলের বাসনই তৈয়ারী হয় বেশী। ইহা একটী সুন্দর কেন্দ্রস্থানীয় ব্যবসায়। এখানকার লোকসংখ্যা একটী প্রকাণ্ড গ্রামেরই মত, ৩০৩৩ জন। আগামি সেন্‌সাসে জানা যাবে কত হইয়াছে দশ বৎসর পরে।

চয়নপুরের ঠাকুরাইদের বাসস্থান এই গ্রামে। এখানে চয়নপুর রাজার গড় আছে। পালামৌ ভ্রমণ করিতে আসিয়া পালামৌ ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট চয়নপুর রাজাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গড় প্রত্যেকেরই দেখিয়া যাওয়া উচিত। চয়নপুর-গড়ের অধিকারী রাজা ঠাকুরাই ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংহ মাত্র কয়েক বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার একমাত্র পুত্র চয়নপুর রাজ-কুল-তিলক কুমার ঠাকুরাই বিরিজদেও নারায়ণ সিংহ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কুমার সাহেব এখন অপ্রাপ্তবয়স্ক।

চয়নপুর রাজ্যের আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। গালা, জঙ্গল এবং কয়লার খনির দিক দিয়াও রাজ্যের আয় আছে। চয়নপুর রাজ্যে অনেক ধাতব পদার্থের খনি আছে শুনা যায়। ছোটনাগপুর manganese, lead ইত্যাদি oreএর জন্য বিখ্যাত সকলেই আশা করি জানেন। কয়লা পালামৌর প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া

যায়। পুরান Meteorological surveyএর রিপোর্ট এবং অনেক জায়গায় দেখিতেও পাওয়া যায় মাটির উপর, Graphite, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি। চয়নপুরের একটি কয়লার খনি সিংরায় দেখিতে গিয়াছিলাম। সিংরার মাইন্‌স্‌এর যথা স্থানে বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

বড় বড় জমিদারদের মতই চয়নপুরের জমিদারীর শাসন-ব্যবস্থা। কিন্তু উত্তরাধিকারী কুমার ঠাকুরাই এখন নাবালক বলিয়া Court of Wardsএর তত্ত্বাবধানে ম্যানেজার কর্ত্তৃক জমিদারীর কাজ চলে। চয়নপুর-রাজ- পরিবারের দানশীলতার কথা যথেষ্ট শুনা যায়। রায় ঠাকুরাই রঘুবরদয়াল সিংহ বাহাদুরের পুত্র ঠাকুরাই জগন্নাথদয়াল সিংহ ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন "The Certificate of Honour"। এই ঠাকুরাই সাহেবের পুত্র রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল সিংহ—has done several works of 'Public utility.' ৺স্বর্গীয় রাজা সাহেব চয়নপুরে একটী বিদ্যালয় এবং একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল সিংহের পুত্র রাজা ঠাকুরাই ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংহ প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া পালামৌ সদর হাসপাতালের সঙ্গে Sir Edward Gait নামে একটী মেয়ে হাসপাতাল করাইয়া দিয়াছেন। পালামৌর প্রথম প্রবন্ধেই Female Hospitalএর ছবি দিয়াছিলাম। পাটনার Medical Schoolটী Collegeএ পরিণত হইয়াছে সম্প্রতি। যুবরাজ ভারত ভ্রমণে আসিয়া Patna, Prince of Wales' Medical Collegeএর স্থাপনা করিয়া যান। এই কলেজে অনেক রাজা মহারাজারা দান করিয়াছেন। চয়নপুররাজ ৩০ হাজার টাকা—বিহার উড়িষ্যার মধ্যে একমাত্র ও সর্ব্বপ্রথম—মেডিকেল কলেজের স্থাপনে সাহায্য করেন।

চয়নপুরের রাজপরিবাররা ভারতের অনেক বড় বড় রাজা মহারাজার সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ আছেন। রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল সিংহের জ্যেষ্ঠ জামাতা হ'চ্ছেন Ruling Chief of Udaipore. সিরগুজার মহারাজা উদয়পুরের রাজার একজন নিকট আত্মীয়। মধ্যম জামাতা হচ্ছেন অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার মাল্লাপুরের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তৃতীয় জামাতা হচ্ছেন পঙ্ককোটের রাজার দৌহিত্র এবং ফৈজাবাদ জেলার মেলেথুর ঠাকুর। উপস্থিত নাবালক রাজার খুড়ামহাশয় ঠাকুরাই ব্রহ্মেশ্বরদয়া সিংহ ছিলেন বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য এবং এখন ইনি মুঙ্গের জেলার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। চয়নপুরের পূর্ব্বপুরুষরাও ছোট নাগপুরের বাহিরে রাজত্ব

চয়নপুরের দুর্গাপ্রতিমা

করিয়াছেন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে, হয় তো আজও তাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন।

আমরা কয়জন যখন রাজবাড়ীর সিংহদ্বারের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে। মস্ত বড় সিংহদ্বার; ইহার দক্ষিণে ও বামে ঘোড়ার আস্তাবল সারি সারি চলিয়া গিয়াছে। সহিস ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর ঘর বোধ হয় আস্তাবলের উপর, দ্বিতলে। এইটিই গড়ের সদর

দরজা। কুমার সাহেবের খুড়ামহাশয়, হারাজী, তখন ছিলেন না; শুনিলাম কয়েক দিনের জন্য মফস্বলে গিয়াছেন। আর একজন রাজবংশীয় গড়ে ছিলেন, তিনিই আমাদের আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমরা ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, মস্ত আঙ্গিনা। সোণার চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটির রকে তখন স্থানীয় লোকদের বেশ মজ্‌লিশ বসিয়াছিল; তাহাতে দু'একজন বৃদ্ধ ছাড়াও রাজ-ষ্টেটের হাসপাতালের বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুও ছিলেন তখন। ভদ্রলোকের নাম আগেই শুনিয়াছিলাম, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ দাস। দাস মহাশয় লোকটি বেশ মিশুক। সোণার-চূড়া মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল

কিশুনদহের ঝরণা

সিংহ। মন্দিরটির গঠন সুন্দর এবং সেটি খুব-উচ্চ। মন্দিরে আছেন শিবলিঙ্গ। মন্দিরের একেবারে মাথায় এক হাতের বেশী চূড়া সোণার পাতে মোড়া। এই মন্দিরের পাশেই ঠাকুরবাড়ী,—চয়নপুর রাজার দেবালয়। ঠাকুরবাড়ীর প্রবেশদ্বারটী খুব প্রশস্ত গেটের মতই। মন্দির-দ্বারের কারুকার্য্য চমৎকার, অতি সূক্ষ্ম। এই কারুকার্য্যটী সেকালের শিল্পের একটী মস্ত প্রমাণ। সম্মুখে প্রশস্ত উঠান সিমেণ্ট করা। গেটের দু'ধারে ফুলের গাছ খানিকটা আঙিনা বেড়িয়া রহিয়াছে। উঠানের পরই ঠাকুর দালানের বারাণ্ডা। বারাণ্ডায় অনেক ঝাড় লণ্ঠন ও সেজ ঝুলিতেছে দেখিলাম। বারাণ্ডার পরই ঠাকুর-ঘর। এখানে নারায়ণ, সীতারাম ও জগন্নাথ বিগ্রহগুলি আছেন। এখানে রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল সিংহের একখানি ফুল্ সাইজ প্লেটের ছবি দেখিলাম। এই দেবালয়টী কত পুরান তাহার স্থিরতা নাই। অনুমান, যখন গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সহিত দেবালয়—হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুটীরও আরাধনার আবশ্যক হওয়ায়, দেবভক্ত চয়নপুর রাজার পূর্ব্বপুরুষ এই দেবালয়ে এই কয়টী বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরই মত এখানে ঠাকুর গড়াইয়া দুর্গাপূজা হয়। প্রতি বৎসরই মহানবমীর দিন অনেকগুলি মহিষ বলি হইয়া থাকে।

ঠাকুর-দালানে অনেকগুলি নাকাড়া ('Kettle drum') আছে। মস্ত বড় বড় কয়েকটী নাকাড়ার শব্দও ভীষণ। বর্গীরা নাকাড়া বাজাইয়া লুঠ করিতে আসিত শুনিয়াছি। এই সব ঠাকুরের অনেকগুলি সেবায়েৎ আছেন। পূজারিরা অনেকেই জমি পাইয়াছেন এবং সিধাও পাইয়া থাকেন। সিধা লইবার প্রথা পালামৌতে একটা বিশেষত্ব। সিংহদ্বার পার হইয়াই অনতিদূরেই মস্ত উঠান এবং সম্মুখে উপবনের পর বন-জঙ্গল-পাহাড়। দক্ষিণে শিবের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুর-বাড়ী এবং বামে অফিস ও কর্ম্মচারীদের ঘরের পরই দরবার-ঘর। দরবার-ঘরের বারাণ্ডায় বাঘের মুখ, হরিণের শিং লাগান মাথা দেওয়ালে ব্র্যাকেটে আট্‌কান। এই ঘরেই রাজারা সিংহাসনে বসিতেন। এই ঘরের দেওয়ালে বড় বড় বাঘের চামড়া আঁটা আছে; ভাল ভাল সোফা, কৌচ এবং মাঝখানে সিংহাসন। সিংহাসনটীর সমস্তটী রূপার তৈয়ারী এবং সোণারও কাজ ইহাতে অনেক। সিংহাসনখানি পুরান হইলেও সযত্নে রক্ষিত বলিয়াই বোধ হয় নূতন মনে হয়। সিংহাসন বেশী দিনের নয়; খুব সম্ভব রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎদয়াল সিংহের রাজত্ব-কালেই প্রস্তুত। আজ বারংবার peacock throne-এর কথা মনে পড়ায় দুঃখ হইতেছে। দরবার ঘরের সম্মুখেই আঙিনার অপর পার্শ্বে অন্দরমহল। সিংহদ্বারের সম্মুখে আঙিনার অপর পার্শ্বে খোলা জায়গা। সেখানে ফুলের

বাগান এবং পুষ্করিণী আছে। এই বাগানে মৃত রাজাদের সময় চিড়িয়াখানার মত বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, ময়ুর ইত্যাদি খাঁচার মত ঘরে ছিল। বাগানের পরই অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গল। এইখান হইতে জঙ্গল মনে হয় যেন প্রাচীরের পার্শ্বেই। প্রকৃতির এ রূপ অতি মনোরম। এই জঙ্গলে সব আছে; হরিণ ময়ুর হইতে আরম্ভ করিয়া রয়েল টাইগারও আছে। মৃত রাজারা এই জঙ্গলে কত শিকার করিয়াছেন। বিহার লাটও এখানে শিকার খেলিতে আসেন। এখান হইতেই সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল। চয়নপুর ষ্টেটের অনেকগুলি ঘোড়া ও মোটর ছাড়া দুইটী হাতী আছে। হাতী না থাকিলে বাস্তবিক রাজা বলিয়া মনেই হয় না।

এই চয়নপুর রাজাদের নিজেদেরই একটী সুন্দর ইতিহাস আছে। চয়নপুরের ঠাকুরাই চেরো রাজাদের দেওয়ানের বংশধর। এখন চয়নপুর রাজ্যের অধিকারী হচ্ছেন নাবালক ঠাকুরাই কুমার বিরিজদেও নারায়ণ সিংহ। ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজপুতের বংশধর। এই চন্দ্রবন্সী রাজপুতদের বলে—ছত্রী চন্দ্রবংশী। এই বংশীয় একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম রাজা দোশাসন সিংহ। দিল্লীর তিন শত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিজের পৈত্রিক বাসস্থান সুরপুর হইতে আসিয়া রাজা দোশাসন সিংহ সম্রাটের অধীনে কার্য্য লইয়া "became a commander of the Imperial forces." দিল্লীর দরবারের পরে Laxmichand Dossabhai Shaএর লেখা এবং রাজকোটের The Kathiawar Printing Works হইতে Royal editionএর দ্বিতীয় খণ্ড, 'The Prince of Wales and the Princes of India' পুস্তকখানিতে লেখা আছে, "The Emperor granted him the whole of the kirat Parganas, along with other jagirs. He, in his old age, retired to Benares, the holy pilgrimage of the Hindus, to lead a retired life, while his son Raja Sarangdhar migrated to the district of Shahabad, and managed to secure the Royal grant of the Talukas of Dhandanda and Tilanthu and possessed the strong fortress of Rohtas." সারংধর ধানদান্দায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা মাথেন সিংহ (দেওসাহী) পরে রাজা হন। ইঁহার দুই পুত্র ছিল, রাজা হেমসাহী ও ঠাকুরাই পুরণ মল। দেওসাহীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হেমসাহীকে দিল্লীর সম্রাট তিলথুর রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। Band Gazetteerএ আছে, রাজা দোশাসনের পুত্র সাধারণ সিংহ সাহাবাদে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণ সিংহ রোটাশ দুর্গের শাসনভার পাইয়াছিলেন এবং Dhandans and Tilothu তালুক দুইটীও পাইয়াছিলেন। তিনি Dhandansএ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মাথেন সিংহ, যিনি পরে দেওসাহী নামেই বেশী পরিচিত, তিনিই পরে উত্তরাধিকারী হন। সম্রাটের সৈন্য দ্বারা বিতাড়িত চেরো রাজা ভাগবৎ রায়কে ইনি স্থান দিয়াছিলেন। দেওসাহীর পুত্র ঠাকুরাই পুরণমল ভাগবৎ রায়ের সঙ্গে পালামৌ আসিয়া তাঁহাকে রাজ্য পাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন এই সর্ত্তে যে, পুরণ মলের এই কার্য্যের জন্য তাঁহার বংশধরের পালামৌ-শাসনে রাজা ভাগবৎ রায়ের বংশধরদিগের মধ্য হইতে রাজা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা চিরকাল থাকিবে।

শ্রীযুত সাহ লিখিয়াছেন, রাজা দেওসাহীর রাজত্বকালে The Chero Chief রাজা ভাগবৎ রায় সাহাবাদের ক্ষত্রিয় রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাহাবাদের রাজা দিল্লীর সম্রাটের শরণাপন্ন হন। ভোজপুরে সম্রাটের সৈন্য চেরো রাজাকে পরাস্ত করে। রাজা ভাগবৎ রায় তখন রাজা দেওসাহীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা দেওসাহী চেরো রাজার সাহায্যার্থ নিজের কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুরাই পুরণ মলকে ভাগবৎ রায়ের সঙ্গে পালামৌ পাঠান। রাক্ষেল রাজপুতরা তখন পালামৌ শাসন করিতেন। Mr. Gupta তাঁহার Chotonagpur Itihasএ বলেছেন যে পুরণ মল চেরো রাজা ভাগবৎ রায়ের সঙ্গে পালামৌ আসেন এবং চেরো রাজার মন্ত্রী ছিলেন; যখন চেরো-রাজারা 'নষ্ট ভ্রষ্ট' হইয়া গেলেন, তখন চৈনপুরের পূর্ব্বপুরুষ একজন আসিয়া চৈনপুরে বাস করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরাই পুরণ মল চেরো রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন কি না শ্রীযুত গুপ্ত ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। শ্রীযুত সাহ বলেছেন যে পুরণ মল "Secured an oath to the effect of an agreement that from the date it would rest

with him and his descendants to select the future chief from the descendants of the Chero Chiefs and that henceforth the Thakuraics only would be the general Managersi. e. the Sarbarakhars of his Raf. তদনুযায়ী ঠাকুরাইরা চেরো রাজাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়া আসিতেছেন এবং নিজেরাও তাঁহাদের Sarabarakhars হইয়া আসিয়াছেন, চেরো রাজা চূড়ামণ রায়ের সময় পর্য্যন্ত। ঠাকুরাইরাই সাধারণতঃ দিল্লীর দরবারে যাইতেন "to represent their masters" এবং এই সকল সৎকার্য্য ও প্রভুভক্তির জন্য অনেক জায়গীর পাইয়াছিলেন। ঠাকুরাই পুরণ মল চয়নপুরেই থাকিতেন এবং এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধররা সেইখানেই আছেন। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে কিরাৎ সিংহ, হেমন্তসিংহ, নেটুলাল সিংহ এবং আরও অনেকে দিল্লীর বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন "By their general proficiencies, military skill and faithful discharge of duties, and they were allowed the special privilege of attending the Imperial Darbar at Delhi, a high distinction at that time enjoyed only by the few ruling chiefs."

মিঃ ট্যালেণ্টস্‌ও মোগল সম্রাট কর্তৃক ইহাদের ক্ষমতার অনুমোদন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Which conferred on the heads of the house the honour of a place near the Imperial throne and also made them several jagir grants; farmans of the Emperor Alamgir, Muhammad Sha, and Farrukhsiyar making these grants are still in existence."

চয়নপুর রাজবংশের একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম ঠাকুরাই অমরসিংহ। ইনি ঠাকুরাই কিরাৎ সিংহের পুত্র। অমর-সিং ১৭২১ সালে একদল বিদ্রোহীর নেতা হইয়া পালামৌর রাজা রঞ্জিৎ রায়কে একটী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জয়কিশুন রায়কে রাজা করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি রাজা রায় কৃষ্ণ রায়কে সিংহাসনে বসান। পিণ্ডারীরা একবার পালামৌ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় অমরসিংহ তাহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শত্রুদের নিকট হইতে একটী নাকাড়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই পিণ্ডারীদের নাকাড়াটী আজও চয়নপুরের রাজবাড়ীতে আছে। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বক্তারসিংহ মারা যান এবং তাঁহার পৌত্র জয়নাথ সিংহ উত্তরাধিকারী হন। Bengal District Gazetteerএ আছে "On his death dissension again broke out."

রাজা ঠাকুরাই সানাথ সিংহকে হত্যা করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নাথ সিংহ একদল সৈন্য লইয়া রাজা জয়কিশুন রায়কে চেৎমা পাহাড়ের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। যুদ্ধে রাজা মারা গেলে চিত্রজিৎ রায়কে ১৭৬৮ সালে 'গদ্দিতে' বসান হইল। মিঃ সাহ বলেন "Dissensions broke out in Thakurai Sanath Singha, a nephew of Bakhtawar Singha, was treacherously murdered by the Raja." ইহার পরই পালামৌ ব্রিটিশদের হাতে আসিল।

ব্রিটিশ পালামৌ অধিকার করিলে ঠাকুরাই দেওয়ানী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮০২ সালে ব্রিটিশ সৈন্য সিরগুজা অভিযান করিলে ঠাকুরাই রামবাকস্ সিংহ সঙ্গে গিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালের কোল বিদ্রোহে রঘুবর দয়াল সিংহ ব্রিটিশের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলে তাঁহাকে ২৬টী গ্রাম ইমান্‌-ই জাইগীর স্বরূপ দেওয়া হয় এবং তিনি একটী 'খিল্লাৎ' ও রায় বাহাদুর উপাধিও গভর্নমেণ্টের নিকট পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজ্যের সূত্রপাতের সময়েই হোরিল সিংহের অধিনায়কত্বে একদল বিদ্রোহী দমন করিতে জয়নাথ সিংহের পুত্র গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সাহ বলেন, এই সব কার্য্যের জন্য হারুন্দা, কাণ্ডানা ইত্যাদি গ্রাম ঠাকুরাই জয়নাথ সিংহের পুত্র পাইয়াছিলেন "with Royal Parwana" তাঁহার পুত্র ঠাকুরাই ছত্রধারী সিংহ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং নিজে লাতেহারের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরাই ছত্রধারী সিংহের পুত্র হচ্ছেন ঠাকুরাই রঘুবর দয়াল সিংহ; ইনিই গভর্ণমেণ্টকে ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহে সাহায্য করিয়া জায়গীর পাইয়াছিলেন।

রায় ঠাকুরাই রঘুবর দয়াল সিংহ বাহাদুরের উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার পুত্র, ঠাকুরাই জগন্নাথ দয়াল সিংহ। ইনি ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে যথেষ্ট সাহায্য

করিয়া "The certificate of Honour" পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎ দয়াল সিংহ গভর্ণমেণ্ট হইতে 'রাজা' খেতাব পাইয়াছিলেন। রাজা ঠাকুরাই জনসাধারণের উপকারের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তিনিই চয়নপুরে হাঁসপাতাল ও স্কুল স্থাপনা করেন। ইনি অত্যন্ত সাহসী ও ভাল শিকারী ছিলেন। শুনা যায়, তিনি বাঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাত্র কয়েক হাত দূর হইতেই বন্দুক চালাইতেন। সমস্ত পালামৌর লোক এবং বাহিরেরও অনেকে রাজা ঠাকুরায়ের শিকার-পটুতার কথার এখনও উপমা দিয়া থাকেন। কোন্ আদিম কাল হইতে মৃগয়া রাজাদের জীবনের একটা মস্ত বড় 'হবি' হইয়াছে, আজ তাহার খবর লইতে হইলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া উপায় নাই। ইনি ছোটনাগপুর ডিভিজনের পক্ষ হইতে দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং অনেকগুলি পদক পাইয়াছিলেন। হাবলধারীবাবু বলেন, রাজা ভাগবৎ দয়াল সিংহ এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি খুব চতুর, ও সরকারের মিত্র এবং ইহার পুত্র রাজকুমার ব্রহ্মেশ্বর দয়াল সিংহও পিতার অনুরূপ। রাজা ঠাকুরাই ভাগবৎ দয়াল সিংহ ১৯১৮ সালের ১৮ই জুন পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র রাজা ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংহ চয়নপুর রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হন। জনসাধারণ রাজা ঠাকুরাই ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংহকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ইনিই প্রায় ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন বলিয়া আজ ডালটনগঞ্জে সুন্দর জানানা হাসপাতাল হইয়াছে।

রাজা ঠাকুরাই ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংহও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৯২২ সালে 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং সেই বৎসরই ৩০শে নভেম্বর তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে। রাজকুমারের নাম কুমার বিরিজ দেও নারায়ণ সিংহ। রাজা ঠাকুরাই তাঁহার পিতার ন্যায় একজন শিকারী ছিলেন। ইনিও শিক্ষিত ছিলেন। ইনি পালামৌতে "লালজী" নামেই প্রসিদ্ধ এবং ইঁহার আর এক ভায়ের নাম "হীরাজী"। রাজা ঠাকুরাই, পালামৌর সর্ব্বজন-প্রিয় লালজী ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করেন। এখন সমস্ত চয়নপুর রাজ্যের মালিক হচ্ছেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমার ঠাকুরাই বিরিজ দেও নারায়ণ সিংহ। কুমার সাহেব মাত্র অষ্টম বর্ষীয় হইলে কি হয়, দেখিলে মনে হয় খুব বুদ্ধিমান।

চয়নপুর গড় হইতে আধ মাইল দূরে ষ্টেটের ডাক্তারখানা। সেখান হইতে "কিশুন্-দহ", একটী দেখিবার জায়গা, প্রায় এক মাইল। Lord Minto যে সময় চয়নপুর আসিয়াছিলেন সেই সময় ডাক্তারখানার উদ্বোধন হইয়াছিল।

আমরা 'কিশুনদহ' দেখে এসেছিলাম। ঝরণাকে এখানে 'দহ' বলে। বড় বড় উপলখণ্ডের আশ পাশ দিয়া প্রবাহিত—

স্তব্ধ বনে জাগিয়ে সাড়া ঝরঝরাণির গান গেয়ে
কোন সুদূরের নীল সায়রে মিশিয়ে যাবার আগ্রহে
নামছে ধীরে একলা পথে শিলাস্তূপের পাশ দিয়ে।

পরিষ্কার জল কাকচক্ষুর মতই, সুস্বাদুও তেমনি। জলের নীচে পর্য্যন্ত সব দেখা যায়। পাথরের কাছে জলের ঘূর্ণিগুলি দেখে মনে যেন উচ্ছ্বাসে গুমরে উঠছে—

শুভ্র-তরল রজত ধারার দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসি,
হাজার পরীর রূপ পেয়ে সে গুম্‌রে মরে উচ্ছ্বাসি।

কিশুনদহের জন্ম-কাহিনী কেহই লেখেন নাই সত্য, কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ এদের জন্মকথা পৃথ্বীবাসীদের শুনিয়ে গিয়েছেন—

বরফ মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগত নায়ে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে;
সুড় সুড়িয়ে, গুড় গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে,
গড়্ গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে।

কিশুন্দহের পাশে আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম কবি Wordsworth ও তাঁহার বৃদ্ধ স্কুল মাষ্টার Matthewর মতই। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর যেন পাগ্‌লা ঝোরার ভাষা শুনিতে পাইলাম—

তোমরা কি কেউ শুন্‌বে নাগো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ-গাথা,
পাগল বলে কর্ব্বে হেলা? কর্ব্বে হেলা মর্ম্ম ব্যথা?
জন্ম আমার 'পাহাড়'পরে' কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গা দিদির পাগল ভাই।

ইহার কলধ্বনি যেন অন্তহীন এক মূর্চ্ছনায় আকাশ বাতাস আন্দোলন করিয়া কি অভিযোগ করিতেছে। আমার মনে হচ্ছিল, আমরাও কি পাগ্‌লা ঝোরার পাগল

নাটে নিত্য নূতন সঙ্গীগুলির অগ্রগণ্য ? পাগলা ঝোরার ধারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাহিতে ইচ্ছা হয়—

হাস্য করে লাস্য ভরে তুলছে মধুর মঞ্জু-তান।
ঝর্‌ঝরানি ছন্দ ধারা! মিষ্টি মধু গুঞ্জ গান॥
দোদুল দুলে নৃত্য তালে নাচছে বন-অঙ্গনে।
স্বপ্ন পুরীর একশ নটীর মধুর নূপুর নিক্কনে॥
দক্ষিণ হাওয়ায় অঞ্চল তার উড়ছে চল-চঞ্চলি।
শত হাসির উচ্ছ্বাসে সে উঠছে কল-কল্লোলি॥
কান্না-হাসির দোল দোলানো মন-ভোলানো অন্তরে—
ঝরঝরানি গান গেয়ে সে প্রাণ কেড়ে নেয় মন্তরে॥

এখান হইতে লাদি মাইল দুই হইবে। লাদি একটী ছোট গ্রাম। এখানে একজন জমীদার আছেন। কুমারসাহেব জমীদারকে এখানে সকলে কুমারসাহেব বলে। লাদির কর্ত্তা হচ্ছেন শ্রীযুত বাবু অম্বিকাপ্রসাদ সিংহ। কুমার সাহেবের 'গড়' নেহাৎ ছোট নয়। কুমার সাহেবের মোটর ও একটী হাতী আছে। জমীদারীর আয়ও যথেষ্ট আছে।

পালামৌতে শুধুই নদী, পাহাড়, জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে দু'একটী সুখ সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রাম!

আবার সেই রকম হুড়াহুড়ি করিতে করিতে আমরা পাটনায় আসিয়াছিলাম। ট্রেনে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রফেসার অবনী ব্যানার্জি মহাশয়ের এক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। শুনিলাম অধ্যাপক মহাশয়ের এক ভাগ্নে শ্রীঅশোক মুখার্জি এবার পূজায় কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত সাইকেলে গিয়াছিলেন। তরুণদের এ খেয়াল দেখে কার না আনন্দ হয়?

আমরা আবার ফিরে এলাম কর্ম্ম-ক্ষুব্ধ জীবনের মাঝে পাটনায়। আমিও এসে উঠলাম পাটনা মাইন্‌স কলেজের হোষ্টেলে—Cavendish House এ।

মরণ ভোল

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

"শৃণোতু যো বা মরণাৎ বিভেতি"

ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, মরণ ভোলা চাই, জরা-মরণ ভুলিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করা চাই, যাহা কিছু প্রাণ-ধারণের উপযোগী তাহা অর্জ্জন করা চাই; যে তাহা করে, সে প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান্। যে বয়সে এই উক্তি পড়িতে হয়, তখন স্বপ্নেও জরার দুঃখ মনে আসে না, মরণ-ভয়ের জুজু দেখা দেয় না; কাজেই সেই উপদেশের বাণী মনে ধরে না, স্মরণে থাকে না। বুড়া যখন মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে তাহার দিন ফুরাইয়াছে, তখন এ উক্তি তাহার কাছে নিরর্থক—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

সাধারণ কথা এই—মানুষেরা মরিতে চায় না, মরণকে ডরায়, অতি দুঃখেও কত বুড়া এই পরিচিত পৃথিবীকে আর এখানকার বাঁধা ঘরের ভালবাসার পদার্থকে ছাড়িতে চায় না। সেই অক্ষম ও দুর্ব্বল বাঁচিয়া কি করিবে জানে না, তবুও বাঁচিতে চায়। অন্য দিকে আবার এ কথাও খানিকটা সত্য, কেহ কেহ দুঃখে বা অভিমানে ভাবে—মরিলে বাঁচি,—চোখ বুজিলে সকল জ্বালা জুড়ায়। এমন লোকও অনেক আছে যাহারা এই চিন্তায় বা ভাবের স্বপ্নে আঁৎকাইয়া ওঠে যে অমর হইতে হইবে,—এই জীবনের অভিজ্ঞতার বোঝা চিরকাল বহিতে হইবে—একদিন চোখ বুজিয়া সকল সুখ-দুঃখ ভুলিতে পারিবে না। চির জাগরণের স্বপ্ন মরণের ভয়ের মত বিভীষিকা। দেখিতে পাই বটে, কেহ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কেহ চায় না; তবে ইসপের গল্পের যম কাছে ঘনাইলে প্রায় সকলকেই বলিতে হয়—জীবনের বোঝা নিও না, আবার মাথায় তুলিয়া দাও।

মানুষ-সৃষ্টির প্রায় প্রথম দিন হইতে নিদান পক্ষে পাঁচ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষেরা মরণের ভয়ে জড়সড় হইয়া উহার ছায়া দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া আসিতেছে। এই যন্ত্রের শরীর, এই সুখ-ভোগের শরীর, এই বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও

আশা মাটীতে মিলাইবে বা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, এ চিন্তা লোক-সাধারণে পুষিতে পারে না, সহিতে পারে না। জীবনের প্রতি মানুষের যে মৌলিক টান আছে তাহার নিগূঢ় ঝোঁকে সে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, স্বপ্নে যখন অশরীরী হইয়া নানা স্থানে নানা কাজ করা যায় ও দুর্গম স্থানে যাওয়া যায়, তখন আমাদের মধ্যে একটা অশরীরী আমি আছে, যে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, মরণে মরে না। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া পাঁচ লক্ষ বৎসরেরও আগে পাহাড়ের গুহায় মৃতের শরীর পুঁতিয়া মৃতের ও পারের ভোগের জন্য কত কিছু ভোগের সামগ্রী মৃতদেহের কাছে পুঁতিয়া রাখা হইত। সে বিশ্বাস মানুষের সমাজে আজও আছে। এ দেশের শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানের মত, শ্মশান-ঘাটে পারের কড়ি দেওয়ার মত ও ভোগের সহচরী করিয়া মৃতের পত্নীকে চিতায় পোড়াইবার মত নানা রকমের আয়োজন পৃথিবীর নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়; হয় ত এখন লোকে বিশ্বাস করে না যে, মানুষের আত্মার মত পারের কড়ির আত্মাগুলি বা পিণ্ডের আধ্যাত্মিক রসটুকু ওপারে গিয়া পৌছায়, কিন্তু তবুও প্রাচীন বিশ্বাসের অনুযায়ী প্রথা সমাজে রহিয়াছে।

এই মানুষের মধ্যে একটা স্থায়ী মানুষ আছে বা আত্মা আছে—এই বিশ্বাস বা ধারণা সারা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রবল। সে আত্মা শরীরের মাল-মসলায় গড়া নয়, ইহাই মৌলিক ধারণা; তবে উহার রূপের ও প্রকৃতির বিবরণ অনেক সাহিত্যে ও প্রবাদে পাওয়া যায়। এ দেশের প্রাচীন কালের নানা বর্ণনার মধ্যে একটা বর্ণনা এই, সে আত্মা অবয়বে হাতের বুড়া আঙ্গুলের মত, আর শরীর ধ্বংস হইলে মাথার চাঁদি ফাটাইয়া বা ফুটা করিয়া চলিয়া যায়; সেই জন্য মাথার সেই স্থানের নাম হইয়াছে ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহা ছাড়া এ ধারণাও আছে যে, আত্মাকে ধরিতে পারা যায় না বটে, তবে তাহার রূপ হুবহু বাহিরের শরীরের মত; আর সেই রূপধারী ও সূক্ষ্মশরীরধারী আত্মাকে বেড়িয়া আছে ঠিক ঐ রকমেরই সাতটা খোসা। জ্ঞানে অভিমানী থিয়সফিষ্টেরা এ দেশের সেই ধারণার অনুরূপ আত্মাকেই মানেন ও সেই রকমের সূক্ষ্ম শরীরে অনেক মৃত লোকের আত্মাকে দেখিতে পান বলেন। এ দেশে ও অন্য নানা দেশে আত্মা সম্বন্ধে আরও অনেক রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল ছেলেমানুষি খেয়ালি কল্পনার তলায় এই মূল বিশ্বাসটি আছে অটল যে, ক্ষয়শীল শরীরের মধ্যে আছে এক অক্ষয় আত্মা। এ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, একটা আত্মার সঙ্গে জুড়িয়া হউক, আর না জুড়িয়া হউক, এই মাটীর শরীরটিকে এক সময়ে মানুষে খাঁটি ক্ষয়শীল মনে করে নাই। মরণ-কথার প্রসঙ্গে তাহা বলিতেছি।

চিরদিন মানুষ চলিয়াছে অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বহিয়া মরণকে ডরিয়া ও মরিতে না চাহিয়া। কিসে মানুষের ধাতু বা ধাত্ বদ্লাইয়া তাহাকে অমর করা যায়, না হয় নিদারুণ পক্ষে বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনীয় আয়ু পাওয়া যায়, অর্থাৎ "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" কথাটি ঠিক থাকে, তাহার জন্য এ কালের জীবন-বিজ্ঞানের সাধক পণ্ডিতেরা বহু চেষ্টায় নানা পরীক্ষা করিতেছেন। বুড়ার শরীরে বাঁদরের "গ্লাণ্ড্" ঢুকাইয়া তাহাকে জোয়ান করিবার অনেক পরীক্ষা চলিতেছে। অতি সেকালের মানুষেরা গভীর দুঃখে ভাবিয়াছিল, কেন তাহাদের আকাঙ্ক্ষার শরীর, ভোগের শরীর ফুরাইয়া যায়, আর এই পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থাকে। এ চিন্তায় এই মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, মানুষের মরণ তাহার পাপের দণ্ড। দেবতা মানুষকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সে অবাধ্য হইয়া তাহা করে নাই ও তাহার ফলে তাহাদের নারী জাতি ইচ্ছায় মানস সন্তান না পাইয়া গর্ভধারণের ক্লেশ সহিবার অভিশাপ পাইয়াছিল, আর সারা মানুষের ভাগ্যে মরণের অভিশাপ আসিয়াছিল। প্রকারান্তরে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই মরণের এই ইতিহাস পাওয়া যায়, ও মনুর মত মানসপুত্র না পাইবার কারণ পাওয়া যায়, তবে বাইবেলের জন্ম-মরণতত্ত্বে এই তত্ত্বটি আছে অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত। আমরা এখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, মানুষ সৃষ্টির আগে যখন গাছ পালা ও পশু পক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সকল দেশের শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে, তখন বুদ্ধি বেশি প্রখর না থাকিলেও মানুষেরা এক সময়ে জন্ম মরণের এমন বোকাটে তত্ত্ব খাড়া করিল কেন! গাছ পালা জন্মিত, বাড়িত,

মরিত, আর তাহা ছাড়া অধিকতর প্রত্যক্ষ ছিল জীব জন্তুর গর্ভধারণ, জন্ম ও মরণ। তাহারা ত পাপ করিয়া পাপের দণ্ড পায় নাই, তবে তাহারা ভব যন্ত্রণা বা জন্মের যন্ত্রণা বা গর্ভধারণের ক্লেশ পাইল কেন, আর মরণ ভুগিতেও বাধ্য হইল কেন? তাহার মানে এই, মানুষেরা গভীর স্বার্থ-বুদ্ধিতে আপনাদের কথাই ভাবিয়াছিল, আর নিজেদের কথা ভাবিবার সময় পরের দিকে তাকাইবার কৌতুহল ও বুদ্ধি পায় নাই।

এ দেশে এক সময়ে কেহ কেহ যখন দেখিয়াছিল যে, নাকে বাতাস না টানিলে প্রাণ বাঁচে না, শ্বাস বন্ধ হইলে মরণ ঘটে; ও আরও যখন দেখিয়াছিল যে পরিশ্রম করিলেই হাঁৎ-ফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়, তখন এই কৌশল খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে কিসে হাঁৎ ফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসের পুঁজি খরচ হইয়া না যায় ও কিসে নিশ্বাস টানিবার একটা নিয়ম গড়িয়া নিশ্বাসকে অশেষ করা যায়; অর্থাৎ প্রাণটাকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখা যায়। বাঁচিবার জন্য মানুষের আছে প্রাকৃতিক মৌলিক টান; তাই সে আগ্রহে এ কৌশলের পরীক্ষা করিয়াছে। এ সাধনায় কেহ অমর হয় নাই বটে, তবে অন্যান্য প্রাণ পোষা সংস্কারের বেলায় যাহা ঘটে এখানেও তাহা ঘটিয়াছে; মনে করিয়াছে ঠিক যেমন করিয়া শ্বাস টানার কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করা হয় নাই। এই কৌশলের শিক্ষকেরা বা গুরুরা বুঝাইয়াছেন যে ঐ রকমের সাধনায় কেহ কেহ যুগ যুগান্তর বাঁচিয়াছেন ও কেহ কেহ বা অমর হইয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। মরাটা যখন দুর্ভাগ্য, তখন এ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অপ্রত্যক্ষ ঘটনাকে অনেকে খাঁটি সত্য বলিয়া মানিয়াছিল, অথবা এখনও অনেকে মানে। সকল দিক দিয়াই দেখি, না মরিবার সাধনাই মানুষের বড় সাধনা।

শরীরকে মানুষে যে আকাঙ্ক্ষায় অমর করিতে চাহিয়াছে, সে আকাঙ্ক্ষার বীজ নিশ্চয়ই আমাদের শরীরের মৌলিক ধাতুর মধ্যে গূঢ় ভাবে আছে। শরীরের ইতিহাস পাইলেই সেই ইতিহাস পাইব। এই শরীরের ইতিহাস পাই জীবনবিজ্ঞানের (Biology) আলোচনায়। শরীরের সেই সত্যকার ভিত্তি বুঝিবার পর আত্মার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়; তবে তাহার আগে মানুষেরা বাঁচিয়া থাকিবার নিগূঢ় টানে নিছক কল্পনার খেয়ালে যে তত্ত্ব বা ফিলসফি গড়িয়াছে, তাহার অসারতা আগে বুঝিয়া নেওয়া ভাল। কুসংস্কারের আঁধার না গেলে সেই সত্যের আলোকের আভাস পাওয়া যাইবে না, যাহা মানুষের আত্মাবিষয়ক ধারণার মূলে স্থির ভাবে আছে।

যাহারা মরিয়া সূক্ষ্ম আত্মা হইয়া থাকার চেয়েও না মরিয়া এই শরীরটাকেই তাজা রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাতেই ঠিক ধরা যায়, কেন মানুষেরা চিরজীবন কামনা করে। মানুষেরা সশরীরে চিরজীবী হইতে চাহিয়াছিল এই জন্য যে, তাহারা যে সকল ভোগের সুখ চায় ও আনন্দের উচ্ছ্বাস চায় তাহা এই শরীরযন্ত্র খসিয়া পড়িলে পাইবার আশা করিতে পারে নাই। আমার শরীর আছে, তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের আনন্দ আছে। শরীর ধ্বংস হইলে সূক্ষ্ম আত্মার সেরূপ ভোগের কামনা ও পরিতৃপ্তির সুখ থাকিতে পারে না। প্রেমের বেলায়ও সেই কথা। শরীর আছে বলিয়াই যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, সেইরূপ আমাদের শরীরের প্রকৃতির ফলেই প্রেমের জন্ম। আমরা বাড়িয়া উঠি মা বাপের কোলে বসিয়া, সখা সহচরদের সঙ্গে খেলা করিয়া ও ঝগড়া করিয়া ও অন্য রকমে পরের মুখ চাহিয়া। বয়সে আমাদের শরীরের অবস্থায় যৌন আকর্ষণ বাড়ে, আর সেই আকর্ষণে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ঘটাই ও বংশ বাড়াইয়া জীবনে প্রেমের মহাকাব্য রচনা করি। যে প্রবৃত্তির স্থায়ী মূল এই শরীরযন্ত্রে, সে মূল যখন একেবারে যন্ত্রখানি গেলেই শুকাইয়া মরিতে বাধ্য, তখন আর কেমন করিয়া শরীর-নাশের পরে সেই প্রেমের উৎসবের আনন্দ ভোগ করিবার তৃষ্ণা থাকিতে পারে? পরের মুখ চাহিবার প্রয়োজন এই শরীর-জাত ও সমাজ-জাত অবস্থার ফল। কাজেই শরীর গেলে সে আকাঙ্ক্ষা থাকে কই, যাহার পরিতৃপ্তির জন্য মরণের ছায়া দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদি? যে আকাঙ্ক্ষা দিয়া আমাদের না মরিবার আশা গড়া, সে আকাঙ্ক্ষা হইল যদি খরগোসের শিঙ দেখিবার মত আকাঙ্ক্ষা, তবে সে আকাঙ্ক্ষায় গড়া যে রকমের আত্মা কল্পিত হয়, সে আত্মার থাকা-না-থাকায় প্রভেদ কি? মাথা না থাকিলে আর মাথা ব্যথা থাকে কোথায়!

এই প্রসঙ্গে একজন বিদেশী বড় কবির স্বরচিত লর্ড-

দেখিয়া কবিতাটির দৃষ্টান্ত দিতেছি। পতি গেলেন যুদ্ধে মরিয়া পরপারে, আর তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীকে দেখিবার জন্ম যমের দুয়ারে ধন্না দিয়া বর পাইলেন, একবার তাঁহার স্বামী তাঁহাকে দেখা দিবেন। স্বামী আসিয়া সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিলেন; পত্নী কোনও শারীরিক সম্ভোগের কামনা না রাখিয়া যাহাকে পবিত্র প্রেম বলি সেই প্রেমে, শোকে, উচ্ছ্বাসে দু'হাত বাড়াইয়া স্বামীর সূক্ষ্ম শরীরকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। স্বামী পত্নীকে বুঝাইলেন যে, সেই আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা, সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস পরপারে অজ্ঞাত ও অভাবনীয়। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, আমাদের প্রেমের যে গভীর অনুরাগ জীবনের শিরোমণি ও আকাঙ্ক্ষার বেদনায় মধুর, তাহা শরীরের বিয়োগে হয় কল্পিত আকাশ-কুসুম। জীবনের মানে কি, অথবা পরিণতি কি, ও আমাদের চিরজীবনব্যাপী আকর্ষণের মূলে কি সত্য আছে, তাহা বুঝিবার আগে যাহা কল্পনা ও ধাঁধা তাহা উড়াইবার প্রয়োজন আছে।

থিয়সফিষ্টেরা ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অলিভার লজের দলের লোকেরা যে ভাবে আত্মার ছবি দেখেন, সেই ভাবে এ দেশের একজন পণ্ডিত একজন মিডিয়মের ঘাড়ে ভূত চাপাইয়া বছর কুড়িক আগে "নব্যভারত" মাসিকে পরপারের খবর লিখিতেন ও মৃত পরিচিত বড় লোকদের বিবরণ দিতেন। আমি তখন "ভূতের কথা" নাম দিয়া নব্যভারতে ১৩১৮ সালে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম ঠাট্টা-তামাসার উপযোগী হাল্‌কা ধরণে; তবুও এখন তাহার খানিকটা অংশ এই সঙ্গে ছাপিতেছি।

ভূতের কথা

আমরা ভূত—বহুবচনটা সম্পাদকীয় নয়, গৌরবের অর্থেও নয়; আমরা বহু আত্মা এপারে আসিয়া একসঙ্গে প্রায় মিশিয়া যাই বলিয়াই এই বহুবচন। সে কথা পাঠকেরা পরে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভূত; সেকালে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাহুল্যের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির ঘাড়ে চাপিয়া, নাকি-সুরে কথা কহিয়া খাসা আসর জম্‌কাইতাম। এখনও যে ছাপা পত্রিকাগুলি স্ত্রীলোক অপেক্ষা মানুষের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে তাহা নয়। তবে অন্তঃপুরচারিণীর গতিবিধি পত্রিকা পরিভ্রমণের মত অবাধ নয় বলিয়া একালে সম্পাদকদের স্কন্ধই আমাদের আবির্ভাবের সুপ্রশস্ত আসর। বৃষস্কন্ধ সম্পাদকেরা ক্ষুণ্ণ হইবেন না; তাঁহাদের ঘাড়ে যে সকল জীবিত লেখক আত্মকর্ম্মক্ষম-দেহের ভার চাপাইয়া থাকেন, আমাদের অশরীরী আত্মা তাহা অপেক্ষা ওজনে লঘু। অন্য দিকে আবার আমাদের অজীবিত জীবন-কাহিনী অতি মধুর। একে লঘু, তায় মধুর; কাজেই এই ভূতের কথা বৈদ্যশাস্ত্র-মতে নিশ্চয়ই সুপথ্য হইবে।

ইতিহাস শুনাইবার পূর্ব্বে আমাদের নাম কি, তাহা বলা আবশ্যক। আমরা জড়শরীর ফেলিয়া দিয়া তোমাদের চক্ষে অদৃশ্য হই বলিয়া, তোমরা প্রাচীন কালে আমাদিগকে "ইহলোক হইতে গত" অর্থে "প্রেত" নাম দিয়াছিলে। ধাতুর অর্থ বদলায় নাই, কিন্তু তোমাদের ধাতু এমনই বিগড়াইয়াছে যে, প্রেত অর্থে একটা ঘৃণ্য পদার্থ বুঝিয়া থাক। তোমরা কোন্ ধর্ম্মমতে ও কি সাহসে আমাদিগকে গণবর্গের ভূত সংজ্ঞাটি দিয়াছ, তাহা জানি না। অন্য দিকে আবার আমরা জীবিত না হইলেও অতীত নয়, বরং এখন আজকালের প্রভেদ বুঝিতে পারি না, ইহলোক-পরলোকের প্রভেদকে ধাঁধা বলিয়া বুঝিয়াছি। তবু আমাদিগকে ভূত বা অতীত বলিবে কেন?

এই দেখ, যেদিন বিহারীলাল ভাদুড়ি থিয়সফি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ডাইলিউশন প্রয়োগ করিয়া আমার জড়শরীরের উত্তাপটুকু রাখিতে পারিলেন না, দ্বারিক কবিরাজ আমার নাড়ী টিপিয়াই পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া গেলেন ও ডাক্তার জগবন্ধু বসু আমাকে গতায়ু মনে করিয়া ত্রস্তপদে ও ব্যস্তহস্তে ফিসের টাকা পকেটস্থ করিলেন, তখন সকলেই বলিল, আমি নাই। আমি কিন্তু তখন হোমিওপেথির জল, বৈদ্যের গুলি ও ডাক্তারের চোঙ্গাকে অগ্রাহ্য করিয়া শরীর-পরিহারের নব অনুভূতি উপভোগ করিতেছিলাম। পৃথিবীতে মাটী নাই, সাগরে জল নাই, আকাশে বায়ু নাই, ব্যোমপথে শূন্যতা নাই, আলোক নাই, অন্ধকার নাই; কেবল আমি বা আমরা আছি। আমরা লক্ষ লক্ষ আত্মা স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মিলিত হইতে লাগিলাম যে, যদি আমার পা থাকিত, তবে সে পাখানি চুলকাইলে বুঝিতে পারিতাম না যে, কাহার পা চুল্‌কাইতেছি। আমার এই মুখবন্ধ

হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে আমি খাঁটি ভূত, মেকি নয়।

কে খাঁটি, কে মেকি, পাঠকেরা একটু তাহা বুঝিয়া নিবেন। যাঁহারা এপারে আসিয়াও তোমাদের ওপারের লেখা অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতেছেন, অথবা মরিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াও হাতড়াইয়া যুক্তি দিয়া পরলোকের কথা বলিতেছেন, অথবা অশরীরী আত্মার জন্য সপ্তমলোক অষ্টমলোকের কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জাল, অত্যন্ত মেকি অথবা নিরবচ্ছিন্ন ধাঁধা। এবার আমাদের প্রশান্ত ভূতের রাজ্যে নূতন ধরণের ভূতের উৎপাত দেখিয়া ভূতকুলের কলঙ্ক নিবারণের জন্য সম্পাদকের গুরু শরীরে একটু লঘু চাপ দিতেছি।

অনেকেই ভূত-দেখার গল্প শুনিয়া থাকেন; সে গল্পগুলি যে মিথ্যা, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝাইয়া দিতে পারি। পৃথিবীতে যাহার শরীরের যেমন চেহারা ছিল, সেই চেহারা নিয়া, সেই পরিচ্ছদ নিয়া, সেই দাড়ি-গোঁফ নিয়া কোন উপায়ে কোন আত্মা কাহাকেও দেখা দিতে পারে না; অথচ ভূতের গল্পে পরিচিত রূপ ও পরিচিত পরিচ্ছদের কথা উঠে। আত্মাকে অশরীরী বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার তোমরা কেমন করিয়া সে আত্মার অবয়ব দেখিতে পাও, আমরা তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতেছি। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মানুষের আত্মার মত তাহার পরিচ্ছদেরও আত্মা আছে? যদি না থাকে, তবে আমরা ভেঙ্কি করিয়া পরিচ্ছদ পরিয়া দেখা দিব কেন? সমগ্র মানুষের একটা অশরীরী অরূপ আত্মা ছাড়াও কি বাহিরের দেহ আয়তনের একটা স্বতন্ত্র আত্মা আছে? যদি আমরা দাঁড়ি-গোঁফযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর নিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে প্রতিদিন যত দাঁড়ি-গোঁফ ও চুল কাটা যায়, নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিত। তাহা হইলে এতদিন এই পরলোক অথবা স্বর্গটি "চুলের স্বর্গ" হইয়া উঠিত।

যাঁহারা ভূতের গান শুনিতে পান, স্পর্শ অনুভব করেন, অথবা ভূতের কেশগুচ্ছ দেখিতে পান, নিশ্চয়ই জানিবেন যে হয় তাঁহারা শিরোরোগে ভুগিতেছেন, না হয় অতি-মাত্রায় আফিম্ সেবন করেন, না হয় তাহা মিথ্যাবাদী। যখন একটা কণ্ঠ ছিল ও আমাদের পরিমিত ভাব কেবল সেই কণ্ঠপথেই বাহির হইত, তখন সঙ্গীত নামে পদার্থটির সৃষ্টি হইত। এখন মাথা গিয়াছে, মাথার ব্যথাও গিয়াছে—কণ্ঠ গিয়াছে, সঙ্গীতও গিয়াছে। আমাদের এপারের ভাবের উচ্ছ্বাসে যদি সত্য সত্যই সঙ্গীত উঠিত, তবে তাহা কদাচ শারীর-সঙ্গীত হইতে পারিত না; অর্থাৎ কণ্ঠের যন্ত্র-সাহায্যে যে যে গান যে প্রকার শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠে, অথবা স্বর ও কণ্ঠ-যন্ত্র পরিমিত বলিয়া যে সঙ্গীত একটা ছন্দের তালে তালে কাঁপিয়া উঠে, সেই সঙ্গীত, সঙ্গীতের সে স্বর, সে ছন্দ, সে তাল, কদাপি আমাদের গানে থাকিতে পারে না। আমাদের ভাবের উচ্ছ্বাস-বিশেষকে সঙ্গীত নাম দিলেও সে সঙ্গীত শুনিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তোমরা মেকি ভূতে বিশ্বাস করিও না। বর্ব্বরের ঘাড়ে যে কৃত্রিম ভূত নামিয়া পল্লীবাসীদিগকে চমকিত করে, থিয়সফির সভাতেও তাহারাই ভদ্র পোষাক পরিয়া খেলা করে। তাহারা সকলেই জাল, সকলেই মেকি, সকলেই ধাঁধা।

তাহারা ধাঁধা, কিন্তু আমরা নই। কিন্তু হায়, এবারে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়া ভাবিতেছি, আমরা ধাঁধা হইলাম না কেন। এই অসীম জীবনভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন জীবিত ছিলাম, ছিলাম ভাল; দুঃখ-কষ্ট হইলেই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতাম, একবার মরিলে বাঁচি। তখন মৃত্যুর পারে দুঃখ অবসানের একটা আশা ছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মরিয়াও সত্য সত্য বাঁচিয়া থাকিতে হয়; যাহাকে "মরিলে বাঁচি" বলে সে সুখটুকু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

রৌদ্রের সঙ্গে ছায়া নাই, জ্যোৎস্নার কোলে অন্ধকার নাই, দমফাটা আনন্দের সঙ্গে বুকভরা বিষাদের ভাবনা নাই। এই ছায়াহীন, এই নিশ্চিন্ত অসীম জীবন নিয়া বড় গোলে পড়িয়াছি। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে খৃষ্টানদের এঞ্জেলেরা একঘেয়ে সুরে এক অফুরন্ত মহিমার গাথা বা দেবস্তুতি কতদিন গাহিবে? একদিন রাত্রে ঘুম না হইলেই তোমরা ছট্‌ফট্ কর ও ঔষধ খাও; কিন্তু আমাদের এই অশ্রান্ত অপরিমিত জাগরণ ডুবাইবার কোন ঔষধ নাই। আমরা জাগিয়া জাগিয়া, বাঁচিয়া বাঁচিয়া পরিশ্রান্ত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিরই ধর্ম্মকল্পনা বা পুরাণ পড়িয়া যে নরকের কথা শিখিয়াছিলাম, তাহা

"বাসন্তী-পূর্ণিমা"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Wo
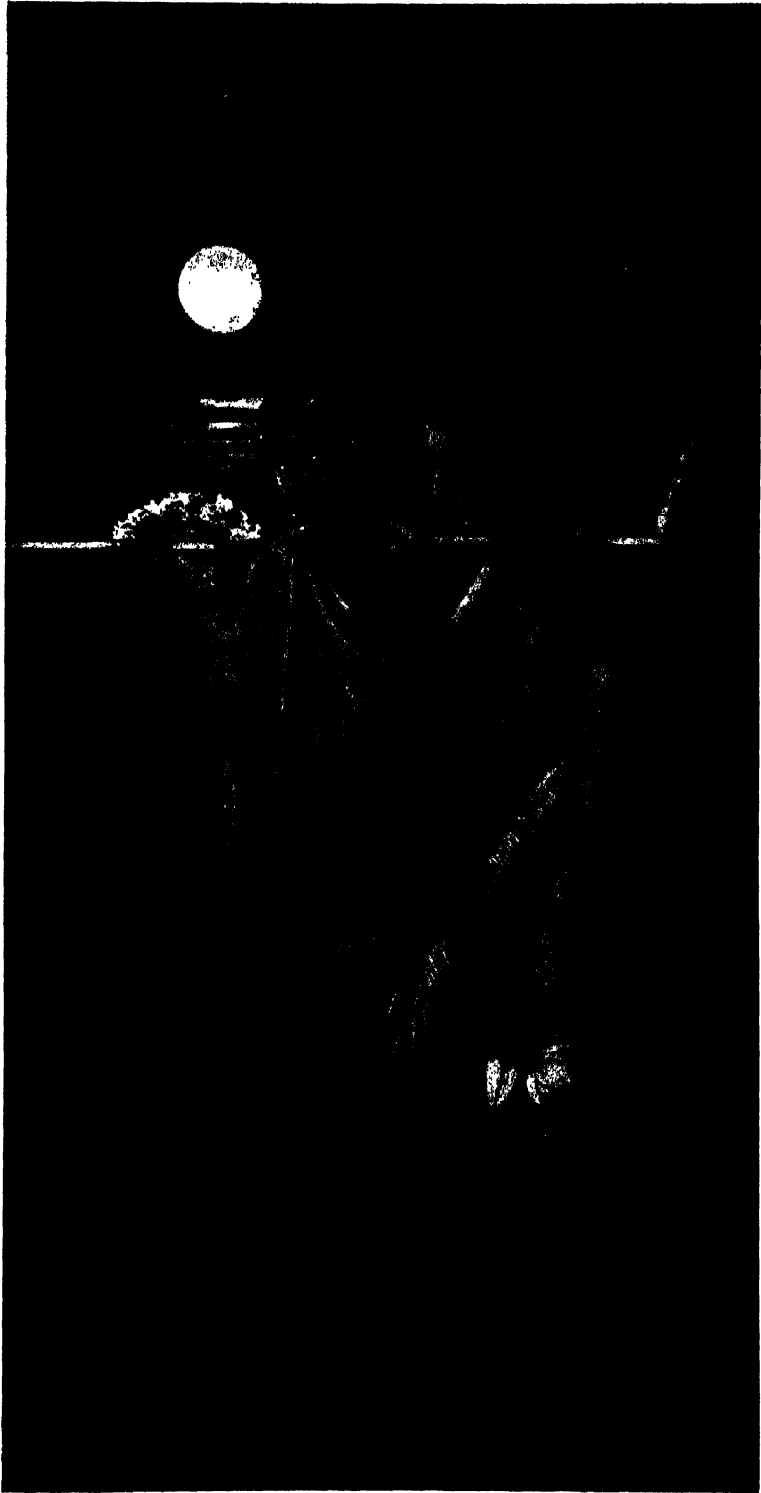
এখন অধিক প্রলোভনের সামগ্রী মনে করিতেছি; কেন না, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। তপস্বীরা যে স্বর্গের প্রলোভনে সংসারের খাঁটি সুখটুকু উপেক্ষা করিয়াছিল, পাদ্রিয়া যাহা লাভ করিবার আয়োজনে শান্তিময় পৃথিবীতে বিদ্রোহ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, সে স্বর্গ এমন ভীষণ জানিলে, তাহারা নিশ্চয়ই নরক লাভের জন্য প্রার্থনা করিত। সুখে থাকিতে ভূতের কিল খাইয়া যাহারা সংসারকে উপেক্ষা করে, তাহারা যথার্থই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে; কেন না, হাসিশূন্য শুষ্ক মুখ নিয়া নির্জ্জনে পেচকসুলভ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলে পৃথিবীর উপর স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়ে। যখনই ভাবি, এই সুদীর্ঘ জীবন কদাপি শেষ হইবে না, কখনও মরণের নিস্তব্ধ শান্তি আমাদের জাগরণের অশ্রান্ত শ্রান্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবে না, তখনই হাঁপাইয়া উঠি।

বৈদিক ঋষিগণ মাথা খুঁড়িয়া এক শত বৎসর পরমায়ুর জন্য প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু নিশ্চয়ই ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিনের পর যখন ভীমরথী উপস্থিত হইত, তখন ভোগময় যৌবনের প্রার্থনার ফল সুখকর হইত না। নিশ্বাসটাকেই জীবন মনে করিয়া যোগীরা যখন নিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া চিরজীবন বাঁচিয়া থাকিবার উদ্যোগ করিতেন, তখন যদি তাঁহারা দম আট্‌কাইয়া না মরিতেন, তবে নিশ্চয়ই অল্প দিনের পরেই যোগপথের নূতন পথিকদিগকে ঐ বিকট সাধনার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেন। ওপারে হউক, এপারে হউক, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন জীবন সুখকর হইতে পারে না।

আমাদের লীলা-খেলা, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ভালবাসা, আমাদের আমি-জ্ঞান বা আত্মা যে দেহ-পিণ্ডের অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র, সে দেহ-পিণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে শুষ্ক জলাশয়ের তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের মত আমাদের সকল তরঙ্গ, সকল বুদ্‌বুদ, সকল আত্মা মিলাইয়া যাইবে বলিয়া আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, নাছোড়বান্দা আত্মা জোঁকের মত বিশ্ব-শরীরে লাগিয়া রহিয়াছে; দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত সে জলেও ডুবিল না, আগুনেও পুড়িল না।

আমরা এখন এই অসীম অনন্ত আত্মা নিয়া কি করিব? হেলেলুজা-গীতি তিক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধুদের নয়ন-নিমীলিত সাধনার দৃশ্য অসহ্য হইয়াছে ও নেমাজ পড়িতে পড়িতে আত্মার কোমরে ব্যথা ধরিয়াছে। যাঁহারা ওপারে বেশ সুখে বসিয়া আছেন, ও আলোক-ছায়া ও সুখ-দুঃখে বিচিত্রতাময় অনুভূতি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সুখের নামে অস্বাভাবিক দুঃখের কল্পনা করিয়া কবি-নামে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গীতে গীত হয় "সেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরদীপ্তি নীলাকাশে।"

সেকালের স্বর্গ ছিল ভাল। কিন্তু যে ক্রমবিকাশের নিয়মে বানরসদৃশ জীব মানুষ হইয়া উঠিল, সেই নিয়মে প্রাচীনকালের ইন্দ্র রাজার স্বর্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া অশরীরী আত্মার নূতন স্বর্গ গড়িয়া উঠিল। সেকালে মানুষ ছাড়া অন্য জীব-জন্তুর মত আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত; জড় পদার্থের আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত; কিন্তু এখন আর পারে না। শ্মশান-ঘাটে কড়িগুলি পড়িয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের আত্মা পারের কড়ি হইয়া ভবপারের খেয়াঘাটে উপস্থিত থাকিত,—শ্রাদ্ধের উৎসর্গ করা বৃষের আত্মার লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হইতে পারা যাইত। এত সুবিধা থাকিতেও সেকালের লোক সকল ভোগের সামগ্রী চিতায় পুড়াইয়া এপারে আনিত না। কেবল কখন কখন কতকগুলি স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া আসিত। সুবিধা থাকিতেও যে তাহারা ধনসম্পদ বহিয়া আনিত না, তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ করিয়া এপারেই তাহারা অনেক ভোগের সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত। তাহা ছাড়া আবার প্রভাত-ভ্রমণের জন্য মন্দাকিনীর তীর ছিল, বাগানবাড়ীর জন্য নন্দনকানন ছিল, ব্যায়ামের জন্য অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল, সন্ধ্যার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য অফুরন্ত সুধা ছিল, ও বিনা টিকিটে ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্য-গীত দেখিবার সুবিধা ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখন আর চুল-দাড়ির স্বর্গ নাই; মানুষের আত্মা ছাড়া আর কেহই এপারে আসিতে পারে না। কিন্তু যদি আসিতে পারিত, তবে স্বর্গবাস একটু সুখকর হইতে পারিত। গয়ায় পিণ্ডদান না করিয়া পুত্রেরা যদি শ্রাদ্ধের সময় থিএটারের অভিনয় দিতেন, পণ্ডিতসভার কচ্‌কচি না করাইয়া একটা ইয়ারদলের হাসি-তামাসার মজলিস্ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে একটু নৃত্য-গীত ও হাসির আনন্দ সেকালের বৃষের আত্মার মত এপারে আসিয়া পৌছিতে পারিত। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি

হইবে? যতদিন মরণের ভয়ে বাঁচিয়াছিলাম, যতদিন আমার অনির্দ্দিষ্ট জীবন-ধারণের বাসনা একটা অনন্ত-জীবন-পিপাসার মত ছিল, সেই বাসনার প্রমাণেই আত্মাকে অমর বলিয়া বুঝিয়া নিতাম ও কল্পনার বলে মৃত্যুভয় জয় করিতাম, সেদিনকার উৎসাহ আর নাই। পরলোক যখন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ছিল বলিয়া তাহার আভাস পাইবার জন্ত থিয়সফির বক্তৃতা শুনিতাম ও কল্পিত ভূত নামাইয়া পরলোকের তত্ত্ব বুঝিতে চাহিতাম, সেদিনকার গাঢ় কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। জীবনের পরপারে আসিয়া মৃত্যুর প্রহেলিকা সরল রেখার মত সোজা হইয়া গিয়াছে। ভ্রান্তিশূন্ত দীর্ঘ জাগরণের পর সেই একই জাগরণ সূর্য্যের আলোক অপেক্ষাও প্রখর হইয়া আমার চিন্তাকে দগ্ধ করিতেছে। ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, আমাকে বা আত্মাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। এই দগ্ধ আত্মা বা দুরাত্মা যে পথ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, এখন সেই পথের দিকে তাকাই ও অতীতের অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আলোকের তীব্রতা পরিহার করিতে চেষ্টা করি। মন ভুলাইবার সকল চেষ্টাই যখন বিড়ম্বনা, তখন আমাদের ভ্রান্তিহীন ভূতের জীবন যেমন আছে তেমনই থাকিবে।

আহার ও প্রেম শারীরিক জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন। না খাইলে কোন শরীরী বাঁচে না ও পরের সঙ্গে ভাব না করিয়া অর্থাৎ সমাজ না গড়িয়া কেহ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যখন শরীর খসিয়া পড়ে তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সকলই খসিয়া পড়ে। যখন পরের মুখের দিকে চাহিতে হয় না, পরের কাছে কিছু লাভ করিবার প্রয়োজন থাকে না, তখন শরীর-জাত ও সমাজ-সংঘর্ষণ-জাত সকল প্রবৃত্তি ও ভাবনাই অস্তমিত হয়। আমাদের সকল ভালবাসার মূলেই পরকে টানিয়া আপন করিয়া নিয়া আপনি বাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যখন বাড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন দূর হইয়া যায়, তখন সে ভালবাসা আমূল শুখাইয়া মরে। মানুষের এমন সুখ, অনুভূতি বা চৈতন্ত নাই, যাহা দুঃখ, অন্ধকার ও জড়তা-নিরপেক্ষ। মানুষের জীবন-নাশের গতিই দুঃখ, শারীরিক স্বাতন্ত্র্যই চৈতন্ত; ও পরিমিত অনুভূতির নামই স্বতন্ত্রতা। ও সেই পরিমিত ভাবেরই একদিকের নাম আলোক, অন্তদিকের নাম অন্ধকার। কাজেই শরীর খসিয়া পড়িলে শারীরিক জড়তা হইতে মানসিক চৈতন্ত পর্য্যন্ত কিছুই বাঁচিয়া থাকে না।

যাঁহারা এই জলের মত তরল প্রবন্ধটি পড়িয়াও পরলোক-তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহাদিগকে একটা অমূল্য উপদেশ দিতেছি। পরলোক-তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির অগম্য; কদাচ কেহ বুঝিতে পারে নাই, কদাচ কেহ বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই কল্পনাবলে ইহলোকের পরদাখানি ছিঁড়িয়া কত লোকে পরলোকের দিকে উকি মারে; ও কখনও বা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া ও কখনও বা ধাঁধায় পড়িয়া "বুঝিয়া ফেলিবার" সুখলাভ করিতে চায়। আমরা বলি, যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া কাজ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা পিতার ক্রোড়ের সন্তানের মত পিতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন; তিনি যাহা করিবেন তাহাই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আশ্বস্ত থাকুন। তোমাদের বিবেচনায় পরলোক যে প্রকার হওয়া উচিত মনে কর, অথবা কল্পনার তুলিতে নিজের বাসনার রং এ পরলোকের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ বল, সেইপ্রকার পরলোকই যে অশরীরী আত্মার জন্ত বিহিত রহিয়াছে, এ কথা ভাবিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই। দার্শনিক পণ্ডিতেরা উর্ণনাভের মত আত্মশরীর হইতে বুদ্ধির জাল বাহির করিয়া সেই জালে আপনাকে জড়াইয়া না মারিয়া ফেলিয়া যাহা প্রত্যক্ষ ও সুস্থির, তাহারই তত্ত্বে অনুরাগী হইলে ভাল হয়। সংসারে ধাঁধা যথেষ্ট আছে; আর অতিরিক্ত ধাঁধা রচনা করিয়া কি হইবে? বর্ব্বর যুগের কল্পিত ভূতগুলিকে যদি গর্ব্ব-স্ফীত মূর্খেরা নূতন পোষাকে সাজাইয়া থিয়সফির নূতন তন্ত্র রচনা করিতে চায়, কিম্বা সভ্যতার বাল্যযুগের দার্শনিক অদ্বৈত-বাদ ও পুনর্জন্মবাদ যদি এ-যুগের দার্শনিকেরা অদ্ভুত তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিও। এ উপায় অবলম্বন করিলেও যদি ভূতের কলঙ্ক না ঘুচে তবে লোকশিক্ষার জন্ত ভবিষ্যতে আরও কিছু লিখিব। আমাদের সেই প্রবন্ধগুলি আমাদের পক্ষ হইতে লিখিবেন—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার *

* নিবেদন: সারা প্রবন্ধটি শেষ হইবার পূর্ব্বে লেখককে নাস্তিক বলিয়া গালি না দিলেই ভাল হয়।

"......লঘুক্রিয়া"

শ্রীসুধীরকুমার সেন এম-এ

এক

কলেজে পড়ি এবং মেসে থাকি। ছোট মেস, মোটে বাইশটী ছাত্র আমরা। সবাইএর উপরে অধ্যক্ষ মহাশয়, নাম 'প্রতুল', আমরা বল্‌তাম 'তেতুল';—তাঁকে দেখ্‌লেই যে জিভে জল আস্‌তো তা নয়, তবে কেমন যেন একটা অম্লমধুর আস্বাদ পেতাম তাঁর গলার স্বরে, সেই জন্যে।

এক ঘরে আমার সতীর্থ টুনু ও আমি থাকতাম। টুনু অবশ্য ডাক-নাম, ভাল নামটা তার অনেকেই জান্‌তো না। সে লেখাপড়ায় যেমন ভালো ছিল, দুষ্টামীতে ছিল তেম্‌নি পাকা। আমি ত তাকে দস্তুর মত ভক্তি কর্‌তাম;—যে ছেলে সারা বছর রাত জেগে থিয়েটার দেখে এবং সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়, সে আবার পরীক্ষায় প্রথম হয়, শুনেছো কখনো?—ভক্তি হবে না? সে যাক্।

বাঁশীমোহনের বাড়ী নোয়াখালি; সে আমাদের পাশের ঘরে থাক্‌তো। বাড়ীতে সবাই আদর করে' তাকে ননী বলে' ডাক্‌তো, আমরা আরও একটু বেশী আদর করে' তাকে ননীচোরা বল্‌তাম; টুনু আবার ননীটুকু বাদ দিত। কিন্তু সাধারণতঃ ছেলেরা তাকে ননী বলেই ডাক্‌তো। ননী লম্বায় ৬ ফুট্, পাশে সাড়ে নয়, কি বড় জোর দশ ইঞ্চি; তার মধ্যে তার গলাটাই হবে প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা, মরালগ্রীবা বোধ হয়। তার বিশ্বাস ছিল, সে অ্যানা প্যাভ্‌লোভার মত graceful; রং সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলের মতই, অর্থাৎ অন্ধকারে চেনা যায় না। আগে গোঁফ ছিল, কলিকাতায় এসে কামিয়ে ফেলেছে। সে জন্যে নীচের ঠোঁট যেন আধ্ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে বলে' মনে হতো'। মাথার চুল একটু বড় বড় করে' রাখা,—কর্কশ এবং রুক্ষ; তাতে প্রায় সব সময়েই তাকে বিরহী যক্ষের মত দেখাত। সে ফুটবল খেল্‌তো, অর্থাৎ প্রায়ই খেলার পোবাক পরে মাঠে যেতো,—খেলতে, না দেখ্‌তে তা জানি না। স্বচক্ষে কেউ তার খেলা দেখে নাই,—তবে সন্ধ্যেবেলা তার খেলার গল্পে সবাই অস্থির হয়ে' উঠ্‌তো।

একটু রাত্ হলে' ননী বাঁশী হাতে করে' ছাতে যেয়ে বস্‌তো,—ফলে, পরীক্ষার্থীদের বাধ্য হয়ে' একতলায় বস্‌বার ঘরে যেয়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অধ্যক্ষ মহাশয় শেষে তার সাধনায় মুগ্ধ হয়ে' তাকে বল্লেন যে, সে যেন কলিকাতাটাকে বৃন্দাবন মনে না করে,—আর বেশী বংশীধ্বনি হলে' তিনি ননীকে গোষ্ঠে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌বেন,—এখানে তার স্থান হবে না;—আগেই ত বলেছি, অধ্যক্ষ মহাশয় একটু অম্লমধুর ভাবে আলাপ কর্‌তেন!

ননীর হৃদয়টী ছিল রোমান্সে ভরপুর। পাঠ্য-পুস্তকে রোমান্সের ব্যাখ্যা তার মন-মত হতো' না, সে বাস্তব জীবনে রোমান্সের সন্ধান কর্‌তো। ফলে, মেসের ছেলেরা কে শনিবার বালীগঞ্জে যায়, কার কাছে মেয়েলী হাতে লেখা চিঠি আসে; কে লুকিয়ে পদ্য লেখে, কে উদাস ভাবে জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে, এই সব তার লক্ষ্যের বিষয় ছিল,—এবং এ ছাড়া নিজের একাধিক বান্ধবীর বিষয় সে সুবিধা এবং সূত্র পেলেই আমাদের সাথে আলোচনা কর্‌তো। বলা বাহুল্য, আমরা তার এক বর্ণও বিশ্বাস কর্‌তাম না,—বাঙ্গালী মেয়েদের আজও অতটা রুচিবিকার হয় নি!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাই নি, ঘরে বসে' ছিলাম। ননী খেলার মাঠ থেকে ফিরে দেখে যে আমি একা একা বসে' আছি। ব্যস্, অম্‌নি তার ভিতরে রোমান্স্ সাড়া দিয়ে উঠলো। সে ভাব্‌লো হয় ত আমি একা বসে' বসে' কোনও অজানা, অচেনা, অরক্ষণীয়া বিশ্বতরুণীর ধ্যান কর্‌ছি! সে তাড়াতাড়ি খেলার পোষাক ছেড়ে একটা চাদর নব্য বাংলার তরুণদের মত করে' গায়ে জড়িয়ে, চুলগুলো হাত দিয়ে আরও বিশৃঙ্খল করে' দিয়ে' পায়ে একজোড়া লাল মখ্‌মলের চটী ঢুকিয়ে—এক কথায় আমার অজানার বিরহে আমার চেয়ে বেশী ব্যথিত ভাব দেখিয়ে আমার পাশে এসে বস্‌লো, গা-ঘেঁসে।

তার ন্যাকামী দেখে আমার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বল্‌লাম না।

ননীর গলার আওয়াজের বিবরণ দেওয়া হয় নি,—না দেওয়াই ভালো,—তবে সে রকম গলা নিয়ে আর যাই হোক, রোমান্স করা চলে না। তাই সে অনেক অভ্যাসের পর এক-রকম মিঠে কড়া স্বর মাঝে-মাঝে বের কর্‌তো, প্রাণে ভাবের উদয় হলে',—সেই রকম গলায় খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—

"কি হয়েছে ভাই—?" সঙ্গে সঙ্গে আমার একটী হাত ধরে' আরও নিবিড় হবার চেষ্টা! ইচ্ছে হ'লো বলি, "ননী, দশটা টাকা ধার দিবি?" ননীকে তাড়ানোর একমাত্র উপায় টাকা ধার চাওয়া; তার পর মুহূর্ত্তেই ননী সে স্থান ত্যাগ কর্‌বে,—এবং তার পর অন্ততঃ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাকে এড়িয়ে চল্‌বে; পরীক্ষা করে' দেখেছি। কিন্তু মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি এলো, ভাব্‌লাম ননীকে শিক্ষা দিতে হবে।

বল্‌তে ভুলে গেছি—একেবারে একলা ছিলাম না। টুনু তখন থিয়েটারে যাওয়ার জন্তে দিবা (সন্ধ্যা) নিদ্রা দিয়ে ঘুমের অভাবটা পুষিয়ে নিচ্ছিল।

আমি ননীর দিকে না ফিরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লাম;—বুকের মাপ একেবারে বেয়াল্লিশ থেকে সাড়ে বত্রিশ হয়ে' গেল।

ননী—"তোমার মনে কিসের যেন একটা ব্যথা থেকে থেকে জেগে ওঠে দেখেছি,—আমার দ্বারা যদি—আমি কি তোমায় একটুও সাহায্য কর্‌তে পারি না?"

আমি ভাব্‌ছিলাম উত্তরটা গদ্যে দেবো না পদ্যে দেবো—

"মনের কথা বল্‌তে তোরে
সাহস নাহি পাই,
ব্যথা ফিরে পাবো কি না
বুঝ্‌বো কেমন করে"—ইত্যাদি

আমি গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললাম—গলায় যতদূর সম্ভব একটা করুণ, সর্ব্বহারা লক্ষীছাড়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ভাব এনে—

"ভাই ননী! আমার কথা লোককে বলা যায় না, আমি বড় অভাগা; আমি একজনকে—" (স্বরভঙ্গ এবং বাক্‌রোধ।)

আড়-চোখে চেয়ে দেখি ননীর বেজীর মত চোখ-দুটো রোমান্সের গন্ধ পেয়ে উৎসাহে আনন্দে জ্বল-জ্বল কর্‌ছে;—সে চট্ করে' উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—"ভাই একটু বসো, আমি এখনি আস্‌ছি,—" এই বলে' নিজের ঘরের দিকে গেল।

আমি বুঝ্‌লাম না কি হলো' তার; বসে' বসে' ভাব্‌ছি কি গল্প বানানো যায়, এমন সময়ে ঘরের এক কোণে লেপের নীচে থেকে টুনুর সাড়া পাওয়া গেল—

—"কি রে! বাঁদর নাচাচ্ছিস্ এই সন্ধ্যে-বেলা? ছেড়ে দে বাবা ওকে, কেন বাঙ্গাল ঘাঁটাচ্ছিস্, শেষে ফ্যাসাদে পড়বি?"

"তোর ঘুম ভাঙ্গলো?"

"অতবড় নিঃশ্বাসের শব্দেও ভাঙ্গবে না? অমি ভাবলাম তোর বক্ষঃস্থল বুঝি ফেটে চৌচীর হয়ে' গেল!"

"নে—নে, আর বাজে বকিস্ নে,—এখন বল ত ওকে কি করে জব্দ করা যায়?"

"উঁহু, ওদিকে ঘেঁসো না বাবা,—নোয়াখালির ছেলে,—তার মানে চাটগাঁর কাছে বাড়ী;—জানিস্ ত ওদিকের ছেলেরা কেমন?—তা'ছাড়া, ও তোর কি করেছে?—ওকে দেখে আমার ত শুধু হাসি পায়,—"

"—আর আমার মনে হয় কাণ-দুটো মলে' দিই;—ঠিক্ যেন একটা ছুঁচো,—কেবল মাটী খুঁড়ে পরের খবর বের কর্‌বার চেষ্টা—"

—"আহা, অত রাগ করিস কেন?—ওর দোষ কি?—বয়স অল্প, তায় সদ্য নোয়াখালি থেকে এসেছে, ভেবেছে—বুঝি, কলিকাতার চালের আড়ত ও শুঁড়ির দোকানেও কাব্যচর্চ্চা হয়, আর এখানে পথে-ঘাটে প্রেম ছড়াছড়ি যাচ্ছে,—কুড়িয়ে নিলেই হলো',—নৈলে আর তোর মত বেরসিকের পেছনে রসের সন্ধানে ঘোরে?"—

"দেখ টুনু! ভাল হবে না কিন্তু—"

"আহা, চটিস্ কেন? ননীর ঘরে ষ্টোভের শব্দ পাচ্ছি, তোকে নিশ্চয় খাওয়াবে রে! এই বেলা বিছানা ছেড়ে উঠি, না হ'লে ফাঁকে পড়্‌বো—"।

"না—না,—তুই শুয়ে থাক, তুই আমাদের রসালাপে যোগ দিলে সব মাটী হবে'।"

"আচ্ছা," বলে' সে আবার লেপমুড়ি দিল।

মিনিট পনেরো পরে দেখি ননী দু' পেয়ালা চা, এবং

দুখানা প্লেটে বিস্কুট, ডিম, এই সব নিয়ে উপস্থিত! টুমু ত ঠিকই বলেছে! ব্যস্—আর চিন্তা নেই, এখন থেকে রোজ একটা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর একদফা খাওয়া,—এ মন্দ না!

ননী—"তোমার নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয় নি?"

আমার ধারণা ছিল হতাশ-প্রেমিক, বিরহী, এদের জন্যেই চাএর ব্যবসা আজও টিকে আছে, বল্লাম—

"চা? কই? ওঃ, খাবো? না, মনে ত নেই খেয়েছি কি না"—

সহানুভূতিসূচক অব্যক্ত শব্দ ননীর গলা দিয়ে বের হ'তে লাগ্‌লো—

"আহা! চা খাওয়া হয় নি? এই যে এনেছি, আমার কেমন যেন তোমাকে দেখেই মনে হলো যে তুমি আজ চা খাও নি—"

মনে মনে ভাব্‌লাম—সাবাস্! এখন গোটা-দুই পুরাতন পঞ্জিকা নিয়ে কপালে তিলক কেটে রাস্তার ধারে গণৎকার সেজে বস্‌লে তোমার অন্ন মারে কে!

ঘরের ও-দিক থেকে একটা শব্দ হলো',—চেয়ে দেখি, টুমু লেপ ফাঁক করে' লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ননী তার দিকে পেছন ফিরে ব'সে ছিল, ইসারায় বল্লাম—"খবর্দ্দার!" সে পাশ ফিরে শু'লো।

আমি—"আবার ও-সব কেন ভাই? আমার ইচ্ছে নেই।" সে পরম সমাদরে আমাকে খাইয়ে দিতে এল! নাঃ! জ্বালালে দেখ্‌ছি! "রাখ, রাখ, আমিই খাচ্ছি,—তুমি আবার এসব আন্‌তে গেলে কেন?" (ভক্ষণ।)

"ভাব্‌লাম একা একা খাবো, তা'ছাড়া তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয় নি। তাই নিয়ে এলাম।" মনে ভাব্‌লাম আহা! তুমি কি কখনো একা কোনও জিনিষ খেয়েছ? কাল রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে যখন মুরগী রেঁধে খেয়েছিলে তখন ত আমাকে মনে পড়ে নি!

ভোজন শেষ হ'লো। ননী তাড়াতাড়ি তার ঘর থেকে তোয়ালে এনে দিলে,—বেচারীর আর দেরী সইছিল না।

তখন অন্ধকার হয়ে' গেছে। চাকর ঘরে আলো দিতে এলে তাকে বারণ করে' দিলাম—অন্ধকারে রোমান্স্ জমবে ভাল!

ননী—"হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে ভাই?"

"বল্‌ছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে কখনো কাকেও বলবে না?" সাথে সাথে সে একটা ছেড়ে দশটা খুব ভীষণ রকমের শপথ কর্‌লো—তাতেই সন্দেহ হলো' যে কাল পর্য্যন্ত ঘটনাটা সহরময় রাষ্ট্র হয়ে' যাবে।

আমি বেশ্ আয়েস করে' তাকিয়া ঠেশ্ দিয়ে চোখ বুজে আরম্ভ কর্‌লাম—"তার নাম বীণা—"

ননীর চেয়ারটা সমবেদনায় ক্যাঁচ্ করে' উঠ্‌লো—অর্থাৎ ননী বেশ্ জমিয়ে বস্‌লো। বল্‌তে লাগ্‌লাম—

"বছর দুই আগে পুজোর ছুটীতে দার্জ্জিলিং যাই; ফির্‌বার সময়ের কথা বল্‌ছি। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে নেমে কলিকাতার গাড়ীতে উঠ্‌তে যেয়ে দেখি কোথাও জায়গা নেই। শেষে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে দেখি, মোটে একটী লোক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার বাইরে Reserved লেখা। বড় দমে' গেলাম। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ কর্‌ছি, এমন সময়ে জান্‌লায় একটী সুন্দর মুখ দেখা গেল,—তাই দেখে আমারও ঝোঁক চেপে গেল যে যেমন করেই হোক এই গাড়ীতেই উঠ্‌তে হবে'।

[এখানে ননী খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্‌লো "হুঁ।"]

আমি ভদ্রলোকটীকে বল্‌লাম—"আপনি যদি আমাকে একটু জায়গা না দেন, তবে আজ এখানেই পড়ে থাক্‌তে হবে', আমি এক পাশে বসে যাবো, আপনাদের কোনও অসুবিধা কর্‌বো না।"

ভদ্রলোক মেয়েটীর দিকে চাইলেন,—তাঁর ভাব দেখে মনে হ'লো যেন জীবনের ছোটবড় কোনও কাজে 'হাঁ' কি 'না' বলা অভ্যাস তাঁর নেই,—সেটা যেন তিনি চিরকাল অন্যের ওপরেই বরাত দিয়ে এসেছেন। কাজেও হ'লো তাই। তিনি বল্‌লেন—"তাই ত মা! এই ছেলেটী আমাদের গাড়ীতে যেতে চাইছে, কি বলি?"—যেন মস্তবড় একটা সমস্যার কথা!

তিনি ভিতর থেকে উত্তর দিলেন—"আপনি আসুন, তিনটে বেঞ্চ আছে, কোনও অসুবিধা হবে না।"

চাম্‌ড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঢুকে পড়্‌লাম। ভিতরে যেয়ে এক দফা ধন্যবাদ দেবো ভেবেছিলাম; কিন্তু সাম্‌না-সাম্‌নি এসে কথা বলতে ভুলে গেলাম। অনেক সুন্দর

মুখ দেখেছি, কিন্তু এমন সরল, নির্ভীক, তেজস্বী মুখ যে মেয়েদের হয়, তা জান্তাম না। নিতান্ত বেকুবের মত হাঁ করে' চেয়ে আছি দেখে তিনি হেসে উঠ্লেন। ভদ্রলোকটী ততক্ষণে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছেন, এবং হাতের বইখানাতে মগ্ন হয়েছেন। বোধ হলো' যেন তখনকার মত মেয়ের হাতে আমাকে সমর্পণ করে' নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

আমি মহা লজ্জিত হয়ে' হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে একটী নমস্কার কর্‌লাম। আমার ভাব দেখে তিনি আমাকে একটী মজার জীব ভাব্‌ছিলেন বোধ হয়; তাই নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সাম্‌লে নেওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি যা মনে এলো বলে' ফেল্‌লাম—"আপনাদের বড় অসুবিধায় ফেল্‌লাম, কিছু মনে কর্‌বেন না।"

তিনি—"মনে কর্‌লেই বা কি কর্‌বেন বলুন? নেমে যাবেন না কি?"

আমার বড় ভালো লাগ্‌লো শুনে। এ-রকম স্থলে সাধারণতঃ লোকে বলে' থাকে "না—না, সে কি কথা" ইত্যাদি।

বল্‌লাম—"আমাকে স্থান দিয়ে যে উপকার করেছেন, সেটা গ্রহণ না কর্‌লে অকৃতজ্ঞতা হ'বে যে! কাজেই আপনাদের অসুবিধা হ'লেও নেমে যাই কি করে? থাক্‌তেই হ'বে।"

"আপনি ত বেশ্ মজার লোক! আমাদের অসুবিধা হ'লেও থাক্‌বেন; কারণ নেমে গেলে আমরা আপনাকে অকৃতজ্ঞ মনে কর্‌বো!" তার পর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"যদি বলি মোটেই অকৃতজ্ঞ মনে কর্‌বো না, আপনি নেমে যান?"

আমি খুব গম্ভীর ভাবে বেঞ্চের ওপরে গিয়ে বস্‌লাম—মাথা নেড়ে বল্‌লাম—"সে কি হয় কখনো? জগতের কাছে, সভ্য সমাজে, আর তাহ'লে মুখ দেখাতে পার্‌বো?" আমার বলার ভঙ্গী দেখে তিনি হাসি সাম্‌লাতে না পেরে পাশের বেঞ্চটায় বসে' পড়্‌লেন।

* * * *

ননী কিছুক্ষণ থেকে কি যেন বলার চেষ্টা কর্‌ছিল, আমাকে থাম্‌তে দেখে বলে' উঠ্‌লো—"তাঁর বয়স কত?" "ছিঃ ননী! মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা কর্‌তে আছে? এটুকু বুদ্ধি তোমার আজও হলো' না? Shame!" ননী বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে' থেমে গেল; একটু পরে বল্‌লো "তার পর?"—

আমি বসে বসে তাঁর কাজ দেখ্‌ছিলাম, নিপুণ হাতে বাক্স বিছানা সব গুছিয়ে রাখ্‌ছিলেন; কি বল্‌বো তাই ভেবে কেবলই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল,—এ ভাবে চুপ্ করে' বসে থাকা উচিত হচ্ছে না তাও বুঝ্‌ছিলাম। মনের মধ্যে অনেক জিনিষ তোলপাড় কর্‌ছিল—কি যেন একটা করা উচিত, অথচ কর্‌ছি না, এই রকমের ভাব।

"এই বাক্সটা একটু ধরুন না"—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। আমার হতবুদ্ধি ভাব তখন অনেকটা কেটে গেছে, বল্‌লাম—"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমারই ও-গুলো ঠিক ক'রে রাখা উচিত, আপনি ছেড়ে দিন"—

"কেন, আমি কি ননীর পুতুল?"

ফস্ করে' বলে' ফেল্‌লাম—"দেখলে ত তাই"—ব'লেই সাম্‌লে নিলাম! চিরকালের বাচালতা সব সময় সাম্‌লাতে পারি না। তিনি কিন্তু কথাটা সহজ ভাবেই নিলেন, বল্‌লেন—"ননীর পুতুল হওয়াটা বাস্তব দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে কিন্তু মস্ত একটা দোষ, ওটা ত প্রশংসার কথা নয়।"

আমি বল্‌লাম—"মাপ কর্‌বেন, বাইরের দিকটাই আগে লোকের চোখে পড়ে,—তাই আমার মন্তব্য যদি ভুলও হয়ে' থাকে, তবে আমার তাতে দোষ নেই যতক্ষণ না আমি আপনার অন্য পরিচয় পাচ্ছি"—

তিনি কথা বল্‌লেন না, কিন্তু সহজ ভাবেই একটা বড় চাম্‌ড়ার বাক্স এক হাতে তুলে উপরে রাখ্‌লেন। ওটা যে আমাকে দেখাবার জন্য করা হ'লো তা ঠিক্ নয়; অভ্যস্ত হাতের কাজ, দেখেই বোঝা যায়। বল্‌লাম, "দেখুন, এখন আমার ওপরে জিনিষপত্রগুলো ছেড়ে দিন, আমার লজ্জা কর্‌ছে আপনাকে এ সব কর্‌তে দেখে"—

তিনি একটু হেসে সরে' দাঁড়ালেন, আমি চট্‌পট্ সব গুছিয়ে দিলাম। গাড়ী ছাড়্‌লো। হাত মুখ ধুয়ে' ভদ্রলোক হ'য়ে জান্‌লার ধারে এসে বস্‌লাম। বুড়ো ভদ্রলোকটী তখন বই বন্ধ করে', চস্‌মা খুলে আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন—"তোমার নাম কি বাবা?"

আমার পরিচয় দিলাম। শুনে তিনি একটু বিস্মিত

হ'লেন, বল্‌লেন—"তুমি আমার বাল্যবন্ধু—র ছেলে? কি আশ্চর্য্য! তার সাথে আজ ১৫ বছর দেখা হয় না। শুনেছিলাম বটে তার একটী ছেলে আছে;—সেই তুমি? তুমি ত বেশ বড়-সড় হয়েছ! কি কর? এম-এ পড়? কি বিষয়ে? সাহিত্য? ওর মধ্যে কি আছে? দর্শন শাস্ত্র পড়, দেখ্‌বে মনের খোরাক মিল্‌বে তাতে"—

নিজের মনেই যেন বলে যেতে লাগ্‌লেন—"তাই ত! এরা সব এখন কত বড় হয়ে' পড়েছে! মা বীণা! এ আমার বাল্যবন্ধু—র ছেলে; আশ্চর্য্য না? একে দেখো',—হ্যাঁ, আর কিছু খেতে দাও তো,—নিশ্চয়ই এর খাওয়া হয় নি"—

"না বাবা, খেতে দেবো না, বস্‌তে দিয়েছি এই ঢের"—বলেই হাসি,—কি মিষ্টি হাসি! বৃদ্ধের কাণে সে কথা গেল কি না কে জানে, আমি একবার আমার সহযাত্রিনীর দিকে ফিরে চাইলাম, দেখ্‌লাম তাঁর কালো চোখ-দুটী হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে' উঠেছে। তিনি বল্‌লেন—"সত্যি? না বানিয়ে একটা পরিচয় দিলেন? আচ্ছা, বাবার বাল্য-বন্ধুর ছেলে বলে' আমার ওপরে আপনার কি দাবী থাকতে পারে যে আমি আপনাকে খেতে দেবো?- কি বলেন বাবা?"

"অ্যাঁ? আচ্ছা, দিও না"—

আবার সেই হাসি! "বাবা অর্দ্ধেক কথার উত্তর না শুনেই দেন।"

আমি বল্‌লাম—"দাবী আছে বই কি। সেই দাবীর জোরে আমি এখন থেকে তোমাকে আর 'আপনি' বল্‌বো না, এখন খেতে দেবে কি না বল,—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে সত্যি।"

সে (এখন আর 'তিনি' না) দেখ্‌লাম আমার কথায় একটুও বিরক্ত হ'লো না, বুঝ্‌লাম দূরত্বের ব্যবধান অনেক কমে' গেছে এর মধ্যেই। বল্‌লো—

"কি লোভী ছেলে! আচ্ছা, দিচ্ছি, কিন্তু ভেবো না যে তোমাকেও আমি 'আপনি' বল্‌বো, বুঝ্‌লে?"

আমার তখন এত আনন্দ হচ্ছিল, যে ক্ষিদে পেলেও খাবার দরকার ছিল না!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাড়ীর আলো জ্বলে উঠ্‌লো। কখন্ কোন্ ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেলাম জানি না। দুজনের কথার আদান-প্রদানে যে মায়াজাল বোনা হচ্ছিল, অমর বাবুর এক কথাতেই তা ছিঁড়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম অমরেন্দ্রনাথ রায়।

"আমাদের পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদ্‌লাতে হ'বে না?"

চমকে উঠ্‌লাম; এত শীগ্‌গির? আর ত মোটে দু ঘণ্টা আছে। কতক্ষণই বা গাড়ীতে উঠেছি, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন বীণাকে কত দিন থেকে চিনি!

[ননী বার দুই সহানুভূতিসূচক মাথা নেড়ে বল্‌লো—"ও-রকম হয়, আমি জানি।"]

অমর বাবুরা ভাগলপুর যাবেন, তাই পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদ্‌লাতে হ'বে, আমি সোজা কলিকাতা যাবো।

গাড়ী বদ্‌লাতে হ'বে রাত দুপুরে। সেটা নভেম্বর মাস। বেশ শীত পড়েছে। দেখ্‌লাম বীণা জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছে,—এলো-মেলো চুল বাতাসে উড়ে মুখের ওপরে এসে পড়্‌ছিল, কি জানি তার কি মনে হচ্ছিল! হয় ত ভাব্‌ছিল, 'এই লোকটার সাথে গল্প করে' দু ঘণ্টা মন্দ কাট্‌লো না,—কিম্বা হয় ত—' থাক্‌গে, সে কথা ভেবে আর লাভ কি? তাকে বল্‌লাম—"তুমি শুয়ে পড়, নাম্‌বার একটু আগে তোমাকে তুলে দেবো—"

—"কেন? আমার সাথে কথা বলে' বলে' বুঝি বিরক্ত হ'লে?"

—"এমন অন্যায় অপবাদ দিও না,—তুমি বেশ জানো তোমার সাথে কথা বল্‌তেই আমি চাই।"

"তবে চলো না কেন আমাদের সাথে? বাবার বন্ধু নিশ্চয় ভাব্‌বেন না যে তাঁর ছেলে হারিয়ে গেছে!"

"তা কি করে হয়? এমন সময় যেতে বল্‌লে যে সত্যই আমার যাবার উপায় নেই।"

"আচ্ছা, কবে তোমার সময় হবে? কবে আস্‌বে বল?"

"এর পরের ছুটীতেই যাবো,—যদি তোমরা বিরক্ত না হও—"

"আবার বিলিতি ভদ্রতা?"

"না, সত্যিই বিরক্ত কর্‌বো,—দেখে নিও।"

"আচ্ছা, করো', যত পারো। এখন বুঝি আমরা চলে' যাবো ভেবে তোমার মন খারাপ হচ্ছে? তাই অমন মুখ ভার করে' বসে' আছ? আমি এখন ঘুমিয়ে পড়লে কি তোমার আরও খারাপ লাগ্‌বে না?"

"বুঝলে কি করে' যে তোমাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগ্‌ছে ?—আর তাই বুঝি কেউ বলে' ?"

"তোমার মনের কথা মুখ দেখ্‌লেই বোঝা যায়, —তাই বোধ হয় তোমাকে আমার অত ভাল লেগেছে। আমারও যখন যা মনে হয় বলে' ফেলি, কখনও কিছু গোপন কর্‌তে শিখি নাই, বোধ হয় সেই জন্যে। লোকে আবার এই জন্যে আমার নিন্দাও করে।"

"আমার কাছে তুমি যা মনে আসে তাই বলো', —আমি কিছু ভাব্‌বো না।"

—"শুধু তোমার কাছে কেন ? সকলের কাছেই তাই বল্‌বো।"

"হেরে গেলাম তোমার কাছে বীণা !"

নিজের মুখে তার নামটা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম—কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনালো !

অমরবাবু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বস্‌লেন। "কয়টা বাজলো ?"—

"সাড়ে দশটা।"

বিছানাপত্র বাঁধা, জিনিষ গোছানো, এই সব আরম্ভ হলো',—পার্ব্বতীপুরে গাড়ী এলো, রাত্রি তখন এগারোটা।

আমার ট্রেণ সেখানে এক ঘণ্টা থাকবে। আমি বল্‌লাম—"তোমাদের আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌বো।"

"তা আস্‌বে বৈ কি, না হ'লে এই জিনিষপত্র আর বাবাকে নিয়ে আমার যা মুস্কিল হ'বে,—হয় বাবা হারিয়ে যাবেন, না হয় কুলী জিনিষপত্র নিয়ে স'রে পড়্‌বে।"

কুলী ডেকে জিনিষপত্র তুলে দিয়ে ওদের নিয়ে রওনা হ'লাম। আমার হাতে বীণার এস্রাজটা। Over-bridge পার হ'য়ে যাচ্ছি, এক এক ধাপ উঠ্‌ছি আর এস্রাজটা সিঁড়ির সাথে ঠেকে টুং টাং করে শব্দ হচ্ছে,—বীণাকে আস্তে আস্তে বল্‌লাম—"শুন্‌ছো, বীণার ঝঙ্কার ?"

"এখনই থেমে যাবে, তুমি চলে' গেলে—"

আসন্ন বিদায়ের বেদনা আমার এক নিমেষে দূর হয়ে' গেল, তার ঐ একটী কথায়,—কি আশ্চর্য্য মানুষের মন ! যার এতটুকু কষ্ট দেখ্‌লে মন বিচলিত হয়,—সেই আবার আমার জন্যে কষ্ট পাবে ভাব্‌লে এত আনন্দ হয় কেন ?—বল্‌লাম, "আমার সাধ্য কি বীণার ঝঙ্কার থামাতে পারি ? তবে আমার প্রাণে আর কোনও সুর বাজ্‌বে না আজ থেকে,—"

কোথা থেকে কি যেন হয়ে' গেল ;—যাকে আজ এই প্রথম দেখ্‌লাম তাকে এ সব কি কথা ?—

[ননী বলে' উঠ্‌লো—'Love at first sight কি না, —অমন হয় আমি জানি, আমারও—' বলেই থাম্‌লো।]

কিন্তু সে অসন্তুষ্ট হলো' না ; বল্‌লো, "আমি কখনো লোকের মধ্যে মানুষ হই নাই ; চিরকাল বিদেশে ঘুরেছি। আপনার লোকের মধ্যে আছেন শুধু বাবা, তাই বোধ হয় তোমাকে আমার অল্প সময়ের মধ্যেই এত ভাল লেগেছে ; আর সেই জন্যেই বল্‌ছি, যে, এত দিন যে আমার কিসের অভাব ছিল, তা তুমি চলে গেলে ভাল করেই বুঝ্‌বো এর পর থেকে—"

আমরা তখন over-bridgeএর উপর দিয়ে যাচ্ছি,—মাথার ওপরে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ, দু-একটী তারা দেখা যাচ্ছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, সিগ্‌নালের লাল নীল আলোগুলো যেন অত্যন্ত সজীব বলে' মনে হচ্ছে ;—পায়ের নীচে দু-একটী পলাতক ইঞ্জিনের শ্রান্ত শব্দ কাণে আস্‌ছে,—মনে হচ্ছে যেন আমরা পৃথিবী থেকে বাইরে কোথাও এসে' পড়েছি ;—অমর বাবু অনেক আগে আগে হেঁটে চলেছেন……।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকলাম ; আত্মসংবরণ করার বড়ই দরকার বুঝ্‌লাম। একটু থেমে বল্‌লাম—"সে অভাব ত তোমার থাকবে না, আমি ত কত শত লোকের মাঝে একজন ; আরও কত লোক আছে,…· তাদের কাকেও হয় ত তোমার আরও ভাল লাগবে।"

সে শুধু মাথা নেড়ে বল্‌লো—"তুমি আমায় চেনো না।"

আমি বল্‌লাম,—"তোমার কাছ থেকে দূরে সরে' যাচ্ছি বলে' তুমি কি ভেবেছ যে তোমার কথা সব সময়ে আমার মনে পড়্‌বে না ? দেখো, পরীক্ষা করে'।"

শুনে তার মুখে হাসি ফিরে এল ; বল্‌লো, "মনে থাকে যেন।"

গাড়ীতে সব জিনিষপত্র তুলে দিয়ে আমরা Platformএ পাইচারী কর্‌তে লাগলাম। ষ্টেশনে দু-চারটী ঘুমন্ত কুলী ও দু-একজন যাত্রী ছাড়া লোকজন নেই। শুধু প্রকাণ্ড platformটা জুড়ে কুড়ি হাত পরে পরে বড় বড় আলো জ্বলছে ; মনে হচ্ছিল যেন সব আলো জ্বালিয়ে রেখে পৃথিবীর লোকে ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু আমরা দু'জনে এই ঘুমন্ত

পুরীতে জেগে আছি। সেই আলো বীণার মুখে এসে পড়েছিল, আমি তার দিকে অবাক্ হয়ে' চেয়ে দেখ্‌ছিলাম; আবার চোখে পড়্‌লো তার সরল নির্ভীক দৃষ্টি,—তার আত্মনির্ভরশীলতা, তার চলার দৃপ্ত ভঙ্গী ;·· ···

গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, তাকে তুলে' দিলাম,—অমরবাবুকে প্রণাম কর্‌লাম। বীণাকে বল্‌লাম—"বীণা, চিঠি লিখো, আর—আর ভুলে যেও না যেন।" বলার ত অনেক কথাই ছিল, কিন্তু বল্‌তে পার্‌লাম না।

সে কোনও উত্তর দিল না, শুধু তার ঠোঁট দুটীতে হাসির একটু আভাষ দেখা গেল। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি কলিকাতায় ফিরে এলাম।

* * * *

ননী এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুন্‌ছিল। আমি থাম্‌তেই বলে' উঠ্‌লো—"তার পর?"

"তার পর আর কি?"

"না, না, আরও আছে নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আছে, কিন্তু আজ আর না,—তুমি বুঝ্‌বে না এ সব পুরানো কথার আলোচনা কর্‌লে কত কষ্ট পাই;—আর একদিন বল্‌বো,"—বলে' দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়্‌লাম।

ননী একবার আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে সহানুভূতি জানিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চ'লে যেতেই প্রবোধ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বল্‌লো—"ইঃ! থিয়েটারে যাবার সময় হয়ে' গেছে রে! যে গল্প শোনাচ্ছিলি এতক্ষণ! কিন্তু ক্রমশঃ হয়ে' গেল যে? আর বানাতে পার্‌লি না বুঝি? এবারে কি কর্‌বি? মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌বি, না তাকে মনের দুঃখে থাইসিস্ করিয়ে মারবি? কোন্‌টা বেশী রোমান্টিক্ হ'বে? আমি বলি কি, ওর থাইসিস্ হোক্,—তোর বিরহে,—কেঁদে কেঁদে, তার পর পুরী কিম্বা মধুপুর যাক্, চেঞ্জে; সেখানে তোর নাম কর্‌তে কর্‌তে পটল তুলুক,—আর তুইও ঠিক্ তার পরের দিন সেখানে যেয়ে—বিনু! একবার শেষ দেখাও দিলে না?—বলে' মুর্চ্ছো যা,—কি বলিস?"—

"তুই গোল্লায় যা হতভাগা!"

"এখন ত থিয়েটারে যাই!"

* * * *

দুই

পরদিন।

সকালে উঠে আমার মন মোটেই প্রসন্ন ছিল না। ননী এখনই এসে জ্বালাতন আরম্ভ কর্‌বে, বাকীটা শুন্‌তে চাইবে,—কিন্তু মাথায় যে কিছু আস্‌ছে না! টুনুকে বলা বৃথা, কারণ, শুন্‌তে পাবে না, এখনও ঘুমুচ্ছে; বেলা ৯টা না হলে' ওর ঘুম ভাঙ্গে না। কি করি?

বসে বসে ভাব্‌ছি, কিন্তু ননী এল না, বুঝ্‌লাম ঘরে লোক থাক্‌তে সে আস্‌বে না। এর পরে আরও অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং দৃশ্য সে কল্পনা করে' নিয়েছে, তাই ভাব্‌ছে যে অন্যের সাম্‌নে সে সব কথা আমি ওকে বল্‌বো না······

ক্রমে বেলা বেশী হলো';—টুনু বিছানায় উঠে বসে' চায়ের ফরমাইস্ কর্‌লো,—তার পর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"কি হলো' রে?"

"তোর মাথা, ননীটা এখনই এসে জ্বালাতন কর্‌বে, কি বলি তাকে? এই সকালবেলা তার জন্যে আমি কোথা থেকে প্রেমের আমদানী কর্‌বো বল্ তো?"

"বেশ্ হয়েছে, ননীর কাছে আর প্রেমের গল্প কর্‌বে? কাল যেটুকু তোমাকে খাইয়েছে, সুদে আসলে তা আদায় করে' তবে ছাড়্‌বে,····· ওকে চিন্‌লে না এখনো?"

"এখন এলে সোজাসুজি বলে' দেবো যে কাল ওকে বোকা বানানো হয়েছিল—"

"আহা এত অল্পেই হাল ছেড়ে দিস্ কেন?—অমন জমাট্ প্রেমের অঙ্কুরেই বিনাশ হবে'—বলিস্ কি রে? তোর কি হৃদয় বলে' কোনও জিনিষ নেই? দাঁড়া, আগে দু'ঘটী জল ঢালি; গাছটা বাড়ুক, তার পর তাকে ছেদন করিস্।"

"তবে তুই যা জানিস্ কর,—"

"তোকে কিছু কর্‌তে হবে' না—শুধু মুখ ঢেকে শুয়ে থাক্ দেখি, আমি বল্‌বো এখন তোর মন ভালো নেই, তোকে যেন কেউ বিরক্ত না করে; ননী আপাততঃ তাতেই খুসী হ'বে। কত মহা মহা পুরুষ প্রেমে পড়ে' গড়াগড়ি দিয়েছে, হাবুডুবু খেয়েছে,—কেউ কেউ বিষও

খেয়েছে,—আর তুই একটু বিছানায় শুয়ে' থাকতে পার্‌বি না ?—"

থাক্‌লাম শুয়ে,—কর্ম্মের ভোগ !

কিছুক্ষণ পরে ননী চোরের মত এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

"এই ! ওকে বেশী বিরক্ত করিস্‌নে,—মন খারাপ করে' শুয়ে আছে, থাক্‌তে দে"—বলে টুনু আমার সাবানটা হাতে নিয়ে স্নান কর্‌তে গেল।

ননী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসে' মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো—ব্যথার ব্যথী আর কি !

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই ;—

"এখন কেমন আছ ?"

খুব জোরে দম নিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম—কিন্তু আজ আর খাবার এল না ! আমি আশা ছাড়্‌লাম না, একটা দুটোতে না হয়, প্রতি মিনিটে একটা করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝাড়্‌বো, দেখি কেমন না খাইয়ে পারে !

ননী আমার হাত ধরে' নাড়ী দেখ্‌বার বৃথা চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো—

"তাই ত ! তোমাকে বড্ড দুর্ব্বল বলে' মনে হচ্ছে যে ? রাত্রে ঘুম হয় নি বুঝি ?—আচ্ছা দাঁড়াও—" বলে' সে উঠে' গেল। ঐ রে ! অষুধ খাওয়াবে না কি এবার ?—কি বিপদেই পড়্‌লাম !

কিছুক্ষণ পরে দেখি ননী এক কাপ্‌ গরম দুধ নিয়ে উপস্থিত ; ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এতে কি মেশানো আছে ?"

"ব্রাণ্ডি।" আঃ, বাঁচা গেল। তখন মনে পড়্‌লো যে ননী ফুটবল খেলার দোহাই দিয়ে মাঝে মাঝে দু এক ড্রাম ব্রাণ্ডি খেতো। যাক্‌, এই বা মন্দ কি ? যথা লাভ। এক-চুমুকে শেষ করে' চোখ বুজ্‌লাম—

ননী দেখ্‌লো তার ব্রাণ্ডি আর দুধ বুঝি মাঠে মারা যায় ! সে কিছুক্ষণ ধরে' আমার তুরিয় ভাব দেখে শেষে মরিয়া হয়ে' উঠ্‌লো—"এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?"

"হ্যাঁ, Thanks, কিন্তু তুমি কেন আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌ছ ?"

ননী ভারী গলায় বল্‌লো—"কারণ আমি তোমার কষ্ট বুঝি বলে' ;—পৃথিবীতে খাঁটী জিনিষ বড্ড কম, তাই খাঁটী জিনিষ দেখ্‌লে তাকে শ্রদ্ধা করি"—

আমি ভাব্‌ছিলাম বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির কথা—"এই ভালবাসা যদি ভগবানকে দিতে, তবে এত দিনে নিশ্চয় তোমার মোক্ষ লাভ হ'তো"—অর্থাৎ এই বুদ্ধি যদি তোমার লেখাপড়ার সময়ে খুল্‌তো, তবে তুমি ঠিক্‌ প্রথম হয়ে' পাশ কর্‌তে—নাঃ! ননীচোরার মধ্যেও ভাল জিনিষ আছে ! যথা,—চা, ডিম, দুধ, ব্রাণ্ডি, আরও হয় ত অনেক কিছু !

"তার পর কি হলো' ভাই ?"

"আমার শরীরটা বড় খারাপ, এখন থাক ভাই, বিকালে।"

বিকালে কি শুধু হাতে আস্‌বে ?···সেদিন দেখেছি তার বাড়ী থেকে মোরব্বা আর চাট্‌নী এসেছে, এখনও কিছু আছে বোধ হয় !

ননী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে' চলে' গেল।

* * * *

বিকালে টুনু বেরিয়ে যেতেই ননী এসে উপস্থিত। আজ আর ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"এইবার বাকীটা বল"—কি জানি তার মনেও সন্দেহ হয়েছিল কি না ?

"কি বল্‌বো ?—সে অনেক কথা"—

"এখানে বল্‌তে সুবিধা হবে না,—না ? চল তোমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই,—কোথায় যাবে ? ইডেন গার্ডেন ? লেক ? গঙ্গার ঘাট ?"

এ দেখ্‌ছি আমাকে নিজের অস্থাবর সম্পত্তির সামিল করে' নিয়েছে ! যাক্‌, তবু যদি এই সুযোগে ননীর খরচে Taxiতে বেড়ান যায় ! মোরব্বা ও চাট্‌নীর আশা ত্যাগ কর্‌লাম। যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বল্‌লাম—"না শুনেই ছাড়্‌বে না ? চল তাহ'লে কোথায় নিয়ে যাবে,···গঙ্গার ধারেই চল, মাথাটাও ধরেছে···।"

ননী সত্যিই Taxi করে' গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেল। জলের কিনারায় ঘাসের ওপরে বস্‌তে গেলাম,—ননী তাড়াতাড়ি তার একমাত্র সিল্কের রুমাল বের করে' পেতে দিল "এইবার বল,—"

গঙ্গার হাওয়া লেগে আমার তখন মাথা খুলে গেছে, বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম—

"গরমের ছুটীতে বীণার কাছে গেলাম। তার নিমন্ত্রণ

উপেক্ষা করার সাধ্য আমার ছিল না; সাত দিনের জন্যে গিয়ে দুমাস ছিলাম। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তটী আমার বীণার সঙ্গ পেয়ে মধুর হয়ে' উঠ্‌তো···সে আমাকে কি ভাব্‌তো জানি না, কিন্তু আমার সঙ্গ যে তার ভাল লাগে, সে কথা রোজ একবার করে' বল্‌তো। অমরবাবুর সাথে দর্শন আর বেদান্ত আলোচনা কর্‌লেই তিনি সন্তুষ্ট থাকৃতেন। আলোচনা করার মত বিদ্যে আমার ছিল না, কিন্তু তার দরকার হতো' না; আমাকে শ্রোতা পেয়েই তিনি সুখী ছিলেন। তিনি এত আপনভোলা লোক বলেই আমরা অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম·· বাধা দেবার বা বারণ কর্‌বার কেউ ছিল না। তা ছাড়া, আমার সাথে বীণার বিবাহ মোটেই অসম্ভব ছিল না; এমন কি উভয় পক্ষ থেকেই সেটা প্রার্থনীয় হবার কথা।—

ফলে যা হবার তাই হলো;—সাত দিন যেতে না যেতে বুঝ্‌লাম যে বীণাকে আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে না পেলে চল্‌বে না······।”

ননী এতক্ষণে উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; এত বড় একটা জমাট্ রোমান্স্ বাস্তব জীবনে যে সম্ভব হয়, তা ওর কল্পনাতেও আসে নি·· এইবার এত দিনে একটা সত্যিকার জ্যান্ত রোমান্সের খোঁজ পাওয়া গেছে,—উৎসাহে আনন্দে ননী নাচে আর কি!

আমাকে থাম্‌তে দেখে সে বলে' উঠ্‌লো—“কেন? তাতে দোষ কি? এমন ত প্রায়ই হয়,···এতে—”

বাধা দিয়ে বল্‌লাম “আগে সবটা শুনে নাও,—কেমন যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল;—বীণাকে এত কাছে পেয়েও ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌তাম না,—এক এক সময়ে তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—নূতন কেউ বলে' মনে হ'তো; কিন্তু নিজের অবস্থাটা ঠিক্ বুঝেছিলাম —আমার বিশেষ ভাব্‌না হ'তো না,—বীণা যে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বে, এ কথা ভাব্‌তে পার্‌তাম না;····· এ বয়সে আমাদের সকলেরই বোধ হয় একটু অহংজ্ঞান থাকে, ···ভাব্‌তাম বীণাও আমাকে ভালবাসে······।

ভেবেছিলাম একদিন বীণার হাত দু'টী ধরে' তাকে মনের কথা জানাবো···ভালো ভালো কেতাবে যে-রকম বর্ণনা আছে, ঠিক সেই মত করে'; আর সেও অমনি লজ্জায় মাথা নীচু করে' সম্মতি জানিয়ে আমার গায়ে ঢ'লে পড়্‌বে,···বা ঐ-রকম কিছু! এই সব কত কি যে ভাব্‌তাম তার ঠিক্ নেই;—শেষে সে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে' জেরা কর্‌তো, কি হয়েছে আমার। ভাব্‌লাম এখনও সময় আসে নাই। আসলে আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না।—

শেষে, যাওয়ার আগের দিন—বিকালে বাগানে বেড়াচ্ছি দু'জনে;—দু'সারি রজনীগন্ধার গাছ বীণা নিজে লাগিয়েছিল, তার ভিতরে একটী মরা গাছের গুঁড়ী ছিল তার বস্‌বার প্রিয় জায়গা। বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে বীণাকে বল্‌লাম—‘তোমার সাথে কথা আছে।’ সে কাঠের গুঁড়ীর ওপরে পা ঝুলিয়ে বস্‌লো, পাশের একটা করবী গাছে হেলান দিয়ে······সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকৃলে ঠিক্ ভাব্‌তো আমি কোনও দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে যাচ্ছি;···মুখ ঘেমে উঠেছে,·· গলার স্বরও বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল না;···

আমি আনমনে করবী গাছটা ধরে' নাড়া দিতেই কয়েকটী ফুল পাতা তার গায়ে মাথায় ঝ'রে পড়্‌লো,···

‘তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাই বীণা!’—সে খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠ্‌লো—! বল্‌লো—‘উঁহু—হ'লো না; হাঁটু গেড়ে বস্‌তে হয় পায়ের কাছে, হাত জোড় করে';—কি বল্‌বে? যে তুমি আমাকে ভালবাস?—সে ত তুমি বল্‌বার অনেক আগে থেকেই বুঝেছি;—তোমার কাণ্ড দেখে! কি বোকা ছেলে! আমার কি চোখ নেই?······’

এমন অদ্ভুত মেয়ে দেখেছ কখনো? আমি হতবুদ্ধি হয়ে' তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম!

সে হাসি থামিয়ে তখন বল্‌তে লাগ্‌লো—‘এই কথাটা বল্‌তে এত সাজ-সরঞ্জাম লাগে না, কি?—ফুলের বাগান চাই, রজনীগন্ধার গন্ধ চাই, করবী গাছের আড়াল চাই, গলার স্বর ভেঙ্গে যাবে, মুখ লাল হয়ে উঠ্‌বে—তিনবার থেমে তার পর বল্‌বে?—তুমি ত বেজায় মজার লোক! দেখ ত আমি কেমন সহজ ভাবে বল্‌ছি—‘আমি তোমাকে ভালবাসি’—এত দিনেও যদি না বুঝে থাকো, সেই জন্যে পরিষ্কার ভাষায় বল্‌লাম—’

আমি তার ঠাট্টা ভুলে গেলাম,—সব ভুলে গেলাম,—তার হাত দুটী ধরে বললাম—'বীণা সত্যি? তাহ'লে—'

'তাহ'লে আবার কি?—ওঃ বুঝেছি—আমাকে বিয়ে কর্‌তে চাও?—কিন্তু সে ত হবে' না—'

'সে কি? কেন?—'

'কথাটা শোন আগে,'—বলে সে যেন অবুঝ ছেলেকে বোঝানোর মত ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—

'তুমি জানো আমি অন্য সকলের মত না,—আমার স্বভাব অন্য রকম;···তুমি কি চাও? আমার ভালবাসা? বা আমাকে ভালবাস্‌তে?—বিয়ে কর্‌লে তা পাবে না;—আমি কখনো বিয়ে কর্‌বো না,—আমার নিজের যা আছে, বাবা গেলে তাতেই আমার চলে যাবে;—আমি তোমাকে ভালবাসি,—বিয়ে কর্‌লে সেটা থাক্‌বে না;—তোমাকে আমি এত ভালবাসি, যে, তোমাকে কখনো হারাবো, তা আমি ভাব্‌তে পারি না;—বিয়ে কর্‌লে ঠিক তাই হ'বে;—ও একটা মস্ত বড় ভুল,—দুদিনেই নূতনত্বের মোহ চলে যায়। যাকে প্রতিনিয়ত নানা ভাবের মধ্যে দিয়ে কাছে পাওয়া যায়, সে শেষকালে একটা অভ্যাসের মত হয়ে' দাঁড়ায়; যেমন দাড়ী কামানো বা চুল বাঁধা,—তাকে না হ'লে হয় ত চলে' না, কিন্তু তাকে ভালবাসা যায় না,—'

একটু থেমে সে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো—'আমি চাই যখনই তুমি আমাকে দেখ্‌বে, তখনই যেন আনন্দে তোমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,—আশায় তোমার বুক দুলে' ওঠে,—আমার পায়ের শব্দটীও যেন তোমার কাণে সত্যিকার সঙ্গীতের সৃষ্টি করে;—বিয়ে হ'লে আমরাও যে আর পাঁচজনের মত হয়ে' যাবো! সংসারের গোলমালে কি আমাদের ভালবাসা বাঁচবে?—কখনো না—এ হতে' পারে না···।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসো যদি তবে আমার হতে' চাও না কেন?—'

'আমি কি একটা অচেতন পদার্থ, না পোষা জন্তু যে একজনের হ'তেই হবে?—আমি কারও হতে' চাই না,—নিজেরই থাকতে চাই;—'

এর কি উত্তর দেবো আমি? কতটুকুই বা ভেবেছি এ বিষয়ে?—যে মেয়ে তর্কে পদে পদে আমাকে হারিয়েছে, তাকে বোঝাবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি আমার কই?···শুধু নিজের মনের কষ্ট,—একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না,—সে ক্ষমতা ছিল না;—শুধু মনে হলো'—ভালবাসার চরম বিকাশ না কি আত্মত্যাগে,—এই কি সেই জিনিষ?··· তাই যদি হবে তবে আমার বুকের ভিতরটা বেদনায় এমন ভরে' উঠ্‌বে কেন? ··আমি কি কিছুই দিতে চাই নি?···

* * *

আর কোনও কথা বলি নাই,—কি বা বল্‌বো?—বীণাকে চিন্‌তাম,—তার মত বদ্‌লাবে না;—তা ছাড়া কি লাভ?—সে যা ভাল বোঝে তা কর্‌বেই···কোনও আশা নেই—।

পরদিন বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। আর কোনও খবর নিই নাই। দু'দিনের জন্যে গিয়েছিলাম,—আবার চলে এসেছি—দু বছর হয়ে গেছে, কিন্তু ভুল্‌তে পারি নাই—"

* * *

ননীর মাথায় এই অতি-আধুনিক নারী সমস্যা ঢুকেছিল কি না জানি না,—তবে সে যে খুব বেশী আশ্চর্য্য হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছিল। নিজের কাল্পনিক দুঃখে এতই বিচলিত হয়ে'ছিলাম যে বোধ হয় দু-এক ফোঁটা চোখের জলও পড়েছিল! ননী সমবেদনায় কাঁদে আর কি!···অনেক অসম্ভব অসম্ভব উপদেশ দিল,—আমার জন্যে সে যে অসাধ্য-সাধন কর্‌তে প্রস্তুত তাও জানালো;—এমন কি নিজে আমার প্রতিনিধি হয়ে বীণার কাছে যেয়ে আমার আর্জ্জি পেশ কর্‌বে এই রকম সঙ্কল্প করেছে তাও বল্‌লো—

দেখ্‌লাম ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে;—গল্প বলার সময়ে খেয়াল ছিল না যে অমরবাবু বলে সত্যিই এক ভদ্রলোক ভাগলপুরে থাকেন;—আমাদের সাথে আত্মীয়তাও আছে,···তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কোনও মেয়ে নেই;—কাজেই এখন ননীকে সাম্‌লানোই হচ্ছে প্রথম কাজ;·· হয় ত সত্যই একদিন ভাগলপুরে যেয়ে উপস্থিত হ'বে!

ঠিক কর্‌লাম ওটা টুনু কর্‌বে,—আমার এই হতাশ প্রেমিকের "পার্ট"এর পরে আর কোনও অভিনয় কর্‌বার সামর্থ্য আমার ছিল না—।

রাত্রে টুনুকে সব কথা বলে' তার পরে বল্‌লাম—

"তোকে এখন ননীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাতে হবে'—না হলে' কি কাণ্ড যে করে' বস্‌বে, তার ঠিক্ নেই···"

টুনু খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বল্‌লো, "আচ্ছা, আজ খাবার সময়ে ননীকে গলাবো—।"

* * *

রাত্রে খাবার ঘরে আমরা সকলে একত্র হয়েছি ;—টুনু খেতে খেতে বল্‌লো—"ওহে তোমরা শোন! সব রোগেরই অষুধ আছে,—কিন্তু প্রেমে পড়ার অষুধ কেউ জানো ?"—

কে যেন বল্‌লো—"ওটা ব্যাধি বলে ধর্‌তে চাও না কি ?"

"সকলের সেরা ব্যাধি,—তার ওষুধ"—বলে' আমার মুখের দিকে চেয়ে,—"ও বের করেছে।"

"কি ?"

"Principleটা নতুন না,—inoculation।"

"প্রেমের টীকে দেবে না কি ?"

"কতকটা ;—আগে থেকে মনে মনে প্রেমে পড়ে' নিলে শেষে আর ভয় থাকে না ;—তখন মেয়েদের দেখলেই যে প্রেমে পড়া,—এটা আর হয় না,—"

"Shame !"

"না—না, সত্যি কথা ;—ওকেই জিজ্ঞেসা কর ;—কিন্তু তাতেও আবার বিপদ আছে ;—যাদের হৃদয়টা বড়ই কোমল, তারা আবার সেই কাল্পনিক প্রেমের গল্প শুনে প্রেমে পড়ে' যায়।—"

"কার আবার Second hand ছোঁয়াচ লাগলো ?"

"আমাদের ননীর"—

"সে কি ?"—সবাই এক সাথে কলরব করে' উঠলো,—টুনুর ভাব দেখে সবাই বুঝেছিল যে এর ভিতরে নিশ্চয় কিছু আছে।

টুনু তখন বীণার কাহিনী সালঙ্কারে সকলের কাছে প্রকাশ করে' দিল,—এবং ননী যে গল্প শুনেই হৃদয় হারিয়েছে, এই রকম অভিযোগ কর্‌লো।

ননী প্রথমে আপত্তি করার চেষ্টা করে'ছিল ; কিন্তু শেষে টুনু যখন ননীর প্রেমিক হৃদয়ের লক্ষণ স্বরূপ মেসের বেড়ালটার সাথে রাত্রে তার প্রেম সম্ভাষণ শুনেছে বলে শপথ কর্‌তে চাইল, ননী তখন আর না পেরে রাগ করে' উঠে গেল। সেই থেকে আমার সাথে তার কথা বন্ধ !

কিন্তু আমার বিশ্বাস ননীর মনে এখনও সন্দেহ আছে আমার গল্প কতটা মিথ্যা সে বিষয়ে। কারণ, শুনেছি বিয়ের পরে (ননীরও বিয়ে হ'য়েছিল !) সে তার স্ত্রীর সাথে রোজ দেখা পর্য্যন্ত কর্‌তো না—পাছে ভালবাসায় ভাঁটা পড়ে !···এবং শোনা যায়, প্রায়ই তাকে উপদেশ দিত—"তুমি আমার না,—তুমি তোমারই ;···তুমি কি একটা অচেতন পদার্থ, না পোষা জন্তু, যে তোমার ওপরে কারও অধিকার জন্মাবে ?·· সংসারের গোলমালের মধ্যে কখনো ভালবাসা বাঁচতে পারে না—।"

তার স্ত্রী বল্‌তো—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারি ভবন, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতি। *

বেলভেডিয়ার্—ইহার প্রতিষ্ঠার বিষয় নিরাকরণ করা অতীব দুরূহ। কথিত আছে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স আজিম্ উস্ শান্ দ্বারা আরম্ভ হয়। উহা পূর্ব্বে মিঃ ফ্র্যাংক্‌ল্যাণ্ডের (Mr. Frankland) বাগান-বাড়ী ছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বেলভেডিয়ারের প্রথম নামোল্লেখ দেখা যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ মেজর টলিকে এই বাটী বিক্রয় করেন। তৎপরে আরো কতিপয় হাত ফিরিয়া শেষে লর্ড ডালহৌসির সময়ে রবার্ট প্রিন্সেপের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন।

---

* মন্দির, মসজেদ্ ও গির্জ্জা প্রভৃতির কথা এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয় নাই।

সুপ্রীমকোর্ট—১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এই আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কার্য্য প্রথমে বুশিয়ে (Mr. Bouchier) নামক এক সওদাগরের বাড়ীতে আরম্ভ হয়। এই বাড়ীকে লোকে কোর্ট হাউস্ বলিত। এইরূপ অনুমিত হয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্য নূতন বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। পরে এই বাটী ভাঙ্গিয়াই তৎস্থানে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে হাইকোর্ট নির্ম্মিত হয়।
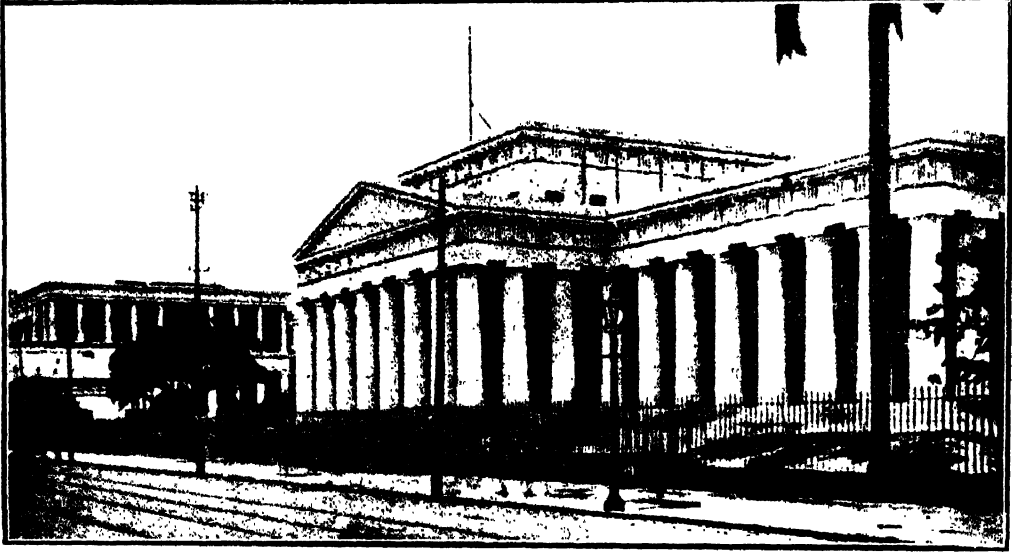
—

সদর দেওয়ানি আদালত—ইহা প্রথমে পীড়িত সৈনিকদের হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বাটী নির্ম্মাণ শেষ হইবামাত্র লর্ড্ উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক ইহাকে আদালত রূপে ব্যবহার করেন। এখানে আপিলের মোকদ্দমাই হইত। পরে উহা মিলিটারী হাঁসপাতাল্ রূপেই ব্যবহৃত হয়। পুরাতন সদর দেওয়ানি আদালত টালির নালার উত্তর পারে ছিল।

—

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্—বর্ত্তমান ডালহাউসি স্কোয়ারকে পূর্ব্বে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বলিত। উহার উত্তর দিকে বর্ত্তমানে যেখানে রাইটার্স্ বিল্ডিংস আছে পূর্ব্বেও এই স্থানেই উহা ছিল। সে বাটীও এতাদৃশ সুবৃহৎ ছিল ; কিন্তু সৌন্দর্য্যে অনেকাংশে হীন ছিল। লর্ড্ ওয়েলেশ্‌লি যখন গভর্ণর্ ছিলেন, তখন তিনি সিভিলিয়ান যুবকদের প্রথম এ দেশে আসার পর এক বৎসর ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে উপযুক্ত পণ্ডিত ও মুন্সির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল সিভিলিয়ান্ যুবকদের সুখ-সুবিধার জন্যই প্রথম এই বাটীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

টাঁকশাল।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

লর্ড, উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থির হয় সিভিলিয়ান্ ছাত্রগণ তাঁহাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত অন্যত্র থাকিতে পারিবেন। ইহার পর ইহাকে সংস্কৃত করিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হয়। ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ্ এই বাটীতেই ছিল। উহা উঠিয়া যাওয়ার পর উহাকে সরকারি অফিসে পরিণত করা হয়।

রেস্ কোর্শ।
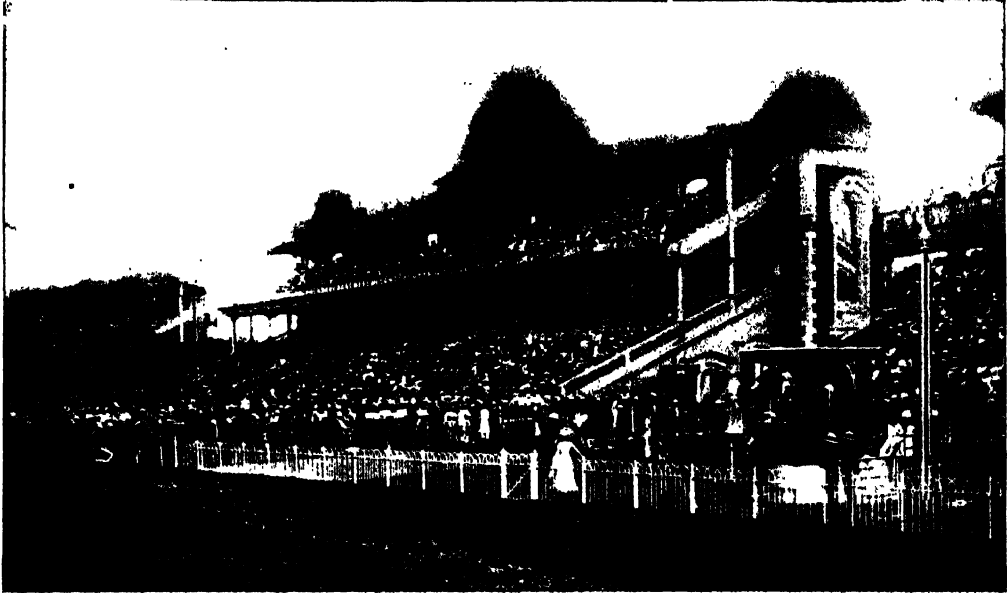
পর সাধারণের প্রয়োজন এবং গুদামরূপে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।

টাউনহল—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে টাউনহল নির্ম্মিত হয়। উক্ত

মহাবটবৃক্ষ—বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেন।

এই অট্টালিকার নির্ম্মাণকাল জানিতে পারা যায় নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের টাকার মধ্যে পাঁচ লক্ষ সিক্কা টাকা লটারির দ্বারা তোলা হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট এই লটারির

জন্ম অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওল্ড্ কোর্ট্ হাউসে টাউন্‌হল ছিল।

এই কোর্ট্ হাউস সেণ্ট্ এণ্ড্রু গির্জ্জার অতি সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। এই অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া টাউনহল নির্ম্মাণের কল্পনা প্রথম হইয়াছিল। গারষ্টিন্ ও অবেরী

এসিয়াটিক্ সোসাইটি।

নামক ইঞ্জিনীয়ারদ্বয়ের সাহায্যে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইংরাজি ১৮০৬।৭ অব্দ ইহার নির্ম্মাণ কাল। বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকীয় ঘোষণাসমূহ ইহার বিস্তৃত সোপানাবলীর উপর হইতে বিঘোষিত হইয়া থাকে।

—

লা মার্টিনার ইনষ্টিটিশন্।

প্রেসিডেন্সী হাঁসপাতাল্—১৭০৯ খৃষ্টাব্দেও ইহা ছিল বলিয়া হ্যামিণ্টন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল পূর্ব্বে সদর দেওয়ানি আদালত যে বাটীতে ছিল তথায় অস্থায়ী ভাবে প্রথম স্থাপিত হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জেনারেল হাঁসপাতালের জন্ম গভর্ণমেণ্ট অনেকটা জমী ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। উক্ত হাঁসপাতাল সাহেবদের ব্যবহারের জন্ম প্রতিষ্ঠিত।

—

মেয়ো হাঁসপাতাল—১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রধানতঃ রেভারেণ্ড জন্ ওয়েনের চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যার্ জন্ শোর্ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, এ কথাও কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন। ইহা প্রথম চিৎপুরে ফৌজদারী বালাখানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল নেটিভ্ হাঁসপাতাল্। ১৭৯৬ বা ৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ধর্ম্মতলার রাস্তায় উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা ষ্ট্রাণ্ড রোডের বর্ত্তমান ভবনে উঠিয়া আইসে এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সাধারণের ব্যবহারে আইসে।

—

এসিয়াটিক্ সোসাইটি—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনিই এখানকার প্রথম সভাপতি এবং ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ইহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক হন। ইহার বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে প্রতি মাসের প্রথম বুধবার রাত্রি ৯টায় ৫৭ নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে ইহার সভাধিবেশন হইত।

মাদ্রাসা—ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের চেষ্টায় আরবি ও পারস্য ভাষা এবং মুসলমান আইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৮০ বা ৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইহাই বোধ হয় এ দেশের প্রথম বিদ্যালয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজি বিভাগ খোলা হয়।

—

ফ্রি স্কুল—খৃষ্টান বালক বালিকাদের জন্য ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ওল্ড্ ক্যালকাটা চ্যারিটি এবং ফ্রি স্কুল সোসাইটির তহবিলের তিন লক্ষ টাকার উপর ইহাতে ব্যয় হয়। প্রথমে জানবাজারের ইহার জন্য একটি বাটী কেনা হয়।

—
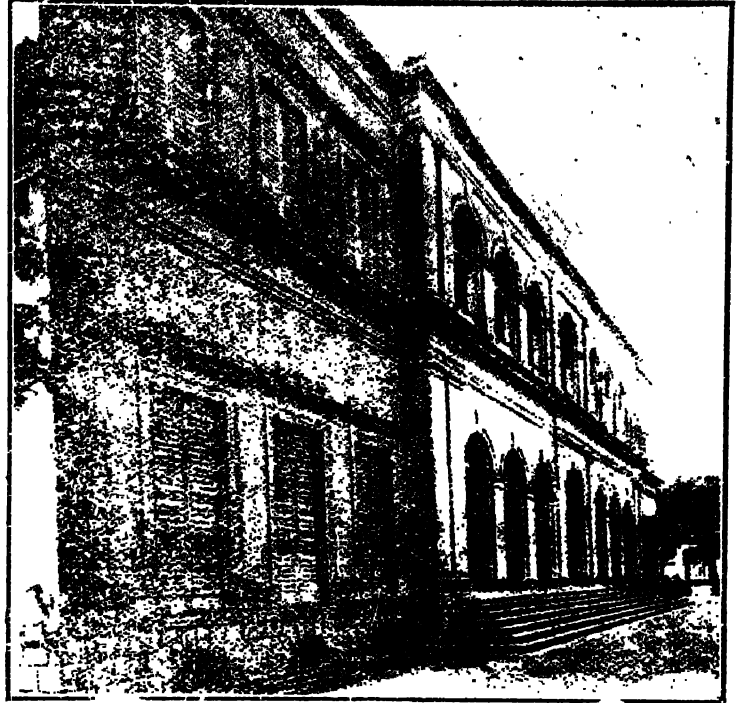
ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ—১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গালা শিক্ষার সুবিধার জন্যই লর্ড ওয়েলেসলির দ্বারা প্রধানতঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা রাইটার্স্ বিল্ডিংএ অবস্থিত ছিল। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতাপাদিত্য চরিত" লেখক রামরাম বসু এখানকার বাঙ্গালা বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক—১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উহার নাম ছিল ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইহা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নাম প্রাপ্ত হয়। প্রথমে মূলধন ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। গভর্ণমেণ্ট মাত্র ১০ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজ—১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি অপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাটী মাসিক ৮০৲ টাকায় ভাড়া লইয়া তথায় হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে ১২০০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহার বাটী নির্ম্মিত হয়। তৎপরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসির সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলা হইলে এই বিদ্যালয়টি উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম ২০টী ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে ইহাকে মহাপাঠশালা বলিত। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বপ্রথম ডেভিড হেয়ারের মনে উদিত হয়, এবং প্রকাশ্যে প্রথম উদ্যোগ হয় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে। ঐ দিন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসীরা চিফ জাষ্টিস্ হাইডের (Sir E. Hyde East) ভবনে লর্ড ময়রার সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঠিক করেন। পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ যে স্থানে ছিল এখন তথায় হিন্দু স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

স্কটীশ্ চার্চ্চ কলেজ।

সদর দেওয়ানি আদালত।

—

বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল্ কিডের পরামর্শ অনুসারে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে

ভারতের এই অদ্বিতীয় বাগানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত তিনি এই রাজকীয় উদ্যানের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার উন্নতির জন্ত তিনি প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই মোগলদের থানা ও মৃৎদুর্গ ছিল। কথিত আছে,

জেনারেল পোষ্ট অফিস্।

চা ও সিনকোনা বা কুইনাইনের চাষ সম্বন্ধে প্রথম এই স্থানেই পরীক্ষা হয়। দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতির গাছও বাঙ্গালায় প্রথম এই স্থানেই রোপিত

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ—পলাশি গেট।

হয়। সুপ্রসিদ্ধ বটবৃক্ষটি তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। এই উদ্যান মধ্যে কীডের একটি প্রস্তরময় স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ইঁহার নাম হইতেই খিদিরপুর নাম হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজ—লর্ড ওয়েলেস্‌লি প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টের সময় ইহা স্থাপিত হয়। তখন ইহার জন্ত বাৎসরিক ৩০০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইত।

বিশপ্ কলেজ—বিশপ মিডলটন্ দ্বারা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইহা প্রথমে বর্ত্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাটী যে স্থানে আছে তথায় স্থাপিত হয়। তথা হইতে ২৩৩ নম্বর সার্কুলার রোড এবং পরে ২২৪ নম্বর লোয়ার সার্কু-লার রোডে উঠিয়া আইসে।

লা মার্টিনিয়ার কলেজ—ক্লড মার্টিনের (General Claude Martin) এর দানপত্রের সর্ত্তানুসারে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দাতার অভি-প্রায়ানুসারেই এই নাম-করণ হইয়াছিল। এখানে ছাত্রদের আহার ও শিক্ষার ব্যয় লাগে না।

জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ ইনষ্টি-টিউশন্—১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সর্ব্বপ্রথম ৫টি বালক লইয়া চন্দননগরের ফিরিঙ্গী কমল বসুর অপার চিৎপুর রোডের বাটীতে ডাক্তার ডফ (Dr. Alexander Duff) কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ইহা বর্ত্তমান বাটীতে উঠিয়া আইসে। তখন ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল সাত শতেরও অধিক। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী ভাবে ইহা বন্ধ হয়

এবং পুনরায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। পরে ইহারই নাম Scottish Church College হয়।

ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন্—উক্ত ডাক্তার ডফের চেষ্টাতেই ইহা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম নিমতলার একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যায়। ডাক্তার ডফ্ একটি অনাথ আশ্রম, একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নর্ম্মাল স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করেন।

ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি—বিশপ টার্ণার এবং কতিপয় দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোকের সহায়তায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লালবাজারে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং খ্যাতনামা দ্বারকানাথ ঠাকুর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

শীলস্ ফ্রি কলেজ—ইহা সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীলের দ্বারা স্থাপিত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইহাই একমাত্র অবৈতনিক বিদ্যালয়।

মেডিক্যাল কলেজ—লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া পর বৎসর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। হাঁসপাতাল পরে নির্ম্মিত হয়। লটারি কমিটির অবশিষ্ট টাকা, পুরাতন ও নূতন হাঁসপাতালের তহবিল এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে রোগীদের লওয়া হয়। তখন ৫০০ রোগী থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে* এস্প্লানেডের ষ্ট্রঙ্গ (E. P. Strong) সাহেবের বাটীর নিম্নতলে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহা ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের বাটীতে উঠিয়া আইসে। এই সময় গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৪৫০০ খানি পুস্তক কলেজ হইতে দেন। পরে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কয়লাঘাটের নবনির্ম্মিত বাটীতে স্থাপিত হইয়া লর্ড মেট্কাফের (Sir Charles Metcalfe) নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মে একটি সাধারণ পুস্তকালয় ছিল। এই বাটীর নক্সা করিয়াছিলেন কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট্ রবিন্‌শন্ (C. K. Robinson) সাহেব। বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বার্ণ কোম্পানী। উহাতে ব্যয় হইয়াছিল ৬৮০০০৲ টাকা।
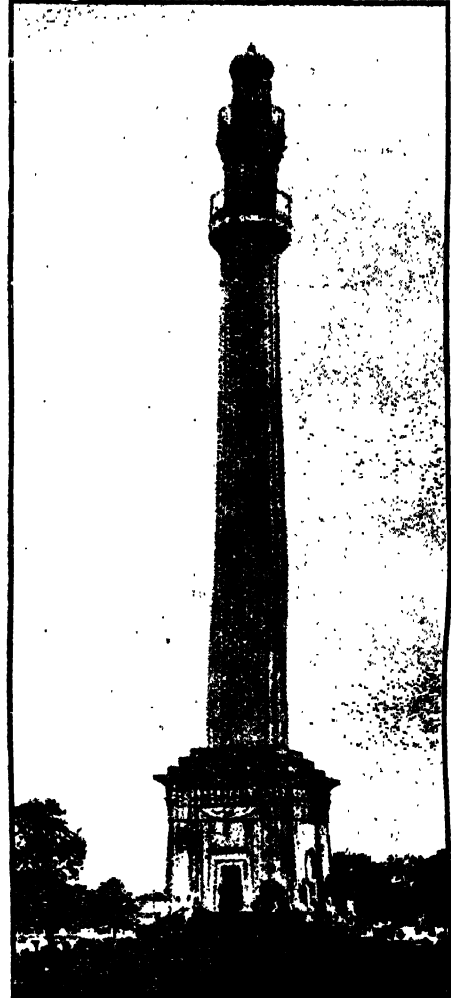
অক্টারলনি মনুমেণ্ট্।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ মধ্যে একটি সাধারণ পুস্তকাগার ছিল।

সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে পার্ক ষ্ট্রীটে রোম্যান ক্যাথলিক সাহেবদের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহার নাম হয় সেণ্ট জন্ কলেজ। বর্ত্তমান

* মতান্তরে ১৮৩৬ সালের ২১শে মার্চ্চ।

বাড়ীটী রেভারেণ্ড ডাক্তার কারুর দ্বারা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ক্রীত হয়।

—

দুর্গের একদিক।

ফ্রিচার্চ্চ অরফেনেজ—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৫টী ছাত্রী লইয়া ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। বসাক ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা এবং ইটালির ক্যানাল্ ষ্ট্রীটে এই স্কুলটী অনেক দিন অবস্থিতির

সেনেট্ হাউস্।

পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল্ এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বেথুন কলেজ—১৮৫০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেথুন সাহেব (J. E. Drinkwater Bethune) দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেপুটি গভর্ণর স্যার জন্ লিটলার কর্ত্তৃক মহা ধুমধামের সহিত ইহার ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষা-মন্দিরের বাটী নির্ম্মাণের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন।

—

আর্ট স্কুল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বৌবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। মঁসিয়ে রিগড্ (Mous Rigaud) নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করেন। Society for the Promotion of Industrial Art দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

—

ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউট্—সাধারণের চাঁদা ও সিপাহী বিদ্রোহের বীরদের স্মৃতিরক্ষার্থ বিবিধ তহবিলের টাকা হইতে ইহা নির্ম্মিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ মহা সমারোহের সহিত ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট লাট বিডন্ (Sir Cecil Beadon) ইহার উদ্বোধন-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—

কাষ্টম্ হাউস—১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে প্রস্তাব হয় পুরাতন দুর্গটিকে কাষ্টম্ হাউসে পরিবর্ত্তিত করা হইবে,

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। পুরাতন কাষ্টম্ হাউস কয়লাঘাটে পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি নূতন বাটীর ভিত্তি স্থাপনা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ—১৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম দুর্গ নির্ম্মিত হয় বা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। শোভা সিংহের বিদ্রোহ হওয়াতেই এই দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল। উহা ক্লাইব ষ্ট্রীটের মধ্য হইতে পুরাতন লালদীঘির উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্ত্তমানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যেখানে আছে প্রথম এই স্থানেই নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের কথা হয়। পরে বর্ত্তমান স্থানটি নির্ব্বাচিত হয় এবং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করা আরম্ভ হয় ও অবিলম্বে ভিত্তি স্থাপনা হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহা নির্ম্মাণে মোট ব্যয় হয় দুই মিলিয়ন্ ষ্টার্লিং, তন্মধ্যে কেবল গঙ্গার ধার বাঁধিতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যে সময় উহা নির্ম্মিত হয়, তখন ভিতরে চারি সহস্র লোক থাকিবার মত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের চতুর্থ উইলিয়মের নামে ইহার নামকরণ হয়।
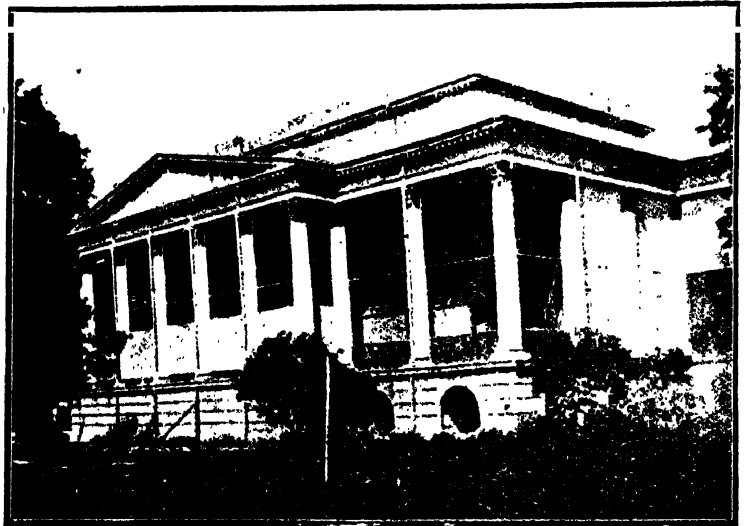
টাঁকশাল্—বর্ত্তমান টাঁকশাল্ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জার পশ্চিমে একটি টাঁকশাল ছিল। উহাতে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তামার পয়সা প্রস্তুত হয় নাই। তখন এ দেশে কড়ি বিশেষ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান টাঁকশালের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে। মেজর্ ফরবেস্ (Major Forbes) উহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড এবং কলকারখানা বসাইতে ১০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এই বাটীর

সংস্কৃত কলেজ।

মেঝের ২৬ ফিট্ নিম্ন হইতে বনিয়াদ তোলা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহাতে ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট ৩১০০০০ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। কথিত আছে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাঁকশাল।

বেথুন কলেজ।

——

জুলজিক্যাল্ গার্ডেন্—ডাক্তার ফেরার্ (Dr. Fayrer C. S. I.) সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই চিড়িয়াখানার কল্পনা করেন। ছয় বৎসর পরে মিঃ সোয়েণ্ডার (Mr. L. Schwender) এর চেষ্টায় এসিয়াটিক্ সোসাইটি এবং হর্টিকালচারাল্ সোসাইটি বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ রূপে যখন ভারতবর্ষে আইসেন তখন উহার উদ্বোধন করেন।

মেডিক্যাল্ কলেজ।

অকটার্লোণী মনুমেণ্ট্—স্যার ডেভিড্ অক্‌টার্লোনীর স্মৃতি রক্ষার্থ চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। সিভিল মিলিটারি ও ব্যবসাদার সকল সম্প্রদায়ের চাঁদা দ্বারা এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই স্মৃতি স্তম্ভ উচ্চে ১৬৫ ফিট্।

রেস্ কোর্স্—বেঙ্গল জকি ক্লাবের দ্বারা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ঘোড়দৌড় খেলা আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান রেস্ কোর্স্ ১৮১৯এ প্রস্তুত হয়। ইহার পূর্ব্বে আকনায় রেস্ কোস্ ছিল।

পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ কমিটি—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়।

হর্টিকালচারাল্ সোসাইটি—ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশনারি জেমস্ কেরির উদ্যোগেই ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম অবস্থায় ইহার উন্নতি কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ডালহাউসি ইনষ্টিটিউট্।

লণ্ডন মিশনারি সোসাইটী—ইহা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরের বাটীতে ইহা স্থানান্তরিত হয়।

ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল—ইহার প্রথম নাম ছিল পপার হাঁসপাতাল।
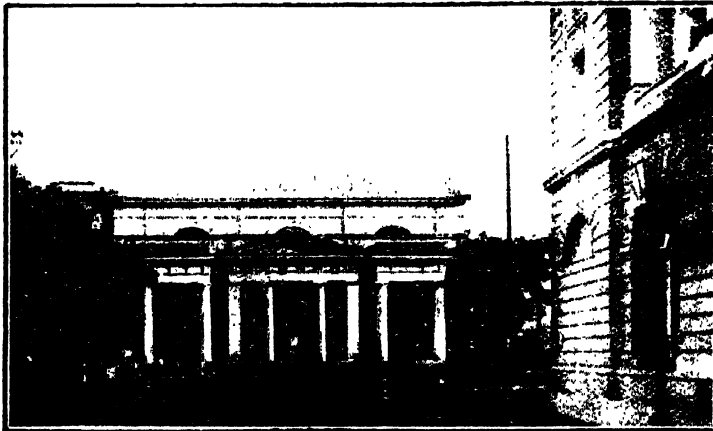
পশুক্লেশ নিবারণী সভা—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ এল্‌গীন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সভার উদ্যোগে সভ্য প্যারিচাঁদ মিত্রের চেষ্টায় পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন প্রস্তুত হয়।

বিজ্ঞান সভা—The Indian Association for the Cultivation of Science নামক সভা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৌবাজারে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি-আই-ই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই ইহার সকল উন্নতির মূল। প্রত্যেক গভর্ণর জেনারেল্ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

শোভাবাজার বেনেভোল্যাণ্ট্ সোসাইটি—দুস্থ ছাত্র ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যার্থ ১৮৩৩।৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

—

মুসলমান সাহিত্য সভা—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবাব আবদুল লতিফ সি-আই ই বাহাদুরের চেষ্টায় ইহার বহু উন্নতি হয়।
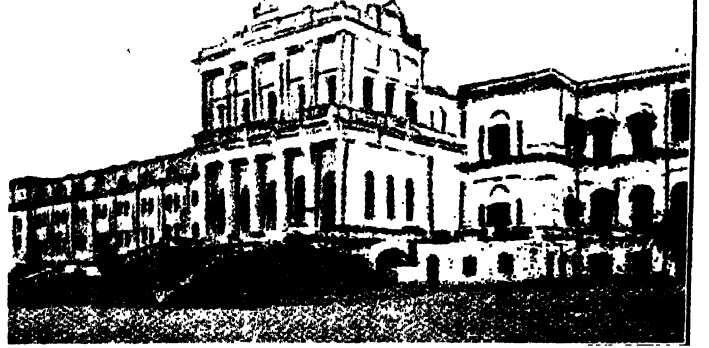
ফিমেল্ অরফেন্ এসাইলাম্—ইউরোপীয় অনাথা বালিকাদের লালনপালন ও শিক্ষার্থ রেভারেণ্ড টি, টমসনের পত্নী মিসেস্ টমসনের দ্বারা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সার্কুলার রোডে স্থাপিত হয় এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছাত্রী লওয়া হয়। ইহার জন্য সারকিউলার রোডে যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল তাহার মূল্য ৩৭০০০৲ টাকা।

ইডেন্ গার্ডেন্—লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসন-কালে তাঁহার ভগিনীদ্বয় মিসেস্ ইডেন্ দ্বারা ১৮৪০ খৃষ্ট্যাব্দে এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার মধ্যে যে বার্ম্মিজ প্যাগোডা আছে উহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মাযুদ্ধের পর প্রোম হইতে বিজয়চিহ্নরূপে ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেলভেডিয়ার।

টাউন হল।

প্রিন্সেপস ঘাট—কলিকাতা টাঁকশালের এসাই মাষ্টার জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই ঘাট নির্ম্মিত হয়

সেনেট্‌ হাউস্‌—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিতরের হলটি প্রায় লম্বে ২০০ ফিট্‌ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্‌। এই হলের মধ্যে বহু মহাত্মার অর্দ্ধাবয়ব প্রস্তর মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি সকল সজ্জিত আছে। প্রশস্ত সোপান শ্রেণীর উপর বারান্দায় যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে উহা মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেট্‌—১৮৬৬ অব্দে বাজার নির্ম্মাণ কল্পে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির দ্বারা পুরাতন ফেনউইক্‌ বাজারের স্থানে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে এই বাজারটি নির্ম্মিত হয়। জমীর মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে তৎকালে মোট ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও পুলিশ-কমিশনর স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ এই বাজারের স্থাপয়িতা। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের The city of dreadful Nights গ্রন্থে এই বাজারের একটী বর্ণনা আছে।

ইউনাইটেড্‌ সার্ভিস্‌ ক্লাব—১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার নাম ছিল বেঙ্গল মিলিটারী ক্লাব্‌। সেনা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ও সিবিল বিভাগের জজ, মিলিটারি ও নৌবিভাগের পাদরীগণ ইহার সদস্য হইতে পারেন। ইহা প্রথম চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত ছিল। ১৮৫৩ সালের ১৫ই মার্চ্চ বেঙ্গল্‌ ইউনাইটেড্‌ সার্ভিস ক্লাব নাম হয়।

ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়াম্‌—এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির দ্বারাই ইহার প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা ইহা গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়। বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের জন্য খোলা হয়। অতীত যুগের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ইহা একটি গবেষণা-মন্দির। একবিংশতিজন ট্রাষ্টীর দ্বারা ইহার কার্য্য পরিচালিত হইত।

পেপার কারেন্সি অফিস্‌—বর্ত্তমান বাটীটি প্রথমে আগরা ও মাষ্টারম্যান্‌ ব্যাঙ্ক কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত হয়। উক্ত কোম্পানী ফেল হইলে গভর্ণমেণ্ট কারেন্সি অফিসের জন্য উহা কিনিয়া লন।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল।

জেনারেল্‌ পোষ্ট অফিস্‌—এই সুন্দর বাটীটি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্টের স্থপতি গ্রানভিল্‌ (Walter B. Granville) সাহেব। এই স্থানে প্রাচীন দুর্গ ছিল। উহার ভিত্তি তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পোষ্ট অফিস নিকটেই ছিল।

গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাম্‌ অফিস্‌—এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ৬৬ ফিট এবং টাওয়ারের উচ্চতা ১২০ ফিট্‌।

"সমাচার দর্পণ" পত্রের ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কি ?

শ্রীরামপুরের পাদ্‌রীরা বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। একজন বাঙালী হিন্দুই যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করেন, গত আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' তাহার কিছু প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছি। আজ আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৫২) তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গুপ্তকবি ১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাধর [গঙ্গাকিশোর ?] ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালা গেজেট'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। গুপ্তকবির এই মূল্যবান প্রবন্ধটি আমার হস্তগত হয় নাই, তবে অল্পদিন পরেই 'ইংলিশম্যান' পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। * তাহা হইতে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে গুপ্তকবির বক্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "In the year 1222 or 23 (B. E.) appeared the first native paper. It was conducted by Gangadhar Bhattacharjee of Calcutta, who is said to have made a fortune by publishing an edition of Bharat Chundar's works. Thus it appears that journalism in Bengalee was not, as some would have us believe, projected by foreigners, nor has Serampore any right to arrogate to itself the credit of being the cradle of the indigenous press. Gangadhar's paper, the *Bengal Gazette*, did not continue long." *

প্রথম বাংলা মাসিকপত্র

বাঙ্গালা গেজেট প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে, ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা "দিগ্দর্শন। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। †

---

* "আমরা গত বৎসর [১২৫৯] প্রথম বৈশাখীয় পত্রে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করাতে তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন বিশেষতঃ ১৮৫২ সালের ৮ই মে দিবসের সাপ্তাহিক ইংলিসম্যান্ পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ অবিকলানুবাদ প্রকটন করত...।"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

* "The Probhakar's History of the Native Press."—*The Englishman and Military Chronicle*, 8 May, 1852.

গুপ্তকবি ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাকিশোর'কে 'গঙ্গাধর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত *Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855) পুস্তকে পাদরী লং 'বাঙ্গালা গেজেট' সম্বন্ধে গুপ্তকবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

† এই দিগ্দর্শন পত্রের ১ম ও ২য় খণ্ডে সর্ব্বপ্রথম 'অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি', 'মকর মৎস্যের বিবরণ', 'বেলুনের বিবরণ', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সন্দর্ভগুলি আবার 'বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত' সঙ্কলিত "বঙ্গীয় পাঠাবলী"র তৃতীয় খণ্ডে "সংবাদ কৌমুদী —১৮২৪" হইতে উদ্ধৃত বলিয়া স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং সত্যার্ণব প্রেসে ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত। "বঙ্গীয় পাঠাবলী"র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি 'রামমোহন রায়ের রচনা' জ্ঞানে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থাবলীর সম্পাদকেরা জানিতেন না যে সন্দর্ভগুলি প্রথমে 'দিগ্দর্শন' পত্রে প্রকাশিত হয়। দিগ্দর্শন অথবা বঙ্গীয় পাঠাবলীর অন্তর্ভুক্ত সন্দর্ভগুলি যে এক তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু সেগুলি যে রামমোহন রায়েরই রচনা একথা জোর করিয়া বলা চলে না।

'দিগ্দর্শন' ২৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড—এপ্রিল, ১৮১৮ হইতে মার্চ্চ, ১৮১৯ ; দ্বিতীয় খণ্ড—জানুয়ারি, ১৮২০ হইতে ফেব্রুয়ারি, ১৮২১। এই মাসিকপত্রের সম্পূর্ণ ফাইল আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

'সমাচার দর্পণ'—প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮—১৮৪১

ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮, ২৩ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) শ্রীরামপুর হইতে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। সমাচার দর্পণের ৪র্থ সংখ্যার শেষে এই 'ইস্তাহার' আছে,—

"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১॥০ টাকা প্রতিমাস লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে২ ১॥০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস২ এক টাকা দিতে হবেক।"

সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত; "এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে।" দেশীয় ও বিলাতী সংবাদ ছাড়া, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও হিতকর সন্দর্ভ ইহাতে স্থান পাইত।

আরও অধিক বিষয় বস্তু সন্নিবেশিত করিবার জন্য যে-আকারের কাগজে সমাচার দর্পণ ছাপা হইত, তাহা বদলাইয়া দৈর্ঘ্যে ইহাকে বড় করা হইল। ১৮২৪, ১৩ই নভেম্বর (২৯ কার্ত্তিক ১২৩১) তারিখের কাগজে দেখিতেছি,—

"সমাচার দর্পণ।—সমাচার দর্পণ কাগজ যে রূপ হইতে ছিল তাহাতে কেবল সমাচার দিয়া দেশবিবরণ কিম্বা ইতিহাস কিম্বা আর২ কোন বিষয় অধিক দিতে পারা যাইত না এপ্রযুক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা কাগজ কিছু বড় করা গেল। যখন অধিক সমাচার পাওয়া যাইবেক তখন কেবল সমাচারই দেওয়া যাইবে ও সমাচারের অল্পতা হইলে ইতিহাস ও নানা দেশ বিবরণ ও আর২ উত্তম২ কথা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হইবেক না।"

১৮২৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৩১) তারিখে লিখিত হইল,—

"সমাচার দর্পণ।—এই সপ্তাহ অবধি আমরা সমাচার দর্পণের শেষে ইংরাজী কিম্বা অন্য২ ভাষা হইতে উত্তম২ নীতি কথা সুসঙ্গতা করিয়া ছাপাইব এবং আমরা ভরসা করি যে ইহাতে দর্পণ গ্রাহকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না যেহেতুক এই সকল নীতি কথাতে যদ্যপি গ্রাহকেরদের উপকার না হয় তথাপি তাহারদের সন্তানেরদের অবশ্য উপকার হইবেক।"

তখন এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল; এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সাল হইতে সমাচার দর্পণকে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সমাচার দর্পণের ফাইল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ঠিক কোন্ সময় হইতে ইহা দ্বিভাষিক হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এ যাবৎ কেহই দিতে পারেন নাই। সমাচার দর্পণের কয়েক বৎসরের ফাইল সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। ১১ই জুলাই ১৮২৯ (২৯ আষাঢ় ১২৩৬) তারিখের কাগজে দেখিতেছি,—

"পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন। সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্ত্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজের মূল্য মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে স্থির করা গিয়াছে। বাঙ্গলা তর্জ্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকরাক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।"

১৮৩২ সাল হইতে সমাচার দর্পণ সপ্তাহে দুইবার—বুধবার ও শনিবার—প্রকাশিত হইত। ১৮৩৪, ৫ই নভেম্বর বুধবার তারিখের কাগজে লিখিত হইয়াছে,—

"পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন

করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।"

সমাচার দর্পণ ১৮৩৪, ৮ই নভেম্বর হইতে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনও জে. সি. মার্শম্যান সম্পাদকতা করিতেছিলেন, কারণ ১৮৩৪, ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) তারিখের কাগজে পাইতেছি,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমত: ৺ ডাক্তর কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই ক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন···।"

১৮৩০ সালে মার্শম্যানের উপর অন্য একখানি বাংলা কাগজের সম্পাদন-ভারও পড়িল। ১৮৪০, ১ জুলাই 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইল।* মার্শম্যান্ সাহেব এই রাজকীয় বার্ত্তাবহের সম্পাদক হইলেন; ১৮৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মার্শম্যান গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্-এর সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই সমাচার দর্পণের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৪১, ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সমাচার দর্পণ বন্ধ করিবার মূল কারণ যে সম্পাদকের কর্ম্মবাহুল্য, তাহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত *The Friend of India* নামক সাপ্তাহিক পত্রের ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৪১ তারিখের সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে :—

"THE SUMACHAR DURPUN.—The Editor of the *Sumachar Durpun* finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals, the *Friend of India* and the *Bengalee Government Gazette*, to attend to, it is not possible to do that justice to the *Durpun*, whether in reference to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation, require. The claims of this paper, coming as they did week after week, immediately between those of two others, left none of that leisure which the mind of every individual who attempts to write for the public, demands. The pleasure which the publication of the journal once afforded, has changed into a severe task, and it appeared most judicious to bring it at once to a close...." (P. 817).

সমাচার দর্পণ—দ্বিতীয় পর্য্যায়

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণ শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ, সমাচার দর্পণের প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আনুকূল্যে উহা কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল।* গুপ্তকবি সমকালিক সাংবাদিক, সুতরাং তাঁহার কথা মূল্যহীন নয়। তাঁহার উক্তির সমর্থক অন্য

* রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্-এর কয়েক বৎসরের (অসম্পূর্ণ) ফাইল আছে। প্রথম বৎসরের চতুর্থ সংখ্যাখানির তারিখ দেখিতেছি,—"মঙ্গলবার, ২১ জুলাই, ১৮৪০।"

* "The defunct *Durpun* was revived under the auspices of the late Baboo Dinanath Dutt, but several

প্রমাণও পাইতেছি। ৮৫১, ৩ মে টাউনশেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর হইতে তৃতীয়বার সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশিত হইলে, 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"THE SUMACHAR DURPUN.—We are happy to perceive that this Native journal has been revived···It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died." (May 15, 1851, p. 309).

তাহা হইলে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ১৮৪১ সালে সমাচার দর্পণের প্রচার রহিত হইলে, "কলিকাতার জনৈক দেশীয় সম্পাদকের" হস্তে কাগজখানি কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়াছিল।

এখন দেখা দরকার কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদকটি কে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। * গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার "বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"কলিকাতা, কলুটোলা নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুকাল 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় প্রকাশ করেন। দীনবাবু প্রাণত্যাগ করিলে, 'সমাচার দর্পণ' আবার উঠিয়া যায়। পরে ১২৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিখ্যাত টাউনশেণ্ড সাহেব পুনরায় সমাচার দর্পণের জীবনদান করেন বটে কিন্তু দুই বর্ষ পরে সেখানি একেবারে বিলুপ্ত হয়।" *

গোপালবাবুর প্রবন্ধটি গুপ্তকবির সংবাদপত্রের বিবরণের "সম্পূর্ণ সহায়তায়" রচিত, কিন্তু তিনি কোথা হইতে ভবানীচরণের নাম পাইলেন বুঝিতেছি না, কারণ গুপ্তকবির প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের কোনো উল্লেখ নাই। আমার বিশ্বাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি ভুলক্রমে চলিয়া আসিতেছে,—উহা 'ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়' হইবে। কারণ ১৮৫১, ১৪ এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত 'তিরোধান প্রাপ্ত' সংবাদপত্রগুলির দীর্ঘ তালিকার মধ্যে (পৃ. ৪) দেখিতেছি,—

"সাপ্তাহিক।

সমাচার দর্পণ	··· জান মার্সমন সাহেব
"	··· ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, "কলিকাতার যে দেশীয় সম্পাদক" কিছুদিনের জন্য সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন,—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই ভগবতীচরণ ১২৪৭ বঙ্গাব্দে (১৮৪০-৪১) 'জ্ঞানদীপিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন; কাগজখানি দুই বৎসর চলিয়াছিল। ভগবতীচরণই "নূতন চন্দ্রিকা"র পরিচালক। †

সমাচার দর্পণ—তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১ · ১৮৫২

সমাচার দর্পণ বন্ধ হইবার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৫০, ৪ মে শনিবার (১২৫৭, ২৩ বৈশাখ) 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হয়। ইহা

untoward circumstances combined to thwart the growth of the resuscitated weekly. It has undergone a second resurrection, and time alone can show how long it is destined to live this time." ("The Probhakar's History of the Native Press.")

* "Mr. John Marshman···disconnected himself from the paper in 1840, when it came under the editorship of Bhabani Churn Banerji."—"Journalism in Bengal", by Nobogopal Mitter. *The Bengal Academy of Literature*, I. No. 6, Jany. 6, 1894.

* অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "নবজীবন", ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৩। পৃ. ৭২৫—৩১।

† ১৮৪৮, ২০ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র "হেড" ক্রয় করেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন চন্দ্রিকা আমারদিগের দৃষ্টিপথে বিহার করিয়াছেন, ইঁহার আকার প্রকার অবিকল পুরাতন চন্দ্রিকার ন্যায়। এবং পূর্ব্বকার সেই অসংখ্য সংখ্যা ও শ্লোকটিও রহিয়াছে···।"—সংবাদ প্রভাকর, ২৩ বৈশাখ ১২৫৯ (৭ মে ১৮৫২)।

'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।' সত্যপ্রদীপ এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশের কল্পনাজল্পনা চলিতে লাগিল। ১৮৫১, ২৯ মার্চ্চ (১২৫৭, ১৭ চৈত্র) ৪৮ সংখ্যক সত্যপ্রদীপে ঘোষিত হইল,—

"সমাচার দর্পণ। ঐ সুপ্রসিদ্ধ নাম কে না শুনিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে দিবসে শুভলগ্নে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজা প্রজা ইতর বিশেষ সর্ব্ব শ্রেণীর মঙ্গলার্থী ও সদুপকারী হইয়া ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে * নিধনগত হন।...পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়েরদের আনুকূল্যক্রমে সত্যপ্রদীপের এক বৎসর অবসান হইলে তৎপরিবর্ত্তে সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিব।...

"সমাচার দর্পণ আগামি মে মাসের ৩ তারিখ শনিবারে প্রকাশিত হইবেক।"

এই বিজ্ঞাপনটি 'সত্যপ্রদীপে'র বাকি কয় সংখ্যাতেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

যথাসময়ে ৩ মে, ১৮৫১ শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখে নবপর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিলেন,—

"আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গলা ভাষার সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় ভাষার পুরাতন দর্পণ গত শনিবারাবধি পুনঃ প্রকাশ হইয়াছে। এ পুনঃ সৃষ্ট দর্পণে শ্রেষ্ট বিষয় সম্পাদকীয় অভিপ্রায় ইংরাজী গ্রন্থ হইতে গৃহীত বিজ্ঞান কাণ্ড লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন দর্পণে এ উভয়বিধ বিষয়ই ছিল না,..."

ইহার পর নব সমাচার দর্পণের মুখপত্র হইতে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"সমাচার দর্পণের নমস্কার। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগের বহুকালীন বৃদ্ধবন্ধুস্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা। বিশেষ ব্যক্তিদের গ্লানি প্রকাশ করণ সম্বাদপত্রের প্রধান অভিপ্রায়, এমত যাঁহারা বোধ করেন তাঁহারদের সঙ্গে আমারদের কোনমতে ঐক্য নাই। তাদৃশ ব্যাপার হইতে সর্ব্বতোভাবেই নির্লিপ্ত থাকিব। গোপাল যদি রামের চতুর্দ্দশ পুরুষের গ্লানি করিয়া দ্বেষপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন কিন্তু এমন সৎকার্য্য দর্পণের দ্বারা করিতে পারিবেন না কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিদিগের কদাচরণ প্রকাশ করণ সমুচিত হইলে ক্ষান্ত হইব না। অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক ত্রুটি এই দুই প্রায় সমান কথা। অতএব এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক বৎসর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য উদ্যোগে যাহা করিতে পারি তাহাই করিব।

"দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কথনং পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরী কৃত হইবেক। অনেকে কহিয়া থাকেন বঙ্গভাষা অতি নীরস প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় কথার সম্পূর্ণ রস তাহাতে প্রকাশ হয় না। পরন্তু এই কথার অনর্থকতার প্রমাণ এই পত্র হয় এতদ্রূপ আমাদের সম্পূর্ণ আশা। দর্পণ, ২১ বৈশাখ।" †

দেখিতে দেখিতে নবপর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ প্রথম বৎসর উত্তীর্ণ হইল। ১ মে, ১৮৫২ (২০ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখে "দ্বিতীয় বালম, ১ম সংখ্যা" বাহির হইল। গুপ্তকবি তাঁহার সংবাদ প্রভাকরে ৮ই মে, ১৮৫২ শনিবার তারিখে লিখিলেন,—

"জগদীশ্বরেচ্ছায় সমাচার দর্পণের বয়ঃক্রম এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম,

* এই তারিখটি ভুল,—ইহা ১৮৪১, ২৫ ডিসেম্বর হইবে।

† সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—১৮৫১, ৫ই মে (১২৫৮, ২৩ বৈশাখ)।

যেহেতু ইনি কৌমার কাল গত করত কৈশোরাবস্থায় অবস্থিত হইলেন, এইক্ষণে ইঁহার দ্বারা জগতের অশেষ প্রকার উপকার হওনের সম্ভাবনা, প্রার্থনা করি এই মুক্তামণ্ডিত সুমার্জ্জিত মোহনমুকুরে মুখাবলোকন পূর্ব্বক সকলে সুখি হউন।

"দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম পত্রে দর্পণ সম্পাদক পাঠকগণকে সেলাম দিয়া লিখিয়াছেন। যথা।

"সেলাম"

"ধাত্রীরূপ শ্রীযুত গ্রাহক মহাশয়গণের সুপালন দ্বারা দর্পণ শিশু এইক্ষণে একবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল এক বৎসরের হইলেও কোন মতে বলহীন পদ নহে বরং যদি কোন বিশেষ গুণ প্রকাশ করি তবে তাহার বয়োপেক্ষা বুদ্ধিমত্তাশক্তি অতিরিক্ত কহিতে পারি।......"

নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ইহার প্রমাণ আছে। ১ বৈশাখ, ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে পাইতেছি—

"অগ্রহায়ণ (১২৫৯) ।...সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।"

ঐ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি সম্পাদকীয় মন্তব্যের একস্থলে লিখিয়াছিলেন—

"গত বৎসর [১২৫৯] যেমন কয়েকখানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।...শ্রীরামপুরে দর্পণ, জ্ঞানারুণোদয় এবং শশধর তিনখানি পত্রেরি পঞ্চত্ব লাভ হইল।"

সমাচার দর্পণ কি কখনও ফার্সী ভাষায়ও প্রকাশিত হইত ?

মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন যে সমাচার দর্পণে "কিছুদিন আবার পূর্ব্ব বিমাতাও (পারসী ভাষাও) উপেক্ষিত হয়েন নাই।" * এই উক্তির মূলে কোনো সত্য নাই। তবে ১৮২২ সালের শেষাশেষি শ্রীরামপুর হইতে একখানি ফার্সী সংবাদপত্র বাহির হইবার কথা উঠিয়াছিল, কারণ ১৮২২, ১৪ সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণে দেখিতেছি,—

"পারসীয়ান কাগজ।—নানাস্থান হইতে অনেক লোক পারসীয়ান খবরের কাগজের কারণ পত্র লিখিয়াছেন এবং কোন২ সমাচার দর্পণপাঠকও বাসনা করেন যে পারসীতে খবরের কাগজ প্রকাশ হয়। অতএব এই সকল লোকেরদের তুষ্টির কারণ পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। • "

পরের সপ্তাহের কাগজে (২১ সেপ্টেম্বর) এই ইস্তাহারটি মুদ্রিত হয় :—

"ইস্তাহার। সকলকে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বাবধি সর্ব্বদেশে সমাচারপত্র প্রকাশিত আছে কিন্তু হিন্দুস্থানে বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে কেবল ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঐ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না এইক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওয়াতে ইংলণ্ডের ন্যায় শহর কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে অনেক ছাপাখানা হইয়া ইউরোপীয় সমাচার ও অন্য২ দেশীয় সমাচারসম্বলিত সমাচারপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালি ভাষাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সাহেব লোকের নিকটে ও ইংরাজী-জ্ঞাতারদের নিকটে ও বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে পঁহুছিতেছে তাহাতে ঐ সকল লোকের সন্তোষ জন্মিতেছে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় অতিপ্রধান ও ভাগ্যবান লোকেরা ঐ ভাষাদ্বয়ানভিজ্ঞতাহেতুক স্বয়ং পাঠ করণে অক্ষম হওয়াতে কেহ২ ক্ষান্ত থাকেন কেহ বা ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালিজ্ঞাতারদের দ্বারা সমাচারাবগত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে পরায়ত্ত-ভোজনবৎ তাঁহারদের তাদৃক তৃপ্তি হয় না অতএব যদি পারসী সমাচার পত্র প্রকাশ করা যায় তবে তাঁহারা পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ রসপান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

"অতএব সে সকলের তুষ্টি ও ইষ্টসিদ্ধির কারণ নিশ্চয় করা গেল যে নানা দেশীয় সমাচার পারসীভাষাতে ছাপা

---

* "বঙ্গীয় সমাচার-পত্রিকা"—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫, পৃ ২৫৫।

হইয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হয় তাহাতে যে সকল লোক ঐ সুখভোগেচ্ছুক হইয়াও পাঠ করণ শক্তি না থাকাতে ক্ষান্ত ছিলেন কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতারূপে প্রতিদেশীয় সম্বাদাবগত হইয়া আত্মমনোবিনোদ করিতে পারিবেন। এবং পারসী ভাষায় সমাচার পত্র হওয়াতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতিও আছে। ঐ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক। ইহা ব্যতিরেকে কোম্পানির রীত্যনুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক অর্থাৎ যেখানে চিঠীর মাশুল আট আনা সেখানে পৈকনামাবরের দুই আনা লাগিবেক। ঐ কাগজ মঙ্গলবারে ছাপা হইয়া বুধবারে স্বাক্ষরকারিরদিগের নিকট পাঠান যাইবেক।

"অতএব জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন যে তদনুসারে পৈকনামাবর প্রতিসপ্তাহে বুধবারে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক।"

এই ইস্তাহারটি পরবর্ত্তী তিন সংখ্যা সমাচার দর্পণে বাংলা ছাড়া ফার্সীতেও প্রকাশিত হয়। তাহার পর দর্পণে 'পৈকনামাবর'-এর আর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের জন্য বিরাট আয়োজন চলিতেছিল। ১৮২৩ সালের মার্চ মাসে কড়া প্রেস আইন পাস হয়। এই আইনের ফলে রামমোহন রায়ের ফার্সী সংবাদপত্র—মীরাৎ-উল-আখবার—বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল কারণে বোধ হয় শ্রীরামপুর মিশন তখন ফার্সী সংবাদ পত্র বাহির করা সময়োপযোগী মনে করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এ সঙ্কল্প একেবারে বর্জ্জন করেন নাই, কারণ দেশে তখনও ফার্সী সংবাদপত্রের আদর ছিল। ১৮২৬, ২৫ মার্চ (১৩ চৈত্র ১২৩২) তারিখের সমাচার দর্পণে বাহির হইল,—

"ইশ্‌তেহার। এই সমাচার দর্পণ এক্ষণে বঙ্গদেশের তাবৎ জিলাতে ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণ পাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচার অবগত হইতেছেন এবং নূতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দর্পণে আলোকন করিতে সমর্থ হন না এবং দর্পণদ্বারা যে সকল নূতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহাও অবগত হইতে পারিবেন না অতএব সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য সমাচার জানিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নূতন২ আইন যে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারেন এই নিমিত্ত পরহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা আগামি এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব। যদি কোন মহাশয় ঐ পারস্য সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ ডাকদ্বারা কাগজ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাসুলের চতুর্থাংশ লওয়া হইবেক। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলার বাহিরে কাগজ লইবেন তাঁহারদিগকে কলিকাতার কোন স্থানে টাকার বরাত দিতে হইবেক যেহেতুক ছয়২ মাস অন্তর ছয় টাকার করিয়া বিল ডাকদ্বারা পাঠাইতে হইলে কোন স্থানে দেড় টাকা কোথাও বা এক টাকা ডাক মাসুল লাগিবেক এবং পরে যদি কোন কারণে পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে পত্র লিখিতে হয় তবে পুনর্ব্বার তদ্রূপ ব্যয় হইবেক ইহা হইলে ছয় টাকা আদায় করিতে দুই কিম্বা তিন টাকা ডাক মাসুল দিতে হইবেক কিন্তু কলিকাতায় কোন স্থানে বরাত থাকিলে এত ব্যয় ও বিলম্ব ও ক্লেশ হইবেক না।"

কিন্তু 'আখবারে শ্রীরামপুর' ১৮২৬, এপ্রিল মাসে বাহির হয় নাই। ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬, ৬ই মে (২৫ বৈশাখ ১২৩৩) তারিখে

প্রকাশিত উপরিলিখিত 'ইশ্‌তেহার'-এর মধ্যে এই কথাগুলি দেখিতেছি,—

"......এবং আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।"

পরের সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৮২৬, ১৩ই মে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল,—

"গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।"

সংক্ষেপে ইহাই বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র—সমাচার দর্পণের ইতিহাস।

পরশমণি

শ্রীহরিধন মিত্র

হে আমার সুরময়, সুন্দর পৃথিবী,—
মোর কাছে কেন তুমি নহ পুরাতন?
কেন তুমি চিরদিন অমল শোভায়
ঘিরিয়া রেখেছ মোর সারা প্রাণ মন?
কতবার আসিয়াছি তোমারি এ বুকে,
কতবার চ'লে গেছি লীলা-খেলা ক'রে;—
অই নভঃ, অই বন, অই বেলাভূমি,...
বাঁধা আছি সবা সনে পরিচয় ডোরে!
চিরদিন যার সাথে এতো জানা-শুনা,
সহজেই সে ত' যাবে পুরাতন হ'য়ে,—
হে পৃথিবী, বল তবে কিরূপে কেমনে
ধরিতেছ প্রতিবার নব সাজ ল'য়ে?
মনে হয়,—যারে আমি বড় ভালোবাসি,
কোটী কোটী জন্ম হ'তে পাইনাক যারে,...
সে-ও আসে মোর মতো তোমারি বুকেতে
তোমারি স্নেহের এই অসীম ভাণ্ডারে!
যতবার আসিয়াছে সে জন হেথায়,
ততবার আসিয়াছে নব নব হ'য়ে;—
আমিও হেরেছি তারে সেইরূপ করি'—
সেইরূপ নব ভাবে, নব আঁখি ল'য়ে!
তোমার বুকেতে যেবা, যে চির নূতন,
তার সাথে হে পৃথিবী চির যোগ তব;
সে তোমায় ছাড়া নয়, তুমি ছাড়া নও,—
কেননা তুমিও হবে রূপে নব নব?
আমি তারে পাই নাই, পাই নাই বলে,
আজ-ও সে আমার কাছে হয় নাই কালো,-
সে যখন হয় নাই—কেন তুমি হবে?
তাই গো তোমার রূপ...অপরূপ, ভালো!
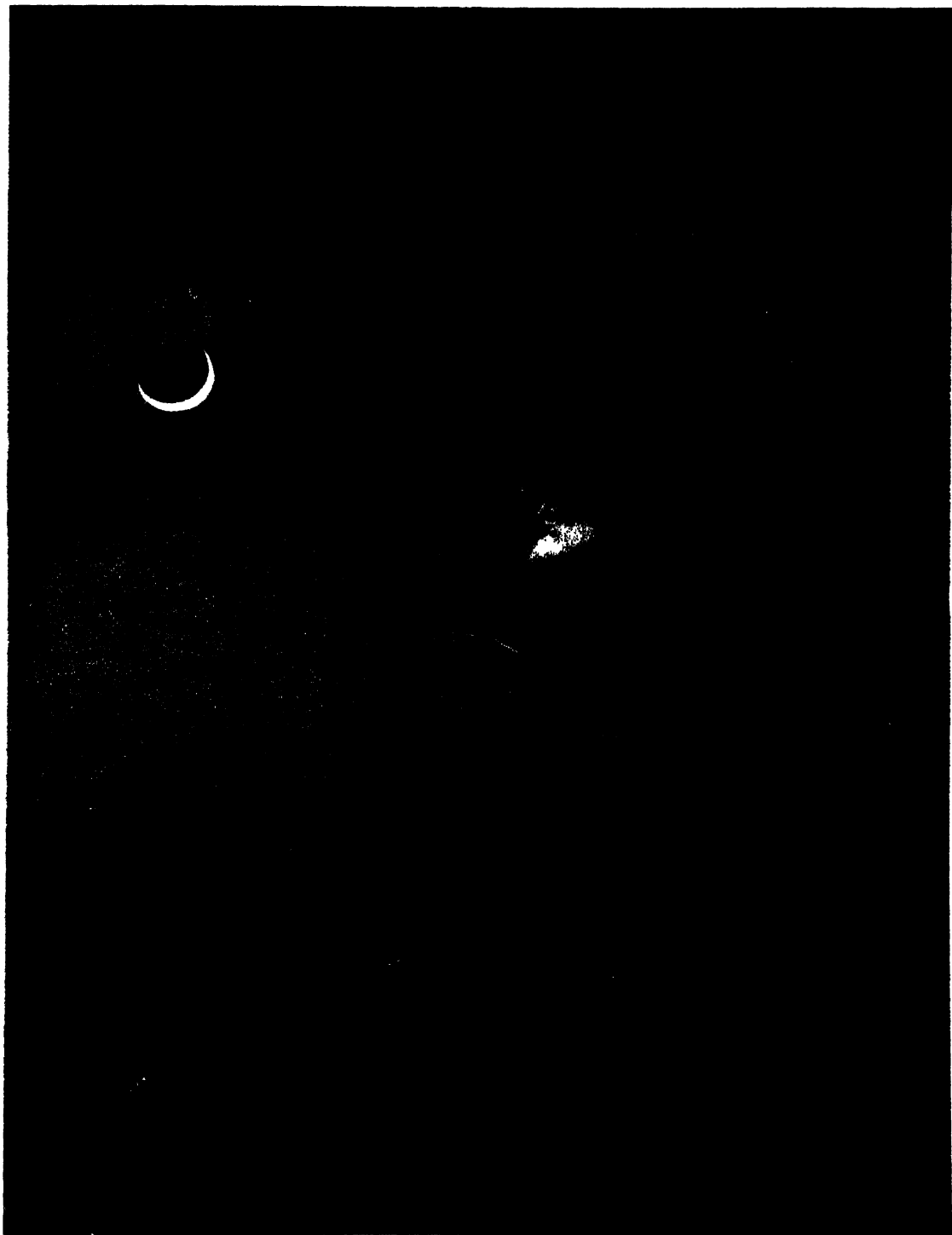
"মসজিদ্ হইতে আজান্ হাকিছে বড় সকরুণ সুর
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর ?"

—জসীম্উদ্দিন

শিল্পী—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র গোস্বামী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অসমাপ্ত

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাখাল-মাষ্টারকে লইয়া গল্প লেখা চলে কি না কে জানে।

রাখাল-মাষ্টার ইস্কুলের মাষ্টার নয়—পোষ্টমাষ্টার।

আমি গল্প লিখি এবং সেই সব গল্প কাগজে ছাপা হয় শুনিয়া অবধি রাখাল-মাষ্টার আমায় কত দিন কতবার যে তাহাকে লইয়া একটা গল্প লিখিয়া দিতে বলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

একটি একটি করিয়া সে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই আমায় বলিয়াছে; কিন্তু সেগুলিকে পরের পর সাজাইয়া কেমন করিয়া যে গল্পের আকারে লিখিয়া ফেলিব তাহা আমি আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই বলিয়া গল্পটি একবার আরম্ভ করিয়াছিলাম:

দেখিতে নাদুশ-নুদুশ্ হ্যালা-ক্যাবলা গোছের চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেম্ দেওয়া চশমা, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া কাটা,—রাখালকে দেখিলে ঠিক পাগল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই ত' রাখাল-মাষ্টার চটিয়া আগুন!

বলিল, 'না তোকে লিখতে হবে না বাপু, যা। মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে এম্নি করেই লিখিস্ তোরা তা আমি জানি।'

বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভারি করিয়া থাকিয়া চশমার ফাঁকে একবার চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'যা বাপু যা, তুই এখন বিরক্ত করিস নে। আমার হিসেব ভুল হয়ে যাবে। বেরো তুই এখান থেকে।'

বলি, 'চটো কেন মাষ্টার, শোনোই না শেষ পর্য্যন্ত।'

'হ্যাঁ, খুব শুনেছি।' বলিয়া কলমটা মাষ্টার তাহার কানে গুঁজিয়া রাখিয়া সোজাসুজি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'পাগল কাকে বলে জানিস? না— অমনি লিখে দিলেই হলো!'

হাসিয়া বলিলাম, 'পাগল ত লিখিনি। লিখেছি— পাগলের মত।'

'ওই একই কথা।' বলিয়া হাত নাড়িয়া আমায় সে চুপ করাইয়া দিয়া বলিল, 'পাগল বলে কাকে জানিস্? পাগল বলে—তোদের গাঁয়ের ওই নিবারণ মুখুজ্যেকে। চব্বিশ ঘণ্টা বৌ আর বৌ। সেদিন বললাম, বলি—ওহে নিবারণ, বোসো, তামাক-টামাক খাও। ঘাড় নেড়ে বললে, না ভাই, উঠি। বেলা হয়ে গেছে,—বৌ বক্‌বে। ওই ওদের বলে পাগল। বুঝলি?'

বলিয়া কান হইতে কলমটি আবার তাহার হাতে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে মাষ্টার তাহার কাজ আরম্ভ করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইল, আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'মিছে কথা না লিখলে তোদের গল্প লেখা হয় না। তবে কাজ নেই বাপু লিখে, মিছে কথা আমি ভালবাসি না।'

* *
*

সেই দিন হইতে কিছুই আর লিখি নাই।

ধানের মাঠের উপর দিয়া প্রায় ক্রোশ-খানেক পথ হাঁটিয়া প্রকাণ্ড একটা বন পার হইয়া গ্রামের শেষে, গুটিকয়েক আমগাছের তলায়, ছোট্ট সেই পোষ্টাপিসটিতে প্রায়ই আমাকে যাইতে হয়।

কোনো দিন হয় ত দেখি,—দরজায় খিল বন্ধ করিয়া পোষ্টাপিসের মেঝের উপর তালপাতার একটি চাটাই বিছাইয়া রাখাল-মাষ্টার তাহার হিসাব লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চারি দিকে কাগজ ছড়ানো,—উড়িয়া যাইবার ভয়ে কোনোটার উপর প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢেলা, কোনোটার উপর আস্ত একখানা ইঁট, কোনোটা বা পায়ের নীচে চাপা-দেওয়া; মুখে বিরক্তির ভাব; ঝড়-বাতাসের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতেছে, আর আপন মনেই কাজ করিতেছে।

হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারি না। অবশেষে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলি, 'ওহে মাষ্টার, দরজাটা একবার খুলবে না কি?'

আর যায় কোথা!

ভিতর হইতে মাষ্টারের চীৎকার শোনা গেল,—'তা আবার খুলব না! সময় নেই অসময় নেই······ বেরো বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে খুন করে ফেলব।'

বাস্—চুপ্।

কাগজের খুস্ খুস্ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিলাম, আর-একবার ডাকি; কিন্তু ডাকিতে হইল না। জানালার কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইতেই তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চোখোচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'সাড়ে তের আনা পয়সার গোলমাল। বুঝ্লি? আস্নক্ ব্যাটা পিওন, আমি তার চাক্রির মাথাটি খেয়ে দিচ্ছি–ত্মাখ্।'

অত-সব দেখিবার অবসর তখন আমার নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, অতখানা পথ আবার আমায় একা ফিরিয়া যাইতে হইবে; বলিলাম, 'দরজাটা একবার খোলো মাষ্টার, চিঠিপত্রগুলো দেখেই আমি চলে' যাব।'

কেন জানি না, হঠাৎ সে প্রসন্ন হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে ঢুকিলাম। সেদিনের ডাকের চিঠি-পত্রগুলা ছিল একটা খাটিয়ার নীচে। রাখাল-মাষ্টার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'দেখিস্ যেন আর-কারও চিঠি নিস্নে।'

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। এমন কথা সে আমায় কোনো দিন বলে না।

মাষ্টার বলিল, 'কত সব মজার-মজার চিঠি থাকে তা জানিস? তুই ত' কোন্ ছার, খাম্-টাম্ খোলা-টোলা পেলে এক-একদিন আমিই দেখি! দেখে আবার বন্ধ করে' দিই।—শুন্বি তবে? একদিন একটা মেয়ে লিখেছে—'

বলিয়া সে শতচ্ছিন্ন দড়ির খাটিয়াটির উপর চাপিয়া বসিয়া হয় ত' কোনও মেয়ের চিঠির গল্প আরম্ভ করিতেছিল। আমার মাত্র দু'খানি চিঠি। হাতে লইয়া বলিলাম, 'থাক্। ও-গল্প তোমার আর-একদিন শুনব, আজ উঠি।'

'তা উঠবি বই-কি! নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে ত'! বাস্,—যা।' বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই আমার ঘাড়ে ধরিয়া দরজাটা পার করিয়া দিয়া আবার ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

আর একদিন অম্নি চিঠির খোঁজে ডাকঘরে গিয়াছি, দেখিলাম, দরজা বন্ধ। ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া সুরু হইয়াছে। তুমুল ঝগড়া!

কি লইয়া যে ঝগড়ার সূত্রপাত, বাহির হইতে কিছুই বুঝা গেল না।

রাখাল-মাষ্টার ক্রমাগত নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর স্ত্রী বলিতেছে,—'না তুমি সাধু নও, তুমি ভণ্ড, তুমি বদ্মাস্, তুমি শয়তান।'

অবশ্য মুখ দিয়া যে ভাষা তাহাদের অনর্গল বাহির হইতেছে তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। দু'জনেই সমান। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। কেহই কম যান না।

নিতান্ত অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। একবার ভাবিলাম, চলিয়া যাই, আবার ভাবিলাম, এতখানা পথ হাঁটিয়া আসিয়া 'ডাক' না দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে আফ্শোষের আর বাকি কিছু থাকিবে না। 'যা থাকে কপালে।' বলিয়া কাশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলাম. 'মাষ্টার!'

উভয়েরই গলার আওয়াজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এত সহজে বন্ধ হইবে ভাবি নাই। দরজা খুলিয়া রাখাল-মাষ্টার মুখ বাড়াইয়া বলিল, 'ও, তুই! আয়. তোর আজ মেলা চিঠি।'

মাসের প্রথম। কয়েকখানা মাসিকপত্র আসিয়াছিল। হাতে লইয়া সেদিন আর দেরি না করিয়াই উঠিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার বলিল, 'বোস্, কথা আছে।'

বাধ্য হইয়া বসিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা?'

মাষ্টার বলিল, 'শুনেছিস? ঝগড়া আমাদের?'

বলিলাম, 'শুনেছি। কিন্তু বুঝ্তে কিছু পারি নি।'

মাষ্টার তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'বুঝতে পারিস নি কি রকম? তুই না গল্প লিখিস?—এ ত' একটা কচি ছেলেতেও বুঝতে পারে।'

কি জবাব দিব বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মাষ্টার বলিল, 'শোন্ তবে। ও-হতভাগী যদি অম্নি করে ত' ওর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেবো না ত' কী করব ?'

অন্তরাল হইতে মাষ্টার-গিন্নির কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'হ্যাঁ, তা আবার দেবে না! আ মরি মরি, কি গুণের সোয়ামী গো!'

'ওই শোন্!' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া মাষ্টার বলিল, 'গলার আওয়াজ শুনেছিস্? কাঠে যেন চোট মারছে।'

এবারেও গৃহিণী কি যেন বলিলেন, কিন্তু কথাটা ভাল বুঝা গেল না।

মাষ্টার তখন বলিতে লাগিলেন, 'শোন্ তবে আসল কথাটাই বলি। একদিন একটা খামের চিঠি—দেখলাম, মুখটা ভাল করে' আঁটা হয়নি। সরিয়ে রাখলাম। এই গাঁয়েরই চিঠি। নিতাই গাঙ্গুলী কয়লা-খাদে চাকরি করে; লিখেছে তার বৌএর কাছে। নিতাইএর বয়েস·· এই তোদেরই বয়েসী হবে, ছোক্‌রা বয়েস,—বৌটিও তেম্নি। ভাবলাম, পড়েই দেখি না কি লিখেছে।—আঃ! সে কি লেখা রে! হ্যাঁ, বিয়ে করা সাথক্! বৌকে যদি অম্নি চিঠিই না লিখতে পারলাম···আর ওই ত্যাখ্ দেখি—' বলিয়া মাষ্টার আর একবার তাহার গৃহিণীর উদ্দেশে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'ওকে চিঠি লিখব কি,—বিয়ে করা ইস্তক্ আজ পর্য্যন্ত মুখে আমার লাথি ঝাঁটাই মারছে। যেমন প্যাঁচার মত চেহারা, তেম্নি গুণ! বলে কি না, 'হতভাগা, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'লে আমি সুখী হতাম।' বলি তাই—'যা না বাপু, যেখানে খুশী তোর চলে' যা, যাকে খুশী বিয়ে করগে যা, আমার হাড়টা জুড়োক্।' কিন্তু ক্ষেমতা নাই। হেঁ-হেঁ! তখন বলে কি না—'হ্যাঁ যাব! মেয়েমানুষের যাবার পথ যে নেই রে পোড়ারমুখো! আমি মরব। মরে' ভূত হ'য়ে এসে তোর ঘাড় মট্‌কাব দেখে' নিস্।' এই ত' বাক্যি।—যাক্, শোন্ তবে আসল কথাটাই শোন্!'

বলিয়া মাষ্টার একটা ঢোক্ গিলিয়া একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, 'নিতাইএর যেমন বুদ্ধি! দেখি, না, চিঠির ভেতর একখানা দশ টাকার নোট। বৌকে পাঠিয়েছে। ভাবলাম, নোটখানা দিই মেরে! ধরবার-ছোঁবার ত' কিছু নেই। তখন আমার সংসারে যা কষ্ট রে, সে আর কি বলব। পঁচিশটি টাকা মাইনে। তাই থেকে বোনের তত্ত্ব পাঠালাম দশ টাকার,—বাকি পনরটি টাকায় আর ক'দিন চলে! বাস্, নোটখানা সরিয়ে রেখে' খেতে গেলাম। খেতে বসে' ভাত আর রোচে না, হাত যেন মুখে আর উঠ্‌তেই চায় না। খালি-খালি ওই নোটটার কথাই মনে হয়। বলি,—না বাবা, এ অস্বস্তিতে কাজ নাই। আধ-খাওয়া করে' উঠে পড়লাম। বৌ বললে, 'ও কি গো! এ আবার কি ঢং!' বললাম, 'থামো।' বাস্! তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে নোটখানা আবার তেমনি খামের ভেতর পুরে' আটা দিয়ে আঁটিয়ে নিজেই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই গাঙ্গুলীর দরজায় গিয়ে ডাকলাম—নিতাইএর বৌকে। বৌ ছেলেমানুষ কিছুতেই আসতে চায় না। বললাম, 'এসে ওই দরজার পাশে দাঁড়াও মা, তাহ'লেই হবে। আমি পোষ্ট-মাষ্টার।' নিতাইএর বৌ ঘোম্‌টা টেনে' এসে' দাঁড়ালো। বললাম, 'এই নাও মা, তোমার চিঠি নাও। চিঠির ভেতর দশ-টাকার একটি নোট আছে।'—চিঠিখানি বৌ হাতে করে' নিলে। বললাম, 'নিতাইকে বারণ করে' দিও বৌমা, এমন করে' টাকা পাঠালে টাকা মারা যায়।' ঘাড় নেড়ে বৌ বললে, 'বেশ'। বাবা! বাঁচলাম! এতক্ষণে নিশ্চিন্তি হ'য়ে বাসায় ফিরে' এসে বললাম, 'দাও এবার ভাত দাও, খাব।' বৌ জিজ্ঞেস্ করলে, 'কেন, কি হয়েছে বল দেখি!' আগাগোড়া সব কথা বললাম বৌকে।—বৌ বলে কি জানিস্?'

'কি বলে?' বলিয়া মাষ্টারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

মাষ্টার হাসিল। বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?'

বলিয়াই মাষ্টার আবার আরম্ভ করিল, 'পোড়ারমুখী বলে কি না,—ওরে আমার কে রে! সাধু ন্যাওড়াগাছ! টাকা তুমি নিলে না কেন?'

'বাস্! এই নিয়ে হ'লো ঝগড়া। বুঝলি এবার?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার রাগিয়া উঠিল; বলিল, 'ছাই বুঝ্‌লি। কিছু বুঝিস্‌নি।—বুঝেও কি তুই ওই মেয়েকে নিয়ে আমায় ঘর করতে বলিস্?'

হাসিয়া বলিলাম, 'কি বলব তা হ'লে ?'

'কি বলবি ?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিস্‌মিস্‌ করিয়া বলিল, 'বলবি,—থ্যাংরা মেরে' বাড়ী থেকে দূর করে দিতে বলবি।'

পোষ্টাপিস ও মাষ্টারের 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান। দেওয়ালের ও-পার হইতে শোনা গেল,—'হে ভগবান! হে ভগবান! এমন সোয়ামীর হাত থেকে আমার নিষ্কৃতি দাও ভগবান! চিরজন্মের মত নিষ্কৃতি দাও—হে হরি, হে মধুসূদন!'—বলিয়া মট্‌ মট্‌ করিয়া আঙুল মট্‌কানোর শব্দ আর কান্না!

রাখাল-মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'চল্‌! এ আর চব্বিশঘণ্টা আমি কত শুনব? চল্‌—তোকে খানিক্‌টা এগিয়েই দিয়ে আসি। চল্‌!'

তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। বাড়ী ফিরিতে হয় ত রাত্রি হইবে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, অস্তসূর্য্যের স্তিমিত রশ্মি মেঘে-মেঘে প্রতিহত, প্রতিফলিত হইয়া সারা আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে হরীতকী, শাল ও মহুয়ার বন। তখন ফাল্গুন মাস। সুচিক্কণ মসৃণ পত্রভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী। শাল ও মহুয়া ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস। ঢেউ-খেলানো অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর সুমুখে কয়েক ঘর সাঁওতালের বস্তি। তাহারই পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ একটি পথ রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া বনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

সেই পথ ধরিয়াই নীরবে চলিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, হাঁ রে, লিখেছিস্‌ কিছু?'

'কি?'

'বা রে! ভুলে গেলি এরই মধ্যে? সেই যে বলেছিলাম।'

হাসিয়া বলিলাম, 'তোমার গল্প?'

মাষ্টার শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বলিলাম, 'না, তোমার গল্প আমি আর লিখ্‌ব না।'

মাষ্টার সে কথায় কান দিল না। বলিল, 'কেন লিখ্‌বি না? লিখ্‌বি, লিখ্‌বি। তবে সত্যি কথা লিখিস্‌ বাপু। এই ধর্‌—আমার বৌটার কথা লিখ্‌বি আগে। লিখ্‌বি যে, ওর মত খারাপ মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই। মাগীটার কাছ থেকে পালাতে পেলে আমি বাঁচি। নিজের চোখেই ত' সব দেখে এলি,—তোকে আর বেশি কি বলব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। তুমি এবার যাও, নইলে ফিরতে তোমার রাত হবে।'

'হোক্‌ না।' বলিয়া রাখাল মাষ্টার আমার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'অন্ধকারে সাপে কাম্‌ড়াবে? কাম্‌ড়াক্‌ না। বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই, মাইরি বলছি, বৌটার জ্বালায় এক-একদিন মনে হয় আমি মরি।'

বলিয়াই সে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিল; বলিল, 'আসি তবে। লিখিস্‌ কিন্তু।'

*

* *

সম্মতি দিয়া ত' বাড়ী ফিরিলাম।

লিখিবার চেষ্টাও যে করি নাই তাহা নয়।

লিখিয়াছিলাম:

'পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতন। রাখাল-মাষ্টারের পোষ্ট-মাষ্টারী করিবার কথা নয়। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

'বড়লোকের ছেলে নয়। ছেলে নিতান্ত গরীবের। তাও যদি বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন!

'শৈশবে পিতৃহীন মাতৃহীন বালক—মামার বাড়ীতেই মানুষ। মামা মস্ত বড়লোক। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাসদাসী, লোকজন,—তিন তিনটি মোটরকার। তাহারই একটিতে চড়িয়া প্রত্যহ বৈকালে রাখাল বেড়াইতে যায়। যেমন পোষাক, তার তেম্‌নি চেহারা! লোকে দেখে আর বলে, 'ব্যাটার কপাল ভাল।'

'মামা বিবাহ দিলেন। গরীবের ঘরের অম্‌নি অনাথা একটি মেয়ে।

'মেয়ের অভিভাবিকা ছিলেন এক পিসি। মামা নিজে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন। মেয়ের পিসি বলিলেন, 'তাই ত' বাছা, ছেলেটির মা নেই বাপ নেই, তার ওপর মামার কাছে মানুষ...'

'মামা বলিয়াছিলেন, 'সেজন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বেয়ান, মামা তার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ভাগ্‌নেকে দিয়ে যাবে।'

'হয়ত' দিতেন। কিন্তু এমনি রাখালের অদৃষ্ট যে, তিনি না দিয়াই মরিলেন।

রাখাল—মেয়ের ছেলে, সুতরাং বলিবার কিছু নাই।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—নিরবলম্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল রাখাল!

'তাহার পর সে সব অনেক কথা। বলিতে গেলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

'পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া শেষে বহুদিন পরে রাখাল একটি চাকরি পায়—পোষ্টাপিসের পিওন। তাহার পর পিওন হইতে—হয় পোষ্ট-মাষ্টার।

'কিন্তু এই যে দুঃখ-দুর্ভোগ ইহাও হয় ত' সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত—যদি সঙ্গিনীটি হইত তাহার মনের মত।

'রাখাল বলে, 'সে দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই, মেয়েটা আমায় ভালবাসে না। ভালবাসলে এত ঝগড়া-ঝাঁটি এত কথা-কাটাকাটি হয় না কখনও।'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

লেখা কাগজগুলা প্রায় প্রত্যহই সঙ্গে লইয়া যাইতাম; ভাবিতাম মেজাজ ভাল থাকিলে মাষ্টারকে একদিন পড়িয়া শোনাইব; কিন্তু পড়া আমার আর কোনোদিনই হইয়া উঠিত না।

ভাল মেজাজে রাখাল-মাষ্টারকে পাওয়া বড় কঠিন।

যে দিন যাইতাম, শুনিতাম, কেহ না কেহ তাহাকে বড় বিরক্ত করিয়া গেছে।

বিরক্ত করিবার লোকের অভাব নাই। কেহ একখানা পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিলেও মাষ্টার তাহাকে দাঁত খিঁচাইয়া তাড়িয়া মারিতে ওঠে। অথচ পোষ্টাপিসে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসিবেই।

গ্রামে তাহার দুর্নামের একশেষ। সবাই বলে, 'এমন বদ্‌-মেজাজী লোক বাবা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। ওর নামে সবাই মিলে একটা দরখাস্ত না করলে আর উপায় নেই।'

কথাটা শুনিয়া বড় দুঃখ হইয়াছিল। মাষ্টারকে একদিন বলিয়াছিলাম,—'দ্যাখো মাষ্টার, পোষ্টাপিসের কাজে যে-সব লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি ওরকম-ধারা ব্যবহার কোরো না। এতে তোমার ক্ষতি হবে।'

'ক্ষেতি? কি বললি,—ক্ষেতি?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, 'না। ক্ষেতি আমার কেউ করতে পারবে না তা তুই দেখে' নিস্‌। অনেকে অনেক চেষ্টাই করেছিল কিন্তু পারে নি। উল্টো পিওন থেকে পোষ্ট-মাষ্টার! ভগবান আমার সহায় আছে।'

এই বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিল। বলিল, 'ভগবান সহায় না থাকলে··দ্যাখ্‌, আমি যে কারও ক্ষেতি কোনো দিন করি নি রে, আমার ক্ষেতি কেউ করবে না দেখিস্‌। ক্ষেতি যা কিছু আমার করবার, তা ওই উনি করেছেন।' বলিয়া সে তাহার অন্তঃপুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'চুপ! শুনতে পেলে কিছু বাকি রাখবে না।'

চুপ করিয়াই ছিলাম।

মাষ্টার কিন্তু চুপ করে নাই। বলিতে লাগিল, 'গাঁয়ের লোক আমার বদনাম করে। না? তা ত' করবেই, বেটারা নিমকহারাম! আমি সাচ্চা মানুষ কি না! ওই দ্যাখ—ওই রেজেষ্টারী চিঠিখানা ফেলে রেখেছি। কেন রেখেছি জানিস? ওই অবিনাশ-বেটার কাছে সেদিন আমি চাল কিনতে গেলাম; শুনলাম, না কি ব্যাটা টাকায় দশ সের করে' চাল বেচছে। আমায় দেখে' বলে কি না, 'না ঠাকুর চাল আমি আর বিক্রি করব না। টাকায় দশ সের ধরে' ত' নয়—টাকায় আট সের।' অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর বললাম, তাই আট সেরই দে না রে বাপু, ঘরে যে এদিকে গিন্নি আমার জল চড়িয়ে বসে আছে।' অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না ঠাকুর, মিছে বকাবকি—আমি দেবো না।' আচ্ছা দাঁড়া রে ব্যাটা অবিনাশ, তোকে কি আমি একদিনও পাব না!—বাস্‌, পেয়েছি। রেজেষ্ট্রী চিঠি একখানা এসেছে ব্যাটার নামে। আজ দুদিন হলো—ওইখানে পড়ে' আছে। থাক্‌ ব্যাটা ওইখানে পড়ে!'

বলিলাম, 'কিন্তু এ তোমার অন্যায় মাষ্টার।'

'অন্যায়?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?'

কি আর বলিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু রেজেষ্ট্রীর চিঠি ফেলিয়া রাখা যে অন্যায়, সে কথা বোধ করি রাখাল-মাষ্টার ভুলিতে পারিল না; তাই সে আবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'অন্যায় কিসের শুনি? সে যে অন্যায় করলে সেটা বুঝি অন্যায় হলো না? আমার অন্যায়টাই অন্যায়। নয় রে?'

কি যে বলিব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিঠি কয়খানি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, মাষ্টার ধরিয়া বসিল, 'ওসব চলবে না, তুই বলে যা!'

বলিলাম, 'চাল সে না দেওয়ায় তোমার ক্ষতি কিছু হয় নি, কিন্তু এতে যদি তার ক্ষতি হয়?'

মাষ্টার অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে ক্ষতি হয়?'

'চিঠিখানা ফেলে রাখায়।'

'তাও ত' বটে।' বলিয়া মাষ্টার নীরবে বারকয়েক্ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'ঠিক বলেছিস্। লেখক-মানুষ কি না, বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু আছে।'

উভয়েই চুপ।

মাষ্টার সহসা বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা!'

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—'হয়েছে তোর চিঠি নেওয়া?'

ঘাড় নাড়িয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অবিনাশের চিঠিখানি হাতে লইয়া মাষ্টার বলিল, 'চল্ তবে নিজেই দিয়ে আসি। কাজ কি বাপু, রেজেষ্ট্রী চিঠি, দরকারীও ত' হ'তে পারে! চল্।'

দু'জনে একসঙ্গেই বাহির হইতেছিলাম, বাহিরে দরজার কাছে দেখি, একজন হৃষ্টপুষ্ট লম্বা চওড়া সাঁওতাল-ছোক্রা দাঁড়াইয়া আছে; মাথায় বাবরি চুল, গলায় লাল কাঁটির মালা, হাতে একটা বিড়ালের বাচ্চার মত মেটে-রঙের মরা খরগোস। সাঁওতাল ছোকরাটিকে দেখিবামাত্র রাখাল-মাষ্টারের মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল; চৌকাঠের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'কে···মুংরা···তুই আজও এসেছিস···'

বলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট্ কাম্ড়াইতে কাম্ড়াইতে মাষ্টার কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মুংরা বলিল, 'ধেৎ তেরি, রোজ-রোজ পুইসা নাই পুইসা নাই; আনতে তবে তুঁই বলিস কেনে?'

অনুমানে ব্যাপারটা কতকটা বুঝিলাম। মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দাম?'

মুংরা দাম বলিবার আগেই মাষ্টার বলিয়া উঠিল, 'নিবি তুই? আহা খরগোসের মাংস—বুঝলি কি না—ভারি সুন্দর। আমার বৌ খুব ভালবাসে। দু'তিন মাস ধরে' আমায় বলছে, কিন্তু ছাই এমন দিনে মুংরা আসে যে আমার হাতে পয়সাই থাকে না। আরও দু'বার দুটো এনেছিল, তা ওই যে বললাম, এমন দিনে আসে হতভাগা···। দাম? দাম আর বেশি কোথায় দাম দু' আনা।'

পকেট হইতে একটি দু' আনি বাহির করিয়া মুংরার হাতে দিয়া বলিলাম, 'দে, ওটা আমায় দিয়ে যা।'

মুংরা অত্যন্ত খুশী হইয়া হাসিতে হাসিতে দু'-আনিটি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

'দাঁড়া তবে; দাঁড়া।' বলিয়া মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া লোহার একটি লম্বা ছুরি আনিয়া বলিল, 'বেশ করে' কেটে ওকে কুটে দিয়ে যা মুংরা, বাবু ছেলেমানুষ, কুটতে পারবে না—বুঝলি? সেই তোরা যেমন করে' কুটিস্। যা—আগে ওই ছোট তালগাছটা থেকে একটা 'বাগ্ড়ো' কেটে আন্, তার পর তালের ওই পাতা দিয়ে বাবুকে জিনিসটে বেশ ভাল করে' বেঁধে দিবি, বুঝলি? বাবু হাতে করে' ঝুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবে।'

সুমুখের ছোট তালের গাছ হইতে একটা 'বাগ্ড়ো' কাটিয়া আনিয়া মুংরা খরগোস কাটিতে বসিল।

মাষ্টারের রেজেষ্ট্রী চিঠি দিতে যাওয়া আর হইল না। বলিল, 'থাক্, পিওনের হাতে পাঠালেই চল্বে।' বলিয়া চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'মামার বাড়ী যখন ছিলাম, বন্দুক নিয়ে প্রায়ই শিকার করতে যেতাম। যেতাম বটে, কিন্তু একটা পাখীও কোনো দিন মারতে পারি নি, বুঝ্লি? গুলি ছুঁড়তাম। ছোঁড়বার সময় মনে হতো—আহা, কেন মারব। বাস্ হাত যেতো কেঁপে, আর শিকার যেতো ফস্কে'। একদিন একটা কুকুর মেরেছিলাম। মামার ছিল পায়রার সখ। বুঝ্লি?'

বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিয়া চুপ করিল। বিগত দিনের সুখৈশ্বর্য্যের স্মৃতি বোধ করি তাহার মনে পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া বলিল, 'বাড়ীতে অনেক-গুলো পায়রা ছিল। নানান্ রকমের পায়রা। একদিন একটা পায়রাকে বুঝি বেড়ালে ধরেছিল। পায়রাটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো, ভাল করে' উড়তে পারতো না। পাশের বাড়ীর সুরেশের পোষা কুকুরটা একদিন ঝপ্ করে' এসে' তার ঘাড়ে ধরে' ঝাঁকানি দিয়ে—দিলে পায়রাটাকে মেরে'। আমার রাগ হয়ে গেল। জানিস ত' আমার রাগ! বাস্, তৎক্ষণাৎ বন্দুক বের করে' চালালাম গুলি। দড়াম্ করে' লাগলো গিয়ে কুকুরটার পেটে। কাঁই কাঁই করে' সে কী তার কান্না! ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। আবার গুলি! বাস্! খতম্! কুকুরটা ছট্‌ছট্ করতে করতে গোঁ গোঁ করে' আমার চোখের সুমুখে মারা গেল। উঃ! সে কী দৃশ্য!'

বলিয়া মাষ্টার একবার শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, 'সেই যে বন্দুক ছেড়েছি, জীবনে আর কোনো দিন··'

এই বলিয়া সেই যে সে মুখ ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া রহিল, অনেকক্ষণ অবধি সে আর কথা কহিল না।

তাহার গল্পটা আমার পকেটে-পকেটেই ফিরিত। ভাবিলাম ইহাই উপযুক্ত সময়। বাহির করিয়া বলিলাম, 'গল্প তোমার খানিকটা আমি লিখেছি। শোনো।'

মুখের ঢাকা খুলিয়া মাষ্টার বলিল, 'পড়্।'

পড়িলাম।

খানিকটা শুনিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, গল্প লিখতে তোরা জানিস্ না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?'

মাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'নাঃ, দুঃখ্ তুই নিজে পাস্ নি কোনো দিন, দুঃখুর কথা তুই লিখবি কেমন করে'। আমি যদি লিখতে জানতাম ত' দেখিয়ে দিতাম কেমন করে' লিখতে হয়।—আচ্ছা পড়্। শুনি শেষ পর্য্যন্ত।'

শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কি একটা কথা যেন সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—মুংরার দিকে। মাংস কুটিয়া সে তখন দু'জায়গায় ভাগ করিতেছে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি রে? দু'জায়গায় কেন?'

বলিলাম, 'আমি বলেছি। একটা তোমায়, একটা আমার।'

'আমার?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বানর! বললাম আমার কাছে পয়সা নেই···তুই আচ্ছা বোকা ত! চারটে পয়সাই বা আমি এখন পাই কোথায়?'

বলিলাম, 'পয়সা তোমায় দিতে হবে না।'

মাষ্টার সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল; তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চারটে পয়সা খরচ করবারও ক্ষমতা আজ আমার নাই।' বলিতে বলিতে চোখ-দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

ভাগ-দুইটার মধ্যে একটা ভাগ বেশি করিয়া দিয়া ছোট ভাগটা মুংরা মাঝিকে তালপাতায় মুড়িয়া বাঁধিয়া দিতে বলিলাম।

মাষ্টার বলিল, 'দাঁড়া, গিন্নিকে দেখিয়ে আনি।'

বলিয়া একটা ভাগ সে দু'হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া হাঁকিতে লাগিল, 'গিন্নি! ও গিন্নি!'

সেই অবসরে আমার ভাগটা লইয়া আমি পলায়ন করিলাম।

যথাসম্ভব দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে ডাক শুনিয়া তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার ছুটিতে-ছুটিতে আমার পিছু ধরিয়াছে।

সারাপথ ছুটিয়া আসিয়া মাষ্টার হাঁপাইতে লাগিল। বলিল, 'পালিয়ে এলি যে? আয় তোকে একবার আসতে হবে।' বলিয়া সে আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

'কেন?' বলিলাম, 'না, রাত হয়ে যাবে, আমি আর যাব না।'

মাষ্টার কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল, 'উঁহু, যেতেই হবে তোকে।'

ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।

হাতে ধরিয়া আমায় পোষ্টাপিসের ভিতরে লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে মাষ্টার হাঁকিল,

'ধরে নিয়ে এসেছি গিন্নি, ওগো ও শ্রীমতী কোথায় গেলে!'

মাথায় একটুখানি ঘোমটা টানিয়া শ্রীমতী আসিয়া দাঁড়াইল।—একহাতে একগ্লাস জল আর একহাতে ছোট একটি পাথরের বাটিতে খানচারেক বাতাসা।

মাষ্টার বলিল 'একটু জল খা।'

পাছে দুঃখ পায় বলিয়া বাতাসা-কয়টি চিবাইয়া জল খাইলাম।

মাষ্টার হাঁকিল, 'পান? পান কোথায়?' বলিয়াই সে নিজের ভুল শুধরাইয়া লইল। বলিল, 'ও, পান ত' নেই বাড়ীতে। পান আমরা দুজনেই খাই না। আচ্ছা দাঁড়া দেখি।'

বলিয়া কি যেন আনিবার জন্য মাষ্টার ভিতরে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল না, পিতলের একটি রেকাবির উপর চারটি কাটা সুপারি ও কতকগুলি মৌরি লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার স্ত্রী আবার ঘরে ঢুকিল। রেকাবি হইতে সুপারি লইতে গিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আয়ত দুইটি চক্ষু, ম্লান একটুখানি হাসি। গৌরবর্ণ কৃশাঙ্গী যুবতী,—দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়। তবে সৌন্দর্য্য যে তাহার একদিন ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। দুঃখে দারিদ্র্যে সে সৌন্দর্য্য আজ তাহার ম্লান হইয়া গেছে।

ভাবিলাম, গল্পে যে জায়গায় তাহাকে কুৎসিত লিখিয়াছি সে জায়গাটা কাটিয়া দিব।

হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম, 'নমস্কার! আজ আসি।'

মাষ্টার গৃহিণী প্রতি-নমস্কার করিল না, কোনও কথা বলিল না, ম্লান একটু হাসিয়া মাত্র তাহার জবাব দিল।

এ মেয়ে যে কেমন করিয়া মাষ্টারের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া আসিলাম; মাষ্টারও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া মাষ্টার হাসিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখলি?'

কি দেখিলাম সে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার বলিল, 'ত্যাখ, আমার গল্পের মধ্যে সেই যে এক জায়গায় লিখেছিস—ও আমায় ভালবাসে না, ওটা কেটে দিস্।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

ভাবিলাম, গল্পটা আগাগোড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লিখিব।

কাব্যের উপেক্ষিতা—উর্ম্মিলা

শ্রীভূপেন গঙ্গোপাধ্যায়

অশ্রু ঝরে অবিরাম,
স্মরিয়া তোমার নাম
অবাক্ত বেদনাময়ী সুন্দরী উর্ম্মিলা!
কেন কবি হেন ভাবে কেন তোমারে সৃজিলা।

প্রথম দেখিনু তোমা বধূবেশে বিবাহ-সভায়।
প্রবেশিয়া রঘুরাজকুলে, দেখা দিলে না আমায়
হায় কবি, কি নির্ম্মম এই অনাদর।
এত স্বার্থ-ত্যাগ, ব্যথা নীরব—কাতর!

ফর্‌মোসা

শ্রীভারতকুমার বসু

ফর্‌মোসা একটী দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর এই দ্বীপটী অবস্থিত। ১৬শ শতাব্দীতে এই দ্বীপটী, এক ঝঞ্ঝার সময়ে জলপথে-ভ্রমণকারী পর্ত্তুগীজদের চোখে প্রথম পড়ে। তারা এই দ্বীপটী দেখে এত সন্তুষ্ট এবং মুগ্ধ হ'য়েছিল যে, এটীর তারা তারিফ ক'রেছিল—"সুন্দর" এই বিশেষণটীর দ্বারা। ফর্‌মোসার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২৫ মাইল এবং প্রস্থ—৮০ থেকে ৯০ মাইলের মধ্যে। দ্বীপটী যেম্‌নি গ্রীষ্ম-প্রধান, তেম্‌নি বৃষ্টি-প্রধান এবং তেম্‌নি মশক-প্রধান। কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষার হাত থেকে রেহাই পেলেও, মশার হুল্ থেকে নিস্তার পাওয়া সেখানে কঠিন; তার একমাত্র কারণ, মশা সেখানে আছে যার-পর নাই অতিরিক্তভাবে এবং সেগুলি ম্যালেরিয়ার জীবাণুতে পরিপূর্ণ! এই সব মশার আক্রমণে আগে আগে সেখানে মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল আশ্চর্য্য রকম বেশী পরিমাণে। শেষে তার অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক Sierra Leone দেশের মতো। শেষোক্ত দেশটীর ব্যাপার হ'য়েছিল এই যে, সেখানে একবার এত বেশী লোক ম'রতে আরম্ভ হ'য়েছিল যে, অনেক লোক তাকে "শ্বেতাঙ্গের কবর-ভূমি" ব'লে বর্ণনা ক'রতে লাগলো। কাজেই, ফর্‌মোসা-ও যাতে

ফর্‌মোসার আদিম অধিবাসীদের বংশধর।

উৎসুক মুখ

কেবল কবরের-ই যায়গা হ'য়ে না দাঁড়ায়, এজন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগ দিলেন; এবং শীগ্‌গির-ই আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া ভীতি ক'মে গেল। আগে সেখানকার অধিবাসী জাপানীরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে যেন ভূতার্ত্তের মতো রাত-দিন কেঁপেই সারা হ'তো। আজকাল তারা বেশ স্বচ্ছন্দে, নির্ব্বিঘ্নে এবং সু-স্বাস্থ্য নিয়ে সেখানে বসবাস

উপরে চালা বেঁধে সেখান থেকে অনেক দূরের শিকারকে লক্ষ্য ক'রছে।

করছে—ঠিক নিজেদের মাতৃভূমির-ই (জাপানের-ই) মতো, আনন্দ-প্রীতি হৃদয়ে নিয়ে। উক্ত জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা সেখানে আজকাল দেড় লক্ষেরও বেশী।

ফরমোসার পশ্চিম সাগরোপকূল থেকে ২৫ মাইল দূরে একটী দ্বীপপুঞ্জ আছে। তার নাম পেস্‌কাডোরস্‌। এই দ্বীপপুঞ্জটী ফরমোসার-ই এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এর

অন্ধ নারী ও তার সঙ্গিনী। এই অন্ধ নারীর বয়স ৭৮ বৎসর পার হ'লেও, প্রত্যেক রবিবারে সে আট মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ঈশ্বরের পূজা ক'রে আসে।

মেয়েটীর গালের দুধারে যে উল্কি চিহ্ন রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, মেয়েটী এইবার বয়স্থা হয়েছে। এইবার সে তার স্বামী নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পারে।

মধ্যে এমন একটী বন্দর আছে, যেটীর দ্বারা ফরমোসার কাজ হয় সকলের চেয়ে বেশী। উক্ত বন্দরটীর মধ্যে বিপুলায়তন অনেক যুদ্ধের জাহাজ এসে দাঁড়াতে পারে। এই সমস্ত জাহাজ-ই বহিঃশক্রর হাত থেকে ফরমোসাকে রক্ষা করবার জন্য নৌ-শক্তিকে প্রবল ক'রে রেখেছে এবং দেশকে সু-রক্ষিত ক'রে আছে। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে পোর্ট আর্থার, শিমোনোসেকি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

কুটীরের মেয়ে

দক্ষিণ ফরমোসার জঙ্গল-পূর্ণ স্থানের অধিবাসী।

আটালিয়াল্ জাতীয় যুবক। সে যেখানেই যাক না কেন, ছোরা তার সঙ্গে থাকবেই।

ফরমোসায় জাপানী উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী, সেখানকার ইতিহাস, অর্থ-সম্পদ, রাজনীতি এবং

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—যে-কোনো দিক দিয়েই ধরা যাক না কেন, ফরমোসা হচ্ছে একটা চমৎকার দেশ! সেখানকার
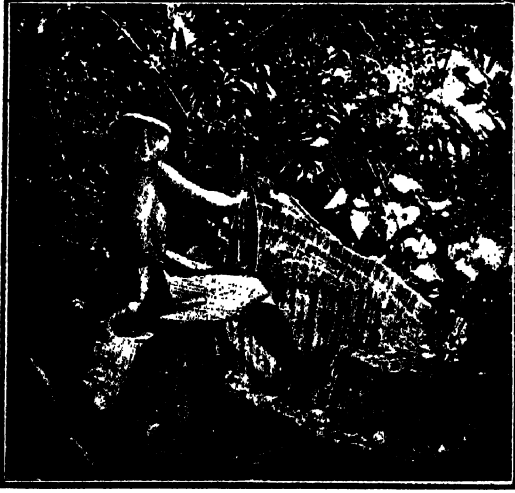
কর্পূরের জন্ম জঙ্গলে কাজ করছে। এই কাজে বিপদের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। কারণ, সশস্ত্র হিংস্রক জঙ্গলীরা যে কখন্ এসে কর্ম্মীর মাথাটী কেটে উড়িয়ে দেবে, তার কোনো স্থিরতা নেই।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থেকেই দেশটীর "ফরমোসা" এই নামকরণ হ'য়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, কোনো কোনো ভ্রমণকারী বলেন, প্রথম-দৃষ্টিতে ফরমোসাকে একটুও তারিফ করা যায় না, যেমন ক'রেছিল ১৬শ শতাব্দীতে ঝড়ের যাত্রী পর্ত্তুগীজরা। তাঁরা যা ব'লতে চান, তা হচ্ছে এই—

ফরমোসার পূর্ব্ব-উপকূলে, যেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকা পর্য্যন্ত ব'হে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেক সু-বিপুল পর্ব্বত। সমস্ত পর্ব্বত-ই সমুদ্র থেকে উঠে ৫।৬ হাজার ফিট উঁচুতে মাথা তুলে আছে। ওই সমস্ত পর্ব্বতের গায়ে ভীষণ গর্জ্জনে সাগরের ঢেউ আছড়ে এসে প'ড়ছে অনবরত। ওই সব পর্ব্বত ভেদ ক'রে মাত্র তিনটী জায়গায় সাগরের জল যাতায়াত করে। উত্তর দিকে যেতে হ'লে নাবিকরা এই তিনটী পথই ব্যবহার ক'রে থাকে। এই পথ নিশ্চয়-ই নয়ন-বিমোহন নয়!···

পশ্চিম-উপকূলের পর্ব্বতগুলির দিকে তাকালে বাস্তবিকই মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে অন্যান্য শৃঙ্গগুলি বড় সুন্দরভাবে ক্রমশঃ নীচু ধাপে নেমে এসেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর—তাদের-ই

শিকারীরা শিকারের দিকে লক্ষ্য ক'রছে

পাদ-মূল থেকে যে সমতল ভূমি ছড়িয়ে গেছে, তারই দৃশ্য! এই সমতল ভূমির উপর যখন পর্য্যাপ্ত শস্যের শ্যামলিমা যায় প্রচুর পরিমাণে। এই সব জিনিষ বাইরে রপ্তানী ক'রে সেখানকার লোকেরা বেশ-কিছু আয় করে।

ছেলেটীর কপালে ও চিবুকে উল্কির চিহ্ন এবং মাথায় বেতের টুপি ও কানে বাঁশের গোজ্ জানিয়ে দিচ্ছে যে, ছেলেটী বয়স্থ হ'য়েছে।

পোষাকের বৈচিত্র্য

যেন মাটীর বুকে সবুজ গালিচা বিছিয়ে দেয়, তখন তা দেখে' মনের মধ্যে আসে বিস্ময়, আসে মুগ্ধতা, আসে অপূর্ব্ব আনন্দ!·· জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে ভ্রমণ-কারীদের সাধ্য কি—সে দৃশ্য ছাখে! সে ত দেখবে কেবল (যদি তখন জোয়ারের টান কম থাকে) তীরের উপর রাশিকৃত বালি, আর, ছড়িয়ে থাকা মাটীর প্রাচুর্য্য! এর উপর বেলাভূমির ভয়াবহ নির্জ্জনতা ত আছেই!

ফরমোসার পশ্চিম অঞ্চলটী একটী সমতল ভূমি। দৈর্ঘ্যে এটী প্রায় কুড়ি মাইল হবে এবং এটী সমস্ত ফরমোসার এক তৃতীয়াংশের সমান। এই সমতল-ভূমিটী খুব উর্ব্বরা এবং এটী থেকে এত বেশী শস্য পাওয়া যায় যে, এককালে এটীকে "চীনদেশের গোলাঘর" ব'লে ডাকা হ'তো। প্রত্যেক বছরে এখানে দু-বার ক'রে ধান ফলে। চা, তামাক, মটর, তুঁত, আলু, আনারস ইত্যাদিও পাওয়া

'ভোনাম্' (vonum) জাতীয় নারী।

পল্লীর অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা একটু একটু শিক্ষা পেয়ে জাপানের একটী জাতীয় গান গাইছে।

একটী জাপানী পরিবার।

জাপানীরা সেখানে কফি, আঙুর এবং অন্যান্য ফলের গাছ থেকে প্রচুর অর্থ পায়। সেখানকার ফুলের সৌন্দর্য্য একটা দেখবার জিনিষ। জেস্‌মিন্, ম্যাগনোলিয়াস্, হোলীহক্‌স্, গোলাপ ইত্যাদি বিবিধ; বিচিত্র বর্ণের ফুল সেখানকার বাগানকে যেন দিন-রাত্তিরই আলো ক'রে রেখেছে!··· সেখানকার জন্তুদের মধ্যে বানর, ভল্লুক, বন-বিড়াল, বাঘ, শূকর, হরিণ, ছাগল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। বিবিধ প্রকারের পাখীর অস্তিত্ব সেখানে দেখা যায়। ওয়ালেস্ তাঁর "Island life" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ১৪৫ রকমের পাখী সেখানে আছে। পতঙ্গেরও প্রাচুর্য্য সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের চেয়ে ক্ষতিকর জিনিষ হচ্ছে—ম্যালেরিয়ার-জীবাণুতে-পূর্ণ মশা এবং প্লেগের জীবাণুতে-পূর্ণ মাছি। সেখানকার যে-সব জায়গায় দ্রাক্ষা-ক্ষেত আছে বেশী, শেষোক্ত মাছিগুলিকে সেইখানেই দেখা যায় প্রচুর। এই সব মাছিকে দেখলেই, বহু বহু বছর আগেকার ফ্যারাও শাসিত প্রজাদের প্লেগ-রোগের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট দুর্ভাগ্যের কথাই মনে প'ড়ে যায়!···সেখানকার শ্বেত-পিপীলিকা ও উই কম ক্ষতিকর নয়!

ফরমোসার পূর্ব্ব-অঞ্চলটী পর্ব্বতে পূর্ণ। তাদের শিখর যেম্‌নি সু-উন্নত, তাদের সংখ্যাও তেম্‌নি গণনাতীত! এই সব পর্ব্বত গভীর জঙ্গলে ভরা। সেই জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়—ওক্, ইবনি (আবলুস কাঠ), কর্পূর ইত্যাদি। এতগুলির মধ্যে কর্পূরের উৎপাদন-ই ফরমোসাকে সমস্ত পৃথিবীর কাছে চির-পরিচিত ক'রে রেখেছে; কারণ, অল্প ব্যয়ের দিক দিয়ে কর্পূর হচ্ছে একটী প্রয়োজনীয় ঔষধ; এবং পৃথিবীর দরকারে এই জিনিষ যতগুলি দেশ বেশী সরবরাহ করে, ফরমোসা হচ্ছে তাদের অন্যতম। ···আফিংয়ের মতো তামাক এবং নুন-ও সেখানে পাওয়া যায় সু-প্রচুর। কিন্তু এগুলির ব্যবসা সরকারের দ্বারা একচেটে হ'য়ে আছে। আগে

ফরমোসা যখন চীনাদের শাসনাধীন ছিল, তখন চীনদেশের লোকেরা জঙ্গল কেটে তছনছ ক'রে ফেলেছিল এবং উপরিউক্ত জিনিষগুলিও চালান্ ক'র্‌তো প্রচুর পরিমাণে। আজকাল সেখানকার সরকারের আইন-অনুসারে ও-সব ব্যাপার আর চ'লতে পারে না। জঙ্গলগুলিরও সংস্কার করা হয়েছে এবং আফিং, তামাক ও নুন বিক্রী করা হয়—সেগুলিকে রীতিমত পরিশোধিত ক'রে। মোট কথা, শেষোক্ত জিনিষগুলির ব্যবসা ক্রমেই উন্নতির পথে যাচ্ছে এবং তাতে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।...

গৃহ-কর্ম্ম

সেখানকার জঙ্গলগুলির মধ্যে যারা বাস করে, তারা-ই হচ্ছে ফরমোসার আদিম অধিবাসী। একদিন এদের-ই পিতৃপুরুষ, চীনাদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে সেখানকার জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের-ই বংশধরেরা আজও তাই জঙ্গলের অধিবাসী। এই জঙ্গলের মধ্যে তারা স্বাধীন ভাবে জীবন কাটায়। পৃথিবীর মধ্যে তারই হচ্ছে সকলের চেয়ে দুর্দ্দান্ত এবং বর্ব্বর। তারা যে কেবল বুনো জন্তু-জানোয়ার শিকার করে. তা নয়,—মানুষ শিকার-ও করে। তাদের তাড়াবার জন্য চীনারা যখন কর্পূর-গাছে-ভরা জঙ্গলের একাংশের দিকে এগিয়ে যেত, তখন তাদের সঙ্গে বর্ব্বরগুলোর প্রায়ই খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেতো। আজও পর্য্যন্ত নিহত চীনেম্যানের মাথা এদের কাছে

পাহাড়ের উপরে কুটীর ও কুটীরের মালিক।

পাহাড়তলীর ছেলে।

মূল্যবান এবং গর্ব্ব-করবার জিনিষের মতো ব'লে মনে হয়, যে-জি নি ষ টী এককালে এদেরই পিতৃপুরুষের দ্বারা নিত্য-প্রার্থিত হ'য়ে উঠেছিল।···আজকাল এই বর্ব্বরদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী। এরা সাতটী বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক জাতি কথা কয় বিভিন্ন ভাষায়। কাজেই, সমগ্র ভাবে এই বর্ব্বরদের ইতিহাস সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব কাজ।···জাপানীরা এদের সভ্য করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগে গেছেন। এ-প্রচেষ্টায় তাঁরা একেবারে অকৃতকার্য্যও হচ্ছেন না।

ফর্‌মোসার পশ্চিমাঞ্চলে মোট ৩,৭০০,০০০ লোক বাস করে; তার মধ্যে ১৫০,০০০ জাপানী। বাকী চীনা। প্রধান প্রধান সহর হচ্ছে—কিলুং, টাম্‌শুই, টাইহোকু কাগি, টাইনান্ ও হোজান্। এগুলির মধ্যে টাইহোকু দেশেই বড়লাট বাহাদুর থাকেন। প্রধান প্রধান বন্দর হচ্ছে—কিলুং, টাম্‌শুই, আন্‌পিং ও টাকো। এক-মাত্র কিলুং-বন্দরেই বড় জাহাজ এসে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বহু-সংখ্যক জাহাজকে আসতে দেবার সুবিধা সেখানে নেই। এই সব জাহাজ আবার আসতে পারবে কেবল তখনি, যখন সমুদ্র থাকবে প্রশান্ত!—এই বন্দরটী দাঁড়িয়ে আছে উত্তর মুখো হ'য়ে। কাজেই, উত্তুরে ঝড়ের সময়ে এর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে: এবং এই বিপজ্জক অবস্থা তাকে পেতে হয় প্রায়ই!

ফর্‌মোসায় বছরের মধ্যে অন্ততঃ চার পাঁচ বার ভীষণ ঘূর্ণি-ঝড় বয়। হিসাবে ধরা হ'য়েছে, এই ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১২৬ মাইল পর্য্যন্ত হয়। মুষল ধারায় বৃষ্টিপাতও সেখানে হয় অতিরিক্ত রকম। সেখানকার কিলুং-দেশে ত বছরের মধ্যে ২৪২ দিনই বৃষ্টি লেগেই থাকে। এই বৃষ্টির গভীরতা ১৯৮ ইঞ্চি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দিক দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের আগে ফর্‌মোসার নাম করা যেতে পারে। পাঁচ ব ৎ স রে র হিসাবে সেখানকার টাইনান দেশের আবহাওয়ার গড়্‌পড়্‌তা বাৎসরিক উত্তাপ হচ্ছে ৮৩ ডিগ্রী।

সভ্যতার আওতায় কতকটা মার্জ্জিত ফর্‌মো-সার অসভ্য, জঙ্‌লা লোক।

ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তাপ ৩৭° ডিগ্রী ক'মে যায়। উত্তাপ যদি কখনো অনুভূত হয় ত, সে উত্তাপের পরিমাণ সাধারণত হয় ৯০ ডিগ্রী। কিন্তু জুলাই-মাসে ৯৮ ডিগ্রীর উত্তাপও পাওয়া যায়।

কর্পূরের তেল (Camphor oil) নিংড়ে বের করবার কারখানা।

মেয়েটীর নাকের দুপাশের উল্কি-চিহ্ন জানিয়ে দেয় যে, মেয়েটী এখন বিবাহ-যোগ্যা হয়েছে

জাপান থেকে ফিলিপাইন্‌স্‌ পর্য্যন্ত যে সব আগ্নেয়গিরির শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ফর্‌মোসা তারই পাশে অবস্থিত! এই কারণেই ভূমিকম্প সেখানে প্রায়ই হয়। তবে জাপানের সেই ইতিহাস-বিশ্রুত অনবরত ভূ-কম্পনের ধ্বংসকারী অত্যাচারের স্বরূপ সেখানে কখনো ফুটে ওঠে না।

খৃষ্টীয় যুগারম্ভের সময়েই চীনা ভৌগোলিকেরা ফরমোসার বিষয় জানতে পারেন। কিন্তু ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফর্‌মোসার সম্পূর্ণ ইতিহাস জানবার উপায় ছিল না। মিং রাজবংশের শাসন কাল পর্য্যন্ত ফরমোসা ছিল চীনা ও জাপানী দস্যুদের আবাস-স্থল। এই দস্যুরা চীনের দক্ষিণ উপ-কূলস্থ দেশে ডাকাতী করতে যেতো এবং জিনিষ-পত্তর লুঠ করে পালাতো। শেষে ১৬২৩ সালে ডাচ্‌রা সেখানে এল এবং জিলাণ্ডিয়া নামক স্থানে একটা দুর্গ তৈরী করলে। এই জিলাণ্ডিয়াই আজকাল এ্যান্‌পিং নামে পরিচিত। ডাচ্‌রা

এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাবার দড়ির সেতু। এই সেতু অসভ্য জঙলীরাই তৈরী ক'রেছে। এতে তাদের যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

আরও একটা দেশে দুর্গ তৈরী করে। এই দেশটারই আধুনিক নাম টাইনান। ডাচ্‌রা যখন সেখানে আসে, তখন সেখানে চীনা ও জাপানী অধিবাসীর সংখ্যা ছিল কম। ডাচ্‌রা নবাবী চালে দেশ শাসন করবার ব্যবস্থা করলে, শুধুই এ মতলবে যে, সেখানে তাদের আশ্রয়টাকে কায়েমী ক'রতেই হবে! কিন্তু ১৬২৬ সালে হঠাৎ স্প্যানিয়ার্ডরা এসে উত্তর ফরমোসা দখল করবার চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু স্থলে ও জলে অনেক যুদ্ধ ক'রে ডাচ্‌রা তাদের হটিয়ে দিলে। এই ভাবে বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই ১৬৬১ সাল পর্য্যন্ত ডাচ্‌রা ফরমোসাকে শাসন ক'রতে লাগলো। কিন্তু দিন কারুরই সমান যায় না। ডাচ্‌দের সময় ফুরিয়ে এসেছিল।

শিকারী।

কোক্সিঙ্গা নামে একটী চীনা দস্যু-পুত্র—সদলবলে এসে ডাচ্‌দের দেশ-ছাড়া ক'রলে। কোক্সিঙ্গার মা ছিল জাপানী এবং বাপ ছিল অতি প্রতাপশালী, ঐশ্বর্য্যবান চীনা দস্যু।···শক্তিতে সে ছিল তার বাপেরই মতো দুর্জ্জয়! পুরো ৯টী মাস ধ'রে সে ডাচ্‌দের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাজিত ক'রলে। কিন্তু রাজ্য-ভোগের সুখ তার অদৃষ্টে ছিল না, কারণ, যুদ্ধজয়ের এক বৎসর পরেই সে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে রাজা হ'লো। সে ২১ বৎসর রাজ্য চালিয়েছিল। এর মৃত্যুর পর ফরমোসা চীনের অধীন হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পালে-পালে চীনেম্যান এসে ফরমোসার মধ্যে ভীড় ক'রতে লাগলো এবং বিভিন্ন দেশে ইংরাজ ও ডাচ্-অধিবাসীরা যেমন রেড্-ইণ্ডিয়ানদের কুকুর-তাড়ানো ক'রে বনের মধ্যে পাঠিয়ে দেয় সেইখানেই থাকতে দেবার জন্য, ঠিক সেই রকম চীনারাও ফরমোসার আদিম অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিলে পার্ব্বত্য জঙ্গলের দিকে। নীড়হারা এই সব হতভাগ্য তাই শোচনীয় ভাবে তাদের জীবন কাটাতে লাগলো—ওই সব নতুন-আম্‌দানী-হওয়া চীনাদের প্রতি অসাধারণ ঘৃণা ও প্রতিহিংসা হৃদয়ে পোষণ ক'রে। তারা সুবিধা পেলেই তাই চীনাদের খুন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে।···অবশ্য এইখানে আর একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যে, চীনারা সমস্ত আদিম ফরমোসা-বাসীকেই যে জঙ্গলে 'নির্ব্বাসিত' ক'রেছিল, তা নয়; এখনো দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে কয়েকঘর আদিম অধিবাসী আছে, যারা তাদের স্বস্থানেই বসবাস করে ঠিক আগেরই মতন। এই জাতির নাম Pepohwan.—জাপানীরা এদের বলে "জুকুবান্"। "জুকুবান্" কথাটার অর্থ—"গৃহ-পালিত বর্ব্বর।" এরা চীনাদের সঙ্গে নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমন কি, এরা চীনাদের আচার ও ভাষাটা পর্য্যন্ত এত চমৎকার ভাবে গ্রহণ ক'রেছে যে, খুব পাকা লোক

নইলে প্রথম দৃষ্টিতে এটা বুঝতে পারা কঠিন হবে যে, এরা মূলতঃ চীনা, না, অন্য কোনো জাতি!

১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত ফর্‌মোসা চীনের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। কিন্তু ১৮৯৪—৯৫ সালের যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে চীনারা আংশিক মূল্য স্বরূপ জাপানের হাতে ফর্‌মোসাকে ছেড়ে দেয়। জাপানীরা কিন্তু শৃঙ্খলার সঙ্গে ফর্‌মোসায় রাজত্ব ক'রতে পারলে না। তার কারণ, এদিকে তাদের চেষ্টাই ছিল না একটুও! কুঁড়ে রাজ-কর্ম্মচারীদের কোনো একটা নিয়ম-কানুন্ ছিল না। কাজেই সেখানে অনবরত বিদ্রোহ দেখা দিতে আরম্ভ ক'রলে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে রাজশক্তির প্রায়ই যুদ্ধ বাধতে লাগলো। সেখানকার জঙ্গল-বাসী বর্ব্বরেরাও ছেড়ে কথা কইলে না। তারাও সেখানকার লোকদের উদ্ব্যস্ত ক'রে তুললে। ওদিকে, দেশ-পর্য্যবেক্ষণের এবং ভাল ক'রে আলোর বন্দোবস্তের অভাবে, অনেক জাহাজ ডুবি হ'তে লাগলো। জাহাজ ডুবি হ'য়ে যে-সব নাবিক কোনো গতিকে প্রাণ নিয়ে আসতে পারতো, তাদেরও নিস্তার ছিল না; কারণ, বর্ব্বররা এবং নানা কারণে, সেখানকার চীনারাও তাদের হত্যা ক'রতো। শেষে, জাপান থেকে এক-জাহাজ সৈন্য সেখানে আনানো হ'লো। এর ফলে, সমস্ত বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড একেবারে থেমে গেল। এ হচ্ছে ১৮৯৬ সালের কথা। এর দশ বৎসর পরে চীনের সঙ্গে টংকিংদেশ-সংক্রান্ত কি-একটা বিবাদের জন্য ফরাসীরা সেখানকার কিলুং এবং পেস্কাডোর্‌স্—দুটী দেশই অল্প সময়ের জন্য অধিকার ক'রে ব'সলো। ফরাসীরা অবশ্য কিছুদিন পরেই ফরমোসাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু দশ বৎসর পরেই বিজয়ী জাপানীরা সমস্ত ফর্‌মোসাকেই অধিকার ক'রে ব'সলো এবং চীনাদের হাত থেকে সেখানকার সমস্ত আধিপত্য কেড়ে নিলে। সেখানকার লোকেরা কিন্তু এই নতুন শাসকের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রতে চাইলে না। শেষে, অনেক রক্তারক্তির পর তারা ক্রমে আপনা হ'তেই নিস্তেজ হ'য়ে গেল। এই রক্তারক্তির প্রায় দুটী বছর ধরে দেশ সামরিক আইন ও শাসনের অধীন ছিল। তখন রাজশক্তি যে সব পাশবিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল, সে-কথা পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কখনো মুছবে না। তখন অ-সামরিক রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত অবাঞ্ছনীয়ভাবে বীভৎস গুণ্ডামি সুরু ক'রেছিল। যাই হোক, শেষে জাপানীরা শান্ত হ'য়ে গেল এবং ১৮৯৮ সালে ভাইকাউণ্ট্ কোডামার বিচক্ষণতাপূর্ণ সুন্দর শাসনের গুণে দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'লো।

আজকাল ফর্‌মোসা নানা দিক দিয়েই উন্নত হ'য়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, বিচার, রেলপথ-রাজপথ নির্ম্মাণ, বন্দরের উন্নতি, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বাতি-ঘর, শিল্প, কৃষি, ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদি ইত্যাদি সব দিক দিয়েই সেখানে উৎসাহের সাড়া পাওয়া যায়। সেখানকার ব্যবসার অবস্থাও বেশ ভাল। ১৯২০ সালে সেখান থেকে মোট প্রায় ৩৮৯,০০০,০০০ ইয়েন্ মূল্যের জিনিষ বাহিরে রপ্তানী করা হ'য়েছিল। এক ইয়েনের দাম দু শিলিং অর্থাৎ দেড় টাকা। বছর কতক আগে সেখানকার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩,৬৫৪,৩৯৮।

বিবিধ বর্ণের পশমের আড়ম্বরযুক্ত চীনা ঘাসের বোনা পোষাক-পরিহিতা আটাইয়াল্ জাতীয় মেয়ে।

জলের ঘাটে

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ

রূপসীরা ভিড় করেছে রূপ দেখাতে রূপের হাটে—
ননদি, আজ দেখে এলেম আনতে গে জল জলের ঘাটে,
পদ্ম ফুলের মতন কেহ
ভাসচে জলে এলিয়ে দেহ,
বাঁকিয়ে গ্রীবা হাঁসের মত কেউ বা আবার সাঁতার কাটে,
দেখে এলেম জলের ঘাটে।

দীঘির পাড়ে বাঁশের ঝাড়ে লুকিয়ে পাতায় ডাকছে পাখী,
অস্ত-রবির রক্তে রাঙা আকাশখানা মাখামাখি।
আনমনে কেউ কলস নাচায়,
সখীর ডাকে ফিরেও না চায়,
আজ কেন বর এলো না'ক সেই কথা সে ভাবচে নাকি!
অলস সুরে গাইচে পাখী।

রঙ্গিনী এক রঙ্গ করে' জল ছিটিয়ে দিচ্চে গায়ে,
"উহু উহু করিস কি ভাই?"—সঙ্গিনী কয় আলতা-পায়ে,
গোলাপ-কুঁড়ি-অলক পরে
কেউ তরুণী পরখ করে
সখীর "সাধের" সোণার চুড়ি বাড়িয়ে বাহু দাঁড়িয়ে বাঁয়ে
নীল সাড়িটি জড়িয়ে গায়ে।

ননদ-ভাজে জায়ে-জায়ে ঝগড়া-ঝাঁটির গল্প হাসি,
এই বয়সে সখ প্রাণে খুব, সাবান মাখে চাঁপার মাসি,
তুমুল তর্ক আলোচনা
চলচে, কানে যাচ্চে শোনা,
জলে স্থলে চলকে পড়ে সুন্দরীদের রূপের রাশি!
—রং তামাসা গল্প হাসি।

রূপসায়রের পদ্মবনে আমার কালো কুরূপ নিয়ে
কী ফাঁপরে পড়ে গেলেম! পালিয়ে এলেম খিড়কি দিয়ে,
অন্দরের এই অন্ধকারে
বন্ধ থাকা মানায় যারে,
তার কি সাজে লোক-সমাজে মুখ দেখানো বাইরে গিয়ে?
পালিয়ে এলেম খিড়কি দিয়ে।

পাছে কারো চোখ পড়ে যায়, ঘৃণায় কেহ ফিরায় আঁখি,
আপনারে তাই সঙ্গোপনে আড়াল করে আগলে রাখি;
শ্রীহীনার এই ব্যর্থ জীবন
মুক্তি দেবে কবে মরণ?
কইব কারে প্রাণের ব্যথা? যে না জানে বুঝবে তাকি?
আড়ালে তাই লুকিয়ে থাকি।

তবুও ত দাদাটি তোর আমায় কত আদর করে,
নতমুখে রই নীরবে কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ঝরে;
উথলে ওঠে কানায় কানায়
হৃদয়খানা কী বেদনায়!
ব্যর্থতার এই শূন্য ডালি দি অঞ্জলি চরণ পরে!
কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ঝরে!

দেহে বিধি রূপ দিলে না, প্রাণে কেন প্রেম দিলে গো?
যায় না মারা দুটি পাখীই একবারে কি এক ঢিলে গো?
দেহও কাঁদে প্রাণও কাঁদে
এই বিরোধ এই বিসম্বাদে—,
প্রতি পদে চলতে বাধে—সারা হলেম গরমিলে গো!
প্রাণে কেন প্রেম দিলে গো?

দেহাতীত প্রেমের কথা কয় অনেকে শুনি কাণে,
আমি ত ভাই ইহার ভিতর পাই না খুঁজে কোনই মানে;
গন্ধ যেমন ফুলের ফাঁদে
আপনাকে ঐ আপনি বাঁধে,
তেমনিতর প্রেম ওলো ভাই দেহের বাঁধন শাসন মানে।
নিছক প্রেমের পাইনে মানে!

কথায় কথায় ঠাকুরঝি লো, এলেম সরে অনেক দূরে,
রূপসীদের হাট বসেছে আয় দেখে আয় খানিক ঘুরে;
বইচে বাতাস শ্রান্তিহরা,
স্বপ্ন সুখ ও শান্তিভরা,
আকাশ ফেটে আলোর ঝলক পড়চে, পাখী গাইচে সুরে,
জলের ঘাটে আয় লো ঘুরে।

লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-ডি, সি-আই-ই

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালীর মনীষা যে কত দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছে, 'ভারতবর্ষ' প্রতি মাসেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান মাসে 'ভারতবর্ষ' যাঁহার মনীষার স্মৃতি-তর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চলিয়াছে, তিনি খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী-বংশীয় লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম-ডি, সি-আই-ই মহোদয়। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী-বংশ ভারত-বিশ্রুত, তথা বিশ্ব-বিশ্রুত বংশ। নবাবী আমল হইতে এই বংশীয় ব্যক্তিরা রাজস্ব বিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ, মান, যশ লাভ করিয়া আসিতেছেন। "সর্ব্বাধিকারী" উপাধিটিও মোগল বাদশাহের প্রদত্ত। ডাক্তার সুরেশ-প্রসাদ এই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন।

ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর চতুর্থ পুত্র। সত্য-প্রসাদ, দেবপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ—সুরেশপ্রসাদের তিন অগ্রজ। তাঁহার সপ্তম ভ্রাতা মুনীন্দ্রপ্রসাদ বঙ্গ সাহিত্যের যশস্বী সেবক। সন ১২৭২ সালের ৩০এ চৈত্র হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী ভুরশুট, বামুনপাড়া গ্রামে মাতামহালয়ে সুরেশপ্রসাদের জন্ম হয়।

বাঙ্গালা দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে—"আটাশে ছেলে"। গর্ভের অষ্টম মাসে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহাকে আটাশে ছেলে বলে। ভ্রূণের পূর্ণ পরিণতির পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুণ এইরূপ শিশু প্রায় দীর্ঘজীবী হয় না,—যত দিন জীবিত থাকে, তত দিনও প্রায় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকে। সুরেশপ্রসাদও ছিলেন আটাশে ছেলে—অষ্টম মাসেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু নিজ জীবনে সুরেশপ্রসাদ প্রচলিত প্রবচনটিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন! চর্ম্মাবৃত মাংস-পিণ্ড তুল্য সদ্যপ্রসূত আটাশে শিশুকে মৃত বোধে পল্লী-গৃহিণীরা তাহাকে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অশিক্ষিতা পল্লীধাত্রী এই শিশুতে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পান। তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ চেষ্টায় শিশুর জীবন রক্ষা পায়। অলৌকিক উপায়ে দৈব কৃপায় রক্ষিত এই শিশু দুর্ব্বল দেহ, এবং আধখানা মাত্র ফুসফুস সম্বল করিয়া উত্তর কালে ভারতে অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসকের খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

শৈশব কাল হইতেই সুরেশপ্রসাদ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া পড়াশুনার জন্য কেহ তাঁহাকে কখনও পীড়াপীড়ি করেন নাই। প্রথম তিনি কিছুদিন বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত বাঙ্গালা পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। পরে হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করিয়া সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ মেধা এবং অপূর্ব্ব মানসিক সম্পদ দর্শনে সুরেশপ্রসাদের আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে আইন অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। তাঁহাদের আশা ছিল ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সুরেশপ্রসাদ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে অনন্য-সাধারণ খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া আইন ব্যবসায় সুরেশচন্দ্রের পছন্দ হইল না। ভারত বিখ্যাত ডাক্তার-পিতার সাহচর্য্যে তাঁহার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি ও যন্ত্র-তন্ত্র নাড়াচাড়া করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছিল; বিশেষতঃ ডাক্তার-পিতার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দর্শনে, চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনের মতের বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের সঙ্কল্প করিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য বলিয়া, দুর্ব্বল পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া স্নেহময় পিতা প্রথমে তাঁহাকে ডাক্তারী পড়িবার অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। অসাধারণ প্রতিভাশালী সুরেশপ্রসাদ

মেডিক্যাল কলেজে প্রথম হইতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। সুরেশপ্রসাদ এম-ডি পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তৎকালে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রের গ্র্যাজুয়েট না হইলে কেহ এম ডি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইত না। সুরেশপ্রসাদ তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউশনের বি-এ ক্লাশে যোগদান করিলেন, এবং সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া এম-ডি পরীক্ষা দিলেন, এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। মেডিক্যাল কলেজে প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া প্রধান পুরস্কার ও বৃত্তি প্রভৃতি লাভ করিতেন।

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে ক্লাশের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্পিট্যাল ডিউটি অর্থাৎ হাসপাতালে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করিতে হয়—সুরেশপ্রসাদকেও করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের উদ্ভব, প্রকৃতি ও নিদান আলোচনা করিয়া অনেক নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিয়া অধ্যাপকগণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন, এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্যাকলিয়ড, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ম্যাকলিয়ড সাহেব ছাত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আই-এম-এস পরীক্ষার্থ নিজব্যয়ে বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সুরেশপ্রসাদও তাহাতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু সুরেশপ্রসাদের জননী পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; এবং পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া পিতাও সুরেশপ্রসাদের বিলাত যাত্রার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। সেই জন্য সুরেশপ্রসাদের বিলাত যাওয়া ঘটিল না।

প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুইটি অঙ্গ—ভেষজ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও পূর্ব্বে এই দুইটি অঙ্গ ছিল। মধ্যে কিছু কাল অস্ত্র চিকিৎসা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের দৃষ্টি পুনরায় অস্ত্র-চিকিৎসার দিকে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর চিকিৎসকগণ Physician এবং শেষোক্ত শ্রেণীর চিকিৎসকগণ Surgeon নামে অভিহিত হন। অবশ্য চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন-কালে উভয় অঙ্গেরই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া এক একজন চিকিৎসক এক একটি অঙ্গ নির্ব্বাচন করেন—কেহ ভেষজ-চিকিৎসক হন, আর কেহ বা অস্ত্র-চিকিৎসক হন। সুরেশপ্রসাদ প্রথমে Physician হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃ-আদেশে তিনি অস্ত্র-চিকিৎসা অবলম্বন করেন।

এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সুরেশপ্রসাদ সাণ্ডার্স সাহেবের চেষ্টায় প্রথমে মেয়ো হাসপাতালের প্রধান ফিজিসিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চির-স্বাধীন-চিত্ত সুরেশপ্রসাদ উত্তরকালে মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াও, দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি মেয়ো হাসপাতালের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চাঁদনী হাসপাতালে যোগদান করেন; কিন্তু এখানেও অধিক দিন না থাকিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বিডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যে-কোন ক্ষেত্রেই নিযুক্ত হউক না কেন, প্রতিভা আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইবে, এবং প্রাধান্য লাভ করিবেই। ফিজিসিয়ানরূপে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সুরেশপ্রসাদ অচিরে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক সুদক্ষ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল, এবং তাহাতেই সুরেশপ্রসাদের ভাগ্যচক্র ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল; এবং এই ঘটনাতেই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক রূপে যশোলাভ করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা কঠিন দুরারোগ্য স্ত্রীরোগে (ওভেরিওটমি—ovariotomy) আক্রান্ত হইয়া তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ডাক্তার জুবার্টের (Dr. Joubert) শরণাপন্ন হন। কিন্তু ডাক্তার জুবার্ট এই রোগ শিবেরও অসাধ্য বলিয়া অস্ত্রোপচার করিতে সম্মত হইলেন না। বহু অনুনয়, বিনয়, অশ্রু-বিসর্জ্জনে কোন ফল লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যা

ডাক্তার জুবার্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার কথা গোপন করিয়া সুরেশপ্রসাদের জননীর করুণা ভিক্ষা করিলেন। মাতার অনুজ্ঞায় সুরেশপ্রসাদ ব্রাহ্মণ কন্যার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া আশাতীত সুফল লাভ করিলেন। সুরেশপ্রসাদের গুরু—বহুদর্শী, প্রবীণ, চিকিৎসক ডাক্তার জুবার্টের ধারণা ছিল, অস্ত্রোপচারে এই রোগ আরাম হইবে না, বরং অস্ত্র-প্রয়োগের ফলে রোগিনীর মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। গুরু যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, শিষ্য তাহা জানিতে পারিলে পাছে অস্ত্রোপচার করিতে অস্বীকার করেন, এই আশঙ্কায় সে কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। দরিদ্রা, রোগ-যন্ত্রণাকাতরা বিপন্না ব্রাহ্মণ কন্যার সনির্ব্বন্ধ আবেদনে পর দুঃখ-কাতরা করুণাময়ী সুরেশ-জননী স্থির থাকিতে পারিলেন না, রোগিনীর চিকিৎসা করিতে পুত্রকে আদেশ করিলেন। জননীর আদেশে জননীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সুরেশপ্রসাদ এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে অস্ত্র চিকিৎসা সমাধা করিয়া রোগিনীকে বিপন্মুক্ত করিলেন। সুরেশ-প্রসাদ তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া অল্প দিন হইল চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স তখনও ত্রিশ বৎসরেরও কম। অভিজ্ঞতাও বয়সেরই অনুরূপ। এমন অবস্থায় এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে অসমসাহসিকতার কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু মাতৃভক্ত পুত্র মাতার আশীর্ব্বাদে এবং শ্রীভগবানের কৃপায় এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বায়রণ যেমন বলিয়াছিলেন—একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, আমি খ্যাতি লাভ করিয়াছি—সুরেশ-প্রসাদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায় যে, এই দুঃসাধ্য অস্ত্র-চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিয়া এক দিনে তিনি বিশ্বযোড়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া ডাক্তার জুবার্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুরেশপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রোগিনীকে দেখিতে যান। রোগিনীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ অধ্যাপক মুক্তকণ্ঠে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের প্রশংসা করিয়া বলেন, শিষ্য হইতে গুরুর মুখোজ্জ্বল হইল। সুরেশপ্রসাদ বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক অধ্যাপককে বলিলেন, মাতার আশীর্ব্বাদের ফলে এই অঘটন ঘটিয়াছে। এই সময় হইতে ফিজিসিয়ান সুরেশপ্রসাদ হইলেন সার্জ্জন সুরেশপ্রসাদ। মাতৃ-আশীর্ব্বাদ বরাবরই সুরেশপ্রসাদের মস্তকে কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং উত্তরকালে তিনি অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

জুবার্ট সাহেব ছাত্রের কৃতিত্ব দর্শনে এতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং একখানি বিলাতী চিকিৎসা-বিষয়ক সাময়িক-পত্রে এই অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে নিজের ত্রুটি এবং শিষ্যের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার অজস্র প্রশংসা করেন। ইহার ফলে সুরেশপ্রসাদ বিলাতের চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত হইলেন; সকলেই প্রশংসমান নেত্রে এই তরুণ অস্ত্র-চিকিৎসককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু কাল পরে কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে মেডিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার জন্য বিলাত হইতে সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক হার্ট সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি সুরেশপ্রসাদকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে সুরেশপ্রসাদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুরেশপ্রসাদ বরাবরই ক্ষীণকায় ছিলেন। সেই ক্ষীণ দেহে এত সমাহিত দুর্জ্জয় শক্তি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হার্ট সাহেব বলিয়া উঠেন—"Young man, we are not supposed to undertake these cases till we are forty and not to cure one till we have killed a hundred. But you have beaten us all." অর্থাৎ ওহে যুবক, চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যে অস্ত্র-চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে আমরা সাহস করি না, এবং এক শত জন রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ একটা অস্ত্র-চিকিৎসায় আমরা সফলতা লাভের আশা করি না, এত তরুণ বয়সে সেই সুকঠিন অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া এবং তাহাতে সফলতা লাভ করিয়া তুমি আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছ।

এক শত কেন, ওভেরিওটমির চিকিৎসায় সুরেশ-প্রসাদ একটাতেও কখনও বিফল-প্রযত্ন হন নাই, একটি রোগিনীরও তাঁহার হাতে মৃত্যু হয় নাই। যাহাকে বলে cent per cent তাহাই তাঁহার সুচিকিৎসা-গুণে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। মনস্বী ও চিকিৎসা-কুশল বাঙ্গালী ডাক্তারের তখন অভাব ছিল না। কিন্তু

কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইলেই নামজাদা গোরা ডাক্তারের ডাক পড়িত। সুরেশপ্রসাদ সাহেব ডাক্তারদের এই একচেটিয়া অধিকারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সুরেশপ্রসাদ বিনা পারিশ্রমিকে এবং সময় সময় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে অকাতরে দরিদ্রের অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন। কিন্তু যে সকল ধনী পরিবারে গোরা ডাক্তারের অবাধ গতিবিধি এবং অখণ্ড প্রতিপত্তি, সেখানে তিনি গোরা ডাক্তারের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক না লইয়া কাজে হাত দিতেন না। ফলে, দেশীয় ধনী পরিবারে গোরা ডাক্তারের প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ এবং তাঁহার সহযোগী ও অনুবর্ত্তী বাঙ্গালী অস্ত্র-চিকিৎসকরা অতঃপর গোরা ডাক্তারদিগের স্থান গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সুরেশপ্রসাদের ইহাই বিশিষ্ট কৃতিত্ব ও গৌরব।

সুরেশপ্রসাদের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। বর্ত্তমান কালে দেশের স্বাস্থ্য অতি মন্দ, এবং দেশবাসী অধুনা প্রতীচ্য চিকিৎসা-পদ্ধতির অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ পাশ্চাত্য প্রথায় দীক্ষিত সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব। বাঙ্গলার একমাত্র উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এই অভাব পূরণে অসমর্থ। কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা-লাভেচ্ছুর অভাব নাই। কিন্তু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বহুসংখ্যক গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়া কেবল স্থানাভাব বশতঃ বিফল-মনোরথ হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার আর, জি, কর, স্যার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ, স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আপার সার্কুলার রোডে College of Physicians and Surgeons of Bengal নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা পরে বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ নামে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সমকক্ষ উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় এই কলেজে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ সাহায্য না পাইলে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ স্থল। স্যার রাসবিহারীর নিকট হইতে কলেজের জন্য অর্থলাভ সুরেশপ্রসাদের আর একটা কৃতিত্ব। সুরেশপ্রসাদ স্যার রাসবিহারীর আশৈশব-পঙ্গু ভগ্ন-মেরুদণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুচিকিৎসা করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে স্যার রাসবিহারী সুরেশপ্রসাদের চিরপ্রিয় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার আর, জি, কর, স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বসু, স্যার নীলরতন সরকার, স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহাদের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া পরিশ্রম করিয়া, নিজেদের "বাঁধা" দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলেন। তাই আজ বাঙ্গলায় উচ্চশ্রেণীর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ সম্ভব হইয়াছে।

সুরেশপ্রসাদের পিতা রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যেরূপ হৃদয়বান ও পরোপকারী ছিলেন, উত্তরাধিকার-সূত্রে সুরেশপ্রসাদ এই সকল পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি তিনি কেমন করিয়া পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী এই—একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক ভদ্রলোক তাঁহার এক পীড়িত পরম আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য সুরেশপ্রসাদকে ডাকিতে আসেন। সেদিন সুরেশপ্রসাদ একটু অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তত রাত্রিতে রোগী দেখিতে যাইতে পারিবেন না বলিয়া পরদিন সকালে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সংবাদ কোনক্রমে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ডাক্তার সূর্য্যকুমারের কর্ণগোচর হইলে পুত্রকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন, তোমার সামান্য অসুস্থতার জন্য রোগী দেখিতে যাইতে পারিলে না,—যাঁহার কঠিন পীড়ার জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তাঁহার অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! ভদ্রলোকের বিপদের কথা শুনিয়া, প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না—রোগীকে দেখিতে আমিই

যাইব, গাড়ী আনিতে বল। পিতার এই কথায় লজ্জিত হইয়া, চিকিৎসকের কঠোর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সুরেশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ রোগী দেখিতে বাহির হইলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি সামর্থ্য থাকিতে আলস্য বশতঃ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করেন নাই।

বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে সুরেশপ্রসাদকে দুর্ব্বল দেহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তখন তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই এত বড় একটা গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং সফলও হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময় তিনি নিজের স্বাস্থ্য বা অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। কলেজ স্থাপন উপলক্ষে তাঁহাকে বহুবার তৎকালীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রীতিলাভ করিয়া লাটসাহেব বলিয়াছিলেন, Suresh can talk.

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুরেশপ্রসাদের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। একদিন একখানি ট্রামগাড়ীর সহিত সুরেশপ্রসাদের মোটর গাড়ীর ধাক্কা লাগে। সুরেশপ্রসাদ দৈব কৃপায় রক্ষা পান, কিন্তু তাঁহার গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি নিজেই তাঁহার মোটর চালাইতেছিলেন। ট্রাম কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে আদালতে তিনি নিজে নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারাজীবের ন্যায় ওজস্বিনী ভাষায় যুক্তি-তর্ক সহকারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আদালত স্তম্ভিত হইয়াছিল, এবং পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ব্যতীত সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্যেও সুরেশপ্রসাদের সমান উৎসাহ দেখা যাইত। বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে বাঙ্গালী জাতিকে জগৎ-বরেণ্য দেখিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সুযোগ পাইবামাত্র তিনি বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স কোর (Bengal Ambulance Corps) এবং য়ুনির্ভার্সিটী ট্রেনিং কোর (University Training Corps) গঠন করিলেন। বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স কোর তুরস্ক দেশে মেসোপটেমিয়ায় আহত ইংরেজ সেনাগণের সেবা-শুশ্রূষা এবং পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। সুরেশপ্রসাদের ঐকান্তিক যত্ন ও নেতৃত্বে এই সেবক-দল গঠিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকগণের সাহসিকতা ও রাজানুরক্তি প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। য়ুনিভার্সিটী ট্রেণিং কোরও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত হয়। বাঙ্গালী সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি আহতের সেবাকার্য্যে কি রণোন্মাদনায় বাঙ্গালী যুবকগণ সুরেশপ্রসাদের সাধ পূর্ণ করিয়াছিল। সুরেশপ্রসাদ ছিলেন এই দুইটি দলের প্রাণস্বরূপ।

সুরেশপ্রসাদ ডাক্তার, তাহার উপর প্রধানতঃ অস্ত্রচিকিৎসক—সার্জ্জন। নীরস চিকিৎসা-ব্যবসায় লইয়া থাকিলেও সুরেশপ্রসাদ কিন্তু সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত ছিলেন না। চিকিৎসা ব্যবসায়ের মধ্যে অবসর পাইলেই তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সূত্রে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণকে তিনি সাহিত্য-বন্ধু রূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন। নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও, আচারে-ব্যবহারে তিনি হিন্দুই ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী অনাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল; শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তিনি হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পালন করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রালোচনা তাঁহার আনন্দের বিষয় ছিল।

তিনি এ্যাম্বুল্যান্স কোর, ইউনিভার্সিটী কোর প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের অধিনেতা হইয়া বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান এবং বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। জন্মাবধি ভগ্নস্বাস্থ্য সুরেশপ্রসাদের ক্ষীণ দেহের উপর এত অত্যাচার সহিল না। প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সন ১৩২৭ সালের ২৬এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে আট ঘটিকার সময় সামান্য কয়েকদিন রোগ ভোগের পর মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকের যাত্রী হইলেন। যুগপৎ চরিত্র-মাধুর্য্য, কমনীয়তা, দৃঢ়তা, পরদুঃখকাতরতা, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি, নির্ভীকতা, স্বাধীনচিত্ততা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের একত্র সঙ্গম সুরেশপ্রসাদের ন্যায় সাধারণতঃ অন্যত্র নয়নগোচর হয় না। তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারিবে।

সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ *

শ্রীরাধারাণী দত্ত

আজকের এই সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে আমি কেবলমাত্র শ্রোত্রী হ'য়েই যোগদান ক'রতে পেলে খুশী হ'তাম বেশী,—কিন্তু সে ভাবে এখানে প্রবেশের 'ছাড়পত্র' কিছুতেই পাওয়া গেল না বলে' অগত্যা কিছু ব'লবার জন্য দুঃসাহসী হ'য়েছি। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলে' আমি এঁদের অনুরোধ রক্ষা ক'রতে চাই মাত্র; কারণ, এ রকম বিদ্বজ্জন সভাতে কিছু বলতে পারি এমনতর সম্পদ্ আমার নেই।

আমাদের দেশের সমালোচকদের সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ আমার মনে প্রায়ই জাগে। সেদিন আমার একটি তরুণী বান্ধবী (যাঁর রচনা ইতিমধ্যেই সাহিত্যের আসরে বেশ আদর পেয়েছে, আমি সেই অপরাজিতা দেবীর কথা বলছি) আমাকে তাঁর একখানি চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন যে, "কবি'র চেয়ে কি 'ব্যক্তি' বড়ো? 'কবিত্ব'র চেয়ে কি 'ব্যক্তিত্ব'ই সাহিত্যক্ষেত্রে বেশী আদর পায়?" বান্ধবীর এই জিজ্ঞাসায়, সেই ক্ষোভটাই আমার মধ্যে আজ আবার সচেতন হয়ে উঠেছে। আমি তাই আজকের এই বাণীর আসরে সাহিত্যিক-প্রশ্নের আকারে সেই কথাটাই উত্থাপন করতে এসেছি।

সাহিত্য-বিচারে নারী-পুরুষ-ভেদটা আমাদের দেশের সমালোচকদের মধ্যে খুব বেশী রকম প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই চোখে পড়ে, কেউ না কেউ লিখছেন,—"অমুক মহিলাটির রচনা মন্দ নয়, মেয়েছেলের লেখা হিসাবে বেশ ভালোই বলতে হবে—" ইত্যাদি। সাহিত্য-বিচারে মেয়েদের জন্য এই যে একটা আলাদা রকম মাপকাঠীর বিশেষ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয়, এটা মহিলা-সাহিত্যিকদের পক্ষে যতখানি অমর্য্যাদাকর, তার চেয়েও ঢের বেশী অমর্য্যাদাকর সেই সমালোচকদের পক্ষে; কারণ, সাহিত্য-বিচারে সমালোচকের দায়িত্ব গুরুতর। তাঁকে শুধু সম্যক্ আলোচনাই নয়, সম-আলোচনাও করতে হবে।

পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিক সুসাহিত্যিক পাওয়া হয়তো তত দুর্লভ নয়, যত দুর্লভ একজন খাঁটী রসগ্রাহী সত্যনিষ্ঠ নিপুণ সুসমালোচক। আমার মনে হয়, প্রত্যেক সমালোচকের প্রধানতঃ দৃষ্টি থাকা উচিত লেখকের মূল সৃষ্টির দিকে। প্রকৃত-সমালোচকেরা লক্ষ্য রাখুন আলোচ্য সাহিত্যের রূপ, রস, প্রাণ, লেখকের সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য ও সেই সঙ্গে

* ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সারস্বত সম্মিলন সভায় পঠিত।

তার বহিরঙ্গরাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষত্ব ও গুণাবলীর দিকে। রচনা-মাধুর্য্য, প্রকাশভঙ্গীর রমণীয়তা ও দীপ্তি, ভাবাভিব্যক্তির নৈপুণ্য, তার আবেদন, ব্যঞ্জনা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা যত ইচ্ছা গবেষণা করুন,—কিন্তু, লেখক বা লেখিকা পুরুষ কিম্বা নারী, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, সামাজিক-প্রতিপত্তি, সাংসারিক অবস্থা, জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সন্ধান রাখা বোধ করি উপযুক্ত সমালোচকের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কবির জীবনী লিখতে বসবেন যিনি, তিনি হয়তো সে সব খবর রাখতে পারেন; কিন্তু যিনি তাঁর কাব্য-সমালোচনা ক'রতে বসবেন, তিনি শুধু কবির রসসৃষ্টির বিশ্লেষণ করুন; তাঁর কাব্য-লক্ষ্মীর মন্দিরাভ্যন্তরের পূজারতি ও ভোগার্চ্চনের দোষ গুণ বিচার করুন; পূজারীর শয়নকক্ষের সংবাদ জানবার তাঁর কোনও বিশেষ আবশ্যক আছে বলে মনে করি না।

নরনারীর Sex-difference বাস্তব জগতে জীবনের ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই না মেনে উপায় নেই;—কিন্তু, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাব্য-জগতে বোধ হয় এই পুরুষ-নারী ভেদটা বিশেষ ভাবে স্বীকার্য্য নয়; কারণ, সাহিত্য-স্রষ্টা যিনি, কবি যিনি—তিনি কখনও কোনও বিশেষ Sexএর গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি তাঁর Sexএর সীমাকে অতিক্রম করেই তবে কবি বা স্রষ্টা হ'তে পারেন। আমাদের দেশে 'কবি' শব্দটি উভলিঙ্গবাচক। ইংরাজীতে Poet এবং Poetess আখ্যা আছে, কিন্তু এদেশে মহিলা ও পুরুষ উভয়েই 'কবি' পদবাচ্যের সম-অধিকারী।

ফরাসী মহিলা-সাহিত্যিক শ্রীমতী (Aurore Dudevant) 'অ্যরোর দ্যুদেভান্ত্' (George Sand) 'জর্জ্জ সাঁদ্' এই পুরুষের ছদ্মনাম নিয়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন; সেদিন (Saint Beuve) 'সেণ্ট ব্যভে'র মতো প্রসিদ্ধ সমালোচকও তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে নারী বলে ধরতে পারেননি। তিনি সেই তরুণ লেখক George Sand এরই রচনা-শক্তির প্রশংসা করে' বলে'ছিলেন "This author had struck a new and original vein and was destined to go far." কিন্তু তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ইংরাজ মহিলা শ্রীমতী J. W. Cross যেদিন 'জর্জ্জ্ এলিয়ট্' (George Eliot) পুরুষের ছদ্ম সংজ্ঞায় সাহিত্যের আসরে নামলেন, Caro, Jules Lemaitre Faguet প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকেরা সেদিন আগে হ'তেই তাঁর পরিচয় জানতে পেরে সমালোচনায় লিখলেন—"A woman's idea of morals and ethics and religious faith dominates all her works." তাঁর রচনার সমালোচনা রচয়িতার নারীত্ব ভুলে নিরপেক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে নি। তাঁরা আরও বলেছিলেন—"It seemed that she had said her whole say and that nothing but replicas could follow." কিন্তু জর্জ্জ্ এলিয়ট্ তাঁদের এ মন্তব্য তাঁর পরবর্ত্তী রচনাগুলি দ্বারা মিথ্যা সপ্রমাণ করেছিলেন।

এখানে আমার মনে আছে, কিছুদিন আগে ভাগলপুরের শ্রীমতী আশালতা দেবীর প্রবন্ধ-রচনা পড়ে' অনেক সমালোচকই সে রচনাগুলি পুরুষের লিখিত বলে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ ক'রতে দ্বিধা করেন নি। নারীর লেখনী এমন কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারে, বা নারীর চিন্তাশীলতা, যুক্তিশীলতা এত গভীর হ'তে পারে, এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু যে সকল পুরুষ নিঃসঙ্কোচে নারীর ছদ্মনাম নিয়ে একাধিক রচনা মাসিক-পত্রে প্রকাশ করেন, অধিকাংশ সমালোচকেরা তাঁদের সে অপকীর্ত্তি ধরতে পারেন না। তাই বলি যে, ভিতরে কিছু substance এবং অচলা sincerity, honesty of purpose and straight forwordness না থাকলেও কেউ কেউ হয়তো তথাকথিত কবি বা সাহিত্যিক হ'য়ে উঠতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সমালোচক হ'বার দুরাশা যেন তাঁরা না করেন; কারণ, সুসমালোচক হ'তে হ'লে ওই গুণগুলির অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন,—ইংরাজীতে যাকে বলে একেবারে imperatively necessary.

'মেয়ে' নামধেয় জীবগুলির প্রতি, কি সংসারে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, এমন কি এই সাহিত্যি-ক্ষেত্রেও, হয় কঠিন বিধি-নিষেধের কঠোর শাসন, নচেৎ সানুগ্রহ করুণা ও সদয় কৃপা এই দু'টির একটি ব্যবস্থা দেখতে পাই। মানুষের সহজ দৃষ্টিতে এবং মানুষ হিসাবে তার ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান নারীজাতি আজও পান্‌নি। সেই যে Ladies championদের যুগ থেকে পুরুষদের Chivalrous spirit,—'Ladies honour first' বা 'For Ladies

only' বলে' সমাজে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনুগ্রহ বা কৃত্রিম আদবকায়দার ব্যবস্থা করেছিল,—তারই ভূত আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও মেয়েদের রচনা আলোচনা সম্পর্কে, দুর্ব্বল সমালোচকদের স্কন্ধে এসে চেপেছে। এই সকল সমালোচকরা বুঝতে পারেন না যে, পুরুষের সেই করুণার দানে, তাঁদের কৃপা-প্রদত্ত সেই কৃত্রিম-সম্মানে নারীর মানমর্য্যাদার চেয়ে লজ্জা ও অপমানই বেশী। পুরুষরা যখন বিশেষ ভাবে 'এটি মেয়েদের লেখা' বলে একটা ভিন্ন মাপকাঠিতে কাব্য বা সাহিত্যের বিচার ক'রতে প্রবৃত্ত হ'ন, তখনই তাঁরা সমালোচকের আসনে বসবার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করেন না কি?

নারী-জীবনের অভিজ্ঞতা ও নারী-হৃদয়ের অনুভূতির বৈশিষ্ট্যই যদি কোনও মহিলার রচনার মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, তবে সাহিত্যের সাধারণ মাপকাঠিতে সে রচনা পুরুষের রচনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমান আসন ও সমান মর্য্যাদা দাবী ক'রতে পারবে না কেন? অপর পক্ষে যদি কোনও মহিলার রচনা একেবারে পুরুষালীও হয়, সে রচনাও সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে উৎকৃষ্ট হ'লে তার স্রষ্টা বা রচয়িতা পুরুষ নয় নারী, এই অপরাধে তা' ব্যর্থ বা বাতিল হবে কিসের জন্ত? 'বধূ' কবিতা রচনা করে' রবীন্দ্রনাথ, কিম্বা 'বিন্দুর ছেলে' গল্প লিখে শরৎচন্দ্র নারীর অন্তর ও চরিত্রের যে বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে পুরুষ বলে' তাঁদের সে রচনা তো এ পর্য্যন্ত insincerityর অখ্যাতি লাভ করেনি কোনও সমালোচকের কাছে; তবে নারীর রচনা-আলোচনা সম্পর্কে সে কথা উত্থাপন করেন কেন এদেশের একাধিক সমালোচকেরা,—আমি তা বুঝতে পারিনে।

সাহিত্য-বিচারে পুরুষ-নারী-ভেদ না রেখে সমান উদার ও সাধারণ দৃষ্টিতে উভয়ের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করে' সত্যনিষ্ঠ রসবিদ্‌ সমালোচক যদি নিছক নিন্দা ও ব্যর্থতার রায়ই উচ্চারণ করেন, সে নিন্দা ও ব্যর্থতার অপযশও মহিলা-সাহিত্যিকদের পক্ষে ঢের বেশী গৌরবের, তবু ঐ ভেদবুদ্ধি ও কৃপাদৃষ্টি-সঞ্জাত, কৃত্রিম-সম্মান-জ্ঞান-পরবশ স্তোক স্তুতি এবং প্রশংসা-লাভ নারীর পক্ষে এতটুকুও সম্মানের নয়।

জীবনের ক্ষেত্রে না হোক্‌, অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রেও কি এদেশের মেয়েরা সমালোচকদের কাছে মানুষের সহজ ও সাধারণ অধিকার দাবী ক'রতে পারেন না? এখানেও কি এ সাম্য ও মৈত্রীটুকু সম্ভব নয়?

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্‌ ও আমেরিকান সাহিত্য

মিঃ সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্‌ নোবেল প্রাইজ গ্রহণ উপলক্ষে সুইডেনের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান আমেরিকান্‌ সাহিত্য ও চিন্তাধারার একটা অতি সুস্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডলার-শাসিত মার্কিন-সভ্যতার এক কোণে যে কয়েকজন সাহিত্যিক ডলারের অনুশাসনকে অবজ্ঞা করিয়া সেই স্বর্ণ-পুরীতে হৃদয়-বস্তুর অন্বেষণে বাণী-সাধনায় নিমগ্ন আছেন, মিঃ লুইস্‌ সাহিত্যের বিশ্ব-সভায় দাঁড়াইয়া সেই অবজ্ঞাত সাহিত্যিকদের পুরোধা রূপেই এই জয়মাল্য গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ লুইসের বক্তৃতা পাঠে মনে হয়, তাঁহার এই সম্মান লাভে আমেরিকা সম্মানিত হয় নাই; আমেরিকা যাহাদের বাণী-সাধনাকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিত, অনাগত মার্কিণ সভ্যতার সেই কয়েকজন প্রভাত-চারণই ইহাতে সম্মানিত হইয়াছেন। সেই জন্ত যখন মিঃ লুইসের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির কথা আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

বিখ্যাত পরিচালক বলিয়াছিলেন, "এই ব্যাপারে আমেরিকা অপমানিত হইয়াছে!"

যেদিন হইতে মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস্ লেখনী ধারণ করেন, সেইদিন হইতে আজ দেশের বাহিরে এইরূপ বিশ্বজয়ী সম্মান-লাভ পর্য্যন্ত, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট হইতে যে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সহযাত্রীদেরও যে তিরস্কার সহ্য করিয়া আসিতে হইয়াছে, মিঃ লুইস্ নোবেল-প্রাইজ গ্রহণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সেই সমস্ত সঞ্চিত গ্লানি ও অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমেরিকান্ সভ্যতার বিরাট প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে যে ভয়াবহ ভাবদৈন্য আজ যুগ-বিস্ময় এই জাতির অতি-মানব শক্তিকে আত্মবঞ্চিতই করিয়া চলিয়াছে, তাহা এই বক্তৃতায় যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় এত অল্প পরিসরে কখনও আর তাহা সম্ভব হয় নাই। সুইডেনে সমাগত সেই সুধি-মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার সময় মিঃ লুইস্ প্রথমে একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। সম্মুখেই তাঁহার বসিয়াছিলেন, স্কাণ্ডিনেভিয়া সাহিত্যের পিতামহী সেলমা লেগারলফ। যখন নোবেল প্রাইজ কমিটীর ডাঃ কার্লফেল্ড তাঁহাকে সভাসমক্ষে পরিচিত করাইয়া দিতেছিলেন, তখন ভারত-গৌরব ডাঃ রমণের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইতে উভয়েই মস্তক সঞ্চালনে উভয়কে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

পরিচয়-অন্তে মিঃ লুইস্ তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন,

"সাহিত্যের জন্য এই নোবেল প্রাইজ পাইয়া আমি যে কতদূর আনন্দিত ও কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে এত দীর্ঘ হইয়া যাইবে যে, তাহাতে আপনারা শ্রুতি পীড়া অনুভব করিতে পারেন, —তাই অনুমতি করুন এইটুকু করপুট-আশ্রিত ধন্যবাদ-জ্ঞাপনেই আমার অন্তরের সমগ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই উপলক্ষে বর্ত্তমান আমেরিকান্ সাহিত্যের ধারা, তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার বিষয় আপনাদের নিকট কিছু বলিতে চাই। এই সম্বন্ধে নিরঙ্কুশভাবে আলোচনা করিতে হইলে আমাকে হয় ত আমার স্বদেশের বহু পূজ্য প্রতিষ্ঠান ও বহু মাননীয় ব্যক্তির প্রতি ঈষৎ কঠোর হইতে হইবে; কিন্তু আজ আপনাদের সম্মুখে এ সম্বন্ধে আত্মগোপন করিয়া আপনাদের অসম্মান করিতে চাই না। তাই অকপট চিত্তে অন্তরের কথা আজ খুলিয়া বলিব। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা যেন মনে না করেন যে, আমার "মনের ঝাল" মিটাইবার চেষ্টা করিতেছি। ভাগ্য কোনও দিন আমার প্রতি বিশেষ অকরুণ হয় নাই। জীবন-সংগ্রামে আমাকে কোনও কঠোর যুদ্ধ করিতে হয় নাই—দারিদ্র্যের অভিসম্পাৎ অপেক্ষা ভাগ্যের দানই বেশী পাইবার সুকৃতি ভোগ করিয়া আসিয়াছি।

যদিও মাঝে মাঝে স্বদেশবাসীর নিকট হইতে বেশ সবল আঘাত পাইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমার আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই; কারণ আমিও তাহাদের আঘাত করিতে কোনও ত্রুটী করি নাই এবং ইহা একান্ত স্বাভাবিকই যে আমাকেও তাহার প্রত্যুত্তরে আঘাত খাইতে হইয়াছে। যখন আমার "Elmer Gantry" প্রকাশিত হয়, তখন কালিফর্ণিয়ার একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক এই পুস্তক পাঠে এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়া যান যে, তিনি আমাকে "লিঞ্চ" করিবার জন্য একটী বিরাট জনতাকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন; মেইন প্রদেশের আর একজন ধর্ম্মযাজক আমাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখার কোনও ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা আছে কি না তাহার গবেষণায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। ইহাতে তত আঘাত লাগে নাই যত আঘাত লাগিয়াছিল আমারই বন্ধু ও সহকর্ম্মী, আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক—সংবাদপত্র-সেবীদের উক্তি! আমার বিরুদ্ধে তাঁহাদের একমাত্র অভিযোগ, আমেরিকান্ ইতর লোকদের কথায় যাহাকে বলে "I knew when cub" "ওকে তো দেখেছি সেদিনের ছেলে!" যেহেতু তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার দুর্ব্বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই হইল আমার সব অপরাধের অপরাধ।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার অভিযোগ করিবার কিছু নাই; কিন্তু আজ যেদেশে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও অর্থ-নীতি সময়ের গতিকেও আগাইয়া চলিয়াছে, যেখানে গৃহ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা একমাত্র প্রাণবন্ত শিল্প-কলা, সেদেশের সাহিত্য ও তাহার মাপকাটি সম্বন্ধে সবিশেষ অভিযোগ জানাইবার

জন্যই আজ আমার এই বক্তৃতা। এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতে চাই; কারণ, তাহার সঙ্গে আমিও যেরূপ সংযুক্ত, আপনাদের এই একাডেমীও সেইরূপ সংযুক্ত।

নিউইয়র্ক হইতে সুইডেনে আসিবার কয়েকদিন আগেকার ঘটনা। আমেরিকার একজন অতি জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথা বলিতেছি—তিনি যথাক্রমে ধর্ম্মযাজক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং রাজনীতি-ধুরন্ধর—আমেরিকার বিখ্যাত "একাডেমী অফ আর্টস্ এণ্ড লেটারস্"এর (সাহিত্য পরিষদের) একজন মাননীয় সদস্য, এবং আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহাকে নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি মৎস্য-শিকার সম্বন্ধে অতি মনোরম প্রবন্ধ রচনা দ্বারা আমেরিকান্ সুধি-সমাজে পরিচিত। ছিপের ফাৎনার দিকে নজর রাখিয়াই যাহাদের জীবনের অধিকাংশ আনন্দ-মুহূর্ত্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহারা এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িয়া কি অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা লাভ করে জানি না; তবে আমার মনে আছে, ছেলে-বেলায় আমি যখন এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়ি, তখন আমার মনে স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে, মাছ ধরিবার যদি কোনও প্রয়োজন বোধ তোমার মনে না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে মাছ ধরিবার একটা গভীর নৈতিক সার্থকতা স্পষ্টই প্রাণে ধরা দিবে।

এই বিজ্ঞপ্রবর আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদে প্রকাশ্য সভা করিয়া ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি এ ভাবে আমেরিকাকে গালাগালি দিয়াছে, তাহাকেই নোবেল প্রাইজ দিয়া নোবেল কমিটী আমেরিকাকে অপমানিত করিয়াছে। আমি জানি না এই উক্তির অন্তরালে তাঁহার অন্তরে কি ছিল; কিন্তু আমার মনে হয়, একজন ভূতপূর্ব্ব রাজনীতি-ধুরন্ধর হিসাবে হয় ত তিনি চাহিয়াছিলেন যে, অতঃপর আমেরিকান সাহিত্যের মর্য্যাদাকে রক্ষা করিবার জন্য ষ্টকহলমে আমেরিকান্ সৈন্য রাখা দরকার।

যিনি ডিভিনিটীর 'ডক্টর', যিনি সাহিত্যের 'ডক্টর', আরও কত কি বিষয়ে যিনি সবিশেষ উপাধিতে ভূষিত, আমার মনে হয়, তাঁহার মনোভাব অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় তাঁহার ভাবা উচিত ছিল, "যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে এই লোকটার বই আদৌ পছন্দ করি না; তবুও এই লেখকটীকে নোবেল প্রাইজ দিয়া সুইডিস একাডেমী একজন আমেরিকান্‌কেই সম্মানিত করিয়াছেন—এই ধারণায় যে, যে-আরণ্যক গোষ্ঠী-সভ্যতা কোনও আত্মসমালোচনার ধার ধারে না—আজ আমেরিকা তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে, আজ সে একান্ত শান্তভাবে আত্ম-সমালোচনা সম্ভোগ করিতে পারে।"

আমার বিবেচনায় তাঁহার ন্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির ইহা বোঝা উচিত ছিল, যে-স্কাণ্ডিনেভিয়া Ibsen ও Pontoppidanকে দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে, তাহার চিত্তে আমার "এ্যানার্কিজম্" কতটুকু লাগিতে পারে? আর আমার 'এ্যানার্কিজম্'এর সব চেয়ে ভয়াবহ উক্তি হইতেছে যে, আমেরিকা তাহার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও শক্তি লইয়া আজও সেই সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই যাহাতে মানব-অন্তরের গভীরতম ক্ষুধার অমৃত-আহার্য্য মিলে। আমার বিশ্বাস Strindberg কচিৎ কখনও স্কাণ্ডিনেভিয়ার জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে কাব্য-রচনা করিয়া থাকিবেন এবং হয় ত নৈশ ক্লাবকে ধন্য করিবার জন্য তিনি কখনও কলম ধরেন নাই; অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার, সুইডেন তাঁহার মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া আছে।

আমি যে এই সমালোচনার এতখানি আলোচনা করিলাম, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, সেই বিজ্ঞপ্রবরের উক্তির মধ্যে কোনও গুরুত্ব আছে। ইহা দ্বারা আমি শুধু ইহাই বুঝাইতে চাই যে, আমেরিকার শুধু পাঠকবর্গ নয়, লেখকগণও, যে-সাহিত্য শুধু আমেরিকান্ হইতে পারিল না, যাহা নির্ব্বিচারে আমেরিকার ত্রুটী-বিচ্যুতিকেও বড় করিয়া দেখাইতে পারিল না, তাহাকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন।

আমেরিকায় কোনও নভেল-লেখককে যদি জনপ্রিয় হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে লিখিতে হইবে আমেরিকান্‌রা আজও সবাই ভদ্র, সুন্দর, ধনী এবং সাধু; আমেরিকার প্রত্যেক নগর এবং উপনগরবাসীরা সারাদিন শুধু পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; সেই তাহাদের জীবনের ব্রত; আমেরিকান্ কুমারীরা যদিও একটু বন্য প্রকৃতির, তবুও তাহাদের মধ্যে এমন সহজাত গুণ

আছে যে, তাহারা আদর্শ জননী ও জায়ারূপে অবলীলাক্রমে আত্ম-পরিবর্ত্তন করিতে পারে; ভৌগোলিক দিক হইতে আমেরিকা শুধু নিউইয়র্কেই ভর্ত্তি এবং সেই নিউইয়র্কে যে সমস্ত ক্রোরপতিরা থাকেন, তাঁহাদের অন্তরে ১৮৭০ সালের বীরত্বের ও শৌর্য্যের বহ্নিশিখা সেই রকম তেজেই প্রজ্বলিত রহিয়াছে, দক্ষিণ দেশে তেমনি নিষ্পাপ মানুষের কুটীরে অম্লান চন্দ্রকিরণ মদির-মধুর ম্যাগনোলিয়ার গন্ধের সহিত মিশিয়া নিত্য আমেরিকানদের চিত্ত ধৌত করিয়া দিতেছে।

আপনারা সুইডেনে বসিয়া Theodore Dreiser, Willa Cather প্রমুখ যে সমস্ত লেখকের লেখার সহিত পরিচিত, আমেরিকায় তাঁহারা মোটেই জনপ্রিয় নন্। মহামহিম আমেরিকার সাহিত্য-পরিষদের মতে আমাদের মাসিক-পত্রিকার সেই সমস্ত লেখকই প্রশংসনীয় ও ধন্য যাঁহারা দ্বিধাহীন কণ্ঠে গাহিতে পারেন যে ৪০লক্ষ লোক লইয়া আমেরিকা যেমন গ্রাম্য-সভ্যতার জীবন যাপন করিত, আজ তাহার ত্রিশগুণ বেশী লোক লইয়া আমেরিকা ঠিক তেমনি উদার, সরল ও ভাবসুন্দর হইয়া আছে; ১৮৪০ সালে যেখানে পাঁচজন মজুর একটা কলে কাজ করিত, আজ যদিও সেখানে দশ হাজার লোক একসঙ্গে কাজ করিতেছে, তবুও বলিতে হইবে যে মনিব ও শ্রমিকের মধ্যে সম্বন্ধ তেমনি আত্মীয়তায় মধুর হইয়া আছে এবং কোথাও কোন জটিলতা নাই; ১৮৮০ সালের সেই স্বপ্ন-মধুর পাঁচটী ঘর-ওয়ালা কুটীর-প্রাঙ্গণে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে যে অন্তরের আত্মীয়তা ছিল, বলিতে হইবে যে আজ চল্লিশতলা বাড়ীর একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে, যেখানে নীচে সংসারের প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটী বিভিন্ন মোটর দাঁড়াইয়া এবং যেখানে সামনের সপ্তাহেই একটা ডাইভোর্স মামলা আদালতে উঠিবে, সেখানে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে সম্বন্ধ ঠিক আগেকার মতই মধুর আছে; অর্থাৎ বলিতে হইবে যে সামান্য গ্রাম্য উপনিবেশ হইতে আজ আমেরিকা যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তরের সেই পিউরিটানিক পবিত্রতা ও সরলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমেরিকার সাহিত্য-পরিষদের মৎস্য-শিকারী পণ্ডিত প্রবর আমাকে এইভাবে নিন্দিত করিয়া সত্যই আমার সুবিধাই করিয়া দিয়াছেন; কারণ, তিনি যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে আমার সমালোচনা করিয়াছেন, তিনি যে বৃহৎ পরিষদের সভ্য, তাহারও সেইরূপ সমালোচনা করিবার অধিকার সেই-সঙ্গে আমাকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমেরিকার বর্ত্তমান চিন্তাধারার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে এই অদ্ভুত সাহিত্য-পরিষদটীর বিষয়ও আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আটলান্টিক সাগর পার হইয়া আসিবার সময়, অলস অবসন্নতার মধ্যে আমার মনে যে একটী বিচিত্র চিত্র ফুটিয়াছিল, তাহা এখানে বলিতে চাই।

আপনারা যখন টমাস ম্যানকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছিলেন (আমার মনে হয় তাঁহার Zauberberg চিন্তা-সমৃদ্ধ য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান), কিংবা যখন কিপলিংকেই এই পুরস্কার দিয়াছিলেন, (কিপলিংএর সামাজিক মর্য্যাদা এত গভীর যে লোকে বলে যে কিপলিংই বৃটীশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন) অথবা যখন বার্ণাড শ'কেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন আমার মনে হয় যে, এই সমস্ত সাহিত্যিকের স্বদেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই হয় ত ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসী অন্য কাহাকেও দেওয়া হইল না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। এবং সেই সঙ্গে আমার মনে হইল যে, আপনারা আমাকে সম্মানিত না করিয়া আমার স্বদেশবাসী অন্য কোনও লেখককে সম্মানিত করিলেও এই প্রতিবাদই শুনিতেন।

ধরুন, আপনারা যদি Theodore Dreiserকে এই পুরস্কার দিতেন। আমেরিকান্ সাহিত্যে ড্রেসার আজ যে-পথে চলিয়াছেন, সেখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে বোঝে না, সমালোচকেরা প্রায়ই সেই জন্য তাঁহাকে কলম লইয়া চারি দিক হইতে আক্রমণ করে। কিন্তু ড্রেসার' আজ আমেরিকার উপন্যাসকে ভিক্টোরিয়া-যুগের ধার-করা নারী-সুলভ ভীরুতা ও লোক-দেখান ভব্যতার হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বলিষ্ঠ, অকুণ্ঠ এবং জীবন-রসে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার এই প্রথম আত্ম বলিদানের ফলেই আজ আমরা জেলে না গিয়াই আমেরিকায় বসিয়া আনন্দ-আশঙ্কায়-ভরা জীবনের গান গাহিতে সমর্থ

হইয়াছি। আলোক-বাহী আমার সহযাত্রী Sherwood Andersonএরও এই মত। Dreiserএর প্রথম উপন্যাস "Sister Oarrie" ত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং আমি প্রথম তাহা পড়ি পঁচিশ বছর আগে। গৃহ-শৃঙ্খলিত আমেরিকার বায়ুহীন প্রস্তরের বন্দী শালায় ড্রেসারের এই প্রথম উপন্যাস সহসা বাধাবন্ধহীন পশ্চিমা বাতাসের প্রাণময় তরঙ্গ লইয়া আসিল—হুইটম্যান ও মার্কটোইনের পর এই প্রথম প্রকৃতির স্পর্শ আবার আমেরিকার প্রস্তর-চিত্তে আসিয়া লাগিল।

অথচ আপনারা যদি ড্রেসারকেই এই পুরস্কার দিতেন তাহা হইলেও আটলাণ্টিক সাগরের ওপার হইতে অসন্তুষ্টির এমনি উচ্ছ্বাস শুনিতে পাইতেন। শুনিতে পাইতেন যে, তাঁহার ষ্টাইল তেমন সুবিধার নয়, তাঁহার শব্দ-সম্পদ্ অদ্ভুত, তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীরা অনেকে পাপী, অনেকে দুঃখদীর্ণ, অনেকে অসন্তুষ্ট, তাহারা আসল আমেরিকান্‌দের মত সাধু, সুন্দর ও সুখ-ঐশ্বর্য্যশালী নয়!

(আগামী বারে সমাপ্য)

দখিনার গান

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হর্ষ-ভরা স্পর্শে আমি
কিশলয়ের দ'ল
ফর্ ফর্ ফর্ নাচন-তালে
হাসাই যে খল্ খল্।

দিয়ে হাজার পাতার তুড়ী
দোদুল্ দোলাই ফুলের কুঁড়ী;
নদীর বুকে শিহর তুলি
করি যে টলমল্।

ফুর ফুর ফুর ফিরি ঘুরি,
ঝুর ঝুর ঝুর ফুলের ঝুরি
ঝরিয়ে যাই বকুল-বনের
ছায়ায় অবিরল।

ঘোম্‌টা খুলে চাঁপা-বেলার,
চুম্ দিয়ে যাই দিন শতবার;
ঘুম্ ভেঙে দিই মাতাল অলির
করি নানান্ ছল।

নিদাঘ-জ্বালায় বধূ যখন
খসিয়ে ফেলে দেহের বসন,
রঙ্গে তাহার অঙ্গে বুলাই
পরশ সুশীতল।

ঝরা ফুলের করুণ কাঁদন
ব্যথায় মেদুর ক'রলে গগন,
তখন আমি বিদায় নে'বো
বেদন-বিহ্বল।

দেবতার দান

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

রামচরণ জাতে মুচী। বলাগড় স্কুলের বাঁ-দিকের বাগানের মধ্যে মস্ত বড় একটা বাঁশঝাড়ের নীচে, সদর-রাস্তার ওপর তার জুতোর দোকান। ও-তল্লাটে তার মতন জুতো না কি কেউ তৈরী করতে পারে না—নামডাক তার খুব। তার বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি কি সত্তর-পঁচাত্তর, তা ঠিক ক'রে বলা বড় কঠিন; অনেকেই তাকে এক ভাবেই অনেক দিন থেকে দেখছে।

বার্দ্ধক্য এসে তাকে আশ্রয় করলেও, তার শরীর যে এক কালে বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় পেশীযুক্ত ছিল, তা এখনও বেশ বোঝা যায়। বার্দ্ধক্যের কবলে প'ড়ে যেমন তার শরীর অক্ষম হ'য়ে পড়েছে, তেমনি কালের কবলে প'ড়েও তার অনেক কিছু হারিয়েছে। তার আগের দিকের জীবনের ইতিহাসটা এই রকম—

রামচরণের বাপ এবং মা দুজনেই রামচরণের ছেলেবেলাতেই মারা যায়। মুচীর ঘরের প্রথা-অনুযায়ী রামচরণের অল্প বয়সেই বিয়ে হয়। তখন তার বাপ-মা দুজনেই বেঁচে। রামচরণের বাপের অবস্থা খুব যে ভাল ছিল তা নয়। দিন-রোজগারের পাওনা পয়সায় দিন চলতো। কারিগর হিসেবে তার নাম-ডাক পসার-প্রতিপত্তি অবশ্য খুবই ছিল। কিন্তু যতখানি পসার ছিল ততখানি পয়সা ছিল না। কাজেই রামচরণের বাপ-মা যখন মারা গেল, তখন রামচরণ উত্তরাধিকারী হ'লো শুধু বাপের সুনামের—পয়সার উত্তরাধিকারিত্ব সে পেলে না। তবে সুনামের সঙ্গে, পয়সা না পেলেও, আরও এমন কয়েকটি জিনিষ সে পেলে, যাতে নির্ভাবনার চেয়ে তার ভাবনাটাই খুব বড় হ'লো। তার একটি হচ্ছে ঋণ, আর অন্যটি হচ্ছে বালিকা স্ত্রী। এই দুটি নিয়েই সে বেশ একটু মুস্কিলে পড়লো।

রামচরণের বাপ-মা যখন মারা যায়, তখন রামচরণের বয়স এত বেশী ছিল না যে, সে বেশ হাসিমুখে এই দু'টো পিতৃ-দত্ত গুরু ভার কাঁধের ওপর বয়। সাধারণ ছেলেরা হয় তো এ বয়সে খেলা করেই কাটায়; কিন্তু গরীবের ঘরের ছেলে ব'লে অল্প বয়সেই ভাবনার বোঝা কাঁধে চেপে পড়ে কি না, তাই রামচরণকেও অল্প বয়সেই বাপের সামনে ব'সে জুতো সেলাই শিখতে হলো। রামচরণ ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ছিল। সেলাইয়ের কাজ অল্প বয়সেই সে বেশ শিখে ফেললে। রামচরণের বাপ ছেলের বুদ্ধি-প্রাচুর্য্য দেখে তাকে বলাগড় স্কুলের নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলে। রামচরণ বাপের কাছে জুতো সেলাই আর স্কুলে লেখাপড়া শিখতে লাগলো। দু'য়েতেই সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগলো। রামচরণের বাপ অলক্ষ্যে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললে। কিন্তু বেশীদিন এ ভাবে চললো না—রামচরণের বাপ-মা তাকে অকৃতী অবস্থাতেই ফেলে স'রে পড়লো।

রামচরণ একটু ভাবনায় পড়লো। কিন্তু সময় সকল সমস্যার সমাধান ক'রে কি না, তাই রামচরণেরও দিন কোন রকম ক'রে কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু এই কোন রকম ক'রে কাটাটা সে যেমন মনে-প্রাণে অনুভব করতে লাগলো, এমন বোধ করি আর কেউ ই নয়। পাড়াগাঁয়ে ক' জোড়া জুতোরই বা ফরমাস্ মেলে! এই সামান্য আয়ে কোন রকমে কায়ক্লেশে সে দিন গুজরান করতে লাগলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে জুতো সেলাই করে, আর সন্ধ্যাবেলা একটু লেখাপড়া করে। ছেলেবেলা থেকেই রামচরণ একটু ধার্ম্মিক গোছের। অনেক কষ্টে সে একখানি ক'রে বটতলার সস্তা সংস্করণের রামায়ণ আর মহাভারত কিনেছিল। সে দুখানি ছিল তার কাছে অমূল্য সম্পদ। সন্ধ্যাবেলা সে রামায়ণ বইখানি নিয়ে পড়তে বসতো। বইখানির প্রতি যত্ন ছিল তার অসীম। কার-কাছ-থেকে-চেয়ে-আনা একখানি খবরের কাগজে সে রামায়ণখানির মলাট দিয়ে বইখানিকে মলিনতার হাত

থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পড়া হ'য়ে গেলে সে সেখানিকে যত্নে ঝেড়ে-পুঁছে, তার সাবেকি আমকাঠের ভাঙা বাক্সটার মধ্যে যত্নে তুলে রাখতো। বইখানি ছিল তার প্রাণ। রামচরণ দুঃখ-কষ্টকে ভগবানের দান বলেই গ্রহণ করেছিল হাসিমুখে।

এটা কিন্তু পারে নি রামচরণের স্ত্রী রাই। ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ-ধাক্কার সঙ্গে ঠিক বনিবনাও ক'রে নিতে পারে নি সে; আর সেই জন্যে তার মেজাজ হয়েছিল রুক্ষ, ঝাঁজালো—ঠিক রামচরণের উল্টো। রামচরণ স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসতো, আর সেটা আন্তরিক। তার স্ত্রীও যে তাকে কম ভালবাসতো তা নয়; তবে দুঃখ-দারিদ্র্যের চাপে তার মনের বহিরাবরণ ছিল রুক্ষ। রামচরণের দ্বারে কোন অতিথি এলে সে বিমুখ হতো না। তার কষ্টার্জ্জিত অর্থে যতদূর সম্ভব সে অতিথিকে তৃপ্ত করতো। এগুলোও ঠিক রাইয়ের মনের মত হোত না। একে নিজেদের সংসারই অচল; তার ওপর আবার এই দয়া-দাক্ষিণ্য। এটা রাই মোটেই বরদাস্ত করতে পারতো না; রামচরণের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিত। রামচরণ বোঝাতো—ওরে, ও রকম করিস্ নে। দান যতই করবি ততই ভগবান দেবেন। শিবি রাজা সর্ব্বস্ব দান ক'রে অনেক পুণ্যি করেছিল, আর আমরা তো সামান্য মনিষ্যি।

রাই ঝঙ্কার দিয়ে বলতো—রেখে দাও তোমার দান। সে ছিল তখনকার দিনের কথা। এখন পুণ্যি করলে একটা কাণাকড়িও ভগবান দেন না। উল্টে দেন দারিদ্দির।

রামচরণ রাইয়ের মুখ চেপে ধ'রে বলে—ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই রে। তিনি দিচ্ছেন, তবেই না আমরা যা হোক দু'টো খেতে পাচ্ছি।

রাই মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলতো—ছাই দিচ্ছেন তিনি। তাঁর বিচার থাকলে কি আর সে শুকিয়েই মরে, আর যার আছে সে খেয়ে ভুঁড়ি ফোলায়। ব'লে মুখ ভার ক'রে চলে যেতো। রামচরণ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো।

রামচরণ যতই দয়া-দাক্ষিণ্যে লোকের প্রতি সহানুভূতি দেখাত, রাই ততই রামচরণের প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠতো। রাই ভাবতো, ভাল রে ভাল, আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে, এ হয়েছে তাই—ঘরে নিজে কি খাবে তার ঠিক নেই, আবার দয়া। আর রামচরণ ভাবতো, তার তো যা হোক কিছু আছে, সে তো দু'বেলা দুটো খেতে পাচ্ছে; কিন্তু যারা পরের দোরে হাত পাতার লজ্জাকে বরণ করে, তারা শুধু নিজেদের কোন কিছু সংস্থান নেই বলেই তো করে; সেই জন্যেই না তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এই নিয়েও তাদের দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে মন-কষাকষি হতো। রাই বলতো, তাদের নেই তো আমার কি। তারা খাটে না কেন? আমরা খেটে রোজগার করবো, আর কতকগুলো কুড়ে আমাদের কাছে হাত পেতে কষ্টে-খেটে-পাওয়া অর্থগুলো নিয়ে যাবে শুধু দুঃখের কান্না মুখে কেঁদে। রামচরণ বাধা দিয়ে বলতো—ওরে, তাদের খাটবার সুযোগ-সামর্থ্য যে নেই; তাই না তারা পরের দোরে হাত পাতে। পরের দোরে হাত পাতা যে কী লজ্জার, তা তারাই বোঝে যারা পাতে। সেই লজ্জাকে যখন তারা ডিঙিয়ে ভিক্ষে করে, তখন তারা সত্যিই দয়ার পাত্র। এ কথাগুলোও রাইয়ের পছন্দ হতো না।

এই দয়া-দাক্ষিণ্যের ঝগড়া যদিও তাদের মাঝে একটা ব্যবধান সৃজন ক'রে তুলছিল, তবুও কেউ কাউকে যে কম ভালবাসতো তা নয়। তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল শুধু এই দয়ার জায়গাটাতেই। রাইয়ের কাছে বাধা পেয়ে পেয়ে রামচরণের মন ক্রমশঃ বেশী ক'রে দয়ালু হ'য়ে উঠতে লাগলো, আর রাইও রামচরণের কাছে বাধা পেয়ে ক্রমশঃ রামচরণের বিরুদ্ধাচারিণী হ'য়ে উঠতে লাগলো। শেষকালে এমন হ'লো যে, রামচরণ রাইয়ের কাছে অনেক কিছুই গোপন করতে লাগলো, বিশেষ ক'রে তার দান।

মানুষের মন এমনি জিনিষ যে, যখন কিছু কাজ গোপনে করে, তখন তার সেই করার আকাঙ্ক্ষাটা বেড়ে যায়। প্রকাশ্যে কোন কাজ সমাধা করলে তত আকাঙ্ক্ষা থাকে না। রামচরণ যখন গোপনে দান আরম্ভ করলে, তখন তার দান করবার আগ্রহ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো; আর সেই জন্যে গোপন করার চেষ্টাকেও বেশী ক'রে সচেতন করতে হ'লো। প্রথম প্রথম এই গোপন দান রাই বুঝতে পারে নি। সে মনে করলে, বুঝি বা তার স্বামীর সুমতি হয়েছে, দান বন্ধ

হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই গোপন দান রাইয়ের চোখে ধরা প'ড়ে গেল। রাই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, এবং বেশী ক'রে স্বামীর ওপর নজর রাখ্‌তে লাগ্‌লো। রাইয়ের নজর যত প্রখর হ'তে লাগলো, রামচরণের গোপন দানও তত গোপনতর হ'তে লাগ্‌লো। দু'জনেরই কেমন জিদ্ চেপে গেল।

গোপন দানটা সেদিন ধরা পড়্‌লো এই রকমে—

বেলা তখন পড়ো-পড়ো। সন্ধ্যার আসন্ন ধূসরতা পৃথিবীর বুকের ওপর এগিয়ে আসছে। আকাশের গায়ে বলাকাশ্রেণী শুভ্র পথরেখা অঙ্কিত ক'রে উড়ে চলেছে কোন্ দিগন্ত-আবাসোদ্দেশে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত গরুর দল ধীর মন্থর গতিতে দড়ির জালিতে মুখ-বাঁধা অবস্থায় রোমন্থন কর্‌তে কর্‌তে মাঠ থেকে ঘরে ফির্‌ছে। বাঁশ-বাগানের মধ্যে অল্প অল্প ধোঁয়া জমে উঠেছে গৃহস্থের ঘরের আগুন থেকে।

রাই ঘাটে গা ধুতে গিয়েছিল। রামচরণ দাওয়ায় ব'সে তখনও রামায়ণখানা পড়্‌ছিল। ঠিক এমনি সময় একজন পশ্চিমে সাধু তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সে আবেদন জানালে যে সে শীতার্ত্ত। রামচরণ কি কর্‌বে ভেবে পেলে না। তার দয়ালু মন সাধুর প্রার্থনায় কাতর হ'য়ে উঠ্‌লো। খানিক পরে মন স্থির ক'রে সে নিজের গায়ের কাপড়খানা সাধুকে দিলে। সাধু প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল। রামচরণের মন দানের খুশীতে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু এই খুশী বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না। রাইয়ের কথা মনে পড়্‌তেই সব খুশী ম্লান হ'য়ে গেল। রাইয়ের কাছে এ কথা তো গোপন থাকবে না বেশী দিন। এই গায়ের কাপড়খানা যে সেদিন মাত্র কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে ধারে কেনা হয়েছে,—এখনও যে দেনা শোধ হয় নি। একটু ভাবনায় পড়্‌লো রামচরণ। রাই তো বুঝবে না তার মনের কথা। সে ক্রমাগত রাইয়ের দুর্ভাবনাকে চাপা দিতে লাগ্‌লো দানের খুশী দিয়ে। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ চেষ্টা হ'তে লাগ্‌লো। রাইয়ের ভয় তার সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে খোলা রামায়ণ কোলের ওপর নিয়ে স্থাণুর মত ব'সে রইলো। ভাবনা-ভরা চিত্ত তাকে রামায়ণ পড়া হতেও বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে।

কথায় বলে,'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।' রামচরণেরও হ'লো তাই। তার এই গায়ের কাপড় দানের ব্যাপারটা যে এত চট ক'রে ধরা পড়ে যাবে, এ সে-বেচারা ধারণা কর্‌তেও পারে নি।

রাইয়ের ঘাট থেকে ফেরবার পথ দিয়েই সাধু চলেছিলেন রাইচরণের গায়ের কাপড়খানা গায়ে দিয়ে। পড়্‌বি তো পড় একেবারে রাইয়ের চোখের ওপর। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় সে প্রথমে ঠিক কর্‌তে পারে নি, এটা রামচরণের গায়ের কাপড়খানাই কি না। প্রথম ভাবলে একই রকম গায়ের কাপড়ও তো হ'তে পারে। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে কেমন সন্দেহ ফেনিয়ে উঠ্‌লো। সে ভাল ক'রে সন্দেহ মেটাবার জন্যে সাধুর পেছনে পেছনে খানিক দূর গেল। ভাল ক'রে দেখার পর তার আর কোন সন্দেহ রইল না—সে বেশ নিশ্চয় কর্‌লে যে, এখানা রামচরণেরই গায়ের কাপড়। মুখখানা ভার ক'রে সে ঘরে ফিরে এলো। তখন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। রাইয়ের ভেতর-বারও তেমনি অন্ধকার। রামচরণ অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল, আর ভাবছিল—না জানি কি অঘটন ঘটবে আজ বা কাল; কারণ, তার এই দানকে রাই কিছুতেই ক্ষমার চোখে দেখবে না। এটা অন্যের কাছে সামান্য দান হ'তে পারে; কিন্তু তাদের মত লোকের পক্ষে এ যে অবস্থার অতিরিক্ত দান। একেবারে বার টাকার গায়ের কাপড় দান—তার গায়ের রক্ত জল-করা টাকায় কেনা। এ কি রাই কোন মতে ক্ষমা কর্‌বে।

রাই বাড়ী ঢুকেই কোমর থেকে কলসীটা দাওয়ার ওপর দুম্ ক'রে নামিয়েই কোন ভূমিকা না ক'রেই ব'লে উঠ্‌লো—বলি গায়ের কাপড়খান যে ঐ হতভাগা খোট্টা মিন্সেকে দিয়ে দিলে, এখন নিজে কি গায়ে দেবে? কাবুলে-ওয়ালার দেনা যে এখনও শোধ হয় নি। আর পারি নে তোমায় নিয়ে। আমার মরণ হলেই বাঁচি। কথায় বলে আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে,—নিজের যে কোথা থেকে কি আসে তার ঠিক নেই, আবার ভাগীদার জোটানো। আর যত অলপ্পেয়ে কী এইখানেই মর্‌তে আসে গা। আমার হাড় ভাজা-ভাজা ক'রে তুল্‌লে।

রামচরণ কোন জবাব দিলে না আজ। দানটা সাধ্যাতিরিক্ত হয়েছে আজ সেও বুঝেছে; তাই কোন

কথা না ব'লে সে চুপ ক'রে রইলো। রাই গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে সেখান হ'তে চলে গেল। হাওয়ার সঙ্গে আর কতক্ষণ ঝগড়া চলে। কিন্তু রামচরণের নিস্তব্ধতা তার ক্রোধকে ভেতরে-ভেতরে আরো ধুঁইয়ে তুল্‌লো। সে গুম্ হ'য়ে রইলো।

সেই দিন থেকে রামচরণ সাধ্য-মত রাইয়ের সাম্‌নে আস্‌তো না, আর রাইও রামচরণের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিলে। দু'জনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বিচ্ছেদের পাঁচীল উঠে গেল।

কিছু দিন পরে রামচরণের একটি ছেলে হ'লো। রামচরণের আনন্দ দেখে কে। দরিদ্রের ঘরে সন্তান হওয়াটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় না হলেও, রামচরণ নব-জাতকে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বরণ ক'রে নিলে। মন আনন্দে ভরপুর হ'য়ে গেল। শিশু তো ভগবানের নব রূপ—তার ঘরে ভগবান অতিথি রূপে এসেছেন—একে কি অবহেলা করা চলে। শিশু রামচন্দ্র, শিশু কৃষ্ণ তো এই ভগবানেরই অংশ—স্বয়ং ভগবান। তার এই শিশুও তো ভগবানের দান—তাঁরই অংশ। এতবড় কথাটা মুচীর ঘরে, দরিদ্রের ঘরে একমাত্র রামচরণই বোধ হয় ভাব্‌তে পেরেছিল।

রামচরণ আর রাইয়ের মধ্যে যে বিরোধ জমে উঠেছিল, এই নবাগতের আগমনে তা দূর হয়ে গেল। রামচরণ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ কর্‌তে লাগ্‌লো; রাই ঘরের কাজে মন দিলে। রামচরণের দান এখনও কমে নি, তবে একটু সংযত হয়েছে, আর ভেবে দান করে মাত্র। রাই আর কোন কথা বলে না। ব'লে ব'লে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে—যা ক'রে করুক রামচরণ। রামচরণ কিন্তু রাইয়ের নিষেধের চেয়ে এই না-নিষেধকেই বেশী ভয় করে। নিষেধটা বাইরের জিনিষ, বোঝা যায়; আর না-নিষেধ ভেতরের জিনিষ, বোঝা যায় না। অবুঝ জিনিষকেই ভয় বেশী। তাই রামচরণ সংযত-দানী হয়েছে।

যে-টুকু মনের মিল এবং সুখ তারা জমিয়ে তুল্‌ছিল, সেটুকু বোধ করি ভগবানের সহ্য হ'লো না। প্রথমেই তিনি সরিয়ে নিলেন তাদের নবজাত শিশুকে—যাকে আশ্রয় ক'রে তাদের বিচ্ছেদের ঝড় কেটে গিয়েছিল। রাই খুবই ব্যাকুল হ'য়ে পড়্‌লো; রামচরণও যে কম শোকাকুল হ'লো তা নয়; তবে সে না কি ভগবানের ওপর অতি বিশ্বাসী, তাই এই বিচ্ছেদকেও তাঁরই বিচার বলেই গ্রহণ কর্‌লে। সে রামায়ণ মহাভারত নিয়ে বেশী ক'রে পড়্‌লো। বকরূপী ধর্ম্মের তত্ত্ব কথা প'ড়ে সে রাইকে শোনাতো। রাই কিন্তু এ-সব কথা বিশ্বাস কর্‌তো না। শিশুর শোক যত না রামচরণকে আঘাত করেছিল, রাইয়ের ভগবানকে অবিশ্বাস, এই ধর্ম্মের বাণীকে অবিশ্বাস, তার মনে খুব জোরেই আঘাত ক'রেছিল। সে কোন প্রতিবাদ না ক'রে নিজের মনে রামায়ণ মহাভারত পড়্‌তো। ধর্ম্মের আবরণের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও সময় সময় তার মনের মধ্যে একটা ব্যথা খচ্ খচ্ ক'রে উঠতো, সেটা শিশুর অভাবজনিত। নিজের অজ্ঞাতে মনে প্রশ্ন উঠ্‌তো, কেনই বা ভগবান দিলেন, আর কেনই বা নিলেন। তখনই আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তো—ভগবানের বিচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন!

তার পর রামচরণের জীবনে আরো পরীক্ষার সময় এলো যখন সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে রাই তাকে ছেড়ে গেল! এবার সে শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে পড়্‌লো। সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—ভগবান, এ কি বিচার তোমার প্রভু! কেন এত পরীক্ষা! কিন্তু তখনই সুদৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সে নিজেকে সংযত ক'রে নিলে। ভাবলে, ভগবান তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিয়ে তাকে তাঁর দিকে অগ্রসর হবার পথ মুক্ত ক'রে দিলেন। তিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়-বিচারক। রামচরণ বার বার ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম কর্‌লে, মন তার কতকটা শান্ত হ'লো।

এই গেল তার গত জীবনের ইতিহাস। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। রামচরণ বার্দ্ধক্যের শেষ সীমানায় প্রায় এসে পড়েছে। চোখে ভাল দেখ্‌তে পায় না; আর কাজ কর্ম্মও বড় করে না। যেটুকু না কর্‌লে নয় সেইটুকুই করে। শুধু তার সময় কাটে রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে। সকালে সন্ধ্যায় মোটা কাঁচের পরকলা দেওয়া চশমাটা সুতো দিয়ে কাণের সঙ্গে জড়িয়ে চোখের সামনে নাকের ওপর তুলে দিয়ে পড়ে। সাধু সন্ন্যাসীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস,—এখন সে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাওয়ার ওপর সে বসে থাকে এবং বই পড়ে।

সেদিন সবে-মাত্র সকাল-বেলায় স্নান ক'রে রামায়ণখানিকে প্রণাম ক'রে ভক্তি-ভরা চিত্তে রামচরণ পড়্‌তে বসেছে, এমন সময় একজন সাধু এসে তার উঠানে দাঁড়ালো এবং কোন ভূমিকা না ক'রে রামচরণকে বল্‌লে—তুমি বড় ভাগ্যবন্ত, ভগবান তোমায় দেখা দেবেন, তোমার কাছে আস্‌বেন।

রামচরণের কাণে এই কথাগুলো দৈববাণীর মত শোনালে। সে উঠে সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌লে এবং সাধ্য-মত দানে তুষ্ট কর্‌লে।

সাধুর কথাটা তার মনে দৃঢ়ভাবে ব'সে গেল। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত সে প্রতীক্ষায় থাকৃতো যে, ভগবান তাকে দেখা দেবেন—সাধুর কথা কি কখন মিথ্যা হয়। এমনি করেই সে দিনের পর দিন ভগবানের দর্শন-প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

মাঘ মাস। শীত খুবই পড়েছে—এমন শীত না কি অনেকে দেখে নি, এমন কি রামচরণও তার বয়সে এমন শীত অনুভব করে নি। তার ওপর সকাল থেকে টিপটিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে। শীত আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। ঘোর দুর্য্যোগ।

সন্ধ্যার পর রামচরণ ঘরে দোর দিয়ে রামায়ণ পড়্‌ছে। হঠাৎ তার মনে হ'লো কে যেন তার দোরে ধাক্কা দিচ্ছে; এবং ক্ষীণ কাতরাণীর শব্দ এলো সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে সে ভাবলে হাওয়ার শব্দ; কিন্তু আবার শব্দ হ'লো। রামচরণ দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে, একটি রমণী ক্ষীণ, মৃতপ্রায় হ'য়ে তার দোরগোড়ায় প'ড়ে আছে। রামচরণ এই শীতার্ত্ত রমণীকে বুকে ক'রে ঘরে নিয়ে এলো। হতভাগিনীর দুঃখে তার মন ভরে উঠ্‌লো। আগুন জেলে সে রমণীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হ'লো। রমণী আসন্ন প্রসবা। রামচরণ কি কর্‌বে কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না। কাউকে যে ডাক্‌বে এও পার্‌লে না। রমণীর তখন এমন অবস্থা যে, জীবন-মরণের সন্ধিস্থল—তাকে ছেড়ে যাওয়া চলে না। রামচরণ যথাসাধ্য সেবা কর্‌তে লাগলো।

ভোরের দিকে একটি সন্তান প্রসব করে রমণী পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়িয়ে চির-শান্তির আশ্রয়ে চলে গেল। রামচরণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইলো।

ভোরের দিকে দুর্য্যোগ কেটে সোনালী রোদ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত রামচরণের কুঁড়ের ভাঙা ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। নবজাত শিশু হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌তেই রামচরণের চমক ভাঙ্‌লো। সে শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করে আনন্দোৎফুল্ল মনে ব'লে উঠ্‌লো—প্রভু, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো। শিশুর মূর্ত্তিতে আমার ঘরে আমায় দেখা দিতে এসেছো—তুমি দয়াময়। এ তোমার আবার নব রূপে নিজেকে দান। রামচরণের মুখ স্বর্গীয় আভায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। *

* টলষ্টয় অবলম্বনে।

পুস্তক-পরিচয়

'বোধসার'—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মূল্য—চারি টাকা।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবিদ্যায় পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 'বোধসারে'র একটী সানুবাদ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রত্নপিটক গ্রন্থাবলী' নামে বারাণসী হইতে নানা গবেষণায় পরিপূর্ণ বেদান্ত-সাহিত্যের বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন। 'বোধসার', এই গ্রন্থমালার তৃতীয় রত্ন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবল আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করেন নাই,—মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকসমূহ যেরূপ প্রসাদ-গুণযুক্ত, তাহাতে অনুবাদক মূল শ্লোকের যে 'অন্বয়' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই 'শাব্দবোধ' হয়—গ্রন্থকার নরহরির সাক্ষাৎ শিষ্য দিবাকরের রচিত টীকার সারাংশ এবং তাঁহার অনুভবপ্রবণ হৃদয়ের সরসতা একত্র মিশ্রণ করিয়া বঙ্গভাষায় 'বোধসারে'র অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। অনুবাদক শাস্ত্রান্তর হইতেও অনেক আবশ্যক প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব সম্পাদনে যত্নপর হইয়াছেন, দেখা যায়।

'বোধসারে'র রচয়িতা নরহরি, কাশীবাসী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য দিবাকর, ১৭৩৮ শকাব্দে এই গ্রন্থের টীকা সমাপ্ত করেন। অনুবাদক, 'পরিচয়ে'র ।৵০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

"তিনি যে কোনও এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা গ্রন্থোপসংহারে ২য় সংখ্যক শ্লোক হইতে জানা যায়।"

শ্লোকটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম;—

"বুধজনহিতকারী সম্প্রদায়ানুসারী
পরমসুখনিধানং মোহমুক্তেনিদানম্।
নরহরিবিহিতোঽয়ং বোধবৃক্ষস্তু তোয়ং
কুমতি বন কুঠারঃ পঠ্যতাং বোধসারঃ॥" (১০১ পৃষ্ঠা)

এই শ্লোকের 'সম্প্রদায়ানুসারী' এই কথার দ্বারা নরহরি কোনও সন্ন্যাসি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এখানে 'সম্প্রদায়ানুসারী' এই বিশেষণের ইহাই তাৎপর্য্য যে, বোধসার গ্রন্থ, অদ্বৈতি-সম্প্রদায়ের অনুমত। ইহাতে গ্রন্থকার কোনও অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই। 'সম্প্রদায়' শব্দের দ্বারা সেই অর্থই সহজতঃ প্রতীত হয়। 'বেদান্তপরিভাষা'কার জহদজহল্লক্ষণার বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সম্মত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—'ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ'। পরে তিনি 'বয়ন্তু ক্রমঃ' এই ভাবে স্বীয় নবীন মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের আডভোকেট শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক, এই 'গ্রন্থাবলী'র প্রবর্ত্তক। তিনি যথার্থতঃ রত্নস্বরূপ এই সকল গ্রন্থের প্রচার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরম অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন। এজন্য তিনি আমাদের অসীম আশীর্ব্বাদের পাত্র। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিব না—তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া আমরাই ধন্য হইয়াছি।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

যাওয়া-আসা মোটরে—কাশ্মীর। শ্রীপ্রমথনাথ মালিয়া প্রণীত, মূল্য তিন টাকা। বর্দ্ধমান সিয়াড়শোলের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া কয়েকখানি মোটর-শকটে কর্ম্মচারী ও পরিজনবর্গ সহ কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই ভ্রমণ-কাহিনী এই সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা সাহেব নিষ্ঠাবান সারস্বত ব্রাহ্মণ; তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পথিপ্রান্তবর্ত্তী হোটেল প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া মোটরে অর্দ্ধ-ভারত অতিক্রম করিয়াছিলেন, ইহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি; কোন সাধারণ তীর্থযাত্রীর পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত। গ্রন্থকার বাঙ্গালী নহেন; সুদূর পাঞ্জাব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান; তথাপি তিনি এই গ্রন্থে বঙ্গভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল, ভাব-প্রকাশের ভঙ্গি সুন্দর এবং বর্ণনা হৃদয়স্পর্শী; ভ্রমণ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বহু বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ পথের এবং ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নানা নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে সেই সকল মনোহর দৃশ্য পাঠকের নয়ন-সমক্ষে যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। উপলমুক্ত নির্ঝরিণী-স্রোতের ন্যায় ভাষার অনাবিল প্রবাহে যেন ভাসিয়া যাইতে হয়। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানিতে বহু উৎকৃষ্ট চিত্র সংযুক্ত করায় ইহার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজা সাহেব বাঙ্গালী না হইয়াও বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা আশা করি, রাজা সাহেব এই শ্রেণীর একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যামোদী পাঠক সমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন তাঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে সন্দেহ নাই। চিত্রভূষিত পুস্তকখানির আকারের ও ছাপা কাগজ বাইণ্ডিং প্রভৃতির তুলনায় ইহার তিন টাকা মূল্য অধিক বলা যায় না।

সম্পাদক

নির্ব্বাসিতের নির্য্যাতন—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা বার আনা। পুস্তকখানির আকার বৃহৎ, উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটিরূপে ইহা মুদ্রিত। একজন ইংরাজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া রাজানুগ্রহে প্রাণ-ভিক্ষা পায় এবং তাহাকে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। এই গ্রন্থখানি তাহার নির্ব্বাসিত-জীবনের নির্য্যাতন-কাহিনী। ঘটনাটি যে সত্য, পুস্তকে তাহার প্রমাণের অভাব নাই, কিন্তু এরূপ বিস্ময়কর ঘটনাবৈচিত্র্য আমরা কোন রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীতেও পাঠ করি নাই। এই হতভাগ্য নির্ব্বাসিতের নির্য্যাতন-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদের মনে হইতেছিল কাল্পনিক-কাহিনী সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই গ্রন্থে বর্ত্তমান। আমরা অনেক অপরাধীর নির্ব্বাসন-কাহিনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ কাহিনী—সত্য ঘটনার বিবরণ পূর্ব্বে কখন পাঠ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। মানুষ এত বিভিন্ন প্রকার দুঃখ কষ্ট বিপদে পড়িয়া, এমন কি, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াও জীবিত থাকে—ইহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, এবং 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে' এই উক্তি সত্য মনে হয়। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সমান চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানির ভাষা পাঠ করিয়া ইহা কোন ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া একবারও মনে হয় না; দীনেন্দ্রবাবুর রচনা-নৈপুণ্য ও সরল ভাষার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সম্পাদক

বাঙ্গালীর খাদ্য—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা অতি গুরুতর ব্যাপার। দ্রব্যাদি ভেজাল হওয়ায় এ ব্যাপারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময়ে কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে পরলোকগত চিকিৎসকপ্রবর চুণীলাল বসু মহাশয় 'খাদ্য' সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন; কবিরাজ মহাশয় তাঁহারই অনুসরণ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে কবিরাজ মহাশয়ের গভীর জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি যে যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে, ইহার 'তৃতীয় সংস্করণ'ই তাহার প্রমাণ।

সম্পাদক

শঙ্কর—একখানি সামাজিক উপন্যাস। রচয়িতা শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য বাংলা কথা-সাহিত্যে যশস্বী। বহুদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁর স্বরচিত একটি পুরাতন গল্প অবলম্বনে তিনি এই উপন্যাসখানি রচনা ক'রেছেন। তাঁর আখ্যায়িকার নায়ক 'শঙ্করের নামেই তিনি এবার এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। তাঁর গল্পটির নাম ছিল 'অগ্নিশুদ্ধি' কিন্তু উপন্যাসের এই নাম পরিবর্ত্তনটি আরও সমীচীন হ'য়েছে বলে মনে

হ'ল। কারণ, শুধু যে 'শঙ্করকে' কেন্দ্র ক'রেই উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে তাই নয়, 'শঙ্করে' গ্রন্থকারের একটি নূতন চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা সূচিত হ'য়েছে। 'শঙ্কর' সামাজিক উপন্যাস হ'লেও সে সমাজ ঠিক কলিকাতা শহরের নয়, গ্রন্থকার পল্লী-সমাজেরই ছবি ফোটাবার চেষ্টা ক'রেছেন. কিন্তু সে ছবিতে পল্লীর চেয়ে শহরের রংটাই যে এসে পড়েছে খুব বেশী রকম, এ কথা হরসুন্দরের পরিবার ও তাঁর ইলা লীলা প্রভৃতি বিদুষী কন্যাগণ নিমাই ডাক্তার ও তাঁর দাদা বউদিদি, এবং শিবধান ও লক্ষ্মী সংবাদ প্রভৃতি দেখে আর অস্বীকার করা চ'লে না। দেশের জন্য, বিশেষ ক'রে পল্লীর জন্য গ্রন্থকারের একটা দরদ এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর একটা ভাবনা এই বইখানির মধ্যে মাঝে মাঝে ছায়া ফেলেছে বটে. কিন্তু, উপযুক্ত আন্তরিকতার আলোয় তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেনি। ভাষা সর্ব্বত্র সমান না হ'লেও, রচনা স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর হয়েছে। নারী চরিত্র-গুলিও গ্রন্থকার বেশ মধুর ক'রে এঁকেছেন। শ্রীনরেন্দ্র দেব

মনীষা—একখানি সামাজিক নাটক। নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ গুপ্ত মহাশয় আর কোনো নাটক লিখেছেন কিনা আমরা জানিনি, কিন্তু তাঁর এই আলোচ্য নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হ'য়েছে দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারলুম না। নাটকখানি যত ভালো কাগজ এবং যত ভা'লো ক'রে ছাপা, ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখা গেলো ঠিক ততটা নয়! পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ সালের অন্নবিপ্লবের ভিত্তিতে বিরচিত, বলে নাট্যকার তাঁর গ্রন্থের নাম মাত্র ঘোষণা দিয়েছেন বটে, প'ড়ে বোঝা গে'লো এ নাটকখানি ঠিক তাহা নয়!—নাটকের নামকরণও সার্থক হ'য়েছে বলা চলে না, কারণ, নায়িকারূপে মনীষা চরিত্রের বিশেষত্ব নাটকের কোনো দৃশ্যেই ফুটে ওঠেনি, বরং শেষদৃশ্যে তা একেবারেই অন্য রূপ হ'য়ে উঠেছে! নাটকের নাম তাঁর গৌরীশঙ্কর রাখাই উচিত ব'লে মনে হয়, কারণ, কোনো চরিত্র যদি ভাল হ'য়ে থাকে এই নাটকে, তবে এই একমাত্র গৌরীশঙ্করই হ'য়েছে. এবং গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রায় তার কলকাঠিতেই প'ড়ছে দেখা গেলো! নাটকখানি "উদ্বোধন" দৃশ্য ছাড়া চার অঙ্কে সমাপ্ত। সমরেন্দ্রনাথের মধ্যে রাজবাহাদুরের ছাপ একটু বেশী রকমই এসে পড়েছে। শ্রীনরেন্দ্র দেব

শকুন্তলা—নাটক। মহাকবি কালিদাসের বিশ্ব-বিশ্রুত সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বাংলায় রূপান্তরিত। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্র-লালের পরই নাট্যকার হিসাবে বাংলাভাষায় অপরেশ বাবুর দান নিতান্ত অবহেলার নয়। 'শকুন্তলা' নাটকের বাংলা অনুবাদ আরও একাধিক আছে, কিন্তু এমন সহজ সরল এবং সরস মধুর ক'রে শকুন্তলাকে ইতিপূর্ব্বে আর কেউ ভাষান্তরিত ক'রতে পারেন নি। অপরেশ বাবুর এই অনু-বাদের আরও একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে এতে মূলের সঙ্গে মিলের অভাব খুব বেশী নেই কোথাও।

"ঢুলত নয়ন, পাটল সুরভিত ঘন বন-ছায়ে দিবস শয়ন,
সুশীতল বারি সিনান সুখকর—শ্রান্তিহর।"

পড়তে পড়তে মনে পড়ে,—

"সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥"

অপরেশ বাবুর ভাষা সুন্দর। সঙ্গীত রচনাও মনোহর। তাঁর 'শকুন্তলা' সকল দিকে দিয়ে সাফল্য অর্জ্জন ক'রতে পেরেছে বলা যায়।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

নমিতা—কবিতা-সমষ্টি। রচয়িতা শ্রীযতীশচন্দ্র বসুর প্রায় কুড়ি বৎসর আগে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় যে সকল কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছিল, 'নমিতা'য় সেইগুলি ও কয়েকটি মাত্র নবলিখিত কবিতা সন্নিবেশিত হ'য়ে কবির অগ্রজের আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। কাব্যে ও সাহিত্যে বাংলা-ভাষার প্রগতি যেরূপ দ্রুত চলেছে, তাতে 'নমিতা' কুড়ি বৎসর আগে এলে যে আদর পেতো, আজ আর তা পাবে ব'লে মনে হয় না।

"বিশ্বের চরণে হয়ে ভকতি প্রণতা
সবারে বন্দনা করে আমার নমিতা"

এ কবিতা স্নেহময় অগ্রজ ও অনুজদের হয়ত' মুগ্ধ ও প্রীত ক'রতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের আসরে কোনো বিশেষ স্থান অধিকার ক'রতে পারবে ব'লে মনে হয় না!

শ্রীনরেন্দ্র দেব

চিত্রলেখা—রূপকে আঁকা ছায়াছবি। চিত্রলেখার চিত্রাঙ্কণ-কারিণী শ্রীমতী বিমলা দেবী সাহিত্যাকাশে একটি নবোদিত তারকা। চিত্রলেখার অঙ্কন-ভঙ্গী স্থানে স্থানে আমাদের বেশ মুগ্ধ করেছে। তাঁর তুলির টানে রেখার সবিশেষ দক্ষতা বা নৈপুণ্য না থাকলেও বিচিত্র বর্ণ-গরিমা ও প্রাণস্পন্দনের অভাব নেই। ছবির ভিতর থেকে শিল্পীর দরদের আভাস পাওয়া যায়। রচনা গদ্য হ'লেও এর মধ্যে কাব্যের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। খুব পাকা হাত না হ'লে এ ধরণের সূক্ষ্ম রস-রচনা নিখুঁত ও সুন্দর হওয়া একান্ত কঠিন। শ্রীমতী বিমলা দেবীর এই প্রথম প্রয়াসের মধ্যে বহু ত্রুটী থাকলেও, 'ফুল' 'শেষ চাওয়া' 'পথ' প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র এই আশাই আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে যে এই তরুণী শিল্পীর কথার আলিম্পন ভবিষ্যতে একদিন বঙ্গবাণীর শ্রীঅঙ্গন রমণীয় কারু-কলায় বিচিত্র ক'রে তুলতে পারে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পদ্মরাগ—কবিতা সংগ্রহ। কাশিমবাজারের কবি শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দীর্ঘকাল ধ'রে বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল কবিতা লিখেছিলেন, সেই সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার সংযোগে এই 'পদ্মরাগের' সৃষ্টি। কবির 'শ্রীকৃষ্ণ' কবিতাটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ হবার বারো বৎসর পরে 'হিন্দু মিশন' নামক একখানি পাক্ষিক পত্রে উক্ত কবিতাটি পুনরায় প্রকাশিত হ'য়েছিল শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর নামে। কবি শৌরীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে যে সবিশেষ ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন এ কথা আমরা তাঁর ভূমিকা থেকে জানতে পারলুম, কিন্তু আমাদের মনে হয় শৌরীন্দ্রবাবুর এতে খুশী হওয়াই উচিত ছিল, কারণ নলিনী দেবী

যতই অন্যায় করে থাকুন না কেন, তিনি যে শৌরীন্দ্র বাবুর কবিতাটিকে মস্ত সম্মান দিয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ভাল জিনিষের প্রতিই মানুষের লোভ হয়, মূল্যবান সামগ্রীই লোকে অপহরণ ক'রে থাকে, সুতরাং শৌরীন্দ্রবাবুর এতে ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ নেই। শৌরীন্দ্র বাবুর "শ্রীরাধা" কবিতাটিও অপহৃত হবার যোগ্য ব'লে মনে হ'লো। 'পদ্মরাগের' ন্যায়ও একাধিক ক'বতা পদ্মরাগ-মণির মতই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর কাব্যখানির নামকরণ সার্থক হ'য়েছে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গ্রন্থ-প্রাপ্তি স্বীকার

দীপ-শিখা—এখানি খণ্ডকাব্য; শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস প্রণীত; মূল্য আট আনা।

বঙ্গে চৌহান—নাটক; শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, প্লীডার, জজেস কোর্ট, বগুড়া, প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

কলিকাতায় চলা-ফেরা (সেকালে আর একালে)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য ব'রো আনা মাত্র।

কাচ ও মণি—উপন্যাস; মৌলভী একরামদ্দিন প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য-জীবন—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা।

দম্পতি—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীশশিকুমার সেন বি এ, এল-এম-এস প্রণীত; মূল্য নয় সিকা মাত্র।

সেলির কুটুম—সচিত্র ছোটদের কাব্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি এইচ-ডি, ডি-লিট্ প্রণীত; মূল্য ছয় আনা।

চৌধুরীদের রথ

জসীম উদ্‌দীন

চৌধুরীদের রথ—
ডান ধারে তার ধূলায় ধূসর তালমা হাটের পথ।
চামচিকে আর আরশুলারা নির্ভাবনায় বসি,
করছে নানান কলকোলাহল রথের মাঝে পশি!
বাদুড় সেথা ঝুলছে সুখে, বাহির জগতখানি,
অনেকদিনই ত্যাগ করেছে তাদের জানাজানি।
গড়ুর বীরের মাথায় বসি পাঁকুড় গাছের চারা,
মেলছে শিকড়, তবু ঠাকুর দেয়নি কোন সাড়া।
কাঠের ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙেছে, খসছে রথের ছাদ,
আজো তবু কেউ করেনি ইহার প্রতিবাদ।

রাস্তা দিয়ে নানান রকম লোকের চলাচল;
নানান রকম আলাপ-বিলাপ, নানান কোলাহল।
কেউ বা চাষী, কেউ বা ধনী, পরদেশী, কেউ দেশী,
ভাবে তারা সবার চেয়ে কাজের কথাই বেশী।
কেউ বা ভাবে মকর্দ্দমায় হারিয়ে দিয়ে কার
বসত-বাড়ী করবে নিলাম বাঁশ-গাড়ীতে তার।
কেউ বা ভাবে কি কৌশলে মেলে কথার জাল,
এক-আনিতে আনবে টেনে ছ'পয়সার মাল।
যতই কেন ব্যস্ত থাকুক, যতই কাজের তাড়া;
হেথায় এলে সব ভুলে চায় রথের পানে তারা।

চাক-ভাঙা আর আর বয়স মলিন চৌধুরীদের রথ
তাদের পানে করুণ চেয়ে সুধায় যেন পথ;—
সুধায় যেন, সেই অতীতের চৌধুরীদের কে,
সুতোর ডেকে রঙীন এ রথ গড়ল পুলকে।
আসল গাঁয়ের বৃদ্ধ প'টো, রঙীন তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন্ সোনার স্বপনে।
রথের চূড়ায় উড়ল ধ্বজা, গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
চলতে পথে থাকত খানিক রথের পানে চেয়ে।

* * * *

তার পরে সেই রথের দিনে, হাজার লোকের মেলা,
দোকান-পসার, ভোজবাজী, আর ভানুমতীর খেলা;

আসত গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সব, আসত ছেলে-মেয়ে,
রঙীন হাসির দুলত লহর রঙীন কাপড় ছেয়ে।
বুড়ো মাসীর স্কন্ধে উঠে ছোট্ট শিশু ছেলে;
এই রথেরি ঠাকুরটিরে দেখত আঁখি মেলে।
গাঁর বধূরা ভালের সিঁদুর মেলে পথের পরে,
সরল বুকের আঁকত পূজা এই ঠাকুরের তরে।
আঁচল তাদের জড়িয়ে ধ'রে ছোট শিশুর দল,
তালের পাতায় বাজিয়ে বাঁশী করত কোলাহল।

দৌড়ের নাও ভাসত গাঙে, রঙিন নিশান লয়ে,
গলুই ভরি জলত পিতল নব-রতন হয়ে।
তাহার গলে পরিয়ে দিত রঙিন সোলার-মালা,
এমনি মত হাজার নায়ে গাঙটি হ'ত আলা।
সেই নায়েতে বাছ খেলাত গাঁয়ের যত চাষী;
বৈঠা পরে বৈঠা হাঁকি চ'লত তারা ভাসি।
তারি তালে গাইত তারা ভাটির সুরে গান,
শুনে নদী উথল-পাথল, ঢেউ ভেঙে খান খান।
কৌতূহলী দাঁড়িয়ে তীরে হাজার নর-নারী,
হাতে তাদের দুলত মালা গলায় দিতে তারি—
যাহার তরি সব তরিরে পেরিয়ে যাবে আগে,
তারে তারা করবে বরণ মনের অনুরাগে।

সে-সব আজি কোথায় গেল, চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন শুধায় সবে তাদের চলা-পথ।
চাকাগুলো ভেঙেছে তার, উই ধরেছে কাঠে,
কোন্ অভিযোগ বক্ষে লয়ে সময় তাহার কাটে।
ছবিগুলো যাচ্ছে মুছে, ভাঙা কদম ডাল
ত্যাগ করিয়া পালিয়ে গেছে নিঠুর বংশীয়াল।
তলায় বসে একলা রাধা কাঁপিছে পুলকে,
জানতে আজো পায়নি তাহার বন্ধু নিল কে।
মাঠের পথে চলছে ধেনু বিরাম নাহি হায়,
রাখাল কবে পাও ভেঙেছে, কেউ না ফিরে চায়।

দল বাঁধিয়া চলছে কোথাও গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
মৃদঙ্গ আর ঢোল বাজায়ে বাঁশীতে গান গেয়ে।
হয়ত কোন পরব গাঁয়ের করবে সমাপন,
হাজার বরষ আগেই তাহার করছে আয়োজন।
কারো কাঁধের ঢোল ভেঙেছে, কাহারো একতারা,
দল-পতি যে নেইক সাথে টের পায়নি তারা।

এমনি কালের কঠোর ঘায়ে দিনের পরে দিন,
এ সব ছবির একখানিরও থাকবে নাক চিন।
এর সাথে সেই গাঁয়ের পোটো,—তাহার কথাও সবে
ভুলে যাবে অজানা কোন্ দিনের মহোৎসবে।
কোন্ সে অতীত আঁধার সাগর, তাহার পারে বসি
এঁকেছিল সোণার স্বপন বরণ ঘষি ঘষি।
হয়ত তারি গাঁয়ের যত নর-নারীর দল,
মনে তাহার ফুটিয়েছিল স্বপন শতদল।
তারি একটি সোণার কলি আলোক-তরির প্রায়
সপ্ত সাগর পার হইয়া ভিড়ছে রথের গায়।
আজ হয়ত অনাদরেই অনেক অভিমানে,
চলছে ফিরে প্রদীপ-তরী সেই অতীতের পানে।

যেথানে সেই বৃদ্ধ পোটো বনস্পতির প্রায়,
হাজার শাখা এলিয়ে বায়ে দুলছে নিরালায়।
চাক-ভাঙা আর বয়স-মলিন চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন চক্ষু মুদে খুঁজছে তাদের পথ।
বনের লতায় গা ছেয়েছে, গাছের শাখা-ভারে
জড়িয়ে ধরে এ সব কথা শুনছে বারে বারে।

পরলোকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

আবার ভারতের রাজনীতিক গগনের একটি পূর্ণ জ্যোতিষ্মান জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল; সমগ্র রাজনীতিক ভারতে একটা-খণ্ড প্রলয় হইল; ভারত-ব্যাপী শোকের হাহাকার উঠিল—ভারতীয় জাতীয় দলের শ্রেষ্ঠ জননেতা, সংযুক্ত-প্রদেশের অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীব, কলিকাতা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, সর্ব্বস্বত্যাগী রাজনীতিক সন্ন্যাসী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহাপ্রয়াণ করিলেন। ২৩এ মাঘ, (১৩৩৭) ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) লক্ষ্ণৌ হইতে টেলিগ্রাম আসিল—'অদ্য প্রাতঃকালে ৬টা ৪০ মিনিটের সময় লক্ষ্ণৌ নগরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু লোকান্তরিত হইয়াছেন।' সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কলিকাতা নগরী, তথা সমগ্র বঙ্গদেশ, তথা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ গভীর শোকে নিমগ্ন হইল।

প্রয়াগ-ধাম-প্রবাসী কাশ্মীরী সারস্বত-ব্রাহ্মণকুলে ইংরেজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্ম হয়। কানপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদের মুয়র কলেজে অধ্যয়ন করেন। স্যার সুন্দরলাল, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পণ্ডিত মতিলাল তিন মাস মাত্র আইন অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবরূপে অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হোমরুল আন্দোলনের প্রারম্ভে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে জাতীয় দলে যোগদান করিয়া হোমরুল আন্দোলনে আত্ম-বিনিয়োগ করিলেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গে পাইওনীয়ার পত্র তাঁহাকে 'ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল অব দি হোমরুল লীগ' আখ্যা প্রদান করেন।

সাংবাদিক হিসাবেও পণ্ডিত মতিলাল অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রথমে তিনি "লীডার" পত্র পরিচালন করিতেন। পরে স্বয়ং "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর পণ্ডিত মতিলাল সংযুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন। 'রাউলাট আইন' সভায় উপস্থাপিত হইলে তিনি তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চনদ ও খিলাফৎ সংক্রান্ত অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিলে তিনি মহাত্মার সহিত যোগদান পূর্ব্বক ওকালতী ও কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে পণ্ডিত মতিলাল, তাঁহার একমাত্র পুত্র ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সহ এই বাহিনীভুক্ত হইয়া কারাবরণ করেন।

জেল হইতে বাহির হইবার পর তিনি মিঃ সি, আর, দাশের সহিত যোগ দিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন, এবং কোকনদ কংগ্রেসের অনুমতি লাভ করিয়া পুনরায় কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। সাইমন কমিশন ঘোষিত হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদ-কল্পে সমগ্র ভারতের পক্ষ হইতে সকল দলের সমবেত চেষ্টায় একটি শাসন ব্যবস্থার খসড়া প্রণয়ন করান। ইহা "নেহেরু রিপোর্ট" নামে সুপরিচিত হইয়া কলিকাতা কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পুত্র জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে আইন-লঙ্ঘন আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় পণ্ডিত মতিলাল অসুস্থ দেহে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা "আনন্দ-ভবন" জাতিকে উৎসর্গ করেন। অতিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া ছয়মাসের জন্য কারাগারে গমন করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হয় ও তিনি রক্ত বমন করিতে থাকেন। সেইজন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু রোগ-মুক্ত হইতে পারিলেন না—ইহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। ভারতের আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র খসিয়া পড়িল; পুরুষ-সিংহ ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে আনন্দ-লোকে প্রস্থিত হইলেন; পড়িয়া রহিল তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি! ভগবান শ্রান্তক্লান্ত বীরের আত্মার শান্তি বিধান করুন।
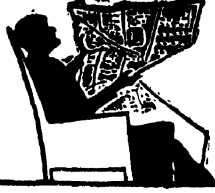
সাময়িকী

বিদেশ হইতে স্বদেশে

প্রায় এক বৎসর কাল য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের ভাবগুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। প্রেসের নিকট এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, "আজ ভারতবর্ষ জগতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—তাহার স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্য নয়—এই আন্দোলনে সে যে অভিনব নৈতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহারই জন্য। বিপ্লবের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আজ একটী অভিনব নৈতিক পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছে।" আজ যে বিরাট কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সারা ভারতকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে যেমন কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কবির ভাব-প্রেরণা। দীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া মহাকবির বাণী, কখনও সাক্ষাৎ ভাবে, কখনও পরোক্ষ ভাবে, সেই বিরাট ভাব-স্রোতকে বহন করিয়া আসিয়াছে। আজ সংগ্রামের এই গভীরতার মধ্যে যেন কবির ভৈরবী-মন্ত্র আবার অগ্নি-সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠে, এই আমাদের প্রার্থনা।

ইহা মাত্র প্রাথমিক অধিবেশন

দশ সপ্তাহ কাল ধরিয়া নানাবিধ বাদানুবাদের পর গত ১৯শে জানুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, এই বৈঠকে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। অধিবেশনের মধ্যস্থলে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহ লইয়া ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, বৈঠক হয় ত মাঝপথেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু বৈঠক যথারীতি শেষ হইয়া গিয়াছে,—এই ঘোষণার পর, বৈঠকের কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্তগুলির দিকে চাহিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এত আয়োজন, এত অর্থ-ব্যয়, এত বিজ্ঞপ্তির পর এই ঐতিহাসিক বৈঠক কি সার্থকতা সম্পাদন করিল? প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্রের মূল-নীতির আভাস দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ের একটা ধারাবাহিক ও স্পষ্ট স্বরূপ বৈঠকের প্রকাশিত বিবরণীর মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আসলে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের জনগণের প্রতিনিধি কংগ্রেস-পক্ষ যোগদান না করায়, উহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। ইহা আমাদের কল্পনা নয়—স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"It is perfectly true that the consultations took place and that *the conference, as it met, was not precisely the same thing that I had in mind.*" ইংরাজী উদ্ধৃত অংশগুলির যেখানে যেখানে 'Italic'এ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমরাই দিয়াছি।

ভারতে দ্বিতীয় বৈঠকের অধিবেশনের কথা

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, "আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যান; আপনাদের দেশে যাইয়া আপনারা এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন যে, বিলাতে আমরা আমাদের বৃটিশ সহকর্মীদের (colleague) সহিত তুল্য-মর্য্যাদায় মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনাদের ভারতে গিয়া সেখানকার জনমতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, আমাদের ও আমাদের কার্য্যের ফলাফলের জন্য জনমতের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে।" জনমত তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা যদি ভারতীয় প্রতিনিধিদের থাকিত, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এই বিদায়-সম্ভাষণের কোনও প্রয়োজন থাকিত না, এবং গোলটেবিল বৈঠক এইরূপ একটা প্রাথমিক বৈঠক না হইয়া তখন ইহাই একটী মীমাংসা-বৈঠকে পরিণত হইত। সেইজন্য লণ্ডন টাইম্‌সের বিশেষ সংবাদ-দাতার সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটী যদি প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আলোচনা-সভায় যোগদান

করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে পুনরায় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন বসিবে এবং তাহা বসিবে এই ভারতবর্ষে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লইয়া যদি এই দ্বিতীয় বৈঠক সম্ভব হয়, তাহা হইলে তখনই আসল কথাবার্ত্তার আলোচনা হইবে এবং সেই আলোচনার সিদ্ধান্ত দেশবাসী সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র

অমীমাংসিত

গোলটেবিল বৈঠকের উপসংহার-বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-নীতি সম্বন্ধে (এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শাসন-তন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে গোলটেবিল বৈঠকে কোনও স্পষ্ট আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন, "We had not met to frame the constitution; make no mistake about that.") বৃটিশ সরকারের মনোভাবের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজী শব্দ-সম্পদের আড়ালে মুক্তি-কামী ভারত কতটুকু সম্পদ্ পাইতে পারে, তাহার অগ্র-চিন্তা করিয়া বিশেষ কোনও লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে প্রতিমা গড়া হইবে —তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও কাহারও বিশেষ কিছু ধারণা নাই—শুধু খড় চড়ান হইয়াছে মাত্র। কমন্স-সভায় দাঁড়াইয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন, "Government are now considering how the work is to be carried on. I am sorry, I cannot offer any suggestions to-day." তাহার উপর, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-নীতি সম্বন্ধে যেটুকু ঘোষণা খবরের কাগজ মারফৎ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যার অংশই অধিক। কমন্স সভার বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন,"The Hon'ble Members who have read the blue book will have noted that *it is clearly stated that everything in it is provisional.* Stability and success of the work *that has to be done* depends upon how *the structure as a whole is to be built up.*"

নয়টী সাব-কমিটীর মতামত

বৈঠকের কয়েকটি পূর্ণ অধিবেশনের পর উহা নয়টী সাব-কমিটীতে বিভক্ত হয়। এই নয়টী সাব-কমিটীর রিপোর্টই গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যফল। তবে এই রিপোর্টগুলি অধিকাংশই অমীমাংসিত। কারণ এইগুলি মাত্র কয়েকটী নীতি; ইহাদের যে কিরূপ পরিণতি হইবে তাহা এখনও কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। (১) কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা অথবা সাম্প্রদায়িক সমস্যা (৪) বর্ম্মার পৃথকীকরণ (৫) উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ (৬) ভোটাধিকার (৭) দেশ রক্ষা ও সৈন্য সংরক্ষণ (৮) পাবলিক সার্ভিস (৯) সিন্ধু-প্রদেশ স্বতন্ত্রীকরণ—এই নয়টী বিষয় লইয়া নয়টী কমিটী গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রে ভারতীয়দের স্বাধিকার দেওয়া যাইতে পারে কি না—দেওয়া যাইলে আপাততঃ কতটুকুই বা দেওয়া যাইতে পারে—ইহাই হইল সকল সমস্যার সমস্যা। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন "** We should have to devise some means of giving *some* responsibility to the Central Government. Nothing would have been accepted without that. The question was—was it possible to give it? If it was possible it ought to be given. If it was not possible then no agreement was possible." প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের শেষ কথার সহিত প্রত্যেক ভারতবাসীই যে একমত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রে এই "*some*" স্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে কি না? আর এই "*some*" বলিতে কতটুকু বোঝায় এবং তাহার পরিমাপই বা কি?

মোটামুটীভাবে গোলটেবিল বৈঠকে কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা হইতেছে,

(১) শাসনক্ষমতা ও শাসনশক্তি সম্রাটের বা সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেলের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) গভর্ণর জেনারেল প্রথমে একজন মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিবেন। সেই মন্ত্রীই পরে তাঁহার মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। সাত কিংবা আট জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। মন্ত্রীসভা গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছা-অনুসারে স্থায়ী হইবে এবং মন্ত্রীগণ যুক্তভাবে ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৩) বড়লাট ইচ্ছা করিলে যে-কোনও মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

(৪) সংরক্ষিত বিভাগগুলির মন্ত্রী গভর্ণর-জেনারেল স্বয়ং নির্ব্বাচিত করিবেন।

(৫) যে-কোনও বিল অগ্রাহ্য করার অধিকার গভর্ণর জেনারেলের থাকিবে।

(৬) কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র দুইটী সভায় বিভক্ত হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে Single transferable vote পদ্ধতি দ্বারা Senate সভায় ১৫০ জন সদস্য মনোনীত হইবেন। দ্বিতীয় সভার নাম হইবে, Lower house—ইহাতে ২৫০ জন সদস্য থাকিবে। (এই দুই সভার মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে তাহা জানা যায় নাই।) উভয় সভাতেই ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট ও সামন্ত-নৃপতিগণের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন।

(৭) আইন-সভার উভয় বিভাগের সদস্যগণের মিলিত সভায় যদি নিন্দার প্রস্তাব পাশ হয়, এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। (প্রাদেশিক সভার সভ্যদের দ্বারা মনোনীত সদস্যদের মধ্যে, যেখানে সরকারী এবং সামন্ত-নৃপতিদের প্রতিনিধিরা থাকিবেন এবং যেখানে সাত-সাতজন মন্ত্রী-অনুগৃহীত সাত-সাতটী দল থাকিবে, সেখানে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুই-তৃতীয়াংশ মিলিত ভোট সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার বলিলেই চলে।)

(৮) বর্ত্তমান অবস্থায় দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রঘটিত বিষয়-সমূহ বড়লাটের হাতে থাকিবে; কারণ বড়লাটই যখন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী, সেই জন্য তাঁহার তদনুরূপ ক্ষমতা থাকাও প্রয়োজন। রাজস্ব আদায় এবং অসংরক্ষিত বিষয়সমূহের খরচার উপর ভারত সরকারের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে।

(৯) প্রধান মন্ত্রীর নিজের কথায়, "ভারতসচিব কতকগুলি ঋণের জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছেন। ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এইগুলি তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে রক্ষণমূলক নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি আর্থিক বিভাগের কোন অংশ ভারতের হাতে অর্পণ করিতে হয়, তবে এমনভাবে তাহা করিতে হইবে যে, তাহাতে ভারতের আর্থিক সুনাম ও মর্য্যাদার হানি না হয়।" এই উদ্দেশ্যে যুক্ত-রাষ্ট্রের এলাকার বাহিরে একটী রিসার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(১০) যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে এই সর্ত্ত হইবে যে, তাঁহারা যে-সমস্ত বিষয় যুক্ত-রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ না করিবেন, সে সমস্ত বিষয় এখনকার মতই বড়লাটের মারফৎ সম্রাটের সহিত সম্পর্কিত থাকিবে।

(১১) প্রাদেশিক শাসন-ব্যাপার স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীমণ্ডলী সমগ্রভাবে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। বিশেষ দরকার বোধে, অসাধারণ অবস্থায় শান্তিরক্ষার জন্য, যুক্ত-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য যতটুকু বিশেষ ক্ষমতা প্রাদেশিক লাটের হাতে রাখা আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের থাকিবে। অর্থাৎ গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসনেও বিদ্যমান থাকিবে।

(১২) বৃটিশ সরকারের অভিমতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলির আকার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তজ্জন্য ভোটাধিকারও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(১৩) সাম্প্রদায়িক সমস্যা অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সমস্যার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহা কোনও মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রধান মন্ত্রী উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, আপনারা নিজেরা যদি সাম্প্রদায়িক বিবাদের আপোষ করিতে সমর্থ না হন, তবে এই উদ্দেশ্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং কোনও ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন।

১৪। ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে; তবে কি কি অবস্থায় উহা সম্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন অনুসারে তদন্ত করিবেন।

(১৫) সীমান্ত সাব-কমিটী উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। তবে অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণরের অপেক্ষা সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণরের কোনও কোনও বিষয়ে অধিকতর বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে; কারণ সীমান্ত প্রদেশের অবস্থান অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের।

(১৬) দেশরক্ষা ও সৈন্য-বিভাগ সম্পর্কিত কমিটীর মতে সৈন্য বিভাগ এখন ভারতবাসীর হাতে দেওয়া যাইতে পারে না; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ক্রম-বিকাশের সঙ্গে

দেশরক্ষার ভার ভারতবাসীরও হাতে ন্যস্ত হইবে—উহা একমাত্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকিবে না। যাহাতে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়, এই জন্য কমিটী অবিলম্বে ভারতবাসীকে উচ্চ সৈনিকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যাহাতে কার্য্য হইতে পারে, সেই জন্য ভারতবর্ষে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতীয় সৈনিকগণকে কমিশন প্রদত্ত হইবে এবং তাঁহারা বিলাতের সাণ্ডহার্ষ্ট, এবং ক্রনওয়ালে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

(১৭) পাবলিক সার্ভিস সাব-কমিটী বর্ত্তমান সিভিল সার্ভিসের নীতি রক্ষা করার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(১৮) সিন্ধুবিচ্ছেদ সাব-কমিটী সিন্ধুপ্রদেশকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার মত দিয়াছেন।

—

ওয়ার্কিং কমিটীর নেতাদের মুক্তি

গোলটেবিল বৈঠকের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর, ভারতবর্ষে যাহাতে এই সম্পর্কে আলোচনা সম্ভবপর হয় তাহার আব-হাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য স্যার তেজবাহাদুর প্রধান মন্ত্রীকে রাজবন্দীদের সাধারণ মুক্তি দিবার দাবী করেন। কারণ পুলিশের কার্য্যপ্রণালী এবং স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব এক সঙ্গে খাপ খাইতে পারে না এবং কারাগারের নিরুদ্ধ জীবন ঠিক শান্তি অলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। আর প্রকৃত অবস্থা এইরূপ যে, যাঁহারা এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে অথবা ইহার সম্বন্ধে কোনও বিবেচনা করিলে দেশবাসী তাহা সহজে অন্তর দিয়া মানিয়া লইতে পারিবে, তাঁহারা যদি কারাগারেই আবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে দায়িত্ব-মূলক শাসন-তন্ত্রের কোনও ক্রমোন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। ২৫শে জানুয়ারী লর্ড আরউইন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কারারুদ্ধ নেতাদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি ঘোষণা করিয়া এক এশতেহার জারী করিলেন এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে যে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল—যাহাতে কংগ্রেসের নেতাগণ মিলিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সুবিধা পান। বিভিন্ন প্রদেশের কারাগারের লৌহ কপাট সহসা খুলিয়া গেল। দেশ-নেতাদের কারামুক্তির সংবাদে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দের এক হিল্লোল বহিয়া গেল। যারবাদার কারা-মন্দির হইতে সবরমতীর ঋষি আবার বাহিরের শুরু কর্ত্তব্যের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নির্বিকার, নিরাসক্ত কর্ম্মযোগীর মত!

—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সর্ত্ত

স্যার তেজবাহাদুর, মিঃ জয়াকর এবং মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তারযোগে কংগ্রেসের সভাপতিকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এই তিনজন বৈঠকওয়ালার অপেক্ষায় তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ বন্ধ রাখিয়াছেন; কিন্তু ইত্যবসরে ৩১শে জানুয়ারী এলাহাবাদে একটী পরামর্শ সভায় তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে,—

(১) রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ মুক্তি এবং শান্তিপূর্ণ পিকেটীংএর অধিকার দিতে হইবে।

(২) লবণ-আইন-ভঙ্গ আইনত দণ্ডনীয় হইবে না।

(৩) দমন নীতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে।

(৪) আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে এলাহাবাদের অধিবেশনে অনুরূপ স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে।

স্যার সাপ্রুর দল ৮ই ফেব্রুয়ারী নাগাদ বোম্বাইতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং খুব সম্ভবতঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন বসিবে। ইতিমধ্যে লাহোর কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটী ঘোষণা করিয়াছে যে, আগামী কংগ্রেস ইষ্টারের অবকাশে করাচীতেই হইবে এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

—

প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের সদিচ্ছা

এখন সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে ভবিষ্য শান্তি-আলোচনার উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। লর্ড আরউইন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নেতাদিগকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়া সেই আবহাওয়া সৃষ্টির বিষয়ে যে অনেকটা সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত-সচিব উভয়েই যে বক্তৃতা দিয়াছেন,

তাহাতে অন্তত ভাষার দিক দিয়া "একটা কিছু" দিবার আশ্বাস-বাণী স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "ভারতের প্রতিনিধিগণ এবং বৃটিশ শাসনতন্ত্রবিশেষজ্ঞগণ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, যদি আমরা (বৃটিশ পার্লামেণ্ট) তাহা গ্রহণ না করি—তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য থাকিবে—নিপীড়ন—একমাত্র নিপীড়ন! ইহাতে আমাদের কোনও কৃতিত্ব বাড়িবে না—সাফল্যের কথা ত দূরের বিষয়। এই নিপীড়ন-নীতিতে সেদিন স্ত্রীলোক এবং এমন কি শিশুগণসহ সমগ্র জনসাধারণ পীড়িত হইয়া উঠিবে। তখন নিপীড়ন কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইবে না—সমগ্র ভারত তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। যদি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই নিপীড়ন-নীতি চালাইতে আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে আর আহ্বান করিবেন না—যদি একমাত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, কেবল ভারতের জনসাধারণকে নয়, বর্ত্তমান যুগের ভাব-ধারাকে নিপীড়িত করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইয়া থাকি, তবে এই শান্তির ব্যাপারে যেন আর আমাদের অগ্রসর হইতে না দেওয়া হয়।" মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ একদল বৃটিশ রাজনৈতিক ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রকে আংশিক-ভাবে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিবার প্রস্তাবেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং ক্রোধে ও অভিমানে মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার দলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের উষ্মার প্রতিবাদে ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন যে বক্তৃতা করেন, তাহার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দুইটী জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়—একটী আন্তরিকতা, আর একটী, যাহা করিবার তাহা অবিলম্বে করা। ভারতবর্ষকে যদি স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা অবিলম্বে করিতে হইবে। অতীত সাক্ষ্য দেয় যে, বিলম্ব বিঘ্নের জনক। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তি বৃটিশ-সম্পর্কের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিত, আজ তাহারাই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকান্ যুদ্ধের সময় মিঃ গান্ধী আমাদের আহত সৈন্যদের সেবার জন্য স্বয়ং ষ্ট্রেচার বহন করিয়াছেন—এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে সেদিন অজস্র অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার অপেক্ষা ট্রাজেডী আর নাই।"

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র যে ভাবেই গঠিত হউক, মিঃ বেনের এই উক্তি যে প্রতি অক্ষরে সত্য এ কথা সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং আজ মিঃ বেন কমন্স-সভায় দাঁড়াইয়া যাহা বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাহাই বলিয়া আসিতেছে।

শান্তির আবহাওয়া কি সৃষ্ট হইতেছে ?

কিন্তু উপাধি-ওয়ালাদের এই প্রকার বক্তৃতার সহিত, ভারতবর্ষে এখনও নানা স্থানে নিম্নতম রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা যে সমস্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা আপাতত কষ্টসাধ্য হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কলিকাতার মেয়র ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড এবং পুলিশের হস্তে লাঞ্ছনার কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেদিন বড়লাটের ঘোষণার ফলে বিনাসর্ত্তে কংগ্রেসের নেতারা কারামুক্তি লাভ করিতেছেন, সেইদিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া পুলিস কমিশনারের আজ্ঞা আত্ম-প্রকাশ না করিলে, পুলিশের মর্য্যাদার কোনও হানি হইত না। যে আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য স্বয়ং বড়লাট আপনার রচিত আইন তুলিয়া লইলেন, এবং বে-আইনী প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ম-তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সামান্য একটা পুলিশ-আইনের মাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যতিক্রমকে এই রকম প্রাধান্য দেওয়ায় লর্ড আরউইনের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ ব্যর্থ হইয়াছে,—মহাত্মা গান্ধীর কথায়, It has taken away all the grace of release,—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর

আজ যাঁর পরলোকগমন সংবাদের উল্লেখ করতেছি, সেই স্বনামধন্য রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর বেহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের অন্যতম গৌরবস্থল ছিলেন এবং পূর্ণিয়াই তাঁহার

স্বর্গীয় রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর
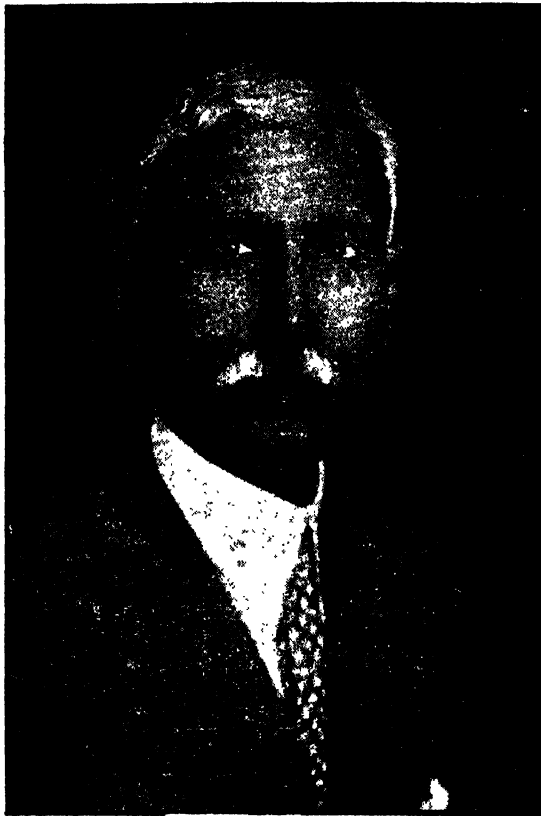
প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। নিশিবাবু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ দোল পূর্ণিমার রাত্রে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ আকিয়াদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কার্য্য ব্যপদেশে পূর্ণিয়ায় থাকায় নিশিবাবু স্থানীয় জিলাস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন, পরে ঢাকা কলেজ হইতে আর্ট-এ ও বি-এ উপাধি গ্রহণ করেন। বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পূর্ণিয়াতেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। ক্রমে ওকালতিতে তিনি প্রধানতমদের অন্যতম হন ও পাবলিক্ প্রসিকিউটার নির্ব্বাচিত হন। গত বিশ বৎসর তিনিই পূর্ণিয়া বারের যশস্বী এডভোকেট ছিলেন।

জতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁর সুমিষ্ট আলাপ, কার্য্যদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা তাঁকে অচিরেই সকল বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি অন্যূন বিশ বর্ষব্যাপী স্থানীয় মিউনিসিপালিটির ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান্ ছিলেন এবং ঐ সুযোগে জনপদের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। এই ম্যালেরিয়া-প্রধান ডিষ্ট্রিক্টের বহু স্থানে ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা এবং ডাক্তার বৃদ্ধি করিয়া গরীব সাধারণের প্রভূত উপকার ও পাঠশালা স্থাপন করিয়া শিক্ষা সুগম করিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি কাউন্সিল ও এসেমব্লির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। গত ৭ই আগষ্ট ১৯৩০ তিনি লোকান্তর গমন করায় সকলেই তাঁর অভাব সন্তপ্ত হৃদয়ে অনুভব করিতেছে; বিশেষ-ভাবে স্থানীয় বাঙালীরা সত্যই যেন বলহীন বোধ করিতেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

—নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত উপন্যাস 'সোণার সিঁড়ি'—১৸৹
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস 'শঙ্কর'—১।৹
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক 'দেশের ডাক'—১৲
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত দৃশ্যকাব্য 'মেঘনাদ'—১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত উপন্যাস 'মাসীমা'—১।৹
শ্রীমন্মথনাথ রায় প্রণীত উপন্যাস 'সমাজ-বীর'—১৸৹
শ্রীসান্ত্বনা গুহ প্রণীত 'অগ্নিমন্ত্রে নারী'—১।৹
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস 'শর্বের মধ্যে ভূত'—৸৹
ও 'দুইবার মৃত্যু'—৸৹
শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত প্রণীত বাল্যপাঠ্য 'বাঘে মানুষে'—।৹
শ্রীবিমলানন্দ রায় প্রণীত ভ্রমণ 'কাশ্মীর'—।৹
মুহম্মদআলী প্রণীত জীবনী 'মহানবী মহম্মদ'—২৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

অন্নপূর্ণা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

চৈত্র—১৩৩৭

দ্বিতীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { চতুর্থ সংখ্যা

লোক-তত্ত্ব *

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ

(১)

ওঁ নমো গণেশায় বাসুদেবায় লক্ষ্মীদেব্যৈ নমোনমঃ।
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব
ততোজয়মুদীরয়েৎ।

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের কথা অনেকের মুখেই শুনা যায়। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই সম্ভবতঃ এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য রাখেন। স্বর্গ বলিতে উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া যেন একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত লোকও এ বিষয়ের প্রকৃত খবর রাখেন না বা রাখিতে চাহেন না। বাপ-দাদার আমল হইতে স্বর্গ বলিতে শূন্য বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। বাস্তবিক পক্ষে এ ধারণা যে কতদূর ভ্রমাত্মক, তাহা একবার আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ অনেকেই পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এই সব গ্রন্থ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই স্বর্গ সম্বন্ধে

অনেক জ্ঞান জন্মে। অন্ত সবগুলি বাদ দিয়াও কেবল একমাত্র সংস্কৃত রামায়ণ এবং মহাভারত হইতেই এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ এবং মহাভারত যে হিন্দুর দৈনিক পঠনীয় গ্রন্থ এ কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের দৈনিক পঠিত গ্রন্থে যে যে বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে, সে সে বিষয় আমরা জানি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? অন্ততঃ পক্ষে বাংলা মহাভারতও যাঁহাদের পড়া আছে, তাঁহারাই জানেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী সহ পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মেরুপর্ব্বতে যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর সকলেরই মৃত্যু হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির একাই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন। স্বর্গ যদি শূন্যে অবস্থিত থাকিত কিংবা প্রেতের আবাসভূমি হইত তবে কি করিয়া যুধিষ্ঠির পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে স্বর্গে গেলেন ? ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনার সময় যে সপ্ত স্বর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন, বৈদিক যুগে বাস্তবিকই এই সপ্ত স্বর্গ বিদ্যমান ছিল ; অবশ্য যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল স্বর্গের নামও বদলাইয়া গিয়াছিল। এই সপ্ত স্বর্গ, যথা :—

১। ভূঃ-লোক—ভারতবর্ষ ; বৈদিক যুগে ভারতবর্ষকে দক্ষিণকুরু দেশও বলা হইত। পুরাকালে এই ভারতবর্ষ বেন রাজার পুত্র পৃথুর নামানুসারে অনেক স্থলে 'পৃথিবী' আখ্যায়ও আখ্যাত হইয়াছে। অনেকে কিন্তু মনে করেন যে বৈদিক যুগে হিমালয়ের অপর পৃষ্ঠে যে স্থলভাগের অস্তিত্ব আছে তাহা জ্ঞাত না থাকায়ই বৈদিকযুগে ভারতবর্ষকে পৃথিবী বলা হইত। বাস্তবিক পক্ষে এ ধারণা ভুল।

২। ভুবর্লোক—ইহাকে কেতুমালবর্ষও বলা হইত। ইহা প্রথমে দৈত্যরাজগণের এবং পরে বরুণের আবাসভূমি ছিল। এই কেতুমালবর্ষ বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের উত্তরাংশ, পারস্য এবং তুরস্ক প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩। স্বর্লোক—বৈদিক কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ এবং ইলাবৃত বর্ষ। এই স্বর্লোকই বর্ত্তমান তিব্বত (বৈদিক মাশক দেশ), চীনতাতার, এবং মঙ্গোলিয়া (বৈদিক মঙ্গদেশ)। এই তিনটি বর্ষ যথাক্রমে শিব, যম এবং ইন্দ্রের বাসস্থান ছিল।

৪। জনলোক—বর্ত্তমান দক্ষিণ-সাইবেরিয়া—বৈদিক নাম ভদ্রাশ্ববর্ষ। ইহা সূর্য্যের আবাসস্থল ছিল।

৫। মহর্লোক—বৈদিক রম্যকবর্ষ ; বর্ত্তমান চীন, মাঞ্চুরিয়া, প্রভৃতি। ইহা চন্দ্রের আবাসভূমি ছিল।

৬। তপোলোক—মধ্য সাইবেরিয়া,—বৈদিক হিরণ্ময় বর্ষ। ইহাই দেবতা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ছিল।

৭।—সত্যলোক—বৈদিক নাম উত্তর কুরুবর্ষ, বর্ত্তমান উত্তর-সাইবেরিয়া, মেরুদেশ এবং গ্রীনল্যাণ্ড। ইহাই চতুর্ম্মুখাখ্য প্রজাপতি ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক।

(ইতি বায়ুপুরাণ ৩৪তম অধ্যায়)

বেদ পাঠে জানা যায় যে, এ ভারত আমাদের মাতৃভূমি,—পিতৃভূমি নহে।

"দৌ নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধনং মাতা পৃথিবী মহীয়ম্"

ঋক্‌বেদ ১০।১০।৪

"দৌ পিতা পৃথিবী মাতা, পিতরঞ্চ দ্যুলোকমপি"

মহীধর ভাষ্য

অর্থাৎ আমাদের পিতৃভূমি স্বর্গলোকে ; আর আমাদের বাসস্থান ভারতবর্ষে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ আর্য্যদিগের উপনিবেশ ছিল। ভারতবর্ষস্থ আর্য্যেরা পিতৃভূমি সন্দর্শনার্থ পিতৃলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকে যাইতেন। এই পিতৃলোক পুণ্যাত্মা লোকের বাসস্থান ছিল। অনেকে শেষ বয়সে তথায় যাইয়া ব্রহ্মচিন্তায় কালাতিপাত করিতেন ; কেহ কেহ বা নিজেদের জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে দেখিবার জন্য তথায় যাইতেন। আবার কেহ কেহ বা ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাদিগকে দেখিতেও যাইতেন। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়ে আছে যে মহারাজ পাণ্ডু পত্নীদিগের সহিত যখন হিমালয়ের অপর পৃষ্ঠে শতশৃঙ্গ-শৈলে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন একদিন অমাবস্যা তিথিতে তথাকার কয়েকজন ঋষিকে উত্তর দিকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?" ঋষিগণ উত্তর করিলেন, "ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃলোকবাসী মহাত্মগণের এক বিরাট সভা হইবে। আমরা তথায় প্রজাপতিকে দেখিবার জন্য যাইব।"

"অমাবস্যান্তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সম্প্রতস্থুর্মহর্ষয়ঃ ॥

সম্প্রয়াতানৃষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বচনমব্রবীৎ।
ভবন্তঃ ক গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ॥
ঋষয় উচুঃ॥ সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি
দেবানাঞ্চ ঋষিণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ প্রজাপতিম্॥"

আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়—

অপিচ সভাপর্ব্বে অর্জ্জুন-দিগ্বিজয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, অর্জ্জুন উত্তরদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সমস্ত দেশের রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে। অর্জ্জুন হিমালয় পার হইয়া আরও উত্তরদেশ জয় করিতে গেলেন। প্রথমে শ্বেত পর্ব্বত পার হইয়া কুবের-পুত্ররক্ষিত রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে কর গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মানস সরোবরের তীরস্থ গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাদিগকে পরাজয় করিয়া হরিবর্ষ পার হইয়া উত্তর কুরুদেশে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেখানে দেবতারা বাস করিতেন। তাঁহারা বিনাযুদ্ধেই কর দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

"স শ্বেতপর্ব্বতং বীরঃ সমতিক্রম্য বীর্য্যবান্।
দেশং কিম্পুরুষবর্ষং দ্রুমপুত্রেণ রক্ষিতম্॥
* * * * * *
সরো মানসমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ॥
* * * * * *
উত্তরং হরিবর্ষন্তু সমাসাদ্য স পাণ্ডবঃ।
ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দনঃ॥
* * * * * *
* * * * * *
তত এনং মহাবীর্য্যং মহাকায়া মহাবলাঃ।
* * * *
উত্তরাঃ কুরবো হ্যেতে নাত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে॥
* * * * *

তার পর বনপর্ব্বে দেখিতে পাই যে অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যাসদেবের পরামর্শমত স্বর্গ লোকে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। যাইবার সময় পথে হিমালয়ের উত্তরে শ্বেতপর্ব্বতে (কৈলাসপর্ব্বতে) শিবের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া এবং বরুণের নিকট হইতেও অনেক দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া পরে ইন্দ্রালয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য যে অর্জ্জুন পদব্রজেই গিয়াছিলেন। স্বর্গে যাইতে হইলে এবং স্বর্গপুরীর নিকটে অবস্থিত সে সকল স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা সমস্তই আজও বর্ত্তমান আছে। ২।১টি স্থানের মাত্র নামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহাতে কি বুঝা যায় না যে স্বর্গ, যাহা দেবতাদিগের আবাস-ভূমি ছিল, তাহা ভৌম ছিল, কদাপি শূন্যস্থ বা আকাশস্থ ছিল না?

অতঃপর মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।—

এই পর্ব্বে লিখিত আছে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী সহ পদব্রজে স্বর্গে রওয়ানা হইলেন। প্রথমে মহাগিরি হিমালয় পার হইয়া বালুকার্ণবে উপস্থিত হইলেন। এই বালুকার্ণব চীনদেশস্থ গবী নামক মরুভূমি। তৎপরেই মেরুপর্ব্বত (গবী মরুভূমির উত্তর দিকে অবস্থিত আল্টাই-পর্ব্বত,—উত্তরমেরুস্থ সুমেরু পর্ব্বত নহে) নয়নগোচর হইল। এই পর্ব্বতেই কিছুক্ষণ পরে পরে দ্রৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। কেবল একা যুধিষ্ঠির মেরুপর্ব্বত পার হইয়া আরও উত্তর দিকে যাইতে যাইতে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। এখন কথা হইতেছে যে স্বর্গ যদি ভৌম না হইয়া আকাশস্থ বা শূন্যস্থ হইত, তবে যুধিষ্ঠির কি করিয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন? আর এক কথা এই যে স্বর্গভূমি হিমালয়ের উত্তর দিকেই অবস্থিত ছিল; কারণ যত লোক স্বর্গে গিয়াছেন, সকলেই হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়াই গিয়াছেন।

কথিত আছে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মলোকে যাইয়া গঙ্গাস্নান করেন এবং তথায় ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বাস করিয়া পরে তনুত্যাগ করেন। এখন কথা হইতেছে এ কোন্ গঙ্গা? আমরা এখন মাত্র এক গঙ্গার কথাই জানি যাহা হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী গোমুখী নামক স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্য-দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। তবে যুধিষ্ঠির কোন্ গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন? আচার্য্য ভাস্কর তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের ভুবন-কোষ-অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেরৌ চতুর্দ্ধাস্যাৎ। বিষ্কম্ভাচলমস্তকাস্তসরঃ সংগতা গতবিয়তা। সীতাখ্যা

ভদ্রাশ্বং সালকানন্দাচ ভারতবর্ষম্। চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যাচোত্তরান্ কুরুন্ যাতা"।

অর্থাৎ মেরু বা আল্টাই পর্ব্বতের দক্ষিণে বিষ্কম্ভপর্ব্বতস্থ সরোবর হইতে গঙ্গা চারি ভাগে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ভদ্রাশ্ববর্ষে বা দক্ষিণসাইবেরিয়ায় যে স্রোত প্রবাহিত তাহার নাম সীতা; ভারতবর্ষে যে স্রোত প্রবাহিত তাহার নাম অলকানন্দা; কেতুমালবর্ষে যে স্রোত গিয়াছে তাহার নাম চক্ষু; এবং উত্তরকুরুদেশে যে স্রোত প্রবাহিত তাহার নাম ভদ্রা। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ভদ্রা নামক গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় বলেন যে ভদ্রার বর্ত্তমান নাম "ইনিসি"। এই নদী এক্ষণে উত্তর সাইবেরিয়ায় প্রবাহিত হইয়া উত্তর মেরু সাগরে যাইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রাশ্ববর্ষ বা দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় প্রবাহিত স্রোত সীতার বর্ত্তমান নাম খুব সম্ভবতঃ "আমুর"। এই নদী আল্টাই (বৈদিক ইলাস্থায়ী) পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যাইয়া ওখটস্ক্ সাগরে পড়িয়াছে। কেতুমালবর্ষে প্রবাহিত স্রোত চক্ষুর বর্ত্তমান নাম অক্শাস্। খুব সম্ভবতঃ চক্ষুর অপর নাম অক্ষি বা অকৃষি হইতেই এই অকৃশাস্ নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অকশাস্ তুর্কীস্থান এবং বোখারা প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরল সাগরে যাইয়া পড়িয়াছে। আরল সাগর বা আরলহ্রদের বৈদিক নাম ছিল "আরহ্রদ" (কৌষিতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ্ ১ম অধ্যায়)। আর ভারতবর্ষে প্রবাহিত স্রোত অলকানন্দা সম্বন্ধে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে মূল স্রোতটি তিব্বত দেশ পার হইয়া হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গোমুখী নামক স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এবং সেখান হইতে নিম্নভূমি দিয়া নামিয়া বঙ্গোপসাগরে যাইয়া পড়িয়াছে। এই চারিটি নদী একই স্থান হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং ইহাদের জল খুব সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল থাকা বিধায়, ইহাদিগকে একই নামে (গঙ্গা) আখ্যাত করা হইত। কৌষিতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে ভদ্রাগঙ্গার নাম দেওয়া হইয়াছে "বিজরা"। যাহার জল পান করিলে এবং যাহাতে স্নান করিলে লোকের জরা-ব্যাধি দূর হয় তাহারই নাম "বিজরা"। অন্য তিনটি গঙ্গার এই গুণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে না পারিলেও ভারতবর্ষস্থ গঙ্গা যে বাস্তবিকই বিজরা সেই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই। স্বর্গনদী গঙ্গার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িবার কথা বিষ্ণুপুরাণেও স্পষ্টতঃই লেখা আছে (২য় খণ্ড—২য় অধ্যায়)।

এক্ষণে ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক প্রভৃতির স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে পুরাণকারগণ কিরূপ বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করা দরকার। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে যে, হিমালয়ের উত্তর দিকেই হেমকূট পর্ব্বত; হেমকূটের পর হরিবর্ষ। (হেমকূটের আর এক নাম কৈলাসপর্ব্বত বা শ্বেতপর্ব্বত)। হেমকূটের সঙ্গেই উত্তর দিকে নিষধ, নীল এবং মাল্যবান্ পর্ব্বত। মাল্যবানের পরেই গন্ধমাদন পর্ব্বত। মাল্যবান্ এবং গন্ধমাদন এই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের নামই মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষ, এবং উত্তর দিকে উত্তরকুরুবর্ষ। আর এই সকল বর্ষে বা দেশে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর এবং অপ্সরাগণ বাস করেন। এইখানেই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিও বাস করেন।

"তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।
অপ্সরাগণ সংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মাচ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেক দক্ষিণৈঃ॥"

ভীষ্মপর্ব্ব—৬ষ্ঠ অধ্যায়

আচার্য্য ভাস্কর তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে বলেন যে নিষধ, নীল, গন্ধমাদন এবং মাল্যবান্ পর্ব্বত পরিবেষ্টিত ইলাবৃতবর্ষ। এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুগিরি। ইহাই কনকরত্নময় ত্রিদশালয়, এবং ব্রহ্মার জন্মভূমি—পুরাণবিদেরা এইরূপই বলিয়া থাকেন।

"নিষধ নীল সুগন্ধ সুমাল্যকৈঃ
অলমিলাবৃত মাবৃতমাবভৌ।
ইহ হি মেরুগিরি কিল মধ্যগঃ
কনকরত্নময়স্ত্রিদশালয়ঃ
দ্রুহিণ জন্ম কুপদ্মজকর্ণিকা
ইতি চ পুরাণবিদোঽমুমবর্ণয়ন্॥"

সিদ্ধান্ত শিরোমণি—ভুবনকোষাধ্যায়, ৩০—৩১ শ্লোক। অতএব বুঝা গেল যে, এই ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরু

পর্ব্বতই ত্রিদশালয় বা দেবতাদিগের আবাসভূমি ছিল। এই ইলাবৃতবর্ষ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা আছে :—

বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণিচোত্তরে।
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতম্ ॥

* * * * *

তত্রদেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগারাক্ষসাঃ।
শৈলরাজ্ঞেঃ প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাঙ্গণাঃ ॥
সতু মেরু পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ ॥

* * * * *

বায়ুপুরাণ, ৩৪ তম অধ্যায়।

অর্থাৎ বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে, বেদী বা ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে তিনটি বর্ষ, যথা, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, এবং ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে তিনটি বর্ষ, যথা ভদ্রাশ্ববর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ এবং উত্তর কুরুবর্ষ। সুতরাং ইলাবৃতবর্ষ ঠিক মধ্যস্থলে; আর সেখানেই মেরুপর্ব্বত বিদ্যমান; এই মেরুপর্ব্বতে দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র প্রভৃতি), গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং অপ্সরাগণ বাস করেন; এবং এই স্থানই পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবের উৎপত্তিস্থান। মেরুপর্ব্বত এই ইলাবৃতবর্ষে অবস্থিত বলিয়া ইহার এক নাম ইলাস্থায়ী পর্ব্বত। খুব সম্ভবতঃ এই ইলাস্থায়ী হইতেই বর্ত্তমান আল্টাই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। আল্টাই পর্ব্বতের চীনদেশীয় নাম উলিয়া সুতাই। বায়ুপুরাণ আরও বলেন যে, উত্তর কুরুদেশ উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে অবস্থিত :—"উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥"

৪৫ তম অধ্যায়।

এই উত্তর কুরুদেশ পুণ্যভূমি, এবং ইহা সিদ্ধপুরুষগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উত্তর-কুরুদেশই বর্ত্তমান উত্তর সাইবেরিয়া বা মেরুদেশ। এক্ষণে এই উত্তরকুরুদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত শতবল প্রভৃতি কয়েকজন বানরকে উত্তর দিকে প্রেরণ করিবার সময় উপদেশ দিতেছেন :—যেখানে বৈখানসসের (আধুনিক বলখাস্ হ্রদ) বিদ্যমান, সেই প্রদেশ অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নামক নদী দেখিতে পাইবে। তাহার দুই তীরেই কীচক নামক বাঁশের ঝাড় আছে। সিদ্ধপুরুষগণ সেই বাঁশের ভেলাতে করিয়াই সেই নদী পার হইয়া থাকেন। তোমরাও সেইরূপেই এই নদী পার হইবে। এই নদীর পরপারেই অর্থাৎ উত্তরপারে সেই পুণ্যময় উত্তরকুরুদেশ। সেই উত্তরকুরুদেশের উত্তরাংশে উত্তর সমুদ্রের তীরে সোমগিরি বর্ত্তমান। এই দেশ সূর্য্য-বিহীন হইলেও অর্থাৎ সেখানে সূর্য্য অস্ত গেলেও একপ্রকার আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। (ইহাই বর্ত্তমানের Aurora Borealis)। এই দেশেই দেবেশ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। তোমরা এই দেশের আর উত্তরে যাইও না। কারণ তথায় সূর্য্য নাই কিংবা সেখানে কোন প্রকার আলোও নাই। ইহা সীমাবিহীন; এর পর আর কি আছে তাহা আমি জানি না।

"হেমপুষ্করসঞ্ছন্নং তত্র বৈখানসং সরঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈ র্হংসৈ র্বিচরিতং শুভৈঃ ॥

* * * * *

তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকানাম বেণবঃ ॥
তে নয়ন্তী পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃকুরবস্তত্র কৃতপুণ্য প্রীতিশ্রয়াঃ ॥

* * * * *

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তর পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্ণাম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥
সতুদেশ বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভি বিজ্ঞেয় স্তপতে ব বিবস্বতা ॥

* * * * *

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষি পরিবারিতঃ।
নকথঞ্চ নগন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণচ ॥

* * * * *

সহি সোমগিরির্ণাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্ত্তিতুমর্হথ ॥
এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥"

উত্তর সাইবেরিয়ার এক অংশে এবং গ্রীনল্যাণ্ডে দেখা যায় যে সেখানে ছয় মাস সূর্য্য উদিত হয় না এবং একবার উদিত হইলে ছয় মাস অস্ত যায় না। সেখানে ছয় মাস কেবল

চন্দ্রালোক। সেখানে সূর্য্যালোকের ছয় মাসে এক দিন এবং চন্দ্রালোকের ছয় মাসে এক রাত্রি। সুতরাং ব্রহ্মার এক দিন এবং এক রাত্রিতে আমাদের এক বৎসর হয়।

"এতদ্দেবানামহঃ যৎ সংবৎসরঃ"—তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ। অপিচ মনুস্মৃতিতে আছে—

দৈবেরাত্র্যহণী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥

১ম অধ্যায় ৬৭ শ্লোক।

কুল্লুক ভাষ্য :—দৈবে রাত্র্যহণীবর্ষমিতি॥ মানুষাণাং বর্ষং দেবানাং রাত্রিদিনে ভবতঃ। তয়োরপ্যয়ং বিভাগঃ। নরানামুদগয়নং দেবানামহঃ। তত্র প্রায়েণ দৈবকর্ম্মাণা-মনুষ্ঠানং দক্ষিণায়নং তু রাত্রিঃ॥

অর্থাৎ দেবতাদিগের রাত্রি এবং দিনে মানুষের অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর হয়। সূর্য্যের উত্তরায়ণে দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়নে রাত্রি। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মলোকে বর্ণিত আছে যে সূর্য্য অস্ত যায় না। জনৈক ঋষি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে ব্রহ্মলোকে সূর্য্য সকল সময়েই দেখা যায়।

"অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা।" ৩।১১।১ম মন্ত্র

তদেব শ্লোকঃ নবৈ তত্র ন নিম্লোচ (setting) নোদিয়ায় (nor rising) কদাচন। দেবস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি। ৩।১১।২য় মন্ত্র

"ন হবা অস্মৈ উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈ বাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।" ৩।১১।৩য় মন্ত্র

খুব সম্ভবতঃ এই ঋষি উত্তরায়ণে ব্রহ্মলোকে যাইয়া আবার উত্তরায়ণেই সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। সুতরাং তিনি তখন কেবল দিনই দেখিয়া আসিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনু তাঁহার মনু স্মৃতিতে কেন লিখিলেন যে উত্তরায়ণে দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়নে রাত্রি হয়? আর রামায়ণই কেন বা পূর্ব্বোক্তবৎ লিখিলেন? অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম-লোক এই উত্তর সাইবেরিয়া বা উত্তর সমুদ্র তীরস্থ উত্তরমেরু দেশেই অবস্থিত ছিল। এ বিষয়ে আর সন্দেহই থাকিতে পারে না। তবে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সিদ্ধান্ত শিরোমণি এবং পুরাণাদি পাঠে দেখা যায় যে ইলাবৃত বর্ষেই ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই তিনি বাস করিতেন। ইহার উত্তর এই যে প্রথম ব্রহ্মলোক ইলাবৃতবর্ষেই ছিল। কশ্যপপুত্র ব্রহ্মাপ্রজাপতি প্রথমতঃ এই ইলাবৃতবর্ষেই থাকিতেন। পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দানবরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। শ্রদ্ধেয় স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় বলেন যে এই ঘটনার পর ব্রহ্মা পূর্ব্ব উপদ্বীপে চলিয়া যান এবং তথায় এক রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার নাম হয় ব্রহ্মদেশ। কিয়দ্দিবস পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামন বিষ্ণুর কৌশলে দানবেরা হৃতরাজ্য হইলে, ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বআবাসে অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষে চলিয়া যান। কিছুকাল পরে ব্রহ্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের হাতে রাজ্য অর্পণ করিয়া উত্তরকুরুদেশে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ইহাই তৃতীয় ব্রহ্মলোক। রামায়ণ, মহাভারত, ছান্দোগ্যউপনিষদ এবং মনুস্মৃতিতে এই ব্রহ্মলোকের কথাই বলা হইয়াছে।

"এবং তস্মৈ বরং দত্বা সর্ব্বলোক পিতামহঃ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ॥"

মহাভারত—আদিপর্ব্ব

এক্ষণে এই ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য লোকের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে যে ভূভাগ বিস্তৃত তাহার নাম ভারতবর্ষ। পুরাকালে অত্রস্থ রাজা বেনের পুত্র পৃথুর নামানুসারে ইহাকে পৃথিবী আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। মহাভারতে ভারতবর্ষকে দক্ষিণ কুরুদেশ বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে এখানে অসভ্য জাতিরা বাস করিত। আর্য্যগণের মধ্যে প্রথমে মনুই ভারতে রাজ্য স্থাপন করেন। এই মনু বিবস্বানের পুত্র, সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র (শক্র) প্রভৃতির ভ্রাতুষ্পুত্র। মনু খুল্লতাত বিষ্ণুর সাহায্যে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন।

"অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতঃ।

মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥"

রামায়ণ—বালকাণ্ড

মনু বিবস্বানের পুত্র বলিয়া মনুর বংশাবলীও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আর স্বর্গপুরী হইতে আগত

দেবতাদিগের দ্বারা এই অযোধ্যাপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে অযোধ্যাকে দেবপুরী বলা হইয়াছে।

"দেবানাং পুরযোধ্যা"—অথর্ব্ববেদ

মহানুভব রামচন্দ্র এই সূর্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন। সূর্য্যবংশের পতনের পর ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারাও প্রবল প্রতাপের সহিত অনেক শতাব্দী-কাল দিল্লীর নিকট রাজত্ব করেন। মহারাজ দুষ্মন্ত, নহুষ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। কোনও কোনও ভারতীয় সামন্ত রাজা আজকালও আপনদিগকে সূর্য্যবংশীয় কিংবা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। তবে অনেক ঐতিহাসিকেরই বিশ্বাস যে এই দুই বংশই কালে লোপ পাইয়াছিল। বাহুল্য বোধে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিলাম না।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। এই হিমালয়ের উত্তরাংশে কৈলাস পর্ব্বত। কৈলাস পর্ব্বত এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কিম্পুরুষবর্ষ বলিয়া কথিত হইত। মহাভারত সভাপর্ব্বে আছে যে পরম যোগী শিব এই রাজ্যের প্রকৃত মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোষাধ্যক্ষ কুবেরের হাতেই রাজ্য রক্ষার ভার থাকিত। এই সভাপর্ব্বেই অর্জ্জুন-দিগ্বিজয়াধ্যায়ে আছে যে, অর্জ্জুন উত্তর দিক জয় করিতে যাইয়া হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে গেলেন। সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন থাকায় কৈলাস পর্ব্বতকেই শ্বেতপর্ব্বত বলা হইত। অর্জ্জুন শ্বেতপর্ব্বত-সংলগ্ন উত্তর ভূভাগ দ্রুমপুত্র (কুবের পুত্র) পালিত কিম্পুরুষাবাস আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন এবং সেখান হইতে কর আদায় করিয়া লইলেন। কিম্পুরুষবর্ষ মানস সরোবর এবং তৎসংলগ্ন ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ বিষয়ে রামায়ণে স্পষ্টতঃই লেখা আছে :—

"কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ ॥
তত্র পাণ্ডুরমেঘাভং জাম্বুনদ পরিস্কৃতম্।
কুবের ভবনং রম্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥
বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা অপ্সরসোগণসেবিতা ॥
তত্র বৈশ্রবণো রাজা সর্ব্বলোক নমস্কৃতঃ।
ধনদোরমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৩৪ শ সর্গ

অর্থাৎ সুগ্রীব বলিতেছেন—তোমরা শ্বেতবর্ণ কৈলাসপর্ব্বত দেখিয়া খুব হৃষ্ট হইবে। সেখানেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত স্বর্ণালঙ্কৃত এবং শুভ্রবর্ণ মেঘ সদৃশ কুবেরের সুরম্য ভবন দেখিতে পাইবে। তাহার কাছেই প্রভূত পদ্মপরিপূর্ণ বিশাল এক সরোবর দেখিতে পাইবে। সেই সরোবরে রাজহংস এবং অপ্সরাগণ কেলি করিয়া থাকে। সেখানেই যক্ষরাজ কুবের যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া থাকেন। এখন কথা হইতেছে, যে সরোবরের কথা এখানে উল্লিখিত আছে, ইহা কোন সরোবর? সকলেই জানেন যে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর দিকে মানস সরোবর অবস্থিত। কবি কালিদাস প্রভৃতি অনেকেই মানসের রাজহংসের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কুবেরের প্রাসাদের নিকটে মানস সরোবরই ছিল। আর কুবেরের প্রাসাদ যে মানসের দক্ষিণ দিকেই ছিল তাহাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়।

এই কুবেরের রাজ্য কিম্পুরুষবর্ষের উত্তর দিকে যম এবং ইন্দ্রের রাজ্য ছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

"মানসোত্তরশৈলেতু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী।
দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ ॥"

অর্থাৎ মানস সরোবরের উত্তরস্থ পর্ব্বতে এবং তাহার পূর্ব্ব দিকে বাসবীপুরী বা ইন্দ্রের বাড়ী বৈজয়ন্তীধাম, এবং সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে (অর্থাৎ মানস সরোবরের উত্তর পারে) যমের পুরী, এবং পশ্চিম দিকে বরুণের আলয় বিদ্যমান। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মানসের উত্তরস্থ নিষধ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ায় ইন্দ্রের বাড়ী ছিল। ইন্দ্রের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ খাস তিব্বত বা বৈদিক মাশক দেশে ছিল যমের পুরী, এবং ইহার খানিকটা পশ্চিম দিকে আরল হ্রদ (বৈদিক "আর" হ্রদ) এবং কাস্পিয়ান সাগরের দিকে ছিল বরুণের পুরী।

এক্ষণে এই ইন্দ্রপুরী বা বৈজয়ন্তীধাম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। দেবতা ইন্দ্র কশ্যপ মুনির সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র; সুতরাং তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বিবস্বান্ প্রভৃতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার রাজ্যের নাম ছিল স্বর্লোক। বৈদিক যুগে ইহা ইলাবৃতবর্ষ নামে কথিত হইত। ঋক্‌বেদে লিখিত আছে "ইলঃ পতির্ম্মঘবা" অর্থাৎ মঘবা (ইন্দ্রের এক নাম) ইল বা ইলাভূমির রাজা। এই ইলাবৃতবর্ষের আর এক নাম

মঙ্গ দেশ, যাহা হইতে বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়া নামের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক যুগে মঙ্গোলিয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে—

"মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ"

ভীষ্মপর্ব্ব—১১ শ অধ্যায়

এই মঙ্গোলিয়া বা ইলাবৃতবর্ষে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এবং অপ্সরাগণও বাস করিতেন; ইহার বিবরণ যে সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে আছে তাহা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রের সভায় শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী অপ্সরাগণ সর্ব্বদাই নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি করিতেন। বৈদিক যুগে মুনিঋষিগণ এবং ক্ষত্রিয় রাজগণও ইন্দ্রপুরীতে যাতায়াত করিতেন। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে মহর্ষি ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রপুরীতে মুনিগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। এ বিষয় চরকসংহিতায় স্পষ্ট ভাবেই লিখিত আছে। অনেক বণিকও ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া বেশী লাভের আশায় ইন্দ্রালয় প্রভৃতিতে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। অথর্ব্ববেদে বর্ণিত আছে যে জনৈক ভারতীয় বণিক তাঁহার পণ্যদ্রব্যাদি মাশক এবং ইলাবৃতবর্ষে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিতেছে "হে ইন্দ্র, তুমি মহান্ ব্যক্তি। তুমি পথিমধ্যস্থ সমস্ত অরাতি এবং হিংস্র জন্তুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া আমার বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দাও।"—

"ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি। নুদনং অরাতিং পরিপন্থিনং মৃগম্। স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্"

অথর্ব্ববেদ

রামায়ণে লিখিত আছে যে, মহারাজ দশরথ দেবাসুর-যুদ্ধে ইন্দ্রকে সহায়তা করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভারতেও দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন ব্যাসমুনির পরামর্শ মতে দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রালয়ে গিয়াছিলেন এবং তথায় পাঁচ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া অনেক দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করতঃ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের দেবরাজ আখ্যা ছিল। ইনি ক্ষমতায় এবং বিদ্যাবত্তায় অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে স্বর্গভূমির রাজা করা হইয়াছিল। এখানে এটুকু বলা আবশ্যক যে, ইন্দ্র কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। ইহা ছিল একটি উপাধি। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই এই উপাধি দেওয়া হইত। তাই পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে ইন্দ্র দেব-সেনাপতি ছিলেন। প্রথম ইন্দ্রের নাম ছিল শক্র। ইন্দ্র যে একটি উপাধি বিশেষ তাহা চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। মহারাজ সগরও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারেন। কাজেই যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই ইন্দ্র হইতেন।

তার পর যমপুরীর কথা।—

যম কশ্যপ মুনির পৌত্র এবং বিবস্বানের পুত্র। বিবস্বান্ বা সূর্য্যের তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা, যম, শনি এবং মনু। যম মনুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। সুতরাং তিনিও যে মানুষ ছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মাশক দেশ বা বর্ত্তমান তিব্বত দেশই যমের রাজ্য ছিল। বেদ পাঠে জানা যায় যে দেবতা-দিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরগণ প্রথমতঃ তথায় বাস করিতেন। কিয়ৎকাল পরে দেবগণের সমবেত পরাক্রমে অসুরগণ পরাস্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তৎকালে এই প্রদেশ অত্যন্ত বাড়বানল সংযুক্ত ছিল। ইহা একটি প্রকাণ্ড জলাভূমির মত থাকায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল; এজন্য উহাকে নরক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আচার্য্য ভাস্কর বলেন—

"বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসঙ্ঘা ঊর্দ্ধে চ সর্ব্বে
নরকা সদৈত্যাঃ"

সিদ্ধান্ত শিরোমণি—ভূবন কোষাধ্যায়।

ঊর্দ্ধ অর্থে বাড়বানল সংযুক্ত স্থানকেই বুঝাইতেছে। এই নরকদেশ মানস সরোবরের উত্তর তীর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও মানসের উত্তর তীর অতীব অস্বাস্থ্যকর। পর্য্যটকেরা এখন পর্য্যন্তও প্রাণভয়ে মানসের উত্তর তীরে যান না। শুনা যায় না কি তীব্বতীয়েরাও তথায় বাস করিতে পারে না।

রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত যম এই নরকপ্রদেশে একটি পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল সংযমনীপুর। ইহাই ছিল নরকের রাজধানী। বায়ুপুরাণে আছে যে মানসের উত্তর দিকে সংযমনীপুরে বৈবস্বত যম বাস করেন।

"দক্ষিণেন পুনর্মেরো মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥"

বায়ুপুরাণ ৪৫ অধ্যায়।

ঋক্‌বেদ বলেন "যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্র অবরোধনং দিবঃ" অতএব ঋক্‌বেদের মতে দেখা যায় যে, যম তাঁহার বাসস্থানের নিকটে একটি অবরোধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুষ্টদিগকে শাস্তি দিবার জন্যই এই কারাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদে দেখা যায় যে, যম গুরুতর অপরাধে অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়বান্ ছিলেন। কখনও অন্যায় বা অধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্যই তিনি ধর্ম্মাবতার বা ধর্ম্ম বলিয়াও আখ্যাত হইতেন। বৈবস্বত যম গুরুতর অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন বলিয়া বেদে কোনও কোনও ক্ষেত্রে "মৃত্যু" আখ্যায়ও আখ্যাত হইয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ স্বর্গরাজ্যের তাবৎ আসামীগণের বিচারই তাঁহার তত্ত্বাবধানে হইত। তাঁহার চরেরা (বর্ত্তমানের চৌকিদার, পুলিশ প্রভৃতি) অপরাধীর সন্ধান পাইলেই তাহাকে ধরিয়া যমের নিকট লইয়া যাইত। তিনিই স্বর্গের High Courtএর Chief Justice ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের কি পণ্ডিত কি মূর্খ অনেকেরই বিশ্বাস যে যমই মৃত্যুর কর্ত্তা; এবং তিনি এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। বেদ-পুরাণাদি পাঠ করিলে যে এ ধারনা থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। কেবল বর্ত্তমানের দোষ নয়, যম সম্বন্ধে এ ভুল ধারণা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এমন কি বৈদিক যুগের শেষ ভাগেও, যখন লোক ক্রমশঃ বেদবিদ্যাহীন হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই জনসাধারণের মনে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, যমই মৃত্যুর কর্ত্তা; অর্থাৎ তিনিই সমস্ত মানুষ এবং প্রাণীর মরণ ঘটাইয়া থাকেন। বাস্তবিক এই যম যে মানুষের মৃত্যুর কর্ত্তা ছিলেন না এবং মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, সে কথাও যে তিনি জানিতেন না, এ বিষয় যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে "যম নচিকেতা" সংবাদে বিশদ ভাবেই বর্ণিত আছে। নচিকেতা এই যমের বাড়ীতে গিয়া তিন রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। যম তখন বাড়ীতে ছিলেন না। পরে যম বাড়ীতে আসিয়া নচিকেতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তুমি মহাশয় লোক; আমার বাড়ীতে আসিয়া তিন রাত্রি যে অভুক্ত রহিয়াছ তজ্জন্য আমার নিকট হইতে ৩টি বর গ্রহণ কর।" নচিকেতা তৃতীয় বর চাহিয়া বসিলেন "ভগবন্, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রেত মানুষের জ্ঞানের অগোচর; কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রেত বলিয়া একটি কিছু জীব আছে; আবার কেহ কেহ বা এইরূপও বলিয়া থাকেন যে-প্রেত বলিয়া কোনও প্রাণী নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে প্রেতবিদ্যা শিক্ষা দিন। ইহাই আমার প্রার্থনীয় তৃতীয় বর।" এই প্রশ্নের উত্তরে যম বলিলেন "পুরাকালে দেবতারাও (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি) প্রেত জিনিসটিকে বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী কালেও এই প্রেতবিদ্যা তাঁহাদের নিকট সুজ্ঞেয় হয় নাই (আমি ত কোন্ ছার্)। ইহা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। নচিকেতা, তুমি অন্য বর চাও।"

নচিকেতা উবাচ। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে, এতাদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ"" ॥ কঠোপনিষদ্ ২০তম মন্ত্র। যম উবাচ। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা, নহি সুজ্ঞেয়মনুরেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব..." ইত্যাদি। কঠোপনিষদ্ ২১তম মন্ত্র।

এই ঘটনা হইতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, মানুষ মরিয়া যে যমের বাড়ী যায়, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা? যদি মানুষ মরিয়া যমের বাড়ী যাইত, তবে প্রেতগণের খবর যম অবশ্যই রাখিতেন। এবং এ কথা সত্য হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি দেবতাদিগেরও আর প্রেতের অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য মাথা ঘামাইতে হইত না, এবং যমকেও নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিব্রত হইতে হইত না। যম স্পষ্টই বলিতে পারিতেন যে "প্রেতসকল আমার পুরীস্থ নরকভূমিতে আছে।" তবে যম যে মানুষের মৃত্যুর কর্ত্তা, ইহার মূলে এইটুকু সত্য আছে যে যম অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন বলিয়া লোকে বলিতেন যে যমই মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে এই সমস্ত লোক নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পিতৃভূমি ইলাবৃতবর্ষ হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞাকারী যম তাঁহাদেরই বংশের একজন লোক; সুতরাং তিনিও

মরণশীল; তিনি কি করিয়া লোকের মৃত্যুর কর্ত্তা হইবেন? ফলতঃ লোকে বিস্মৃতিবশতঃই এই অবান্তর কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। বেদে আছে যে পিতৃলোকবাসী দেবগণ যমকে রাজপদে বৃত করিলেন:—"তস্মাৎ যমঃ পিতৃনাং রাজা" সেই হেতু যম পিতৃলোকের রাজা হইলেন। এই পিতৃলোক কদাপি প্রেতলোক নহে। মহর্ষি দেবল বলেন "ন প্রেতাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ" অর্থাৎ প্রেতগণ কখনও পিতৃপদবাচ্য হইতে পারেন না। অতএব যমও কদাপি প্রেতলোকের রাজা হইতে পারেন না। লোকের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। যম বৈদিক মাশক-দেশে নরক ভূমিতেই রাজত্ব করিতেন।

এই যমপুরীর অবস্থা সম্বন্ধে মহাভারত সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, "এস্থান নাতিশীতোষ্ণময়। আর যম তাঁহার সংযমনীপুরীতে রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। এই স্থানে নানা প্রকার সুখাদ্য পাওয়া যায়। এখানে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং অপ্সরাগণ গীত বাদ্যাদিতে সুখে কাল কাটাইয়া থাকেন, এবং প্রায়ই সাধু, সন্ন্যাসী এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাবতার যমকে দেখিতে যান।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বর্ণনার মধ্যে শ্রাদ্ধের মন্ত্র "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী" র উল্লেখ নাই। কেন যে নাই তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

* প্রবন্ধকার এই প্রবন্ধটি পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় প্রদর্শিত, পথ অনুসরণ করিয়াই লিখিয়াছেন। ইতি—প্রবন্ধকার

আশা-বাণী

শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

মুছে যাবে চিরতরে আঁখি হতে মম
শোভা সুখে ভরা এ ধরণী? চির তরে!
জীবনের সব সাধ, সব ভালবাসা
অনন্ত আঁধার মাঝে হ'য়ে যাবে লীন?
জগৎ চলিতে র'বে আপনার পথে,
ভাসিবে ধরণী নিত্য রবির কিরণে,
উঠিবে চাঁদেতে হাসি, পাখী গা'বে গান,
আসিবে বসন্ত ঋতু ফিরিয়া ফিরিয়া,
মঞ্জরিবে শুষ্ক তরু মলয়-পরশে;
ভরিয়ে বিচিত্র-রূপে প্রকৃতির বুক,
শুধু জাগিবে না আলো আমারি আঁখিতে?
পৃথিবীর লতাগুল্ম অণুপরমাণু
ক্ষুদ্র কীট পশুপক্ষী মানব মানবী
মিলিবে অপার সুখে প্রেম-আকর্ষণে,
শুধু আমি নাহি রব? জগৎ-মেলায়
এতটুকু স্থান শুধু হ'বে না আমারি?
এ কথা না লাগে মনে, না হয় প্রত্যয়,
কিছুতেই মরণেরে সত্য নাহি মানি।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে চলে মৃত্যুলীলা,
কেহ না এড়াতে পারে কালের কবল;
চখের সম্মুখে নিত্য হেরিছে মরণ,
তবু কেন আছে জীব মৃত্যুভয় ভুলে,
সংসারে বাঁধিছে বাসা যেন চিরতরে?
শ্মশান-বৈরাগ্য কেন নাহি হয় স্থায়ী,
জীবন না-ফেলে ছেয়ে কাল-বিভীষিকা?
অন্তরের অন্তঃস্থলে শুনিতেছে সবে
আত্মার অমোঘ বাণী দিব্য সত্যময়—
অমৃতের পুত্র তারা, ধ্বংস কারো নাই,
যাত্রাপথে জন্মমৃত্যু শুধু সন্ধিক্ষণ,
চলিছে সকল জীব অমৃত-সন্ধানে।

রক্তের টান

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

দশম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলার অহঙ্কার এবং গর্ব্ব, কমলার সংস্রবে পড়িয়া, ক্ষণেক নামিতেছিল, ক্ষণেক উঠিতেছিল। কিন্তু এবার ইহা কত শীঘ্র—কত অসাক্ষাতে জল হইয়া গেল—ইহার সাক্ষী ছিল না। সে একটা বিশেষ গতি লইয়াই কলিকাতায় ফিরিল। তাহার মস্ত ভয় ছিল যে, কাল-বৈশাখীর দুর্দ্দান্ত হাওয়ার মত মাতা আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িবেন। তাঁহার সম্মতি না লইয়া অসাক্ষাতেই সে দেশের বাড়ীতে চলিয়া গেল—গোপালকে রাখিয়া আসিল—কিছুই তাঁহাকে জানাইয়া করিল না।

গৃহে আসিয়া সংবাদ লইয়া সে জানিল, মাতা পিত্রালয় হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিবার প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। বরঞ্চ এই পায়ে সর্ব্বপ্রথমে যাইয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিতে পারিলে তাঁহার এই স্নেহের উপদ্রব হইতে অনেকটা বাঁচা যাইতে পারিবে। এইরূপ মনে করিয়া সে সেই গাড়ীতেই মায়ের কাছে চলিয়া গেল। বিধু জিনিস-পত্র নামাইয়া লইয়া গোছাইয়া রাখিতে লাগিল।

কাত্যায়নী বারান্দা হইতে দেখিলেন, মেয়ে আসিয়া নামিলেন। ইহারই প্রতীক্ষায় তাঁহার চক্ষু দুটি পথে পড়িয়া টাটাইয়া উঠিয়াছে। এখন কিন্তু চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। মেয়ে আসিয়া পদধূলি লইল—তিনি তখন সেই দিনের বেলায় আকাশের তারা গণিতেছেন। চঞ্চলা বলিল, "মা! আমি এসেছি যে!"

তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "বেশ ত! গোপাল কই?" "সে দেশের বাড়ীতে আছে।"

"কেন?" "তাকে আন্‌তে পারা গেল না।"

কাত্যায়নী জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি গুড় পেয়েছে সেখানে যে আট্‌কে গেল—আর একটা দুধের বালককে আন্‌তে তোরও গায়ের জোর কমে গেল? সেই হতভাগা ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে রোদে রোদে মাঠে মাঠে বেড়াবে—আর এর বাগানের কুলটা—ওর বাগানের নীচুটা চুরি কর্‌বে। ছেলে এবার বেশ দুরন্ত হয়েই ফির্‌বে।"

চঞ্চলা চম্‌কাইয়া উঠিল। সে তাহার জ্বলন্ত চক্ষু-দুটি মাটির দিকে নীচু করিয়া বলিল, "চোখে দেখ্‌লেও এত বড় কথা মুখে বের কর্‌তে লোকের আট্‌কে যায় মা! আর তুমি সম্পূর্ণ আন্দাজ করেই বল্‌ছ। তারা গরীব হতে পারে—হতভাগা তারা নয়। আর তুমি যে শিক্ষার কথা বল্‌ছ, তাদের বাপ মার কাছে তেমন কুশিক্ষা পাবার কিছুমাত্র সুবিধা নাই।"

আজিকার এই অহেতুক বিরোধের ইচ্ছা চঞ্চলার আদৌ ছিল না। বিশেষতঃ ইঁহাদের সম্বন্ধে মাতা ইতিপূর্ব্বে অনেক বিষই ঢালিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে বিষ স্নেহের বশে বসিয়া বসিয়া নীরবে হজম করিতে পারিবে কি না—ইতস্ততঃ করিবার সে কালও চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মেয়ে যে মুখের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া গেল,

তাহার এই আচরণের পরক্ষণে এইরূপ একটু খোঁচা দিতে কাত্যায়নী আনন্দ বোধ করিতেছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "তুই শেখাবি আমাকে? যাদের পেট অষ্টপ্রহর জলে আছে, তাদের রীত প্রকৃতিতে বিশ্বাস করিস্ তুই?"

এতটা সহ্য করা যায় না; সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "কিন্তু তুমিই তাদের ঘরে আমাকে সঁপে দিয়েছ।"

কাত্যায়নী কি বলিতে যাইতেছিলেন; সে কাণে আঙুল দিয়া বলিল, "আর না—থাক্। অনেক কথাই আমার মুখে বেধে রইল। কিন্তু এমন করে আর কোন দিন আমার অপমান তুমি কোর না।"

সে ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া বসিল এবং সহিসকে হাঁকাইতে বলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চঞ্চলা যখন গৃহে আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; হিরণ তখনও ফিরে নাই। সে মুখ হাত ধুইয়া বস্ত্র ত্যাগ করিল। তার পর বিছানায় যাইয়া শয়ন করিয়া রহিল। জুড়াইবার ইচ্ছা—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একটুখানি বিষ যে কোথায় ঢালিয়া পড়িয়াছে, তাহাই এখন শরীরময় সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে।

চোখের উপর আলো পড়িতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, ঝিটা আলোর সুইচটা টিপিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। গৃহের চারিদিক্‌কার বিলাস-সামগ্রী ঝক্‌মক্ করিয়া তাহার চোখে তখন জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। সে তাহাকে ধমক দিয়া ফিরাইল; বলিল, "তোরা সকলগুলি লোকে কি আমাকে জ্বালাতন না করে ছাড়্‌বি নে? নিবিয়ে দে আলো। আর বাবুকে বল্‌বি, খদ্দের ডেকে আলমারী-টালমারীগুলো বিক্রী করে ফেলে দিতে। দুটি প্রাণী—রাজ্যিশুদ্ধ জিনিষের দরকারই বা কি? ঝাড়্‌তে-মুছ্‌তে তোদেরও ত মেহনত কিছু কম হয় না।"

ঝি বুঝিল, ঠাকুরাণীর মগজটা কি কারণে তাতিয়া আছে। আলো নিবাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

এক-একদিন গৃহ-সজ্জার এক একটি মূল্যবান দ্রব্য আসিয়া পৌঁছিত, আর চঞ্চলা জনে জনে ডাকিয়া দেখাইত। সে সকল আজ অতি অকিঞ্চিৎকর ঠেকিতেছে। যে ঐশ্বর্য্য কমলার আচরণে সে অনুভব করিয়া আসিয়াছে, তাহার কাছে এ সকল কাঠ-পাথরের মূল্য কি? ইহার জন্য আজ আর তাহার অন্তরে কোন উদ্বেগই নাই। বরঞ্চ ভগিনীর সংস্পর্শে ধূলি-মাটির উপর যাইয়া শয়ন করিতে প্রাণ পাগল করিতেছে! সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল—আরাম পাইল না। স্বামী কাছে আসিলে যদি শান্তি পায়—এই আশায় দ্বারের দিকে পদশব্দ শুনিবার প্রতীক্ষায় সে কাণ পাতিয়া রহিল।

হিরণ আসিয়াই ঘরটি অন্ধকার দেখিল। সুইচটা টিপিয়া দিয়া খাটের উপর অল্প একটুখানি নজর পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, "আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানাটার উপর গড়াচ্ছিস্ নাকি রে!"

একটু নিকটস্থ হইলে সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, "তুমি না কি? আমি ভাবলুম, ঝি বুঝি—অন্ধকারে বিছানাটার উপর আরাম করে গড়িয়ে নিচ্ছে। গায়ে গহনা নেই—একখানা সাধারণ শাড়ী কাপড় পরেছ—চেনা যায়? ভাল ছিলে ত? কখন্ এলে? দেরী কর্‌লে কেন?"

চঞ্চলা তখন উঠিয়া বসিয়াছিল; বলিল, "একটু আগে।"

"গহনাগুলো কি হ'ল? দান করে এলে—না দেনা-পত্তর শুধ্‌তে দিলে?"

এরূপ চিন্তা স্বাভাবিক। কারণ মোটামুটি কতকগুলি গহনা কখনই সে গা-ছাড়া করিত না। তার পর বাড়ীর লোকেরাও অভাবের মধ্যে কাটাইতেছিলেন।

চঞ্চলা এ-কথার কোন জবাব করিল না। হলধরের গৃহে শোকের দিনে পাড়ার মেয়েদের চক্ষু এড়াইবার জন্য সেই যে মুড়ীসুড়ী দিয়া গহনাগুলি সে খুলিয়া ফেলিয়াছিল, আর তাহা পরে নাই। কিন্তু স্বামীর এ অনুযোগ কাণে বড় বিশ্রী শুনাইল। এই গহনা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্বাগ্রে বড়জায়ের অঙ্গেই উঠিবার কথা—তাহা সে পায় নাই। তার পর সেই সংসারেরই খোঁটা দিয়া এ-কথা কি করিয়া তিনি মুখে আনিলেন?

হিরণও আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল না। জিজ্ঞাসা

করিল, "বাড়ীর খবর কি? দাদার শরীর আজকাল কেমন? মা কেমন আছেন?"

সে অল্প-সল্প উত্তর দিল, "ভাল।"

ভৃত্য টেবিলের উপর দু' পেয়ালা চা রাখিয়া গেল। হিরণ এক পেয়ালা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল; অন্যটি পড়িয়া রহিল। হিরণ বলিল, "জুড়িয়ে গেল যে!"

"যাক্‌গে।" "খাবে না?" "না।" "কেন?"

"এই ত কত দিন খাই নি—কি হয়েছে তা'তে।"

হিরণ একটু বিস্মিত হইল। তার পর ভাবিল. যাক্, একটা নেশার বস্তু গেল—মন্দ কি? সে জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল কোথায়? তাকে ত দেখছি নে?"

"সে আসে নি।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? শরীরে ভাল আছে ত? এই ম্যালেরিয়ার সময় তাকে ফেলে রেখে চলে এলে?"

চঞ্চলা দেখিল, এতটুকু সহানুভূতি কাহারও কাছে যে পাইবে, সে আশা আর নাই। বিরক্তিতে তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে চুপ্ করিয়া রহিল।

হিরণ বলিল, "বেশ মা কিন্তু তুমি। দুটো না—দশটা না—একটিমাত্র ছেলে! দেশ ছেড়ে লোকে এ সময় পালায়, আর তুমি ব্যাধির মুখে ছেড়ে চলে এলে?"

চঞ্চলার আর সহ্য হইল না; রাগিয়াই সে উত্তর করিল, "তোমাদের ঘরের আরও ত ছেলে আছে সেখানে। তারা যদি বাঁচে—সেও বাঁচ্‌বে। কিন্তু তোমার প্রশ্নের আরও একটি জবাব ছিল। ভাই যদি সর্ব্বাবস্থায় ভাইকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে—মা কেন ছেলেকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না?"

চঞ্চলার আজিকার এ ব্যবহার যেমন আশ্চর্য্য তেমনি বেদনাদায়ক। একটা গোটা ইতিহাসের সমস্ত পৃষ্ঠাগুলিই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিচার করিতে সময় লাগে। আর তখনকার সে দিনও কি এখন ছিল? অনেক জড়তা অনেক বিস্মৃতি আসিয়া জড় হইয়া গিয়াছে। হিরণ বলিল, "কিন্তু আগে ত এক মুহূর্ত্তও গোপালকে ছেড়ে থাক্‌তে পারনি?"

"তা পারি নি। আজ পেরেছি কি না, ঠিক ধারণা কর্‌তে পাচ্ছি না। পার্‌লে বেঁচে যেতুম।"

হিরণ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তাকে রেখে আসার মানেটা কি?"

চঞ্চলা বলিল, "আমি জানি না। আমি তাকে রেখে আসি নি, সে নিজেই এল না। অধীরের সঙ্গে তার দেহের রক্ত একই। সেই রক্তের টানে যদি সে বাঁধা পড়ে থাকে, সে দোষ তারও না—আমারও না; যিনি এই রক্তের সৃষ্টি করেছেন তাঁরই।"

হিরণের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন ঘাম ঝরিতেছে। সে বলিল, "দোষ-গুণ যারই হোক্, ছেলেমানুষ সে ত বটে? তুমি মা—তুমি কেন ধমক দিয়ে তাকে আন্‌লে না?"

মায়ের সঙ্গে বাদানুবাদের তিক্ততায় চঞ্চলার অন্তর তখনও ভরিয়া ছিল। তার পর একটু অবকাশ সে পাইল না,—গৃহে এই দ্বন্দ্ব উঠিয়া পড়িল। যাহার কথা সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, সেই বড় জায়ের কথা একটি-বারও ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। সুধীরেরও খবর বলা হইল না। কেবল গোপালকে লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মায়ের সঙ্গে অনিবার্য্য সে দ্বন্দ্বের জন্য কতকটা প্রস্তুত ছিল; কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত কলহের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বরঞ্চ দীর্ঘকাল পরে তাহার এই মতানুবর্ত্তিতার দরুণ স্বামীর নিকটে একটু স্নেহের কণা তাহার মিলিবে, এই আশাই সে করিতেছিল। অসহ্য ক্রোধে ও বেদনায় পালঙ্ক হইতে নামিয়া মেঝের উপর যাইয়া সে গড়াইয়া পড়িল; এবং ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই কান্নার অবস্থায় সে বলিল, "যিনি রক্তে রক্তে ব্যবধান রাখেন নি, তাকে পৃথক করবার কি অধিকার আছে আমার? আমি কেন তিরস্কার করতে যাব? পার, তুমি যেয়ে নিয়ে এস।"

ইহার মুখের অনেক কাহিনী বহুবার হিরণ শুনিয়াছে। স্বামীর উপর কর্ত্তব্য—গৃহপরিজনের উপর কর্ত্তব্য—এ নীতি শিক্ষাও ইহারই নিকট সে পাইয়াছে। কিন্তু আজিকার এ নীতি সম্পূর্ণ অপরিদৃষ্ট হইলেও ক্ষতি ছিল না—যদি সহিবার পক্ষে সুপ্রচুর হইত। কলঙ্কের বড় চিহ্নটা বক্ষঃ-পঞ্জর ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া এই চঞ্চলাই যে একদিন নাড়িয়া চাড়িয়া চোখ ফুটাইয়া দেখাইবে—কে জানিত; বোধ করি সংসারে জ্ঞান সঞ্চয়ের ইহাই প্রকৃত পন্থা।

যাহা হউক চঞ্চলার আজিকার এই উক্তির ভিতরে

শ্লেষ ছিল না। ইহার ভিতরে তেজও ছিল—ভিক্ষাও ছিল। কিন্তু ইহা নির্ণয় করিবার জন্ম হিরণের অন্তরে পূর্ব্বের সে ধৈর্য্যও ছিল না—কাতরতাও ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে চঞ্চলা যখন মাথা উঁচু করিল, তখন দেখিতে পাইল, স্বামী কখন্ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চঞ্চলা সেই মেঝের উপর কতক্ষণ কাঠ হইয়া বসিয়া ছিল—মনে নাই। ঠাকুর যখন ভাতের থালা লইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার চেতনা হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় ?"

"তিনি নীচের ঘরে ফরাশের উপর শুয়েছেন। তাঁর ভাত সেইখানে ঢাকা দিয়ে রাখতে বল্লেন—তাই রেখে এসেছি।"

চঞ্চলা একটা নিশ্বাস ছাড়িল; বলিল, "আচ্ছা।"

ঠাকুর চঞ্চলার ভাত উপরের ঘরে চাপা দিয়া রাখিয়া গেল।

চঞ্চলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। এই কান্নার যখন শেষ হইল, তখন স্বামীর উপর সহানুভূতিতে তাহার অন্তর আবার ভরিয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে স্বামীর মতিগতি ত কোন দিনই এমন ছিল না। তাহারা মায়ে-ঝিয়ে মিলিয়া স্বামীকে যে পথে দেখিতে চাহিত, আজ যদি সেই পথে দেখিয়া কান্না পায়, সে জন্ম সে আজ দায়ী করিবে কাহাকে? দীর্ঘদিনের কত কত ক্ষুদ্রতা আজ বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বুকের ভিতর যেমন দগ্ধ করিতেছিল, তেমনি স্বামীর উপরকার পূর্ব্বক্ষণের সমস্ত রাগ তাহার জল করিয়া দিতেছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ—সকলে নিদ্রিত। চঞ্চলা ভূ-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ধীরে ধীরে কবাট খুলিল। তার পর নীচে নামিয়া যাইয়া, স্বামী যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

হিরণেরও ঘুম হয় নাই। প্রথমটা স্ত্রীর উপর আক্রোশে তাহার অন্তর জলিয়া রুখিয়াই ছিল। কিন্তু অত্যন্ত অতর্কিতে চঞ্চলা তাহার ধমনীর রক্তে যে রক্তের খোঁচা দিল, ইহার মধ্যে তখন এইটুকু আনন্দ ধরা দিতেছিল যে, যে রক্তের সম্মান সে নিজে রাখিতে পারে নাই—পুত্রই আজ সেই সম্মান রাখিয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিতেছে। কমলার কথা নাই বা ধরিলাম, অধীর ও সুধীর মরিল, কি বাঁচিল, কি ভাসিয়া গেল—এ সংবাদ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল সে লয় নাই।

হিরণ নির্জ্জীবের মত বিছানার উপর পড়িয়া ছিল। চঞ্চলা মৃদু পদক্ষেপে তাহার পার্শ্বে যাইয়া বসিয়া করাঙ্গুলীর দ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল। বলিল, "ঘুমুলে ?"

সে কোন উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার হাতখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে সে পড়িয়া রহিল।

চঞ্চলা বলিল, "তুমি বোধ হয় ভাবছ, আজ কি করে এ বিষ আমি ঢাল্‌ছি? কিন্তু এ কি বিষ? আমার আগের পাপটুকু যদি এর সঙ্গে মিশিয়ে না ধর্‌তে—নীচেরই ঘরে দারোয়ানদের পায়ের ধুলোর মধ্যে ঐ কোণটায় পড়ে তোমার ভাত আজ পচ্‌ত না।"

চঞ্চলার হাতের পোঁছার বন্ধনটায় অতিরিক্ত একটু চাপ পড়িল। কোন উত্তর সে পাইল না। সে বলিল, "তুমি বোঝ নি যে কি কান্না এই বুকে উঠেছে। আমার প্রাণের প্রাণবস্তু যেখানে—সেখানে আঘাত না কর্‌লে যে নিজকে শোধরাতে পারি নে!"

চঞ্চলা যে তাহার অসমাপ্ত ভোগের পথে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত তুচ্ছ করিতে শিখিল, ইহাতে প্রতি রোমকূপে আনন্দের সাড়া পড়ে। কিন্তু হিরণের দুঃখই হইল। সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলিতে না জানি ইহার কত ক্লেশই হইতেছে! হিরণ উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়েছ ?"

চঞ্চলা সে কথার উত্তর দিল না। বলিল, "ওপরে ভাত আছে—খাবে চল। এখানকার ও-ভাত খেতে দিতে পারি নে আমি।"

স্ত্রীর সঙ্গে উপরে যাইয়া হিরণ কিছু খাইল। চঞ্চলা কিছুই মুখে দিল না; খাটের উপর যাইয়াও শুইল না,—মেঝের উপর একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া রহিল। হিরণ তাহাকে কয়েকবার ডাকিল, সে নড়িল না। বলিল, "মনের ভুলে ঐ জমকাল বিছানাটায় একবার গড়িয়ে নিয়েছি। তার জ্বালা আমার এখনও যায় নি। যার প্রাণে যেটায় যখন বেশী আরাম পায়, সেইটেই ত তার কাছে দামী জিনিষ।"

হিরণ তাহার মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ স্বচ্ছ দর্পণের সাহায্যে চঞ্চলা তাহার আত্মার স্বরূপত্বের সন্ধান পাইল, যাহার ফলে তাহার সমস্ত গর্ব্বটা এমন তুচ্ছ হইয়া গেছে।

চঞ্চলা বলিল, "একটা কথা আমি তোমার কাছে জান্‌তে চাইছি। লজ্জা দেবার কারণে নয়—সন্ধি করার জন্যে। রাগ না কর ত বলি। এতদিন তুমি রাগ করেছ—আমিও মুখ ফিরিয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে এসেছি—এখন আতঙ্ক হয়।"

হিরণ বলিল, "লজ্জা আমার নেই চঞ্চল! হয় ত আঘাতই পাব। এই অল্পক্ষণের আলোচনায় আমি এখন ভেবে দেখ্‌ছি, সে আঘাতে আমার শ্রদ্ধাই হবে।"

চঞ্চলা একটা নিশ্বাস ছাড়িল; বলিল, "দিদির কথাই বল্‌ছিলুম। সংসারে তাঁর মত হতভাগিনী কে? সকলের খবর শুন্‌তে চাইলে—তাঁর কথাটাই জান্‌তে ভুলে গেলে!"

হিরণ কোন সাড়া দিল না, শুব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু এ কথা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গৃহের সকল ঘটনারই সঙ্গে চঞ্চলা শুধু পরিচয় করিয়া আসে নাই—দরদের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। হিরণের মুখ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তেমনি কাল হইয়াও গেল। সে বলিল,—"তাঁর সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব আমার ছিল। সে তিলে তিলে অতি বিশ্রী হয়ে গেছে। অনেক পা ভিন্ন পথে আমি বাড়িয়ে ফেলেছি। অতি সাধারণ নিয়মে যে প্রশ্ন তুমি আমাকে কর্‌লে, তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সাধারণ নয়—খুবই শক্ত।"

চঞ্চলা বলিল, "কিন্তু সে দায়িত্ব ত্যাগ করা আমার পক্ষে শক্ত। তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্কটা তোমরা দেখ্‌ছ, তা' ছাড়া আরও দুটো সম্পর্ক আমার আছে। গুরুরও সম্পর্ক—জাতিরও সম্পর্ক। অনেক অপমান তোমরা তাঁকে করেছ। আমি এতটা জানতুম না যে, আমাদের জাতিটা এত বেশী ঘুমিয়ে পড়ে আছে, আর তোমরা জড়পিণ্ডের মত তাদের নিয়ে যা' তা' খেলা কর্‌ছ। যেদিন তোমাদের ঘরে এই কাণ্ড ঘটে গেল, সেদিন সমাজের মেয়েরা ধোপা-নাপিত বন্ধর মত—তোমাদের হাঁড়ী বেড়া ছেড়ে দিলে না কেন, আমি তাই ভাবি।" কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "ভুলের ঘরে একটা মাদুরের কাঙাল সে—আর আমাকে তুমি ঐ পালঙ্কের উপর উঠে শুতে বল্‌ছ?"

তাহার চক্ষু দিয়া মুক্তাধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বর ক্রন্দনে জড়াইয়া সে বলিয়া চলিল, "তাঁর মর্য্যাদা আমাকে রাখ্‌তেই হবে। কলঙ্ক নিয়ে আমি তাঁকে যেতে দেব না। তুমি সাহস দাও ত আমি পার্‌ব।"

দেওয়ালের ঘড়ীটায় পর পর তিনটি আঘাত বাজিল। বিড়ালটাও হিরণের ভুক্তাবশিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া শয্যার এক কোণে যাইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে। চঞ্চলার এই পর্য্যাপ্ত আলোচনার মধ্যে হিরণ শুধু দৃষ্টি স্থির করিয়া শুষ্ক চোখে বসিয়া রহিল। চঞ্চলা বলিল, "তুমি আমার একটি কথারও জবাব দিলে না। সে আমার পক্ষে একরকম ভালই হল। পুরুষ লোকের ওষ্ঠ নড়্‌তে দেখ্‌লে আমার এখন ভয় হয়। এত অত্যাচারও আমাদের এই দেশে আছে, আমি জানতুম না।"

হিরণ বলিল, "রাত অনেক হয়েছে—তুমি শোবে না?"

একটু আগেই যে 'ঠং' 'ঠং' করিয়া ঘড়িটা কয়েকবার শব্দ করিয়া গেল, তাহা চঞ্চলার কাণে আসে নাই। সে চাহিয়া দেখিল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। বলিল, "তুমি শুয়ে পড়, রাত আর নেই।"

এই বলিয়া সে উঠিয়া যাইয়া আলো নিবাইয়া দিল এবং পুনর্ব্বার ঘরের মেঝের সেই মাদুরটার উপর আসিয়াই শুইল। পৃথক শয্যায় থাকিয়া সেই নিষ্ফল অন্ধকারের মধ্যেও সে আবেদন জানাইল যে, "কতদূর কি তোমার কাছে চাইব আমি—জানি না। কিন্তু সর্ব্বস্ব পণের কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে। অধীর আর গোপালের কাছে বড় কি? এদের বুকে ধরে সকল রকম তুচ্ছ ফাঁকই পূরণ করা যায়।"

এ প্রশ্নেরও জবাব আসিল না। অন্ধকারের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া প্রশ্নটি শুধু বাজিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চঞ্চলা স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গোপালগঞ্জে হলধরের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় নরেশের সে খোঁজ করিয়াছিল—পায় নাই।

মায়ের কাছে এবার সে বিদায় লইতে যায় নাই।

তিনি রাগের ভরে একদিন ইহাদের ব্যাঙ্কের খাতাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছিল। এখন সমস্ত টাকাটাই সে তুলিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

হলধরের গৃহে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে সে হরসুন্দরীর নিকটে গেল। তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া সে বলিল, "মা! আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে আমার ভরসা হয় না। কিন্তু এমন সাহসের জায়গাই বা আমার আর কোথায় আছে?"

হরসুন্দরী বলিলেন, "যেদিন একলাটি এই মন্দিরে এসে উঠেছি, সেদিন আমি নিঃস্ব হয়েই এসেছি মা! আমার কি আছে যে তোমাকে তাই দিতে পারি? তোমার চেয়ে বড় বৌমার আমার কাছে অধিক কিছু পাবার অবস্থা ঘটে গেছে। কিছুই দিতে পারি নি মা! এমনই নিঃস্ব আমি।"

চঞ্চলা ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "সেই কথা ভেবেই আপনার পায়ের ধূলো নিতে এসেছি আমি। আপনি আমাকে একটু আশ্রয় দেবেন না?"

হরসুন্দরী বলিলেন, "তুমি আমাকে অল্পই জান। যারা জানে—তাদের পর্য্যন্ত আমার মনের কষ্ট কোন দিন জানাই নি। কিন্তু আগের যাত্রায় তুমি যে পাপের সংসারে পা না তুলে দুলের পুণ্যের ঘরে বাস করে গেলে, সে খবরও ত আমি জানি।"

এ বড় অতিরিক্ত ইনি দিতেছেন। কুণ্ঠায় সে মুখ নীচু করিয়া ফেলিল।

হরসুন্দরী বলিলেন, "আমার দোষ দিও না মা! ছেলেরা যখন সমর্থ হয়, তখন সংসার তাদেরই হাতে চলে যায়, এই এখনকা'র সাধারণ রীতি হয়েছে। আমি জিদ করে বৃথা অপমান কিনতে পারি নি। কিন্তু ভাগ্যে আমার অপমানই ছিল। আমি যে ঘর ছেড়ে চলে এলাম—সেটাও তারা ছোট করে দেখ্‌লে।"

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থানটি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিলেন না। তার পর চঞ্চলা ঘাড় আরও নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার একটু দয়া পেলে এই লাঞ্ছনা বোধ করি আমি থামিয়ে দিতে পারি।"

ক্ষণকাল বধূর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার দয়া-টয়া কিছু নয়। আমারও বিশ্বাস, ইচ্ছা কর্‌লে তুমিই থামিয়ে দিতে পার। ছেলেরা বৌ গেলে বৌ পায়—তাই তাদের দরদ এত কম। তুমি ত মেয়ের জাতি—তোমার গায়ে যে আঁচড় লেগেছে সে ত ঐ নূতন বৌটির দ্বারা পূরণ হয় না। তারা যাই করুক, তুমি যে তাঁকে স্মরণ করবে, এ কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়; স্মরণ না কর্‌লেই আশ্চর্য্যের হ'ত।"

স্মরণ অনেক কালই করা হয় নাই। চঞ্চলা ইঁহার বলিবার ভঙ্গী কোন্ দিকে, গ্রহণ করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

হরসুন্দরী বেদনা দিতে কিছুই বলেন নাই। যেদিন হইতে এই মেয়েটির উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেইদিন হইতেই ইহার সঙ্গ প্রার্থনা মন্দিরের ঠাকুরটির কাছে তিনি অনেকবারই করিয়াছেন। কিন্তু চঞ্চলা ইঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া আর কথা বাড়াইতেও সাহস করিল না। সে একেবারে মূল প্রশ্নই তুলিয়া বসিল। বলিল, "মা! আপনি দিদির হাতে খেয়েছেন দেখেছি। কলিকাতায় সে অনুমতি আমিও একবার পেয়েছি। দুলের ঘর বলে আপনি কি আমাদের কাছে যাবেন না? আমি আপনাকে নিতে এসেছিলুম।"

হরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "প্রশ্নটি খুবই নূতন, বৌমা! কারণ এমন সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। হলধর আমাদের জাতি নয়—জ্ঞাতি নয়। যদিও তার হাঁড়ির ভাত আমি খেতে যাচ্ছি নে, তবুও আমি বিধবা মানুষ ত বটে। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিজের মনে প্রশ্ন করি, তার পরে জবাব দি, এমন একটু ধাঁধাও যে আজ আমার অন্তরে নেই। হলধরের গৃহে যদি যেতে না পারি—গ্রামের কোন্ কুলীন বামুনের ঘরে যেতে পারি, তুমিই আমায় বলে দাও না বৌমা? সে যাক্—কি ভরসায় তুমি বুক বাঁধ্‌লে কিছুই ত শুনা'লে না?"

চঞ্চলা শুধু মুখ নীচু করিয়া জানাইল,—"ভয় কি মা! টাকা আছে।"

ভয়ই হইল।

চঞ্চলা চাহিয়া দেখিল, ইঁহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হরসুন্দরী কিন্তু কোন তর্ক তুলিলেন না। মেয়েটির

মনে যে সদিচ্ছা জন্মিয়াছে, ইহাকে কিছু সময় সহজ পথে চলিতে দেওয়াই ভাল। নচেৎ ইহার মন অবশ হইয়া পড়িতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে হয় ত নিজেই সে নিজের গতি ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

ইহার পর সে কিরণ এবং ইন্দুকেও যাইয়া লইয়া আসিল এবং বৃহৎ এক ভোজের আয়োজনের ফর্দ্দকারাক করিতে বসিয়া গেল। হরসুন্দরী তখনও বাধা দিলেন না, তাহার মনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

নরেশের জন্য কেবল চঞ্চলার প্রাণে স্বস্তি ছিল না; কমলাও তাহার ঠিকানা বলিতে পারে নাই।

আসিবার কালে বিধুকেও সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বিধুকে মাথায় রাখিয়া হলধরই ছোট বধূর ইঙ্গিত মত প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া খাটিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে একটা ময়দান ছিল। সেখানে বড় বড় ছাপ্‌ড়া ঘর—নিমন্ত্রিতদের বিশ্রাম এবং আহারের জন্য নির্ম্মিত হইল। তা'ছাড়া রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর—এ সকলেরও নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। হলধরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা আসিয়া শরীর জল করিয়া খাটিতেছিল, জন মজুরও নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

কিরণ ভাল-মন্দ কিছুই বলেন নাই; হিরণ সুধু বলিয়াছিল, "কারও কাছে মত নিলে না—এই আয়োজন তুমি কচ্ছ—ভাত পচিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে না কি?"

চঞ্চলা বলিয়াছিল, "মা যখন এসেছেন, তখন তাঁর মতও আমি পেয়েছি; আর কারও মত নেবার সময় আমি এখনও বুঝি নি। তোমরা এক কেলেঙ্কারী করেছ—আমিও না হয় আর একটা করি। কিন্তু আমার কাজে তুমি বাধা দিতে পারবে না।"

হিরণ আর কিছু বলে নাই।

কমলা ইহার অপেক্ষায় ছিল না।

গৃহে যখন লোকজন বাড়িয়া গেল, তখন তাহারা দুই জায়ে ছেলেদের লইয়া একটা বারাণ্ডায় শুইত। ইন্দু আর হরসুন্দরী ঘরেই শুইতেন; কিরণ ও হিরণ বাহিরের ঘরে শুইত।

চঞ্চলা শয়নঘরে আসিয়া দেখিল, কমলা বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। চোখের জলে বালিস ভিজিয়া যাইতেছে। সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কেন কাঁদ্‌ছ দিদি! তোমাকে কাতর দেখ্‌লে যে আমি পাগল হয়ে যাই।"

কমলাও তাহাকে দুই হাতে বুকে টানিয়া লইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না।

চঞ্চলা বলিল, "কি হয়েছে একটু তাড়াতাড়ি বল তুমি। সত্যি—আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছি নে।"

অতি কষ্টে অশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া কমলা বলিল, "শেষটা কি বিবেকের কাছে এই আদেশ পেলি ভাই? আমাকে আত্মহত্যাই করাবি তুই?"

তাহার মাথাটা আরও ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—কি কর্‌লুম আমি?"

আরও কাঁদিয়া—আরও কাতর হইয়া—সে বলিল, "সেবার পাড়ার লোক ডেকে এনে একজন আমার অপমান করালে, আর এবার তুই দেশশুদ্ধ লোক জড় কর্‌বি?"

চঞ্চলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর তাহার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, "তুমি ভুল ধারণা করেছ। আমাকে তুমি বোঝ নি; কিন্তু আমি ত তোমাকে জানি। তোমার অপমান আমি কর্‌তে পারি?"

কমলার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে জিজ্ঞাসা করে,—তবে এ সকল কি! কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আজিকার মত এই সামান্য আলোচনাও কাহারও কাছে কোন দিন সে করে নাই। আজি যেটুকু বলিল, ইহারই মধ্যে যেন নিজের অনেকখানি গৌরব সে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—এই চিন্তায় ও ব্যথায় চঞ্চলার ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে হলধর হরসুন্দরীর পায়ের কাছে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল; সে বলিতেছিল, "মা! তোমার কাছে বসে তিন ছিলুম তামাক পোড়ালাম। ছোটমা যে কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, তা'তে সকাল বেলাটায় এতখানি ছুটি আমার নেই। একটা

কথা আমি তোমাকে নিবেদন করে যাই। বড়বাবু আর ছোট বাবুকে মনে করে যেন ঘা মেরে বোস না মা! আবার একটা খিচুড়ী পেকে যাবে। দম্ভ তানাদের ত চূর্ণ হয়ে গেছে। ধর্ম্মের কাছে দম্ভ কতক্ষণ থাকে মা? একবার আশ্চয্যি কাণ্ড দেখ, মা একটু নড়ে বস্‌লেন না—সবগুলিকে কাছে ধরে টেনে আন্‌লেন। বুঁচির মারও কি ভাগ্যির জোর কিছু কম? ঘরে বসে আপনাদের সকলগুলি লোকের পায়ের ধূলোও নিলে, সে কি হলধরের পুণ্যে মা? অত জোরের কপাল ব্যাটা ছেলের হয় না মা!"

এই সময় চঞ্চলা আসিয়া হরসুন্দরীর কাছে বসিল; বলিল, "বেলা কতখানি হয়ে গেছে বাবা! এখনও বসে বসে তামাক টান্‌লে এদিককার কাজকর্ম্ম যে সব মাটি। এদিকে যা' যা' করবার বাকী, আর কাকেও দেখিয়ে দাও, তোমার এখন অন্য কাজ আছে।"

হলধর হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "দেখ্‌লে মা, হলধরের পুণ্যি যদি কিছু থাকে ত এই। এত বড় হুকুম পাল্‌তে পারি আর না পারি কাণে শুনেও পরিতোষ আছে। যে কাজ তুমি করেছ ছোটমা,—এ বুড়ো হাড় কখানা তোমার পায়ে বাঁধা রেখে যদি আজন্মকাল খেটে যাই, তোমার ঋণের শোধ কর্‌তে পার্‌ব না মা!"

কমলা নিজের দুঃখ কষ্ট একমাত্র সহিষ্ণুতার দ্বারাই স্থিতির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিত। তাহার অন্তরে যে নিদারুণ ব্যথা জাগিয়া আছে, তাহা তাহার কথাবার্ত্তা বা আচার-ব্যবহারে কিছুমাত্র বুঝিতে পারা যাইত না। কিন্তু সকলের বড় যে ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্মই যে তাহার চিরদিন একটা ভিত্তিহীন কলঙ্কে আবৃত হইয়া থাকিতে চলিল, জাতিতে খাটো হইলেও হলধরের নিকটে ইহা দুর্ব্বোধ্য ছিল না। ইহার কারণটা যত তুচ্ছ—লজ্জাটা ত তত তুচ্ছ নয়। তাহার নিজের কোন হাতই ছিল না। কিন্তু কমলার কাছে আসিলে অপর যা' কিছু চিন্তা সকলই সে হারাইয়া ফেলিত। সে বলিল, "আর কি কাজ আমার শুন্‌তে বাকী আছে বলে ফেল মা! বিধুবাবুকে কল্‌কাতায় পাঠালে—মাথাওয়ালা ছেলে বটে! আমরা শুধু খাটুতেই জানি মা! তোমার রান্নার ঘর—ভাঁড়ার ঘর—খাবার ঘর—কি কেতাদুরস্ত করে তৈরি করালেন, দেখ্‌লে তারিফ লেগে যায়। ঐ রকম একটা লোক হাতের মুষ্টিতে পেলে তোমার সব কাজ আমি এক নিশ্বেসে তুলে দিতে পারি।"

গ্রামের একজন আসিয়া খবর দিয়াছিল যে, নরেশ হাত পা-ভাঙ্গিয়া হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। সেইখানে সে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। তাই কমলার কোলের ছেলেটির মৃত্যু সংবাদ দিয়া, অবিলম্বে তাহাকে একবার আসিবার জন্য বিধুকে চঞ্চলা কলিকাতায় পাঠাইয়াছে।

হলধরের কথার প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "এদিক্‌কার কাজ ত সংক্ষেপ হয়ে উঠেছে। বিধু-ঠাকুরপো নেই, তা আর কি করা যাবে। আর কাকেও দেখিয়ে-শুনিয়ে দাও।"

হলধর বলিল, "আবার কি কাজ তুমি চাপাচ্ছ, সে হুকুমটা ত এখনও হয় নি মা!"

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "ক'খানা গ্রাম নিয়ে তোমাদের সমাজ বাবা!"

"চার গণ্ডা ত বটেই। তা' ছাড়া দু'তিন ঘর লোক বাস করে এমনও দু' চারখানা গাঁ আছে।"

চঞ্চলা বলিল, "আস্‌ছে মঙ্গলবারেই ত খাওয়ানর দিন ঠিক করা গেছে। এরই মধ্যে সকল গ্রামগুলিতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আস্‌তে হবে, কেহ যেন বাদ না যায়।"

হলধরের চক্ষু দুটি কপালে উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "তাদেরও কি খাওয়াতে হবে মা? বামুন কায়েতের ভোগটা ত আগে হওয়া চাই।"

চঞ্চলা বলিল, "আমাদের উপর তাঁদের দয়া নেই। তাঁদের আর আমরা নাড়্‌ব না।"

হরসুন্দরী জানিতেন, অন্ততঃ কিছু সময় থাকিতে বধূটি তাহার সঙ্কল্পের খবর একবার দিবেই দিবে। এখন তিনি দেখিলেন, হলধরের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া বধূটি যত কিছু না খুঁজিতেছে, তাঁহার পায়ের দিকে দৃষ্টি নত করিয়া এই ইচ্ছার সবখানি মীমাংসা সে জানিয়া লইতে চাহিতেছে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা জ্ঞাপনের এই মৃদু চক্ষু দুটি তাঁহার অন্তরের কোণে তখন আনন্দের একটুখানি বিপ্লবও তুলিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা তোমার প্রয়োজনের প্রথম উদ্যম—না শেষও বটে!"

চঞ্চলা বলিল, "আপনি যদি অনুমতি করেন, আমাদের এই মহা মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রয়োজনের

শেষ হয়ে গেছে মা! হলধরের এই বাড়ীটাই সে মিলনের তীর্থ-ভূমি। তাই স্মরণ রাখার জন্যে এই আয়োজন করা গেছে।"

হরসুন্দরী নিশ্বাস ছাড়িলেন; বলিলেন, "ভাল কথা। আর কাকেও তুমি ডাক্‌তে চাও না—পেতেও চাও না?"

চঞ্চলা ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "আবশ্যক কি? তাঁদের ডেকে দিদিকে কি আর এক দফা যাচাই করাতে বস্‌ব? আমি ত পুরুষ নই মা!"

হরসুন্দরী আর কথা বলিলেন না; সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন।

হলধর তখন উঠিয়া যাইয়া ঘর হইতে একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিখানা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা! আমি চল্‌লাম। লোচন ঠাকুর আর লটুবাবুকে ডেকে আনি গিয়ে। নৌকোর গুড়োই ত তানারা। মা ছেলেমানুষ! বুদ্ধি-শুদ্ধি আর কতই পেকেছে! তানাদের সঙ্গে তুমি একটা নিষ্পত্তি করে ফেল। দুলে বাগ্দী খাওয়ালে তানারা চটে যাবে। মায়ের একটা কিনেরা হবে না। আমার কথা শোন মা! ভীমরুলের চাকে আর ঘা দিও না।"

হরসুন্দরী বলিলেন, "না হলধর! তোমার জাত্-জ্ঞাত যাঁরা আছেন তাঁদেরই তুমি বলে এসগে! ও-সকল লেজ নাড়ানাড়ি আর সহ্য হবে না। বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে ত তা'কে? ছোট-বৌমা যদি এঁদের ডাক্‌তে পাঠাতেন, তোমার ঘর ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হ'ত।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

শ্বশ্রূর অনুমতি পাইয়া চঞ্চলা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। মাছ, তরকারী, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ভারে ভারে ঘরে আসিয়া জমিতে লাগিল। গ্রামের সকলে অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সকল লক্ষ্য করিতেছিলেন। হিরণ যে বিলক্ষণ ধনী হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা বেশ অনুভব করিতে পারিতেছিলেন; এবং ভ্রাতৃ-জায়াকে ঘরে তুলিয়া লইবার জন্য প্রচুর অর্থের সদ্‌গতির দ্বারা এবার যে তাঁহাদের মান-মর্য্যাদা রাখিতে প্রস্তুত হইতেছে, ইহার জন্য মিষ্টান্নের প্রতি যেমন তাঁহাদের লালসা বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেইরূপ তাঁহাদের অসীম ক্ষমতার বিষয় এত দিন পরে হরসুন্দরীও যে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলেন, এই আনন্দে তাঁহাদের অন্তরও নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে যখন সদ্ব্যয়ের পরিবর্ত্তে অসদ্ব্যয়েরই সঠিক খবর তাঁহারা পাইলেন, তখন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য নানা স্থানে আবার তাঁহাদের সভাসমিতি বসিয়া গেল।

হাঁসপাতালের এক ডাক্তারের নিকট সন্ধান পাইয়া বিধু এবার নরেশকে গ্রেফতার করিয়া বসিল। সে তখন সুস্থ হইয়া বাসায় আসিয়াছে।

বিধুকে অতি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না; সুধীরের দুঃসংবাদ অবগত হইয়া সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সহিত বাড়ীতে চলিয়া আসিল।

তাহারা যখন গৃহের সম্মুখীন হইল, হলধরের ছাপড়া ঘরে তখন ভোজের পাতা পড়িয়া গিয়াছে। দূর হইতে এই সকল বড় বড় ধর এবং ভিতরে জনকোলাহল শুনিয়া নরেশ প্রথমটা বেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি কাণ্ড বিধু?"

বিধু সকলই জানিত; শুধু হলধরের জাতি-গোষ্ঠীরা খাইতেছে, ইহাই সে জানিত না। সে এখন আর কিছু গোপন করিবার আবশ্যকতাও বোধ করিল না। বলিল, "ছোড়্‌দা বাড়ী এসেছেন। বৌঠান্‌কে ঘরে নেবার জন্যে বোধ করি একটা প্রাচিত্তির টিত্তির কি হচ্ছে।"

নরেশ সেইখানে দাঁড়াইয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু তখন জলিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের ঐ কদর্য্য স্থানটার দুর্গন্ধের সমস্তটা যেন ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক্‌কার হাওয়া কলুষিত করিয়া তাহার প্রাণ অকস্মাৎ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রায়শ্চিত্ত কে কর্‌ছে? তোদের সমাজের ধুরন্ধররা—না বড়-বৌ? নিজেদের দোষ কোন কালে তাদের চোখে পড়েছে—যে তা'। কর্‌বে? বড়-বৌই কর্‌ছেন। এই মিথ্যে অপবাদ এতগুলো লোকের সাম্‌নে আজ তাঁকে স্বীকার করে নিতে হল? এই দেখ্‌তে তুই আমাকে টেনে আন্‌লি হতভাগা? আর ছোট ভাইটের বুঝি পয়সার জোর হয়েছে, তাই দেখাচ্ছে? দু-দুবার প্রাণের জোর দেখাবার সুযোগ তার চলে গেছে, সে খবর কে রাখে? মা কোথায়?"

"তিনিও এসেছেন।"

"দাদাও এসেছেন? অষ্ট-বজ্রের মিলন হয়েছে! ওঃ! ভাল। কিন্তু তুই যাই বলিস্, মা কিন্তু এদের এই কাণ্ড

দেখে এক সময় পালিয়ে গেছেন—আর নয় মূর্চ্ছো গিয়ে ধড়ে প্রাণ নেই—তুই বাড়ী গিয়ে ছ্যাগ্‌গে।”

বিধু দেখিল, নরেশ যে পথে আসিয়াছিল, পিছু ফিরিয়া সেই পথে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, “যাচ্ছ কোথায় মেজদা?” নরেশ উত্তর করিল না, পায়ে তখন সে খুবই জোর দিয়াছে।

বিধু দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিল। সে তাহাকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়া ছাড়িয়া দিল—এত বড় একটা দুর্ব্বলতার খবর কি করিয়া সে দিবে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিধু তাহাই ভাবিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ময়রার দোকানে কিছু সন্দেশ পাইতে বাকী ছিল। কিরণ লোক সঙ্গে লইয়া সেগুলি আনিতে গিয়াছিলেন। একটা চৌমাথার কাছে আসিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, নরেশ যেন ঝড়ের বেগে নদীর ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। মাথায় ছাতা নাই—ঘর্ম্মে সমস্ত দেহ ক্লেদসিক্ত হইয়া গিয়াছে। কি একটা কাণ্ড ঘটাইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে মুখ দেখিয়া ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, “কে যায়—নরেশ না?”

নরেশ ফিরিয়া দেখিল; দাঁড়াইয়াও গেল। বলিল, “হাঁ দাদা! আমি। দাঁড়ান একটিবার, পায়ের ধূলোটা নিয়ে যাই।” এই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল এবং অগ্রজের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল; বলিল, “আমি চল্‌লাম তা'হলে।”

যেমন বলা—তেমনি চলা—তার আর দেরী ছিল না। কিরণ বলিলেন, “শোন—শোন—বিধু তোমাকে আন্‌তে গিয়েছিল না?”

“হাঁ। কিন্তু কেন আমাকে দেরী করাচ্ছেন? তাতে আপনারই বিপদ বেশী। যাঁদের জন্যে মণ্ডা নিয়ে যাচ্ছেন—দেরী দেখ্‌লে হয় ত তাঁরা পাতা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে আর এক কাণ্ড করে বস্‌বেন। আটে-ঘাটে কুল বেঁধে ভাইয়ের সঙ্গে আলাপের লোভে আবার তা' ভেঙ্গে দেবেন? আপনি যান্—দেরী কর্‌বেন না।”

কিরণ তাহার রাগের কারণ এইবার অনেকটা বুঝিলেন; বলিলেন, “মণ্ডা যাঁদের পাতে দেবো, তাঁরা গোলমালের লোক নন্। তুই একটিবার শুনে যা—বুঝে যা। তোকে একটিবার চোখ্ মেলে দেখ্‌বার অবকাশ দে। আমার প্রাণ যে কেঁদে মরে যাচ্ছে!”

নরেশ ফিরিয়া আসিল; বলিল, “এমন নিরুপদ্রবের মানুষ তুমি কোথায় খুঁজে পেলে দাদা?”

কিরণ তাহাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; বলিলেন, “আঃ! বাঁচ্‌লাম! আমার ভাই তুই—আর এতবড় বুক তোর—আমাকে একটু ভাব্‌তে সময় দে—অত তাড়াতাড়ি করিস্‌নে।”

নরেশ বলিল, “কিন্তু তুমি যে খুব বড় কাজেই ব্যস্ত। ভাব্‌বার তোমার অবসর কৈ? আমাকে ছেড়ে দাও দাদা! কাজ মিটে গেলে যদি সময় পাও, ভেবে দেখো, আমি কত ছোট। বড় হ'লে তোমাদের বড় বড় কাজে সায় দিতে পার্‌তুম।”

কিরণ বলিলেন, “আমি কাঁদ্‌ব—না তোর কথার জবাব দেব। তোকে পেতে কত কান্না বুকে জড় হয়ে রয়েছে—আমি পার্‌ছি নে ভাই দম ফেটে যাচ্ছে।”

এই বলিয়া তিনি তাহার স্কন্ধদেশে মাথা রাখিলেন। একটু দম লইয়া বলিলেন, “অনেক অপমানই আমি তোদের করেছি। আর কর্‌ব না। আমার কথায় বিশ্বাস কর্, বাড়ী চল ভাই! সব জান্‌তে পারবি।”

নরেশের চোখের পাতাদুটি তখন ভিজিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, “আমি তোমার কতবড় নিষ্ঠুর ভাই, তুমি জান না। তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু দু'জনার মান-অপমান বোধ এক জায়গায় মেলে—এই বিশ্বাসটুকুই আমার হয় না। কাদের তুমি খাওয়াচ্ছ না বল্‌লে ত যেতে পারি নে দাদা?”

কিরণ বলিলেন, “তোর কিছুমাত্র ভয় নেই নরেশ। আমাকে তুই ভয় করিস্—কিন্তু আমার বিচারে কিছুই হয় নি। ছোট বৌমাই সব কচ্ছেন। মা-ও রয়েছেন। হলধরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের তাঁরা খাওয়াচ্ছেন।”

নরেশের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, “কিন্তু বিধু যে বল্‌লে—”

"সে জানে না। বিধু চলে যাবার পর তাঁদের এ মতলব আমরা জানতে পেরেছি।"

নরেশের মুখ দিয়া কথা সরিল না; সুধু নিশ্বাস বহিয়া বহুদিনের সঞ্চিত একটা বড় দুর্যোগ যেন কাটিয়া গেল।

কিরণের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ব্যাগ হাতেই সে ভোজের খোলাটে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কি পরিতোষ পূর্ব্বক ইহারা আহার করিতেছে এবং কত রকমের উৎকৃষ্ট আহার্য্যই ইহাদের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। আনন্দে তাহার অন্তঃকরণ নৃত্য করিয়া উঠিতে লাগিল।

কে কি পাইল না পাইল হলধর পাতায় পাতায় যাইয়া তদারক করিয়া বেড়াইতেছিল। নরেশকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল; বলিল, 'দণ্ডবৎ হই মেজো বাবু! আপনি এলেন, এখন যজ্ঞি পূর্ণ হলো। আপনার জন্যেই প্রাণ টাটাচ্ছিল। মা আমার ভাগ্যিবতী কি না একবার দেখুন। ছোট মা সবই ভাল করলেন, কেবল আমার মাথাটাই নীচু করে দিলেন।"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"নটুবাবু আর লোচন ঠাকুর ভাবছেন,—হলধর কেবল আপ্তজনই চিনলে।"

নরেশ বলিল, "ঠিকই করেছেন তিনি। তিনি যে তোমাদেরই চিনেছেন। অচেনা লোকের কাছে যেতে বিপদেরও ভয় আছে।"

এই সময় গোপাল আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; বলিল, "পথে ঘাটে আপনার কষ্ট গেছে, চান্ করবেন আসুন। মা আপনাকে ডাকছেন।"

নরেশ তাহাকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইল; বলিল, "এদের খাওয়াটা দেখি আগে, তার পর তোমার মাকে গিয়ে আশীর্ব্বাদ করব।"

গোপাল তাহার ক্রোড়ের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে আনন্দধ্বনি সহকারে যখন খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল, তখন নরেশের চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে।

নরেশ গৃহে আসিলে চঞ্চলা তাহাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং আসন পাতিয়া দিয়া গাড়ু গামছা ও একখানা পাখা সেইখানে রাখিয়া দিল। নরেশ বলিল, "মা! আশীর্ব্বাদ কি করে' করে আমি মুখে বলতে জানিনে।" হরসুন্দরীর পদধূলি লইয়া সে কহিল, "বৌমার আশীর্ব্বাদটা আমার হ'য়ে তুমি করে দাও মা! ওঁর যা' প্রাপ্য ততটুকু দেবার শক্তি কেবল তোমারই আছে। কিন্তু ওঁকে তুমি রাজরাণী হতে বলো না মা! ওঁর ক্রোড়ের প্রসারতা দিন দিন বাড়ুক, আর সংসারে তিল পরিমাণ স্থানও যাদের দুষ্প্রাপ্য তারাই ওঁর ক্রোড়ে এসে আশ্রয় পাক্, এই রকমের একটা বড় আশীর্ব্বাদ তুমি ওঁকে কর।"

শ্বশ্রূর কাণের কাছে মুখ লইয়া চঞ্চলা মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কিছুই করি নি মা! উনি অকারণে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। আপনার দেহের রক্তটুকু ত বড় সাধারণ নয়। সেই রক্তেই ত গোপালের জন্ম। দেশে আসবার জন্য গোপালের বায়না যদি আপনি দেখতেন! আপনাদেরই রক্তে রক্তে টান ধরে গেল। আর সেই পুণ্যে আপনাদের পায়ের ধূলিটাও আমি মাথায় পেলুম।"

হরসুন্দরী বলিলেন, "বেটির অত্যাচার একবার ত্যাখ্ নরেশ! নিজের পাওনা-গণ্ডাটা পর্য্যন্ত এই বুড়ো মানুষটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। এত বোঝা আমি বই কি করে?"

চঞ্চলার দ্বারা যে সকল কার্য্য ঘটিল, ইহার অন্তরালে যে সঙ্কল্পটি ছিল তাহা এত স্পষ্ট যে, সে সম্বন্ধে কেহ কোন দিন শুনিতে চাহেন নাই। শুধু হরসুন্দরীর সঙ্গে আলোচনার কালে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সংসারের এই বড় মিলনের পরে সম্ভ্রম দিয়া অন্য কোন মিলন তাহারা চাহে না। সেই সঙ্কল্পমত তাঁহারা দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া বাড়ীর সকলগুলি লোক হলধরকে সঙ্গে লইয়া যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিতেছেন, সেদিন নটবর দিগম্বর প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকগুলি আসিয়া তাঁহাদের পথ আগুলাইয়া ধরিলেন।

শেষ

বীরবলের পত্র

(১)

Like most people, I do not myself understand physics, and I never shall. But no one can read the books of Professor Eddington without feeling his imagination profoundly stirred.

G. Lowes Dickinson.

So much in praise of science. It does not follow that we must adopt the very poor philosophies, which scientific men have constructed: the notion that the real is what can be weighed and measured, and that our higher interests are a kind of luminous haze floating above the real world and unable to affect it at all, is very bad philosophy, and theology is quite right to protest against it. It would leave us with no art, no religion, and no science either. The eternal and absolute values are at least as much parts of reality, as atoms and electrons.

Dean Inge.

শ্রীমান দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে, "বিজ্ঞানের দুর্মতি"-শীর্ষক যে খোলা চিঠি লিখেছেন, এবং যে পত্র 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, সে চিঠির খোলা-জবাব গুপ্ত মহাশয়ই দেবেন; কারণ, উক্ত পত্রের উত্তরে তাঁর নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে, অন্ততঃ কৈফিয়ৎ হিসেবে। আর সে কৈফিয়ৎ তিনি সন্তোষজনকরূপেই দিতে পারবেন।

এ বিষয়ে আমারও একটি কথা বলবার আছে। সে কথাটি এই: উক্ত চিঠিতে দিলীপকুমার আলোচনা বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়েছেন। এ আলোচনার বিষয় আর যাই হোক্, আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দ্বন্দ্ব নয়। তা যে নয়, তা পরিষ্কার করে বোঝাতে হলে এই সব খোলা চিঠি-চাপাটির জন্ম-কথা বলা প্রয়োজন। আমি সংক্ষেপে এ আলোচনার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত করছি।

গত বৎসর বোধহয় কার্ত্তিক মাসের উত্তরা-পত্রিকার মারফৎ, শ্রীমান দিলীপ বীরবলের বরাবর একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি পাঠান। সে চিঠিতে তিনি এ যুগে বিজ্ঞানের ট্রাজেডির ব্যাখ্যান করেন। আজকাল যাকে নব-ফিজিক্স বলে, তা যে Newtonএর প্রবর্ত্তিত সনাতন ফিজিক্স-এর ধাত বদলে দিয়েছে, এই ঘটনাকেই শ্রীমান দিলীপ বিজ্ঞানের ট্রাজেডি মনে করেন। এ চিঠির কি উত্তর দেব, তা' আমি প্রথমে ভেবে পাইনি।

যাকে বলে নব ফিজিক্স, তার সর্ব্ব-প্রধান কথা দুটি হচ্ছে quanta ও relativity। এখন বীরবল যদি এ দুটি কথা নিয়ে কোনরূপ বাগ্-বিস্তার করেন, তা'হলে তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে—এই হচ্ছে বীরবলের চূড়ান্ত রসিকতা। শুনতে পাই যে পরা-গণিতের পারগামী না হলে, ও দুই শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। যাঁরা পরা-গণিতের মুখ্য আচার্য্য, তাঁদের কাছেও না-কি ও অঙ্ক অসহ্য। শ্রীমান দিলীপের দার্শনিক গুরু Bertrand Russell বলেছেন যে, যে-গণিতের উপর Relativity প্রতিষ্ঠিত, সেই tensor calculus হচ্ছে intolerably technical।

অপরপক্ষে বীরবলের কাছে অঙ্কের তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত, তার প্রমাণ তার literatureএ taste আছে।

(২)

তারপর ভেবে দেখলুম যে, শ্রীমান দিলীপ ও-চিঠি তাঁর গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী বন্ধুদের না লিখে যে আমাকে লিখেছেন, তার কারণ শ্রীমানেরও literatureএ taste আছে। উপরন্তু তিনি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল যে, নানা

বিষয়ে অনধিকারচর্চ্চা করবার বদ অভ্যাস আমার আছে। যথা, আমি সঙ্গীতশাস্ত্রে অব্যবসায়ী হয়েও সঙ্গীতের বিষয়ে উচ্চবাচ্য করি; ঋজুপাঠ প্রথম ভাগের বিদ্যে নিয়ে হর্ষচরিতের আলোচনা করি। এর কারণ, আমি শাস্ত্রী নই, সাহিত্যিক মাত্র। আর এই সব অনধিকার-চর্চ্চার দরুণ, শাস্ত্রীমহাশয়রা আমার প্রতি হয় চোখ রাঙান, নয় ঠোঁট বাঁকান। তাঁরা ভুলে যান যে, আমি তাঁদের এলাকায় ট্রেস্‌পাস্ করিনে। এ সত্য কি স্পষ্ট নয় যে, যেখানে শাস্ত্রের আরম্ভ সেইখানেই সাহিত্যের শেষ; অথবা যেখানে সাহিত্যের আরম্ভ সেইখানেই শাস্ত্রের শেষ? তা ছাড়া, যে কাজ একবার করা যায়, তা আর একবার করতে বাধে না। শ্রীমান দিলীপের চিঠি পাবার পূর্ব্বে, আমি ভারত-রোমক সমিতিতে "ফ্রান্সের নব মনোভাব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, এবং সে প্রবন্ধ বিচিত্রা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে আমি এই বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করি। আর আমার বিশ্বাস, শ্রীমান দিলীপ যে-সকল বৈজ্ঞানিক আচার্য্যের বচন তাঁর পত্রে উদ্ধৃত করেছেন, আমি তাঁদের সকলেরই নাম উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করি; যেহেতু তাঁদের নামজাদা পুস্তকাবলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বই আমি হাতে পেলেই পড়ি, সে বই বুঝি আর না বুঝি। যেমন কলম হাতে পড়লেই লেখবার প্রবৃত্তি কারও কারও পক্ষে অদম্য হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি বই হাতে পড়লে তা পড়বার প্রবৃত্তি দমন করতে পারিনে। ইংরাজরা বলে "যত খাও তত ক্ষিদে বাড়ে"। পড়বার ক্ষিদে আমার উক্ত কারণে বেড়ে গিয়েছে। সে যাই হোক্, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমি ইউ-রোপের যে নব মনোভাবের প্রতি বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, শ্রীমান দিলীপও তাঁর পত্রে সেই একই মনোভাবের ব্যাখ্যান করেন। সুতরাং শ্রীমান দিলীপের পত্রপাঠমাত্র আমি উত্তরা-পত্রিকার মারফৎ তার প্রাপ্তিস্বীকার করি। আমার আশা ছিল যে, এই সুযোগে আর পাঁচজন বিশেষজ্ঞ এ আলোচনায় যোগ দেবেন। বিলেতের ছাড়া কাপড় পরে' মনোরাজ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ানোটা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আর সে ভূভাগে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনোভাব যে গতকল্যের মনোভাব বলে গণ্য হচ্ছে, সে কথাটা আমাদের শিক্ষিত-সমাজকে শোনানো মন্দ নয়, এই ধারণাবশতঃই আমি উক্ত পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে সাহসী হই।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আমার অনুরোধে এ আলোচনায় যোগ দেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি বিচিত্রা-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এবং তারই জবাবে, শ্রীমান দিলীপের খোলা চিঠি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছে।

এ আলোচনার জন্মকথা ও ইতিহাস বিবৃত করলুম। এখন এ আলোচনার যথার্থ বিষয়টি কি, তা পরিষ্কার ও পরিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এবং এ পত্রে আমি এ আলোচনার খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এ পত্র এ আলোচনার উপসংহার স্বরূপে গণ্য করতে পারেন, না হয়ত উপক্রমণিকা হিসাবে।

(৩)

শ্রীমান দিলীপ অতুলবাবুকে সম্বোধন করে লিখেছেন যে—

"আপনার আর একটা যুক্তির সারবত্তা বা পয়েণ্ট আমি কিছুতেই ধরতে পাচ্ছিনে। আপনি বলেছেন স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে, পরের এলাকায় যে ট্রেস্‌পাস্ করেছে, সে বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন।"

আমারও বিশ্বাস পরের এলাকায় অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্রে যে অনধিকারপ্রবেশ করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে, সে science নয়; scientific philosophy। তা যদি না হত ত আমরা এ আলোচনায় কোন্ সাহসে যোগ দিলুম?—এ জ্ঞান আমাদের আছে যে, আমাদের পুরোনো physicsএর জ্ঞানও যদ্রূপ, নব physicsএর জ্ঞানও তদ্রূপ। গাছ থেকে যে মাটিতে আপেল পড়ে, তার নাম যে gravitation, এই জ্ঞানই আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমা। অপরপক্ষে philosophy নিয়ে বকাবকি করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। কারণ মানুষমাত্রেরই অন্তরে একটা-না-একটা ফিলজফি থাকে, সে ফিলজফি যতই কাঁচা, যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। সম্ভবতঃ এই অস্পষ্টতাই হচ্ছে ফিলজফির বিশেষত্ব। কারণ ফিলজফি চিরকালই জিজ্ঞাসা, কস্মিনকালেও মীমাংসা নয়। তাই এক যুগের মীমাংসা আর এক যুগের জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে।

নানাপ্রকার খণ্ডজ্ঞান নিয়ে মানুষের মন সুখী হয় না,

তদুপরি বিশ্বের একটি অখণ্ড জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং এই প্রবৃত্তি থেকেই ফিলজফির জন্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে, ভক্তিযোগে স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরও সমান অধিকার আছে; তেমনি এই ফিলজফি নামক বিদ্যায় অ-দার্শনিকদেরও অধিকার আছে। এই বিশ্বাসে আমি এ আলোচনার আসরে নামতে সাহসী হয়েছি।

(৪)

বৈজ্ঞানিক-দর্শন বলেও যে একরকমের দর্শন আছে, এবং সে দর্শন বহুলোকের অন্তরঙ্গ হয়েছে, আমাদের এ অনুমান যে সত্য, তা রাসেল মহোদয়ের কথাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছি; কারণ শ্রীমান দিলীপের মতে উক্ত লেখকের কথাগুলি অত্যন্ত "সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ।" রাসেলের কথাগুলি এই :—

On the one hand, we all depend upon scientific inventions and discoveries for our daily bread, and for our comforts and amusements.

On the other hand, certain habits of mind connected with a scientific outlook, have spread gradually during the past three centuries, from a few men of genius to large sections of the population

Sceptical Essays.

এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথাগুলিকে আমি আরও সংক্ষিপ্ত করছি, আশা করি তাতে তাদের গর্ভস্থ সার নষ্ট হবে না। রাসেলের বাক্যের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, বিজ্ঞানের দ্বে ফলে অমৃতোপমে একটি হচ্ছে "যন্ত্র", অপরটি "মন্ত্র"। আর বিজ্ঞানের এই মন্ত্রভাগের নামই scientific philosophy। এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও এ দর্শনের মোহে অজ্ঞান হওয়া যায়, যেমন এ যুগে "large sections of the population" হয়েছে,—শুধু বিলেতে নয়, এ দেশেও।

(৫)

Whitehead, Eddington প্রভৃতি এ যুগের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ও অঙ্কজ্ঞানীরা তাঁদের নব মত প্রচার করে যে রাসেল সাহেবের daily bread, comforts and amusements কেড়ে নেবেন, এ ভয় তিনি পান না; কারণ তিনি Eddingtonএর Nature of the Physical World নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে—যাক্ Science machineএ থাকবে—সোভানাল্লা! এ অবশ্য ঠাট্টা। কারণ যন্ত্র গড়া যে Science-এর অবরকর্ম, এ জ্ঞান রাসেল সাহেবের পুরোমাত্রায় আছে। Scienceএর অপর ফল, "certain habits of mind connected with a scientific outlook"—সাদা কথায় scientific philosophyর প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্যেরা যে বিমুখ হয়েছেন, এতেই রাসেল সাহেব যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উক্ত বিজ্ঞানাচার্য্যদের প্রতি উপহাস স্পষ্টহাসি বটে, কিন্তু কষ্টহাসি।

এই Scientific philosophy জিনিষটে কি? এই বিরাট ও বিচিত্র বিশ্ব—যায় আমাদের মন ও প্রাণ—যে matter ও motion এর যোগবিয়োগের ফলে উৎপন্ন হয়েছে, এই সত্য হচ্ছে এ দর্শনের প্রথম সূত্র। আর পরমাণুর যোগাযোগ যে ঘটে motionএর হালচালের ফলে, এবং তার পদ্ধতি যে mechanical, তা physics হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে। এক কথায়, এই বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শনের নাম হচ্ছে Modern materialism। আর এ দর্শন যে এ যুগের লোকায়ত দর্শন হয়েছে ("large sections of population"এর গ্রাহ্য) তার কারণ এ দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা অতি সহজ; কেননা তা common sense অর্থাৎ লৌকিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। Matter ও motion আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত। আর যন্ত্রের ধর্ম্মের না হোক্ কর্ম্মের আমরা সকলেই পক্ষপাতী। কারণ যন্ত্রশক্তির প্রভাবেই মানুষে রূপকথার রাজ্যকে বাস্তব করে তুলেছে। তাই এই যন্ত্রের যাদুই বহু লোককে scienceএর মন্ত্র মুগ্ধ করেছে।

(৬)

এখন এ কথা সকলেই জানেন যে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। কিন্তু এ বিশ্বাসের জবাবদিহি করতে হলেই তর্ক করতে হয়। কাজেই philosophyমাত্রেই হয় religionএর অনুকূল, নয় প্রতিকূল। এখন materialism নামক

philosophy যে religionএর পরিপন্থী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতীতেও materialism religious মনোভাবের সহায় ছিল না, বর্ত্তমানেও হতে পারে না। কি শৈব ধর্ম্ম, কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম, কোনটাই চার্ব্বাক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে বেদান্ত দর্শনের উপর; অন্ততঃ বেদান্ত দর্শন ও সব ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। চার্ব্বাক দর্শন হচ্ছে সেকেলে materialism, এবং বেদান্ত দর্শন হচ্ছে চিরকেলে idealism। Materialismএর মতে সৃষ্টির মূল ধাতু হচ্ছে matter, আর idealismএর মতে spirit।

এখন এ কথা অবিসম্বাদী যে, মানুষের প্রকৃতি অনুসারে এ দুয়ের মধ্যে একটি-না-একটি তার মনঃপূত হয়। দর্শন বিষয়েও লোকের রুচি ভিন্ন। সে রুচির ধাত লজিক বদলাতে পারে না, কারণ এই উভয় দর্শনই লজিকের ছুরিতে অকাট্য। বহুকাল পূর্ব্বে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বলে গিয়েছেন—"দুরুচ্ছেদং হি চার্ব্বাকস্য চেষ্টিতম্"। অপরপক্ষে আজ ইউরোপীয় দার্শনিকরা বলছেন যে, idealism নামক দর্শন is logically irrefutable। এ সত্ত্বেও কেউ বা spiritকে বলেন ধোঁয়া, কেউ বা আবার matterকে বলেন মায়া।

আচ্ছা, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এই idealismই আমার মন স্বচ্ছন্দে অঙ্গীকার করতে পারে। Spirit যদি ধোঁয়াও হয় ত, সে ধূম পান করে' আমার মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে; অপরপক্ষে পরমাণুর ছাতু আমার মনের অন্নও নয়, পথ্যও নয়। মনের ও-খোরাক আমার ধাতে সয় না। অবশ্য ফিলজফির ক্ষেত্রেও একদল ছাতুখোর আছেন, যাঁদের William James বলেন tough-minded, অর্থাৎ খোট্টা। দুঃখের বিষয় আমি সে জাতির লোক নই।

এখন আমি যতদূর বুঝি, এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা, পরমাণুকে চিরে-চিরে আবিষ্কার করেছেন যে, তার অন্তরে matter নেই—আছে শুধু বিদ্যুৎগর্ভ মহাশূন্য। এর ফলে মানুষের মনের উপর materialismএর চাপ যে কমে যাবে, তা অবশ্য নয়; কিন্তু সে materialism আর scientific থাকবে না। Scienceএর জ্ঞান বিন্দুমাত্র না থেকেও যে ঘোর materialist হওয়া যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং চার্ব্বাক। প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিকরা কিছু না জেনেও সব জানেন।

(৭)

Idealism চিরকালই দর্শন হিসেবে religionএর আত্মীয়। আর যেহেতু এ যুগের বিজ্ঞান, materialismকে নিজের কোলে আর আশ্রয় দিচ্ছে না, তখন বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে idealist হবার কোনও বাধা নেই। আর বাধা নেই বলেই অনেক বৈজ্ঞানিক Idealismকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ধর্ম্মজ্ঞানের যম, এমন কথা আর জোর করে বলছেন না। ইদংএর জ্ঞান অহংজ্ঞানের অথবা আত্মজ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি না, এ সন্দেহ সেকালের দার্শনিকদেরও ছিল। শঙ্কর এই কারণেই, প্রধানবাদ ওরফে সাংখ্য দর্শনের উপর লজিকের তলওয়ার চালিয়েছিলেন।

এখন Science বলতে আমরা একমাত্র Physics বুঝিনে; Biologyও science, এবং Psychologyও science। গত শতাব্দীতে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, মন ও প্রাণকে যতদিন Physicsএ পরিণত না করা যাবে, ততদিন Psychology ও Biology যথার্থ science হবে না। কারণ matter এবং motionএর বহির্ভূত অপর কোনও সত্তা কিম্বা শক্তি যে থাকতে পারে, সে ধারণা তাঁদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁরা mindকে matterএ, এবং lifeকে motionএ মিলিয়ে দিতে পারেন নি। অর্থাৎ তাঁদের হাতে পড়ে ও দুই বস্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়নি। Mind matterকে বাবা বলতে কিছুতেই রাজি হল না। মানুষের মাথার ব্রেন যে matter, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এবং mindএর সঙ্গে যে brainএর সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। অতএব mind হচ্ছে matter-এর সূক্ষ্ম শরীর—এই ছিল গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মত। Matterএর স্থূল শরীরই হোক আর সূক্ষ্ম শরীরই হোক, উভয়েই যে matter, তা ত মোটা বুদ্ধির লোকরাও অস্বীকার করতে পারেন না;—অতএব যার নাম matter তারই নাম mind, এ সত্যটা প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ রয়ে গেল। Quantity সূক্ষ্ম হলেই যে তা Quality হয়—এই ছিল গত শতাব্দীর পণ্ডিতী ধারণা। এরকম কথা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, এ জ্ঞান এ যুগের psychologistদের হয়েছে। ফলে mindকে এখন আর কেউ in terms of matter বর্ণনা করেন না। Mind বলে যে একটি স্বতন্ত্র জিনিষ

আছে, যার কোনও explanation নেই, এই কথাটা মেনে নিয়ে তারই description হচ্ছে নব Psychology। যা স্বতঃসিদ্ধ তার আবার প্রমাণ কি ?

(৮)

তারপর biologistরাও আবিষ্কার করলে যে, life অর্থাৎ প্রাণকে Physicsএর গণ্ডীর ভিতর বন্দী করা যায় না। অর্থাৎ প্রাণের গুণাগুণ সব Physico-chemical lawএর সাহায্যে explain করা যায় না।

প্রাণীমাত্রেরই দেহ আছে, আর সে দেহটি matter ও motionএর যোগে গড়া। কিন্তু যাকে আমরা প্রাণ বলি, সে বস্তু যন্ত্র নয়—যন্ত্রী। এ যন্ত্রী, দেহ নামক যে বস্তু গড়ে, তা machine নয়—organism। সুতরাং modern materialismএর দ্বিতীয় সূত্র,—mechanismএর সাহায্যে প্রাণীর দেহের সৃষ্টির রহস্যও ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাণের কার্য্যের ভিতর purpose আছে, পরমাণুর উদ্দাম লীলার ভিতর নেই।

তারপর matterএর মূল ধাতু পরমাণুও এ যুগে Physics হাত ফস্কে গিয়েছে। এখন পরমাণু আর একটি ছোট্ট নিরেট গোলা নয়,—যা নিয়ে Physicistরা বিশ্বসৃষ্টির খেলা খেলতে পারেন। Atom হচ্ছে একাধিক electronএর একটি পরিবার মাত্র। আর এ সব ইলেক্ট্রনের পরস্পরের সম্পর্কও অতি দূর সম্পর্ক, আর এ পরিবারের মধ্যে আছে সুধু ঘোর অশান্তি। এই বেয়াড়া পরিবার কখন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে, তারও ঠিক নেই।

আগে যাকে ভাবতুম পরমাণু, তা এখন দেখছি হাঁ-ইলেক্‌ট্রিসিটির সঙ্গে না-ইলেক্‌ট্রিসিটির ভাব আর আড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন এই সব বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী ইলেক্‌ট্রাণুরা পদার্থ নয়; হয় তারা তেজকণা, নয় ত অশরীরী শক্তিবিন্দু—সম্ভবতঃ গণিতবিদের idea মাত্র। যদি তাই হয় ত বিশ্বের মূল ধাতু idea—বাহ্যবস্তু নয়; অর্থাৎ তা মনোগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এক কথায় Physics এখন অঙ্কের অন্তরে লীন হয়েছে। আর যা নিয়ে গণিতের কারবার, সে হচ্ছে আগাগোড়া idea,—কোন বস্তু নয়। যদি সত্যই তা হয়ে থাকে ত, এ যুগের বিশ্ব পদার্থ দিয়ে গড়া নয়, equation দিয়ে গড়া; অর্থাৎ science যে বিশ্ব গড়েছে, সে একরকম মানসী সৃষ্টি। অর্থাৎ matterএর পিছনে যা আছে, তার নাম mind। সংক্ষেপে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ছিল caterpillar, এ যুগের বিজ্ঞান হয়েছে butterfly। ভূচর যে খেচর হয়েছে, এ অবশ্য tragedy নয়। কারণ মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠা ব্যাপারটা উর্দ্ধগতি,—অধোগতি নয়। এ অবস্থায় scienceএর সঙ্গে religionএর বিরোধ সম্ভবতঃ কমবে, কারণ religionও গগন-বিহারী।

(৯)

অবশ্য এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, materialism নামক দর্শন লোকের মন থেকে একেবারে মুছে যাবে। মানুষমাত্রেরই দেহও আছে, মনও আছে। আর দেহ বস্তুটা যতটা ধরাছোঁয়া যায়, মন নামক পদার্থ ততটা নয়, কারণ মন আকাশের মতই উদার ও সীমাহীন। দেহ থেকে যে মনের জন্ম,—এ ভুল মানুষে যুগে যুগে করবেই। সুতরাং idealismএর পিঠপিঠি materialismও চিরকালই দেখা দেবে। Modern materialism অপদস্থ হয়েছে অথবা হচ্ছে বলে যে future materialism আবির্ভূত হবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারেন না।

গত শতাব্দীতে physics metaphysics হয়ে উঠেছিল; এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, পদার্থবিদ্যা পরাবিদ্যা নয়, অপরাবিদ্যা। এবং ও বিদ্যার চাবিতে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। তা যে যায় না, তা Sir James Jeansএর সদ্যোজাত পুস্তিকার নামেতেই প্রকাশ। এ পুস্তিকার নাম হচ্ছে The Mysterious Universe; যদিও Jeans এই বিরাট বিশ্ব ও তার অন্তর্গত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইলেক্‌ট্রাণুর সকল গূঢ় তত্ত্বই জানেন।

আমার শেষ কথা এই যে, এ আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এই কথাটা শোনানো যে, materialismএর আর যে গুণই থাক—তা scientific নয়। Scienceএর প্রতি ভক্তি আমার অচলা, কারণ আমার বিশ্বাস science হচ্ছে মানববুদ্ধির অজর ও অমর কীর্ত্তি। তবে বিজ্ঞানভক্ত হলেই যে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এ জ্ঞান হারাতে হবে, তার কোন

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী

(২৮)

অভ্যাস! অভ্যাস! সব দিকে সব ব্যাপারে অভ্যাসের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইতেছে। অনভ্যাসের কাছে কেহই মাথা নোয়াইতে চায় না; এবং যত বড় গুরুতর প্রয়োজনই হউক, অভ্যাসের প্রভুত্ব কেহই অবহেলা করিতে পারে না। একাগ্র অন্তরে ব্রহ্মচিন্তার শক্তি যে অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয়,—মাতালের মদ্যাসক্তি, লম্পটের বেশ্যাসক্তি, বিষয়ীর বিষয়াসক্তি, সংসারীর সংসারাসক্তিও সেই অভ্যাসের দ্বারা গঠিত!

ব্রহ্মচারী গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিলেন, এমন কি যাহা ভাবা তাঁর উচিত নয় বলিয়া মনে করিতেন, সেই অতীত—এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধেও অনেক কিছু ভাবিলেন। শেষে অভ্যাসের টানে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতেই কখন সব ভুলিয়া ইষ্ট-মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন যথাসময়ে ঘুম ভাঙিল এবং যথানিয়মে নিত্য-ক্রিয়া সারিয়া ব্রহ্মচারী যখন বাহিরে আসিলেন, তখন দেখা গেল, ঠিক নিত্যকার নিয়মমত ব্রহ্মচারিণী জল-খাবার সাজাইয়া লইয়া রোয়াকে বসিয়া আছেন। তিনি পূর্ব্বেই আহ্নিক পূজা সারিয়া আসিয়াছেন।

পদশব্দে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া সহজভাবে বলিলেন, "এই যে বেশ চল্‌ছ। আজ ব্যথা নাই?"

ব্রহ্মচারী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁর মুখ-ভাব আজ স্বাভাবিক; এবং দৃষ্টিতে সেই পরিচিত চিন্তাশীল ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিন্ত চিত্তের মাঝে সহসা কি অভিমান ফেনাইয়া উঠিল কে জানে, ব্রহ্মচারী ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "আর আমার পায়ের দিকে নজর দিতে হবে না। যা করছ, কর। তুমি যে কি পদার্থ, তা কাল তোমায় চিনে নিয়েছি। নিজে ত গোল্লায় গেছই,—এবার তোমার দিকে চোখ রাখ্‌তে গিয়ে আমায় শুদ্ধ গোল্লায় যেতে হবে না কি?"

এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিল না। জলখাবারের পাত্রটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিত-মুখে বলিলেন "নিবেদন করো।"

ব্রহ্মচারী আসনে বসিলেন। নিবেদন করিয়া সরবতের গ্লাশটা প্রথমে এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া নামাইলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "থাক্, এবার ধাতে এসেছ ত? এখন মনের সুখে খানিক ঝগড়া-ঝাঁটি করা যাক্, কি বল?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন "ব্রহ্মচারি, জাগর্ত্তি কো?"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বলিলেন "'যো সদসদ্ বিবেকী!' কিন্তু এর মধ্যে 'শিবোঽহম্' বলে চুপ মেরে যাওয়া ত পছন্দের ব্যাপার বলে মনে করছি না। বিশেষতঃ কাল তুমি যে কাণ্ড করেছ, তার প্রতিশোধ নেওয়া চাই। গীতায় সেই যাকে বলেছে—'আসুরিক ভাব' সেই অবস্থাটা দিনকতক উপভোগ করাই এখন আমার দরকার। নইলে তোমায় জব্দ করবার সুবিধে হচ্ছে না।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "উপভোগ? ছিঃ, কথাটা ভাল হোল না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা নয় ত কি? ভোগ? তাতে যে কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে বিচার-বুদ্ধি আশ্রয় করে চল্‌তে হবে। উপভোগের পথে ত সে বালাই নাই। দু চক্ষু বুজে, দিব্বি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়ে চল্‌লেই, ব্যস্! এমন চলা চল্‌ব যে তুমিও তারিফ করে বল্‌বে 'বাঃ'!"

নিরুদ্বিগ্ন মুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আচ্ছা, যখন তারিফ্ করা-করির সময় আস্‌বে, তখন মনে থাকে ত আট্‌কাবে না। এখন উঠি?"

বাধা দিতে উদ্যত হইয়া, ব্রহ্মচারী সহসা থামিলেন। বলিলেন "আচ্ছা যাও। জল খেয়ে এস। কিন্তু তার পর একবার আমার ঘরে এসে বসো। গোটাকতক কথা আছে।"

"আচ্ছা" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী খাওয়া শেষ করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারিণী নিজের কম্বল আনিয়া চৌকাঠের বাহিরে পাতিয়া বসিলেন। বলিলেন "কি বল্‌বে, বল।"

ব্রহ্মচারী ঘরের মেঝেয় কম্বলে বসিয়া সামনে একখানা বই রাখিয়া গম্ভীর মুখে কি ভাবিতেছিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া চোখ তুলিলেন, বলিলেন "কোথা বস্‌ছ? বাইরে রোদের ঝাঁজ,—ঘরে এসে বসো না।" বলিয়াই গত রাত্রের কথা মনে পড়িল। গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া পরিহাস-ভরে বলিলেন "বল, অভ্যাস নাই!"

ব্রহ্মচারিণী শান্ত মুখে বলিলেন "অভ্যাস ত নাই ই। তা ছাড়া এখনো এত মাতব্বর হয়ে উঠি নি যে সব নিয়মের বাইরে যাওয়াটা সহ্য হবে। দেহ-মনের স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে—যা রয়, সয়, সেইটুকু ধরে চলাই ভাল।"

কথাটা সহজ, কিন্তু ইহার মধ্যে কোথায় যে একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু ব্রহ্মচারী সহসা গোপন মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। যে মান-অভিমানকে তিনি চিরদিন দুপায়ে মাড়াইয়া চলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেই অভিমানই সহসা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত ফণা উদ্যত করিল। ক্ষণেকের জন্য অধোমুখে স্তব্ধ থাকিয়া, কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিয়া বলিলেন "আমিও স্বামী, সেটা মনে আছে?"

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, চপল পরিহাসের ভিতর দিয়া এমন কথা ব্রহ্মচারী কতবার বলিয়াছেন; কিন্তু আজ যেমন করিয়া বলিলেন, এমন ভাবে কখনও বলেন নাই। ব্রহ্মচারিণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ ব্রহ্মচারীর আনত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে বলিলেন "এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে জেগেছে, তা বুঝতে পারছি। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে গেলে, অনেক তর্কই করা যায়; কিন্তু মুখের কথায় এ তর্কের মীমাংসা হতে পারে না। অন্ততঃ যে রকম ধরণে অত্যুক্তি করলে তুমি মনে করবে, এতেই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল, সে রকম অতিরঞ্জিত করে কথা বলার অভ্যাস আমার নাই। আমি সমস্ত তর্ক-বিতর্কের প্যাঁচ এড়িয়ে সোজা কথা বলছি,—আমি অনিচ্ছায় হোক, অজ্ঞানে হোক, কোথাও যদি তোমার শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে থাকি,—ভাল! আমি অপরাধ স্বীকার করছি, আমায় ক্ষমা করো।"

ব্রহ্মচারী লজ্জিত হইলেন। অন্তরের লুক্কায়িত ভুজঙ্গের মাথায় এক পদাঘাত করিয়া তার উদ্যত ফণা নোয়াইয়া দিলেন। ম্লান হাস্যে বলিলেন "কি পাপ! আমি কি তোমায় ক্ষমা চাইবার জন্যে ডেকেছি? আর আমিই বা তোমায় ক্ষমা করবার কে? যদিও বাঙালীর ঘরে জন্মেছি, কিন্তু স্বামীগিরির চাকরীতে এত পরিপক্ক হই নি যে, কথায় কথায় নিজেকে জুতোর ঠোক্কর মেরে মনে পড়িয়ে দেব যে আমি স্বামী, অতএব অন্ন বস্ত্রের মূল্যে তোমার ইহ-পরকালের সব কর্ত্তৃত্ব-ভার আমি কিনে নিয়েছি,—এত অহঙ্কারের ভার আমি বইতে পারব না। বরঞ্চ ওই গোবরার মার ঠাকুদ্দা টাকুদ্দার গলায় যদি মালা দিতে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারীর ঘরের দেয়ালে আটকানো ঘড়ির দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সাড়ে সাতটা বাজ্‌ল। বাজে কথা ছেড়ে দাও। কি দরকারী কথা আছে, বল।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বার দুই ঢোঁক গিলিয়া ব্রহ্মচারী খুব নিম্ন-স্বরে বলিলেন "কাল ও-রকম অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলে কেন? এ কি স্নায়ুবিকার, না মস্তিষ্ক-বিকলতা?"

মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারিণী দৃষ্টি নত করিলেন। যেন নিজের কি একটা অতি প্রিয় জিনিস, অপ্রিয় দৃষ্টির আক্রমণ হইতে লুকাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘাড় হেঁট করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন "হতে পারে। কিন্তু আজ বোধ হয় আমায় প্রকৃতিস্থই দেখ্‌ছ? সে কথা আর কেন?"

"ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে হচ্ছে।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সন্ন্যাসীকে ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে নেই। ভবিষ্যৎকে—ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দাও।"

"পূরো সন্ন্যাসী হলে তাই করতুম্‌। কিন্তু এই যে অর্দ্ধেকটা সন্ন্যাস, অর্দ্ধেকটা সংসার—এতে মুস্কিল হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত কি না তাই ভাবছি।"—বলিতে

বলিতে ব্রহ্মচারী হাসিলেন। বিদ্রূপের সুরে বলিলেন "শেষ পর্য্যন্ত বরাতে সন্ন্যাস টিকবে কি সংসার টিকবে, তা ত বুঝতে পারছি নে।"—এবং কণ্ঠস্বর আরও তরল পরিহাসের অঙ্কে এক পর্দ্দা নামাইয়া বলিলেন "ভাখো—ভদ্রলোকের মত সাধু ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি,—সেই যে লাফিয়ে মগডাল ধরার উপমাটি আমার ওপর চালাতে,—সেটা এবার তোমায় মনে পড়িয়ে দেবার সময় এসেছে। বেশী বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। শেষ পর্য্যন্ত হাতটি ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসব—সেইটে কি ভাল কথা ?"

কথাটা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন জবাব না দিয়া ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তরে মৃদু হাসিলেন।

সহসা উৎসুক উত্তেজিত কণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন "কে বলেছিলেন বল ত,—'ওপর দিকে ওঠ্‌বার সময় মেয়েরাই আগে ওঠে, কিন্তু নীচের দিকে নামবার সময় পুরুষরাই আগে নামে।'—কার কথা ?"

মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বিবেকানন্দ স্বামীর। দেববাণী ভাখো—বোধ হয় ওতেই পাবে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "থাক দেববাণী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বয়ং টিকি ধরে নাড়া দিচ্ছে—"

বলিতে বলিতে কি মনে পড়ায় হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হইলেন। অন্যমনস্ক ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "শক্ত্যানন্দ স্বামীও বলেন যে, এক শ্রেণীর মেয়ে আছে, যারা ভয়ানক এক-রোখা। ভালর দিকেই হোক, মন্দর দিকেই হোক, চরমে যাবার সঙ্কল্প করে এরা একবার যেটা ধরে, সেটা থেকে তাদের টলানো মুস্কিল। আর এক কথা—মন্দর দিকে যারা চরমে যায়, ভালর দিকে তারাই চরমে যেতে পারে।"

ব্রহ্মচারিণী মাথা হেঁট করিলেন। চিন্তিত মুখে একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন "হুঁ। তার পর ?"

"তার পর আর কি ?"

"আর এক শ্রেণীর মেয়েদের সমালোচনা সুরু করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ঠাট্টা হচ্ছে ?"

ব্রহ্মচারিণী অবিচলিত শান্ত স্বরে বলিলেন "তোমার শক্ত্যানন্দ স্বামী নানা শ্রেণীর মেয়েদের ঠিকুজি কুষ্ঠি চষে বেড়িয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা অলৌকিক। যাদের টলানো মুস্কিল, তাদের কথা ত শুনলাম। যাদের টলানো সহজ, তাদের সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বজ্ঞান দান করো। তুমি তাঁর শিষ্য—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমি তাঁর শিষ্য ?"

"শাস্ত্র-মতে তাঁকেই শিষ্য বলা হয়, যিনি গুরুভক্ত। স্বামিজীর মতবাদগুলা নির্ব্বিচারে ভক্তি-ভরে গলাধঃকরণ যখন করছ, তখন শিষ্য বলাটা কি ভুল হয়েছে ? তার পর ? স্বামিজীর অভিচার-টভিচার কি কতদূর এগুল ? খবর পেলে কিছু ?"

ব্রহ্মচারীকে রাগ জানাইবার অবকাশ মাত্র না দিয়া অকস্মাৎ এই যে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বর্ষণ করা হইল, ইহাতে যথার্থই ব্রহ্মচারী চমকিয়া উঠিলেন। একে বহির্জগতের ব্যাপারে তিনি কাণ ও মন দিতেন অল্প, তার উপর শক্ত্যানন্দ স্বামীর ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি মনে মনে তাঁহাকে যা মনঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। যদি বা অন্য চিন্তার ভিড়ে মিশিয়া কিছুক্ষণের জন্য সে দুঃখটা ভুলিয়াছিলেন, আবার খোঁচা খাইয়া তাহা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আজ তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারিলেন না। ক্ষণেকের জন্য শুব্ধ থাকিয়া, নিষ্ফল-ক্ষোভ-পীড়িত কণ্ঠে বলিলেন "শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের ভুলের জন্যে কি আমাকে জবাবদিহি করতে হবে ? তাহ'লে বিন্দের দুশ্চরিত্রতার জন্যেও আমি দায়ী ? তা যদি হয়, তাহলে তার উপপত্নী-গুলোর মূর্খতার জন্যে তুমিও অপরাধী !"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। পূর্ব্বের মতই শান্তস্বরে বলিলেন "হাঁ, আমি যদি তাদের মূর্খতাকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম 'বাঃ' বেশ করছ তোমরা ! মূর্খতাই ত পরম পাণ্ডিত্যের পরিচয় ! চরিত্রহীনতাই ত মানুষের জীবনের চরমোৎকর্ষের লক্ষণ !' —এ কথা যদি বলতাম, বা তাদের আস্কারা দেবার জন্যে তাদের ভুলকে সমর্থন করতাম, তাহলে অপরাধী হতাম বৈ কি ! সে অপরাধের জন্য মানুষের বিচার এড়িয়ে গেলেও আর এক বিচারকের কাছে আমায় জবাবদিহি করতে হোত। শাস্তি পেতে হোত। বিন্দু বাবাজীর উপপত্নী-মা-লক্ষ্মীদের সঙ্গে ত আমার চাক্ষুস পরিচয় নেই, আর এমন অন্যায় আস্কারাও দিই নি।"

ব্রহ্মচারী নিজের কম্বলের উপর শুইলেন ! হাতে মাথা রাখিয়া, ঘাড় উঁচু করিয়া বলিলেন "আমিই কি শক্ত্যানন্দ

ঠাকুরের অন্যায়কে আস্কারা দিচ্ছি? এ সব ব্যভিচার অভিচারের খবর কতটা যে সত্যি, তাও তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। খাচ্ছি ত—এক মুখে ঝাল্। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকের মুখেই অনেক রকম শুন্‌ছি। কিন্তু তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কি বলেন সেটাও শোনা চাই।"

একটু থামিয়া বলিলেন "একেই ত আমি উদ্ধত, অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ। নিজের রাগকে আমি ভয়ানক ভয় করি। তাতে এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার,—যে ব্যাপারের সঙ্গে শুধু আমার নয়,—আরও দশজনের মঙ্গলামঙ্গল জড়িয়ে আছে,—সে ব্যাপারের মীমাংসা কর্‌তে গেলে, অনেকখানি মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। এ তো তোমায় দন্ত নিষ্পেষণ করার মত নির্ভাবনার ব্যাপার নয়!"

বলিতে বলিতে তিনি হাসিলেন। পুনশ্চ বলিলেন "ত্যাখো, বিন্দে শুয়ারকে একটা গুণে আমি যথার্থই ভক্তি করি। যত বড় বিরুদ্ধ অবস্থাই হোক, তার কুক্রিয়ার জন্য যে যতই কটূক্তি করুক, সে অটল ধৈর্য্যে—স্থির। আমার মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে না।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তোমার অসহিষ্ণুতা, তোমার অনেক ক্ষতির কারণ। ওটা সংশোধনের চেষ্টা করা খুব উচিত। কিন্তু বিন্দুর সহিষ্ণুতা? শুনেছি গণ্ডারের চামড়ায় তরোয়ালের চোট্ বসে না। সেটা কি তার সত্ব গুণের আতিশয্য বলে মনে কর?"

"আহা, আমার মত এমন রজোগুণের গোলামি ত নয়।"

"না। ওই রকম শ্রেণীর অনেক অসৎ-স্বভাব লোকের প্রকৃতি আমি লক্ষ্য করেছি। তারা সাধারণ মানুষদের হিতাহিত বিচার, লৌকিক সংস্কারকে গ্রাহ্য ত করেই না, কেউ কটূক্তি কর্‌লে তাও গায়ে মাখে না। নিজের ভুলকে ভুল বলে চেনবার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগ্রত থাকে না, তখন ভুলের শাস্তিকে, শাস্তি বলে অনুভব কর্‌বার শক্তিও জেগে থাকে না। সন্ধান নিলে জান্‌তে পার্‌বে, অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা মানুষগুলার প্রকৃতিতে ওই রকম সহিষ্ণুতার গিল্‌টি-করা অগাধ আলস্য-জড়তাই বল, মস্তিষ্ক-জড়তাই বল, বা অনুভব-শক্তির জড়ত্বই বল,—এক রকম সহিষ্ণুতা আছে, যা সহস্র নিন্দা তিরস্কারেও টলে না। ন্যায়, সত্য, ধর্ম্মের যুক্তি-তর্কেও গলে না। এ সহিষ্ণুতা, সত্ব গুণ বা রজোগুণের অন্তর্গত কোন একটা বিশেষ উচ্চ অবস্থা বলে মনে করা ভুল। আমার ত এই রকমই মনে হয়।"

ব্রহ্মচারী চুপ করিয়া একটু ভাবিলেন। তার পর এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন "অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য,—এ ক্ষুরধার ব্রত পালনের যোগ্যতা সকলের নাই, সেটা সত্য কথা। সাধারণ মানুষ, ভদ্র পবিত্র আদর্শ সামনে রেখে বিবাহ করুক, সংসারী হোক, কর্ম্মী জীবনে জয়শ্রীলাভ করুক,—এটা আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় বলে মনে করি। কিন্তু চরিত্র-বিশুদ্ধি, যেটাকে মানব জীবনের সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য, সব চেয়ে বড় পবিত্রতা বলে আমি মনে করি, সেটাকে যখন স্বামিজী নিতান্তই তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করে শ্লেষভরে ভ্যাংচান, অবজ্ঞাভরে হেসে উড়িয়ে দেন, তখন বাস্তবিক বল্‌ছি আমি মর্ম্মাহত হই। একদিন বড় দুঃখ পেয়ে তাই তাঁকে বলেছিলাম যে, "ব্রহ্মচর্য্য-হীন সাধনা যে কি জিনিস, তা আমার ধারণায় আসে না।"

দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তিনি কি জবাব দিলেন?"

গভীর হতাশার সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন "তোমার ধারণাশক্তি তাহলে নিতান্তই স্থুল!"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ব্রহ্মচারি, স্বামিজীর কথাবার্ত্তা বলার ধরণটি বড় চমৎকার, কি বল?"

মাথা নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া ব্রহ্মচারী সজোরে বলিলেন "হাঁ! ওই একটি আশ্চর্য্য গুণ! যদিও আমাদের মতের মিল নেই, পথের মিল নেই, তবু লোকটিকে ভালবাসি ওই কথা বলার ধরণটির জন্যে। যদিও কথাগুলো আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, বৈদিক মতবাদকে তিনি রীতিমত কুযুক্তির সাহায্যে খণ্ডন কর্‌ছেন, সব বুঝ্‌ছি। তবু তাঁর কথা একবার শুন্‌লে আবার শুন্‌তে ইচ্ছা হয়!—ভারি মিষ্টি কথা।"

ব্রহ্মচারিণী কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "ব্যবসা কর্‌তে হলে বণিক-সুলভ সদ্‌গুণ কতকগুলো চাই। না হ'লে কি ব্যবসায় সাফল্য লাভ কর্‌তে পারা যায়? কুহকী, ঐন্দ্রজালিক, যখন তাদের বিদ্যা শিক্ষা করে, তখন সব চেয়ে বেশী করে তাদের শিখ্‌তে হয় বাক্‌চাতুরীর কৌশল। কেন না, লোকের কাণে ধাঁধা লাগাতে পার্‌লে, চোখে ধাঁধা লাগাতে পার্‌লে

মনে রঙ্ ধরানো সহজ। মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা বিকৃত হয়ে গেলে, তখন মানুষের বিচারবুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে যা খুশী তাই স্বীকার করানো সম্ভব!"

কথা কয়টা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর চক্ষু ক্রমশঃ বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি আর সুস্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বসিলেন; এবং কি বলিবার উপক্রম করিতেই, ব্রহ্মচারিণী ঘড়ির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন "আটটা বাজ্‌ল। এবার উঠ্‌তে হচ্ছে। হবিষ্যের যোগাড়টা গুছিয়ে রেখে নিজের কাযে যেতে হবে।"

সমস্ত তর্ক ও আলোচনার উদ্যম ওই এক কথায় স্তব্ধ হইল। উত্তেজিত মন ও উদ্যত রসনা সংযত করিয়া ব্রহ্মচারী নিরুপায় ভাবে বলিলেন —"যাও।"

উঠিয়া নিজের কম্বলটা হেঁট হইয়া গুটাইয়া লইতে লইতে ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কই ব্রহ্মচারি? তুমি বক্‌লে না? আমি যে অনেক বকুনি খাবার প্রত্যাশা করেই এসেছিলাম।"

ব্রহ্মচারী আবার শুইয়া পড়িলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "আমিও কাল রাত্রি থেকে মনে মনে অনেক বকুনি,—ভদ্র, অভদ্র অনেক গাল মুখস্থ করে রেখেছিলাম। কোত্থেকে পরচর্চ্চা টেনে এনে তুমি সব ভুলিয়ে দিলে। আচ্ছা, যাও এখন! আজ সন্ধ্যার পর মনু-সংহিতা তোমার জন্যে রইল! স্ত্রীলোকদের অধিকার যে কতদূর, আর কর্ত্তব্য যে কতখানি, তা এবার তোমায় শেখাচ্ছি!—"

এ কথার উত্তরে ব্রহ্মচারিণী কিছু বলিবার বা মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে ঠাকুর্দ্দার পরিচিত কণ্ঠ অকস্মাৎ ধ্বনিত হইল "তাই ত শেখানো উচিত।"

দুজনেই মহা অপ্রস্তুত! এই বিশ্রাম্ভালাপের মাঝ-খানে বৃদ্ধ যে কখন নিঃশব্দ-পদে বাড়ী ঢুকিয়াছেন এবং কতক্ষণ হইতে যে দুষ্টামি করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল—তিনি কতকগুলা কথা শুনিয়াছেন।

"ঠাকুর্দ্দা যে! আরে আসুন, আসুন,—" বলিতে লতে ব্রহ্মচারী সলজ্জ হাসিমুখে বাহিরে আসিলেন; এবং পরমুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারিণীর বিস্ময়াহত নির্ব্বাক্ দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—ঠাকুর্দ্দা রোয়াকে উঠিতেছেন, তাঁর পিছনে ব্রহ্মচারিণীর মা এবং তাঁর বৃদ্ধা পিসিমা অর্থাৎ দিদিমা ধীরে ধীরে আসিতেছেন!

ব্রহ্মচারী নিস্পন্দ, নির্ব্বাক!

২৯

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া, উভয়ে যখন এই গুরুজনের দলটিকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইহাঁদের সংসারধর্ম্ম ত্যাগ, গৈরিক রুদ্রাক্ষ গ্রহণ, ব্রতপালন ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে বৃদ্ধা দিদিমা ও ঠাকুর্দ্দা একযোগে যে অভিযোগ সুরু করিলেন, তাতে পরিহাসের মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলেও, কেহ হাসিতে পারিলেন না। মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মত প্রৌঢ়া জননী অধোমুখে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিলেন না। তাঁর সেই নীরব অশ্রুই মূর্ত্ত তিরস্কার হইয়া মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। অতি স্নেহশীল অভিভাবকের ব্যথিত দৃষ্টির সামনে, অবাধ্য শিশুরা অনুতপ্ত হইলে—নিজেদের অপরাধ-ভারে যে ভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এই অপরাধী যুগলের অবস্থাও তাই হইল। ব্রহ্মচারিণী যদি বা নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা চাপিয়া হাসিমুখে সহজ স্বচ্ছন্দ হইয়া সময়োচিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী পারিলেন না। বিমর্ষ ম্লান মুখে তিনি একবার মাত্র কুশল প্রশ্ন করিয়া সেই যে মাথা হেঁট করিলেন, সে মাথা আর তুলিলেন না।

সকলে আসন গ্রহণ করিলেন; এবং প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া ইহাঁদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতুটা যাহা জানা গেল, তাহা এই—ঠাকুর্দ্দার ছোট বোন ও ভগিনী পঞ্চাশোর্দ্ধে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের আশায় তীর্থে গিয়াছিলেন। কাশীধাম হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণে মা ও দিদিমার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁরা কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে কলি-কাতায় যাইতেছিলেন। কুটুম্বিতার পরিচয় পাইয়া, সদাশয় দম্পতী বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ইহাঁদের একদিনের র ধরিয়া আনিয়াছেন। আগামী কল্যই ইহাঁরা চলিয়া যাইবেন। প্রসাদের বিবাহে মাতা নিজে কন্যা

সম্প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার গৃহে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। অতএব ঠাকুর্দ্দার সাদর আতিথ্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মচারিণী আরও জানিলেন, ভোর চারটার সময় ইহাঁরা বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া ব্রহ্মচারিণী অনুযোগের স্বরে বলিলেন "বাবাঃ! মা ভোরবেলা এসেছেন; ঠাকুর্দ্দা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটাও খবর পাঠান নি!"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কেন পাঠাব? আমার মেয়ে তাঁর বাপের বাড়ী এসেছেন, তোমাদের তাতে কি? যখন ফুরসুৎ হয়, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতে মেয়েরা বেরোন। আমার মেয়েও এখন বেরিয়েছেন,—এই তোমাদের ঢের ভাগ্যি মনে কর। কি বলুন বেন ঠাকরুণ?"

ঠাকুর্দ্দা দিদিমার দিকে চাহিলেন। দিদিমা বয়সে ঠাকুর্দ্দার চেয়ে বড়, অতএব বৈবাহিককে বেশী লজ্জা করিবার প্রয়োজন দেখিলেন না। মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বার্দ্ধক্য-সুলভ ধীরতার সহিত বলিলেন "ভাগ্যি না দুর্ভাগ্যি বলুন। এরা হয় ত মনে করছে, দুটিতে দিব্বি নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে ছিলাম, কোথা থেকে এই পাপগুলো জ্বালাতন করতে এল।"

ব্রহ্মচারীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ওই দেখুন না একজনকে। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন ত আছেনই। মুখে একটা বাক্যি অবধি নেই!"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কোত্থেকে থাকবে?—আজ যে বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছেন! কাল শুনে গেছি বেদান্ত-চর্চ্চা হচ্ছে,—আজ শুনলুম মনুসংহিতা! উঃ, কি ধড়িবাজ! লোকে ষোল আনা বুজরুকি করে, ওর বুজরুকি বত্রিশ আনা!—কি বলব, মা যে সঙ্গে ছিলেন! নইলে আমি আজ আরও ঘণ্টাখানেক আড়ি পেতে ওই ভণ্ড তপিস্বিকে—"

ব্রহ্মচারী থামের আড়ালে সরিয়া আত্মগোপন করিলেন এবং অদূরবর্ত্তিনী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া ম্লান হাস্যে ঠাকুর্দ্দাকে নিরস্ত হইতে নিঃশব্দে অনুনয় করিলেন।

ঠাকুর্দ্দার দয়া হইল। জিহ্বা সংযত করিলেন। মার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি কোন চিন্তা করবেন না, মা। আমার মত সংসারী ঠাকুর্দ্দা থাকতে প্রসাদ কখনো সন্ন্যাসী হতে পারে? ও যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক, যাবে কোথা? লোহার শেকলে বাঁধা পড়েছে। সন্ন্যাসের পরমাই ওর ফুরিয়েছে, আর দিনকতক সবুর করুন। তা'পর দেখবেন 'কালে কালে কতই হবে'!"

ব্যথিতা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ঠাকুর্দ্দার আস্ফালনের ঘটা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী কোন প্রতিবাদ করিলেন না, কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরঞ্চ এই আক্রমণের আঘাতে তাঁর অপরাধের গুরুভার লঘু হইয়া যাইতেছে বলিয়া যেন স্বস্তিবোধ করিলেন। ভারমুক্ত চিত্তে, খুশী হইয়া সকৌতুকে মৃদু মৃদু হাসিয়া তিনি ঠাকুর্দ্দাকে উৎসাহ দিলেন এবং নিজের ভণ্ডামির অভিযোগ যেন নিজেই নীরবে সমর্থন করিতে সুরু করিলেন।

ইহার মধ্যে কোথায় যে একটা ফাঁকি রহিয়া গেল, সাদাসিধা স্বভাবের ভালমানুষ দিদিমা তাহা ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাস-উৎসাহী নাৎ-জামাইয়ের সংসার-ধর্ম্মের দিকে মতি পরিবর্ত্তনের সংবাদে তিনি যথার্থই আন্তরিক সন্তোষ বোধ করিলেন এবং সংসার-ধর্ম্ম পালনই যে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সংসারে থাকিয়া, অবকাশ-মত ভগবানকে স্মরণ করাই যে পরম সুন্দর শান্তিময় পন্থা,—এ সংবাদটা নানা ছন্দে কীর্ত্তন করিয়া জ্ঞানবান নাৎ-জামাইয়ের ভালমানুষির অজস্র প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

অদূরে মায়ের কাছে বসিয়া ব্রহ্মচারিণী আনত মুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। মাতাও অশ্রুসিক্ত চোখে মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া ইহাদের আলাপ-আলোচনা শুনিলেন। তিনি কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। চোখের জল মুছিয়া কন্যার উদ্দেশে ধীরে ধীরে বলিলেন "নীলিমা কাপড়খানা বদলে এস মা। তোমাদের দিকে আমি চাইতে পারছি নে।"

কথাটা সকলেই শুনিতে পাইলেন এবং এই 'তোমাদের' বহুবচনটা যে নীলিমা ছাড়া আর কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাও বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। ঠাকুর্দ্দা এবার মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। কারণ মুখে তিনি যতই আস্ফালন করুন, এবং প্রতিবন্ধকতার চাপে কোণঠাসা হইয়া

নাতিটি তাঁর তামাসায় যোগ দিয়া নিজের ভণ্ডামিকে যতই স্বীকার করুক, আসলে সে যে কি পাত্র, তা ঠাকুর্দ্দা চিনিতেন। সাধন-ভজনের নিয়ম রক্ষায় তার কঠোরতা যে কতখানি, সেটা ঠাকুর্দ্দার অবিদিত ছিল না। মাতার এই অনুরোধটার সপক্ষে স্পষ্টাক্ষরে ওকালতি করিতে তাঁর ভরসায় কুলাইল না। শুধু সসঙ্কোচে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ব্রহ্মচারী আজ কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মৃদুস্বরে বলিলেন "বেশ ত ঠাকুর্দ্দা, এক-খানা শাদা কাপড়ই পর্‌তে বলুন।"

সাহস পাইয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তাহলে তুমিও পীতাম্বর-খানি ছাড়ো।"

এবার ব্রহ্মচারী একটু কাতর হইলেন। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে নিজের নকল গেরুয়া বস্ত্রের দিকে একবার চাহিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন "আমাকেও ছাড়্‌তে হবে? ভাল! তা হ'লে একখানা শাদা কাপড় দিতে বলুন। কিন্তু আমার শাদা কাপড় আছে কি?"

নিজের কাপড়-চোপড় কি যে আছে কি যে নাই, ব্রহ্মচারী কস্মিন কালে খোঁজ রাখিতেন না। ঠাকুর্দ্দা প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে পৌত্রবধূর দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী মাথা নাড়িলেন—অর্থাৎ নাই। ব্রহ্মচারী থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দেখিতে পাইলেন না। মাতা ততক্ষণে অস্ফুট স্বরে বলিলেন "কেন? জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বে যা পাঠিয়েছিলুম, সে কাপড়?"

জামাতার কল্যাণ স্মরণ করিয়া মাতা সে নিয়মটি এখনও পালন করিতেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সে যে জড়িপাড় ঢাকাই। পর্‌বেন কি?"

দিদিমা চোখ টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন "পর্‌বে, পর্‌বে। তুমি নিয়ে এস।"

ব্রহ্মচারী ইহাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন না। বলিলেন "আছে ঠাকুর্দ্দা?"

মধ্যস্থ ঠাকুর্দ্দা সাগ্রহে বলিলেন "আছে বই কি। দিচ্ছেন।"

"আচ্ছা। একখানা শাদা চাদর থাকে ত দিতে বল্‌বেন, নইলে শিল্কের চাদর।"

বলিয়া গৈরিক উত্তরীয়ের ফাঁশ খুলিতে খুলিতে ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে গিয়া, ট্রাঙ্ক খুলিয়া, কোঁচানো ঢাকাই ধুতি চাদর আনিয়া ঠাকুর্দ্দার সামনে রাখিলেন। ঠাকুর্দ্দা প্রশংসমান দৃষ্টিতে কাপড়খানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "বাঃ, দিব্বি কাপড়। লক্ষ্মী দিদিমণি আমার, তুমি ঘরে গিয়ে ওকে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া চুপি চুপি বলিলেন "কিন্তু বকুনি যদি লাভ হয়, তার অর্দ্ধেক ভাগ আপনার?"

ঠাকুর্দ্দা উৎসাহের সহিত বলিলেন "ভাল, ভাল—আমি তোমার লাভের অংশীদার! তুমি যাও।"

ব্রহ্মচারিণী চৌকাঠের কাছে কাপড় রাখিয়া সরিয়া আসিতেছিলেন, ব্রহ্মচারী ইসারা করিয়া তাঁকে ভিতরে ডাকিলেন। ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিয়া কাপড়খানি পুনশ্চ তুলিয়া লইয়া তিনি ভিতরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী বিষাদ-গম্ভীর মুখে চুপি চুপি বলিলেন "এঁরা যে যা বলেন, শুনে যাও। অবাধ্যতা করে কারুর মনে কষ্ট দিও না।"

ব্রহ্মচারিণী বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "কিন্তু যা শোনবার নয়, তাও যদি শুন্‌তে বলেন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "পায়ে ধরে সন্তুষ্ট করে অনুমতি নাও। গুরুজনদের মনে ব্যথা দিয়ে আমি ঢের ভোগ ভুগেছি। তুমি আর কর্ম্মফল সঞ্চয় কোর না।"

মাথা নাড়িয়া স্বীকার জানাইয়া ব্রহ্মচারীকে কাপড় দিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাঁর মুখে অজ্ঞাতেই একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি বাহিরে আসিতেই তিনটি প্রাণী একযোগে উৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া তাঁর মুখপানে চাহিলেন; এবং তাঁহাদের উৎসুক দৃষ্টিতে অকস্মাৎ বিস্ময়ের রেখা পরিস্ফুট হইতে দেখিয়া, ব্রহ্মচারিণী চক্ষের পলকে আত্মসম্বরণ করিলেন। স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিলেন "নাঃ ঠাকুর্দ্দা, আপনার বরাতে আমার লাভটা ফস্কে গেল! আপনাকে আর অংশীদার রাখছি নে।"

ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত খুশী হইলেন। চুপি চুপি বলিলেন "শূয়ারটা কাপড় নিয়েছে?"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী জানাইলেন "হাঁ।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "ভাল, ভাল। যাও—তুমি কাপড় বদ্‌লে এস।"

ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। পরণে সেই সৌখীন ঢাকাই ধুতি। জড়িপাড় কোঁচানো চাদরটা খুলিয়া গলার রুদ্রাক্ষ মালা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়াছেন। সামনে আসিয়া হাসিমুখে নিম্নস্বরে বলিলেন "দেখুন ঠাকুর্দ্দা, এবার ত ঠিক আপনার নাতি হয়েছি।"

ঠাকুর্দ্দা সন্তোষ-তৃপ্ত দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া বলিলেন "হাঁ। লক্ষ্মী ছেলে! এস।"—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দু হাত বাড়াইয়া তাঁকে বুকের মধ্যে টানিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

"নারায়ণ নারায়ণ—"বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী নিজেকে মুক্ত করিয়া সসম্ভ্রমে ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। ঠাকুর্দ্দা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু আজ আপত্তি টিকিল না। তার পর যথাক্রমে দিদিশাশুড়ী ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, একখানা আসন টানিয়া লইয়া শাশুড়ীর সামনে বসিলেন। প্রসন্ন হাস্য-সুন্দর মুখে বলিলেন "এক মা তো আমার ওপর রাগ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আপনাকে কিন্তু মা ক্ষমা করে যেতে হবে। কর্ম্মদোষে আমি আপনাদের অনেক দুঃখের কারণ হয়েছি, তার প্রতিফলও পেয়েছি। এখন আমার ক্ষমতায় যতটা সম্ভব, আপনাদের সন্তুষ্ট কর্‌তেই চাইছি। বলুন ত মা, ক্ষমা কি আদায় কর্‌তে পার্‌ব না?"

ইহা শোক নয়, দুঃখ নয়, বেদনা নয়, অভিযোগ, অনুযোগ—কিছুই নয়; শুধু সরল বালকের মত আবদার মাত্র! চোখের জল মুছিতে মুছিতে মা একটু হাসিলেন। বলিলেন "মার কথা মনে পড়ে বাবা? এখন তাঁর জন্যে দুঃখ হয়?"

ব্রহ্মচারী স্মিত মুখে বলিলেন "না মা, দুঃখ আমার হয় না। তাঁর আয়ু শেষ হয়েছিল, চলে গেছেন। তিনি যাবেনই, তাও অনেক দিন আগে থেকে জেনে রেখেছিলাম। তাঁর অদৃষ্টের ভোগাভোগ—সেও তাঁর স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল। এ সব কোন কিছুর জন্যেই আমার দুঃখ কষ্ট হয় না। শুধু দুঃখ এই, তাঁর মনোকষ্টের জন্যে আমায় নিমিত্তের হেতু হতে হয়েছিল। সাধন গ্রহণ করে—আমি ভুল করেছি কি ঠিক কায করেছি—তার বিচারের সময় এখনো আসে নি। শুধু এই কথাটা আমি বল্‌ছি,—আপনাদের মনস্তাপে আমি শান্তি পাচ্ছি নে। যদি ভুলই করে থাকি, ভাল। সংসারে ক্ষমা বলেও ত একটা কথা আছে,—আমি সেইটেই আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি।"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী দু হাত একত্র করিয়া অনুনয়-হাস্যরঞ্জিত মুখে পুনশ্চ বলিলেন "প্রসন্ন চিত্তে শুধু এই আশীর্ব্বাদটা করুন,—আমার কায সিদ্ধ হোক।"

মা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাটীর দিকে চাহিয়া, নিঃশব্দে উদ্বেলিত মনোভাব দমন করিলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "কিন্তু মেয়েটার কথাও ত ভাবতে হয় বাবা! তোমার হাতে ওকে দিয়েছি, তুমি যদি ওকে গ্রহণ না কর, তুমি যদি ওকে সুখী না কর—তবে ওর জীবনটা—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী অতি নিম্ন স্বরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "এইগুলো আপনাদের অত্যন্ত ভুল কথা মা। সংসারীদের ওই যে বাঁধা গতের বচন,—ওই যে ত্যাগ-গ্রহণের আড়ম্বর আস্ফালন—অত বড় ভূয়ো ধাপ্পাবাজী আর নাই! কিন্তু যাক সে কথা,—নিজের মনগড়া ভাবের ঝেঁাকে মত্ত হয়ে, বচনের হেঁয়ালি নিয়ে তারা মারামারি করুক। আমার কথা তারা বুঝবে না। আমার মা, ত্যাগেরও কিছু নেই, গ্রহণেরও কিছু নেই। শুদ্ধাচারে থেকে উপকার বোধ করি; তাই এই নিয়মগুলো পালন করি,—এই যা।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"লোকাচার মতে যাকে ত্যাগ করা বলা হয়, তাও তো কাউকে ত্যাগ আমি করি নি। আর সুখী করা? মা, এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না। যে নিজের সুখ নিজে সৃষ্টি করে নিতে পারে,—সেই যথার্থ সুখী।"

মা মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া অধিকতর নিম্নস্বরে বলিলেন "আপনি মা,—আপনাকে বল্‌তে আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে, আপনার স্নেহদৃষ্টির সামনে আমরা সবাই ছোট, সবাই অনভিজ্ঞ। আমাদের হিতাহিত আমরা যতটা বুঝি, আপনারা তার চাইতে বেশী বোঝেন; আমাদের মঙ্গল আমরা যতটা চাই, আপনারা তার চাইতে বেশী চান, সব সত্য। কিন্তু তবুও বলছি মা—"

বলিয়া ব্রহ্মচারিণীর ঘরের বন্ধ দুয়ারের দিকে কটাক্ষ করিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "যাঁর জন্যে ভাবছেন, তাঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই। পার্থিব কামনায়, বা সংসারাসক্তিতে যে একেবারেই ভ্রূক্ষেপশূন্য!"

ব্রহ্মচারী এত নিম্নস্বরে কথাগুলা বলিলেন যে অদূরবর্ত্তী ঠাকুর্দ্দা ত কিছুই শুনিতে পাইলেন না, এমন কি অতি নিকটে থাকিয়া দিদিমাও কিছু শুনিতে পাইলেন, কিছু শুনিতে পাইলেন না। কথাগুলা ভালরূপে শুনিবার জন্য তিনি আর একটু আগাইয়া বসিলেন। শুধু ঠাকুর্দ্দা যেখানে বসিয়া ছিলেন, সেইখানে বসিয়া, গৈরিকধারী নাতির এই শাদা ধুতি-চাদর-পরিহিত মূর্ত্তিটি সস্নেহ দৃষ্টিতে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিভৃত মনে কি একটা কল্পনা-জল্পনা খেলা করিতেছিল, তিনিই জানেন,—মধ্যে মধ্যে একটা দুষ্ট-কৌতুকের হাসি অলক্ষ্যে তাঁর অধর-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ব্রহ্মচারীর আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বলিতে সাহস পাইলেন না। এই ব্যথিতা জননীর কাছে তাঁর একমাত্র সন্তানের বৈরাগ্যের সংবাদ কতখানি যে প্রকাশ করা উচিত, এবং কতখানি যে প্রকাশ করা উচিত নয়,—কিসে তিনি সুখী হইবেন এবং কোন্ কথায় যে তাঁর সুখী হইবার সম্ভাবনা কম, যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ব্রহ্মচারী তাহাই ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

নাৎ-জামাইয়ের এই ইতস্ততঃ-পরায়ণ ভাব দেখিয়া, নাতনীর সংসার-বৈরাগ্যের অপরাধটা তাঁরই স্কন্ধে চাপাইয়া, দিদিমা কি একটা মধুর পরিহাসের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় দুয়ার খুলিয়া ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচারী ছাড়া সকলেই মুখ তুলিয়া তাঁর দিকে চাহিলেন,—হাঁ, তিনি কাপড় বদলাইয়াছেন, তবে শাদা কাপড় পরেন নাই। সেই পুরাতন গরদের শাড়ীখানি পরিয়াছেন।

কাহারও দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া তিনি আনত গম্ভীর মুখে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিলেন এবং হবিষ্যের আয়োজন গুছাইয়া লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিলেন।

দিদিমার মুখের কথা মুখেই রহিল এবং কে যে কি বলিবেন প্রথমটা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি যখন বারেণ্ডা অতিক্রম করিয়া রোয়াকে নামিয়াছেন, তখন ঠাকুর্দ্দা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কই দিদি, তুমি শাদা শাড়ী পরলে না?"

ব্রহ্মচারিণী ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর্দ্দার সামনে থামের আড়ালে দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় সরাইয়া হাসিমুখে চুপি চুপি বলিলেন "পরেছিলুম, আবার ছেড়ে রেখে এসেছি। এখন আমার অনেক কায পড়ে আছে। হবিষ্যের ডাল বেঁটে রেখে আহ্নিক পূজোয় যেতে হবে ঠাকুর্দ্দা, আকাচা কাপড়ে ত এগুলা করা চলবে না। এর পর কাপড়খানা কেচে রাখব, সব কায সারা হলে সেটা পরব। আপনারা রাগ করবেন না।"

ঠাকুর্দ্দা শশব্যস্তে বলিলেন "রাগ? না, না, তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি? রাগ করতে হয় ত, এই শূয়ারটার ওপর করব। আচ্ছা এখন তোমার কাযে যাও, কিন্তু ওবেলা যখন মা আসবেন, তখন যেন তোমার ভৈরবী মূর্ত্তি দেখতে না হয়, বুঝলে?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন। ঠাকুর্দ্দা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "এবার এঁদের সব ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে আলাপ চারী করবার সময় হয়ে আসছে। আর ত এঁরা এখন মর্ত্ত্যের মানুষদের মুখদর্শন করবেন না। চলুন মা, আমরা এবার উঠি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।"

ব্রহ্মচারী একটু হাসিয়া বলিলেন "মা তো এ পাষণ্ডের আশ্রমে জলগ্রহণ করবেন না, মাকে বলতে সাহস হয় না। কিন্তু দিদিমার আপত্তি কি? দিদিমার সঙ্গে ত আমার কোন শত্রুতা নাই।"

দিদিমা মাথা নাড়িয়া স্বাভাবিক ধীরতার সহিত বলিলেন "আছে বই কি! সন্ন্যাসীর দান কেন গ্রহণ করব? আগে সংসারী হও, তবে তোমার বাড়ীতে জলগ্রহণ করব।"

নিজের কাপড়ের পাড়টা দেখাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "এমন জড়িপাড় ঢাকাই ধুতিতেও সন্ন্যাসের অপবাদ খণ্ডন হোল না? না, না, দিদিমা আপনার ওজর করা চলবে না—"

ঠাকুর্দ্দা এক ধমক দিয়া বলিলেন "তুই ষ্টুপীড্ তো ভয়ানক পাজী! আমার অতিথি ভাঙাচ্ছিস্! আমার কত পুণ্যের ফলে, এই তীর্থবাসিনী পুণ্যব্রতা তপস্বিনীর

পায়ের ধূলোয় আজ আমার বাড়ী পবিত্র হয়েছে, তোর অমি লোভ জাগল!—না:, বেন ঠাকরুণ, উঠুন। আপনাকে আর এক দণ্ডও এখানে রাখ্‌ছি নে। ও ছোঁড়া পুণ্যের লোভে মানুষ খুন কর্‌তে পারে।"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "এত বড় অবিবেচক-মতের উপাসনা আমি করি বলে বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, আপনার পুণ্য অর্জ্জনে বাধা দেব না, কিন্তু ওবেলা,—রাত্রে?"

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "না। নিদ্রার ব্যবস্থা বরঞ্চ এখানে হতে পারে, কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা কক্ষনো নয়।—"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৩০)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে, তখনও টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রীষ্মের গুমট বাটিয়া বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে।

আহ্নিক পূজা সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারী বারেণ্ডায় উঠিলেন। সামনাসামনি দুই ঘরেই আলো জ্বলিতেছিল। ব্রহ্মচারীর ঘরের মেঝেয় তাঁর জন্য কম্বল বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল। বৃষ্টির জন্য আজ রোয়াকে বসিবার স্থান নাই।

ব্রহ্মচারিণী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পূজাহ্নিক সারিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজের ঘরে বসিয়া দিদিমার সহিত কথা কহিতেছিলেন। বৃষ্টির পূর্ব্বেই মা ও দিদিমা নিরালায় পূজাহ্নিক করিবার জন্য এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। রাত্রে পুনশ্চ ঠাকুর্দ্দার বাড়ী গিয়া জলযোগ করিয়া আসিবার কথা আছে। দিদিমার আহ্নিক সারা হইয়াছে, মা এখনও ব্রহ্মচারিণীর পূজার ঘরে আছেন।

দিদিমার সাড়া পাইয়া ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। দিদিমা চৌকাঠের কাছে বসিয়াছিলেন, বাহির হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া হাত বাড়াইয়া দিদিমার পায়ের ধূলা লইয়া ব্রহ্মচারী আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিলেন "আহ্নিক সেরে উঠে, গুরুজনদের কাউকে সাম্‌নে পেলে আমার বড় আনন্দ হয় দিদিমা। মা কই?"

দিদিমা বলিলেন "তিনি নীলিমার পূজোর ঘরে। তাঁর উঠতে একটু দেরী হয়। কই, নীলিমা, তুমি প্রসাদকে প্রণাম করলে না?"

ব্রহ্মচারিণীর জপের রুদ্রাক্ষ মালাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আলোর সামনে হেঁট হইয়া বসিয়া তিনি নূতন সূতায় মালা গাঁথিতেছিলেন। দিদিমার কথা শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মাথার কাপড় টানিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন "আমি জপের আসনেই মনে মনে সব গুরুজনদের নমস্কার করে আসি।"

ব্রহ্মচারী তাঁকে দেখিতে পাইলেন না, শুধু কথাটা শুনিতে পাইলেন। বাহির হইতে মৃদু স্বরে বলিলেন "ওই জন্যে আসন থেকে ওঠবার সময় রোজ আমার পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে। আমার পা নিয়ে কেনই যে অনধিকারচর্চ্চা করেন, বুঝ্‌তে পারি না।"

দিদিমা হাসি মুখে বলিলেন "তা বাইরে কেন? ঘরে এসে বস, ঝগড়াটা মুখোমুখি হোক, ভাল করে একটু শুনি।"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "পরের সীমানার মধ্যে পা বাড়ানো নিরাপদ নয় দিদিমা, নিজের সীমার মধ্যে থাকাই ভাল।"

ব্রহ্মচারিণী পুনশ্চ হেঁট হইয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বলিলেন "ঘরে কম্বল পেতে রেখে এসেছি দিদিমা, গিয়ে বস্‌তে বলুন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তার মানে? আমায় বিদেয় করে দিয়ে তুমি একা দিদিমাকে ভোগ-দখল করবে? দিদিমা এজমালির সম্পত্তি, সেটা মনে আছে?"

ব্রহ্মচারিণী সংক্ষেপে বলিলেন "বেশ ত, দিদিমাও ওঘরে গিয়ে বসুন না।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে চুপ করিয়া একটু ভাবিলেন। তার পর দুয়ারে হাত রাখিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "তা দিদিমা যে একটু ভাল করে ঝগড়া শুন্‌তে চাইছেন, তার ব্যবস্থা কি হবে? মা আসন থেকে ওঠ্‌বার আগেই সে কাযটা সেরে নিলে ভাল হয় না? কেন না, মার সামনে আবার লক্ষ্মীছেলে সাজ্‌তে হবে ত? কি দিদিমা, ঝগড়ার জন্যে যোড়হাত করে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করতে হবে না কি?"

ব্রহ্মচারিণী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আঃ, মা শুনতে

পাবেন যে ? দিদিমা আপনি ও ঘরে গিয়ে কথাবার্ত্তা বলুন, আমি এইখানে থাকি। মা হয় ত এখুনি উঠে আসবেন।"

দিদিমা হাসিমুখে বলিলেন "না রে বাছা না, মা এখন আস্‌বে না। প্রসাদ, তুমি এখানে বস। নীলিমা, তোমার কম্বলখানা দাও।"

মালা গাঁথিতে গাঁথিতে নিরুদ্বিগ্ন মুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আমার কম্বল নেবেন না।"

দিদিমা অবিশ্বাস-ভরে বলিলেন "নাঃ, নেবে না! নিতে কি হয়েছে ?"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ তাঁর পক্ষ সমর্থন করিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভাবে বলিলেন "দেখুন দেখি দিদিমা, কেউ কিছু দিয়ে দেখেছেন কখনো, নিই কি না নিই ?"

ব্রহ্মচারিণী এবার মাথা তুলিয়া চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "ভণ্ডামির একটা সীমা আছে দিদিমা, সেটা আর কেউ ভুল্‌লেও আমি ভুলি নি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ভুলি নি বলে অহঙ্কার জেগেছে, তখন ভুল্‌তে আর দেরী নেই। যাক্, আমায় এখন 'যাইতে উত্তরে, বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূরব মুখে' নীতি-বাক্যটা স্মরণ রেখে চল্‌তে হবে। কই আমার সেই শাদা কাপড়খানা ? গেরুয়া ছেড়ে এবার মার 'জামাতা বাবাজী' সাজ্‌তে হবে যে। ইনি শাদা কাপড় পরেছেন দিদিমা ?"

ব্রহ্মচারিণী দুয়ারের পাশে দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া ছিলেন, বাহির হইতে তাঁকে দেখা যাইতেছিল না। দিদিমা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "পরেছে। ছাখো না প্রসাদ, কেমন মানিয়েছে ?"

কতকটা হতাশ-কাতর কণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন "আর দিদিমা! নিজের সাজ-পোষাকের ধাক্কাতেই জখম হয়ে রয়েছি, পরের সাজ-সজ্জায় আর দৃষ্টি দিয়ে কায নেই। নিজের সখ মেটাবার জন্য গেরুয়া ধরলে পরের সখের ঠেলায় তাকে ছাপায়বার ছাড়্‌তে হয়,—আমারও সেই দুর্দ্দশা হয়েছে। কতদিনেই যে গুরুর কাছ থেকে যথার্থ গৈরিক বস্ত্র আদায় কর্‌বার্ যোগ্য হব, যা একবার ধর্‌লে আর ছাড়্‌তে হবে না।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরের ভিতর হইতে চাপা গলায় বলিলেন "আর একটু কপটাচার আশ্রয় করে চল্‌লে সে যোগ্যতাটা শীঘ্র শীঘ্র এসে পড়বে। 'যাইতে উত্তরে বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূরব মুখে' নীতি-বাক্যের জোরে দিদিমাকে ঠকানো চলে, ভগবানকে ঠকানো চলে না।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা! আশীর্ব্বাদ করে অভিশাপ দিচ্ছি, একবার এই অবস্থায় পড়ো। দায়ে ঠেকে যেন ওই নীতি-বাক্যই পালন করতে বাধ্য হও, দর্প যেন চূর্ণ হয়।"

ব্রহ্মচারিণীর হাত হইতে সহসা মালা খসিয়া পড়িল! শুষ্ক বিবর্ণ মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী তাঁর অবস্থা দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন "আচ্ছা আপনি বসুন দিদিমা, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

দিদিমা সাগ্রহে বলিলেন "এসো; এইখানেই এসে বসো প্রসাদ।"

"আচ্ছা" বলিয়া ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারিণী মালা তুলিয়া লইলেন। আলোর সামনে ঝুঁকিয়া নতমুখে আবার মালা গাঁথিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)
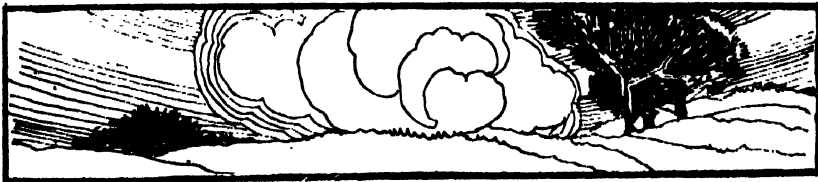
মরণ-ভোল

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

(২)

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

এ বড় ভুল কথা যে মানুষে মরণ না ভুলিলে ভয়ে ভয়ে কাজ-কর্ম্ম করিবে ভাল করিয়া। উল্টা দিকে বরং ইহাই ঘটিতে পারে যে, বাঁচিয়া যখন বহুকাল ভোগের আশা নাই, তখন কোনপ্রকারে দিনকতক নিজের স্বার্থের কাজ করিলেই চলে। কেহ-কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, মানুষের যদি ধারণা হয় যে, সে ভাল কাজ না করিলে মরিয়া কীট প্রভৃতির মত নীচ প্রাণী হইবে, তাহা হইলে মরণের ভয়ে ও নরকের ভয়ে কাজ করিবে ভাল। এ তর্ক যে টেঁকে না তাহা প্রাচীন কালের একটা গল্পের দৃষ্টান্তে বলিতেছি।

গল্পে আছে:—এক যে ছিল দুষ্ট ধনী। তাহাকে নারদ আসিয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, তাহাকে দুষ্কর্ম্মের জন্য যাইতে হইবে নরকে, হইতে হইবে একটা বিষ্ঠার পোকা, আর তখন এখানকার সুখের খাদ্য ছাড়িয়া খাইতে হইবে ঘৃণ্য পদার্থ। দুষ্ট ধনী উত্তরে বলিল—ঠাকুর, উহাতে আমার ভয় নাই; কারণ যদি কীট হইয়া জন্মি তবে আমার মানুষের বুদ্ধি থাকিবে না,—মানুষের রুচিও থাকিবে না; হইবে কীটের বুদ্ধি ও কীটের রুচি। তাহা হইলে যাহা কীটের খাদ্য তাহা এই রাজভোগের মত মধুর হইবে, ও কীটের বুদ্ধিতে এ কথা মনে উঠিবে না যে আমি মানুষ হইবার সুখ পাইলাম না। ঠাকুর তখন এ জবাব শুনিয়া মাথা চুল্‌কাইয়া স্বর্গে গেলেন। পুনর্জ্জন্মবাদে না আছে ভয়, না আছে আশা। সত্যের হিসাবে এই পুনর্জ্জন্মবাদ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা পরে বলিতেছি!

এখন কথা এই যে, জন্ম-জন্মান্তরের কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, সে কথা যদি না-ই ভাবা যায়, ক্ষতি কি? অজানা কথার সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাইয়া হউক, বা নিজের কল্পনায় একটা স্বপ্ন খাড়া করিয়া হউক, পরলোকের একটা মানচিত্র আঁকিবার প্রয়োজন কোথায়? পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, যাহারা সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সত্যই মনে করে যে, অনাদি শক্তির হাতেই তাহারা বাড়িতেছে ও চলিতেছে, তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া জীবনকে নির্ভয় করিবে না কেন। আমি একটা তথ্য খাড়া করিলেই যে সেটা সত্য হইবে, আর পরমেশ্বরকে আমার তথ্য অনুসারে কাজ করিতে হইবে, ও না করিলে পরমেশ্বরকে হইতে হইবে আমার বিচারের অনুযায়ী একটি নিষ্ঠুর পুরুষ, ইহার ত কোন মানে নাই। তুমি যখন ঈশ্বরকে দয়াময় ভাবিয়াই পরলোকের মানচিত্র আঁক, তখন এ কথাটা ত ভাবা বড় সহজ যে, তিনি কোলের শিশুকে আছড়াইয়া না মারিয়া তাঁহার নিয়মে যাহা ভাল তাহারই একটা ব্যবস্থা করিবেন। মিছাই যাহা জানা যায় না, তাহা জানার জন্য অলিভার লজের পিছু ছুটিয়া পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ওপরটা দেখিবার জন্য পাগলামি করিবে কেন? ওপারটাকে দেখা অসম্ভব করিয়াই স্রষ্টা যেন এই জীবন গড়িয়াছেন; কেন-না এ জীবন যে ভাবে গড়া, তাহাতে মরণের ওপার অজ্ঞাত থাকাতেই জীবনের চিন্তা ও কাজ চলিতেছে ভাল। ঠিক এই কথাটি পরে বুঝাইব।

মরণ ভোলা—সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে নির্দ্দেশ পাই তাহা উপাদেয়। বুদ্ধদেব বুঝাইয়াছিলেন যে, মানুষেরা তাহাদের দুঃখ না কমাইয়া আস্ত শরীরকে ব্যস্ত করিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া গায়ে ঘা সৃষ্টি করিয়া দুঃখের মাত্রা বাড়াইতেছে ঐ অসার মরণের কল্পনাটাকে ফুলাইয়া ফুলাইয়া। তিনি প্রাণের শান্তির জন্য যে সকল দুঃখদায়ক তৃষ্ণা (তন্‌হা) অর্থাৎ উদ্বেগময় বাসনা ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে "ভব-তন্‌হা" একটা। ভূ+অ থেকে উৎপন্ন ভব শব্দের অর্থ জন্ম। সেকালে মানুষ চাহিত এই "ভব"

এড়াইতে। জন্মিলেই দুঃখ ; কাজেই আবার এই জন্ম না-হওয়া ও অন্য জীব হইয়া না-জন্মা ছিল প্রাণের প্রার্থনা। এখন অনেকে ভব-সাগর বলিতে এই পৃথিবীটাকেই বুঝিয়া থাকেন ; সেটা একালের মন-গড়া অর্থ। আমি জন্মিতে চাই, জন্মের সুখ চাই, অথবা জন্ম এড়াইয়া দিব্যলোকে সুখে বাস করিতে চাই—এইরূপ কামনাকে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—'একটা মস্ত দুঃখের কারণ'। এই ধর, তোমাকে যাইতেই হইবে মগধ হইতে উজ্জয়িনী, ও তাহার পর উজ্জয়িনীর পরপারে কোন অজানা রাজ্যে তোমাকে যদি যাইতেই হয়, তাহা হইলেও সুস্থ শরীরে ও নিশ্চিন্ত মনে তোমাকে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত পৌঁছা চাইই-চাই। পরলোকে যাহাই থাকুক, এ-লোকের শেষ পাড়ি ঐ উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত না গেলে যখন চলে না, তখন দুঃখ-ক্লেশ এড়াইয়া প্রসন্ন মনে কি ভাবে রাস্তা হাঁটিয়া দশজনের সঙ্গে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত যাইতে পার তাহার চেষ্টা কর। এই চেষ্টা অবশ্য অনুষ্ঠেয়,—পরলোক থাকুক্ আর নাই থাকুক্। এই অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য পালনের পথে তুমি একটা কল্পিত দুঃস্বপ্ন গড়িয়া কাল্পনিক ভয় ভাবনা কুড়াইয়া প্রসন্ন মনে কাজ করিবার পথে বাধা জন্মাও কেন? বৌদ্ধ সাহিত্যে পাই, বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা তাঁহাকে পরলোক সম্বন্ধে যখনই প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন তিনি কোনও জবাব দেন নাই। প্রশ্ন হইল—পরলোক আছে? বুদ্ধদেব কথা কহিলেন না। প্রশ্ন হইল—তবে কি পরলোক নাই? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন না। কোন কাজের কাজে না লাগিলেও মানুষে অলস খেয়ালে যে সকল প্রশ্ন করিত, বুদ্ধদেব সে সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন না। তবে "উদানম্" বইখানিতে 'অত্থি ভিক্খবে' প্রভৃতি বাণীতে যে অকৃত ও অচ্যুত স্থানের কথা আছে, তাহার বিচার এখানে করিব না ; কারণ সে ভাবের নিগূঢ়তা অনেক কথায় ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বুদ্ধদেবের উপদেশ যাহাই হউক, আর অন্যান্য শাস্ত্রের মত যাহাই হউক, লোকসাধারণের মনের ভাব বিচার করিয়া দেখি যে, লোকে যে কাজ-কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে, সে কি পরলোকের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া, না আপনাদের মনের ও প্রবৃত্তির প্রাকৃতিক টানে? শিশুরা মরণের কথা জানে না ও ভাবে না ; তাহারা শরীরের প্রকৃতির ফলে নাচিয়া-খেলিয়া আনন্দে বাড়িয়া উঠে। মানুষেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার খোঁচানিতে কিছু উপার্জ্জনের জন্য "ছুটাছুটি করে ভূমণ্ডল" ; সুখে বাড়িয়া উঠিবার তাড়ায় পৃথিবীর দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মনের ও প্রাণের প্রসার বাড়ায় ; যৌন-ভাবের আগ্রহে বিবাহ করে, সন্তান পালন করে ও ঘর-বাড়ী সাজাইয়া অতি দূর হইতে দূর ভবিষ্যতের জন্য আপনার ও আপনার বংশধরদের জন্য স্থিতির ব্যবস্থা করে। এ সকল কাজে লোকসাধারণ পরলোকের মালা জপিয়া চলে না ; নিজে কতদিন বাঁচিবে, জানে না ; জানে—একদিন বুড়া হইয়া, না হয় অন্য রকমে মরিবে। জানে না সে—যে নারিকেলের মত গাছগুলি পুঁতিতেছে, তাহার ফলভোগ সে করিবে কি-না ; তবুও ভবিষ্যতের জন্য গাছ লাগাইয়া চলিয়াছে। তাহার আশার গুড়ে বালি পড়িবে কি-না, না ভাবিয়া ক্রমাগত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিতেছে। একদিন তাহার আর ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবে কি-না, তাহা মনে না করিয়া ভবিষ্যতের দিকেই পা বাড়াইয়া চলিতেছে। মানুষের শরীরের প্রকৃতির মধ্যে, তাহার শারীরিক মৌলিক ধাতুর মধ্যে এমন একটা অচ্ছেদ্য স্থায়ী টান আছে, যাহার কথা সে কোন তর্ক করিয়া না বুঝিয়া জীবনের পথে হাঁটিতেছে। জীবনের এই যে নিগূঢ় টান, যাহা মানসিক ধারণার অতর্কিতে কাজ করিয়া মানুষকে ভবিষ্যৎ-মুখী করিয়া চালাইতেছে, তাহার মানে কি? সৃষ্টিতে এই জীব-রক্ষার রহস্য যতটুকু বুঝিতে পারা সম্ভব, তাহা জীবনের উৎপত্তির বিবরণে আলোচনা করিব।

ফিলসফি রচিয়া অর্থাৎ নিজের ভাবের সূতায় ভাব গাঁথিয়া যে ঐ রহস্যটুকু ধরা যায় না, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। এই যে আমাদের চেতনায় সংজ্ঞা ফুটিয়াছে—আত্মপর-বোধ ফুটিয়াছে, জীবনের স্পৃহা ও ভবিষ্যতের আশা জাগিয়াছে, আমরা কি ভাবিয়া-ভাবিয়া তাহার উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারি? আমরা যে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা-জাত বুদ্ধি দিয়া সকল কথা বুঝি ও প্রত্যক্ষ করি, তাহা দিয়া কি ঐ সংজ্ঞাটারই গোড়ার অবস্থা বা উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারি? সকল মানুষের মধ্যেই ঐ যে আছে তাহাদের সংজ্ঞা ও বুদ্ধি জড়াইয়া একটা মনন, সেটা একই ধাতুতে গড়া। এই যাহার নাম দিলাম মনন, তাহাকে একখানা ছুরির মত ভাবিয়া নিতেছি। ছুরিখানি দিয়া নানা জিনিস কাটা যায়, অর্থাৎ নানা জিনিসের

অবস্থা বা প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়; তবে কেমন করিয়া ঐ এক ধাতুতেই গড়া ঐ ছুরিখানি দিয়া ঠিক ছুরিখানাকেই কাটিব? এ যে নিজের ঘাড়ে নিজে পা দিয়া ঘাড়ের উপর দাঁড়াইবার চেয়েও অসম্ভব চেষ্টা! কেমন করিয়া স্তরের পর স্তরে—জীবের পর জীবে চেতনা ফুটিয়াছে, আত্ম-সংজ্ঞা ফুটিয়াছে, তাহার যেটুকু শারীর ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই ইতিহাসে বা বিবরণে নিগূঢ় রহস্যটির কোন আভাষ পাওয়া যায় কি-না দেখিব। যাঁহারা আত্মা বা মানুষের বিকশিত চৈতন্যের অনন্ত স্থায়িত্ব ঠিক ভাবে বুঝিতে চান্, তাঁহাদের পক্ষে গোড়ায় চেতনার উদ্ভবের ইতিহাস জানা চাই; তাহা হইলে কুসংস্কার কাটাইয়া খাঁটি জ্ঞানের পথে চলিতে পারিবেন। চৈতন্যের উদ্ভবের ইতিহাস দিতেছি।

আমাদের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বের আদি কি, বীজ কি, উহার মূল কোথায়? এক 'সময়ে' কিছুই ছিল না, আর 'পরে' বিশ্বের উপাদান জন্মিল, ইহা মানুষের চিন্তার অতীত,—কল্পনায় ধারণা করা অসম্ভব। 'সময়' বলিতে গেলে বুঝি আজ-কাল দিয়া গাঁথা 'আগের' ও 'পরের' একটা অশেষ ধারা; এই সময়ের ভাবনা এড়াইয়া এমন একটা আদি কালের কথা ভাবিতেই পারি না যখন 'সময়' ছিল না,—'আগে-পরে' দিয়া গাঁথা অবস্থাটি ছিল না।

অন্যদিকে আবার 'আগে' ও পরে' ভাবিতে গেলেই একটা 'স্থানের' ভাবনা জাগে; অর্থাৎ একটা অবস্থা আগে ও একটা অবস্থা পরে বলিলেই তাহার অর্থ হয় যে, সেই অবস্থা একটা 'স্থান' জুড়িয়া "আছে"। মনে পড়ে 'আছে',—'নাই' অবস্থাটি মানুষের ভাবনায় জাগে না। 'না ছিল এ সব কিছু' মানুষের মনের কথা নয়,—একটা মিথ্যা কথার ফাঁকা আওয়াজ। যিনি কবিতায় লিখিয়াছেন 'না ছিল এ সব কিছু,' তাঁহাকেই উহার সঙ্গে জুড়িয়া লিখিতে হইয়াছে—"আঁধার ছিল অতি ঘোর 'দিগন্ত' প্রসারি"; অর্থাৎ কিছু ছিল বলিতে হইয়াছে ও যাহা ছিল তাহা একটা স্থানে ছিল বলিতে হইয়াছে। বিশ্বের উপাদান ছিল না ও পরে হইল, সময় ছিল না ও পরে হইল, মহা শূন্যও ছিল না ও পরে হইল, এরূপ ভাবনা করিবার চেষ্টা অতি অসম্ভব চেষ্টা। শ্রেষ্ঠতম মানুষের ভাবনায় যাহা অসম্ভব, তাহা ছাড়িয়া সম্ভবকে লইয়াই উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে।

যে 'মহাশূন্য' এড়াইয়া কিছু ভাবিতে পারি না, 'মহাকাল' ভুলিয়া আমাদের চিন্তা নাই, তাহা ধরিয়াই বিশ্বের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানের মূলে ও জ্ঞানকে জড়াইয়া আছে এই যে মহাশূন্য, উহাতে সূক্ষ্মদর্শীরা অশেষ তরঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই তরঙ্গিত মহাশূন্যকে আকাশ বলিব না; যাহা ফুটিয়াছে অর্থাৎ মোটা দৃষ্টিতে প্রকাশ (প্র+কাশ) পাইয়াছে তাহাই লোকসাধারণের ভাষায় আ+কাশ—ইংরেজি sky। সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছিলেন ইথর (ether)। এই ইথর শব্দে এখন একটা কিছু বিরোধ আছে বটে, তবে নাম দিয়াই যখন বস্তু-নির্দ্দেশের সুবিধা করিতে হইবে, তখন এই সহজে উচ্চার্য্য ইথর শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করিলাম।

এই তরল হইতেও তরল ইথরে কাঁপুনি উঠিয়া ঢেউ খেলিল কেমন করিয়া? এই কাঁপুনি বা গতি ঐ ইথরের স্থিতিগত প্রকৃতি বা ধর্ম্ম। পদার্থ বলিতেই বুঝিতে হইবে তাহার একটা ধর্ম্ম, যাহা দিয়াই সেই পদার্থটি বুঝি; উহা পদার্থ হইতে আলাদা বস্তু না। মানুষের রূপ যেমন মানুষ হইতে অভেদেই ভাবিতে হইবে, তেমনই ঐ গতিকে ইথরের সঙ্গে অভেদে উহার প্রকৃতি বা ক্রিয়া স্বরূপে ভাবিতেই হইবে। ইথরের প্রকৃতিতে বা ধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছে এই যে, উহার এক অংশে চলিয়াছে এক রকমের গতির খেলা ও অন্য অংশে চলিয়াছে অন্য রকমের গতির খেলা। একটা গোল বলের মধ্যে একটা কাঠি চালাইয়া উহাকে ঘুরাইলে যে রকমের বর্ত্তুল গতি হয়, তাহাই এক অংশের গতির ধারা; ইংরাজিতে বলে rotational গতি,—আমরা বলিব বর্ত্তুল-গতি। একটু লম্বা ছাঁচের বর্ত্তুলের দুই প্রান্ত চাপা পড়িলে তরল বর্ত্তুল যেমন ভাবে ঘুরিতে পারে, সেই ভাবে ইথরের অন্য অংশে ঢেউএর আবর্ত্তন চলিয়াছে; এই ধরণের গতির ইংরেজি বিশেষণ irrotational, আর আমরা বলিব পরাবর্ত্ত-গতি। নিজে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া না নিলে এই গতির ভেদ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইবে না। এই গতিবিভেদে জন্মিতেছে ঢেউএর কোট্‌কা, আর সেই কোট্‌কাগুলি হইয়া ওঠে বিদ্যুৎগর্ভ। কোথা হইতে আসিল

"ওরে, ও শ্বেত-করবি !

—আজ কি সখি ভাঙ্গলো ঘুমঘোর ?"

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সেই বিদ্যুৎ? যাহাকে বিদ্যুৎ বলি, তাহা ঐ গতিরই একটা রূপান্তরিত অবস্থা। পদার্থের ধর্ম্মে যাহা আছে তাহাই আলাদা আলাদা অবস্থায় নানা রূপে ফুটিয়া ওঠে। বিদ্যুৎগর্ভ ফোট্‌কাগুলির ইংরাজি নাম electron; দু-একজন পূর্ব্ববর্ত্তী লেখককে অনুসরণ করিয়া উহার সংস্কৃত নাম দিলাম বিদ্যুৎ-কোরক ও বাঙ্গালা নাম দিলাম বিদ্যুৎ-কুঁড়ি। এই বিদ্যুৎ-কুঁড়ির যোগে যাহা জন্মে তাহার নাম অণু বা পরমাণু; আর সেই পরমাণুকে বলি সারা বিশ্বের উপাদান। কি পদ্ধতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে জোড়া বাঁধে, তাহা বলিবার আগে বলিয়া রাখি যে, আমাদের দেশে জোড়া-লাগা পরামাণু সংহতির মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা ধরিয়া ঐ সংহতির ভিন্ন ভিন্ন নাম পাই; যথা দুইটি পরমাণুর সংহতির নাম দ্ব্যণুক। সংখ্যা হিসাবে এইরূপ অনেক নাম থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র পরমাণু-সংহতি মাত্রের নাম দিতেছি দ্ব্যণুক, অর্থাৎ ইংরেজি molecule.

এই পরমাণু ও দ্ব্যণুক কত ক্ষুদ্র তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। হাইড্রজেন নামক বাষ্পীয় পদার্থের ছত্রিশ হাজার দ্ব্যণুক যতটুকু স্থানে থাকিতে পারে তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের ঘন-পরিমাণ—এক ইঞ্চের '০১৯৩৭ অংশ মাত্র। এই যে আছে কল্পনার অতীত সংখ্যা পরমাণু, উহার মধ্যে 'জাতিভেদ' আছে, অর্থাৎ এক পরমাণু একরকম বাষ্পীয় পদার্থের gas বা মূল, আবার অন্য পরমাণু অন্যের মূল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরমাণুদের মধ্যে এক হিসাবে ক্ষমতার প্রভেদ আছে; কোন এক জাতির পরমাণু অন্য যে কয়েকটি পরমাণুকে আপনার গায়ে জোড়া লাগাইতে পারে, তাহার হিসাব আছে, যথাঃ—হাইড্রজেন বাষ্পের একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর একটার সঙ্গে মিলিতে পারে, অক্‌সিজেনের পরমাণু পারে অন্য দুইটিকে মিলাইতে, কারবনের পরমাণু অন্য চারিটিকে মিলাইতে, আর নাইট্রজেনের পরমাণু অন্য তিনটি অথবা পাঁচটিকে মিলাইতে পারে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই যাহা ঘটে, তাহা হইল পরমাণুর একটা প্রাকৃতিক লক্ষণ।

পরমাণুদের আর জন্মগত ধর্ম্মের বা প্রকৃতির কথা বলিতেছি। প্রত্যেক পরমাণুতে যে গতি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ নড়া-চড়ার ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহার একটা বিশিষ্টতা এই যে, প্রত্যেক পরমাণু এক-দিকে বোঁ করিয়া ছুটিয়া দুরান্তে পলাইতে চায়, আবার অন্য-দিকে অন্য পরমাণুকে টানিতে চায় ও অন্য পরমাণুর দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে যেমন দেখি, এক দিকে আছে তাহার বৈরাগ্য-বুদ্ধি ও অন্য দিকে আছে প্রেমে সংসার গড়িবার বুদ্ধি—ঠিক যেন সেই রকমের দুইটি "টান" প্রতি পরমাণুতে একসঙ্গে মিলিয়া আছে, ও দুইটি "টানই" যুগপৎ একসঙ্গে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যে সকল পরমাণুতে সকল পদার্থ গড়া ও আমরা গড়া, তাহার আর একটি প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি। কোন একটা পদার্থ গড়িবার উদ্যোগে (বুদ্ধি করিয়া নয়) যখন পরমাণুতে পরমাণুতে অচ্ছেদ্য পাকা যোগ ঘটে (অর্থাৎ রাসায়নিক যোগ ঘটে), তখন ভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিক অবস্থার পরমাণুরা অথবা বিদ্যুৎ-কুঁড়িরা পরস্পরকে অতি প্রবলবেগে (তড়িৎ প্রবাহে কাঁপিতে কাঁপিতে) অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন-পাশে বাঁধে। কোন বিবাহে, কোন স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মিলনে বা গভীর অনুরাগের আলিঙ্গনে অত বেগ নাই, অথবা উত্তেজিত ভাবের অত কাঁপুনি নাই।

এইমাত্র বলিলাম একটা "পাকা যোগের" কথা,—যে-রকম যোগের ফলে পরমাণুরা আপনাদের নিজের মত আলাদা আলাদা না থাকিয়া একটা বিশিষ্ট রকমের নূতনত্বের জন্ম দেয়। উহার স্বরূপ বলিতেছি। জলে লবণ দিলে যে লোনা জল হয়, তাহাতে নূতন একটা পদার্থ জন্মে না; জল শুকাইলে বা উড়িয়া গেলেই লবণ আলাদা হইয়া পড়িবে। এটা হইল কাঁচা যোগ; এ-রকম যোগে একটার সঙ্গে আর একটা গুলাইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। আর পাকা যোগে যে রাসায়নিক পরমাণু গড়ে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের পরমাণুকে আর মিলনের পরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; 'ক' ও 'হ' এমন ভাবে মিলিয়া যায় যাহাতে জন্মে একটা 'খ'; সেই 'খ' হইল এমনভাবে আলাদা ও নূতন, যাহাতে 'ক'-কে বা 'হ'-কে আলাদা করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্ব্যণুকদের মিলনের বিভিন্ন ধরণের ও ভঙ্গির ফলে যে বিভিন্ন রকমের পদার্থ গড়িয়া উঠে, সেটাতে পরমাণুদের আর এক রকমের প্রকৃতি জানা যায়। মনে কর, পরমাণুরা এই ধরণে ও ভঙ্গিতে মিলিল, যেমন চা'ল দিয়া চুড়া করিয়া

নৈবেদ্য সাজায় অথবা অন্য ধরণে কোন পদার্থকেই গোল করিয়া কিম্বা চৌকা করিয়া সাজায়; এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে সাজিয়া মিলিবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পদার্থ জন্মে। কয়লাতে যে জাতির পরমাণু পাই, হীরকেও সেই জাতির পরমাণু পাই; পরমাণুরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে মিলিবার ফলেই এক মিলনের ফল হইয়াছে—কয়লা, অন্য মিলনের ফল হইয়াছে—হীরক।

বুঝাইয়া বলিবার কথাটা হইল এই যে, যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, গড়িয়াছে ও গড়িতেছে, তাহা পরমাণুদের মজ্জাগত ধর্ম্ম,—পরমাণু হইতে অচ্ছেদ্য, পরমাণুর প্রকৃতিতে। গতি বল, আকর্ষণ বল, শক্তি বল, মিলনের ধরণ বা ভঙ্গি বল, বিদ্যুৎ বল, আলোক বল, উত্তাপ বল সে সকলই পরমাণুদের প্রকৃতিগত ধর্ম্মের ফল; এক ধর্ম্ম এক অবস্থায় ফুটিয়া উঠে, আর অন্য ধর্ম্ম অন্য অবস্থায় ফুটিয়া উঠে, এইমাত্র। যে মহাশূন্যের ও-পারের ভাবনা মানুষের চিন্তায় অসম্ভব, সেই মহাশূন্যকে পাই ইথর-সাগররূপে। এই ইথর সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববীজ। ইথরে ঢেউ খেলিয়া যায়, আর সেই ঢেউ এ ফোটে বিদ্যুৎ-কুঁড়ি; বিদ্যুৎ কুঁড়ির যোগে হয় পরমাণু; আর পরমাণুর নানারকমের যোগে জন্মে সকল রকমের পদার্থের সমষ্টি এই সারা বিশ্ব।

মানুষের কাছে সকল তত্ত্বের বড় তত্ত্ব তাহার জীবনের রহস্য। এই যে বিশ্বের জড়পিণ্ড, এই যে পাথর, এই যে মাটি, এই যে জল, উহা যত সুসম্বদ্ধ হইলেও জড়মাত্র; আর জড়ে ও জীবে কত প্রভেদ! এই যে মানব চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ, আত্ম-পরের জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত, মননে নিরত, আশঙ্কায় ও আশায় উৎসাহিত, কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব, প্রীতিতে প্রফুল্ল, নির্ব্বাণের ভয়ে ভীত, সে কি জড়পিণ্ড বৈ আর কিছু নয়? শরীর পুড়িয়া ছাই হয়; তখন তাহাতে তাহাই পাই যাহা অচেতন জড়পিণ্ডের উপাদান; কিন্তু সেই জড়ের উপাদান কি করিয়া জীবনে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, আর জীবনে উদ্বুদ্ধ চেতনা শরীরের ক্ষয়ে কি পরিণাম পায়, তাহাই হইয়াছে মানুষের চিন্তনীয় সমস্যা।

সমস্যাপূরণের পথে প্রথম প্রশ্ন এই—জীবনের রহস্য কি জড়ের রহস্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বা গভীরতর? জড়ের সমস্যাপূরণে এইটুকুই বিশেষভাবে আমাদের অবোধ্য ও অসাধ্য যে, মহাশূন্য বা ইথর কিরূপে কোথা হইতে জন্মিল; সেই জন্মের রহস্যকে বা আদির রহস্যকে যদি স্বতন্ত্র হেঁয়ালি রূপে রাখি, তবুও জড়ের রহস্য অপেক্ষা জীবনের রহস্য গুরুতর হয় কি-না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা ইথরের ধাতুগত,—যাহা তাহার প্রকৃতি, তাহারই প্রকাশে এই বিশ্ব গড়িয়াছে, বুঝিতে পারি; সে স্থলে ইথরের জন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যাহা, ইথর যে বিশ্ব-বীজ হইল কেন, সে জিজ্ঞাসাও তাহাই। যাহা হইয়াছে, তাহা একটা ধাতুগত প্রকৃতি নিয়াই হইয়াছে।

ইথরে ঢেউ খেলায়, সে ঢেউএ আলোক ফোটে অথবা বিদ্যুৎগর্ভ স্ফোটক বা বিদ্যুৎ-কুঁড়ি জন্মে, বিদ্যুৎ কুঁড়ির যোগে পরমাণু হয়, আর পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যোগে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জড় পদার্থ দেখি, সে সকলেরই উৎপত্তি হয়। ইথরে এমন গুণ কোথা হইতে আসিল যে, উহা হইতে এতখানি বিকাশ সম্ভব হইল? এরূপ প্রশ্নের এই একই অর্থ যে, ইথর হইল কোথা হইতে? ঐ যে ঢেউ, আলোক, বিদ্যুৎ ও পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা গেল, উহাতে সূচিত হইতেছে একটা গতি, শক্তি,—কর্ম্ম-ক্ষমতা। ঐ গতিটিকে, শক্তিকে, কর্ম্ম-ক্ষমতাকে ইথর হইতে অথবা পরমাণু হইতে অথবা একটা সুসম্বদ্ধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিতে পার না; ও-গুলির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই; —উহারা ইথর বা পরমাণুদের লীলায় পরিস্ফুট নানা অবস্থার নাম। নাম ও রূপ যেমন কোন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নয়, গতি প্রভৃতিও তেমনই পদার্থ হইতে অভিন্ন একটা শক্তি স্বতন্ত্রভাবে নিজের অস্তিত্ব নিয়া আছে, এইরূপ ভুল ধারণা অনেকের আছে বলিয়া এতখানি লিখিতে হইল। যে পদার্থকে কেবল যে ধর্ম্মের ফলে চিনিতে পারি, তাহার সেই ধাতুগত লক্ষণ যখন তাহার ক্রিয়ায় ফোটে, তখন সেই ক্রিয়াকে বা ক্রিয়ার লক্ষণকে আলাদা একটা পদার্থ বলিতে পারি না; সুবিধার জন্য আলাদা অবস্থার আলাদা নাম দিতে হয়, এই মাত্র। এ কথা মনে রাখিলে জীবের শরীরে প্রকাশিত গুণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন রকমের হেঁয়ালির বা রহস্যের আবর্ত্তে পড়িব না। কথাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের এই পৃথিবী যখন অসাধারণ উত্তাপে ফাঁপা বাষ্প-গোলক ছিল, তখন পাথর, জল প্রভৃতি কিছুই পাথর-

রূপে বা জলরূপে ছিল না। উহার তাপ খানিকটা উপিয়া যাইবার পর পৃথিবীর কাঠামরূপে উহার বাহিরের আবরণ বা খোসাখানি কঠিন হইল; পরে আবার বহু যুগযুগান্তের পর, অধিকতর শৈত্য আসিবার পর যখন জলের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন তপ্ত বৃষ্টির ধারায় পৃথিবীর কঠিন আবরণের উপরকার বড় বড় খাতে বা গর্ত্তে জল জমিয়া সমুদ্র হইল। পৃথিবীর কঠিন খোলসখানির বা স্থলের জন্ম যে জলের জন্মের অনেক আগে, আমরা পৌরাণিক সৃষ্টির বিবরণের সংস্কারে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। এই যে পাথর ও নানা ধাতু জন্মিল ও তাহার পর জল জন্মিল, উহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য পৃথিবীর স্রষ্টাকে উদ্যোগ করিতে হয় নাই; যত তপ্ত হইলেও পৃথিবীর পিণ্ডে যাহার বীজ ছিল, তাহাই তাপ-ক্ষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুকূল অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাথর, মাটি, জল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, জীব সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইবে না কেন? পৃথিবী তাহার শরীরের অংশগুলির পরে পরে বিকাশের ইতিহাস স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। গোড়ায় যে স্তর পড়িয়াছিল ও তাহার উপর আবার যে স্তর পড়িয়াছিল, তাহা আলাদা আলাদা করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। গোড়ার স্তরে আমরা কোন জীবের কঙ্কাল পাই না; জীবের উদ্ভব হইয়াছিল জলের জন্মের পরে একটি নূতন অনুকূল অবস্থার আবির্ভাবের সময়ে। সকল শ্রেণীর জীবের (উদ্ভিদেরও বটে) জীবনের মূল যে "জৈবনিক" পদার্থ, উহা যে ধাতু, পাথর জল প্রভৃতির মত পৃথিবীর আত্মশরীর হইতে অনুকূল অবস্থায় ফুটিয়া বাহির হয় নাই, এ কথা যে বলিবে তাহাকেই জৈবনিকের অপার্থিব সৃষ্টির প্রমাণ দিতে হইবে। অনুকূল অবস্থায় পরে পরে সকল পদার্থ জন্মিতে পারিল, আর জৈবনিকের বেলায় কেন যে বলিতে হইবে সে অন্য মুল্লুক হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহার কারণ পাওয়া যায় না; যাহা এক সময়ে জন্মিয়াছে এই পৃথিবীতে ও রহিয়াছে এই পৃথিবীতে, তাহা যে এই পৃথিবীর নয়, এ কথা যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন তিনি আশ্চর্য্য রকমের জীব।

এক সময়ের বিকাশের অনুকূল অবস্থায় (যে অবস্থা এখন আর আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি না) পৃথিবীর স্থল-ভাগ সাগরকে ঠিক কি কি পদার্থ উপহার দিয়াছিল, সাগরের গর্ভে যাহার রাসায়নিক যোগে খানিকটা আঠার মত জৈবনিক রচিত হইল, তাহা এখনও জৈবনিকের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই। জীবন্ত জৈবনিকের রাসায়নিক উপাদান ঠিক্-ঠাক্ কি রকমের, তাহা এখনও ধরা পড়ে নাই বটে, তবে জৈবনিকের মরণের পরের বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, উহাতে অর্দ্ধ তরল অবস্থায় সেই (albuminous) পদার্থ আছে, যাহা আমরা একটি ডিমের ভিতরকার শাদা ভাগে পাই। যে দিন পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ হইতে পারিবে, সেদিন জানা যাইবে যে, কি কি জড় পদার্থের রাসায়নিক যোগে জৈবনিকের উৎপত্তি। এখনও জৈবনিকের ধাতু সম্পূর্ণ নির্ণীত হইতে পারে নাই বলিয়া উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে অপার্থিব কল্পনা চালান যায় না। যদি এখনও জানা না যাইত যে কি কি বাষ্পীয় পদার্থের যোগে জলের উৎপত্তি হয়, তবে জলকে পৃথিবীর উপাদানের বাহিরের পদার্থে প্রস্তুত বলা অসঙ্গত হইত।

যে রাসায়নিক সামগ্রী (colloidal substance) জৈবনিকের ধাতু বা ভিত্তি, তাহার যে যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয় তাহা এই:—জৈবনিক তাহার নিজের প্রকৃতির ফলে নিজে নিজে বাড়িয়া উঠিতে পারে, নিজেকে রক্ষা করিতে পারে ও নিজের শরীর হইতে অন্য জৈবনিক উৎপাদন করিতে পারে। জৈবনিকে এই যে বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, উহা জড় পদার্থে লক্ষ্য করা যায় না। মাটির ডেলাকে বাড়াইতে হইলে আর খানিকটা মাটি আনিয়া ডেলাটির উপর বোঝাই করিতে হয়, মাটির ডেলাটি নিজে তাহার ভিতরে কোন রস শুষিয়া তাহাকে মাটিতে পরিণত করিয়া মাটির অঙ্গ বাড়াইতে পারে না; ডেলাটি ভাঙ্গিতে গেলে উহা কুঁচকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না; আর মাটির ডেলা নিজের শরীর হইতে ডেলা-শিশুর জন্ম দেয় না।

সকল রকমের গাছ পালা ও জীব জন্তু যে এই জৈবনিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিকাশের ফল, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ বা মতভেদ নাই; কারণ নানা দিক্ দিয়া নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জীবনের এই ক্রম বিকাশ নির্ণীত হইয়াছে ও হইতেছে। সন্দেহ আছে ও জ্ঞানের অভাব আছে জৈবনিকের উৎপত্তি অথবা উহার রাসায়নিক প্রকৃতির যথার্থ তথ্য সম্বন্ধে; সৃষ্টির যে

নিয়মে জড়-জগৎ শাসিত, তাহাতেই সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ শাসিত।

পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছি যে এরূপ প্রশ্ন অতি নিরর্থক যে, কোথা হইতে জড়ের প্রকৃতিতে এমন কিছু আসিল, যাহার ফলে নানা গতি, নানা ক্রিয়া ও নানা ফল ফলিয়া বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে; কারণ জড়ের উপাদানের জন্মের হেতু জিজ্ঞাসা করাও যাহা, ঐ অবস্থাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করাও তাহাই। কি নিয়মে, কি পদ্ধতিতে, কিরূপ সংযোগের ফলে বিশ্ব গড়িয়া উঠে, তাহাই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধেয়।

জীবনের বেলায়ও সেই একই কথা। কি পদ্ধতিতে ও নিয়মে জৈবনিকের ক্রিয়ায় প্রথমে এক রকমের জীব বা উদ্ভিদ হইল ও পরে তাহা হইতে ক্রমবিকাশে উচ্চতর জীব ও উদ্ভিদ জন্মিল, তাহাই বিজ্ঞানে নির্দ্ধারিত হয়। যেখানে স্নায়ুচক্রের বিকাশ হয় নাই, বা মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নাই, অথবা শরীর একটি বিশিষ্ট রকমের কাঠামে গড়িয়া উঠে নাই, সেখানে জৈবনিকের যে ক্রিয়া পাওয়া যায় না ও যে লক্ষণ ফুটিয়া উঠে না, তাহা যদি বিশিষ্ট কাঠামের শরীরে স্নায়ুচক্র প্রভৃতির বিকাশে প্রকাশ পায়, তবে নিতান্ত অদ্ভুত রকমে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। উচ্চ জীবে যে "আমি" বলিয়া একটা জ্ঞান ফুটে, বেদনা ও চেতনা জন্মে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বহে ও জ্ঞানের কৌতূহল জাগে, সে সকলই জৈবনিকের ক্রমবিকাশে বিশিষ্টরূপ শরীর পরিগ্রহের ফলে।

আত্মা বলিতে কি বুঝি ও তাহা কেন বুঝি, তাহার বিচার এখানে হইবে না। গোড়ার অতি উত্তপ্ত পৃথিবীতে যাহা পুড়িয়া ধ্বংস হয় নাই, অনুকূল অবস্থায় চিতা-ভস্ম পার হইয়া জীবন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনের মৃত্যুর পরের দাহে কিরূপ পরিণাম পাইবে, সে তত্ত্বের বিচার পরে করিতেছি।

পার্থিব উপাদানেই পৃথিবীর উৎপত্তি, আর সেই উপাদানই এই পৃথিবীর জীবন ও জীবের উৎপত্তি। আমরা পায়ের তলায় মাটি দলাই, আর মাটিকে ঘৃণ্য ভাবি। তাই সেই মাটি হইতে জীবনের উৎপত্তি ভাবিতে অনেকের মনে বাধে। কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে না যে, জড় গড়িয়াছিল একটা শয়তান্, আর জীব গড়িয়াছিলেন অন্যে। সসম্মানে ও সবিস্ময়ে যাহারা জড়ের দিকে চাহিতে পারে না, তাহারাই নাস্তিক ও পরমার্থ তত্ত্বের বিরোধী। জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিলেই সৃষ্টির ও স্রষ্টার গৌরব বুঝিব।

স্বয়ম্বরা

শ্রীপিযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ, বাতাস, ধরণীর কালো,
নদীর জল আর যত কিছু ভালো,
সুষুমা কান্তি; সকল ভ্রান্তি,
যত অশান্তি, গভীর শান্তি,
যা কিছু ধরার তৃণ কীট সব,
অপরাধ আর হীনতা বিভব—
দাঁড়াও তোমরা—ক্ষণিকের সাধ;
যা কিছু আমার আছে অপরাধ
তোমাদের পায়ে করি নিবেদন,
যদি হ'য়ে থাকে রূঢ় আচরণ—
যুড়ি দুই কর ভিক্ষা মাগি,
ক্ষমা ক'রো মোর ভুলের লাগি।

* * * *
* * * *
* * * *

কুৎসিতা নয়, সুন্দরী বেশে
মাতিয়া উঠুক বসুন্ধরা,
হ'ক না মরণ তারেই হেসে
করবে বরণ স্বয়ম্বরা।

রাজা নাদীর—

আফগান-বিদ্রোহের কথা এখনও এত পুরাতন হয়নি, যার জন্যে এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হ'তে পারে। এই বিদ্রোহের উপর যবনিকা পাত হয়েছে আফগানিস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গ ক্ষেত্রে নাদীর খাঁর আবির্ভাবের ফলে।

মাইক্রোফোনের সামনে রাজা নাদীর

নাদীর ছিলেন প্যারিসে আফগানিস্থানের রাজদূত। বিদ্রোহ যখন চরমে উঠেছে সেই সময় তিনি দেশে ফিরে আসেন—শা ওয়ালী খাঁ প্রমুখ ভাইদের নিয়ে। বলা বাহুল্য সে সময় তিনি রাজা হ'বার অভিপ্রায় আভাসে ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করেন নি, বলেছিলেন ঠিক তার উল্টো কথা। আমীর আমানুল্লা যেদিন ইংরাজদের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত হ'বার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সেদিন নাদীর খাঁ ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত; বলা যেতে পারে যে তিনি না থাকলে আমানুল্লার সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'ত না। সুতরাং বুদ্ধি ও শক্তি বলে কাবুল অধিকার করতে তাঁর পক্ষে বিলম্ব হ'বার কথা নয় এবং তা হয়ও নি। ফলে সেনা নায়ক নাদীর আজ আফগানিস্থানের রাজা,—জগতে এমন ভাগ্য বিবর্ত্তনের উদাহরণ আরও অনেক আছে। যাক সে কথা।

সম্প্রতি রাজা নাদীর তাঁর সিংহাসন-আরোহণের প্রথম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করেছেন। এখানে

উৎসব-অঙ্গনে গীতবাদ্য

সেই উৎসব সম্পর্কীয় দু'টী ছবি দেওয়া হ'ল। একটীতে রাজা নাদীর মাইক্রোফোনের সামনে বক্তৃতা করচেন; অন্যটীতে উৎসব অঙ্গনে গান বাজনা চলচে।

মহিলা সোভিয়েট মন্ত্রী—

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী এত রকমের কথা শোনা যায় যে, তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তর্কের মধ্যে না গিয়ে একটা কথা বোধ করি নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে যে সোভিয়েট রাশিয়া

নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান আসন দিতে কোন দিকেই কার্পণ্য করচে না। সামাজিক, ব্যবসায়িক, রাজনীতিক —সমস্ত বিষয়েই তারা নারীকে অখণ্ড স্বাধীনতা দিচ্চে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ষ্টকহোলমের যিনি

সোভিয়েট রাশিয়ার মহিলা মন্ত্রী

সোভিয়েট মন্ত্রী, তিনি পুরুষ ন'ন,—মহিলা। ইনি মাদাম আলেকজেন্দ্রা কোলোন্তে নামে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতিক মহলে সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেচেন।

সিংক্লেয়ার লুইস—

নোবেল-পুরস্কার-সমিতি ১৯৩০ সালের সাহিত্য পুরস্কার দিয়েচেন আমেরিকার সর্ব্ব-সংস্কার-বিদ্রোহী,'ব্যাষ্টি'-স্রষ্টা সিংক্লেয়ার লুইসকে। ইতঃপূর্ব্বে ঐ গৌরব অর্জ্জনের

মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস

সৌভাগ্য আর কোন আমেরিকানের হয় নি—সেই জন্যে অনেকে বিস্ময় বোধের সুযোগ পেয়েচেন। তা' ছাড়া আমেরিকার নামকরা সাহিত্যিক আরও অনেক আছেন, যেমন—এডিথ হোয়ার্টন, থর্ণটন উইল্ডার, এডনা ফার্বার এবং ফ্যানি হার্ষ্ট। কিন্তু খ্যাতি-সম্পন্ন লেখক হ'লেই যে নোবেল সমিতি তাঁকে মাল্য-দান করবেন, ঐ কথা মনে করবার দরকার নেই। সমিতি সাহিত্যিক প্রতিভাই শুধু বিচার করেন না, দেখেন তার আন্তর্জ্জাতিক আবেদন কতখানি, তা' দিয়ে মানব সমাজের কতখানি মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে লুইস নোবেল পুরস্কার অর্জ্জনের যোগ্য ব্যক্তি। আমেরিকার বর্ত্তমান গণিত ও যন্ত্রধর্ম্মী সভ্যতাকে তিনি এমন অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বেত্রাঘাত করেচেন, যে, আত্মস্বার্থমগ্ন আমেরিকা আজ 'ব্যাবিট' ও 'মেন ষ্ট্রীট' পড়ে চমকে দাঁড়িয়ে ভাবচে—'কোথায় এলাম, কোথায় চলেচি সবই ?'

লুইস দেখতে বিশেষ সুশ্রী ন'ন। তাঁর চুলগুলি লাল, চোখ দু'টী ছোট। বাপ মায়ের একজন ছিলেন জাতিতে ওয়েলশ, আর একজন স্কটিশ। লুইসের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে 'মেন ষ্ট্রীট' এবং 'ব্যাবিট' আমেরিকায় জনপ্রবাদের মত খ্যাতিলাভ করেচে কিন্তু 'ডড্‌সওয়ার্থ'ই বোধ হয় সকলের সেরা।

ব্রেজিল বিদ্রোহের জের

সম্প্রতি ব্রেজিলে যে ছোট খাট বিদ্রোহ হয়ে গেছে, তার কথা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকা এখনও বিস্মৃত হ'ন নি। বিদ্রোহ যখন গুরুতর আকার ধারণ করল, সৈন্যদল গিয়ে

ব্রাজিলের প্রেসিডেণ্ট গ্রেপ্তার

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল, তখন সেখানকার প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার ওয়াশিংটন লুই পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাতেও তিনি নিষ্কৃতি পেলেন না। গ্রেপ্তার করে তাঁকে নিয়ে

যাওয়া হ'ল রিয়োর অন্তর্গত ক্যাপাকাবানা দুর্গে—সেইখানেই তিনি অন্তরীণ থাকবেন।

জনমত যখন উত্যক্ত হয়, তখন বুঝি এ ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। এখানে ডাক্তার লুইয়ের গ্রেপ্তারের ছবি দিলাম।

পোপের মুদ্রা

এককালে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ওপর পোপের ছিল অখণ্ড আধিপত্য। কিন্তু কালক্রমে তাঁর সে প্রভাব খর্ব্ব হয়ে যায় এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভ্যাটিকান প্রাসাদের সীমার মধ্যে বসে গৌরবময় অতীতের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় থাকে না। সম্প্রতি ইটালীর শাসন-তরণীর পরিচালক মুসোলিনির চেষ্টায় পোপ তাঁর হৃত গৌরবের কিছু কিছু ফিরে পেয়েচেন। এই উপলক্ষে ভ্যাটিকানে বিপুল উৎসব হয়ে গেছে। পোপ পিয়াস তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার নমুনা স্বরূপ একরকম পদক বা মুদ্রার প্রচলন করেচেন। তার এক দিকে আছে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি, অপর দিকে বিরাট ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও তার সীমানা। মুদ্রার পরিকল্পনা করেচেন অধ্যাপক অরেলিয়ো মিসতুরুজ্জী।

পোপের মুদ্রা

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘড়ি

গত ডিসেম্বর মাসে একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘড়ি নীলামে বিক্রী হয়ে গেছে। ঘড়িটী এক সময়ে ছিল প্রথম চার্লসের সম্পত্তি। তার পর অনেক হাত ঘুরে ঘুরে সেটী এসে পড়ে ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে—এবং এতকাল সেইখানেই ছিল। ঘড়িটী পকেটে রাখবার উপযোগী হ'লেও তাতে 'এলার্মের' বা 'সতর্ক' করবার ব্যবস্থা আছে এবং এই জন্যেই তার দাম। ঘড়িটী যিনি নির্ম্মাণ করেছিলেন তাঁর নাম ওডওয়ার্ড ইষ্ট। ১৬১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘড়ি

দুর্ব্বৃত্তের শবাধার

আমেরিকায় দলবদ্ধ ডাকাতির সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেচে তা'তে সে দেশের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েচেন।

দস্যুর শবাধার

এরা শাসন-তন্ত্রের কাউকে গ্রাহ্য করে না। এদের দলপতিরা কোটী কোটী ডলারের অধিকারী। এখানে যে

শবাধারটী দেখচেন, সেটী তাদের কোন দলপতির দেহ-রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল। তার নাম জো এইলো—মেশিন-গানের সাহায্যে তাকে বধ করা হয়। তার শবদেহ সমাধি-স্থানে নিয়ে যাবার জন্য এই শবাধারটী নির্ম্মিত হয়েছিল ১০ হাজার ডলার ব্যয়ে। তার দলের লোকরাই অবশ্য এই ব্যয় বহন করে। ১০ হাজার ডলার আমাদের ৩০ হাজার টাকার কিছু বেশী।

ছায়া-চিত্রে বিবর্ত্তন-বাদ

ইট-কাঠের স্তূপের মধ্যে বন্দী, আজকের মানব-সমাজের দিকে তাকিয়ে এ' কথা অনুমান করা কঠিন যে, একদিন তাদের পূর্ব্বপুরুষ হিংস্র জীব জানোয়ারের প্রতিবেশী হয়ে বাস করত,—তাদের দেহকে আবৃত করবার উপযুক্ত আচ্ছাদন ছিল না,—অসিদ্ধ পশুর মাংস ছিল তাদের লোভনীয় খাদ্য। নৃ-তত্ত্ববিদরা অবশ্য এ-সব খবর রাখেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নেই। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ চিত্র-নাট্য নির্ম্মাতা 'য়ুফা' কোম্পানী 'জীবন-রহস্য' নামে একখানি চিত্র-নাট্যের সাহায্যে মানুষের বিবর্ত্তনবাদকে রূপ দেবার চেষ্টা করেচেন। এই চিত্র-রূপ এত বিজ্ঞান-সম্মত এবং বিস্ময়কর হয়েচে যে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, নৃ-তত্ত্বের ছাত্রদের পক্ষেও তা লোভনীয় হয়ে উঠেচে। হ'বারই কথা। কারণ অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলের অতুলনীয় নির্দ্দেশ অনুসারে ছবিখানি তোলবার ব্যবস্থা হয়েছিল।
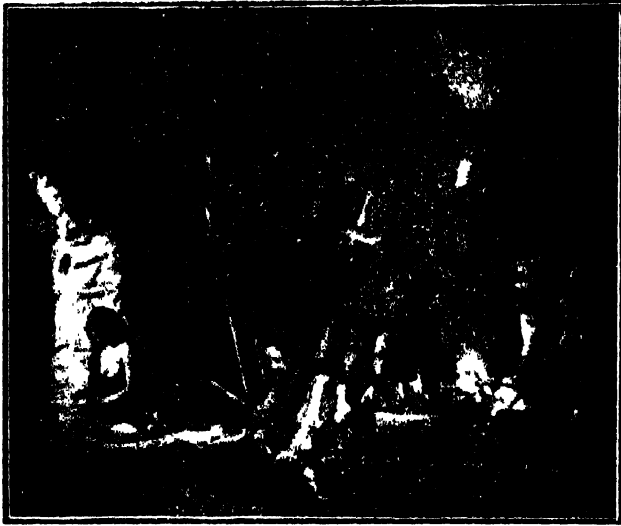
গুহাবাসী আদিম মানব-পরিবার

মানুষের আদি পুরুষ

সমাচার দর্পণে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল সংবাদপত্রের ফাইল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, সে-যুগের সমাজের, বাংলা ভাষার ক্রম-গঠনের, বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির ইতিহাস লিখিবার জন্য অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। বিশেষতঃ যে-সকল খ্যাতিমান্ পুরুষের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের জীবন চরিত সঙ্কলনে এই সংবাদপত্রগুলি অপরিহার্য্য। দুঃখের বিষয়, এদিকে কাহারও চেষ্টা বড়-একটা দেখা যাইতেছে না।

অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি আমি বাংলার দ্বিতীয় সংবাদপত্র—সমাচার দর্পণের প্রথম কয়েক বৎসরের ফাইল দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা—২৩এ মে ১৮১৮ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) হইতে ১৪ই জুলাই ১৮২১ (৩২ আষাঢ় ১২২৮) পর্য্যন্ত ফাইল সংগৃহীত আছে।* পরবর্ত্তী তিন বৎসরের সমাচার দর্পণের ফাইল—১৪ই এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮) হইতে ১০ই এপ্রিল ১৮২৪ (৩০ চৈত্র ১২৩০) পর্য্যন্ত—আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করিয়াছি; এগুলির সন্ধান পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো লেখকই পান নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ছয় বৎসরের সমাচার দর্পণ হইতে—অবশ্য অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব—নানাবিষয়ক জ্ঞাতব্য তথ্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত এই ফাইল হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ডাঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার "সমাচার দর্পণ" নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪, পৃ. ১৪৯-৭০)

লালাবাবু

বঙ্গের নরনারীর নিকট লালাবাবুর নাম সুপরিচিত। সমাচার দর্পণ পাঠে তাঁহার শেষ জীবনের ইতিহাস জানা যায়।

(৮৯ সংখ্যা। ২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬)

শ্রীযুত লালাবাবু। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন।··· তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না।···

(১০৯ সংখ্যা। ১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭)

লালাবাবুর মৃত্যু।···লালাবাবু অনুমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিন শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন

করিয়াছিলেন তাঁহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র২ লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন২ আহার অনায়াসে সরকার হইতে বরাওর্দ্দরূপ পাইত বিশেষ২ দিনে ইহা হইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থস্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরীবৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন ঐহিক সুখ লিপ্সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যেং কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমীদারি ও অন্য২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।"

শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লালাবাবু' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। মোরেনো সাহেবও লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।* কিন্তু এগুলিতে জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পের ভাগই বেশী—কাজের কথা খুবই কম। মাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮২০, জুলাই সংখ্যায় (পৃঃ ১৯৯ ২০৩) লালাবাবুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। ভারত-গভর্মেণ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন-প্রবাসের ইতিহাস ১৯২৭ সালের *Bengal: Past & Present* পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

রামমোহন রায়

(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫)

"সহমরণ। কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহনরায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

(৪ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

"নূতন পুস্তক। সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহনরায় পুনর্ব্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

(২২ মে ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

"বেদান্ত মত। ৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮)

এই সংখ্যায় প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতার উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষে সমাচার দর্পণ সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন,—

* See *Bengal: Past & Present*, October—Decr. 1926.

"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।"

'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে রামমোহন রায় একখানি পত্রে প্রশ্নগুলির উত্তর সমাচার দর্পণে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক তাহা পত্রস্থ করেন নাই; তিনি ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ (১৮ ভাদ্র ১২২৮) তারিখের কাগজে মন্তব্য করিলেন,—

"পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন। শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিস্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।"

রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে ইংরেজী ও বাংলায় "ব্রাহ্মণ সেবধি" (*Brahmunical Magazine*) প্রকাশ করিয়া তাহাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিয়াছিলেন।

(৬ এপ্রিল ১৮২১। ২৫ চৈত্র ১২২৮)

অনেকেই রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পাঠ করিয়াছেন। তিনি যে-চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন সেই প্রশ্নগুলি প্রথমে এই সংখ্যা সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। ইহার গোড়ার অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"প্রেরিত পত্র॥ শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

"ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিসকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

"সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।"

তাহার পর প্রশ্ন চারিটি আছে। সর্ব্বশেষে সমাচার দর্পণ সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।"

নর্ত্তকী নিকী

(৭৪ সংখ্যা। ১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬)

"নর্ত্তকী। শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান ['ধনী' অর্থে] লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।"

(৯ মার্চ্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

"বিবাহ॥ মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেওয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়।…"

অসামান্ত রূপবতী ও অপূর্ব্ব নৃত্যকুশলা এই মুসলমান বাইজী সেকালের অনেক বড় বড় মজলিসে নৃত্য করিত। ১৮২৩ সালে ফ্যানি পার্কস নামে এক ইংরেজ মহিলা রাজা রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ীতে নিকীর নৃত্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়া যান :—

"1823, May.—The other evening we went to a party given by Ramohun Roy, a rich Bengallee baboo; the grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed. In various rooms of the house nach girls were dancing and singing···The style of singing was curious; at times the tones proceeded finely from their noses; some of the airs were very pretty; one of the women was Nickee, the Catalani of the East." *

মহারাজা তেজচন্দ্র ও রামমোহন রায়

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

"বর্দ্ধমানাধিপের মোকদ্দমা।—শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার মৃত পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বহাদরের রাণীরা সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদ্দমা হইয়া যে রূপ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ। মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারি কুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বর্দ্ধমান চাকলার দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাঁহার বিয়োগে আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় দুই বৎসরের কারণ বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ের মোকদ্দমা পূর্ব্বে জেলা ও কোর্টে হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল কারণ তাঁহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই সমাচার চন্দ্রিকাহইতে লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপর্য্য গ্রহ হইল না।"

রাজা প্রতাপচাঁদের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ সখ্য ছিল; প্রতাপচাঁদ কলিকাতা আসিলেই রামমোহন রায়ের মানিকতলার উদ্যানবাটীতে যাইতেন। * রামমোহনের দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রাজা প্রতাপচাঁদের দেওয়ান ছিলেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া যখন তাঁহার বিধবা রাণীরা শ্বশুর তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন, তখন গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ই রাণীদের তরফে মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়, তাঁহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার এবং দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরই প্ররোচনায় যে রাণীরা বার-বার মোকদ্দমা করিয়া তেজচন্দ্রকে উদ্বাস্ত করিতেছেন,—একথা তেজচন্দ্র ১৮২৩, ১৮ নভেম্বর তারিখে লিখিত একখানি ফার্সী পত্রে গভর্ণর-জেনারেলকে নিবেদন করিয়াছিলেন।

তেজচন্দ্রের সহিত রামমোহনের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমানাধিপের সহিত রায়-বংশের বহুদিন হইতে ঘোর বিবাদ—বর্দ্ধমানাধিপ রামকান্তকে [রামমোহনের পিতা] নানারূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন; এ কারণ রামমোহন বর্দ্ধমানের রাজার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না।" (২য় সং, পৃ. ৬১)

রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী'

সম্বাদ কৌমুদীর প্রচারকাল লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। ১৮২১, ৪ ডিসেম্বর তারিখে সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হইলে সমাচার দর্পণ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

* *Wanderings of a Pilgrim*, etc., by Fany Parkes, London, 1850, i. 29-30.

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" পুস্তকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২১ । ৯ পৌষ ১২২৮)

"সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট কিন্তু ইহার কোন ভাগ আমরা পাই নাই যেহেতুক তৎপ্রকাশক ব্যক্তি আমারদের নিকটে ইহার সমাচার পাঠান নাই কিন্তু অন্য২ লোকেরদের স্থানে তাহার বিষয় শুনা গিয়াছে তাহাতে অতি সুন্দর জ্ঞান হইয়াছে। ইহার পর আমারদের স্বাক্ষরকারিরদের তুষ্টিজনক যে২ বিষয় ঐ কৌমুদীতে পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা দর্পণ আরো আলোকযুক্ত করিব।

সংপ্রতি এই সপ্তাহে কৌমুদী ও দর্পণ বিষয়ক এক কাব্য কোনহ কাব্য কর্ত্তার নিকট হইতে এখানে পঁহুছিয়াছে তাহাতে তাহার গুণবত্তা প্রকাশ অশেষ কিন্তু তাহা ছাপা করিলে আত্মশ্লাঘা দোষ হয়।"

সম্পাদক বলিয়া নাম না থাকিলেও রামমোহন রায়ই 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সম্বাদ কৌমুদীর সংস্রব ত্যাগ করিলে হরিহর দত্ত আড়াই মাস সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাহার পর সম্পাদক হন—গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। ২৪ সংখ্যক [১৪ মে ১৮২২] সম্বাদ কৌমুদীর গোড়ায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

১। পাঠকগণের প্রতি পূর্ব্ব সম্পাদক—হরিহর দত্তের বিদায়-বাণী।

২। বর্ত্তমান সম্পাদক—গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের নিবেদন।" *

* "Contents of the *Sungbaud Cowmoody*, No. XXIV"—The *Calcutta Journal*, 14 May 1822, p. 193.

১৮৩০ সালের গোড়া হইতে সম্বাদ কৌমুদী দ্বিসাপ্তাহিক হয়।

১৮২২ সালের 'ক্যালকাটা জর্নাল'-এর 'এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট' বিভাগে সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম ৩০-৪০ খানি সংখ্যার বিষয়-সুচি ও অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে।

সমাচার চন্দ্রিকা

সম্বাদ কৌমুদীর ন্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশকাল লইয়াও মতভেদ আছে। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে এ বিষয়ে আর কোনো মতদ্বৈধ থাকিবে না।

(২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮)

"ইস্তাহার। কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে। এবং এতৎ পত্র গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী যে২ মহাশয় হইবেন তাঁহার নাম সম্বলিত পত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবামাত্রে তাঁহার নিকট চন্দ্রিকা পত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

পুঁ জানাইতেছেন ডাকের মারফত যাঁহার নিকট সমাচারচন্দ্রিকা পাঠান যাইবেক তাঁহারদিগের চন্দ্রিকা পত্রের মূল্য ১ টাকা ও ডাকের খরচ দিতে হইবেক ইতি।"

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ২৩এ ফাল্গুন ১২২৮ (৫ মার্চ্চ ১৮২২) তারিখে সমাচার চন্দ্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

(৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮)

"প্রেরিত পত্র ॥ শ্রীযুত সমাচার দর্পণকারক মহাশয়

প্রতি আমার নিবেদন। আমার এই পত্র দর্পণে অর্পণ করিলে অনেকের উপকার হয় অতএব যদি যোগ্য হয় তবে শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অর্পণ করিবেন।

'সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতে ছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাঁহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানি সূচক হইলে নামের বিপরীত হয়। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে পরস্পর নিন্দা প্রকাশ রহিত করিয়া নানাদেশীয় নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন ইহা হইলে পাঠকেরা আনন্দিত হইয়া পাঠ করিবেন এবং উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক এবং যদর্থে করিতেছেন তাহারও সিদ্ধি হইবেক।'

এই যে প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল তাহা দর্পণে প্রকাশ করিলাম এবং পত্র প্রেরক যেমত লিখিয়াছেন এ অতি সুন্দর লিখিয়াছেন যেহেতুক বিশিষ্ট দ্বয়ের মধ্যে ভেদ জন্মিলে বিশিষ্ট লোকের খেদ হয় এবং বিশিষ্টের মধ্যে ভেদ না থাকে বিশিষ্টের এই প্রার্থনা অতএব উভয়েই বিবেচনা করিবেন।"

বেগম সমরু

(৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭)

"বেগম সমরু। উজ্জয়নী হইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমরু শ্রীযুত নবাব নসীর দ্দৌলাকে * বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।"

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

"বেগম সমরু। উত্তরের আখবারদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে. তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।"

সার্দ্ধানার অধীশ্বরী বেগম সমরুর জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ আছে। উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তাঁহার জন্মতারিখ—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। বেগম সমরুর অলৌকিক জীবনকথা আমি বাংলা ও ইংরেজীতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। মোগল-সাম্রাজ্যের অবনতির ইতিহাস জানিতে হইলে বেগম সমরুর জীবন-কাহিনীর উপকারিতা আছে।

ভোজদেব

(৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮)

"শ্রীভোজদেবের রাজত্বের কীর্ত্তি অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধা আছে কিন্তু তিনি কোন সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া এতাদৃশ বহুকালস্থায়ি যশঃ পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছেন তাহার কিছু নিদর্শন না পাওয়াতে সকলের মনে উৎকণ্ঠা আছে এবং এই বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

সে সন্দেহ দূর হইল যে মোং হুসিংগাবাদের পূর্ব্ব বিশ ক্রোশ অন্তর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে সোহাজপুর গ্রামে সংপ্রতি এক প্রস্তর মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শ্রীভোজ রাজের পিতৃ বা মুঞ্জরাজের নাম ও তাহার রাজত্ব করণের সময় নিরূপণ আছে তাহার দ্বারা জানা যায় যে শ্রীভোজদেব আট শত বৎসর হইল তৎপ্রদেশে ধারা নগরীতে রাজত্ব করিয়াছেন।"

ত্রিপুরা রাজার অভিষেক

(৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮)

"ত্রিপুরা ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্গা মাণিক্য ইংগ্লণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তারদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শাসন-কর্ত্তারা সে বিষয় তদারক করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা ত্রিপুরার জজ ও মেজেস্ত্রিড সাহেবে-

---

* 'নসীরদ্দৌলা' নামেও স্যর ডেভিড অক্টারলোনী পরিচিত ছিলেন।—"সেখানে [উজ্জয়িনীতে] জনরব হইয়াছে যে নবাব শ্রীযুত নসীরদ্দৌলা অর্থাৎ শ্রীযুত সর ডেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎপ্রদেশের সুবেদার হইবেন।"—সমাচার দর্পণ, ১৩ অক্টোবর, ১৮২১।

রদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত উত্তম সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ভ করিয়া রাজবাটী নিকটবর্ত্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত জজ সাহেবপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল। পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল।

অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিস্ত্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটীপর্য্যন্ত অতিবড় ৩০ ত্রিশ সুসজ্জ হস্তীর উপরে ডঙ্কা হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবেরা রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট সম্ভাষা করিলেন ও আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল। রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে আইলেন। সাহেবেরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা ঐ খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া ঐ খীলাত পরিধান করিলেন ও পাগ বান্ধিলেন এবং অপূর্ব্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। পরে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য২ লোক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহাসনের উত্তর ভাগে দাঁড়াইলেন তৎ কালে ব্রাহ্মণেরা অনেক শান্তিবাক্য পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে শুক্ল বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে ব্রাহ্মণেরা পুনঃ২ শান্তি করিলেন।

পরে রাজা সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাভ্যুক্ষণ করিলেন এবং রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলারা রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বস্ত্র আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান২ লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাজা তৎকালে আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বসিলেন সে সিংহাসন হস্তি দন্তে নির্ম্মিত ও স্বর্ণে মণ্ডিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দ্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর। পরে যথাযোগ্য সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

সেই দিনে সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন ও তাবৎ লোককে উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা সাহেবেরদের গৃহে গিয়া তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রি যোগে উত্তম খানা হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক আমোদ হইল।

সম্বাদ তিমিরনাশক

(২৯ নভেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

"সুসম্বাদ ॥—একনবতিসংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক তৎপ্রকাশক ব্যক্তি তিমির নাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ফল সিদ্ধির সম্ভাবনাও বটে সে যে হউক সৎকর্ম্মের উদ্যোগও শুভসূচক। ইতর লোকেও কহে যে খোষ খবরের ঝুটও ভাল অতএব তাহার দোষ গুণ বিবেচনার আবশ্যকতা বড় নাই যে হেতুক সকল লোক স্ব স্ব বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দোষাদোষ বিবিচ্য নহে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিই প্রশংসনীয়া। অতএব নূতন পত্রপ্রকাশক ব্যক্তি নূতনব্রতী এই সকল হিতোপদেশ ও প্রাচীন পত্রাদি দর্শনদ্বারা দিগ্দর্শন হইলে ক্রমে পরিপক্কতা-প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামক সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৮২৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম প্রচারিত হয়।

ওরিয়েণ্টাল মার্কারি

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

"ওরিএন্টেল মেরকিউরি নামে এক ইংরেজী সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে সে কাগজ ১৮ সংখ্যাপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে ঐ কাগজের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

মেরকিউরি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রকাশ হয় ইহাতে নানা দিগ্দেশীয় সম্বাদ এবং হিন্দুরদিগের তীর্থ বৃত্তান্ত যাহা সকলে জ্ঞাত নহেন তাহার চমৎকার২ বিষয় বিশেষ বিশেষণ বর্ণন করিয়া তৎপ্রকাশক প্রকাশ করিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকের হিতার্থে রাজদ্বারা প্রার্থনাপূর্ব্বক অনেক২ পত্র প্রকাশ করিতেছেন এতদ্ভিন্ন নানা দেশীয় জ্ঞানোপযোগী বিষয় অনেক প্রকাশ করিতেছেন ঐ কাগজ পাঠ করিলে বহুতর উপকার হইতে পারে।

শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার লোক-সংখ্যা

(১০ আগষ্ট ১৮২২। ২৭ শ্রাবণ ১২২৯)

"কলিকাতার লোকসংখ্যা।—আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত চতুর্দ্দশ শালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের সাহেব লোকেরা কি অনুসারে গণনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহারদের দ্বারা পুলিসের অধ্যক্ষেরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার আট শত আটত্রিশ। মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাষট্টি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার দুই শত তিন। চীন দেশীয় চারি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।"

ফিলিক্স কেরি'র মৃত্যু

(১৬ নভেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

"মরণ॥—মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল। এবং ইনি স্বপিতৃ শ্রীযুত উলিয়ম কেরি সাহেবের কর্ম্মের অনেক সাহায্য করিতেন ও নানা প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিতেন সংপ্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানেতে এই২ সকল কর্ম্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ডেকসিয়ানরি যাহা শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও ফিলিক্স কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বর্ম্মা অক্ষরে পালি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গালা। কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর কারণ দিগ্দর্শন। শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বাঙ্গালা করিতেছিলেন। যাত্রাগ্রসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটীন নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।"

সংস্কৃত কলেজের গোড়ার কথা

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

"সংস্কৃত পাঠশালা।—শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর নিকট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে গৃহ যত দিবস প্রস্তুত না হয় তাবৎ কাল মোং বহুবাজারের চৌরাস্থার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটীতে পাঠ হইবেক শুনা যাইতেছে ঐ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন ঐ সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ পাঁচ টাকা মাসিক পাইবেন তাঁহারা স্ব২ মনোনীত স্থানে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ঐ পাঠশালার কর্ম্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া বিজ্ঞতম শ্রীযুত ডাং উইল্‌সন্ সাহেব ও শ্রীযুত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবেরা তাঁহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুনা গেল গ্রন্থ পাঠ ও পাঠের সময় এতদ্দেশের রীত্যনুসারে হইবেক ইতি।"

(১০ জানুয়ারি ১৮২৪। ২৭ পৌষ ১২৩০)

"সংস্কৃত পাঠশালা।—১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুআরি ১৮২৪ সাল মোং বহুবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারম্ভ হইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে২ শাস্ত্র পাঠ হইবেক তাহা লিখা যাইতেছে।

ন্যায়   শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি।
স্মৃতি   শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।
অলঙ্কার শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।
কাব্য   শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।
ব্যাকরণ ১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ।
২শ্রীযুত রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন।
৩শ্রীযুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

এই কএক শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন না কিন্তু নিরূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিক পাইতে পারিবেন।

পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহ২ দুই প্রহরে আসিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পড়াইবেন আর২ নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

"সংস্কৃতকালেজ। এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সংপ্রতি যে যে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতনভুক ছাত্র।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্র		১৬
কৌমুদী ঐ	ঐ	৬
কাব্য	ঐ	১১
অলঙ্কার	ঐ	৫
স্মৃতি	ঐ	৬
ন্যায়	ঐ	৬
		৫০

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভুক হইয়াছেন তদন্য ৩০ জন আসিয়া ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিত বেতনভুক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে তত্তৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নানা শাস্ত্রের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একটা ছাপাখানা হইবেক।

পঠনের নিয়মকাল। দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্টা অবধি ৩ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ও ছাত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাবৎ বন্দোবস্ত হইবেক।"

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

"সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।—২৫ ফেব্রুআরি বুধবার বৈকালে সংস্কৃত কালেজনামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্তু প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। শুনিলাম যে ইহাতে ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাদ্যকর

সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে সমারোহপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন।"

বরিশালে জলপ্লাবন

১৮২২ সালে জুন মাসের গোড়ায় বরিশাল জেলায় জলপ্লাবনের ফলে তথাকার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়,—

(২৯ জুন ১৮২২ । ১৬ আষাঢ় ১২২৯)

"দয়া প্রকাশ ॥ শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতা হইতে সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ও তৈল লবণ ডালি ঘৃত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। এবং বাখরগঞ্জের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা।

আসামী	তঙ্কা
* * *	*
রামমোহন রায়	১০০
গোপীমোহন দেব	১০০
রসময় দত্ত	৩২
জে এস বকিংহেম	২০০
সনফর্ড আরনট	৫০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	২০০
রামদুলাল দে	২০০
নবকিশোর মিত্র	২৬
বিশ্বম্ভর সেন	৫০

জিনিষের বাজার দর

সমাচার দর্পণের শেষে জিনিষপত্রের বাজার দর দেওয়া থাকিত। ১৮২২ সালের প্রারম্ভে জিনিষপত্রের দর কিরূপ ছিল উদ্ধৃত করিতেছি।

(১৩ জানুয়ারি ১৮২২ । ৩০ পৌষ ১২২৮)

বাজার ভাও ॥

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩৮
নারিকেল তৈল	১	১০	১২
চালু পাটনাই	১	২	২৵
মুগী	১	১।৵	১॥
পাছড়ি উত্তম	১	২।	২॥
পাছড়ি মধ্যম	১	১৮	১৸৵
বালাম	১	১৵	১৶
অড়হর ডালি	১	১॥৴	১॥৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২৭	২৮
ভৈসা ঘৃত	১	২৫	২৬
মিছরি উত্তম	১	১৪।	১৫
চিনী কাশীর	১	১০	১০।
মধ্যম	১	৯।৵	৯॥
তামাকু	১	৩	৬
হরিদ্রা	১	৩	৩।
কর্পূর	১	৫০	৫২
*	*	*	* *

গির্জ্জা

(১৬ মার্চ ১৮২২ । ৪ চৈত্র ১২২৮)

"চুচুঁড়া ॥ মোং চচুঁড়াতে এক আরমানী গির্জাঘর আছে সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রির্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবী বেগরাম ঐ গ্রির্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।…"

(২১ এপ্রিল ১৮২১ । ১০ বৈশাখ ১২২৮)

"নূতন গ্রিজাঘর। মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।"

দ্বারকানাথ ঠাকুরের নূতন গৃহ

(২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ৬ পৌষ ১২৩০)

"নূতনগৃহ সঞ্চার ॥—মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটীতে অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া

চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"

উর্দ্দু ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র

(১৪ জুন ১৮২৩ । ১ আষাঢ় ১২৩০)

"নবীন সম্বাদপত্র॥ শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দ্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমসুল আথবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে অধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে যেহেতুক মনুষ্যেরদের জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয়ের যত বৃদ্ধি হয় ততই উত্তম।"

দেখা যাইতেছে, ইহার প্রথম সংখ্যা ৩০ মে ১৮২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহা উর্দ্দু ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। প্রথম সংবাদপত্রখানির নাম—জাম-ই-জাহান নুমা; ১৮২২, ২৮ মার্চ্চ তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ হুসেন আজাদের "আবে হায়াৎ" গ্রন্থপাঠে উর্দ্দু ভাষাভাষীদের ধারণা হইয়াছে যে ১৮৩৩ সালে আজাদের পিতাই দিল্লী হইতে প্রথম উর্দ্দু সংবাদপত্র বাহির করেন।

নূতন পুস্তক

(১৮ মে ১৮২২ । ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

নূতন পুস্তক॥—মোকাম খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন বহুদর্শী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন ইহাতে অনেক২ অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক উপকার হইবেক।"

(২৪ আগষ্ট ১৮২২ । ৯ ভাদ্র ১২২৯)

"ইস্তাহার। বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্হ প্রসিদ্ধ জান্‌সন্স ডিক্স্যানেরি। শ্রীযুত জন মেন্দিস সাহেবকর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮ টাকা।…"

বালিকা-বিদ্যালয়

(৮ মার্চ ১৮২৩ । ২৬ ফাল্গুন ১২২৯)

"বালিকাপাঠশালা॥—কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকা-পাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য২ লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন যে তাহাতে অন্য২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকারা ঐ পাঠশালাতে আসিয়া মিস কুকহইতে আর২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়া শিক্ষা করাণেতে মিস কুকের অধিক পরিশ্রম ও কর্ম্মের অল্পতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না।"

গৌড়ীয় সমাজ

(২৯ মার্চ ১৮২৩ । ১৭ চৈত্র ১২২৯)

"গৌড়ীয় সমাজ।—১১ চৈত্র রবিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে

গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যে২ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন···ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়··ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল···ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব···ও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি···।

ইহারদিগের আগমনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে সভার অনুষ্ঠান-পত্র আপনি পাঠ করুন। তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অনুমতি করিলেন। পরে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য অতএব এতদ্দেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ বদ্ধকরণার্থে অর্থ দান করুন। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ইহাঁরা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন যে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যাহারা ধনদান করিলেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে।

নাম	সকৃৎ দান	ও ত্রৈমাসিক দান
...	...	...
শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর	২০০	৩০
" উমানন্দন ঠাকুর	২০০	৩০
" চন্দ্রকুমার ঠাকুর	৫০০	৬০
" দ্বারিকানাথ ঠাকুর	২০০	৩০
" কাশীকান্ত ঘোষাল	২০০	১২
" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	১০
" বিশ্বনাথ মতিলাল	১০০	৮
" রামকমল সেন	১০০	২৫
" রাধাকান্ত দেব	২০০	৩০
	২১৫১	২৬৪

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে ঐ সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন তাঁহারদিগের নাম শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক।

(১৭ মে ১৮২৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

গৌড়ীয় সমাজ॥—২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসের বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ সভার এক সভ্য শ্রীযুত বাবু কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রন্থহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকের কএক অংশ সভ্যগণের সন্নিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন যে এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ প্রদান করিলাম। সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থগ্রহণ করিলেন।

আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।

(২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্বিন ১২৩০)

গৌড়ীয় সমাজ।—শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে ৩০ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণেরা সভা করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়।"

কাশীর প্রাচীন ইতিহাস

(৩০ নভেম্বর ১৮২২ । ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

"কাশী ॥—জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তারদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজেনেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিদ্ধস্ত করিয়াছিল। ইহারপরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজত্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল। কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাড় সাঁড় সিঁড়ি।"

কাশীর দুর্গাদেবীর মন্দির

(১০ এপ্রিল ১৮২৪ । ৩০ চৈত্র ১২৩০)

"কাশী।—মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেক২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গা-দেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পাস্তামাত্র [?] হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাট-মন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

আই হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

হাঁ করে ভাবলে আর কি হবে। প্রতুল যা শুনিয়ে গেল,—সে দেখচি আসবেই। আমাকে যেন ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে গেল। দুনিয়ায় কি স্বস্তির ব্যবস্থা কোথাও নেই! অনেক করে' এই 'ধ্রুব-লোকটি' জুটেছিল,—এখানেও বাঘ সঙ্গ ছাড়েনা!

কোম্পানির ট্রেণ চলে গেছে,—চেয়ে দেখি দ্বিচক্র সাম্পানীগুলিও যাত্রী নিয়ে সরে পড়েছে! উপায়? মধ্যে চার মাইল ব্যবধান,—পদব্রজে সেটা সমাধানের সামর্থ্য আর নেই।

হঠাৎ গাড়ীর ছ্যাড়্‌ ছ্যাড়্‌ শব্দ সাহানা সুরের মত কর্ণে প্রবেশ করে উৎকর্ণ করে দিলে। ষ্টেসনেই আসছে। ঘোড়াটা উর্দ্ধশ্বাস ছুটেছে,—সকালে চারটি ঘাস খেয়েছিল, গাড়োয়ান সপাসপ্‌ চাবুক চালিয়ে, ঘাস নিয়ে তার পরি-শোধ নিচ্ছে! উঃ—এখানেও আছে নাকি?

যম আর কোথায় নেই! মন বলে উঠলো,—আর বেশী দিন নয় বাবা, তোদের দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে,—বিলেতে বড় বড় দয়ার্দ্র মাথা বিনিদ্র হয়ে উঠেছে। অচিরেই কোটরে কোটরে মোটর ঢুকবে;—ঘর থেকে ময়লা পর্য্যন্ত বইবে। তোরাই শেষ মার্টার্।

দেখি অত্যুচ্চে গাড়োয়ানের পাশেই অচ্যুত বাবু,—তাঁরি ব্যস্ততায় ঘোড়ার দুরবস্থা। এখনো ত' ট্রেণ আসেনি,—এতো তাড়া কেনো!

গাড়ীর মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি।—কেরাণীর মূলধন বাড়ীতেই বাড়ে,—বেতন না বাড়লেও। ভগবান কাকেও সবদিকে মারেন না,—এ সৌভাগ্যটি গরীবদের দিয়ে রেখেছেন। গাড়ীর মধ্যে তাদের পরস্পরের চড়চাপড় আঁচড় কামড় চীৎকার চলেছে। এই ক্ষুদ্র 'মিনেজারি' নিয়ে অচ্যুত বাবু যেন মহাপ্রস্থানে চলেছেন!

দেখা হতেই প্রথম প্রশ্ন—"ট্রেণ চলে গেলো নাকি?—এই কুলি,—কুলি?"

বললুম,—"কোন্ ট্রেণ,—কোথায় যাবেন?"

বললেন,—"যে ট্রেণ পাই,—যেখানে হয়…"

"তবু?"

"ইচ্ছে তো মশাই—শান্তিপুর।"

"ব্যস্ত হবেন না, এখনো অনেক সময়।"

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রণগোপাল, গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে,—"আমি কিন্তু যাচ্ছিনা বাবু,—আপনাদের তুলে দিয়ে,…পরশু 'শীল্ড ম্যাচ্' রয়েছে তা জানেন?"

"থাম্ থাম্,—জানি বলেই তোর"…আমার দিকে ফিরে বললেন—"ছোঁড়া ১৯ বচরে ম্যাট্রিক্ ফেল্ কোরে—মরিয়া হয়ে উঠেছে! শুনচি খেলায় উনি নাকি অগ্রীদের মধ্যমণি—(সেণ্টার ফরওয়ার্ড্)—"

—"ওঃ আপনি? মাপ করবেন, মাথার ঠিক নেই মশাই,—নমস্কার করতে ভুলে গেছি। তা,—আপনি এ সময়ে?—জানেন না বুঝি……"

"এ সময়ে মানে?—ব্যাপার কি?"

বললেন—"ছেলে-পুলে নিয়ে এখানে বাস আর সেফ্ (নিরাপদ) নয় মশাই…"

"তাতে আর আমার দুর্ভাবনা কি? ছেলে তো নেই।"

"আরে মশাই পেনসন্ তো আছে? সে যে ছেলের বাবা! ছেলের পিণ্ডি দেয়,—সে যে অন্ন দেয়।"

"তা যেন বুঝলুম,—কিন্তু হয়েছে কি? মড়ক নাকি?"

বললেন—"সে সব সেকালে হোতো মশাই,—আমাদের সন্ধ্যে-আহ্নিকের মত সবই উঠে গেছে…"

এই সময় চতুর্থ অপত্য ভূতো গাড়ীর ফোঁকর গলে ভূপতিত!—"ঐ গেলো গো" বলে অচ্যুত-পত্নী চীৎকার করে উঠলেন!

আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুললুম।—"কোথায় লেগেছে বাবা?"

অচ্যুতবাবু তখন পত্নীকে বলছিলেন,—"এখনো 'বড়-দেবতা' রয়েছেন,—ট্রেণের ফোঁকরের জন্যে ও-কটা যেন থাকে! যেন ঝাড়া হাত পায় বাড়ী যেতে পারি।"

আমার দিকে চেয়ে বললেন,—"ভাববেন না, কোথাও লাগেনি;—পড়ে পড়ে টোন্ মেরে গেছে। দেখচেন না,—কাঁদলেনা।—যাক্, আপনি কি বলছিলেন?"

"এমন কিছু নয়,—আপনার প্রাণভয়ে পালাবার মত ব্যস্ততা দেখে—আর পরলোকের পরোয়া না রেখে ঘোড়াটার পিটের ওপর দিয়ে Short cut (সোজা রাস্তা) বানাবার প্রয়াস দেখে ভাবছিলুম,—হয়েছে কি?"

"রেখে দিন মশাই পরলোক—আমরা আদালতে কাজ করি, আমাদের পরলোক ভাববার ফুরসৎ কোথায় মশাই। মক্কেলেরাই ইহলোক সামলাচ্ছে তাই রক্ষে। বিবাহের পর কি আর পরলোক থাকে মশাই—কেবল এই সব ছোট লোক নিয়ে আজন্ম ভোগা।"

রণগোপাল সহ্য করতে না পেরে—সরোষে দু'একটা সাইকলজির কথা বলে ফেললে। ছেলেরা অন্যায় কথা বরদাস্ত করবে কেনো,—এডুকেশন পাচ্ছে।

অচ্যুতবাবুর মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠলো, বললেন—"শুনলেন?"

আমি সেটা না শুনে বললুম,—"হ্যাঁ,—আপনি যে এমন নিরাপদ স্থানটির বদনাম দিচ্ছেন,—হয়েছে কি? তা তো বললেন না,…"

"আরে মশাই সে দিন আর নেই—এখন 'কর্ম্মক্ষেত্র' চলছে,—'কর্ম্মযোগ' সুরু হয়ে গেছে!"

বললুম,—"বাঙ্গালীদেরও ?"

"তারাই তো সুরু কর্‌লে"……

শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। গর্ব্বের হিল্লোলে প্রাণটা দুলে উঠলো; ভাবলুম—লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! এ প্রদেশে বাঙ্গালীর কর্ম্মের পথ বিধিমতে কণ্টকাকীর্ণ করে রাখা হয়েছিল। একমাত্র ছাড়-পত্র ছিল—'ডোমিসাইল্ সার্টিফিকেট্'। সেটা লাভ করা—রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করার চেয়ে সহজ ছিলনা। যাক্—বাঙ্গালী প্রখর বুদ্ধিবলে কর্ম্মের পথ করে নিয়েছে দেখছি;—জাতটি কেমন! অচ্যুতবাবু তাতে এতো ভয় পাচ্ছেন কেনো? ওঁর তো পাকা চাকরি। বললুম,—

"যাক্—'কর্ম্মযোগ' এসে গেছে—বাঁচলুম। ছেলেপুলে' গুলোর কিনারা হল।—উঃ গ্রাজুয়েটের গাঁদি মেরে যাচ্ছিল—এখন চাঁদির মুখ দেখতে পাবে, ধরিত্রী ঠাণ্ডা হবে। তবে আবার ভাবছেন কেনো এতো। দুর্য্যোগ তো কেটে গেছে। আপনি কর্ম্মক্ষেত্রে জোমে থাকতে থাকতে এই 'কর্ম্মযোগের' সুযোগে রণগোপালকে কলম হাতে দিয়ে রণক্ষেত্রে ঢুকিয়ে নিননা। বাপ থাকতে 'ফেলে' আটকায় না (মেলের) mailএর speedএ (চালে) সব ঢুকে পড়ে। এই আমাদেরই কথা ভাবুন না,—ফেল্ করা ছিল আমাদের বংশের ধারা—একচেটে কারবার। আটকেছিল কি! এই চতুর্থ পুরুষে পড়েছে। মিছে ভাববেন না;—এখন ভাই-ভায়ের রাজ,—brothers domainএ ডোমিসাইলের একৃসাইল্। এই তো মওকা।"

"কি বকচেন মশাই,—'কর্ম্মযোগ' খুব বুঝেচেন তো!"

"কেনো—শক্তটা কি? 'কর্ম্ম' মানে তো চাকরি,—আর চাকরি মানে কেরাণীগিরী,—এ আর কোন্ বাঙ্গালী না জানে?"

"একবার যাননা বুঝতে পারবেন। এ সে কর্ম্মযোগ নয় মশাই—খাস মুকুন্দদাসের 'কর্ম্মক্ষেত্র'। একদিন গিয়েই ছেলেমেয়েরা সব front (চড়োয়া) হয়ে দাঁড়িয়েছে,—আটকানো দায়।—লোকে লোকারণ্য!"

'মুকুন্দদাস' শুনে চমকে গেলুম! হুঁ—তিনিই হবেন। মানুষ চেনা ভার! ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই একটা বড় রকম স্কিম্ (মতলব) এঁচে থাকবেন। দেশের জন্যে কার না প্রাণ কাঁদে?…খুব চাপা লোক বটে!

বললুম—"ছেলেরা front হবেনা, চাকরির জন্তে সব মুকিয়ে রয়েছে,—যাবেনা? আর এই সময় কিনা আপনি ছেলে নিয়ে সরচেন!"

"আপনাকে বোঝাতে পারবনা মশাই, একটু এগিয়ে গেলেই শুনতে পাবেন। কি গানটা রে ভুতো? শুনিয়ে দেনা……

ভূতোর কপালটা ফুলে উঠেছিল, সে কপালে হাত বুলুতে বুলুতে একেবারে পঞ্চমে ধরলে—"

"করমেরি যুগ এসেছে
সবাই কাজে লেগে গেছে,—"

"চুপ চুপ,—হয়েছে, বস্" বলে, অচ্যুতবাবু একবার চারদিক চাইলেন।

ভূতো তখনও ভেঁজে চলেছে—
—"মোরাই কি রহিব শয়ান।"

"থাম্ পাজি" বলে, ধমক্ দিলেন।

"এ বেটারা এখানে থাকলে কি আর চাকরি থাকবে মশাই। ঘর ঘর ওই সুর উঠেছে,—এস্তোক"…বলে পত্নীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।—"শেষ সাতটা বচর আর কাটেনা দেখচি,—সাত দিন কাটা ভার।"

ট্রেণ এসে গেল। পড়ি তো মরি এইভাবে অচ্যুতবাবু ছেলেমেয়ে নিয়ে ছুটলেন। একবার পেছু চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"গুণে নিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ—সাতটা মোট ঠিক্ আছে।"

"মোট নয়—মোট নয়, মা-ষষ্ঠীর কৃপা-সমষ্টি।"

পত্নী আর কথা কইলেন না।

রণ-গোপাল গাড়োয়ানকে কি ইসারা করলে।

আমি গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়োয়ান বললে,—"এলুম বলে,—তামাকটা টেনেনি বাবু।"

আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিলনা,—তাড়াও ছিলনা। তখন মুকুন্দবাবুই মগজে গজগজ করছেন।—কি চাপা লোক।—ওঃ—কাশী ধর্ম্মক্ষেত্র কিনা, ধর্ম্মক্ষেত্রে তাই কর্ম্মের কথা কইতেননা,—আনন্দমঠ কি নন্দকুমারের নামে অত চটে যেতেন। একটা প্রিন্সিপল ধরে চলেন,—প্রিন্সিপল্ না থাকলে কি মানুষ! লোকটি খাঁটি।—নন্দকুমার খানা

নিশ্চয়ই এনে থাকবেন। যাক্—দুর্ভাবনা গেল,—সে সব নোট্ গেলে কি আর……

রণগোপাল লম্বা পা ফেলে এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো। গাড়োয়ান যথাস্থান নিলে। বললুম—"ঘোড়াটাকে আর চাবকা না বাবা,—জলদি নেই।—কই—তুমি গেলেনা ?"

"হ্যাঁ—আমি যাবো ! গেলুম আর কি !—লালমণির হাটের veterna হাট আসছে,—সামলাবে কে মশাই ? শৈলেনের এক একটি কিক্,—বাপ্—আমাদের তেমন একটা গোল-কিপার থাকলে ;—আচ্ছা দেখা যাক্—ভুখি থাইনা। আজ থাসি তো খাওয়া থাক। এক হপ্তা আগে থেকে রোজ সকালে ছুটো করে কাঁচা ডিম্ চলচে, তার effectও কম্ নয়…"

বুঝলুম,—আমার চেয়েও তার brain এর strain (মস্তিষ্কের মোচড়) অনেকখানি বেশী।

বললুম,— "তুমি গেলে না, তোমার বাবা যে বড় ক্ষুণ্ণ হবেন—"

"তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েই আছেন মশাই ;—থিয়েটার করবো তাতে ক্ষুণ্ণ, ডিম খাবো তাতে ক্ষুণ্ণ, ফুটবল্ খেলবো তাতে ক্ষুণ্ণ, জুলপি রাখবো না—তাতে ক্ষুণ্ণ, পড়া শোনাতে পর্য্যন্ত,—জোলার নভেল পড়বো তাতেও ক্ষুণ্ণ! ও একটা দুরারোগ্য রোগ মশাই,—বদ্দির বাবার সাদ্দি নেই যে সারাব………

"কত করে একখানা গোর্কির Mother (মাদার) জোগাড় করেছিলুম,—ফাদার বেজায় ক্ষুণ্ণ! কেনো মশাই,—সব বুঝতে পারি না-পারি চেষ্টাও কোরবনা ?,—হীরের এক টুকরো মিললেও তো যথেষ্ট। কি বলেন ‥ "

বললুম,—"তা বটে,—তবে তিনি খুসি কিসে ?"

"সে আর জিজ্ঞেস করবেন না মশাই,—পকেটে কিছু পড়লেই খুসি,—তা রোজ ২।০ টাকা টানেন। কাচারির বড় কাজই ওই ! তাদের ছেলেরা চোর না হয়ে যে আজো জেলের বাইরে বেড়াচ্ছে,তা দেখেও তো খুসি হওয়া উচিত ;—তাও নয়। ভাইগুলো বড় হলে কি হবে তা কে জানে ? আজ-কাল আট বচরের ছেলেরাও সব বোঝে মশাই,—শিখবে না ?"……

শুনে তো আমি নির্ব্বাক ! বললুম—"তা তোমার বাবা এত ব্যস্ত হয়ে সকলকে বাড়ী রাখতে যাচ্চেন কেনো। লম্বা ছুটি নিয়েছেন বুঝি ?"

"লম্বা ছুটি ওঁর কুষ্ঠীতে লেখেনি। বলেন ছুটি নিলেই লোকসান,—অন্য কেউ মেরে নেবে। রবিবারেও তাঁর কাছারি যাওয়া চাই।"

বললুম—"সে তো তোমাদেরই সুখে রাখবার জন্যে ভাই।"

"সুখ কতো !—তিন মাস বলছি একটা মফ্লার না হলে চলচে না, তা জুটলোনা। বলেন—হরিহর ছত্রের মেলায় সস্তা পাওয়া যাবে,—কাছারির প্যায়দাকে দিয়ে আনিয়ে দেবেন। The idea ! একি গরু কেনা, না গলার দড়ি, না ল্যাঁগোট্ !"

বললুম,—"বাড়ী থেকে ফিরবেন কবে ?"

"বাড়ী কি মশাই,—বাড়ী বিদেয় করে পথে না দাঁড়ালে কি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মেলে, না চাকরির দেউড়ি খোলে !—আগে গৃহত্যাগ করে সাধু হওয়া চাই। সব সাধু হয়েছেন ! এখন কেউ মামার বাড়ী কেউ শ্বশুর বাড়ী যান,—আমাদেরও তাই বলতে শেখান। সব সত্যাগ্রহীর দল।—আমার মশাই স্পষ্ট কথা। আবার গুরু করাও আছে, মন্ত্র নেওয়াও আছে,—জপ্ও চলে…Child Show (শিশু প্রদর্শনী) খুলেছে,—টিকি Show (প্রদর্শনী) খুললে এঁরাই প্রাইজ্ পাবেন।'

"থাক ও-কথা ভাই, বাপ্ সম্বন্ধে—তিনি যা ভালো বোঝেন"…

—"বাপ্ কি মশাই ! সে-দিন কাছারির এক বাণ্ডিল কাগজ বাড়ীতে ফেলে গিয়েছিলেন,—তাই দিতে গিয়েছিলুম। আমার এই দেখচেন তো,—খদ্দরের জামা কাপড়। উনি শশব্যস্ত,—তাড়াতে পারলে বাঁচেন! অঞ্জনাপ্রসাদ ওঁর ওপরওলা, জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কে ?" সাফ্ বললেন কিনা,—পাড়ায় থাকে! বলতে যাচ্ছিলুম—'ওঁর ছেলে', কিন্তু ঘৃণায় মুখ থেকে তা বেরুলনা। আমার কাছে স্পষ্ট কথা মশাই. সেই দিন থেকে আর 'বাবা' বলিনা। বলতে পারা যায় মশাই ? আপনি কি বলেন ? এঁরা থাকতে যদি স্বরাজ হয়—সে মিছের স্বরাজ থাকবে না এবং থাকাও উচিত নয়"—

'এবং'টা এমন সজোরে বেরুলো, তার তাড়ায়

আমার মনটাও সাড়া দিয়ে উঠলো। বললুম—"যাক্,—ও-সব কথা থাক ভাই।"

"তা যাই বলুন মশাই,—আপনারা থাকতে, I mean ওঁরা থাকতে, কোনো আশাই নেই! এমন নরক নেই যার তলা পর্য্যন্ত যেতে ওঁরা নারাজ,—চাকরি আর পয়সার জন্যে। দেশের একমাত্র ভরসা—আমাদের মায়েরা—তা দেখে নেবেন; এই বলে চললুম মশাই। আমার কাছে স্পষ্ট কথা।"

রণগোপাল নমস্কার করে নেবে পড়লো, এবং আশ্বাস দিয়ে গেল—আবার দেখা হবে।

আমি অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলুম,—আমাকে আবার দেখা হবার আশ্বাস দিয়ে আপ্যায়িত করা কেনো! ছেলেদের ভালোবাসি বটে—তারা চিরদিনই আমার প্রিয়,—রণগোপাল সেটা জানলে কি করে। ছেলেটি কিছু অতিরিক্ত স্পষ্টবাদী,—আজকালের ছেলেরা চুপ করে অন্যায় সইতে পারেনা,—গুরুজনদের সেটা বুঝে সাবধান হওয়াও উচিত।

আমিও ঠিকানায় পৌঁছে গেলুম।

'দাদা মশাই এসেছেন' বলে সাড়া পড়ে গেল।

মাথাটা ঘুরচে,—এখন স্নানাহার সেরে লম্বা ঘুম।

১৭

শুয়ে চোখ বুজতেই,—পাণ্ডাজি, উল্কামুখী, উকীল, প্রতুল, অচ্যুতবাবু, তস্য স্পষ্ট-বক্তা পুত্র রণগোপাল,—অনাহূত আসতে আরম্ভ করলেন। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান—কেউ হঠতে চাননা। বড় বড় বিচারকদের সওয়াল জবাব শোনায় গাঢ় অভিনিবেশের মধ্যে যেমন নাক ডাকতে শোনাও যায়,—সেই সনাতন প্রথা ধরে বোধ হয় আমারও প্রগাঢ় অভিনিবেশ এসে থাকবে। কতক্ষণের জন্যে জানিনা।

সম্মিলিত শিশুকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত সহসা বায়ুমণ্ডল চঞ্চল করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। শুনলুম—

করমেরই যুগ এসেছে,
সবাই কাজে লেগে গেছে
মোরাই কি রহিব শয়ান!

সেই ভূতোর কাছে শ্রুত বুলি! অচ্যুতবাবু অসত্য বলেন নি। কিন্তু মন্দটা এতে কোথায়? ভয়ের কি আছে? বলা নেই, কওয়া নেই, যুগটাই বা এলো কখন? যাক্, যখন এসেই গেছে, শয়ান থাকাটা আর শোভন নয়, একটা কিছু কাজে লাগাই ভালো।—তামাকটাই সাজি।

উঠে পড়লুম।—দেখি স্কুলের ছুটি হয়েছে, বালকেরা বই বগলে করে একমনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। কি সুন্দর দৃশ্য। ভাবী ভরসা,—কত মধুর!

বাড়ীর ভেতর থেকে সাত বছরের মেয়ে স্বাতী শোভা চা এনে সামনে ধরে দিলে।

বললুম—"এখুনি?"

"আমরা যে যাত্রা শুনতে যাব,—মা বলে দিলেন—সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। তুমি যাবেনা? খুব ভালো যাত্রা।"

"কিসের পালা রে,—দক্ষযজ্ঞ না হরিশ্চন্দ্র।"

স্বাতী নাকমুখ বেঁকিয়ে বললে,—"সে ভারি তো!—এ বেমন লাঙোল নিয়ে…"

"ওঃ—বলরামের ব্যাপার।"

"তুমি কিচ্ছু জানোনা দাদা মশাই" বলতে বলতে চলে গেলো।

হাসি পেলে,—Subject (বিষয়) আর পাবে কোথায়,—গিরিশ ঘোষ কি কিছু রেখে গেছেন!

দেখি—একদল তরুণ গোধূলি-লগ্নে ফুটবল্ লুফতে লুফতে মাঠ থেকে জীবনের সাড়া নিয়ে ফিরচে। হাসি হল্লা হুটোপাটি,—এই তো লাইফ্! প্রাণ-চাঞ্চল্য চারদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে—কি করি কি করি করাচ্ছে। এরাই তো ভাংবে গড়বে,—এরাই জগৎ-চিত্রকর। কত কল্পনা, কত ঘটনা, কত সুখ দুঃখ, কত স্বার্থ, কত ত্যাগ, কত মহত্ত্ব এদেরই মধ্যে প্রকাশের অপেক্ষা করে রয়েছে—

"এই যে উঠেছেন! আমরা দু'বার ফিরে গেছি।—আপনারও নাক ডাকে" বলে অমিয় হাসতে লাগলো।

বললুম—"মরা-নাক তো নয়,—ডাকবেনা?"

মানুষ অনেক কাজই অজ্ঞানে বা অসাড়ে করে—কিন্তু নিন্দুকের কাছে রেহাই নেই!

তারা হাসতে হাসতে বললে—"আমরা কি নিন্দে করেছি,—ডাকছিল তাই বলছি।"

"তা বেশ করেছ। কি করি বলো, মুখ বন্ধ, তাই অন্য যন্ত্র বোধ হয় আপনি বেজে ওঠে। ওকেই বলে দেশের

ডাক। শ্রোতা যে পেয়েছিল—এই ঢের! এখন সব ভালো আছ ত? আজ যে সব মাঠ থেকে এখনি ফিরলে?"

"আপনি শোনেন নি বুঝি! এখানে "কর্ম্মক্ষেত্র" খুব জমেছে,—মুকুন্দদাস এসেছেন,—যাবেন না? দেখবেন, একদম্ থ্রিলিং!"

"আমি তাঁকে খুব চিনি,—খাঁটি মানুষ। দেখা হবেই। তাঁর কাছে আমার কাজও আছে,—একখানা বই···"

"দিয়েছেন বুঝি,—ও! তবে তো শুনতেই হবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন।"

আমি সে কথা না বাড়িয়ে বললুম,—"তোমাদের ক্লব্ কেমন চলছে? কি কি নতুন বই বাড়লো? রুসোর ওয়ার্ক্ আনিয়েছ?"

"এখানে আবার ক্লব!—সে উঠে গেছে মশাই। মাসে যিনি দশ টাকার সিগারেট্ ফোঁকেন্ তিনিও চারগণ্ডা পয়সা ছাড়তে চাননা—ধোঁকেন্। নিজেদের পড়বার অবকাশ নেই,—তাঁদের পয়সায় পরের ছেলেরা পড়বে কেনো, তাতে তাঁদের কি লাভ? কেউ বলেন,—নভেল নাটক পড়ে মেয়েরা মাটি হয়ে যাবে,—ছেলেরা জাহান্নমে যাবে;—না আনায় মনুসংহিতা, না আছে 'ঘেরণ্ড'! একজন দেখতে এসে বললেন—"ঘনরামের জীবন-চরিত নেই, তবে আর আছে কি?"

মনে মনে ভাবলুম—"এ যুগেও এমন নির্লিপ্ত সমাজ আছে বলে তো নজরে পড়েনা। এও কম্ বাহাদুরী নয়! সেই সুখেই তো এখানে শান্তি প্রত্যাশায় আসা।"

বললুম—"তা, তোমরা তবে কি নিয়ে আছো,—ফুটবল? ওটা ভালো; শুনতে পাই ভালো খেলোয়াড়রা পাস্ হয়ে যায় এটা মাষ্টারেও চান না। এক কেলাসে expertরা (ধুরন্ধররা) তিন বচর থেকে বেশ পেকে বেরয়—Sound হয়! ওটা মন্দ নয়। শুনতে পাই চাকৃরি জুটতেও দেরি হয়না। তা আসল 'গোল্' তো ওই-ই। জন্মের মত গোল্ মিটে যায়। Sportsmanshipএ আজকাল Studentshipএর চেয়ে খাতির বেশী, বড় পদ মেলে। আনন্দই জীবনকে ফোটায়······"

তপন বললে—"তাই মাঝে মাঝে থিয়েটরও আছে।"

"এখন কি চলছে?"

"পরপারে।"

"এরি মধ্যে!"

"শীগগিরই দেখতে পাবেন।"

"দেখবো বই কি,—আমি টিকিট জোগাড় করে বসে আছি"।

সকলে হাসলে।

মনোরঞ্জন বললে—"চলো,—সকাল সকাল না গেলে জায়গা পাওয়া যাবেনা,—আজ মেয়ে পুরুষ সব ভেঙ্গে পড়বে। আপনি তো যাচ্চেনই · ····"

বলতে বলতে সব চলে গেল।

ভাবতে লাগলুম—কার ভেতর কি আছে কিছু বোঝবার জো নেই! মুকুন্দবাবু এত বড় শক্তি নীরবে বয়ে বেড়ান কি করে? আমার কাছে ঠিক্ উল্টো কথাই কইতেন! মানে কি? আমাকে সন্দেহ করবার কারণই বা কি?—গুরুদেবই জানেন।

একবার যেতে হবে কিন্তু। পরিচিতেরা তো যাবেনই—এক ক্ষেত্রেই সকলকে পাবো। তবে মুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো,—কাল একদম surprise visitএ—চম্‌কে দেওয়া।

(ক্রমশঃ)
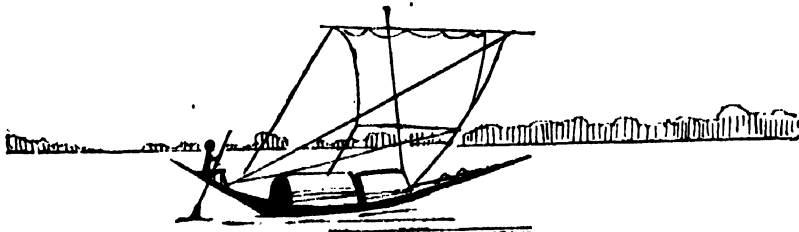
প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারী ভবন, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হারমোনিক ট্যাভার্ণ—ইহা সেকালের এক বিখ্যাত ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে আজকালের মত বড় বড় হোটেল ছিল না। ইহা লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা একটী সুদৃশ্য বাড়ী—সাধারণের বিশ্রামাগার, এসেমব্লি, বল-নাচ ও অভিনয়-কক্ষ রূপে ব্যবহৃত হইত। সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ-কালে ইহা বর্ত্তমান ছিল। তখনকার দিনে ইহাই টাউন হলের কাজ করিত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য এই স্থানে এক মহাসভা হয়। এই সভা হইতে ২৬০টি স্বাক্ষর সম্বলিত এক অভিনন্দন পত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়।

* * * *

লণ্ডন ট্যাভার্ণ—এই নামে অন্য একটী ট্যাভার্ণও উক্ত ট্যাভার্ণের নিকট ছিল।

* * * *

গলিস্ ট্যাভার্ণ (Le Gallais Tavern)—এই নামে পূর্ব্বকালে আর একটী ট্যাভার্ণ ছিল।

* * * *

ব্রেড্ এণ্ড চিজ্ বাঙ্গলো—ইহাও একটি সাধারণের যাতায়াত ও বিশ্রামের স্থান ছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা বৈঠকখানায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

* * * *

বেঙ্গল ক্লাব্—১৮২৭ সালের প্রথমে ৩৩ নম্বর চৌরঙ্গী ভবনে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা লর্ড মেকলের বাড়ী ছিল। এই বাড়ীটির বহু পরিবর্ত্তন করিয়া ক্লাবের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়। ভাইকাউণ্ট কমবারমেয়ার (Hon'ble Viscount Conbermere) ইহার প্রথম সভাপতি হন। সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সাতজন মনোনীত সভ্যের দ্বারা উহা পরিচালিত হইত। প্রথম অবস্থায় ডালহাউসি স্কোয়ারে বর্ত্তমান নিউম্যান্ কোম্পানি যে বাটীতে আছে, সেই বাটীতে উহা স্থাপিত হয় এরূপও উল্লেখ পাওয়া যায়।

অধুনা-লুপ্ত বেঙ্গল্ ক্লাবের বাটী।

* * * *

সাটার্ডে ক্লাব্—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উড্

ষ্ট্রীটে ইহা খোলা হয়। এখানে কনসার্ট্ নৃত্য নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ খুব হইত।

* * * *

কারেন্সি অফিস—এই বাড়ীটি প্রথম আগ্রা ও মাষ্টার-ম্যান্ ব্যাংকের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে উহা গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়া লইয়া কারেন্সি অফিসে পরিণত করেন।

* * * *

সান্‌সুসি থিয়েটার।
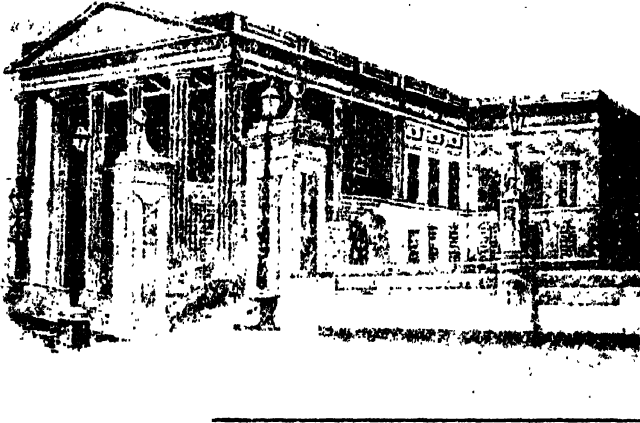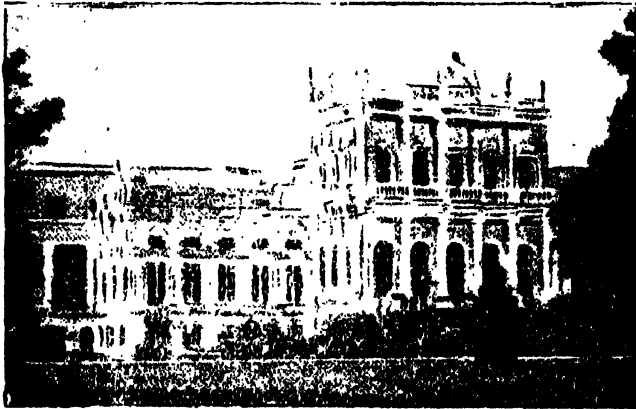
বেলভেডিয়ারের সম্মুখ দৃশ্য—৫০ বৎসর পূর্ব্বে।

ক্যাল্‌কাটা গল্‌ফ ক্লাব্—ইহা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * * *

খিদিরপুর মিলিটারি অরফ্যান্ স্কুল—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কিল্‌পাট্রিক্ (Major Kilpatric) কর্ত্তৃক ইহা প্রথম হাওড়ায় স্থাপিত হয়। পরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে উঠিয়া যায়। এই বাটী বারওয়েলের (Richard Barwell) বাসভবন ছিল। মধ্যে একটি অতি সুন্দর বল-রুম ছিল।

* * * *

রাইডিং স্কুল্—যে স্থানে এসিয়াটিক্ সোসাইটী আছে, তথায় একটি অশ্বপরিচালনা শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল, উহা এলাং (L' Elang) সাহেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মতলায় একটি অশ্বশালা ছিল। তথায় সপ্তাহে দুইবার বুধ ও শুক্রবার প্রকাশ্য নিলামে ঘোড়া গাড়ী কুকুর প্রভৃতি বিক্রয় হইত।

* * *

বেঙ্গল জকি ক্লাব্—উহা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি জুয়া খেলা ও ঘোড়দৌড় প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন না। পরে মারকুইশ্ অব্ হেষ্টিংস ইহার প্রশ্রয় দেন।

* * *

সেল্‌বিস্ (Selby's) ক্লাব্—ইহা একটী বড় জুয়ার আড্ডা ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ ইহা তুলিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

এসেম্ব্লী রুম—ডেকার্স লেনে ইহা অবস্থিত ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর বিদায় কালে এখানে বল-নাচ দেওয়া হইয়াছিল।

* * *

চেম্বার্স অব্ কমার্শ—পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ক্যালকাটা চেম্বার অব্ কমার্শ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সভ্য-সংখ্যা ছিল ৭৯ জন। উহার অফিস ছিল বগেড্ ওয়ার হাউসে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শও এই বাটীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহার প্রথম অর্দ্ধ-বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সভায় কলিকাতার ৮৬ জন এবং বাহিরের ১৮ জন সভ্য যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম যুগের খ্যাতনামা সওদাগরি অফিসের

মধ্যে এখন মাত্র মেসার্স গিলেণ্ডারস্ আরবুথনট্ ও মেকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি আছেন।

*　　*　　*　　*

কমার্শিয়েল্ এক্সচেঞ্জ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর চেম্বারের একটী সাধারণ সভায় ইহার প্রতিষ্ঠা বিষয় স্থির

মেডিক্যাল্ কলেজ হাসপাতাল

হয়। পর বৎসর ১লা জুন খোলা হয়। ১৮৬৭ অব্দের ২৯শে জুন সকল সভ্য একমত হইয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ব্রোকার্স্ এক্সচেঞ্জ" নাম দেয়।

*　　*　　*　　*

ডভ্‌টন্ কলেজ—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ উইলিয়ম রিকেট্ (William Ricketts) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের অভিভাবক ও চাঁদাদাতৃগণের গঠিত একটি সমিতির দ্বারা ইহা প্রথম পরিচালিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন ডভটন্ (Captain John Doveton) ইহার তহবিলে ২৩০০০০্ টাকা দান করেন। এই সময় হইতে ডভ্‌টন্ কলেজ নাম হয় এবং উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম ইহার নাম ছিল পেরেণ্ট্যাল্ একাডেমী। খৃষ্টানদের শিক্ষা বিষয়ে ইহা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

*　　*　　*　　*

ফ্রি-ম্যাশন্স্ হল—১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডালহাউসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ওল্ড্ কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে—যতদিন না ঐ বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় ততদিন—প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপরে লালবাজারের পুলিশের অপর দিকে যেখানে পূর্ব্বে এক সময় প্রসিদ্ধ হারমনিক্ ট্যাভার্ণের বাটী ছিল, উহার সংলগ্ন এক বাটীতে উঠিয়া আইসে।

ইডেন্ ফিমেল্ হস্পিট্যাল্।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই বাটী ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ৫৫ নম্বর বেণ্টিক্ ষ্ট্রীটের বাটীতে আইসে। এই স্থানে ৬০ বৎসর ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল জানা যায় না। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা

জর্জ্জ পমফ্রেটের (District Grand Master George Pomfret) কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, এইমাত্র জানিতে পারা যায়।

* * * *

ক্যালকাটা মিকানিকস্ ইনষ্টিটিউট্—শিল্প ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারি স্যার্ পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত

লোরেটো হাউস্।

হয়। পরে এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্যালকাটা লিসিয়াম্ (Calcutta Lyceum) নাম হয়। সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার একজন ক্ষমতাশালী সভ্য ছিলেন।

* * * *

কলিকাতা স্কুল বুক্ সোসাইটি—বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদি প্রকাশার্থ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ১৮৫৬ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে—তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সভ্য ছিলেন।

* * * *

বিদ্যোৎসাহিনী সভা—স্বনাম-প্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় তাঁহার বাটীতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা হইতে গ্রন্থকারদিগকে অর্থাদি দ্বারা উৎসাহিত করা হইত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্য লিখিলে এই সভা তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং তাহার সহিত একটি মূল্যবান রৌপ্য-নির্ম্মিত ক্লারেট গ্লাস উপহার প্রদান করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য ছিলেন।

* * * *

The Association of Friends for the Promotion of Social Improvement—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরের কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বাঙ্গালার সামাজিক উন্নতির জন্য এক সভায় ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি, চন্দ্রশেখর দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সেন, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখার্জ্জি, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র কমিটির সভ্য ছিলেন।

* * * *

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্—প্রথম যে কমিটি দ্বারা এই সমিতি গঠিত হয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য ছিলেন—রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দে ও রামগোপাল ঘোষ।

* * * *

বেঙ্গল্ সোশ্যাল্ সায়ান্স এসোসিয়েসন্—সামাজিক

উন্নতি এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মিলন সাধন উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি তদানীন্তন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার সভাপতিত্বে এক সভায় এই এসোসিয়েসনটি স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম সভাপতি হন মিঃ সেটন্‌কার্ (Hon'ble Justice Seton Karr I. C. S.)। সহকারী সভাপতি পি, নরম্যান্ ও রমানাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন বেভারলি (H. Beverley I. C. S.) এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। মিস্ মেরি কারপেণ্টার ইহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

*　*　*　*

রামজয় দত্ত স্কুল—১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় রামজয় দত্তের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয়। সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সময়ে ইংরাজি অভিধান বা ব্যাকরণ ছিল না।

*　*　*　*　*

আর্চার সাহেবের স্কুল—১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্চার (Mr. Archer) সাহেবের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

*　*　*　*　*

সেরবোরণ সেমিনারি—বর্ত্তমানে যেখানে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ আছে, তাহার কিছু দক্ষিণে সেরবোরণ (Mr. Sherborne) সাহেবের বাটীতে সম্ভবতঃ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা উক্ত সাহেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রভৃতি এই স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর-বাড়ীতে সাহেবের যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল।

*　*　*　*

মার্টিন্ বাউলের স্কুল—১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে আমড়াতলায় মার্টিন্ বাউল (Mr. Martin Bowl) নামক এক ফিরিঙ্গী ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল মহাশয় এখানকার ছাত্র ছিলেন।

*　*　*　*

ডারেল্ সেমিনারি—ডারেল্ (Mrs. Durrell's) নাম্নী

লাট ভবনের পুরাতন দৃশ্য।

কাউন্সিল্ হাউস্ ও পুরাতন লাট ভবনের দক্ষিণ-দিকের দৃশ্য।

এক মহিলা কর্ত্তৃক ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহা শুধু স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * * *

হজেস্ স্কুল—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের এক বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, আর্ম্মাণী গির্জ্জার নিকটে হজেস্ (Mr. Hodges) নামক এক সাহেব কর্ত্তৃক একটী গভর্ণমেণ্ট স্কুল খুলিবার

হিন্দু স্কুল্।

লাট সাহেবের বাটী ও উহার তোরণ।

প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে অন্য কথা কিছু জানা যায় না।

* * * *

গ্রিফিথ্ সাহেবের বোর্ডিং স্কুল্—শিয়ালদার নিকট বৈঠকখানায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রিফিথ্ নামক সাহেব তাঁহার বাগান-বাটীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* * * *

ইউনিয়ন্ স্কুল—ইহা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার ছাত্র-সংখ্যা ছিল এক শত।

* * * *

এর‍্যাটুন পিটার্সের স্কুল—ইহা Arratoon Peters দ্বারা সম্ভবতঃ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

* * * *

স্নাবেলস্ স্কুল—স্নাবেলস্ (L. Schnabel's) দ্বারা ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। এখানে পিয়ানোফোর্টে শিক্ষা দেওয়া হইত। মাসিক বেতন ছিল ৫০৲ টাকা।

রামনারায়ণ মিত্রের স্কুল্—দেড় শত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে রামনারায়ণ মিশ্র নামে অতি সামান্য ইংরাজি-জানা এক উকিলের কেরাণী যোড়াবাগানে এই বিদ্যালয়টির স্থাপন করেন। এখানে অবস্থানুসারে ৪৲ হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন দিয়া পড়িতে হইত। এখানে Thomas Dice এর Spelling Book পড়ান হইত।

* * *

কিয়ারন্যান্ডার স্কুল—১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশন্ চার্চ্চ লেনে খ্যাতনামা মিশনারি কিয়ারন্যানডার কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

হেজেস্ বালিকা বিদ্যালয়—১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিবি হেজেস্ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। ইহাই কলিকাতার প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় বলিয়া জানা যায়। এখানে নৃত্যকলা ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত।

* * * *

চিৎপুর রয়েল বোর্ডিং স্কুল্—চিৎপুরে মহম্মদ রেজাখাঁর সুরম্য প্রাসাদের নিকটে কোন সাহেব কর্ত্তৃক ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। এখানে ছাত্রদের খাওয়া-পরার জন্য মাসিক

৩০৲ টাকা দিতে হইত। যাহারা শিক্ষকের সহিত এক টেবিলে খাইত তাহাদের ৫০৲ টাকা দিতে হইত। ১৪ জনের অধিক ছাত্র এখানে লওয়া হইত না।

*　*　*　*

পিটস্ বিবির স্কুল (Mrs. Pitt's School for Young

CALCUTTA, 10th JANUARY, 1834.

Received from ... the sum of Sicca Rupees Sixty for One Subscription Ticket for a Series of Ten Italian Operas.

Sa. Rs. 60

Secretary to the Musical Society, 13, Mangoe Lane.

Chowringhee Theatre 20 July 1826
Contribution of 1826
Received of R C Plowden Esqr
Sicca Rupees One hundred
... payable upon the following Share
No 74
S Rs 100
Manager Secy & Treasurer
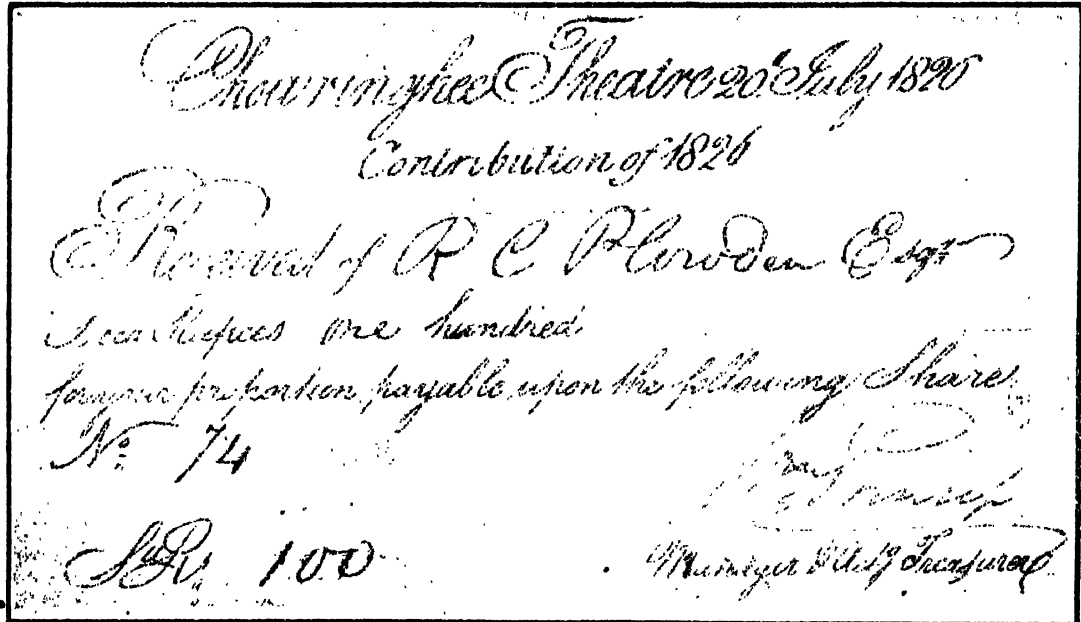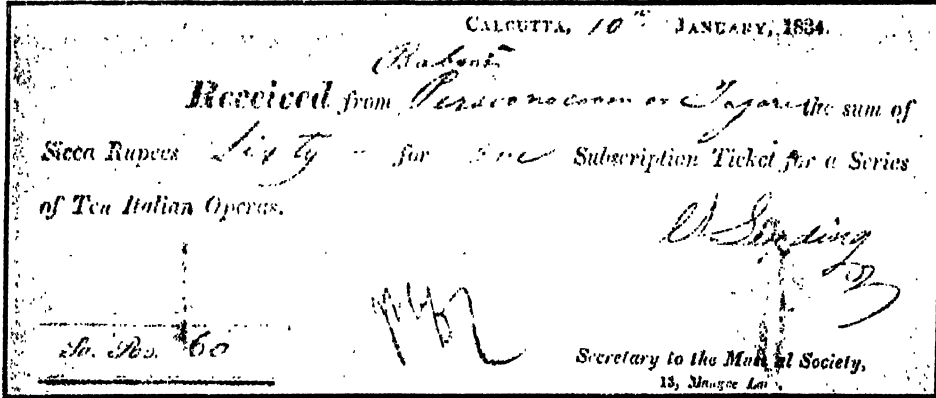
শত বৎসর পূর্ব্বের দুইখানি থিয়েটারের টিকিট্।

Ladies)—১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্য ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। এ ভাবের বিদ্যালয় ইহাই প্রথম।

*　*　*　*

কলিকাতা একাডেমি—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কাসিম নামক এক সাহেব দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ডাইক্ সাহেবের 'স্পেলিং বুক' ও 'স্কুল মাষ্টার' এই পুস্তকদ্বয়ের অধ্যাপনা হইত। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই বিদ্যালয়ে প্রথম ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

*　*　*　*

রিড্ সাহেবের স্কুল—১৮০০ খৃষ্টাব্দে রিড্ (Reid) নামক এক সাহেব হাটখোলায় ইহা স্থাপন করেন। কোন্নগর-নিবাসী মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব কিছুদিন এখানে পড়িয়াছিলেন।

*　*　*　*

প্র্যাট্ মেমোরিয়াল্ গার্লস্ স্কুল—৮৪ এ লোয়ার সার্কিউলার রোডে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল জানা যায় না।

* * * *

ক্ষেম বসুর স্কুল—ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষেমঙ্কর বসু নামক এক ভদ্রলোকের দ্বারা ইহা পাথুরিয়াঘাটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম এই বিদ্যালয়েই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

* * * *

লাট ভবনের একটী দৃশ্য।
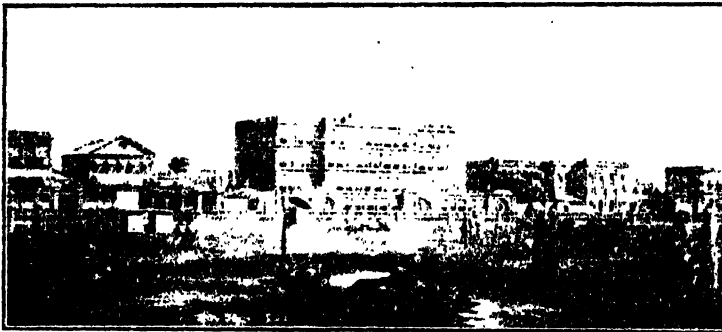
ক্লাব্ হাউস্।

লোরেটো হাউস্—সাহেবদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিড্লটন রোডে ইহা স্থাপিত হয়। 'লোরেটো সিস্টারস্' ইহার প্রধান অভিভাবিকা ছিলেন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার কতিপয় শাখা আছে।

* * * *

কেথিড্র্যাল্ অরফ্যানেজ—খৃষ্টানগণের চেষ্টায় গৃহহীন, মাতাপিতাহীন ছাত্রদের জন্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। অবৈতনিক ছাত্রগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট বেতন দিয়া থাকেন।

* * * *

ইটালী অরফ্যানেজ্—লোরেটো সিস্টারগণের চেষ্টায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। এখানে অনাথ বালকগণ অবৈতনিক ভাবেও পড়িতে পায়। ইটালীর নর্থ-রোডের উত্তর দিকে প্রচুর জমি সমেত একখানি সুবিস্তৃত বাটীতে ইহা সংস্থাপিত হয়।

* * * *

মেট্রপলিট্যান্ একাডেমী—গরাণহাটায় বাঁধা বটতলার উত্তর দিকে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হাটখোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়।

* * * *

সেণ্ট জোসেফ্স্ স্কুল—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বউবাজারের ৬৯নং বাটীতে 'দি বৌবাজার বয়েজ্ স্কুল' নামে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা রোম্যান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটী অবৈতনিক বিভাগও আছে।

হিন্দু চ্যারিটেবল্ ইন্‌ষ্টিটিউসান্—ইহার অন্য একটি নাম ছিল হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ছাতু বাবু, লাটু বাবু প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন্ এখানে হেড-মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' দেউলিয়া হইলে এই স্কুলের তহবিলের টাকা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইহা উঠিয়া যায়।

* * * *

সেণ্ট পলস্ স্কুল—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাই স্কুলের অধঃপতন হওয়ার পর বৎসর তাহার স্থানে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

সেণ্ট জনস্ কলেজ—জেস্যুইটগণ সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া যাইলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

সেণ্ট্ অ্যান্ডা্রুটস্ সেমিনারী—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ান্ ফিল্যানথ্রপিক্ ইনষ্টিটিউশন্ উঠিয়া যাইবার পর বৎসর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

*　　*　　*

আর্ম্মেনিয়ন্ ফিল্যানথ্রপিক্ ইনষ্টিটিউশন্—আর্ম্মানীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ইহা স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহার বিলোপ সাধন হয়।

*　　*　　*

লেডিস্ সোসাইটি ফর্ নেটিভ্ ফিমেল্ এডুকেশন্—১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইল্সন্ নাম্নী এক মহিলা ইহা স্থাপন করেন।

*　　*　　*

ষ্ট্যাথাম্স্ একাডেমী—প্রথমে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ইহা অবস্থিত ছিল। মিঃ ষ্ট্যাথাম্ (Mr. Statham) ইহাকে পরে হাওড়ায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ধর্ম্মতলা একাডেমী—ডেভিড্ ড্রামণ্ড্ নামক এক সাহেব দ্বারা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। ইহাকে ড্রামণ্ড একাডেমীও বলিত। ড্রামণ্ড সাহেবের পৃষ্ঠদেশ কুব্জ ছিল, এজন্য স্কুলটিকে "কুঁজো সাহেবের স্কুল"ও বলিত। এই স্কুলেই প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত হয় এবং গ্লোকের ব্যবহার সম্বন্ধেও এই স্থানেই প্রথম শিক্ষাদান করা হইত। সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও (Derozio) সাহেব এখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

*　　*　　*　　*

আনন্দীরামের স্কুল—আনন্দীরাম নামক জনৈক ভদ্রলোক ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজ বাটীতে হিন্দু ছাত্রদের জন্য সামান্য রকমের একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এখানে পড়াইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বা ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজেই পড়াইতেন।

*　　*　　*　　*

ইউনিয়ন্ স্কুল—পূর্ব্বে ইউনিয়ন স্কুল নামে একটী স্কুলের কথা বলা হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে এই নামে আর একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। স্বনামখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তিস্থাপন উৎসব—৪ঠা মার্চ্চ—১৮৬৫

হেয়ার স্কুল।

*　　*　　*　　*
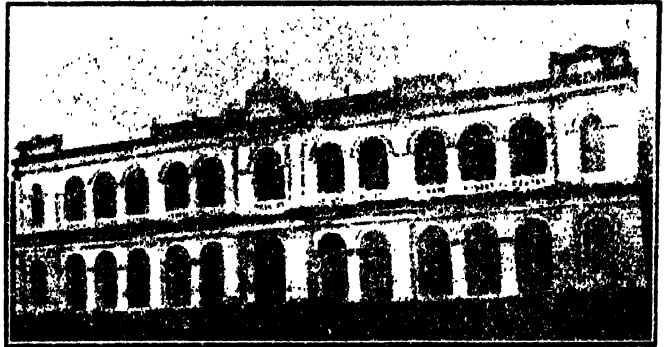
চার্চ্চ মিশনারী স্কুল—দরিদ্র হিন্দু বালক বালিকাদের জন্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নিমতলায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বৎসরই লুপ্ত হয়। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় কয়েক মাস এখানে পড়িয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর একাডেমী—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকতলায় ইহা মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবীনমাধবের স্কুল ছাড়িয়া পাঁচ মাস এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

* * * *

ভেরিউলাস্ একাডেমী—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। মাষ্টার্স নামক এক সাহেব এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

* * * *

লিন্‌ড্‌ষ্টেট্ ও অর্ভের মেসিনারী—১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুইজন সাহেবের সহযোগিতায় ইহা স্থাপিত হয়! ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেল্।

* * * *
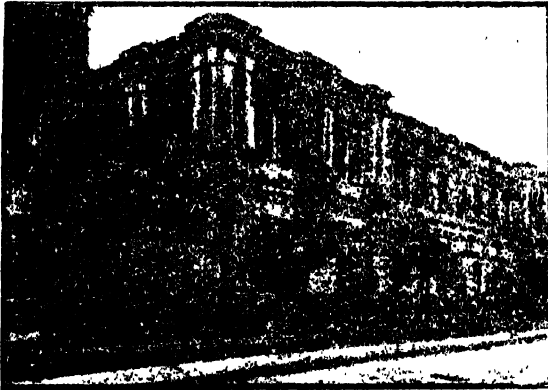
ইণ্ডিয়ান্ একাডেমী—হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে শুঁড়িপাড়ার রাজা রামমোহন রায় দ্বারা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখানে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। রামমোহন বিলাতযাত্রা কালে পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে প্রধান শিক্ষক এবং নবীনমাধব দেকে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া যান।

* * * *

গোবিন্দ বসাকের স্কুল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখানে পড়িয়াছিলেন।

* * * *

কলিকাতা হাই স্কুল—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেভারেণ্ড্ ম্যাকুইন্ সাহেব ইহার প্রথম রেক্টর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই ইহা উন্নতির শীর্ষ সীমায় উঠিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহার অধঃপতন হয়।

* * * *

নবীনমাধব দের স্কুল—ইণ্ডিয়ান একাডেমীর লভ্যাংশ লইয়া তথাকার প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের সহিত বিবাদ হওয়ায় দ্বিতীয় শিক্ষক নবীনবাবু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই অবৈতনিক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র বসু এখানে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন।

* * * *

নেটিভ্ অরফ্যান্ স্কুল্—বিবি উইলস্ কর্ত্তৃক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়।

* * * *

নিত্যানন্দ সেনের স্কুল্—আনুমানিক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল বাউল সাহেবের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন এখানে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

* * * *

ফ্যারেল্ সেমিনারী—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আরচার সাহেবের দেখাদেখি ফ্যারেল্ (Mr. Farrel) সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

* * * *

দি ক্যালকাটা বেনাভোলেণ্ট্ ইন্‌ষ্টিটিউট্—দরিদ্র খৃষ্টানদিগকে শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বৌবাজারে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের ডক্টর কেরী এখানকার প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। এখানে আর্ম্মাণী, মগ, পর্টুগীজ, চিনাম্যান্ প্রভৃতি জাতির বালকগণও পড়িত।

* * * *

হাটারম্যান্ সাহেবের স্কুল—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হাটারম্যান্ সাহেব কর্ত্তৃক বৈঠকখানায় এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ছয়টি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার

ন্যায় ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কলিকাতায় আর কেহই ছিলেন না। এখানে অধ্যয়ন করিয়া বহু লোক কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

* * * *

ম্যাকে সাহেবের স্কুল্—নিমতলা ষ্ট্রীটে ম্যাকে সাহেব দ্বারা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় এখানে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই এই স্কুলটি উঠিয়া যায়।

* * * *

গ্রামার স্কুল্—পূর্ব্বোল্লিখিত পেরেণ্ট্যাল্ একাডেমীর অধ্যক্ষগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় ১৮২৩ সালের জুন মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেলভেডিয়ারের তোরণ।

* * * *

সেণ্ট্রাল্ স্কুল্—১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই স্কুলের ভিত্তিস্থাপন ও পরবর্ত্তী বৎসরে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

* * * *

আপার এণ্ড্ লোয়ার অর্ফ্যান্ স্কুল্—এই বিদ্যালয় দুইটি প্রধানতঃ কীল্প্যাট্রিক্ সাহেবের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মাতাপিতৃহীন বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তিনিই করেন। এই উদ্দেশ্যে মিলিটারি অর্ফ্যান্ সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে এই স্কুল্ দুইটি স্থাপিত হয়। প্রত্যেক স্কুল বালক ও বালিকাদের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আপারটিতে প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের এবং লোয়ারটিতে সৈনিকগণের পুত্র-কন্যাগণ পড়িত। বিদ্যালয়গুলি প্রথমে হাওড়ায় তৎপরে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে 'খিদিরপুর হাউস্' নামে পরিচিত বাটীতে উঠিয়া আইসে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যালয় দুইটি উঠিয়া যায়।

* * * *

চ্যারিটি স্কুল—কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়ের কথা যাহা জানা যায় তাহা চ্যারিটি স্কুল। ইহা ১৭৩৪ অথবা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে উঠিয়া যায় এবং তদবধি ইহাকে "ওলড্ চ্যারিটী স্কুল" বলিত। ইহার জন্য কোম্পানি এবং বহু ভদ্রলোক বহু অর্থদান করিয়াছিলেন।
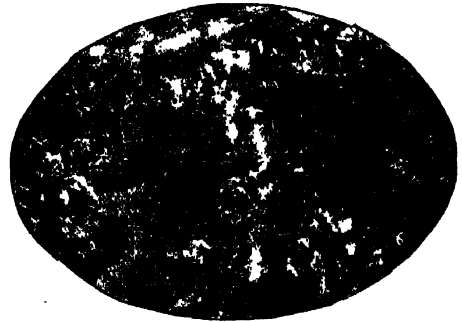
* * * *

বেলভেডিয়ার উদ্যানের এক অংশ।

সেণ্ট্ জেমস্ স্কুল—৮১নং লোয়ার সার্কুলার রোডে সেণ্ট্ জেমস্ চার্চ্চের নিকটে অক্ষম ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্কুলবাড়ীখানির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

* * * *

হ্যালিফ্যাক্স্, লিন্ড্স্টেড্ ড্রাপার সাহেবের স্কুল্, রেভারেণ্ড ইয়েট্স্ সাহেবের স্কুল্, লসন্ বিবির স্কুল্ প্রভৃতি আরও কতিপয় বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* * * *

গভর্ণমেণ্ট হাউস—ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপরে যে স্থানে বান্ হাউস্ আছে তথায় অর্থাৎ দুর্গের মধ্যে প্রথম গভর্ণরের বাস-ভবন ছিল। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের দ্বিতীয়

রাত্রে উহা অগ্নিসাৎ হয়। তৎপরে যে স্থানে বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ অবস্থিত, তথায় একটি বাটী প্রস্তুত হয়। উহা সম্ভবতঃ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। বেয়ার (Bayer) নামক একজন এঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস্ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি প্রথম সঙ্কল্প স্থির করেন এবং কাপ্তেন ওয়াট্ (Captain Wyatt) স্থপতি নিযুক্ত হন। এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। মোট ব্যয় হইয়াছিল প্রায় দেড়লক্ষ পাউণ্ড। জমি খরিদে ৮০০০০্ টাকা এবং আসবাব-পত্র খরিদে ৫০০০০্ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ হিকি। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে
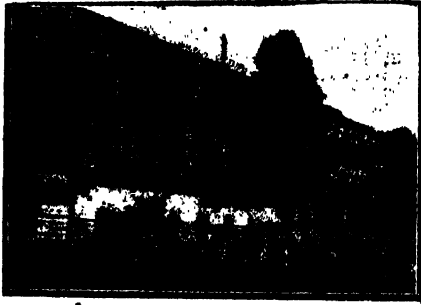
প্রেসিডেন্সি কলেজ।

লর্ড ভেলেন্‌সিয়া কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ এই স্থানে প্রথম এক উৎসব ও বড় ভোজ হয়।

* * * *

জেনারেল ব্যাঙ্ক—এই নামে বহু পূর্ব্বে একটী ব্যাঙ্ক ছিল।

* * * *

কলিকাতা থিয়েটার—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ ও লায়ন্ রেঞ্জের কোণে ইহা অবস্থিত ছিল। এক শত টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া ইহার জন্ত এক লক্ষ টাকা তহবিলে সংগৃহীত হইয়াছিল। হেষ্টিংস্, বারওয়েল্, ইম্পে, ম্যান্‌সন্ প্রভৃতিও ইহাতে চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা কলিকাতার দ্বিতীয় থিয়েটার। 'নিউ থিয়েটার' নামে যে নাট্যশালার কথা জানা যায়, সম্ভবতঃ উহা বিভিন্ন নহে। ইহাতে যাহারা অভিনয় করিত তাহারা সকলেই অবৈতনিক ছিল। পূর্ব্বোক্ত থিয়েটার সম্ভবতঃ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়।

* * * *

লেবেডফ্‌স্ (Lebedoff's) থিয়েটার—কলিকাতা থিয়েটার বিলুপ্ত হইলে কতিপয় ছোট ছোট থিয়েটারের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে ইহা উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পুরাতন চীনাবাজারের কোণে ইহা খোলা হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানকে তখন ধূমতলা বলিত।

* * * *

এথিনিয়াম্ থিয়েটার্—ইহা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ্চ ১৮ নং সার্কুলার রোডে খোলা হইয়াছিল।

* * * *

চৌরঙ্গ থিয়েটার—ইহাও সাধারণের চাঁদা হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক অগ্নিদাহে ইহা বিনষ্ট হয়। ইহা হইতেই থিয়েটার রোড নাম হইয়াছে।

* * * *

বৈঠকখানা থিয়েটার—ইহা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বৈঠকখানায় পর্ত্তুগীজ চার্চ্চের কাছে ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

* * * *

ওল্ড প্লে হাউস্—ইহা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ডালহাউসি স্কোয়ারকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার্ বলিত।

* * * *

হোয়েলার প্লেস্ থিয়েটার—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই নামে একটী থিয়েটার ছিল।

* * * *

খিদিরপুর থিয়েটার—১৮১৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইহার একটি অভিনয়ের কথা জানা যায়।

* * * *

সান সুশি (Sans Souci) থিয়েটার—পার্ক ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজ যে স্থানে আছে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তথায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম এক মোহর, ১২্ টাকা ও ৬্ টাকা বসিবার আসনের মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল।

* * * *

মিউসিক্যাল্ সোসাইটি—শত বৎসর পূর্ব্বে ১৩নং ম্যাঙ্গো লেনে ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। Ten Italian Operas নামে দশটি অভিনয় করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেকটির প্রবেশ মূল্য ৬৲ টাকা ছিল!

* * * *

চৌরঙ্গী ড্রাম্যাটিক্ সোসাইটি—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন ইহার প্রথম বাৎসরিক সভাধিবেশন হয় বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

* * * *

লটারি কমিটি—কলিকাতা নগরীর উন্নতির প্রাথমিক যুগে লটারি খেলার দ্বারা বহু উন্নতি হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম লটারি খেলা আরম্ভ হয় বলিয়া জানা যায়। প্রথম প্রথম আমদানি মালপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি মূল্যবান সম্পত্তি পর্য্যন্ত লটারির সাহায্যে বিক্রীত হইয়াছিল। টেরিটি বাজার নামক বাজারটি, যাহার মূল্য তৎকালে প্রায় দুই লক্ষ সিক্কা টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, উহাও এক সময় লটারির পুরস্কার ছিল। সরকারের অনুমোদনে প্রথম যে লটারি হয়, তাহার কথা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। উহার প্রথম পুরস্কার ছিল এক লক্ষ টাকা। মোট পুরস্কার ছিল তিন লক্ষ টাকা। সাধারণের হিতার্থ লটারির দ্বারা যাহা যাহা হইয়াছিল তন্মধ্যে এক্সচেঞ্জ বাটী, টাউনহল, ফ্রি ম্যাসনের জন্য বাটী নির্ম্মাণ, কলেজ ষ্ট্রীট, বেন্টিক ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড্, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারাও সাধারণের জন্য উদ্যান-ভ্রমণের স্থানসমূহ ও সৌধাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুপ্রীম গভর্ণমেণ্ট লটারি কমিটীর কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন।

ভবানীপুর ইয়ংমেন্স্ লিটারারি এসোসিয়েসন্—সাহিত্য-চর্চ্চা ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।

* * * *

বেথুন সোসাইটী—ইহাও একটী শিক্ষা বিষয়ক সভা; ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* * * *

ফিবার হস্পিট্যাল্ কমিটি—লটারি কমিটির তিরোভাবের পর সহরের স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি-কল্পে লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ড দ্বারা ইহা সৃষ্ট হয়। পিটার গ্রাণ্ট্ (Sir John Peter Grant) ইহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন।

* * * *

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ ফর দি কালটিভেসন্ অব্ সায়ান্স্—স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "National Institute for the Cultivation of Science by the Natives of India" গঠনের কল্পনা প্রথম তাঁহার মনে হয়। এই সময় হইতে ১৮৭৬ পর্য্যন্ত তাঁহার অর্থ-সংগ্রহার্থ অতিবাহিত হয় এবং ৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ করেন। সেট জেভিয়ার্ কলেজের ফাদার লাফোঁ (Rev. Father Lafont) প্রথমাবধি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গালার ছোটলাট স্যার্ রিচার্ড টেম্পল্ও বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে উহার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বৎসরই ৩০০০০৲ টাকায় জমি খরিদ হয় এবং মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে একটি ভাল ল্যাবরেটারির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করা হয়। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে ৮০০০০৲ টাকা সংগ্রহ হয় এবং লর্ড রিপণ দ্বারা ১৮৮২ অব্দে উহার ভিত্তি স্থাপন হয়। ভিজিয়ানা-গ্রামের তদানীন্তন মহারাজা ৪০০০০৲ টাকা দান করায় তাঁহার নামে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, আনন্দচন্দ্র বসু, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।*

* এই পরিচয় প্রবন্ধে প্রত্যেক বিষয়টি প্রায় কোন না কোন গ্রন্থাদি হইতে লইলেও, এবং কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে পাদটিকায় তাহার কোন উল্লেখ না করিলেও, সেকালের কতকগুলি ইংরাজী স্কুলের কথা ১৩৩৬ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, বি-এ মহাশয়ের "সেকালের কলিকাতায় ইংরাজী স্কুল" প্রবন্ধ হইতে লইয়াছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

অনুনয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

হে দরদী ভৃত্য, তোমায়
বল্‌ছি বারম্বার
করনা'ক ঘরটী আমার
এমন পরিষ্কার।
নেই'ক ধূলা, নেই'ক মাটী,
টুকরা কাগজ, কুলের আঁটি,
সবটুকু ঠাঁই পরিপাটী
শূন্য চারিধার।

২

বারান্দাতে কুম্‌রে পোকা
বাঁধতেছিল চাক,
রাখনি যে চিহ্ন তাহার
ভাঙলে হে বেবাক।
কাঁচ্‌-পোকাটী যত্ন করে,
'টবে'ই ভবন তুললে গড়ে,
সব ভেঙ্গেছ একটীও নাই
জাল যে মাকড়সার।

৩

আস্‌তো ঘরে মৌমাছি ও
বোল্‌তা নিরন্তর,
বাঁধতো কাঠের টুক্‌রা দিয়ে
পায়রা-মিথুন ঘর;
একেবারে মারি-ধরি
করলে সবায় দেশান্তরী;
এমন করে একলা ঘরে
তিষ্ঠান যে ভার।

৪

চিনি যদি শুধুই থাকে,
পিঁপড়ে না ধরে,
সার্থকতা নাই মনে হয়,
মন কেমন করে।
ডেঙ্গের দলের পাইনে সাড়া,
বৃথায় আচার এ ভাণ্ডারা,
কালো নাগার পঙ্‌ক্তেরি
কোথায় সে বাহার!

৫

আসুক তারা, ঘুরুক তারা,
করুক বিরক্ত,
সে স'হা যায়, অসহযোগ-
শাস্তি যে শক্ত।
মারি, ধরি, বকি, শাসি,
তবু তাদের ভালবাসি,
ঘরে আমার হাঘরেদের
উঠুক রে ঝঙ্কার।

৬

বলছি তোমায় বারম্বারই
দরদী ভৃত্য,
জেনো থাকে ঝঞ্ঝাটেরি
সঙ্গে অমৃত;
জঙ্গলেরি সঙ্গে সদাই
পারিজাতের বীজ থাকে ভাই,
ময়লা ধূলার মাঝেই বসে
আনন্দ-বাজার।

লক্ষ্মণ ও সীতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কুলজারঞ্জন চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works
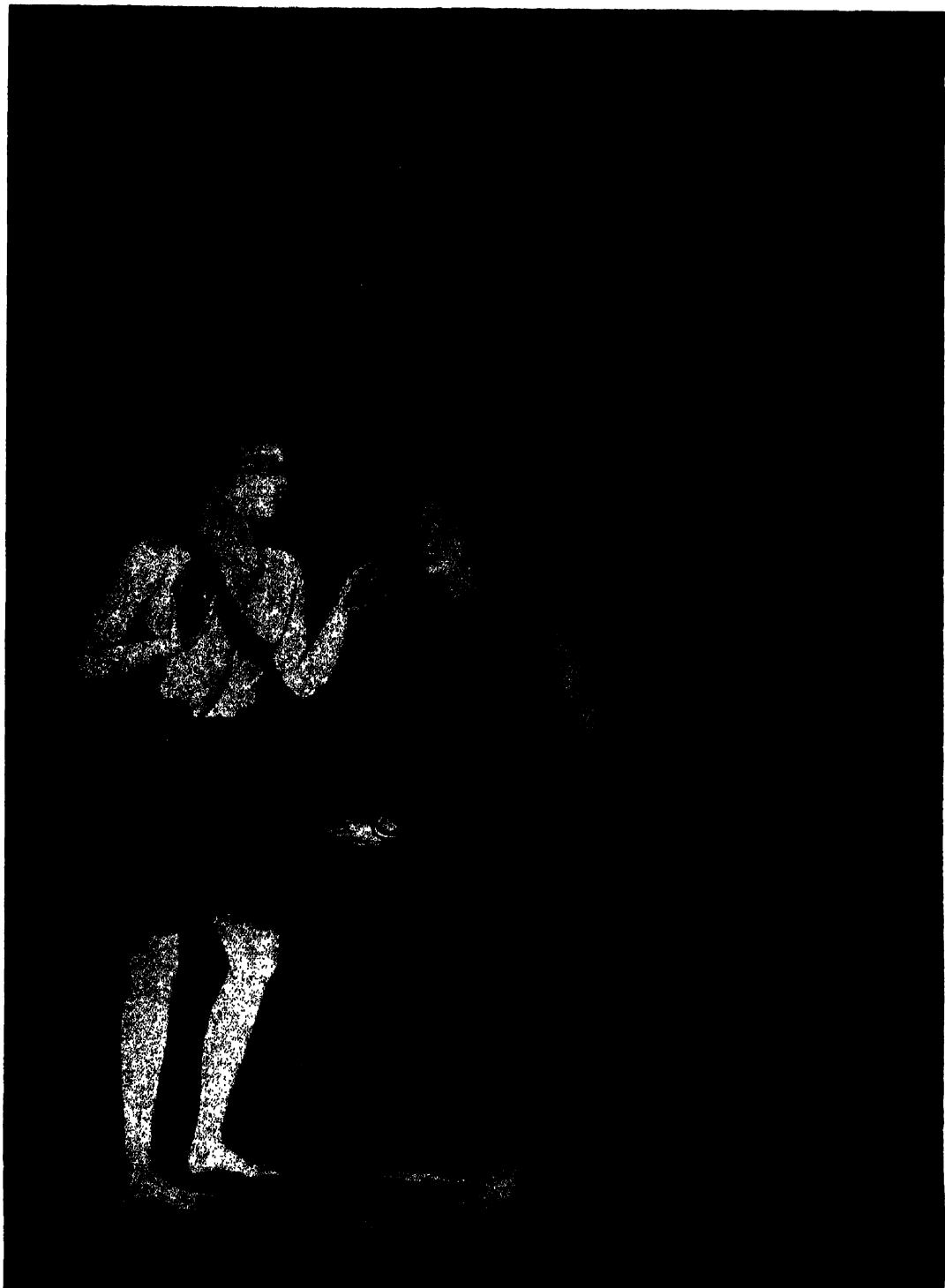
শেষ-প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্বকথা—আশুতোষ গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক তাঁহার শিক্ষিতা, সুরূপা ও পূর্ণযৌবনা কুমারী কন্যা মনোরমাকে লইয়া স্বাস্থ্য-উদ্ধারের ওজুহাতে আগ্রায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে আসিলেন ; এবং সেখানকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া বেশ একটা মজ্‌লিস গড়িয়া তুলিলেন। আশু বাবুর নিরভিমান, সহজ, ভদ্র আচরণে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। আশু বাবু বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ; মেয়ে মনোরমাও তাই। কলেজের অধ্যাপক অবিনাশ, হরেন্দ্র, অক্ষয় প্রভৃতি প্রত্যহ আশুবাবুর বাড়ী আড্ডা দিত। অবিনাশ বিপত্নীক, একটী ছেলে আছে ; তার তত্ত্বাবধানের জন্য তার বিধবা শ্যালিকা নীলিমা তাহার বাসায় আছেন। হরেন্দ্র বিবাহ করে নাই, কয়েকটী ছেলেকে বাসায় রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খুলিয়াছে। অক্ষয় অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। সে সেকেলে-ভক্ত,—আজকালকার নব্য-শিক্ষিতা মেয়েদের উপর সে হাড়ে চটা ; এবং তর্ক-স্থলে এই শ্রেণীর মেয়েদের যা-ইচ্ছে-তাই বলিতে তার মুখে বাধে না। আশুবাবুর আর একজন গুণগ্রাহী শিবনাথ ; অথবা শিবনাথের সুশ্রী চেহারা ও তাহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া আশুবাবু তাহাকে খুব আদর করেন এবং তাঁহার কন্যা মনোরমাও শিবনাথকে বড়ই সম্মান করে। শিবনাথ পূর্ব্বে এই আগ্রা কলেজেরই অধ্যাপক ছিল। অত্যন্ত মদ্যপ বলিয়া তাহার কলেজের চাকরী যায়। তাহার পর সে কোথায় এক বন্ধুর সঙ্গে পাথরের কারবার করে। সে বন্ধুটী হঠাৎ মারা গেলে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে ঠকাইয়া কারবারটী সে আত্মসাৎ করে। অনেক দিন পরে একটী যুবতীকে স্ত্রী-পরিচয় দিয়া হঠাৎ আগ্রায় উপস্থিত হইয়াছে এবং আশুবাবুর মজ্‌লিসে স্থান পাইয়াছে। একদিন আশুবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সকলে উপস্থিত, শিবনাথও ছিল। অক্ষয় সেখানে শিবনাথের চরিত্রের কথা তাহার মুখের উপর বলে ; প্রথমা স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতেও আর একটা কোথাকার কি জাতের ঝিয়ের মেয়েকে স্ত্রী বলিয়া সঙ্গে রাখিয়াছে, সুতরাং শিবনাথের সংসর্গ পরিত্যাজ্য। এ-ভাবে শিবনাথকে অপদস্থ করায় শিবনাথ দৃক্‌পাতও করিল না, আশুবাবু ও মনোরমা অস্বস্তি বোধ করিলেন। তার পর একদিন ঘটনাক্রমে আশুবাবুর বাড়ীতেই শিবনাথের স্ত্রী কমলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইল। মনোরমা এই যুবতীকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিল না, কিন্তু সরল উদারহৃদয় আশুবাবু কমলের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই সময় আশুবাবুর ভাবী জামাতা অজিতকুমার বিলাত হইতে ফিরিয়া আশুবাবুদের সঙ্গে দেখা করিতে আগ্রায় আসিল। এ ছেলেটার স্বভাব চরিত্র অতি সুন্দর। ইহার পর একদিন সকলে দল বাঁধিয়া তাজ দেখিতে গেলেন। সেখানে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা উপলক্ষে কমল যে সকল মত প্রকাশ করিল, তাহা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল ; যেমন তাহার যুক্তির শৃঙ্খলা, যেমন তাহার বলিবার ভঙ্গী, তেমনই তাহার তেজস্বিতা। সে যে খুব শিক্ষিতা এবং নব্য-ধরণের যুবতীদিগের পৃষ্ঠপোষিকা, তাহা তাহার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিতে পারা গেল ; সে হিন্দু নারীর সেকেলে সংস্কারকে সর্ব্বাংশে ঘৃণা করে ; এমন কি আশুবাবুর ন্যায় নিরীহ ব্যক্তিও কমলের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। বিলাত-প্রত্যাগত অজিতকুমার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী যুবতীর শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর আশুবাবুর বাড়ীর বাগানের মধ্যে নির্জ্জনে মনোরমা ও শিবনাথকে একাসনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া অজিত বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। তাহার পর অজিত কমলের বাড়ীতে তাহার সহিত দুই দিন দেখা করে, শেষ দিন কমল তাহার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলে যে, প্রথম বয়সে তার মায়ের চরিত্র সম্বন্ধে একটা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় তার বাবা তার মাকে লইয়া আসামে এক চা-বাগানে চলিয়া যায়। সেখানে ভদ্রলোকের মৃত্যু হওয়ায় তার মা বাগানের সাহেবের নজরে পড়ে। সেই সাহেবের বাংলাতেই কমলের জন্ম। সাহেব তাহাকে এক মাদ্রাজী খৃষ্টানের সঙ্গে বিবাহও দিয়াছিলেন। তাহার বয়স যখন আঠারো উনিশ, তখন তার সে স্বামী মারা যায় এবং তার জন্মদাতা সাহেবও মারা যান। তার মা তখন চা-বাগানের এক কেরাণী, এই শিবনাথের কাকার আশ্রয় লয়। সেই সময় শিবনাথ ওখানে যায় এবং কমলকে লইয়া আসে। এই কথা-প্রসঙ্গে কমল তার মায়ের সম্বন্ধে এমন কথা বলিল যে, অজিত তাহাকে অশ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। অজিত আরও শুনিল যে, শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করিয়াছে, বাসায় আর আসে না, সুতরাং কমল আর কোথাও চলিয়া যাইবে। ইহারই দুই এক দিন পরে কমল আশুবাবুকে এক পত্র লিখিল যে, এক ব্যক্তি তাহার কাছে কিছু টাকা পাইবে,—আশুবাবু যদি জামিন হন তাহা হইলে পাওনাদার অপেক্ষা করিতে পারে। আশুবাবু সেই পত্রবাহককে তাড়াইয়া দিলেন, জামিন হইতে সম্মত হইলেন না। এই সময়ে একদিন আগ্রায় নারী কল্যাণ-সমিতি স্থাপনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী মালিনী এক সভা আহ্বান করিলেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই গেলেন। শিবনাথ, কমলের নিমন্ত্রণ হয় নাই, তাহারা যায়ও নাই। সেই সভায় অক্ষয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিল, তাহা আধুনিক শিক্ষিতা যুবতীদিগকে আক্রমণ করিয়া ; এবং তাহা যে কমলকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল ; এবং অবিনাশ, হরেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিবাদও

করিল; সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইল না। এই সভা হইতে ফিরিয়া অবিনাশের শ্যালিকা নীলিমা কমলের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অবিনাশের বাসায় আনিলেন। আহারের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু কমল যখন বলিল যে, সে হবিষ্য করে, অন্য কিছু খায় না, তখন সকলেই অবাক্। হরেন্দ্র তখন কমলকে তাহার ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল, কমল সাগ্রহে স্বীকার করিল। তখন আলোচনা আরম্ভ হইল হরেন্দ্রের আশ্রম লইয়া। সে আলোচনায় উপস্থিত সকলেই যোগ দিলেন। কমল একেবারে ভারতের সনাতন আদর্শ উড়াইয়া দিতে লাগিল; তাহার যুক্তিতর্কের মুখে ভারতের পুরাতন বৈশিষ্ট্য একেবারে ভাসিয়া গেল। তার পর তর্ক করিতে করিতেই তাহারা হরেনের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপস্থিত হইল। হরেনকে অবিনাশই আগ্রায় আনিয়া কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরেনের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। সে আগ্রায় একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকগুলি অসহায় ছেলেকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতেছিল। আশ্রমের কঠোরতা দেখিয়া কমল তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিল—এ ভাবের শিক্ষার দ্বারা কোন কিছুই হইবে না বলিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল। হরেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই ব্যথিত হইল; কিন্তু নীলিমা কমলের কথায়, তাহার তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া গেল, যদিও সে কমলের যুক্তিতে সায় দিতে পারিল না। আশ্রমের রাজেন ও সতীশের কথাবার্ত্তায় কমল বড়ই আনন্দিত হইয়াছিল। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া অজিত কমলকে লইয়া মোটরে বাহির হইল এবং পথের মধ্যে অজিত কমলকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইবার কথা তুলিল; কিন্তু নানা কথা-কাটাকাটির পর সে প্রস্তাব যেমন ছিল, তেমনই রহিল। তাহারা কমলের বাসার দ্বারে পৌঁছিলে আশ্রমেরই একজন কর্ম্মী রাজেন তাহাদের সংবাদ দিল যে, শিবনাথ পীড়িত হওয়ায় তাহাকে আশুবাবুর বাড়ীতে আনা হইয়াছে; আশু বাবু কমলকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য রাজেনকে পাঠাইয়াছে। তাহারা তখনই আশুবাবুর বাড়ীতে গেল এবং সকলে মিলিয়া রোগীর ঘরে যাইয়া দেখে, শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সন্নদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া আশুবাবু স্তম্ভিত হইলেন এবং সকলে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। তার পর আর শিবনাথের আশুবাবুর বাড়ীতে স্থান হইল না, রাজেন তাহাকে একটা ছোট বাড়ীতে লইয়া গেল এবং কমলকে সংবাদ দিতেই সে আসিয়া শিবনাথের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, পূর্ব্বকথা মনেও আনিল না। শিবনাথ কয়েক দিন পরে সুস্থ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। তখন আগ্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয়ানক প্রকোপ, মুচিপাড়াতেই আক্রমণটা বেশী; রাজেন ও কমল এই মুচিদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে অবিনাশ ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া ছেলে লইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে; আশুবাবুর খুড়া মহাশয় মনোরমাকে কাশীতে লইয়া গিয়াছেন, নীলিমা অবিনাশের শূন্য বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া আশুবাবুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। বেলা নামে আর একটী মেয়ে আসিয়া আশু বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অজিত আর আশু বাবুর বাড়ীতে যায় না; আগ্রাতেই হরেনের আশ্রমে যোগ দিয়াছে। আশুবাবু অসুস্থ।]

(২২)

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র,—এর বেশি দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত ব্যাধিটাও তেম্‌নি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব-স্ব নিয়মেই চলে,—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই, সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য দেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া ছাই করিয়া দিল সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত যে এম্‌নিই হয়। এম্‌নি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে এবং এম্‌নি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই,—ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ব্ববিধ দুঃখই তাঁহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ-প্রসন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ, এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্য্যের অভাব বহু স্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহেনা, মনে হয়

আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁসিয়া আসে, মন্তব্য প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়,—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়া-বাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন তো সারিয়া আসিতেছে। কিন্তু হেতু যাই হোক একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার চিত্তের গভীর তলদেশে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে আগ্রা-বাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত, আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তারপরে, হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেম্‌নি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকাল বেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, রায় বাহাদুর সদরআলা, কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী—নানা কারণে স্থান ত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা—হরেন্দ্র, অজিত, এবং বাঙালী পাড়ার যাঁহারা আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন তাঁহাদের কেহ কেহ। তাঁহার উপরের প্রশস্ত কক্ষটা প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আসেনা শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ী গিয়াছে, বোধহয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সম্বাদ পৌছিবার প্রতীক্ষায় আছে। আর আসেনা কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজ্‌লিসি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজ্‌লিসে আর যোগ দিতে পারেননা, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন,—তাঁহার স্বাস্থ্য-হীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্ত্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তায় কোথাও ত্রুটি ঘটেনা, বাহিরের লোকে বাহিরে হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা, সভা-শেষে পরিতৃপ্ত চিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

সম্ভব কি করিয়া যে হয় এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইতনা, অভ্যাসও ছিলনা, ভালও বাসিতনা। কিন্তু, অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ এই গৃহের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেম্‌নি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্ত-ধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধকরি কেহ অনুভবও করেনা।

হিম-ঋতুর প্রথমার্দ্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতেই টিপি-টিপি বৃষ্টি নামিয়াছিল,—বিকালের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। আজ বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিলনা। ঘরের শার্শীগুলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে, আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেম্‌নি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি-একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়া-দেশের সবই উল্টো। কিছুকাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলাম,—জুন কিম্বা জুলাই হয়ত হবে,—এই জলের জন্যে যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে না এলে এ কখনো আমি কল্পনাও করতে পারতুমনা। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এ খবর কি সকলের কাছে পৌছয়?—পৌছয়না।

বেলা সরল চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে? জবাবটা এম্‌নি অভাবিত রূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন সে তেম্‌নি একমনে সেলাই করিয়া

যাইতেছে, যেন এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহ-প্রিয় রমণী নয়, এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক, এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই,—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি তেম্‌নিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য কৌতুকে চপল, চঞ্চল,—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ,—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে যেন লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে, সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ কোরে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চ্চা বলেই নয়, হাহাকার ক'রে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক্ সে আমি পারিনে, এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্ম-সম্মান-বোধ বজায় থাক্, তার বড় আমি কিছুই চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিলনা।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণ ভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারেনা—কখনো পারেনা তা বল্‌চি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভালো। এতদিন একসঙ্গে আছি এ তো আমি ভাবতেই পারতুমনা।

নীলিমা হাঁ, না, একটা উত্তরও দিলনা, যেন ঘরে কেহ নাই এম্‌নি ভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশঃ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-মত কি ছিল কেহ জানেনা, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেননা। মেয়েকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন, এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি সখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইলনা। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন, দিন কতক দেখা-শুনা ও মন জানা জানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেষ্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বায়ু-পরিবর্ত্তন, এম্‌নি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশ যেটুকু তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে-হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যা-পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চাহিলেন। বন্ধু মহলে আপোষের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিলনা। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিলনা, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্য মত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিলনা। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিম্‌লা, মুসোরি, নইনি প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার

পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি তো ছিলইনা, বরঞ্চ অতিশয় মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর সম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত পরের মতও আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়ীতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ, অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল, একেবারে অন্যরূপ। এ গৃহে কাহার স্থান যে কোথায়, এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্ত্তৃত্বও ছিল তেম্নি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও-কথা নীলিমা বলেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিলনা, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্যে বেলা?

বেলা কহিল, আপনি তো সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবেনা। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও কোরবনা। নিজের মর্য্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সব চেয়ে বেশি, আজও তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সব চেয়ে কঠিন। অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও আমি তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটি।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিলনা, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বল্‌ছিলেন যে বিবেক-বুদ্ধিটাই সংসারে মস্তবড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয়না।

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন ওটা শুধু নির্বোধের হাতের অস্ত্র। সাম্‌নে পিছনে দুদিকেই কাটে,—ওর কোন ঠিক্-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও-কথা তুমি মুখে এনোনা নীলিমা।

বেলা কহিল, এত বড় দুঃসাহসের কথাও তো কখনো শুনিনি।

আশুবাবু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে; তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায়না, মানাও চলেনা।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই, বাবার নিষেধও মান্‌তে পারিনি,—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুমনা।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি দিয়েছিলাম।

বেলা কহিল, Thanks. সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, তার কারণ স্ত্রী পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই; কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তাঁর সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভন নয়, কিন্তু সে যদি তার স্বামীকে সত্যই বর্জ্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবোনা।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বই কি।

নীলিমা নীরবে চাহিয়া রহিল।

সে চাহনির সম্মুখে আশুবাবু কেমন যেন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিলেন, কিন্তু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার

তো কিছু নেই নীলিমা। বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হোতো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি তো কমলের একজন বড় ভক্ত; বলো ত সে নিজে এ-ক্ষেত্রে কি কোরত? কি জবাব দিতো? তাইতো সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত কোরে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয়, নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই তো টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন তার সকল কথা বোঝাও যায়না, মানাও চলেনা। তার সম্বন্ধে এইটেই আপনাদের সব চেয়ে সত্যি। চলেনা কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে, আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেননা। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যেই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভালো নয়।

নীলিমা এ কথা কাণে তুলিলনা, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন, এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করতো তা' সেই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি কোরে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই ক'রে আহার সংগ্রহ করতে হোতো, —তাও হয়ত সব দিন জুটতোনা। কমল আর যাই করুক, যে-স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ কোরে বাঁচতে চাইতনা। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা ক'রে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাসা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যেন তাহার কাজ; সে যে সহসা এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে, দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিসে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বোলতামনা। কমল একটা দিনের জন্যেও শিবনাথের নিন্দে করেনি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ করেনি,—কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায়, শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা' বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেননা। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী স্ত্রীর তুল্য অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেননা যে, মেয়েমানুষ হয়ে আমি এর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে; আমি জানি এ সত্যি; কিন্তু এ-কথাও জানি যে সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে-মুখে, আন্দোলনে-আন্দোলনে এ সত্য এম্‌নি ঘুলিয়ে গেছে যে আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চ্চা করবেননা।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে সেলাইয়ের জিনিস-পত্রগুলা তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখো-মুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া তার চেয়েও তাঁহার বেশি অসম্ভব মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের

বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভিজিয়াছে,—বৌদি কই ?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে, এ ভরসা তাঁহার ছিলনা ; সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো অজিত, বোসো হরেন্দ্র—

বসি। বৌদি কোথায় ?

ইস্! দুজনেই যে ভারি ভিজে গেছো দেখ্‌চি—

আজ্ঞে, হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন ?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ করিলেন, এমন সময়ে ভিতরের দিকের পর্দ্দা সরাইয়া নীলিমা আপনিই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

অজিত কহিল, এ কি ? আপনি হাত গুণতে জানেন নাকি ?

নীলিমা বলিল, গোণা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানলা থেকেই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। একটি ভাঙা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশশুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে ? তাইতে দুজনকেই ভিজ্‌তে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী—অন্যায় করেননা—তাই চুল চিরে ছাতি ভাগ ক'রে পথ হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। এই বলিয়া সে জামা-কাপড় হরেন্দ্রের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং, দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চল্‌বেনা।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক বিষণ্ণ-মুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল ; এবং নীলিমা জানেলার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হে হরেন, আর খুঁড়োনা। দেখ্‌চোনা মেয়েদের কি রকম ব্যথা লাগ্‌লো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্ত্তন করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারেনা। অতএব চিরস্তুয়মান হিমাচলের ন্যায় ও-দেহ অক্ষয় হোক্, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন্, এবং জল-বৃষ্টির ছুতা-নতায় ইতর জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ তো আবহমানকাল চলে আস্‌চে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দ্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোবামোদ না করলে ইতরজনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি ?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুন্‌তে একটু লোভ হয়।

তবে, আরম্ভ কোরব নাকি ?

আচ্ছা এখন থাক্। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়োগে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে ? তার পরে ?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখিগে ইতর জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট কোরে চেষ্টা করতে হবেনা বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাণ্ডার উথ্‌লে যাবে। চলো অজিত, আর ভাব্‌না নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসিগে, এই বলিয়া সে অজিতের হাত

ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

(২৩)

অজিত কহিল, জল আস্‌বার তো কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। এবং আবার দুজনে সেই ভাঙা ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকার-তত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌছান। অবশ্য, তার পরের ভাব্‌নাটা নেই,—এখানে তা' চুকিয়ে নেওয়া গেছে,—সুতরাং, ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা'হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভোরেই খেয়ে নিলেনা কেন?

হরেন্দ্র সবিনয়ে কহিয়া উঠিল, না না, থাক্,—তাতে আর কি হয়েছে—আপনি সেজন্যে ব্যস্ত হবেননা আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরাগী-গিরিতে পেকে গেছেন,—এ-দিক থেকে ওঁর কোন ত্রুটি কেউ দেখতে পারবে না। ভাব্‌না শুধু অজিতবাবুর জন্যে। এমন সংসর্গেও যে তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠ্‌তে পারছেন না, সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখ্‌লেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপই থাক্, উনি ধরাই পড়ুন একদিন,—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা কোরে পুজো দেবো।

তা'হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বক্‌চেন হরেনবাবু,—ভারি বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারি রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব না কি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়,—আর একটুখানি বেড়েছে; এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। ব্রহ্মচর্য্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক্, শোনামাত্রই ভক্তি ও প্রীতিতে অগ্নিবৎ হয়ে ওঠেন। মেজাজ ভালো থাক্‌লে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুক বোধ করতেও অপারক হননা। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করছিলেন আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উত্তর পাইল না। তাহার রুক্ষ স্বর ইঁহাদের কাণে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল,—অথচ, নিজের মধ্যে এম্‌নি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে ত আশুবাবু? সে আমাদের কে, তবু এতবড় অন্যায় সহ্য হোলো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেলো। কিন্তু কমল বল্‌লে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে 'না'র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর থেকে হাত বাড়িয়ে দান করার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই,—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই ক'রে থাক্, আমার প্রস্তাবে সে চম্‌কে উঠে শুধু বল্‌লে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালোবেসেছিল তার প্রতি নির্ম্মমতার হীনতা কমল ভাবৃতেই পারলে না। এবং সকলের চোখের

আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ কোরে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়,—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেলো।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সব চেয়ে রাগ হয় ও-যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য, স্মৃতি, নৈতিক-অনুশাসন, সব কিছুকেই উপহাস কোরে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পর-ধর্ম্মের ভাব বয়ে যাচ্চে; তবুও ওর মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থ টাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।

আশুবাবু খুসি হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা, তেম্‌নি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে-মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন কোরে থাকলে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকতো না। শুয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হোতো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এম্‌নি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত, পুরুষদের চেয়ে অনেক দিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এম্‌নি সামান্য করে রাখে যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্ব্ব-জন্মে কোন রাজরাণীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ-জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হোতো।

হরেন্দ্রও হাসিল, কহিল, কি কোরব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা' ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞেসা করুণ দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুনি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক্, কিন্তু বেঁচে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ—কি করেন হরেনবাবু। আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, হবে একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা'হলে বলুন আপনার যা' ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমটা ছাই তুলেই দাওনা ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচ্‌তে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই; অন্ততঃ, অক্ষয়টা বেঁচে থাক্‌তে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ী রওনা ক'রে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখ্‌চি তোমরা তা'হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিট্‌কিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে তো মরলোনা! দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বা'র হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে!

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বলা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা' নয়তো কি!

বেলা কহিল, সত্যিই তো তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল,

সেদিন ঠিক এই নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েননি ?

কই, মনে তো হয়না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ তো সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে—এই বলিয়া সে বইখানা পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি ?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত,—"একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম।"

বেলা কহিল, তার মানে ? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেছেন নাকি ?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন, এবং, হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারী-দেহের ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের যে ছবি দিয়েছেন তা' স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক্।

অজিত কহিল, থাক্। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হ'লেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন,—বেশ তো অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়োনা শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ সাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুননা শুনি। অন্ততঃ, সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা আছে, তা' সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, এবং বড় ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝা যায় দাগ যদি কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে,—সে বহুদিন পূর্ব্বে। সেদিন তাঁকে ভালোবেসেছিল অনেকে ;—একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা কোরে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেলো বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলেনা। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ওনি। তারপরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে,—যাকে পঁচিশ বৎসরের দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে, এ ধারণাই যেন তার ছিলনা। কুশল প্রশ্ন অনেক হোলো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হোলোনা ; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হোতো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ দ্বার ভেঙে বাইরে আস্‌তে চাইতো, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, কিন্তু এ যায়না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন,—না না, ইংরিজি নয় অজিত, ইংরিজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাঙ্‌লায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগ্‌লো, তুমি এম্‌নি করেই বাকিটুকু বলে যাও।

আমি পারবো কেন ?

পারবে, পারবে। যেমন কোরে বলে গেলে তেম্‌নি কোরেই বলো।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মতো আমার ভাষার জ্ঞান নেই ; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই দোষে। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ী ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা' নয়, বরঞ্চ একান্ত মনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন।

অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ-আশ্বাসে আর যেন সে যন্ত্রণা না পায়। এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হয়নি, তবু নিঃসন্দেহে আজ বুঝা গেছে, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক্ বা না যাক্, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবেনা, তা'কেও দুঃখ দেবেনা। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একবার উল্টো দিক থেকে। দু'য়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে ; আজ ঠিক সেই দিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শারীর-ধর্ম্ম বশে অবসিত-প্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের সেই উদ্দীপ্ত, উন্মাদ বাসনাকেই আজ শ্রান্ত, অবসন্ন করে দিয়ে থাকে, অভিযোগের কি আছে ? অথচ, বাড়ী ফেরবার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসারের চেহারাটাই আজ যেন চোখে তার আলাদা মূর্ত্তি ধরে দেখা দিলে। ভালোবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়,—এ সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা' বড় নয়,—যা' রূপজ, যা' অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, —সেই কুৎসিতের জন্যেও যে নারীর অবিজ্ঞাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্ম্মম অপমানে আহত করতে পারে, আজকের পূর্ব্বে সে তার কি জান্‌তো ?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ তো বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলনা।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তারপরে অজিত ?

অজিত বলিতে লাগিল,—মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেলো যে কেবল ঐ মানুষটিই তো নয়, বহু লোকে বহুদিন ধ'রে তাকে ভালোবেসেছে, কামনা করেছে,—সেদিন একটুখানি হাসি মুখের একটিমাত্র কথার জন্যে যেন তাদের আকুলতার শেষ ছিলনা। প্রতিদিনের প্রতিপদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটী ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিল্‌তোনা। তারাই বা আজ গেল কোথায় ? কোথাও তো যায়নি,—এখনো ত, মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে, গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগ্‌ড়ে ? তার হাসির রূপ বদ্‌লে ? এই তো সেদিন,—দশটা বছর, কতদিনই বা—এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো ?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত,—হয়ত, শুধু গেছে তার যৌবন, তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক তাই। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন ?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জান্‌লেন কি কোরে ?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তারপরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ী ফিরে শোবার ঘরের মস্তবড় আরশীর সুমুখে আলো জেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোষাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদ্‌লে গেলো। এমন কোরে ধাক্কা না খেলে হয়ত এখনো চোখে পড়তনা যে নারীর যা সব চেয়ে বড় সম্পদ,—আপনি যাকে বল্‌ছিলেন তার মা-হবার শক্তি,—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান ; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জল-ধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে ;—কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বল্পায়ুঃ, এ বার্ত্তা পৌঁছল তার কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এম্‌নিই হয় অজিত, এম্‌নিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে ?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আর্শীর সুমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। এক দিন কি ছিল, এবং আজ কি হ'তে বসেছে। কিন্তু সে বিবরণ আমি বল্‌তেও পারবনা, পড়তেও পারবনা।

নীলিমা পূর্ব্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না

না, অজিতবাবু, ও থাক্। ঐ যায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল,—না একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা' বয়েস, তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলেনা নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ, ওতো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে তো চল্‌বেনা।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুসি হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটিই তিনি নিজে দিয়েছেন। বলেছেন, আজ থেকে নিঃশেষের মুক্তি প্রতীক্ষা ক'রে থাকাই হবে আমার অবশিষ্ট জীবনের একটি মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্য্যের ভগ্ন-স্তূপ হয়ত আজও কোন দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে-মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেম্‌নি মিথ্যে। যে-রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' ব'লে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবোনা, পরকেও না।

আর কেহ কিছু কহিলনা, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারি সুন্দর লাগ্‌লো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল; সে এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিল, কহিল, ও আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমূল ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছায় না। রমণীর রূপ কি এম্‌নি তুচ্ছ জিনিষ যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই?

নীলিমা কহিল, নেই, এ কথা তো লেখিকা বলেননি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটেনা এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ঘোচেনি। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বল্‌ছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাক্‌লে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্‌দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাক্‌লেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন,—কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেননা মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীব-জগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে চলে গেছে,—তাইতো সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এতো দুরূহ। এক চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায়না বলেই তো তার মর্য্যাদা আশুবাবু!

তাও বটে। গল্পের বাকিটা শুনি অজিত।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবেনা আশুবাবু। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোরে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবোনা। হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন,—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ,—আপনার এই অনির্দ্দিষ্ট ঢিলে-ঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে যে আমার সইবেনা। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—রূপের বিচারে হারলে তো তোমার লজ্জা নেই হরেন। বরঞ্চ, জিত্‌লেই যেন,—

না, সে আমি শুন্‌বনা।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার ভুল সপ্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে তর্ক করতে

আমার ইচ্ছেও হয়না, লজ্জাও করে। বস্তুতঃ, নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভালো, হয়েন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বহুকাল পূর্ব্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালোবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী,—আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা কোরতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘট্‌বেনা।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘট্‌লো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেননা,—সে প্রকৃতিই তাঁর নয়,—কিন্তু, জিজ্ঞাসা করার কথা কারো মনেও উদয় হয়নি। এম্‌নি তাঁর দেহের গঠন, এম্‌নি মুখের সুকুমার শ্রী, এম্‌নি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশি হতে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বই কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্য্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না। এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সম-বয়সী,—তখন বোধ করি আটাশ উনত্রিশের বেশি ছিলনা।

তারপরে?

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক মুহূর্ত্তেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেলো। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধা-সাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার কিছু পরিমাণও নড়ানো গেলো না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাব্‌তেই পারলেনা।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হলে বোধ করি অসম্ভব হ'তনা?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয়না? তেমন পুরুষ কি সে দেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি দুর্ভাগা বিশেষণটা বিশেষ কোরে সেই পুরুষদেরই স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালোবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেনা, এতবড় সত্য বস্তুটাও কোথা দিয়ে যে এক নিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন;—একদিন যেদিন নারী ছিলাম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারে কবে ঘটে এর পূর্ব্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শ্রান্তভাবে কহিল, আজ থাক্। ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি,—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্য দিন বোল্‌ব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্তই থাক্।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই স্বামী-বিহীনা মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পর-ছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে,—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের এড়িয়ে চল্‌তে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয়

আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চল্‌তে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেননা, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ, স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্য-বতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, নারী-জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায় টেরও পাননা।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌছয়নি, কিন্তু ভাগ্য দোষে যারা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে তাদের পথের নির্দ্দেশ কোন্ দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনি মাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশি শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই এ আমি জানি,—কিন্তু, তার মাঝে নারীর অবিরুদ্ধ, কল্যাণময়, সত্যকার আনন্দ আছে কি না আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল?

আশুবাবু মনে মনে যেন একটু কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন, দিন দুই তিন হোলো মনোরমা চলে গেছেন, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ ক'রে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর ক'রে ডেকে কাছে বসালাম। আমার ব্যথার যায়গাটা সে সাবধানে পাশ-কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলেনা। কথায়-কথায় এই ধরণের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়লো, তখন, আর তার হুঁস্ রইলনা। তোমরা জানই ত তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলাই যেন তার passion। মন সায় দিতে চায়না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলেনা, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলেনা, বল্‌লে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও-প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসেনা, আসে শুধু শূন্যতা থেকে,—ওঠে বুক খালি ক'রে দিয়ে। ওতো স্বভাব নয়,—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কানা-কড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো হঠাৎ ভেবে পেলামনা, তবু বো'ললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার ধর্ম্ম-বস্তুটির সঙ্গে শুধু যে তোমার পরিচয় নেই তা' নয়, অপরিচয়ের অনৈক্য তোমার শিক্ষায়, তোমার সংস্কারে, তোমার দেহের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুটিতে,—নইলে, আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সব চেয়ে বড় সফলতা। এবং, এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বল্‌লে, করতে দেখেচেন? একটা নাম করুন তো? সে এ রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমন ধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেননা কেন? মনে পড়েনি বুঝি?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিয়া রহিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপন করিবার চেষ্টা করিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেননা, কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,—তেম্‌নি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হোতো, কিন্তু সে যখন মনে এলোনা, তখন, কমল বল্‌লে, আমাকে যে-শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোলো আনায় খাটেনা? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, তাই মুখস্থ-বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি কোরে ভাবে এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্ম-প্রসাদের ব্যর্থ বিড়ম্বনায় তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বল্‌লে, সহমরণের কথা তো আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরতো, এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি

দিতো, দুপক্ষের দম্ভই তো সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেক্‌তো যে, বৈধব্য-জীবনের এত বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায় ?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলামনা। কিন্তু, সে অপেক্ষাও করলেনা, নিজেই বল্‌লে, উত্তর তো নেই, দেবেন কি ? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, প্রায় সকল দেশেই এই আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটা বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য অবস্ত ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন ক'রে দেয়, ভাবুতেই দেয়-না ওর মাঝে নর নারী কারও জীবনেরই শ্রেয়: আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়,—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই,—কিন্তু আর না আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বল্‌লে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বোল্‌লাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ কথা কি তিনি কখনো শেখাননি যে নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায় ? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা ?

কমল বল্‌লে, তিনি বল্‌তেন, মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত ও নয়,— ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন সৌখীন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা। তার বড় নয়!

বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বোল্‌লাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন ? এবং জগতে যা কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে ?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেননা। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বোল্‌লাম, তুমি যা বল্‌চো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য-কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালোবাস্‌তে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে এ চিত্তের অক্ষমতা,—এবং, অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলেনা। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ ব'লে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থ-ই সেদিন তুমি দেখ্‌তে পাওনি—

কমল বল্‌লে, আজও পাইনে আশুবাবু,—সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান কোরে আনে। ও তো কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের শক্তি,—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম,—শক্তির স্পর্দ্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরণের অসংযম, এ কথা কি কোন দিন ভেবে দেখেননি আশুবাবু ?

ভেবে দেখিনি সত্যি। তাই, চিরদিনের ভেবে আসা কথাটাই খপ্ কোরে মনে পড়্‌লো। বোল্‌লাম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধ'রে গ্রাস ক'রে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা তো মেটেনা,—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন ও-পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেছেন,—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশি জ্বলে ওঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমেনা।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বল্‌তে গেলেন কেন ? তার পরে ?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বল্‌লে, শাস্ত্রে ঐ রকম আছে নাকি? থাক্‌বেই ত।

তাঁরা জান্‌তেন জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্ম্মের সাধনায় ধর্ম্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকি,—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ ক্ষেত্রেও তাঁরা আক্ষেপ করে যান্‌নি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার স্পর্দ্ধায় যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বোল্‌লাম, না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হয়না এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বল্‌লে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। একি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা যে ভাঙ্‌বার আগেই মনে হবে,—থাক, আর না, এবার উঠে ঘরে যাই। এর আসল সত্তা তো বাইরের ভিড়ের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিকার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারেনা।

বোল্‌লাম, তা হতে পারে, কিন্তু ও যে রিপু, ওকে তো মানুষের জয় করা চাই ?

কমল বললে, কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবেনা। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার,—তাদের কোন্ সত্বটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে ? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখকে জয় করা নয় ? অথচ, ঐ ধরণের যুক্তির জোরেই মানুষে অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাত্‌ড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হোলো ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি একটা নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, কি যে হোলো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখোদিকি। কথাটা ব'লে ফেলে নিজের কানেই বিঁধ্‌লো, কারণ, কটাক্ষ করার মতো কিছুই তো তার নেই,—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলেনা, শান্ত মুখে আমার পানে চেয়ে বল্‌লে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু। দুঃখ যে পাইনি তা' বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা' ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা' পেয়েছি,—আনন্দের সেই ছোট ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্ত-দাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুক্‌নো ঝরণার নিচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'-হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালোবাসার আয়ুঃ যখন ফুরলো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধুঁয়ায় আকাশ কালো করে তুল্‌তে আমার প্রবৃত্তিই হোলো না। তাই, তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাব্‌লেন এতবড় অপরাধ কমল মাপ করলে কি কোরে ? কিন্তু অপরাধের কথাই যে আমার মনে আসেনি,—এসেছিল শুধু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হোলো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচ্‌ড়ে উঠ্‌লো—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু,—বোল্‌লাম, কমল, অম্‌নি মণি মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে,—সেই তো সাত রাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত ?

কমল চুপ ক'রে চেয়ে রইলো। জিজ্ঞেসা কোরলাম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালোবাস্‌তে পারবে কমল ? এম্‌নি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে ?

কমল অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ, সেই আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য্য অস্ত গেছে ব'লে সেই অন্ধকার-টাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয়-আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দুচোখ বুজে তাকেই বোল্‌বো এ আলো নয়, এ মিথ্যে ? জীবনটাকে নিয়ে এম্‌নি ছেলে-খেলা করেই কি সাঙ্গ ক'রে দেবো ?

বোললাম, রাত্রি তো কেবল একটি মাত্রই নয় কমল,

প্রভাতের আলো শেষ কোরে সে তো আবার ফিরে আস্‌তে পারে ?

সে বল্‌লে, আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন কোরব।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে বসে রইলাম—কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখ্‌লাম, না, তা' নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র,—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানেনা, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করেনা; ওর অনাগত, তাই,—যা আজও এসে পৌছয়নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্ব্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলনা, কিন্তু এ কথাও তো মনে মনে স্বীকার না-করে পারলামনা যে, এ তো কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা' শিখেচে একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচে। কতটুকুই বা বয়েস, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক উপলব্ধি করে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। জীবনটা সত্যিই তো আর ছেলে-খেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান তো সে জন্যে আসেনি। আর-একজন-কেউ আর-এক-জনের জীবনে বিফল হ'ল বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বোল্‌বো কি কোরে ?

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হ'ল, বৃষ্টিও কমেছে,—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিলনা,—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোট-খাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকি ছিল, কিন্তু আজ সে সকল তেম্‌নি অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল,—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়ন-কক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন এই নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ গৃহের মধ্যে আসিয়া তাহাদের কাছে অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা হইয়া গেল;—অথচ, পরমাশ্চর্য্য এই যে কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—এক-দিন যে দিন নারী ছিলাম!

(২৪)

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ, আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাধিল হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এম্‌নি শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে তাহাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইতনা। অবশেষে তাহারাই এক-দিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী-সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুন্‌ডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে; অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে, অপরাহ্ণে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সেও গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারো দিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেননা।

নীলিমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠেনা। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙাবার সমাজ নেই,—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেম্নি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনেরই বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হলোনা ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তাকে নিজের কর্ত্তব্যে বাধা দিলেনা। কেউ যা পারলেনা ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হোলো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে,—অথচ, মেয়েদের কত কথাই তো ভাবতে হয়!

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই তো উচিত নীলিমা।

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বে-পরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠ্‌তে তো আমরাও পারি।

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে, আপনিও না। কারণ, জগৎ সংসার যে-কালী গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেল্‌বার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেক দিক থেকেই এ কথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরি সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি,—কত যে জ্বলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে,—কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নর নারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক পা এগোয়না। কেন জানেন? এখন দেখ্‌তে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলেনা, ন্যায় ধর্ম্মের দোহাই পেড়ে মেলেনা, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল ক'রে মেলেনা,—এ কেউ কাউকে দিতে পারেনা,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখ্‌লেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায়না,—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে দশ বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইলনা, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হোলোনা যে এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্য্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিতো কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাক্‌লে সে কি কোরতো?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা কোরতো, রাঁধতো বাড়্‌তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ কোরতো; বস্তুতঃ, একলা মানুষ, টাকা-কড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতোনা।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ-কর্ম্ম কোরবনা, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাক্‌বেনা, হরদম্ ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধ-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ, এই ধরণের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাক্‌তে তো জানেনা, তখন স্বামী পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্ম্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো,—আনন্দের ধারার মত সংসার তার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেতো ও টেরও পেতোনা। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেচে, আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি, কেউ একটা দিনও সে-সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারতোনা।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই বটে। তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদেরই গাড়ী।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন সম্বাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ, খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল, এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্তে ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। কে জান্‌তো আমাকে আপনারা এত ভালোবাসেন,—তা'হলে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতাম। এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেম্‌নিই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেননা।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই,—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বল্‌চি আমার দোষ হয়েছে,—আমি ঘাট মান্‌চি। কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেননা তখন সে সত্যই ভারি আশ্চর্য্য হইল, এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্ত পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয় বচনে কহিল, আপনি আসবেন জান্‌লে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতামনা, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারি হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী,—নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবেনা,—তবে ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চার জনকে আহ্বান করেছেন। আচ্ছা, আজ তা'হ'লে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধ্‌তো। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বোলতাম, না তুমি বলে ডাকতাম?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্ব্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা' ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটু খট্‌কা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক্। সাত আট দিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজ্‌ছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্তে যেন মনে মনে তপস্যা করছিলাম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য্য তাহার মুখে নাই, তাই, অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্ট একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি তো সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্র সমাজের কেউ তো আমাকে চায়না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেননা, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয় তো এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি কোরে চেয়ে থাকে তো এই নীলিমা। এতখানি ভালোবাসা হয়ত তুমি কারো কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্ত নহে, এই ধরণের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই তাহার আচরণে একটা কুণ্ঠিত অস্থিরতা পরিলক্ষিত হইত,—বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এম্‌নিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা

তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ তো, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই আমিই ভার নিয়েছি বল্‌বার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কোরে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই কটা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন,—আগ্রায় এতলোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেননা কেন? জ্ঞানতঃ, কোনদিন কোন অন্যায় করেননি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বল্‌তে পারেননি, এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধহয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পারো।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে; হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিলনা, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্যে সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন; এবং পরে, দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন—এই মাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে খুঁজ্‌ছিলেন কেন? এর কোনটাই তো আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ, ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি তো তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়-মনে ভগবানকে ডাক্‌ছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবোনা; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ী, শ্বশুর-বাড়ী দুটোই তো ক্ষুইয়েছি,—এর ওপর উপরি-লোক্‌সান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবোনা,—এখন ভগ্নী-পতির আশ্রয়টাও ঘুচ্‌লো। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল,—দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই,—যে-কটা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সাম্‌নে আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বোল্‌ব, না পাই মরবো। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জ্জনার মত আর ঘাটে-ঘাটে ঠেক্‌তে-ঠেক্‌তে আয়ুর শেষ দিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবোনা। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাস্‌লে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ ব'লে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজ-কাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও,—সেই তো আমার ভয়।

কমল কহিল, হোলাম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবেনা দিদি, আমিই হয়ত পৃথিবী-ময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন্‌।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এম্‌নি কোরে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন কি আমি করতে পারি।

তোমাকে কিছুই করতে হবেনা কমল, যা করবার আমি নিজেই কোরব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্ত্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘট্‌তে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘট্‌তে দেবেননা কি কোরে? মেয়ে তো আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেননা, কারণ, অস্বীকার করার যো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায়না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল; সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবদ্দির দুর্ব্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে,—সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিক্‌টা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, সে পরিচয়টা কি সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ এক-মাত্র সন্তান, কি কোরে যে মানুষ করেছি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃ হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্য্যন্ত উপহাস করবে। তা'ছাড়া তুমি বুঝ্‌বেই বা কি ক'রে? কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয়, তার কর্ত্তব্যও তো আছে? শিবনাথকে আমি চিন্‌তে পেরেছি। তার সর্ব্বনেশে-গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়েনা। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দ্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশি দিন থাক্‌বেনা,—সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন,—তাহ'লে?

তাহ'লে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বোঝার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যিই স্থির করেছেন?

হাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ ক'রে রইলে যে কমল, জবাব দিলেনা?

কই, প্রশ্ন তো কিছুই করেননি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান, দুর্ব্বলকে সে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে চলে আস্‌চে। এতে বল্‌বার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিলনা, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার তো শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্ব্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি? কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে; তবুও যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেছি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো ব'লেই তো? সত্যিই কি এ তুমি বুঝ্‌তে পারোনি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেছি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু, দুঃখ নিবারণ করতে পারলেননা বলে কি রাগ কোরে তার দুঃখের বোঝা সহস্র গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় কোরে বিসর্জ্জন দেবেন,—ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেননা?

আশুবাবু বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁর মুখে আসিলনা,—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এম্‌নি ভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ কোরে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখ্‌তে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ, আমি কামনা করি ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেননা সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এম্‌নি কোরেই মানুষে আপনাকে শোধ্‌রাতে শোধ্‌রাতে আজ মানুষ হতে পেরেছে। ভুলকে তো ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকের পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেক্‌চে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার অবধি নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ শঙ্কায় আচ্ছন্ন মন তাঁহার কোনমতেই ইহাতে সায় দিতে পারিলনা। হয়ত, সব কথা কানেও গেলনা, অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়েনা। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারোনা?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল। এবং, ইহাই স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধ কণ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্ত্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবোনা। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বোল্‌ব যে খাইয়ে-পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজে বই মুখস্ত করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেননি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি আজ দৈবাৎ এসে পড়েই থাকে, আমি হন্তারক হতে যাবো কিসের জন্যে?

কথাটা আশুবাবুর ভালো লাগিলনা, কহিলেন, তুমি কি তাহলে বল্‌তে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়?

কমল কহিল, অন্ততঃ, ভয় দেখিয়ে নয় এইটুকুই বল্‌তে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতামনা। আমার বাবা আমাকে এই ভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এই দিকেই দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু, আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালোবাসা দিতে পারে না,—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এই ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের সীমা থাকবেনা। কিন্তু তখন তাকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাব্‌না ছিল, কিন্তু সে-ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষে ক'রবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ সব কথার মার-প্যাঁচ কমল,—যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় কোরেই পেতে হবে,—ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিল্‌বেনা।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করিনি আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই,—মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি,—ভুল ভেঙে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আস্‌তে হবেনা এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু তো ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙ্‌বেই, কিন্তু তারপরেও যে তাকে দীর্ঘ দিন বাঁচতে হবে,—তখন সে থাক্‌বে কি নিয়ে? বাঁচ্‌বে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বল্‌বেননা। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হোতো, তার মূল্য ছিলনা। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের মস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ কোরে তোলে, নইলে, আমিই বা আজ বেঁচে থাক্‌তাম কি কোরে? বরঞ্চ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন ভুল যদি ভাঙে তখন যেন সে আপনাকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশি বাধিল। বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার দেখ্‌তে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য?

আমি মা হলে মেনেই নিতাম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতাম, তবু এই উপায়ে

বাধা দেবার আয়োজন কোরতামনা। মনে মনে বোল্‌তাম, এ জীবনে যে-রহস্যের সাম্‌নে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝ্‌তে পারলামনা কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ বাড়ীতে আস্‌তে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে তো যথার্থ ভালোবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ;—এ মিথ্যে যেমন কোরে হোক্ নিবারণ করাই পিতার কর্ত্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা, এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারেই সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবেনা, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিত-বোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা। অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালোবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন। বহু-দিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই,—সংসারে ইহার তুলনা বিরল,—এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন জাতীয়।

ইহার ভালো মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফল বিড়ম্বনা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্ব্বিঘ্ন শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধ-চিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে, এম্‌নি দুর্ল্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্দ্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সেই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ বিবাহে সম্মান নাই, কল্যাণ নাই, বঞ্চনার 'পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকাল ব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবেনা,—হয়ত এ সবই সত্য,—কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে বস্তু বাকি থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড় এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত্ত উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত তাঁহার অনির্ব্বাপিত দীপ-শিখাকেও দীপ্তির পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেম্‌নি বসিয়া আছে,—বেশ বুঝা গেল এ লইয়া সে আর কথা কাটাকাটি করিতে চাহেনা। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজনে মৌনাবলম্বন করিলে তো অপরের মন শান্তি মানেনা। বস্তুতঃ, এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার মুখে যাই কেননা বলুক, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্দ্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত; ভদ্র সমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটেনা, অথচ, এই মেয়েটিরই নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচেনা।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি

কখনো সেদেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেছি। অনেক ভালোবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েছে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে-বিবাহ যখন অনাদরে-উপেক্ষায় অনাচারে-অত্যাচারে ভাঙ্‌লো তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এম্‌নি দেখ্‌তে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখ্‌তে পাই আশুবাবু। ভাঙার নজির সেদেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠ্‌চে,—উঠবারই কথা',—এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝ্‌তে যাওয়াও তেম্‌নি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলেনা ; বলিলেন, সে যাক্‌, কিন্তু আমাদের এই দেশটার পানে একবার ভালো কোরে চেয়ে দেখো দিকি। যে-প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আস্‌চে তার সৃষ্টিকর্ত্তাদের দূরদর্শিতা। এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের পরে নেই, আছে বাপ মা গুরুজনদের পরে। তাই বিচার-বুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠেনা, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি তো মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি, আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালোবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুবুদ্ধি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানেনা। কিন্তু তর্ক ক'রে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্ত্যক্ত করচি ; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্য্যের আবির্ভাব দেখ্‌তে পায়না, দেখ্‌তে পায় শুধু তার অবসান। সূর্য্যদেবের কেবল রঙ এবং চেহারার সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাক্‌লে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌছনো যাবেনা। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এত ক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই, এখন কহিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালা গুলোও খুলে দেওয়া চাই। এ তো চোখের দোষ নয়,—দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে, যে দিকটা খোলা আছে সে দিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলে থাক্‌লেও এ ছাড়া কোন কিছুই কোনদিন চোখে পড়বেনা।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়োনা কমল, আর একটুখানি বোসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই,—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবোনা। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝ্‌তে পারি। তুমি কি যথার্থই বোল্‌চ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক্‌?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালোবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বল্‌তে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশোবার বোঝাতে চাচ্চি, কমল, এ হয়ত তার ভয়ানক ভুল,—এ ভুল ভাঙবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই ভাঙে তা' নয়, সত্যিকার ভালোবাসাও ভাঙে। তাই অধিকাংশ ভালোবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও দেশের এতো দুর্নাম, এতো বিবাহ ছিন্ন করার মাম্‌লা। শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বলো কমল, তাই বলো। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেচি।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙেনা কমল?

কমল কহিল, ভাঙ্‌বার কথাও নয় আশুবাবু। সে তো অনভিজ্ঞ-যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়,—চোখ-চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই-করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ্ না থাক্‌লে তাতে সহজে ফাটল্ ধরেনা। এদেশ-ওদেশ সবদেশেই সে ভারি মজ্‌বুত—সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইলনা।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার

ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকি থাকবে কি?

থাকবে যে-স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরিয়েছে' তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিলনা, কিন্তু তার বেশি ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকু মাত্র দিয়েই বিদায় করেছে আমরা তাঁকে কৃপা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকেনা, দুহাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়েও যা' হাতে থাকে মাণিকের মত তা' হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা' দিয়ে শোভা-যাত্রা করা যায়না ব'লেই, দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে,—বলে ঐ তো সর্ব্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার ঢের আছে কমল। মণি-মাণিক্য সকলের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদ-মস্তক সোনা-রূপোর গয়না না পেলে যাদের মন ওঠেনা, তারা তোমার ঐ এক ফোঁটা হীরে-মাণিকের কদর বুঝবেনা। যাদের অনেক চাই তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক যায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা থাক্।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই নাহয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেননা। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভ-বুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারেনা। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক্, বেলার স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই আমি জোর করে বল্‌তে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক কোরে তার ঠিকানা মেলেনা।

কমল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এম্‌নি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালোবাসার সবটুকু হোতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠ্‌তোনা,—কিন্তু তা' নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান বুদ্ধি কম, তর্ক কোরে তোমাকে বোঝাতে পারবোনা, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়া-কাড়ি কোরে এদের পাওয়া যায়না, অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণধী কমল এক নিমিষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়,—একেবারে তাহার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে তাহারই এলো-মেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা,—আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে,—পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্-নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ্‌বো, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এ ভাবে অবজ্ঞা কোরোনা। বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে,—মিথ্যে দিয়ে কখনো এত লোককে ভোলানো যায়না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা' দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার

প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিলো নর-নারীর ভালোবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানবসভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল; কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন তারা মেয়েদের শুধু অপমান কোরেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও তারা বন্ধ ক'রেছিল, এবং এই অসত্যের পরেই ভিত্ পুঁতেছিল ব'লে আজও এর দুঃখের কিনারা হোলোনা।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটু বাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেননা। এই আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন,—কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বই কি কমল। কিন্তু সে তো মনিবের ফরমাস মতো কাটা-ছাটা মানান্ করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক,—চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক্, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচেনা।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেননা তা' বলে দিচ্চি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেনা, শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরিজিতে Emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি তো জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরি করেনি, করেছিল আপনাদের মতো যাঁরা মস্ত বড় পিতা,—নিজেদের বাঁধন-দড়ি আল্‌গা কোরে যাঁরা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন,—তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যান্‌সিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিনে কেন, দেবার আসল মালিক যে আপনারা,—আমরা নই,—জগৎ-ব্যবস্থার এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বল্‌তেন, পৃথিবীর ক্রীত-দাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবেরাই, নইলে দাসের দল বিদ্রোহ কোরে গায়ের জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করেনি। এম্‌নিই হয়। শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্ব্বলকে ত্রাণ করে। তেম্‌নি, নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব তো তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকেনা, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেননা। এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্য্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই আকস্মিক দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

লোকটিকে কখনো তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার অকস্মাৎ জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্ব্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন। কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইলনা। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের দ্রব্য-মূল্যের হার

শ্রীগোকুলবিহারী দাস

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' হরিহর শেঠ মহাশয় কলিকাতার পরিচয় প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতায় প্রচলিত বাজার দরের যে ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছেন, তাহা অতি শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক। বর্ত্তমান দ্রব্য-মূল্যের সহিত ইহার পার্থক্য এত অধিক যে সহসা এই বিবরণ পাঠ করিলে মন বিস্ময়রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মাসিক ২ টাকায় এক চাকুরি পদে বাহাল হন, তখন তাঁহার গৃহে আনন্দোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত-রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—'দুই টাকা বেতনের কথা শুনিয়া দিশাহারা হইবারই কথা। সেকালে আট আনা দশ আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত। এক টাকায় এক মণ দুধ মিলিত। শাকসব্জি ও তরিতরকারী প্রায় ক্রয় করিতে হইত না। সেকালে দরিদ্র লোকে টাকা প্রায় দেখিতে পাইত না, দেখার দরকারও হইত না। বিনা টাকায় দিন চলিত। বঙ্গের কি দুরদৃষ্ট! আমাদের কি পোড়াকপাল! এমন সুখের দিন দরিদ্রের ক্রোড় হইতে চিরদিনের জন্য অপহৃত হইয়াছে।" কিঞ্চিদূর্দ্ধ এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাজার-দর এইরূপ সুলভ ছিল; আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছি। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহার একটী খসড়া করিবার প্রয়াস হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আরম্ভ।

শুক্রনীতিতে গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুর মূল্য নিম্নলিখিতরূপ দেওয়া আছে। পীতবৎসা প্রস্থদুগ্ধা একটী গাভীর মূল্য ১ রাজত পল। ১টী ছাগলের মূল্য গরুর অর্দ্ধেক এবং একটী মেষীর মূল্য ছাগলের অর্দ্ধেক। দৃঢ় যুদ্ধশীল মেষের মূল্য ১ রাজত পল। রাজত পলকে আধুনিক মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে উপরিউক্ত পশ্বাদির মূল্য সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা হইবে। দশ পলে এক ধরণ হয়। ১ রাজত ধরণের ওজন ৩২ কৃষ্ণল বা রতি। এক টাকার ওজন ৯৬ রতি। ইহার বার আনা অংশ রজত ধরিলে এক টাকায় ৭২ রতি রজত আছে। এই হিসাবে ১ রাজত ধরণ (যাহাতে ৩২ রতি রজত আছে)—প্রায় সাত আনা। ১ রাজত পল ১ ধরণের দশমাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন পয়সা। সুতরাং ঐ সুদূর প্রাচীন কালে তিন পয়সায় একটী গরু পাওয়া যাইত; যে সে গরু নয়, গরুটীর পীতবর্ণের বৎস থাকিত এবং ইহা প্রস্থদুগ্ধা অর্থাৎ প্রচুর দুগ্ধশালিনী হইত। ছাগলের মূল্য দেড় পয়সা এবং মেষীর মূল্য এক পয়সা অপেক্ষাও কম। দৃঢ় যুদ্ধশীল মেষের মূল্য তিন পয়সা। গরুর মূল্য সাত আনা পর্য্যন্ত হইতে পারিত। এর চেয়ে চড়া দাম নাই। একটী মেষ বা মেষীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য তিন পয়সা পর্য্যন্ত হইতে পারিত। মহিষীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য ‌॥৵১০ এবং মহিষের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ।/৫ হইতে ।৵০। একটী অষ্টতাল অর্থাৎ চারি হস্ত পরিমিত উচ্চ বৃষের মূল্য ছিল ২॥৵০; একটী উটের দাম ।/৫ হইতে ।৵০ ছিল, ইহা ৪৵ পর্য্যন্ত হইতে পারিত। অশ্ব ও হস্তীর মূল্য অতিশয় অধিক ছিল, ইহা দুই, তিন বা চারি হাজার রাজত পল বা তদপেক্ষাও অধিক হইতে পারিত। পূর্ব্বকালে বিচারার্থ আগত বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে যে পক্ষ পরাজিত হইত তাহাকে সাধারণতঃ বিপক্ষের দাবী পূরণ করিতে হইত এবং রাজ্যকে সমপরিমাণ দণ্ড দিতে হইত। এই নীতিটী অবলম্বন করিয়া আমরা কোন কোন বিষয়ের মূল্য নিরূপণ করিতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্যে এইরূপ বিধান আছে যদি পশুপালক বাগাল স্বীয় অনবধানতাবশতঃ কোন পশুর মৃত্যুর কারণ হয় তাহা হইলে সে পশুস্বামীর নিকট সদৃশ একটী পশু প্রত্যর্পণ করিবার জন্য দায়ী হইবে এবং রাজার নিকট ।৵১০ দণ্ডভাগী হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত নীতিটী খাটাইয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে গরু জাতীয় পশুর সাধারণ মূল্য ছিল ।৵১০। শুক্রনীতিতে আমরা দেখিয়াছি গরুর মূল্য সাত আনা পর্য্যন্ত হইতে পারিত। অতএব এই দ্বিতীয় উপায়ে আমরা শুক্রনীতি কথিত মূল্যের অনুরূপ মূল্যই পাইতেছি। তৃতীয় আর একটী পন্থা আছে, তাহার উল্লেখ পরে করিব।

ধান বা চালের কোন মূল্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘুরাইয়া নাক দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোন গরু কোন ক্ষেত্রস্বামীর শস্য ভক্ষণ করিয়া ঐ ক্ষেত্র মধ্যে শায়িত থাকিলে গরুর অধিকারী রাজাকে ৮ মাষ দণ্ড দিতে এবং ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইত। গরু কর্ত্তৃক যে পরিমাণ ভূমির শস্য ভক্ষিত হইত সেই পরিমাণ ভূমিতে যে ধান জন্মিতে পারিত সেই পরিমাণ ধান ক্ষতিরূপে ধার্য্য হইত। শস্য ভক্ষণ করিয়া গরুটীর সেই ক্ষেত্রমধ্যে শায়িত থাকার ব্যাপার হইতে এই তথ্যটী প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, উপরিউক্ত দণ্ড কেবল সেই স্থলে ব্যবস্থিত হইত যে স্থলে গরুটী উদর পূরণ করিয়া শস্য ভক্ষণ করতঃ স্থানান্তরে গমন করিতে অক্ষম হইয়া ক্ষেত্র মধ্যেই শয়ান থাকিত। এইভাবে চলৎশক্তিহীন হইবার মত শস্য ভক্ষণ করিতে হইলে একটী গরু এক বিঘা জমির দশমাংশের ধানগাছ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলে বলিয়া মনে করিতে

পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জমি উর্ব্বরা ছিল ; উর্ব্বরা জমিতে এক বিঘায় সাধারণতঃ কুড়ি মণ ধান ফলে। অতএব ঐরূপ একটী গরু দুই মণ ধানের ক্ষতি করিতে পারে। রাজা দণ্ডরূপে যাহা পাইতেন তাহা ক্ষেত্র-স্বামীর মূল্যের তুল্য পরিমাণ। অতএব রাজা যে ৮ মাষ দণ্ডরূপে পাইতেন তাহা ২ মণ ধানের মূল্যের সমান। ২০ মাষে এক পণ বা এক আনা হয়। অতএব এক আনায় পাঁচ মণ বা এক টাকায় ৮০ মণ ধান পাওয়া যাইত। অতএব মোটামুটি বলিতে পারি যে একটাকায় ৪০।৫০ চাল মিলিত। সায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলায় একটাকায় ৮মণ চাল মিলিত। সেদিন পর্য্যন্ত টাকায় দুই মণ চাল মিলিয়াছে। কাজেই দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে টাকায় ৪০মণ চাল বিক্রীত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। বরং জমি প্রাপ্তির সুলভতা এবং ভূমির নবীন উর্ব্বরতা শক্তির কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সুলভ মূল্যে চাল মিলিতে পারিত।

তখনকার দিনে মানুষ, পশু প্রভৃতির আহার খরচ কিরূপ হইত তাহাও নিরূপণ করা সম্ভব। মনুসংহিতায় ৮ম অধ্যায়ের ৩৯২ শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যে মঙ্গলকার্য্যে বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, সে স্থলে যদি গৃহস্থ প্রতিবেশী স্বগৃহ-নিকটবর্ত্তী অথবা তদনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তবে ঐ অপরাধে উহাকে এক মাষ দণ্ড করাইবেন।" অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই দণ্ড বিহিত ছিল। অতএব একজন ব্রাহ্মণের ভোজ্য এবং দক্ষিণা বাবদ এক মাষ ধার্য্য ছিল। ভোজ্য এবং দক্ষিণা সমমূল্য ধরিলে একজন ব্রাহ্মণের ভোজনের মূল্য হয় অর্দ্ধ মাষ। মনু-সংহিতার গণনানুসারে ১৬ মাষে এক পণ বা এক আনা হয়। সুতরাং অর্দ্ধ মাষ এক পয়সার অষ্টমাংশ। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে বিশিষ্টরূপ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভোজন-ব্যয় আরও কম ছিল। আমরা তাহা পরে দেখিব। কোন দ্রব্য হারাইয়া গেল সেই নষ্ট দ্রব্য যে কেহ পাইত সে তাহা রাজার নিকট জিম্মা দিত। রাজা দ্রব্যস্বামীর অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘোষণা দিয়া দ্রব্যটী রাজসরকারে রাখিয়া দিতেন। এক বৎসরের মধ্যে দ্রব্যস্বামী ঐ দ্রব্যের দাবী করিলে রাজা তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন এবং তাহার নিকট হইতে দ্রব্যটীর রক্ষাবিধানের নিমিত্ত স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিতেন। এক বৎসরের মধ্যে দাবী উপস্থিত না করিলে দ্রব্যটী রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৭ শ্লোকে কোন্ পশু রক্ষা বাবদ্ কত শুল্ক রাজার প্রাপ্য ছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ঘোড়ার নিমিত্ত চারি পণ বা চারি আনা ; মানুষের নিমিত্ত পাঁচ আনা ; মহিষ, উষ্ট্র এবং গরুর নিমিত্ত দুই আনা এবং ছাগলের নিমিত্ত এক পয়সা আদায় করা হইত। অর্থাৎ এক বৎসর রক্ষা করার জন্য ঐ ঐ প্রাণীর ইহার অধিক ব্যয় হইত না। আহার্য্য খরচ, পালন খরচ এবং রাজার লভ্য এই তিনে মিলে ঐরূপ দাবী হইত। অতএব আমরা আহার বাবদ উপরিউক্ত হারের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ গণনায় এক বৎসরে একটী ঘোড়ার দুই আনা, মানুষের দশ পয়সা, মহিষ, উষ্ট্র এবং গরুর এক আনা এবং ছাগলের অর্দ্ধ পয়সা—আহার খরচ পড়িত। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, একটী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ভোজনের খরচ ছিল এক পয়সার অষ্টমাংশ অর্থাৎ এই ব্যয়ে দুই বেলা আহার করিয়া এক বৎসরে ১।৶০ খরচ হইত। কিন্তু এখানে আমরা পাইতেছি—একটী মানুষের সাংবৎসরিক ভোজন ব্যয় দশ পয়সা। প্রমাণ লোকের এ খরচ নয় ; বালকেরাই হারাইয়া যাইত, অতএব ঐ হার বালকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। একটী প্রমাণ লোক একটী বালকের দুই গুণের কিঞ্চিৎ অধিক ভোজন করিতে পারে মনে করা যাইতে পারে। অতএব প্রমাণ লোকের সাংবৎসরিক ভোজন ব্যয় ছয় আনা বা মাসিক দুই পয়সা। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় ষোড়শোপচারে হইয়া থাকে, সুতরাং সাধারণ ভোজন ব্যয় অপেক্ষা উহা চারিগুণ হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন পশুর মূল্য নিরূপণ করিবার তৃতীয় এক পন্থা আছে—এইরূপ মন্তব্য পূর্ব্বে এক স্থানে করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। মনু হারান জিনিষ রক্ষা করার জন্য রাজার প্রাপ্য দ্রব্য-মূল্যের ১/৬ অংশ বলিয়াছেন। পশু-রক্ষার জন্য রাজাকে কিছু ব্যয় করিতে হয় ; অতএব পশুরক্ষা করিলে রাজা নিজের ব্যয় পোষাইয়া লইবার জন্য ১/৬ অংশ অপেক্ষা অধিক দাবী করিবেন ইহা স্বাভাবিক। অতএব পশুরক্ষায় রাজার প্রাপ্য ১/৪ অংশ ধরা যাউক। যাজ্ঞবল্ক্য যাহার পরিমাণ দিয়াছেন, তাহার সহিত এই নীতি মিলাইয়া আমরা নিম্নলিখিত মূল্য পাই—ঘোড়ার মূল্য এক টাকা ; মহিষ, উষ্ট্র, গরু প্রভৃতির মূল্য আট আনা এবং ছাগলের মূল্য এক আনা। পূর্ব্বে স্থিরীকৃত মূল্য ইহারই অনুরূপ। তিন উপায়ে একই মূল্য পাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্তের প্রমাদশূন্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। নারদ-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সকল দ্রব্যের মূল্য এক মাষ অপেক্ষা কম সেই সকল দ্রব্য অপহৃত হইলে মূল্যের পাঁচগুণ দণ্ড চোরের নিকট হইতে আদায় করা হইত। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি অপহৃত হইলে মূল্যের পাঁচগুণ দণ্ড হইত ;—কাষ্ঠভাণ্ড, তৃণ, মৃন্ময়দ্রব্য, চর্ম্ম, চর্ম্মনির্ম্মিত থলি, মধু, অস্থি, শাক, আদা, ফল, মূল, দুগ্ধপ্রস্তুতদ্রব্য, ইক্ষুরসাবকার, লবণ, তৈল, পক্কান্ন, কৃতান্ন, মৎস্য এবং আমিষ। মনুসংহিতায় ৩২৮-৩২৯ শ্লোকে বর্ণিত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও ঐ এক শ্রেণীভুক্ত, যথা, উর্ণাদিসূত্র, কার্পাসসূত্র, কিণ্ব, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র, তৃণ, চর্ম্ম প্রভৃতি, মৃন্ময় দ্রব্য, মৎস্য, পক্ষী তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু, মদ্য, মোদক এবং পক্কান্ন। অতএব ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য এক মাষ অপেক্ষা ন্যূন ছিল। কিন্তু পক্ষী, মৃন্ময়ভাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য ব্যতিরেকে সকল দ্রব্যই পরিমেয়, সুতরাং উহাদের কত পরিমাণের মূল্য এক মাষ ইহা না জানিলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। দ্রব্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে উহারা গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ। চোরে চুরি করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া এক জাতীয় দ্রব্য যাহা লইয়া যাইতে পারিত তাহা সাধারণতঃ এক মাষ অপেক্ষা অল্প মূল্য হইত, এই আবিষ্কৃত সত্যটীর উপর নির্ভর করিয়া উপরিউক্ত দণ্ডের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ এক গৃহস্থের এককালীন সংগৃহীত এক এক জাতীয় আহার্য্য দ্রব্য সাধারণতঃ এক মাষ মূল্যের অধিক হইত

না। কথাটা আরও পরিষ্কার করা যাউক। মনে করা যাক, কোন চোর কোন গৃহস্থের গৃহে চুরি করিতে প্রবেশ করিয়াছে। সে দেখিল একটী পাত্রে গৃহস্থিত পরিজনবর্গের আহারার্থ পাক করা অন্ন রহিয়াছে; সে ঐ প্রস্তুত সমস্ত অন্ন লইয়া প্রস্থান করিল। একটী গৃহস্থ পরিবারে ৮।১০ জন সভ্য থাকে। অতএব ৮।১০ জনের জন্য প্রস্তুত একবেলার পক্বান্নের মূল্য এক মাষ অপেক্ষা কম! আমরা পূর্ব্বেই অন্নের যে মূল্য স্থির করিয়াছি তাহার সহিত এই অনুমানের সাদৃশ্য আছে। আমরা দেখিয়াছি একজনের আহারের ব্যয় মাসিক দুই পয়সা ছিল। ১৬ মাষে এক আনা হয়; অর্থাৎ এক মাষ এক ছিদাম বা ৫ কড়ার সমান। অতএব একজনের একদিনের আহার খরচ ছিল $\frac{৪}{৩}$ কড়া। হিন্দু স্মৃতিগুলিতে দেখা যায় যে পূর্ব্বে কেবল দুইবার আহার করা রীতি ছিল। অতএব একজনের দুইবেলার আহার খরচ $\frac{৪}{৩}$ কড়া। এই হিসাবে প্রায় ৮ জনের একবেলার খরচ এক মাষ। আহারের জন্য পক্বান্নের সহিত অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি থাকিত। অতএব ৮ জনের এক বেলার পক্বান্নের খরচ এক মাষ অপেক্ষাও কম ছিল। আমরা দুই বিভিন্ন পথে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ৮।১০ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটী পরিবারে তৈল, ঘৃত, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের দরুণ এককালীন ব্যয় এক মাষ অপেক্ষা কম ছিল। এই তথ্যটার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য আমরা নিরূপণ করিতে পারি। একটী ঐরূপ পরিবারের দৈনিক তৈল খরচ অর্দ্ধ পোয়া ধরা যাইতে পারে। অতএব অর্দ্ধপোয়া তৈলের মূল্য ১ মাষ পর্য্যন্ত হইতে পারিত। অর্থাৎ এক সের তৈলের দাম দুই পয়সা। এইরূপ হিসাবে এক সের ঘৃতের মূল্য এক আনা, মাংস পয়সায় ১০ সের, মৎস্য পয়সায় ৫।৬ সের, গুড় পয়সায় এক সের এবং দুধ পয়সায় ৬।৫ সের। ৮।১০ জনের প্রয়োজনীয় মদ্য, মোদক প্রভৃতির মূল্যও এক মাষ ইত্যাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যের ২য় অধ্যায়ের ২৪১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কোন রজক যদি কাহারও বস্ত্র হারাইয়া ফেলে বা কাহাকেও বিক্রয় করে তাহা হইলে ঐ রজকের দশ পণ অর্থাৎ দশ আনা দণ্ড হইবে। এখানে বস্ত্রস্বামীর ক্ষতিপূরণের কথা পৃথকভাবে উল্লিখিত না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে রাজার প্রাপ্য ও বস্ত্রস্বামীর প্রাপ্য উভয় জড়াইয়া দশ আনা দণ্ড বিহিত ছিল। উভয়ের প্রাপ্য তুল্যাংশ ছিল। অতএব বস্ত্রস্বামী বস্ত্রের মূল্য স্বরূপ পাঁচ আনার অধিকারী হইত। অর্থাৎ একটী বস্ত্রের মূল্য পাঁচ আনা ছিল। অন্যান্য বস্তুর সহিত তুলনায় প্রাচীন কালে বস্ত্রের মূল্য অধিক ছিল বলিতে হইবে। এখনকার কালে পাঁচ আনা অতি সামান্য জিনিষ; কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বর্ত্তমান যুগে বহুবিধ যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হওয়ায় বস্ত্র বয়ন কার্য্য অতি সুসাধ্য ও সহজ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এক একখানি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইত, তাহাতে বস্ত্র সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই নিমিত্ত প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বস্ত্র-প্রাপ্তি একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। ইংরাজের ব্যবসায় ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাপড় ইটালি প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে সোণার ওজনে বিক্রীত হইত। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বস্ত্র কিরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে প্রত্যেক গৃহস্থই তখন নিজ নিজ সংসারের আবশ্যক অনুযায়ী বস্ত্র তৈয়ার করিয়া লইত; এই জন্য ব্যয়াধিক্য কোন প্রকারে পীড়াদায়ক হইত না। বাড়ী-নির্ম্মাণ-ব্যয় অতি সুলভ ছিল। কেহ কোন গৃহ কুটীর বল পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিলে, যাজ্ঞবল্ক্য ভগ্নকারীর ৩৫ পণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ৩৫ পণের অর্দ্ধেক রাজার প্রাপ্য এবং বাকী অর্দ্ধেক গৃহের মূল্য স্বরূপ গৃহস্বামীর প্রাপ্য। সুতরাং একটী গৃহকুটীরের নির্ম্মাণ-ব্যয় সাড়ে সতর আনা বা প্রায় এক টাকা। নদী পারাপার হওয়া তখনকার দিনে একটী বিশেষ আয়াসসাধ্য কার্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য ফেরি চার্জ্জ সমসাময়িক অন্য বস্তুর তুলনায় অধিক ছিল। মনুসংহিতায় নদী পার হইবার শুল্কের হার নিম্নলিখিতানুরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একখানি খালি গাড়ী পার করিতে হইলে এক পণ বা এক আনা শুল্ক দিতে হইত। এক পুরুষের বহন-যোগ্য ভার পার করিবার নিমিত্ত দুই পয়সা শুল্ক লাগিত; পশু এবং স্ত্রীলোক পার করিতে হইলে এক পয়সা লাগিত এবং ভারশূন্য পুরুষ পার করিতে অর্দ্ধ পয়সা লাগিত। দরিদ্র লোক পার করিতে হইলে যৎ-সামান্য শুল্ক লইয়া পার করা হইত। গর্ভিণী স্ত্রী, যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণাদির পারাপারে কোন শুল্ক লাগিত না। সাধারণতঃ কৃষি-জাত, বন্য ও খাদ্য-দ্রব্য যেরূপ সুলভ ছিল, শিল্প-দ্রব্য সেরূপ ছিল না। কলকারখানার অনাবিষ্কার যেরূপ ইহার একটী কারণ, সেইরূপ অন্য একটী কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজকালকার যুগে কারিগর, শিল্পী, কুলী মজুর প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রমকারিগণকে অতি অল্প পারিশ্রমিক দিয়া ক্যাপিট্যালিষ্টরা (Capitalists) অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে এইরূপ Capitalist systemএর প্রচলন ছিল না, অধিক লাভের সম্ভাবনায় আর্টিজ্যান (artisan) ও লেবার (labour)কে ধনপতির নিকট বলি দেওয়া হইত না। শিল্পী, কারিগর কুলীমজুর, চাকুরে, ভৃত্য প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত বেতন, ভাতা ও পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। তাহারা পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহাতে প্রচুর পারিশ্রমিক পাইয়া স্ব স্ব পরিজনবর্গ লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও সচ্ছলভাবে দিন যাপন করিতে পারে, তাহা রাজা ও সমাজ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য পরিশ্রম-জাত বা শিল্পদ্রব্য আপেক্ষিক অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

তখনকার জীবনযাত্রার সুলভতা সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শুক্রনীতি নিম্নলিখিতরূপ সৈন্যবাহিনীর জন্য মাসিক ৪৪০০ কর্ষ খরচ নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ১০০ অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্য, ৩০০ বন্দুকধারী পদাতিক, ৮০ জন অশ্বারোহী, ১ জন রথী, ২ জন বৃহৎ কামানচালনাকারী গোলন্দাজ, ১০ জন উষ্ট্রারোহী সৈন্য, ২ জন গজারোহী, ২ জন শকট চালক এবং ১৬ জন বৃষচালক। এই সকল উপাদান লইয়া গঠিত একটী সৈন্যবাহিনীর মাসিক খরচ ৪৪০০ কর্ষ। কর্ষ আর পণ একই জিনিষ। কিন্তু শুক্রনীতি ধৃত পণের মূল্য ৮০ কড়া

নহে, উহা ১৫০ কড়া অর্থাৎ সাড়ে সাত পয়সা। অতএব ৪৪০০ কর্ষ প্রায় ৫১৬৲ টাকার সমান। প্রায় ৫০০ জন সৈন্য এবং উপরিউক্ত সংখ্যক অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহন সমন্বিত বাহিনীর মাসিক ব্যয় ছিল ৫১৬৲ টাকা। ঘোড়া, উট প্রভৃতির আহার খরচ কিরূপ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেই হারে উপরিউক্ত সংখ্যক ঘোড়া, উট প্রভৃতির মাসিক ব্যয় ১৬৲ টাকার অনেক কম পড়িত। তাহা হইলেও তাহাদের জন্য ১৬৲ টাকা পৃথক্ রাখিলে প্রত্যেক সৈন্যের মাথাপিছু এক টাকা পড়ে। অর্থাৎ সৈনিকদের মাসিক বেতন এক টাকা ছিল। এক টাকায় একজন সৈনিকের এক মাসের সংসার-খরচ চলিত। এক এক সংসারে ৮।১০ জন করিয়া পরিজন বা সভ্য থাকিত মনে করা যাইতে পারে। এক টাকায় সকলের ভরণ পোষণ হইত! যেখানে কেবল ভোজনের জন্য মাথা-পিছু মাসে দুই পয়সা পড়ে, সেখানে এক টাকায় ৮।১০ জন লইয়া গঠিত একটী সংসার হেসেখেলে চলিত। আজিকার দিনে ইহা তাজ্জব বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু এক সময়ে ইহা বাস্তব ছিল। তাহা বলিয়া দুর্ভিক্ষ বা দারিদ্র্য ছিল না এরূপ নহে। দুগ্ধাভাবে অশ্বত্থামার ওদনোদক সেবন এবং বিশ্বামিত্রের চণ্ডাল-গৃহে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে একেবারে দুর্লভ না হইলেও দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য অতি বিরল এবং স্বল্পব্যাপক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৫১ শ্লোক এ বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। শ্লোকটীর অর্থ এই "যদি মাসে মাসে ধনের সুদ লওয়া না হয়, তবে সুদেমূলে দ্বিগুণ হইয়া উঠিলে, ঐ দ্বিগুণই পাইবে, উহার অধিক পাইবে না। ধান্য, ক্ষেত্রফল এবং উর্ণাদিলোম ও বলীবর্দ্দাদিতে সুদেমূলে পাঁচ গুণ পর্য্যন্ত লওয়া যাইতে পারিবে, উহার অধিক নয়।" মনে হইতে পারে এই শ্লোকের সহিত আমাদের বক্তব্যের সম্পর্ক কোথায়! কিন্তু বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত দেখিলে ইহাই আমাদিগকে অভিজ্ঞ কর্ণধারের ন্যায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া যাউক। ধরা যাউক ৪০০ মণ ধানের দাম ৫৲ টাকা (প্রাচীন হারে)। ৫৲ টাকা সুদে প্রয়োগ করিলে সুদে আসলে ১০৲ টাকার অধিক গ্রহণ করিতে পারা যাইত না। কিন্তু ৪০০ মণ ধান বৃদ্ধিসহ ২০০০ মণ হইতে পারিত এবং উপরিউক্ত হার অনুসারে এই ২০০০ মণ ধানের দাম ২৫৲ টাকা। এরূপ বৈষম্যের কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দেশে শস্য প্রচুর জন্মিত; কোন গৃহস্থ ঋণগ্রস্ত হইলে তাহার ক্ষেত্রজাত শস্য ঋণের সুদ পরিশোধ কল্পে প্রদান করিতে ক্লেশ অনুভব করিত না। কিন্তু শস্যের পরিবর্ত্তে অর্থ প্রদান করা সহজসাধ্য ছিল না। শস্য বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করিবার পন্থা সুগম ছিল না। শস্য ক্রয় করিবে কে? সকলেরই গৃহে শস্য প্রচুর থাকিত, কাহারও অভাব ছিল না। যে দ্রব্য প্রয়োজনীয় নহে তাহার বিক্রয় সহজসাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং অর্থমূলক বৃদ্ধি অপেক্ষা শস্যমূলক বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে ধার্য্য হইবার কারণ হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে কাহারও শস্যের অপ্রতুলতা ছিল না। দেশের বাহিরে চালান যাইলে কি হইত সে বিষয়ে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। মনু হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটীকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে উদরপূর্ত্তির অভাবে ভারতবাসিগণকে হাহাকার করিতে হইত না। বিদেশে চালান দিয়া দুই একজনের বিলাসিতার প্রশ্রয় ইহা হইতে হইবার সুবিধা ছিল না হয়ত; কিন্তু দেশের শস্য দেশে থাকিয়া সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রত্যেক গৃহস্থের অন্নাভাব দূর করিত। কবির ভাষায় ভারত জননীকে তখন প্রকৃতই বলা যাইতে পারিত—

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

ব্রহ্ম দর্শন

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ

নিগূঢ় ধর্ম্ম জানা সাধন-সাপেক্ষ। সদ্গুরুর উপদেশে সাধনমার্গে উন্নতিশীল সাধক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মাত্রেই একমাত্র যোগ ও যোগের চরম অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন।

স্বয়ং ব্যাসদেব বলিয়াছেন:—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতঃ।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত, অথচ আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি। তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত। আমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত এবং স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা সঙ্কীর্ণভাব কল্পনা দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। তোমায় হস্তপদাদি বিশিষ্ট সামান্য মানুষরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি—ইত্যাদি এই মহাদোষ ক্ষমা করুন। ঈশ্বরের রূপ হইলেই তিনি সাকার হইয়া পড়েন। সাকার হইলেই সীমাবিশিষ্ট হইলেন। অতএব ব্রহ্মকে অনির্ব্বচনীয়তা হইতে এবং জ্ঞানস্বরূপ হইতে দূরীকৃত করা হইল। সাকার না হইলে রূপ হইতে পারে না। ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বর রূপবিহীন। তিনি অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্য অদাহ্য অদৃশ্য অবধ্য নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থিরভাব এবং অনাদি আত্মাশক্তি। জগতের কোন দার্শনিকই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই।

ঈশ্বরবাদঃ—বেদমতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান অবাঙ্মনসোগোচর। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ। ইন্দ্রিয়াতীত চিন্তার, জ্ঞানের, ধারণার অতীত। ঈশ্বরকে রুচি অনুযায়ী ভক্তেরা, সাধকেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আরাধনা

করে থাকেন এবং করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের রূপ নাই। উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও গীতায় ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর অস্তিনাস্তির অতীত। ঈশ্বরের গুণ নাই (ব্রহ্মজাল সূত্তে শাশ্বতবাদ)। ঈশ্বরকে জানি বা জানি না বলা যায় না (যাজ্ঞবল্ক্য)। ঈশ্বর নির্গুণ।

ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াদি বিহীন:—ঈশ্বর গুণাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ত্রিগুণাতীত কালাতীত। বেদান্তদর্শনে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি শূন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি-সামর্থ্য আছে বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। (মণ্ডক—২।২।৮। ব্রহ্মসূত্র—৩।২।২০। ভাগবৎ—৭।১।৪৮। বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য—২।১।১৪-১৫। কঠোপনিষদ—২।১২। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথারই উক্তি করিয়াছেন।

নিরাশ্বরবাদ:—চার্ব্বাক="যাবজ্জীবং সুখং তিষ্ঠেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইত্যাদি অদ্ভুত নীতির প্রচারক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলেন যে "অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথানিলঃ কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎস্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ যে যে পদার্থের স্বাভাবিক যে যে দ্রব্যগুণ আছে তদ্বশতঃ দ্রব্য সংযুক্ত হইয়া যাবতীয় পদার্থ ও ভূত রচিত হয়। জগতের কর্ত্তা কেহ নাই এবং হইতে পারে না।

মহর্ষি কণাদ:—মহর্ষি কণাদ পরমাণু তত্ত্ববাদ প্রচারক। তিনি তাহার মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডের কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই।

মহর্ষি কপিলমুনি:—কপিলমুনি সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনাদিকাল হইতে আপনা-আপনি হইয়াছে এবং এইরূপভাবেই চলিয়া আসিতেছে ও থাকিবে।

মহর্ষি জৈমিনী—তাঁহার মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। তিনি বেদ মানিতেন। ঈশ্বর যে আছেন তাহা কুত্রাপি বলেন নাই। সেইজন্য জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য ইহাঁকে নাস্তিক দার্শনিক উক্তি করিয়াছেন।

ফিউয়ারবেক্:—ফিউয়ারবেক্ বলেন যে ঈশ্বর নাই। ইহা সূর্য্যের মত সুস্পষ্ট এবং দিবালোকের মত পরিস্ফুট। ঈশ্বর তো নাই পরন্তু ঈশ্বর হইতে বা থাকিতে পারেন না। এ জগৎ আপনা হইতে উৎপন্ন।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ নাই। তবে একটা কার্য্যকরী শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে! তা বলে ঈশ্বর যে আছেন তা বলা যায় না। প্রমাণের অভাব। এ তো বিষম কথা!!

হারবার্ট স্পেন্সার বলেন যে জীবের মত ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই। ঈশ্বরের যখন ইচ্ছাই নাই তখন তাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। জগতের কারণ অজ্ঞাত। প্রকৃতি অনাদি অনন্ত। যাবতীয় পদার্থ অণু পরমাণুর সংযোগ বিয়োগে হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টির কারণ।

কর্ম্মসংন্যাস্ যোগ

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

ব্রহ্ম জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু জীবের স্বভাবই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৪ শ্লোক, ৫ম অঃ গীতা। ঈশ্বর কাহারও পাপভার এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না; কারণ তাঁহাতে কোন গুণ নাই। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় জীবগণ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকে। (১৫ শ্লোক, ৫ম অঃ গীতা)। এবং বলে থাকে তিনি যা করান তাই করি। কি অত্যাচারের কথা।

জন্মান্তরবাদ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন। (২২ শ্লোক, ২য় অঃ গীতা।) আত্মা অমর।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥
(১৪।১৫ শ্লোক, ১৪শ অঃ গীতা।)

যদি সত্ত্বগুণ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইলে জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তবে সে ব্রহ্মবিদগণের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়। রজোগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত ব্যক্তি মনুষ্য লোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধির সময়ে মৃতব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ঈড়ায় যখন বায়ু চলে তখন এইরূপ অবস্থা হয়। ঈড়া পিঙ্গলাতে যখন বায়ু চলে তখন বিষয় চিন্তা থাকে সুতরাং তখন ব্রহ্মধ্যানে দেহত্যাগ হয় না। যখন সুষুম্নামার্গে বায়ু চলে তখন মরিলে ব্রহ্মচিন্তায় দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুকালে যেমন চিন্তা বা ভাবের উদয় হয় গতিও তেমনি হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময়ে যেমন যেমন ভাব মনে পড়ে মৃত্যুর পর তদনুরূপ দেহ প্রাপ্তি হয়। ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্লোক, ৮ম অঃ গীতা। তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেই বলিতে পারে যে, মৃত্যুকালীন ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মরিব তাহা হইলে পরম গতি হইবে। "মৃত্যুকালীন ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মরিব" ইহা এত সহজ নয়। ইহা কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। তবে মৃত্যুকালীন ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মনুষ্য মরিতে পারে।

কার্য্য-কারণ ফল

কর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি বিনষ্ট করিবার শক্তি কাহারও নাই,—যতক্ষণ অগ্নি থাকিবে ততক্ষণ উহার দাহিকা শক্তি থাকিবে—সেইরূপ কর্ম্মের গতি ও ফলকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। উপস্থিত কর্ম্মের ফল পরমুহূর্ত্তে প্রসব করিতে পারে। অগ্নিতে আঙুল দিলে যেমন তাহার ফলে আঙুল দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মের ফল

পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে প্রসব করিবে। এই কর্ম্মফল আবহমান কাল চলিতেছে।

এই কর্ম্মপ্রবাহ দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালিত হইতেছি। আমাদের শুভ অশুভের, সুখ-দুঃখের কর্ত্তা আমরাই। কেন না, আমাদের শুভ-অশুভ, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, পাপ-পুণ্য আমাদের কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই প্রবাহ কর্ম্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎকারণ নিবন্ধন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অথবা কর্ম্ম-ফলদাতার সম্বন্ধে কোন কথা বা প্রশ্ন আসিতে পারে না। আমি যদি অসৎ কর্ম্ম না করি তবে আমার ভয় পাইবার বা শাসিত হইবার শঙ্কা নাই। যদি কর্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন তবে তিনি কর্ম্মের দ্বারাই কার্য্য করিতে বাধ্য। তিনি পাপ এবং পুণ্যের বিচার করিয়া তার অসৎ এবং সৎ ফল জীবকে দেন না। জীব নিজেই তার কর্ম্মফল ভোগ করেন। কর্ম্মই মোক্ষদাতা। কর্ম্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। "উৎপত্তি সর্ব্ব জন্তুনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।" কর্ম্মবশেই জীব জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্ম্মবশেই জীব লয় পায়, এবং কর্ম্মবশেই জীব সুখদুঃখ পাপ-পুণ্য ভয় অভয় মঙ্গল অমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য স্বভাবেরই অধীন এবং স্বভাবেরই আজ্ঞাধীন। জীব কর্ম্মবশেই উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়া থাকে। এবং কর্ম্মবশেই দেহত্যাগ করে। কর্ম্মবশেই শত্রুমিত্র ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক ত্যাগী উদাসীন যোগী ঋষি হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর (শ্রীভাগবৎ ১০ম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়)। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত। ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। (১৫ শ্লোক, ৩য় অঃ গীতা) সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রাপ্য এবং অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তথাপি তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। (২২ শ্লোক ৩য় অঃ গীতা) ঈশ্বর সকল কর্ম্মের মধ্যে আছেন এবং সকল কর্ম্মই তাঁহার মধ্যে আছে; অথচ তিনি নির্লিপ্ত। নিষ্কাম কর্ম্ম জীবকে মোক্ষপদ দিয়া থাকে।

ঈশ্বর নির্ব্বিকার নিরাকার।

ঈশ্বর=ওঁ-তৎ-সৎ। ওঁ=সূক্ষ্মদেহ। তৎ=কূটস্থ চৈতন্য। সৎ=ব্রহ্ম। আত্মক্রিয়া ব্যতীত "ওঁতৎসৎ" মুখে উচ্চারণ করিলে কোন ফল-লাভ হয় না।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ গীতা

অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি। চরাচর ভূত সমুদায় আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমি নির্লিপ্ত। আমাকে কোন গুণ স্পর্শ করিতে পারে না। ভূত সকল ঈশ্বরে আছে; কেন না, ঈশ্বর (অব্যক্ত মূর্ত্তি স্থিরভাব) প্রাণরূপে ভূতে না থাকিলে কিছুই থাকিত না। কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্গুণ বলিয়া সকল ভূতে থাকিয়াও তিনি কোন ভূতে নাই (২৯ শ শ্লোক, ৯ম অঃ গীতা)। ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও আমাতে নাই। আমি জানি যে সূত্রে মালার ন্যায় তাহারা আমাতে গাঁথা আছে; কিন্তু সেই প্রাণরূপ সূত্রে তাহাদের লক্ষ্য না থাকায় তাহারা জানে না যে সমস্তই আমাতে গাঁথা আছে। আমি নির্ব্বিকার নির্গুণ—বায়ু যেমন আকাশে থাকিয়াও আকাশের সহিত মিশে না তেমনি ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও চঞ্চল ভাব হেতু আমাতে মিশে না; অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। সদ্গুরূপদিষ্ট সাধনা দ্বারা প্রাণ ও মনের চঞ্চলতা দূর করিয়া স্থিরত্ব লাভ করিতে পারিলে তবে নির্গুণ ব্রহ্মরহস্য বুঝা যায়। যিনি বলিতে পারেন যে "আমি ব্রহ্মকে জানি বলিতে পারি না এবং আমি ব্রহ্মকে জানি না তাহাও বলিতে পারি না" তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, ত্রিগুণাতীত, কালাতীত। ব্রহ্মজ্ঞগণই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

ব্রহ্মজ্ঞান।

সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ গীতা

সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মার শরণাগত হইতে হইবে। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতি দ্বারা মনকে সংযত ও স্থিরীকৃত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করতঃ অসৎকর্ম্ম পাপ প্রলোভন হিংসা দ্বেষ মায়া মোহ কাম ক্রোধ অহং দর্প প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন তীব্র ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য আপনা আপনিই মনের নিভৃত স্থানে আসিবে এবং তৎসঙ্গে প্রাণ ও মনের চঞ্চলতা অন্তর্হিত হইয়া স্থিরভাব হইবে। এইরূপে নির্ম্মল শান্ত যোগিগণই মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হন। তর্কের বা শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় ব্রহ্ম তর্কে বহু দূর। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে তীর্থে যাইতে হয় না বা একাকী অরণ্যে বাস করিতে হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নির্জ্জন স্থান নাই। যেখানেই যাই না কেন সেখানে 'আমি' আছি। এই আমিত্ব না যাইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আত্মক্রিয়া দ্বারা যিনি "ওঁতৎসৎ" (ওঁ=সূক্ষ্ম দেহ, তৎ=কূটস্থ চৈতন্য, সৎ=ব্রহ্ম) জানিয়াছেন তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। আত্মকর্ম্ম ব্যতীত লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এই শরীরেই হলাহল এবং অমৃত দুইই আছে। প্রাণায়ামাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই আদিতে। অন্তর্লক্ষ্যে যে অবস্থায় মন সর্ব্বদা গুণাতীত এবং কামনা শূন্য হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করে, সেই অবস্থা ব্রহ্ম-জ্ঞান। কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথে অন্তরায়। অতএব প্রাণ ও মনের গতি ফিরাইয়া প্রাণ ও মনকে যথাস্থানে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে এই সকল শত্রু জয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্তোত্রমন্ত্রাদি সাধনভজন উপাসনা কীর্ত্তন প্রভৃতিও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথের সহায়ক। তবে স্তোত্রমন্ত্রাদি সাধন ভজন উপাসনা সংকীর্ত্তন প্রভৃতি মুখে উচ্চারণ করিয়া চক্ষে জল ফেলিলে কিছুই হয় না। যখন চক্ষু মন ও প্রাণ জিহ্বা ওষ্ঠ প্রভৃতি সাধনভজন উপাসনা সংকীর্ত্তন সময় স্পন্দিত না হয় তখনই প্রকৃত সাধনভজন উপাসনা সংকীর্ত্তন হয়।

দিনের শেষে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সাধারণ জীবের রুচি আকর্ষণের জন্য ভাল। ধর্ম্মের ভানও ভাল। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত হয়। সে অবস্থায় তাহার প্রাণ স্থির ও অচঞ্চল। কেবলমাত্র প্রাণ সূক্ষ্মভাবে চক্রে চক্রে চলে। না চলিলে মানব মরিয়া যাইত।

(২০।২১।২২ শ্লোক, ৬ষ্ঠ অঃ গীতা)

যবদ্বীপের মহাভারত

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যবদ্বীপ হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন উপনিবেশ। কিন্তু কোন্ যুগে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। হিন্দুদিগের যেমন নিজের কোন ইতিহাস নাই, তেমনি তাহাদিগের যে সকল বংশধর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কোন ইতিহাস নাই। আজ বড়-ভুধরের মন্দির বা কাম্বোডিয়ায় ওঁকার বটের মন্দির কেবল বিদেশী পর্য্যটক বা ঐতিহাসিকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে মাত্র। কবে কোন্ যুগে কাহা কর্ত্তৃক ঐ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাঁহারা ঐ সকল স্থানে গিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখান হইতে কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তথায় হিন্দুশাস্ত্র অধিক নাই। মহাভারত, রামায়ণ বা ঐরূপ দুই চারিখানি পুরাণ, যাহা যবদ্বীপে এখনও পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ভারতবর্ষীয় রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি হইতে এত পৃথক ও বিকৃত যে, সেগুলি বহুকাল পরে কেবল স্মৃতি ও কিম্বদন্তী হইতে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আরও অনুমিত হয় যে, যাহারা ঐ সকল দ্বীপে বসবাস করিত, তাহারা মূল দেশের সহিত কোনরূপ সামাজিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ রাখিত না। কেবল ভারতীয় বণিকগণ মাঝে মাঝে তথায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন। যবদ্বীপে একটী অব্দ প্রচলিত আছে—উহা ৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার কিম্বদন্তী এই যে, ঐ বৎসর জয়বার নামক একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ যবদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মহাপুরুষ হইতে যবদ্বীপের রাজবংশের উৎপত্তি। কিম্বদন্তী এই যে, এই জয়বার মহাভারতোক্ত অর্জ্জুন হইতে পঞ্চম পুরুষ। আর একবার ক্লিঙ্গ (কলিঙ্গ) হইতে কুড়ি হাজার পরিবার যবদ্বীপে গিয়া বসবাস করিবার কথাও তথায় প্রচলিত আছে। ইহারা অনুমান খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আর একটী প্রাচীন উপাখ্যান আছে যে, গুজরাট হইতে দুই সহস্র লোক খৃষ্টীয় পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে তথায় যাইয়া রাজ্য স্থাপন করে। এই সমস্ত কিম্বদন্তী হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, তিনটী বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় জনসমুদ্রের তিনটী স্রোত যবদ্বীপের উপকূলে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, তাঁহারা যে ভারত হইতে শিক্ষায় ও সভ্যতায় একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা এ দেশ হইতে সংস্কৃত ভাষা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। সে দেশের মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণগুলি 'কবি' ভাষায় লিখিত। এই কবি ভাষা যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা। তথাকার বর্ত্তমান অধিবাসিগণ এ ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ লোক এখন যবদ্বীপে আর দেখা যায় না। কদাচিৎ ২।১টী দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। আমাদিগের বেদ, উপনিষদ্ বা কোন দর্শন গ্রন্থও তাঁহারা লইয়া যান নাই। তবে বৌদ্ধ যুগে ঐ সকল দ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তথাকার মহাভারতের তাঁহারা নাম দিয়াছেন 'ব্রাতযুদ্ধ' (ভারত যুদ্ধ ?)। ভারতবর্ষের মহাভারতের ন্যায় ইহা বিশালকায় গ্রন্থ নহে। ইহা মাত্র ৭১৯টী চারি চরণ-বিশিষ্ট শ্লোকে বিরচিত। ১০১৯ খৃঃ অব্দে 'পাসেদা' (ব্যাসদেব ?) নামক একজন কবি ইহার রচনা করেন। তথাকার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাভারতোক্ত ঘটনাগুলি সমস্তই যবদ্বীপে ঘটিয়াছিল এবং যবদ্বীপেই ভারতোক্ত প্রাচীন স্থানগুলি ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ তাঁহারা করেন। এইরূপে হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারাবতী, অযোধ্যা, মথুরা, মৎস্যরাজ্য প্রভৃতি স্থানগুলি যবদ্বীপে কোথায় কোথায় ছিল, তাহা এখনও তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। তথায় তাঁহারা যে সকল নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলিকে তাঁহারা ভারতীয় নামেই অভিহিত করিতেন এবং তাহা হইতেই কালক্রমে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। এইবার আমরা তথাকার মহাভারতের কথা কিছু বলিব।

শান্তনু নামে এক রাজা হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী (গঙ্গা নহে) দেবব্রত নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন শান্তনু, কে দেবব্রতকে প্রতিপালন করিবে, এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলাশর (পরাশর) নামক মৎস্যপতির এক শ্যালক ছিল। তাঁহার পত্নী অম্বরসরীর আবিয়াস্ নামক এক পুত্র ছিল। আবিয়াস্ (ব্যাস) দেবব্রতের ন্যায় নব-প্রসূত। রাজা শান্তনু অম্বরসরীকে দেবব্রতকে স্তন্য দ্বারা প্রতিপালন করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। পুলাশর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তনুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে নারদ আসিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। উভয় রাজায় এই সন্ধি হইল যে, অম্বরসরী শান্তনুর গৃহে যাইয়া দেবব্রতকে প্রতিপালন করিবে, কিন্তু শান্তনুর মৃত্যুর পর পুলাশর হস্তিনার রাজা হইবেন। শান্তনু ইহাতে সম্মত হইলেন। শান্তনুর মৃত্যুর পর পুলাশর হস্তিনার রাজা হইলেন। তাঁহার পুত্র আবিয়াস্ যখন বড় হইলেন, তখন তাঁহাকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়া তিনি বনগমন করিলেন ও তপস্যায় মন দিলেন। "গুনুং চামারা গণ্ড"র (যবদ্বীপের একটী স্থান) সন্ন্যাসী 'বলিস্মা'র বয়স্থা কুমারী অম্বালিকাকে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাস বিবাহ করিলেন। তাঁহার তিন পুত্র হইল। (১) ধ্রেতরাষ্ট্র, ইনি অন্ধ। (২) পাণ্ডু ; যাঁহার মস্তক একদিকে ঝুঁকিয়া থাকিত। (৩) আর্য্য বিদুর ; ইনি খঞ্জ ছিলেন।

পাণ্ডু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন, তখন তাঁহাকে রাজা করিয়া আবিয়াস্ বনগমন করিলেন। তথায় তিনি তপস্যায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। (১) দর্মবংশ, (২) বিম, (৩) অর্জ্জুন ইহারা দেবী কুন্তীর গর্ভে ; আর (৪) নকুল ও (৫) সেদেব, দেবী মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর অকাল-মৃত্যুতে সিংহাসন শূন্য হইল। কারণ, তাঁহার পুত্রেরা সকলে নাবালক ছিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র আবিয়াস্‌কে বুঝাইয়া সম্মত করাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবগণকে অনুর্ব্বর জঙ্গলাবৃত 'অমেও' নামক স্থানে পাঠাইলেন। তাহাদের সঙ্গে এক সহস্র লোক ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সঙ্গে দিলেন। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদয় লোকের সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় চাষবাস করিতে লাগিলেন ও ক্রমে তথায় অন্যান্য লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল ও উক্ত স্থানে একটা রাজ্য গড়িয়া উঠিল। বিরাটরাজ মৎস্যপতি পাণ্ডবগণকে এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সহস্র লোক, যাহারা তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই রসাক্ষদিগের (রাক্ষস) হস্তে প্রাণ দিল। পার্শ্ব ঐ রসাক্ষদিগের রাজা ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র হাস্তনায় রাজ্য করিতে লাগিলেন ; পরে তাঁহার পুত্রদিগকে ঐ রাজ্য অর্পণ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণকে কৌরব নামে অভিহিত করা হইত ও তাহাদের সংখ্যা ছিল ৯৭। দেবী কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। অশ্বত্থামা দ্রোণের পুত্র ও জয়দ্রথ ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা। কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথকে লইয়া কৌরবগণের একশত সংখ্যা পূরণ হয়।

পাণ্ডবগণ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণকে দূত করিয়া কৌরবদিগের নিকট পাঠাইলেন। জয়বার (যুধিষ্ঠির) তিনটী পৃথিবীর নিকট যুদ্ধের জয়ের জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা চারি শ্রেণীর পণ্ডিত সমর্থন করিলেন এবং পর্ব্বতের দেবতা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। চারি শ্রেণীর পণ্ডিত :—(১) দ্বিজবর (সমাজ ও গ্রামের পণ্ডিত) ; (২) ঋষি (যিনি বনে তপস্যা করেন) ; (৩) সেবা (যিনি উপবাসাদি করেন ও সর্ব্বদা প্রহরীর কার্য্য করেন) ; (৪) গুরু (যিনি সৎপরামর্শ ও নীতি-শিক্ষা দেন)।

দেবতা তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া জয়বারকে বর দিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া কৌরব সভায় গমন করিলেন। এই সময় পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাট ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গজহ্বর (হস্তিনা) নগরে গমন করিলে কণ্ব, জনক ও নারদ নামক তিনজন বীরপুরুষ তাঁহার সহচর হইলেন। কৃষ্ণ সারথি হইয়া উঁহাদের রথে আরোহণ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করাইলেন। রাস্তাঘাট সজ্জিত হইল। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনার জন্য আদেশ দিলেন। কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধন আদেশ পালন করিল না। অন্য সকলেই তাঁহাদের আদেশ পালন করিলেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে উঠিলেন। তথায় দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, আর বিদুর, শল্য, দ্রুতরাজ, কর্ণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তারপর হস্তিনার রাজা আসিয়া কৃষ্ণকে খাদ্য প্রদান করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে অভদ্র বলিয়া গালি দিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীর ভবনে গেলেন। কুন্তী পুত্রদিগের জন্য অনেক বিলাপ করিলেন। কৃষ্ণ তার পর বিদুরের ভবনে গেলেন। এদিকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, কৃপ ও দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরদিন সভায় কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। উক্ত চারিজন তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিলেন। অন্যান্য সকলে কৃষ্ণের মতে মত দিলেন। দুর্য্যোধনের পিতামাতাও দুর্য্যোধনের বিপক্ষে মত দিলেন। এই সময় সাত্যকি সংবাদ আনিলেন যে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য সশস্ত্র প্রহরী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া দেবতা কালের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেইস্থানেই তাঁহার চারিটী হস্ত, তিনটী মস্তক ও তিনটী চক্ষু বহির্গত হইল। তাঁহার শরীরে ব্রস, সাধুগণ, দেবতাগণ ও রসাক্ষদিগের রাজা আবির্ভূত হইলেন। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, পর্ব্বত নড়িতে লাগিল, সমুদ্রে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কৌরবদিগের মুখ শুকাইয়া গেল। তখন দ্রোণ ও ভীষ্ম স্তব-স্তুতি দ্বারা কৃষ্ণকে শান্ত করিলেন। তার পর কুন্তীকে এই সংবাদ দিয়া কৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন ও বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। কর্ণ কৃষ্ণের পার্শ্বে ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষে যাইতে বলায় বঙ্গেশ্বর তাহা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কুন্তী কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। কর্ণ সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু পাণ্ডব-পক্ষে যাইতে সম্মত হইলেন না।

পাণ্ডবগণ সমস্ত শুনিলেন। তার পর যুদ্ধ করাই স্থির হইল। তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, উত্তরা, দ্রৌপদী, শ্রীগণ্ডী, তারপর দর্ম্মসূনু ও সর্ব্বপশ্চাৎ কৃষ্ণ এইরূপ শৃঙ্খলায় সসৈন্যে তাঁহারা যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণের পশ্চাৎ নিমন্যু (অভিমন্যু), তার পর সাত্যকি, তাঁহার পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের দুইটী পুত্র, পঞ্চবালা ও চিকিৎরা, ইঁহারা সকলে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কুন্তীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমদিন 'সোয়েতান'কে (শ্বেত) সেনাপতি করা হইল। ওদিকে দুর্য্যোধনও সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে আসিলেন ও ভীষ্মকে সেনাপতি করিলেন। উভয় পক্ষে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ রাবণ-ব্যূহ রচনা করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল, এমন সময় অর্জ্জুন উভয় পক্ষে স্বীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন ও কৃষ্ণকে যুদ্ধ থামাইয়া দিতে বলিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন ও বলিলেন "যুদ্ধে নামিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন অসম্মানজনক ও তাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নহে।"

যুধিষ্ঠির শত্রুপক্ষে গিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য ও কৃপ ইঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া আসিলেন। তার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরশঙ্খ ও উত্তর নিহত হইলেন। শ্বেত অগ্রসর হইলেন ও শল্যপুত্রকে নিহত করিলেন। ঘটোৎকচ, দ্রুপদ পুত্র, কিরীটারাথজ ইঁহারা সকলে পাণ্ডব-পক্ষে যুদ্ধ করিলেন। ভীষ্ম অগ্রসর হইয়া শ্বেতের সহিত যুদ্ধ করিলেন ও

অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিহত করিলেন। তার পরদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হইলেন। পাণ্ডবগণ কাগেংপাতে অর্থাৎ শকুনি-ব্যূহ রচনা করিলেন। কৌরবগণও তাহাই করিল। যুদ্ধক্ষেত্র রক্তসমুদ্রে পরিণত হইল। অর্জ্জুন-পুত্র রাবণ, রসাঙ্ক সেরেঙ্গী কর্ত্তৃক নিহত হইল। ভীষ্ম এরূপ প্রবলবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে থামাইলেন। তখন পুনরায় ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্ম দর্মবংশকে মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিলেন। শ্রীখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। দুইটী তীরে ভীষ্ম রথ হইতে পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইল না। উভয় পক্ষে বীরগণ তাঁহার নিকটে গেলেন। ভীষ্মের দেহ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না। দেহবিদ্ধ শরই তাঁহার শয্যা হইল। ভীষ্ম জল প্রার্থনা করিলে অর্জ্জুন পাতাল হইতে জল আনয়ন করিলেন। ভীষ্ম সাত মাস শরশয্যায় রহিলেন। যতদিন সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন না হয় ততদিন তথায় তিনি অবস্থান করিবেন, এই কথা বলিলেন।

তার পর দ্রোণ সেনাপতি হইলেন। উভয় পক্ষে গজব্যূহ রচনা করিলেন। অর্জ্জুন ভগদত্তকে সংহার করিলেন। পরদিন ত্রিগর্ত্ত ও দশজন কৌরব সেনাপতি অর্জ্জুনকে অন্যস্থলে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ঐরূপে দূতপুত্রে ভীমকে লইয়া গেল। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করিলেন। অভিমন্যু লক্ষ্মণ কুমারকে নিহত করিলেন। অবশেষে নিজে শত্রু বেষ্টিত হইয়া নিহত হইলেন। অভিমন্যুর স্ত্রী দেবীসুন্দরী (ইনি শ্রীকৃষ্ণের কন্যা) স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন। কিন্তু উত্তরী আট মাস গর্ভবতী থাকায় সহমৃতা হইলেন না। ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিলেন। অর্জ্জুন দর্মবংশের উপর রাগিলেন। কৃষ্ণ থামাইয়া শান্ত করিলেন। জয়দ্রথ অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ শুনিয়া অর্জ্জুন পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অপর পক্ষে দ্রোণাচার্য্যও তাহাকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেবতা শক্রকে পূজা করিতে বলিলেন। দেবতা আসিয়া বলিলেন 'পাশোপতী' নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিলে জয়দ্রথ নিহত হইবে।

পরদিন দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করিলেন ও জয়দ্রথকে তাহার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সাত্যকি তুংসায়, কাম্বোজানা এবং আম্বিষ্ঠকী প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিলেন। ভীম চিত্রায়ুধ জয় সুসেন প্রভৃতি যোদ্ধাগণকে নিহত করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন হওয়ায় অর্জ্জুন বাণের দ্বারা জল আনয়ন করিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে নিহত করিতে যাইতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার হস্ত ছেদন করিলেন। সাত্যকি উঠিয়া ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু ভীম ও অর্জ্জুন ইহারা বহু চেষ্টা করিয়াও জয়দ্রথের নিকট যাইতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণ চক্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন করিলেন। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কৃষ্ণ অন্ধকারে অর্জ্জুনের রথ জয়দ্রথের নিকট লইয়া গেলেন ও অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কৃষ্ণ ঝড়ে তাহার মস্তক তাহার পিতার হস্তে ফেলিলেন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। তার পর কৃষ্ণ চক্র সরাইয়া লইলেন ও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। দুর্য্যোধন দ্রোণকে ভৎর্সনা করিলেন ও কর্ণকে লইয়া রাত্রিকালে যুদ্ধ করিতে গেলেন। ভীম কর্ণের ভাইকে নিহত করিলেন ও দুর্য্যোধনের ভ্রাতাগণকে বধ করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণের নিকট যাইতে দিলেন না ; কারণ অর্জ্জুন নিশাযুদ্ধ জানিতেন না। ঘটোৎকচ কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনীত হইল। কারণ, ঘটোৎকচ রাক্ষস আর রাক্ষসেরাই নিশাযুদ্ধ ভাল জানিত। সিয়ালধান নামক একজন অন্ধ রসাঙ্ক (রাক্ষস) কৌরব পক্ষে ছিল। ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে সে নিহত হইল। আরও অনেক রাক্ষস ঘটোৎকচের হস্তে শমন সদনে গমন করিল। অবশেষে কর্ণ অনেক কষ্টে ঘটোৎকচকে নিহত করিলেন। দেবী আরিম্বী (হিড়িম্বা) পুত্রশোকে চিতারোহণ করিলেন। পরদিন দ্রোণ ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অশ্বত্থামার মিথ্যা নিধনবার্ত্তা প্রচার করিয়া দিলেন। সব পাণ্ডবই সেই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও দৃষ্টদ্যুম্ন সেই অবস্থায় তাঁহার মস্তক ছেদন করিল।

পরদিন কর্ণ সেনাপতি হইলেন। শল্য তাহার সহকারী হইলেন। কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করিলেন। অর্জ্জুন প্রধান চন্দ্রঙ্গল (অর্দ্ধচন্দ্র) ব্যূহ রচনা করিলেন। ভীম দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন ও দুঃশাসন দুর্য্যোধনের রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। ভীম দুঃশাসনকে ধরিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার রক্ত পান করিলেন। কর্ণ ও অর্জ্জুন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের গ্রীবাদেশ লক্ষ্য করিয়া শর যোজনা করিলেন। শল্য ইঙ্গিত দ্বারা অর্জ্জুনকে মস্তক একপার্শ্বে হেলাইতে বলিলেন। কর্ণের বাণ ব্যর্থ হইল। অর্দ্ধাবিলিক একটী সর্পাকার রাক্ষস। সে অর্জ্জুনের পূর্ব্ব শত্রু। এই সময় শত্রুতাসাধন করিতে আসিয়া সে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইল। তার পর অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিলেন ও কৌরবগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শকুনির পরামর্শে দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিল। শল্য ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না ও এই সূত্রে অশ্বত্থামার সহিত শল্যের কলহ হইল ও যুদ্ধের উপক্রম হইল। দুর্য্যোধন উভয়কে শান্ত করিলেন। শল্য শেষে সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ নকুলকে শল্যের নিকট নিরস্ত্র হইবার জন্য অনুরোধ করিতে পাঠাইলেন। শল্য পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং দর্মবংশের হস্তে পুস্তক অকালিমা অসাড় নামক অস্ত্রে নিহত হইবেন, ইহা বলিয়া দিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া শল্যের স্ত্রী সত্যবতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। শল্য তাঁহাকে লুকাইয়া যুদ্ধে গেলেন।

পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। শল্য একাকী। একটী অস্ত্র নিক্ষেপ করায় হাজার হাজার দৈত্য সর্প রসাঙ্ক উত্থিত হইল। কৃষ্ণ সকলকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে উপদেশ দিলেন। দৈত্যগণ তাহা দেখিয়া কাহাকেও আক্রমণ না করিয়া চলিয়া গেল। ভীম তখন শত্রুপক্ষে মহামার আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের উপদেশমত দর্মবংশ পূর্ব্বোল্লিখিত অস্ত্রের দ্বারা শল্যকে সংহার করিলেন।

কৌরবগণ পলায়ন করিল। শকুনি ধরা পড়িয়া ভীম কর্তৃক নিহত হইল। ভীম তাহার রক্ত পান করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সকলেই নিহত হইল। সুযোধন পলায়ন করিলেন। দেবী সত্যবতী তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। শোকে অধীর হইয়া তরবারি হস্তে রথে চড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে স্বামীর মৃতদেহ পাইলেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া পদচুম্বন করিতে লাগিলেন। 'সিরি পাঙা' চিবাইয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতে লাগিলেন ও নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন "আমি তোমার অনুসরণ করিব। যদিও তুমি স্বর্গে অনেক বিদ্দাদরি (বিদ্যাধরী) পাইবে তথাপি আমার জন্য একটু স্থান রাখিবে" ইত্যাদি। তার পর তরবারি বাহির করিয়া বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ও দাসী সুগন্দিকীকে বলিলেন "মন্দ্রকে (মদ্র) ফিরিয়া যাও।" দাসী বলিল "আমি না থাকিলে কে আমার কর্ত্রীর সেবা করিবে?" এই বলিয়া সেও অস্ত্র লইয়া বক্ষে বিদ্ধ করিল। তাঁহারা সকলেই স্বর্গে গেলেন। শল্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। স্বর্গে গৃহ সকল রেশমে নির্ম্মিত ও উজ্জ্বল বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। প্রচুর খাদ্য ও নানাবিধ দ্রব্য তথায় সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। সেখানে বয়সের কোন তারতম্য নাই। সকলেই চির যৌবন লইয়া সুখে কালাতিপাত করে।

পাণ্ডবেরা শুনিল সুযোধন নদীর মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাহারা তথায় গমন করিল। বীম তাহাকে ভীরু বলিয়া গালি দিল। সুযোধন জল হইতে উঠিয়া বলিল "আমি ভীরু নহি, দেবতার পূজা করিতে জলের নিম্নে গিয়াছিলাম; আমি পাণ্ডবদের যে কোন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত।" কৃষ্ণ বীমকেই নির্ব্বাচন করিলেন। নারদ 'কক্রাসান'কে এই সংবাদ দিলেন। ইনি মদুরার রাজা ও কৃষ্ণের বড় ভাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কাহাকেও মারিতে পারিলেন না। অবশেষে অস্ত্র ছাড়িয়া উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন অনবরত নিজের বাম উরুতে করাঘাত করিয়া ভীমকে দুর্য্যোধনের উরুদেশের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ভীম তাহা স্মরণ করিয়া গদা দ্বারা তথায় আঘাত করিলেন। সুযোধন পড়িয়া গেলেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ভীম তাঁহার মৃতদেহে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কক্রাসান ইহা দেখিয়া ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া ক্রোধে বর্শা লইয়া ভীমকে মারিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন ও বলিলেন "ইহা প্রতিহিংসা, ইহাতে দোষ দেওয়া যায় না।" এই স্থানে যবদ্বীপের গ্রন্থ শেষ। বলীদ্বীপের মহাভারতে আরও কিছু আছে। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

সুযোধনের মৃত্যুর পর পাণ্ডবরা হস্তিনায় গমন করিলেন ও তথায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। রাত্রিকালে যখন সকলেই নিদ্রিত তখন কৃষ্ণ একা জাগ্রত ছিলেন। সুযোধন কিরূপ নির্দ্দয়ভাবে ভীম কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। পরদিন কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই চিন্তিত হইল। হস্তিনা ছাড়িয়া সকলে তাঁহার সন্ধানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বাহির করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তথায় নানারূপ অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন। পরদিন হস্তিনা হইতে সংবাদ আসিল, অশ্বত্থামা রাত্রিযোগে সহরে প্রবেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, শ্রীখণ্ডী, ও পঞ্চ কুমারকে নিহত করিয়াছে ও সব মন্ত্রীরা পলায়ন করিয়াছে। পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন সব সত্য। স্ত্রীলোকেরা রোদন করিতেছে। কৃষ্ণ স্ত্রীলোকগণকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে লইয়া অশ্বত্থামার সন্ধানে বাহির হইলেন। পর্ব্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। ভীম তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পৃথিবী ও পর্ব্বত কম্পিত হইতে লাগিল। নারদ আগমন করিলেন এবং বলিলেন "পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে।" অশ্বত্থামাকে বলিলেন "তুমি পাণ্ডবগণের নিকট আত্মসমর্পণ কর, এবং তোমার পুষ্পক বা চূড়ামণিক উহাদিগকে দাও।" অশ্বত্থামা বলিলেন "আমি পাণ্ডবদিগকে উহা দিব না, উহা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে দিব এবং উহার নাম হইবে 'পরীক্ষিৎ'।" কৃষ্ণ সাক্ষী রহিলেন। পরে অশ্বত্থামা ভীমকে পুষ্পক দিলেন এবং বলিলেন 'অর্জ্জুনের পৌত্রকে ইহা দিবে।' অশ্বত্থামা চলিয়া গেলেন। পাণ্ডবরাও ফিরিল। কৌরবদিগের মধ্যে যুযুৎসু কেবল অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। দর্মবংশ রাজা হইলেন ও পরীক্ষিৎ বড় হইলে তাঁহাকে রাজ্য দিয়া সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া রাখিলেন। যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজগণ, যাহারা জীবিত ছিল তাহারা সকলেই দর্মবংশকে সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইল এবং তাঁহার নাম হইল 'বতর জয়বায়'। মতান্তরে ইনিই যবদ্বীপের রাজবংশের আদিপুরুষ।

গ্রন্থখানি নানা ছন্দে লিখিত। তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ছন্দের ন্যায়। যথা,—জগদিতা, সুয়ান্দান, বসন্ততিলক, বংশপত্র, শেকরিণী, শ্রগদার, বসন্তলীলা, ইত্যাদি। পুস্তকখানি উচ্চাঙ্গের কবিত্বপূর্ণ। কৃষ্ণ যখন হস্তিনায় যাইতেছেন সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া কালিদাসকে মনে পড়ে। বালকগণ ক্রীড়া ভুলিল। স্ত্রীলোকগণ তাহাদের প্রসাধন অসম্পূর্ণ রাখিয়া, কেহ দর্পণ হাতে করিয়া, কেহ অসম্পূর্ণ মালা লইয়া, কেহ অসম্বৃত অবস্থায়, কেহ হস্ত দ্বারা বক্ষস্থল আবৃত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল। শল্যের পতনে সত্যবতীর বিলাপ বড়ই হৃদয়বিদারক। রাত্রিকালে হস্তিনার বর্ণনা অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে বাগ্মিতাও আছে। যুদ্ধের বর্ণনাগুলি বীরত্ব ও মহত্ত্বে পূর্ণ। যদিও মহাভারতের উপাখ্যান-ভাগের কিছু ইতর-বিশেষ আছে, কিন্তু চরিত্রগুলি অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কুন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, অভিমন্যু সব ঠিকই আছে।

এ দেশের মহাভারতের কবি গান্ধারী ও কৌরব-বধূগণের সমরক্ষেত্রে স্ব-স্ব পতি-পুত্র অন্বেষণ ও তাহাদের বিলাপের বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে এক সত্যবতী দ্বারা কবি সেই কার্য্য করিয়াছেন।

এখন ইহাতে কি কি বিষয় নাই দেখা যাউক। জতুগৃহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান, রাজসূয়, পাশাখেলা, পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যুর সপ্তরথী বেষ্টিত হওন, স্ত্রীপর্ব্ব, যদুবংশ ধ্বংস বা

কৃষ্ণের দেহত্যাগ, পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ এ সকল কিছুই ইহাতে নাই। যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুনের বিষাদ ও কৃষ্ণের সান্ত্বনা আছে। গীতার আর কোন জিনিষ ইহাতে নাই। ভীষ্ম বধে কৃষ্ণের কোন পরামর্শ ছিল না। দ্রোণ বধে 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা কথা কৃষ্ণই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ইতিগজ'র কোন উল্লেখ নাই। সমস্ত পাণ্ডবের মুখ দিয়া তিনি ইহা বলাইয়াছিলেন! অর্জ্জুনের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের ধনুর্গুণ কাটিবার কোন কথা নাই। কৃষ্ণ কন্যা দেবীসুন্দরী বা সিতিসুন্দরী অভিমন্যুর স্ত্রী। তাহার অপর স্ত্রী মৎস্যপতির কন্যা উত্তরী। শ্রীখণ্ডী দ্রুপদ কন্যা ও তাহাকে অর্জ্জুনের স্ত্রী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকে নারায়ণ, জনার্দ্দন, পদ্মনাব ঈশ, কেশব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভীমকে বায়ুপুত্র, সেনা, বকোদর প্রভৃতি, ও অর্জ্জুনকে পাল্গুন, পার্থ, জনার্দ, কেমেটী, যুধিষ্ঠিরকে দর্মবংশ, দর্মকুসুম, যুধিষ্ঠির, গুনানতালি, চণ্ডকপুত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্রৌপদী, রাজা দ্রুপদের কন্যা ও দর্মবংশের স্ত্রী। পঞ্চ পতির কোন কথা নাই। পঞ্চ কুমার দর্মবংশের পুত্র। ককারসান বা ককরাসান মথুরার রাজা, কৃষ্ণের বড় ভাই। কর্ণকে কখন অঙ্গেশ্বর কখন বঙ্গেশ্বর বলা হইয়াছে। তাহার জন্ম আমাদের মহাভারতের উপাখ্যানের ন্যায়। সূর্য্যপুত্র, অর্কপুত্র, রাধেয়, কর্ণ প্রভৃতি তাহার নাম। ভীষ্মের মাতা গঙ্গার কোন উল্লেখ নাই। ভীষ্মের মাতা শান্তনুর রাণী ছিলেন। হৃদে বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু, এরূপ কোন উক্তি উহাতে নাই।

যবদ্বীপে আরও কয়েকখানি প্রাচীন পুরাণ আছে। আমাদের দেশের পুরাণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য খুব কম।

চক্রধরপুর

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ্-ডি

সম্প্রতি আমরা সিংহভূম জেলার অন্তর্গত চক্রধরপুর নগরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া তথায় প্রায় দেড় মাস কাল বাস করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে যে স্থান

সিংহভূম জেলার কাটবাড়ি গ্রাম

দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই নগরটি ছোট হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা বেশ মনোরম। ইহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-বেষ্টিত একটি উপত্যকা বিশেষ। এই দেশের লোকেরা সব যে কোল তাহা নহে; মুণ্ডা এবং একপ্রকার মিশ্রিত জাতি আছে যাহারা কোল্ এবং উড়িয়া ভাষায় কথাবার্ত্তা

সারাইকেলা রাজ্যাভিমুখে খরকাই নদী
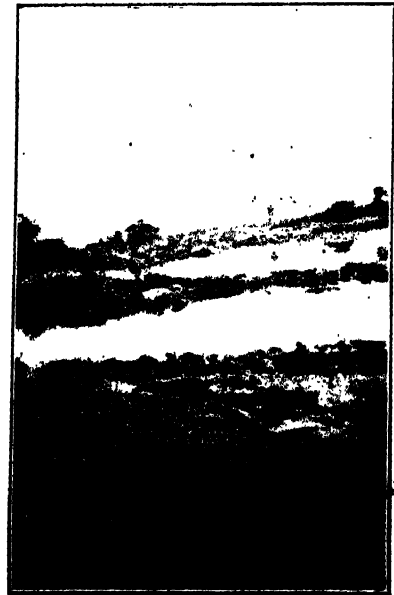
বলে। এই দেশের কূপের জল ও বায়ু খুব স্বাস্থ্যকর, এবং এই দেশবাসীর স্বাস্থ্যও খুব প্রশংসনীয়। কূপের জলে অধিক পরিমাণে চূণ ও অল্পমাত্রায় লৌহ আছে। এ দেশের

লোকের মধ্যে ভূতের ভয় বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। গালা, গুটিপোকা এবং বিড়ির কারবার এ স্থানে আছে। পূর্ব্বে পাঁচটি গালার কারখানা চলিত, কিন্তু আজকাল দুইটি চলিতেছে। এই দেশে মারবাড়বাসিগণ আসিয়া পেট্রোল ও কাপড় প্রভৃতি জিনিসের ব্যবসা করিতেছে। এখানকার বাজারে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। এ দেশে অনেক বাঙালীর বাস আছে। একজন বাঙালী বহুদিন হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন—তাঁহার নাম রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন অশীতিবর্ষীয় সরকারী- পেন্সন্-ভোগী অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি বলেন যে, যখন তিনি এইখানে প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে কেবল জঙ্গল ছিল, এবং পথে দিনের বেলায় ভল্লুক দেখা যাইত। যোগেন্দ্র বাবুর আদি নিবাস শান্তিপুর। তিনি একজন সজ্জন, সদালাপী ও পরহিতকারী ভদ্রলোক। তাঁহারই উদ্যোগে এখানে একটি কালীবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার বাঙালী ভদ্রলোকগণের চেষ্টায় এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য চক্রধরপুরের রাজার সাহায্য বিনা তাঁহাদের এই চেষ্টা বিফল হইত, সন্দেহ নাই। এখানকার স্ত্রীলোকেরা খুব কর্ম্মঠ। চক্রধরপুর নগরটি সঞ্জয় (১) নদীর বাম দিকে অবস্থিত। ইহার পরিধি ১॥০ স্কোয়ার মাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এখানে বাস করে। চক্রধরপুরের কতকাংশ পোড়াহাট রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি মিডিল ইংলিশ স্কুল আছে। ইহার ছাত্র-সংখ্যা খুব কম নহে। এই রেলের অনেক কর্ম্মচারী এখানে বাস করে। উক্ত রেলের ট্রাফিক সুপারিন্‌টেণ্ডেটের আপিস এখানে আছে। এই স্থানে রেলের ইংরাজ ও ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের জন্য দুইটি ক্লাব আছে।

বৈতরণী নদীর উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু

চৈবাসার হ্রদ

সারাইকেলার পথে

পোড়াহাটের রাজাকে চক্রধরপুরের রাজা বলা হয়। তাঁহার প্রাসাদ চক্রধরপুরে আছে। এক সময়ে পোড়াহাটের রাজা স্বাধীন ছিলেন।

(১) এই নদীটি সুবর্ণরেখা নদীর একটি শাখা মাত্র।

রাজা অর্জ্জুনসিংহের রাজদ্রোহিতায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাট রাজ্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু পরে আবার পোড়াহাট রাজার বংশধরগণকে এই রাজ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ফেরৎ দেন।

এখানে সপ্তাহে বুধবার ও রবিবার এই দুই দিন হাট বসে। হাটে যে-সকল জিনিস পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কুমড়া, বেগুণ, বিলাতী বেগুণ এবং কচু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাটের দিন মোরগের লড়াই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লড়াই দেখিবার জন্য বহু লোক-সমাগম হয়। ইহা একটি নিষ্ঠুর খেলা সন্দেহ নাই; কারণ,এই লড়াইতে অনেক মোরগের প্রাণ নষ্ট হয়। মোরগদ্বয়ের এক পায়ে ছোট শাণিত ছুরী বাঁধিয়া দেওয়া হয়, এবং মোরগদ্বয় পরস্পরকে ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে। কলিকাতায় পূর্ব্বে বড়লোক "বাবু" দিগের ভিতর বুলবুলের লড়াই যেমন চলিত, ইহাও সেইরূপ। এই মোরগের লড়াই দেখাইতে বহু দূরদেশ হইতে মোরগ আনীত হয়। এখানে এ সময়ে প্রায় প্রত্যেক দর্শকই জুয়া খেলিয়া থাকে। গরীব দেশ বলিয়া জুয়ার পরিমাণ এক হইতে চারি পয়সা মাত্র; মোরগের অধিকারীরা হিন্দু, মুসলমান, কোল প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক। এই লড়াইয়ের একটা নিয়ম হইতেছে যে, পরাজিত মোরগ জয়ী মোরগের অধিকারীর প্রাপ্য।

চক্রধরপুরে যেখানে আমরা বাস করিয়াছিলাম, তাহার পশ্চাতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটি বড় পাহাড় এবং জঙ্গল আছে। পাহাড়ের নিম্ন দেশে দুইটি গ্রাম আছে,—একটির নাম চেলাবেড়া, এবং অপরটির নাম চিরুবেড়া। এখানকার প্রায় সমস্ত লোকই কোল। ইহারা সরল এবং সত্যবাদী। এই কোল জাতির ভিতর কাহাকেও চুরী করিতে দেখা যায় না। ইহাদের কোনো অভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক কোলগ্রামে আমরা কোলদিগকে সর্ব্বদা তীর-ধনুক লইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই তীর-ধনুক
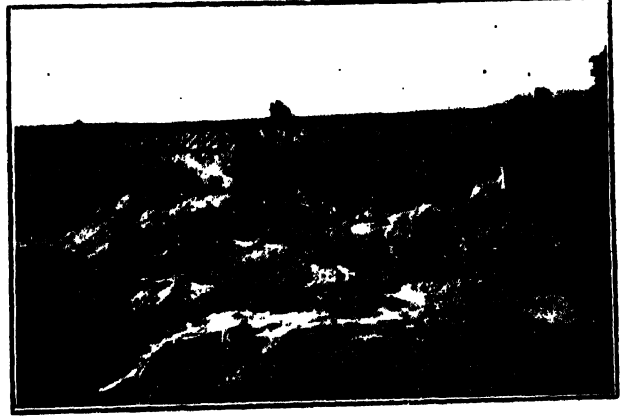
সঞ্জয় নদী—চক্রধরপুর চৈবাসার পথে
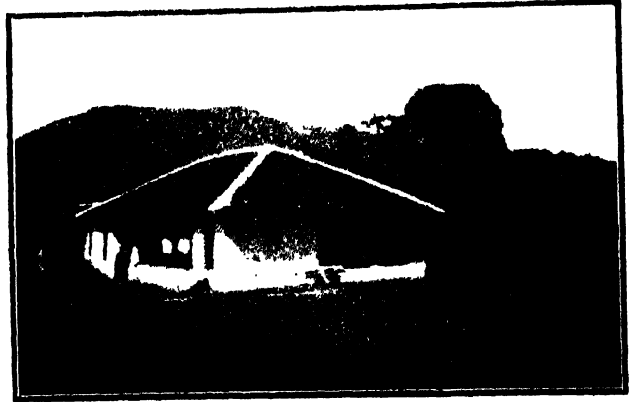
হেসাডির ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাংলা

টেবোর জঙ্গল এবং পার্ব্বত্য-পথ

দ্বারা তাহারা পক্ষী বধ করে। সন্ধ্যার সময়ে কোলদিগকে রাজপথে মাতাল হইয়া চলিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখান হইতে পনেরো মাইল দূরে সিংহভূম জেলার প্রধান নগর চৈবাসা অবস্থিত। চৈবাসা নগরটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে হয়। এখানে একটি হ্রদ আছে যাহা পুরুলিয়ার হ্রদ অপেক্ষা ছোট। চক্রধরপুর হইতে চৈবাসার পথটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ্য। পথিমধ্যে সঞ্জয় নদীর উপর একটি সুবিস্তৃত সেতু আছে। এই পথের মধ্যে সাইত্‌বা এবং চিত্তিমিতি যাইবার রাস্তা। আমরা এই দুই গ্রামের পথে কিছু দূর

রোরো নদীর উপর সেতু

বৈতরণী নদী

চৈবাসা রোরো নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার পরিধি প্রায় দুই স্কোয়ার মাইল। রোরো নদী উপর একটি পুরাতন সেতু আছে। সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর একটি নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিতেছেন। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবারে খুব বড় হাট হয়। সেই হাটে বহু লোকের সমাগম হয়; এবং বহু প্রকার জিনিস সরবরাহ হয়। কিংবদন্তী আছে যে, একজন চই'র নামে চৈবাসার নামকরণ হয়। চই এই দেশের প্রধান লোক ছিল। চৈবাসার সরকারী আদালত, ডাকবাংলা, সরকারী হাইস্কুল, দাতব্য ঔষধালয়,

হেসাডির পার্ব্বত্য পথ

বৈতরণী নদীর উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুর ভগ্নাবস্থা

গিয়াছিলাম। পথের এক পার্শ্বে পাহাড় এবং সরকারী জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলে ছোট জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। সাইত্‌বার পথে ষোলো মাইল যাইলে আমরা বাকৈলা নামে কোল্‌দিগের একটি বড় গ্রাম দেখিতে পাই।

পুলিস হাসপাতাল, জেল প্রভৃতি আছে। এই স্থানে সিংহভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার বাস করেন। এই স্থানে পানীয় জল কুয়া হইতে তোলা হয়। কতকগুলি বাঁধ অর্থাৎ বড় পুষ্করিণী আছে। এখানে গুটিপোকার

ব্যবসা আছে, এবং একটি বড় মদের ভাটী আছে। চক্রধরপুরেও একটি মদের ভাটী দেখা যায়। চক্রধরপুর হইতে চৈবাসায় যাইবার জন্য বাস-সার্ভিস আছে। চক্রধরপুর এবং চৈবাসায় দেখিলাম যে কতকগুলি কোল,—কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েই খৃষ্টান হইয়াছে। খৃষ্টান স্ত্রীলোকেরা মস্তকে লাল ফিতা ধারণ করে। এখানে এবং চক্রধরপুরে খৃষ্টান পাদ্রীগণের ভজনাগার আছে। চৈবাসায় হো এবং ওঁরাওদিগের নাচ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা চৈবাসা হইতে জয়ন্তীগড় নামক একটি স্থানে মোটরে করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই স্থানটী চৈবাসা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বৈতরণী নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। বৈতরণী নদীর উপর একটি পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিহার এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের এবং কিয়োঞ্জর রাজার অর্থে একটি সুদৃঢ় লৌহ সেতু Jessop কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকালীন বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর Sir Edward Gait কর্ত্তৃক উহা উন্মুক্ত হয়। জয়ন্তীগড় গ্রামটি সিংহভূম এবং উড়িষ্যার সীমানায় অবস্থিত। এখানে Inspection বাংলা আছে। এখানেও হাট বসে, এবং কিয়োঞ্জর ও ময়ুরভঞ্জ দেশ হইতে লোকে এই হাটে খোল বিক্রয় করিতে আসে। কিংবদন্তী আছে যে পোড়াহাটের রাজার কোনো পূর্ব্বপুরুষ জয়ন্তীগড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কিয়োঞ্জর রাজ্যের মধ্যে চমকপুর নামক স্থান জয় করিয়া, তাঁহার এই জয় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এই স্থানে একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গড় প্রস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই গড়ের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; কেবল দেখিলাম কতকগুলি উৎকলবাসী একটি গ্রামে বাস করিতেছে। এই বৈতরণী নদী বর্ষার সময়ে অতি ভীষণাকার ধারণ করে এবং গ্রামখানিকে ভাসাইয়া দেয়। তখন হতভাগ্য লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া অন্য উচ্চ স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিয়োঞ্জর রাজ্যের ভিতর আমরা প্রবেশ করি নাই, কেবল সেতু হইতে কিছু দূরে গিয়াছিলাম। শুনিলাম এই স্থান হইতে প্রায় ২৪ কি ২৫ মাইল দূরে একটি ভয়ানক জঙ্গল আছে। তাহাতে হাতী প্রভৃতি বড় বড় জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। চৈবাসা হইতে জয়ন্তীগড়ের পথটি খুব সুন্দর। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল আছে। একটি জঙ্গলে একটি বড় ময়ূর দেখিয়াছিলাম। আমাদের সহযাত্রী হাজারীবাগ-নিবাসী সুবিখ্যাত শিকারী ভূতপূর্ব্ব সরকারী District Engineer শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বন্দুক উঠাইবার পূর্ব্বেই ময়ূরটী উড়িয়া গিয়াছিল। চৈবাসা হইতে গমন কালে পথিমধ্যে জোড়াপোকারিয়া, হাটগামারিয়া, জালদিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই সকল গ্রামে বিশ্রাম-বাংলা, ডাক-বাংলা, অথবা P. W. D.-বাংলা আছে। পথিকগণ এই সকল স্থানে বিশ্রাম করিতে পারে।

ইহার পর আমরা মোটরে জাম্‌সেদ্‌পুর গিয়াছিলাম। চৈবাসা হইতে জাম্‌সেদ্‌পুর ৩৯ মাইল। পথ লোহিতবর্ণ; জঙ্গল আদৌ নাই। এক স্থানে দুইটি পাহাড় আছে। চৈবাসা হইতে পাঁচ মাইল যাইয়া আমরা খরাকী নদী দেখিয়াছিলাম। এই নদীর উপর সেতু আছে, কিন্তু বর্ষাকালে এই সেতুটি জলে প্লাবিত হইয়া যায়। নদীটি সুদীর্ঘ এবং সুবিশাল। ইহার পর আমরা কালঝরণা এবং গোবিন্দপুর পার হইয়া চৈবাসা হইতে ২৭ মাইল পাথর পার হইবার পূর্ব্বে চৌমাথায় আসিয়া পড়িলাম। সিধা পথে ঘাটশিলা এবং গেলুডি যাইতে পারা যায়। আমরা বাম দিকে ফিরিলাম, এবং কালীমাটি পার হইয়া মহামান্য টাটার নগরে প্রবেশ করিলাম। টাটা নগরটি খুব সুন্দর এবং পরিষ্কার। মাননীয় টাটার দেশবিশ্রুত কীর্ত্তি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কারখানা। সকলেরই এই কারখানা পরিদর্শন করিয়া জীবন সার্থক করা উচিত। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে এরূপ কারখানা আছে কিনা সন্দেহ। টাটানগরের রাস্তাগুলি পীচ্ দিয়া প্রস্তুত। রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক্ আলো খুব বেশী রকম আছে। এখানে বাড়ীগুলি সুনির্ম্মিত। প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন ছোট উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র নগর রাত্রিকালে দেখায় যেন অগ্নি পরিবেষ্টিত, এবং দিনে কারখানার কল দিয়া সর্ব্বদা ধূম নির্গত হয়। এখানকার বেশীর ভাগ লোক টাটার কারখানার কর্ম্মচারী।

আর একদিন আমরা মোটর করিয়া আম্‌দা-গোয়ার রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। চৈবাসা হইতে ২৭ মাইল গিয়া দেখিলাম যে জগন্নাথপুর নামে একটি বিখ্যাত

কোল্ গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি Inspection বাংলা, একটি কোল স্কুল, এবং স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে। এই গ্রামের নামকরণের কারণ এই যে, জগন্নাথ সিংহ নামে পোড়াহাটের এক রাজা এখানে একটি কর্দ্দম-নির্ম্মিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার কোনো অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই নাই। এখানকার কোলরা খুব সরল ও সদা প্রফুল্লচিত্ত। তাহাদের দেখিলে মনে হয় না যে তাহাদের কোনো অভাব আছে, কিংবা তাহারা সংসার-ভারে প্রপীড়িত, কিংবা তাহাদের অন্য কোনো কষ্ট আছে। জগন্নাথপুর ছাড়িয়া জামদাভিমুখে চলিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম. দুই ধারে জঙ্গল এবং সম্মুখে একটি উচ্চভূমি। ঐ উচ্চ ভূমিতে যাইয়া দেখি নিম্নে ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গল ভেদ করিয়া গোয়ার পথ গিয়াছে। এই স্থানটি শিকারীদের সর্ব্বপ্রকার শিকার পাইবার একটি উপযুক্ত স্থান। এখানে কোলরা ধান চাষ করিয়া থাকে, এবং সরিষার চাষও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর চক্রধরপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিশ মাইল দূরে গৈলকেরা গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে সরকারী forest বাংলা দুই তিনটি দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক শুক্রবারে এখানে হাট হয়। হাজারীবাগে বহু জঙ্গল দেখিয়াছি, কিন্তু গৈলকেরার মতন ভীষণ জঙ্গল আমরা কোথাও দেখি নাই। এই জঙ্গলে শাল গাছ প্রচুর আছে, এবং কাঠুরেরা কাঠ কাটিতে যায়। ইহার চারি মাইল দূরে সারেন্দা-তলবর্ত্ম (tunnel) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি প্রকাণ্ড বন্য হস্তী বি, এন, রেলওয়ের কোনো চলন্ত ট্রেণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

চক্রধরপুর হইতে চৈবাসা যাইবার পথে চৈবাসার সন্নিকটে সারাইকেলার পথ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে ২৪ মাইল দূরে সারাইকেলা রাজ্য অবস্থিত। সারাইকেলা রাজ্যাভিমুখে বিশাল খরকাই নদী দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্য খুব মনোমোহকর। এই নদীতে বহু পক্ষী-সমাগম দেখিয়াছিলাম। এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিলাম না। এই স্থানে একটি ডাক-বাংলা ও ঔষধালয়, এবং রাজার বাটী আছে। শুনিলাম মহারাজার বয়স খুব বেশী হইয়াছে। মহারাজা পরম ধার্ম্মিক এবং প্রজারঞ্জক। মহারাজা এবং তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই উৎকল-বংশীয় রাজ্যে কয়েকটি মন্দির আছে; তাহাদের মধ্যে হনুমানজীর মন্দির প্রসিদ্ধ। মহারাজার একটি বড় হস্তী আছে, ইহার দাঁত সুদীর্ঘ। গ্রামটি বেশ পরিষ্কার।

ইহার পর আমরা বারীপাদার পথে গমন করিয়াছিলাম। সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্য-সীমানায় গিয়া দেখিলাম যে ছাত্রা নামক একটি নদী আছে। এই নদীর উপর কোনো সেতু নাই। এই রাস্তায় কোনো জঙ্গল নাই; বহু আসন বৃক্ষ আছে, এবং এই বৃক্ষ হইতে গুটিপোকা পাওয়া যায়। সিংহভূম জেলার প্রায় সর্ব্বস্থানেই আসন বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। চৈবাসা হইতে ১৯ মাইল দূরে কাঠবাড়ী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের বাম পার্শ্ব দিয়া বারীপাদা যাইবার পথ। কাঠবাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর রহিয়াছে। ঐ গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ প্রস্তরের উপর বসিয়া তাহারা পঞ্চায়েৎ করে। কোলগ্রামে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কুটীর সকল দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের কারুকার্য্য-জ্ঞান বেশ আছে।

একদিন আমরা চক্রধরপুর হইতে রাঁচি গিয়াছিলাম। চক্রধরপুর হইতে রাঁচি ৭২ মাইল পথ। পথিমধ্যে নাকেদি গ্রাম পার হইয়া টেবো পাহাড়ের নিম্নদেশ পাওয়া যায়। সেখানে পৌছিয়া দেখি একটি সাইন বোর্ড রহিয়াছে—Caution ! Numerous sharp bends. আমরা ড্রাইভারকে খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। পথের দুই ধারে ভীষণ জঙ্গল, সুদীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত। মোটর গাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে টেবোর উচ্চ স্থানে পৌছিল। এই উচ্চ স্থানটি সমতলভূমি হইতে ২৫০০ ফিট উচ্চ। হাজারিবাগে অনেক জঙ্গল দেখিয়াছি, কিন্তু এইরূপ সুদীর্ঘ জঙ্গল দেখি নাই। এই নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য পথটি মধ্যে মধ্যে পীচ্ দিয়া বাঁধানো, এবং নীচে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কলকল রবে প্রবাহিত। এই নদীর জল বড়ই অস্বাস্থ্যকর। শুনিলাম এই জল পান করিলে সদ্য সদ্য জ্বর হয়। এই নদীতে একটি কোল রমণীকে নগ্নাবস্থায় আমরা স্নান করিতে দেখিয়াছিলাম। টেবোর Inspection বাংলা পার হইয়া আমরা হেসাডি পাহাড়ে পৌছিলাম। প্রকৃতিদেবীর

ভীষণ মূর্ত্তি এখানে বিরাজিত। এত বড় বনের মধ্যে আমরা বল্লমধারী কোল ব্যতীত কোনো জীবজন্তু দেখিতে পাই নাই। আমাদের সহযাত্রী সুপ্রসিদ্ধ শিকারী নবীন-বাবু শিকার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, এবং জানিলেন যে এ সব সরকারী জঙ্গল,এবং সরকার বাহাদুরের অনুমতি ব্যতীত এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। এই জঙ্গলে রাত্রিকালে বাস করিতে কিংবা মোটরগাড়ী লইয়া যাইতে কেহই সাহস করে না। হেসাডিতে একটি Inspection বাংলা আছে। এই টেবো-হেসাডি জঙ্গলটি ২০ কি ২১ মাইল বিস্তৃত। চক্রধরপুর হইতে ৬৪ মাইল-পাথর হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে, এবং ৪৪ মাইল-পাথরে শেষ হইয়াছে। হেসাডি পার হইয়া আমরা পার্ব্বত্য রাস্তার শেষ দেখিতে পাইলাম, এবং বাঁধগায়ে পৌঁছিলাম। পরে আরও অগ্রসর হইয়া জাস্তি এবং মুরহু পার হইয়া খুন্তি-গ্রামে পৌঁছিলাম। খুন্তি একটি বড় Sub-division; এখানে একটি আদালত ও বড় বাজার আছে। এখানকার লোকসংখ্যা কম নহে। ইহার পর কালমাটি এবং হাটিয়া পার হইয়া রাঁচি পৌঁছিলাম। রাঁচি সম্বন্ধে আমার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা মানভূম, সিংহভূম, ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণার মধ্যে যে-সকল দেশ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে চক্রধরপুরের কূপের জল সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। কলিকাতার ধূলি ও ধূম হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কেহ যদি এই সকল স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিনের জন্য যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। অনেকের ধারণা চক্রধরপুরে ম্যালেরিয়া আছে, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। সেখানকার ডাক্তারেরা বলেন যে, বর্ষাকালে সিংহভূম জেলার সুদূর গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক আক্রান্ত হয়; তাহার কারণ সেখানে তাহারা সবুজ জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে স্নান করে, ঐ জল পান করে, এবং ঐরূপ জলাশয় হইতে উৎপন্ন মশক দ্বারা দষ্ট হইয়া এইরূপ জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ পাল বি-এ, ও শ্রীমান্ রাইচরণ দত্ত তুলিয়াছেন।

বাজীকর

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

আমি গরীব কেরাণী। কোন বিদেশী সওদাগরের আফিসে খাতা লিখিয়া ৪৭॥০ টাকা মাসিক মাহিনা পাই। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী-রপ্তানী মালের হিসাব লিখিবার সময় ভাবি, জগতে তো টাকার অভাব নাই,—তবে আমার এবং আমার ন্যায় আরও অনেকের এমন অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয় কেন? আরও যা ভাবি, তা আর লিখিলাম না; কেন না, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় শিহরিয়া উঠিবেন, ও আমার এই ক্ষুদ্র কাহিনীটী ছাপা হইবে না। ধনীর সঞ্চিত ধনের উপর গরীবের তপ্ত নিঃশ্বাস,—সে যে অতি ভয়ানক জিনিষ,—সকল দেশের সকল সমাজেই সেই সর্ব্বনেশে জিনিষটাকে পাথর-চাপা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে!

যাক্ সে কথা। সেদিন মাসের পয়লা। আফিসের খাজাঞ্চী বাবুর নিকট হইতে ৪৬৮/০ মাহিনা বুঝিয়া পাইয়াছি;—কয়েকদিন ঠিক দশটার সময় কাঁটায় কাঁটায় হাজিরা দিতে পারি নাই বলিয়া বাকী এগার আনা পয়সা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ঐ কয় আনা পয়সার জন্য বড়বাবুর নিকট বিস্তর কাঁদাকাটী করিয়াছিলাম;—উহার অভাবে আমাকে কয়েক রাত্রি যে উপবাস করিয়া কাটাইতে হইবে, তাহাও জানাইয়াছিলাম;—কিন্তু বড় বাবুর পাষাণ হৃদয় গলে নাই। তাঁহারও অবশ্য বিশেষ দোষ নাই। তিনি পাঁচ শত টাকা মাহিনা পান;—তিনি বুঝিবেন কিরূপে, মাত্র এগার আনার পয়সা একজন গরীব কেরাণীর পক্ষে কত বড় গুরুতর ব্যাপার!

৪৬৸৴০ আনা!—আফিস হইতে বাহির হইয়াই হিসাব করিতে করিতে চলিয়াছি,—কাহাকে কি দিতে হইবে। মুদীর দোকানেই ত বাকী প্রায় ৩০৲ টাকা। তার পর গয়লা, তাহারও পাওনা ৭৷৮ টাকার কম হইবে না। ছেলেটা ইস্কুলে পড়ে; তাহার মাহিনা দিতে হইবে, নতুবা নাম কাটিয়া দিবে। এর উপরে বাড়ী-ভাড়া—নাঃ, আর উপায় নাই,—গত মাসের বাড়ী-ভাড়া বাকী আছে,—এবার না দিলে ছেলেমেয়ে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে! ছোট মেয়েটা একখানা ডুরে সাড়ীর জন্য কয়েক দিন ধরিয়া কান্নাকাটী করিতেছে, এ মাসে না কিনিলে যে রক্ষা নাই! নিজের জুতা-জোড়া একেবারে শতছিন্ন—তালি দেওয়া,—ছোট সাহেব ছোকরা সেদিকে কয়েকবার কটমট করিয়া চাহিয়াছে। হয় ত বড় সাহেবের কাছে কখন একটা রিপোর্ট করিয়া বসিবে! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে সত্যসত্যই "সরষের ফুল" দেখিতে লাগিলাম!

এই সব ভাবিতে ভাবিতে কোন্ পথে কতদূর আসিয়াছি, তাহাও আমার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ডুগডুগীর শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক; তাহারই এক কোণে পথের ধারে লোকের ভীড় জমিয়াছে। একটু অগ্রসর হইয়া ভীড়ের ভিতর উঁকি দিয়া দেখিলাম, একজন নেংটীপরা বেদে ডুগডুগী বাজাইতেছে, সঙ্গে তাহার একটী রামছাগল ও একটা বানর। বুঝিলাম, তাহাদেরই কসরৎ দেখাইবার জন্য সে আসর জমাইতেছে। যাক্, আপাততঃ এই বাজীকরের খেলাই না হয় কিছুক্ষণ দেখি,—বাড়ী গেলেই তো যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা যমদূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে!

"—কী মশায়—কেমন ভদ্দর লোক আপনি,—একেবারে যে ঠেলে ফেলে দিতে চান্! জামা জুতো পরলেই ভদ্দর লোক হয় না,—অমন ঢের ঢের দেখেছি—হ্যাঁ—!"

বক্তার চেহারা দুষমনের মত, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, ঘাড়ের দিকে চুল কামানো!

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম; লোকটী তবু আপন মনে গজগজ করিতে লাগিল।

…বেদে ডুগডুগী বাজাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় অবিশ্রান্ত বকিয়া যাইতে লাগিল। এক সময়ে সে বাজনা থামাইয়া দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া যোড়হাতে তাহার নিজের ভাষায় বলিল, "এই যে রামছাগলটী দেখিতেছেন, এ বড় সোজা চীজ নহে,—চীনা মুলুকে উহার জন্ম;—আমার গুরু অনেক মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক করিয়া চীনদেশ হইতে ওটীকে আনিয়াছিলেন,—সেজন্য তাঁহাকে পাকা বারটা বৎসর চীনমুলুকে থাকিতে হইয়াছিল। ছাগলটীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ও মানুষের মনের কথা বলিতে পারে। যে-কেহ মনে মনে প্রশ্ন করিবে, ও ঘাড় নাড়িয়া তাহার উত্তর দিবে। আর এই যে দেখিতেছেন, বানর,—এটী স্বয়ং রুমের বাদশাহ আমাকে বকসীস দিয়াছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ও খুব পণ্ডিত;—কোথায় কোন্ গুপ্তধন আছে, তাহা খড়ি পাতিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে!"

দর্শকদের মধ্যে বিস্ময় ও উল্লাসের গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল,—সকলেই নিজের মনে কথা প্রশ্ন করিবার জন্য বা গুপ্তধনের সন্ধান লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

প্রথমে "চীনমুলুক হইতে আনীত" রামছাগলটী তাহার কেরামতী দেখাইবার জন্য উঠিল। সে এক পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল; এবং মাথাটী একবার দক্ষিণে, একবার বামে ধীরে ধীরে হেলাইতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার গলার ঘণ্টা টুংটুং করিয়া বাজিতে লাগিল। বাজীকর সকলকে বুঝাইয়া দিল যে, ছাগল দক্ষিণে মাথা হেলাইলে প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" এবং বামে হেলাইলে প্রশ্নের উত্তর "না" বুঝিতে হইবে।

একে একে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া সম্মুখে আসিল। তাহারা মনে মনে কি সব প্রশ্ন করিল এবং সর্ব্বজ্ঞ ছাগলটী কি উত্তর দিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কাহারও মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়াছে, কেহ বা চিন্তান্বিত—বিমনা!

অভিনয় শেষ করিয়া রামছাগলটী রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে সরিয়া গেল। তখন "রুমের বাদশাহের প্রিয়পাত্র" দৈবজ্ঞ বানর তাহার বিদ্যার পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। একখণ্ড কালো পাথরের উপরে খড়ির টান দিতে দিতে সে যে কত ব্যাকুল প্রার্থীকে "গুপ্ত ধনের" সন্ধান দিল, তাহার সীমা নাই! আমিও একবার ভাবিলাম, বাড়ীর

আশেপাশে কোথাও গুপ্তধন আছে কি না সন্ধান লই, কিন্তু কেমন একটু লজ্জা বোধ হইল,—অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

সর্ব্বশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হিসাবে রামছাগলের পিঠে চড়িয়া বানরটী কিছুক্ষণ ডুগডুগীর তালে তালে নৃত্য করিল। এই কার্য্যে যে সে বিশেষ পটুত্ব দেখাইল, তাহা বলাই বাহুল্য! ভীড়ের মধ্যে যে সমস্ত বালকবালিকা ছিল, তাহারা বানরের এই নৃত্য-নৈপুণ্য দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

খেলা শেষ হইল। বাজীকরের ইঙ্গিতে বানরটী তখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দর্শকদের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্‌সীস চাহিতে লাগিল। কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ভারী তো খেলা, ওর জন্ম আবার পয়সা!" কিন্তু অনেকেই একটী করিয়া পয়সা দিল,—আমিও একটী পয়সা দিলাম। এইরূপে সম্ভবতঃ আট দশ আনার পয়সা বাজীকর বক্‌সীস পাইল। তখন সে "ঝুলীকাঁথা" গোছাইয়া দর্শকবৃন্দকে 'সেলাম' করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল,—আমিও যাইবার জন্ম পা বাড়াইলাম।

এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। অকস্মাৎ দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং বাজীকরের নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"শালা চোর, ডাকু, বাটপারী কয়কে পয়সা লিয়া!"

বাজীকর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যোড়হাতে বলিল—"নেহি হুজুর—নেহি হুজুর—চোর ন হুঁ,—খেল করতে হে—"

"আলবৎ তুম্ শালা চোর হ্যায়—ডাকু হ্যায়—"

বলিয়াই একজন গুণ্ডা এক ঝটকায় বাজীকরের ঝুলিটা কাড়িয়া লইল এবং তাহা উজাড় করিয়া সমস্ত পয়সা লুণ্ঠন করিল। তার পর তাহারা তিন লম্ফে ভীড় ঠেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

এমন অকস্মাৎ এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল যে, দর্শকেরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "চোর চোর—ধর্ ধর্" করিতে করিতে গুণ্ডাদের পশ্চাতে ছুটিল। কেহ কেহ "পুলিশ পুলিশ" বলিয়া দু-একবার ব্যর্থ চীৎকার করিল। অপর সকলে ক্রোধ, বিরক্তি, বিস্ময় ও সহানুভূতি পূর্ণ নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কিন্তু কি জানি কেন, আমার পা আর উঠিল না; আমি সেই বাজীকরের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাজীকরের রক্তহীন বিবর্ণ মুখ যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গিয়াছে, কোটরগত চোখ দুইটা যেন কপালে উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যবৎ হইয়া রহিল। তার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সে বালকের মত কাঁদিতে লাগিল,—অশ্রুধারায় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

আমি তাহার নিকটে গিয়া সান্ত্বনার স্বরে ভাঙ্গা হিন্দীতে কহিলাম—"এ জী—কাঁদো মৎ,—কাঁদো মৎ—ঘরমে যাও, কাল ফিন্ পয়সা মিলেগা—"

আমার সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই হোক বা যে কারণেই হোক, বাজীকর কিছুক্ষণ নীরবে বেদনা-কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল—তাহার মর্ম্ম এই "বাবু, আজ কি উপায় হইবে,—আমার লেড়কী যে দুই দিন না খাইয়া আছে,—আজ কিছু পেটে না পড়িলে, সে আর বাঁচিবে না। শুধু ওই লেড়কীটার জন্যই আমার ভাবনা,—আমি হতভাগা না হয় না খাইয়াই থাকিলাম,—ভগবান তো আমাকে সব রকম দুঃখকষ্ট সহিবার জন্যই দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন—"

লোকটীর কথা শুনিয়া বেদনায় আমার বুক টন টন করিয়া উঠিল। উহার মেয়েটী দুই দিন না খাইয়া আছে,—ও নিজে হয় ত কয় দিন খায় নাই, কে জানে? আজ যদি ওরা না খাইতে পায়—

হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম, বানর ও ছাগলটী মুখামুখী হইয়া প্রভুর পার্শ্বেই বসিয়া আছে,—কেমন এক প্রকার বেদনা-কাতর দৃষ্টিতে তাহারা প্রভুর দিকে চাহিতেছে,—যেন প্রভুর এই বিপদ তাহারা পশু হইলেও বুঝিতে পারিয়াছে এবং ভাষাহীন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। …তাই ত, এ দুটী প্রাণীও হয় ত কয়েক দিন কিছুই খায় নাই!…

না—এ দৃশ্য আর সহ্য করা যায় না। পকেট হইতে

ধীরে ধীরে একটা টাকা বাহির করিয়া বেদের হাতে দিয়া বলিলাম,—"যাও জী—ঘরে যাও,"—নেংটী পরা শীর্ণকায় বেদে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তার পর মাটীতে মাথা লুটাইয়া গদগদস্বরে বলিল—"বাবুজী, আজ আপনি আমাদের জান্ দিলেন, আপনি দেবতা—"

তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমি আর সেদিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

এ মাসের মাহিনা বাবদ ৪৫৸৵০ যখন গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিলাম, তখন তাঁহার চোখে-মুখে যে ক্রোধ-ক্ষোভ-নৈরাশ্যপূর্ণ বেদনা ফুটিয়া উঠিল, তাহ আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিল। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আপিসের নূতন সাহেব ছোকরা অত্যন্ত খামখেয়ালী;—একদিন ৫ মিনিট দেরী হইয়াছিল বলিয়া সে অন্যায় পূর্ব্বক একটা টাকা বেশী কাটিয়া লইয়াছে। রাস্তায় একজন বেদেকে দয়ার্দ্র হইয়া একটা টাকা দান করিয়াছি, এই সত্য কথাটা আমি কিছুতেই দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি-রূপিণী পত্নীকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। এ যদি আমার কাপুরুষতা হয়—পাপ হয়—পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন!

(২)

দুই মাস পরের কথা। বাজীকরের ব্যাপারটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সেদিন রবিবার—আপিসের ছুটী ছিল। সহকর্ম্মী বন্ধু রমানাথের নিকট হইতে গোটাকয়েক টাকা ধার করিয়া, অপরাহ্নে জেলেপাড়ার বস্তীর মধ্যে দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময় দেখি, সেই বাজীকর গলির মোড়ে একখানা খোলার ঘরের সামনে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। লোকটার শীর্ণদেহ যেন শীর্ণতর হইয়াছে, পাঁজরার হাড় কয়খানা আঙ্গুলে গোণা যায়,—পরনে শতছিন্ন নেংটী, লজ্জা নিবারণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই সে জ্যোতিঃহীন কোটরগত চোখ দুইটা দিয়া ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তার পর ঈষৎ লজ্জিতভাবে একটা সেলাম করিয়া বলিল—"বাবুজী!"

আমি বাঙ্গলাতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি খবর জী, লেড়কী কেমন আছে?"

প্রশ্ন শুনিয়া লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল। অতি কষ্টে সে যে কয়টী কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, লেড়কীর খুব ব্যারাম, বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। কোন বৈদ্যকে ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার বা ঔষধ-পথ্য দিবার সামর্থ্যও তাহার নাই; কেন না, তাহার প্রিয় বানরটী মরিয়া যাওয়াতে, আজকাল তাহার উপার্জ্জন প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

"রুমের বাদশাহের প্রদত্ত" "দৈবজ্ঞ" বানরটীর এই অকাল-মৃত্যু শুনিয়া মনে সত্যই দুঃখ হইল; ততোধিক দুঃখ হইল, বাজীকরের মেয়েটীর অবস্থা শুনিয়া। কহিলাম—"চল, তোমার লেড়কীকে দেখে আসি!"

বাজীকর কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে আমার কথাটা ভাল বুঝিতে পারে নাই। না বুঝিবারই কথা,—কোন জামা-জুতা-পরা "ভদ্রলোক" যে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করিবে, ইহা সে কিরূপে বিশ্বাস করিবে! অবশেষে আমার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া বোধ হয় কথাটায় তাহার বিশ্বাস হইল। সে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"চলুন, বাবুজী—।"

একখানা খোলার ঘরকে মাটীর দেয়াল দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগে কাহার যেন মুরগী রাখিবার জায়গা, অপর ভাগে বাজীকর আশ্রয় লইয়াছে। এই অংশটী এত সঙ্কীর্ণ ও অপ্রশস্ত যে তাহার মধ্যে একজন লোক ভাল হইয়া বসিতে পারে কি না সন্দেহ। ঘরখানির সঙ্গে আলো-বাতাসের চির-বিবাদ। দরজার নিকটে গিয়া ঘরের ভিতরে একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বাজীকর বলিল—ঐখানে তাহার লেড়কী শুইয়া আছে।

অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই চোখে পড়িল না;—কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে দেখিলাম,—মাটীর উপরে একখানি জীর্ণ কাপড় পাতা, তাহাতে ৮।১০ বৎসরের একটী মেয়ে শুইয়া আছে। অস্থিচর্ম্মসার তাহার দেহ, যেন মাটীর সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। ঘরের অপর কোণে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, সেই "চীনমুলুক

হইতে আনীত" রামছাগলটী,—সেও অস্থিচর্ম্মসার,—যেন মৃত্যুর জন্য ধুকিতেছে! আমি স্তম্ভিত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাজীকরকে তাহার মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হইল না।

মেয়েটী বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, বাপের গলার সাড়া পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল "—বাপুজী!"—তার পর হস্ত দ্বারা নিজের উদর স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইল—তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে! হতভাগ্য পিতা ক্ষুধার্ত্ত কন্যাকে কোনই ভরসা দিতে পারিল না,—কেন না, সে দাবী পূরণ করিবার সাধ্য তাহার নাই! সে কেবল নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

আমি একটা দুয়ানি বাজীকরের হাতে দিয়া বলিলাম—"শীগগীর একটু দুধ কিনে নিয়ে এস, আমি আছি—"

বাজীকর দুয়ানিটা হাতে করিয়া পাগলের মত ছুটিল। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ভগবান তো শুনিয়াছি দয়াময়, তবে মানুষ এত দুঃখ, এত কষ্ট পায় কেন? ভগবান কি তবে নাই? অথবা থাকিলেও তিনি কি নির্ম্মম, হৃদয়হীন?—

বাজীকর দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইল। দুধটুকু খাইয়া মেয়েটীর মুখে চোখে যে তৃপ্তি ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল, ভাষায় তাহার কি বর্ণনা করিব? হায় মানুষের প্রাণ—অন্নের জন্য তাহার কী তীব্র কাতরতা!

খোলার ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে বাজীকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"লেড়কীর মা, তোমার স্ত্রী কোথায়?"

বাজীকর মাথা নাড়িয়া হস্তের ইঙ্গিতে জানাইল—সে বাঁচিয়া নাই!

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত দিন হল মারা গেছে?"

বাজীকর প্রথমতঃ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে ভাবিল। অবশেষে কহিল,—"বাবুজী, আপনি কি তাহা শুনিতে চান? সে অতি কষ্টের কথা—!"

এই দরিদ্র বাজীকরের জীবনের সব কথা জানিতে আমার একটা প্রবল আগ্রহ হইল; কহিলাম—"হাঁ শুনবো, তুমি বল—"

বাজীকর কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার জীবনের যে দুঃখের কাহিনী বলিল, তাহা যথাযথ ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার নাই, পাঠকেরও বোধ হয় শুনিতে শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। অতএব আমি অতি সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি।

বাজীকরের অবস্থা চিরকালই এমন ছিল না। তাহার নাম রামদাস। দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী গ্রামে সে চাষী গৃহস্থ ছিল। ২০।২৫ বিঘা জমি, লাঙ্গল, গরু, মহিষ প্রভৃতিও তাহার ছিল। এক রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিতেই তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কুক্ষণে গ্রামের জমিদার চতুর্ভুজ সিংএর পাপ দৃষ্টি তাহার স্ত্রীর উপর পড়িল। তাহার স্ত্রী যমুনা ছিল খুবই সুন্দরী, বয়স ২০।২২ বৎসর। জমিদার প্রথমতঃ দুষ্টা স্ত্রীলোক লাগাইয়া যমুনাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যমুনার মন ছিল খাঁটী, সে কিছুতেই প্রলোভনে টলিল না। জমিদার তখন রামদাসকে ধরিয়া লইয়া গিয়া খুব মারপিট করিল, প্রাণের ভয় দেখাইল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হইল না। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে রামদাসকে প্রয়োজন বশতঃ কোন এক দূর গ্রামে যাইতে হইল, অনিবার্য্য কারণে সে রাত্রিতে সে গৃহে ফিরিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতে বাড়ী পৌঁছিয়া দেখে, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার স্ত্রী যমুনা নিরুদ্দেশ। প্রতিবাসীরা বলিল, রাত্রিতে কতকগুলি লোক মশাল হাতে তাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, তাহারাই নিশ্চয় তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

রামদাস সবই বুঝিল। সে পাগলের মত জমিদার চতুর্ভুজ সিংহের বাড়ীর দিকে ছুটিল,—দেউড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া মাথা-মুড় খুঁড়িতে লাগিল,—কিন্তু তাহার কথা কেহই শুনিল না,—জমিদারের পাইকেরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। পরদিন সকালে গ্রামের বাহিরে একটা পুকুরে যমুনার মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গেল।···লোকে বলিল যমুনা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। কিন্তু কেন যে সে আত্মহত্যা করিল, তাহার আত্মহত্যার জন্য কোন্

নরাধম দায়ী, একমাত্র রামদাস ছাড়া আর কেহই বোধ হয় তাহা জানিল না, বুঝিল না।...

তার পর? তার পর আর কি? মেয়ে লখিয়ার বয়স তখন ২।৩ বৎসর। তাহাকে লইয়া রামদাস একদিন রাত্রে গ্রাম হইতে পলায়ন করিল,—বাড়ী-ঘর, জমীজমা, গরু মহিষ লাঙ্গল সবই পড়িয়া রহিল। সেগুলিও চতুর্ভুজ সিং দখল করিয়া লইয়াছে কি না কে জানে!

কাহিনী শেষ করিয়া একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাজীকর বলিল—আজ সাত বৎসর হইল লখিয়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দেশ-বিদেশে সে ঘুরিতেছে, জীবন-ধারণের জন্য এই বাজীকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ভগবান যাহার উপর রুষ্ট, অদৃষ্টে যাহার দুঃখ আছে, তাহার দুর্গতি খণ্ডন করে কে? একটী মাত্র মেয়ে লখিয়া, তাহাকেও আর বুঝি সে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।...

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নামিয়া আসিয়াছিল। গলির মোড়ে ম্লান গ্যাসের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। কয়লার ধোঁয়ায় বাড়ীর বায়ু মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অদৃষ্ট বড়, না ভগবান বড়? না সকলের চেয়ে বড় সমাজের অত্যাচারী ধনশালী লোকেরা?

কিছুক্ষণ পরে আমার চমক ভাঙ্গিল। যন্ত্রচালিতবৎ পকেটে হাত দিয়াই রমানাথের নিকটে ধার-করা টাকার মধ্য হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া বাজীকরের হাতে দিলাম। এদিকে ওদিকে চাহিয়া চুপে চুপে বলিলাম—"একজন বৈদ্য ডেকে লেড়কীকে দেখাও, আর কিছু খাবার কিনে দেও—"

বলিয়াই দ্রুতপদে গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। পিছন হইতে ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইলাম—"বাবুজী"! কিন্তু আমি আর ফিরিয়া চাহিলাম না।

তিন দিন পরে বাজীকর ও তাহার মেয়ের সন্ধান লইবার জন্য পুনরায় সেই বস্তীতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘর খালি, কেহই সেখানে নাই। ডাকাডাকিতে বাড়ীওয়ালা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—হাঁ, একজন বাজীকর ও-ঘরে ছিল বটে, কিন্তু দুইদিন হইল তাহার মেয়েটা মারা গিয়াছে, সেইদিন হইতে সেও কোথায় নিরুদ্দেশ! লোকটা বড় বজ্জাত, সাত আনা পয়সা এখনও তাহার কাছে ভাড়া বাকী। যাক্, আধমরা রামছাগলটা ফেলিয়া গিয়াছে, ওটা বিক্রী করিলে কিছু পাওয়া যাইবে—

*   *   *   *

তাহার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বাজীকরকে আর কখনো দেখি নাই। এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে তৃণের ন্যায় কোথায় সে ভাসিয়া গেল, কে তাহার হিসাব রাখে!

মৃগদাবের মনস্তাপ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বৃন্দাবন খুড়োকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছি। কথায় বলে, প্রয়াগ-কাশী। প্রয়াগ ঘুরিয়া তাই কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় এক প্রকাণ্ড ষাঁড় খুড়োর লাল র‍্যাপারখানি চর্বণ করিতে আসিল। খুড়ো চটিয়া লাল,—বলিলেন, 'দেখ দেখি মিউনিসিপ্যালিটি বেটাদের কাণ্ড! গরুগুলাকে খোঁয়াড়ে দেওয়া উচিত।' খুড়োকে একবার বাগবাজারে এক প্রকাণ্ড ষাঁড়ে তাড়া করিয়াছিল, সে অনেক কথা। সেই হইতে খুড়োর ষাঁড়ে বড় ভয়।

গঙ্গাস্নানাদি সারিয়া মন্দির দর্শন করা গেল। কাশীর পাণ্ডারা, যাহারা সারা ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া খায়, খুড়োর কাছে তাহারাও হার মানিল। মন্দিরে দাঁড়াইয়া দেবতার সম্মুখে খুড়ো অনায়াসে মিথ্যা বলিয়া গেলেন, যে, তিনি বংশানুক্রমে কাশীরই বাসিন্দা। তখন তাঁহার কাছে পাণ্ডারা দক্ষিণা চাহিবে কোন্ মুখে?

কাশীর গঙ্গার ঘাট

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া খুড়োকে All Asia Education Conference-এ লইয়া গেলাম। দেখিলাম মহা ভীড়,—চীন, জাপান প্রভৃতি নানা দেশ হইতে নানা পণ্ডিত আসিয়াছেন। ভলেণ্টিয়ার দল, অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ ও গাড়ী ঘোড়ায় সমস্ত স্থানটুকু ভর্ত্তী। মাঝখানে প্যাণ্ডেল্, সেখানে প্রবেশ করে কার সাধ্য। খুড়ো চীনেম্যান্ দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন,—'যত সব হুজুগে লোকের কাণ্ড, হাম্বাগ।' খানিকক্ষণ বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া, প্রদর্শনী ঘুরিয়া, যুযুৎসু দেখিয়া, চৈনিক শিল্পীর আঁকা ছবি দেখিয়া ফিরিতেছি, খুড়ো সহসা পিছন হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'এ পুলিসম্যান, এ কন্‌ষ্টেবল।' ফিরিয়া দেখি, খুড়োর বুকপকেটটি কাটা; মধ্য হইতে তাঁহার টাকার পার্স্‌টি কে বা কাহারা সরাইয়া লইয়াছে। আর দেখিলাম খুড়োর হাতে একটি কাঁচি। বুঝিলাম, চোর বেটারা তাড়াতাড়িতে ঐটি ফেলিয়া পলাইয়াছে। খুড়ো অম্‌নি সেটি টপ্ করিয়া কুড়াইয়া লইয়াছেন। পুলিস আসিল, দারোগা আসিল, ভলেণ্টিয়ারের দল হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল; দেখিতে দেখিতে সেখানে একটি ভীড় জমিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া সেখানে ফেরীওয়ালারা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ফেরী করিতে লাগিল, একটা কানা ও একটা খঞ্জ আসিয়া ভিক্ষা চাহিল, এবং সর্ব্বশেষে এক প্রকাণ্ড ষাঁড় একজন ভলেণ্টিয়ারের মাথার উপর দিয়া ঘাড় তুলিয়া ভিতরে ব্যাপার কি তাহা সোৎসুক-নেত্রে দেখিতে লাগিল। খুড়োর পকেট-কাটার বৃত্তান্ত নোট বহিতে লিখিয়া লইয়া দারোগা বাবু খুড়োর বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। খুড়ো বলিলেন, 'বাড়ীর ঠিকানা কেন বাপু?' দারোগা জানাইল মকরদামা হইলে খুড়োকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। সাক্ষ্য দিবার নাম যেমন শোনা, খুড়া অম্‌নি এক লাফে সেই ভিড় হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে কাশীর গলির গোলোকধাঁধার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। চারি দিকে

একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। অনেক লোক, "ডাকু ভাগ গিয়া, পাকড়ো, পাকড়ো" বলিয়া কিয়দ্দুর খুড়োর পিছু পিছু ছুটিল, কিন্তু ধরিতে পারিবে কেন? জীবন-যুদ্ধে খুড়ো চিরদিনই পলাইয়া জিতিয়াছেন,—পলায়নে তাঁহাকে হারাইতে পারে এমন পালোয়ান আজিও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। পুলিশ তখন আমাকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। উহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, আমরা দাগী চোর বা ধাপ্পাবাজ। আমি তখন আসল ব্যাপার বলিলাম। খুড়োর আইন-আদালত ব্যাপারে ভীষণ ভয়, বিশেষতঃ সাক্ষ্য দিবার নাম শুনিলে খুড়োর মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। একবার সদরে সাক্ষ্য দিবার সময় উকীলের জেরাতে খুড়োকে বাপের নাম ভুলাইয়া দিয়াছিল,—সে অনেক কথা। সেই হইতেই সাক্ষ্য দিবার নামে খুড়োর হৃৎকম্প হইয়া থাকে।

বাসায় ফিরিয়া দেখি খুড়ো লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন; বলিলেন, কম্প দিয়া 'ম্যালোয়ারী' আসিয়াছে। আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেটারা বাসা পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে আসে নি ত?' আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া হাঁটুতে ভর দিয়া জানালায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুলিসের নামগন্ধ নাই। তখন আবার লেপমুড়ি দিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

জানিতাম—খুড়োর ভালুক জ্বর। শুনিতে পাই ভাল্লুক বড় ভয়ঙ্কর জানোয়ার। মানুষ দেখিলে আর রক্ষা নাই, একবার পাইলে হয়। কিন্তু বিধির বিধান এই যে আক্রমণ করিবার উত্তেজনায় ভাল্লুকের অমনি কোঁ কোঁ করিয়া জ্বর আসিয়া পড়ে,—তখন যঃ পলায়তি স জীবতি। বাড়ী-ওয়ালার ভৃত্যটি যেমন পুরী মিঠাই হস্তে উপনীত হইল, খুড়োর ভালুক-জ্বর অমনি সারিয়া গেল। খুব পরিপাটি-রূপে আহার সমাধা করিয়া খুড়ো একবার অপহৃত পার্স টির জন্য শোক করিলেন, আর একবার পুলিসের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, পার্সে কত ছিল তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, পার্সে একটি টাকা ও সাড়ে তিনটি পয়সা ছিল। টাকাটি মেকী। অনেক কাল খুড়ো চালাইবার চেষ্টা করিয়াও চালাইতে পারেন নাই। আজ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন,—প্রদর্শনীওয়ালাদের ঠকাইয়া যদি চালাইয়া দিতে পারেন। তার বদলে চোর বেটাদের কাঁচিখানি লাভ, কিছু না হৌক গোঁফ ছাটাও ত চলিবে। কম্ সে কম্ দামও কোন্ চৌদ্দ গণ্ডা পয়সা না হইবে। মন্দ কি? এই বলিয়া খুড়ো নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। আমিও চোর বেচারার দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরের দিন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া খুড়োকে লইয়া সারনাথ দেখিতে গেলাম। অনেকখানি পথ, হাঁটিয়া যাওয়া কঠিন। অষ্টাবক্রের মত অষ্ট-স্থান-বক্র এক টঙ্গা আসিল। টঙ্গাওয়ালা নামিয়া খুড়োকে উঠিতে বলিল। খুড়ো পিছনের পাদানে যেমন পা দিয়া উঠিয়াছেন, অমনি

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মূর্ত্তি—সারনাথ

ঘোড়া চলিতে সুরু করিল। "আরে থামা, থামা" করিতে করিতে খুড়ো ধপাৎ করিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেন। তার পর উঠিয়া আমার প্রতি, টঙ্গাওয়ালার প্রতি, অশান্ত অশ্বশাবকটির প্রতি, যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন তাহার উল্লেখ না করাই ভাল।

সারনাথে ভগ্ন-ইষ্টকের স্তূপসকল দেখিয়া খুড়ো বলিলেন, 'হ্যাঃ, এই তোমার সারনাথ? বলি আছে, কি এখানে বাপু? কতকগুলা ভাঙা ইটের পাঁজা দেখাতে এতদুর টেনে আনলে?' ওগুলো যে বহু শত বৎসরের

পুরাতন, এ কথা খুড়ো বিশ্বাসই করিলেন না, বলিলেন, 'হ্যাঃ, তুমিও যেমন, ওসব সাজিয়ে রেখেছে,—স্রেফ পয়সা রোজগারের ফন্দী।' একজন অতি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের এই বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনারা দেখ্‌ছি এখানে নূতন। আসুন না—আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।' আমি তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। অগত্যা খুড়োকেও চলিতে হইল; কিন্তু তিনি বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে চলিলেন, 'এই নাও, এই এক ফ্যাসাদ হল দেখছি।'

সারনাথে প্রবেশের মুখে যে স্তূপ আছে তাহাকে চৌখণ্ডী স্তূপ বলে। ভদ্রলোকটি বুঝাইয়া দিলেন—বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মপ্রচারের জন্য সারনাথের প্রবেশ-পথে এইখানে কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই স্থানটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সম্ভবতঃ সম্রাট অশোক এখানে এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মোগল যুগে হুমায়ুন বাদশা এই স্তূপে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া সম্রাট আকবর স্তূপের শীর্ষে একটা অষ্ট-কোণী বুরুজ নির্মাণ করাইয়া ফার্সী ভাষায় লেখাইয়া দেন যে হুমায়ুন বাদশা এখানে বসিয়া সূর্য্যের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটির মুখে শুনিলাম ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে জেনারেল কানিংহাম্‌ এই স্তূপের মাথা হইতে বরাবর নীচে একটি কূপ খনন করেন, কিছু পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য। খুড়ো এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; এই কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'এঁ্যা, বলেন কি মশায়? কোনও গুপ্তধন পেলেন না কি?' খুড়োকে এক গণৎকার বলিয়াছিল, তোমার ভাগ্যে গুপ্তধন লাভ আছে। সে কথা শুনিয়া খুড়ো একবার সাবল লইয়া তাঁর ভাড়াটে বাড়ীর মেঝে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তার জন্য বাড়ীওয়ালা খুড়োর নামে উচ্ছেদের মামলা করিয়াছিল। সে অনেক কথা। পুরাতন জায়গা দেখিলেই খুড়োর গুপ্তধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'না কিছুই পাওয়া যায় নি।' খুড়ো শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অপরে যে গুপ্তধন পাইবে ইহা খুড়োর অসহ্য।

চৌখণ্ডী স্তূপ হইতে অর্দ্ধ মাইল চলিয়া ভদ্রলোকটি কিটো (Kittoe)-আবিষ্কৃত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখাইলেন। বলিলেন, এই সঙ্ঘারামটি মধ্যযুগের। ইহার নীচে আর একটি প্রাচীনতর সঙ্ঘারামের সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সঙ্ঘারামটি না কি চারিতলা ছিল (যদিও খুড়ো তাহা বিশ্বাস করিলেন না), এবং একদিন না কি ইহাতে আগুন লাগে। খননকালে গমের আটার রুটি এবং কয়েকটি মাটীর হাঁড়িতে ভাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। খুড়ো বলিলেন, 'এঁ্যা, ভাত পাওয়া গিয়াছিল? কই, সে ভাত আছে? পুরানো চালটা অম্বলের ভারী ওষুধ হে!' অম্বলের ব্যায়রামের জন্য খুড়ো অনেক তন্ত্র মন্ত্র করিয়াছেন,—দিনকতক এক কাপালিকের খপ্পরে পড়িয়া কারণ-সংযোগে শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন,—তাঁহার তদানীন্তন চেহারা দেখিলে ভক্তি হইত। তার পর খুড়ীর সম্মার্জ্জনীর চোটে কাপালিকটা দেশত্যাগী হইয়াছে, খুড়োর তন্ত্রমন্ত্রও বিদায় লইয়াছে;—সে অনেক কথা। ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'না—সে ভাতের খবর কিছু জানি না।'

রাজা মতিচাঁদের বসিবার কক্ষ—কাশী

ধর্মরাজিকা স্তূপ, প্রাচীন কূপ প্রভৃতি দেখাইয়া ভদ্রলোকটি আমাদের প্রধান মন্দিরে লইয়া গেলেন। মন্দিরের কেবল দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে, আর প্রায়

সবই বিলুপ্ত। মন্দিরের ভিতরে আর এক সারি দেওয়াল দেখাইয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন অতীত যুগে মন্দিরটির চূড়া ভাঙিয়া পড়িবে এই আশঙ্কা হওয়াতে ভিতর হইতে এই দেওয়াল গাঁথা হইয়াছিল। মন্দিরটি না কি বোধগয়ার মন্দিরের মত উচ্চ ছিল। খুড়ো এ কথা বিশ্বাস করিলেন না; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আরে দূর, তুমিও যেমন।' ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'আমরা ধামেক স্তূপ
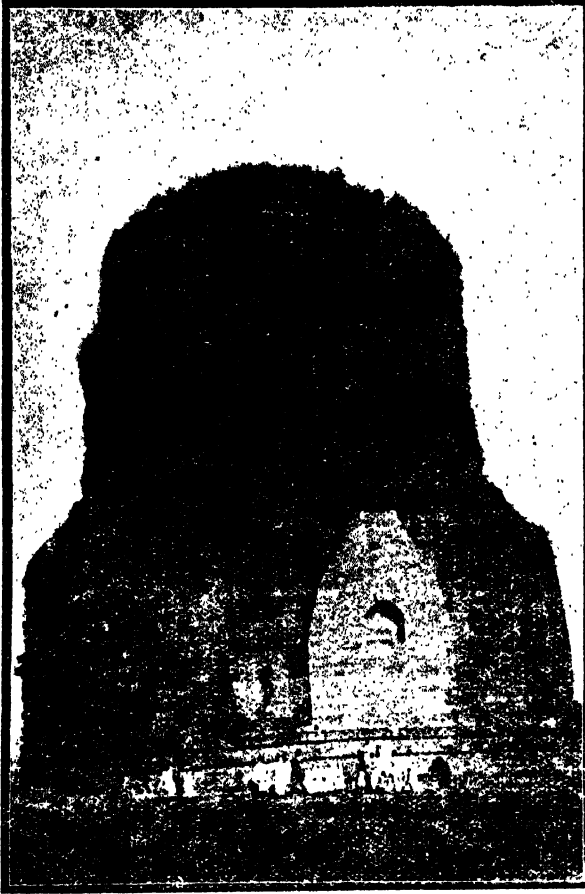
ধামেক স্তূপ—সারনাথ

দেখে শেষে অশোক-স্তম্ভটি দেখব; কেন না, অশোক-স্তম্ভটিই একরকম প্রধান দ্রষ্টব্য বললেই হয়। এটি সব শেষের জন্যে রইল।'

ধামেক স্তূপের কাছে গিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন এটির নাম ধর্মেক্ষা (ধর্ম+ঈক্ষা) স্তূপ,—চলিত ভাষায় ধামেক স্তূপ। এটি সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের। বোধ হয় এইখানে বুদ্ধদেব প্রথমে তাঁর ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন; তাই এই স্থানটিকে এই স্তূপ দিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।' আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্তূপটির চমৎকার কারুকার্য্য দেখিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম খুড়ো বলিতেছেন, 'লাখ্ লাখ্ ইট পুড়িয়ে এই ধুম্বো এক পাহাড় করাটার মানেটা কি হ্যা? আরে ধেৎ, তুমিও যেমন, এ-সব দেখতে আবার মানুষ আসে?' চারি দিকে অনেক দ্রষ্টব্য ছিল, কিন্তু খুড়ো আর সে সব কিছুতেই দেখিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, 'ক্ষেপেছ, কাজকর্ম নেই, এই দুপুর রোদে তোমার সঙ্গে পোড়ো ইটের পাঁজা দেখে বেড়াই আর কি? ঘুরে ঘুরে হায়রান্ হয়েছি,—চল, এখন কোথাও গিয়ে একটু বসব।' তখন ভদ্রলোকটি পরামর্শ দিলেন 'চলুন মিউজিয়ামে যাওয়া যাক্, সেখানে ছায়া আছে, আর দেখবার জিনিষও আছে অনেক। পরে অশোক-স্তম্ভ দেখে ফিরবেন।'

মিউজিয়ামে কুষাণযুগের প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও তদুপযোগী প্রকাণ্ড ছাতা দেখিয়া খুড়ো ত মহা আশ্চর্য্য,—বলিলেন, 'হ্যাঁ মশায়, সেকালে লোকে কি এত উঁচু হত? এ যে এক পেল্লয় ব্যাপার!' অশোক-স্তম্ভের শীর্ষে যে চারিটি সিংহমূর্ত্তি ছিল, তাহা এই মিউজিয়ামে আনিয়া রাখা হইয়াছে। সেটি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন—কি সুদৃঢ় কারুকার্য্য, বজ্রলেপ পালিসে কি মসৃণ, আর কি চমৎকার ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তিগুলি। খুড়ো একরকম উচ্ছ্বসিত হইয়াই বলিলেন, 'আহা, এ যেন ঘূর্ণীর কারিগর গড়েছে রে!' ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "বাবু, আপনি নিশ্চয় ঘূর্ণীর কারিগরের গড়া আম আতা লিচু দেখেছেন? সেও এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে তাতে রঙ আছে, এতে নেই।' খুড়ো তাঁহার এই চমৎকার কলাশিল্প-জ্ঞানের পরিচয় না দিলেই পারিতেন।

বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র-প্রবর্ত্তন মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ আর ফিরে না। মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইতে হয়। আহা, কী আনন্দ ওই মূর্ত্তির মুখে ফুটিয়াছে! সে আনন্দের আভা বুঝি প্রাণের গহন মন্দিরে লুকাইয়া

ফুটিয়াছে। তাহাকে দেখিতে গেলে বুঝি বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিতে হয়! তাই কি মূর্ত্তির চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে? সুগঠিত ওষ্ঠপুট দুইটি হইতে না জানি কী সে বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—না জানি, ভারতের প্রাণে সে বাণী কী আনন্দের শিহরণ জাগাইয়াছিল! ঐ বজ্রের মত কঠিন সবল বক্ষঃ, সুগঠিত হস্তদ্বয়, সিংহকটির মত ক্ষীণ কটিদেশ, এ সকল কি তাঁহার বিরাট তেজকে প্রকটিত করিতেছে না, যে তেজ একদা মারকে জয় করিয়াছিল এবং বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন 'আমি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, স্বয়ং এই ধরণী তাহার সাক্ষ্য।' তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আজিও অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে তাহা আবৃত্তি করে—

"অনেকং জাতিসংসারং সংধাবিস্সা পুনঃ পুনঃ
গৃহকারকং এষমাণঃ স্বং দুঃখা জাতি পুনঃ পুনঃ।
গৃহকারকো দৃষ্টোঽসি ন পুনর্গেহং করিষ্যসি
সর্বে তে পার্শ্বকা ভগ্না গৃহকূটং বিসংস্কৃতম্
বিসংস্কারগতে চিত্তে ইহৈব ক্ষয়ম্ অধ্যগাঃ॥" *

আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ যদি আপনারা ক্ষমা করেন, তবে সাধারণ পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্য আমার ভাবানুবাদটি আপনাদের উপহার দিতে সাহস করি—

"ওগো আমার মনের ঘরের ঘরকরনিয়া
বিশ্বে বিশ্বে ঘর ফেঁদেছ
বারে বারে দুঃখ দেছ
আছ আমার হিয়ায় জুড়ে জানে না মোর হিয়া
এবার তোমায় চিনেছি গো, ঘরকরনিয়া!
ভাঙল ঘরের খুঁটার বালাই
ফাড়ল ঘরের মটকা চালাই,
ঘর বাঁধিবার সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া
ক্ষয় তোমারে পেতেই হবে, ঘরকরনিয়া!"

আমার মন বহু শতাব্দীর পারে এক ধ্যানমৌন বটতলে চলিয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে ভদ্রলোকটি আমাকে সচেতন করিয়া মূর্ত্তিটির বিশেষ পরিচয় দিতে লাগিলেন। মূর্ত্তিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী বামহস্তের মধ্যমাকে মাত্র স্পর্শ করিয়া আছে। ইহাকে ধর্মচক্র মুদ্রা বলে। ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন অর্থে ধর্ম-প্রচার। মস্তকের চতুর্দ্দিকে প্রভামণ্ডল রহিয়াছে। এই প্রভামণ্ডলের উভয় পার্শ্বে এক-একটি বিদ্যাধর শোভা পাইতেছে। ইহারা ফুলের অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছে। মূর্ত্তিটির নিম্নভাগে প্রায় মধ্যস্থলে একটি চক্র খোদিত রহিয়াছে। ইহাই ধর্মচক্র। চক্রের উভয় পার্শ্বে বুদ্ধশিষ্যগণ ও শ্রোতৃগণ বসিয়াছেন। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে যে দুইটি মৃগ রহিয়াছে, উহারা মৃগদাব, অর্থাৎ সারনাথের সঙ্গে এই মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন, সারনাথের পূর্ব নাম ছিল মৃগদাব। জাতকের এক গল্পে আছে যে, বুদ্ধদেব পূর্ব-জন্মে এই স্থানের জঙ্গলে এক মৃগের দলপতি ছিলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের আদেশে প্রত্যহ এক এক মৃগকে রাজার ভোগের জন্য রাজার রন্ধনশালায় যাইতে হইত। একদা এক মৃগীর পালা আসিল। মৃগীর জঠরে তখন শাবক ছিল। মৃগী বলিল, 'আমি মরিলে দুইজনে মরিবে, অতএব অন্য কাহাকেও পাঠান হউক।' অন্য কেহ যাইতে চাহিল না। তখন মৃগদলপতিরূপী বুদ্ধদেব স্বয়ং যাইয়া কাশীরাজের আবাসে উপনীত হইলেন; এবং যূপকাষ্ঠে গলা দিয়া নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীরাজ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া মৃগপতিকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং মৃগপতির অসামান্য আত্মত্যাগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অরণ্যকে মৃগদায় হইতে মুক্তি দিলেন। মৃগদায় হইতে উদ্ধার হওয়ায় অরণ্যের নাম হইয়াছিল মৃগদায় অথবা চলিত ভাষায় মৃগদাব।

ভদ্রলোকটি মিউজিয়ামে রক্ষিত রাজা কর্ণদেবের লিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ত্রিকলিঙ্গাধিপতি পরমভট্টারক শ্রীমান্ কর্ণদেব আর্য্যভিক্ষু-সঙ্ঘকে কিছু দান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, যে-কেহ ইহাতে বাধা উপস্থিত করিবে সে "বিষ্ঠায়াম্ কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে"! এমন প্রচণ্ড শাস্তির ব্যবস্থা যাহার জন্য, সে দানটি যে কি তাহাই জানা গেল না; কারণ, কালের প্রভাবে সেই কয় পংক্তি অবলুপ্ত

* Prof. Pischel's decipherment quoted by Yamakami Sogen in his "Systems of Buddhistic thoughts" p. 68.

হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকটি যখন শিলালিপি পড়িতেছিলেন, খুড়ো উদ্‌গ্রীব ভাবে তাহার ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন, যদি ইহাতে গুপ্তধনের বিবরণ কিছু থাকে। ভদ্রলোকটিকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "'অষ্ট সাহস্রিকা পূজাপাঠ নিবন্ধনা,' বলিয়াই থাম কেন বাপু, পড় না তার পর কি লেখা আছে।" ভদ্রলোক বলিলেন, 'তার পর লিপির কিয়দংশ লুপ্ত হয়ে গেছে।' খুড়ো বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, 'হ্যাঃ, ত্রিকলিঙ্গাধিপতি আছে, পরম ভট্টারক আছে, আর কেবল ঐ আসল কথাটাই লুপ্ত হয়ে গেছে?" মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "বলবে না, তাই বল।" খুড়োর দৃঢ় ধারণা যে, ঐ অংশে কোনও বিশেষ গুপ্তধনের কথা লেখা আছে, এবং পাছে খুড়ো তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, সেই ভয়ে ভদ্রলোকটি তাহা পড়িলেন না, চাপিয়া গেলেন।

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি মনে মনে দুঃখিত হইলেন। আমি তাঁহার নিকট খুড়োর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। অতঃপর তিনি কুমরদেবীর সারনাথ প্রশস্তিটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। এই প্রশস্তির ভাষা অতি সুন্দর, কবিত্বও মনোহর। সামান্য একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"জনি কুমর দেবী হস্ত দেবীব তাভ্যাং
শরদমলসুধাংশোশ্চারুলেখেব রম্যা।
দুরিতজলধিমধ্যাল্লোকমুদ্ধর্তুকামা
স্বয়মিহ করুণার্ত্তা তারিণীবাবতীর্ণা॥

অর্থাৎ কুমরদেবী এই দম্পতী-সম্ভূতা। তিনি শরৎকালীন অমল সুধাংশুর চারু-লেখার ন্যায় রমণীয়া। দুরিত (পাপ)-জলধির মধ্য হইতে লোকের উদ্ধার-কামিনী হইয়া এই করুণার্ত্তা তারিণীর মত স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন।

এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন বঙ্গমহীভুজের প্রিয়পাত্র কবি, শ্রীকুন্দ তাঁহার নাম। ইহা শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন বামন নামে শিল্পী। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এই 'বঙ্গ মহীভুজঃ' অর্থাৎ বঙ্গরাজ কথাটি আমাদের মনে কত স্মৃতিই জাগিয়ে দেয়; কোথায় গেল সেই বঙ্গমহারাজ, কোথায় গেল সেই স্বাধীনতা, সেই কাব্য, সেই শিল্প, সেই প্রাণ!"

খুড়ো সহসা আমার জামার আস্তিন ধরিয়া টানিয়া ঘরের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া চুপি-চুপি কহিলেন, "লোকটা অত স্বাধীনতা স্বাধীনতা করছে কেন বাপু? বলি, কংগ্রেসী ভলেণ্টিয়ার নহে ত? ওটাকে এখুনি বিদায় করে দাও। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, ছাঁ-পোষা মানুষ, বুড়ো বয়সে শেষে কি ফ্যাসাদে পড়তে হবে? আর একটা কথা, লোকটা সেই তখন হতে পিছু নিয়েচে, এখন দক্ষিণা কত হেঁকে বসে দেখ। দশটাকাই বা চায়! তখনই বারণ করেছিলাম, বাপু, ওটাকে জুটিও না। কথা শুনলে না, এখন মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখছি।"

আমি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। খুড়োর জ্বালায় শেষে কি পাগল হইব! খুড়ো আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বাধ' বাধ' লাগছে,—আমিই লোকটাকে বিদায় করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া ভদ্রলোকটির কাছে গিয়া অল্প একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিলেন, "হেঁ হেঁ, আপনার খুবই হয়ে হল বাবু, তখন থেকে ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে বকর বকর করছেন, তা বাবু আমি গরীব ছাঁ-পোষা মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, আপনাকে আর কি দেব? হেঁ হেঁ, এই আধুলিটে নিন।" এই বলিয়া একটা আধুলি (বোধ হয় সেটিও মেকী) ভদ্রলোকটিকে দিতে গেলেন। আমি ভাবিতেছিলাম ভদ্রলোকটি না জানি এই অপমানে কী না মনে করিবেন। কিন্তু দেখিলাম তিনি প্রশান্ত হাস্য করিলেন, কহিলেন, 'ভগবান্ আমার অর্থের অভাব রাখেন নি। চলুন—অশোকের শিলালিপি দেখাইয়া আমি বিদায় নেব।' খুড়ো তখন অগত্যা চলিলেন, এবং অর্দ্ধ-স্বগতভাবে বলিলেন "এ যে যেতে চায় না হে, আচ্ছা ফ্যাসাদ দেখছি।" যদিও আধুলিটি বাঁচিয়া গেল ভাবিয়া তিনি মনে মনে খুসীই হইলেন। হায়, অশোক-স্তম্ভ দেখিতে গিয়া কপালে এত নিগ্রহ ঘটিবে জানিলে কি যাইতাম?

দেখিলাম, স্তম্ভটির কতক অংশ মাটীর নীচে রহিয়াছে। উপরের কতক অংশ ভগ্ন অবস্থায় অনতিদূরে পড়িয়া আছে। স্তম্ভটির চতুর্দ্দিক উচ্চ রেলিং দিয়া ঘেরা, এবং উপরে ছাদ। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপে স্তম্ভটিকে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভদ্রলোকটি বিনা আয়াসে অশোকের শিলালিপিটি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও কোথাও লিপি অস্পষ্ট বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন,

প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বের শেষভাগে এই বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল;—তাহা নিবারণ-কল্পে এই অনুশাসন প্রচারিত হয়। ইহাতে লেখা আছে, বৌদ্ধসঙ্ঘে কেহ ভেদ উপস্থিত করিতে পারিবে না। ভিক্ষুই হৌক আর ভিক্ষুণীই হৌক, যে কেহ সঙ্ঘে ভেদ উপস্থিত করিবে, সে অবশ্য শ্বেত বস্ত্রধারণ করিয়া অনাবাসে (অর্থাৎ মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত স্থানে) বাস করিবে। ইহাই ছিল প্রায়শ্চিত্ত। দেবতাদিগের প্রিয় শেষে এই কথা বলিতেছেন—"হেমেব সবেসু কোটবিসবেসু এতেন বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা"—অর্থাৎ এই প্রকারে সকল দুর্গের আশ্রিত প্রদেশে এই আদেশ প্রচারিত কর।

খুড়ো লাফাইয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকটিকে পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, আমার সঙ্গে চালাকী পেয়েছ? 'হেমেব কোটবিসবেসু এতেন' মানে আশ্রিতপ্রদেশে এই আদেশ প্রচারিত কর? তোমার মুণ্ডু! আমায় বোকা বোঝাতে এসেছ? আমি ছেলেবেলা নরঃ, নরৌ, নরাঃ মুখস্থ করি নি, না? সংস্কৃত আমি কিছুই জানি নে, না? 'হেমেব কোটবিসবেসু এতেন'—কোটি কোটি হেম এখানে আছে—আর তুমি বেটা তার অর্থ করছ এই আদেশ প্রচারিত কর! বেটা চোর, ধড়িবাজ, পাজী! সব গুপ্তধন নিজে নেবে? তখন থেকে কেবল চেপে যাচ্ছ! এবার ধরেছি! দেখি এবার কপালে যা থাকে।" এই বলিয়া নিমেষমধ্যে বৃন্দাবন খুড়ো উচ্চ রেলিং টপকাইয়া ঝুপ্ করিয়া স্তম্ভের গর্ত্তে লাফাইয়া পড়িলেন। হায়, হায়, আমরা ত বিস্ময়ে নির্বাক নিশ্চল! খুড়ো কি শেষে পাগল হইলেন! ফিরিয়া দেখি তিনি সেই চোরের নিকট প্রাপ্ত কাঁচির সাহায্যে স্তম্ভের নাচের মেঝেটি খুঁড়িতে প্রয়াস পাইতেছেন। আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তুমি কি না শেষে এই গর্ত্তের ভিতর লাফিয়ে পড়লে? ভীমরথি হয়েছে? পড়েছ ত তিন হাত গর্ত্তে, এখন বেরুবে কি করে? থাকো তুমি ওখানে, আমরা চল্লুম। ওপরে নোটিশ দেখ নি, এখানে কোনও রকম অনিষ্ট করলে জেল হয়! কোটি কোটি হেম তোমার জন্যে ওখানে বসে আছে, তুমি যত পার খোঁড় আর কোঁচড় ভর্ত্তি কর। আমি থানায় খবর দিতে চল্লাম। তারা এসে তোমার তুলুক, তার পর জেলে নিয়ে থাক। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।"

জেলের কথা শুনিয়া খুড়োর গুপ্তধনের আশা নিভিল। তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বাহিরে আসিবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উচ্চ রেলিং ধরিবেন কি উপায়ে? বিশেষতঃ যে উৎসাহ-বহ্নির দহনে তিনি ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তাহা নিভিয়াছে। জেল-ভীতি আসিয়া তাঁহাকে রীতিমত কাবু করিয়াছে। তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া কহিলেন, "ওরে আয় আয় আয়! রাগিসনে, ফিরে আয় বাবা! আমায় টেনে বার কর বাপ সকল, তোদের খুড়ো যে মারা যায় বাবা, ছাঁ-পোষা মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি।" ইত্যাদি। তাঁহার চোখ মুখ নাসিকা হইতে হু হু করিয়া জলপ্রবাহ নিঃসৃত হইতে লাগিল,—বিরাট গোঁফ্ দাড়ী ছাপাইয়া টপটপ ঝরিতে লাগিল। খুড়ো কাঁদিয়া আকুল। তখন আমরা দুজনে ফিরিলাম। তার পর ভদ্রলোকটি খুড়োর মুণ্ডটি ধরিলেন, আমি শুইয়া পড়িয়া রেলিং-এর ফাঁকে হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদযুগল ধরিলাম এবং হেঁইও, হেঁইও করিয়া খুড়োকে টানিয়া তোলা সুরু হইল। গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় আমাদের চেঁচামেচি, তার সঙ্গে খুড়োর অশ্রান্ত চীৎকার মিলিত হইয়া, ভেড়ার গোহালে আগুন লাগিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দের সৃজন করিল। ভাগ্যে সেখানে আর কেহ ছিল না। খুড়ো চীৎকার করিলেন, "ওরে মুণ্ডু ধরিস নে, মুণ্ডু ছিঁড়ে যাবে বাবা, ঘাড় ধর।" ভদ্রলোকটি অতি কষ্টে অগত্যা খুড়োর মুণ্ড ছাড়িয়া বগলের কাছটায় ধরিলেন। খুড়ো অমনি কৈমাছের মত ঝটকা দিয়া বলিলেন, "ওরে বগলে হাত দিস্ নে, কাতুকুতু লাগে যে!" যাহা হউক অতি কষ্টে অনেক কায়দা করিয়া অবশেষে খুড়োকে টানিয়া বাহির করা হইল। মাটীতে পা দিয়াই খুড়ো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "বেটা খুনে, বদমায়েস, চোর! তখন থেকে বলছি, যা, কিছু দেখতে চাই নে, তবু বেটা আমাকে না দেখিয়ে ছাড়বে না। ছিনে জোঁকের মত পিছনে লেগে আছে! তোর জন্যই ত এত দুর্গতি!" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া দুই হাত ঘনঘন আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, "সারনাথ, সারনাথ, সারনাথ—বলি, হল ত সারনাথ দেখা! যত সব হতভাগার পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!"—যেন সমস্ত দোষই আমাদের। তার পর ভদ্রলোকটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি

রাখিয়া চেঁচাইয়া কহিলেন, "বেটা কংগ্রেসী ভলেণ্টিয়ার, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর! দাঁড়াও পুলিস ডাকছি! এই পুলিস, এই পুলিস, ইধার আও, ইস্কো জল্দি করকে পাকড় লেও!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে রাগিয়া থর্থর্ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি অশ্রুজলে ভদ্রলোকটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আজকের দিনটা স্মরণীয় হল বটে।"

এইরূপে তীর্থযাত্রা সমাধা হইল। খুড়ো আমার আগেই কাশী ছাড়িয়া গিয়াছেন। কথা ছিল থাকিবার ও খাইবার খরচ খরচা আধাআধি ভাগাভাগি হইবে। কিন্তু তাঁহার দ্রুত প্রস্থানে সমস্ত ব্যয়ভার আমার কাছ হইতেই পাওনাদারগণ আদায় করিল। খুড়ো দেশে আসিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন—আমি তাঁহার টাকার লোভে তাঁহাকে সারনাথের এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পলাইয়াছিলাম। তিনি অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন।

এই ঘটনার পর হইতে খুড়োর সঙ্গে আমার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইল।

হিন্দোল

শ্রীকংসারিলাল চট্টরাজ বি-এ

এস, গৃহপিঞ্জর ত্যজি হিন্দোল ঝুলায়ে
সোহাগী বিহগী এস মেলি বাহুপক্ষে।
দাও, মর্ত্ত্যবাসিনী প্রিয়া নন্দন ভুলায়ে
বক্ষের তাপ ঢালা এ শীতল বক্ষে।
পরো, থম্থম্ বাদলায় ঝম্ঝম্ পাঁইজোর
দেখা আজ চাই তোর ও সুরে যে পাই জোর।

আজি, বজ্র বধির ক্ষ্যাপা বিহ্বল বাদলা
রূপখানি তোর প্রিয়া আঙ্গুরের মদ্য
আমি, চোখ ভরি বুক ভরি পান করি একলা
আর পড়ি কালো চোখে পুলকের পদ্য।
এত, কাছে তবু আরও কাছে কোথা তুই আয় তুই,
গন্ধের মল্লার গায় কেয়া গায় যুঁই।

দেখ, ময়ূরের রূপে রবে যে ছড়ালো রঙগীত,
বাদলের উৎসব আন্লো এ দুনিয়ায়,
তার, সঙ্গ কি মিল্বে গো গাইবো কি সঙ্গীত
ধ'রবি তো বন্দনা-ডোরে জালবুনি আয়।
জ্বলে, আরতির দীপ তার ও রজনীগন্ধার
দেবালয় চিনি তার, চিনি নাতো কোন দ্বার।

ওগো, সতরটী বরষার সুন্দরী মালিকা
জড়াইয়া থাকো মোরে, ঢাকো সব অঙ্গ
তুমি, দুর্ভর জর্জ্জর অন্তর-পালিকা,
সঙ্গীরে দিও তব চিরদিন সঙ্গ।
মরি, বাঁধলো কি বাসা ঠোঁটে দুনিয়ার কুঙ্কুম,
ওই রঙ্ ঋণ্ দাও, চুম দাও দাও চুম।

করে, অঙ্গের মুখরাগে মাধুরীকে নির্ব্বাক্
পাতলা সে নীল সাড়ী আবরণে আগলায়
তবু, দুধে আল্তার রঙ শুধু খায় ঘুরপাক্
ফাঁক পেলে ইশারায় কথা কয় পাগলায়।
ওগো, ভূঁয়ে আর নেমোনা দোল খাও হও হরদম্
আল্তা যে ধুয়ে যাবে ভূঁই ভরা কর্দ্দম্।

দূরে, চেয়ে দেখ গেয়ে চলে নর্ত্তকী নদীরা,
বুকে বয় চঞ্চল উচ্ছল ঢেউদল,
ছিছি, শোননি কি এ বুকের ক্রন্দন বধিরা
কি হলো আমার আজ কেউ বল কেউ বল
আমি, চুরমার করি পার দুর্ব্বার শৃঙ্খল্
খুঁজি প্রেমসিন্ধুর কোথা কুল কোথা তল।

যদি, সঁপলে গো হিয়া মোর হিন্দোল-বাহিনী
বিহ্বলা প্রেম তোর হোল মোর বর্ম্ম
কেউ, টুঁটি টিপে মারবে না অন্তর-কাহিনী
দুজনায় খুজি আয় দুজনার মর্ম্ম।
শুধু, একবার থামিয়ে দি ফুস্ফাস্ ফিস্ফাস্
ইঙ্গিতে কথা কো'ক্ নির্ব্বাক্ বিশ্বাস।

পঞ্চভূত

মন্মথ রায় এম-এ

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক]

[অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের শয়নকক্ষ। অধ্যাপক-পত্নী মনীষা মরণাপন্ন কাতর। মনীষা ঘুমাইতেছেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক এবং ডাক্তার। রাত্রি প্রায় দশটা।]

ডাক্তার॥ দেখুন, এখনো বোধ হয় সময় আছে। আপনি কালই এ বাড়ীটা ছেড়ে অন্য একটা নূতন বাড়ীতে উঠে যান্—

অধ্যাপক॥ আপনাদের ঐ এক কথা। কিন্তু কথাটির মানে আমি একেবারেই বুঝিনে।···ভূত বলে কিছু নেই; ওটা শুধু দুর্ব্বল মনের একটা আতঙ্ক মাত্র—

ডাক্তার॥ মানলুম। কিন্তু··যখন এই বাড়ীটাতে ঐ আতঙ্ক থেকেই আপনার স্ত্রী মরণাপন্ন কাতর, তখন কি, অন্ততঃ তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্যও এ বাড়ীটা ছেড়ে—

অধ্যাপক॥ আপনি রোগের মূল কারণটি ভুলে যাচ্ছেন। আতঙ্কটার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল গৃহ নয়, মন। হাঁ, ডাক্তার বাবু, এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্ভুল—

ডাক্তার॥ এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা শোভা পায় না, যখন আপনি এই প্রেততত্ত্ব নিয়েই পি-আর-এসের থিসিস্ লিখছেন।···শেষ হয়েছে?

অধ্যাপক॥ হয়নি, কিন্তু, আজ রাত্রের ভেতরই শেষ কর্ত্তে হবে। শেষ কর্ত্তেই হবে। কেন, জানেন?

ডাক্তার॥ আজ রাত্রেই শেষ কর্ত্তেই হবে! কেন?

অধ্যাপক॥ ঐ থিসিস্ দাখিল কর্ব্বার শেষ দিন হচ্ছে কাল। আজ সারাটি রাত আমাকে লিখ্‌তে হবে—

ডাক্তার॥ রোগিণীর সেবা এবং থিসিস্ লেখা এক সঙ্গে—কি করে হবে?

অধ্যাপক॥ সে আমি ভাবিনে? সেবা কর্ব্বার লোক আছে।

ডাক্তার॥ লোক পেয়েছেন? রাত্রে তো এ বাড়ীতে ভয়ে কেউ থাকতে চায় না আমি শুনেছি; সে কথা কি তবে—

অধ্যাপক॥ সবাই মিথ্যা আতঙ্কে ভীত নয় ডাক্তার বাবু। যারা সত্যের সন্ধানে বের হয়েছে—

ডাক্তার॥ এ বাড়ীতে সেরূপ সৎসাহস কি একজনের বেশী আছে? অর্থাৎ আপনার দোসর—?

অধ্যাপক॥ না থাকলে আমার থিসিস্ লেখা চলতো কি করে? বিশেষ রাত্রি ভিন্ন এরূপ গভীর গবেষণায় আমার মন বসেনা, অথচ রাত্রেই ওর অসুখ বাড়ে—। তারা রাত্রে এসে মনীষার সেবাশুশ্রূষার ভার নেয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে লিখি—

ডাক্তার॥ তারা কে?

অধ্যাপক॥ আমার পাঁচজন ছাত্র। হাঁ, আপনি তো তাদের দেখেছেন···ক্ষিতীশ···অপরেশ···

ডাক্তার॥ দেখেছি, এবং এও দেখেছি মনীষাদেবী বিকারের ঘোরে ওদের ভয়েই বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন—

অধ্যাপক॥ সে আমিও দেখেছি। অথচ সে ভয় নিতান্তই কি নিরর্থক নয় ডাক্তারবাবু? মনীষার এই মানসিক বিকার এই চিত্তবিভ্রমই আমার থিসিসের গোটা একটি অধ্যায়েরই বিষয়-বস্তু করেছি—। আমার ঐ ছাত্ররা মনীষার ঐ চিত্তবিকারের খোরাক যোগায়, নির্ভয়ে। আমি পর্য্যবেক্ষণ করি···গবেষণা করি··· লিখি—

ডাক্তার॥ আমিও লিখব—

অধ্যাপক॥ লিখবেন! কি লিখবেন—?

ডাক্তার॥ খুব সম্ভবতঃ একটি থিসিস্-ই···

অধ্যাপক॥ কি বিষয়ে?

ডাক্তার॥ আপনার সঙ্গে আমার আর একটু ঘনিষ্ট পরিচয় আবশ্যক। তবে তাতে হাত দিতে পার্ব্ব—

অধ্যাপক ॥ বলুন না—বলুন না—আজই বলুন—না—

ডাক্তার ॥ না, আজ নয়। সে কথা যাক্। কাল সকালে দুটো ওষুধ পাঠাবো···একটা মনীষা দেবীর, অপরটা—

অধ্যাপক ॥ অপরটা—?

ডাক্তার ॥ আপনার।

অধ্যাপক ॥ আমার!

ডাক্তার ॥ হাঁ, আপনার। আপনি খাবেন। যদি না খান—

অধ্যাপক ॥ আমি ওষুধ খাব! আমার আবার কি হল—?

ডাক্তার ॥ অসুখ হয়েছে—

অধ্যাপক ॥ আমি তো কোন অসুখ বুঝছিনে—

ডাক্তার ॥ ব্যাধি ঐ।···শুনুন, আপনি যদি ওষুধ না খান, মনীষাদেবীকেও আমার ওষুধ দেবেন না।

অধ্যাপক ॥ আমার অসুখ—!

ডাক্তার ॥ হাঁ।···আর শুনুন। মনীষাদেবী বেশ ঘুমোচ্ছেন। আজ রাত্রে ওঁর সেবাশুশ্রূষা না হয় নাই হ'ল। ক্ষিতীশ বাবুরা এলে আজ রাত্রে তাদের বাড়ী গিয়ে ঘুমুতে বলবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থিসিস্ লিখুন··· নমস্কার—

অধ্যাপক ॥ নমস্কার। [ডাক্তারের প্রস্থান।] ডাক্তার বাবু বেশ রসিক লোক দেখ্‌ছি, অথবা, ওঁরও কি মানসিক বিকার? অসুখ হল মনীষার, আর ওষুধ খাব আমি! হাঃ হাঃ হাঃ [উচ্চহাস্য। তাহাতে মনীষা চমকিয়া উঠিলেন।]

মনীষা ॥ কে ও?

অধ্যাপক ॥ আমি—

মনীষা ॥ ক্ষিতীশ বাবু?

অধ্যাপক ॥ না—

মনীষা ॥ অপরেশ—?

অধ্যাপক ॥ আমি—আমি—

মনীষা ॥ তেজেশ?

অধ্যাপক ॥ আঃ—আমি।

মনীষা ॥ কে? মরুত্তম বাবু?

অধ্যাপক ॥ [কাছে আসিয়া] আমাকে চিনতে পাচ্ছ না মনীষা?

মনীষা ॥ আ—তুমি! আমি ভাবছিলুম বুঝি ব্যোমকেশ বাবু।

অধ্যাপক ॥ তারা এখনো আসে নি। এই এল বলে। ওরা না এলে আজ আমার উপায়ই নেই। মনীষা, কাল বেলা ১০ টায় আমার থিসিস্ দাখিল করতে হবে—আর বারো ঘণ্টা সময়ও নেই!

মনীষা ॥ আমারো নেই নেই। আমারো হয়ে এসেছে। এস না···আমার কাছে একটু বসো। তোমার আঙুলগুলি কই? আমার চুলের ভেতর দাও দেখি—

অধ্যাপক ॥···দিচ্ছি। কিন্তু আমার থিসিস্‌টা—

মনীষা ॥ শুধু চুলের ভেতর দিলেই হল? ওগুলি চুলের ভেতর এঁকে বেঁকে খেল্‌লে না কেন? তুমি কিছু জান না।···ক্ষিতীশ বাবু সেদিন—

[দরজায় ক্ষিতীশের আবির্ভাব]

ক্ষিতীশ ॥ আমি এসেছি দেবী—!

মনীষা ॥ [আতঙ্কে] না—না—না—

অধ্যাপক ॥ এসো ক্ষিতীশ —

মনীষা ॥ [রুখিয়া উঠিয়া] খবরদার, কখনো না—

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা—

মনীষা ॥ যম! যম! ও আমার যম!

ক্ষিতীশ ॥ মনীষা দেবী, আমি—

মনীষা ॥ [অধ্যাপকের হাত দুখানি আঁকড়িয়া ধরিয়া] ওরা আমায় নিয়ে যাবে। তুমি আমায় ধরে রাখ—

অধ্যাপক ॥ ওরা তোমার সেবাশুশ্রূষা কর্ত্তে এসেছে। আমাকে যে এখনি থিসিস্ লিখতে যেতে হবে—ভেবে দেখ মনীষা, আমি পি আর-এস হব···সে কি তোমারি কম গর্ব্ব মনীষা?

মনীষা ॥ রেখে দাও তোমার পি-আর-এস। তুমি আমার কাছে এস। আমার বিছানায় এস। আমার বিছানায় এস। আমার আদর করো···ভালবাসো·· আমায় একটি চুমো দাও—

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা, ছিঃ, ক্ষিতীশ, তুমি ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বোস। খানিকটা পরে এসো···এসো কিন্তু—

ক্ষিতীশ ॥ নিশ্চয়—Sir

মনীষা ॥—গেছে ?

অধ্যাপক ॥ হাঁ, গেছে। কিন্তু মনীষা, এ সব তোমার কি পাগলামি বল দেখি—

মনীষা ॥ দোরটি দাও—

অধ্যাপক ॥ ওরা তবে কি করে আসবে ?

মনীষা ॥ ওদের আসতে হবে না। ওরা এলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে—

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা,—আবার ভুল বকছ ?

মনীষা ॥ না—না, ভুল নয়। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেই ওরা আসবে। তুমি দোর দাও—

অধ্যাপক ॥ ওদের না আসতে দিলে তোমার সেবা-শুশ্রূষা কর্বে কে ?

মনীষা ॥—কেন, তুমি। তুমি আমার কাছে থাকো। এই একটি বালিশে আমরা দুজনে মাথা রাখি—মুখোমুখী হয়ে শুই, তুমি কথা বল, আমি শুনি···। আমায় একটি চুমো দাও···আমার সকল অসুখ সেরে যাবে,—সত্যি বলছি···আমি সত্যি বলছি—

অধ্যাপক ॥ কিন্তু আমার যে অবসর নেই মনীষা—। আজ রাত্রের মধ্যে আমাকে থিসিস্‌টি শেষ কর্ত্তে হবে—। এই দেখ, রাত প্রায় ১১টা হল। আর তো আমি না গিয়ে পারি নে—

মনীষা ॥ –এস !

অধ্যাপক ॥—ক্ষিতীশদের ডেকে দি—

মনীষা ॥—খবরদার। দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক ॥—তোমার শুশ্রূষা—?

মনীষা ॥—লাগবে না। আমি বেশ আছি। তুমি দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক ॥ ওরা যে এসেছে !

মনীষা ॥ [কোন কথা কহিলেন না। শালখানি মুখের ওপর টানিয়া আনিয়া মুখ ঢাকিলেন।]

অধ্যাপক ॥ মনীষা—[কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় ডাকিলেন] মনীষা !

[দ্বারে ক্ষিতীশ।]

ক্ষিতীশ ॥ বোধ হয় ঘুমিয়েছেন Sir—

অধ্যাপক ॥ আমারো তাই মনে হচ্ছে।—এস, ভেতরে এস।

মনীষা ॥ [মুখ হইতে শাল সরাইয়া] কখনো না—। আমি ঘুমুব···কিন্তু ওরা এলে আমি পাগল হয়ে যাই··· ওরা চলে যাক্—

অধ্যাপক ॥ তাহলে ক্ষিতীশ—

ক্ষিতীশ ॥ বলুন Sir—

অধ্যাপক ॥ শুশ্রূষার আজ আবশ্যক বুঝছি নে—

ক্ষিতীশ ॥ বেশ Sir, আমরা ড্রয়িং-রুমেই শুয়ে থাকব। যদি আবশ্যক হয় আমরা আসব।

মনীষা ॥ দোর দাও—

অধ্যাপক ॥ দিচ্ছি। আর কিন্তু বিরক্ত কর্ত্তে পার্ব্বে না। এই দোর দিলুম। এইবার তুমি ঘুমোও—। আমি আমার লাইব্রেরী-ঘরে লিখতে চললুম ··

মনীষা ॥ আমার পাশের এই জানলাটা—

অধ্যাপক ॥—বন্ধ কর্ব্ব ?

মনীষা ॥ তুমি কি সত্যসত্যই আমায় ছেড়ে··· লিখতে যাচ্ছ ?

অধ্যাপক ॥ না গিয়ে যে উপায় নেই মনীষা—

মনীষা ॥ তবে ওটা বন্ধ করে যাও—

অধ্যাপক ॥ কেন মনীষা ? দিব্যি হাওয়া আসছে—

মনীষা ॥ হাঁ, যতক্ষণ তুমি আছ। দিব্যি হাওয়া··· ফুরফুরে হাওয়া···! শুধু কি একা ? সঙ্গে এনেছে বকুলের আকুল গন্ধ। সে কি শুধু গন্ধ ? সেই গন্ধে ভেসে বেড়াচ্ছে আমারি মর্ম্মবাণী···তুমি আমার পাশে আছ, আমি তোমার পাশে আছি···আমরা অমর ! আমরা অমর !

অধ্যাপক ॥ বাঃ, বেশ কথা মনীষা। তবে জানালা খোলাই থাক। আমি এখন আসি—

মনীষা ॥ না—না—তবে জানালা বন্ধ করে দিয়ে যাও—

অধ্যাপক ॥ কেন ? ফুরফুরে হাওয়া···বকুলের ব্যাকুল গন্ধ—

মনীষা ॥ হাঁ, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আছ। যেই তুমি আমায় পায়ে ঠেলে দূরে যাবে···অমনি রুখে আসবে এক ঝড়ো হাওয়া ·! শুধু কি একা ? তারি সঙ্গে উড়ে

আসবে ধূলো আর মাটি…আমার সেই যুগযুগান্তের খেলার সাথী!…শুধু কি ঐ…ঐ যে আকাশ ··ওর চোখে তখন আগুন জ্বলবে…বিদ্যুতের চমকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে… তাও যদি বা না যাই, ও তখন কাঁদতে বসবে…সে চোখের জলের বৃষ্টিধারাও যদি তুচ্ছ করি…ঝড়ো হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঐ বাহিরে—। ওদের ভাণ্ডার থেকে যে রূপ আমি তোমার তরে তিলে তিলে চুরী করে তিলোত্তমা হয়ে পালিয়ে এসেছিলুম…যেই রূপ ওরা আবার তেমনি তিলে তিলে কেড়ে নেবে—

অধ্যাপক॥ তুমিও কি কোন থিসিস্ লিখছো মনীষা—? এত কথা তুমি কবে কোথা থেকে শিখলে?

মনীষা॥ কেন? ঐ ক্ষিতীশ…ঐ অপরেশ…ঐ তেজেশ…ঐ মরুত্তম…সেই ব্যোমকেশ! তারা যে এ কথা কত বার কত ভাবে আমায় বলে! কখনো কাণে-কাণে! কখনো মনে মনে!

অধ্যাপক॥ বল কি মনীষা? ওরা?

মনীষা॥ জান না তো ওদের কীর্ত্তি! গভীর রাতে আমার পাশে বসে যখন ওরা বলে ওরাই সেই ধূলা মাটী, সেই আকাশ বাতাস আগুন এবং জল, আমার জন্য ওরা ওঁৎ পেতে বসে আছে…শুধু দেখেছে…তুমি আমায় ছেড়ে কতদূর গেছ…কতদূরে আছ…বল দেখি কেমন করে আমি বাঁচি?

অধ্যাপক॥ তুমি আজ বড্ড ভুল বকছ মনীষা!

মনীষা॥ ভুল নয়, ভুল নয়। ভুল করছ তুমি। তুমি আমায় যতই ভুলছ…ততই ওরা সাহস পেয়ে এগিয়ে আসছে! তুমি আমায় ছেড়ে যতই দূরে চলে যাচ্ছ, ওরা ততই আমায় গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে!…যে চুমোটি তুমি আমায় দাও না, সেই চুমোটি ওরা দিতে পাগল! আমি কি দেখি, জানো?

অধ্যাপক॥—কি

মনীষা॥ একটা প্রকাণ্ড লড়াই আমাকে নিয়ে অহরহ চলছে!

অধ্যাপক॥ লড়াই?

মনীষা॥ হাঁ, লড়াই। কোন্ যুগে যেন তুমি মনে প্রাণে শুধু রূপই কামনা করেছিলে। সেদিন ঐ ছিল তোমার ধ্যান, ঐ ছিল তোমার তপস্যা। সেই আকর্ষণেই আমার জন্ম, হাসিমুখে তোমার তরে তিল তিল করে ওদের ঐশ্বর্য্য হরণ করে তিলোত্তমা হয়ে তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়ালুম…তুমি মনে প্রাণে সেদিন আমায় বরণ করে বুকে নিলে!··তখন…ভাঙলো ওদের ঘুম। কিন্তু জেগে উঠে ওরা দেখে আমি তোমার মনে ··আমি তোমার প্রাণে… আমি তোমার ঐ আঁখিতারার মাঝে…!…ওরা আমায় খুঁজেই পেল না…খুঁজেই পেল না…হাঃ হাঃ হাঃ [পাগলের মতো হাসিতে লাগিলেন।]

অধ্যাপক॥ সর্ব্বনাশ হল! আমার থিসিস্—

মনীষা॥ [তৎক্ষণাৎ বিরাট বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে] হাঁ, সর্ব্বনাশ হল ঐ থিসিসে! সেই দিন ওরা ঐ থিসিসের অন্ধকারে পথ পেল। আগে ওরা আমার ত্রিসীমানায়ও আসিতে সাহস পায় নি; কিন্তু যেই ওরা দেখল আমার চেয়ে তোমার কাছে থিসিস্ বড়·সেই দিন—সেই দিন হতে তুমি যতই এক-পা—এক-পা দূরে যাচ্ছ…ওরা এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে—[চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—] শেষে—অবশেষে—

অধ্যাপক॥ অবশেষে তুমি পাগলই হলে মনীষা—

মনীষা॥ [সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া] আজ কিনা ওদের আঙুল আমার মাথার চুলে কত খেলাই খেলে! ওদের ঠোঁট আমার মুখের কাছে কাঁপে! ওরা আমার পায়ে ধরে কাঁদে! কানে কানে চুপিচুপি ডাকে …আয়! আয়! আয়!··কিন্তু, তখন…তুমি—

অধ্যাপক॥ হয়তো থিসিস্ লিখি, এবং সে থিসিস্ আজ আমাকে শেষ কর্ত্তেই হবে, এই বাকী রাতটুকুর ভেতর, অতএব—

মনীষা॥ তুমি যাবে?

অধ্যাপক॥—না গিয়ে আমার উপায় নেই। অবশ্য এ ঘরেও লিখতে পারতুম, কিন্তু…তোমার জ্বালায়—

মনীষা॥ থিসিস্‌ই কি তোমার সব? আমি কি তোমার কেউ নই?

অধ্যাপক॥ তুমি আমার স্ত্রী। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মনে এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা নেচে বেড়াচ্ছে। অমন প্রশ্ন আর ক'রো না, লোকে শুনলে হাসবে। নাও, জানালা বন্ধ করে দিলুম। এইবার তবে [ঘড়ির দিকে

চাহিয়া] বারোটা বাজতে চলেছে—[ত্বরিৎপদে পার্শ্বের কক্ষে প্রস্থান।]

মনীষা ॥ শোন—শোন—

[অধ্যাপক ॥ তুমি বলে যাও, আমি লিখতে লিখতে শুনে যাচ্ছি—]

মনীষা ॥ এই যে—এই যে--ওগো--তারা এসেছে—জানলায় তারা এসেছে—

[অধ্যাপক ॥ আসুক—]

মনীষা ॥ ও—হো—হো—

[চীৎকার করিয়া উঠিয়া ভয়ে তখনি পাড়িয়া গেলেন।]

* * * *

[দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপক তাঁহার কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।]

অধ্যাপক ॥—কে ?

[বাহির হইতে ॥ আমরা—!]

অধ্যাপক ॥ কে তোমরা ?

[বাহির হইতে ॥ ঝড় উঠেছে, ধুলামাটি উড়ছে, আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টিও নামল। একসঙ্গে পঞ্চভূতের তাণ্ডব নৃত্য—!]

অধ্যাপক ॥ [ছুটিয়া মনীষার নিকট গিয়া] মনীষা—মনীষা—

[কোন উত্তর পাইলেন না—]

* * * *

[এদিকে বাহিরের চাপে দরজাটি ভাঙিতে ভাঙিতে খুলিয়া গেল। অধ্যাপকের পঞ্চ ছাত্র···ক্ষিতীশ, অপরেশ, তেজেশ, মরুত্তম এবং ব্যোমকেশ ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং মনীষার চারিপাশে ঝুঁকিয়া পড়িল।]

অধ্যাপক ॥ মনীষা—মনীষা—[পঞ্চ ছাত্র মনীষার দেহ স্পর্শ করিল।]

পঞ্চ ছাত্র ॥—হয়ে গেছে। এখন এঁকে নিতে হবে—

অধ্যাপক ॥—কোথায় ?

পঞ্চ ছাত্র ॥—শ্মশানে !

মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে-সি-আই-ই

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের শোভাবাজার রাজবংশ এক সময়ে বাঙ্গলার ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই ইতিহাস-বিশ্রুত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ (অগ্রহায়ণ,) সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে মহারাজা নবকৃষ্ণের বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ রাজবংশে বহু মনস্বী জন্ম গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। আজ, ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট এই বংশেরই আর একজন মনস্বীর চিত্রপটে অলঙ্কৃত হইল।

মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কে-সি-আই-ই মহোদয় শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র—এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সপ্তম পুত্র।

পুত্রসন্তান না থাকায় মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা গোপীমোহন দেবকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর জন্ম গ্রহণ করেন। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান-প্রণেতা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে-সি-এস-আই রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র।

তরুণ জীবনে

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর (২৫এ আশ্বিন, সন ১২২৯ সাল) মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কতকগুলি বিশেষ পদের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলার অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া ঐ সকল পদে

লোক নিযুক্ত করেন। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ তৎকালে মাত্র তরুণ যুবক ছিলেন। তথাপি, তিনি এইরূপ একটি পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বর্ষ পরে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ এই পদ ত্যাগ করেন।

সাধারণের কার্য্য

এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতার অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম গভর্ণর, এবং চব্বিশ পরগণার জেলা বোর্ডের (তৎকালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার সদস্য পদে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতেন) সদস্য পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তিনি এই সকল পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

তদ্ব্যতীত মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা সহরের অন্যতম শান্তিরক্ষক (Justice of the Peace), অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, তিনবার বাঙ্গলার জমিদার-সভার (বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন) সভাপতি, কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (আধুনিক ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী) সহকারী সভাপতি, এবং কলিকাতার 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র প্রথম সভাপতি প্রভৃতি পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন কোন সাধারণ অনুষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত স্যার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

রাজসম্মান

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রকৃষ্ণ রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নগরীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দরবার ও উৎসব হয়। সেই উৎসব উপলক্ষে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ তৎকালীন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন; এবং বড়লাটের শিবিরের অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাজার শিবির স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কে-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন; এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

অন্তিমে

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ (সন ১৩০৯ সালের ৬ই চৈত্র) মধ্যাহ্ন কালে মহারাজা বাহাদুর হৃদ-রোগে সহসা লোকান্তরিত হন। পরদিন কলিকাতা টাউন হলে লেডী ল্যান্সডাউনের চিত্রের আবরণ উন্মোচন-উৎসব ছিল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এই উৎসবে সভাপতি হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তখন বলিয়াছিলেন—"কেবল মাত্র গতকল্য আমি স্যার প্যাট্রিক প্লেফেয়ারের নিকট হইতে জানিতে পারি যে, তিনি (মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ) অদ্য অপরাহ্ণে আমাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন, এইরূপ কথা ছিল; আর এখন, এখানে আমাদের মধ্যে থাকিয়া বক্তৃতা করার পরিবর্ত্তে, তিনি পরলোকের যাত্রী হইয়াছেন। ভারতবর্ষে আমরা সকলে যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ অতর্কিত দশা-বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা মাথায় করিয়া বাস করি—এই ঘটনা তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে আমরা সকলেই আমাদের অতি আদরের স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণকে সুদীর্ঘ কাল স্মরণ করিব। তিনি সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণের আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন; সকল সদনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন অগ্রণী, এবং এই দেশের হিতানুষ্ঠানে সতত নিরত ছিলেন। তাঁহার শোচনীয় এবং আকস্মিক মৃত্যুতে আমি যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, তদ্দ্বারা কেবল আমার নিজের নহে, সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি মাত্র।"

মহারাজের বংশ

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে এক্ষণে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, এম-এ, বি-এল, (অবসর-প্রাপ্ত জেলা ও সেসনজজ), এবং গৃহীতাবসর এটর্ণী মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ত্তমান আছেন। মহারাজ-কুমার "রামায়ণের কথা ও অন্নপূর্ব্বা বিবাহ" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অন্য অনেক পুস্তিকাও এককালে বিলক্ষণ জনাদর লাভ করিয়াছিল।

অশোক

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

নিসর্গ রমার রক্ত সমঞ্জীর চরণ আঘাতে
তব শুভ জন্ম হলো কবে কোন্ আরক্ত প্রভাতে।
তার পর হতে কবি কল্পবাণী বরষে বরষে
হিঙ্গুল অক্ষরে লেখা ফুটাইছ মলয়া-পরশে।
অনাদৃত আজ, তব রসবাণী কেহ নাহি বুঝে,
কবি আজ উদাসীন, কবিরাজ রসায়নে খুঁজে।
ও-লাবণ্যে আজি তুমি রসিকেরও চিত্ত নাহি হর',
বর্ণের গিয়াছে দিন, নেত্র হতে নাসা আজ বড়।

তোমার মর্য্যাদা ছিল—ছিলে যবে ব্রজের বিপিনে,
শঙ্করের তপোবনে, পম্পা রেবা অচ্ছোদ পুলিনে।
রৈবতক-শৈলশিরে, বিদর্ভের বৃক্ষবাটিকায়,
বিদিশার পুরোদ্যানে, উজ্জয়িনী নিকুঞ্জ-শাখায়।
যক্ষপুরে উচ্চারিতে বসন্তের মঙ্গলাচরণ!
রক্ষেরাও করেনি কি তব কুঞ্জে পুরশ্রী-সাধন?

যুগে যুগে অতনুর স্বর্ণতূণ ভরেছ অশোক,
কত বিরহীর হৃদি বর্ণাঘাতে করেছ সশোক,
তোমার স্তবকে ভাবি স্তনতট, কত কুতূহলী
তরল আঁখির দৃষ্টি তব অঙ্গে পড়েছে উছলি।
ভাবি তব পর্ণজালে লুকায়েছে নয়নের তারা
তব শাখা আগুলিয়া ধরিয়াছে কত প্রিয়াহারা।
লাঞ্ছিতা সতীরে তুমি যুগে যুগে দিয়েছ সান্ত্বনা,
তব রেণু-কোষে গূঢ় আজো তার সকল যন্ত্রণা।

হেরিয়া তোমার কুঞ্জে ঋতুরাজ রথের কেতন
বধূরা বাসন্তী-রঙে রাঙাইত বিলাস-বসন।
উচ্ছলিত কোলাহল অকস্মাৎ যৌবনের পুরে
অন্তরের কুহুধ্বনি শিহরিত লক্ষ রোমাঙ্কুরে।
কিশোরীরে সীমন্তিনী করিয়াছ সীমন্ত পরশে,
দিগঙ্গনা আয়ুষ্মতী হত তব রাগ-লাক্ষারসে।
কত মধুৎসব স্মৃতি, কত হোলী লীলার আবীর,
কত স্মর-পূজাঘটা তব কুঞ্জ করেছে মন্দির।

তুমি হ'তে বনশ্রীর বয়ঃসন্ধি-বিলাস-সূচনা,
তারপর নানাপুষ্পে হ'ত তার বাসক রচনা।
বসন্তের অগ্রদূত, তপোবনে বিকাশে তোমার
হইত যোগীর রূঢ় মানসেও বসন্ত-সঞ্চার।

সে দিন গিয়াছে তব। আজি তব কুণ্ঠিত বিকাশে
মলয়া আতপ্ত হয় শুধু মোর ব্যথিত নিশ্বাসে।
বসন্ত এসেছে শুনি দিগ্‌দিগন্তে বন্ধু তোমা খুঁজি।
অতীতের স্মৃতি রক্ত লিপিখানি মোর বক্ষে গুঁজি
দাও তুমি সন্তর্পণে অকস্মাৎ নিভৃতে নীরবে;
সহসা চমকি উঠি পরিচিত ও কর-পল্লবে।
তোমার উন্মেষে শুনি মালবিকা-মঞ্জীর নিক্কণ,
জাগে মনে রসময় ভারতের নিখিল স্বপন।
সুপ্তোত্থিত বসন্তের নিদ্রারুণ বিলোচন সম
তুমি যবে জাগো বন্ধু—স্বপ্নলোকে যাত্রা হয় মম।
বর্ষে বর্ষে জাতিস্মর কর মোরে, মাতাও ইঙ্গিতে
স্মৃতি মম শত শত বসন্তের বিনোদ সঙ্গীতে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের প্রেয়সীর বিম্বাধরে হাসি
তব শোণিমায় হেরি, তাই তোমা আরো ভালবাসি।

থাক সে সকল কথা। চারিদিকে বড় কোলাহল,
একটু নিরালা পেলে দুটি কথা জানাই কেবল
অবজ্ঞাত হে অতিথি, ভাবে এরা বন্য বা বর্ব্বর
তোমারে চেনে না বলি—নাই তাই আতিথ্য সাদর,
একটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসে না প্রথম সাক্ষাতে,
বসন্ত-সূচনা-বার্ত্তা জানে এরা পঞ্জিকার পাতে।
সেই ভারতের কথা কহ তুমি রঞ্জিত কৌশলে
ইহাদের সে ভারত ডুবিয়াছে কাল-সিন্ধু-জলে।
যোগসূত্র ছিন্ন আজি বহুকাল অতীতের সনে,
বিচ্ছিন্নে কেমনে আর পুনঃ তুমি বাঁধিবে বন্ধনে?

বুঝে না তোমার ভাষা,—যতটুকু বুঝে অন্যমনা
ভাবে এরা মিথ্যা যত কু-কবির অলস জল্পনা।
অনাহূত কর্ণিকার শিমুলের উচ্চ কোলাহলে
তোমার ছন্দিত ভাষা ডুবে যায় কোথায় অতলে।
দেখ না চৌদিকে অই বিজাতীয় পুষ্প সমারোহ
তোমারে ফেলেছে ঢাকি বিথারিয়া শোণিমার মোহ।

সে দিন গিয়াছে তব, ফিরিবে না—শুনে খুশী হবে
আমারো গিয়াছে দিন। একই দশা দুজনার তবে।
তাহাতে কিসের ক্ষোভ, সাজে না ত অশোকের শোক,
মিত্রতা মোদের মাঝে এ দুর্দ্দিনে গাঢ়তর হোক্।
তাই আকিঞ্চন বন্ধু—যত দিন না হয় মরণ
বর্ষে বর্ষে এ বন্ধুরে কৃপা ক'রে করিও স্মরণ।

বিংশ-শতাব্দি

শ্রীজগৎ মিত্র

পিতাপুত্রে খাইতে বসিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্র, তাহার সহিত পরামর্শ করা চলে।

রমণীবাবু বলিলেন—তাহলে ঐখানেই ঠিক করি? কি বলো মোহিত, তোমার আপত্তি নেই তো কিছু? কিন্তু ওরা হাজার টাকার কমে রাজি হবে ব'লে তো বিশ্বাসই হয় না!

মোহিত ইতস্তত: করিয়া বলিল—আমার মত যদি জিজ্ঞেস করেন, এ বিয়েতে আমার মত নেই, বাবা।

—কেন?

মোহিত বলিল—করুণার মতো মেয়েকে ও-রকম ব্যবসাদারের ঘরে দিলে আমার মনে হয় ভারি অন্যায় হবে, বাবা। ও একটু-আধটু লেখাপড়া কর্‌তে ভালবাসে; কিন্তু ওখানে···

রমণীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—তোমার ঐ এক কথা মোহিত। ব্যবসাদারেরা কি লেখাপড়া করে না? আর পাত্রটিই বা কি মন্দ শুনি? ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বাবার ব্যবসার জন্যে বেশী পড়্‌তে পেলে না। টাকাকড়ি ওদের যথেষ্টই আছে। তা ছাড়া পাত্রের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে খোঁজ নিয়েছি। আমাদের অবস্থায় এর চেয়ে ভাল তুমি আর কি আশা কর্‌তে পার? তুমি বিদ্বান, রূপবান, ধনবান ছেলে চাও,—আমিও কি তা' চাইনে? কিন্তু হাজার টাকার বেশী দেবার যখন আমার সামর্থ্য নেই, তখন ·।

—বাবা, ঐখানেই আমার আপত্তি। করুণার মতো সুশ্রী, শিক্ষিতা মেয়েরও বিয়ের জন্যে যদি পণের কথা ভাব্‌তে হয়, তা'হলে তা'র বিয়ে না দেওয়াই ভাল। আটবছরে গৌরীদান না ক'রে তা'কে যে এতবড় কর্‌লেন, লেখাপড়া শেখালেন, সে কি এই জন্যে?

রমণীবাবু 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, পয়সা থাক্‌লে গৌরীদানই করতাম, মোহিত। নেহাৎ বাধ্য হ'য়ে বড় মেয়ে ঘরে রাখ্‌তে হয়েছে। এতদিন সময় পেয়ে মাত্র ঐ হাজার টাকাই জমাতে পেরেছি। ওর চেয়ে বেশী আর কোত্থেকে দেব? আজকালকার ছেলেদের ঐ এক কথা—লেখাপড়া! মেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, না রোজগার কর্‌তে বেরুবে? লেখাপড়া শিখেও সেইতো তা'দের হাঁড়ি ঠেল্‌তে হবে, আর ছেলে বইতে হবে। মেয়েদের লেখাপড়া আমি বড় পছন্দ করিনে। করুণা যে পড়ছে, সে একমাত্র তোমার জেদেই। তোমার মা তো পড়্‌তে-শুন্‌তে জানেন না, কিন্তু আমার তো' তা'তে কোনদিন কিছু অসুবিধে হয়নি, মোহিত।···

মোহিত আরক্তমুখে বাবার দিকে চাহিল। কয়েকটি উত্তর তাহার ঠোঁটের কাছে আসিয়া ফিরিয়া গেল। বস্তুত: বাবার এইরূপ মতবাদ আজ নতুন নয়—সহিয়া গেছে। বাবার সহিত মোহিতের বিন্দুমাত্র মিলিত না। রমণীবাবু ছিলেন ঘোর প্রাচীনপন্থী, কিন্তু মোহিত অত্যন্ত আধুনিক। কথা-কাটাকাটি রাত্রদিনই চলিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রিয়ও নহে শোভনও নহে; তাই সাধারণতঃ মোহিত বাবার কথায় উচ্চবাচ্য না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিত।

কিন্তু ভগিনীর শিক্ষার ব্যাপারে পাশ কাটাইবার উপায় ছিল না। সেই লইয়া একবার বচসা হইয়া গেছে; সে আজ দুই তিন বৎসর আগেকার কথা। রমণীবাবু কিছুতেই কন্যাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিতে রাজি নন, কিন্তু মোহিত বাঁকিয়া বসিল; বলিল—মেয়েদের প্রতি এতখানি অবিচার করিলে, তাহাদের জন্ম-অধিকারে বাধা দিলে বাড়ীর সহিত সে কোন সংস্রব রাখিবে না—যেখানে খুসী চলিয়া যাইবে। মেয়েদের এত হীন ভাবা কেন? তাহারা কি মানুষ নয়?

সেবার রমণীবাবু হার মানিয়া কন্যাকে ইস্কুলে দিলেন। কথা ছিল ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্য্যন্ত করুণার বিবাহ

স্থগিত রাখা হইবে ; কিন্তু সেটা সাময়িক নিষ্পত্তি মাত্র। পাশকরা পুত্রকে রমণীবাবু হাতছাড়া করিতে চান না। ভরসা ছিল পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি কয়েক হাজার টাকা ঘরে আনিবেন। কিন্তু সে ভরসা বুঝি আর নাই। পুত্রের আধুনিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পণের কথা দূরে থাকুক, ভাল রোজগার করিতে না পারিলে সে বিবাহই করিবে না বলিয়াছে।

পুত্রকে যাহাই বলুন, রমণীবাবু বহুদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে থাকিলে উপযুক্ত পুত্রকেও উপেক্ষা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন।

সে যাহা হোক। সম্প্রতি করুণার প্রবেশিকা পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, আর মাত্র দুইমাস বাকি। সুতরাং পুত্রের আধুনিকতাকে রমণীবাবু আর বড় বেশী বরদাস্ত করিতে রাজি নন।

ব্যবসাদার পাত্র সম্বন্ধে মোহিত আপত্তি তুলিলে রমণীবাবু উষ্ণ স্বরে বলিলেন,—তবে তুমিই পাত্রের সন্ধান ক'রো মোহিত। ব্যবসাদারেরা এবার থেকে আইবুড়ো হয়েই থাকুক তা'হলে। তোমাদের মাথায় কি যে আজকাল ঢুকেছে। দেখি, কতো লাটসাহেব জোটে তোমার বোনের।

মোহিত গম্ভীর স্বরে বলিল—চটুবেন না বাবা, পাত্র সন্ধানে আছে। দু'মাস সবুর করুন, করুণার পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্।

রমণীবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—পাত্রের জোগাড় করেছ ? পণ লাগ্‌বে না ?

—না!

—বিদ্বান ?···পয়সা-কড়ি আছে ?

—ছেলেটি খুব ভাল, বাবা।

রমণীবাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, কহিলেন—ছেলেটি কে হে ? আমি কি তাকে চিনিনে, মোহিত ? তা'র বাবা কি করেন ?

মোহিত বলিল—আমি যে কলেজে ঢোকবার চেষ্টা কর্‌ছি, ছেলেটি সেই কলেজেরই প্রফেসার—আমার বন্ধু, খুব ভাল ছেলে। নাম বোধ হয় শুনেছেন ? শ্রীমুরলী-চৌধুরী। তার বাবা মস্ত বড় উকিল। শশাঙ্কবাবুর নাম শোনেননি ? মুরলী বলেছে, প্রফেসারি করবে না—ব্যারিষ্টার হয়ে আস্‌বে।

বিস্ময়ে রমণীবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। পরক্ষণেই চক্ষু নামাইয়া বলিলেন—তোমার বন্ধু ? কিন্তু তুমি তো সাহিত্যিকদের সঙ্গেই বেশী মেশো! মুরলীও সাহিত্যিক নাকি ? লেখাপড়া-জানা বড়লোকের ছেলেরাও সাহিত্য-চর্চ্চা করে তা হলে ?

মোহিত আরক্তমুখে বলিল—এ আপনার কি রকম কথা বাবা ? সাহিত্যিক বল্‌তে আপনি কি মূর্খ আর আর গরীবই বোঝেন ?

—রাগ ক'রো না মোহিত। আমি মুক্ষুসুক্ষু মানুষ ; এটুকু বুঝ্‌তে পারিনে, পদ্য আর গল্প লিখে নিজের বা পরের কি উপকার হয়! ভেবে পাইনে, তোমরা রবি-ঠাকুরকে নিয়েই বা এত হই হই কর কেন! লেখার দাম যাই হোক, সাহিত্যিকদের ওপর ব্যক্তি হিসেবেও আমার আদৌ প্রীতি নেই। নামজাদা সাহিত্যিকরা স্বদেশে কি বিদেশে, বেশীর ভাগ চরিত্র হিসেবে তেমন ভাল ছিলেন না ব'লে শুনেছি···।

মোহিত বাধা দিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—বাবা, আপনি কি মুরলীবাবুকে চরিত্রহীন ব'লে সন্দেহ কর্‌ছেন ? তাহ'লে ব'লতে চান আমিও···

উত্তেজনায় মোহিত আর বলিতে পারিল না। রমণী-বাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—আমি সে কথা বলিনি, রাগ ক'রো না, মোহিত। নিজের বোনকে তুমি সৎপাত্রেই দেবে, এ আমি জানি। কিন্তু তোমার বন্ধুগুলি আমার মনঃপূত নয়, আমি শুধু তা'ই বল্‌তে চেয়েছি। তা' মুরলী যে করুণাকে না দেখে-শুনেই বিয়ে কর্‌তে রাজি হলেন ?

—রাজি তা'কে করেছি। করুণা তো অপছন্দের মেয়ে নয় ; তা'কে সে দেখেছে।

—করুণাকে দেখেছে ?···কবে দেখে গেল, সঙ্গে আর কে কে এসেছিল ? আমাকে বলনি তো।

মোহিত আমতা আমতা করিয়া বলিল—আজ্ঞে; বিশেষ কেউ নয়, সঙ্গে দু' একটি বন্ধু ছিল।

রমণীবাবু উদ্বেগের সঙ্গে বলিলেন—সঙ্গে বন্ধু ছিল ? সকলেই সাহিত্যিক নাকি ? যাক্‌গে, একদিন দেখে

গেছে তা'তে আর কি! কিন্তু দেখ মোহিত, একটা কথা তোমায় বলছি। বলি-বলি ক'রে বলাও হয়নি। আজ কথা যখন উঠেছে। দেখ, প্রত্যেক রবিবার বাইরের ঘরে ম্যালাই ছেলে-ছোকরা জমা হয় দেখেছি। কি হয় তোমাদের? সাহিত্য বুঝি? দেখ, করুণা এখন বড় হয়েছে, তা'র বিয়েরও প্রায় সব ঠিকঠাক্; সুতরাং এ বাড়ীতে আর ওই সব ছেলে ছোকরাদের ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়। বড় হয়েছ, সবই তো বোঝ! লেখাপড়া-জানা মেয়েদের মন···কিছুই তো' বলা যায় না। আজকাল আবার কি যে সব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল হয়েছে। প্রেমট্রেম আমার দুচক্ষের বিষ!···ওদের আস্‌তে বারণ ক'রে দিও, বুঝলে, বারণ ক'রে দিও···

পিতার কথায় মোহিতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, যাহা হয় হোক, স্পষ্ট জানাইয়া দি যে মুরলীও এই সাহিত্য-সভার সভ্য; কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলাইল। কতকগুলা কথা-কাটাকাটি করিয়া কি লাভ? এমন কি নির্ব্বিবাদে ভগিনীরা বিবাহের জন্ত সে তাহাদের সাহিত্য-সভা পর্য্যন্ত অন্তত্র বসাইতে লাগিল।

* * * *

মুরলীর সহিত করুণার বিবাহের সব ঠিকঠাক, কেবল কন্তার পরীক্ষা হইয়া গেলেই হয়। রমণীবাবু ভাবেন, এ ছাই পাশের আর কি প্রয়োজন? কিন্তু শুনিলেন জামাতারও নাকি একান্ত ইচ্ছা, করুণা পরীক্ষা দেয়।

পাত্র সর্ব্ববিষয়েই মনোমত। তাঁহাদের অবস্থায় এরূপ ছেলে কদাচিৎ মেলে—এ কথা রমণীবাবুর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। গৃহিণীর তৃপ্তির শেষ নাই।

কিন্তু তবু রমণীবাবুর মনটা যেন খুঁত খুঁত করিতে থাকে। অতো লেখাপড়া শিখিয়া কি-না একটি পয়সাও পণ লইবে না? আজকালকার ছেলেদের কি যে বুদ্ধি! রমণীবাবু কিছু পণ দিতে পারিলে যেন বাঁচেন। তাঁহার বিশ্বাস, বিনাপণের বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত নয়, তাহার মধ্যে দৃঢ়তাও যেন থাকে না। প্রেমের বিবাহ যেমন অত্যন্ত গর্হিত, ইহাও যেন কতকটা তেমনি। ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও পূর্ব্বে বাপপিতামহরা কন্তার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ কি?···

আর একটি বিষয় তাঁহার ভাল লাগে না। মুরলী নাকি সাহিত্যিক! ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া শিখিয়া এ সব ছেলেমানুষীর প্রয়োজন কি? কোথাও কিছু নাই, প্রেমের গল্প আর প্রেমের কবিতা লেখা,—কেন? আমাদের পবিত্র হিন্দু-সমাজে প্রেম বলিয়া কোন পদার্থ আছে নাকি? ঐ জিনিষটার স্পর্শে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম জাহান্নমে যাইবে যে। রমণীবাবু ভাবেন, বিবাহ হইয়া গেলে জামাতাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সাহিত্য হইতে বিরত করিবেন। কিন্তু নিজের পুত্রের বেলা? রমণীবাবু স্থির করিলেন, মোহিত যদি সাহিত্য না ছাড়ে তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন।

গৃহিণীকে প্রবোধ দিয়া রমণীবাবু প্রায়ই বলেন—ভয় পেয়ো না গিন্নী, আমাদের মুরলীর একটু-আধটু সাহিত্য-রোগ আছে, কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে সব সেরে যাবে। ভয় পেয়ো না···।

করুণাকেও তিনি নানা ভাবে প্রবোধ দেন। তাঁহার ধারণা সাহিত্যিকদের কেহই সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে না। সাহিত্যিককে বিবাহ করিয়া কোন মেয়েই নাকি সংসারে শান্তি পায় না। কিন্তু করুণা ভয় পাইয়াছে কিনা মুখ দেখিয়া বুঝা যায় না। বিবাহের কথায় সে সরিয়া যায়। কখনো কখনো মুখ গম্ভীর করিয়া থাকে। আবার কখনো তার দুই ঠোঁটে ক্ষীণ কৌতুকের হাসি ফুটিয়া ওঠে। করুণার আসল মনোভাবটি রমণীবাবুর হৃদয়ঙ্গম হয় না বলিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তারও অন্ত নাই।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গেছি। রমণীবাবু স্কুল-মাষ্টার—তিরিশ বছর এই কাজে চুল পাকাইয়াছেন। ঠিক তা' নয়, এই কাজে তাঁর টাক পড়িয়াছে। বর্ত্তুলাকার লম্বোদর দেহ, শ্মশ্রুগুম্ফবিমণ্ডিত উজ্জলশ্যাম আনন এবং বিরলকেশ মসৃণ মস্তক লইয়া রমণীবাবু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জাগ্রত প্রতীক। হরিভক্তির শেষ নিদর্শন কয়েকটি কেশ সেদিন পর্য্যন্ত মস্তকের পশ্চাৎভাগে দুলিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও যখন ঝরিয়া গেল, তখন রমণীবাবুর দুঃখের আর শেষ রহিল না। তিনি ঘটা করিয়া তিলক কাটিতে সুরু করিলেন।

পুরাতন এণ্ট্রেন্স পাশ করা বিদ্যায় রমণীবাবু সব কিছুই স্কুলে শিখাইতেন। ইংরাজী, অঙ্ক, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, জ্যামিতি, স্বাস্থ্যনীতি—মায় ড্রিল পর্য্যন্ত। তাহার উপর সকাল-বিকালে টিউশানি করিতেন অগুন্তি, সুতরাং এই

গল্পটির অদ্ভুত উপসংহারের জন্য রমণীবাবুকে আপনারা কেহ দোষ দিবেন না। তিরিশ বছর মাষ্টারি করিয়া ভদ্রলোকের রসবোধ জিনিষটি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য সব স্কুল-মাষ্টারই যে রমণীবাবুর মতো, এ কথা বলিতেছি না।

যাক সে কথা, এখন গল্পটাই শেষ করি। করুণার পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস দেরি। বেচারাকে খুব বেশী পরিশ্রম করিতে হইতেছে, বিশেষ করিয়া জ্যামিতি তাহার মাথায় ঢোকে না। একদিন সে বাবাকে বলিল—বাবা, 'নাইন্ পয়েন্ট সার্কল'টা একবার বুঝিয়ে দেবে?

রমণীবাবু দেখিলেন বেগতিক। তিনি উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রদের বড় পড়ান না সুতরাং জ্যামিতির সহিত পরিচয় তাঁহারও বড় বেশী নাই; কিন্তু তবু কন্যার কাছে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধে। ভাবিলেন বিকালে বাড়ী আসিয়া জ্যামিতিটা একটু দেখিয়া লইবেন। তিনি বলিতে পারিতেন—মোহিতের কাছে বুঝে নিও। কিন্তু পুত্রের কাছেও হার মানিতে রমণীবাবু রাজি নন। বলিলেন —এখন আমার সময় নেই করুণা, বিকেলে হবে'খন।

বিকালে শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া রমণীবাবু দেখিলেন, কন্যা পড়িবার ঘরে নাই। তিনি ভাবিলেন ভালই হইল, এই সুযোগে জ্যামিতিটা একবার দেখা যাক। মুস্কিল আর কি! মেয়ে-মানুষের কি যে দরকার ছিল এত!…

কিন্তু জ্যামিতিখানা খুলিয়াই রমণীবাবুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার হাতে পড়িল একখানা খোলা-চিঠি; ভ্রম বশতঃ করুণা সেখানা পুস্তকের মধ্যে রাখিয়াছিল। কে জানিত বাবা জ্যামিতি খুলিবেন? চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমণীবাবু পড়িতে লাগিলেন।

"প্রিয় বান্ধবী, আমাদের ভয় কেটে গেছে—তোমার বাবা রাজি হয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যিকদের প্রতি কেন যে তাঁর এতো অশ্রদ্ধা তা' তিনিই জানেন। তুমি যে কবিতা লেখ এ কথা তিনি বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও জানতেন না—নয়? আমাদের সাহিত্য-সভায় তুমি প্রায়ই যোগ দিতে, তাও তিনি জানেন না।—আশ্চর্য্য নয় কি? মোহিতের মুখে শুনলাম, প্রতি রবিবার বিকেলের দিকে তিনি বাড়ী থাকেন না, বুড়োদের আড্ডায় তাস খেলতে যান। ঘটনাচক্রে চোর হতে হ'ল শেষকালে। তোমার সঙ্গে চুরি করে ভাব করবার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। গোপনতার প্রয়োজন কি? তাই বলে তোমাকে কিছু বল্‌ছি না, তুমি কি করবে? তোমার বাবা যে একটা প্রাচীনপন্থী তা' জানতাম না।

পণ নেব না শুনে তোমার বাবা দুঃখিত শুনলাম। নেব না কি হাজার টাকা? বেশ কিছুদিন (Honey-moon) হনিমুন করা যাবে। না না, চোট না লক্ষীটি, ঠাট্টা কর্‌ছিলাম। 'হনিমুনের' জন্যে পয়সার অভাব হবে না।

সেদিন তোমার একটা কবিতা পড়লাম—বেশ লাগলো। আমি মেয়েদের মুখে মেয়েদের কথাই শুনতে চাই। জীবনে যা' একান্ত সত্য, তা'কে স্বীকার করতে আমাদের দেশের মেয়েরা ভয় পায় কেন? মেয়েরা ভালবাসলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে নাকি? আমাদের দেশের মেয়েরা প্রেমের কবিতা লেখেন হয় জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে, না হয় পতি-দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে, মাটির মানুষকে তাঁরা ভালবাসেন না—সত্যই কি তাই?

তুমি বলবে, মেয়েদের সমাজে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাই তারা সত্য কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু বিংশ-শতাব্দিতে এই বিশ্বব্যাপী নারী-প্রগতির যুগে ও সব বাজে যুক্তি আমি আর শুনিনে। মুক্তি যারা একান্ত করে চাইতে পারে, কার সাধ্যি তা'দের ঠেকিয়ে রাখে? প্রবল তো দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করবেই! কিন্তু দুর্ব্বলকে সবল হ'তে হবে আপনার প্রচেষ্টায়।

আমাদের দেশে মেয়েরা এখনো কেন মুক্ত হয়নি জান? তা'দের মুক্তি-সাধনায় তারা ঐ অত্যাচারী প্রবল প্রতিপক্ষেরই সাহায্য চাইচে বলে। নারী পুরুষের মুখ চেয়ে আছে কেন? যাক সে কথা।

জীবনের সহজ সত্যকে স্বীকার করার সাহস আছে ব'লে তোমার কবিতাকে আমি নতুন আলোয় দেখেছি। ভাবছি, আমার ঘরে এসে তোমার সেই সত্য-দৃষ্টি নিষ্প্রভ হ'য়ে যা'বে না তো? আমি কি তোমার উপযুক্ত হতে পারব 'কণা'? তোমাকে ঐ নামেই ডাকতে ভাল লাগে।

তোমার বাণী আরও সুস্পষ্ট হোক, সত্যনিষ্ঠ হোক, আজ এইটুকুই বন্ধুর একান্ত প্রার্থনা। তোমার পরীক্ষা

শেষ হবে কবে? ভাল করে পাশ করা চাই কিন্তু। ভালবাসা জেনো। ইতি

গুণমুগ্ধ শ্রীমুরলী চৌধুরী"

চিঠি শেষ করিয়া রমণীবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন- মোহিত!! · করুণা!!

চীৎকার শুনিয়া বাইরের ঘর হইতে মোহিত উপরে ছুটিয়া আসিল—সে কবিতা লিখিতেছিল। করুণা এবং তা'র মা ছুটিয়া আসিল পাশের ঘর হইতে। রমণীবাবু কম্পিত হস্তে চিঠিখানি মোহিতের হস্তে দিয়া রক্ত-চোখে কহিলেন—ছাখ, তোমার মুরলীর কীর্ত্তি। তোমার শিক্ষিতা বোনকেও দেখ। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা আইবুড়ো থাকলে কি হয়, তাই দেখ! ছেলেমেয়ে সাহিত্য করলে কি হয় বোঝ এইবার। করুণা, এদিকে আয়···দাঁড়া, তোকে বিতিয়ে সোজা করছি···।

রমণীবাবু ক্ষিপ্তের মতো কন্যার দিকে আগাইয়া গেলেন। গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া মাঝ-পথে বাধা দিয়া বলিলেন—ও কি, অতো বড় মেয়েকে মারবে নাকি?

রমণীবাবু গৃহিণীকে ঠেলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—চোপ্ রও! সব ঘাড় ধরে নিকাল্ করব বাড়ী থেকে। প্রেম?···আমার বাড়ীতে, হিঁদুর বাড়ীতে 'লভ্'? ঘাড় ধরে দূর করে দেব বাড়ী থেকে!···কালই সেই দোকানদারের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। 'লভ্' করা হয়েছে? মোহিত, তুই জান্‌তিস্ এ সব? কথা বল্‌ছিস না যে?

উত্তেজনায় রমণীবাবুর জিহ্বা জড়াইয়া গেল। তিনি আরো অনেক কটূক্তি করিতেন। মোহিত তাঁহাকে বাধা দিয়া জোরের সঙ্গে বলিল—বাবা, আপনি কি বল্‌ছেন? আপনি কি একেবারে পাগল হ'য়ে গেলেন! আগে মেজাজ ঠাণ্ডা করুন, ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করুন, বল্‌ছি সব। করুণার গায়ে হাত দেবেন না, ছিঃ ছিঃ, স'রে আসুন।

রমণীবাবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পাগল হয়েছি? বেশ করেছি! তোরাই তো আমায় পাগল করেছিস্। শুনব, কি শুনব শুনি? তা হ'লে তুইও এর মধ্যে ছিলি? রাস্কেল, দূর হ বাড়ী থেকে! তোর বোনকে শুদ্ধু নিয়ে যা। এ বিয়ে আমি কখনই দোব না! জানো আমি হিঁদুর সন্তান, স্কুলমাষ্টার?···

রমণীবাবু এবার করুণাকে ঠেলিয়া মোহিতের গায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। মোহিত ভগিনীকে ধরিয়া ফেলিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, আকস্মিক আঘাতে করুণার সর্ব্বাঙ্গ সাদা হইয়া গিয়াছিল—এইবার বুঝি সে জ্ঞান হারাইবে। তাই কাঁদিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না, সে দাদার দেহে ভর দিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

মোহিত বলিল—বেশ, তাই যাচ্ছি, আমি অন্য বাড়ী থেকেই বোনের বিয়ে দেব। চ' করুণা আমরা যাই, কাঁদিস্ নি···।

গৃহিণী এবার স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—ওগো, তুমি এ কি করছো। বিনাদোষে ছেলে-মেয়েকে তাড়িয়ে দেবে?

—বিনাদোষে? কেন, তোমার মেয়ে প্রেম করেনি?···

—সেতো আমরা সকলেই জানি। কেবল তুমিই চোখ বুজে ছিলে। মুরলী ওকে ভালবেসে বিয়ে করছে, করুণাও তাকে ভালবেসেছে। এ তো ভাল কথা, সৌভাগ্যের কথা! নইলে হঠাৎ মুরলীর মতো জামাই তুমি বিনা পয়সায় পেতে কোথায়?

—কি? তুমিও জান্‌তে? অথচ আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি? কতো দিন থেকে ওরা চিঠি লিখ্‌ছে, দেখা-শোনা করছে?—কতো দিন? বল? বল্‌বে না? আমার কাছে এতোদিন তুমি লুকিয়েছ কেন? সব লক্ষ্মীছাড়া! যাও, তুমিও বেরিয়ে যাও ওদের সঙ্গে। যাও, আমি কাউকেই চাইনে।

উত্তেজনায় রমণীবাবু খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। গৃহিণী তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—ওগো, তুমি কেন একে খারাপ ভাবে দেখছ? মুরলী তো করুণাকে বিয়ে করছে! বিয়ের আগে বরকনের মধ্যে জানাশোনা থাকাটা কি খারাপ? এই জানাশোনা থাকে না বলেই তো আমাদের দেশে সংসারে স্বামী স্ত্রীতে এতো অশান্তি। পছন্দের বিয়ে হয় না ব'লেই তো মেয়েরা স্বামীদের কাছে চিরকাল ছোট এবং গলগ্রহ হ'য়ে থাকে। কিন্তু দু'জনে দুজনকে পছন্দ করলে কেউ আর বড়-ছোট থাকে না। তখন দুজনেরই দায়িত্ব সমান। নয় কি? তুমিই বল···

বিস্ময়ে রমণীবাবু খানিকটা স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তার পর হঠাৎ বসিয়া

পড়িয়া বলিলেন—যাও, আমাকে ছুঁয়ো না, সরে যাও বলছি। এই যে, মুখে কথা ফুটেছে দেখছি। এতোদিন বক্তৃতা ছিল কোথায়! যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে। যাও, দূর হ'য়ে যাও—আমি এ বিয়ের মধ্যে নেই। চুলোয় যাক্ সাহিত্যিক, বিদ্বান না হাতী—

মোহিত তীব্রস্বরে বলিল—মা, আর কতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গালাগাল শুনবে? চলে এস…

—তাই চলো বাবা, চ' করুণা।

রমণীবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—চাবি নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়? করুণা চাবি দিয়ে যা'। আমার টাকা-কড়ি মিলিয়ে নেব। তোদের কারুকে বিশ্বাস নেই।

মা ও করুণার আঁচল হইতে চাবি দুটি খুলিয়া মোহিত রমণীবাবুকে দিয়া গেল। নীচে নামিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—কি হবে, মহি? উনি যে একেবারে ক্ষেপে গেছেন। এত বড় অবুঝ…।

মোহিত বলিল—তুমি ভেব না মা। এখন খানিকটা চুপ ক'রে থাকি এসো এখানে। বাবাকে চিনতে তো আর আমার বাকি নেই। এখন নিজের গোঁয়েতেই আছেন, রাগ পড়্‌লে হয় তো বুঝতে পার্‌বেন সব। বেশী কিছু হয়, দিনকতক মামার বাড়ীতেই ওঠা যাবে। সেখান থেকেই করুণার বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। দেখ দিকি মিছিমিছি কেলেঙ্কারী।…

* * * *

ছেলেমেয়ে চলিয়া যাইবার পর রমণীবাবু খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর অন্য ঘরে গিয়া চাবি দিয়া করুণার বাক্স খুলিলেন। দেখিলেন, তার মধ্যে অনেকগুলি চিঠি। খুলিয়া দেখিলেন, বেশীর ভাগই মুরলীর লেখা—দু' একটা স্কুলের মেয়েদের নিকট হইতে আসিয়াছে। এতগুলি চিঠি ডাকে আসিয়াছে, অথচ তিনি একদিনও সন্দেহ করেন নাই। তিনি ভাবিতেন সবগুলিই বুঝি সহপাঠিনীদের লেখা। কিন্তু ঠিকানায় স্পষ্ট পুরুষের হস্তাক্ষরও তিনি চিনিতে পারেন নাই কেন? রমণীবাবু রাগে দুঃখে ওষ্ঠ দংশন করিলেন।

চিঠির সঙ্গে কয়েকখানি আধুনিক মাসিক পত্রিকা। দু'টি কবিতার খাতাও সেই সঙ্গে। মাসিক পত্রগুলি খুলিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকটিতে শ্রীমতী করুণা বসুর কবিতা আছে। বিপুল ক্রোধে রমণীবাবু চিঠি, খাতা, কাগজপত্র সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিলেন। মাথায় চুল থাকিলে তাহাও ছিঁড়িতেন হয় তো।

রমণীবাবু ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বকিতে লাগিলেন—শেষে এও সাহিত্যিক? আমার চৌদ্দপুরুষ কখনো পদ্য লেখেনি—শেষে করুণা? হবে না? যেমন ভাই তার তেমনি বোন। যাক, চুলোয় যাক! এদের জন্যেই তো দেশ উচ্ছন্ন গেল, সমাজ রসাতলে গেল…।

একবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রমণীবাবু কান পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও একটুও শব্দ নাই। তাঁর গাটা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। মাথাটা যেন হিম হইয়া আসিতেছে। মস্তিষ্কে যেন 'সোঁ সোঁ' করিয়া শব্দ হইতেছে। রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া রমণীবাবু দেখিলেন, একটিও জনমানব নাই। তখন বৈশাখের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত স্তব্ধ।

রমণীবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিতে লাগিলেন—গেল যাক্। বলেও গেল না একবার। সবেতেই জোর—ভাল কথার কেউ নয়। নিজের ছেলে-মেয়ের কাছেও কুকুর হ'য়ে থাকতে হবে। হায় ভগবান, এমনি ভাগ্য। একটা ছেলে, সে'ও বশ নয়। আবার গিন্নী এককাঠি সরেশ। ছেলেমেয়ের সামনে আমায় উপদেশ। যাক্ চুলোয় যাক্, উচ্ছন্নে যাক্…।

ক্ষমা আমি করব না। করুণা যদি বলে, দোষ করেছি ক্ষমা করো, বাবা—তাহলেও না। ঐ মুরলীকে ক্ষমা চাইতে হবে। সাহিত্য ছাড়্‌তে হবে, আর হাজার টাকা পণ নিতে হবে। 'লভ'-টব্ চলবে না—আমি হিঁদুর ছেলে…

রমণীবাবু আর একবার রাস্তার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—গেছে যাক, একবার বলেও গেল না। এতই রাগ! কি আর বলেছি? বয়ে গেল! আমি না হয় মেশেই খাব এবার থেকে—বয়েই গেল ।

রমণীবাবু মাটির দিকে চাহিয়া আবার পায়চারি সুরু করিলেন। তখন নীচের একটি ঘরে ছেলে মেয়ে এবং মা পরস্পরের দিকে চাহিয়া সামনা-সামনি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া। মা ও মেয়ের চোখের অশ্রু শুকাইয়া গেছে বটে, কিন্তু তাহার সরু রেখাটি কপোল হইতে তখনো মিলাইয়া যায় নাই। আর মোহিত ভাবিতেছিল, বিংশ-শতাব্দিতে এই সব মিথ্যা পাগলামি আরো কি বরদাস্ত করিতে হইবে?…

ফ্রান্স

শ্রীভারতকুমার বসু

ব্যবহার, রুচি এবং কার্য্যের দিক দিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকের কথা ধরা যাক। ফ্রান্সের চাষারা কিম্বা কুলীরা যে কাজ করে, ; সঙ্গে তুলনায় সে কাজ কিছুমাত্র কম নয়। তারা

পরিশ্রমী, সবল-স্বাস্থ্য ফরাসী কৃষক

কাজ ক'রে যায় যেন কৌতুক উপভোগ করবার জন্যই। ইংল্যাণ্ডের কর্ম্মীদের তুলনায়, তারা আহার্য্য পায় অনেক বেশী। ফরাসী কর্ম্মীরা যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ ক'রলেও, মগজের কাজের দিক দিয়ে, মূর্ত্তি, ছবি এবং স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যকে তারা তারিফ ক'রতে পারে। তারা কোনো লোকের সামনে মাথা থেকে টুপী নামিয়ে ফেলে, সেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করবার জন্য নয়। তারা পুরুষ এবং নারী উভয়কেই সম্মান দেখাতে টুপী নামিয়ে রাখে। তারা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত হ'লেও, দস্তুরমত বুদ্ধিমান। তাদের ব্যবহার অতি চমৎকার এবং তাদের মধ্যে এমন একটী

দুয়ারের পাশে পান্থশালার অধিকারী পথিকের আশায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে

মার্জ্জিত ভাব আছে, যা কোনো দেশের কোনো শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কোনো ভদ্রলোক যদি তাদের সঙ্গে গল্প করেন, তা হ'লে তিনি বেশই লক্ষ্য ক'রবেন যে, তারাও গল্প ক'রছে যার-পর-

মেয়েরা কাপড় ধোলাই ক'রছে

শব-যাত্রী

নাই স্বাধীনভাবে অকুণ্ঠিত মনে, এবং তাদের সে গল্পের মধ্যে হাস্য-কৌতুক জড়িত থাকলেও, তাঁর সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্ম প্রত্যেক উত্তরের মধ্যে তাদের সতর্ক দৃষ্টি

বাদ্যকর

শস্য থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলছে

আছে বিলক্ষণ। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও ফরাসী চাষারা এই গুণটী থেকে বঞ্চিত ছিল না।

ফ্রান্সের চাষা মজুরদের সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড্ বড় সুন্দর অভিমত প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

কাঠুরিয়া

"ফ্রান্সের সাধারণ ব্যক্তিরাই ফরাসীদের মধ্যে সকলের চেয়ে খাঁটী লোক। আমার মনে হয়, তারা সেখানকার জন-মণ্ডলীর অমনুষ্যত্ব এবং গোলামী—এই দুটী মানসিক অবনতির হাত থেকে মুক্ত। তারা যেন ভদ্র-অভদ্র-পার্থক্যকারী একটী গুণের দ্বারা, আমার পরিচিত প্রত্যেক দেশের সাধারণ লোকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর জীবন যাপন করে।"

ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক লোকেরই বিশ্বাস, ফ্রান্সদেশে 'গার্হস্থ্য জীবন' কথাটি অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এ বিশ্বাস একান্তই অমূলক। ফ্রান্সের গার্হস্থ-জীবন ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান কিম্বা বিগত যে-কোনো যুগের গার্হস্থ্য-জীবন হ'তে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ, এবং তা অনেক বেশী শিক্ষা

পাবার সূত্র। এই গার্হস্থ্য জীবনকে ফরাসীরা অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে এমন একটী নিয়ম থাকে, যেটী বাড়ীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত মেনে চ'লতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পারিবারিক উকীল

অঙ্গ-মর্দ্দনের দ্বারা চিকিৎসা

বয়ন-যন্ত্রের জন্য শণ্-হাতে ফরাসী মেয়ে ;
এ থেকে শণের দড়ী তৈরী হবে

আলুর ক্ষেতে

অমিতব্যয়ী গৃহস্বামীর হাত থেকে সংসার-খরচের টাকা নিয়ে নিজে সে জন্য উচিত মত ব্যবস্থা ক'রতে পারেন, যাতে না গৃহস্বামীর দোষে পরিবারবর্গ কষ্ট পান। সংসারের সুবিধার জন্য, উকীল যদি ইচ্ছা করেন, তা হ'লে তাঁর বিবেচনাটীকে আইনের দ্বারা কাজে লাগাবারও ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।—এই ধরণের ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের পরিবারে একেবারে অজ্ঞাত।

ফরাসী জননীরা ছেলের কাছ থেকে যথেষ্ট

শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে থাকেন। ছেলেদের প্রতি তাঁরা খুবই স্নেহশীলা। ছেলেরা সামান্ত দোষ-ত্রুটি ক'রলে, তাঁরা কড়া শাসনের দ্বারা তাদের মনে অশান্তি আনতে চান না। অবশ্য তাঁরা যে মাঝে মাঝে তিরস্কার করেন না, তা নয়। কিন্তু সে তিরস্কার করা হয় আদরের ছলেই। ছেলেরা যে কাজ ক'রলে সন্তুষ্ট হয়, জননীরা তাদের সে সুযোগ দিয়ে থাকেন আন্তরিক ভাবেই। এই সব কারণেই তাঁরা ছেলেদের কাছ থেকে এমন নম্রতা ও শিষ্টতা পান, যা পাওয়া কোনো ইংরেজ জননীর জীবনে ঘ'টে ওঠে না। ফ্রান্সের ছেলেরা জীবন থেকেই সামাজিক শিক্ষা লাভ করে। এই সুন্দর শিক্ষাই প্রধানতঃ ফ্রান্সের সামাজিকতার পরিচয় দেয়।

ফরাসীদের মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিষ আছে। তারা আচার এবং ব্যবহারের বাইরেকার ঝকঝকানিকেই বেশী পছন্দ করে। এইটাই তাদের সাধারণ জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তারা সুন্দরভাবে কথাবার্ত্তা ক'য়ে এবং সুন্দর-ভাবে পোষাক প'রে দৃষ্টির আকর্ষণ-স্থল হ'তে চায়। তারা

পাত্লা মস্লিন্-জড়ানো প্রাচীন-যুগের টুপী-মাথায় ফরাসী মেয়ে

পথ

প্রতিক্ষণেই মায়ের অগাধ স্নেহপ্রবণতার পরিচয় পায় ব'লেই, বাপের চেয়ে হয় মা-ঘেঁষা বেশী; বিশেষভাবে যখন তারা কোনো মুস্কিলে পড়ে, তখন বাপের চেয়ে মাকেই তারা পায় সর্ব্বাগ্রে—বন্ধুরূপে, পরামর্শ-দাত্রীরূপে। তার এক-মাত্র কারণ, মায়ের সহানুভূতি এবং সাহায্য থেকে তারা কখনো বঞ্চিত হয় না।

সেখানকার ধনী, গরীব—প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। ইংল্যাণ্ডে এইভাবে একসঙ্গে বাস অতটা দেখা যায় না। সেখানকার লোকেরা গৃহ-নিজেদের ঠিক ফিট্‌ফাট্ ক'রে রাখবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করে। সুন্দর দৃশ্য, সুসজ্জিত রাজপথ, মনোমুগ্ধ-কর হর্ম্ম্য এবং তৃণ-শ্যামল মাঠ ও উদ্যানের শোভায় তারা তৃপ্তি পায়। তারা যে কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুচারু রুচির পক্ষপাতী, তার পরিচয় বেশ ভালভাবেই পাওয়া যাবে—সেখানকার অতি-অতি দরিদ্র অধিবাসীরও বাড়ীতে গেলে। কিন্তু লণ্ডনে এ পরিচয়ের একান্ত অভাব। বেশী কথা কি, ফ্রান্সের কোনো স্থানে কোনো নোঙরা পল্লী পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু ইংলণ্ডে?

বিলাতী লেখক বলেন, সমস্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অপরিচ্ছন্নতার জঞ্জাল রাশিকৃত হ'য়ে আছে আজও; এবং এগুলো নিশ্চয়ই সংরুচির পরিচায়ক নয়!

কাপড় ধোলাই

ফ্রান্সের কোনো কুলীও যদি, সদর-রাস্তা ত দূরের কথা, নিজের বাড়ীতেও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তা হ'লে তার আত্ম-সম্মান নষ্ট হবে। নিজের ঘরগুলিকে পরিষ্কার ক'রে রাখা এবং তার মধ্যে প্রত্যেক জিনিষটীকে যথাস্থানে সাজানোই হচ্ছে ফরাসী রমণীর সম্মান-রক্ষার কার্য্য। এই কাজের দায়িত্ব সে বংশ-পরম্পরায় পেয়ে থাকে। সেখানকার বড় বাড়ীতে যাঁরা 'ফ্ল্যাট্' ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাঁদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সামান্য একটু বলা দরকার। ধরুন, কোনো মহিলা ওই রকম একখানি 'ফ্ল্যাট্' ভাড়া নিয়ে আছেন। তিনি প্রত্যহ সকালে যার-পর-নাই চমৎকার ভাবে সাজ-সজ্জা ক'রে, মাথার চুলগুলিকে বেশ ক'রে আঁচ্ড়ে, মুখে-হাতে অঙ্গরাগ মেখে, গায়ে একটু 'এসেন্স্' ঢেলে, কিছুক্ষণ আয়নার সামনে নিজের মুখ খানিকে দেখে, মৃদু একটু হেসে একটা ঝুড়ি নিয়ে, পা ফেলে টুক্-টুক্ ক'রে চ'ললেন বাজার ক'রতে। দেখলে মনে হবে, সে যেন তাঁর বাজার ক'রতে যাওয়া নয়,—বিয়ে ক'রতে যাওয়া!

সেখানকার মেয়েরা গৃহ-কর্ম্মও করে যেমন সুন্দরভাবে,

নরম্যাণ্ডি-দেশের তরুণী

গির্জ্জা থেকে ফিরছে

ব্যবসাদার স্বামীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে খদ্দের-বিদায় এবং হিসাব-লেখার কাজ-ও করে তেম্নি সুন্দরভাবে। অনেক

লোকই অধিকাংশ সময়েই প্রধানতঃ স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং উপদেশ পেয়েই জীবনে উন্নতি ক'রতে পারেন। সেখানকার মেয়েরা মিতব্যয়িতার গুণ নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বোধ হয় এই কারণেই, তাদের বদ্‌নাম পেতে হয় 'কৃপণ' ব'লে। কিন্তু প্রত্যেক কাজেই যে হিসেবী হওয়া দরকার, ফরাসী মেয়েরা তারই মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত!

ফরাসীরা সৌন্দর্য্যের ভক্ত। চিত্র-শিল্পের ভিতর দিয়ে এই সৌন্দর্য্যকে পেতে হ'লে, তাই তারা চায় প্রকৃতির মূর্ত্তি

আধুনিক বিগ্রহে প্রাচীন পোষাক-পরিহিত কৃষক-দম্পতী

দেখতে! প্রকৃতি যেন নারীর বেশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। তার কুঞ্চিত, ঘন কেশদাম এলিয়ে প'ড়েছে। আয়ত তার বক্ষ। বক্ষে আঁটা র'য়েছে সুদৃশ্য 'কর্সেট্'। নারীর স্বাভাবিক, সুন্দর, সহজ মূর্ত্তি ই এই ছবির ভিতরে তারা দেখতে চায়। আর্টের জটিল্ কালোয়াতী তারা এ মূর্ত্তির মধ্যে একটুও চায় না।

মনোবৃত্তির দিক দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর লোক যারা, তারা সকল দিক দিয়েই অবস্থাপন্নদের কাছে নীচুই হ'য়ে থাকে চিরকাল। অবস্থাপন্নরা আহারে, পোষাকে, আনন্দে—সব বিষয়েই শ্রমিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীবন যাপন করে। শ্রমিকরা যেন তাদের কাছে নগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু ফ্রান্সে এই পার্থক্য-মূলক মনোবৃত্তি একেবারেই নেই। সেখানে ধনী, নির্ধন, অভিজাত,

সুরা প্রস্তুত ক'র্‌ছে

নিম্নজাত সব সমান। মিস্ হান্না লিন্‌চ্ তাঁর ফ্রান্স্-ভ্রমণের একখানি বইয়ে একটী চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রেছেন। ফ্রান্সে থাকবার সময়ে একটী কল-অধিকারী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। একদিন কল-অধিকারী তাঁর স্ত্রীর সামনে ব'সে যখন আগুনে-ঝল্‌সানো মুরগীর মাংসকে পরিষ্কার ক'রছিল, সেই সময় মিস্ হান্না তাঁদের কাছে নৃপতি এ্যালফ্রেড ও পরিত্যক্ত রুটির গল্পটী

তুললেন। কল-অধিকারীর সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে (অথবা গল্প শুনে দুঃখিত হবার ভান ক'রে) হঠাৎ ব'ললেন, "কি ব'ললেন! সেই মেয়েটী রাজা এ্যাল্‌ফ্রেড্‌কে মারলে! আর সেই মেয়ে আমারই মতো একজন চাষার মেয়ে!"—এই কথা শুনেই কল-অধিকারী তৎক্ষণাৎ বললেন, "আঃ! সেই মেয়েটী রাণী ই হোক, কিম্বা চাষার মেয়েই হোক, তাতে কোনো তফাৎ নেই। কথা হচ্ছে এই যে, সে নারী,—চিরদিনই নারী!" এই থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, ফ্রান্সে উচ্চ নীচ ব'লে কোনো পৃথক কথাই নেই। কল-অধিকারী চাষা এবং এ্যাল্‌ফ্রেডের সম্বন্ধেও ব'লতে পারতো, "তাদের দুজনের মধ্যে রাজা অরাজার কোনো পার্থক্য নেই। তারা দুজনেই পুরুষ!"—সেখানকার লোকেরা যতই অল্প অর্থ অর্জ্জন করুক না কেন, বেশী অর্থ-অর্জ্জনকারী ব্যক্তির সঙ্গে নিজেদের কোনো পার্থক্য আছে ব'লে তারা মনে করে না। অবশ্য কোনো ব্যক্তির প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেখে তারা যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয় না, তা নয়; কিন্তু তা ব'লে তারা সম্পদশালী ব্যক্তিদের কিছুতেই শ্রেষ্ঠতর ব'লতে রাজী নয়!

ফ্রান্সে কিন্তু তথা-কথিত অভিজাতদের অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের পিতৃপুরুষ বিস্তর খেতাবের মালায় গৌরবান্বিত ছিলেন। কাজেই, তাঁদেরই বংশধর যাঁরা, তাঁরা অভিজাত না হ'য়ে আর যান কোথা! এ হেন ঘোর অভিজাতরা, সাধারণ ব্যক্তিদের চেয়ে তাই নিজেদের সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর ব'লে জানাতে চান বরাবর। কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন গাঁয়ে-না-মানা আপনি-মোড়লের দল। সেখানকার লোকেরা তাঁদের প্রতি বিদ্রূপেরই হাসি হেসে থাকেন। অবশ্য তাঁরা খাতির পেয়ে থাকেন এক শ্রেণীর ব্যক্তির কাছ থেকে। এই ব্যক্তিরা হচ্ছেন ব্যবসাদার। তাঁরা খাতির করেন, কারণ, সে খাতির করার মধ্যে তাঁদের স্বার্থের উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগ।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক বলেন, ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ভদ্রানুকারী ব্যক্তি অর্থাৎ নকল ভদ্র অর্থাৎ ফোতো সাহেব দেখা যায় গণ্ডায়-গণ্ডায়। ফ্রান্সে কিন্তু ভদ্রত্বের অনুকরণ কিম্বা মেকীত্ব একেবারে অপরিজ্ঞাত। কেবল মধ্যবিত্ত-ঘরের কয়েক শ্রেণী লোক অভিজাত সাজতে চান। ভুঁই

দ্রাক্ষা-আহরণ

ব্রেটন-দেশের কৃষক-ভবনের শয়ন-কক্ষ; এখানে শয্যার স্থান, মেঝে কিম্বা চৌকী কিম্বা এই-রকম কোনো-কিছুর উপর নয়। এখানে শয্যার স্থান দেয়ালের কুলুঙ্গির ভিতরে। ছবিতে কুলুঙ্গি-শয্যাস্থলে কয়েকটী মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে

ফোঁড় হঠাৎ-অভিজাত এই সব লোক নিজেদের নামের আগে 'ডি' এই কথাটী লেখেন। তার দ্বারা তাঁরা জনসাধারণকে প্রতারিত ক'রে এইটুকু জানাতে চান যে, তাঁরা যা-তা ঘরের ছেলে নয়; তাঁদের রীতিমত

বংশ-মর্য্যাদা আছে! জার্ম্মাণ কথা "ভন্-"এর মতো আছে, সমস্তই তার স্বনাম-প্রসিদ্ধ পিতৃপুরুষের "ডি"র দ্বারা বোঝায় যে, কোনো লোকের জায়গা- সম্পত্তি!

পল্লী-দৃশ্য
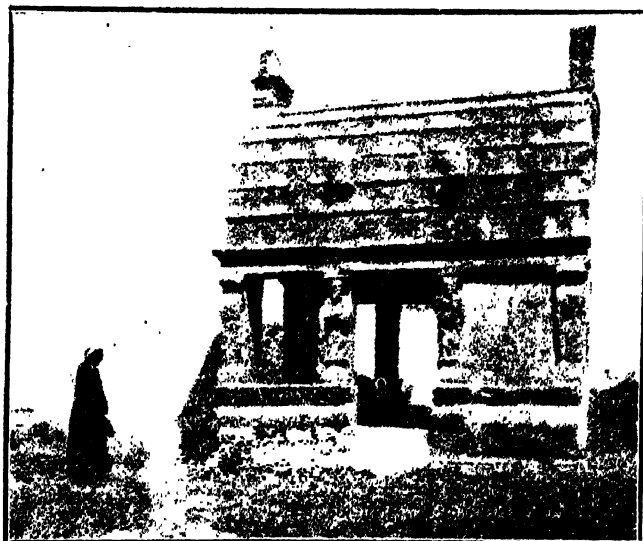
ব্রেটন্-দেশের একটী প্রাচীন মন্দির

এই মন্দিরের সামনে এসে মাঝে মাঝে কুমারীরা যীশু-জননীর কাছে স্বামী প্রার্থনা করে

জমি, কি, বাড়ী আছে; কিম্বা সে ওমুক-জায়গার জমীদার, কি হেন-তেন; কিম্বা তার যে-সব জায়গা-জমি

ফ্রান্সে কিন্তু এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁরা সাধারণের কাছ থেকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা ও সম্মান পান,—যে-রকম পান মার্কুইস্, কাউণ্ট এবং ব্যারণ প্রভৃতিরা। ওই সব ব্যক্তি সহৃদয়তা, সদাচরণ এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের পরিচয়ের জন্যই সাধারণের কাছে আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে থাকেন। তাঁরা তাঁদের বাড়ীর পুরানো ভৃত্যদের প্রতি বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। তাঁরা চাষা-ভূষো কিম্বা গরীব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে খুব সরল এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে কথাবার্ত্তা করেন। তাঁরাই আচারে-ব্যবহারে এমন একটী আদর্শ গঠন করেন, যার দ্বারা ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রের মূল্যবান বিশেষত্ব চোখে পড়ে।

ভল্টেয়ার যখন ১৪শ লুই (Louis XIV.) থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর জীবন-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে, জগৎকে একটী জিনিষ উপহার দিতে চেয়েছিলেন, তখন ফ্রান্সের সামাজিক তেজস্বিতাই তাঁর কাছে উপহার-যোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'য়েছিল। যে আভিজাত্য অর্থে গর্ব্ব না বুঝিয়ে, আত্ম-সম্ভ্রম বোধকে বোঝায়, সেই আভিজাত্যই ফ্রান্সের সামাজিক আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহারের একটী বড় সুন্দর এবং উন্নত আদর্শকে তৈরী ক'রেছে। এই আদর্শ ই ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রেছে। এমন কি, অর্দ্ধ-অসভ্য চাষারাও এই আদর্শে মনুষ্য-পদবাচ্য হ'য়ে উঠেছে।

সেখানকার একটি জিনিষ কিন্তু অনেকেরই চোখে যেন কেমন-কেমন ঠেকতে পারে। সাধারণতঃ ভদ্র

বলতে যা বোঝায়, সেখানকার ভদ্রলোকের কাছে তার মনস্তত্ত্বগত কোনো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। সেখানকার ভদ্রতার সঙ্গে অন্তরের কোনো সম্বন্ধ নেই; বাহ্যতঃই তার প্রকাশ ও উচ্ছলতা। সুতরাং কেউ যদি তাদের নিন্দা ক'রে বলেন যে, তাদের যত-কিছু সদাচরণ, সমস্তই লোক-দেখানো, তা হ'লে সে নিন্দার মধ্যে মিথ্যা থাকবে না একটুও, নিশ্চয়!

সামান্য কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে কতকগুলি যথার্থ "বীরের" দর্শন পাওয়া গিয়েছিল। প্যারিসের একটা বাজারের কাছে একখানি বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। কিছু পরেই দেখা গেল, সেই বাড়ীর ভিতর থেকে কতকগুলি সুন্দর-পোষাক-পরা "বীরপুরুষ" মেয়েদের আগেই পালিয়ে আসবার জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রছেন। তাঁদের মধ্যে সকলেই শেষে মেয়েদের ঠেলে ফেলে, তাদের ঘাড়ে-মাথায় চেপে কোনো গতিকে লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়েও এলেন। এ রকম "বীরপুরুষ" কিন্তু, সত্য কথা ব'লতে গেলে, ইংলণ্ডে পাওয়া যায় না। অবশ্য এখানে এ কথাও ব'লে রাখা দরকার যে, ফ্রান্সের যে সব ব্যক্তি উপরি-উক্ত "বীরোচিত" কার্য্য ক'রেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন "তথা-কথিত অভিজাতদের" গুষ্টির মধ্যে। একমাত্র আমোদ এবং আলস্যের সঙ্গেই তাঁদের সদ্ভাব। কাজেই, ননী-কোমল দেহে অগ্নির দৌরাত্ম্য তাঁরা সহ্য ক'রবেন কি ক'রে! এই "অভিজাত"রা ছাড়া কিন্তু ফ্রান্সের আর-সব লোকই উক্ত ব্যাপারে কর্ত্তব্যের পরিচয় দিতে ইংলণ্ডবাসী হ'তে কোনো অংশে কম যায় না।

অভিজ্ঞেরা বলেন, ফরাসীদের ধৈর্য্য, দয়া, বুদ্ধি অন্য জাতির চেয়ে কমই আছে। তারা ভিন্ন জাতীয় লোককে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে কোনো কিছু শেখাবার কষ্ট সহ্য ক'রতে একটুও রাজী নয়। একবার রুমানিয়া দেশে কামান-সজ্জা, যুদ্ধের সময় খ-পোত পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়গুলি শেখাবার জন্য কতকগুলি ফরাসী রাজ-কর্ম্মচারী শিক্ষক-রূপে প্রেরিত হ'য়ে রুমানিয়ায় গিয়েছিলেন। তখন রুমানিয়ার লোকরা খুবই আনন্দিত হ'য়ে উঠেছিল। তারা ব'লেছিল, "এটা আমাদের খুব-ই আনন্দের জিনিস হবে, কারণ, ফরাসিরা ত আমাদেরই ভাই!"—কিন্তু ফরাসী কর্ম্মচারীরা কিছুদিন থাকবার পরই রুমানিয়ান্‌দের উক্তি বদ্‌লে গেল। তারা ব'ল্‌লে, "হায়, আজ যদি আমরা ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের শিক্ষক-রূপে পেতুম, তা হ'লে আমাদের কত ভাল হ'তো!"—ফরাসী কর্ম্মচারীরা রুমানিয়ান্‌দের অনুপযুক্ত দেখে শিক্ষা দেবার কাজে নীরব হ'য়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, রুমানিয়ান্‌রা হচ্ছে যার-পর-নাই গর্দ্দভ। কাজেই, গাধাকে পিটে ঘোড়া করবার ধৈর্য্য আনবার বিষয়ে তাঁরা রীতিমত অধৈর্য্য হ'য়ে উঠলেন। রাশিয়ান্‌রাও এইভাবে ফরাসীদের কাছে কম্ ভোগান্‌টা ভোগে নি। ফরাসীদের কাছে রাশিয়ান্‌রাও অল্প বুদ্ধি

ফরাসী তন্তুবায়

অর্থাৎ মোটা-বুদ্ধি ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল!...আসল কথা হচ্ছে এই যে, প্যারিসের লোকেরা কেবল প্যারিস্‌টিকেই যেন আদর্শ ক'রে রেখেছে। তারা পৃথিবীর সমস্ত জিনিষকে প্যারিসের জিনিষের সঙ্গে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে তুলনা করে,—যা একেবারে ন্যায়সঙ্গত নয়! তারা এইটা ভাবতেই অভ্যস্ত যে, তাদের প্যারিস্ পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের উঁচুতে স্থান পাবে এবং বিভিন্ন জাতি প্যারিসেরই অনুকরণের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে ও পরিশ্রম ক'রছে। তাদের এই ধারণাকে সেখানকার ব্রিটিশ ও রাশিয়ান্ ঔপনিবেশিকেরা একেবারে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না।

তবে তারা সেখানকার নেটিভ্‌দের উক্ত চিন্তা-স্বপ্নের "সত্য"টার দিকে ফিরে তাকাবার আগ্রহ দেখায়। এর একমাত্র কারণ, তারা খুব চতুর। তাদের আগ্রহ-প্রকাশের মধ্যে কৌশলের গোপনতা ঘুমিয়ে থাকে। তারা জানে যে, তাদের ব্যবসা চালাইতে হ'লে, নেটিভ্‌দের হাতে রাখা চাই। তাদের ক্ষুণ্ণ ক'র্‌লে নিজেদের কারবারের ক্ষতি হ'তে পারে।

ফ্রান্সের প্রকৃত পরিচয় পেতে হ'লে সেখানকার চাষাদের কাছে যাওয়া উচিত। রাজনীতির তীব্র গন্ধে ভরা, কোলাহল-মুখর সহর পার হ'য়ে পল্লী-জননীর সীমাহারা করুণা যেখানে গাছে গাছে, মাঠে মাঠে অঙ্কুরের শ্যাম-শ্রী বিছিয়ে দিয়েছে, সেইখানেই কানন ক্ষেতের ভক্ত পূজারী সরল হৃদয় চাষাদের কাছেই ফ্রান্সের আসল ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে। তারা গ্রাম্য কথা, শস্যের কথা নিয়েই ভুলে থাকে। রাজনীতির উগ্রতা তাদের কাছ ঘেঁষে যাবারও জায়গা পায় না। তাদের মধ্যে বক্তৃতার উত্তেজনা নেই, অভিমতের দ্বন্দ্ব নেই, জাতীয় সমস্যার চর্চ্চা নেই, কিছু নেই! তারা একান্ত সহজ মানুষ; অন্ত-শত চিন্তা করবার বিষয়ে তারা একেবারে শক্তিহীন। কিন্তু তারাই হচ্ছে সমস্ত ফ্রান্সের একমাত্র অবলম্বন,—সুদৃঢ় মেরুদণ্ড। তারা সত্ত্ব-টত্ত্ব ব'লতে কিছু বোঝে না; বোঝে, অর্থাৎ বুঝতে চেষ্টা করে যদি সত্ত্বের দ্বারা কাজ হয় ভাল। তারা লোকদের কাছে প্রেসিডেণ্ট্‌ নির্ব্বাচনের বিষয় জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু তা প্রেসিডেণ্টের শাসন-ব্যাপার জানতে নয়। তারা শুনতে চায় যে, নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হ'লে তাদের বিষয় সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হবে, কি, না! অর্থ জমাবার দিক দিয়ে ফরাসীরা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে পরাজিত করে। সুদে-খাটানো অর্থের স্বপ্ন-আনন্দে বিভোর! ইংল্যাণ্ডে কিন্তু যারা সাপ্তাহিক মাহিনা পায়, কিম্বা অল্প মাহিনা পায়, তাদের আর ওই-ভাবে অর্থ জমানো সম্ভবপর হয় না। ফ্রান্সে কিন্তু লোকেরা যতই অল্প পারিশ্রমিক পাক না কেন, তারই ভিতর থেকে তারা কিছু না-কিছু জমাইবেই! না জমিয়ে তারা পারেই না!

বিশ্বসাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস ও বর্ত্তমান আমেরিকান্‌ সাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[পূর্ব্বাংশে মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস বলেন যে, তাঁহাকে ছাড়া অন্য কোনও বর্ত্তমান আমেরিকান্‌ সাহিত্যিককে নোবেল প্রাইজ দিয়া সম্মানিত করিলেও, আমেরিকার প্রবীণ সাহিত্য ও সমাজ-নেতাদের মধ্যে এমনই অসন্তোষ দেখা যাইত, যেমন তাঁহার বেলায় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—]

আপনারা যদি Eugene O'neillকেই নোবেল প্রাইজ দিতেন—যে ব্যক্তি এই দশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকান্‌ নাটককে বাহ্যিক কায়দার প্রাণহীন বাহাদুরীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে অন্তরের অপরূপ ভাব-ঐশ্বর্য্যে ও প্রাণ-স্পন্দনে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইলে আপনারা এই বিজ্ঞ সমালোচকদের তিরস্কার স্বরূপ হয় ত শুনিতে পাইতেন যে, ইউজিন ও'নিলের মহা-অপরাধ যে, তিনি যে-জীবন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা আমেরিকান্‌ ভব্যতার পরিমাপে বৈঠকখানার টেবিল-চেয়ারের মধ্যে সাজান যায় না—ভূমিকম্প, অথবা বিরাট ঝঞ্ঝার মত তাহা ভয়াবহ, কঠোর ও রুদ্র।

জেমস্‌ ব্রাঞ্চ ক্যাবেলের বেলায় হয় ত শুনিতেন যে সে লোকটা ঈর্ষাপরায়ণ; শুনিতেন—উইলা কাথার নারী হইয়াও "A lost lady" নামক পুস্তকে নেব্রেস্কা প্রদেশের

কৃষকদের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আমেরিকান্ নীতি-ধর্ম্মের পন্থার অনুসরণ করেন নাই; হেনরী ম্যানকেন একজন হীন নিন্দুক; শেরউড এণ্ডারসন যৌন-প্রবৃত্তিকে মৎস্য শিকারের মত জীবনের একটী অতি প্রয়োজনীয় প্রেরণা বলিয়া ভ্রান্তি পোষণ করেন; আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার আমেরিকান্ ধনতান্ত্রিকতার গৌরবকে পঙ্গু করিতে হীন চেষ্টা করিয়াছেন; জোসেফ হারগেসিমার ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য্য-বোধকে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার অমৃত-সম্বল বলিয়া ঘোষণা করিয়া আমেরিকান্ সৌন্দর্য্য-বোধকে আঘাত করিয়াছেন; আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে নিতান্ত নাবালক এবং পুস্তকে এমন সমস্ত কথা ব্যবহার করেন যে, কোনও আমেরিকান্ বৈঠকখানায় তাহা উচ্চারণ করা যায় না।

অতএব দেখিতেছেন যে, আমার স্বদেশবাসী সহযাত্রী বন্ধুরা সকলেই অতি নিন্দনীয় শ্রেণীর ব্যক্তি; তাঁহাদের কাহাকেও নির্ব্বাচিত না করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াও আপনারা আমেরিকার নিকট সেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নয়—একজন আমেরিকান্ রূপে আমি আজ আপনাদের এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে, এই টমাস ম্যান, শ, ওয়েল্‌স্, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, সেলমা লেগারলফ, হ্যনজিও ও রোলাঁর য়ুরোপে দাঁড়াইয়া আমার এই সমস্ত সহযাত্রীদের নামোল্লেখ করিতে অন্তরে মহা-গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

আজ আমাদের সাহিত্য বা শিল্পকলার সম্মুখে কোনও বৃহৎ আদর্শের মহৎ উদাহরণ নাই। আমাদের পিছনে এমন কোনও সাহিত্য-দেবতা নাই যাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে আমরা নির্ভাবনায় চলিতে পারি;—এমন কোনও শয়তান নাই, যাহার নির্দ্দেশ এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ পাই। আজ তাই আমেরিকান্ নভেল-লেখক, কবি, নাট্যকার, শিল্পী, প্রত্যেকে চারি দিকের ভাবের অরাজকতা ও চিন্তার কোলাহলের মধ্যে আপনার অন্তরের নিষ্ঠাকে একমাত্র সম্বল করিয়া সঙ্গীহীন দীর্ঘপথে একা যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হয় ত এই নিঃসঙ্গতা প্রত্যেক শিল্পীর অপরিহার্য্য ভবিতব্যতা। ভবঘুরে এবং দাগী বদমায়েস বলিয়া খ্যাত (ফ্রান্সের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি) ফ্রাঁসই ভিলোঁর ভাগ্যে কোনও দিন সভ্য-সমাজের সৌভাগ্যের স্পর্শ-লাভ ঘটে নাই। কোনও দিন তাঁহার মুমূর্ষু চিত্ত এবং তদধিক মুমূর্ষু দেহকে কেহ করুণার স্পর্শে সঞ্জীবিত করিতে চাহে নাই। আজ তাঁহার সমসাময়িক সমস্ত কার্ডিন্যাল ও ডিউকদের বিস্মৃত-স্মৃতির সমাধির উপর ভিলোঁর স্মরণ-মন্দির মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে;—কিন্তু সেদিন তাঁহাকে পোড়া রুটী খাইয়া কখনও কারাগারে, কখনও পথের ভিক্ষুকদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। *

কিন্তু আমেরিকার সাহিত্যিক অথবা শিল্পীদের এইরূপ দুঃখ দৈন্য ভোগ করিতে হয় না। আমেরিকানরা আমাদের টাকা দেয়—যথেষ্ট টাকা দেয়। সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই হতভাগ্য যাঁর পাম-বীচে নিজের ভিলা নাই—ভিলার সম্মুখে নিজের মোটরটী দাঁড়াইয়া নাই। আমেরিকান্ শিল্পীদের ইহার অপেক্ষা বেশী আর্থিক দুর্দ্দৈবের সম্মুখীন হইতে হয় না। কিন্তু আর এক রকমের মহা দুর্দ্দৈব আছে, যাহার সহিত প্রতিদিন এই সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সংগ্রাম করিতে হয়। দারিদ্র্যের যন্ত্রণার অপেক্ষা তাহার গ্লানি কম কঠোর ও তীব্র নয়। তাহার নাম নির্ম্মম উদাসীনতা। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের এই বুঝিতে দেওয়া হয় যে, আমরা যাহা সৃষ্টি করি না কেন, তাহাতে আমেরিকার কাহারও কিছু যায়-আসে না। যেখানে বাড়ী উঠে আশী-তলা, মোটর যেখানে তৈরী হয় লাখে লাখ, কারবার যেখানে হয় কোটীতে কোটীতে, সেখানে আমাদের সৃষ্টি নিরর্থকতার অভিশাপে নিশি-দিন আমাদেরই হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়া লইতেছে। আমাদের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, প্রতিষ্ঠান নাই; এমন কোনও সঙ্ঘ বা ব্যক্তি নাই যাহার প্রশংসা আমাদের প্রেরণা দিতে পারে, যাহার নিন্দা আমাদের প্রতিভাকে নন্দিত করিতে পারে।

অবশ্য American Academy of Arts and Letters আছে। এই প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন প্রকৃত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আছেন, নিকোলাস বাটলারের ন্যায় কৃতবিদ্য ও বিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালকগণ আছেন, উইলবার ক্রসের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও আছেন, এবং কয়েকজন অতি উচ্চশ্রেণীর লেখকও আছেন; কিন্তু ইহাতে নাই, থিওডর ড্রেসার, হেনরী ম্যানকেন, নাই আমেরিকার

* ভিলোঁর জীবন-কাহিনী পূর্ব্বে "বিশ্বসাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-সমালোচক জর্জ্জ নাথান, নাই আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইজিন ও'নীল, নাই আমেরিকার প্রাণবন্ত কবিরা—মিলে, জেফার্স্, স্যাণ্ডবার্গ, লিওসে; নাই আমেরিকার বিশিষ্ট নভেল-লেখকগণ উইলা কাথার, জোসেফ হারগিস্মার, শেরউড এণ্ডারসন, আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে, মেরী অষ্টিন, জেম্‌স্ ক্যাবেল, আপটন সিনক্লেয়ার।

আমি অবশ্য আশা করি না যে, এমন কোনও সৌভাগ্যশালী প্রতিষ্ঠান হইতে পারে, যাহাতে এই সমস্ত প্রতিভাশালী স্রষ্টা অন্তর্ভুক্ত হইতেন; কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান ইঁহাদের একজনেরও সাহচর্য্য লইল না, সে তো স্বেচ্ছায়, আজ যাহা প্রাণবন্ত, বীর্য্যবন্ত, অন্তরের ঐশ্বর্য্যে ধনী, তাহাকে নির্ম্মম উদাসীনতায় এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়া, জীবনের গতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। ইহা আজিকার আমেরিকার সাহিত্যের আশ্রয়-নিকেতন নয়—ইহা শুধু লংফেলোর সমাধি-ভবন।

আমি এখানে আপনাদের আবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমি শুধু আমেরিকান্ একাডেমীকে আক্রমণ করিবার জন্যই এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিতেছি না। এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ, অমায়িক এবং সম্ভ্রান্ত। এই সমস্ত সাহিত্যিককে অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারে আবার অনেক সময়, উক্ত প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সাহিত্যিকগণেরও কম অপরাধ নাই। এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিখ্যাত ভোজে আমি কখনও ড্রেসারকে অতিথিরূপে ভাবিতে পারি না—হয় ত সেখানকার আবহাওয়ায় তাঁহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে; মেনকিন উপস্থিত হইলে হয় ত বিদ্রূপে সুপেয় ও সুভোজ্যগুলিকে অকারণে তিক্ত করিয়া তুলিবেন। তাই এখানে শুধু আমি এই কথা বলিতেছিলাম যে, ইহা একান্ত দুঃখের কথা যে, এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকার প্রাণ-প্রবাহের স্পর্শ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।

শুধু এই প্রতিষ্ঠান নয়—আমাদের শিক্ষায়তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সযত্নে এই নব-সৃষ্টির প্রাণ-ধারা হইতে নিজেদের দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন। একমাত্র ফ্লোরিডার রোলিন্স কলেজ, ভারমণ্টের মিডলব্যারী কলেজ, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়, এবং চিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়—এই চারটী শিক্ষায়তন সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত কিছু সম্পর্ক রাখেন। মাত্র এই চারটী প্রতিষ্ঠান। আর আমেরিকা তাহার মোটর-ব্যবসায়ের মতন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সঙ্গীত বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ। যখনি দেখা যায় যে, গথিক ধরণের কোনও সাধারণ অট্টালিকা তৈয়ারী হইতেছে, তখনই ধরিয়া লওয়া যায় যে, এখানে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় উঠিবে, যেখানে দুই শত হইতে কুড়ি হাজার ছাত্রকে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে যে, তাহারা সযত্নে যেন বর্ত্তমান প্রতিভার সৃষ্টিকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে;—তাহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য কোনও রকমে বি-এ ডিগ্রীর গৌরব-চিহ্ন অর্জ্জন করা।

কিন্তু জ্ঞান-সাধনার শুধু একটী বিভাগে আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা ধনকুবেরদের মাথা নত হয়—সে বিজ্ঞান। আমাদের সমাজ-শীর্ষ বণিক-সম্ভ্রান্তগণ সাহিত্য বা কাব্যের কথায় যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুন না কেন, তাঁহারা একান্ত বশ্যতার সহিত মিলিকান, মাইকেলসন, ব্যাণ্টিং বা থিওবল্ড স্মিথকে সহ্য করিবেন।

সেখানে তাঁহারা প্রত্যক্ষ জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিবেন; সেখানে যে কোনও পুরাতনকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদের অন্তর বিন্দুমাত্র কাঁপিবে না। কিন্তু সাহিত্যের বিচারের বেলায় সাহিত্য-অধ্যাপকের ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয় যে, যে-মানুষকে চোখের সম্মুখে তিনি দেখিতেছেন, তিনি এই বর্ত্তমান মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া কিছু সৃষ্টি করিলে, তাহা সাহিত্য হইতেও পারে। যে-জীবন এক-শো বছরের পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং যে-ব্যক্তি সেই এক-শো বছর আগেকার জীবনের কথা লিখিয়া এক-শো বছর আগে মানব-দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আমাদের সাহিত্য-অধ্যাপকদের বিচারে আর কোনও লোকের সাহিত্যিক হইবার অধিকার নাই; যে ব্যক্তিকে আজও চোখের সামনে ঘুরিয়া ফিরিতে দেখা যায় অনেকটা অতিসাধারণ মানুষের মত—একজন মোটর-চালকের চেহারার সঙ্গে যাহার চেহারার হয় ত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—সে ব্যক্তি যে সাহিত্য-সৃষ্টি করিবে, ইহা ভাবিতে আমাদের বিজ্ঞ লোকদের অন্তরে আঘাত লাগে। তাঁহারা চান সাহিত্য হইবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নিষ্কলুষ এবং চাঞ্চল্য-রহিত,—একেবারে মৃত্যু-স্থির।

আমার মনে হয় যে, এই বিষয়ে একমাত্র আমেরিকান্ বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরাধী করা চলে না। আমি বিশেষ রকমে জানি যে, অক্‌স্‌ফোর্ড বা ক্যাম্‌ব্রিজের পণ্ডিতদের সম্মুখে যদি কেহ ওয়েল্‌স্ বা গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির সহিত—যে ওয়েল্‌স্ ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি সাহিত্যিক হিসাবে একটী অতি গুরুতর অন্যায় কাজ করিতেছেন যে তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের সহিত মৃত্যুতে-অমর স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতির যদি কোনও তুলনা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই কুৎসিত কার্য্যে শিহরিয়া উঠেন। সুইডেন, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক অধ্যাপক আছেন, যাঁহারা আজও রসানুভূতি অপেক্ষা সাহিত্যিক শব-ব্যবচ্ছেদকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু যে নূতন দেশ নূতন মানুষের প্রেরণা ও প্রাণশক্তিতে নূতন ভাবে জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—সেই আমেরিকায় সাহিত্য-অধ্যাপকদের নিকট স্বভাবতই ইহা আশা করা যায় যে, তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণ-ধারার নব-নব স্ফূর্ত্তিকে প্রাচীনতার ছায়াসমৃদ্ধ য়ুরোপের অধ্যাপকদের অপেক্ষা অধিকতর উদারতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয়, আমেরিকায় তাহা সম্ভব হয় নাই।

এক-দিকে দেশের জ্ঞান-বৃদ্ধদের নিকট কোনও প্রেরণা পাওয়া দূরে থাকুক, এইরূপ তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা—অপর দিকে আমাদের দেশে কোনও ব্রাণ্ডেস বা টেইন, গ্যেটে বা ক্রোচে নাই। আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য মেরুদণ্ডহীন ও অপরিসর। অবিবাহিতা বৃদ্ধা কুমারী, ফুটবলের ভূতপূর্ব্ব রিপোর্টার এবং জীবনের অভিজ্ঞতাহীন অধ্যাপকগণ আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের কর্ণধার। বিচারের কোনও পদ্ধতি নাই, কোনও পরিমাপ নাই।

উনবিংশ-শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ক্যামব্রিজ-কনকর্ড সম্মিলনের ফলে আমরা এমার্সন, লংফেলো, লাওয়েল, এবং হোমস্‌কে পাই; কিন্তু তাঁহারা য়ুরোপেরই প্রতিধ্বনি; এবং তাঁহারা আমেরিকায় কোনও প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হুইটম্যান, থরো এবং পো যখন আসিলেন, তখন ভব্য-সমাজ তাঁহাদের একঘরে করিয়া রাখিল। অবশেষে উইলিয়াম ডীন্ হাওয়েলস্ যখন আসিলেন, তখন একটা স্পষ্ট পরিমাপের দেখা পাওয়া গেল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরিমাপ নির্দ্ধারিত হইল, তাহা শোচনীয়।

মিঃ হাওয়েলস্ ছিলেন অতি মধুর প্রকৃতির একজন আদর্শ ভদ্রলোক। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার ছিল ধর্ম্মযাজকের বাড়ীতে গিয়া চা-পান করা। অশ্লীলতা তাঁহার আতঙ্কজনক ছিল এবং কোনও রকম পাপের চিত্র তিনি দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার মতে কৃষকদের আঁকিতে হইলে, তাহাদের গায়ের কাদা দেখান যাইতে পারে না; নাবিকদের যদি আঁকিতে হয় তাহাদের মুখে প্রার্থনা-সঙ্গীত দিতে হইবে এবং সকলের অন্তরে ফ্লোরেন্সে তীর্থ করিতে যাইবার ব্যাকুল বাসনা থাকিবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হাওয়েলসের এই প্রভাব জনসাধারণ ও শিক্ষিতদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিরাজ করে। হাওয়েলসের প্রভাবে মার্ক টোয়েনের মত সাহিত্যিককেও বৃদ্ধবয়সে "নামাবলী" গায়ে দিতে হইয়াছিল। হাওয়েলসের প্রভাব এখনও চলিয়া যায় নাই। হামলিন গার্ল্যাণ্ড হাওয়েলসের একজন বিশিষ্ট শিষ্য এবং হাওয়েলসের অনুকরণ না করিলে তিনি গুরুর অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী লেখক হইতে পারিতেন। হামলিন গার্ল্যাণ্ড তবুও আজ আমেরিকান্ সাহিত্য-সমাজের পরিচালক; এবং তরুণ লেখকদের নামোল্লেখেই তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহার ধারণায় বর্ত্তমান লেখকদের প্রকৃত শিক্ষা ও ভব্যতা-জ্ঞান নাই—কারণ তাহারা বলে যে নর-নারী সাধারণত যে ভাবে প্রেমালাপ করে তাহার সহিত প্রার্থনা-পুস্তকের পরিভাষা মিলে না; এবং তাহাদের রচিত পুস্তকে অনেক সময় সাধারণ লোকের মুখে যে সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করা হয়, তাহা মেইন ষ্ট্রীটের Women's Literary clubএ উচ্চারণ করা ন্যায়ানুমোদিত নয়। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই হ্যামলিন গ্যার্ল্যাণ্ডই তাঁহার যৌবনে এমন দুইখানি পুস্তক রচনা করেন, যাহাতে এই দুই অপরাধই বর্ত্তমান। তাঁহার "Main Traveled Roads" নামক উপন্যাসে তিনি প্রথম এই যুগে আমেরিকান্ সাহিত্যে বস্তু জ্ঞানের পরিচয় দেন।

কিশোরকালে যখন এক দূর গ্রামে বসিয়া প্রথম "Main Traveled Roads" পড়ি, তখন সেই পুস্তকে

বর্ণিত গ্রাম্য জীবনের সহিত আমার চারিদিককার গ্রাম্য জীবনের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ব্যালজাক ও ডিকেন্স পড়িয়া এই ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহারা হয় ত তাঁহাদের দেশের নিম্ন-স্তরের জীবন সম্বন্ধে সত্য কথা লিখিতে পারেন; কিন্তু আমেরিকায় যে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা কখনও ভাবি নাই। আমাদের উপন্যাসে দেখান হইত যে, আমাদের দেশের চাষীরা বা সাধারণ লোকেরা সকলেই সাধু এবং সভ্য। কিন্তু গার্ল্যাণ্ডের এই উপন্যাসে প্রথম দেখিতে পাইলাম যে, এই একজন লেখক বলিতেছেন যে, তাহারাও মাঝে মাঝে পাপ করে, ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং এমন সমস্ত কাজ করে যাহার সহিত প্রচলিত ভব্যতার আদৌ সামঞ্জস্য হয় না। এবং সেইদিন হইতে আমার মনে এই বাসনা জন্মে যে, জীবন সম্বন্ধে যদি লিখিতে হয়, এই জীবন্ত জীবন সম্বন্ধেই লিখিব।

আমার আশঙ্কা হয় যে, মিঃ গার্ল্যাণ্ড যখন শুনিবেন যে, আমি আজ যে ভাবে আমেরিকাকে চিত্রিত করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহার উদ্দীপনা প্রথম তাঁহারই নিকট হইতে পাই, হাওয়েলসের অস্তিত্বহীন আমেরিকার কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে নয়, হয় ত তখন তিনি খুব আনন্দিত হইতে পারিবেন না। এই স্বাধীনতার দেশ আমেরিকায় ইহাই চরম আক্ষেপের বিষয় যে, যে-ব্যক্তি প্রথমে মুক্তির পথ খুলিয়া দেন, তিনিই পরে সেই পথ আগলাইয়া থাকেন।

কিন্তু যখন হাওয়েলসের মত লোক আমাদের কাণে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের পাদ্রী-শাসিত গ্রামের একটা নিকৃষ্ট সংস্করণ রূপে গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিতেছিলেন, সেই সময় হুইটম্যান, ড্রেসার, মেলভিল, ম্যানকেন প্রভৃতি অগ্রসিয়া বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন যে, ধার-করা ভব্যতার মুখস্থ বুলি আওড়ান অপেক্ষা এই বিরাট জাতির বিশ্ব-সভ্যতায় দিবার উপযুক্ত আরও বৃহত্তর দান আছে।

আজ একদল সাহিত্যিক সেই নূতন প্রাণধারাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহাদের জয়গানে এই শোক-গীতির মধুর পরিসমাপ্তি করিতে চাই।

বিরাট প্রান্তর, নদ-নদী-পর্ব্বত লইয়া, আকাশচুম্বী সৌধমালাগরবী অগণিত মহানগরী লইয়া, জীর্ণ দেহ পুরাতন কেবিনের পুণ্যস্মৃতি লইয়া, কোটী কোটী স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত কোটী-কাম্য কর্ম্ম প্রেরণা লইয়া যে আমেরিকা আপনার বিরাটত্বে আপনি প্রতিষ্ঠিত, সেই আমেরিকাকে আজ যাঁহারা সাহিত্যে নবরূপ, নবশক্তি দিতেছেন, তাঁহাদের নমস্কার করিয়া এই অভিভাষণ সাঙ্গ করিলাম।

নির্ব্বাচন

শ্রীঅরুণময় সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এস্‌সি, বি-এল্

(১)

শিশিরের অর্থ ছিল প্রচুর। উচ্চ সম্মানের সহিত এম্-এ পাশ করিয়া কিছুদিন প্রোফেসরি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পর 'ল' পড়িতে আরম্ভ করে; যথাসময়ে পাশ করে এবং হাইকোর্টে প্র্যাক্টিসও সুরু করে, কি রকম হচ্ছে জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'সবুরে মেওয়া ফলে'। বিবাহ করিতে তাহার অনিচ্ছা বা অরুচি ছিল না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। কারণ, মেয়ে পছন্দ হয় না। বি-এ পাশ করিয়া অবধি বহু মেয়ে দেখিয়াছে—একটীও পছন্দ হয় না। কোথাও মেয়ে দাম্ভিকা, কোথাও অশিক্ষিতা, কোথাও বা কুৎসিতা—ইত্যাদি। অতএব—যে 'কার্ত্তিক' সে 'কার্ত্তিক'ই রহিয়া গিয়াছিল।

ভবেশ তাহার বন্ধু—পরম বন্ধু। তাহারা জমিদার। পল্লীগ্রামে বাড়ী। কলিকাতায় বাসা আছে, এবং তথায়ই বাস করে। বি-এ পাশ করিয়াই বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সরস্বতীর সেবা অপেক্ষা কমলার সেবাকেই শ্রেয় ভাবিয়া লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া দিয়া—ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসিয়াছিল।

দুই বন্ধু শিশিরের জন্য মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল। দেখার পর ভবেশ বলিল, 'চমৎকার!'

শিশির বলিল, 'ধেৎ!'

ভবেশ বলিল, 'সর্ব্বতোভাবে কাম্য।'

শিশির বলিল, 'ছাই।'

ভবেশ বলিল, 'শিশির, এ মেয়ে ছাড়িস্‌নে, বিয়ে করে ফেল্‌, নইলে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি। এ রকম কিন্তু পাবিনে আর।'

শিশির বলিল, 'তোর পচ্ছন্দ হয়েছে, আমার হয় নাই। নিজে পছন্দ করে ঠকে যাব সেও ভাল; কিন্তু যেখানে নিজের পছন্দ নেই, সেখানে শুধু অন্যের সার্টিফিকেটএ বিবাহ করে জিত্‌বারও স্পৃহা নেই।'

ভবেশ বলিল, 'তোর স্পৃহাগুলো বেশ মৌলিক। প্রোফেসরি ছেড়ে 'ল' পড়বার সময়ও এম্নি বলেছিলি। জ্বর হলে পর ডাক্তারের ইচ্ছায় কুইনাইন খাওয়ার চেয়ে নিজের ইচ্ছায় কুইনাইন না খেয়ে কষ্ট পাওয়াও ঢের ভাল—এই না তোর যুক্তি! দেখ্‌, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাটাকে এ ভাবে আঘাত করিস্‌নে।'

শিশির বলিল, 'তুই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একশবার স্বীকার করি; কিন্তু, তোর উপমাটা ঠিক হয়নি।'

ভবেশ চুপ করিয়া গেল।

(২)

কিছুদিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভবেশের বাসায় শিশির চা পান করিতেছিল। ভবেশ প্রশ্নটা পুনরায় তুলিয়া বলিল,—'রমাকে তোর পছন্দ হয় নাই বলেছিলি, তা যেন বুঝলুম। কিন্তু কেন? সে ত সুশ্রী এবং উচ্চ-শিক্ষিতা।'

শিশির বলিল, 'কারণ, সে ধনীর কন্যা, পিতা বিলাত-প্রত্যাগত; মানি সে সুন্দরী, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ভাল গাইতে পারে;—সবই স্বীকার কর্চ্ছি কিন্তু ময়্যাল এডুকেশন তার আছে? তারা ব্রাহ্মভাবাপন্ন, আর—'

ভবেশ উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া বলিল 'ব্রাহ্মভাবাপন্ন হতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম নয়; তাছাড়া ব্রাহ্মদের ময়্যাল এডুকেশন নেই এই কি তুমি বল্‌তে চাও?'

ভবেশের এই আকস্মিক উত্তেজনায় শিশির হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা না শুনেই ত বাধা দিলে, আশা করি এবার সবই শুনে তবে বাধা দেবে। দেখ, এই যে মেয়েটী, কি না ওর নাম?'

'রমা।'

'বেশ, এই যে রমা—এর আঠারো বছর বয়সের জীবনটার আলোচনা কর। দেখ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়াটাকে দোষ দিচ্ছিনা, দোষ হচ্চে এই যে—যে সোসাইটীতে ও জন্মেছে ও বেড়ে উঠেছে, যা ও দেখেছে আর শুনেছে, তাতে ওর কি শিক্ষা হয়েছে জান?' সব জিনিষকে যুক্তি দিয়ে দেখা। কথাটা বুঝিয়ে পরিষ্কার করে বলি। গ্রামের মেয়েদের সাথে এদের তুলনা কর যে কোন একটা বিষয় নিয়ে—ধর এই রামায়ণ মহাভারত। গ্রামের মেয়েরা রামায়ণ মহাভারত পড়বে অসীম ভক্তির সহিত—আর এরা পড়বে সবটাকে নিছক কবি-কল্পনা এবং বড় রকমের একটা অসম্ভব জিনিষ ভেবে। ওদের কাছে যা ধর্ম্ম, এদের কাছে তা শুধু কবি-কল্পনা—এর বেশী কিছু নয়। ভক্তিতে ওরা যা অত্যন্ত সহজ এবং সম্ভবপর দেখে, যুক্তির চক্ষে এদের কাছে তা অতি অসম্ভব এবং হাস্যকর। গ্রামের মেয়েরা শিখে সীতার পতিভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, রামের পিতৃভক্তি—শিক্ষা, যা ব্যক্তিগত-ভাবে তাদের অশেষ উপকার করে এবং সমষ্টিভাবে সমাজেরও অশেষ কল্যাণ করে। এরা কিন্তু কিছুই শিখ্‌তে পায় না। ভাবে, লক্ষ্মণ মস্ত একটা বোকা, আর সীতা অত্যন্ত সেন্টিমেন্টেল। শিলা কি করে জলে ভাসে, আর বানর কি করে কথা কয়, এই নিয়ে তর্ক করেই এদের রামায়ণ মহাভারত পাঠ সাঙ্গ হয়। আর কি অদ্ভুত শিক্ষা দেখ! বাইবেল পড়ে যীশুর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যাওয়া কিন্তু এদের অদ্ভুত ঠেকে না, কারণ এ-সব বিলিতী ভাষায় লেখা—এবং সাহেবেরা বিশ্বাস করেন।

'যুক্তি'র অত্যধিক অনুশীলনের ফল হয় এই যে, শেষটায় যীশুও এদের ধরে রাখতে পারে না—এরা নাস্তিকতায় এসে পৌঁছয়। সোনায় সোহাগা হচ্ছে এই যে, ভগবান যে আছেন, এ কথা ভাবতেও এদের occasion হয় না—সময় হয় না। এই রমার জীবনটাতেই দেখ। পূজা-পার্ব্বণ ত এদের চুলোয় গেছে,—কালীপূজা, দুর্গাপূজা, এসব ত পুতুল-পূজা। গীতা ত হিজিবিজি—Latin, Greek। তাই সকালে উঠে, চা খেয়ে কিছুক্ষণ পড়ে,

স্কুল কলেজে গিয়ে এবং তথা হতে বাড়ী ফিরে বিকাল বেলা মোটরে ঘুরে রাত্তিরে ফিরে এসে মজলিস্ বসিয়ে গান-বাজনা কিংবা পড়াশুনা কিংবা ছুটোই করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ২৪ ঘণ্টার এই রুটিনের মধ্যে এক সেকেণ্ডও আছে ভগবানের জন্ম? নেই! এ স্বীকার করতেই হবে। তার পর, স্কুল কলেজে কি শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক্। এ দেশের স্কুল-কলেজে যে ভগবানের স্থান নেই তা তুমিও জান, আমিও জানি। গড্‌লেস্ এডুকেশন পাচ্ছি আমরা। ফল হচ্ছে এই যে—বিড়ালকে 'ক্যাট্' এবং কুকুরকে 'ডগ্' বলা পর্য্যন্তই যদি আমাদের বিদ্যার দৌড় না হয়, তবে আর অল্প একটু বেশী—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

সেক্স্‌পিয়র পড়ে, মিল্টন পড়ে, শেলী পড়ে মার্জ্জিত রুচি অর্জ্জন করি—মনের বিকাশ সাধন করি, সবই করি, কিন্তু ময়্যাল দিক্ দিয়ে আমরা শিশুই থেকে যাই; ময়্যালিটীর ক, খ-ও শিক্ষা হয় না আমাদের। দেখ, মোটর কার যখন পাহাড়ের নীচে নামে তখন ব্রেক্‌এর সাহায্যে নামে। ব্রেক্ না থাক্‌লে কি তার অদৃষ্টে ঘটে, তা ত জান। যৌবন-কালটাও হচ্ছে মোটরের পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচু যাবার মত। ময়্যাল এডুকেশন ব্রেকের কাজ করে। অক্ষয় দত্তের বইএ পড়েছিলুম, যৌবন অতি বিষম কাল। তোমরা ইয়ঙ্গ-বেঙ্গল হয়ত তা স্বীকার করবে না—বলবে, এ মধুর কাল। যদিও সেটাও সত্য। পয়েণ্ট থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। বলছিলুম এই যে—ভগবান এক্। ভগবান সম্বন্ধে ধারণা অনেক পাপ কাজ থেকে মনকে বিরত করে এবং পুণ্য কাজ কর্‌তে মনকে উৎসাহিত করে—অনুপ্রাণিত করে। এদের ধন থাক্‌তে পারে, মান থাক্‌তে পারে; কিন্তু এদের ভগবান নেই। অনেকে হয়ত তা জোর করে বলে না, public opinion-এর ভয়ে—লোক-নিন্দার ভয়ে। অনেকে হয় ত ভাবে, ভগবান থাকলে থাক্, না থাক্‌লে নেই। অনেকে হয় ত কিছুই ভাবে না। এই 'ত্রিবিধ' অনেকের কথাই বলছি, এদের ভগবান নেই, সুতরাং কিছুই নেই। এরা দেউলিয়া—ময়্যাল ইন্‌স্‌লভেণ্ট।

ভবেশ বলিল, 'ওহে Orator। রমা তোর বৌদির বোন, মনে রাখিস্। চটে গিয়ে চা-টা-বন্ধ করে দেবে কিন্তু।'

ভবেশের স্ত্রীকে শিশির বলিল, 'বৌদি, রাগ কর্‌লে।'

রমলা বলিল, 'না, রাগ করবার কি আছে এতে?'

শিশির—'তবে বলে যাব।'

রমলা—'নিশ্চয়।'

শিশির একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল—'তার পর দেখ আমাদের রুচি। বর্ত্তমান সাহিত্যে সঙ্গীতে দেখ্‌তে পাবে। সাহিত্যের নামে এগুলি কি বেরুচ্ছে? সত্যকে নির্ভয়ে বলা উপন্যাস লেখকের কাছে একটা মস্ত বড় কথা। মানব জীবনের সত্য কথাগুলোকে কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে অঙ্কন করে দেখানোই হচ্ছে তাদের কাজ। কিন্তু এর অজুহাতে কি বিশ্রী সৃষ্টিই হচ্ছে আজকাল। সত্য সীমাবদ্ধ হয়েছে নারীর বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মধ্যে। বিশ্বের আর কোথাও সত্য মিল্‌ছে না। সত্যের level দিয়ে, যেটা আর্ট নয়, লেখকরা আজ তাই চালাচ্ছে। এবং সেগুলি বেশ কাট্‌ছে, আদৃত হচ্ছে! রুচি আমাদের কি হয়েছে দেখতে পেলে? আর—'

ভবেশ বলিল, 'শিশির, আমি কিছু বলতে পারি?'

শিশির থামিল।

ভবেশ বলিল,—'কাদের কথা তুমি বলছ? আক্রমণটা ত আরম্ভ করেছিলে রমাদের সোসাইটীকে। এখন দেখছি আমাদের সবাকেই জড়িয়েছ। সবাই আমরা আসামী?'

শিশির ইহার কোন উত্তর দিল না, বলিতে লাগিল—

'তার পর আসুক থিয়েটার, বায়স্কোপ। আমাকে ভুল বুঝো না। সিনেমা ভাল জিনিষ, থিয়েটারও ভাল জিনিষ। কারণগুলাও জানি; নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ, ইত্যাদি। সবই সত্য। কিন্তু, থিয়েটার বায়স্কোপ থেকে ফিরে এসে আর যাহাই হোক বৈরাগ্যের ভাব হয় না। শিক্ষা হয়, দীক্ষা হয়—সব হয়। কিন্তু জনের স্ত্রীকে জেম্‌স্‌এর সঙ্গে প্রেমে পড়ে প্রেমলীলা করতে দেখে এসে পরনারীর প্রতি মাতৃভাব বেড়ে পড়ে না। আমোদ পাওয়া যায় এবং Up-to-dateও হওয়া যায় বটে; কিন্তু ঐ যে বলেছিলুম নৈতিক বিষয়ের ক, খ-ও শিক্ষা হয় না।'

শিশির থামিল।

ভবেশ মৃদু হাসিয়া শিশিরকে ব্যঙ্গ করিয়া স্ত্রীকে বলিল,

'দেখ রমলা! তুমি টের পেয়েছ কি না জানি না, আমি কিন্তু বহুদিন থেকে দেখে আসছি আমাদের শিশিরের যুক্তির ক্ষমতা অসাধারণ। দার্শনিকও বটে। সে এরিষ্টটল না হতেও পারে; কিন্তু হিন্দু-সমাজের পরম সৌভাগ্য যে আজ এর জীবনের সন্ধিক্ষণে শিশিরের মত reformerকে পেয়েছে। শিশির! শীগ্‌গিরই তুমি একটা কেশব সেন হতে পারবে আমি বলে দিলুম। কলেজ স্কোয়ার কিংবা মির্জ্জাপুর পার্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে দাও। দেরী করো না। বহু লোক জুটে যাবে। যা তোমার যুক্তি, যা তোমার সমালোচনা—দুদিনেই নাম করে ফেল্‌বে। বিবেকানন্দ হতে পারবে।'

শিশির রাগিয়া গেল, বলিল—'দাম্ভিক তুমি। ভাব, সব যুক্তি শুধু তোমারই আছে। আর আমরা আবল্ তাবল্ বলি। পৃথিবীতে জ্ঞানী লোক মাত্র তুমি একা। আর আমরা সব বোকা, কথা বলতেও জানি না।"

(৩)

দিন পনর পর ভবেশ একদিন সন্ধ্যা-মজলিসে শিশিরকে বলিল—'শিশির, তুমি স্বীকার কর আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার মঙ্গল চাই?'

শিশির বলিল, 'নিশ্চয়।'

ভবেশ 'বেশ; তবে শোন! ভেবে দেখলুম, তোমার সেদিনের কথাগুলো ঠিক্। বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি তুমি—তোমাকে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে করানো উচিত নয়। তাই বালীগঞ্জে বলে পাঠিয়েছি বিয়ে হবে না। তারা কিন্তু খুব আশা করেছিল!'

খুসী হইয়া শিশির বলিল, 'বেশ করেছ'।

ভবেশ বলিল, 'তুমি সত্যি বলেছ, পত্নী-নির্ব্বাচন একটা কঠিন কাজ, অত্যন্ত বেশী বিবেচনার দরকার। তোমার যে-ভাবে শিক্ষা হয়েছে, যে সমাজে তুমি বেড়ে উঠেছ, সেইরূপ শিক্ষার, সেইরূপ সমাজের মেয়ে চাই তোমার। রমার সঙ্গে বিয়ে হলে কি বিশ্রী হত! সকাল-বেলা উঠে তুমি পড়তে বসতে গীতা, আর সে খুলে বসত কেশব সেনের জীবনী। তুমি চাইতে এক্ রকম, ও চাইত অন্য রকম। তুমি বলতে সাদা চাই, ও বলত কালো চাই। জীবন নীরস, আনন্দহীন হয়ে পড়্‌ত। এরূপ শান্তিহীন বিবাহ ঢের হচ্ছে আজকাল। কারণ গার্জ্জেনরা অর্থের লোভে অন্য সব ভুলে যান্। আমারই কেস্ ধর না কেন! রমলা ত রমারই বোন—কত আর বেশী ভাল হবে? আমি যদি বলি এই কর, ঠিক জেনো এ সে করবে না। আমি যদি বলি এদিক দিয়ে যাও, ও যাবে অন্য দিক দিয়ে। কি বিপদেই না পড়েছি!'

রমলা হাসিতে লাগিল।

চোখ টিপিয়া রমলাকে সাবধান করিয়া দিয়া ভবেশ বলিল, 'তাই বলছিলুম, তোমার জন্য গ্রামের মেয়ে চাই।'

শিশির বলিল, 'তা ত বলিনি।'

ভবেশ বলিল 'না, গ্রামের নয়। সহরেরই, তবে বেশ হিন্দুভাবাপন্ন। রমাদের মত ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন নয়। এম্নি একটী মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। আজ বিকেলবেলা তোমায় আমায় যাব মেয়ে দেখতে—হাওড়ায়।'

মেয়ে দেখিয়া আসিয়া শিশির বলিল—'চেহারাটা রমার মত কিন্তু।'

ভবেশ বলিল—'দূর্! রমার চেয়ে ঢের সুন্দর। ওর লজ্জা কত! রমাটা ত নির্লজ্জ। ভাবী বরের সঙ্গে—ঐ সেদিন তোমার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলে। এটী গৃহলক্ষ্মী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এম্নি মেয়ে হিন্দু-গৃহে চাই। গীতার শ্লোক মুখস্থ আছে। ব্রত-ট্রতও করে। বেশ মেয়ে।'

শিশির বলিল, 'বেশ!'

ভবেশ বলিল 'রাজী।'

শিশির বলিল, 'রাজী।'

(৪)

সেই দিন সন্ধ্যা-বেলায় ভবেশ শিশিরের মাতাকে বলিল—'মামীমা, রমাকে বৌ করতে চেয়েছিলে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। শিশির রাজী হয়েছে।'

শিশিরের জননী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'রাজী হয়েছে! কালও ত শিশিরের সঙ্গে কথা হল, বল্লুম, বাবা মেয়েটী বেশ লক্ষ্মী, বিয়ে করে ফেল্। সে বল্লে—একে বিয়ে করলে আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এ কি করে হলো বাবা?'

ভবেশ বলিল, 'মামীমা—জান ত ভবেশ খেয়ালী। ওর ধারণা ভবানীপুর বালীগঞ্জের মেয়েরা যা-ইচ্ছে-তাই। হিন্দু-ধর্ম্ম মানে না—ব্রাহ্মভাবে চলে। পরীক্ষা করেও দেখ্‌বে না, কারো যুক্তিও শুনবে না। নিজের ধারণাটাকে অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নিয়ে বসে থাকবে। তাই আমরা যুক্তি করে, হাওড়ায় রমাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে মেয়ে দেখিয়ে এনেছি।'
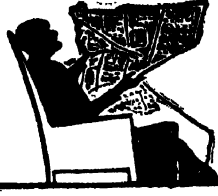
সাময়িকী

নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলার মহিলাদের কয়েকটি নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। নিজস্ব বলিতেছি এই জন্য যে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে—নারীশিক্ষার প্রথম যুগে—বাঙ্গলার পুরুষরাই বাঙ্গলার নারী-সমাজের শিক্ষা-বিধানে অগ্রসর হইয়া নারী-শিক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নারীদের শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষদের নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে, তাঁহাদের পরিচালনে, নারীদের সম্যক শিক্ষালাভ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে বেশী দিন বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে এই ব্যবস্থার সংশোধন বা পরিবর্ত্তনও সম্ভবপর হয় নাই। ক্রমে নারীরা শিক্ষালাভ করিয়া নারী-সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় নারীশিক্ষা-জগতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আমরা নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উচ্চশিক্ষিতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর মহিলারা এই নারী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—"নারীজাতি যাহাতে সুগৃহিণী, সুমাতা ও স্বাবলম্বী হইতে পারেন ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি প্রাণবান্ অঙ্গ হইয়া আপনাপন বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করা হইবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান চেষ্টা।" অনুষ্ঠান-পত্রে নারীশিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠান সকল বয়সের ও সকল অবস্থার নারীজাতির মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। যাঁহারা শুধু কেবল শিক্ষালাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন, প্রতিষ্ঠান তাঁহাদিগকে তদ্রূপ শিক্ষাই দিবেন, এবং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সেই ভাবে শিক্ষা দিতেও প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত আছেন। তদ্ব্যতীত, অর্থকরী এবং চারুশিল্প ও সুকুমার কলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এই প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা ৫২।বি রিচি রোড বা ৮০।এফ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুষমা সেন গুপ্তা এম-এ মহাশয়ার নিকট সংবাদ লইতে পারেন।

ইলেক্‌ট্রো-মেডিক্যাল এঞ্জিনীয়ার

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি Germany হইতে X Ray এবং Electro-Medical যন্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং ৪নং কুপার ষ্ট্রীটস্থ Messrs VARTON & Coর পরিচালক। বার্লিনে Messrs SANITAS Coর এই সমস্ত যন্ত্রপাতির বিশ্ববিখ্যাত বিরাট কারখানায় বহুদিন যাবৎ কার্য্য করিয়া ঐ কারখানার প্রধান Engineerএর বিশেষ শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। গত কয়েক বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে যেরূপ সর্ব্বত্র এক্স-রে ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এরূপ বিশেষজ্ঞ Engineerএর আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যতদূর জানি, বর্ত্তমানে এই সব বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের কারখানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় ইন্‌জিনিয়ার ভারতবর্ষে ইনিই প্রথম। আমরা ইঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অর্দ্ধ-নগ্ন রাজদ্রোহী ফকিরের স্পর্দ্ধা—

একদল বৃটিশ রাজনৈতিক বর্ত্তমান ভারতে দুইটী কুৎসিত ও বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছেন। একদিন—প্রায় দু'হাজার বছর পূর্ব্বে—জেরুজালেমের নিভৃত-প্রান্তরে নগ্নপদ জীর্ণবাস সন্ন্যাসী মেরীর পুত্রকে বিচরণ করিতে দেখিয়া রোমান অধিপতি যেমন সেই ভয়াবহ কদর্য্যতায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন! একটী দৃশ্য মিঃ চার্চ্চিলের চোখে পড়িয়াছে; আর একটী দেখিয়াছেন,—ভারত-বন্ধু ষ্টেট্‌সম্যান পত্র।

সমুদ্রের ও-পারে বসিয়া মানস-চক্ষে যে-দৃশ্য দেখিয়া মিঃ চার্চ্চিল বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায়—যে গান্ধী বিলাতের আইনের টোলে উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হন, সেই ব্যক্তি এখন রাজদ্রোহী ফকির সাজিয়া মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে সমান সর্ত্তে সন্ধি-আলোচনা করিবার জন্য অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় লাটপ্রাসাদের সোপান অধিরোহণ করিতেছেন—ইহা অতীব বীভৎস ও লজ্জাকর! মিঃ চার্চ্চিল বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বিশেষ করিয়া যে প্রাসাদ ও নগরী রাজ মর্য্যাদার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রায় পনেরো কোটী টাকা লাগিয়াছে!

আর একটী "Scandalous" দৃশ্য দেখিয়াছেন ভারতবন্ধু ষ্টেটস্‌ম্যান। There is something scandalous in the spectacle we are now witnessing at Delhi. * * * We find it in the clustering of the millionaires about the person of Gandhi" "সম্প্রতি দিল্লীতে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা একটী "কেলেঙ্কারী"র দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। * * * সে-দৃশ্যটী হইতেছে—যে-ভাবে ভারতের ক্রোড়পতিরা গান্ধীর দেহের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে।"

মিঃ চার্চ্চিলের সৌন্দর্য্যবোধে আঘাত লাগায় এবং ভারতবন্ধুর সামাজিক নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় বিশ্বজগতে কি ভাবান্তর ঘটিবে তাহা আমরা জানি না; কিন্তু যে দুই দৃশ্য দেখিয়া আজ তাঁহারা ঘৃণায়, ক্ষোভে ও লজ্জায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা আজ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, হিমালয়ের তুষার-কিরীটকে আলোক-মণি-মণ্ডিত করিয়া ভারতের নব-ভানু নব-অরুণোদয়ের অপূর্ব্ব মহিমায় জাগিয়া উঠিতেছে। তাহারই আলোক-চ্ছটায় আজ গঙ্গা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-কাবেরীর তীর ছাড়াইয়া বিশ্বজগৎ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছে—নূতন দিনের নূতন সূর্য্য আসিয়াছে—নূতন জগতের নূতন মহামানব দেখা দিয়াছে—ঐ নগ্নতনু শীর্ণদেহ ফকিরের অদম্য চিত্তকে আশ্রয় করিয়া। রাজনীতির ব্যবসায়ে আজ চিত্ত-ধর্ম্ম জয়ী হইতে চলিয়াছে—তাই ক্রোড়পতি হইতে দরিদ্র কৃষক তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ভারতে যাহা সম্ভব হয় নাই, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী মহাত্মা গান্ধীর ভাব-প্রেরণায় আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে—ক্রোড়পতিরা জাতির মুক্তি-আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বহু বর্ষ আগে একদিন এই ভারতে যেমন শ্রেষ্ঠী-কন্যারা পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভার পিছনে ফেলিয়া মাত্র গৈরিকবাসে ভগবান অমিতাভের বাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যকে বৈরাগ্যে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার সুন্দরতম কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আজ বহু যুগ পরে সেই ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে সেই সুন্দর দৃশ্যেরই পুনরভিনয় হইতেছে—বিংশ-শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠী-কন্যাদের জীবন-অবদানে। ঐশ্বর্য্য আজ নূতন করিয়া বৈরাগ্যের নিকট মুক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

মহাত্মায়-বড়লাটে নয়, গান্ধীতে আরউইনে মিলন

মহাত্মা গান্ধী শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ভারতের রাজ-প্রতিনিধির সহিত সামনা-সামনিভাবে মানুষের সহিত মানুষের মতন সহজভাবে সকল কথার আলোচনা করিতে চান। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আরউইন এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া আত্ম-গরিমাই বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং যে-ভাবে তিনি এই আলোচনা পরিচালন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সরকারী নিয়ম-কানুনের উর্দ্ধে উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া, তিনি এই আলোচনা একান্ত ধৈর্য্য ও উদারতার সহিত পরিচালন করিয়া শান্তি-স্থাপনের শুভেচ্ছাকে একান্ত স্পষ্টভাবেই রূপ দিয়াছেন। তাহার ফলে গত ৪ঠা মার্চ্চ অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় বৃটিশ-রাজপ্রতিনিধিরূপে আরউইন এবং ভারতের জনমতের অথবা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী এক সন্ধি-পত্রে মিলিত স্বাক্ষর করেন। যে সদিচ্ছার প্রমাণের জন্য কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া এত আন্দোলন করিয়া আসিতে-ছিলেন, এই সন্ধি-পত্র সেই সদিচ্ছার প্রতিভূ। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী অতঃপর কংগ্রেস ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র রচনায় সহযোগিতা করিবার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবে। ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র আলোচনার পূর্ব্বে যে শান্তির আব-হাওয়ার প্রয়োজন, এই ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহারই সৃষ্টি হইল। এই সন্ধির সর্ত্তগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ লোক হয় ত প্রথমেই দেখিতে চাহিবেন যে, কোন্ পক্ষের হার, কোন্ পক্ষের জিত হইল; কিন্তু সে মনোভাবের দিক হইতে এই সন্ধির সর্ত্তগুলি দেখা যুক্তি-সাপেক্ষ ও সময়ানুমোদিত হইবে না; কারণ, আসল আলোচনা অথবা পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব হইবে আগামী গোলটেবিল বৈঠকে। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষে কোনও প্রকার রেষারেষি অথবা শত্রু-মনোভাব থাকিলে, স্থির আপোষ-মীমাংসার উপযুক্ত আবহাওয়ার হানি ঘটিতে পারে। সন্ধির সর্ত্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই সেইজন্য এই ব্যাপারই নজরে পড়ে যে, যাহাতে কোনও পক্ষে আলোচনার সময়ের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ বর্দ্ধিত না হয়, এইরূপ ভাবেই সর্ত্তগুলি উভয়-পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষমতা বা নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গড়া হইয়াছে। লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধি যিনি আসিতেছেন এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের মনোভাব যদি মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোনও কারণে ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস ও সরকারের উভয়ের এই মিলিত শুভেচ্ছায় যে সুফল ফলিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

আলোচনার পূর্ব্বে সন্ধির সর্ত্ত

সরকারের পক্ষ হইতে সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। [সরকারী ঘোষণার এই অনুবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত]

নয়াদিল্লী, ৫ই মার্চ্চ

সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত সপরিষৎ বড়লাট নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রকাশ করিতেছেন :—

(১) মিঃ গান্ধী এবং বড়লাটের মধ্যে কথাবার্ত্তার ফলে স্থির হইয়াছে যে, আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হইবে এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্ট, তথা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি কার্য্য করিবেন।

(২) শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে শাসনতন্ত্রের যে ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা আরো আলোচনা করা হইবে।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যে ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন একটি সারাংশ। দেশরক্ষা, বহির্ব্যাপার, সংখ্যা-লঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা, ভারতের আর্থিক দায়িত্ব প্রভৃতি অপরিহার্য্য।

(৩) ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যাহাতে আগামী রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনায় যোগ দিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) এই আপোষ আইন-অমান্য আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

(৫) আইন-অমান্য আন্দোলন কার্য্যতঃ বন্ধ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও প্রতিদানমূলক কার্য্য করিবেন। কার্য্যতঃ আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার অর্থ উক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে, তাহা

যে প্রকারই হউক না কেন, প্রত্যাহার করা, বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি বন্ধ করা :—

(১) যে কোন আইনের ব্যবস্থার সঙ্ঘবদ্ধভাবে অমান্য।

(২) রাজস্ব ও অন্যান্য আইনসঙ্গত কর না দেওয়ার আন্দোলন।

(৩) আইন-অমান্য আন্দোলনের সমর্থন করিয়া বে-আইনী সংবাদপত্র প্রকাশ।

(৪) সাধারণ ও সামরিক কর্ম্মচারী বা গ্রাম্য কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে বা তাহাদিগকে চাকুরী ত্যাগের জন্য প্ররোচনা করার চেষ্টা।

(৫) বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন সম্পর্কে দুইটী প্রশ্ন উঠিতেছে : —প্রথম, বর্জ্জনের রকম, ও দ্বিতীয়, ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য অবলম্বিত কর্ম্মপন্থা।

গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে :—ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ অর্থনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় শিল্পকে গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতে অনুমোদন করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে প্রচার, অনুরোধ উপরোধ বা বিজ্ঞাপন দিতে গবর্ণমেণ্ট বাধা দিবেন না। কেবল দেখিতে হইবে যে, ইহা করিতে যাইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আইন ও শৃঙ্খলার বিঘ্ন জন্মান না হয়।

বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে যাইয়া কাপড় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিদেশী জিনিষের মধ্যে প্রধানতঃ বিলাতী জিনিষই বর্জ্জন করা হইয়াছে এবং ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, রাজনীতিক চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হইয়াছে।

স্বীকার করা হইয়াছে যে, এরূপ বর্জ্জন-নীতি লইয়া কংগ্রেস সরল ও অকপটভাবে ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যের এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবেন না। সুতরাং আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার অর্থ হইবে এই যে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জন-নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় যাহারা ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহারা যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকে বিনা বাধায় ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে দিতে হইবে।

(৬) বিদেশী পণ্যের পরিবর্ত্তে দেশী পণ্যের প্রচলন প্রচেষ্টার বা মাদক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, উহা সাধারণ আইনানুমোদিত পিকেটিংকে যেন ছাড়াইয়া যাইতে না পারে। ঐ ধরণের পিকেটিংয়ে ভীতি প্রদর্শন, জোর-জবরদস্তি, জুলুম, বাধাদান ইত্যাদি চলিতে পারিবে না বা সাধারণ আইনের আমলে পড়িতে পারে এরূপ কোন কার্য্য করা চলিবে না। যদি কখনও কোথাও ঐরূপ ধরণের কোন বিধি-বহির্ভূত কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানে পিকেটিং নিষিদ্ধ হইবে।

(৭) মিঃ গান্ধী পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে কতিপয় অভিযোগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ঐ সকল অভিযোগ সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্তের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের তদন্তের পথে বিশেষ বাধাবিপত্তি আছে এরূপ মনে করেন ; এবং মনে করেন যে, ইহার ফলে পুলিশ ও অপর পক্ষের মধ্যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের উদ্ভব হইবে। উহা শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মিঃ গান্ধী এই বিষয়ের উপর আর জোর না দিতে রাজী হইয়াছেন।

৮। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইলে গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

৯। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে, ঐগুলি প্রত্যাহার করা হইবে। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে যে ১নং অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে, উহা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত হইবে না।

১০। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনানুযায়ী নোটিশ জারী করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল নোটিশ জারী করা হইয়াছে, ঐগুলি প্রত্যাহার করা হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী যে সকল নোটিশ জারী করিয়াছেন, ঐগুলি এই ব্যবস্থার মধ্যে আসিবে না।

১১। (১) আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল মামলা দায়ের করা হইয়াছে, ঐগুলির সহিত হিংসানীতি অবলম্বনে প্ররোচনা ব্যতীত যদি হিংসা নীতি

অবলম্বনের কোন সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে ঐ মামলা-গুলি প্রত্যাহার করা হইবে।

(২) ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের শান্তিরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে।

(৩) কোন স্থানে কোন গবর্ণমেণ্ট আইন-ব্যবসা সম্পর্কিত বিভাগ অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কোন আইন-ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে যদি হাইকোর্টে কোন মামলা রুজু করিয়া থাকেন, তবে সেই গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিবার দরখাস্ত করিবেন।

(৪) আইন অমান্যের সহিত জড়িত কোন সৈনিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা এই বিষয়ের আওতায় পড়িবে না।

(২) (১) আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে নিরুপদ্রব অপরাধ করিয়া যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে, কিন্তু হিংসামূলক নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট বা হিংসামূলক কার্য্যে প্ররোচনা দানের সহিত সংশ্লিষ্ট আসামীগণ এই ব্যবস্থার আওতায় পড়িবে না।

(২) (২) প্যারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী কোন কয়েদী জেলে হিংসামূলক কার্য্যে প্ররোচনা দানের অপরাধে অপরাধী, অথচ হিংসামূলক কার্য্যের অপরাধে অপরাধী নহে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কোন কয়েদীর বিরুদ্ধে ঐ ধরণের কোন অভিযোগ আনীত হইয়া থাকিলে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইবে।

(৩) যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ কর্ম্মচারী বা সৈনিক আদেশ অমান্যের অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

(১২) যে সকল জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই, ঐগুলি মকুব করা হইবে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির শান্তিরক্ষামূলক ধারানুযায়ী কোন জামীন বাজেয়াপ্তের আদেশ হইয়াছে অথচ বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই, এরূপ জামীন বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে। যে সকল জরিমানার টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, ঐগুলি আর ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

(১৩) কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের খরচায় যে অতিরিক্ত পুলিশ বসান হইয়াছে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনানুসারে প্রত্যাহার করা হইবে। প্রকৃত খরচের অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট ফেরৎ দিবেন না; কিন্তু নির্দ্ধারিত ট্যাক্স যাহা আদায় হয় নাই, তাহা রেহাই দেওয়া হইবে।

(১৪) (ক) আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে অর্ডিন্যান্স অনুসারে বা ফৌজদারী আইনানুযায়ী যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে থাকিলে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

(খ) রাজস্ব অনাদায়ের জন্য যে সকল সম্পত্তি ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সে সকল সম্পত্তি কালেক্টর যদি মনে করেন যে, উহার মালিকেরা বদ মতলবক্রমে রাজস্ব আদায়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিতেছেন না, সেগুলি প্রত্যর্পণ করা হইবে। উক্ত সময় নির্দ্দেশ সম্পর্কে দেখিতে হইবে যে, এজন্য যাঁহারা রাজস্ব না দিয়াছেন, তাঁহারা উহা দিতে যে সময় চান, সেই সময়ই দিতে হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে রাজস্ব সম্পর্কীয় আইনানুসারে রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখা হইবে।

(গ) সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হইয়া থাকিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইবে।

(ঘ) যে স্থলে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্য ভাবে চূড়ান্তরকমে তৎসম্পর্ক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না এবং নীলাম বিক্রয়ে প্রাপ্ত টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে না; কিন্তু সম্পত্তির রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

(ঙ) কাহারও সম্পত্তি আইনানুযায়ী ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত হয় নাই, এই মর্ম্মে মামলা দায়ের করিলে আইনানুসারে প্রতিকার পাইবে।

(১৫) (ক) ১৯৩০ সালের নবম অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অর্ডিন্যান্সের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে কালেক্টর মনে করিবেন যে, জমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি যাহা বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করা হইয়াছে, তাহার মালিকেরা মতলবক্রমে রাজস্ব বা কর একটা নির্দ্দিষ্ট

সময় মধ্যে দিতে অস্বীকার করিবেন না, কেবল সেই সব স্থলেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইবে। রাজস্ব দিতে সম্পত্তির মালিকেরা যে সময় চাহিবেন, সেই সময় দিতে হইবে এবং দরকার হইলে রাজস্ব সম্পর্কিত আইনানুসারে রাজস্ব স্থগিত রাখা হইবে।

(গ) যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষ কিনিয়া নিয়াছে, সেই স্থলে গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া লইবেন যে, উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—মিঃ গান্ধী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তিনি খবর পাইয়াছেন যে এবং তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ঐ সকল ডিক্রির ও নিলামের কতকগুলি অন্যায় ও বে-আইনী হইয়াছে ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যতদূর খবর পাইয়াছেন, তাহাতে মিঃ গান্ধীর এই যুক্তি গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন না।

(ঘ) কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা আটক করা আইনসঙ্গত হয় নাই বলিয়া যাঁহারা মনে করিবেন, তাঁহারা আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৬) গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, কচিৎ কোথাও বাকি খাজনা আদায় বিধি-বহির্ভূতভাবে হইয়া থাকিলেও হইতে পারে ; কাজেই কোথাও এইরূপ হইয়া থাকিলে অবিলম্বে ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যদি সত্যই বে-আইনী কাজ করা হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে উহার প্রতিবিধান করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

(১৭) যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী পদত্যাগ করার পর ঐ পদে পুনরায় লোক নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে, ঐ সকল ক্ষেত্রে সরকার উক্ত পদত্যাগকারক কর্ম্মচারীকে আর ঐ পদে বহাল করিতে সক্ষম হইবেন না। আর যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ ব্যক্তিগত ভাবে বিবেচনা করিবেন এবং পদত্যাগ কালে সরকারী কর্ম্মচারিগণ পুনঃ নিয়োগ জন্য আবেদন করিলে যে নীতি হিসাবে করা হয়, এই ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারসমূহ উদারতার সহিত ঐ নীতির অনুসরণ করিবেন।

(১৮) সরকার লবণ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান আইন অমান্য উপেক্ষা করিতে পারেন না বা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় লবণ আইনের ক্ষমতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না ; তবে কতিপয় দরিদ্র দেশবাসীর সাহায্যের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রীতি মানিয়া লইতে পারেন—অ ৎ যে সকল অঞ্চল হইতে লবণ সংগ্রহ করা যায় বা তৈয়ার করা যায়, ঐ সকল অঞ্চলের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণকে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য বা আশেপাশের গ্রামগুলির মধ্যে বিক্রয়ের জন্য লবণ তৈয়ার করিতে দেওয়া হইবে ; কিন্তু ঐ অঞ্চলের বহির্ভূত কোন লোকের নিকট ঐ লবণ বিক্রয় করা চলিবে না।

(১৯) কংগ্রেস যদি এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বাধ্য-বাধকতা সকল পূর্ণভাবে মানিয়া চলিতে না পারেন, তাহা হইলে জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন মনে করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর—এইচ, ডব্লিউ, ইমার্সন, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা—

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ ম্যাহ্‌মুদ সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নিকট তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, যাহাতে আপোষ-নিষ্পত্তির সর্ত্তগুলি অবিলম্বে পালিত হয়, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহকমণ্ডলী আইন-অমান্য, করদান বন্ধ এবং সর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট অপর সকল আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। মদের ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটীং সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—

(১) ক্রেতা বা বিক্রেতা কাহারও প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করা চলিবে না,

(২) কোনও দোকানের বা বাড়ীর সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকগণ শুইয়া থাকিতে পারিবেন না,

(৩) স্বেচ্ছাসেবকগণ শোকসূচক কোনও শব্দ করিতে পারিবেন না,

(৪) কোন প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি দাহ করা বা তাহা লইয়া শোভাযাত্রা করা চলিবে না,

(৫) কোন দোকানদার বা ক্রেতাকে বয়কট করা

হইলেও তাহার খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার বাড়ীতে ভোজন, বা তাহার দ্বারা কোনও কাজ কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৬) কোন অবস্থাতেই উপবাস বা অনশন ব্রত অবলম্বন করা হইতে পারিবে না। যে ক্ষেত্রে কোনরূপ চুক্তিভঙ্গ হইবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে শ্রদ্ধার ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকিবে, কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রেই উপবাস করা যাইবে।

ইহাই মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দিষ্ট অহিংস উপায়ে পিকেটীং। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি কেহ তর্ক করেন যে, এইরূপ সর্ত্তের দ্বারা নিয়মিত হইলে বিদেশী বস্ত্র বা মদ্য বর্জ্জন সফল হইবে না, তাহা হইলে আমি বলি যে, উহা অসফলই হউক। এইরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিগণের অহিংসার বলে বিশ্বাস নাই ইহাই বুঝায়। *** আমি বিশ্বাস করি যে, আমার উপদেশ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশের মত সকলেই পালন করিবে। যদি আমার এই সর্ত্তগুলি পালন করিতে গিয়া বর্জ্জন সাফল্য লাভ না করে, আমি জানি তাহা হইলে সেই অকৃতকার্য্যতার দায়িত্ব আমারই উপর পড়িবে। আমি সে দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত।"

—

বিপ্লব-পন্থীদের কি হইবে?

দিল্লীতে সমবেত দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রসেবীদের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন "কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিপ্লবীদিগকে তাঁহাদের কার্য্য বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন বর্ত্তমান সময়ের জন্য অন্ততঃ রাজনৈতিক "পলিসি" হিসাবে অহিংস-নীতি গ্রহণ করিয়া দেশের মুক্তি-আন্দোলনে সহায়তা করেন। তাহার পর সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে এমন কি যাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাঁহারাও মুক্তি পাইবেন।"

—

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার 'বাতায়ন'-এর কবি উমা দেবী অকালে ২৩ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। উমা দেবী দর্শন-শাস্ত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক পরলোকগত মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা এবং ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট ষ্টোন কোম্পানীর ম্যানেজার বিলাত-প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা দেশে যে কয়েকটী খ্যাতনামা মহিলা কবি আছেন, উমা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার খ্যাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'ঘুমের আগে' পড়িয়াই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম; তাহার পর এই অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার 'বাতায়ন' বাঙ্গালা দেশের কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম, উমা দেবীর অতুলনীয় প্রতিভা কালে অধিকতর বিকশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিবে। কিন্তু, সকল আশাই বৃথা হইল, উমা অকালে চলিয়া গেলেন। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ উমা দেবীর কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উমা দেবী তাঁহার সরস কবিচিত্তের স্পর্শে, কমনীয় ব্যবহারে, অনাবিল সৌজন্যে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমরা শ্রীভগবানের কাছে উমা দেবীর শুভ্র পবিত্র আত্মার পরম শান্তি কামনা করি।

—

রোগ—বাজেটে ঘাটতি, প্রতিকার—কর-বৃদ্ধি

ভারত-সরকার এবং বাঙ্গলা সরকার যথারীতি তাঁহাদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিয়াছেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই যে শোচনীয় আর্থিক দুর্দ্দশার চিত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর চিত্ত অতিমাত্রায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—ইহা কল্পনা করিতে বিশেষ কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ভারত-সরকারের বাজেটে বর্ত্তমান-বৎসরে (১৯৩০-৩১) ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও ১৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। বর্ত্তমান বর্ষে বিশ্বব্যাপী মন্দা ব্যবসায়, দেশের আর্থিক দৈন্য এবং তাহার উপর জাতীয় আন্দোলনের চাপে ভারত-সরকারের রাজস্ব বহু বিভাগে ভয়ানক হ্রাস পাইয়াছে। কাষ্টম্‌স্, আয়কর, লবণ এবং আফিমের দরুণ হ্রাস হইয়াছে, ১২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ৮৯ লক্ষ টাকা, অন্যান্য বিবিধ রাজস্ব বাবদ ১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা। কাষ্টম বিভাগে বিশেষ ভাবে কাপড় ও

পাটের উপর শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস হইয়াছে যথাক্রমে, ৩, ৪৫ লক্ষ এবং ৮৫ লক্ষ টাকা।

এখন ইহার প্রতিকার কি? ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ঠিক করিয়াছেন যে, এই ঘাটতি মিটাইবার জন্য আগামী বর্ষে (১৯৩১-৩২) ভারতে সাড়ে ২৩ কোটী টাকা এবং ইংলণ্ডে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ-গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতেই কি নিস্তার পাওয়া যাইবে? তাহা সত্ত্বেও আগামী বর্ষের বাজেটে ১৭ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। ঋণ-গ্রহণেও কুলাইল না—অতঃপর? অতঃপর কর-বৃদ্ধি! সামরিক বিভাগে পোনে দুই কোটী এবং অন্যান্য সিভিল বিভাগে প্রায় এক কোটী টাকা ব্যয় কমাইয়া এই ঘাটতির পরিমাণ ১৪ কোটী ৫১ লক্ষ টাকাতে দাঁড় করান যায়। এই ঘাটতি পরিপূরণের জন্য ভারত সচিব ১৪ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার কর-বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহা হইলেই ভারতসরকারের তহবিলে আগামী বর্ষে ৩১ লক্ষ টাকা থাকিয়া যাইবে!

বর্ত্তমান বৎসরের ঘাটতির জন্য ঋণগ্রহণ করা হইবে এবং আগামী বর্ষের সম্ভাব্য ঘাটতির জন্য কর-বৃদ্ধি হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নিম্নলিখিত ভাবে কর-বৃদ্ধি হইবে,—

কার্পাসজাত বস্ত্রাদি শতকরা ১০ হারের সিডিউলের শতকরা ২৲ হারে এবং শতকরা ১৫ হারের সিডিউলের শতকরা ৫ হারে এবং বিলাস-দ্রব্যের শতকরা ১০ হারের সিডিউলের শতকরা ৫ হারে বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল।

মদ ও স্পিরিটের শুল্ক শতকরা ৩০ হইতে শতকরা ৪০ হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং বিয়ারের সম্পর্কে আরও শতকরা ৬৬ হারে শুল্ক দিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকারের চিনির প্রতি-হন্দরে একটাকা চারি আনা এবং মটর পেট্রোলের প্রতি গ্যালনে দুই আনা এবং কেরোসিন প্রতি গ্যালনে তিন পয়সা এবং প্রতি আউন্স রৌপ্যের উপর দুই আনা করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইল।

ইহা ব্যতীত ভারতের অর্থসচিব স্থির করিয়াছেন যে টাকার বাট্টা ১৮ পেন্সেই স্থির করিতে হইবে।

বাঙ্গলা সরকার যে বাজেট দাখিল করিয়াছেন, তাহাও উক্তরূপ শোচনীয়। ১৯৩১-৩২ বর্ষে সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা সরকারের অর্থ-সচিব দেখাইয়াছেন যে, বৎসরের শেষে ঘাটতি পড়িবে—১ কোটী ৩৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। আইন অমান্য আন্দোলনের শক্তি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যে-ধারণা পূর্ব্বে থাকুক না কেন, এখন দেখা যাইতেছে যে তাহার ফলে বাঙ্গলা সরকারের ২৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে এবং আসল তহবিলে ঘাটতি পড়িয়াছে ৯৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে এক আবগারী-বিভাগে ঘাটতি পড়িয়াছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

বাঙ্গালা সরকার এই ঘাটতি পরিপূরণের জন্য সম্ভবতঃ ভারত সরকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, এই আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক করিতে গিয়া ভারত সরকার অথবা বাঙ্গলা সরকার হয়ত ঋণ করিয়া অথবা কর বৃদ্ধি করিয়া খাতার হিসাব বজায় রাখিতে পারেন; কিন্তু যে সমস্ত হতভাগ্য কর-দাতাগণ এই নিদারুণ আর্থিক দৈন্যের মধ্যে এই অতিরিক্ত করের বোঝা বহিবে, তাহার কথা কে ভাবিবে?

অবশ্য এ কথা ঠিকই যে, প্রত্যেক দেশই, যখন বাজেটে ঘাটতি পড়ে তখন হয় ঋণগ্রহণ করেন, না হয় কর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই দুইটী পন্থা হইল সর্ব্বশেষ পন্থা। ঋণ করিবার পূর্ব্বে অথবা কর-বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্য শাসন-তন্ত্র একবার ভাল করিয়া নিজের সংসারটী দেখিয়া লয়—সেখানে কোনও অপব্যয় হইতেছে কি না, কিম্বা সেখান হইতে আপাততঃ অনাবশ্যক কোনও ব্যয় ছাঁটিয়া ফেলা যায় কি না। আজকে নূতন নয়, বহুদিন ধরিয়া শাসন-বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য বহু আন্দোলন ভারতবর্ষে হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এত দাম দিয়া সুশাসন আর কোনও জাতিকে কিনিতে হয় না। জাপান, রুষিয়া, আমেরিকা, এমন কি ইংলণ্ড কোথাও শাসন-বিভাগ এত উচ্চ-মাহিনা-ওয়ালা লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। "সিভিল সার্বিস" এবং সামরিক বিভাগ পুষিতেই এই সুজলা সুফলা রত্নগর্ভা দেশ আজ ভিখারিণী সাজিতে চলিয়াছে। যখন কোনও যুদ্ধ নাই এবং যখন সমগ্র জগৎ যুদ্ধ-বিরতির চেষ্টা করিতেছে, তখন ভারতবর্ষের মত শস্ত্রহীন দেশকে সামরিক বিভাগের জন্য ৫৪ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়; এবং দেশের এই নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে হতভাগা করদাতাদের উপর ১৪৷৷০ কোটী টাকার কর বসান যাইতে পারে এবং কোটী কোটী টাকা ঋণের বোঝা চাপান যাইতে পারে; কিন্তু ৫৪ কোটী টাকা খরচের মধ্যে সেখানে কায়ক্লেশে মাত্র পৌনে দুই কোটী-টাকা ব্যয় হ্রাস হইতেছে! এমন কি ইংলণ্ডে দেশের আর্থিক দুর্দ্দশার কথা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রীমণ্ডল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের বেতন হ্রাস করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের "সার্ভিস" ওয়ালারা, আপনাদের পুরা মাহিনা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না! বোঝা বহিবার জন্য আছে এই হতভাগ্য ভারতবাসী, আর তদপেক্ষা হতভাগ্য কৃষকের দল!

স্বর্গীয়া উমা দেবী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সে একদা অনাহূত তোমার মন্দিরে
গিয়াছিনু মোর প্রিয় পূজারিণী সনে
বন্দিতে বিশ্বের বন্দ্য বরেণ্য কবিরে,
বন্দী যারে ক'রেছিলে প্রীতির বন্ধনে!

ক্ষণেক আতিথ্য লভি' সেদিন তোমার
পেয়েছিনু যে মধুর স্নিগ্ধ পরিচয়,
হে বান্ধবী, জানি তাহা নহে ভুলিবার;
সে আনন্দ-স্মৃতি রবে জীবনে অক্ষয়!

সেদিন আস'নি তুমি ছন্দ-বীণা হাতে
কেবল অমৃত ছিল দু'টি আঁখি পাতে।
তারপরে একদিন হেরিনু তোমায়
গুঞ্জরিছ মঞ্জু গীতি 'বাতায়ন' ছায়!

মুগ্ধ প্রাণ শুনি সেই অভিনব গান,
তব 'ছায়াছবি' কবি, কল্প-অবদান
সাহিত্য-লক্ষ্মীর ভালে পরালো যে টিপ
উষার আলোর মতো উজল সে দীপ!

তাহারি অরুণ দীপ্তি আবার যে-দিন
টানিয়া আনিল মোরে তব দ্বারে সখী,
আষাঢ় ঘনায়েছিল ফাল্গুনে সেদিন
প্রীত হয়েছিলে তুমি আমারে নিরখি'!

কাব্যের কূজন ল'য়ে দু'জনে গুঞ্জনি'
অকাল-বাদল-সাঁঝ কেটেছিল সুখে;
কে জানিত অলকায় বাজে আগমনী
তোমার যাবার রথ দাঁড়ায়ে সম্মুখে!

বর্ষণমুখর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
বসন্তের বর্ণগন্ধ লুপ্ত একেবারে,
তথাপি দেখিয়াছিনু' সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
আনন্দ-চঞ্চল প্রাণ দুলিছে কাঁপিয়া!

অসময়ে চলে গেলে হে তরুণী কবি!
প্রতিভার' শুকতারা অস্ত অকস্মাৎ;
ধন্য হ'য়েছিল যা'রা তব সঙ্গ লভি'
তাহাদের বক্ষে দেবী রূঢ় বজ্রাঘাত!

স্বর্গীয়া উমা দেবী

আচম্বিতে এলো ডাক! নিঠুর মরণ
না-ফুটিতে ফুল-কলি করিল হরণ!
মুকুল ঝরিয়া গেল ফলে না-চুমিতে
রজনীগন্ধার ডাল লুটালো ভূমিতে!

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত উপন্যাস "যাদুঘর"—২৲
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "কোষ্ঠী-দেখা"—২৲
শ্রীঅতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি "কাকলি" ২য় খণ্ড—২৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "প্রতিষ্ঠা"—২৲
শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক "এম-এ" প্রণীত ১ম খণ্ড "কেদার-বদরি ভ্রমণ"—২।॰
শ্রীরামনারায়ণ কর প্রণীত উপন্যাস "স্বতপা"—২।॰
মোহাম্মদ কোরবান আলী প্রণীত "মৌলানা রুমের মসনবী শরিফ"—১।॰
শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী প্রণীত "যাদুবিদ্যা"—৸॰
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "রং চং"—।৵॰
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত নাটক "হিন্দোলা"—১৲
নাটক "বরাবরের মত"—।॰
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত জীবনী "গঙ্গাধর"—৸॰
মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত উপন্যাস "নেকনজর"—১॥॰
মোহাম্মদ মোবারক প্রণীত গল্প "হীরের ফুল"—।৵॰
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রক্তরেখা"—১৸॰
শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ স্বামী ব্রহ্মচারী প্রণীত "শ্রীশ্রীগীতাকাব্য"—॥৵॰

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
203, CORNWALLIS STREET, CAL.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

গায়ত্রী (প্রাতে-ব্রহ্মাণী)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
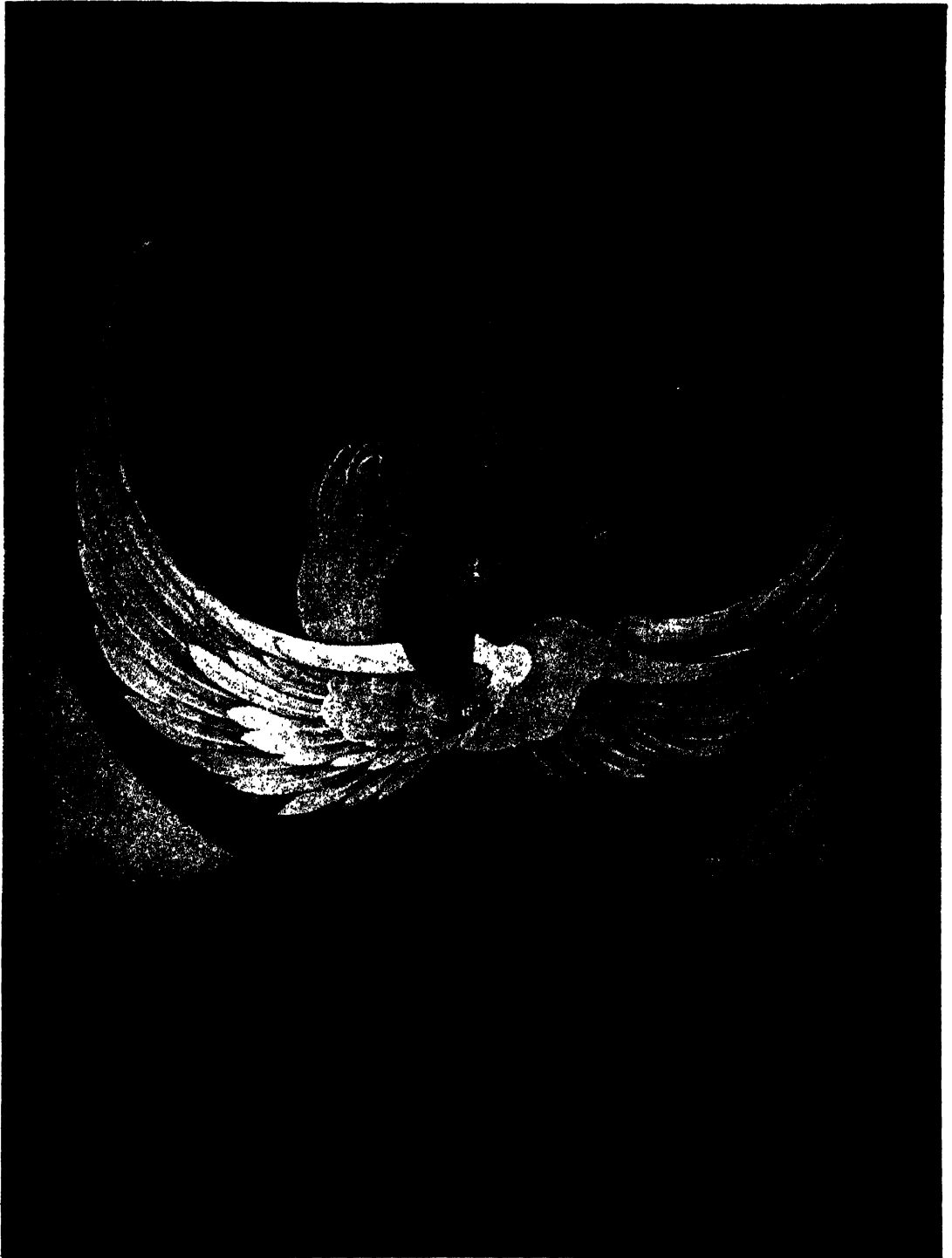
ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { পঞ্চম সংখ্যা

লোকতত্ত্ব

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ

(২)

এইবার বরুণলোকের কথা :—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাসবীপুরীর পশ্চিম দিকে বরুণের পুরী বিদ্যমান্। বেদ, পুরাণ এবং মহাভারতাদিতে লিখিত আছে যে, মেরুপর্ব্বতের পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষ। সুতরাং এই কেতুমালবর্ষই বরুণের রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান আফগানিস্থান, পারস্য এবং তুর্কীস্থান প্রভৃতি এই কেতুমাল-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকলেই জানেন যে, শাস্ত্র পুরাণাদিতে বরুণ জলাধিপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'জলাধিপ' কথায় আমরা সাধারণতঃ বুঝি জলের অধিপতি অর্থাৎ নদ, নদী, এবং সমুদ্রাদির কর্ত্তা। বাস্তবিকই বরুণের রাজ্য জলময় ছিল। বৈদিক যুগে তাঁহার রাজ্য দ্বীপময় ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান আফগানিস্থান, যাহার বৈদিক নাম অপ্ বা জলবহুলতা হেতু—অপগস্থান ছিল—এখনও ছোট ছোট পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীতে পরিপূর্ণ। ঋক্‌বেদ পাঠে জানা যায় যে বরুণের রাজ্যের পশ্চিম দিকে মহাসমুদ্র ছিল। এই সমুদ্রই চড়া পড়িয়া পরিশেষে কাস্পিয়ান হ্রদে পরিণত হইয়াছে। আচার্য্য ভাস্করের সিদ্ধান্ত-শিরোমণিগ্রন্থে দেখা যায় যে স্বর্ণদী গঙ্গা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি দিকে গিয়াছে। কেতুমালবর্ষে যে শাখা গিয়াছে তাহার নাম চক্ষু। চক্ষুর আর এক নাম অক্ষি বা অক্ষু হইতেই বর্ত্তমান অকশাস্ হইয়াছে। এই অকশাস্ নদী বর্ত্তমানে বোখারা এবং তুর্কীস্থানের ভিতর

দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরল হ্রদে (বৈদিক নাম আর হ্রদ) যাইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বুঝা যায়, বরুণের রাজ্য কেতুমালবর্ষ কোথায় ছিল। অপিচ মহাভারত সভাপর্ব্বে নকুল-দিগ্বিজয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে নকুল পশ্চিম দিক জয় করিতে যাইয়া সিন্ধু, গান্ধার (আধুনিক কান্দাহার) প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিলেন। তৎপরে আরও পশ্চিম দিকে যাইয়া হুন, শক, কিরাত, পহ্লব, যবন প্রভৃতি অনেক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিলেন। এই সমস্ত দেশই বরুণ-পালিত দেশ বলিয়া কথিত হইত :—

"এবং বিজিত্য নকুলো দিশং বরুণপালিতাম্"

মহাভারত—সভাপর্ব্ব

কাজেই স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে বরুণের রাজ্য কোথায় ছিল। হুন, শক প্রভৃতি জাতির বাসভূমি যে তুর্কীস্থানেই ছিল, তাহা ভারতের ইতিহাস পাঠক ব্যক্তিমাত্রই জানেন। কারণ এই দুই জাতি প্রায় ২১০০ বৎসর পূর্ব্বেই সমস্ত মধ্যএসিয়া এবং ভারতেরও অনেকাংশ দখল করিয়াছিল। শক-শ্রেষ্ঠ মহারাজ কনিষ্কের নাম এখনও ইতিহাস পাঠক-মাত্রই জানেন। আর পারস্যদেশীয় পহ্লব বংশীয় রেজা খাঁ এখন পারস্যের সিংহাসনেই আসীন আছেন। বরুণের প্রজা দৈত্য, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিও ছিল বলিয়া মহাভারতে দেখা যায়। অর্জ্জুন এই বরুণের নিকট হইতে অনেক দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সুদর্শনচক্র নামক অব্যর্থ অস্ত্র এই বরুণের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। এইবার বিষ্ণুলোক :—

বিষ্ণুলোকের আর এক নাম হিরণ্ময়বর্ষ। ইহাকে কোনও কোনও স্থলে তপোলোকও বলা হইয়াছে। বিষ্ণু কশ্যপমুনির পুত্র, অদিতির গর্ভসম্ভূত। তিনি দেখিতে খর্ব্বকায় ছিলেন বলিয়া বামনবিষ্ণু বলিয়াও কথিত। হিরণ্ময়বর্ষই বর্ত্তমান মধ্য-সাইবেরিয়া। ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে সকলকেই বিষ্ণুলোক পার হইয়া যাইতে হইত। সুতরাং বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোকে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। তাই বিষ্ণু বেদে দ্বারপাল নামে আখ্যাত হইয়াছেন :—

বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং দ্বারপাঃ স এব অস্মৈ এতদ্বারং বিবৃণোতি" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—

বামন বিষ্ণুর হিরণ্ময়বর্ষ মধ্য-সাইবেরিয়ায় হইলেও ইহা মধ্য-সাইবেরিয়ার পশ্চিমাংশে ছিল। বিষ্ণুর রাজধানীর নাম বৈকুণ্ঠপুরী রাখা হইয়াছিল। এই বামন-বিষ্ণু তিনবার ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন জানা যায়—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদম্"

যজুর্ব্বেদ

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় মনে করেন যে বিষ্ণুর ভারতে তিনবার আসিবার কারণ তিনটি :—

১। দানবগণ কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়া।

২। অসুররাজ বলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে।

৩। ভ্রাতুষ্পুত্র মনুকে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বামন বিষ্ণু ছদ্মবেশে বলির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছলে এবং কৌশলে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। বলি অগত্যা পাতালপুরীতে (দক্ষিণ আমেরিকায়—কদাপি মাটীর নাচে বা অভ্যন্তরে নহে) যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় "বলিভিয়া" নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই বিষ্ণুর ভারতাগমন সম্বন্ধে পদ্মপুরাণকার লিখিয়াছেন :—

"স্বর্লোকে বসতি বিষ্ণো বৈকুণ্ঠে অস্য মহাত্মনঃ
স কথং মানুষে লোকে পদংন্যাস চকারহ ॥"

পদ্মপুরাণ—

বিষ্ণু যে বৈকুণ্ঠপুরী ছাড়িয়া তিন তিনবার কি জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিষ্ণুলোক সম্বন্ধে ভীষ্মপর্ব্বে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

বিষ্ণুলোকের খানিকটা পূর্ব্ব দিকেই বিষ্ণুর ভ্রাতা বিবস্বানের রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের নাম ছিল ভদ্রাশ্ববর্ষ। ভদ্রাশ্ববর্ষ যে মেরুপর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ছিল তাহা মহাভারত পাঠে জানা যায়—

"মেরোঃ পার্শ্বমহং পূর্ব্বং বক্ষ্যাম্যথ যথাযথম্ ॥
তস্য মূর্দ্ধাভিষেকশ্চ ভদ্রাশ্বস্য বিশাম্পতে।
ভদ্রশালবনং যত্র কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥
কালাম্রস্তু মহারাজ নিত্যপুষ্পফলঃশুভঃ।
দ্রুমশ্চ যোজনোৎসেধঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥
তত্রতে পুরুষাঃ শ্বেতাস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাশ্চ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥"

ভীষ্মপর্ব্ব—৭ম অধ্যায়

সেখানে ভদ্রনামে শালবন আছে এবং কালাম্র নামে মহাদ্রুম আছে। সেই কালাম্র গাছে সর্ব্বদাই ফুল এবং ফল পাওয়া যায়। আর সেখানে সিদ্ধপুরুষগণ বাস করিয়া থাকেন। সেখানকার পুরুষেরা শ্বেতবর্ণ, তেজপূর্ণ এবং মহাবীর্য্যবান্, আর স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণা এবং অত্যন্ত প্রিয়দর্শনা হইয়া থাকে। এই ভদ্রাশ্ববর্ষের বৈদিক নাম ছিল অহঃ এবং রাত্রি—জনপদ। অহঃ এবং রাত্রি দুইটি দ্বীপ ছিল। খুব সম্ভবতঃ একটি দ্বীপ দিবাভাগে এবং অপরটি রাত্রিভাগে সমুদ্র হইতে ভাসিয়া উঠায় তাহাদের নাম যথাক্রমে অহঃ এবং রাত্রি রাখা হয়।

ঋক্‌বেদে লিখিত আছে যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তদীয় সহোদর সূর্য্যকে "অহঃ" এবং "রাত্রি" জনপদে, এবং খুল্লতাত চন্দ্রকে "সংবৎসর" নামক জনপদে প্রতিষ্ঠিত করেন :—

"সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধিসংবৎসরোঽজায়ত, অহোরাত্রাণি"

ঋক্‌বেদ

সূর্য্য তাঁহার রাজ্য পরিদর্শন করিবার জন্য মাসে মাসে তথায় যাইতেন।

"তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দ্বীপ্তায়তনং মহৎ

মাসে মাসে অবতরতি তত্র সূর্য্যপ্রজাপতিঃ ॥" বায়ুপুরাণ

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এই প্রজাপতি সূর্য্যকে আমরা আকাশস্থ জড় সূর্য্য বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ইহা যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা আর বলিবার নয়। আকাশস্থ জড় সূর্য্য কি করিয়া কশ্যপমুনির পুত্ররূপে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন? এই সূর্য্য মানুষ ছিলেন। তাঁহারই কোনও বংশধর, যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে পিতার উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন (যেমন মিথিলার জনক বংশীয় রাজগণ এবং অযোধ্যার রাজবংশের গুরু বশিষ্ঠবংশীয়গণ করিতেন) রাবণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই কোনও বংশধরের ঔরষে কুন্তীর কানীন-পুত্র কর্ণের জন্ম হইয়াছিল। প্রশ্নোপনিষদে লিখিত আছে বৈদিক যুগে অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আদিত্যলোকে আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতেন।

"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানমন্বিষ্য
আদিত্যং অভিজয়ন্তে" প্রশ্নোপনিষদ, ১০ম মন্ত্র

আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য যেমন অনেক লোক কাশী, নবদ্বীপ, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, তৎকালেও অনেক লোক ব্রহ্মবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য দেবলোকে মহাপণ্ডিত আদিত্য বা সূর্য্যের নিকট যাইতেন। এই সূর্য্যদেবই সামবেদের সমাহার করেন যথা :—"সূর্য্যাৎ সামবেদঃ"। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে যে ব্রহ্মলোকের প্রজাগণ সেখানে কোনও হিম-প্রলয় বা সংপ্লব আরম্ভ হইলে আত্মরক্ষার্থ নিকটবর্ত্তী সূর্য্যলোকে প্রবেশ করিতেন।

"ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃসর্ব্বে সর্ব্বেষু সাধবঃ

* * * *

রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্"

ভীষ্মপর্ব্ব—৭ম অধ্যায়

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই আদিত্য-লোক যদি আকাশস্থ অগ্নিময় পদার্থ জড়সূর্য্যে থাকিত তবে কি এই সব সম্ভব হইত? আকাশস্থ জড়সূর্য্যের দুইটি নাম দেখা যায়, যথা আদিত্য ও কাশ্যপেয়। এইগুলি বিস্মৃতি বশতঃই রাখা হইয়াছে সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ পিতৃলোকে যাওয়া প্রায় বন্ধ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন যে, সূর্য্য তাঁহাদের বংশসম্ভূতই, এবং মনে করিতে থাকেন যে বেদোক্ত সূর্য্য এই আকাশস্থ জড় সূর্য্যই। তাই "আদিত্য" এবং "কাশ্যপেয়" এই দুইটি নাম জড়-সূর্য্যের সঙ্গেই জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় মনে করেন যে কাশ্যপেয় অর্থ ভগবানের পুত্রও হইতে পারে। ভগবানের পুত্র আমরা পৃথিবীস্থ সকলেই। তাই সূর্য্যও কশ্যপস্য অপত্যং পুমান্ কাশ্যপেয় হইলেন। ইহা বস্তুতপক্ষে অভিধানগত ব্যাখ্যা মাত্র।

দেশের জনসাধারণের এবং অনেক পণ্ডিত লোকেরও মনে এই বিশ্বাস যে, আকাশস্থ জড় সূর্য্যই আমাদের পিতৃপুরুষ সূর্য্য, যিনি কশ্যপমুনির পুত্র, অদিতির গর্ভজাত সন্তান, যিনি রাবণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন এবং যিনি কর্ণের পিতা। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এই সূর্য্যলোকের দক্ষিণ পার্শ্বেই চন্দ্রলোক, বা বৈদিক মহর্লোক বিদ্যমান ছিল। মহাভারতে চন্দ্রলোককে রম্যক-বর্ষ নামে বলা হইয়াছে। এই রম্যকবর্ষ বর্ত্তমানের মাঞ্চুরিয়া এবং খাস্ চীনের অনেকাংশ ব্যাপিয়া ছিল। পূর্ব্বে এই রম্যকবর্ষ দ্বীপ ছিল বলিয়া ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ বা চন্দ্রমণ্ডল বলা হইত। চন্দ্র মহর্ষি অত্রির পুত্র। মহর্ষি অত্রি কশ্যপ-মুনির খুল্লতাত ছিলেন বলিয়া জানা যায়; কাজেই চন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির খুল্লতাত ছিলেন (চন্দ্র কশ্যপমুনি অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন)। তৈত্তিরিয় উপনিষদে লিখিত আছে "মহষতি চন্দ্রমা" অর্থাৎ চন্দ্র মহর্লোকের অধিপতি ছিলেন। প্রশ্নোপনিষদের মতে রম্যকবর্ষের নাম "সংবৎসর" জনপদ। এই সংবৎসর জনপদ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; যথা, উত্তর সংবৎসর এবং দক্ষিণ সংবৎসর।

"সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য অয়ণে
দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ।" প্রশ্নোপনিষদ্—৯ম মন্ত্র

অনেকে কিন্তু এই সংবৎসরকে বৎসর অর্থাৎ দ্বাদশ মাস এই অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা যে ভুল তাহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং ঋক্‌বেদ পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

"সংবৎসর খলু বৈ দেবানাং পুঃ"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সংবৎসর দেবতাদিগের পুরী বা আবাসস্থল। সংবৎসর যদি জনপদ না হইয়া কাল বা সময় হইত তবে তাহা কি করিয়া দেবতাদিগের পুরী হইল? অপিচ ঋক্‌বেদেও দেখিতে পাই

"সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধিসংবৎসরোঽজায়ত"
ঋক্‌বেদ—১০ম মণ্ডল ১৯০ সূত্র

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে সংবৎসর ভাসিয়া উঠিল। এই সংবৎসর অর্থে সংবৎসর নামক জনপদ; কদাপি কাল হইতে পারে না। কারণ সমুদ্র হইতে সময়ের জন্ম হয় না; বরঞ্চ সমুদ্র হইতে দ্বীপ প্রভৃতি ভূমিখণ্ডেরই জন্ম হইয়া থাকে। স্বামী যোগানন্দও এইরূপই মনে করেন। এই চন্দ্রমণ্ডল বা চন্দ্রদ্বীপ (চন্দ্রের আবাসস্থল) সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে লিখিত আছে :—

"উত্তর কুরুণাং পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তু দক্ষিণে
সমুদ্র-উর্ম্মিমালাঢ্যো নানারত্নবিভূষিতঃ
পঞ্চযোজনসাহস্রং অতিক্রম্য সুরালয়ম্
চন্দ্রদ্বীপ ইতি খ্যাতশ্চন্দ্রমণ্ডল সংজ্ঞিতঃ॥" বায়ুপুরাণ

অর্থাৎ উত্তর কুরুদেশের দক্ষিণ দিকে (বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়ায় এবং পূর্ব্ব-চীনদেশে) সুরালয় বা ইন্দ্রপুরী হইতে ৫ হাজার যোজন দূরে সাগরবেলায় নানারত্ন পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। ইহাই চন্দ্রদ্বীপ নামে অভিহিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বায়ুপুরাণ ঋক্‌বেদেরই সমর্থন করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্র হইতে দ্বীপাকারেই ভাসিয়া উঠিয়াছিল (ঋক্‌বেদে যাহাকে সংবৎসর বলা হইয়াছে)। পরিশেষে সমুদ্রে আরও চড়া পড়ায় ইহা ভূমিখণ্ডের সহিত মিলিয়া যায়। এই চন্দ্রমণ্ডল অতিশয় শস্যশালী ছিল। তথায় সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইত বলিয়া চন্দ্র "ওষধিনাথ" এবং "সুধাকর" নামে অভিহিত হইতেন। চন্দ্রের প্রজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ"
যজুর্ব্বেদ

এই চন্দ্র যদি আকাশস্থ জড় চন্দ্র হইতেন তবে কি এই সকল সম্ভব হইত? আর তাঁহার রাজ্য কি উত্তর কুরুদেশের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব্বচীন দেশে হইত?

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে :—

"সোমঃ পিতৃনামধিপতিঃ কথং শাস্ত্রবিশারদঃ।
তদ্বংশ্যা যে চ রাজানো বভূবুঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ॥"

পিতৃলোকের অধিপতি সোম (চন্দ্র) শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তাঁহার বংশীয় রাজগণ খুব কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। হস্তিনা-পুরের রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। তাঁহারা যে কিরূপ বিখ্যাত ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। মহারাজ দুষ্মন্ত, নহুষ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কথা কে না জানেন?

এক্ষণে কথা হইতেছে যে প্রোক্ত চন্দ্র যদি আকাশস্থ জড় চন্দ্র হইতেন তবে কি করিয়া তাঁহার বংশধরেরা এতাবৎকাল

ভারতবর্ষে রাজত্ব করিলেন ? বলা বাহুল্য এই সমস্ত ভ্রান্তির মূলে বিস্মৃতি বর্ত্তমান। লোক ক্রমশঃ বেদবিদ্যাহীন হইয়া আসল দেবতাদিগকে ভুলিয়া তন্নামবিশিষ্ট আকাশস্থ জড়-পদার্থদিগকে পূজা করিতে লাগিল। এক নাম বিশিষ্ট হইলেই যে সে অন্য একজন বা অন্য এক পদার্থ হইয়া যাইবে তাহার কোনও কারণ নাই। আজকালও ত অনেকের নাম শিব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, চন্দ্র প্রভৃতি রাখা হয়। তবে তাঁহারাও কি সেই সেই নাম বিশিষ্ট দেবতাদিগের ন্যায় পূজ্য হইবেন ? লোক অজ্ঞানতাবশতঃ আসল চন্দ্রকে ভুলিয়া আকাশস্থ সেই জড় চন্দ্রকেই পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

এখানে বলা আবশ্যক যে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম এবং ১০ম খণ্ডে যে ৫টি অমৃত-ভূমির কথা বর্ণিত আছে, এই ৫টি অমৃত-ভূমিই স্বর্গলোকের ৫টি অংশ। অমৃতভূমি অর্থে পরম স্বাস্থ্যকর স্থান বুঝাইতেছে। আমরা ইংরেজীতে sanitarium বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, ছান্দোগ্য উপনিষদেও অমৃতভূমি অর্থে তাহাই বুঝাইতেছে। প্রথম অমৃতভূমিতে পূর্ব্বে অগ্নিদেব বাস করিতেন। পরবর্ত্তীকালে অগ্নিদেব প্রথম অমৃতভূমি বা কিম্পুরুষবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করিতেন। মহাযোগী শিব এবং ধনাধিপতি কুবের অগ্নি পরিত্যক্ত এই কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেন। ধনাধিপতি কুবেরের বাসস্থান মানসসরোবরের দক্ষিণতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডকে তিব্বতীয়েরা আজ পর্য্যন্ত "গ্যালপো নরজিঙ্গি ফোপরাং" বলিয়া থাকে। জাপানী পরিব্রাজক "কাউয়াগুচির" তাঁহার গ্রন্থ Three years in Tibet (তিব্বতে তিন বৎসর) এ লিখিয়াছেন :—"On ascending the hill (Dolma-la) one sees to the right a snowy range of the northern parts of Mount Kailasa, nomed in Tibettian" "Gylpo Norjingi phohrang" wpich means the "residence of King Kuvera the god of wealth."

৫ম অমৃতভূমি বা উত্তর কুরুদেশে বাস করিতেন সুরশ্রেষ্ঠ চতুর্মুখ বা চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রহ্মা। অতএব বেদে যে কথাটি আছে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ইহার অর্থ হয় "হে অমৃতলোকবাসী দেবগণ, তোমরা শুন"। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক পণ্ডিত লোকের মুখে ইহার নানা-প্রকার কূট অর্থ শুনা যায়। পূর্ব্বাপর মিল না রাখিয়া এবং সমস্ত গ্রন্থের সহিত সঙ্গতি না রাখিয়া অভিধানগত বা দার্শনিক ব্যাখ্যা করিলেই যে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইল এ ধারণা ভুল।

অপিচ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদেও এই কথা বিশদভাবেই বর্ণিত আছে—

"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছসি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স আদিত্যলোকং, স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকং তস্যাহ বা এতস্য ব্রহ্ম-লোকস্যারোহ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরানদীল্যোবৃক্ষঃ সালজ্যং ইত্যাদি ১ম অধ্যায় ৩য় মন্ত্র।

অর্থাৎ গার্গ্যপুত্র চিত্র তদীয় পুরোহিত আরুণি এবং শ্বেতকেতুকে স্বর্গলোকের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিতে-ছেন :—দেবযান পথ দিয়া যাইতে যাইতে প্রথমে অগ্নিলোক, তৎপর বায়ুলোক, বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়। পথিমধ্যে আরহ্রদ (বর্ত্তমান আরলহ্রদ), বিজরানদী (ব্রহ্মলোকে বা উত্তর কুরুদেশে প্রবাহিত ভদ্রানামক গঙ্গা), ইল্যবৃক্ষ (ইলাবৃত বা ইলাভূমিতে যে এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিত) এবং সালবৃক্ষ (যাহার বল্কল দ্বারা ধনুকের জ্যা নির্ম্মিত হইত) পার হইয়া যাইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বেদোক্ত, পুরাণোক্ত এবং উপনিষদাদিতে বর্ণিত ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, ইন্দ্রলোক, যমলোক প্রভৃতি ভৌম ছিল ; কদাপি আকাশস্থ বা শূন্যস্থ ছিল না। আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্তই আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিই।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষ হইতে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইবার সে বিষয়ের কিছু আলোচনা করা দরকার। বায়ুপুরাণে আছে যে, পিতৃপুরুষ দেবতাদিগের দুইটি পথ দক্ষিণ এবং উত্তরে লম্বমান। এই দুইটি পথই দেবযান পথ এবং পিতৃযান পথ। দেবযানপথ ভারতবর্ষ হইতে উত্তর দিকে উত্তরকুরু বর্ষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং পিতৃযান পথ পিতৃলোক

হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে এই দেবযান পথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"এষ দেবযানঃ পন্থা সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাৎ বহিঃ" অর্থাৎ এই দেবযান পথ সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; এবং সেথানেই ইহার শেষ। কদাপি অণ্ডের অর্থাৎ পৃথিবীর বাহিরে শূন্যে যায় নাই। এই দেবযান এবং পিতৃযান পথ ব্যতীত আরও দুটী পথের নাম পাওয়া যায়। এই দুইটি পথের নাম ধূমযান এবং রাত্রিযান পথ। তবে সাধারণ কথায় এই চারিটি রাস্তাকেই "দেবযান" পথ বলা হইত। এই দেবযান পূর্ব্বোক্ত বিশেষ দেবযান পথের নাম নহে। সকলগুলিই দেবলোকে যাইবার পথ বলিয়া সাধারণ কথায় দেবযান পথ বলিয়া কথিত হইত। বায়ুপুরাণে আছে

"চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ"

বেদপাঠে জানা যায় যে সূর্য্যদেব নির্ম্মিত যে সকল রাস্তা অন্তরীক্ষ (অর্থাৎ আফগানিস্থান) হইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে সেগুলি সবই বেশ পরিষ্কার এবং সুগম :—

"যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসো অনরেণ সুকৃতা অন্তরীক্ষো।
তেভি নো হত্বা পথিভিঃ পুরস্তাৎ প্রতীচী আত্মগাৎ অধিহর্ম্মেভ্যঃ॥ ঋকবেদ

ঋক্‌বেদ পাঠে আরও জানা যায় যে বিবস্বান্ তদীয় পুত্র মনুর ভারতাগমন কালে তাঁহাকে একটি শ্বেত অশ্ব দিয়াছিলেন। বেদোক্ত এবং পুরাণোক্ত যে চারিটি রাস্তার কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে দুইটি সীমান্ত প্রদেশের খাইবার এবং বোলান্ পাশ দিয়া আফগানিস্থান (বৈদিক অন্তরীক্ষ লোক) হইয়া স্বর্গরাজ্য হইয়া একেবারে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই পথ দিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। আর একটি রাস্তা বদরিকাশ্রম হইয়া হিমালয়পর্ব্বত পার হইয়া তিব্বত দেশের ভিতর দিয়া গিয়াছে। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই পথেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। বামন বিষ্ণু ও অসুররাজ বলীকে দমন করিবার জন্য এই রাস্তা দিয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আর একটি রাস্তা দেখা যায় কালিংপোং হইয়া সিকিম এবং ভোটান রাজ্যের সীমান্ত দিয়া তিব্বত দেশের ভিতর দিয়া। খুব সম্ভবতঃ ইহাই সেই চতুর্থ রাস্তা।

লঙ্কাধিপতি রাবণের সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি প্রবাদ্ প্রচলিত আছে যে, তিনি, যাহাতে সকলে স্বর্গলোকে সুবিধামত যাইতে পারে, তজ্জন্য একটি সিঁড়ি প্রযুক্ত রাস্তা তৈয়ার করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা দোষেই না কি আর এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সমস্ত রাস্তা কি স্বর্গের ভৌমত্বের পরিচায়ক নহে? কিন্তু বিস্মৃতি দোষে সকলই নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পিতৃযান বলিতে জনসাধারণ প্রেতযান বুঝিয়া থাকেন। অনেকেই মনে করেন যে এই সমস্ত দেবযান এবং পিতৃযান পথ দিয়া প্রেতগণ স্বর্গে যাতায়াত করেন। যদি এই সকল রাস্তা প্রেতের জন্যই নির্ম্মিত হইয়া থাকিত, তবে তাহাদিগকে প্রেতযানই বলা হইত। কষ্ট করিয়া আর দেবযান, পিতৃযান, ধূমযান এবং রাত্রিযান বলা হইত না। সোজা প্রেতযান বলিয়া ফেলিলেই সকল ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। এবং এই সব পথে আসিতে আর মনুর শ্বেতবর্ণ অশ্বের দরকার হইত না, বা যুধিষ্ঠিরাদির জীবিতাবস্থায় স্বর্গে যাইবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া এত কষ্ট করিতে হইত না। কেবল বর্ত্তমান সময়ের দোষ নয়, বৈদিকযুগের শেষকাল হইতেই ভারতের জনসাধারণ এমন কি পণ্ডিতগণও এই সকল রাস্তার কথা বিস্মৃত হইতে থাকেন। ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আমরা উপনিষদে পাইয়া থাকি; যথা ছান্দোগ্য উপনিষদের "শ্বেতকেতু-প্রবহন সংবাদ" এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের ১ অধ্যায় ১ম—৩য় মন্ত্র।

এইবার দেবতা বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ করা যাক্। এই দেবতারা কে ছিলেন, সে বিষয় জানা খুবই দরকার; নতুবা তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদ পাঠে জানা যায় যে এ ভারত আর্য্যদের পিতৃভূমি ছিল না। তাঁহাদের আদিম বাসস্থান ছিল ইলাবৃত-বর্ষে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যায় যে, ইলাবৃতবর্ষস্থ দেবতারা এবং ভারতাগত আর্য্যেরা একবংশসম্ভূত এবং এক স্থান-

বাসী। তবে ইলাবৃতবর্ষস্থ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপনিবিষ্ট আর্য্যগণ কিরূপে দেবতা আখ্যা পাইলেন? বৈদিকযুগে মানুষ বিদ্বান্ হইলেই দেবতা আখ্যা পাইতেন; এবং মূর্খ ও অবিদ্বান্ হইলে অসুর আখ্যা লাভ করিতেন; যথা—"বিদ্বাং সো হি দেবাঃ। তদ্‌বিপরীতা অবিদ্বাংসো হি অসুরাঃ" শতপথ ব্রাহ্মণ

আরও দেখা যায় "এতে দেবাঃ প্রত্যক্ষং যৎ ব্রাহ্মণাঃ" অর্থাৎ এই দেবতারাই ব্রাহ্মণ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বৈদিকযুগে বেদবিদ্ মাত্রই দেবতা আখ্যা লাভ করিতেন, আর এই দেবতারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর্য্যব্রাহ্মণগণের আদিম বাসস্থান ইলাবৃতবর্ষে বেদবিদ্যার খুবই চর্চ্চা হইত। তাঁহারা (আর্য্যব্রাহ্মণগণ) জ্ঞান, বিদ্যা-বত্তায় এবং পরাক্রমে অন্য সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া দেবতা আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তবে এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতাগত আর্য্যব্রাহ্মণেরা কি বেদবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন না? তাঁহারা দেবতা আখ্যা পাইলেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে সমান জ্ঞানী, এবং সমান অবস্থাসম্পন্ন হইলেও পিতৃভূমিতে যাঁহারা স্থায়ীভাবে বাস করেন তাঁহারা সাধারণতঃ পিতৃভূমি হইতে বহির্গত অন্যত্র উপনিবিষ্ট স্বজনগণ হইতে একটু বেশী সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ ঘটনা আমরা সমাজে সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকি। ভারতে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ দেবতাগণের বেলায়ও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তাঁহারা ইলাবৃতবর্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ব্রাহ্মণদেবতাদের ন্যায় বিদ্যাবত্তায় সমান পারদর্শী হইলেও পিতৃভূমি হইতে চ্যুত বলিয়া পিতৃভূমিস্থ জ্ঞাতিগণের মত সম্মান সমাজে লাভ করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি কারণে তাঁহাদের সম্মানের লাঘব ঘটিয়াছিল। ভারতাগত দেবতাগণের সংখ্যাধিক্য না থাকায় তাঁহারা ভারতস্থ আদিম অধিবাসীদিগের কোনও কোনও দলের সহিত মিশিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং সেই হেতু তাঁহাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে কতকটা অনার্য্য ভাবও সম্ভবতঃ প্রবেশ করিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহারা লোক-সমাজে এবং নিজেদের চোখেও কতকটা খাট হইয়াছিলেন।

আর ইলাবৃতবর্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ শীত-প্রধান দেশ বিধায় সেখানকার লোকেরা সাধারণতঃ দেখিতে খুব সুন্দর এবং বলিষ্ঠকায় ছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতাগত আর্য্যদেবতারা অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া দেখিতে অনেক কালো এবং কৃশকায় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরাও পিতাপিতামহদের মতই হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা সমাজে পিতৃভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সম্মানলাভ করিতেন না। সুতরাং পিতৃভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণ দেবতাই রহিয়া গেলেন এবং ভারতাগত দেবতারা তাঁহাদের দেবত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন।

আর এক কথা—মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণাদি পাঠে দেখা যায় যে, দেবতারা সকলেই বিমানচারী ছিলেন, এবং বিমানে চড়িয়া এদেশে আসিয়া বেড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু ভারতাগত ব্রাহ্মণদেবতাগণ বিমানবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না। তাই তাঁহারা নিজেদের অপেক্ষা হিমালয়ের পরপারে অবস্থিত ব্রাহ্মণগণকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং "দেবতা" আখ্যা দিয়াছিলেন। তবে রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে রাবণের "পুষ্পকরথ" নামে এক বিমান ছিল। কিন্তু সেটি রাবণের নিজের তৈরী ছিল না; কুবেরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছিল। পরে তাহা রাবণনিধনকর্ত্তা রামচন্দ্রের হস্তগত হয়। অধিকন্তু, ইলাবৃতবর্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় রাজ্যই ব্রাহ্মণ-প্রধান ছিল (মঙ্গাঃ ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ—মহাভারত। সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ—যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষি-পরিবারিতঃ—রামায়ণ)। সুতরাং সে সকল স্থানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেদবিদ্যার চর্চ্চা এবং ব্রহ্ম-চর্চ্চা অনেক অধিক হইত। কাজেই পিতৃভূমির ব্রাহ্মণগণ অনেক উন্নত ছিলেন। তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। তাঁহারা এমন অনেক অস্ত্রের প্রয়োগ জানিতেন, যাহা ভারতের লোকেরা জানিতেন না। কাজেই দিব্যাস্ত্র শিখিতে হইলে স্বর্গে যাইয়া শিখিতে হইত।

কালক্রমে যখন ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ ভুলিতে আরম্ভ করিলেন যে দেবলোক তাঁহাদের পিতৃভূমি, তখন তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা দেবগণ হইতে পৃথক্, এবং দেবতারা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তার পর বিস্মৃতি এবং অবিদ্যা যখন পূর্ণমাত্রায় আসিল, তখনই নানা প্রকার অবান্তর

কল্পনার সৃষ্টি হইতে লাগিল। বেদবিদ্যাহীন হইয়া লোকে ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল যে এই সকল স্বর্গ শূন্যস্থ; কদাপি ভৌম নহে। এখন পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের এমন কি অনেক পণ্ডিত লোকেরও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে। তবে দেশের লোকের বেশী দোষ দেওয়া যায় না। ইহাই কালের নিয়ম। নতুবা রাঢ় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ একই পিতামাতার সন্তান হইয়া অল্পকাল মধ্যে কিরূপে এত পৃথক হইয়া পড়িলেন? এখন আর রাঢ় এবং বরেন্দ্রে বিবাহাদি কোনও সম্বন্ধই হইতে পারে না। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত লোকও এ বিষয়ের প্রকৃত খোঁজ রাখেন না বা রাখিতে চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞলোকদের মত বিশ্বাস করেন যে স্বর্গ সকল শূন্যস্থ; আবার কেহ কেহ বা ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং অস্মদ্দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত অনেক ভদ্রলোকের ন্যায় গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া থাকেন, "এ সব মিথ্যা, ইহা কবির কল্পনা মাত্র।"

তবে স্বর্গ যে শূন্যস্থ বা উপরের দিকে অবস্থিত, লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইবারও কারণ আছে। ইলাবৃতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ প্রভৃতি সকলগুলিই পর্ব্বতময়প্রদেশে এবং সেই হেতু ভারতের সমতল ভূমি অপেক্ষা অনেক উপরে অবস্থিত। আর দেবতারা ভারতবর্ষে আসিবার সময় বিমানে চড়িয়া আসিতেন বলিয়াও লোকের মনে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে বুঝি দেবতারা তাঁহাদের শূন্যস্থ ভবন হইতেই আসিয়া থাকেন। আবার দেশে আর এক মতাবলম্বী লোক দেখা যায় যাঁহারা গম্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন যে স্বর্গসকল উত্তর দিকে অবস্থিত; কিন্তু উত্তর দিকে কোথায় তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। তবে এই ধারণা হওয়ারও কারণ আছে। তাহা স্বর্গলোকসমূহের ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পরপারে অবস্থিতির জন্যই।

তবে এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে সাধারণ লোক, যাহারা অজ্ঞ এবং বেদবিদ্যাহীন, তাহারা হয়ত বুঝিল যে স্বর্গভূমি শূন্যে অবস্থিত। পণ্ডিত লোকেরা কিরূপে স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেলেন? ইহার উত্তর এই যে দেবতাদিগের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে যাইবার রাস্তা সমূহ ক্রমশঃ বিপদসঙ্কুল হইতে লাগিল। পিতৃযান, দেবযান, ধূমযান প্রভৃতি রাস্তা সমূহের দুইধারে অসভ্য শক, হূন, কিরাত প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতিরা বাস করিত। দেবতারা যেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, এই সমস্ত জাতিরাও মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল এবং পথিমধ্যস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল; এবং কাহাকে কাহাকেও বা প্রাণে মারিতে লাগিল। কাজেই প্রাণের ভয়ে স্বর্গলোকে লোকের যাতায়াত কমিতে লাগিল এবং উত্তরকালে তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। কাজেই কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলেই দেবলোকের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। বলা প্রয়োজন যে, দেবতাদিগের ক্ষমতা হ্রাস মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষমতা এককালে লোপ পাইয়া গেল।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে "এই সকল দেবতারা এখন কোথায় আছেন? তাঁহাদের' অধ্যুষিত রাজ্য সকল ত বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাঁহারা কোথায় গেলেন?"

ইহার উত্তর এই যে মহাভারতীয় আমল হইতেই দেবতারা যুদ্ধ-বিদ্যায় হেলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। মহাভারত সভাপর্ব্বে দেখা যায় যে অর্জ্জুন উত্তর দিক্ জয় করিতে বাহির হইয়া হিমালয় প্রদেশে স্থিত অনেক দুর্দ্ধর্ষ জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবপুরী জয় করিতে গেলেন; কিন্তু সেখানে যাইবামাত্র সেখানকার সৌম্যমূর্ত্তি দেবতারা আসিয়া বলিলেন যে এ দেবভূমি, এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি নাই। তুমি বিনা যুদ্ধেই কর লইয়া যাও। ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে দেবতারা যুদ্ধ বিদ্যা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন এবং জ্ঞানচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে নির্জ্জিত অনার্য্য জাতিরা এই সুযোগে খুব প্রবল হইয়া উঠিল এবং সমস্ত দেবরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। সেই যুদ্ধে খুব সম্ভবতঃ অনেক দেবতাই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বাদ-বাকী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও নির্জ্জীব হইয়া কিছুদিন পরে অনার্য্যদের সহিত মিশিয়া গেলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। মহাভারতেই দেখা যায় যে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অনেক শক, যবন এবং ম্লেচ্ছজাতি এবং আরও পশ্চিমে গান্ধার (কান্দাহার) দেশ-সংলগ্ন প্রদেশসমূহে

কিরাত, পহ্লব, হুন, প্রভৃতি জাতিরা বাস করিত। এবং তিব্বত বা মাশক দেশের পূর্ব্বাংশে চীনাগণ বাস করিত। এই চীনাগণও যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। তাহাদের রাজ্য মহাভারতীয় যুগে আসামের অন্তর্গত প্রাগজ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ কয়েক শতাব্দী (অর্থাৎ মহাভারতীয় যুদ্ধের কয়েক শতাব্দী পর) হইতেই শক, হুন প্রভৃতি জাতিরা খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং সমস্ত মধ্য-এশিয়া প্লাবিত করে। তাহারা ভারতবর্ষেরও কিয়দংশ দখল করিয়াছিল। অপরপক্ষে চীনাগণও খুব প্রবল হইয়া উঠে। খুব সম্ভবতঃ এই সকল অসভ্য জাতির দ্বারাই দেবভূমি কলুষিত এবং দেবসভ্যতা ধ্বংসীকৃত হয়। নির্জ্জিত ব্রাহ্মণ দেবতারা অনন্যোপায় হইয়া এই অসভ্যদের সহিত মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-এশিয়া হইতে আর্য্য সভ্যতাও এককালে লোপ পাইয়া গেল। আন্তর্জাতিক বিবাহাদির দ্বারা দেবতাগণের চেহারার পরিবর্ত্তন ২।১ পুরুষের মধ্যেই হইয়া গেল এবং তাঁহারা পূর্ব্ব সভ্যতাও ভুলিয়া গেলেন। এখন সমস্ত মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর এশিয়ায় চ্যাপ্টা নাসা ব্যতীত উন্নত নাসিকা দেখিতেই পাওয়া যায় না। ইহাই খুব সম্ভবতঃ দেবতাদের শেষ পরিণতি। সেই দেবলোক আজিও বর্ত্তমান; কিন্তু সে সকল স্থানে আর দেবতারা নাই। তাই অনেক অজ্ঞলোক বলিয়া থাকে কলিতে সব দেবতা অন্তর্দ্ধান। এই অন্তর্দ্ধান যে কি রকমের অন্তর্দ্ধান তাহা এখন সকলেই বুঝিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহাভারতীয় যুগের পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-এশিয়া হইতে দেবসভ্যতা লোপ পাইয়া যায়। পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সেগুলি খৃঃ পূঃ ৪র্থ কি ৩য় শতাব্দীতে লেখা হয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সে সব গ্রন্থে লেখা আছে যে ভগবান বুদ্ধের নিকট হইতে ইন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতেছেন। এখন কথা হইতেছে যে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে (খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে) গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার মধ্য-এশিয়া জয় করেন। তথনকার যে যে রেকর্ড পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দেবতাদের উল্লেখ নাই। যদি তখন পর্য্যন্তও দেবতারা থাকিতেন তবে অবশ্যই কেতুমালবর্ষের রাজা বরুণের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হইত। কাজেই দেখা যাইতেছে যে পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির কথা বিশ্বাস করিয়া লইলে দেবগণের অবনতি বা ক্ষমতার এককালীন হ্রাস ৫ম শতাব্দীর মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই আর্য্য দেবতাগণ বুদ্ধের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ছাড়িয়া দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ-শ্রমণ লইয়া যাইবার জন্য খৃঃ পূর্ব্ব কয়েক শতাব্দী হইতেই যে তিব্বত এবং চীনদেশীয় রাজগণ ভারতে তদ্দেশীয় পুরোহিত প্রেরণ করিতেছিলেন, ইহার প্রমাণ ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বুদ্ধের আবির্ভাবের বা তিরোধানের শতাব্দী খানেকের মধ্যেই সম্ভবতঃ দেবভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। তবে পরবর্ত্তী কালের অসভ্য জাতির কবল হইতে তথাকার বেদ, উপনিষদাদি রক্ষা পায় নাই। অসভ্য জাতিদের এরূপ আচরণ ইতিহাসে যথেষ্ট দেখা যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী, তক্ষশিলার এবং নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুস্তকাগার-সমূহ অসভ্য জাতি কর্তৃক ধ্বংসীকৃত হয়। এই কারণেই মধ্য-এশিয়ায় এবং উত্তর-এশিয়ায় (মেরুদেশসমূহে) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। সামবেদের সূত্রকার মাশকাচার্য্য মাশক বা তিব্বত দেশীয়। লাট্যায়ণ, দ্রাহ্যায়ণ প্রভৃতিও উত্তরদেশীয় অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তরের লোক। ঋক্‌বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায় যে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতাগণ মন্ত্রদ্রষ্টা। কাজেই তাঁহারাও যে ঋক্‌বেদের প্রণয়ন কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। সামবেদ সম্বন্ধে লিখিত আছে "সূর্য্যাৎ সামবেদঃ" অর্থাৎ সূর্য্যদেব সামবেদের প্রণয়ন করেন। তবে ঋক্‌বেদের ন্যায় সামবেদেও অনেক ঋষির নাম দেখা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচন হইতে ইহা বুঝা যায় যে সূর্য্যদেব সামবেদের প্রণয়ন আরম্ভ করেন। আর চন্দ্রদেব "চান্দ্র ব্যাকরণ" নামে একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। অতএব দেখা যাইতেছে নিশ্চয়ই দীর্ঘকালের অত্যাচারের ফলে মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-এশিয়া হইতে আর্য্যসভ্যতার নিদর্শনগুলি লোপ পাইয়াছে। (ভবিষ্যতে হয়ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কল্যাণে

এ বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কারও হইতে পারে। ইদানীং মধ্য-এসিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন।) ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে শিবপূজার প্রথা অনেকদিন হইতে প্রচলিত থাকায় শিবের বাটীর অবস্থান কোথায় ছিল তাহা অনেকেই জানেন। তিব্বতীয়গণ শিবের এবং কুবেরের বাড়ীর কথা আজকালও বলিয়া থাকে। তাহারা কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরাংশ এবং মানস সরোবরের দক্ষিণাংশকে "গ্যালপো নরজিঙ্গি ফোপ্রাং" বা কুবেরের আবাস ভূমি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু চীনাগণ এরূপ বলে না। তাহার কারণ এই যে তিব্বতীয়গণ এবং চীনাগণ এক বংশীয় নহে। চীনাগণ মঙ্গোলিয় বা ইণ্ডো-এরিয়ান্ বা আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। পক্ষান্তরে তিব্বতীয়গণ মঙ্গোলিয় বা ইণ্ডো-এরিয়ান্ বা আর্য্য জাতির বংশধর। কাজেই তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গেলেও পিতৃপুরুষদিগের বিশ্বাস এবং আচার ভুলিতে পারে নাই। দেহের পরিমাপ এবং মুখের চেহারা প্রভৃতি দেখিয়া বুঝা যায় যে তিব্বতীয়গণের এবং তাক্‌লামাগানবাসী তুর্কীগণের মধ্যে অনেক আর্য্যভাব বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে পূর্ব্বদিক-নিবাসী চীনাদের সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ ঢের। যদিও এই দুই জাতিকেই সাধারণ কথায় মঙ্গোলিয় বলা হইয়া থাকে, তথাপি দেহের এবং মুণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া চীনাদিগকে মঙ্গোলিয় বলা যে কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। (See *Journal of the Royal Anthropological Institute* 1912, p.p. 467-468)

সুতরাং মহাভারতে যে লেখা আছে "মঙ্গাঃ ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ" সে কথাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মহাভারতের কথাকে, এবং বেদ উপনিষদ এবং পুরাণাদির প্রমাণকে অনেকেই পুঁথির প্রমাণ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ Joyce সাহেব Royal Anthropological Institute এর Journalএ এ কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া প্রকারান্তরে শাস্ত্রাদির প্রমাণেরই সমর্থন করিয়াছেন। শূদ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে শাস্ত্রাদিতে ভুবনবিন্যাস অধ্যায় লেখা হয় নাই এ কথা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্রাদি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে লেখকগণ বাস্তবিকই পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন বা ভূগোল এবং ইতিহাস বিষয়ে অনেক খোঁজ রাখিতেন। আর এক কথা, চীনদেশীয়গণ যে মঙ্গোলিয় বা আর্য্য দেবতাদের বংশীয় নহে এ কথা মহাভারতে স্পষ্টই লেখা আছে। আজকাল চীনাগণ সমস্ত চীনদেশ, মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কীস্থান প্রভৃতি ছাইয়া ফেলিয়াছে। মহাভারতীয় যুগে কিন্তু তাহারা এরূপ বিস্তৃত ছিল না। তৎকালে তাহারা পূর্ব্ব চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাদের বাসস্থান সাংটাং, সাংহাই, ইন্দোচীন এবং আসামের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ছিল। তৎকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আধুনিক কামরূপ) চীনা এবং কিরাতদিগের রাজ্যকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ছিল।

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ।

সভাপর্ব্ব—২৬ তম অধ্যায়

Chinese Chronicle অর্থাৎ চীনদেশীয় রাজমালা দেখিলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চীনাদিগের রাজ্য সাংটাং এবং তাহার নিকটে অবস্থিত কয়েকটি স্থান পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চীনাদিগকে মঙ্গোলিয় জাতি বলা একটা নেহাৎ ভুল। বর্ত্তমানে আমরা মঙ্গোলিয় সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা চৈনিক সভ্যতা বই আর কিছুই নহে; আদত মঙ্গোলিয় সভ্যতা আর আর্য্য সভ্যতা একই। চৈনিক সভ্যতার সহিত বা আসুরিক (বৈদিক ভাষায় বলিতে গেলে) সভ্যতার সহিত মঙ্গোলিয় বা আর্য্যসভ্যতার কোনই সম্পর্ক নাই। এ সম্বন্ধে ঋক্‌বেদ বলিতেছেন ;—ভীমদ নামক এক ঋষি ইন্দ্রের স্তব করিবার সময় বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, অসুরগণ আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝে না। তাহারা বেদবিহিত কর্ম্মপদ্ধতি মানে না এবং মানব জাতির ধর্ম্মও পালন করে না। তুমি তাহাদিগকে বধ কর।"

ঋক্‌বেদ—১০ম মণ্ডল—২য় অনুবক—৬ষ্ঠ সূত্র

মধ্য এশিয়া হইতে কালক্রমে (বৈদিক যুগেই) আর্য্যগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। এক দল পশ্চিম দিকে অর্থাৎ এশিয়া মাইনর, আর্ম্মেনিয়া বা আর্ম্মানিদেশ, বেবিলোনিয়া প্রভৃতি স্থানে যায় এবং আর

এক দল গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদ্দেশের লোকের আকৃতি-প্রকৃতিতে অনেক আর্য্য ভাবের প্রমাণ পাইয়াছেন। এমন কি তাহাদের আচার, ব্যবহার এবং শিক্ষা সভ্যতাতেও আর্য্য ভাবের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জেরুসালেম, পেলেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী য়িহুদী-গণ্‌ যে পূর্ব্ব দিক হইতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ বাইবেলেই দেখা যায়—

"And the whole earth was of one language, and of one speech, and it came to pass, as they journeyed from the east, they found a plain in the land of Shinnar, and they dwelt there".

Gyenesis. chap. XI.

বাইবেলের কথা মানিয়া লইলে সমস্ত পৃথিবীর এক ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা এবং পৃথিবীকে ইলাবৃতবর্ষ (অগ্র্য সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়) বলিয়া ধরিলে বোধ হয় আপত্তির কারণ কিছুই নাই। পুরাণাদিতেই আছে যে ইলাবৃতবর্ষ বা ইলা "ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ" অর্থাৎ পৃথিবীস্থ তাবৎ জীবের সৃষ্টি স্থান। আর বাইবেলে Paradise বা স্বর্গের যে বর্ণনা আছে, তাহার সঙ্গে ইলাবৃতবর্ষস্থ চারি-নদী-বিশিষ্ট এবং পর্ব্বতের উপর সমভূমিতে অবস্থিত ত্রিদশালয় বা দেবনগরের খুবই মিল আছে। এই চারিটি নদী যে স্বর্ণদী গঙ্গার চারিটি স্রোত, তাহা পূর্ব্বেই বিষদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলের সভ্যতা বা য়িহুদীদিগের সভ্যতা যে ঋক্‌বেদের সভ্যতার অনেক পরে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে (See Historical Quarterly 1929-30 Age of Rig Veda) আর য়িহুদীরা যে মঙ্গোলিয়া হইতেই এশিয়া মাইনরে গিয়াছিল তাহাও বাইবেলের কথাতেই প্রতীয়মান হয়। য়িহুদীগণকে আরবদেশীয়গণ হিব্রু Hebrew বলিত। এই Hebrew কথাটি আরবী ধাতু Eber (এবার) হইতে আসিয়াছে। Eber বা "এবার" অর্থে নদী পার হওয়া (to cross, or, to be across, a river) বুঝায়।

সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায় খৃঃ পূঃ ১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে এমন কতকগুলি উপনিবেশ ছিল যেখানকার লোকেরা আর্য্যভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত এবং আর্য্যপূজিত দেবতাগণের পূজা করিত। মিশর দেশের টেল্‌ এল্‌ অমর্‌না নামক স্থানে কতকগুলি "কিউনিফর্ম্‌ টেবলেট" পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কতকগুলি বৈদিক নাম পাওয়া যায়।

"There are strong evidences to show that in the 15th & the 16th centuries B. C. in Syria & upper Mesopotamia there were several colonies of men of Aryan speech, some of whom worshipped Vedic Gods.

In the Cuneiform tablets discovered at Tell-el Amarna in upper Egypt containing letters from the tributary kings of western Asia to Egyptian Pharaohs, we find such Aryan names of chieftains, Artamanya, Bawarzana or perhaps Mayarzana."

See p. p. 29. 30. Indo Aryan Rac s & the Journal of Royal Asiatic Society 1911. p. 44.

আর একটি জোরাল রকমের আবিষ্কারের কথা জানা যায়। বেবিলোনিয়ার নিকটস্থ "মিতানি" রাজগণের ধর্ম্ম কি ছিল তাহাও জানা গিয়াছে। একটি "কিউনিফর্ম" লেখার নমুনার আবিষ্কার হইয়াছে যাহাতে একটি সন্ধির বিষয় জানা যায়। মিতানিরাজের সন্ধিপত্রে অনেকগুলি বৈদিক দেবতার নাম.পাওয়া যায়, যথা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি।

"Another great discovery, cuneiform writing from Baghazkuci, has revealed the religion of the kings of Mitanni. One of these writings embody a treaty between the Mitanni king Mattiuaza & the Hittite king Subbiluliuma wherein the deities of the two countries are invoked as protectors of the treaty. Among the Gods invoked by the Mitanni king occur the well-known Vedic names Mitra, Varuna, Indra, & others" *Indo-Aryan Races* P. 31.

অতএব দেখা যাইতেছে এই সকল দেশে আর্য্যসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল।

বলা বাহুল্য, এ সব দেশ বরুণের রাজ্য কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

আর্য্যগণের আর একটি শাখা গ্রীসদেশেও গিয়াছিল। গ্রীকদিগের আকৃতি-প্রকৃতির এবং আচার-ব্যবহারের এবং ভাষার সঙ্গে আর্য্যগণের আকৃতি প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারের এবং ভাষার খুব সুসাদৃশ্য আছে। আর্য্যগণের ন্যায় গ্রীকগণও অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত। গ্রীকগণের স্বর্গের নাম Elysium। এই "ইলিসিয়াম" বৈদিক "ইলা" বা "ইলাস্থায়ী" হইতেই রূপান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গ্রীকগণের মতে তাহাদের দেবতাগণ অলিম্পিয়া নামক পর্ব্বতে বাস করিতেন। আর মধ্য-এশিয়াস্থ আর্য্য দেবতাগণ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রভৃতি) ইলাস্থায়ী বা আল্টাই নামক পর্ব্বতে বাস করিতেন। এই ইলাস্থায়ী বা আল্টাই পর্ব্বতের চীনদেশীয় নাম "উলিয়াসুতাই"। গ্রীকগণ যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে এবং যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে দেবতাদিগের নিকট নানাপ্রকার জিনিস উৎসর্গ করিত। বৈদিক যুগে আর্য্যগণও এইরূপ করিতেন। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্র, পুরাণাদিতে আছে। গ্রীকগণ কালক্রমে খাঁটি আর্য্য-সভ্যতা এবং আচার-ব্যবহার ভুলিয়া গেলেও তাহাদের এবং পিতৃভূমির নামকরণের সহিত আর্য্যদের পিতৃভূমির নামকরণের মিল ছিল।

ভারতীয় আর্য্যগণের এবং মধ্য-এশিয়াস্থ অন্যান্য আর্য্যগণের পিতৃভূমির নাম "দ্যৌঃ পিতা" অর্থাৎ স্বর্গলোক বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গোলিয়া পিতৃভূমি। গ্রীকগণ বলিত "Zeus Pater" "জিউস্ পাটের"। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ যেমন কালক্রমে দ্যৌঃ পিতার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়া স্বর্গকেই পিতা অর্থাৎ জন্মদাতা,—পিতৃভূমি বলিয়া পিতা নহে,—বলিতে আরম্ভ করিলেন, গ্রীকগণও ঠিক সেইরূপ Zeus Pater কথার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া Zeus নামক দেবতাই জন্মদাতা পিতা এরূপ বুঝিতে আরম্ভ করেন। গ্রীকভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক মিল দেখা যায়। উপরিউক্ত পিতৃভূমির নামকরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে গ্রীকগণ মঙ্গোলিয়া হইতেই গিয়াছিলেন।

উপসংহারে ইহা বলা দরকার যে আজকাল অনেক পণ্ডিত লোক ভূতত্ত্ববিদগণের বা নৃতত্ত্ববিদগণের নজীর ছাড়া কিছুই বড় একটা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে, হাতে-কলমে কোনও প্রমাণ না পাইলে শুধু পুঁথির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুঁথি পঞ্জিকায় এবং শাস্ত্রপুরাণাদিতে যে স্থানে যে জাতির বাসস্থানের কথা উল্লিখিত আছে, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বা নৃতত্ত্ববিদগণ ইহার বাহিরে যাইতে পারেন নাই, বা পুঁথি পঞ্জিকার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পাতাল বা আমেরিকার কথা বলিলে অস্মদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিতই নাক সিঁটকাইতেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আমেরিকা বা পাতাল ভূমিতে এশিয়ার সভ্যতার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। * মেক্সিকো সহরের ১৭ মাইল উত্তরে সন্‌জুয়ান্ টিউটি হায়কান্ নামক জায়গায় মাটীর অনেক নীচে একটি আজটেক্ পিরামিড পাওয়া গিয়াছে। সেটি সুডোল গোটা আছে। ভিতরে পাথর কাটিয়া হরফ খোদাই করা আছে। মেক্সিকোতে চীনের তরফের সরকারী নায়ক কংসিয়া কুয়াং এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পাথর কাটিয়া শিল্পী সূর্য্য, চন্দ্র, নগর এই তিনটি কথা পরিষ্কার চীনা অক্ষরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছে। কালিফর্ণিয়ার অধ্যাপক জন ফ্রায়ার বলিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে চীনদেশের বৌদ্ধশ্রমণেরা নির্ব্বাণ মুক্তির ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য আমেরিকা গিয়াছিলেন। উপরিউক্ত তিনটি শব্দই সংস্কৃত। কাজেই বুঝা যায় যে মধ্য-এশিয়ায় আর্য্যসভ্যতার ছাপ চীনাদের মন হইতে তখন পর্য্যন্ত মুছিয়া যায় নাই। (নারায়ণ পত্রিকা—১৩২৭ সাল শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য; এবং সেই বৎসরেরই Illustrated London News) আর এই আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের পৌরাণিক যুগে আমেরিকা যাতায়াতের কথাও বেশ প্রমাণিত হইতেছে। কাজেই যখন বেদ, পুরাণ, উপনিষদাদিতে উল্লিখিত অন্যান্য স্থানের বিষয় আধুনিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে, তখন খুব

* পাতাল বা আমেরিকা নামক আমার একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই বাহির হইবে। প্রবন্ধটি Calcutta University Research Associationএ পঠিত হইয়াছিল ১৯শে জানুয়ারী সোমবার। See Advance 26/1/31, also Bengali 25/1/31.

সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়া বিষয়ক সমস্তগুলি কথাই সত্য। কারণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পালি, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় এক কথারই সমর্থন করা হইয়াছে দেখা যায়। ভবিষ্যতে হয় ত এ বিষয়ে অনেক আবিষ্কার হইতে পারে।

এই প্রবন্ধে যে সব দেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে লোকের মনে সমস্যার উদয় হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দেবতারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, সুতরাং মানুষ ছিলেন। কাজেই তাঁহারাও যে মানুষের মতই মরিতেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে শীতপ্রধান দেশের লোক বলিয়া এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নানাপ্রকার নিয়ম পালন করিতেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক দিন বাঁচিতেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। জীবন এবং মৃত্যু কি তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে মৃত্যু কিছুই নহে; উহা একটি পরিবর্ত্তন মাত্র। এ সংসার এবং এ জীবন মিথ্যা। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তাই তাঁহারা ব্রহ্মনাম-রূপ অমৃত পান করিয়া "অমর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহারা যে মরিতেন না, এবং সেই হেতু 'অমর' আখ্যা পাইয়াছিলেন তাহা মিথ্যা। কারণ যোগোপনিষদে লেখা আছে যে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই বা ছিলেন না যিনি মরিবেন না বা মরেন নাই। এই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, কুবের প্রভৃতি সকলেই যথাকালে দেহত্যাগ করিতেন।

"অন্নজো মহিষশ্চৈব কংসো বানাসুর স্তথা।

* * * *

ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ তথৈবচ॥
যক্ষাশ্চৈবাথ গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে চ যমকিঙ্করাঃ।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যু পথং গতাঃ॥
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাস্তথা বালির্মহাবলঃ।
মহাবলো মহাতেজা হনুমাংশ্চ তথৈবচ॥

* * * *

ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো ভবেদজরামরঃ॥"

যোগোপনিষদ্

কাজেই দেখা যায় যে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, দৈত্যদানব, যক্ষকিঙ্করগণ, হনুমান্ (যাহাকে আমরা অমর বলিয়া থাকি) এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতাগণও মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে অজর এবং অমর কেহই নাই।

অপিচ, রামায়ণেও দেখিতে পাই যে সুগ্রীব রামচন্দ্রের তীর নিক্ষেপ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বলিলেন, "বালি ত কোন্ ছার, আপনি সমরে ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতাকেই বধ করিতে সমর্থ।"

"সেন্দ্রানপি সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বংবাণৈঃ পুরুষর্ষভ।
সমর্থঃ সমরে হন্তুং কিংপুনর্বালিনং প্রভো॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১২শ সর্গ

ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে দেবতারাও মরিতেন? ঋক্‌বেদে কিংবা তৎপরে রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির কথার উল্লেখ আছে, তাঁহারা যে একই পুরুষ ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম ব্রহ্মাদি দেবতার পর হইতেই এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি উপাধি বিশেষ হইয়া পড়ে। এইরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। পূর্ব্বে প্রথম ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ইলাবৃতবর্ষে অবস্থিতিকালে তথায় যে যজ্ঞ হইত, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি হোতার কার্য্য করিতেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে স্ব স্ব ক্ষমতা এবং উপযুক্ততা অনুসারেই হোতাগণ কার্য্যের ভার নিতেন। প্রথম ব্রহ্মা, (যিনি কশ্যপ ঋষির পুত্র,) চতুর্ব্বেদবিদ্ ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার নাম ছিল চতুর্ম্মুখ বা চতুরানন; চারিদিকে চারিটি মুখ ছিল বলিয়া নয়। বেদ অর্থ জ্ঞান। ব্রহ্মা খুব জ্ঞানী ছিলেন; চারিদিকেই তাঁহার খুব বুদ্ধি খেলিত। তাই তিনি চতুরানন বা চতুর্ম্মুখ বলিয়া কথিত হইতেন। এই প্রথম ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী বিবেচিত হইতেন তাঁহাকেই এই চতুর্ম্মুখ আখ্যা দেওয়া হইত, এবং তিনিই যজ্ঞে ব্রহ্মা হোতার কার্য্য করিতেন। বিষ্ণু তপোলোকের রাজা ছিলেন বলিয়া যিনিই যখন তপোলোকের রাজা থাকিতেন তিনিই বিষ্ণুহোতার কার্য্য করিতেন। এইরূপেই ক্ষমতা অনুসারে ইন্দ্র, বরুণ, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি আখ্যা পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিল। এই যুক্তির সত্যতাস্বরূপ আমি ভারতবর্ষীয় যজ্ঞের প্রথা বলিতেছি।

এখনও আমাদের দেশে কোনও যজ্ঞ করিতে হইলে তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি হোতার দরকার হয়। বলা বাহুল্য যে এই সব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি হোতার কার্য্য আমরা নিজেরাই করিয়া থাকি। ইহাতে কি বুঝা যায় না পূর্ব্বে স্বর্গে যজ্ঞ করিবার কিরূপ প্রথা ছিল? তবে স্বর্গীয় প্রথায় আর আমাদের প্রথায় এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, প্রভৃতি হইতে আমাদের চতুর্বেদবিদ্, কিংবা বৈজয়ন্তীধামের রাজা, কিংবা পঞ্চবেদবিদ্, কৈলাসপর্ব্বত নিবাসী পরম যোগী শিব, কিংবা যমের ন্যায় ধর্ম্মাধিকরণ হইতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রালয়ে সংবৎসরান্তে যে যজ্ঞ হইত তাহাতে যাঁহারা হোতার কার্য্য করিতেন তাঁহারা তৎস্থানবর্ত্তী পূর্ব্বপূর্ব্ব হোতৃগণের ন্যায় জ্ঞানী থাকিতেন। আমাদের বেলায় মূর্খ এবং রাজ্যহীন হইলেও চলে। প্রভেদটুকু সামান্যই! *

---

* প্রবন্ধটি গত ডিসেম্বর মাসে Calcutta University Research Associationএ পঠিত হইয়াছিল।

গান্ধী-বন্দনা

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্ ওহে ভারতের দুঃখহারী;
প্রণাম তোমারে ওহে বলীয়ান্ ভারত-মুক্তি-পতাকাধারী;
তোমারে প্রণাম ওহে অগ্রণী, কোটী কোটী মূক নরের নেতা;
দুঃখে বক্ষে ধরিয়া আদরে ওহে দুঃখ-ক্লেশ-দৈন্য-জেতা;
শঙ্কাবিহীন ওহে কৃশকায়, কৃশ দেহে পোষবজ্র নিতি;
খর্ব্ব তনুতে গর্ব্ব বিরাট, দুখের গর্ব্ব, বিরাট-প্রীতি।
প্রণাম তোমারে ধীর বৈষ্ণব, অতুল-বিনয়ী, মিষ্টভাষী;
প্রণাম তোমারে দৃপ্ত যোদ্ধা, কুলিশ-মন্ত্রে কলুষ-নাশী।
তোমারে প্রণাম সাগর-উদার, ধরণী সমান ধৈর্য্যশালী;
হিমাচল সম অটুট-অটল, সূর্য্য প্রখর-অংশু-মালী;
অগ্নি সমান উজল পাবক, জননী সমান স্নেহানুরাগী;
শিশুর মতন মুক্তি সরল, শঙ্কর সম সর্ব্বত্যাগী।
তুমি কি প্রতাপ, তুমি পুরুরাজ, তুমি কি শিবাজী
ভারত-ত্রাতা?
তুমি কি সমর-নিপুণ কৃষ্ণ—গীতার মহান্ গীতোদ্গাতা?
তুমি কি বুদ্ধ, নানক, নিমাই? মহম্মদ কি অতল বলী?
তুমি কি খৃষ্ট?—তব মাঝে বীর প্রেমিক সকলে উঠিছে জ্বলি'।
ওহে শিবাজীর শক্তি-বিকাশ, ওহে বুদ্ধের প্রণয়বাহী,
তোমারি মাঝারে শিবাজীরে নমি' বুদ্ধেরে নমি' কীর্ত্তি গাহি।

* * * * *

চলেছ খর্ব্ব, গর্ব্ব-দৃপ্ত চরণে দলিয়া মৃত্যু-ভীতি;
পশ্চাতে চলে কোটী কোটী নর, কোটী কোটী নারী
অসীম-ধৃতি;
তোমার কণ্ঠে লভিয়াছে ভাষা কোটী মানবের কঠোর ব্যথা;
মূর্ত্ত তুমি যে মুক্তি-স্বপন—ত্যাগে যা ভারত বেদন-নতা।
তোমাতে হয়েছে সংহত যত দাসের দুঃখ যুগে ও যুগে;
অনশন-ক্ষীণ লক্ষ লোকের অসহ যাতনা বহিছ বুকে;
কোটী কৃষকের ঋণদায় তুমি নিজ ঋণ সম মানিলে মনে;
মিলালে চিত্ত গত-গৌরব হৃত-বৈভব ভারত সনে।

* * * * *

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্, বুদ্ধ তুমি যে শিবাজী তুমি;
তোমারে প্রসবি' ধন্য হয়েছে পেষণ-পীড়িত ভারতভূমি।
শত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে দাস-পাশে আর পেষণ-পাশে;
রত্নপ্রসূ ও বীরপ্রসূ এই ভারত এখনও মরেনি ত্রাসে।
আজও আছে তার শৌর্য্যের বীজ, আজও মহত্ব সজীব রহে;
গান্ধী, তোমারে প্রসবি' ভারত আপন শকতি সবারে কহে।
প্রণাম তোমারে গান্ধী বিরাট, প্রণাম মুক্তি-পতাকা-ধারী;
প্রণাম তোমারে ভারত-সূর্য্য, প্রণাম ভারত-বিপদ-হারী।

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২৫)

শীতের সূর্য্য অস্ত গেল। প্রদোষচ্ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপ্‌সা হইয়াছে, একটা জরুরি সেলাইয়ের বাকিটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্ব্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি-একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানা-জানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা সুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এম্‌নিই একটা-কিছু যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলনা।

তাহার পরে হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া সহসা এমন যায়গায় আসিয়া চুপ করিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলেনা।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল যেন মাথা তুলিবার সময়টুকুও নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব, অজিতকে পুনরায় আরম্ভ করিতে হইল, কহিল, আশ্চর্য্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়লোনা!

কমল মুখ তুলিলনা, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ, তুমি এতই সাদা-সিধে যে কোন সন্দেহই করোনি, কিন্তু এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে-না পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারেননা?

অজিত বলিল, হয়ত পারি,—কিন্তু সে তোমার মুখের পানে চেয়ে। এম্‌নি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা'হলে চেয়ে দেখুন, বলুন, পারেন কি না।

অজিতের চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল; ক্ষণেক পরে কহিল, তোমার কথাই সত্যি। তাকে তুমি অবিশ্বাস করোনি, কিন্তু তার ফল দাঁড়ালো তো এই!

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণে হাতে পেলেন সেটা খুলে বলুন? এই বলিয়া কমল পুনরায় একটু হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনেরো অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বল্‌তে জানোনা কমল?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালোবাসে,—ওটা স্বভাব।

তা'হলে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বল্‌তে একটু শেখো, নইলে সংসারে কাজ চলেনা।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে, মেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজ ঠিক এম্‌নিই অচল হ'য়ে উঠবে। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুকরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশি, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর, নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা' প্রকাশ পেলেনা হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালোবাসলে যে কি করে সেইটে শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং, তাদের হয়ে জবাব-দিহি করতে পারবোনা, কিন্তু তারা ভালোবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটেনা,—স্পষ্ট, পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্ত্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়ী-ওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ, তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট, মজবুত কোরে গ'ড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত রাখেনা। তারা সাধু লোক। কিন্তু—

তাহারও অসমাপ্ত বাক্য বাধা পাইয়া থামিল। দ্বার-প্রান্তে অনুরোধ আসিল,—আমরা ভেতরে আস্‌তে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি দিন মাত্র দেখেচো', তবু আশা করি তাকে ভোলোনি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা শাদা, আজ হয়েছে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণা মাত্র,—আর কিছু না। ও ৺কাশীধাম থেকে সদ্য প্রত্যাগত,—ঘণ্টা দুয়ের বেশি নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি, আমি আস্‌চি শুনে ও কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলেনা। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য্য,—আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাহ্ণেই সমুপস্থিত। যাক্, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি তো ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠ্‌লো বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বোসো। এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল, হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বোসো হে সতীশ, জাত যাবেনা। কাশী ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকো তার চেয়েও উঁচু যায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলোনা।

না, সে জন্যে নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁটা দেওয়া আপনার মুখে সাজেনা হরেনবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহন্ত-মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও ছোট। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা। সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ ভুল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহন্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না-মেনে চলা। একজনের তো পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশি তত্ত্ব-সঞ্চয় কোরে। ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান-তালে পা ফেলে চল্‌তে হয়ত আর পেরে উঠ্‌বোনা। এখন ভাব্‌না কেবল ওই অর্দ্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী-কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকে ও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচার-নিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি, শুধু ক্ষোভ এই যে, আর

একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ী ভাড়ার টাকাগুলো আমার আর লাগ্‌তোনা।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে ?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা ? আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কিছু একটা নাম আছে,—সতীশ জান্‌তেও পারে,—কিন্তু, আধুনিক-কালের আঁকা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচো ? দেখোনি ? তা'হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবেনা। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তো হঠাৎ মনে হ'য়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি আশ্রমে ঢুক্‌চে। একটা ভরসা পেলাম, আশ্রম ভেঙে দিলে তারা দেশের কোন-একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে,—মারা যাবেনা।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি ?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আর আমার সহ্য হয়না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিন্‌তেই পারোনা। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কিনা সে তুমিই জানো, কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে আমি যাই করিনা কেন ওদের ভয় নেই। কারণ, চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সম্বাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে তর্ক কোরে সতীশবাবুর লাভ কি হবে ? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুল্‌তেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ কোরবনা। আমার আপত্তি শুধু ঐ সত্যবস্তুটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি ?

সতীশ বিনীত কণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবেনা। কিন্তু তর্কের জন্যে নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটাকয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবোনা ?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিলনা, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাসা কোরে বল্‌লেন আমি কাশী ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু যায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই,—আশ্রম ভাঙলে ক্ষতি হবেনা, কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভালো করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাক্‌লে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারতোনা। তার মতো ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির মধ্যে দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এরই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে আমরা গড়ে তুল্‌তে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠ বাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া তো কখনো সঙ্ঘ সৃষ্ট হয়না। আর শুধু ছেলেরাই তো নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি। কষ্ট ওখানে আছে,—থাক্‌বেই তো। বহু শ্রম কোরে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই তো আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের তো কিছু নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক্ না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা কোরবনা, কারণ, সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয়-আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ তো অস্বীকার করা যায়না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এ সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম্ম নয়, জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বালিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জা

জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদুকণ্ঠ সতেজ, ও উদ্দীপনায় কালো মুখ বেগুনে হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই দিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক্, আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা, আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙ্তে চাচ্চেন, কিন্তু ভাঙাটাই কি বড়? গোড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশি বড় নয়? আপনিই বলুন?

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? কটার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি, এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমের শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্ষুব্ধ মুখের চেহারা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বল্লেই তো কৈফিয়ৎ হয়না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখানো হয়। একে তো উপেক্ষা করা চলেনা।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দাম নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তাকে ভালো হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠেনা। যে বর্ব্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌তো, আজও যদি সে সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করতে চায় তাকে তো ভালো বলা চলেনা, সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে তো বর্ব্বরের তুলনা হয়না হরেনদা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জানো আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করাই যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায়না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্ব্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেনদা। আপনি তো জানেন, আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে-উপাদান যে-সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে-সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম্ম,—সেই আমাদের আপন জিনিষ। এই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, নাও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস,—এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ,

বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল ; তাই দিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল,—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিন নিশ্চিহ্ন কোরে তারে সংসার থেকে মুছে' দিতে এতটুকু দ্বিধা করলেনা। সে অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব্ব পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণে সত্য ছিলনা?

হরেন্দ্র বলিল, ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেন্দা, এ সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল ; আর কিছুই নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিক কালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ সহসা উত্তর দিলনা। বহুক্ষণ নির্ব্বাক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার,—সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের লজ্জা, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের তো জয় হবেনা, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু ; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হোতোনা যে ভাবের জন্যে, বিশেষত্বের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার সমাদর, মানুষের জন্যেই তার দাম? মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হোলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় তো হবে? তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নরনারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন তো নবীন তুর্কির দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরণো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিনই তার হয়েছে বারম্বার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে,—তার সমস্ত আবর্জ্জনা ভেসে গেছে,—আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। মনেও করেনি তারও বিবর্ত্তন আছে। সেই মোহ গেল আজ মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠ্‌লো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরো হবে। সতীশবাবু, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে এও তো না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এও তো সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ তো ভালোর শত্রু নয়, ভালোর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভালো,—সে। এইখানেই ভারতের ভয়। এবং, সেই আরো-ভালো যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজ-দণ্ড তুলে দিয়ে ওকে স'রে যেতে হবে। একদিন শক, হূন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি। —তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকি রয়ে গেল ফরাসি-ইংরেজ এসে পড়লো বলে। সে মিয়াদ

আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক্, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগ্‌বে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়্‌বেনা, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এম্‌নি কোরে বল্‌তে থাক্‌লেই হবে সর্ব্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙ্‌লায়,—সে বেশি দিন নয়—বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে কোরে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শ-ভ্রষ্ট জনকয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয়-স্পর্দ্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকেই তুচ্ছ কোরে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইলনা, প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়্‌লো। সেই বিষম দুর্দ্দিনে মনস্বী যাঁরা স্ব-জাতির কেন্দ্র-বিমুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁরা শুধু দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র-অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে অসাধারণ কিছুই ছিলনা। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে, খুব বেশি লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যেই সেটা হ'তে পারেনি। কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ, চুপ করিয়াই আছে। হয়ত, জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিলনা। অজিতকে সে চিনিত, —কিন্তু হরেন্দ্রও যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্ব্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িমা এম্‌নি বিসদৃশ শুনাইল যে, সে নীরবে থাকিতে পারিলনা। কহিল, হরেনবাবু, এক ধরণের লোক আছে তারা ভূত মানেনা কিন্তু ভূতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারেনা। এ দেশে আশ্রমের জন্যে টাকার অভাব হবেনা, ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবেনা; অতএব, সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওঁকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি, সে খোঁজ তিনিও করেননি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিলনা, আমার মনে ছিলনা। কামনা করি, ধর্ম্মকে যেন আমরণ এম্‌নি ভুলেই থাক্‌তে পারি। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী ব'লে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন, এবং নমস্য বলে যাঁদের নমস্কার করলেন, সর্ব্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুল্‌বেনা।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখনো শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে সেইটে আগে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে আমি ভাব্‌তে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিত-পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এই-খানে হয় মানুষের ভুল। ওর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো ব'লে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এ কথাটা ও বুঝ্‌তেই পারেনা।

কমল কহিল, পারি, শুধু দাম নেবার বেলাতেই

একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেচি। ও-শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি,—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেছে। কিন্তু, দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘর-ছাড়া কোরে এনেছে তাদের নিয়ে যে কি কোরব আমি ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও তো তাদের পারবোনা।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ, অলৌকিক কিছু-একটা কোরে তুলতে চাইবেন-না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন কোরে তাদের বড় কোরে তোলে তেম্‌নি কোরেই এদের মানুষ কোরে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হ'তে পারিনি কমল। মাষ্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখা-পড়া শেখাতে হয়ত পারবো, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কি না সেই আমার ভয়।

কমল বলিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত কোরে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পাননা। সন্দেহ আসে, হয় ওরা দেব্‌তা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখে পড়েনা। পরন্তু, মন-গড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত, মলিন কোরে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা' দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েছে কি? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরা তাকে বলে সুন্দর,—সে আমার সয়, কিন্তু মেয়েরা নিজেদের সেই পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্য্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয়, তখন আশা করার কিছু থাকেনা। আপনারা নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞেসা কোরলাম, বাবারা, কেমন আছো বলো ত? ছেলেরা একবাক্যে বল্‌লে, খুব সুখে আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে,—এম্‌নি শাসন। নীলিমা দিদি আমার পানে চেয়ে বোধ-করি উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার জবাব খুঁজে পেলামনা। মনে মনে ভাব্‌লাম, ভবিষ্যতে এরাই আন্‌বে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক্‌, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা তো যুবক? এরাও তো সর্ব্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেননা, সুতরাং, সেও যাক্‌। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই তো বেশি পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ কোরোনা কমল, কিন্তু তোমার রক্তে তো বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা ইয়োরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এ দেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভালো। দেহের রূপ ছাড়া বোধহয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় ব'লে জেনেচো।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেননা। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় কোরে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠ্‌তে পারেনা। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুট্‌লো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম তো আর জগৎ ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা কোরে কারও বাঁচ্‌বার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচ্‌কে হেসে আপনারাও বল্‌বার দিন পাবেন,—কেমন! বলেছিলাম ত! দিনকয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জান্‌তাম। কিন্তু, চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেই দিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বল্‌তে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নিচু কোরে পড়ে, তার ধূলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দ্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজের দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিব-নিব হয়ে আস্চে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা, চোল্লাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিলনা।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না প'ড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেভায়, তাকে বন্ধু বলে জান্‌বেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার আর নেই, তবু বলতে পারি, যত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক্, ভারতের কাছে সে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাসে প্রোমোশন-না-পাওয়া ছেলের এম-এ পাশ-করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ ব'লে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা ব'লেও তেম্‌নি একটা কথা আছে। সেটা ভোলা উচিত নয়।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু, এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্ব্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে-ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতের সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিলনা, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা অতীতে একজনের পূর্ব্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল, এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার সে গুরু হয়ে বসবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি। বলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(২৬)

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাঁহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনে এই কয়দিনে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ, আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলো-মেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিলনা,—ঘটিলও তাই।

ফটকের দরওয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নিচের বারান্দায় সাধারণতঃ, কেহ বসিতনা, তথাপি, খানকয়েক চৌকী, মেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙানো ছিল, আজ সেগুলা অন্তর্হিত। শুধু, ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখানো লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে-স্থানে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, সেগুলা পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিলনা। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়াছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিলনা, পর্দ্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশি মাত্রায় খুসি হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—কমল যে! এসো মা এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল,—এ কি? আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন,—বুড়ো? সে তো ভগবানের আশীর্ব্বাদ কমল। বয়স যখন বাড়ে, তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও তো ভালো দেখাচ্চেনা?

না।

কিন্তু, আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছো কমল?

ভালো আছি। আমার তো কখনো অসুখ করেনা কাকাবাবু।

তা' জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ, তোমার লোভ নেই। কিছুই চাওনা ব'লে ভগবান দু'হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখ্‌লেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ তো ডেপুটির আদালত নয় মা, যে ধমক্ দিয়ে মাম্‌লা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক্, তবু মানি, যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাইতো আজই সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌লাম, শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেচে,—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে,—ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোকে শুধু ভুল ক'রেই ভাবে, মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দ্দেশে শূন্যর দাম আছে। আমি তো দেখি কিচ্ছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটী হয়, শূন্যর সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠেনা। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিলনা, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই তো যাবার সময় হোলো, কাল-পরশু যে চোল্‌লাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাব্‌তে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুল্‌বেনা।

কমল কহিল, না, ভুল্‌বোনা। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেক্‌চে বলে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি-সত্যিই পদার্থ,—মায়া নয়।

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেননা, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো যান্‌নি বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা' বাড়ীতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবেনা। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটুখানি দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরণো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে নাপারি, তোমার মুখ থেকে কেউ-কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্ব্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইলনা, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবেনা। এই অকর্ম্মণ্য দেহটার দাম তো ভারি,—এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবোনা। কিন্তু কে জান্‌তো কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন কোরেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠ্‌তে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এত বড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাব্‌তে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমা-দিদিকে দেখ্‌চিনে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন—কাল সকাল থেকেই আর দেখ্‌তে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার পাঁচ জন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন কোরে গড়ে তুল্‌বে এই তার কল্পনা। তুমি শোনোনি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুন্‌বে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যা-বেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ কোরে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড়-একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্ম্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ কোরে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম,—হয়ত এই আমার শেষ উইল,—এটর্ণিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্যে এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিলো,

ভালো-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত শাদা। কি যে হোলো হঠাৎ ভেবে পেলামনা। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল চোখে-মুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম,—চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলোনা। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশি নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বস্‌লো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠ্‌লো, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হুহু কোরে কেঁদে উঠ্‌লো। সে কি কান্না! মনে হোলো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়লো,—আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইলনা।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত্ত নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই তিন। এ অবস্থায় তারে কি যে বোল্‌বো আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়ালো, একবার চাইলেওনা,—ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বল্‌লে সে একটা কথা, না বোল্‌লাম আমি। তারপরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝতে পারেননি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হোতো এ শুধু ছলনা,—শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণ দেহ, এই অক্ষম অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় জীবনের দাম যার কাণাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়। এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেনা। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকি দিন ক'টা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা!

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ বিচ্ছেদের যখন মাম্‌লা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিলো। তারপরে থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলনা। নিজের স্বামীকে এম্‌নি ক'রে সর্ব্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ কোরে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই নিজের মনে স্থান দিতে পারছিলনা। ও বলে তাঁকে ত্যাগ করাটাই তো বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্য্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও তো কষ্টি পাথর, ওতে যাচাই করেই ভালোবাসার মূল্য ধার্য্য হয়। আর এ কেমন-তরো আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুট্‌লনা? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়,—এ বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ ভাবি, ভালোবাসায় পারেনা কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্ম-মর্য্যাদা-বোধের টগ্-অফ-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমিই ওর আদর্শ,—কিন্তু, চাঁদের আলো যেন সূর্য্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেলো। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে কত দিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দুশো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল। স্ত্রীর ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালোবাসার সে কেবল একটি মাত্র দিক্‌,—এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা,—আপনাকে বিসর্জ্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত

পেতে নিতে পারলামনা বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে-সকল দিক আঁধার করিয়াছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভালো কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙাতে দেবোনা। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবেনা। অনুমতি দিতে তো পারবোনা, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্ব্বাদটুকু রেখে যাবো দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল ভ্রান্তি-ভালোবাসা,—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেক পরে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমা দিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন,—কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখো মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারবোনা। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু এখনো এ সংশয় আসেনি যে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করিনে, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্ম-বঞ্চনা বল্‌তে পারবোনা। এ তর্কে মিল্‌বেনা, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষে এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে,—সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা,—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকি দিনগুলোকে শূলের মতো বিঁধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালবাসতো। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল সংশোধনের দিন তো তার শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অন্ততঃ, অসম্ভব তো নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘট্‌তে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে কোরেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল কহিল, তা' জানিনে। কিন্তু যাকে পেলেনা, পাওয়া যাবেনা, তাকেই স্মরণ কোরে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেন?

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবেনা, কমল। আমি যা পারি, তুমি তা' পারোনা। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়,—একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলেনা,—balance of yarning—তৃষ্ণার শেষ বিন্দু জল তাদের নিঃশেষে পান কোরে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত,—উপুড় হয়ে শুষে খাবার প্রয়োজনই হয়না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু, তাই বলে তো আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মান্‌তে পারবোনা; আকাশ-কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তর কাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে-শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভ'রে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এম্‌নি কোরেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ কোরে দিয়েছে। নীলিমা দিদির দেখা পাবো কিনা জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন,—যাচ্চো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার কোরে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে তো আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহে-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম শ্রদ্ধা করিনে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা'ছাড়া নীলিমা, এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল সহাস্যে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরা-বালি নেই,—তাই। চোর-বালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারেনা, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নীরেট মাটি লোহা পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই চলে। নীলিমা দিদিকে সব মেয়েতে বুঝ্‌বেনা, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায় তারা ওকে বুঝ্‌বে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি কোরে বুঝেছি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে,—জ্বালা নিভেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী,—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ,—নইলে, ওরা ভালোবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দু-ভাগ কোরে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা,—তারপরে সেটা ফুরোয়। ফুরোয় বলেই প্রেমের সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে,—নইলে বাজ্‌তো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি তো জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায়নি, মণি আপনি ভুলেছে। সূর্য্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়, কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বল্‌বে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলেনা, মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচেনা। তার কি বলো ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাইতো ঘুরে-ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকা-বাবু, শেষ আর হচ্চেনা। বরঞ্চ, যাবার সময় আপনার ওই আশীর্ব্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা' ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিন্‌তে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা,—তার বেশি নয়। ওটাকেই নারীর সর্ব্বস্ব বলে যে দিন মেনে নিয়েছেন সেই দিনই সুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্ব্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান, কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুণকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন,—আমি গাড়ী আন্‌তে পাঠিয়েচি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি? কিন্তু বেলা তো নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা' বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়,—আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন।

উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পারো আমাকে জানিয়ো। কিন্তু কাল বোলোনা যে আমাকে জানাননি কেন? নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় ব'লে আমি দাবি করতে পারিনে, কিন্তু ওঁকে তো আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয়না।

তোমার বাসাতেই তো থাকবেন?

হাঁ,—অন্ততঃ, এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ বাড়ীতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে, ও-বাড়ীতেও দোষ হবেনা।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বললেননা যে এতকাল এ সুযুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেম-সাহেবের জিনিস-পত্রের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাওগে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ-বাড়ী থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি, কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে,—বোধ হয় ওঁদের একটা reconciliation হোলো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলনা, শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেননা যে?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্ম-গরিমায় বাধ্‌লো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হোচ্চ কেন কমল? চরিত্র দোষে যে-স্বামী অপরাধী তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর, নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির একই সুরে বাঁধা—এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিলনা, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিলনা।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমল তেম্‌নি ভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইলনা। যাবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়ীতে পুরণো কেউ আর রইলনা।

যদু?

হাঁ, আপনার পুরণো চাকর।

কিন্তু সে তো নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন পাঁচেক হোলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইলনা। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো, কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন্, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকা-কড়ি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ অপরিমিত, —কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে সব ফেলে এয়েচো। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই,—এম্‌নি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু। রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি দু-পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুন্‌তে পাই। তাই, ব'সে ব'সে ভাবি।

ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজও সে ছেড়ে থাক্‌বেনা। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল সহজে উপরে যাইবার যো নাই, রাশিকৃত বাক্স তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে; উঁকি মারিয়া দেখিল অজিত হিন্দুস্থানী মেয়ে-লোকটির সাহায্যে ষ্টোভে জল চড়াইয়াছে, এবং চা-চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দ্দিকে আতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড ?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—চা, চিনি কি তুমি লোহার-সিন্দুকে বন্ধ কোরে রাখো না কি ? জলটা ফুটে-ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন ? সরে আসুন, আমি তৈরি ক'রে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার ? বাক্স-তোরঙ্গ-পোঁট্লা-পুঁটুলি, এ সব কার ?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েছেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে ?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বার করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নিচেই পড়ে থাকবে ? চুরি যাবে যে।

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—যায়নি তো। একটা চামড়ার বাক্সে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভালো। এক জাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরে সাবালক হয়না। তাদের মাথার ওপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক্, নিচে আসুন। ধরা-ধরি কোরে তোলবার চেষ্টা করা যাক্।

(২৭)

বাড়ী-ঘালা এইমাত্র পুরা-মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিস-পত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা ছাঁদা জিনিসগুলার ফর্দ্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই,—যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশি নীরব।

সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রর নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়,—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা,—কমল, নিশ্চয় এসো ভাই। নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে না কি ?

যাবো বই কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি ?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে, কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনো চিঠির পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক্, বাঙালী-মহলে খবরটা জানা-জানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কি ভাবে ও কোথায় এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ, জানা কঠিন ছিলনা,—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত গম্য স্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখেদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা-কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙ্‌লো-বাড়ী তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়ীটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে ; এই বাটীতেই দুজনে কিছুকাল বাস করিবে। মাল-পত্র যাইবে লরিতে, এবং পরে, শেষ-রাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি,—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, তুমি কি একা যাবে নাকি ?

যাইনা। তোমার দোর তো খোলাই রইলো, যবে খুসি দেখা ক'রে যেতে পারবে। কিন্তু আমার তো সে আশা নেই,—শেষ দেখা দেখে আসিগে,—কি বলো ?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই দেখিতে পাইল, নানাছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত

ইসারায় আজ শুধু একটি মাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, তাহারই সমুখে এই একটিমাত্র রমণীকে পরিত্যাগ করার মতো কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারেনা। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ী কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রর বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন, দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলা, কোলাহলও কম হইতেছে-না। মাঝখানে আশুবাবু ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন, এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে-একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল, এবং ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময় কলস্বরে সম্বর্দ্ধনা করিল,—কমল যে? কখন্ এলে? অজিত কই?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল যে-ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ-দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিতনা। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেননি,—শরীরটা ভালো নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। দেখ্‌ছিলাম, ধর্ম্মকে তো ফাঁকি দিলেন, কর্ম্মকে ফাঁকি দিলেন কিনা! এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্য-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া উর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতায় ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই,—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল,—কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রর কথায়। আর দুটি নারীর সমুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগ ভরে বলিয়া ফেলিল,—এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হোলো। কমল ছাড়া ঠিক এম্‌নি কথাটি আর কেউ বল্‌তে পারতোনা।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন শাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্বটি এতে পরিস্ফুট হোলো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এবার জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিন্‌তে পারো ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হোলো। চিন্‌তে তুমি পারচো ত অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিলনা, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিলনা, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই সহর থেকে, হয়ত বা এ দেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্ছেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্ত্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েছো বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে-ক'টি ছেলে বর্ত্তমান আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা পথেই তাদের মানুষ কোরে তোলেন। তোমরা সকলে অনেক দিন অনেক কথাই বলেছো, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্ত্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফল্‌লো বুঝি ওঁর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই তো। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবু আমার মনে হয় ভাঙবার প্রয়োজন ছিলনা। সকল ধর্ম্ম-মতই তো মূলতঃ এক, সিদ্ধি লাভের জন্যে এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন ক'রে চলা। যারা মানেনা বা পারেনা, তারা না-ই পারলো, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ কোরেই বা লাভ কি? কি বলো অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার তো এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হোলোনা আশুবাবু, বরঞ্চ, হোলো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন কোরে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতামনা। কিন্তু তাতো নয়,—আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্ম্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্ম্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা' যেন হোলো, কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল পরিহাস যে করে নাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশি নয়? সকল ধর্ম্মই আসলে এক, এ আমি মানি। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। মুঠোর মধ্যে ওকে তো পাওয়া যায়না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে। যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল কোরে বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া চলে। তাইতো জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল ধর্ম্ম যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ তো সবাই জানে, কিন্তু তাই ব'লে কি মানতে পারে? আপনিই বলুননা অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল। ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইলনা।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারি অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাওনা? তাইতো তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সাম্‌নের পর্দ্দাটা সরিয়ে দিন,—আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝ্‌তে বিলম্ব হবেনা। নইলে, আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি কোরে? মাঝখানে কুয়াসার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু তো পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে তো চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্ত্তন। কালের ধর্ম্মে আজ যা' অচল, আঘাত কোরে তাকে সচল করতেই চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি ব'লেই তো। মিথ্যে বলে জান্‌লে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে শ্রদ্ধায় সারা-জীবন মেনে মেনেই চল্‌তাম,—একটুও বিদ্রোহ কোরতামনা।

একটু থামিয়া কহিল, ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেলো নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলেনা আচার-অনুষ্ঠানে। পুরণোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে-তলে দিতে লাগ্‌লো তার পূজো, ভেতরে গেলনা শেকড়, সখের ফ্যাশান গেলো দুদিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এম্‌নি কোরেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সাম্‌লেছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিলনা, গম্ভীর হইয়া

রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিক মত আজও সায় পায়না, মনের মধ্যেটা রহিয়া-রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুস্কিল এই যে, তুমি ভগবান মানোনা, মুক্তিতেও বিশ্বাস করোনা। কিন্তু যারা তোমার ওই অজ্ঞেয় বস্তুর সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেল্‌লেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে; সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেলো আমি নিজের দুর্ব্বলতাই অনুভব করেছি।

তা'হলে ভালো করেননি হরেনবাবু। বাবা বল্‌তেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট ক'রে আনলেও লাভ হয়না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাব্‌তেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার দুই বছর মুছে ফেল্‌লেই আস্‌বে পরম লাভ। এম্‌নি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলেতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুল্‌বে বাইবেলের সত্য-যুগ। তাদের লাভের হিসেবের অঙ্ক জানে অনেকে, জানেনা শুধু মঠ-ধারীর দল যে, বিগত-দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্ত্তমানের বিধি-নিষেধের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি, কিন্তু ভাঙা-আশ্রমে বাকি রইলেন যাঁরা তাঁদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়—ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল,—যত উজ্জ্বলই হোক্ তবু সে ছবিই,—তার বড় নয়। এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি যার থেকে তার যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে জীবন গড়া চলেনা। শ্রীরামচন্দ্রের যুগকেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগকেও না। মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক্, তাতে ফিরে যাওয়া যায়না। পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি নিয়েই তো মানুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখো-মুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভয়তা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেননা বলি কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা' পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেচি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু, আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোষাক, মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বল্‌লেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বই কি হে। বলোগে, রাতও তো হোলো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌ-ঠাকরুণ আসা পর্য্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয়না। ওঁর তো কোথাও যায়গা ছিলনা,—কিন্তু সতীশ রাগ ক'রে চলে গেলো।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ, সতীশেরও অন্য উপায় ছিলনা। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী,—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারি যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভালো হোলো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্ব্বহ। এই বলিয়া সে

পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল,—হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল,—কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকে সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পূজো বারেবারেই ঘাড় হেঁট ক'রে আত্ম-পূজোয় নেমে আসে। এছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ তো শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়,—এ দু'য়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্দ্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ ক'রে পেতে চায়, তখনি দেখি সে আপনাকেও পায়না, ভগবানকেও খোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্যে দুশ্চিন্তা রাখবেননা, হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিতনা, তাই শেষ কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল,—আত্মদর্শন। অর্থাৎ, আপনাকে নিগূঢ় ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা,—সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানোনা, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত কোরে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত যোজনায় সফল হয়না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই তো যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল-ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ব্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাস-পরায়ণ হিন্দু-চিত্ত নির্বাত-দীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত, সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু তো হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠেনা। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যু-বরণ-করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেছে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জ্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-চিন্তাই হয় তো, এই কথাই জোর করে বল্‌বো যে এই দুটো সিংহ-দ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্ব্বার আসিয়া জানাইল খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

(২৮)

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুন্‌তে পেলাম আপনারা চলে যাচ্ছেন। পরিচিত সকলের বাড়ীতেই আপনি এক-আধবার গেছেন, শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে নয়; 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করেনা, অভিমানও করেনা। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা যে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি-ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃক্‌পাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি তো কখনো যেতে বলেননি?

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবেনা?

কি কোরে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্ছি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদ্‌লালো কি কোরে? বরঞ্চ, আরো ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ, তাই হোতো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ কিছু বুঝ্‌লেন কি না জানিনে,—না-বোঝাও আশ্চর্য্যি নয়,—কিন্তু, আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা তো সেই দেড় হাজার বছরের পুরণো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান,—কিছুই তো ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় তো কেবল এইটুকুই বল্‌তে পারি যে ওঁদেরও ভেবে দেখ্‌বার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন-একটা-দিনেই সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মান্‌তে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেছেন একবার তাঁকে দেখবেননা?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখ্‌তে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও প্রশ্ন কেউ করেনা। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখা-পড়া শেখবার সময়ও পায়নি দরকারও হয়নি। রাঁধা-বাড়া, বার-ব্রত, পুজো-আহ্নিক নিয়ে আছে, আমাকেই ইহকাল পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হ'লে ওষুধ খেতে চায়না, বলে, স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে বুঝবে স্ত্রীর আয়ুঃ শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রর কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি তো ভাগ্যবান,—অন্ততঃ, স্ত্রী-ভাগ্যে! এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্ল্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই,—ঠিক জানিনে। হয়ত, একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, একটা অনুরোধ কোরব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখ্‌বেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন,—এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাব্‌বো। আচ্ছা, চোল্‌লাম,—নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল। এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে এই সেই অক্ষয়! এবং, মানুষের জানার বাহিরে এই ভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্ন শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে! একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা!

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। এ তাহার স্বভাব,—বিশেষ কেহ কিছু মনে করেনা। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বল্‌ছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি ব'লে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বল্‌ছিলেন, লোকে এইটিই বুঝ্‌তে পারেনা যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখেনা। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং, চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিলনা যে উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও পারা যায়। কদাচার ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে

সর্ব্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষ-বেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে কোরোনা মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রর সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন। কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্য্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা, বেশ-ভূষায় আপ্ টু-ডেট। এ ভুললে যে একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ তো করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবেনা তা' জানি। রাগ আমাদেরি হোলোনা,—শুধু হাসি পেলে। কিন্তু তুমি বাসায় যাবে কি কোরে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাবো?

বাঃ—নইলে যাবো কি কোরে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু, আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবেনা,—কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল,—হ্যালো! বেটার লেট দ্যান নেভার! এ কি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলা সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে তো আর দেখা হোতোনা। আমরা আজ ভোর রাত্রেই দুজনে চলে যাচ্চি।

আজই? এই ভোরে?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে সুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেরই মনে হইল গায়ে কে যেন পাঁক মাখাইয়া দিল।

বহুক্ষণে সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া একপাশে বসিল। কথাটা তাঁহার গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত, আর কথনো আমাদের দেখা হবেনা, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হোতো আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—এ জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বারবার বলেচি, বারবার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ,—যা কিছু আমার আছে,—সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত কোরে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব্ব সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের হাতে রাখিবার আজ তাহার আর কিছুই নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক্, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে তো আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবেনা জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা'হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র কোরে বাড়ী গাঁথ্‌তে চেয়োনা। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত কহিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাওনা,—কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখ্‌বো কমল? কই সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ, তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। ঐ একই কথা, মা। এই আত্ম-সমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশি।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফলে যাবেনা।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে তো আসোনি, নীচে চলো।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এম্‌নি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হোলো,—যা' ও কথনো করেনা।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি-চুপি জবাব দিল, পেয়েছি ? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিলনা। তাহার কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিলনা তাহা কানে ঠেকিল। এমনিই হয়। বিশ্বের এম্‌নিই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলোনা যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিলনা।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, আমি আবার আসবো। কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবো। জীবনে কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেননা। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এই রূপে সে দেখা দেয়—তাকে আর কিছুতে চেনা যায়না। আর যাই কেননা করো দিদি, অবিনাশ বাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হয়োনা।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়ীতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসেনা, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি দিলে, অজিতকে তাই অজ্ঞানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষে কোরো মা।

ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি যে ভালোবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু, শুচিতার রূপ নিয়ে যাবার সময়ে আর আমি তর্ক তুলবোনা। আমার ক্ষোভের নিশ্বাসে তোমাদের বিদায়ক্ষণটিকে মলিন কোরে দেবোনা। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল, শুধু দুচার জনের জন্যেই,—তাই তার দাম। তাকে সাধারণে টেনে আন্‌লে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৈষ্ণবদের দিন পর্য্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা ?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম্ম কাকাবাবু।

ধর্ম্ম ? তোমার ও ধর্ম্ম ?

কমল কহিল, হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃত দেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের

সৃষ্টি হবে। এম্‌নি কোরেই শুভ শুভতরের পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ। দেখ্‌তে পাননা কাকাবাবু, সতী-দাহের বাইরের চেহারাটা রাজ-শাসনে বদ্‌লালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেম্‌নিই জ্বলচে? তেম্‌নি কোরেই ছাই কোরে আন্‌চে? এ নিভ্‌বে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেননা, শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির-মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি। তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্ব্বলতা,—কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন সংসারে ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। আচ্ছা, আসি। বাসদেও, চলো।

টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরি তার। হরেন্দ্র গাড়ীর আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার এক ছোট সরকারী হাঁসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ,—গ্রামের এক ঠাকুর-বাড়ীতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহ-মূর্ত্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্ত্তনাদি সহ শোভা-যাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্মসাৎ করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সম্বাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অনাবিল জ্যোৎস্না রাত্রি সকলের চক্ষেই এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দুদিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলেনা?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা তো যেতোনা, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্ত-হাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো। তুমি আর যাই করো, এ রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত কোরোনা। বাসদেও,—চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশি বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিলনা। শুধু বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন।

এবং, সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন্‌,—চলো।

শেষ
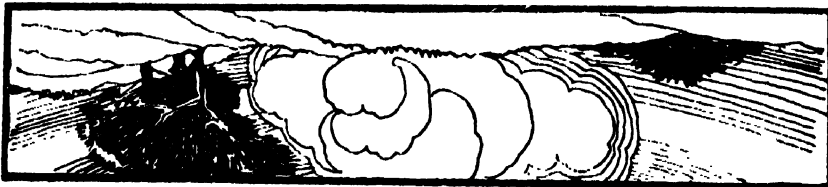
সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন অনুসন্ধানের ফলে ১৮২৭, ১৪ এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৩৪) হইতে ১৮৩০, ১০ এপ্রিল (২৯ চৈত্র ১২৩৬) পর্য্যন্ত সমাচার দর্পণের ফাইল পাওয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরের কাগজ হইতে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

রাধাকান্ত দেবের "বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস"

(৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮)

"নূতন পুস্তক। এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতি ভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্ক সংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি২ সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের একখণ্ড আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।

সেকালের বিচার

(২০ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

সুপ্রীমকোর্ট। জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমীদার আপন পুত্রের অসুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুই দিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হাঁটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকট হইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না বরং জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল পুনর্ব্বার উঠাইয়া আর দশ বেত

মারিলেন পরে দুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার উত্তর ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্ধুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সৎকার করাইলেন। এইরূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল। পরে আসামীর সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দিল যে প্রতাপনারায়ণ মফস্বলে কোম্পানির খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দণ্ড্য হইয়াছিল সে অতিবলবান ও তাহার বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও স্বচ্ছন্দে চাপরাসীদের সহিত জেলখানায় গিয়াছিল এবং যে বেত্রাঘাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি ডাক্তরের দুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিন দিন উপশম বোধ হইয়া তৃতীয় দিনে ঐ ক্ষত শুষ্ক হইয়া তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহির্ভাগে বেড়াইত ও সেইখানে আহারাদি করিত পরে তাহার শয্যায় চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ওলাউঠা রোগ হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার কুটুম্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বন্ধুয়ানের সৎকারের কারণ কেবল কাষ্ঠাহরণার্থে গিয়াছিল সুতরাং সিফাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার দ্বারা শ্রীযুত হেজ সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন।"

"চরকা আমার ভাতার পুত"

(৫ই জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪)

"চরকাকাটনির দরখাস্ত।—

শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপনং সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহর-পর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সুতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সুতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সুতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সুতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সুতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমেং ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে

সুতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সুতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সুতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সুতা এমন কখন বিলাতি সুতা হইবেক না পরে বিলাতি সুতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সুতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সুতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সুতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সুতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন।

কোন দুঃখিনী সুতা কাটনির

শান্তিপুর দরখাস্ত।—সং চং।”

সখের কবির দল

(২২ নভেম্বর ১৮২৮। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

“সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদন মিদং কতক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সুতার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইঁহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দলহইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পর্ব্বে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষা পাইয়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন নেড়ারদিগের দায়হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।

ভব ঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।”

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫)

“কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায় দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্‌যোগ যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলন করণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী সিটি বাদ্যোত্তম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ

করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গাথকগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিন দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবার তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অথাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাদ্দিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

কলিকাতার দেশীয় ছাপাখানা হইতে ১৮২৯ সালে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬)

"গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক। আমরা অতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক গতবৎসরে কলিকাতার মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত সংখ্যা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প-কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের ফর্দ্দ এক্ষণে আমরা প্রকাশ করিলাম সেই ফর্দ্দে দৃষ্ট হয় যে গতবৎসরে বাঙ্গলা ভাষায় ছোট বড় ৩৭ খান পুস্তক হয়। ইহার মধ্যে কএক খান পাম্‌ঃপ্লট অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বটে তথাপি হিন্দুরদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণকরণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে এইরূপ পুস্তক মুদ্রিত করণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ঐ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কিন্তু যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যার চর্চ্চা হয় তদনুসারে বুঝি যে অল্প২ নানাবিধ বিদ্যাসম্পর্কীয় মুদ্রিত পুস্তকসকল আরো বিদ্যার্থি লোক-কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লোকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

আমরা ইতস্ততো নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্ব্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে যেং দেশের নামপর্য্যন্তও কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতিআহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্নদেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত শুশ্রূষা হইয়াছে। ইহার এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রমাণ অল্পকাল হইল আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন এবং তত্তদ্দেশের নাম বিশেষ করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিখিত ছিল কিঞ্চিৎ কালান্তর আমারদের সম্বাদ পত্র মফঃসলনিবাসি কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদপত্রে যত দূরদেশীয় সম্বাদ ব্যক্ত থাকে তত্তদ্দেশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব।

অরুণোদয়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল
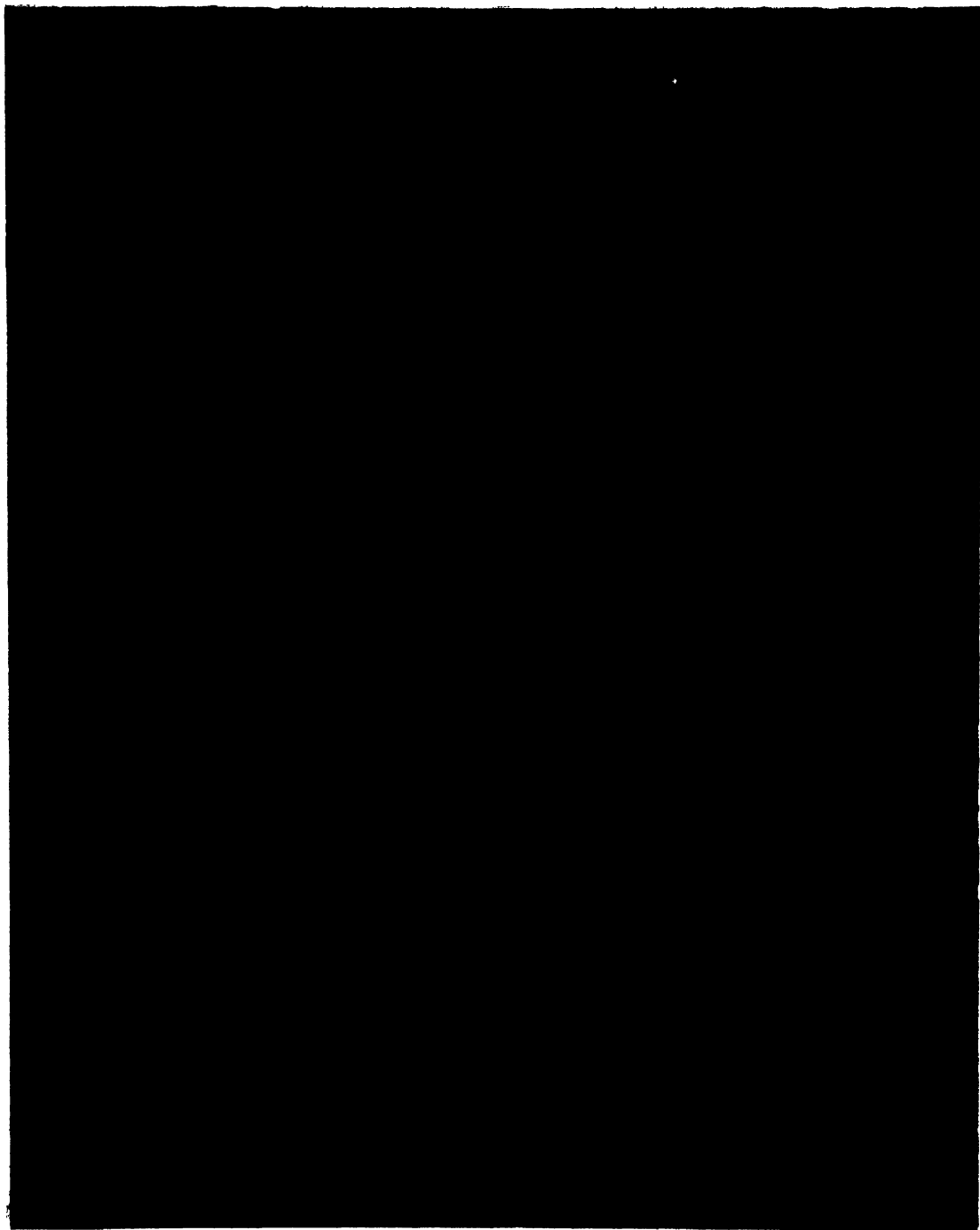
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রালয়ে নীচে লিখিত পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।—

শঙ্করীগীতা। বায়ুব্রহ্ম। আসাম বুরঞ্জি। ভাগবতের একাংশ ছাপা হইতেছে।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে মোং চোরবাগান আদিপর্ব্ব। সভাপর্ব্ব। বিদ্যাসুন্দর। নিত্যকর্ম্ম। রসমঞ্জরী। পদাঙ্কদূত। মানসিংহোপাখ্যান। পঞ্জিকা।

শ্রীযুত মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়ে।

সংসারসার। গঙ্গাভক্তি। বিষ্ণুর সহস্র নাম। অভয়া-মঙ্গল। চন্দ্রকান্ত। রতিমঞ্জরী। ভাগবত। আদিরস। ভগবদ্গীতা। চাণক্য। নিত্যকর্ম্ম। বিদ্যাসুন্দর।

পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়

ব্যবস্থার্ণব। নলদময়ন্তী। বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গল। চাণক্য। মহিম্ন। কর্ম্মবিপাক। নিত্যকর্ম্ম। বেতাল। চন্দ্রবংশ। পঞ্জিকা।

মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়

ইংরেজী ভাষায়

মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক। ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলাতে সেল্ফগাইড। বকেবিলরী ও হিতোপদেশ সংগৃহীত। বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি। মনোড়ি প্রভৃতি। পীর ও ডাক্তার। বিক্রয় পুস্তকের বিবরণ বহী। নূতন বাজারের কেতাবের বিবরণ বহী। লার্ড লিবরপুলের যৌবনকালের বিবরণ। ঐরলণ্ডীয়েরদের ইংগ্লণ্ডদেশে আগমন। মিমায়ের অফ মিস ফেনউইক্। কালিডসকোপ মাগজিন নং ১৫ পর্য্যন্ত। কাটিকিজম। চার্চ কাটিকিজম।"

অক্টারলোনী মনুমেণ্ট

(১৫ নভেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

"কলিকাতায় স্থাপিত নূতন স্তম্ভ। আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে সর ডেবিড আক্তরলোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাঁথিবার কারণ চাঁদা হইয়াছিল আমরা এখন শুনিতেছি যে সেই চাঁদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ ময়দানে এক উচ্চ স্তম্ভ গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তম্ভ মৃত্তিকাঅবধি শৃঙ্গপর্য্যন্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে···। সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানেরদের প্রতি অতি কৃপাবান ছিলেন অতএব তাহার স্মরণরাখণার্থে সেই স্তম্ভ মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল অনুসারে গাঁথা যাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকেতে ও কতক ভাগ চণ্ডালগড়ের [চুনারের] প্রস্তরেতে নির্ম্মিত হইবে ···।

এই স্তম্ভের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বহুকালপর্য্যন্ত থাকিবে এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইবে।"

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

"অক্তরলোনি সাহেবের স্তম্ভ। মৃত সর ডেবিড অক্তর-লোনি সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে। এক বৎসর গত হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্দ্বারা জানা যায় যে তাহার বাহিরের চতুর্দ্দিগে দুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকা হইতে ৮৬ হাত উচ্চ দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁথিতে বাকী আছে তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাপ প্রস্তুত হইয়াছে যদি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণা যায় এবং স্তম্ভের নীচের ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণ্য হয় তবে অনুমান হয় যে তাহা ৭৫ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই স্তম্ভ যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দ্বারা যে কলিকাতা নগরের সৌন্দর্য্য হইবে এমত সম্ভাবনা হয়।"

দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুর্ঘটনা

(১০ জানুয়ারি ১৮২৯। ২৮ পৌষ ১২৩৫)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। গত বুধবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপন গাড়িতে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ির ঘোড়া অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল কিন্তু কোচমেন নানা-প্রকার উদ্যোগ করিল কোন প্রকারেই ঘোড়া থামাইতে পারিল না পরে ঐ ঘোটকের লম্ফোল্লম্ফেত কোচমেন গাড়ি-হইতে ভূমিপতিত হইল বাবু এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া গাড়ি-হইতে নামিবার উদ্যোগ করিলেন কিন্তু অবরোহণকালে তাহার বস্ত্র গাড়িতে বদ্ধ হইয়া কিছু দূর গমন করিয়া পতিত হইলেন তাহাতে তিনি কিঞ্চিদাঘাতী হইয়াছেন তিনি যে

স্থানে এই রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলেন তাহার নিকটে শ্রীযুত ডাক্তর মারতিন সাহেবের ঘর ছিল এবং সেই ডাক্তর সাহেব তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে চিকিৎসা করিলেন।"

নূতন সংবাদপত্র

(২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

বঙ্গদূত :—

"নূতন সমাচার প্রকাশ। মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেষ নামক এক নূতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী ও নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে অতএব গুণগ্রাহক মহাশয়সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি ঐ স্থানে তত্ত্ব করিলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন ইতি।"

বঙ্গদূতের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৯, ৯ই মে তারিখে। আমি ২৩এ মে (৩য় সংখ্যা) হইতে ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯ পর্য্যন্ত বঙ্গদূতের ফাইল কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দুই-তিন পৃষ্ঠা ফার্সীতে লিখিত। কাগজের সব শেষে লেখা থাকিত,—

"এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বৈতন ১ তঙ্কা মাত্র। যে কেহ এই সমাচার পত্র গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি গবরণমেণ্ট হোসের পূর্ব্ব বাঁশতলার গলিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি॥"

শ্রীযুত নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬)

সম্বাদ কৌমুদী :—

"নানাবিধ সমাচার।...সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে।"

(৭ জুলাই ১৮২৭। ২৪ আষাঢ় ১২৩৪)

অরিয়েণ্টাল রেকর্ডার :—

"নূতন সমাচার পত্র। গত ৪ জুলাই অবধি অরিএনটেল রিকার্ডরনামক এক নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ হইতেছে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত হইবে ইহার মাসিক মূল্য গ্রাহকেরদিগের নিমিত্ত এক টাকা স্থির হইয়াছে। সং কৌং" [সংবাদ কৌমুদী]।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

পার্থিনন :—

"নূতন সম্বাদপত্র। সংপ্রতি প্রার্থিননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নূতন সম্বাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে২ মুদ্রিত হইবে অনুমান প্রতি সপ্তাহে একবার। তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক। তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতিসদ্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চ্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।"

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

"প্রার্থিননামক সমাচারপত্রের উত্থান ও পতন। প্রার্থননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠকবর্গের গোচরার্থ গত ১২ ফালগুণ চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে ঐ কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু কএক জন হিন্দু বালক যাঁহারা উত্তমরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লাসকরণে তৎ প্রকাশকদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া ছিল কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেননা বালকেরা প্রায় সর্ব্বদাই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞাপ্তি হইলে অবশ্যই তৎ কর্ম্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় প্রার্থননপত্রের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা শুনিলাম ধর্ম্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিরস্ত হইয়াছে

ইহাতে প্রার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল। সং চং" [সমাচার চন্দ্রিকা]।

কলিকাতায় জগমোহন বসুর ও রামমোহন রায়ের স্কুল

(৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫)

"ভবানীপুরের স্কুল।—গত সপ্তাহে ভবানীপুরের স্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল সেই ভবানীপুরের স্কুল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বসুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা প্রাচীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিল তাহার পর তাহারা নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং যে২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা হইল সেই২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল।

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র ঐ জগমোহন বসু ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন ইহাতে তাহার উপযুক্ত প্রশংসা গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে যে অল্প প্রশংসা করি তাহাতে ঐ জগমোহন বসু বিরক্ত হইবেন না ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের যে মূল্য থাকে তদ্বিষয়ে আমরা স্তুতি কি অবজ্ঞা করিব না কিন্তু আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল জাতির মধ্যে ইহার অতিসুখ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্যা প্রদানের বিষয়ে অল্প লোকের মন ছিল সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া কি শ্রাদ্ধকরণেতে যেরূপ সুখ্যাতি পাওয়া যায় তাদৃশ সুখ্যাতি অদ্যপর্য্যন্ত এ দেশের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না এতন্নিমিত্তে যাঁহারা সুখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন তাঁহারদিগের স্তব জ্ঞাপন করা সম্বাদপত্রের দ্বারা অত্যুচিত।

গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তকেতাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবে কিন্তু আমরা ইহা কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতদ্দেশীয় কর্ত্তা সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্তুষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা দিন২ এ দেশে অধিকরূপে প্রচার হয়।"

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে রামমোহন রায়

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

"দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পরিবর্ত্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশে একটী বাণিজ্য কুঠীর স্থাপনার্থে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। এখন সেই মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছেন।"

উপরিলিখিত "একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি" রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রধানতঃ দিল্লীশ্বরের দাবি-দাওয়ার মীমাংসার জন্যই বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলাত-গমন ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ সরকারী দপ্তরের সাহায্যে লিখিত আমার *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* পুস্তকে দেওয়া আছে।

সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

"সমাচার চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত। সহমৃতাবিষয়ক। ২৭ জুলাই ইণ্ডিএগেজেটনামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নরমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন।…"

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

"…লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কিপ্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইঁহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।—চন্দ্রিকা, ৩ ডিসেম্বর।"

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার ছদ্মনামে রামমোহন রায় ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন বা ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেন। ইহা যে রামমোহন রায়েরই রচনা, উপরিলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬)

"চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্ম শালা।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ট্রষ্টডীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ট্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সরহদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ট্রষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।"

রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাটী নীলাম

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

"ইশতেহার।—স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পঁহুচান যায়।

ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে সুকেশের ষ্ট্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিগে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।"

আপার সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার থাকেন তাহাই রামমোহন রায়ের মানিকতলার উদ্যানবাটীর অংশ-বিশেষ।

সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

"চন্দ্রিকা ও কৌমুদী পত্রহইতে আমরা বর্ত্তমান সপ্তাহে দুই প্রকরণ লইয়া মুদ্রিত করিলাম। চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার কৌমুদীকার ব্রহ্মসভার সাহায্যকারক। এই উভয়ের মধ্যে যে এতদ্বিষয়ক বিসম্বাদ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে তাহার দোষগুণবিষয়ক চর্চ্চা করিতে আমারদের মনঃস্থ নাই কেবল উভয়পত্রের মধ্যে এতদ্বিষয়ক বিবরণ যাহা আবশ্যক বোধ হয় তাহা আমরা নির্লিপ্ত হইয়া আপন দর্পণে অর্পণ করি। সতীবিষয়ক ব্যাপার সংপ্রতি ঐ উভয় সমাচারপত্রে লিখিত বাদানুবাদমাত্রের আশ্রয় হইয়াছে অতএব আমারদের এক্ষণে প্রার্থনা এই যে ঐ উভয় সমাচারপত্রের সতীবিষয়ক উত্তর প্রত্যুত্তর চুম্বকরূপে দর্পণে অর্পণকরাতে সতীর বিষয়ে মৌনীথাকা আমারদের প্রতিজ্ঞা আছে তল্লঙ্ঘন পাঠকবর্গেরা বোধ না করেন।"

ব্রাহ্মসমাজে মুসলমান বাদক

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

"শ্রীযুত যথার্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব্বং গ্রন্থকারেরা ধূম দৃষ্টিকরত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবমস্তুতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দ্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বর-বিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ব্বশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্প চন্দন বোধ করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন এ কি আশ্চর্য্য যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন। সং কৌং" [সম্বাদ কৌমুদী]

১৮২৮, ২০ আগষ্ট তারিখে রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের (অনেকে 'ব্রহ্মসভা'ও বলিত) প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতি-কথার একস্থলে লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু [চক্রবর্ত্তী] গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন।...তখন ব্রাহ্মসমাজে বেঞ্চ ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সকল লোক গিয়া বসিতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে বসিতেন।" *

ক্লড মার্টিনের উইল

(৪ এপ্রিল ১৮২৯। ২৩ চৈত্র ১২৩৫)

"জেনরল মার্টিন।—৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিন-নামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলীন্য ছিল না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশির বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর ন্যায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানা প্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন২ উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যে স্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীত্যনুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐর্লণ্ডদেশস্থ এক ব্যক্তি কহিয়াছে যে যত লোক আস্তবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংগ্লণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।"

(১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫)

"কলিকাতায় নূতন পাঠশালাস্থাপন।...এই সপ্তাহে আমরা শুনিতেছি যে তাহার [জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের] নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সংপ্রতি স্থাপিত হইবে।

গত ১২ মার্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা তাহা আপনারদের ডিক্রাক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর যাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহগ্রন্থনের বরাওর্দ্দ করিবেন সেই গৃহপ্রভৃতি ১৮৩০ সালের দিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কালের পর জেনরল মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।"

ক্লড মার্টিনের নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহারই দানে কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের লা মার্টিনিয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের লিয় শহরে তাঁহার জন্ম। স্বদেশের জন্যও তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত," ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫০৭।

তিনি কোম্পানীর একজন নামজাদা ফরাসী কর্ম্মচারী ছিলেন।

কলিকাতায় বীমার আপিস

(১৯ জুলাই ১৮২৮। ৫ শ্রাবণ ১২৩৫)

"অগ্নিবিষয়ক বিমা।—গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাঁহরা সেই গৃহপ্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।"

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

"নূতন বিমা।—কতক দিন পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা ডাক বাঙ্গির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিমা করিবেন।"

নেপালের কাগজ

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬)

"নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ড-দেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পূর্ব্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চুণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহা হইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।"

শ্রীক্ষেত্র

(২৬ মে ১৮২৭। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

"শ্রীক্ষেত্রের নিষ্করহওন মনস্থ।—আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রিম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহায্য করণ-হইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরাদার রাজার উপরে অর্পণ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত ঐ পথে গমনকারিদিগের স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মনস্থ করিয়াছেন। সং চং।"

"কাজীর দৌরাত্ম্য"

(২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ শ্রাবণ ১২৩৬)

"আসামদেশেতে জবন জাতি অত্যল্প অনুমান দুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে এবং পিরমুরসীদপ্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞিইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম

রাজার আমলে গোহত্যা করিতে পারিত না তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ শরার প্রায় জারী ছিল না গুয়াহাটি ও রঙ্গপুর রাজধানীতে যাহারা থাকে তাহারা বরং শরানুসারে চলে মফঃসলে আর বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত কাজী পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু যাপ্যরূপে থাকিত এইক্ষণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল হওয়াতে মীরজা তাজবেগকে কাজী মোকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে ঐ কাজি অকদখানিরুখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয়া মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহা হুজুরে জাহির হওয়াতে বারম্বার তহকীয়ত করাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জানা গেল যে এক জবন বালক অনুমান ৭।৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে ঐ কাজীর তরফ এক জন মুসলমান গোগমন রূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তঙ্কা দণ্ড চাহাতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে ৪০ তঙ্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়া টাকা লইয়াছিল তাহাতে ঐ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল তাহাতে শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু ইহাতে তাহার উপর...অপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে কজাই কর্ম্মহইতে মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাহার যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক।"

সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমার সংখ্যা-হ্রাস

(৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬)

"সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্ম্মের আরম্ভকালে ২০ বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না। হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড়২ ঘর সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারদের ক্রমেং এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহারদের প্রতি ঐ মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত্য ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। অনেক লোক ইহার পূর্ব্বে ধনি ও সম্ভ্রান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মোকদ্দমাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে তাহা এক প্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন কিন্তু একবারো সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাঁহারদের মনে সুতরাং এই জিজ্ঞাস্য হয় যে তাঁহারা যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে পারি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাঁহারা বিবাদ উপস্থিত হইবামাত্র সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন এই রীতি বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃশ্য।"

কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্যচর্চ্চা

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

"বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।—হরকরা নামক সম্বাদপত্রদ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ

ইংলণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোল রচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয়ৎসংগ্রহ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে যদি সমুদায় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্ত্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক। তৎ পুস্তকহইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমারদের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে তাহাতে তৎকবির কাব্যীয় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে সুযোগ বুঝিয়া আমারদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতিবিস্ময়নীয়। ইহার পূর্ব্বে কএক জন মধ্যমরূপে তদ্ভাষাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে দুই এক জনও তদ্ভাষায় যশঃপ্রাপক দুই এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন তাঁহারা কেবল পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে তৃপ্ত হইতেন এবং লিখন পঠনকরণে যৎকিঞ্চিৎ নৈপুণ্যপ্রাপ্তহওন এবং তদ্ভাষায় যে কোনরূপে বাকপ্রয়োগাদিকরণ হইতে অন্য কিছু মাত্র তাঁহারদের আকাংক্ষা ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চর্য্য তদ্ভাষানুশীলন হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়। তাঁহারদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন।”

বালিকা-বিদ্যালয়

(২৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪)

“বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের পাঠশালা।—বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদায় বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বর্দ্ধমানস্থ বিবি পীরণ তাঁহার স্বামির পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে ঐ দেশস্থ ১২ টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বন্ধ আছে এবং এই বিবির গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষায়ো অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য২ স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠশালায় পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৫৮৭৩ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়। এই নূতন পাঠশালা যাহার মূল পত্তন ১৮২৬ সালের মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রায় এক্ষণে প্রস্তুত হইল এবং সকল পাঠিকাকে একত্র করিবার আশয়ে বিবি উইল্সন তদবধি ঐ বালিকারদিগকে ঐ বাটীর নিকটবর্ত্তি স্থানে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেহেতুক ঐ রিপোর্টেতে প্রস্তাব করে যে বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বর্দ্ধমানে ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে। সং চং।”

(২৮ জুন ১৮২৮। ১৬ আষাঢ় ১২৩৫)

“বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস।—গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস-করণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত চিপজুষ্টিস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও আর২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা

পাঠশালা যে প্রধান২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে পাঠশালাতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্যাম বাজারের পাঠশালাতে ৩০ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বর্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটা পাঠশালা বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায় ১০০ বালিকা পড়ে তদনন্তর ঐ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধানা শ্রীমতী বিবি আমহার্ষ্টকে এবং আর২ কএক জন অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইঁহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোসৈটিরা ৮০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে বিক্রয় হইয়া কতক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে ঐ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরাও ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং কতক গুলিন হুনরি দ্রব্য ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্তু ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইঁহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া এ বহু কালের পতিতা ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।"

অক্ষর পরিচয়

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

"শুড়া লিথোগ্রেফিক প্রেষ। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা।... এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণযন্ত্রাধ্যক্ষ অতিসুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণ সকলের উচ্চারণের বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের মূল্য এক টাকামাত্র আমরা উক্তবিষয় স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়া ইহা এতদ্দেশীয়েরদিগের নিতান্ত উপকারজনক বটে অতএব সকলকে পরামর্শ দিতেছি ঐ গ্রন্থ গ্রহণে সবলেই মনোযোগ করুন। সং চং।"

প্রাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে কাশীপ্রসাদ ঘোষ

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬)

"বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক। লিটিরেরি গেজেটনামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে উদ্গ্রামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায়নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ

পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশহওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে উহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নাম ও ইংগ্লণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

অপর তিনি বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসনামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদ্যরচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাঙ্গলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহারদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গ্রন্থ গত তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত না হইয়া বারম্বার নকল হইয়াছে অতএব মূর্খেরা আপন২ ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার তাহাতে ভাষার অন্যথা করিয়াছে এমত বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ তরজমা অতিরগাল এবং তাহার যদি অপভাষা সকল বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ পুস্তক অতি গ্রাহ্য হয়। অতিশয় খ্যাতাপন্ন এক সুপণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর পদ্যরচকের মধ্যে কাশীদাসনামক এক শূদ্র পদ্যরচক হইল এবং তিনি মহাভারতের কএক পর্ব্ব বাঙ্গলা ভাষায় পদ্যেতে রচনা করিয়া পাণ্ডব বিজয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত গোবিন্দানন্দনামক এক ব্রাহ্মণ ঐ রূপ চণ্ডীর স্তবাদি বিস্তারকরণপূর্ব্বক চণ্ডীনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দুই পুস্তকও অপভাষা রহিত নহে। চণ্ডীর

প্রশংসা ঘটিত অন্নদামঙ্গলনামক এক গ্রন্থ ভারতচন্দ্র নামে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ঐ কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ ছিলেন। ঐ রাজা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কর্ত্তৃক রচিত পূর্ব্বোক্ত রাজার চরিত্র শ্রীরামপুর তিন বার মুদ্রিত হয় তদ্বিষয়ে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কহেন নাই। পণ্ডিত লোকেরদের সমাগমেতে তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে সুশোভিত ছিল ঐ পণ্ডিতেরদিগকে তিনি অনেক২ ভূমি বৃত্তিদান করিলেন এবং অদ্যপর্য্যন্ত তাঁহারদের সন্তানেরা ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বংশের রাজকীয় অধিকার দুই তিন শত ধনবান লোকের মধ্যে খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সভার ভাঁড় অন্য২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার অনেক২ রহস্য কথা অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচরদ্রূপ চলিত আছে তাহা সকল যদি সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদপ্রমোদের অত্যুত্তম এক পুস্তক হয়।

অপর কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দরনামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কএক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক কাব্য-রস দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে২ অনেক আদিরসঘটিত কথার দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে।

অপর তিনি কহেন যে কলিকাতার যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত রাধামোহন সেন বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষের এই এক উত্তম লিখিতপত্র আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল তাহার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলাম কিন্তু আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ইঙ্গরেজী বুঝেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহা পাঠ করুন ইহা আমারদের পরামর্শ।…"

মর্ম্মর

শ্রীপ্রণব রায়

অবারিত আকাশ ছোট ঘরখানির মধ্যে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। মরুদেশের মতো সে-আকাশে আছে শুধু বিশুষ্ক বিবর্ণতা! অতীত দিনে সেখানে হয় তো বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ জেগেছিল; কিন্তু এখন আর চেনবার যো নেই।

ছোট ঘরখানির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্বল্পায়তন পৃথিবীও গ'ড়ে উঠেচে। সে-পৃথিবীতে শুধু প্রতিদিনকার হীন হিংসা, বিষাক্ত বিদ্বেষ, আর অসহিষ্ণু অসন্তোষ! বসন্ত হয় তো একদিন এসেছিল সেখানে; ফুলও ফুটেছিল বৈ কি! কিন্তু বিগত বসন্ত কোনো স্মৃতিই রেখে যায় নি।

সেই বিবর্ণ আকাশের তলায়, সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর মাঝে দীর্ঘ দ্বাদশটি বছর কেটে গ্যাচে—।

তার পর—

সংসারের চাকা সকাল থেকেই সশব্দে চল্‌তে থাকে। ঝিয়ের সঙ্গে শৈল কথা-কাটাকাটি করছিল:

কড়াখানা মাজ্‌বার এ কী ছিরি লা বিন্দি? হেঁসেলের কালি উঠল না এখনো—!

বিস্ময়ের ভঙ্গী ক'রে বিন্দি বল্‌লে, কালি আবার কোতায় দেখ্‌লে মা? তেঁতুল আর ছাই দিয়ে এই তো ঘ'ষে ঘ'ষে মাজ্‌নু!

কড়াখানাকে নাকের কাছে একবার তুলে ধ'রে শৈল ব'লে উঠ্‌ল, উঃ, আঁসটে গন্ধ এখনো ছাড়ে নি! না বাপু, এমনধারা ব্যাগার-ঠেলা কাজ আমার ঘরে চল্‌বে না—ইল্লৎপনা আমি সইতে পারি নে—।

বিন্দি বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। দু'বার ক'রে কড়া মাজ্‌তে গেলে আরেক বাড়ীতে কাজ করা চলে না, বেলা হ'য়ে যায়। বল্‌লে, পার্‌ব নি মা—তোমার মন যোগানো ভার বাছা—।

গলা চড়িয়ে শৈল জবাব দিলে, না-পারবি তো চ'লে যা' না ফর্‌ফর্‌ ক'রে। অত তেজ দেখাচ্চিস্‌ কেন লা? ঠিকে-ঝি কি এ-তল্লাটে আর নেই? আ মর্‌—

শীর্ণ চোয়াল-ওঠা মুখখানা রাগে আরো কদাকার দেখাচ্ছিল। শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর এই কলুষ-ভীরুতা ওকে অন্ধ ক'রে তুলেচে।

ধৈর্য্য বিন্দিরও আর রৈল না; বল্‌লে, দাও, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও। এমন মুনিবের ঘরে কেউ কাজ করতে আস্‌বে নি মা—কেউ আস্‌বে নি!

শৈল এবার গলা সপ্তমে তোলবার উপক্রম করছিল, এমন সময় উঠোনের কোণে যা'র আবির্ভাব হ'ল, সে সুরপতি। সুরপতির এক হাতে বাজারের থলে, অপর হাতে মাছের খলুই। আষাঢ়ের খর রোদে মুখখানা তামাটে হ'য়ে উঠেচে, গায়ের ঘামে-ভেজা ফতুয়াটা নিংড়ালে বোধ হয় জল পড়ে।

সুরপতি মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী; সেই হিসেবে ওকে কুলীন-বাঙালী বলা যেতে পারে। বেঁটে খাটো লোকটি, নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতি, তামাটে মুখে পোষমানা পশুর মতো একটি নিরুপদ্রব ভাব লেগে আছে। জীবনটা শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে, ও বোধ করি কোনো দিন উঠে বস্‌বে না। নিরুৎসাহ দুই চোখের পানে চাইলে মনে হয়, সুরপতি জীবনে কখনো বৃহতের স্বপ্ন দেখে নি; অফিস্‌ঘরে ব'সে 'লেজার' এর জের টান্‌তে টান্‌তে ও স্বপ্ন ছাখে শুধু একটুখানি সেবার, আর নিশ্চিন্ত একটি অবসরের! কিন্তু নিত্যকার অশান্তি, অভিযোগ, কলহ-কোলাহলও সুরপতির গা সহা হ'য়ে গ্যাচে, অতিশব্দায়মান সংসার-চক্রের সঙ্গে অনুরূপ তাল রেখে চল্‌তে পারে।

ছাই-মাখা হাতদু'খানা সুরপতির সুমুখে ঘুরিয়ে বিন্দি এবার কাঁদ'-কাঁদ' হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, দাও বাবু, আমার মাইনে-পত্তর ফেলে দাও—সাতজন্মে এমন মুনিব দেকি নি মা! গরীব-গুর্ব্বো মানুষ আমরা, গতর খাটালে কাজের ভাব্‌না কি গা?—

ব্যস্ত বিব্রত সুরপতি শুধু শুধোতে পারলে, কি, ব্যাপারটা কি? সকাল বেলাতেই—

বিন্দি একনিশ্বাসে ব'লে চল্‌ল, পারব নি, অমন মুখনাড়া খেয়ে কাজ করতে পার্‌ব নি—দাও, এ-মাসের ক'দিনের মাইনে চুকিয়ে দাও—

শৈল একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, মাইনে দোব না, আরো কিছু! খ্যাংরা মেরে বিদেয় করব—

বিন্দি এবার সোৎসাহে নিজের স্বরশক্তি প্রমাণ ক'রে দিলে, ইঃ, খ্যাংরা মার্‌বে! অমন ভদ্দরলোক ঢের দেকেচি—আমার হকের পাওনা ঠকিয়ে নেবার মৎলব বুঝি?—

নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা! নীচতা, অপমান, কলহ দিয়েই প্রতি নব-দিবসের উদ্বোধন হয়।

ব্যতিব্যস্ত সুরপতি একবার বল্‌বার চেষ্টা করলে, আহা, টাকা দু'টো না-হয় ফেলেই দিচ্চি—

থাক্‌, আর দাতব্যি করতে হবে না।—শৈল ধমক্‌ দিয়ে উঠ্‌ল। গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বিন্দি ততক্ষণে চ'লে গ্যাচে।

ঘরের ভেতর কোলের জন্মরুগ্ন মেয়েটা তখন প্রাত্যহিক ক্রন্দনের পালা সুরু করেচে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বুঝি বা দম আটকে আসে!

শৈল চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে, ওরে অ উষি—অ চুলোমুখী, মেয়েটা যে ককিয়ে-ককিয়ে গ্যালো, কোলে নিয়ে ভুলোতে পার্‌চ না?

মেজ ছেলে পঞ্চু অনেকক্ষণ থেকেই বায়না সুরু করেছিল, খিদেঁ পেয়েচেঁ—এঁ—এঁ—

শৈল এবার সত্যিই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল; পঞ্চুর পিঠে প্রচণ্ড দু'টো চড় বসিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল, দূর হ', দূর হ', আপদ-বালাই কোতাকার—

তার পর বাজারের থলে নিয়ে হেঁসেলে ঢুক্‌লে। সুরপতি তখন কল ঘরে, সাড়ে ন'টায় অফিসের হাজিরা। উষার সমস্ত সান্ত্বনা সত্ত্বেও অবুঝ রুগ্ন শিশুর ফোঁপানি

তখনো থামে নি ; মার খেয়ে পঞ্চু চীৎকারের চোটে গগন বিদীর্ণ করবার চেষ্টা করছিল ; প্রভাতাকাশের বর্ণচ্ছটা তখন মলিন কুৎসিত হ'য়ে উঠেচে!

রান্নাঘরের ভেতর থেকে শোনা গ্যালো, অপরিসীম অবসন্ন কণ্ঠে শৈল বল্‌চে, মরণ হ'লেই বাঁচি—

কিন্তু মরণ তা'র হয় না ; অতি-পরিচিত অতি-পুরাতন সঙ্কীর্ণ আকাশ আর পৃথিবীর মাঝে সে বেঁচে রয়েচে—দীর্ঘ দ্বাদশটি বছর ধ'রে। জীবন তা'র গলির মোড়ের ওই নিষ্পত্র বকুলগাছের মতো বৃথা। জীবনে তা'র বিস্ময় নেই, বৈচিত্র্য নেই, বিকাশ নেই ; শুধু তুচ্ছ স্বার্থে ঘা' খেয়ে খেয়ে, অকারণ কলহের আবর্ত্তে ঘুরে ঘুরে, জঘন্য নীচতায় পঙ্কিল হ'য়ে ক্লান্ত দিনরাত্রিগুলি একটানা ব'য়ে চলেচে। অপরাহ্ণের আকাশ দেখে কে বিশ্বাস করবে, এরি বুকে এক সময় সূর্য্যোদয়ের সমারোহ জেগেছিল!

তবু শৈল বেঁচে আছে।—

দুপুরবেলায় বাধ্‌ল বচসা—।

বাড়ীর পূব-তরফটা সুরপতি ভাড়া দিয়েচে,—দোতলায় খান-দুই শোবার ঘর, আর নীচেকার দালানে দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা রান্নার একফালি জায়গা, কল-পায়খানা অবিশ্যি আলাদা নয়। দু'টি পরিবার পৃথকভাবে থাক্‌বার ব্যবস্থা ছোট বাড়ীটিতে নেই, তবু ভাড়াটে বসাতে হয় ; এই অর্থসঙ্কটের বাজারে মাস গেলে পঁচিশটে ক'রে টাকা কি কম?

পূব-তরফের অংশটা ভাড়া নিয়েচেন শিয়ালদা' আদালতের এক উকিল। এর আগে ছিলেন এক ইস্কুল-মাষ্টার। স্ত্রী, ছেলে, আর বয়স্কা বিধবা একটি বোন্—উকিলবাবুর পরিবার বল্‌তে এই ক'টি প্রাণী। আদালতে পসার কেমন, তা' তিনিই বল্‌তে পারেন, তবে রঙ-চটা আল্‌পাকার সেই সনাতন চাপ্‌কানটি ছাড়া আজ পর্য্যন্ত তাঁ'র গায়ে নতুন পোষাক উঠ্‌ল না!

পাশাপাশি এই দুই পরিবারের মধ্যে প্রায়ই যেটা প্রকাশ পেত সেটা সম্প্রীতি নয়,—সংঘর্ষ।

সেদিন দুপুরে তা'রই পুনরভিনয় হ'য়ে গ্যালো—। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অসাবধানে জলের ছিটে এসে প'ড়েছিল এ পাশে,—এই নিয়েই বচসা। ঝঙ্কার তুলে শৈল উষাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে, দেখলি না দেখ্‌লি—জল ফেল্‌বার ছিরিখানা দেখ্‌লি একবার!

দরমার ও-পাশ থেকে উকিলবাবুর স্ত্রী শশব্যস্তে ব'লে উঠ্‌ল, ভালো জল মা, ভালো জল—নোংরা নয়।

হেঁসেলের জল ভালো বৈ কি! এঁটো-কাঁটা থৈ থৈ করচে চারদিকে—চোক্‌খাগীদের একটুও আক্কেল নেই গা?—

লজ্জায় কুণ্ঠায় উষা বেচারী অপ্রতিভ হ'য়ে প'ড়েছিল। শুচিবায়ুগ্রস্তা মায়ের এই অকারণ কলহ-প্রবৃত্তিতে তা'রই মুখ কালো হ'য়ে যায়। চাপা গলায় বল্‌লে, ঝগ্‌ড়া না-বাধালে চল্‌ছে না বুঝি? দু' ফোঁটা জল ছিট্‌কে গায়ে লেগেচে তো কী এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হ'য়ে গ্যাচে শুনি?

তীক্ষ্ণ গলায় শৈল চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, থাম্ তুই. আচার-বিচের সব তোর হুকুমে রসাতলে দিতে হবে নাকি না? অনৈরণ দেখ্‌লে আমার গা'-জ্বালা ক'রে! আমার বাড়ীতে ও-সব ইল্লৎগিরি পোষাবে না, তা' ব'লে রাখ্‌চি।

চীৎকার শুনে উকিলবাবুর বিধবা বোন্ দোতলা থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন। কথা তিনি অতি অল্পই বলেন, কিন্তু যে ক'টি বলেন, তা'র ধার অত্যন্ত বেশী। স্পষ্ট গম্ভীর গলায় বল্‌লেন, না পোষায় অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। ভাড়াটে বাড়ীর অভাব কল্‌কেতায় তো নেই! শাসানো কিসের জন্যে?

বেশ তো. উঠে গেলেই হয়!—রাগে অপমানে বিদ্বেষে শৈল কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বস্‌ল, পায়ে ধ'রে কে সাধ্‌চে থাক্‌তে? ভাড়াটের-ই বা কি অভাব কল্‌কেতায় শুনি?—মরি লো, ভা'য়ের ভাতে থেকে আবার বড়মান্‌ষি ফলানো হচ্চে!

ঝগ্‌ড়ার গন্ধ পাড়াময় ছড়িয়ে যেতে বেশী দেরী হয় নি। পাশের একতলা ন্যাড়া ছাতে বামুনদিদি এসে দাঁড়িয়েছিল, সুমুখের জান্‌লা খুলে কৈবর্ত্ত বৌও মুখ বাড়ালে।

—যাই বল বাছা, তোমার মুখের বিষ অনেকখানি। ভেয়ের ভাতে আচে তো আচে, তা'তে কা'র কি? কারুর ধার ক'রে তো খায় না!—

—কত ভাড়াটেই তো এল, গ্যালো, কারুর সঙ্গেই তো তোমার বনল না বাছা।

হ্যাঁ গো ভালোবলুনির দল! বলে, গাঁ'য়ে মানে না আপনি মোড়ল!—একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে শৈল কোমর বাঁধ্‌বার উদ্যোগ করছিল। লজ্জায় ম'রে গিয়ে উষা কাতর কণ্ঠে বল্‌লে, পায়ে পড়ি মা, তুমি থাম'।—

দরমার ওপাশ থেকে অনুচ্চ অথচ তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গ্যালো, তাই যাব', উঠেই যাব'। এবার থাক্‌ব ভদ্র-গেরস্তের সঙ্গে।

শৈল ততক্ষণে কল-ঘরে ঢুকে সেই অবেলায় বাল্‌তি বাল্‌তি জল মাথায় ঢাল্‌চে।

শৈল বেঁচে আছে; কিন্তু এরি নাম কি বেঁচে থাকা? সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর পৃথিবীর মাঝে কুৎসিত কুৎসা আর হীন হিংসার বিষাক্ত বাষ্পে রুদ্ধনিঃশ্বাস শৈল প্রতি পলে আত্মহত্যা করচে!

উকিল-পরিবার সত্যিই উঠে গ্যালো—বাড়ী ছেড়ে দিয়ে।

ফাঁকা ঘরগুলোর দিকে চেয়ে শৈল হঠাৎ ব'লেছিল, গা'য়ে প'ড়ে তো আমি বল্‌তে যাই নি—নিজেরাই বল্‌লে উঠে যাব'।

সুর পাল্টে ফের বল্‌লে, তা' গ্যাচে, যাক্‌ গে। বাড়ী আমার অতিথ্‌শালা, ভাড়াটের অভাব হবে না।

অতিথিশালাই বটে!

মাস না ঘুর্‌তেই সুরপতির বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এলো। এবারে ইস্কুল-মাষ্টার নয়, উকিলও নয়; ছেলেটি বুঝি কোন্‌ কলেজে প্রোফেসরি করে। অল্পদিন হোল বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েচে, ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাট নেই। এম্‌নি ধরণের ছোটখাট বাড়ী ওরা খুঁজ্‌ছিল।

সকাল থেকেই গরুর গাড়ী-বোঝাই মালপত্র আস্‌তে সুরু হয়েচে, শৈলর সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না তখন। কেবল উষাই একশোবার ছুটে এসে জানিয়ে গ্যাচে, কেমন নক্সা-কাটা খাট এলো মা—দাঁড়া-আয়নার দেরাজ—একটা হীরেমন পাখী অবধি, কী সুন্দর টুক্‌টুকে রংটি—

শৈলর কাণে কতক যায়, কতক যায় না।

দুপুর তখন গড়িয়ে গ্যাচে, ভাদ্রের অবসন্ন রোদ ছাদের আল্‌সের ওপাশে হেলে পড়েচে। হেঁসেলের পাট সেরে ওপরের ঘরে এসে শৈল সবে পাণ মুখে দিয়েচে, এম্‌নি সময়ে কে এসে দোরগোড়া থেকে ডাক্‌লে, দিদি।

শৈল তাকিয়ে দেখ্‌লে। দেখ্‌বার মতোই চেহারা বটে। বছর সতেরো আঠারোর একটি মেয়ে চৌকাঠের ও-পারে দাঁড়িয়ে। পরনে একখানি বৃন্দাবনী শাড়ী, ঘোমটার তলা থেকে সিঁথির সিঁদুর দেখা যাচ্চে, তা'রই নীচে কৃষ্ণতারা দু'টি চোখে চঞ্চলতা টল্‌টল্‌ করচে, ঠোঁট দু'খানিতে খুনীর রঙ। বৌটি ফর্সা নয়; তা' না হোক্‌, সর্ব্বাঙ্গে ওর কাঁচা ধানের সুষমা!

অবাক্‌ হ'য়ে শৈল দণ্ড-দুই তাকিয়েই ছিল। হেসে বৌটি বল্‌লে, ভাব করতে এলুম আপনার সঙ্গে—এক বাড়ীতেই থাক্‌ব যখন—

বৌটি ব'লেই চল্‌ল, এম্‌নি-ধারা বাড়ীই আমরা খুঁজ্‌ছিলুম—এম্‌নি দক্ষিণ খোলা, ঘরের কোলে ছোট্ট একখানি বারান্দা, খোলা ছাদ—ভারি পছন্দ হয়েচে আমার। আকাশ দেখে বাঁচ্‌ব! কল্‌কেতায় থাকার যা সুখ! ছিলুম দর্জ্জিপাড়ায় ঘুপ্‌সি একটা বাড়ীতে, যেমন অন্ধকার তেম্‌নি গুমোট্‌! হাঁপিয়ে মরি আর কি! আমি ভাই ঘরের মধ্যে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারি নে, ছোটবেলা থেকে ভারি দামাল আমি।

বল্‌তে বল্‌তে বৌটি হেসে উঠ্‌ল।

শৈল চুপ ক'রে কথা খুঁজ্‌ছিল। কী-ই বা বলা চলে? ঝগড়া করতে বস্‌লে কথার পিঠে কথা কওয়া যায়, আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দিতে দেরী হয় না; কিন্তু গায়ে প'ড়ে যে ভাব করতে আসে, কী কথা বল্‌বে তা'কে? হাসির জবাব কি?

উষাকে দেখিয়ে বৌটি শুধোলে, আপনার মেয়ে বুঝি? বেশ মিষ্টি মুখখানি!

উত্তর খুঁজে পেয়ে শৈল বল্‌লে, হ্যাঁ।

—আপনাদেরও রান্না নীচেই হয় তো?

ঘাড় নেড়ে শৈল জানালে, নীচেই হয়।

রাঁধেন আপনি নিজেই তো? মাগো, ঠিকে বামুনের রান্না কি মুখে দেওয়া যায়—ছাই! আচ্ছা, আপনাদের গয়লা দুধ দেয় কেমন? জোলো দুধ আবার ওঁর মুখে—যাই ভাই, অনেক কাজ, ছিষ্টির জিনিষ গুছোতে হবে এখন।

ঢেউয়ের মতো যেমন এসেছিল, তেম্নি চ'লে গ্যালো। শৈল হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। গায়ে প'ড়ে অমন আত্মীয়তা পাতানো তা'র ভালো লাগে না বাপু। বৌটির মুখখানা কিন্তু মন্দ নয়, কথাগুলির মধ্যে বেশ একটি সুর আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চ'লে গ্যালো, একটিবার বস্‌তে বল্‌লেও তো হ'ত! কি জানি কি ভাব্‌লে!

পাঁচ মিনিটও কাটে নি, আবার এসে হাজির। হেসে বল্‌লে, একবার এসো না ভাই দিদি—উনুন গড়তে হয় কেমন ক'রে দেখিয়ে দেবে এসো।

মেয়েটা বুঝি পাগল? এই 'আপনি', আবার এই 'তুমি'! শৈল ভাবছিল, এইবার তা'র বিরক্ত হওয়া উচিত। মেয়েমানুষের অত চঞ্চল স্বভাব ভালো নয়—অত গা'য়ে-পড়া ভাব ই বা কেন?

এলোখোঁপার প্রকাণ্ড স্তূপ ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়েচে, ঘোম্‌টাও গ্যাচে খ'সে, কপালময় স্বেদবিন্দু। বৌটি হেসে বল্‌লে, একলা ক'দিক সাম্‌লাই বলো? চলো না দিদি, আমার ঘরকন্না দেখে আস্‌বে।

শৈল বিরক্ত হয়েচে কি না, মুখ দেখে বোঝ্‌বার যো নেই। কিন্তু সে উঠ্‌ল।

দোতলায় কাঠের পার্টিশান্ তুলে দুই অংশকে ভাগ করা হয়েচে, পার্টিশানের মাঝখানে কাটা-দরজা। এতদিন বন্ধই ছিল, বৌটিই আজ সেই পুরাতন আগল খুলেচে।

ওদের ঘরের ভেতর খাট, বিছানা, বাক্স, দেরাজ—সব গাদাগাদি করা, বাসনপত্র ঘরের কোণে গড়াগড়ি যাচ্চে, বড় একখানা ছবির কাঁচ চৌচির। ঘরের এই বিশৃঙ্খলাকে বৌটি দু'খানি অপটু হাত দিয়ে কিছুতেই স্ববশে আন্‌তে পারে নি, ছবির ভাঙা কাঁচ ফুটে একটি আঙুল উঠেচে রাঙা হ'য়ে, দুই চোখে চঞ্চল উৎসাহ তবু নেভে নি এখনো!

দাঁড়ের হীরেমনটা ডেকে উঠ্‌ল, কে এলো গো, কে? বৌটি বল্‌লে, পাখী পোষার সখ আমার খুব। তুতীকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাক্‌তে পারি নে।

তার পর ঘরময় ঘুরে ঘুরে বল্‌তে লাগ্‌ল, খাটখানা কোথায় পাত্‌ব বল তো দিদি? এই পুব-দিকটায় পাতি, বেশ হবে—জান্‌লা দিয়ে ভোরবেলার আকাশ দেখা যাবে। আর এই দেরাজটা রাখি ওই কোণে। আচ্ছা, সূর্য্যাস্তের ওই বড় ছবিখানা পশ্চিমের দেয়ালে টাঙালে কেমন মানায়?

শৈল ততক্ষণে ছড়ানো বাসনগুলো একত্র করেচে, দেরাজটাকে টানাটানি ক'রে দিয়েচে এক কোণে সরিয়ে, নীচু পেরেকে খান কয়েক ছবিও টাঙিয়ে ফেলেচে। শৈল একগাছা ঝাঁটার সন্ধান করছিল।

বৌটির কলকণ্ঠে তখন বান ডেকেচে বুঝি! বারান্দায় একবার ঘুরে' এসে বল্‌লে, ফুল তোমার ভালো লাগে না দিদি? আমার ভারি ফুলের সখ ভাই। বারান্দার ধারে কতকগুলো টবে ফুলের চারা বসাবো গোলাপের, হেনার—

কালো চোখে কী আলো! সর্ব্বাঙ্গ থেকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চেয়ে চেয়ে শৈলর মনের মধ্যে কেমন গোল বেধে যাচ্ছিল।

সিঁড়ির মুখে পা বাড়িয়ে বল্‌লে, উনুনটা গ'ড়ে দিই গে' যাই, চলো—।

নীচে নেমে শৈল শুধোলে, গড়্‌ব কিসে? মাটি আছে বৌ?

খিল্‌খিল্ ক'রে মেয়েটি হেসে উঠ্‌ল, হাসি তা'র আর থাম্‌তেই চায় না। বল্‌লে, ওমা, তুমিও বুঝি ওই ব'লে ডাক্‌বে? আমার নাম নীলা। মাটি তো নেই ভাই!

—দেখি আমাদের আছে কি না। শৈল নিজেদের তরফে গিয়ে উষাকে দেখে বল্‌লে, ছুঁড়িটে যেন কী! সংসার পাত্‌বেন উনি, গুছিয়ে দিতে হবে আমাকে! অত আদিখ্যেতা সয় না বাপু।

কিন্তু দেখা গ্যালো, উনুন গড়্‌বার মাটি নিয়ে শৈল নীচে নাম্‌চে।

কাদা হাতে শৈল তখন উনুন নিকোচ্ছিল, জুতোর শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই দেখে বছর পঁচিশ ছাব্বিশের একটি ছেলে হঠাৎ এসে পড়েচে। সুস্থ, সুকান্ত চেহারা, প্রশস্ত ললাটে একটিও রেখা পড়ে নি, চোখ-মুখ থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়্‌চে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মাথার কাপড় আরো খানিকটা টেনে শৈল তাড়াতাড়ি স'রে গ্যালো।

সিঁড়ির কাছে আস্‌তেই নীলার গলা কাণে এলো: উনি ও-বাড়ীর দিদি…সকাল থেকে কোথায় ঘুরে বেড়ানো

হচ্ছে শুনি? এবার থেকে শাস্তি দেব···আঃ, ও কি··· ভারি হ্যাঙলা হচ্চ তুমি দিন্‌কে-দিন ··

দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে শৈল পার্টিশানের দরজাটা দিলে বন্ধ ক'রে। নিজের ঘরে এসে যখন দাঁড়াল, তা'র বুকের ভেতরটা তখন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌চে। ধীরে ধীরে সে জান্‌লার দিকে এগিয়ে গ্যালো। প্রথম শরতের প্রসারিত আকাশে গাঢ়-নীল একটি মায়া, নিষ্পত্র বকুল-শাখায় দু'টি কাক গা'-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে আছে, সমস্ত পাড়াটি মধুর একটি দিবাস্বপ্নে আবিষ্ট। শারদ মধ্যাহ্নের এই মোহময় পারিপার্শ্বিকের মাঝে শৈলর গায়ে অকারণে একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। মেয়েটা কিন্তু ভারি বেহায়া!

শৈল হঠাৎ আঙুলের পাব্ গুণ্‌তে সুরু ক'রে দিলে— ষোলো আর বারোয় আটাশ—দীর্ঘ ক্লান্ত আটাশটি বছর! আটাশ বছরের জীবনে কি ফুল ফোটে, না কোনো মোহ থাকে?

আছে শুধু বিবর্ণ আকাশ, আর বন্ধ্যা পৃথিবী!

পার্টিশানের দরজাটা বন্ধই ছিল। দুপুর বেলায় নীলা হেঁকে বল্‌লে, দোর খোলো না গো—অ দিদি ঘুমুচ্চ না কি?

খুল্‌তেই হ'ল দরজাটা। বন্যার মতো নীলা ঘরে ঢুক্‌লে: দোরে খিল্ এঁটে ব'সে থাক' কেন গা—পর না কি আমি? একলাটি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে ভারি বিচ্ছিরি লাগে ভাই, কথা কইতে না পেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

শৈলর আঁচলে টান দিয়ে নীলা বল্‌লে, চলো না দিদি দু'জনে মিলে পাড়া বেড়িয়ে আসি।

পাগল আর কি! শৈল বল্‌লে।

তুমি যেন কী! এরি মধ্যে বুড়িয়ে গেচ একেবারে! সত্যি ভাই, চৌপ'র দিন ঘরকুনো হ'য়ে থাক্‌তে একটুও ভালো লাগে না আমার। আর-বছর পূজোয় গিয়েছিলুম রাঁচি, সারাদিন বেড়িয়ে বেড়িয়েই কাট্‌ত। খোলা মাঠ, আর কী হাওয়া! পাহাড়ে উঠ্‌তে গিয়ে একদিন পা ফস্‌কে মরেছিলুম আর কি প'ড়ে, ভাগ্যিস্ ও ধ'রে ফেল্‌লে! চাঁদ উঠ্‌লে সেখানে এমন সুন্দর লাগ্‌ত!

নীলার চোখে বন-বিহগীর আনন্দ!

গলি দিয়ে তখন ফিরিওলা হেঁকে যাচ্চে, বেলোয়ারি চুড়ি চাই-ই।

নীলা একেবারে নেচে উঠ্‌ল চুড়ি পরবে দিদি—ডাক্‌ব?

শৈল উদাসীন কণ্ঠে বল্‌লে, দূর, চুড়ি পরবার বয়েসই আমার আছে বটে! তুই-ই পর্ না—।

বেছে বেছে নীলা পাকা ধান রঙের চুড়ি পর্‌লে। শুধোলে, এই রঙটা কেমন মানাবে দিদি?

একটু হেসে শৈল বল্‌লে, বেশ। বর তোর খুব খুশী হবে'খন।

ফিক্ ক'রে হেসে নীলা বল্‌লে, আহা, খুশী হবে না ছাই! এসে কতো ঠাট্টা করবে'খন—। আচ্ছা, তুমিও দু'গাছা ক'রে পর' না ভাই।

ক্ষেপ্‌লি না কি লা? বুড়ো হ'তে চল্‌লুম, আর কি চুড়ি পরবার সখ আছে!

রাগ ক'রে নীলা বল্‌লে, ইস্, বুড়ো অম্‌নি হ'লেই হ'ল কি না! তুমি যেন কী! মাথাটা পর্য্যন্ত ভালো ক'রে আঁচ্‌ড়াও নি, একটা খোঁপাও কি বাঁধ্‌তে নেই?—

নীলা তাড়াতাড়ি উঠে গ্যালো; ফিরে যখন এলো, হাতে তখন মোটা চিরুণী একখানা, আর গন্ধ-তেলের শিশি।

এইবার জ্বালাতন সুরু হবে বুঝি? না, না, ও-সব—

ধমক্ দিয়ে নীলা বল্‌লে, তুমি থাম'। লক্ষ্মী মেয়ের মতন মাথাটা এগিয়ে দাও দিকি—।

আশ্চর্য্যি মেয়ে! নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না। ঝগ্‌ড়া করতে শেখে নি, বক্‌লে ভাবে পরিহাস। জোর ক'রে ভাব করবে, আগলও খুল্‌বে জোর ক'রে!

শৈল-র চুলে গন্ধতেল মাখাতে মাখাতে নীলা শুধোলে, বকুলের গন্ধটা তোমার কেমন লাগে দিদি? আমার বড় পছন্দ।—আচ্ছা, গলির মোড়ে ওই বকুল গাছটায় আর ফুল ধরে না কেন ভাই? একটি পাতাও তো নেই!— মরা গাছটাকে দেখ্‌লে এমন মায়া হয়!

পেছনে ব'সে নীলা দেখ্‌তে পেল না, ক্ষণকালের জন্যে শৈলর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হ'য়ে উঠেচে।

কথা কইচ না কেন গা? একলা আমিই বক্ বক্ ক'রে মরচি—। রাগ ক'রে নীলা বল্‌লে।

হেসে শৈল জবাব দিলে, কি বল্‌ব বল্ না।

আদর ক'রে শৈলর গলা জড়িয়ে কণ্ঠটি অতি কোমল ক'রে নীলা বললে, তোমার বিয়ের গপ্প বলো না দিদি। তার পর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি শুধোলে, প্রথম রাত্তিরে তোমার ভয় করে নি?

এ কেমনধারা প্রশ্ন! অপরাহ্নের আকাশের চোখে কি বিগত অরুণোদয়ের স্বপ্ন জাগে?

ফিকা হেসে শৈল বললে, সেই কোন্ কালের কথা—এখন কি আর মনে আছে—?

পার্টিশানের ওপাশ থেকে কাশির আওয়াজ এলো। শৈল বললে, ওই তোর কথা কইবার লোক এসে প'ড়েচে—

ঔদাসীন্তের ভান করে নীলা বললে, এসেচে তো আমার তা'তে কি?

দাঁড়ের হীরেমনটা ততক্ষণ ডাকতে সুরু করেচে, ওগো, ওগো—

একটা মস্ত কাজ নীলার হঠাৎ মনে প'ড়ে গ্যালো—বারান্দায় ভিজে কাপড়গুলো শুকোতে দিয়েছিলুম—তোলা হয় নি এখনো—।

শৈল এবার হেসে বললে, কেন মিছে মনে মনে হেদিয়ে মরচিস্? যা' পালা—

মুখ রাঙা ক'রে একটি কিল দেখিয়ে, নীলা পালাল। দুই চোখে গাঢ় অবসাদ নিয়ে শৈল স্থাণুর মতো চুপ ক'রে ব'সে রৈল—অনেকক্ষণ। অতর্কিতে একটি নিশ্বাস পড়্তেই চম্কে উঠে তাড়াতাড়ি সে নীচে নেমে গিয়ে উনুনে আঁচ দিতে বসল। ছেলেপুলেরা এখুনি এসে পড়বে ইস্কুল থেকে, ঘুম থেকে উঠলেই কোলের রোগা মেয়েটার জন্তে বার্লি চাই, নতুন ঠিকে-ঝিটা, আজ্কে কামাই করল হয় তো।

এই আটাশ বছরের জীবন!

সূর্য্য ডুবে যাবার আগে কোল্কাতা সহরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—

অন্ধকারে চোরের মতো চুপি চুপি শৈল পার্টিশানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ফাঁক দিয়ে নীলাদের ঘর দেখা যায়, আলো জ্বলচে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে ছেলেটি কি লিখ্ছিল, নীলা পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে তা'র ঘাড়ে দিচ্ছিল সুড়্সুড়ি। একবার কলম থামিয়ে ছেলেটি খপ্ ক'রে নীলার হাত দু'টি ধ'রে সুমুখে টেনে নিয়ে এলো, তার পর এক হাতে নীলার দু'হাত ধ'রে রেখে অপর হাত দিয়ে তা'র দুই গালে ছোট দুই চড় মারলে—।

নীলার হ'ল রাগ। মুখ ভার ক'রে আঁচল দুলিয়ে সে জানলার কাছে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ছেলেটি দু'একবার ডাকল, সাড়া নেই। ছেলেটি তখন উঠে আস্তে আস্তে নীলার কানে কানে কি যেন বলল, শোনা গ্যালো না, দু'জনেই কিন্তু হেসে উঠল। হাসি তো নয়, তরঙ্গ, দক্ষিণ হাওয়া!

তার পর একই চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দু'জনের সুরু হ'ল গল্প। নীলার পরণে একখানি রঙিন শাড়ী, পায়ে আল্তা, সযত্ন-রচিত কবরীতে ফুল, মুখে সুখস্বপ্নের আবেশ। ছেলেটির ললাটে, চোখে আভা। সন্ধ্যা নয়, ওদের আকাশে সবে ভোর হয়েচে; ওদের পৃথিবীতে ফাল্গুনের ফুল্লতা, বন-মর্ম্মর!

শৈলর সারা দেহ তখন থর্থর্ কর্চে। দেখ্তে দেখ্তে মুখ তা'র কঠিন কুটিল হ'য়ে উঠ্ল।

এ-পাশের ঘরে তক্তাপোষের ওপর হাত-পা মেলে অফিস্-ফেরৎ সুরপতি মুদ্রিত চক্ষে বিড়ি টান্ছিল। শৈল ঢুকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্ল, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী না, কি? অমন বেহায়াপনা আমি সইতে পারব না ব'লে দিচ্চি—ঘেন্নায় মরি—

চোখ না মেলেই সুরপতি নির্ব্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কি, ব্যাপারটা কি?

রুদ্ধ আক্রোশে শৈল সাপিনীর মতো ফুঁস্ছিল। চোখে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের জ্বালা। বললে, কাল সকালেই নীলার স্বামীকে অন্ত বাড়ী খুঁজ্তে ব'লো—এখানে ওদের থাকা হবে না—

বিস্ময়াহত সুরপতি উঠে বস্বার আগেই, শৈল দুম্ দুম্ ক'রে নীচে নেমে গ্যাচে—।

সন্ধ্যার মুখে গাড়ীতে বাকী খুচ্রো জিনিষপত্র বোঝাই হচ্ছিল।

শৈল তখন হেঁসেলে। নীলা আস্তে আস্তে এসে আব্ছা গলায় বললে, চল্লুম তা' হ'লে দিদি—

মুখ না ফিরিয়েই শৈল বললে, এসো—।

গলির মোড়ে গাড়ীর ক্ষীণ শব্দটুকু মিলিয়ে গ্যালো। ফাঁকা ঘরটিতে শৈল গিয়ে দাঁড়াল,—অস্পষ্ট একটি সুগন্ধ এখনো ঘরটিতে লেগে রয়েচে! বাইরের আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ উঠেচে, জ্যোৎস্না যেন সলজ্জা অভিসারিকা। ফাল্গুন মাস পড়েচে বোধ হয়, গলির মোড়ে বকুলের মরা শাখায় তাই দেখা দিয়েচে কয়েকটি ভীরু কিশলয়!

বাইরের পানে চেয়ে চেয়ে শৈলর চোখ দু'টি আজ আবিষ্ট হ'য়ে উঠ্ল। কি ভেবে নিজের ঘরে গিয়ে খুঁজে-পেতে আল্তা বের ক'রে বারো বছর পরে হঠাৎ শৈল পা রাঙাতে বস্ল। আল্তা পরার পর চুল-বাঁধার পালা, ফুল পেলে শৈল হয় তো আজ খোঁপায় গুঁজ্ত। খোঁপা বাঁধা হ'লে, বেছে বেছে অনেক দিনের তুলে-রাখা একখানি জরী-পেড়ে নীলাম্বরী বের ক'রে গ্যালো গা ধুতে'।

গা ধুয়ে, পরিপাটি ক'রে নীলাম্বরীখানা প'রে শৈল যখন ঘরে এল, রুক্ষ মুখের রেখাগুলি তখন মিলিয়ে গ্যাচে, দুই চোখে অপূর্ব্ব একটি সুষমা! আজ্কের আটাশ বছরের শৈল যেন বারো বছর আগেকার ষোলো বছরের শৈলকে ফিরিয়ে এনেচে!

সুরপতি অফিস্ থেকে তখনো ফেরে নি। ক্রন্দনরতা রোগা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ঊষা ছাতের ওপর বেড়াচ্চে। পঙ্কু বেরিয়েচে খেল্তে।

শৈলর ভারি সখ হচ্ছিল, দুই ভুরুর মাঝখানে ছোট্ট একটি খয়ের-টিপ্ পরবার। বহুকাল-বিস্মৃত একটি চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যা তা'র বর্ণহীন আকাশে আজ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে! সে-সন্ধ্যায় শৈল ঠিক্ এম্নি ক'রেই প'র্ত রঙিন শাড়ী, পায়ে দিত আল্তা, কপালে আঁক্ত টিপ্।

আর্শীর সুমুখে দাঁড়িয়ে টিপ্ পর্তে গিয়ে সহসা শৈলর যেন চেতনা ফিরে এলো। আর্শীতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সে স্বপ্নোত্থিতের মতো চম্কে উঠ্ল: এ কী! আটাশ বছরের শৈলকে আজ এ কী নিদারুণ পরিহাস করেচে সে! এই নির্লজ্জ কাঙ্গালবৃত্তি আজ্কের এই বিগত-যৌবনা নারীটি কেমন ক'রে সইবে?

নীলাম্বরীখানি খুলে সাদা ছাড়া-শাড়ীখানা শৈল আবার পরলে, পরিপাটি কবরী এলো ক'রে দু'হাতে চুলগুলি জড়িয়ে রাখলে, কল্তলায় গিয়ে পায়ের আল্তা ফেল্লে ধুয়ে।

চন্দ্রালোকিত আকাশের ক্ষণিক বর্ণ-মালা গ্যালো মুছে, বৃহৎ পৃথিবী আবার রূপান্তরিত হ'ল সঙ্কীর্ণ একটি ঘরে!

শৈলর শী ́অস্থিসার গালের ওপর দিয়ে তখন জলের ধারা নেমে এসেচে।

খানিক পরে নীচে থেকে শৈলর গলা শুন্তে পাওয়া গ্যালো, ওরে অ উষি, ভর-সন্ধ্যেয় রোগা মেয়েটাকে ছাতে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগানো হচ্চে কেন?—না বাপু; এ ঝি-মাগীকে নিয়ে আর পারি নে! হেঁসেলে সগ্‌ড়ি রয়েচে এখনো; না-ধুয়েই পালালো—

দক্ষিণ হাওয়ায় বকুলের বিরল-পল্লব শাখায় শাখায় একটি ক্ষণিক মর্ম্মরধ্বনি উঠে' আবার মিলিয়ে গ্যালো—।

তাজ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন মসীকৃষ্ণ নীরব সন্ধ্যায়
নির্বাত আলোকহীন, এই যমুনায়
সৈকতে বল্লভে রাখি' প্রেয়সী তাঁহার
অবগাহি'ছিল, ফিরে উঠে নাই আর!
প্রিয়া-প্রতীক্ষায় তাই দাঁড়িয়ে দয়িত,
কিম্বা তাঁর অপ্রমেয় মূর্ত্তপ্রেম সিত।

কৈলাসে কুম্ভ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য

ভারতবর্ষে হরিদ্বার, এলাহাবাদ এবং উজ্জয়িনীতে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভ হয়। কিম্পুরুষবর্ষে (তিব্বতে) কৈলাস পর্ব্বতে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভ হইয়া থাকে।

"ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মাৎ নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্॥

বায়ুপুরাণ ৩৪।২৮

আমাদের এই জনপদের নাম হৈমবতবর্ষ বা ভারতবর্ষ; ইহার পরে (উত্তরে) হেমকূট সনাথ কিম্পুরুষবর্ষ। "এবং দক্ষিণে নেলাবৃতং নিষধো হেমকূট হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষ কিম্পুরুষবর্ষ ভারতানাং যথা সাংখ্যম্"

শ্রীমদ্ভাগবৎ ৫।১৬।৯

ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, হরিবর্ষের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষ।

কাল সহকারে প্রাচীন নাম কিম্পুরুষবর্ষ লুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে "টীবেট্" অথবা তিব্বত নাম প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান তিব্বতের অপর একটী প্রাচীন নাম "অগ্নিলোক"। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভারতের ইতিহাসে "হুন্" নামে একটী জাতির উল্লেখ আছে (সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতেও হুন্ জাতির উল্লেখ আছে।) ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তিব্বত "হুন্দেশ" বলিয়াও পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আল্‌মোড়া জেলার পট্টি চৌদাস, পট্টিব্যাস নিবাসী ভূটিয়া বাণিজ্যকারিগণ তিব্বত দেশকে "হুন্দেশ" এবং তিব্বতের অধিবাসীদিগকে "হুনিয়া" বলিয়া উল্লেখ করে।

বৃটিশ ভারতবর্ষ ও নেপাল হইতে তিব্বতে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। প্রায় সব কয়েকটী পথেই অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে হয়।

(১) কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে লাডক্ প্রদেশের লে নগর। তথা হইতে তিব্বত দেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র পারটক্। পারটকে পশ্চিম-তিব্বতের শাসনকর্ত্তার (গভর্ণরের) বাস।

মহাভারতে এই পথের উল্লেখ আছে।

"সকল পুণ্যের আয়তন মহর্ষি-সেবিত এই কাশ্মীর মণ্ডল অবলোকন কর। এই স্থান দিয়া মানস সরোবরে গমন করিতে হয়। *** যাজকগণ পরিবারের কল্যাণ কামনায় চৈত্র মাসে এই সরোবরে নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা পিনাকপাণির পূজা করিয়া থাকেন।"

(বনপর্ব্ব, তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

(২) পঞ্জাবের কাঙ্গরা জেলার নাহোন্ হইতে।

(৩) কুলু হইতে স্পিটীর মধ্য দিয়া সাংব্রাঙ্ গিরিসঙ্কট (mountain pass) অতিক্রম করিয়া

(৪) সিম্‌লা হইতে বুশহির রাজ্যের মধ্য দিয়া।

(৫) স্বাধীন গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রীর পথে ভৈরো ঘাটীর এপার হইতে জাড্‌গঙ্গার কূলে কূলে উত্তর দিকে যাইয়া লেলং বা লিলাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া

(৬) বৃটীশ গাড়োয়াল জেলার বদরিকাশ্রম হইতে দেড় মাইল মানাগ্রাম। মানাগ্রাম হইতে মানা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া

(৭) বদরিকাশ্রমের পথে যোশীমঠ হইতে বাওলী নদীর কূলে কূলে অগ্রসর হইয়া নিতি গিরিসঙ্কট। নিতি উত্তীর্ণ হইয়া এই গিরিসঙ্কট কালিদাসের মেঘদূতে "ক্রৌঞ্চরন্ধ্র" "হংসদ্বার" নামে উক্ত হইয়াছে।

(৮) আলমোড়া জেলার আস্‌কট হইতে তিন মাইল দূরে গৌরী-গঙ্গা। বর্ত্তমান নাম গোরী। গর্জ্জিয়ায় গৌরীর পুল পার হইয়া উৎস অভিমুখে কূলে কূলে জোহার পরগণার মিলান্, মনস্থিয়ারী। তথা হইতে উন্টাধুরা উত্তীর্ণ হইয়া এক পথে জয়ন্তী ও কুংড়িবেংড়ী গিরিসঙ্কট।

অপর পথে কুন্দার, চিটী চুরা। যে কোনও পথেই এক দিনে তিনটী গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া।

আলমোড়া জেলার অন্ত কয়েকটী গিরিসঙ্কট (৯) দর্ম্মা (১০) লংখিয়া বা লাম্পিয়া (১১) মাঙ্সাঙ্ (১২) লীপু। ইংরেজী ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে হেনরী স্যাভেজ ল্যাণ্ডোর নামে এক সাহেব লংখিয়ার পথে তিব্বতে গিয়াছিলেন। লীপু গিরিসঙ্কটের পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যে টিংকার, তৎপর মন্তাং, কেরাঙ্গ, কুটী এবং ওয়ালাংচন গিরিসঙ্কট, দারজিলিং হইতে সিকিমের মধ্য দিয়া এক রাস্তা, ভুটানের মধ্য দিয়া অন্ত রাস্তা।

লীপু গিরিসঙ্কট আলমোড়া জেলার সর্ব্ব পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। উচ্চতা সমুদ্র-বক্ষ হইতে ১৬৭৮০ ফিট। এই পথে বৃটিশ ভারতের শেষ জনপদ গার্ব্বিয়াং হইতে তিব্বতের প্রথম জনপদ তক্‌লীকোট চারি দিনের পথ। গার্ব্বিয়াং হইতে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া একুশ বাইশ দিনে পুনরায় গার্ব্বিয়াংএ প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। অন্যান্য সমস্ত গিরিসঙ্কট হইতে লীপু গিরিসঙ্কটের উচ্চতাও অল্প। এই জন্য এই পথেই অধিকাংশ যাত্রী গমনাগমন করিয়া থাকে।

ইংরেজী ১৯২২ সালে মন্তাং গিরিসঙ্কটের পথে আমি নেপাল হইতে মানস সরোবর ও কৈলাস যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ড হইতে অষ্টাদশ দিবসের পথ মুক্তিনাথে পৌছিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, সেখান হইতে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া মানা গিরিসঙ্কটের পথে বদরীকাশ্রমে আগমন করা যায়। যাহাদিগের নিকট এই পথ পরিচিত এরূপ গাইড্ ও ভারবাহক সংগ্রহ করিতে না পারায় ব্রিজম্যানগঞ্জের (জেলা গোরখ্পুর) পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে জাপানী পণ্ডিত ডাঃ কাওয়াগুচি যে এই পথে মানস ও কৈলাস গিয়াছিলেন, ইহা আমার ১৯২২ সালে জানা ছিল না।

বর্ত্তমান বৎসরে—ইংরেজী ১৯৩০ অব্দের মে মাসের মধ্য ভাগ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা ১৩৩৭ সনের জ্যৈষ্ঠের প্রথম হইতে আশ্বিনের মধ্যভাগ (লক্ষ্মী-পুর্ণিমা পর্য্যন্ত) কৈলাসে কুম্ভ। এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিবার জন্য ২৪শে মে বাঙ্গালা ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার একাদশী তিথিতে সস্ত্রীক কাশী ত্যাগ করিলাম। কাশী হইতে একটী বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা আমাদের সঙ্গে গেলেন।

বসুমতী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা বিধবা মাতা আমাদের কৈলাসে যাওয়ার কল্পনা পূর্ব্বে জানিয়া পুত্রের নিকট হইতে কৈলাস যাইবার সম্মতি আনাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী স্বামী রামানন্দও কাশীর জয়ীন্দ্রপুরী নামক একজন সন্ন্যাসীর বাঙ্গালী শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনিও সেই দিনই যাত্রা করিলেন। অদ্য হইতে মানস ও কৈলাস দর্শনানন্তর ১৯শে আগষ্ট তারিখে আলমোড়া প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। সতীশবাবুর মাতা আমাকে "বাবা" আমার স্ত্রীকে "মা" ও আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণ-কন্যাটীকে "সীতা" বলিয়া ডাকিতেন। আমরা স্বামী, স্ত্রী তাঁহাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে "মা" বলিয়া উল্লেখ করিব।

গত বৎসর সাধু গম্ভীরনাথজীর দুইজন বাঙ্গালী যুবক শিষ্য স্বামী শঙ্করনাথ ও স্বামী বিশ্বনাথ মানসসরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আলমোড়া জেলার ধারচুলা রামকৃষ্ণ তপোবনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুভবানন্দ প্রণীত "কৈলাস ও মানস যাত্রা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে পথঘাটের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম। নাথজীদ্বয়ের মৌখিক ও পুস্তকের লিখিত উপদেশ অনুসারে আবশ্যক শীতবস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে লইলাম। খাদ্য জিনিষের মধ্যে শুষ্ক তরকারী, তেঁতুল, লবণ, মসল্লার গুঁড়া, চাউল, সরিষার তৈল, চিনি, ঘৃত, মিশ্রি ও শুষ্ক ফল ইত্যাদি। চা পানের অভ্যাস থাকাতে, চা, উপকরণ,—জমাট দুগ্ধ, টীনের মাখন, বিস্কুট ইত্যাদি। একটী প্রাইমাস্ ষ্টোভ্ স্প্রীট সঙ্গে নিলাম। কেরোসীন তৈল আল্‌মোড়া হইতে লওয়া যাইবে।

আমার একজন বন্ধু এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনাকে তীর্থযাত্রী বলিয়া মনে না হইয়া বিবাহের বরযাত্রী বলিয়াই ভ্রম হয়।"

মা কোনরূপ অগ্নিপক দ্রব্য আহার করেন না। কাশীতে সমস্ত দিন অন্তে দুগ্ধ ও ফল আহার করেন।

কৈলাসের দুর্গম পথে এ নিয়ম রক্ষা করা অসম্ভব হইবে জানিয়া আমাদের অনুরোধে চিনি, মিশ্রি ও ঘৃত—অগ্নিপক্ব দ্রব্য এবং পাণিফলের আটা ও শুষ্ক ফল সঙ্গে লইলেন।

বেলা ১০-১২ মিঃ বেনারস্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দেরাদুন একস্‌প্রেসে আমরা রওয়ানা হইলাম। নাথপন্থী সন্ন্যাসীদ্বয় শঙ্করনাথ ও বিশ্বনাথজীও কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গেই রওয়ানা হইলেন। রাত্রি ১০-৪০ মিঃ গাড়ী বেরেলী ষ্টেসনে পৌছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করনাথ ও বিশ্বনাথ আমাদের সঙ্গেই বেরেলী নামিলেন। আমাদিগকে কাঠগুদামগামী গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তাঁহারা পরবর্ত্তী পেশোয়ার একস্‌প্রেসে কাশ্মীর অভিমুখে যাইবেন। জয়পুর হইতে শ্রীমৎ সদানন্দ স্বামী নামক একজন কৈলাস-যাত্রী সন্ন্যাসী বেরেলীতে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন।

রাত্রি ১২-৪০ মিঃ আমরা বেরেলী ত্যাগ করিলাম। গাড়ী বেরেলী ষ্টেসন হইতেই ছাড়ে—প্ল্যাটফর্ম্মেই ছিল। আমরা সকলে এক গাড়ীতেই উঠিলাম এবং যথেষ্ট স্থান থাকাতে অতি আরামে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

বেনারস্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেসনে আমাদিগকে বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছিল। যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী থাকাতে এবং পূর্ব্ব হইতেই গাড়ীতে যাত্রী-সংখ্যা অধিক থাকাতে মা, আমার স্ত্রী ও সীতাকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নাথ-স্বামীদ্বয় ও আমি এক গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম; স্বামী রামানন্দ ও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। মালপত্র কিছু এ গাড়ীতে কিছু সে গাড়ীতে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমার একটা বাক্স কাশীতেই জখম হইল।

২৫শে মে সকাল ৬টায় কাঠগুদাম পৌছিলাম। সমতল ত্যাগ করিয়া এখন আমরা পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলাম।

কাঠগুদামের পূর্ব্ববর্ত্তী হল্‌দ্বয়ানী ষ্টেসনে অনেক যাত্রী অবতরণ করিয়া সেখান হইতে মোটর লরীতে আল্‌মোড়া গেলেন। কাঠগুদামেও অনেক মোটর লরী উপস্থিত থাকে। কোন নির্দ্দিষ্ট ভাড়া নাই—যাত্রী-সংখ্যার আধিক্য এবং অল্পতা দেখিয়া চালকগণ ভাড়া নির্দ্দেশ করে। এই মোটর-ভাড়ার উপর আবার প্রত্যেক যাত্রীকে আট আনা পথকর দিতে হয়।

কাঠগুদামের নিম্নে একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী। নদীর নির্ম্মল জলে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া একখানি মোটর লরীতে আল্‌মোড়া যাত্রা করিলাম।

কিয়দ্দূর গমনের পর গাড়ী অচল হইয়া পড়িল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পরিশ্রমে আবার তাহাকে সচল করা হইল। সেখান হইতে অনেকটা দূর গমন করিয়া একটী ছোট বাজারে গাড়ী থামিল। রাস্তার দুই পাশে কয়েকখানা দুগ্ধ, দধি ও সন্দেশের দোকান। অনেক যাত্রীই এখান হইতে জলযোগ করিয়া লইলেন। আমরাও কেহ কেহ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলাম।

আমাদের মোটরে স্বাস্থ্যনিবাস নাইনিতাল-যাত্রীও কয়েকজন ছিলেন। কিছুদূর আসিয়া তাঁহারা নামিয়া গেলেন। এ পথে একটী পাহাড়; পায়ে হাঁটিয়া চড়াই উৎড়াই করিতে হয়; কিন্তু মোটর-ভাড়া কম পড়ে। সাধারণতঃ যাহাদের সঙ্গে অধিক জিনিষপত্র না থাকে, তাহারাই এই পথে গমন করে।

অদ্য রবিবার। কয়েকজন সাহেব ধর্ম্মযাজক অনেক দেশীয় (পাহাড়ীয়া) খ্রীষ্টানদিগকে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। এই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে এ দৃশ্য দেখিয়া আমাদের মোটরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী উদয় সিংহ নামক একটী যুবককে জিজ্ঞাসায় জানিলাম এই মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী ভজনালয়ে রবিবাসরীয় উপাসনা শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। উদয়-সিংহ বলিলেন তিনিও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার পিতার নাম রেভাঃ নৈন্ সিংহ। তিনি ধারচুলাতে ধর্ম্মপ্রচারক। ধারচুলাতে একজন আমেরিকান্ সাহেব প্রচারকও সস্ত্রীক বাস করেন। আলমোড়া জেলাতে অনেক পাহাড়ীয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদিগকে "ইশাহী" বলে এবং ইহাদের অধিকাংশই আমেরিকান্ এপিস্‌কোপাল সম্প্রদায়ভুক্ত।

ভাউলিয়া ও রাণীক্ষেত নামে আরও দুইটী স্বাস্থ্যকর স্থান আমাদের পথে পড়িল। উভয় স্থানেই অনেক যাত্রী নামিল উঠিল।

সরকার হইতে প্রত্যেক গাড়ীর জন্য যে যাত্রীসংখ্যা

নির্দ্দিষ্ট আছে চালকগণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক যাত্রী গাড়ীতে লইয়া থাকে। নির্জ্জন পথ—কে দেখে ?

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় আমরা আল্‌মোড়া পৌঁছিলাম। হিন্দু-হোটেল নামে একটী হোটেলে দু'টী কামরা ভাড়া করিয়া এক কামরাতে মা এবং তাঁহার সঙ্গী সাধু ২ জন ও অপর কামরাতে আমরা তিন জন আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(২)

যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুঁ (সংস্কৃত নাম কুর্ম্মাঞ্চল) ডিভিসনে আলমোড়া একটী জেলা—কাঠগুদাম রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ৮০ মাইল দূরে। এই ৮০ মাইল মোটর গাড়ীর রাস্তা। ভারবাহী পশু গমনের জন্য অন্য একটী রাস্তা আছে—তাহাতে দূরত্ব কিছু অধিক। কুমায়ুঁ ডিভিসনে আর দুইটী জেলা নাইনিতাল ও গাড়োয়াল। নাইনিতাল যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস। পূর্ব্বে গাড়োয়াল একটী অখণ্ড স্বাধীন রাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে কিয়দংশ বৃটিশ অধিকৃত—বৃটিশ গাড়োয়াল বা পৌরী গাড়োয়াল। অবশিষ্টাংশ স্বাধীন গাড়োয়াল বা টিহ্‌রী গাড়োয়াল। এখানে স্বাধীন অর্থে করদ মিত্র। টিহ্‌রী রাজধানী। এই অংশে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী বুড়াকেদার প্রভৃতি তীর্থ এবং বৃটিশ গাড়োয়ালে কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদ্রীনাথ এবং দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি পঞ্চপ্রয়াগ অবস্থিত।

আলমোড়া জেলার উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে নাইনিতাল, পশ্চিমে বৃটিশ গাড়োয়াল এবং পূর্ব্বে কালীনদী। এই কালীনদী পশ্চিমে বৃটিশ ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যের মধ্যসীমা। আল্‌মোড়া জেলার বিস্তৃতি ৩১০ বর্গ-মাইল। সংস্থান—লেটিটিউড্‌ ২৮°৫১′ এবং ৩০°৪৯ উত্তর; লংগিটিউড্‌ ৭৯°২ এবং ৮১°৩১ পূর্ব্ব। সমুদ্রবক্ষ হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপর আল্‌মোড়া জেলার সদর স্থাপিত।

"কৌশিকি শাল্মলী মধ্যে পুণ্যঃ কাষায়পর্ব্বতঃ"। এই কাষায় পর্ব্বতের পরবর্ত্তী নাম "খাগ্‌মারা"। বর্ত্তমানে আল্‌মোড়া।

আল্‌মোড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহাও একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও তাপমান যন্ত্রের পারদ ৮৮ ডিগ্রীর উপরে উঠেন। জুন মাসের গড়্ পড়তা ৮৪ ডিগ্রী। বর্ত্তমানে এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট।

আল্‌মোড়ার নিজস্ব প্রাচীন ইতিহাস আছে। খ্রীঃ ৯৫৩ অব্দ হইতে ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতল হইতে এক ক্ষত্রিয় যুবক এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে আগমন করিয়া সোরের (বর্ত্তমান পিথোরাগড়) রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি সোমরাজ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কালী নদীর বামকূলে কুমায়ুঁ রাজ্য স্থাপন করেন। সোমরাজ নিজেকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সোমরাজের অধস্তন বংশীয় রাজগণ চাঁদরাজ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

সোমরাজের রাজধানী ছিল চম্পাত্তৎ—বর্ত্তমান পিথোরাগড় সবডিভিসনের মধ্যে। চম্পাত্তৎ সমুদ্রবক্ষ হইতে ৫৬৪২ ফিট্ উর্দ্ধে। যাঁহারা টনকপুর রেলষ্টেশন হইতে আস্‌কোট গমন করেন, তাঁহাদিগকে চম্পাত্তৎ হইয়া যাইতে হয়। টনকপুর হইতে চম্পাত্তৎ ৩০ মাইল। ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চম্পাত্তৎ কুমায়ুঁ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

এই সময় মধ্যে কুমায়ুঁর চাঁদরাজগণের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী নেপাল ও গাড়োয়ালের রাজগণের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। তৎব্যতীত চাঁদরাজগণ আস্‌কোট্, দরমা ও জোহার তিনটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য জয় করিয়া কুমায়ুঁ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আস্‌কোটের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না করিয়া রাজাকে কর দানে বাধ্য করিয়া স্বাধীনভাবে স্বীয় রাজ্য শাসন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গুর্খারাজও এ অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। বৃটিশ রাজও আস্‌কোটের রাজাদের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া বাঙ্গালাদেশের জমীদারের ন্যায় ইহাদিগকে চিরস্থায়ী ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়াছেন এবং করদ মিত্র কি স্বাধীন রাজাদের ন্যায় উত্তরাধিকারে Line of primiogenture-এর অধিকার দান করিয়াছেন।

রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছিল। রাজা ইন্দ্রচাঁদ রাজ্যে রেশমের চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

১৫৬৩ খ্রীঃ রাজা কল্যাণচাঁদ আল্‌মোড়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অব্দে রাজা বাজবাহাদুর গাড়োয়াল

রাজ্য হইতে বলপূর্ব্বক নন্দাদেবীর মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া আলমোড়াতে স্থাপনা করেন। নন্দাদেবী আলমোড়া রাজ্যের মঙ্গলদেবতা (guardian saiut)।

কৈলাস ও মানস সরোবর-যাত্রী ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি হুনিয়াদের (তিব্বতীয়) অত্যাচারের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া রাজা বাজ বাহাদুর ১৬৭০ খ্রীঃঅব্দে জোহারের মধ্য দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতের তক্‌লাখার অধিকার করিয়াছিলেন। কুমায়ুঁ রাজ্য হইতে তিব্বতে যাইবার পথ হিমালয়ের গিরিসঙ্কট কয়টী তিনি চাঁদ-রাজদের অধিকারে আনয়ন করেন। ভারতীয় তীর্থ-যাত্রিগণের প্রতি আর কোনওরূপ অত্যাচার হইবে না —তিব্বতরাজ অথবা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতিতে তক্‌লাখার পুনরায় তিব্বতীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করেন।

তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে রাজকোষ হইতে সদাব্রত দানের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

১৭৬১ খৃঃ তাৎকালিক কুমায়ুঁ রাজ চারি সহস্র সৈন্য সহযোগে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহম্মদ শাহ আবদালীর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নেপালের গুর্খারাজ কুমায়ুঁ রাজ্য অধিকার করেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ গোর্খা রাজকে পরাজিত করিয়া কুমায়ুঁ রাজ্য বৃটিশ শাসনাধীনে আনয়ন করেন। বর্ত্তমান আলমোড়া জেলা কিছুকাল কুমায়ুঁ জেলা নামে পরিচিত ছিল। পরে ইহার বর্ত্তমান নাম প্রচলিত হইয়াছে।

পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজবাটী ছিল। কুমায়ুঁ রাজ্য বৃটিশ অধিকারে আসার পর রাজবাটীতে ডেপুটী কমিশ-নরের আফিশ স্থাপিত হইয়াছে। নন্দাদেবীর প্রাচীন মন্দিরও এখনও সেখানে আছে। কিন্তু বিগ্রহ সহরের পশ্চিম প্রান্তে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। চাঁদ রাজবংশীয়গণ কিছুকাল পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলার প্রধান সহরে যে সকল প্রতিষ্ঠান সচরাচর থাকে, তদতিরিক্ত এখানে একটী সৈন্যাবাস আছে। পূর্ব্বে গোরা সৈন্য থাকিত, বর্ত্তমানে গুর্খা সৈন্য আছে।

যে সময়ে এখানে গোরা সৈন্য থাকিত, সেই সময় সেই সৈন্যদলের এক ব্যক্তি প্রতি রবিবার দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দান করিতেন এবং দুই একটি কুষ্ঠরোগীকে অর্থ সাহায্য করিতেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি আলমোড়াতে একটী কুষ্ঠনিবাস স্থাপন করেন। সেই ক্ষুদ্র নিবাসটী বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আমেরিকার এপিস্‌কোপেল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এখন উহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে মে হইতে ১২ই জুন পর্য্যন্ত আল্‌মোড়া ছিলাম। কাশীর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম হইতে আসিয়া আল্‌মোড়ার স্নিগ্ধ শীতলতা এই অষ্টাদশ দিবস উপভোগ করিলাম।

২৬শে মে সকালবেলা ডেপুটী কমিশনর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। বাঙ্গালার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানতম কর্ম্মচারী মিঃ কোল্‌সন্ সাহেবের নিকট হইতে একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। আমার কৈলাস যাত্রার পথে প্রয়োজন মত যান্ বাহনের সরবরাহ করিবার জন্য আল্‌মোড়া হইতে গারবিয়াং পর্য্যন্ত সমস্ত পথের পাটোয়ারীদিগের প্রতি আদেশপত্র প্রেরণ করিবার জন্য ডেপুটী কমিশনার সাহেব আফিশে আদেশ পাঠাইলেন এবং আমার যাত্রা শুভ হউক এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

সাহেবের বাঙ্গালা হইতে আফিশে আসিয়া অস্থায়ী আফিশ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট বাবু মথুরা দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বাবু মথুরা দত্ত আল্‌মোড়া সহরেরই অধিবাসী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক। তিনি নিজেও কৈলাস দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

এখন আল্‌মোড়া ত্যাগ করিলে পথে ধারচুলা কি গারবিয়াং কোনও স্থানে আমাদিগকে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ বিলম্ব করিতে হইবে—বাবু মথুরা দত্ত আমাকে এই কথা বলিলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বে লীপু গিরি সঙ্কটের পথ খোলে না। যদিও ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ভিন্ন অন্য কয়েক মাসেই লীপুগিরি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সাহেবদের প্রণীত পুস্তকাদিতে এরূপ লিখিত আছে— তথাপি, প্রকৃত অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নবেম্বরের মধ্য হইতে জুনের শেষ পর্য্যন্ত হিমালয় উল্লঙ্ঘন করা যায় না।

লীপু গিরি-সঙ্কটের পথে হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিলে

শিবদুর্গা (পর্বতগাত্রে)

[illegible]

শিক্ষক মাদ্রাজ আর্ট স্কুল
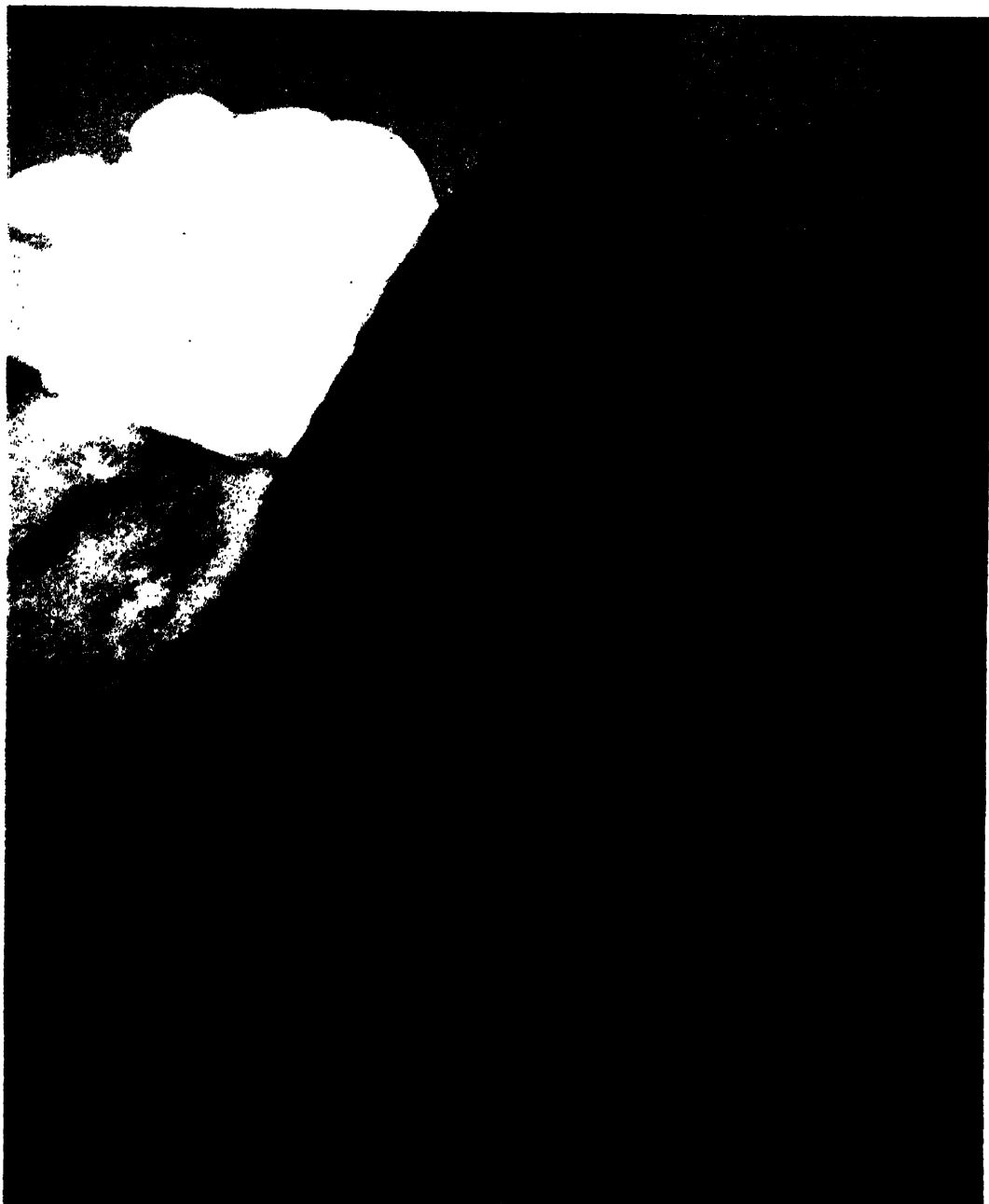
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তিব্বতের প্রথম জনপদ তক্‌লাকোট্। তক্‌লাকোটে শত্তুলিঙ্গ বৌদ্ধ বিহার ভিন্ন অন্যত্র সমস্ত বৎসর-ব্যাপী অধিবাসী থাকে না। ব্যাস ভুটিয়া (ভারতবর্ষের শেষ জনপদ গার্ব্বিয়াং, গুঞ্জি, কুঠীর অধিবাসী) এবং চৌদাস ভুটিয়া (পাঙ্গু, শোসা, ছিতাংএর অধিবাসিগণ) জুলাইএর প্রথম হইতে নবেম্বরের প্রথম পর্য্যন্ত বাণিজ্য উপলক্ষে তক্‌লাকোটে থাকে। ভুটিয়া ও হুনিয়া (তিব্বতীয়)-দিগের বাণিজ্যকেন্দ্র তক্‌লাকোট। হুনিয়ারা সোরা, লবণ, ব্রিক্ (Brick) (তিব্বতীয় চা), স্বর্ণরেণু, পশম প্রভৃতি ভুটিয়াদিগকে দিয়া প্রতিদানে বিলাতী কাপড়, আটা, ছাতু, গুড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় এবং স্ফটিকের মালা আয়না প্রভৃতি সৌখীন জিনিষ গ্রহণ করে। ভুটিয়াগণ শীতকালে তক্‌লাকোট ত্যাগ করিয়া প্রথমে গারবিয়াং প্রভৃতি স্থানে, পরে ধারচুলাতে চলিয়া আসে। শীতঋতুর অবসানে পুনরায় মে মাসের মধ্যভাগে গার্ব্বিয়াং ও তৎপরে তক্‌লাকোটে গমন করে। ভুটিয়া বণিক্‌দের অনুপস্থিতি কালে কোন যাত্রী যদি তক্‌লাকোটে যাইতেও পারে, তথাপি, সে যান, বাহন, পথপ্রদর্শকের অভাবে. কৈলাস কি মানস সরোবর যাইতে পারিবে না।

আফিশ হইতে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নানাহার শেষ করিলাম। বাবু মথুরাদত্তের পরামর্শানুযায়ী আল্‌মোড়ায় কিছুদিন অবস্থান করাই সঙ্গত মনে করিলাম। শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দ ও সচ্চিদানন্দজী আলমোড়ায় বাজার-চৌধুরী কিষণদাসের একখানা নূতন বাঙ্গালা এক মাসের অনূর্দ্ধ-কালের জন্য কুড়ি টাকায় ভাড়া করিয়া আসিলেন। বৈকালে হোটেল ত্যাগ করিয়া নূতন বাসায় গেলাম।

বাসাখানি বাজারের পশ্চাৎভাগে খোলা মাঠের মধ্যে অল্প দিন হইল তৈয়ারী হইয়াছে। বাসা হইতে জলের ঝরণা একটু দূরে—এই একমাত্র অসুবিধা ভিন্ন অন্য কোন অসুবিধা নাই। জল আনিবার জন্য মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন পাহাড়িয়া ভৃত্য নিযুক্ত করা গেল।

২৪শে মে তারিখে একাদশী। ২৫শে তারিখে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মোটরে আলমোড়া আগমন। মা এই দুই দিন নির্জ্জলা উপবাস করিয়া অদ্য নূতন বাসায় আসিয়া স্নানান্তে রাত্রে দুধ ও ফল খাইলেন। তিনি দিবাভাগে কিছুই আহার করেন না। গতরাত্রে যদিও তাঁহার জল-যোগের কোন প্রতিবন্ধক ছিল না, কিন্তু "হোটেলে"! ছিলাম, এই জন্যই কিছুই আহার করেন নাই।

আমরা বলিলাম, "মা, যেরূপ উপবাসের ঘটা—বোধ হয় কৈলাস দর্শনের পূর্ব্বেই আপনার কৈলাসপ্রাপ্তি ঘটে!" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আল্‌মোড়াতেই ভয় পাইব কেন? দুর্গম পথ নহে। যখন কষ্ট সহ্য করিতে না পারিব তখন দেখা যাবে।"

আল্‌মোড়াতে গরুর দুধ টাকায় চারি সের। দুগ্ধ বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু। দুধের স্বাদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে বিক্রেতা সগর্ব্বে উত্তর করিত—"হমলোগ্ পাহাড়ীয়া হ্যায়।" অর্থাৎ দুগ্ধে জল মিশ্রণ এখনও শিক্ষা করি নাই। স্থানীয় লোকেরা টাকায় পাঁচ সের দুগ্ধ পান শুনিলাম। যাঁহারা "হাওয়া খুরী" (বায়ুসেবন) করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। আমাদিগের সাজসরঞ্জাম দেখিয়া আমাদিগকে কৈলাস-যাত্রী না বুঝিয়া স্বাস্থ্যকামী বলিয়া বুঝিয়াছিল।

ভাল চাউল টাকায় চারি সের। আলু যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঢেরস ॥৵০ আনা সের, বেগুণ ।৵০, কাঁচা লঙ্কা ৵০ সের। ঝিঙ্গে একটী এক আনা। বর্ষার পরে তরকারী মিলিবে ও সস্তা হইবে, আশার বাণী শুনিলাম।

আল্‌মোড়া অবস্থানকালে এখানকার কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল মুখার্জ্জি সাহেবের সহিত আমাদের (পুরুষ তিনজনের) পরিচয় হয় এবং তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীয়া মহিলা যাত্রিগণের পরিচয় হয়। নূতন পরিচয় ব্যাপারে মহিলাগণই অতিমাত্রায় অগ্রসর। রাস্তায় অপরিচিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে উভয় দলের স্ত্রীলোকেরাই অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতেন; আমরা পুরুষগণ দূরে নীরবে অবস্থান করিতাম। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিতও পরিচয় হয়। দুই দিন মিশনের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

নিরুপদ্রব আইন ভঙ্গের ঢেউ এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ট্রাইকলার ধ্বজা উড়াইয়া বালক ও যুবকগণ শোভাযাত্রা করিত এবং "মেরে সোণেকে হিন্দুস্থান" প্রভৃতি সঙ্গীত গাহিত। এই সমস্ত শোভাযাত্রাও নিরুপদ্রবেই সম্পন্ন

হইত। কেবল ২৭শে মে তারিখে শোভাযাত্রা অন্তে মিউনিসিপাল আফিশের আঙ্গিনায় ধ্বজা স্থাপন করিলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয় এবং ধ্বজা স্থানান্তরিত করিতে ডেপুটী কমিশনর সাহেব আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ নিরুপদ্রবে পালিত না হওয়ায় গুর্খা সৈন্যগণ উহা স্থানান্তরিত করে এবং কয়েকজন দেশসেবক অল্প-বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন।

৬ই জুন হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত মুসলমান পর্ব্ব মহরম উপলক্ষে তাজিয়া বাহির হইয়াছিল এবং হিন্দু মুসলমানে কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। আলমোড়াতে মুসলমান অধিবাসী অল্প। যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ সাজাহান বাদশাহের রাজত্বকালে এখানে আসিয়াছিল এবং তদবধি পুরুষাক্রমে বাড়ীঘর করিয়া এখানেই আছে, তাহারাও আপনাদিগকে পেশোয়ারী, কাবুলী, দিল্লীওয়ালা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

মহরমের শোভাযাত্রায় একটী দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখিলাম। অতি সুশ্রী ধনী মুসলমান বালকগণ উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া স্কন্ধে এক একটী জলপূর্ণ ক্ষুদ্র মশক লইয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছে এবং মশক হইতে পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে অল্প অল্প জল দান করিতেছে।

১০ই জুন তারিখে স্বদেশ-সেবকদের পক্ষ হইতে একজন সাহেব নন্দাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করিলেন।

আমরা নূতন বাসায় আসিবার পর ২৮শে মে তারিখে ঘোড়াওয়ালা জোহার সিংহ আসিয়া দেখা করিল এবং আমাদিগকে ধারচুলা লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় ১০ই জুন তারিখে আসিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল।

মা'র মালবাহী ঘোড়া ৩টা ও তাঁহার নিজের জন্য সওয়ারী ঘোড়া একটা, আমার জন্য মালবাহী ঘোড়া ৩টা ও আমার স্ত্রীর জন্য সওয়ারী ১টা, মোট আটটা ঘোড়ার আমাদের প্রয়োজন। আলমোড়া হইতে ধারচুলা ৮ দিনের পথ। প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য বার টাকা দিতে হইবে, জোহার সিংহের সঙ্গে এই চুক্তি হইল।

১০ই জুন নির্দ্ধারিত সময়ে জোহার সিংহ আসিয়া না পৌঁছানতে একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। আমাদের বাসার মালিক চৌধুরী সাহেবের পুত্রকে এখন কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে জোহার সিংহ অতি সাধু লোক—"জান্" থাকিতে কথার "খেলাপ্" করিবে না। তবে দূর দেশের—পথ হয় ত কোন দৈব-দুর্বিপাকে আসিতে পারে নাই,—দুই একদিনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে।

১২ই জুন বৃহস্পতিবার দুপ্রহরে জোহার সিংহ আসিয়া পৌঁছিল। বিগত পরশ্ব আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। আগামী কল্য প্রত্যূষে আল্‌মোড়া ত্যাগ করিব স্থির করিয়া জোহার সিংহকে বিদায় দিলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

দশম পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাসভবন

গৌরী সেন—খ্যাতনামা দাতা গৌরী সেন বড়বাজারে বাস করিতেন।

———

বৈষ্ণবচরণ শেঠ—সুপ্রসিদ্ধ শেঠ-বংশের পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণবচরণও বড়বাজারে বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বে তাঁহারা কয়লাঘাটে যে স্থানে মেটকাফ্ হল্ ছিল তথায় বাস করিতেন বলিয়া কাপ্তেন উইলসনের মানচিত্রে চিহ্নিত আছে। তখনকার কালে রামকৃষ্ণ ও অমিচাঁদ শেঠ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালীর সাহেবপল্লীতে বাটী ছিল না।

———

হরি ঘোষ—প্রথিতনামা দেওয়ান হরি ঘোষ, তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তাঁহার

বাটীতে অনেকে আশ্রয়লাভ করিত; এই কারণে 'হরি ঘোষের গোয়াল' কথাটি প্রচলিত হইয়াছিল।

দেওয়ান রামচরণ—গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের বেনিয়ান্ টোলার মোড়ের উপর যে বাটীতে স্বর্গীয় কবিরাজ বিনোদলাল সেন বাস করিতেন ঐ বাটী যে স্থানে আছে, তথায় হুগলীর ফৌজদারের কাছারী-বাটী ছিল। ফৌজদার রাজা মাণিকচাঁদ কয়েক মাস কাল এই বাটীতে
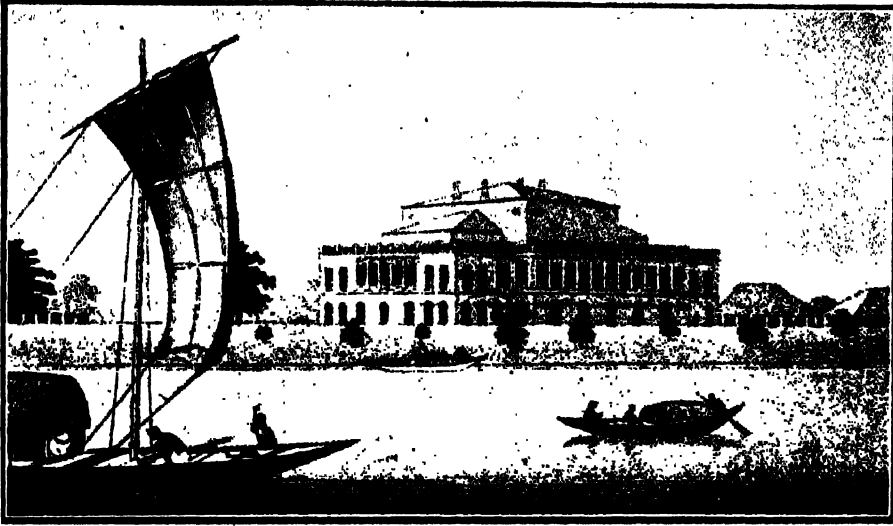
ব্যারাকপুর হাউস্।

আন্দুল রাজবংশের আদি-পুরুষ দেওয়ান রামচরণ পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন।

ভূকৈলাসের রাজবংশ—এই বংশের আদিপুরুষ গভর্ণর ভিয়ারলেষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ইনি গোবিন্দপুরের বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে বাস স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রাসাদ-সম বাটীর নাম প্রদান করেন 'ভূকৈলাস'।

ষাইট বৎসর পূর্ব্বের ওল্ড কোর্ট-হাউস্ ষ্ট্রীট্।
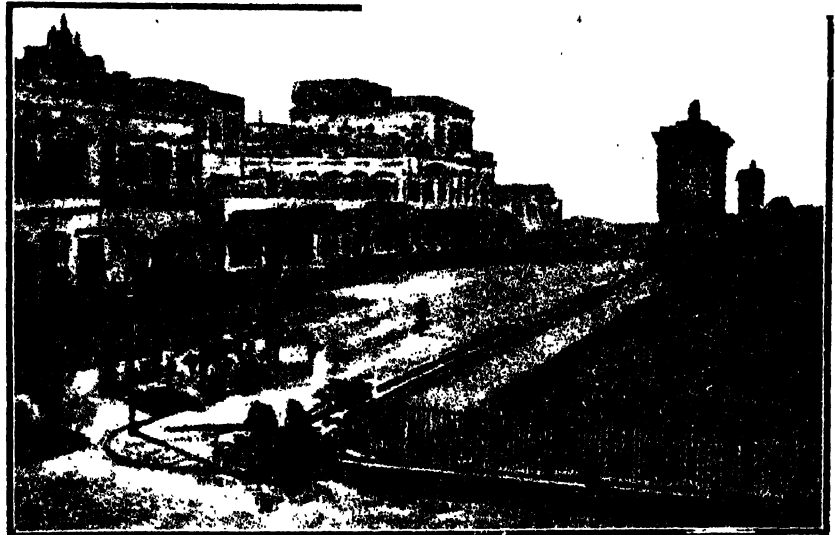
আমীর চাঁদ—বর্ত্তমান লায়নস্ রেঞ্জে ইঁহার বাটী ছিল।

হুগলীর ফৌজদার—লোয়ার চিৎপুর রোড ও কলু-

আদালত করিয়া দেশীয়দের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন।

হুজুরীমল্—ধনাঢ্য শিখ ব্যবসায়ী হুজুরীমলের বাসভবন

ছিল বড়বাজারে। তাঁহার বাড়ী খুব বড় ছিল। বৈঠক-খানায় তাঁহার একটী বাগানবাড়ী ছিল।

রাজা রাজবল্লভ—ইনি বাগবাজারে বাস করিতেন।

—

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পার্ক ষ্ট্রীটের সর্ব্বাপেক্ষা

সদর বোর্ড অব্ রেবিনিউ অফিস।

ওল্ড্ বিশপ্ প্রেস্। (৫নং রসেল ষ্ট্রীট্।)

সুবৃহৎ বাটীতে (৬নং) তিনি বাস করিতেন। বঙ্গদেশের ছোটলাট স্যার জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই বাটীতে বাস করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভবন ছিল বলরাম দের ষ্ট্রীটে।

—

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটায় ইঁহার প্রকাণ্ড বাসভবন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত—রামবাগানের দত্ত পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত তরু দত্ত ও অরু দত্তও এই বংশসম্ভূতা।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—মাণিকতলা ষ্ট্রীটের সন্নিকটে সিমুলিয়ার গোঁসাইদিগের বাটীতে ইঁহার জন্ম হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটে এক্ষণে 'টেগোর কাস্‌ল' যেখানে আছে, তথায় তাঁহার প্রাসাদ ছিল।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র বাগবাজারের বসুপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিমচাঁদ গোস্বামী—ইনি নিমু-গোঁসাই নামে খ্যাত। আহিরী-টোলার গোঁসাই বংশে ইঁহার জন্ম।

—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—খিদির-পুরের পুলের নীচে হইতে আরম্ভ করিয়া মেটিয়াবুরুজের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, উহার ধারে একটি বাটীতে কবি বাস করিতেন।

—

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারও খিদিরপুরে বাটী ছিল।

—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেনের বাটীতে বাস করিতেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি ৬নং মাণিকতলা রোডে বাস করিতেন।

—

রাজা রামমোহন রায়—৮৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও ১১৩

কেশবচন্দ্র সেন—১৮৩৮ হইতে ১৮৭৭ পর্য্যন্ত ইনি ৫৯ নং ভবানীচরণ দত্তের গলিতে বাস করিতেন। ৭৮ নং আপার সার্কুলার রোডের "লিলি কটেজ" নামক বাড়ীও তাঁহার ছিল।
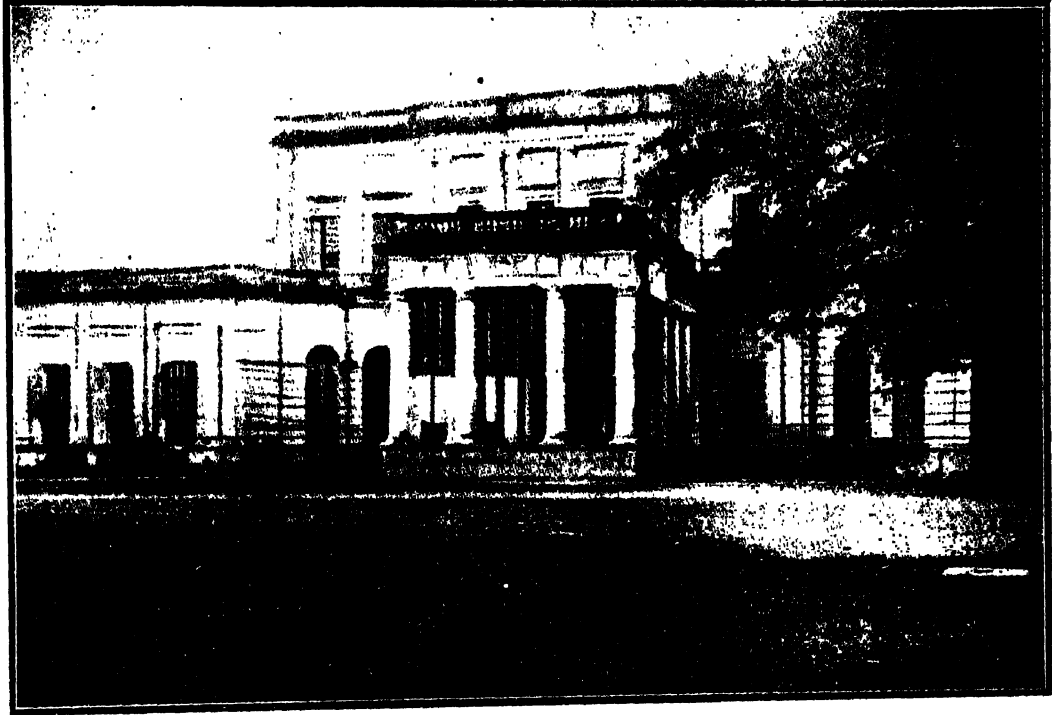
হেষ্টিংস্ হাউস্। (সম্মুখের দৃশ্য)

খিদিরপুর হাউস। (রিচার্ড বারওয়েলের ঐতিহাসিক বাসভবন।)

নং আপার সার্কুলার রোডে বাস করিতেন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শেষোক্ত বাটীতে ছিলেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণ—শোভাবাজারের রাজবাটীতে ইনি বাস করিতেন।

অক্টারলোনী মনুমেণ্ট হইতে এসপ্ল্যানেডের দৃশ্য।—৫০ বৎসর পূর্ব্বে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৫নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জির লেনে বাস করিতেন।

নবাব রেজা খাঁ—চিৎপুরে উদ্যান মধ্যে এক সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদে তিনি বাস করিতেন। লোকে তাহাকে চিৎপুরের নবাব-প্রাসাদ বলিত। তিনি বাঙ্গলার নায়েব-দেওয়ান ছিলেন। চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার গভর্ণর কলিকাতায় গেলে প্রায় তাঁহার বাটীতেই বাস করিতেন।

রায় রায়ন মহারাজা রাজবল্লভ—ইনি সুতানুটীতে বাস করিতেন।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং—জোড়াসাঁকোতে ইঁহার বাড়ী ছিল। ইনি পাইকপাড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন।

কান্তবাবু—কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু। ইনিও জোড়াসাঁকোতে বাস করিতেন।

রায় রায়ন মহারাজা গুরুদাস—ইনি মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র, সুতানুটীর চড়কডাঙ্গায় বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন বর্ত্তমান বিডন উদ্যানের স্থানেই তাঁহার বাটী ছিল।

পীতাম্বর মিত্র—ইনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব্ব-পুরুষ, মেছুয়াবাজারে বাস করিতেন।

মুন্সী সদরদ্দীন—ইনি রিচার্ড্ বারওয়েলের ফার্শি শিক্ষক ছিলেন। ইনিও মেছুয়াবাজারে বাস করিতেন।

মদনমোহন দত্ত—সুতানুটী নিমতলায় বাস করিতেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—মিঃ হুইলারের দেওয়ান বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন।
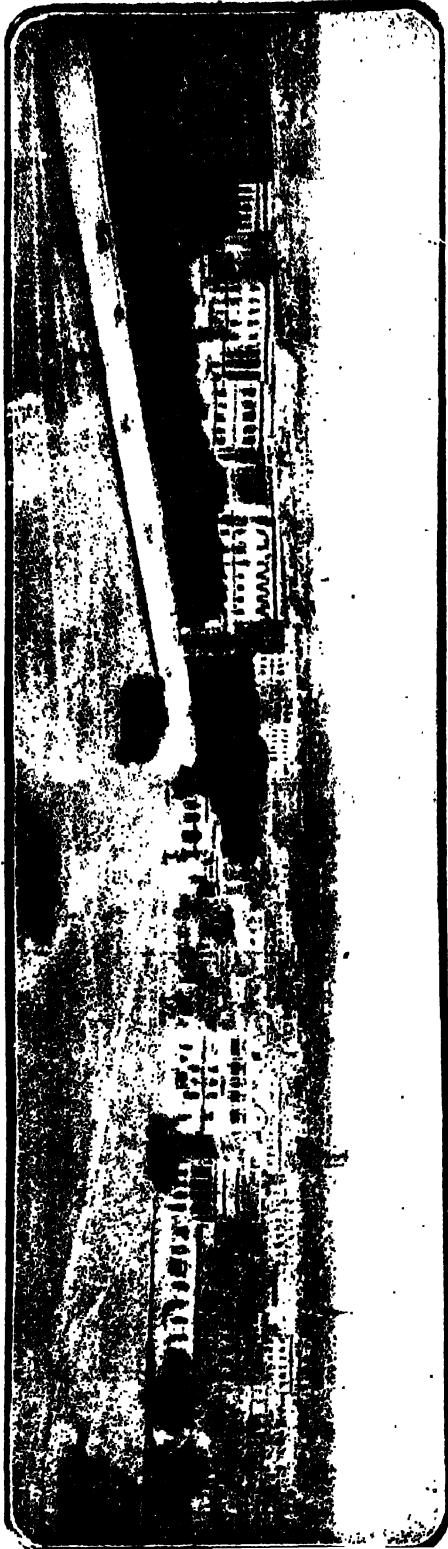
বনমালী সরকার—পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান বনমালী সরকার কুমারটুলিতে থাকিতেন। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি কুমারটুলিতে বাস করিতেন। ইঁহার প্রাসাদসম অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সময়ে কলিকাতার মধ্যে ইহা একখানি প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল।

গোবিন্দরাম মিত্র—ইনিও কুমারটুলিতে বাস করিতেন। চিৎপুরের নবরত্ন মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া অক্টারলনি মনুমেণ্ট্ অপেক্ষাও উচ্চ ছিল। উহা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে পড়িয়া যায়।

—

ওমিচাঁদ—ইনি ঠিক কোন স্থানে বাস করিতেন তাহার কোথাও উল্লেখ পাই নাই। ইঁহার কলিকাতায় বহুসংখ্যক প্রাসাদসম অট্টালিকা ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা যে স্থানকে কেন্দ্র করিয়াছিলেন উহা ওমিচাঁদের উদ্যান ছিল। উহাই এখন হালসিবাগান নামে খ্যাত।

দেওয়ান কাশীনাথ—বড়বাজারে ইঁহার বাস ছিল।

—

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গার্ডেনরিচের নিকট পদ্মপুকুর নামক স্থানে কবিবর বাস করিতেন।

—

নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ—লক্ষ্ণৌএর নির্ব্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ মেটিয়াবুরুজে বাস করিতেন।

—

রামদুলাল সরকার—বিড্‌ন্‌ষ্ট্রীটের তাঁহার প্রাসাদতুল্য ভবনে তিনি বাস করিতেন।

মহারাজ নন্দকুমার—বর্ত্তমানে বিডন-বাগান যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, জনপ্রবাদ—মহারাজ নন্দকুমারের আবাসবাটী তথায় ছিল।

—
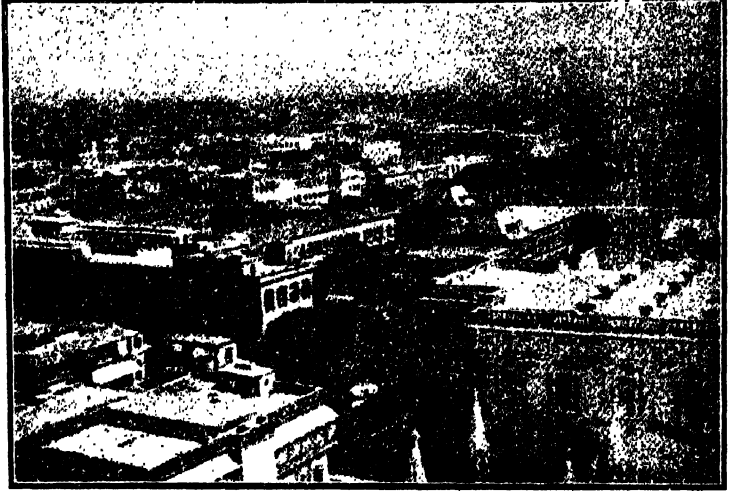
নবাব মীরজাফর—জনপ্রবাদ—খিদিরপুরে বেল-

হাইকোর্ট হইতে টেলিগ্রাফ অফিসের দিকের দৃশ্য— ৫০ বৎসর পূর্ব্বে
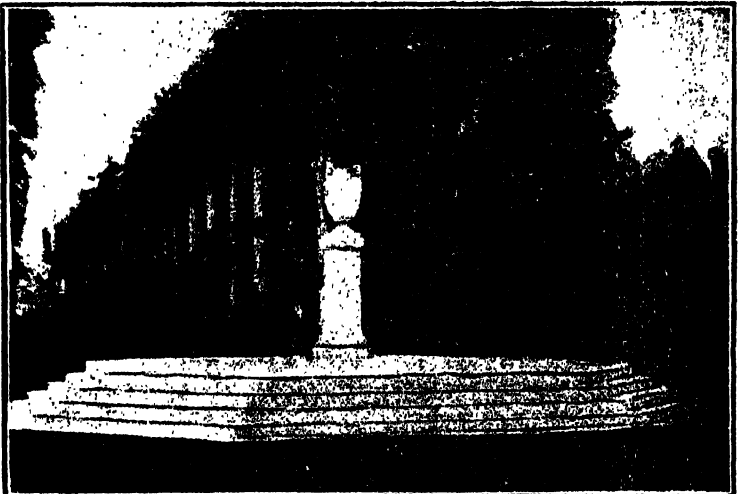
কীডের স্মৃতিস্তম্ভ ও পাম্ এভেনিউ। বোট্যানিক্যাল গার্ডেন্।

ভেডিয়ার রোডের নিকটে যেখানে এগ্রিকালচারাল সোসাইটির বাগান আছে, তথায় নবাব মীরজাফরের কলিকাতার বাসভবন ছিল। কথিত আছে, বর্ত্তমান চিড়িয়াখানা যে স্থানে আছে, তথায় তাঁহার প্রণয়িনী মণি বেগমের জন্য একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও এই

স্থানকে লোকে বেগমবাটী বলিয়া থাকে। হরিণবাড়ীর জেল যেখানে আছে, ঐ স্থানে নবাবের বাড়ী ছিল এরূপও অনেকে বলিয়া থাকেন।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা—ইনি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন।

লাট ভবন—১৯শ শতাব্দীর প্রথমে।

জুলজিক্যাল্ গার্ডেনের এক অংশ।

রাণী রাসমণি—জানবাজারে ইঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বিরাজিত। উহা মাড় বাবুদের বাটী নামে খ্যাত।

শ্রীনাথ দাস—সেকালের হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীনাথ দাস মহাশয় ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটের নিকট নিজ নামের এই গলিতে বাস করিতেন।

শিশিরকুমার ঘোষ—স্বনামখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার যশোহর জেলার মাগুরা গ্রাম হইতে আসিয়া বাগবাজারের আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।
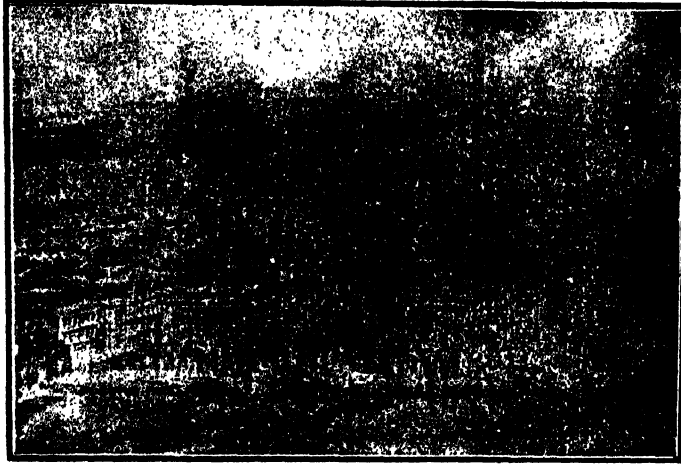
অক্রুর দত্ত—অক্রুর দত্তের গলি নামে যে পথ আছে, সেই পথ পার্শ্বেই দত্ত মহাশয়ের সুবিস্তৃত বাসভবন। এই দত্ত পরিবারেই সুকবি গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভা বিকশিত হয়।

নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু—ইঁহারা সহোদর ছিলেন। কাঁটাপুকুরের সান্নিধ্যে ইঁহাদের প্রাসাদ-সম অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুরের এই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বনামধন্য স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন। ইনি রসারোডের ধারে তাঁহার নিজ বাটীতে বাস করিতেন।

দ্বারকানাথ মিত্র—বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র রসারোডের উত্তর অংশে লণ্ডন মিশন কলেজের বাটীর পার্শ্বে বাস করিতেন।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র—বিচারপতি রমেশচন্দ্রের আদি নিবাস রাজারহাট বিষ্ণুপুর। তিনি ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—ইনি ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রোডের সন্ধিস্থলে তাঁহার বাটীতে বাস করিতেন।

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে গ্রে ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া উত্তর দিকের বাটীতে তিনি বাস করিতেন।

বোরোটার বাড়ী। (২১নং ম্যাঙ্গো লেন।)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের মনুমেণ্ট হইতে ধর্ম্মতলার দিকের দৃশ্য।
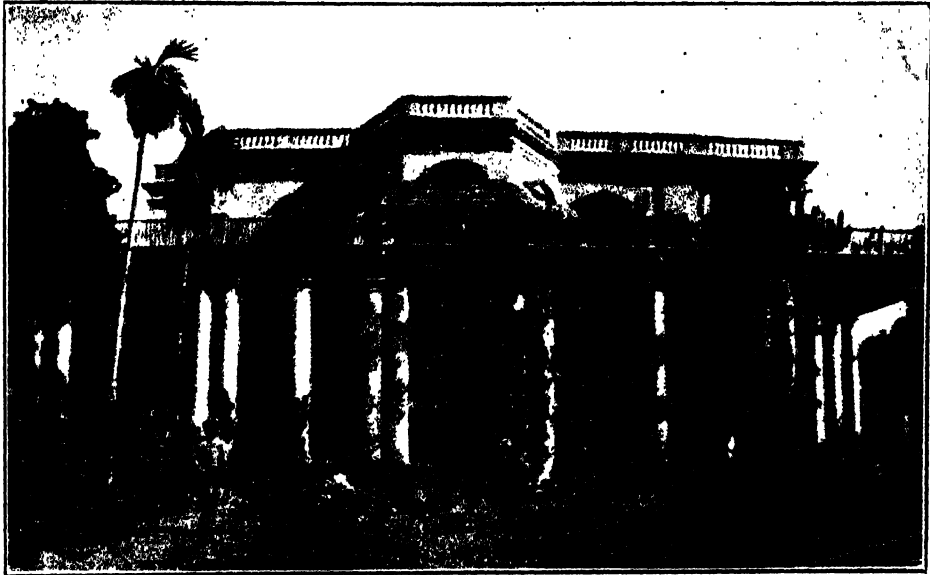
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসভবন নারিকেলডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা রোডে।

রামচন্দ্র ঘোষ—হুগলীর নিকটস্থ আকনাগ্রাম হইতে আসিয়া ইনি কুমারটুলীতে বাস করেন। ইনিই কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদিপুরুষ।

দৈবকীনন্দন ঘোষ—আড়পুলীর ঘোষ বংশের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পৌত্র রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ই কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর চোরবাগানের মোড়ে "সিদ্ধেশ্বরী" কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দির-গাত্রে

মাণিকচাঁদ যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ। (ডায়মণ্ড হারবার রোড)
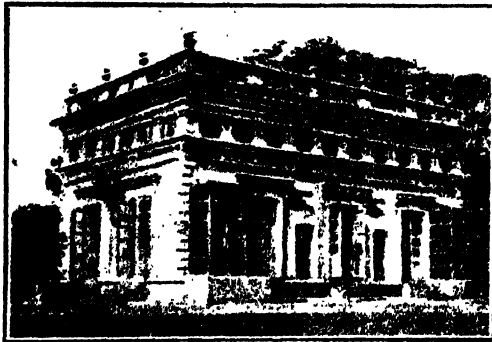
মনকি হাউস্—জু গার্ডেন।

প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে—"শঙ্কর হৃদয়-মাঝে কালী বিরাজে।"

—

পাদরী বেলাসী—বর্ত্তমান ওয়েলেসলি প্রেস্ ও ডালহাউসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত ইঁহার বাটীর সীমা বিস্তৃত ছিল। বড়লাটের মিলিটারি সেক্রেটারীর বাটী যে স্থানে আছে ঐ স্থানে তাঁহার বাটী ছিল।

—

সার্ম্মণ্ সাহেব—প্রিন্সেপ্ ঘাটের দক্ষিণ দিকে খিদিরপুরের নিকট সাহেবের বাটী ছিল।

—

হলওয়েল সাহেব—চার্চ্চলেন্ ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে একখানি এবং বাঁকশাল্ ষ্ট্রীটের মোড়ে যেখানে ছোট

ব্রহ্মবিজয় স্মৃতি—প্যাগোডা ইডেন্ গার্ডেন্।

আদালত আছে তথায় একখানি, তাঁহার এই দুইখানি বাটী ছিল। ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী অফিস যেখানে আছে, ঐ স্থানে তাঁহার আবাসবাটী ছিল। পরে ঐ স্থানেই পুরাতন টাঁকশাল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

—

পেরিঙ্গ গার্ডেন্—উহা বাগবাজারে ছিল। সিরাজ সর্ব্বপ্রথম এই স্থান আক্রমণ করেন।

—

বেগম জন্‌সন্—ইঁহার প্রকৃত নাম মিসেস্ ফ্রান্সিস্ জন্‌সন্। ইনি পুরাতন দুর্গের উত্তর দিকে তাঁহার বাটীতে বাস করিতেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সময় তিনি এসিয়ার মধ্যে ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন।

জন পামার্—সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জন পামার, লালবাজার পুলিশ অফিষ যেখানে আছে, তথায় বাস করিতেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৫০০০০০০ পাউণ্ড দেনার জন্য ইনি দেউলিয়া হন।

ডক্টর টেলার্—গার্ডেন রিচে বাগানবাড়ী ছিল।

কর্ণেল্ ওয়াটসন্—ওয়াট্‌গঞ্জে ইঁহার বাগানবাড়ী ছিল। ওয়াটসনগঞ্জ হইতে ওয়াটগঞ্জ নাম হইয়াছে।

—

লর্ড অকল্যাণ্ড্—বেল্‌গেছিয়ায় ইঁহার এক বিখ্যাত বাগানবাড়ী ছিল। উহা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খরিদ করেন এবং পরে পাইকপাড়ার রাজাদের বিক্রয় করেন।

—
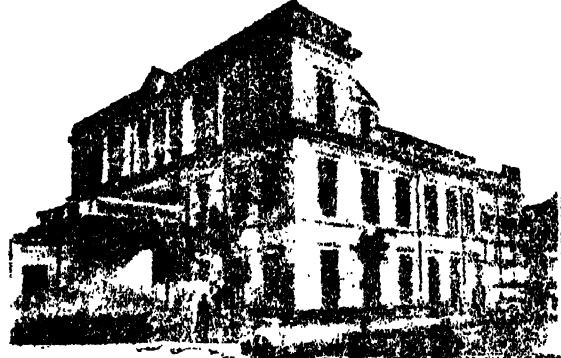
রাজা রামমোহন রায়ের ৮৫নং এমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাটী।

রাজা রামমোহন রায়ের ১১৩নং আপার সার্কুলার রোডের বাটী।

সেকালের ডাল্‌হউসি স্কয়ার।
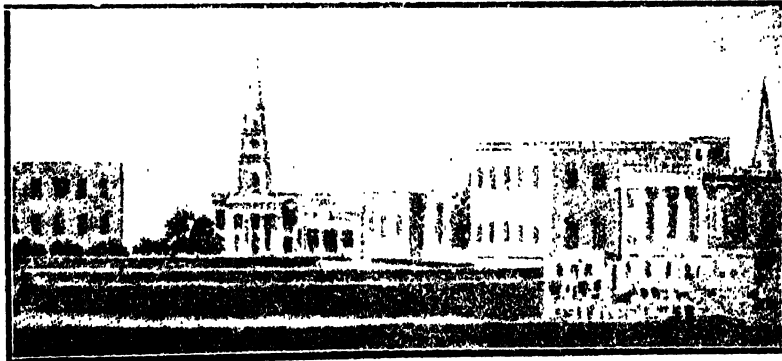
স্যার জেমস্ কল্‌ভিল্—ওল্ড্ পোষ্ট্ অফিষ ষ্ট্রীটে বাটী ছিল। পূর্ব্বে পোষ্ট অফিষও এই পথে ছিল।

মেয়র কোর্ট্—লালদীঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যেখানে এক্ষণে সেণ্ট এণ্ড্রুর গির্জ্জা আছে, তথায় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

—

সুপ্রীম কোর্ট—ওল্ড কোর্ট হাউস্ নামক বাটীতেই এই আদালত বসিত। ইহা একটী সুন্দর সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। তৎকালে ইহাতে টাউনহলের কাজও হইত।

১৭৩৭এর ঝড়ে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে অবস্থা বিশেষ খারাপ হইলে, গভর্ণমেণ্টের আদেশে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

—

মিসেস ফে - ইনি একজন ব্যারিষ্টারের পত্নী ১৭৮০

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ইডেন গার্ডেন।
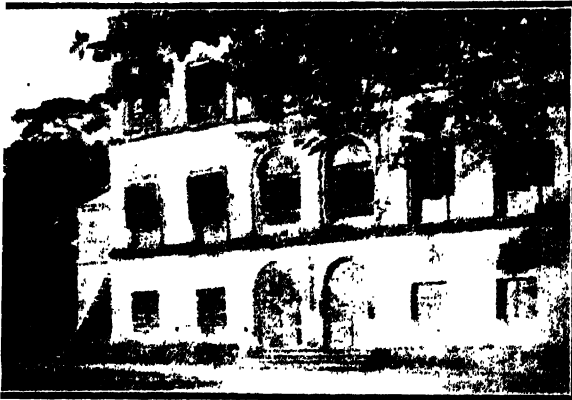
থ্যাকারের জন্মস্থান—ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট্।

খৃষ্টাব্দে এ দেশে আইসেন। তিনি তৎকালে বিলাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গকে অনেকগুলি পত্র লেখেন, উহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ। ওল্ড পোষ্ট অফিস্, যাহা হইতে পথের নাম হইয়াছে, ঐ বাটীতে তিনি বাস করিতেন।

জেনারেল্ এলেক্জেণ্ডার কিড্—ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাব যে বাটীতে ছিল, উহা কিড্ সাহেব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করিতেন।

—

সদর দেওয়ানি আদালত—বর্ত্তমান সদর ষ্ট্রীট্ যাহার পূর্ব্বে স্পিক্ রোড্ নাম ছিল তথায় অবস্থিত ছিল। মিঃ স্পিকের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট বাড়ীটি ভাড়া লইয়া আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাতন সদর দেওয়ানি আদালত ভবানীপুরের কাছে লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর ছিল।

—

চিফ জাষ্টিস্ হেনরি রসেল্—তিনি রাসল ষ্ট্রীটের প্রথম বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই রাস্তার ১২ নম্বর বাটীতে চিফজাষ্টিস্ স্যার বার্নিস্ পীকক্ বাস করিতেন। উহার পার্শ্বের বাটীতে জন্ নর্ম্মাণ্ সাহেব বাস করিতেন। ইঁহাকে এক মুসলমান হাইকোর্টে হত্যা করে।

—

হেনরী ভ্যান্সিটার্ট—ইনি ১৭৬০ হইতে ১৭৬৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন। ৭-১ নম্বর মিড্লটন রোতে ইঁহার উদ্যানভবন ছিল। তাঁহার পর সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্জাষ্টিশ স্যার এলাইজা ইম্পে এখানে বাস করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ হিবারও কয়েক মাস এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পার্ক ষ্ট্রীটেও তাঁহার একটী বাগানবাড়ী ছিল।

লর্ড ক্লাইব—বর্ত্তমান রয়েল্ এক্সচেঞ্জের স্থানে ইঁহার বাটী ছিল। কেহ কেহ বলেন গ্রেগাম কোম্পানীর পুরাতন অফিষ যেখানে ছিল সেই স্থানেই তাঁহার বাটী ছিল। তাঁহার দমদমায়ও একটী বাটী ছিল। ইহাই দমদম বুলেটের জন্মস্থান।

—

ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্—৭নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে যেখানে বার্ণ্ কোম্পানীর অফিষ ছিল তথায় তাঁহার সহরের বাসভবন

ছিল। এই ভবন তাঁহার পত্নী বায়লেস্ ইমহক্ দ্বারা নৃত্যগীতাদিতে সর্ব্বদা আনন্দ-মুখরিত থাকিত। এই বাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান লাটভবন যেখানে আছে সেখানেও একখানি ছোট বাড়ী ছিল। আলিপুরের "হেষ্টিংস্ হাউস্" নামক বাড়ীখানিও তাঁহার বাড়ী ছিল। নবাব মির মহম্মদ জাফর আলি খাঁ নবাব মিরকাশিম কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়া তিন বৎসর যখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন হেষ্টিংসের সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকে দান করেন। এই বাটীটি তাহার মধ্যে অন্যতম। ইহা বর্ত্তমান আলিপুর জজ আদালতের নিকট অবস্থিত। হেষ্টিংস্ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে লইয়া এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি এখানে দারুচিনি ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান বৃক্ষলতা রোপণ করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের চেষ্টায় "গেষ্ট হাউস্" রূপে ব্যবহারের জন্য খরিদ সূত্রে ইহা গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। সুখ-সাগরে হেষ্টিংসের আর একটি বাগানবাড়ী ছিল।

——

বারওয়েল্—হেষ্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য রিচার্ড বারওয়েল্ সেণ্ট্ ষ্টিফেন্ গির্জ্জার সান্নিধ্যে একটি প্রাসাদ তুল্য বাটীতে বাস করিতেন। এ বাটীটি এখনও দণ্ডায়মান আছে। খিদিরপুরের মিলিটারী অরফেন্ এসাইলামও পূর্ব্বে বারওয়েলের বাটী ছিল।

——

স্যার এলাইজা ইম্পে—চৌরঙ্গীতে ইঁহার বাড়ী ছিল। এই বাটীতে পরে নানেরা থাকিতেন। এই বাটী এবং সেণ্ট পলস্ স্কুলের বাড়ী চৌরঙ্গীর মধ্যে অতি প্রাচীন।

——

হাইকোর্ট হইতে সহরের দৃশ্য—৫০ বৎসর পূর্ব্বে

চৌরঙ্গী থিয়েটার।

ইডেন গার্ডেনের এক অংশ

ডেভিড হেয়ার—ইনি চার্চ্চলেন ও হেয়ারষ্ট্রীটের মোড়ের বাটীতে বাস করিতেন। ইহা সম্ভবতঃ বাঁকশাল ষ্ট্রীটের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

বিচারপতি লিমেষ্টার—ইনি ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের নিকট একটী বাটীতে বাস করিতেন। ইনি মহারাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমার অন্যতম বিচারক ছিলেন।

রেপটাইল্ হাউস্—জু গার্ডেন্।
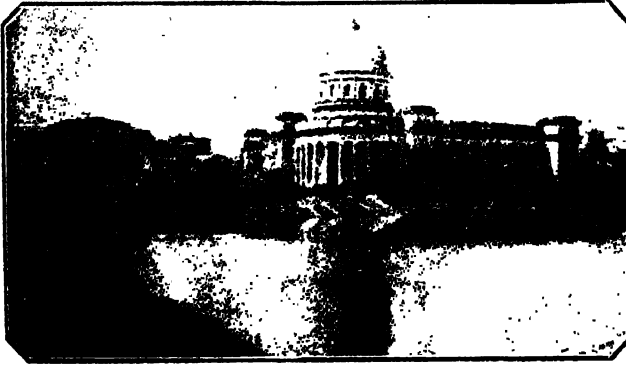
অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের জেনারেল পোষ্ট অফিস। তখন ঘড়ি ছিল না এবং দক্ষিণ দিকের নূতন বাটী নির্ম্মিত হয় নাই।

ক্লাইভের দমদমের বাটী।

স্যার আয়ার কুট্—বর্ত্তমান ট্রেজারি বিল্ডিং যেথানে আছে, পূর্ব্বে এই স্থানের একটি বাটীতে সেনাপতি স্যার আয়ার কুট্ বাস করিতেন।

মনসন্—জেনারেল ক্লেভারিং মিশন রোর যে বাটীতে বাস করিতেন, কাউন্সিলের সদস্য মনসন্ তাহার পরবর্ত্তী বাটীতে বাস করিতেন। এই বাটীতে পিগট্ চ্যাপম্যান্ কোম্পানীর অফিস ছিল।

স্যার উইলিয়ম জোন্স—ইনি গার্ডেন-রিচের একটী বাগানবাড়ীতে থাকিতেন। জজিয়তি করিতে তথা হইতে প্রত্যহ তিনি পদব্রজে সুপ্রীমকোর্টে আসিতেন। এই ভবনে বসিয়াই তিনি মনুসংহিতা, শকুন্তলা প্রভৃতির তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। ২ নম্বর এসপ্ল্যানেড যেখানে এখন হাইকোর্ট নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় নিউকোর্ট হাউসেও তিনি বাস করিতেন।

অমিয়ট্—কয়লাঘাটে শেঠেদের যে বাড়ী ছিল তাহাতে তিনি ভাড়াটিয়া রূপে বাস করিতেন।

এডওয়ার্ড আয়ার—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে যেখানে ফিন্‌লে মিউর কোম্পানীর অফিস ছিল, কৌন্সিলের সদস্য আয়ার সাহেব তথায় বাস করিতেন। তিনি অন্ধকূপ-হত্যা হইতে বাঁচিয়া যান।

কুক্‌সাহেব—ইনি কোম্পানীর সেক্রেটারী ছিলেন। পুরাতন চিনাবাজারের নিকট থিয়েটার ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা ছিল, তথায় তিনি বাস করিতেন।

জষ্টিস্ চেম্বার্—ইনি কাশীপুরে থাকিতেন। ভবানী-পুরেও তাঁহার একখানি বাগানবাটী ছিল।

বিসপ্ হিবার—ইনি ৫ নম্বর রসেল্ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তৎপূর্ব্বে ৩ নম্বর হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের বাটীতে ছিলেন। তথায় তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী ও পরিজনবর্গের স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় প্রথমোক্ত বাটীতে উঠিয়া যান।

স্যার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্—কথিত আছে, বর্ত্তমান বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্শের বাটী যেখানে আছে তথায় স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাড়ী ছিল। উহা পুরাতন প্লে-হাউসের পশ্চাতে ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ক্লাইভ যে বাটীতে ছিলেন, সেই বাটীতেই পরে তিনি বাস করিতেন। 'খিদিরপুর হাউস' নামক বিখ্যাত বাটীটিও তাঁহার ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের প্রত্যূষে ৫টার সময় এই বাটীর নিকটেই হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। উভয়ে ১৪ পদ মাত্র ব্যাবধানে থাকিয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়েন। তাহাতে ফ্রান্সিস্ আহত হন এবং তখন তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ টলি সাহেবের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। আলিপুরের পশুশালার পশ্চাতে দেবদারু বর্ম্মের সান্নিধ্যে যেস্থানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল, সে স্থান আজিও 'ডুয়েল্ এভেনিউ' নামে পরিচিত।
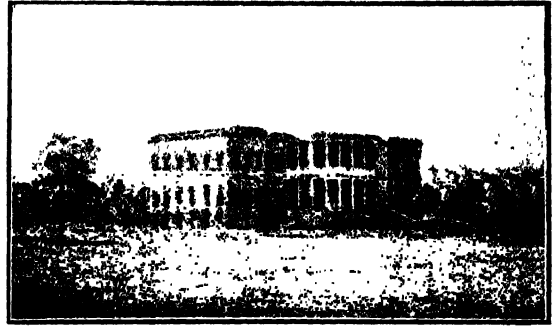
ক্লেভারিং—মিশন রোর ৮ নম্বরের বাটীতে বাস করিতেন। তিনি তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওয়াটারলু ষ্ট্রীটের কোণে যে বাড়ীতে মেসার্স উইনসর কোম্পানী ছিল, তথায়ও তিনি বাস করিয়াছিলেন।

পোর্ত্তুগীজ ব্যবসাদার জোসেপ্ বোর‍্যাটো (Joseph Baretto) বর্ত্তমান ম্যাংগো লেনের এক বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। বোরেটো ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা আছে। ২৫ নম্বর ম্যাংগো লেনের বাটীতে তাঁহার একটি ব্যাঙ্ক ছিল।

লর্ড মেকলে বেঙ্গল ক্লাব যে স্থানে আছে (৩৩ নম্বর চৌরঙ্গী) এই স্থানে লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) বাস করিতেন।

হেষ্টিংস্ হাউস।

খিদিরপুর হাউস—১৭৯৪

মিসেস ফের বাটী।

অরফ্যান এসাইলাম—বর্ত্তমানে হাওড়ার কাছারি যে বাটীতে আছে, তথায় অরফ্যান্ এসাইলাম ছিল।
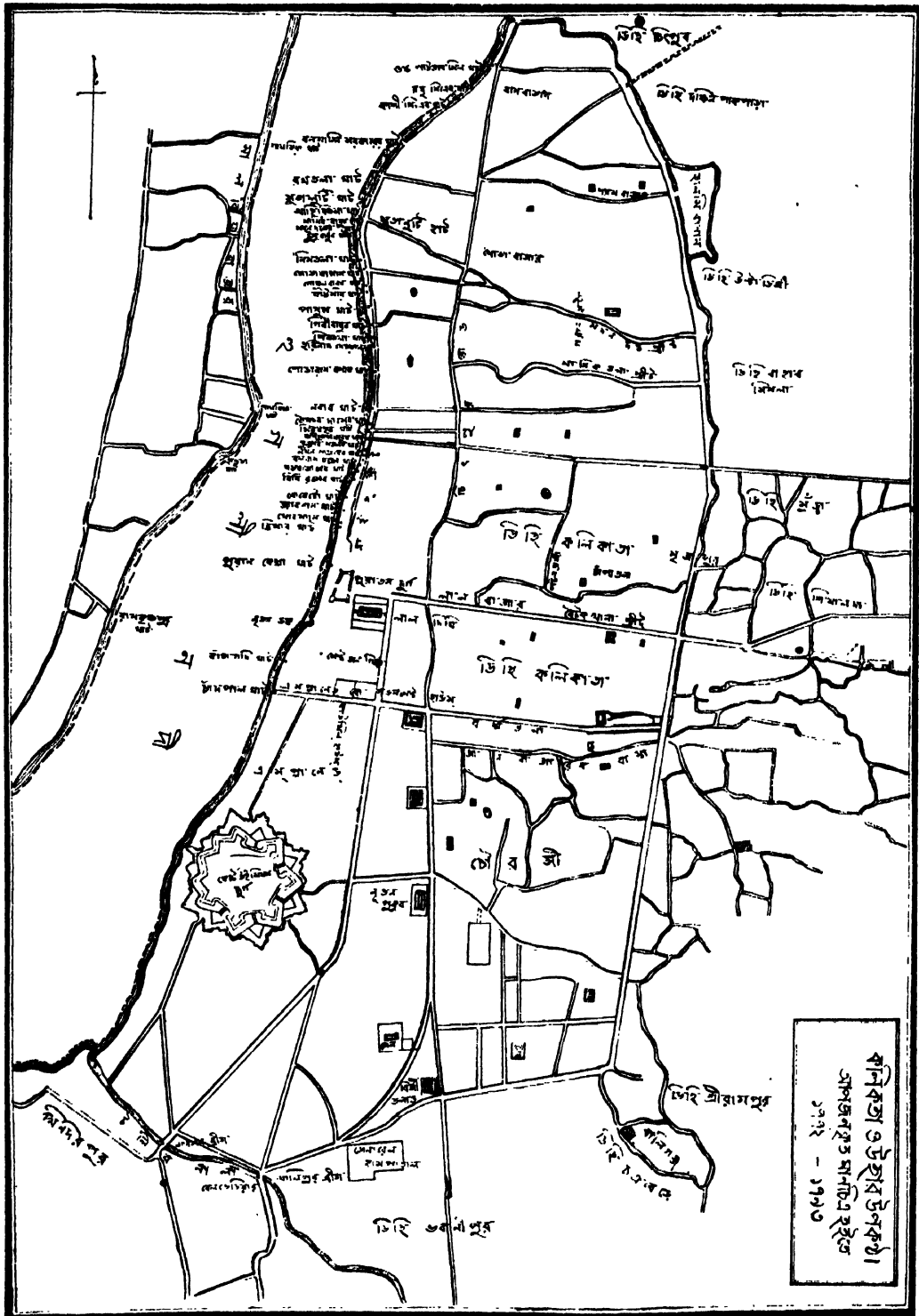
ক্লার্ক (Longueville Loftus Clarke) সাহেব সুপ্রীম্‌কোর্টের ঠিক পশ্চিমে এসপ্ল্যানেডের একটী বাটীতে বাস করিতেন। তিনি সুপ্রীম্‌কোর্টের এড্‌ভোকেট্‌ ছিলেন।

জন পামার—প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার জন পামারের (John Palmer) লালবাজারে বাড়ী ছিল।

পুরাতন দুর্গ—বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের অধিকৃত সীমার মধ্যে প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ম্‌ দুর্গ স্থাপিত ছিল।

কোম্পানীর সোরার গুদাম—যে স্থানে বার্ড কোম্পানীর অফিস ছিল ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ছিল, সোরার গুদাম তাহার নিকটেই ছিল।

কাউন্সিল্‌ হাউস্‌—বর্ত্তমান কাউন্সিল হাউস্‌ ষ্ট্রীটে উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর এই বাড়ীটী ক্রয় করেন।

ট্রেজারি বিল্ডিং—প্রথম ট্রেজারি বিল্ডিং কাউন্সিল্‌ হাউসে ছিল।

পুরাতন টাঁকশাল—আহমটি কোম্পানী ও ষ্টেশনারি অফিষ যেখানে আছে, তথায় পুরাতন টাঁকশাল ছিল।

মেটকাফ হল্‌—কোম্পানীর প্রধান দালাল রামকিষণ শেঠের বাটী ছিল। পিটার অমিয়ট্‌ (Peter Amyatt) যিনি ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নিকট মিরকাশিমের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি এই বাটীতে ভাড়াটিয়া ছিলেন।

চার্লস্‌ গ্রাণ্ট—গ্রাণ্ট্‌ লেনে বাস করিতেন।

মারকাস্‌ স্কোয়ার্‌ পূর্ব্বে বসাক দীঘি কলাবাগান নামে বসাকদের বাগান ছিল।

মাডাম্‌ গ্রাণ্ড—মাডাম গ্রাণ্ড্‌ তাঁহার নব-বিবাহিত স্বামীর সহিত বর্ত্তমান আলিপুর রোডে রেড্‌গার্ডেন হাউসে বাস করিতেন। এই স্থানেই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যখন গ্রাণ্ড সাহেব বারওয়েলের সঙ্গে সান্ধ্য ভোজন করিতে গিয়াছিলেন তখন ফ্রান্সিস্‌ (Sir Philip Francis) তাঁহার ঘরে ধৃত হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম্‌ থ্যাকার—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থ্যাকারে ৩৯ নং ফ্রি-স্কুল্‌ ষ্ট্রীটের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রিচ্‌মণ্ড থ্যাকারে কোম্পানীর আমলে বোর্ড-অব্‌ রেবেনিউর সেক্রেটারি ও চব্বিশ-পরগণার কালেক্টর ছিলেন। তিনি আলিপুরের একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। স্যার ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিসও সেই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। আলিপুর জেলে যাইবার পথটি এখনও থ্যাকারে রোড বলিয়া পরিচিত।

উইলিয়ম্‌ রিকেটস্‌—ডভটন্‌ কলেজ প্রতিষ্ঠাকারী রিকেটস্‌ সাহেব বর্ত্তমান ৯ নম্বর রিপণ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। ভারতের সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে বিলাতের সিলেক্ট-কমিটিতে তিনি ভারতবাসীর হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হাউস্‌—বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের যে বাটীতে লোয়েলীন কোম্পানীর কার্য্যালয় তথায় অতি পুরাকালে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হাউস স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও এই বাড়ীতে থ্রোন্‌রুম্‌ ও কৌন্সিল চেম্বাররুম্‌ রূপে ব্যবহৃত ঘরগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চার্লস্‌ ওয়েষ্টন্‌—সেকালের বিখ্যাত দাতা ওয়েষ্টন্‌ সাহেব টেরিটী বাজারের একটী বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিচারপতি হাইড্‌—বর্ত্তমানে টাউনহল যে স্থানে আছে তথায় হাইড্‌ সাহেবের বাসভবন ছিল। তিনি এই বাটীর জন্য মাসিক বার শত টাকা ভাড়া দিতেন।

ডিরোজিও—বর্ত্তমানের ১৫৫ নম্বর সার্কুলার রোডের বাটীতে খ্যাতনামা ডিরোজীও সাহেব বাস করিতেন। *

* এই পরিচ্ছেদের কোন কোন বিষয়ে অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত কোন কোনটির পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে, তাহা অনিবার্য্য।

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী, রত্নপ্রভা

(৩১)

একটু পরে ব্রহ্মচারী কাপড় বদলাইয়া নিজের কম্বলখানি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিদিমা তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে সরিয়া বসিয়া বলিলেন "এসো ভাই, ভেতরে এসে বসো।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কিন্তু মা যখন আসবেন—"

দিদিমা বলিলেন "এলে তখন দেখ্‌তে পাব। এখন বসো ত।"

ব্রহ্মচারী চৌকাঠ পার হইয়া কম্বল পাতিয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন। হাসিমুখে বলিলেন "দিদিমা, বিশ্বেশ্বরের রাজত্ব থেকে এলেন, সেখানকার খবরাখবর একটু বলুন। আচ্ছা, বিশ্বেশ্বরের বাঁদরগুলো সব আছে কেমন? তারা আপনার সঙ্গে কিছু খুন্‌সুটি করে নাই ত?"

দিদিমা একটু হাসিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে করে না, তবে আমার নাৎনীর সঙ্গে করে বটে!"

"এঃ, ছি, ছি, ছি!—" বলিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন। বলিলেন "নাঃ, জামাইবাবু সাজা যত সহজ, জামাইবাবুর মত বোল্‌ চাল্‌ ধরা তত সহজ নয়। কুটো বুদ্ধিতে দেখছি দিদিমা আমার ওপর যান!"

দিদিমা হাসিমুখে বলিলেন "তা তো যাই। এখন আমার কথা শোন দেখি,—গুরু হয়েছে, সাধন-ভজন করছ, সবই তো বেশ ভাল। এবার দিনকতক সংসারী হও, আমরা দেখি। তার পর আমরা কাশীলাভ করলে —"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "উহুঁ, এই বর্ষায় কাশীলাভ নয়, শুধু সর্দ্দিলাভই ভাল। দাঁড়ান, পূজোর বারেণ্ডায় লণ্ঠনটা রেখে আসি, নইলে মা অন্ধকারে আসতে পারবেন না হয় ত।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া গিয়া নিজের ঘর হইতে লণ্ঠন লইয়া পূজার বারেণ্ডায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পুনশ্চ নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া বলিলেন "মা কতক্ষণ এসেছেন? তুমি উঠে আস্‌বার্‌ পর না কি?"

বলিতে বলিতে তিনি ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া কায করিতে করিতে নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন "হাঁ।"

দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া মার জীবনের গভীর বিষাদবহ দুঃখ-অশান্তির কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। একমাত্র কন্যা ও জামাতার সংসার-বৈরাগ্যই যে তাঁর মর্ম্মান্তিক ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, জামাতার মতি-পরিবর্ত্তনের জন্য বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে তিনি কি আকুল প্রার্থনাই যে অহোরাত্র জানাইতেছেন, সে সব কথার বিস্তারিত ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী বিমর্ষ-গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নির্ব্বিকার মুখে মালা গাঁথা শেষ করিয়া সূতার দুই মুখ একত্র করিয়া যথারীতি গ্রন্থি বন্ধন করিলেন। তার পর একটু হাসিয়া বলিলেন "মার ছেলেমানুষির ইতিহাস ওই পর্য্যন্তই থাক দিদিমা, কাশীর ভাল ভাল সাধুদের গল্প একটু বলুন দেখি, শুনি।"

ব্রহ্মচারী বিষাদ-ভরা মুখে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "কি নিষ্ঠুর দেখ্‌ছেন দিদিমা? যাকে বলে নির্ম্মম পাষাণ,—তাই হয়ে পড়েছেন। মার কথা শুনে, আমি পরের ছেলে,—আমার কষ্ট হচ্ছে। উনি মার নিজের মেয়ে—ওঁর গ্রাহ্যই নাই। সাধে কি আর আমায় সংসার ছাড়্‌তে হয়েছে দিদিমা!—"

দিদিমা আশান্বিত মুখে আগ্রহের সহিত বলিলেন "ওরই দোষে, নয় প্রসাদ? আমরাও তাই বলাবলি করি,—যত দোষ এই মেয়েটার। ও ইচ্ছা করলে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন

"এই মুহূর্ত্তে আমায় সংসারী কর্‌তে পারেন। কিন্তু সে চিন্তা ত নাই—"

ব্রহ্মচারিণী এবার মুখ তুলিয়া ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন; গম্ভীর হইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "যাদের সংসারী হবার যোগ্যতা নেই, তাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা ছেড়ে অসংসারী থাকাই ভাল।"

ব্রহ্মচারী কৌতুকভরে বলিলেন "তপস্বিনী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কিরও বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লোকের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পীড়াপীড়িতে উত্যক্ত হয়ে, তিনিও রাগের মাথায় সে সৎকার্য্যটা করে ফেলেন। তাও একবার নয়,—দু'—দু'বার!—"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "রাগের মাথায় যে সৎকার্য্যেই তিনি সিদ্ধিলাভ করে থাকুন—সংসার ধর্ম্মে অনুরাগটায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন নি। দু' দফাতেই—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই যবনিকা পতন হয়ে গিয়েছিল!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা যাক্। কিন্তু 'সর্পে-সর্পে ন মাণিক্যং,' সংসারে সবাই ত ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি নয়। অন্ততঃ তুমি ত নও-ই। লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা,—নিদেন মার দুঃখের দোহাই দিয়েও রাগের মাথায়—" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসি-মুখে চুপ করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে বলিলেন "কি? সংসার ধর্ম্মে অনুরাগ?"

মাথা চুলকাইয়া, ঢোঁক গিলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন "অনুরাগে না পার, ঘোরতর বিরাগের সঙ্গেই নীরস কঠোর কর্ত্তব্য পালন করো। তার পর থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে। কাল থেকেই গয়না-কাপড়ের আব্‌দার নিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দাও! দেখি পুরোদস্তর সংসারী হতে পারি কি না?"

মুখে হাত আড়াল দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—"তার পর?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তার পর ভালবাসা-টাসার বায়না!"

"তার পর?—"

"তার পর দু' একটা ছেলে-মেয়ে হয়ে রোগে ভুগে-ভুগে মরুক,—তখন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে অখণ্ড মনোযোগে শোক-চর্চ্চা! কি বলুন দিদিমা, এই সবই ত সংসার-ধর্ম্ম?"

বলিয়া ব্রহ্মচারী দিদিমার মুখের দিকে চাহিলেন। দিদিমা হাঁ, না কোন উত্তর না দিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী প্রশান্ত মুখে সদ্য গাঁথা মালার গ্রন্থিগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন "শুধু ওই সব নয়। একেই ত ক্রোধ-চর্চ্চায় উৎসাহের সীমা নাই; তার ওপর লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য-চর্চ্চার জন্য বিস্তর উপাদান চাই। সম্পন্ন প্রতিবেশীদের হিংসা কর্‌বার জন্যে সময় চাই। বিষয়ের ভাগীদারদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করবার জন্যে প্যাঁচালো ন্যায়-বুদ্ধি চাই। নিরীহকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত কর্‌বার জন্যে আইন-সঙ্গত ধর্ম্মবুদ্ধি চাই। যে আমার অন্যায়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ কর্‌বে, তার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে নির্জ্জলা মিথ্যাচার-কৌশলে অগাধ পাণ্ডিত্য চাই! সংসার কি অম্নি করলেই হোল? ওর মার-প্যাঁচ আগে মুখস্থ করা চাই!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "বাপ! কি ভয়ানক সুসংবাদ! আমার পায়ের রক্ত চন্‌চনিয়ে মাথায় উঠ্‌ছে যে!"

মাথা হইতে একটা চুলের কাঁটা খুলিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিত-মুখে বলিলেন "শুধু সংবাদেই এই? কার্য্য-ক্ষেত্রে আরও কত কি হবে।"

তার পর পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তিনি কাঁটা দিয়া কাণ চুলকাইতে চুলকাইতে আরামের আবেশে চক্ষু বুজিলেন।

দিদিমার এবার আর সন্দেহ রহিল না যে, এই অভিনব সংসার-ধর্ম্ম-পালন ফর্দ্দটার সঙ্গে ইহাঁদের আন্তরিক সত্যের লেশমাত্র সম্বন্ধও নাই! নিজের চেষ্টার নিষ্ফলতায় কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া, একটু রাগ জানাইয়া তিনি বলিলেন "বেশ গাওনা হচ্ছে। দুজনে মিলে একটা 'যাত্রারা' দল খুলে ফেল!"

কাণ চুলকাইতে চুলকাইতে একটা চোখ আধখানা খুলিয়া, ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আপনি তার মাঝে বিন্দে-দূতী সাজবেন, কেমন?"

উচ্ছ্বসিত হাসি সামলাইবার জন্য ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইলেন। হাসির ধমকে থামিয়া থামিয়া শশব্যস্তে বলিলেন "আরে চুপ্ চুপ্! দিদিমা হচ্ছেন,—মার পিসিমা! তাঁকে বিন্দে-দূতী সাজাচ্ছ? মা শুন্‌তে পেলে তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বেন যে!"

ব্রহ্মচারিণী নিরুদ্বিগ্ন মুখে পুনশ্চ চোখ বুজিয়া কাণ চুলকাইতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

দিদিমা হাসিমুখে সস্নেহ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "ঠিক সেই ছেলেবেলার স্বভাবটি আছে! বাড়ীশুদ্ধ লোক ওকে রাগাবার জন্যে লাখ্ কথা কইছে, ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে ভেবে ভেবে, গম্ভীর মুখে টুক্ করে এমন এক জবাব দিয়ে বস্‌ত, যে সবাই অবাক্। ছোট-বেলায় ওর ভারি সুন্দর বুদ্ধি ছিল। আহা, ওই বুদ্ধির জন্যে ওর বাপ ওকে কি ভালই বাস্‌তেন।"

বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু নীরব থাকিয়া দিদিমা পুনশ্চ বলিলেন "কিন্তু এত বুদ্ধি থাক্‌তেও তোমাকে যে সংসারে ফিরিয়া আন্‌ছে না, এতেই আমাদের বড় দুঃখ হয়।—ওর রকম-সকম দেখে আমার এমন রাগ ধরছে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের গুরুকে নমস্কার করে ওর আসন, মালা, সব কেড়ে নিই।"

ব্রহ্মচারিণী কাণ হইতে কাঁটা খুলিয়া পুনরায় চুলে গুঁজিলেন। গম্ভীর মুখে বলিলেন "নাঃ! এই 'বিষহরির আজ্ঞে' সাপের মন্ত্র, কাঁদুনী গান, এ আর থাম্‌বে না। দেখি যার হোল কি না। একটু সরো ত ব্রহ্মচারি—"

ব্রহ্মচারিণী বাহিরে যাইবার জন্য উঠিলেন।

দিদিমা সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ও, তোমায় কি বল্লে প্রসাদ? ব্রহ্মচারী? নয়?"

ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে বিদ্রূপ-দৃষ্টি হানিয়া ব্রহ্মচারী সলজ্জ হাস্যে বলিলেন "কি আর বল্‌ব দিদিমা!—একটা শেয়ালকে যদি দিনরাত বলা হয়,—'তুই বাঘ, তুই বাঘ, তুই বাঘ!' তাহলে শেয়ালটা মনে করে সত্যিই আমি বাঘ হয়ে গেছি! আমারও সেই দুর্দ্দশা দাঁড়িয়েছে! স্বামী বলে মনে করবার যদি কেউ থাকতেন্ তবে ত আমার মনে পড়্‌ত যে—হাঁ আমারও স্ত্রী বলে কেউ একজন আছেন।"

দিদিমা অত্যন্ত রাগ জানাইয়া বলিলেন "তা তো বটেই! পুরুষ মানুষ!"

ব্রহ্মচারী সাগ্রহে বলিলেন "বলুন ত দিদিমা! এর মধ্যে কোথায় সবিকল্প সমাধি, কোথায় নির্ব্বিকল্প সমাধি, এই সব নিয়ে যদি মাতাল হয়ে পড়েন, তবে আমার যে একটা কথা বল্‌বারও লোক থাকে না। কাযেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণকে সাফ গাঁজার ধোঁয়া বলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয়!"

অকস্মাৎ যোড়হাত করিয়া ব্রহ্মচারিণী তীব্র তিরস্কার-পূর্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী থতমত খাইয়া থামিলেন এবং অপ্রতিভভাবে নিজেও যোড়হাত করিয়া ব্রহ্মচারিণীর দিকে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে চাহিলেন। দু'জনের নয়নে নয়নে নীরব সঙ্কেতে কি যেন একটা কথা হইয়া গেল। বাহিরের লোক দিদিমা, এই গুপ্ত রহস্যের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, হতভম্ব হইয়া নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন "শাপ দিয়েছ যখন, তখন তা ফল্‌বেই! তুমি আর শত্রুতা কোর না। সরো, পথ দাও।"

ব্রহ্মচারী সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া, বিনা-বাক্যে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণী বাহির হইলেন।

দিদিমা আত্মসম্বরণ করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "বাবাঃ! পথ ছেড়ে দেবার জন্যে প্রসাদকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হোল! কেন পাশ কাটিয়ে কি যাওয়া হোত না? যদি ছোঁয়াই যেত, তাতে কি জাত যেত?"

বাহির হইতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সন্ন্যাসীদের জাতই নেই, তা যাবে কি?"

দিদিমা বলিলেন "তবে এত ভয় কাকে?"

"মানুষকে নয়, ভয় সাধন-পথের বিঘ্নকে।"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মচারী দুয়ারের সামনে অন্ধকার বারেণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া দিদিমা ধীরে ডাকিলেন "প্রসাদ—"

বাহির হইতে ব্রহ্মচারী অন্যমনস্কভাবে সাড়া দিলেন "আজ্ঞে।"

"এসো, ঘরে বসো।"

ব্রহ্মচারী নীরবে আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিলেন। অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিদিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "কি ভাবছ প্রসাদ?"

ব্রহ্মচারী ফিরিয়া চাহিলেন; ম্লান-হাস্তে বলিলেন "শুনেছি পাগ্‌লামির ভান কর্‌তে কর্‌তে লোকে সত্যিই পাগল হয়ে যায়। তাই ভাবছি—বাঁদরামির ভান কর্‌তে কর্‌তে সত্যিই বাঁদর হচ্ছি না ত? না দিদিমা, অনেক মূর্খতা করেছি, আর নয়। চলুন, আমার এবার ঘরে।—একটু জ্ঞানযোগ,—না ভক্তিযোগই আপনার ভাল লাগ্‌বে বোধ হয়, কি বলুন? তাই চর্চ্চা করা যাক।"

দিদিমা ভক্তিযোগের জন্য কিছু মাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না; কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "নীলিমা তোমায় কি ইসারা করলে বল ত? হঠাৎ তুমি এমন দমে গেলে কেন?"

মাথা- হেঁট করিয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন "অনধিকার-চর্চ্চা অপরাধের জন্যে। রসনার অসংযমে মানুষকে অনেক দুঃখই পেতে হয়। আমি বড় অপরাধী!"

নাৎজামাইয়ের বিমর্ষতা মোচনের জন্য দিদিমা প্রবল তাচ্ছিল্যের-স্বরে বলিলেন "ওঃ। ভারি ত মানুষ, ওর শাসনকে আবার গেরাজ্যি করে!"

ব্রহ্মচারী সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। বাহিরের দিকে কাণ পাতিয়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন "মার আহ্নিক হয়ে গেছে, কথার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওঁকে প্রণাম করে আসি।"

উঠিয়া গিয়া পূজার বারেণ্ডায় ঢুকিতে উদ্যত হইয়া তিনি থামিলেন। মা ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। সরু বারেণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া হাতে মাথা রাখিয়া আড় হইয়া শুইয়া আছেন, কন্যা পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে।

নিজের আগমন জ্ঞাপনের জন্য ব্রহ্মচারী বাহির হইতে ডাকিলেন "মা—"

"এসো বাবা" বলিয়া মা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে মাথায় কাপড় টানিয়া মাথা হেঁট করিলেন। পরিহাসের পীড়নে দায়ে ঠেকিয়া, দিদিমা ও ঠাকুর্দ্দার সামনে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু মার সামনে সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "আপনার আহ্নিক পূজো হয়ে গেছে? নতুন যায়গায় এসে কাযের কিছু অসুবিধা হয় নি ত?"

মা বলিলেন "না, তোমার বাড়ী বেশ নিরিবিলি। বেশ কায হয়েছে।"

নম্রভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা এখানে শুয়েছেন কেন মা? যায়গা বড় সঙ্কীর্ণ যে। ওখানে চলুন। আমি আপনাকে প্রণাম কর্‌তে এসেছি।"

আপত্তির সুরে মা বলিলেন "আমি এম্নিই আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—"

ব্যগ্র অনুনয়ের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন "না মা, আমি পায়ের ধুলো নেব যে।"

বলিয়া কিসের অপেক্ষায় যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ মাতা বুঝিলেন না, কিন্তু কন্যা বুঝিলেন। ব্রহ্মচারিণী বিনাবাক্যে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া পূজার ঘরের চৌকাঠ ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যাপারটা মার দৃষ্টি এড়াইল না। কন্যা-জামাতার মধ্যে স্পর্শদোষ বিচারের আড়ম্বরটা যে কত বড় প্রকাণ্ড হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিলেন। অন্তরে অন্তরে আহত হইয়া তিনি অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জামাতা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইতেই তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; সহসা তাঁর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্ত-ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিলেন "বাবা—"

মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া ব্রহ্মচারী অত্যন্ত সহজভাবে বলিলেন "কেন মা?"

মা ব্যথিত স্বরে বলিলেন "বাপ-মার একমাত্র ছেলে তুমি! বংশলোপ কোরো না বাবা,—এবার সংসারী হও।—"

মাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তার পর বিষণ্ণমুখে শুষ্ক স্বরে বলিলেন "অনিচ্ছা নেই মা। কিন্তু মনে হয়—মনে হয় ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবার সাধ্য ত আমাদের—আমার নাই।"

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের সহিত মা বলিলেন "কেন এমন সাধন নিয়েছিলে বাবা?"

এবার ব্রহ্মচারী হাসিলেন। শান্তস্বরে বলিলেন "নিজের ইচ্ছেয় কি কেউ এ সাধন নিতে পারে মা? একটা অদৃশ্য

ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, আমাকে এ পথে আসতে হয়েছে।"

তার পর আর একটু হাসিয়া সহজ ভাবে বলিলেন "আর তাই যদি কর্ম্মে থাকে,—আবার ফিরব সংসারে। কে বলতে পারে, এখনো কত কর্ম্মভোগ বাকী আছে। কিন্তু আপনি চোখের জল ফেলবেন না মা, আপনাদের চোখের জলকে আমি বড় ভয় করি।"

মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিলেন "কেন যে চোখের জল ফেলছি তা তো জানো না বাবা। আশীর্ব্বাদ করি হোক একটি মেয়ে, আর এম্নি একটি জামাই।—তার পর নিজেদের যখন চোখে জল পড়বে, তখন বুঝতে পারবে,—কত দুঃখ, কত জ্বালা!"

এই অভিশাপের উত্তরে জামাতা শুধু সলজ্জ স্মিত মুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। মাতার পিছন হইতে নিঃশব্দ পদে সরিয়া কন্যা পূজাগৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁর তিরোধান মাতা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু জামাতা জানিতে পারিলেন। নতমুখে নিঃশব্দে তিনি আবার একটু হাসিলেন।

উত্তর প্রতীক্ষায় ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মাতা মৃদু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন "আর পোড়া মেয়েও আমার বরাতে হয়েছে তেম্নি! না মানুষ, না জন্তু! কি যে ওর মতি-গতি, কিছু বুঝতে পারি না।"

ইহার উত্তরেও জামাতা নিঃশব্দে হাসিলেন। মা আবার কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন,—এমন সময় বাহির হইতে ঠাকুর্দ্দার ভগিনী ও পত্নী ডাক দিলেন "কই গো আমাদের মেয়ে কই? বেন্-ঠাকরুণ কোথা? রাত হয়েছে, এবার চলুন।"

(৩২)

খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প-গুজব করিয়া মা ও দিদিমা যখন ঠাকুর্দ্দার বাড়ী হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী ইঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া বই পড়িতেছিলেন। ডাক শুনিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার চাকর ও পুত্র আসিয়াছিল, ইঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা বাহির হইতে ফিরিয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া সকলে আসিয়া রোয়াকে উঠিলেন। রোয়াকের ধারে জলের বালতি ও ঘটি ছিল। পা ধুইতে ধুইতে অন্যান্য কথার পর দিদিমা বলিলেন "তোমাদের খাওয়া হয়েছে প্রসাদ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নীলিমা কই?"

ব্রহ্মচারিণীর শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে বলিলেন—"ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

তার পর নিজের ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ বলিলেন "আপনারা আর রাত করবেন না, এবার শুয়ে পড়ুন দিদিমা, বারোটা বেজে গেছে, আমি শুতে চললাম।"

বলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী কখনও দুয়ারে খিল দিতেন না, ইহা সকলেই জানিতেন। দিদিমায়েদের শয়নের স্থান ব্রহ্মচারিণীর ঘরে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

দিদিমা ও মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলেন। নিম্নস্বরে কি দু-একটা কথাবার্ত্তাও হইল। দিদিমা পা ধুইয়া গুটি-গুটি চরণে আসিয়া ব্রহ্মচারীর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। চুপি চুপি ডাকিলেন "প্রসাদ—"

ব্রহ্মচারী প্রদীপ নিবাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। ডাক শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ত্রস্তে বলিলেন "আজ্ঞে?"

অত্যন্ত মিনতির সুরে দিদিমা বলিলেন, "একটা কথা আছে ভাই।"

পুনশ্চ প্রদীপ জ্বালিয়া গায়ের চাদরটা টানিয়া গায়ে জড়াইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "ভেতরে আসুন।"

দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দিদিমা পরম সৌজন্যের সহিত বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আহা, তুমি শুয়ে পড়েছিলে? আবার জ্বালাতন করতে এলুম ভাই, রাগ কোর না।"

তার পর মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিলেন "তোমার শাশুড়ী দুঃখ করছেন ভাই। লক্ষ্মী মাণিক আমার, আজকের মত একটি কথা রাখো।"

"কি বলুন।" ব্রহ্মচারী উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অতিশয় মিনতি-ভরা সঙ্কোচের সহিত দিদিমা বলিলেন

"রাগ কোর না। নীলিমাকে,—এই আজকের মত এ ঘরে দিয়ে যাই। কি বল ?—"

ব্রহ্মচারীর মুখ গম্ভীর হইল। নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন "এইগুলো অন্যায় ছেলেমানুষি নয় দিদিমা ? আমরা কি ছেলেখেলা কর্‌ছি ? না,—মান-অভিমানের পালা চল্‌ছে, তাই মিটমাট্ কর্‌তে এসেছেন ?"

দিদিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না না, সে সব ত কিছু নয়, তা জানি। কিন্তু ছাখো ভাই, গুরুজনদের মনে কষ্ট দিলে, তাতেও কিছু ধর্ম্ম হয় না। আর লোকে এমনও একটা কথা বলে যে, এক ঠাঁই মেয়ে-জামাইকে দেখ্‌লে মায়ের হরগৌরী দর্শনের পুণ্যফল হয়—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন "তাই না কি ? তা সে পুণ্যফল ত ঘরে ঘরে নিত্যই ফল্‌ছে, আপনারা কে-কত পুণ্য অর্জ্জন কর্‌বেন করুন-না। কিন্তু না দিদিমা, আপনাদের লোকাচার-শাস্ত্রের ও-সব অনুশাসন আমার ওপর চালাবেন না। মাকে বুঝিয়ে বলুন।"

নিরুপায় ব্যাকুলতার আতিশয্যে অধীর হইয়া দিদিমা বলিলেন "দোহাই প্রসাদ, আমার মাথার দিব্য,—আজকের মত কথা শোনো। 'না' বোল না।"

জিভ্ কাটিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "আঃ, ছি ছি, দিদিমা। কি যা-তা কথা বলেন! কিন্তু 'না' বল্‌তে না পার্‌লেও আমি 'হাঁ' বল্‌তে পার্‌ব না। ব্রত আমার একার নয়। এর দায়িত্ব কতখানি তাও তিনি জানেন। আর তিনি—"

কি বলিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী থামিলেন। চিন্তিত মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, নিকটস্থ শেলফের উপর হইতে একখানা বই পাড়িয়া লইলেন। প্রদীপের কাছে হেঁট হইয়া তার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তাঁর ইচ্ছা হয়, এ ঘরে আস্‌তে পারেন। আপনাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে আমি এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি, ঘরে স্থানাভাব হবে না।"

পাছে ব্রহ্মচারী আবার বাঁকিয়া বসেন সেই ভয়ে দিদিমা আর বেশী কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ব্রহ্মচারীর ভদ্রতা ও নম্রতার জন্য সাধুবাদ কীর্ত্তন করিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়ারের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে ডাকিলেন "ব্রহ্মচারি—"

বই পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চোখ রাখিয়া বলিলেন "হুঁ। এস।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিলেন। অপক্ক নিদ্রার জ্বালাভরা আরক্ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "ব্যাপার কি ? কি বুঝিয়েছ এঁদের, বল ত ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী ম্লান হাসি হাসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন "ছাখো, আজ সমস্ত দিনটা আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে, 'হে ভগবান, একটা দিনের জন্যে এঁদের সন্তুষ্ট করবার ধৈর্য্য আমায় দাও।' ধৈর্য্য পেয়েছি বটে, কিন্তু পরীক্ষা এবার বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। মার যে এতদিনের পর হরগৌরী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌বে, এমন আশঙ্কা ত আমার ছিল না।"

বলিয়া সংক্ষেপেই দিদিমার মার্ফৎ শ্রুত মাতার আবেদন-কাহিনীর বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মচারিণী নিকটস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন। দুহাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "আমাকেও মার চোখের জলের তাড়া খেয়ে উঠে আস্‌তে হোল। ক'দিন থেকে ভাল ঘুম হয় নি, আজ বর্ষা-বাদলে মনে ক'রেছিলুম ঠাণ্ডায় স্বস্তিতে ঘুমিয়ে বিশ্রাম পাব। কি যে সব গোলমাল জুড়ে দিলে—"

ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সহানুভূতির স্বরে বলিলেন "আহা, তোমার ঘুম পেয়েছে ? তা ঘুমোও তুমি আমার এই কম্বলে। আমি ওই ইজি-চেয়ারে আর একখানা কম্বল পেতে রাতটা কাটিয়ে দিচ্ছি।"

প্রস্তাবটা ব্রহ্মচারিণীর আদৌ প্রীতিকর নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ব্রত, উপবাস, শাস্ত্রচর্চ্চা উপলক্ষে, তীর্থের পথে, ধর্ম্মশালায়, উভয়ের একত্রে রাত্রিযাপন বহুবার হইয়াছে। কেহ বিশেষ অসুস্থ হইলে অপরকে তাঁর শুশ্রূষার জন্যও কদাচিৎ রাত্রে নিকটে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু এ-গুলা প্রয়োজনের অনুরোধে, ব্রতের অনুকূলে, বৈধ কর্ত্তব্য পালন মাত্র। অল্প স্বল্প অসুস্থতায় কেহ কাহারও সাহায্য লইতেন না, অপরের সেবার আগ্রহও ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

ব্রহ্মচারিণীর মনে পড়িল গত কল্য রাত্রে তাঁকে অসুস্থ অনুমান করিয়াই ব্রহ্মচারী নিজের চোখের সামনে তাঁকে বিশ্রাম করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যে ভাবে প্রত্যাখ্যান জানাইয়াছিলেন, তাও মনে পড়িল! কার উপর বলা শক্ত, সহসা বিষম রুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "হ্যাঁ, দাও তোমার কম্বল! ওটা আজ আমায় নিতে হবে, মা ভয়ানক কটু শপথ দিয়েছেন। তার পর যাও,—তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর, আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করি। পারো ত, আরও কতকগুলো আবোল তাবোল বকো। যে আদেশ পালন করতে পারব না, সেই আদেশ দিয়ে রাখো। যেন ভবিষ্যতে কর্ম্মফলের তাড়া খেয়ে একদিন সেই আদেশ পালন করতে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হই! কি শাপই দিয়েছ সন্ধ্যাবেলায়!"

ব্রহ্মচারী কম্বল ছাড়িয়া ঘরের অন্য প্রান্তে টেবিলের কাছে পাতা ইজি চেয়ারটার দিকে যাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারিণীর শেষ কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন "তুমি ত আচ্ছা পাগল!"

"হুঁ, তোমার মাথার ঠিক থাকলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হব।" বলিতে বলিতে কম্বলটা তুলিয়া একবার ঝাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী পুনরায় বিছাইলেন।

ব্রহ্মচারী ঘাড়ের নীচে দুহাত রাখিয়া ইজি চেয়ারে শুইলেন। চোখ বুজিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "মাথার ঠিক থাক, আর না থাক,—আমি বিন্দে শূয়ার নই। আর তুমিও আশা করি,—কিন্তু থাক আশার কথা। আমি অনুরোধ করছি, রাগারাগি কোর না। তোমার আজকের রাগ কাল থাকবে না, কিন্তু আজ যা অশান্তি সৃষ্টি করবে, তা মার চিরদিনের জপমালা হয়ে থাকবে। তাঁর প্রত্যেকটি দীর্ঘশ্বাস, প্রত্যেক ফোঁটা চোখের জল,—আমাদের পক্ষে এক একটা বজ্র হয়ে দাঁড়াবে।"

ব্রহ্মচারিণী ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন "অপরাধ করে থাকি, দণ্ড পাব। কিন্তু এ কি হচ্ছে বল ত? ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে—"

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "আস্তে। মা শুনতে পাবেন যে! ছাখো, তোমায় মিনতি করে বলছি, মনের মধ্যে পুত্রশোকই উপস্থিত হয়ে থাকুক, কন্যাশোকই উপস্থিত হয়ে থাকুক, আজকের মত ধৈর্য্য ধরো।"

ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাক থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন "আমি নিজের জন্যে ভাবছি কি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "না। আমার জন্যে ভাবছ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু নিশ্চিন্ত হও, আত্মা-অনাত্মার বিবেক-বিচারটা আপাততঃ স্মরণ আছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুমোও।"

"দুয়ারটায় খিল বন্ধ করি?"

"দরকার কি?"

"দিদিমা হচ্ছেন মার ভগ্নদূত। হয় ত আড়ি পাতবেন, কে কোথা রয়েছি দেখে গিয়ে মাকে খবর দেবেন।"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়াই উত্তর দিলেন "তবে খিল বন্ধ করো। কিন্তু কাল সকালে কি কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কাল বৃহস্পতিবার। তুমি গুরুবারে এবার মৌনব্রত নাও!"

ব্রহ্মচারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সেই ভাল। নিজের রসনাকেও সংযম শেখানো যাবে, দিদিমাকেও জব্দ করা হবে। নইলে আজ হরগৌরী দর্শনের বায়না ধরেছেন, কাল হয় ত ন্যাড়ানেড়ীদের আড্ডা থেকে কোন নতুন তত্ত্ব ধার করে এনে তাই আবদার ধরবেন। হে ভগবান, একবার দেশটায় জ্ঞানযোগের আলো জ্বালো, অজ্ঞান কুসংস্কারগুলো দূর করো। আমরা স্বস্তি পেয়ে বাঁচি। আমাদের রক্ষা কর নারায়ণ!"

দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া ব্রহ্মচারিণী শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন

"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ
নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ।"

ব্রহ্মচারী স্তব্ধ! ওই ক্ষুদ্র সঙ্কেত-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অকস্মাৎ তাঁর মন যে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তা-রাজ্যের মাঝে ঠিকরাইয়া পড়িল এবং সেখানে কি বিপুল গভীর আনন্দ-তন্ময়তায় তিনি বিভোর হইলেন তিনিই জানেন,—অনেকক্ষণ তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। তার পর কতকটা সম্বিৎ পাইয়া ভাবাচ্ছন্নের মত,—যেন আপনাকে আপনি লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

"অতএব ত্যজ বৃথা শোক রাশি
ছেড়ে দাও রজ্জু বল হে সন্ন্যাসি—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ!"

তারপর দুজনেই নীরব, নিস্পন্দ!

বাহিরে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। ঘরের ভিতর গ্রীষ্মের গুমট আবার ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ পরে কাণের কাছে মশকের গুঞ্জন-গান অনুভব করিয়া তন্দ্রা ভাঙিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। অন্ধকারে মেঝের দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "তুমি মশারী টাঙাও নি? মশার উৎপাতে ঘুমুতে পারবে কি?"

ব্রহ্মচারিণীর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ব্রহ্মচারী অধিকতর নিম্নস্বরে সসঙ্কোচে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, তথাপি উত্তর পাইলেন না। নিজমনে একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন; অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া সাবধানে ব্রহ্মচারিণীর কম্বল এড়াইয়া ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া প্রেকে গুটান রেশ্‌মি মশারী পাড়িলেন। অন্য তিন দিকের দেওয়ালে প্রেকে রেশ্‌মি ফিতা পূর্ব্বেই বাঁধা ছিল। মশারীর কোণগুলা তাহাতে বাঁধিয়া, মশারীটা কম্বলের চারিপাশে ছড়াইয়া দিলেন। তার পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া "নারায়ণ নারায়ণ" বলিতে বলিতে আবার আসিয়া ইজি-চেয়ারে শুইলেন। চাদরখানা সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া, অন্যমনে তন্দ্রালস-জড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

"লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে;
জানিনা কখন, ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।"

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর আরও জড়াইয়া আসিল। নিঃশ্বাস আরও ধীর—গভীর হইয়া আসিল। ক্রমে কণ্ঠধ্বনি থামিল। নিঃশ্বাস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া দীর্ঘচ্ছন্দে পড়িতে লাগিল।

ব্রহ্মচারিণী যেন এইটুকুর জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে মশারী তুলিয়া এবার তিনি বাহিরে আসিলেন। একখানা পাখা লইয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া, অতি সাবধানে, নিঃশব্দে, নিদ্রিতকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর নিঃশ্বাস আরও গাঢ় হইয়া উঠিল, তিনি অগাধে ঘুমাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। একটা অস্বাভাবিক ভয়, সঙ্কোচ ও উৎকণ্ঠায় তাঁর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। যদি হঠাৎ ব্রহ্মচারীর ঘুম ভাঙিয়া যায়, যদি হঠাৎ তিনি চোখ মেলেন, তবে? অসময়ে, এত নিকটে আসিয়া, পত্নীর এই সেবার আয়োজন, ইহা তাঁর কতটা দৃষ্টি-কটু হইবে? হয় ত তাঁর নিকট ইহা প্রেতিনীর উপদ্রব বলিয়াই গণ্য হইবে। হয় ত বিরক্তির আতিশয্যে আর ঘুমাইতে পারিবেন না, নিদ্রাহীনতার জন্য হয় ত কাল অসুস্থ হইবেন। তার পর কয় দিন ধরিয়া যে সেই অসুস্থতার জের চলিবে, তাঁর সাধন-ভজনের কত বিঘ্ন হইবে, সেই ক্ষতিই যে সব চেয়ে বেশী আশঙ্কাজনক।

আর যদি তিনি পাখার বাতাস বন্ধ করিয়া সরিয়া যান, তাতেও ফল ভাল হইবে না। ব্রহ্মচারী মশার উপদ্রবে ভালরূপে ঘুমাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারিণী বাহিরে থাকিলেও তিনি মশারীর ভিতর যাইবেন না, ইহাও সুনিশ্চিত। মশারীও এখানে একটা ছাড়া দুটা নাই এবং একমাত্র মশারীর ভিতর উভয়ের নিদ্রা যাওয়া—! বিশ্রামের প্রয়োজন যতই থাক, সে নিষিদ্ধ চিন্তা পরিহার করা আরও প্রয়োজন!

কি নিষ্করুণ উভয়-সঙ্কট!—

বিরুদ্ধ ভাব-দ্বন্দ্বে চিত্তবৃত্তি অধীর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারিণী সবলে আত্মসংযম করিলেন! তাই ত, এ করিতেছেন কি? একটা তুচ্ছ বিষয়কে এত ফেনাইয়া বড় করিয়া দেখিবার কি প্রয়োজন? এত বড় আহাম্মকির কারণ কি?

দপ্ করিয়া মনে পড়িল ব্রহ্মচারীর সেই পরিহাসচ্ছলে বর্ষিত অভিশাপ! সেটা পরিহাসই বটে; কিন্তু ব্রহ্মচারিণী অপ্রিয় সত্যের আঘাতে ব্রহ্মচারীর মনে যে ব্যথা উৎপাদন করিয়াছিলেন, তার প্রত্যভিঘাত যাইবে কোথা? এই কি তার দণ্ড নয়?

ব্রহ্মচারিণী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে হাসিলেন। শক্তিশালী সাধক, তোমায় শত কোটী নমস্কার! তোমার

ইচ্ছাস্থষ্ট দুর্ব্বুদ্ধিকে আঘাত করা চলে, আঘাত করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া চলে! কিন্তু তোমার সদুদ্দেশ্যকে কপটাচার বলিয়া বিদ্রূপ করিলে, সে আঘাত—'সাপকে মারিতে শিবকে' লাগিয়া যায়! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর সাধক! তোমার এই সেবার সুযোগটুকু হইতে আজ যেন বঞ্চিত হইতে না হয়! তোমার শান্তিময় নিদ্রার যেন ব্যাঘাত না ঘটে! তুমি ঘুমাও, ঘুমাও!

ব্রহ্মচারীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ব্রহ্মচারিণী বিনা বাধায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিল। পাখা রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী নিজের মশারী কম্বল গুটাইয়া যখন ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতেছেন, তখন শব্দ পাইয়া ব্রহ্মচারীর ঘুম ভাঙিল। অভ্যাস-বশে ঘুমের ঘোরেই প্রাতঃস্মরণীয় স্তব স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী চোখ খুলিয়া উঠিলেন। এ সময় সাধ্যপক্ষে কাহারও সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না, আজও করিলেন না। ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্নান করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

(৩৩)

আহ্নিক পূজা সারিয়া ব্রহ্মচারিণী পূজার বারেণ্ডায় সবে মাত্র বাহির হইয়াছেন, ব্রহ্মচারীও ঠিক সেই সময় নিজের পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিলেন "আরে শোনো, শোনো। মাথায় একটা চমৎকার ফন্দি এসেছে!"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "হোল সঙ্কল্প-ভঙ্গ! শুক্রবারে মৌনব্রত নেবার কথা ছিল না?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "কথা ছিল বটে, কিন্তু সঙ্কল্প করতে গিয়ে বাধা পড়ল। মাথায় দুষ্টু বুদ্ধির আবির্ভাব হোল। চল তো মার কাছে! মা কাল রাত্রে অভিশাপ দিয়েছেন যে একটি মেয়ে হোক। তার জন্যে যেন আমাদের চোখে জল পড়ে।—আচ্ছা! মার শাপই ফলাবো। মাকে বলবে চল তো,—মাকেই আমরা পোষ্য-কন্যা গ্রহণ করব!—"

ব্রহ্মচারিণী সলজ্জ হাস্যে বলিলেন "মাকে এই কথা আমায় বলতে হবে? আমি পারব না, ছি ছি! ইচ্ছে হয় তুমি বল গিয়ে।"

ব্রহ্মচারী হাসি চাপিয়া কপট অনুযোগের স্বরে বলিলেন "আহা, আমি হচ্ছি পরের ছেলে, আমার কি এতটা ধৃষ্টতা সাজে! তুমি হচ্ছ মার নিজের মেয়ে—"

"কাযেই ধৃষ্টতাগুলা প্রকাশ করা আমাকেই সাজে! ওঃ! কি বোঝানই বোঝালে ব্রহ্মচারি!—" বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন।

ব্রহ্মচারী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কেন? কি অন্যায় কথাটা বলেছি? ঠাকুর্দ্দা একাই মার বাবা হতে পারেন? আমি মার বাবা হতে পারি না?"

অধিকতর লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আঃ কি জ্বালা! বাবাগিরির দখলি স্বত্ব নিয়ে ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে মামলা কর, আমার কাছে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?—মা শুনতে পাবেন যে!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "মা যে আমার এখানে জল গ্রহণ করতে চাইছেন না। এটা ত ভাল কথা নয়। তুমি মাকে বলবে চলো। আজ এখানে মায়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আজকে তাঁর যাওয়া হবে না। এসেছেন যখন, তখন অনুগ্রহ করে দুদিন থেকে যান। তার জন্যে আমিও মার বাবা হতে রাজী আছি, তুমিও মার মা হতে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী যথাসাধ্য রাগ জানাইয়া বলিলেন "আমি পারব না, যাও! মার মত আবদেরে মেয়ের মা হতে গেলে, মেয়ের বায়না সাম্‌লাতে আমায় স্নানাহার বন্ধ করতে হবে! এক বায়নার তাড়াস কাল রাত্রে উৎকণ্ঠা অস্বস্তিতে ঘুমুতে পারি নি, কলিক্ ধরবার যোগাড় হয়েছে। আর হাঙ্গামা বাধায় না।"

ব্রহ্মচারীর হাসি বন্ধ হইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখের ম্লান শুষ্কতা লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন "তুমি ঘুমুতে পার নি, নয়? আমি ওই ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু একবার বোধ হয় ঘুমিয়েছিলে, আমি ডেকে সাড়া পাই নি—"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সাড়া দিয়ে তোমার শুদ্ধু ঘুম নষ্ট করা উচিত ছিল কি?"

সংশয়ভরা দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী গম্ভীর হইয়া বলিলেন "অর্থাৎ—অ! বুঝেছি। তোমাকে ত জানি। যাও, ব্যথা ত যোগাড় হয়েছে, আর কর্ম্মভোগ বাড়িও না। দয়া করে একটু ঘুমোও গিয়ে। হবিষ্যের জন্তে তাড়াহুড়ো করে ব্যস্ত হয়ো না। আজ আমি নিজেই সব করে নেব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও।"

"এই অসময়ে কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন যায় ?"

ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "যায়! ছাখো, মার সামনে আমায় রাগিও না। যা বল্‌ছি, শোন।"

একটু দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "এই জন্তে নিজের অসুখ বিসুখের কথা তোমায় বল্‌তে ইচ্ছে করে না। এমন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠো,—তিলকে তাল করো। মা দিদিমার সামনে এ সব কথা নিয়ে গোলমাল কোর না, তোমায় মিনতি করছি—"

বলিতে বলিতে পাশের ছোট জানালা দিয়া উঠানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এই যে এঁরা উঠেছেন। নাওয়া হয়ে গেছে। বেরিয়ে চল, এবার ওঁরা আহ্নিক কর্‌তে আস্‌বেন। আমি আগে যাই—"

বলিয়া ব্রহ্মচারিণী বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্কোচের সহিত মিনতি করিয়া বলিলেন "ছাখো, আমার কলিকের কথা ওঁদের জান্‌তে দিও না। ব্যথা এমন কিছু বাড়ে নি, চেষ্টা করে দেখি চুপি চুপি সামলে নিতে পারব, বোধ হয়।"

বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী চিন্তিত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সদ্যঃস্নাতা মা ও দিদিমা কুয়াতলার কাছে দাঁড়াইয়া গোবরের মার সহিত কথা কহিতেছিলেন। গোবরের মা প্রাত্যহিক নিয়ম মত আসিয়া গরুর কায করিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া বিচালি কাটিতে বসিয়াছিল। দিদিমার টুকটুকে সুন্দর রঙ ও বার্দ্ধক্য-শ্লথ রসনার সুমিষ্ট বচনে মুগ্ধ হইয়া সে প্রাণ খুলিয়া নিজের ঘরকন্না পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতিনীদের সম্বন্ধে গল্প জুড়িয়াছিল। দিদিমা ও মা আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন।

ব্রহ্মচারিণী আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন "বেলা হয়ে যাচ্ছে দিদিমা, যান পুজো সেরে আসুন। আমার পুজোর ঘরেই আপনাদের দুজনের আসন পেতে দিয়ে এসেছি।"

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "প্রসাদ কখন উঠবেন ? তাঁর জল খাওয়া হলেই তুমি জল খেও।"

নত মুখে মেয়ে উত্তর দিলেন "উঠেছেন। এখুনি বেরিয়ে আসবেন। আপনারা যান মা।"

ব্রহ্মচারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, দিদিমা তাঁর পাছু লইলেন। ভাঁড়ার ঘরের কাছে আসিয়া নিভৃতে বলিলেন "হ্যাঁরে, প্রসাদ রাগ করে নি ত ?"

ব্রহ্মচারিণী ভাঁড়ার ঘর খুলিয়া ব্রহ্মচারীর জলখাবার সাজাইতে বসিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "বাস্তিক আর কাকে বলে ? যান, আগে ইষ্টদেবতার পাওনাটা চুকিয়ে আসুন, তারপর কে রাগ করেছে, কে তাপ করেছে, তার খোঁজ নেবেন।"

দিদিমা উৎসুক হইয়া বলিলেন "বলি, প্রসাদ কথা বলেছিল ত ?"

"কথা ত দিন রাতই বল্‌ছেন। আপনি আহ্নিক পুজো সেরে আসুন দেখি, নইলে আমি আর কথা বলব না। এইখানে আপনার জলখাবার সাজিয়ে রাখ্‌ছি দিদিমা, আপনি আজ এইখানে—"

"তোমার মা—"

"ওঁকে বল্‌বার যো নেই। আমি বল্‌তেও পারব না বাপু। আপনি লক্ষ্মী সক্ষ্মী মানুষ, আমার কথা শুনুন। আপনি আজ এইখানেই দুটি হবিষ্য কর্‌বেন, কেমন ? আমি তা'হলে সকাল সকাল চাপিয়ে দিই। কাল ত একাদশী—"

ব্রহ্মচারী বারেণ্ডায় উঠিয়া দিদিমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আবার দিদিমা এখানে গল্প সুরু করলেন ? ইষ্টদেবতার যে ওধারে তেষ্টায় ছাতি ফাট্‌ছে। যান, যান, পূজাপাঠ সেরে নিন্। তা'পর গল্প স্বল্প হবে।"

তাড়া খাইয়া দিদিমা প্রস্থান করিলেন। ভাঁড়ার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "মাকে বলে এলুম, কিন্তু বৃথা। ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতেই ওঁর ব্যবস্থা হোক। দিদিমা কি একলা এখানে খেতে রাজী হবেন ?"

ব্রহ্মচারীকে আসন পাতিয়া জলখাবার দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দিদিমার আপত্তি কে শুনছে ? তবে ঠাকুর্দ্দার

হাঙ্গামাকেই ভয়। ওঁদের আহ্নিক পুজো ত হোক, তার পর সে বিচার হবে। তুমি বসো।"

ব্রহ্মচারী বসিলেন; বলিলেন "তুমি সরবৎ খেয়ে একটু ঘুমোও। এঁরা আহ্নিক করে উঠলেই আমি তোমায় জাগিয়ে দেব, যাও।"

ব্রহ্মচারিণীর শরীর সুস্থ ছিল না। প্রস্তাবটায় আপত্তি করিলেন না। সরবৎ খাইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রবল নেশার মত গভীর তন্দ্রাভাবে শীঘ্রই দুই চক্ষু বুজিয়া গেল।

জল খাইয়া ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন। একটুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া সাবধানে নিঃশব্দ পদে আসিয়া ব্রহ্মচারিণীর ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। বাহির হইতে কাণ পাতিয়া শুনিলেন গৃহ নিস্তব্ধ; তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সহসা নিদ্রাভিভূতের মৃদু-কাতর-ধ্বনি কাণে গেল। বোধ হইল ঘুমের ঘোরেই তিনি কোনরূপ শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছেন। অথবা ভিতরে কোনরূপ যন্ত্রণা হইতেছে, নিদ্রিতের নিদ্রাঘোর ছাপাইয়া তারই অস্ফুট অভিব্যক্তি ধ্বনিত হইতেছে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারী নিঃশব্দে দুয়ার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী দুহাতে, দুহাতের কনুই ধরিয়া, তার উপর মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন। সামনের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের রৌদ্রতাপ-তপ্ত তীব্র আলো ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া মুখের উপর পড়িতেছিল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট। কপাল কুঁচকাইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন অসুস্থের এই যন্ত্রণাদায়ক নিদ্রা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না; এবং এই ঘুম ভাঙিয়া গেলে যন্ত্রণা দ্বিগুণ বেগে বাড়িয়া উঠিবে, সে আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অতএব যে কোনরূপেই হউক এখন ইঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখাই নিরাপদ।

আকস্মিক অসুস্থতা নিবারণের জন্য গোটাকতক ঔষধ হাতের কাছেই প্রস্তুত করা থাকিত। নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া ব্রহ্মচারী ঔষধের বাক্স খুলিলেন। নিদ্রাকারক আরকে ভিজাইয়া একটা তুলার গুটিকা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নিজের কম্বল ও পাখাখানা লইয়া আবার ব্রহ্মচারিণীর ঘরে ফিরিলেন। অতি সন্তর্পণে নিদ্রিতের নাকের কাছে তুলাটুকু ধরিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তেই ঔষধের ক্রিয়া দেখা গেল। নিদ্রা গাঢ় হইল, যন্ত্রণা-ধ্বনি দূর হইল। ব্রহ্মচারী নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঔষধ রাখিলেন। সামনের জানালাটা বন্ধ করিয়া, ব্রহ্মচারিণীকে পাশ ফিরাইয়া শোওয়াইলেন। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া হাত পায়ের উত্তাপ দেখিয়া, বুঝিলেন—আপাততঃ আর আশঙ্কার কারণ নাই। এখন দীর্ঘনিদ্রাই মাত্র প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারিণীর মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়া ব্রহ্মচারী তাঁর মাথার কাছে কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। বাঁ হাতে পাখা লইয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে ডান হাতে নিজের মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। তাঁর চোখ বোজাই রহিল, শুধু মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া সতর্ক ভাবে এক একবার ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন মাত্র। তিনি নিরাপদে ঘুমাইতেছেন কি না, বিনা বাধায় পাখার বাতাস পাইতেছেন কি না,—শুধু এইটুকু মাত্র দেখিয়া আবার চোখ বুজিয়া নিজের ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা অন্য চিন্তায় মন সংলগ্ন থাকিলে যে-শ্রেণীর মানুষ অতি-নিকটের ব্যাপারে প্রায়ই দৃকপাত করিতে চাহে না, সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হয় না,—ব্রহ্মচারী সেই শ্রেণীর মানুষ। ব্রহ্মচারী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন মা বা দিদিমা কেহ পূজার ঘর হইতে বাহির হইলেই তিনি এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু তাঁহারা কে যে কখন বাহির হইবেন এবং বাহির হইলে, সে সংবাদটা জানিবার জন্য ব্রহ্মচারীকেই যে বাহিরের দিকে চোখ রাখিতে হইবে, সে কথা ব্রহ্মচারী ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দুয়ারের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া, তিনি একান্ত নিশ্চিন্ত-মনেই নিজের কায করিতেছিলেন। গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া যে কতখানি সময় কাটিয়া গেল, কোন হিসাবই রাখেন নাই।

সহসা পিছনে মৃদু শব্দ পাইয়া ব্রহ্মচারী পিছন ফিরিয়া দুয়ারের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন দিদিমা কৌতুক-স্মিত মুখে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছেন। মা তাঁর পিছন হইতে উঁকি দিতেছিলেন,

ব্রহ্মচারীকে পিছন ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়াই তিনি সত্বর অদৃশ্য হইলেন।

একাগ্র-চিন্তা-তন্ময়তায় অকস্মাৎ আঘাত খাইয়া যে চিত্ত-বিক্ষেপ জাগিল, তার ধাক্কা সামলাইয়া লইতে ব্রহ্মচারীর বেশ একটু সময় লাগিল। ধীরে সুস্থে মালা রাখিয়া মাথা ঠিক করিয়া ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিলেন। দিদিমার চৌর্য্যবৃত্তির দৌরাত্ম্য মাথা হেঁট করিয়া সহিতেই হইবে; কিন্তু পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এই শিশু-জনোচিত কৌতূহল-স্পৃহা—?

লজ্জায় ব্রহ্মচারীর আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল! পাখা রাখিয়া ত্রস্তে উঠিলেন। মাথা হেঁট করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে নিম্নস্বরে বলিলেন "কি দিদিমা, আহ্নিক হোল?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মা অন্তর্হিত হইয়াছেন। সলজ্জ বিস্ময়ে চুপি চুপি বলিলেন "মা কোথা গেলেন?"

দিদিমা হাসিমুখে নীরবে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। অর্থাৎ তিনি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়াছেন। ব্রহ্মচারী সলজ্জ অনুযোগের স্বরে চুপি চুপি বলিলেন "ছি ছি দিদিমা, আপনি বোধ হয় আগে এসেছেন? আমায় একটু সাবধান করতে নেই? মা আপনার পিছন থেকে—ছি-ছি! কি মনে করলেন বলুন ত।"

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে দিদিমা বলিলেন "আমিই ত ওকে ডেকে এনেছি। দেখুক, মেয়েকে জামাই কত ভাল-বাসে! মেয়ে ঘুমুচ্ছে, জামাই বসে বাতাস করছে, আহা—"

ব্রহ্মচারী সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "ঘুমুচ্ছেন? অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন!—কলিক ব্যথা ধরেছে।"

দিদিমা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন "ব্যথা ধরেছে?"

মা ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন "কতক্ষণ? এই ত বাছা আহ্নিক করে উঠে এলো।"

ব্রহ্মচারী দেখিলেন ব্রহ্মচারিণীর অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে আর চলে না। আত্মরক্ষার জন্য সত্য প্রকাশ করাই মঙ্গল। বলিলেন "তখন থেকেই ব্যথা জানিয়েছিল, আমায় জানিয়ে এসেছিলেন। আপনারা ভাববেন বলে আপনাদের জানান নি, চেপে চুপে রেখেছিলেন। আমায় জল খেতে দিয়েই শুয়ে পড়েছেন।"

মা ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বলিলেন "তখন থেকে ব্যথা ধরেছে! আহা, মরে যাই! তাই বাছার মুখখানা অত শুকু দেখলুম্! আমি ভেবেছি ছেলে মানুষ, বুঝি তেষ্টা পেয়েছে। কিছু খায়-ও নি বোধ হয়?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "এক চুমুক সরবৎ খেয়েছেন মাত্র।"

তার পর সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন "আজ আর ভয়ের কারণ নেই। সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছি, ওষুধ দিয়েছি, এখন নেশার ঝোঁকে খুব ঘুমুবেন। ঘুম ওঁর বড় দরকার। খান কম, ঘুমোন কম, আর খাটেন বেশী। এই করেই ব্যথাটি টেনে আনেন। কাল রাত্রেও ঘুমোতে পারেন নি; তার প্রতিক্রিয়া যাবে কোথা?—"

ব্রহ্মচারী বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে তার ছিদ্র ধরিয়া দিদিমা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলেন "কাল রাতে ঘুমোতে পায় নি? অ!—তা অত রাত কি জাগায়?"

ব্রহ্মচারী থতমত খাইলেন; এবং ক্ষণ মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন—এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নিজেই। সামনেই মা দাঁড়াইয়া! লজ্জা ও বিরক্তি যতই বোধ হউক, প্রকাশ করিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং কিল খাইয়া কিল চুরি করিতে হইল। কথাটা যেন শুনিতেই পান নাই এমনি ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন 'চলুন মা, আপনাকে ঠাকুর্দ্দার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। আর দিদিমা, আপনার আজ এখানে জলখাবার ব্যবস্থা হয়েছে, চলুন ভাঁড়ার-ঘরে। আপনাকে বসিয়ে দিয়ে যাই।"

দিদিমা বলিলেন "শুধু বসিয়ে দিয়ে যাবে? খাইয়ে দেবে না?"

এই সূত্রে চাপা-হাসির উৎস খুলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "সে ত সৌভাগ্যের বিষয়! কেবল অনুমতির অপেক্ষা মাত্র! চলুন।"

দিদিমাকে লইয়া তিনি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিলেন। তার পর প্রচণ্ড ভৎর্সনা-সূচক একটা "হুঁঃ!" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, গভীর ক্ষোভের সহিত বলিলেন "দিদিমা, বিশ্ব-নাথের ঘরের লোক হয়ে, এই কি আপনার দয়াধর্ম্ম হোল? মার সামনে আমায় কি অপ্রস্তুতেই ফেল্লেন, বলুন দেখি! আমার ইচ্ছা হোল বলি ধরিত্রী দ্বিধা হও!"

দিদিমা দু'হাত নাড়িয়া, পরম প্রসন্ন বদনে বলিলেন

"বলি আমার নাৎনীকে তুমি রাত জাগিয়েছ ত? সত্যি কথাটি কবুল কর! ফুলশয্যা ত কর নি—এত দিনে কম্বল-শয্যা ত করতে হয়েছে?"

দু হাতে নিজের দু কাণ চাপিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী দারুণ দুঃখের সহিত বলিলেন "রাম, রাম, রাম! হে বিশ্বনাথ, কতদিনেই সুদিন দেবে! এই বৃদ্ধাকে মহা সমাদরে কাঁধে করে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দেব! তার পর পর-পারে পৌঁছে, আমার বিরহী দাদামশায়ের কাছে বিলম্বের জন্যে খুব একচোট বকুনি খাবেন, তবে আমার বড় সুখ হবে!"

ব্রহ্মচারিণীর ঘর হইতে মা ডাকিলেন "প্রসাদ, একবার এখানে এস ত, বাবা।"

(৩৪)

ব্রহ্মচারী তটস্থ হইয়া উত্তর দিলেন "আজ্ঞে যাই।"

তার পর জলখাবারের পাত্রের দিকে দিদিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, রীতিমত ধমকের ভঙ্গীতে বলিলেন "নিন, শীঘ্র নিবেদন করুন। অনেক বেলা হয়েছে, ছেলে মানুষ, আর পিত্তি পড়ায় না!"

দিদিমা হাসিমুখে জলখাবারের পাত্র লইয়া বসিলেন; ব্রহ্মচারী বাহির হইয়া গেলেন।

হৃতচৈতন্য কন্যার পাশে মা মাথায় হাত দিয়া অভিভূতের মত বসিয়া ছিলেন। ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের বাহিরে, মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "কি বলছেন্ মা?"

মা হতাশ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন "এ যে একেবারে অজ্ঞান অভিভূত! ডেকে সাড়া পাচ্ছি না।"

ব্রহ্মচারী আশ্বাসের স্বরে বলিলেন "ভয় নেই মা। ওটা ওষুধের দরুণ হয়েছে। ও ঘোর কেটে যেতে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। আপনি আসুন, আপনাকে ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি, বেলা হয়েছে।"

মা বলিলেন "আমায় এখন বোল না বাবা। আমি এর কাছে এখন বসি। এম্নি কপাল আমার! একদিনের জন্য এলুম, তাও মেয়েটাকে ভাল দেখ্‌তে পেলুম না?"

নিজের দুরদৃষ্টের জন্য তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মচারী বিপন্নভাবে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই মাতৃস্নেহ, এই সন্তান-বাৎসল্য, এই গভীর স্নেহসৃষ্ট মমতা-দৌর্ব্বল্য,—এ সব ভয়ানক ঝঞ্ঝাটকে তিনি এখন দূর হইতে নমস্কার করেন। মার অসাক্ষাতে নিজের অনাগত সন্তানের মৃত্যুর জন্য অখণ্ড মনোযোগে শোকচর্চ্চা করিবার ব্যাপার লইয়া যত উৎসাহেই আলোচনা করা যাক, মার সামনে মাতৃ-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না; এবং জগৎটা যত বড়ই মায়াময়, অনিত্য, নশ্বর হউক, সন্তান-বাৎসল্যে অভিভূত জননীর চোখে জল দেখিলে তাঁরও হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়। পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলেন সেই ভয়ে ব্রহ্মচারী একটি কথা বলিয়া মাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা মাত্র করিলেন না।

মা বলিলেন "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ঘরে এস।"

আদেশ পালনের জন্য ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণীর মাথার কাপড় মা খুলিয়া দিয়াছেন,—দৃশ্যটা চোখে ঠেকিবামাত্র ব্রহ্মচারী অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে ঢুকিলেন না।

মা বুঝিলেন। তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন "তুমি এস বাবা এস। এই কি লজ্জার সময়? আর, কেই-বা লজ্জা করবে? ওর কি জ্ঞান গোচর আছে?"

ব্রহ্মচারী মনে মনে বলিলেন, ওঁর না থাক, আমার ত আছে!—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কথাটা বলা হইল না। চুপ করিয়া রহিলেন।

মুখে স্বীকার করুন না করুন, পত্নীর সদ্‌গুণ-রাশিকে তিনি মনে মনে সম্মান করিতেন। তাঁর ভদ্র, মহৎ, পবিত্র স্বভাবকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। পত্নীর এই পবিত্র, তেজস্বী স্বভাব, ব্রহ্মচারীর জীবনের উচ্চতর চরিতার্থতালাভ-চেষ্টার পথে কতখানি সহায়তা করিতেছে,—তাঁর সাময়িক দৌর্ব্বল্য, তাঁর আকস্মিক আত্ম-বিস্মৃতির মোহকে কতবার কতভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছে, তার হিসাব ব্রহ্মচারী মনে রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু মোটের মাথায় সেজন্য অন্তরে অন্তরে কৃতজ্ঞ আছেন। নিজের ত্রুটি-দৌর্ব্বল্য, আত্মগ্লানির জালায় অধীর হইয়া পত্নী সম্পর্কটার উপর রূঢ় দুর্ব্ব্যবহার করিতে বা রসনার সংযম হারাইতেও তাঁর আপত্তি ছিল না, পরে সেজন্যে ক্ষমা চাহিতেও বাধিত না। কিন্তু পত্নীর অসামান্য রূপলাবণ্যকে যতই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করুন,

সে সৌন্দর্য্যের প্রবল ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণী শক্তিকে তিনি মনে মনে ভয় করিতেন। আজীবনের কঠোর সংযম-সাধনা,—পবিত্র ব্রতী জীবনের উচ্চ-দায়িত্ব-জ্ঞান, তাঁহাকে নিজের কর্ত্তব্য-পথে যতই অটল স্থির রাখিতে চেষ্টা করুক, —চারিদিকের বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাত, এবং পত্নীর এই জলন্ত রূপরাশি, তাঁর মনের কঠোরতা, একটা নিগূঢ় কাতরতার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নিজের দৃষ্টিকে বেশী স্বাধীনতা দিতে তাঁর সাহস হইত না। পাছে মন তার সঙ্গে যোগ দিয়া ভোগলালস-মত্ততায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে! ব্রহ্মচারিণীও স্বামীর আনুগত্য যেখানে যত রকমেই স্বীকার করুন, স্বামীর এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবার পাত্রী ছিলেন না, এটাও ব্রহ্মচারীকে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে হইয়াছিল। নিজের মনে যা হয় হউক, কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর ব্রতী জীবনের মর্য্যাদা, ব্রহ্মচারীর কাছে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল।

ব্রহ্মচারী বাহিরে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মা বুঝিলেন জামাতা প্রয়োজনের অনুরোধে অসুস্থের সেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘনে প্রস্তুত নহেন। অগত্যা কন্যার মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া পুনশ্চ জামাতাকে ডাকিলেন। সেই সময় দিদিমাও বাহিরে আসিলেন। দিদিমাকে আগাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী নিজের পরিত্যক্ত কম্বলেই আবার বসিলেন। মা মেয়ের পাশে রহিলেন। দিদিমা অন্য দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণীর অসুখের বিষয় লইয়া, ভীতি-বিহ্বলা মাতা দিদিমার সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই দুর্জ্জয় শূলরোগ ব্রহ্মচারিণীর মাতামহীর ছিল, মাতার আছে এবং শিশুকাল হইতে ব্রহ্মচারিণীকেও ধরিয়াছে। এই রোগের পীড়নে মাতামহী অকালে গত হইয়াছেন, মাতার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছে, কন্যার এই অবস্থা। এখন এই একমাত্র কন্যাকে ও জামাতাকে রাখিয়া কি করিয়া সকাল সকাল ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন, এই দুর্ভাবনাতেই মাতা অস্থির। তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন, অনেক পরিতাপ করিলেন, অনেক চোখের জল ফেলিলেন। ব্রহ্মচারী নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সকলে অন্যমনস্ক রহিলেন, ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধের নেশা বোধ হয় কতকটা লঘু হইয়া গিয়াছিল। তিনি মাথা ঝাঁকাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন "সরো, সরো, ব্রহ্মচারি, পথ দাও। আসনে বসবার সময় হয়েছে,—আসন, আমার আসন—"

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কাতর শব্দ করিতে করিতে মহা ব্যস্ত উত্তেজিতভাবে উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

যথার্থই আসনে বসিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। খুব সম্ভব অভ্যস্ত সংস্কার-বশেই এ কথা তাঁর মনে জাগিয়াছে। ব্রহ্মচারী বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া তাঁর মাথাটা বালিশে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে ঔষধ সিক্ত তুলাটা নাকের কাছে ধরিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "এই যে আসন। বসো। বল, অস্থাসন মন্ত্রস্থ—"

ব্রহ্মচারিণীর উত্তেজনা-চাঞ্চল্য মুহূর্ত্তে দূর হইল। প্রসন্ন বিড় বিড় করিয়া আসন-শুদ্ধির মন্ত্রাদি আওড়াইতে আওড়াইতে আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত শিথিল হাতের আঙুলগুলি কর জপিবার ভঙ্গীতে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া মা ও দিদিমা হতবুদ্ধি নির্ব্বাক। ব্রহ্মচারীও সহসা এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, যে ইচ্ছা সত্বেও কেহ কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মচারিণীর নিঃশ্বাস খুব ধীর ও গভীর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারী ঔষধ রাখিলেন। মাথার উপর হইতে হাত সরাইয়া লইয়া, আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিলেন।

দিদিমা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া—একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন "উঃ, এত যাতনার মাঝেও 'আসন আসন' কয়ছে? কি শিক্ষেই শিখিয়েছ প্রসাদ!"

"আমি?" বলিয়া ব্রহ্মচারী ম্লান হাস্যে দিদিমার দিকে একবার চাহিয়া আবার মাথা হেঁট করিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "জন্মান্তরের সংস্কার সকলকেই তার উপযুক্ত পথে টানে। আপনার সংস্কার, আপনাকে তীর্থবাসে আনন্দিত করে রেখেছে। মার সংস্কার মাকে সন্তান-বাৎসল্যে মায়া মমতায় অভিভূত করেছে, মা চোখের জল ফেলছেন। আর ওই এক মূর্ত্তিকে দেখুন, ওঁর মন কোন্ দিকে

ছুটেছে। তবু মা এই মেয়ের জন্তে কাঁদবেন? কর্ম্মভোগ আর কি!"

দিদিমা বলিলেন "সকলের সংস্কার ত বল্লে। তোমার নিজের সংস্কার?"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। সনিঃশ্বাসে বলিলেন "আমার সংস্কার আমায় বাঁশ-বাগানে ডোমকাণা করেছে দিদিমা! না পারছি আপনাদের সন্তুষ্ট করতে—না পারছি, নিজের পথ মুক্ত করতে!"

আরও কি বলিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী নিজের রসনা সংযত করিলেন। মার দিকে চাহিয়া যোড়হাতে অনুনয় করিয়া বলিলেন "এবার উঠুন মা, অনেক বেলা হয়েছে।"

মা একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন "উঠ্ছি বাবা, উঠ্ছি। তোমার হবিষ্যের আজ কি হবে?"

"আমার স্বপাক অভ্যাস আছে মা। বার ব্রত বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে বা অন্ত কারণেও স্বপাক আমায় চালাতে হয়, আজও তাই হবে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এসে নিজের কাযে বসিগে। দিদিমা কষ্ট করে একটু এইখানে বসুন।"

বলিতে বলিতে ঠাকুর্দ্দার ভৃত্য ও পুত্র আসিয়া উপস্থিত। তাহারা ইহাঁদের লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ব্রহ্মচারী মাকে অনুনয় বিনয় করিয়া উঠাইয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। দিদিমা রহিলেন।

মা প্রস্থান করিলে ব্রহ্মচারী স্নানের জন্ত উঠিলেন। পুনরায় যন্ত্রণা কাতরতা প্রকাশ করিলে ঔষধ শুঁকাইবার জন্ত যথারীতি উপদেশ দিয়া তিনি বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন "ভাগ্যে দিদিমা এসেছিলেন, তাই আজ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাযে যেতে পারছি। অন্ত দিন হলে আমার কায বন্ধ রাখতে হোত। কি দিদিমা, হরগৌরী দর্শনের বাসনা আর ধরবেন? সখ্ মিটেছে?"

দিদিমা মুখ ভার করিয়া বলিলেন "আর বড়াই কোর না, যাও।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন "কেন করব না? আপনারা যে ওঁকে সংসারী হতে বলেন, ছেলেমেয়ে হবার আশীর্ব্বাদ করেন!—ওই শূল-ব্যাধি—ও সম্পত্তি ভোগের জন্ত উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করতে গেলে উনি কি আর ভবধামে থাকবেন?"

দিদিমা বলিলেন "ষাট্ ষাট্ মার বাছা! কেন ভবধামে থাকবে না? কার ধার করে খেয়েছে শুনি?"

হতাশ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "নাঃ, এ সব কুতার্কিকের সঙ্গে কথা বলা দায়! আচ্ছা, ও যুক্তিটা যদি পছন্দসই না হয়, তা হলে দয়া করে মাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দেবেন যে সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসী থাকাই মঙ্গল। তারা সংসারী হলে তাদের সর্ব্বনাশ হয়!"

প্রবল তাচ্ছিল্যের সহিত দিদিমা বলিলেন "কে সন্ন্যাসী? তুমি? পোড়া কপাল আমার! আমার এমন ইন্দ্রাণীর মত রূপসী নাৎনী থাকতে তোমায় সন্ন্যাসী করে কে? তোমার বাইরের ভড়ং কেবল আমাদের জ্বালাবার জন্তে বই ত নয়! কিন্তু মন যে তোমার কোথায় বাঁধা পড়েছে, তা' তো মনে মনে বুঝছি!"

সংসারী আত্মীয়রা যখন সংসারের দিকে ব্রহ্মচারীকে ফিরাইবার জন্ত টানাটানি করিতেন, তখন নিজের যেখানে যত দুর্ব্বলতাই থাক, ব্রহ্মচারী সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া আত্মরক্ষার জন্ত প্রবল আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিতেন। অভ্যস্ত সংস্কার-বশে এবারেও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধ-ভাব-সংঘাতে নিজের অন্তরের রোখটা সন্ন্যাসের অনুকূলে ভাল করিয়া ঝালাইয়া লইতেছিলেন। তার মাঝখানে দিদিমা অকস্মাৎ এই যে আঘাতটি করিলেন, ইহার নিগূঢ় সত্যতা সহসা মর্ম্ম-কেন্দ্রে পৌঁছিয়া তাঁহাকে চমকাইয়া দিল। নিজের দুর্ব্বলতার জন্ত ধিক্কার বোধ হইল! তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিতেও পারিলেন না এবং সত্য কথা স্বীকার করিতেও সাহস পাইলেন না। তাঁর মুখ শুকাইয়া গেল, স্তব্ধ-বিমূঢ় হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

অবস্থা দেখিয়া দিদিমা বল পাইলেন। বলিলেন "যা করবার তা করেছ ভাই। এখন এ সব মতি-গতি ছাড়। ত্যাগী হবে, বেশ ত, অন্তরে ত্যাগী হও। সেই ত্যাগই ত যথার্থ ত্যাগ। বাইরে ভোগী হও, সব দিক বজায় রাখ, সবাইকে সুখী কর, তবে ত মানুষের যোগ্য কায হবে!"

ধাঁ করিয়া ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল শক্ত্যানন্দ স্বামীর যুক্তি! মন অশান্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, স্নান করিয়া আসনে বসিতে ছুটিলেন।

যথাসময়ে পূজাহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মচারী

দেখিলেন, ইতিমধ্যে মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। রান্নাঘরে উনানে আগুন দিয়া, ভাঁড়ার-ঘর হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া বার্লি, দুধ, সব বাহির করিয়া ব্রহ্মচারিণীর জন্য পথ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর হবিষ্যের আয়োজন গুছাইয়া লইয়া, হবিষ্য চাপাইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী কাহারও সেবা লওয়া সহিতে পারিতেন না; ব্যাপার শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। অনুযোগ করিয়া বলিলেন "এ কি মা, এ যে আমায় অপরাধী করা হচ্ছে। আপনার এ কষ্টভোগ করা কেন?"

মা কাঁদিলেন। লোকে তাহাদের আদরের সামগ্রী জামাতাকে কত আরাধনায় নিকটে পায়, কত রসনাতৃপ্তিকর ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, কত সাধ-আহ্লাদ করিয়া খাওয়ায়। আর তিনি অভাগিনী? যা তাঁর চোখে দেখিবার কথা নয়,—সেই গেরুয়া, হবিষ্য ইত্যাদি দুঃসহ উপসর্গ দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ইত্যাদি বিলাপ চলিল।

ব্রহ্মচারী বিব্রত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। নিজের ঘরে ঢুকিয়া কম্বল পাতিয়া অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িলেন। মনের ভিতর নিদারুণ অবসাদ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল,—আর ত এই প্রতিকূলতার অত্যাচার সহ্য হয় না। গুরুজনদের এই অশ্রুজলের অভিশাপ,—ইহা মাথায় লইয়া তিনি কোন্ সন্ন্যাস-সাধনায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন? প্রাণান্তকর ব্যাকুলতায় চেষ্টা করিয়াও তিনি যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না,—কে বলিতে পারে, পিছনের এই আকর্ষণই তার প্রধান কারণ নয়? এর চেয়ে সোজাসুজি সংসারী হইয়া, সকলের সব দেনা চুকাইয়া দিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেন, তবে হয় ত সাধনায় শতগুণ উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতেন! আজ আর তাহা হইবার পথ আছে কি?

ব্রহ্মচারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।—শত সহস্র অপ্রিয় তিক্ত চিন্তা জাগিয়া, মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িবে,—ব্রহ্মচারী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া পড়িলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিষাদভরা মুখে খড়ম ও নামাবলী লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে গেলেন।

গ্রাম্য ভদ্রলোকদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত একটি ছোটখাট গ্রাম্য লাইব্রেরী ছিল। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা অর্দ্ধশিক্ষিত গুটি দুই ছেলে তার মোড়ল ছিল। তাহাদের কাছে গিয়া, অসময়ে লাইব্রেরী খোলাইয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া কতকগুলা বহি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ী ঢুকিতেই মা উদ্বিগ্ন হইয়া সামনে আসিলেন। এই অসময়ে তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, রৌদ্রে বাছার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে,—হবিষ্য কোন্ কালে নামিয়া শুকাইতেছে, ইত্যাদি সস্নেহ অনুযোগপূর্ণ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা ছিল, আগে মা ও দিদিমা ঠাকুর্দ্দার বাড়ী গিয়া আহার করিয়া আসিবেন, তবে তিনি হবিষ্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু মার পীড়াপীড়িতে তাহা হইল না। হবিষ্য গ্রহণের জন্য তাঁহাকেই আগে বসিতে হইল এবং মার স্নেহ-যত্নের অত্যাচারে আজ তাঁর নির্দ্দিষ্ট মাত্রার দ্বিগুণ পরিমাণে দুধ ঘি হবিষ্য গ্রহণ করিতে হইল।

যথাসময়ে ঠাকুর্দ্দার বাড়ী হইতে লোক আসিল। মা ও দিদিমা আহার করিতে গেলেন। ব্রহ্মচারিণী তখনও নিদ্রাভিভূতা। ব্রহ্মচারী আজ আর বসিতে পারিতেছিলেন না। পরিপূর্ণ পাকস্থলী যে কি জিনিস, তাহা তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ সেই অবস্থায় পড়িয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিলেন। ব্রহ্মচারিণীর দুয়ারের বাহিরে কম্বল পাতিয়া তিনি শয়ন করিলেন, এবং অনেক দিনের পর আজ মাতালের মত অঘোর অচৈতন্য হইয়া দিবানিদ্রা ভোগ করিলেন।

যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। এত দীর্ঘ-সময়ব্যাপী সুনিদ্রা ভোগ বহু দিন তাঁর অদৃষ্টে ঘটে নাই। কাযেই ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথমটা এই নূতন ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে মহা অস্বস্তি বোধ হইল। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, এই আপত্তিতে মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল; কিন্তু শরীর এত সুস্থ, সবল এবং গ্লানিশূন্য বোধ হইল যে, মহা উৎসাহ উদ্যমের সহিত নিজের কাযে বসিতে প্রবল আগ্রহ হইল। কাযেই অপ্রসন্নতা ভোগ করিবার সময় পাওয়া গেল না। ব্রহ্মচারী উঠিলেন।

মা ও দিদিমা আহার করিয়া যথাসময়ে এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিণীও ইতোমধ্যে চেতনালাভ

করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। পথ্য সেবন করিয়া, কিছুক্ষণের জন্ম বিশ্রাম করিয়া, এখন তিনি এত স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করিতেছেন যে, এবার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া স্নানাহ্নিকের উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁর শরীর এবং স্বাস্থ্য যেমনই হউক,—জীবনী-শক্তির প্রাথর্য্য ছিল অদ্ভুত তেজস্বিতাপূর্ণ। যত বড় কঠিন ব্যাধিই হউক, স্বাস্থ্যলাভ করিবার সময় তিনি আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে সুস্থ হইয়া উঠিতেন। কর্ম্মফলে যে ব্যাধিরই আবির্ভাব হউক, বিশুদ্ধ-চেতা রিপুঞ্জয়ী ব্যক্তির দেহে সে ব্যাধি দীর্ঘকাল প্রভুত্ব করিতে পারে না, ইহা প্রায়ই দেখা যায়।

সেদিন বৈকালের ট্রেণে মা ও দিদিমার চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর অসুস্থতার জন্ম তাহা হইল না। আগামী কল্য প্রত্যূষে তাঁহাদের যাত্রা করা স্থির হইল।

সন্ধ্যায় স্নানাহ্নিক পর্ব্বের পর বিশ্রামের জন্ম ব্রহ্মচারিণী ও দিদিমা রোয়াকে বসিয়া ছিলেন। ব্রহ্মচারী আসিয়া দিদিমাকে প্রণাম করিয়া নিজের কম্বলে শুইয়া পড়িলেন। হাই তুলিয়া বলিলেন "উঃ, আবার ঘুম পাচ্ছে যে। মার কৃপায় ওবেলা আমার যা হবিষ্য করা হয়েছে,—সাংঘাতিক! এখন দিন দুই নির্জ্জলা উপবাস করলে তবে—"

দিদিমা মহা অপ্রসন্ন হইয়া প্রতিবাদ জুড়িয়া দিলেন, কেবল উপবাস করিলেই কি ধর্ম্ম হয়? ষোল বৎসর বয়স হইতে তিনি বিধবা এবং প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া বিস্তর উপবাস করিয়া দেখিয়াছেন;—নিয়মিত উপবাসে যথেষ্ট উপকার হয় বটে, কিন্তু অনিয়মিত উপবাসে কেবল দেহের শক্তিক্ষয়—তথা সাধনায় সামর্থ্য হারানো হয় মাত্র। নিজের যৌবনের কঠোর কৃচ্ছ সাধনার কাহিনী তিনি বলিতে লাগিলেন,—ইহার ফলে ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া নিজের সাধনা পর্য্যন্ত যখন তিনি পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন দৈবক্রমে এক জ্ঞানী সাধকের দর্শন পান এবং কিরূপভাবে তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন, দেহরক্ষায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হন, সে সব কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়া—শেষে সস্নেহ ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন "তোমাদের সব ভাল,—শুধু বড় খাওয়া কম, ওইটে ভাল নয়। তাই নীলিমাকে বল্‌ছিলাম যে শূলরোগকে তাড়াতে হলে, সুনিয়মে খেতে হয়, ঘুমতে হয়, —নিয়ম মত খাটতে হয়।"

ব্রহ্মচারী ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "সব পারবেন্ দিদিমা, শুধু সুনিয়মে খাওয়া আর ঘুম,—ওটা পারবেন্ না। নিয়ম-পালন সম্বন্ধে উনি পরকে চমৎকার উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু নিজে নিয়ম-পালন করতে মোটে পারেন না। দেখুন না, কেমন থামে ঠেস দিয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন, যেন এ পৃথিবীর জীব ন'ন।"

ব্রহ্মচারিণী চোখ বুজিয়া সুপ্তি-জড়তাচ্ছন্নের মত বসিয়া ছিলেন। সেই অবস্থাতেই বলিলেন "আস্তে। মা কাষে বসেছেন।"

ব্রহ্মচারী কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন "বুঝলেন দিদিমা, ইনি ভয়ানক এক-রোখা একলষেঁড়ে হয়ে পড়ছেন। এঁকে সঙ্গে করে একবার বাইরের জগৎটা ঘুরিয়ে আনতে পারেন?"

ব্রহ্মচারিণী এবার দৃষ্টি খুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন "তুমি বাইরের জগৎটার যে অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সে অংশে ঘুরতে যেতে আমার মোটে প্রবৃত্তি নেই, দিদিমাকে অনুরোধ করা বৃথা। বরঞ্চ দিদিমা যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে যেতে রাজী থাকেন, তবে যেতে পারি।"

দিদিমা বলিলেন "তোকে তোর সব চেয়ে বড় তীর্থ—এই স্বামীর কাছে রেখেছি। আবার তীর্থ কি?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বড় তীর্থ বটে, কিন্তু এখানকার পাণ্ডার খাঁই বড় বেশী।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমার স্নায়ুমণ্ডলী স্বভাবতঃই উত্তেজনা-প্রবণ—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সুতরাং এ কথা নিয়ে আলোচনা করা নিরাপদ নয়।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আচ্ছা, তুমি তাহলে দিদিমার সঙ্গে গিয়ে বিয়ে-বাড়ীটা ঘুরে এস। দেখে এস, সেখানে—মেয়েদের জাতীয় বিশেষত্বটা কি। কেমন দিদিমা, এঁর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার, নয়?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "সংসারীদের সংসার-ধর্ম্মের মাঝে অসংসারীদের গিয়ে অধিষ্ঠান হওয়া—কেবল উৎপাত করা। মানুষের ওপর ওতটা অত্যাচার করতে আমার সাহস হয় না। আমার পক্ষে এই নিভৃত কোটরটিই ভাল। এইখান থেকেই সকলের জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা করছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তবু যাবে না ?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদিমা বলিলেন "ঢের জপিয়েছি প্রসাদ, ও তোমায় ছেড়ে এখান থেকে নড়বে না। ও তোমাকে বড্ড ভালবাসে।"

মহা উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া ব্রহ্মচারী সবিদ্রূপে বলিলেন "সত্যি ভালবাস ?"

ব্রহ্মচারিণী নির্ব্বিকার মুখে বলিলেন "ভগবানের রাজ্যে যা কিছু ভাল,—তা ভালবাসি বই কি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি মুস্কিল! ও কথার অর্থ যে ভয়ানক ব্যাপক! আমায়—শুধু আমায় ভালবাস কি না, বল।"

ব্রহ্মচারিণী শান্ত স্বরে বলিলেন "তুমি কে আগে জবাব দাও। ওই হাত-পা ক'খানা? না, দন্ত-নিষ্পেষণ, না, বৃথা বাক্যবাগীশতা ? কোন্‌টা তুমি ?"

ব্রহ্মচারী আবার শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন "না, তোমায় নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে। মনে করেছিলাম দিদিমাকে সাক্ষী রেখে এই ভালবাসার হুজুগ নিয়ে একটা ঘোরতর উৎকট মামলা সৃষ্টি করব; দিদিমা একাধারে আমার সাক্ষী আর উকীল হবেন,—ব্যস্! তোমায় হারিয়ে দিয়ে সোজা শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা করে দেব! সব পণ্ড কর্‌লে!—"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আর একটু চেঁচাও। মা দূর থেকে মনে কর্‌বেন—এরা এখানে গাঁজার আড্ডা বসিয়েছে।"

সেই সময় মাকে পূজাগৃহের বাহিরে আসিতে দেখা গেল। ব্রহ্মচারিণী চট্ করিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী সংযত হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রণামের পর মা আসন গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মচারী বসিলেন। আগামী কল্য প্রত্যুষে যাওয়ার কথা উঠিল। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, আর থাকিলে চলিবে না। বিবাহের পর মা কলিকাতায় থাকিবেন, দিদিমা কাশী ফিরিবেন। ফিরিবার পথে এখানে আসিয়া দিনকতক থাকিয়া যাইবার জন্ত দিদিমাকে ব্রহ্মচারী বিস্তর অনুরোধ করিলেন। দিদিমা উত্তর দিলেন "সত্যবদ্ধ হও, সংসারী হবে—তবে আস্‌ব।"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তর হইলেন।

(৩৫)

পরদিন ভোরে মা ও দিদিমা তাঁহাদের বাড়ীর সরকারের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারীও সহসা ভয়ানক গম্ভীর হইয়া শাস্ত্র-চর্চ্চায় মগ্ন হইলেন। মন অত্যন্ত অশান্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, তিনি এইরূপই করিতেন। মনঃস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সাধ্যপক্ষে বাহিরের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিতেন না। ব্রহ্মচারিণীর সহিত বিশেষ প্রয়োজনে কথা চলিত মাত্র। এবার তাও বন্ধ হইল।

ব্রহ্মচারিণী অচঞ্চল, স্থির। তাঁহাকে খাইতে দিতে হইবে, সুতরাং কথা না বলিলে চলিবে না। অতএব যতটুকু কথা বলা আবশ্যক, ঠিক ততটুকুই বলিতেন। এ অবস্থায় ব্রহ্মচারীর বিনানুমতিতে কোন প্রশ্ন করা বা তাঁহার মানসিক অশান্তির কারণ অনুসন্ধানে উদ্যোগী হওয়ার তাঁর পক্ষে নিষেধ ছিল। তিনি নীরবে আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

কয়দিন এই ভাবে কাটিল। ব্রহ্মচারীর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না, বিমর্ষতা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অন্তরের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রসন্নতা হারাইয়া, বাহিরের স্বাস্থ্য ও শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। আবার আহার কমিতে লাগিল। ইহা লইয়া ব্রহ্মচারিণী অনুযোগ করিলেন, ব্রহ্মচারী বিরক্ত হইলেন। বাদানুবাদে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইবে ভাবিয়া ব্রহ্মচারিণী চুপ করিলেন।

বর্ষা পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর বাহিরে ভিজা রোয়াকে আর সব দিন বসা চলে না। ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে আশ্রয় লইলেন। বিনা প্রয়োজনে ব্রহ্মচারিণীর সে দিকে যাওয়া নিষেধ। তিনি নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া যখন মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে দিন কাটিতেছে, তখন হঠাৎ একদিন স্বামিজীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল, 'বিশেষ প্রয়োজন, আজই আশ্রমে যাওয়া চাই।' ব্রহ্মচারী যাইবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া লোক ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু যাইলেন না। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, আবার ডাক আসিল। এবারও ব্রহ্মচারী গেলেন না। আবার ডাক আসিল, তথাচ নয়। পরদিন স্বামিজী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তিনি এবার বাড়ী ঢুকিলেন না। বাহির হইতে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া, কি যে বলিলেন, কি যে করিলেন,—ব্রহ্মচারিণী জানিতে

পারিলেন না। সেই দিন, দুপুরেই ব্রহ্মচারী মহা ব্যস্ত হইয়া আশ্রমে ছুটিলেন।

এবার ব্রহ্মচারিণী শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু নিষেধ করিতে সাহস পাইলেন না। অথবা নিষেধ করিলেও তার ফল ভাল হইবে না, হয় ত তাতে ব্রহ্মচারীর অধিকতর রোখ চড়াইয়া দেওয়া হইবে, মনে করিয়া নিরস্ত রহিলেন। ওই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অভিচার-দক্ষ, হীনস্বার্থপ্রিয় তান্ত্রিকের তীব্র ইচ্ছাশক্তির নিকট ব্রহ্মচারীর পবিত্র নির্ম্মল উচ্চ ব্রতাবলম্বী ইচ্ছাশক্তি যে সহসা কেমন নিস্তেজ, কত অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা ব্রহ্মচারিণী একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছেন। শক্ত্যানন্দ স্বামী যদি উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের এই শক্তিকে নিযুক্ত করিতেন, তবে উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে শক্তি অর্জ্জন করিলেও শক্তির সদ্ব্যবহার তিনি শিক্ষা করেন নাই। অথবা চিত্তশুদ্ধির অভাবে, নীচ কামনার তাড়নায়, শক্তির অপ-প্রয়োগেই তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এই শক্তি প্রয়োগের ফলে আধ্যাত্মিক শক্তিহীন, দুর্ব্বল-চেতা মানুষদের আকস্মিক সর্ব্বনাশ সাধন করা যায়। তাহাদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পশুত্বের সর্ব্বনিম্নতম স্তরে পাঠান যায়,—চাই কি রোগ বা মৃত্যু ঘটানও অসম্ভব নয় বলিয়া শুনা যায়। শক্ত্যানন্দ স্বামী কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীর উপর শক্তিচালনা করিতেছেন তিনিই জানেন, তবে আপাততঃ ব্রহ্মচারীর দেহ মনের উচ্চ লক্ষ্য ও পবিত্রতা নাশের দিকেই যে তাঁর আক্রোশপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ স্থির হইয়া আছে,—এটুকু ব্রহ্মচারিণী যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন।

ব্রহ্মচারী বাহির হইয়া গেলে, ব্রহ্মচারিণী নিজের আসনে বসিলেন। কিন্তু আজ চিত্ত চঞ্চল হইতে লাগিল, কিছুতে তার একাগ্র-স্থিরতা আনা গেল না। কেবল মনে হইতে লাগিল ব্রহ্মচারীর জীবনের পবিত্র ব্রতের উপর স্বামিজীর এত আক্রোশ কেন? দুষ্টগ্রহ-কোপে ব্রহ্মচারীর এখন সাধনায় মনোযোগ নাই, সুতরাং সাধন-বল নিস্তেজ। সম্বল আছে শুধু—ওই অজেয় পবিত্রতা-বলটুকু। ওই শক্তি-বলেই ব্রহ্মচারী এখনও সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ওই বলটুকু কোনরূপে ধ্বংস হইলে,—তিনি যে কোথায় গিয়া পড়িবেন ভাবিতেও আতঙ্ক হয়! হয় ত তাঁর জীবন-সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইবে, হয় ত তাঁর ইহজন্মের উচ্চতর সার্থকতালাভ চেষ্টা ইহজন্মের মতই নষ্ট হইবে;—সে ক্ষতির তুলনা নাই। মূষিককে সিংহের শক্তি বুঝান যায় না,—চরিত্রহীনকে ব্রহ্মচর্য্যের দিব্যশক্তি বুঝান অসম্ভব। স্বামিজীর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,—নিজে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের কোন ধার ধারেন না, পরের ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠাও তাঁর কাছে একান্ত অসহনীয়!—অবোধ দুর্ব্বল শিশু নিজের পায়ে ভর দিয়া দশ হাত ছুটিতে পারে না, ছুটিতে গেলে তাকে দশবার পড়িতে হয়, দশবার উঠিতে হয়! কিন্তু কোন শক্তিমান সবল যুবা অবহেলায় দশ—শত—সহস্র হাত একছুটে পার হইতেছে দেখিয়া তার পা খোঁড়া করিয়া দিবার জন্য সেই দুর্ব্বল অক্ষম শিশু বায়না ধরিলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায়, ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে স্বামিজীর অবস্থাটাও কি সেইরূপ নয়? হয় ইহা একান্ত অন্ধ-নির্ব্বুদ্ধিতা, নয় ইহা নিগূঢ় ঈর্ষা-কাতরতা!—অথবা অপর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কি?

ব্রহ্মচারিণী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে গত দিনের অনেক স্মৃতি মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রখর অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগিয়া সেই সব ঘটনার রীতিমত তদন্ত সুরু করিল। দৃষ্টি—দূর দূরান্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল;—ব্রহ্মচারিণী অনেক দূর অবধি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া হাসিলেন! তাই ত, স্বামিজী ব্রহ্মচারীর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন সত্য, এতটা পরিশ্রম অপর কোন সাধারণ ব্যক্তির জন্য করিলে, সে ব্যক্তি এতদিনে চূর্ণ হইয়া যাইত! কিন্তু ব্রহ্মচারীর কি হইয়াছে? হইয়াছে,—সাময়িক মোহ উৎপাদন মাত্র! স্বামিজীর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির আঘাতে ব্রহ্মচারী কাঁপিয়াছেন, টলিয়াছেন, পথভ্রষ্ট হইতে উদ্যত হইয়াছেন,—কিন্তু তাঁর অজেয় পবিত্রতা-বল যথাসময়ে তাঁর নিদ্রিত বিবেককে জাগাইয়া তুলিয়াছে। বিবেকের বর্ম্মে ঠেকিয়া স্বামিজীর শাণিত অস্ত্রগুলি চূর্ণ হইয়াছে! স্বামিজীর প্রভাবের নিকট ব্রহ্মচারী সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করিলেও—স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই! অতএব—?

ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন! জন্মান্তরের কর্ম্মফলে ব্রহ্মচারীর এখন বড় দুঃসময় পড়িয়াছে; তাই স্বামিজীও

তাঁকে ভৌতিক উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত করিবার অধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু এ ভৌতিক উপদ্রবের জীবনীশক্তি কতটুকু?—সদ্বিবেচক ধনীর ধন-ভাণ্ডার অফুরন্ত হয়, কিন্তু অবিবেচক 'ফতো নবাবের' নবাবীর জারী কতক্ষণ টিকে? করিয়া লউন, স্বামিজি, করিয়া লউন! যতক্ষণ আপনার সুসময় আছে, এবং যথেচ্ছ শক্তি পরিচালনার অধিকার আছে,—ততক্ষণ দুষ্প্রবৃত্তির খেলা দেখাইয়া, নিরীহ মানুষের সৎপ্রবৃত্তিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু ভগবৎ-শক্তি নিদ্রিত নয়, এবং এ ভৌতিক শক্তি-বলে সেই চির-অপরাজের শক্তিকে পরাস্ত করা চলে না। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে—সে শক্তি চির-জাগ্রত আছে বলিয়াই ব্রহ্মচারিণী বিশ্বাস করেন!

ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত বিশ্বাস নির্ভরতায় অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। তার কাছে সব কিছু অমঙ্গল আশঙ্কাই অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বোধ হইল। ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন। মনকে সমস্ত বাহ্য ব্যাপার হইতে টানিয়া লইয়া যথানিয়মে স্থির করিলেন। তার পর জপে নিযুক্ত হইলেন।

পবিত্র—পবিত্রতম ভাবসত্তার অতলস্পর্শ গভীরতায় ডুবিয়া, মন অন্য রাজ্যে চলিয়া গেল। কোথায় রহিলেন শক্ত্যানন্দ স্বামী, কোথায় রহিল তাঁর নীচ-স্বার্থ-সাধনকারী অভিচার-শক্তি! ঝড়ের মুখে কুটার মত সে সমস্ত স্মৃতি কোথায় উড়িয়া গেল, তার খোঁজ রহিল না।

বৈকালে যথাসময়ে তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। ঘর দুয়ার ঝাঁটপাট দিয়া, গৃহস্থালীর খুচরা কায-কর্ম্ম করিয়া স্নানের জন্য যাইতেছেন, এমন সময় গোবরের মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিল "ওগো মা ঠাকরুণ, বাবা ঠাকুর কোথা? পাটনা থেকে লোক এসেছে, তেনাকে খুঁজছে।"

পাটনার লোক!—একটু চেষ্টা করিতেই স্মরণ হইল, কয়দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছেন, সেখানে ভাসুর-ঝির বিবাহ-উৎসব লাগিয়াছে। তাঁহাদের যাইবার জন্য বিশেষ জিদ করিয়া মা-ঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানা তিনি ব্রহ্মচারীর কাছে পৌছাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী যাওয়ার সম্বন্ধে এখনও কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। ইহার মধ্যে সহসা লোক উপস্থিত!

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তিনি ত বেরিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে বোধ হয় ফিরবেন। কে লোক এসেছেন, বাড়ীর মধ্যে ডাক। কজন এসেছেন?"

উত্তরে গোবরের মা জানাইল একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী, আর একটি আট নয় বৎসরের বালক আসিয়াছে।—ছেলেটির নাম মণি।

মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারিণীর মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মন, উচ্চ ভাব-রাজ্য ছাড়িয়া, নিমেষ মধ্যে সেই অতীতের স্নেহময় সংসার-রাজ্যে, সহস্র স্নেহবন্ধনের মধ্যে, একান্ত-নিরীহ বধূ-জীবনের অঙ্কে ফিরিয়া আসিল। সেখানে গুরুজনদের নিত্য-কল্যাণবর্ষী স্নেহদৃষ্টির সামনে তিনি কত গভীর স্নেহযত্নের পাত্রী ছিলেন—সেখানে পরিবারস্থ প্রিয় পুত্র-কন্যাগণের কত অন্তরঙ্গ, কত মমতার 'ছোট-মা' ছিলেন!

আজ সংসারের সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছেন। মনে হয়, সংসারাভিলাষী আত্মীয়-স্বজনদের প্রত্যেকের স্বার্থে অল্প-বিস্তর মাত্রায় আঘাত করিয়াছেন,—এ আচরণে প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর ক্ষুব্ধ, দুঃখিত! তাঁহাদের সামনে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস হয় না, সঙ্কোচে মাথা নুইয়া পড়ে! কিন্তু এই স্বার্থ-বোধহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ-দুলালগুলি,—পরম স্নেহাস্পদ প্রিয় শিশুগুলির নিকট কোন ভয় নাই! ইহাদের কাছে তিনি সেই ছোট-মা আছেন এবং হে ভগবান, তাই থাকিতেই দাও!

ব্রহ্মচারিণী সাগ্রহে বলিলেন "মণি! সে যে আমাদের সেজ ছেলে! ডাক, ডাক, দেখি তার চাঁদ মুখখানি! কতদিন দেখি নি —"

ডাকিতে হইল না। একটি পাৎলা ছিপ্‌ছিপে সুন্দর সুকুমার বালক ব্যগ্রভাবে দুয়ারের পাশ হইতে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল, ব্রহ্মচারিণীব সাড়া পাইয়া সলজ্জ হাসিমাখা মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ব্রহ্মচারিণী অগ্রসর হইয়া, বাঁ হাতে বালকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইয়া শিশুর মত হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন "আমার ক্ষুদে বাবাটি! তুমি এসেছ! এস, এস,—সঙ্গে কে এসেছেন?"

বালক লজ্জায় ব্রহ্মচারিণীর বাহুপাশে মুখ লুকাইয়া উত্তর দিল "বুধন ভেওয়ারী।"

বুধন জ্যাঠামহাশয়দের কারবারের দীর্ঘকালের পুরাতন কর্ম্মচারী, জ্যাঠামহাশয়দের বিশ্বস্ত মন্ত্রী, অতএব সংসারের একজন গণ্যমান্য মুরুব্বি বিশেষ! ব্রহ্মচারিণী সসম্ভ্রমে মাথায় কাপড় টানিয়া বলিলেন "তেওয়ারী ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর ডাক। হাত পা ধুয়ে জল খান। গোবরের মা, তুমি একটু দাঁড়িয়ে যেও বাছা।"

তেওয়ারী ডাক শুনিয়া বোঁচকা বুঁচকি লইয়া ধীর মন্থর গমনে বাড়ীর ভিতর আসিলেন। ষাট পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ কনৌজ ব্রাহ্মণ। শুধু কারবারের লোক নহেন,—প্রভুগোষ্ঠির ছেলে পিলেদের কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সেই ছেলেরা এখন বড় হইয়াছে, ছেলে পিলের বাপ হইয়াছে। সুতরাং পরিবারস্থ সকলেই এই বৃদ্ধকে সমীহ করিয়া চলে। ব্রহ্মচারিণী দূর হইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন, হাত পা ধুইবার জল দিলেন। বৃদ্ধ সসঙ্কোচে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অস্ফুট স্বরে 'জয়স্তু' বলিয়া প্রণামের অত্যাচার সহিলেন, কিন্তু পা ধুইবার জল গ্রহণ করিলেন না। নিজেই খোঁজ করিয়া কুয়াতলায় গিয়া জল তুলিয়া হাত মুখ ধুইলেন। তার পর আসনে বসিয়া ভাঙা বাংলায় বলিলেন "সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি মা, আপনাদের মেয়ের বিয়ে। আর তো এই বন-বাদাড়ে লুকিয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

ব্রহ্মচারিণী ঘোমটার ভিতর হইতে নিঃশব্দে মৃদু হাসিলেন। তেওয়ারীকে জল খাইতে দিলেন, মণিকে হাত-মুখ ধোওয়াইয়া জলযোগে বসাইলেন। খাইতে খাইতে তেওয়ারী বলিলেন "মণি, ছোটমাকে জিজ্ঞাসা কর তো, ছোটবাবু কতদূরে গেছেন? আমাকে কেউ সেখানে নিয়ে যেতে পারে না?"

লইয়া যাইবার লোক আছে, গোবরের মার ছেলে বা নাতিরা যে কেহ শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে এখনই বৃদ্ধকে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই পথশ্রান্ত বৃদ্ধকে ততদূরে পাঠাইয়া ক্লেশ দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই অদ্ভুত বৈরাগ্যবান বৈরাগীর আড্ডায় গিয়া বৃদ্ধ যদি তাঁহার মাননীয় স্নেহাস্পদ প্রভুকে স্বামিজীর পদসেবা-নিরত দেখেন, তবে প্রভুর সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে ক্ষমা করা তাঁর ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িবে, সে আশঙ্কাও আছে।

ছোটমার কাছে চুপি চুপি কথাটার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া মণি জবাব দিল "ছোট্‌কা বোধ হয় এখুনি ফিরবে। তোমায় আর কষ্ট করে যেতে হবে না। বাইরের ঘর খুলে বসে তামাক টামাক খাও, জিরোও এখন।"

বাহিরের বৈঠকখানা ঘরটা চাবিবদ্ধ থাকিত। পাছে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা লোকেরা আসিয়া আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করায়, সেই ভয়ে ব্রহ্মচারী সে ঘর খুলিয়া কখনও বসিতেন না। কালে-ভদ্রে কেহ আসিলে সেখানা ব্যবহৃত হইত।

তেওয়ারী জল খাইয়া বাহিরের ঘরে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন "এই বড় বোঁচকায় আপনার গহনার বাক্স, খরচের টাকা, আর কি সব জিনিসপত্র দিয়েছেন, মণির পকেটে চাবি আর চিঠি আছে, দেখে শুনে মিলিয়ে নেন মা। বড় বাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে কলকাতায় বিয়ের বাজার করতে গেছেন। পর্শু ফিরবেন্‌। ফের্‌বার্ পথে আমাদের তুলে নিয়ে এক সঙ্গে বাড়ী যাবেন। আপনি ছোটবাবুকে বলে বুঝিয়ে পড়িয়ে যেতে রাজী করান মা,—আমি এই কথা আপনাকে বলবার জন্যে এসেছি। কর্ত্তা-বাবুরা, গিন্নি মায়েরা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে যেতেই হবে।"

ব্রহ্মচারিণী ঘোমটার ভিতর চুপ করিয়া রহিলেন। তেওয়ারী তামাক ইত্যাদির সরঞ্জাম পূর্ণ ছোট বোঁচকা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মণি চিঠি ও গহনার বাক্সের চাবি দিল। খামের ভিতর একরাশি পত্র। বাড়ীর প্রত্যেক কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়কে আলাদা করিয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্রহ্মচারিণীর নিরাভরণা গৈরিকধারিণী মূর্ত্তি তাঁহাদের সহনীয় হইবে না বলিয়া তাঁর অলঙ্কারও পাঠাইয়াছেন। এ গুলি পরিয়া তিনি যেন বিবাহবাটীর উপযুক্ত হইয়া অতি অবশ্য আসেন ইত্যাদি অনুরোধ।

শেষে লেখা হইয়াছে, মণি স্বয়ং গিয়া ছোটমাকে আনিবার জন্য অত্যন্ত উপদ্রব করায়, বাধ্য হইয়া তাহাকে পাঠান হইল। আসিতে যেন অন্যথা না হয়।

চিঠিগুলি পড়িয়া ব্রহ্মচারিণী খামে মুড়িয়া রাখিলেন। ব্রহ্মচারীর মতামতের উপরই এ ব্যাপারের চরম মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, তাতে যে কোন উপলক্ষ্যেই হউক, স্বামিজীর সংস্রব হইতে ব্রহ্মচারীকে বিচ্ছিন্ন করাই মঙ্গল। কিন্তু দুষ্ক্রিয়াশীল অসংসারীর

সংসর্গ অপেক্ষা, সৎকর্ম্মশীল সংসারীদের সংসর্গ যে নিরাপদ, এ কথা ব্রহ্মচারীকে বুঝান সহজ নয়।

ব্রহ্মচারিণী রোয়াকের সিঁড়িতে বসিয়া মৌন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মণি নিকটে বসিয়া একান্ত মনোযোগে ব্রহ্মচারিণীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে অভিমান-ভরা অনুযোগের স্বরে বলিল "হ্যাঁগা ছোট মা, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন?"

ব্রহ্মচারিণী চিন্তা-গতি সংযত করিলেন। সস্নেহে বালকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন "কেমন হয়ে গেছি বাবা?"

বালক গভীর অভিমান-ভরে বলিল "এই রোগা হয়ে গেছ, কালো হয়ে গেছ,—আর এমন ভিকিরীদের মত কাপড় পরেছ কেন? তুমি কি ভিকিরী?"

বলিতে বলিতে রাগে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। সস্নেহে তার মাথাটি কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন "বালাই ষাট্! আমার এমন রাজা-বাবা থাক্‌তে আমি ভিখারী হতে যাব কেন?"

বালক দারুণ অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "তবে কেন এমন কাপড় পরেছ? এ, আমার ভাল লাগে না। তুমি ভাল কাপড় পর্‌বে চল।"

ব্রহ্মচারিণী তার অভিমান ভুলাইয়া দিবার জন্য, মহা সমাদরে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন "পর্‌ব—পর্‌ব। তুমি আমার ছোট্ট বাবা—তোমার হুকুম মান্‌ব বই কি!"

"তবে ভাল কাপড় পরো, গয়না পরো—"

"পর্‌ব এখন। যখন তোমার বিয়ে হবে,—আমার বৌমা আসবে—"

সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল "না,—তোমার বৌমা আস্‌বে না। আমি ছোট্‌কার মত বিয়ে কর্‌ব না।"

ব্রহ্মচারিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার ছোটকাকা বিয়ে করেন নি? কে বল্‌লে তোমায়?—তাহলে আমি কোত্থেকে এলাম?"

বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "তুমি ত আমাদের বাড়ী থেকে এসেছ। তুমি ত আমাদের ছোট-মা।"

ব্রহ্মচারিণী স্তব্ধ! ইহার পর কি উত্তর দিবেন সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না। অপ্রস্তুতের মত হাসিতে লাগিলেন! তিনি শুধু ইহাদের ছোট-মা, আর কাহার কেহ নহেন!

বালক নিজের মনেই মাথা নাড়িয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল "আমিও এবার থেকে কম্বলে শোব, হবিষ্যি কর্‌ব, দেশান্তরী হ'ব। কেমন ছোট-মা, তাহলে আমি ছোট্‌কার মত হ'ব ত?"

একটু হাসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তাহলে তোমার কাকার মত হবে বটে, কিন্তু যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ কথা নয় বাবা। এ সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। হবিষ্য কর্‌বে কি? দেশান্তরী হবে কি দুঃখে?"

বালক তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া আগ্রহের সহিত বলিল "কেন? তা'হলে তুমি আমার কাছে থাক্‌বে। কেমন, থাকবে ত ছোট-মা? আর আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না ত? তোমার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে, বড় কান্না পায়।—খালি খালি কান্না পায় ছোট-মা!"

ব্রহ্মচারিণী নির্ব্বাক! বালকের এত বড় ত্যাগ বৈরাগ্যের মূলে কত বড় অন্ধ মমতা লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিলেন,—বাৎসল্য স্নেহ কি জিনিস তাহা সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া মুহূর্ত্তের জন্য অনুভব করিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না, শুধু দুহাত বাড়াইয়া, এই অন্ধ স্নেহশীল বালককে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন। বালকের ললাট চুম্বন করিয়া অশ্রু-সিক্ত নয়নে নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

বালক দুহাতে তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কোলের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল "বল ছোট-মা, আর কোথাও যাবে না? এবার যদি যাও, আমি লাঠি দিয়ে, তোমার পা খোঁড়া করে দেব।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে কে বলিলেন "সেই ভাল। দে, পা দুখানা খোঁড়া করে,—গতি রোধ হোক্!"

চকিতে দুজনেই পিছন ফিরিয়া চাহিলেন! দেখা গেল, বক্তা স্বয়ং ব্রহ্মচারী! অদূরে দাঁড়াইয়া পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

তাম্রলিপ্ত ও কিরণসুবর্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রলাল মৈত্র বি-ই

(প্রতিবাদের উত্তর)

বিগত ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমি যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম, ও তৎপরে প্রভিনাথ বাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' দেখিতেছি তাহার পুনরায় প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায় মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রভিনাথ বাবুর মতই তমলুকের অধিবাসী। উপেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "প্রাচীন তাম্রলিপ্তই যে বর্ত্তমান তমলুক তৎসম্বন্ধে বহু পণ্ডিতের লিপিবদ্ধ দৃঢ় কারণ সঙ্কলিত অসংখ্য প্রমাণ ও বহুকাল হইতে এই ধারণাও সত্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ সুরেন্দ্র বাবুর স্বীয় বুদ্ধি-প্রসূত অভিনব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটী বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।" অপর স্থানে লিখিয়াছেন "সুরেন্দ্র বাবু যে সমস্ত অভিনব অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন—কোন বিশেষজ্ঞ প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে না করিলেও প্রতিবাদের খাতিরে কিঞ্চিৎ না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।" আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আলোচনা পরিচালনা ও যথাযথ প্রতিবাদ করিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তমলুক মহকুমাবাসী হইয়া তমলুকের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় কয়েকটী কথা না লিখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছি না।" বলা বাহুল্য যে বিশেষজ্ঞদিগের না হউক আমার উক্ত প্রবন্ধটী তমলুকবাসী ভদ্রমহোদয়গণের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

উপেন্দ্র বাবুর লেখা হইতে বুঝিতে পারিলাম আমার "অভিনব অনুমানগুলি" "বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি" করিয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত তমলুকে অবস্থিত হউক কিম্বা সপ্তগ্রামের নিকট অবস্থিত থাকুক, ইহাতে বাস্তবিকই কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তাহা হইলেও লোকে বোধ হয় বা বাতিকগ্রস্ত হইয়াই এ সব বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকে; এবং কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মহামতি কানিংহাম্‌, ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিতগণ যে উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের দেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত এই জনপদের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমিও সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। আমি জানি যে তাঁহাদিগের মীমাংসার বিরুদ্ধ মত প্রচার করা কত কঠিন। তবুও চেষ্টা করিয়াছি। আমার দৃঢ় ধারণা—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহার যদি সম্যক সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমাকে "অভিনব অনুমানের" আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয় লিখিতেছি—

প্রথমতঃ, কানিংহাম সাহেবের কথাই ধরা যাউক। তিনি জানিতেন যে গ্রীস দেশীয় লেখক প্লিনি পালিবোথ্রা (পাটলিপুত্র) হইতে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম স্থান ৬৩৭॥ রোমান মাইল অর্থাৎ ৫৮৭ ইংরাজি মাইল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্লিনির লেখা হইতেই আমরা মেগাস্থানিসের বর্ণিত ভারতবর্ষের অনেক বিবরণ জানিতে পারি। ঐতিহাসিক হিসাবে প্লিনি বিখ্যাত লোক ছিলেন। এ সব জানিয়া শুনিয়াও কানিংহাম সাহেব প্লিনির লিখিত উক্ত সংবাদটী ভ্রম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি মনগড়া ভাবে দূরত্বটী ৭৩৭॥ মাইল অর্থাৎ ৬৭৮ ইংরাজি মাইল ধরিয়া লইয়াছেন (১)। তিনি যদি প্লিনির লেখা ওরূপ ভাবে উড়াইয়া না দিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, বর্ত্তমান গঙ্গার মোহানা হইতে ৯০ মাইল উত্তরে অর্থাৎ কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গঙ্গার মোহানা হয় এবং তমলুক সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত থাকে। প্লিনি তাম্রলিপ্তকে Taluctoe বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

তার পর হাণ্টার সাহেবের কথা। তিনি সপ্তগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম (সপ্তর্ষির নগর) পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভ হইতে হুগলীতে পর্ত্তুগীজদিগের সহর পত্তন করিবার সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের প্রধান বন্দর ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে Grand Trunk Roadএর ধারে ১২খানি ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হয়। ইহাই বর্ত্তমান সাতগাঁও। এই স্থান হইতে সরস্বতী নদীর ধার পর্য্যন্ত পশ্চিমস্থিত লাল ঝাপা নামক গ্রামের সীমা অবধি স্থানটী বড়ই নতোন্নত—দেখিয়া মনে হয় ইহা একটী প্রকাণ্ড বসবাসের স্থান ছিল। রাস্তার অনতিদূরে একটী বড় স্তম্ভের শিরোভাগ জমির উপর দৃষ্টিগোচর হয়। "কলিকাতা

---

(১) According to Pliny the distance of Palibothra from the mouth of the Ganges was only 637,5 Roman miles; but his numbers are so corrupt that very little dependence can be placed upon them. I would, therefore, increase his distance to 73'5 Roman miles, which are equal to 678 British miles.—Cunningham's Ancient Geography of India by S. N, Majumder. Page 243.

রিভিউ" পত্রে বহুকাল পূর্ব্বে রেভারেণ্ড লঙ্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লিনির সময় হইতে পর্ত্তুগীজদিগের আগমন-কাল পর্য্যন্ত সাতগাঁওই বঙ্গদেশের রাজকীয় বন্দর ছিল। এখন ইহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। উইলফোর্ড সাহেব এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—Ganges Regia, now Satgaon, near Hoogly. ইহা একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে প্রাচীন রাজাদিগের আবাস ছিল; এবং কথিত হয়, ইহার আকার অতিশয় বৃহৎ ছিল; এবং একশতখানি গ্রাম ইহার কুক্ষিগত ছিল। এই নামের অর্থ হইতেছে সাতখানি গ্রাম, যে গ্রামগুলি সাতটী ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ, সাতগাঁতে ভগীরথ গঙ্গা আনিবার সময় একবার বিশ্রাম করিয়াছিলেন। একখানি পুরাণে লিখিত হয়, কান্যকুব্জ-রাজ প্রবৎসের সাতটী ছেলে ছিল। তাঁহারা, সকলেই ঋষি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতে সাতখানি গ্রামের নাম হইয়াছে। ইহাদিগের নাম—অগ্নিদ্র, রোমনক, বপিসন্ত, সৌরবানন, বাড়, সাবন, এবং দ্যুতিদন্ত। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং প্লিনির লেখা হাণ্টার সাহেব বোধ হয় অবিশ্বাস করেন নাই। (২) সেই সময় হইতেই ইহা বঙ্গদেশের রাজকীয় বন্দর ছিল, এ কথা জানিয়াও তমলুকে আর একটী তাদৃশ বন্দর ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে তিনি ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই। যিনি উভয় স্থানেরই কিম্বদন্তী-ঘটিত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ৭০ মাইলের ভিতরে একই দেশের দুইটী রাজকীয় বন্দর একই সময়ে অবস্থিত থাকা সন্দেহের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই।

আমাদের দেশের কোন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক তমলুকের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য লিখিয়াছেন যে, তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরটী একটী বৌদ্ধ-স্তূপের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় কোন সাধারণ রাজমিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিতে পারিত যে, বর্গভীমার মন্দিরের মত প্রকাণ্ড মন্দির কেন, একটা অনতিবৃহৎ ইমারতও তোলা-মাটীর স্তূপের উপর প্রস্তুত হইতে পারে না। এই সামান্য পর্য্যবেক্ষণের অভাবে ঐ উক্তির দ্বারা তমলুকের প্রাচীনত্ব প্রমাণ তো হয়ই নাই; পরন্তু—ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু সমাজের উপর বৌদ্ধ কীর্ত্তিধ্বংসকারী বলিয়া অযথা কলঙ্কারোপ করা হইয়াছে।

গঙ্গার মোহানার অবস্থান সম্বন্ধে প্লিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে অশ্রদ্ধেয় বোধে পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তাহার আর একটী কারণের কথা লিখিতেছি। সকলেই জানেন, বাঙ্গালার ব-দ্বীপ দুইটী প্রকাণ্ড নদীর দ্বারা বাহিত পলি হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইতেছে। গঙ্গা নদী বঙ্গের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বমুখী হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং ব্রহ্মপুত্র ইহার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং উভয়ে সংযুক্ত হইয়া পরে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণস্থ সমুদ্রে সঙ্গত হইতেছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থল চিরদিন এক স্থানে ছিল না। কখন ব্রহ্মপুত্র গঙ্গাকে কোণঠাসা, কখনও বা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বক্তিয়ার খিলজীর তিব্বত অভিযান ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হওয়ার ইতিহাস বিশ্বাস করিতে গেলে মনে করিতে হয় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মপুত্র ত্রিস্রোতার সহিত এক হইয়া রঙ্গপুর সহরের নিকট দিয়া বর্দ্ধনকোটের পার্শ্বে প্রবাহিত হইত। (৩) মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, রঙ্গপুর হইতে ই, বি, রেলের সমসূত্রে প্রবাহিত ক্ষীণতোয়া যমুনা নদী, সিরাজগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা যমুনা নদীর পূর্ব্ব-স্মৃতি বহন করিতেছে। রেনেল সাহেব বলেন রাজসাহীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মাধনগর ই, বি, রেল ষ্টেশনের দিকে বারলই (বড় নদী) নামক যে ক্ষীণতোয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং নারদ নামক নদী যাহা নাটোর ষ্টেসনের নিকট দেখা যায়, উহাই এককালে পদ্মা বা গঙ্গা নদীর খাত ছিল। (৪) ফারগুসন সাহেব তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পরস্পর আধিপত্য লাভের জন্য দ্বন্দ্বের একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৫) এই সমস্ত বর্ণনা ও ঘটনাবলী দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গঙ্গার ব-দ্বীপের অগ্রগতি কোন কালেই বেশী একপাশ হইয়া বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই—প্রায় একই পূর্ব্ব-পশ্চিম রেখায় অবস্থিত থাকিয়া অগ্রসর হইয়াছে। হুয়েন সাঙ্গ যখন এ দেশে আসেন তখন তিনি সমতট ও তাম্রলিপ্ত উভয়কেই সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী স্থানরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গের মানচিত্র সম্মুখে ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমতট বা যশোর তৎকালে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী স্থান হইলে ব-দ্বীপ ত্রিকোণ ভাবে বদ্ধিত হইয়াছিল মনে না করিলে তমলুককে উপসাগরের শীর্ষদেশে কল্পনা করা যায় না—সপ্তগ্রামকেই ঐরূপ মনে করিতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষে এই সব প্রমাণ উপেক্ষা করা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধিগণেরই বিবেচ্য।

প্লিনির লিখিত সাগরের দূরত্ব রামায়ণ হইতেও কিছু প্রমাণ করা যায়। "বালকাণ্ডে" লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তাড়কা বধার্থ রওনা হইয়া একরাত্রি গঙ্গা ও সরযূ নদীর সঙ্গম-স্থল অঙ্গদেশে বিশ্রাম করেন। তৎপর অতি প্রত্যূষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা নৌকাযোগে গঙ্গা ও সরযূ (ঘোগরা) নদীর সঙ্গমস্থলে উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করেন। তৎকালে সেই দেশকে করূশ দেশ বলিত। বর্ত্তমান মানচিত্রে ইহাকে আরা জেলা লেখা হয়। করূশ দেশের অরণ্য মধ্যে তাড়কা রাক্ষসীর সহিত রামের যুদ্ধ হয় এবং বোধ হয় সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাড়কা নিহত হয়। রাত্রিকালে বনমধ্যেই তাঁহারা অবস্থান করেন। তৎপর দিন তাঁহারা চলিতে চলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটী পর্ব্বতের সানুদেশে সুরম্য উপবন দেখিতে পান মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম জানিতে পারেন যে, ঐ স্থানের নামই

(২) Hunter's Statistical account of Hugli, page 307 to 309.

(৩) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২২।

(৪) District Gazetteer—Rajshahiye.

(৫) Oldham's Geology of India.—page 441.

"সিদ্ধাশ্রম"। ঐ স্থানেই মহর্ষি তাঁহার যজ্ঞস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ঐ যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ জন্তই রামকে আনয়ন করা হইয়াছে। অতঃপর মহর্ষি তথায় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাড়কানন্দন মারীচ তদীয় দলবল সহ ঐ যজ্ঞবিঘ্ন করিতে আরম্ভ করে। তখন মহাবীর রাম ভীষণ এক তীর প্রহার করিয়া মারীচকে এক শত যোজন দূরে মহাসমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তীর দ্বারা অতদূরে নিক্ষেপ করার কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও দূরত্ব অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। সুধী পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আরা জেলা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, আর যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহারা যদি আরা জেলার মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, গঙ্গা হইতে সোন নদ পর্য্যন্ত সমগ্র আরা জেলার মধ্যে উহার দক্ষিণাংশে একই মাত্র পর্ব্বত বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে স্থান হইতে এক্ষণে Kalyanpur Lime Works, Octavious Steel Company প্রভৃতি চুণ সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত আছে; এবং আরা সহর হইতে দক্ষিণ মুখে যাইতে গেলে ঐ পাহাড়টী প্রথমে সাসারণ (Sasaran) নামক স্থান হইতে দৃষ্টি-গোচর হয়। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে ঐ সাসারণ বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই মহর্ষি বিশ্বামিত্র-বর্ণিত সিদ্ধাশ্রম ছিল এবং এই স্থান হইতে শত যোজন দূরে মহাসমুদ্র ছিল। প্রাচীন কালে পাটলিপুত্র হইতে তক্ষশীলা পর্য্যন্ত যে রাজকীয় রাস্তা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে ৬০০০ হাজার ফুট অন্তর অন্তর ক্রোশ-চিহ্ন দেওয়া ছিল, এ কথা মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, তদ্দেশে তৎকালে চারি হস্তে এক ধনু ও এক সহস্র ধনুতে এক ক্রোশ এই মাপই প্রচলিত ছিল। চির-প্রচলিত ৪ ক্রোশে এক যোজন গণনা করিলে দেখা যায় যে সাসারণ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মহাসমুদ্র তখন ৪৫৫ মাইল দূরে ছিল। অবশ্যই সেকালে মানচিত্র প্রচলিত না থাকায়, ইহা যে-রাস্তায় শীঘ্র যাওয়া যাইত তাহারই মাপ,—ঘুরিয়া-ফিরিয়া নদীর রাস্তায় মাপিলে আরও এক শত মাইল বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫৫০ মাইল হইবার কথা। মনীষিগণ মনে করেন যে, রামায়ণ খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সমসময়ে লেখা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা প্লিনির লিখিত দূরত্ব সমর্থন করে।

উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"এতদ্ব্যতীত সুরেন্দ্রবাবুই লিখিয়াছেন 'সাধারণতঃ ১০০ শত বৎসরে ১ ফুট বাড়ে'। সুতরাং এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম রহিয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করেন। যদি তাঁহার মত ধরা যায় তাহা হইলে এই তমলুক যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে না, এ কথা তিনি বলিতে পারেন কি?" উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, আমি যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহা সমস্তই Indo-Gangetic Plain হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে বিশেষ ব্যতিক্রমের কোন চিহ্ন পাই নাই। এক শত বৎসর বড় অল্প সময় নহে এবং ১ ফুট একটা প্রকাণ্ড উচ্চতা নহে। উচ্চতার সামান্য ইতর-বিশেষ হইলেই সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে বহু পার্থক্য আসিয়া পড়িত এবং তাহা নিশ্চয়ই আমার ধৃত প্রমাণগুলিতে প্রতীয়মান হইত। তমলুক সম্বন্ধে আরোও ভাবিবার বিষয় আছে। তমলুকের পূর্ব্ব ধারে রূপনারায়ণ বা দারুকেশ্বর নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া দামোদর নদের মতই বৃহৎ কংসাবতী (কপিশা) নদী প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে বিপুলকায় গঙ্গার শাখা সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। এই তিন নদীর সম্মিলিত পলিতে সম্পূর্ণ মহকুমাটী যুগ যুগ ধরিয়া সমৃদ্ধ হইতেছে। সুতরাং ব্যতিক্রম যদি কিছু হইতে হয়, তবে ইহার উচ্চতার সমৃদ্ধির দিকেই হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ইহার লেভেল (level) এখনও ৮ হইতে ১০ M. S. L. এর কোঠায় রহিয়াছে। বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে—Indo-Gangetic Plainএর উন্নতির হারের ব্যতিক্রম স্বীকার করিতে পারি না। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ বাবুকে আমি আমার গণনার বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা তিনি করিতে পারেন নাই। সুধী পাঠকগণ মধ্যে যদি কেহ কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, আমাকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

তমলুক ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অবনমিত হইয়া থাকিলে তমলুকের বর্ত্তমান নিম্নাবস্থা হইতে পারিত ইহা আমি অস্বীকার করি না এবং বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ যে অন্ততঃ তিনবার অবনমিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু হুয়েন সাঙের আসিবার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর যে ইহা অবনমিত হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই। শেষোক্ত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে গঙ্গার মোহানার অবস্থান সম্বন্ধে যে নূতন তথ্যগুলি সন্নিবেশিত করিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় তমলুক যে প্লিনির সময়ে সমুদ্রগর্ভে ছিল ইহা আর অস্বীকার করা যাইবে না।

উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "যদি সেই সেই স্থান-বিশেষের Shot level হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রুতিবাবুও তমলুকের যে কয়টী স্থান-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সুরেন্দ্রবাবু উড়াইয়া দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন কেন জানি না।" আমি বাস্তবিকই দুঃখিত যে লেখকের এই উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি শ্রুতিবাবুর প্রবন্ধটী এবং আমার উত্তর পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু এমন কোন স্থানের বর্ণনা দেখিতে পাই নাই, যাহার উত্তর আমার প্রবন্ধ মধ্যে নাই। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক লেখক কিসের উত্তর পান নাই দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "সুরেন্দ্রবাবুর মতে যদি ১০০ শত বৎসরে ১ ফুট স্তর জমে ধরা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের যুদ্ধের সময় সপ্তগ্রাম সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছে কি প্রকারে সম্ভব হয়।" আর এক স্থানে লিখিয়াছেন 'সুরেন্দ্রবাবুর স্তর হিসাবের মতে মহাভারতের যুদ্ধের সময় সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এমন কি ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইউয়ান্ চোয়াংএর সময়েও সাগরের mean level হইতে মাত্র ॥৫ ফুট উচ্চ ছিল। এ অবস্থায় সেই স্থান তাম্রবর্ণের শক্ত পাথর মাটীর (Laterite) দেশ ছিল এবং সেই অনুসারে তাম্রলিপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ উক্তি বা অনুমান কতদূর সমীচীন তাহা পণ্ডিত-গণের বিবেচ্য।" উত্তরে বলিতে চাই, লেখক দেখিতেছি হাওয়ার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করিয়াছেন—আমার প্রবন্ধটী মনোযোগ সহকারে পড়িবারও অবকাশ পান নাই। আমি তজ্জন্য পুনরায় আমার প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি।

"মহাভারতে যে দেশটাকে তাম্রলিপ্ত বলে তাহা এতদঞ্চলের তাম্রবর্ণ পাথর (La erite) ও মাটী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। এই লালবর্ণের পাথর ও মাটী আর্য্যাবর্ত্তের তুলনায় বাঙ্গালার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারায়ণগড় হইতে আরম্ভ করিয়া মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা, মান্দারণ, বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশ, খণ্ডঘোষ, বৰ্দ্ধমান, মানকর, নসিগ্রাম, গোকর্ণ, শিউরি, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত কোথাও ২০ মাইল, কোথাও ৫০, কোথাও বা ১০০ মাইল বিস্তার বিশিষ্ট একটা তাম্রবর্ণ মাটী ও পাথরের দেশ রহিয়াছে। এটী গঙ্গার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত। এই দেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়ীয় জাতিদিগের নিকট ইহার রংয়ের জন্যই ইহা "লাঢ়" বা "রাঢ়" নামে পরিচিত ছিল। পরে বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা যখন এ দেশে আসেন, তখন তিনি এই দীপ্তি-শালী (Glossy) পাথরের রং দেখিয়া ইহাকে সুহ্ম বলিয়াছিলেন। তৎপরে যে আর্য্যরা আসিয়াছিলেন তাঁহারাই ইহার তাম্রবৎ রং দেখিয়া ও অধিবাসীদিগের নিকট ইহার "লাঢ়" বা "রাঢ়" নাম শ্রবণ করিয়া ইহাকে তাম্রলিপ্ত বা তামা দ্বারা লিপ্ত দেশ বলেন। বাস্তবিকই এই পাথর ও মাটীর ভিতর বর্ত্তুলাকার যে সমস্ত চাকচিক্যময় লৌহখণ্ড দেখা যায়, তাহা দেখিতে ঠিক তাম্র-নির্ম্মিত বর্ত্তুলের মত। রাঢ় দেশের সীমার সহিত রাঙ্গামাটী বা ল্যাটেরাইট্-পাথর-বহুল দেশের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া স্বতঃই ইহা মনে উদয় হয়।" (ভারতবর্ষ, ১৩৩৫, অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ৯১৮—৯১৯) তারপর "হেমচন্দ্র অভিধানে 'দামোলিপ্ত' বা 'বিষ্ণুগৃহ' বলিয়া একটী দেশের নাম আছে, তাহা তাম্রলিপ্ত দেশের সহিত অভিন্ন (ইহা অভিধানের মত—নিজ মত নহে) * * * যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে দামোদর নদটী বৰ্দ্ধমান সহরটাকে কেন্দ্র করিয়া ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাহু দ্বারা যুগ যুগ ধরিয়া কালনা হইতে রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত তালবৃন্তের ন্যায় একটী অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ভূমিখণ্ড তৈয়ারী করিতেছে। ইহার একটা শাখা এককালে কালনার নিকট ভাগীরথীতে মিলিত। তৎপর ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী শাখা কুন্তি নাম গ্রহণ করিয়া সপ্তগ্রামের নিকট নৌসরাইতে মিলিত। ইহার আর একটী শাখা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেও উলুবেড়িয়ার ১ মাইল উত্তরে সিজবেড়িয়া গ্রামের নিকট মিলিত। ইহার আর একটী শাখা বৰ্ত্তমানে ফলতার সম্মুখে হুগলী নদীতে মিশিতেছে। বৈদেশিক নাবিকগণও উহাকে নানা স্থানে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অঙ্কিত মানচিত্রে লেখা আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড যে দামোদর দ্বারা লিপ্ত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইহাকে "দামোলিপ্ত" বলিলে কি হেমচন্দ্রের অভিধান বা মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? এই প্রকার দামোলিপ্ত দেশের ভিতরেই পুরাতন সপ্তগ্রাম ও তালাণ্ডু নামক স্থানগুলি অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বিশেষ কষ্ট-কল্পনা না করিয়াও একটী দেশের আমরা পরিচয় পাই যাহা তাম্রলিপ্ত বা তামা দিয়া লেপা দেশের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাকে দামোলিপ্ত বলিলে ঐ শব্দের যৌগিক অর্থের কোন ব্যতিক্রম হয় না।" (ভারতবর্ষ, ১৩৩৫, চৈত্র। পৃষ্ঠা ৫৮৭—৫৮৮।)

তার পর "তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, হুয়েনসাং নিজে যে তাম্রলিপ্ত বন্দর দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহা কোথায়? * * * যশোর কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই যদি সমতট হয়, তবে ঐ স্থানের পশ্চিমে প্রায় এক শত মাইল দূরে গঙ্গার ধারে তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল। মানচিত্র দেখিলে পুরাতন সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানকেই তাম্রলিপ্ত বলিয়া মনে হয়।" (ভারতবর্ষ ১৩৩৫, অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ৯০৫—৯১৬)।

এই তিনটী উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে পাঠকগণের কি মনে হইতে পারে যে তিনটী স্থানের বর্ণনা আমি যাহা করিয়াছি তাহারা সব এক অভিন্ন এবং তাহাদের সব level এক রকমের? আমার ১৩৩৫ সালের চৈত্রের প্রবন্ধে বৰ্দ্ধমানের level এক শত M. S. L. লিখিয়াছি। এবং ইহাও লিখিয়াছি Laterite বা লালমাটী গঙ্গার পলিতে উৎপন্ন হয় না। ইহার উৎপত্তির কারণ স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারাও কি বোধ হয় নাই Laterite অংশের Level পৃথক রকমের? উদ্ধৃত অংশ মধ্যে এ কথাও স্পষ্টই লেখা আছে যে দামোলিপ্ত দেশটী, আমার মতে, তাম্রলিপ্ত দেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল—তদ্দ্বারা কি বোঝা যায় না যে, তাহা তাম্রলিপ্তের সহিত একসীম নহে? উপেন্দ্রবাবু দেখিতেছি শ্রুতিনাথ বাবুর মত আমার প্রবন্ধটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই। করিয়া থাকিলেও মনে হয় যে, তিনি "রাঢ়" দেশের সহিত সম্যক পরিচিত নহেন। কাজেই অনর্থক মিথ্যা বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছেন। যাঁহারা দেশটী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ঐ তাম্রবর্ণ ল্যাটেরাইট ও লালমাটীর অংশটী ২০ হইতে এক শত মাইল বিস্তার-বিশিষ্ট একটী ফালির মত দেশ,—মেদিনীপুর হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই জমি হইতে মানুষের খাদ্যোপযোগী শস্য ভাল সংগ্রহ হয় না। ইহার অধিকাংশই জঙ্গল। এই স্থানে প্রাচীন কালে হস্তীর বসবাস খুবই সম্ভব ছিল। এই রকম জঙ্গলাবৃত লালমাটি ও প্রস্তরাকীর্ণ ময়ূরভঞ্জের অংশ বিশেষে এখনও প্রচুর হস্তী পাওয়া যায় এবং ময়ূরভঞ্জের এই অংশ মেদিনীপুর বৰ্দ্ধমান জেলার লালমাটির অংশের সহিত সংযুক্ত।

আমি সপ্তগ্রামের level যে ১৫ হইতে ২০ লিখিয়াছি, তাহা ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বৰ্দ্ধমান জেলায় চাকরী করিতাম, সেই সময়কার লওয়া সপ্তগ্রামের নিকটস্থ সরস্বতী নদীর কতকগুলি Cross Section হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যে উঁচু নীচু স্থানগুলিকে লোকে সপ্তগ্রাম বলিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহার Level উহা হইতে ৪।৫ ফিট উচ্চ। G. T, Surveyএর যে সমস্ত Bench Mark সপ্তগ্রাম হইতে বৰ্দ্ধমানের দিকে দেওয়া আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে তালাণ্ডুর নিকটস্থ স্থানের level ২৬ M. S. L. (৬) এবং সপ্তগ্রাম হইতে ৭ মাইল দূরস্থিত খন্যানের level ৩৪ M, S. L. (৭) এবং বৰ্দ্ধমানের দিকে যাইতে হইলে প্রতি মাইলে ৩ হইতে ৪ ফুট Rise পাওয়া যায়। এদিকে তমলুকে কি দেখা যায়? যে Mapটী দিয়াছি তাহাকে তমলুক হইতে ১৪ মাইল দূরস্থিত

---

(৬) Vide Map of Bengal—Published by Surveyor General of India in 1922,

(৭) Vide G. T. S. Bench mark No 126 line 79A.

Orissa Trunk Roadএর ধারের Spot level ১১, ৯, ৮, ১৩, ও ৯ M. S. L. এবং তাহা হইতে আরও ২½ মাইল উত্তর-দক্ষিণ দিকে পাঁশকুড়া Spot level ১২, ১৩, ও ১৪ M. S. L. (৮) অথচ এই স্থানগুলি রূপনারায়ণ ও কংসাবতী নামক দুইটী বড় নদী দ্বারা সমৃদ্ধ।

আমি আবার প্রথম প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ, ১৩৩৫, অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ৯৯৫) মধ্যে লিখিয়াছি, "সাধারণতঃ দেখা যায় একটী বন্দর এক স্থানে একবার স্থাপিত হইয়া সমৃদ্ধ হইলে নদীর চড়া পড়িয়া বা অপর কোন কারণে সে স্থানটী যদি নৌকা-জাহাজ প্রভৃতির পক্ষে দুরধিগম্য হয়, তাহা হইলে তৎবন্দরের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীগণ সহজে সে স্থান ছাড়িতে চাহে না, নদীর মোহানা পরিষ্কার করিয়া ও প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিয়া সেই বন্দরটী সংরক্ষণের চেষ্টা করে এবং তাহাতে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করে না। যখন পরিত্যাগ করিতে নিতান্তই বাধ্য হয় তখন পূর্ব্ব স্থানের নিকটেই নদীর নূতন মোহানায় নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। এইরূপে বন্দরটী অগ্রসর হইতে থাকে।" আরও লিখিয়াছি যে "বর্ত্তমান গঙ্গা নদীর খাত যদিও ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িয়াছে, তবুও বড় বড় জাহাজ এখনও অনেক উত্তরে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতে পারে ও ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে আরও উত্তরে সপ্তগ্রামে আসিত তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।" এই সব লেখা হইতে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে, বন্দর চিরকাল এক স্থানে স্থির থাকে না—ক্রমে স্থান-পরিবর্ত্তন করে ? এই সামান্য কথা না বুঝিয়া বন্দরটীকে চির স্থির এবং একটা প্রকাণ্ড দেশের সঙ্গে একসীম কল্পনা করিয়া উপেন্দ্রবাবু কত কি বলিয়াছেন। শেষে "সপ্তগ্রামের হস্তী বোধ হয় হালকা ছিল" বলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবুর পরিহাসের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকরাজ বাস্তবিক এক হাজার হাতী সংগ্রহ করেন নাই ; ২।৪টী ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন ; কিন্তু চাল-কলা-ভোজী ব্যাসদেব, যিনি ঘটনাগুলির বিবরণ মহাভারতে লিখিয়াছিলেন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চাল-কলা উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দ্বারা গ্রন্থ মধ্যে এক হাজার হাতীর কথা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা সুন্দর যুক্তি ও ততোধিক আশ্চর্য্য রাজবুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। সপ্তগ্রামের কিম্বদন্তী এই যে, এক শত গ্রাম ইহার কুক্ষিগত ছিল ; সুতরাং সময়ে সময়ে বন্দরের স্থান পরিবর্ত্তিত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত একই নামে ঐ বন্দর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে ইহা মনে করা অন্যায় নয়। এই জন্য হয়েন সাঙ্গের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে প্লিনির সময় পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম, তালাণ্ডু ও পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত কোথাও এই বন্দরের অবস্থিত অসম্ভব ছিল না। সপ্তগ্রাম বা তালাণ্ডুকে হয়েন সাঙ্গের সময়ের বন্দর বলিবার যে সমস্ত কারণ আমি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও কারণ আছে। যথা :—

(১) প্লিনির বর্ণিত Taluctœ নামের সহিত তালাণ্ডু নামের আশ্চর্য্য মিল।

(২) হয়েন সাঙ্গ এই বন্দরে একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এই স্তম্ভের কোন নিদর্শন তমলুকে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সপ্তগ্রামে এখনও একটী স্তম্ভের শীর্ষ মাটির উপর দেখা যায়।

দামোলিপ্ত হইতে বিষ্ণুগৃহ নাম উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি যে কারণ দেখাইয়াছি, তাহা ছাড়া আরও কারণের কথা আমার মনে হইয়াছে সমস্ত রাঢ় দেশ মধ্যে দামোদর উপত্যকাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ইহার লোকসংখ্যাও ও অন্যবিধ লক্ষ্মীশ্রী অন্য দেশ অপেক্ষা বেশী। এই জন্যও ইহার নাম বিষ্ণুগৃহ হইতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বন্দর চিরকাল এক জায়গায় স্থির থাকে না। বস্তুতঃ আমি বিশ্বাস করি ও বলিতে চাই যে আর্য্যগণের এ দেশে শুভাগমনের সময় হইতে চিরকালই সপ্তগ্রামে ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল না। গঙ্গার মোহানা যখন কলিকাতা কিম্বা তাহার আরও উত্তরে ছিল, তখন সমুদ্র-উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গাভিঘাতের জন্য সপ্তগ্রামে বন্দর রাখা সুবিধাজনক ছিল না। সেই সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে আরও উত্তর দিকে সম্ভবতঃ উজানীতে (বঙ্গদেশের উজ্জয়িনী —বর্ত্তমান নাম মঙ্গলকোট—জেলা বর্দ্ধমান) অজয় নদ তীরে বন্দর অবস্থিত ছিল। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলাবাসী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার সুবিখ্যাত "চণ্ডীতে" উজানী বন্দর হইতে যে ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রার কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ভট কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, সপ্তগ্রাম বন্দর পূর্ণ গৌরবে চক্ষের উপর উপস্থিত থাকিতে, এই দেশের লোকের প্রাচীন কালে সিংহল যাত্রা করিতে হইলে যে উজানী হইতে যাইতে হইত, এই ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল না থাকিলে, যে উজানীতে বর্ত্তমানে একখানি সামান্য তরণীও যাইতে পারে না—সেই উজানী হইতে প্রভূত বাণিজ্য-সম্ভার সহ বহু পোত সিংহল অভিমুখে যাত্রা করার মিথ্যা বর্ণনা লিখিলে "কবি নিরঙ্কুশ" সত্বেও ইহার জন্য কবিকঙ্কণকে উপহাসাস্পদ হইতে হইত তিনি এ কথা মেদিনীপুর জেলার কোন রাজার আশ্রয়ে বসিয়াই লিখিয়াছিলেন, এবং তমলুককে তিনি তমলুকই লিখিয়াছেন—তাম্রলিপ্ত বন্দর লেখেন নাই। পদ্মপুরাণে লিখিত চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য-যাত্রা ও বিপুলা বা বেহুলার মৃত পতি লইয়া ভেলায় করিয়া সাগর-সঙ্গমের দিকে যাত্রা এই উজানী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এ কথা অনেক কবিই লিখিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণে দামোদর নদ-তীরের লোকে আজও চাঁপাইনগরে চাঁদসদাগরের বাড়ী দেখাইয়া দেয়। এই সব নানাবিধ কারণে আমি মনে করি যে ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয় সিংহের সিংহল-যাত্রা এই উজানী বন্দর হইতে হইয়াছিল এবং তিনি সিংহলে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিলে তথায় বাণিজ্য করিবার জন্য যে সমস্ত বণিকেরা এই দেশ হইতে যাইত, তাহাদেরই কাহারও কাহারও কাহিনী এই সমস্ত গাথায় ও কাব্যে স্থান পাইয়াছে। অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের নিকটে অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, হর্ণক

---

(৮) Notes of levels taken from Index Map of the Soadighi-Ganga Khal Project reduced to M. S. L. from P. W. D. datum,

বা কাষ্ঠদ্বীপ (কাটোয়া), সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থানের নামের অর্থ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সব স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল। উজানী মহাভারত-বর্ণিত রাজা বাসুদেবের রাজত্ব পুণ্ড্র দেশ ও গ্রীসীয় লেখকদের বর্ণিত Ganda Redae বা Ganjes Regia রাজ্য মধ্যে অবস্থিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে হুয়েন সাঙ্গ যে বন্দরে আসিয়াছিলেন তাহা সপ্তগ্রাম বা তাম্রলিপ্তে অবস্থিত ছিল।

উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তমলুকের তাম্রশাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদি পাওয়া গেলে সুরেন্দ্রবাবুর গবেষণার কি গুরুত্ব প্রকাশ পাইত তাহা বুঝিতে পারি না।" উপেন্দ্রবাবু অবশ্যই জানেন, তাঁহাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহাদের তমলুক একটী পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল। যখন চেদীরাজ রাজেন্দ্র চোল ১০২২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন ও ঐ জয়বার্ত্তা ১০২৩ খৃষ্টাব্দে তিরুমালাই শিলা-লিপিতে খোদিত করিয়া রাখেন, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। যখন উড়িষ্যা-রাজ অনঙ্গ ভীমদেব বড় দামোই নদী পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার অংশ-বিশেষ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয় করেন, তাহার ভিতরও তমলুকের নাম নাই। কেন নাই—কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের ইতিহাসে উত্তর পাই যে, ইহা প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল; কাজেই জয় করিতে পারে নাই। দেশের level এত নিম্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলে অমনি উত্তর আসিল, যে ঝড়-ঝঞ্ঝায় দেশ বারে-বারে বিধ্বস্ত হইয়াছে বা দেশ বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে রাজাদের পরাক্রমের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? সুতরাং তাম্রশাসন ও নামাঙ্কিত মুদ্রাদি পাইলে এই রাজ্য কেমন স্বাধীন ও কত পরাক্রান্ত ছিল তাহা জানিবার কি সুবিধা হইত তাহাও কি ঐতিহাসিক-দিগকে বলিয়া দিতে হইবে? মৎবর্ণিত তাম্রলিপ্ত-রাজ যাহা ছিলেন, তাহা সাতগাঁর কিম্বদন্তীতে লিপিবদ্ধ আছে, ইহার অধিক বীরত্বের কথা আমার জানা নাই। তমলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমি যে সব ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছি—তাহাতে দেখা যায় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাত্র ইহা মনুষ্য বসবাসের স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।

দামল জাতির কথা—তাম্রলিপ্ত ও দামোলিপ্ত প্রাচীন কালে যে একসীম দেশ ছিল ইহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীন প্রমাণ কিছু নাই। দ্বিতীয় কথা দামল জাতির কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই। ইহার উত্তরে উপেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন "বাঙ্গালায় যে এককালে দামল ও তামল জাতির প্রাধান্য ছিল তাহা কতক বুঝা যায়। এখনকার Anthropologist-রা স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালী মঙ্গল বা দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দামল জাতির বংশধরগণ মান্দ্রাজের দামিল বা তামিল জাতি। এই প্রাচীন তামিল জাতি হইতেই উদ্ভূত তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশে বা পালি ভাষায় তাম্রলিপ্তি (তাম্রলিপ্ত) শব্দ হইতেই তামিল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে:—অতঃপর পণ্ডিত প্রবর "পিলের" লিখিত গ্রন্থ হইতে, "প্রতিভা" পত্রিকা হইতে, "পৃথিবীর ইতিহাস" হইতে তামিল জাতির গতিবিধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হইতে একটি কথা স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে দ্রাবিড় শব্দের "দ" ও মঙ্গল জাতির "মল" হইতে যেন একটি বর্ণসঙ্কর জাতির নামকরণ হইয়াছে—এবং সেই জাতি বঙ্গ ও মান্দ্রাজ প্রদেশটাকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, দ্রাবিড় জাতির নাম না হয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে—"মঙ্গল" জাতির নাম কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়? কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত কি ইহার কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন? অথচ দ্রাবিড় শব্দের মধ্যে কোন্ বৈয়াকরণিক বা পালিভাষার প্রক্রিয়ার দ্বারা "মল" শব্দটি স্থান লাভ করিল? "মঙ্গল" জাতি ইউরোপীয়দের আবিষ্কার—হিন্দুর কোন গ্রন্থ ইহার অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ যেমন একজন পণ্ডিত ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লোকের নাক ও কাণ মাপিয়া বাঙ্গালীর ও মান্দ্রাজীর বর্ণসঙ্করত্বের কথা ঘোষণা করিলেন, অমনি দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁহাদের স্বদেশের বিপুল গ্রন্থারণ্য আলোড়ন করিয়া ইহার অনুকূলে যুক্তি সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইয়া "দামল" জাতির অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করিলেন। জাতীয় জীবনের ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশার ও লজ্জার কথা আর কিছু হইতে পারে না। হিন্দু গ্রন্থে "মঙ্গল" জাতি বলিয়া কোন জাতি উল্লিখিত হয় নাই—বা হিন্দু গ্রন্থকারের নিকট বাঙ্গালী ও তামিল জাতি যে মিশ্রজাতি—ইহা জানা ছিল না। সুতরাং ঐ পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। "দামোলিপ্ত" ও "তাম্রলিপ্ত" শব্দদ্বয়ের যাহা স্বাভাবিক ও সংস্কৃতানুগত ব্যাখ্যা তাহাই আমি করিয়াছি ও উহা কোন্ দেশ বুঝাইতে পারে তাহাও দেখাইয়াছি। এতদ্দেশবাসীর রক্তে মিশ্রণের চিহ্ন পাওয়া গেলেও ইঁহারা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও সে কথা জানিতেন না—সুতরাং দামল নামক মিশ্রজাতির কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই।

উপেন্দ্রবাবু যদি বলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, তাম্রলিপ্ত হইতে তামিল ও দামোলিপ্ত হইতে দামল জাতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তিনি কেন এই সোজা কথাটির ভিতর "তাম্রলিপ্ত" "পালিভাষা" প্রভৃতি বাক্যের আমদানী করিয়াছেন? তাঁহাদের মতে "দামোলিপ্ত" ও "তাম্রলিপ্ত" একসীম দেশ, তবে কেন সেই দেশ-অধিবাসীদের দুইটি নামের আবশ্যক হইয়াছিল এবং কেনই বা তাহার ভিতর বঙ্গ ও মন্দ্রদেশ-বাসীদের বর্ণসঙ্করত্বের কথা আইসে? যদিই মনে করা যায় যে "তাম্রলিপ্ত" শব্দ হইতে পালিভাষার অপভ্রংশে "দামল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি "তাম্রলিপ্তের" কোন্ বৈয়াকরণিক বা পালিভাষার উল্লম্ফনে বা নিপাতনে ঐ শব্দ হইতে "বিষ্ণুগৃহ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল? উপেন্দ্রবাবু ইহার সদুত্তর প্রদান করিলে বাধিত হইব।

রাজা ময়ূরধ্বজ বা তাম্রধ্বজের কথা—ইহা আমি অবিশ্বাস করি না। তবে ইঁহারা কোন্ দেশের বাসিন্দা ছিলেন তাহাই আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত জিষ্ণু হরি বিগ্রহের কথা স্বীকার করিলেও তমলুকে তাহার আবির্ভাব দেখিয়া তমলুকের প্রাচীনত্ব প্রমাণের বড় বেশী সহায়তা করে না। যেমন করিয়া যশোহরের "যশোরেশ্বরী"

সুদূর অম্বরের রাজপ্রাসাদে স্থান পাইয়াছিল, কিম্বা যেরূপে বিষ্ণুপুরের রাজবিগ্রহ "মদনমোহন" কলিকাতার বাগবাজারে স্থান পাইয়াছে, সেইরূপে জিষ্ণু হরি বিগ্রহটিও তমলুকে স্থান পাইতে পারে।

কপালমোচন তীর্থের কথা—তমলুকের লোকেরা তথায় ঐ তীর্থের অস্তিত্ব বর্ণনা করেন। অন্যান্য দেশের লোক কি বলেন শুনুন।

এই মতে নানা তীর্থ ভ্রমে বহুকাল।
ব্রহ্মহত্যা দূর নহে মোচন কপাল॥
বিষ্ণু ঠাঁই গিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
বিষ্ণু বলে শুন শিব আমার বচন॥
বারানসী নামে তীর্থ আছে পৃথিবীতে।
জগন্নাথ নারায়ণ তথা বসে নিত্য॥
ব্রহ্মহত্যা দূর হবে তাঁহার দর্শনে।
কপাল খসিবে মনিকর্ণিকার স্নানে॥
বিষ্ণুর বচনে শিব বারানসী গিয়া।
পাতক মোচন করে বিষ্ণুরে দেখিয়া॥
কপাল মোচন হইল মনিকর্ণিকায়।
সেই যে কপালী নাম সর্ব্বলোকে গায়॥
কপাল মোচনী তীর্থ তে কারণে বলি।
এতেকে শিবের নাম হইল কপালী॥ (৯)

অবশ্যই এ কথা আমার বলা উচিত যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মস্তকটা কত বড় ছিল এবং তাহা বারাণসীর মণিকর্ণিকায় বা তমলুকের পুকুরের ভিতর স্থান পাইতে পারে কি না তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম।

কোর্বিনামা—উপেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "তমলুক-রাজের প্রদত্ত কোর্বিনামা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ। কোন বংশের কুলজি বা কোর্বিনামা অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না।" সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও উপেন্দ্র বাবু ঘোষণা করিতে ভোলেন নাই যে "এ বিষয়ে হাণ্টার সাহেবের ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অক্সফোর্ড অকেন হল হইতে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া পত্রযোগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।" হাণ্টার সাহেবের মত ক্ষমতাশালী বিজ্ঞ পণ্ডিত-বরের এই দুর্দ্দশাকর অভিজ্ঞতা লাভের পর আর কোন লোকের এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা হইতে পারে না। তবে তমলুক-রাজের কোর্বিনামাখানি কি উপাদানে প্রস্তুত, কি কালি দ্বারা লিখিত এবং কি উপায়ে মহাভারতের সময় ৩৩০০ বৎসর হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে জানিতে পারিলে যাঁহারা পুরাতন দলিলাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন তাঁহাদের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। ভাষাতত্ত্ববিদের পক্ষেও ইহা কম উপকার করিবে না; কেন না বঙ্গলিপির আকার প্রকার কিরূপে ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাহার কতকটা সত্য ইতিহাস ইহা হইতে লাভ করা যাইবে। এইজন্য অনুরোধ করি উপেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিয়া ঐ সমস্ত বিবরণ সহ কোর্বিনামার একটী Photograph প্রকাশ করুন। এবং "তমলুক নগর যখন ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ হুয়েন সাঙ্গের সময়ে) এবং ইহার পূর্ব্বে ও পরে একাধিকবার জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল" এবং প্রতিনাথ বাবুর লিখিত "তমলুকের অবনমনের" সময় এই কোর্বিনামা কিরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহার একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করুন। এইগুলি জানিতে পারিলে এ বিষয়ে বিচার সম্ভব হইবে।

চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ ও ফা হিয়ান প্রভৃতি কিরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব স্থির করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের লেখা পাঠেই জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব তাঁহার "Ancient Geography of India" গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখায় দূরত্ব ও দিক্ যে কত সত্য, তাহা তাঁহাদের এই লেখা দৃষ্টে ১২০টী স্থান আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল মনে করিলেই সহজে অনুভব করা যায়। সংক্ষেপতঃ মাপটী হুয়েন সাং এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

A third *Yojana* (which was according to Yun Chwang 1 1/3 of the general *Yojana*) of 12·12 miles. This third *Yojana* was, according to Fleet, the original *Yojana* (from yui-yoroke) the yoking distance—the distance which copil a pair of bullocks could draw a fully Laden cart. This *Yojana* was taken by the Chinese pilgrims as equal to 100 "lis." (১০)

ইহার ভাবার্থ এই যে হুয়েন সাং যে ১০০ লি মাপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রচলিত যোজন—যতদূর একখানি পূর্ণ বোঝাই গরুর গাড়ী সারাদিনে চলিয়া থাকে—অর্থাৎ প্রায় ১২½ মাইলের সঙ্গে সমান। উপেন্দ্র বাবুকে আমি অনুরোধ করি যে ১৩৩৫ সালের চিত্র সংখ্যায় "ভারতবর্ষে" "নাবিকদের মানচিত্র" সম্বন্ধে আমার অভিমতটী তিনি যেন পুনরায় পাঠ করেন। তাহাতে দেখিতে পাইবেন, আমি তন্মধ্যে তমলুকের বা অপর কোন স্থানের রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। অন্যত্র অবশ্যই বলিয়াছি—তাহা রেনেল সাহেবের ম্যাপ হইতে। ইনি রীতিমত মাপ করিয়া ঐ ম্যাপখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ম্যাপ ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তদ্ভিন্ন আমার আর কিছু বক্তব্য নাই—ওমালি সাহেব যাহাই অনুমান করুন না কেন।

উপেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "তমলুক গঙ্গার ধারে অবস্থিত ছিল কি না, এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্র বাবু সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন। গঙ্গাখালি (গেঁয়োখালি) খাল হইতে রূপনারায়ণ নদের গঙ্গা নাম হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও, যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতে

---

(৯) পদ্মাপুরাণ—বংশীধর রায় বিরচিত—শ্রীরমানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল। পৃষ্ঠা ৪৫।

(১০) J. R. A. S. 1906 Page 1011—Notes taken from page XXX 11 of S. N. Mojumdar's edition of Cunningham's Ancient Geography of India.

তমলুকই যে তাম্রলিপ্ত তাহা প্রমাণিত হইবার কি অন্তরায় হইবে? যে কারণেই হউক, তমলুক গঙ্গার ধারে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে, এই কথার দ্বারা তাহা প্রমাণ হয়।" রূপনারায়ণ গঙ্গাকে প্রাচীন নাবিকগণ ভ্রম ক্রমে যে "পুরাতন গঙ্গা" বলিয়াছেন ইহা বাঙ্গালার নদী বিষয়ের পরম বিশেষজ্ঞ রেনেল সাহেবের অভিমত এবং তাহা মেদিনীপুরের ইতিহাস লেখক যোগেশবাবু সাদরে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়াছেন। তমলুক যে গঙ্গার ধারে কস্মিন কালেও অবস্থিত ছিল না ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আমি প্রথম প্রবন্ধেই দিয়াছি, অথচ তাম্রলিপ্তবাসীরা গঙ্গার ধারের বাসিন্দা বলিয়া গ্রীসীয় ঐতিহাসিকেরা, বিশেষতঃ প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন—সুতরাং তমলুককে তাম্রলিপ্ত বলায় গঙ্গার জন্য কি অন্তরায় হয় তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? উপেন্দ্র বাবু গঙ্গাখালিকে ব্র্যাকেটের ভিতর "গেঁয়োখালি" লিখিয়া দেখিতেছি এক ঢিলে দুইটা পাখী শিকার করিবার মৎলব করিয়াছেন। গেঁয়োখালি যখন রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত, তখন ঐরূপ লিখিয়া তিনি রূপনারায়ণ ও প্রাচীন সরস্বতী (হুগলী) নদীকে এক সঙ্গে "গঙ্গা" প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মা গঙ্গার যে এমন অদ্ভুত "গেঁয়ো" নাম ছিল ইহা আমার জানা ছিল না।

আজ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম মহাকবি কালিদাস লিখিত রঘুবংশখানি পাঠ করি তখন হইতেই তাহার প্রথম শ্লোকটী (১১) আমার মস্তিষ্ক মধ্যে একটী সুদৃঢ় সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছিল। সেটী এই যে প্রাচীন মহাকবিরা নিরর্থক বাক্য ব্যবহার করিতেন না—তাঁহারা বাক্য ও অর্থ জগতের আদি পিতামাতার মত নিত্য-সম্বন্ধ-যুক্ত মনে করিতেন। সেই সুদৃঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই পরবর্ত্তীকালে আমি তাম্রলিপ্ত, দামোলিপ্ত, সুহ্ম, কলিঙ্গ প্রভৃতি মহাকবিদের ব্যবহৃত শব্দ গুলির অর্থ ও তাহার দ্বারা কোন্ দেশ বুঝাইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া যাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই সুধী পাঠকগণ সমক্ষে প্রবন্ধ রূপে উপস্থাপিত করিয়াছি। সংস্কৃত ভাষার কঠিন অনুশাসনগুলি যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহারা কোন স্থানের নাম বিকৃত করিয়া বা কদর্থ করিয়া লিখিতে পারেন না। প্রাচীনকালে হিজলীকে হৈজল, বা অন্ধ পুত্রের নাম পদ্মলোচন লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না।

উপেন্দ্র বাবু পরিশেষে লিখিয়াছেন "তমলুক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বলিয়া মাদলা পঞ্জীতে তমলুক বা তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায় না" এ কথার প্রতিবাদে সুরেন্দ্র বাবু উক্ত পঞ্জীতে ময়না চোর, দাঁতন চোর প্রভৃতি বিবিধ উল্লেখ করিয়াছেন।" লেখক দেখিতেছি আমার বক্তব্য কি তাহাই জানেন না। "মাদলা পঞ্জীতে" তমলুকের উল্লেখ নাই ইহার প্রতিবাদ আমি আদৌ করি নাই। বরং মাদলা পঞ্জী লিখিত "চোর" বা "চোলা"যুক্ত মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার অন্তর্গতঃ কতকগুলির বিশিষ্ট নাম দেখিয়া ঐগুলি যে সমুদ্র উপকূলস্থ লবণাকর জলাভূমি বুঝাইয়াছে—এবং এগরা, ময়না, দাঁতুন প্রভৃতি স্থান যদি সেই সময় "চোর" বা "চোল" থাকে তবে তমলুককে সমুদ্রগর্ভে থাকিতে হয় ইহাই বলিয়াছি। জানিনা কেন উপেন্দ্রবাবু আমার স্পষ্ট উক্তি বিকৃত করিয়া সুধী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন ১৩৩৫ সালের ভারতবর্ষের ৫৮৮ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখেন।

---

(১১) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌঃ॥

আত্মা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মমতে মানুষের আত্মা অমর ও অভৌতিক (Spiritual) পদার্থ। উহা মানবের জীবদ্দশায় তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পর কবর মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং শেষ বিচারের দিন কবর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে হাজির হইবে। ঈশ্বর পুণ্যাত্মাগণকে স্বর্গে ও পাপাত্মাগণকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে আত্মা ঐ প্রকার পদার্থ এবং মৃত্যুর পর দেহের সহিত কবর মধ্যে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু শেষ বিচারের দিন নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া (কিরূপ দেহ তাহা জানা যায় না) খোদার নিকট উপস্থিত হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ ও পুণ্যের বিচার করিবেন। যাঁহারা জীবদ্দশায় মুসলমান-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও নিয়মিত নমাজাদি ও কোরাণের বিধি সকল পালন করিয়াছেন, খোদা তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিবেন; সেখানে তাঁহারা উৎকৃষ্ট পানীয় ও সুস্বাদু খাদ্য সকল পান ও ভোজন ও সুন্দরী পরিগণকে বিহার করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিবেন। এবং যাঁহারা উক্তরূপ কার্য্য সকল করেন নাই, অথবা কাফের অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, খোদা তাঁহাদিগকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে আত্মা অজর অমর ও বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম। উহা মানবের স্থূল দেহমধ্যে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পর দেহ হইতে বাহির হইয়া আকাশে উত্থিত হয়। পরে ইহজন্মের কৃত পাপ ও পুণ্য অনুসারে কিছুকাল নরকে অথবা স্বর্গে বাস করে এবং তথায় সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইলে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর ক্ষীণ হইয়া লিঙ্গ-শরীর প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ-শরীর প্রাপ্তির পর তাহা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যাত্মাগণ সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাপাত্মাগণ কদাচারী অধার্ম্মিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা বিষয়-বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও যোগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; তাঁহারা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যান।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে আত্মার স্বরূপ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে আত্মা বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ অথবা মনের ন্যায় অভৌতিক পদার্থ, যাহাকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, অথচ উহা আকাশে বিচরণ করিতে পারে; দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট মানবের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে উহা এক শরীর

হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারে ও ব্যক্তি-বিশেষের পুত্র-কন্যা-রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

বর্ত্তমান কালে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুদূর অতীত কালের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মা সম্বন্ধে উক্তরূপে অযৌক্তিক ও মন-গড়া সিদ্ধান্ত সকল করিয়াছিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলন দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমরা জানিতে পারিয়াছি ; যথা—

১। জগতে একমাত্র শক্তি (energy) ও তাহার আধার পদার্থ (Substance বা matter) বিদ্যমান আছে। শক্তি ও পদার্থ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে উহারা কখনও পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। কেহ পরমাণুকে (atom) কেহ বা ইথর্‌কে (ether) কেহ বা ইথর্ অপেক্ষা আরও কোন সূক্ষ্ম পদার্থকে (যাহার প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি জানা যায় নাই) এই শক্তির আধার বলিয়া বিবেচনা করেন। হিন্দুদিগের দর্শন-শাস্ত্র যাহাকে পঞ্চভূতের তন্মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এই পদার্থ অনেকটা সেই প্রকার।

২। পদার্থ অবলম্বন করিয়া শক্তি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে ; এমন কোন স্থান খালি নাই যেখানে উহা নাই।

৩। শক্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন হইয়া অনাদিকাল হইতে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। ইহাই তাহার ধর্ম্ম বা প্রকৃতি। জগতের যাহা কিছু দৃশ্য (phenomenon), পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া হইতে তাহা উৎপন্ন।

৪। জগতে শক্তির যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিকাশ হউক না কেন তাহাদের সমষ্টি ও জগতস্থ যাবতীয় পদার্থ সকলের সমষ্টি চিরকাল একই থাকে।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন :—অঙ্গারক (Carbon), জলজান (hydrogen), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষার-জান (nitrogen)—ইহারা সকলে জীবনহীন অচেতন পদার্থ। ইহাদের মধ্যে অঙ্গারক ও অম্লজান কোন বিশেষ মাত্রায় ও অবস্থায় মিলিত হইলে তাহা হইতে অঙ্গারীয় অম্ল (Carbonic acid), জলজান ও অম্লজান হইতে জল; যবক্ষার জান ও অন্যান্য কয়েকটী আদি ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া যবক্ষার লবণ (Nitrogenons Salts) সকল উৎপন্ন হয়।

এই সকল নূতন মিশ্র পদার্থ যে সকল আদি ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তাহারা সকলেই নির্জ্জীব পদার্থ। কিন্তু যখন তাহারা কোন অবস্থা-বিশেষে একত্র হয় তখন তাহাদের মিশ্রণে এমন একটী জটিল পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহাকে আমরা (protoplasm) প্রটোপ্লাজম্ বলি এবং এই প্রটোপ্লাজম্‌ই জীবনরূপ দৃশ্য (phenomena) প্রদর্শন করে।

"Carbon, Oxygen, Nitrogen are all lifeless bodies ; of these Carbon and Oxygen unite in certain proportions and under certain conditions to give rise to Carbonic acid ; hydrogen and oxygen produce water ; Nitrogen and other elements give rise to Nitrogenous salts. These new compounds like the elementary bodies of which they are composed are lifeless. But when they are brought together under certain conditions they give rise to still more complex body protoplasm, and protoplasm exhibits phenomena of life."

—Huxley's Lectures and Essays.

নির্জ্জীব পদার্থে যে সকল মৌলিক উপাদান দৃষ্ট হয় সজীব পদার্থে তদতিরিক্ত অন্য কোন মৌলিক উপাদান দৃষ্ট হয় না।—সজীব পদার্থের মৌলিক উপাদান সকলের এক প্রকার বিশিষ্ট ভাবে মিশ্রণে এলবুমিনয়েড (albuminoid) শ্রেণীর প্রটোপ্লাজম্ (protoplasm) নামক মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই সজীব পদার্থে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

উক্ত এলবুমিনয়েড নামক পদার্থের পরমাণু সকলের পরস্পর বিনিময় বশতঃ যে রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই সজীব পদার্থের প্রাণ। অম্লজান, জলজান এবং যবক্ষারজান মৌলিক পদার্থের সহিত অঙ্গারক (Carbon) মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে এলবুমিনয়েড্ নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। অঙ্গারক সহযোগে প্রটোপ্লাজম্ নামক যে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার জটীল গঠন, চঞ্চলতা ও তরল আঠাবৎ পদার্থের তুল্য ঘনত্ব বশতঃ উহা অঙ্গারক বিহীন, অন্যান্য মিশ্র পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র।"

"No other elements are found in organic bodies than those of the inorganic bodies.

The combination of elements which are peculiar to organism and which are responsible for their vital phenomena are compound protoplasmic substance of the group of albuminoids.

Organic life itself is a chemico-physical process based on the metabolism (or interchange of materials) of these albuminoids which is a combination of the elements oxygen, hydrogen, nitrogen, sulphur with carbon.

The protoplasmic compounds of carbon are distinguished from most other chemical combinations by their very intricate molecular structure, their instability and their jelly like consistency.

—E. Haeckel.

মানব দেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিৎ (biologist) পণ্ডিতগণ বলেন, উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের দেহ এবং সর্ব্বোচ্চ জীব মানবের দেহ

ভজন
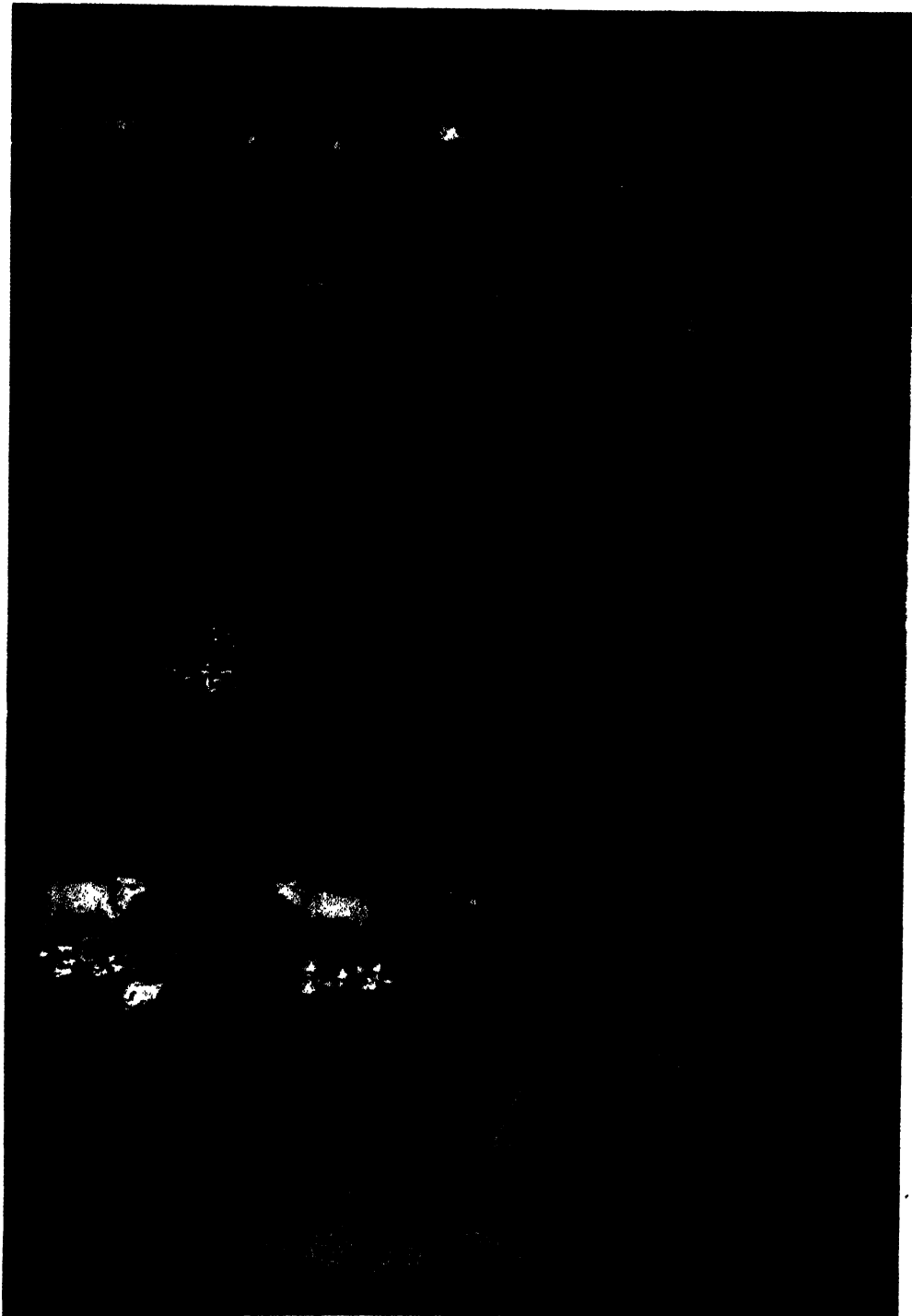
শিল্পী—শ্রীযুক্ত চিত্রসেন বড়ুয়া

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আদিতে একটীমাত্র ক্ষুদ্র জীবকোষ (cell) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক পুরুষের অণ্ডকোষে শুক্র (sperm) নামক এক প্রকার তরল পদার্থ বর্ত্তমান থাকে! ঐ তরল পদার্থ মধ্যে অসংখ্য শুক্রকীট (spermatozoa) সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। স্ত্রীলোকের জরায়ু (ovasy) মধ্যে এক সময়ে একটী মাত্র ডিম্বকোষ (ovum) থাকে। এই শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ প্রত্যেকেই এক একটী ক্ষুদ্র জীবকোষ মাত্র ; ইহাদিগকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীর ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অনেকগুলি শুক্রকীট যখন শুক্রের সহিত জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহারা সকলেই জরায়ুস্থ ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। উহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান ও বলবান সেই কৃতকার্য্য হয় ; অবশিষ্ট সকলে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া পরে মরিয়া যায়। এই সংমিলিত জীবকোষ হইতেছে প্রত্যেক মানবদেহের আদি অবস্থা। শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের দেহে প্রোটোপ্লাজম্ (protoplasm) নামক যে লালাবৎ পদার্থ থাকে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া যে প্রাণশক্তি থাকে তাহাদের পরস্পর মিলনে অপর একটী প্রাণশক্তি বিশিষ্ট নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হয়। এই নূতন জীবকোষ কিয়ৎপরিমাণে মাতৃ-জীবকোষের ও কিয়ৎ-পরিমাণে পিতৃ-জীবকোষের দৈহিক ও মানসিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই নূতন জীবকোষ হইতে যে দেহ গঠিত হয়, তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধি মাতার খাদ্য ও কার্য্যাবলীর দ্বারা সাধিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পরে যখন তাহা গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া বহির্জগতের সংস্রবে আসে, তাহার শারীরিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি সকলের বিকাশ, তাহার বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার (heredity), পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment) এবং জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) ও স্বভাব অনুরূপ নির্ব্বাচন এই কয়েকটী, মানবগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহার প্রধান কারণ। বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার যেন অদৃষ্ট ও অন্যগুলিকে কর্ম্মফল বলা যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকগণ মন ও মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে এইরূপ বলেন :—

"নির্জ্জীব পদার্থের গঠন ও উৎপত্তি, তাহাদের উপাদান জড়পরমাণু সকলের অন্তর্নিহিত শক্তি সকলের ঘাত ও প্রতিঘাত ও তজ্জনিত উহাদের মধ্যে সর্ব্বদা যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইতে হইয়া থাকে। সজীব পদার্থের দেহের গঠন ও প্রাণের ক্রিয়া সকল নির্জ্জীব পদার্থের গঠন ও উৎপত্তির ন্যায় একই প্রণালীতে সংঘটিত হয়। উদ্ভিদ ও জীবগণের বৃদ্ধি ও পুষ্টি, এমন কি তাহাদের স্পন্দন, অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া সকল তাহাদের দেহস্থ পরমাণু সকলের অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় (potential) শক্তির কার্য্যকরী (Kinetic) শক্তিতে প্রকাশ ও তদ্বিপরীত যথা— কার্য্যকরী শক্তির নিষ্ক্রিয় শক্তিতে পরিণতি এই উভয় কারণে হইয়া থাকে। এই শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য ও পূর্ণ বিকাশ হইতেছে মানবের মন। চিন্তা ও বিচার-শক্তি মনেরই ক্রিয়া বিশেষ। মনের এই ক্রিয়া বিশেষ জীব-দেহের গ্যাঙ্গালিয়ন জীবকোষস্থ (Ganglion Cell) নিওরোপ্লাজম্ (neuroplasm) নামক পদার্থের পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ প্রকার পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে উহা সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনায় অনধিগম্য। স্নায়ুমণ্ডলীর এই জটিল ও শ্রমসাধ্য ক্রিয়া যাহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর জীবগণের ও মানবের মনের ক্রিয়া বলি তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের শাসনেই ঘটিয়া থাকে।

All vital activities of organic life are based on a constant reciprocity of force and a co-relative change of metabolism just as much as simplest process in lifeless bodies. Not only growth and nutrition of plants and animals, but even the functions of sensation and movement, their sense action and psychic life depend on the conversion of potential into kinetic energy, and vice versa. Even the most perfect and elaborate forms of energy that we know—the psychic life of higher animals, the thought and reason of man—depend on material process or changes in the neuroplasm of the ganglian cell ; they are inconceivable apart from such modifications. The supreme law dominates all these elaborate performances of the nervous system which we call, in the higher animals and man "the action of the mind."

—Earnest Haeckel.

মানবের জীবাত্মা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়গণের স্নায়ুমণ্ডলী কর্ত্তৃক মস্তিষ্কস্থ জীবকোষ সকলের যে স্পন্দন হয় তাহা হইতেই মানবের গতি, ও অনুভূতি, আত্মজ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া সকল প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয়গণ এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার জৈবিক ক্রিয়ার সমষ্টিক মানবের জীবাত্মা বলা যায়। "It is the sum total of the physiological functions of the material organs or it may be called the collective title for the sum total of man's cerebral functions" মানবদেহে তাহার মস্তিষ্কের ক্রিয়া যে পরিমাণে ক্রমশঃ বিকশিত হয়, মানবের জীবাত্মাও সেই পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাল্যকালে তাহার অল্প বিকাশ হয়, যৌবনে অপেক্ষাকৃত অধিক, ও প্রৌঢ় অবস্থায় পূর্ণ বিকাশ হয়, ও বৃদ্ধাবস্থায় তাহার অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়া মৃত্যুকালে যখন তাহার শারীরিক ক্রিয়া সকলের নাশ হয় তখন তাহার জীবাত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানব যখন জরায়ু মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটী জীবকোষরূপে অবস্থিতি করে, তখন তাহার প্রাণ থাকিলেও, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন না হওয়ায় তাহার জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্ভবে না। মানুষের দেহ-গঠনের সহিত যখন জীবাত্মার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় তখন দেহের নাশ হইলে দেহ হইতে পৃথকরূপে তাহার অস্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভবে এবং তাহার পুনর্জ্জন্মই বা কেমন করিয়া হইতে পারে?

মানুষের মৃত্যু হইলে তাহার দেহের উপাদান জীবকোষ সকল প্রাণহীন হয় ও তাহারা তাহাদের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গারক প্রভৃতিরূপে পরিণত হয় ; এবং যে শক্তি সকল তাহার দেহে জৈবিক ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ও যাহার সমষ্টিকে জীবাত্মা বলিয়াছি, তাহারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর তাহার জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কেমন করিয়া থাকিতে পারে ? *

মস্তিষ্ক হইতে মানবের ও উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবগণের জ্ঞানের ও মনের ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। শরীরতত্ত্ববিদগণের এই সিদ্ধান্ত প্রাণিগণের পীড়ার নিদান অনুসন্ধান করিলে নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোন পীড়া বশতঃ যদি মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশ নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার ক্রিয়া বিচলিত হয়। ইহা হইতে আমরা মস্তিষ্কের কোন্ স্থানের ক্রিয়া বিচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারি। মস্তিষ্কের কোন অংশ পীড়াগ্রস্ত হইলে সেই স্থানের উপর যতটুকু অনুভব ও চিন্তা-শক্তি নির্ভর করে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মস্তিষ্কের যে স্থানে বাক্ শক্তির স্ফুরণ হয় তাহাতে কোন পীড়া হইলে কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। অনেক প্রকার খাদ্য যথা, চা, কফি প্রভৃতি চিন্তাশক্তির উত্তেজক, মদ্য সুখ ও দুঃখের অনুভব শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, মৃগনাভি কর্পূর প্রভৃতি ম্রিয়মাণ জ্ঞানকে পুনর্জীবিত করে ;—ইথর ও ক্লোরোফরম জ্ঞানশক্তিকে বিলুপ্ত করে। অনুভব শক্তি ও অহংজ্ঞান যদি শরীর-যন্ত্রের বহির্ভূত কোন অভৌতিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া কি প্রকারে সাধিত হইত ?

জীবাত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে যখন তাহার দৈহিক যন্ত্র সকলের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না তখন তাহার মনের ক্রিয়া কোথা হইতে আসে ? তখন জীবাত্মা স্বর্গে কি নরকে গিয়া কি প্রকারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, অপ্সরীগণের নৃত্য দর্শন ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করে ? মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও অন্যান্য দৈহিক ব্যাপার যখন সুখ ও দুঃখের কারণ, তখন জীবাত্মার মস্তিষ্ক এবং দেহ না থাকায় উহা কি প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে ?

জগতে একমাত্র আত্মা (Energy) অতি সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্র (Substance) অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে বিদ্যমান আছে। আকাশে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আত্মা ও তাহার অবলম্বন পদার্থ বিদ্যমান নাই। এই আত্মা (energy) কতিপয় নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত কাল হইতে পদার্থের (matter) উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। এই ক্রিয়ার ফলে বিশ্বের নীহারিকাময় আদি অবস্থা হইতে বর্ত্তমান রবি, শশী, নক্ষত্রপুঞ্জ-সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের, বৃক্ষ, লতা, পুষ্পপত্র শোভিত নদ-নদী সাগর পর্ব্বত বেষ্টিত, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ সমাকুল এই পৃথিবীর ও ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে।

"Energy is inseparably dependent on matter. Substance is every-where subject to eternal movement and transformation under certain laws, the result of which is countless phenomenal forms and their evolutlon. All organic and inorganic bodies have been formed by the process of evolution of their original constituent matter and force."

এই শক্তি কি প্রকার তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ও গণিত-শাস্ত্রে পণ্ডিত সার জেমস্ জিনস্ বলেন,—

"এই জগৎ এক বিরাট মনের চিন্তা-প্রসূত। এই মনই এই জগতের নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু এই মন আমাদের ব্যক্তিগত মন নহে। যে পরমাণু হইতে আমাদের ব্যক্তিগত মনের উৎপত্তি সেই পরমাণু সকল সেই বিরাট মনের মধ্যে চিন্তারূপে অবস্থিত ছিল এবং তাহা হইতেই জড়-পরমাণু সকলের উৎপত্তি এবং উহাতেই সেই মনের বিকাশ। জগৎ-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় ইহার সঙ্কল্প ও পরিচালনা কোন এক বিরাট মন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই মন কতকটা আমাদের ব্যক্তিগত মনের ন্যায় হইলেও তাহা আমাদের মনের মত ভাব প্রবণ, নৈতিকজ্ঞান-বিশিষ্ট অথবা সৌন্দর্য্যরসগ্রাহী নহে। ঐ মন গণিতশাস্ত্রবিদের মনের ন্যায় সদা নির্ভুল চিন্তা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।

"Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter ; we are beginning to suspect that we ought rather to point it as the creator and governor of the realm of matter—not of course our individual minds, but the minds in which the atoms out of which our individual minds have grown exist as thoughts. The old dualism of mind and matter, which was responsible for the supposed hostility, seems likely to disappear, not through matter becoming in any way more shadowy or unsubstantial than heretofore, or through mind becoming resolved into a function of the working of matter, but through substantial matter resolving itself into a creation and manifestation of mind.

We discover that the universe shows evidence of a designing and controlling power that has something

---

* জীবাত্মার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক হইলে লেখক বিবেচনা করেন জীবাত্মার পুনর্জন্ম পিতা মাতার সন্তানেই আংশিক ভাবে হইয়া থাকে। দেহের নাশ হইলে জীবাত্মার ব্যক্তিগত কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। যে বিভিন্ন শক্তি সকল মনুষ্যদেহে ব্যক্তিগত জীবাত্মা-রূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল দেহ-নাশের পর তাহারা অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

in common with our individual minds,—not so far as we have discovered, emotion, morality or aesthetic appreciation, but tendency to think in the way which for want of better word, we describe as mathematical mind."

—Sir James Jeans.

পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যেও হিন্দুদের বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দেখা যায়। কেহ বলেন, শক্তি ও পদার্থ দুইটী পৃথক্ বস্তু, অথচ উহারা এরূপভাবে সংযুক্ত যে উহারা কখনও পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না। কেহ বলেন জগতে একমাত্র শক্তিই বিদ্যমান আছে। পদার্থ ঐ শক্তি হইতে উৎপন্ন; উহা শক্তিরই অবস্থা বিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা—"এই সমস্ত মনই—এতদ সর্ব্বং মন এব।"

"সৈন্ধব লবণখণ্ড যেমন অন্তরবাহ্যভেদশূন্য একরূপ লবণ রস, আত্মাও সেইরূপ অন্তরবাহ্যভেদশূন্য একরূপ প্রজ্ঞা স্বরূপ। সেই আত্মা পঞ্চভূতের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া সেই পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া যায়। বিলীন হইলে আর সংজ্ঞা থাকে না।"

জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যে শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাই তাহার আত্মা। এই শক্তি যখন জীবগণের দেহ মধ্যে অবস্থা বিশেষে প্রাণ, মন ও গতিরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি। জগত ও সমুদয় শক্তির সমষ্টির নাম পরমাত্মা। এই পরমাত্মা পদার্থ রূপ আধার অবলম্বন করিয়া জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অনাদি কাল হইতে এইরূপ ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে—কবির ভাষায় ইহাই ভগবানের লীলা খেলা। এই পরমাত্মাই উপনিষদ-কারগণের ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। পরমাত্মা জগৎ হইতে পৃথক্ কিছু নহেন—এই জগৎই তিনি। পাঁচ সহস্র বৎসর পুর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ গভীর চিন্তা দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন—

"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীৎ।"

—ছান্দোগ উপনিষৎ

"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো—"

"সোহ সাবাসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"

ঈশোপনিষৎ।

"সোহং ভাবেন পূজয়েৎ"

মৈত্রী উপনিষৎ।

কাঙ্গাল হরিনাথ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

বর্ত্তমান বৈশাখের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় যাঁহার সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত করিয়া যে সাধকশ্রেষ্ঠের সুমধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিলাম, তিনি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। 'কাঙ্গাল' কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া, কাঙ্গালের মত জীবনযাপন করিয়া, বিশ্বের সকল কাঙ্গালের যিনি আশ্রয় তাঁহারই শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কাঙ্গালের হৃদয় যে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল, লক্ষপতির প্রাসাদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না; কুবেরের রত্নভাণ্ডারে তাহার সম্পূর্ণ অভাব; তাঁহার মস্তকে চিরদারিদ্র্যের যে কণ্টক-মুকুট শোভা পাইত, রত্ন-মুকুটের দীপ্তি ও গৌরব তাহার তুলনায় নিষ্প্রভ।

সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। যাঁহাদের অন্তরের ঐশ্বর্য্য যত অধিক, তাঁহাদের বাহিরের আড়ম্বর তত অল্প; কাঙ্গালের সাজই তাঁহাদের ভূষণ। এই জন্যই আজ সমগ্র ভারতের হৃদয়দেবতা, মহাত্যাগী, জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত দর্পান্ধ নেতা কর্ত্তৃক 'অর্দ্ধোলঙ্গ রাজনৈতিক ফকির' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

হরিনাথ মজুমদার 'কাঙ্গাল' ছিলেন; আমাদের এই কাঙ্গালের দেশে ইহা তাঁহার গৌরবের 'খেতাব।' তিনি নদীয়া জেলার একটি অখ্যাত অংশে অখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারখালী গ্রামে ১২৪০ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সে আজ ৯৮ বৎসর অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দ পুর্ব্বের কথা। তখন দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করিতে পারি, [illegible] করিতে পারি না।

হরিনাথ মাতৃ-স্নেহেরও কাঙ্গাল ছিলেন; তাঁহার বয়স এক বৎসর হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মাতৃহীন হইতে হইয়া-

ছিল। এই জন্যই তিনি বোধ হয় উত্তরকালে বিশ্বজননীর অপার স্নেহের মাধুর্য্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া মাতৃস্নেহের অভাব কথঞ্চিৎ পরিপূরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে কথার আলোচনা পরে করিব।

মাতৃহীন হরিনাথকে তাঁহার খুল্ল-পিতামহী প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই; বৈষয়িক কার্য্যে ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার জীবন অত্যন্ত কষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালের কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় নাই। এই সময় কুমারখালীতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল; হরিনাথ সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে অল্পদিন পরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বলিখিত আত্মকাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন, "অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাব আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।"

সুতরাং, তিনি বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষাতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীন কিশলয়-দল যেমন নবোদ্ভিন্ন সুকোমল পল্লব-সাহায্যে সূর্য্যের আলোক-ধারা ও সমীরণের মুক্ত-প্রবাহ হইতে জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করিয়া, ক্রমশঃ সবল ও বর্দ্ধিতশ্রী হইয়া ভবিষ্যতে কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও শীতের শিশির-সম্পাত সহ্য করে, তিনিও সেইরূপ অনন্য-সাধারণ হৃদয়ের বলে বহিঃপ্রকৃতি ও মহচ্চরিত্র মানবের উচ্চ আদর্শ হইতে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আহরণ করিয়া উত্তর কালে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত, অধর্ম্ম, দুর্নীতি ও পীড়নের সহিত অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সেকালে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা মা-সরস্বতীর চাপড়াসী হইলেও যমদূতের এক-একটি মানবীয় সংস্করণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন; সেইরূপ একটি গুরুমহাশয়ের সুগুরু বেত্রদণ্ডের ভয়ে একদিন তিনি একটি পরিত্যক্ত কূপের ভিতর নামিয়া লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন। এইরূপ 'একগুঁয়ে অবাধ্য ছেলে' কখন মানুষ হইতে পারিবে, তাঁহার হিতৈষী মুরুব্বিরা কখন তাহা আশা করিতে পারেন নাই।

সেকালে নদীয়া জেলার নানা স্থানে বহুসংখ্যক নীল-কুঠী ছিল; এক-একজন 'কুঠীয়াল সাহেব' সেই সকল কুঠীর অধ্যক্ষতা করিতেন। যে সকল ভদ্রসন্তান সেকালে লেখাপড়া শিখিতে না পারিত, তাহারা হয় নীলকুঠীতে, না হয় পুলিশের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত। হরিনাথের হিতৈষী আত্মীয়গণ কোন নীলকুঠীর এক নায়েবকে মুরুব্বি ধরিয়া তাঁহাকে সেই কুঠীতে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং আশা করিলেন কিছুদিন পরে হরিনাথ আমীন বা গোমস্তার পদ লাভ করিয়া দুই হাতে পয়সা লুঠিতে পারিবেন। কিন্তু হিতৈষীগণের এই আশা পূর্ণ হইল না; তিনি কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া কুঠীর কর্ম্মচারিবর্গের চরিত্রের পরিচয় পাইলেন; দেখিলেন, তাহাদের অধিকাংশই অসচ্চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী, প্রজাপীড়ক, মিথ্যাবাদী এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল অপকর্ম্মেই অকুণ্ঠিত। পরিহাস-রসিক নাট্যকার দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে' যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, হরিনাথ নীলকুঠীতে বসিয়া তাহার প্রত্যেক দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। তিনি শিক্ষানবীশিতে ইস্তফা দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন; হিতৈষী মুরুব্বিরা হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ছোঁড়ার অদেষ্টে বিস্তর দুঃখু আছে!"

হরিনাথ নীলকুঠীতে অল্পদিন শিক্ষানবীশি করিলেও সেই সময়েই কুঠীয়াল সাহেবদের প্রজা ও শ্রমজীবিবর্গের দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এই সকল অত্যাচারের প্রতিকারের সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। কিন্তু তিনি সহায়-সম্পদহীন নিরাশ্রয় যুবকমাত্র; তাহার উপর লেখা-পড়াও ভাল শিখিতে পারেন নাই; কেবল অদম্য সঙ্কল্পের সাহায্যে প্রবল-প্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নীলকর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একাকী কিরূপে যুদ্ধঘোষণা করিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে যেমন অদম্য সাহস ও হৃদয়-বলের প্রয়োজন, সেইরূপ সুশাণিত লেখনীও অপরিহার্য্য। এইজন্য বঙ্গভাষা সম্যক প্রকারে আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া তৎকাল-প্রচলিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি পুস্তক ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে তাঁহার এরূপ-

কষ্ট হইয়াছিল যে, একখানি বস্ত্র সংগ্রহের জন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একখানি পুস্তক এক রাত্রির মধ্যে তাঁহাকে নকল করিয়া দিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয় হয়। তিনি স্বগ্রামস্থ প্রজাবর্গের অভাব, অভিযোগ ও জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদের উৎপীড়নের বিবরণ গুপ্ত-কবি-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেকালে পল্লীবাসিগণের অভাব অভিযোগ এ কাল অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, এবং তাহা প্রকাশ করিবারও তেমন কোন উপায় ছিল না। সেকালে জমীদারেরা প্রজাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন; এজন্য কারণে অকারণে তাহাদিগকে জমীদার ও তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত; এবং সহজে তাহার প্রতিকার হইত না। স্থানীয় অধিবাসিগণের অভাব অভিযোগের বিবরণ গুপ্ত কবির হস্তগত হইলে তিনি তাহা সযত্নে 'প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন, এবং রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে হরিনাথকে উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে হরিনাথ সংবাদপত্র-সম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

হরিনাথ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ও রুচি মার্জ্জিত ছিল; সেকালের জনসাধারণের মত তাঁহার গোঁড়ামী ছিল না; এবং স্ত্রীজাতিকে তিনি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন; এজন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। 'না জাগিলে যত ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'—তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিতেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য তিনি তাঁহার বাসভবনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া কয়েকটি বালিকাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; এবং স্বগ্রামস্থ বালকগণের সুশিক্ষার অভাব অনুভব করিয়া এই অভাবও কিয়ৎ-পরিমাণে নিরাকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন করিয়া গ্রামস্থ বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; তিনি স্বয়ং তাহাদের শিক্ষকতায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা যত্নে অনেক ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময় দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবিবর্গকে জমীদার, মহাজন ও কুঠীয়ালগণের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সে আজ ৬৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় বঙ্গদেশে বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল ছিল। কুমারখালীর ন্যায় ক্ষুদ্র মফস্বল-পল্লী হইতে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারে, ইহা তখন কেহ স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে অসম্ভবও সম্ভবপর হইয়াছিল। কিছুদিন পরে এই সংবাদপত্র পরিচালনে তিনি তিনজন সাহিত্যিক শিষ্যের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে আমাদের পরম বন্ধু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র সি-আই-ই এবং সুবিখ্যাত তান্ত্রিক স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য; বর্ত্তমান প্রসঙ্গের লেখক তাঁহার তৃতীয় অযোগ্য শিষ্য। কাঙ্গাল হরিনাথের নিকট সংবাদপত্র সেবায় আমাদের 'হাতে খড়ি'। উত্তরকালে অক্ষয়কুমার ও শিবচন্দ্র বঙ্গভাষার লেখকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কাঙ্গালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

যাহা হউক, চির-দরিদ্র কাঙ্গাল হরিনাথ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানি প্রথমে কলিকাতার 'গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে' মুদ্রিত ও কুমারখালী হইতে প্রকাশিত হইত। তখন ইহা মাসিক সংবাদপত্র ছিল, পরে ইহা পাক্ষিক ও পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে কাঙ্গালের চেষ্টায় কুমারখালীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে কুমারখালী হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'গ্রামবার্ত্তা' দ্বারা আমাদের দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা যে জমীদার, মহাজন ও কুঠীয়ালগণের অন্যায় অত্যাচারের দমন হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, প্রজার প্রতি সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল সারবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তৎপ্রতিও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, এবং সরকার তাঁহার মন্তব্য অগ্রাহ্য করিতেন না। নদী ও বিবিধ পয়ঃ-

প্রণালীর সংস্কার দ্বারা জলকষ্ট নিবারণ, ডাক ও পুলিশ বিভাগের কার্য্যের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি লেখনী পরিচালিত করিতেন। ডাকঘরে মণিঅর্ডার যোগে টাকা প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা এ দেশে তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশে 'সোমপ্রকাশ' ও 'গ্রামবার্ত্তা'র ন্যায় উচ্চশ্রেণীর শক্তিশালী সংবাদপত্র আর একখানিও ছিল না।

এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে ও বিবিধ দুশ্চিন্তায় হরিনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। একালে বিজ্ঞাপনের আয় সংবাদপত্র-প্রকাশের অনুকূল; কিন্তু সেকালে একালের মত বিজ্ঞাপনের 'কদর' ছিল না; তাহার উপর পল্লীগ্রামের সংবাদপত্র, কে তাহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ নষ্ট করিবে? একে সুলভ সংবাদপত্র, তাহার উপর বিজ্ঞাপনের আয় না থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই কাঙ্গাল ব্যয়ভারে প্রপীড়িত হইলেন, ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহার উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য তাঁহাকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইল। তিনি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনজন শিক্ষকের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় ও স্বাবলম্বন-গুণে তাঁহার পাঠশালাটি অচিরে ঋণমুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইল। কিন্তু এই সংগ্রামে তাঁহাকে অস্ত্রাহত বিজয়ী বীরের ন্যায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় তিনি অল্পদিনেই নিরাময় হইয়া 'গ্রামবার্ত্তা'র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধানে অধিকতর মনঃসংযোগ করিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসীরা অধিক মূল্যে সংবাদপত্র ক্রয়ে অসমর্থ; ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই বিজ্ঞাপনহীন সংবাদপত্রের মূল্য এক পয়সা মাত্র ধার্য্য করিলেন! কোন সংবাদ পত্র যে এক পয়সা মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে, ইহা তখন জনসাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরবর্ত্তী যুগে আমাদের দেশে অনেক বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, নূতন নূতন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হওয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে; কিন্তু স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সুলভ সমাচার' ব্যতীত গ্রামবার্ত্তার ন্যায় সুলভ সংবাদপত্র এ দেশে আর একখানিও তখন ছিল না। কিন্তু গ্রামবার্ত্তার মূল্য এক পয়সা নির্দ্ধারিত হওয়ায় হরিনাথ অধিকতর ঋণজালে জড়িত হইলেন। কাঙ্গাল যাহাদের কল্যাণের জন্য সংবাদপত্র সম্পাদনে কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন, পল্লী-অঞ্চলের সেই সকল গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট তিনি যথাযোগ্য সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিতে পারেন নাই। সাধারণ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া, স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, কাঙ্গালকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত; কিন্তু ভগবানের করুণায় নির্ভর করিয়া সকল বিপদ তিনি নত মস্তকে সহ্য করিতেন। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইত, এবং বিপদের মেঘ মস্তকের উপর ঘনীভূত দেখিয়াও তিনি কিরূপ অবিচলিত থাকিতেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জবরদস্ত 'হ'—সাহেব একদিন সফরে বাহির হইয়া কোন অনাথা পল্লী-রমণীর একটি দুগ্ধবতী গাভীর সন্ধান পাইলেন। তিনি গাভীটির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া ছলে বলে কৌশলে গাভীটি হস্তগত করিলেন। দুঃখিনী পল্লী-রমণী প্রবল-প্রতাপ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কুকার্য্যের প্রতিকার করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অপকার্য্যের সংবাদ হরিনাথের কর্ণগোচর হইল। এই সংবাদে হরিনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া গ্রামবার্ত্তায় 'গরুচোর ম্যাজিষ্ট্রেট' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন, এবং তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের গর্হিতাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

যেকালে সামান্য একটা পাহারাওয়ালার লাল-পাগড়ী দেখিলে অনেক প্রবল-প্রতাপ ধনাঢ্য জমীদার প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেন এবং অনেক ক্ষমতাশালী শিক্ষিত ভূস্বামী যাঁহার অসংযত বাক্যের বা অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও ওষ্ঠাগ্রে আনিতে সাহস করিতেন না, একজন নিঃসম্বল নিরাশ্রয় দরিদ্র গ্রামবাসী সেই দুর্দ্দান্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কুকার্য্যের

কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন ; তিনি কি ভাবে তাঁহার উচ্চপদের গৌরব নষ্ট করিতেছেন, দায়িত্বজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতেছেন, নির্ভীকচিত্তে তাহা গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন—এই সংবাদ যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত কু-কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত বা লজ্জিত না হইয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, এবং হরিনাথকে লাঞ্ছিত ও বিপন্ন করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এতদূর উত্তেজিত হইলেন যে, একদিন অশ্বারোহণে স্বয়ং কুমারখালী উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া শুনিলেন কুমারখালী অঞ্চলের সমস্ত জন-সাধারণ কাঙ্গালকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহার লাঙ্গুলাকর্ষণ সুবিবেচনার কার্য্য নহে ; অগত্যা তাঁহাকে ভগ্নমনোরথ হইয়া পাবনায় প্রত্যাগমন করিতে হইল। পরে তিনি হরিনাথের সাহস, তেজস্বিতা ও বহু সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর মধ্যে হরিনাথ মানুষের মত মানুষ।"

আর একবার কোন বিখ্যাত জমীদারের পক্ষ হইতে প্রজাবর্গের পীড়ন আরম্ভ হইলে হরিনাথ নির্ভীক চিত্তে সেই অত্যাচার-কাহিনী 'গ্রামবার্ত্তা'য় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জমীদারের কর্ম্মচারীবর্গ অর্থ দ্বারা তাঁহার মুখবন্ধ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন জমীদারের পক্ষ হইতে হরিনাথের মাথা ফাটাইবার জন্য লাঠীয়াল নিযুক্ত হইল। কিন্তু লাঠীয়ালেরা তেজস্বী হরিনাথের দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। তীতুমিঞা, আব্বাস্ মিঞা, খাতুমিঞা প্রভৃতি লাঠীয়ালের দল হাল ছাড়িয়া দিলে একজন পাঞ্জাবী গুণ্ডা হরিনাথের বাড়ী সশস্ত্র উপস্থিত !—হরিনাথ গৃহাভ্যন্তরে সহযোগিবর্গের সহিত 'গ্রামবার্ত্তা'র কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় গুণ্ডা অস্ত্র ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া তাঁহার গৃহত্যাগ করিল। এই সময় তিনি সাবধান থাকিলেও কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি অকম্পিত হস্তে গ্রামবার্ত্তায় লিখিলেন, "আমরা এতদিন সহ্য করিয়াছি, আর সহ্য করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর—প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, সত্যের জয় অপরিহার্য্য ; অবশেষে কাঙ্গালেরই জয় হইল। কিন্তু ২২ বৎসর 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশের পর অর্থাভাবে ও ঋণদায়ে তাঁহাকে কাগজ বন্ধ করিতে হইল।

হরিনাথের সাহিত্যপ্রীতি অসাধারণ ছিল। তাঁহার ভাষা সুললিত ও প্রকাশের ভঙ্গি অনিন্দ্য-সুন্দর ছিল। তাঁহার রচিত 'বিজয় বসন্ত' একালেও বঙ্গভাষার আদর্শ-রূপে বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য পদ্য রচনাগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ' অধ্যাত্ম-জগতে উচ্চাসন লাভ করিবার যোগ্য। তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটক ও পাঁচালীগুলি মধুর রসে পূর্ণ। হরিনাথ এই উপায়ে বহুদিন পূর্ব্বে পল্লীসমাজে ধর্ম্মভাব ও সুনীতি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বাউল সঙ্গীতে এক সময় উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ প্লাবিত হইয়াছিল। এখনও রাখাল-বালক সায়ংকালে ক্লান্তদেহে গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় সন্ধ্যার আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়িতে থাকে,—

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে,
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে।"

হরিনাথ সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সাধন-সঙ্গীতে ভক্ত হৃদয়ের নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা ও নির্ভরতা পরিস্ফুট। তাঁহার সেই সকল আন্তরিকতাপূর্ণ সঙ্গীত-সমূহ হইতে আমরা একটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"এত ভালবাস থেকে আড়ালে !
আমি কেঁদে মরি ধরতে নারি দুটি হাত বাড়ালে।
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর
কারাগারে হায় রে !
তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি
আমারে বাঁচালে ॥
আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম, হায় রে !
মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময় ! তুমি ক্ষীর
ক'রে যে দিলে !

দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত,
ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারই ত, হায় রে !
ও নাথ ধনধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম
তোমার দয়া বলে।
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে !
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে, আমি কাঁদলে
কর কোলে ?
আমি কাঁদলে বসে হতাশ হয়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে !
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ
দাও বলে।
ও নাথ, দেখা নাহি দেবে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায় রে !
ও নাথ, তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি
দেখালে কাঙ্গালে !"

যে অসীম মাতৃভক্তি তাঁহার সুকোমল হৃদয় প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অবশেষে জগন্মাতার চরণে বিলীন হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় জনসাধারণ হরিনাথের সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বার্দ্ধক্যে হরিনাথ সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সংসার-চিন্তা, অন্নকষ্ট তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগকাতর, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি মাত্রই কাঙ্গালের অপার্থিব স্নেহে সান্ত্বনা লাভ করিত, ধন্য হইত। ধনীর ধনে যে অভাব পূর্ণ না হইত, তাঁহার সমবেদনা, তাঁহার স্নেহ অনাথ আকিঞ্চনের সেই অভাব পূর্ণ করিত। কুমারখালীতে প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু কুমারখালী কাঙ্গাল হরিনাথের পবিত্র নামে এখনও গৌরবান্বিত। পৃথিবীতে অর্থই যদি সব হইত, তাহা হইলে কপিলাবস্তুর এক সর্ব্বত্যাগী-ভিক্ষুর নামে, বেথলেহেমের এক দরিদ্র সূত্রধর-পুত্রের নামে আজ অর্দ্ধ পৃথিবীর মানব-সমাজ পরিচালিত হইত না। সবরমতীর এক ত্যাগী সন্ন্যাসীর পদতলে আজ সমগ্র ভারত আত্ম-নিবেদন করিত না।

কাঙ্গাল হরিনাথ ১৩০৩ সালের ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্য-বাসরে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বদেশের ও ভগবানের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর ৩৪ বৎসর অতীত হইল। কুমারখালীর জনসাধারণ ও কাঙ্গালের ভক্তবৃন্দ তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-চর্চ্চায় একটি দিন অতিবাহিত করিবার জন্য অক্ষয়-তৃতীয়ায় একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। আজ আমরা কাঙ্গালের স্মৃতি-চর্চ্চায় আমাদের অক্ষম লেখনী সার্থক করিলাম।

ফ্রান্স

শ্রীভারতকুমার বসু

(২)

ফ্রান্সের লোকেরা অর্থ-সঞ্চয়ের যে একান্ত পক্ষপাতী, তার দুটী উদ্দেশ্য আছে; প্রথম বৃদ্ধ বয়সের পুঁজি সংগ্রহ ক'রে রাখবার জন্য; দ্বিতীয়—কন্যার বিবাহ-পণ ঠিক ক'রে রাখবার জন্য। সেখানে কন্যার বিবাহের সময়ে বিবাহ-পণ সংগ্রহ ক'রে রাখা চাই-ই। সম্প্রতি কয়েক বছর ধ'রেই সেখানে স্বাধীন প্রেমের দ্বারা বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু তা হ'লেও, আজও পর্য্যন্ত সেখানে পিতা-মাতার নির্ব্বাচন ও সম্মতি অনুসারেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার রীতি আছে। বিবাহের আগে দেনা-পাওনার কথা ঠিক হ'য়ে যায়।

পিতামাতার নির্ব্বাচনের দ্বারা এই রকম ফরাসী বিবাহ যে ইংরেজদের স্বাধীন প্রেমের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহের মতোই সমান সুখ ও শান্তিকে এনে দিতে পারে, এ কথা ইংলণ্ডের লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চান না; এমন কি, অনেকে ফরাসী উপন্যাস ও নাটক প'ড়ে এই রকম মত পোষণ করেন যে, ফরাসী দম্পতীরা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল! আর, স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি বাধ্য না হয়, সেজন্য একমাত্র ফ্রান্সকেই দোষ দেওয়া যায় কেন? ইংলণ্ডেও কি তার অভাব আছে? তবে এ কথা ঠিক যে, সুখী এবং বাধ্য

পাথরের উনুনে আগুন ধরাচ্ছে

কুম্ভকার

দম্পতী ইংলণ্ডেও যেমন দেখা যায়, ফ্রান্সেও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম দেখা যায় না।

ফরাসীদের সঞ্চয়শীলতার স্বভাবের জন্য তাদের ব্যক্তিগত উপকার হয় যেমনি, তাদের সাম্প্রদায়িক

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ ;
মরণে তাহা-ই তুমি
ক'রে গেলে দান!"

উপকারও হয় তেমনি। জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে ১৮৭১ সালে যখন ফ্রান্সকে প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিতে হ'য়েছিল, তখন নির্দ্দিষ্ট দিনেরও অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের লোকেরা সেই অর্থ দিতে পেরেছি —একমাত্র তাদের সঞ্চয়শীল স্বভাবের জন্যই। এই স্বভাবের জন্যই আজও পর্য্যন্ত সেখানে "ষ্টেট্"-অনুগৃহীত দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত—অত্যন্ত অল্প।

সেখানকার মেয়েরা ইংলণ্ডের মেয়েদের মতো খরচের বাড়াবাড়ি একেবারেই পছন্দ করে না। তার সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইংলণ্ডের সামান্য কোনো চাষার ঘরেও খাবার জিনিষের মধ্যে মাখন, ডিম, মুরগী, মাংস, রুটি, কেক্ ইত্যাদি ইত্যাদির কোনো

কাপড়ের ওপর এম্‌ব্রয়ডারির কাজ ক'রছে

ত্রুটি কিম্বা অপ্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যাবে না; কিন্তু ফরাসী চাষারা আহারের রকমারীত্বকে অর্থাৎ খরচের বাহুল্যকে ঘৃণা করে। তারা সাদাসিদে আহারেই খুসী এবং বাড়্‌তি খরচের অর্থ জমিয়ে আরও খুসী। কিন্তু এই ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা একটুও প্রমাণ হয় না যে, রুচি তাদের বিকৃত। এ সম্বন্ধে ফ্রান্স-ভ্রমণকারী মিঃ হ্যামিল্‌টন্ ফাইফ নজীর দিচ্ছেন এই রকম—

"ফরাসীদের রুচি যে কী সুন্দর, এ-বিষয়ে একটী

পোষাকের বৈচিত্র্য
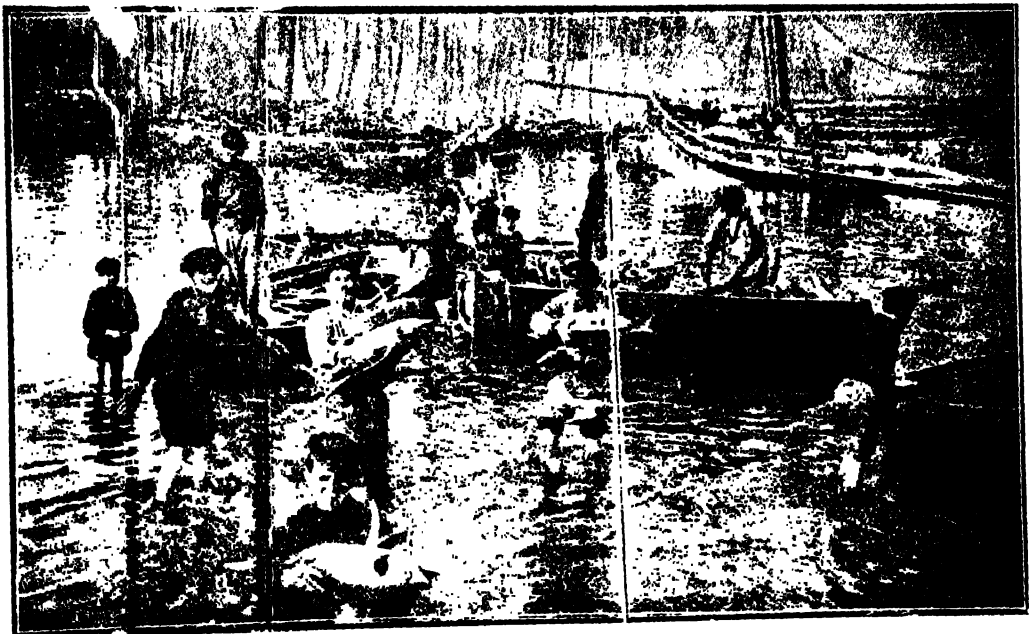
নৌকায়-ধরা Thou-মাছ নিয়ে আসছে

চমৎকার ঘটনার কথা আমার মনে প'ড়ছে। একবার নেখা নকার একটী পল্লীগ্রামে আমি বাইসাইকেলে চ'ড়ে

জালে-ধরা "সার্ডিন্" মাছ। ফরাসীরা এই মাছ খেতে খুব ভালবাসে

নৌকা থেকে দিনের-ধরা মাছ বাজারে নিয়ে যাচ্ছে

যাচ্ছিলুম। হঠাৎ আমার গাড়ীর একটা দরকারী কল্ ভেঙে গেল। তখন ঠিক দুপুর। সেখান থেকে পরবর্ত্তী সহর অনেক মাইলের পথ। ট্রেণে ক'রে যাবারও স্থবিধে ছিল না; কারণ, বিকেলের আগে ট্রেন নেই। আমার

বাহুল্য-বর্জ্জিত মিতব্যয়ী ব্রিটনের (Breton) "মেয়র"। প্রথম দৃষ্টিতে এঁকে চেনাই দায়!

সঙ্গে ছিল আমার ভাই। আমরা দুজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রতে লাগলুম। তখন খিদে-ও পেয়ে গেছে দারুণ! চারিদিক চেয়ে মনে হ'লো, খাদ্য পাওয়া সেখানে অসম্ভব! যাই হোক, আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম এবং রাস্তার ধারে একটী কুটীরের সামনে এলুম। কুটীরের দরজায় শব্দ ক'রতেই ভিতর থেকে একটী বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললুম, "আমরা কি এখানে কোনো খাবার জিনিষ পেতে পারি?"

বৃদ্ধা ব'ললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়, যদি আপনারা ভেতরে আসবার কষ্টটুকু নেন, আর, সামান্য ক্ষণ বসেন।"

আমরা ভিতরে ঢুকলুম। কিন্তু আমাদের মন একেবারে দ'মে গেল সেই মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে আমরা দেখতে পেলুম, কুটীরের মধ্যে কোনোখানেই আগুনের এতটুকু 'আঁচ' পর্য্যন্ত নেই! কিন্তু আশ্চর্য্য! আধ মিনিটের মধ্যেই বৃদ্ধা কতকগুলো জ্বালানী কাষ্ঠ নিয়ে উপস্থিত হ'লো এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। তার পরই সে আধ ডজন টাট্‌কা ডিম এনে, একটা 'প্যানে'র উপর

মহিলারা উপাসনার জন্ম গির্জ্জায় যাচ্ছেন

সে-গুলোকে ভেঙে চমৎকার 'ওম্‌লেট্‌' তৈরী ক'রে ফেললে। আমরা যখন সেই ওম্‌লেট খেতে আরম্ভ ক'রেছি, সেই সময়েই সে আরও কত চমৎকার উপাদেয় খাবার তৈরী ক'রতে লাগলো। এই সব খাবার আমরা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলুম ত বটেই, উপরন্তু খেলুম আর একটা জিনিষ। সেটা তার বাড়ীর তৈরী এক-রকম সুস্বাদু মদ। সুগন্ধী 'কফিতে' চুমুক দেবার সময় সেই মদের মিষ্টতা আমাদের কাছে যে কী ভালই লেগেছিল, তা বলা যায় না!···এর চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনও ভদ্রলোকই নিশ্চয়ই কোথাও আশা ক'রতে পারে না!···এই সময়ে আমরা এই 'খানা'র সঙ্গে কোনো ইংরেজ পল্লীবাসীর বাড়ীর 'খানা'র তুলনা-মূলক সমালোচনা মনে মনে ক'রেছিলুম। ইংরেজ পল্লীবাসীর বাড়ীতে পাওয়া যেতো কি?—ময়লা টেবিলের

'সিন্‌'-নদীর তীরে বাঙালী। শ্রীমান বিজন-কুমার দত্ত (ডানদিকে) সুইজার্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশ ঘুরে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীমানের বয়স মাত্র ২২ বৎসর

ওপর সাজানো শুক্‌নো মাংস আর মাখন-মাখানো কাল্‌কের শক্ত রুটি।"

এই পার্থক্য থেকেই বুঝতে পারা যায়, ফরাসীরা সঞ্চয়শীল জাতি হ'লেও, তাদের সভ্যতা, তাদের লৌকিকতা, তাদের শিষ্টতা এবং তাদের রুচি একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ।

ফরাসীরা 'অর্থ' বস্তুটাকে বোঝে বিলক্ষণ। এই জন্যই,

যে-কাজ থেকে অর্থ পাওয়া যাবে না, সে-কাজ তারা সখের খাতিরেও ক'রতে রাজী নয়। এই মনোবৃত্তিই পৃথিবীর নানা স্থানে ফরাসী উপনিবেশগুলিতে যাবার ও থাকবার বিষয়ে তাদের রীতিমত বাধা দেয়।

মৎস্য-রক্ষার আড়তে পাঠাবার জন্য Thou-মাছ বাক্স-বন্দী করা হ'য়েছে

মাছ শুকিয়ে রাখবার আড়ৎ। আড়তের দুর্গন্ধে কাজ করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু অভ্যস্তদের এ বিষয়ে কোনোই অসুবিধা হয় না

ফ্রান্সের সঙ্গে ফরাসী উপনিবেশগুলির ব্যবসা নেই ব'ললেই হয়। এর প্রধান কারণ, উপনিবেশগুলিতে ফরাসীদের সংখ্যা থাকে অত্যন্ত কম। ফরাসীরা ফ্রান্স ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। আর, ফ্রান্সের লোক-সংখ্যাও এত বেশী নয় যে, অর্থের সন্ধানে তাদের অন্য দেশে যাবার দরকার হবে। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমস্ত ফরাসীর জন্যে ফ্রান্সে যথেষ্ট যায়গা আছে; কিন্তু সমস্ত ব্রিটনের জন্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কেন যায়গা নেই?—এর উত্তর হচ্ছে এই যে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চ'লেছে। কিন্তু গত শতাব্দী থেকেই ফ্রান্সের জন-বৃদ্ধি হচ্ছে খুব মন্থর গতিতে; এমন কি, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে লোকবৃদ্ধি একেবারেই হয়নি ব'ললেই হয়। ১৮৬৬ সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮ লক্ষ। আজকাল সেখানকার লোক-সংখ্যা অল্পাধিক ৪০ লক্ষ হবে। ১৮৬৮ সাল থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ থেকে অল্পাধিক ৪৭ লক্ষে উঠেছে।

ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা যে বিশেষ বাড়ে না, সে জন্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। দেশ যত সভ্য হবে, দেশের লোকের জন্মও হবে তত অল্প পরিমাণে। এর অবশ্য মনস্তত্ত্বগত কারণ আছে।

ফ্রান্সে বৃহৎ পরিবার দেখা যায় কদাচ। সন্তানহীন পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হয় অনেক। শতকরা পঞ্চান্নটি দম্পতীর মাত্র একটী ক'রে সন্তান হয়। শতকরা সতেরোটী দম্পতীর একেবারেই কোনো সন্তান হয় না। সেখানে যতগুলি পরিবার আছে, তাদের অর্দ্ধেকগুলির প্রত্যেকটীতে মাত্র দুটীর বেশী শিশু জন্মায় না। এই অল্প-জননের কারণ হচ্ছে দুটী। একটী স্বাভাবিক কারণ, এবং আর একটী—কৃত্রিম কারণ।

ফ্রান্সে প্রত্যেক পরিবারের সন্তান-সন্ততি পিতার সম্পত্তি সমানভাবে উত্তরাধিকার-সূত্রে পায়। এই জন্য

প্রত্যেক পিতামাতা আদৌ ইচ্ছা করেন না যে, তাঁদের অনেকগুলি ছেলেপিলে হোক। কারণ, সন্তান যদি বেশী

কারখানায়।...টিনের মধ্যে তেলে-জড়ানো শুক্‌নো সার্ডিন্‌মাছ রপ্তানীর জন্য 'প্যাক্‌' করা হ'য়েছে

বিক্রীর জন্য বাজারে কাঠের জুতা সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে

হয়, তা হ'লে সম্পত্তি-বিভাগের পর প্রত্যেকেই অতি-সামান্য অংশ পেয়ে হয় ত জীবনে অন্ন অর্জ্জনের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ক'রবে এবং প্রত্যেককেই হয় ত খাটতেও হবে যথেষ্ট। ফরাসী-পিতামাতা তাই সন্তানের এই কষ্টের কথা কল্পনাতেও আনতে ইচ্ছা করেন না এবং নিজস্ব সম্পত্তিকে খুব মিতব্যয়িতার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখেন। ইংরেজ পিতা-

মাতা কিন্তু অতটা সহানুভূতিসম্পন্ন নন; তাঁরা নিজেদের সম্পত্তিকে উপভোগ ক'রেই আমোদ পান।···

নাপিতের ক্ষৌর কার্য্য

সাগর-তীরের ক্ষেত থেকে অশ্ব ও বলদ-টানা গাড়ীতে শস্য বোঝাই ক'রে নিয়ে যাচ্ছে

ফরাসী আইন-মতে বিষয়-ভাগের বেশ একটী স্বাতন্ত্র্য আছে। কোনো পিতা কিম্বা মাতা পারিবারিক সম্পত্তি থেকে একটী শিলিং-ও বাড়্তি নিতে পারবেন না। সম্পত্তি সেখানে পিতা-মাতা-ছেলেপিলে নির্ব্বিশেষে সমান ভাগে বিভক্ত হয়। বাপের যদি একটা ছেলে থাকে, তা হ'লে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ পাবে বাপ, আর বাকী অর্দ্ধেক পাবে ছেলে। যদি বাপের দুটি ছেলে থাকে, তা হ'লে, বাপ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে, বাকী অংশ দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে।

ফরাসী-বিবাহের মধ্যে চুক্তির বাঁধন আছে সত্য, কিন্তু এ চুক্তি একেবারেই লিখিত হ'তে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না বর-কন্যা-পক্ষের তরফ থেকে মাতা-পিতার সম্মতি পাওয়া যায়। মাতা পিতার অজ্ঞাত-সারে কোনো বিবাহ-ই সেখানে গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। এইখানে একটী নতুন কথা বলা যাক।—সেখানকার বাপ মা যেমন ছেলেদের খাওয়া-পরা-থাকা-ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট আত্মনিয়োগ করেন, ঠিক তেম্‌নি সেখানকার ছেলেরাও মা-বাপের অক্ষম অবস্থায় তাঁদের পালন এবং যত্নের দিকেও আত্মনিয়োগ ক'রতে বাধ্য; এমন কি, বিধবা শাশুড়ীর-ও সমস্ত ভার প্রত্যেক জামাইকে নিতে হবে।

আগে আইনের জন্য সেখানকার মেয়েরা নিজস্ব প্রয়োজনীয় অনেক কিছু কাজ করবার অধিকার পেতো না। শেষে ১৮৮৬ সাল থেকে তারা স্বামীর সম্মতি না নিয়েও নিজেদের বৃদ্ধ জীবনের জন্য অর্থ জমিয়ে রাখবার অধিকার পেলে। মাত্র ১৮৯৫ সাল থেকে সেখানকার বিবাহিতা মেয়েরা সেভিংস্‌-ব্যাঙ্কে অর্থ রাখবার সুযোগ পেয়েছে। এই অর্থ তারা যখন খুসী তুলে নিতে পারে। আগে আদালতে কোনো ফরাসী নারীর-ই সাক্ষ্য গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হ'তো না; কিন্তু ১৮৯৭ সাল থেকে তারা উক্ত বিষয়ে আইন-গত অধিকার পেয়েছে।···

সুচের কাজে বিশ্রাম-সময় উপভোগ ক'রছে

সু-বসনা তরুণী দুগ্ধ-বিক্রেত্রী খরিদ্দারের বাড়ীতে
দুধের যোগান দিতে যাচ্ছে
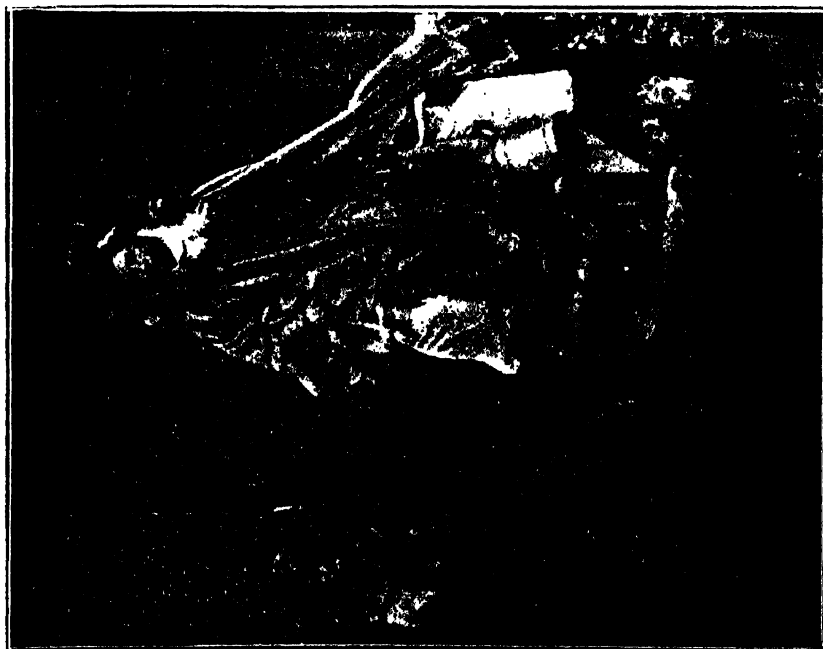
ফ্রান্সের পুরুষরা, সহযোগিতা ও পরামর্শের দিক দিয়ে সেখানকার নারীর উপর অনেকটা নির্ভরশীল; ইংরেজ পুরুষদের মধ্যে এতখানি নির্ভরতা খুব বেশী দেখা যায় না।

কাঠের জুতা তৈরী হচ্ছে। কৃষক-শ্রেণীর অনেকেই এই জুতা ব্যবহার করে

কাপড় ধোলাই ক'রছে

ইংরেজদের মতো ফরাসীরা—মেয়ে-পুরুষ উভয়েই—ক্লাব-জীবনের বিশেষ পক্ষপাতী নয়। কেবল প্যারিসের "Le Jockey" নামক ক্লাবে মেয়েদের প্রবেশাধিকার আছে। 'ক্লাব হচ্ছে নারী-মহল থেকে পরিত্রাণ পাবার যায়গা,'—ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্লাবের এই রকম ব্যাখ্যাই চ'লে আসছে। ফরাসীরা এই ব্যাখ্যাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

ফরাসী স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোনো কার্য্যের কথাই গোপন থাকে না। দৈনিক-পত্রের সংবাদ থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু-পালন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রকমের প্রত্যেকটী বিষয়ের আলোচনা প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই হ'য়ে থাকে অকুণ্ঠ চিত্তে। আলোচনার মধ্যে হাসি-ঠাট্টা-গল্প চলে নিতান্ত খোলাখুলি ভাবে; এবং সে আলোচনার যে মধুর সমাপ্তি হয়, তার একমাত্র কারণ, সেই সময়ে কোনো পক্ষই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার বিষয়ে একটুও মনোযোগী হয় না। এইজন্যই, ফরাসী নারী ইংরেজ নারীর চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী, অনেক বেশী মুগ্ধতায় ভরা।

ফরাসী-নারীর কুমারী-জীবনের সংগঠন-রীতি বড়ই সুন্দর। কুমারী নারীর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা, বিবাহযোগ্য বয়স না আসা পর্য্যন্ত তার পড়বার বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'য়ে থাকে। বালিকা-সুলভ মন যাতে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন-প্রভাবে মূর্চ্ছিত হ'য়ে না পড়ে, এইজন্যই রঙীন রোম্যান্সের বই পড়া তার পক্ষে নিষিদ্ধ। ভাব-প্রবণতার নেশা চোখে নিয়ে সে জীবনের দিকে তাকায় না। ইংলণ্ডের মেয়েদের মতো তারা প্রেম ও বিবাহকে কেবল আমোদের-ই জিনিষ ব'লে ভাবে না।

অনুভূতির মাপ-কাঠিতে আবেগ কিম্বা অনুরাগ কতটুকু কিম্বা কতখানি হ'লে ভালো হ'তো জানতে পারা যায়, এমন গল্প তাকে প'ড়তে দেওয়া হয় না। যে-জিনিষটীকে পাওয়া যাবে না, এমন কোনো-কিছুর কল্পনাও তার মনের কোণে স্থান পায় না। এই সব নানা কারণে, পিতামাতার দ্বারা নির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করবার আগে সে তার নিজস্ব পছন্দের কথা উত্থাপন করে কদাচ। যদি একান্তই তার পাত্রকে অপছন্দ হয়, তা হ'লে সে তার মা কিম্বা বাবাকে এক সময়ে তার ইচ্ছার কথা জানাতে পারে। এই রকম ক্ষেত্রে প্রায় ই মেয়েকে নিরাশ হ'তে হয় না।...

বিবাহ জিনিষটী ইংরেজ তরুণীদের কাছে যেমন একটা উন্মাদনার জিনিষ, ফরাসী মেয়েদের কাছে ঠিক তা নয়। বিবাহ তাদের কাছে সাংসারিক জীবন-পথে প্রবেশ করবার নৈতিক সূত্র স্বরূপ। এই সাংসারিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সেখানকার প্রত্যেক মেয়েকেই কুমারী অবস্থায় উপযুক্ত আদর্শে পালন করা হয় এবং উচিত মত শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানকার যে-সব মেয়েরা আশ্রম-বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, তাদের শিক্ষনীয় বিষয় খুব বেশী না থাকলেও, সাংসারিক প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। আগে উক্ত আশ্রম বিদ্যালয়ে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস মেয়েদের পড়ানো হ'তো। আজকাল কিন্তু এ-নিয়মের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস পড়ানো মানেই নয় কি যে, সরল মন বালিকাদের প্রকারান্তরে বোঝানো, বিপ্লবের পর ফ্রান্সের উল্লেখ্য কোনো ইতিহাস-ই নেই ?...

বিগত ৪০ বছরের মধ্যে ফ্রান্সে মেয়েদের জন্য অনেকগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। শরীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব এবং সাংসারিক মিতব্যয়ের কথা সেখানকার অন্যতম শিক্ষনীয় বস্তু। পৃথিবীর দার্শনিকদের কর্ম্ম-পরিচয়ের কথাও সেখানে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়। সূচের কাজ, দরজির কাজ, রান্নার কাজ-ও সেখানে 'হাতে-নাতে' শেখানো হয়। এই শিক্ষা পেতে হ'লে, বাৎসরিক ৮ পাউণ্ড থেকে ১২ পাউণ্ড দর্শনী লাগে। যে সব ছাত্রী বাড়ীর বদলে স্কুলেই শেষোক্ত কাজগুলির শিক্ষার অভ্যাস ক'রতে চায়, তাদের প্রত্যেকের বাৎসরিক আরও ৬ পাউণ্ড বেশী মূল্য দিতে হয়। খাদ্যের রসায়ন-তত্ত্ব, বৃক্ষ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েরও সরল, সহজ শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয়—তরুণী শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা, খুব সুন্দরভাবে। লিখে এই সব পরীক্ষায় অনেক মেয়েই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না বটে, কিন্তু এ কথা সত্য যে, বাস্তব জগতের যে-টুকু তত্ত্বের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়, তা তাদের স্মরণে

বৃদ্ধের কাজ। যথেষ্ট বয়স হ'লেও, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েনি

থাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত। বেঁচে থাকার ব্যাপারের মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য আছে, স্কুল থেকে তার শিক্ষা পেয়ে, তাদের মন আনন্দ-বিস্ময়ে দুলে' ওঠে। এই কারণেই, সাংসারিক জীবনে তারা উপযুক্ত জননী হ'তে পারে, উপযুক্ত গৃহকর্ত্রী হ'তে পারে, উপযুক্ত রাঁধুনী হ'তে পারে।

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ফ্রান্সের কুমারী-সমাজের জন্য একটী নিয়ম ছিল। আজকাল এ নিয়মকে ঠেঙিয়ে তাড়ানো হ'য়েছে। আগে কোনো কুমারীই উপযুক্ত-বয়স্ক অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গেই মেশবার অধিকার পেতো না। টন্‌টনে নীতিবাগীশ্‌রা গাল ফুলিয়ে 'গোম্‌ড়া' গলায় ব'লতো, "কি সর্ব্বনাশ! অত বড় সোমত্ত ছেলেটার সঙ্গে কি না ওই রকম ডাগর আইবুড়ো মেয়েটা ঘুরে বেড়াচ্ছে!" আজকাল কিন্তু নীতিবাগীশদের মুখ সেলাই হ'য়ে গেছে। প্রত্যেক মেয়েই আজকাল বন্ধুভাবে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে পারে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে—ফ্রান্সের রাজপথে পাশাপাশি যাওয়া সাই-কেলে-চড়া অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে। এই ঘনিষ্ঠতা

আলুর ক্ষেতে

ঠিক জন্মগ্রহণ করবার সময়েই কিছু কিছু ব্যক্তিগত অনিষ্ট ঘ'টতে সুরু হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তার সংখ্যা বেশী নয়।

ফ্রান্সের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা ইংল্যাণ্ড কিম্বা আমেরিকার উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের মতো জাহান্নমে যায় কদাচ। ফ্রান্সের জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্বই এ-বিষয়ে তাদের সাহায্য করে। হয় ত—হয় ত কেন, অনেক সময়ে নিশ্চয়ই, পিতামাতারই অত্যধিক আদরে ছেলেরা বিগ্‌ড়ে যায়। কিন্তু যে-হেতু সেখানকার পারিবারিক শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য ঘরের উকীল থাকে (গতবারেই এবিষয়ের উল্লেখ করা হ'য়েছে), সেই কারণে, সেই উকীল আইন-গত অধিকার নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে শোধ্‌রাবার জন্য এগিয়ে আসেন। যদি তিনি দেখেন, এ ক্ষেত্রে বাপের আদরই দোষী, তা হ'লে তিনি ছেলেকে বাপের বাড়ী থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা ক'রবেন না। যদি তিনি দেখেন, ছেলের মাথার ওপরে বাপ কিম্বা কোনো অভিভাবক নেই, তা হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ 'ট্রাস্‌টী' নিযুক্ত ক'রবেন—ছেলে ও তার বিষয়-সম্পত্তির ওপর নজর রাখবার জন্য।

ফ্রান্সের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে এই রকম এক-একটী ঘরের উকীল রাখবার নিয়ম কবে এবং কোথা থেকে আমদানী করা হ'য়েছে, তা জানতে হ'লে সর্ব্বজ্ঞ বিধাতার কাছে যাওয়া উচিত; কারণ, মধ্যযুগের আগে তার কোনো ইতিহাসই খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না।

নিরালায় গল্প। মেয়ে দুটীর টুপীর পার্থক্য থেকে জানা যায় যে, তারা ফ্রান্সের ভিন্ন জায়গায় বাস করে

রোম্যান্‌ প্রথার অনুসরণেই এটী আত্মপ্রকাশ ক'রেছে কি না, তার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। তবে এ কথা ঠিক যে, এই নিয়মটীর মধ্যে ফ্রান্সের বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে অনেকখানি। এবং উদ্দেশ্যটী হচ্ছে এই যে. সমস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াবার জন্য উকীলকে মাথার উপর খাড়া ক'রে লোকেরা শান্তিতে বাস ক'রতে পারবে।

ঘরের উকীলকে এক-একটী পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আইনগত অধিকার দেন—বিশেষ শ্রেণীর বিচারক। এঁদের বলা হয়—"Juge de paix", অর্থাৎ শান্তির বিচারক। প্রত্যেক প্রাদেশিক বিভাগেই এক-

একটী শান্তির বিচারক থাকেন। বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে ঝগড়ার নিষ্পত্তি করাই তাঁর কার্য্য। কাউকে শাস্তি দিতে হ'লে, তিনি বড় জোর তার কাছ থেকে আট পাউণ্ড জরিমানা আদায় ক'রতে পারেন, কিম্বা, তাকে অল্প সময়ের জন্ত কারাবন্দী ক'রতে পারেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রায়ই তাঁকে শাস্তি দিতে হয় না;—আপোষের মধ্যেই হাঙ্গামা মিটে যায়। এই সব বিচারকের পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু তাঁর গুণে, তাঁর বিচারে মুগ্ধ প্রত্যেক লোক তাঁকে যা সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখায়, প্রচুর অর্থের চেয়েও তা অনেক বেশী মূল্যবান।

বেলা-প্রদোষে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১)

হৈমন্তী সন্ধ্যায় আজি দূর বেলাভূমে
পড়ে মা তোমারে মনে। লুলিত কুসুমে,
ক্ষণে-ক্ষণে-শিহরিত চুত বীথিকায়,
ঝুরে তব মঞ্জু গন্ধ কান্ত সান্ধ্য বায়।
অদূরে আলোকমুগ্ধ বঞ্জুল কাননে
ঘনশ্যাম পাতাগুলি হরিত প্রেক্ষণে
কার পানে চেয়ে? স্বচ্ছ নভের আড়ালে
গাঢ় নীলকান্ত দ্যুতি কে কল্যাণী ঢালে
ধরার মাটির থালে—অনিন্দ্য মধুরা!
চলোর্ম্মি শিঞ্জিত নিধি পিই' সেই সুরা
মাতোয়ারা সম যেন টলি' টলি' চলে।
দিগন্ত বিতত চূর্ণ অভ্রে জ্ব'লে জ্ব'লে
উঠে যাযাবরশিখা; এখানে—ওখানে
ছুড়িয়া ছুড়িয়া আবীরের শর হানে
কনক কার্ম্মুকে তার রক্ত দিবাকর
ব্রীড়ারাগে সাড়া দেয় রক্তিম অম্বর
সে-শর-চুম্বনে। বুঝি তার সম্ভাষণে
ফুটে মা পরশ তব এ বেলা বিজনে
তাই ফিরে ফিরে চায়?

শুধু ভাবি—হেন
স্নিগ্ধাভাষখানি তব পাই না মা কেন
এমন সৌগন্ধী ছন্দে উৎসবে, মিলনে,
লক্ষ-দীপমালা-বিহসিত সভাঙ্গনে?
কোটী রশ্মি ঠিকরিয়া পড়ে, প্রাণ তায়
ক্ষণতরে উঠে দুলি',—পরক্ষণে হায়,
যাচে নির্জ্জনতা ফিরে। কেন? সে-লগনে
দেখা দাও বলি' বুঝি?—তাই পড়ে মনে?

(২)

নিথর সৈকতে শোনে কোন্ গূঢ় রেশে
কাণ পাতি স্তব্ধ হৃদি? দিবসের শেষে
ময়ূখ ময়ূরকণ্ঠী ধূসরায়মান
জলধরে বুনে কার বিদায়ের গান
ফাঁকে ফাঁকে নীলাকাশ গাঁথি'? মীড় শুনি
ছন্দিত কল্লোলে—কার? উঠে গুনগুনি'
কার বা বিস্মৃত গাথা নিখিল আবহে?
অম্ভোধি-উরসে অংশুমালীর বিরহে
বিষাদ না জাগি' জাগে কী সুর?—অম্বর
কার মৃগমদ-গন্ধে আজি ভর ভর?
বিথারি' তৃষিত বাহু দীর্ঘ বনস্পতি
কার তরে ঊর্দ্ধায়িত?—ধূপ দীপারতি
স্বনে কার গোধূলি-মঞ্জীর? উদাসিনী
বেলাভূমি কার তরে দূর বিসর্পিণী?
নিষণ্ণ নীরধি-নীড়ে নীরদের ছায়
বৃত্তাকার দ্বীপ রচি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
গৃহলক্ষ্মী সম অলকার ঝরকায়
জ্বালি' বাতি একে একে তারকা শিখায়
সন্ধ্যালক্ষ্মী 'আয় আয়' ডাকে। ক্ষণে ক্ষণে
মরমর বান যায় ডেকে তালীবনে

শাখাশাখী করিয়া উতলা,—বুঝি তারা
কার আগমনে দেয় উলু! পথহারা
দুটি গাভী তাহে দেয় সাড়া থাকি' থাকি'।
দিনান্ত দিগ্বধূক্রোড়ে ক্লান্ত মাথা রাখি'
প্রতীক্ষা-মগন। কোন্ অচেনা সুবাস
হৃদয়ে বহিয়া আনে কী সুর উদাস!···

(৩)

যাহা এতদিন ছিল প্রেয়, সুমধুর,
আজি যেন মনে হয়—দূর—কত দূর!
দুঃখ সুখ, যার সাথে বিজড়িত হিয়া
ছিল কত সূত্রে—কবে গেছে যে সরিয়া!···
বিবিক্ত দ্রষ্টার সম যেন আপনায়
মনে হয়।—শুনি এক নব বারতায়!

(৪)

নব বারতায়? তাই দেয় না ক দোল
পুরাতন জীবনের লক্ষ উতরোল
চির পরিচিত ছন্দে? তাই আঁখি মোর
নির্লিপ্ত অঞ্জন পরে? শ্লথ মায়া ডোর
পড়ে খসি' নির্ম্মোকের সম? তাই আজি
সুদূর নেপথ্যে রহি' রহি' উঠে বাজি'
নূপুর-নিক্কণ কর্ণে বীততৃষ্ণা তালে?
নব বেশ জাগে ব'ল' হৃদি-অন্তরালে?

(৫)

সবই বাজে নববেশে—সত্য। শাখা মাঝে
উঁকি দিয়া যুগ্ম তারা কত রঙে নাচে—
বহুরূপী ঢঙে যেন! কভু বা রূপালি,
কভু রক্ত, কভু শ্বেত—কখনো সোনালি!
মেদুর মৌনতা! ছিল যা কিছু অস্থির
ধরে এ কী ধ্যানমূর্ত্তি—নিমীল—গম্ভীর!
বারি ব্যোম ব্যাপি' যেন রহে থমকিয়া
অশরীরী ছায়া এক—পক্ষ বিস্তারিয়া!
মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া তারে উঠিয়া প্রণমে
রোমাঞ্চিত হয় তনু সে-স্পর্শে—সম্ভ্রমে!

(৬)

সে-রোমাঞ্চে দশদিকে ফাটে নব দ্যুতি
বিচিত্র ব্যঞ্জনা সাথে—অপূর্ব্ব আকুতি
জাগে হৃদে—যেথা ওই মেঘের সিঁথায়
সোনার সিন্দূরবিন্দু নিঃশব্দে মিলায়,—
যেথা দূর হতে কোন্ বংশীরব আসে
ভাসি গাঢ়—অশ্রুপ্লুত; পীতাভ আকাশে
ধীরে ছেয়ে আসে যেথা ছায়ার রাগিণী;—
সেথা ডাকে নব সুরে মুক্তি বিমোহিনী।
পাসরিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি, অশ্রু সান্ত্বনায়,—
ঘরছাড়া অভিসার পানে ছুটে যায়
বিবাগী পরাণ।—নহে বিতৃষ্ণা বরিতে:—
নব প্রাপ্তি-গলে বরণের মাল্য দিতে।

(৭)

অভিসার? কার? হায়, প্রাণ কি তা জানে?
জীবন দেবতা তার বলে কানে কানে
শুধু এক কথা: যাহে ছিল এতদিন
তৃপ্ত, তারে বিসর্জ্জিয়া দ্বিধা-সর্ত্ত-হীন
ঝটিকার তাড়নায় জলদের মত,
ধাইতে হইবে ত্যজি' চিরাভ্যস্ত যত
আলস্য-মন্থর স্বস্তি, আকাঙ্ক্ষা বামন
ব্যর্থ আঁখিলোর-দিগ্ধ ব্যথা আলিম্পন;
বিজয় তোরণ যেথা দিগন্তের পারে
দেয় হাতছানি, তারই তরে পারাবারে
দিতে হবে পাড়ি। খেয়া?—প্রাণের নির্দ্দেশ।
পথের পাথেয়?—পথে মিলিবে অশেষ।

(৮)

আর যদি মিথ্যা হয় আশার নির্দ্দেশ
মৃগতৃষ্ণিকার সম? তাহে ক্ষোভলেশ
নাহি কোনো। যার তরে করি হাহাকার,
কাড়াকাড়ি প্রাণপণ, এমনই কী তার
অপূর্ব্ব সঙ্গীত? অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া
জলের অঞ্জলি সম যায় নিঃশেষিয়া
দেখিতে দেখিতে। বিন্দুসম জ্যোতি যায়
আঁধার-পাথারে ডুবি'। তারে নাহি চায়
উচ্চাশী পরাণ। সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা বৃহত
আকাশকুসুম যদি,—যদি এ জগত
শুধু জড়, বস্তু-সার তবে তারে ল'য়ে
কী বা হবে করি' ঘর?—ব্যর্থ বোঝা ব'য়ে

দুদিনের তরে ? যদি জীবনে অমৃত,
সর্ব্বক্লান্তিহরা শান্তি, অনবগুণ্ঠিত
স্থায়ী জ্যোতি নাহি মিলে ;—যদি চিরশেষ
বুদ্বুদের সম হেথা সব গীতিরেশ ;—
বর্ষ-কতিপয় মধ্যে সফল স্বপন
নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যায় ;—তবে মিছে মন
কেন চা'বে তারে ? হেন অপূর্ব্ব সৃষ্টিরে
নাহি অভিনন্দি'—দিব বিদায় অচিরে।
গাহিয়া এ হেন শুষ্ক ছন্দহীন গীতি
সুরহীন রিক্ত কণ্ঠে—কভু প্রেমপ্রীতি
লভে সার্থকতা ?

কভু নহে। সত্য যদি
শূন্যময়—মরুরেই তবে নিরবধি
পূজিব বঞ্চনা ত্যজি'। মহত প্রয়াস
যদি বৃথা বিড়ম্বনা;—বিফলতা পাশ
চাহিব অতৃপ্তি চির ; তবু স্বল্পজয়
নহেক ঈপ্সিত মোর—মলিন সঞ্চয়।
যে সুদূর তৃষ্ণা প্রাণে মাহেন্দ্র লগনে
দিয়েছিল দেখা—ক্ষণতরে—সঙ্গোপনে—
যদি তাহা নহে মিটিবার—যদি স্বপ্ন,
স্বপ্ন-চারণেই তবে র'ব চিরমগ্ন।

* * * * * *

এ সৌরজগতে যদি জীবন কেবল
ক্ষণধ্বংসী ফেন সম চমকে চঞ্চল
সব আগমনী গীতি হেথা আসে বাহি'
ঝরাফুলদলপথ—তবে নাহি চাহি
মাতৃহীন মৃত্তিকার ম্লান উঞ্ছবৃত্তি,
দিনগত পাপক্ষয়—কৃপণের তৃপ্তি।
তার চেয়ে যাক্ কল্লোলিয়া কল্পনায়
অনিকেত নীলকণ্ঠ স্তোত্র—যার পায়
নমিয়াও গর্ব্ব আছে ; তবু বরমালা
ছোটরে না দিব কভু ; প্রেম প্রাণঢালা
নাহি নিবেদিব ক্ষুদ্রে। রিক্ত জীবনের
দ্যূতাগারে কোনমতে ত্রস্ত ঘুঁটিদের
আগুলিয়া ছক পরিক্রমা ? ছিছি, হেন
অবসন্ন জীবন না যাপি কভু যেন।

যদি রিক্ত ধরা—মিথ্যা ধূপারতি-স্তবে
অপদার্থ পদার্থেরে পূজিব না ভবে।
যদি তুমি নাহি—

(৯)

কিন্তু মাগো, চিন্তা এ কী
অসম্ভব আসে মনে ? কেন শূন্য দেখি
চারিধার মুহূর্ত্তেরও তরে ? মর্ম্মতলে
যেই গূঢ় স্বর ফুটে—তারে কোন ছলে
করি অনাদর ?—হায় ! যুক্তির আদেশে ?
চেতনা তাহার কাছে পাতে হাত শেষে
যে তাহারই সৃষ্ট ? খোঁজে জোনাকীর পাশে
ছায়াপথ পথের ইঙ্গিত ? হাসি আসে।—
প্রতি পদে ক্ষুণ্ণ হয় দিশা যার—তারি
মুখ চেয়ে রবে অনুভূতির দিশারী ?
যার জ্যোতিকণা চুম্বি' মার্ত্তণ্ড উজ্জ্বল
যাহার স্ফুলিঙ্গে নেত্রে বিস্ময়-বিহ্বল
দিব্য দৃষ্টি জাগে, প্রেম হয় আত্মহারা—
তারি অন্তঃপুরে দিবে সংশয় পাহারা ?
বুদ্ধি হবে রাণী ? অতীন্দ্রিয় বারতায়
ভেটিব ইন্দ্রিয় পথে ? লভিব আত্মায়
দেহব্যবচ্ছেদাগারে ? অপূর্ব্ব যুকতি।
যেই ধ্যানলোক-বর্ণচ্ছটার আরতি
প্রেমে দেয় ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ, ভোগে কায়া,
যার তেজে বস্তু লভে বাস্তবতা—মায়া—
শূন্য সেই ?—সত্য শুধু জড় পরমাণু
অমরতা-স্বপ্ন মিথ্যা ? সত্য শুধু স্থাণু ?
বীণার মূর্চ্ছনা মিথ্যা—সত্য শুধু তন্ত্রী ?
সত্য—যন্ত্র দারুসার,—মিথ্যা তার যন্ত্রী ?
আমি মিথ্যা—সত্য শুধু বিশ্লেষণ যায়
করি মোর ছায়াময়ী চেতনার ভায় ?

(১০)

বাক্য-বেড়াজাল মাগো কতই ধাঁধায়
ফেলে বাক্যবাগীশেরে ! কত না ঘুরায় !
প্রাণের অতল বাণী, আকাঙ্ক্ষা শাশ্বতে
যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্রে বধি' বলে : 'এ জগতে

একমাত্র সত্য—শুধু যাহা ক্ষণতরে
উপরে ভাসিয়া উঠে।' যেন তাহে ভরে
গহন অন্তর তৃষ্ণা! ডুব নাহি দিয়া
সুগুপ্ত শুক্তির মুক্তা চাহে লুব্ধ হিয়া।
দণ্ড দুই হেথা হোথা করে সন্তরণ
দুচারিটি ঝিনুকেরে করে পরীক্ষণ,
তাহে হ'লে ব্যর্থ, রচে যুক্তি অপরূপ!
বলে: 'মুক্তা কোথা?—ও হে ঝিনুকেরি স্তূপ!'
যুক্তির মন্থনে বুদ্ধি নাহি লভি সুধা
প্রাংশু পাণ্ডিত্যের পাণ্ডু সৌধ গড়ি' ক্ষুধা
চাহে মিটাইতে।

(১১)

মাগো, হেন আস্ফালন
বরজি' তোমারে চাহি করিতে অর্চ্চন
প্রেমের কুঙ্কুমে ধূপে, ভক্তির চন্দনে,
আর্জ্জবের দীপে—নহে পাণ্ডিত্য বন্দনে।
দূরে যাক্ দ্বিধা—দাও শ্রদ্ধা অচপল;
ফুটিয়া উঠুক সুপ্ত চিত্ত শতদল।……

(১২)

চাহিতে না চাহিতে মা নূতন জোয়ার
প্লাবি' সব পলকেতে করে একাকার!

* * * * *

সব একাকার।……

মন সংশয়েরে ছাড়ি'
প্রেমের প্রত্যয়-মাঝে খুঁজে শান্তিবারি।
মনে হয় অতীতের যত ক্ষতি-লাভ,
যত দুঃখ-সুখ, হর্ষ-ব্যথা, পুণ্য-পাপ
সমান হইয়া গেছে;—পর্ব্বত চূড়ায়
আরোহিলে সামুমূলে যেমন দেখায়
বাপী হ্রদ তরু-তৃণ।……

আজি সান্ধ্যবায়
তেমনি অতীত-স্মৃতি ছায়াবাজি প্রায়
মনে হয়:—

কত আশা নিরাশায় দোলা,
জয়ের ঝিলিক-দীপ্তি পরাজয়ে ভোলা,
তুচ্ছ চাক্‌চিক্যে হওয়া নিয়ত উতলা,
মনে পড়ে মিলনের বিদ্যুৎ-চঞ্চলা
মাদকতা, বিরহ-আকুল প্রশ্ন শত,
এক ভেবে আর করা, শঙ্কা হর্ষ কত!
বারবার স্বপ্নভঙ্গ, নিত্য ওঠাপড়া,
অতৃপ্ত কামনা কত, কত ভাঙাগড়া,
জীবনের সন্ধিলগ্নে। প্রথম যৌবনে
মনে পড়ে সেই মুগ্ধ বেদন পূজনে
দীর্ঘশ্বাস-ভরা; হিয়া লুণ্ঠিত ব্যথায়
ঝরিতে দেখিলে কুসুমেরও কলিকায়
তুহিন-সম্পাতে; কাব্যে নিঠুর শিশিরে
নিতি অভিশাপ দিত তিতি' আঁখিনীরে।
মনে পড়ে: সেই প্রতি প্রিয়-সমাগমে
আসন্নবিচ্ছেদ-ভীতি বিঁধিত মরমে
কী অদৃশ্য কাঁটা হ'য়ে! অশান্তি সরবে
মনে হত কত কাম্য! কাড়াকাড়ি—স্তবে
কী উৎসাহ! কত ক্ষুণ্ণ হ'ত অভিমান
এতটুকু পরাজয়ে! জয়ে কী সম্মান
দিত হৃদি!

(১৪)

কিন্তু পরক্ষণে জয়মালা
যেত যবে শুকাইয়ে—খুঁজিত নিরালা
আশ্রয় এ প্রাণ। প্রতি পলে হ'ত মনে:
'কেন প্রতি মিলনের মুখর লগনে
'আশঙ্কা ঘনায়ে উঠি' করে প্রতিক্ষণে
'সকল উল্লাসে ম্লান?' সুধাইত হিয়া,
'জীবনের ফাঁকগুলি লিপ্সায় ভরিয়া,
'কর্ম্মধূনে বুজাইয়া, তরীখানি বাহি'
চলিলেই পাব তারে যারে সত্য চাহি?'
মনে হ'ত; 'শেষ হ'য়ে এল কলরব
'আলোক-আসব-মত্ত সকল বৈভব
'ক্ষণিকের; তিমিরের ব্যাদিত গহ্বরে
'সর্ব্ব জয়দীপ্তি লভে লুপ্তি চিরতরে।'
মোহের উৎসবে মাগো বরণ করিয়া
চলিতাম বটে নিত্য তোমারে ভুলিয়া,—

কিন্তু থেকে থেকে মনে হ'ত ; 'সব দান
'যেন স্বর্ণমৃগ সম মায়া ! স্তুতি গান
'ব্যঙ্গ অভিনয় ! আসঙ্গের আঁধিয়ার
কত গাঢ় দেখাইতে ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার
দণ্ড দুই জ্বলা !'
কাম্যবনে বুকে যত
ধরিতাম চাপি' স'রে স'রে যেত তত।

(১৫)

এ ছলে ছলনাময়ী, চাহিলে বুঝাতে
তোমা বিনা কত অসহায় এ-ধরাতে
মোরা নরনারী ? হায়, মোদের আশায়
ডালি—সে ত মরীচিকা ! তাই বারবায়
প্রতি হাসিফুলে জীবনের মালাটিতে
বুঝি দুটি অশ্রুমাঝে গাঁথ ? লুব্ধচিতে
সেই মালাজপ যবে করিতে মা ধাই,
হাসিরে জপিতে অশ্রু নিত্য পাসরাই !
অন্ধ মোরা ভুলে যাই—বিকচ কলিকা
দেখিতে দেখিতে ঝরে ! নিষ্কম্প দীপিকা
ফুৎকারেতে নিভে যায়। চঞ্চল গৌরব
দুফোঁটা শিশিরে হয় বিগত-সৌরভ !—
বুঝেও বুঝি না ;—তাই উপহাস করি
প্রাণের এষণা গূঢ় ; তোমারে পাসরি।
চাহি' পাই ; লভি' দেখি পেয়েছি মা যারে
গভীর অন্তরতলে চাহি নাই তারে।
যাহা সত্য চাই—তাহা কাড়াকাড়ি মাঝে
চকিতে গুণ্ঠন খুলি মুখ ঢাকে লাজে।

(১৬)

কিন্তু মাগো যেই সুধা এ-অশ্রু-ছায়ায়
উপচি উঠিতে চাহে প্রাণ-পিয়ালায়,
হেন পলাতক কেন সুরভি তাহার—
মুহূর্ত্তে উবিয়া যায়—বৃথা বার বার ?
মনে প্রশ্ন জাগে মাগো—আজ আয়ু যার
মনে হয় চিরন্তন, কাল কেন তার
চিহ্নও না পাই খুঁজি' ?—যত অলি গলি
অন্বেষি না কেন—তবু উঠে না ত ঝলি'
জয়যাত্রা তার নাশি' তামসী আঁধার।
দিব্যাঞ্জন হয় অন্তর্হিত ; হেরি সার—
স্বখাত-সলিলে-ডোবা, বোঝা অর্থহীন ;
তব বরে পাওয়া যায়—য়াখা সুকঠিন।

(১৭)

হৃদয়ের এক অংশ যাচে আত্মদান,
অপরাংশ খোঁজে গণ্ডী, গর্ব্ব, অভিমান,
স্তোকবাক্য। একজনা প্রার্থে ও-চরণ,
অন্যজনা মাগে তৃপ্তি করিয়া বরণ
আপন স্বার্থের কূপে। তুচ্ছতম দায়
কত ছলে হ'য়ে ওঠে নিত্য অতিকায় !
হৃদয়ের মর্ম্মকোষে ফুটে যে-নির্দ্দেশ।
কৌটিল্যের চূর্ণ-উর্ম্মিবাতে তার রেশ
পলকে ডুবিয়া যায়। একান্ত সরল
যেই পথ—সে পাওয়ার আভাষে বিহ্বল
হয় প্রাণ—শত সূক্ষ্ম বাধা বর্ম্ম তার
চকিতে অগম্য করি' তুলে বারম্বার।
যেই আধ আলোস্পর্শে উদ্ভাসে পরাণ,
উষাপাতে নিশা সম,—হয় খান খান
নিমিষের সংশয়ে মা। হায় একক্ষণে
গণি যারে সারাৎসার—স্তিমিত' বরণে
প্রতিভাতে পরক্ষণে।—লুকোচুরি ছলে
এ-হেন নিঠুর খেলা, ছি !—খেল কী ব'লে ?

(১৮)

এ ও তবু সয় প্রাণে। কিন্তু মা গো, হায়
সবচেয়ে দুঃখ এই—হয় অন্তরায়
সাধনাই সাধনার পথে—থাকি' থাকি'।
যে প্রেমবর্ত্তিকা দিবে আলো—সেই ঢাকি'
দেয় যদি পথ অভিমান রূপ ধরি'
উগারি' অজস্র কালি, বল তবে বরি'
কোন ধ্রুবতারাটিরে কনকবরণী
ক্রুদ্ধ পারাবারে হৃদি বাহিবে তরণী ?
অক্ষেম লুকাবে যার ক্ষেমস্পর্শে, করে
সেই যদি সন্ধি মিথ্যা সনে—বল নরে
কোথায় দাঁড়াবে ? পড়ে যদি—কারে ধরি'
উঠিবে আবার—যত কৃপাকণা
জাগায় সাধনা গর্ব্ব ?—এ কী বিড়ম্বনা।

যে-করুণাপাতে মোহ লজ্জিত চরণে
পলাবে—তাহারি নিয়ে যদি সঙ্গোপনে
শশীকলা সম বাড়ে আত্মপ্রতারণা
ছদ্মবেশে—তবে মাগো, কোথায় সান্ত্বনা ?

(১৯)

তব প্রেমাস্বাদ কভু যেই অভাজন
পায় নাই—তার কাছে রিক্ততা তেমন
নহে মা দুঃসহ। আপনার চারিধার
বিরচি' পঙ্কিল স্রোতোহীন পরিখার
স্বল্পায়ু সান্ত্বন—করে শূন্য দুর্গে বাস ;
সুরেলা কণ্ঠের গান নাহি শুনি'—আশ
মিটে তার শুনি স্বরশ্রীহীন সঙ্গীত ;
জন্মদুঃখী মুষ্টিভিক্ষা তরে লালায়িত।

কিন্তু মা, সুকৃতিবশে মাত্র একবার
পেয়েছে যে স্বাদ তব সুর-মূর্চ্ছনার,—
সে যদি বঞ্চিত হয় উপচীয়মান
তোমার পীযূষ হ'তে—ঊর্দ্ধের সোপান
সহসা হারায়—বল দাঁড়ায় কোথায় ?
নিরাশার মেঘ যে মা পলকে ঘনায় !
দুঃসহ সংশয়-আঁধি সকল গভীর
দৃষ্টিরে মলিন করে ; নিহিত হৃদির
উৎসারিত ভক্তিধারা হয় রুদ্ধ প্রায় ;
কভু কি পেয়েছে কিছু ?—খসি' সে সুধায়।

(২০)

এমনি মা ঘটে হায় ! মনগড়া ছাঁদে
ও-মূর্ত্তি কল্পিয়া চলি—তাই প্রাণ কাঁদে ;
তাই হই হতোদ্যম থাকি' থাকি' হেন,
বুদ্ধি রচে লক্ষ তর্ক লূতাতন্তু—যেন
সে-ঊর্ণায় তোমারে মা কভু ধরা যায় !
আড়ম্বর-ফাঁদ পাতি' প্রেম-বৎসলায়
ধরিতে কামনা ! ! হায়, ঠেকি অনুক্ষণ
বুঝেও বুঝে না তবু এ অবুঝ মন।
হৃদয় শরণাগতি প্রার্থে—বারবার ;
বুদ্ধি চাহে নিজ সর্ত্তে দরশ তোমার
আপন যোগ্যতা করি' ঘোষণা নিরত,
যত করি দাবী—তুমি সরে যাও তত।

(২১)

স'রে যাও ? কিন্তু সে-ও নিমেষের তরে ;
ছেড়ে কি মা যেতে কভু পার হেলাভরে ?
কুলিশ কঠোর তুমি—কুসুম কোমল,
মনোবাক্যাতীত যদি—তুমি প্রেমোচ্ছল।
হারাই তোমারে যদি বিজ্ঞতায়, ভানে,
তর্ক-বাহ্বাস্ফোটে, অভিনয়-অভিমানে,—
ত্বরিত-পাখায় যদি যাও মা উড়িয়া
প্রেম-মধুহীন প্রাণপ্রসূনে ত্যজিয়া ;—
সরল প্রার্থনা সুরে যেই তোমা ডাকি
অমনি উর মা হৃদে পদাম্বুজ রাখি'
সিত সরসিজাসনা সন্তাপহারিণী !
অমল-আলোক-উৎসা অবনী-হ্লাদিনী।
স্তবমূঢ় তনুমন বন্দে সে-আসার
সিতাংশু-শিঞ্জিত শর্ব্বরীর প্রেমধার
বন্দে নভে যথা। বুদ্ধি ভাবিয়া না পায়—
যে-রূপের এতটুকু আভাষ বহায়
হেন সুরধুনী-ধারা, তার কোথা শেষ ?
না না—ভাবে না সে কিছু—শুধু নির্ণিমেষ
রহে চেয়ে। আপনারে গণে ধন্য বলি'
দেহের সকল মন্থরতা উঠে ঝলি',
ধূলিদীন মর্ত্ত্য ছন্দ বাজে উল্লসিত
অমর্ত্ত্য কিঙ্কিণী-লাস্যে প্লাবি' গুঞ্জরিত।
নগণ্য আলেখ্যে ফুটে নূতন মঞ্জিমা,
তুচ্ছতম তৃণে হেরি অদৃষ্ট ভঙ্গিমা।
প্রতিপদে গণি যারে বাধা—কারাসম
তারও পৃথ্বীটান-গ্লানি অনুপ পরম
যতিভঙ্গহীন ব্যোমছন্দের রভসে
লভে নব সার্থকতা—অন্তরে উছসে
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি-স্তোত্র ; হৃদি যায় দলি'
সকল সংশয়তমঃ ; মুহূর্ত্তে উজলি,
উঠে সর্ব্ব সীমা নব সম্ভাবনা বর্ণে
অনুস্বাতি রূপান্তর লভে দীপ্ত স্বর্ণে ;

পথরোধী-ক্লৈব্য-জাড্য-চমূ-পুঞ্জীভূত
বালার্ক-আহত কুজ্ঝটিকা সম ভীত
পলায় নিমেষে। অমলিন চিদাকাশে
নূতন জ্যোতিষ্ক-বিভা যেন পরকাশে।
ধমনীতে পদধ্বনি, শোণিতে ডমরু
বাজে ভেরী স্বনে—চক্ষে লুপ্ত হিমমরু।
যে-আনন্দ স্বপনেও চিত্ত চক্রবাল—
চতুঃসীমামাঝে দেখা দেয় নাই কাল,
আজ বাজে চিরপরিচিত ছন্দে নাচি',
সর্ব্বসখা আপনারে মনে হয় আজি।
শীতবন্ধ্যা প্রাণ পুন বসন্ত-আগমে
নবীন-বল্লরী সম তোমারে মা, নমে।

(২২)

এ বেলা-প্রদোষে তব এই অপরূপ
লীলাছন্দ আসে ভাসি' জাগায়ে অরূপ
স্বপন সুন্দর গন্ধ! ছাড়িয়া আগতে
চাহি সম্ভাষিতে মা গো আজি অনাগতে।

(২৩)

সব ক্ষোভ যায় মুছে আজি ধীরে-ধীরে।
তারকা-নিচোলা সন্ধ্যা সায়াহ্ন-সমীরে
তব পরিমল বহি' আনে; হৃদিপুর
উদ্বেলিত সেই গন্ধে; কোন্ চেনা সুর
অরধ-বিস্মৃত উঠে রণিয়া অস্ফুটে,
কী অমিয়া উপজে মা, প্রাণের সম্পুটে!

(২৪)

প্রণমি তোমার পদে সুধায় এ-মন:
কোন্ ইন্দ্রজালে ঘটে হেন অঘটন?
যারে কভু দেখি নাই, শুনি নাই—তার
সূক্ষ্ম স্পর্শে সব হেন হয় একাকার
কোন্ মন্ত্রে? স্থূল বাস্তবেরে স্বপ্নসম
নিরখি এ চর্ম্মচক্ষে? স্বপ্ন দূরতম
একান্ত বাস্তব হয়? ও-রূপ স্মরণে
সব কাড়াকাড়ি-রোল ত্বরিত-চরণে
পলায়। নয়নে মোর উঠে উদ্ভাসিয়া
এক নবরাজ্য যেন তিমির ভেদিয়া
স্বপ্ন সম্ভাবনা ছাপি'; কোন কোজাগর
পৌর্ণমাসী আভাষে মা, চিত্ত ভর ভর?

(২৫)

পশ্চিমে হ'য়েছে লীন শেষ অস্তরাগ
বনস্থলী-শীর্ষে; ইন্দু লেপে পীত ফাগ
পূর্ব্বাচলে বারিধির বক্ষে টানি তার
লক্ষ হেম বিম্ব; আন্দোলি' সে মণি-হার
কম-কণ্ঠে নাচি' সন্ধ্যা তরঙ্গে তরঙ্গে
পাল তুলি' যায় চলি' কটাক্ষ বিভঙ্গে।
জ্যোতিপথে হয় ম্লান নক্ষত্র-দীপালি
চন্দ্রোদয়ে।...ফুটে আভা—উচ্ছল—সোনালি।
দূরে...দুটি মেঘসখী স্বর্ণকিরীটিনী
স্বর্ণ-ঝারি হতে ঢালে স্বর্ণ-প্রবাহিনী।
দূরে যায় সব দ্বন্দ্ব...স্বপন বিভ্রান্তি,
পাণ্ডুর হইয়া আসে মোহ কামকান্তি।
তরু, তৃণ, বেলা, বীথি, ছায়াপথ ব্যেপে
শান্তি আসে ছেয়ে ধ্যানমৌন পদক্ষেপে...
কৌমুদী যামিনী তারা-চন্দ্রাতপতলে
দুলায় খদ্যোত-মালা গন্ধবহ-গলে,
সরিত্-উৎসঙ্গে, কুঞ্জছায়া-কটিতটে!...
যাহা ছিল দূর...আসে এত সন্নিকটে!...

সে সামীপ্যে সব পরাভব লভে লুপ্তি
অবর্ণ্য পূর্ণতা মাঝে!...বিছায় সুষুপ্তি!...
বিস্মৃত স্তন্যের স্বাদ রসনার 'পরে
আসে ফিরে...নিখিল, মা, সেই স্বাদে ভরে!

বঁড়বাবুর বিপত্তি

(গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল

সূচনা

গলির মধ্যে ছোট দোতলা বাড়ী। পথের ধারের খড়খড়িগুলা পরিষ্কার ঝরঝরে। বাড়ীখানি পুরানো। তা হোক, দেওয়াল বালি-ঝরা নয়। পাড়ার লোকে বলে, বাড়ী কেন পরিষ্কার থাকিবে না? কর্ত্তা নিজের হাতে খড়খড়ি সাফ্ করেন, দেওয়ালের কোথাও বালি ঝরিলে, নিজে চূণবালি আনিয়া কর্ণিক-হাতে মেরামত করেন। বাড়ীতে চাকর-দাসীর উৎপাত নাই তো!…

পাড়ার লোকে আরো বহু নিন্দার কথা বলে। তা বলুক। পাড়া-পড়শীর মন চিরদিনই হিংসায় ভরা। কবে তারা কার ভালো দেখিতে পারে! তারা কর্ত্তার নামও করে না; এবং সকাল বেলায় মুখ দেখা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। একেবারে না দেখা সম্ভব নয় বলিয়া তারা আপোষে এটুকু স্থির করিয়াছে, সকালে ও-মুখ না দেখিলেই হইল!

পাড়ায় যখন এতখানি নিষেধ-শাসন, তখন আমরা না হয় নামটা নাই করিলাম! কুসংস্কার আমরা না মানি, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো মানেন! তাই…

বড়বাবু বলিয়াই যদি তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ ইঙ্গিত করি, তাহাতে বক্তব্যের মর্ম্ম অপ্রকাশ থাকিবে না। কারণ…

বড়বাবুর রোজগার মন্দ নয়; একটা অফিসের তিনি বড়বাবু; এবং সে-কারণে আফিসে তাঁর প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড। কেরাণী চিরদিনই বেচারী…এ অফিসেও তাই।

অর্থাৎ বড়বাবুর সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী; ছেলেমেয়ে নাই। দাসী-চাকর চোর হয়; চুরির প্রশ্রয় দিতে তিনি নারাজ; সেজন্য দাসী-চাকর রাখেন নাই। নিজের হাতে বাজার, নিজের হাতেই ঘর-দ্বার সাফ্ করেন,—ছেলেমেয়ে নাই, লোক-লৌকিকতার বালাই নাই। গৃহিণী রান্নাবান্না করেন,বাসন মাজেন। ঘর-সংসারের আরো পাঁচটা কাজ তাঁর আছে।…এই কাজের মধ্যেই তিনি তাঁর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া গৃহধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে ইহলোকে হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, বড়বাবু ও তাঁর গৃহিণীর জীবন-নাট্যে কোনদিন প্রথম অঙ্ক ছিল না, একেবারে এই চতুর্থ অঙ্ক হইতেই এ নাট্যের অভিনয় সুরু হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁরা ভুল করিবেন! তাঁদের জীবনেও ঠিক আর পাঁচজনের জীবনের মত প্রথম অঙ্ক আসিয়াছিল। প্রথম অঙ্কে সেই অজস্র আনন্দ, মিলন-বিরহ, প্রীতি-অভিমান, গল্প-গান, শীত বসন্ত, রৌদ্র-বর্ষা সবই আসিয়া যথাসময়ে দেখা দিয়াছিল, তারপর সহসা তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে দেখা গেল, বড়বাবুর অর্থ-উপার্জ্জন এবং সে-অর্থ অতি সতর্ক হাতে ব্যয়,—গৃহিণীর জীবন সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর সোপান গড়াইয়া একেবারে এই যন্ত্র-বৎ খাটুনিতে আসিয়া আট্কাইয়া গিয়াছে। একদম্ বৈচিত্র্যহীন…ঠিক ইট-কাঠের জীবনের মত…প্রয়োজন সারাতেই তার চরম সার্থকতা!

গৃহিণীর প্রাণে থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা বাজে। পাড়ার আর পাঁচজন আসিয়া কাণের কাছে যখন পাঁচ-রকমের পাঁচটা কথা তোলে, তাঁর মন তখন কুয়াশা ঠেলিয়া বিচিত্র-রঙে-রঙীন কোন্ অতীতের কোণে কিসের সন্ধানে যে ঘুরিয়া ফিরে!

কিন্তু উপায় কি! হিন্দুর ঘরে তিনি পুরুষের স্ত্রী হইয়া জন্ম লইয়াছেন, এই পুরুষ তাঁর ইহকাল-পরকাল, তাঁর ধর্ম্ম, তাঁর তপস্যা! এবং মনে প্রতিবাদ জাগিলেও মুখে সে প্রতিবাদ তোলা চলে না, ধর্ম্মে চিড়্ খাইবে! কাজেই তিনি নিজের ভাগ্যকে ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে আরো ব্যথিত করিতে নারাজ!

প্রতিবাদ প্রথম-প্রথম চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সেই স্বামী প্রৌঢ়ত্বে প্রোমোশন্ লইয়া একেবারে পুঁথির দেবতার মত অটল হইয়া উঠিয়াছেন—স্ত্রীর মান-অভিমানের মিঠা অনুযোগ বা কঠিন রোষ পাষাণে মাথা ঠুকিয়াই মরে! স্বামী-দেবতার পাষাণ অঙ্গ সে মান-অভিমান ভেদ করিতে পারেনা!

পালা-আরম্ভ

১

অবস্থা যখন এমন, তখন এক ঘটনা ঘটিল। সেই ঘটনার কথাই বলিতে বসিয়াছি।

কিন্তু সে ঘটনা বলার পূর্ব্বে, ছোট একটু দৃশ্যান্তর বর্ণনার প্রয়োজন আছে। সে দৃশ্যটুকু এই,—

সুরেশ গৃহিণীর ছোট ভাই। সুরেশ সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে, পত্নী এণা বি-এ পাশ। একে বি-এ, তায় বুদ্ধিতে এণা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! বড়বাবুর গৃহে এণা আসিয়া গৃহিণীর দশা দেখিয়া ফুঁশিয়া উঠিল,—নিজেদের দাবী ছেড়ে তুমি দিদি একেবারে সাইফার করে ফেলেচো নিজেকে! ছি! তাহলে আমাদের এই যে কণ্ঠস্বর উচ্চ করেচি আজ, আমাদের individualityর জাগরণ-প্রচেষ্টায়,—এ প্রচেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ নিষ্ফল হবে!…

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—একদিন ঝাঁজ দেখিয়েচি, এণা, কিন্তু শেষে ভাবলুম, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সংসার ছাড়া সুখ-দুঃখ মান-অভিমান ছিল, মনে হতো, সেইটেই জীবন; সংসারটা শুধু জীবনের Back-ground. আজ সে-সব সরে সংসারটুকু পড়ে আছে—একেবারে ছাদ-হীন, বৈচিত্র্যহীন প্রান্তরের মত! এ প্রান্তর পায়ে চলে পার হতেই হবে—তাই, এ নড়াচড়া…

কথা শুনিয়া এণার সম্ভ্রম হইল। দিদির জীবনের স্ফুলিঙ্গ তাহা হইলে একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই! হয়তো উৎসাহের বাতাস পাইলে আবার জ্বলে!…

এণা কহিল—হতাশ হলে তো চলবে না, দিদি—

দিদি কহিলেন,—হতাশ ঠিক নই, ভাই! তবে কার জন্য, কেনই বা জাগা! যদি ছেলেমেয়েও একটা থাকতো…

এণা দীপ্ত চক্ষে চাহিল—মাতৃত্বের প্রতি দিদির এত মায়া!

দিদি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

এণা কহিল,—আর কিছু না হোক্,—সব বিষয়ে চুপ করে থাকাও ঠিক নয়…ওতে তোমারও যেমন ব্যক্তিত্ব যাচ্ছে, চাটুয্যে-মশায়েরও তেমনি!…অন্ততঃ একটু প্রতিবাদ তুলো—তাতে ভগবানের দেওয়া এই মস্তিষ্ক, তার কিছু চর্চ্চা হবে। মস্তিষ্কেই মানুষের জীবন।…

দৃশ্য ছোট; কথাগুলাও খুব গভীর দার্শনিক নয়—তবু এ কথাগুলা গৃহিণীর মনে কেমন গাঁথিয়া গেল!

শুধু কি কথার জন্যই? বোধ হয়, না। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এণা…আদরের ভাজ; তায় সে রূপসী, বিদুষী, তরুণী…এই ব্যক্তিত্বের জোরেই মানুষের কাছে কথার দাম।

এণা সেইদিনই চলিয়া গেল। সুরেশ চলিয়াছে রেঙ্গুনে ওকালতি করিতে,—এণা তার রেঙ্গুনের সঙ্গিনী।

২

এণার সঙ্গে গৃহিণীর উক্ত কথাবার্ত্তার পর প্রায় সাত-আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে বর্ণনার মত ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় এগারোটা। কর্ত্তা কলতলার ফাটা চাতালে মনোযোগ-সহকারে সীমেণ্ট ঢালিয়া মাজিয়া ঘষিতেছিলেন, গৃহিণী রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া সে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

দ্বারে কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল—বেয়ারা…

কর্ত্তা কহিলেন,—কে ডাকে?

বাহির হইতে উত্তর আসিল—একখানা চিঠি…

কর্ত্তা গৃহিণীর পানে চাহিয়া কহিলেন—ছাখো তো গা!

এ কাজে কর্ত্তার অনুমতি ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আজ দশ বৎসর কর্ত্তার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ নারীর স্থান অন্দরে এবং ঘোমটার মধ্যে! কিন্তু তা হইলেও প্রত্যেক নিয়মের যেমন exception আছে—তেমনি অবরোধের গণ্ডী-বিধিতেও এমনি দু-চারিটা exceptions কর্ত্তার codeএ চলিত হইয়াছে।

কলতলার পরই একটা সরু পথ; এই পথের প্রান্তে সদর দরজা।

কর্ত্তার কথায় গৃহিণী আসিয়া সেই সরু পথে

দাঁড়াইলেন···দ্বারের কাছে এক মলিনবেশ ছোকরা। গৃহিণী কহিলেন—ডাকওলা নয়···! কি চিঠি? দাও···

বালক কহিল,—বাবুর চিঠি। তাঁর হাতে দেবার কথা আছে। বালকের কথায় গৃহিণী কর্ত্তার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—ওগো···

'ওগোর' কাণেও কথাটা পৌঁছিয়াছিল। 'ওগো' মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—ওঁর হাতেই চিঠি দাও। আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

বালক কহিল—আজ্ঞে, আমায় বলে দেছে, বাবুর হাতে ছাড়া আর কারো হাতে এ চিঠি দিবিনা···

কর্ত্তা কহিলেন—ভালো ফ্যাশাদ! কার চিঠি হে বাপু? কে লিখেচে?

বালক কহিল—আজ্ঞে···

গৃহিণী কহিলেন,—কার চিঠি—সত্যিই তো! এমন কি যে, আমার হাতে দেবে না!

কর্ত্তা কহিলেন—চিঠি ঐখানে রাখো তাহলে···

বালক কহিল—আজ্ঞে, আপনার হাতে দেবো···বলিয়া সে চিঠি দেখাইল।

গোলাপী খাম। গৃহিণী কহিলেন—লেখা দেখি,—খামে কার নাম? বিয়ের চিঠি নাকি? গোলাপী খাম! বাড়ী ভুল হয়নি তো?

বালক খামখানা দেখাইয়া কহিল—আজ্ঞে না। এই যে লেখা—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। এই নম্বরও ৪৯। এ বাড়ীর নম্বর ৪৯ দেখে তবে আমি কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকেচি।

গৃহিণী দেখিলেন, খামের লেখাটুকু মেয়েলি হাতে! এ চিঠি কে লিখিল?

বালক কহিল—বিয়ের চিঠি নয়···

কর্ত্তা তখনো কর্ণিক ঘষিয়া সিমেণ্ট মাজিতেছিলেন; কহিলেন—কার চিঠি, বলোই না···

এ কথায় বালক গৃহিণীর পানে চাহিল, তার পর কহিল—মণিমালা দেবীর কাছ থেকে আসচি···

মণিমালা দেবী! গৃহিণীর বিস্ময়ের সীমা নাই। সে আবার কে? কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন···

গৃহিণী কহিলেন—চিঠি দাও···আমি বাবুকে দিচ্ছি।

কর্ত্তা আগাইয়া আসিলেন, কহিলেন—এ মণিমালা দেবীটি কে?

বালক মৃদু হাসিল···তার পর কহিল—সেই যে চাঁপাতলায় ক'দিন যেখানে গেছলেন···

কর্ত্তা স্তম্ভিত! গৃহিণীর পানে চাহিলেন। গৃহিণীর মুখে কথা নাই,—দুই চোখের দৃষ্টি স্থির! বালক কহিল—তাহলে চল্লুম।

গৃহিণীর হুঁশ হইল, সেই সঙ্গে কর্ত্তারও। কর্ত্তা কহিলেন—চিঠি?

বালক কহিল—লুকিয়ে দিতে বলেছিলেন—যেন কেউ না জানে! যদি আর কেউ দেখে, কি, জেনে ফেলে, তো দিতে বারণ···যা হোক আমি যাই। আপনি আজই গিয়ে দেখা করবেন। বলে দেছেন, খুব দরকার আছে···বলিয়াই বালক নিমেষে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল···

কর্ত্তা ও গৃহিণী হতভম্ব! দুজনেই চেতনাহীন। গৃহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন,—সে নিশ্বাসে তাঁর চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে তিনি দেখেন, কর্ত্তা গিয়া কলতলায় বসিয়াছেন, তাঁর হাতে সেই কর্ণিক। গৃহিণীর চোখের সামনে এণার মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে এণার সেই কথা—সব বিষয়ে চুপ করে থেকে ব্যক্তিত্ব হারিয়ো না, দিদি!

ঠিক কথা! এমনি চুপ করিয়া থাকিয়া আজ কোথায় নামিয়া আসিয়াছেন! কিন্তু কেন? সত্য, জীবন এখনো ফুরায় নাই—এখনো কতদিন বাঁচিতে হইবে! এবং বাঁচিতেই যদি হয়,···

গৃহিণী কহিলেন—এ মণিমালা দেবীটি কে, শুনি—

স্বর শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন—জানি না!···তিনি আবার সীমেণ্টে মন দিলেন।

গৃহিণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য করিলেন, পরে কহিলেন,—হুঁ!···সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী ··

অতীতে নারীর এই ভ্রূভঙ্গীতে কত রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কত বিপ্লব, কত যুদ্ধ···তার ইয়ত্তা নাই!

গৃহিণীর ভ্রূভঙ্গী মধু চাটুয্যে লক্ষ্য করেন নাই···কর্ত্তার মাথা তখন মণিমালা দেবীর চিন্তায় বিভোর! তিনি ভাবিতেছিলেন,—

তাইতো! ছেলেটা বাজীর মত শোঁ করিয়া চলিয়া গেল কেন? কে এই মণিমালা?···ঠিকানার ভুল হয় নাই। ৪৯নং বাড়ী···মধুসূদন চাটুয্যে! বয়স হইয়াছে, তবু ঐ নাম-সঙ্কেতে প্রাণ এখনো দোলে!

৩

পরের দিন অফিস খোলা। আহারাদি সারিয়া মধু-চাটুয্যে অফিসে ছুটিলেন···গৃহিণীর মৌন মূর্ত্তি···মুখে কথা নাই। তিনি তাহাতে বিস্মিত হইলেন না! এমন তো আরো হইয়াছে! বেশী বয়সে মনের তরলতা ঠিক নয়।

অফিস হইতে ফিরিয়া দেখেন, বাড়ীর সদরে চাবি বন্ধ! ব্যাপার কি? সামনে মুদির দোকান। মুদি আসিয়া বলিল,—মা-ঠাকরুণ বাপের বাড়ী গেছেন। চাবি রেখে গেছেন, আর এই চিঠি···

কর্ত্তা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া গৃহে ঢুকিলেন; পরে মুখ-হাত ধুইয়া চিঠি খুলিলেন। চিঠিতে লেখা আছে,—

"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসের পাত্র, ততদিন আমার বিশ্বাস। তা যখন টুটিল, তখন তোমার সঙ্গে এক গৃহে আর বাস করিতে পারিনা।···

যদি কোনোদিন বোঝো, নিঃস্বার্থ অকপট প্রেম কোথায়, তবেই সেদিন গৃহে ফিরিব।

তুমি আমারই—মণিমালার নও।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এমনি কথা পড়িয়াছিলাম —যদি তোমার মনে না থাকে, তাই কয় ছত্র লিখিয়া মনে করাইয়া দিলাম।

বই কাছে নাই বলিয়া কোটেশনে কিছু ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু মর্ম্মটুকু ঠিক এই। ইতি

শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী।

চিঠি পড়িয়া মধু চাটুয্যে প্রথমে স্তম্ভিত, পরে ক্রুদ্ধ এবং অবশেষে হৃষ্ট হইলেন।

হৃষ্ট হইবামাত্র তিনি হিসাবের খাতা খুলিয়া কতকগুলা পাতা উল্টাইয়া কি-সব হিসাব দেখিলেন, দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, এ-মাসের আর সাতটা দিন বাকী···যে চাল আছে, তাহাতেই বেশ চলিয়া যাইবে। একলা মানুষ! এ মাসে আর চাল কিনিতে হইবেনা। আঃ!

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি সংসারের তত্ত্ব লইতে চলিলেন। রান্নাঘরে উচ্ছিষ্ট থালা-বাটী পড়িয়া আছে; উনানে রাশীকৃত পাঁশ···ভাঁড়ারে তরী-তরকারীর চিহ্নমাত্র নাই···। চাল-ডাল? আছে···কিঞ্চিৎ!

মধু চাটুয্যে ভাবিলেন, যাক্, আলো জ্বালার প্রয়োজন নাই! আজ রাত্রে নিদ্রা দি··কাল সকালে ভাত, এবং আলু-ভাতে···ব্যস্!

পরদিন কিন্তু অসুবিধাও ঘটিল। সকালে সেই উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা শেষ করিয়া উনান ধরাইতে গিয়া মধু চাটুয্যে দেখেন, এ এক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। শিক্ষা নহিলে এ কাজে সফলতার আশা নাই! মুদিকে খোসামোদ করিয়া আনিয়া তাকে দিয়াই উনান ধরাইয়া লইলেন—পরে হাঁড়িতে চাল ও জল ঢালিয়া, সেই সঙ্গে দুটা আলু ছাড়িয়া তিনি গেলেন স্নান করিতে!···অসুবিধা কাঁটার মত বিঁধিলেও ব্যয় কমিয়াছে, এ-চিন্তায় আরাম প্রচুর! আরাম ঠেলিয়া কাঁটার যাতনা মাথা তুলিবে, এমন সাধ্য নাই!

আহারে বসিতে সেই শৈশবের অশ্রু দুই চোখ ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়—বুকে-জমা এতদিনকার কত কঠিন নুড়ি-পাথরের গা বহিয়া!···মনকে তিনি বুঝাইলেন, গৃহিণীকে আসিতেই হইবে। গৃহ ছাড়িয়া ক'দিন বাহিরে থাকিবে? গৃহের প্রতি মায়া কি সত্যই নাই···যে-গৃহের সঙ্গে এতকালের ঘনিষ্ঠতম পরিচয়?

আরো দু'তিন দিন কাটিল,—বড়বাবু প্রত্যহ অফিস হইতে ফিরিবার সময় ভাবেন, আজ গিয়া দেখিব, গৃহিণী···

কিন্তু তাঁর আশা মিটিল না, অর্থাৎ গৃহিণী ফিরিলেন না। বড়বাবু নিশ্বাস ফেলিলেন। যে-মানুষটি শুধু রান্নাবান্না, এবং কচিৎ কখনো ছোট একটু অনুযোগ-অভিযোগ লইয়া থাকিত, সে যে তুচ্ছ করিবার নয়, এ বয়সেও বড়বাবু ক্রমে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ভাবিলেন, একবার যাই, গিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনি।···পরক্ষণে মনে হইল, না! সাধিয়া আনিলে বহু বিপ্লবও সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে! তার চেয়ে···

পরদিন অফিসের দরোয়ানকে ডাকিলেন,—রঘুনন্দন, বাবা···

রঘুনন্দন কহিল—জী···

বড়বাবু কহিলেন,—তোমার ঐ ভাইপো···ওর চাকরি হলো ?

রঘুনন্দন কহিল—হাঁ, ওই যশ্‌দানন্দন···? তা, আপ্‌কা মেহেরবাণী হোনেসে···রঘুনন্দন বিনয়ে একেবারে অবনত হইয়া পড়িল।

বড়বাবু কহিলেন,—বেশ, সাহেবকে সময়মত একবার বলবো। কিন্তু তার আগে···

বড়বাবু দ্বিধা ছাড়িয়া কথাটা পাড়িলেন, কহিলেন—তোমার ভাইপো! তাকে ফেলতে পারিনা। তা আপাততঃ আমার বাড়ী দুবেলা দুটী ভাত চড়িয়ে আমায় যদি খাওয়ায়···

রঘুনন্দন বহুবার বড়বাবুর গৃহে গিয়াছে···ফাই-ফরমাশে। হাল জানে। সে কহিল—মা-জী··· ?

বড়বাবু কহিলেন—তোমার মা-জী থোড়া তীরথ্‌ করতে গেছেন কিনা···

রঘুনন্দন কহিল—বহুৎ খুব্‌···

বড়বাবু কহিলেন—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমরা মছ্‌লী খাই—তোমার ভাইপোর খাওয়া আমার ওখানে···শেষে জাত যায় যদি ?

রঘুনন্দন কহিল—তাতে কি! ও আপিসমে আয়কে খাবে। হামি তো ভাত পাকাইবে···

সে জানে, পয়সা খরচের ব্যাপারে বড়বাবুর কুণ্ঠা কতখানি! তাই ওদিক দিয়া না গিয়া সে ভাবিল, এমনি ভাত পাকাইয়া বড়বাবুর মন যদি যশোদা অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে চাকরিটুকু কায়েমি হওয়ার পক্ষে আশা থাকে!···

সেই ব্যবস্থাই হইল···

কিন্তু যশোদা খোট্টা···সদ্য দেশ হইতে আসিয়াছে—তার হাতে অন্ন যে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিতে লাগিল, সে মূর্ত্তি দেখিলে করুণাময়ী অন্নপূর্ণা দেবীও বুঝি অন্ন-জল ত্যাগ করেন! বড়বাবুর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমে অসুস্থতায় দাঁড়াইল, এবং অফিসের ফেরত তিনি একদিন গিয়া সাধিয়া গৃহিণী নন্দরাণীকে গৃহে আনিলেন।···

নন্দরাণী আসিলেন, কিন্তু মূক যন্ত্রটির মত আর রহিলেন না। আসিয়াই প্রথমে কহিলেন,—আমি এসেচি, কিন্তু একজন ঝী রাখা চাই। বাসন মাজতে আমি পারবো না;—পষ্ট কথা···আমার হাতে বাত···

কর্ত্তার মেজাজ ভালো ছিল না; থাকিবার কথা নয়। তিনি বলিলেন,—ঝী! চুরি করে ভুত্তিনাশ করুক্‌ আর কি! নোংরা, ইন্নুতে কাণ্ড···

গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—নোংরা হবে না—আমি সেদিকে নজর রাখবো।···ঝী রাখতে না পারো, আমায় আবার চলে যেতে হবে, নয়তো বাসন মাজানো, জল তোলানোর ব্যবস্থা করো!···

গৃহিণী অধিক বাক্যব্যয় করিলেন না। বাক্যব্যয় সম্বন্ধে তিনি ইদানীং খুবই কুণ্ঠিত ছিলেন,—কাজেই সে-ব্যাপারে সাধনার প্রয়োজন ছিল না।

বড়বাবু দেখিলেন, গৃহিণীর চিত্ত-বৃত্তি যেরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে দাসী না আনিলে তাঁহাকে গৃহে ধরিয়া রাখা দায় ঘটিবে।

অগত্যা দাসী আসিল। দাসী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাজার করার ব্যাপারে দু-একদিন ত্রুটি ঘটিতে সুরু হইল। বড়বাবু প্রতিবাদ তুলিতে গেলে গৃহিণী সাফ্‌ বলিয়া দিলেন,—আমার সংসার চালানোয় যদি খুঁৎ পাও তো নিজে আবার সংসার ছাখো। আমার এখানে থাকার প্রয়োজন দেখচি না তাহলে।

বড়বাবু মুখের কথা বুকের মধ্যে পুরিয়া দুশ্চিন্তাজালবর্ত্তী হইলেন।

৪

সেদিন বড়বাবু অফিস হইতে ফিরিবামাত্র গৃহিণী কহিলেন—তোমার চিঠি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী খামে আঁটা একখানা চিঠি বড়বাবুর কোলে আসিয়া পড়িল।

খাম দেখিয়া বড়বাবু কহিলেন—আমার চিঠি? এ যে মেয়ে-হাতের লেখা···

গৃহিণী কহিলেন,—খামে তোমারি নাম লেখা···

বড়বাবু দেখিলেন, তা বটে! কিন্তু এ চিঠি··· ?

গৃহিণী যেন অন্তর্যামিনী···কহিলেন—তোমার সেই

মণিমালা দেবীর চিঠি নয়তো? যাঁর জন্ম আমার বনবাস ঘটেছিল?

বনবাস! মণিমালা দেবী!...সেই অতীতের দৃশ্য বড়বাবুর চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সেই দিন হইতেই শান্ত গৃহে বিপ্লবের সূত্রপাত!...

তবু মন চন্‌মন্‌ করিয়া উঠিল! কি কথা এ খামের মধ্যে? প্রাণের কি গোপন রহস্য?...

গৃহিণী স্থির দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বড়বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন—না, না—আপিশের কোনো ছোক্‌রা হয়তো!...কিম্বা কারো বিয়ের নেমন্তন্ন...

গৃহিণী কহিলেন—ছোকরার হাতের লেখা অমন হয় না। আর বিয়ের নেমন্তন্ন হলে কোণে 'শুভবিবাহ' কথাগুলো ছাপা থাকতো!...

তা ঠিক! কাজেই বড়বাবু নীরব রহিলেন; এবং গৃহিণী কহিলেন—চিঠি বুঝি আমার সামনে পড়তে লজ্জা হচ্ছে?...তাই বুঝি সংসারের খরচ সর্ব্বস্বান্ত হবার ভয় প্রতিপদে? এ বয়সেও...ছি!

বড়বাবুর মনের মধ্যে দুটো বিড়াল যেন কলহ বাধাইয়াছিল! কি তীব্র সে কলহের রব! একটা কেবলি বলিতেছে, খোলো চিঠি, পড়ো গো...আর একটা তাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিতেছে—খবর্দ্দার! গিন্নী দাঁড়িয়ে—এখনি কুরুক্ষেত্র ..

বড়বাবু হতভম্ব! গৃহিণী ফশ্‌ করিয়া খামখানা টানিয়া কহিলেন—দেখি, কার চিঠি...

খপ্‌ করিয়া যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া ওঠে, তেমনি খপ্‌ করিয়াই গৃহিণী খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন। চিঠি পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয়তম

তোমার প্রাণের মধু সবই কি ফুরাইল, হে আমার মধুসূদন চাটুমণি?...শনিবার বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়ার কথা পাকা তো? দেখো, ভুল না হয়! আর বায়োস্কোপে যাইতে হইলে, কি চাই, মনে আছে?...একজোড়া ভালো জরিদার নাগরা, একটা ক্রচ, সোনার রিষ্টওয়াচ, আর সেই গুজরাটী শাড়ী। ভুল না হয়!...

কবে আসিবে? আমি যে বিরহ-বেদনায় মরি! পুরানো গৃহিণীর এমন কঠিন বাঁধন যে নিমেষের জন্য গ্রন্থি শিথিল হয়না? আজ আসা চাই। ইতি

তোমার বুকের মণিমালা

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলিয়া সাহিত্যে নাকি একটা কথা আছে—তার চেয়েও জোরালো কিন্তু চলিত গ্রাম্য কথা, তপ্ত তেলে বেগুন ছাড়িয়া দেওয়া...

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘটিল। গৃহিণী একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—বটে! তোমার ভাত রাঁধবার জন্ম আমায় নিয়ে এসেচো খোসামোদ করে! আমোদ ওদিকে ধরে না যে! বায়োস্কোপ! তার উপর এই ক্রচ, শাড়ী, হাত-ঘড়ি! আমার জন্ম একটা ঝী রাখতে হলে হাজার বায়নাক্কা ওঠে! এ অপমান আমি কখনো সইবো না—কখনো না। আমি মরি কষ্ট করে, ভাবি, পয়সা জমাচ্ছে। বুড়ো বয়সে তীর্থধর্ম্ম করবে বলে! তা না, এই রোগ ধরেচে!...

বলিতে বলিতে গৃহিণী গিয়া সিন্ধুকটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তার মধ্য হইতে এক তাড়া নোট্‌ বাহির করিয়া আঁচলে বাঁধিলেন—বাঁধিয়া বড়বাবুর কাছে আসিয়া কহিলেন,—দেখাচ্ছি, তোমার মণিমালা দেবীকে বায়োস্কোপ! দেখি, কি দিয়ে ক্রচ্‌ কেনো!

বড়বাবু যেন পাষাণ...গৌতমের শাপাগ্নিতে সে-যুগে অহল্যা বুঝি এমনি ভাবেই পাষাণ হইয়াছিলেন!... আকাশের বাতাস নিমেষে স্তব্ধ হইল! চারিধারে অসহ্য গুমট্‌!...কিন্তু শুধু অপবাদ নয় তো...অতগুলা নোট .. গৃহিণী যে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন..নোটগুলার অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে!

অপরাধীর মত বড়বাবু কহিলন—কিন্তু আর যে-দোষে দোষী হই,—ও চিঠি সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না!

গৃহিণী কহিলেন,—থাক্‌! বায়োস্কোপ, গহনা, শাড়ী... এ-সবের আব্দার অনেকদিনের মেলামেশা না হলে কেউ করে না...! এই যে আমি...কখনো আব্দার তুলেছি!

বড়বাবু কহিলেন—চিঠিখানা দেখতে দাও হয়তো কারো ষড়!

গৃহিণী কহিলেন—বড়ই বটে! সেদিন আমায় দেখে সে-ছোঁড়া চিঠি দিলেই না!...

বড়বাবু কহিলেন—কিন্তু ঐ বায়োস্কোপ...আমি কখনো যাই?

গৃহিণী কহিলেন—বাড়ীতে জানিয়ে যাও না, জানি। পাছে আমি যাবার বায়না ধরি...! তাছাড়া এ কার সথে যাওয়া? বুকের মনিমালা যে! বাস্‌রে,—বইয়েই এমনি কথা পড়ি। জল-জ্যান্ত মানুষ এমন চিঠি লেখে, তা কখনো জানিনা!

বড়বাবু হতাশভাবে কহিলেন—তুমি বুঝচো না! কোথাও এর মধ্যে মস্ত কিছু গোলযোগ ঘটেচে...

গৃহিণী কহিলেন—তাতো ঘটেচে...দেখচি, যখন চিঠি আমার সামনে এসে পড়েচে...তাই বলি, এতদিন বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম—বেশ তো চলছিল, কোনো অভাব ঘটেনি ..শেষে নাকি ভাত রেঁধে দেবার দরকার হলো...

বড়বাবু নিরুপায় নেত্রে চাহিয়া কহিলেন—ওগো...

গৃহিণী সনিশ্বাসে কহিলেন—থাক্, আর আদর কাড়াতে হবেনা।

বড়বাবু কহিলেন,—কিন্তু ও নোটগুলো...?

গৃহিণী কহিলেন—আর যাই করি—তোমার ঐ বুকের মণিমালা দেবীর ক্রস্ আর হাতঘড়ি কেনায় ব্যয় হবেনা—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

গৃহিণীর রুদ্ধ কণ্ঠ বহুকাল পরে মুক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়া বসিলেন,—পয়সার গিঁট বাঁধচো কার জন্যে...? একটু আরাম সকলেই চায়! মানুষের একটু সঙ্গও। তার কিছু নেই! যেন বনে বাস করচি! কেন? কিসের জন্যে এত সইবো ..

এমন অন্তহীন রহস্য যে, তার মধ্যে দিশাহারা বড়বাবু চক্ষু মুদিলেন।

গৃহিণী যে-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, ও-নোট? না, উদ্ধারের কোনো আশা নাই! ..

চিঠিখানা ছুড়িয়া বড়বাবুর গায়ে নিক্ষেপ করিয়া গৃহিণী বিদায় লইলেন।...

৫

পাঁচ-সাতদিন পরের কথা।

রবিবার। গৃহিণী গিয়াছিলেন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে। বড়বাবু উপরের ঘরে একটা চাবি-ভাঙা ড্রয়ার হাতড়াইতেছিলেন, মিউনিসিপ্যালিটি কি একখানা ড্রেণের নোটিশ দিয়াছে, তার সন্ধানে। হঠাৎ হাতে ঠেকিল,—একটা বাণ্ডিল। কাগজে মোড়া। মোড়ক খুলিয়া দেখেন,—দশখানা গোলাপী খাম ও চিঠির কাগজ.. সেই সঙ্গে টুকরা চিঠি...

চিঠিখানা পড়িলেন,—এণার লেখা। এণা লিখিয়াছে...

বারোখানা গোলাপী খাম ও চিঠির কাগজ পাঠাচ্ছি। যে প্ল্যান খাটানো গেছে—মনে আছে তো? ঐটিই হলো মারাত্মক দাওয়াই! সত্যি, অত পয়সা-কড়ি—দু'খানা গহনা কেনই বা পরবে না? বায়োস্কোপ কেন দেখবে না?...

কি হয়, আমায় জানিয়ো দিদি। এখানে একলা হাতে কাজ পাইনা তো। তোমাদের কি হয় জানলে তাই নিয়ে নয় একটা ছোট গল্প লিখে ফেলবো। মেয়েমানুষ হাতা-বেড়ি নয়, গরু-ছাগলও নয়। তারো সখ আছে...নয়? চিঠির জবাব দিয়ো।

স্নেহের এণা

বটে! এ তবে ষড়...চক্রান্ত! ওঃ!...

বড়বাবু ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিলেন, পরে বাণ্ডিলটা লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বাহিরের ঘরের তক্তাপোষে শুইয়া পড়িলেন।...

বহুক্ষণ পরে বাড়ীর দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। গৃহিণী নামিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল—পাড়ার আরো মেয়ে সওয়ারী ছিল।

বাহিরের ঘরে উঁকি দিয়া গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—উঠে বসো একবার...

যন্ত্রচালিতের মত বড়বাবু উঠিয়া বসিলেন। গৃহিণী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিলেন, প্রণামান্তে কহিলেন,—কেমন মানিয়েচে, বলো তো!

বড়বাবু চাহিয়া দেখেন, গৃহিণীর পরণে নূতন গরদের শাড়ী, টকটকে লালপাড়...

গৃহিণী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—নতুন কাপড়, নতুন গহনা গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে পরতে হয় কিনা...তাই গেছলুম। গাড়ীভাড়া আট

আনা পড়েচে, শেয়ারে। তোমার বেশী খরচ করাইনি···

তারপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিলেন—এই নতুন চুড়ি করালুম পাঁচ গাছা করে দশ গাছা। আর এই হাত-ঘড়ি···এগা বড্ড ধরেছিল···হাল-ফ্যাসানের কিছু না হলে চলেনা! তাই···। তা, সে টাকা থেকে খরচ হয়েও বেঁচেছে সাঁইত্রিশ টাকা তিন আনা। একখানা গুজরাটী শাড়ী কিনবো সে টাকায়···

বড়বাবুর দেহে প্রাণ-বায়ু ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি কহিলেন,—সে চিঠি তুমিই লিখেচো তাহলে··?

গৃহিণী কহিলেন—মন খারাপ হয়ে গেল নাকি! নিজের স্ত্রীর চিঠি বলে? পরের স্ত্রী সত্যি-মণিমালার লেখা হলে খুব খুশী হতে—না?

বড়বাবু কহিলেন—তা নয়··তবে এ ছলনার কি দরকার ছিল?

গৃহিণী কহিলেন—ছলনা কি রকম?

—নয়? মণিমালা দেবী নাম নেওয়া?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন—ফুলশয্যার রাত্রে আমায় কি বলে ডেকেছিলে, মনে নেই···? আদর করে বলেছিলে, তুমি আমার মণি, মণি, বুকের মণিমালা!—সে কথা আমি ভুলিনি। কিন্তু আর কখনো ও-নামে ডাকোনি—

বড়বাবু আবার স্তম্ভিত—ধন্য স্মৃতি এই নারীজাতির! তাঁর মনেও নাই, কবে প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেশে··· কিন্তু গৃহিণী? আজো সেটুকু মনে রাখিয়াছেন!

গৃহিণী কহিলেন—আজ আপিসের ছুটী আছে তো! নতুন দু'চার রকম রান্না রাঁধচি···

বড়বাবুর মুখ ঘোরালো; মুখে কথা নাই! গৃহিণী কহিলেন,—রাগ করো না! আমি স্ত্রী···আমার বেশভূষা তোমার তৃপ্তির জন্যেই। তুমি আবার তেমনি হও। পয়সাকেই একমাত্র ধ্যানের বস্তু না করে আমার পানে একটু চেয়ো গো···মন আমার সত্যি আজো মরে যায়নি! বুঝলে!

বড়বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়াটা টানিয়া তাহাতে হেলান্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রেম

শ্রীরাধারাণী দত্ত

স্বার্থের সংকীর্ণ-নীতি, নিত্য নব নিষেধ শাসন
নারিলো রোধিতে মোরে। এ সবার ঊর্দ্ধে সিংহাসন
আমারে দিলো যে বিধি,—মানব-হৃদয়-পদ্ম হেম!
স্রষ্টার সুন্দর স্বপ্ন,—শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি আমি—প্রেম।

সমাজ গড়িছে নর, শৃঙ্খলা রচিছে প্রতিদিন
কত না বিবিধ বিধি-বন্ধনের বিধান কঠিন!
জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশে দেশে নানা নাম রূপে
মানুষ করিছে বন্দী মানুষের অন্তরের ভূপে।

বন্ধনে বাঁধিতে মোরে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল নারে,—
শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে মোর মুক্ত প্রাসাদের দ্বারে।
যদিও বেসেছি ভালো ভূলোকেরে দ্যুলোক অধিক,
তথাপি স্বর্গের আমি, আনন্দের অনিন্দ্য পথিক।

অনন্ত আকাশ সম উদার আমার চিত্ত ছায়া,
নির্ম্মল অজেয় মুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী স্বচ্ছকায়া!

অবাধ উদ্দামগতি, উচ্ছ্বসিত দীপ্ত প্রাণময়,
আমার প্রভাবে মানে ভগবান নিজে পরাজয়।

ভূপালে ভিক্ষুক করি, ভিখারীরে করি মহারাজ,
হীনেরে করিতে ক্ষমা, দীনেরে বরিতে নাহি লাজ!
কুটীরে প্রাসাদ রচি, এক করি মাণিক মৃত্তিকা,—
ধনী ও নির্ধনে পায় সমভাবে মোর জয়টীকা।

শুভাশুভ দলি' পায় চলি যায় মোর জয়রথ,—
ধূলির ধরণী বুকে গড়ে তুলি সুখের জগৎ।
যারে ছোঁয়া দিই সে-ই সোনা হয় স্পর্শরসে মোর,—
কল্পনার স্বপ্নলোকে রহে নিত্য আনন্দে বিভোর।

শ্রদ্ধা প্রীতি ভক্তি স্নেহ মমতা মাধুর্য্যরস যত
জেগে ওঠে প্রাণে প্রাণে, আত্মদানে উন্মুখ সতত!
আমি প্রেম, বিশ্বমাঝে বিধাতার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতরো,—
মানুষে দেবতা করি, প্রিয়জনে দেবতারো বড়ো।

জাপানের উৎসব—

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের মত জাপানেও আধুনিকতার বাতাস বইতে সুরু করেচে—তা'র কেশ-বেশ, তার জীবন-যাত্রার ধারায় দেখা দিয়েচে নূতনত্ব। সেদিন যে টোকিয়ো ভূকম্পনের অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেল, তাও নূতন করে গড়ে তুলতে জাপানের দেরী লাগল না।

তরণী-উৎসব।

এত অগ্রগতি সত্বেও জাপান কিন্তু একটী জায়গায় বনেদী রয়ে গেছে। বহুযুগ পূর্ব্বে জাপানে যে সমস্ত উৎসব প্রচলিত ছিল, তা আজও সেখানে বিশেষ বিশেষ তিথিতে যথোচিত সমারোহের সহিত পালিত হয়ে থাকে।

এই উৎসবগুলির কোন কোনটী এত প্রাচীন যে তার উৎপত্তি খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হ'বে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে 'ফিউন হোকো' 'তরণী-উৎসবটী' প্রচলিত হয়েছিল ১৬৯ থেকে ২৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর সময়ে। সম্রাজ্ঞী

'হোকা উৎসব'

জিঙ্গোর কোরিয়া অভিযানকে উপলক্ষ করে এই উৎসবটীর সূচনা হয়।

'তরণী-উৎসব' বলে পরিচিত হলেও এই উপলক্ষে জলে নৌকা-ভাসাবার প্রথা নেই। নৌকাকৃতি একখানি রথ

লোকে টেনে নিয়ে যায় পথের উপর দিয়ে। রথের সম্মুখ-ভাগে থাকে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো, আর কতকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তি।

আর একটী উৎসবের নাম 'হোকা হোকো' বা হোকা-উৎসব। পুরাকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন বা নৃত্যে পটু হ'তেন, তাঁকে জাপানীরা বলত 'হোকাশী'। এই উৎসব উপলক্ষে যে রথ ব্যবহার করা হয় তার সামনে থাকে নৃত্য-নিরত এক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর মূর্ত্তি। এত উঁচু রথ আর কোন উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করা হয় না। এর উচ্চতা ৭৭ ফীট।

'পতাকা-উৎসব'।

জাপানের আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ উৎসবের নাম—কঙ্কু হোকো; টোরি (মোরগী) হোকো; সুকী (চাঁদ) হোকো।

প্রত্যেকটী উৎসব পালিত হয় অদ্ভুত উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গে;—মনে হয় আবার বুঝি জাপান ফিরে গেল অতীত কালে। কারণ, যে উৎসব যে যুগে প্রচলিত হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে জাপানের অধিবাসী তদনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে।

এগুলি গেল সর্ব্বসাধারণের উৎসব। তা ছাড়া ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দেবার জন্যে আবার উৎসব-পালনের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্যে জাপানে যে উৎসব-পালনের ব্যবস্থা আছে হিনা-সাতসুরী, ছেলেদের উৎসবের নাম তাঙ্গো-নো-সেকু। য়ুরোপে ছেলে-মেয়েদের জন্ম-তিথি

আধুনিক জাপানী বধূ

পালনের জন্যে যে উৎসব হয়, এগুলির সমারোহ তা'র চেয়ে অনেক বেশী।

হিনা সাতসুরী পালন করা হয় প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসের ৩রা তারিখে। কেন যে এই উৎসবের প্রচলন হয়েছিল সে কথা জাপানের কেউ জানে না বললেই হয়। তবে

আজ যে ভাবে এই উৎসব পালিত হয়, সপ্তদশ শতাব্দী-তেও ঠিক সেই ভাবেই তা পালিত হ'ত। এই দিন প্রত্যেক বাড়ীতে ছোট ছোট মেয়েরা নিজেদের পুতুলগুলিকে পুরাকালের পোষাকে সাজিয়ে পূজা করে এবং নিজের নিজের মেয়ে-বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে। ছেলেদের এই উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার অধিকার নেই।

৫ই মার্চ্চ তারিখে পালিত হয় ছেলেদের উৎসব—তাঙ্গো নো সেকু অথবা পতাকা-উৎসব। এই উৎসব কেবল ছেলেদের জন্যে, মেয়েরা এতে যোগ দিতে পারে না। এই উৎসবে প্রধানতঃ প্রাচীন কালে যুদ্ধে ব্যবহৃত পতাকাগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়; তা ছাড়া থাকে অতীতের ঢাল-তলোয়ার—যুদ্ধাস্ত্র। পতাকা-গুলির নীচে দাঁড়িয়ে ছেলের দল করে কলরব। ছেলেদের মধ্যে সংগ্রাম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করা কিন্তু এই উৎসবের উদ্দেশ্য নয়। তারা যাতে দেশের অতীত গৌরবকে অশ্রদ্ধা না করে, তারা যাতে সাহসী হ'তে পারে—সেই জন্যেই এইগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দিন ছেলেদের সুগন্ধ উষ্ণ-জলে স্নান করতে হয়।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও এই উৎসব জাপানে প্রচলিত ছিল। সেদিন কিন্তু এ উৎসব কেবল ছেলেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সরকারীকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাতে যোগদান করতেন। তখন উৎসব-পালনের ব্যবস্থাও ছিল একটু অন্য রকম। কালক্রমে তার পরিবর্ত্তন হয়েচে।

নব-দিল্লীর বিস্ময়—

এই সেদিন—ফেব্রুয়ারী মাসে বিরাট সমারোহের সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ নব দিল্লীর দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হ'ল। ভারতের বুকে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির বাস-ভবন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েচে, তা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে কতখানি সুখকর, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নব-দিল্লীর নূতন সৌধশ্রেণী যে আধুনিক স্থাপত্য-বিজ্ঞানের গৌরবের বিষয় সেই কথাই এখানে সংক্ষেপে বলতে চাই। উদ্যান, তোরণ-দ্বার, সেক্রেটেরিয়েট, রাজপ্রতিনিধির বাস-ভবন—প্রত্যেকটী তার সাক্ষ্য। একজন বিখ্যাত স্থপতি তাই বলেচেন যে নূতন দিল্লী আধুনিক ভারতের রোম। এই সমস্ত সৌধ ও অন্যান্য জিনিষের যিনি পরিকল্পনা করেচেন, তাঁর নাম সার এড্উইন লুটেইন্স। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সার হার্বার্ট বেকার। প্রত্যেক জিনিষের ছবি দেবার মত স্থানের এখানে অভাব। আমরা মাত্র দুইটী ফোয়ারার ছবি দিয়ে তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলাম। এর একটী বড়লাটের বাড়ীর চূড়ার উপর অবস্থিত; অপরটী দেখতে পাওয়া যায় রাজপ্রতিনিধির প্রমোদ-উদ্যানে। উদ্যানের ফোয়ারাটীকে দেখলে হঠাৎ মনে হয় যে কতকগুলি পাথরের প্লেট যেন
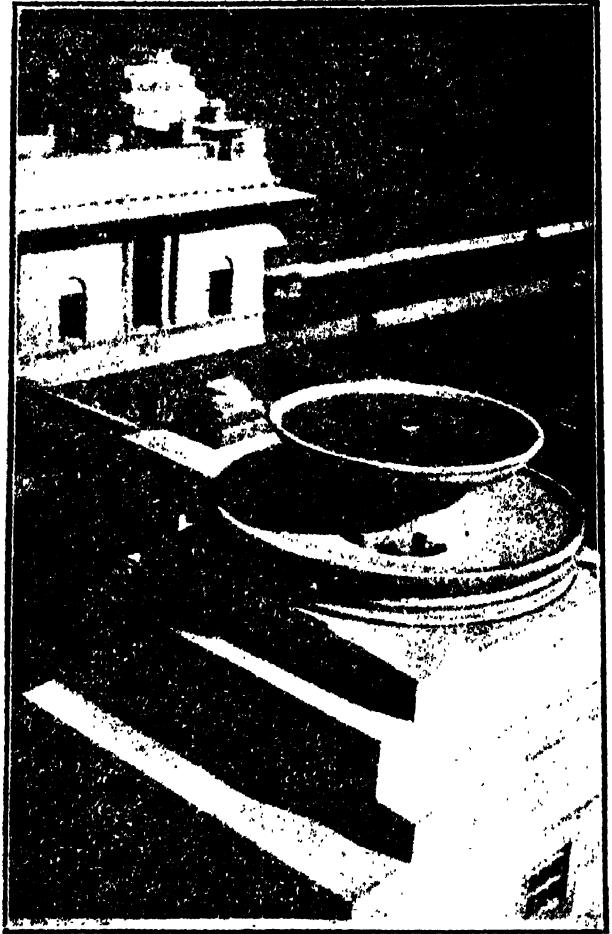
বড়লাট-প্রাসাদ (নব-দিল্লী) ছাদের উপর কৃত্রিম উৎস

চক্রাকারে সাজানো রয়েচে—কিম্বা কতকগুলি রৌপ্য-মুদ্রাই বুঝি!

নূতন দিল্লীর এমনিধারা বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের দিকে

দিল্লীর লাট-প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের বিচিত্র উৎস

চেয়ে কেউ ভাবতে পারে না যে এ দেশের অধিকাংশ লোক অন্নচিন্তায় কাতর, ক্ষুধায় উৎপীড়িত!

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম-মোটর--

আধুনিক আমেরিকার পথে পথে মোটরের সমারোহ আজ যত বেশী, তেমন আর কোন দেশে নয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মোটর তৈরী হ'বার পর এখনও অর্দ্ধ শতাব্দীও কাটে নি।

আজকের দিনের লাস্থালে বা' ক্যাডিল্যাক দেখে কল্পনাও করা যায় না যে, সে-দিন মোটরের আকৃতি কি রকম ছিল। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মোটরের ছবি দেওয়া হ'ল। এটী তৈরী করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফেলিন। তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই গাড়ীখানি লা এঞ্জলিসের লুনা পার্কে সযত্নে রাখা আছে।
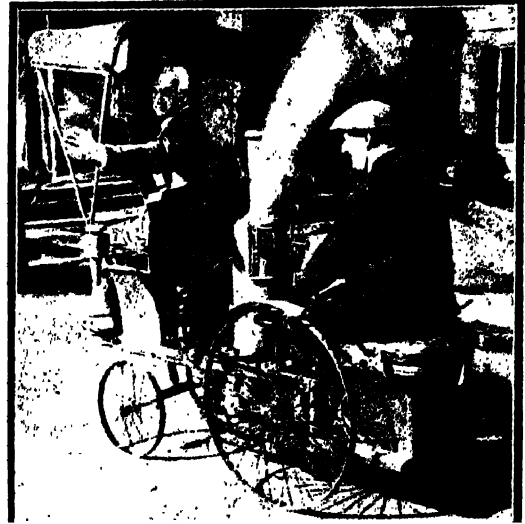
যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম মোটর গাড়ী

পৃথিবীর বৃহত্তম ভেক—

দক্ষিণ কেনসিংটনে প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহের জন্য যে যাদুঘর আছে, তা'তে সম্প্রতি যে-সকল জিনিষ সংগ্রহ

ভেকরাজ—"রাণা গোলিয়াথ"

করা হয়েচে, তার মধ্যে 'রাণা গোলিয়াথ' জাতীয় এক বিরাট ভেকের নাম সকলের আগেই মনে পড়ে।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এতবড় ভেক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই শ্রেণীর ভেক পাওয়া যায় কেবল ক্যামেরুন্সে। একটা বড় ইঁদুরের তুলনায় এরা কত বড় তা ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে।

বিচিত্র 'বাস'—

ইংলণ্ডের এল এস, এস, রেলওয়ে কোম্পানী এক নূতন রকম গাড়ী তৈরী করেচেন যাকে বাসও বলা চলে আবার ট্রেণও বলা চলে। কেন না টায়ার লাগিয়ে গাড়ীখানাকে যেমন সাধারণ রাস্তায় চালান যায়, তেমনি টায়ার খুলে নিয়ে রেল-লাইনের উপর দিয়েও তাকে চালাবার ব্যবস্থা আছে।

রাশিয়ান উর্ব্বশী—আনা প্যাভলোভা

বিচিত্র 'বাস'

পরলোকে প্যাভলোভা—

বিংশ-শতাব্দীর উর্ব্বশী আনা প্যাভলোভা ২২শে জানুয়ারী তারিখে ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে, হেগ সহরে পৃথিবী থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করেচেন। সমস্ত কলা-জগৎ আজও এই মৃত্যুহীন নর্ত্তকীর জন্ত শোকাশ্রু উৎসর্গ করচে এবং বহুকাল ধরে করবে।

ষোড়শ বসন্তের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং বিপুল খ্যাতি সঙ্গে করে তিনি 'ইম্পীরিয়াল রাশিয়ান ব্যালেট' ছেড়ে আসেন এবং ১৯০৮ সালে দিয়াঘিলেভসের দলে যোগ দেন। ১৯১১ সালে রাশিয়ামেয়ে প্যাভলোভা লণ্ডনের কভেণ্ট-গার্ডেন নাট্যমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই থেকে তাঁর খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিবাহ করেছিলেন ভিক্টর দাঁদরেকে। বিবাহের পর বেশীর ভাগ তিনি থাকতেন তাঁর হ্যাম্পষ্টীডের বাড়ীতে।

মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে তিনি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান তাঁর দলবল নিয়ে। ভারতের কলা-রসিকদেরও তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

যান চলাচল-নিয়ন্ত্রণ—

প্রত্যেক বড় সহরেই যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্চে। প্রত্যেক বড় সহরকেই সেজন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করতে হ'চ্চে; তার কয়েকটা পরিচয় নিখিল-প্রবাহের পাঠক-পাঠিকাদের দিয়েছি। এখানে এই শ্রেণীর আর একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করলাম। এতে পথ-রক্ষীর দুই হাতে সঙ্কেত জ্ঞাপক দুটী ল্যাম্প থাকে।

হইয়াছিল ; কিন্তু কোনও চেষ্টা ঠিক সফল হইতে পারে নাই। সে যেই বুঝিত যে তাহার উপর কোনও আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তৎক্ষণাৎ সে হাতের কাছে ইট, পাথর যাহা পাইত, তাহা লইয়া পা ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইত ; যে তাহার দিকে আগাইয়া আসিবে, তাহারই মাথা গুঁড়া হইয়া যাইবে। তাহার চেহারার মধ্যে এমন একটা বীভৎসতার ছাপ ছিল যে, তাহাকে দেখিলেই লোকের ভয় করিত। বিশেষ করিয়া ভয়ের ছিল, তাহার ছোট ছোট চোখদুটী। কোটরের ভিতর হইতে ছোট চোখ দুটীর দৃষ্টি যেখানে গিয়া পড়িত, মনে হইত গরম লোহার শিকের মত সে-স্থল যেন সে ভেদ করিয়া চলিয়াছে। চোখাচোখি হইলে মনে হইত যেন সম্মুখে এক হিংস্র বন্য জন্তু দাঁড়াইয়া আছে, চোখে তার এক আদিম ভয়াল হিংস্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন জগতের কোনও কিছুকে ভয় করে না।

সে খুব অল্প কথাই কহিত ; কিন্তু তাহার সকল কথার মাত্রা ছিল "পাজী বদমায়েস"। ঐ নামে সে কারখানার উপরিওয়ালাদের ডাকিত, ঐ নামে সে পুলিশের লোকদের গালাগালি দিত। বাড়ীতে ঐ নামে স্ত্রীকে সম্বোধন করিত।

তাহার ছেলের বয়স তখন চোদ্দ। একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সহসা ছেলের চুলের মুঠী ধরিয়া টানিয়া তুলিবার তাহার বাসনা হইল। মাথায় হাত দিতে না দিতেই, পুত্র গর্জ্জিয়া উঠিল। সামনে একটা হাতুড়ী পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।

"খবরদার! আমার গায়ে আর হাত দিও না বলছি। অনেক সহ্য করেছি, আর আমি কিছুতেই সহ্য করবো না!"

পুত্রের দিকে চাহিয়া মাইকেল হাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা পাজী বদমায়েস!"

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "এই দেখ্, কাল থেকে আর আমার কাছে পয়সা চাইবি না, এবার থেকে তোর ছেলে তোকে রোজগার করে খাওয়াবে!"

ভয়কুণ্ঠিত স্বরে নারীটী বলিল, "আর তুমি যা রোজগার করবে, সব মদ খেয়ে ওড়াবে তো?"

"তোর তাতে কি বদমায়েস!"

সেই দিন হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যতদিন সে বাঁচিয়া ছিল, সে পুত্রের কোনও খোঁজখবর লইত না—পুত্রের সঙ্গে কোনও কথা বলিত না।

ব্লাসবের সঙ্গীহীন জীবনের একটী নিত্য সঙ্গী ছিল, সে তার কুকুর। কুকুরটী তারই মত ভীষণ ও বীভৎস। প্রতিদিন সকালে সে যখন কারখানায় যাইত, কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেট পর্য্যন্ত যাইত। সন্ধ্যা-বেলায় কারখানা হইতে সে যখন ফিরিয়া আসিত, কুকুরটী তাহার অপেক্ষায় গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছুটীর দিন সে যখন ভাটীখানায় ঘুরিয়া বেড়াইত, কুকুরটীও সারাদিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিত। রাত্রে মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া কুকুরটীকে লইয়া সে খাইতে বসিত, আপনার প্লেট হইতেই কুকুরটীকে খাওয়াইত। কুকুরটীকে সে কোনও দিন মারে নাই, কোনও দিন আদরও করে নাই। খাওয়া শেষ হইলে, স্ত্রীর অপেক্ষা না করিয়াই ডিসগুলি সে ছুড়িয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিত ; একটী হুইস্কীর বোতল লইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া গান গাহিত। গানের ভাষা তাহার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া জড়াইয়া যাইত। সেই বীভৎস স্বরের ধাক্কায় দাঁতের ফাঁক হইতে রুটীর টুকরা ছিটকাইয়া পড়িয়া গোঁফে দাড়িতে আসিয়া লাগিত। সে আপনার মনে জগতের সকলের অনধিগম্য ভাষায় যতক্ষণ বোতলে মদ থাকিত, ততক্ষণ গাহিয়া চলিত। তাহার এই সঙ্গীত শুনিয়া মনে হইত, শীত-সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রান্তরে যেন ক্ষুধিত শার্দ্দূল চীৎকার করিতেছে।

—এই সমস্ত ঘটনা যখন আমি সেই সমস্ত শিক্ষিত লোকদের বলিতাম, তাহারা বিশ্বাস করিত না। তাহারা মনে করিত আমি কোন্ প্রাচীন কালের গল্প করিতেছি।

সাময়িকী

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষে বোলপুর শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের সহিত প্রীতিযুক্ত সহৃদয়বর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ যে হইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। এই সময় বিশেষভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক, কর্ম্মী, অথবা যাঁহারা যে কোনো ভাবে আশ্রমের সঙ্গে মনে মনে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা এই জয়ন্তী উৎসবের নেতৃগণকে জানাইলে তাঁহারা সকলকে এই অনুষ্ঠানের কথা জ্ঞাপন করিতে পারেন। প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা, এবং জন্মোৎসব সম্পর্কে চিঠি-পত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

অক্ষয়-স্মৃতি-রক্ষা

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকরূপেই তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা থাকিলেও, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল—এবং তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও নাট্যকার, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পরসজ্ঞ ছিলেন। রাজসাহী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, বাঙ্গলার ইতিহাস তাঁহার সাধনভূমি ছিল, ভারতের লুপ্ত গৌরব তাঁহার আদরের বস্তু ছিল। তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক অপনয়ন করিয়া মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের নানা বিষয়ক পরিচয় প্রদানে বিদ্বজ্জন-সমাজের গৌরবের পাত্র হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের অনুরক্ত শিষ্য ও বন্ধুবর্গ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা-ভূমি রাজসাহীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরের অর্থকাঠিন্য নিবন্ধন তাঁহারা তাঁহাদিগের সংকল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃসময় বলিয়া বসিয়া থাকিলে, এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা দশের কার্য্য, দশের অর্থ-সাহায্যেই ইহা হইবে। তাই, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে, রাজসাহীর ও বাঙ্গলার অধিবাসিগণের নিকট অক্ষয়কুমার স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি অক্ষয়কুমারের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা এই মহৎ ব্যাপারে অর্থসাহায্য করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। অর্থসাহায্য অক্ষয়কুমার মেমোরিয়াল কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের নিকট (পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী) পাঠাইতে হইবে।

সাতটা বাজিতে পনেরো মিনিট থাকিতে

২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে পনেরো মিনিট। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির সহিত লাহোর সেনট্রাল জেলে তিনটী যুবক,—ভগৎসিং, রাজগুরু এবং শুকদেব—ফাঁসীর রজ্জুতে প্রাণত্যাগ করিল! কোটী কোটী লোকের আবেদন তিনটী প্রাণীর জীবন-রক্ষা করিতে পারিল না।

সমগ্র ভারত আজ যাঁহাদের শোকে ম্রিয়মাণ, তাঁহারা কিন্তু পরমানন্দে ফাঁসীর রজ্জুকে আলিঙ্গন করিলেন। যখন

রুদ্ধ-কারার দ্বার মুক্ত করিয়া যখন তাঁহাদের বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিনন্দন করিয়া ভগৎসিং বলেন, আপনার সৌভাগ্য, আপনি আজ দেখিবেন স্বাধীনতার সৈনিক কেমন আনন্দে ফাঁসীর রজ্জুকে আলিঙ্গন করে।

ফাঁসীর মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রকাশ যে, তাঁহারা তাহার উপর লাফাইয়া উঠিতে যান। ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর প্রিয়াকে প্রথম চুম্বনের মত তাঁহারা ফাঁসীর রজ্জুকে চুম্বন করিলেন। সুদূরপথযাত্রী বন্ধুরা মৃদুস্বরে কি কথা বলিতে লাগিলেন।

তারপর—

তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে পনেরো মিনিট বাকি ছিল। সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে।

ওধারে ডাঃ আন্সারীর গৃহে শীর্ণদেহ এক তপস্বী তাঁহাদের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেইদিন সকাল-বেলাই তিনি ভারতের রাজ-প্রতিনিধিকে তিনটী যুবকের প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন করিয়া শেষ-পত্র লিখিয়াছেন। সারাদিন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। রাত্রি নয়টার সময় রাজপ্রতিনিধির উত্তর লইয়া পত্রবাহক আসিল। পত্রখানি রাজ-প্রতিনিধির স্বহস্তে লিখিত।

পত্রের বিষয় অবগত হইয়া নিরাসক্ত যোগী ক্ষণকাল নতমস্তকে মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর এক বিকট হাস্যে বলিয়া উঠিলেন, সত্যই নাই, ভগৎসিংরা আর নাই।

সেই হাসি দেখিয়া একজন বলিয়াছেন, খুব হারিতে অভ্যস্ত জুয়াড়ী শেষ দানও হারিয়া যেরূপ হাসে, এ সেই হাসি!

"নমস্তে"

মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগৎসিং দশ বৎসরের ভ্রাতাকে একটী পত্র লিখিয়া যান। সেই তাঁহার শেষ-স্মৃতি। পত্রটী এইরূপ,—

প্রিয় কুলতার, তোমার চোখে জল দেখে আমার মনে বড় ব্যথা লেগেছে। আজকে তোমার কথায় যে আবেগ ছিল, তা আমার মনকে এসে আঘাত করেছে। ভাইটী আমার, মন দিয়ে পড়াশোনা করো, আর স্বাস্থ্যটী ভাল রেখো। দুঃখ করো না।

এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি। সঙ্গে একটা কবিতা পাঠালাম, স্মরণে রেখো—

ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোন লাভ নেই। সমগ্র জগৎ যদি আমাদের বিপক্ষ হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি! এস, ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করি।

হে আমার বন্ধুগণ, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রভাতের দীপশিখার মত আমি ঊষার আলোকে হারাইয়া গেলাম।

আমাদের ভাব ও ভাবনা জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবে। এই এক মুঠা ধূলা যদি ধূলায় মিশিয়া যায়, যাক্।

তবে, বিদায়। হে আমার স্বদেশবাসি, তোমাদের কল্যাণ হোক। বহুদূরের পথে আজ আমরা যাত্রা করিলাম।

'নমস্তে!'

ফাঁসীর পর

গান্ধী-আরউইন সর্ত্তের পর, করাচী কংগ্রেস-সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র দেশের মিলিত আবেদনকে অগ্রাহ্য করিয়া ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে সমগ্র দেশে একটা বিষাদের ছায়া আপনা হইতেই ঘনাইয়া আসে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে জাতীয় দল গভর্ণমেণ্টের এই আচরণের প্রতিবাদে সভা-গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই উপলক্ষে জাতীয় দলের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে মিঃ রঙ্গচারিয়ার বলেন,

"গভীর দুঃখ ও বিশেষ মনস্তাপের সহিত আমি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। গত বৎসর ৭ই অক্টোবর তারিখে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল হইয়াছিল, এত দিন পরে গত রাত্রিতে সরকার তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। এই বিচারের ঘটনা সকলেই জানেন। এই ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতিবাদ সত্বেও অর্ডিন্যান্সের সহায়তায় স্পেশাল বিচার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অসাক্ষাতে এই বিচার হয়। জনসাধারণের অধিকাংশের বিশ্বাস যে, যে অভিযোগের জন্য ইহাদের ফাঁসী হইল, অন্ততঃ ভগৎ সিংএর তাহার সহিত যোগ ছিল না। জনসাধারণের এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ নানা উপায়ে ভারত-সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। ভারতের তপস্বীর মধ্যবর্ত্তিতায় ভারতের জনসাধারণের

এই আবেদন যে গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন, তাহা অনেকেই আশা করিয়াছিল। কিন্তু ভারত-সরকার সে সমস্ত আবেদন গ্রাহ্যই করিলেন না। বিচারের সঙ্গে ক্ষমার সংমিশ্রণ হইলে, ভারত-সরকারেরই মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইত এবং পরস্পর মিলনের সুযোগকেই আরও দৃঢ়তর করিত। কিন্তু সে সুযোগ আজ ভারত-সরকার হারাইলেন।"

ফাঁসীতে রাজনৈতিক ফলাফল

গান্ধী-আরউইন মিলনের ফলে দেশের সকলেরই একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধীর আবেদনের ফলে এবং দেশবাসীর মিলিত প্রতিবাদে ভারত-সরকার হয়ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত করিবেন, অন্ততঃ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তাহা স্থগিত থাকিবে। মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণের বক্তৃতায়ও এই ব্যাপারের স্পষ্ট আভাস ছিল। বিপ্লব পন্থাকে অনুমোদন না করিলেও, দেশবাসী ইংলণ্ড ও ভারতের সম্প্রীতির অনুকূল শান্তির আবহাওয়ার জন্য এই কয়েকটী যুবকের প্রাণ-ভিক্ষা করিয়াছিল। আয়ারল্যাণ্ডের সিনফিনদের সহিত সংগ্রামে যখন ইংলণ্ড ডি ভ্যালেরার সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করেন, তখনও ডি ভ্যালেরার পক্ষ হইতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সহযাত্রীদের মুক্তির সর্ত্ত ইংলণ্ড স্বীকার করিয়া লন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। জীবনের বিনিময়ে জীবন গ্রহণ করার ব্যবস্থা আজ আইন-শাস্ত্র হইতে তুলিয়া দিবারও আন্দোলন জগতের নানা দেশে হইতেছে। এ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর সমস্ত প্রতিবাদ, মহাত্মা গান্ধীর আবেদন সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া করাচী কংগ্রেস-সপ্তাহের মধ্যে এই ফাঁসীর দণ্ড কার্য্যে পরিণত করিয়া, কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা বৃহৎ সমস্যা ও ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেন। সর্ব্বদেশেই জনসাধারণ আবেগের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যেখানে সাক্ষাৎ রাজনীতির সহিত জনসাধারণ বহুকাল হইতে বিচ্ছিন্ন, সেখানে জনসাধারণ হঠাৎ বুঝিতে পারে না, যে, রাজনীতির সহিত হৃদয়ের যোগ কতটুকু এবং কোথায়। সেইজন্যই ভগৎ সিং প্রভৃতিদের ফাঁসীর পর একদল লোক সহসা মহাত্মা গান্ধীর উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং তেত্রিশ কোটী লোক যাঁহাদের বাঁচাইতে পারিল না, তাঁহাদের বাঁচাইবার জন্য সেই একজনকে দায়ী বলিয়া অভিযোগ করিতে কুণ্ঠিত হইল না; মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বাহির হইল; দিল্লী সর্ত্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাথা তুলিয়া উঠিল এবং সম্মুখের করাচী কংগ্রেসের কর্ত্তব্যকে কঠোরতর করিয়া তুলিল। অনেক সময় উকীলরা সাক্ষীদের রাগাইয়া দিয়া জেরায় সকল কথা বাহির করিয়া লয়—রাগের মাথায় সাক্ষী সমস্ত গুলাইয়া ফেলে। রাজনীতির ব্যাপারেও অনেক সময় আবেগ ও ক্রুদ্ধ উত্তেজনার ফলে জনসাধারণ প্রতারিত হয়। আপনার আদর্শে স্থির, কূট রাজনৈতিক মহাত্মা গান্ধী এই সমস্যা বুঝিতে পারিয়াই ভগৎ সিংএর মৃত্যুর পর এক বিবৃতিতে বলেন, ভগৎ সিং এবং তাঁহার বন্ধুরা আজ ফাঁসীর মধ্য দিয়া শহীদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ শত সহস্র লোক ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের অভাব অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছেন। এই সমস্ত যুবক দেশ-প্রেমিকদের উদ্দেশে যে সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমারও সম্পূর্ণ অংশ আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি দেশের যুবকদের তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছি। যে ত্যাগ, কর্ম্মনিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ সাহসিকতা আজ তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, আমাদের উচিত সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুসরণ করা; কিন্তু এই সমস্ত গুণ তাঁহারা যে কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা যেন আমরা গ্রহণ না করি। হত্যার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হইবে না। গভর্ণমেণ্টের দিক দিয়া তাঁহারা বিপ্লবীদলকে জয় করিবার মাহেন্দ্রক্ষণকে হারাইলেন। আপোষ-মীমাংসার খাতিরে, কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ ফাঁসী স্থগিত রাখা তাঁহাদের স্পষ্ট কর্ত্তব্য ছিল। এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা আবার দেখাইলেন যে, জনমতকে পদদলিত করিবার কিরূপ শক্তি তাঁহাদের মধ্যে আছে। কিন্তু জাতির কর্ত্তব্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। * * * * রাগিয়া গিয়া আমরা যেন ভুল পথ গ্রহণ না করি।

কালো ফুলের মালা

কিন্তু একদল যুবক এবং গুটী কয়েক নেতাকে এই রাগ পাইয়া বসে। দিল্লীর সর্ত্ত নিপাত যাউক, গান্ধী নিপাত যাও, চীৎকার ধ্বনি করাচী কংগ্রেসের দ্বারপ্রান্তে
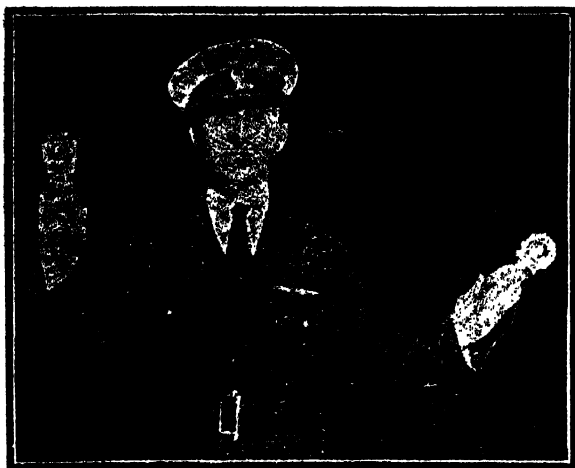
যান-চলাচল-নিয়ন্ত্রণ

একটী গাড়ীঘোড়াকে থামতে বলে; অপরটী বলে চলতে। একটী হাত যখন উঁচু করে রাখা হয়, তখন অপর হাতের ল্যাম্পটী থেকে কোন রকম আভা বার হয় না। প্রয়োজন হ'লে দুটী হাতই নীচু করে রাখা যায়।

থারাবল্ডী বিদ্রোহের প্রতীক—

কয়েকমাস আগে সমস্ত ব্রহ্মদেশকে চঞ্চল করে, থারাবল্ডীতে যে বিদ্রোহ-অগ্নি জ্বলে উঠেছিল, তাঁর স্মৃতি বোধ করি এত অল্পকালের মধ্যে পাঠক-পাঠিকার মন থেকে মুছে যায় নি। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মের পুলিসের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল প্রচার করেন যে, তাঁদের চেষ্টার বিদ্রোহ প্রশমিত হয়েচে এবং বিদ্রোহীদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্চে। এই বিদ্রোহের নায়কের নাম ছিল সায়া সেন—সে নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিত। বৃটিশ সৈন্য তার প্রাসাদ আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের একটী পতাকা, একটী কাঁসর এবং একটী টুপী নিয়ে আসে। এখানে সেইগুলির ছবি দেওয়া হ'ল। ছবির কোণে যে টুপীটি দেখা যাচ্চে,—সেটী বিদ্রোহীদের নায়ক সায়া সেন স্বয়ং ব্যবহার করত।

বিদ্রোহের প্রতীক

বিশ্ব-সাহিত্য

গর্কীর আত্মচরিত হইতে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

·· ডোবরিঙ্ক ষ্টেশনের মালঘরে রাত্রি-বেলা চৌকীদারীর কাজ করি। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে পরের দিন সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত লাঠী হাতে মালঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। দিগন্ত-প্রসারী মাঠে নৈশ-অন্ধকারে উন্মাদ ঝড়ো হাওয়া বহিয়া যাইত—বাতাসে তুলার মত তুষার ছড়াইয়া পড়িত।

মাঝে মাঝে একান্ত মন্থর গতিতে তুষার ভেদ করিয়া কোনও রকমে পিছনের মালগাড়ীগুলিকে টানিয়া লইয়া এঞ্জিন যাওয়া-আসা করিত। তুষার-পঙ্কিল নৈশ-নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা ক্লান্ত কাতর একঘেয়ে শব্দ জাগিয়া উঠিত, মনে হইত কে যেন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সারারাত্রি ধরিয়া ক্লান্ত অবশ করে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইতেছে।

একদিন দেখি, আধো-অন্ধকারে মালঘরের এক কোণে তুষারের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে দুইটী লোক দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা বরফের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। কসাক্‌স্—মালঘর হইতে ময়দা চুরি করিতে আসিয়াছে।

অন্ধকারে শুনিলাম ভিক্ষুকের মত একটী কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি ভিক্ষা চাহিতেছে। কোনও সাড়া না পাইয়া সেই কণ্ঠ পুনরায় একটু উচ্চ-গ্রামে অর্দ্ধ-রুবেল ঘুষের কথা জানাইয়া দিল।

"ও সব আমার কাছে হবে না"—উত্তর দিলাম।

তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। সেই রাত্রির অন্ধকার আর সেই তুষার-বাহী নৈশ-ঝঞ্ঝা। আমি জানি যে, এই সব লোক পেটের দায়ে চুরি করিতে আসে নাই—তাহারা আসিয়াছে ভোড্‌কা ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে।

এ উপায়ে সুবিধা না হইলে, তাহারা অন্য ব্যবস্থা করিত, গ্রাকোভা নাম্নী একজন স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিত। দুই এক বস্তা ময়দার বিনিময়ে সে দেহ বিক্রয় করিত। পাথরের মত খোদাই-করা তাহার দেহ—পাথরের মত লজ্জাহীন তাহার মন। * * *

আমার সহিত তাহার প্রায়ই দেখা হইত, কিন্তু কোনও সুবিধা হইত না; অন্য চৌকীদারের সহিত রফা করিবার সুপরামর্শ দিয়া আমার এলাকা হইতে তাহাকে দূরে থাকিতে বলিতাম। তবুও কি জানি কেন, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত, চুরির ব্যবস্থার জন্য নয়—নানারকম আবোল-তাবোল বকিয়া যাইত—আমি নীরবে শুনিতাম।

একদিন রাত্রিবেলা দেখি মালঘরের এক-কোণে সে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, ভয় নেই, আমি চুরি করতে আসি নি! আমি একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

আকাশের তারার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম তখন মধ্য-রাত্রি। বলিলাম, বেড়াবার পক্ষে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে বোধ হয়!

তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া সে বলিল, এমনি মাঝ-রাতেই আমাদের সূর্য্যি উঠে!

তারপর আমার পাশে বসে পরিষ্কার ভৎর্সনার স্বরে সে আমাকে বলে, ঘুমোও কেন? ঘুমোবার জন্যে কি তোমাকে ওরা মাইনে দেয়?

পকেট থেকে একমুঠো মটর বার ক'রে চিবোয়। চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা তুমি তো লেখাপড়া জানো—ওবোলক শহরটা কোথায় বলতে পার?

—ও নাম আমি কখনও শুনি নি। কেন, সেখানে কি?

শুনছি সেখানে মেরী আবার নাকি আবির্ভূতা হয়েছেন—কোলে তাঁর শিশু যিশু;—ভাবছি আমি যাব সেখানে। আমার সেখানে যাওয়া উচিত—কি বল?

কেন?

কেন? জানো, জীবনে কত পাপ করেছি! আর

তার জন্যে দায়ী এই তোমরা পুরুষ মানুষ। তোমার কাছে ধূম-পানের কোনও ব্যবস্থা আছে?

একটা সিগারেট দিলাম। সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সে বলিল, দেখো কারুকে যেন বলো না যে আমি সিগারেট খাই। মেয়েমানুষ সিগারেট খেলে কসাকগুলো ভারী রাগ করে।

স্বচ্ছ আকাশে সহসা তখন একটা তারা খসিয়া পড়িল।

—ওরই মত আমিও একদিন ঝরে পড়ে যাব। আচ্ছা, তোমার অন্ধকার রাত, না এমনি পরিষ্কার রাত ভাল লাগে। রাত যদি এমন ঝরঝরে হয়, তাহলে আমার ভয়ানক বিরক্তি লাগে। রাত্রি হবে অন্ধকার—কি বল?

সিগারেটের ছাই ঠুকিয়া ফেলিয়া দিয়া সে হাই তুলিয়া ক্লান্ত স্বরে বলে, এসো একটু ফুর্ত্তি করা যাক্।

আমি বাধা দিই। ক্ষুণ্ণ হইয়া সে বলে, আমি যার সঙ্গে মিশি সেই খুশী হয়—কিন্তু তুমি···

যাহাতে সে আহত না হয়, এই রকম ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, তাহার কুৎসিৎ নিলর্জ্জতা আমাকে পীড়া দেয়।

আমার কথার সত্যতা যেন সে বুঝিতে পারে। বলে, চিরকালই এই রকম ছিলাম না·· এই একঘেয়েমীর মধ্যে জীবনের সমস্ত লজ্জা কখন ডুবে গেছে···

তারপর উঠে দাঁড়ায়। আমাকে শুনাইয়া বলে, যাই, ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে। ধীরে ধীরে আবার অন্ধকারে সে মিশিয়া যায়। * * * *

সেই সময় আমি বুঝিতে পারিতাম না যে, যাহারা মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, মুক্ত প্রান্তরের মধ্যেই থাকে, তাহাদের জীবনের একঘেয়েমীর অর্থ কি। রুষিয়ার এই সমস্ত সীমাহীন তেপ্রান্তর মাঠের শূন্যতার মধ্যে জীবনের অপ্রয়োজনীয়তা প্রতি সূর্য্য-করে ফুটিয়া উঠে;—সে শূন্যতার মাঝে এমন কিছু নাই যাহা অন্তরে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রেরণা জোগাইতে পারে।

সেই সময় আমার চারিপাশে যে সমস্ত বিচিত্র নর-নারী ক্ষণিক পরিচয়ের আলোকে আমার অন্তরে নানা রূপের ছায়াপাত করিয়া যাইত, তাহারা জানিত না যে সেই ছায়া-মরীচিকার মধ্যে আমার চিত্ত কোন্ নিগূঢ় আলোক-তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে বেদনায় নিত্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত।

ষ্টেশন-মাষ্টারের ওখানেই নৈশ আড্ডা বসিত। লোকটী ছিল একজন পাকা চোর;—ষ্টেশনে যে-সমস্ত মাল আসিত, তাহার কিছু না কিছু অংশ তিনি আপনার জন্য রাখিতেন। কুলীরা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিত, কারণ নিষ্ঠুরতায় তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে সেখানে কেউই ছিলনা। শোনা যায় লোকটী প্রহারে তাহার স্ত্রীর জীবন সাঙ্গ করে; তাহার পর আর বিবাহ করে নাই।

রাত্রিবেলায় তাহার বাসায় আড্ডা বসিত। আশে-পাশের গ্রাম হইতে কয়েকজন পুরুষ এবং কয়েকজন নারী আসিত। সারারাত্রি ধরিয়া মদ্যপান চলিত। পুরুষ ও নারী আদিম অবস্থার পশুর মত আপনাদের অন্তরের কামনা ভোগ করিত * * * *

মানুষকে জানিবার উদগ্র বাসনা তখন নেশার মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমার চারিদিকে দেখিতাম, পশু আর মানব অনবরত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। দেখিতাম, আপনার অন্তরের কুৎসিৎ কামনাকে ভোগে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়া মানবত্ব অর্জ্জনের চেষ্টায় মানুষ অনবরত কামনার আবর্ত্তে আরও নামিয়া চলিয়াছে—

একদিন রোমাস আমাকে বলিয়াছিল, জগতের সব কিছু জানা চাই, বোঝা চাই। বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা চাই; নইলে জীবনের কোনও মানে থাকে না। তাই যেখানে পার একবার খুঁজে দেখবে—কোথাও কোন্ অন্ধকারে কোনও সত্য লুকিয়ে আছে কিনা। আর জীবনকে যদি বুঝতে চাও, যদি সত্যকে পেতে চাও, ভয়হীন-চিত্তে জীবনকে গ্রহণ করবে। বীভৎস বা ভয়াবহ বলে যাকে মনে হয়, তাকে জানলেই দেখবে, সে মোটেই ভয়াবহ নয়।

রোমাসের এই পরামর্শ আমি জীবনে ভুলি নাই। তাই সর্ব্বদাই সজাগ হইয়া জীবনের প্রতি অন্ধকার গহ্বরে ভয়লেশহীন চিত্তে নামিয়া যাইতাম। মানুষকে অতি কুৎসিৎ-রূপে দেখিয়াছি—এত কুৎসিৎ যে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া পারা যায় না; কিন্তু তবুও মনে হয়, মানুষের চেয়ে পবিত্র ও মহৎ সৃষ্টি অন্য কিছু আর এই বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডে নাই। তাহারই অন্তরে আছে এক অপরূপ মৃত সঞ্জীবনী, যাহার ফলে একই জীবনে লক্ষ মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নব-জীবনের অমৃত-আস্বাদ সে ভোগ করিতে পারে। * * * *

ভোখরিঙ্ক ষ্টেশনের জীবন আমার পক্ষে ক্রমশঃ অসহ হইয়া উঠিল। ষ্টেশন-মাষ্টারের নৈশ-উৎসবে আমাকে যোগদান করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে আমার সর্ব্ব দেহমন বিষাক্ত হইয়া উঠিত। আবেদন করিয়া অন্য এক ষ্টেশনে মালঘরের চটের বস্তা, তারপলিন ইত্যাদির জমা-খরচ রাখিবার চাকরী লইয়া চলিয়া গেলাম।

নূতন ষ্টেশনে আসিয়া একদল শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ হইল। আমি যে রেলে চাকরী করিতাম, সেখানকার সমস্ত চুরি, জুয়াচুরি ধরিয়া দিবার ভার ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকিলেও, তাঁহাদের চারিপাশে যে ভয়াবহ মূর্ত্তিতে মানুষ নিত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহার খবর তাঁহারা রাখিতেন না।

চটের বস্তা ও তারপলিন পাহারা দিতে দিতে মন আমার স্বপ্ন দেখিত, সুন্দরতর জীবনের, মহত্তর অস্তিত্বের। রাত্রি-বেলায় পকেট হইতে সেক্‌স্‌পীয়ার ও হাইনের পুরাণো গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া পড়িতাম। সেই উদাসীন নিস্তব্ধতার মধ্যে সেক্‌স্‌পীয়ার পড়িতে পড়িতে সহসা মন কেমন উদাস হইয়া উঠিত—অর্থহীন বদ্ধ-দৃষ্টি লইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। অন্ধকারে মনে হইত আমার চারিদিক দিয়া মৃত-মানবের অনন্ত অশ্রান্ত কলরোল উঠিতেছে,—লক্ষ চিত্তের অপ্রকাশের মৌন ব্যথায় রুষিয়ার রাত্রি এক অপরূপ নিঃশব্দতার করুণ রাগিণীতে ভরিয়া উঠিত। * * *

চারিদিকে অজ্ঞতা আর ব্যভিচার,—জীবনের, যৌবনের, কামনার।

শহরের মেয়র প্রতি সপ্তাহে পাদ্রীকে ডাকিয়া একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন,—অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শহরের কূপগুলা হইতে ভূত তাড়ান।

স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের প্রহার করিয়া সুখ পাইতেন না; বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেন। হতভাগ্য নারী প্রহারে জর্জ্জরিত এবং বিবস্ত্র হইয়া বাড়ীর বাহিরে ছুটিয়া পলাইয়া আসিত। পাড়ার লোকে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত, বিবস্ত্রা নারীকে মাষ্টার প্রহার করিতেছে। নিত্যই এই ঘটনা ঘটিত। একদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। দেখি, লোকগুলি পরমানন্দে সে দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। একজনকে এই নিলর্জ্জতার জন্য তিরস্কার করায় সে আমার উপর রাগিয়া গেল; বলিল, এতে রাগ করবার কি আছে? এ ব্যাপার দেখবার সবারই অধিকার আছে। মস্কোতে তো আর এরকম দেখা যাবে না।

রেলওয়ের যে কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমি থাকিতাম, একদিন তাহার সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক। সে আমাকে বোঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, য়িহুদীরা যে শুধু জুয়াচোর তাহা নয়, তাহারা নপুংসক। আমি যত চেষ্টা করি তাহাকে বোঝাইতে, সে তত রাগিয়া যায়। অবশেষে তাহার সন্দেহ হইল যে, আমি নিশ্চয়ই য়িহুদী। সেই দিনই রাত্রি-বেলায় যখন ঘুমাইতেছি, তখন দেখি, সে আর দুইজন লোক লইয়া আমার ঘরে আসিয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আমি য়িহুদী কি না।

পুলিশের দারোগার বাড়ীতে যে মেয়েটী রাঁধুনীর কাজ করিত, সে এঞ্জিন-চালকের প্রেমে পড়িয়াছিল। প্রত্যহ সে স্বহস্তে তাহাকে খাবার দিয়া আসিত। তাহাকে দিবার জন্য কেক সে আলাদা করিয়া তৈয়ারী করিত এবং তাহাতে রক্ত মিশাইত। তাহার ধারণা যে, তাহাতে সে লোকটাকে বশে আনিতে পারিবে। মেয়েটার একটী বন্ধু জানিতে পারিয়া এঞ্জিন-চালককে সমস্ত ব্যাপার বলিয়া দেয়। ডাইনীর পাল্লায় পড়িয়াছে মনে করিয়া ড্রাইভারটী উন্মাদ হইয়া গেল এবং একদিন শুনিলাম যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

কারখানার মাইকেল ছিল অন্য আর এক রকমের। কারখানার ফোরম্যান বা ম্যানেজারদের সে মোটেই গ্রাহ্য করিত না; এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের অপমান করিতেও ছাড়িত না। ফলে অত বড় জোয়ান আর ওস্তাদ্ হওয়া সত্ত্বেও তাহার রোজগার বেশী হইত না। কারখানার বাইরেও লোকে তাহাকে ভয় করিত, তাহার নিকট আসিত না। কারণ ছুটির দিন সে কাহাকেও না কাহাকেও প্রহার না করিয়া বড়-একটা বাড়ী ফিরিত না।

বহুবার তাহাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিবার চেষ্টাও

জাগিয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধীকে অপমান করিবার জন্য নওজোয়ান ভারত-সভার যুবকবৃন্দ নানা প্রকার ঘৃণ্য চেষ্টা করেন এবং এক যায়গায় তাঁহাকে কালো ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ না হইয়া, ইহা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেন। কয়েকজন যুবকের উদ্ধত আচরণ বিবেচনা না করিয়া; ইহার পশ্চাতে যে বিদ্রোহী মনস্তত্ব কাজ করিতেছে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও সাহসিকতার সহিত তাহার সম্মুখীন হন। তাঁহার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রার পর তিনি করাচীতে এক প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সহস্র সহস্র লোক নতমস্তকে সে বক্তৃতা শ্রবণ করে; এবং যে সমস্ত নওজোয়ানী যুবক আগের দিনও তাঁহার গলায় কালো ফুলের মালা পরাইতে গিয়াছিল, তাহারাও স্থির হইয়া মহাত্মাজীর কথা শোনে। সভায় নওজোয়ানী যুবকবৃন্দের কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন, তারা অনেক রকমে আমাকে অপমান করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা কালো কাপড়ের তৈরী ফুলের মালা দিয়াই তাহাদের শোক প্রকাশ করিয়াছে। আমি মনে করি, সেই মালা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত তিনজন স্বদেশ-প্রেমিকের দগ্ধ হৃদয়েরই প্রতীক। তাহারা ইচ্ছা করিলে উহা আমার উপর বর্ষণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাদের হাত হইতে উহা লইবার অধিকার তাহারা আমাকে দেয়। আমিও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা গ্রহণ করি। অবশ্য তাহারা "গান্ধী নিপাত যাও" "গান্ধী ফিরিয়া যাও" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে সঙ্গতভাবেই তাহাদের ক্রোধের অভিব্যক্তি হইয়াছে; ঐ সকল কথা ব্যবহারের অধিকার তাহাদের আছে। এ সব বিষয়ে আমি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। যে ব্যক্তি আমাকে এই মালা দিয়াছে, সে যদি তাহার ভ্রম স্বীকার করিয়া আমার নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া লইতে যায়, তাহা হইলে এই মালা আমি তাহাকে প্রদান করিব; নতুবা এই কালো ফুলের মালা যত্নের সহিত আমি আশ্রমে রাখিয়া দিব। আমি গান্ধী আমরণ এই অহিংস-নীতি আশ্রয় করিয়া থাকিব এবং তাহার জন্য যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও হয়, তাহাও করিব।

শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল—করাচি কংগ্রেসের সভাপতি

ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীর ফলে দেশের রাজনৈতিক মহলে যে ভেদের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, করাচী কংগ্রেসে হয়ত শোচনীয় দলাদলির সৃষ্টি হইয়া কংগ্রেসের সংহত শক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, নিরাড়ম্বর করাচী কংগ্রেস একটা জিনিষ প্রমাণিত

করিয়াছে যে, দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে।

—

করাচীর পূর্ব্বে কানপুর

করাচীতে যখন ভারতের নেতৃবৃন্দ একটা সম্মিলিত জাতির সংহতি-শক্তিকে দৃঢ়তর করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত, সেই সময় ২৪.শে মার্চ্চ তারিখে কানপুরে সহসা এক

মহাত্মা গান্ধী

প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। হিন্দু-মুসলমানের রক্তে কানপুরের মাটী রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সমগ্র ভারত যখন হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টায় ব্যাপৃত, যখন প্রত্যেক দলের নেতা শুভ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া একটা সম্মানজনক মিলনের পন্থা খুঁজিতেছেন, সেই সময় সহসা কি সূত্র অবলম্বন করিয়া এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হইল, তাহা আজও রহস্যে সমাচ্ছন্ন। ৩০শে মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন, ১৪১ জন নিহত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪২ জন হিন্দু ও ৯৯ জন মুসলমান এবং ৩৮৬ জন আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২১৯ জন হিন্দু ও ১৬৭ জন মুসলমান। কিন্তু বেসরকারী খবরে প্রকাশ যে হতাহতের সংখ্যা ইহার ঢের বেশী।

কিন্তু সবার চেয়ে রহস্যের ব্যাপার এই যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলিয়া প্রচারিত হইলেও, এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলসূত্র কি, তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—
ডাক্তার চৈতরাম গিদ্‌ওয়ানী

২৪শে তারিখে এই ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং সেন্সরের দ্বারা বিলম্বিত হইয়া ২৫শে তারিখে সন্ধ্যাবেলা এই সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে এবং ২৬শে তারিখের কাগজে ইহা বাহির হয়। এবং প্রথম যে সংবাদ আসে, তাহাতে বলা হয় যে, ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসীর খবর পাইয়া কানপুরের হিন্দু ও মুসলমান দোকানদারগণ স্বেচ্ছায় একযোগে দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করেন। একদল হিন্দু ও মুসলমান যুবক তৎপরে কারেন্সী অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিদ্রোহাত্মক ধ্বনি করিতে থাকে। এই

খবর পাইয়া সেখানে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। তৎপরে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জনতার সহিত সৈন্যদের সংঘর্ষ লাগে। জনতা ঢিল ছোঁড়ে, সৈন্যরা গুলী দ্বারা প্রত্যুত্তর দেয় এবং তাহার ফলে ২০জন লোক হত এবং ৬০ জন লোক আহত হয়। প্রথম-প্রেরিত সংবাদে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের কথা ও সম্ভাবনা কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়-দিনের সংবাদে জানা গেল যে, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ জোর করিয়া একদল মুসলমান দোকানদারকে হরতাল করিতে বাধ্য করায় ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। প্রথম দিনের সংবাদ ছিল হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জনতার সহিত

"প্রতাপ"-সম্পাদক পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী
(কানপুর হাঙ্গামায় নিহত)

সৈন্যের সংঘর্ষ, দ্বিতীয় দিনের সংবাদ কংগ্রেসী হিন্দু ও হরতাল-বিমুখ মুসলমানের সংঘর্ষ।

ভগৎসিং প্রভৃতির মৃত্যুতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান যে সমানভাবে মুহ্যমান্ হইয়াছে—এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। নওজোয়ান ভারত সভা, যাহারা আজ এত উত্তেজিত হইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীকেও অপমান করিতে তাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সভাপতি এবং সেক্রেটারী মুসলমান। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উভয়-ক্ষেত্রেই মুসলমান সদস্যগণ বক্তৃতা দ্বারা অথবা সভা-ত্যাগ করিয়া এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। তেত্রিশকোটী লোক যে মৃত্যুতে মুহ্যমান্, কানপুরের কয়েকটী দোকানদার তাহাতে কেন যে সহানুভূতি দেখাইতে পারিল না, তাহাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

—

গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী—

কিন্তু, আরম্ভ যাহা লইয়াই হউক, তাহার পরিণতি যদি এইরূপ দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর হত্যায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে! প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরমায়ে পুষ্ট জনতা যে কোনও কারণে, অনেক সময় মিথ্যা গুজবের উপর নির্ভর করিয়াও

সর্দ্দার ভগৎ সিং

যদি একবার পরস্পরের সম্মুখে লাঠী হস্তে দাঁড়াইল, অমনি হিন্দু-মুসলমানের অকারণ রক্ত-পাতে ধরণী কলঙ্কিত হইয়া উঠে। এই মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে জনমতকে গড়িয়া তুলিতে কংগ্রেস প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যে কোনও ভাবে, আকারে হোক, ইঙ্গিতে হোক, আজ ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে, বা তাহাতে সহায়তা করে, সেই ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু। কানপুর হাঙ্গামায় যে সমস্ত লোক অকারণে প্রাণ দিল, তাহাদের মধ্যে কানপুরের বিখ্যাত নেতা ও 'প্রতাপ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেশ-শঙ্কর বিদ্যার্থীর আত্মদান এক দিকে যেমন হিন্দু-মুসলমান

বিরোধ দূর করিবার শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে, অপর দিকে স্বদেশবাসীর হস্তে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু এই দুর্ভাগা জাতির চির-কলঙ্ক-স্বরূপ থাকিবে। হাঙ্গামার সময় বিদ্যার্থী বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে বীরের মত অগ্রসর হন। কিন্তু বিপক্ষ জনতা তাঁহাকে কাপুরুষের মত হত্যা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেয়; দুইজন মুসলমান যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এই বর্ব্বরতার লজ্জা প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরকে যেন স্পর্শ করে। ইহার জন্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে তিরস্কার করিয়া কোনও লাভ নাই; কিন্তু

রাজগুরু

এই বর্ব্বরতা প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর হইতে দূর করিবার জন্য যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও না কোনও উপায়ে সহায়তা না করিবে, তিরস্কার তাহার জন্য।

হরচাঁদরায় নগর—

করাচীর বালুকা-প্রান্তরে হরচাঁদ রায় নগর আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তায় দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিন্ধুর বিখ্যাত জন-নায়ক ও ব্যবসায়ী শেঠ হরচাঁদরায় বিষণদাসের স্মৃতি লইয়া কংগ্রেস-নগরীর নামকরণ হয়। এবার কংগ্রেস-নগরীর তোরণে শানাই বাজে নাই—মৃত্যু তাহার অভয়-শঙ্খ বাজাইয়া জাতীয় মহাসভার উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিয়াছে; করাচীর মরু প্রান্তর তপ্ত-বুকে তাহা বরণ করিয়া লইয়াছে। মতিলাল, মোহাম্মদ আলী, ভগৎসিং, রাজগুরু, শুকদেব, বিদ্যার্থী এবং নামহীন আর কত মুক্ত-মানবের মৃত্যু-নিগড়-মুক্ত আত্মা হরচাঁদরায় নগরের বায়ুকে বেদনা-মহিম করিয়া রাখিয়াছিল। নব-জীবনের সূতিকাগারে অদৃশ্য পুরোহিতের মত মৃত্যু অমৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চারিদিকে সিন্ধুর উদাসীন মরু-প্রান্তর; ঊর্দ্ধে মৃত্যু-মথিত চন্দ্রাতপহীন উন্মুক্ত আকাশ, সম্মুখে কঠোর গুরু কর্ত্তব্য! কথার মালা গাঁথিবার

শুকদেব

লগ্ন আর নাই, বন্ধুহীন কণ্টক পথে যাত্রার লগ্ন আসিয়াছে। যাত্রীদের সম্মুখে সর্দ্দার বল্লভভাই। আর কোনও সেনাপতিকে বুঝি এইরূপ পারিপার্শ্বিকতায় এত মানাইত না।

সভাপতির অভিভাষণ

এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন যেমন বাহিরের দিক হইতে আড়ম্বরশূন্য, এবারকার সভাপতির অভিভাষণ তেমনি আয়তনের দিক দিয়া ক্ষুদ্রতম অভিভাষণ এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার-বিবর্জ্জিত। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তম শিষ্য, বারদৌলীর কর্ম্মবীর তাঁহার অভিভাষণে ভাষার জাল

বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই—সহজ সোজা ভাবে মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট আদর্শকেই দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে অপূর্ব্ব নম্রতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা আজ সর্দ্দার বল্লভভাইকে ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীরব কর্ম্মী বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে, কর্ম্মযোগীর সেই সুন্দর আত্মগোপন-চেষ্টা তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন অভিভাষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সর্দ্দারজী তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভে পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব এবং অখ্যাতনামা অন্যান্য কর্ম্মী, যাঁহারা এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রাণদান করিয়াছেন,

স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া নিজের সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক নম্রতায় বলেন,

"আপনারা সামান্য একজন কৃষককে ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। আমাকে আপনাদের প্রধান সেবক নিযুক্ত করিয়াছেন; আমি জানি যে, আমি যে সামান্য সেবা করিয়াছি তজ্জন্য নহে, গুজরাট যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহারই এই পুরস্কার।"

জগতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে অহিংসা-নীতির চরম প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া সর্দ্দারজী বলেন,

"ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কার্য্যতঃ ভারতবর্ষ জগৎকে দেখাইয়াছে যে, সার্ব্বজনীন অহিংসা আজ আর স্বপ্ন নহে—উহা অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বাস্তব সত্য। মানব জাতি আজ বিশ্বাসের অভাবেই হিংসার অতি-ভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে।

"অহিংসার দিক হইতে দেখিলে আমাদের সংগ্রামকে সমগ্র পৃথিবীর সংগ্রাম বলা যায়। অতীব আনন্দের কথা এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র আমাদিগকে সহানুভূতিদ্বারা সাহায্য করিয়াছে।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয়

এবারকার কংগ্রেসের সম্মুখে সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, দিল্লীর চুক্তি। সেই সম্পর্কে সর্দ্দারজী বলেন যে, "সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকেই শান্তির সম্মানজনক পন্থা থাকিলে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে আশ্রয় করিতে হইবে। সুতরাং যখন আমরা দেখিলাম যে শান্তির পথ উন্মুক্ত, তখন আমরা সেই পথ ধরিলাম। রাউণ্ড-টেবিল কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণ স্পষ্টভাবে

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছেন ; ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সে দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন ;

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু

শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত

তদ্ভিন্ন প্রধান মন্ত্রী, বড়লাট এবং আমাদের দেশের অনেক বিশিষ্ট লোক যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে ওয়ার্কিং কমিটি মনে করিলেন যে, যদি সম্মানজনকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হয় এবং কংগ্রেস যাহা জাতির পক্ষে উৎকৃষ্টতম মনে করে, সে দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে কংগ্রেস রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য রাউণ্ড-টেবিল কন্ফারেন্সে যাইতে পারে। যদি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সংগ্রাম ভিন্ন পথ না থাকে, তবে সে সংগ্রামের অধিকার হইতে জগতের কোন শক্তিই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, "একজন হিন্দু হিসাবে আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নীতি অনুসরণ করিয়া সংখ্যা-লঘিষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে একটী স্বদেশী ফাউণ্টেন পেন এবং স্বদেশী কাগজ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডু

উপহার দিয়া বলিতে চাই—আপনারা আপনাদের সব দাবী লিখিয়া দিউন, আমি তাহা পালন করিব। আমি জানি সমস্যা সমাধানের উহাই সব চেয়ে বড় পন্থা। কিন্তু, একজন হিন্দুকে এই ভাবে কাজ করিতে হইলে তাহাকে সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা অন্তরের মিলন চাই, জোড়াতালির মিলন চাই না। কাগজেপত্রে যে একতা হয়, তাহা সামান্য একটু ধাক্কা খাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা যদি সাহস অবলম্বন করে এবং নিজেরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের স্থান অধিকার করে, তবেই প্রকৃত একতা হইতে পারে। উহা সব চেয়ে বড় বিজ্ঞতার কাজ হইবে।"

বিলাতী পণ্য ও বস্ত্র-বর্জ্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া সর্দ্দারজী সকল প্রকার বিলাতী পণ্য-দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে বলেন যে, "বিগত আন্দোলনে বৃটিশ-পণ্য-বর্জ্জন আন্দোলনকে আমরা একটা অস্ত্র হিসাবে চালাইয়াছি। কিন্তু যদি আপনাদিগকে আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা দেশে শান্তি আনিতে হয়, তবে আমাদিগকে নিছক রাজনীতিক অস্ত্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক দিকে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আমরা অন্যদিকে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিতে পারি না। সুতরাং বৃটিশ-পণ্য-বর্জ্জনের দিকে জোর না দিয়া আমাদিগকে স্বদেশী প্রচারের দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। স্বদেশী প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার। আমাদের দেশে যে জিনিষ পাওয়া যায়—আমরা ইংলণ্ডের হউক বা অন্য দেশের হউক তাহার পরিবর্ত্তে নিজের দেশের জিনিষই ক্রয় করিব।"

অতঃপর ব্রহ্ম-ব্যবচ্ছেদ, মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন, প্রবাসী ভারতবাসীর সমস্যা, অস্পৃশ্যতা পরিহার প্রভৃতি কয়েকটী

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
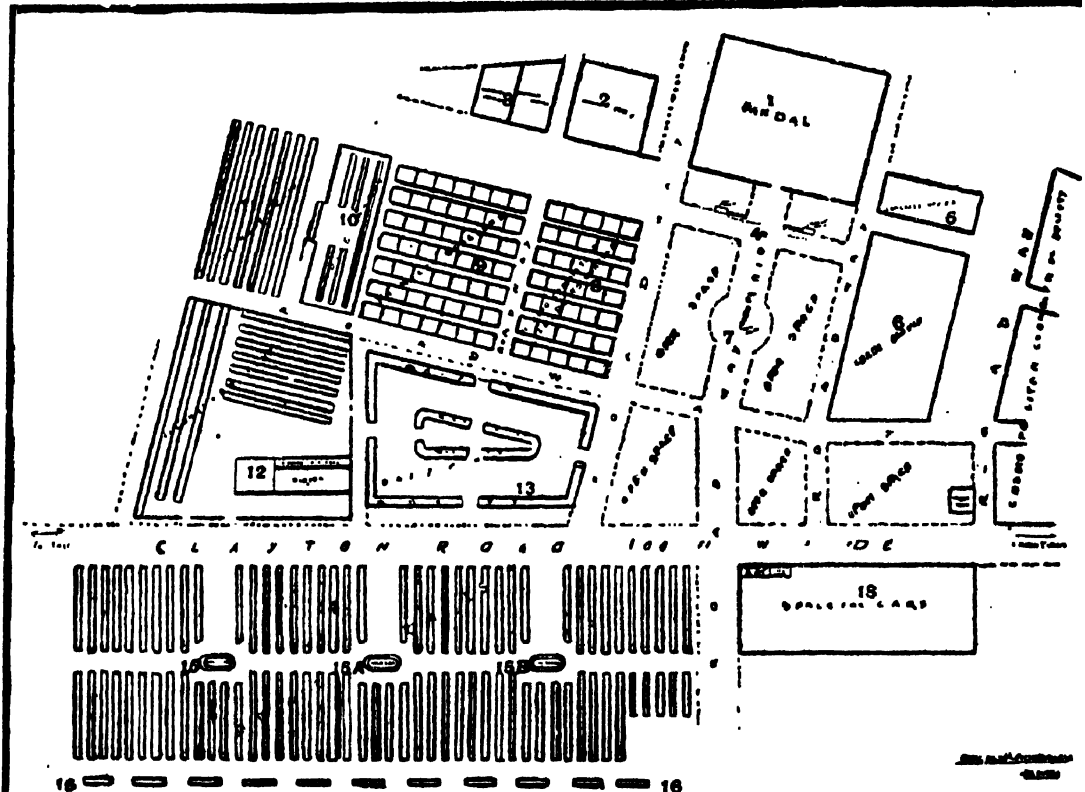
হরচাঁদ রায় নগরের নক্সা

বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি দেশবাসী সকলকে কংগ্রেসের পন্থা অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে অনুরোধ করিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত অভিভাষণ শেষ করেন।

কংগ্রেসের গৃহীত প্রধান প্রস্তাবাবলী

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে,

(১) রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি এবং তাঁহাদের উপর হইতে বাধা নিষেধ প্রত্যাহার। প্রস্তাবক সভাপতি।
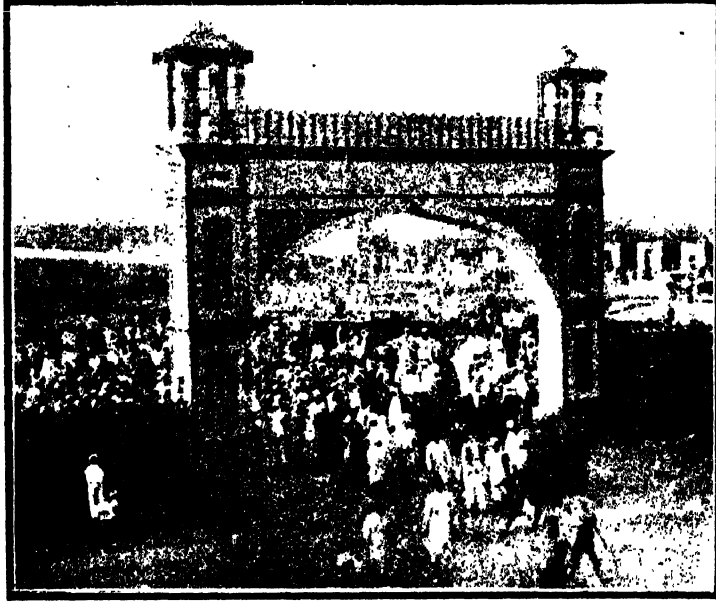
কংগ্রেস নগরের তোরণ

মতিলাল-মণ্ডপ—করাচি

(২) লাহোরের আত্মঘাতী যুবকত্রয়ের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁহাদের অবলম্বিত হিংসানীতির প্রতিবাদ ও আত্মার কল্যাণ-কামনা। মৌন দিবস বলিয়া মহাত্মাজীর বদলে প্রস্তাবক পণ্ডিত জহরলাল। সভায় ভগৎ সিংএর মাতা ও পিতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভগৎ সিংএর পিতা সর্দ্দার কিষণ সিং বলেন—

"১৯০৭ সালে আমি এবং আমার ভ্রাতা সর্দ্দার অজিৎ সিং ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি পাঞ্জাবে রাজনৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। অজিৎ সিং ও লালা লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত হইলেন। আমার এক ভাই কারাগারে মারা গেলেন। আমি যখন কারাগারে, সে সময় ভগৎ সিংএর জন্ম হয়। আমি এবং আমার বন্ধু মেটা মিলিয়া সেই সময় এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, সদ্যজাত শিশু যেন প্রকৃত দেশসেবক হইতে পারে। আমার একান্ত কামনা ছিল যে, সে দেশের কার্য্যে প্রাণত্যাগ করে।"

(৩) দিল্লীর চুক্তি সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, দিল্লীচুক্তি-অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের সহিত ভবিষ্যৎ

শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে বোঝাপড়া করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

তিনঘণ্টা-কাল আলোচনার পর সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইয়া মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শেঠ হরচাঁদ বিষণদাস

(৪) সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ :—সীমান্ত প্রদেশে নাকি এইরূপ এক প্রচার কার্য্য চলিতেছে যে, কংগ্রেস তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিত নহেন, এই সন্দেহ দূর করিবার ব্যবস্থা অচিরে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

(৬) এই কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহকেও অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন 'খাদি' প্রচার ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করেন।

(৭) এই কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের নিকট

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের অধিনায়ক
শ্রীযুক্ত সন্তদাস ইদ্‌নানী

আবেদন জানাইতেছেন, তাঁহারা যেন গঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা এবং বিদেশী কাপড় ও সূতা আনা বন্ধ রাখেন।

করাচি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী

(৫) এই কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন বিদেশী বস্ত্র ক্রয় হইতে বিরত হন ; বিদেশী কাপড় ও সূতা-ব্যবসায়িগণ যেন উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

(৭) এই কংগ্রেস দেশী মিলের মালিকগণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন, তাঁহারা যেন দেশের বিরাট গঠনমূলক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাহায্য করেন।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় সুভাষচন্দ্র—

এবার করাচী কংগ্রেসের সম্মুখে সব চেয়ে প্রধান সমস্যা ছিল, গান্ধী-আরউইন-চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস আগামী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবে। অনেকে এই চুক্তির সর্ত্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে বৃটীশ-সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া দেশব্যাপী স্বাধীনতা-আন্দোলন স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে চুক্তিবিরোধী দলের আশঙ্কা বলবত্তর হয়। সেইজন্য অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, করাচী কংগ্রেসে হয়ত দলাদলি হইয়া যাইবে এবং যে সংহতি-শক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী সকল দলের সম্মিলিত সহায়তার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হয়ত শিথিল হইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তি-বিরোধী দলের নেতা হিসাবে করাচী কংগ্রেসে উপস্থিত হন। কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় তিনি প্রকৃত রাজনৈতিকের ন্যায় স্থির ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহার বিপক্ষতা প্রত্যাহার করিয়া বলেন যে, সম্মিলিতভাবে আমলাতন্ত্রের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখন যেরূপ হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন হয় নাই। আমলাতন্ত্র ও সমগ্র পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর জন্য সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান। আমরা সন্ধির সর্ত্তসমূহ অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটকালে কংগ্রেসে এই ব্যাপার লইয়া দলাদলির সৃষ্টি করিলে তাহাতে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহার পর পূর্ণ কংগ্রেসে অতি সামান্য বাদানুবাদের পর মহাত্মার প্রস্তাব জয়ধ্বনি সহকারে গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের সভাপতির শিবির

আজাদ ময়দানে জাতীয় পতাকা

——

নূতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ

মহাত্মা গান্ধী নূতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে নিম্নলিখিত নেতাগণের নাম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ সৈয়দ-মামুদ, শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ এম এল আনে,

কংগ্রেস পতাকাতলে বিরাট সভা

শোভাযাত্রার এক অংশ

সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং উহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,— শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ মহম্মদ আলম, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, ডাঃ এম এ আনসারি,

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, ও মিঃ কে, এল, নরীম্যান।

ডাক্তার আন্সারী

মহাত্মাজী এই নাম উল্লেখ করিবার সময় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"আমিই এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার জন্য আমিই দায়ী। আপনারা যদি সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

হইতে কাজ চান, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্ম-পরিষদে যাহাতে তাঁহাকে অকারণ ব্যাঘাত না সহিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে আমিই বাদ দিয়াছি, কারণ তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনায় আমি তাঁহার পূর্ণ সহায়তার অঙ্গীকার পাইয়াছি। * * * দক্ষিণ-ভারত

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

হইতে একজনও প্রতিনিধি লওয়া হয় নাই, তাহার কারণ দক্ষিণ ভারতের উপর আমার বন্ধুত্বের দাবী অনেক বেশী।"

সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কাভিসা

কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ কি ?—

এতদিন ধরিয়া কংগ্রেসে ভারতের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে "স্বরাজ", "পূর্ণ স্বরাজ" "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন" প্রভৃতি কথা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের কল্পিত স্বাধীনতার একটা স্পষ্ট

রূপ দিবার জন্য একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং উহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, "কংগ্রেস এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, দরিদ্র জনসাধারণের উপর শোষণ ক্রিয়া বন্ধ করিবার জন্য ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে কোটী কোটী অনশনক্লিষ্ট জনগণের জন্য যথার্থ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবস্থাও থাকা চাই। সুতরাং কংগ্রেসের কল্পিত স্বরাজের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা যাহাতে জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য কংগ্রেসের মনোভাব এমন ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে জনসাধারণ সহজেই তাহা বুঝিতে পারে।

সুতরাং কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে রাষ্ট্র-তন্ত্রেরই সম্মতি দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবেই, অথবা এমন ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে স্বরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ সব বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন :—

(১) জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার, যথা—(ক) পরস্পর মেলামেশার স্বাধীনতা, (খ) বাক্য এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (গ) বিবেকের স্বাধীনতা এবং সাধারণের শৃঙ্খলা ও নীতিধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ধর্ম্মমত পোষণের এবং আচরণের স্বাধীনতা, (ঘ) জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণ বিবেচনায় কোন ব্যক্তির সরকারী চাকুরী, ক্ষমতা বা সম্মানজনক পদ কিম্বা কোন ব্যবসা বা বৃত্তি সম্পর্কে কিছুমাত্র অনধিকার থাকিবে না, (ঙ) সাধারণের রাস্তা, সাধারণের কূপ এবং সাধারণের ব্যবহৃত অন্যান্য সকল স্থানে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার, (চ) প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী সর্ব্বসাধারণের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার।

কংগ্রেসের বেদীর উপরে—বাম দিক হইতে—ডাঃ চৈতরাম গিডওয়ানী, সর্দ্দার বল্লভভাই, ও মহাত্মা গান্ধী

প্রেসিডেণ্টের শোভাযাত্রা—প্রথমে লাল-কোর্ত্তা বাহিনী, পরে ক্যাপ্টেন জেস্তারাম, বাম পার্শে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ; মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল প্রভৃতি পরে আসিতেছেন

(২) রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

(৩) শিল্পজীবী শ্রমিকদের জীবিকার উপযোগী

বেতন; কাজ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়; কাজের জন্ম স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা; বার্দ্ধক্য, পীড়া এবং বেকার অবস্থায় যে আর্থিক ক্লেশ উপস্থিত হয় তাহা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

(৪) দাসত্ব হইতে কিম্বা দাসত্বের কাছাকাছি অবস্থা হইতে শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) নারী শ্রমিকদের রক্ষা এবং তাহাদের গর্ভাবস্থায় ছুটির জন্ম বিশেষ উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(৬) স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়েদের যাহাতে কারখানায় নিযুক্ত না করা হয় তাহার ব্যবস্থা।

(১২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা।

(১৩) বর্ত্তমান সামরিক ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেক হ্রাস।

(১৪) বিচার-বিভাগের খরচ এবং মাহিয়ানা হ্রাস। বিশেষ কারণে নিযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই একটি নির্দ্দিষ্ট হারের বেশী বেতন পাইবে না। এই বেতন সাধারণতঃ ৫০০ শত টাকার উপরে হইবে না।

(১৫) দেশ হইতে বিদেশী কাপড় এবং বিদেশী সুতা বিতাড়িত করিয়া দেশী কাপড় রক্ষার ব্যবস্থা।

বাম পার্শ্বে মিঃ কে, এফ্, নরীম্যান—মধ্যে ভগৎসিংহের চিতাভস্ম ও ছবি হস্তে সর্দ্দার জমিয়ৎসিং
(বোম্বাই কন্‌গ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক)

(৭) নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ম শ্রমিকদের সঙ্ঘ স্থাপনের অধিকার এবং সালিশীতে বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

(৮) ভূমির রাজস্ব এবং খাজনা কমাইবার ব্যবস্থা: যে সমস্ত জমির ফসলে লাভ হয় না, সেই সব জমির খাজনা আবশ্যক সময়ের জন্ম রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা।

(৯) নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর কৃষি ব্যবসা হইতে যে আয় হইবে তদুপরি আয়কর ধার্য্য।

(১০) উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ধার্য্য।

(১১) বয়স্ক লোকদের ভোটাধিকার।

(১৬) মদ্য এবং মাদক ঔষধাদির প্রচলন সম্পূর্ণ বন্ধ।

(১৭) লবণের উপর কোন কর থাকিবে না।

(১৮) ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা এবং জনসাধারণের উপকার-কল্পে রাষ্ট্র হইতে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ।

(১৯) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শিশু-শিল্প এবং খনি-সম্পদের কর্ত্তৃত্ব এবং।

(২০) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—সর্ব্বপ্রকার সুদের নিয়ন্ত্রণ।

(২১) আগামী বর্ষের কন্‌গ্রেস উড়িষ্যায় বসিবে।

স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল চৌধুরী—

"ভারতবর্ষে"র পাঠকবর্গ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন যে, মনমনসিংহ—সেরপুরের অন্যতম ভূস্বামী ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয় গত ৪ঠ মার্চ্চ, ১৯৩১, কলিকাতা বালিগঞ্জ-স্থিত নিজ ভবনে সহসা হৃদ্‌-রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। ডাক্তার

স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল চৌধুরী

চৌধুরী প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এমন অমায়িক, নিরহঙ্কার এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ভদ্রলোক ছিলেন যে, তিনি যে এতবড় বিলাত প্রত্যাগত পণ্ডিত, বড় জমিদার এবং উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহা জানা যাইত না। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার এমন প্রবল অনুরাগ ছিল যে, সহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোক-গমন সংবাদে মর্ম্মান্তিক দুঃখিতচিত্তে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয়া ফুলকুমারী গুপ্তা

এ মাসে আমরা আরও একটি শোকসংবাদ পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাদের পরম প্রীতিভাজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিদুষী ফুলকুমারী গুপ্তা সম্প্রতি লোকান্তরিতা হইয়াছেন। ফুলকুমারী হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তি-পাড়া গ্রামে বিখ্যাত সেনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের বীজ উপ্ত হয়। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি বয়সোচিত চপলতা ও তরলতা পরিহার করিয়া দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে শ্রীশবাবু বোম্বাই, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে বাস করেন। ফুল-কুমারী এই সুযোগে স্বামীর সহিত বহু তীর্থ দর্শন ও সাধু সন্ন্যাসীর কৃপালাভ করেন। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইনি সুযোগ্য পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ন্যায় দর্শন ও গীতার উপদেশ লাভ করেন। ফুলকুমারী শাস্ত্রে যে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, তাঁহার "অবসর" ও "সৃষ্টিরহস্যে" তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।
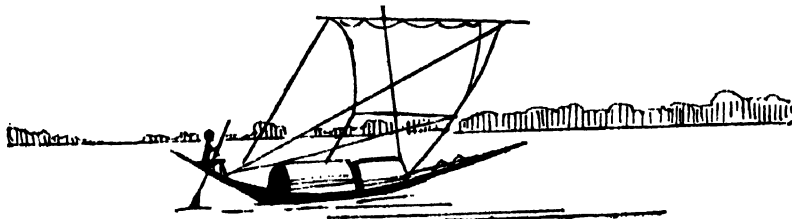
সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত 'দুর্নীতির পথে'—।৵০, ও 'অনাসক্তিযোগ' (গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য)—।৵০
শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত 'ভাগবত কুসুমাঞ্জলি'—১।০
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মাটির রাজা'—১৷০
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ'—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'প্রতিহিংসার প্রতিফল'—৸০ ও দস্যু-সম্মিলনী—৸০
শ্রীসান্ত্বনা গুহ প্রণীত 'অসমাপ্ত'—১॥০
শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত 'রোগীর-জগৎ'—১।০

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র উনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵০, ভি, পিতে ৬॥৵০, ষাণ্মাসিক ৩৷৵০ আনা, ভি, পিতে ৩।৵০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই অষ্টাদশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষ" কি করিয়াছে, না করিয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই—২০৪ খানি "ভারতবর্ষে" তাহার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—অষ্টাদশ বর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য; এই বৎসরে চারিখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সে কয়খানির লেখক খ্যাতনামা। উনবিংশ বর্ষেও এই ভাবে কয়েকখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে"র আসন্ন আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্গের সুধি-সমাজে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা এই অষ্টাদশ বর্ষকালের মধ্যে একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; প্রথম বর্ষ হইতেই "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। প্রতি বৎসরই "ভারতবর্ষে" কোন না কোন বিশেষত্ব বিকশিত হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উনবিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত অষ্টাদশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র কথা বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CAL

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

গায়ত্রী (মধ্যাহ্নে-বৈষ্ণবী)

—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } অষ্টাদশ বর্ষ { ষষ্ঠ সংখ্যা

মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ

মামাংসা-দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, তাহার স্বরূপ নিরূপণ, তাহার প্রমাণ নির্দ্দেশ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিচার। সুতরাং মীমাংসা-দর্শনে প্রমাণের কূট বিচার ও জগৎ, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার কিরূপে স্থান পায়, তাহা দেখান উচিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ধর্ম্ম প্রমাণ-গম্য কি না, তাহা দেখান কর্ত্তব্য; যেহেতু, প্রমাণের দ্বারাই সকল পদার্থের অস্তিত্ব সাধিত হয়। ধর্ম্ম কোন্ প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়, তাহার আলোচনা মীমাংসা-দর্শনে আবশ্যক। এই সকল তত্ত্বের নির্দ্ধারণের জন্য মীমাংসা-দর্শনে প্রমাণের বিচার দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্ম আচরণ করিলে সুখ হয়। এ সুখ কাহার হয় তাহারও নিরূপণ আবশ্যক। যে সুখী হয়, সে কি প্রকার, ইহা না জানিলে লোকে সুখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি আত্মা না থাকে তাহা হইলে পরলোকের জন্য ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। আত্মা যদি শরীর হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলেও পরলোকে অনাবিল সুখের আশায় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেই পারে না। অতএব জীব সম্বন্ধে বিচারের আবশ্যকতা আছে। কর্ম্ম কি আপনিই ফল দেয়, না ঈশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া ফল দেয়? যদি কর্ম্ম ঈশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া ফল দেয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; কারণ, তাহার দ্বারা অতি শীঘ্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া

যাইতে পারে। আরও অন্যান্য কারণে মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বর-বিষয়ক বিচার আবশ্যক। ইহলোক ও পরলোক যদি মায়ার কার্য্য হয় ও ব্রহ্মই যদি একমাত্র পারমার্থিক বস্তু হন, তাহা হইলে মীমাংসকেরা ধর্ম্মকে যে চক্ষুতে দেখিতে বলেন, সে চক্ষুতে লোকে আর দেখিতে পারিবে না; সুতরাং মীমাংসকেরা জগদ্বিষয়ক বিচার নিশ্চয়ই করিবেন। অতএব ধর্ম্ম মীমাংসা-দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য হইলেও, অন্যান্য দর্শনের ন্যায় প্রমাণের বিচার মীমাংসা-শাস্ত্রে অবশ্যই স্থান পাইবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল দার্শনিকই মানিয়াছেন। যে চার্ব্বাক কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না, তিনিও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া আপনার মত প্রচার করিয়াছেন। অতএব যে প্রমাণের স্বীকারে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, সেই প্রমাণের কথার আলোচনা করা যাক। মীমাংসকদের মতে প্রত্যক্ষের দ্বারা ধর্ম্ম প্রমাণিত করা যায় না। ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-গম্য কি না, এই বিচারের মীমাংসার জন্য মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষের আলোচনা হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিচার প্রায়ই ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনের অনুগত। স্থানে স্থানে মীমাংসা নিজের নবীনত্ব দেখাইয়াছে।

প্রত্যক্ষ শব্দ প্রতি ও অক্ষ শব্দদ্বয়ের সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ শব্দ কি মীমাংসকদের অভিপ্রেত নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানদ্বয়কে বুঝায়? প্রত্যক্ষ শব্দের যৌগিক অর্থ হইতে জানা যায় যে, যে জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপাদিত হয় না; অতএব উক্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ শব্দের বাচ্য নয়। মীমাংসকেরা বলেন যে, প্রত্যক্ষ শব্দের যৌগিক অর্থের দ্বারা তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ শব্দের এই স্থলে যোগরূঢ়ির দ্বারা অর্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে; কারণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম্পরা ভাবে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার এ প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা হইলে অনুমানাদি সমস্ত জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ শব্দ-বাচক হইয়া পড়ে। এবং সমস্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ শব্দ-বাচক, ইহা কোন মীমাংসকই স্বীকার করিতে পারেন না; অতএব প্রত্যক্ষ শব্দের যৌগিক অর্থ ধরিলে চলিবে না। যোগরূঢ়ির দ্বারা মীমাংসকদের অভিমত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ শব্দ-বাচক ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি? প্রত্যক্ষের সাধারণ ভাবে একটি লক্ষণ দেওয়া হয়, যে-জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু এইরূপ লক্ষণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞান মাত্রই মনো জন্য। মন ইন্দ্রিয়। অতএব এইরূপ লক্ষণ করিলে জ্ঞান মাত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এইজন্যই জৈমিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ জন্য যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষাত্মক বলা চলে না। প্রাচীন মীমাংসকেরা বলেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন অনুমিত্যাত্মক নয়, সেইরূপ ইহা প্রত্যক্ষ স্বরূপও নয়। ঈশ্বর জ্ঞান মীমাংসক স্বীকৃত ষড়্বিধ প্রমা জ্ঞান বিলক্ষণ যথার্থ জ্ঞান। নবীন নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকেরা বলেন যে, ঈশ্বরের ভূত ও ভবিষ্যদ্বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন প্রকারেই হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্ত্তমান বস্তু বিষয়কই হইয়া থাকে। কিন্তু সেশ্বর মীমাংসকেরা বলেন যে, প্রত্যক্ষের অন্য লক্ষণ করিতে হইবে; কারণ, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক ও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তু বিষয়ক।

এই নবীন মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইতেছে যে, যে জ্ঞানের উৎপত্তিতে অন্য কোন জ্ঞান করণ হয় না, সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ। অনুমিতি-জ্ঞান ব্যাপ্তি-জ্ঞান ব্যতীত হয় না। শব্দবোধ পদজ্ঞান ভিন্ন হয় না; ও উপমিতি সাদৃশ্য জ্ঞানাদি ব্যতিরেকে হয় না। এই প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য সকল জ্ঞানই জ্ঞানরূপ করণকে অপেক্ষা করে, অতএব এই লক্ষণ নির্দ্দোষ। ঈশ্বর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ কারণ ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য; সেই হেতু ইহার কোন করণেরই অপেক্ষা নাই। এখন এক আপত্তি উঠিতে পারে যে, সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই সবিকল্পক জ্ঞানের উৎপত্তি পক্ষে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান করণ। অতএব শেষোক্ত লক্ষণ অতীব সঙ্কীর্ণ; কারণ লক্ষণের দ্বারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একদেশ গৃহীত হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সকল কারণ করণ হয় না। যে কারণের ব্যাপারের দ্বারা কার্য্য উৎপাদিত হয়, সেই কারণকে করণ বলা হয়। ব্যাপার একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ হইতেছে যে, যাহা

কারণের দ্বারা উৎপাদিত হয় ও কারণের কার্য্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার। যেমন, কুঠার দ্বারা বৃক্ষের ছেদন হইয়াছে। বৃক্ষের ছেদন রূপ ক্রিয়ার করণ কুঠার। কুঠার ও বৃক্ষের সংযোগ হইতেছে ব্যাপার। এই সংযোগ কুঠার রূপ কারণের দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং ইহা কুঠারের কার্য্য ছেদন রূপ ক্রিয়ার জনক; কারণ, এই সংযোগের ফলেই 'ছেদন ক্রিয়া' নিষ্পন্ন হয়। নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের কোন ব্যাপার নাই; অতএব নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্পের কারণ হইলেও করণ নয়। অতএব প্রত্যক্ষের লক্ষণে কোন দোষ নাই।

অতি-নবীন মীমাংসক গাগা ভট্ট এই মত গ্রহণ করেন নাই। মনে হয় কোন কোন স্থলেও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও করণ হইতে পারে। নামোল্লেখ সংকৃত প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদৃশ স্থলে নির্ব্বিকল্পক প্রথম সবিকল্পক প্রত্যক্ষ রূপ ব্যাপার দ্বারা দ্বিতীয় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে। যখন আমরা বলি যে এই সে রাখাল। আমার পূর্ব্বে রাখালের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান আছে; তাহার পর 'এই রাখাল' এই প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান হইয়াছে। তাহার পর পূর্ব্বানুভূত রাখাল ও বর্ত্তমানে উপলব্ধ রাখাল যে একই লোক এই জ্ঞান হইয়াছে। এই স্থলে আমরা বলিতে পারি যে, রাখালের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান তাহার প্রথম সবিকল্পক জ্ঞানকে ব্যাপার করিয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের জনক। অতএব নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও কোন কোন স্থলে করণ হইতে পারে। এখন প্রত্যক্ষের প্রকৃত লক্ষণ কি? নব্য মীমাংসক গাগা ভট্ট প্রত্যক্ষের একটী নিকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন। এখন সেই লক্ষণের আলোচনা করা যাক। উৎপত্তি ও বিনাশশীল জ্ঞান দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও সেই সব জ্ঞানের উপর কেবল যে জাতি থাকে, সেই জাতিবিহীন যে জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষ। এই লক্ষণের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দেখা যাক্, এই লক্ষণের দ্বারা কোন্ প্রকার জ্ঞান লক্ষিত হয়। অনুমিতি ব্যাপ্তি জ্ঞান ভিন্ন জন্মে না। জ্ঞাপক চিহ্নের জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য সীমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত জ্ঞাপ্যের জ্ঞানের নাম অনুমিতি। ধূম দেখিয়া যখন আমরা দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে অবস্থিত অগ্নির জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলিয়া থাকি। এই রূপ জ্ঞান, জ্ঞাপক (ধূমাদির) জ্ঞান না হইলে, হয় না; কারণ, জ্ঞানলাভ কোন জ্ঞাপ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। তখন ইহার সহিত যাহার অব্যভিচারী সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান না হইলে কিরূপে জ্ঞাপ্যের জ্ঞানের আশা করা যাইতে পারে। এই জ্ঞাপ্যের জ্ঞান ব্যাপ্যের জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত হয়। এই ব্যাপ্যের জ্ঞান উৎপত্তি ও বিনাশশীল; কারণ, ব্যাপ্যের জ্ঞান সদা সর্ব্বদাই আমার নাই ও থাকে না। এই জ্ঞানের উপর কেবল যে জাতি থাকে, সেই জাতি প্রত্যক্ষের উপর থাকে না; অর্থাৎ এই জ্ঞান যে জাতীয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে জাতীয় নহে। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমিতি নহে। পদের জ্ঞান হইলে পদার্থের স্মরণ হয় ও তাহার পর ইন্দ্রিয়ের দূরবর্ত্তী বাক্যের অর্থের জ্ঞানের নাম শব্দবোধ। ইহাও উক্ত কারণে প্রত্যক্ষ নয়। সাদৃশ্যাদি জ্ঞান জন্য উপমিতিও প্রত্যক্ষ নয়। অর্থাপত্তি ও অভাবাখ্য প্রমাণও প্রত্যক্ষ নয়। সবিকল্প জ্ঞান কাহার কাহার মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান জন্য হইলেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে কোন দোষ হয় না। কারণ, সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রই প্রত্যক্ষ নয়; অতএব উৎপত্তি ও বিনাশশীল জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানের উপর মাত্র যে জাতি থাকে, সেই জাতি প্রত্যক্ষের উপর থাকিতেছে না; কারণ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকের উপর এমন কোন জাতি নাই, যাহা উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিতের উপর কেবল মাত্র থাকে। ফল কথা এই যে, প্রত্যক্ষের প্রায় প্রত্যেক স্থানে ইন্দ্রিয় করণ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যাপার ও অনুমিতিত্ব প্রভৃতি জাতি যখন প্রত্যক্ষের উপর থাকে না তখন প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ নির্দ্দোষ।

প্রভাকরের মতানুযায়ীরা বলেন সাক্ষাৎ প্রতীতিই প্রত্যক্ষ। এই সাক্ষাৎ প্রতীতি শব্দের অর্থ কি? স্বরূপের জ্ঞানের নাম সাক্ষাৎ প্রতীতি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের নিজের রূপের প্রকাশের নাম সাক্ষাৎ প্রতীতি। অনুমিতি প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ প্রতীতি বলা চলে না। কারণ, অনুমিতি রূপ জ্ঞান কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। ধূমের জ্ঞান না হইলে দূরস্থিত অগ্নির জ্ঞান হয় না। অনুমিতির স্থলে বিষয় অগ্নি প্রভৃতি অগ্নি ভিন্ন ধূমাদিকে অপেক্ষা করে আপনার প্রকাশের জন্য; অতএব অনুমিতি প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, সকল

প্রত্যক্ষস্থলেই বিষয় অন্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে না। সর্ব্বত্রই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্থলে বিষয় নামাদিকে অপেক্ষা করিয়া প্রকাশিত হয়। এরূপ স্থলে প্রভাকরের প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দোষ নয়। আর যদি প্রাভাকরেরা বলেন যে, ঐ সব স্থলেও প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দোষ হইয়াছে, অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হওয়া প্রত্যক্ষ লক্ষণের আবশ্যক অংশ নয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, অনুমিতি প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ হউক ; কারণ, অনুমিতি স্থলেও সাধ্য বিষয় অন্যকে (সাধনকে) অপেক্ষা করিয়া প্রকাশিত হয়। অতএব প্রাভাকরদের মত সমীচীন বলিয়া মনেহয় না।

বৌদ্ধদের মতে সকল প্রকার আরোপ-বিনির্ম্মুক্ত ও ভ্রমভিন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। নাম জাতি প্রভৃতির যে জ্ঞান তাহা আরোপিত জ্ঞান। আমরা নামের সহিত বস্তুকে বুঝি। প্রকৃতপক্ষে নাম আর বস্তু এক নয়। এই নাম ঘটিত জ্ঞান আরোপিত জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। জাতি বলিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রে কোন পদার্থই নাই। অতএব জাতির সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান যে সবিকল্পক জ্ঞান, তাহা আরোপিত জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই রূপে দেখান যাইতে পারে যে, সমস্ত সবিকল্পক জ্ঞানই আরোপকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। আর ভ্রম জ্ঞান কোন কালেই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব আরোপ ও ভ্রম ব্যতীত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই মত খুব সঙ্গত নয়। কারণ, পরে দেখান হইবে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান যেমন যথার্থ জ্ঞান, সবিকল্পক জ্ঞানও তেমনিই যথার্থ জ্ঞান। জাতি অবাস্তব পদার্থ নহে। সুতরাং জাতিঘটিত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। বৌদ্ধদের এই লক্ষণ সবিকল্পক জ্ঞানের কোন পরিচয় দেয় না ; অতএব এই লক্ষণ অসম্পূর্ণ।

অতঃপর প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বিচার করা যাক্। ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ কি ? আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অর্থকে যাহা বিশদ রূপে প্রকাশিত করে, তাহাই ইন্দ্রিয়। অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক যে দ্রব্য তাহা ইন্দ্রিয়। অথবা জ্ঞানের আশ্রয় না হইয়া যাহা জ্ঞানের কারণ মনঃ সংযোগের আশ্রয় তাহা ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার ; যথা, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক, কর্ণ ও মন। চক্ষু যখন কেবল মাত্র রূপকে প্রকাশিত করে, তখন চক্ষু তৈজস পদার্থ অর্থাৎ তেজঃ পরমাণুর দ্বারা গঠিত। জিহ্বা যখন কেবল মাত্র রসকেই গ্রহণ করে, তখন ইহা জলীয় পদার্থ। ঘ্রাণ যখন কেবল মাত্র গন্ধকেই গ্রহণ করে তখন ইহা পার্থিব বস্তু। ত্বক্ যখন স্পর্শ মাত্রকেই জ্ঞাত করায় তখন ইহা বায়বীয় বস্তু। কর্ণ-কুমারিল, পার্থ সারথি মিশ্র ও গাগা ভট্টের মতে দিগাত্মক ; কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে দিক্ হইতে শ্রোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণ ভট্টের মতে শ্রোত্র আকাশাত্মক। ইহার বিশেষ বক্তব্য হইতেছে যে, অপরাপর বহিরিন্দ্রিয় যখন ভৌতিক পদার্থ, তখন কর্ণও কেন ভৌতিক হইবে না। নারায়ণ ভট্ট যদিও বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া কর্ণকে আকাশাত্মক বলেন নাই, তথাপি তিনি উঁহাদের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন ও মীমাংসকদের চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। মনও একটী ইন্দ্রিয় ; কারণ, সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত হয় না। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন প্রকারেই আন্তর সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নয় ; অতএব, যে আন্তর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই মন।

মনের পরিমাণ বিভু ইহাই হইতেছে প্রাচীন ভাট্টবাদের মত। তাঁহাদের মতে বিভুদ্বয়ের সংযোগ সম্ভবপর এবং সংযোগ মাত্রের পক্ষেই কর্ম্ম কারণ নয়। প্রাচীন মতেও শরীরাবচ্ছেদেই মন ইন্দ্রিয়। নবীন মীমাংসক গাগাভট্ট প্রভৃতির মতে মন অণু পরিমিত। ইঁহারা বিজাতীয় জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করেন না। উভয় মতেই মন অন্যের অধীন না হইয়া বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু আন্তর বিষয় (আত্মা, আত্মগুণও তদ্গত জাতি) প্রত্যক্ষে মনের স্বাতন্ত্র্য আছে।

সন্নিকর্ষ ভাট্ট মতে তিন প্রকার,—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায় ও সংযুক্ত সমবেত সমবায়। নারায়ণ পণ্ডিতের মতে সন্নিকর্ষ দুই প্রকার—সংযোগ ও সংযুক্ততাদাত্ম্য। তিনি পরে সংযুক্ত তদাত্ম্য তাদাত্ম্যও স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী মীমাংসকেরা সমবায়ের স্থলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। নবীনেরা বৈশেষিকদের ন্যায় সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। পার্থিব দ্রব্যাদির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই অন্য অন্য দ্রব্যের অন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগে প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকে। কালের প্রত্যক্ষ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত যুগপৎ সংযোগে হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত তাদাত্ম্য অথবা সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে হইলে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের গত গুণ কর্ম্ম ও জাতির গ্রহণ হইয়া থাকে। জাতি গুণ ও কর্ম্মগত সত্তা, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব জাতি পরম্পরা ভাবে দ্রব্যের সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং তাহাদের গ্রহণ সংযুক্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই পক্ষ সকলে স্বীকার করেন না। এই জন্য নারায়ণ পণ্ডিত বলিয়াছেন এই সব ক্ষেত্রে সংযুক্ত তদাত্ম্য-তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সত্তাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গাগাভট্ট প্রভৃতির মতে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্বন্ধে সত্তাদির প্রত্যক্ষ হয়।

তার্কিকগণ সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষ্য বিশেষণ ভাব ভেদে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম তিন প্রকার সন্নিকর্ষের উদাহরণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। শেষ তিন প্রকার সন্নিকর্ষের আলোচনা করা যাক্। তার্কিকদের মতে শব্দ আকাশের গুণ এবং ইহা সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে। ইঁহাদের মতে কর্ণও আকাশাত্মক। অতএব শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দরূপ বিষয় সমবায় ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু মীমাংসকদের এই সন্নিকর্ষ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, শব্দ একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য ও সংযোগ সম্বন্ধ দ্বারা ইহা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। শব্দত্ব জাতি শব্দের উপর থাকে। এই জাতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সমবেত সমবায় সম্বন্ধে গৃহীত হয়। কিন্তু মীমাংসক মতে শব্দত্ব জাতি সংযুক্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অথবা সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে গৃহীত হয়; কারণ, শব্দ সংযোগ সম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা গৃহীত হয়। আর অভাবের সহিত কোন ভাবদ্রব্যের সংযোগ অথবা সমবায়াদি সম্বন্ধ নাই। অতএব অভাবের বিশেষণ বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ রূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রহণ হয়। সমবায় সম্বন্ধ দ্রব্য প্রভৃতির উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে না; অতএব ইহাও বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সম্বন্ধ রূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা গৃহীত হয়। মীমাংসক মতে অভাব প্রত্যক্ষ হয় না; কারণ ইহা ষষ্ঠ অভাবাখ্য প্রমাণগম্য। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের জন্য বিশেষ্য বিশেষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। পুনরায় সমবায় রূপ সম্বন্ধ নাই; অতএব সমবায় প্রত্যক্ষের চিন্তা লইয়া মীমাংসকের ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আরও একটী কথা মনে পড়িতেছে যে চক্ষু সংযুক্ত পদার্থের সহিত সমবায় ও অভাবের বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ, দণ্ডী পুরুষ প্রভৃতি দুইটী পদার্থের বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সম্বন্ধের দৃষ্টান্তস্থল ও সেই স্থলে দুইটী পদার্থ পৃথক্ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ বলিয়াই বিশেষ্য বিশেষণভাব সম্বন্ধ সম্ভবপর হইয়াছে; কিন্তু অভাবের ও সমবায়ের দ্রব্যের সহিত বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু, উহাদের দ্রব্যের সহিত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাভাকরেরা সংযোগ, সংযুক্ত সমবায় ও সমবায় ভেদে তিনপ্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে রূপত্ব প্রভৃতি গুণ সমবেত জাতি নাই; অতএব সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। শব্দত্ব জাতি প্রাভাকরেরা অস্বীকার করেন; অতএব সমবেত সমবায় স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। অভাব বলিয়া কোন ভাবাতিরিক্ত পদার্থ নাই; ও সমবায় সম্বন্ধ যখন অতীন্দ্রিয়, তখন বিশেষ্য বিশেষণভাব সন্নিকর্ষ স্বীকার অনাবশ্যক। এই মত নৈয়ায়িকেরাই নিরাস করিয়াছেন। সুতরাং ইহার পুনরায় খণ্ডন বৃথা। ফল কথা এই যে, "তত্রাদ্যং ত্রিতয়ং তাবন্নামমাত্রেণ ভিদ্যতে। সমবায়াদয়স্তন্যে সন্নিকর্ষা নিরাশ্রয়াঃ ॥" অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের প্রথম তিনটী সন্নিকর্ষ সংযোগ, সংযুক্ত সমবায় ও সংযুক্ত সমবেত সমবায় ও মীমাংসকদের স্বীকৃত তিনটী সন্নিকর্ষ বস্তুতঃ একই জিনিস; কেবল বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। নৈয়ায়িকদের স্বীকৃত অন্তিম তিনটী সন্নিকর্ষের কোন আশ্রয় নাই; সুতরাং তাহারা নিরর্থক।

প্রত্যক্ষ সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবার পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা কেবল মাত্র দ্রব্যাদির স্বরূপ জানা যায় ও যাহা শব্দ সম্পর্ক শূন্য সেই মূকের জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। যখন আমি কোন একটী দ্রব্য মাত্র দেখি, তাহাকে গুণ বা ক্রিয়া বিশিষ্ট বলিয়া দেখি না এবং সেই জ্ঞান আমার কোন পূর্ব্ব পরিচিত জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না, অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে কোন ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, কেবলমাত্র

একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, সেই জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পক; কারণ, এই জ্ঞান কোন বিশিষ্ট জ্ঞান নয়; অর্থাৎ এই জ্ঞানে কোন বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাব নাই। নবীনেরা বলেন যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় ব্যক্তি ও জাতি; কিন্তু তাহারা বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বোধগম্য। আমরা কখন কখন বলি যে কিছু দেখা যাইতেছে; কিন্তু সেই পদার্থ কোন্ জাতীয় তাহার নিরূপণ করিতে পারি না। তখন আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক। আমি দূরের থেকে কোন একটী প্রাণী দেখিলাম এবং ইহা গরু কি অশ্ব তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার ব্যক্তি বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এবং আমি এই জ্ঞানকেও জানিয়া থাকি; কারণ, ইহার বলেই বলিয়া থাকি যে, আমি কিছু দেখিলাম। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়; কিন্তু ইহার সত্তা স্বীকারের যথেষ্ট প্রমাণ আছে; কারণ, বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান ব্যতীত হয় না। আর এই বিশেষণ জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কোন বস্তু বা তাহার ধর্ম্মকে প্রকাশিত করে না। কিন্তু কোন কোন মীমাংসক মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ বা তাহার বিশেষরূপ প্রকাশিত করে। নবীন মীমাংসক মত নৈয়ায়িকের মতের অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু এই নবীন মতের বিরুদ্ধে একটী আপত্তিও শুনা যায় যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ্য ও বিশেষণের সন্নিকর্ষের ফলেই বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে এবং বিশেষণ জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ নয়। কিন্তু এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, আমাদের বহু দ্রব্য বিষয়ক একটী জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু সেই জ্ঞান কোন বিশিষ্ট জ্ঞানের জনক নয়; অর্থাৎ পূর্ব্ব জ্ঞানের পরে আমাদের সেই সকল বহু দ্রব্য পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের বিষয় হয় না। কোন কোন দার্শনিক এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞান মাত্রই শব্দসম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান শব্দসংস্পর্শশূন্য। অতএব এই জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নাই। এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অর্থের দর্শন না হইলে শব্দের স্মরণ হয় না ও ব্যবহার হইতে পারে না। অতএব শব্দ স্মরণের ও ব্যবহারের মূলীভূত অর্থের দর্শন আছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়।

অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বলেন যে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কেবল মাত্র সত্তা। কোন বিলক্ষণ পদার্থই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। ঘট ঘটত্ব প্রভৃতি নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না। কারণ বিলক্ষণ বস্তু জানিতে হইলেই ভেদের জ্ঞান আবশ্যক; এবং এই ভেদ বুদ্ধি প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় না। ভেদ অভাব পদার্থ; সুতরাং ইহার জ্ঞান অভাব প্রমাণের দ্বারা হইয়া থাকে। এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, নীলের প্রত্যক্ষ ও পীতের প্রত্যক্ষ যে পরস্পর ভিন্ন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অদ্বৈতবাদীরা যদি ইহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মত অতীব হেয় বলিয়াই মনে করিতে হয়। আর যদি ইঁহারা সেই জ্ঞানদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে বলিতে হয় প্রত্যক্ষের দ্বারা বৈলক্ষণ্য গৃহীত হয় ও বৈলক্ষণ্য বুদ্ধির মূলীভূত ভেদও গৃহীত হয়। যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা সন্মাত্র প্রকাশিত হয় বলা চলে না; কারণ, কার্য্য ও কারণ সমান রূপের হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অভেদের গ্রাহক ও ইহার কার্য্য সবিকল্পক জ্ঞান ভেদের গ্রাহক ইহা হইতেই পারে না। অতএব নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশেষের গ্রাহক ও কেবল মাত্র সন্মাত্র বস্তুর গ্রাহক নয়।

বৌদ্ধেরা বলেন যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তিকে প্রকাশ করে এবং ইহাই কেবল প্রমাণ। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বিশেষ্য প্রকাশিত হয় না; কারণ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণকে অসম্বদ্ধ অবস্থায় প্রকাশিত করে। বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পদার্থদ্বয়ের কোন কালে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা স্ফুরণ হয় না। এই জন্যই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে সম্মুগ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণ বিভক্ত আকারে পরিস্ফুট হয় না। বৌদ্ধমতের অপরাংশ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের নিরূপণ কালে আলোচিত হইবে।

সবিকল্পক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পরবর্ত্তী প্রত্যক্ষ বিশেষ। শব্দের স্মরণ সহিত নির্ব্বিকল্পকের পরই জাতি প্রভৃতি যুক্ত বস্তু বিষয়ক যে স্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তাহার নাম সবিকল্পক। যেমন আমার কোন দ্রব্যের জ্ঞান হইল। তাহার পর আমার জ্ঞান হইল যে ইহার বর্ণ লাল। এই যে পরবর্ত্তী জ্ঞান—যাহার সঙ্গে লাল বর্ণ ও দ্রব্য এই দুইটী নামের স্মরণ হয় ও যাহার জন্য লালবর্ণ বিশেষণ ও দ্রব্য বিশেষ্য ও তাহাদের সম্বন্ধের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞান হয় তাহাই সবিকল্পক। পার্থসারথি মিশ্রের মতে সবিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও তাহাদের সম্বন্ধ পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। গাগা ভট্ট প্রভৃতি পরবর্ত্তী মীমাংসকেরা বলেন যে সবিকল্পক জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণকে সম্বন্ধ রূপে প্রকাশ করে। 'লাল ঘট' ইহা সবিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণ। প্রাচীন মতে এই জ্ঞান 'লাল' অংশকে পৃথক্ করিয়া 'ঘট' অংশকে পৃথক্ ভাবে ও লাল ও ঘটের সম্বন্ধকে পৃথক ভাবে প্রকাশিত করে। নবীন মতে 'লাল ঘট' এই জ্ঞানের 'লাল ও ঘটের' সম্বন্ধ বিষয় হইয়া থাকে। এই জ্ঞান চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ত্বাচ, রাসন, ঘ্রাণ ও মানস ভেদে ছয় প্রকার। এবং এই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় পাঁচ প্রকার। সুতরাং বিষয়ানুসারে বিভাগ করিলে সবিকল্পক জ্ঞান পাঁচ প্রকার। জাতি দ্রব্য গুণ কর্ম্ম ও নাম ইহার বিষয় হইয়া থাকে। যখন আমার জ্ঞান হয় "এইটী গরু" তখন এই জ্ঞানের বিশেষণ গোত্ব জাতি ও ইহার বিশেষ্য 'এই' শব্দ বাচ্য গরুর দেহ ও জাতি ও গরুর দেহের সম্বন্ধ। অতএব এই জ্ঞানের বিশেষ্য ভিন্ন বিষয় জাতি। 'দন্তযুক্ত লোক' এই জ্ঞানের বিশেষ্য ভিন্ন বিষয় দন্ত এবং ইহা দ্রব্য। 'শুক্ল অশ্ব' এই বিজ্ঞানের বিশেষণ শুক্ল গুণ। 'লোকটী যাইতেছে' এই প্রকার জ্ঞানের বিশেষণ ক্রিয়া; অতএব এই সবিকল্পক জ্ঞান ক্রিয়া বিষয়ক। 'এই ব্যক্তি গোবিন্দ' এই প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান নাম বিষয়ক। অন্যান্য সবিকল্পক জ্ঞানে জাতি দ্রব্য গুণ বা কর্ম্মের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; কিন্তু নাম বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানে নামের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ জ্ঞাপিত হয় না। 'শব্দের দ্বারা, পূর্ব্বে যিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি উদ্বোধিত হয়, তাহার পর, পূর্ব্ব জ্ঞাত ব্যক্তি ও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ব্যক্তি একই ব্যক্তি' এই প্রকারের জ্ঞানকে নাম বিষয়ক সবিকল্পক কহে।

কেহ কেহ আর একটী প্রকারের সবিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যভিজ্ঞা নামক ষষ্ঠ প্রকারের সবিকল্পক জ্ঞান আছে। কিন্তু পার্থসারথি মিশ্র, নারায়ণ ভট্ট প্রভৃতি ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যভিজ্ঞা নাম বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। নাম বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানে শব্দ পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর সংস্কার জাগরূক করে; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে শব্দ সংস্কারের উদ্বোধনে বিশেষ কোন কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগ করে না। 'সেই ব্যক্তিই এই ব্যক্তি' এই আকারের জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী বস্তুর একত্ব জানিতে পারি। নাম বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানেও আমরা পূর্ব্ব-দৃষ্ট ও অধুনা দৃষ্ট বস্তুর অভিন্নতা বুঝিতে পারি। সুতরাং এই প্রত্যভিজ্ঞা নাম বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান। প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার সহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটী জ্ঞান রূপে উৎপাদিত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা দুইটী জ্ঞান। 'সেই ব্যক্তি' এই জ্ঞান সংস্কারের দ্বারা আনীত হয় ও 'এই ব্যক্তি' এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপাদিত যয়।

বৌদ্ধেরা সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের যাহা বিষয় তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয় প্রকাশিত করে না। বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সম্বদ্ধ বিষয় সবিকল্পক জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত বিষয় নাই। যে বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই সেই বিষয়ের যাহা জ্ঞান উৎপাদিত করে তাহাই প্রমাণ। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কোন-মতেই প্রমাণ হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যখন নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা উৎপাদিত হয়, তখন ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নয়, অতএব ইহা প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। পুনরায় বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে সবিকল্পক কোনরূপেই অপরোক্ষ হইতে পারে না। অপরোক্ষ শব্দের অর্থ স্বলক্ষণ। স্বলক্ষণ শব্দের দ্বারা আমরা কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বুঝি। এই ব্যক্তি মাত্র যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই অপরোক্ষ বিভাস। এক কথায় বলিতে গেলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই কেবল প্রত্যক্ষ

পদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারে। সবিকল্পক জ্ঞান শাব্দজ্ঞানের মত কেবলমাত্র সম্বন্ধকে প্রকাশিত করে। শাব্দজ্ঞানের দ্বারা আমরা স্মারিত পদার্থের সম্বন্ধ যেমন বুঝিতে পারি সেইরূপ সবিকল্পক জ্ঞান পূর্ব্বে জ্ঞাত বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধকে প্রকাশিত করে। শাব্দজ্ঞান কোন শুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রকাশিত করে না। শব্দবোধ যদি ব্যক্তিকে প্রকাশিত করিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতও আমরা ব্যক্তিকে জানিতে পারিতাম। কিন্তু সেইরূপ সম্ভবপর হয় না; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তি প্রকাশিত হয় না; দগ্ধ ব্যক্তি অগ্নিসংযোগের ফলেই অগ্নিব্যক্তিকে জানিতে পারে। দাহশব্দ শুনিয়াও অগ্নির স্মরণ হয়। এই অগ্নির জ্ঞান অগ্নি ব্যক্তিকে প্রকাশিত করে; কিন্তু অগ্নির স্মরণ দ্বারা অগ্নি ব্যক্তিবিষয়ক আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। অতএব শাব্দবোধ দ্বারা আমাদের ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান হয় না। সবিকল্পক জ্ঞান শাব্দজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় বিষয়কে প্রকাশিত করে। অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞান ব্যক্তিকে প্রকাশিত করে না। অতএব সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এখন কেহ কেহ বৌদ্ধ মতের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন ব্যক্তি যখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কোন বস্তু দেখিয়া বলেন যে ইহা গরু, তখন সেই জ্ঞানকে কোন্ ব্যক্তি অপরোক্ষ জ্ঞান না বলিয়া থাকিতে পারেন? বৌদ্ধেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে বস্তু সবিকল্পক জ্ঞানের জন্য বিশদরূপ প্রতীত হয় না। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্য এবং এই জন্যই সবিকল্পক জ্ঞানের সময়ও বস্তুর বিশদাকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং যে সকল জ্ঞানের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ নাই, সেই সকল জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর বিশদাকার প্রকাশিত হয় না। শাব্দজ্ঞান ও অনুমান নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের কার্য্য নয় ও উহাদের সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এই জন্য উহাদের দ্বারা বস্তুর পরিষ্কাররূপে স্ফুরণ হয় না। সবিকল্পক জ্ঞান ঐ সমস্ত জ্ঞানেরই মত; সুতরাং সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর প্রকৃতরূপ কোনরূপেই জ্ঞাপিত হইতে পারে না। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী জ্ঞান। সুতরাং সবিকল্পক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। এই সংস্পর্শের ফলেই সবিকল্পক জ্ঞান কালেও দ্রষ্টা বস্তুর প্রকৃত রূপ দেখিতে পান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবিকল্পক জ্ঞান বস্তুর প্রকৃত রূপের প্রকাশক নয়। অতএব সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়।

ইহার উত্তরে মীমাংসকেরা বলেন যে বৌদ্ধেরাও স্বীকার করেন যে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক। প্রত্যক্ষকে অপেক্ষা না করিয়া অনুমান প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। সাধ্য ও হেতুর কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ জানিতে না পারিলে অনুমান হইতে পারে না। এই সম্বন্ধ জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় না; কারণ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রকাশিত করে; কিন্তু দুইটী পদার্থের সম্বন্ধকে প্রকাশিত করে না। অতএব এই সম্বন্ধ জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা যখন অনুমান প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক বলিয়া স্বীকার করেন, তখন আপনাদের উক্তির দ্বারাই আপনারা বিরুদ্ধভাষী হইয়া পড়িতেছেন। সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার না করিলে অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্বক হয় না। মীমাংসকেরা অনুভবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন যে, লোকে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া গরু দেখিয়া 'এইটী গরু' এই প্রকার যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষই এবং নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধের ফলেও এই গো ব্যক্তিগ্রহ হয় না। কারণ এই প্রকার স্বীকারের মূলে কোন প্রমাণ নাই। শাব্দবোধ ও অনুমিতির বিষয় সামান্যাকার এবং সামান্যাকার সবিকল্পকেরও বিষয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী জ্ঞান সামান্যাকারকে বিশদরূপে প্রকাশিত করে না; কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান সামান্যাকারকে বিশদ রূপে প্রকাশিত করে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বিষয়ের জন্য জ্ঞানের তারতম্য হয় না। যদি বিষয়ের বৈচিত্র্য জ্ঞানের বিভিন্নতার কারণ হইত, তাহা হইলে ব্যক্তির জ্ঞান সর্ব্বদাই অপরোক্ষ হইত এবং সামান্যের জ্ঞান সদাসর্ব্বদাই পরোক্ষ হইত। কিন্তু এইরূপ নিয়ম দেখা যায় না। সামান্যও কোন কোন স্থলে পরোক্ষ হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে অপরোক্ষ হয়।

মীমাংসকেরা পুনরায় দেখাইতেছেন যে সামান্যাকার অপরোক্ষও পরোক্ষ হইয়া থাকে। কোন লোক দূর হইতে কোন একটী শ্বেত বস্তু দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগ্রহ হইলেও, উহা কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিয়া

উঠিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঐ বস্তুটী অশ্ব বা গো হইবে। পরে তাহার শব্দ শুনিয়া নিশ্চয় করিলেন যে ঐ বস্তুটী অশ্ব; কারণ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনা যাইতেছে। তখন তাঁহার অশ্বত্বের যে জ্ঞান হইল তাহা পরোক্ষ; কারণ, তিনি বলিয়া থাকেন যে উহা অশ্ব হইলেও অশ্বরূপে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় নাই। তাহার পর সেই বস্তুটার নিকটে আসিয়া বলিয়া থাকেন "হাঁ, ইহা অশ্বই বটে; কারণ ইহার অশ্বত্ব জাতি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু দূর হইতে ইহার জাতি প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।" এই উদাহরণটী যদি বেশ করিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহাই বেশ মনে হয় যে, ব্যক্তি দূর হইতেও প্রত্যক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ে ইহার সামান্যভাগ প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং অনুমানের দ্বারা সেই সামান্য ভাগের শুধু পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল। দ্রষ্টা দূরবর্ত্তী বস্তুর সন্নিকটে আসিয়া তাহার জাতি প্রত্যক্ষ করিলেন। পূর্ব্বে জাতির জ্ঞান হইয়াছিল, পরেও তাহার জ্ঞান হইল। পূর্ব্বের জ্ঞান ও পরের জ্ঞান এক নয়। সুতরাং বিষয়ের জন্য জ্ঞান পরোক্ষ বা অপরোক্ষ হয় না। জ্ঞানের করণের ভেদ হইলে জ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদিত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য করণের দ্বারা যাহা উৎপাদিত হয় তাহা পরোক্ষ। সবিকল্পক জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্বন্ধের ফলেই যখন জন্মিয়া থাকে এবং ইহা যখন অপরোক্ষ প্রকাশ তখন সবিকল্পক জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ।

এখন দেখা যাক্ প্রত্যক্ষের প্রতি সাধারণ কারণ কি? গাগা ভট্টের মতে প্রত্যক্ষ মাত্রের প্রতি মহত্ব হেতু যে কোন দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহার পরিমাণ মহৎ হওয়া আবশ্যক। অতি ক্ষুদ্র দ্রব্য কোনকালে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহীত হয় না। কোন গুণের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই গুণটী কোন মহৎ পরিমাণ যুক্ত দ্রব্যের গুণ অবশ্যই হইবে। গুণাদি গত জাতি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সেই জাতির এমন গুণের উপর থাকা উচিত যে গুণ মহৎ-পরিমিত দ্রব্যের উপর থাকে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাধারণ নিয়ম হইতেছে যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ের রূপ উদ্ভূত ও অনভিভূত হওয়া প্রয়োজনীয় এবং বিষয়ের সহিত আলোকের সংযোগ আবশ্যক। বিষয়ের রূপ অনুদ্ভূত হইলে আমরা তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; যেমন ইন্দ্রিয়গুলির আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয়ের রূপ অভিভূত হইলেও আমরা তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; যেমন দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণের দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রাদির রূপ অভিভূত হয়; এবং তৎকালে উক্ত বিষয়গুলির সহিত আলোক সংযোগ সত্ত্বেও এবং উহাদের রূপ উদ্ভূত হইলেও, সেই বিষয় সমূহের আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। আলোক সংযোগ না হইলেও বিষয়ের উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপ থাকিলেও বিষয় আমাদের চক্ষু দ্বারা গৃহীত হয় না। যেমন অন্ধকার গৃহে অবস্থিত দ্রব্যসমূহ আমরা চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে কালের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব প্রভৃতি কারণ নয়। ত্বাচ প্রত্যক্ষের পক্ষে রূপ কারণ নয়; অতএব বায়ুর ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। কেহ কেহ বলেন যে বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ। গাগা ভট্ট এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ। মানস প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্বকে কেহ কেহ হেতু বলিয়া স্বীকার করেন এবং কেহ কেহ স্বীকার করেন নাই। কাহার কাহার মতে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় না। ক্রিয়া পূর্ব্বদেশ হইতে বিভাগ এবং উত্তর দেশের সহিত সংযোগের দ্বারা অনুমিত হয়; সুতরাং এই মতে মহত্ব ক্রিয়ার প্রত্যক্ষের প্রতিকারণ নয়।

গাগা ভট্টের গ্রন্থে দুই প্রকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কথা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং সামান্য লক্ষণা জন্য ও জ্ঞান-লক্ষণা জন্য যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

সামান্য লক্ষণা শব্দের অর্থ কি? প্রথমতঃ এই সামান্য শব্দেরই অর্থ কি? এই সামান্য শব্দ জাতির বাচক নয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে যে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই বিশিষ্ট জ্ঞানে যাহা বিশেষণ হয় তাহাই সামান্য। নয়ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হইয়া 'এই ঘট' রূপ আকারে একটী বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এই জ্ঞানের বিশেষ্য 'এই' এবং বিশেষণ 'ঘটত্ব'। এই 'ঘটত্ব' হইতেছে সামান্য। সামান্য লক্ষণা

বলিতে আমরা সামান্যের জ্ঞান অথবা জ্ঞায়মান সামান্য বুঝি। এবং এই সম্বন্ধের দ্বারা এইরূপ সামান্যের আশ্রয়ীভূত যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় এবং এই সম্বন্ধের ফলে ঐ সকল ব্যক্তি বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। এইরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করা আবশ্যক। কারণ, এতাদৃশ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে ঘটশব্দের যে সকল ঘট ব্যক্তির সহিত শক্তি আছে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু ব্যক্তি মাত্রেরই আপন আপন ব্যবহারের বিষয়ীভূত ঘট দ্রব্যের সহিত ঘটশব্দের শক্তি জ্ঞান হইয়া থাকে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় এই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে লোকের সুখজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ লোকের ভুক্ত সুখ বিষয়ক ইচ্ছা হয় না ও যে সুখ একেবারে অজ্ঞাত তদ্বিষয়কও ইচ্ছা হওয়া অসম্ভব। অতএব প্রবৃত্তি হওয়া দুঃসাধ্য। রঘুনাথ শিরোমণি এই মত স্বীকার করেন নাই। তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলেও লোকের সুখের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। সুখ নিশ্চয় হইলেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে লোকে সুখের অনুভব করিয়াছে এবং সুখের অসাধারণ ধর্ম্মও সুখের অনুভবকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সুতরাং যখন সুখের জন্য কোন কর্ম্ম করিবার আবশ্যক হয়, তখন লোকের সুখ নিশ্চয় আবশ্যক। সুখত্ব আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আমার সুখ নিশ্চয় হইতে পারে। এবং এই সুখ নিশ্চয়ের পর সুখের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। গাগা ভট্ট শিরোমণির মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি গঙ্গেশের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে অনুভূত সুখের জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হয় না এবং অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সুখের জন্যও কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া সকল সুখ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে।

জ্ঞান লক্ষণা সন্নিকর্ষ জন্যও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা আবশ্যক। আমরা বলিয়া থাকি যে চক্ষুর দ্বারা সুরভি-চন্দন দেখিতেছি। চন্দনের সম্বন্ধ চক্ষুর দ্বারা আমরা কোন মতেই দেখিতে পারি না। অতএব যে বিষয়ের জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান রূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা আমরা সেই বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান সন্নিকর্ষ বলিয়া ইহাঁর নাম জ্ঞান-লক্ষণা সন্নিকর্ষ। এই জ্ঞান-লক্ষণা সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অলৌকিক।

তার্কিকগণ যোগজ ধর্ম্ম সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষের ফলে যোগীদের সর্ব্ববস্তু বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মীমাংসকগণ এইরূপ যোগীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তির সীমা আছে। ইন্দ্রিয় হইতে হইলেই তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ অবশ্যই হইবে। পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ যাহা সাধারণের ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা ইন্দ্রিয় মাত্রেরই অগোচর। অতএব যোগজ ধর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের এমন কোন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না, যাহার দ্বারা যোগী সকল বস্তুই নির্ব্বিবাদে প্রত্যক্ষ করিবেন। ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারাও আমরা যোগীদের সত্তা প্রমাণিত করিতে পারি না; কারণ, এ-সব গ্রন্থের অন্য বিষয় প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য থাকিতে পারে।

বিপত্তি

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, রত্নপ্রভা-সাহিত্য-ভারতী

(৩৬)

ছোটমার পা খোঁড়া করিবার মত সৎপ্রস্তাবটার মধ্যে ছোটকাকার আকস্মিক আবির্ভাব ও অযাচিত ভাবে সেই প্রস্তাব সমর্থন করা বালক মোটেই পছন্দের বিষয় মনে করিতে পারিল না। ব্যাপারটা তার কাছে দুঃসহ ঠাট্টার মতই মনে হইল। লজ্জায় লাল হইয়া লুকাইবার পথ পাইল না, অগত্যা—যাঁর পা খোঁড়া করিবার জন্য এই লজ্জা, তাঁরই কোলে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

কথাটার গৌণ অর্থ বালক যাহাই বুঝিয়া থাকুক, ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন—তার মুখ্য অর্থ কি। তিনি হাসিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সে মুখ আজ অস্বাভাবিক উৎসাহ-চাঞ্চল্য-প্রদীপ্ত! সে দৃষ্টিতে আজ, এ কি? সে,—বৈরাগ্য-পূত, প্রশান্ত ঔদাস্যের দিব্য জ্যোতিঃ আজ কোথা? এ দৃষ্টি যে আজ কামনাভার-ব্যথিত, গোপন-অপরাধ-লাঞ্ছিতের লজ্জা-ম্লান দৃষ্টি! ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইলেন,—এ কি তাঁর ভ্রান্তি, না যথার্থ সত্য?

ব্রহ্মচারিণীর সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আজ ব্রহ্মচারী সহ্য করিতে পারিলেন না। মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। উঠানের আমগাছটার নীচে আসন পাতিয়া বসিলেন। আসন সঙ্গেই ছিল, কারণ যার-তার সহিত একাসনে বসিতেন না বলিয়া বাহিরে যাইবার সময় ব্রহ্মচারী একখানি ছোট আসন সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন।

ব্রহ্মচারিণীর দৃষ্টি নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। ব্রহ্মচারী বসিয়া মুখ তুলিতেই ধীরে বলিলেন "ওখানে কেন?"

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ব্রহ্মচারী কুণ্ঠিত হাস্যে বলিলেন "চারি দিকেই সংসারীর ভিড় লেগে গেছে, এবার আমার পক্ষে 'তরুমূল নিবাসঃ'ই শ্রেয়ঃ। আশ্রমে স্বামিজীর স্ত্রী এসেছেন, এখানে তুমি গণেশ-জননী মূর্ত্তি ধরেছ,—বাইরে তেওয়ারী সংসারীদের সংসার-ধর্ম্মের নিমন্ত্রণ নিয়ে, দৈত্যরাজ শুম্ভের সুগ্রীব দূতের মত হাজির। ব্যাপার চূড়ান্ত! আর ত পারা যায় না! হায়রাণ হয়ে পড়েছি।"

তার পর ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে বক্র কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন "তুমি হলে এ অবস্থায় কি করতে?"

ব্রহ্মচারিণী সংযত স্বরে বলিলেন "আমায় ত দৈত্যদূত কেউ নিমন্ত্রণ করতে আসে নি।—এই বাচ্চা দেবদূতটিকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছি।" বলিয়া সস্নেহে বালকের পিঠ চাপড়াইলেন। সে তখনও কোলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আহা, দৃষ্টিটা আর একটু নীচে নামাও। আরও কেউ মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছে যে! তাকে দেবদূত বলে সন্দেহ করলে ভুল হবে। সেও একটা জবাব চাইছে। জবাব দাও।"

ব্রহ্মচারিণী এ কথার গূঢ় অর্থ বুঝিলেন,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তাহলে অসুরনাশিনী মহাশক্তিকে প্রণাম করে, তাঁরই ভাষায় জবাব দিই—

"কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

যাও, প্রভু অসুর-রাজকে সংবাদ দাও!"

ব্রহ্মচারীর মুখের উৎসাহ-দীপ্তি দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। আত্ম-গোপনের জন্য তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাসিতে পারিলেন না। মাথা হেঁট করিয়া বিকৃত স্বরে শুধু বলিলেন "হুঁ।"

ব্রহ্মচারিণী তাঁকে নীরব থাকিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন "শঙ্করানন্দ ঠাকুরের স্ত্রী এসেছেন বল্‌লে নয়? ছেলে মেয়েরাও এসেছে?"

ব্রহ্মচারী ঢোঁক গিলিয়া লজ্জার বাধা ঠেলিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "তান্ত্রিক সাধনার মাঝে ছেলেমেয়েরা এসে কি করবে? দরকার শুধু—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হুঁ, বুঝেছি। কেমন দাম্পত্য-লীলা দেখে এলে?"

প্রশ্নটার মধ্যে বেশ একটু শ্লেষাত্মক বিদ্রূপের সুরই ধ্বনিত হইল! ব্রহ্মচারী একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন, কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। সসঙ্কোচে মাথা হেঁট করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন, তবুও উত্তর নাই। তার পর বোধ হয় সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই ব্রহ্মচারী শুষ্ক হাস্যে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া বলিলেন "যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি—" দেবীর এই কথার উত্তরে দৈত্যদূতকে বল্‌তে হয়েছিল 'অত গর্ব্বিতা হবেন না দেবি, কারণ "ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাং স্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ"'।"

ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন। বলিলেন "অতএব সেই খবরেই দেবী কাহিল! নিরুপায় হয়েই বলেছেন "কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা।" বুঝলে ব্রহ্মচারি, আর উপায় নেই। সিংহরা সিংহ-ধর্ম্মেরই উপাসক; তাদের দলের কেউ যদি ছাগল ভেড়ার পালে গিয়ে মেশে,—যদি কোন বিজ্ঞ ছাগল তাকে বশীভূত করে ছাগধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর উপদেশে হায়রাণ্ করে দেয়,—তবে বড় দুঃখের বিষয়! কিন্তু সব সিংহ ত ছাগমন্ত্রে মোহিত হয়ে আত্ম ধর্ম্ম বিস্মৃত হতে পারে না। উপায় কি?"

ব্রহ্মচারী নত মুখে নিজের খড়ম যোড়ার শোভা নিরীক্ষণে মনোযোগী হইলেন। মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, কোন উত্তর; দিলেন না।

বালক ইহার মধ্যে মুখ তুলিয়াছিল এবং মিটিমিটি চক্ষে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। ছোট কাকাকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক দেখিয়া, এবার তার ভরসা হইল। আদর করিয়া দুহাতে ব্রহ্মচারিণীর চিবুকের দুপাশ ধরিয়া সানুনয়ে বলিল "ওগো ছোট মা, তুমি আজ রাত্রে আমাকে একটা সিঙ্গির গল্প বোলো। কতদিন তোমার গল্প শুনি নি।"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। সাদরে বালকের মুখখানি দু' হাতে ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "সিঙ্গির গল্প শুন্‌বে? সেই ভাল।—আচ্ছা, এখন এই চিঠিগুলো তোমার কাকাকে দিয়ে এস মণি।"

মণি চিঠি লইয়া ব্রহ্মচারীকে দিতে গেল। ব্রহ্মচারী এক হাতে চিঠি লইয়া পাশে রাখিলেন; অন্য হাতে মণির হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "এস বংশধর, এর পর পিণ্ডি-টিণ্ডি দিয়ে তোমরাই ত উদ্ধার করবে। তোমাদের সঙ্গে মস্ত বড় স্বার্থের সম্পর্ক আছে। এস, দিন থাক্‌তে একটু আদর-টাদর ঘুস্ দিয়ে রাখি।"

মহা লজ্জিত হইয়া চোখ মিট্ মিট্ করিয়া মণি হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল "দাঁড়াও, তোমায় পেন্নাম করি, ছাড়।"

ব্রহ্মচারী ছাড়িলেন না। তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন "আমি প্রণাম নেব না, তুই বোস্।"

"ছোট মাকেও পেন্নাম করতে ভুলে গেছি। ছাড়, আগে পেন্নাম করে আসি।"—বলিয়া মণি পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

ব্রহ্মচারিণী দূর হইতে সহাস্যে বলিলেন "তুমি যদি আমায় প্রণাম করো, তবে আমিও তোমায় উল্টে প্রণাম করব।"

বালক সরোষে বলিল "কক্ষনো নয়।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বাঃ, তোমায় বাবা বলি যে! বাবা হলে অনেক দুঃখ পেতে হয়; মেয়েকে কক্ষনো প্রণাম করতে নেই, এই হচ্ছে বাবার কায!"

পিতৃত্বের এত বড় মর্য্যাদা-দায়িত্বের উপর আর তর্ক চলে না। অগত্যা প্রণাম করা হইল না। মণি মুখ কাঁচু মাঁচু করিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া, ব্রহ্মচারীর কোলে আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। পাছে কাকার গায়ে পা ঠেকে সেই ভয়ে, পা দুখানা যথাসাধ্য দূরে ছড়াইয়া দিল।

ব্রহ্মচারী তাকে বাড়ীর সকলকার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আশ্রিত প্রতিপালিত সকলে কে কেমন আছে, কে কি করিতেছে,—প্রত্যেকের সম্বন্ধে যা যতটা মনে পড়িল জিজ্ঞাসা করিলেন।

খুড়া ভাইপো'র কথা চলিতে লাগিল, চিঠি পড়ার কোন উদ্যোগ নাই। ব্রহ্মচারিণী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "চিঠিগুলা একবার পড়ে নাও।"

ব্রহ্মচারী নতমুখে বলিলেন "ওসব এখন পড়্‌লে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আহ্নিক পূজো সেরে এসে পড়্‌ব।"

"মন খারাপ হতে এখনও কিছু বাকী আছে কি?"

ব্রহ্মচারী তেমনি হেঁট মুখে উত্তর দিলেন, "না, আজ আর কিছু বাকী নেই। স্বামিজীর ওখানে আজ এক জ্যোতিষী আমার করকোষ্ঠি বিচার করে এক সর্ব্বনেশে কথা বলেছেন।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সর্ব্বত্যাগ-ব্রতীদের সর্ব্বনাশ!—কথাটা মন্দ নয়।"

ব্রহ্মচারী বক্র কটাক্ষে চাহিয়া সপরিহাসে বলিলেন "না, মন্দ নয়। মাথায় বাজ পড়্‌বার ব্যবস্থা! সন্তান আগত!"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। স্নানের জন্য কুয়াতলার দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন "তাহলে জ্যোতিষীকে ধন্যবাদ। কা'ল খবর দিও,—এসেছে।"

তার পর মণির দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "কি বল মণি বাবা, তুমি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছ! বেশ করেছ। দ্যাখো বাবা,—আমি এখন নেয়ে পূজোয় বসতে চললুম। তুমি যেন এখন মনে মনে 'ছোটমা' 'ছোটমা' জপ কোর না, তাহলে আমার জপ তপ সব গোল হয়ে যাবে। তুমি বরঞ্চ তেওয়ারী ঠাকুরের কাছে গিয়ে,—একটু রামচন্দ্র কিম্বা তাঁর ভাইয়ের ইন্দ্রজিৎ বধের গল্প শোন গিয়ে। লক্ষ্মী বাবা দেখো,—যেন আমার কথা মনে কোর না।"

তার পর কাহাকেও কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তিনি কাপড় গামছা লইয়া কুয়াতলায় ঢুকিলেন।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারী গামছা কাঁধে লইয়া, উঠানে পায়চারী করিতেছেন। মণি বাহিরে গিয়াছে। ব্রহ্মচারিণী নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী কুয়াতলার দিকে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—"আজ কদিন হোল, স্বামিজীর স্ত্রী এসেছেন। স্বামিজীর উপযুক্ত স্ত্রীই বটে! শ্লীলতা জ্ঞানে দুজনেই কি সমান পরিপক্ক! ওঁরা দুই মূর্ত্তি যেখানে থাকবেন, সেখানে আর কোন ভদ্রলোকের তিষ্ঠাবার স্থান নাই।"

উদাস গম্ভীর মুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "উত্তম সংবাদ! বাধিত হলাম। দর্শন শ্রবণ অনেক কিছুই করে এসেছ ত? এবার জপের আসনে গিয়ে—সেই সব মনন আর নিদি-ধ্যাসন কর।"

ব্রহ্মচারী কুয়াতলার দিকে যাইতে যাইতে হাসিমুখে ফিরিয়া চাহিলেন। বলিলেন "উহুঁ—মননটায় অন্ততঃ—" তার পর বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া, পুনশ্চ একটু হাসিয়া দ্রুত অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রহ্মচারিণী আরও গম্ভীর হইলেন। সেইখান হইতেই ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে শান্তস্বরে বলিলেন "কৃতার্থ হলাম। কিন্তু সব পরিহাসেরই সীমা আছে। "ধ্যায়তে বিষয়াণ পুংসা সঙ্গস্তেষূপজায়তে" ব্রহ্মচারি! তোমার মন পড়ে আছে শঙ্করানন্দ ঠাকুরের আড্ডায়, ধ্যান করছ তাঁর কদর্য্য রসিকতা,—তোমার কাছে এর বেশী শিষ্টাচার আশা করাই বৃথা। রাত্রে তেওয়ারী কি খাবেন, তার খবর নিও।"

ব্রহ্মচারী কুয়াতলার ভিতর হইতে উত্তর দিলেন "নিয়েছি। তোমার হাতে রুটি তরকারী খাবেন।"

"ভাল।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন।

একটু শীঘ্র শীঘ্র আহ্নিক-পূজা সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারিণী উনান ধরাইয়া তেওয়ারী ও মণির জন্য ডাল চড়াইয়া দিলেন। ঘরে হবিষ্যের ঘি আছে, দুধ আছে, আলু আছে। নুন লঙ্কা পাঁচ ফোঁড়ন আছে। আটা আছে! অভাব ছিল কিছু টাট্‌কা তরকারীর। মণি তার নিজের হাতে তৈরী সখের বাগান হইতে গোটাকতক বেগুণ ও পটল আনিয়াছে, তাহাতে আজ রাত্রের মত উহাদের চালাইয়া দেওয়া যাইবে।

ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া আটা মাখিতেছেন, এমন সময় নিঃশব্দ-পদে মণি বাড়ী ঢুকিল। ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া সাহ্লাদে বলিল "তোমার পূজো হয়ে গেছে ছোটমা? আমি তিনবার এসে ফিরে গেছি। বাবাঃ, তুমি এত দেরী কর কেন? মায়ের ঠাকুর ত অত দেরী করান না।"

ব্রহ্মচারিণী একখানা পীঁড়া মণিকে বসিতে দিয়া বলিলেন "মায়ের ঠাকুর মাকে বাইরে অনেক পূজার কায দিয়ে রেখেছেন। আমার ত বাইরে অত কায দেন নি, তাই ভিতরের কায সারতে একটু সময় যায়। মণি, তোমায় গরম গরম লুচি তরকারী করে দিই—"

বাধা দিয়া মণি বলিল "না, আমি তোমার সঙ্গে হবিষ্য করব।"

"রাত্রে হবিষ্য করবে কি?"

মণি বলিল "তবে? কাল দিনের বেলা বুঝি? আমি মাছ খাব না ছোটমা, আমায় হবিষ্য দিও—"

অত্যন্ত রাগ জানাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ছ্যাখো, ও-সব অনাছিষ্টি বায়না কোর না। ওপর-ওলারা শুনতে পেলে আমার গর্দ্দান যাবে। ছোট ছেলে, মাছ খাবে না কি?"

"তুমি যে খাও না।"

এ কথায় ব্রহ্মচারিণী অত্যন্ত বিব্রত হইলেন। আজে-বাজে নানা ওজর দেখাইয়া জানাইলেন ছোট বয়সে তিনি ও-সব যথেষ্ট খাইয়াছেন। অতএব মণিকেও ছোট বয়সে মাছ খাইতে হইবে।

মণি ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল "আগে খেতে, এখন খাও না কেন?"

মিথ্যা কথা বলিবার অভ্যাস না থাকিলে যা হয়, তাই হইল। ব্রহ্মচারিণী এবার সরলভাবেই সত্য স্বীকার করিলেন। বলিলেন "সাধন-ভজনের অসুবিধা হয় বলে ছেড়ে দিয়েছি, নইলে খেতে আপত্তি কি?"

মণি উৎসাহের সহিত বলিল "তবে আমিও কাল থেকে সাধন-ভজন করব। মাছও খাব না—লেখাপড়াও করব না।"

মুহূর্ত্তে এক ধমক! মণি স্তব্ধ!

ব্রহ্মচারিণী রাগত ভাবে বলিলেন "তবে আর কি? লেখাপড়া ছাড়বার এমন হুজুগ ত আর নেই! ছ্যাখো, সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য, মানুষ গড়া,—মূর্খ গড়া নয়,—ভূত প্রেত গড়া নয়। যদি সাধন-ভজন করতে চাও,—আগে মন দিয়ে লেখা পড়া শেখো। মনুষ্যত্ব জিনিষটা কি বোঝো। তার পর সাধন-ভজনের নাম মুখে এনো। হুজুগে পড়ে অনর্থক খেয়াল নিয়ে লাফালাফি করার নাম সাধন-ভজন নয়। যে লেখাপড়া করতে পারে না, সে সাধন-ভজনও পারে না।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মচারী সামনে আসিয়া দেখা দিলেন। এইমাত্র তিনি আসন হইতে উঠিয়াছেন,—দূর হইতে তিরস্কারগুলা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। বলিলেন "কি রে মণে, বকুনি খাচ্ছিস্? পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়,—আমার কাছে আয়।"

যদিও ছোটমার কাছে বকুনি খাইয়া মণির দুঃখের সীমা ছিল না, কিন্তু কাকার হাসি ও আহ্বানে সে মহাখাপ্পা হইল। নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সরোষে বলিল "না, যাব না।"

ব্রহ্মচারিণী ময়দা ভিজাইয়া ঢাকা দিয়া বঁটি ও তরকারী লইয়া কুটনায় বসিলেন। মণির কথা শুনিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "মিথ্যে ভাংচি দিচ্ছ ব্রহ্মচারি। ও আমার কাছে বকুনি খাবে, গাল খাবে, চাই কি প্রহার খেতেও রাজী আছে। তারপর কাঁদতে হয়, আমার কাছে বসেই কাঁদবে। কিন্তু আমায় ছেড়ে নড়বে না। ছোট বেলা থেকেই ওর ওই অভ্যাস।"

"ঘোচাচ্ছি অভ্যাস! নড়বে না বই কি! আয় শূয়ার, আমি ধরে নিয়ে যাব।" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসি-মুখে অগ্রসর হইতেই, মণি প্রমাদ গণিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এক লাফে ছোটমার কাছে উপস্থিত হইল। বিনাবাক্যে দুহাতে তাঁর কটি বেষ্টন করিয়া কোলে মুখ লুকাইল।

ব্রহ্মচারিণী হাঁ হাঁ করিয়া বঁটি কাৎ করিয়া সামলাইয়া লইলেন। সভয়ে বলিলেন "ওকে অমন করে তাড়া দিও না ব্রহ্মচারি, এখুনি এক কাণ্ড হয়ে যেত।"

ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন "এক কাণ্ডই কর্‌ব আজ! দাও তো ওকে সরিয়ে—"

সংবাদ শুনিয়া মণি আরও কঠিন হইয়া ব্রহ্মচারিণীকে চাপিয়া ধরিল।

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। সকাতরে বলিলেন "উঃ, গেল আমার শিরদাঁড়া ভেঙে! ওরে ক্ষুদে পরশুরাম, মাতৃহত্যা করিস্‌ নে। কে তা হলে সিঙ্গির গপ্প বল্‌বে?"

মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে বাহু-বন্ধন শিথিল হইল। চট্ করিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষুদ্র পরশুরাম একবার দেখিয়া লইল—কাকা কত দূরে? কাকা তখন অতি নিকটে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া হাসিমুখে সামনে ঝুঁকিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মচারিণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অভ্যস্ত সংস্কার-মাহাত্ম্য!

বালক ভয় পাইল, এবং বোধ হয় ভিতরের ভয়ের তাড়াতেই—কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক ভীষণতার আভাস ফুটাইয়া মহা তর্জ্জন করিয়া বলিল "খবর্দ্দার বল্‌ছি, ছোট মাকে ছুঁয়ো না।"

বালক জানে, বাড়ীর ছোট ছেলেরা এবং বৃদ্ধ পিতা-মহরা ছাড়া—আর কাহারও ছোট মাকে ছুঁইতে নাই। ছোট কাকাকে চিরদিনই তাহারা বাহিরের লোকরূপে দেখিয়াছে, বাহিরের লোক বলিয়াই জানে। বাড়ীর আশ্রিত, প্রতিপালিত বয়স্ক পুরুষরা—বাড়ীর ছোট বধূ 'ছোটমার' সম্বন্ধে যেমন সসম্ভ্রমে দূরত্বের ব্যবধান মাপিয়া চলেন, ছোট কাকার পক্ষেও তাই চলা উচিত, এমন কি গুরুজনদের সামনে আরও একটু বেশী লজ্জা করিয়া চলা উচিত। ইহাই সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিয়াছে, এবং ইহাই চিরদিন চলিবে, জানিয়াছে।

তর্জ্জন করিয়াই তর্জ্জনকারী বীর শিশু আবার মুখ লুকাইল। দুজনেই হাসিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে অর্থসূচক কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "শাসন-কর্ত্তার আদেশ শুনেছ ত? যাও, সরে পড়ো ব্রহ্মচারি। আমার কায করতে দাও।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ওকে ছেড়ে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী সস্নেহে বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "আশ্রিতকে ত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়। ওকে আমার কাছে থাকতে দাও।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তাহলে আমিও এইখানে বসি।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তাহলে আমার কায হবে না। তুমি ওম্নি করে তাড়া দেবে, আর ও জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে,—শেষে আমি হয় বঁটিতে কেটে মরব, নয় আগুনে পুড়ে ঝল্‌সাব।"

বালক মুখ লুকাইয়া বলিল "ছোট্‌কা, তুমি তেওয়ারীর কাছে যাও। তেওয়ারী তোমায় ডেকেছে।"

ব্রহ্মচারীর স্মরণ হইল তেওয়ারী তাঁহাকে বহুক্ষণ ডাকিয়াছে। এখানকার পাড়া-প্রতিবেশী জ্ঞাতি-কুটুম্বদের দ্বারস্থ হইয়া কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিবার ও নিমন্ত্রিতদের গুছাইয়া লইয়া পাটনায় পাঠাইবার ভার তাঁহার ও ঠাকুর্দ্দার উপর পড়িয়াছে। কায অনেক, সময় অল্প,—শীঘ্রই সেগুলা সারা চাই বটে। এখনই ঠাকুর্দ্দার কাছে যাইতে হইবে।

বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া সপরিহাসে বলিলেন "দৈত্য দূতকে ত হাঁকিয়ে দিয়েছ। তোমার দেব-দূতের নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে কি কর্‌বে? যাবে মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ত আমি খাই নে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়াতে যাব কি না, তাই জিজ্ঞাসা করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "তাই—তাই। যাবে?"

ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন "যাব বই কি। আমাদের মেয়ের বিয়ে যে!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "একেই বলে স্ত্রীজাতির জাতীয় বিশেষত্ব! তা, তোমাকেও কি হরগৌরী দর্শনের পুণ্য অর্জ্জনের জন্য আড়ি পাত্‌তে হবে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "গলায় দড়ি আমার! আমি—আমিই! আমি দিদিমা নই!"

ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন।

(৩৭)

রান্নাবান্না শেষ হইল, ব্রহ্মচারী ও তেওয়ারী তখনও ফিরেন নাই। মণি তখন খাইতে চাহিল না, অগত্যা

রোয়াকে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী তাহাকে সিংহের গল্প শুনাইতে লাগিলেন।

গল্প চলিতেছে, কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী ফিরিলেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তেওয়ারী ফিরেছেন? তাঁকে ডাক, খেতে দিই।"

ব্রহ্মচারী নিজের কম্বলে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন "নিষ্কর্ম্মা বুড়ো এর মধ্যে ফিরবে? ঠাকুর্দ্দার কাছে গিয়ে তার ভাব-সমাধি লেগেছে, দুজনেই দুজনকে পেয়ে বসেছেন! পুরোনো আমলের কাহিনী সব চল্‌ছে, বেগতিক দেখে সরে পড়লুম। কবে ফুলশয্যার দিন ওদের ভাঙ্‌ আর লাড্ডু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সরে পড়েছিলুম,—এখনো সে কথা বুড়োর মনে আছে! তাই নিয়ে ভজন গান চল্‌ছে, সে কাহিনী এখন শেষ হবে না। তুমি মণেকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে শোও-গে। আমার আর তেওয়ারীর ঢাকা দিয়ে রেখে যাও।"

ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিবাদ করিলেই তর্ক-বিতর্ক অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তর রহিলেন।

কাকাকে দেখিয়াই আসন্ন-বিপদাশঙ্কায় মণি ছোটমার পিঠে মুখ লুকাইয়াছিল। এবার উভয়কে নীরব দেখিয়া, ছোটমার বাহুমূলে মৃদু চাপ দিয়া চুপি চুপি বলিল "হ্যাঁ ছোট মা, তা'পর সিঙ্গিটার কি হোল?"

ছোটমা কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আষাঢ়ের আকাশ সেদিন মেঘশূন্য পরিষ্কার। শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ ঢালিতেছিল। শায়িত ব্রহ্মচারীর মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল, তিনি চোখ বুজিয়া কি ভাবিতেছিলেন। মুখ সহসা ভয়ানক বিমর্ষ-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়িতেছে। বাহ্যিক প্রফুল্লতার আড়ালে তিনি যতই আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করুন, ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র দুশ্চিন্তা-পীড়ন যে চলিতেছে তার সন্দেহ নাই। সেইদিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী একাগ্র মনোযোগে কি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মণির ব্যবহার প্রথমে তাঁর অনুভূতিগোচর হইল না। মণি অধীর হইয়া আরও উপদ্রব জুড়িল, তিনি সচেতন হইলেন। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া তার দিকে চাহিলেন। বলিলেন "রাত হয়েছে। আর গল্প নয়, খাবে চল। ব্রহ্মচারি, তুমিও ক্লান্ত হয়েছে, একেবারে খেয়ে শোও।"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া উত্তর দিলেন "না, তেওয়ারী আসুক। তুমি মণেকে খাইয়ে দাও।"

গল্পের নেশায় মণির তখন মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। আহার নিদ্রায় আগ্রহ ছিল না। সে প্রতিবাদের স্বরে বলিল "না, আমি ছোট্‌কার সঙ্গে খাব।"

ব্রহ্মচারীর জেদ টলান দুরূহ। সে সমস্যা মীমাংসার একটা ছুতা পাইয়া ব্রহ্মচারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রীতমুখে মণিকে কোলে টানিয়া সাদরে কপালে চুমা খাইয়া বলিলেন "তোমার কাকাকে টেনে তোল ত' বাবা,—দুজনে একসঙ্গে খেতে বসো, তা'পর গল্প বল্‌ছি।"

"বাঃ, বেশ ষড়যন্ত্র!—" বলিয়া ম্লানহাস্যে ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণীও কি একটা উত্তর দিবার জন্য তাঁর দিকে চাহিতে গিয়া সহসা উঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিলেন! জুতা চাপিয়া সাবধানে নিঃশব্দ পদে শক্ত্যানন্দ স্বামী আসিতেছেন! মুখে তাঁর সেই সর্ব্বজন-মুগ্ধকর অদ্ভুত হাসি, দৃষ্টিতে ক্ষুধার্ত্ত লালসা! তিনি ব্রহ্মচারিণীকেই লক্ষ্য করিতেছেন!—একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে এবং তীব্র অস্বস্তিতে ব্রহ্মচারিণীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল!

ত্রস্তে মাথায় কাপড়টা একটু বেশী করিয়া টানিয়া, মণিকে সরাইয়া দিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী উঠানের দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির মত উঠিয়া বসিলেন।

স্তব্ধ-বিমূঢ় মানুষগুলিকে কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া, স্বামিজী নিজেই কৈফিয়ৎ ছন্দে বলিলেন "প্রসাদ, বইখানা আশ্রমে ফেলে এসেছিলে, তাই দিতে এলাম।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া প্রীতহাস্যে বলিলেন "আপনি বেশ ভাল আছেন? এ ছেলেটি কে?"

ব্রহ্মচারিণী কথা বলিতে পারিলেন না। দূর হইতে নিঃশব্দে প্রণাম করিলেন মাত্র। স্বামিজী নিকটে আসিয়া ব্রহ্মচারীর কম্বলের উপরে বইখানা রাখিয়া কাহারও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া, নিজেও সেই কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখ শুকাইল।

উত্তর না পাইয়া স্বামিজী ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন "এ ছেলেটি কে ?"

ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে মণির পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তার পর মণির দিকে চাহিয়া বলিলেন "মণে, যা খেয়ে আয়। আর রাত করিস্ নি।"

অর্থাৎ ইহাঁদের সরাইয়া দিবার ইঙ্গিত! ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন। মণির হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী ও স্বামিজী নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

মণি রান্নাঘরে গিয়া খাইতে বসিল। কিন্তু সিংহের গল্প আর জমিল না। ছোট মা বড় অন্যমনস্ক। গল্পের মধ্যে অসহনীয় রকমে ভুল হইতে লাগিল। মণি বার বার ভুল সংশোধন করিয়া দিল, আবার ভুল হইল। আবার সংশোধন, আবার ভুল! ক্রমাগত ইহাই চলিল।

খাওয়া শেষ হইলে মণিকে আঁচাইয়া দিবার জন্য রান্নাঘরের বাহিরে জল-নিকাশের নর্দ্দমার কাছে ব্রহ্মচারিণী লইয়া আসিলেন। সেখান হইতে উভয়ের উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। স্বামিজীর কি কথার উত্তরে ব্রহ্মচারী ব্যগ্র আপত্তির সুরে বলিতেছেন,—"আমায় বল্‌বেন না আর!"

স্বামিজী বলিলেন "কেন বল্‌ব না ? তুমি স্বামী!"

ব্রহ্মচারী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"স্বামিজি, স্বামীর উপরে স্বামী একজন আছেন! এ আসুরিক দৌরাত্ম্যের অপরাধ তিনি স্বয়ং গ্রহণ করবেন! তাঁর বিচার, তাঁর দণ্ডে পরিত্রাণ পাব কি ?"

অবজ্ঞাসূচক হাস্যে স্বামিজী বলিলেন "কি চিত্ত-দৌর্ব্বল্য! কি ভ্রান্তি! এ বুজরুকি তোমায় শেখালে কে ?"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি বলেন মশাই! মনের ভেতর একটা অপবিত্র কামনা রেখে ওঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে। ভয়ে বুক ধড়্ ফড়্ করে, মনে হয় হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ভেঙে গেল!"

উত্তর হইল "হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য মাত্র! এ চক্ষুলজ্জা শাদা চোখে ঘোচ্‌বার নয় ?"

"গাঁজা টেনে চোখ লাল করব ?" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন।

স্বামিজী হাসিলেন না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন "গুরুর আদেশে তাও করতে হয়। যদি গুরু বলে স্বীকার করো,—তবে যা আদেশ করব, অন্ধ বিশ্বাসে চোখ বুজে তাই পালন করতে হবে। তাতে মৃত্যু ঘটে, সেও স্বীকার! বল্‌তে পাবে না—'না'!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "মৃত্যুকে ডরাই না, কিন্তু অপমৃত্যুও প্রার্থনীয় নয়!—অন্ধ-বিশ্বাসকেও ভয়ানক ডরাই। দেহজ্ঞান যাঁর সম্পূর্ণ লয় হয়ে গেছে, খুব উঁচু অবস্থায় যাঁরা উঠে গেছেন, এ সব সাংঘাতিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা আত্ম-পরীক্ষা করে,—আত্মজয়ে তাঁরাই কৃতকার্য্য হতে পারেন। সাধারণ মানুষ এ সব নিয়ে অনধিকার-চর্চ্চা করতে গেলে নিজেকে কলুষিত, অভিশপ্ত করে বলেই আমার আশঙ্কা হয়।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন "অনুপযুক্ত গুরুর দোষেই সে হয়। উপযুক্ত গুরু পিছনে থাক্‌লে কোন আশঙ্কা নাই। তবে শিষ্যের পক্ষে চাই, অন্ধ নিষ্ঠায় গুরু-ভক্তি,—চাই প্রাণপণে আদেশ পালন। পারবে না সেটুকু ? আমায় একবার বিশ্বাস করেই ঢাখো।"

ব্রহ্মচারী দমিলেন। কাতর কণ্ঠে বলিলেন "আমায় আর একটু সময় দিন, স্বামিজি!"

স্বামিজী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "একেই বলে মতিচ্ছন্ন! আহাম্মক, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি!' ওঁকে ডাক, আমিই বোঝাচ্ছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহির হইতে বুধন ডাক দিলেন "মণি বাবু—"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে সুস্থে মণিকে আঁচাইয়া হাত পা ধোয়াইয়া, মুখ হাত পা মুছাইতে মুছাইতে স্থির কর্ণে উভয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন। যা শুনিলেন, ইহাই যথেষ্ট। বুধনের ডাক শুনিয়াই বলিলেন "তেওয়ারীকে বাড়ীর ভেতর ডাক মণি, খেতে দিই।"

মণি উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল। তেওয়ারী বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে পুনশ্চ সাড়া দিলেন "ছোট বাবু।"

ব্রহ্মচারী থতমত খাইলেন। শশব্যস্ত উঠিয়া বলিলেন "হাঁ। এস তেওয়ারি।"

স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি তাহলে এখন আসুন। পারি ত কাল গিয়ে দেখা করব।"

মূর্ত্তিমান বিঘ্নরূপী তেওয়ারীর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামিজী বিনাবাক্যে উঠিলেন

অপ্রসন্ন মুখে তেওয়ারীর পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তেওয়ারীও নীরবে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবামাত্র, তেওয়ারীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী অদৃশ্য হইলে, ব্রহ্মচারীর দিকে বেশ একটু কড়া দৃষ্টিপাত করিয়া তেওয়ারী বলিলেন "ঠাকুরজী কে ছোট বাবু? বাড়ীর ভেতর এসেছিলেন কেন?"

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন এ প্রশ্ন তেওয়ারীর পক্ষ হইতে হয় নাই। জ্যাঠা মহাশয়দের পক্ষ হইতে হইতেছে। সসঙ্কোচে বলিলেন "আমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

ব্রহ্মচারীর দিকে একটা ভর্ৎসনার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তেওয়ারী বলিলেন "লোকটা দারু পিয়ে এসেছিল, গন্ধ টের পেয়েছ? পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বুঝলাম।"

ব্রহ্মচারিণী সেই সময় জল ও পীড়া লইয়া রোয়াকে উঠিয়া তেওয়ারীর ঠাঁই করিয়া দিলেন। তিনি সরিয়া গেলে, ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে বলিলেন "তেওয়ারি, জ্যাঠা মশাইদের কাণে যেন এ কথা ওঠে না, দেখো বাপু। উনি যে খেয়ে এসেছিলেন, তা আমি বুঝতে পারি নি। তাহলে বাইরে নিয়ে যেতাম।"

তেওয়ারী অসন্তোষের সহিত বলিলেন—"মাতালের সব থাকে,—মনুষ্যত্ব থাকে না। সব জ্ঞান থাকে,—কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ সব লোক, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকবে, এটা ভাল কথা নয়। আর তুমিই বা ওদের সঙ্গে মিশছ কেন?"

ব্রহ্মচারী মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

ব্রহ্মচারিণী আহার্য্য আনিয়া দিলেন। তেওয়ারী ছোটবাবুকেও আহারে বসিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিলেন; ব্রহ্মচারী যথাবিহিত ওজর আপত্তি করিয়া তেওয়ারীকে আহারে বসাইলেন। তিনি একটু পরে বসিবেন।

খাইতে খাইতে নানা কথার পর বৃদ্ধ বলিলেন "তাহলে পর্শু ছোট-বৌমাকে নিয়ে, যাচ্ছ ত?"

মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কোথায় সে বিয়ে বাড়ীর হট্টগোলের মধ্যে যাব? আমার কায-কর্ম্মের ব্যাঘাত হবে, আমি যাব না। তোমাদের ছোট-বৌমা যেতে চান ত সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তুমি কোথা থাকবে?"

"এই খানে।"

"একলা?"

"আবার কি?"—বলিয়া একটু ভাবিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কিম্বা দিন কতকের জন্যে শ্রীক্ষেত্রে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। দেখি, পারি ত তাই যাব।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া তেওয়ারী বলিলেন "হুঁ। তা'পর, কর্ত্তাবাবুরা মাথা চাপড়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। ও সব হবে না। এখানকার ডেরা ডাণ্ডা তুলে, চল পাটনা। তোমায় একা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

ব্রহ্মচারিণী দুধ ও মিষ্ট পরিবেশন করিতে আসিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিলেন। মাথায় ঘোমটা টানিয়া, পরিবেশন করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারী অদূরে নিজের কম্বলে বসিয়া তেওয়ারীর খাওয়া দেখিতেছিলেন। তেওয়ারীর কথা শুনিয়া নিঃশব্দে হাসিলেন।

তেওয়ারী বলিতে লাগিলেন "কর্ত্তা বাবুরা বুড়ো হয়েছেন, কোন্ দিন আছেন, কোন্ দিন নেই। বড়-গিন্নিমা বাতে পঙ্গু হয়েছেন, কেবল তোমাদের জন্যে কাঁদেন। আর ক'দিনই বা তাঁরা আছেন? এখন তাঁদের ছেলে তাঁদের কোলের কাছে থাকবে চল। তার পর তাঁরা কৌত হলে তোমার এই বাতিক নিয়ে যেখানে খুশী হৈ হৈ করে বেড়িও।"

তেওয়ারী অনেক বুঝাইলেন। ব্রহ্মচারী কি বুঝিলেন, কি না বুঝিলেন তিনিই জানেন। নতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

তেওয়ারী খাইয়া আঁচাইয়া বাহিরে গেলেন। ব্রহ্মচারীও নিজের কম্বলটা ঝাড়িয়া পাতিলেন। তার পর গামছা লইয়া কুয়াতলায় গেলেন।

একটু পরে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী তখন কম্বলের কাছে তাঁর আহার্য্য রাখিয়া অদূরে থামে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর দিকে একবার চাহিলেন। অসময়ে স্নানের অর্থ বুঝিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না। মণি তাঁর গায়ে ঠেস দিয়া তন্দ্রালস চক্ষে ঝিমাইতেছিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া

বলিলেন "কিরে, তুই এখনো জেগে আছিস? এতক্ষণ ছিলি কোথা? রান্নাঘরে?"

রান্নাঘরেই ছিল বটে। কিন্তু যার হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে লুকাইয়া ছিল, তার কাছেই সে কথা স্বীকার করা, মোটে সমীচীন বোধ করিল না। ছোটমাকে আর একটু ঠাসিয়া বসিল, এবং তাঁর আঁচলটা টানিয়া নিজের মুখে আড়াল দিল।

তার রকম দেখিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন, বলিলেন "কেবল মায়েদের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রয়েছিস্! তুই কি ছেলে রে? কাঙারু-শাবক না কি?"

বলিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য তিনি নিজের ঘরে ঢুকিলেন। মণি মুখের কাপড় সরাইয়া ফিস ফিস্ করিয়া বলিল "হাঁগা ছোটমা, কাঙারু-শাবক মানে কি?"

ব্রহ্মচারিণী অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন; সংক্ষেপে বলিলেন "কাল বল্‌ব।"

মণি বলিল "রাত্তিরে বল্‌তে নেই বুঝি? হাঁ গো, কাল কখন আমাদের মোট পুঁটুলি বাঁধা হবে? রেল গাড়ীতে যেতে যেতে তুমি আমায় অনেক গল্প বলো ছোট-মা, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব।"

ছোট-মা হাঁ না কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীকে বাহিরে আসিতে দেখা গেল। অতএব মণি তৎক্ষণাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়া, ছোটমার কোলে মাথা রাখিয়া পুনশ্চ নির্ঝুম হইল।

দড়িতে কাপড় শুকাইতে দিয়া ব্রহ্মচারী আসিয়া আহারে বসিলেন। নিবেদন করিয়া হেঁট হইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন "মণেকে শুইয়ে দাও। ওর ঘুম এসেছে যে।"

আঁচলের আড়াল হইতে মণি ফোঁস করিয়া উঠিল "নাঃ, ছোটমার খাওয়া হলে আমি ছোটমার সঙ্গে শোব।"

"ওরে শূয়ার, তুই এখনো টাট্‌কা আছিস্! আয়, আমার কম্বলে শো।"

"না।"

"না কেন?"

"তোমার কম্বল ভাল নয়।"

"তোর ছোটমার কম্বল বুঝি বৈকুণ্ঠের আমদানি?"

বৈকুণ্ঠ যে কোথা এবং সেখানে কম্বল নামক কোন বস্তু যথার্থই প্রস্তুত হয় কি না, মণি তার কোন সংবাদ রাখিত না। অসংকোচে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। মুখ তুলিয়া এবার ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ও কি সত্যিই কম্বলে শোবে? পারবে ঘুমুতে?"

ব্রহ্মচারিণী অন্য মনে উত্তর দিলেন "একখানা চাদর পেতে নেব।"

তার পর ডান হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁর আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেন কে জানে,—বলিতে বাধিল। সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ করিয়া, হেঁট হইয়া নীরবে খাইতে লাগিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন বালক এই অবকাশে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

আহার শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন। বলিলেন "বাসন কোসন যেখানে যা পড়ে রইল থাক। এ দুদিন গোবরের মাকে দিয়ে কায করাও। যাও, খেয়ে এস। মণে ঘুমিয়ে পড়েছে? ওকে তুলে শুইয়ে দিয়ে আসব?"

ব্রহ্মচারিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ত্যাগ-ব্রতের লক্ষ্য অনেক বড়। সে পথে এগোতে চাইলে সকলের আগে চাই,—অপবিত্র, মলিন বাসনা ত্যাগ করা। শুদ্ধ পবিত্র বাসনা ত্যাগ করা নয়,—তাহলে মুক্তির পথে এগোন অসম্ভব হয়ে পড়ে,—নয় কি?"

ব্রহ্মচারী আঁচাইবার জন্য উঠিতেছিলেন, আবার বসিলেন; শুষ্কমুখে ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন "হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "শক্ত্যানন্দ ঠাকুর এত রাত্রে তোমায় ভৈরবী-তন্ত্র দিতে এসেছিলেন কেন? আমায় পড়াবার জন্তে?"

ব্রহ্মচারী বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কি মুস্কিল!"

অতি ধীর স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ঠিক তাই! কিন্তু আমি জল পড়ার ভূত নয়! রাজ-দর্শনে যেতে হয়, শুচি-শুদ্ধ হয়ে ভদ্র আচারে দরবারের পথ দিয়ে যায়, মেথর খাটবার পথ দিয়ে যাবার প্রবৃত্তি নেই। নিজের কার্য্যসিদ্ধির

জন্তে তিনি যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমার কার্য্যহানির জন্তে উপদ্রব কর্‌তে নিষেধ কোরো।"

সে কথা ব্রহ্মচারীর কাণে গেল কি না, তিনিই জানেন। মহা ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন "কি বিপদ, বইখানা গেল কোথা ?"

হাত বাড়াইয়া পিছনে থামের আড়ালটা দেখাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারিণী সংযত স্বরে বলিলেন "এই খানে আছে। বই-খানা কম্বলের পাশে রেখে তুমি অন্তমনস্ক হয়ে নাইতে গেছ, তোমার এই ছেলে এসে—কৌতূহলী হয়ে বইয়ের মাঝ-খানটা খুলে কুৎসিত অশ্লীল শ্লোকোদ্ধার করে আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছে এর মানে কি ?"

ব্রহ্মচারী অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া মুহ্যমান,—স্তব্ধ রহিলেন।

সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ভাল, ব্রহ্মচারি, ভাল! তোমাদের কারুর মধ্যে ঈশ্বর-ভক্ত সাধু সাজবার লোভ হয়েছে, কারুর মধ্যে কর্ম্মফল-লব্ধ দুঃখ-কষ্ট এড়াবার লোভ হয়েছে, কারুর মধ্যে সস্তায় কিস্তিমাৎ করে বৈধ, অবৈধ ভোগ-সুখের লালসা জাগ্রত হয়েছে ; অতএব সবাই—লোভের খাতিরে মহাপুরুষের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের জোরেই কার্য্যসিদ্ধি করো। তোমার টাকা-কড়ি তাঁর কারণ-সলিলে সমাধিলাভ করুক, তোমার মূল্যবান কাযের সময় তাঁর লীলা-খেলা দর্শনে সদ্ব্যয় হোক, —কিছুই বলবার নেই আমার! কিন্তু তুমি যে ভদ্র, তুমি যে জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র স্বভাব, এটুকু বিশ্বাস রাখার অধিকারে আমায় বঞ্চিত কোরো না। তা যদি করো তা হলে, পৃথিবীতে আমার সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়টাই সব চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।"

ব্রহ্মচারী নির্ব্বাক, নতশির।

নিদ্রাচ্ছন্ন মণিকে উঠাইয়া ব্রহ্মচারিণী নিজের শোবার ঘরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এবার ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে বলিলেন "খাবে কখন ?"

"মন সুস্থ হলে। আপাততঃ ক্ষিদে-তেষ্টা নাই, খাওয়া সহ্য হবে না।"

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ অনুরোধ করিতে উদ্যত হইতেই তিনি যোড়হাত করিয়া বলিলেন "বোলো না।"

ঘরে ঢুকিয়া তিনি দুয়ার বন্ধ করিলেন। সে রাত্রে আর বাহির হইলেন না। জলস্পর্শ করিলেন না।

(৩৮)

ভোরে উঠিয়া ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারী উঠিয়াছেন। গোবরের মাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। সে এঁটো বাসন গুছাইয়া লইয়া ঘাটে মাজিতে যাইয়েছে। ব্রহ্মচারী উঠানে আম গাছের নীচে পায়চারি করিতে করিতে নিমকাঠি দিয়া দাঁত মাজিতেছেন।

কেহ কাহারও দিকে চাহিলেন না, কেহ কথা কহিলেন না। বাসনের আশা ছাড়িয়া, ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘর ধুইয়া যথারীতি ঘর দুয়ার ঝাঁট দিয়া, স্নান করিয়া পূজার বারেণ্ডায় ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী তার আগেই স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। আজ তিনি তখনও নিজের আসনে বসেন নাই। পূজার ঘরের দুয়ারে বসিয়া ধুনাচিতে আগুন দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারিণী বারেণ্ডায় ঢুকিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে ঢুকিবার পথ পাইবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী সঙ্কেতটা বুঝিলেন, কিন্তু সরিলেন না। নতমুখে নিম্নস্বরে বলিলেন "তুমি কি ঠিক করলে ? সত্যিই এদের সঙ্গে যাবে ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সে আলোচনা পরে হবে। তুমি সরো, আমি এখন আহ্নিক পূজো সেরে নি।"

মাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "পরে কখন হবে ? মণে উঠ্‌লে সে ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে।"

"ঘুরলেই বা। তোমার যা বলবার আছে, তার সামনেই বোলো।"

ম্লান হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন "উহুঁ। সে গিয়ে হয় ত জ্যাঠামশাইদের কাছে সব বলে দেবে। তাঁরা একেই ত আমার ওপর কত সন্তুষ্ট, হয় ত আরও চটে যাবেন।"

সংযত স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "চট্‌বার মত কথা না বললেই পারো। তাঁদের অনেক জ্বালাতন করেছ, এখন যতটা পারো সন্তুষ্ট রেখে চলো।—তাঁদের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদের উপর আমাদের জীবনের অনেক কল্যাণ নির্ভর করে।"

বিমর্ষভাবে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী নতমুখেই বলিলেন "সত্যিই তোমার যেতে ইচ্ছা আছে ?"

"তোমার মত কি ?"

এবার ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে মুখ উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় এবং বোধ হয় রাত্রি জাগরণের অবসাদে আচ্ছন্ন। মুখের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তুমি কি রাত্রে ভাল ঘুমোও নি ?"

বিষণ্ণ হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন "সারারাত নয় !""

"কেন ? কাল রাত্রে ত বেশ ঠাণ্ডা ছিল। শরীর অসুস্থ হয় নি ত ?"

মাথা হেঁট করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "না।"

তার পর পুনশ্চ দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন "সংসারীদের সংস্রব আর কেন ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণেক ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, ব্রহ্মচারিণী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন "দুয়ার ছাড়, আমি ঘরে ঢুকি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সরিলেন না। বিষাদ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন "বিষয়ীদের সংস্রবে আর না যাওয়াই ভাল।"

ব্রহ্মচারীকে উঠিতে দেখিয়া ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীকে নিশ্চল দেখিয়া আবার পিছাইয়া দাঁড়াইলেন ; ধীর স্বরে বলিলেন "বিষয়-হীনের নিঃশ্বাসেও যখন কামনার উত্তাপ ভোগ করতে হচ্ছে, তখন বিষয়ীদের সংস্রবে আপত্তি করলে চলবে কেন ? আর, গুরুজনরা আমার কাছে গুরুজনই ! তাঁরা বিষয়ী কি বিষয়ত্যাগী, তা আমার দেখবার দরকার নাই ; আমার অধিকার—মাত্র সেবায়। গুরুজনদের সংস্রবে বাস করে, তাঁদের সেবা-শুশ্রূষায় আত্ম নিয়োগ করায় আমাদের যথেষ্ট উপকার হতে পারে।"

ব্রহ্মচারী ম্লান মুখে পরিহাস-ভরে বলিলেন "উপকার কি ? সংসারাসক্তি ?"

"না। চিত্তবিকার সংশোধনের সুযোগ !"

ব্রহ্মচারী নতশিরে স্তব্ধ রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পুনশ্চ বলিলেন "অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে শীঘ্রই কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নইলে—"

নতমুখে আগুনে বাতাস করিতে করিতে ব্রহ্মচারী বলিলেন "নইলে কি ?"

"জীবনের গুরুতর অকল্যাণ-আশঙ্কা। অতি কষ্টে ধাপে ধাপে উঠে, যেখানে এগিয়ে গেছ, সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে পড়তে হবে।"

ব্রহ্মচারী প্রথমটা কথা বলিতে পারিলেন না। তার পর প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন "আবার এগিয়ে যেতে কতক্ষণ ?"

"সামর্থ্য নষ্ট হলে এগিয়ে যাবে কিসের জোরে ? সাধনার জন্যে কি চাই, না চাই, সব খবরই ত জানো। শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের ইঙ্গিতে"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী অপ্রসন্ন ভাবে নিজের অধর দংশন করিয়া থামিলেন। মাটীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন "অপব্যয়ে সাধন-পথের সব পাথেয় যদি উজাড় করে দাও, তাহলে জীবনটাই যে দেউলিয়া হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। ক্লেশভরে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন "যায় যাবে। সন্ন্যাস না হয়,—সংসার ত হবে।"

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বাঃ, বাঃ, ব্রহ্মচারি ! এই সঙ্কল্প স্থির করতেই বুঝি সারারাত জেগে ছিলে ? শক্ত্যানন্দ ঠাকুর ক্ষমতাবান লোক বটে ! তোমার শক্তি-হরণে তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন !"

ভয়ঙ্কর চমকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি বল্লে ? শক্তি-হরণ ?"

ধীর স্থির কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "হাঁ। নইলে তোমার মুখ থেকে এ কথা বেরোয় ? তোমায় বার বার সাবধান করেছি, সঙ্গত্যাগী হয়ে কায করবার জন্যে অনেক অনুরোধ করেছি,—কথা গ্রাহ্য কর নি। এখন ভোগ কর তার প্রতিক্রিয়া ! চেয়ে ছাখো ব্রহ্মচারি ! যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, সেখানে যথেচ্ছাচারের শাস্তি অতি কঠিন, অতি ভয়ঙ্কর ! তোমার শক্ত্যানন্দ ঠাকুর যতই বিজ্ঞতার ভাণ করুন,—এখানকার খবর জানতে তাঁর এখনো ঢের দেরী ! আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, সরো। পথ দাও।"

অন্ধকার মুখে ব্রহ্মচারী পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিলেন। ঘর ঝাঁট দিয়া, হাত ধুইয়া, গামছায় হাত পা মুছিয়া নিজের আসনে বসিলেন। তাড়াতাড়ি বলিয়া ধুনাচিতে আগুন করিলেন না, শুধু একটা ধূপ জ্বালাইয়া ধূপদানিতে রাখিয়া যথারীতি আচমন করিয়া পূজাহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারী জলন্ত ধুনাচি লইয়া নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণীর আসনের নিকট হইতে শূন্য ধুনাচিটা তুলিয়া লইয়া, নিঃশব্দে তাঁর আসনের পিছনে বসিলেন। নিজের ধুনাচি হইতে আগুন লইয়া তাতে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

অতর্কিতে তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নিজের কাযে একান্ত তন্ময় ব্রহ্মচারিণী সেই শব্দে চমকিয়া চোখ মেলিলেন। পিছন ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলেন।—কে জানে কেন, সহসা অধীরভাবে বিষম উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "কি ?"

তাঁর এই আকস্মিক উত্তেজনায় ব্রহ্মচারীও বিস্মিত হইলেন। ম্লানমুখে বলিলেন "কিছু নয়। তোমার ধুনুচিতে আগুণ দিচ্ছি। ও কি, উঠ্‌ছ কেন ?"

ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রহ্মচারীও সসঙ্কোচে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণী জানু পাতিয়া আবার আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং পর মুহূর্ত্তে অশ্রুসজল নয়নে যোড়হাত করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন "তোমার পায়ে পড়ছি ব্রহ্মচারি, ঘৃণ্য প্রলোভনে আত্মহারা হয়ো না, শান্ত হও। তোমার নিঃশ্বাসেও আমায় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সরে যাও।"

মাথা হেঁট করিয়া বাহিরে গিয়া ব্রহ্মচারী দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন ; একটি কথাও বলিলেন না।

আহ্নিক পূজা সারিয়া ব্রহ্মচারী আজ অনেক বিলম্বে উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মচারিণী যথারীতি তাঁর ও মণির জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। তাঁর মুখভাব সম্পূর্ণ প্রশান্ত, নির্ব্বিকার। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে যে অশান্তিকর ভাব-সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছিল, তার কথা বোধ হয় ব্রহ্মচারিণীর স্মরণ ছিল না, কিম্বা স্মরণ থাকিলেও বোধ হয় তার জের টানিয়া চলিবার ইচ্ছা ছিল না। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া, মালা নমস্কার করিয়া গলায় রাখিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন "তেওয়ারী উঠেছেন কি না একবার খবর নাও। এখন যদি জল খান, ডেকে আন।"

ব্রহ্মচারীর মুখমণ্ডল বিষাদ-গম্ভীর। তিনি দৃষ্টি নামাইয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন "মণি উঠেছে ?"

"উঠেছে। কুয়াতলায় মুখ ধুতে গেছে। তুমি তেওয়ারীকে দ্যাখো। একটু শীঘ্র ফিরো।"

ব্রহ্মচারী বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তেওয়ারী উঠেছে। আরও বেলা হোক,—ধীরে সুস্থে স্নানাহ্নিক করে তবে জল খাবে। বেলা বারোটায় কমে, ওর গায়ত্রী জপবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আসবে না।"

তার পর আসনে বসিয়া বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা এসেছেন। ওঁর পুকুরে আজ মাছ ধরা হচ্ছে, অতএব ওঁর বাড়ীতে আজ দু-বেলাই তেওয়ারী আর মণির নিমন্ত্রণ। অতিথি দুটিকে ধার দেবার জন্য তোমায় অনুরোধ জানালেন।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সেদিন তাঁর অতিথি ধার চাওয়া হয়েছিল বলে তিনি ঝগড়া করেছিলেন নয় ? আজ আমি ঝগড়া করব। কই তিনি ?"

ব্রহ্মচারী এবার দৃষ্টি তুলিয়া ম্লান হাস্যে বলিলেন, "তেওয়ারীর সঙ্গে কথা কইছেন। পরে ঝগড়া কোরো। আগে জল খেয়ে এস। সেই কাল দুপুরে হবিষ্য করেছ, রাত্রে রাগের মাথায় আর জলস্পর্শ করলে না, মনে আছে ?"

মনে ছিল না, এবার মনে পড়িল। এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা ব্রহ্মচারী এখনও স্মরণ রাখিয়াছেন দেখিয়া ব্রহ্মচারিণী একটু বিস্মিত হইলেন, একটু লজ্জিত হইলেন ; কিছু বলিলেন না, শুধু নীরবে হাসিলেন।

ব্রহ্মচারী যথারীতি আহার্য্য নিবেদন করিয়া মুখ তুলিলেন। হাত গুটাইয়া বলিলেন "কই ? মণে এখনো এলো না। কোথায় সে ?"

কাপড় বদলাইয়া ব্রহ্মচারিণীর ঘরের ভিতর হইতে মণি বাহির হইল। এক ছুটে আসিয়া ব্রহ্মচারিণীর কম্বলের কাছে বসিয়া সসম্ভ্রমে সানুনয়ে বলিল "এবার তোমার ছোঁব ছোটমা ?"

ব্রহ্মচারিণী স্মিতমুখে বলিলেন "ছোঁও।"

ছোঁয়া আর কিছুই নয়, শুধু ঠেস দিয়া বসা মাত্র। বসিয়া নিজের জলখাবারের পাত্র কাছে টানিয়া লইয়া মণি গম্ভীর হইয়া আদেশ করিল "ছোট্‌কা আগে খাও। তুমি বড় ছেলে।"

দুজনে খাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী নীরব। সস্নেহে মণির পিঠে হাত বুলাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আজ

আমাদের ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে তোমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে মণি, দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে যেও।"

গভীর অবজ্ঞা-ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মণি বলিল "কে আবার তোমাদের ঠাকুর্দ্দা? নাঃ, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাব না, আমি তোমার সঙ্গে হবিষ্যি করব।"

মিনতি করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আজ পূর্ণিমা। আমাদের হবিষ্য নেই বাবা।"

"তাহলে তুমি কি খাবে?"

"সরবৎ, ফল, দুধ।"

মণি উৎসাহের সহিত বলিল "আমিও তাই খাব।"

ব্রহ্মচারিণী রাগ জানাইয়া বলিলেন "তাহলে আমি আজ নির্জ্জলা উপবাস করব।"

মণি অম্লান বদনে বলিল "আমিও তাই করব।"

এবার ব্রহ্মচারী হাসিলেন, বলিলেন "ওরে শূয়ার! জল টল খেয়ে নির্জ্জলা উপবাস কি?"

মহা তর্ক বাধিল। অনেক কষ্টে অনুনয় বিনয় করিয়া, নিজেদের মহামান্য ঠাকুর্দ্দার সম্মান রক্ষার জন্য মণিকে নিমন্ত্রণে রাজী করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আমাদের এখানটা তোমার কেমন লাগছে মণি? বেশ ভাল ত?"

মণি দুঃখের সহিত বলিল "সব বেশ ভাল। শুধু তোমার একটা ছোট ছেলে থাকলে বেশ হোত, তাকে নিয়ে আমি খেলা করতুম।"

ব্রহ্মচারীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হইল; তিনি আরও মাথা হেঁট করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া, সস্নেহে মণির মাথা চাপড়াইয়া অসঙ্কোচে বলিলেন "ওরে বাপ্‌রে! এই সব ধাড়ি ছেলেদের সাম্‌লাতেই প্রাণ অস্থির, আবার ছোট ছেলে! মানুষ করবে কে?"

মণি তৎক্ষণাৎ বলিল "আমি করব! তুমি শুধু একটু করে দুধ খাইয়ে দিও। আমি তাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাব। বেঞ্চিতে কাঁথা পেতে শুইয়ে রেখে, পড়ব। সে খেলা করবে, ঘুমুবে। মেজদা বলেছে ছোটমার ছেলে হলে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াবে।"

ব্রহ্মচারী একবার মণির দিকে চাহিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পাছে ব্রহ্মচারিণীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হয়, সেই ভয়ে সসঙ্কোচে দৃষ্টি নামাইয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন "তাহলে ত সব দিকেই নির্ঝঞ্ঝাট পাকা বন্দোবস্ত। আর ভাবনা কি?"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সেটা অবিবেচক অনভিজ্ঞের কাছে—সুবিবেচক অভিজ্ঞের কাছে নয়। মা বাপের দায়িত্ব এত সোজা, এত সহজ হলে পৃথিবীর সব ছেলেই—'মানুষ' হোত, 'ভূত প্রেত' হোত না।"

তার পর মণির দিকে গোপনে ইঙ্গিত করিয়া হাসিমুখে বলিলেন "কিন্তু এখানে আসল কথা হচ্ছে,—সেখানকার বাড়ীর ভাই-বোনদের জন্যে মন কেমন করছে এবার। তাই 'নানা-বাহানা' সুরু হয়েছে। একবার সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে চরিয়ে আন্‌তে পারো? সেখানে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব হলে হাঙ্গামা মিটে যাবে।"

ব্রহ্মচারী জল খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। নিজের ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন "মণে, জামা জুতো পরে নে। চল, তোকে গোচারণের মাঠ দেখিয়ে আনি।"

মণিকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সমস্ত দিনে উভয়ের আর কোন কথা হইল না। বিবাহের নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া, ব্রহ্মচারী ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সারাদিন বাহিরে ঘুরিলেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কর্ম্মা, তাঁহারা কালই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের তেওয়ারী ও মণির সহিত কাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। যাঁহারা কাযের লোক, তাঁহারা এতদিন থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের সকলকে বিবাহের পূর্ব্ব দিন ঠাকুর্দ্দার সহিত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইলে ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তুই কবে যাচ্ছিস?"

ব্রহ্মচারী মাথা চুলকাইয়া অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। আহ্নিক পূজার ব্যস্ততায় অজুহাত জানাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ঢুকিয়া ব্রহ্মচারী আহারে বসিলেন। মণি তখনও জাগিয়া ছিল, বলিল "ছোটকা, তোমার জিনিসপত্র কি কি যাবে? মোট পুঁটলি বাঁধবে কখন?"

মণির দিকে চাহিয়া একবার ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কাল বলব।"

(৩৯)

পরদিন সকালে যথাসময়ে অহ্নিক পূজা শেষ করিয়া ব্রহ্মচারিণী পূজার ঘরের দুয়ার খুলিতেই দেখিলেন দুয়ারের সামনে সরু বারেণ্ডায় ব্রহ্মচারী কম্বল বিছাইয়া শুইয়া আছেন। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু শীঘ্র শীঘ্র তিনি পূজা পাঠ সারিয়া উঠিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এখানে শুয়ে? মাথা ঘুরছে না কি?"

"না" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া দুয়ার চাপিয়া বসিলেন। বলিলেন "বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ব্রহ্মচারীর স্বর গম্ভীর—ধীর।

ব্রহ্মচারিণী তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন:—না, সে মুখ, বর্ব্বর ঔদ্ধত্যে, উদ্যত অপরাধীর মুখ নয়। সে মুখ, আত্মজয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প স্থির-প্রতিজ্ঞ মানুষের মুখ!

ব্রহ্মচারিণী আশ্বস্ত চিত্তে নিজের পূজার আসনখানি পুনশ্চ বিছাইয়া দূরে ঘরের মেঝের বসিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন "অত দূরে নয়। তেওয়ারী বাড়ীর ভেতর এসেছে, মণির বিছানার কাছে বসে আছে। বেশী চেঁচিয়ে কথা হবে না।"

ব্রহ্মচারিণী আসনখানা টানিয়া দুয়ারের কাছে আনিয়া বসিলেন। বলিলেন "বল।"

"তুমি এদের সঙ্গে আজ যাওয়াই ঠিক করেছ ত?"

নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "না গেলে কি ভাল দেখায়? এইটি বাড়ীর বড় মেয়ে। এর পর অন্য ছেলেমেয়েদের বিয়েতে না দাঁড়ালে চলে যাবে, কিন্তু প্রথম কাযটায় না দাঁড়ালে সকলেরই মনে দুঃখ হবে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, আমি কিছুই বুঝি না। বোঝবার সময়ও নাই। তুমি ভাল বোঝ,—যাও। আমি বারণ করব না। কিন্তু সেখানে বড়মার অসুখ, গেলে তুমি সহজে ফিরতে পারবে না, ফেরা উচিতও নয় বোধ হয়।"

ব্রহ্মচারীর কথায় বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আগে চল তো সেখানে, তার পর—"

"কে চলবে, আমি?" বলিয়া ব্রহ্মচারী ম্লান হাসি হাসিলেন। বলিলেন "আর নয়। সংসারের হট্টগোলে বাস করবার মত মনের অবস্থা আর নাই। এবার সংসারীদের সংস্রবে বাস করতে গেলে, হয় পুরো সংসারী হতে হবে, নয় অহর্নিশি দারুণ অশান্তি ভোগ করতে হবে।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "গঙ্গার দুকূলে একসঙ্গে বেড়ানো চলে না। এ কূলের শোভা দেখ্‌তে হলে, ও কূল ছাড়্‌তে হয়,—ও কূলের শোভা দেখ্‌তে হলে এ কূলের মায়া রাখা চলে না। যে কূল ছেড়েছ, সেখানে তোমায় আর যেতে বলি না। সেখানকার উদ্দাম অশান্তিকর ঝড়ঝাপ্টা—উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। বরঞ্চ এ কূলের এই স্নিগ্ধ শান্তিবহ আব্‌হাওয়ায় যদি শান্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করতে পারো, তবে নিজেকে সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু লাভের উপযুক্ত করে গড়ে নিতে পারবে। আমিও সেটা প্রার্থনীয় বলে মনে করি।"

ব্রহ্মচারিণী একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিলেন "সংসার তোমার নয়, তুমিও সংসারের নও। তা যদি হোত, তাহলে এত কাণ্ড ঘট্‌ত না। ও সব বৃথা জল্পনা ছেড়ে দাও। তবে গুরুর প্রতীক্ষায় যখন বসেই রয়েছ, তখন নিরাপদ স্থানেই বস্‌বে চল। গুরুজনদের কাছে থেকে অনাসক্ত নির্লিপ্ত হয়ে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তোমার বুকের জোর থাকে, তুমি যাও। আমায় সেখানে যেতে বোলো না। আমার যখন মনে পড়ে,—তাঁরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছেন, অনর্থক একটা নিরপরাধ ভদ্রলোকের মেয়ের জীবনটা পিষে দিয়েছেন,—তখন তাঁদের সমস্ত সংস্রব আমার কাছে বিষ হয়ে ওঠে!"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চোখে জল আসিল।

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। বলিলেন "তুমি করছ কি ব্রহ্মচারি? কাকে কর্ত্তা সাজাচ্ছ? তাঁরা নিমিত্তের হেতু মাত্র। আমার কর্ম্ম আমায় ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের দোষ কি? তাঁরাও কোনখানে আমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যে ক্রটি করেন নি। স্নেহ যত্ন মমতা, ভরণ-পোষণের ভার—কোনখানে তাঁরা কর্ত্তব্যে ক্রটি করেছেন, বল?"

ব্রহ্মচারী চোখের জল সামলাইয়া বিষাদ-ভরে হাসিলেন। বলিলেন "তোমায় চিনি। লোকে আত্মত্যাগ করে,—তুমি স্বহস্তে আত্ম-বলিদান করে বসে আছ!"

সবিদ্রূপ হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দোহাই তোমার!

আমি জীব-হিংসার বিরোধী। বলি দেওয়া যদি সত্যিই ঘটে থাকে, সেটা আমার কর্ম্ম নয়, জেনো।”

ব্রহ্মচারী সনিঃশ্বাসে ম্লান-হাস্যে বলিলেন “তবে আমারই কর্ম্ম। আর এও জানি, সাধনের পথে তোমায় সহধর্ম্মিণী পেয়েছি, কিন্তু যথেচ্ছাচারের পথে তোমায় সঙ্গিনী পাব না।”

ব্রহ্মচারিণী মৃদু স্বরে অতি নম্রভাবে বলিলেন “সেটা আশাও কোরো না।”

তার পর দুজনেই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন “ভালই হয়েছে। এই উপলক্ষে তুমি স্বেচ্ছায় আমায় ভারমুক্ত করে যাচ্ছ,—এটা ভালই হোল। আমাকেও অনুমতি দিয়ে যাও, আমিও এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ি।”

“কোথা ?”

“আপাততঃ পুরুষোত্তম।”

“তার পর ?”

“যেখানে হোক।”

“অজ্ঞাতবাসে ?”

“অন্ততঃ আত্মীয় বল্‌তে যেখানে একটীও প্রাণী আছে, সেখানে আর বাস করব না। যতদিন না চিত্ত স্থির হয়, ততদিন আমার খবরও কেউ পাবে না, তোমাদের খবরও আমি নেব না।”

ব্রহ্মচারিণী অত্যন্ত নিরীহভাবে বলিলেন “মন্দ কি ? তা এ সব বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার ত আমার নাই। মাথার ওপর যাঁরা অভিভাবক আছেন—”

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন “আমি তাঁদের কারও স্বার্থহানি করছি নে। স্বার্থহানি করছি শুধু তোমার! এ সংসারে আমার সঙ্গে তোমারই স্বার্থের সম্পর্ক সব চেয়ে বড়—”

“হায় ব্রহ্মচারি! এত বড় স্বার্থবুদ্ধির ক্রীতদাসই যদি হতাম, তাহলে তোমার এ বৈরাগ্য—” বলিয়া বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী নতমুখে মৃদু হাসিলেন।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন “কি ? এ বৈরাগ্য এতদিন রসাতলে পাঠাতে না কি ?”

যুক্ত-করে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন “রাম রাম! এত বড় অপরাধী-বাক্য উচ্চারণের সাহস আমার নেই। ভাবতেও আতঙ্ক হয়, ঘৃণা বোধ হয়। না ব্রহ্মচারি, এই সংযম-সুন্দর পবিত্র জীবন বহন করার জন্যে যে তোমায় নিন্দা করে করুক, যিনি তোমার ওপর রুষ্ট হন,—হোন—আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার উচ্চ লক্ষ্যের অনুমোদন করি। আমার সহানুভূতি তোমার জন্যে আছে,—থাক্‌বেও।”

কেন কে জানে, আজ প্রত্যেকবার কথা বলিতে বলিতে, কথা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর চোখে জল আসিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতা তিনি অতি সন্তর্পণে সামলাইয়া লইতেছিলেন, ব্রহ্মচারিণীকে জানিতে দেন নাই। কিন্তু এবার আর সামলাইতে পারিলেন না। ত্রস্তে উত্তরীয়-প্রান্তটা চোখে চাপা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন “তোমার শ্রদ্ধা, তোমার সহানুভূতি তোমাতেই থাক, আমার আর ও-সব জানবার শোনবার দরকার নেই। আমি বিদায় নিতে এসেছি, আমায় আজ অনুমতি দিয়ে যাও,—আমি সরে পড়ি।”

ব্রহ্মচারিণী কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর সহসা তরল কণ্ঠে হাসিয়া নিজের আসনখানা গুটাইয়া তুলিতে তুলিতে নিজের মনেই ব্যঙ্গ-চপল সুরে বলিলেন “এঃ! এ সন্ন্যাসীটি এবার মাটী হবার যোগাড় হয়েছেন! সাধে লোকে এ সব মানুষকে ঠাট্টা করে! এ কি বাসনা-ত্যাগ ? না বাসনা-বিক্ষোভ!”

ব্রহ্মচারী নীরব, নিস্পন্দ।

ব্রহ্মচারিণী সপরিহাসে বলিলেন “সরো। দুয়ার জুড়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাক্‌লে হবে না। আমার পথ ছাড়ো।”

ব্রহ্মচারী চোখের ঢাকা সরাইলেন না; তেমনিভাবে শুইয়া থাকিয়া ভারী গলায় বলিলেন “তোমার পথ ছেড়ে দিচ্ছি। তুমিও আমার পথ ছেড়ে দিয়ে যাও। বল,—আমি যাই।”

সহাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন “কি বিপদ! আমি কি তোমায় ‘যাও’ বল্‌বার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছি ? আমার ও-কথা বলবার অধিকার কোথা ? যাঁরা আজীবন তোমায় বুকে করে মানুষ করেছেন, মাথার ওপর যাঁরা মুরুব্বি রয়েছেন—”

"তাঁরা তোমার মুরুব্বি হতে পারেন, আমার নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ভাল—তাঁরা আমারই মুরুব্বি। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, নিজের হিতাহিত-ও আমি ভাল বুঝি না। আমার হিতাহিত বিবেচনার দায়িত্ব তাঁদের ওপর। যাও, তাঁদের কাছে গিয়ে অনুমতি নাও।"

"তাঁরা সে অনুমতি দেবেন না, তুমি মত দিয়ে যাও।"

"আমি অনধিকার-চর্চায় অপারগ!" বলিয়া একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন "রকম কি? তুমি মণিরই কাকা বটে! তার ভাইবোনদের জন্মে মন কেমন করছিল, সে বায়না শুরু করলে—'ছোটমার একটা ছোট ছেলে থাকলে বেশ হোত!' তোমার আজ কার জন্যে মন কেমন করছে তুমিই জানো,—এক অনাসৃষ্টি আবদার নিয়ে হাজির হয়েছ। বুড়ো বয়সে আর ছেলেমানুষী করতে হবে না, সরো।"

ব্রহ্মচারী নড়িলেন না। চুপ করিয়া যেমন শুইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন "এটা কিসের জন্যে হচ্ছে? ভালবাসায়?"

ব্রহ্মচারী তথাপি নীরব।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কিন্তু, ভালবাসাটা হচ্ছে কাকে শুনি? আমাকে? না নিজের মোহকে?"

ব্রহ্মচারী এবার বিচলিত হইলেন। উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। ধরা গলায় বলিলেন "সম্ভবতঃ নিজের মোহকেই! কিন্তু মনকে শাসন করাও অসম্ভব, সেই জন্যেই সরে যেতে চাইছি।"

"তার পর? সরে গিয়ে মিশবে কোথা? শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের দলে? না, বিন্দু বাবাজীর দলে?"

একটু বিরক্তির সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি ঠাট্টা করচ? আমার অবস্থা তুমি মোটেই বুঝতে পারছ না।"

"হয় ত তাই। কিন্তু তবুও কিছু কিছু বুঝতে পারছি। সন্ন্যাসির স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সংশোধনের উদ্যমও জেগেছে দেখে বড় সুখীও হচ্ছি। কিন্তু হঠকারিতা কোন ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় নয়। যথার্থ ভ্রমণশীল যোগী হতে গেলে যতখানি অবিকৃতচিত্ত, যতখানি সুদৃঢ় স্বাস্থ্য দরকার, তোমার এখনো সে অবস্থা আসে নি।"

ব্রহ্মচারী গম্ভীর হইয়া বলিলেন "অবস্থা আকাশ থেকে পড়ে না, তাকে গড়ে নিতে হয়।"

"তা হয়। কিন্তু তোমার মনের যা অবস্থা দেখছি, তাতে আত্ম-গঠনের উপাদানটা আপাততঃ কোন্ রকম পছন্দ করবে সেইটে চিন্তার বিষয়। শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের মন্ত্রণায় মন ত উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ভৈরবী-তন্ত্রের আসবাব-পত্রও হাতের কাছে মজুত—"

"আঃ! কেন জ্বালাতন কর? যাচ্ছি ত জন্মের মত, এ সময় আর রাগারাগি কোর না। ও সব কথা আর তুলো না।"

"কেন তুলব না? যত অনর্থের মূলই হয়েছে ওই সব চর্চ্চা।"—বলিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া ব্রহ্মচারিণী থামিলেন। একটু নীরব থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন "হয় ত তোমার দোষ নয়, গ্রহকোপের ফল। তাই এই অসৎ সঙ্গ জুটেছে, অবিবেক মতের গোলকধাঁধায় পড়ে নিজের শান্তি নষ্ট করছ, আমায়ও অশান্তি-পীড়িত করে তুলেছ!"

সবই সত্য। কিন্তু তবুও ব্রহ্মচারী প্রতিবাদ করিবার জন্য মুখ তুলিয়া কি বলিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারিণী বাধা দিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন "কুতর্কের জোরে ভগবানকেও ভূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা আমার জানা আছে। কুতর্কে আমি অক্ষম, ক্ষমা করো।—ব্রহ্মচারি, এই চপল মনোবৃত্তির ক্ষণস্থায়ী প্রেতলীলা,—এ ইন্দ্রজাল এক নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাকাশে উড়িয়ে দেওয়াই উদাসীনের কর্ত্তব্য! কোথায় বসে আছ সন্ন্যাসি? ওঠো।"

বলিতে বলিতে নিজের ললাটে তর্জ্জনী ঠুকিয়া ব্রহ্মচারিণী এক অদ্ভুত সঙ্কেতসূচক কটাক্ষে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত্তে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তকে তীব্র শিহরণ খেলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। তার পর স্থির নিস্পন্দ হইয়া চোখ বুজিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সংযত ধীর স্বরে বলিলেন "ধর্ম্মশীল মোক্ষার্থীকে পরাস্ত করে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ মন আকর্ষণ করে নেয় সত্য।—কিন্তু অপরাজেয়,—চির-অপরাজেয় এই আত্মিক-শক্তি!"

তার পর ভাবাভিভূত তন্দ্রাচ্ছন্নের মত উঠিয়া, পুনরায় নিজের পূজার ঘরে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারিণী কোন প্রশ্ন করিলেন না, কিছু মাত্র বাধা দিলেন না। নিঃশব্দে ব্রহ্মচারীর পরিত্যক্ত কম্বলখানি গুটাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(৪০)

ব্রহ্মচারী যখন আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। ছয় ঘণ্টা-ব্যাপী সুকঠোর পরিশ্রম,—মাঝে একবার মাত্র আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ব্রহ্মচারিণীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন। দারুণ ক্লান্তিতে সমস্ত মস্তিষ্ক অবসন্ন। মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারিণী প্রস্তুত ছিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না। সামনে জলখাবার ধরিয়া দিয়া নীরবে মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর তখন কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। অনেকক্ষণ স্তব্ধ-নির্ঝুম থাকিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন "মণে কই ? জল খেয়েছে ?"

"খেয়েছে। ঠাকুর্দ্দার বাড়ী বেড়াতে গেছে।"

"তেওয়ারী ?"

"আজ সকাল সকাল স্নানাহ্নিক করে রাঁধ্‌তে বসেছেন। জল খেয়েছেন।"

"তুমি ?"

ব্রহ্মচারিণী নীরব। ব্রহ্মচারী এ নীরবতার অর্থ বুঝিলেন। আর প্রশ্ন করিলেন না। উঠিলেন, নিবেদন করিয়া নত মুখে জলযোগ করিয়া বলিলেন "যাও, খেয়ে এস।"

"যাচ্ছি। ব্রহ্মচারি, এতদিনে গুরুর আদেশ পালনের কথা মনে পড়্‌ল ? আজ থেকে সঙ্কল্প করে গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন সুরু কর্‌লে ?"

ব্রহ্মচারী বিষণ্ণভাবে বলিলেন "নিজের পার্থিব কল্যাণ-কামনায় স্পৃহা নেই বলে তাঁর আদেশ এতদিন অবহেলা করেছি। সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় করুণার বিরুদ্ধে অনেক কৃতঘ্নতা করেছি। কিন্তু আজ আর পার্‌লুম না। তাঁর জন্যে আজ বড় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, জানিনা তিনিও এ হতভাগাকে স্মরণ করছেন কি না। যাই হোক, তিনি যা যা কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, আজ সব করে এসেছি। এর পর ভালই হোক, মন্দই হোক, আর আমার দুঃখ নেই। আদেশ পালন কর্‌তে পেরেছি, এতেই আমি কৃতার্থ।"

দৃঢ় স্থির-স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন

"শাস্ত্র শিক্ষা তৎপরতা, গুরুবাক্য একাগ্রতা

নিজ যত্ন প্রগাঢ়তা, এই তিন ধরিলে।

এ জগতে কি না হয় ? হয় ত্রিভুবন জয়

অসাধ্য সাধন হয় ঋষিবাক্য শুনিলে।"

ব্রহ্মচারি, এ কথার মানে যে জেনেছে,—সেই বুঝেছে। যে জানেনা, সে বুঝ্‌বেওনা। যাক সে। সঙ্কল্প করেছ ত কাযে বস্‌লে, এখন আর ত আসন ছেড়ে এখান থেকে নড়্‌তে পার্‌বে না।"

"না। অন্ততঃ এক মাস নয়। তুমি পাটনা গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বোলো,—যেন তাঁরা বিরক্ত না হন। আমি কাজ শেষ করে এক মাস পরে গিয়ে, তাঁদের পায়ের ধুলো নেব।"

ব্রহ্মচারিণী কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন "এক মাস পরে ? পাটনা যাবে ত ঠিক ?"

"হাঁ, নিশ্চয়। নিজের গরজে যেতে হবে। বড়মা অসুস্থ, বুড়ো ব্যাটাদেরও ঢের জ্বালাতন করেছি। কর্ম্মফলের দেনাগুলো এবার চুকিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হতে চাই।" বলিয়া ব্রহ্মচারী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন।

"ভাল। এখন বিশ্রাম করো।" ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

একটু পরে ঠাকুর্দ্দা মণিকে লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী আগাইয়া গিয়া ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আসুন। আপনাকেই খুঁজছি ঠাকুর্দ্দা। দায়ে ঠেকেছি, উপদেশ প্রার্থনা কর্‌ছি।"

মণি মাঝখান হইতে বলিল "তোমাদের ঠাকুর্দ্দা বেশ ভাল ঠাকুর্দ্দা, ছোটমা!—"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "এত অনুগ্রহের কারণ ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কাল অপরিচয়ের জন্যে আমাদের ঠাকুর্দ্দার নামে ভুরু কুঁচ্‌কে, নাক সিঁট্‌কানো হয়েছিল। আজ পরিচয় হয়েছে, সন্তোষের আতিশয্যে তাই ত্রুটি-সংশোধন হচ্ছে ঠাকুর্দ্দা। আসুন, পূজোর বারেণ্ডায় ঠাণ্ডায় বসুন।"

ঠাকুর্দ্দা আসন গ্রহণ করিলে এ-কথা ও-কথার পর, ব্রহ্মচারিণী তেওয়ারীর রন্ধনের সংবাদ লইবার ছুতা করিয়া মণিকে সরাইয়া দিলেন। তার পর অত্যন্ত নিম্নস্বরে ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ঠাকুর্দ্দা সেখানে হইতে বিদায় লইয়া ব্রহ্মচারীর ঘরে আসিয়া দর্শন দিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ স্নানে যাইবার জন্য মাথায় তেল মাখিতেছিলেন। ঠাকুর্দ্দা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিলেন "কি রে প্রসাদ, তুই এখন পাটনা যাবি না? মাস খানেক পরে যাবি?"

প্রণাম করিয়া একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "এর মধ্যে গুপ্তচরটির কাছে খবর পেয়েছেন? হাঁ, ঠাকুর্দ্দা, আমার ভয়ানক কায পড়েছে। আপনি যখন যাবেন, জ্যাঠা মশাইদের বুঝিয়ে বলবেন। এ ক্ষেত্রে যেন অপরাধ ক্ষমা করেন, মাসখানেক পরে আমি নিশ্চয় যাব।"

"নিশ্চয় ত?"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা। তা আমি তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌ব। তাহলে নাৎবৌ এখন থাকুন। তুই যখন যাবি, সঙ্গে করে নিয়ে যাস।"

প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "সে কি! তা কি করে হবে? বাড়ীতে বিয়ে, উনি এখন যাবেন না! না ঠাকুর্দ্দা, ওঁকে আজ পাঠিয়ে দেন। আট্‌কাবেন না।"

মুচকিয়া হাসিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "আট্‌কাব না রে, আটকাব না। তোর সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।"

উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "জ্যাঠা মশাই'রা—"

"সে ভার আমার।"

"মণে ওঁকে ছেড়ে যাবে না। দোহাই ঠাকুর্দ্দা, ছোট ছেলেকে কাঁদাবেন না।"

"ছোটকেও কাঁদাব না, বড়কেও কাঁদাব না। তুই গোলমাল করিস্ নি, থাম! আমি তেওয়ারীকে ইসারা করে দিয়ে যাচ্ছি, ও ভুলিয়ে ভালিয়ে সব ঠিক করে নেবে।"

বলিয়া ঠাকুর্দ্দা বাহিরে গিয়া ডাকিলেন "কই হে মণীন্দ্র কই?"

মণি তখন মহা ব্যস্ততার সহিত ছোটমার বসিবার কম্বল, শুইবার কম্বল, কাপড় গামছা সব টানাটানি করিয়া আনিয়া মোট বাঁধিবার জন্য এক স্থানে স্তূপাকার করিতেছিল। ডাক শুনিয়া বলিল "আজ্ঞে।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "মোট পুঁটুলি তোমার কাকা বাঁধবে এখন। তুমি সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে তেওয়ারীকে নিয়ে এগিয়ে ষ্টেশনে যাও। তোমার ছোটমার জন্যে গাড়ী বাড়ী সব রিজার্ভ করগে, তা'পর তোমার কাকা আহ্নিক-পূজো সেরে তোমার ছোটমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তেওয়ারী কোথা গেল? তাকে বলে যাই।"

ঠাকুর্দ্দা তেওয়ারীর সন্ধানে রান্নাঘরে গেলেন। ব্রহ্মচারী চিন্তিত মুখে গামছা লইয়া স্নানের জন্য কূয়াতলায় চলিলেন। মণি বারেণ্ডায় মোট বাঁধিবার দুশ্চেষ্টায় বিব্রত রহিল।

ব্রহ্মচারিণী স্নান করিয়া কূয়াতলায় বাহিরে আসিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "ঠাকুর্দ্দার এ ঘটকালির মানে কি? তিনি যে তোমার যাওয়া বন্ধ করছেন, শুনেছ?"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "শুনেছি। বিজ্ঞ গুরুজনদের আদেশ মেনে চলাই ভাল!"

"কিন্তু এই অবিজ্ঞ লঘুজনটি যে মারা যাবে। তোমার জ্যাঠ-শ্বশুররা—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "সে দায়িত্ব ঠাকুর্দ্দার।"

"তা হলে তুমিও এ অঘটন ঘটানর মধ্যে আছ? কি উদ্দেশ্যে রয়ে গেলে বল ত?"

"কোন্ উদ্দেশ্যের দোহাই দিলে খুশী হবে বল? তোমার কাযের বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে রইলাম—বল্‌ব?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা হলে ভরসা পাই। খাওয়া-দাওয়ার জন্যে উৎপীড়ন করে কাযের বিঘ্ন ঘটাবে এ তো জানা কথাই।"

ব্রহ্মচারিণী কোন উত্তর না দিয়া পূজা করিতে গেলেন।

যথাসময়ে ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাঁধিয়া বাড়িয়া মণিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তার পর ব্রহ্মচারীর হবিষ্য হইয়া গেলে নিজের হবিষ্য নিবেদন করিয়া আলাদা রাখিয়া মণিকে আবার ডাকিলেন। চোখের জল মুছিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "এস বাবা, তোমার হবিষ্য করবার

বড় সখ। আমার ঠাকুরকে নিবেদন করা প্রসাদ এক মুঠো নাও।"

পূর্ণ উদরের পক্ষে সেই এক মুঠাই যথেষ্ট। আকাজ্ক্ষা-তৃপ্তির আনন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া মণি বলিল "এবার সেখানে গিয়ে রোজ তোমার সঙ্গে হবিষ্য কর্‌ব ছোটমা। তোমার হবিষ্য বেশ।"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন।

নিজের হবিষ্য শেষ হইলে তিনি মণিকে যাত্রার জন্ম সাজাইতে বসিলেন। হাত মুখ মুছাইয়া, জামা কাপড় পরাইয়া মাথার চুল আঁচড়াইয়া যথারীতি সাজাইয়া দিলেন। চঞ্চল বালক মহা আপত্তির সহিত সাজসজ্জার উপদ্রব সহিতে সহিতে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল "দেখো ছোটমা, তুমি বেশী দেরী করো না। আমি গাড়ী রিজার্ভ করে ওদের সব্বাইকে তুলে নিয়ে বসে থাক্‌ব।"

ব্রহ্মচারিণী সংক্ষেপে বলিলেন "না বাবা, আমার দেরী হবে না। কায ক'টা সারা হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

তেওয়ারীকে গোপনে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া, আত্মীয়-কুটুম্বদের সহিত মণিকে গরুর গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, ব্রহ্মচারী বাড়ী ফিরিলেন। দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী চুপ করিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে নিজের কাপড় কম্বলের মোটটা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিজের মনেই বিষণ্ণ হাস্যে বলিলেন "ধোপার পাটায় আছ্‌ড়ে অনেক কষ্টে যে কাপড়ের ময়লা সাফ করা হয়েছে, সে কাপড় পরে কয়লার ঘরে ঢুক্‌লেই মুস্কিল! যতই সাবধানে থাকা যাক, নড়্‌তে চড়্‌তে কাপড় ময়লা হয়ে যায়! মণে শূয়ারের জন্যে আমার মন কেমন করছে।"

ব্রহ্মচারিণী নীরব।

ব্রহ্মচারী বলিলেন "অত তন্ময় হয়ে কি দেখ্‌ছ?"

সামনের মোটটার দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "এটা। এতক্ষণ তাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তার কাযের দিকে লক্ষ্য করি নি। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ম্মিষ্ঠ ছেলের কীর্ত্তি দেখ্‌ছি। আমার যেখানে যা-কিছু ছিল, সব টেনে-টুনে এনে জড় করে মোট বেঁধেছে। জপের আসন, মালা, মায় আসনের গ্রন্থগুলো পর্য্যন্ত বাদ দেয় নি! গাঁঠরীতে বিশ গণ্ডা গিঁটের বাহার ছাখো!"

বলিতে বলিতে তিনি হাসিমুখে একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন "খোল, খোল! যেখানে যত মায়াবন্ধনের গ্রন্থি আছে, সব মোচন করো। 'ভেঙে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল!'"

"ভাঙ্‌ছি। তুমি আজ অনেক খেটেছ, বড় ক্লান্ত হয়ে আছ। দেহটার বিশ্রাম দরকার, ঘরে যাও।"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী মোট খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

(২১)

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। ব্রহ্মচারীর সাধন-ভজন, গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। পরিশ্রম গুরুতর,—সাধনার নিয়মানুসারে এ অবস্থায় অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা বাক্যব্যয় নিষিদ্ধ। সে সামর্থ্যও থাকে না। অবসর-কালে অবসন্ন দেহে নীরব বিশ্রাম এবং সকালে সন্ধ্যায় উঠানে নীরবে পায়চারি বা ব্যায়াম করিতেন। লোকসঙ্গের ভয়ে বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। হাট-বাজার গোবরের মা করিতে লাগিল। শক্ত্যানন্দ স্বামী আর নিজে আসিলেন না, কয়দিন পরে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারীর এবার যথার্থই সামর্থ্যের অভাব, কাযেই যাইতে পারিলেন না। লোক ফিরিয়া গেল।

ব্রহ্মচারিণীকে এ অবস্থায় অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইল। নিজের নিত্যক্রিয়া সারিয়া, বাকী সব সময় সাবধানে ব্রহ্মচারীর অবস্থা লক্ষ্য করা ও নীরবে প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করিয়া যাওয়াই তাঁর প্রধান কায হইল। সময় সময় ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশমত শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত মাত্র, তার পর দুজনেই নীরব। বহির্জগৎ বাহিরে পড়িয়া রহিল। অন্তর্মুখী মন লইয়া, দুজনেই অন্তর্জগতের রহস্য বৈচিত্র্যে তন্ময় মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

কর্ম্মবীর ঠাকুর্দ্দা গ্রামের বাকী কুটুম্ববর্গকে লইয়া যথাসময়ে পাটনা গেলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া দিন পনের পরে ফিরিলেন। সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার আসিয়াছে, সংবাদ পাওয়া গেল। সে ছেলেটি বি-এ পাশ করিয়া এবার ফাইন্যাল ল' পরীক্ষা দিয়াছে।

ছুটির অবকাশে এই ছেলেটি যখনই গ্রামে আসিত, তখনই গ্রামে একটা হৈ চৈ বাধিয়া যাইত। "আনন্দ মঠের" সন্তান-ধর্ম্মের লক্ষ্যটা এই ছেলেটির যেন আংশিক-ভাবে অস্থি-মজ্জায় জড়িত ছিল। অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সুকঠোর ন্যায়-পরায়ণতা এবং অদ্ভুত কৃতিত্ব-বলে সে অসাধ্য সাধন করিত। দল বাঁধিয়া পল্লী-সংস্কার, নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল সাফ ইত্যাদি মামুলি কায ত আছেই,—তা ছাড়া রীতিমত ডিটেক্‌টিভ-বৃত্তি করিয়া সকলের 'হাঁড়ির খবর জানা' এবং অটল ন্যায়পরায়ণতার সহিত, নির্ভীক ভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তার যথেষ্ট 'হাতযশ' ছিল।

সদ্‌গুণের জন্য এই ক্ষুদে খুড়শ্বশুরকে ব্রহ্মচারিণী স্নেহ করিতেন, তার সঙ্গে কথা কহিতেন। খুড়শ্বশুর দেখা করিতে আসিলে আগ্রহের সহিত তাঁর প্রত্যেক কাযের খুঁটিনাটি খবর লইতেন; তাঁর সংসাহস, সৎ উদ্যমে উৎসাহ দিতেন। সমবয়স্কা হইলেও এই ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূটির, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও গুণের জন্য খুড়শ্বশুর তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। যদিও ইঁহাদের জপতপগুলা তিনি প্রাচীন ভ্রান্ত মতের অন্তর্গত কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে কাহারও ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসে আঘাত করিতেন না। বরঞ্চ শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে বংশবৃদ্ধির চেষ্টায় নিরস্ত হইয়া ইঁহারা যে ম্যাল্‌থাসের মতটা প্রকারান্তরে সমর্থন করিতেছেন, সেজন্য ইঁহাদের ভদ্র রুচি ও সভ্যতা-জ্ঞানের মনে মনে প্রশংসা করিতেন।

খুড়শ্বশুর অন্য বারে গ্রামে আসিয়া সকলের আগেই এখানে আসিতেন, কিন্তু এবার আসিলেন না। ঠাকুর্দ্দাও পাটনা হইতে ফিরিয়া দেখা দিলেন না, বাড়ীর ঝিএর দ্বারা শুধু ইঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন মাত্র। খুড়শ্বশুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তিনি বাহিরের কাযে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, পরে দেখা করিতে আসিবেন। ঠাকুর্দ্দার সম্বন্ধেও সেই উত্তর পাওয়া গেল।

বহির্জগতের ব্যাপারে উদাসীন ব্রহ্মচারী এ-সব সংবাদে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু ব্রহ্মচারিণী একটু যেন চিন্তিত হইলেন; প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

গোবরের মা আসে, যায়, কায করে। কিন্তু আজকাল সে একেবারে নিঃশব্দ। ব্রহ্মচারিণীও সমভাবে তার সঙ্গে বাহিরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারেন না। তা ছাড়া তার কথার মূল্য নির্দ্ধারণও সহজ নয়। সত্য মিথ্যা, সম্ভব অসম্ভব-জ্ঞান সে বেচারার বেশী নয়; সুতরাং বাহিরের সংবাদ চাপা রহিল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীর আরব্ধ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দুই দিন মাত্র বাকী। ব্রহ্মচারীর দেহ অবসাদ-ক্লিষ্ট, কিন্তু মন অপার্থিব প্রসন্নতায় শান্ত, সমাহিত। ব্রহ্মচারিণী নিস্তব্ধ, প্রফুল্ল।

সেদিন দুপুরে হবিষ্যের পর উভয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় স্বামিজী আসিয়া বাহির হইতে ডাকাডাকি সুরু করিলেন। ব্রহ্মচারী সাড়া দিলেন। নিজের আসন ও একখানা কম্বল ঘাড়ে ফেলিয়া বাহিরের ঘরের চাবিটা খুঁজিয়া লইয়া বাহিরে চলিলেন।

দুয়ার খুলিয়া স্বামিজীর সহিত তিনজন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। অভ্যাসবশে ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিলেন। স্বামিজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। সঙ্গে ওঁর দুটি বন্ধু এসেছেন। চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যাক।"

তেওয়ারীর তিরস্কার ব্রহ্মচারীর স্মরণ ছিল। তাড়াতাড়ি চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে গিয়া স্ত্রীলোকগুলির উদ্দেশে বলিলেন "আপনারা বাড়ীর ভেতর যান্ মা। আসুন স্বামিজি, আমরা দুজনে বাইরের ঘরে বসি।"

স্বামিজী স্মিতমুখে বলিলেন "বাইরের ঘরে কেন? বাড়ীর ভেতর চল না। যখন কষ্ট করে আসা গেছে, তখন সবাই মিলে একসঙ্গে বসে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক।"

হইতে পারে ইহা বন্ধু-প্রীতির অনুরোধে নিছক নির্দ্দোষ আনন্দ-কারক প্রস্তাব মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মচারীর কাণে কথাটা ভাল লাগিল না। সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন "আমার স্বাস্থ্য মজবুত নয়। হট্টগোল সহ্য করতে পারব না, মাথা ধরে যায়! নিরিবিলিতে চলুন।"

স্ত্রীলোক তিনটি ইতিমধ্যে চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ওই কথার উত্তরে

সহসা ঘোমটা সরাইয়া চাপা গলায় এমন এক কদর্য্য ইঙ্গিত-সূচক পরিহাস করিলেন,—যার মাধুর্য্য-রস উপলব্ধির প্রমাণ স্বরূপ আর স্ত্রীলোক দুটি রসিকতা করিয়া হাসিয়া কাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন! স্বামিজীও তাহাতে যোগ দিয়া হাসিতে লাগিলেন, দু-একটা টীকা টিপ্পনিও যোগ করিলেন।

স্বামিজীর ধৃষ্টতা-অত্যাচার সহ্য করা ব্রহ্মচারীর অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু এই অপরিচিত ভদ্র গৃহের স্ত্রীলোকগুলির এ কি উন্নত রুচির পরিচয়? স্তম্ভিত-বিমূঢ়ের মত মাথা হেঁট করিয়া ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া, ব্রহ্মচারী ধীরে সরিয়া গেলেন। বাহিরের ঘর খুলিয়া কম্বল বিছাইয়া ডাকিলেন "এখানে আসুন স্বামিজি।"

অগত্যা স্বামিজীকে বাহিরে বসিতে হইল। কুশল প্রশ্নাদির পর ব্রহ্মচারী বলিলেন "মা-ঠাকরুণের সঙ্গে অন্য যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কি এই গ্রামের?"

স্বামিজী এদিকে ওদিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন "হাঁ, ওই মুখুজ্যেদের মেয়ে একটি, আর ওপাড়ার বোসেদের বৌ একটি। দুজনেই বেশ শিক্ষিতা, রসিকা স্ত্রীলোক। তোমার সঙ্গে পরিচয় নেই বোধ হয়? পরিচয় করবে?"

মুখুজ্যেদের মেয়ে! বোসেদের বৌ! বিন্দুমাধবের জবানবন্দী অলক্ষিতে ব্রহ্মচারীর স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। স্বামিজীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "এঁরা কি আপনার শিষ্যা?"

"হুঁ। সাধন ভজন নিয়েছে। বেশ কাজকর্ম্ম করছে। অল্প দিনেই বেশ উন্নতি করেছে।"

তার পর ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে স্থির মর্ম্মভেদী দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন "বলেছি ত আগেই। আমাদের ক্রিয়া-কলাপ যেন শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। তোমাদের মত বেশী খাটতে হয় না, অল্প খাটনিতেই কার্য্য-সিদ্ধি!"

এ কথা ব্রহ্মচারী অনেকবার শুনিয়াছেন এবং অনেকবার এ মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নিজের আরব্ধ সাধনায় অবহেলা করিয়াছেন। কিন্তু আজ কথাটায় কিছুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "আমার ভাগ্নে বিন্দু এঁদের চেনে।"

স্বামিজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "হাঁ চিনবে বই কি। ওই বোসেদের বিধবা বৌটির বিষয়-সম্পত্তি ওর জ্ঞাতি-শত্রুরা বেদখল করেছিল। তাই বিন্দু ওর পিছনে দাঁড়িয়েছে। তদ্বির করে ওঁর স্বত্ব বজায় রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে। অনাথা, বিধবা,—তাকে আশ্রয় দিয়ে বিন্দু মানুষের মত কায করেছে। কি বল? করে নি?"

"ধর্ম্ম আর নীতি-সঙ্গত ভাবে আশ্রয় দিলে বিপন্নকে আশ্রয় দানটা মানুষের যোগ্য কাযই বটে। তবে বিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান আর নৈতিক বুদ্ধি যে রকম সূক্ষ্ম, তাতে তার আশ্রয় নেওয়াটা মানুষ বা মেয়েমানুষ কারুর পক্ষেই নিরাপদ নয়, মনে হয়। তাতে অরক্ষিতা, অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক!"

বলিয়া একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "বিধবার বিষয়-সম্পত্তি ওঁর স্বামী ত বদমাইসি করে সব উড়িয়ে গেছেন। বিস্তর দেনা করে গিয়েছিলেন, জ্ঞাতিরাই ত তা শোধ করেছেন। তাঁরাই ত ওঁকে এতদিন প্রতি-পালন করছিলেন জানি। তাঁরা ত বেশ শিক্ষিত, বিশিষ্ট ভদ্রলোক।"

ব্যঙ্গভরা শ্লেষের স্বরে স্বামিজী বলিলেন "হুঁ, বিশিষ্ট ভদ্রলোক! এইবার দেখ না, তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাবার ব্যবস্থা করছি। ওই বৌটা প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের সাত গুষ্টির মুখ পোড়াবে, তাদের মানইজ্জৎ নষ্ট করবে। ও তাদের বিরুদ্ধে বলাৎকারের অভিযোগ আনছে। সাক্ষীও যোগাড় হয়েছে। আমরাও সাক্ষী দেব, তোমাকেও সাক্ষী দিতে হবে।"

স্তম্ভিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "স্বামিজি, কথাটা সত্যি?"

ধূর্ত্ত স্বামিজী তৎক্ষণাৎ অসাধারণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "সত্যি বলেই ত শুনছি। বিন্দু নিজের চোখে দেখেছে।"

"কি করে দেখলে? সে ত থাকে বাগ্দী পাড়ায়। উনি ভদ্র ঘরের কুলবধূ, থাকেন ভদ্র পরিবারের ভেতর—"

উৎকণ্ঠায় ব্রহ্মচারীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। হাঁপাইয়া তিনি থামিলেন।

স্বামিজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন "আর বড়াই কোর না বাপু! জানতে কিছু বাকী নেই। কথাটা গোপন রাখ তো বলি। বিন্দু রাতবিরেতে গোপনে ওর বাড়ীতে যায়। বুঝলে কি না?"

রুদ্ধশ্বাসে ব্রহ্মচারী বলিলেন "অর্থাৎ? স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা, বলুন? ওঃ!"

উত্তরে স্বামিজী অম্লান বদনে বলিলেন "তাতে কি হয়েছে ? চরিত্রহীনতাই চরিত্র-নিষ্ঠার মূল ভিত্তি, মনুষ্যত্ব-বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়,—এ কথা বড় বড় পণ্ডিতও আজ-কাল স্বীকার করছেন।"

তার পর অতিশয় বিজ্ঞ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "জগতে সতী কে আছে বল ?"

স্বামিজী অবলীলাক্রমে কথাটা বলিলেন ; কিন্তু কথাটা কাণে ঢুকিবামাত্র ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তক যেন তীব্র বিদ্যুত্তাড়নে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ! ক্ষণেক তাঁর ব্যাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্তম্ভিত আড়ষ্টভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। তার পর কষ্টে আত্মদমন করিয়া সনিঃশ্বাসে বলিলেন "মাথায় বজ্রাঘাত হবে স্বামিজি ! এত বড় অপরাধী-বাক্য উচ্চারণ করবেন না। না, বৃথা তর্কে আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করবেন না। জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র স্বভাব নরনারী এ পৃথিবীতে আছেন কি না, এ প্রশ্ন নিয়ে অজিতেন্দ্রিয়দের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা কত ভয়ানক মূঢ়তা, সেটা ভগবান আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ কথা নিয়ে আর আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে। মেয়েদের সম্বন্ধে কুৎসিত প্রসঙ্গ চুলোয় যাক। অন্য কথা বলুন।"

চতুর স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সপ্তম সুরে বীণা বাঁধিয়া সাধন-ভজনের তান-আলাপ সুরু করিলেন। কিন্তু আজ আর ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বের মত মোহিত হইতে দেখা গেল না ! স্বামিজীর কোন কথায় তিনি সায় উত্তর দিলেন না। ঔদাস্যপূর্ণ অবহেলার সহিত কতক কথা শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। চোখ বুঝিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া রহিলেন।

স্বামিজী অনেকক্ষণ বকিয়া শেষে থামিলেন। বলিলেন "কই হে, কথা বলছ না কেন ?"

সংক্ষেপে ব্রহ্মচারী বলিলেন "আজ-কাল বেশী কথা বলতে পারি নে। কঠোর পরিশ্রমে শরীর বড় অবসন্ন হয়ে আছে।"

শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর নালিশ চলে না। অগত্যা কথার মোড় ঘুরাইয়া, স্বামিজী কৌশলে অন্য কথা পাড়িলেন। ব্রহ্মচারীর বিমর্ষতা মোচনের জন্য গ্রামের লোক সম্বন্ধে অনেক হৃদয়োত্তেজক কাহিনীর অবতারণা করিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা চলিল। ব্রহ্মচারী সৌজন্যের অনুরোধে এবার অল্প দু-একটা কথা বলিলেন।

বৈকালের বেলা পড়িয়া আসিতেই ব্রহ্মচারী কোন অনুরোধ উপরোধ না মানিয়া স্নানের জন্য উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা স্বামিজীও উঠিলেন। স্ত্রীলোকদের বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারিণীর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছায় স্বামিজী একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী আজ সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সৌজন্যের আড়ম্বর প্রকাশের সুযোগ হারাইয়া স্বামিজী ক্ষুণ্ণ হইলেন।

সন্ধ্যার স্নানাহ্নিকের পর ব্রহ্মচারী আজ-কাল সকাল সকাল খাইয়া শয়ন করিতেন, নচেৎ ভোরে উঠিবার সুবিধা হইত না। আজও পূজাপাঠ সারিয়া আসিয়া সকাল সকাল শয়নের জন্য খাইতে বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণী অন্য দিনের মত মৌন হইয়া রোয়াকের সিঁড়িতে বসিয়া ছিলেন। ব্রহ্মচারী হেঁট হইয়া খাইতে খাইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন "স্বামিজীর স্ত্রীকে কেমন দেখ্‌লে ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "পশু তোমার কায শেষ হোক। তার পর সে আলোচনা হবে।" একটু থামিয়া বলিলেন "কাল সকালে একবার বেড়াতে বেরুবে ?"

"কেন ? দরকার আছে ?"

"আছে। ঠাকুর্দ্দার খোঁজ-খবর কদিন পাই নি। কে কেমন রইলেন, একবার খোঁজ নিয়ে আস্‌তে। খুড়শ্বশুরকে অনেক দিন দেখি নি, একবার ধরে আন তো ভাল হয়।"

একটু ভাবিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "চাচা এবার এসে অবধি এদিক মাড়ায় নি। বিয়ে-থা'র হুজুগ মাথায় চড়েছে না কি ? ছোক্‌রা করছে কি ?"

"খোঁজ নিলেই জান্‌তে পারবে। একবার ডেকে দিও, তোমার লাইব্রেরীর চাঁদাটাদাগুলো তাঁকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "তা' তো দেবে। আমারও গোটা পঁচিশেক টাকার দরকার। পশু, না' হয় তশু দিতে পারবে ?"

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কেন ? স্বামিজীর জন্যে ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "কি মুস্কিল!"

ধীরভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তাহলে স্বামিজীর জন্তেই! জন-সমাজের সংস্রবে বাস করছ, পারো জনসমাজের মঙ্গল সাধন করো। না পারো,—চুপচাপ নিজের কায করে যাও। নিজের নীচ স্বার্থবশে যিনি জন-সমাজের অনিষ্ট-সাধন-ব্রতী, তাঁর সাহায্যের চেষ্টা না করাই ভাল। যে খুন করে সে-ই শুধু অপরাধী নয়, যে খুনীর পৃষ্ঠপোষকতা করে সেও দণ্ডনীয়। সেদিন পাঁচশো টাকা উড়িয়ে যা কর্ম্মভোগ যোগাড় করেছ—"বলিয়াই তিনি সহসা থামিলেন।

ব্রহ্মচারীও থতমত খাইলেন। বুঝিলেন পাঁচশো টাকার গোপন সদ্গতির ইতিহাসটা যেরূপে হউক ব্রহ্মচারিণীর গোচরীভূত হইয়াছে। সন্দেহ হইল,—হয় ত স্বামিজীর স্ত্রীই উহা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কথাটা লইয়া নড়াচাড়া করিতে সাহস হইল না।

কথা এড়াইয়া গিয়া একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আর্থিক ব্যাপারে যাদের এত পাটোয়ারী বুদ্ধি, তাদের সাধন-ভজনে কোন উন্নতি হয় কি না সন্দেহ।"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন "আমায় বোকা ঠকিয়ে জুয়াচোররা জিতে গেলেই আমার ধর্ম্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে, এই কথাই কি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করব?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন "হায়! চণ্ডীপাঠের সঙ্গে রোজ বিশ্বজননীর পাদপ্রান্তে প্রার্থনা জানাচ্ছি,—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" —উল্টো ফল হচ্ছে কেন?"

ব্রহ্মচারিণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তোমার অদূরদর্শিতার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী চেও না ব্রহ্মচারি! তুমি নিষ্কাম সাধক। নিষ্কাম মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী ভার্য্যালাভই তোমার মঙ্গল।"

"কিন্তু, তাঁর যে মনোরমা হওয়া উচিত। মন-জ্বালানো অপ্রিয়বাদিনী হওয়া ত উচিত নয়।"

"যথেচ্ছাচারী মনের উপযুক্ত মনোরমা চাও? তাহলে নিজের অক্ষমতার জন্তে ত্রুটি স্বীকার করতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের মত বিয়ে করতে রাজী থাক তো বল, দেখে শুনে স্বামিজীর ফরমাস-মত একটা উপযুক্ত কনে ঠিক করে দিই।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "কৃতঘ্ন আর কাকে বলে? হাঁ, ভাল কথা। আজ আমি স্বামিজীর কাছে—কথায় কথায় অভিচারের কথা তুলেছিলাম। কথার ভাবে বোধ হল উনি ও-সব করেন না। অভিচারের নামে ভয়ানক ঘৃণা প্রকাশ করলেন।"

ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তা' তো করবেন-ই। চাণক্য মরেছেন, তাঁর নীতি মরে নি। সিগারেটের বাক্সর সেই চিরকুটখানার কথা তুলেছিলে?"

ব্রহ্মচারী রাগ করিয়া বলিলেন "তাই কি তোলা যায়? চক্ষু-সজ্জা ত একটা আছে? বিশেষতঃ ভদ্রলোক এখন বড় বিপন্ন। কত দুঃখ করছিলেন, বলছিলেন 'ছাখো ভাই, এখানকার লোকগুলো এম্নি পাজী,—আমার স্ত্রী এসেছেন, তাঁকে বলছে আমার রক্ষিতা। এখানকার লোকেরা হিংসা করে আমার মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে শত্রুতা করছে, করুক। কিন্তু ঈশ্বর ঘুসখোর নন, তিনি আমায় কখনই পর্য্যুদস্ত করবেন না, এ বিশ্বাস আমি রাখি'।"

মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ঈশ্বর ঘুসখোর নন, তিনি কাউকেই পর্য্যুদস্ত করেন না। তবে পাপই পাপীকে শাস্তি দেয়, ঈশ্বরের এই নিয়মটা নির্ঘাৎ সত্য।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "পৃথিবীতে বিনা পাপেও অনেককে শাস্তি পেতে হয়। শনির কোপে পড়ে শ্রীবৎস রাজার কি দুর্গতি না হয়েছিল, কলির কোপে পড়ে নল রাজার কি দুঃখই না হয়েছিল!"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দন্ত নিষ্পেষণটা কিছুকাল যাবৎ মুলতুবি আছে, নয়? মন কেমন করছে তার জন্তে?"

"অর্থাৎ? রাগাবার চেষ্টায় আছ? না। আর রাগ্‌তে পারি নে। বড় মাথা টন্ টন্ করে। ঠাট্টা যাক। উনি আমায় বড্ড ধরেছেন যে 'তোমার সাহসেই আমার সাহস, তোমার জোরেই আমার জোর। তুমি যদি আমার পক্ষে না দাঁড়াও, তাহলে এখানে তিষ্ঠাতে পারব না'।"

ব্রহ্মচারিণী আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া নিজমনেই কবিতা আওড়াইলেন,—

"সাধিতে স্বকার্য্য খল তোষামোদ করে;
তাহে মুগ্ধ প্রতারিত বোধহীন নরে।"

অপ্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "ওই তোমার এক কুসংস্কার। লোকটা এখন বিপন্ন, লাঞ্ছিত—"

তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "জেলখানা-গুলায় অনেক চোর, ডাকাত, খুনে,—বিপন্ন, লাঞ্ছিত অবস্থায় আছে। তাদের জন্যে আমরা করুণাবোধ করতে পারি, কিন্তু সেই খাতিরে তাদের অন্যায়কে ন্যায় বলে সমর্থন করতে পারি নে।"

"তারা ত আমার—আমাদের শরণাগত নয়।"

"ইনি শরণাগত বটে! উদাসীনের এত আত্মাভিমান! কিন্তু উদাসীন হতে হবে বলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-বুদ্ধিকে বলিদান করলে চলবে না। শরণাগত বলে অন্ধ স্নেহে পাপাচারীর পৃষ্ঠপোষকতা করলেও চলবে না। 'মিত্র হোক ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে, সবার বাড়া শত্রু সে'—এই কঠোর ন্যায়-পরায়ণতাও, সময়-বিশেষে গুণবান লোক-বিশেষের জন্যে দরকার।"

ব্রহ্মচারী আর কথা বলিলেন না, আঁচাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারিণী নীরবে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া, খাইয়া, শয়ন করিতে গেলেন।

(৪২)

পরদিন সকালে নিজের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ শেষ করিয়া, জল খাইতে বসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "শোন। কাল বলছিলে নয়,—'মিত্র হোক ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে, সবার বাড়া শত্রু সে,' কেমন? আচ্ছা। যদি মনের বাঁদরামিতে ভুলে আমিই কোন দিন ভণ্ড হই? আমায় নিয়ে সেদিন কি করবে বল দেখি?"

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া বাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন "কি করব, তুমিই অনুমতি দাও।"

"আমিই অনুমতি দেব?"—বলিতে বলিতে সিংহের ন্যায় গ্রীবা উচ্চ করিয়া, ব্রহ্মচারী দৃঢ় স্থির স্বরে বলিলেন "যেদিন দেখবে আমিও পথভ্রষ্ট, ভণ্ড হয়েছি,—সে দিন নির্দ্দয় নির্ম্মম হয়ে আমাকেও দূ—র করে দিও! পারবে?"

ব্রহ্মচারিণী নির্ব্বিকার মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ বলিলেন "বল, পারবে ত? তা যদি পারো, তাহলে বুঝ্‌ব 'হাঁ'! আমার আত্মোন্নতিসাধন-ব্রতের যথার্থ সহধর্ম্মিণী তুমিই! তাহলে হিতৈষী বন্ধু বলে কৃতজ্ঞ হয়ে জন্ম জন্মান্তর তোমার পূজা করব।"

বাদামগুলি রেকাবিতে রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণী হাত ধুইলেন। প্রসন্ন মুখে ব্রহ্মচারীর পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন "সহধর্ম্মিণীরা স্বামীর আত্মোন্নতি-সাধন-ব্রতের সহধর্ম্মিণীই হয়, বাঁদরামি ব্রতের উৎসাহ-দায়িনী হয় না। ভগবান না করুন, যদি তেমন দুর্দ্দিন কখনো আসে, আর তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়,—সেদিন তোমার কর্ম্মফলই তোমায় দূর করবে। আমি দূর করবারও কেউ নই, নিকট করবারও কেউ নই,—এটা বেশ জানি।"

স্মিত মুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন "তাহলে কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রকাশ করে আমিই ঠকেছি! যোড় হাত করে এবার বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, 'এ্যায়সে প্রেমধন ক্যায়সে মিলে, বল্‌রে চণ্ডাল বন্ধু ভাই!'

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "প্রেমধন লাভ করতে হলে, প্রেমের উল্টামুখী আকর্ষণটা জয় করে কাযে লাগলেই যথেষ্ট। তখন প্রেমকে খুঁজ্‌তে হবে না, প্রেম নিজেই এসে মানুষকে খুঁজে নেবে! যোগ্য হও, পূর্ণ যোগ্যতায় নিজেকে গড়ে নাও। কোথায় গুরু খুঁজ্‌ছ? গুরু ত সঙ্গেই—"

বলিতে বলিতে সহসা অব্যক্ত ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আত্ম-বিস্মৃতের মত ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন "না, না,—সে কথা এখন নয়। সেটা বোঝবার সময় এখনও আসে নি। থাক,—থাক।"

তার পর সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "নাও, নিবেদন করো।"

ব্রহ্মচারী একটু অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন "কথা বলতে বল্‌তে তুমি কি রকম যে অন্যমনস্ক হয়ে যাও,—কার কথার জবাব যে কাকে দাও, বুঝ্‌তে পারি নে।"

একটু ব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে হলে পার্থিব ব্যাপারে যতখানি সচেতন থাকা উচিত, সব সময় তার মাত্রা ঠিক রাখ্‌তে পারি নে। নীচের ব্যাপারে মনকে টেনে নামিয়ে আন্‌তে আমার ভারি কষ্ট হয়, ভারি কষ্ট হয়। নাও, বসো।"

ব্রহ্মচারী নিবেদন করিয়া ভোজনে মন দিলেন, ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গেলেন।

জলযোগের পর যে যার নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। আজ অষ্টমী, হবিষ্যের হাঙ্গামা নাই।

একটু পরে উঠান হইতে ঠাকুর্দ্দার ডাক শোনা গেল—"প্রসাদ!" সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরিচিত কণ্ঠের স্নেহময় আহ্বান ধ্বনিত হইল "ছোট-মা।"

দুজনেই বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন ঠাকুর্দ্দা ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার আসিয়াছেন। যথারীতি আদর-অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে বসান হইল।

প্রথমেই ঠাকুর্দ্দা পাটনার বিবাহ-বাটীর সংবাদ লইয়া পড়িলেন। নির্ব্বিঘ্নে শুভ বিবাহ শেষ হওয়া,—ইহাঁদের না যাওয়া, প্রতারিত মণির রাগ দুঃখ,—জ্যাঠামহাশয়দের নরম-গরম মন্তব্য, জ্যাঠাইমাতাদের অশ্রু-বিসর্জ্জনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারী হাই তুলিয়া বলিলেন "ঘায়েল্ হয়ে পড়েছি। চাচা, যদি অনুমতি দাও বাবা,—একটু আড়ালে গিয়ে জিরিয়ে আসি।"

বিনয় রাগ জানাইয়া বলিলেন "বিদেয় হও। তোমার মত মুখপোড়া ছেলের এ সব কথা শুনতে হবে না।"

ঠাকুর্দ্দা শশব্যস্তে বলিলেন "আঃ, কি করিস, কি করিস্ বিনে? বলিস্ না, বল্‌তে নেই।"

বিনয় বলিলেন "বল্‌ব না কি বাবা? আপনার নাতি সত্যিই দেব্‌তা বনে যাচ্ছেন, কি, মনুষ্যত্ব জবাই করে পচে জন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার হিসেব আমি চাই।"

এত বড় কথা! ঠাকুর্দ্দা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন! কিন্তু ব্রহ্মচারী স্মিতহাস্যে বলিলেন "মনুষ্যত্বের হিসাব দুনিয়ার কারবারে তোমরা দাও চাচা। আমি রিটায়ার্ড। তুমি যত পারো তোমার মা, বাবার কাছে বসে চিল্লাও। আমি বিশ্রামে চল্লুম। ঠাকুর্দ্দা, একটু পরে এসে আপনাকে রাগাব মশাই—"

সত্যই ব্রহ্মচারী গিয়া নিজের ঘরে শয়ন করিলেন।

ঠাকুর্দ্দাও কম্বলের উপর আড় হইয়া শুইলেন। উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "প্রসাদ, নাৎ-বৌ আমার গোটাকতক পাকা চুল তুলে দেবেন কি?"

ব্রহ্মচারী নিজের ঘর হইতে বলিলেন "সেটা আমার অনুমতি-সাপেক্ষ নয়। আপনার নাৎ-বৌয়ের উপযুক্ত ছেলে সামনে বসে আছেন, তাঁর অনুমতি নিন। 'বৃদ্ধা পুত্র বশেতিষ্ঠে' শাস্ত্রের অনুশাসন। বয়েস ত ঢের হয়েছে!"

বিনয় মুখভঙ্গি করিয়া করিয়া বলিলেন "খুব হয়েছে জ্যেঠতাত! আর কেঁড়েলি কর্‌তে হবে না। এখানে যখন বস্‌বে না, তখন ছোট-মা কেন ঘোমটা দিয়ে হাঁপিয়ে সারা হন। দুয়ারটা ভেজিয়ে দাও।"

ব্রহ্মচারী নিজের দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারিণী ঘোমটা সরাইয়া ঠাকুর্দ্দার মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয় পিতার পায়ের কাছে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথার পর বিনয় নিম্নস্বরে বলিলেন "ছোট-মা, কাল শক্ত্যানন্দ স্বামী তিনজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে হানা দিয়েছিলেন কেন গা?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "সেই কথা বল্‌বার জন্যেই আমি আপনাদের খুঁজ্‌ছিলাম বাবা, আপনি যে তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য খবর আমিই আপনাকে দেব!"

বিনয় বলিলেন "আমি তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েছি, আপনাকে কে বললে?"

"রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হয়েছে। কাক অত্যন্ত চতুর, অতি ধড়িবাজ,—সেই জন্যে কোন্ অস্পৃশ্য বস্তু ভোজন করে তাকে মর্‌তে হয় জানেন ত? আপনার বিরুদ্ধে তাঁরা নালিশ কর্‌তে এসেছিলেন, আমার কাছে। উঃ, সে কি নির্ম্মম আক্রোশ! বিশেষতঃ ওই মুখুজ্জেদের মেয়েটির—"

ঠাকুর্দ্দার আর পাকা চুল তোলানো হইল না; মাথা টানিয়া লইয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া চুপি চুপি বলিলেন "সেও এসেছিল? আস্তে, আস্তে,—আর বোসেদের বিধবা বৌটা? তাকে কেমন দেখলে বল দেখি?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "এমন সুশ্রী গঠন খুব অল্প মানুষের মুখে দেখেছি, আর এমন ভয়ঙ্কর পৈশাচিক ক্রূর ভাবও খুব অল্প মানুষের মুখে দেখেছি। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই মহৎ পণে আবদ্ধ হয়ে এই দলটি ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেছেন। তাঁরা চরমে যাবার জন্যে প্রস্তুত।

যতদূর বুঝলাম ঠাকুর্দ্দা, শক্ত্যানন্দ ঠাকুর তাঁদের মাথাগুলি একেবারে খেয়েছেন।"

একটু থামিয়া বলিলেন "আপনি রাগ করবেন না ঠাকুর্দ্দা, কথাটা বলা হয় ত আমার উচিত নয়। কিন্তু না বল্‌লেও থাকতে পারি নে, আপনার নাতিটিও তাঁর বশীকরণ-শক্তি-প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেছেন। চোখ থাকতেও উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কাণ থাকতেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, একেবারে মোহাচ্ছন্ন অবস্থা!"

বিনয় বলিলেন "যাকে বলে 'হিপ্নোটাইজড্!' শক্ত্যানন্দ 'পাওয়ারফুল ইভল্ স্পিরিট' বটে! কিন্তু এইবার বাছাধনকে বুঝতে হবে যে, বাবার ওপর বাবা আছেন।"

ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন "আর, এই ঘরের ঢেঁকি কুমীরকে এবার আমি সায়েস্তা করব!"

ঠাকুর্দ্দা ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিলেন "উহুঁ, উহুঁ। প্রসাদ আর যা-হোক, তা হোক,—আসলে বেচারা নিষ্কপট সরল!"

বিনয় বলিলেন "ঈশপের গল্পের সেই বোকা ছাগল আর কি! যাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কুয়ার মধ্যে টেনে এনে, ধূর্ত্ত শেয়াল যার কাঁধে চড়ে পালিয়েছিল।"

দুঃখিত হইয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "বেদ-বেদান্ত নাড়া-চাড়া করে ও-বেচারা সহজবুদ্ধি জিনিসটা হারিয়েছে।"

বিনয় সবিনয়ে বলিলেন "সেটা আপনাদের গোষ্ঠির মুনি ঋষিরা সবাই হারিয়েছিলেন বাবা। দুর্ব্বাসা থেকে ব্যাস পর্য্যন্ত অনেকেই তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। কাশী গড়তে ব্যাসকাশী গড়েছেন, শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন। যজ্ঞ করতে বসেছেন, দৈবশক্তি বিকশিত করছেন,—অসীম ক্ষমতা! কিন্তু যেই অসুররা রাক্ষসরা এসে হানা দিলে, অম্নি কর্ত্তাদের চক্ষু ছানাবড়া! যেন সব ফৌজদারী মামলার খুনী আসামী! মুখ দে' একটা সত্যি কথা পর্য্যন্ত বেরুবে না!"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন "খুড়শ্বশুর আমার উকীল বটে! পুরাকালে ঋষিরা যখন যজ্ঞ করতে বসতেন, তখন যজ্ঞরক্ষার জন্য সত্যই দেবতাদের ডেকেডুকে কুলোত না। অস্ত্রবিশারদ ক্ষত্রিয় রাজাদের ডেকে আনতে হোত। শুধু দৈবশক্তির দ্বারা আসুরিক শক্তি সব সময় পর্য্যুদস্ত করা চলে না,—চল্‌লে স্বয়ং দেবতারা অসুরের হাতে বারবার লাঞ্ছিত, স্বর্গচ্যুত হতেন না। আসুরিক শক্তি বিধ্বস্ত করতে হলে চাই ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থান। তাই দেবতাদেরও দায়ে ঠেকে, চণ্ডী-রূপের উপাসনা করতে হয়েছিল। কথাটা সত্য বটে।"

তার পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন "নিন বাবা খুড়শ্বশুর, ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক রূপে আপনারা তৈরী হয়ে দাঁড়ান ত। ধর্ম্ম আর নীতির পক্ষ অবলম্বন করে আসুরিক উপদ্রবের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ ঘোষণা করুন। দেব-দৈত্যের লড়াই ঢের দেখেছি, এবার দৈত্য আর মানুষের লড়াই দেখি!"

উৎসাহিত হইয়া বিনয় বলিলেন "এই ত বীর-জননীর বাণী! কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে 'মারো বাহাদুর, লড়ো বাহাদুর' করলে হবে না মা-ঠাকরুণ! দয়া করে নিজেরাও আলিস্যি ছেড়ে, একটু কায করুন। দেশের মূর্খ মেয়েদের হিতাহিত-বুদ্ধি উন্মেষের জন্য, কার্য্যকরী জ্ঞান উদ্বোধনের জন্যে, একটু শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করুন দেখি। ওদের পক্ষি ঝিকে দিয়ে তামাক সাজানো, পা টেপানোর গরজে শক্ত্যানন্দ ঠাকুর তাকে 'শিক্ষিতা মেয়ে' উপাধি দিয়েছেন। তার অধিকতর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে, তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছেন, —উন্নতির চরম সীমা। পক্ষি শক্ত্যানন্দ যাকে বলে ঠাকুরের ফরমাস মত শিক্ষিত হয়ে নিজে ত উৎসন্ন গেছেই, তার সমবয়স্ক পাড়া ঘরের মেয়েগুলোকে নিজের দলে টেনে নেবার জন্যে সে এমন জোর প্রোপাগাণ্ডা সুরু করেছে যে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।"

খুড়-শ্বশুর আরও বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়া বলিলেন "থাম্ থাম্, স্ত্রীলোক অবধ্য। রসনা অত বেশী স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিস্ নে।"

একটু হাসিয়া খুড়শ্বশুর বলিলেন "ব্যাপারটা বিপজ্জনক বটে। কিন্তু 'শক্ত্যানন্দ প্যাটার্ণের' এই শিক্ষার মোহ থেকে মেয়েগুলিকে উদ্ধার করা বড় দরকার।"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "হাঁ, বড় দরকার। সেদিন ওই যে দলটী এসেছিল, তাদের কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করে আমারও তাই মনে হোল। সহজ বুদ্ধিতে

আমরা যেটাকে সৎ পথ বলে মনে করি, যে পথকে শ্রদ্ধা করি, যে পথে চল্‌তে চাই,—সে পথটার ওপর এঁদের মর্ম্মান্তিক ঘৃণা বিদ্বেষের যেন সীমা নেই।”

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন “ওদের দোষ নেই। ল্যাজকাটা শিয়াল মাত্রেই চায়, সকলের ল্যাজ কাটা যাক! অবশ্য এ ক্ষেত্রে উপমাটা আমার সুষ্ঠু হোল না, ল্যাজকাটা শিয়ালের চেয়ে স্কন্ধে-কাটা পেত্নী বলাই বোধ হয় বেশী সুশ্রী হোত। যাক সে কথা, আচ্ছা দিদিমণি, শক্ত্যানন্দ স্বামীর স্ত্রীকে কেমন দেখ্‌লে বল দেখি?”

প্রশ্নটা শুনিয়া বিনয় আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিলেন “আমায় এ প্রশ্ন কেন ঠাকুর্দ্দা? তাঁর প্রকৃত পরিচয় ত আপনারা জান্‌তেই পেরেছেন।”

অর্থসূচক দৃষ্টিতে পিতাপুত্রে একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। বিনয় বলিলেন “তবুও আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। আপনার কি মনে হয়?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন “মনে হওয়া-হওয়ির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌তে হয়,—ইনি শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হলেও হতে পারেন, বয়সের তুলনায় দুজনের পার্থক্য এত। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে হলে বল্‌ব, ইনি আমার অপরিচিতা নয়। কলকাতায় সোনাগাছির মোড়ে মামারা একবার কিছুদিনের জন্যে বাড়ীভাড়া করেছিলেন, বিয়ের আগে আমি সেখানে থেকে স্কুলে পড়্‌তাম। তখন পাশের বাড়ীতে একদল মেয়ের সঙ্গে এঁকে বাস কর্‌তে, ঝগড়া কর্‌তে, মারামারি কর্‌তে দেখেছিলাম। তারা কোন শ্রেণীর মেয়ে তা বুঝ্‌তেই পারছেন! তাদের সবাইকে দেখলে এতদিনের পর চিন্‌তে পার্‌ব কি না সন্দেহ, কিন্তু এঁকে বিশেষ করে চিনে রেখেছিলাম; যে হেতু একজন মাতাল নেশার ঝোঁকে মদের বোতল ছুঁড়ে একদা এঁর পা জখম করেছিল। তাই নিয়ে কিছু হাঙ্গামা হয়। সে সময় আমরা ছোট, কৌতূহলের আবশ্যকতা অনাবশ্যকতা জ্ঞান ছিল না। আমার মামাত বোনরা আর আমি দোতলার জানালার ফাঁক দিয়ে দিন রাত এই বিশেষ দ্রষ্টব্য, আহত জীবটিকে আগ্রহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতাম।”

একটু থামিয়া সসঙ্কোচ হাস্যে বলিলেন “ভুল করবার সম্ভাবনা নাই। এখানে এঁকে দেখে প্রথমটা চম্‌কে গিয়েছিলাম, তার পর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে বুঝলাম সংশয় নাস্তি; সেই ক্ষত-চিহ্নই বর্ত্তমান।”

“আপনাকে তিনি চিন্‌তে পেরেছিলেন?”

“রামচন্দ্র বলুন।”

“মামার বাড়ীর পরিচয় দেন নি ত?”

ব্রহ্মচারিণী মাথা নাড়িলেন।

ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বিনয় বলিলেন “চাচাকে এ সব কাহিনী বলেছেন?”

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন “না! নৈমিত্তিক কাযে বসেছেন, মাথা এখন অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। এখন চিত্ত-বিক্ষেপকর কোন কথা বলাও নিষেধ, শোনাও নিষেধ। দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে ত, কেউ না কেউ ভস্ম হবেই!”

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন “দেখ্‌লি নে, বাড়ীর কথা শুনে সরে পড়্‌ল। না বিনে, প্রসাদকে আজ উত্ত্যক্ত করিস নে, ওর কায আগে শেষ হোক।”

তার পর আরও কিছুক্ষণ তিনজনে নিম্নস্বরে নানা কথা হইল। বিনয় খুঁটিয়া খুঁটিয়া শক্ত্যানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারিণী যতটুকু জানিতেন অকপটে প্রকাশ করিলেন। বিনয়ের কাছে অনেক নূতন সংবাদও জানিতে পারিলেন। দুঃখিত হইয়া বলিলেন “শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের এতখানি স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্যে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যে আপনার ভাইপো দায়ী, তার সন্দেহ নাই।”

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন “ঠিক কথা। প্রসাদ তাকে মহাপুরুষ বলে খাতির না কর্‌লে কে চিন্‌ত শক্ত্যানন্দ স্বামীকে? প্রসাদ যাকে শ্রদ্ধা কর্‌লে, জন-সমাজ অন্ধ ভক্তিতে সসম্ভ্রমে তার পূজা জুড়ে দিলে! বিচার-বুদ্ধির বালাই ত কারুর নেই! যার পূজা কর্‌ছে সে যে কি পদার্থ, কেউ একবার বাজিয়ে দেখ্‌লে না। দু চক্ষু বুজে সবাই প্রসাদের গোড়েই গোড় দিলে!”

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন “তা হলে বল্‌তে হচ্ছে, ঠিক হয়েছে। শক্ত্যানন্দ ত অকৃতজ্ঞ নয়! আমার পরোপকার-উৎসাহী চাচার সাধুভক্তির উপযুক্ত পুরস্কারই সে দিয়েছে!”

ঠাকুর্দ্দা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন “এই, থাম!—চঃ, চঃ, আজ ওঠা থাক্। আর নয়।”

ব্রহ্মচারিণী যোড় হাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা, আর একটু বসুন। কথাটা চাপ্‌ছেন কেন? ঠারে-ঠোরে সবই ত বুঝতে পার্‌ছি। শুধু স্পষ্ট করে নাম ক'টা বলে দিন, শুনে কর্ণ পবিত্র হোক!"

বিনয় উঠিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া জুতা পরিতে পরিতে বলিলেন "ছোট মা, আমারই ছোট-মা! আপনার নাতি নন যে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবেন! কথাটা শুনিয়ে দিন না বাবা, দেখবেন ছোটমা-ও আমার মত খুশী হবেন।"

ঠাকুর্দ্দা কুণ্ঠিত হইলেন, ইতস্ততঃ করিলেন। শেষে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত, খুব নিম্নস্বরে আরও কি কতকগুলা কথা বলিলেন।

ব্রহ্মচারিণী কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, একটি মাত্রও প্রতিবাদ করিলেন না। নির্ব্বিকার মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীর স্বরে বলিলেন "খুড়শ্বশুর, আপনি ঠিক বলেছেন! শক্ত্যানন্দ ঠাকুর অকৃতজ্ঞ নয়। আমি খুশী হলাম!"

ঠাকুর্দ্দা ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন "ব্যস্! আর কিছু নয়? প্রসাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে এই ঘৃণিত মিথ্যাপবাদ, এ কি তুমিও বিশ্বাস কর?"

স্মিত হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক, ঘরের কোণে থাকি ঠাকুর্দ্দা! বিশ্বের রীতি-নীতির কোন খবরই রাখি না, লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের সময়ও পাই না। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূল্য কি? শক্ত্যানন্দ ঠাকুর যখন বাইরের ব্যাপারে স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তখন ঘরের ভিতর বসে আমার তার প্রতিবাদ করাই মূঢ়তা!"

মৃদু মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিলেন "আচ্ছা ছোট-মা, ও মূঢ়তার ভারটা আমার ওপরই থাক!"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কেন বাবা? আপনি কি এতই অবহেলার বস্তু?"

বিনয় বলিলেন "আপনারা সকলেই যখন অন্যায়-নিষ্ঠ, মিথ্যাচারীদের স্পর্দ্ধার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তখন বাধ্য হয়েই নিজেকে অবহেলার বস্তু করে তুল্‌তে হচ্ছে। গ্রাম্ভারী চালে সম্মানের পাত্র সেজে থাকবার সুযোগ দিলেন কই?"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "আমরাই আপনার সে সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছি, নয়? আচ্ছা, আপনি সত্য-মিথ্যার তদন্ত করছেন, ন্যায়সঙ্গত ভাবে সেই তদন্তই করুন। আপনার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, সুকর্ম্মের শানে পড়ে আরও উজ্জ্বল হোক। লোক-সমাজ ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যার খাতির বুঝুক, ভাল কথা। কিন্তু অপরাধীর শাসন-বিচারের ভারটা নিজের হাতে নেবেন না, আমার অনুরোধ।"

বিনয় বলিলেন "দেখুন ছোট্‌মা, বাপ মাকে যদি গাল খাওয়াবার ইচ্ছা না থাকে, তবে অমন অনুরোধ আমায় করবেন না। এই সব মিথ্যাবাদীদের ছ্যাচড়া-কীর্ত্তনের মীমাংসা করতে কোন্ জজ সাহেব, কোন্ ম্যা'ষ্ট্রেট্ সাহেব আসবেন বলুন ত?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের বিশ্বাস,—এখানকার মানুষ হিংসা করে যতই তাঁর শত্রুতা করুক, যতই মিথ্যাপবাদ দিক—ঈশ্বর কখনই তাঁকে পর্য্যুদস্ত করবেন না। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন,—সকলের চেয়ে বড় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী একজন আছেন, সকলের চেয়ে বড় নির্ভুল বিচারক একজন আছেন। শক্ত্যানন্দ যে ভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে মনে হয়,—তাঁর ত্রুটি সংশোধনের জন্য আপনাদের কাউকেই আর পরিশ্রম করতে হবে না। অন্ততঃ আজকাল দুটো দিন অপেক্ষা করুন।"

বিনয় বলিলেন "তথাস্তু। ইতিমধ্যে আমার বাকী তদন্তও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাবা উঠুন।"

ঠাকুর্দ্দা উঠিলেন। ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে চাহিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "প্রসাদ, আমায় রাগাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিস্, কিন্তু এখন আমার অনেক কায; রাগ করবার সময় নেই। আজ চল্লুম ভাই। দুঃখ করিস্ নে।"

ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "তা হ'লে কবে এসে রাগ করবেন, কথা দিয়ে যান, নচেৎ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হব।"

বিনয় বলিলেন "রাগ করবেন কি রাগ করাবেন, সে সমস্যার পরে আলোচনা হবে। পর্শু তর্শু সকালের দিকে যদি আমরা আসি, তোমার ফুরসুৎ হবে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "হাঁ। অতি অবশ্য এসো।"

ঠাকুর্দ্দা ও বিনয় বিদায় লইলেন।

(৪৩)

পরদিন সকালে নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, নৈমিত্তিক ক্রিয়ার জ্ঞাত-অজ্ঞাত ত্রুটি সংশোধনের জন্য পাড়ার ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে সিধা পাঠাইয়া ব্রহ্মচারী নিশ্চিন্ত হইলেন; জল খাইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারিণী আসিয়া দুয়ারের বাহিরে কম্বল পাতিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী তখন একমনে নিজের হাত-পায়ের পেশীগুলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সঙ্কুচিত প্রসারিত করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, ব্রহ্মচারিণীর আগমন টের পাইলেন না। ব্রহ্মচারিণী ধীরে ডাকিলেন "ব্রহ্মচারি—"

মুখ না তুলিয়াই ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে বলিলেন "এসেছ? উঃ, তুমি করেছ কি গো?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কি করেছি?"

হাতের পেশী স্ফীত করিয়া দেখাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "গ্যাখো দেখি! ডবল বেড়ে গেছে: এই ক'দিন ত খাওয়া-দাওয়ার দিকে মনোযোগ দিই নি। অন্যমনস্ক পেয়ে মনের সুখে খুব গিলিয়েছ! বল,—দুধ ঘির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছ?"

ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তরে মৃদু হাসিলেন।

ব্রহ্মচারী অপ্রসন্নভাবে বলিলেন "না, না—কাযটা ভাল হয় নি। খাওয়া বাড়ানো আমি দু চক্ষে দেখতে পারি নে।"

ব্রহ্মচারিণী শান্ত ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "না দেখ্‌তে পারো, চক্ষু বুজে থাক্‌লেই হয়। ওদিকে তোমার মনোযোগ দেবার কিছুমাত্র দরকার নেই।"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নিজের দুই গালে হাত বুলাইয়া বলিলেন "হুঁ, আমার গাল ভারি হয়ে উঠেছে।"

"অপরাধ হয়েছে, স্বীকার কর্‌ছি। এখন ও কথা থাক। শোনো আমার কথা—"

কে শুনিবে? ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া বলিলেন "গ্যাখো, আমার নৈমিত্তিক কায শেষ হয়েছে। এখন শুধু নিত্যক্রিয়া মাত্র। এখন বেশী খাওয়া আমার সহ্য হবে না। খাওয়া কমিয়ে দাও।" বলিতে বলিতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে বলিলেন "তোমায় এমন ক' হিল দেখাচ্ছে কেন বল দেখি?"

ম্লান হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘট্‌লে চেহারা অমন কাহিল দেখায়। আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগ্‌ছে না। তোমার কায ত শেষ হয়েছে, এবার পাটনায় চলো।"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "হুঁ, এবার যেতে হবে।"

অনুরোধের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দেরী কোর না। মণিকে কথা দিয়ে রেখেছি, আমার সত্যরক্ষা করাও। ছেলেদের জন্যে আমার মন কেমন কর্‌ছে।"

ব্রহ্মচারী সকৌতুক হাস্যে বলিলেন "এর নাম সন্ন্যাস! হায় বুদ্ধদেব, রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র ছেড়ে কোন্ নির্ব্বাণের সন্ধানে বেরিয়েছিলে বাবা?"

লজ্জিত হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমার ভয়ানক দুর্ব্বলতা আছে, অস্বীকার কর্‌ছি নে। নিজের দুর্ব্বলতাকে আমি নিজেই ভয় করি। ঠাট্টা কর্‌ছ কি?"

তিনি আরও কি বলিতেন,—বাহির হইতে ডাক-পিওন হাঁকিল "চিঠি আছে।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া গিয়া চিঠি লইয়া আসিলেন,—একখানি মাত্র পোষ্টকার্ড। চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মচারী বলিলেন "এই নাও! তোমার ধাড়ি-বাচ্ছা, কচি-বাচ্ছা সকলকার কাঁদুনী গান শোনো। বাপ! আমায় যদি এত ভালবাসবার লোক কেউ থাকত, আমি মারা যেতাম।"

চিঠিখানি ব্রহ্মচারিণীর সামনে ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিয়া কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণী চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বড়-জ্যাঠা-মশায় নিজে লিখিয়াছেন। ইহাঁদের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহারা সকলে ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বাড়ীর পাশে বাগানে সম্প্রতি যে তেতলা বাড়ীখানি তৈরী হইয়াছে, সেইখানিই ইহাঁদের বাসের জন্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। সেখানকার নির্জ্জনতা, শান্তির যাতে ব্যাঘাত না হয়, ছেলেপিলেরা গিয়া সর্ব্বদা যাতে উৎপাত না করে, সেজন্য তিনি যথোচিত প্রহরার ব্যবস্থা

করিয়াছেন। কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবে না। ইহাঁরা যেন শীঘ্র যান। ছোটমার জন্য মণি অত্যন্ত মন-মরা হইয়া আছে। সেজন্য তার স্বাস্থ্যও ভাল নাই। প্রায়ই রাত্রে ঘুমের ঘোরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া "ছোটমা ছোটমা" বলিয়া কাঁদে। ছেলেটির জন্য তাঁরা উদ্বেগ-বিব্রত হইয়া আছেন। ছোটমা সেখানে গিয়া পৌছিলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন। ইত্যাদি।

চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া কোলে রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। একদৃষ্টে সামনের আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী সকৌতুক হাস্যে বলিলেন "কি ভাবছ? মন কেমন করছে?"

ব্রহ্মচারিণী দৃষ্টি না ফিরাইয়া বলিলেন "এতক্ষণ কারণ বুঝি নি, তাই মন কেমন করছিল, এখন কারণ বুঝতে পারছি, আর মন-কেমন করা অনুচিত। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, এ বন্ধনের বোঝা মাথায় তুলে,—এতে জড়িয়ে পড়া নয়, একে যেন ছাড়িয়েই যেতে পারি। 'কর্ম্মফল ঘুচাইব তব কর্ম্মজ্ঞানে'—তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন,—এই ক্ষমতা আমায় দিন।"

বাহির হইতে ব্যগ্র-উত্তেজিত কণ্ঠে বিনয় ডাকিলেন "ছোট-মা—"

পরক্ষণে সম্ভবতঃ আত্ম-সংশোধনের জন্যই পুনশ্চ ডাক দিলেন "প্রসাদ কাকা—"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ছাখো ছেলের কাণ্ড! রাস্তা থেকে হাঁক পাড়ছেন—আগে 'ছোটমা',—তার পর ভুল শুধরে 'অমুক কাকা'!—ডাক বাড়ীর ভেতর।"

ব্রহ্মচারী তটস্থ হইয়া হাঁক দিলেন "কে চাচা? ভেতরে এস।"

দুখানা টেলিগ্রাফের রসিদ হাতে লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বিনয় বাড়ী ঢুকিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া উৎকণ্ঠা-উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "বিন্দে আর শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের খবর পেয়েছ?"

বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "না। কি খবর?"

বিনয় বলিলেন "কাল সন্ধ্যার পর বিন্দুবাবু বাগদী পাড়ায় বিমলির ঘরে বসে, বোসেদের বৌকে নিয়ে কি সব মিথ্যে মামলা মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলেন। কদিন বর্ষা হচ্ছে—হঠাৎ মাটীর ভিজে দেয়াল, খড়ের চাল, বাঁশ, বাঁখারি সব হুড়মুড় করে ভেঙে ঘাড়ে পড়েছে। বিন্দুবাবুর ডান হাতটি আর চিবুক গুঁড়ো হয়ে গেছে, বোসেদের বৌয়ের বাঁ পাটি—আর ঠোঁট দুখানি থেঁতো হয়ে গেছে। দুজনেই অজ্ঞান। খবর পেয়ে রাত্রেই সেখানে ছুটেছিলাম। অনেক চেষ্টায় এখন দুজনেরই জ্ঞান ফিরেছে।"

একটু থামিয়া দম লইয়া পুনশ্চ বলিলেন "সকালে খবর পেলাম, তোমার গুণধর শক্ত্যানন্দ ঠাকুর কাল রাত্রে শ্মশানে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে, কি সব আভিচারিক ক্রিয়া করতে গিয়েছিলেন। তার পর—অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যেই হোক, বা কোন রকম ভয় পেয়েই হোক,—হঠাৎ আসনের ওপর ঘাড় মোড় ভেঙে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে দু-একজন কে ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ চম্পট দিয়েছে। সারারাত সেই অবস্থায় শ্মশানেই পড়ে ছিলেন। ভোরে চাষারা দেখ্‌তে পেয়ে তুলে এনেছে। অবস্থা সাংঘাতিক। ডাক্তার বল্‌লেন, আর্টারি ছিঁড়ে এ্যাপোপ্লেক্সি। কবিরাজ বলছেন বাতব্যাধি কিম্বা পক্ষাঘাত। বাঁচা সঙ্কট। শক্ত্যানন্দ ঠাকুরকে আর বিন্দেকে ডাক্তার পাল্কী করে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গেছেন। বোসেদের বৌকে তার আত্মীয়-স্বজনদের জিম্বায় গছিয়ে দিয়েছি। বিন্দের বাপকে টেলিগ্রাম করে খবর দিলাম, শক্ত্যানন্দের কে এক ভাইপো না ভাগ্নে আছে, তাকেও টেলিগ্রাম করলাম। ওঁর স্ত্রীপুত্রের ঠিকানা কেউ বল্‌তে পারছে না,—কেউ বল্‌ছে স্ত্রীপুত্র আছে, কেউ বল্‌ছে নেই। তুমি ঠিক খবর বল্‌তে পারো?"

আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্রহ্মচারীর মন মুসড়াইয়া গিয়াছিল। বিনয়ের শেষ প্রশ্নে হতভম্ব হইয়া বলিলেন "ওঁর স্ত্রীপুত্রের ঠিকানা? স্ত্রী ত কাছেই রয়েছেন!"

নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া ক্ষুব্ধ হাস্যে বিনয় বলিলেন "বৎস সত্যকাম! তুমি তোমার ছান্দোগ্য উপনিষদের পৃষ্ঠায় ফিরে যাও! পথ ভুলে এ মাটীর পৃথিবীতে এসে, আমাদের বড় বিপদগ্রস্ত করেছ। ছোটমা, একগ্লাশ জল দিন ত বাবা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

ব্রহ্মচারিণীর মুখে লেশমাত্র বিস্ময়ের চিহ্ন ছিল না, শুধু গভীর বিষাদে সমস্ত মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।
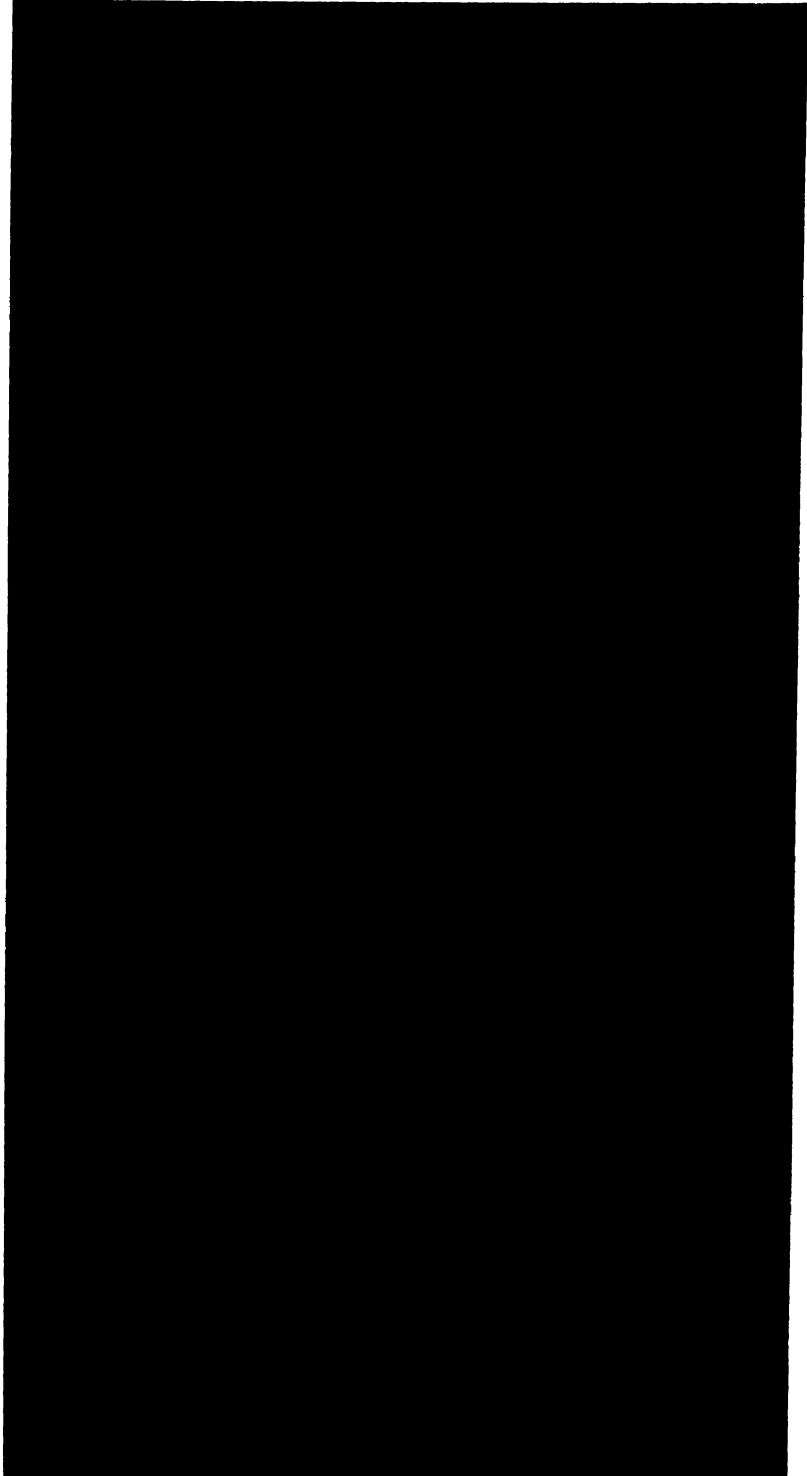
"প্রলয়ের সুর"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

কিছু মিষ্ট ও জল আনিয়া আসন পাতিয়া বিনয়কে খাইতে দিলেন ; একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

বিনয় জল খাইয়া শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "বসো বৎস, এবার এক নিঃশ্বাসে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত আবৃত্তি করব। তোমার নৈমিত্তিক ক্রিয়া, না শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কি মহামারী কাণ্ড ছিল, সেটা শেষ হয়েছে কি ?"

ব্রহ্মচারী ম্লানভাবে হাসিয়া বলিলেন "হয়েছে। কি বল্‌বে বল না বাবা, অত খবরে কায কি ?"

বিনয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "বাপ! তোমার এই খবরের জন্যে, কি ভয়ানক অবস্থায় পড়ে রসনাকে সংযমের তপস্যা শেখাচ্ছি, সে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। গাঁ-শুদ্ধ লোকের রসনা তড়্‌পাচ্ছে, কেবল আমারি এই বিখ্যাত বলা-মুখটি চুপ! বাবা কেবল আমাকে সাম্‌লাচ্ছেন,—'সাবধান, প্রসাদের কাণে যেন এ-কথা না ওঠে। প্রসাদ শক্ত কাযে বসেছে, এ সময় কোন রকমে ওর মন চঞ্চল হলে রক্ষা থাক্‌বে না। ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হবে,'—ইত্যাদি, ইত্যাদি! কাযেই চুপ। ভেবে-ছিলাম আজ তোমার কায শেষ হবে, কাল সব্বাইকে ডেকে এনে যথাশাস্ত্র শক্ত্যানন্দের পিণ্ডদান কর্‌ব। কিন্তু 'বিধির মার দুনিয়ার বার'—বাবাজীর এমন অবস্থা হোল যে শুধু 'কোয়াইট্‌ সেন্সলেস্' নয়, একেবারে বাক্‌রোধ! চেয়ে আছেন, কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন,—একটা শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে না! বড় কষ্ট। দেখে দুঃখ হোল। আমার মত নাস্তিক কাফেরকেও মনে মনে স্বীকার কর্‌তে হোল যে, হাঁ, ভগবানের বিচার বলে একটা জিনিস আছে! বাক্‌শক্তি অপব্যবহারের চমৎকার সাজা বটে!"

ব্রহ্মচারিণী বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "খুড়শ্বশুর, এই জন্যেই আপনাকে বারণ করেছিলাম যে সত্যমিথ্যার তদন্ত করুন, কিন্তু শাসন-বিচারের ভার নিজের হাতে নেবেন না। শক্ত্যানন্দ ঠাকুর উদ্ধত দম্ভে অনাচারী হয়ে যে রকম কর্ম্মভোগ জোগাড় করছিলেন, তাতে বেশ বুঝ্‌তে পারছিলাম,—এম্নি একটা আকস্মিক দুর্দ্দৈব ঘটিয়ে তিনি নিজেই নিজের আয়ুক্ষয় করবেন, অপমৃত্যু ঘটাবেন।"

ব্রহ্মচারী আক্ষেপের স্বরে বলিলেন "ইস্! ছি-ছি-ছি! শক্ত্যানন্দ ঠাকুর শেষে অভিচার কর্‌তে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস কর্‌লেন ? বড় দুঃখের বিষয়!"

বিনয় বলিলেন "শুধু অভিচার ? অভিচার, ব্যভিচার মিথ্যাচার—যা খুঁজবে তাই! এক বড়লোকের বখা ছেলে—তার নাম হচ্ছে নিমাই,—সে মুখুজ্জেদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়-বন্ধু কে হয় বটে! সে ছোঁড়া মুখুজ্জেদের বিধবা মেয়ের ওপর বুঝি 'দিষ্টি' দেয়। শক্ত্যানন্দ তাকে বশীকরণ না কিসের লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে' বিস্তর টাকা আদায় করেছে। তার পর মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হস্তগত করে,—নিজেই তার সর্ব্বনাশ করেছে। মেয়েটা ত গেছেই, আর ছোঁড়াটা ওঁর অভিচারের প্রকোপেই হোক, বা যে কারণেই হোক, বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে যেমন-যেন জড়পিণ্ড গোছ হয়ে গেছে! স্তম্ভিত, জ্ঞানশূন্য—জীবন্মৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে বলিলেন "ও হো-হো? সে ছোক্‌রাকে যে আমিও দেখেছি। সে একদিন এ বাড়ীতে এসেছিল—"

বিনয় বলিলেন "হুঁ। সব খবর রাখি। সেই ছোক্‌রা!—তোমার মত একজন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী সাধকের অন্তঃপুরে যার অগাধ গতিবিধির অধিকার আছে,—সে লোক শক্ত্যানন্দ হোক, শয়তানানন্দ হোক, সাক্ষাৎ ভূত-প্রেত হোক,—জনসমাজের চোখে তিনি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য! শক্ত্যানন্দের হাতের কি সিঁদ্‌কাটিই হয়েছিলে বাবা তুমি! তোমার বাড়ীর মধ্যে তিনি আস্‌তেন, অতএব গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা তাঁর শ্রীচরণ দর্শনে যাবার অধিকার পেয়েছিল। তিনিও সুবিধা পেয়ে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মূর্খ মেয়েগুলোর মস্তক উত্তম-রূপে চর্ব্বণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক অল্পবয়স্ক বিধবাকে হিপ্নোটাইজ্ করে সাফ্ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাদের স্বামীর আত্মাকে পরলোক থেকে আনিয়ে তিনি নিজের দেহে স্থাপন করেছেন। অতএব তিনিই তাঁদের ধর্ম্মতঃ স্বামী! তার পর কি আর বল্‌ব? ধর্ম্মের অনুরোধে সব অধর্ম্মই চলে গেছে!"

ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তক তীব্র আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। উঠিয়া,—কাণে হাত দিয়া সঙ্কোচে বলিলেন "শিব শিব শিব! কি মহাপাপ! এ শক্ত্যানন্দের এ শাস্তি হবে না ত হবে কার? তিনি ধর্ম্মের ধাপ্পা দিয়ে

এদের একটা জন্ম নষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে—"

ব্রহ্মচারিণী শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন "হাঁ হাঁ ব্রহ্মচারি! থামো! বসো, শুধু শুনে যাও। বিচারের অধিকার তোমার নয়।—সেদিক দেখ্‌তে আর একজন আছেন। তুমি শুধু শিক্ষা লাভ করো,—ভবিষ্যতের জন্তে একটু কাণ্ডজ্ঞান সঞ্চয় করো।"

ব্রহ্মচারী আত্মদমন করিয়া বসিলেন। গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তীব্র বেদনা-পীড়িত স্বরে বলিলেন "ওঃ, ভগবান! কর্ম্মদোষে আমিই শক্ত্যানন্দের পাপানুষ্ঠানে নিমিত্তের হেতু হলাম! আমার এ অপরাধের শাস্তি কি?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "তোমাকেও তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে গেছেন। ক্ষুব্ধ হোয়ো না, চোখ খুলে চেয়ে ত্যাখো—খুব বেঁচে গেছ! যথার্থই গ্রহশান্তি করেছ, এতদিনে তোমার ফাঁড়া কাট্‌ল! মাথাটি ঠাণ্ডা করে এবার স্থিরচিত্তে নিজের মিথ্যাপবাদ শোনো। শক্ত্যা-নন্দকে ধন্যবাদ দাও, তিনি তোমার উপকার করে গেছেন! আমি হবিষ্যের আয়োজন গোছাতে চললুম। খুড়শ্বশুর, আপনি বলুন।"

ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

খুড়শ্বশুর একটু যেন থতমত খাইয়া গেলেন। ইহাঁদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কি যেন কিসের একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সূচক সঙ্কেতের আভাস অনুভব করিলেন, কিন্তু তার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; কুণ্ঠিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "তোমার মহৎ দোষ, তুমি অতিরিক্ত সরল; আর সবাইকে নিজের মত সত্যনিষ্ঠ মনে করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, মূর্খতা করেছি। তুমি রাজী থাক তো বল, তোমার সামনে নাকে খৎ দিচ্ছি।"

বিনয় হাসিলেন। বলিলেন "দোহাই চাচা! তাহ'লে বাবা আমায় মেরে ফেল্‌বেন! শুধু একটি কথা দয়া করে মনে রেখো, 'সকল মানুষ নয় কো মানুষ, কেবল মানুষের ছাপ। কারুর পেটে বাঘ-ভাল্লুক, কারুর পেটে সাপ!' আচ্ছা বল তো বাপধন, রত্‌না নাপ্‌তে বলে কোনও মূর্ত্তিকে তুমি চেন কি? তিনি শক্ত্যানন্দের চরণাশ্রিত একজন,—ওই তন্ত্রের ভাষায় যাকে বলে সাধক চক্রবর্ত্তী গো, তাই! চেন তাকে?"

ব্রহ্মচারী খানিকটা ভাবিয়া বলিলেন "নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে, মানুষটা দেখেছি কি না মনে পড়ছে না।"

বিনয় বলিলেন "তোমার শক্ত্যানন্দের ভেল্কি-বাজীর জয় হোক! ব্যভিচারাসক্ত একযোড়া ঝি চাকরকে তোমাদের স্কন্ধে চাপাবার জন্তে শক্ত্যানন্দ অনুরোধ করেছিলেন মনে আছে? স্ত্রীলোকটা সন্তান-সম্ভবা ছিল। ছোটমাকে তার আঁতুড় তোলার ভার দেওয়া হয়েছিল, মনে পড়ে?"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "মনে পড়্‌ছে। তার পর?"

বিনয় বলিতে লাগিলেন "স্ত্রীলোকটা ভদ্রঘরের মেয়ে। '—'গ্রামের মুস্তফীদের বাড়ীর বৌ। শক্ত্যানন্দের কুহকে পড়ে বিপথে আসে, শেষে অবস্থা শোচনীয় দেখে ধূর্ত্ত শক্ত্যানন্দ কোথা থেকে ওই রত্‌না ব্যাটাকে এনে নিজের সাবষ্টিচিউট্‌ দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, তোমার স্কন্ধে ভর দিয়ে তোমার ভিটেয় ভ্রূণহত্যা করাবে। ছোটমা নিজের সময়ের অভাব বলে আঁতুড় তোলার দায়িত্ব নিতে স্বীকার করেন নি। অতএব বাগ্দী পাড়ায় বিন্দুবাবুর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি সে কার্য্য সমাধা হয়েছে। গ্রামের অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামশুদ্ধ লোক খাপ্পা হয়ে বিন্দে আর শক্ত্যানন্দকে চেপে ধরে।—শক্ত্যানন্দ সাফ জবাব ঝেড়ে দিয়েছে,—স্ত্রীলোকটা প্রসাদবাবুর উপপত্নী! প্রসাদবাবু পাঁচশো টাকা দিয়ে তাদের ভ্রূণহত্যা করবার আদেশ দিয়েছেন, তাই তিনি বন্ধুত্বের অনুরোধে নিঃস্বার্থ পরোপকার করেছেন। তাঁর দোষ কি?"

ব্রহ্মচারীর পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত যেন পাথর হইয়া গেল। স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, নিশ্চল হইয়া তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—এক পা নড়িলেন না, একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন না।

বিনয় বলিয়া চলিলেন "নিজে ঈশ্বর-ভক্ত হবার লোভে,—শয়তান-ভক্ত, মিথ্যাচারী, ভণ্ডের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলে বাবা? তার শাস্তি যাবে কোথা? হাওয়ায় খবর অনেক দিন থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছে! বাবা

অনেকের মুখেই অনেক গুজব তোমার বিরুদ্ধে শুনেছেন, তোমায় তার আভাসও দিয়েছেন। কিন্তু তুমি বোকা রাম,—কথাটায় মোটে কর্ণপাত কর নি। আমি গ্রামে এসে দেখি, গ্রাম তোলপাড় হচ্ছে। হুজুগে লোকগুলো এই গুজব নিয়ে যেখানে সেখানে বৈঠক বসাচ্ছে, দুশ্চরিত্র লোকগুলোর হর্ষ আস্ফালনের সীমা নাই। 'ব্রহ্মচারীর যখন এই দুর্দ্দশা, তখন তারা ত বদ্‌মাইসি করবার জন্যে ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পেলে!' ওঃ, সে কি উল্লাস, উৎসব!"

একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিলেন "আমায় ত চেন? নামলাম ডিটেকটিভ্‌ বৃত্তিতে। এই বর্ষা-বাদল মাথায় করে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে, সন্ধান নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লাম। সকলেরই দেখি,—কাণ আছে, চোখ নাই। সবাই বলে প্রসাদবাবুর অধঃপতনের কথা কাণে শুনেছি, চোখে দেখি নি। দেখেছে শুধু বিন্দুবাবু। উত্তম, বিন্দুবাবুর দলে গিয়ে ভিড়লাম। খেলিয়ে খেলিয়ে অনেক কষ্টে ডাঙায় মাছ তুললাম। রহস্য আবিষ্কৃত হোল—বিন্দুবাবু নিজে কিছু দেখে নি, সত্য মিথ্যা কোন খবরই জানে না। মদ মাংসের লোভে শক্ত্যানন্দের আড্ডায় ধর্ণা দেয়,—শক্ত্যানন্দ তাকে জপিয়ে-সপিয়ে প্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে ঐ কথা রাষ্ট্র করতে বলেছেন, তাই সে বলেছে। উত্তম। রত্‌নার সাক্ষ্য নিলাম, সে প্রথমে মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌ল না। স্বীকার করলে—শক্ত্যানন্দের শিক্ষামতই সে প্রসাদবাবুর নাম করছে, নইলে প্রসাদবাবু লোকটি যে কে—তাই সে জানে না। মেয়েটার সাক্ষ্য নিলাম। সে দায়ে পড়ে অকপটে শক্ত্যানন্দের শয়তানীর কাহিনী সব স্বীকার করলে। তার পর কেঁচো খুড়্‌তে গিয়ে সাপ বেরুলো। শক্ত্যানন্দের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে যে স্ত্রীলোকটি এখানে এসে রয়েছে, সে সোনাগাছির এক বিখ্যাত মা-ঠাকুরুণ।"

ব্রহ্মচারী সকাতরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "ছি ছি! শক্ত্যানন্দ অপরাধী। তাঁকে যা বল্‌বে, বলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভদ্রলোকের মেয়ে। তিনি নিরপরাধ; তাঁকে কটূক্তি কোর না বাবা। ভগবানের কাছে অপরাধী হতে হয়।"

বিনয় হাসিলেন। বলিলেন "বৎস, বেশী বিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা কোর না। শক্ত্যানন্দের শয়তানী চক্রান্তের কাছে তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র! তুমি শক্ত্যানন্দকে যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলে, সেই পাঁচশো টাকার তিনশো পঁচাত্তর টাকায় ভুলো স্যাকরাকে দিয়ে কার্ণিশ প্যাটার্ণের চুড়ি গড়িয়ে উপপত্নীকে উপহার দিয়ে তবে এখানে আনা হয়েছে। আরও শুন্‌তে চাও? মা-ঠাকরুণ এখানেও নিজের কেরামতি জাহির করে আরও অনেককে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "রাম রাম রাম! থাম চাচা, আমি আর শুন্‌ব না।"

"শুন্‌বে না কি? নিদেন আর একটু শুন্‌তে হবে। "ছোটমা এদিকে আসুন ত।"

ব্রহ্মচারিণী হবিষ্যের আলোচাল ধুইবার জন্য যাইতে-ছিলেন, ডাক শুনিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয় এক নিঃশ্বাসে সোনাগাছির মোড়ে তাঁর মামাদের বাড়ীভাড়া করা এবং তার পাশের বাড়ীর অধিবাসিনীদের প্রকৃত পরিচয় বিবৃত করিয়া বলিলেন "এই ত সেই মা-ঠাকুরুণটির কুলশীল, বংশ-মর্য্যাদা, ব্যবসায়-গৌরবের পরিচয়?"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন "চাচা বলে কি? এ সব কথাও সত্যি?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "দেখুন খুড়শ্বশুর, এখনো বিশ্বাস হয় নি।"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "না না, আমি শুধু এই কথা বল্‌ছি, তাহলে এখন নয়,—শক্ত্যানন্দ ঠাকুর অনেক দিন আগেই ধ্বংসের পথে রওনা হয়েছিলেন! বড় দুঃখের বিষয়!"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "খুড়শ্বশুর, সাজাহান নাটকে আওরঙ্গজেবের ভণ্ডামির অভিনয় দেখেছেন?"

ইঙ্গিতজ্ঞ বিনয় তৎক্ষণাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন "যা বলেছেন! নিতান্তই যে চাচাকে চিনি। নইলে আমিও বলতাম চাচা লোক দেখাবার জন্যে তেম্নি ভণ্ডামিই জুড়েছে বটে! নাঃ, এ ছোক্‌রার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকারের আশা নাই!"

"আমারও তাই বিশ্বাস!" বলিয়া ব্রহ্মচারীর দিকে স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "যাও, স্নান করে পুজোয় বস গিয়ে। খুড়শ্বশুর, সোনা-গাছির মায়েদের সোনাগাছিতে বিশ্রাম করতে দিন,

আপনি যান, ঘরের মায়ের খবর নিন। আমার ঠাকুমা নিশ্চয় এতক্ষণ ছোট ছেলের জন্যে ভাব্‌ছেন। উঠুন, ঢের বেলা হয়েছে।"

বিনয় উঠিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চিন্ত থাক চাচা। শক্ত্যানন্দের 'আন্‌কন্‌সাস্‌' অবস্থা দেখেই ইনি জিনিসপত্র সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করেছেন। এখন শক্ত্যানন্দের সত্যকার স্ত্রী পুত্র কেউ থাকে ত বলো, খবর দিই।"

বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের সব সত্যি কথাই যখন আমার বরাতে মিথ্যা হয়ে গেল, তখন আর কোন সত্যি কথা বলার ভরসা রাখি নে। ওঁর ভাইপো ভাগ্নে কেউ আসে ত তাঁর কাছে খোঁজ নিও।"

বিনয় প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারিণী কুয়াতলায় ঢুকিলেন।

(৪৪)

স্নান করিয়া, কাপড় বদলাইয়া, পূজার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারিণী ডাকিলেন "ব্রহ্মচারি, আসনে বস্‌বার সময় হয়েছে।"

সাড়া পাইলেন না। ব্রহ্মচারিণী ঘুরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারীর দুয়ারের সামনে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন ব্রহ্মচারী কম্বলে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শুব্ধ নির্ঝুম হইয়া গাঢ় চিন্তামগ্ন।

ব্রহ্মচারিণী ধীরে ডাকিলেন "ব্রহ্মচারি—"

ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। হতাশ বিহ্বল স্বরে বলিলেন "উঃ, শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের হোল কি? আমার মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।"

স্মিত মুখে করুণা-শীতল কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে-তাকে বল্‌তে নেই, স্পষ্ট করে সত্যি কথাও সব যায়গায় বলা চলে না। খুড়শ্বশুর ছেলেমানুষ, কর্ম্মযোগ-উৎসাহী। তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, খুশী করে ঠিক পথে চালাবার জন্যে যতটুকু বলা উচিত, বলা গেছে। আর ও-কথা কেন? কর্ম্মশ্রান্ত বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার মহা বাণী আজ আমার মনে পড়ছে—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই সব ছেড়ে-ছুড়ে আমার কাছে চলে আয়।—' চল, ব্রহ্মচারি, আমরা নিজের কাযে ডুব দিই। "শ্রেয়াণ দ্রব্য ময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌,—জ্ঞানযজ্ঞঃ" ওঠো!"

খুব চড়াসুরে বাঁধা এস্‌রাজের একটা তারে মৃদু আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত তার সেই অনুরণনে যেমন ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তকের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী—তেমনি ওই একটি কথায় সহসা অব্যক্ত ভাবাবেগে তীব্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! তিনি উঠিলেন!

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া বারেণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। মন আজ বড় প্রশান্ত, মুখভাব আজ বড় প্রফুল্ল। দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতার জ্যোতিঃ খেলা করিতেছে।

ব্রহ্মচারিণী তখনও পূজাহ্নিক সারিয়া উঠিয়া আসেন নাই। ব্রহ্মচারী তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কঠোর সাধনা-ক্লান্ত মস্তিষ্কের জড়তা-কুহেলি-ঘোর আজ কাটিয়া গিয়াছে। মনেই হউক, মস্তিষ্কেই হউক—এক অভাবনীয় দিব্য-ভাব আজ অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বড় আনন্দ, বড় আনন্দ! এখন উপযুক্ত সাধকের সহিত একান্ত নিভৃতে, গভীর আনন্দবহ তত্ত্বালোচনার ইচ্ছা হইতেছে। ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গ আজ বড় প্রয়োজন।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ব্রহ্মচারিণী আসিলেন না। বর্ষাকাল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই এক এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল। বৃষ্টি আবার চাপিয়া আসিল। ব্রহ্মচারী ঘরে ঢুকিলেন। অনেক দিনের পর—আজ সেতার বাহির করিয়া সুর বাঁধিয়া গান ধরিলেন;—

"মা কি তেমনি শিবের সতী!......
সাবধানে মন, কর সাধন, হয়ে শুদ্ধমতি।"

বাহিরে বৃষ্টির শব্দে গান-বাজনার আওয়াজ ডুবিয়া গেল। অদূরে পূজাগৃহে নীরব উপাসিকার উপাসনায় কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বৃষ্টির প্রবল শব্দ ভেদ করিয়া ততদূর পর্য্যন্ত গানের সাড়া পৌঁছাইল না।

ব্রহ্মচারী গাহিতে লাগিলেন; গানের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও শান্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। দুচোখে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল! কিছুক্ষণ পরে

বেগ কমিল। ব্রহ্মচারী গান-বাজনা বন্ধ করিলেন।

অকস্মাৎ চমক-ভাঙা হইয়া মনে পড়িল, নির্দ্দিষ্ট সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারিণীর এতক্ষণ পর্য্যন্ত আসনে থাকা স্বাভাবিক নিয়ম নয়! তবে?

নিজের কম্বলখানা ঘাড়ে ফেলিয়া ব্রহ্মচারী ছুটিলেন। ব্রহ্মচারিণীর পূজা-গৃহের দুয়ারে আসিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছেন, তাই! ব্রহ্মচারিণী আসনে নিস্পন্দ, স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন,—বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা।

ক্ষণেক ভাবিয়া ব্রহ্মচারী নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। ব্রহ্মচারিণীর আসনের একটু দূরে নিজের কম্বল পাতিয়া বসিলেন। যথানিয়মে চিত্ত স্থির করিয়া, নিজেও উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া চলিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে,—ব্রহ্মচারিণী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। অব্যক্ত কাতর শব্দে বার বার কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কথা বাহির হইল না। অবিরাম ধারায় দুই চোখে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সতর্ক ব্রহ্মচারী আজ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। স্থিরচিত্তে ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করিতে-করিতে ব্রহ্মচারিণীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,—কিন্তু বড় অস্ফুট, বড় জড়িত স্বর। বহু দূর-দূরান্তর হইতে কেহ প্রাণপণ ব্যাকুলতায় চীৎকার করিয়া ডাকিলে, যেমন অস্পষ্ট, ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়,—ব্রহ্মচারী কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, তেমনি অস্পষ্ট ক্ষীণ, আকুল আহ্বান।—"এগিয়ে এস, এগিয়ে এস! আমি পেয়েছি,—আমি জেনেছি! তুমি এগিয়ে এস ব্রহ্মচারি, সব জান্‌তে পারবে।"

কোথায় অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে, ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। আনন্দের আবেশে তাঁর কণ্ঠ রোধ হইল, দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। কোন কথা বলিলেন না। শুধু ব্রহ্মচারিণীর আসনের আর একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণী চোখ মেলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চোখের পাতা, চোখে যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছিল,—ভালরূপ চাহিতে পারিলেন না। নেশায় অভিভূত মাতালের মত ঢুলু ঢুলু চক্ষে চাহিয়া, আড়ষ্ট জিহ্বা অতি কষ্টে সঞ্চালিত করিয়া অস্ফুট জড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন "সাধকের সুধাপান ব্যাপারটা কি, জানবার জন্যে বাইরে ঘুরে ঘুরে বড়—বড় কষ্ট পেয়েছ। ভুল করেছ, ও তো বাইরের জিনিস নয়! আজ সমস্ত দেহ, মন, আত্মা দিয়ে আমি তা টের পেয়েছি!…আমি ভয়ানক নেশায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম!…শুধু দু চার ফোঁটা মাত্র…তাতেই বাহ্যজ্ঞান লোপ!…অতি কষ্টে, বড় কষ্টে, অপার্থিব আনন্দ-রাজ্য থেকে নেমে এসেছি, শুধু তোমায় খবরটা দেবার জন্যে। মদের নেশায় আংশিক ভাবে বাহ্যজ্ঞান লোপ করা যায়,—কিন্তু আত্মজ্ঞান তাতে লাভ হয় না।"

একটু থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া, যেন গলার কাছে কি একটা জিনিস আটকাইয়াছিল, সেটা গলাধঃকরণ করিয়া, অধিকতর জড়িত স্বরে বলিলেন "অসৎ সঙ্গে মিশে কি আত্মজ্ঞান লাভ হয়? কোথায় গুরু খুঁজছ? গুরু ত তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন! প্রস্তুত হয়ে এস, শুধু প্রস্তুত হয়ে এস! গুরু-সেবা? জানো না? "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"—আত্মকর্ম্ম……!"

অস্ফুট স্বরে কি একটা সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য স্থির হইয়া বলিলেন "এই প্রকৃত গুরু-সেবা! এই থেকেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়! এতেই সব ব্যাঘাত-যোগের—সব বিপত্তি-মোচন!"

ব্রহ্মচারীর আপাদ মস্তক বার বার শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু নিজের অবস্থার দিকে তখন লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। ব্রহ্মচারিণী টলমল করিতেছিলেন—ব্রহ্মচারী হাত বাড়াইয়া তাঁর স্কন্ধদেশ ধরিলেন।

স্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত্তে একটা অভাবনীয় প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুত্তরঙ্গ ব্রহ্মচারীর সর্ব্বশরীরে বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া,—নিমেষে মস্তিষ্ক-কোটরে কেন্দ্রীভূত হইল! ললাটের অভ্যন্তর-দেশে ক্ষণমধ্যে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতালোক জ্বলিয়া উঠিয়া সহসা —এ কি!…

ব্রহ্মচারী বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া—যেন কোন্ অদ্ভুত, আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

ভাবাভিভূতা ব্রহ্মচারিণী আবার ঢোঁক গিলিলেন,

যেন আবার কোন অদৃশ্য বস্তু নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিলেন। তার পর অধিকতর জড়িত স্বরে বলিলেন "এই সুধা পান! এ বাহ্য জগতের বাহ্য বস্তুজাত সুরা নয়! এ অ—পার্থিব, অপার্থিব—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না। প্রবল নেশায় অভিভূত হইয়া টলিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্ব্বিকার মুখে সেই পতনোন্মুখ দেহ নিজের বুকে গ্রহণ করিলেন। দেহজ্ঞান আজ লুপ্ত! স্পর্শদোষ বিচারের প্রয়োজন বুঝি আজ শেষ হইল।

(শেষ)

অনুতাপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

সুহৃদ আমার, বন্ধু আমার,
ক্ষণেক সরো ভাই,
আজকে ভালবাসবো যাদের
ভালবাসি নাই।
যাদের থেকে ছিলাম দূরে,
অভিমানের অচল চূড়ে,
আজকে জাগে হৃদয় জুড়ে,
তাদের কথাটাই।

২

হয় ত তা'রা বেদন ব্যথা
অনেক দিয়েছে,
হয় ত অনেক প্রাপ্য আমার
ছিনিয়ে নিয়েছে;
আমি তাদের চাইতে নীচু,
দেবার মত দিইনি কিছু,
করিয়াছি পুঞ্জীভূত
ঘৃণাই একজাই।

৩

কুবাস যদি এনেই থাকে
মধুর মলয়ে,
কেন তারে নিতুই দূরে
রাখবো বল হে?
নিজের বুকের গন্ধে তারে
অভিষেক যে করতে পারে,
প্রীতির মৃগনাভির আমি
সন্ধানে বেড়াই।

৪

পুরীর পথে কোথায় কাঁটা
ফুটলো চরণে,
রথের পুলক ভুলে তাহাই
রাখবো স্মরণে?
পা দিয়েছি কাঁটার মুখে,
ভেবেই আমি মরছি দুখে,
আনন্দেতে আজকে তারে
আদর করে যাই।

৫

কেউ করেছে নিন্দা তাতে
এতই অভিমান,
দেব নাক তারে আমার
ভালবাসার দান?
হিংসা কেন করবো জমা,
যাই মেগে যাই সবার ক্ষমা,
ধূনীর আঁচে বিভূতি হ'ক
বিদ্বেষেরি ছাই।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

একাদশ পরিচ্ছেদ

যান বাহন ডাক টেলিগ্রাম *

নৌকা, বজরা, পানসি, স্লুপ, এমন কি সমুদ্রগামী জাহাজ প্রভৃতি জলযানের ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেও নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর জলযান ছিল। ইয়োরোপীয়গণ প্রথম প্রথম জনের ৫৲ টাকা, ১৬ জনের ৬৲ টাকা, ১৮ জনের ৬।৷০ টাকা, ২০ জনের ৭৲, ২২ জনের ৭৷৷ টাকা, ২৪ জনের ৮৲ টাকা।

৪ দাঁড়ি নৌকার মাসিক ভাড়া ২২৲ টাকা, ৫ দাঁড়ির ২৫৲ টাকা, ৬ দাঁড়ির ২৮৲ টাকা।

নৌকা (৪র্থ চিত্র)
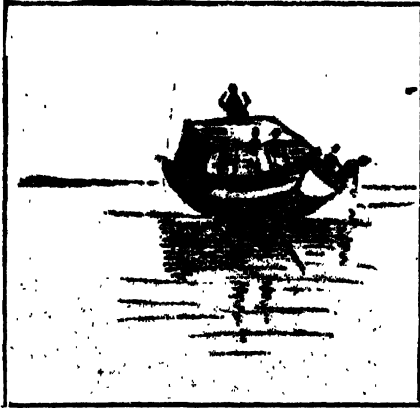
নৌকা (২য় চিত্র)

নৌকাযোগেই সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। সৌখিন ও বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্য গঙ্গা-বক্ষে অনেক সুন্দর সুন্দর বোট, ময়ূরপঙ্খী দেখা যাইত।

* * * * *

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল, ৮ জন দাঁড়ির বজরা দৈনিক ২৲ টাকা, ১০ জনের ২৷৷ টাকা, ১২ জনের ৩৷৷ টাকা, ১৪
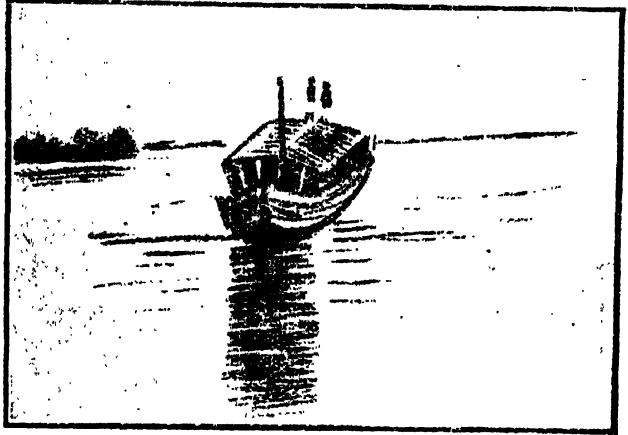
ব্যারাকপুর হাউস্—১৮০৩—সেকালের গঙ্গাবক্ষে বিবিধপ্রকার তরী

* প্রাচীন কালের যানবাহনের উপকরণ নিতান্ত কম না থাকিলেও সে সকলের বর্ণনা সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না জানি না; আমি অনেক প্রকারেরই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সকলের কিছু কিছু পাইয়াছি তাহাও লিখিয়া বুঝান সুকঠিন। এই সকল কারণে আমি পথ ঘাটের প্রাচীন চিত্র হইতে অশ্ব ও গোযানের এবং জলযানের কতকগুলি ছবি চিত্রকারের সহায়তায় অঙ্কিত করাইয়া পাঠিকা ও পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। ফেয়ারি কুইন ও ষ্টিফেনসনের ছবি দুইখানি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় সংগ্রহ হইয়াছে।

২৫০ মণের নৌকা ভাড়া ২৯৲ টাকা, ৩০০ মণের (৭ দাঁড়ি) ৩৪৲ টাকা, ৪০০ মণের (৮ দাঁড়ি) ৪০৲
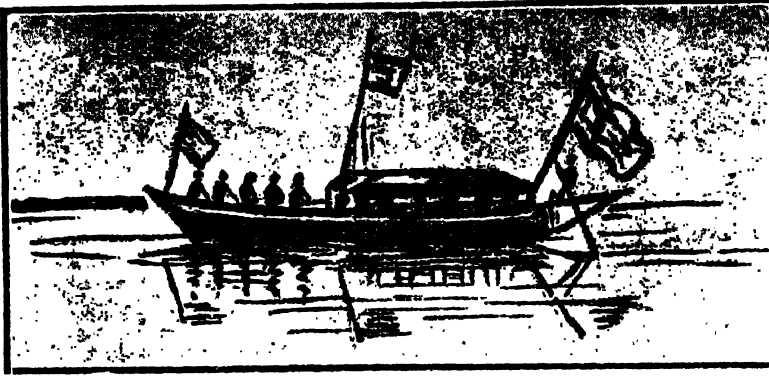
নৌকা (৩য় চিত্র)

টাকা, ৫০০ মণের (১০ দাঁড়ি) ৫০৷৷ টাকা ভাড়া ধার্য্য ছিল।

তখন জলপথে কলিকাতা হইতে বহরমপুর যাইতে ২০, মুরশিদাবাদ ২৫, রাজমহল ৩৭, মুঙ্গের ৪৫, পাটনা ৬০, বেনারস ৭৫, কানপুর ৯০, মালদা ও ঢাকা ৩৭৷৷ দিন করিয়া সময় লাগিত।

প্রথম যুগে অশ্বই বিলাসী বা দূর-যাত্রীদের প্রধান বাহন ছিল। হস্তী ও উষ্ট্রও কলিকাতার পথে সর্ব্বদা দেখা যাইত।

সে সময়ে জলপথে মেসার্স্ হোমস্ এণ্ড এলেন (Mess s Homes and Allen Co.) কোম্পানীর মাল পাঠানোর কাজ প্রায় একচেটিয়া ছিল।

ঘোড়ার গাড়ী প্রচলনের অনেক কাল পূর্ব্বে পালকির ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রথমাবস্থায় গাড়ী চলিবার মত পথও ছিল না। কলিকাতা হইতে লাহোর

ডুলি

চেয়ার-পালকি।
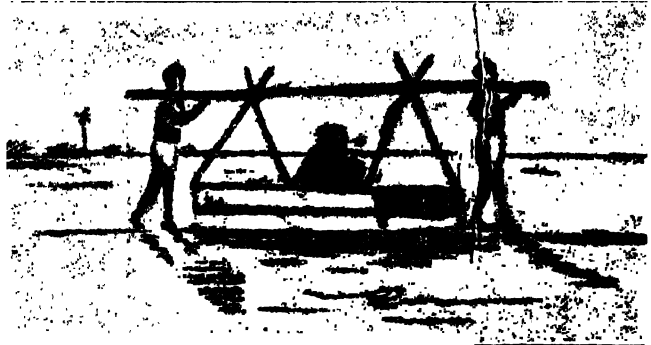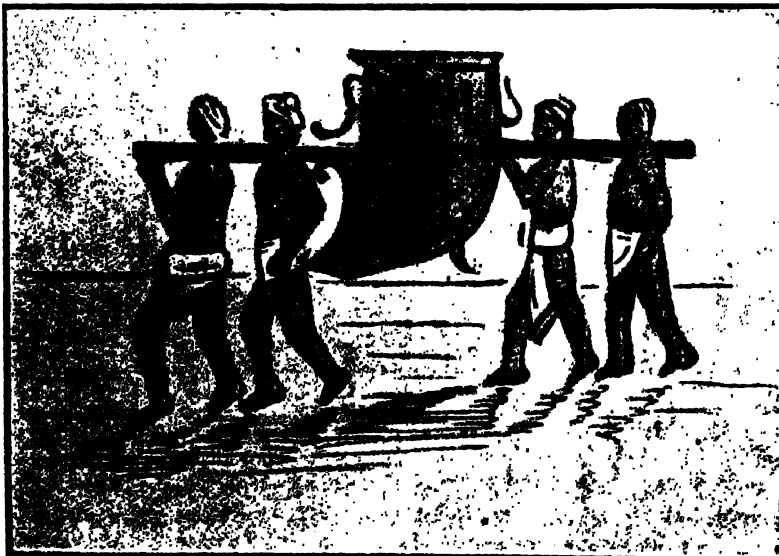
পর্য্যন্ত যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আছে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। উহা প্রস্তুত করিতে প্রতি মাইলে প্রায় এক সহস্র পাউণ্ড হিসাবে ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত যে পথটি আছে, উহা ১৮০৫ সালের ২৬ জুলাই সাধারণের জন্য খোলা হয়। এই সময়ের পর দশ বার বৎসরের মধ্যে মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল ভাল রাজপথ প্রস্তুত হয়।

*   *   *   *

পালকি বহু প্রকারের ছিল এবং অনেক সুদৃশ্য পালকিও প্রস্তুত হইত। উহা সাধারণতঃ দেড় শত হইতে তিন চারি শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। প্রায় সকল প্রকার পালকিতেই একজন মাত্র লোক বহনের ব্যবস্থা ছিল। অধুনা বিরল হইলেও যেরূপ ঘেরা পালকি দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় ওরূপ ছিল না। উহার চতুর্দ্দিক খোলা থাকিত এবং উর্দ্ধাংশের মধ্যভাগ উঁচু থাকিত। ধনী লোকেরা বেশ কারুকার্য্যময় এবং গদি শাটীন প্রভৃতি শোভিত মূল্যবান পালকি ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ঢাকা পালকি এবং চেয়ার পালকির প্রচলন আরম্ভ হয়। তঞ্জাম নামক একপ্রকার নরবাহী যানও ব্যবহৃত হইত। চেয়ার পালকিকেও তঞ্জাম বলিত। ইহা বিলাত হইতে আমদানী হইত। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহা বিলাসিদের খুবই আদরের জিনিষ ছিল। লেডি উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ভারতে অবস্থানকালে ইহাই ব্যবহার করিতেন।

পালকি বহনের জন্য প্রায় ছয়জন করিয়া বেহারা থাকিত। এতদ্ভিন্ন ছত্রধারী লোকও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহাদের ছাতা-বরদার বলিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পালকির ব্যবহারকে প্রতীচ্যের বিলাসিতা বলিয়া গণ্য করিত; এবং বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ভিন্ন উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পলাশি-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নিয়ম ছিল।
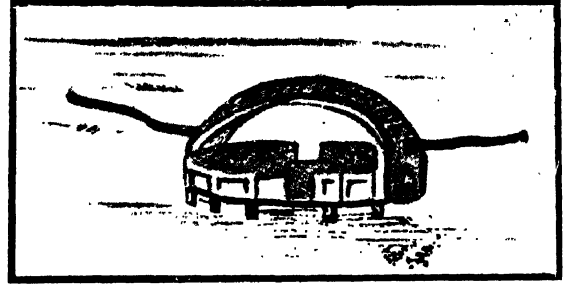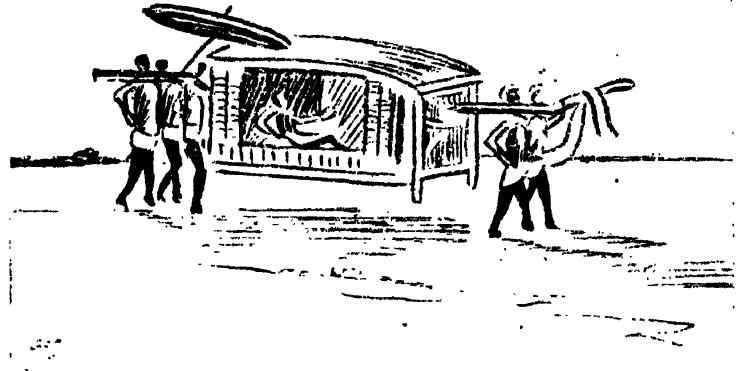
পালকি—১ম চিত্র

পালকি—২য় চিত্র

পালকি—৩য় চিত্র

*   *   *   *

সেকালে কলিকাতা হইতে পালকি ডাকের ভাড়া নিম্নলিখিত রূপ ছিল—

চন্দননগর ও গরুটী	২১॥ হইতে ২৪॥০	টাকা
হুগলি, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া	৪২॥ হইতে ৪৬॥০	টাকা
মৃজাপুর	৭০৲ হইতে ৭৬৲	টাকা
কাশিমবাজার মুরশিদাবাদ	১৪৭॥০ হইতে ১৫৯॥০	টাকা
রাজমহল	২৩৮৶ হইতে ২৫৭৶০	টাকা
ভাগলপুর	৩২৮৶ হইতে ৩৫৪৶	টাকা
মুঙ্গের	৩৭৬। হইতে ৪০৬।০	টাকা
পাটনা বাঁকিপুর	৫০০৲ হইতে ৫৪০৲	টাকা
দানাপুর	৫১২॥ হইতে ৫৫৩॥০	টাকা
বক্সার	৬১৫৶ হইতে ৬৬৭৶০	টাকা
বেনারস	৭০৭॥ হইতে ৭৬৩৲	টাকা

*   *   *   *

প্রাচীন কাল হইতে পালকি বেয়ারার কাজ উড়িয়াদের একচেটিয়া ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক ঠিকা বেয়ারাদের পারিশ্রমিকের দৈনিক হার এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—
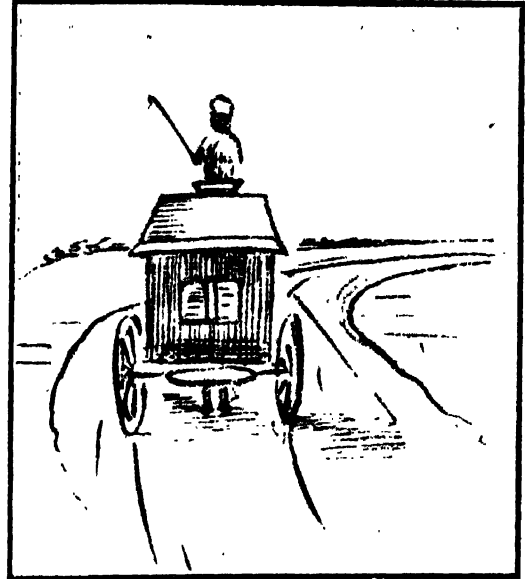
অশ্বযান—১ম চিত্র

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের যান-বাহন-পূর্ণ রাজপথ
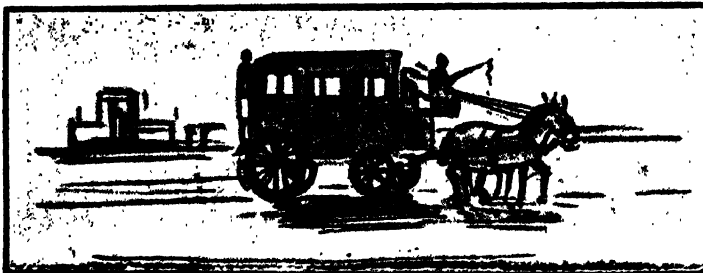
৫ জন ঠিকা বেয়ারা দৈনিক সিক্কা ১৲ টাকা

ঐ অর্দ্ধদিন (প্রায় ৮ ঘণ্টা) ॥০

দূরত্ব হিসাবের ৫ মাইলের অনধিক দূর যাইবার মজুরি প্রতি বেয়ারা চারি আনা। ৮ মাইলে একদিন ধরা হইত।

অশ্বযান—২য় চিত্র

পাল্‌কি-ডাক দেখিতে কতকটা পাল্‌কির মত ; কেবল পার্থক্যের মধ্যে তাহাতে চাকা লাগান থাকিত। অনেকে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মানুষে টানা এইরূপ গাড়ী পছন্দ করিত। ইহাই পাল্কি-গাড়ীর আদি অবস্থা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা প্রথম চালিত হয় কানপুর হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত। ১৮৫০এ কলিকাতা হইতে কান-পুরে ডাক-লাইন খোলা হয়।

* * * *

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী ছিল না। তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দী না যাইতেই ফিটন্, চেরেট্, বগি, ল্যাণ্ডোলেট, পাল্‌কিগাড়ী, ব্রাউনবেরি প্রভৃতি বহু প্রকার অশ্বযানের প্রচলন হয়। ফিটন গাড়ীগুলিতে প্রায় পনি ঘোড়া যোড়া হইত। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক গ্রাঁপি (Gran'pri) ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত বর্ণনা মধ্যে উক্ত সকল প্রকার গাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে চারি ঘোড়ার গাড়ীও ব্যবহৃত হইত জানা যায়।

* * * *

সেকালে মাল বহনের কাজ ছাড়াও, লোকের ব্যবহারের জন্য কয়েক প্রকার গোযান প্রচলিত ছিল। পশ্চিমের একার মত গাড়ি ও ডুলিতে যাতা-য়াতের ছবিও পুরাতন চিত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মালবাহি কুলি

ময়লা ফেলার গাড়ী

* * * *

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফার ডেক্সটার (Christopher Dextor) নামক একজন ভাড়াটিয়া গাড়ীর কারখানা-ওয়ালার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারির একটি বিজ্ঞাপন হইতে গাড়ী ভাড়ার নিম্নলিখিত রূপ হারের কথা জানা যায়—

চারি ঘোড়ার গাড়ী প্রতিদিনের ভাড়া ২৪৲, মাসে ৩০০৲
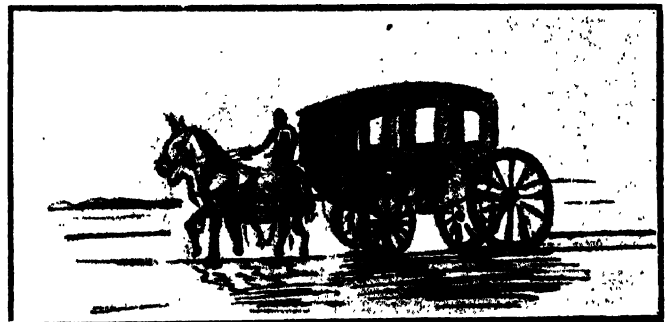
অশ্বযান—৩য় চিত্র
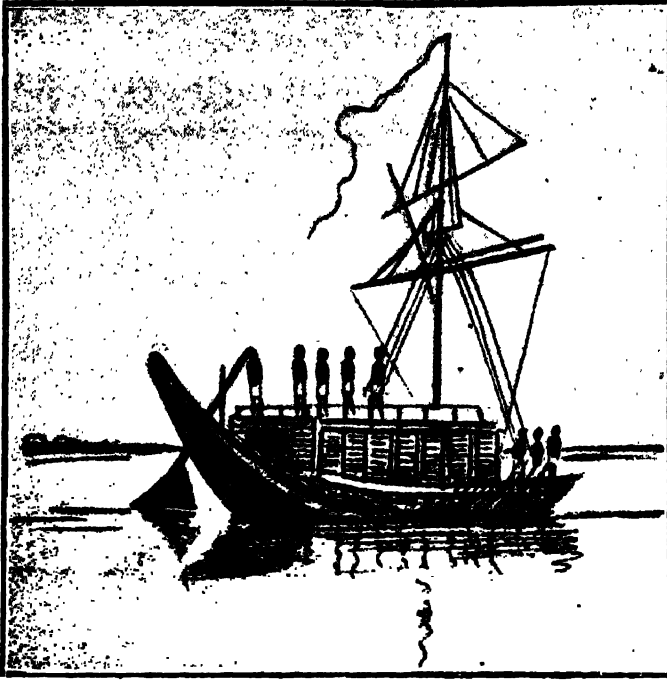
কারা
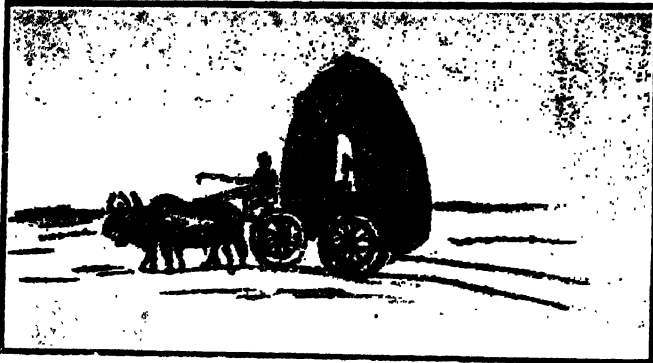
গোযান—(২য় চিত্র)
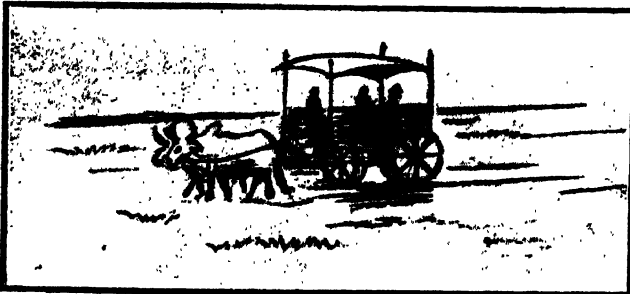
গোযান—(৩য় চিত্র)

দুই ঘোড়ার গাড়ী দৈনিক ১৬৲
মাসিক ২০০৲

ছয় মাসের জন্য মাসিক ১৫০৲ এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ১৩৩/৪ পাই।

কেবলমাত্র ২টী ঘোড়া প্রতিদিন ১০৲ মাসে ১৬০৲, ছয় মাসে মাসিক ১১০৲ টাকা। বগি ও ঘোড়া প্রতি দিন ৫৲, মাসে ১০০৲, ছয়মাসে মাসিক ৮০৲, বৎসরে মাসিক ৬৪৲ টাকা।

গাড়িওয়ালা ষ্টুয়ার্ট্ কোম্পানী, সেটান্, কুক্, হার্টব্রাদার্স, ভেলাণ্ট্ ও ব্রাউন্ কোম্পানীও সুপ্রাচীন।

* * * *

সেকালে বাবুগিরি বা ধনৈশ্বর্য্য দেখাইবার একটি প্রধান সামগ্রী ছিল গাড়ী, বড় বড় জুড়ি এবং নানাবিধ পোষাক-পরিহিত কোচম্যান, সহিস্। ধনীলোকের সহিসদের সঙ্গে সময় সময় একটি করিয়া সুদৃশ্য চামর থাকিত। উহা পোষাকেরই অঙ্গ; নচেৎ উহার অন্য কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সহিসগণ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রাস্তায়, বিশেষ মোড়ের কাছে সতর্ক করিবার জন্য এক প্রকার সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। সহিস-দের এই হাঁকিবার পারদর্শিতা একটা গুণের মধ্যে পরিগণিত হইত। এসকল দৃশ্য ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বিরল ছিল না। কোম্পানীর আমলে গড়ের মাঠের ধারে যখন গাড়ী বা পাল্‌কি করিয়া ধনী লোকেরা সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন মশাল-চিরা জলন্ত মশাল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িত। এক শতাব্দী পূর্ব্বে কোচম্যানের মাহিনা ছিল মাসিক ৫৲ সহিসের ছিল ২৲ টাকা।

* * * *

ব্যারুষ্, মশকুরে ব্রাউনবেরি—ইহারা মোটর গাড়ী প্রচলনের পূর্ব্বে পর্যান্তও খুব বেশী চলিত। বড় বড় ডাক্তার হাকিম প্রভৃতিরা

প্রায় ব্রুহাম গাড়ী ব্যবহার করিতেন। ওয়েলার ঘোড়ারও তখন আদর ছিল।

* * * *

অর্থবান লোকেদের বিবাহে বর ও বধূকে লইয়া যাইবার জন্য রূপা বা রৌপ্যমণ্ডিত বা গি ল্টি ক রা ওক্তারামা, চতুর্দ্দোলা, মহাপায়া ও তঞ্জাম ব্যবহৃত হইত। এখনও দূর পল্লীগ্রামে কদাচিৎ দেখা যায়।

* * * *

পথের আবর্জ্জনা লইয়া যাইবার জন্য সরু গলির মধ্যে লৌহ-নির্ম্মিত এক চাকার এক প্রকার ঠেলা গাড়ি এবং সদর রাস্তায় শীর্ণ অশ্ব-বাহী দ্বিচক্র এক প্রকার গাড়ী ব্যবহৃত হইত।

* * * *

কলিকাতায় পূর্ব্বে শাল ও সেগুন কাষ্ঠের জাহাজ নির্ম্মিত হইত। প্রথম ১৭৬৯ ও ৭০ সালে দুইখানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৭১ সালে প্রথম যে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম 'ননস্যাচ্' (Nonsuch)। উহা ৪২৩ টন ভারবাহী, উহাতে ৩১টী কামানের স্থান ছিল। ইহার আট বৎসর পরে "সারপ্রাইজ" (Surprize) নামক আর একখানি ৩২ কামানের যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ইহা দেশীয় কারিগরদিগের দ্বারা নির্ম্মিত এবং সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছিল। ১৭৮১ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৭ খানি এবং তৎপরে ২১ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সন্নিকটে মোট ২২৩ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। টিটাগড় ও অন্যত্রও জাহাজ প্রস্তুত হইত।

* * * *

ডক্ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম প্রস্তাব হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮০ সালে উহার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং দশ লক্ষ টাকা
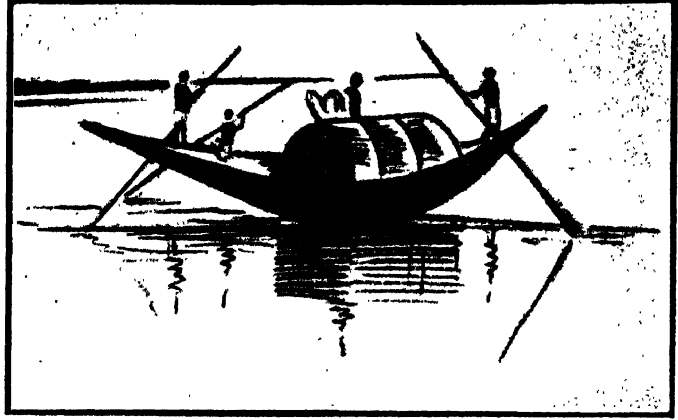
নৌকা (১ম চিত্র)
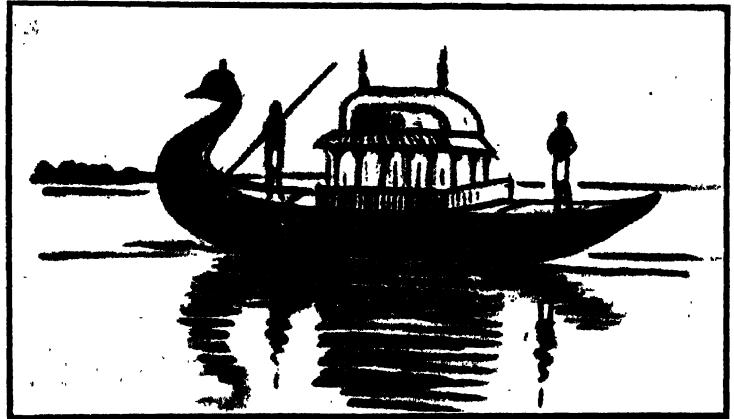
ময়ূরপঙ্খী—নৌকা

চৌ-ঘুড়ি গাড়ি

ব্যয়ে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। সালিখায় যে ডক আছে উহা ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বেকন্ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। প্রথম যে জাহাজখানি এখানে সংস্কৃত হয় তাহার নাম অর-ফিয়াস্। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কোন্নগরেও একটি ডক্ ছিল।

সেকালের ডাক লইয়া যাইবার গাড়ি

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ খিদিরপুরে 'জন্ শোর' নামে প্রথম বাষ্পচালিত পোত চালান হয়। প্রথম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক ষ্টীমার লাইন খোলা হয় কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত। প্রতি আরোহীর ভাড়া লাগিত ৮৲ টাকা। প্রথম যে দুইখানি ষ্টীমার চলাচল করিত, তাহাদের নাম কমেট্ (Comet) ও ফায়ারফ্লাই (Fire-fly)।
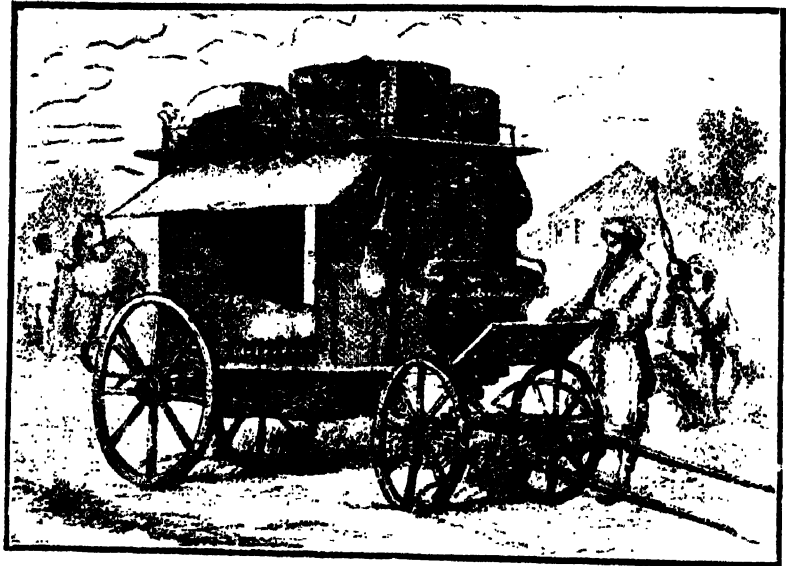
ফেয়ার কুইন এঞ্জিন

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় প্রথম কলিকাতায় দুইখানি ষ্টীমার প্রস্তুত হয়। উহাতে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৮০০ মাইল যাইতে তিন সপ্তাহ লাগিত।
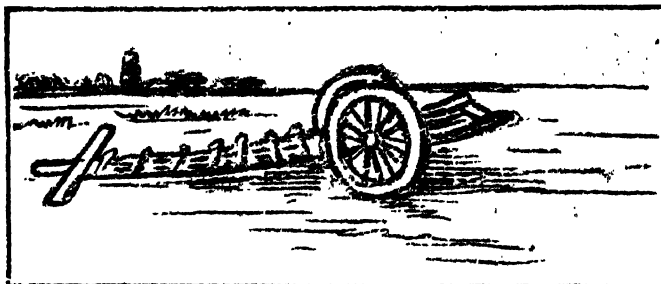
মালবাহী গাড়ী

সর্ব্বপ্রথম যে বাষ্পীয় পোত বিলাত হইতে কলিকাতায় আইসে, উহার নাম এণ্টারপ্রাইজ্ (Enterprise)। উহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ফল্‌মাউথ বন্দর হইতে ছাড়িয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া পৌছে। উহা দুইখানি যাইট অশ্বশক্তির এঞ্জিন সংযোজিত ৫০০ টন ভারবাহী জাহাজ।

* * * *

শুনা যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যে সময় কলিকাতায় এক প্রদর্শনী খোলা হয়, সেই সময় এক কোম্পানী প্রথম ঘোড়ার ট্রাম খুলিয়াছিল। সে কোম্পানীর লোকশান কোম্পানী এ জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু সংখ্যক ওয়েলার ঘোড়া আমদানী করিত। ট্রামের কাজে ঘোড়াগুলি যখন অযোগ্য বিবেচিত হইত তখন উহা বিক্রয় করিয়া
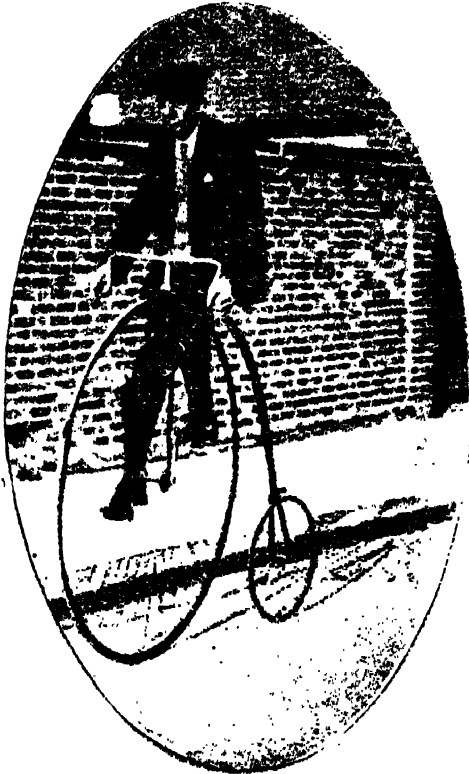
সেকালের বাইসাইকেল

গো-যান—৪র্থ চিত্র

ফেলিত। ঠিকা গাড়ীর মালিকগণ উহা ক্রয় করিয়া গাড়ীতে যুড়িত। ইহা হইতে 'ট্রামের ঘোড়া' একটি কথা হইয়াছিল। ধর্ম্মতলা হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত এঞ্জিন-সাহায্যে ট্রাম চালিত হইত।

* * * *

হস্তি ও উষ্ট্র পথ দিয়া যাইতেছে

প্রথম যে সাইকেল গাড়ী এ দেশে আমদানী হয়, উহা দ্বিচক্র বিশিষ্ট,—সামনের খানি খুব উচ্চ প্রায় সাড়ে চারি পাঁচ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ; উহারই ঠিক উপরে বসিবার স্থান থাকিত। পশ্চাতের চাকাখানি খুবই ছোট ছিল। ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও উহা দেখা যাইত। ট্রাইসাইকেল গাড়ীও পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইত।

* * * *

হওয়ায় উহা উঠিয়া যায়। ইহার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী ট্রাম লাইন খুলিয়াছিল।

মাল বহনের জন্য অশ্ব ও গর্দ্দভেরই অধিক প্রয়োজন হইত। বলদগাড়ী বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে।

মহিষ-শকট পূর্ব্বে ছিল না। ঝাঁকা-মুটে আবহমান হইতে আছে। দুইখণ্ড কাষ্ঠের উপর ভারি মাল রাখিয়া

সেকালের বাষ্পীয় পোত—'পেরা'

বগিগাড়ী

টানিয়া লইয়া যাইবারও একরূপ ব্যবস্থা ছিল। তখন বলদ-গাড়ীতে ২০ মণ মাল বহন করিত।

* * * *

দূরদেশে কলিকাতা হইতে প্রথম ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক যায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কানপুরে।

* * * *

পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে প্রথম যে সকল জাহাজ আসিত তাহা বায়ু ও মনুষ্য শক্তিতে পরিচালিত হইত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী নদীতে জাহাজ আসিত বলিয়া জানা যায়। শেঠেদের সহিত ব্যবসায় সম্পর্কেই সুতানুটিতে প্রথম জাহাজ আসিত।

প্রথম যুগে অনেক বাষ্পীয় পোতে পাইলও সংযুক্ত থাকিত। কোন কারণে বাষ্পীয় শক্তি পোত পরিচালনায় অক্ষম হইলে বায়ু সাহায্যে চালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এরূপ করা হইত। প্রাথমিক যুগে 'এণ্টার-প্রাইজ' 'হিমালয়া' 'পেরা' প্রভৃতি যে জাহাজগুলি এ দেশে আইসে, তাহা এই শ্রেণীর ছিল। ইহার পূর্ব্বে সাধারণ পাইল দেওয়া জাহাজই আসিত।

* * * *

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পি এণ্ড ও কোম্পানী কলিকাতা-সুয়েজ নামক একটি শাখা ষ্টীমার-লাইন খোলে। উহার প্রথম চালিত ষ্টীমারখানির নাম 'হিন্দুস্থান।' পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রথম নাম ছিল পেনিনসুলা ষ্টীমশিপ কোম্পানী।

* * * *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও স্বয়ং জাহাজের কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'হিউ লিণ্ডসে' নামক একখানি জাহাজ তাঁহাদের জন্য প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল।

* * * *
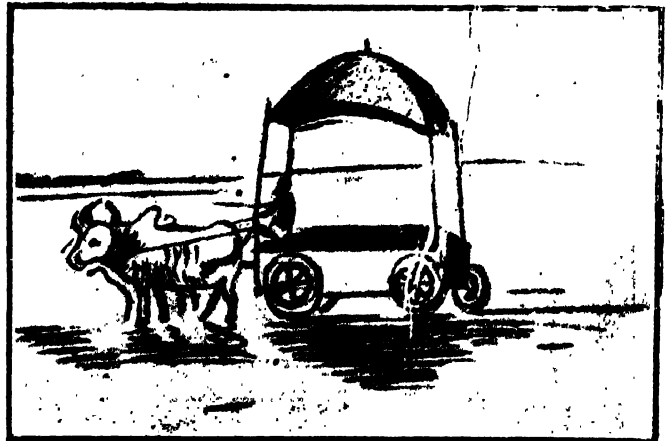
গোযান—(১ম চিত্র)

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এক পিপা মদের ভাড়া ছিল ১৫ পাউণ্ড এবং অন্য অধিকাংশ মালের ভাড়া টন-প্রতি ৩০ পাউণ্ড ১০ শিলিং ছিল।

* * * *

রেলগাড়ী চালাইবার জন্য লর্ড ডালহাউসির শাসন-কালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্টিফেন্সন্ (Mr. Rowland Macdonald Stephenson) সুপ্রীম গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম আবেদন করেন। ১৮৪৪-৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থ তিনি একটা মোটামুটি সার্ভে করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার্থ কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষও ইহার অল্প দিন পরে ৫০ মাইল রেল চালাইবার অনুমতি পান। ষ্টিফেন্সন্ সাহেবই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের প্রতিষ্ঠাতা।

* * * *

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইবার উপযুক্ত রেলপথ প্রস্তুত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম এঞ্জিন আসিয়া পৌছে এবং ২৮শে তারিখে মিঃ হজসন্ (Hodgson) উহা পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের নাম 'ফেয়ারি কুইন'। উহা এখন লিলুয়া কারখানায় আছে। পর বৎসর ১৫ই আগষ্ট হুগলী পর্য্যন্ত, ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এবং তৎপর বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পাকা রকম রেল খোলা হয়।

* * * *

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ৪খানি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮খানি, তৃতীয় শ্রেণীর ১৭খানি এবং ওয়াগান্-ভ্যান্ প্রভৃতি মোট ৬৩ খানি, অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩ খানি গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার সমস্তগুলিই প্রসিদ্ধ গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী এবং সেটন্ কোম্পানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

* * * *

যেদিন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম রেল খোলা হয়, সেদিন বিশেষ উৎসবের সহিত এই কার্য্য সমাধা হয়। গভর্ণর জেনারেলের শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বশতঃ তিনি সমগ্র উৎসবটীতে যোগদান করিতে না পারিলেও হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন এই নূতন বাষ্পীয় যান দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান ও অন্যান্য বহু স্থানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

* * * *

রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পৌছিতে তখন সময় লাগিত ৭ ঘণ্টা। প্রথম ভাড়া ধার্য্য হয় ১৮৶০। রেল খোলার প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ধার্য্য হয় প্রতি মাইল ½ পেনি।

* * * *

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ ২৬ খানি ওয়াগানে ১৪৭ টন কয়লা সহ প্রথম কয়লার গাড়ী হাওড়ায় পৌছে।
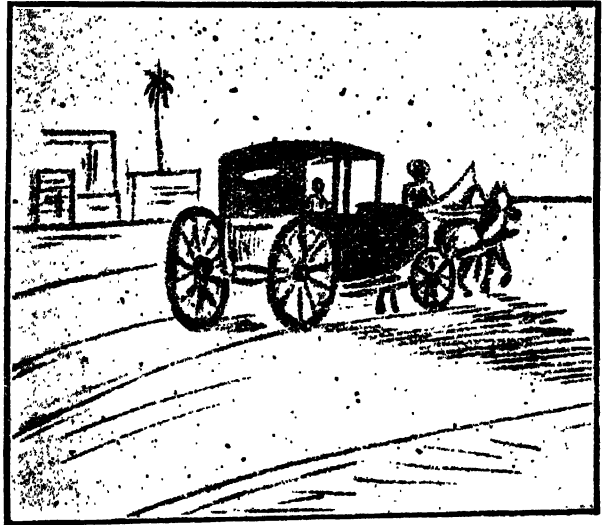
ব্রুহাম গাড়ী

* * * *

পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেল খোলার প্রথম ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোট ১০৯,৬৩৪ জন আরোহী হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫১১, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১০০, এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৮৩১১৮ জন। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের ভাড়া ও সামান্য মালের মাশুলে মোট ৬৭৯২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং ৯ পেন্স পাওয়া গিয়াছিল। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত লাইন খোলার পর প্রথম পনের সপ্তাহে যাত্রী-সংখ্যা হইয়াছিল মোট ১৭৯৪০৪ জন এবং সাপ্তাহিক আয় ৯০০ পাউণ্ড।

* * * *

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবের সময়ও এ দেশে ডাকের প্রচলন

ছিল এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় উহার কিছু উন্নতি হয় বলিয়া জানা যায়।

* * * *

উন্নত প্রণালীতে প্রথম ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা টাঁকশালের কর্ণেল্ ফরবেসের (Colonel Forbes) পরিকল্পনা-মত তালগাছ-অঙ্কিত দুই আনা মূল্যের টিকিট প্রথম ছাপা হয়। তৎপরে বিলাতের দেলারু কোম্পানীর নিকট হইতে টিকিট তৈয়ারি হইয়া আসিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ৪,৭৭,৩২,৪৯৬ ডাক টিকিট প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন অর্দ্ধ আনার টিকিটের বর্ণ ছিল নীল, এক আনার লাল এবং চারি আনার লাল ও নীল ছিল। এই সময় হইতেই সস্তা ডাকের এবং সর্ব্বত্র এক হারে টিকিটের প্রচলন হয় এবং বিলাতি চিঠির মাশুলও কম হয়।

* * * *

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মোট চিঠি বিলির সংখ্যা পাওয়া যায় ৩২,৯১,৬১,৮১১।

* * * *

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে আড়াই তোলা ওজনের চিঠির মাশুলের নিম্নের লিখিত মত হার বিজ্ঞাপিত হয়; যথা;—

ব্যারাকপুর	৴০	পাটনা	।৴০
চন্দননগর	৴০	সিলেট	।৴১
মুর্শীদাবাদ	৵০	চট্টগ্রাম	।৵০
সুখসাগর	৵০	বক্সার	।৵০
ডায়মণ্ড পয়েণ্ট	৵০	বেনারস	।৶০
রাজমহল	৶০	হায়দ্রাবাদ	৸০
কটক	৶০	মাদ্রাজ	১৵১০
মুঙ্গের	।০	পুনা	১।০
কল্পদ্বীপ	।০	বোম্বাই	১॥৴০

* * * *

বিলাতে প্রথম ডাক যায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। তখন হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে একবার করিয়া ডাক যাইতে থাকে। তখন ৪ ইঞ্চ লম্বা ও ২ ইঞ্চ চওড়া অপেক্ষা বড় আকারের বা গালা মোহর করা পত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রেরকের স্বাক্ষর সহ সরকারের সেক্রেটারি মারফৎ উহা পাঠান হইত। চিঠির মাশুল চিঠি বিলির সময় আদায় করা হইত। মাশুলের হার ছিল সিকি তোলায় দশ টাকা, অর্দ্ধ তোলায় পনের টাকা এবং এক তোলায় কুড়ি টাকা।

* * * *

বেঙ্গল আর্মির ডাক্তার উইলিয়ম্ ব্রুক্ (Sir William Brooke O'shanghnessy M. D.) সর্ব্ব প্রথম এ দেশে তাড়িতবার্ত্তা প্রচলন বিষয় চেষ্টিত হন্। তিনি প্রথম কলিকাতা হইতে কেদ্‌গিরিতে টেলিগ্রাফ লাইন বসাইয়া পরীক্ষার দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বর্ম্মার সহিত যুদ্ধকালে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

* * * *

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। উহা তখন সরকারি কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। সাধারণের জন্য ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রথম তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ। ইহার পর ভারতের বহু স্থানে ক্রমে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে থাকে। *

* যাঁহারা প্রথম যুগের যান বাহন পরিচালনের ইতিহাস বিশদ রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মল্লিখিত 'পুরাতনী' নামক পুস্তকে ও বিগত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "ভারতে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনের প্রথম যুগ" প্রবন্ধে তাহা পাইবেন।

সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ এপ্রিল ১৮২৪ (৬ বৈশাখ ১২৩১) হইতে ৭ এপ্রিল ১৮২৭ (২৬ চৈত্র ১২৩৩) তারিখ পর্য্যন্ত সমাচার দর্পণের ফাইলও হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।—

গৌড়ীয় সমাজ

(৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১)

"গৌড়ীয় সমাজ।—১৪ আষাঢ় [২৬ জুন] শনিবার রাত্রিকালে শহর কলিকাতায় গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল তন্মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে অল্প দিবসের মধ্যে বেদপাঠারম্ভ হইবেক।"

কলিকাতা মাদ্রাসার নূতন গৃহ

(২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১)

"বিদ্যাবৃদ্ধি।—ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও কান্যকুব্জ-প্রভৃতি প্রধান২ নগরেতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না এবং পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান্ লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানবান্ হইত না এবং অন্য২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত না সুতরাং অসভ্যের ন্যায় থাকিত। কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে২ লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানার্থে নানাস্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনে২ জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে এবং মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবেরা পার্কস্ত্রিটে ৬৮ নম্বরের গ্রাণ্ডলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া বাদ্যোদ্যম করত ধারানুসারে সেখান হইতে গমন করিয়া ঐ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন করিলেন পরে ঐ সংপ্রদায়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়া যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদুপরি অর্পণ করিলেন। ঐ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সেস্থানে একত্র হইয়াছিল।"

কলিকাতা মাদ্রাসার উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৭৮০, সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান-ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান আইন শিখিয়া সরকারী কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে। হেষ্টিংস সম্মত হইলেন, এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দিলেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অল্পদিন পরেই হেষ্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া, 'বৈঠকখানার নিকট, পদ্মপুকুরে' একখণ্ড জমি কিনিলেন। ১৭৮০ অক্টোবর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে চলিয়াছিল। এই এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন, অতঃপর সরকারের উচিত মাদ্রাসা-পরিচালনের সমস্ত খরচ-খরচা বহন করা, এবং পদ্মপুকুরে কেনা জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা। হেষ্টিংসের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া

বোর্ড বিলাতে কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু ১৭৮২, এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোনো ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের একখানি সরকারী কাগজে প্রকাশ, ১৭৮১, ৩০ এপ্রিল হইতে পর বৎসরের মে মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস তাঁহার খরচ-খরচা বাবদ ১৫২৫১৲ টাকা, ও বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার দাম ৫৩৪১ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সালের জুন মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে-বাড়িতে চার্চ অভ স্কটলাণ্ডের জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় সরকার ১৮২৩, জুন মাসে অপেক্ষাকৃত উপযোগী স্থানে—মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ার) এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১,৪০,৫৩৭ টাকা ব্যয় হইল। 'সমাচার দর্পণ' হইতে যে-অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ১৮২৪, ১৫ই জুলাই তারিখে বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭, আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিত-রূপে কলেজ বসিতে থাকে।

১৮৩০, ২২ মে তারিখের সমাচার দর্পণে একটি "ইশতেহার" বাহির হইয়াছিল ; ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় সর্ব্বপ্রথম কোন্‌খানে মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। ইশতেহারটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভাড়া দেওয়া যাইবেক কিম্বা বিক্রয় হইবেক।

বহুবাজারে ১১১ নম্বরের জমি ও বাটী যে স্থানে পূর্ব্বে মহম্মদন মদরসা ছিল তাহা বাজারের উপযুক্ত উত্তম স্থান কিম্বা নানাকর্ম্মের নিমিত্তে অনায়াসে রূপান্তর করা যাইতে পারে তাহা আগামি ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার মেং টালা কোম্পানির নীলামে বিক্রয় হইবেক যদি ইহার পূর্ব্বে ভাড়া কিম্বা খোসসওদাদ্বারা বিলি না লাগে।"

কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস :—Bengal : Past & Present, Jany.—June 1914 (সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত এস. সি. সান্যালের প্রবন্ধ)। Chas. Lushington : The History, Design & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity.

কবিওয়ালা হরুঠাকুরের মৃত্যু

(২১ আগষ্ট ১৮২৪। ৭ ভাদ্র ১২৩১)

"২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন। এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতিসুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।"

জল-কর

(২৮ আগষ্ট ১৮২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩১)

"নূতন আয়িন।—কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।"

নূতন পুস্তক

(১৩ নভেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১)

"প্রাণতোষণী নামধেয় লতা।—খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রাম তোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুণ্ডমালা মৎস্যসূক্ত মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র ও মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় ও মহানির্ব্বাণ মালিনীবিজয় মহানীলতন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা ও মেরুতন্ত্র ও ভৈরবী ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ও তারারহস্য শ্যামারহস্য-ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণতোষণী নামধেয় লতা নামে এক গ্রন্থ বহুকালে বহু পরিশ্রমে বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন যেহেতুক এক গ্রন্থে বহু কার্য্য সাধন হয় না এই গ্রন্থে প্রায় কোন কার্য্য সাধনাবশিষ্ট থাকে না।"

(১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আষাঢ় ১২৩২)

"জন্‌সনস ডিকসিয়ানারি।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তর জানসন সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক এক নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ঐ পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে···।

আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে ঐ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে যেহেতুক প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ হইয়াছে।

ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানাবিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ২ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী করণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা বৃক্ষ মূলে বসিয়া নূতন২ কাব্য পাঠ করিতে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহবা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন কিন্তু ইহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসর-পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন যত কালপর্য্যন্ত ভাষা থাকে ততকালপর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।"

"বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসরপর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেব-কৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।"

(২৩ জুলাই ১৮২৫ । ৯ শ্রাবণ ১২৩২)

"সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও স্বরোদয় ও সর্ব্বার্কচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্ব্বক জ্যোতিষের ফল ঐক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ভ এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।"

(৬ আগষ্ট ১৮২৫ । ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

"শ্রীযুত ডাক্তর ব্রিটন সাহেব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ইংরাজী ও হিন্দি ও ফারিস্ ও আরব্বি ও সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষাতে শরীরের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জ্জমা করিয়া এক পুস্তক-প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তক এক্ষণে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে।"

(২০ আগষ্ট ১৮২৫ । ৬ ভাদ্র ১২৩২)

"শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় বহুদর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তকদ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতুক ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা

ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

"প্রাচীন পদ্যাবলি॥—চাতকাষ্টক ও ভ্রমরাষ্টক পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন ও বানরাষ্টক ও বানর্য্যষ্টক এই ছয় প্রকার প্রাচীন সংগ্রহ অর্থাৎ প্রথমে অশেষ শ্লেষঘটিত চাতকের উক্তি মেঘের প্রতি এবং দ্বিতীয়ে ভ্রমর ও পদ্মিনী ও কেতুকীপ্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং তৃতীয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশারদ পঞ্চরত্নের সারোদ্ধার নীতি শিক্ষা ও চতুর্থে ঐ মহাতেজা রাজার হিতোপদেশ এবং পঞ্চমে ও ষষ্ঠে ঐ রাজসমীপস্থিত দেবরাজ প্রেরিত বানরী ও বানরাকৃত দেবতা বিশেষের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিবিধ কৌশলে রাজনীতিইত্যাদির মূল শ্লোক ও তদীয়ার্থ পয়ার ছন্দে সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরামপুরে রত্নাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত শ্রীরামতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে।"

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ৭ ফাল্গুন ১২৩৩)

"শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি ও শব্দাম্বুধি ও প্রাণতোষণী ও তন্ত্রকৌমুদীনামক গ্রন্থচতুষ্টয় ক্রমে স্বব্যয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি বাবুজী মহাশয় যে এক প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলীনামক বৈদ্যক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কিপর্য্যন্ত লোকোপকার হইয়াছে ও হইবেক তাহা সকলেই অনুভূত হইতেছেন ঐ গ্রন্থের পরিমাণ প্রায় ১৫০ এক শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ঐ গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কাপ্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে আর ঐ গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন···। সং চং।"

কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত নূতন পথ

(১১ ডিসেম্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

"যাতায়াতে সুগম।—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে।

রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনের অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতুক তাম্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই। অনুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বাসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক।

কলিকাতাহইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট সিকরোলস্থ ইংগ্রণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।

(২৩ জুলাই ১৮২৫। ৯ শ্রাবণ ১২৩২)

"কাশী।—সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে।"

১৮২৪ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১)

"শন ১৮২৪ শালে বেং কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কৃত পদ্ম পুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকর্তৃক কৃত আনন্দ লহরীর সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং মোং বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তর্জমা সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবকর্তৃক সংগ্রহীত জানসেন ডিকস্যানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা।

মোং মীরজাপুরে সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানায় শ্রীকৃষ্ণ মোহন দাস কৃত জ্যোতিষ দিন কৌমুদী।

রতিমঞ্জরী　১

তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ।　১

পদাঙ্ক দূত।　১

পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী　১

আনন্দলহরীর পয়ার　১

রাধিকা মঙ্গল　১

মোং শাঁখারি টোলার মহেন্দ্র লাল ছাপাখানাতে শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন　১

শ্রীবদনচন্দ্র পালিতকৃত নারদসম্বাদ　১

মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায় শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কৃত লে ডিরূল নামে পারসী ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে এক কেতাব হয়।　১

মোং আড়পুলির ছাপাখানায় শ্রীবারাণসী আচার্য্য কর্তৃক ছাপাকৃত কালীর সহস্র নাম　১

বিষ্ণুর সহস্র নাম　১

রাধিকার সহস্র নাম　১

হনুমচ্চরিত্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষুরাদি স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ　১

এবং ঐ ব্যক্তিকৃত ভাষাতে জ্যোতিষের তর্জমা এক গ্রন্থ　১

এবং শ্রীমন্ত রায়কর্তৃক ছাপাকৃত ভগবতীগীতা এবং তাহার ভাষা　১

এবং কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্য গুণ ভাষা　১

শ্রীযুত লক্ষিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃত সমেত ভাষাতে উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাহার পত্র সংখ্যা পাঁচ শত পাঁচ পৃষ্ঠ। এই গ্রন্থ বড় উপকারী তাহার মূল্য ষোল টাকা যাহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি কলুটোলায় চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে গেলে পাইতে পারিবেন।

অন্য পণ্ডিতকর্তৃক মনু গ্রন্থেরও ভাষা হইয়াছে কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই। মনু গ্রন্থ ব্রাহ্মণের অবশ্যই গ্রাহ্য ইহাতে যে এদেশে গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে ক্রমে২ ছাপাকর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক।”

আমদানি-রপ্তানি

(২ এপ্রিল ১৮২৫। ২১ চৈত্র ১২৩১)

“এতদ্দেশীয় বাণিজ্য। ১৮২২।২৩ শালে এতদ্দেশে নানা স্থানহইতে চারি কোটি আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যূন এ দেশে না থাকে।”

বরযাত্রীদের সহিত রসিকতা

(২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

“বর যাত্রিকের অবস্থা ॥—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়ী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল

বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিনপ্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফাঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।—সং কৌং" [সম্বাদ কৌমুদী]

কলিকাতায় হাসপাতাল

(১১ জুন ১৮২৫ । ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

"হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ সালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন-দুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে…।"

(৪ জুন ১৮২৫ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

"নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।…এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়াহইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালি টোলাহইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দররূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।…সং চং।"

(৮ জুলাই ১৮২৬ । ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

"চিকিৎসালয়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীন-দুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় নং ২২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক স্ত্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।"

বেরা-ভাসান

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ৩ আশ্বিন ১২৩২)

"প্রেরিতপত্র।—বেরা ভাসান। শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতায় অনেক প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধ্যে হিন্দু মহাশয়েরা পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়ে অন্য জাতির সঙ্গে ঐক্য করেন না তজ্জন্য অন্য জাতির দেবার্চ্চনা করা দূরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু যবনাদি জাতির দেবোৎসবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু ঐক্য হইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও শ্রুত আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থতুল্যজাতি কোন যবনী-বারাঙ্গনার নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়া মহরমের সময়

তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গণা সমভিব্যাহারে আহার বিহার করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই তাহাকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়েরা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে এবং তাহার ভৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘুতা স্বীকার করিয়া সে দায়ে উদ্ধার হয় তথাচ সে অপবাদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটীতে যিনি২ গিয়াছিলেন তাহারদিগকে লোকেরা কলঙ্কী করিত সে একটা হঙ্গাম হইয়া কতক কাল ছিল। সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষণে কলিকাতাস্থ হিন্দুলোকের মধ্যে অনেকের যবনাদি নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি এই মহানগরে কত মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পর্ব্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভাসান হইয়াছে তাহাতে কত্রক জন হিন্দু বাবু আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য ব্যয়দ্বারা সেই পর্ব্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মশীল বাবুর পুত্র বিদ্যাসৌজন্যার্জিত যশে যশস্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর ঐ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখা অসাধ্য স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লইয়া বেরার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন ডেরা নির্ম্মাণের বিস্ময় কি লিখিব সঙ্গে রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঙ্কা শরুকা দস্তিমসাল রণমসাল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেন না ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা দয়ালুতা দাতৃত্ব ধার্ম্মিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা সুসজ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে ব্যয় কে করে সুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাজ্ঞায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করে ধার্ম্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্ম্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেষাদ্বেষ না করে সুতরাং এসকল গুণ ঐ বাবুতে বর্ত্তে।

অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্য দূর হইতেছে বাবুরদিগের বেরা ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাঁহার যাহা বাঞ্ছা সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ।

কস্যচিৎ রাগদ্বেষশূন্যস্য। সং চং।"

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১০ আশ্বিন ১২৩২)

"ধরম্ কি বেরাপার॥

শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়॥—তোমার চন্দ্রিকা পত্রে গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎপত্রে উজ্জ্বল করাতে অনেকের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারদিগের মনের মালিন্য দূর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারদের অন্ধকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়া মুখ মলিন হইয়া যাইবেক যেহেতুক।

গত ৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাসিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথা নয় দৃষ্টিমাত্র আমীর উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কারণ বেরার সর্ব্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা রক্তপতাকা নীলপতাকা পীতপতাকা নানাপ্রকার পতাকাতে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা২ খাসগেলাপওয়ালা খাসবরদার আসাবরদার চোপদার জমাদার ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ জগঝম্প বাজে তাসাকড়কা বাজে দেশী ঢুলিকমাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোসনচৌকী মৌন হয় লাজে। শতশত গেলাসের সিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাদি।

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য্য চমৎকৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ্ম ময়ূর যুত বাই ধর্ম্মপ্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া

অভিনব নির্ম্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর চতুর্হস্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধরমকি বেরাপার ইতিমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই সুসজ্জ সজ্জাসজ্জিত বাই বাটীতে পুনরাগমন করিয়া সমস্তরাত্রি নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি। সং চং।"

কবিওয়ালা নীলুঠাকুরের মৃত্যু

(১৯ নভেম্বর ১৮২৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

"শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুইভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলুঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এপ্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইঁহারদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে। তিং নাং [তিমিরনাশক]।"

কবিওয়ালা নীলমণির মৃত্যু

(২৬ নভেম্বর ১৮২৫। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

"গত সপ্তাহে আমরা নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।"

ইংরেজের হস্তে চুঁচুড়া সমর্পণ

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

"চুঁচুড়া।—৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যূষে চুঁচড়াতে গিয়া ঐ শহরের বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচড়ার বড় সাহেব হলণ্ডীয় অধিপতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান সে নীশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্য্যন্ত হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়পতাকা উড্ডীয়-মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।"

(৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

"চুঁচড়া ॥—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চুঁচড়া ইংগ্লণ্ডী-য়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।"

১৮২৫ সালে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

(১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২)

"ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরাম-পুরের নানা ছাপাখানাতে যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।

মোং কলুটোলা চন্দ্রিকা আপীসে শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্য্য সূচক পুরাণবোধদ্দীপননামক ভাষা গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত নায়ক নায়িকাবিষয়ক দূতী বিলাসনামক গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং মাধবশর্ম্মকর্ত্তৃক রচিত শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষা বিবরণ ভাগবতসার নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং বেতালকর্ত্তৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়।

হরগোবিন্দ দত্তকৃত সাত্ত্বত সভাপ্রবেশ প্রবন্ধ নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।

এবং চাণক্যকৃত হিতোপদেশসূচক ১০৮ শ্লোক শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা ভাষা করিয়া সংস্কৃত সমেত ছাপাইয়াছেন।

এবং শৃঙ্গারতিলক নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপান।

এবং মোহমুদ্গরনামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ ব্যক্তি ছাপান।

এবং ভাষা সমেত দায়ভাগ ঐ ব্যক্তি ছাপান।

মোং বহুবাজার লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে।

ব্যঙ্কটাধ্বরি নামধেয় মহাকবি প্রণীত বিশ্বরূপাদর্শনামক উত্তম গ্রন্থ তাহাতে নানা দেশের দোষ গুণবিষয়ক বিশ্বাবসু কৃশানু নামকোভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে শ্রীরামস্বামী ছাপাইয়াছেন।

এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার রচিত দায়ভাগ সংগ্রহ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

এবং জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত ছাপা হইয়াছে।

মোং মৃজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ভাষা করিয়া শ্রীযুত তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ছাপা করিয়াছেন।

সাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে।

নারদসম্বাদ ছাপা হইয়াছে।

শোভা বাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে বত্রিশসিংহাসন ছাপা হয়।

মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্শ সাহেবের ছাপাখানায় নীলের আইন ১ দফা

মনোরঞ্জন ইতিহাস রিপ্রিণ্ট নাগর অক্ষর।

পাঠশালার রীতি কাশীর আদম সাহেবকৃত হিন্দীভাষা নাগর অক্ষর।

উপদেশ কথা ঐ সাহেবকৃত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট।

তারিণীচরণ মিত্রকৃত গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ কাএতী নাগরী।

কিট সাহেবকৃত ব্যাকরণ।

সমশুল আখবার প্রেসে।

জহরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদশাহী বিবরণ ইত্যাদি।

তৌকিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা।

দস্তরল্‌এন্‌সা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা।

এআর মহম্মদ অর্থাৎ শ্যাখৎ।

এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে অতএব ইহাতে যেং বিষয় তাহা লিখা গেল।

কালেজ প্রেসে।

ব্যাকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়।

কবিতারত্নাকর নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

জ্যোতিষ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের মিসন ছাপাখানায়।

ভাষা ব্যাকরণ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে।

ভাষা অভিধান হইতেছে।

পারসী ও বাঙ্গালা আইন হইতেছে।

১৮২৫ সালের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২)

"১৮২৫ শালের মধ্যে এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

* * * *

খিদিরপুরের খালের উপর লৌহময় নূতন সেতু হয়।

সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।

৮ জানুআরি তারিখে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

শহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি [নীলরত্ন ?] হালদার নূতন ছাপাখানা করেন।

জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়।

জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুলবিষয়ে নূতন আইন হয়।

কলিকাতার কোম্পানির কলেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয় নামে এক নূতন ছাপাখানা হয়।

সংস্কৃত কলেজের গোড়ার কথা

(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

"পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত॥—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।"

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২)

"সংস্কৃত কালেজ॥—১ ফেব্রুআরি বুধবার দিবা দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকাতার বহুবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।…শুনা যাইতেছে যে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়া অল্প দিবস পরে পটল ডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর তীরে নূতন ঘরে যাইবেন।"

(১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২)

"বিদ্যালয়।—শ্রীযুত কোম্পানীর পাটশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ঘরে আগামি বৈশাখ মাসের মধ্যে সংস্কৃত পাটশালা ও হিন্দুকালেজ উঠিয়া যাইবেক তদ্বিষয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্যে বন্দোবস্ত হইবেক তাহা অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।—সং কৌং" [সম্বাদ কৌমুদী]

(১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

"হিন্দুকালেজ।—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃত পাঠশালার কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্ত-পণ্ডিত ১৮ বৈশাখ শনিবার লোকান্তরগত হইবাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যুগাধ্যান মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি যে বৈদ্য শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে।

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় পূর্ব্বে যে পড়ুয়াদ্বারা পড়ান ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে একালেজ ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন অর্থাৎ প্রায় সকলের ইচ্ছা হইবেক যে ঐ পাঠশালায় আপন২ বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান আর যেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক।"

সমাচার দর্পণের ফার্সী-সংস্করণ—'আখবারে শ্রীরামপুর'

(৬ মে ১৮২৬। ২৫ বৈশাখ ১২৩৩)

"ইশ্তেহার। এই সমাচার দর্পণ এক্ষণে বঙ্গদেশের তাবৎ জিলাতে ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণপাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচার অবগত হইতেছেন এবং নূতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দর্পণে আলোকন করিতে সমর্থ হন না এবং দর্পণদ্বারা যে সকল নূতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহাও অবগত হইতে পারিবেন না অতএব -সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য

সমাচার জানিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নূতন২ আইন যে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারেন এই নিমিত্ত পরহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা অদ্যাবধি আথবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।...ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাশুলের চতুর্থাংশ লওয়া যাইবেক।"...

(১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

"গত শনিবার অবধি আথবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে...।"

নেটিভ ফিমেল স্কুল

(২০ মে ১৮২৬। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

"কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহর্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতিসমারোহ পূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।"

রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ

(৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

"গ্রন্থ প্রকাশ।—বাঙ্গাল হরকারানামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্য-দ্বারা সর্ব্বত্র ধন্য২ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি বাঙ্গলা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কানুতর্ক-দ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—সং কৌং।"

রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ:—"রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ [গৌড়ীয় ব্যাকরণ] রচনা করে, তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও চলে।" (পৃ. ৮১১)

কলিকাতায় বীমার আপিস

(৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩)

"নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেজেসম্বিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্ড কোর্ট ইস্ত্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কি প্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যন্ত কোন২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের কাগজ আছে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে

দাদিকেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।—সং চং।" [সমাচার চন্দ্রিকা]

গড়ের মাঠের গীর্জা

(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

"গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নূতন গ্রীজাঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধনা হইয়াছে এবং তৎসময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাঁহার মোসাহেবেরা ও অন্য২ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন।

এই গ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে এমত সুন্দররূপে কোন গ্রীজাঘর হয় নাই।"

কলিকাতার ইতিহাসের গোড়ার কথা

(২৩ ডিসেম্বর ১৮২৬। ৯ পৌষ ১২৩৩)

"কলিকাতার বৃত্তান্ত।—এই মহানগর কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন ইংরাজেরা সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন মেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে কুঠী উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯।৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং এক শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।

১৬৭৮।৭৯ সালে এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ সহগত্রা হইতে উদ্যতা হইবাতে ঐ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস সুখেতে কালযাপন করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে ঐ সাহেবের ঔরষে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে ঐ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় ঐ স্থানে চারনক সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি ঐ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক কহা যায়।

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তিদ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনৌজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।—সং চং।"

কলিকাতার শ্মশানঘাট

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩)

"অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলাহইতে বাগবাজারপর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে ইহা ব্যক্ত হইতেই কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ঐ টাকায় তিনটা ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর২ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক।"

ছেলেমেয়েদের কুস্তি

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

"কুস্তি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীল শ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না। তিং নাং।" [তিমিরনাশক]

জগন্নাথ দেবের পরিচারক

(১ অক্টোবর ১৮২৫। ১৭ আশ্বিন ১২৩২)

"শ্রীক্ষেত্র॥—...সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন যেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত নহেন।

১ মুদিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চনা এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।

২ রসুয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহারা হোম করিয়া সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজার ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে বেশ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত পূজা করেন।

৩ তিন জন পশুপালক॥ ইহারা অবকাশপূজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পূজানন্তর যখন অবকাশ পায় তখন পূজা করে এবং রত্ন সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক তিন পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।

৪ ভীতবাহু। ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে২ যায় সওয়ার অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না যদি ভোগ মারা যায় তবে পূজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।

৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্দ করে যদি ইহারা না থাকে তবে ভীতবাহু দ্বার বন্দ করিয়া থাকে।

৬ পত্তিমহাপাত্র। ইহারা প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও সুদ্ধ বসনকে বহন করে এবং স্নানযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্য্যন্ত অর্চনা করে ও অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস পূজা করে।

৭ পবিত্রবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাণ্ডারদিগকে ডাকে।

৮ গরাবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশুপালক পাণ্ডারদিগকে জল দেয়।

৯ খুটিয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশুপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যূষে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহারদিগকে ডাকে এবং বেশের সময় বস্ত্র ও সন্তামালা যোগাইয়া দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে।

১০ পানিয়ামেকাপ। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে। যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের দ্বারা গণনা করিয়া দেয়।

১১ চাঙ্গড়ামেকাপ। মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়া দেয় ও গণিয়া রাখে যাত্রিরা কাপড় দিলে একবার পরাইয়া গণিয়া রাখে।

১২ ভাণ্ডারমেকাপ। অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়া মেকাপ অলঙ্কার খুলিবার সময় গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়া ইহার জিম্মায় রাখে।

১৩ সওয়ার বড়ু। এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মার্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল দেয় এবং মহাপ্রভুর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া সেবকেরদিগকে দেয়।

১৪ পরীক্ষবড়ু। পূজার সময় দর্পণ লইয়া দণ্ডায়মান থাকে। অখণ্ড মেকাপ প্রদীপে তৈল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে। পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। ডাবখাট। শয্যা নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে। জয় বিজয় দ্বারের পড়িচারী ভোগ

দ্বারের চৌকী থাকে এবং ভোগের সময় কাহাকেও ছাড়ে না।

১৫ খড়্গানায়ক। পূজা সমাপ্তা হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাণ্ডাকে দেয় ও নিবেদন করায়। চতুর্দ্দশ নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বস্ত্রাদি দ্বারা যে বেশ হয় তৎকালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে।

১৬ খাটশয্যা মেকাপ। খাট শয্যা সম্মুখে পাতিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাণ্ডারে রাখে। আস্তান পড্যারি অবকাশ বল্লভভোগ সময়ে পূজার পরিচর্য্যা করে।

১৭ মুখপাখল পড্যারি। অবকাশ সময়ে সুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়।

১৮ সওয়ার কোট। ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা করিয়া দেয়।

১৯ মহাসওয়ার। প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে। গোপালবল্লভ পরিবেশন করে।

২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়া খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।

২১ রোসপাইব। রসুয়শালায় প্রদীপ জ্বালায় এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের সঙ্গে২ চৌকী দিয়া জয় বিজয় দ্বার ছাড়াইয়া দেয়।

২২ বিরিবহা সওয়ার। সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়া সওয়ারেরদের জিম্মা করিয়া দেয়।

২৩ ধোয়া পাখালিয়া ব্রাহ্মণ। রসুএর স্থান ধোয়া পাকলা করে।

২৪ অঙ্গারবহা ব্রাহ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

২৫ দয়িতা সয়াত্তরী। মহাপ্রভুকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

২৬ দাত্য। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।

২৭ সুধু সওয়ার। বল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ও ভোগ মারা গেলে অন্নাদি ভিতরহইতে বাহির করে। পর্ব্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়া দেয়।

২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে।

২৯ মহাজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে।

৩০ বিমানবড়ু। মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে।

৩১ মুদলীভাণ্ডার। দ্বারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয় এবং জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।

৩২ ছুতার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে।

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয়সময়ে তরাস ধরে।

৩৪ মেঘডম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডম্বুর লইয়া বাহির হয়।

৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে।

৩৬ পানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়।

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুষ্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।

৩৮ ঘণ্টুয়া। ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাজায়।

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুয়ারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।

৪০ প্রধানি পাণ্ডা ওগয়রহ। সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে স্বর্ণের বেত দেয় ও মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেছরী দেয়।

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়া মেকাপের জিম্মা করিয়া দেয় এবং পর্ব্ব যাত্রায় ধূপ লইয়া সঙ্গে যায়।

৪২ বরীদিগা। পাঁকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে।

৪৩ সমন্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।

৪৪ গৃহ মেকাপ। কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।

৪৫ যোগকমা। কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে।

৪৬ তোমাবতী। রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়া যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।

(৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

৪৭ চাউল বাছা। চাউল ও মুগ বাছে।

কিস্তী
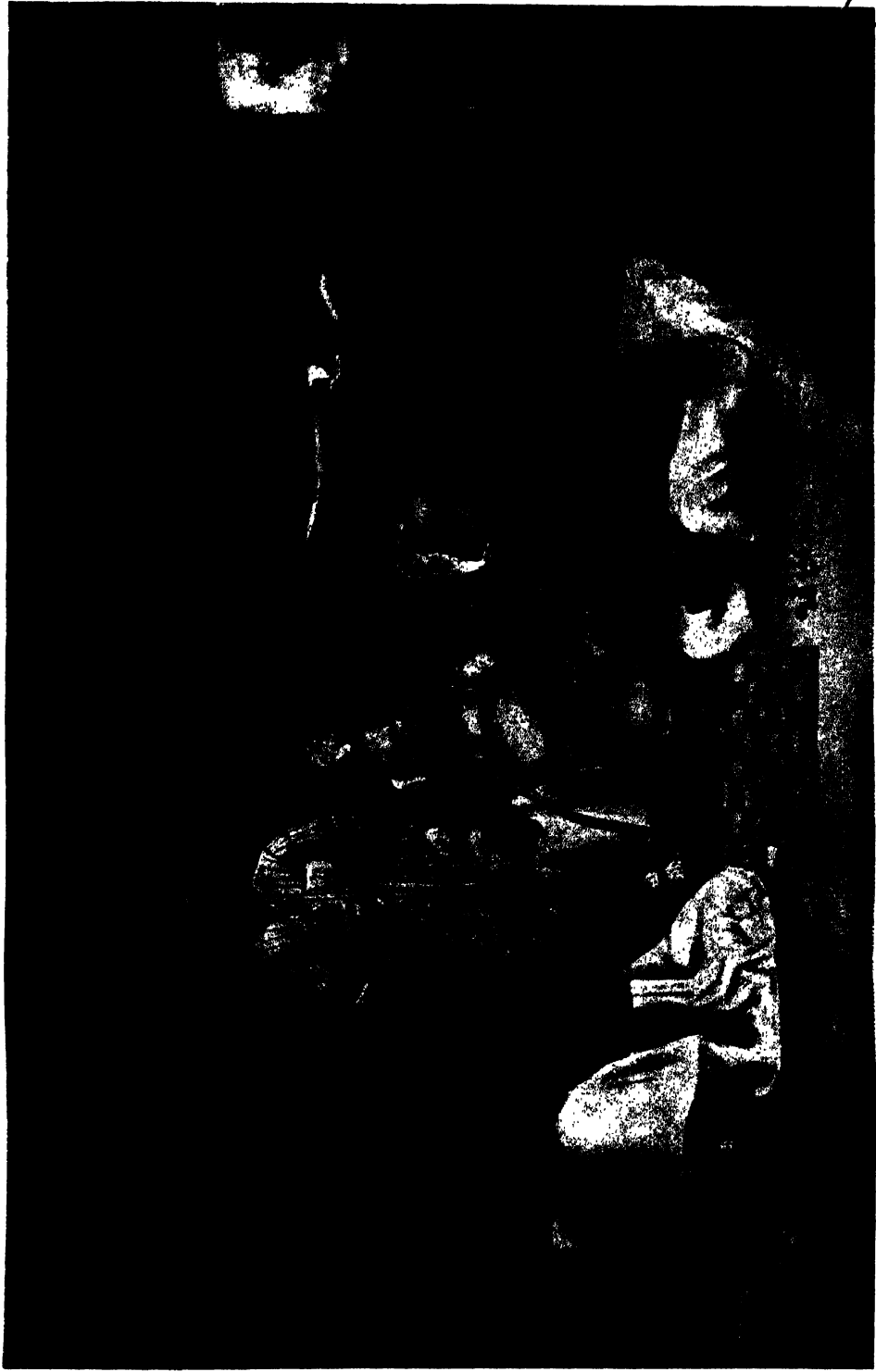
শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

৪৮ এলেক। মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।

৪৯ পাত্রক। সকল সেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দেউল শোধন করিয়া চৌকি শোয়।

৫০ চুনরা। গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।

৫১ খড়্গাধোয়ানিয়া। পশ্চিম দিগহইতে জগমোহন-নামক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মার্জনা করে।

৫২ নাগাধ্যাস। মহাপ্রভুর স্নানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়।

৫৩ দারিগানী। মহাপ্রভুর চন্দন লেপনের পূর্ব্বে গীত গায়।

৫৪ পুরাণ পাণ্ডা। মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে।

৫৫ বীণকার। বীণা বাজায়।

৫৬ তনবোবক। জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে।

৫৭ শংখুয়া। পূজার সময় শংখ বাজায়।

৫৮ মাদলী। পূজার সময় মাদল বাজায়।

৫৯ তুরীনায়ক। তুরী বাজায়।

৬০ মহাসেটী। মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে।

৬১ পানীপাইমাহার। বেড়ার ভিতর হইতে ময়লা বাহির করে।

৬২ হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছা ও ছোট পরিছা করে। এবং ভোগ বিবেচনা করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় লেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর নিয়মিত কর্ম্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও দেখে।

মহাপ্রসায়েত। পর্ব্ব যাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাজ-ভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের পাওনা তাহারদিগকে দেওয়াইয়া দেয়। চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভাঁড়ারের হিসাব লেখে।

গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মা গো—

পাই না তোরে যখন এ-হৃদ্‌মাঝারে
খুঁজি তখন বাহিরেতে কত যে!…
চাই মা যখন চন্দ্রকিরণ—তাহারে
পাই না: শুধুই বজ্র ভীষণ গরজে।

আঁধার তখন নেমে আসে ঘনায়ে
যাচি যখন নীলাম্বরের বরাভয়;
মন্দ মলয় মাগি যখন—কাঁপায়ে
বর্ষে প্রলয়-করকাপাত হিমময়।

ভাবি তখন: কভু কি এ বসুধায়
ফুট্‌বে আবার কান্তারুণের শান্তহাস?
এলোকেশী নিশীথিনীর তমিস্রায়
কেমন ক'রে ওঠে যে বুক!—জাগে ত্রাস।

ভাবি: বুঝি হারালাম যা ছিল সব
মিল্‌বে না যা—মিথ্যা তারি তরে, মা!
বিদায় যখন মাগে অধীর কলরব,
মদির-মুগ্ধ হৃদয় তাহে ডরে, মা!

দিঠির মোদের কতটুকু পরিধি?
দেখ্‌তে পাওয়া যায় যতটুক্—তাহারে
আঁক্‌ড়ে থাকি—লুব্ধ!…কাঁপে এ-হৃদি
চাইতে সসীম দিগ্বলয়ের ওপারে।

প্রতিপদেই লাভ ও ক্ষতির ঠিক্ দিয়ে
চলি মোরা—বিজ্ঞ জ্ঞানের ভাণ্ডারী!…
একটু ব্যয়েই সুধায় কৃপণ মনটি এ:
"শেষকালেতে মিল্‌বে ত সুদ—কাণ্ডারী;

এম্‌নি ক'রেই কাটে মা, দিন—প্রতিদিন,
দাবী করি' কয়তে ক্ষতির পূরণ মোর
প্রতি পলে ; পাছে চাওয়া হ'লে ক্ষীণ—
দেওয়ার বেলা না রহে বা স্মরণ তোর।

কভু যদি চাই মা, হিয়ার অতলে
তোর-দেওয়া ধন উৎসর্জিতে তোর পায়ে,
অম্‌নি ব্যাকুল সাবধানী মোর মন বলে :
"ফেলো না গো ওটুক্ পুঁজি খোয়ায়ে।"

জানে না হায়!—এতটুকও চরণে
নিবেদিলে—পায় শতগুণ ফিরায়ে ;
জান্‌বে সে বল্ কেমনে তোর ধরণ এ?
গৃধ্নু শুধুই বোঝে—নগদ বিদায়ে।

চিত্তদুয়ার খুল্‌তে কভু চায় সে কি—
নিত্য কারার গণ্ডীমাঝেই নন্দে যে?
মণ্ডুকে নীল নভের ভাষা বুঝ্‌বে কি ··
তৃপ্ত—আবিল কূপটুকুরই গন্ধে সে।

প্রাণের নিভৃত্-লোকে যে সুর উথলায়
কান পেতে তায় শুন্‌বে কভু—আন্‌মনা?
ধেয়ায় নি' যে কায়াহীনা অসীমায়
শুন্‌বে সে-জন ছায়াবীণার মূর্চ্ছনা?

তাই ত' ভুলে থাকি নীরব সেই-বরে
মঞ্জীরে যার ছায়াপথও ছন্দিত···
তাই ত ভুলি শুন্‌তে বাণী নিথরে
হিল্লোলে যার বিশ্বহিয়া কম্পিত।

তাই বুঝি এই শঙ্কা জাগে প্রাণে মোর—
লব্ধ ধনে হয় ত্যজিতে পাছে গো?
তাই কাটে না বুঝি চলায় নেশা-ঘোর—
নূপুর বাধা হ'য়ে সদাই বাজে গো?

বুঝ্‌ব যেদিন—এমন পাওয়া জীবনে
মিলে—শুধুই আছে চাওয়ার অপেক্ষায়,
যার এতটুক সান্দ্র হিরণ কিরণে
যুগের-আঁধা মুহূর্ত্তেকে উজলায় ;—

বুঝ্‌ব যেদিন—সকল ক্ষতির বাড়া লাভ
নিহিত্ রাজে একটি দানের পাথেয়ে ;—
শিখ্‌ব সেদিন চল্‌তে পথে ; মনস্তাপ
রইবে না আর—পাড়ি দেব গান গেয়ে।

কভু বা···কোন্ একটি পূত পলকে,
সেই দানেরই খেলে যেন পূর্ব্বাভাষ!
তখন তিমির পলায় তোর এক ঝলকে,
চোখের-ঠুলি খ'সে পড়ে চোখের পাশ।

তার পরেতেই আবার নয়ন-চক্রবাল
গুটিয়ে আসে কেন এমন ত্বরিতে?
আচম্বিতে অন্তহোলির ইন্দ্রজাল
মূর্চ্ছাহত যেমন লগ্ন-সন্ধিতে

এই ভরসায় কেবল মা, বুক বেঁধেছি :
যে-দান লভি' মত্ত সাগর আখ্যানে
গোষ্পদেরও গর্ব্ব তাহাই—চেয়েছি
তাই ত' সাহস করি' তোর ঐ মুখপানে।

নইলে ভেবে-চিন্তে কি কেউ ও পদে
সঁপ্‌তে পারে যা-কিছু তার আপনার?
যে-অবদান তোর-দেওয়া নয় শুভদে!
দেয় তোরে তা ফিরিয়ে—হেন সাধ্য কার?

যে-বারিধার ভরে তড়াগ নদী হ্রদ
তারেই ফিরায় বারিদরূপে ধরাতল ;
যে-আলোটি বক্ষে ধরে কোকনদ
তারেই ফুটায় গন্ধরূপে সমুজ্জ্বল।

তোর চরণে ঢেলে দেব প্রাণটি তাই
তোর-দেওয়া দান ব'লেই—নইলে কেমনে
দেব মা, বল্?—পাব কোথা?—সর্ব্বদাই
গঙ্গাপূজা—গঙ্গাজলের তর্পণে।

আলো ও আঁধার

শ্রীনির্ম্মলা দেবী

এক—কাণ্ড

কুড়ি বছরের ভাড়াটে বাড়ী, তাও ছাড়তে হলো। কোথায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কোথায় একেবারে ভবানীপুরে বলরাম বসু লেনের মোড়ের মাথায়। এই কুড়ি বচ্ছর ভাড়াটে জীবনের মধ্যেও স্বামী আমার নিজের বাড়ী করবার সুবিধা পেলেন না, বা ইচ্ছে করে করলেন না। তিনি লোন অফিস্ রাখেন, সুদী কারবারের মস্ত মহাজন। যত বুঝাই —কলিকাতার বাড়ী একটা সম্পত্তি,—স্বামী একচক্ষু মুদিয়া হিসাব দেন, আহা! মেয়েমানুষ বোঝ না, ত্রিশ হাজারের কম এ সহরে ভদ্র গেরস্থর থাকবার মত বাড়ী হয় না। তবেই কি না হিসাব করো একশ টাকার যদি সাড়ে তিন-টাকা সুদ হয়, তবেই সেই অনুপাতে তিরিশ হাজারের সুদটা ইত্যাদি ইত্যাদি। এর ওপর আর কথাও নাই। আমি ত অঙ্কবিদ লোন্ অফিসের কর্ত্তা নই, কাজেই চুপ করতে হয়।

দেড়'শ টাকা ভাড়া এ বাড়ীর,—আমাদের কল্‌কাতার ভাড়াবাড়ী অপেক্ষা ভালই। বাড়ীর সামনে লেন বলিতে যাহা বুঝায়,—নেহাৎ তেমন সরু রাস্তা নয়। গাড়ী, মটোর, বাস্ সর্ব্বদাই আনা-গোনা করছে। বাঁ দিকের বারাণ্ডা হইতে অদূরে ভবানীপুরের বড় রাস্তার ট্রাম চলাচল দেখতে পাওয়া যায়।

নতুন অচেনা জায়গা;—গেরস্থালীর ওলট-পালোট বিশৃঙ্খলার মধ্যে কদিন কেটে গেল, আশে পাশের প্রতিবাসী বা কেমন, কেমন জায়গায় বা এসে পড়লাম, —চার দিকে তাকিয়ে দেখবারও অবসর মেলে নি। আজ পাঁচ দিন ধরে জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করে করে কতক অবসর পেলাম। কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে গরমের অলস মধ্যাহ্নে এখন অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন গলির সম্মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চার দিকে কৌতূহলী চোখ্ বুলিয়ে একবার দেখে নিলাম,—তাই ত, এই যে বাড়ীর সামনেই মস্ত ফটকওলা প্রকাণ্ড সাদা রঙের বাড়ীটা। ওটি কাদের গো, আমারই পড়শী,—তা এ পাঁচ দিনে পরিচয় মেলে নি, কাউকে কোন কথা জিগ্যেসা করাও হয় নি। ঝক্‌ঝকে পোষাক আঁটা, তক্‌মাওলা খানসামার দল, ফটকে গুর্খা দারোয়ান, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ-পাখা শোভিত বাটীর মালিক যে ধনী ব্যক্তি, এ বুঝতে দেরী হোল না। ফটক থেকে সিধে, লাল কাঁকরের রাস্তার দুধারে ক্রোটনের সারি, ঐ গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত। আশে পাশে বিলাতী পাতাবাহার, রঙিন ফুলের ছড়াছড়ি। ঐ না, বৃহৎ মোটর দাঁড়িয়ে! বাড়ীটা তৈরীর কায়দা আছে। মধ্যের রাস্তা বাদ দিয়ে গাড়ী-বারান্দার ছাদ থেকে দুপাশে দুটা বারান্দা একেবারে ফটকের দুই পাশে লেনের উপর এসে পড়েছে। তার ছাদ থেকে মেয়েরা রাস্তার কোনও দ্রষ্টব্য জিনিস থেকে বঞ্চিত না হন, এই বোধ হয় গৃহকর্ত্তার অভিপ্রায়। কিম্বা বাড়ীটাকে নতুন ফ্যাসানদার বলাও চলে। যাক্, ধনী প্রতিবাসীরা কেমন না জানি!—নাঃ, যাই—ওদিকে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত এখনও শেষ হয় নি।

আজই সকালে ঐ গোসলখানার ওধারে, একেবারে বাড়ীর পেছনে একটা এঁদোপড়া সরু গলি আবিষ্কার করেছি। দুটা পায়খানার ওধারে বাথরুমটা বেশ বড়, আমার পছন্দসই। এ বাড়ীর পেছনেও সরু বারান্দা, ওই ওধার পর্য্যন্ত। শেষ সীমানায় দুটী ছোট ছোট ঘর। গৃহস্বামী কি উদ্দেশ্যে করেছেন জানি না, আমার বেশ সুবিধাই হোল। দুই দাসীর জন্যে ঐ ঘর দুটী ঠিক করে দিলাম।

বিকেলে গা ধুতে গিয়ে একবার ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ছোট গলির প্রতিবাসীদের পরিচয় নেবার চেষ্টা করলাম। পচা এঁদোপড়া নোংরা গলির মুখেই এক টীনের চালের নীচে টীন মিস্ত্রি ঠুক্‌ঠাক্ করে বদনা তৈরী করছে।

ভাঙা ক্যানেস্তারা, ফুটা বাল্‌তি চার দিকে ছড়ানো। তার পাশেই ছোট্ট এক ঘর (বরঞ্চ খোপ বলাই চলে)। সামনে তার ছাতাপড়া কাঠের বারকোসে শুক্‌না বেগুনী, ফুলুরী সাজানো। সেগুলি কতকালের জানা যায় না। একখানা কলঙ্কপড়া পেতলের থালায় আধসিদ্ধ মটর; মধ্যে একটা লাল লঙ্কা গোঁজা। পাশেই মস্ত বড় একটা উনুনের মুখে রাশ করা ছাই পড়ে; তার পাশেই তেলচিটে একখানা বড় কড়া, একখানা ঝাঁঝরি পড়ে। গাদা করা ছাইয়ের পাশে একখানা শিল পাতাই আছে। ভাঙা পাখার উপরেই কাঠের একখানা উচুঁ পীঁড়ির ওপর বয়স্থা হিন্দুস্থানী গিন্নী বসে চোখ মুদে পরম আরামে ছোট হুঁকায় তামাক টানচে—আর খক্‌খক্‌ কেশে কেশে, ঘরময় থুথু ফেলে ফেলে বেচারার দম বন্ধ হবার যোগাড় আর কি! করপোরেশনের দৌলতে গলিটী ইট দিয়ে বাঁধানো বটে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে মাটীই ছিল এই গলির পক্ষে ভাল; কেন না যতদুর নজর চলে—গলির সেই শেষ সীমা পর্য্যন্ত, ভয়ানক অপরিষ্কার।—ছেঁড়া মাদুর, ভাঙা ঝুড়ী, বোতলের টুক্‌রা ভাঙা, মরা ইঁদুর, ছেঁড়া ন্যাকড়া, আরসুলার সঙ্গে ডাল, ভাত নর্দ্দমার গন্ধের সহিত মিশিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যকুশলতার জয় ঘোষণা করেছে।

যাক্‌, দেখি আর আমার প্রতিবাসী কে আছেন। বেগুনীর পাশেই আবার এক খোপ—চার পাঁচজন উৎকলবাসী, খুপরীর বাহিরে মাটীর দাওয়ায় বসিয়া মহা কলরবে তাস পিটচে,—যত না খেলচে তার চারগুণ চেঁচাচ্ছে তাদের কিড়ির মিড়ির ভাষায়। এবারে ঠিক আমার বাড়ীর সেই শেষ সীমায় দাসীদের ঘরের সামনেই একতলা নোনাধরা একখানি কোঠা বাড়ী,—গলির পক্ষে অভিজাতবংশীয় বল্‌তে হয়। তবে হাঁ-করা ইট-বার-করা বাড়ীখানি যে কতকালের তৈরী, তা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার যোগ্য মনে হোল। জানালার গরাদে খসে পড়েচে, কেরাসিন কাঠের বাক্স দিয়ে তার আবরণ হয়েছে। বালি যে কোন কালে কোথায়ও ছিল বোঝা যায় না। ছাদে ওঠবার ভাঙা সিঁড়ী,—এক দিক তার একেবারে খোলা। দুখানা ভাঙা বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে রেলিঙ তৈরী হয়েছে। হঠাৎ পা ফস্‌কে গেলে নীচের উঠানে পড়বার কোন বাধা যে থাক্‌বে না, তা রেলিঙ দেখেই বুঝা যায়। পচা বাঁশ—হাতের ভরও সইবে কি না সন্দেহ। নীচে একটা করগেটের ঘর থেকে প্রচুর ধূম বেরুচ্চে। একমনে চেয়ে চেয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি, সেই ভয়াবহ সোপান বেয়ে কে ছাদে উঠে এলো। ছাদময় ইতস্ততঃ ছেলের কাঁথা দুচারখানা ছড়ানো ছিল, তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছাদের মধ্যে সে এসে দাঁড়ালো। এইবার তাকে ভাল করে দেখবার সুবিধা হলো—বুঝলাম হাঁ, স্ত্রীলোকই ত বটে (হাসিবেন না, সত্য)। তাঁর দীর্ঘ আকৃতি, মস্তকের সম্মুখে টাক্‌ হেতু বিরল কেশ দেখে প্রথমে তিনি মহিলা কি পুরুষ ঠিক করতেই পারি নি। কৃষ্ণবর্ণের উপর শুষ্ক লম্বা মুখ, পরণে আধময়লা ছেঁড়া নরুণ-পাড় ধুতী। তিনি এইবার সোজা এই দিকে মুখ করে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর অপূর্ব্ব চোখ দুটীর দিকে আমি অবাক হয়ে চেয়েই রইলাম। ঠিক কি করে বুঝাই,—যেন কাঁকড়ার চোখ,—ছোট ছোট অথচ কোটর হইতে ঠেলিয়া উপর দিকে বার হয়ে আস্‌চে। ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়েই, মুখ কুঁচকে ফিরিয়ে উঠানের দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় চীৎকার করে ডাকলেন, অ বিম্‌লি, ওলো ও কর্ত্তার কাপড়খানা কোথা? আ মর্‌ সাড়া নেই, যত আপদ, মরেও না, কানের মাতা খেয়েছিস না কি? মুয়ে আগুন—বলতে বলতে সেই আধভাঙা সিঁড়ী বেয়ে তর্‌তর্‌ করে নীচে নেমে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়েই রইলাম।

দুই—পর্ব্ব

নহবতের মধুর সুরে ঘুম ভেঙে গেল। আঃ, সাহানায় তান ধরেছে! কি গো, ব্যাপার কি? বুঝি মিষ্ট সুরের মধ্যেও বুকভাঙা বেদনা আছে, নইলে চোখে জল আসে কেন? ঘুম ভেঙে শুয়ে শুয়ে যত শুনছি, বুকটা মুচড়ে উঠচে—কোথায় যেন আপন ধন আছে, তাকে বুকের কাছে পাচ্ছি না,—কবে যেন এ মিষ্ট সুর আমার আপন ছিল, আজ তাকে ধরতে পারি না।

মাথার শিয়রে একখানি ইজিচেয়ারে বসে স্বামী আমার চা পান শেষ করে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করেছিলেন। হঠাৎ চোখটা সেই দিকে পড়্‌তেই চশমার মধ্য থেকে তিনি চেয়ে বিদ্রূপহাস্তে

বলে উঠলেন, ঘড়িটা একবার দেখ-দিকি, সাতটা বাজে যে, এখনও বলচো ব্যাপার কি? সামনেই যে বিয়ে বাড়ী—খবর রাখ না?

তাই ত বটে, কন্যা-বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় আমার,—অল্পেই আলোড়িত হয়ে ওঠে।

বিছানা ছেড়ে উঠে স্বামীর দিকে চেয়ে বললাম, বিয়ে ত জানি। মেয়েটাকে জনমের মত পর করে দেওয়া আর কি।

তিনি কাগজখানি চেয়ারের হাতায় রেখে আমার একখানা হাত টেনে হাতের ওপর রেখে স্নেহমধুর চক্ষে আমার দিকে চেয়ে বললেন, রীতি, তোমার মেয়ে যে তোমার কাছে বার মাস থাকে, এটা অবশ্য তুমি পছন্দ কর না?

ওগো, না, না, না, তা আমি চাই না। অলক্ষ্যে শিউরে উঠলাম, তোমরা কি বুঝবে গো, আমার ঐ এক সন্তান। ঐ একমাত্র ধন নীতি, তাকে আমি পরের হাতে সঁপে দিয়ে একলা আছি। তাই ভালো গো, তাই ভালো, তারা আমার মেয়েকে ভালবাসে। জামাই আমার বুকের মাণিককে ভালবেসে—একদিন চোখের আড়াল করে না। এ মায়ের প্রাণ, কন্যা-বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়ে বেদনার মধ্যে কি সুখ, কি আনন্দ তা কন্যার জননীরাই জানে। বিশেষ যাঁদের এক সন্তান।

উঠে গৃহকার্য্যে মন দিলাম। এখন আর প্রতিবাসী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা নই। যদিও মধ্যে চওড়া লেনের ওপারের প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুবিধা পাই না, তবু সকলের পরিচয় পেয়েছি। সামনের ধনী প্রতিবাসী মিঃ বোস্ পূর্ব্বে এটর্ণী ছিলেন, এখন বৃদ্ধবয়সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। দুই যোগ্য পুত্র তাঁর,—একজন ব্যারিষ্টার, ও একজন কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। কন্যা পাঁচটীও শিক্ষিতা। তাঁরাও ধনী ঘরের ঘরণী হয়েছেন। সব ছোট মেয়ে করবীর বিয়ে হচ্ছে পূর্ব্ববঙ্গের এক জমিদার পুত্রের সঙ্গে। তা ছাড়া, শুনি মিঃ বোসের জমিদারী ও ভাড়াটে বাড়ীর আয়ও নেহাৎ কম নয়। এদিকে ধনী পড়শীর সঙ্গেও যেমন, তেমনই পেছনের সরু গলির দরিদ্র প্রতিবাসীদেরও সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় নি। টীন মিস্ত্রী, বেগুনী-ফুলুরী, উড়ে পাচকদের কথা বাদ দিয়ে ঐ একতলার অধিবাসীদের খবর কিছু কিছু পেয়েছি। বাটীর কর্ত্তার নাম রজনীকান্ত চৌধুরী। সেই প্রথম দিনের দেখা কাঁকড়া-চক্ষুই তাঁহার গৃহিণী। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান, আমাদের মত লোকের সুবিধা নয়। কর্ত্তা কোন অফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনার চাক্‌রী করেন। পোষ্য অনেকগুলি। প্রথম বিয়ের ফল এক মেয়ে, আর সেই মেয়েরই একটী ছোট চার বছরের ছেলে। এ পক্ষের ঐ জবরদস্ত গৃহিণী, আর তাঁর গুটী সাত-আট ছেলেমেয়ে। আমার দাসী সদু ও কামিনীর মা আরও গুহ্য খবর এনে আমার কাণে তোলে। রজনীবাবু নাকি ঐ বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ভাল পাত্রে। সে নাকি মোটর গাড়ীর ড্রাইভার। তা মাইনে পায় অনেক—চার কুড়ীর ওপর,—মদ খেয়ে বেশ্যা বাড়ী পড়ে থাকে। কাজেই মেয়েটী গরীব বাপের ঘাড়ে। বড় শান্ত, লক্ষী মেয়ে, নাম তার বিমলা। সৎমার বকুনি গালাগালি, বাপের হতচ্ছেদ্দা সয়ে মুখ বুজে রাঁধে, বাড়ে, জল তোলে, সাবান কাচে, ঘর ঝাঁট থেকে বাসন-মাজা, ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করা পর্য্যন্ত তার কাজ। মেয়েটীকে আমি দেখ্‌তে পাই। শান্ত মুখে বড় বড় কাল চোখ, শ্যামবর্ণে সুশ্রী গঠনের একহারা মেয়েটী। হাতে দুগাছি লাল রবারের রুলি। মুখশ্রী খুব সুন্দর না হলেও মুখখানি দেখলেই মায়া—আহা! যেন সে কল,—কাজের আর বিরাম বিশ্রাম নেই। কোলের ছেলেটী ধূলা মেখে খেলা করে, মা বলে কোলে ওঠবার বায়না ধরে, সময় নাই। এদিক ওদিক চেয়ে ভয়চকিত মুখে একবার ময়লা আঁচলখানি দিয়ে সযত্নে ছেলের গায়ের ধূলা ঝেড়ে দেয়, চুপি চুপি সান্ত্বনা দেয়। ছিঃ বাবা এখন কোলে ওঠে না, কাজ রয়েছে। দেখে দেখে অকারণে আমার চোখের জল বাধা মানে না। আজ একবার চানের সময় কি মনে করে ঐ ধারের বারান্দায় গেলাম। বেলা প্রায় নটা—চেয়ে দেখি, ছাদের একধারে একরাশ এলোচুল জড়িয়ে বড় একখানি কাঁশীতে বড়ির ডাল ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঐ মেয়েটী, বিমলা বড়ি দিচ্ছে। হঠাৎ বাঁ হাতের উল্টোপিট দিয়ে মেয়েটী চোখের জল মুছে ফেলে, সভয়ে এদিক ওদিক চাইতেই আমার দিকে নজর পড়ায় অপ্রস্তুত হয়ে ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার বৃথা চেষ্টা করলে। আমি বললাম, এখন বর্ষার সময় বড়ি কি ভালো হয় মা? মৃদুস্বরে বিমলা

বললে—মা বড়ি খেতে বড় ভালবাসেন কি না,—আহা, না জানি সৎমা আজ আবার কি ব্যথাই না তাকে দিয়েছে। চেয়ে চেয়ে ঐ মা-হারা মেয়েটীর মুখ দেখি, আর মায়ের প্রাণ আমার—কন্যাকে মনে পড়ে বুকটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ধরা গলায় মেয়েটী আবার বলে উঠলো—আজ তবু একটু রদ্দুর আছে না মা?—আহা মা, মা, মা, বাছা রে, যদি তোরও মা হতে পারতাম। নীচে থেকে কর্কশ আওয়াজ বেজে উঠলো—বিমলি, মরণ—বড়ি দেওয়া একটা ছুতো, না? পাড়ায় পাড়ায় গপ্প করা—হুঁ ঐ রীত, চরিত দেখেই না জামাই বিদেয় করে দিয়েচে, নেমে আয়—কয়লাগুলো ভাঙ—

(তিন—সৃষ্টি)

আজ সকাল থেকে মনটা ভাল নেই। নীতির চিঠি ক'দিন পাইনি। আর ঐ ও-বাড়ীর ঐ বিমলার ছেলেটীর বড় অসুখ শুনলাম। আহা অভাগীর ঐ মাত্র সম্বল যে। আরও অনেক কথা সদুর মুখে শুনলাম। পরশু থেকে ছেলেটা জ্বরে বেহুঁস। বিমলা না কি বাপকে ডাক্তারের কথা বলছিলো। সৎমা তার মুখ বেঁকিয়ে বলে, হেঁ, নিমোনি না আর কিছু, সর্দ্দি জ্বর ও সর্দ্দি জ্বর। তুলসীপাতার রস খাওয়াগে যা। অতবড় মানুষি গরীব বাপের ঘাড়ে চলে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সুবোধ পিতা আর দ্বিতীয় কথা কইবার ভরসা পাননি।

বেলা প্রায় দশটা। সামনে বিয়ে বাড়ী। খুব ঘটা করে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এলো। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে জোড়া শাঁখ বেজে উঠলো। স্বামীর জন্যে ভেট্‌কি মাছের ঘণ্ট্ রাঁধছি, কামিনীর মা বাটনা বাটচে, সদু একরাশ কচু শাক নিয়ে বসেচে। শাঁখের শব্দ শুনেই, ওমা, তত্ত্ব এলো দেখসে, বলেই শিল, বঁটী ফেলে ছুটলো। অত তাড়া আমার নেই, তরকারীটা নামিয়ে গরম মশলা দিয়ে চাপা দিয়ে গেলাম, দেখা যাক্‌। তাই ত, পাত্র পক্ষ যে ধনী তা তত্ত্ব দেখে বুঝা গেল। গোলাপী-রঙে ছোপান কাপড় পরে সারি সারি দাসী চাকরের দল ফটকে প্রবেশ করচে—তা কৌচ্, কেদারা, আলমারী, দেরাজ কিছুই বাদ পড়েনি—প্রায় দেড়শ লোক হবে। অবাক হয়ে দেখচি, বড় বড় রূপার গামলায় লাল রঙ গুলে গুলে রূপার পিচকারী দিয়ে দিয়ে কুটুম বাড়ীর লোকেদের রঙানো হলো, সুগন্ধে দিক আমোদ করলে। স্বামীর খাবার সময় হলো—যাই। তাঁর খাওয়া, অফিস যাওয়া সারা হতেই সকালের সেই বেদনাটা বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। আজ যেন কোন কাজে মন নেই, তাই এত বেলায় স্নান সারা হয়নি। অন্যমনস্কে তেল মেখে চানের জন্য তৈরী হলাম বটে, কিন্তু ওদিকে যেতে অন্তরের তাগিদে বারান্দায় এসেই দাঁড়ালাম। ঐ দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, না জানি অমল কেমন আছে। কই, কাউকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না—খোলা দরজার মধ্য দিয়ে উঠানের অর্দ্ধেকটা দেখা যায়। ওটা কি, ঐ মাটীর বেদীর ওপর তুলসী গাছ, ওর নীচে ওটা কি গো; মানুষ! চোখ মুছে ভাল করে দেখি, ওমা, তাই ত, ঐ বিমলা না, মাটীতে উপুড় হয়ে পড়ে,—হাঁ হাঁ হাত দুখানি জোড় করে ওপর দিকে ছড়ানো, এলো চুল অযত্নে এদিক ওদিক হয়ে মাটীতে লুটোপুটী, পরণে সরু লালপাড় একখানি ধুতী—আহা! হায় অভাগী, ওগো, আমার কোনও হাত নাই, চোখ যে ঝাপসা হয়ে আসে। কিছু জিজ্ঞাসা করবারও ভরসা হয় না, করি কি, চোখ মুছে সরে এলাম। বুকটা কেমন করতে লাগলো। স্নান সেরে নামমাত্র আহারে বসলাম, কেবলই মনে জাগে,—সেই নিঃসহায়া, ব্যাকুলা, মাতৃমূর্ত্তি—মনের চক্ষে বিমলার সেই লুণ্ঠিত ক্ষীণ দেহখানি দেখ্‌তেই লাগ্‌লাম। উপায় নাই, উপায় নাই,—একবার সামান্য রকমে চেষ্টা করতে গিয়ে প্রচুর অপমানিত হয়েছিলাম।

শ্রাবণের আকাশ, বিকেল থেকে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, প্রকৃতি দেবী যেন নূপুর পায়ে দিয়ে নাচছেন। ওধারে বিয়ে বাড়ীর বিশৃঙ্খলা, গোলমাল—সকলে ভেবেই আকুল। পরশু গায়ে হলুদ গিয়াছে, আজ বিয়ে শুনেচি। আজ বিমলার ছেলের অসুখ না কি আরও বেড়েচে।

অন্যমনস্কে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। উদাস নেত্রে মেলে চেয়ে চেয়ে দেখি, গাড়ী বারান্দার উপরেই হলঘর ফুলপাতা নেতের সারি দিয়ে সাজানো, বিদ্যুৎ ঝাড়ে গোলাপের মালা, ভিতরে পুরু কাশ্মীরি গালচে পাতা। বৃষ্টি একটু কমে কমে একেবারে ধরে এলো। সারা বাড়ীটা সাজানো হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য যা কিছু

অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল,—লোকেরা তাড়াতাড়ি সেগুলি আবার যথাস্থানে সাজাবার চেষ্টায় লেগে গেল। ফুলে, পাতায়, মালায়, আলোয়, বাড়ী আবার উৎসব বেশ ধারণ কর্‌লে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই চার দিকে বিদ্যুৎ-আলো জ্বলে উঠলো। সারি সারি গাড়ী, মোটর, ফটকে প্রবেশ করচে। অলঙ্কারের সিঞ্জন তুলে, সুগন্ধে চার দিক মাতিয়ে, দামী দামী শাড়ীর বাহারে সেজে—তরুণী, প্রৌঢ়া, বালিকার দল কলহাস্যে আনন্দ-বাসর বিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করচে। উপরে হলঘর থেকে গ্রামোফোন্ বাজচে—"ওগো আমার নবীন সাথি, ছিলে তুমি কোন বিমানে।" কতকগুলি কিশোরীর দল, একেবারে গেটের ওপর বারান্দায় এসে জটলা করে বস্‌লো। চারিদিকে ফুলের টব—গাছের সারিতে আলো বসানো হয়েছে। খানকতক চেয়ার পাতা। তারা চঞ্চল হয়ে একবার রাস্তার দিকে চায়। কেউ গুন্‌গুন্ করে গান গায়। একগোছা কুঁড়ীর মালা হাতে করে এ ওর গলায় খোঁপায় পরায়। পাশেই একটা অর্গ্যান। একটী মেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাজনার দিকে এগিয়ে গান ধর্‌লে "বাদল বাউল বাজায় রে, বাজায় রে একতারা"। সুসজ্জিত খানসামারা চায়ের ট্রে হাতে করে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে চা পান করাচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা ফুল, পাতা, আলো, হাসি, গান নিয়ে উৎসব বেশ ধারণ করে যেন তারই প্রতীক্ষা করচে। স্বামীর আজ বিয়ে বাড়ী নিমন্ত্রণ, আমারও আর কাজ নাই। এত আনন্দের মাঝে—আমার হৃদয় অন্ধকার, নিরানন্দ প্রাণ—সদু আজই বিকেলে জানিয়েচে, ছেলেটার অবস্থা ভাল নয় মা—আমার মন আজ এত দেখে শুনেও স্থির হচ্ছে না! ওরা আমার কে? কেউ না। তবে? হায়, আমারও ত কন্যা আছে, আমার নীতি তার যদি এই রকম পুত্র—ওঃ, না—না, কি ভাবচি? তাই ত, বিমলা কি করচে? অমল কি ছটফট করচে? না স্থির হয়েই পড়ে আছে?—যাই, ঐ এঁদোপড়া বস্তির দিকেই মন যেতে চায়। ঐ কে না?—ঐ অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি করে? কে কাঁদে না? না—না, মনের ভ্রম,—দূর হতে বাজনার শব্দ কাণে আসচে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি একটু যা ধরেছিল, বড় বড় ফোঁটায় আবার আরম্ভ হল যে! দেখতে দেখতে আকাশ কড় কড় করে ডেকে এলো। লিক্‌লিকে বিদ্যুৎ আকাশের মাঝ চিরে চোখ ঝলসে দিলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিজচি—তবু সরতে পারচি নে। বড়লোকের বিয়ে—বৃষ্টি, বিদ্যুৎ উপেক্ষা করে, গলির মুখে অনেক লোক জড় হয়েচে। তাদের কোলাহল, মেঘের ডাক, বৃষ্টির শব্দ বাজনার শব্দ মিশ্রিত হয়ে একটা হলহলা-শব্দ ভেসে উঠেচে। দেখতে দেখতে বাজনা কাছে এলো, হৈ, হৈ, বৃষ্টির জন্য সব লণ্ডভণ্ড। এই এঁদোপড়া নিকষ কালো গলির মধ্যেও বরের প্রশেসনের আলো ঠিক্‌রে পড়ে, খানিকটা আলো করে তুল্‌লে। কাণে সবই আসচে বটে, কিন্তু অচেতন জড়ের মত চোখ কাণ মাত্র উৎকর্ণ রেখে বিমলার বাড়ীর দিকে চেয়েই আছি—ও কি? সেই গলা—সেই কর্কশ ভাঙা গলা—ওরে ও পচা—দেক্‌চিস্ না—বার কর—বার কর—ঐ ঐ উঠোনে!—ঘরে মরবে না কি? ও ত হয়ে এলো,—এঁ্যা বলে কি? অন্ধকার—অন্ধকার—সারা বিশ্বের অন্ধকার বুঝি এই গলিতে আজ বাসা নিয়েছে? কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো, সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝি আজ আমার চোখে কাণে এসে ভর করেচে। ওদিক থেকে গানের স্বর ভেসে আসচে—অন্ধকারের বুক চিরে—লক্ লক্ শিখা—তীক্ষ্ণ—আর্ত্ত প্রাণ-ফাটা স্বরে—কে?—একবার—বাবা—অমল, ঐ একবার—প্রাণপণ শক্তিতে সে বুঝি—কে—কে? দুহাতে বারান্দার রেলিঙ চেপে ধরলাম, ঠক্‌ঠক করে কাঁপচি—চীৎকার করে বলতে যাচ্ছি, ওরা আমার কে?—কেউ না, কেউ না—অন্ধকার অন্ধকার—বুক ফেটে—তার পর আর মনে নাই।

আমাদের সিকিম যাত্রা

শ্রীহরিপদ মৈত্রেয়

বিগত বছর পূজার সময়টা যখন দারজিলিংয়ের সেনিটেরিয়মে কাটাচ্ছিলাম, তখন একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সিকিম যাওয়ার প্রস্তাবটা এসে উপস্থিত হ'ল। রাত্রিতে চকদীঘীর রাজা মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুরের ঘরে ব'সে আমরা গল্প করছি, এমন সময় রাজা সাহেব ব'ললেন্—দেখ, ফালুট থেকে এভারেষ্টের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখবার পর থেকেই সিকিম যাওয়ার কল্পনাটা আমার মাথার ভিতর ঘুরছে। এতদিন মনের মত একটা দল পাই নি ব'লে কাউকে সে কথাটা বলি নি। এবার তো আমরা অনেকেই জুটেছি, চল এবার সিকিম যাওয়া যাক্। প্রথমটা তাঁর মত বয়োবৃদ্ধ লোকের পক্ষে দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশের এতটা পথশ্রম সহ্য হবে কি না সন্দেহ করছিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের এ আশঙ্কাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ যৌবনোচিত উৎসাহে আমাদের সকলের উৎসাহ দ্বিগুণমাত্রায় বেড়ে গেল—তাঁর প্রস্তাবটা সভায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হ'ল। সিকিম যাত্রার আর মাত্র তিন দিন বাকী।

অভিযানের উদ্যোগ-পর্ব্ব পুরোমাত্রায় চল্‌তে লাগল। সিকিমের দুর্গম রাস্তায় বড় মোটর অচল, সুতরাং দুখানি Baby Austin ও একখানি Baby Triumph ঠিক হ'ল। সঙ্গে ডাক্তার থাকা দরকার, তারও ব্যবস্থা হ'ল। যেখানে যেখানে থামতে হবে, সর্ব্বত্রই টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হ'ল। ছোটখাটো ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে সিকিমের রেসিডেণ্টের নিকট পরিচয়-পত্র নেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কাজগুলি রাজাসাহেব যথাযথভাবে ঠিক ক'রে ফেললেন। তাঁর ব্যবস্থার ভিতর কোন ছিদ্রই রইল না। অভিযান-নেতা ছাড়া পার্টিতে ছিলেন—কলিকাতার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ইডেন সেনিটেরিয়মের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার কালীপ্রসাদ সিংহ রায়, হ্যাপি ভ্যালি চা এষ্টেটের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লুইস্ জুবিলি সেনিটেরিয়মের হস্তলাল গিরি।

৩০শে অক্টোবর সকাল সাতটায় আমরা সেনিটেরিয়ম থেকে তাকদা অভিমুখে যাত্রা করলাম। তাকদা দারজিলিং থেকে পোনর মাইল দূরে, ঘুম পাহাড় হ'য়ে যেতে হয়। ঘুম থেকে তাকদা পর্য্যন্ত রাস্তাটি এখনও সুন্দর আছে; কারণ তাকদার অধুনালুপ্ত সৈন্যনিবাসের অনুগ্রহে এ রাস্তাটি গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি হ'তে অতীতে কোনদিনই বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু এই এগার মাইল রাস্তায় মোট বত্রিশটি Sharp turn আছে। তা' ছাড়া ছোটখাটো বাঁক যে কত আছে, তার হিসাব নেই। মোটরে চ'ড়ে Merry-go-roundএর অভিজ্ঞতা আমাদের এই রাস্তাতেই প্রথম হ'ল। তাকদা পৌঁছে তারাপদ বাবুর বাংলোতে চা-পান করা গেল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই তাকদাতে একটী গুর্খা সৈন্য-নিবাস ছিল। পাহাড়ী সিপাহীরা মাঝে মাঝে মুক্তির হাওয়া খাওয়ার লোভে এখান থেকে সঙ্গোপনে খ'সে পড়ত,—তখন এই শৈলমালা-বেষ্টিত দেবতাত্মা হিমালয়ের নিভৃত কোল থেকে তাদের পুনরুদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট সৈন্য-নিবাসটি উঠিয়ে দিয়েছেন। বাড়ীগুলি যা ছিল সেগুলি জলের দামে নিলামে বিক্রি হয়েছে। দেশীয় ও বিদেশীয় জনকতক ভদ্রলোক বর্ত্তমানে বাড়ীগুলির মালিক হয়েছেন। তারাপদ বাবুও একখানি চমৎকার বাংলো কিনেছেন। স্থানটি বড়ই সুন্দর। সামনে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি দৃষ্টি রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর পিছনে সুদূর চক্রবালে দিগন্ত-প্রসারিত সমতলভূমির সঙ্গে আকাশের যেন কোলাকুলি হচ্ছে। দূরে তরুরাজি-শোভিত শ্যামল সমভূমির বুকের উপর খরস্রোতা তিস্তা যেন আল্‌পনা দিতে দিতে চলেছে। আশা করা

যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ স্থানে স্বাস্থ্যান্বেষীদের একটা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠবে।

বেলা প্রায় ন'টার সময় তাকদার মায়া কাটিয়ে তিস্তা ব্রীজ অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। তাকদা থেকে প্রায় দুই মাইল পথ ভয়ানক ঢালু, রাস্তার উপরে এবং নিচে দুধারেই চা-বাগান। তারপর ঢালু কথঞ্চিৎ কমে এল এবং চা-বাগানগুলো ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হ'তে লাগল। রাস্তার দুধারে পাহাড়ের গায়ে রং-বেরং-এর কত রকম নাম-না-জানা ফুলের মেলা বসেছে। মাঝে মাঝে স্তরে স্তরে, পংক্তিতে পংক্তিতে ফসল ফলেছে। বিচিত্র লতাগুল্মে, ফুলে ফলে পাহাড়ের গায়ে যেন সৌন্দর্য্যের হাট বসেছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণার ধারাগুলি রাস্তা ছাপিয়ে কুলকুল শব্দে নিচের দিকে ছুটে চলেছে।

বেলা প্রায় স'দশটার সময় দারজিলিং হিমালয়ান রেলের কালিমপং শাখার রেল-লাইনের কাছে এসে পড়লাম। আমাদের মোটরের রাস্তা এখান থেকে তিস্তা নদীর পাশ দিয়ে রেল-লাইন ও নদীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছে। তিস্তার অপর পারে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে নানা রকম রংয়ের নানা রকম গাছ। খরস্রোতা তিস্তা পাহাড়ের বুক চিরে' উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বিশাল প্রস্তরখণ্ড মাথা উঁচু করে আছে। বর্ষার প্লাবনে সেগুলো নদীতট থেকে উন্মূলিত হয়েও আজ পর্য্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে নি—তাই সেগুলোর উপর জলস্রোতের অবিরাম আক্রমণ চ'লছে। স্রোতের ঘায়ে তাদের চারদিকে অবিশ্রান্ত শুভ্র-ফেনপুঞ্জ ও বিচিত্র আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছে।

তিস্তা ব্রীজের নিকটে কালিমপং-এর উদীয়মান উকিল রায়সাহেব হরিপ্রসাদ প্রধান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তাঁকে আগেই টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এতদঞ্চলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি পার্ব্বত্য অভিজাত-বংশের ছেলে; যথেষ্ট তাঁদের বংশগৌরব। সিকিম রাজদরবারেরও তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। অনুরোধ করা মাত্র তিনি আমাদের পথি-প্রদর্শক হতে রাজী হলেন। তিস্তা ব্রীজের পাশেই পুলিস ষ্টেসন। রাজাসাহেবকে দেখামাত্রই থানার অফিসারেরা
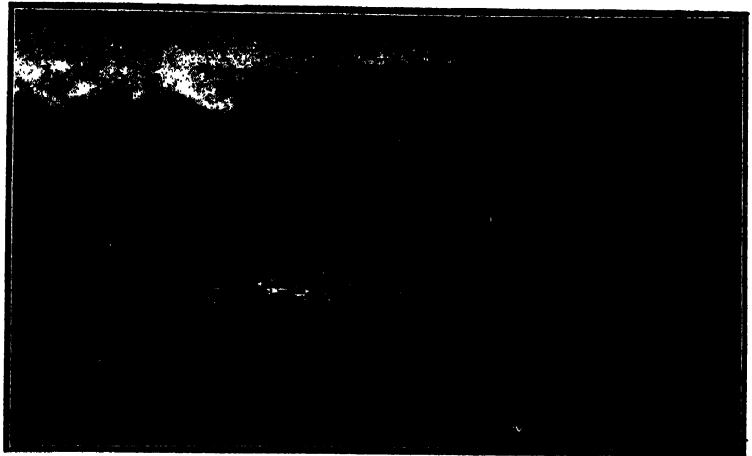
অভিযান-নেতা—রাজা মণিলাল সিংহ রায় সি-আই-

দূর হইতে কালিমপং

সাদর অভিনন্দন জানাল। আমাদের নূতন সহযাত্রীর জন্য মোটরে স্থান করবার প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের কিছু মালপত্র থানার হেপাজাতে রাখতে হ'ল। পোল পার হ'য়ে অল্প দূর যাবার পরই একটা পাহাড়ী বালকের চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। পিছনে তাকিয়ে দেখি সে রাজাসাহেবের ছোট্ট চামড়ার বাক্সটি হাতে ক'রে মোটরের পিছুপিছু ছুটে আসছে। বাক্সটি মোটরের পিছন থেকে পড়ে গিয়েছিল; ছেলেটি দেখ্‌তে পেয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটেছে। গাড়ী থামিয়ে তাকে বক্‌সিস করতেই সে ছুটে পালাল। পাহাড়ী বালকের সততা দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম।

রেলিং পর্য্যন্তও নেই। চালকের অসাবধানতায় যদি কোনক্রমে একটু এদিক-ওদিক হয়, তাহ'লে ত একেবারে সলিল-সমাধি। প্রাণ হাতে নিয়ে সকলে চলেছি। কিন্তু এই দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশের নগ্ন সৌন্দর্য্য আমাদের সব উৎকণ্ঠাকে যেন নিঃশেষে ডুবিয়ে দিল। চারিদিকে পর্ব্বত-প্রাকার, মাঝখানে তরঙ্গ-চঞ্চলা তিস্তার অবিশ্রান্ত কলমর্ম্মর। আশে পাশে পাহাড়ের গায়ে কত বিচিত্র বর্ণের Fern হাওয়ায় দুলছে। স্থানে স্থানে শৈবালাচ্ছন্ন পাহাড়ের গা ব'য়ে ঝরণার ধারাগুলি লীলাচঞ্চল ভঙ্গীতে নদীর উপর ঝ'রে পড়ছে। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোন স্বপ্নপুরীর মধ্যে এসে পড়েছি।

কালিম্পং

তিস্তা ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তা নদীর ধার দিয়ে ক্রমশঃই উপরের দিকে উঠেছে। প্রায় দু'মাইল আসার পর তিস্তা এবং বড়-রঙ্গিতের নয়নাভিরাম সঙ্গম দেখা গেল। দুটো নদীর জলের রংয়ের পার্থক্য বেশ সুন্দর বোঝা যায়। তিস্তার জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, আর রঙ্গিতের জল ঘোলাটে। ক্রমশঃই আমরা গহন বনের ভিতর ঢুকতে লাগলাম। ডানপাশে পাহাড়ের গা,—ঘনসন্নিবিষ্ট নানা জাতীয় বৃক্ষলতাগুল্মে আচ্ছন্ন; বাম পাশে প্রায় পাঁচশ' ফিট নিচে তিস্তার ফেনিল তরঙ্গ-গর্জ্জন। রাস্তাটি ছোট মোটরের পক্ষেও নিতান্ত অপরিসর; বামপাশে

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা রংপুতে পৌছলাম। এ স্থানের ঠিক নিচেই রংপু নদী, সিকিম রাজ্যের সীমানা। নদী পেরিয়ে ওপারে পৌছেই আমাদের ছাড়পত্র নিতে হল। এখানে একটা বাজার আছে। তার পাশেই দেখি তিব্বত থেকে আগত একটা পাহাড়ীদের দল অনেকটা যায়গা জুড়ে বিশ্রাম ক'রছে। তাদের সঙ্গে আছে গলায় ঘুণ্টী দেওয়া একপাল মালবাহী অশ্বতর, আর গোটাকয়েক হিংস্রদর্শন তিব্বতী কুকুর। সেগুলো দলটিকে পাহারা দিচ্ছে। খানিকটা দূর যাওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে নানাপ্রকার

ফসল দেখতে পাওয়া গেল। ক্রমশঃই জঙ্গল কমে আসছে ও ফসল বেড়ে চলেছে। সিকিম পাহাড়ের যে এত উর্ব্বরতা আছে, তা' কোনদিনই কল্পনা করি নি। স্থানে স্থানে পাহাড়গুলোর গোড়া থেকে মাথা অবধি স্তরে স্তরে ধান পেকে আছে। এ ছাড়া, কমলালেবু, যব, এম, ভুট্টা ও অন্যান্য পাহাড়ী ফসলও বেশ ফলেছে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় সাঙ্কোখোলা ডাকবাংলোতে পৌঁছান গেল,—পেটে তখন বাড়বাগ্নি জ্বল্‌ছে। হাতমুখ ধুয়ে এখানে বেলা দুপুরে প্রাতরাশ শেষ করা গেল।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক উপরে উঠবার পর আমরা বেশী চোখে পড়ে। রাস্তার দুপাশেই কমলালেবুর বাগান। পাকা টুকটুকে কমলালেবুতে গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছিল মোটর থামিয়ে কিছু কমলালেবু চুরি করি, কারণ কমলালেবুর মালিকদের দেখা কোথায়ও পাই নি। কিন্তু পাশে উপবিষ্ট "বর্দ্ধমান-সিংহের" ভয়ে সেটা আর সাহসে কুলোল না। ছেলেবেলার নষ্টচন্দ্রের উৎসব বহুকাল পরে স্মৃতির দুয়ারে ঘা দিল।···খানিকটা উপরে উঠে' দূর শৈলশিখরে সিকিমের রাজধানী গ্যাণ্টক দেখা গেল।

আমরা বেলা প্রায় আড়াইটার সময় গ্যাণ্টকে পৌঁছলাম। পর্ব্বত-মেখলা সহরটি যেন আপন গৌরবে

তিস্তা

সিংটমে পৌঁছলাম। নিকটেই একটা সেতু দেখা গেল। এটা কিছুদিন আগে স্রোতের প্রবল টানে ভেঙ্গে গিয়েছিল, সম্প্রতি নূতন ক'রে তৈরী করা হয়েছে। এর কাছেই সিংটম নদী এসে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে। সঙ্গমের মাঝখানে ও আশে-পাশে বিরাট উপলখণ্ডগুলি এবং স্রোতে ধ্বংসে পড়া গাছগুলি প্রকৃতির অতীতের প্রলয় নৃত্যের সাক্ষী দিচ্ছে। এখান থেকে আমাদের রাস্তাটি তিস্তা ছেড়ে সিংটম নদীর পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। খানিকটা দূরে রাণীখোলা নদী এসে সিংটমের সঙ্গে মিলেছে। এ প্রদেশে কমলালেবুর প্রাচুর্য্যটাই সব চাইতে নিচের উপত্যকা-ভূমির উপর রাজত্ব করছে। আমরা সোজা বৌদ্ধ মঠের দিকে অগ্রসর হ'লাম। সেখানে ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি মঠের সব অংশ আমাদের দেখালেন ও ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। মঠটির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্প্রতি শেষ হয়েছে। তিব্বত থেকে চিত্রকর এনে দেয়ালগুলি নানা রংয়ের ছবিতে চিত্রিত করা হয়েছে। মঠটির স্থাপত্যেরও একটা বিশেষত্ব আছে—ইহা সম্পূর্ণ তিব্বতীয় আদর্শে নির্ম্মিত। মঠের খোদাইকরা কারু-কার্য্যগুলিও এই বিশিষ্ট ধরণের।

মঠের ঠিক নিচেই মহারাজার বাগান-ঘেরা প্রাসাদ।

সামনে পাহাড়ের পর পাহাড়, গহন জঙ্গলে ঢাকা; আর তার পিছনে সুদূর দিকচক্রবালে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের হিমশৃঙ্গ যোগমগ্ন ধূর্জ্জটীর মত নিশ্চল, নিস্পন্দ। মনটা যেন বাস্তব জগতের গণ্ডী ছাড়িয়ে কোন্ কল্পনা-রাজ্যের সন্ধানে ছু'ট গেল।...প্রাসাদের সিংহ-দ্বারেই মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে দরবার-হলে নিয়ে গেলেন এবং মহারাজাকে খবর পাঠালেন। অনতিবিলম্বে মহারাজা এসে অতিথিবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে গল্প জুড়ে দিলেন। রাজাসাহেব তাঁর পিতৃবন্ধু সুতরাং খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই গল্প চল্‌ল। মহারাজার সৌজন্যে ও আন্তরিকতায় সকলেই বিশেষ খুসী হ'লাম। তিনি কথা-বার্ত্তা ইংরেজীতেই বল্‌লেন, দেখে মনে হ'ল তিনি বেশ সুশিক্ষিত। দরবার-হলের দুটো জিনিস খুব আশ্চর্য্য রকমের মনে হ'ল; একটী, ঘরজোড়া তুষারশুভ্র, সুকোমল কার্পেট,—মাঝখানে দুটো বিরাট ড্রাগনের মূর্ত্তি। মহারাজা বল্‌লেন, এখানা স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিকিম দরবারকে উপহার দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি, এক-জোড়া বিচিত্র ত্রিপাদ টেবিল। টেবিলের পাগুলি নর-কঙ্কালের প্রতিকৃতি। শুনলাম এগুলো পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হ'ত! বেলা স'তিনটের সময় মহারাজার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সহর দেখতে বের হ'লাম। বর্ত্তমান যুগের পার্ব্বত্য সহরে মোটামুটি যা যা থাকে, এখানেও তার কোন অভাব নেই। এমন কি এই সুদূর পাহাড়ের মাথায়ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে।

এইবার আমাদের ফেরবার পালা। পথে একটী দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু বলবার মত ঘটে নি। প্রায় মাইল ত্রিশ নেমে আসবার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। মোটরগুলো তো যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটা মোড়ে তারাপদ বাবুদের গাড়ীখানা একটা গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল—হেড-লাইটের আলো মোড়ের মাথায় সব যায়গায় ঠিকভাবে পড়ছিল না। মোটরের রেডিয়েটারখানা একেবারে ভেঙ্গে গেল। এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে আমরা সকলে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। গাড়ীখানা যে রাস্তা থেকে পাহাড়ের নিচে প'ড়ে যায় নি, সেজন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। ঠিক হ'ল যে আমরা তিস্তা ব্রীজে গিয়ে আর একখানা গাড়ী পাঠাব, তাতে বন্ধুরা পরে যাবেন। অগত্যা তাঁরা সেই হিংস্রজন্তুসমাকুল বনপ্রদেশে সূচীভেদ্য অন্ধকারে প'ড়ে রইলেন। মাইলটেক আসার পর রাস্তার পাশে একটী দোকানে টিম্ টিম্ ক'রে আলো জ্বল্‌ছে দেখা গেল। তার আশে-পাশে সেই ক্ষীণালোকে দু'চারখানা চালা-ঘরও চোখে পড়ল। শ্রীযুক্তা মল্লিক মহাশয়া মাতৃত্বের অনু-

তিস্তা ব্রীজ

প্রেরণায় বল্লেন যে, তারাপদবাবু ও ডাঃ রায়কে যে প্রকারেই হোক এই লোকালয়ে রেখে যেতে হবে—বাঘ ভালুকের মুখে কিছুতেই রাখা হবে না। যাহোক, অনেক কষ্টে ভাঙ্গা গাড়ীখানাকে চালিয়ে এনে আমরা কোনক্রমে তিস্তা ব্রীজে পৌছলাম। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে একখানা মোটর মিল্‌ল না। অগত্যা ওঁদের থানায় রেখে আমরা কালিমপং চললাম এই ভেবে যে, কালিমপং থেকে শীঘ্রই একখানা মোটর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কালিমপং-এর পথে মল্লিক মহাশয়ের মোটরের সামনে একটা বাঘ পড়ল, আমাদের মোটরখানা তার ঠিক পিছনেই ছিল। তখন মনে হ'ল ভাগ্যে সেই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে তারাপদ বাবুদের রেখে আসি নি। শ্রীযুক্তা মল্লিক মহাশয়ার বিজ্ঞ পরামর্শের জন্য তাঁর উপর অসীম শ্রদ্ধা হ'ল। রাত্রি নটার সময় আমরা কালিমপংএ পৌছলাম। তখনি একখানা ট্যাক্সি তিস্তা ব্রীজে পাঠান হল। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় তারাপদবাবুরা এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

রায় সাহেব আমাদের জন্য কালিমপং-এ তাঁর খুড়তুতো ভাই মতিচাঁদ বাবুর বাংলো ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। সেখানেই আমরা ডেরা পাতলাম। মতিচাঁদবাবু ও তাঁর কনিষ্ঠেরা যে প্রকার আতিথেয়তা দেখালেন, তেমনটি আমাদের কপালে কমই জুটেছে। এরূপ আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা সংসারে কমই মেলে। সামান্য ক্ষণের পরিচয়েই আমাদের একেবারে আপনার ক'রে নিলেন—প্রবাসে এসেছি, এ কথা একেবারে ভুলিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বাহাদুর রামচন্দ্র মিস্ত্রী, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু কালুরাম, ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঘোষ রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সকালটা বেশ গল্প গুজবেই কাটল। মতিচাঁদ বাবুদের নিকট বিদায় নিয়ে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় আমরা সহর দেখতে বেরুলাম। প্রথমেই মহাপ্রাণ গ্রেহাম সাহেবের "Kalimpong Homes" দেখতে গেলাম। নিরাশ্রয় পতিত শিশুদের জন্য স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রেহাম সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি। সেখান থেকে Electric Rope-way দেখতে যাওয়া গেল। এই Rope-wayটী তিস্তা শাখার রিয়াং ষ্টেষণ হ'তে কালিমপং পর্য্যন্ত তারযোগে মাল চলাচলের নূতন উদ্ভাবন। ফেরবার পথে রায় বাহাদুর রামচন্দ্র মিস্ত্রী মারোয়ারের প্রথানুযায়ী "পান সুপারী" দ্বারা রাজা সাহেবকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর আন্তরিকতায় সকলেই বিশেষ প্রীত হ'লাম।

বাজার—গ্যাণ্টক

কালিমপং সহরটি ধীরে ধীরে বেশ গ'ড়ে উঠছে। এখানকার উচ্চতা দারজিলিং এর চেয়ে প্রায় দু'হাজার ফিট

কম। সেজন্ম এ স্থানটা বাঙ্গালীদের কাছে দারজিলিং-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত লোভনীয়, কারণ শীতের প্রখরতা বাঙ্গালীর ধাতে বরদাস্ত হয় না। এখান থেকে কাঞ্চন-জঙ্ঘা বেশ সুন্দর দেখা যায় ও সুদূরে দারজিলিং সহরের কতকটা অংশ চোখে পড়ে। পাহাড়ের নিচের উপত্যকা-ভূমির উপর দিয়ে তিস্তার আঁকা বাঁকা স্রোতরেখা এ স্থানের আর একটী চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। মোটের উপর এ স্থানটি বেশ সুন্দর।

বেলা তিনটার সময় কালিমপং ছেড়ে চল্‌লাম। তিস্তা ব্রীজ হ'য়ে তাকদা পৌঁছতে প্রায় চারটে বেজে গেল। তারাপদবাবুর বাংলোতে চা জলযোগ শেষ ক'রে যখন আবার রওনা হওয়া গেল, তখন ঘন কুয়াসায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে এল। মোটরের হেডলাইটেও রাস্তার মোড়ের সব জায়গা দেখা যায় না। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে দুর্ঘটনা এড়িয়ে পথ চ'লতে হ'ল। ঘুম পাহাড় হয়ে রাত্রি প্রায় ৭টার সময় নিরাপদে দারজিলিং-এ ফিরে এলাম।

আমাদের এই অভিযান যদিও দু'দিনের মধ্যে শেষ হয়েছিল, তাহ'লেও আমাদের কোন অসুবিধাই ভোগ করতে হয় নি—তার কারণ, রাজা সাহেবের সঙ্গ। তাঁর মহৎ গুণের জন্য তিনি এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশেও সুপরিচিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তাঁর আভিজাত্য-গৌরব সত্ত্বেও তিনি এই সুদূর পার্ব্বত্যবাসীকে বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে বেঁধেছেন।

তাঁরই সাহচর্য্যে আমাদের এ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

নিরাশ্রয়ে

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

বাংলার ব্যাঘ্র ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখে রসা রোড দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাড়া-গাড়ীর গাড়োয়ান হাঁকিল, "এ-এ-এ, লালাজী, চলিয়ে সামনে সে, রাস্তা ছোড়িয়ে। আর কোতো দূর যাবো?"

গাড়ীর সমস্ত ঝিলমিলি উঠান, ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "আউর যেরা চলো, বাৎলায় দেতা হুঁ।"

জিহ্বা ও তালু সংযোগে অব্যক্ত শব্দ করিয়া গাড়োয়ান বলিল, "জগ্‌গুবাজার বোল্লে, তাই শেয়ালদা থেকে দেড়-টাকা লেব বল্লুম। এখন চল্লে কালিঘাট। কেয়া দিগ্‌দারী! সিকিন্ কিলাস গাড়ী আছে—এই-এই, ধামা, আন্ধা হ্যায়, কেয়া?"

"কাঁহা কালীঘাট হায় হো? উও তো হিঁয়াসে বহুত দূর। জানে হোগা গিরীশ মুখার্জ্জী রোড, আভি পৌঁছ্ যায়গা।"

পথচারী একজন শুনিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "ঐ তো গিরীশ মুখার্জ্জী রোড দেখা যাচ্ছে, বাঁয়ে রাস্তাকা মোড় হায়।"

গাড়ী গিরীশ মুখার্জ্জি রোডে ঘুরিল। দুই চারিটী বাড়ী ছাড়াইয়া গিয়াই ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "বাঁয়ে সবুর।"

বাড়ীটী দ্বিতল, পুরাতন হইলেও সদ্য রং-করা দরজা-জানালা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সদরে বৃহৎ পাগড়ীধারী দরোয়ান বসিয়া ছিল, গাড়ী আসিতে দেখিয়া উঠিয়া আসিল। বাহিরে প্রস্তর-ফলকে ইংরাজী ও বাংলায় লেখা—

শ্রীঅহিভূষণ মিত্র, বি-এল,
উকিল, জজকোর্ট, আলিপুর।

গাড়ী হইতে দীর্ঘকায়, অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত যুবক নিখি-লেশ দত্ত বিষণ্ণ বদনে অবতরণ করিল। ভিতরে তাহার পত্নী চারি পাঁচ বৎসরের পুত্র সমেত বসিয়া। গাড়ীর ছাতে একটী ট্রাঙ্ক, একটী হাত-বাক্স ও একটী বিছানা।

পুত্র বলিল, "বাবা, আমিও যাব।" বালকের মাতা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন না, তোমার যে জ্বর বাবা, স্থির হয়ে বোস। উনি আসুন, তার পর নামবে।"

নিখিলেশ দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু ঘরমে হ্যায়?" দরোয়ান পার্শ্বের সজ্জিত ঘর দেখাইয়া বলিল, "বাইরে।"

বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। মক্কেল আর কেহ উপস্থিত নাই। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত, সিগারেট-মুখে উকিল অহিবাবু 'ফরোয়ার্ড' হাতে আরাম-কেদারায় বসিয়া খোলা জানালা দিয়া গাড়ী আসা হইতে আরম্ভ করিয়া যুবকের অবতরণ পর্য্যন্ত সমস্তই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখ চক্ষু বিরক্তিতে ভরা।

যুবক ঘরে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। চসমা-মণ্ডিত চক্ষু তুলিয়া অহিবাবু একবার, "কে, নিখিল? কখন এলে?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই 'ফরোয়ার্ডে'র স্থানে স্থানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিখিলেশ কুণ্ঠিত ভাবে নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিনিট খানেক পরে চক্ষু না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, "গাড়ীতে অণি রয়েছে? নেমে ভিতরে যেতে বল, আর দরোয়ানকে বল, জিনিষপত্র নামিয়ে গাড়ীর ভাড়া দিয়ে বিদেয় করে দেবে।"

"আজ্ঞে ভাড়া আমার কাছে আছে, আমি দিচ্ছি।" নিখিল বাহির হইয়া গেল।

বক্র দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া শ্লেষের সহিত অহিবাবু আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভিখিরীর আবার তেজ দেখ,—বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কোর। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। ওঃ, ভারি মাসিক কাগজে কবিতা লেখেন! বাংলা মাসিকগুলো গণ্ডমুখ্যু—বাঙ্গালীর মেয়েরা ছাড়া তো আর কোন decent educated gentleman ছোঁয় না। তারি আবার অহঙ্কার—"

পেন্‌সন্‌-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জগদীশ মিত্রের আদরের কন্যা, বাল্যে মাতৃহীনা অণিমাসুন্দরীর যখন বিবাহ হয়, তখন পাত্র, সম্পন্ন গৃহস্থের একমাত্র সন্তান নিখিলেশ প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা সুস্থ সবল দীর্ঘকায়, কুঞ্চিত কেশ, সৌম্যদর্শন যুবককে দেখিলে সকলেই পছন্দ করিত, কিন্তু তাহার সহিত আলাপ করিয়া কেহ বড় সন্তুষ্ট হইত না। সকলেই বলিত, "ব্রজেন্দ্র বাবুর ছেলে মিথিল বড় খামখেয়ালি আর মুখচোরা। লোকের সঙ্গে মিশতে জানে না।" বস্তুতঃ নিখিলেশ আপন খেয়ালে আপনি থাকিত, দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত কাহারও সহিত বড় মিশিত না। ছাত্রদের আড্ডায় বা কোনও মজ্‌লিশে যাইতে তাহাকে কেহ কখনো দেখে নাই। পড়াশুনাতেও সে খেয়ালি ছিল,—মন হইলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সীতে ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু দেড় বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাকে পাঠ্যপুস্তক হাতে লইতে দেখে নাই। সমস্ত সময়টাই আপন মনে ইংরাজী-সাহিত্য আলোচনায় কাটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক মাল-মসলা সংগ্রহ করে। সেক্সপীয়র, বায়রণ, শেলি, টেনিসন তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া উঠে; স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারে সম্বন্ধে সমালোচনামূলক তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের কাছে যশস্বী হইয়া পড়ে।

টেষ্ট পরীক্ষা আসন্ন হইলে হঠাৎ কি খেয়ালে পাঠ্য-পুস্তক লইয়া বসিল। ফলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়া প্রেসিডেন্সীতেই বি-এ পড়িতে লাগিল। কিন্তু একমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই সে সমান নির্লিপ্ত।

বিবাহের এক-বৎসর পরে বি, এ, পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। পিতা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, পুত্রের সাহিত্যালোচনায় তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি সেকালের প্যারীচরণ সরকারের ছাত্র, আধুনিক বি-এ, এম্‌-এ পাসকে বড় আমল দিতেন না। মাতার দুই একবার অনুযোগের উত্তরে স্বল্পভাষী পুত্র বলিল, "ওসব আমার ভাল লাগে না।" নিরুপায় হইয়া মাতা বলিলেন, "ভাল না লাগে, থাক। উনি যা রেখে যাচ্ছেন, বুঝে সুজে যদি চলতে পার, কোন অভাবই তোমার হবে না।"

ইহার দুই বৎসরের মধ্যে প্রথমে শ্বশুর ও পরে পিতা-মাতার কাল হওয়ায় খামখেয়ালি অনভিজ্ঞ নিখিলেশ নবীনা পত্নী ও সদ্যোজাত পুত্র সহ সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিল। অভিভাবক-স্থানীয় শ্যালক

অহিভূষণ তখন আলিপুরে পসার জমাইতেছেন। তিনি কিন্তু কোনও দিনই নিখিলেশকে দুচক্ষে দেখেন নাই, আজও তাঁহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, সম্পূর্ণ তফাতে রহিলেন। মুখচোরা নিখিলেশ যে উপযাচক হইয়া তাঁহার কাছে গেল না, এটা তিনি বেশ ভাল করিয়াই মনে রাখিলেন।

পয়সা থাকিলে মানুষের আত্মীয় স্বজনের অভাব হয় না, নিখিলেশেরও জুটিল। মাতুলালয় সম্পর্কীয় কয়েকটী কয়লার আড়তদার আসিয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন মানুষের অভাব না থাকিলেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া শুধু বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠা কবিতা লিখিয়া ভরান নিতান্তই অপকর্ম্ম। বিত্ত বাড়াইবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, এবং সে কর্ম্মে কয়লার কারবারই প্রশস্ত পথ। বৎসর পাঁচেক পরমাত্মীয়দের পরামর্শে এই পথে চলিলে পর অবশেষে নিঃসম্বল অবস্থায় নিখিলেশকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তখন তাহার দুইটী পুত্র।

অন্নাভাবে সকল কর্ম্মে অনভিজ্ঞ নিখিলেশ অবশেষে ডিব্রুগড়ের নিকটবর্ত্তী একটী চা-বাগানে সামান্য বেতনে কেরাণীগিরিতে বাহাল হইয়া সপরিবারে কলিকাতা ছাড়িল। আলিপুরের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মিত্র, বি-এল্ মহাশয় নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "ওটা অতি অপদার্থ, আমাদের সবায়ের নাম ডুবাতে বসেছে।"

বিপদ বুঝি কখনো একলা আসে না। তাই বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে কালাজ্বরে নিখিলেশের প্রথম পুত্র বিজয় এক প্রকার অচিকিৎসাতেই প্রাণত্যাগ করিল। অহিবাবু ভগ্নীর পত্রে তাহার বাড়াবাড়ির কথা শুনিয়া সপ্তাহেক পরে পঁচিশটী টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিজয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কাজে লাগিল। দ্বিতীয় পুত্র অজয়ের বয়স তখন চারি বৎসর। খেলার একমাত্র সঙ্গী দাদার অকালমৃত্যু তাহার শিশু মনে বড়ই আঘাত করিল। সেই জন্যই হোক, বা দাদার অসুখের সময় তাহার অযত্ন হওয়ার জন্যই হোক, সেও জ্বরে পড়িল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, এই সকল বিপদের দিকে দৃকপাতও না করিয়া কয়েক দিনের অনুপস্থিতি হেতু ম্যানেজার সাহেব নিখিলেশকে কটূক্তি করিয়া বসিল। রাগ ও অপমানের জ্বালা মনেই চাপিয়া সে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মে ইস্তফা দিল। অনি তাহার বৌদিদিকে সমস্ত খুলিয়া লেখায় তিনি তাহাদের চলিয়া আসিতে, ও যে কয়দিন না নিখিলেশের পুনরায় কাজ-কর্ম্ম হয়, ততদিন ভবানীপুরে তাঁহাদের ওখানে থাকিতে, বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন।

ইহা বলাই বাহুল্য বোধ হয়, যে, অহিবাবুর সহিত তাঁহার পত্নীর এই ব্যবস্থা লইয়া বিলক্ষণ বচসা হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর পক্ষপাতিত্বে নিখিলেশের উপর তাঁহার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল।

"বাথ্‌রুমের ভিতর ফট্‌ফট্ করে কাপড় কাচে কে রে? ঠাকুরঝি বুঝি?"

অণিমা দরজা খুলিয়া উত্তর দিল, "বৌদি' ডাকছ?"

"আচ্ছা, ভাই, এই ভরসন্ধ্যে বেলা একরাশ কাপড় নিয়ে না বসলেই হচ্ছিল না? ঝিকে বল্লেই তো পারতে। তোমার নিজের সর্দ্দি-কাসি, ছেলের এত জ্বর; গ্যাখ তো, বেচারা এসে চুপ করে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে—"

"আমি তো বৌদি' ওকে ছেলেদের সঙ্গে দাদার কাছে বসতে বলে এসেছিলুম। ও যে কখন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে তা ত জানতেও পারি নি। আর এই ক'খানা কাপড় আর ঝিকে কি কাচতে বলব, তার তো এখন অন্য কাজকর্ম্ম রয়েছে।"

"কেন ভাই, তুমি এমন পরের মত ব্যবহার কর? আমার নিজের দরকার হলে আমি কি ঝিকে বলি না? অজয়, তুমি দাদাদের সঙ্গে মামার কাছে বসলে না কেন? ঠাণ্ডা পড়ছে, জ্বর গায়ে কি এই জলের উপর এসে দাঁড়াতে আছে?

অজয় বলিল, "আমি ওখানে বসেছিলুম, মামাবাবু বল্লেন, 'সমস্ত দিন পরে এসে এখানে আমি জল খাচ্ছি, তোমার বসে হাঁ করে দেখবার তো কিছু নেই, তুমি যাও এখান থেকে'।" তাহার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল।

অণিমা বিবর্ণ মুখে একবার ভ্রাতৃবধূর মুখের দিকে চাহিল;—তাঁহার মুখ হেঁট,—সন্ধ্যার অন্ধকার না হইলে দেখা যাইত সমস্ত দেহের রক্ত বুঝি তাঁহার মুখেই জমা হইয়াছে। "রুগ্ন ছেলে, পাছে খেতে চায়, তাই ও-রকম বলেছেন। আয় বাবা অজু, আমরা যাই, তোকে

বিস্‌কুট দেব, খেলা করিগে চল।" তাড়াতাড়ি অজয়কে কোলে করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। অণিমা কম্পিত হস্তে কোনমতে কাপড়গুলি কাচিয়া ছাদে শুখাইতে দিতে গেল।

রাত্রে নিখিলেশের নিকট সমস্ত বলিয়া অণিমা বলিল, "আর তো এখানে থাকা চলে না। বৌদি' একা আর কত সামলাবেন? দাদার ইচ্ছে নয় আমরা থাকি। সাধ করে কি আমি কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম? সেদিন নবা চাকরকে খোকার জন্তে এক পয়সার বিস্কুট আনতে দিলুম,—বড় বায়না করছিল; বৌদির কাছ থেকে রোজ রোজ চাইতে লজ্জা করে। দাদা ঘর থেকে শুনতে পেয়ে তাকে ডেকে একখানা চিঠি দিয়ে চেৎলা পাঠালেন। চেঁচিয়ে আমায় শুনিয়ে নবাকে বল্লেন, 'এখন ওসব বাজে কাজে যেতে হবে না, পয়সা ফেরৎ দিগে, চিঠির জবাব আমায় এখুনি চাই।' নবা আমায় পয়সা ফেরৎ দিয়ে চলে গেল। রুগ্ন ছেলে, বায়না নিয়েছে, তাও তো দেখলেন, ইচ্ছে করলে বৌদিকে তো বলতে পারতেন, কিম্বা নবাও তো ফেরবার পথে আনতে পারত, পয়সা ফেরতের হুকুম দেবার তো কিছু ছিল না। জানতেন তো তুমি বাড়ী নেই,—আমি কিছু আর নিজেই যাব না আনতে।"

অণিমা কাঁদিতে লাগিল। অল্পবয়সে মাতৃহীনা বলিয়া পিতার বড় আদরের ছিল। বিবাহের পরও শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে সাজান পুতুলটী করিয়া রাখিত। আজ অবস্থা বিপর্য্যয়ে এই তাচ্ছিল্য তাহাকে বড়ই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। নিখিলেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

"আর দেখ, এসে পর্য্যন্ত সেই যা প্রথম দিন আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেমন আছিস্';—বাস্, আর কোন দিনই আমার সঙ্গে একটা কথা বলেন নি। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটান। এতবড় শোক বুকে করে এসেছি, ঘরের লক্ষ্মী বৌদি যদি না থাকতেন, বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম। কিন্তু এ রকম করে ক'দিন চলবে? অন্ত কোথাও যাবার ব্যবস্থা কর।"

নিখিলেশ বলিল, "কাল গ্রেহামের আফিষে সেই কাজটার জন্তে যাবার কথা আছে, কাল আর হবে না, পরশু রামনগরে একবার যাব। দেশে আমার অংশ তো যায় নি, জ্ঞাতিরা বোধ হয় ফেলতে পারবে না। দেখি সেখানে কি বন্দোবস্ত করতে পারি। এখানে আসবার তো ইচ্ছে ছিল না; কি করি, একটাকে তো সেই জঙ্গলে বিনি চিকিৎসায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম, এটারও জ্বর। সেই পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার মধ্যে কি করে নিয়ে যাই। তুমি ভেব না, কোন রকমে এ দুটো দিন কাদায় গুণ দিয়ে পড়ে থাক, তার পর অন্ত ব্যবস্থা না হয় রামনগরেই যাব, যা হয় হবে।"

নিখিলেশ দেশে গিয়াছে, সমস্ত দিন অণিমা তাহার আগমনের অপেক্ষায় অস্থির। সেখানে যদি কোনও বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই। উৎকণ্ঠার সীমা নাই, তাহার উপর অজয়ের জ্বর কিছুতেই ছাড়িতেছে না। নিখিলেশের বাল্যবন্ধু ডাক্তার হেমবাবুর হাতে কেস রহিয়াছে, তিনি সেই দিন প্রাতে ঔষধ বদলাইয়া দিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার পর নিখিলেশ ফিরিল। অণিমা প্রথমটা তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; কি খবর কে জানে! নিখিল জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "কোন ভাবনা নেই, অনু, বিপিনকাকা তোমাদের ভার নিতে রাজি হয়েছেন। আমি কালই গিয়ে তোমাদের রেখে আসব, পরশু থেকে তো গ্রেহামের আফিসে আমায় কাজে লাগতে হবে। বিপিনকাকাই বৌবাজারে একটা মেসের ঠিকানা বলে দিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলে সুরেন সেখানে থাকে। আমি সেইখান থেকেই আফিস করব। আসছে মাসের মাইনে পাবার পর প্রত্যেক শনিবার শনিবার দেশে যাব। রামনগরে একটা ভাল ডাক্তারখানা আছে, আর যে সাব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে দেখে এলুম, অনেক বয়েস হয়েছে, কাকা বল্লেন ভাল ডাক্তার। অজুর চিকিৎসা ভালই হবে। ওর টেম্‌পারেচর আজ কি রকম?"

অণিমা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দুপুর থেকে আবার ১০২ উঠেছে। কি যে হবে জানি না। যাই হোক, একটা নিশ্চিন্ত হলুম,—এ ভয়ে ভয়ে এখানে থাকতে প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছে। এখন তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, রাত পৌনে দশটা বাজে, তোমায় ভাত দিতে বলি।"

"দাঁড়াও, একটু ঠাণ্ডা হই, প্রায় তিন মাইল পথ হেঁটে

ট্রেণ ধরেছি। ওখানে ম্যালেরিয়া ছাড়া এইটেই যা অসুবিধে, ষ্টেসন কাছে হলে তো ডেলি প্যাসেঞ্জারই হতে পারতুম—"

"বাবা, তুমি কোথা গিয়েছিলে? আমার জন্যে লজনচুস্ বিস্কুট্ আনলে না? মা, আলো নিবিয়ে শুতে এসো না, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

"এই যে অজু, যাচ্ছি, তোমার বাবাকে খেতে দি, তার পর যাচ্ছি।"

"নিখিল—"

উভয়ে চাহিয়া দেখিল, দরজার বাহিরে অহিবাবু দাঁড়াইয়া। অণিমা মাথায় কাপড় টানিয়া এক পাশে সরিয়া গেল।

"অজার জর তো ছাড়ে না, একটা ব্যবস্থা কর—"

"কি আর করব বলুন, হেম তো আজ আবার মিকশ্চার বদলে দিয়েছে।"

"—আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী যাচ্ছেন, আর আমার ঝিও বলছে কাল পরশু দেশে যাবে। অণির এখানে একলা থাকার সুবিধে হবে না। যে ক'দিন না তোমার ছেলে সারে, আমি বলি কি দাদাবাবুর বাড়ী কি অন্য কোথাও গিয়ে থাক—"

"সেই ব্যবস্থা করতেই তো আজ দেশে গেছলুম—"

"—আর বলি তোমাকে যে এটা হোটেলখানা নয় যে যখন খুসি যাবে, যখন খুসি আসবে। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী; আমি তোমার মতন হাবাতে ভ্যাগাবণ্ড নই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নি, কিন্তু তোমার একটু ভদ্রতা শিখতে হয়। তুমি কারুর সঙ্গে কথা বল না, সদাই মনমরা হয়ে ঘাড় হেঁট করে যাও-আস,—ও কি?"

চটিজুতা ফটাফট্ করিতে করিতে অহিবাবু চলিয়া গেলেন, নিখিলেশ প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। অণিমা মাটিতে বসিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল দেখিয়া অজয় বলিল, "ঐ ছাখ বাবা, মা আবার দাদার জন্যে কাঁদছে। আমরা তো সবাই একদিন আকাশে গিয়ে দাদাকে দেখতে পাব, তবে কেন কাঁদে? শুতে এসো না মা, আমি যে আর জেগে থাকতে পারছি না।"

"চুপ কর অজু, চোখের জল ফেল না, তোমার দাদার অকল্যাণ হবে। তিনি যাই করুন, আমাদের হতে তাঁর না অভিশাপ লাগে, সেটা দেখতে হবে। সব গুছিয়ে চল এখনি হাসিমুখে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কালীঘাটে যাত্রী-নিবাস আছে, রাত্রিটা সেইখানেই কাটিয়ে কাল রামনগরে চলে যাব। দেখ তো, তোমার কাছে কত আছে?"

অণু বাক্স খুলিয়া দেখাইল ১১৸৶০।

"ঐতেই আপাততঃ ঢের হবে। দেশে গিয়ে বিপিন কাকার কাছে হাওলাত মিলবে। এখন সব গুছিয়ে নাও।"

উভয়ে জিনিসপত্র গুছাইতেছে, ঝি আসিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইল। অণিমা একবার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি গা?"

"কি আর বলব পিসিমা, সবই শুনতে পেয়েছি। পিসে মশাইয়ের ভাত বেড়ে ঠাকুর ডাকতে আসবে, আর এই কাণ্ড। মা শুনেই গিয়ে ঠাকুর-ঘরে খিল দিয়ে পড়েছেন। একে লক্ষ্মীবার আজ, তার উপরে রাত-উপসী রেখে মুখের গেরাস কেড়ে নিয়ে এত রাতে বিদেয় করা। অমঙ্গলের ভয়ে আমার গা কাঁপছে, মা। গাঁয়ে আমাদের এ রকম হলে একঘরে করত। কলকেতার ভদ্দরলোকদের কথাই আলাদা।"

"অমঙ্গলের ভয় পেও না ঝি,—রাত-উপসী কেন? দুজনেই আমরা একটু একটু খোকার মিছরি থেকে খেয়ে জল খেয়েছি। আর আজ বেস্পতিবার বটে, তবে বারবেলা তো কেটে গেছে, এত রাতে যেতে দোষ নেই। তোমার মাকে আমাদের প্রণাম দিয়ে বোলো তিনি যেন ভয় না করেন, আমরা রাত-উপসী যাই নি।"

"—সরো পিসিমা, বিছানাটা আমি বেঁধে দিচ্ছি, তুমি পারবে না।"

ভোর পাঁচটা বাজে। কালীঘাট যাত্রী-নিবাসের একতলায় স্যাঁতসেঁতে একটা ঘরের কোণে মেঝের বিছানায় অজয় শুইয়া ছটফট করিতেছে, মাথার উপর ইলেকটিক্ আলো, তাহাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া আড়াল করা। অণিমা থার্ম্মমিটর লইয়া দেখিল, ১০৪এর উপর। আকুল হইয়া বাহিরের দিকে নিখিলেশের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল।

বাহিরে পদশব্দ হইল, নিখিলেশ আসিয়া বলিল, "হেমকে টেলিফোনে সব বল্লুম, সে শুনে রাগ করতে লাগল, তার কাছে সোজা কাল যাইনি বলে। এখনি ট্যাক্সি করে আমাদের যেতে বলেছে। তুমি সব গুছিয়ে নাও, আমি ট্যাক্সি ডাকি। অজুর জর বেড়েছে বলে ভয় পেও না, অত রাতে নাড়ানাড়িতে সুস্থ ছেলেই রোগে পড়ে তো এ রুগ্ন ছেলে। যে কদিন না একটু ভাল হয়, হেমের বাড়ীতেই থাকতে হবে, সে বলে দিয়েছে তার আগে ছাড়বে না। সে নিজে ডাক্তার, সুবিধাই হল, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।
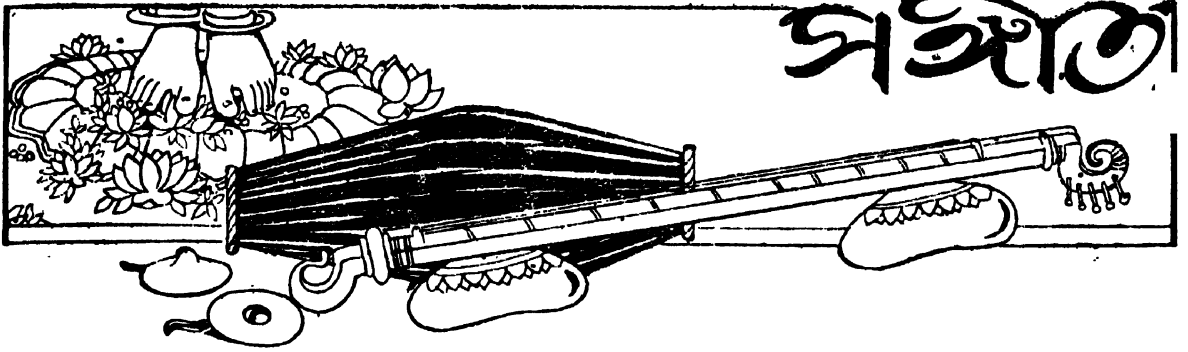
কথা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ,　　　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

চিরজীবনের বন্ধু হে তুমি
　　চিরজনমের প্রিয়তম !
তোমারি চরণে দিনু গো উজাড়ি
　　সব কিছু যাহা আছে মম !
এ জীবনে প্রিয় তোমারে বরিয়া'
হৃদয় আমার গিয়াছে ভরিয়া,
মলিন যা কিছু সকলি ঝরিয়া'
　　গিয়াছে গো নিরুপম
　　ওগো সুন্দর প্রিয়তম !

তুমি প্রিয়তম কি যে রূপ ধরে'—
উজিলে আমার হৃদয়ের পরে'—
অধরে যে সুধা পড়িল গো ঝরে'—
　　চির অমৃতের সম।
অন্তর আজি পুলকিত হ'ল
　　ওগো অন্তরতম !
　　ওগো সুন্দর প্রিয়তম !!

{ সা পা পা | ণদা পা পা | ম জ্ঞমপা মা | জ্ঞা রা সা I
চি র জী　ব নে র্　বন্ - - - ধু　হে তু মি

প্সা সা সা | সরজ্ঞা ণ্া ণা | সা জ্ঞমপা মপা | মপা -া -া } I
চি র জ　ন - - মে র　প্রি য় - - ত -　ম - - -

{ পা মপধণা ণা | ণা ণা ণা | ধণা ধর্সা ণা | পধা পা মা I
তো মা - - - রি　চ র ণে　দি - নু - গো　উ জা ড়ি

পা পর্সা ণা | ধা পা পা | মপমা জ্ঞা মপা | মপা -া -া } II
স - ব কি　ছু যা হা_　আ - - ছে ম -　- - -

{ মা পা পা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সরা র্সর্রর্সণা I
এ জী ব নে প্রি য় তো মা রে ব রি- য়া---

ধা ণা ণা | ধা সণা ণা | ধা ধর্সা ণর্সণা | ধা পা পা } I
হৃ দ য়্ আ মা র গি য়া- ছে-- ভ রি য়া

পা মপধণা ণা | ণা ণা ণা | ধা ধর্সা ণর্সণা | ধা পা পা I
ম লি--- ন যা কি ছু স ক- লি-- ঝ রি য়া

মা মপা মপমা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সরা সা সা | রা ণা ণা I
গি য়া- ছে-- গো নি রু প- - ম - ও গো

সা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা মা | জ্ঞমা পদা মপা | পা পা সা II
সুন্ - দ র প্রি য় ত- -- ম - -

{ সা সজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা রমা জ্ঞা | রা সা সা I
তু মি- প্রি য় ত ম্ কি- যে- রূ প ধ রে

সা গা গা | গা গা গমা | রা গা রগা | পা মা মা } I
উ জি লে আ মা -র্ হৃ দ য়ে র্ প রে

মা মপধণা ণা | ণা ণা ণা | ধা ধর্সা ণর্সণা | ধা পা পা I
অ ধ--- রে যে সু ধা প ড়ি- ল-- গো ঝ রে

মা জ্ঞমপা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সরা সা -া | -া -া -া I
চি র-- অ মৃ তে র স ম - - - -

{ সা র্রা র্রা | র্রা র্রা রা | র্সা র্রা র্সর্রর্মর্জ্ঞা | র্রা র্সা র্সা I
অন্ - ত র আ জি পু ল কি--- ত হ ল

র্সা ণর্সর্রা র্সা | ণা ধা পা | মপমা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা রা সণ্ I
ও হে-- অন্ - ত র ত-- ম - - ও গো-

সা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা মা | জ্ঞমা পদা মপা | পা -া সা } II
সুন্ - দ র প্রি য় ত- -- ম - - -

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে হিন্দী ভাষায় পরম প্রিয় কবি রহিমের কথা বলা হয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থায় রহিমের জীবন-কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যাঁরা তাঁর জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করবেন, তাঁরাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য অনেক কিছু করলেন—এ কথা অস্বীকার করার যো নেই। বিশেষতঃ রহিমের সহিত মহারাণা প্রতাপ ও গোস্বামী তুলসীদাসজীর সাহচর্য্য ও যোগাযোগ সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত হওয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই কাম্য।

পক্ষপাতশূন্যতা, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান, মন্ত্রণাকুশলতা, প্রভৃতি গুণসম্পন্ন মহামনীষীর পারিবারিক জীবনও মধুময় ও প্রীতিপূর্ণ ছিল।

একবার রহিমের বেগম ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ মহারাণা প্রতাপের সেনাদলের কবলে পড়েছিলেন। রাণা তাঁদের পরম সমাদর করে মহা সমারোহে রহিমের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। বাড়ী ফিরে বহুমানাস্পদা মহিলারা রাণার সাদর ব্যবহারের কথা শতমুখে ব্যক্ত করেছিলেন।...... এই বিষয় নিয়ে হিন্দীতে অতি সুন্দর কবিতাবলী রচিত হয়েছে। তাহা যেমন প্রাণস্পর্শী ও সুললিত, তেমনি সর্ব্বজনসমাদৃত।

কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে ও ঘটনায় মানব-মনের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার রহিমের এক চাকর ছুটি নিয়ে বাড়ী যায়। নববিবাহিত সে,—কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে শীঘ্রই ফিরে এলো।

ছোট্ট বউটি তার স্বামীর মনিবের নিকটে দু-ছত্রের কবিতায় এক আরজী পেশ করে স্বামীর বিদায় বাড়িয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করল। মহানুভব রহিম অশিক্ষিতা পল্লীবধূর লিখিত কবিতাটি পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি চাকরটিকে পূর্ণ বেতনে এক বৎসরের বিদায় ও তার জীবনসঙ্গিনীর জন্য বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

কবি-সমাদর, কাব্যচর্চ্চায় উৎসাহ, সাহিত্যের উন্নতি রহিমের দৈনন্দিন অগণ্য কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে থাকতো।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হোলো এই যে, এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে হিন্দী ভাষায় বহু কবিতা ও গান রচিত হয়েছে।

আর এক রকমের গান ও কবিতা হিন্দীতে আছে, যা বাংলা ভাষায় বড়-একটা পাওয়া যায় না। যথা,—সৈন্যদলের জয়গীতি, যুদ্ধের গান ও কবিতা ও সৈনিক-বধূর গান।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' মাসিকে হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে পুরানো হিন্দী সাহিত্যের কথাই উল্লিখিত হয়ে আসছে। বর্ত্তমান হিন্দী সাহিত্যের ভাব-ধারার কথার এখনও উল্লেখ করিনি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসীতে' প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল হিন্দীর লড়াইয়ের গান "আল্হা" সম্বন্ধে কৃতিত্বের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন।

সৈনিক-বধূর দু-একটি গানের নমুনা দেওয়া যাক্।

......রাজা যুদ্ধযাত্রা করেছেন। ভীষণ লড়াই বেধেছে। হঠাৎ মেঘ করে এসেছে......আকাশের দুকুল ছাপিয়ে।......

রাণী বলছেন—

> "কালী বদরিয়া বহিনী লাগো,
> বদরা লাগো ভাই হমার;
> রিমঝিম্ বরসো মেরে মহলন পর.
> কন্তা আজ রৈন্ রহি যায়।"

এর অর্থ হোলো এই যে "কালো মেঘ, তুমি আমার ভাই ও বোন, আমার কান্ত (স্বামী) আজই যুদ্ধে যাবেন। তোমরা এমন জোরে ঝম্‌ঝম্ করে বর্ষণ আরম্ভ কর যে তিনি আজ রাত্রে প্রাসাদ থেকে বাহিরে না যেতে পারেন।"

.....সৈনিক-বধূ. তার বীর স্বামী যুদ্ধে যাচ্ছে দেখে, মহানন্দে বলছে—

> "গজব কিয়ে যায় মন
> মেরা সিপাহিয়া,
> মেরে সিপাহিয়াকে কালী কালী জুল্‌ফঁয়,
> সুরমা গজব কিয়ে যায় মন
> মেরা সিপাহিয়া।"
> ইত্যাদি—

এর মর্ম্মার্থ হোলো এই যে "আমার মন মুগ্ধ করে সৈনিক চলেছে। সৈনিকের কালো কালো চুল ও সুরমা দেওয়া চোখে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে ইত্যাদি।

রাণা প্রতাপের জীবনকথা নিয়ে অনেক যুদ্ধের গান হিন্দীতে রচিত হয়েছে; এমন কি, তাঁর পরম প্রিয় অশ্ব চৈতক কে নিয়ে হাজারো কবিতা

রচিত হয়েছে। এমন কি, মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী চৈতক্যের নামে কবিতা রচনা করে তাকে ধন্য করেছেন!

গিরিধর কবি-রায় সর্ব্বজন-সমাদৃত কবি ছিলেন। তিনি যে ললিত ছন্দে কবিতা রচনা করতেন তার নাম হোলো "কুঁড়লিয়া"।

তাঁর জীবনকথা বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। তিনি যে রাজার রাজত্বে বাস করতেন তাঁর সঙ্গে গিরিধরের বাদানুবাদ হয়। রাজা কবির প্রিয় কয়েকটি ফুলের গাছ চেয়েছিলেন—পালঙ্ক তৈয়ার করবার জন্য। কবি সে কথায় অসম্মত হন; ফলে রাজা জোর করে তা কেড়ে নেন।

এই দুঃখ-দুর্দ্দশা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি সস্ত্রীক ঐ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। কবির স্ত্রী, যিনি সাধারণ্যে "সাঁই" নামে পরিচিত, একজন প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন।

সংসার-ত্যাগ, দারিদ্র্য, রাজ-নিগ্রহ কিছুই কবি ও তাঁর জীবনসঙ্গিনীর কাব্য-চর্চ্চায় বাধা জন্মাতে পারে নি। উভয়ের অমূল্য অবদানে হিন্দী সাহিত্যের মণি-কোঠা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

দু-একটি "কুঁড়লিয়া'! নমুনা দেওয়া যাক্।

"দৌলত পায় ন কিজিয়ে, সপনে মে অভিমান,
চঞ্চল দিন জল চারিকে, ঠাঁউন রহত নিদান,
ঠাঁউ ন রহত নিদান, জিয়ত জগমে যশ লিজে,
মিঠে বচন শুনায়, বিনয় সবহী কি কিজে,
কহে গিরিধর কবিরায়, অরে য়হ সব ঘট তৌলত
পাহুন নিশিদিন চারি, রহত সবহী কে দৌলত।"

সোজা কথায় এর মানে হোলো এই যে "কবি বলছেন, দুনিয়ায় তুমি দু-দিনের জন্য এসেছ। তোমার যদি ধন দৌলত থাকেও, তবুও অভিমান কোরো না। সকলের প্রতি বিনয়নম্র ব্যবহার কোরো। চিরদিন কিছু থাকে না। ধন, মান, জন সবই চঞ্চল, এ কথা মনে করে নিজের কর্ত্তব্য করে যাও।"

গিরিধরের কবিতা পল্লীবালার মুখে বড় শ্রুতিমধুর ও চিত্তাকর্ষক। গাঁয়ের ছেলেরা পর্য্যন্ত আবৃত্তি করে থাকে।

বড় উপদেশপূর্ণ এই খাঁটি কবিতাবলী। জেনে রাখলে অনেকের জীবনে Mottoর কাজ করতে পারে।

হিন্দীর আর এক ধুরন্ধর কবি ছিলেন গঙ্গ, যাঁর কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং রহিম যাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন!

একবার গঙ্গ-কবি আওরঙ্গজেব বাদশার দরবারে নিমন্ত্রিত হন। বলা বাহুল্য তিনি বহু রাজা-রাজড়া ও শাহজাহান্ বাদশা কর্ত্তৃক বহুবার পুরস্কৃত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

কবির কবিতা শুনে সমস্ত সভা মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন কি, আওরঙ্গ-জেবের মত 'কট্টর' লোকও কবিতার ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না।

কবির "বিদাই" (পুরস্কার) দেওয়া হোলো ঘোড়া, হাতী, মোহর ও শাল। একখানি পাল্কীও দেওয়া হোলো। কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেব ভালো হাতী না দিয়ে কবিকে একটি বুড়ো হস্তিনী দান করলেন। কবি তা দেখে একটি কবিতা রচনা করে তৎক্ষণাৎ সভায় আবৃত্তি করে শোনালেন। আওরঙ্গজেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কবিতাটি এই—

"তিমির লঙ্গ লই মোল, চলি বব্বর কে হলকে,
রহি হুমায়ুন পাশ, গই অকবরকে দলকে,
জহাঙ্গীর যশ লিয়ো, পীঠি কো ভার ছোড়ায়ো,
শাহজহান করি ন্যায়, তাহি কো মাড় চটায়ে,
বল রহিত ভই, পৌরুষ থকো, ভগী ফিরত বন স্যার ডর,
আওরঙ্গজেব করিনী সোই, লৈ দিলি কবি "গঙ্গ" ঘর।"

এর মানে হোলো এই যে "তৈমুরলঙ্গ প্রথম এই হস্তিনীকে ক্রয় করেন, তৎপরে উহা বাবর বাদশার হাতীশালে ছিল। পরে হুমায়ুন ও আকবর বাদশার সেনা দলে ছিল। জহাঙ্গীর বাদশা এর পীঠে চড়ে অনেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। শাজাহান বাদশা হস্তিনীকে বেশ যত্ন করে রেখে ছিলেন এবং পুরনো বলে কোনো বিশেষ কাযে লাগান নি। এখন হস্তিনীটি বুড়ো হয়ে পড়েছে, যুদ্ধে যেতে চায় না, শ্যাল কুকুরের ভয়ে পর্য্যন্ত ভীত হয়। আওরঙ্গজেব বাদশা সেই হস্তিনীটি গঙ্গ কবির ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।"

বড় মজার কবিতা। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত লজ্জিত হ'ন্ এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ অকর্ম্মণ্য হস্তিনীটিকে ফেরৎ নিয়ে কবিকে একটি উৎকৃষ্ট হস্তী পুরস্কার স্বরূপে দিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সভাকবি ছিলেন কবিবর বৃন্দ। আওরঙ্গজেব বাদশার পৌত্র শাহজাদা আজিমমুশ্সান ব্রজভাষা ও উর্দু ভাষার একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন। বহু কবির আশ্রয়দাতাও ছিলেন তিনি। কবিদের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন।

শাহজাদা যখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি আওরঙ্গজেব বাদশার নিকটে প্রার্থনা করে বৃদ্ধ কবিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঢাকা সহরে নিজের সাথে রেখে দেন। বৃদ্ধ কবি শাহজাদার পরম প্রিয় সখা ছিলেন। ইনি নীতিপূর্ণ কবিতা রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আকবর বাদশার 'নৌরত্নের' জনৈক প্রধান সদস্য খান্খানা আব্দুল রহিমের কাব্যচর্চ্চা ও কবি-সমাদর সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মহারাজা বীরবল ও রাজা টোডরমল কবিতা রচনা করে ও কবি-সমাদর করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

টোডরমল আকবর বাদশার রাজস্ব-সচিব ছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে মুসলমান রাজত্বের সময় জরীপ ও সেটেলমেন্টের কায তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

জ্ঞানী গুণীর সমাদর তিনি অকাতরে করতেন ও কবিদের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করতে তিনি কখনও হটে যেতেন না। তাঁর রচিত কবিতা উঁচুদরের।

রহিমের ন্যায় মহা প্রতিভাশালী কবি, বীর, দাতা ও কর্ম্মী মহারাজা বীরবলের কবিদের প্রতি সমাদরের কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত।

কেশবদাস কবির কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ছয় লাখ টাকা "বিদাই" দিয়েছিলেন!

বীরবলের কবিতা বড় মধুর ও সরসতাপূর্ণ। তিনি প্রত্যেক কবিতার শেষ কলিতে নিজের উপনাম 'ব্রহ্ম' নামে নিজেকে অভিহিত করতেন্।

বীরবল ও রহিম আকবর বাদ্‌শার পরম প্রিয় সখাও ছিলেন। বীরবলকে সঙ্গে না নিয়ে আকবর কোথাও যেতেন না। বাদ্‌শা আকবরের জীবন-কথা আলোচনা করলেই প্রথমেই চোখে পড়ে বীরবল ও রহিমের অসীম প্রভাব। উভয়ের উপরেই বাদ্‌শার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল।

মহারাজা বীরবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এই দুঃসংবাদে আকবর অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে তাঁর মর্ম্মন্তুদ্ দুঃখ যে একটি দু-লাইনের কবিতাতে ঢেলে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। 'ভারতবর্ষে'র পাঠকপাঠিকাদের সেটি উপহার দিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি।

কবিতাটি এই ——

"দীন দেখি সব দীন,
এক ন দিন্থো দুসহ দুঃখ ;
সো অব হমকো দিন,
কছুক্ ন রাখো বীরবর।"

বীরবল জীবনে কোনো লোককে কখনও কোনো কষ্ট দেন নি। দরিদ্রতম লোককে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে তাকে পর্য্যন্ত তিনি আনন্দিত করেছেন। সেই বীরবল আজ আমার প্রাণে এমন দুঃখ দিয়ে গেলেন যে জীবনে তা আমি আর ভুলতে পারবো না।

এ শুধু কবিতা নয়,—আদর্শ সম্রাট সাহান্‌শা আকবরের প্রিয়তম সখার উদ্দেশে গভীর অশ্রু-উপহার!

—

অঙ্কমালার উৎপত্তি

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ভারতই অঙ্কমালার ও পাটীগণিতের জন্মস্থান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—ভারত মহাদেশের কোন্ স্থান উক্ত গৌরবের ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত দাবী করিতে পারে? অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে কোন্ প্রদেশে অঙ্কমালার জন্ম হইয়াছে? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে, আর একটী মৌলিক সত্যের সাহায্য লইতে হইবে। সেইটী হইতেছে এই যে—বঙ্গীয় অক্ষরমালাও নিত্য-দৃশ্যমান জীবজন্তু বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির সাঙ্কেতিক অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অঙ্কমালার উৎপত্তি বঙ্গীয় অক্ষর মালা হইতে এবং তাহার সত্যতা নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণ হইতেই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণীকৃত হইবে।

নিম্নলিখিত উদাহরণ কয়টী মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, বঙ্গীয় অঙ্কমালার সৃজন তত্তৎ অঙ্ক-জ্ঞাপক বাক্যের আদি বা প্রধান অক্ষর হইতেই হইয়াছে। যথা :—

এক	এ	১
দুই	দ	২
তিন	ত	৩
চারি	চ	৪
পাঁচ	প	৫
ছয়	ছ	৬
সাত	স	৭
আট	ট	৮
নয়	ন	৯
দশ	শ	১০

এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক-জ্ঞাপক বাক্য ও তাহাদের আদ্য অক্ষর বা প্রধান অক্ষর ও অঙ্কগুলি যাহা পার্শ্বে পার্শ্বে রাখা হইয়াছে, উহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে অঙ্কগুলি নিঃসন্দেহে তত্তৎ বাক্যের আদি বা প্রধান্ অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একএর 'এ' হইতে যে ১, দুইএর দ হইতে যে ২, ত হইতে ৩, চ হইতে যে ৪ এর উৎপত্তি, তাহা একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলেই জানিতে পারা যায়। পাঁচ ও দশ সম্বন্ধে একটু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। 'প' ও 'শ' এর দণ্ড বা datum বাদ দিলেই ৫ ও ১০ পাওয়া যায়—পাঁচ ও দশ হইতেই এই দুইটী অঙ্কের জন্ম তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ছয় এর 'ছ' এর লাঙ্গুল বাদ দিলেই ৬ পাওয়া যায় এবং সাতের স এর অর্দ্ধ গোলাকৃতি অংশ পূর্ণ গোলাকৃতিতে পরিণত করিলেই ৭ পাওয়া যায়—সন্দেহ নাই। আটের 'ট'এর ঊর্দ্ধাংশ বাদ দিলেই ৮ পাওয়া যায় এবং নয়ের 'ন'এর মাত্রা বাদ দিলেই ৯ অঙ্ক পাওয়া যায়, দেখিলেই জানা যায়। দশের 'শ' হইতেই ১০ অঙ্ক ও অঙ্ক-বিজ্ঞানের সার বা প্রাণ—শূন্য বা Zeroর উৎপত্তি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় পাঠশালার বালকেরা উচ্চ কণ্ঠে "জোড়াপুটুলি শ লেখ" বলিয়া তালপাতায় শ লিখিয়াছে, কিন্তু কেহ কি স্বপ্নেও মনে করিয়াছে, এই জোড়া পুটুলির এক পুটুলি দশ অঙ্কের ১ জ্ঞাপক ও অপর পুটুলি '০' শূন্য জ্ঞাপক হইয়া, আধার বা datum বিহীন দশ ১০ অঙ্কের সৃজন করিবে? অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, দৈব কৃপায়ই বহু মহাসত্যের অস্তিত্ব ও উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। মৃত ভেকের দেহস্পন্দন ও তাহার তাঁবার তার ও দস্তার ঝিল্‌মিলের সহিত বায়ু আন্দোলনে ক্ষণিক স্পর্শহেতু কম্পনই Chemical Electricityর সৃজন মানবের আয়ত্তাধীন করে। সেইরূপে বঙ্গীয় 'শ'এর অপরূপ জোড়াপুটুলি আকৃতি হইতেই, অঙ্কের প্রাণ বা সার শূন্য বা zeroর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় সন্দেহ নাই। কে বলিতে পারে, 'শ'এর এইরূপ জোড়াপুটুলি আকারের সাহায্য বিনা কখনই শূন্যমাতৃক অঙ্কমালার উৎপত্তি হইত কি না? সুসভ্য রোমকেরা এই শূন্য বা zeroর অভাবেই, তাহাদের অঙ্ক-বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারে নাই এবং মাত্র চিহ্নমাতৃক শূন্য-বিরহিত পাঠ দ্বারাই পঞ্চাশ, শত, সহস্র

ইত্যাদির জ্ঞাপন দ্বারা, বিজ্ঞানাসম্মত গোলক-ধাঁধার ঘূরপাক খাইয়াছে—অঙ্ক-বিজ্ঞান বা পাটীগণিতের কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারে নাই। পরে ভাগ্যক্রমে, বঙ্গমাতার দান 'শ' হইতে উৎপন্ন শূন্য ও দশের (১০) এর সাহায্যে যথার্থ অঙ্ক-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, আরব-ব্যবসায়ীগণের সাহায্যে উহা য়ুরোপ-খণ্ডে বিস্তার লাভ করে—ইহাই ঐতিহাসিক সত্য।

এক্ষণে অনেকে বলিবেন সংস্কৃতের শ অক্ষর ত "জোড়াপুটুলি" আকৃতি বিশিষ্ট নহে, তাহা হইলে সংস্কৃতে কি পাটীগণিত অবিদিত ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর কিছু জটিল—কিন্তু কঠিন নহে। সংস্কৃত বাক্যের অর্থই হইতেছে, কোন প্রাচীনতর অসংস্কৃত ভাষার সংশোধন। এই হিসাবে বঙ্গভাষারই প্রাচীনতরতার নির্দেশ পাই। পরন্তু এই সমাধান নূতন নহে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণের অভিমতও তাহাই। অধিকাংশ শিলা-লিপির লিখন-প্রণালী ও অক্ষরগুলির আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, উহাদের সাদৃশ্য দেবনাগর অপেক্ষা বঙ্গ অক্ষর-মালার সহিতই অধিক। ইহা মানিয়া লইলে, আমরা দুই সত্যের পরিচয় পাই—এক, বঙ্গভাষার ও লিখনের সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীনত্বের, ও দ্বিতীয়তঃ, ভারতের ভাষা সমূহ মধ্যে বঙ্গভাষারই, অঙ্ক-মালার মাতৃত্বের দাবীর অবিসম্বাদী গৌরব। বস্তুতঃ, বঙ্গ-বর্ণমালা হইতেই যে অঙ্কমালার উৎপত্তি সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

'শ' হইতেই যে অঙ্কমালার প্রাণ শূন্যের উৎপত্তি ও তৎ-সংযুক্ত দশের (১০) জন্ম, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—কারণ 'শ'এর দণ্ড বা datum বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা ঠিক দশ '১০' অর্থাৎ একের পৃষ্ঠে শূন্য দশ। অর্থাৎ, 'শ'এর দ্বারা যে মাত্র '০'এর উৎপত্তি তাহা নহে, উহার আকৃতি হইতে দশ অঙ্কের একের স্থিতি—'অঙ্কস্য বামাগতি' এই তথ্যজ্ঞাপক শূন্যের বাম দিকে, দক্ষিণ দিকে নহে। বলা বাহুল্য—এগারো, বারো, তেরো প্রভৃতি পরিভাষা উক্ত অঙ্কগুলির প্রণয়ন-ধারা-জ্ঞাপক অর্থাৎ শূন্যের স্থানে ১ দিয়া এক আরও বা এগারো, ২ দিয়া বারো, ৩ দিয়া তেরো প্রভৃতি সংজ্ঞার উৎপত্তি। দশের অনুকরণে, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ বাক্যেও শ, শূন্যের সাহায্যে উহাদের উৎপত্তি, জ্ঞাপন করিতেছে। এই সঙ্গে ইহাও বলা চলে যে বিশ অঙ্কের, শূন্য আবিষ্কারের পূর্ব্বের নাম ছিল কুড়ি (য়ুরোপিয়ান ভাষায় Score) এবং শূন্য জন্মিবার পরেই উহার নামকরণ হইয়াছিল বিশ সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ের অনুশীলনকালে আমরা আর একটী চিত্তাকর্ষক ব্যবহারিক সত্যের (Practical truthএর) আভাষ পাই। মোটামুটী ইহা বলা চলে—যে দেশে যে সত্যের উৎপত্তি—সেই দেশেই সেই বস্তুর ব্যবহারিক-ভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণত৽দেখা যায়। যেমন Italy দেশে Galvaniর জন্ম, এবং তড়িৎ (Electricityর) ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়েও উক্ত দেশীয় Marconiর নামই সর্ব্বপ্রধান, সন্দেহ নাই। সেইরূপে বঙ্গদেশে অঙ্কমালার উৎপত্তি বলিয়া, ব্যবহারিক অঙ্কেও শুভঙ্করের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়, সন্দেহ নাই। অঙ্ক বিজ্ঞানে বঙ্গবাসীর পটুতা অসাধারণ এবং বিশেষতঃ Mental Arithmeticএ, শুভঙ্করের দয়ায় বঙ্গবাসিগণের অসাধারণ ক্ষিপ্রতা সর্ব্বজন-বিদিত।

অতএব অতঃপর নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতের মধ্যে, পুণ্যভূমি বঙ্গদেশই অঙ্কমালার জন্মস্থান এবং বঙ্গবাসিগণের উহা কি প্রকার নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

—

চিকিৎসা-শাস্ত্রে-মনোবিজ্ঞানের স্থান বা মানসিক চিকিৎসা

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ

দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গীভূত মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই একটু সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। অনেকেই ভাবেন, মনের অলীক কল্পনা-জল্পনা যে বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়, কর্ম্মময় বাস্তব জীবনের সহিত তাহার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? কিন্তু অধুনা শিক্ষা ও চিকিৎসা-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিরূপ ফলোপধায়ক হইতেছে, তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চিকিৎসা-জগতে মনোবিজ্ঞান বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর এক যুগ-পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। আমাদের শরীর ও মন অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। যেমন সুস্থতায় তেমন রোগে এতদুভয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে প্রত্যেক রোগের শারীরিক ও মানসিক এই উভয় দিক আছে। তথাপি কতকগুলি রোগ প্রধানতঃ শারীরিক, যেমন জ্বর, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি; এবং অন্য কতকগুলি রোগ মুখ্যতঃ মানসিক, যথা উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া (hysteria) অত্যাসক্তি (mania), স্বপ্নবিহার (somnambulism), স্মৃতিভ্রংশ (amnesia), ব্যক্তিত্ব বিপর্য্যয় (alteration of personality), শব্দব্যাধি (aphasia) ইত্যাদি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর রোগগুলির কারণ প্রধানতঃ দৈহিক। জীবাণু বিশেষ শরীরে প্রবেশ করিয়া বসন্ত বা কলেরা উৎপাদন করে। যকৃতের বিকার ঘটিয়া কামলারোগ জন্মে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত শ্রেণীর রোগগুলি সাধারণতঃ মানসিক কারণেই ঘটিয়া থাকে। দুঃসহ শোকে অভিভূত হইয়া কেহ উন্মাদ বা বায়ুরোগে আক্রান্ত হইতে পারে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও বিরল নহে। অর্থাৎ মানসিক কারণে দৈহিক রোগ এবং দৈহিক কারণে মানসিক রোগও ঘটিয়া থাকে। অকস্মাৎ অত্যধিক ভীতি-নিবন্ধন প্রবল উদরাময় জন্মিতে পারে। আবার ধুতুরা সেবন করিয়া উন্মাদ ঘটিতে পারে।

অতএব শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগে, বিশেষতঃ মানসিক রোগে মনের প্রভাব অল্প নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে চিকিৎসকগণ রোগের নিদান নির্ণয়ে এ কথার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং রোগ-মুক্তির জন্যও তাঁহারা মনের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হয়েন নাই। অদ্যাপি অধিকাংশ উন্মাদাশ্রমে

(lunatic asylum) পুরাতন প্রণালীর স্থূল চিকিৎসাই প্রচলিত আছে। এই সকল আশ্রমে হাতকড়া, বেত্রাঘাত, নির্জ্জন কক্ষে অবরোধ এবং পটাশিয়াম্ ব্রোমাইড্ প্রভৃতি নিদ্রাকর্ষক দুই একটী ভেষজই এখনও চিকিৎসকদের প্রধান অবলম্বন। এই প্রকার বাহ্য-চিকিৎসায় রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হইলেও রোগের মূলোৎপাটনে যে অনেক স্থলেই ইহা ব্যর্থ হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। নিদারুণ পুত্রশোকে ক্ষিপ্ত কোনও ব্যক্তির পক্ষে পটাশিয়াম্ ব্রোমাইড্, মধ্যম-নারায়ণ বা লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা সহৃদয় তত্ত্বদর্শী সুহৃজ্জনের সহানুভূতিপূর্ণ সান্ত্বনাবাক্যই অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে; ইহা আশা করাই যুক্তিযুক্ত। মানসিক রোগের নিদান প্রধানতঃ মানসিক, উহার চিকিৎসাও মুখ্যতঃ মানসিক হওয়াই সঙ্গত।

মানসিক চিকিৎসা একেবারে নূতন জিনিষ নয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার অল্প-বিস্তর প্রচলন আছে। আমাদের দেশে ঝাড়াফুঁকা, তন্ত্রমন্ত্র, সাধু-সন্ন্যাসীদের দৃষ্টি, স্পর্শ, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি নানা আকারে এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে খৃষ্টীয় বিজ্ঞান (christian science), যাদুবিদ্যা (witchcraft) ইত্যাদি নামে এই মানসিক চিকিৎসা বহু কাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সকল চিকিৎসা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়াই সর্ব্বত্র গণ্য হইয়াছে। যাহা অলৌকিক, তাহা বিস্ময় উৎপাদন করে, বুদ্ধিকে পরাহত করে; কিন্তু মানব-সমাজের সার্ব্বজনীন জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করে না। অধুনা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের পর যে প্রণালী-বদ্ধ মানসিক চিকিৎসা পাশ্চাত্য-জগতে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাকে বাস্তবিক বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে; তাহা সত্যই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নূতন অধ্যায়। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

মনশ্চিকিৎসা (Psychotherapy বা mind-cure) শুধু মনের চিকিৎসা নহে, ইহা মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে রুগ্ন দেহ ও মন উভয়েরই চিকিৎসা। এই চিকিৎসাসাধ্য রোগসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) সাধারণ মানসিক রোগ, যথা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা (hysteria), মৃগী (epilepsy), অস্বাভাবিক ভয়, অস্থিরতা, বাতিক (obsession), আত্মপ্রত্যয়ের একান্ত অভাব; (২) নৈতিক রোগ, যথা অস্বাভাবিক চৌর্য্য-প্রবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, উগ্র স্বভাব, কামবিকার বা যৌন-প্রবৃত্তি-সম্পর্কে রুচিবিকার; (৩) মনোবিকার হইতে উৎপন্ন কতিপয় দৈহিক রোগ, যথা হিষ্টিরিয়া-জনিত পক্ষাঘাত, স্নায়বিক অজীর্ণতা, নিখুঁত চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা (functional blindness)। (১) মানসিক চিকিৎসার আয়ত্তাধীন এই ত্রিবিধ রোগকেই মনোজ স্নায়ু-বিকার (psycho-neuroses) বা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া-বৈগুণ্য (functional nervous disorders) বলা যায়। স্নায়বিক রোগ দুই প্রকার:—

এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের, আঘাত বা অপচয় হইতে উদ্ভূত। অন্য প্রকার অক্ষত স্নায়ুমণ্ডলীর বিপথ-চালিত ক্রিয়া-জনিত। ইহাতে মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র সমূহের অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহাই আছে; শুধু তাহাদের ক্রিয়া বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং মনো-বিকারই এই বিপর্য্যয়ের কারণ। হিষ্টিরিয়া রোগীর পক্ষাঘাত, অন্ধতা, জ্বর, হৃদ্‌কম্প ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রেই মানসিক চিকিৎসা আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে।

মানসিক চিকিৎসা তিন শাখায় বিভক্ত:—(১) কৃত্রিম স্বপ্নাবেশ ও অভিভাবন (hypnotism and suggestion), (২) আত্মাভিভাবন (auto-suggestion), (৩) মনোবিশ্লেষণ (psycho-analysis)। এই তিন শাখাকে মানসিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশে তিনটী স্তর বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। নিম্নে এই ত্রিবিধ প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) কৃত্রিম স্বপ্নাবেশ ও অভিভাবন—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ফরাসী-দেশের নান্‌সি নগরে ও তাহার উপকণ্ঠে কতিপয় মনশ্চিকিৎসক সম্মিলিত ভাবে এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই চিকিৎসক সম্প্রদায় নান্‌সি স্কুল (Nancy School) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। লিবোণ্ট্ (Liebeault) ও বার্ণহাইম্ (Bernheim) ইঁহাদের অগ্রণী। এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রোগীতে কৃত্রিম স্বপ্নাবেশ আনয়ন করিয়া তাহাকে আরোগ্যের সহায়ক ভাবসমূহ দ্বারা অভিভূত করা হয়। যেমন, উত্থান-শক্তি-রহিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোনও রোগীকে কৃত্রিম-স্বপ্নাবিষ্ট করিয়া চিকিৎসক বলিলেন, 'আপনি ত বেশ দৌড়াইতে পারেন। একবার উঠিয়া দৌড়ান দেখি।' অমনি সে উঠিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব মনে করিবার কোনও হেতু নাই। দৈহিক রোগ-উৎপাদনে, সুতরাং রোগ-নিরাকরণে, মনের প্রভাব সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান্ তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য ১৯১৭ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ল্যান্সেট্ (Lancet) পত্রিকায় প্রকাশিত লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার জে, এ, হাড্‌ফিল্ড, এম্-এ, এম্-বি কর্ত্তৃক পরিচালিত কয়েকটী পরীক্ষার ফল এ স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। (১) কোনও রোগীকে কৃত্রিম স্বপ্নাবিষ্ট (hypnotised) করিবার পর জনৈক দর্শক তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া, 'তাহাকে লাল তপ্ত লৌহ দ্বারা স্পর্শ করা হইল' এই বলিয়া অনুপ্রেরিত করিল। দেখিতে দেখিতে রোগী সন্তপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করিতে লাগিল এবং সত্য সত্যই তাহার হাত ফুলিয়া উঠিল ও তাহাতে ফোস্কা পড়িয়া গেল। এই পরীক্ষা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়াও একই প্রকার ফল প্রদান করিয়াছে। আবার অন্য স্থানে স্বপ্নাবেশ ভিন্নও জাগ্রত অবস্থায়ই অভিভাবন ক্রিয়া (Suggestion) দ্বারা কোনও রোগীর বাহুর তাপ ৯২° ডিগ্রী (ফা) হইতে ৭৮° ডিগ্রীতে (ফা) নীত

(১) cf. The Mind, edited by R. J. S. Mcdowall, Longmans, 1927, p 119.

(২) Ibid. p. 125.

হইয়াছিল এবং বিপরীত অভিভাবন দ্বারা পুনরায় পূর্ব্ব তাপ আনয়ন করা হইয়াছিল। সুতরাং মন সাক্ষাৎ ভাবে দেহের অবস্থান্তর জন্মাইয়া রোগ বা আরোগ্য সংঘটন করিতে পারে। শুধু তাহাই নয়। মনের অসহযোগিতায় দেহের রোগ পূর্ণতা বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। উক্ত ডাক্তার সত্য সত্যই লাল তপ্ত লৌহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া রোগীর দেহে ফোস্কা উৎপাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু 'কোনও ব্যথা হইবে না' এই অনুপ্রেরণা (Suggestion) করার ফলে রোগী কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ করে নাই। এবং এই সত্য ফোস্কা পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম ফোস্কা হইতে অনেক সহজেই সারিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ মনোজাত রোগ দেহজ রোগ হইতেও দুরারোগ্য।

অভিভাবন ব্যতিরেকে শুধু কৃত্রিম স্বপ্নাবেশ দ্বারাও বহু রোগের উপশম হইতে পারে। ষ্টকহলমের ডাক্তার উয়েটারষ্ট্রাণ্ড (Wetterstrand) এই উপায়ে দুরারোগ্য মৃগীরোগ পর্য্যন্ত সারাইয়া দিতেন। ইনি কখনও কখনও রোগীকে এক মাস পর্য্যন্ত স্বপ্নাবিষ্ট রাখিতেন। এই যশস্বী ডাক্তার মাত্র ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ও স্থলবর্ত্তী মনশ্চিকিৎসক পোল্ ব্যেরে স্বপ্রণীত গ্রন্থে আরোগ্য-সাধনে কৃত্রিম স্বপ্নের (hypnotismএর) উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৩) তিনি বলেন যে কৃত্রিম স্বপ্নে মানুষ ক্ষণকালের জন্য মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে। বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বাণতুল্য সুখকর অনির্ব্বচনীয় অবস্থা আনয়ন করে। এক ঘণ্টার হিপ্‌নটিজমে দেহ-মনের যে বিশ্রাম হয় সারারাত্রির নিদ্রায়ও তাহা হয় না। ফলে দেহমন নবীনতা ও সজীবতা লাভ করে, রোগ প্রশমিত হয়।

(২) আত্মাভিভাবন—কিন্তু উল্লিখিত মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। অধুনা বহু মনশ্চিকিৎসক নানা কারণে কৃত্রিম স্বপ্নাবেশ ও পরাভিভাবন-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিভাবনের (auto-suggestionএর) পক্ষপাতী হইয়াছেন। পূর্ব্ব প্রণালী বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে রোগীর ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে এবং সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফলও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ একের স্বাধীন ইচ্ছা অন্যের নিকট বলিদান করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং কুএ, বডুইন (Coue´, Baudouin) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ রোগীকে নিজেই নিজকে সুস্থতা-সম্পাদক চিন্তাধারা দ্বারা অভিভূত করিবার উপদেশ দিতেন। উক্ত ফরাসী ডাক্তার এমিল্ কুএ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সম্প্রদায় 'নান্‌সি স্কুলে'র পুরাতন পন্থা পরিত্যাগ করেন, এবং আত্মাভিভাবন প্রণালীতে বহু রোগীকে রোগমুক্ত করেন। তাঁহার যশোরাশি অচিরেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ। রোগী প্রত্যহ দশবার বা বিশবার (কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়) এই কথাটী আবৃত্তি করিবে,—আমি দিনের পর দিন উত্তরোত্তর সর্ব্বথা নিরাময় হইতেছি।' ('Everyday and in every way, I am becoming better and better.)। এই কৃতী চিকিৎসক মাত্র ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন।* (৭) যাঁহারা আমাদের দেশী ওঝাদের ঝাড়া-ফুঁকা একটু অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ওঝা দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রোগীতে বলিতে হয়, 'রোগ আর নাই, রোগ আর নাই।' ইহা আত্মাভিভাবন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(৩) মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis)—উপরিউক্ত পরাভিভাবন ও আত্মাভিভাবন এই উভয়বিধ চিকিৎসা-প্রণালীই অল্পবিস্তর রহস্য-সমাচ্ছন্ন; এবং চিকিৎসকের ব্যক্তিগত প্রভাবই এই গুলিতে রোগ-মোচনের মূল কারণ। বিশেষতঃ এগুলিতে মানসিক বিকারের মূল উৎপাটন না করিয়া তাহার বাহ্য উপসর্গ-নিরোধের চেষ্টা মাত্র হইয়া থাকে। তাহাতে রোগ আপাততঃ দূর হইয়াও অনেক স্থলে পুনরাক্রমণ করে। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সিগমুণ্ড ফ্রয়ড (Sigmund Freud) প্রমুখ নাৎসি-সম্প্রদায়ের কতিপয় মনশ্চিকিৎসক মানসিক রোগের চিকিৎসায় এক অভিনব বিশ্লেষণ-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। ভিয়েনার ডাক্তার জেসেফ ব্রয়ের (Dr. Joesef Breuer) সর্ব্বপ্রথমে কোনও হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অকল্পিত ভাবে বিশ্লেষণ-প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ করেন! কিন্তু ব্রয়েরের আবিষ্কার কাকতালীয় সংযোগমাত্র। ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ফ্রয়ড। ফ্রয়ড ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত এই নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধীন মতবাদ বিবৃত করিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ স্বপ্নব্যাখ্যা (Interpretation of Dreams) প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিরোধী দলের অভাব হইল না। কিন্তু প্রতিপক্ষের সমালোচনার কশাঘাত ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ তাঁহাকে স্বমত ত্যাগ করাইতে পারে নাই। বরং তাঁহার শিষ্য, সমর্থক ও গুণগ্রাহীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে তিনি আজ এক নূতন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য। এখন তাঁহার মনোবিশ্লেষণ প্রণালীর প্রচার কল্পে একটী আন্তর্জাতিক মনোবিশ্লেষণ সমিতি (International Association of Psycho-analysis) গঠিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাহার শাখাসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে কলিকাতায় এইরূপ একটী শাখা সমিতি আছে। বার্লিন ও ভিয়েনা নগরে দুইটী ফ্রয়ডীয় চিকিৎসালয় এবং ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [৫]

এই অভিনব চিকিৎসা বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হয়। ফ্রয়ডের মতে ইচ্ছাবৃত্তিই সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি। চিন্তা ইচ্ছা দ্বারাই চালিত এবং ইচ্ছা পূরণেরই উপায় মাত্র; আর সংবেদন অর্থাৎ সুখদুঃখানুভূতি ইচ্ছার তৃপ্তি বা ব্যর্থতার ফল ভিন্ন আর

---

* Poul Bjerre M. D. History and Practice of Psychoanalysis, translated into Ergtish by E. N. Barrow, 1920.

(৪) Encyclopaedia Britannica, Emile Coue´.

(৫) Encyclopaedia Britannica. Psycho-analysis.

কিছুই নহে। রেলগাড়ীগুলি যেমন এঞ্জিনের বলে চালিত হয়, আমাদের চিন্তাধারাও সেইরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নানা পথে ধাবিত হয়। সুতরাং সুস্থ বা অসুস্থ কল্পনারাশির স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাহার মূলীভূত ইচ্ছার সন্ধান লইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছারও মূল উপাদান কতকগুলি সহজাত অন্ধপ্রবৃত্তি বা সংস্কার (instinct)। মনোবিদ্‌গণ বলেন, যাবতীয় সহজ সংস্কার মূলতঃ দুইটী মূল সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত—(১) আত্মরক্ষা সংস্কার ও (২) বংশরক্ষা সংস্কার। যৌনলিপ্সা ও অপত্যস্নেহ বংশরক্ষা সংস্কারেরই প্রকারভেদ।

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানসিক ক্রিয়াসমূহ দুইভাবে সাধিত হয়, আমাদের জ্ঞাতসারে বা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। সাধারণ মনোধিদের উপেক্ষিত এই শেষোক্ত প্রচ্ছন্ন বা অচৈতন্য মানসিক ব্যাপারগুলিই (the unconscious) ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। মনের এই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ চৈতন্যবিহীন হইলেও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। ফ্রয়ডের এই মতবাদের পোষকতাকারী দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইংরেজ কবি কলেরিজের 'কুবলা খাঁ' ও 'প্রাচীন নাবিক' শীর্ষক কবিতাদ্বয় স্বপ্নে রচিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কৃত্রিম স্বপ্নাবিষ্ট (hypnotised) ও স্বপ্নবিচরণশীল লোকদের (Somnambulists) অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপও অচেতন মনের ক্রিয়াশীলতাই প্রতিপাদন করে।

ফ্রয়ড বলেন, মানবের যাবতীয় বাসনার মূলীভূত, তাহার অস্থিমজ্জায় জড়িত বিবিধ সহজ সংস্কারপুঞ্জই তাহার আদিম অহং (Ego)। এই প্রবল আদিম অহমের আত্মবিকাশপথে কালক্রমে একটী প্রবল অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ভূয়োদর্শনের ফলে এবং শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধি হেতু আর একটী নৈতিক অহং ক্রমে গড়িয়া উঠে, ইহাকে প্রচলিত ভাষায় বিবেক বলে। ফ্রয়ড ইহাকে সমালোচক (Censor) বা বৃহত্তর অহং (Super-ego) বলেন। ইহার কঠোর দমননীতির (repression) ফলে আমাদের বহু বাসনা, কল্পনা মনের চৈতন্যহীন তলদেশে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু সহজ সংস্কারপুষ্ট প্রবল বাসনারাশি চৈতন্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও নির্ম্মূল হয় না। বরং দমনের ফলে তাহাদের নিরুদ্ধ শক্তি প্রবলতর হইয়া কোনও সুযোগে উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রূপ ভীষণ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে।

এক্ষণে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে ফ্রয়ডের মতে আমাদের সহজাত সংস্কাররাশির মধ্যে যৌন সংস্কার বা কামপ্রবৃত্তিই (Eros) প্রবলতম। প্রধানতঃ ইহার দুর্দ্দমশক্তিই বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় বহু রূপ ধারণ করিয়া মানব-জীবনের প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করে। কাম-ব্যাপার শুধু যৌন সম্মিলনেই নিবদ্ধ নহে (sexuality is not merely genitality)। ফ্রয়ড বলেন, সদ্যোজাত শিশুর মাতৃস্তন্যপান হইতে বৃদ্ধের ধর্ম্মচর্চ্চা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই কামবৃত্তির মূর্ত্ত বিকাশ। এই বৃত্তি স্বাভাবিকপথে চালিত হইয়া চরিতার্থ হইলেই মনের স্বাস্থ্যবিধান করে এবং অতিমাত্রায় দমিত হইলে ইহা অস্বাভাবিক পথে আত্মবিকাশ করিয়া বিবিধ মনোব্যাধিরূপে মনোরাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, প্রত্যেক হিষ্টিরিয়া রোগের মূলে কোনও না কোনও কামব্যাপার নিহিত আছে। রোগী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার বাহ্য উপসর্গসমূহের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তাহার মনের অজানা কোণ হইতে ঐ মূল কারণটী টানিয়া বাহির করার নামই মনোবিশ্লেষণ (psycho-analysis)। ফ্রয়ডীয় ভাষায় আবেগ কামনা-মিশ্রিত বদ্ধমূল কল্পনা-পুঞ্জকে কম্‌প্লেক্‌স্ (complex) বলে। আমরা ইহাকে 'ভাবগ্রন্থি' বলিতে পারি। (৬) কোনও কম্‌প্লেক্‌স্ প্রচলিত নীতিবিরুদ্ধ হইলে নৈতিক লজ্জা আসিয়া তাহাকে চাপিয়া বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করে। কিন্তু যাহার শিকড় অস্থিমজ্জায় জড়িত, যাহা প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পুষ্ট সেই বাসনা-কল্পনারাশি চিরতরে চাপিয়া রাখা যায় না। তাহা ফাঁক পাইলেই মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। বিবেকের কড়া পাহারার ভয়ে তাহা মনের অজ্ঞান গহনে সাবধানে আত্মগোপন করিলেও সুযোগমতে বিবিধ অদ্ভুত মনোবিকার ও দেহবিকাররূপ বিস্ফোরক নিক্ষেপ করিয়া মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। কারণীভূত ভাবগ্রন্থটী (complex) ধরা দেয় না, দেখা যায় শুধু তার কার্য্য। হিষ্টিরিয়া রোগীর প্রলাপ, অঙ্গকম্পন, অঙ্গবৈকল্য প্রভৃতি উপসর্গগুলিকে কোনও ফ্রয়ডীয় চিকিৎসক উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে ধাবমান অদৃশ্য সেনাদলের পতাকা সঞ্চালনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিশান দেখিলেই গুপ্ত সৈন্যের গতিবিধি জানা যায়। তেমনই সুচতুর চিকিৎসক প্রলাপাদির পশ্চাতে লুক্কায়িত ক্রিয়াশীল ভাবগ্রন্থিটী অনুমান করিতে পারেন। তৎপরে তিনি উহা রোগীর স্মৃতিপথে সুকৌশলে টানিয়া আনেন। রোগী রোগ ও তাহার কারণের সম্বন্ধটী স্পষ্ট দেখিতে পাইলে রোগ আপনি দূর হইয়া যায়। ভূপ্রোথিত হইয়া যে শক্তি ভীষণ ভূকম্পনের সৃষ্টি করে, তাহাকে মুক্ত ভূপৃষ্ঠে তুলিতে পারিলে আর ভয় থাকে না, তাহা আপনি হাওয়ায় উড়িয়া যায়। দমনে যে রোগের উৎপত্তি মোচনই তাহার অমোঘ চিকিৎসা। এই চিকিৎসায় কেহ কেহ পূর্ব্ববর্ণিত কৃত্রিম স্বপ্ন এবং অভিভাবন পন্থারও কথঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া থাকেন।

মনোবিশ্লেষণ চিকিৎসাপ্রণালী বুঝাইবার জন্য দুচারটী সত্যঘটনামূলক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। হিষ্টিরিয়া রোগই বিশেষভাবে এই চিকিৎসাসাধ্য। এই রোগে প্রচ্ছন্ন মনোবিকারসমূহ কত অদ্ভুত দৈহিক উপসর্গ ঘটাইতে পারে, তাহার আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

১। সুইজারল্যাণ্ড দেশে দ্বাবিংশ বর্ষীয় একটী যুবক সতের বৎসর দারুণ হাঁফানী রোগে ভুগিতেছিল। (৭) সঙ্গে অস্থিরতা এবং হিষ্টিরিয়ার অন্য বহু লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। জুরিক নগরবাসী ফ্রয়ড্‌পন্থী ডাক্তার অস্‌কার্ ফিষ্টার্ এই রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে রোগী পঞ্চমবর্ষ বয়সে ষ্টীম্ রোলার দেখিলেই অস্বাভাবিক রকম ভয় পাইত। উক্ত চিকিৎসকের আদেশে রোগী ষ্টীম্‌রোলার সম্বন্ধে একাগ্র

(৬) ফ্রয়ড্‌পন্থী জুং (jung) ইহাকে লিবিডো (libido) বলেন।

(৭) The Psycho-analytic method by Dr. Oskar Pfister Eng. tr. by Dr. Charles Rockwell Payne, Kegan Paul 1915, p. 69.

চিত্তে ভাবিবামাত্র দাম্পত্য আলিঙ্গনের চিত্র তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। এবং সে তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিত যে ষ্টীম্‌রোলারটা তাহার ঘনশ্বাসযুক্ত পিতাকেই সূচিত করিতেছে। অতঃপর চিকিৎসকের উপদেশ-ক্রমে রোগী হাঁকানীর আক্রমণের সময় তৎকালীন চিত্তস্থ ভাব সকল নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিতে লাগিল। ফলে ইহা আবিষ্কৃত হইল যে শৈশবেই ঐ রোগীর মনে তাহার অজ্ঞাতসারে রতিক্রিয়ারত উচ্ছ্বাসযুক্ত পিতার বিভীষিকাময় চিত্র দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং সাদৃশ্যবশতঃ ফুস্‌ফুস্ শব্দকারী ষ্টীম্ রোলার ও হাঁফানী রোগী সম্পর্কীয় কল্পনার সহিত তাহা জড়িত হইয়াছিল। সে অজ্ঞাতসারে হাঁফানী কাশীর ছলে পিতারই অনুকরণ করিতেছিল। বলা বাহুল্য এই ব্যক্তি হাঁফানী রোগীর শ্বাসকষ্টও পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। উক্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা রোগী তাহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্নভাবের সহিত রোগের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যখন বুঝিতে পারিল, হাঁফানী আপনাআপনি সারিয়া গেল।

২। এই ব্যক্তিই দীর্ঘকাল অদূরদর্শিতা রোগে (Short-sightedness, myopia) ভুগিয়া উত্তরোত্তর চশমার শক্তি বৃদ্ধি করতঃ আরোগ্য-লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। (৮) মনোবিশ্লেষণ দ্বারা ইহা নির্ণীত হইল যে সে যৌবনোদ্‌গমে হস্তমৈথুনরূপ কদর্য্য অভ্যাসের জন্য পিতা কর্ত্তৃক গুরুতররূপে প্রহৃত হইয়াছিল। তিনি এই বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, 'রে শূকর, তোর চোখ এখনই বুজিয়া আসিয়াছে, তুই অচিরেই অন্ধ হইবি।' (৯) এই অভিশাপ তাহার চিত্তের অচৈতন্যদেশে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াই ক্রমশঃ অন্ধতা উৎপাদন করিতেছিল। মনো-বিশ্লেষণ ফলে ব্যাপার বুঝিবামাত্র তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল, চশমার আর প্রয়োজন রহিল না।

৩। মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে সন্তোষজনক অভিজ্ঞান প্রয়োগ করতঃ কোনও সুচতুরা বালিকা কৌশলপূর্ব্বক তাহার মাতার জিহ্বার একটা দুরারোগ্য যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি অনায়াসে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মাতা ও কন্যার ভিতর রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। মাতা বলিতেছিলেন, তাঁহার রোগ অন্য হইতে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব নয়। সত্য বটে, অনেক কাল আগে এই রোগের প্রথমাক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবম্বিধ রোগগ্রস্ত কোনও যুবক বন্ধু তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি ত জিহ্বা দ্বারা কোনও ভোজ্যদ্রব্য বা ভোজনপাত্র স্পর্শ করেন নাই। সঙ্কোচহীনা বালিকা অমনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওমা! তুমি ঐ যুবকের সহিত নিজকে অভিন্ন মনে করিয়াছিলে বুঝি! তবে তুমি তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলে!' সত্যই রোগিনীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রচ্ছন্ন কামস্পৃহা জিহ্বাস্ফীতি ব্যপদেশে চরিতার্থ হইতেছিল মাত্র। ফ্রয়ডীয় ভাষে এই রোগের মূলীভূত চিন্তাধারা এই—সমাজ-ভয়ে যাহার সহিত বাস্তব জগতে মিলিত হইতে পারিলাম না, নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজ্যে আমি তাহার সহিত একাত্মা হইয়া আমার অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিসাধন করিব। সুতরাং তাহার রোগ আমি নিজ অঙ্গে বরণ করিয়া লইব। রোগিনীর নিকট এই তথ্য উদ্‌ঘাটনের ফলে রোগ অচিরে লোপ পাইল। (১০)

৪। উনবিংশ বর্ষীয়া কোনও বালিকা খুব প্রবল কাশিতে ভুগিতে-ছিল। (১১) চিকিৎসকগণ হার মানিলেন। ডাক্তার বিয়ার মনোবিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলেন, রোগিনী দ্বাদশ বর্ষ বয়সে এক যুবকের সহিত প্রণয় করিতে গিয়া পিতামাতা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন হইতে সে প্রায়ই বলিত যে তাঁহার পিতামাতা তাহাকে ভালবাসেন না। অতঃপর একবার তরুণ ব্রঙ্কাইটিস্ রোগ তাহাকে আক্রমণ করিল। কোনও চিকিৎসক ডাকা হইল না, তাহার আশানুরূপ যত্ন হইল না। পিতামাতার প্রতি তাহার বিরক্তি আরও বদ্ধমূল হইল। এবং তাহার রোগের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য প্রমাণ করিবার জন্যই যেন মনের অচৈতন্য দেশে কাশিটা স্থায়ী করিবার জন্য প্রবল বাসনা জন্মিল। ফলে, এই দুশ্চিকিৎস্য রোগ। চিকিৎসকের যত্নে যখন কারণটা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, তখন রোগও আপনি সারিয়া গেল।

আমরা ফ্রয়ডীয় মতবাদ সম্বন্ধে দু একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নিখিল জীবজগতে কামবৃত্তির দুর্দ্ধর্ষ শক্তির প্রভাব সকল দেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রয়ড ও তৎশিষ্যগণের একদেশ দর্শিতা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। তাঁহার মতে শিশু মাত্রই পিতামাতার প্রতি কামভাবাপন্ন হয়। এই ভাবগ্রন্থিকে তিনি ইডিপাস্ কম্‌প্লেক্‌স্ বলেন। (১২) প্রচলিত শিক্ষানিয়মে শৈশবে ইহার দমনেই মানসিক রোগের বীজ উপ্ত হয়। সুতরাং শিশুদিগের ভাবী মঙ্গলের জন্য মাতা ও ভগ্নীদিগকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে; ইহাই ফ্রয়ডের মত। (১৩) এই উদ্ভট, সুনীতিবিরুদ্ধ, সমাজ-বিধ্বংসী মতের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফ্রয়ডের মতে নীতিজ্ঞানটা যেন সমাজ উদ্যানের একটা অবাঞ্ছিত আগাছামাত্র। কিন্তু কামবৃত্তি যেমন নৈসর্গিক, মানুষের নীতিজ্ঞানও তেমনই স্বভাবজাত। আর একটা কথা এই যে মনোবিশ্লেষণপ্রণালী ঘাঁটাঘাটি করিয়া সম্পূর্ণ বিস্মৃত কামব্যাপারঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন বিষয়গুলি রোগীর মনে অনাবশ্যকরূপে জাগাইয়া তুলে। কোনও কোনও রোগীকে আরোগ্যলাভ করিয়াও পরে আত্মগ্লানিবশতঃ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে দেখা গিয়াছে। আবার কোনও কোনও চিকিৎসক রোগীকে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিতে উপদেশ দিয়া পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে সহায়তা করিয়াছেন। ফ্রয়ড রোগের বীজানুসন্ধানে রোগীর অন্তরের দিকে চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সত্যের অভিমুখে বহুদূর লইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণ মতে মানুষের স্বাস্থ্য ইতর প্রাণিধর্ম্মমাত্র। হয় ত অধিকতর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যতের কোনও প্রতিভাবান্ চিকিৎসাবিদ্ বলিবেন, মানবস্বাস্থ্য মানবজীবনের সর্ব্বতোমুখী সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ; সুতরাং এই ব্যাপক পূর্ণ স্বাস্থ্যের ভিতর তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির একটা বিশেষ স্থান আছে।

(৮) Ibid. p. 175.

(৯) উক্ত কুক্রিয়াসক্ত হইলে সরলদৃষ্টি দূর হয় এবং চোখ ছোট হইয়া যায়, ইহা বিশেষজ্ঞের মত।

(১০) Ibid, p. 177.

(১১) Ibid, p. 179.

(১২) প্রাচীন গ্রীক্ কবি সোফক্লস্ রচিত ইডিপাসের আখ্যানটী সর্ব্বজনবিদিত।

(১৩) The History and Practice of Psychonalysis by Bjerre, tr. into Eng. by E. N. Barrow, 1920, p 235.

মরণ ভোল (৩)

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

তাহা নাস্তিক তাহারা, অতি বড় স্থূলবুদ্ধির লোক তাহারা, যাহারা আত্মমোহে আপনাদের চৈতন্যটুকুর গৌরবে বাদবাকি সারা বিশ্বকে তুচ্ছ ভাবে,—জড় নামে পরিচিত পদার্থকে হেয় মনে করে। এই কুৎসিত চিন্তায় তাহারা খর্ব্ব করিতে চায় তাঁহারই মহিমাকে যিনি অনাদি অনন্তরূপে বিশ্ব-বীজ। এক দিকে ইহারা পড়া-পাখীর মত আওড়ায়—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ," আবার অন্য দিকে বলে এই বিশ্বটা মায়ার ধাঁধা, এই জড় অতি অস্থায়ী অপদার্থ পদার্থ। যিনি চিরসত্য, তাঁহারই রচিত জড় নামে পরিচিত পদার্থের বিকাশে জীবের ও জীব-চৈতন্যের উদ্ভব, এ কথা স্বীকার করিতে মূঢ় লোকদের মানহানি হয়, যদিও জানে না যে মহিমায় রচিত জড়ের নিগূঢ় রহস্য কি।

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এ পর্য্যন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বল যতখানি বাড়িয়াছে তাহাতে সে দেখিয়াছে যে সারা বিশ্বের উদ্ভবের ইতিহাস ধরিতে গেলে তাহাকে পৌঁছাইতে হয় এক অনন্ত শক্তি-স্রোতের কূলে, যেখানে আছে কেবল শক্তির লীলা ও অবিচ্ছিন্ন গতির খেলা। দেখিতে পাই, সেই গতির বর্ত্তনেই বিদ্যুৎ-কুঁড়ি ফুটিতেছে, আর তাহা হইতে অণু-পরমাণু জন্মিয়া নানা ধরণের সংযোগে বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই, তাহার ধ্বংস কল্পনা করে বা তাহাকে অস্থায়ী স্বপ্নের খেলা বা মায়ার খেলা বলিতে পারে। বলিয়াছি, একদিন আমাদের এই পৃথিবী শবদাহের চিতার আগুনের চেয়ে কোটি কোটি গুণে অধিক উত্তপ্ত আগুনের গর্ভ হইতে জন্মিয়াছিল, আর অনেকখানি শীতলতা লাভের পর জন্মিয়াছিল তাহার জড়-পিণ্ড বা কাঠামখানা, ও আরও অনেক পরে জন্মিয়াছিল তাহার গর্ত্তে-গর্ত্তে বা সাগরে সাগরে জল। এ কথাও বলিয়াছি যে একদিন বিশেষ অনুকূল অবস্থায় পৃথিবীর কাঠামখানার কোনও কোনও উপাদান সাগরের জলে পুষ্ট হইয়া সেই জৈবনিকের জন্ম হইয়াছিল, যাহা গাছ-পালা হউক, প্রাণী হউক, সকলেরই জীবনের মূল। এই ক্রম-বিকাশের লীলাতেই যে জীবে-জীবে চৈতন্য জন্মিয়াছে ও আমাদের আমি-বুদ্ধির সংজ্ঞা জন্মিয়াছে, তাহা সবিস্ময়ে ও অকুণ্ঠিত ভক্তিতে মনে রাখিতে হইবে।

আমাদের চৈতন্যের প্রতিভায়, মননের ও কামনার প্রকৃতিতে ও জীবনভরা সকল কর্ম্মের গতিতে এমন কিছুই নাই যাহার উদ্ভব ও পুষ্টি হয় নাই বা হইতেছে না জড়ের সংযোগে ও জড়ের রসে। যাহা জড়ের অণুতে অণুতে ছিল, তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে মানুষের সকল কর্ম্মে ও ধর্ম্মে, অর্থাৎ যাহা বিশ্ববীজে ছিল, তাহাই আমরা পাইয়াছি। যাহাদিগকে আমরা নীচ জীব বলি, তাহাদের মধ্যে যে চেতনা ও নানা প্রবৃত্তির লীলা ও কর্ম্ম দেখিতে পাই, তাহারই অধিকতর বিকাশ দেখি মানুষে।

বাঁচিতে চায় সকলে। এই বাঁচার প্রার্থনা মানুষের মনে তাহার সংজ্ঞার সঙ্গে জুড়িয়া উচ্চারিত অথবা প্রার্থিত হয়; কিন্তু যেখানে এই প্রার্থনা সংজ্ঞায় জাগে না, কেবল শরীরের কাজে লক্ষিত হয়, সেখানেও এই প্রার্থনা আছে ষোলআনা। পরমাণুরা মরে না, তাহাদের মরণ নাই; ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা অন্য পরমাণুর সঙ্গে জুড়িয়া বৃহৎ হইতেছে, বিশ্ব গড়িতেছে,—অক্ষয় হইয়া চলিয়াছে। সংজ্ঞাহীন এক কোষের ছোট-ছোট জীব মরণদায়ক বিষের স্পর্শে কোঁচকাইয়া সেই দিকে যায়, যে দিক তাহার স্থিতির অনুকূল। আঁধার স্থানের লতাটি ডগা বাড়াইয়া ধায় আলোকের দিকে, অজ্ঞাতে তাহার জীবন বাড়াইবার অনুকূল দিকে। অতি নীচের স্তরের জীব থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই জীবন-মূলের জৈবনিকের ধর্ম্মে বাঁচিয়া থাকিবার টানে ছুটিতেছে ও বাঁচিয়া বাঁচিয়া জীবনের পথের যত কর্ত্তব্য তাহা মরণ ভুলিয়া সম্পাদন করিতেছে। এই মৌলিক মর্ম্মান্তিক টানের গতিতে বা সুখে আমরা মরণ এড়াইয়া চিরজীবী হইবার বাসনা করি, আর শরীর পুড়িয়া গেলেও আমাদের চেতনা অনন্ত কাল অক্ষয় রহিবে, বিশ্বাস করি।

মানুষের এই আকুল বাসনা কি ধাঁধা? অণুপুঞ্জ মরে না; সে চিরস্থায়ী। এই জড় বিশ্বের কোথাও ধ্বংস বা মরণ নাই। সে বিশ্ব কেবল পরিবর্ত্তনে নূতনতর ও উন্নততর হইয়া বাড়িতেছে। সকলেই বাঁচে; কেবল মরিবে আমাদের বিবর্ত্তনে জাত চেতনার সংজ্ঞা ও আমিত্ব? এই প্রশ্ন পদ্যের আকারে ঠিক পঞ্চাশ বৎসর আগে একটি রচনায় লিখিয়াছিলাম; তাহার এক ছত্র এই:—'সকলেরই পরিণতি—অক্ষয় অমর গতি, চৈতন্যের ভাগ্যে একা আঁধার নির্ব্বাণ!' বিশ্বে উদ্ভূত কোন পদার্থই যখন মরে না, তখন মানুষের সংজ্ঞাবদ্ধ আমিত্বের বেলায় কেমন করিয়া এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের ব্যতিরেক খাড়া করিয়া স্থির করিব যে, এই এখনকার মত শেষের দিকের এই সংজ্ঞাময় চৈতন্য কেবল ধ্বংস হইবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে? কোন মানুষের পক্ষে তাহার মরণের পরের চৈতন্যের পরিণতির কথা জানিবার উপায় নাই; কোন মানুষেরই আলাদা আর একটা চৈতন্য দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে পারে না যে শরীরান্তে চেতনার কি হইল। জানিবার উপায় নাই বলিয়া কল্পনায় মরণ-পারের পর্দা ছিঁড়িয়া মৃতের ভূতের ছবি তুলিতে পারি না অথবা মস্তিষ্কের বিকার ঘটাইয়া ভূতের বাণী শুনিতে ও শোনাইতে পারি না। অন্য দিকে আবার চেতনার স্বরূপ জানিবার চেতনা নাই বলিয়া—নিজের ঘাড়ে নিজে চড়িতে পারি না বলিয়া, স্পর্দ্ধায় বলিতে পারি না যে সারা বিশ্বের নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটে ও আমাদের উদ্ভূত বা বিকশিত চেতনা দীপ নিভিবার মত নিভিয়া যায়। "জানি না"—বলিয়া স্থির থাকিবার বুদ্ধি ও বুকের পাটা অতি অল্প লোকেরই আছে। কেহ বা মূঢ়তায় ও চপলতায় পরলোকের মানচিত্র আঁকিয়া নানা মতবাদ সৃষ্টি করে, আর কেহ বা সমানে সেই মূঢ়তায় ও চপলতায় এই দাম্ভিক অজুহাতে চৈতন্যের স্থিতি অস্বীকার করে যে সে নিজে উহার স্থিতির প্রমাণ পায় নাই বা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অবস্থা ধরিয়া যখন বিচার করি, তখন বিকশিত আমিত্বের বিলোপ কল্পনা করা অসম্ভব হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী যে অগ্নি-গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহার তাপের সঙ্গে তুলনায় আমাদের চুলার আগুন ও চিতার আগুন শীতল শিশিরের ফোঁটা। সেই দাহের পর পৃথিবী মনোহর রূপ ধরিয়া বাড়িল ও সেই দাহের মধ্যে তাহার অন্তরে যে জীবনের বীজ ছিল, তাহা বিকশিত করিয়া জীবলীলা বাড়াইল ও মানুষের মত জীবে সংজ্ঞাময় আমিত্ব জন্মিল। এই অবস্থার দিকে তাকাইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছি ও যাহা প্রকাশিত হয় নাই, তাহা এই:—

যমের বাণী; ওহে প্রাণী, কিসের লাভে
দুঃখের পুঁজি বাঁচাতে চাস্—খুঁজে আবার নূতন আবাস?
নির্ব্বাণে তোর সকল জ্বালা নিভে যাবে।

বটেরে শঠ! এ যে বিকট ফাঁপা ফাঁকি!
সৃষ্টি যুগের দাহ সয়ে—জীবন-বীজের আধার বয়ে
উঠ্‌ল বেড়ে সজীব ধরা। জানিস্ না কি!

সেই যে বিকাশ, সেই ইতিহাস ভুল্‌বি কি তুই!
জন্ম-যুগের অগ্নি-সিন্ধু;—চিতার আগুন শিশিরবিন্দু।
যমের ছলায় জীবন বিলায় নেহাৎ ভীতুই।

দিব্য বুঝি দুঃখের পুঁজির গরব মহান্,
দুঃখ মনের ভ্রান্তি তাড়ায়—মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে বাড়ায়।
বিশ্বপতি তাই ত অতি দুঃখ সহান্।

শ্মশান-ঘাটের পোড়া কাঠেই তোমার দাবি!
দুঃখে গড়া মহৎ বিত্ত,—নিয়ে যাবে অমর চিত্ত;
তুই ত বেজায় ছাই মেখে গায় উড়ে যাবি!

কবিতায় প্রকাশিত আশাটুকু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া প্রচার করিতেছি না; কেবল একটা ভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শরীর ভস্ম হইলে তাহার উপাদানপুঞ্জ পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা অণুতে মিলিয়া এই পৃথিবীতেই জীবিত থাকে; উহার উপমায় কেহ কেহ এই উপপত্তি বা মতবাদ খাড়া করিয়াছেন যে, শরীরের জড়-পুঞ্জের রসে পুষ্ট চৈতন্যটুকু এই পৃথিবীরই এ-জীবে সে-জীবে জন্ম পাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সংসার-চক্র মতবাদের অনুকূলে যে প্রমাণটি দাখিল করা হয় তাহার বিচার করিতেছি। প্রথম কথা এই যে, চৈতন্যের যখন থাকাই চাই, তখন সে থাকে কোথা; দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা

দেখিতে পাই মানুষে মানুষে শরীরে, মানসিক ক্ষমতায় ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে কত প্রভেদ। এই অবস্থাটির ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, কর্ম্মফলে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বা জীবের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া বাড়ে বলিয়া এই প্রভেদ ঘটে। এ রকম প্রমাণের উপর যে ঐ মতবাদটি কিছুতে টিকিতে পারে না, তাহার আভাষ দিতেছি। বীজ রাখার জন্য গাছে যে বেগুনটি পাকাই, সেটিকে কাটিলে দেখিতে পাই যে, বীজগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে অন্য অনেক বীজের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করিয়া, অবয়বে ছোট হইয়া অথবা কিছু বিকৃত হইয়া ; আর কতকগুলি আছে বেশ মুক্তভাবে সুবিকশিত অবস্থায়। এখন বীজ বিভাগ করিয়া যদি বেগুনের গাছ লাগাও, তবে দেখিবে যে, ভাল বীজের গাছে ভাল বেগুন হইয়াছে, আর বিকৃত বীজের গাছে ভাল বেগুন ফলিতেছে না। বেগুনের ও বেগুনের বীজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির কর্ম্মফল কল্পিত হয় না, অথচ একই বেগুনের বীজের গাছে-গাছে কত প্রভেদ ঘটে। মানুষের বেলায় যখন দেখিতে পাও, তাহারা নানা রকমের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষা পাইয়া বাড়ে ও সন্তান উৎপাদনের সময়ে বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যে ও মনের ভাবে সন্তানদের জনক-জননী হয়, তখন অযথা একটা কর্ম্মফলের ফাঁকিতে ফেলিয়া আত্মার পুনর্জন্ম কল্পনা কর কেন? পূর্ব্বে গোটাকতক জীবন-রহস্যের কল্পিত ব্যাখ্যার সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই বক্তব্য। জড়ের দিকে বা কোনও জীবের দিকে না তাকাইয়া ও বিশ্বব্যাপী নিয়মের কথা না ভাবিয়া মানুষেরা জীবনের সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া পদে-পদে কেবল কল্পনার আশ্রয়ে ধাঁধা গড়িয়াছে। কোন কাজ করার মানেই হইল, সে-কাজের একটা ফল আছে ; এই সোজা কথাটার উপর একটা ধাঁধা জুড়িয়া বেজায় রকমের বিরাশী-দশ আনা ওজনের যে কর্ম্মবাদ খাড়া করা হইয়াছে, সেটা মাকড়সার জালে জড়ান অতি অসার তথ্য। সুপ্রথায় সত্যের আলোচনার সময়ে এই সকল গুরু ওজনের তথ্যকে উপেক্ষা করাই ভাল। যাহা বুদ্ধিতে কুলায় না, তাহার ব্যাখ্যায় হেঁয়ালি রচনা করিলে বুদ্ধির উপরে বোকামিকে বড় স্থান দিতে হয়। যাঁহারা বলেন যে যাহা কিছু জ্ঞান বা বুদ্ধির জোরে বোঝা যায় না, তাহা বুঝিতে হইলে পৃথিবীর সকল অবস্থা ও ঘটনা ভুলিয়া অন্ধকারে বসিয়া ধ্যানের জোরে ধরিতে হয়, তর্ক করিয়া তাঁহাদের ধ্যান ভাঙ্গা অসম্ভব। জগদীশচন্দ্রকে ও রমনকে যদি পদার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া ধ্যান করিয়া তথ্য ধরিতে বলা যায়, তবে ফল কি হইবে ?

আমরা মানুষের ভয়-ভাবনার বিষয়েই এত কথা লিখিতেছি ; সেই জন্য কেবল বিচার্য্য এই যে, মানুষের মনে বিকশিত সুসম্বদ্ধ আত্ম সংজ্ঞার পরিণতি কি। এই যে বলিয়াছি যে যাহা কিছু উদ্ভূত বা বিকশিত, তাহাদের সকলেরই যখন স্থিতি আছে, তখন ঐ সুসম্বদ্ধ অবস্থার লোপ বা নির্ব্বাণ ভাবা সুসঙ্গত হইবে কি না। এ বিষয়ে একটি যুক্তির কথা বলিব যাহা হয় ত সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সুবোধ্য না হইতে পারে। যাঁহারা বীজগণিতের থিওরেম্ অঙ্ক কষিয়াছেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য এই যুক্তিটি দিতেছি। যেখানে আমরা একটা অজানা n বা একটা 'ক্ষ' অবস্থার মূল্য বা সত্য ধরিতে যাই, তখন অঙ্কটি কষি এইভাবে, যথা :—'ক+খ'-কে প্রথমে একের গুণ চড়াইয়া গণি ও পরে পরে অন্য অঙ্কের মূল্য গণিয়া n—1 অথবা 'ক্ষ—১' গুণে গণিয়া দেখিয়া যে অজানার পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যন্ত কতখানি প্রত্যক্ষ মূল্য পাওয়া যায় ; তখন অঙ্ক কষিয়া স্থির করি যে যাহা ক্ষ—১ পর্য্যন্ত সত্য তাহা অনির্দ্দিষ্ট 'ক্ষ' সম্বন্ধেও সত্য। গণিতের এই সূক্ষ্ম বিচার ধরিয়া বলিতে চাই যে, অণু-পরমাণু হইতে পৃথিবীর সকল অবস্থাই যখন স্থায়ী, যখন সকল পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই একটা নূতনের উদ্ভব বা উন্নতির উদ্ভব, তখন এই শেষ অজানা কথাটির বা চৈতন্যের উদ্ভবের বেলায় কেমন করিয়া বলিব যে উহার স্থিতি থাকিবে না বা উহা পরিবর্ত্তনে নূতনতর উন্নতিতে বাড়িবে না। এখানে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উদ্ভাসিত বা বিকশিত সংজ্ঞার কথা বলিলাম।

আমি বলিয়াছি, প্রতি মানবের মনে উদ্বুদ্ধ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভাবে সু-সম্বদ্ধ সেই সংজ্ঞার কথা, যাহা আমিত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে জড়াইয়াই যথার্থ চৈতন্য নাম পাইতে পারে। সকল চৈতন্য একসঙ্গে জড়াইয়া আত্ম-পর-বোধ হারাইয়া যে অবস্থা ঘটিতে পারে সেই অচিন্ত্য ভাবের কথা বলি নাই, আর সেই ভাব যে আপন-পর-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের পক্ষে অচৈতন্য জড়ত্বের মত, সে কথা লক্ষ্য করিয়াও কিছু

বিচার করি নাই। প্রতি ব্যক্তিনিষ্ঠ সংজ্ঞার প্রকৃতি ও পরিণতির কথাই আলোচনা করিয়াছি। আমরা ভাবিতে বাধ্য—বলিতে বাধ্য যে, এই বিশ্ব-প্রকাশের আদি ও অন্ত আমাদের এ পর্য্যন্ত বিকশিত মনের ধারণার অতীত। এ কথাও খাঁটি সত্য যে, চপলতার ফাঁকা দাম্ভিক তর্কে যে-শ্রেণীর নাস্তিকতার কথা আগে শোনা যাইত, এখন আর ধীর পণ্ডিতদের মুখে তাহা শোনা যায় না। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ধারণা আছে তাহা উপেক্ষা করিয়াই বলিতে পারি যে, এই সাধারণ ধারণা জ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল যে, এক অনাদি অনন্ত সত্তা এই অশেষ বিশ্ব-প্রকাশের মূলে। উত্তবের এই মূল সত্তা যে সৃষ্টি শেষ করিয়া দূরে বসিয়া আছেন বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন, এখন এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তার উদয় অসম্ভব; আমরা দেখিতেছি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পলে অনবরত জড় বিশ্বের ও মানবের মনে নূতন নূতন সৃষ্টির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি চলিয়াছে। যে সত্তা হইতে আমাদের চৈতন্যের উদ্ভব, যাঁহাকে নিত্যই বুঝিতেছি তিনি অশেষ-কর্ম্মা,—সেই চৈতন্যদাতা তাজা।

অলিভার লজই হউন আর যে কোন বুজরুকই হউন, কাহারও সাহায্যে বুঝিতে পারিব না যে আমাদের জীবনে বর্দ্ধিত সুসম্বদ্ধ সংজ্ঞা মরণান্তে কি ভাবে কোথায় থাকে। চেতনার প্রকৃতিতে যে জ্ঞান জন্মা অসম্ভব, তাহা আমার মধ্যে কিরূপে ফুটিবে, যদি চৈতন্যের প্রকৃতি না বদ্‌লাইয়া যায়? কাহারও চৈতন্য এমনভাবে বদ্‌লাইলে তাহা অনায়াসে ধরা পড়িত, কারণ দেখা যাইত যে তাহার সাধারণ দশটা কাজ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কাজ বুঝিবার ক্ষমতা হইতে ভিন্ন কি না। এরূপ ভিন্নতা থাকার কোন নিদর্শন পাই না, অথচ যে বিষয়ের পরীক্ষার সুবিধা নাই, সেই অদেখা বিষয়টির বেলায় একটা বুজরুকির দম্ভ শুনিয়া ভুলিব কি করিয়া? যে বুদ্ধিতে লোকে অজানা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধাঁধা রচে ও বুদ্ধির মাকড়সার জালে নিজেকে জড়ায়, সেই বুদ্ধিতেই বুজরুকিতে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরে বিশ্বাসীদেরও "জানি না" বলিয়া থাকার বুকের পাটা নাই।

পৃথিবীর সকল ঘটনার তুলনায় বুদ্ধির লজিক্-এ আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ সংজ্ঞাকে অস্থায়ী বলিবার অধিকার আমাদের নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পরলোকের একটা নক্সা গড়িবার ক্ষমতা বা অধিকার জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের জীবনের মূল যে জৈবনিক, তাহার নিগূঢ় ধাতুর প্রকৃতি এই যে সে আমাদের সংজ্ঞাবদ্ধ জীবনকে অবিশ্রান্ত ভবিষ্যতের দিকে চালাইতেছে,—মরণের চিন্তা থাকিলেও মরণ ভুলাইয়া কর্ত্তব্য পালনের দিকে ছুটাইতেছে। এ অবস্থায় জুজুর ভয় বাড়াইয়া কর্ম্মে অপটু হওয়া ভীরু কাপুরুষের কর্ম্ম। জীবন যে-ভাবে বাঁধা আছে, তাহাকে জুজুর ভয়ে বিধ্বস্ত না করিয়া উহাকে ঠিক একটি ঘড়ির মত বাঁধিয়া চল; দম্ দেওয়ার ফলে ঘড়িকে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দম্ ফুরাইয়া অচল হইবার থাকিলেও টক্‌টক্ করিয়া ঠিক সময় রাখিয়া দম ফুরাইবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিতে হয়, তেমন-ই করিয়া দম্ ফুরাইবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু ভুলিয়া প্রফুল্ল মনে কাজ করিয়া যাও। এই ভাবে জীবনকে বাঁধিতে হইলে ও প্রফুল্ল মনে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে হইলে, মানুষের পক্ষে চাই সেই অতি সত্য অনন্ত সত্তার দিকে দৃষ্টি ফেলা। উপনিষদে আছে, আমাদের সর্ব্ব সংশয় ছিঁড়িয়া যায় (ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ), যদি ঐ সত্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে,—যদি যাহা খাঁটি সত্য তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণ করি। তুমি যখন ইচ্ছা করিয়া বিশ্বব্যাপী আইনকে বদ্‌লাইতে পারিবে না,—তুমি যখন জান—'বিধাত্রা বিহিতংমার্গং ন কশ্চিদধিবর্ত্ততে',—তুমি যখন জান যে তোমার কল্পনায় গড়া মতবাদকেই অনন্ত সত্তা আপনার আইনরূপে রচনা করিবেন না, তখন তুমি এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে সেই সত্তাপ্রদত্ত জ্ঞান ধরিয়া অগ্রসর হও; মরণকে ভোল:—

> শৃণোতু যো বৈ মরণাদ্ বিভেতি
> সত্তা হ নিত্যা ভুবনে নিগূঢ়া
> জাগর্ত্তি সা চেতসি সত্যমেতৎ
> মৃত্যুর্হি ছায়া নবচেতনায়াঃ।

চেতনায় এই "নব" কি হইবে জানি না। আমরা দেখিতেছি যে, জীবের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে জড় বা অচেতন বলি তাহার রসে; আর আমাদের আমিত্বযুক্ত সংজ্ঞা পুষ্টি পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে শরীরের ক্রিয়ার রসে,

পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার রসে, ও প্রত্যেক শরীরে সে নিজের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব বাড়াইয়াছে পৃথিবীর মানুষের সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদের দ্বন্দ্বে ও প্রেমে। এই যে প্রেমাদি রসে পরিপুষ্ট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চেতনা, সে নিজের নিজের বিশেষত্বে বৃদ্ধির কিরূপ টান বা গতি পাইয়াছে, তাহাতে সে যেদিকে আকৃষ্ট হইয়াই ছুটুক, তাহাতে ভাবনার কথা কিছুই নাই।

যাহারা বলে, আত্মা কেবল একাই দ্রষ্টা, তাহার গায়ে কিছু লাগে না, অর্থাৎ সে কোন পৃথিবীর রসে পুষ্ট হয় না, তাহাদের সেই কল্পিত আত্মার কেহ কখনও সন্ধান পায় নাই; ভূত নামাইবার আসরেও এ যুগে রূপধারী আত্মার কথাই শুনি। আমরা যে বিকশিত চৈতন্যের কথা বলিলাম তাহা ত পৃথিবীর রসে উৎপন্ন ও প্রেম প্রভৃতি নানা ভাবে পরিবর্দ্ধিত। কাজেই এই যে সংজ্ঞাবদ্ধ চৈতন্যের কথা বলিতেছি, সেই বিশেষরূপে উদ্ভূত সামগ্রী স্থায়ী হইলে সে ত যে-সকল রসে পুষ্ট হইয়াছে তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে না। অর্থাৎ তাহার ভাব জন্মাইবার ও পুষ্টি জন্মাইবার আধার বা পদার্থ যেখানেই পড়িয়া থাকুক, সেই বর্দ্ধিত চেতনাকে নিশ্চয়ই আধারগুলি হইতে প্রাপ্ত ফলে বা গুণে ভূষিত থাকিতে হইবে। ক্ষোভে ও বৈরাগ্যে মানুষ বলিতে পারে, তাহাকে পৃথিবীর সকল পদার্থ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কিন্তু এই সুসম্বদ্ধ সংজ্ঞার বা চেতনার যদি স্থিতি থাকে তবে সে তাহার অর্জ্জিত কিছুই ফেলিয়া যাইতে পারে না; কারণ সকল অবস্থায় ভাবের রসেই তাহার পরিবর্দ্ধন।

এই প্রসঙ্গে ও চিন্তায় মনে হইতেছে চৈতন্য সম্বন্ধে একটা কথা, যাহা কল্পনার খেয়ালে জাগা স্বপ্নের মত। যাহা জড়, তাহা যদি বিবর্ত্তনের ফলে জীব গড়িল, ও আমিত্ব সংজ্ঞায় ভূষিত আমাদিগকে গড়িল, তবে কি একদিন ভবিষ্যতের বিবর্ত্তন-ফলে আমাদের সারা দেহ জড়ত্ব পরিহার করিয়া চেতন হইয়া উঠিবে,—অথবা অতি দূর দূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্ব সংজ্ঞায় জাগিয়া অনন্তে আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হইবে? যাহা অল্পে ফুটিয়াছে, তাহা কি বৃহত্তর প্রসারে ফুটিয়া ওঠা অসম্ভব? এ সম্ভব-অসম্ভব যাহাই হউক, একদিকে যেমন দেখিলাম, আমাদের বিকশিত চেতনা ধ্বংস হইবার নয়, অন্য দিকে তেমন-ই দেখিলাম, আমাদের পরিণতি যাহাই হউক, মৃত্যু ভুলিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হওয়াই শান্তিতে জীবন-ধারণের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্রীযুক্ত জেন ফু কাউর চিত্রপ্রদর্শনী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে চীনের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত জেন ফু কাউর চিত্রের প্রদর্শনী হইয়া গেল। প্রদর্শনীতে পুরাতন চীনা চিত্রের নমুনাও অনেক ছিল। শ্রীযুক্ত জেন ফু কাউকে চীনের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইনি ক্যান্টনের ফাইন্ আর্টস্ সোসাইটির সভাপতি। শ্রীযুক্ত কাউ চীন হইতে বেনারসে সমগ্র এশিয়ার শিক্ষাসম্মিলনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য—এই উপলক্ষ্যে এ রকম প্রতিভাশালী শিল্পীর মূলচিত্রের সহিত পরিচয় করার সুযোগ হইল।

বহুদিন হইতেই বাংলার প্রাচ্য-চিত্রকলা-পদ্ধতির শিল্পীদের সহিত জাপানের শিল্পীদের যোগস্থাপন হইয়াছে। জাপানের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত টাইকোয়নি, হিসিদা, কাত্সুতা, আরাই কোয়ানপো প্রভৃতি কলিকাতায় বাস করিয়া গিয়াছেন। জাপানের আর্ট-ক্রিটিক মনীষী ওকাকুরা বাংলার শিল্পীদের কম প্রভাবান্বিত করেন নাই। জাপানের শিল্পীদের সহিত বাংলার শিল্পীদের সখ্য স্থাপন হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় আরম্ভের সময়,—প্রাচ্য-চিত্রকলা-পদ্ধতির গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের সহিত আমাদের আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে।

চীনের প্রাচীন শিল্পীদের পরিচয় ইয়োরোপীয় বহু পণ্ডিতের গ্রন্থে পাইয়াছি; কিন্তু আধুনিক শিল্পীর পরিচয়

কোথাও পাই নাই। শ্রীযুক্ত কাউই প্রথম সে পরিচয় চাক্ষুষ ঘটাইলেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে নবীন চীনের সাড়া বহুদিন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু নতুন শিল্পীরা যে কি করিতেছে; তাহা আজই জানিতে পারিলাম। এরূপ চিত্রকলার প্রদর্শনী ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর হয় নাই।

বরষার অভিযান

আগামী বৎসর সমগ্র এশিয়ার শিক্ষা-সম্মিলন চীনে হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ হইয়াছে; আশা করি আমাদের বাংলার শিল্পীরা চীনা শিল্পীর সৌহার্দ্দের বিনিময় করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের শিল্পীদের তরফ হইতে কেহ যদি সেই সম্মিলনে যোগ দেন এবং তৎসঙ্গে বাংলার নব পদ্ধতির চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী করেন, তবে চীনের সহিত আমাদের আদান-প্রদান দৃঢ় হইবে।

প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত কাউকে অভিনন্দিত করিলে শ্রীযুক্ত কাউ তদুত্তরে বলেন "বহু প্রাচীন কাল হইতেই চীনের সহিত ভারতবর্ষের যোগ রহিয়াছে; চীনে ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পে ভারতের প্রভাব বিদ্যমান। হান্ রাজত্বের সময় হিমালয়ের ভিতর দিয়া চীনে ভারতের বৌদ্ধ সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের শিল্পকলাকে বহন করিয়া আনিয়াছে। কালের ঘটনাচক্রে সেই সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়াছে, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। ভারতে আসিয়া আমার মনে হইতেছে না, আমি নতুন দেশে আসিয়াছি। চীনে আমি বহু দিন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি, আর ভাবিয়াছি কবে সেই দেশ দেখিব। আজ আমার সেই স্বপ্নের দেশের সন্ধান মিলিয়াছে। বহু দিনের হারানো বন্ধুকে ফিরাইয়া পাইয়াছি, আজ যাহাদের আমি চারি পাশে দেখিতেছি,—মনে হইতেছে না ইঁহারা আমার সহিত অপরিচিত; স্বপ্নে যেন বহুবার ইঁহাদের সহিত দেখা হইয়াছে।"

বহু দিন হইতেই ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় চীনা চিত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে এবং বোষ্টনের ম্যুজিয়মে বহু প্রাচীন চিত্র রক্ষিত আছে।

চীনা চিত্রের প্রথা ইয়োরোপীয় চিত্র হইতে একেবারে ভিন্ন। চীনা চিত্র ইয়োরোপীয় শিল্পীদের কাছে এক নতুন রূপলোকের সন্ধান দিয়াছে। ইয়োরোপে রেনেশাঁর পর হইতে ইয়োরোপীয় শিল্প ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল বস্তুতন্ত্রতার দিকে। বস্তুকে হুবহু প্রকাশ করার চরম লক্ষ্যে তাহারা যখন পৌছিল, তখন দেখিল শিল্প-জগতে সৃষ্টি করার আর কিছু নাই। তাহারা নতুনের সন্ধানে ছুটিল। প্রাচ্য শিল্পকলা তাহাদের সেই অজানার সন্ধান দিল। ইয়োরোপের নব গোষ্ঠীর শিল্পীরা চীনের চিত্রকলা হইতে খুব সাহায্য পাইয়াছে।

চীনা চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হইল, তাহার রেখা-কৌশল এবং ছন্দ। চীনে চিত্র এবং লিখন তুলির সাহায্যে সম্পাদিত হয় বলিয়া চীনের চিত্রকলা লেখারই সামিল।

ক্যালিগ্রাফী বা লিখন-কৌশল চীনা চিত্রের প্রধান অঙ্গ। চিত্রে দেখিতে হইবে quality of drawing—তুলি চালনার কায়দা। চীনা চিত্রকরগণ তাহাদের রেখার নানা ভাষা বাহির করিয়াছে। বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা characterestics প্রকাশ করিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রেখার প্রকাশ। ইয়োরোপের হালের শিল্পীরা এ বিদ্যার খুব কসরত করিতেছে। ফরাসী চিত্রকর সুরাট (Seurut) এর বিন্দুরারা অঙ্কিত (Pointellism) দৃশ্যচিত্র কতকটা চীনাভাব হইতে প্রণোদিত। ভ্যান্ গগের (Van Gogh) চিত্রাবলীর রেখা চীনকে স্মরণ করাইবে।

চীনা চিত্রকলা এবং সকল প্রাচ্য চিত্রকলাই আলো ছায়ার সমাবেশকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কম্পোজিসন অথবা রচনা-সৌষ্ঠবের মূল ভিত্তি—ছন্দ। চীনা চিত্রকলায় Geometrical perspective অথবা জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষণ না থাকিলেও aerial perspective অথবা বায়বীয় পরিপ্রেক্ষণ ত্যাগ করে নাই। বিভিন্ন স্তরের রং পর পর দিয়া দূরত্ব দেখাইয়াছে। দৃশ্যচিত্রে প্রায়ই দেখা যায়—শিল্পী সমতল ভূমি হইতে আঁকেন নাই, পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া যেন আঁকিয়াছেন। ইহার কারণ—শিল্পী দূরত্ব দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। চীনের একজন বিখ্যাত চিত্রকর দৃশ্য-চিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আর্টিষ্টের সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করার প্রয়োজন; কিন্তু আঁকার সময় দেখিতে হইবে চিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অংশ কি। সেই অংশ রাখিয়া অপ্রধান অংশ চিত্র হইতে বাদ দিতে হইবে, চিত্রে দূরত্ব আনিতে হইবে। এই নীতি হইতেই ইম্প্রেসনিজ্‌ম্‌এর উৎপত্তি।

চীনা চিত্রের এক বৈশিষ্ট্য তার অবকাশ বা space। চিত্রে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ফাঁক রহিয়াছে। এই ফাঁক চিত্রের অনেক কথা ব্যক্ত করে।

চীনা চিত্রে বিষয়ের আভিজাত্য নাই। তবে যে-কোনো বস্তু বা প্রাণী লইয়া চিত্র অঙ্কিত হউক না কেন, তাহাতে বিষয়ের আরোপ করা হয়। তখন চিত্র কেবল বস্তুর ভিতর আবদ্ধ থাকে না; বস্তুঘটিত ব্যাপারের অন্তরালে যেন কত আখ্যান আছে, শিল্পী তাহার রহস্য-যবনিকা তুলিয়া দেয়—এবং আমাদের সামনে চোখে পড়ে না, অথবা চোখে পড়িলেও তাহা এত সাধারণ যে সকলেই অবজ্ঞা করিয়া যায়—তাহাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে।

প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত কাউর একটি চিত্রের নাম "একটি শুবরে পোকা শরতের ঝরা পাতার সহিত ভাসিয়া চলিয়াছে।" একটা পাথর ঝুঁকিয়া আছে, পিছনে দেখা যাইতেছে ঝরণা, পাথরে গুল্ম জন্মিয়াছে, শরতের বাতাসে

ব্যাঘ্র

পাতা ঝরিতেছে। একটি পাতাকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া আছে এক শুবরে পোকা। এ যেন কোথাও নিরুদ্দেশ-যাত্রা, চতুর্দ্দিকে আকাশের বিরাট শূন্যতা, কোথাও আশ্রয় মিলিবে কি?

একটি চিত্রের নাম "মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু।"

এ সব তো অতি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু ইহাতেই চীনা চিত্রকর রস পান। চিত্রের নামকরণে কবিত্ব আছে, একটা মোহ যেন আছে—যেমন "ফুলের ছায়ায় স্বপ্নাতুর মাছ।"

প্রদর্শনীতে প্রাচীন চিত্র যাহা ছিল—অধিকাংশই মিঙ্‌যুগের, য়ুএন্ অথবা মঙ্গোল যুগের, এবং সিঙ্‌যুগের খান কয়েক ছিল। সুঙ্ যুগের ছিল দু'খানা।

নৌকার মাস্তল

চীনের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয় সুঙ্ রাজত্বের সময় (খৃঃ অব্দ ৯৬০—১২৮০)। এ সময় শুধু চিত্রকলা নয় সকল বিষয়ে চীন ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভেনিসের বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো সুঙ্ রাজত্বের সময় চীনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি চীনের বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং রাজধানী হাংচাউ নগরীর গরিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সুঙ রাজত্ব তাতার, মঙ্গোল প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতির আক্রমণে খিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মঙ্গোল অধিপতি কুবলাই খাঁ সুঙ-বংশের সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। তিনি যে কেবল যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার দরবারে শিল্প, সাহিত্য উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। য়ুএন অথবা মঙ্গোল রাজত্বের কাল ১২৮০—১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ। মঙ্গোলরা কালক্রমে চীনের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া একেবারে চীনা হইয়া গিয়াছিল।

১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলরা মিঙদের দ্বারা বিতাড়িত হইলে মিঙ্‌রাজত্ব আরম্ভ হয়।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে চীনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; মিঙ্ সম্রাট্ দুরন্ত যাযাবর মাঞ্চু তাতারদের সাহায্য চাহিয়া পাঠান। তাহারা সাহায্য করিতে আসে; কিন্তু সিংহাসন দখল করিয়া বসে। মাঞ্চুরা মিঙ উপাধি গ্রহণ করিয়া মিঙ্ রাজত্ব আরম্ভ করিল। পরাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ মিঙ্ রাজ চীনাদের টিকি রাখিতে বাধ্য করে। চীনারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, টিকি তাহাদের দাসত্বের চিহ্ন। এই টিকিই তাহাদের সভ্যতার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ধীরে ধীরে ইয়োরোপ একদিন খৃষ্টধর্ম্ম এবং অহিফেন লইয়া চীনে প্রবেশ করিল। অহিফেনসেবী চীন মোহাবিষ্ট হইয়া ইয়োরোপকেই সর্ব্ববিষয়ে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

নানা পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে চীনের মোহতন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছে, সকল স্বাধীন জাতির সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিতে চীন আজ বদ্ধপরিকর। স্বর্গীয় সন্ য়ুত সেনের নেতৃত্বে সিঙ্ রাজত্বের অবসানে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কাউর একটি চিত্র আছে—নাম "ইন্দুর"। ঝুড়ির ভিতর ফল রহিয়াছে, কতগুলি ইন্দুর তাহা ভোজনে তৎপর। সহরে গ্রামে সকলে ঘুমাইতেছে; ইন্দুর তাহাই বাহির হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ভোজন করিতেছে, বাধা দেওয়ার কেহ নাই। সমগ্র চীন সেইরূপ নিদ্রায় মগ্ন—বৈদেশিকরা তাহাই চীনকে বিনা বাধায় ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে।

শ্রীযুক্ত কাউর নিকট জানিলাম, চীনে এখন তিন শ্রেণীর চিত্রকর রহিয়াছে। ১ম শ্রেণী প্রাচীন পন্থী—যাহারা কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। ২য় শ্রেণী—ইয়োরোপের অনুকরণকারী; ৩য় মডার্ণ স্কুল। শ্রীযুক্ত কাউ শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পী। এই ৩য় শ্রেণীর বোধ হয় তুলনা চলে জাপানের বিজিট্‌সুন্ সোসাইটির শিল্পীদের সহিত। ইহার স্থাপয়িতা মনীষী ও-কাকুরা। শ্রীযুক্ত টাইকোয়ান প্রভৃতি ইহার সভ্য।

স্কুলের আদর্শ। তিনি প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি চান না, অথবা ইয়োরোপীয় শিল্পের অনুকরণও চান না। প্রাচীন টেক্‌নিক আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই মডার্ণ স্কুলের অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন সম্ভব। এই টেকনিক আয়ত্ত করিতে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর অভ্যাসের প্রয়োজন।

বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক লাওট্‌সে চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে

সূর্য্যাস্তে পর্ব্বত-শিখর

ভগ্ন-সেতু

বলিয়াছেন "অঙ্কনে কোনো প্রকার পদ্ধতি না থাকা খারাপ, কিন্তু একমাত্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করা আরও খারাপ। শিক্ষার্থীর প্রথমে উচিত এক মূল নীতির অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করা এবং পরে বিচারপূর্ব্বক সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করা। অঙ্কন পদ্ধতির অধিকার এমন জন্মিবে
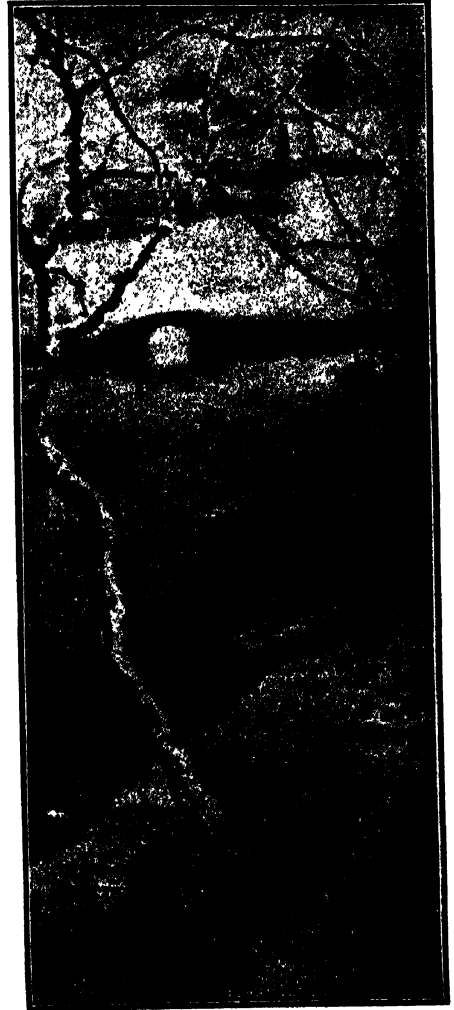
দুঃখের বিষয় নবীন চীনের শিল্পের প্রগতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কাউর সহিত বিশেষ আলোচনা করা গেল না; কারণ, তিনি ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ। দোভাষীর সাহায্যে আলোচনা বেশী অগ্রসর হইল না। তিনি বলিতেছিলেন, প্রাচীন প্রথাকে আয়ত্ত করিয়া নতূনকে গ্রহণ করা মডার্ণ

যে তার প্রকাশ যেন বাহিরে থাকে না।" এ যেন ঠিক আমাদেরই কথা।

শ্রীযুক্ত কাউর এক চিত্র "বরষার অভিযান"—এরোপ্লেনের ছবি। শ্রীযুক্ত কাউ বলিতেছিলেন যে তিনিই প্রথম চীনা চিত্রে এরোপ্লেন আঁকিয়াছেন। ক্যানটন সহরের প্যাগোডার চূড়া দেখা যাইতেছে—উপরে বাদলা

কুয়াশার আবরণে উইলো গাছ

আকাশে এরোপ্লেন চলিয়াছে। এ যেন নবীন ও পুরাতনের সমন্বয়। বৃষ্টিবাদল মাথায় করিয়া নবীনের যাত্রা।

চীনের শিল্পীরা জন্তু আঁকায় খুব পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। বাঘ, হরিণ, ঘোড়া, বানর, মহিষ প্রভৃতি সকল জন্তুতেই তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। সকল রকম পাখী—কীট, পতঙ্গ কিছুই চীনা শিল্পীর তুলিকে এড়াইতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত কাউর বাঘের চিত্রটি চমৎকার। বাঘের হিংস্র প্রকৃতির ভাব পরিস্ফুট। বাঘের নাকের ডগা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখের ডান নখ পর্য্যন্ত 'স্প্রিং' অথবা ধনুকের ন্যায় বক্ররেখা গতি এবং শক্তি পরিচয় দিতেছে; কোথাও যেন এখনি ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু চোখে যেন একটু ভয় এবং সন্দেহের ভাব। পাহাড়ের কোণে অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে।

Study বা অনুশীলন করার দিকে শিল্পীরা খুব ঝোঁক দেয়। লাওটুসে বলেন "এত চিত্র আঁকিতে হইবে যে কালী গুলিবার লোহা যেন ঘষিয়া ক্ষয় হইয়া যায়। অব্যবহার্য্য তুলি একত্র করিলে যেন স্তূপাকৃতি হয়। দশ দিন ধরিয়া জলের অনুশীলন করিতে হইবে, পাহাড় আঁকিতে হইবে পাঁচ দিন। দশ হাজার পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং দশহাজার লিল হাঁটিতে হইবে।"

যাহা আঁকিবে বার-বার অনুশীলন করিয়া শেষ ছবি আঁকিয়া ফেলে যেন মুখস্ত বলার মত,—একটা অক্ষরের মত ছবিটা যেন পূর্ব্ব হইতেই শিল্পীর মনের মধ্যে ছিল।

চীনাদের দৃশ্যচিত্রে যেমন প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে, মানুষের চিত্রে তেমন হয় নাই। ইহার কারণ, দৈহিক সৌন্দর্য্যে চীনা শিল্পী আকৃষ্ট হয় নাই। চীনা চিত্রে নগ্ন চিত্র নাই। চীনা কবি, চীনা চিত্রকর তেমন করিয়া মুগ্ধ হয় নাই নারীর সৌন্দর্য্যে, যেমন করিয়া হইয়াছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে। বিশাল প্রকৃতির ভিতর মানুষের স্থান কতটুকুই বা? চিত্রকর যেন প্রকৃতির ভিতর নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতিকে এরূপ ভাবে পৃথিবীর কোনো শিল্পী দেখে নাই। তাহারা যে দৃশ্যচিত্র আঁকে,—তাহার ভাবকে প্রকাশ করে—যেমন পাহাড় আঁকিবে তাহার উচ্চতার, জল আঁকিবে তাহার গতির, আকাশ আঁকিবে তাহার বিস্তৃতির। বসন্ত প্রভাতে প্রকৃতি যেন খুসি, সন্ধ্যায় বিষণ্ণ।

শ্রীযুক্ত কাউর একটি দৃশ্যচিত্র আছে—নাম "সূর্য্যাস্তে পর্ব্বত-শিখর"। সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত পর্ব্বত-শিখর, নীচে বনানীর ভিতর একটি কুটীর দেখা যাইতেছে; জন কয়েক লোক নগরের কোলাহল ছাড়িয়া নির্জ্জন প্রকৃতির নিভৃত ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ, ম্লান।

'নৌকার মাস্তুল' ক্যানটনের নদীর দৃশ্য; ক্যানটন নগর, নৌকার মাস্তুল, রাত্রির নিস্তব্ধতা—সমস্ত প্রকৃতি যেন স্বপ্ন দিয়া ঘেরা।

'ভগ্ন সেতু' হ্যাংচাউর নিকট সাইউ হ্রদের দৃশ্য। দূরে একটা ভগ্ন সেতু—পারে ঝোপঝাড়ের পাশে নৌকা বাঁধা; পত্রলেশহীন একটা বৃক্ষ রিক্ততা জানাইতেছে, বরফ পড়িয়াছে।

"কুয়াশার আবরণে উইলো গাছ" সুন্দর চিত্র। বসন্তের উষা কুয়াশায় ঘেরা, উইলো গাছে নবীন কিশলয়ের উন্মেষ। সমস্ত জগৎ আনন্দময়। উইলো গাছে পাতার ঝালর ঝুলিতেছে, একটু ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পাওয়া যাইতেছে।

সকল ছবিই যেন এক একখানি কবিতা।

সেবার অভিশাপ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

—ভারতি!
জীবন-ভোর ঢালিনু লোর,
করিনু তোর আরতি।

দাসত্ব যে দিবস্-ব্যাপী,
অর্দ্ধাহারে যামিনী যাপি,
নিদ্রাহারা ত্রিযামা জাগি'
ধেয়ানু তোর মূরতি!

দশের করতালি চাহিনি,
হইনি যশ-ভিখারী,
গর্ব্ব তবু—আমি যে তোর
সেবার চিরাধিকারী।

উপহাসি বা অযশ-বাণী
আমারে দিতে পারেনি গ্লানি,
তাহারি ফাঁকে পেয়েছি যশও—
দেখিনি দাম বিচারি'।

কিন্তু মাগো সে অধিকারে
আসিল বুঝি ক্ষুণ্ণতা,
অন্ন নাহি—বস্ত্র নাহি—
নয়নে হেরি শূন্যতা।

বসনাভাবে বধূ লুকায়,
অশনাভাবে শীর্ণকায়,
দুধের শিশু কাঁদিছে বুকে—
স্তন্যহীনা স্তন্যদা!

—ভারতি!
জীবন-ভোর ঢালিনু লোর,
করিনু তোর আরতি।

সেবায় ত্রুটি ছিল কি কিছু?
অহং ছিল সেবার পিছু?
দিয়াছি যাহা—তাহা কি ফাঁকি?
রয়েছে বাকী আরো কি?

দেবী-সেবকে তবে কেন মা
দৈব হানে ভ্রূকুটি?—
চাহি না যশ,—বস্ত্র দে মা,
অন্ন দে মা দু' মুঠি!

দাসত্বে ত দিনটি দাগী,
রেখেছি রাত সেবার লাগি,'
রজত-অভিশাপে সে যাবে
মলিন হ'য়ে কি টুটি'?

নারী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এক

ইটালী অঞ্চলে একটি ছোট্ট এঁদো গলি। তাহার মধ্যে একখানা আধ-খোলা, আধ-কোঠা ঘর—দেওয়ালটা ইঁটের, ছাতটা খোলার। তারই মাঝে একটি দুঃখী পরিবার; একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি বালিকা। পুরুষটির নাম জেকব বিশ্বাস। নেটিভ খৃশ্চান, একটি সওদাগরী আফিসে সামান্য একটি চাকুরী করে। গৃহিণীর নাম, স্বর্গের সুষমা। স্বর্গের সুষমার পিতা গির্জ্জার পাদ্রী ছিলেন; মেয়েটির নামে যতখানি সম্ভব ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন; তাহার মনটিকেও যতখানি পারিয়াছিলেন, ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। জেকবের সঙ্গে স্বর্গের সুষমার বিবাহ দিবার কিছুদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। একমাত্র দুহিতার স্বামীকে একটি ভালো কর্ম্মে ঢুকাইয়া দিবার যে ইচ্ছা তাঁহার অন্তর প্রদেশ আশান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল, অকালে আশা-লতিকাটিকে ছিন্নমূল করিয়া দিয়া যীশু চরণে তিনি আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন। তদবধি জেকব সেই ছোট্ট সওদাগরী-আফিসটিতে 'বাজার বাবু'র কাজ করিয়া আসিতেছে। বারো বৎসরে বারোটি টাকা মাহিনা বাড়িয়া এখন বেয়াল্লিশটি টাকা পায়। মেয়েটি পাদ্রী স্কুলে বিনা বেতনে পড়ে। মেয়েটির নাম, স্বর্গ-শোভা। বাজারের কাজে দু' পয়সা ছিল, কিন্তু স্বর্গের সুষমা সে পাপ-অর্থ স্পর্শ করিবে না শুনিয়া জেকবও সেই 'দু'পয়সা'র মায়া অকাতরে ত্যাগ করিয়াছিল।

১৯৩০ সাল—খৃষ্টমাস উৎসব আগত-প্রায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের 'পাণ্ডবগণ'-বর্জ্জিত ইটালীর সেই ধূমমলিন, প্রায়ান্ধকার নেটিভ খৃশ্চান পল্লীটির ভিতরে সেই ছোট্ট ঘরখানির জানালার ধারে বসিয়া জেকব-দম্পতীর কন্যা স্বর্গ-শোভা একখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত খৃষ্ট-পদাবলী পাঠ করিতেছে। ঘরটি অন্ধকার—কেবল জানালার ঠিক সামনে কর্পোরেশনের একটি গ্যাস-স্তম্ভ হইতে খানিকটা আলো জানালার কাছটিতে আসিয়া পড়িয়াছে; সেই আলোতেই মেয়েটি নিবিষ্টমনে সাধু পদাবলী মুখস্থ করিতেছে। বারান্দার এক কোণে বালিকার মাতা এরণ্ড তৈলের একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পাক করিতেছেন। যে পদটি মেয়ের খুব ভালো লাগিতেছে, মেয়ে উঠিয়া গিয়া সেইটি মাকে শুনাইয়া আসিতেছে।

পাশে তাহাদেরই মত এক দুঃখী নেটিভ খৃশ্চানের বাড়ী; তাহাদের ঘড়িতে আট-টা বাজিল; আর প্রায় সেই সঙ্গেই ইহাদের ঘরের কড়া বাজিয়া উঠিল। স্বর্গ-শোভা আর মহাজন পদাবলীতে মনঃ-সংযোগ করিয়া রাখিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

জেকব বিশ্বাস ঘরে ঢুকিয়া, মেয়ের মুখটি তুলিয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল। মেয়ের বয়স বার-তের বৎসর হইয়াছে।

জেকব লোকটির বয়স বছর চল্লিশ হইবে। ঘনশ্যাম বর্ণ, পাতলা একহারা চেহারা, দুঃখ-দারিদ্র্য-জনিত কষ্টের ছাপ মুখখানাতে সুস্পষ্ট। দেশী ছিটের মোটা একটি পাৎলুন, সেই ছিটেরই গলা-বন্ধ একটি কোট, মাথায় একটা সোলা টুপি, পায়ে শত তালিযুক্ত একজোড়া জুতা। জুতাটার রঙ পূর্ব্বে কি ছিল, অথবা এখন কি আছে, তাহা বোঝা যায় না।

জেকব জামা 'কাপড়' ছাড়িতেছে, স্বর্গের সুষমা হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া সেখানে আসিয়া, জামাটি, পাৎলুনটি, গেঞ্জিটি লইয়া বারান্দার দড়িতে, হাওয়ায় টাঙাইয়া দিয়া আসিল। এক বাল্তি জল, একটি টিনের মগ ও এক-খানি শতছিন্ন গামছা দ্বারের সামনে রাখিয়া, পাখাখানি হাতে লইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলো সেখানটাতেও পড়িতেছিল। স্বর্গের সুষমাকে

দেখিলে মনে হয় না যে তাহার মেয়ে এত বড় হইয়াছে, এমনই ছোট-খাট স্নিগ্ধ সুন্দর তার চেহারাটি। রংটি হয়ত এককালে খুবই ফর্সা ছিল, এখন তাহা নাই, মুখখানি হয়ত খুবই সুন্দর ছিল, এখন তাহা নাই;—তথাপি যাহা আছে, তাহাই দেখিবার মত। ছিপ্‌ছিপে দেহ-লতাটি হইতে শোভা ও সুষমা চেষ্টা করিয়াও বিদায় লইতে পারে নাই। পরণে একখানি লাল কস্তাপাড় শাড়ী, ধোপদস্ত নয় সত্য; তবে অপরিষ্কারও নহে। হাতে বেলোয়ারি বেগুণে রঙের দু'গাছি চুড়ী; মাথার বাম দিকে সিঁথি—তাহাতে হিন্দু নারীর মত, সূক্ষ্ম একটি সিন্দুর-রেখা। সুষমা বলে, 'সিন্দুর-চিহ্নটি তাহার মনকে প্রফুল্ল রাখে।' আর সে ত কোথাও যায় না, কাহার সঙ্গে বড় মিশে না, খৃশ্চান-নারীর সীমন্তের সিন্দুর লইয়া তাই সমালোচনাও বড় হয় না।

সুষমা বলিল—ওঠ, হাত মুখ ধোও, ভাত হয়ে গেছে।

জেকব নিঃশব্দে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া আসিল; ইত্যবসরে শোভা জানালার সামনে ছোট টেবিলখানি পাতিয়া, তাহার উপরে একখানা থালা পাতিল, একটা গ্লাসে জল ভরিয়া আনিয়া রাখিল। সুষমা গরম ভাত থালায় ঢালিয়া দিল। ভাতের দুইপার্শ্বে দুইটি গর্ত্ত করিয়া খানিক আলু-পেঁয়াজ-কুচা-চিংড়ীর একটা তরকারী ও অড়হর ডাল খানিকটা দিল। পিতা ও পুত্রী আহারে বসিল।

জেকবের মুখে আজ একটিও কথা নাই কেন? অন্য-দিন সে কত কথা বলে। বাজারের কথা, রাস্তার ভিড়ের কথা, সাহেবের কথা, এমন কত কথা!

সুষমা বলিল—হ্যাঁ গা, আজ কথা কইছ না কেন?

জেকব মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—কেন, কইছি ত!—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

ইহাদের খাওয়া হইয়া গেলে, সুষমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া ভাত তরকারী লইয়া খাইতে বসিল। খৃশ্চান হইলেও, সুষমার চাল-চলনটা হিন্দু নারীর মতই; স্বামী বা কোন পুরুষের সামনে নির্লজ্জের মত গপ্ গপ্ করিয়া খাইতে সে আজও পারিল না। বিবাহের পর কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে একাসনে আহার করিয়াছিল, মেয়ে বড় হইতে আবার সে 'হিন্দু' হইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি তখন দশটা, শোভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; সুষমা বাসন মাজিয়া, রান্নাঘর ধুইয়া, দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া শয্যায় প্রবেশ করিল। জেকবের দক্ষিণ পার্শ্বে নিদ্রিত শোভা, সুষমা বামপার্শ্বে আসিয়া বসিতেই, জেকব বলিল—সুষমা, কথা কইছিলুম না কেন, জিজ্ঞাসা কর-ছিলে না?

হ্যাঁ।

খবর ভাল নয়, সুষমা। মাইনে দশটি টাকা কমে গেল।

সুষমা চুপ করিয়া রহিল। কিছুদিন হইতে মাহিনা কমিবার প্রস্তাব শুনা যাইতেছিল; স্বামী-স্ত্রীতে তাহা লইয়া আলোচনাও চলিয়াছিল। সংবাদ সাংঘাতিক সত্য; কিন্তু অপ্রত্যাশিত নহে। এই সংবাদের জন্য সুষমা প্রস্তুত ছিল।

জেকব বলিল—বুঝলে সুষমা, কেন মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না।

সুষমা এইবার কথা বলিল; কণ্ঠে তাহার যতখানি মাধুর্য্য ছিল, অন্তরে তাহার যতখানি সান্ত্বনা ছিল, তাহা দিয়াই বলিল—তার আর কি হ'বে বল! হাত তো নেই; ওরই মধ্যে চালাতে হ'বে।

জেকব হাসিল; এ হাসিকে হাসি বলিব, না ক্রন্দন বলিব, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না; বলিল—বত্রিশ টাকায় তিন-তিনটে প্রাণীর চলে কখনও?

সুষমা বলিল—তিন টাকায় চলে, এমন পরিবারও আছে।

কথাটা মিথ্যা নয়।

জেকব সুষমার হাতখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে শোওয়াইয়া দিয়া বলিল—পারবে চালাতে মণি আমার—পারবে চালাতে?

—নিশ্চয় পারব। তুমি দেখো।

সতী নারীর কণ্ঠস্বরে বিশ্বের বিশ্বাস বোধ করি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; জেকব পরম নিশ্চিন্তমনে প্রিয়তমার মুখখানিকে টানিয়া নিজের মুখের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদিল। চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই একটি ধারা গড়াইয়া কপোলে পড়িয়া সুষমার কপোল ভিজিয়া উঠিল। সুষমা মুখ তুলিয়া স্বামীর গণ্ড স্পর্শ

করিয়া বলিল—তুমি না পুরুষ? তোমার চোখে জল? পুরুষের কান্না শোভা পায় না।

জেকব ধরা গলায় বলিল—না, তা শোভা পায় না। পুরুষ যে পরুষ! নহিলে জেনেশুনে আমার দুঃখের সংসারে এনে স্বর্গের সুষমাকে যে কষ্টটা দিয়েছি—

সুষমা জেকবের মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আবার সেই কথা! বলিনি তোমায় যে, ও-কথা শুন্‌লে আমার কান্না পায়! বলি নি তোমায় যে, আমার কোন কষ্ট নেই!

জেকব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—কষ্ট নেই বটে! পেট ভরে দুবেলা দুটো ভাতও তোমার জোটে না!

সুষমা বলিল, নাঃ, জোটে না! তোমায় বলেছে!

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া সুষমা আবার বলিল--তুমি যদি নারী হতে, আমার হৃদয় বুঝতে পারতে। পুরুষ তুমি, তুমি কি ক'রে বুঝবে যে, যত দুঃখ, যত দারিদ্র্য, যত কষ্টই হোক্ না কেন, স্বামী পুত্র থাকৃলে স্ত্রীলোক কত সুখী? তুমি কি ক'রে জান্‌বে, স্বামীকে খাইয়ে, ছেলে মেয়েকে খাইয়ে যদি অন্নকণা পেটে না-ও যায়, স্ত্রীলোকের তাতেও কষ্ট নেই? তুমি কি করে বুঝবে, স্বামীর ভালবাসা, ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধাভক্তি পেলে নারী আর কিছুই চায় না? হিন্দু-মেয়েরা যে বলে হাতের লোহা, সিঁথের সিঁদুরের চেয়ে বড় কাম্য আর নেই, তা কি মিথ্যে? সেই জন্যেই আমি সিঁদুর পরি, ঐ সিঁদুর আমার মাথায় অক্ষয় হোক্, এর চেয়ে বেশী আমি কিছু চাইনে—কিছু নয়। হিন্দুনারীর মতন, ঐ সিঁদুর মাথায় থাকৃতে থাকৃতেই যেন আমি মরি। হিন্দু-নারীর মতনই বা বলি কেন, আমিও ত হিন্দু। বাবা খৃশ্চান হয়েছিলেন; কেন হয়েছিলেন, তা জানিনে, কিন্তু তাঁর বাবা, তাঁর বাবা, তাঁরও বাবা—কত কাল, কত শতাব্দী, কত পুরুষ আমরা হিন্দু! হিন্দু শোণিত কি দু'বার গীর্জ্জেতে গিয়েই নিশ্চিহ্ন হয়েছে? কখনও না। আমি জানি, আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, আমাদের শোভাও হিন্দু। সমাজে স্থান না থাকে, না থাক্—আমাদের কাছে গির্জ্জেও নেই, সমাজও নেই, কিন্তু ঈশ্বর ত আছেন! সেই ঈশ্বর, তিনি কৃষ্টই হোন্, আর খৃষ্টই হোন্, তাঁতে যেন আমাদের ভক্তি থাকে—অসতে যেন মন না যায়—আমি অসুখী হব না, তোমাদেরও অসুখী করব না।

অন্য লোকের কাণে এই নারী-বক্তৃতাটি কেমন লাগিত বলিতে পারি না, কিন্তু সরল, সৎ, সত্য ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসী জেকব সেই অন্ধকারেও সুষমার মুখে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি দেখিতে পাইল; তাহার কণ্ঠের স্বরে আলাহাম্বিণী সান্ত্বনা অনুভব করিতে পাইল—দুটি চোখে জল টল টল করিতে লাগিল। দরিদ্র জেকব মুহূর্ত্তের জন্য দারিদ্র্য বিস্মৃত হইল; প্রৌঢ় জেকব ক্ষণেকের তরে তাহার বয়স বিস্মৃত হইল; জরা ভুলিল; সুষমার বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া নবীন প্রেমিকের মত জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেল।

আমার হৃদয়বান পাঠক, জেকবের জন্য কি তোমার দুঃখ হয়? আমার ত হয় না। মরা গাঙে জোয়ারের জলের মত, ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর মত, শুকনা ডালে ফুলের মত, দারুণ গ্রীষ্মে শীতল ধারার মত এমন ঘরণী যাহার, তাহার দুঃখ?—সুখের তুলনায় কতটুকু সে দুঃখ?

দুই

হাঁটু-ভোর কাদার মধ্য দিয়া লক্ষ-লোক-বাহিত রথচক্র যেভাবে চলিয়া থাকে, জেকব, তাহার স্ত্রী সুষমা ও কন্যা শোভা-বাহিত সেই ক্ষুদ্র সংসারটি সেইভাবেই চলিতেছে। পার্থক্য এই যে, রথের টানের সময় বিরাট কোলাহল উত্থিত হয়, এত অনটনের মধ্যেও এই সংসারটিতে কোনরূপ কোলাহল নাই।

মাহিনা কমিয়া গিয়াছে। প্রথমটা জেকব একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সংসারের নিয়মই এই; সম্ভাবিত শোক ও দুঃখের কল্পনাতেই মানুষ অস্থির হইয়া পড়ে, তার পর ধীরে ধীরে সকলই সহিয়া যায়। জেকবের দুঃখের সংসারে ব্যয় হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু সুগৃহিণীর চেষ্টায় ও যত্নে, তাহা এমনই ধীরে ধীরে, এমনই সন্তর্পণে করা হইয়াছে যে, তাহাতে কেহই বিচলিত হয় নাই।

জেকব খাইতে বসিয়াছে, সুষমা সামনে বসিয়া, শোভা বাতাস করিতেছে। কলায়ের থালার মাঝখানে ভাত, থালার যেখানটায় সাধারণতঃ লবণ দেওয়া হয়, সেই স্থানটিতে লবণ পরিমাণ চিংড়ী-সম্ভতি; আর কলমি শাকের একটু তরকারী।

সুষমা বলিতেছিল, আফিস-ফেরত আজ একবার বাড়ীওলা বাবুর কাছে যেতে ভুল' না।

জেকব বলিল—যাব; কাজ হবে কি-না কে জানে।

সুষমা বলিল—তা ত বটেই; তবে চেষ্টা করতে হ'বে ত? তুমিই ত বল, লোকটি ভাল, দয়া হ'লেও হ'তে পারে।

—হ্যাঁ, লোকটি বেশ।

জেকবের আহার শেষ হইল; সে কোটটা গায়ে দিয়া, ছাতাটি হাতে লইয়া বাহির হইতেছে; সুষমা বলিল—আর সেই গৃহশিল্প-প্রদর্শনীটার খোলবার দিনটা জেনে আসবার সময় আজ পাবে কি?

জেকব বলিল—হ্যাঁ, সে ত আফিসের পথেই, জেনে নেব'খন।

—জিনিষ পাঠাতে হ'লে শেষ দিন কবে, তা'ও জেনে এস।

আচ্ছা—বলিয়া জেকব চলিয়া গেল। শোভাকে খাওয়াইয়া, তাহার শতছিন্ন সেমিজটা সেলাই করিয়া, তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়া সুষমা আহারে বসিল। চিংড়ী-শিশু আর ছিল না, কলম্বী-চর্চ্চড়ীরও পরিমাণ ক্ষুণ্ণ—একমাত্র পোড়া লঙ্কা লবণ সহযোগে চারটি ভাত খাইয়া লইয়া সুষমা সেলাই লইয়া বসিল।

কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় শীঘ্রই একটি গৃহশিল্প-প্রদর্শনী বসিবে। সুষমা একটি সূচি-কার্য্য করিতেছে; ইচ্ছা আছে, সেইটিকে প্রদর্শনীতে পাঠাইবে। যদি সে'টি বিক্রয় হয়, সেই অর্থে শোভার দুইটা সেমিজ করিয়া দিতে হইবে। মেয়েটা স্কুলে যায়, বয়স হইয়াছে, অন্য কোনরূপ জামা না-জুটুক, সেমিজ ছাড়া স্কুলে যাওয়া যায় না! তাই, প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন দিবারাত্র কাজ করিয়া সুষমা শিল্প-কার্য্যটিকে প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। প্রদর্শনী খুলিবার যদি দেরী থাকে, তাহা হইলে, আর একটা কিছু বুনিয়া ফেলিবে। স্বামীর পাৎলুনটাও আর চলে না—দুইটা নূতন পাৎলুন করিয়া দিবার ইচ্ছাও আছে। তাহার নিজের কাপড় জামার দরকার বড় হয় না—কাপড় যাহা আছে, তাহাই আরও অনেকদিন চালান যাইবে—সে ত বাহিরে যায় না; কিন্তু উঁহাদিগকে যে বাড়ীর বাহিরে যাইতে হয়, পাঁচজনের সামনে বাহির হইতে হয়।

সন্ধ্যা-দীপটি জ্বালিয়া, তখনই নিবাইয়া দিয়া, সুষমা তোলা উনুনটি সেই গ্যাসালোকিত জানালার পার্শ্বে বসাইয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া ফেলিল। খিচুড়ীর একটা সুবিধা, বিনা-তরকারীতেই গলাধঃকরণ করা চলে। দুই বেলা মাছ-তরকারী কোথা হইতে হইবে?

রান্না-বান্না শেষ করিয়া, খিচুড়ীর হাঁড়ী, উনুন প্রভৃতি বারান্দার 'রান্নাঘরে' রাখিয়া আসিয়া, সুষমা মেয়ের সঙ্গে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে বসিল। খৃষ্টমাস-উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উৎসব দুঃখীর চৌকাঠ মাড়ায় না, ইহাদের ত্রিসীমানাতেও তাহাকে দেখা যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা যে কিছুই করে নাই তাহাও নয়। আজকাল রোজ সন্ধ্যায় মাতা-দুহিতায় ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে, কোন কোন দিন জেকবও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আজ জেকবের বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবে, কাজেই শোভাকে খাওয়াইয়া দিয়া, সুষমা জানালার পাশটিতে শিল্প-কার্য্য লইয়া বসিল।

ন'টার সময় জেকব আসিল; তাহার মুখ দেখিয়াই সুষমা বুঝিল, বাড়ীওয়ালার দয়া হয় নাই। সে প্রশ্ন করিল না। প্রদর্শনীর কথা তুলিল।

জেকব বলিল,—আজ শুক্রবার, আসছে শুক্রবারের মধ্যে জিনিষ পাঠাতে হবে।

সুষমার মুখ আনন্দের জ্যোতিঃতে ভরিয়া উঠিল। তাহা হইলে সাতদিন সময় পাওয়া গেল; আর একটা কাজ করিয়া ফেলিবার অবসর মিলিল!

জেকব খাইতে বসিয়া নিজেই বাড়ীওলার কথা তুলিল; বলিল—বাড়ীওলা এখানে নাই, চা'-বাগানে গিয়াছেন; তাঁহার ছেলের সঙ্গে দেখা, সে সাফ্‌ জবাব দিল, এক পয়সাও ভাড়া কমাইবে না।

সুষমা নীরবে শুনিতে লাগিল।

জেকব বলিল,—তার বাপের কাছে যখনই গেছি, কাছে বসাইয়া, পান দিয়া, কত গল্প করিতেন; আর ছোকরা একবার বসিতেও বলিল না; অমন বাপের এমন ছেলে কেমন করিয়া হয়!

সুষমা কহিল,—না কমাক্ গে যাক্, আমরা চালিয়ে নেব।

হাঁড়ীতে অন্নকণাটিও ছিল না, কোন রাত্রেই থাকিত না; সুষমা রাত্রের আহার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পাছে স্বামী বা কন্যা জানিতে পারে, বারান্দার সেই ঘরে

গিয়া কিছুক্ষণ এ'টা ওটা নাড়াচাড়া করিয়া অবশেষে কল হইতে খানিকটা জল খাইয়া ঘরে আসিয়া সেলাই লইয়া বসিত। রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সুষমা যখন শয্যা গ্রহণ করিত, তখন সর্ব্ব দেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বপ্রকারের শোক-দুঃখ-রোগ-সন্তাপহারিণী সুষুপ্তি দুঃখিনী নারীকে সযত্নে, সস্নেহে সর্ব্বশান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইতেন।

অন্য দেশের, অন্য বর্ণের নারীর কথা জানি না, বলিতে পারি না—ভারতের নারী—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, জৈন, খৃষ্টান নয়—ভারতের নারীর—এই রূপ, এই মূর্ত্তিই আমি দেখিয়াছি, দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

তিন

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, সুখ সুখকে, দুঃখ দুঃখকে অনুসরণ করিয়া থাকে। দরিদ্রের সংসারে রোগ ঢুকিলে তখন একেবারে ষোল-কলা সম্পূর্ণ হয়। জেকব এক মাস ধরিয়া জ্বরে ভুগিল, নেটিভ খৃশ্চান সমিতির চিকিৎসক বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু ঔষধ-পথ্য বিনা-পয়সায় হইত না। শোভা সহপাঠিনীদের নিকট হইতে দু' একটি টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিল, তাহা হইতেই যাহা হয় করিয়া রোগ-চর্য্যা চলিল।

তাহার আফিসও এমন যে সে মাসের মাহিনাটা পুরা দিল না। অর্দ্ধেক কাটিয়া লইল। বলিল, hard times!

এই সময়ে, একদিন গভীর রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ বাক্যালাপ চলিতেছিল।

জেকব বলিতেছিল—নিকল্‌সন রায় দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছে, শোভাকে সে গয়নায় মুড়ে রাখবে। আমাদের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তা'ও করবে। তা'র শুঁড়োর বাড়ীখানা আমাদের লিখে দেবে।

সুষমা বলিল—তার যদি রাজার ঐশ্বর্য্য থাকত, আর সে সবই আমাদের দিত, তা হ'লেও আমি তার হাতে শোভাকে দিতাম না। লম্পট নিকল্‌সন কত মেয়েকে যে ভাসিয়েছে, তা কি তুমি শোন নি? তার নামে পুলিশ-আদালতে অপকার্য্য ও নিষ্ঠুরতার মামলা হয় না, এমন দিন যায় না।

জেকব বলিল—কিন্তু আমি শুনেছি, তার সে-রকম ভাব নাকি এখন আর নেই। চরিত্র একেবারে শুধরে গেছে।

—তুমি বিশ্বাস কর ঐ কথা?

জেকব এ কথার আর উত্তর দিল না; তবে সে যে আশাভঙ্গজনিত দুঃখে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সুষমা হৃদয় দিয়াই অনুভব করিতেছিল। হায়! দুঃখের দিনের অবসান হয়, সে ইচ্ছা কি তাহার হৃদয়ের হৃদয় অহোরাত্রি কামনা করিতেছে না! দুঃখ কাহার বেশী? কাহাকে খালি ভাতের থালা স্বামী কন্যার সম্মুখে ধরিয়া দিতে হয়? বেদনা কাহার অধিক? কে প্রিয়জনদের একদিন, একটি দিন ভাল খাইতে, ভাল পরিতে দিতে পারে না? কিন্তু যত দুঃখই হোক, সারাজীবন তিলে তিলে মরিতেও হোক, নিকল্‌সনের মত হতচ্ছাড়া লম্পটের হাতে কন্যাদান করিতে প্রাণ ধরিয়া কখনও পারিবে না।

শোভার মুখের উপর রাস্তার গ্যাসের আলো পড়িয়াছিল। সুন্দর মুখখানি! এত অভাব অনটনের মধ্যেও মুখখানি সদ্যস্ফুট গোলাপটির মত স্নিগ্ধ, সুন্দর, কোমল, পেলব। নিষ্পাপ রক্তিম অধর, কালিমাবিহীন সুস্পষ্ট চোখের কোণ, কলঙ্কশূন্য কিশলয়—কোমল কপোল। দেবপূজার যোগ্য কুসুম কি পাষণ্ড নিকল্‌সনের সেবার জন্য সৃষ্ট হইতে পারে?

জেকব অনেকক্ষণ পরে বলিল—লোকটাকে কি বলা যায়, তাই ভাবছি। আমার আফিসের সাহেবদের সঙ্গে তার খুব মাখামাখি, পেছনে না লাগে আবার!

তাহা যে নিকলসনের পক্ষে অসম্ভব নয়, সুষমা তাহা জানিত বলিয়াই ভয়ে ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে-যে মা! সন্তানের হিত চিন্তার বড় তাহার প্রাণে আর কি আছে?

বলিল—শোভা এখনও তের'য় পড়ে নি, এইটুকু এক রত্তি মেয়ের বিয়ে দেব কি বলে?

জেকবের মাথায় একটা ফন্দী, ঘনমেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতরেখার মত খেলিয়া গেল। জেকব বলিল—ঠিক বলেছ সুষমা, শারদা আইনের বলে, চোদ্দ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিয়ে দিতে কেউই পারে না। শেষে কি জেল খাটব!

প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করা হইল বটে; কিন্তু দুঃখাবসানের

পথটি রুদ্ধ হওয়ায় জেকবের মন যে খানিকটা দমিয়াই রহিল, তাহা বলা বাহুল্য।

সুষমার ভয় ছিল, পাষণ্ড আফিসের সাহেবদের কাছে 'চুকলি' কাটিয়া একটা অনিষ্ট না ঘটায়!

নিকল্‌সন সেদিক দিয়া না গিয়া একটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ আবিষ্কার করিল। স্কুল-ফেরত শোভার সঙ্গ গ্রহণ করিয়া তাহাকে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, কার্নিভ্যাল প্রভৃতির লোভ দেখাইতে লাগিল। শোভার দু'একজন সহপাঠিনী সহজেই জালে পা দিতে আগ্রহশীলা হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখীর মেয়ে দুঃখী শোভা বিলাসের লোভে আদৌ আকৃষ্টা হইল না; বলিল—আমি ও-সব কখনও দেখি না।

'দেখিতে দোষ কি,' 'সব মেয়েই দেখে,' 'অনাবিল আনন্দ বই ত আর কিছু নয়' ইত্যাদি কোনও যুক্তিই শোভাকে টলাইতে পারিল না।

নিকল্‌সন আশা ছাড়িবার পাত্র নয়; পরের দিনও সে কুমারীগণ-সঙ্গ গ্রহণ করিল এবং নিউ মার্কেট, জু, মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইল। শোভা পূর্ব্বের মতই অচল, অটল। অন্য মেয়েরা শোভার উপর চটিয়া গেল; জনান্তিকে তাহার একগুঁয়েমি, ঠ্যাঁটাপণা, অভদ্রতার নিন্দাও করিল। স্কুলের দাসীকে নিকল্‌সন রৌপ্য-মন্ত্রে বশ করিয়াছিল, এদিন সে সব মেয়েকে বাড়ী পৌঁছাইয়া শোভাকে সব শেষে একাকী লইয়া চলিল। নিকল্‌সনের পক্ষে ইহা সুবর্ণ-সুযোগ। নিকল্‌সন ভাল কাপড়, ভাল জামা, ভাল জুতা, ভাল এসেন্স প্রভৃতির চার ফেলিয়া শোভার শুষ্ক মন সরস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নিকল্‌সন জানিত না, পাষাণ হইতে জল নিষ্কাশন সম্ভব নয়। দুঃখের চাপে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তরুণ-হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি এই তরুণীর হৃদয় হইতে অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। নিকল্‌সন কোনও ভরসাই পাইল না। ছল, কৌশল বৃথা গিয়াছে, বাকী বল। পরদিন তাহাই কার্য্যে লাগাইবে স্থির করিয়া নিকল্‌সন বিদায় লইল।

শোভার ভিতরটা কাঁদ কাঁদ হইয়াই ছিল; বাড়ীতে ঢুকিয়া, মাতার সম্মুখীন হইতেই সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া, সব কথা জানিয়া লইয়া, সুষমা বলিল—বুঝেছি শোভা, এ সেই নিকল্‌সন। কাল থেকে তোর আর স্কুলে যেতে হবে না।

শোভা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—পড়ব না?

সুষমা কহিল—না মা, বাড়ীতে যতটুকু হয়, তাই হ'বে। স্কুলে তোকে আর আমি যেতে দেব না। ঐ পশুটা যখন পিছু নিয়েছে, তখন কিসে কি হয়, কিছু বলা যায় না মা। ও লোকটার অসাধ্য কর্ম্ম নেই।

খুব কম ছেলেই শোভার এ সময়কার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে, কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই তাহার গভীর দুঃখ হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারিবে। পড়িতে না পাওয়ার যে দুঃখ, যে হতাশা, তাহা ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কেন যে বেশী অনুভব করে, তাহা অবশ্য আমি বলিতে পারিব না, তবে ছেলে ও মেয়ে—এই দুয়ের মনোভাব যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় লেখকের সঙ্গেই একমত হইবেন।

শোভা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন কথাও মনে হইল, মরিতে কেন সে পথের ব্যাপারটা মা'কে বলিতে গেল।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া জেকবও সকল কথা শুনিয়া মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই বিমর্ষ হইল। কত বিনিদ্র রজনী জাগিয়া স্ত্রী-পুরুষে তাহারা একমাত্র দুহিতার ভবিষ্যৎ চিন্তাই করিয়াছে। লেখাপড়ায় শোভার যেরূপ উৎসাহ, জ্ঞানলাভে তাহার যেরূপ অনন্যসাধারণ আগ্রহ, তাহার যেরূপ তীক্ষ্ণ মেধা, তাহাতে দুঃখীদম্পতী এরূপ আশা পোষণ করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হইত না যে-কালে শোভা হয়ত শিক্ষাবিভাগে বড় চাকরী পাইয়া তাহাদের শেষের দিনগুলা স্বচ্ছন্দ করিয়া দিতে পারিবে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ কোর্স প্রায় তৈরী। প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলিয়াছেন, শোভা যদি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারেন, তিনি শিক্ষা-বিভাগের কোন-একটা বৃত্তি শোভার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন, শোভা মধ্য ও বি-এ পড়িয়া অনায়াসে শিক্ষাবিভাগে একটি কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবে। হায়, আশার গতি কি দ্রুত ও দূরস্পর্শী! আর কত স্বল্পক্ষণস্থায়ী, কত ক্ষণভঙ্গুর!

শোভা সে রাত্রে খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, দুঃখের ভারে কণ্ঠ অবরুদ্ধ-প্রায়; খাইবে কি করিয়া?

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া ইহা স্থির হইল—পরদিন জেকব স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া গাড়ীতে করিয়া শোভাকে লইয়া যাইবার ও রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা হয় কি-না জানিবে; যদি সেরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে শোভার লেখাপড়া চলিবে, নতুবা ঐ পর্য্যন্ত।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—মিষ্টার বিশ্বাস, আপনি দেখিতেছি, আমাদের সমাজেও পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত করিতেই যত্নবান।

পাছে গরীব দাসীটির অনিষ্ট ঘটে, জেকব আসল কথাটা বলিল না, একটু ঘুরাইয়া বলিল—জানেনই ত, সব পাড়ায়ই ভাল মন্দ কতকগুলি করিয়া ছোকরা থাকে; কিছুদিন হইতে জানিতে পারিয়াছি, কয়েকটি মন্দ প্রকৃতির লোক শোভাকে জ্বালাতন করিতেছে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—সে রকম দুই একজন লোকের নাম ঠিকানা আমায় অনুগ্রহ করিয়া দিন, আমি আজই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদিগকে 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিতেছি।

জেকব আরও ভয় পাইয়া গেল। নিকল্‌সন অর্থবান, সে যদি ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারে, অর্থবলে সে বাঁচিয়া যাইবে, এবং সেই অর্থের জোরেই ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পশ্চাদপদ হইবে না।

জেকবকে নীরব দেখিয়া শিক্ষয়িত্রী কহিলেন—আপনি তাহাদের চিনেন না বুঝিলাম; আচ্ছা, শোভা চিনে ত! আমি একদিন শোভার সঙ্গে গিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া লইব।

জেকব বলিল—কিন্তু শোভার মা আজ হইতেই শোভার স্কুলে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষয়িত্রী চক্ষু কপালে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—তাহা কখনই হইতে পারে না। শোভার সম্মুখে একটা অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা এই ভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়, মিষ্টার বিশ্বাস। আচ্ছা, এক উপায় হইতে পারে, তিনটি মুসলমান মেয়ে গাড়ী করিয়া স্কুলে আসে-যায়, তাহাদের প্রত্যেকের তিন টাকা করিয়া মাসে লাগে, সেই গাড়ীতে শোভাকে আনা যাইতে পারে; কিন্তু দুই টাকা করিয়া আপনার লাগিবে।

জেকব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মেয়েটা পড়িতে পাইবে ত! দু'টাকা যেমন তেমন করিয়া জোগাড় করিতেই হইবে। আফিসে রোজ দুই পয়সা টিফিন খায়, সেইটা বন্ধ করিলে প্রায় এক টাকা হয়, আর এক টাকা সংসার হইতে বাঁচাইতে হইবে। জেকব শিক্ষয়িত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

টিফিনের পয়সা সুষমা বাঁচাইতে দিল না; সংসার হইতেই দুইটি টাকা বাঁচাইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। পাঠক, তুমি বিস্মিত হইতে পার, গঞ্জিকাসেবীর অভ্যাস বলিয়া রহস্য করিতেও পার, কিন্তু আমার পাঠিকা-রাণীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন—সুষমা আগে মাত্র একটিবার অন্নাহার করিত, দুইটি টাকার জন্য সেই একবারেরও অর্দ্ধেকটা সে কমাইয়া দিল। দু'টাকা বাঁচিল।

মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে বন্ধ গাড়ীতে চড়িয়া শোভা স্কুলে যায় ও আসে। নিকল্‌সন গাড়ীর কাছেও ঘেঁসিতে সাহস করে না—গাড়োয়ানটাকে দেখিতে যেন জল্লাদ।

চার

সকালের ডাকে চিঠি আসিয়াছিল, সুষমার দুইটি শিল্পকার্য্যই প্রদর্শনীতে বিক্রীত হইয়াছে। দুইটির মূল্য পাওয়া গিয়াছে, কুড়ি টাকা। ষ্টল-খরচা, কমিশন ইত্যাদি কাটিয়া লইয়া প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ মণিঅর্ডারে আঠারো টাকা বারো আনা পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুপুরে মণি-অর্ডার-পিওন টাকা দিয়া গেল। জেকব আফিসে, শোভা স্কুলে, সুষমা টাকা কয়টা বুকে চাপিয়া মাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কতদিন—কতদিন পরে এমন সুনিদ্রা তাহাকে অখণ্ড শান্তি দান করিল।

শোভার জন্য একজোড়া কাপড় আসিল; তাহার সেমিস্‌ ও বডির জন্য রঙীন ছিট ও জেকবের পাৎলুন ও কোটের জন্য মোটা জিনও খানিকটা আনা হইল। সুষমা একরাত্রের মধ্যেই পিতা ও পুত্রীর একটি করিয়া জামা তৈরী করিয়া দিল। শোভা যখন নূতন কাপড়, সেমিস্‌ ও বডি পরিয়া স্কুলে গেল, জেকব যখন তাহার নূতন

পাৎলুনের উপর কোটটি পরিতেছিল, তখন সুষমার দুই চক্ষু বহিয়া যে অশ্রু-উৎস ছুটিল, কাব্যে-উপন্যাসে তাহারই নাম আনন্দাশ্রু। দুঃখীর গৃহ ছাড়া, দরিদ্রের চক্ষু ছাড়া এ অশ্রু আর কোথায় ঝরে!

এ হতচ্ছাড়া পাড়া দিয়া কখন কোনও ফেরিওয়ালা যায় না, আজ এক দুর্ভাগা কি-জানি-কেন "মাছ নেবে গো" হাঁকিয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল, সুষমা তাহাকে ডাকিয়া জ্যান্ত কৈ মাছ এক পোয়া কিনিয়া ফেলিল। পথের উপর বসিয়া দাঁড়াইয়া, সোরগোল করিয়া কয়েকটি শিশু মার্ব্বেল খেলিতেছিল, তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া একটি পয়সা অগ্রিম পারিশ্রমিক দিয়া, নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে আধসের আলু, এক ছটাক ঘি আনাইয়া লইল।

সে-রাত্রে পিতা-পুত্রী যখন বারবার অন্ন চাহিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিল, তখন সামনে বসিয়া দেখিতে দেখিতে সুষমা আবার কাঁদিল। পাছে স্বামী-কন্যা চোখের জল দেখিতে পায়, সুষমা বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রে জেকবের হাতখানা হঠাৎ সুষমার গায়ে পড়িতেই জেকব চমকিত হইল। গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সুষমা বলিল—ও কিছু নয়।

"উহা যে কিছু" "অবশ্য কিছু"—ইহা সুষমা কিছুতেই মানিল না। সংসারটি নিজের হাতে যেমন চালাইয়া লইয়া যায়, তেমনই চালাইতে লাগিল।

কিন্তু একদিন আর পারিল না, সকালে শয্যাত্যাগ করিতে গিয়া পড়িয়া গেল। জেকব ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল; সে মূর্খ কিছুই বুঝিল না, একটা ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঔষধে রোগ বাগ মানিল না। তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেছে, উত্থানশক্তিরহিত সুষমা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, শোভা বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছে, জেকব বাহিরে কোথায় গিয়াছিল, আসিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—নিকল্‌সন সাহেব-ডাক্তারকে আনতে চায়।

সুষমার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু অগ্নিবৃষ্টি করিল; অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর জলন্ত অঙ্গার উদ্গীর্ণ করিল; বলিল—আবার নিকল্‌সন!

জেকব বলিল—কিন্তু সুষমা, কাসির সঙ্গে রক্ত—ও যে বড্ড ভয়ের কথা!

সুষমা হাসিয়া বলিল—কিসের ভয়?

ভয় যে কিসের, মন তাহা শতমুখে বলিলেও, মুখ তাহা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারে না। জেকব শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল। সুষমা জোর করিয়া তাহাকে আফিসে পাঠাইয়া দিল, শোভা বাড়ীতেই রহিল।

বিকালের দিকে শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল। ছেলেমানুষ শোভা কি যে করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কিছু ভাবিয়া না পাইয়া কি-রকম হইয়া উঠিল। সুষমা বলিল—কিছু ভয় নেই মা, তিনি আসুন, তারপর যা হয় হবে। তুই শুধু বাইবেল্ পড় মা।

শোভা ভক্তিগদগদকণ্ঠে একটির পর একটি ক্যাণ্টো পড়িয়া যাইতে লাগিল, সুষমা মনঃপ্রাণ স্থির করিয়া শুনিতে লাগিল।

তখনও অপরাহ্নের আলো ধরণীতল রক্তিম করিয়া রাখিয়াছে, শ্রান্ত বিহগের শান্ত-কলগীতি তখনও অখিল-অনিলে ঝঙ্কৃত হইতেছে, সুষমা বলিল—শোভা, উনি এসেছেন মনে হচ্ছে। দোরটা খুলে দেখ্‌ত মা!

শোভা বলিল—না মা, বাবা এখনও আসেন নি; তাঁর আস্‌বার সময়ও ত হয় নি মা!

সুষমা ম্লানমুখে হাসি আনিয়া কহিল—সময় হয়েছে শোভা, সময় হ'য়েছে। তুই দেখ্‌ গিয়ে তিনি এসেছেন।

শুধু মা'র কথা রাখিতেই শোভা উঠিয়া গেল—সুষমা-সুষমার মুখে আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সে আকুল-আগ্রহে দ্বার-পথে চাহিয়া রহিল।

জেকব সকাল সকালই আসিয়াছিল, সে'ও দ্বার-সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে, শোভা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—মা কেমন করে জান্‌লেন যে তুমি এসেছ! তুমি ত কড়াও নাড় নি, কিছুই না। আমায় বল্লেন, দোর খুলে দে; তিনি এসেছেন।

এ-কথায় জেকব আরও ভয় পাইয়া গেল।

সুষমা বলিল—আমার মাথাটা তোমার কোলে তুলে নাও; শোভা আমার বুকে হাত রাখ মা। ভগবান, এই ত স্বর্গ!

তারপর শোভা বুকের ওপর লুটাইয়া পড়িয়া কত

ডাকিল, জেকব মুখে মাথায় চুম্বনে ভরিয়া দিল কিন্তু…… স্বর্গের সুষমা, মর্ত্ত্য ছাড়িয়া চলিয়া গেছে!

গরীবের ক্ষুদ্র কুটীর, আলো নাই, বাতাস নাই, উৎসব নাই, কোলাহল নাই—বিজনঘন বনের মত শান্ত, স্তব্ধ, নীরব, নিথর। ছোট্ট ঘরের ছোট্ট-খাট্ট ভাঙাচোরা আসবাবের মাঝখানে প্রাণহীন একখানি দেহ, আর শিয়রে, পার্শ্বে, ক্ষীণ-প্রাণ এই পিতা পুত্রী! অন্ধকার—তাই রক্ষা, নতুবা হয় ত যাহাদের প্রাণ এখনও দেহপিঞ্জর-মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিতেছে, পরস্পরের দিকে দৃষ্টি পড়িলে তাহাদের প্রাণও দেহমুক্ত হইয়া পড়িত। মরুভূমির মধ্যে ছিল একটিমাত্র পান্থ-পাদপ, তাহারই অঙ্গ বহিয়া বাহির হইত, এক এক বিন্দু বারি—বিশ্বের মধু ছিল সেই বারিবিন্দুতে মিশ্রিত; বিগলিত স্নেহে, প্রেমে, করুণায় ভরা সে পাদপও আজ ভূপতিত।

রাস্তার সেই গ্যাসটা জ্বলিয়া উঠিতেই এক রাশ আলো আসিয়া সেই মুখখানিতে পড়িল, যে মুখখানি আঁধার রাতে তারার জ্যোতিঃ বিকীরণ করিত, যে মুখখানি সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, যে মুখখানি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শুষ্ক হয় নাই, রোগে কালো হয় নাই, মৃত্যু যে মুখে মলিনতা দিতে পারে নাই, হিন্দুর আয়তি-চিহ্ন সিন্দূর-রেখায় উজ্জ্বল সেই মুখখানি! এমন শান্ত-শোভা, এমন অনাবিল প্রসন্নতা, এমন মধুময় পরিপূর্ণতা—কে বলিবে বিগতজীবন সে! কে বলিবে নারী মরিয়াছে?

নারী মরে না! যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে নারী এমন করিয়াই তনু ত্যাগ করে; মরে না। হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিল, সে বড় দাতা সন্দেহ নাই; কিন্তু সে'ও নিজেকে রাখিয়াছিল। তাহারও বড় দাতা, নারী! দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়া, প্রতিটি শিরা দিয়া, প্রতিটি শোণিত বিন্দু দিয়া, নারী ছাড়া এমন দান আর কে করিতে পারে? মুখের হাসি, চোখের ঘুম, দেহের সুখ, মনের শান্তি, নারী ছাড়া আর কে এমন করিয়া উৎসর্গ করিতে পারে? দেহের রক্ত, বক্ষের মধু, প্রাণের শ্বাস কে এমন করিয়া দান করে?—নারী! বিশ্বের দৃষ্টির অন্তরালে, গৃহের একটি কোণে, সেবাসমাহিতচিত্তা নারী, কেমন-একদিন শান্ত চরণ ক্ষেপে, তৈলহীন ভোরের দীপটির মত ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হয়! শোক-সভা হয় না, স্মৃতি-মন্দির কেহ গড়ে না, বুঝি-বা দু'দিন পরে দু' ফোঁটা অশ্রুও কাহারও দু'নয়ন ভারাক্রান্ত করে না—তবু সে সর্ব্বস্ব দান করিয়া, সর্ব্বহারা হইয়া অবশেষে তাহাকেও হারাইয়া দেয়! কে-জানে কেমন করিয়া এমন হয়! কে-জানে স্রষ্টা কেমন করিয়া নারীকে গঠন করেন! সৃষ্টির আদিতেও তাহা যেমন রহস্যাচ্ছন্ন ছিল, আজও তাহা তেমনই রহস্যে ঢাকা, বুঝি-বা সৃষ্টির অন্তেও তাহা তেমনই রহস্যাবৃত থাকিবে।

রাত্রি হইল, জেকব শোভাকে বলিল, আর দেরী নয় মা, ওঠ্!

শোভা মায়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল, শিয়রের নীচে কয়টি টাকা! এত বড় দুঃখের সময়েও শেষ-খরচের টাকা ক'টির ভাবনাও বড় কম ছিল না! ইহারই জন্য আবার নিকল্‌সনের দ্বারস্থ না হইতে হয়। কিন্তু সমাধির খরচও রাখিয়া গিয়াছে সে—
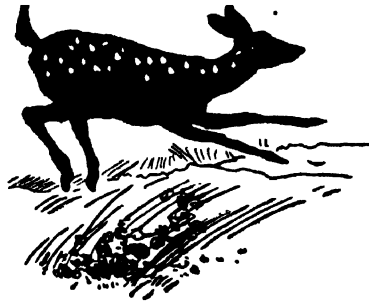
তাশের-প্রাসাদ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বন্ধু! এ ভয় জেগেছিলো মনে
হয়ত' একদা এমনি হবে—
তোমার নয়নে আমার রূপের
মোহ-অঞ্জন মিলাবে যবে!

হে প্রিয়, তোমার দোষ নেই কিছু
তোমাদের এই স্বভাব জানি,
পুরুষ তোমরা—বহু-বল্লভ!—
তবু তোমাদের অভাব মানি;

তোমাদের যারা ভালোবেসে করে
নিঃশেষে নিজ আত্মদান,
তাদের জীবন দুর্ব্বহ করো,
বিক্ষত করো তাদের প্রাণ!

একটি নারীর সব কিছু নিয়ে
তবুও তোমরা তৃপ্ত নও,
ক্ষণিকের খেলা—না-ফুরাতে বেলা
নব-হৃদি-জয়ে লিপ্ত হও!

প্রেম যায়, তবু বরণ-মালার
বন্ধনে বাঁধা ছন্দ ল'য়ে
প্রাণহীন সেই প্রণয়-গীতের
সুর ভাঁজি মোরা অন্ধ হ'য়ে!

একদা যেদিন ভুল ভেঙে যায়
চেয়ে দেখি হায়,—চূর্ণ বুক,
কূল-হারা ফুল ভেসেছে অকূলে
ডুবে গেছে তার সকল সুখ!

*　*　*

তুমি এসেছিলে আমার আকাশে
প্রথম-অরুণ-উদয় সম
প্রভাত-আলোয় ভেবেছিনু—বুঝি
তুমিই জীবন-দেবতা' মম!

তোমার পত্র দিয়েছিলো ঢেকে
এ মরু-প্রাণের আতপ-তাপ,
তব অনুরাগে গিয়েছিলো মুছে
অতীত দুখের শোনিত-ছাপ;

নব জনমের পেয়েছিনু স্বাদ,
নব জীবনের অভ্যুদয়
এনেছিলো ওগো—তব ভালোবাসা—
ভাবিনি যে তাও' মিথ্যা হয়!

ভুলে গিয়েছিনু সকল অভাব,
আমার সকল বেদনা-স্মৃতি,
কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছিলো
শূন্য-হৃদয়ে তোমার প্রীতি!

তোমার প্রেমের উচ্ছ্বাস-বাণী
শ্রবণে অমৃত ঢেলেছে যত
তনু-মন-প্রাণ সব ক'রে দান
ঘন অনুরাগে ডুবেছি তত।

আপনার জন ভুলেছি সবারে
চেয়েছিনু শুধু তোমারি মুখে,
মরণের পর স্বর্গ মানিনি,
স্বর্গ মেনেছি তোমারি বুকে!

অমরাবতীর স্বপ্ন দেখেছি
অধরে তোমার অধর ছুঁয়ে,
সোহাগ পরশে হরষে কেঁপেছি
আবেশে পড়েছি চরণে নু'য়ে।

তোমার নিবিড় আদরে আমার
সকল অঙ্গ উঠেছে কেঁপে,
তব আশ্লেষে পুলক বিজুরি
খেলেছে বেপথু এ তনু ব্যেপে!

সে যে প্রতারণা—বুঝিতে পারিনি—
এমনি তোমরা কপট-ছল,—
ক্ষোভে-লজ্জায়-ঘৃণায় আজিকে
বাধা নাহি মানে চোখের জল;

নারীর জীবন—নারীর হৃদয়—
তোমাদের কাছে শুধুই খেলা—
এ কথা জেনেও ভুলেছিনু,—তাই
ব্যর্থ হ'লো এ প্রাণের মেলা!

পুরুষের প্রেম—শুধু অভিনয়—
কৃত্রিম জেনে যত্ন তার—
তবু—তারি হাতে দিয়েছি বিলায়ে
নারী জীবনের রত্ন সার!

সুদৃঢ় দুর্গ ভেবেছিনু যারে
চেয়ে দেখি আজ হঠাৎ জেগে
তাশের-প্রসাদ!—ভেঙে পড়ে গেছে—
কে জানে কখন বাতাস লেগে!

মাইকেল ও বিদ্যাসাগর

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, এম-ডি, এফ্-এ, এস্-বি

৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৩৬ পৃষ্ঠায়—বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলকে কিরূপ অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে দিয়াছেন—

"মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মহত্বের ও সহৃদয়তার উপযুক্ত কার্য্য করিলেন। তাঁহার নিকট সে সময়ে মধুসূদনের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ছিল না। তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনর শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি মধুসূদনকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন। অবশিষ্ট তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিশোধিত ছিল।" এই উক্তির সমর্থনে গ্রন্থকার কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে ৪৮৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে—"মধুসূদন ইংলণ্ডে অধ্যয়ন কালে কিম্বা এ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কোন দিনও ঈশ্বরচন্দ্রকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সে ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে হইয়াছিল।" পৃঃ ৪৮৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে মধুসূদনের ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহাকে সংস্কৃত যন্ত্রের তিন ভাগের দুই ভাগ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স প্রকাশিত সটীক মেঘনাদ-বধ কাব্য সংস্করণের ভূমিকাতে মাইকেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। তাহাতে বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"এই পাঁচ বৎসর তাঁহাকে অর্থাভাবে বিদেশে মরণাধিক যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় ছয় হাজার টাকা দিয়া কবিকে ঋণমুক্ত ও স্বদেশ প্রত্যাগমনের সুযোগ করিয়া দেন।"

৺বিহারীলাল সরকার তাঁহার বিদ্যাসাগর-জীবনীতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে এরূপ যেন কেহ না মনে করেন যে মাইকেল ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কুমৎলবে বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার ঋণ পরিশোধ

করিবার ক্ষমতাই ছিল না। তাঁহার অপরিমিত ব্যয়ই তাহার প্রধান কারণ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'মধু-স্মৃতি' নামক ধারাবাহী প্রবন্ধনিচয়ে মাইকেল সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু মাইকেলের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে "উপরিউক্ত পত্র পাঠে বুঝা যায় (আমরা কিন্তু সেই পত্রে ঋণ পরিশোধের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে পাইলাম না) যে মধুসূদন তাঁহার ব্যারিষ্টারি ব্যবসার প্রথম বৎসরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ (সম্ভবতঃ ২।৩ হাজার টাকা) পরিশোধ করিয়াছিলেন। আরও কিছু দিয়াছিলেন কি না আমরা জানিতে পারি নাই। যে বিপুল ব্যয়—তাহাতে কোথা হইতে কি হইবে।"

ভারতবর্ষ ৪র্থ বর্ষ ১৩২৩, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ২২৭ পৃঃ—

৺সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত বিদ্যাসাগর চরিতে—

(Isvara Chandra Vidyasagar—A story of his Life and Works By Subal Chandra Mitra) ৩৯১ পৃঃ মাইকেল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"After his return to Calcutta Michael obtained from Vidyasagar 4000 rupees over and above the 6,000 rupees that had been remitted to him in Europe by his generous friend. *But he never repaid a single pice.*

The 6,000 rupees which Vidyasagar remitted to Michael in Europe, he had raised by loan from Onoocool chandra Mukerjee and Sris Chandra Vidyara'na.

Besides, he had borrowed from them other sums on Michael's account to pay off his other debts which were very considerable. When Michael returned from Europe, Onoocool chandra began to make pressing demands for repayment of his money as will be seen from the following letter which was addressed by him to Vidyasagar—

April, the 8th, 1867.

My dear Sir,

* * * *

"I am at present much in want of money, pray oblige me by letting me have the 3,000 Rs. and the interest on 12,000 Rs. mortgage. You are aware that no interest has yet been paid.

"Now that Mr. Michael is here, he ought to settle these affairs without delay. How do you do ? I hope well. Believe me

Yours very sincerely
sd O. C. Mookerji.

ইহার অনুবাদ—

মাইকেল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার পর বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ৪,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার উদার-হৃদয় বন্ধুর নিকট হইতে পূর্ব্বে ইউরোপে প্রেরিত ৬০০০৲ টাকা ব্যতীত এই টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এক পয়সাও প্রত্যর্পণ করেন নাই।

ইউরোপে প্রেরিত ৬,০০০৲ টাকা, বিদ্যাসাগর অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে ঋণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর মাইকেলের অন্যান্য বহু ঋণ পরিশোধ জন্য উঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করেন। মাইকেল কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে অনুকুলচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার টাকা পরিশোধার্থ বিশেষরূপে তাগিদ করেন। নিম্নলিখিত পত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়—

এপ্রিল ৮ই, ১৮৬৭

প্রিয় মহাশয়—

* * * *

বর্ত্তমানে আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ৩০০০৲ টাকা ও বন্ধকী ১২,০০০৲ টাকার সুদ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনি জানেন যে কোনও সুদ অদ্যাপি দেওয়া হয় নাই।

এক্ষণে মাইকেল এখানে আছেন। এই সকল কার্য্য আর দেরী না করিয়া তাঁহার বন্দোবস্ত করা উচিত। আপনি কেমন আছেন। আশা করি সব কুশল।

আপনার একান্ত বশম্বদ
ও, সি, মুখার্জ্জী

বাবু মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মাইকেলের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের পুরাতন কর্ম্মচারী। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে মাইকেল তাঁহার তালুকের পত্তনিদার নিযুক্ত ও বিলাতে টাকা পাঠাইবার ভার অর্পণ করিয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বিলাত যাত্রা করেন। মাইকেলের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্য (১২৬৮—৭৪ পর্য্যন্ত) ৩০০০৲ টাকা, পরে ৩৫০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। কিন্তু মহাদেব বাবু মাইকেলকে এক রোকা দিয়া আপত্তি করায় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার বার্ষিক আয় (১২৭৫ হইতে) ৩০০০৲ তিন হাজার টাকাই সাব্যস্ত হয়। বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে তাঁহার বিষয়ের গাঁতিদার ও পত্তনিদার নিযুক্ত করেন (১২৬৮ সাল ৯ই আশ্বিন ১৮৬১ খৃঃ অঃ ১লা অক্টোবর)। এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, বিলাতে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চারি কিস্তীতে ২৯৯৭॥০ টাকা পাঠাইবেন। তন্মধ্যে মাইকেলের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার জন্য কলিকাতায় মাসিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা হিসাবে দিবার নিয়ম করেন। তাহাদের জন্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহার স্ত্রী নিয়মিতরূপে মাসিক বরাদ্দ টাকা না পাইয়া ১৮৬৩ খৃঃ অঃ মে মাসে বিলাতে মাইকেলের নিকট যাইতে বাধ্য হন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিয়াছেন—"মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামক তাঁহার পিতার কর্ম্মচারী ও প্রতিপালিত জনৈক ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভূসম্পত্তি পত্তনি প্রদান করিয়া এবং খিদিরপুরের বাসভবন তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার জীবনীকার বলেন 'এইরূপ স্থির হইল যে মহাদেব মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিয়ৎপরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন এবং তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র তাহার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত হিতৈষী ব্যক্তি মহাদেবের প্রতিভূ হওয়াতে মধুসূদন ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অথবা তাঁহার পত্নীকে অর্থাভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।'

"মধুসূদনের পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রাজা দিগম্বর মিত্র ব্যতীত বৈদ্যনাথ মিত্র নামক আরও এক ব্যক্তি তাহার প্রতিভূ স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"

ভারতবর্ষ। ৩য় বর্ষ, ২খ, ৫ সং, ৭৬৪-৬৫ পৃঃ।

"মহাদেব বাবু মাইকেলকেও টাকা নিয়মিতরূপে পাঠাইলেন না। কতকাংশ পাঠাইবার পর তিনি একেবারে টাকা পাঠান স্থগিত করিলেন। বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র ও মাইকেলের পিসতুতো ভাই—বৈদ্যনাথ মিত্র আইনানুযায়ী কলিকাতায় তাঁহার প্রতিভূ (এজেণ্ট) স্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। মহাদেব বাবুকে ও তাঁহাদিগকে মাইকেল অর্থ জন্য বহুবার তাগিদ পত্র দিলেন। অর্থ পাঠান দূরে থাকুক, শেষে পত্রের উত্তরও তিনি পাইলেন না। বিদেশে অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উত্তমর্ণরাও তাঁহাকে ঋণদানে বিরত হইলেন। ঋণভার-প্রপীড়িত মাইকেলের দৈন্যদশা এইবার চরম সীমায় পৌছিল। কেন না এইরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা উপস্থিত হইলেন। কলিকাতা হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা না পাইয়া এবং পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাওয়ায় মাইকেল বিষম বিপদে পড়িলেন। ফ্রান্সে তাঁহার জেল হইবার উপক্রম হইল। অগত্যা ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে টাকা পাঠাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার দুঃখের কাহিনী পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর ঋণ করিয়া শীঘ্র ১৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া মধুসূদনকে সাহায্য করেন। মধুসূদনও তাঁহার বিষয়ের বন্দোবস্ত, মহাদেব বাবুর নিকট প্রাপ্য ৪০০০৲ টাকা আদায় ও অবশেষে বিষয় বন্ধক রাখিয়া ১৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার বন্ধু হাইকোর্টের উকীল (পরে জজ) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিষয় বন্ধক রাখিয়া ১২০০০৲ টাকা কর্জ্জ করেন। এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাসাগর নিজ দায়িত্বে পূর্ব্বেই ৩০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে ৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ করেন। শেষোক্ত টাকার জন্য

বিদ্যাসাগর মাইকেলকে বিশেষ তাগাদা করিয়া এক পত্র লিখেন। কিন্তু টাকা আদায় হইল না * * * * * মধুসূদনের ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্রের তিনভাগের দুই ভাগ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।"

চণ্ডীচরণ বন্দ্যো—বিদ্যাসাগর। পৃঃ ৪৮৯।

কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ৫০৫ পৃঃ এইরূপ লেখা আছে—"মধুসূদনের ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ছাপাখানার ১।৩ অংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।"

বিদ্যাসাগর যেরূপ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃ আর কেহ করিতেন কি না সন্দেহ। বিষয় যাহাদের নিকট গচ্ছিত বা যাহাদের নিকট টাকা পাওনা, তাহাদের নিকট টাকা পাইবার আশা নাই দেখিয়া বিদ্যাসাগর ঋণ করিয়া টাকা পাঠান। এইরূপ সাহায্যকারী বন্ধু মাইকেলের অদৃষ্টে জুটিয়াছিল। কিন্তু মাইকেল যে তাঁহার এক পয়সা ঋণ পরিশোধ করেন নাই, এই উক্তি সত্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুকূল বাবুর নিকট হইতে যে ঋণ করেন তাহা সুদে ও আসলে নিজ তালুক বিক্রয় করিয়া ১৯০০০৲ টাকা শোধ দেন। এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত (ক) চিহ্নিত দলীল পাঠ করিলেই তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মাইকেল ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। তবে তাহা ঋণ করিয়া ঋণ পরিশোধ। বিদ্যাসাগরকে তাঁহার সমস্ত ঋণের এক ফর্দ্দ দিয়া যে সাহায্য চাহিয়াছিলেন তাহা বিদ্যাসাগর কেন, সকলেরই সাধ্যাতীত।

মাইকেল মিথ্যা কথা বা প্রবঞ্চনা আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। বিদ্যাসাগরের ঋণ তিনি, পত্রে, কবিতায়, ও বন্ধুবান্ধবের নিকট মৌখিক উল্লেখ করিয়া বহুবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাইকেল তাঁহার বৈষয়িক বন্দোবস্তের জন্য একখানি আইন-সঙ্গত Power of attorney লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই দলীলের ক্ষমতায় বিদ্যাসাগর মাইকেলের বিষয় সম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপ করিতে পারিতেন (৪২ নং পত্র, যোগীন্দ্র বাবুর 'জীবনচরিত' ৫র্থ সংস্করণ) বিলাত যাইবার পূর্ব্বে টাকার জন্য বিশেষরূপে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্যারিসে যখন কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন তখন মহাদেব বাবুর নিকট তাঁহার ৪০০০৲ টাকা পাওনা হইয়াছিল—(৪০ নং পত্র)। সেই টাকা আদায় করিয়া বিলাতে কিয়দংশ টাকা পাঠাইতে ও বক্রী টাকা হইতে অন্যান্য বন্ধুদিগের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১০০০৲ টাকা শোধ করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে (৩৯ নং পত্র) উক্ত ৪০০০৲ টাকার সুদ দিবার জন্য পাওনাদারকে দায়ী করিতে লিখেন। বিদ্যাসাগর একবার বিলাতে ১০০০৲ টাকা পাঠান তাহা সম্ভবতঃ—তাঁহার আলিপুর কোর্টে পাওনা ১০০০৲ টাকা হইতে সংগৃহীত (I suppose the amount sent by you is the money I had in the Alipure Court"—৪১ নং পত্র)। অনুকূল বাবুর নিকট হইতে গৃহীত ৩০০০৲ টাকা, এবং বন্ধকী-খতে ১২০০০৲ টাকার সুদে আসলে ১৯০০০৲ টাকা নিজ তালুক বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করেন ((ক) চিহ্নিত দলীল)।

যোগীন্দ্র বাবু মাইকেলের জীবন-চরিতে ৪৪১ পৃঃ—লিখিয়াছেন—"কাহাকেও বঞ্চনা করিব, মধুসূদন কখনও স্বপ্নে সে কথা মনে করিতেন না। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিহীন ও অমিতব্যয়ী ব্যক্তি প্রবঞ্চক না হইলেও তাহার কার্য্য অনেক সময় প্রবঞ্চকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, মধুসূদনের ব্যবহার সময়ে সময়ে সেইরূপ হইত।"

মাইকেল কখনও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"মধুসূদনের কৃতজ্ঞতার আদি অন্ত ছিল না। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, প্রদীপ্ত ভাষায়, মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেন। এমন দিন, এমন ঘণ্টা ছিল না—যে দিন তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী এই তিনজনের অপরিসীম বদান্যতার বিষয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ না করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের আশা না থাকায় মধুসূদনের ক্ষোভের সীমা ছিল না।" (মধুস্মৃতি—ভারতবর্ষ-৪র্থ বর্ষ, ২য় খ, ৬৭১ পৃঃ)।

মাইকেলের সকল জীবনীলেখকই তাঁহার গাঁতিদার ও পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার নিন্দাসূচক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইউরোপ-প্রবাস কালে মাইকেলকে টাকা না পাঠানর দরুণ কবিবরের বিশেষ কষ্ট। এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কেন যে তিনি টাকা পাঠান নাই, তাহার

কারণ কিছুই জানা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ—মাইকেলের তালুক অল্প মূল্যে তিনি খরিদ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিত মধুস্মৃতি হইতে এ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম—

"মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার মাতুল বংশীধর তাঁহাকে বলেন 'মধু! তুমি এতটা বিষয় মহাদেবকে হেলায় বিলাইয়া দিলে।' তাহাতে মধুসূদন উত্তর করেন, "মামা! ব্রাহ্মণ অসময়ে আমাকে টাকা দিয়া উপকার করায়, আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তা ও নির্গুণে, ভায়েদের ত কোন অভাব নাই।"

(ভারতবর্ষ ৪র্থ বর্ষ, ২য় খ, ৪৭৮ পৃঃ)

এই বংশীধর ঘোষ মাতুলের সম্বন্ধে তাঁহার কেমন ধারণা, তাহা কবিবর তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিত এক পত্রে পরিচয় দিয়াছেন—"The bearer has come to me with a very handsome letter from my old rascal of an uncle Bansidhar Ghose of Katipara"—(ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, ২ খ, ৪৭২ পৃঃ)। এই মাতুলের বাটীতে মধুসূদনকে মাটীর বাসনে করিয়া খাদ্যাদি ও পানীয় দেওয়া হইয়াছিল।

মাইকেল বিলাত যাইবার পূর্ব্বে মহাদেব চট্টোর স্ত্রী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে মফস্বলে তালুকদার ও দরগাঁতিদার নিযুক্ত করিয়া দলিলে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"আমার বিষয়ের উদ্ধার ও দেনা পরিশোধ জন্ত আপনার স্বামী অনেক সাহায্য, যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং অন্ত পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্ত ৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত দুই চক তাঁহাকে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল ইত্যাদি" (দলিল নং 'খ')

মহাদেব বাবুর সম্বন্ধে মাইকেলের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাইকেল যাহার নিকট হইতে কোন উপকার পাইয়াছেন, সাধ্যমত তাহার প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় এইরূপ মহত্ত্বে পূর্ণ ছিল।

মাইকেলের বিষয় মহাদেব চট্টো বহু অর্থব্যয়ে সরীকগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। সেই কারণে তাঁহার স্ত্রীকে মাইকেল গাঁতিদার নিযুক্ত করেন। এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া, অনুকুলবাবুর ঋণ পরিশোধ জন্ত সেই মোক্ষদা দেবীকেই তিনি তাঁহার তালুক বিক্রয় করেন। প্রবাসে যাহার জন্ত অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছেন, তাহাকেই তালুক বিক্রয়—ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ অন্য খরিদ্দার পাওয়া যায় নাই।

বিলাত-প্রবাসে মহাদেববাবু কেন যে টাকা পাঠাইলেন না, সে সম্বন্ধে কোন লেখক কিছুই বলেন নাই। মাইকেলের এজেণ্ট বাবু দিগম্বর মিত্র ও বাবু বৈদ্যনাথ মিত্র কেন টাকা পাঠানর জন্ত বন্দোবস্ত করেন নাই তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ জানা যায় নাই। জানিবার আর উপায় নাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই পরলোকে। প্রকাশিত পত্রাদিতে তাহার কোন বিবরণ নাই।

বাবু বৈদ্যনাথ মিত্র মাইকেলের পিসতুতো ভাই। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিসতুতো ভ্রাতা বাবু বৈদ্যনাথ মিত্র ও বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়কে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাইকেল, তাহার পিতা মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে ভূসম্পত্তি পূর্ব্বে বাচনিক দান করায়, রেজেষ্ট্রী করিয়া দানপত্র লিখিয়া দেন। সেই দানপত্রে পিতৃদত্ত সম্পত্তি ব্যতীত সাগরদাঁড়ীর ভদ্রাসন বাটী ও অন্যান্য ২০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিজেই লিখিয়া দান করেন। 'গ' চিহ্নিত দলীলে এই বিষয় লিখিত আছে। বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ডায়মণ্ডহারবারে উকীল ছিলেন, এবং বৈদ্যনাথবাবু মুর্শিদাবাদে রাণী স্বর্ণময়ীর তরফে উকীল ও আমমোক্তারের কাজ করিতেন এইরূপ জানিতে পারিয়াছি। বাবু দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) একজন বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। এই সকল ব্যক্তির হস্তে নিয়মিতরূপে টাকা পাঠাইবার ভারার্পণ করিয়া মাইকেল কেন যে অর্থকষ্ট ভোগ করেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেলের জীবন-চরিতে ৪২৬ পৃঃ লিখিয়াছেন—"মনুষ্য প্রকৃতি না বুঝিয়া, তিনি যে অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাকে এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল * * * যাহাদের উপর তিনি নিজের বৈষয়িক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহারা আপন আপন কার্য্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন।" কিন্তু

তাঁহাদের মধ্যে কেহই অপাত্র ছিলেন না—একজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, একজন উপকারী বন্ধু জমীদার, একজন দান-গৃহীতা ভাই। ইহাকেই বলে অদৃষ্ট!

"১৮৬১ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাবু দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন। এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কৃতজ্ঞতার পূর্ণ মূর্ত্তি মধুসূদন তাঁহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করেন! কিন্তু পরে তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসকালে মিত্রজা তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে মধুসূদনের স্থায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার করেন। য়ুরোপ-প্রবাসে তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা মানুষের হয় না। সেই বিপদে তাঁহার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ বলিতে হইবে। জগতে বীরের স্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাসহিষ্ণু মধুসূদন কঠোর সাধন-সমরে জয়যুক্ত হইলেও অভ্যন্তরে তিনি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। অসহ্য ক্লেশ না হইলে মহানুভব মধুসূদন তাঁহার দত্ত উৎসর্গপত্র কখনও প্রত্যাহার করিতেন না।" ভারতবর্ষ, মধুস্মৃতি, ৩য় বর্ষ, ১খ, পৃঃ ৩০১।

গৌরদাস বসাক লিখিয়াছেন—"The scurvy treatment which Digumbir Mitra (Raja) dealt out to him, would in any other case, have led not only to open rupture but to a mortal severance; but Madhu forgave and forgot as if nothing had happened." বিলাত যাইবার পর দিগম্বরবাবু ৮০০৲ টাকা মাইকেলকে পাঠাইয়াছিলেন। মহাদেব চাটার্জীও কতক টাকা পাঠাইয়াছিলেন, যাহাতে মাইকেলের পাওনা ৪০০০৲ হইতে প্রায় ৩০০০৲ টাকা হইয়াছিল (মাইকেল জীবনী ১ম সং, ৪১নং পত্র)। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ব্যারিষ্টার হইয়া হাইকোর্টে ব্যবসা চালাইবার জন্ত গোলযোগ হয়, তখন বিদ্যাসাগর, দিগম্বরবাবু ও কলিকাতার বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি মাইকেলের সুখ্যাতি করিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাইকেল স্পেন্‌স্ হোটেলে বাস করেন। সেই সময় তাঁহার তালুক মহাদেব বাবু ২০,০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম এই বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে মন্তব্য লিখিয়াছেন—

"এই সময় নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহার তালুক আবাদ প্রভৃতি ভূসম্পত্তি তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল। তাঁহার পত্তনিদার সুযোগ বুঝিয়া কয়েক সহস্র মাত্র মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চিরতরে গ্রাস করিয়া বসিল। মধুসূদন সেই অর্থের কিছুই পাইলেন না, সমস্ত ঋণদাতাগণের হস্তে চলিয়া গেল। বিরাট ঋণস্তূপ তেমনিই উত্তুঙ্গ হইয়া রহিল, তাহার কণিকাও স্খলিত ও চ্যুত হইল না।" (মধুস্মৃতি, ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় খ, ২২৭ পৃঃ।) এই টাকায় মাইকেলের প্রধান ঋণ, অনুকুলবাবুর নিকট সমস্ত দেনা, পরিশোধ হয়। বিদ্যাসাগর ইহার সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া মাইকেল অনুকুল বাবুর ঋণ ১৯০০০৲ টাকা প্রথমেই শোধ করেন।

"মাইকেলের সুহৃৎ গৌরদাস বসাক এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His Talook which one Mahadeb Chatterjee with somewhat like unfair means, got out of him, and which yields to the present proprietor an annual income of 6000 rupees, was parted with for a song, in a moment of desperate need. (see Reminiscences by G. D. Bysck of Michael M. S. Dutt—Appemdix to Bose's Life of Michael M. S. Dutt). "মাইকেলের তালুক মহাদেব চাটার্জ্জী নামক এক ব্যক্তি কতকটা অসদুপায়ে তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করেন। সেই তালুকের বর্ত্তমান অধিকারী বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা পান। বিশেষ অভাবের সময় নামমাত্র মূল্যে তিনি ক্রয় করেন।"

মাইকেলের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের পত্রাবলী বা তাঁহাদের লিখিত ঘটনাবলীর বিবরণী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। মাইকেলের জীবনীকারগণ তাঁহার তালুক-ক্রেতাকে অন্যায়-রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। সাধারণে তাঁহার কার্য্যের কথা ভালরূপে জানিবার সুযোগ পান নাই। আমি তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিতেছি না। আমি কোনরূপে মহাদেববাবুর বংশীয় কোন ব্যক্তির সহিত পরিচিত নহি।

তবে তিনি বিনামূল্যে তালুক ক্রয় করেন নাই। ৩০০০৲ টাকার আয়ের বিষয়ের মূল্য ৩০,০০০৲ টাকা। ২০,০০০৲ টাকা দিয়া সেই বিষয় ক্রয় করিলে, অল্প মূল্যে লওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাকে ফাঁকি দিয়া লওয়া বলা যায় না।

মধুসূদনের যখন পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তিনি মাদ্রাজে। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতার কৃত বলিয়া একখানা জাল উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লইয়া তাঁহার পিতৃব্য ও খুল্লতাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিষম কলহ হয়। সেই উইলখানি জাল। গৌরদাসবাবু লিখিয়াছেন (Reminiscences of Michael M. S. Dutta)—

When in 1855 his paternal house at Kidderpur became the subject of dispute, under Act IV, (since re-enacted in the Criminal Procedure) of 1840, and the parties were fighting over its possession before Mr. Fergusson, the Magistrate of 24 Parganas, I felt the necessity of having Madhu up here at once, to prevent further litigation, and to see that he entered into possession of the property as the only legal heir and rightful claimant. His patrimony was being frittered away by his uncles and cousins, under a forged will alleged to have been left by his father, who, as a matter of fact, had done nothing of the kind. When pressed on his death-bed to make a will, Madhu's father observed, 'যাহার বিষয়, সে এসে নেবে' i. e., 'he whose state it is, will come and take it."

ইহার ভাবার্থ:—

১৮৫৫ খৃঃ অঃ ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ফার্গুসান সাহেবের এজলাসে, মাইকেলের পিতার মৃত্যুর পর, খিদির-পুরের বসতবাটী লইয়া তাঁহার পিতৃব্য ও জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে, আমি মধুসূদনকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য,—যাহার ন্যায্য অধিকার, তিনি আসিলে আর মোকদ্দমা চলিবে না। একখানি জাল উইল লইয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু বাস্তবিক কোন উইল করেন নাই। মৃত্যু-শয্যায় তাঁহাকে উইল করিতে জেদ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "যাহার বিষয়, সে এসে নেবে।"

রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জী গৌরদাসবাবুর পত্র লইয়া মাদ্রাজে মাইকেলের হস্তে দিলেন। মাইকেল কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু রিক্তহস্ত। নিজ বাটীতে প্রবেশ-পূর্ব্বক অল্পবয়স্কা সুন্দরী যুবতী বিমাতাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের দশা দেখিয়া নিজের বিপদ ভুলিয়া গেলেন। মধু আসিলেন, কিন্তু মোকদ্দমা থামিল না। এই সময় মহাদেববাবু ও বৈদ্যনাথবাবু মাইকেলের জন্য স্বতন্ত্র বাসভবন ভাড়া করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন। মহাদেববাবু তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। মোকদ্দমার সমস্ত খরচ নিজে হইতে দিয়া মাইকেলের বিষয় উদ্ধার করেন। বিষয় ও বাটী এইরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। সেই উপকার স্মরণে মহাদেববাবুকে মাইকেল গাঁতিদার নিযুক্ত করেন। তাহাতে মহাদেববাবুর প্রাপ্য ৫৫০০৲ টাকা সেলামীরূপে শোধ হয়। পরে তালুক বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে মহাদেববাবুর স্ত্রীকেই বিক্রয় করেন। বিদ্যাসাগর অনুকূলবাবুর নিকট বিশেষ অপদস্থ হইতেছেন জানিয়া তালুক বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—Necessity never made a good bargain,—B. Franklin। মাইকেলের প্রয়োজনেই তাঁহার তালুক বিক্রীত হয়। যাহারা কিনিবে, সকলেই সস্তা দরে কিনিতে চাহে। মাইকেলের বন্ধুগণ মহাদেব চাটুজ্যেকে দোষী করেন। কিন্তু ইহা অন্যায়। কলিকাতায় কত ধনী লোক সস্তায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাহার জন্য কাহাকেও নিন্দনীয় হইতে দেখা যায় না। মাইকেলও মহাদেববাবুকে তালুক ক্রয় জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন নাই। প্রবাসে মাইকেলকে টাকা না পাঠানর জন্য মহাদেব বিশেষরূপে দোষী, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা মাইকেল সম্বন্ধে এত সমসমসাময়িক বিবরণ হইতে কোনরূপে কোন কারণ বা মহাদেববাবুর কোন বক্তব্য অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

মাইকেলের বিষয় ও বাটী বিক্রয়, দানপত্র, ঋণ গ্রহণের দলীল ইত্যাদির আলিপুর রেজেষ্ট্রী অফিসে নকল আছে।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনীলেখকগণ সেগুলি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। আমি যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটী ফর্দ্দ এই প্রবন্ধের শেষে যোগ করিয়া দিলাম। অনুসন্ধিৎসু মহোদয়েরা তদ্দৃষ্টে কবির জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

আমরা মধুসূদনের দুঃখে দুঃখিত হই, তাঁহার নৈরাশ্যময় জীবনের জন্য দুঃখ করিয়া সহানুভূতি দেখাইবার চেষ্টা করি, তাঁহার করুণ কাহিনী শুনিয়া আমাদের হৃদয়তন্ত্রী সমবেদনায় ঝঙ্কার করিয়া উঠে; কিন্তু আমরা ভগবানের বিধান কিছুই বুঝিতে পারি না। যে কার্য্যের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য তিনি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

"……… গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

সেই মধুচক্র নির্ম্মাণ তাঁহার কার্য্য। ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন,—সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—

I sat and thought of my shattered plans,
The things I have tried to do,
For disappointments in one and all
Had followed them through and through,
An angel came, and stepping, wrote
Put an "*H*" where you placed the '*D*',
For *D*is appointments in earthly plans
Are *H*is appointments for thee."

দলীলের পরিচয় ও তালিকা

১। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ—মাইকেল এম্ এস্ দত্ত ভেণ্ডর, নং ৮৪, বুক বি (B), ভলুম ২৩, পৃঃ ৫০।

বেণীমাধব মুখো নামক এক ব্যক্তির নিকট ৩০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া ১০০০৲ সুদ দিব বলেন ও ভরতভায়ণী গারুলীয়ায় রকম ৵১৩।—ও চক মুলকিয়া গদারডাঙ্গা তাঁহাকে মৌরস দিবেন বলেন।

২। ১৮৬১ খৃঃ অঃ মাইকেল এম্ এস্ দত্ত ভেণ্ডর নং ৯০৩ বুক A H, ভল ৬৭, পৃঃ ৪১৬ :—

জেমস্ হেন্‌রী ফ্রেডরিক নামক এক সাহেবকে মাইকেল খিদিরপুরের বসতবাটীর পার্শ্বের ও পশ্চাতের জমী বিক্রয় করেন। মূল্য ১৬০০৲ টাকা।

৩। ১৮৬১ খৃঃ অঃ—আলিপুর রেজেষ্ট্রী অফিস, মাইকেল, নং ২১৬, বুক G I, ভল্ ৭, পৃঃ ১৪১ বা ১৪৭ :—

জেমস ফ্রেডরিক কোন কারণে বেদখল হইলে মাইকেল তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন স্বীকার করেন।

৪। ১৮৬১ খৃঃ অঃ আলিপুর রেজেষ্ট্রী অফিস, মাইকেল, নং ২৮৯, বুক Ch ভল ৭, পৃঃ ৪০২—৩ :—

পাইকপাড়া নিবাসী বাবু মহাদেব চট্টোর স্ত্রী শ্রীমোক্ষদা দেবীকে চক মুলকিয়া ও গদারডাঙ্গার ডোল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাতে বাবু বৈদ্যনাথ ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে ৩০০৲ টাকা করিয়া বার্ষিক দিবার বন্দোবস্ত আছে।

৫। ১৮৬২ খৃঃ অঃ ৭ই জুন দলিলের তারিখ।

মাইকেল তাঁহার পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ ও দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়দিগকে মুলকিয়ায় ৭১০ রকম পিতৃনির্দ্দেশ অনুসারে ও স্বয়ং সাগরদাড়ীর ভদ্রাসনের অংশ ও অন্যান্য জমী দান করেন। মুলকিয়ার অংশের আনুমানিক মূল্য ২০০০৲ টাকা। সাগরদাড়ী বাটী ও অন্যান্য জমীর মূল্য ৩০০০৲ টাকা হইবে।

৬। ১৮৬২ খৃঃ অঃ মাইকেল ভেণ্ডর, নং ১৯৮, বুক A3, ভল্ ৬৯, পৃঃ ২১৭ :—

মাইকেল খিদিরপুরস্থ বসত বাটী বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন। মূল্য ৭০০০৲ টাকা। হরিমোহনবাবু কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মধুসূদনের বাল্যবন্ধু। হরিমোহনবাবুর সেই বাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজায় মাইকেল নিমন্ত্রণে যাইয়া পূজার আড়ম্বর দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। (মধুস্মৃতি, ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, চৈত্র ১৩২৩, পৃঃ ৪৭৯)।

৭। ১৮৬২ খৃঃ অঃ মাইকেল সিকিউরিটী বণ্ডের এক্সিকিউটার নং—১৪৮, বুক B R, ভল্ ২৮, পৃঃ ৭ :—

সদর দেওয়ানী আদালত হইতে মাইকেল তাঁহার বাটীর দরুণ ডিক্রী ও দখল পাইয়া খিদিরপুরের হরিমোহন বন্দ্যোকে ৭০০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন। তাঁহাকে এই

দলিল লিখিয়া দেন যে ঐ বাটী হইতে বেদখল হইলে হরিমোহন বাবুকে ৯৫০০৲ টাকা দিবেন। বেদখল না হইলে দলীলের সর্ত্ত অগ্রাহ্য হইবে। মাইকেলের বিমাতা হরকামিনী দাসীও ঐ বাটীর জন্য মামলা করিতেছিলেন। উপরন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্রগণ এক জাল উইল দ্বারা মোকদ্দমা করিতেছিলেন। এই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে।

৮। ১৮৬২ খৃঃ অঃ—মাইকেল বন্ধকদাতা নং ১৬৩, বুক—BR, ভল্ ২৮, পৃঃ—২৫ :—

চক মূলকিয়া—রকম ।১০ দান বাদে বক্রী ৷৷৵১০ রকম ।০ বন্ধকে বৈদ্যনাথ, দ্বারিকানাথ ও মাইকেল ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। দলিলের তারিখ ১২৬৯ সাল, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। কর্জ্জ দাতার নাম—মধুসূদন মজুমদার।

৯। ১৮৬২ খৃঃ অঃ—মাইকেল দেনদার, নং ১৬০, বুক GI, ভল ৭, পৃঃ ৩৭২ :—

মথুরানাথ কুণ্ডু নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে দফায় দফায়—১৭০০৲ টাকা কর্জ্জ করেন। কিছু বন্ধক দেন নাই। দলিলের তারিখ—১৮৬২। ৩রা জুন।

১০। ১৮৬২ খৃঃ অঃ—মাইকেল ও মহাদেব চাটার্জ্জী নং ৪১, বুক BR, ভল, ২৭ (দলিলের উপর কিন্তু ভলুম ৩ লেখা আছে) পৃঃ ১৭৩-৭৪ :—

মাইকেল ও মহাদেব উভয়ে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে, আপন আপন সম্পত্তি জামিন স্বরূপ রাখিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাহিরবান্দ পরগণার নায়েব নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১১ ; ১৮৬৫ খৃঃ অঃ—কলিকাতা রেজেষ্ট্রী অফিস—(রেজিষ্টার জেনারল অব্ অ্যাসুর‍্যান্স) বুক II, ভল ৪, পৃঃ ৫৬-৫৯, নং ৮৫ :—

এই দলীল মাইকেল ফ্রান্স হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার বিষয় বন্ধক দিয়াছিলেন।

১২। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ—আলিপুর রেজেষ্ট্রী অফিস। মাইকেল বিক্রয় কোবলাদাতা—গৃহীতা শ্রীমতী মোক্ষদাদেবী। মাইকেলের তালুক বিক্রয় করিয়া ২০০০০৲ টাকা পান। ১৯০০০৲ টাকা দিয়া অনুকূল বাবুর ঋণ পরিশোধ।

এইরূপ আরও দলীল পাওয়া যায়। সেই দলিল পাঠ করিলে মাইকেলের দুঃখময় জীবনের বহু বিবরণ জানা যাইতে পারে।

(ক)

No 51 (stamp one hundred fifty Rs) Duly stamped under cl, 23 of sch A of stamp ct admissible under sec 21, 22, 23, 32, 34 of the Registration Act cost paid Rs 11/- P. B. Mookerjee. Hd. Clerk

Presented for registration between the hours of 12 & I P. M. on the 25 day of Feby 1868 at the Presy Registry office by Michael Madhusudan Datta the resident of Calcutta Barrister-at-law and by whom also the receipt of consideration was admitted. He is personally known to the offg Regr. Sid. Michael M. Dutta sd P. C. Boral offg, Regr. 25th Feby. 68.

Mickail Madhusudan Datta.

শ্রীমোক্ষদা দেবী, স্বামির নাম শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নিবাস বাহির সিমুলিয়া —সহর কলিকাতা বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত এস্‌কোয়ার বারিষ্টর এট-ল পিতার নাম মৃত রাজনারায়ণ দত্ত সাং মোকাম—স্পেনস্ হোটেল সহর কলিকাতা বিক্রয় কবলা পত্র মিদং সন ১২৭৪ সালাব্দে লিখিতং—

কার্য্যাঞ্চাগে—আমার পিতা মৃত রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় জেলা জসহরের সবডিবিছান খুলিনিয়ার অধীন সুন্দরবনের অন্তঃপাতী ২২০নং লাটের মধ্যগত চক মূলকিয়ার ষোল আনা তালুকদার এবং গাতিদার ও চক গদারডাঙ্গার রকম ৷৷০ আনার তালুকদার ও রকম ষোল আনার গাঁতিদার থাকিয়া পরলোকগত হওয়ার পর—আমি ওয়ারিশি স্বত্বে ঐ উভয় মহলে দখলীকার হইয়া এবং আপনার সহিত মফঃস্বলি তালুকদারি ও দরগাঁতিদারি বন্দবস্ত করিয়া আপনার স্থানে খাজনা গ্রহণপূর্ব্বক দখলিকার আছি সুন্দরবনের নূতন রুল মোতাবেক এই দুই মহলের বন্দবস্ত আমলে আনিয়া চক-মূলকিয়া আমার নামে

৪৭৪৪নং ও চক গদারডাঙ্গা আমার ও চন্দ্রমোহন দত্তের নামে ৪৭৪৩ নং উক্ত জেলার কলেকট্টারি তৌজিভূক্ত হইয়াছে—চক মুলকিয়ায় সদর খাজনা সম্প্রতি শালিয়ানা ১১৭৵১০ একশত সতোর দুই আনা দশ পাই টাকা হিসাবে ও চক গদার-ডাঙ্গার খাজনা শালিয়ানা ৮৬৵৬ ছেয়াশী এক আনা ছয় পাই টাকা হিসাবে আদায় হইতেছে—আপনার সহিত প্রথমত বন্দবস্ত এই নিয়মে হইয়াছিল যে ১২৬৮ শালাবদি আপনি মাহালে দখলিকার হইয়া ১০ দশ বৎসর ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার হিসাবে পরে সর্ব্বদা ৩৫০০৲ পৈত্রিশ শত টাকা হিসাবে খাজনা দিবেন কিন্তু আপনার প্রার্থনামতে আমি বিলাত যাইবার সময় আপনাকে এইরূপ এক রোকা দিয়াছিলাম যে আমার বিলাত হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনার স্থানে শালিয়ানা ২৫০০৲ পোচিশ শত টাকা হিসাবে খাজনা লওয়া যাইবেক ও আপনার আপত্তির প্রতি বিলাত হইতে আসিয়া বিবেচনা করিব তদনুসারে ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত ২৫০০৲ পোঁচিশ শত টাকা হিসাবে খাজনার সরবরাহ করিয়াছেন আমি বিলাত হইতে আসিয়া ইহাই স্থির করিয়াছি যে আমার শাল্লিয়ানা মং ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা হিসাবে সন ১২৭৪ বার শত চোহাত্র সাল হইতে সর্ব্বদার জন্য খাজনার সরবরাহ করিবেন ও তন্মধ্যে সনং কালেকটারি খাজনা ও ডাক খরচা গভর্ণরমেণ্টর অবধারিত অনুসারে ও শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে আমার দাতব্য ৩৪৮৸৴০ তিন শত আট চল্লিশ তের আনা টাকা ও শ্রীযুত চন্দ্রমোহন দত্তকে গদারডাঙ্গার অংশের মালিকি মুনফা মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা আমাকে দিবেন এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রায় ১৯০০০৲ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইয়াছি—তাহা পরিশোধ জন্য আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার দরবস্ত হকুক মবলগে ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা মুল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম আপনি অদ্যাবধি উক্ত উভয় মহালের দরবস্ত হকুকের মালিক ও ওয়ারিশান ক্রমে দান বিক্রয়ের অধিকারিণী হইলেন আমি অথবা আমার স্থলাভিষিক্তগণের কোন স্বত্ব ও সম্পর্ক রহিল না—আপনি কালেকটারিতে আমার নাম খারিজে আপন নাম জারি ও রাজস্ব আদায় ও রাজ-মোহন দত্ত ও বৈদ্যনাথ ও দ্বারিকনাথ মিত্রকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা প্রদান পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে রহেন—

তাহাতে আমার অথবা আমার স্থলাভিষিক্তগণের কোন ওজর আপত্তি নাই ও হইবেকনা যদি কস্মিনকালে কেহ কোন দাবিদাওয়া করি কিম্বা করে সে বাতিল নামঞ্জুর—বর্ত্তমান সনের মোনফার টাকার মধ্যে অর্দ্ধাংশ আপনি লইবেন ও অর্দ্ধাংশ আমাকে দিবেন এতদর্থে মুল্যের টাকা তপশীলের মোতাবেক বুঝিয়া পাইয়া আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম এবং দলিল সকল বিং তপশীল আপনাকে দেওয়া গেল—ইতি সন সদর তারিক ১৩ মাঘ—

পোনের তঙ্কা—

নিজের লইয়াছি—	১০০০৲
বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—	১৯০০০৲
	২০০০০৲

তপশীল দলিল আপনার দত্ত কবুলতি—	১
অনুকুলবাবুর নামীয় মর্টগিজ	১
বাকী দলিল সকল আদালতে	স্থানে আছে

তাহা করিয়া নিজ লইবেন

Copied by	True copy	True copy
21/7	T. P. Ghose	P. C. Boral
Compd by	for Regr.	Off g. Presy.
R. Gupta	20. 7. 08	Registrra

Application for this copy.

No of application 3945 *Date* 20. 7. 08

copy delivered to applicant 21. 7. 08.

Sd illegible
Record Keeper
Regr. office,
24 Purgana, 21.7.08

Book 1
Vol. 1
Page 159
Deed no 51
Stamp Eighty two Rupees

No 289 Book, Ch. Vol 7 Page 4o2 to 403

This deed was presented to me for registration by Nobin Chandra Ghosh mooktear on be'...

of Michaeul M. S. Dutt. Having verbally taken the deposition of the wi nesses Gobind Chandra Mitter and Rasik lall Bose I have registered it this day the 1st day of October 1861 between the hours of 4 & 5 P. M.

Sd. Tarak nath Sen
Register of Deed
24 Pergs.

ডৌল বন্দবস্ত রূপেয়া জেলা জসহারের অন্তপাতি সুন্দরবনের ২২০ নং লাটের মধ্যেগত চকমুলকিয়া ও গদারডাঙ্গা তালুকদার ও গাঁতিদার শ্রীমাইকেল মধুশুদন দত্ত মফস্বল তালুকদার ও দরগাঁতিদার শ্রীমক্ষ্যদা দেবী জওজে শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায় সাকিন পাইকপাড়া—পরগণে হোগলা থানা নওয়াবাদ হালসাকিন বাহিরশীমলা—সহর কলিকাতা—ইতি—

আসামী	জুমনা
ইং সন ১২৬৮ সাল বাং সন ১২৭৪ সাল	শালীয়ানা
মুদ্দত ৭ সাত বৎসর কোম্পানি	২৯৯৭৷৷০
ইং সন ১২৭৫ সাল সর্ব্বকার জন্ত	
কোম্পানি ৩৫০১৲	

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধ জন্য আপনার স্বামি অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্ত ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চক্ তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদনুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা পণে উক্ত চক মুলকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেল এবং তাহার শালিয়ানা জমা ইং ১২৬৮ নাং ১২৭৪ সাল মুর্দ্দত ৭ বৎসর মঃ ২৯৯৭৷৷০ উনত্রিশ শত সাড়ে সাতানর্ব্বই টাকা ও ইং ১২৭৫ সাল সর্ব্বদার জন্ত মঃ ৩৫০১ পৌত্রিশ শত একটাকায় অবধারিত হইল আপনি উক্ত উভয় চকের হাসিল পতিত রাইরতি খামারদিগর আবাদীয়াতে ও জলকর ও বনকর ও ফলকর ইত্যাদি দরোবস্তী হকুকে দখলিকার হইয়া মালগুজারির টাকা নিয়লিখিত কিস্তী-বন্তী-বন্দী মোতাবেক সন বসন মাহ বমাহ কিস্তী বকিস্তী সময়বমাহ পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রয় অধিকারিণী হইয়া ভোগ দখল করিবেন কিস্তী খেলাপ করিলে শতকরা মাসীক ১৲ এক টাকা হিসাবে শুদ দিতে হইবেক খাজনা বাকী পড়িলে খাজনা আদায়ের বিশয় এইক্ষণে যে সকল আইন প্রচলিত আছে ও উত্তরকালে যে সকল আইন জারি হইবেক—তদনুসারে মফস্বলি তালুক ও দরগাঁর স্বত্ব বিক্রীর দ্বারা অথবা যে কোন প্রকারে আমার ইচ্ছা হয়—বাকী খাজনার টাকা মায় সুদ আদায় করা জাইবেক তাহাতে আপনার অথবা আপনার ওয়ারিসানের কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না—কালেক্টারিতে আমার খাজনার যে টাকা দাখিল করিতে হইবেক—দাখিলের ভার আপনাকে দেওয়া গেল আপনি কালেট্রারির খাজনার কিস্তীবন্দী মোতাবেক দাখিল করিয়া দিয়া তাহার দাখিলা আমাকে দিবেন। কালেকট্রির খাজনা দাখিলের ক্রটীতে আমার বিষয়ের কোন হানি হয় তাহার ক্ষেতিপূরণ আপনি করিয়া দিবেন যে পর্য্যন্ত আমি অন্য কোন নিয়ম না করিব সে পর্য্যন্ত আমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে আপনী ও আপনার ওয়ারিশান সন সন মঃ ৩০০৲ তিনশত টাকা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ও তাঁহাদের ওয়ারিশানকে দীবার তাহাদের নিকট রশীদ লইবেন ঐ রশীদ ও কালেকট্রির দাখিলা আমার নিকট দাখিল করিলে ঐ টাকার দাখিলা পাইবেন অবধারিত জমার কমিবেশী হইবেনা—উক্ত দুই চকের জমী জরিপ জমাবন্দী ও ইত্যাদি দ্বারা যে কিছু লাভ করিতে পারেন তাহা তাহা আপনি পাইবেন ১২৬৭ সালের আদায়ী টাকা হইতে—যে টাকা তলোবি দেওয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিয়া আমাকে দিবেন বকেয়া বাকী যাহা থাকে আপনি পাইবেন বে-আইন বেজাবেতা কোন কর্ম্ম করিবেন না যদি করেন তাহার জবাব দিহি আপনার জেম্বা হাকিমান হজুর হইতে কোন হকুম জারি হইলে তাহা নিজ খঃচে তামিল করিবেন গ্রামের প্রচলিত নিরিখের কম নিরিখে কোন জমীর বন্দবস্ত করিবেন না—শীমানা সরহর্দ্দ কাএম বহাল রাখিয়া জাহাতে আবাদ গোলজার হয় তাহার তদির সর্ব্বদা করিবেন এতদর্থে ডৌল কবুলতি লইয়া বন্দবস্ত লিখিয়া দিলাম—ইতি—সন ১২৬৮ আটসট্টি সাল—তারিখ ৯ই আশ্বিন—

কাত কিস্তী বন্দী

ইং ১২৬৮ সাল না ৭৪ সাল— মুদ্দত ৭ সাত বৎসর	ইং ১২৭৫ সাল অবধি প্রতি সন
মাহ পৌষ———৩৭৪॥৶০	৪৩৭॥৶০
মাহ মাঘ———[illegible]	[illegible]
মাহ ফাল্গুন—১১২৪/০	১৩১২৸৶০
মাহ চৈত্র———৭৪৯।৶০	৮৭৫।০
২৯৯৭॥০	৩৫০১

ইসাদি

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়
সাং সাহাপুর পাযপাগণে তথা
জেলা যশহর হাঃ মোঃ বাহির
শীমুলিয়া সহর কলিকাতা

শ্রীগিরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাং পাবালা জেলা যশহর
হাঃ মোঃ ঐ—

শ্রীরসিকলাল বসু
সাকীন মনীরপুর
পঃ বাকদীন জেলা যশহর
হাঃ মোঃ বাহির শিমুলিয়া
সহর কলিকাত্তা

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র
সাং উৎকুল পরগণে মষ্যুদীন
জেলা যশহর হাঃ মো
কলিকাতা বাহির শীমুলিয়া

শ্রীনবিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
সাং পাঁচরাকার ডাঙ্গা
পরগণে শ্রীপদগহ হাঃ মোঃ
কলিকাতা বাহির শিমুলিয়া

শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং মাধববাটী পঃ বুকল
হাঃ মোকাম কলিকাতা
বাহির শিমুলিয়া

Copied & Read by
Ram Taran Bose
30/I/08

True copy
G. C. Ghosh
for Registrar
30/1/08

Compd by
30/1/08

No of applicaten io 30. 1. 08. Delver 606
of i e d 30. 1. 08.

ষ্ট্যাম্প ৫০৲

পূজনীয় শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মিত্র ও তথা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় বরাবরেষু :—

লিখিতং শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত ওলদে ৺রাজনারায়ণ দত্ত কস্য দানপত্র মিদং সন ১২৬৯ সালাব্দে লিখনং

কার্য্যানন্তাগে মহাশয়েরা আমার পিস্তুত ভ্রাতা এবং বাল্যকাল অবধি আমার পিতার প্রতিপালনাধীন ছিলেন মহাশয়দের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পিতা মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী সুন্দরবন মোতালক ২২০ নং লাটের মধ্যগতি আমার পৈতৃক ভোগ দখলী তালুক চক মুনকীরার রকম ।১০ দান করায় সন ১২৬৮ সালের প্রথম বৈশাখ অবধি সদর মালগুজারী বাদে মুনফা ৩৪৮৸৴০ আনা টাকা চক মজকুরের পত্তনিদার শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর নিকট হইতে মহাশয়েরা পাইয়া আসিতেছেন এ পর্য্যন্ত তাহার দানপত্র লিখিয়া দেওয়া হয় নাই—এতদ্ভিন্ন জেলা যশোহরের পূর্ব্বস্থিত শ্রীযুত জজ ফিলিপ সাহেবের বিচারিত সন ১৮৩৫ সালের পরেন ও মোকদ্দমার চূড়ান্ত ফএসালা যাহাতে জ্যেষ্ঠতাৎ ৺রাধামোহন দত্ত বাদী ও পিতা মহাশয় প্রভৃতি প্রতিবাদী ছিলেন ঐ ফএসালার লিখিত উক্ত জেলার মহল ওয়াকফ্ চারি আনির মোতালক পত্তনি তালুক লাট ভরত ভাএনা ও লাট শারুটীয়া ও সলদহ বুড়ী হাটী জিউপুর ও পঃ দাতিয়ার সেনপুর, রাড়ীপাড়া ও পঃ বাগমারার সারসা ও পঃ রামচন্দ্রপুরের সাগরদাঁড়ী বিছঁড়া কোমরপুর ও গয়রহ গ্রামস্থিত স্বকর ও নিষ্কর ভূম্যাদি ভদ্রাসন বাটী পোক্তা ও কাঁচাঘর তন্নিস্থ ও পার্শ্বস্থ ভূম্যাদি স্থাবর সম্পত্তির রকম ৶১৩৷— অংশে ৺ পিতা মহাশয় প্রাপ্ত ও দখলিকার থাকিয়া সন ১২৬১ সালের মাঘ মাহায় পরলোক গমন করেন। আমি এ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয় দখল করিতে পারি নাই—ঐ সমস্ত অর্থাৎ উক্ত ফএসালায় লিখিত পিতা মহাশয়ের উক্ত রকম অংশ যাহাতে অনুমান সালিয়ানা ২০০৲ টাকা মুনফা ও যাহার আনুমানিক মূল্য ২০০০৲ তাহা অত্র মহাশয়দিগকে দান করিলাম ও উপরোক্ত দখলি চক মুনকীরার রকম সাড়ে চারি আনা যাহার লভ্য ৩৪৮৸৴০ আনা টাকা ও আনুমানিক মূল্য ৩০০০৲ হইবেক ও যাহা বাচনিক দান করিয়াছি—এই উভয় দান কৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার যে কিছু স্বত্ব ও অধিকার আছে তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে মহাশয়দের বর্ত্তিল মহাশয়েরা আমার হকে হকদার ও দান বিক্রয়ের স্বত্তাধিকারী হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহেন দানকৃত বেদখলি বিষয়ের দখল ও ওয়াশীলাত মহাশয়দের আদায় করিয়া দেওয়ার মানস ছিল কিন্তু আমার ইংলণ্ডে যাইবার ব্যস্ততা নিবন্ধন তাহা না পারিয়া লিখিয়া দিতেছি যে মহাশয়েরা ওয়াশীলাত আদায় করিয়া লইবেন ও আবশ্যক মতে সদর মফঃস্বল নামজারী করিবেন ও চক মুনকীরার পত্তনিদারের নিকট আলাহিদা করার দাদ লিখাইয়া লইবেন এমতে অত্র দানপত্র লিখিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি যে অত্র দানপত্রের লিখিত বিষয়ের নিয়ম সম্বন্ধে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান কেহ কখনও কোন দাবী দাওয়া করিবে না যদি করি কি করে তবে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর এতদর্থে অত্র দানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মোঃ সন ১৮৬২ ৭ই জুন।

Sd. Michael M. S. Dutta, Kidderpur.

ইসাদী—

শ্রীতারকনাথ সেন, রেজিষ্ট্রার
আলিপুর
জেলা ২৪ পরগণা,

শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়—	শ্রীবেচশ্যাম গোস্বামী
মোং হাইকোর্টের কাছারী	সাং খিদিরপুর
শ্রীবিশ্বনাথ দে	শ্রীপঞ্চানন ঘোষ
সাং—ঐ	সাং—ঐ
শ্রীগুরুচরণ বাগ	শ্রীমধুসূদন মজুমদার
সাং—ঐ	সাং—ইটালি

Serial no······

deed

Vol. 70

Ideutified by Babu Ashutose Mukherji Pleader. Judges Court, Alipur, 24 Perghns.

এই প্রবন্ধে লিখিত অনেক উপকরণ আমি বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। নগেন্দ্র বাবু কবিবর মধুসূদনের পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্রের পৌত্র। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিসনে তিনি হেড ক্লার্ক রূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সাহায্য জন্য আমি বিশেষরূপে উপকৃত।

ক্ষয়কাশ

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌

(এই বিষয়টি ৯ই আষাঢ় ১৩৩৭, বেতার মারফতে লেখক কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল)

রোগী ও মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, ইচ্ছা-বসন্ত—এ দেশে বহুকাল হইতেই লোকক্ষয় করিতেছে ; কিন্তু, টাইফয়েড্‌, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও ক্ষয়কাশও, সেই সঙ্গে এ দেশে কায়েমীভাবে চাপিয়া বসিতেছে, এ কথাটি খুব যত্ন করিয়াই আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা, বাঙ্গালীরা, ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই চলিতেছি। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে,

হাজার করা

বাঙ্গালার জন্মহার—সবচেয়ে কম (২৯·৬)

এবং „ মৃত্যুর হার—নিতান্ত কম নয় (২৫.৫)

বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়ার পরেই, ক্ষয়কাশ থেকে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী। বাঙ্গালায় সাড়ে চার কোটি লোকের বাস ; তাহাদের মধ্যে, বৎসরে আট লক্ষ লোক ক্ষয়কাশ ব্যারামে ভোগে ও বৎসরে এক লক্ষ লোক ক্ষয়কাশ ব্যারামে মরে! কলিকাতায় প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস ; তাহাদের মধ্যে, বৎসরে, প্রায় তিন হাজার লোক সুধু ক্ষয়কাশে মরে ও ২৮,০০০ লোক ঐ ব্যারামে ভোগে! গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, ক্ষয়কাশ হইতে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়াছে এবং গত দশ বৎসরের মধ্যে, পনর গুণ বাড়িয়াছে! অপর দেশের তুলনায়, আমাদের দেশে ক্ষয়কাশ হইতে হাজার-করা মৃত্যুর হার দেখুন :—

অষ্ট্রীয়ায়,	হাজারে	০.৬	জন
আমেরিকা যুক্তরাজ্যে	„	০.৮২	„
ইংলণ্ডে	„	০৮	„
জার্ম্মাণীতে	„	১.২	„
কলিকাতায়	„	২.৪১	„

স্মরণ রাখিবেন যে, এই ব্যারামে অন্ততঃ ছয় মাস ভুগিয়া, তবে লোকরা মারা যায় ;—কাযেই, এই ছয় মাস তাহাদের কায—কামাই হয় ; তাহার উপরে, চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয় আছে ;—এই ভাবে, এই দরিদ্র ভারতবর্ষে, বেতন বাবদে, যে আট কোটি টাকা উপার্জ্জিত হইতে পারিত, তাহা মাঠে মারা যায়! ধনে ও প্রাণে মারিতে, এই ক্ষয়কাশের মত ভীষণ ব্যারাম আর কয়টি আছে? এক কথায়, এই কাল-রাক্ষসী বাঙ্গালার বুকে বসিয়া, তাহার সুখ ও শান্তি, ধন ও যৌবন হরণ করিতেছে!

এ ব্যারামে কাহারা বেশী ভোগেন, জানেন?—দেশের যুবক-যুবতীরাই—বিশেষ করিয়া, যুবতীরা এবং গর্ভবতী যুবতীরাই—এই ব্যারামে বেশী ভোগেন! পনর হইতে ৩০ বৎসর বয়সের লোকরাই এ ব্যারামে বেশী মারা যান! যে বয়সে মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায় সতেজ থাকে, যে বয়সে মানুষ প্রাণ খুলে সংসারে খাটিতে চায় ও পারে,—সেই পূর্ণ যৌবন বয়সেই এই ব্যারামে বেশী লোক ভোগে। কিন্তু, তাই বলিয়া, অপর বয়সে এ ব্যারাম হয় না, এমনটি মনে করিবেন না। যে ব্যারাম আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হাহাকার তুলিতেছে, সেই ক্ষয়কাশ নিবারণের জন্য, সমস্ত জাতিকে সমবেত ভাবে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেই হইবে—নতুবা, আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিতে, শিহরিয়া উঠিতে হয়! বাঙ্গালার মায়েরা, এই কথাগুলি বেশী মন দিয়া শুনুন।

ব্যারামের কারণ।

এ ব্যারাম কেন হয়?—যে লোকের ক্ষয়কাশের ব্যারাম হয়, তাহার মলে, মূত্রে, থুথুতে, গয়ারে, হাঁছিতে, কাশিতে, এমন কি, জোর নিঃশ্বাস-বায়ুতে—ঐ রোগের অসংখ্য "টিউবার্‌কল্‌" নামক জীবাণু বাহির হয়। ঐ "টিউবার্‌কল্‌" জীবাণু বা ব্যাসিলাস্‌ খাবারের সঙ্গে পেটে, বা ধূলার সঙ্গে বা হাওয়ার সঙ্গে সুস্থ লোকের দেহের মধ্যে ঢুকিলেই, এই ব্যারাম উৎপাদন করে। অর্থাৎ, প্রত্যেক

ক্ষয়কাশ রোগী, অসাবধান হইলে, অন্ততঃ বিশ জন সুস্থ লোককে এই ব্যারাম অলক্ষিতে দান করে! আমাদের কয়েকটি সামাজিক প্রথার দোষেও, এই ব্যারাম বিস্তৃতি লাভ করে, যথা—

(১) অবরোধ-প্রথা।—অল্প যায়গার মধ্যে, চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, ঘরে সার্সি আঁটিয়া, পর্দ্দা টাঙাইয়া, ভগবানের মুক্ত দান সূর্য্যের কিরণ ও বায়ুকে আসিতে না দেওয়ায়, ও কারণে-অকারণে চতুর্দ্দিকে জল ঢালায়, বাড়ী এঁদো ও স্যাঁৎসেঁতে হয়।—যেখানেই অন্ধকার ও স্যাঁৎসেঁতে, সেখানেই সকল রকম ব্যারামের বাড়াবাড়ি! বোরখা ব্যবহারেও এই দোষগুলি আরো বেশী পরিমাণে বাড়ে।

(২) বাল্য-বিবাহ।—পঁচিশ বৎসর পার হইতে না হইতেই সাতটি সন্তান হইলে, সন্তানের দেহ গঠনে ও স্তন্য-দানে মাতার শরীর হইতে অত্যধিক পরিমাণে মেদ ও চূণ জাতীয় লবণ (ক্যাল্‌সিয়াম্) বাহির হওয়ায়, মাতার শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর শরীরে মেদ ও চূণ জাতীয় লবণের হ্রাস ঘটিলে, ক্ষয়কাশ হইবার বেশী সম্ভাবনা হয়।

মন্দ সামাজিক প্রথার পরে, বর্ত্তমান সভ্যতার বেগ ও উদ্বেগ জনিত দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা, উদয়াস্ত বদ্ধ ঘরে পরিশ্রম; গলি ঘুঁজির মধ্যে ও ঘনবসতি যায়গায় অন্ধকার, স্যাঁত-সেঁতে, ধোঁয়ার দৌরাত্ম্যময় বাড়ীতে বাস; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণঘাতী পাঠ ও পরীক্ষার পেষণ; ছত্রিশ জাতির এঁটো চায়ের ও চপের দোকানে খাওয়ার কদভ্যাস; পেট পুরিয়া, তাজা, ভেজালহীন বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাবার খাইতে না পাওয়া; পাঁচ রকমের নেশা করা—বর্ত্তমান সভ্যতার এই উপদ্রবগুলি বাঙ্গালী জাতিকে ধনে ও প্রাণে মারিতেছে—তাহার রোগ-প্রতিরোধ করিবার শক্তি কমাইয়া দিতেছে! তাহার উপরে—বিদ্যালয়ে, আপিষে, কার-খানায়, এবং বিশেষ করিয়া থিয়েটার-বায়স্কোপে, রেলে, বাসে, ষ্টীমারে, ট্রামে—ছত্রিশ রকম লোকের সঙ্গে ঠাসা-ঠাসি ও মুখোমুখি করিয়া বহুক্ষণ থাকা কালীন, কাহার কি ব্যারাম আমরা অজান্তে উঠাইয়া আনি, কে জানে? পোষ্টাপিষ, রেল, ষ্টীমার, বায়স্কোপ ও থিয়েটারের টিকিট-ঘরে—কি ভীষণ ভিড়ে, কতক্ষণ মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইবার সময়ে, আমরা যে কত ব্যারাম অলক্ষ্যে সংগ্রহ করি, তাহার হিসাব কেই বা রাখে? সরকার ও কর্পোরেশন, এই সাংঘাতিক ব্যবস্থার জন্য দায়ী। এবং আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিদ্যাই শিখি, কিন্তু আমাদের সব চেয়ে নিকট ও সব চেয়ে প্রিয় এই দেহের রক্ষার কোন কথাই শিখি না, ব্যারাম ধরিলে মরিতে জানি! তাহার উপরে, সহরের বুকের উপরে বস্তি, ব্যারাক, কারখানা, হাঁসপাতাল, গুদাম ও মেসের বাড়ীর নিত্যই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। যত রকম দুরারোগ্য ব্যারাম সারাইবার জন্য, বাহিরের লোকরা সহরে আসিয়া, ভাড়া-বাড়ীতে কত রকমের মারাত্মক ব্যারামের বিষ ছড়াইয়া সরিয়া যান,—পরবর্ত্তী নিরীহ, সুস্থকায়, নূতন ভাড়াটিয়া বেচারী, অজ্ঞাতে, সপরিবারে সেই ব্যারাম-গ্রস্ত হন! বর্ত্তমান সভ্যতার এই নানাবিধ মাশুল দিয়াও, আজ আমরা ধনে ও প্রাণে মরিতে বসিয়াছি! অথচ এ সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাই নিবার্য্য—যদি আমরা জনে জনে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সজাগ হই!

তাহার উপরে, ব্যক্তিগত কদভ্যাসের ফলেও, ক্ষয়কাশ কম বিস্তৃতি লাভ করিতেছে না! হাঁ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা ও সিক্‌নি মোছা, এক বিছানায় বা মশারিতে বহুলোক শোয়া, এক হুঁকায় তামাক, ও যে-সে পাত্রে জল, চা, চপ খাওয়া; এক পাতে, অথবা কাহারো "প্রসাদ" খাওয়া; কুঁজো হইয়া বসা—কত কদভ্যাসের নাম করিব? এইগুলির ফলে, স্বয়ং ভুগিতে হয় এবং একজন হইতে দশজনের মধ্যে এই মারাত্মক ব্যারাম ছড়াইয়া পড়ে।

এই ভাবেই, কতকটা সামাজিক প্রথার দোষে, কতকটা ব্যক্তিগত কদভ্যাসের ফলে, এবং বেশীর ভাগ, বর্ত্তমান সভ্যতার উৎকট ও উদ্ভট অব্যবস্থার ফলে, আজ হু হু করিয়া ক্ষয়কাশ ব্যারাম বাড়িয়াই চলিয়াছে! আর আমরা নির্ব্বিচারে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, পতঙ্গের ন্যায় মরিতেছি!

ব্যারামের কারণ,—খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে, অথবা প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে,—দেহের মধ্যে, টিউবারকল্ ব্যাসিলাসের প্রবেশ লাভ। এই জীবাণুটি রক্তবীজের চেয়ে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে; এবং, দেহের যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে,

সেখানকার সমস্ত সার পদার্থ কুরিয়া খাইয়া ফেলে, ও সেই সঙ্গে, রক্তে নিজ দেহ মল অনবরত ছাড়িতে থাকে। দেহের যেখানে ঐ জীবাণু আশ্রয় করে, সেখানটিতে প্রথমে ঘামাচির মত উচু একটি ব্রণ হয়; ঘামাচির মত টিবিটিকে ইংরাজীতে টিউবার্‌কল্ বলে। এই জন্য, যে জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় টিউবার্‌কল্ বা টিপির মত ব্রণ সৃষ্টি করে, তাহাকে টিউবার্‌কল্ ব্যাসিলাস্ বলে। বুকের ফুস্‌ফুসে ঢুকিয়া, ফুস্‌ফুস্‌কে ধ্বংস করিতে থাকিলে, তাহাকে "থাইসিস্" বা "কন্‌জাম্প্‌সান্" বলা হয়; হাড়ে ধরিলে, "কেরীজ্" বলা হয়; পেটের মধ্যে গ্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে, "অ্যাব্‌ডমিনাল্ থাইসিস্" বলা হয়; গলার দু'পাশে গ্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে, "স্ক্রফুলা" বলা হয়; এবং এই সবগুলির সাধারণ নাম—"টিলবার্‌-কুলোসিস্" বা টিউবার্‌কল্ জীবাণু দ্বারা রক্ত দূষিত হওয়া।

ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণ।

এই ব্যারাম চোরের মত দেহে ঢোকে;—কিন্তু একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে, ইহার প্রবেশ বুঝিতে পারা যায়।—

শিশুদের বেলায়—যে শিশুরা দিনরাত হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলে, যাহাদের বুক সরু ও চ্যাপ্টা, যাহাদের গলার দু'পাশে গ্ল্যাণ্ড বা বীচি টের পাওয়া যায় ও সেই সঙ্গে যাহাদের টন্‌সিলের ব্যারাম লাগিয়াই আছে, যে শিশুরা কুঁজো হইয়া ভিন্ন বসে না—তাহাদের যদি বাড়-বাড়ন্ত না হয় ও ঘুষঘুষে জ্বর হয়, তবে খুব সাবধান!

বয়স্ক লোকদিগের বেলায়—যাঁহাদের কথায় কথায় সর্দ্দি হয়; যাঁহারা অকারণে দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি বোধ করেন; যাঁহারা অকারণে রোগা হইতে থাকেন; ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, সূতিকা, বা প্লুরিসি যাঁহাদের ধরে; হাড়ে বা গাঁইটে যাঁহাদের ব্যারাম ধরে; বা যাঁহারা কাশিতে কাশিতে রক্ত তোলেন—তাঁহাদিগের বিষয়েও খুব সাবধান! লক্ষ্য করিবেন, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা পুরাতন গ্রহণী, অগ্রাহ্যের ব্যারাম নহে।

নিবারণের উপায়।

এ দেশে, এ ব্যারাম প্রায়ই মারাত্মক হয়। কাযেই, ব্যারাম ধরিলে, খুব বেশী কিছু করা যায় না। অতএব, যাহাতে এ ব্যারাম না ধরে, তাহা করাই বুদ্ধিমানের কায। তাহা হইলে, কি কি করিলে, এই ব্যারাম নিবারণ করা যায়?—

প্রথম কর্ত্তব্য।—উপরের বর্ণিত লক্ষণের একটি দেখা দিলেই, মাঝে মাঝে রীতিমত হেলথ একজামিন করান চাই। "ও কিছু নয়" বলিয়া, ব্যারামের প্রথম লক্ষণগুলি অগ্রাহ্য করা মারাত্মক। পাশ্চাত্যরা স্বাস্থ্যের মূল্য জানেন বলিয়া, বৎসরে বৎসরে রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান; এ দিকে আমরা দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, জগতের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছি।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।—নিয়মিতভাবে, প্রত্যহই কিছু না কিছু সূর্য্যকিরণ সেবন করিবেন। ঘর-দ্বারে দুই বেলা অবাধে রৌদ্র আসিতে দিবেন—ঘরে সার্সি রাখিবেন না। কথায় কথায় ছাতা ব্যবহার করিবেন না। রৌদ্রে বসিয়া তৈল মাখিবেন। বিছানা ও কাপড়-চোপড় প্রত্যহ রৌদ্রে দিবেন। বন্য পশুরা, গাঙের মাঝিরা, মুটে-মজুররা মুক্ত বায়ু ও প্রচুর সূর্য্যকিরণ পায় বলিয়া, সহজে পীড়িত হয় না। যে গোরু অবাধে মাঠে চরিতে পায়, তাহার স্বাস্থ্য, ও গোয়ালে বাঁধা গোরুর স্বাস্থ্য তুলনা করিলেই, বুঝিতে পারিবেন, রৌদ্র সেবনের কি সুফল।

তৃতীয় কর্ত্তব্য।—নিয়ম করিয়া প্রচুর পরিমাণে মুক্ত বায়ু সেবন করা চাই। মাথা মুড়ি দিয়া শোয়া, একগলা ঘোম্‌টা দেওয়া, বোর্‌খা ব্যবহার করা, ঘরে সার্সি বন্ধ করা বা চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা টাঙান—একদম ত্যাগ করিতে হইবে। বারো মাস দরজা জানালা খুলিয়া শোয়ার অভ্যাস করিতে হইবে। অযথা জামা-জোড়া বা পোষাকের বাহুল্য ত্যাগ করিতে হইবে। শীতকালে, খোলা গায়ে, দুপুরে রৌদ্র সেবন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের রীতিমত হাওয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

চতুর্থ কর্ত্তব্য।—যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে:—

(ক) টাট্‌কা, ভেজালহীন, পুষ্টিকর খাদ্য, খাইতে হইবে।

(খ) কলে মাজা ধব্‌ধবে সারহীন চাউল না খাইয়া, ঢেঁকিছাটা ও সম্ভব হইলে আতপ চাউল খাইবেন।

ভাতের ফেন গালিবেন না—ভাতের গায়ে উহা মারিয়া দিবেন। ফেনে পুষ্টিকর কিয়দংশ ও ভাইটামীন (খাদ্যপ্রাণ) থাকে।

রোলার মিলের ধব্‌ধবে ও ভাইটামীন বর্জ্জিত ময়দা না খাইয়া টাট্‌কা হাতে-ভাঙা ও ভাইটামীন পূর্ণ লাল আটা খাইবেন।

কলের চিনি না খাইয়া, কাশীর চিনি বা গুড় খাইবেন, তাহাতে যথেষ্ট ক্যাল্‌সিয়াম থাকে। চিনিতে কিছু থাকে না।

(গ) নিত্য কাঁচা শাক-সব্জী কিছু-না-কিছু, অথবা, টাট্‌কা-ফল খাওয়া চাই। বাঙ্গালী ছাড়া, পৃথিবীর সকল জাতিই টাট্‌কা কাঁচা শাক-সব্জী যথেষ্ট খায়; যথা, স্যাল্যাড, গাছ ছোলা, সর্ষের শাক, শশা, পেঁয়াজ, সেলারী, মূলা, গাজর, বিলাতি বেগুন, এবং, বাঙ্গালায় মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে ফল বেশী ব্যবহার করেন।

(ঘ) দুধ, ঘি, মাখন—নিয়ম করিয়া ও যথেষ্ট পরিমাণে নিত্য খাওয়া চাই। অভাবে, ছেলে পিছু একটা—

(অ) ছাগল পুষুন—দুধ সস্তায় পাইবেন। তাহা ছাড়া ছাগলদের ক্ষয়ের ব্যায়াম ধরে না—গোরুকে ধরে।

(আ) টাট্‌কা চর্ব্বি ব্যবহার করুন—তাহাতে ভাইটামীন আছে, তাহাতে ভেজাল নাই।

(ই) সরিষার, তিলের বা নারিকেল তেলে, ভাইটামীন নাই। অথচ বারো মাস আমরা এই ভাবেই চৌদ্দ-আনা স্নেহজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করি।

(ঈ) ভেজিটেব্‌ল্‌ প্রডাক্ট বা বনস্পতি ঘি—বিষবৎ ত্যাজ্য। উহা দুষ্পাচ্য ও উহা আমিষ বা খনিজ তৈল-শূন্য নহে।

যে সকল নিকৃষ্ট জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈলের কোনও গতি হইত না, তৈলকে হাইড্রোজিনেট্‌ করিয়া, সেই অপকৃষ্ট, অখাদ্য ও দুর্গন্ধ তৈলগুলি, দেখিতে সুন্দর হইতেছে ও দুর্গন্ধহীন হইতেছে ও সেই জন্য অবাধে ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হইতেছে।

(ঙ) চুণ জাতীয় লবণ ও আইয়োডীন লবণ প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে খাওয়া চাই। দুধ, ডিম, গম, শুঁটি, কমলালেবু, কড্‌লিভার অয়েল, আখ্‌রোট, কিস্‌মিস্‌, মনক্কা, পাকা কলা, লেবুর রস, যব, স্যালাড্‌ শাক প্রভৃতিতে ঐগুলি যথেষ্ট পাইবেন।

পঞ্চম কর্ত্তব্য।—নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা চাই—স্ত্রীলোকদিগকেও। অঙ্গ-চালনায় স্ত্রীলোকদিগের দেহের কমনীয়তা ও লাবণ্য বাড়ে বৈ কমে না। অঙ্গ চালনা করিলে, দেহ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী হয় ও সকল রকম রোগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়; রীতিমত ব্যায়ামের ফলে, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি—ক্লেদ সম্যক নিষ্কাশিত হওয়ায়, দেহ রোগমুক্ত থাকে ও অযথা ও কুদৃশ্য "ভুঁড়ি" গজায় না। যেখানেই "ভুঁড়ি" সেখানেই পেটের মধ্যে ময়লা জমা ও কাযেই, অস্বাস্থ্য।

ষষ্ঠ কর্ত্তব্য।—নিয়মিত ভাবে, প্রত্যহ, ৫ হইতে ৭ ঘণ্টা কাল সুনিদ্রা হওয়া চাই। শিশু, কাঁচা পোয়াতি ও ব্যারামীরা এই ঘুমের প্রসাদেই কেমন চটপট সারিয়া উঠে, তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাই বলিয়া দিবানিদ্রা যৌবনে কখনো দিতে নাই—"মা দিবা সাপ্সী।"

সপ্তম কর্ত্তব্য।—পরিষ্কার থাকা চাই—

দেহে :—জামা-জোড়া কম পরিবেন, এবং নিত্য পরিষ্কার পরিচ্ছদ ছাড়া পরিবেন না।

রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গ করিবেন ও রীতিমত গা রগড়াইবেন। থাব্‌লা থাব্‌লা, এখানে একটু ওখানে একটু, তৈল মাখিয়া, ঝুপ্‌ করিয়া একটা ডুব দিলে, তাহাকে স্নান করা বলা যায় না।

অভ্যাসে :—নাক খোঁটা, নখ কামড়ান, কোঁচার খুঁট মুখে দেওয়া, থুথু দিয়া শ্লেট মোছা, আঁচলে কচি-ছেলেদের সিক্‌নি মোছা, যেখানে-সেখানে নিজেরা থুথু ফেলা ও সিক্‌নি মোছা, এক থালায় খাওয়া, কচিছেলেকে যে-সে চুম্বন দেওয়া,—ত্যাগ করিতে হইবে।

বাড়ীঘর :—জলের ছিটা না দিয়া, ধূলা উড়াইয়া কখনো ঘর দ্বার ঝাঁট দিবেন না।

উনান ধরাইলে, যাহাতে ধোঁয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া না বেড়ায়—তাহা করিবেন।

ঘরে অবাধে রৌদ্র ও হাওয়া আসিতে দিবেন।

অষ্টম কর্ত্তব্য।—বাড়ীতে রোগী থাকিলে,—

(১) তাহার রীতিমত চিকিৎসা করাইবেন; এবং

(২) সে ব্যক্তি যাহাতে বাড়ীর ও পাড়ার কাহাকেও বিপন্ন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে, এই এই সদভ্যাস গুলি করাইবেন, যথা—

(ক) কাশিবার বা হাঁচিবার সময়ে,—মুখের সম্মুখে রুমাল আড়াল দিবেন।

(খ) নির্দ্দিষ্ট ঢাক্‌নী দেওয়া পাত্রে ভিন্ন, কোথাও থুথু, গয়ার, সিক্‌নি, মল, মূত্র ফেলিবেন না ;—সারাদিনান্তে, সেই পাত্রের ময়লা ঝাঁঝরিতে ফেলিবেন অথবা মাটিতে গভীর গর্ত্ত খুড়িয়া পুঁতিবেন ; অথবা কড়া লাইসল-দ্রব মিশাইয়া, অথবা কেরোসিন তৈল বা কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া, পুড়াইয়া দিবেন—কখনো রাস্তায় ঘাটে ফেলিবেন না।

(গ) রোগীর পান-ভোজনের আলাদা পাত্র রাখিবেন। খাওয়া হইলে, পাতে জল ঢালিবেন—যাহাতে এঁটোর উপরে মাছি না বসে। এবং সকলের শেষে, ঐ পাত্রগুলি যেন মাজা হয়।

(ঘ) রোগী নিজ কাপড়-চোপড় ভিন্ন কাহারো বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন না ; ছাড়া-কাপড় চুপড়ি ঢাকা দিয়া রাখিবেন, এবং সকলের শেষে, সেই কাপড়গুলি লাইসলের জলে ফুটাইয়া, আলাদা শুকাইবেন।

(ঙ) রোগীর পড়া বই, কাগজ প্রভৃতি বাহিরে যাইতে দিবেন না বা বাহির হইতে ভিতরে আসিতে দিবেন না।

আশা করি, আপনারা প্রত্যেকেই, এই সর্ব্বনেশে ব্যারাম নিবারণ কল্পে অবহিত হইয়া এ দেশ হইতে এই রাক্ষসীকে তাড়াইয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আদর

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ওরে পরাণ প্রিয়! ওরে অমিয় মাখা!
ওরে নয়ন-মণি! ওরে নয়নে-রাখা!
ওরে চাঁদের আলো! ওরে ফুলের হাসি!
আমি বোঝাব কিসে?—তোরে কী ভালবাসি,
বুকে হৃদয়ে আঁকা!
ওরে পরাণ প্রিয়! ওরে অমিয় মাখা!

তোর উজল আঁখি কালো কাজল-পরা
যেন সজল মেঘে থির দামিনী-ভরা!
পড়ে ডালিম ফেটে রাঙা গোলাপী-গালে!
নাচে চরণ দুটি সুরে ছন্দে তালে!
প্রাণ পাগল-করা
তোর উজল আঁখি কালো কাজল-পরা।

তুই সাগর-সেঁচা মোর অতুল নিধি!
বহু পুণ্যে মোরে তোরে মিলালো বিধি!
চির রঙ্গময়ী! তোর সঙ্গসুখে
সহি দুঃখ শত উৎ- ফুল্লমুখে!
ওরে জুড়ানো-হৃদি!
তুই সাগর-সেঁচা মোর অতুল নিধি!

তুই কল্পলতা! তুই মর্ত্ত্যে পরী!
দিলি তৃপ্তি প্রাণে সুখ শান্তি ভরি।
তুই মিষ্টি মধু! তুই সৃষ্টি সেরা!
দিল্ রোশনী-করা আরে দোস্ত মেরা!
ওরে আমরি মরি
তুই কল্পলতা তুই মর্ত্ত্যে পরী!

তুই প্রলয় শিখা! তুই মলয় হাওয়া!
—লাখো মালতী যূথী প্রাণে ফুটিয়ে-যাওয়া!
মেশা অমৃতে বিষে ওরে হীরের ছুরি!
তুই মোহের ফাঁসি! তুই মায়ার ডুরি!
মন— দুরূহ-পাওয়া!
তুই প্রলয় শিখা তুই মলয় হাওয়া!

ওরে জীবনে আশা! ওরে মরণে স্মৃতি!
তোরে ঘিরিয়া গাহে যত কাব্য গীতি!
ওরে সোহাগে-গলা! পড়া— আদরে গায়ে
জল চল্‌কে ওঠা চোখে ফুলের ঘায়ে!
তুই নতুন নিতি!
ওরে জীবনে আশা! ওরে মরণে স্মৃতি!

ফ্রান্স্

শ্রীভারতকুমার বসু

(৩)

ফ্রান্সে যে-সব দুষ্টু ছেলেকে তাদের বাপ-মা বাড়ীতে 'টিট্' ক'রতে পারেন না, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় একটা স্কুলে। এই স্কুলের নাম "পিতৃ-ভবন" (Maison Paternelle)। এখানে প্রত্যেক ছেলের খাওয়া, থাকা এবং পড়ার জন্ম প্রত্যেক মাসে ১০ পাউণ্ড থেকে ১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে হয়। প্রত্যেক ছেলের কাছে স্কুল থেকে একটী চাকর দেওয়া হয়। চাকরদের কাজ—ছেলের কাছে খাবার নিয়ে আসা, ছেলের সঙ্গে ব্যায়াম-চর্চ্চা করা যাজকদের। তাদের সেখানে নাম ধ'রে ডাকা হয় না,—ডাকা হয় তাদের নম্বর ধ'রে।

উক্ত স্কুলের এই রকম ধারণা যে, নির্জ্জনতার মধ্যে আটক ক'রে রাখলে, দুষ্টু ছেলেরা শুধ্‌রে যাবে। এই জন্মই সেখানে প্রথমেই ছেলেদের বন্ধ ক'রে রাখা হয় ছোট-ছোট বিশ্রী ঘরের মধ্যে। তার পর যেম্‌নি দেখা যায় যে, তারা শান্ত-শিষ্টের মতো লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে আরম্ভ ক'রেছে, তখনি তাদের অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরে

বসন ধোলাই

এবং ছেলের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ব্যায়াম অর্থাৎ ভ্রমণের জন্ম স্কুল থেকে মাত্র এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে। আরও এক ঘণ্টা সময় ব্যায়ামের জন্ম পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সেজন্ম ছেলের চাকরকে পাঁচ পেন্স ধ'রে দিতে হবে। স্কুলের মধ্যে ছেলেদের খুব বেশী খাটানো হয় এবং পরীক্ষার জন্ম তাদের প্রস্তুত করানো হয়। সেখানে পরস্পরকে দেখতে দেওয়ার সুযোগ ছেলেদের দেওয়া হয় না। তারা কেবল দেখতে পায়—তাদের ভৃত্য, শিক্ষক এবং ধর্ম্ম-সরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে লেখাপড়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের চমৎকার চমৎকার দেশে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্কুলে এক ঘণ্টার জন্ম বেড়ানো ছাড়াও ছেলেদের জিম্‌ন্যাষ্টিক্, বেড়া-তৈরী, সাঁতার, ঘোড়ায়-চড়া ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেরা স্কুলের পাঠ্য শেষ ক'রে বেরিয়ে আসবার সময় তাদের এই ব'লে একটা প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর ক'রতে বলা হয় যে, তারা আর কখনো কুঁড়ে কিম্বা দুষ্টু হবে না।

উপরি-উক্ত "পিতৃ-ভবনে" সাধারণতঃ ধনীদের ছেলেরাই যেতে পারে। ফ্রান্সে কিন্তু সস্তার শিক্ষালয়ও আছে। সেখানে বেশীর ভাগ বিধবাদেরই দুষ্টু ছেলেদের সংশোধনের জন্য পাঠানো হ'য়ে থাকে। সেজন্য বাৎসরিক খরচ পড়ে, মাত্র ২০ পাউণ্ড। এই সব স্কুলে ছেলেদের আটক ক'রে রাখবার আগে বিচারকের কাছ থেকে আদেশ নিতে হয়।

পথ

ব্রিটন-দেশের পথ। সামনেই যে-দুটী লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পোষাকে ব্রিটনের ছাপ আছে সম্পূর্ণভাবে

শিক্ষার দিক দিয়ে ফরাসী উচ্চ স্কুলের সঙ্গে ইংলণ্ডের উচ্চ স্কুলের তুলনা ক'রলে, অনেকখানি পার্থক্য চোখে পড়ে। ফ্রান্সের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক উঁচু আদর্শে এবং অনেক সুন্দর ও সহজ ভাবে। ফ্রান্সের ছাত্রেরা লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে অনেক-কিছু বিষয়েরই ঢের বেশী খবর রাখে।
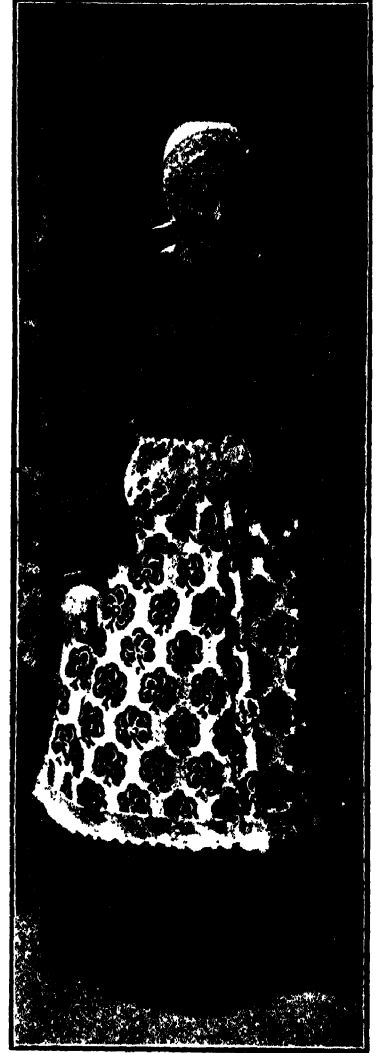
ব্রিটন (Breton)-দেশীয় সুসজ্জিতা মেয়ে

ঐতিহাসিক ঘটনা পড়ে তাদের কল্পনা দুলে ওঠে এবং জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাদের রুচি উন্নত হয়। সেখানকার উঁচু এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শিক্ষার কোনো পার্থক্য

নেই. যেমন আছে ইংল্যাণ্ডে। ম্যাথু আর্ণল্ড ব'লে-ছিলেন, "ইংল্যাণ্ডের দৈহিক পরিশ্রমের কর্ম্মীরা সেখানকার আছে। এরা সকলেই একই প্রকার শিক্ষা লাভ ক'রেছে।"

কিন্তু মিঃ আর্ণলডের এই উক্তির মধ্যে তখন সত্যের

ব্রিটন-দেশের কৃষক

ধীবর-দম্পতি

ধীবর-রমণীর মাছ-ধরা

সমাজ-পিরামিডের ভিত্তি গঠন ক'রে আছে। তাদের ছাড়াও সেখানে সংখ্যায় প্রচুর এক শ্রেণীর লোক ভাগ তেমন বেশী কিছু ছিল না। অবশ্য আজকাল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে।

কিন্তু তা হ'লেও সমগ্রভাবে ধরতে গেলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শিক্ষার দিক দিয়ে ইংলণ্ডের চেয়ে ফ্রান্সের মধ্যেই আজকাল বেশী লোক দেখতে পাওয়া যায়। এর একমাত্র তাদের ডাকা হয়। কিন্তু যখন তারা নিজস্ব মত নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা যে তাদের পিতা এবং পিতামহের মতো "ভাল মানুষটি" না হ'য়ে রীতিমত উৎসাহের

উৎসবের নৃত্য

শাক-সব্জীর গাড়ী খদ্দেরদের কাছে বিজ্ঞাপন করবার জন্য ব্যবসাদার নিজে যন্ত্রের শব্দ ক'রছে

কারণ, ফ্রান্সের ছেলেরা সামাজিক এবং মানসিক শিক্ষা পায় গৃহ-জীবন থেকে। কোনো-কিছুর বিচারের জন্য সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে প্রচার ক'রতে যাচ্ছে, সেজন্য তাদের একটুও বাধা দেওয়া হয় না।

ফরাসী দেশে শিক্ষার সু-পদ্ধতির জন্য সেখানকার বিদ্যালয়গুলির তারিফ ক'রতে হয়। কিন্তু ছাত্রদের খেলা ও আমোদের জন্য এই অল্প দিন আগে পর্য্যন্তও যে সেখানে কোনো রকম সু-ব্যবস্থা ছিল না, এজন্য বাস্তবিকই স্কুলগুলিকে নিন্দাই ক'রতে পারা যায়। ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলি কিন্তু এদিক দিয়ে এক-একটী আদর্শ। আজকাল অবশ্য ফ্রান্সের প্রত্যেক স্কুলেই ছাত্রদের জন্য জিম্‌ন্যাষ্টিক, সাঁতার, ফুটবল খেলা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'য়েছে। ব্যায়ামের মধ্যে মুষ্টি-যুদ্ধ অন্যতম। সেখানকার "Lycee Michelet"

রবিবারের পোষাক-পরিহিতা ব্রিটানী-দেশের মেয়ে

নামক একটী স্কুল এ-সব দিক দিয়ে বেশ নাম ক'রেছে। ছেলেদের বয়স অনুযায়ী থাকা, পড়া এবং খাওয়া-খরচ সমেত এই স্কুলে বাৎসরিক দিতে হয় ৩০ পাউণ্ড থেকে ৭০ পাউণ্ড। কেবল পড়বার খরচের জন্য নীচু থেকে উঁচু শ্রেণী পর্য্যন্ত ১০ থেকে ২০ পাউণ্ড লাগে। সুতরাং বড় ছাত্রদের কেবল থাকা ও খাওয়ার খরচ পড়ে মাত্র ৫০ পাউণ্ড। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের স্কুলে? সেখানে ১২০ পাউণ্ড থেকে ১৫০ পাউণ্ডের এক পেনি কমেও ছেলেরা যেতে পারবে না।

শিক্ষা দানের বিষয়ে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছাকাছি গেছে। কিন্তু তা হ'লেও, প্রথমোক্তের সঙ্গে শেষোক্তগুলির পার্থক্য আছে। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সৃষ্টি হ'য়েছে কেবল লেখাপড়ারই জন্য। অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শ কিন্তু আরও উঁচু। সেখানে ছেলেদের এমন তৈরী ক'রে দেওয়া হয়, যাতে তারা পরে দেশ-চালনেরও যোগ্যতা পেতে পারে। সেখানে জীবন এবং শিক্ষা হাত-ধরাধরি ক'রে চলে। সেখানে ছেলেরা এমন একটী চমৎকার সামাজিক শিক্ষা পায়, যার দ্বারা

চমৎকার সুতা কাটা

তারা পরে দেশের রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হ'তে দেয় না। কিন্তু ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফ্রান্সের ছেলেরা কোনো সামাজিক শিক্ষা পায় না; তার একমাত্র কারণ, উক্ত শিক্ষা পাবার জন্য ত আর তারা সেখানে যায় না;—তারা যায়—বিদ্যার্জ্জনের পিপাসা নিয়ে; তারা যায় বিদ্যার্জ্জনের দ্বারা তাদের মেধাকে উগ্র হ'তে উগ্রতর করবার জন্য। এই কারণেই, ইংলণ্ডে যেমন সমস্ত সম্প্রদায়ই সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি ইত্যাদির দিক দিয়ে যেন এক ছাঁচে ঢালা ব'লে মনে হয়, সে-রকম

ফ্রান্সের মধ্যে পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের ছাত্রেরা কেবল ক্লাসে যোগ দেবার সময় ছাড়া, আর কোনো সময়েই তাদের সহপাঠীদের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার আছে ব'লে বোধ করে না। তার উপর, ফরাসী বিদ্যালয়গুলিতে বিশ্রামের সময় কোনো "স্পোর্টের" ব্যবস্থা নেই। তার ফলে, ছেলেরা মানুষ হবার পূর্ণ পন্থা যা, সেই দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করবার সুযোগ পায় না। ফরাসী গুলি তখন কেবল ছেলেদের বুদ্ধি-বিকাশেরই দিকে দৃষ্টি দেয়। এইখানে ব'লে রাখা দরকার যে, শেষোক্ত এই "বুদ্ধি-বিকাশ"ই যে ভমৃকালো-গোছের বিরাট একটা কিছু, তা নয়। ফরাসী ছাত্রেরা বুদ্ধি অর্জ্জন করে সত্য, কিন্তু ও-রকম বুদ্ধি কেবল ফ্রান্সে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক ছেলেরই মস্তিষ্কের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে যথেষ্ট !...

কাঠের জুতা তৈয়ার

উৎসবের প্রাচীন-পোষাক-পরিহিত দম্পতী

অধ্যাপকদের কাছে ছেলেরা কেবল ছাত্রেরই মত ;—এর বেশী কিছু নয়। কাজেই, ছেলেরা অধ্যাপকদের কাছে এর বেশী আর-কিছু উপদেশ, পরামর্শ বা সাহায্য পায় না। এক কথায় ব'লতে পারা যায়, ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন ছেলেদের বুদ্ধির চেয়ে চরিত্র-গঠনের দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়, ফ্রান্সের বিশ্ব-বিদ্যালয়-

ফরাসী ছাত্রদের মধ্যে সহানুভূতির আকর্ষণ নেই ব'লেই, তাদের মনের প্রগতি প্রসারতা লাভ ক'রতে পারে না।

ফ্রান্সে কৃষক ও শ্রমিকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে, তারা নির্ভুল ভাষায় চমৎকার কথা কইতে শিখেছে।—ফ্রান্সের পল্লীগ্রামে ছোট ছেলেরা

১৩ বছর বয়সের মধ্যেই গ্রাম্য স্কুলে প'ড়তে যায়। স্কুলের মাষ্টার মশাইকে সকলেই বেশ খাতির করে। ছেলেদের বাপ-মাও খুসী হ'য়ে মাষ্টার মশাইকে তাঁর কষ্ট স্বীকারের জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। আগে এই মাষ্টার মশাইগুলির বড়ই দুরবস্থা ছিল। ফরাসী রাজাদের পর থেকে, এমন কি, তৃতীয় নেপোলিয়নের পর থেকেই তাঁদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আগে গরীব ছেলেদের পড়াবার জন্য কোনো অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করবার জল্পনা-কল্পনা হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে তা কেবল মুখের কথাই হ'য়ে রইল। নেপোলিয়ান শিক্ষার বিষয়ে একটুও ভাবতেন না। অনেকেরই মত তিনি চাইতেন যে, অল্প ব্যক্তি শাসন ক'রবে বহু ব্যক্তিকে এবং লোকে যতই শিক্ষা কম পাবে, ততই ভাল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রও এই মত পোষণ ক'রতেন। যাই হোক, ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র (Third Republic) স্থাপিত হবার পরই সেখানকার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি

আঁধারের মধ্যে শিশু-হস্তে ফরাসী জননী

"জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে
পাত্রখানি নাও ভ'রে নাও নিবিড় অনুরাগে।"

ছিল না। কাজেই, স্কুলের শিক্ষকদের, কবরের মাটী খুঁড়ে কিম্বা গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিয়ে নিজেদের জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'রতে হ'তো। অন্যান্য শিক্ষকেরা ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতেন এবং কোথাও কোন প্রকারে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেলেই, সেই সুবিধার বিনিময়ে ছেলেদের পড়াতেন। কোনো কোনো শিক্ষককে নাপিতের কাজ ক'রেও নিজের আহার্য্য সংগ্রহ ক'রতে হ'তো। ফরাসী বিদ্রোহের পর গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ়ভাবে তৈরী করা হ'লো এবং তার পর থেকেই সেখানে সু-শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও করা হ'লো। আজকাল এই সব বিদ্যালয়ের ছোট-বড় স্তরও আছে। ছোটগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বড়গুলিতে সেই সব ছেলেদের পড়ানো হয়, যারা কারিগর, চাষা কিম্বা হিসাব-লেখক কেরাণীর কাজ ক'রবে ব'লে মনস্থ ক'রেছে। এই ভাবে ছোট থেকে বড় স্কুল পর্য্যন্ত

প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।" রাষ্ট্র স্বয়ং এ-সবের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং

সামুদ্রিক কাঁকড়া-সংগ্রহ

সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন। এই সব স্কুলে ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষা পায় ব'লেই, গ্রামের মর্য্যাদা বাড়িয়ে আজকাল তারা সকল বিষয়েই তুখোড় হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারছে।

ঐ সব স্কুলের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা আজকাল আগেকার তুলনায় অনেক—অনেক উন্নত। তার একটু কারণ আছে। আগে ফ্রান্সে পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল প্রচুর। তারা চাইতো যে, দেশ তাদের দ্বারাই চালিত হোক। এবং তারাই ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতো। এই কারণেই, উপরিউক্ত শিক্ষকদের অর্থ-কষ্ট হ'তো—যার-পর-নাই শোচনীয় ভাবে। কিন্তু মানুষের দুঃখ ঈশ্বরের চোখে একদিন না একদিন পড়বেই প'ড়বে।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও দেশের লোকেরা লক্ষ্য ক'রলে যে, সেখানকার পুরোহিতরা

বাদ্যকর

আবার সেখানে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা ক'রছে। কত রক্তপাতে যে-দেশের ভিত্তি তৈরী হ'য়েছে, তার স্বাধীনতা-লুপ্তির ভয়ে "ষ্টেট্" ওই সব শত্রুর শক্তি-নাশ
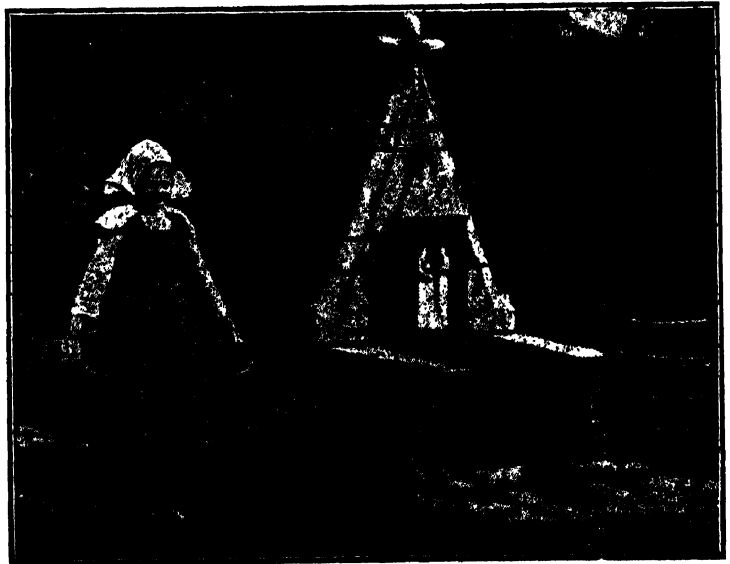
পুণ্য-চিহ্ন-যুক্ত ঝর্ণা ও জলার্থিনী

করবার বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। প্রথমেই এই রকম একটী আইন প্রচার করা হ'লো যে, পুরোহিতদের অধীনে যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির বিধি-বিধান "রেজিষ্টার্" ক'রতে হবে এবং সেগুলির জমা ও খরচের হিসাব দাখিল ক'রতে হবে। পুরোহিতরা এই রকম আইন প্রণয়নে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। দেশে শীগ্‌গির ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিলে। গভর্ণমেণ্ট তখন এ জিনিষটাকে অবহেলা ক'রতে পারলেন না। অবিলম্বেই পুরোহিতদের পারিশ্রমিক

রবিবারের পোষাক-পরিহিতা ব্রিটন-দেশের কৃষক-রমণী

ও "পেন্‌শানে"র জন্য "ষ্টেট্" থেকে যে দু'লক্ষ ষ্টার্লিং দান করা হ'তো, তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো।—এই ভাবে গবর্ণমেণ্ট ও পুরোহিতদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মনোভাব জাগ্রত ছিল অনেক দিন পর্য্যন্ত। শেষে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সব মিটমাট্ হ'য়ে যায়। এই রকমে পুরোহিতদের অখণ্ড প্রতিপত্তি ক'মে যাবা'র সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকদেরও বরাত ফিরে যায়। আজকাল তাঁরা ছেলে পড়িয়ে যা আয় করেন, তাতে তাঁদের জীবিকা চ'লে যায়।

ফ্রান্সের লোকেরা চায়, পৃথিবীর মানুষের প্রতি ভ্রাতৃভাব নিয়ে শান্তির মধ্যে বাস ক'রতে। কিন্তু তাদের এই সৎ ইচ্ছার মূলে হঠাৎ একদিন বাজ প'ড়লো। ১৯০৫ সালে জার্ম্মাণী ব'লে পাঠালে যে, "কুঁয়াই-ডি-ওরসে"-তে ফ্রান্সের বৈদেশিক সচিব M. Delcasse-কে পদচ্যুত ক'রতে হবে। এই শুনেই, ফ্রান্সের নবশক্তি উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো; যুবকদের বীরোচিত হৃদয় দুলে উঠলো,—যেমন দুলে উঠেছিল—১৯১৫ সালে Verdun-এর জন্য রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে। ফরাসীদের আর যুদ্ধের ইচ্ছা ছিল না। ১৮৭০ সালের স্মৃতিও

ধর্ম্ম-প্রবণা বৃদ্ধা

করুণ হ'তেও করুণ। অনর্থক লোক-ক্ষয়ের সম্ভাবনায় জা র্ম্মা ণী'র ইচ্ছাই পূর্ণ করা হ'লো। কিন্তু এর দ্বারা ফ্রান্সের ভীরুতা প্রকাশ হয় না। ফ্রান্স ঐ কাজ ক'রেছিল কেবল রাজনৈতিক কারণে;—ফ্রান্সের শক্তিহীনতা প্রমাণ ক'রতে নয়। ফরাসীরা যে কত বড় বীর, বিগত মহাসমরের ইতিহাস যাঁদের কাছে অজ্ঞাত নেই, তাঁরাই তা জানেন। শত্রুর সামনে ফরাসীদের অন্তর যেন দ্বিগুণ তেজে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। বিখ্যাত লেখক কোনান্ ডয়েলের "The Tragedy of the Korosko"—নামক একটী গল্পে ফরাসীদের একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে;—মিশরে একদল ভ্রমণকারী

নিজেদের ধর্ম্ম রাখবার জন্ম প্রাণ দিতে রাজী হ'লো। কিন্তু বাকী ফরাসী ভ্রমণকারীরা কি ক'র্‌লে?—ফরাসীরা কতকগুলি দরবেশের দ্বারা বন্দী হয়। তাদের বলা হ'লো যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হ'লে, তাদের হত্যা করা হবে।—দলের মধ্যে যারা গোঁড়া ছিল, তারা ত

কুকুর ও অশ্বতর চালিত গাড়ী

খৃষ্টান নয়। তাদের কাছে আল্লা এবং যিশু সমান। সুতরাং ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে তাদের অনিচ্ছা নেই। কিন্তু তারা তা নিলে না একটা বিশেষ কারণে। তাদের যে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্ম জোর করা হচ্ছে! বীরের জাতির পক্ষে এ অসহ্য!—তারা ধর্ম্মের জন্ম নয়, – আত্ম-মর্য্যাদার জন্ম, স্পষ্ট বললে যে, তাদের হত্যা না ক'রে কেউ দীক্ষিত ক'রতে পারবে না। বিপদের সময়ে এই রকমই অটল থাকে ফ্রান্সের প্রত্যেক লোক!…

ব্রিটিশ-জাতির বহুদিন ধ'রেই এই রকম ধারণা ছিল যে, ফরাসীরা সামান্ত কারণেই রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অমূলক। অনেক বিলাতী লেখক বলেন, ১৯০৫ সালে জার্ম্মাণী যেমন

Huelgoat দেশের মেয়ে

M. Delcasseকে বৈদেশিক সচিবের যায়গা থেকে সরিয়ে দেবার জন্ম ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিল,

বিশ্রামের সময়ে কৃষক-রমণীরা তাস্ খেলছে

ঠিক সেই রকমই যদি জার্ম্মাণী জানাতো গ্রেট্‌ব্রিটেন্‌কে, তা হ'লে কি হ'তো? তা হ'লে, লণ্ডন এবং অন্যান্য দেশ

যুদ্ধ-ঘোষণার শব্দে মুখর হ'য়ে উঠতো। ফ্রান্সে কিন্তু ১৯০৫ সালে এ রকম মুখরতা একটুও আত্ম-প্রকাশ করেনি। জার্ম্মাণীর কথা শুনে সেখানকার আকাশ-বাতাস গুরু-গাম্ভীর্য্যে ভ'রে উঠলো,—ভীষণ বজ্র-ঝঞ্ঝার আগে থম্‌থমে মেঘের মতো।

বিগত মহা-সমরের ঘোষণার সময়েও ঠিক এই ভাবে ফ্রান্সে উত্তেজনার কোনো কোলাহল শুনতে পাওয়া যায় নি। সমস্ত কাজই চ'লে যেতে লাগলো ঠিক আগেকার মতই। কেবল কতকগুলি নারীর ক্রন্দন-স্বর উঠলো—খুব অনুচ্চ কণ্ঠে। পরের দিন সকালেই দেখা গেল, প্রত্যেক সহর এবং গ্রামের তোরণে-তোরণে সৈন্যের পাহারা ব'সে গেছে এবং তারা পথিকদের কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে পরিচয়-পত্র দেখতে চাইছে। ওদিকে যুবা থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যারাকের মধ্যে জড়ো হ'তে লাগলো। তার মধ্যে, কাব্য লেখা ছেড়ে এসেছিল কবি, শিক্ষকতা ছেড়ে এসেছিল অধ্যাপক, এবং আপন-আপন কাজ ছেড়ে এসেছিল—কেরাণী, দোকানদার, বিদ্বান, অবিদ্বান ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেই। সকলেই লাল পা-জামা এবং নীল কোট প'রে যোদ্ধার সাজে সাজ্‌লো—খুব শান্তভাবে। কোনো রকম উত্তেজনার কোলাহল তাদের মধ্যে ফুটে উঠলো না।

ঠিক এই ভাবে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে যখন সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করা হ'লো, তখন লণ্ডনের লোকেরা চীৎকার ক'রে আনন্দ প্রকাশ করবার, উৎসব করবার, ট্যাক্সিতে চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবার এবং বাকিংহাম-রাজপ্রাসাদের বারাণ্ডায় রাজা-রাণীকে ডাকবার আনন্দেচ্ছা অনুভব ক'র্‌লে। কিন্তু প্যারিসের লোকেরা কি ক'র্‌লে ? তারা একখানি পতাকাও ওড়ালে না এবং Elysee রাজ-প্রাসাদের বারাণ্ডায় প্রেসিডেণ্টকে ডাকবার চিন্তাও ক'রলে না।—এই রকম কেমন-যেন-এক উদাসীন ভাব ফরাসীদের চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বরাবর। এই উদাসীনতাই ফরাসীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য!…

বিদ্যাসাগর

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার কে-টি

ইংলণ্ডের সাহিত্যে এবং সমাজের ইতিহাসে ডাক্তার সেমুয়েল জন্‌সনের যে স্থান, বাঙ্গলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঠিক তাহাই। দুজনেই খাঁটী মানুষ ছিলেন; কঠোর দারিদ্র্য হইতে নিজ চরিত্রবলে উঠিয়া প্রতিষ্ঠা ও ধন লাভ করেন, অথচ শেষদিন পর্য্যন্ত মিতব্যয়ী, সরল, করুণহৃদয়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা এবং কঠোর শ্রমী ছিলেন। দুজনেই প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, এবং সেই প্রাচীন লাটিন (এখানে সংস্কৃত) ভাষার শব্দ ও রচনা-পদ্ধতি নিজ প্রতিভাবলে মাতৃভাষায় চালাইয়া দেন এবং তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত আদর্শ হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আমাদের পিতামহের যুগে ইংরাজীনবিস এবং বাঙ্গলালেখক সমভাবে জনসনী ইংরাজী ও বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা ষ্টাইল অনুকরণ করিতেন। এই দুজনের চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ভণ্ড স্বার্থপর মিথ্যাবাদী মূর্খ নেতাদের নীরব তিরস্কার করিত, সমাজের সকল লোকের প্রেম ও ভক্তি পাইত। দুজনের মধ্যে কেহই বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু আজ তাঁহারা দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর নিকট ঠিক যেন নিজের লোক।

আমাদের দেশে ক্লব্ নাই, এবং ভগবান মনুর যুগে চীনদেশ হইতে রেশমী পতাকা ভিন্ন আমদানী বন্ধ থাকায় রাত্রে ভদ্রলোক সকলে একত্র হইয়া চা পান করিবেন এরূপ ব্যবস্থা ধর্ম্ম-সংহিতায় লেখা হয় নাই, এই দুই কারণে জন্‌সন্ যেমন সমাজে সাহিত্যসম্রাটরূপে বিরাজিত ও স্বীকৃত ছিলেন, বিদ্যাসাগর প্রকাশ্যে তাহা হইতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েকটি কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর জনসন অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি সেকেলে

সংস্কৃত পণ্ডিত এবং পণ্ডিতদের বংশধর হইলেও নব্য ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেন; সেই আবহমান কালের সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি বদলাইয়া নবযুগের উপযোগী এবং সভ্যদেশের জ্ঞানীদের মতানুযায়ী ও স্বাভাবিক করিয়া দেন। আর, প্রবল বাধার বিরুদ্ধে, হিন্দুদের যুগযুগ ধরিয়া প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে, এই ধনহীন, সামাজিক প্রতিপত্তিহীন, দলবলহীন, একাকী, "অসভ্য" পণ্ডিত দাঁড়াইয়া সমাজের সংস্কার করেন। তাঁহার দানশীলতাও জনসনের অপেক্ষা অধিকদূর প্রসারিত, অধিক পরিমাণে দাতার সর্ব্বস্বক্ষয়কর ছিল।

লণ্ডনের সৌখিনদল অনেকদিন পর্য্যন্ত জনসনকে চিড়িয়াখানা হইতে পলাতক ভালুক বলিয়া মনে করিতেন, আর আমাদের তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাস্তায় দেখিলে উড়ে বেহারা হইতে পৃথক ভাবিতেন না।

ভারতের সেই যুগসন্ধির স্থলে দাঁড়াইয়া লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রথম রাস্তা কাটিয়া, তাহার অভাবনীয় বাধাবিপত্তিগুলি কার্য্যদক্ষতার সহিত, সহৃদয়তার সহিত, অক্লান্ত শ্রমের সহিত দূর করিয়া, লোকজনকে বুঝাইয়া, সাধারণের উৎসাহ জাগাইয়া, বেসরকারী সাহায্য লইয়া, বিদ্যাসাগর স্বদেশের যে স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন, জনসনের সেরূপ সুযোগ হয় নাই; তিনি চিরজীবন সাহিত্যিক ছিলেন, কখনও শিক্ষানেতা বা সমাজ-সংস্কারক হন নাই। পুত্র-কন্যার হাতে দেওয়া যাইতে পারে এরূপ বিশুদ্ধ অথচ হৃদয়রঞ্জক সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে বিদ্যাসাগরের যে কীর্ত্তি, ইংলণ্ডে তাহার দৃষ্টান্ত এডিসন, জনসন নহেন। সম্পূর্ণ দিশীলোকের দ্বারা পরিচালিত এবং সরকারী-অর্থসাহায্যহীন ইংরাজী কলেজ বিদ্যাসাগরই প্রথম স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের দানশীলতার এবং স্পষ্ট (অনেক সময় তিক্ত) বচনগুলির অনেক গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এগুলি সংগ্রহ করিবার অতি চমৎকার সুযোগ আমি দুইবার পাই, কিন্তু হারাইয়াছি। বিদ্যাসাগরের "সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়" নামক দোকানের সুদক্ষ পণ্ডিত ম্যানেজার চণ্ডীবাবু আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় আমোদ, মাছ ধরার জন্য রাজশাহী জেলায় আমাদের কাচারীর গ্রামে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তখন তাঁহাকে প্রথম দেখি। আমার বেশ মনে আছে যে চণ্ডীবাবু সমস্ত বৈকাল তাঁহার বহুমূল্য সরঞ্জাম লইয়া পুকুর পাড়ে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু আমাদের পুরাতন পৈত্রিক বড় বড় পুকুরগুলির পরিপক্ক রুই কাতলা ঘোর স্বদেশী ছিল, তাহারা চণ্ডীবাবুর বিলাতী বড়শী, হুইল, পচা পনীরের চারা প্রভৃতি দেখিয়া কিছুতেই ভুলিতনা; কয়েকটি কাঁচাবুদ্ধি হালফ্যাসানের মৎস্য-যুবক মাত্র বিদেশীর মোহে ধরা পড়িল। শেষে যে দিন জাল ফেলিয়া অতি বড় বড় মাছ ধরা হইল, তখন চণ্ডীবাবু তাহাদের আকার দেখিয়া আপশোষ করিতে লাগিলেন।

আর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রজনাথ দে মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শংকর ঘোষের লেনে তাঁহার বাসার কাছে আমার বাসা ছিল এবং তাঁহার কলেজে কয়েক বৎসর কর্ম্ম করি। রবীন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতির পাঠকগণ কবির মৃগয়া অভিযানের সময় ব্রজবাবুকর্ত্তৃক বিনা পয়সায় উড়ে মালীর নিকট ডাবসংগ্রহের কথা মনে রাখিয়াছেন। আমার নিকট ব্রজবাবু বিদ্যাসাগরী গল্প ও বচনগুলির এক জীবন্ত অভিধান বলিয়া মনে হইত, এবং তাঁহার সুরসিক বলিবার ভঙ্গীতে গল্পগুলি আরও মনোমুগ্ধকর হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তখন কাজের চাপে এবং পরে নানা বিদেশে আমার কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করার ফলে আমি যাহা শুনিয়া-ছিলাম তাহার কোনটিই লিখিয়া রাখি নাই। এখন জীবনসন্ধ্যায় দেখি যে স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়াছে।

এজন্য সেই বিদ্যাসাগরী যুগের একমাত্র জীবিত সাক্ষী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে এই প্রাচীন বয়সে তাঁহার বিদ্যাসাগর-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে পরমসৌভাগ্য এবং এই লেখার "নিমিত্তমাত্র" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার সদ্য প্রকাশিত "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ" (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দাম এক টাকা) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় শাস্ত্রীমহাশয় ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী নিজের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি দিয়াছেন। আর ব্রজেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পুরাতন দপ্তরে বহুদিন শ্রম করিয়া বিদ্যাসাগরের সরকারী চাকরি, শিক্ষা সংস্কার, এবং নানা লোকহিতকর

কার্য্যে উপদেশ ও সাহায্য দান সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করিয়া তাহা গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে সব গল্প দেশময় প্রচলিত, তাহা অনেক সময় আংশিক অসত্য, অনেক সময়ে তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ নাই। কিন্তু সমসাময়িক সরকারী দলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বয়ংলিখিত দরখাস্ত, কথাবার্ত্তার রিপোর্ট, এবং শিক্ষাবিভাগের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী হইতে অতি খাঁটী এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু ভবিষ্যৎ বিদ্যাসাগর-জীবনীর জন্য অমূল্য উপাদান রাখিয়া গেলেন। অলঙ্কারের ছটা দিয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় শুধু কথা গাঁথিয়া জীবনী লিখিলে তাহা বিকায় বেশী, কিন্তু প্রকৃত জীবনচরিতের হাড় ও মাংসপেষী তাহাতে থাকে না, এইরূপ ভীত্তিহীন জীবনীর আদর দুদিনে শেষ হয়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর একান্ত নিষ্ঠার ফলে সংগৃহীত এই তথ্যগুলি চিরদিন কাজে লাগিবে, প্রকৃত বিদ্যাসাগরকে দেখাইয়া দিতে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গলায় দানবীর অনেক হইয়াছেন। বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলার আর চলন নাই। অধিকতর অগ্রসর সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের ফলে বিদ্যাসাগরের সংস্কার দুটী যেন আজ-কাল চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মহান্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উপকার সাধিত হইতেছে। এই বিষয়টি ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে অতি বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার প্রণালী সংশোধন, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বাংলা শিক্ষা (অর্থাৎ vernacular, primary and middle school) বঙ্গদেশে প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার এবং পাঠ্যগ্রন্থ সৃষ্টি,—এই সব কাজে বিদ্যাসাগর যে কতদূর পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন ("স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে") এবং চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং গ্রন্থতালিকা দিয়া বইখানি শেষ করা হইয়াছে।

গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষাশেষি, অর্থাৎ সিপাই বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এক কঠিন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিরূপে দেশের জনসাধারণকে জ্ঞানের অংশীদার করা যায়? উচ্চশিক্ষা দেওয়া ত সহজ কাজ,—বিলাতি পুস্তক ও শিক্ষক, এবং দেশীয় ছাত্রদের একস্থানে আনিয়া মিলাইতে পারিলেই হইল; এক মাত্র টাকার দরকার এবং সরকার সর্ব্বাগ্রে সেই জন্য টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকের, গ্রামবাসীদের, কে দেখে?

"Dr. Duff vigorously exposed the folly of expending immense sums in educating the sons of fat Babus, men 'made of milk and sugar and ghi.' and rich Muhammadans, and neglecting the education of the poor···There are 35 millions of ryots in Bengal (*i. e.*, the population of France), and out of these not more than two or three per cent can read intelligently.···The Government make a great flourish about education, but they mean—giving education to men who can afford to pay for it, and not to poor oppressed Sudras." (Lt. Gen: C. Mackenzie's *Storms and Sunshine of a Soldier's Life*, ii 186.)

বঙ্গের এই কঠিন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিবার চেষ্টা হইল, বিদ্যাসাগর নিজে তাহাতে কত শ্রম করিয়া, কত উপদেশ দিয়া, তর্ক বিতর্ক করিয়া, প্রকৃত পন্থা আবিষ্কার করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া তাহাই অবলম্বন করিতে সম্মত করাইলেন তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজিও ভোগ করিতেছে, যদিও তাহারা তাহাদের দাতার নাম জানেনা। প্রার্থনা করি এই চির উপকৃত দেশবাসীর স্মৃতি মন্দিরে—

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।"
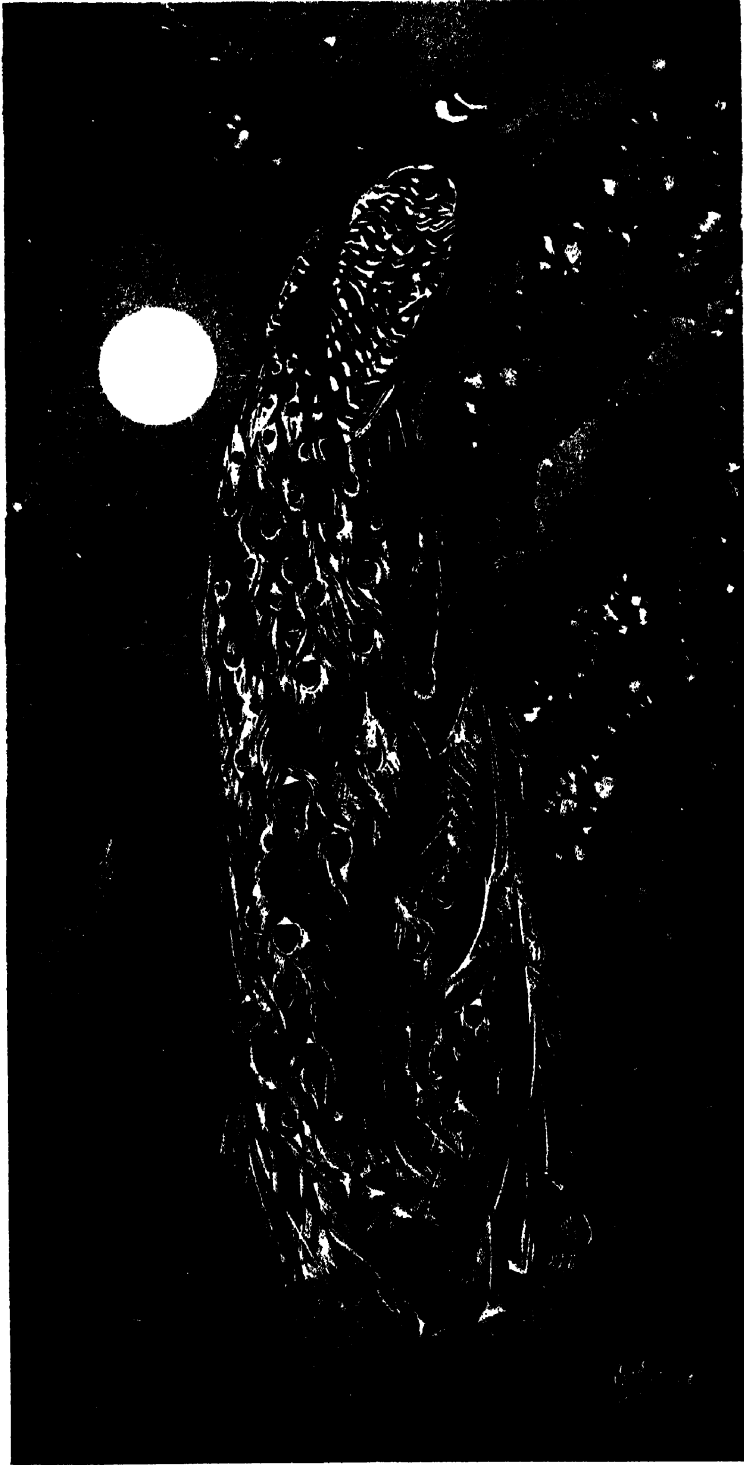
পূর্ণিমা (জাপানী পদ্ধতি)

শিল্পী— শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মতিলাল শীল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শৈশবে

অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় করিতে পারিয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা অধিক নহে; এবং মতিলাল শীল মহাশয় সেই অল্পসংখ্যক মহৎ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত। মতিলাল শীল মহাশয় যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তাহার সদ্ব্যয় করিয়া তাহা সার্থক করিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গলার বহু সাধারণ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার নামের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। মতিলাল যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালীন সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে মতিলাল শীল মহাশয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

মতিলাল ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার পিতা চৈতন্যচরণ শীল মহাশয়ের চীনাবাজারে একখানি বস্ত্রের দোকান ছিল। তাঁহার নিবাস ছিল কলুটোলায়। বঙ্গীয় সন ১১৯৮ সালে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) মতিলালের জন্ম হয়। সোণার ঝিনুক মুখে করিয়া জন্মগ্রহণ না করিলেও মতিলাল অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তৎকালীন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তৎকালীন প্রথা অনুসারে প্রথমে স্থানীয় পাঠশালায় মতিলালের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি কিছুদিন মিঃ মার্টিন বৌল নামক একজন ইয়োরেশিয়ান প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক ইংরেজি বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা করেন। এই সময়ে বাবু নিত্যানন্দ সেন কলুটোলায় একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয় হইতে মতিলাল প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বিদ্যালয়ের পরিণামে বাবু গৌরমোহন আঢ্য সুপ্রসিদ্ধ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

মতিলালের পুঁথিগত বিদ্যা ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু কর্ম্ম-জীবনে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ান ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সাহচর্য্যে চলনসই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত গণিতে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় নিজের চেষ্টায় তৎকালসুলভ গণিত-বিদ্যাও কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেকালের প্রথা অনুসারে তাঁহার ইংরেজি ও বাঙ্গলা হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের তিনি অনুরাগী ছিলেন এবং তাহাতে সাধকোচিত সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে, সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়, তিনি সখের কবির দলে ও অপরাপর আমোদ প্রমোদে যোগ দান করিতেন।

বাল্যকালেই মতিলালের পিতৃবিয়োগ হয়। মতিলালের জীবনীকার লিখিয়াছেন, স্বাভাবিক অভিভাবকের অভাবে মতিলাল এই সময়ে কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং অসৎসঙ্গে পড়িয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহার অন্যতম অভিভাবক বাবু বীরচাঁদ শীল তাঁহার বিবাহ দেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর। মতিলালের শ্বশুর বাবু মোহনচাঁদ জামাতাকে লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হন। তখনও রেল হয় নাই। তিন মাসে নৌকা যোগে তাঁহারা কাশীতে উপস্থিত হন। তথা হইতে তাঁহারা বৃন্দাবন, জয়পুর, মথুরা প্রভৃতি ঘুরিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। চব্বিশ বৎসর বয়সে মতিলাল, রীতিমত বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

কর্ম্মক্ষেত্রে

এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত মতিলালের পরিচয় হয়। তাঁহারা দুর্গের অধিবাসীদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার মতিলালের

উপর অর্পণ করেন। দুই বৎসর এই কর্ম্ম করিবার পর মতিলাল বালি খালের কাষ্টমস্ দারোগার পদ লাভ করেন। কিন্তু এই কার্য্য তিনি দীর্ঘকাল করিতে পারেন নাই।

বাল্যকালে আমরা "চরিতাষ্টক" গ্রন্থে মতিলাল শীল মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছিলাম। শৈশবে পঠিত মতিলাল-জীবনীর একটি কথা এখনও মনে আছে—মতিলাল খালি শিশি-বোতল ও কর্কের ব্যবসায় করিয়া ধনশালী হন। মতিলালের জীবনে সেই খালি শিশির ব্যবসায়ের সূত্রপাত এই সময়ে হয়। একদা তিনি অত্যন্ত সুলভে প্রচুর পরিমাণে খালি শিশি বোতল বিক্রীত হইতে দেখিয়া সমুদায় বোতল ক্রয় করিয়া লন। কিছুদিনের মধ্যে বাজারে শিশি বোতলের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তখন উহা বিক্রয় করিয়া তিনি বিলক্ষণ লাভবান হন।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এইরূপ দূরদর্শিতা মতিলাল শীল মহাশয়ের উন্নতির প্রধান কারণ। বাজারের তেজী-মন্দী অনুসারে ব্যবসায়ীদের উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। কোন্ সময়ে কোন্ জিনিসের চাহিদা বেশী হইবে, তাহা লক্ষ্য করা এবং তদ্বিষয়ে ওয়াকিব-হাল থাকা চতুর ব্যবসায়ীর প্রধান গুণ। ইহা বহুদর্শিতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা এবং সুবিবেচিত বিচার-শক্তির ফল। মতিলাল এই গুণটি অজস্রভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী মহলে শীঘ্রই তাঁহার এই গুণটির কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে, এবং মতিলাল ব্যবসায় ক্ষেত্রে অখণ্ড প্রতিপত্তি লাভ করেন। সে যুগের অন্যান্য যাঁহারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকেরই এই গুণটি অল্পাধিক পরিমাণে ছিল।

এই প্রতিপত্তির ফলে মতিলাল অচিরে ইয়োরোপীয় বণিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে ষ্ট্রাণ্ড ফ্লাওয়ার মিলের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ স্মিথসন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মতিলাল তাঁহার বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হয়। ক্রমে ক্রমে বহু বিলাতী জাহাজের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে বেনিয়ান নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা তাহাদের পণ্য বিক্রয় করাইয়া লইতে লাগিল। ভারতে ও চীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপের কাল—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মতিলাল এই সকল কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। বেনিয়ান রূপে তিনি কেবল যে বিলাতী জাহাজের মাল বিক্রয় করাইয়া দিতেন তাহা নহে—এ দেশে অবস্থান কালে এবং এ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জাহাজে যে সকল মালের প্রয়োজন হইত, এতদ্দেশীয় বাজার হইতে মতিলাল তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি ভারতবর্ষের সহিত বিলাতের বাণিজ্য ব্যাপারে মধ্যবর্ত্তিতা করিয়া উভয় দিক হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

জাহাজের মুৎসুদ্দিগিরি, এবং মিঃ স্মিথসনের মুৎসুদ্দি-গিরি ব্যতীত, শীল মহাশয় নিম্নলিখিত সাহেব কোম্পানী-গুলিরও বেনিয়ান ছিলেন—

মেসার্স লীচ, কেট্‌লওয়েল
" লিভিংষ্টোন, সাইরেরেস এণ্ড কোং
" ম্যাকলিওড, ফাগান এণ্ড কোং
" চ্যাপম্যান এণ্ড কোং
" টুলো এণ্ড কোং
" রালি, মাভ্রোজানি
" ওসওয়াল্ড, শীল এণ্ড কোং
" কেলসাল এণ্ড কোং

এই শেষোক্ত কোম্পানীর আপিসে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত মতিলালের পরিচয় হয়। রামগোপাল তখন তরুণ যুবক—কেলসাল কোম্পানীর আপিসে সহকারীর কর্ম্ম করিতেন। জহুরী জহর চেনে—রামগোপালকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া শীল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—ইনি একটি রত্ন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বন্ধু-সমাজে রামগোপাল "রবার্ট" নামে অভিহিত হইতেন। মতিলাল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—রবার্টের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। সেই ভবিষ্য-দ্বাণী যে কিরূপ সফল হইয়াছিল, রামগোপালের জীবনীতে আমরা তাহা দেখিয়াছি।

বাঙ্গলাদেশে যে নীলের ব্যবসায় এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, মতিলাল তাহার প্রথম বাজারের গোড়াপত্তন করেন। মেসার্স মূর, হিকে এণ্ড কোং নামে নীলের ব্যবসায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মতিলাল দেশীয় পণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ ভাবে নীল, চিনি, চাউল ও সোরা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। একজন ইয়োরোপীয়ান বণিকের সহিত বাজী রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া কেবল হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া নীলের একটা নমুনা পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহার গুণাগুণ ও বাজার-দর বলিয়া দিয়াছিলেন। ফলে তিনিই বাজী জিতেন। চাউল, সোরা, চিনিও তিনি এইরূপে কেবল অনুভূতি শক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুণাগুণ ও বাজার-দর নির্ণয় করিতে পারিতেন।

কিছুকাল মুৎসুদ্দিগিরি করিবার পর মতিলাল স্বয়ং আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এ দেশ হইতে তিনি নীল, রেশম, চিনি, সোরা ও চাউল ইয়োরোপে রপ্তানী করিতেন, এবং ইয়োরোপ হইতে বস্ত্র ও লৌহজাত দ্রব্য আমদানী করিতেন। তাঁহার পড়তা এমন ভাল ছিল যে, তিনি যে কোন ব্যবসায়ে হাত দিতেন, তাহাতেই আশাতীত লাভ করিতেন। ধূলিমুষ্টি ধরিলে স্বর্ণমুষ্টি হওয়া যাহাকে বলে, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। তিনি কোম্পানীর কাগজ বা অন্য কোনরূপ 'সিকিউরিটী'তে টাকা আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসিতেন না, টাকা খাটানো তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, এবং তাহা বিনিয়োগের অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া মতিলাল অবশেষে জাহাজের কাজ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের ছোট বড় ১২।১৩ খানি জাহাজ হইল। এই সকল জাহাজ চীন ও ইয়োরোপে বাণিজ্য করিতে যাইত। এই সকল জাহাজের মধ্যে কলিকাতায় নির্ম্মিত এক-খানির নাম তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নামে, "রাজরাণী" রাখা হয়। কলিকাতায় টানা জাহাজের প্রথম প্রবর্ত্তন তিনিই করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রথম জাহাজখানির নাম—বেলিয়ান।

জাহাজের কার্য্যেও প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় মতিলাল উদ্বৃত্ত অর্থে জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বাঙ্গলার অন্যতম বড় জমিদার হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা এবং সন্নিহিত স্থানসমূহেও তিনি বহু ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বিষয় কর্ম্মে লাভ ও ক্ষতি দুইই হয়। মতিলাল যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিছু কিছু ক্ষতিও সহ্য করিতে হইত। এইরূপ ক্ষতি একত্র করিলে অর্দ্ধকোটীর কম হইবে না। তথাপি তিনি কুবেরের ঐশ্বর্য্য তাঁহার পুত্রগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সদনুষ্ঠান

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মতিলাল বারাকপুর রোডে বেলঘরিয়া গ্রামে একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন, প্রত্যহ এখানে ৫০০ হইতে ১০০০ লোককে অন্নদান করা হইত। অধুনা এখানে প্রত্যহ দেড়শত লোককে খাইতে দেওয়া হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় মতিলালের জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল শীল মহাশয় প্রত্যহ ৩০০০ লোককে অন্ন এবং অনেককে বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

অনাথ শিশু ও অনাথা বিধবাগণকে মতিলাল নিয়মিত ভাবে বৃত্তিদান করিতেন। দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সাহায্য লাভ করিত; এমন কি বার্দ্ধক্য বশতঃ ভৃত্যগণ কর্ম্মে অসমর্থ হইলেও তাঁহার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইত না। জনসাধারণের বিপদ আপদে তাঁহার কোষাগার সদা উন্মুক্ত থাকিত। তৎকালে এমন কোন সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান ছিল না যাহাতে তিনি অর্থ সাহায্য ও অন্যপ্রকার সাহায্য না করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল শীলের বিবাহের সময় মতিলাল ঋণদায়ে কারাবদ্ধ বহু ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ মহৎ কার্য্য তিনি ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আরও কয়েকবার করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় জ্বর চিকিৎসার হাসপাতাল স্থাপনার্থ মতিলাল শীল মহাশয় প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করেন, এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্গত একটি রোগিনিবাস (ওয়ার্ড) এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতার পরি-চায়ক হিসাবে "মতিলাল শীল'স ওয়ার্ড" নামে অভিহিত হয়।

সাধারণতঃ যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়, স্বয়ং মতিলাল সেরূপ কোন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; তাই বলিয়া তিনি শিক্ষাবিমুখ ছিলেন না। শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা এবং মহোপকার তিনি ত স্বীকার করিতেনই; কিন্তু কেবল মুখের কথায় তাহা স্বীকার করা না করা সমান

কথা। মতিলাল তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া "শীলস্ ফ্রী কলেজ" স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এখানে ৩৬০টি বালক বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বেলঘরিয়ার অতিথিশালায় যেমন একদিকে তিনি দেহের খোরাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপর দিকে "শীলস ফ্রী কলেজে" তিনি তদ্রূপ মনের খোরাকের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। অর্থের ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যয় আর কি হইতে পারে? ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান—এই দুই মহৎ অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

মতিলাল সমাজ-সংস্কারক

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে এ দেশে যে ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, মতিলাল তাহা হইতে মুক্ত ছিলেন না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দুগণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একটি ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন। সতীদাহ আইন রহিত করিবার জন্য সভা হইতে বিলাতের পার্লামেণ্টে আবেদন প্রেরণ করা হয়। সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মতিলাল শীল মহাশয়কে সভায় যোগ দান করিবার জন্য বহু উপরোধ অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে সভার সম্পাদক এবং "চন্দ্রিকা" সংবাদ-পত্র সম্পাদক পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শীল মহাশয়কে সভায় যোগ না দিবার কারণ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে শীল মহাশয় বলেন, উহা ধর্ম্মসভা নয়,—অধর্ম্মসভা। ইহার পর স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে সভার একটি অধিবেশন হয়। সেই সভায় মতিলাল শীল মহাশয় সভাকে দরিদ্র নারায়ণের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে বিধবা ও অনাথদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য একটি তহবিল স্থাপিত হয়, এবং মতিলাল স্বয়ং সেই তহবিলে ত্রিশ সহস্র টাকা প্রদান করেন। ইহার পর সভার লক্ষ্য ও কার্য্য-পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

শীল মহাশয় এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যিনি সাহস পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে তিনি ২০০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। এক ব্যক্তি এই পুরস্কার পাইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

রাজনীতিক ব্যাপারেও মতিলাল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইংরেজ শাসনের যাহাতে উন্নতি হয়, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার বরাবরই ছিল, এবং এ পক্ষে কোনরূপ চেষ্টা হইতে দেখিলে তিনি তাহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

সন ১২৬১ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০এ মে) তারিখে মতিলাল শীল মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ডাক্তার যখন তাঁহার জীবনের আর আশা নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার নিজের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় তাঁহারই নির্ম্মিত গঙ্গাতীরস্থ ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইখানে সজ্ঞানে পরম শান্তিতে তিনি লোকান্তরে প্রয়াণ করিলেন।

মতিলাল শীল মহাশয়ের অসংখ্য সৎকার্য্যের মধ্যে এইখানে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে একটি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। তাহাতে ত্রিশটি রোগী থাকিত। শীল মহাশয় ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হইলে মতিলাল তাহাতে ১২০০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এবং ঐ চাঁদা বাবদ তাঁহার বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের ভূমিখণ্ড দান করেন। সেই ভূমির উপর মেডিক্যাল কলেজ নির্ম্মিত হয়।

হীরা বুলবুল নামক একটি পতিতা নারীর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা হইলে হিন্দুগণ ক্রুদ্ধ হন, এবং বহু-বাজারের রাজেন্দ্র দত্ত (রাজাবাবু) ও মতিলাল শীল মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু মেট্রোপলিট্যান কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য শীল মহাশয় মাসিক ৫০০ টাকা দিতেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখের "লিটারারী গেজেটে" প্রকাশ, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের পারি-

তোষিক বিতরণের জন্য মতিলাল শীল মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ফিভার হাসপাতালের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

পুত্রের বিবাহের সময় যেমন, দুর্গা পূজা ও অন্যান্য সময়েও মতিলাল বহু কারাবদ্ধ ঋণীকে খালাস করিয়া আনিতেন।

গঙ্গাস্নানার্থীদের সুবিধার জন্য মতিলাল গঙ্গাতীরে একটি ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহা এখনও "মতিশীলের ঘাট" নামে পরিচিত।

দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মতিলাল সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। *

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে মতিলাল শীল ট্রাষ্ট এষ্টেট হইতে প্রকাশিত Life Meitti Lall Seal গ্রন্থ হইতে এবং "বৈশ্যশক্তি" ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশ্যামলাল শীল দেবভূতি লিখিত "সামাজিক বিশৃঙ্খলতা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

যাদুঘর।—শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। 'যাদুঘর' তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। যাঁরা তাঁর 'গরমিল' ও 'খেলার পুতুল' পড়েছেন, তাঁদের এ কথা বলা বাহুল্য যে, কবি নরেন্দ্র দেব কথাশিল্পেও একজন উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ্। তাঁর সুন্দর, সুললিত, সাবলীল ভাষা যথার্থই উপভোগ্য। 'যাদুঘর' সুধু গল্প নয়; 'যাদুঘরে' শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব আমাদের সমাজের নানা দিকের সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চরিত্র-চিত্রণে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারা ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই এই বইখানিতে। যাদুঘরের গল্প আরম্ভ হয়েছে একজন আভিজাত্য-গর্ব্বে-উদ্ধত ধনীর সঙ্গে একজন স্কুল-মাষ্টারের সংঘাত নিয়ে। এই ধনীর একমাত্র সুশীল, সুবোধ ও উচ্চ-শিক্ষিত সন্তান প্রকাশ এবং সেই শিক্ষকের রূপসী, বিদুষী ও গুণবতী কন্যা বিভা উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার তাঁর মাতৃহারা কন্যাকে সুখী করবার আশায় প্রকাশের মত সুপাত্রের হাতে তাকে সম্প্রদান করতে উৎসুক ছিলেন; কিন্তু প্রকাশের আভিজাত্য-গর্ব্বিত ধনী পিতা দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হলেন না; বরং এরূপ অসম্ভব প্রস্তাব করবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করবার জন্য পুত্রের শিক্ষককে অপমান করতে ইতস্ততঃ করেন নি। শিক্ষক প্রকাশের পিতার এই রূঢ় আচরণে মর্ম্মাহত হ'য়ে কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিলেন। পিতার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে বিভাও এ বিবাহে কোন আপত্তি করল না। কিন্তু বিবাহের পরেই সে বুঝতে পারল যে জীবনে কত বড় ভুলই না সে ক'রে ফেলেছে। প্রকাশ পিতার ব্যবহারে লজ্জিত হ'য়ে গৃহত্যাগ করে চলে যায়। দৈবাৎ বিভার সঙ্গে জয়পুরে তার দেখা হয়। তার পর প্রকাশ গৃহে ফিরে এল, কিন্তু বিবাহ করতে কিছুতেই সম্মত হোলো না। তার পর মাষ্টার মহাশয়ের মৃত্যু হোলো, বিভাও বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এল, এবং প্রকাশের ভগিনী উমার চেষ্টায় প্রকাশের পিতাই এই নিরাশ্রয়া মেয়ে দুটীর অভিভাবক হলেন। প্রকাশের জননী কেমন ক'রে তাদের দুটীকে আপনার করে নিলেন এবং আরও অনেক সুন্দর ঘটনা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব অতি সুকৌশলে ও সুন্দর লিপি-চাতুর্য্যে প্রকাশ করেছেন, তা এই বইখানি পড়লে বুঝতে পারা যায়। লেখক পুরাতন সমাজকে আধুনিক যাদুঘরে টেনে এনে অতি সুকৌশলে সাজিয়ে দিয়েছেন। বইখানি পড়তে বসলে শেষ না করে থাকা যায় না। এদিকে কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রচ্ছদপটের উপর সুরঞ্জিত ছবি—এ সব যেমন হবার, তেমনই হয়েছে।

কোষ্ঠী-দেখা।—জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের মাসফল, লগ্নফল, ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র, এই তিনখানি বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, জ্যোতিষের মত কঠিন অথচ উপাদেয় পুস্তক অতি সরল, সুন্দর ও সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় লিখতে তিনি অদ্বিতীয় বললেও বেশী বলা হবে না। কোন প্রকার বিশেষ বাগাড়ম্বর না ক'রে, অকারণ-পাণ্ডিত্য-প্রকাশের দুর্জ্জয় লোভ সংবরণ করে, তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে বইগুলি লিখেছেন; এবং আমরা যতদূর জানি, তাঁর বইগুলি যথেষ্ট জনাদর লাভ করেছে। এই 'কোষ্ঠী দেখা' বইখানিও তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাঁর কোন রকম পড়াশুনা নেই, তিনিও এই বইখানি পড়ে কোষ্ঠীবিচার করতে পারবেন। তিনি একটী কথা অম্লান বদনে স্বীকার করেছেন যে, কোষ্ঠীবিচারে হিন্দু জ্যোতিষ ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, এর কোনটীকেই অগ্রাহ্য করা চলে না, করা কর্ত্তব্য নহে। বাচস্পতি মহাশয় তাঁর অভিজ্ঞতার ফল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চিন্তাধারার অনুসরণ না করে, বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত

করছি। অন্ত বইগুলির মত এই কোষ্ঠী-দেখাও সাধারণ্যে সাদরে গৃহীত হবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বতপা।—শ্রীরামনারায়ণ কর এম-এ প্রণীত; মূল্য দুই টাকা চারি আনা। এখানি সুবৃহৎ, ৪৫৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত উপন্যাসখানি লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হইলেও, তাহা ব্যর্থ হয় নাই, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে নরনারীর যে নূতন আদর্শ দেখা দিয়াছে, গ্রন্থকার সুকৌশলে সেই সকল আদর্শ-মূলক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন; এবং লেখক সে সকল চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার দেশসেবা ও সমাজসেবা সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলির দ্বারা তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন; অথচ নিজে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। আমরা এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

গরীবের ছেলে।—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। সুপ্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রবাবুর লেখার পরিচয় প্রদান করা নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি তাঁহার এই 'গরীবের ছেলে' উপন্যাসখানিতে তাঁহার গল্প রচনার পারদর্শিতার বিশেষ প্রমাণ দিয়াছেন। পাড়াগেঁয়ে গরীব মা-বাপের ছেলে সরোজ সহরের সম্পত্তিশালী বাবু যুবক ও যুবতীদের সঙ্গে মিশে, তাদের চা'ল ধরে যে, কেমন করে ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়েছিল, সৌরীন্দ্রবাবুর তুলিকায় তার ছবি অতি স্পষ্ট অঙ্কিত হয়েছে। তিনি যে কয়টী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তার কোনটাই অতিরঞ্জিত হয় নাই।

পূর্ণচ্ছেদ।—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। এই উপন্যাসখানির প্রধান নায়ক ফকিরকে অঙ্কিত করিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। গ্রাম-পল্লীর কথা, দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শৈলজানন্দ একেবারে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অঙ্কিত করেন; এই কারণেই তাঁহার উপন্যাসগুলি পাঠকগণের এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; এই 'পূর্ণচ্ছেদ' উপন্যাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলজানন্দের অশ্রান্ত লেখনী যেন এমনই উপাদেয় উপন্যাসে বাঙ্গালা কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে।

আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ (১ম খণ্ড)—শ্রীমোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত, অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত; মূল্য ৸৹। খাদি-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, মহাত্মার পরম ভক্ত শিষ্য, ত্যাগী সতীশবাবু একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন, মহাত্মার আত্মকথা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন; আর এই ৪১৭ পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য বারো আনা ধার্য্য করিয়া দেশের সাধারণ পাঠকেরও অধিগম্য করিয়া তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীকে ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীর সমস্ত লোক মানব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিবাদন করিতেছে, ভক্তি-প্রণত চিত্তে তাঁহার অননুকরণীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। সেই মহাত্মার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য স্বাভাবিক; এবং সেই জীবন-কথা মহাত্মা স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে জনসাধারণ যে বিশেষ আকৃষ্ট হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। মহাত্মা যেমন সরলভাবে গুজরাটী ভাষায় তাঁহার অলৌকিক জীবন কথা বলিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশবাবুও তেমনি সরল, সহজ বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। এ পুস্তকের পরিচয় কি দিব? ইহার লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইলে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে—এ যে অমূল্য গ্রন্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।—(গান্ধীভাষ্য), মূল্য বারো আনা। এই অমূল্য গ্রন্থখানিও খাদিপ্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটী ভাষায় 'অনাসক্তি যোগ' নাম দিয়া গীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সতীশবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনেক সংস্করণ হইয়াছে, অনেক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে; সে সমস্তই পরম উপাদেয়। তাহা হইলেও মহাত্মার লিখিত ভাষ্য পড়িবার মত, ভাবিবার মত হইয়াছে; বিশেষতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভে মহাত্মাজি যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর, তাহা তাঁহার ন্যায় ত্যাগী মহাত্মারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু এই পাঁচশত পৃষ্ঠার পুস্তকখানির অসম্ভব সুলভ মূল্য বারো আনা ধার্য্য করিয়া ইহাকে সকলেরই সাধ্যায়ত্ত করিয়াছেন; ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন। এই গীতার বহুল প্রচার কে না কামনা করিবে?

লে মিজেরাব্‌ল্‌।—অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক অনূদিত, পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ; মূল্য সাত টাকা চারি আনা। ভিক্টর হিউগোর লে মিজেরাবল একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস; বলিতে গেলে, পৃথিবীর কথা-সাহিত্যে এখানি অতুলনীয়। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বাবু এই বৃহৎ উপন্যাসখানির সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ লেখেন নাই, সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন; এবং সে অনুবাদ এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, কোথাও ভাষা আড়ষ্ট হয় নাই। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর এমন শ্রমসাধ্য কার্য্যে তিনি ব্যতীত আর কেহ হস্তার্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এই পাঁচ খণ্ড পুস্তক ভাল কাগজে এবং উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে তাঁহার ব্যয়ও কম হয় নাই। ইহা তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার লিপি কুশলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। আমরা এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

নক্সী-কাঁথার মাঠ।—জসীমউদ্দীন প্রণীত; মূল্য এক টাকা। কবি জসীমউদ্দীন যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি খাঁটি পল্লী-কবি। তাঁহার প্রত্যেকটী কবিতা পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীচিত্রে উজ্জ্বল। সহরবাসী পাঠকগণ এই সকল কবিতার সম্যক্ রস গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই যে, পল্লীর সহিত তাঁহাদের নিগূঢ় পরিচয় নাই, পল্লী-কৃষকদিগের ভাষাও অনেকের অধিগম্য নয়। কিন্তু আমি পল্লীবাসী;

পল্লীকৃষকদিগের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত বিশেষ পরিচিত। তাই কবি জসীমউদ্দীনের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক বর্ণনা, প্রত্যেক উপমা আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে; তাঁহার এই 'নক্সী-কাঁথার মাঠে' আমি পল্লী-জননীর, পল্লী বধূর, পল্লী যুবকের অতুলনীয় চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন কবিকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি—ইহা আমার এতই ভাল লাগিয়াছে।

সনাতন হিন্দু—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। সনাতন হিন্দু সমাজ রক্ষণশীল—ইহাই এতদিন হিন্দু সাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু হিন্দু-সমাজের আরও যে একটা রূপ—তাহার উদার দিক আছে, তাহা কম লোকেই জানিত। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় "সনাতন হিন্দু" বইখানিতে হিন্দু সমাজের সেই উদার রূপটি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তর্কভূষণ মহাশয়ের কয়েকটি অভিভাষণের ও তদানুষঙ্গিক বাদানুবাদের সমষ্টি। ইহাতে সনাতন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ও উদার উভয় মত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পাঠক-পাঠিকাগণের বিচার করিয়া দেখিবার এবং নিজ নিজ মতামত গঠন করিবার সুবিধা হইয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার উদার মতগুলি অভিভাষণের আকারে প্রকাশ করিবার পর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার জের এখনও চলিতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীয় ও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতের সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

কাঠিয়া বাবা।—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য দশ আনা। এখানি ছেলেদের বই। ভারতের নব জাগরণের দিনে বালকদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই মহাপুরুষের চরিত্রের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ভারতের পশ্চিমোত্তর কোণের পঞ্চনদ প্রদেশ অনেক সাধু মহাপুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। যে পঞ্চনদ শিখধর্ম্মগুরু নানকের জন্মভূমি, কাঠিয়া বাবাজী মহারাজও সেই পঞ্চনদের বক্ষেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষের চরিত্র ছেলেদের উপযোগী সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহাপুরুষের প্রকৃত নাম রামদাস। তাঁহার গুরু দেবদাসজী রামদাসকে কাঠের কৌপীন পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় কাঠিয়া বাবা। কাঠিয়া দাস বাবাজী মহারাজ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সাধু। বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ অহিংস। কিন্তু অহিংসা যে ভীরুতার নামান্তর নহে—প্রয়োজন হইলে সাধু বৈষ্ণবকেও হিংসা করিতে হয়—যুদ্ধ করিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও হয়—উজ্জয়িনীর এক কুম্ভমেলায় বৃন্দাবনের মোহন্ত কাঠিয়া দাস বাবাজী তাঁহার শিষ্যগণকে এবং ৭০ হাজার বৈষ্ণব সাধুকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাবাজী মহারাজের অনেক অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী বইখানিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আরাতামা।—উপন্যাস; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। বাঙ্গলা সাহিত্যে আজকাল যে ধরণের উপন্যাস প্রকাশিত হয়, আরাতামা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার ঘটনাস্থল, নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি চরিত্রগুলির নাম-ধাম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি—সমস্ত বিষয়ই নূতন। ইহাতে রাজনীতি আছে, অথচ ইহা ঠিক রাজনীতিক উপন্যাস নহে। আখ্যানবস্তুর ঘটনাস্থল যেখানে, সেখানকার যুদ্ধনীতিরও কিছু পরিচয় ইহাতে আছে। প্রধানা নায়িকা আরাতামা অলৌকিক শক্তিশালিনী। তাহার জীবনও রহস্যময়। (নগেন্দ্রবাবুর সকল বইতেই যেরূপ রহস্যাভাস থাকে, এ বইখানিতেও তাহাই আছে—এবং বিশেষ করিয়া নায়িকা-চরিত্রে।) সে তাহার প্রণয়াস্পদের কাছে তাহার জীবন-রহস্য প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। আরাতামার যখন পূর্ণ গৌরবের সময় (এবং সম্ভবতঃ রহস্যভেদেরও সময়) ঠিক সেই সময়েই তাহার জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল—তাহার উন্মাদিনী পরিচারিকা বাষ্টি তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে একখানি ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। আরাতামার প্রাণবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়োগান্ত উপন্যাসখানিরও যবনিকাপাত হইল; রহস্য—রহস্যই রহিয়া গেল।

বিশ্ব-সাহিত্য

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বার্ণার্ড শ'র প্রথম জীবন

আজ যে-লোকের কথায় সমস্ত জগৎ সন্ত্রস্ত, একদিন সেই ব্যক্তি সভায় বক্তৃতা দিবার সময় একটীও কথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই; এত জোরে পা কাঁপিতে থাকে যে তাঁহাকে বসিয়া পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল বুকের ভিতর হইতে হৃদ্‌পিণ্ড স্থান-চ্যুত হইয়া পঞ্জর ভেদ করিয়া আসিতে চাহিতেছে; অথচ আজ তাঁহার কথার আক্রমণে য়ুরোপ থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত মেদিনী কম্পান্বিত।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' ২৬শে জুলাই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন

সহরে এক আইরিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জর্জ্জ কার শ'। তিনি সরকারী দফ্‌তর-খানায় বেশ ভাল চাকুরী করিতেন এবং শেষ-বয়সে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধান, গম ইত্যাদি শস্তের ব্যবসায় করেন। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' তাঁহার একমাত্র পুত্র-সন্তান।

স্কুলে বার্ণার্ড শ' একেবারে থার্ড বেঞ্চের ছাত্র ছিলেন। এধারে পিতার ব্যবসায়ে তেমন অর্থাগম কিছুই হইল না। তাঁহার মাতা একজন সুগায়িকা ছিলেন! তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কোনও রকমে সংসারের সঙ্গতি বজায় রাখিতেন।

এই রকম অবস্থায় শ'র আর বেশী দূর লেখাপড়া করা সম্ভবপর হইল না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছেলেকে পড়াইবার মত অর্থ-সঙ্গতি তাঁহার মাতাপিতার ছিল না। সেইজন্ম অল্প বয়সেই বার্ণার্ড শ' এক জমিদারী-সংক্রান্ত অফিসে কেরাণী হইয়া জীবনের প্রথম অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কিন্তু সেখানে যে-উপায়ে দরিদ্র লোকদের ঠকাইয়া কেরাণীরা দুপয়সা করিত, তাহা শ' করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেরাণীর জীবনের একঘেয়েমীও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। মার দিক হইতে শ' সঙ্গীত ও কাব্যকলার প্রতি একটা গভীর অনুরাগ সঞ্চয় করেন। যখন তাঁহার মাত্র কুড়ি বছর বয়স, তাঁহার বাসনা হইল যে লণ্ডনে যাইবেন—সেখানে হয় ত বৃহত্তর জীবন যাপনের একটা পন্থা মিলিবে।

লণ্ডনে আসিয়া তিনি অনেক চেষ্টার পর একটী পাক্ষিক কাগজে সঙ্গীত-সমালোচনা-বিভাগে লিখিবার অধিকার পাইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার লেখা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেল।

লণ্ডনে এডিসন টেলিফোন কোম্পানীতে একটী চাকরী জুটিল; কিন্তু সাহিত্যিক জীবনের বাধা বিবেচনায় কালবিলম্ব না করিয়াই তিনি সে চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং অনবরত খবরের কাগজের আফিসে লেখা পাঠাইতে লাগিলেন এবং অনবরত তাহা ফেরৎ আসিতে লাগিল। এই সময় তাঁহাকে নিদারুণ অর্থ-কষ্টের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। লণ্ডনের রাস্তায় ভবঘুরের মতন অতি সামান্য পোষাকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সম্পাদকগণের নিষ্ঠুরতায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্তও লেখনী ত্যাগ করেন নাই। নভেল লিখিয়া তিনি প্রকাশকদের নিকট যাইতেন; কিন্তু কোনও প্রকাশক সেই সমস্ত প্রকাশ করিত না। কিন্তু শ' তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরাশ না হইয়া প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঁচ পাতা করিয়া লিখিয়া যাইতেন। নয় বৎসরের মধ্যে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' লেখনীর সহায়তায় মাত্র ছয় পাউণ্ড উপার্জ্জন করেন। পরে একদিন একটী প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতনের সমকক্ষ-পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেন। (প্রবন্ধটী বিখ্যাত জার্ম্মাণ লেখক Max Nordeau রচিত Degenerationএর প্রত্যুত্তর-স্বরূপ "Sanity of Art" নামক রচনা) আজ বার্ণার্ড শ'র সহিত দুটী কথা বলিবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু লোক দিনের পর দিন কি অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া চেষ্টা করে;—কিন্তু সেদিন সেই মলিন পোষাকে, একগাল দাড়ি সমেত বার্ণার্ড শ' যদি কোনও ধনী বন্ধুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে সেই অতর্কিত আক্রমণে গৃহস্থ রীতিমত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিত।

এই রকম সময় একদিন লণ্ডনে ফ্যারিংটন ষ্ট্রীটের মেমোরিয়াল হলে হেনরী জর্জ্জ নামে একজন আমেরিকান্ সমাজ-সংস্কারকের বক্তৃতা শুনিয়া শ'র মনে সামাজিক চেতনা সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠে। সেই বক্তৃতার সূত্র ধরিয়া তিনি যতই চিন্তা করেন, বা যাহা কিছু অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্য হইতে সমাজ-সংস্কারের মহা-কর্ত্তব্য তাঁহার জীবনে এক অভিনব আহ্বান আনিয়া দিল। তিনি স্থির করিলেন, লণ্ডনের সামাজিক জীবনের সমস্ত গ্লানি দূর করিবার জন্য, যদি এমনি হয় একাই তিনি সংগ্রাম করিবেন। এই সম্বন্ধে শ' স্বয়ং বলিয়াছেন, "My destiny was to educate London."

সেই উদ্দেশ্যে তিনি লণ্ডনের প্রত্যেক সভায় যোগদান করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভায় গিয়া বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিতেন। প্রথম প্রথম অতি হাস্যকর দৃশ্য হইত। বক্তা কথা উচ্চারণ করিতে পারিত না—পা কাঁপিয়া বসিয়া পড়িত। তবুও লণ্ডনের লোক প্রায় প্রত্যেক সাধারণ সভাতে সেই ম্লান-বেশ যুবকটীর দেখা পাইত। অবশেষে শ' সভা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

উদাসীন জনতা চারিপাশ দিয়া চলিয়া যায়। কে শোনে উন্মাদ যুবকের সমাজ-সংস্কারমূলক বক্তৃতা! কিন্তু শ'র অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কেহ কাণ দিক বা না দিক, শ' প্রতিদিন লণ্ডনের রাস্তার ধারে সেই উদাসীন জনতাকে আহ্বান করিয়া আপনার অন্তরের বক্তব্য বলিয়া যাইতেন। কেহ তখনও ভাবে নাই—যে-সুর ও যে-স্বর একদিন বিংশ-শতাব্দীর নাগরিক জীবনের সমগ্র গতিস্রোতকে স্তম্ভিত করিয়া দিবে, সেদিন লণ্ডনের রাস্তায় জনতার উপেক্ষার মধ্যে সে তাহার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করিতেছিল।

শ' ছেলেবেলা হইতে স্বভাবতই ছিলেন হাস্য-রসিক এবং ব্যঙ্গপ্রিয়! যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সোজা বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিতেছে না, তখন তিনি গায়ে পড়িয়া রাস্তার লোকের সঙ্গে বক্তৃতার ছলে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং লোকে মজা পাইয়া ক্রমশঃ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। শ'র সাহিত্যের মধ্যে যে ব্যঙ্গের সুর তাহার প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে মিশিয়া আছে, হয়ত এইভাবেই তাহার জন্ম হয়।

ক্রমশঃ রাস্তার ধারের এই বক্তাটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং যে-সমস্ত কথা সে বলে, তাহা সবার কাছে নূতন লাগে। যথাসময়ে পুলিশের নজরও লোকটীর উপর পড়িল। একদিন সকালবেলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শ' কিন্তু নিয়মিতভাবে হাইড পার্কে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এদিন আর শ্রোতা জুটিল না;—একে বর্ষা, তাহার উপর ছয় জন পুলিশের লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উচ্চ-বাচ্য করিলেই ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু শ' বিন্দুমাত্র দমিলেন না। সেই পুলিশদের উদ্দেশ করিয়াই, ব্যঙ্গ-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহারা গম্ভীর মুখ লইয়া যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল, অবশেষে হাসির মধ্যে তাহার সঙ্গে আড্ডায় মাতিয়া গেল।

লণ্ডনের রাস্তার ধারের বক্তাটী আজ বিশ্ব-সভ্যতার রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই রকম ভাবেই বক্তৃতা দিতেছেন:—অসম্মানিত রাষ্ট্র, আহত সমাজ, ক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব, লাঞ্ছিত ঐতিহ্য, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু সেই হাইড পার্কের পুলিশের মত ইহারাও আপনাদের আক্রোশ ভুলিয়া সেই বক্তার বচন-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া যত আকৃত হইতেছে, ততই বোকার মত হাসিতেছে—আঘাত করিতে আসিয়া নিরস্ত্র হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

নিট্‌শের শেষ-দিন

পাশ্চাত্য-জগতের অতি-মানব অথবা Super-man তত্ত্ববাদের জনক ফ্রেডারিক নিট্‌শে—যিনি দার্শনিক হিসাবে না হইলেও কবি হিসাবে আজ জগতের সুর-সভা-লোক অলঙ্কৃত করিয়া আছেন এবং শত ত্রুটী সত্ত্বেও যাঁহার সাহিত্য প্রাণ শক্তির অপূর্ব্ব আধাররূপে চিরদিনই রসের ভাণ্ডারে রক্ষিত হইবে - সহসা শেষ জীবনে উন্মাদ হইয়া যান। আপনার অস্থির অন্তরকে রূপ দিতে সমগ্র জীবন তিনি ভাবোন্মাদনায় মত্ত থাকেন; কিন্তু সমসাময়িক জগৎ তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে নাই। যে লোক বিশ্ব-মানবের নব-মুক্তির জন্য অতি-মানবের সৃষ্টি করিয়া জগৎবাসীকে আহ্বান করিতেছিল—তাহার কথা কেহই শুনিত না। ক্ষিপ্ত হইয়া নিট্‌শে নিজেকে ধ্বংস না করিতে পারিয়া, অন্তরের যাহা কিছু কাম্য ও সুন্দর ছিল, তাহাই ধ্বংস করিতে লাগিলেন,—যীশুকে আক্রমণ করিলেন, ওয়াগনারকে গালাগালি দিলেন, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিলেন, সামাজিক মানুষকে অরণ্যচারী দলবদ্ধ পশু বলিয়া দূরে বর্জ্জন করিলেন—এবং বিশ্ববিহীন নির্জনতায় মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তির সম্মুখে নিজেকে দাঁড় করাইলেন। চক্ষুর দৃষ্টি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল—ক্রমশঃ তিনি অন্ধ হইয়া আসিলেন। স্নায়ুর বিকার সর্ব্ব-দেহকে পঙ্গু করিয়া তুলিল। সেই সময় অন্যান্য দেশের সুধী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সামান্য সামান্য প্রশংসা আসিতে লাগিল। ফ্রান্স হইতে বিখ্যাত সমালোচক টেইন প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন; বিখ্যাত সমালোচক জর্জ্জ ব্রাণ্ডেস্ পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীট্‌শে সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা দিতেছেন; বিখ্যাত সাহিত্যিক ষ্ট্রিণ্ডবার্গ জানাইলেন যে, তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেছেন, সবার উপরে এক অজ্ঞাতনামা ভক্ত নীট্‌শের নামে কিছু টাকাও পাঠাইল। কিন্তু যখন এই সমস্ত

আশার আলোক-রশ্মি আসিল, তখন নীট্‌শের অন্তরের দীপ-শিখা নিভিয়া আসিতেছিল। চক্ষু দৃষ্টিহীন, অন্তর অন্ধকার!

হঠাৎ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন প্রবল স্নায়ুর আক্ষেপে তিনি হত-চৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। চেতনা পাইয়াই টেবিলে গিয়া অন্তরের প্রিয়তমা ওয়াগনারের ভগ্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া শুধু লিখিলেন, Ariadne, I love you, কি মনে করিয়া ব্রাণ্ডেস্‌কে একখানি পত্র লিখিলেন, তলায় স্বাক্ষর করিলেন, "The Crucified" ক্রুশ-বিদ্ধ। অন্য আর যে দুই-একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে পরিপূর্ণ উন্মাদনা ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুরা আসিয়া দেখে নীট্‌শে তাঁহার প্রিয় পিয়ানোর উপর কনুই দিয়া বাজাইতেছেন, এবং তার-স্বরে চীৎকার করিতেছেন।

প্রথমে তাঁহাকে পাগলা-গারদে রাখা হয়। সমালোচক-চণ্ডাল Max Nordeau সেই ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লেখেন, "The right man in the right place." সেখান থেকে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, তাঁহার ভগিনী আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান। যতদিন জ্ঞান ছিল, ততদিন প্রকৃতি ছিল তাঁহার উপর নিষ্করুণ। সদা দ্বন্দ্বে ও আলোড়নে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি জ্ঞান অপহরণ করিয়া সেই অস্থির চিত্তে এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত মৌনতা আনিয়া দিল। যে ব্যক্তি ঝড়কে আহ্বান করিয়া কথা কহিয়াছেন, ভিসুভিয়াসের অগ্নি-স্রাবের মত ভাষায় অগ্নি-প্রবাহে যিনি নিজেকে জর্জ্জরিত করিয়া য়ুরোপকে প্লাবিত করিয়াছেন, অনাগত অতি-মানবের মুখে যিনি দিলেন ভাষা —জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি নির্ব্বাক মৌনতায় কাটাইলেন। সারাদিন একাকী মৌন হইয়া বসিয়া থাকিতেন—আহার, নিদ্রা কিছুই জানিতেন না। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া স্নেহময়ী ভগিনীর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। কতদিন নীট্‌শে তেমনি মৌনতার মধ্যে সেই অশ্রু-প্রবাহ দেখিতেন—কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেন না। একদিন শুধু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিসবেথ, কাঁদছো কেন? কোনও কষ্ট হয়েছে?"

একদিন উন্মাদ নীট্‌শে মৌন হইয়া শুনিতেছেন অদূরে বন্ধুরা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। অনেকক্ষণ সেই কথা শুনিতে শুনিতে কি ভাবিয়া উন্মাদের বিষণ্ণ মুখ ক্ষীণ আলোকে উদ্ভাষিত হইল। বিস্মৃতির অতল-সমুদ্র-তল হইতে স্মরণের একটী মুক্তাফল সহসা কেমন করিয়া দেখা দিল। উন্মাদ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "মনে হচ্ছে আমিও একদিন কয়েকখানা বই লিখেছিলাম।"

তারপর আবার বিস্মৃতির তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস উন্মাদের চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। উনবিংশ-শতাব্দীর নব-ভাব-তন্ত্রের উন্মাদ শিশু বিংশ-শতাব্দীর আগমন-মুহূর্ত্তেই চির-মৌনতার ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। নীট্‌শে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

স্কট ও সাহিত্যিক অধ্যবসায়

বিখ্যাত ইংরাজ নভেল-লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কটের যখন পঞ্চান্ন বৎসর বয়স, তখন সহসা তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা দেখা দিল। তিনি বালাণ্টাইন কোম্পানী নামক এক প্রেসের অংশীদার ছিলেন। এই প্রেসেই তাঁহার সমস্ত বই ছাপা হইত। নানা কারণে সহসা এই প্রেস দেউলিয়া হইয়া যায় এবং স্যার ওয়াল্টার স্কটের ঘাড়ে ১৩০,০০০ পাউণ্ডের দেনা আসিয়া পড়ে। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর।

লোকদের না ঠকাইয়া তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি সেই সমস্ত টাকা পরিশোধ করিবেন। স্কটের এই ভয়াবহ আর্থিক দুর্গতির কথা শুনিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া উঠিল। ওয়েভারলী নভেলের লেখকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া লর্ড ডাডলী বলেন, যত লোককে স্কট তাঁহার অপূর্ব্ব কাহিনী রচনার দ্বারা যে আনন্দের কয়েকটী অমূল্য মুহূর্ত্ত দিয়াছেন, তাহার প্রতিদানে, সেই সমস্ত লোক যদি আজ স্কটকে ছয় পেন্স করিয়াও দেয়, তাহা হইলে স্কট রথচাইল্ডের মত ধনী হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্কট কাহারও নিকট হইতে দানস্বরূপ কিছু গ্রহণ করিলেন না। তিনি আপনার মনে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত, অবিরাম তাঁহার লেখনী হইতে মানব-চরিত্রের অপূর্ব্ব সব কাহিনী বহির্গত হইতে লাগিল এবং স্কট তাঁহার অংশের ৪০ হাজার পাউণ্ড ঋণ শোধ করিলেন।

রাণী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্' আরম্ভ হ'ল।

বীণা বল্লে 'যাবি ভাই—ঐ এসেছে?'

'চল্।' জনকতক ছেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াল খেলা ছেড়ে।

লীলা বল্লে, 'না রে—এক্ষুনি গিয়ে গোলমাল করলে বকুনি খাবি; ওঁর 'পাঠ' শেষ হয়ে যাক্।'

কথাটার যুক্তি-যুক্ততা সকলেরই মনে লাগল। আর লীলা আংশিক নেত্রীও বটে; দলপতির অবর্ত্তমানে ওকে সকলেই মেনে চলে।

'পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব'। 'চল্ ভাই এইবার শেষ হয়ে গেছে'—শিশুর দল বালক বালিকার দল সব এসে দাঁড়াল।

সুন্দর মধুর সুরে—পণ্ডিতজী তখন মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে 'সর্ব্ব পাপ হরো হরি' বলে মুখ তুল্লেন।

দালানের এক কোণে একখানি কম্বলের আসন পাতা, সুমুখে একখানি পিঁড়ির ওপর পণ্ডিতজীর পুঁথিপত্র—আর একটী তাম্রকুণ্ড তুলসীদল গঙ্গাজলসহ।

পণ্ডিতজীর সামনে একেবারে আট দশখানি ছোট ছোট লাল টুকটুকে হাত বেরিয়ে এল—

'পণ্ডিতজী মেরা', 'পণ্ডিতজী মেরি', 'পণ্ডিতজী হামকো পহিলে'।

সুমুখের পুঁথিপত্রসমন্বিত পিঁড়িখানি সরাতে সরাতে সৌম্যদর্শন শুভ্রকেশ পাকা-গোঁফ হাসিমুখ বৃদ্ধ বলতে লাগলেন—'ধীরে বেটা, ধীরে' চশমা নিকাল লেঁ।'

পরামর্শ আগের দিন করাই ছিল।—কে একজন চাকর হাত দেখায়, ছেলের দল তা' দেখতে পেয়ে—ঠিক করে কাল পণ্ডিতজীকে ধরে সকলে নিজের নিজের ভাগ্যের ইতিহাস আগেই পড়িয়ে নেবে।

চশমাটী পরে—একখানি ছোট হাত ধরে বল্লেন, 'এক এক করকে বেটা।'

একে একে সকলের সৌভাগ্যের ইতিহাস শোনা-জানা হয়ে গেল। কারুকে তার সব শুদ্ধ-সমাবেশ, কারুকে কোনো বিশেষ গ্রহাধিপতির করুণাবিশিষ্ট, কারুকে চতুষ্কোণ, কারো বা যব-চিহ্নযুক্ত, কেউ বা যশ, কেউ বা অপরিমিত ধন, কেউ বা সুখভাগী হবে;—এমনি কথায় সকলেই জনে জনে তাদের ভবিষ্যৎ সুখের ইতিহাস শুনে নিতে লাগল।

গলিতে চটীর শব্দ হ'ল—লীলার দাদা রমেশ উঠানে এসে দাঁড়াল. 'কি রে,—কি ওখানে?'

'হাত দেখাবে দাদা? তুমি পাশ হবে কি না বলে দেবেন—আমাদের সব বলে দিচ্ছেন', লীলা সাগ্রহে ভাইকে বল্লে।

সুধীর বল্লে, 'হ্যাঁ, ওর হাত খুব ভাল বলেছেন, বল্লেন, 'রাণী কি সদৃশী'—।'

রমেশ বিনা বাক্যে পণ্ডিতজীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলে।

পরীক্ষার সাফল্য যশ রেখা—ধনভাগ্য যা কিছু সব জানা হয়ে গেল।

'ভারি জানে; বাজে ও সব! চাকরগুলো দেখায় বলে তোরাও বোকা তাই বিশ্বাস করিস্' রমেশের খুড়তুতো দাদা নরেশ বল্লেন।

বীণার দিদি বল্লে, 'না ভাই, একটু একটু পারেন বোধ হয়।—সব কি আর বসে বসে মিথ্যে কথা বল্‌বেন। আর কাকে কাকে তো অনেক কথা বলেছেন, সেগুলো ফললে না ফললেই বোঝা যাবে।'

'আচ্ছা আমি কাল দেখাব—আমার তো সেকেণ্ড-ইয়ার,—দেখি কি হয়—'

'তা' তুমি যদি না পড় তাহলে কি হবে?' রমেশের বিশ্বাস হয়েছিল একটু।

'আচ্ছা—তোরা থাম্ না—দেখা যাক্ না কি হয়।'

কৈলাসের রম্য শিখরে, দেবদারুচ্ছায়ায়, প্রশস্ত সুন্দর শিলাতলে, অজিনাসনে বসে, একদা কবে গৌরী ভগবান শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেন, এই যে অখিলব্রহ্মাণ্ড-বিশ্ব—এই ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণ—এদের শান্তির মুক্তির কি উপায় কিছুই নাই?

দেবাদিদেব প্রসন্ন বিমল হাস্যে বলেন, 'হে দেবী, যাঁর··· নাসাগ্রে বরমৌক্তিকম্, কণ্ঠে চ মুক্তাবলী, বক্ষঃস্থলে কৌস্তভম্—সেই যে গোবিন্দ সেই তাঁর—

'শ্রীগোপাল মহীশালা—সর্ব্ব বেদান্ত পালকাঃ'—ইত্যাদি সহস্র নামান্বিত শ্লোকাবলী যে শোনে, যে পাঠ করে, তার—তাঁর কৃপায় পরম শান্তি লাভ হয়—সকল প্রকারের কাম্য লাভ হয়—ইত্যাদি।

পণ্ডিতজীর পাঠ এমনি করে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে এল।

তাঁর গুপ্তবিদ্যা কেমন করে এক রজনীর মধ্যে সমস্ত বাড়ী জানতে পেরেছে। সহস্র নাম পাঠ শেষের দিকে আস্তে আস্তে বাড়ীর সব ছোট বড় ছেলেমেয়ে, রমেশ, তার দাদা নরেশ, একটী দুটী করে এসে বস্‌ল। বিবাহিতা বালিকা দু'একটী, একটী অবগুণ্ঠনবতী বধূও এসে বস্‌ল।

পূর্ব্বদিনের মত ক'খানি সম্প্রসারিত হাত এগিয়ে এল—একটু বড়দের।

সৌম্য সুন্দর হাসিমুখ বৃদ্ধ পুঁথিপত্র সাবধান করে এক-একখানি করে সকলের হাত দেখতে আরম্ভ করলেন—'বড়া আচ্ছা তেরি হাত মায়ি' 'তেরি বড়ি সৌভাগ্য দিখ্‌তি হ্যায়', 'বেটী, তুমারা ভি আচ্ছাই হায়'··।

'দেখে মায়ি তুমারে?'—অবগুণ্ঠনবতী বধূটীর হাতখানি দেখতে লাগলেন। 'আচ্ছা হায়···হাঁ সন্তানস্থান?···হাঁ আচ্ছা'—পণ্ডিতজী স্বগত যেন বলতে লাগলেন 'প্রচুর ধন···কর্ম্মস্থান বড়া আচ্ছা,···প্রভূত যশ······কিন্তু!···' আশ্চর্য্য হয়ে হাত থেকে চোখ তুলে চাইলেন···সমুদ্রযাত্রা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রচুর যশ ধন কার?···অতি অস্পষ্ট সন্তানস্থান···

একটী উচ্ছ্বসিত হাস্যে বধূটী তার ঘোমটা খুলে ফেল্লে। শিশুর—বালক বালিকার দল সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে হেসে উঠ্‌ল 'ও ভাই ছোড় দাদা!—ওমা দেখ্ ভাই, দিদির চুড়ী বালা পরে এসেছে'—

'আরে তুম মস্করী করতে হো···সব বট্‌পন্‌কা খেল্,—' সদানন্দ পণ্ডিতজীও অপ্রতিভভাবে হাসতে লাগলেন।

'ঠিক হ্যায়,—ঠিক হ্যায়', বলে বৃদ্ধ আপনার পুঁথিপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গোণা সম্পূর্ণ হ'ল না। লীলার মনে হ'ল পণ্ডিতজী হয় ত দুঃখিত হলেন।

২

ধরিত্রীর কণ্ঠে বসন্ত শরতের সেঁউতি শিউলির প্রস্ফুটিত মালা আরও বিশবার দুলেছে। শরতের আলোর উৎসব—বর্ষার ঘনমেঘের লীলা—অপরূপ দিনরাত্রির পল্লবও তাতে গাঁথা হয়ে গেছে।

'মা, লীলাকে একবার আনি? কতদিন ধরে ভুগছে!' লীলার দাদা মাকে বল্লেন।

'নিয়ে আয়। যদি সারতে পারে—মনে তো সুখ নেই!'

'দাদা, আচ্ছা তোমার মনে আছে ভাই?—সেই বুড়ো পণ্ডিতজীর কথা?—যিনি—সহস্রনাম শোনাতে আসতেন পিসিমাকে'—

লীলা একখানি সতরঞ্চি পেতে ছাতে শুয়ে ছিল—তার দাদা একটী ইজিচেয়ারে। অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিস্তব্ধ।

'হুঁ-উ।—সেতো এখনো বেঁচে আছে রে—কখনো কখনো মার কাছে আসে। কি তার?' দাদা অন্যমনস্ক ভাবে অর্দ্ধভুক্ত সিগারেটটী দূরে ফেলে দিয়ে—'ঐ যাঃ' বলে উঠ্ল।

'কি হল?'

'তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে সিগারেটটা ফেলে দিলাম আর কি?'—

'ওঃ আমি বলি না জানি কি?—আমি ভাবছিলাম কি শোনো—সেই হাত-দেখার কথা মনে আছে?'

'কার?' মা এলেন—লীলার পাশে জায়গা করে শুয়ে পড়লেন।—

লীলা একটু থেমে বল্লে—'এই আমাদের ছোট বেলার দুষ্টুমীর কথা'—

কথার স্রোত অন্য পথে বইল। চাকরের অবাধ্যতা, বাজার-দর, অন্য ছেলেমেয়ের খবর পাওয়া।

মা বেশ ঘুমুলেন বোঝা গেল।

দাদা নিশ্চিন্ত মনে একটা চুরুট ধরালে।

'বল্ কি বল্‌ছিলি?'

'না, এমন কিছু না'—লীলা অন্যমনস্কভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল।

'তবু ভাল। তোর কি মনে আছে না কি, কি কাকে বলেছিল?'

'হ্যাঁ। তোমাকে বলেছিলেন দূর বিদেশ গমন কিম্বা সমুদ্রযাত্রা, প্রভূত—যশ ধন সৌভাগ্য···শুধু তোমার বিয়ে আর সন্তানস্থান ভাল করে কিছু বলেন নি। সেই যে তুমি ঘোমটা দিয়ে বসেছিলে—মনে নেই?'

উচ্চহাস্যে মার ঘুম ভাঙিয়ে কার্নিসে-বসা সুপ্ত পায়রাদের সচকিত করে দাদা বল্লেন 'হ্যাঁ রে,—সত্যিই তো সমুদ্রযাত্রা তো হয়েছে। তা সে তো ঠিকই ছিল। ধনভাগ্য আর কই হ'ল? তোকে কি বলেছেন?'

'আমাকে?······ঐ বলেছিলেন 'রাণী কি সদৃশী' হাত'··· লীলা চুপ করলে।

দাদার মনে হ'ল ঐ কথা চারটীর আড়ালে সমস্ত কথা সঙ্গোপন রয়েছে। কি একটা ব্যথিত সন্দেহে ভাইয়ের মনটা ভরে উঠল।

'রাণী নয়—? কি রে, অমন জমীদার-ঘরণী তুই!' দাদা সপরিহাসে একটুখানি উঁচু হয়ে বোনের মুখ দেখবার চেষ্টা করলে।

লীলা হাসলে, শুধু বল্লে—'কাল একবার চল না দাদা, না হয় তো ওঁকে আনাও? আমার যে কতদিন মনে হয়েছে সেই ঠকানোর কথা।'—

'আচ্ছা' বলে দাদা হাতের চুরুটটা রেখে চলে গেল।

কালো আকাশে অগণন তারা, মাঝ-আকাশে কাল-পুরুষের দীর্ঘ জ্যোতির্দেহ লেখা; উত্তরের আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডল সবে উদয় হয়েছেন; ঝিকমিক করা, ম্লান, দীপ্ত, ঈষৎ রক্তাভ, সাদা, আকাশভরা নক্ষত্র।

লীলার মনে পড়ল, কঙ্কাবতীর নক্ষত্রের মালা পরা, তারা ছিঁড়ে আনা। শুদ্ধ অর্দ্ধরাত্রে মনে হতে লাগল কোন্‌টা সত্য, কারা সত্য! ওরা, না এই জগতের অধিবাসীরা? লীলার ঘুম আর আসে না। কালপুরুষের দীর্ঘদেহ—আলোর মূর্ত্তিখানি কি করে দৃষ্টি পেলে কে জানে,—একমনে ধরিত্রীর দিকে চেয়ে আছে—যেন করুণায় ভরা দৃষ্টি!

রাত্রি-শেষে আকাশ আপনার গভীর গম্ভীর অদ্ভুত রূপ লুকিয়ে ফেল্লেন, লীলাও ঘুমল।

'ও রে সে পণ্ডিতজী—বাতে ধরেছে বড্ড, আসতে পারবে না,···তা কি করবি?'—দাদা খেতে বসে বোনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তুমি যাবে দাদা? চল না?' লীলা দাদার পানে চাইলে।

"আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা যাব—তৈরী থাকিস্।'

৩

সন্ধ্যায় অন্ধকার ধূলি-সমাচ্ছন্ন নগরীর পথে আরও অন্ধকার এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে, রাস্তার ছায়াঘন কালো গাছের তলায়।

পণ্ডিতজীর ছোট্ট বাড়ীর দরজায় এসে লীলাদের গাড়ী দাঁড়াল।

অঙ্গনের এক পাশে একটু জায়গাতে সতরঞ্চি পেতে পণ্ডিতজী যোগবাশিষ্ঠের 'কথা' পাঠের আরম্ভ করেছেন, যাঁর কৃপায় পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে......তাঁকে বারম্বার নমস্কার করে পাঠ আরম্ভ হ'ল।

অবগুণ্ঠিতা লীলা—তার মা দাদা সব প্রণাম করে বসলেন। দাদাও অন্য মনে সুমধুর শ্লোকগুলি শুনতে বসে পড়ল। কাজ তো রোজই আছে!

বৃদ্ধ সহাস্যে ওঁদের দিকে চাইলেন একবার।

অল্প মাত্র পাঠ হ'ল। শ্রোতারা সব সম্রান্ত অভ্যাগতকে দেখে, শেষ হ'তেই উঠে গেল।

লীলা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বল্লে, 'আপনার আমাকে মনে আছে?'

সরল হাস্যে পণ্ডিতজী বল্লেন, 'নেহি বেটা।'

দাদা বল্লেন, 'আমার বোন, আমাকে মনে আছে আপনার?'

পণ্ডিতজী জানালেন, তাকে তিনি চেনেন। ডাক্তার-বাবুকে কে না চেনে সহরের। তাঁর পৌত্রের অসুখে তিনিই ওষুধ দিয়েছেন।

দাদা হেসে বাধা দিয়ে বল্লে, 'আপনাকে আমরা ঠকিয়েছিলাম, সে কথাটাই আপনি ভুলে গেছেন,—আমার ওষুধের কথাই মনে আছে! সেই যে জওরৎ সেজে আপনাকে হাত দেখিয়েছিলাম?'

পণ্ডিতজী একটুখানি স্মরণ করে তারপর হেসে উঠলেন, 'ইয়াদ হুয়া বেটা, কিন্তু তাতে কি? ভালই তো খবর-?'

দাদা বল্লে, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমার আর আমার বোনের হাত আপনি আবার একবার যদি 'কৃপা' করে দেখেন।'

পণ্ডিতজী আসন্ন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ইতস্ততঃ করে পৌত্রকে প্রদীপ উস্কে আনতে বল্লেন। লীলার দাদার হাত একটু দেখে বল্লেন, 'আপ বড়া ভাগ্যবান হোঙ্গে।'

লীলার হাতখানি অনেকক্ষণ দেখে বল্লেন, 'মা, তোমার অন্তর সব সময়ে অসুখী থাকে।'

লীলার মা বল্লেন, 'বাবা, ও নিঃসন্তানা—আর নৈলে ওর সব ভাল।'

'হাঁ মায়ি' পণ্ডিতজী জবাব দিলেন। হাত ছেড়ে দিলেন। তার পর নতমুখে মৃদুস্বরে দাদাকে বল্লেন, 'বেটা, 'পতি-সুখ' এর নেই, পুত্র-সুখও নেই। কিন্তু রাণীর মতন ধন আছে—এই কথাই আমার মনে হয় বলেছিলাম। দানপুণ্য খুব কম।'

লীলা চুপ করে বসে ছিল; আভাসে বুঝতে সেও পারলে।

দাদা বল্লেন, 'এর কখনো পরিবর্ত্তন হবে না?'

'হাঁ হতে নিশ্চয় পারে, কিন্তু সে তো আমরা বুঝব না বেটা, যিনি মুককে বাক্‌শক্তি দেন, খঞ্জকে চলৎশক্তি দেন, তিনি সবই পারেন বদলে দিতে।'

মা উন্মুখ হয়ে চেয়ে ছিলেন—ভাবটা তাঁরও বোধগম্য হ'ল যেন, বল্লেন, 'বাবা, একে আপনি কোনো সৌভাগ্যের কবচ দিতে পারেন?'

'না মায়ি, আমি এসব জানি না কিছু, আমি তাঁর কাজের উপর কিছু করতে পারি না তো।'

লীলা চুপ করেই ছিল—এবারে সে দাদাকে বল্লে, পণ্ডিতজী তাদের ছোটবেলার অপরাধ যেন ক্ষমা করেন, তাই সে আজ এসেছে।

পণ্ডিতজী উচ্চহাস্যে জীর্ণ গৃহখানি ভরিয়ে দিয়ে বল্লে, 'মা বচ্‌পনকা খেল কোই ইয়াদ রখ্‌তা? আর তোমরা ছিলে বালক বালিকা মাত্র।'

প্রণাম করে সবাই উঠলেন। বাইরে তখন অন্ধকার।

পণ্ডিতজীর ঘরের নারায়ণের আরতি আরম্ভ হ'ল। স্তিমিত প্রদীপে মৃদু আলোকিত ঘরখানি পঞ্চ-প্রদীপের পাঁচটী আন্দোলিত শিখায় ঘরের চতুর্দ্দিক আলো করে দিতে লাগল। লীলারা সেখানে একটু দাঁড়াল; লীলার মনে হ'ল, যিনি মূককে কথা কওয়াতে পারেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান, তিনিই সব পারেন, সকলের প্রাপ্য সকলকে দেন। সুখের হোক, শান্তির হোক, দুঃখের হোক, নিতে হবে সেই সত্য। পণ্ডিতজীর কথাই সত্য।

ভারতবষ

শ্রীহরিসাধন পাইন

বেদ-সামগান-ভারত-রামায়ণ-সংহিতা-গীতা-কলস্বরা,
তড়াগ-স্রোতস্বতী-নদ-হ্রদ-হৃদি-কাঞ্চন-গিরি-মনোহরা,
উচ্ছল-জলদল-কল্লোল-মুখরিত-উদ্বেল-উদ্দাম-সিন্ধু,
নীল গগন পর হসিত ভাস্কর অগণন তারকা, ইন্দু।
সেই মহাভারত জন্মভূমি মাতা স্বর্গাদপি সুপবিত্র,
জয় জয় আদিমাতা দেব-আরাধ্যা নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

বক-যূথ-শত বলাকা পারাবত গতি মোহন সুন্দর,
কোকিল-ময়ূর-পাপিয়া-চন্দনা গীত-বন্দনা সুস্বর;
পুণ্য পীঠভূমি কুম্ভ মেলামাঝ লক্ষ সাধু সমাগত,
প্রয়াগ পুরী স্বর্ণ কাশীধাম নবদ্বীপ প্রেমগীতি রত।
সেই মহাভারত..............................
..............................নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

জয় অনিন্দিতা নিখিল বন্দিতা জয়তু শ্যামল বর্ণা,
অশনি গর্জ্জনে ত্রিভুবন ত্রস্তা হাস্য বিদ্যুৎ ঝর্ণা।
ইন্দ্রধনু-চারু-বিজয়-অস্ত্র অসীম-নীল-নভ লিপ্ত,
পত্রপুষ্প কিশলয় বল্লরী তৃণ-তরু-লতা-তনু দৃপ্ত।
সেই মহাভারত..............................
..............................নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

পিতা-পিতামহ-আদি নর-বন্দ্যা, শূর-শত-বন্দিনী-মাতা,
ভারত-কানন নন্দন বন সম উশীর চন্দন স্নাতা,
কাঞ্চন-করবী-কামিনী কুন্দ বকুল-চামেলি-চম্পা,—
পদ্ম-পারিজাত-পারুল-পলাশ-পরিমল-পবন কম্পা।
সেই মহাভারত..............................
..............................নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

হোম-যাগ-যজ্ঞ-তর্পণ-অর্পণ-অর্ঘ্য-অর্পিত নিত্য
বিমোহিত, আস্য হাস্য অভিনব ত্রিংশ-কোটি জন চিত্ত;
নিদাঘ-প্রাবৃট-সুন্দর-শরত-হেমন্ত-শীত-বসন্ত,
ষড়ঋতু লীলাময়ী আদি মাতৃকা আদ্যাশক্তি অনন্ত।
সেই মহাভারত..............................
..............................নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

মুরজ-মন্দিরা-মুরলী-মাদল-মন্দ্রিত-মধুর-ধরা,
বাঁশের বাঁশরী বীণা বন্দনা, নুপুর-রিণি-ঝিনি-স্বরা,
যোগী-মহেশ্বর-ধ্যানরত-চিত্ত, পূত-কৈলাস-তীর্থ,
নমো নমো নমো সুন্দরী-জননী দীন দুঃখীর বিত্ত।
সেই মহাভারত..............................
..............................নয়ন প্রীতিকর চিত্র।

সাময়িকী

কংগ্রেস ও ভবিষ্যৎ—

দিল্লীর সর্ত্ত অনুযায়ী কংগ্রেস সাময়িকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়া শান্তি-প্রচেষ্টার জন্য সরকারকে আর একটী সুবিধা দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা যে ভারত-সরকার সন্ধির সর্ত্ত পালন করিতেছেন না এবং শান্তির জন্য যে মনোভাবের প্রয়োজন, তাহাকেও কার্য্যে রূপ দিতে দ্বিধা করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, অচির-ভবিষ্যতে অধিকতর ব্যাপক ও গভীর ভাবে পুনরায় সংগ্রামের সূচনা হইবে। মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই এক্ষণে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ভারত-সরকার এখনও মীরাটের বন্দীদের এবং বিনা বিচারে অবরুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির কোনও চেষ্টা করিতেছেন না। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, "A strong Government never errs when it releases prisoners before the expiry of their sentences, for it ever possesses the power to re-arrest them should they commit crimes. And political crimes become rare where there is no political injustice."—মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বে বন্দীদের ছাড়িয়া দিলে, শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোনও প্রমাদ হয় না; কারণ যদি পুনরায় তাহারা রাজনৈতিক অপরাধ করে, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহাদের বন্দী করিবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের থাকে। আর যেখানে কোনও রাজনৈতিক অবিচার নাই, সেখানে রাজনৈতিক অপরাধও হয় না।

দিল্লী মোস্‌লেম কন্‌ফারেন্স—

করাচী কংগ্রেসের পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, যে-একদল মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই দিয়া এতদিন সরকারী চাকরীর মোহে এবং হিন্দু-প্রতিযোগিতার আতঙ্কে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, হয় ত তাঁহারা এই কংগ্রেসের স্পষ্ট মনোভাব জানিতে পারিয়া এই বিরাট গণ-আন্দোলনে যোগদান করিবেন। করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্পষ্টভাবে বুঝিবেন যে, দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির আদর্শকেই এবার কংগ্রেস অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন; এবং সেই দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে মুসলমানদেরই সংখ্যা বেশী। মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল অকপট চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায্য দাবীর মীমাংসা না করিয়া কংগ্রেস কোনও শাসন-ব্যবস্থা স্বীকার করিবে না। কিন্তু, এই সমস্ত সত্ত্বেও কানপুরের শোচনীয় দাঙ্গার পর দিল্লী মোসলেম কন্‌ফারেন্সে সমবেত এক শ্রেণীর মুসলমান নেতাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা জাতীয়তা-আন্দোলনের সত্যই পরিপন্থী। তবে, সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, ইহা ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি-সম্মেলন নয়, ইহা মাত্র কতকগুলি স্বার্থান্বেষী মুসলমান উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীর সম্মেলন। ডাঃ আলম দিল্লী কন্‌ফারেন্সের প্রারম্ভে এক বিবৃতিতে সেই কথাই বলিয়াছেন। একমাত্র মৌলানা শওকৎ আলী ব্যতীত উক্ত সভায় এমন কোনও মুসলমান নেতা ছিলেন না, যিনি একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে কথা কহিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট আসন-সংরক্ষণ, চাকরীতে মুসলমানদের বিশেষ দাবী স্বীকার, নতুবা সংখ্যা-গুরু হিন্দু সম্প্রদায় ৭ কোটী মুসলমানকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে, এই সমস্ত অতি-পুরাতন মামুলী প্রস্তাবই দিল্লী কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হইয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান নেতা ভারতবর্ষ ও ভারতীয় মুসলমানদের

জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত আছেন,—তাঁহারা কেহই এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন নাই। উক্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে পাঞ্জাব সরকারের অন্যতম মন্ত্রী স্যার ফিরোজ খানুন্‌ বলিয়াছেন, "If the Congress has won power by fighting the British, we shall fight the Congress." এই উক্তি হইতে ইহাই বোঝায়, বৃটীশদের সঙ্গে সংগ্রাম করায় স্বার্থহানির সমূহ সম্ভাবনা আছে, চাকরীর মোহ ত্যাগ করিতে হইবে, দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনকে বরণ করিতে হইবে, এবং এমন কি মৃত্যুও অসম্ভব নয়;—অতএব চাকরী বজায় রাখিয়া, ভোগবিলাস সমস্ত বজায় রাখিয়া, দিব্য-আরামে প্রভুর কৃপা-দৃষ্টির আওতায়, মুমূর্ষু স্বদেশ-বাসীর সঙ্গেই সংগ্রাম করা শ্রেয়ঃ! কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে, জনসাধারণেরও ভোটের অধিকার থাকিবে এবং এই জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মুসলমান; অতএব কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করা শ্রেয়! কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করাই কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব;—আর এই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যেই মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশ; অতএব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই শ্রেয়ঃ! কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, অন্যায় সুদের পীড়ন হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য আইনের প্রয়োজন; এবং সকলেই জানেন যে, মুসলমান কৃষক-সমাজ এই সুদের পীড়নে কিরূপে জর্জ্জরিত; অতএব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই শ্রেয়ঃ! মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, একপ্রকারের আতঙ্ক-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই অপরের আতঙ্কে দিন অতিবাহিত করেন; এবং ক্রমশঃ এই আতঙ্ক তাঁহাদের এইরূপ পাইয়া বসে যে, উন্মাদনার ঘোরে অপরকে আঘাত করিতেছে মনে করিয়া কখন সে স্বহস্তে আপনাকেই হত্যা করিয়া ফেলে! আতঙ্ক-ব্যাধিগ্রস্ত এক শ্রেণীর মুসলমান নেতাদের কথা ভাবিলে, তাহাই মনে হয়। তাঁহাদের নিজেদের এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই যে, একটা কিছু গড়িয়া তোলেন; অথচ জাতির প্রত্যেক অগ্রগতির সম্মুখে তাঁহারা পদে পদে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিবেন।

কিন্তু সুখের বিষয় যে, ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা, যাঁহারা আজীবন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত থাকিয়া অশেষ দুঃখ ও নির্য্যাতন অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি সমগ্র ভারতের আদর্শ, তাঁহারা সকলেই একযোগে এই দিল্লী কন্‌ফারেন্সের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিতেছেন। ডাঃ আলম বলিয়াছেন, কংগ্রেস পৃথক নির্ব্বাচন চাহিলে, তিনি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন; বোম্বের জনসভায় মিঃ ব্রেলভী বলিয়াছেন, "আমরা মিশ্র-নির্ব্বাচনমণ্ডলী ব্যতীত আর কিছুই চাহি না। যদি পৃথক নির্ব্বাচনমণ্ডলী অব্যাহত থাকে, তবে হইলে আমরা মহাত্মার সহিতও সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইব। পৃথক নির্ব্বাচনমণ্ডলী থাকিলে, উভয়পক্ষের সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা অশান্তি সৃষ্টি করিবে এবং তাহার সুবিধা লইয়া একদল লোক ধনীদের বঞ্চিত করিয়া স্বাধীনতার ফলভোগ করিবে। যাহারা কোনও কালে জাতির কোনও সংগ্রামে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই, আজ তাহারাই সাম্প্রদায়িক অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।"

লক্ষ্ণৌতে মুসলমান জাতীয় দলের সম্মেলনসভায় সভাপতিরূপে স্যার আলী ইমাম ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলমান সমাজ যে অনুপাতে আত্মদান করিবে, সেই অনুপাতে সে স্বাধীনতার সুবিধা ভোগ করিবে। ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোনও বিশেষ দাবী কাহারও থাকিবে না। একমাত্র স্বদেশ-প্রেমের ভিত্তির উপর সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নিজেদের স্বার্থের জন্য অজ্ঞ জনসাধারণকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া যে সমস্ত মুসলমান নেতা আজও সমাজের উপর আধিপত্য করিতে চাহেন, মুসলমান-জনসাধারণ কবে তাঁহাদের এই কাপট্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে?

মিঃ পেডির হত্যা ও বিপ্লবীমতবাদ—

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন সমগ্র দেশ এক সংহত শক্তি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, তখন সহসা মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডির হত্যা প্রত্যেক কংগ্রেসী নেতার এবং কংগ্রেসের আদর্শে

বিশ্বাসী ভারতবাসীর চিত্তকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। জেলা শিক্ষক-সম্মেলন উপলক্ষে মিঃ পেডি যখন শিক্ষা-প্রদর্শনীর ঘরে প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি দেখিতেছিলেন, সেই সময় কে বা কাহারা তাঁহাকে গুলী করে। আহত হইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিঃ পেডি দেহত্যাগ করেন। আততায়ীকে অন্বেষণ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতেছে। প্রকাশ যে, আততায়ী গুলি করিয়াই রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের হাত হইতে জোর করিয়া বাইসাইকেল কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। মিঃ পেডির এই অকাল-মৃত্যুতে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই প্রকারের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক অল্প-বুদ্ধিরই পরিচায়ক। একটা সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রের সহিত যেখানে সংগ্রাম, সেখানে এইরূপ দুই একটা কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণে স্বাধীনতা আসিতে পারে না। কাপুরুষোচিত বলিলাম কেন না, অধুনা মহাত্মা গান্ধীর নব যুদ্ধ-নীতিতে অহিংস নিরস্ত্র সত্যগ্রহীকে যে শৌর্য্য ও বীরত্বের পরিচয় দিতে হয়, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা—

দীর্ঘ আঠারো মাসের পর মেছুয়াবজার বোমার মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন যুবক সন্দেহক্রমে ধৃত হন—তাঁহাদের মধ্য হইতে ৮ জন স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারেই প্রথমে মুক্তি লাভ করেন; অপর ১৭ জন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হাইকোর্টে আপীল করেন এবং এই আপীলের ফলে আরও ৯ জন মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে হাইকোর্ট সর্ব্ব-শেষ বিচারালয় হইলেও, হাইকোর্টের উপরেও আছে পুলিশ। তাই হাইকোর্টের বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্বেও, যখন এই ৯ জন যুবক আদালতের বাহিরে আসিল, অমনি স্বনামখ্যাত সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাহাদের গ্রেফতার করা হয়। কোনও বিপ্লবের বা ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনার সন্দেহে এই আইন প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু আমাদের স্বতই জানিতে ইচ্ছা যায়, দীর্ঘ আঠারো মাস কাল ধরিয়া পুলিশ হেফাজতে থাকিয়া তাহারা নতুন কি ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিল যে, বিনা বিচারে আজ তাহাদের আটক করিয়া রাখা হইল?

কানপুরের দাঙ্গার জন্য দায়ী কে?—

কানপুরের শোচনীয় দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী বসিয়াছে, তাহাতে নিত্য যে-সমস্ত ভয়াবহ তথ্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পড়িয়া সভ্য শাসন-তন্ত্রের অধীন থাকিয়া বিস্মিত হওয়া ব্যতীত কোনও দ্বিতীয় পন্থা থাকে না। এই দাঙ্গায় সহস্রাধিক লোক হতাহত হইয়াছে, পাঁচ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মত একটী মহাপ্রাণকে আমরা হারাইয়াছি! এই পুলিস আর এই সশস্ত্র সৈন্যের শাসনের মধ্যে এইরূপ অনাচার সম্ভব হয় কি করিয়া? এক শ্রেণীর লোক দাঙ্গার পরই এই কথা প্রকাশ করিতে চাহেন যে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক এবং বানর-সেনাদের উৎপাতের ফলেই এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের নীতিকেই আক্রমণ করা হয়। পণ্ডিত জহরলাল এই প্রসঙ্গে বলেন, "কানপুরের দাঙ্গার জন্য মুসলমানও দায়ী নহে, হিন্দুও দায়ী নহে, দায়ী সেই তৃতীয় পক্ষ—এইরূপ দাঙ্গাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়া যাহাদের লাভ আছে।"

এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা তদন্ত করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যুক্ত-প্রদেশের সরকারকে প্রবল-ভাবে অনুরোধ করা হয়। বহু অনুরোধের পর এই ব্যাপারে তদন্ত করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে একটী কমিশন বসিয়াছে। এই কমিশনের সম্মুখে উচ্চ রাজকর্ম্ম-চারী এবং শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা যে-সমস্ত সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহা হইতে পাঠকদের বিচারের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

(১) কানপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য বাবু বিক্রমজিৎ সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, পুলিশের ব্যবস্থা অনুপযুক্ত ছিল এবং তাহারা জনসাধারণকে রক্ষা করে নাই ও তাহাদের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। যখন দাঙ্গা চলিতেছিল,

পুলিশ তথন দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র দর্শকের মত ব্যাপারটা দেখিয়াছে। সাক্ষী বারম্বার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিশ কোনও প্রকার সাহায্য করে নাই।

(২) আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার্স অফ কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ জে, জে, রায়ান গোয়ালটুলীতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাজারটী ভীষণভাবে জ্বলিতেছিল। বড় রাস্তায় পুলিশ দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদিগকে কি করিতে বলা হইয়াছে। তাহারা উত্তর দেয় যে, তাহারা কোনও হুকুম পায় নাই।

(৩) ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ ই, এম, সাউটার তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, দাঙ্গার সময় অনেক অঞ্চলে পুলিশ ছিল না এবং তিনি স্বয়ং পুলিশকর্ম্মচারীর নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়াও পান নাই।

(৪) ডি, এ, ভি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, জনতা অত্যন্ত ভীরু ছিল, কারণ কর্ত্তৃপক্ষের যে কোন লোক দেখিলেই তাহারা পলাইয়া যাইত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যদি কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তবে কত সহজে দাঙ্গা নিবারণ করা যাইত। এই ব্যাপারে পুলিশের আচরণ অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। তাহারা একেবারে কিছুই করে নাই। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তৎপর আর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না।"

কলিকাতার দ্বার-প্রান্তে ভয়াবহ সৈন্য-বাহিনী—

গত ১১ই এপ্রিলের ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় সহসা কলিকাতা-আক্রমণের এক ভয়াবহ সংবাদ বাহির হয়। সমস্ত নগরবাসী আতঙ্কে শুনিল যে, শত্রু প্রবল-পরাক্রমে গঙ্গার স্রোত ধরিয়া নৌকা বাহিয়া একেবারে কলিকাতার গার্ডেন-রীচ উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত! এক নূতন শত্রু সুদূর মালয় উপদ্বীপে এতদিন একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে এবং আমাদের দুর্ভাগ্য, বিদেশীয় অভিযানের সর্ব্বপ্রিয় লক্ষ্য-স্বরূপ তাহারা এই বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হয়। গোপনে তাহারা সুন্দরবনে আসিয়া তাহাদের ঘাটী স্থাপন করে; এবং এখন প্রকাশ যে পরিপূর্ণ বাহিনী লইয়া তাহারা অগ্রসর হইয়াছে, এই মৃত্যু-মথিত দেশে আবার মৃত্যুর বীজ ছড়াইতে।

এই নূতন শত্রুর নাম Anopheles ludlowi—আনোফিলেস্ লাডলাউই। পুরাকালের গ্রীকদের নামের মত শোনায় বটে; কিন্তু গ্রীকদের মত ইহারা সুসভ্য নয়। ইহাদের "রুধিরাক্ত বিজয়-শকটের" পশ্চাতে কোনও নূতন সভ্যতা বাড়িয়া উঠে না—পরিবর্ত্তে সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ধন এই মানুষ চিরকালের মত অদৃশ্য হইয়া যায়, নতুবা পঙ্গু হইয়া থাকে।

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বজবজ ইহারা প্রথম আক্রমণ করে এবং সেখানকার শতকরা আশীজন লোক এই অতর্কিত আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়। এই নূতন শত্রুর নিকট শাদা আর কালোয় ভেদ নাই;—বজবজের দরিদ্র শ্রমিক হইতে মিলওয়ালা ধনী ইংরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সাক্ষাৎভাবে তাহা বুঝিয়াছেন। বজবজ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কলিকাতার উপর অতর্কিত আক্রমণ করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বাহ্নেই অপর-পক্ষ সতর্ক হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ গার্ডেন-রীচে গার্ডেন-রীচ অ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটী বলিয়া একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে; এবং এই মৃত্যুর ভয়াবহ অগ্রদূতদের অতর্কিত আক্রমণ হইতে অসহায় মানব-শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন চলিতে থাকে। ক্ষুদ্র শত্রু, সামান্য তাহার আঘাত, কিন্তু অমোঘ তাহার ফল। এত ক্ষুদ্র যে দুটী অঙ্গুলের চাপে শিশুও তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু তাহারই স্বগোত্রদের আক্রমণে আজ বাংলা নির্বীর্য্য, পঙ্গু, দুর্ব্বল! এবার যে দল আসিতেছে, তাহারা না কি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা ঢের বিক্রমশালী এবং বাংলার এই নদ-নদী-খাল-বিল-ভরা জলময়ী মূর্ত্তিকেই তাহারা যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। এখানকার সমস্ত মানুষকে হতবীর্য্য করিয়া আদি আরণ্যক গৌরবে তাহারা এইখানেই অধিষ্ঠান করিতে চায়।

স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মিঃ আয়াঙ্গার এবং এই শ্রেণীর আক্রমণকারীদের চির-শত্রু ডাঃ বেণ্টলী কিছুদিন পূর্ব্বে এই রকম এক অতর্কিত আক্রমণের

সম্ভাবনা সম্বন্ধে কলিকাতা করপোরেশন ও বাঙ্গলা সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সতর্কতা-বাণীর কথা-মত যে কোনও আত্মরক্ষার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। সুখের বিষয় কলিকাতা করপোরেশন এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান এই শত্রুর ধ্বংস-সাধন চেষ্টায় এখন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কবে যে এই মশক-যুদ্ধ-উদাসীন রাষ্ট্র ও নিষ্ক্রিয় জনতাকে প্রবুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী জাতি অক্ষয় জয়টীকা অর্জ্জন করিবে, কে জানে ?

—

কলিকাতার নূতন মেয়র—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে কলিকাতার মেয়র এবং মিঃ আবদুল রজ্জাক ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন এবং মেয়রের পদ লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বেও যে-সমস্ত দলাদলি ও কুৎসিত কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, আশা করা যায় এই ব্যবস্থায় তাহার অবসান হইবে। ডাঃ রায় একজন অতি কর্ম্মঠ ব্যক্তি এবং তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। শ্রীযুক্ত রজ্জাক মহোদয়ও বিগত কয়েক বৎসর ডেপুটী মেয়রের কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সম্মানে সত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং আশা করি, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কংগ্রেস করপোরেশনের ভার লইয়াছিল, সে আদর্শ-অনুযায়ীই তাঁহারা করপোরেশনকে একটা সত্যকার বলিষ্ঠ, কার্য্যক্ষম এবং নগর-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

—

লর্ড আরউইনের বিদায়

গত ১৭ই এপ্রিল লর্ড আরউইন পাঁচ বৎসর কাল এই দেশ শাসন করিয়া কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। যেদিন তিনি বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন, সেই দিনই নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন বোম্বাইতে পদার্পণ করেন। লর্ড আরউইন ব্যক্তিগত-ভাবে ভারতের বহু ব্যক্তির নিকট হইতে 'আদর্শ খৃষ্টান' "আদর্শ ভদ্র" প্রভৃতি সম্মান পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই পাঁচ বৎসর কালের শাসনের সহিত ভারতবাসীর অন্তরে যে-সমস্ত কঠোর আঘাতের স্মৃতি দিনের পর দিন জমা হইয়া আছে,—গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, নেহেরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান, কলিকাতা ও লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবে উপেক্ষা, সাইমন কমিশন, তার পর অর্ডিন্যান্স, সমগ্র ভারতবর্ষকে মূক করিয়া রাখা, ভারতের লবণ হ্রদের ধারে ধারে সত্যগ্রহীর লবণাক্ত

অশ্রুজল আর রক্তবিন্দু, সমগ্র জাতির আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড—এই সমস্ত স্মৃতি খৃষ্টানত্বের আদর্শে সন্দেহ আনে; নতুবা এই বোঝায় যে, যে লৌহ-ফ্রেমে আঁটা হইলে মানুষ প্রাণহীন যন্ত্র হইয়া যায়, তিনিও সেই বিরাট মনুষ্যত্ব নিষ্পেষণ-যন্ত্রের একটী অসহায় অঙ্গ-স্বরূপই ছিলেন।

মিঃ আবদুল রজ্জাক

আর একটী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ

য়ুরোপের আর একটী সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল। স্পেনের রাজা আলফান্সো দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল রাজত্ব করার পর সাধারণতন্ত্রীদের দাবীর ফলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রীরা রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া স্পেনে রাজতন্ত্রীদের সহিত সাধারণতন্ত্রীদের তুমুল সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল। এই ব্যাপারে প্রায়ই স্পেনে অন্তর্বিপ্লব ঘটিত। এবারকার মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে দেখা গেল যে, সাধারণতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রীদের অধিকাংশ স্থলেই পরাজিত করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। শাসন-ব্যাপারে সমস্ত সদস্যপদ বিরুদ্ধ পক্ষের লোকের দ্বারা অধিকৃত দেখিয়া, রাজা তাঁহার সভাসদ্‌গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া যে-ভাবে সাধারণতন্ত্র জগতে প্রসারলাভ করিতেছে, তাহাতে এ কথা বিশ্বাস করা যায় যে, একদিন এমন দিন আসিবে যে রাজতন্ত্র শুধু ইতিহাসের পাতায় পড়িয়া থাকিবে।

স্যার জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনা—

কলিকাতা করপোরেশন বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে আয়োজন করেন, তাহার জন্য করপোরেশন কলিকাতার করদাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন। ভারতের, তথা জগতের এই সুধীশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দিত করিয়া করপোরেশন নিজেকেই ধন্য করিয়াছেন। অভিনন্দনের উত্তরে স্যার জগদীশ একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, এই কলিকাতার পথের ধারে এক লতার দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার রহস্যান্বেষী চিত্ত আমাদের চারিদিকের এই মূক জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। এই বক্তৃতায় স্যার জগদীশ স্যার চন্দ্রশেখরের অসামান্য কৃতিত্বের কথাও সানন্দে উল্লেখ করেন। আমরা আশা করি, কলিকাতা করপোরেশন এইভাবে কলিকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মান দেখাইয়া কলিকাতারই গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর

বিগত ১৯শে এপ্রিল সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় রায় রসময় মিত্র বাহাদুর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়া-

ছেন। ১৮৫৯ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চানক গ্রামে এক ভদ্র কায়স্থ-বংশে রসময়বাবু জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং পরলোকগমনের সময় তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। এম-এ পাশ করিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চিরজীবন শিক্ষকতা করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু বলিতে গেলে এই শিক্ষকতা কার্য্যকে তিনি গৌরবময় করিয়া গিয়াছেন—এমন আদর্শ শিক্ষক আমরা দ্বিতীয় দেখি নাই। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, এখনও করে! যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন, একদিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাও রসময়বাবুকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া থাকেন। রসময়বাবু যেমন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, তেমনই আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন। যিনি তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তন গান শুনিয়াছেন, তিনিই ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তন গান করিবার সময় এমনই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইত। রসময়বাবু প্রকৃত পক্ষেই রসময় ছিলেন। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় রসময়বাবুর আবাল্য সখা ছিলেন, সতীর্থ ছিলেন; জীবনান্ত পর্য্যন্ত লর্ড সিংহ রসময়বাবুকে আপন ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন। রসময়বাবু অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্ম-জীবনকথা, যাহাকে তিনি 'কৃপাদৃষ্টি' নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি ও নির্ভরতা দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্রদ্বয়ের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

—
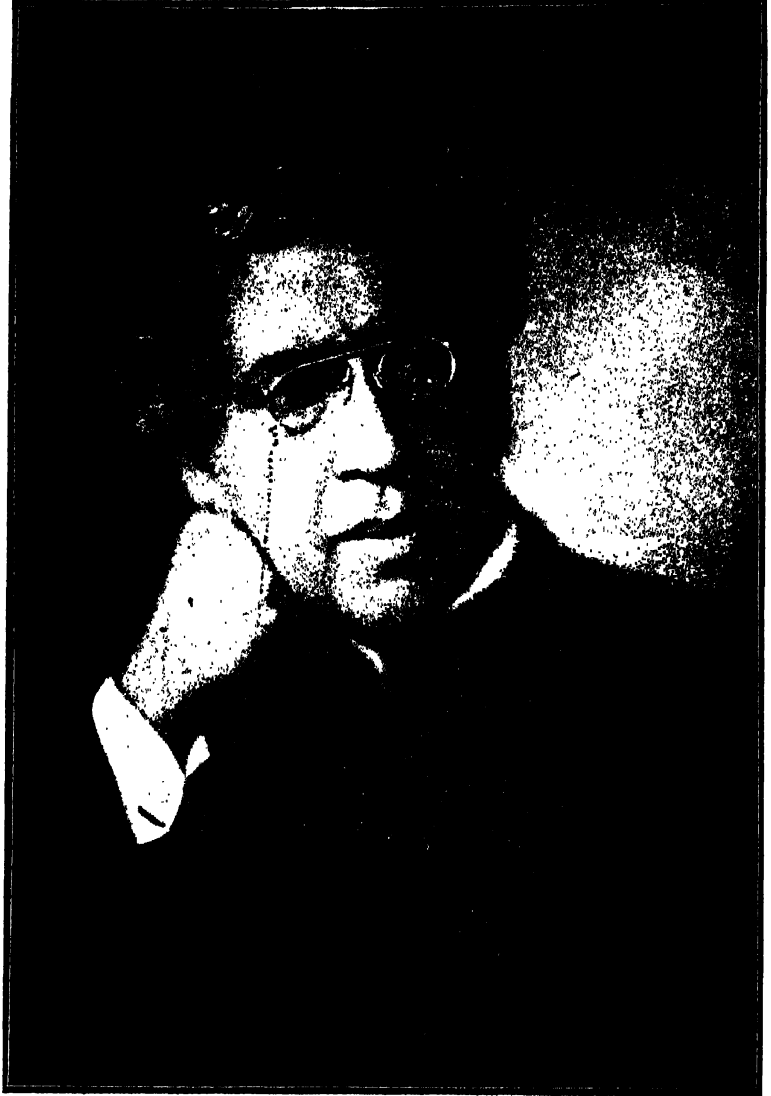
আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

নিখিল-বঙ্গ নারী-মহাসম্মেলন—

শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে কলিকাতা টাউন-হলে নিখিল-বঙ্গ নারী-মহাসম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এই মহাসম্মেলন অভূতপূর্ব্ব

ব্যাপার। এই মহাসম্মেলনে বঙ্গনারীর মনস্তত্ত্বের অনেকটা অংশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নারী-মহাসম্মেলনের সংশ্রবে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। সেটী এই—সম্মেলন রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। এটি আমাদের মতে ঠিক হয় নাই। কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি রাষ্ট্র, সমাজ ও

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর

ধর্ম্মকে এক সূত্রে বন্ধন করিতে চাহেন; তুরস্কের কামাল পাশাও এই তিনটি বস্তুকে একই সূত্রে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই তিনটি জিনিস চিরদিনই স্বতন্ত্র ছিল। সহসা ইহাদিগকে মিশাইয়া ফেলিবার ফলাফল ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই;—উহা এখনও পরীক্ষাধীন, এবং বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি বিবেচনা করেন, এই মিশ্রণের ফল ভাল হইবে না। সুতরাং বঙ্গের মহিলা সমাজ এত তাড়াতাড়ি এই তিনটিকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিলেই ভাল করিতেন। সে যাহা হউক, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গলার নারীসমাজকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মহিলা-সমাজ যে ভাবে পুরুষদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখকে বরণ করিয়াছেন, রেগুলেশন লাঠির আঘাত মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, অকাতরে অকুণ্ঠিতচিত্তে কারাবরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা নির্ব্বাচনাধিকার লাভের যোগ্যতা অবিসম্বাদিত রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আরও এক কারণে আমরা তাঁহাদের নির্ব্বাচনাধিকার লাভের দাবীর সমর্থন করিতেছি। গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে তাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল পুরুষজাতিকে যেরূপ শাসনে সংযত রাখেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তাঁহারা পুরুষদের পার্শ্বে থাকিলে পুরুষরা সংযত থাকিবে;—রাষ্ট্রক্ষেত্রে এখন যেমন কপটতা, ভণ্ডামি, পরশ্রীকাতরতা, কুচক্রান্ত, দলাদলির প্রভাব দেখা যায়—নারীরা তাহার অতীত বলিয়া তাঁহাদের কল্যাণময় শাসন-দণ্ড পরিচালনে এই সকল রাষ্ট্রীয় পাপের অবকাশ থাকিবে না। সর্ব্বশেষে আমরা সম্মেলনে একটি দুর্লক্ষণ দেখিয়া ব্যথা অনুভব করিতেছি। সেটি তাঁহাদের প্রতীচ্যের অনুকরণপ্রিয়তা। সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব বিচারার্থ উত্থাপিত হইয়াছিল, যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার নারী-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা প্রতীচ্যের মুখাপেক্ষিণী হইয়া রহিয়াছেন। এটির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। বাঙ্গলা অতি প্রকাণ্ড দেশ—সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল-নিনাদ-করালে! এই দেশ অতি প্রাচীন, ইহার সভ্যতাও প্রাচীনতম। বাঙ্গলার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। প্রতীচ্যের মুখাপেক্ষা —

বঙ্গনারী সেই বিস্মৃত বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া বাঙ্গালাকে পৃথিবীর আদর্শে পরিণত করিবেন, ইহাই আমরা চাই। তবে আশার কথা এই যে, সম্মেলনের ইহা প্রথম অধিবেশন মাত্র। নারীজাতির কর্ত্তব্য ও কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে সম্মেলনের ধারণা এখনও স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। কাল সহকারে এই ধারণা স্পষ্টীকৃত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে অতি মহৎ আদর্শ দিতে পারিবেন এইরূপ আশা করা যায়।

সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘ

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছি, বাঙ্গালাদেশের সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘ একটী শুভ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ও মনান্তর দূরীকরণের পথ প্রশস্ত হইবে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা সাময়িক ও সংবাদপত্র পরিচালনা করেন, তাঁহাদের অনেকে অনেক সময় জাতি-বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া অপর সম্প্রদায়কে সামান্য কারণে, তুচ্ছ কারণে বা অকারণেও আক্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়, সুফল কিছুই হয় না। এই কারণে এ দেশের সংবাদপত্র-সেবীবৃন্দ সমবেত হইয়া এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর এভাবে কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবেন না। অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে মতান্তর হইবেই; কিন্তু, তাই বলিয়া আক্রমণ করিয়া মনান্তর সৃষ্টি করা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। প্রার্থনা করি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংবাদপত্র-সেবীদিগের এই শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হউক; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, কোলাহল প্রশমিত হউক, দেশে শান্তি স্থাপিত, হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাইয়ের মত মিলিত হউক।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শেষ-প্রশ্ন"—৩৲
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "বাসবী"—২৲
শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "বিজ্ঞান-কাহিনী"—৸৹
শ্রী[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাঙ্গালীর মা"—।৹
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "গিরিশ-গ্রন্থাবলী" ৯ম ও ১০ম ভাগ প্রত্যেক—২৲
মৌলবী মোহাম্মদ আকরাম উদ্দীন সঙ্কলিত "কোর-আনের আলো"—১৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ধরপাকড়"—।৹
শ্রীঅপরাজিতা দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বুকের বীণা"—১।৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "মেবার মহিমা"—১৲
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত বাল্যপাঠ্য "ভয়ঙ্কর"—৷৵৹
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত বাল্যপাঠ্য "গুরুদক্ষিণা"—।৵৹
শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত প্রণীত বাল্যপাঠ্য "কৃষ্ণকুমারী"—।৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র ঊনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵৹, ভি, পিতে ৬৷৵৹, ষাণ্মাসিক ৩৵৹ আনা, ভি, পিতে ৩।৵৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নং দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই অষ্টাদশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষ" কি করিয়াছে, না করিয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই—২১৬ খানি "ভারতবর্ষে" তাহার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—অষ্টাদশ বর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য; এই বৎসরে চারিখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সে কয়খানির লেখক খ্যাতনামা। ঊনবিংশ বর্ষেও এই ভাবে কয়েকখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে"র আসন্ন আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্গের সুধি-সমাজে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা এই অষ্টাদশ বর্ষকালের মধ্যে একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; প্রথম বর্ষ হইতেই "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। প্রতি বৎসরই "ভারতবর্ষে" কোন না কোন বিশেষত্ব বিকশিত হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া[illegible]ন। ঊনবিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত অষ্টাদশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র কথা বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CAL

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CAL[illegible]TA.